সচিত্র মাসিক পত্র

৩৫শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র

১৩৪২

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

কার্ত্তিক—চৈত্র

৩৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড—১৩৪২ সাল

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পূজারিণী

শ্রীতারাদাস সিংহ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৫শ ভাগ
২য় } কার্ত্তিক, ১৩৪২ { ১ম সংখ্যা

মাটিতে-আলোতে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আরবার কোলে এল শরতের
শুভ্র দেবশিশু, মরতের
সবুজ কুটীরে। আরবার বুঝিতেছি মনে—
বৈকুণ্ঠের সুর যবে বেজে ওঠে মর্ত্ত্যের গগনে
মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন রচে খেলাঘর
অনিত্যের প্রাঙ্গণের পর,
সম্মিলিত লীলারস তারি
ভ'রে নিই যতটুকু পারি
আমার বাণীর পাত্রে, ছন্দের আনন্দে তারে
ব'হে নিই চেতনার শেষপারে,
বাক্য আর বাক্যহীন
সত্যে আর স্বপ্নে হয় লীন।

দ্যুলোকে ভূলোকে মিলে' শ্যামলে সোনায়
মন্ত্র রেখে দিয়ে গেছে বর্ষে বর্ষে আঁখির কোণায়,

তাই প্রিয় মুখে
চক্ষু যে পরশটুকু পায়, তার দুঃখে সুখে
লাগে সুধা, লাগে সুর,
তার মাঝে সে রহস্য সুমধুর
অনুভব করি
যাহা সুগভীর আছে ভরি'
কচি ধান ক্ষেতে ;
রিক্ত প্রান্তরের শেষে অরণ্যের নীলিম সঙ্কেতে ;
আমলকী পল্লবের পেলব উল্লাসে ;
মঞ্জরিত কাশে ;
অপরাহ্ণ কাল,
তুলিয়া গেরুয়াবর্ণ পাল
পাণ্ডুপীত বালুতট বেয়ে বেয়ে
যায় ধেয়ে
তন্বী তরী গতির বিদ্যুতে,
হেলে পড়ে যে রহস্য সে ভঙ্গীটুকুতে ;
চটুল দোয়েল পাখী সবুজেতে চমক ঘটায়
কালো আর সাদার ছটায়
অকস্মাৎ ধায় দ্রুত শিরীষের উচ্চ শাখাপানে
চকিত সে ওড়াটিতে যে রহস্য বিজড়িত গানে।

হে প্রেয়সী এ জীবনে
তোমারে হেরিয়াছিনু যে-নয়নে
সে নহে কেবলমাত্র দেখার ইন্দ্রিয়,
সেখানে জ্বেলেছে দীপ বিশ্বের অন্তরতম প্রিয়।
আঁখিতারা সুন্দরের পরশমণির মায়াভরা,
দৃষ্টি মোর সে তো সৃষ্টি-করা।
তোমার যে সত্তাখানি প্রকাশিল মোর বেদনায়
কিছু জানা কিছু না-জানায়,
যারে ল'য়ে আলো আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি

উৎসর্গ করেছি বারে বারে,
সেই উপহারে
পেয়েছে আপন অর্ঘ্য ধরণীর সকল সুন্দর।
আমার অন্তর
রচিয়াছে নিভৃত কুলায়
স্বর্গের সোহাগে ধন্য পবিত্র ধূলায়॥

২৫ আগষ্ট, ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

বিস্ময়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনে নানা সুখ দুঃখের
এলোমেলো ভিড়ের মধ্যে
হঠাৎ কখনো এসেছে
সুসম্পূর্ণ সময়ের টুক্‌রো।
গিরিপথের নানা পাথর-নুড়ির মধ্যে
যেন আচম্‌কা কুড়িয়ে-পাওয়া একটি হীরে।
কতবার ভেবেছি গেঁথে রাখব
ভারতীর গলার হারে;
সাহস করি নি,
ভয় হয়েছে কুলোবে না ভাষায়।
ভয় হয়েছে প্রকাশের ব্যগ্রতায়
পাছে সহজের সীমা যায় ছাড়িয়ে।

ছিলেম দার্জ্জিলিঙে,
সদর রাস্তার নীচে এক প্রচ্ছন্ন বাসায়।
সঙ্গীদের উৎসাহ হ'ল
রাত কাটাবে সিঞ্চল পাহাড়ে।

অপরাহ্ণে চল্‌লেম বেঁকে বেঁকে
বনের পথ দিয়ে।
চড়াই পথে উঠতে উঠতে বেলা গেল কেটে।

শিখরে যখন উঠেছি
সূর্য্য নেমেছে অস্ত-দিগন্তে
বহু নদীর রেখাকাটা
বহু দূর বিস্তীর্ণ উপত্যকায়।
পশ্চিমের আকাশে
সুর বালকের খেলার আঙিনায়
উল্‌টে পড়েছে স্বর্ণ-সুধার পাত্রখানা
পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে।

দাঁড়িয়ে রইলেম স্থির হয়ে।
মন্ত্ররচনার যুগে জন্ম হয় নি
মন্দ্রিত হয়ে উঠল না মন্ত্র
উদাত্তে অনুদাত্তে।
এমন সময় পিছন ফিরে দেখি
সামনে পূর্ণচন্দ্র।
যেন কোন্ রসিকের জন্যে অপেক্ষা করছে
বরফে-ঢাকা পাহাড়গুলির
জনহীন নিঃশব্দ সভায়।

গুণী বীণায় আলাপ করে প্রতিদিন।
একদিন যখন কেউ কোথাও নেই
এমন সময় সোনার তারে রূপোর তারে
হঠাৎ সুরে সুরে এমন একটা মিল হ'ল
যা আর কোনোদিন হয় নি।
সেদিন বেজে উঠল যে রাগিণী
সেদিনের সঙ্গেই সে মগ্ন হ'ল
অসীম নীরবে।
গুণী বুঝি বীণা ফেললেন ভেঙে।

অপূর্ব্ব সুর যেদিন বেজেছিল
ঠিক সেইদিন আমি ছিলেম জগতে
বলতে পেরেছিলেম—
আশ্চর্য্য !

৪ মে, ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

গোপালন ও অন্নসমস্যা

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

(২)

এক কালে এদেশের লোক গাভীকে কত নিষ্ঠার চক্ষে দেখিত তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বাংলা ভাষায় প্রচলিত 'গোধন', 'গো-মাতা,' 'গো-সেবা'—এই সকল কথার মধ্যে দেখিতে পাই। মহাভারতে, পুরাণে দেখি গো-সেবা তাপসী ও মুনি-পত্নীদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। স্বামিসেবা, অতিথিসেবা, রন্ধনশালা ও অগ্ন্যাগারের পাশাপাশি গোশালা গৃহস্থালীর একটি প্রয়োজনীয় স্থান জুড়িয়া থাকিত। দোহন করিতেন বলিয়া কন্যার নাম হইয়াছিল দুহিতা ; কালের কুটিল গতিতে দুহিতা এখন দোহন করিতে ভুলিয়াছেন ; এখন তিনি শোষণ করেন পিতৃকুলকে। রাজা দিলীপ ও রাণী সুদক্ষিণা কেমন করিয়া নন্দিনীকে সেবায় তুষ্ট করিয়াছিলেন তাহা সুবিদিত। ঋক্‌বেদের এক স্থানে জনৈক মুনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "অপর মুনির কন্যার জন্য ভাল বর জুটে, কিন্তু আমি দরিদ্র, আমার যথেষ্ট গোধন নাই, তাই আমার কন্যার অদৃষ্টে মনোমত পাত্র জুটে না।" প্রাচীন কালে রাজা-রাজড়াদের ঐশ্বর্য্যের বিবরণ দিতে হইলে তাঁহাদের গোধনের সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইত। মহাভারতে দেখা যায়, বিরাট রাজার গোধন লইয়া কৌরবদের সহিত একটা খণ্ডযুদ্ধই হইয়া গেল। এ সকল উপাখ্যান হইলেও ইহা হইতে গাভীর সঙ্গে হিন্দু গৃহস্থ ও গৃহস্থালীর কিরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এখন জীবনযাত্রার প্রণালী অনেক বদলাইয়া গিয়াছে দেশের মাঠ-ঘাটও নূতন করিয়া বাঁটোয়ারা হইয়াছে। প্রায় ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও প্রতি গ্রামে গোচারণের বিস্তৃত মাঠ ছিল ; সেখানে গ্রামের গাভী ও বলদ যথেচ্ছ ঘাস খাইয়া পুষ্টিলাভ করিত ও গাভীরা প্রচুর দুগ্ধ দান করিত। এখনও অনেক গ্রাম আছে যাহাদের নাম হইতে বোঝা যায় যে এক সময়ে সে-সকল জায়গায় গোয়ালার বসতি ও গোচারণের মাঠ ছিল। পোড়াদহের কাছে গোয়ালবাথান, খুলনা জেলার প্রান্তদেশে গোয়ালমঠ প্রভৃতি গ্রাম ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। যশোহর জেলার অন্তর্গত কপোতাক্ষীর তীরে দেয়াড়ার মাঠ নামে এক বিখ্যাত গোচারণভূমি ছিল। ইহা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত। 'ছিল' বলিতেছি এই জন্য যে উহা আর গোচারণের মাঠরূপে ব্যবহৃত হয় না। প্রায় সাত-আট শত ঘর গোয়ালা ইহার আশপাশে বসবাস করিত। এই সুবিস্তীর্ণ মাঠে তাহাদের গরু চরিত। দেশের লোকে সুলভে প্রচুর দুগ্ধ, ঘি, মাখন, ছানা খাইতে পাইত। ইহার জন্য গোয়ালারা মালিককে নামমাত্র খাজনা দিত—তাহাও টাকায় নহে ; দুধ, ঘি ও ছানার বরাদ্দেই ভূস্বামী তুষ্ট থাকিতেন।

ক্রমে কলকজার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁতি, জোলা, কামার, মাঝীরা নিজ নিজ জাতি-ব্যবসায় ছাড়িয়া ভূমির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইল। একমাত্র বিলাতী কাপড়ের কল্যাণেই কত তাঁতির তাঁত বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।* আর এক সর্ব্বনাশ হইল পাটের চাষে; ইহা দাবানলের মত দেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ফলে জমির উপর উপর্য্যুপরি এত চাপ পড়িতে লাগিল যে এই সমস্ত গোচারণের প্রতি হৃদয়হীন জমিদার ও প্রতিপত্তিশালী গ্রামবাসীদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই শনির দৃষ্টি হইতে দেয়াড়ার মাঠও নিষ্কৃতি পায় নাই। নিঃসম্বল গোয়ালারা আর কত লড়িবে, আইনের কূটজালে হয়রাণ হইয়া তাহারা অবশেষে রণে ভঙ্গ দিল। সেই বিস্তীর্ণ গোচারণের মাঠ এখন ভাগবিলি হইয়া গিয়াছে। সেখানে এখন পাটের রাজপাট বসিয়াছে। ঘাস অভাবে গাভীকুল কৃশ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের বাঁটে দুধের ধারা শুকাইয়া গিয়াছে। যেখানে টাকায় বত্রিশ সের করিয়া দুধের বিকিকিনি হইত, সেখানে আজ টাকায় চার সের হইতে ছয় সেরের বেশী দুধ মিলে না।

ইংলণ্ড ও ইউরোপে গোপালন ও দুধের কারবার কৃষিকার্য্যের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গবিশেষ।† কৃষিব্যাপারে আমি শুধু এই দিকটাই বেশী করিয়া আলোচনা করি, কারণ বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় দুধের অপ্রাচুর্য্য বা মন্বন্তরের ফলেই বাংলার ঘরে ঘরে শিশুরা অপুষ্টি ও রিকেট্স্ প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছে। ইউরোপ-ভ্রমণকালে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আয়ার্লণ্ড ও স্কটলণ্ডে দেখিয়াছি—বিস্তীর্ণ গোচারণের মাঠ ও চাষের জমি পাশা-পাশি রহিয়াছে। শুধু মরকত-দ্বীপ ((Emerald Isle) আয়ার্লণ্ডেই নহে, ইউরোপের অপর দেশেও মাঠের শ্যামল শোভা দেখিয়া চোখ জুড়াইয়া গিয়াছে। বিশাল বলীবর্দ্দ ও গাভীগণ মাঠে দাঁড়াইয়া জাবর কাটিতেছে, চতুর্দ্দিকে লম্বা লম্বা ঘাসের আটি কর্ত্তিত হইয়া শুকাইতেছে। ইহাই ও-দেশের 'হে' (hay)। শুনিলাম অনেক মাঠে গ্রীষ্মকালের কয়েক মাসের মধ্যে এই ঘাস দুই-তিন বার করিয়া কাটা হয় ও শীতকালের জন্য সঞ্চিত হয়। সেই জন্যই বোধ হয় ইংরেজী প্রবাদের উৎপত্তি—"Make hay while the sun shines." ১৮৮২ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর কাল যখন এডিনবরায় প্রবাস যাপন করিতেছিলাম তখন শহরতলীর মাঠে গিয়া দেখিতাম যে পশুদের খোরাক জোগাইবার জন্য গাজর, শালগম, ম্যাঙ্গেল-ভূর্জ্জেল (Mangel-wurzel) প্রভৃতি কত রকম ফসল ফলিয়াছে। কিন্তু ইহারই প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ১৬৮৫ অব্দে এ বিষয়ে ইংলণ্ড কত দূর পশ্চাৎপদ ছিল তাহা মেকলের উক্তি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি তাঁহার ইংলণ্ডের ইতিহাসের এক স্থানে বলিতেছেন, "তৎকালে চাষের ক্রম বা পালা সম্বন্ধে অজ্ঞতার অন্ত ছিল না। দেশে তখন সবেমাত্র কয়েক প্রকার সব্‌জী—বিশেষ করিয়া শালগমের প্রচলন হইয়াছে; শীতকালে এই সকল সব্‌জী পশুদের পক্ষে উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্যহিসাবে অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারিত, কিন্তু লোকে তখনও উহাদের ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং মাঠে যখন ঘাস থাকিত না বা শুকাইয়া যাইত তখন গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুদিগকে বাঁচাইয়া রাখাই দুঃসাধ্য হইত। উপায়ান্তর না দেখিয়া লোকে ঐ সকল পশুকে শীতের প্রারম্ভেই মারিয়া ফেলিত এবং লবণাক্ত করিয়া রাখিয়া দিত।"* স্থানান্তরে মেকলে বলিতেছেন, "ইদানীং যে-সকল গো-মেষাদি আমাদের হাট-বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনীত হয় তাহাদের তুলনায় তৎকালীন পশুগুলি নিতান্ত শীর্ণ ও খর্ব্বকায় ছিল।" ১৬৮৫ সালের ইংলণ্ডের যে চিত্র মেকলে দিয়াছেন, ১৮৮৮ সালে তাহার প্রভূত পরিবর্ত্তন স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। চেষ্টা

---

* অতি দুঃখেই কবি গাহিয়াছিলেন:—

"তাঁতি কর্ম্মকার
করে হাহাকার
খেটে খেটে তাদের অন্ন মেলা ভার,
*　　*　　*
কলের বসন বিনে কিসে রবে লাজ,
ধরবে কি তবে দিগম্বরের সাজ?—" ইত্যাদি

† ১৯২৬ সালের রয়েল-কৃষি-কমিশনে সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গে আমার উক্তি দ্রষ্টব্য।

* আমাদের দেশের নোনা ইলিশের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

করিলে আমাদের দেশেও নানাবিধ পুষ্টিকর পশুখাদ্য জন্মাইতে পারা যায়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশিমবাজারের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে গিয়াছিলাম। সেখানে প্রচুর জোয়ারের গাছ জন্মিয়াছে দেখিলাম। মহারাজার নিকট শুনিলাম ঐ সকল গাছ বিচালীর মত শুকাইয়া পালা দিয়া রাখা হয় এবং শুক্‌না সময়ে উহা খাইয়াই খামারের গরু বাঁচে। ঢাকার সরকারী কৃষিক্ষেত্রেও জোয়ারের গাছ জন্মে। গাছগুলি কাটিয়া একটি গর্ত্তের মধ্যে জমা করা হয় এবং তাহার উপরে খাসের চাপড়া দিয়া গর্ত্তের মুখ ঢাকিয়া দেওয়া হয়। পরে অনাবৃষ্টির সময় এই সংরক্ষিত জোয়ার গাছ উপাদেয় ও পুষ্টিকর পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় ভাষায় এই সংরক্ষণ-প্রণালীকে 'সাইলেট্' (ensilage) করা বলে। ফরিদপুরের কৃষিক্ষেত্রে অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র আমাকে বলিয়াছিলেন যে ঐ অঞ্চলের অনেক জমি পদ্মার পলিমাটি হইতে উদ্ভূত, সুতরাং শীত ও গ্রীষ্ম কালে সমান রস থাকে। একটু যত্ন করিলেই, যখন পাট ও ধানের ফসল উঠিয়া যায় তখন ভুট্টা, জোয়ার ও মাসকলাই প্রভৃতি নানাবিধ সব্‌জী সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে আর পাটচাষের দেশে গৃহস্থ ও চাষীকে অসময়ের জন্য উচ্চমূল্যে বিচালী সংগ্রহ করিতে হইত না। ঢাকা ও কাশিমবাজারের ন্যায় প্রতি গ্রামে জোয়ার প্রভৃতি চাষের ব্যবস্থা অনায়াসেই হইতে পারে। পশ্চিমা গোয়ালারা কি প্রণালীতে ভুট্টা ও জোয়ারের গাছগুলি ব্যবহার করে এবং খাদি প্রতিষ্ঠানে সোদপুরের গোশালাতেই বা কিরূপে এই প্রকারের গো-খাদ্যের সংস্থান করা হয়, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। বিলাতের গাজর, শালগম প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল সব্‌জী বহুদিন পর্য্যন্ত সরস থাকে ; সুতরাং শুকনা সময়ের জন্য অনায়াসেই সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে। আমরাও এই সকলের চাষ করিতে পারি। বাংলার মাটিতে সোনা ফলে, কিন্তু কুঁড়েমি ও অজ্ঞতার বশে বৎসরের অর্দ্ধেক দিন সেই মাটি নিস্ফলা পড়িয়া থাকে। এই অপচয়ের পাপেই গো-জাতি ধ্বংসের পথে উঠিয়াছে, দুধের বাজারে আগুন লাগিয়াছে এবং আমাদের বংশধরগণ দুগ্ধ অভাবে দিনদিন শীর্ণ ও রুগ্ন হইয়া অবশেষে অকালমৃত্যু বরণ করিতেছে।

প্রসঙ্গক্রমে শৈশবকালের কথা মনে পড়িয়া গেল।* তখন দুগ্ধবতী গাভীর সেবা প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মকর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ ছিল। আমাদের বাড়িতে নানা প্রকারের গাভী ছিল। আমার বেশ মনে আছে আমার মা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই সকল গাভীর আহারের তত্ত্বাবধান করিতেন। আমাদের বাড়ির এই নিয়ম ছিল যে শিশুরা অন্ততঃ পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধাহারী থাকিবে। এমন কি সম্পন্ন গৃহস্বামী ও গৃহিণীরা প্রত্যুষে গোশালা পরিষ্কার করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। গোয়াল হইতে যে আবর্জ্জনা ঝাঁটাইয়া বাহির করা হইত তাহাতে উত্তম সারের কাজ চলিত। চালের খুদ ও কুঁড়োর সহিত কলাগাছ কিংবা লাউয়ের টুকরা সিদ্ধ করিয়া এক রকম ফ্যান্‌সা ভাত প্রস্তুত হইত, উহা গাভীর দৈনন্দিন খাদ্য ছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ গোচারণের জন্য পৃথক মাঠ নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন, সেখানে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া গাভীগণ পুষ্ট হইত। ধানের ফসল উঠিয়া গেলে প্রচুর বিচালী পালা দিয়া রাখা হইত। শীতকালে মাঠে যখন ঘাস থাকিত না, তখন এই সঞ্চিত বিচালী কাজে লাগিত। তিসি ও সরিষার খইল বিচালীর সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলেও গাভীর দুধের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই খইলও আর গরুর ভোগে আসে না। দেশের কতক খইল পানের বরজে উত্তম সাররূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত বিদেশেও কম রপ্তানী হয় না। কলিকাতার সন্নিকটে গৌরীপুর অঞ্চলে যে-সকল তেলের কল আছে সেখান হইতে প্রচুর তিসির খইল জাহাজ ভরিয়া বিদেশে যায়—সেখানকার পশুদের খোরাক জোগাইতে।

আমাদের হাতে গোজাতির যেখানে এত দুর্গতি চলিতেছে, ঠিক তাহারই পার্শ্বে পশ্চিমা গোয়ালারা কিরূপে গো-সেবায় তৎপরতা দেখাইতেছে এবং দুধের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ও সাফল্য লাভ করিতেছে তাহার আভাস পূর্ব্ব প্রবন্ধে দিয়াছি। তাহাদের ও খাদি প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্তে বোঝা যায় যে চেষ্টা করিলে গোচারণভূমির অভাবে গোয়ালে বাঁধা গরুর উপযুক্ত খাদ্যের অভাব হয় না, এবং দুগ্ধেরও অপ্রাচুর্য্য হয় না।

* আমার আত্মজীবনীর ("Life & Experiences" &c., vol. I) ৩৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু চক্ষের সম্মুখে এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়াও আমাদের চৈতন্য হয় না। অলসতা ও শ্রমবিমুখতার জন্য আমরা কুলী-মজুর, মাঝিমাল্লা, গাড়োয়ান ও গোয়ালার সকল শ্রমসাধ্য কাজই একে একে ভিন্ন প্রদেশীয়দের হস্তে তুলিয়া দিয়া নিদারুণ অন্নসমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। সেন্সস রিপোর্টে দেখা যায় যে বড় বড় ব্যবসায়ী ও বণিকদের কথা বাদ দিয়া কেবল মাত্র শ্রমজীবিগণই বৎসরে প্রায় সাত-আট কোটি টাকা বাংলা দেশ হইতে রোজগার করিয়া দেশে পাঠায়, অতএ অর্থনীতির দিক হইতে দেখিলে আমাদের যে কি সর্ব্বনা হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে। দেখিয়া শিখিবার মত সুমা আমাদের হয় নাই, ঠেকিয়া শিখিবার সময়ও উত্তীর্ণপ্রায় এখনও সজাগ না হইলে আমাদের ভাগ্যে আরও অনে লাঞ্ছনা ও দুঃখ অনিবার্য্য, এমন কি কালক্রমে এ জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবারও সম্ভাবনা।

অহেতুক

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

পূজার পরে তপোনাথ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য হাজারিবাগ রোড আসিল;—তিনটি প্রাণী; সে, তাহার স্ত্রী ও মা। ষ্টেশনের অনতিদূরে একখানি চমৎকার বাড়ি পাওয়া গিয়াছে। গাঢ় নীল রঙের বাড়ি, ফিকা নীল আকাশের পটভূমিকায় সজল মেঘের মত দাঁড়াইয়া। পিছনে দূরে দূরে নীল গিরিশ্রেণী আকাশের গায়ে মিশিয়াও মিশিয়া যায় নাই। পাশেই শালের জঙ্গল ক্রমে উঁচু হইয়া পাহাড়ের কোলে গিয়া মিলিয়াছে।

বাড়িটায় অল্পদিন পূর্ব্বে কেহ বোধ হয় ছিল। বারান্দার দেওয়ালের এক কোণে পেন্সিলে অনেক হিজিবিজি কাটা আছে। এক জায়গায় কাঠ-কয়লা দিয়া কে একটা ছবিও আঁকিয়াছে। ছবিটা হয় গাধার, নয় ঘোড়ার;—গরুরও হইতে পারে। তারই নীচে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা আছে র মা দি দি র ব র। লেখা এবং ছবি দুইটিরই উপর হাত দিয়া মুছিয়া দিবার ব্যর্থ প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, নূতন করিয়া চুণকাম করার পরেও সে চিহ্ন যায় নাই। এখানে-ওখানে বহু জায়গায় আরও যে কত লোকের, পুরুষ ও নারীর, নাম খড়িতে, কাঠ-কয়লায় এবং পেন্সিলে লেখা আছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সেই সব অপরিচিত নাম বার-বার পড়িতে পড়িতে মন একটি রমণীয় মোহে হালকা হইয়া ওঠে। অকারণেই তাহাদে সঙ্গে পরিচয়স্থাপনের লোভ হয়।

পিছনে বাড়ির সংলগ্ন ঘেরা জায়গায় যে কয়টা বড় শাল ও আমলকীর গাছ আছে সেগুলা হয়ত অযত্নবর্দ্ধি কিন্তু কতকগুলি ফুলগাছও একদা লাগানো হইয়াছি এখনও তাহার চিহ্ন আছে। সেদিক হইতে এক ঘুরিয়া আসিয়া তপোনাথের খেয়াল হইল, যে-কয়টা এখানে আছে বাগানটাকে ভাল করিতে হইবে। চারিদি কাঁটা-তারের বেড়া ঠিকই আছে। কোথাও দুই-এ খুঁটি হয়ত নড়বড় করিতেছে। সে কিছুই নয়। সবিতা সঙ্গে থাকিলে এই উপলক্ষ্যে কয়টা দিন বেশ আনন্দেই ক যাইবে। সে সবিতাকে লইয়া টানাটানি করিতে লাগি

কিন্তু সবিতা তখনও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। সে দেওয়ালে ঠেস হাঁটুর ফাঁকে একখানা ইংরেজী বই রাখিয়া মনোযোগের স অধ্যয়ন করিতেছিল।

বিব্রত ভাবে বলিল, বা রে বাঃ! আমি পড়ছি যে

এক ফুঁয়ে তাহার কথা উড়াইয়া দিয়া তপোনাথ বলি ওঃ! ভারী পড়া! আমার এম-এ'র পড়া বন্ধ র আর যত চাড় তোমার। ওঠ।

সবিতাকে বাধ্য হইয়া উঠিতে হইল। কিন্তু চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া বলিল—না ছিঃ, মা কি মনে করবেন বল ত? অত বেহায়াপনা কি ভাল?

তপোনাথ কথাটাকে আমলই দিল না। তাহাকে টানিতে টানিতে বলিল—এর আর বেহায়াপনা কি? তুমিও যেমন! মা দেখ্‌তেই পাবেন না। তাঁর কি ফুরসৎ আছে? রান্না নিয়েই ব্যস্ত।

সবিতা আর একবার বলিল,—না, না ছিঃ!

কিন্তু তপোনাথ তাহাকে ছাড়িল না। বাগানের দিকে এক প্রকার টানিয়াই লইয়া চলিল। তাহাদের ঠিক সম্মুখেই একটা ছোট পাহাড় আশ্চর্য্য মায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ধোঁয়াটে সবুজ পাহাড়ে কি যে রহস্য আছে, মানুষ একবার চাহিলে আর চোখ ফিরাইতে পারে না। পাহাড় যেন মানুষকে ডাকে, ডাকে, কেবলই ডাকে।

সবিতার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তপোনাথ বলিল—দূর থেকে পাহাড় দেখতে বেশ লাগে, না?

সবিতা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। একটু পরে বলিল—আজ বিকালে যাবে ওখানে বেড়াতে?

তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তপোনাথ হাসিয়া ফেলিল। বলিল—ও কি কাছে ভেবেছ? খুব কম হ'লেও মাইল-চারেক দূরে।

সবিতা বিস্মিত ভাবে কহিল—ও মা! ওই ত পাহাড়!

—তাই মনে হচ্ছে বটে! গাছগুলো পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। মনে হচ্ছে পা বাড়ালেই পৌঁছে যাব। পাহাড়ের ওই মজা। পাহাড়ের আর মেয়েদের। মনে হয় হাত বাড়ালেই ধরা যাবে, কিন্তু যায় না। পাহাড় আর মেয়ে শুধু দূর থেকে ভুলোয়,—ধরা দেয় না।

কথাটা সবিতাকে বাজিল। দুঃখিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, তুমি যখন-তখন ও খোঁটা আমাকে দাও কেন? কি তুমি আমার কাছে পাও নি?

দূর পাহাড়ের দিকে চাহিয়া তপোনাথ বলিল—কি যে পাই নি সে আমিও জানি না। কি যে চাই তাও বলতে পারব না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারি তোমাকে পেয়েও আমার দুঃখ ঘোচে নি। ধরা তুমি আজও আমাকে দাও নি।

বিস্মিত ভাবে সবিতা বলিল—ধরা দিই নি?

—না। তোমাকে পেয়েও আমি পাই নি।

কয়টি শুকনো পাতা সবিতার কোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। সে-কয়টি তুলিয়া লইয়া নখে করিয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে গাঢ় কণ্ঠে তপোনাথ বলিল—কাল রাত্রে কথা কইতে কইতে হঠাৎ কখন তুমি ঘুমিয়ে পড়লে। ঘরে কাচের জানালা দিয়ে অজস্র চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। আমার চোখে কিছুতে আর ঘুম আসছিল না। শেষে বাইরে এসে বসলাম। সামনের বনে, দূর পাহাড়ের গায়ে চাঁদের আলো প'ড়ে মনে হচ্ছিল, কিছুই যেন এই বস্তুজগতের নয়। সবই যেন শুধু চোখ মেলে দেখাই যায়,—ধরাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না। কতক্ষণ তাই দেখলাম। সমস্ত শিরা উপশিরা পর্য্যন্ত যেন ঝিম্ ঝিম্ করছিল। যা বস্তু নয়, মানুষের স্নায়ু বোধ হয় তা বেশী ক্ষণ সহ্য করতে পারে না।

বেদনায় সবিতার মন ভরিয়া উঠিল। স্বামীর দুটি আঙুল লইয়া খেলা করিতে করিতে অনুতপ্ত স্বরে কহিল—আমি কিছুই জানি না।

—না, তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে। আমি আবার ফিরে এসে তোমার শিয়রের কাছে বসলাম। তোমার ফুলগুলি নিয়ে কতক্ষণ খেলা করলাম।

—আমায় ডাকলে না কেন?

তপোনাথ সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিল—না।

বিবাহের পরে সবিতার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। পাড়াগাঁয়ের লাজুক মেয়ের মত সে নয়। প্রাণ খুলিয়া হাসিতে, জোরে জোরে ছুটিতে, উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতে এবং বড় বড় ছেলেদের সঙ্গে সমানে তর্ক করিতে শহরেও তাহার জুড়ি মেলে না। শ্বশুরালয় তাহার নিকট অপরিচিত নয়। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে শাশুড়ীকে খুড়িমা বলিয়া ডাকিয়াছে এবং নিজের মায়ের মত তাঁহার কাছে আবদার করিয়াছে। সেই মেয়ে কি করিয়া এখন তাঁহারই পায়ে পায়ে অবাঙ্‌মুখে ঘুরিয়া বেড়ায় সে একটা রহস্য। এ যেন সে মেয়েই নয়। তপোনাথ ভাবে, মেয়েরা অদ্ভুত। যখন যেখানে থাকে তার সঙ্গে আশ্চর্য্য রকম মিশিয়া যায়।

মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া বলিত—তুমি কি সেই সবিতা?

সবিতাও ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিত—তোমার কি মনে হয়?

—রাত্রে মনে হয় সেই সবিতাই বটে। দিনের আলোয় চিনতে পারি না। এত লজ্জা কোথায় পেলে? এত শান্তই বা হ'লে কি ক'রে?

সবিতা রাগ করিত না, হাসিত। বলিত—সেই দণ্ডী রাজার গল্প শোন নি? রাজা উর্ব্বশীকে পেয়েছিল,—দিনে অশ্বিনী, রাত্রে উর্ব্বশী। আমরা সবাই তাই। দিনে বইতে হয় বহু লোকের বোঝা, রাত্রে নিজেকে ফিরে পাই। বুঝলে?

কথাটা তপোনাথের মনে লাগিত। একটু ভাবিয়া বলিত—তাই হবে। কিন্তু আমার দিন চলে কি ক'রে?

—তোমার আবার ভাবনা? তোমার কত বন্ধুবান্ধব, কত রকমের আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলো। তোমার দিন ত হাওয়ায় চলে যাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তপোনাথ বলিত—তাই বা চ'লে যায় কই? এই বিদেশে কোথায় বা পাই বন্ধুবান্ধব, কোথায় বা পাই আমোদ-প্রমোদ।

আবার তখনই গলা নামাইয়া বলিত—কিন্তু তাতেও বোধ হয় দিন কাট্‌তো না সবিতা। তোমার সঙ্গ নইলে এক দণ্ডও আমার কাটবে না। এ যে কি হয়েছে···

তাহার কাকুতিতে সবিতার মন বোধ হয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনই বুড়ীর মত গম্ভীর হইয়া বলিল—দেখ, গেরস্তর ঘরে বউ নিয়ে অত মাতামাতি করতে নেই। লোকে নিন্দে করে। এই যে যখন-তখন তুমি আমায় ডাক, একবার ধরে পেলে আর ছাড়তে চাও না, এতে আমার যে কি লজ্জা করে সে আর তোমায় কি বলব? এমন হয়েছে যে, তুমি বাড়ি এলেই মা তাড়াতাড়ি আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

সবিতা অপাঙ্গে চাহিয়া লজ্জিতভাবে হাসিল।

—আমার এত লজ্জা করে!

তপোনাথও হাসে। বলে—সেই ত ভাল। লজ্জাও করুক, তুমিও থাক। তোমার লজ্জিত মুখখানি দেখতে আরও ভাল লাগে। কি এত কাজ যে দিনরাত্তির মায়ের পিছু পিছু ঘোরো?

চোখ নামাইয়া সবিতা বলিল—কিচ্ছু কাজ নেই। তবু ঘুরি, যদি একটা মেলে।

—কিছু মেলে?

—মাঝে মাঝে। অতি সামান্য।

—আজ পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যাব ভাবছি। যাবে? তাহ'লে মায়ের কাছে ছুটি চেয়ে নিই তোমার জন্যে।

সবিতা তাড়াতাড়ি বলিল—না, না, আজ না। আজ বিকেলে মায়ের কাছে একটা নতুন রান্না শিখতে হবে।

তপোনাথ ধীরে ধীরে তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। মনে মনে সে দুঃখিত হইল। কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। তাহার ব্যথিত মুখের দিকে চাহিয়া সবিতার বুক ফাটিয়া যাইত। তবু একটা সান্ত্বনার কথাও বলিতে পারিত না। শাশুড়ীকে সে ভয় করে, ভয় করে লোকনিন্দাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে শাশুড়ীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইত, তিনি একবার পিছনে চাহিয়া আবার নিজের কাজে মন দিতেন। কোনো দিন একটা ফরমাস করিতেন, কোনো দিন করিতেন না।

কয়দিন হইতেই তপোনাথের জননীর শরীর খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু সে কথা চাপিয়া রাখিয়াই সমস্ত কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। আজও করিতেন, কিন্তু সবিতা আজ আর তাঁহাকে কিছুতেই রান্নাঘরে ঢুকিতে দিল না। মা প্রথমে রান্না করিবার জন্য অনেক জেদাজেদি করিলেন। অবশেষে হার মানিয়া হাসিয়া রান্নাঘরের বাহিরের বারান্দায় বসিয়া একসঙ্গে রৌদ্রসেবন ও গৃহস্থালীর তদারক করিতে লাগিলেন।

সবিতা কোমরে আঁচল জড়াইয়াছে। অবগুণ্ঠনের পাশ দিয়া কালো এলো চুল পিঠের উপর লুটাইতেছে। ব্যস্ততার আর সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে শাশুড়ীর চোখ সজল হইয়া উঠিল। বধূ-নির্ব্বাচনে তাঁহার ভুল হয় নাই। সবিতা ঘর-গৃহস্থালী রাখিতে পারিবে। তাহার কাজ করিবার ব্যবস্থা আছে, হিসাবজ্ঞান আছে, নিষ্ঠা আছে।

জীবনে প্রথম স্বামী-সেবার নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করিয়া সবিতারও যেন আর মাটিতে পা পড়িতেছিল না। প্রত্যেকটি দ্রব্য নিজের হাতে রাঁধিয়া পরিবেশন করিতে পাইবে এই

আনন্দ সে যেন আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। কেমন একটু লজ্জাও করিতেছিল। যদি পরিবেশনকালে স্বামীর চোখে চোখ পড়িয়া যায়! অবগুণ্ঠনের ফাঁকে সে ত এক বার না-চাহিয়াও পারিবে না। আর তপোনাথ যে ছেলে, সে ত ইচ্ছা করিয়া শুধু তাহাকে বিপদে ফেলিবার জন্যই চোখে চোখ ফেলিতে চেষ্টা করিবে। লজ্জা বলিয়া কিছু যদি তাহার থাকে!

ওদিকে সমস্ত সকাল তপোনাথ তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া অগত্যা একাই পাশের বাড়িতে যে নূতন ভদ্রলোক আসিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিবার জন্য বাহির হইল।

অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সৌম্য মূর্ত্তি। মাথার সম্মুখের দিকে টাক। পরনে ইংরেজী পোষাক। একটি ছড়ি হাতে সম্মুখের বাগানে পায়চারি করিতেছিলেন। তপোনাথকে পাইয়া তিনিও বাঁচিলেন, তাঁহার মেয়েও বাঁচিল। বৃদ্ধ বয়সের যা রোগ, ভদ্রলোক একটু বেশী কথা বলেন। একা মেয়ের পক্ষে সকল কথায় মনোযোগ দেওয়া কম পরিশ্রমের ব্যাপার নয়। তপোনাথ আসিতেই পিতাকে তাহার কাছে গচ্ছিত রাখিয়া মেয়েটি ভিতরে চলিয়া গেল।

মিঃ ডাট্ বলিলেন—আমার মেয়ে অনুভা। ওই একটি মাত্রই আমার সন্তান।

তপোনাথ চাহিয়া দেখিল, বছর চব্বিশ-পঁচিশের একটি শীর্ণ মেয়ে। রংটি বেশ মাজা, গলায় সরু এক গাছি হার। হাতে দুই গাছি করিয়া সরু চুড়ি। পায়ে পাৎলা চটি।

মিঃ ডাট্ জোর করিয়া তাহাকে চা খাওয়াইলেন, এবং ঘণ্টা-দুই ধরিয়া অনর্গল কত কথাই বকিয়া গেলেন। তপোনাথের যে প্রকার মানসিক অবস্থা তাহাতে কতক কানে গেল, কতক গেল না।

ফিরিয়া আসিয়া স্নান সারিয়া সে আহারে বসিল। কিন্তু কথাও কহিল না। সবিতা যে এই প্রথম তাহাকে নিজের হাতে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেছে তাহাও যেন চোখে পড়িল না।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—খেয়ে ত যাচ্ছিস, রান্না কেমন হয়েছে?

তপোনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িল। মাথা নাড়িয়া বলিল—বেশ হয়েছে, মন্দ হয় নি।

—বেশ হয়েছে, মন্দ হয় নি সে আবার কি রকম? আর দু-খানা কাট্‌লেট দেবে?

—না, না, আর দরকার নেই।

—একটু মাংস?

—কিছু চাই না।

তপোনাথ আহারান্তে শুইয়া পড়িল। প্রত্যাশা করিতে লাগিল, তাহার ক্রোধের কারণ বুঝিতে সবিতার নিশ্চয়ই বিলম্ব হয় নাই। এইবার সে অভিমান ভাঙাইতে আসিবে। তাহার চোখে আর ঘুম আসে না, কেবল এপাশ-ওপাশ করে।

অভিমান ভাঙাইতেও বটে, কিন্তু তারও চেয়ে বেশী রান্না কেমন হইয়াছে তাহা নিজমুখে শুনিবার জন্য সবিতাও ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তবু পারিল না। বসিয়া বসিয়া অসুস্থা শাশুড়ীর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

ওঘরে তপোনাথ তখন ঘুমাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অবশেষে উঠিয়া বসিয়াছে। বেলা তখন দুইটার বেশী নয়, কিন্তু পড়ন্ত রৌদ্রের দিকে চাহিলে মনে হয় বেলা আর নাই। সম্মুখের পাহাড়ের গায়ে ছায়া আরও ঘন হইয়াছে। কিন্তু শালবনের মাথায় এখনও রৌদ্র বেশ চিকমিক করিতেছে।

এদিকের জানালা দিয়া রেল-লাইন এবং ষ্টেশনের অনেকটা দেখা যায়। শুইয়া শুইয়া ষ্টেশনটা দেখিতে আশ্চর্য্য লাগে। যেন পটে আঁকা ছবি। মাটির সঙ্গে যোগ নাই। ওখানে কে যেন টাঙাইয়া রাখিয়া গিয়াছে, যে-কোন মুহূর্ত্তে সরাইয়া লইয়া যাইতে পারে। কিছুমাত্র স্থায়িত্ব নাই। ট্রেনের পর ট্রেন আসে। ক্ষণকাল বিশ্রাম করে। যাত্রীর কোলাহলে সমস্ত ষ্টেশন চঞ্চল হইয়া ওঠে। মনে হয় শুধু যাত্রী নয়, ষ্টেশনটা-সুদ্ধ এই ট্রেনে কোনও অজ্ঞাত দূর দেশে চলিয়া যাইবে। পিছনে পড়িয়া থাকিবে শূন্য মাঠ। কিন্তু ট্রেন চলিয়া যায়। বিষণ্ণ ষ্টেশন শূন্য মাঠে খাঁ খাঁ করে। যেন সঙ্গীরা তাহাকে একা ফেলিয়া লুকাইয়া পলাইয়া গেল, সঙ্গে লইয়া গেল না।

কোন অজ্ঞাত সুদূরের তৃষ্ণায় তপোনাথের মনও হু হু করিয়া ওঠে। মনে হয়, মিথ্যা অপরিচিতকে পরিচিত করার প্রয়াস, মিথ্যা স্নেহ মায়া মমতা, মিথ্যা মানুষের জন্য মানুষের দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ। আসে বটে, জীবনের তরুচ্ছায়ায় দুইটি

একটি আসিয়া জোটে। কিন্তু যাবার বেলায় কেহ কাহাকেও ডাকিয়া যাওয়ার সময় পায় না।

তপোনাথ চাকরকে এক গ্লাস জল দিবার জন্য ডাকিল। এক মিনিটের মধ্যে সবিতা এক গ্লাস জল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল। যেন কত কাল পরে দেখিতেছে এমনি অবাক হইয়া তপোনাথ একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিল। তার পর ধীরে ধীরে জলের গ্লাস তুলিয়া লইল।

লজ্জিতভাবে হাসিয়া সবিতা বলিল---আমার কিন্তু দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই। চায়ের জল হ'য়ে গেছে। দু-খানা লুচি ভেজে নিয়েই আসছি।

পিছু ডাকিয়া তপোনাথ বলিল --লুচি থাক সবিতা, শুধু এক বাটি চা হ'লেই হবে।

পিছু ফিরিয়া হাসিয়া সবিতা বলিল---রাগ করেছ?

—না, রাগ নয়। খিদে নেই।

-- রোজ থাকে, আজ নেই?

সবিতা কাছে সরিয়া আসিল। ম্লানমুখে বলিল—আমার ওপর রাগ ক'রো না। তোমার কাছে আসতে আমার কি সত্যিই ইচ্ছে হয় না? কিন্তু কত যে বাধা সে ত জান।

—তোমার ওপর রাগ করেছি এ কথা ত বলি নি।

—না, বল নি। তুমি যা চাপা, কোন দিন কিছু বলবে না। কিন্তু আমি কি কিছু বুঝি না?

- বোঝ? তপোনাথের মন ধীরে ধীরে নরম হইতেছিল। তখনই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল --চা দেবে না? জল যে ফুটে শেষ হ'তে চলল।

সবিতা আর কিছু বলিল না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সে দীর্ঘশ্বাস তপোনাথের বুকে বিঁধিল নিশ্চয়। তবু তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল না। নির্ব্বিকার ভাবে রেল-লাইনের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অল্প দিনের মধ্যেই দত্ত-পরিবারের সঙ্গে তপোনাথের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইল।

দত্তসাহেব নিজে মস্ত পণ্ডিত লোক, এবং এত বড় পণ্ডিত-লোকের যাহা হয়, কোন্‌টা তাঁহার নিজের মত আর কোন্‌টা নয় বুঝিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। যে-বিষয়েই আলোচনা উঠুক, বিরুদ্ধ পক্ষে তাঁহার যথেষ্ট বলিবার থাকে। সাধারণত দাঁড়ায় তপোনাথ ও অনুভা এক দিকে। তাহাদের বয়স কম, সুতরাং মতামত সব বিষয়েই উগ্র এবং স্পষ্ট! অন্য পক্ষে দত্তসাহেব একা। তাঁহার কথা বুঝিতে ইহাদের যথেষ্ট ক্লেশ হয়। কারণ কিছুই তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন না।

তর্ক করার মত বেড়ানও দত্তসাহেবের আর একটা রোগ। কিছু দূরেই একটা ছোট পাহাড় আছে। তাহার পাদদেশে এক ছোট শিলাখণ্ডের উপর বৈকালিক আসর বসে। আসর জমাইবার পক্ষে স্থানটি মনোরম সন্দেহ নাই। পাশে শালবন দূর দিগন্তে গিয়া শেষ হইয়াছে। পিছনে পাহাড়ের পটভূমিকা। ওপাশে যতদূর দেখা যায় লাল মাটি তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া অস্তগামী সূর্য্যের আভায় টক্ টক্ করিতেছে। মাঝে মাঝে এক একটা ন্যাড়া মহুয়া গাছ নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে। ন্যাড়া, কিন্তু তাহার ডালে ডালে এত টিয়াপাখী আসিয়া বিশ্রাম করিতেছে যে, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

কয় দিন ইহাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করিয়া তপোনাথ ইহাদের ভক্ত হইয়া উঠিল। সকালে ও বিকালে ইহাদের আসর আফিমের নেশার মত তাহাকে টানে। অধিকাংশ দিন বাড়িতে চা-পানেরও তর সহে না। তার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়ে। সবিতাকে লইয়াও আর সময়ে-অসময়ে খুনসুড়ি করিবার সময় পায় না। মায়ের কাছে রান্না শিখিবার জন্য তাহাকে বাধাহীন অবকাশ দিয়াছে। শহরের সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা থাকিলেও তপোনাথ আসলে পল্লীগ্রামের ছেলে। তাহাদের দেশের বৃদ্ধেরা যে-বয়সে সর্ব্বাঙ্গে তিলক কাটিয়া এবং গায়ে নামাবলী জড়াইয়া অধিকাংশ সময় পরকালের চিন্তা এবং বাকী সময় মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করে, সে-বয়সে দত্তসাহেবের ইহলোক-সংক্রান্ত সকল প্রকার সমস্যায় এত উৎসাহ দেখিয়া বিস্মিত হয়। আর অনুভা যেন প্রাণশক্তির উষ্ণপ্রস্রবণ। সেদিন একটা চমৎকার অজানা ফুল দেখিয়া যে কাণ্ড করিল, সে উৎসাহ শিশুর মধ্যেও দেখা যায় না। এ বয়সে সাধারণ মেয়ে ঘরণী-গৃহিণী ছেলেপুলের মা হইয়া রীতিমত স্কুল-মাষ্টার বনিয়া যায়। কিন্তু অনুভার কলহাস্যের যেন শেষ নাই। সে হাসি শুনিলেও মানুষের বয়স পাঁচ বৎসর কমিয়া যায়।

রাত্রে শুইয়া তপোনাথ এই কথাই ভাবিতেছিল। এমন সময় পানের ডিবা হাতে সবিতা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। আলোটা এক কোণে মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। দরজা বন্ধ করিয়া আলোটা সে উজ্জ্বল করিয়া দিল। তার পর পানের ডিবা তপোনাথের শিয়রের কাছে ঠুক করিয়া রাখিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল। রাত্রে নির্জ্জন কক্ষে স্বামীকে সে মোটেই লজ্জা করে না। অনেক দিন পরে আজ স্বামীকে জাগ্রত পাইয়াছে।

স্বামীর আরও সন্নিকটে ঘেঁষিয়া আসিয়া তাহার মুখখানি আলোর দিকে তুলিয়া বলিল—এখনও রাগ পড়ে নি ?

—রাগি নি ত।

তপোনাথ শুইয়া শুইয়াই দু-খানি হাত সবিতার কোলের উপর রাখিল।

—রাগ নি ? দেখি ?

সবিতা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলিল—তবে অত গম্ভীর কেন ?

তথাপি তপোনাথের গাম্ভীর্য্য টুটিল না। একটু নড়িয়া-চড়িয়া শুধু বলিল—ভাবছি।

—ভাবছ ? এত ভাবনা কিসের শুনতে পাই না ?

সবিতার শাড়ীর পাড় লইয়া খেলা করিতে করিতে তপোনাথ বলিল—সে অন্য কথা। দত্তসাহেব একটা কথা আজ বলছিলেন···

দত্তসাহেবের কথা সবিতা ইতিপূর্ব্বেও অনেক শুনিয়াছে। এ সব বড় বড় কথায় তাহার আগ্রহ কম। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—দত্তসাহেবের কথা থাক। শোন, কাল সকালে উঠেই ষ্টেশনে গিয়ে বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম ক'রে আসবে।

—হঠাৎ ?

—হঠাৎ নয়। তুমি ত দত্তসাহেব আর তাঁর সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে দিনরাত্রি মেতে আছ। এদিকে দশ দিন বাবার কোন চিঠি আসে নি খেয়াল আছে ?

বাবার কথায় তপোনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—না, না, দশ দিন ? অত হবে না। এই ত সেদিন···

ম্লান হাসিয়া সবিতা বলিল—সেদিন নয়, দশ দিন হ'য়ে গেল। তোমার দিনরাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে খেয়াল ত রাখ না। বেশ আছ !

অপ্রস্তুত ভাবে তপোনাথ বলিল—তা হ'লে কালকে··· নিশ্চয়ই···দশ দিন হ'য়ে গেল···আমি ত···আশ্চর্য্য !

তাহার মাথার চুলগুলি ললাটের উপর হইতে সরাইয়া দিতে দিতে সবিতা গম্ভীর হইয়া বলিল—আশ্চর্য্য আর কি ! পুরুষমানুষের স্বভাবই এই।

—না, না···আমি ত ভাবতেই পারি নি···দশ দিন !··· তোমাদের একবার···আশ্চর্য্য !···কালই টেলিগ্রাম ক'রে দোব···এর আর···

মাথার শিয়রের দিকের জানালাটা খোলা ছিল, এতক্ষণ চোখেই পড়ে নাই। হু হু করিয়া খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতেই সবিতা সচেতন হইল। সেটা বন্ধ করিতে গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল।

অন্ধকার রাত্রি। বোধ হয় কুয়াশা করিয়াছে। ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের সব কয়টি আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঘনীভূত অন্ধকারে সে আলো অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। যাত্রীদের কোলাহলও শীতের চোটে মন্দীভূত। সবিতা অনেক ক্ষণ জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সার্চ্চ-লাইটের তীব্র আলোয় রেলপথ এবং আরও খানিকটা অংশ আলোকিত করিয়া একখানা ট্রেন আসিয়া থামিল। ট্রেনখানি প্রায় ফাঁকা। মাঝে মাঝে দুই-একটি কামরায় কয়েক জন করিয়া যাত্রী। তাহারাও নিদ্রিত। ট্রেনখানিও যেন নিদ্রিত পুরী। ঝিমাইতে ঝিমাইতে ভাসিতে ভাসিতে এই ঘাটে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য ঠেকিয়া আবার ঝিমাইতে ঝিমাইতে চলিয়া গেল।

একটু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সবিতা জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

বিছানার কাছে ফিরিয়া আসিয়া একটুখানি কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, দত্তসাহেবের মেয়ে খুব শিক্ষিতা, না ?

তপোনাথ তখনও কি যেন ভাবিতেছিল। অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল—হুঁ।

সবিতা বিছানার একাংশে নিজের পূর্ব্বের জায়গায়

বসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমিও ত এবার ম্যাট্রিকুলেশন দিতাম।

এতক্ষণে তপোনাথ তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিল। বলিল—দিতে? দিলে না কেন? আমি ত পড়াতে চেয়েছিলাম। তুমিই ত বললে, পরীক্ষা হ'য়ে গেছে, তুমি ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস করেছ?

তপোনাথের কাছে টুপ করিয়া শুইয়া পড়িয়া সবিতা সলজ্জভাবে বলিল—এখন থেকে পড়ব। পড়াবে?

তাহাকে বুকের কাছে আকর্ষণ করিয়া তপোনাথ বলিল—কেন পড়াব না? নিশ্চয় পড়াব। তুমি পড়লে ত আমি বাঁচি।

আনন্দে যেন সবিতা গলিয়া পড়িতেছিল। বলিল—দত্তসাহেব কি বলছিলেন, বলবে? খুব কঠিন কথা নয় ত? আমি বুঝতে পারব?

সবিতার মাথার ঘোমটা খুলিয়া দিয়া তপোনাথ সোৎসাহে বলিল—কেন পারবে না? কঠিন আবার কি? জান সবিতা, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কথা বুঝতেও সহজ বুদ্ধির বেশী আর কিছু দরকার হয় না। শুধু বোঝবার আগ্রহ থাকা চাই। থাকবেই না বা কেন? এ পৃথিবীতে আমরা শুধু চাকরি-বাকরি আর ঘরকন্না করতে ত আসি নি। তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ আছে। সে কাজে অবহেলা করলে···তোমার ঘুম পাচ্ছে সবিতা?

সবিতা একেবারে স্বামীর বুকের মধ্যে ঘেঁষিয়া আসিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—একটু।

—ঘুমোও তা হ'লে।

তপোনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সযত্নে তাহার মাথার বালিশটা ঠিক্ করিয়া দিল।

সকালে উঠিয়া তপোনাথ চেষ্টারফিল্ডটা গায়ে দিতেছে, সবিতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় চললে?

—ষ্টেশনে।

—প্রি-পেড টেলিগ্রাম ক'রো, বুঝলে? আজ দুপুরের মধ্যেই তাহ'লে জবাব এসে যাবে।

—তাই করব।

—চা খেয়ে যাবে না? দেরি হবে না।

—এসে খাব।

সবিতা আর কিছু বলিল না। চেষ্টারফিল্ডের একটা বোতাম উল্টা করিয়া পরানো হইয়াছিল; সেইটা ঠিক করিয়া দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

টেলিগ্রামটা নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পাঠাইয়া দিয়া তপোনাথ দত্তসাহেবের বাড়ি গেল। দত্তসাহেব তখন একখানা ইজি-চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। একটু আগে বোধ হয় চা খাওয়া শেষ করিয়াছেন, পাশের টিপয়ে তখনও চায়ের বাটি পড়িয়া আছে। আর আছে একটা সিগারেটের ছাই ফেলিবার পাত্র। খানকয়েক খবরের কাগজের পাতা পায়ের নীচে পড়িয়া। অনুভা একটা অনভিজ্ঞ মালীকে লইয়া বাগান তদারক করিতেছিল। ইতিমধ্যেই তাহার স্নান হইয়া গিয়াছে।

—এস।

দত্তসাহেব হাতের কাগজগুলা এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া চশমাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

তপোনাথ একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া অনুভার দিকে চাহিতেই অনুভা একটুখানি হাসিয়া দূর হইতেই ছোট্ট একটি নমস্কার করিল।

বলিল—বড্ড ব্যস্ত।

দত্তসাহেব চিন্তিত মুখে বলিলেন—হিট্‌লারের কাণ্ডটা পড়ছ? বড় বড় লোকের সরাসরি বিচার আর মৃত্যুদণ্ড, আইনষ্টাইনের মত লোকেরও নির্ব্বাসন, সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ, কি আরম্ভ হয়েছে জার্ম্মেনীতে?

—শুধু জার্ম্মেনী?

তপোনাথের বাকী কথা মনেই রহিয়া গেল,—অনুভা হাত-ইসারায় তাহাকে ডাকিতেছে।

দত্তসাহেব সন্তর্পণে চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া বলিলেন—ওদের দেশের কথা যখন ভাবি অবাক হ'য়ে যাই। বুঝি, রাজনীতির ভালমন্দ সাধারণ নীতির মাপকাঠিতে বিচার করতে যাওয়া ভুল। ওরা ডিক্টেটার, ওদের সময় সংক্ষেপ। যা করতে চায়, তাড়াতাড়ি করতে হবে। তবু···

অনুভার ছাই-রঙের শাড়ীখানি কোমরে বেড় দিয়া জড়ান। হাতে জলের ঝারি। ঘাড় নাড়িয়া ডাকিতেছে—আসুন না।

তপোনাথ দত্তসাহেবের কথার উত্তরে বলিল—তা ঠিক।

দত্তসাহেব হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন—ঠিক নয়? ওদের কিছুতে তর্ সয় না। সামনে যে পড়বে, বাধা যে দেবে, তখনই তার মুখ বন্ধ করতে হবে। উদ্দেশ্য যদি কখনও সিদ্ধ হয়, আদর্শরূপ পায়, এ সব ছোটখাটো ভুলের জন্যে তখন সময়-মত ধীরেসুস্থে দুঃখ প্রকাশ করলেই চলবে।

দত্তসাহেব আর একবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তপোনাথ বাগানের দিকে চাহিয়া ছিল। চমকিয়া সভয়ে তাঁহার দিকে চাহিল।

দত্তসাহেব আরামের সঙ্গে চুরুটে একটা হাল্কা টান দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বল?

—সে ত নিশ্চয়।

আর কি বলা যাইতে পারে ভাবিয়া না-পাইয়া তপোনাথ ইতস্ততঃ করিতেছে এমন সময় অনুভা আসিয়া একখানা হাতে টান দিয়া বলিল—উঠুন।

অনুভা বুঝিয়াছে, সে নিজে গিয়া তপোনাথকে উঠাইয়া না আনিলে তপোনাথের সাধ্য নাই দত্তসাহেবের সামনে হইতে উঠিয়া আসে।

জমাট আলোচনায় বাধা পাইয়া দত্তসাহেব বিস্মিত ভাবে বলিলেন—কোথায়?

ঘাড় বাঁকাইয়া অনুভা বলিল—মাটি-খোড়ার লোকের অভাবে আমি কাজ করতে পারছি না, আর উনি দিব্যি এখানে ব'সে তর্ক করছেন। উঠুন বলছি।

দত্তসাহেব ভদ্রসন্তানের দুর্গতিতে বিব্রত হইয়া বলিলেন—আহা, তোমার মালীটা কোথায় গেল?

ঝঙ্কার দিয়া অনুভা বলিলেন—সে জল তুলবে না? উঠে আসুন।

তপোনাথকে বাগানে টানিয়া লইয়া গিয়া অনুভা বলিল—বাজে তর্ক করতে এত ভালও লাগে আপনার? মহৎ চিন্তায় কি হয় বলুন ত? ডিস্‌পেপসিয়া ছাড়া সত্যি সত্যি আর কিছু হয়?

তপোনাথ হাসিয়া বলিল—আমার ত এখনও হয় নি।

—মাটি না খুঁড়লে হবে। নিন, গাঁইতি নিন।

অনুভা জোর করিয়া তাহার হাতে গাঁইতিটা গুঁজিয়া দিল। এমন সময় একসঙ্গে দুই জনেরই দৃষ্টি পড়িল, তপোনাথের বাগানের বেড়া ধরিয়া সবিতা বিবর্ণ মুখে একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। তাহাদের চোখে চোখ পড়িতেই সরিয়া গেল। অনুভা এখান হইতেই চেঁচাইয়া তাহাকে ডাকিল। কিন্তু সে যে শুনিতে পাইল এমন মনে হইল না।

অনুভা উৎসাহের সঙ্গে বলিল—ওঁকে ডাকুন না?

তপোনাথ হাসিয়া বলিল—ও আসবে না। ব্যস্ত আছে।

দুপুরবেলা আহারাদির পর তপোনাথ একবার গড়াইয়া লইল। কিন্তু ঘুম আসিল না। সকালে বাড়িতে টেলিগ্রাম করা হইয়াছে; এতক্ষণ উত্তর আসা উচিত। কেন আসিল না, কে জানে। তাহার মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া কেবল বাহির হইতেছে সবিতা আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

—দত্তসাহেবের ওখানে যাচ্ছ? এই দুপুরবেলা?

—না।

তপোনাথ পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, পথ না পাইয়া ফিরিয়া আসিল।

—কোথায় যাচ্ছ তা হ'লে?

—ষ্টেশনে।

—সেখান থেকে দত্তসাহেবের বাড়ি ত?

তপোনাথ সবিতার কথার গূঢ়ার্থ ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না। ঘাড় নাড়িয়া বলিল—যেতে পারি। কেন?

—ওখানে যেতে পাবে না।

তাহার আয়ত চোখে আশ্চর্য্য মিনতি! ঠোঁট কাঁপিতেছে। তপোনাথ অবাক। বলিল—তার মানে?

—তার মানে জানি না।

সবিতা আর বলিতে পারিল না। দরজার কোণে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে সকল ব্যাপার তপোনাথের কাছে স্পষ্ট হইল। কেন দত্তসাহেবের বাড়ি যাওয়ায় আপত্তি, কোথায় তাহার ভয় বুঝিয়া এক মুহূর্ত্তে তাহার মন সবিতার প্রতি বিতৃষ্ণায় বিরূপ হইয়া উঠিল।

রূঢ় কণ্ঠে কহিল—ছিঃ সবিতা, তোমার মন এত নীচু!

এত বড় অপবাদেও সবিতা মুখ তুলিল না, কেবল তাহার কান্না আরও বাড়িতে লাগিল। অবরুদ্ধ কান্নায় তাহার দেহলতা এমন করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল যে মনে হইল এখনই ওই দোরগোড়াতেই সে ভাঙিয়া পড়িবে।

সবিতার চোখের জল তপোনাথ সহিতে পারে না। আপনাকে সংযত করিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল—আমার সম্বন্ধে যা-খুশী মনে কর, যা-খুশী বল যায় আসে না। কিন্তু নিরীহ ভদ্রমহিলাকে কেন এর মধ্যে জড়াও?

সবিতা তথাপি কথা কহিল না।

তপোনাথ কহিল—এ-কথা তাঁর কানে গেলে জীবনে আর কখনও আমার মুখ দেখবেন?

এবার সবিতা ঝাঁঝিয়া উঠিল। তাহার দুইটি গণ্ড অশ্রুলেখায় কলঙ্কিত হইয়াছে; মুখে ক্রূর হিংসার ছায়া। একটা ভঙ্গী করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—সেই ত তোমার ভয়।

সে আবার মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তপোনাথের এবার হাসি পাইল। বুঝিল, ইহার উপর রাগ করা বৃথা। তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া অনেক ক্ষণ কি যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল। ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—চল দেশে ফিরে যাই।

সবিতা মুখ তুলিল না। কিন্তু কান্না বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে কপাট খুঁটিতে লাগিল।

—আজই রাত্রের গাড়ীতে। বাবার জন্যেও মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে। বাড়ি যাওয়াও দরকার।

এইবার সবিতা উৎসাহিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিল—সত্যি যাওয়া দরকার। তিনি একা রয়েছেন, আমরা কেউ নেই। অসুখ-বিসুখ হ'লে…আর থাকাও ত অনেক দিন হ'ল।

চিন্তিত মুখে তপোনাথ বলিল—হুঁ, সেই ব্যবস্থাই করা যাক। মা কোথায়?

সবিতা পথ ছাড়িয়া দিল। বলিল—ওঘরে। তিনিও খুব ভাবছেন।

—দেখি, তাঁর সঙ্গে একবার…

মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য তপোনাথ ওঘরে চলিল। যাওয়ার সময় সবিতাকে জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা করিতে বলিয়া গেল।
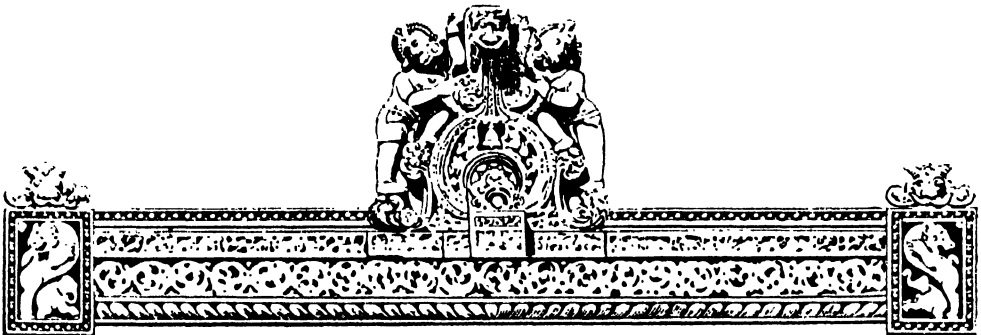
পশ্চিমযাত্রিকী

শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ

(২)

পিরামিড থেকে ফিরে মিশরের নীল-নদীর ধারে এলুম। লোকে শুনলে আমাকে কি ভাববে জানি না, আমার নদীটিকে মাণিকতলার খালের মত লাগল। শুনলুম নদীতে এখন তেমন জল নেই। বেশী জলের সময় এর সৌন্দর্য্য
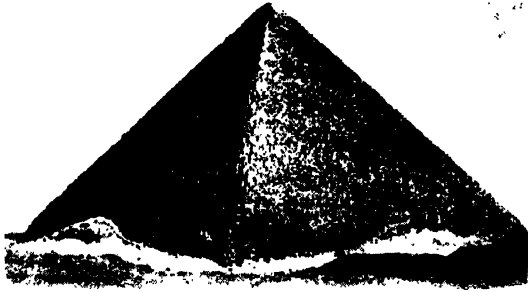
কায়রো চিয়প্‌স পিরামিড

বোঝা যায়। এর পর আমরা আবার হোটেলে ফিরে এলুম। মাথা দিয়ে তখন আগুন ছুটছে। তখন আর শুধু মুখ-হাত ধুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। লম্বা ইজার-পরা একটা ঢেঙ্গা বয়কে ডেকে বোবার মত ইসারায় জানালুম, চান করব। জলের বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারবে ত? সে একটা অবোধ্য ভাষায় কি যে বল্‌লে, কিছুই বোঝা গেল না। তখন অন্য উপায় দেখতে হ'ল।

আমাদের খাওয়া-দাওয়া দেখাশুনা করবার জন্য টমাস্ কুক কোম্পানী এক জন লোককে নিযুক্ত করেছিল। ইনি ফরাসী, আরবী ও ইংরেজী জানেন, আমাদের মনের বাসনা তাঁকে জানাতে তিনি বল্‌লেন তিনি বন্দোবস্ত করিয়ে দেবেন কিন্তু আমাদের এই পুরাপুরি স্নানের জন্য আলাদা কিছু (অর্থাৎ মাথা-পিছু ৫ শিলিং) দিতে হবে; এর জন্য টমাস্ কুক কিছু দেবেন না। আমাদের চুক্তি-করা ভাড়া দেওয়ার টাকার ভেতর আমরা কেবল ওই বেসিনে মুখ-হাত ধুয়ে কাকস্নান করতে পারব। গরমের জ্বালায় তা'তেই আমরা রাজী হ'তে একটা কালো অন্ধকার চাকর দোতলায় আমাদের নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা ক'রে একটা বাথরুম দেখিয়ে দিলে, দু-খানা বড় ও দু-খানা ছোট তোয়ালেও দিলে। স্নানের জলে কয়েক ফোঁটা ক্লোরোদক ফেলে খুব আরাম ক'রে স্নান ক'রে কাপড় বদ্‌লে আমরা নীচেয় এলুম। এসেই মধ্যাহ্নভোজনে বসা গেল। অত ক্ষুধার সময় খাওয়াটি আমরা বেশ ভালই পেয়েছিলুম, মুরগীর মাংসের পিসপ্যাস, সুপ, কয়েক টুকরা লালটুকটুকে, সুমিষ্ট তরমুজের ফালি। আমাদের মনটা তখন আইসক্রীম খাবার জন্য উস্‌খুস্ করছিল। একবার কথা পাড়তেই তদারকওয়ালা-মহাশয় জানালেন, "নিশ্চয়, আইসক্রীম আছে বইকি।"

আহারাদি সেরে এবার আমরা কায়রোর বাজারের ভিতর গেলুম। বাজারের রাস্তার দু-পাশে দোকানপাটের খুব

কায়রো—নীলনদ

ঘটা। এই রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত গলির মতন। দু-পাশেই দোকানে মেয়ে-পুরুষের খুব ভীড়। মেয়েরা সকলেই কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানা। সকলেরই নানা রকম পরিচ্ছদ আছে, কিন্তু তার উপর একটি কালো কাপড়ের আবরণ সবাইকার থাকা চাই-ই। কপালের অৰ্দ্ধেক ও নাকের তলা থেকে ওষ্ঠাধর পর্য্যন্ত আবৃত। মুখের যতটুকু দেখ্‌তে পেলুম তাইতেই বুঝলুম মেয়েরা অধিকাংশই রূপসী। ফলের দোকান, রেশমী কাপড়, সোনা-রূপার পেতল-তামার গহনা, বাসন, তরি-তরকারী ইত্যাদি সব রকমের দোকান। রাস্তায় কাঠফাটা রোদ, ফেরীওয়ালা একটা ঝাঁকা মাথায় কি হেঁকে চলে গেল। ঝাঁকাটি আমাদের দেশেরই মত। রাস্তার দু-পাশের অধিকাংশ বাড়ি-গুলিরই দরজা-জানালা সব বন্ধ দেখলুম। বোধ হয় রৌদ্রের উত্তাপের জন্য।
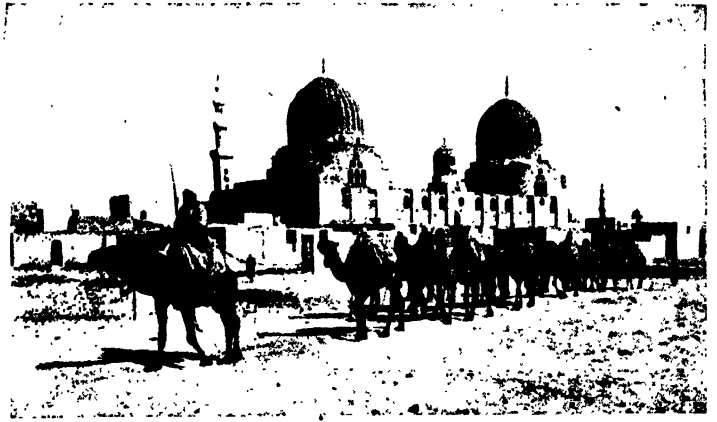
কায়রো—উটের সারি চলিয়াছে

কায়রো মমেলুক সমাধি-মন্দির

কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা উটের গাড়ী চলেছে। তা'তে বড় বড় কালো কালো তরমুজ বোঝাই। চালক গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় তরমুজের আধখানা কামড়াতে কামড়াতে হেঁটে চলেছে, সঙ্গে ছোট ছেলে-মেয়েও দু-একটি আছে। গাড়ীর পাশ দিয়ে এক মৃতদেহ কবর দেবার জন্য নিয়ে গেল। তার কফিনের ওপর নানা বর্ণের ফুলপাতা, মানুষ ও ঘোড়ার মূর্ত্তি আঁকা, এই সব দেখতে দেখতে আমরা মহম্মদ আলির মসজিদে পৌঁছলুম। ফেরবার সময় দেখি এক দরিদ্রা মিশর-বাসিনী কাঁধে জলের জগ্ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাদের ইসারায় জানালে যে আমরা যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে থাকি ত তাকে পয়সা দিয়ে এই জল পান করতে পারি। রাস্তার ধারে একবার গাড়ী দাঁড়ালে হয়, ফোটোগ্রাফার, পুঁতির মালাওয়ালা, পিকচার-পোষ্টকার্ডওয়ালা ছেঁকে ধরবে। এর ওপর আর এক দল ফেরীওয়ালা আছে এরা এক রকম জ্যান্ত ছোট ছোট সবুজ পোকা বিক্রী করতে আসে। এই পোকার নাম ইজিপসিয়ন ক্যারাবাস্। অনেক কাল আগে মিশরবাসীরা তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মৃতদেহ কবর দেবার সময় এই বিষাক্ত পোকাগুলিকেও সেই সঙ্গে কবরস্থ করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, কোন দস্যু মৃতদেহের অলঙ্কারাদি চুরি করতে এলে এই পোকার দ্বারা তারা সমূলে বিনষ্ট হবে। এই পোকাগুলিই মৃতের রক্ষকস্বরূপ ছিল। এখন আর সে পিরামিডের যুগ নেই। লোকে কবর দেবার সময় বিষাক্ত পোকাও ব্যবহার

কায়রো—দুর্গ

কায়রো—মহম্মদ আলি মসজিদ

কায়রো—হেলিওপোলিস—হিন্দু প্রাসাদ

কায়রে সুলতান হাসান-মসজিদ

হ'লে এই পোকা কিনে বাড়ি নিয়ে যাবে, তাকে খাইয়ে-পরিয়ে কাচের বাক্সয় ক'রে নিজেদের ড্রইং-রুমে রেখে দেবে, অতিথি-অভ্যাগত এলে দেখাবে। মেয়েরা একে মেরে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে গলায় লকেট ক'রে পরবে, সখ বটে! মিস মেয়োর দেশের লোকের রুচিই আলাদা।

সারাদিন এই রকম ঘুরে হোটেলে আবার খানিক ক্ষণের জন্য ফিরে আসা হ'ল। তখন ট্রেনের সময়ের অনেক দেরি ছিল, আমরা ট্রেনে ক'রে
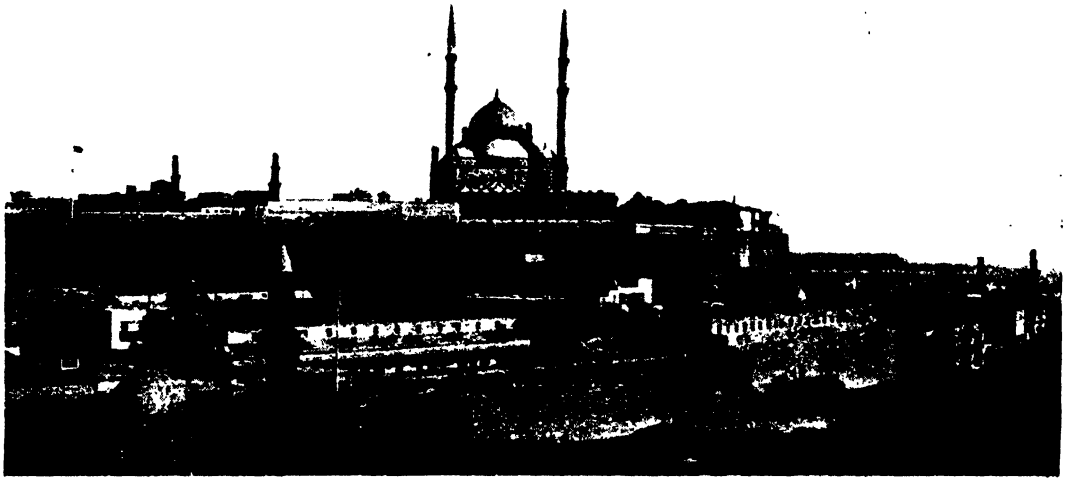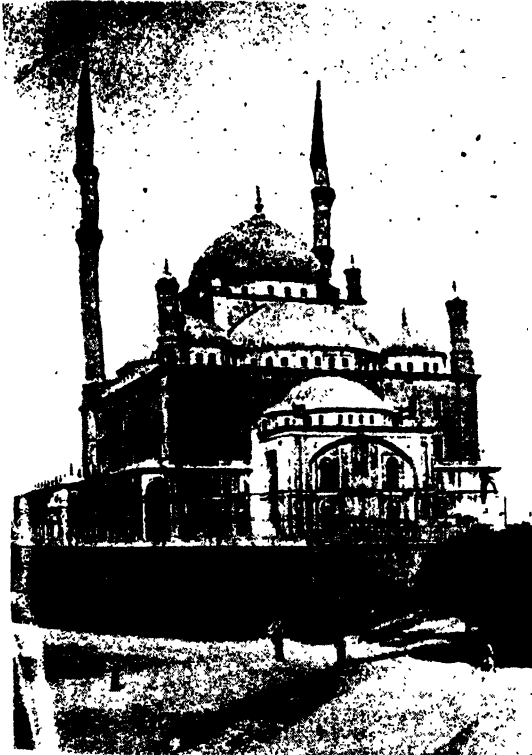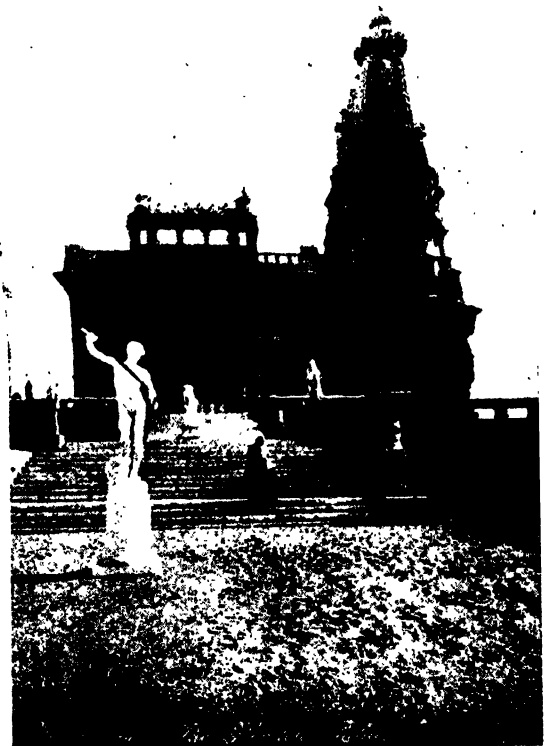
করে না, কিন্তু সেখানকার এই ফেরীওয়ালারা বিদেশী দর্শক পেলেই এই পোকাগুলি বিক্রী করতে আসে। এদের আর পূর্ব্বপুরুষদের মত বিষ নেই, শুধুই কুলোপানা চক্কর আছে, আমার কাছে এ পোকা নিয়ে আসতেই বললুম এ আর আমি কি করব, আমাদের দেশে পোকামাকড় যথেষ্ট আছে। শুনলুম তেমন তেমন উৎকট সৌখীন আমেরিকান্ টুরিষ্ট

কায়রে—তৃতীয় এমেনোফিস্ ও রাণী টিগির প্রতিমূর্ত্তি

পোর্টসেডে গিয়ে জাহাজ ধরব। একে ত সারারাত চোখে ঘুম নেই, মোটরে লম্বা পাড়ি দিতে হয়েছে, তার ওপর সমস্ত দিনেও এই ঘোরাঘুরি, চেয়ারে ব'সে ব'সে সকলেই ঢুলতে লাগলুম। গাইড খানিক পরে এসে জানালে ষ্টেশনে যাবার জন্য আমাদের মোটর হাজির। পিরামিডের তলায় দাঁড়িয়ে তোলা আমাদের ছবিও এই

কায়রে—যাদুঘরে 'মমী' মুখস

কায়রো জেলা আকহনাটেন সূর্য্যোপাসনা করিতেছেন

সময় চেপে এল। ছবিতে কার মাথার চুল ঠিক আছে, কার হাসিটি খুব 'সুইট' হয়েছে, মেম-মহলে তাই নিয়ে এক কলরব সুরু হয়ে গেল। আমরা সকলেই এক এক কপি ছবি কিনলুম।

ষ্টেশনে এসেও ট্রেনের জন্য খানিকটা অপেক্ষা করতে হ'ল। তার পর ট্রেনে ক'রে আবার ছুট। সন্ধ্যাবেলায় ট্রেনের রেস্তোরাঁ-কারে রাত্রের খাওয়া সেরে নেওয়া গেল, তখন রাত আটটা। দূরে খেজুরগাছের পিছনে সূর্য্য সবে অস্ত যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা সবাই ট্রেনে একচোট ঘুমিয়ে নিলুম। পোর্টসেডে পৌঁছে আবার মোটরে ক'রে সমুদ্রের ধারে এলুম, এসে দেখি আমাদের ভিক্টোরিয়া জাহাজ সুয়েজ থেকে এখানে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সমস্ত জাহাজটি ইলেক্‌ট্রিক আলোতে ঝলমল করছিল। তখন প্রায় রাত এগারটা, সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে ধুলা-মাখা অবস্থায় ক্লান্ত শরীরে নিজেদের সেই জাহাজ-খানিকে দেখে এত আনন্দ হ'ল, যেন নিজেদের বাড়িতে ফিরে এলুম। তখন জাহাজের সব খাওয়া-দাওয়া মিটে গেছে, নাচের আসরে সবাই নেমেছে। পানীয় দ্রব্য ছাড়া আর কিছু খেতে পাওয়া যাবে না. আমাদের কিন্তু আবার খিদে পেয়ে গিয়েছিল।

কেবিনে ঢুকে দেখি বিছানা প্রস্তুত, আজ একটা ক'রে বাড়তি কম্বলও আছে গায়ে দেবার জন্য, রাত্রে ঠাণ্ডা পড়বে বোধ হয়। বাথরুমে ঢুকে বেশ ক'রে গরম জলে গা ধুয়ে ফেললুম। বাড়ি থেকে আস্‌বার সময় মা যত্ন ক'রে যে আমসত্ত্ব সঙ্গে দিয়েছিলেন, সেই একটু ও এক গেলাস ক'রে জল খেয়ে শুয়ে পড়া গেল। সকালবেলায় দরজায় ষ্টুয়ার্ডের ঠক্‌ঠকানির চোটে ঘুম ভাঙল, তাকে ঘরের ভিতর আসতে বলতেই সে এসে হাসিমুখে সুপ্রভাত জানিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, আমরা আজ কি ব্রেকফাষ্ট খাব না? ন'টা বেজে গেল যে? তা'কে আমাদের খাবার আজ ঘরের ভিতরেই আনতে ব'লে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম।

২২শে জুন:—আমাদের শরীর বেশ ভাল আছে। ক্রমশঃ শীত অনুভব করছি। এখন কেবিন বেশ আরামের, আমরা ইটালীর বুটজুতাটার তলা দিয়ে যাচ্ছি। কাল জাহাজ নেপলস্ বন্দরে দুই ঘণ্টার জন্য থামবে, আমরা সেই সময় শহর দেখবার জন্য নামবো। যতই দেশ-বিদেশ বেড়াই না কেন, খাওয়া ও শোওয়ার সময় নিজের বাড়িটির জন্য মন কেমন করে।

২৩শে জুন: জাহাজ ভোরবেলা নেপলস্ শহরের কাছাকাছি আসতেই কেবিনের পোর্টহোল দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলুম. জলের উপর চতুর্দ্দিকে কাগজ, দড়ি, ন্যাকড়া, খালি টিনের কৌটো সব ভাসছে। গোটাকয়েক নৌকা সাদা ধপ ধপে পাল তুলে তরতর্ ক'রে চলে গেল। কিছু দূরে বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়স তার বিরাট দেহ নিয়ে ধোঁয়ায় মিশে দাঁড়িয়ে আছে, মাথা দিয়ে অনবরত সাদা ও কাল গাঢ় ধোঁয়া উঠে আকাশে মিশে

যাচ্ছে। আমরা খাবার ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে নামবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এলুম। জাহাজ বন্দরে লাগতেই আবার সেই রকম সিঁড়ি লাগালে, পুলিসকে পাসপোর্ট দেখিয়ে আমরাও নেমে এলুম। টমাস কুক কোম্পানীর সাহায্যে একটি ঢাকা ট্যাক্সি-গাড়ী পাওয়া গেল, তাতে আমরা দুই জন ও স্যর জোসেফ ও লেডী ভোরে—এই চার জনে উঠে পড়লুম। আমাদের বন্ধু শ্রীঅবনীনাথ মিত্র সস্ত্রীক নেপল্‌সে নেমে গেলেন, তাঁরা ওখান থেকে অন্যান্য দেশ দেখতে যাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন।

পম্পে কর্ণেলিয়স রুফসের গৃহাবশেষ

আমরা মোটরে ক'রে যাবার সময় রাস্তার দু-পাশেই পাথরের ঢিপির দেওয়ালের মত দেখতে পেলুম। ড্রাইভারের কাছে শুনলুম সেগুলি লাভা, ভিসুভিয়সের অগ্নি-উদ্গীরণের ফলে বেরিয়েছিল। কালে গ্র্যানাইট পাথরের চাঙড়ের আকার ধারণ করেছে ও পরে আবার এই সব পাথর কাটিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে। আমরা প্রথমে কোরাল ফ্যাক্টরীতে গেলুম, সমুদ্রের তলা থেকে নানা রকম প্রবাল সংগ্রহ ক'রে এনে এখানে কলের সাহায্যে তাকে কেটে পালিশ ক'রে, মেয়েদের গলার মালা, ইয়ারিং, ব্রেসলেট ইত্যাদি গহনা ও ছবির ফ্রেম প্রভৃতি তৈয়ারী হয়, বেশ দেখিবার মত জিনিষ। তার পর আমরা ভিসুভিয়সের তলায় পম্পে নগর দেখ্‌তে গেলুম। এই পম্পে এক কালে ফলফুলেভরা একটি সুন্দর শহর ছিল। তার পর হঠাৎ একদিন ভিসুভিয়সের কৃপায় আগুন লেগে ও ঘন ঘন ভূমিকম্পের ফলে সব ভূমিসাৎ হয়ে চাপা পড়ে। ঘর, বাড়ি, দোকান-পাট, মানুষ, কুকুর বেড়াল ইত্যাদি সমস্তই গলিত লাভার তলায় চাপা প'ড়ে পাথরের ঢিপির মত হয়ে গিয়েছিল, এখন সেই সব মাটি থেকে খুঁড়ে বের ক'রে মিউজিয়ম ক'রে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি, দোকান পাথরের পুতুল, ছবি, চেয়ার, টেবিল, ডাক্তারী ছুরি-

পম্পে—বাসিলিকা
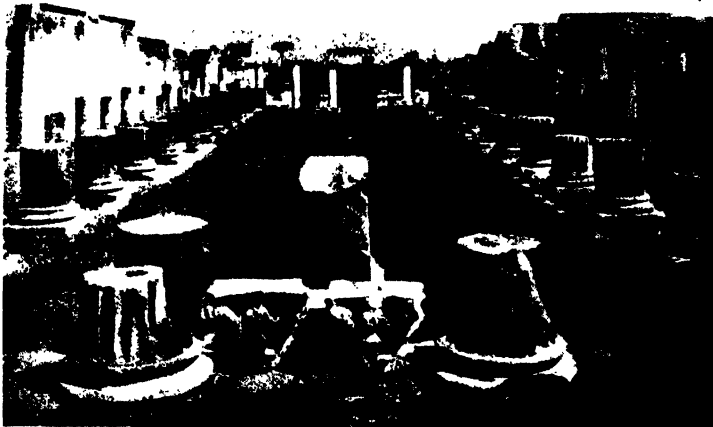
কাচি, টেষ্টটিউব, গ্যাসজার, জলের ডিক্যাণ্টার, মাটির নানা রকম বাসন, পোড়া দড়ি, পেঁয়াজ, আখরোট, এমন কি আস্ত আস্ত ডিম পর্য্যন্ত বেরিয়েছে। এই পম্পে শহরটি দেখ্‌তে আমাদের প্রায় দুই ঘণ্টা কেটে গেল। রাস্তাঘাট হেঁটে হেঁটে বেড়িয়ে দেখে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল।

পম্পে—রাস্তা

নেপলস্ শহরটি সুন্দর, একেবারে সমুদ্রের ধারেই পাহাড়ের উপর। ট্রাম, বাস, মোটর-সাইকেল সব চলছে; পাহাড়ের গায়ে গায়ে আঙুর, আপেল, চেরীর গাছে ভর্ত্তি, এসব ছাড়া ফুল আছেই। আমরা এবার জাহাজে ফিরে এলুম। আবার জেনোয়ার উদ্দেশে পাড়ি সুরু হ'ল।

২৪শে জুন: আজ সকালে জাহাজ জেনোয়ায় পৌঁছল। এবার আমরা জাহাজ-বোঝাই লোকজন, জিনিষপত্র সমেত সকলেই নেমে পড়লুম। কেন-না জাহাজ সাত দিন এখানে থাকবে, তার পর আবার বোম্বাইয়ে ফিরে যাবে।

জাহাজ থামতেই দেখি সকলেই ইটালীয়ান্ ভাষায় কথা বলছে, কেউ ইংরেজী জানে না, কিন্তু সবাই ফরাসী ভাষাটা জানে। কথা কইতে গেলেই জিজ্ঞাসা ক'রে বসে, "পার্লে ভু ফ্রাঁসে" অর্থাৎ ফরাসীতে কথা কইতে পার? আমাদের কাছে একটি বাঙালী ছেলে এগিয়ে এল। ডাক্তার কালিদাস নাগ আগে থাকতেই এঁকে আমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য লিখে জানিয়েছিলেন। ইনি আমাদের কাছে এসে বললেন, "আমি কালিদাস বাবুর ছাত্র, এখানে পড়ি। আমার নাম বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।" আমরা এক জন নিজের দেশের লোক দেখ্‌তে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

পম্পে—মার্কারি-মন্দিরবেদী

কলকাতার চৌরঙ্গীর ফারপো কোম্পানীর অংশীদার মিঃ এ. ফারপো এ সময়ে ইটালীয়ান লেকে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁর তরফ থেকে তাঁর ভাই আমাদের জাহাজ থেকে নামিয়ে নিতে এসেছিলেন। মিঃ এ. ফারপোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। এঁর এক ভাই প্রোফেসার

এনরিকো ফারপো তাঁর আফিসে অল্প ক্ষণের জন্য কি কাজে গেলেন কথা রইল আমরা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের সঙ্গে জেনোয়া শহরের খানিকটা বেড়িয়ে তার পর তাঁর আফিসে গিয়ে একসঙ্গে লাঞ্চ খেতে যাব। আমরা বেড়াতে বেরুলুম. রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, দু-পারেই লোক এই অদ্ভুত শাড়ীপরা মানুষ দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের কৌতূহল বেশী। জনকয়েক মেয়ে ত পিছু নিলে, সে এক অস্বস্তির ব্যাপার।

নেপল্‌স

এনরিকো ফারপো জেনোয়ায় থাকেন। ইনি আবার মোটেই ইংরেজী জানেন না, এঁর স্ত্রী কিন্তু জানেন। সেজন্য সস্ত্রীক এসেছেন যাতে আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার ঠিক সুবিধা হয়। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দু-দিন থাক্‌বার জন্য এঁরা দু-জনেই আমাদের বল্‌তে লাগলেন। কিন্তু আমরা সেই দিনই মিলান্‌ চলে যাব ব'লে আগে থাকৃতেই ঠিক ক'রে রেখেছিলুম, সেই জন্য থাক্‌তে পারব না বললুম। মিসেস্‌ এনরিকো ফারপো সারারাত ধ'রে কোথায় নাচের মজলিসে ছিলেন। তাঁর বিশ্রামের দরকার, তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন। প্রোফেসর এনরিকো ফারপো সেদিন আমাদের ও শ্রীমান্‌ বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহকে দুপুরে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে ফেললেন। প্রোফেসর এনরিকোর কৃপায় আমাদের বাক্সপেটরা খুলে দেখাতে হয় নি। আমরা প্রথমে রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়ে ওয়েটিং-রুমে আমাদের সব জিনিষপত্র জমা রাখলুম। তার পর লয়েড ট্রিস্‌টিনো আফিসে গিয়ে ফেরবার সময়ের জাহাজে বাথ রিজার্ভ ঠিক আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলুম, কিন্তু সেখানে এ বিষয়ে কোন খবর পেলুম না। শুনলুম আমরা লণ্ডনে পৌছে টমাস কুকের আফিসে হয়ত খবর পেতে পারি। প্রোফেসর

রাস্তার ফুটপাথের ওপর কাল ছোট ছোট মোজায়েক পাথর বসিয়ে ফুল, লতাপাতার নক্সা করা। পথে ফুলওয়ালী মস্ত বড় সাজিতে ক'রে নানা রঙের ফুল বেচছে। ফুলের সাজিটি দেখ্‌লে মনে হয় একটি প্রকাণ্ড বড় বেতের মোড়াকে উল্টে তার ভেতর ফুল বসানো হয়েছে। ফুলওয়ালীর পোষাকটিও ফুলের মত নানা রঙের তৈরি। তার চেহারার লালিত্যে, গঠনের সৌন্দর্য্যে, দাঁড়াবার ভঙ্গীতে তাকে খানিক ক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখবার ইচ্ছা হয়। পথের ধারে ধারে তিনতলা-সমান ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা ফুলের গাছে ফুল ভর্ত্তি, সুগন্ধে সমস্ত রাস্তা ভরপুর। রাস্তাগুলি সমস্তই পাহাড়ের উপর উঁচু-নীচু ক'রে তৈরি. পাহাড়ের উপরই ট্রাম-বাস সব চলছে। আমরা শ্রীমান্‌ বীরেন্দ্রের বাড়িতে গেলুম,

নেপল্‌স—সান্টা লুসিয়া

তিনি এ বাড়িতে বোর্ডার, বাড়ির মেয়েরা আমাকে ভীড় ক'রে দেখ্‌তে এল; কেউ শাড়ী, কেউ হাতের চুড়ী, কেউবা কপালের সিঁদুরের টিপ দেখতে লাগলো। আমরা খানিক পরে প্রোফেসর এনরিকোর আফিসে এলুম। তিনি আমাদের এখানকার বড় হোটেল "সিরামারে" নিয়ে গেলেন। সেখানে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আমরা ষ্টেশনে এলুম। ষ্টেশনে দেওয়ালের খিলানে খিলানে চমৎকার ছবি আঁকা। আমরা ওয়েটিং-রুম থেকে মোটঘাট নিয়ে মিলান যাবার জন্য ট্রেনে উঠলুম, তখন বোধ হয় বেলা সাড়ে তিনটে। বীরেন্দ্র সিংহ আমাদের ব'লে দিলেন যে মিলানে নেমে কুলীর দরকার হ'লে "ফাকিনো" ব'লে ডাকতে। প্রোফেসর এনরিকো ব'লে উঠলেন, "সি, সি, সি" অর্থাৎ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক্ ঠিক্। এঁর সঙ্গে আমাদের যা কথাবার্ত্তা হয়েছিল শ্রীমান বীরেন্দ্র সমস্ত জন্যই দোভাষীর কাজ করেছিলেন, তিনি খুব ভাল ইটালীয়ান ভাষা জানেন। আমরা বৈকালে ৪টার সময় মিলান রওনা হলুম।

পোর্টসেড্‌ বন্দর

ট্রেনে যাবার সময় পথের দু-ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। বড় সুন্দর দৃশ্য, মাঝে-মাঝে নীল-রঙের লেক দেখতে পাচ্ছি। বৈকালে ছ'টার সময় মিলান ষ্টেশনে পৌছে "ফাকিনো" ব'লে হাক দিতেই চার-পাঁচটা কুলী হাজির। আমাদের গন্তব্য স্থানের নাম শুনে তারা একেবারে একটি প্রাইভেট মোটর-বাসে তুলে দিলে। আমরা যে হোটেলে

মিলান—পায়াজা কাস্তেলো

ভিসুভিয়স
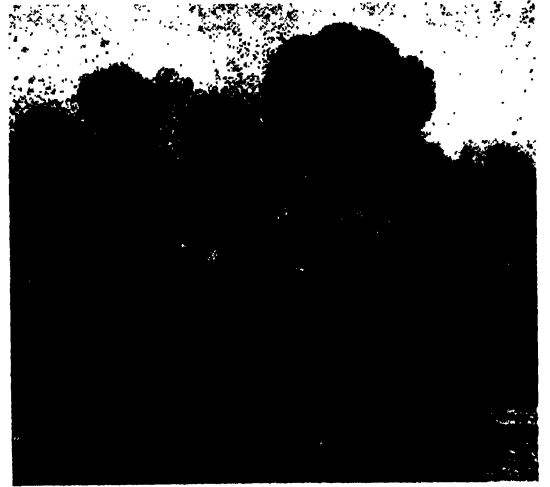
গিয়ে উঠব, দেখলুম বাসে সেই হোটেলেরই নাম লেখা রয়েছে। কাছেই দু-এক জন দাঁড়িয়ে ছিল, এক জন কাছে এসে বললে, "আমরা হোটেলেরই লোক, বিদেশী লোক কেউ এলে, হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকি। তোমরা তোমাদের জিনিষপত্রসমেত এই গাড়ীতে হোটেলে যাও। গিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দিও, অন্য লোকদের নিয়ে

জেনোয়ায় মাৎসিনী-মূর্ত্তি

যাব। হোটেল এখান থেকে দশ-পনর মিনিটের রাস্তা।" এরা বেশ ইংরেজী বলতে পারে দেখলুম। বুঝলুম ব্যবসার খাতিরে পাঁচ রকম লোককে হোটেলে নিয়ে যেতে হয়, সেই জন্য দু-চারটা ভাষা আয়ত্ত ক'রে রেখেছে!

আমরা একটি বাথরুম-সমেত ঘর ঠিক ক'রে ফেললুম। তিনটি ঘর পেলুম—বাথরুম, শোবার ঘর, বসবার ঘর, বেশ ভাল ব্যবস্থাওয়ালা ঘরগুলি, জন-পিছু প্রতিদিন ৫০ লীরা ক'রে দিতে হ'ল (অর্থাৎ ১০৲ টাকা)। মুখ-হাত ধুয়ে, চা-রুটি, জ্যাম-জেলী খেয়ে, রাত্রের জন্য ভাত ও কারি করতে বললুম। ভেবেছিলুম কি একটা ছাইপাঁশ ক'রে দেবে, কিন্তু খেতে গিয়ে দেখি আমাদের দেশের মতই করেছে। আমরা যখন রাত ন'টার সময় খেতে গেলুম তখনও বেশ রোদ রয়েছে। মেয়েগুলি সকলে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, বোধ হয় শাড়ীপরা দেখে। খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়া গেল।

২৫শে জুন:—সকালবেলা হোটেলের ম্যানেজারকে আমরা এখানকার সব দেখব জানাতেই তিনি টমাস কুকের আফিসে টেলিফোন ক'রে জানিয়ে দিলেন। খানিক পরে কুকের আফিস থেকে আমাদের জন্য গাইড-সমেত একটি ঢাকা গাড়ী এল। আমরা প্রথমেই মিলানের কেথিড্রেল দেখতে গেলুম। এটি চার-শ বছরের পুরাতন, কিন্তু এখনও তৈরি চলছে, শেষ হয় নাই। চমৎকার দেখতে, ঝকমক করছে, জানালার কাচের ওপর সুন্দর ছবি আঁকা। এর ভেতরে অনেক পোপের প্রতিমূর্ত্তি। সমস্ত শ্বেতপাথরে তৈরি, এদের পোষাক-সংলগ্ন লেশের কারুকার্য্যের দিকে দেখলে মনে হয় না এগুলি পাথরের, সত্য কাপড়ের তৈরি বলেই ভ্রম হয়। পাথরের স্তম্ভগুলিও সুন্দর গঠনের, সমস্ত জিনিষের পালিশের ঔজ্জ্বল্য খুব। এর পর আমরা আর একটি গীর্জ্জা দেখতে গেলুম। এটিও বহুকালের পুরাতন. ইট, কাঠ, চূণ ও বালির দ্বারা

সুয়েজ-প্রণালী
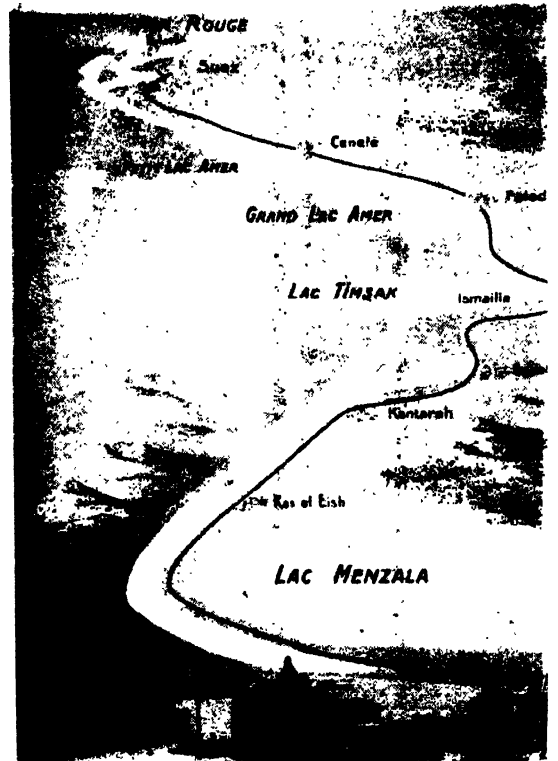
জেনোয়া—ক্রীষ্টোফোরো কলোম্বো স্মৃতিমূর্ত্তি

ঐশ্বারী, কিন্তু দেখবার মত। এর দেওয়ালের গায়ে জলের রং দ্বারা আঁকা অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। তাদের রংগুলি এখনও খুব পরিষ্কার। এর মধ্যে বিখ্যাত চিত্রকর লিয়োনোদো দ্য ভিঞ্চির আঁকা "Last Supper" বা "যীশুর শেষভোজন" নামক ছবিটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পথে যেতে যেতে গাইডকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কত রকম ভাষা জান? সে বল্‌লে, "সাত রকম, আমাদের অনেক দেশের যাত্রী নিয়ে কারবার করতে হয়, সে জন্য যে গাইড হবে তার সব সময় খোশমেজাজী হওয়া ও পাঁচ-সাতটি ভাষা জেনে রাখা দরকার।" তার পর আমরা মিলানের আরকেড দেখতে গেলুম। এটি এখানকার বাজার, সারা বাজারটির ছাদ রঙীন কাচের আবরণে আবৃত; যাতে রোদের উত্তাপ ভেতরে না আসে, অথচ আলো পাওয়া যায়। গাইডের কাছে খবর পেলুম মিলানের সিল্ক সৌখীন সমাজে খুব আদরণীয়। আমি কয়েক মিটার (প্রায় ৪০ ইঞ্চিতে ১ মিটার, ইটালীতে গজের পরিবর্ত্তে মিটার ব্যবহৃত হয়) সিল্ক কিনলুম। গাড়ীতে উঠবার সময় এক জন লোক নানা রকম ব্রোচ বিক্রী করতে এল। দু-একটি হাতে নিয়ে দেখছি ইত্যবসরে রাস্তার যত মেয়ে পুরুষ আমাকে পিঁপড়ের মত ছেঁকে ধরল। সকলেরই মুখে "ইণ্ডিয়ানো" কথাটা শুনতে পেলুম, সবাই আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। মেয়েরা এ বিষয়ে বেজায় সমালোচনা সুরু ক'রে দিলে। যদিও আমি তাদের ভাষা বুঝতে পারলুম না, তবুও তাদের হাত-পা নাড়া ও কথাবলার ভঙ্গী দেখে কিছু কিছু অনুমান করতে পারছিলুম। অবশেষে গাইডের ধমকানির চোটে একটু পথ ছাড়তেই গাড়ীতে উঠে পড়লুম। তারাও তাদের রাস্তা দেখলে, ওদের হাতে বইয়ের গোছা ছিল, মেয়েরা সবাই স্কুলে যাচ্ছিল। যতই ইটালীতে ঘোরা-ঘুরি করছি, এদেশের বেশীর ভাগ লোকের ভিতরে যে গ্রাম্য অসভ্যতাটা আছে সেটা ক্রমশঃই টের পেতে লাগলুম, সে সব ঘটনা পরে বলব। আমরা এবার শহরের গোরস্থান

পোর্টসেড্—লেসেপ্‌স-মূর্ত্তি

দেখতে গেলুম, দেশের অবস্থাপন্ন নামজাদা লোকেরা মারা গেলে এইখানে কবর দেওয়া হয়। সমস্ত বাগানটি ফুলে ভর্ত্তি, চতুর্দ্দিকে মর্ম্মরমূর্ত্তি, যে লোক মারা যাবার সময় যেরকম ভাবে শুয়ে মারা গেছে প্রথমে তার ছবি তুলে তার পর সেই রকম মূর্ত্তি পাথরে গ'ড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এদের দেখে মনে হ'ল, এরা মারা গিয়েও এখনও পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারে নি। তাই চারিদিকে দালান-কোটা, ঘর-বাড়ি তৈরি ক'রে বাইবেল খুলে ব'সে আছে। সবাই যেন চিকিৎসা-সঙ্কটের তারিণী কবিরাজের "জ্যান্ত বড়ি", ডাকলেই ডাক শুনবে। এও একটা দেখবার ও মনে ক'রে রাখবার জিনিষ। শুনলুম, সাধারণের ও গরিবের জন্য আলাদা গোরস্থান অন্য জায়গায় আছে, কিন্তু সময়াভাবে আমাদের যাওয়া হয় নাই। আমরা হোটেলে ফিরে এলুম, হোটেলে এসে আমরা সব জিনিষপত্র গুছিয়ে তুলে ষ্টেশনে গিয়ে লুগানো যাবার ট্রেন ধরলুম।

জন্মস্বত্ব

শ্রীসীতা দেবী

১৩

সকলেই সকলকে এক-একবার দেখিয়া লইল, কিন্তু মমতা এ পর্য্যন্ত একবারও দেবেশের দিকে তাকায় নাই। একে ত তাকাইতেই লজ্জা করে, কারণ কি সূত্রে যে দেবেশ আজ এখানে আসিয়াছে, তাহা মমতা ভাল করিয়াই জানে। তবু কৌতূহল বলিয়া একটা জিনিষ ত আছে? মমতার যে এই নূতন মানুষটিকে দেখিতে একেবারেই ইচ্ছা করিতেছিল না তাহা নয়, তবে অন্যেরা—বিশেষ করিয়া মামীমা বা লুসি যদি তাহাকে ঐদিকে তাকাইতে দেখিয়া ফেলে, তাহা হইলে মমতার আর লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। লুসি ত বাক্যবাণের চোটে মমতাকে অস্থির করিয়া তুলিবে, মামীমাও ঠাট্টা করিবেন। সম্পর্কে মামী হইলে কি হয়, ঠাট্টা-তামাশার বেলা প্রভা সকলের সমবয়সী। বেটু এবং খোকাও এই লইয়া নিজেদের মধ্যে গল্প করিবে, মমতাকে কিছু নাই বলুক।

তবু একবার না তাকাইয়া মমতা থাকিতে পারিল না। তাহার কৌতূহলটাই জয়ী হইল। তাহার বাবা এবং মামা যখন দেবেশের সঙ্গে কথা বলিতে ব্যস্ত, মা ও মামী এক রাশ খাবারের ব্যবস্থা করিতেছেন, সেই ফাঁকে একবার দেবেশকে দেখিয়া লইল। সৌভাগ্যক্রমে দেবেশ তখন অন্য দিকে তাকাইয়া ছিল। মমতার মনে হইল, মানুষটার রংটা বেশ ফরশাই বটে, কিন্তু বড় যেন ফুলবাবুর মত চেহারা। পুরুষমানুষ এই রকম হইলে কি মানায়? তাহাদের সর্ব্বাগ্রে বলিষ্ঠ ও সুগঠিত হওয়া দরকার। আর এক জন ছেলের কথা মমতার মনে পড়িল। সে ফরশা নয়, কিন্তু যথার্থ পুরুষের মত চেহারা তাহার। কাহারও গাড়ী অচল হইলে, দেবেশ কি গাড়ী ঠেলিতে পারিত? কখনই না।

শিশির এতক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়া, খুব জোর গলায় যামিনীর কাছে নিজের সময়-মত না-আসিতে পারার কারণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ছোট বউ অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তাঁহার কি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। যামিনী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন, কারণ ছেলেমেয়েদের এ সকল বিষয়ে এখনই বেশী জ্ঞান দান করিতে তিনি ব্যগ্র ছিলেন না।

এ পর্য্যন্ত সুরেশ্বর ভিন্ন কেহই দেবেশের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা বলে নাই। দেবেশ ইহাতে মনে মনে বিরক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, কারণ সে এখানে সুরেশ্বরের সঙ্গে গল্প করিবার জন্য আসে নাই। যামিনীর উচিত তাহাকে আদর-আপ্যায়ন করা, মমতার না-হয় লজ্জা করিতে পারে। যামিনী না-হয় মস্ত বড় মানুষের গৃহিণী, কিন্তু দেবেশই বা

কি ফেলনা? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ইঁহারাই আর অত ঘটা করিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেন না।

যামিনীও দেখিতেছিলেন, তাঁহার অতিথির মুখ ক্রমেই গম্ভীর হইয়া আসিতেছে, কারণটাও ঠিকই ধরিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কি বলিয়া যে কথা আরম্ভ করিবেন, তাহা ভাবিয়াই পাইতেছিলেন না। বাল্যকাল হইতে যামিনী মুখচোরা, কাহারও সঙ্গে অগ্রসর হইয়া আলাপ সুরু করিতে কোন দিনই তিনি পারেন না। অগত্যা প্রভাকে তিনি টিপিয়া দিলেন, "একটু ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও না ভাই, বৌ, দেখছ ত কেমন মুখ আঁধার ক'রে ব'সে আছে।"

প্রভা তৎক্ষণাৎ দেবেশের কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া গল্প জমাইয়া তুলিল। সে এ-সব ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। দেবেশও বিরক্তি ভুলিয়া গিয়া গল্পে মজিয়া গেল। কিন্তু যামিনীর উপর অভিমানটা তাহার একেবারে দূর হইল না। যামিনীকে তাহার নিজের খুবই ভাল লাগিয়াছিল, তাঁহারও যদি দেবেশকে খানিকটা অন্ততঃ ভাল লাগিত তাহা হইলে দেবেশ খুশী হইত।

যামিনী জলযোগের প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন। লুসি আর মমতা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে খাবার দিতে লাগিল। পাশেই মস্ত বড় ডাইনিং-রুম, সেখানে কৈলাস ঠাকুর আইসক্রীম্ ফ্রীজারের হাতল ঘুরাইতেছে দেখা গেল। বেটু এবং সুজিত তৎক্ষণাৎ সেইখানে গিয়া জুটিল। এ ঘরে তাহারা একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মমতা এবং লুসিও খানিক ঘোরা-ফেরা করিতে পাইয়া বাঁচিয়া গেল, ততটা সঙ্কোচ আর তাহাদেরও রহিল না। দেবেশের সামনে খাবারটা অবশ্য লুসিই দিয়া আসিল।

প্রভা বলিল, "ওকি আপনি ত কিছুই খাচ্ছেন না? আপনাদের বয়সে আমরা ও ক'টা জিনিস এক নিশ্বাসে শেষ করতাম।"

দেবেশ বলিল, "তাহ'লে এখনও তাই করা উচিত। সে দিনগুলো খুব বেশী দিন গত হয়েছে ব'লে ত মনে হচ্ছে না।"

প্রভা ভাবিল, বাবাঃ, এ যে দেখি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। আমাকে কি শালাজ ঠাউরেছে নাকি? আমি যে মামী-শাশুড়ী হ'তে চলেছি, সে খেয়ালই নেই।"

মুখে বলিল, "সে ত একেবারে পাষ্ট হিষ্ট্রী। সে যাক্ গে, সব জিনিষ ঘরে তৈরি, কিছু ফেল্‌লে মনে করব যে ভাল হয় নি।"

অগত্যা দেবেশকে আর একটু খাওয়ার পরিমাণ বাড়াইতে হইল। এমন সময় যামিনী কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে চা দেব কি? যা গরম আজ, অনেকেই চা খেতে চাইছেন না।" দেবেশ আপ্যায়িত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ, এক পেয়ালা পেলে ভাল হয়।" যামিনী সরিয়া গেলেন, প্রভা দেবেশের অলক্ষ্যে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া লইল।

শিশিরও প্রায় প্রভার জুড়িদার। নিজের পিতৃব্যত্বের মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া মমতাকে কাছে টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে বর পছন্দ হ'ল? বেশ ত টুকটুকে, তোর পাশে বেশ মানাবে।"

মমতা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "যাও কাকাবাবু, তুমি ভারি ফাজিল।" সে সারা সন্ধ্যা আর শিশিরের কাছেই ঘেঁসিল না।

দেবেশ দূর হইতে খুড়া-ভাইঝির দিকে চাহিয়া ব্যাপারটা খানিক আঁচ করিয়া লইল। ভাবিল, "বাঃ, ঠোঁট ফুলিয়ে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। তবে মেয়েটি একটু বেশী খুকীভাবাপন্না।" তাহাকে লইয়া যে ইহারই মধ্যে ঠাট্টা-তামাশা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, ইহাতে সে সন্তুষ্টই হইল।

জলখাবার খাওয়া এক পালা শেষ হইল। মিহির সুজিত আর বেটুর আর এক পালা আরম্ভ হইল, অন্যরা আইসক্রীম খাইতে মন দিল; সুরেশ্বর মমতা আর লুসির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বেশী আইসক্রীম্ খেয়ে যেন গলা ধরিয়ে ফেলো না, গান করতে হবে দু-জনকেই।"

লুসি চুপি চুপি বলিল, "ইস্, গান আমি করলাম আর কি?" কিন্তু মনে মনে সে জানিত গান তাহাকে করিতেই হইবে, ভাগ্যে সেতারটা লইয়া আসে নাই, না হইলে বাজাইতেও হইত। এ সব বিষয়ে প্রভা অতি সতর্ক। কোন মজ্‌লিশে মেয়ের কি কি বিদ্যা আছে, তাহা দেখাইবার সুযোগ সে কখনও ছাড়ে না।

মমতার বাবার কথা শুনিয়া অভিমানেই কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। কি যাহার তাহার সামনে তাহাকে এমন করিয়া

খেলো করা? বাবার যতই আভিজাত্যের অহঙ্কার থাক্, এদিকে ত দেখি মেয়ের আত্মসম্মানের ভাবনা কিছুমাত্র নাই। যতটা না আইস্‌ক্রীম্ খাইতে ইচ্ছা করিতেছিল, রাগিয়া সে তাহার চেয়ে অনেক বেশী খাইয়া ফেলিল।

সুরেশ্বর ভয়ে ভয়ে বিশেষ কিছুই খাইতেছিলেন না। অথচ ভোজনবিলাসী মানুষের পক্ষে খালি বসিয়া বসিয়া অন্যের খাওয়া দেখা বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখের ব্যাপার। তাই খাওয়া-দাওয়াটা তিনি চটপট চুকাইয়া ফেলিতে চাহিতেছিলেন। শ্যালক এবং ছোট ভাইয়ের উপর তাঁহার রীতিমত রাগ হইতেছিল, তাহারা ক্রমাগত খাইয়া চলিয়াছে বলিয়া।

লুসি আইস্‌ক্রীমের প্লেট সরাইয়া রাখিতেই তিনি তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এবার একটা গান আরম্ভ হোক কেমন?"

প্রভা তাড়াতাড়ি বলিল, "সেতারটেতার নেই বুঝি? গানের চেয়ে বাজনাটাই ওর হয় ভাল।"

যামিনী বলিলেন, "সেতার ত নেই ভাই। বেহালা আর এস্রাজ আছে, ও বুঝি শুধু সেতারই বাজায়?"

সুরেশ্বর চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কিছু কি এ বাড়ি থাকবার জো আছে? সেতারটেতার কত কি ছেলেবেলা বাজিয়েছি, তা কে বা সেগুলোর খোঁজ রাখছে!"

যামিনী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সুরেশ্বরকে কোনদিন কোনপ্রকার বাজনা বাজাইতেই তিনি দেখেন নাই। সেতার এ বাড়িতে কখনও চোখে পড়িয়াছে বলিয়া ত তাঁহার বোধ হইল না। কিন্তু বাহিরের এক ভদ্রলোকের ছেলে বসিয়া, তাহার সামনে ত এ-সব লইয়া স্বামীর সঙ্গে তর্কাতর্কি চলে না? স্বামীর অবশ্য অত বাচবিচার নাই।

শিশির তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। বলিলেন, "সেকি দাদা? কোন্ সেতারের কথা বলছ? সেই বাবার আমলের সেটা? বৌদিদি বোধ হয় সেটা কোনকালে চোখেও দেখেন নি।"

সুরেশ্বর একটু কোণঠাসা হইয়া বলিলেন, "হুঁঃ, সেটা কেন শুধু, কত ছিল। তা কোথায় উড়ে-পুড়ে গেছে।"

প্রভা এ-সব বাকবিতণ্ডা থামাইবার জন্য তাড়াতাড়ি লুসিকে ঠেলিয়া অর্গ্যানের কাছে বসাইয়া দিল। লুসিকে অগত্যা গান আরম্ভ করিতেই হইল।

দেবেশ আইস্‌ক্রীমের প্লেট নামাইয়া রাখিয়া গভীর মনোযোগ সহকারে গান শুনিতে আরম্ভ করিল। লুসির গান তাহার বেশী কিছু ভাল লাগিল না, তবু গানের শেষে সে খুব উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। প্রভার দেবেশ সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা উচ্চ হইয়া গেল।

সুরেশ্বর এইবার মমতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এইবার তোমার পালা মা। লুসি দেখ বল্‌বামাত্রই কেমন রাজী হয়েছে।"

মনে মনে যতই আপত্তি থাক, এত লোকের সামনে মমতা তাহা প্রকাশ করিতে পাইল না। তাহাকেও গিয়া বাজনার কাছে বসিয়া গান আরম্ভ করিতে হইল। তাহার গান দেবেশের ভালই লাগিল। ভাল ত সবই। দেখিতে ভাল, শুনিতে ভাল, বাপের টাকা আছে, মেয়েরও নানা 'একমপ্লিশমেণ্ট' আছে। খালি বয়সের উপযুক্ত চালচলন যদি হইত। বয়স ত দেখিয়া মনে হয় সতের-আঠার হইতে পারে। এ বয়সের ঢের মেয়ে দেবেশের দেখা আছে, তাহাদের পরিবারে নারীজাতিরই সংখ্যাগত প্রাধান্য। তাহারা সব এই বয়সে এক-এক জন মস্ত গিন্নীবান্নী, ছেলেপিলের মা। মমতাকে দেখিয়া কিন্তু বোধ হয় না যে সে পুতুল-খেলা ছাড়া আর কিছুতে এখন মন দেয়।

মমতার গানের সকলেই প্রশংসা করিল। প্রভা দেবেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি গানটান করেন না?"

দেবেশ বলিল, "আজ্ঞে না, ও সব মোটেই আসে না, তবে গানবাজনা শুনতে আমি খুবই ভালবাসি।"

মিহির হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, "আচ্ছা দিদি ত এককালে চমৎকার পিয়ানো বাজাতে, এখন আর বাজাও না?"

সুরেশ্বর যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন, "তাই নাকি, কই কখনও শুনেছি ব'লে ত মনে পড়ছে না?"

প্রভা ক্যাঁট করিয়া বলিয়া উঠিল, "তা শুনবেন কেন? বিয়ের পর কি আর নিজের স্ত্রীর গানবাজনা কখনও কানে ঢোকে? অন্যের স্ত্রী কানেস্তারা বাজালেও তাই তখন বেশী মিষ্টি লাগে।"

শিশির, মিহির, দেবেশ সকলেই হাসিতে লাগিল।

ছেলেমেয়ের সামনে তাঁহাকে এমন ভাবে খোঁচা দেওয়াতে সুরেশ্বর অবশ্যই চটিয়া গেলেন, কিন্তু প্রভা পালাজ মানুষ, কান মলিয়া দিলেও তাহাকে কিছু বলিবার উপায় নাই। অগত্যা সুরেশ্বরকে খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসিতে হইল।

কিন্তু দেবেশ কথাটা পড়িতে দিল না। বলিল, "আমি ভাল বাজনার খুব ভক্ত, যদিও ঘন ঘন সে-সব শোনার সৌভাগ্য আমার হয় না।"

শিশির বলিলেন, "হ্যাঁ বাজাও না বৌদি, আমিও ত প্রায় ভুলে গেছি যে তুমি কোনদিন বাজাতে।"

যামিনীর কাহারও সামনে বাজাইতে ভাল লাগিত না। বাজানোর অভ্যাসটা অবশ্য তিনি বরাবরই রাখিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র শ্রোত্রী ছিল মমতা। মায়ের বাজানোর সে পরম ভক্ত। কত মানুষ অতি বাজে বাজায়, তাহারা লোকসমাজে কত বাহবা নেয়, আর, তাহার মা এত ভাল বাজাইতে পারেন, অথচ কেহ তাহা শুনিতে পায় না, ইহা মমতার একটা আপ্‌সোসের বিষয় ছিল।

যামিনীকে অগত্যা বাজাইতেই হইল। দেবেশ একেবারে অবাক হইয়া গেল। ভদ্রমহিলা শুধু রূপবতী নয়, রীতিমত গুণবতীও বটে, এত ভাল বাজনা সে বাঙালীর মেয়ের কাছে আর শুনিয়াছে বলিয়া ত মনে পড়িল না। সুরেশ্বরকে সে বনিয়াদী হিন্দু জমিদারই মনে করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু দেখিয়া সুখী হইল যে অন্দরমহলটি তাঁহার নানা দিকেই বেশ আধুনিক। সকল দিকেই আধুনিক হইলে দেবেশের সুবিধা হইত। মা-বাপের মনোভাব বোনদের মারফতে কিছু কিছু সে জানিতে পারিয়াছিল। এই মেয়ের সঙ্গে কোর্টশিপ করিতে গেলেই হইয়াছে আর কি? রবীন্দ্রনাথের নব-বঙ্গ দম্পতীর প্রেমালাপের অবস্থা হইবে বোধ হয়। মমতাকে দেখিলে মনে হয় পুসিমেনী এবং চাঁপাকুলের প্রতিই তাহার বরের চেয়ে বেশী অনুরাগ হইবে।

যামিনীর বাজনা শেষ হইতেই সবাই খুব জোর গলায় তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে আরম্ভ করিল। সুরেশ্বরেরও বাজনাটা ভাল লাগিয়াছিল, তবে সে-বিষয়ে কিছু বলা তিনি অনাবশ্যক বিবেচনা করিলেন। ভাল লাগিল না খালি সুজিতের। মায়ের এ-সব মেমসাহেবী সে একেবারে পছন্দ করিত না। তিনি যদি অনন্ত ও বাজুবন্ধ পরিয়া সারাদিন ঝি-চাকরদের বকিতেন এবং সুজিতের জন্য দিনে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করাইতেন, তাহা হইলেই সে খুশী হইত। বনিয়াদী চাল যে কিরূপ হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে তাহার মতামত তাহার পিতার চেয়েও কড়া ছিল।

চা খাইতে আসিয়া সারারাত কিছু আর বসিয়া থাকা যায় না। দেবেশের যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না, তবু তাহাকে উঠিতে হইল। সুরেশ্বর তাহাকে যখন-খুশী আসিবার জন্য বার-বার করিয়া বলিতে লাগিলেন। যামিনী একবারও বলিলে সে ঢের বেশী খুশী হইত, কিন্তু তিনি তাহাও বলিলেন না। প্রভা অবশ্য অনেক কথা বলিয়া গেল। তাহাদের বাড়ি যাইতে সুদ্ধ নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিল। যামিনীর যে এ বর পছন্দ হয় নাই তাহা সে জানিত, অতএব ভবিতব্যের কথা বলা যায় না ভাবিয়া সেও একটু টোপ ফেলিয়া রাখিল।

এবার আর দেবেশকে ট্যাক্সি করিয়া যাইতে হইল না। সুরেশ্বর তাহাকে নিজের গাড়ীতেই পাঠাইয়া দিলেন। বেটু এবং সুজিত তাহাকে পৌছাইতে চলিল।

প্রভা বলিল, "লুসিকে আজ নিয়ে যাই, কেমন ঠাকুরঝি?"

যামিনী কিছু বলিবার আগেই মমতা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। বলিল, "এখনই কেন নিয়ে যাবেন মামীমা? এখনও ত স্কুল খোলে নি? আমার কলেজ আর ওর স্কুল খুললে ত আর মাসে একদিনও দেখাসাক্ষাৎ হবে কিনা সন্দেহ।"

প্রভা বলিল, "আচ্ছা, তবে থাক আর দু-চার দিন। আমার যে একলা আর দিন কাটে না। খোকাকে ত দু-দণ্ডও বাড়িতে পাবার জো নেই।"

১৪

দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটিটা অবশেষে ফুরাইয়া গেল। যেদিন লুসির স্কুল খুলিল, তাহার আগের দিনই সে বাড়ি চলিয়া গেল। মমতার কলেজ খুলিবে আর কয়েক দিন পরে, কি কি পড়িবে, বাড়িতে মাষ্টার রাখিতে হইবে কিনা, এই লইয়া মা মেয়েতে দিনরাত আলোচনা হইতে লাগিল।

সুরেশ্বরের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না যে মমতা আর কলেজে যায়। মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখার বিরুদ্ধে ত তিনি চিরকালই ছিলেন, এখন অল্প বিদ্যার উপরেও চটিয়া উঠিতেছেন। যে-শিক্ষায় মেয়েছেলেকে এমন করিয়া তোলে যে পুরুষের বিধিদত্ত শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধ স্বীকার করিতে তাহারা ভুলিয়া যায়, সে-শিক্ষা কোন কাজের নয়। মমতাকে নিজের মনের মত করিয়া মানুষ করিতে পাইলেন না, এই তাঁহার বড় একটা দুঃখ থাকিয়া গেল। কিন্তু স্ত্রীর জ্বালায় তাঁহার ইচ্ছামত কিছু করিবার জো কি? সারাদিন ছিনে-জোঁকের মত পিছনে লাগিয়া আছে। আর মেয়েও হইয়াছে তেমনি মা-অন্তঃপ্রাণ। মায়ের অঙ্গুলি-হেলনেই সে উঠিতেছে বসিতেছে। সুরেশ্বর যামিনীকে খোঁচা মারিতে যতই ভালবাসুন, নিজের মেয়ের চোখে জল আসিবে ভাবিতেই কাতর হইয়া ওঠেন।

সুতরাং মমতাকে কলেজে পাঠানই স্থির হইয়াছে। দেবেশের বিলাত যাত্রা করিতে এখনও মাস দুই তিন দেরি আছে, সেখানেও সে অন্ততঃ পক্ষে দুইটা বছর কাটাইয়া আসিবে। তত দিন মেয়ে বাড়ি বসিয়া থাকিয়াই বা করিবে কি? গানবাজনা, ছবি আঁকা, সেলাই এবং কায়দাদুরস্ত ভাবে ইংরেজী বলা, এই ক'টা শিখিলেই সুরেশ্বরের মতে যথেষ্ট হইত, কিন্তু এ বাড়িতে ত আর কর্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম নয়? মেয়ের মারফতে গৃহিণী সব কাজই নিজের মর্জ্জিমত উদ্ধার করিয়া লন। তা মেয়ে কলেজেই পড়ুক। মেয়েদের কলেজ, আশা করা যায় মেয়ে সেখানে নিরাপদেই থাকিবে, যা না দিনকাল পড়িয়াছে, কোথা দিয়া কি বিপদ ঘটে কিছু বলা যায় না। মাও কুপরামর্শ দিতে ওস্তাদ, মেয়ে একটা কিছু গোল বাধাইয়া এমন চমৎকার সম্বন্ধটা নষ্ট করিয়া না দেন, তাহা হইলেই হয়।

কলেজও খুলিয়া গেল। যামিনীই মমতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কলেজে ভর্ত্তি করিয়া আসিলেন। এখানকার স্কুলেই মমতা পড়িত, কাজেই তাহার ভয় বা সঙ্কোচ কিছুই হইল না। সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিশিয়া, নূতন মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়া সে মহানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একলা-একলা থাকিয়া তাহার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। যামিনী তাহাকে রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। মেয়েকে কলেজে দিতে পারিয়া তিনিও খানিকটা স্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন। মেয়ের মানুষ হওয়া, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারার ক্ষমতা থাকা কত যে দরকার তাহা যামিনীর মত হাড়ে হাড়ে অল্প নারীকেই বুঝিতে হয়। মমতা যাহাতে স্বামীর হাতের পুতুল না-হয়, এমনি ভাবেই তাহাকে গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা যামিনীর মনে ছিল। স্বামী যথাসাধ্য তাঁহার সকল ইচ্ছাতেই বাদ সাধিবেন তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু তিনিও প্রাণ থাকিতে জেদ ছাড়িবেন না, সে-বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। মমতাই এখন জীবনের তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। ছেলের সব আশা তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে পুরাপুরি সুরেশ্বরের বংশধরই হইবে, আরও এক কাঠি সরেশ না হইলেই হয়।

সুরেশ্বরের শরীর এখনও সামলায় নাই। গরমটা ভাল করিয়া কাটিয়া না গেলে ভাল থাকিবার আশাও ছিল না। এই দারুণ গরমে এখানে তাঁহাকে আটকাইয়া পড়িয়া পচিতে হইল কেবল মেয়ের মঙ্গল ভাবিয়া। কিন্তু মেয়ে কি তাহা ভুলিয়াও মনে করে? মায়ের প্ররোচনায় সেও ত ক্রমে পিতাকে শত্রু মনে করিতে শিখিতেছে। এ ধারণাটি কি কারণে সুরেশ্বরের মস্তিষ্কে গজাইয়াছিল তাহা বলা শক্ত, কারণ তাঁহার প্রতি ব্যবহারে মমতার কোনও পরিবর্ত্তনই দেখা যাইত না।

পূজার সময় সুরেশ্বরের দার্জ্জিলিং যাইবার ইচ্ছা, এখন ডাক্তারটি মত করিলেই হয়। যামিনীই হয়ত তাঁহাকে টিপিয়া দিয়া থাকিবেন। নারীজাতির কথা পুরুষমানুষে সহজে ঠেলিতে ত পারে না? যামিনী কোনকালেই দার্জ্জিলিং যাইতে চান না, এ তাঁহার এক রোগ। কারণটা যে কি তাহা আজ অবধি সুরেশ্বর ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না। সত্য বটে যে যামিনীর মা জ্ঞানদা দার্জ্জিলিঙে মারা গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আসিয়া যায় কি? মা বাপ কাহারও চিরকাল বাঁচিয়া থাকে না, কোন-না-কোন স্থানে তাহারা মারা যাইবেই। তাই বলিয়া কি সে-সব দেশ আর জন্মে মাড়াইতে হইবে না?

দেবেশের আর এ বাড়িতে আসা, সেই দিনের পর ঘটিয়া উঠে নাই। যতই তিনি ব্যাপারটাকে পাকা করিয়া তুলিতে চান, ততই কেমন করিয়া সব যেন ওলটপালট হইয়া যায়।

এ বাড়ি হইতে ফিরিয়াই দেবেশ একপালা সর্দ্দিজ্বরে পড়িল, কেমন করিয়া জানি না, তাহার দারুণ ঠাণ্ডা লাগিয়া গিয়াছিল। জ্বর ছাড়িতে-না-ছাড়িতে দেশে জমিজমা লইয়া কি এক গণ্ডগোল বাধিল, গোপেশ বাবু পেটের অসুখে ভুগিতেছিলেন, তিনি যাইতে পারিলেন না, অগত্যা দেবেশকেই চলিয়া যাইতে হইল। সে এখনও সেখান হইতে ফিরিয়া আসে নাই। নিতান্ত কনে-দেখা-গোছের সে একবার মমতাকে দেখিয়া গিয়াছে মাত্র, তাহাদের ভিতর একটা কথাও হয় নাই। ইহাতে কতদূর কি কাজ হইবে তাহা সুরেশ্বর বলিতে পারেন না। কিছু কাজ না হওয়াই সম্ভব। দেবেশের মেজাজটি বেশ সাহেবী বলিয়া খ্যাতি আছে, সে শুধু একবার চোখে দেখিয়া কোন মেয়েকেই বিবাহ করিতে রাজী হইবে না। মমতা সুন্দরী ও গুণবতী বটে, কিন্তু এমন অত্যাশ্চর্য্য কিছু নয় যে একবার তাহার দর্শনেই মানুষ নিজের মতামত সব ভুলিয়া যাইবে। গোপেশ বাবুর কাছ হইতে অতি অমায়িক চিঠি আরও গুটিকয়েক আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে সুরেশ্বর ভুলিতেছেন না। গোপেশবাবুর টাকাটা হাতে পাওয়া অনতিবিলম্বে প্রয়োজন, তিনি ত অমায়িক চিঠি লিখিবেনই ? কিন্তু বিবাহ ত তিনি করিবেন না, করিবে ভাবী সিভিলিয়ন দেবেশ, কাজেই তাহার মুখ হইতে পাকা কথা না শুনিয়া সুরেশ্বর অগ্রসর হন কিরূপে ? একলা-একলা এত ভাবনা ভাবিতে গিয়া সুরেশ্বরের মেজাজ আরও খারাপ হইয়া যাইতেছে। মেয়ের বিবাহের ভাবনা চিরকাল মেয়ের মা বেশী করিয়া ভাবে, কিন্তু এক্ষেত্রে মা'টিও চমৎকার। বিবাহ না দিতে পারিলেই তিনি বর্ত্তিয়া ন।

কলেজে ঢুকিয়া মমতা প্রথম প্রথম পৃথিবীর আর সব কিছুই ভুলিয়া গেল। কত নূতন সঙ্গিনী জুটিয়াছে, প্রফেসররাও সব নূতন, এক-এক জন কি সুন্দর পড়ায়। মমতা এখন কলেজের মেয়ে হইয়াছে, তাহার পদমর্য্যাদা বাড়িয়াছে কত! শিক্ষকরা পর্য্যন্ত কেহ কেহ তাহাদের 'আপনি' সম্বোধন করিয়া কথা বলে। তাহাদের নিজেদের বসিবার ঘর আছে। লাইব্রেরী হইতেও তাহারা বই নিতে পারে, এই রকম কত কি সুবিধা। এক রবিবার মামার বাড়ি গিয়া সে সারাটা দিন লুসির কানের কাছে কলেজের গুণগান করিয়া তাহার হাড় জ্বালাইয়া দিল।

লুসি এইবার ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়িতেছে, কলেজে ঢুকিতে তাহার প্রায় এক বছর দেরি। কাজেই কলেজের গল্প তাহার খুব বেশী ভাল লাগিল না। মমতাকে ঠেলা দিয়া বলিল, "কি খালি কলেজ, আর কলেজ! ভারি একটা আশ্চর্য্য জিনিষ না ? কেউ আর কোনদিন কলেজে যায় নি যেন।"

মমতা একটু আহত হইয়া বলিল, "তা হ'লে কিসের গল্প করতে হবে ?"

লুসি ফট্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, দেবেশ বাবু আর তোদের বাড়ি একবারও এসেছিলেন ?"

মমতা বিরক্তমুখে বলিল, "না, তাঁর গল্পটা বুঝি তোমার কানে ভারি মিষ্টি লাগবে ?"

লুসি মাথা দোলাইয়া বলিল, "তা ত লাগতেই পারে ? ভাবী ভগ্নীপতি হাজার হ'লেও।"

মমতা তাহার পিঠে একটা চড় মারিয়া বলিল, "যাঃ, ভগ্নীপতি না আরও কিছু! আমি বিয়ে করলাম আর কি ? তোর যদি এত পছন্দ তবে তুইই করগে যা।"

পাশের ঘরে প্রভার সাড়া পাওয়া যাইতেছিল। লুসি তাই ফিশ্ ফিশ্ করিয়া বলিল, "তাঁর ত আমায় পছন্দ হবে না গো ? আমি ত জমিদারের মেয়ে নই ?"

মমতা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "টাকাটাই ওদের আসল পছন্দ, মানুষ যে একটা কেউ হ'লেই হ'ল। ভাবলেই আমার গা জ্বলে যায়।"

লুসি বিজ্ঞভাবে বলিল, "ও ত পৃথিবীর সনাতন নিয়ম, ও নিয়ে রাগ ক'রে আর হবে কি ? তবু এটা এক দিকে ভাল, মা-বাপদের মেয়েদের জন্যেও কিছু খরচ করতে হয়, নইলে হতভাগা ছেলেগুলো ত সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে বসেই আছে।"

মমতা বলিল, "মেয়েদের জন্যে খরচ করা আর কি হ'ল ? টাকাটা ত আর তার রইল না ? সেই হতভাগা ছেলের দলেরই এক জনের গর্ত্তে ত গেল ?"

এমন সময় প্রভা খাইতে ডাকায় তাহাদের আলোচনাটা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না।

দেবেশ দেশে চলিয়া যাওয়াতে যামিনী খানিকটা নিশ্চিন্ত

হইয়াছিলেন। নিত্য এই এক ব্যাপার লইয়া সুরেশ্বরের সঙ্গে ঝগড়া করা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। নিজেরও ইহাতে কোন শান্তি থাকে না, সুরেশ্বরেরও শরীর খারাপ হয়। তাঁহার যদি পলাইবার কোন জায়গা থাকিত, দিন-কয়েকের জন্য অন্ততঃ মেয়েটাকে লইয়া পলাইয়া বাঁচিতেন। কিন্তু যাইবেনই বা কোথায়? সামনে পূজার ছুটিতে যদি ভাই-ভাজের সঙ্গে কোথাও যাইতে পারেন, তাহার আগে কোনই সুবিধা নাই। তখনও সুরেশ্বর যাইতে দিতে রাজী হইলে হয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়া যামিনী অন্যত্র আরাম করিতেছেন, এ ধারণা মাথায় আসিলে কখনই তিনি যাইতে দিবেন না।

মমতার কলেজের দিনগুলি বেশ একটির পর একটি করিয়া কাটিয়া যাইতেছে। স্কুলের দলের সকলেই প্রায় তাহারা একসঙ্গে পড়িতেছে।

অলকার সাজপোষাকের ঘটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার উপর নাকি তাহারও এক আই-সি-এস্ পাত্রের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে, কাজেই অলকা এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পড়াশুনায় তাহার আর মন নাই, কোন কালেই অবশ্য ছিল না। বাড়িতে নাকি তাহার জন্য এক জন মেম শিক্ষয়িত্রী শীঘ্রই রাখা হইবে, কায়দাকানুন এবং ইংরেজী বলা ভালমতে শিখাইবার জন্য। কলেজের প্রফেসররা অত ভাল ইংরেজী নাকি বলিতে পারেন না। মমতার জন্য কেন যে তাহার মা বাবা ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন না, তাহা অলকা কিছুতেই ভাবিয়া পায় না। সেও ত ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরেই ভবিষ্যতে যাইবে? তাহার জন্য ত উপযুক্ত ভাবে তৈয়ারী হওয়া দরকার। ক্লাসের মেয়েরা কেহ অলকাকে দেখিতে পারে না, তাহার নিত্য রাজা-উজীর মারা শুনিতে শুনিতে সকলের হাড় জ্বালাতন হইয়া যায়। মমতার সঙ্গে অনেকেরই বেশ ভাব হইয়াছে।

বর্ষা নামিয়াছে খুব। কলিকাতার লোকের তাহাতে খুব বেশী অসুবিধা নাই। রাস্তাঘাট জলে ডুবিয়া গেলে ঘণ্টাকয়েক সামান্য একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু বাংলা দেশের অনেক স্থানেই ভীষণ বন্যার আবির্ভাব হইয়াছে। গৃহহীন, আশ্রয়হীন নরনারীর আর্ত্তনাদে দেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। সুরেশ্বরের জমিদারীর ভিতরেও কয়েক জায়গা ভাসিয়া গিয়াছে। তাঁহার কাছে সাহায্যের জন্য ঘন ঘন আবেদন আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার যে কানে সে-সব ঢুকিতেছে, তাহাই বোধ হয় না। তাঁহার ধারণা প্রজারা দুষ্টামী করিয়া বাড়াইয়া বলিতেছে।

যামিনীর প্রাণে ব্যাপারটা বড়ই আঘাত দিতেছিল। স্বামী তাঁহার কথা নিশ্চয়ই শুনিবেন না, তাহা তিনি জানিতেন, তবু একবার কথাটা না-তুলিয়া পারিলেন না। কে যেন ভিতর হইতে সারাক্ষণ তাঁহাকে খোঁচাইতেছে। এত আরাম উপভোগ করিতেছেন তাঁহারা যাহাদের খাটুনির ফলে, তাহারা আজ দলে দলে অনাহারে নিরাশ্রয়ে মরিতে বসিয়াছে, তাহাদের জন্য তাঁহার কি কিছুই করিবার নাই?

শরীর খারাপ, পাছে খাওয়ায়-দাওয়ায় ডাক্তারের উপদেশের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয়, সেই ভয়ে যামিনী এখন সর্ব্বদাই সুরেশ্বরের খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকেন। ইহা লইয়াও কথা-কাটাকাটি হয়।

যামিনী যথাসম্ভব চুপ করিয়া থাকেন, নিতান্ত না পারিলে এক-আধটা জবাব দেন।

আজ খাইতে বসিয়া সুরেশ্বর নিজেই কথাটা তুলিলেন। বলিলেন, "দেখছ, আজও এক গাদা কেমন চিঠি এসেছে? একেবারে নাছোড়বান্দা।"

যামিনী বলিলেন, "মরতে বসলেও যদি মানুষ নাছোড়বান্দা না হয়, ত কিসে হবে? তুমি কিছু যে করছ না, সেটা কি খুব ভাল হচ্ছে নাকি?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তুমিও যেমন, যত ছোটলোকের কথায় বিশ্বাস করো। একখানাকে দশখানা ক'রে বলা ওদের চিরকালের স্বভাব। ওদের কথা শুনে চল্‌লেই আমার জমিদারী করা হয়েছিল আর কি?"

যামিনী বলিলেন, "দেশজুড়ে সবাই মিথ্যা কথা বলছে, এ কখনও হয়? যদি এতই অবিশ্বাস তোমার, নিজে গিয়ে একবার দেখে এস।"

সুরেশ্বর চটিয়া বলিলেন, "যাবার মত আমার শরীরটা খুব রয়েছে না? সে ভাবনা ত তোমার কত। তুমি নিজে যাও না সেই অজপাড়াগাঁয়ে, দু-দিনে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে এখন।"

যামিনী বলিলেন, "আমি যেতে এখনই রাজী আছি, যদি আমার যাওয়ায় কিছু কাজ হয়। কিন্তু তুমি ত আর আমার কথায় বিশ্বাস করবে না? সেই জন্যেই বলছি যে তোমার নিজে গিয়ে দেখা ভাল। গুষ্টিসুদ্ধ নবাবী করছি যাদের খাটুনির ফলে, তারা দলে দলে না খেয়ে জলে ভিজে মরছে, আর আমরা খাটের উপর ব'সে আছি, এ একটা মহাপাপ ব'লে আমি মনে করি।"

সুরেশ্বরের রাগ হইল অত্যন্তই, কিন্তু কি ভাবে উত্তর দিলে যামিনী সবচেয়ে খোঁচা খান তাহা তিনি কিছুতেই ভাবিয়া পাইলেন না। গজ্ গজ্ করিতে করিতে বলিলেন, "নিজের কাপড় গহনা যা আছে, সব দিয়ে দাও না গিয়ে, প্রাণে যদি এতই দয়া। দয়ার ধাক্কাটা আমার ঘাড় দিয়েই বা যায় কেন?"

যামিনী উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "বেশ তাই দেব, তখন যেন আমায় দোষ দিতে এস না।" বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া এখন সুরেশ্বরের আপসোস হইতে লাগিল। যামিনী যে-রকম মানুষ, অনেক টাকার জিনিষপত্র দিয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নয়। অন্য কোন কারণে না হোক, স্বামীকে জব্দ করিবার জন্যই তিনি তাহা করিবেন। ঘরে বাহিরে এত জ্বালাতন মানুষে সহ্য করে কি করিয়া? খাওয়া শেষ না করিয়াই সুরেশ্বর উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তাঁহার 'ব্লড প্রেসার' আজ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। চাকরকে বলিলেন ডাক্তার বাবুকে ডাকিবার ব্যবস্থা করিতে।

যামিনী চাকরের মুখে খবর শুনিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল আবার? এই ত বেশ ছিলে?"

সুরেশ্বর খাটে শুইয়া "উঃ, আঃ" করিতেছিলেন। বলিলেন, "এত উৎপাতে মানুষের শরীর কখনও ভাল থাকে? অসুখ করবে না ত কি?"

যামিনী একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "জগতে থাকতে গেলেই নানা অশান্তি ঘটে, তার আর উপায় কি? তা তোমার যদি এতে এতই শরীর খারাপ হয়, তাহ'লে জমিদারীর চিঠিপত্র আর তুমি প'ড়ো না। আমিই দেখব, খুব কিছু দরকারী থাকলে তোমায় জানাব। চিঠি লিখে তাদেরও কিছু লাভ হচ্ছে না, প'ড়ে তোমারও কিছু লাভ হচ্ছে না।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তা ত বুঝলাম, কিন্তু ঘরে তুমিও ত আমায় নিষ্কৃতি দাও না?"

যামিনী বলিলেন, "বেশ, আমিও আর তোমায় কিছু বল্‌ব না।"

সুরেশ্বরের মনের ভার তবু কমিল না। তিনি বলিলেন, "বলবে না ত, কিন্তু এমন কিছু ক'রে বসবে যে তার চেয়ে হাজার কথা বলাও ভাল মনে হবে।"

যামিনী হতাশ হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে কি হ'লে তোমার নিজের সুবিধে হয়, তাই না-হয় ব'লে দাও।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "সে কি আর এক কথায় বলা যায়, একটু বুঝে চল্‌লেই পার? মোট কথা, এখন হট্ ক'রে কতকগুলো গয়নাগাঁটি যেন দিয়ে ব'সো না।"

যামিনী হাসি চাপিয়া বলিলেন, "আচ্ছা," বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই বিকালে মমতা কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কলেজের মেয়েরা চাঁদা তুলছে মা, বন্যার জন্যে। আমি কি দেব?"

যামিনী তাহার হাতে দশ টাকার একটা নোট দিয়া বলিলেন, "এইটা এখন ত দাও, তার পর ভেবে-চিন্তে দেখা যাবে। আমাদের ত আরও ঢের বেশী দেওয়া উচিত, কিন্তু তোমার বাবার এখন অসুখ, কিছু বলতে গেলেই বিরক্ত হন, তাই কি ভাবে কি দেব, তা এখনও ঠিক করতে পারি নি।"

মমতা বলিল, "মা, টাকা দিতে না পারলেও অন্য জিনিষ ত দেওয়া যায়? ছেঁড়া কাপড়সুদ্ধ তারা নিচ্ছে। আমাদের ত দুই-তিন আল্‌মারী বোঝাই কাপড়, কোনো জন্মে অত কাপড় আমরা প'রে উঠতে পারব না, কিছু কিছু দিয়ে দিলে হয় না?"

যামিনী বলিলেন, "ও সব সৌখীন কাপড় গরিব-দুঃখী মানুষের কি কাজে লাগবে, মা? তাদের মোটা কাপড় দরকার। তুমি ভেবো না, আমরা কোন উপায়ে কিছু দিতে পারবই।"

মমতা বলিল, "দেশবন্ধু পার্কে এরই জন্যে খুব বড় সভা হবে মা, আমরা যাব? মেয়েদের জন্যে আলাদা জায়গা থাকবে।"

যামিনী বলিলেন, "ভেবে দেখি।" তিনি জানিতেন সোজাসুজি সুরেশ্বরের কাছে এ প্রস্তাব করিলে কখনই তিনি রাজী হইবেন না। অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। মেয়ের প্রাণেও যে দুঃখীর জন্য দরদ জাগিয়াছে দেখিয়া তিনি সুখী হইলেন। সুজিত আসল বাপ কা বেটা, টাকা উড়াইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত, টাকা কোথা হইতে আসে সে ভাবনা তাহার নয়। (ক্রমশঃ)

নর-নারীর সম্পর্ক ও স্বাধিকার নির্ণয়

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

নরনারীর সম্পর্ক ও তাদের কর্ম্মক্ষেত্রের সীমানা নিয়ে আমাদের সমাজে বর্ত্তমানে একটি সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। কতকগুলি নারী আজ আর পুরুষের শাসন এবং গৃহের বাঁধন মান্‌তে চাচ্ছেন না; অধিকন্তু বিবাহের স্থায়িত্ব, এমন কি তার প্রয়োজন পর্য্যন্ত স্বীকার করতেও কেউ কেউ নারাজ। দৈহিক পবিত্রতা নিয়ে যত হিতোপদেশ ও শাস্ত্রবচন চলে এসেছে এ যাবৎকাল, তাতে তারা বিশ্বাস করে না এবং এটাকে তারা প্রাচীন যুগের একটা অন্ধ কুসংস্কার ব'লে মনে করে। তরুণেরা অনেকে তরুণীদের সমানাধিকারের দাবি সম্বন্ধে তেমন জোরগলায় সায় না দিলেও, পরস্পরের অবাধ মেলামেশা সম্বন্ধে একমত। প্রাচীনপন্থীরা তরুণ-তরুণীদের এ-সব মতামত এবং তাদের আচরণ দেখে যে আঁৎকে উঠবেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু মধ্যপন্থী যাঁরা, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলার প্রয়োজন যাঁরা স্বীকার করেন এবং তাঁদের সময়ে তাঁরা চলেও এসেছেন এগিয়ে, তাঁরাও এখন আর এদের সঙ্গে সমান তালে চল্‌তে পারছেন না। তাই নূতন ক'রে বর্ত্তমান সামাজিক পরিস্থিতির বিচার করার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু তা বিচার করবার আগেই রক্ষণশীল দলের একটা বড় ভ্রান্ত ধারণা দূর ক'রে দেওয়া আবশ্যক। সেই ধারণাটা হচ্ছে এই যে, মেয়েদের উচ্চশিক্ষাই বর্ত্তমান অবস্থার জন্য সর্ব্বাংশে দায়ী। এটা সত্যি ব'লে আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি নে। কারণ পনর-বিশ বছর পূর্ব্বে যে-সব মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ উপাধি নিয়ে বের হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আজকালকার এ-রকম বে-পরোয়া আচরণ আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই নি। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সেগুলি ধর্ত্তব্য নয়। বর্ত্তমানে যে নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা হচ্ছে যুগ বা কাল ধর্ম্মের ফল—এইটে যদি আমরা অস্বীকার করি, তাহ'লে গোড়াতেই ভুল করব। কেমন ক'রে জানি নে,—জানবার আমাদের দরকারও নেই—আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরাতন অনেক আদর্শই ভেঙে পড়ছে। ঔদ্ধত্য বা স্বাধীন আচরণের দাবি নিয়ে একটি ছোট্ট বালকও আজ গুরুজনের শাসন অবলীলাক্রমে অস্বীকার করবার শক্তি ও মর্য্যাদা নিজের মধ্যে অনুভব করতে সুরু করেছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার সঙ্গে এর কোনরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে ব'লে বিশ্বাস হয় না, কারণ এই স্কুল-কলেজেই আমরাও একদিন পড়েছিলুম। ধর্ম্মশিক্ষা নীতিশিক্ষা আমাদের সময়েও ছিল না, এখনও নেই। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করি যে সৎ শিক্ষা লাভ করার কোন বিশেষ ব্যবস্থা বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে নেই, তাহ'লে সত্যের খাতিরে এ-কথাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, কু-জ্ঞান বা কু-আচরণ শিক্ষারও বিশেষ কোন ব্যবস্থা শিক্ষা-বিভাগ করেন নি।

স্কুল-কলেজে পড়ে আমরা ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞান আহরণ করি মাত্র। এতে আমাদের উপকার না হ'লেও, অপকার নিশ্চয়ই হ'তে পারে না। সুতরাং শিক্ষাকে অপরাধী করা, বর্ত্তমান অবস্থার জন্য

দাবী করা, সর্ব্বাংশে ভুল। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা যদি আমরা বন্ধ ক'রে দিই, তা হ'লে তারা অনেকখানি শক্তি হারাবে, বর্ত্তমান যুগে বেঁচে থাকবার ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে; কিন্তু সময়ের হাওয়া বন্ধ হবে না। তারা শিক্ষাই শুধু পাবে না, কিন্তু আর সব জিনিষই আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করবে। গোটাকয়েক "শিক্ষিতা" মেয়ের আচরণ অনিন্দনীয় নয় ব'লে আমরা উচ্চশিক্ষাকে সকল দোষের আকর ব'লে ধরে নিতে রাজী নই; কারণ চোখ মেলে একটু তলিয়ে দেখলেই আমরা দেখতে পাব, এ-দোষ শুধু তাদের নয়, এদোষ বর্ত্তমানকালের শহরবাসী তথাকথিত ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে অনেকেরই। বরং শিক্ষা যাঁরা পান নি, আধুনিকতার সব দোষই তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করেছে অল্প-বিস্তর; শুধু শিক্ষার সুবিধা বা গুণটুকুই তাঁদের মধ্যে নেই। উচ্চশিক্ষা যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত সেক্স্ য্যাপীল কাটিয়ে উঠে একদিন জ্ঞানের, কর্ম্মের ও আনন্দের উচ্চতর ক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন; কিন্তু অশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতা-দিগকে আধুনিকতার আবর্জ্জনা আঁকড়েই পড়ে থাকতে হবে। দশ-আনা ছ-আনা চুলের ছাঁট, অভিভাবকের কষ্টার্জ্জিত অর্থে পান-সিগারেটের শ্রাদ্ধ ও থিয়েটার-বায়োস্কোপ-দর্শন তাদের কমবে না; হব্ল্ ক'রে শাড়ী পরা, রুজ-পমেটম পাউডার মাখা, স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের সঙ্গে ট্রামে বাসে ভ্রমণও বন্ধ হবে না। তা বন্ধ করতে হ'লে আমাদের তরুণ-তরুণীদের ফিরে পাঠাতে হবে সুদূর নিভৃত পল্লীগ্রামে—চীনে প্রাচীরের অন্তরালে—যেখানে বিশ্ব-সভ্যতার হাওয়া আজও তেমন ক'রে প্রবেশ করবার পথ পায় নি। তাতে লাভ হবে, দুনিয়ার জীবন-সংগ্রামে শক্তিমানদের সর্ব্ববিজয়ী রথচক্রের চাপে আমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবার পথ আরও সুগম ও সহজ হবে; কিন্তু শেষের সেদিন পর্য্যন্ত মনসিজের ফুলশরের ক্রিয়া সেখানেও কোনরূপে বন্ধ হবে না।

দোষ যদি কিছু ঘটে থাকে তা হচ্ছে নূতন কালের, নূতন সভ্যতার। তারই বিশ্বগ্রাসী স্রোতের মুখে সকলের সঙ্গে আমরাও ভেসে চলেছি। শক্তিমানের পক্ষে যা হয়ত একটা নূতন রকমের খেলা, আমাদের মত দুর্ব্বল জাতির পক্ষে তাই হবে পরম সর্ব্বনেশে লীলা। কারণ ওরা সৃষ্টিও করে, ভোগও করে। আমরা সৃষ্টি করতে জানি নে, শুধু ভোগ করতে চাই। পশ্চিমের নূতন কামসূত্র,—হোলিউডের সস্তা চিত্র আমাদের দুয়ারে এসে হানা দিয়েছে, তার পাগল করা নববৃন্দাবনের বাঁশরীর আহ্বান নিয়ে। তাই ফ্রয়েড, হ্যাভলক্ এলিস্-এর যে সব বাক্য ছিল এতদিন শেল্‌ফে তোলা—তারা আজ আত্মপ্রকাশ করেছে নূতন অর্থ, নূতন রূপ নিয়ে, অনেকের বুভুক্ষু অন্তরের কাছে; তাদের দেহ-মন এক অভিনব চেতনার মধ্যে জেগে উঠেছে। চারিদিকের বঞ্চনা এবং আমাদের অপটুতা যতই বেড়ে চলেছে, ততই যেন তারা আদিম মানবের ক্ষুধা চরিতার্থ করবার সহজ উপায়ের মধ্যে মুক্তি ও সান্ত্বনা খুঁজতে সুরু করেছে এবং এর মধ্যে কোন দোষ নেই, পাপ নেই, এই প্রবোধ পাবার এবং দেবার জন্যে নূতন শাস্ত্র, নূতন নীতি জোরগলায় আওড়াতে আরম্ভ করেছে। মা যে শিশুকে ভালবাসে, আদর করে চুমো খায়, তার মূলে রয়েছে নরনারীর সেই আদিম প্রেরণা,* ফ্রয়েড-এর এই মতবাদই আজ আমাদের কাছে হয়েছে নূতন বেদ। তাই কে কবে অক্সফোর্ডে "সখ্য বিবাহে"র কথা বলেছিলেন, তারই সঙ্গে আমাদের অনেক কুমার বন্ধু গলা মেলাতে সুরু করেছেন। অপর সম্প্রদায়ের কেউ এতদূর পর্য্যন্ত গিয়েছেন কি না বল্‌তে পারি নে; কারণ এ রকম তরুণীর সাক্ষাৎলাভ আমার মত মধ্যবয়সী মধ্যপন্থীর আজও ঘটে নি। বালিশের খোলের মত মোটা অক্সফোর্ড ট্রাউজার অনুকরণ ক'রে সাহেব সাজা যত সহজ, আগুন নিয়ে খেলা ততটা সহজ নয়। অক্সফোর্ডের ধ্বনি অক্সফোর্ডে সম্ভবতঃ থেমে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের কোন কোন তরুণ এমন গালভরা কথা, আধুনিকতার এতবড় নজির, সহজে ছাড়তে রাজী নয়। এতে তাদের হানিমুন হবে অক্ষয়, পূর্ব্বরাগের বসন্ত হবে অটুট। বিবাহের হিমশীতল হাওয়া আর তাদের জীবনকে মিইয়ে দিতে পারবে না! পশ্চিম থেকে আমদানী

* ফ্রয়েডের এই মতের ভুল দেখাইয়াছেন Prof. William McDougall, F. R. S., তাঁহার "An Outline of Psychology," pp. 431, 432, এবং "An Outline of Abnormal Psychology," pp. 417, 418, 419, 421এ। ফ্রয়েডের তিন জন প্রধান শিষ্য Jung, Adler, ও Stekel, তাঁহার Pan-sexuality মত মানেন না। ফ্রয়েড নিজেও Pan-sexuality মত পরিত্যাগ করিয়াছেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।

নবুদ পেলে এই তরুণরা আর কারও কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু পশ্চিম সত্যের অনুসন্ধানে, গবেষণা হিসাবে যে-সব বিষয়ের আলোচনা করে মাত্র, তারা অমনি তা নিজ জীবনে গ্রহণ ক'রে ব'সে আছে। অনেক কিছু কাজের ফাঁকে অবসর-মুহূর্তে সে দেশের তরুণ-তরুণীরা অবাধ মেলামেশার মধ্যে আত্মসমর্পণ যদি বা করে, তা হ'লেও তার মধ্যে সমাজধারার ভেতর দিয়ে পাওয়া এমন একটা কিছু নিয়ম ও সংযম আছে, যা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু আমাদের সব কাজকর্ম্ম জাহান্নামে গেল, অন্নবস্ত্রের সমস্যা নিদারুণ হয়ে উঠল,—সে জন্য আমাদের ভাবনা নেই, সমাজের এই দুর্দ্দিনে ও দুঃসময়ে আমাদের এই তরুণ-তরুণীদের সকল মন অধিকার করল কি না একমাত্র আদিরস। কি কুক্ষণেই ফ্রয়েড মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ সব কথা লিখেছিলেন। তাঁর কথার বিকৃত অর্থ ক'রে এরা নরনারীর সম্পর্ককে আজ যে-ভাবে নোঙ্‌রা ক'রে তুলবার চেষ্টা করছে, তিনি যদি তা দেখ্‌তে পেতেন তা হ'লে পরম অনুশোচনায় তাঁকে হয়ত তাঁর পুঁথি পুড়িয়ে ফেলতে হ'ত। নরনারীর কামজ ভালবাসা নিয়েই যেন এই সংসারটা এবং মানুষের এই জীবন। তা ছাড়া যেন এই দুনিয়ায় আর কিছু নেই, আর কেহ নেই। জ্ঞানের আজন্ম তপস্যায় কত লোক জীবন কাটিয়ে দিলে, সত্যের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য কত লোক পথের ভিখারী হ'ল, সমাজ ও দেশের কল্যাণের জন্য কত নরনারী নিঃশেষে আত্মবলিদান দিলে, দুর্গতের দুঃখনিবারণের জন্য কত মানবহিতৈষী আজন্ম সেবাব্রত গ্রহণ করলে, সচ্চিদানন্দের প্রেম-আরাধনায় কত মুনিঋষি তন্ময় হ'য়ে রইল, এ সব আজ আর এরা চোখে দেখতে পায় না বা চোখে দেখতে চায় না। কারণ ফ্রয়েড বলেছেন—আমাদের সকল কাজের মূলেই রয়েছে আদিম মানবের কামপ্রেরণা এবং তাকে বাদ দিয়ে আর কিছু হবার উপায় নেই!* কিন্তু এই অসংযত বিশৃঙ্খল যৌন আকর্ষণের হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে, তাতে ইন্ধন জুগিয়ে, আমরা কি লাভ করব? নরনারীর প্রেম যেমনি শাশ্বত, তেমনি সুন্দর জিনিষ। এটা সৃষ্টিধর্ম্মের একটা বড় অংশ। সত্য শিব ও সুন্দরের মূলে নিশ্চয়ই এই প্রেমানুভূতি রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা তার অন্তর্নিহিত নিয়ম ও সংযম। তাকে বাদ দিয়ে যদি আমরা এই প্রেম লাভ করতে যাই, কি মঙ্গল লাভ আমাদের হ'তে পারে? যেখানে অমৃত উৎসারিত হ'তে পারত, সেখানে কি শুধু হলাহল গরল উদ্‌গিরণ হবে না বা হচ্ছে না?

পরকীয় বা পরকীয়া প্রীতির প্রয়োজন প্রমাণ করবার জন্য একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত এরা সৃষ্টি ক'রে ফেলেছে। সেই ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, কবি, শিল্পী, ভাবুক বা কর্ম্মী যদি কোন সুন্দরী নারীর সঙ্গ থেকে বিশেষ প্রেরণা পায় তবে সমাজের অন্যায় শাসনে তাকে তা থেকে বঞ্চিত ক'রে আমরা তার শক্তিকে পঙ্গু করব কোন্ অধিকারে? "A thing of beauty is a joy for ever"—কবির এ বাণী যদি সত্যি হয় তবে আমরা কতকগুলি পুরাতন অপদার্থ সংস্কারের বশে তাকে ঠেকাব কোন্ সুবাদে? সহজ উত্তর হচ্ছে এই যে, সুন্দরকে যে ভাবে এরা পেতে চায়, সে রকমে পেতে গেলে সুন্দর আর সুন্দর থাকবে না এবং প্রকৃত পাওয়া থেকে আমরা বঞ্চিত হব। পূর্ণিমার চাঁদকে আমরা টেনে নামিয়ে আনি নে, সুন্দর সুগন্ধ ফুলকে আমরা নিষ্ঠুর মুষ্টির মধ্যে পীড়িত করি নে—প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য আমরা নানা রূপে নানা ভাবে দেখতে পাই, তাকে আমরা পরম শ্রদ্ধার সহিত নিঃশব্দে উপভোগ করি, তাকে উপলব্ধি করি আমরা অনুভূতির মধ্যে, ভাবের মধ্যে, তাকে আবদ্ধ করি নে আমরা পাগলের মত ভোগের বস্তু হিসাবে। শ্রদ্ধা হারিয়ে, সংযম হারিয়ে, প্রকৃতির বিধানকে লঙ্ঘন ক'রে আমরা যা পাব, তা সত্যও নয়, শিবও নয়, সুন্দরও নয়।

কালের স্রোতকে ফেরাতে আমরা পারব না, কিন্তু তাতে মূঢ়ের মত ভেসে চললেও আমরা বাঁচতে পারব না; আমাদের অকূলে তলিয়ে যেতে হবে। এই স্রোতকে স্বীকার ক'রে নিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র তরীকে সামলাতে হবে, তীর লক্ষ্য ক'রে সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে। আমি যখন কীর্ত্তিনাশার তীরে বাস করতুম, বর্ষার দুকূল-ভাঙা খরস্রোত, কালো মেঘ, আর নৌকার দুলুনি—এই তিনের মিলন হ'লেই আমার এক ছোট ছেলে (নিতান্ত শিশু নয়) নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়তে চাইত। সেটা অকূলের বা অসীমের আহ্বান হ'তে পারে; কিন্তু আমরা কোন তরুণ-তরুণীর এমন

* আগেকার পাদটীকা দেখুন।—প্রবাসীর সম্পাদক

ব্যর্থ পাগলামীতে আত্মবলিদানের অনুমতি দিতে পারি নে।

মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্। পুরুষের স্বাধীনতার মত নারীর স্বাধীনতাকে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আজ আমাদের মানতে হবে। পুরুষের পক্ষে শিক্ষা যেমন অপরিহার্য্য, নারীর পক্ষেও তাই; কারণ উভয়েই মানুষ এ কথা আমরা স্বীকার ক'রে নিয়েছি। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি পুরুষের পক্ষেও আদর্শ নয়, নারীর পক্ষে আরও নয়। কিন্তু পুরুষের শিক্ষা দোষত্রুটিহীন নয় বলেই তা যেমন আমরা বন্ধ রাখি নে; নারীর শিক্ষাও তেমনি বন্ধ রাখব না; কারণ অশিক্ষা অপেক্ষা এ শিক্ষাও নিঃসন্দেহে বাঞ্ছনীয়। উভয়ের জীবনের উদ্দেশ্য ও অধিকার ঠিক ক'রে নিয়ে উভয়বিধ শিক্ষা-সংস্কারের চেষ্টা আমরা করব। সেই জন্যই শিক্ষা-সংস্কারের পূর্ব্বে পরস্পরের অধিকার নির্ণয় করা দরকার। সেই বিচারই এখন করা যাক্।

বিধাতাপুরুষকে যদি অস্বীকারও করি, প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করতে পারি নে। অনেক কিছু সমস্যার সমাধান আমাদের জীবনে সহজ হয়ে যায় যদি আমরা প্রকৃতিরূপ বৃহৎ পুঁথিখানা একবার ভাল ক'রে পড়বার ও বুঝবার চেষ্টা করি। সৃষ্টির সব রহস্য তারই মাঝে নিহিত রয়েছে, একটু হুঁস হয়ে চোখ মেলে দেখে নেওয়ার অপেক্ষায়। প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে নারীকে হ'তে হয়েছে জননী এবং পুরুষকে হ'তে হয়েছে জনক; এর ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। কোন মানব-শিশুর পাঁচ আঙুলের জায়গায় ছ-আঙুল গজাতে পারে, দু-হাত না হ'য়ে তিন হাতও কারও থাকতে পারে—প্রকৃতির দুষ্ট খেয়ালে; কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টি হ'তে ভুলেও কোন পুরুষ কোন দিন সন্তান ধারণ করে নি এবং বুকের দুধ দিয়ে শিশু মানুষ করে নি। মানুষের জ্ঞান প্রকৃতির উপর যতই দৌরাত্ম্য ও আধিপত্য করুক না কেন, আজও এটা সম্ভব ক'রে তুলতে পারে নি। কথাটা খুব পুরনো হ'লেও আমরা যেমন ক'রেই হোক এই সত্যটাকে উপেক্ষা করবার ভান করছি। অতি-প্রগতিশীল মেয়েদের ভিতরকার ভাবখানা অনেকটা এই রকম—সন্তান-ধারণের ভার যদি অন্যান্য ভারের মত পুরুষের কাঁধে চাপান না-যায়, তা হ'লে এটুকু অন্ততঃ করা যেতে পারে যে আমরা কেউই সে ভার গ্রহণ করব না। কিন্তু এচেষ্টা হবে সৃষ্টির মূলতত্ত্বের বিরোধী—প্রকৃতির নিয়মের প্রতিকূল, সুতরাং অসঙ্গত ও অপরিণামদর্শী। আমার বক্তব্য এই যে, মেয়েদের প্রধানতঃ মা হ'তে হবে। তাই তার বিশেষ রকম কতকগুলি প্রয়োজন আছে, যেমন সাময়িক বিশ্রাম ও পুরুষের অভিভাবকত্ব। জিনিষটাকে বাড়িয়ে বলবার দরকার নেই, সহজ যুক্তির দিক্ থেকে বিবেচনা করলেই এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে গৃহিণী ও জননীরূপে গৃহই নারীর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র এবং পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র প্রধানতঃ রইবে বাইরে—গৃহের প্রয়োজন সংগ্রহের জন্য। কথাটা নিতান্ত প্রাচীনপন্থীদের মামুলী কথার মত শোনালেও আমরা এ কথা বলতে বাধ্য। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বাদ দিয়ে আমরা উভয়েই যদি বাইরের কাজে স্বাধীন উপার্জ্জনে লাগতে চাই, কাজ-জোটা আমাদের হবে আরও কঠিন, বেকার-সমস্যা বাড়বে বই কমবে না, সামাজিক সমস্যা আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে—যেমন ইউরোপে হচ্ছে। তার চাইতে প্রকৃতির নির্দ্দেশে কর্ম্মবিভাগ মেনে নিলে, দু-জনারই যথেষ্ট কাজ করবার থাকবে (অন্ততঃ অকাজ বাড়বে না)—নীড়ও বজায় থাকবে, বিধাতাপুরুষও হবেন সন্তুষ্ট। সমাজের হালচাল দেখে হিট্‌লার, মুসোলিনীও তারই ব্যবস্থা করেছেন। অবশ্য তা ব'লে আমরা এমন কথা বলি নে যে অন্তঃপুর ও বহির্জগতের মধ্যে সীতার জন্য দেবর লক্ষ্মণের আঁকা দুর্লঙ্ঘ্য সীমারেখা টেনে দিতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মর্য্যাদা হবে সমতুল্য—ঘরে এবং বাইরে; প্রয়োজনের তাগিদে, প্রকৃতির নিয়মে কর্ম্মক্ষেত্র শুধু হবে বিভিন্ন—কিন্তু অলঙ্ঘনীয় নয়।

পুরুষ ও নারীর সীমা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে আমরা এত দূর পর্য্যন্ত যেতে রাজী আছি যে, সকল নারীর বিবাহের প্রয়োজন নাও থাকতে পারে, মাতৃত্বের দাবির চাইতে জ্ঞানের অনুশীলন কিংবা বাইরের কর্ম্মপ্রেরণা তাদের কাছে প্রবলতর হ'তে পারে—তাদের এই দাবি আমরা অস্বীকার করব না, সেটা হবে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—নিয়ম নয়।

কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে এই সীমানির্দ্দেশ যদি আমরা স্বীকার করি তা হ'লে নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী শিক্ষার তারতম্যও আমাদের স্বীকার করতে হবে—আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারের "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষানীয়াতি যত্নতঃ"—

এই মূলনীতি মেনে নিয়ে। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান উভয়কেই শিখ্‌তে হবে; সেটা হ'ল প্রত্যেক ইমারতের ভিত্তির মতই অপরিহার্য্য। তার পর যার যে-রকম প্রয়োজন সেই বুঝে পছন্দসই উপরের কাঠাম তৈরি হবে। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার যোগ্য এবং অভিলাষী তারা নরনারীনির্ব্বিশেষে তা গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু যেমন সাধারণ মেধার ছেলেদের বেলা শিক্ষার মধ্যমান (secondary education) সমাপ্তির পর আমরা তাদের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করি, তেমনি মেয়েদের বেলাও তার বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্র গৃহের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। যথা, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, স্ত্রী-স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিশুপালন, সেবা, রন্ধন, সীবন-কার্য্য ইত্যাদি।

এতক্ষণ যা বললুম তা হ'ল মুখবন্ধ বা আইনের হেতুবাদ (whereas)। এখন ক্রমিক নম্বর দিয়ে আমার প্রস্তাবিত আইনের ধারাগুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করব। সকল দলই এই আপোষ বা বণ্টননামা অনুযায়ী নূতন আইন মেনে নিতে রাজী আছেন কিনা ভেবে দেখবেন। প্রতিভার জাত নেই। তার কথা স্বতন্ত্র।

এখানে যা বলা হচ্ছে তা সাধারণ নরনারীর জন্য।

(১) ছেলে ও মেয়ে উভয়েই সমানভাবে সাধারণ শিক্ষা (যাকে আমরা secondary education standard বলি) পাবার অধিকারী, এতে কোন পক্ষ আপত্তি করতে পারবেন না।

(২) সাধারণ শিক্ষালাভ করার পর মেয়েরা বিশেষ ক'রে গৃহিণী হবার উপযোগী শিক্ষার জন্য সাধারণতঃ প্রস্তুত হবেন এবং ছেলেরা প্রস্তুত হবেন কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য।

ব্যতিক্রম :—কিন্তু যে-সব মেয়ে উচ্চতম শিক্ষালাভের জন্য অভিলাষিণী তাঁদের অভিলাষে সমাজ বাধা দিতে পারবে না।

টীকা :—বিবাহের সম্বন্ধকে অক্ষুণ্ণ, শান্তিময় ও টিকসই করবার জন্য বিশেষরূপ শিক্ষার ও মনোবৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজন আছে ব'লে আমরা মনে করি। বিবাহ-সম্বন্ধ জগতের অন্য কোন বিষয় অপেক্ষা কম টেক্নিক্যাল নয়। তাই আমেরিকায়, জার্ম্মেনীতে যেমন মেয়েদের উপযুক্ত গৃহিণী করবার জন্য অধুনা বিশেষ প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, আমাদেরও তাই করতে হবে। এই ব্যক্তিত্বের যুগে একসঙ্গে চলবার জন্য যে পরম সহিষ্ণুতা, ত্যাগস্বীকার ও উদারতার প্রয়োজন, সে-সম্বন্ধে তরুণ-তরুণী উভয়েরই বিবাহের পূর্ব্বে হ'তে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করা আবশ্যক।

(৩) বিবাহ এবং গৃহধর্ম্মই মেয়েদের আদর্শ, এটা সাধারণ নিয়ম হিসেবে মেয়েদের মেনে নিতে হবে।

ব্যতিক্রম :—অবশ্য যাঁরা অন্য কোন উচ্চ আদর্শের প্রেরণায়, যথা, শিক্ষাবিস্তার, সেবাব্রতগ্রহণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বিবাহে অনিচ্ছুক, নূতন সামাজিক আদর্শে তাঁহাদিগকে হেয়জ্ঞান করা হবে না। পুরুষের ক্ষেত্রেও সেই একই আদর্শ নির্দ্দিষ্ট হবে।

(৪) স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে পুত্র ও ভ্রাতার সহিত নারীর সমানাধিকার থাকবে।

(৫) বিপত্নীকের দারপরিগ্রহে যেমন বাধা নেই, বিবাহেচ্ছুক বিধবাদেরও বিবাহে কোন সামাজিক বাধা থাকবে না।

টীকা :—প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কল্যাণে আইনের বাধা পূর্ব্বেই দূর হয়েছে। সন্তান-সন্ততি থাকা সত্ত্বেও বেশী বয়সে কোন পুরুষ বিয়ে করলে যেমন সমাজে হেয় ও বিরুদ্ধ সমালোচনার যোগ্য ব'লে গণ্য হয় এবং সমাজের এই মনোভাব তাকে অনেকটা সংযত রাখে, মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই হবে ব'লে আমরা মনে করি এবং প্রাচীনপন্থীদের ভয় পেতে বারণ করি।

(৬) বিশেষ জুলুম, অবিচার ও অনাচারের ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নরনারীকে দিতে হবে। যদৃচ্ছা যে-কোন অজুহাতে এ বিচ্ছেদ আইনতঃ ঘটতে পারবে না।

টীকা :—এতে আমাদের প্রাচীন বন্ধুদের বেশী ভয় পাবার কারণ আছে ব'লে আমরা মনে করি নে; পৃথিবীর মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ সবচেয়ে সহজ করা হয়েছে সোভিয়েট রুশিয়ায়। আমরা শুনেছিলুম সে-দেশ থেকে বিবাহ উঠে গেছে* ; কিন্তু মুক্তির পথ সহজ হ'লেও হয়ত সেই জন্যই তারা

* উঠিয়া যায় নাই।—প্রবাসীর সম্পাদক।

মুক্তি নিচ্ছে না। আমেরিকা, ফ্রান্স ও অন্যান্য অনেক দেশের চাইতে রুশিয়ায় বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা কম।

(৭) পুত্রকন্যার বিবাহে পিতামাতা তাদের মত গ্রহণ করবেন, পক্ষান্তরে পুত্রকন্যাও পিতামাতার মত গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন। মতবিরোধ ঘটলে তিন জনের মধ্যে দু-জনের মত প্রবল হবে। পিতামাতার মধ্যে এক জনের অবর্ত্তমানে দুয়ের মতভেদ হ'লে পরবর্ত্তী নিকটতম অভিভাবক বা আত্মীয়ের মত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই পুত্র বা কন্যার অমতে বিবাহ হ'তে পারবে না।

টীকা :—পিতামাতা সংসার সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ এবং তাঁদের চেয়ে হিতৈষী সন্তানের আর কেউ নেই। তাই অনভিপ্রেত বিবাহ বন্ধ করবার ক্ষমতা তাঁদের যুক্তভাবে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু জোর ক'রে বিয়ে দেবার অধিকারও তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সংমা বা সংপিতাকে অধিকার দেওয়া হবে কি না তা নির্ভর করবে নূতন সামাজিক ব্যবস্থা কিরূপ চলে, দেখবার পর। তাই এ সম্বন্ধে এখন কোন ব্যবস্থা করা হ'ল না।

(৯) বিধবা ও অবিবাহিতা মেয়েকে, এমন কি বিবাহিতা মেয়েকেও নিজের জন্য বা পরিবার-প্রতিপালনের জন্য সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের অধিকার দিতে হবে।

টীকা :—ইচ্ছা এবং চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক মেয়ের বিবাহ সম্ভবপর না হ'তে পারে ; বিধবা নিরাত্মীয় হ'তে পারেন বা আত্মীয়েরা তাঁর ভার নিতে রাজী না হ'তে পারেন ; বিবাহিতার বেলায় স্বামীর আয় পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট না হ'তে পারে ; এই সব কারণে এই অধিকার স্বীকার করতে হবে। তবে এটা হবে অনন্যোপায়ের ব্যতিক্রম।

পরিশেষে আমার বক্তব্য—প্রয়োজনের দাবিতে ও নূতন আর্থিক ও অন্যবিধ অবস্থার চাপে অপেক্ষাকৃত কম অমঙ্গলকর হিসাবে (lesser evils) অনেক কিছু ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের এখানে মেনে নিতে হয়েছে ; কিন্তু তাতে ভয় পাবার কিছু নেই যদি মানুষের মধ্যে দেবতার পাশে যে বর্ব্বরটা ব'সে আছে তাকে আমরা আসন ছেড়ে না দিই। নরনারীনির্ব্বিশেষে আমরা মানুষের স্বাধীনতাকে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা এক জিনিষ নয়। আমাদের চুপ ক'রে থাকলে চলবে না। বর্ত্তমান দুনিয়ার ও সময়ের সঙ্গে যোগ রেখে আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শকে ঠিক ক'রে নিতে হবে এবং তার অনুকূলে জনমত গঠন করতে হবে।

বিশেষ ক'রে মেয়েদের সাবধান হ'তে হবে ; কারণ বহু যুগের অবরোধের কারা ভেঙে আজ যাদের মুক্তি ঘটেছে, তাদের মুক্তির আনন্দ আজ অসীম। অভিভূত মোহের অঞ্জন আজ তাদের চোখে চোখে। পুরুষ অভিজ্ঞ পাকা খেলোয়াড়—নূতন নূতন শিকারকে আত্মবিস্মৃত দেখে আজ তাদের আনন্দের সীমা নেই—তরুণীদের তাই হুঁসিয়ার ক'রে দিচ্ছি, পুরুষের ফাঁদে যেন সহজে পা না-বাড়ান, যে-কোন পথিক হাওয়ার শিহরণে শরতের হাল্কা মেঘের মত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরে না বেড়ান।

[প্রবাসীর সম্পাদকের মন্তব্য। যাঁহারা নিজে কোন পর্য্যবেক্ষণ, গবেষণা, চিন্তা, বিস্তৃত অধ্যয়ন না করিয়া ফ্রয়েডের মত বলিয়াই তাঁহার কোন মত গ্রহণ করেন, তাঁহাদের এই জার্ম্যান মনীষীর অন্য মতও গ্রহণ করা উচিত। তাঁহার এইরূপ একটি মত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ভাদ্রের 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"We believe that civilization has been built up, under the pressure of the struggle for existence, by sacrifices in gratification of the primitive impulses, and that it is to a great extent for ever being re-created, as each individual, successively joining the community, repeats the sacrifice of his instinctive pleasures for the common good. The sexual are amongst the most important of the instinctive forces thus utilized; they are in this way sublimated, that is to say, their energy is turned aside from the sexual goal and diverted towards other sides, no longer sexual, and socially more valuable. But the structure thus built up is insecure, for the sexual impulses are with difficulty controlled; in each individual who takes up his part in the work of civilization there is danger that a rebellion of the sexual impulses may occur, against this diversion of their energy. Society can conceive of no more powerful menace to its culture than would arise from the liberation of the sexual impuleses and a return of them to their original goal."

Sigmund Freud, Introductory Lectures on Psycho-analysis (Eng. translation by John Riviere) London, 1933, pp. 17-18.

অর্থাৎ "আমাদের বিশ্বাস, জীবনসংগ্রামের চাপের মধ্যে মানব-

সভ্যতা যে গঠিত হইতে পারিয়াছে তাহার কারণ মানুষ রিপুগুলিকে চরিতার্থ না করিয়া সংযত করিয়াছে ; এবং এই সভ্যতা যে অনেকটা পুনঃ পুনঃ গঠিত হইতেছে বা উন্নতিলাভ করিতেছে তাহারও কারণ, যেমন এক এক জন মানুষ সমাজে স্থান লাভ করে সে তেমন সর্ব্বসাধারণের হিত-সাধনের জন্য তাহার সহজ ভোগলালসা উৎসর্গ করিয়া থাকে। এইরূপে যে সকল বিষয়কে সংযত করিয়া জনহিতে নিয়োজিত করা হয় তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কামরিপু। এইরূপে কামরিপুকে উন্নীত করা হয় (sublimated), অর্থাৎ তাহার শক্তি ভোগের পথ হইতে সরাইয়া, সমাজের হিতকর পথে চালিত করা হয়। কিন্তু এই প্রকারে যে ইমারত (সভ্যতা) তৈয়ারী করা হয় তাহা নিরাপদ নহে, কারণ কামরিপু সংযত রাখা কঠিন। যে ব্যক্তি সমাজের হিতের জন্য সভ্যতার ইমারত গঠনে হস্তক্ষেপ করে, তাহার পক্ষেই এই ভয় থাকে, তাহার রিপু বিদ্রোহ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে সৎপথে পরিচালনে বাধা উৎপাদন করিতে পারে। স্বেচ্ছাবিহারী হইলে সভ্যতার যে ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, সমাজের পক্ষে তদপেক্ষা গুরুতর বিপদ কল্পনা করা যায় না।"*

রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছেন :

মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে অক্সফোর্ড হইতে ডাক্তার জে, ডি আন্‌উইন কৃত *Sex and Culture* নামক একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সভ্য এবং অসভ্য জাতিনিচয়ের আচার-ব্যবহারের ইতিহাস আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার ইন্দ্রিয়সংযমের সহিত মানবসমাজের উন্নতি-অবনতির সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই আলোচনার ফলে তিনি কয়েকটি নীতি বা নিয়ম (law) নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অতীত-কালে মানবসমাজ এই সকল নীতির দ্বারা নিয়মিত হইয়াছে, এবং আশা করা যায় যে ভবিষ্যতেও হইবে। তন্মধ্যে প্রথম নিয়ম এই—

"The cultural condition of any society in any geographical environment is conditioned by its past and present methods of regulating the relations between the sexes."

"অতীতে এবং বর্ত্তমানে যে-সকল উপায়ে স্ত্রীপুরুষের যৌন-সম্বন্ধ নিরূপিত হয় তাহার উপর দেশবিদেশের জনসমাজের সভ্যতা অর্থাৎ উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে।"

দ্বিতীয় নিয়ম—

"No society can display productive social energy unless a new generation inherits a social system under which sexual opportunity is reduced to a minimum. If such a system be preserved, a rich and yet richer tradition will be created, refined by human entropy."

অর্থাৎ "যে সামাজিক ব্যবস্থা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ খুব কমাইয়া দেয়, এইরূপ ব্যবস্থা যে-সমাজে প্রচলিত না থাকে, সেই সমাজ সৃষ্টিক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু এই প্রকার সংযমের ব্যবস্থা যদি রক্ষিত হয় তবে সমাজ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।"]

বঞ্চিত

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ

১

অকলঙ্ক তুষারশুভ্র যৌবনের উপর যেদিন কলঙ্কের প্রথম মসীরেখাপাত হইল, সেদিন মং-বা আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিল না!

মান্দালয়ের বাজারে সেদিন বড় ভিড়। সন্ধ্যায় উজ্জ্বল দীপাধারে আলো জ্বলিতেছে। সুবেশধারিণী নর্ত্তকী ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিতেছে। সুদৃশ্য চিক্কণ বস্ত্রের উপর শ্বেত, পীত, নীলাভ প্রস্তরখণ্ড ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিতেছে। নৃত্যের ছন্দবন্ধে, লীলায়িত তনুর গতিভঙ্গীতে, বাদ্যের সুমিষ্ট নিক্কণ মিশিয়া যেন তরঙ্গায়িত লালসার হিল্লোল তুলিয়াছে!

নর্ত্তকী যুবতী এবং পরম রূপবতী।

নাচিতে নাচিতে যুবতীর দৃষ্টি যেখানে মং-বা বসিয়া হঠাৎ সেখানেই নিবদ্ধ হইল। সম্মুখে উপবিষ্ট সুঠাম সুপুরুষ মং-বাকে দেখিয়া তাহার চক্ষু যেন আর ফিরিতে চাহিল না—শুভ্র হীরকাধারে উজ্জ্বল আলোক যেমন আপনার পরিপূর্ণ জ্যোতিতে ঝলকিয়া উঠে, তেমনই যুবতীর দৃষ্টি মং-বার মুখের উপর পড়িয়া আপনার অপূর্ব্ব দ্যুতিতে স্ফুরিত হইয়া উঠিল। মং-বাও যুবতীর দিকে চাহিয়াছিল—যেন আত্মহারা—যেন হঠাৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব রত্নের সন্ধান মিলিয়াছে!—এমনি করিয়াই বুঝি লৌহ চুম্বকে আকৃষ্ট হয়, বুঝি পতঙ্গ বহ্নির লেলিহান রূপশিখার পানে ছুটিয়া যায়!

নৃত্য থামিয়া গেল। মং-বার সম্বিৎ ফিরিল; মন্ত্রমুগ্ধের মত জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি, পিয়ারী?"

নর্ত্তকী বিলোল কটাক্ষে চাহিল—বর্ণচ্ছটায় যেন সমস্ত

আলো নিষ্প্রভ হইয়া গেল। যুবতী মধুর হাসিয়া বলিল—"আমি মা-খিন্।"

সেইদিন হইতে মং-বার জীবনে সমস্ত উলট্‌পালট্ হইয়া গেল।

বড়লোকের ছেলে সে—অগাধ সম্পত্তি, অসীম প্রতিপত্তি। ব্রহ্মরাজ মিন্দন মিনের সময় তাহার প্রপিতামহ ভারতবর্ষ হইতে এদেশে আসিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের প্রকাণ্ড কারখানা, বিশাল সম্পত্তি গড়িয়া উঠে। এখন সে-ই সে প্রকাণ্ড ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। মাতা বহুদিন স্বর্গগতা হইয়াছেন। বৃদ্ধ পিতা কামাল সাহেব কারবারের ভাবনাচিন্তা পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া মক্কার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। শুধু পুত্রস্নেহেই এতদিন হজ্র-তীর্থে যাইতে পারেন নাই। তাঁহার শেষ বাসনা, পুত্রকে সংসারী করিয়া দিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনকয়টা হজরত-পদলাঞ্ছিত পবিত্র মক্কায় কাটাইয়া দিবেন।

পুত্র কিন্তু সংসার সম্বন্ধে এখনও উদাসীন। সে এখনও পিতার আশ্রয়ছায়ায় বর্দ্ধিত হইতে চায়। বিষয়-সম্পত্তি পিতার কল্যাণে সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে সুশৃঙ্খলায় চলিয়া যাইতেছে। শুধু সে উপলক্ষ্যহিসাবে দৈনন্দিন কাজ করিয়া যায়। তাহার মন কিন্তু পড়িয়া থাকে পুস্তকের পৃষ্ঠায়, খেলার মাঠে আর পার্ব্বত্য উপত্যকার শ্যাম বনানী-প্রান্তে।

বড়লোকের ছেলের এই যুবাবয়সে এহেন চরিত্র অদ্ভুত লাগে বটে। কিন্তু মং-বা বরাবরই এমনি অদ্ভুত স্বভাবের ছেলে ছিল। তাহার পিতাও এ বিষয়ে তাহাকে উৎসাহ দিতেন। কামাল সাহেব অপত্যস্নেহপরায়ণ হইলেও নৈতিক চরিত্রের দিকে অত্যন্ত সংযমী ও কঠোর বিচারক ছিলেন। এখানে মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাও তাঁহার কাছে অসহ্য। তাই অন্যান্য বড়লোকের ছেলেদের মত মং-বা যাহাতে অল্পবয়সে খারাপ হইয়া না-যায়, সেদিকে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল স্বভাবসংস্কারবশে মং-বা যখন সুপথগামী হইল, তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। ছেলে বড় হইয়া উঠিল, সরল, সচ্চরিত্র, শিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইল, কলেজ হইতে সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়া বৃত্তি লইয়া ঘরে আসিল, পিতা আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন।

কিন্তু, আজ, এ কি? সে-সংযমের বাঁধ কোথায় ভাসিয়া গেল? মং-বা শিহরিয়া উঠিল।

সে আজ করিতেছে কি—কোন্ নর্ত্তকীর মুখচন্দ্র ভাবিয়া এত দিনের সাধনা, এত দিনের গৌরব এক নিমেষে বিলুপ্ত করিয়া দিবে? তাহার পিতাই বা তাহাকে ভাবিবেন কি, আর সেই বা কি বলিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিবে?

সমস্ত রাত্রি সে বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইল। তাহার সারা শরীরে যেন অসহ্য উত্তাপ, সমস্ত শয্যায় যেন কাঁটা ফুটিতেছে। মনে মনে সে যতই তর্ক করুক না কেন, স্বাভাবিক সংস্কারকে, আভিজাত্য-গর্ব্বকে যতই তাহার চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করাক না কেন, রহিয়া রহিয়া যেন সেই নর্ত্তকীর প্রলুব্ধ হাসি তাহার চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া আসিতে লাগিল—যুবতীর লীলাচঞ্চল সুঠাম দেহলতা তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ছাইয়া ফেলিল। রজনীর শেষে আধনিদ্রা হইতে সে যখন জাগিয়া উঠিল, তখনও ভোরের আলো পূর্ব্বাকাশে ফুটিয়া উঠে নাই। সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ। যেন নিশার উত্তেজনায় অবসাদক্লান্ত ধরণীর হৃদ্‌স্পন্দন শান্ত হওয়ায় সে তখন শ্রান্তির ঘুম ঘুমাইতেছে। আকাশ প্রশান্ত, সৌম্য, গম্ভীর। পূর্ব্বাশার ভালে শুকতারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

মং-বার মন শান্তিতে ভরিয়া গেল। বাহিরে আসিতেই এক ঝলক্ ঠাণ্ডা হাওয়া তাহার মস্তকে শীতল প্রলেপ বুলাইয়া গেল। পূর্ব্বাকাশে চাহিতে মনে হইল শুকতারার ভিতর হইতে মা যেন তাহাকে ডাকিতেছেন। অম্‌নি উজ্জ্বল, সৌম্য দীপ্তি তাঁর, চক্ষু দুটি অম্‌নি করুণায় ভরা, মাথায় ঊর্দ্ধগ্রথিত বেণীর উপর স্তবকে স্তবকে ফুলহার আজিও উজ্জ্বল, অম্লান। মা বলিলেন, "মং-বা, বাছা আমার, ভুল বুঝিও না, প্রলোভনে লুব্ধ হইও না। সত্য, সুন্দর চিরকাল তোমার কাম্য হউক। পৃথিবী কুটিল ছলনায় ভরা। আমাদের অনাবিল স্নেহ, নিষ্কলঙ্ক অমর প্রেম তোমাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকুক্।"

মং-বা যেন মনে মনে বলিল, "করুণাময়ী মা আমার, তোমার আশীর্ব্বাদ অক্ষয় হোক্। কিন্তু, মা, মন আমার আজ বড় অশান্ত, কালিমায় ভরা। ব'লে দাও, মা, পথ কোথায় পাব?"

মা যেন তাহার মনের কথা বুঝিলেন। শান্ত হাসিতে মুখ ভরিয়া উঠিল, করুণায় নয়ন ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল;

বলিলেন, "বাছা, স্বার্থ যেখানে, মোহ যেখানে, সেখানে যাইও না। সত্যের মিলন আত্মায় আত্মায়—সেখানে স্বার্থ, মোহ, ছলনার লেশমাত্র নাই। দেখ, আমি এদেশের মেয়ে, তোমার বাবার পূর্ব্বপুরুষ বিদেশী। এ ক্ষেত্রে আমাদের মিলন অপরের চোখে বিসদৃশ হয়েছিল। কিন্তু আমাদের যোগ ছিল আত্মায় আত্মায়। আমরা জীবনে কোনদিন অনুতপ্ত হই নি।"

মং-বা দেখিল, জননী ধীরে ধীরে তারকামণ্ডলীর মধ্যে মিলাইয়া গেলেন। দিগ্বলয়ে উষার আলোকরেখা ছড়াইয়া পড়িল। বিশ্ব নবীন জীবনে জাগিয়া উঠিল। একান্ত শ্রদ্ধায়, নির্ভরতায়, মং-বা নতমস্তকে বিশ্বের জীবনদাতাকে প্রণাম করিল।

আজ রহিয়া রহিয়া মনে পড়িতে লাগিল বহুদিন আগেকার কথা। সেদিন সে ছিল নিতান্ত বালক, আর তাহার পাশে ছিল নেহাৎ একটা কচি, সরল মুখ।

সে সাকিনা—পিতৃবন্ধু মফিজুদ্দিন সাহেবের মেয়ে—তাহার বাল্যসঙ্গিনী।

ছেলেবেলায় দু-জনে প্রায় একসঙ্গেই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহাকে না হইলে সাকিনার এক দণ্ডও চলিত না। সে ফুল তুলিত, সাকিনা মালা গাঁথিত; সে ঘোড়া হইত, সাকিনা কাঁধে উঠিত; সে ধূলা-বালি বহিয়া আনিত, সাকিনা ঘর গড়িত।—দু-জনে কত দিন তাহারা বর-বধূ সাজিয়াছে!

কিন্তু বিশেষ করিয়া একটা দিনের কথা তাহার মনে আসিতে লাগিল।

পূর্ব্ব দিনে অভিনয় দেখিয়া আসিয়া সেদিন তাহারা নিজেরাই "লয়লা-মজনু" অভিনয় করিবে ঠিক করিয়াছে। সমস্ত ঠিকঠাক; সন্ধ্যায় অভিনয় হইবে। সে হইবে মজনু; লয়লার ভূমিকায় সাকিনা। ছোট ছোট দর্শক অতিথি ভীড় জমাইয়া কলরব তুলিয়াছে। কিন্তু ঠিক সেই চরম মুহূর্ত্তে এক গণ্ডগোল বাধিয়া গেল।

কি একটা কারণে হঠাৎ তাহাকে বাহিরে যাইতে হইল।

সাকিনা হুলস্থুল বাধাইয়া দিল···তাহার সঙ্গে ছাড়া সে অভিনয় করিবে না। সকলে অনুরোধ করিল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ক্ষুণ্ণ হইল—মা একটু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিলেন, " এ তোর কি আদিখ্যেতা, বাপু, এতগুলো ছেলে-মেয়েকে তবে ডেকে আন্‌লি কেন? কত ঢংই তুই শিখেছিস্, বাছা!"

একটি মেয়ে বলিল, "না, মাসীমা, মং-বাকে নইলে ও করবে না। আমরা এত বল্‌ছি তাও শুন্‌ছে না।"

আর একটি মেয়ে অগ্রসর হইয়া অনুনয় করিয়া বলিল, "আয় না ভাই, অত মান কেন?"

সাকিনা তাহার হাত ঝটকাইয়া দিয়া গোঁ হইয়া বসিয়া রহিল।

মা সত্যই একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোর সব-তাতেই বাড়াবাড়ি, বাপু। সে বেটাছেলে, কত দরকারে তাকে বাইরে যেতে হবে—সে কি সব সময়ই তোর আঁচলে গেরো দিয়ে ব'সে থাকবে?"

সাকিনা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। বালিকা স্বভাবসিদ্ধ ক্রন্দনের স্বরে বলিয়াছিল, "থাকবে না কেন, নিশ্চয়ই থাক্‌বে—সে রোজ রোজ—সব দিন—আমার সঙ্গে থাক্‌বে। সে যায় কেন? তাকে নইলে আমি থাক্‌বো না। কিছুতেই না।"

পা ছুঁড়িয়া সে তারস্বরে কান্না জুড়িয়াছিল।

তত ক্ষণ মং-বা ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আসর ভাঙিয়া গিয়াছে—সন্ধ্যাটা মাটি হইয়া গিয়াছে। মং-বার মাতা কর্ম্মান্তরে ছিলেন, সাকিনার চীৎকার শুনিয়া তিনিও ছুটিয়া আসিয়াছেন।

সখী সাকিনার মায়ের কাছে সব শুনিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন; সাকিনাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "তুমি কেঁদো না, মা, আমি ওকে এনে দেব। ও বড় দুষ্টু, না? ওকে এম্‌নি ক'রে বেঁধে আন্‌ব যে ও যেন আর কখনও তোমার কাছ থেকে যেতে না পারে।"

তার পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া দুই সখীর সে কি হাসি!

যাইতে যাইতে সাকিনার মা বলিয়াছিলেন, "মিছে নয়, দিদি, দুটিতে কি সুন্দর মানায়—কি ভাব দু-জনের!"

তার পর কতদিন গিয়াছে—সাকিনার মাও স্বর্গে গিয়াছেন—তাহারা দূরে চলিয়া গিয়াছে। কত দিন তাহাদের

সহিত দেখা হয় না—সে ত এক রকম সবই ভুলিতে বসিয়াছে!

বাল্যের সেই নির্ম্মল, সুন্দর জীবন!—সেদিন কি আর ফিরিয়া আসিবে?

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মং-বা আপন কাজে মন দিল। কিন্তু কাজে মন বসে না। কি যেন একটা অভাব থাকিয়া থাকিয়া মনের মধ্যে সাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পুস্তক লইয়া বসিয়া থাকিল, দেখিল একটা পৃষ্ঠাও পড়া হয় নাই। বাঁশী লইয়া বাহির হইল—কিন্তু বাঁশীও যেন বেসুরা বাজে। কি যেন তাহার নাই—কি যেন সে চায়—এম্নি একটা ভাব তাহার মন বিরক্তিতে ভরিয়া দেয়। সে মন সংযত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু কে যেন থাকিয়া থাকিয়া অন্তর হইতে বলিয়া উঠিল—"মূর্খ, এ আত্মসংযম নয়, আত্মনিপীড়ন। মং-বা, জীবন সম্ভোগের জন্য, আপনাকে পিষিয়া মারিবার জন্য নয়।"

সেদিন খেলার মাঠ হইতে ফিরিবার সময় একটা লোককে সে তাহার দিকে আসিতে দেখিল। বোধ হইল, তাহাকে আগে যেন সে কোথায় দেখিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মনে পড়িল, লোকটা সেদিন মা-খিনের দলে ছিল। এই সে মা-খিনের নৃত্যসঙ্গী। দারুণ ঘৃণায় অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেও তাহার চক্ষু আগন্তুকের দিকেই চাহিয়া রহিল।

আগন্তুক মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমায় চিন্‌তে পার, বন্ধু? আমি মা-খিনের ভাই, টুন্-অঙ্—সেদিন তুমি আমায় দেখেছিলে।"

ঘাড় নাড়িয়া মং-বা জানাইল—"হাঁ।"

টুন্-অঙ্ পুনরায় বলিল, "সেদিন থেকে মা-খিনের কি হয়েছে জানি না। সে তোমায় দেখবার জন্যে ভারি ব্যস্ত হয়েছে। অনেক খুঁজে খুঁজে আমি আজ এই খেলার মাঠে তোমার সন্ধান পেয়েছি। একবার আসবে আমার সঙ্গে?"

মং-বা রূঢ়ভাবে বলিয়া উঠিল, "তোমায় অনেক ধন্যবাদ, টুন্-অঙ্। কিন্তু মা-খিন্‌কে ব'লো, তাঁর কাছে আমি যাব না-তিনি যেন আমায় সে রকম মনে না করেন।"

কোন কথার অপেক্ষা না-করিয়া মং-বা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। টুন্-অঙ্ মিট্ মিট্ করিয়া গম্যমান্ মং-বার দিকে চাহিয়া রহিল—মুখে তাহার ধূর্ত্ত হাসি।

টুন্-অঙ্ লোকটা নেহাৎ মন্দ ছিল না। কিন্তু সে ছিল একটা জোয়ারের জলে ভাসিয়া-আসা জিনিষের মত—সর্ব্বদাই স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা তাহার অভ্যাস। নিজের চেষ্টা কোনকালে তাহার ছিল না। বরাবরই মা-খিন্‌কে সে তাহার কাছে কাছে দেখিয়া আসিয়াছে। ছেলেবেলাকার কথা খুব একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের মত মাঝে মাঝে তাহার মনে পড়ে। কবে সুদূর অতীত শৈশবে তার মা মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রিয় সখী মা-খিনের মায়ের কাছে ছেলেটিকে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিল। তখন থেকে টুন্-অঙ্ আজ পর্য্যন্ত এইখানেই আছে। নিশ্চিন্ত আরামে, নির্বিকার আলস্যে তার দিন চলিয়া যাইতেছে। মা-খিনের সঙ্গে সে পাশাপাশি বাড়িয়া উঠিয়াছে—এক বৃন্তে ফোটা দুইটি ফুলের মত। সে তাহাকে যত্ন করে, স্নেহ করে, গোপন অগোপন সব কথাই বলে।

তাই টুন্-অঙ্ ভাবিয়াছিল যে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সে মা-খিনের অঞ্চলতলে কাটাইয়া দিবে। মা-খিন্ যে অদূর ভবিষ্যতে তাহাকে বিবাহ করিবে, এ আশাও সে মনে মনে পোষণ করে। মা-খিনের কার্য্যকলাপের মধ্যেও সে-জিনিষটা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মা-খিন কাহাকেও চায় না—এ পর্য্যন্ত অনেক বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছিল, কিন্তু কাহাকেও সে বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই। তাহার মতে, কেহ তাহার অর্থের জন্য, কেহ বা তাহার রূপের জন্য তাহাকে বিবাহ করিতে আসে। পুরুষে যে ভালবাসিয়া, আপনাকে বিকাইয়া দিয়া নারীকে চায় এ ধারণা তাহার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাই সকলকেই সে ফিরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু টুন্-অঙ্‌কে সে বরাবরই একটা স্নেহমিশ্রিত প্রীতির চক্ষে দেখে। তার কোন আবদারেই রাগ করে না। তাই টুন্-অঙ্ যখন তাহার সহিত বিবাহের কথা বলে, তখন সে একটু হাসিয়া উত্তর দেয়, "এত তাড়াতাড়ি কি, ভাই? আমি ত তোমারই আছি।"

কিন্তু বুঝি কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে মং-বার সহিত মা-খিনের দেখা হইয়া গেল। টুন্-অঙ্ আর মা-খিনের মনের নাগাল পায় না, অনেক কথার উত্তরও পায় না। সেই দিন হইতে সে কিছু আনমনা, কিছু গম্ভীর। শুধু মং-বা সংক্রান্ত কোন কথা হইলে মন দিয়া শোনে। টুন্-অঙ্ তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে

পরিহাস করিলে সে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া তাহাকে বুঝাইয়াছিল—"বোকা, এটা বোঝ না যে লোকটা বোধ হয় বড়লোকের ছেলে; তার হাতে হীরার আংটী ছিল তাকে হাতে রাখ্‌লে কাজ দেবে।"

টুন্‌-অঙ্গ্‌ একটু গোঁয়ার-প্রকৃতির হইলেও বোকা নয়। কিন্তু মা-খিনের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও তাহার ছিল না। তাই মনে একটু সন্দেহ রহিয়া গেলেও সে ভাবিল,—হবেও বা, নর্ত্তকীর খেয়াল, বড় দাঁও মারবে ভেবেছে—দেখিই না ব্যাপারটা কি? দু-পয়সা এলেই বা মন্দ কি?

তাই সে মং-বার সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। যখন সে জানিতে পারিল যে মং-বা বাস্তবিকই বড়লোক, কিন্তু তাহা হইলেও সে মা-খিনের কাছে আসিবে না, তখন তাহার মন হইতে একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। লাভটা হাতছাড়া হইয়া গেল বলিয়া একটু যে হতাশার ভাব আসিল না তাহা নহে, কিন্তু তার চেয়ে মনে মনে একটা আরাম অনুভব করিল—"যাক, একটা আপদ্‌ গেল—বাঁচা গেল।"

কিন্তু সে যখন সালঙ্কারে এ-সব কথা মা-খিনের কাছে বর্ণনা করিল, তখন মা-খিন্‌ মুখে কিছু না বলিলেও একেবারে মরমে মরিয়া গেল। বাহিরের হাসিচাঞ্চল্য বজায় রাখিয়া চলিলেও সেই দিন হইতে তাহার মনের কোণে ভাঙন ধরিল।

সে মনে মনে স্থির করিল আর কখনও টুন্‌-অঙ্গের নিকট মং-বার কথা বলিবে না। এমন হৃদয়হীন পাষাণ সে? এমন আন্তরিকতাহীন অভদ্র, টুন্‌-অঙ্গ্‌? আর সে নিজেই বা কি করিয়া এরূপ লজ্জাহীনা ভিখারিণীর মত উপযাচিকা হইতে গেল?

তবুও—তবুও যেন মং-বাকে সে ভুলিতে পারে না—প্রতি চরণচাঞ্চল্যে সেই প্রিয়মুখ চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠে—প্রতি নূপুর-নিক্কণে মনে হয় যেন সে পর মুহূর্ত্তেই আবেগমাখা ভাষায় তাহাকে ডাকিবে। সে আহ্বান সে ত এড়াইতে পারে না?—কি করিবে সে?—

কিন্তু তাহার প্রিয় কি তাহাকে চায়?

সে ত তাহাকে চায় না? তবে সেই বা কেন তাহাকে ভুলিতে পারিবে না?

২

অনেক দিন পর আজ দিন-কয়েক মফিজুদ্দিন সাহেব মং-বাদের বাড়িতে আসিয়াছেন; সঙ্গে আসিয়াছে সাকিনা।

বাল্যসখীকে দেখিয়া মং-বার মনে কৌতূহল জাগে—কিন্তু সাকিনা ধরা দেয় না; আড়ালে আড়ালে চলে। সাকিনা এখন বড় হইয়াছে—লজ্জা করিতে শিখিয়াছে।

ভারি সুন্দরী হইয়াছে সে!

কিন্তু মং-বার চোখের সাম্‌নে বাহির না হইলেও কারণে-অকারণে যেন সে তাহাকে দেখা দেয়। তাহার আনন্দময়ী মূর্ত্তি, রূপের দীপ্তি সমস্ত ঘরে খেলিয়া বেড়ায়। দাস-দাসীরা মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকে; পরস্পর বলাবলি করে, "আর যা-হোক মানি বেয়ান্‌, আমাদের দিদিমণির একখানা রূপ বটে! অমন রূপ না হ'লে এ ঘরে মানায়?"—দিদিমণি বলিতে তাহারা অজ্ঞান!

সময়ে অসময়ে সাকিনার চোখে মুখে আনন্দ উছলিয়া উঠে!

দেখিয়া শুনিয়া মং-বা ভাবে, কিসে তাহার এত আনন্দ? সে কি এখনও তাহাকে মনে করে—তাহার কথা ভাবে?

মং-বা শিহরিয়া উঠে—তাহার নিজের মনে কালিমা; আর কাহাকেও সে পঙ্কিল করিতে চায় না। আহা, চিরদিন ভাল থাকুক্‌ সে!

কিন্তু বিষয়টা যেন জটিল হইয়া উঠিতেছে। পিতার সহিত মফিজুদ্দিন সাহেবের সর্ব্বদাই পরামর্শ চলিতেছে—নিভৃতে! ব্যাপারটা কি? মং-বার কৌতূহল হয়, আশঙ্কাও জাগে। ছেলেবেলাকার কথা, মায়ের মনের সাধ মনে পড়ে।

অবশেষে এক দিন আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। পিতা তাহাকে ডাকাইয়া গম্ভীর ভাবে স্বর্গগতা জননীর ইচ্ছা, সব পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়া দিলেন, শুভদিনে সাকিনার সহিত তাহার বিবাহ হইবে। সমস্ত বিষয়ে নিজেকে তাহার অপরাধী মনে হইতে লাগিল—সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

বাড়িতে সকলের আনন্দ দেখে কে?

দাসীকে ডাকিয়া লইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া সাকিনা তাহাকে নিজের গলার হারটা বক্‌শিশ দিল। অন্তরাল হইতে মং-বা দেখিতে পাইল।

উদ্‌গত একটা দীর্ঘশ্বাস সে চাপিয়া গেল, মনে মনে ভাবিল—নিষ্পাপ, সরলা বালিকা; মং-বার স্বরূপ সে জানে না। আহা, সাকীর মত তাহার যদি একটি ছোট বোন্ থাকিত!

এক দিন সাকিনা মং-বার কাছে ধরা পড়িল।

সেদিন মং-বা বাহিরে চলিয়া গেলে দাসীকে সঙ্গে লইয়া সাকিনা তাহার পড়িবার ঘর সংস্কার করিতে লাগিয়া গেল।

গোছান-অগোছান সমস্ত বই ঝাড়িয়া-পুঁছিয়া আলমারীর তাকে তাকে সে সাজাইয়া রাখিল। চেয়ার, টেবিল, দেরাজ সমস্ত পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া কোমরে কাপড় বাঁধিয়া নিজেই ঝাঁটা হাতে করিয়া ঘরের কোণের ঝুল ঝাড়িতে লাগিল!

দাসী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছে—এতক্ষণ তাহার কোন কাজ করিতে হয় নাই, সে দাঁড়াইয়া ছিল—বলিল, "তুমিই যদি সব করবে, দিদিমণি, তবে আমি এলাম কেন, গো?"

উপর হইতে মুখ না নামাইয়াই সাকিনা উত্তর দিল, "তুই ত রোজই করিস্ বাছা, আমিই আজ একটু মনের মত ক'রে দিই না কেন?"

দাসীর হাসি আর থামে না; বলিল—"তুমি ত বল্‌বেই, গো, তোমার বাড়ি, তোমার ঘর, তুমি করবে না ত করবে কে? তোমার মনের মত ত সবই হবে।···তবে আমার গতোরে ত আর ঘুণ ধরে নি যে আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, আর তুমি ভালমানুষের মেয়ে কালিঝুলি মেখে ভূত সাজবে?···দাদাবাবু আমায় বল্‌বে কি গো?"

কোন কথা না-মানিয়া নিজের কাজ করিতে করিতেই সাকিনা বলিল, "আ-মর্, তোর হয়েছে কি, অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন?···কোথায় তোর দাদাবাবু?"

দাসী আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না, মুখের কাপড় ফেলিয়া দিয়া বলিল, "একবার চেয়েই দেখ না, গা?"

দ্বারে দাঁড়াইয়া—মং-বা।

হাত শিথিল হইয়া পড়িল—সম্মার্জ্জনী খসিয়া গেল।

সাকিনার মুখে, চোখের পাতায়, কপালে স্বেদবিন্দু টলমল্ করিতেছে—চূর্ণ অলকদাম এদিকে-ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া উড়িতেছে—শ্রমে কপোল রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।—বুকের স্পন্দনটাও যেন দেখা যায়!

লজ্জায়, সঙ্কোচে, আনন্দে, বেপথুমতী সাকিনা যেন তপঃশ্রান্ত উমার মতই "ন যযৌ, ন তস্থৌ" অবস্থায় আরক্ত নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

দাসী অন্তর্হিত হইল।

এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া মং-বা বলিল, "আমায় এত লজ্জা কেন, সাকী?"

সাকিনা মুখ তুলিয়া তাহার পানে একটু সলাজ হাসিয়া ছুটিয়া পলাইল।

মং-বা ভাবিতে লাগিল—সাকিনা তো বেশ, বেশ লাগে তাহাকে। কিন্তু তবুও কি যেন তাহার নাই—সে যেন তাহার কাম্য নয়। সে ত মা-খিন্ নয়? আহা, যদি সে তাহার মত হইত!

জোর করিয়া মং-বা মা-খিন্‌কে তাহার মন হইতে তাড়াইতে পারে না। সময়ে অসময়ে তাহার কথা মনে আসে! মা-খিনের আহ্বান সে রূঢ়ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—মা-খিন্ চিঠি লিখিলে সে তাহাকে কঠোর উত্তর দিয়াছে। নর্ত্তকীর অঞ্চলে সে কখনও বাঁধা পড়িবে না। তবুও থাকিয়া থাকিয়া কেন তাহাকে মনে পড়ে?

সাকিনা ত তার চেয়ে শতগুণে ভাল? নিষ্কলঙ্ক—শুভ্রা, ফুটনোন্মুখী কলিকা—একান্ত নির্ভরশীলা, প্রীতিময়ী; স্নেহে সরলতায় ভরা—ইহার কাছে নৃত্যচঞ্চলা, চটুলস্বভাবা, বিলাসিনী মা-খিন? তবে কেন সে সাকিনাকে জীবন-সঙ্গিনী করিবে না?

কন্যার বিবাহের কথা স্থির করিয়া মফিজ্জুদ্দিন সাহেব কিছুদিন পরে সাকিনাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। মং-বা আবার দৈনন্দিন জীবন-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল।

কিন্তু দৈবের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। মং-বারও হইল তাহাই। বড় রকমের একটা ফুট্‌বল ম্যাচ খেলিতে গিয়া সে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া হাসপাতালে আনীত হইল। পরদিন প্রত্যূষে সংবাদপত্রের শীর্ষস্তম্ভে বড় বড় হরফে বিখ্যাত খেলোয়াড় মং-বার দুর্ঘটনা ও সঙ্কটময় অবস্থার কথা ব্রহ্মের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল।

এক দিন, দুই রাত্রি অজ্ঞান অবস্থায় কাটাইয়া যখন সে চক্ষুরুন্মীলন করিল, তখন প্রভাতের অরুণ কিরণ উন্মুক্ত

জানালা দিয়া তাহার শয্যাপ্রান্তে সোনালী আলো ছড়াইয়া দিয়াছে। মাথায় অতি কোমল, অতি মধুর শীতল হস্তের স্পর্শ! কে যেন জননীর স্নেহে, দয়িতার আদরে শিয়রে বসিয়া তাহার সেবা করিতেছে। ধীরে ধীরে মং-বা ডাকিল—"তুমি কে?"

শুশ্রূষাকারিণী কথা কহিল না; বোধ হইল হাত তুলিয়া উত্তরীয়প্রান্তে সে চোখ মুছিয়া ফেলিল। একটু আশ্চর্য্য হইয়া মং-বা শিয়রের পানে চাহিয়া দেখিল—অধোমুখে বসিয়া মা-খিন্।

"আঃ, মা-খিন্, তুমি?'' বলিয়া পরম আরামে মং-বা শিশুর মত নিশ্চিন্ত শান্তিতে চক্ষু মুদিল।

মা-খিন্ আসে যায় নীরবে, প্রচ্ছন্নভাবে। কামাল সাহেবও প্রায়ই পুত্রের নিকট আসেন, কিন্তু তিনি তাহার কোন সন্ধান পান না। অজ্ঞানাবস্থা কাটিয়া গেলেও মং-বা দারুণ জ্বরবিকারে পড়িয়াছে। তাই কামাল সাহেব পুত্রকে গৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেও চিকিৎসকেরা তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার অনুমতি দেন নাই। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবসাদে সে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে—স্বপ্নের ঘোরে যেন মনে হয় কে তাহার পার্শ্বে পরম যত্নে অক্লান্ত পরিশ্রমে মমতা-ভরা বিনিদ্র আঁখি মেলিয়া আছে!

কয়েক দিনের নিপুণ চিকিৎসা ও অবিরাম শুশ্রূষার পরে মং-বা সুস্থতার দিকে ফিরিল। মা-খিনের উপর আর কোন বিরক্তির ভাব মনে আসে না, এখন সে তাহার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। কিন্তু মা-খিনের আসা-যাওয়া যেন কমিয়া যাইতেছে—সে যেন পারতপক্ষে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চায়। মং-বা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে—কেন সে এমন করিতেছে? কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর ভরিয়া যায়—এমন কোমলহৃদয়া, সেবাব্রতা নারী সে, আর সে নিজে তাহার সহিত এমন রূঢ়, নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে!

সেদিন সন্ধ্যায় সে নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া ছিল; মা-খিন তাহার শয্যাপ্রান্তে আসিলে সে হঠাৎ তাহার হাত-দুখানি চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে বসাইল; বলিল, "ব'সো, কথা আছে।"

মা-খিন্ বসিল। মং-বা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তুমি আজকাল আমায় এমন এড়িয়ে চল কেন, বল ত?"

মা-খিন্ উত্তর দিল না। নতমুখে নীরব রহিল।

মং-বা পুনরায় বলিল, "আমায় মাপ কর, খিন, আমি তোমার উপর বড় কঠোর ব্যবহার করেছিলাম। তখন ত আমি জানতাম না, তুমি এত ভাল, এত সুন্দর? বল, তুমি আমায় মার্জ্জনা করেছ?

মা-খিন্ ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইল; বলিল, "এ সব কথা এখন কেন? তুমি ত আমার কাছে কোন দোষ কর নি? দোষ করেছিলাম আমিই।"

"সে কোন কাজের কথাই নয়; শুধু তোমার অভিমানের কথা" বলিয়া কি ভাবিয়া হঠাৎ মং-বা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তুমি এই সন্ধ্যাবেলায় এখানে থাকই বা কি ক'রে—কাজে যাও না?"

মা-খিনের মুখ হইতে কোন উত্তর আসিল না; শুধু সে এঞ্জিবিলম্বিত বোতাম টিপিয়া ধরিয়া তাহার নীলাভ প্রস্তর-খণ্ডের পানে চাহিয়া রহিল।

মং-বা ছাড়িল না; বলিল, "বলই না, গো, কোথায় এখন কাজ নিয়েছ?"

সলজ্জ মুখে মা-খিন্ উত্তর দিল, "আমি আর সে কাজে যাই না।"

"সে কি, কাজ ছেড়ে দিয়েছ?" মং-বা অতিমাত্র বিস্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, ''কেন?"

মা-খিন্ হাসিল; বড় করুণ, বড় মলিন সে হাসি, বলিল, "তুমি ত নর্ত্তকীর আঁচলে বাঁধা থাকতে চাও না?"

মং-বা হতবাক্ হইয়া গেল। তাহার মুখে কোন উত্তর জোগাইল না।

মা-খিন্ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। মং-বা মুখ ফিরাইয়া জানালার দিকে চাহিল। বাহিরে বিস্তৃত প্রান্তর, সীমাহীন নীলিমায় মিলিয়া গিয়াছে। প্রান্তে সুদূর বনরেখা; সমতলক্ষেত্র হইতে স্তরে স্তরে উঠিয়া পর্ব্বত-শীর্ষে উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের বুক চিরিয়া, বনানী ভেদ করিয়া একটি পথ পাহাড়ের গায়ে আঁকিয়া-বাঁকিয়া মেমিওর দিকে চলিয়াছে। তখনও স্তিমিত আলো ধরণীর বক্ষ হইতে অপসৃত হইয়া যায় নাই। আকাশে দুই-একটি করিয়া তারা ফুটিয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট আলোকে, গোধূলি-অবসানের ধূসর ম্লানরাগে বিশীর্ণ বনসরণি যেন

কোন্ বেদনাকাতর চিত্তের হতাশার ছায়া বহিয়া মৌন অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ব্যথাপাণ্ডুর মুখে যেন মা-খিনের সেই করুণ হাসি!

মং-বা ভাবিতে লাগিল—কি দুর্ব্বার আকর্ষণে এই ব্যথিত নারী-চিত্ত তাহাকে টানিতেছে! এ কি বিধাতার ইঙ্গিত? না, এ তাহার নিয়তি?

মা-খিন্ করিয়াছে কি—শেষে তাহার জন্য জীবনের অবলম্বন সে ছাড়িয়া দিয়াছে! এত বড় আত্মত্যাগ, এত ভালবাসা? প্রতিদানে সে কি পাইয়াছে—শুধু নিষ্ঠুর বেদনা, নির্ম্মম আঘাত! মং-বা ভাবিতে পারে না—কি করিবে সে—হৃদয়ের আহ্বান মানিবে, না, কর্ত্তব্যের আদেশে চলিবে।

পরদিন অপরাহ্ণে মং-বা বাস্তবিকই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কাহার হস্তস্পর্শে হঠাৎ জাগিয়া গেল। চোখ না মেলিয়াই অভ্যাস-মত প্রশ্ন করিল, "কে, মা-খিন্?"

যে আসিয়াছিল, সে হঠাৎ অপরিচিত নাম শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল; ভাবিল, "কে এ?" কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি মা-খিন্ নই; কে বল ত?"

চোখ মেলিয়া সেদিকে চাহিয়া মং-বা সাকিনাকে দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া গেল। "কি, সাকী, তুমি এসেছ?" বলিয়া মং-বা লজ্জিত ভাব দমন করিয়া বলিল, "কখন এলে তুমি? তুমি যে আস্‌বে আজ, আমি ত ভাবতেই পারি নি? আমি ভেবেছিলাম, এখানকার "নার্স" বুঝি কোন কাজে এসেছে?"

"তারই নাম বুঝি মা-খিন?"

সংক্ষেপে মং-বা উত্তর দিল, "হাঁ।"

"বাঃ, সে বেশ মেয়ে ত? কেমন তোমার সেবা করছে—এ রকম শুনলে কিন্তু আমার ভারী হিংসে হয়।" বলিয়া সাকিনা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল; বলিল, "আমিও ত বেশ—তোমার কোন কথাই জিজ্ঞাসা করছি না? তোমার শরীর এখন কেমন?"

—"বেশ ভালই।"

সাকিনা তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার শৈশবের মতই প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিল। বলিল, "জান, তোমার খবর পেয়ে আমি কি বিপদেই পড়েছিলাম! আমার তখুনি আসবার ইচ্ছে—কিন্তু বাবার পড়েছে ভারী কাজ—কার সঙ্গেই বা আসি—বাবা বল্‌লেন, দাঁড়া, একটু বন্দোবস্ত ক'রে নিই—কিন্তু আমি খালি ছট্‌ফট্ করছি; মন ত এখানেই পড়ে আছে কি না?"

একটু ঠাট্টার সুরে মং-বা বলিল, "সত্যি নাকি?"

"যাও, তুমি ভারী দুষ্টু," বলিয়া সাকিনা উদ্বেগভরা দৃষ্টিতে পুনরায় কহিল, "উঃ, কি সর্ব্বনেশে ব্যাপার! দু-দিন তোমার জ্ঞানই ছিল না? শুনে আমার যা ভয় হয়েছিল, ভেবেছিলাম, এখানে এসে তোমায় কেমন দেখব!"

বাধা দিয়া মং-বা বলিল, "এখন বেশ ভাল দেখছ ত, ভয় তা'হলে গেছে বল?"

"না, ভয় গেছে কি ক'রে বলি—যতক্ষণ তুমি সুস্থ হয়ে এখান থেকে ঘরে না এস! কখন কি হয়, কে জানে?"

বাস্তবিকই মং-বার বিপদ সম্পূর্ণ কাটে নাই—সে এখনও দুর্ব্বল। সবল না হওয়া পর্য্যন্ত অবসন্ন দেহযন্ত্র যে-কোন মুহূর্ত্তে বিকল হইয়া পড়িতে পারে। সাকিনা ঘন ঘন যায় আসে; আজকাল সেই-ই অধিকাংশ সময় তাহার কাছে থাকে। মা-খিন্‌ও আসে কিন্তু কদাচিৎ; তাও শুধু যেন একটা কর্ত্তব্য হিসাবে কাজ করিয়া যায়—হৃদয়ের কোন ধার ধারে না। মং-বারও কেমন একটা আড়ষ্ট, অপরাধীর ভাব। মা-খিন্‌কে দেখিলে সে কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কখনও কখনও দূর হইতে মা-খিন্ সাকিনাকে দেখিতে পায়; সে আর অগ্রসর হয় না; অন্তরাল হইতে সরিয়া যায়।

মং-বা এখন সবল হইয়া উঠিয়াছে। মা-খিন্‌ও আজ কয়েক দিন একেবারে আসে নাই। মং-বার মন তাহাকে দেখিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে। কিন্তু সম্মুখে সে দেখিতেছে শুধু সাকিনাকে। অপরাধের ভারে তাহার চিত্ত যেন নুইয়া পড়িতে চায়। একদিন সে সাকিনার হাত দুখানি ধরিয়া বলিল,—"সাকী, বোন্, আমার কথা ভুলে যাও।"

সাকিনা বিস্মিত হইল; বলিল—"এ আবার কি কথা?"

দুই ফোঁটা অশ্রু মং-বার গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল; বলিল—"সাকী, সত্যই আমি তোমার যোগ্য নই। তুমি জান না, আমি কি গভীর অপরাধে অপরাধী।"

অঞ্চল দিয়া সাকিনা তাহার চোখের জল মুছাইয়া বলিল, "এখন এ-সব কথা ব'লো না। অসুখে-বিসুখে তোমার মাথার ঠিক নেই। কে যোগ্য, কে অযোগ্য, সে কথা পরে হবে।"

আরোগ্যলাভ করিয়া সেদিন মং-বা ঘরে যাইবে। আজ একটি বারের জন্য সে মা-খিন্‌কে দেখিতে চায়। সুযোগ মিলিবে কি ?

কিন্তু সুযোগ বুঝি আপনা হইতেই ধরা দিল। অনেক দিন পর আজ মা-খিন্ রোগমুক্ত মং-বার কক্ষে প্রবেশ করিল—দু-জনেই নীরব। নীরবে মা-খিন্ এটা-ওটা নাড়িয়া-চাড়িয়া, পরিষ্কার করিয়া, আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। বলি-বলি করিয়া মং-বারও বুঝি কোন কোন কথা বলা হয় না—ওই বুঝি মা-খিন চলিয়া যায়! অবাধ্য সঙ্কোচকে কোনরূপে দমন করিয়া অবশেষে মং-বা বলিল—"তুমি এত দিন এখানে আস নি কেন ?"

মা-খিন্ জবাব দিল, "আমি অন্য জায়গায় 'ডিউটি'তে ছিলাম।"

—তুমি তাহ'লে বাস্তবিকই এখানকার 'নার্স' ?

ধীরস্বরে মা-খিন্ উত্তর দিল, "তাতো দেখতেই পাচ্ছ ? কেন, তোমার কি কোন সন্দেহ হয় ?"

—না, সন্দেহ এমন কিছু নয়; তবে তোমার এই রূপ—

বাধা দিয়া মা-খিন্ বলিল, "হঠাৎ দেখছ, নয় কি ? তবে এটা আমার একটা খেয়াল। ছেলেবেলায় মা আমায় এই বিদ্যেটা শিখিয়েছিলেন, আর এখানে আমার জানা-পরিচিত লোক দু-এক জন আছেন কি না, তাই খুশীমত ঢুকে পড়েছি।"

প্রত্যুত্তরে মং-বা শুধু একবার—"ওঃ" বলিয়া যেন কি চিন্তা করিতে লাগিল।

মা-খিনেরও কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেও যেন যাইতে পারিতেছে না। নতমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

হঠাৎ মং-বা বলিল, "মা-খিন্, আজ আমি চলে যাচ্ছি।"

—জানি।

—কোন দুঃখ হবে না তোমার—তুমি আমায় মনে রাখবে ?

—আমার কথা আমার কাছে, তুমি তোমার কাজে যাও। বিধাতার কাছে প্রার্থনা করবো, তুমি যেন সব কাজে সফল হও।

—এত দিন পরে আজ একথা কেন, মা-খিন্ ? তুমি কি আমার মন জান্‌তে পার নি ?—বলিয়া মং-বা হঠাৎ অগ্রসর হইয়া মা-খিনের হাত দুখানি টানিয়া লইয়া আবেগভরে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"মা-খিন্, তুমি আমার, আমার প্রাণ, আমার জীবন, আমার যা-কিছু সব।"

বুকে মুখ লুকাইয়া মা-খিন্ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—"না, না, তুমি আমার নও। আমি নীচ, আমি নর্ত্তকী ;—তুমি অন্যের, তুমি সাকিনার।"

অশ্রু আর তাহার বাধা মানে না ; মং-বা তাহাকে যতই প্রবোধ দেয়, গুমরিয়া গুমরিয়া সে ততই কাঁদিয়া উঠে।

মং-বা বুঝাইতে লাগিল, "লক্ষ্মীটি, কেঁদো না। সাকিনার কথা ত তুমি জান না ; তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছে বটে, কিন্তু সে ত ছোট বোনের মত ?—ছোট বোন্‌কে কি কেউ বিয়ে করে ?"

—সত্যিই তুমি আমাকে চাও, সাকিনাকে চাও না ?

—সত্যি, গো, সত্যি।

অশ্রুজলের উপর মৃদু হাসির রেখা খেলিয়া গেল ; মা-খিন্ বলিল, "কিন্তু সাকিনা ত তোমাকে স্বামিরূপে পেতে চায় ?"

—সে বোঝে না ব'লে। আমিই তাকে সব বুঝিয়ে বল্‌বো। সে ছেলেমানুষ, তাকে লোকে যেমন বলেছে, সে তেমনি বুঝেছে। কিন্তু আমি সব কথা বল্‌লে সে বুঝতে পারবে। ছেলেমানুষের একটা খেয়াল ত ?

মা-খিন্ গলিয়া গেল। প্রিয়তমের আদরে, সোহাগে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল। তাহার আলিঙ্গনে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া গভীর আবেগে মুখ তুলিয়া বলিল, "তবে তুমি আমারই—অন্যের নও।"

—আমি তোমারই, মা-খিন্,—শুধু তোমারই—বলিয়া পরম আগ্রহে মং-বা মা-খিনের স্ফুরিত ওষ্ঠে প্রণয়ের প্রথম চুম্বন অঙ্কিত করিল।

এক মুহূর্ত্ত সমস্ত নীরব।

হঠাৎ কক্ষদ্বারে তীব্র পরিহাসের স্বরে ধ্বনিত হইল, "বাঃ, মং-বা, এ অতি চমৎকার !"

সচকিত হইয়া উভয়ে দেখিল, দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সাকিনা। স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। আলিঙ্গন-মুক্ত হইয়া উভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। মং-বা নীরব, নতমুখ। মা-খিনের বুক প্রলয়ের তালে স্পন্দিত হইতেছে।

—বড় সুন্দর প্রেমালাপ ভেঙে দিলাম আমি!—বলিয়া সাকিনা পুনরায় তীব্র শ্লেষে হাসিল। "এখন যে কথা বল্‌ছ না, ভাই সাহেব? এই বুঝি তোমার সেই সৌখীন নার্স?"

মং-বার নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না।

সাকিনা জ্বলন্ত বহ্নিশিখার মত মা-খিনের দিকে ফিরিয়া বলিল, "কি গো, তুমি হাসপাতালের 'নার্স'—না প্রেমের ব্যাপারী? এমনি ক'রে অসুস্থ লোকদের মাথা খেয়ে বুঝি পয়সা আদায় কর? রোগীরা এখানে আসে, তাদের দোষ দেব কি? তাদের ত মাথার ঠিক্ থাকবেই না? কিন্তু তুমি কোন্ হিসাবে তাদের মজিয়ে বেড়াও?"

চিরদর্পিতা মা-খিন্ আর সহ্য করিতে পারিল না। সাকিনার দিকে চাহিয়া স্থিরস্বরে বলিল, "না-জেনে কথা ব'লো না। কে কা'কে মজিয়ে বেড়ায় ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন?"

—তুমি বলতে চাও উনিই তোমার পেছনে ছোটেন।

—যদি বলি তাই?

সাকিনা জ্বলিয়া উঠিল; চীৎকার করিয়া বলিল—"মিথ্যাবাদী, শয়তানী! মং-বা তোর পেছনে ছোটে? কি দেখিয়ে তুই তাকে যাদু করেছিস? হাসপাতালের তুচ্ছ একটা দাই তুই—তোর কি দেখে মং-বা ভুলবে? তার পায়ের একটা নখের যোগ্যতাও তোর নেই।"

মা-খিন্ চীৎকার করিল না, রূঢ়কথা বলিল না। একবার নতমুখ মং-বার মুখের পানে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—"যোগ্যতা আছে কি নেই, সে নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই নে। কিন্তু যিনি আজ কোন কথা বললেন না, তাঁকেই আর একদিন এ কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রো। জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো, এই তুচ্ছ দাই একটা আঙুল হেলালে এক জন মং-বা কেন, অমন শত শত মং-বা তার পায়ের তলায় পড়ে থাকে—এ কথা সত্য কি না।"

মং-বা মুখ তুলিয়া চাহিবার পূর্ব্বেই মা-খিন্ কক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আজ তাহার মনে পড়িয়া গেল, টুন্-অঙ্-এর কথা। টুন্-অঙ্ তাহারই মত দীন, অভাগা। তাহারা উভয়েই যে অভিজাত্যহীন অপাংক্তেয়ের দলে! মা-খিন্ ভাবিল, সেও বুঝি একদিন নীচ বলিয়া টুন্-অঙ্‌কে ঘৃণা করিয়াছে—নিজেকে উচ্চের সংশ্রবে আসিয়াছে মনে করিয়া ভাবিয়াছে উচ্চ। তাই আজ অনুশোচনায় তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। টুন্-অঙ্ তাহার সহোদর ভাইয়ের মত—নিজের বুদ্ধির ভুলে সে যদি তাহাকে অন্য ভাবে দেখিয়া থাকে, তাহাতে তাহার দোষ কতখানি? আর সে নিজেও ত কোনদিন তার ভুল সংশোধন করিয়া দিবার চেষ্টা করে নাই—বরঞ্চ অনেকখানি প্রশ্রয়ই ত দিয়াছে? তবে টুন্-অঙ্-এর দোষ দিবে সে কি করিয়া?

টুন্-অঙ্‌কে সে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে—তাহার ব্যবসা ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে। সে তাহাকে অনেক নিষেধ করিয়াছিল, বাধা দিয়াছিল, কিন্তু মা-খিন্ শোনে নাই। টুন্-অঙ্ বড় হতাশ হইয়া, বড় নিরুপায়ভাবে তাহার করুণাভিক্ষা চাহিয়াছিল; পায় নাই। তার পর সে রূঢ় হইয়াছে, দুর্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে—অনেক সময় শ্লীলতার ধার ধারে নাই, তাহাতে মা-খিন্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দূর হইয়া যাইতে বলিয়াছে, তাহার আবাল্যের সুখদুঃখ, স্নেহ-করুণার নীড় হইতে। সেই মর্ম্মান্তিক আঘাতে, ক্ষোভে, অপমানে সে আজ ঘরছাড়া, নিরুদ্দেশ। কে জানে সে এখন কোথায়—তাহার মনের ভাব কি?—তাহার সন্ধান লওয়া এখন ভাল হইবে, না মন্দ হইবে?

এত দিন পরে আজ ঘরে ফিরিয়া মা-খিনের মনে হইল ঘরখানা নেহাৎ ফাঁকা, নেহাৎ শূন্য; এত দিন ধরিয়া যে কাজ সে করিয়াছে তাহা নিতান্তই ব্যর্থ, উপহসনীয়।

বাস্তবিকই টুন্-অঙ্ এখন 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছে। সে আর মা-খিনের করুণার উপর জীবন কাটাইবে না।—তাহার মনে হইয়াছে, নিষ্কর্ম্মা, পরান্নভোজী বলিয়া মা-খিন্ তাহাকে ঘৃণা করে। তাই সে কর্ম্মী, ধনবান্ হইয়া একবার দেখাইবে যে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া মা-খিন্ কতটা ভুল

করিয়াছে। যদি কোনদিন সে তাহাকে বিবাহ করিতে চায়, তবেই মা-খিনের কাছে সে যাইবে, নচেৎ নয়। তাই টুন্-অঙ্ এখন একটা প্রকাণ্ড জুয়ার গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে। মা-খিনের খবর সে যে না রাখে, তাহা নয়।

কিন্তু আক্রোশ তাহার মা-খিনের চেয়ে বেশী মং-বার উপর। যত দিন সে হাসপাতালে ছিল, তত দিন টুন্-অঙ্ বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই।—ভাবিয়াছিল, মং-বা বাহির হইলে তাহাকে দেখিয়া লইবে। কিন্তু এখন বাহির হওয়ার পরে যে ব্যাপারটা সে দেখিতে পাইল, তাহাতে সে কি করিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। একবার ভাবিল, মা-খিনের কাছে যাই; এখন তাহাকে আপনার করিয়া লইতে পারিব। আবার ভাবিল,—না, এত শীঘ্র দেখা দেওয়া ভাল নয়; কেন নিজেকে এত সুলভ করি? দেখিই না কিছুদিন, ওদের ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত কতদূর গড়ায়,—মং-বাই বা কি করে?

সেদিনকার অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর সাকিনার মনের আনন্দ একেবারে উবিয়া গেল। মং-বার সহিত সে আর কথা বলে না—কেহ আর তাহার মুখে হাসি দেখে না—খালি বসিয়া বসিয়া ভাবে। কি করিবে সে? তাহার বড় কান্না পায়। যাহাকে সে এত দিন দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছে, যাহার উপর তাহার এত ভক্তি, এত অসীম বিশ্বাস, কেমন করিয়া সে এমন একটা তুচ্ছ নারীর মোহে বাঁধা পড়িল?

প্রথম প্রথম সাকিনা মনে করিয়াছিল, হয়ত মং-বা তাহার কাছে আসিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিয়া কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিবে, তাহার ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু মং-বা যখন আসিল না, তখন সুগভীর অভিমানে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল—তাহার মরাই ভাল, তা হ'লে মং-বার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, সে নিষ্কণ্টক হয়। কেন, রোগশয্যার মধ্যেই সে ত তাহাকে ভুলিয়া যাইতেই বসিয়াছিল—একটা আদরের, একটা সোহাগের কথাও ত তাহাকে বলে নাই?

সাকিনার মনে হইল মং-বা তাহাকে ভালবাসে না, কোনদিনই ভালবাসে নাই—সে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

ভালবাসে সে মা-খিন্‌কে; কেন সে জোর করিয়া তাহার স্নেহ-সোহাগ আদায় করিবে? মং-বাকে সে মুক্তি দিবে, তাহাকে মুক্তি দেওয়া তাহার কর্ত্তব্য।

নিজের প্রতি যত্ন সে একেবারে ছাড়িয়া দিল। কলের পুতুলের মত ঘুরিয়া বেড়ায়; অযত্নে, অনিয়মে মাঝে মাঝে জরও হয়; শরীর দিন দিন ক্ষয় হইয়া আসে; সে তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে না।

কিন্তু পুরাতন দাসীর চোখে তাহা ধরা পড়িল। একদিন সে সাকিনার চুল বিনাইতে বিনাইতে বলিল, "এ কি গো, দিদিমণি, অমন শুকিয়ে শুকিয়ে দড়ি হ'য়ে যাচ্ছ কেন গা?"

সাকিনা মৃদু হাসিয়া বলিল, "মরণ আর কি, কোথায় রোগা হচ্ছি দেখ্‌লি?"

দাসী বলিল, "ষাট্ ষাট্; তবে আমার চোখ্‌কে কি ক'রে এড়াবে, বাছা? কেন, দাদাবাবুর সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছে নাকি?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া সাকিনা বলিল, "খালি তোর দাদাবাবু, আর দাদাবাবু—আর কি তোর কথা নেই, বাছা? তা থাকে ত বল্—তার নাম আর করিস্ নে আমার কাছে।"

মুখ ঘুরাইয়া দাসী বলিল, "সে কি কথা গো? আজ বাদে কাল তোমার বিয়ে—সে তোমায় দেখ্‌বে না ত কে দেখ্‌বে গা? সোয়ামী ছাড়া আর মেয়েমানুষের যত্ন-আত্তি করবার কে আছে, বল?"

সাকিনা মুখ ফিরাইল।

দাসী করুণায় বিগলিত হইয়া বলিল, "আহা, মা-মরা মেয়ের দরদ আর কে বোঝে, বাছা?"

মায়ের নামে সাকিনা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "আমি বেশ আছি, দিদি; আমার আর কাউকে কাজ নেই—বিয়ে আমি করব না—তাকে বলো—সে ত আমাকে চায় না?"

দাসীর মুখ হইতে ক্রমে ক্রমে শাখাপল্লবিত হইয়া কথাটা অনেকের কানে পৌঁছিল। সাকিনা মং-বাকে বিবাহ করিতে চায় না শুনিয়া কামাল সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পুত্রকে ডাকাইয়া তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোন সদুত্তর পাইলেন না। তবে মং-বার মুখের ভাবে সে-ই যে ইহার জন্য দায়ী, তাহা বুঝিতেও তাঁহার বাকী রহিল না। অনুমানে তাহাকে তিনি অনেক ভৎর্সনা করিয়া বিদায় দিলেন; বলিলেন, "সে যদি সাকিনার কাছে আপন ব্যবহারের জন্য

লজ্জিত না হয়, তাহা হইলে যেন আর তাঁহাকে পিতা বলিয়া পরিচয় না দেয়।"

মং-বা বুঝিল, পিতা যাহা বলিতেছেন, তাহা অনুমানে। তবে সাকিনা অভিমান করিয়া, রাগ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে না বলিয়াছে। সাকিনার সহিত তাহার একটা বোঝাপড়া করিতে হইবে। তবে যাক্,—মং-বা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল—সাকিনা তাহার রাগের কারণ কাহাকেও বলে নাই। সে হিসাবে সে ভাল মেয়ে। তাহার মন সাকিনার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল। সুযোগ বুঝিয়া সরাসরি তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল তো সাকী, এ গণ্ডগোল তুমি কেন তুলেছ?"

সাকিনা কথা কহে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর উত্তর দিল, "আমি তোমায় মুক্তি দিয়েছি।"

—এ আবার কেমন কথা, সাকী?

—কেন, তুমি ত আমায় চাও না? তাই ভাব্লাম নিরর্থক কেন তোমায় বেঁধে রাখি? তাই তোমায় ছেড়ে দিয়েছি।

—বাঃ, এ সব ধারণা তোমার ঢোকাল কে, আর এ সব আজগুবি ভাবনাই বা কেন?

—বেশ ত, তুমি যেন কিছুই জান না?

মং-বা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল; তাই সাকিনার কাছে তাহার প্রশ্নে কোনরূপ অপ্রতিভ হইল না, বা অপরাধের ভাব দেখাইল না; বলিল, "সময় ও অবস্থা বিশেষে লোকের মন ঠিক থাকে না, তা ত তুমি জান। আমার তখনকার অবস্থা একবার ভেবে দেখ দেখি?"

খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উদাস দৃষ্টি মেলিয়া সাকিনা উত্তর দিল, "অনেক ভেবে দেখেছি আমি, তোমাকে ধ'রে রাখা আমার উচিত নয়। আমার কর্ত্তব্য তোমায় মুক্তি দেওয়া।"

—এত দিন পরে আজ একথা কেন সাকী? ছেলেবেলায় দু'জনে একসঙ্গে কত খেলেছি, কত স্বপ্নের ঘর গড়েছি, এত দিনে কি সব ভুলে গেছ?

বড় মধুর, বড় কোমল—শৈশবের রঙীন্ স্মৃতিতে কে যেন আঘাত করিল! সাকিনা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না; ধীরে ধীরে বলিল—সে-সব কথা ভুলে যাও, ভাই! সে হবার নয়। তোমার পথ আর আমার পথ ভিন্ন। তুমি তোমার পথে যাও; আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিচ্ছি, অভিমানে নয়।"

দু-ফোঁটা অশ্রুজল সাকিনার নয়ন বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

"এ কি, তুমি কাঁদছ, সাকী?" বলিয়া তাহার হাত দুখানি ধরিয়া মং-বা বলিল, "আমায় মার্জ্জনা কর সাকী—এক মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় তোমার মনে বড় ব্যথা দিয়েছি—তখনকার অবস্থা ভেবে সে-সব ভুলে যাও; তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না।

সাকিনা নীরব রহিল। নীরবে নয়নজল টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও মং-বা তাহাকে হাঁ বলাইতে পারিল না। সেই একই উত্তর তাহার মুখ দিয়া বাহির হয়, 'না, ভাই, সে হয় না। তা হবার নয়।"

অশ্রু সে মুছিয়া ফেলিয়াছে—তাহার ভাব স্থির, গম্ভীর। উদাসীন যোগিনীর মত নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সে যেন শূন্যপানে চাহিয়া আছে।—কি তাহার মনে উদয় হইতেছে, কে জানে?

মং-বা হার মানিল। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "দেখ, তুমি যা ভাবছ সে সব নিছক্ তোমার মনগড়া কথা। অন্য সময়ে একটু ভেবে দেখো, কি ছেলেমানুষী করছ তুমি।—আমি এর কোনটাই মেনে নিতে পারি না।"

একটু থামিয়া মং-বা পুনরায় কহিল, "ছেলেবেলা থেকে আমায় অনেক অধিকার দিয়েছ; সেই জোরে আজ বল্‌ছি, তোমায় আমি ছাড়তে পারি না। তোমার কোন কথাই আমি কাউকে বল্‌তে পারি না। বিয়ের আয়োজন যেমন চল্‌ছে, তেম্‌নি চল্‌বে। ভেবে-চিন্তে দেখে তোমার প্রাণ চায়, নিজের মুখে এসব কথা কর্ত্তাদের ব'লো—আমি পারবো না।"

মং-বা চলিয়া গেল। সাকিনা নির্ব্বাক্ রহিল। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার শক্তিও বুঝি তাহার নাই—সে কথা বলিতে পারিল না। বুকের মধ্যে কি যেন একটা আসিয়া সমস্ত তোলপাড় করিয়া দিল। নিজের অবস্থা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। বুঝি মং-বার অধিকারের দাবি সে অস্বীকার করিতে পারে না—বুঝি এক মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য সে তাহার বাল্যসখাকে চিরকালের জন্য নিরাশ করিতে

পারে না—বুঝিবা তাহার করুণ প্রার্থনায় সে সমস্ত হৃদয় দিয়া "না" করিতে পারে না!

তবু সন্দেহ ত তাহার মন হইতে একেবারে যায় না?—সে সরল বিশ্বাস, সে ভক্তি আসে কই?—হায়, ভগবান্, এ কি করিলে—সেদিনের ছবি কেন তাহাকে দেখাইলে?

শুধু নিস্তব্ধ রাত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া সে মনে মনে বলে—"আমায় বিশ্বাস দাও, দেবতা, বিশ্বাস দাও।—হৃদয়ে বল দাও, দয়াময়!"

৩

আয়োজন চলিতে লাগিল। সাকিনার দিক হইতে আর কেহ কোন কথা শুনিতে পাইল না। যাঁহারা আগের কথাটা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কিন্তু সোয়াস্তি পাইল না শুধু এক জন। সে মং-বা। আজকাল সে ঘরের বাহির হয় না, বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ সে এক প্রকার উঠাইয়াই দিয়াছে। গৃহের আবহাওয়ায় সে আপনাকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত রাখিতে চায়—সাকিনার সান্নিধ্যে থাকিয়া পৃথিবীর আর সমস্ত ভুলিবে বলিয়া।

তবে তাহাও বুঝি হয় না! কখন আপনার অজ্ঞাতসারে মা-খিনের মূর্ত্তিখানি তাহার মনের কোণে আঁকিয়া উঠে, সে তাহা টের পায় না। সে ভাবে, আহা, অভাগিনী নারী!—সে এখন সমস্ত ছাড়িয়াও নিজের গর্ব্ব ছাড়িতে পারে নাই। সে এখন করিতেছে কি,—কি লইয়া আছে? কেমন আছে সে?—হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়, সে কি করিতেছে—কাহার কথা ভাবিতেছে। অসংযত মনকে সে বিবেকের তীব্র কশাঘাতে ফিরাইয়া আনে।—নির্জ্জন কোণ হইতে বাহির হইয়া সাকিনার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

মনের এইরূপ দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া দিন অগ্রসর হইতে লাগিল। আজ রাত্রির প্রভাতে কাল কাহাদের বিবাহ। চিরজীবনের গ্রন্থিবন্ধন আগত দিবসে—ব্যবধান শুধু আজকার রাত্রি। এই রাত্রিটুকু একবার মং-বা শেষের মত সব কথা ভাবিয়া লইবে। তাহার পর, সে নূতন জীবন আরম্ভ করিবে—অতীত পুরাতনের দিকে চাহিবে না!

জ্যোৎস্নালোকিত সুন্দর রাত্রি। নবাগত পরিজনবর্গে সমস্ত গৃহ সারাদিন মুখরিত ছিল। এখন কর্ম্মক্লান্তির শেষে নিদ্রার কোলে সমস্ত নীরব। অতি মধুর, সোনার রাত্রি। সারা আকাশের গায় চাঁদের কিরণধারা; মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা তারা জ্যোৎস্নার আলোয় ঝলকিতেছে। মং-বার সমস্ত মন ভরপূর করিয়া দিল—শুধু থাকিয়া থাকিয়া একটা অব্যক্ত বেদনা বুকের মধ্যে টন্ টন্ করিতে লাগিল।

অনেক দিনের পরিত্যক্ত বাঁশীটি লইয়া আগেকার মতই সে বাহির হইয়া গেল—শুধু নিঃশব্দে।

মান্দালয়ের উপকণ্ঠে সেই জনশূন্য বনপ্রান্তর। জ্যোৎস্নার আলো সারা প্রান্তরের উপর দিয়া বহিয়া গিয়া ঊর্দ্ধে বনরেখায় মিলিয়া গিয়াছে। প্রান্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চ একটা টিলার উপর গিয়া মং-বা বসিয়া পড়িল। নিম্নে যত দূর দেখা যায়, স্থানে স্থানে ধূসর তৃণশীর্ষে শিশিরবিন্দু ঝল্‌মল্ করিতেছে—স্থানে স্থানে বালুকণা রজতরেখায় ঝিলিক্ দিতেছে।

কনুইয়ের উপর ভর দিয়া মং-বা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিল। উপরে নীলাকাশে শুভ্র চন্দ্রমা—নিম্নে জ্যোৎস্না-লোকিতা শ্যামা বসুন্ধরা। এ যেন দিগন্তের সীমাহীন সমুদ্রে দোল খাওয়া। এই ত জীবন—জীবনের উত্থান ও পতন—চরম পরিণতি!

উঠিয়া বসিয়া মং-বা বাঁশীতে ফুৎকার দিল। বহুদিনের অনাদৃত বাঁশী আজ যেন বড় করুণভাবে বাজিয়া উঠিল।

বাঁশীর সুরে মং-বা তন্ময় হইয়া গেল। যেন বহুদিনের অতীত স্মৃতি—অনেক দিনের হারানো জিনিষ—আজ বাঁশীর সুরে ধরা দিল। জগৎ ভুলিয়া, স্থানকাল ভুলিয়া, আপন ভুলিয়া, বাঁশী বাজিতে লাগিল। এ যেন জ্যোৎস্নালোকিতা যমুনার কূলে বিরহীর চির অভিসার—এ যেন মরমীর মর্ম্মছেঁড়া ক্রন্দন—যেন চিরবিরহের আকুল উচ্ছ্বাস—রহিয়া রহিয়া বাতাসের গায়, গাছের পাতায়, বনমর্ম্মরে কাঁপিতে লাগিল—সমস্ত বন, সমস্ত প্রান্তর, সারা যামিনীর হৃদয় আলোড়িত হইয়া ব্যগ্র, আকুল ক্রন্দন ধ্বনিত হইল—তুমি এস, এস হে, চিরঈপ্সিত, চিরকামনার ধন, এস।

হঠাৎ কে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—ছিন্ন তার বীণার মত বাঁশী থামিয়া গেল। মং-বা মুখ তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে মূর্ত্তিমান বেসুরের মত দাঁড়াইয়া টুন্-অঙ্।

মং-বা কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই টুন্-অঙ্ আগেকার

মতই বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল, "বন্ধু, আমি তোমার ব্যথার ব্যথী, তোমার দুঃখে সমবেদনা জানাতে এসেছি।"

মং-বা জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে?"

—মানে অতি সোজা। অর্থাৎ তুমি হতাশ প্রেমিক, আমিও তাই। তবে পার্থক্য এই যে, তোমার আশা কোনদিনই পূর্ণ হবে না; আমার আশা শীঘ্রই সফল হবে।

—বটে?

—হাঁ, ঠিক তাই। মা-খিন্ তোমার উপর বড় বিরূপ। কোনদিন তোমার নাম পর্য্যন্ত মুখে আন্‌তে বারণ করেছে। আর সে আমায় বিয়ে করবে বলেছে।

—বিয়ে করবে তোমায়?

—কেন, তোমার বিশ্বাস হয় না? কিন্তু বাস্তবিকই সে বলেছে বিয়ে করবে—তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে, যত দিন না বেশ টাকা-পয়সা হাতে জমে। তার পর সে সব ভেবে দেখবে।

হাঃ হাঃ করিয়া মং-বা হাসিয়া উঠিল,—"তা হ'লে ত সবই ঠিক হয়ে গেছে—কবে হবে বিয়ে?"

মং-বার পরিহাসে টুন্-অঙ্গ্ কিছু উষ্মার স্বরেই জবাব দিল, "হবে, শীগ্‌গিরই—যেদিন হবে, তুমিও জান্‌তে পারবে।"

সহাস্যে মং-বা জিজ্ঞাসা করিল, "টাকাপয়সাটা জম্‌বে কবে?"

—তাতেও দেরি হবে না। মা-খিন্ ত সেজন্যে খুব চেষ্টা করছে। আজকাল রোজই নাচের মুজরায় যাচ্ছে।"

"কি?" মং-বা গর্জ্জিয়া উঠিল; বলিল, "সে আবার নাচের ব্যবসা ধরেছে? আমার এতটুকুও বিশ্বাস হয় না, টুন্-অঙ্গ্। তুমি ঘোর মিথ্যাবাদী।"

টুন্-অঙ্গ্ তেম্‌নি মিটিমিটি হাসিতে লাগিল, বলিল, "ভুল, বন্ধু, ভুল; আমার উপর রাগ করা বৃথা। তোমার বিশ্বাস না হয়, এস। চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়ে দেব।"

যন্ত্রচালিতের মত মং-বা উঠিল। যেথায় বহুদিন পূর্ব্বে উজ্জ্বল আলোকমালা শোভিত মঞ্চে মা-খিন্‌কে সে প্রথম দেখিয়াছিল, সেথায় আজও তাহাকে তেমনই আলোকিতা দীপমালার মধ্যে সজ্জিতা দেখিতে পাইল!

মা-খিন্ তখন গাহিতেছে

"ওগো, ও দরদী বঁধু,
শেষের সেদিন নয়নের জলে
এসে দেখা দিও শুধু;
হে মোর দরদী বঁধু!"

নৃত্যের তালে তালে সে যেন আপনাকে ঢালিয়া দিতেছিল; সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় সে যেন আপনার সত্তা ভুলিয়া গিয়াছিল। পূজারিণীর প্রাণের নৈবেদ্য কাহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হইতেছিল, তাহা সে-ই জানে।

মং-বা জনতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিল, সবই শুনিতে পাইল। তাহার চক্ষুকর্ণ সমস্তই দেখিতেছে শুনিতেছে বটে, কিন্তু মস্তিষ্কে কোন ধারণাই আসিতেছে না। যেন কোন্ দূরাগত কণ্ঠস্বর বহু দিবসের অতীত স্মৃতি—একসঙ্গে এক ঝাঁকে সমস্ত আনিয়া দিয়া তাহার মাথায় গণ্ডগোল পাকাইয়া দিল। সে তাহাতে শুধু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাম্‌নে কি হইতেছে, যদি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, তখন হয়ত সে সে-কথার উত্তরই দিতে পারিত না!

রাত্রি অধিক হইয়াছে—জনতা কমিয়া যাইতেছে। এমন সময় মা-খিন্ হঠাৎ মং-বাকে দেখিতে পাইল। কি হইয়া গেল তাহার মধ্যে কেহ জানিতে পারিল না। কিন্তু শরীরে যেন একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া উঠিল—কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া গেল—উর্দ্ধালোড়িত হস্ত অবশ হইয়া পড়িল—চরণ থামিয়া গেল—থর থর কাঁপিয়া মা-খিন মঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল।—সহসা অর্দ্ধপথে আনন্দের অবসান হইল।

* * *

রাত্রিশেষে নিস্তব্ধ গৃহে মা-খিন্ ডাকিল, "টুন্-অঙ্গ্, ভাই!"

বড় দুর্ব্বল সে—শয্যা হইতে উঠিতে পারে না—মাথাটা এখনও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে।

অতি অসহায় দীনভাবে মা-খিন্ কহিল, "টুন্-অঙ্গ্, ভাই, আমার সব শেষ হয়েছে।"

শিয়রে নির্ব্বাক্ বসিয়া টুন্-অঙ্গ্। যদি সাধারণ অবস্থায় মা-খিনের এই আক্ষেপোক্তি সে আজ শুনিতে পাইত, তাহা হইলে বোধ হয় তন্মুহূর্ত্তে তাহার বুকে ছুরি বসাইয়া দিতে এক বিন্দুও দ্বিধা করিত না। কিন্তু তাহার এই কাতর

অসহায় ভাব মনে আজ মমতা জাগাইয়া দিল; বলিল, "ভয় কি, বোন্, আমি আছি।"

"তাই বল, ভাই, তাই বল" বলিয়া মা-খিন্ শয্যার উপর উঠিয়া বসিল; টুন্-অঙ্গ্-এর হাত দুখানি নিজের দুর্ব্বল হাতে ধরিয়া বলিল, "আজ প্রতিজ্ঞা কর, ভাই, আমি তোমার বোন্, আর শুধু তুমি আমার ভাই, আর কোন সম্বন্ধের কথা যেন তোমার মনে না আসে।"

মুহূর্ত্তে টুন্-অঙ্গ্-এর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য কোমল রাখিয়া বলিল, "এত দিন আশা দিয়ে শেষে নিরাশ করা কি তোমার ভাল হবে, মা-খিন্? তুমি ভাল হয়ে ওঠ; তার পরে এ-সব কথা চিন্তা ক'রো। তখন দেখবে, সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

"তা আর হয় না, ভাই!"—বলিয়া মা-খিন্ করুণ হাসিল; বলিল, "আমি ত তোমার কাছেই চিরকাল আছি, ভাই! তবে কেন তুমি নিরাশ হবে?—অন্য সম্বন্ধটাই কি এত বড় সম্বন্ধ?"

টুন্-অঙ্গ্ কথা কহিল না।

হতাশার স্বরে মা-খিন পুনরায় কহিল, "আমি বরাবর জানি, ভাই, বিয়ে আমার অদৃষ্টে নাই।"

ক্ষুব্ধ হাস্যে টুন্-অঙ্গ্ উত্তর দিল, "তাই বুঝি ওই শয়তানটাকে আবার ভোলাবার জন্যে ফাঁদ পেতেছিলে?"

"সে কথা ভুলে যাও, ভাই।" বলিয়া অতি ব্যগ্রভাবে মা খিন নিজের ব্যথিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "আর আমার উপর কোন রাগ অভিমান রেখো না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ভাই, এত দিন যেমন দুটি ভাই বোনে আমরা ছিলাম তেমনি চিরকাল থাকবো। এ জীবনে কাউকে কখনও বিয়ে করবো না।"

টুন্-অঙ্গ্ ক্ষুণ্ণ মনে বসিয়া রহিল; অবশেষে সুস্পষ্ট স্বরে কহিল, "তোমার প্রতিজ্ঞা আমার মনে থাকবে, মা-খিন্!"

কিছুক্ষণ পরে তাহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও নিদ্রিত দেখিয়া টুন্-অঙ্গ্ চুপি চুপি এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া অতি সন্তর্পণে বোধ করি বা তাহার জুয়ার আড্ডার উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

সে রাত্রি মং-বার কেমন করিয়া কাটিল সে নিজেই তাহা মনে রাখে না। বাঁশী ফেলিয়া দিয়া বিভ্রান্তের মত সে এদিক-ওদিক ঘুরিয়াছে। যেমন করিয়া হউক্, মা-খিন্‌কে সে খুঁজিয়া বাহির করিবে, তাহাকে তাহার চাই!—জগৎ-সংসার অতল জলে ডুবিয়া যাক্—তাহার কিছু যায় আসে না।

রাত্রিশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কোন্ এক সময় বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। তখন ঊষার পূর্ব্বরাগ কেবল আকাশে ফুটিয়া উঠিতেছে; প্রভাত-পাখীরা সবে কাকলী গাহিয়া উঠিতেছে। মং-বার মনে হইল, বাড়িতে নিদ্রার স্তব্ধতা ভাঙিয়া কর্ম্মের কোলাহল আরম্ভ হইয়াছে। মনে পড়িল—আজ তাহার বিবাহোৎসব। মুহূর্ত্তেই মনটা অত্যন্ত বিরূপ হইয়া গেল। না, সে ওই বন্দীশালায় প্রবেশ করিবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—সাকিনাকে। আহা, নির্দ্দোষ, সরলা বালিকা!—কিন্তু, হায়! মং-বার মন যে বিধাতা অন্যরূপ গড়িয়াছেন?—সে কি করিবে?

—না, একবার মা-খিন্‌কে দেখিতে হইবে। বড় অসহায়া, অভাগিনী সে!—দেখিতে হইবে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে কেমন আছে।—মং-বা নিজের প্রাণ দিয়াও তাহার দুঃখ দূর করিবে।—কিন্তু, কিন্তু সাকিনাকে সে ব্যথা দিবে কেমন করিয়া?

মং-বা আবার চলিল—চলার যেন আর বিরাম নাই। প্রান্তর বহিয়া মং-বা পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তিন্তিড়ী, আমলকী, আম্র, জম্বু, দেবদারু ও অন্যান্য বনজাত বৃক্ষলতাগুল্মে বনস্থলী অন্ধকার; মধ্যে মধ্যে সরু সরু পায়ে চলার পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া এদিক-ওদিক গিয়াছে।—দারুণ পরিশ্রমে, মানসিক উদ্বেগে, মং-বার চরণ টলিতে লাগিল—সে আর চলিতে পারে না। একটা পায়ে চলার পথের পাশে বৃহৎ এক বটবৃক্ষমূলে মং-বা বসিয়া পড়িল—চিন্তার সে বিরাম চায়!

অমনি ভোরের শীতল বাতাস মায়ের মত স্নেহকরস্পর্শে তাহার সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া দিল—মং-বা ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাতে বাড়ির লোকে যখন মং-বাকে দেখিতে পাইল না, তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল। প্রথমে মনে করিল, সে হয়ত কোথাও বেড়াইতে গিয়া থাকিবে। কিন্তু ক্রমে

বেলা বাড়িতে লাগিল, তখনও মং-বার দেখা নাই। সকলে অস্থির হইয়া উঠিল। আত্মীয়স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত, কর্ম্মচারিবর্গ, দাস-দাসীতে গৃহ পরিপূর্ণ। বিবাহের সমস্ত উদ্যোগই পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। কিন্তু এ সমস্তই যাহার জন্য তাহারই যে দেখা নাই! শিবহীন যজ্ঞের মত সবই পণ্ড হইয়া যায় যে? তাহার হইল কি, কোথায় গেল?

কামাল সাহেব ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের গৃহে লোকজন মং-বার খোঁজে চলিল। মং-বার সন্ধান মিলিল না। তখন শহরের এদিকে-ওদিকে, এ-রাস্তায় সে-রাস্তায়, মসজিদে, চায়ের দোকানে, লোক ছুটিল। তবুও মং-বার দেখা মিলিল না। অমঙ্গলের আশঙ্কায় বৃদ্ধ পিতার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র, আজ এই বিবাহের দিনে করিল কি—কোথায় গেল? সাত-পাঁচ ভাবিয়া শেষে পুলিসে খবর দেওয়া হইল।

বেলা গড়াইয়া পড়িল। তবুও মং-বার দেখা নাই। আনন্দোৎসব নিরানন্দে পরিণত হইতেছে—বিবাহ-বাটীতে কাহারও মুখে হাসি নাই, কাহারও মুখে কথা ফুটিতেছে না, সমস্ত নীরব। কেবল মাঝে মাঝে কোন অনুসন্ধানকারী ফিরিয়া আসিলে তাহাকে ঘিরিয়া লোকজন কোলাহল করিতেছে। বিবাহের আনন্দস্থলে এ যেন নিশীথে নিস্তব্ধ শ্মশানভূমে থাকিয়া থাকিয়া নিশাচর পাখীর গমনধ্বনি কানে আসিতেছে।

সংবাদ সাকিনার কর্ণে পৌঁছিল। কিন্তু সে চীৎকার করিল না, অবসন্ন হইয়া পড়িল না। এক বিন্দু জল কেহ তাহার চোখে দেখিতে পাইল না। অনেক ক্ষণ সে শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে সে উঠিল; প্রসাধন করিল, অঙ্গরাগ সমাপন করিয়া এক-একটি করিয়া অলঙ্কার পরিল। বিবাহের পূর্ণ সাজে সজ্জিতা হইয়া ঘরের বাহিরে আসিল। পিতা তাঁহার কন্যাকে দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ধীরে সাকিনা পিতার কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইল; বলিল, "বাবা, দুঃখ ক'রো না; ওঠ।"

শোকে মুহ্যমান পিতা হায় হায় করিয়া উঠিলেন; হতাশার স্বরে বলিলেন, "এ তুই আমায় কি দেখালি, মা, কি সাজে এলি? কেন আর আমার দুঃখ বাড়াস্ মা?—কোথায় গেল সে,—সে কি আর আস্‌বে?"

সাকিনা স্থিরস্বরে বলিল, "বাবা, আমার মন বল্‌ছে, তিনি আস্‌বেন।—তিনি আস্‌বেনই—এ জেনেও কি আমি চুপ্ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারি, বাবা?"

বৃদ্ধ পিতা শিশু বালকের মতই ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

* * * *

মা-খিন্ জাগিয়া উঠিয়া দেখিল টুন্-অঙ্ চলিয়া গিয়াছে। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। এই তাহার জীবন—তাহার জীবনের অবলম্বন। টুন-অঙ্ আজ জুয়াড়ী, পুলিস তাহার পিছু ঘুরিতেছে—যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহার এই অবলম্বন বাতাসে তৃণখণ্ডের মত উড়িয়া যাইতে পারে। প্রকাশ্যে সে লোক-সমাজে মুখ দেখাইতে পারে না, নিশার অন্ধকারে সে চোরের মত পলাইয়া যায়, তাহারই ভরসায় তাহাকে চিরজীবন কাটাইতে হইবে! অতিদুঃখে মা-খিনের হাসি পাইল।

নিজের অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া সে ভাবিতে লাগিল —সত্যই কি টুন্-অঙ্-এর ভরসায় তাহার সমস্ত জীবন চলিবে? সে ভরসার আস্থা কতটুকু? তাহাকে বিশ্বাস কি? আজও যে তাহার উপর সন্তুষ্ট নয়—কাল রজনীর অত কাতর অনুনয় যে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছে, সে যে কখন কি করিয়া বসে, তাহার ঠিক কি? তাহার উপর তাহার জীবনবৃত্তি তাহাকে চারিদিক হইতে বিপন্ন করিতেছে। এ অবস্থায় হতাশ হইয়া সে কি না করিতে পারে?

না, এ ভাবে থাকা হইবে না। এই আজন্মের চিরপরিচিত ভূমি তাহাকে ছাড়িতে হইবে। এই জীবনদায়িনী মৃত্তিকা, বর্ণগন্ধে ভরা আকাশ-বাতাস, সর্ব্বস্মৃতি-বিজড়িত বাসগৃহ, স্নেহময়ী জননীর কোল ছাড়িয়া সে চলিয়া যাইবে—এমন স্থানে, যেখানে কেহ তাহাকে চেনে না, কেহ তাহার কথা ভাবে না—যেখানে সে আগন্তুক, অতিথি মাত্র। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া মা-খিন্ আজ প্রথম এমন করিয়া জন্মভূমির কথা ভাবিতে পারিল—আশপাশের দৃষ্ট অদৃষ্ট প্রত্যেক জিনিষের প্রতিই তাহার বড় মায়া হইতে লাগিল।

কিন্তু, ছাড়িতেই যে হইবে অতি নিষ্ঠুরের মত সে এত স্নেহের আকর্ষণ ছিন্ন করিবে। তবে যাইবার পূর্ব্বে একবার

বড় সাধ হয়—মা-খিন্ চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া লইল কেহ তাহার প্রলাপ শুনিতে পাইতেছে কি না—সাধ হয়, শুধু একটিবারের জন্য মং-বাকে দেখিতে।

বিধাতা সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন কি?

মা-খিন্ উঠিল। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল। বাক্সপত্র খুলিল—কতক জিনিষ বাহির করিয়া একসঙ্গে করিল। বাকী জিনিষ ভাল করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া আবার বাক্সের মধ্যে ভরিল। যাইবার উদ্যোগ আয়োজন সমাধা করিয়া বাহির হইল।

রাস্তার ধারে একটা দোকানে কিছু খাইতে খাইতে মা-খিন্ ভাবিতে লাগিল—যাওয়া যায় কখন? দিনে লোকজন নানা প্রশ্ন করিবে কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে ইত্যাদি। সুতরাং দিন গেলে অন্ধকার পড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে যাওয়াই ভাল। টুন্-অঙ্গ্ যদিও আসে, একটু বেশী রাত্রির আগে আসিবে না। সন্ধ্যাবেলাই তাহ'লে সব চেয়ে ভাল সময়। কিন্তু এখন এতটা সময় কি করি।

মা-খিনের পা আপনিই চলিল—প্রায় সমস্ত শহরটাই প্রদক্ষিণ করা হইল। বেলা পড়িয়া আসিল—ঘুরিতে ঘুরিতে মা-খিন্ হাসপাতালের পাশে আসিল। এই সেই স্থান, যেখানে এক দিন তাহার সব কামনাই সার্থক হইয়াছিল। মা-খিন্ চাহিয়া দেখিল, ওই সেই ঘরের জানালা—আজও তেমনই খোলা রহিয়াছে—আজও সূর্য্যের শেষরশ্মি গাছের পাতার ফাঁক দিয়া তেমনই গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়াছে! বিভ্রান্তের মত চাহিয়া চাহিয়া মা-খিন্ চলিল।

সূর্য্যের আলো আজ যেন বড় চোখে লাগে—লোকের দৃষ্টি তার দিকে যেন জিজ্ঞাসু হইয়া চাহিয়া আছে। খোলা মাঠের পথ ছাড়িয়া মা-খিন্ নির্জ্জন বনপথ ধরিল। বনের শীতল ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার চলিল। চলিতে চলিতে বনের ওই ধারে বড় গাছটার তলায় কি দেখা যায় না? সভয়ে মা-খিন্ পিছু হটিল। কিন্তু হটিয়া গিয়া কৌতূহলবশে আবার দৃষ্টি বিস্ফারিত করিল। ওকি, একটা মানুষ না? ওই ত তার চোখে মুখে সূর্য্যকিরণ পড়িয়াছে। সে আবার অগ্রসর হইল। মুখটা যেন চেনা যায়—তাই ত, এ ত তা'র সেই চিরপরিতচিত মুখ। যার জন্ত এত দিন সে বসিয়া আছে, যার জন্তে মনের মধ্যে সে অহর্নিশ এত বেদনা পোষণ করিয়াছে, যাকে আজ একটি বারের দেখা দেখিতে সে এত লালায়িত—এই ত চির-কামনার, চিরসাধনার, চিরবাঞ্ছিত সেই মুখ!

মা-খিনের সারা গায় কাঁটা দিয়া উঠিল—উদ্বেগে সমস্ত বুক তোলপাড় করিতে লাগিল—উন্মাদিনী পথঘাট না মানিয়া, কোন দিক্ না দেখিয়া চলিল। পায়ে কাঁটা ফুটে, স্কন্ধলম্বিত উত্তরীয় লতাগুল্মে আটকাইয়া যায়, চরণ চলিতে চাহে না—তাহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

যেথায় বটবৃক্ষমূলে নিদ্রিত মং-বার চোখে মুখে সূর্য্য-কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার পার্শ্বে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া মা-খিন্ বসিয়া পড়িল। দুর্ভিক্ষপীড়িত ভিক্ষুকের মত ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দেখিয়া দেখিয়া আশা যেন আর মেটে না—মুখের উপর হইতে দু-একটা মশা মাছি তাড়াইয়া দিল—অতি যত্নে, অতি সাবধানে ললাটের স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিল। শেষে, উদ্গত একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া, ধীরে ধীরে মুখ বাড়াইয়া চিরজন্মের মত সর্ব্বশেষ একটি চুম্বন দান করিল।

সুকোমল স্পর্শে বুঝি বা প্রাক্তনের অলক্ষ্যবিধানে, মং-বা জাগিয়া উঠিল। নিদ্রাঘোরে চক্ষু মেলিয়া, সম্মুখে মা-খিন্‌কে প্রথম দেখিতেই, দুই ব্যগ্রবাহু মেলিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা-খিন্, মা-খিন্, এতদিন কোথায় ছিলে?—আমায় ফেলে এত দিন কোথায় ছিলে তুমি?"

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে—হাঃ, হাঃ, হাঃ,—অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল। ঝটিতি বাহুমুক্ত হইয়া উভয়ে উঠিয়া দেখিল—আগন্তুক টুন্-অঙ্গ্।

—বাঃ, রতনে রতন, একেবারে সোনায় সোহাগা!—কিন্তু আর নয়, আমার অশুভ গ্রহ, জীবনের শনি, পথের কণ্টক—তুমি আজ চিরকালের জন্য দূর হও।

অতর্কিত মং-বা বুঝিবার সময় পাইল না—বিদ্যুদ্বেগে টুন্-অঙ্গ্ দা উঠাইয়া সজোরে তাহার গায়ে কয়েকটা কোপ বসাইয়া দিল।

উন্মত্ত টুন্-অঙ্গ্ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।—"চমৎকার প্রতিজ্ঞা তোমার মা-খিন্, চমৎকার অভিনয়—কিন্তু আজ তোমার শেষমিলন—শেষ অভিনয় রজনী।" মা-খিন্‌কে

লক্ষ্য করিয়া টুন্-অঙ্গ্ দা উঠাইয়া আবার হাসিয়া উঠিল— হাঃ হাঃ হাঃ।

কিন্তু সেই উর্দ্ধোত্থিত হস্ত আর নামিল না—অট্টহাসির সঙ্গে সঙ্গেই সহসা বন্দুক গর্জ্জন করিয়া উঠিল—পাঁচ হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া টুন্-অঙ্গ্ পড়িয়া গেল। পুলিসের অব্যর্থ গুলীতে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়াছিল।

মা-খিন্ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল।

* * *

প্রদোষে, গোধূলির ম্লানরাগে, দিবারাত্রির সেই অপূর্ব্ব সঙ্গমসময়ে, যেখানে সাকিনা মিলনের স্থির প্রতীক্ষায় বসিয়া —সেখানে মৃত্যুপথযাত্রী মং-বাকে বহিয়া আনা হইল।

সাকিনা মং-বার মস্তক কোলে তুলিয়া লইল।

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ বুঝি একবার জ্বলিল। মং-বার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া সাকিনার পানে চাহিয়া অসীম মমতামাখা স্বরে মং-বা বলিল, "সাকী, আমি জানি তুমি আমার প্রতীক্ষায় ব'সে আছ—তাই তোমার কাছে এসেছি। এক মুহূর্ত্তের মনের উত্তেজনায় জীবনে কি ভুলই করেছি—তার জন্যে মাপ চাই, সাকী! কিন্তু আজ সকল দ্বন্দ্বের অবসান।"

মং-বা চক্ষু মুদিল। বাক্যনিঃসরণের চেষ্টায় শোণিতস্রাব প্রবলতর হইতেছিল।—জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সে—প্রতি মুহূর্ত্তে শরীর দুর্ব্বলতর হইয়া আসিতেছে।

অবশেষে চক্ষু মেলিয়া মং-বা পুনরায় ধীরে ধীরে কহিল, "তুমি আমার জন্যে এখনও তেমনই ব'সে আছ, সাকী? আমিও তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করবো সেখানে, যেখানে মোহ আত্মাকে আচ্ছন্ন করে না—যেখানে মন বিবেককে চাপা দেয় না—যেখানে সবই সত্য, সবই সুন্দর।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মং-বা যেন শূন্যে কাহাকে দেখিতে পাইল; ক্ষীণস্বরে শূন্যপানে চাহিয়া বলিল, "আজ তুমি আবার এসেছ, মা?—এবার ত আমি তোমায় ছাড়ব না? তোমার সঙ্গে যাব। মা, মা, একটু দাঁড়াও, আমি যাই।"

মং-বার প্রাণ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সাকিনা নির্ব্বাক বসিয়া—চোখে তার জল নাই—দৃষ্টিতে পলক নাই—পরম যত্নে প্রিয়তমের প্রাণশূন্য দেহ আঁকড়াইয়া আছে।

যখন সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে সরাইয়া লইতে গেল, তখন সাকিনার দেহেও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেল না।

* * *

তাহার পর অনেক দিন গিয়াছে। পুত্রশোকে বৃদ্ধ কামাল সাহেব কিছুদিন পরেই গতাসু হইয়াছেন। মং-বার কথা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে।

ভুলে নাই শুধু এক জন।

প্রতি সন্ধ্যায় এক ভিক্ষুণী মং-বার কবরপ্রান্তে আসিয়া ফুল দিয়া যায়; দীপ জালিয়া যায়। উর্দ্ধমুখে ভগবানের চরণে প্রার্থনা নিবেদন করিয়া নতমস্তকে প্রণতি জানায়। অঞ্চল তাহার বাতাসে দুলিতে থাকে—দীপশিখার মত ক্ষীণতনু বেদনায় নুইয়া পড়ে—ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস বুক চিরিয়া বাহির হইয়া যায়।

আর—মাঝে মাঝে শুধু দূর বনপ্রান্তর হইতে একটা হাহাকার বাতাসে ভাসিয়া আসে—হা, হা, হা।

এমন কত বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস, কত বঞ্চিতের হাহাকার, আকাশে বাতাসে মিলাইয়া আছে, কে জানে?

মক্ষিকা-উপন্যাস

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

কলিকাতায় দুইটি প্রধান সঙ্গী, মশা ও মাছি

রেতে মশা দিনে মাছি,
এই নিয়ে কল্‌কাতা আছি।

বহুকাল হইতে এই কবিতাটি মুখে মুখে চলিয়াছে। আমাদের অসীম ধৈর্য্যের বোধ হয় তাহাই কারণ।

আয়ুর্ব্বেদে আছে মক্ষিকা-বিষের কথা। বিষনাশের উপায়:—

মরিচ মহৌষধ বালক নাগাহ্বৈর্ম্মক্ষিকা বিষলেপঃ।
লালা বিষমপনয়তো মূলে মিলিতে পটোল নীলিকয়োঃ।

মরিচ, শুঁঠ, বালা ও নাগকেশরের প্রলেপ দিলে মক্ষিকা-বিষ নষ্ট হয়। পটোল ও নীল-মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে লালা-বিষ নিবারিত হয়। মক্ষিকানাশক ধূপ:

ত্রিফলার্জ্জুন পুষ্পাণি ভল্লাতক শিরীষকম্।
লাক্ষা সর্জ্জরসশ্চৈব বিড়ঙ্গশ্চৈব গুগ্‌গুলঃ।
এতৈ র্ধূপৈর্ম্মক্ষিকানাং মশকানাং বিনাশনম্।

—গরুড়পুরাণ

ত্রিফলা, অর্জ্জুনফুল, ভেলা, শিরীষ, লাক্ষা, ধূনা, বিড়ঙ্গ এবং গুগ্‌গুলের ধূপে মাছি ও মশার মৃত্যু। মাছি কি কি রোগ বিস্তার করে আয়ুর্ব্বেদে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

খাবারের উপর মাছি বমি করিতেছে

ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে যক্ষ্মা, ওলাওঠা, আমাশয়, শিশুর উদরাময় এবং চক্ষুরোগ বিশেষের রোগবীজাণু বহন করে মাছি। জীবটির আয়তন ক্ষুদ্র, সিকি ইঞ্চি পরিমাণ, কিন্তু শক্তি অসীম।

প্রথমতঃ, ব্যঞ্জনী শক্তি

চল্লিশ দিনে একটি মাছির বংশবৃদ্ধির সংখ্যা ৬৪,৫১,২০০।

ডিম ফুটাবার স্থান,—জঞ্জালপাত্র বা গর্ত্ত, গোবর-গাদা
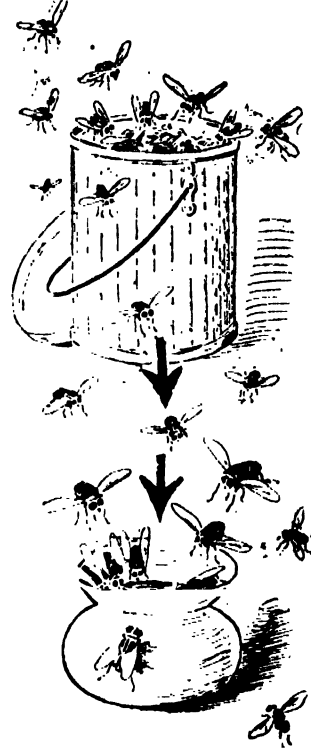
মাছি আবর্জ্জনাকুণ্ড হইতে আসিয়া খাবারে বসিয়াছে

ইত্যাদি। কলিকাতার জঞ্জাল-রেল প্রতিদিনে ২৮০০০ মণ ময়লা ছড়াইতে ছড়াইতে ধাপার দিকে অগ্রসর হয়। তবু অনেক ময়লা পড়িয়া থাকে। প্রত্যেক ডিম, একটি এক ইঞ্চির বারো ভাগের এক ভাগ পরিমাণ লম্বা সুতোর মতন। বারো ঘণ্টা কি এক দিনে সেটা হয় ছানা। আগে ছিল একটা অন্ধকার, স্যাঁৎসেতে গরম জায়গায়। পরে আসে ঠাণ্ডা শুকনো গোবরগাদায় কি মাটির নীচে। পাঁচ-সাত দিনে হয় পালকহীন মাছি। এই অবস্থাটা শীতকালে।

বসন্তের প্রারম্ভে ইহারা আনন্দে বোঁ বোঁ শব্দে উড়িতে থাকে। ফাল্গুনে যিনি একক, চৈত্রে তিনি দশ লক্ষ।

দ্বিতীয়তঃ, সৈন্যসংগ্রহ-শক্তি

একটি মাছি প্রায় ২৫,০০,০০০ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নরদেহ আক্রমণ করিতে পারে। ইহাদের নাম রোগবীজাণু।

আহার সম্বন্ধে উদার; বাছবিচার নাই। রুচি তরল পদার্থে। কঠিন খাদ্য লালায় ভিজাইয়া চুমুক দিলে পেটে তলাইয়া যায়; সুতরাং মিষ্টান্নে আপত্তি নাই।

রম্য স্থান

আনন্দে বিচরণ ও সন্তানোৎপাদনের স্থান, কলিকাতার আবর্জ্জনা-রেল, খোলা নর্দ্দামা এবং গোশালা।

আবর্জ্জনা-রেল

এই রেলের মায়া "দুরত্যয়া"। জন্ম ১৮৬৭ সালে; পোষণের ব্যয় ১৫ লক্ষের অধিক। সুতরাং ৬৮ বৎসরের সন্তানকে ত্যাগ করা সহর-পিতাদের পক্ষে কঠিন। আবার স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ নগরবাসীদের জ্বালায়ও তিষ্ঠা ভার। আমার গুরু ডাক্তার ডেভিড্ স্মিথ যখন ছিলেন স্যানিটারী কমিশনর, তিনি বলিয়াছিলেন এই প্রথা স্বাস্থ্যতত্ত্বের অপব্যবহার (great sanitary abuse) এবং চিন্তাহীনতার পরিচায়ক (ill-considered and reckless system of conservancy)। কিন্তু চিরকালই সরকার বাহাদুর সবজান্তা। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, ডাক্তারী তাঁহাদের করতলস্থ আমলকবৎ। ছোটলাট পরিদর্শন করিয়া বলিলেন:— "অস্বাস্থ্যকরতার চিত্র অতিরঞ্জিত।" আমি যখন ছিলাম কর্পোরেশনের সদস্য, এবং সুভাষচন্দ্র ছিলেন বড়সাহেব (C. E. O.), সুভাষ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, রেল উঠিয়া যাইবে দুই বৎসরের মধ্যে। দশ বৎসরের কথা। ইতিমধ্যে চিংড়ীহাটাবাসীদিগের আপত্তি, রেলের ধাঙ্গড়দের ধর্ম্মঘট করা ইত্যাদি নানাবিধ বিভীষিকা-সন্ত্রস্ত কর্পোরেশন কম্পিত কলেবরে পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

মাছির দ্বিতীয় রম্য স্থান খোলা নর্দ্দামা। কলিকাতার খোলা নর্দ্দামার দৈর্ঘ্য ৩২০ মাইল। মাইল-প্রতি প্রতিদিন কেরোসীন-ব্যবহারের ব্যয় অন্ততঃ ৫৲। দেউলিয়া হইবার ভয়ে কর্পোরেশন সে-বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেন না।

তৃতীয় রম্য স্থান গোয়ালঘর ও গোয়ালা-বাড়ি। শক্ত ঠাঁই। গোয়ালাদের অসন্তোষের ফল কাউনসিলার-পদ-প্রার্থীদের ভোট-বিভ্রাট এবং স্বাস্থ্যকর্ম্মচারীদের আয়-সংক্ষেপ। আজকাল আবার স্থানে স্থানে সংঘবদ্ধ গোপ বা যাদব-সভার হুঙ্কার।

মার্কিন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎদের পরামর্শ

Kill a fly in Spring,
You do a fine thing,
Kill a fly in May,
You keep thousands away;
Kill a fly in June,
You'll get results soon;
Kill a fly in July,
You just kill a fly."

বসন্তে মক্ষিকা নাশ;
সাবাস ভাই সাবাস।
মে মাসেতে মাছি মার।
হাজারে হাজারে তাড়া।
জুন মাসে হ'লে হত।
ফল পাও মনোমত।
অপেক্ষা করিয়া মার জুলায়ে অগত্যা।
বৃথা পরিশ্রম ঐ এক মাছি হত্যা।

ডিম্ব বা পক্ষহীন অবস্থায় মাছি মারা সঙ্গত। বসন্তের আরম্ভেই জঞ্জালস্তূপ, গোবরগাদা, পচা লতাপাতা ইত্যাদি দূরে ফেলা উচিত। গোবর মাঠে রৌদ্রে শুকাইতে দিলেই মাছিছানার মৃত্যু। গোবরগাদা সরাইবার সুবিধা না থাকিলে সোহাগার জল ছড়াইলে ডিম-ছানা মরে। কেরোসীনও মক্ষিকানাশক কিন্তু ইহাতে সার গুণ নষ্ট হয়। আস্তাবল ও পাইখানা সংক্রান্ত আইন, মাছি ধরিবার ফাঁদ ও জাল, বসন্তের প্রারম্ভে মাছির জন্মস্থানের সন্ধান এবং স্বাস্থ্য-বিভাগের কার্য্যতৎপরতা আমেরিকায় মাছির উপদ্রব অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছে।

আমি যখন ৺ রাধাগোবিন্দ করের মেডিকেল স্কুলে স্বাস্থ্য-বিদ্যার অধ্যাপক ছিলাম, তদানীন্তন ছোটলাট স্যর চার্লস্ ইলিয়ট এক দিন পরিদর্শন করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, বাংলার মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সদস্যদের স্বাস্থ্য-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বাস্তবিক তাঁহাদের

স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞান থাকিলে তাঁহারা নির্ব্বাচন-ভোট অপেক্ষা জনগণের জীবন অধিক মূল্যবান মনে করিতেন।

মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি

তাহারা চায় ঘা বা ময়লা। সুতরাং মাছির সংখ্যা সহর-পিতাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতার মাপকাঠি। তাঁহাদের বিভাগীয় কর্ত্তাদের সঙ্গে যদি বাধ্যতামূলক সম্বন্ধ না থাকে, কর্ত্তাদের কর্ম্মের উপর যদি খর দৃষ্টি থাকে, স্বাস্থ্যবিধি-লঙ্ঘন-কারীদের যথোচিত শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা যদি করা হয়, মশা মাছির উপদ্রব যে অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মাছি চায় পচা ঘা। কর্পোরেশন-দেহে কর্ত্তব্য-হীনতা পচা ঘা থাকিলেই মাছির আনন্দ। সেই আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হউক, বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করি।

উত্তরে

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

এতদিন হ'ল, আশা করি তুমি পড়েছ আমার লেখা,
এবারে তোমার কি বলার আছে বল।—
হেন একান্তে গোধূলিবেলায় পথে পাব তব দেখা
অভাবিত সুখে হৃদয় যে টলমল।
তুমি জান—আমি কথাতে কাঙাল, মুখে ছোট মোর মন,
বুঝায়ে বলিতে পারিব না, কি যে চাই,
একবার শুধু ও দুটি নয়নে, বেশী নয় কিছুখন
দুরাশা আমার—আমারেই যদি পাই!
সব-কাজ-সারা সব-সাজ-ছাড়া সুদীর্ঘ দিনশেষে
সবখানি মন রয়েছে সকল ভুলে;
কতটুকু কাল?—এখুনি আবার ভোলা খুঁটিনাটি এসে
মন কেড়ে লবে কলকোলাহল তুলে।
এই ক্ষণটুকু—এ যখন তুমি পেয়েছ তোমারে একা,
গহন গভীর নীল সে অতলে তব
সাঁঝতারা সম দীপিছে আমারই আত্মার রূপরেখা
ও আঁখি-মুকুরে তারই ছায়া দেখে লব।
আঁখিতে আমার আঁখি মিলাইয়া বলিতে চাহিলে কিছু
ভাষায় বুঝাতে লাগে যদি বাধবাধ,
নীরবে না-হয় চেয়ে ভরা চোখে অমনি ক'রো তা নীচু,
অধর দু-খানি কাঁপিবে তো আধআধ!—
—তবেই সে হবে; এর পরও রবে আরও বোঝাবার বাকী,
—মনে কর আমি এত কি বেদনাহীন?
কথা কি বোঝাবে, যা বুঝেছি তব মৌনের ধ্যানে থাকি,
না-বলা সে-ভাষা ভুলিব না কোনদিন।

এসেছ যখন আরও কাছে এস, আর একটু সুধা ঢালো,
কোন ভাবে আজ একটুকু দাও সাড়া,
দেখ, ও-মুখের কিনারে কিনারে ঘুরিছে গোধূলি আলো,
অধীর বাতাস আঁচলে দিতেছে নাড়া!

বল, তুমি বল—পড়েছ সে লেখা, কেমন লেগেছে প'ড়ে?
বুঝেছ কি তবে কে মোরে করিল কবি,
পড়িতে পড়িতে পড়া শেষ হ'তে উঠেছে কি মন ভ'রে
সব চেয়ে যারে ভালবাস তারই ছবি?

—এটুকুই বল—চাও তুমি মোরে, মোর কথা মনে ওঠে
কিছু সে আমার তোমার মনের মত,
কি ঐশ্বর্য্য দিতে পার তুমি, কথা তো এ ক'টি মোটে,
একটি জীবনে পাব যে জীবন কত!

এক জন উদীয়মান চিত্রশিল্পী ঃ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় লক্ষ্ণৌ সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পর, একাধিক বাঙালী ছাত্র হালদার-মহাশয়ের স্কুলে শিল্পশিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হয়েছিল। এদের মধ্যে অধ্যক্ষের শিক্ষা সফল ক'রে যাঁরা কৃতবিদ্য হতে পেরেছেন, তাঁদের মধ্যে রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি গোরক্ষপুর কলেজের প্রফেসর, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র। গোরক্ষপুর স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন্ পাস ক'রে ইনি ১৯৩১ সালে হালদার-মহাশয়ের পরিচালিত ফাইন আর্ট ক্লাসে যোগ দেন। পৌরাণিক চিত্রে ও অলঙ্কার-শিল্পে ইনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। নন্দলাল বসুর পরে, আর কোনও বাঙালী শিল্পী পৌরাণিক চিত্রের পরিকল্পনায় বিশেষ আকৃষ্ট হন নি। আধুনিকতার অতি-প্রগতির দাপে, অনেক শিক্ষানবীশ শিল্পীরা মনে করেন, যে, সাধারণভাবে বাঙালী হিন্দুরা প্রাচীন পৌরাণিক ভাব-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবে ভারতের প্রাচীন পুরাণে বর্ণিত কৃষ্টির জগতে আমরা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস হারিয়েছি। 'সবুজ পত্রে' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর পূর্ব্বে লিখেছিলেন, "আমরা পৌরাণিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি।" এ কথা সুনিশ্চিত যে অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায় পারদর্শী বাঙালী সম্পূর্ণরূপে পৌরাণিক যুগের ভাব-ধারায় বিশ্বাস হারিয়েছেন। অথচ এমন অনেক উচ্চশিক্ষিত লোক এখনও দেখা যায় যাঁরা এই আধুনিক যুগেও পৌরাণিকতার সংস্কার থেকে একেবারে মুক্তি পান নি। এলাহাবাদের রামলীলার মিছিল দেখে অনেক সংস্কার-মুক্ত উচ্চ-শিক্ষিত বাঙালীকে অশ্রুপাত করতে দেখা গিয়েছে।* পৌরাণিক জগতে বিশ্বাস হয়ত মানুষের মনের শিশুভাবের লক্ষণ। অনেকে বলেন যে মানুষের "মানসিকতা" যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ পরিণত পরিপক্ক-বুদ্ধিসঙ্গত হয়—তখনই এই আদিমজাতিসুলভ, সরল, বিশ্বাসগুলি প্রাচীন জীর্ণ বসনের মত মানুষের মত থেকে আপনি খসে পড়ে। ইউরোপের নিত্য-পরিবর্দ্ধমান বিজ্ঞান-বুদ্ধি দিনে দিনে, ইউরোপের ভক্তিবাদকে খ্রীষ্টীয় পুরাণের বহু দূরে অপসারিত করেছে। বিজ্ঞানের ঝড়ে ও বিদ্যুতে মিথ্ ও মিরাকলের অশরীরী ছায়া দূরীকৃত হয়েছে। তথাপি, ইউরোপে পৌরাণিক ভাবধারায় বিশ্বাস একেবারে অন্তর্হিত হয় নি। ইউরোপের শিক্ষাতত্ত্বের মনীষী, বিশেষজ্ঞ-গণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন সাগার (Sagar) উপকারিতা যথেষ্ট স্বীকার করেন। ইউরোপের অনেক স্কুল ও কলেজে গ্রীক্, রোমান, ও নর্স পুরাণের (Mythologyর) পঠনপাঠনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আমেরিকার স্কুলসমূহে ছাত্রদের প্রাচীন পুরাণের উপকথার রস চাক্ষুষ করিবার সুযোগ দেবার জন্য দলে দলে "বাসে" চড়িয়ে যাদুঘরে প্রাচীন শিল্পের নিদর্শনে পৌরাণিক চিত্রাবলী দেখান হয়। আমাদের দেশে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক লোক ইংরেজী শিক্ষিত। বাকী সকলে এখনও পৌরাণিকতার অন্ধযুগের "যে তিমিরে সে তিমিরে।" সুতরাং বর্ত্তমান যুগেও যে চিত্রকর পৌরাণিক বিষয়-বস্তু অবলম্বন ক'রে ছবি লিখে যাবেন, তিনি অন্ততঃ অনাহারে মারা যাবেন না। আগে বউবাজারের "আর্ট ষ্টুডিও", এবং পরে রবিবর্ম্মার পুণার "আর্ট প্রেস," যাদের ছবির তৃষ্ণা মেটাতেন, পৌরাণিক চিত্রের সস্তা প্রতিলিপি ছেপে সেই শ্রেণীর ক্রেতা এখন এক রকম অনাদরে পড়ে রয়েছেন। নন্দলালের "পটে" লেখা নূতন পদ্ধতির "শিবপুরাণ" পৌরাণিক চিত্রের পিপাসা একবার নূতন ক'রে জাগিয়েছিল। তার পথ অনুসরণ ক'রে দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ দুই-এক জন চিত্রকর আমাদের কিছু আশা দিয়ে এসেছেন। কিন্তু নন্দলালের পর আর কেহই

* জ্বালানি কাঠের মত নীরস প্রবাসী-সম্পাদকের এই সত্য অপবাদ রটিয়া থাকিবে।

পৌরাণিক চিত্র-বস্তু অন্তরের সহিত, নিষ্ঠার সহিত বরণ করেন নি। তার পর এক যুগ কেটে গেছে। বাংলা দেশের, তথা সারা ভারতের, চিত্র-বিদ্যার ক্ষেত্রে, এক জন নূতন পৌরাণিক চিত্রকরের আগমন প্রতীক্ষা ক'রে আমরা ব'সে আছি। এমন সময়ে হালদার-মহাশয়ের ছাত্র রামেশ্বর উপস্থিত হয়েছেন আমাদের উপবাসী পৌরাণিক মনের খাদ্য যোগাতে। ইংরেজী আধুনিক চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে রাসেল্ ফ্লিন্ট, হ্যারি মর্লে প্রমুখ জন-কয়েক বড় শিল্পী পৌরাণিক চিত্র লিখে যশ অর্জ্জন করেছেন। তথাপি, তাঁরা সকলেই পৌরাণিকতার সরল অকৃত্রিম ও অলৌকিক জগতে ফিরে যেতে পেরেছেন এ কথা মনে করা অত্যন্ত ভুল হবে। অনেকের পক্ষেই ভীনস্, ডায়েনা, নিম্ফ, ও ফনের চিত্র-রচনা করা, নগ্ন মূর্ত্তির সেবার একটা সুযোগ ও অজুহাত মাত্র। হিন্দু সংস্কৃতির পৌরাণিক জগতে অবশ্য অপ্সরী, কিন্নরী, প্রভৃতি বসনহীনা নায়িকাদের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু অধিকাংশ পৌরাণিক চিত্রে অদ্ভুত ও ভয়ানক রসের দৌরাত্মাই বেশী। কেবল নগ্ন "মডেলের" সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে হিন্দুর পৌরাণিক জগতে প্রবেশ লাভ করা যায় না। এই পথের পাথেয় অলৌকিক ধ্যান-ধারণা, গভীর ভাবুকতা, ও উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা। নন্দলালের পৌরাণিক চিত্রে আমরা এই সমস্ত গুণেরই পরিচয় পেয়েছি।

নন্দলালের পর পৌরাণিক চিত্রে নূতন ভাব ও রসের প্রবর্ত্তনা করা বোধ হয় অসাধ্যসাধন। তথাপি, আমার মনে হয় রামেশ্বরের প্রচেষ্টার মধ্যে অনেকটা আশার বীজ নিহিত আছে। তাহার অন্তরের মধ্যে পৌরাণিক বস্তু সাধনার উপযোগী একটা স্বাভাবিক প্রেরণা আছে কিনা তা অনুসন্ধান করবার সুযোগ আমার ঘটে নি। কিন্তু যে-পরিবারে এই যুবক-শিল্পী জন্ম নিয়েছেন সেই পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। এই পরিবারের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং একাধিক বংশধর শিক্ষা-ব্যবসায়ী। আধুনিক উচ্চ-শিক্ষা ইহাদের বংশ-পরাম্পরাগত প্রাচীন হিন্দু-শিক্ষার সংস্কৃতিকে অভিভূত করতে পারে নি এই ধারণা আমার মনে বেশ স্পষ্ট জেগে উঠেছিল।

এই পরিবারের প্রায় সকলের চরিত্রে, কেবল আচার-গত বাহ্য শুচিতা নহে, বেশ একটু আভ্যন্তরিক শুচিতা, নিষ্ঠা ও সংযমের পরিচয় পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছিলুম। যে-পরিবেশের মধ্যে মানুষ হ'লে শিল্পী পৌরাণিক চিত্রবস্তুর সম্মান রাখবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারেন, রামেশ্বরের বাল্য-জীবন সেই পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। 'প্রবাসীর' ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত "কল্কি অবতারে"র পরিকল্পনায় নবীনশিল্পী এমন একটু শক্তির পরিচয় দিয়েছেন যাতে ক'রে মনে হয়, যে তাঁর নিজস্ব সাধনা তাকে জয়যাত্রার পথে চালিত করেছে। তাঁর যম রাজার চিত্রও এই অনুমান সমর্থন করে। অনেক সময়ে মনে হয় সিদ্ধির প্রয়াস সিদ্ধিলাভ হ'তে বড়। সাধনার অবসানে, সিদ্ধি শক্তির বিরাম ও বিশ্রামে পর্য্যবসিত হয়;—সাধনার প্রয়াস শক্তি ও শক্তিমানের জীবন্ত ও সক্রিয় প্রতিমূর্ত্তি।

প্রেস, কলিকাতা — যম — শ্রীরাজেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমান ইতালী
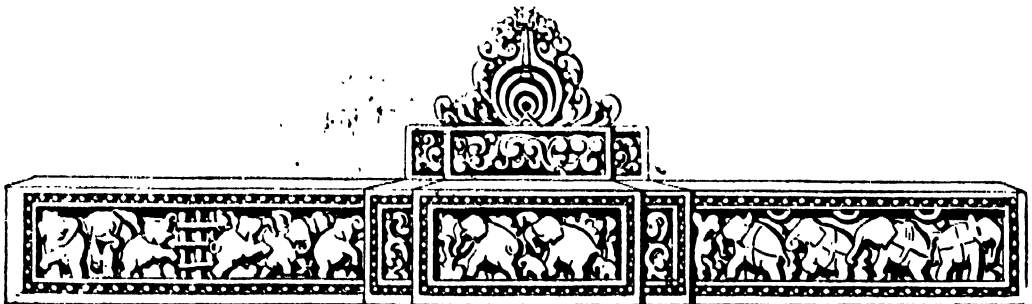
শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগতের ইতিহাসের বর্ত্তমান অধ্যায়ে ইতালী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বর্ত্তমান ইতালী বিশ্বের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি আকর্ষণ করছে; সমগ্র বিশ্ব আজ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে আফ্রিকার স্বাধীন রাজ্য আবিসীনিয়ার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান ইতালীর আক্রমণের উদ্যত আস্ফালন দেখছে। কালো জাতেরা তাকে অক্ষমের অবলম্বন নিষ্ফল গালিগালাজ করছে, যে-সব সাদা জাতের স্বার্থহানির সম্ভাবনা নাই তারা দূরে দাঁড়িয়ে, তামাশা দেখছে হয়ত মনে মনে ইতালীর ওপর বেশ একটু খুশীই হয়ে উঠছে, আর স্বার্থসম্পন্ন সাদা জাতেরা নিজের সীমানা রক্ষায় ব্যস্ত। যে ইতালী আজ গোটা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে —যার দরজায় আজ ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়ার দূতেরা ঘন ঘন যাওয়া-আসা করছে—যে সদম্ভে লীগ অব নেশ্যনস্‌কে প্রয়োজন হ'লে পরিবর্জ্জনের ভয় দেখাতে আজ সাহস করছে—ইংরেজ ও ফরাসীর মত দুটি শক্তিশালী জাতির শান্তিসম্মেলনের জন্য আহ্বানকে যে ইতালী আজ সদম্ভে প্রত্যাখ্যান করছে—

ইতালীর রাজা এবং মন্ত্রী মুসোলিনী সৈন্যদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন

মহাযুদ্ধের পরে এই সেদিনও যে ছিল কৃপার পাত্র; মিত্রশক্তিদের অন্যতম হয়েও মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ভাগবাঁটোয়ারার সময় ইতালীর প্রতি শক্তিশালী জাতিরা উপেক্ষাভরে কৃপার পাত্র মনে ক'রে যে অন্যায় ও অবিচার করেছিল দুর্ব্বল ইতালী দুঃখে ক্ষোভে সেদিন তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। মুসোলিনীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে গণতান্ত্রিক ইতালীকে শক্তিমান জাতগুলি বিশিষ্ট একটা জাত বলেই গণ্য করত না। আভ্যন্তরীণ দলাদলি

ইতালীর সৈন্যদের কুচকাওয়াজ

ও শক্তিলাভের কাড়াকাড়িতে ইতালী জর্জ্জরিত ছিল, ফলে সঙ্ঘশক্তির অভাবে সে ছিল শক্তিহীন কৃপার পাত্র। তারও পূর্ব্বের ইতালী ত অষ্ট্রিয়ার অধীনে একটি পরাধীন বৈশিষ্ট্যহীন দেশমাত্র ছিল। আজ সহসা কি শক্তির মন্ত্রে এই দুর্ব্বল সংহতিহীন ইতালী এত পরাক্রান্ত হয়ে উঠল যে, সে বিশ্বরাষ্ট্র সভার হুমকিকে অগ্রাহ্য ক'রে পরাক্রান্ত ব্রিটেনকে সদম্ভে প্রতিযোগিতায় আহ্বান ক'রে বলে, "সাধ্য থাকে সুয়েজ-প্রণালী বন্ধ কর ?"

মুসোলিনী এবং পোপ রাষ্ট্রের সঙ্গে ভ্যাটিকানের পূর্ব্ব বিরোধের নিবৃত্তিসূচক সন্ধিপত্র সাক্ষর করছেন

এর মূলে আছে মুসোলিনীর ঐকান্তিক সাধনা। আমরা মুসোলিনীর পররাজ্যলোলুপতার জন্য তাকে হীন, লোভী, অমানুষ সব কিছু চোখাচোখা শব্দ সাহায্যে গালাগাল দিতে পারি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা যদি তার অমানুষিক শক্তি ও প্রতিভাকে অস্বীকার করি তা হ'লে সমালোচকের দৃষ্টি হারিয়ে ভাবুকতার অনুসরণ করব মাত্র।* শক্তিশালী কোন্ জাতি অন্যান্য দেশ জয় করে নাই ? † ইতিহাসের আদি থেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ত শুধু এই শক্তির বিকাশ, ব্যাপ্তি ও বিনাশের পরিচয়। এর মধ্যে নূতনত্ব কোথায়, অমানুষিকতা কোথায় ? যারা দুর্ব্বল তারা অক্ষমতার অভিশাপ বইবেই ; শক্তিমান দুর্ব্বলের ওপর আধিপত্য করবে এ ত শাশ্বত নিয়ম। আজ আমরা কালো, আজ আমরা পরাধীন তাই মুসোলিনীর এই কালোর বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যর্থ প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু যেদিন সভ্যতা-সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ভারতের বুকেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যজাতি এদেশের অধিবাসী কালো অনার্য্যদের দেশ থেকে দেশান্তরে বন্য পশুর মত তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সেদিনের কথা কি আমরা ভুলেছি ? ‡ ভারতীয়দের সমুদ্রপারে বালি, জাভা, শ্যামরাজ্যে রাজ্যবিস্তারের কাহিনী আজও আমরা সগৌরবে ঘোষণা ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, তখন ত আমরা লজ্জিত হই না।§ যাই হোক, এ প্রবন্ধ মুসোলিনীকে সমর্থনের জন্য নয়, শক্তিমানের জয়যাত্রার গোড়ার

গ্রামে ট্র্যাক্টর ও অন্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষি শিক্ষা দিবার জন্য নারী-শিক্ষক তৈরি করা হচ্ছে

* এখানে একটা প্রচলিত ইংরেজী বাক্য মনে রাখতে হবে :—"দানবের মত শক্তি থাকা ভাল, কিন্তু তা দানবের মত ব্যবহার করা ভাল নয়।"—প্রবাসীর সম্পাদক।

† পৃথিবীতে চোর-ডাকাতের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও চুরি-ডাকাতি নিন্দার যোগ্যই বিবেচিত হয়ে আসছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

‡ ভুলি নাই, এবং তার সমর্থনও আমরা করি না।—প্রবাসীর সম্পাদক।

§ ঐ সকল দেশে ভারতীয় প্রাধান্য ও সভ্যতা ঠিক কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা কি নির্দ্ধারিত হয়েছে ?—প্রবাসীর সম্পাদক।

কথা আলোচনার জন্য। ইতালী আজ শক্তিমান, কাজেই শক্তির দম্ভ তার স্বাভাবিক। আমাদের আলোচ্য বিষয়, এই শক্তি দশ-বার বছর আগের দুর্ব্বল লাঞ্ছিত ইতালী কেমন ক'রে সংগ্রহ করেছে। ইতিহাসের বর্ত্তমান অধ্যায়ে সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যুত্থানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সেও একটি দুর্ব্বল জাত থেকে শক্তিশালী জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু তার শক্তির দম্ভ এত প্রকট নয়, পরকে আক্রমণ করবার মত শক্তি আজও সে সংগ্রহ করে নাই, যদিও তার পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে ইতালীর রূপান্তরের বহু আগে থেকে।

শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য নির্ম্মিত বিভিন্ন রকমের আধুনিক বাসগৃহ

ইতালীর রাষ্ট্রনায়ক মুসোলিনী যে তার সকল শক্তির উৎস এতে সন্দেহ নাই। কি ভাবে এই বার-তের বৎসর সময়ের মধ্যে মুসোলিনী তার দেশকে এমন শক্তিমান ক'রে তুলেছে তার ইতিহাস সবিশেষে আলোচনা করার মত স্থানের এখানে একান্ত অভাব। ফাসিষ্ট-রাজত্বের দশম-বার্ষিক উৎসবের সময় আমি রোম নগরীতে ছিলাম। এই উৎসব উপলক্ষে পরিচালিত প্রদর্শনীতে ফাসিষ্ট ইতালীর অগ্রগতির যে সব ইতিহাস ও বিবরণ পেয়েছিলাম তার কিছু কিছু এখানে দিলাম। এগুলি তাদেরই প্রচারপত্র থেকে সংগৃহীত, কাজেই অত্যুক্তির আশঙ্কা আছে। কিন্তু সবই সত্য ব'লে মেনে নিচ্ছি এই জন্য যে ফাঁকির ওপর এত বড় একটা দেশের এমন আকস্মিক আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। বর্ত্তমান জগতের সমস্ত দেশ যখন ধনী ও শ্রমিকের দ্বন্দ্বে আকুল, অর্থসমস্যায় বিপন্ন, শাসনযন্ত্র অনবরত পরিবর্ত্তনের আশঙ্কায় শাসকমণ্ডলী শঙ্কিত, সেই সময় দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রেখে পরকে আক্রমণ করা অন্যের পক্ষে মারাত্মক হ'লেও মুসোলিনীর বাহাদুরীর কথা সন্দেহ নাই।
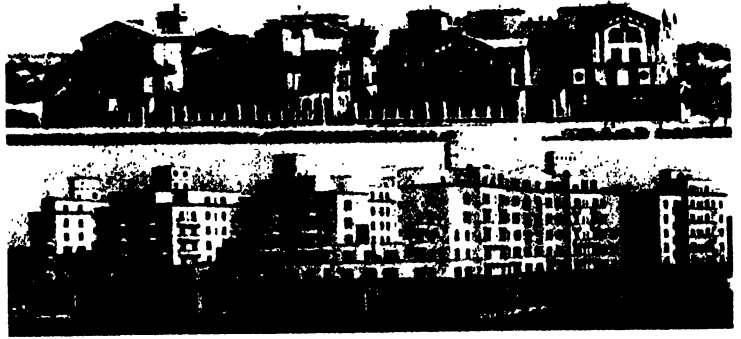
স্বাস্থ্যবতী ও সুখী শ্রমিক-জননী

মুসোলিনীর প্রথম কীর্ত্তি বিরুদ্ধবাদী হয়েও ইতালীর রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব। বিনা রক্তপাতে তিনি ইতালীর শাসনযন্ত্র করায়ত্ত করেন ও রাজার মন্ত্রী হিসাবে কাজ করায় তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সহজেই তিনি করতে পেরেছেন, কোনো শক্তিশালী দলের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হ'তে হয় নি। তাছাড়া পোপের সঙ্গে সন্ধিও তাঁকে নির্ব্বিবাদে কাজ করার অনেকখানি সুবিধা দিয়েছে।

দেশের যাবতীয় শ্রমিক ও মালিক সম্প্রদায়কে নিজের নিজের সমিতিভুক্ত ক'রে দেওয়ায় ও তাদের মতদ্বৈধ মিটাবার জন্য বিশেষ বিচারালয়ের ব্যবস্থা করায় দেশের ধনী ও শ্রমিক

ইতালীর বিমানপোত

যাতে নিজের আহার্য্যের জন্য সমস্ত গম নিজের দেশে উৎপন্ন করতে পারে সেজন্য মুসোলিনী অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন, নিজে গম কেটে দেশের কৃষকদের উৎসাহিত করেছেন। ফাসিষ্ট রাষ্ট্র দেশের বহু জলা জমিকে বহু ব্যয়ে উদ্ধার ক'রে শস্যশ্যামলা করেছেন; দেশের দিকে দিকে জলপ্রণালী হয়েছে। যে-সব ক্ষেত্রে একবার মাত্র ফসল উৎপন্ন হ'ত, এখন সেখানে দুইবার হয়। ৬,০০০,০০০

উভয় সম্প্রদায়ই সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের নিজের কাজ চালায়। শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট বে-আইনী, তেমনি তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আহার্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা করেছে।

১১৯,২৪৮টি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান জেনারেল কনফেডারেশন অব ইণ্ডাষ্ট্রির সভ্য এবং ২,২৮৫,৪৬৯ জন শ্রমিক কনফেডারেশন অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেটের সভ্য। দেশের কৃষক-শক্তিকেও মুসোলীনি একত্র করেছেন; ২,১৪৮,৪২২টি কৃষক জেনারেল কনফেডারেশন অব ফার্ম্মার্স সিণ্ডিকেটের সভ্য। দেশের কৃষির উন্নতির জন্য চলন্ত কৃষি-প্রদর্শনী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। আলোকচিত্র সাহায্যে, এরোপ্লেন থেকে বিতরিত প্রচার পত্রের মারফৎ, আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের সাহায্যে ও বিভিন্ন প্রদর্শনীর দ্বারা দেশের লোকের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে। ইতালী

মুসোলিনীর আমলের পূর্ব্বে জমির অবস্থা

একর জমির জল নিকাশ ক'রে ভাল জমিতে পরিণত করা হয়েছে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (যখন ফাসিষ্টরা শাসনতন্ত্র অধিকার করে) ১,৭৭৯,০০০,০০০ লিরা* জল নিকাশের জন্য ব্যয়িত হয় আর ১৯২২ থেকে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ফাসিষ্ট আমলে ঐ বাবদ ৩,১৮০,০০০,০০০ লিরা খরচ হয়েছে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় জমি-উদ্ধারের জন্য ফাসিষ্ট সরকার ১,১২২,০০০,০০০ ডলার মঞ্জুর করেছে। মুসোলিনীর এই আন্তরিক চেষ্টার ফলে দেশের উৎপাদন-শক্তি বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে। ১৯২২ সালে (প্রথম যখন ফাসিষ্ট দল অধিকার লাভ করে) ইতালীতে মোট ৪৩,৯৯২,০০০ কুইণ্টাল† গম উৎপন্ন হয়, আর ১৯৩২ সালে উৎপন্নের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায়

রাষ্ট্র-পরিচালিত স্বাস্থ্যনিবাসে ক্রীড়ারত বালকগণ

* ১ লিরা—প্রায় ৩½ পেন্স।

† ১ কুইণ্টাল—২২০·৪ পাউণ্ড।
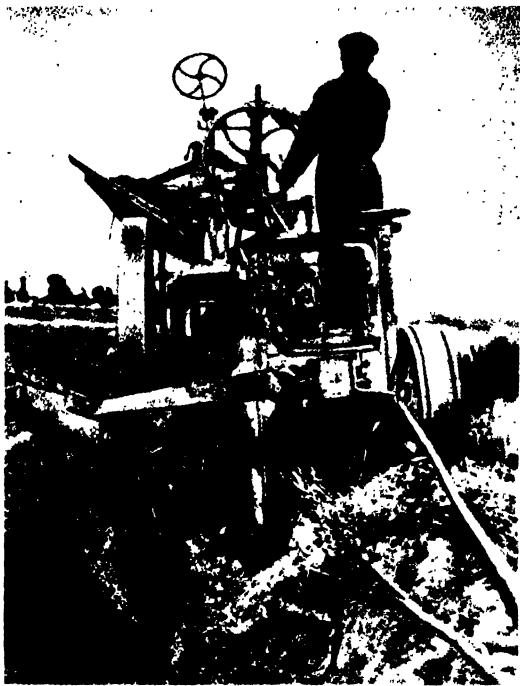
অনুর্ব্বর জমিকে যন্ত্রসাহায্যে উর্ব্বর শষ্যক্ষেত্রে পরিণত করা হচ্ছে

তরুণ ফাসিষ্ট   সামরিক নিয়মে এদের জীবন গ'ড়ে উঠেছে

স্বাস্থ্যনিবাসে মুক্তবায়ুতে অধ্যায়নরত বালিকাদল

এক দল বালিকা এবং তরুণ ইতালীয়ান

ইতালীর বিমান-বাহিনীর কুচকাওয়াজ

অসামরিক বিমান-বিভাগের (civil aviation) যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ১৯২৬ সালের ১লা এপ্রিল প্রথম এই বিভাগ খোলা হয়। ১৯৩২ সালের ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এই বিভাগের বিমানপোত ১৯,৮৪৪,৩৫৫ কিলোমিটার পথ উড়েছে। ১৬৪,৯৪৯ জন যাত্রী এবং ৪,৮৭,১৭৩ কিলোগ্রাম চিঠি ও সংবাদপত্র ও ২৬,৮৮,৪১৯ কিলোগ্রাম† জিনিষপত্র বহন করেছে। জলপথে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য অসামরিক জলপোতের অনেক উন্নতি সাধিত

৭৫,১৫০,৬০০ কুইণ্টাল। জমি-উদ্ধারের জন্য বৎসরে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক ২৫০ দিন কাজ পায়।

এ ছাড়া দেশের মধ্যে যানবাহনের সুবিধার জন্য সেতু, বাঁধ, রেল-লাইন ইত্যাদির জন্য ১৯২২ সালের ২৮শে অক্টোবর থেকে ১৯৩২ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৩৬,৪৩১,১৫৬,০০৭ লিরা খরচ হয়েছে। ১৯২২ সালে জলস্রোত সাহায্যে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তির (Hydro-electric) পরিমাণ ছিল ১,৩০০,০০০ কিলোওয়াট, ১৯৩২ সালে সেই শক্তি দাঁড়িয়েছে ৪,৩০০,০০০ কিলোওয়াট।

১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে ৮০০০ কিলোমিটার* রাস্তা মেরামত করা হয়েছে, এতে ৩৭০ লক্ষ দিন কাজ হয়েছে। রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ট্রেনগুলিরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। রেলকর্ম্মচারীরা আগের চেয়ে দেড় গুণ বেশী কাজ করে, কয়লা খরচ শতকরা ২৫ ভাগ কমে গিয়েছে, ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ শতকরা ৭·৩১ থেকে শতকরা ০·১২ ভাগ হয়েছে। ট্রেন-বিভাগ আগের চেয়ে যে অনেক উন্নত হয়েছে তা সে দেশের অধিবাসীরাই বললে। ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত ১৩০০ কিলোমিটার লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলতো; ১৯৩২ সালে ৩৪০০ কিলোমিটার লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলে। দেশের মধ্যে নানা শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ও কৃষিজ পণ্যের প্রচারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে।

মুসোলিনীর আমলে জমির অবস্থা

হয়েছে। বর্ত্তমানে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে যাত্রী সংখ্যার বহু অংশ ইতালীয়ান জাহাজ কোম্পানী বহন করে। রেক্স (Rex) ইতালীর জগদ্বিখ্যাত জাহাজ। জগতের বৃহত্তম জাহাজ ফ্রান্সের নরম্যানডির পরেই বোধ হয় রেক্সের স্থান।

এই ত গেল দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতির ব্যবস্থা। দেশরক্ষার জন্য যে বিপুল ব্যবস্থা মুসোলিনী করেছেন তারই বাহ্য বিকাশ আজ আবিসীনিয়া আক্রমণে। জলে, স্থলে, ব্যোমে সর্ব্বত্র সে শক্তিমান হয়ে উঠেছে—এই শক্তির পরীক্ষা দিতেই আজ সে অগ্রসর।

এইবার দেখা যাক কি ভাবে দেশে মানুষ তৈরি হয়েছে—

* ১ কিলোমিটার = ⅝ মাইল।

† ১ কিলোগ্রাম = ২⅕ পাউণ্ড।
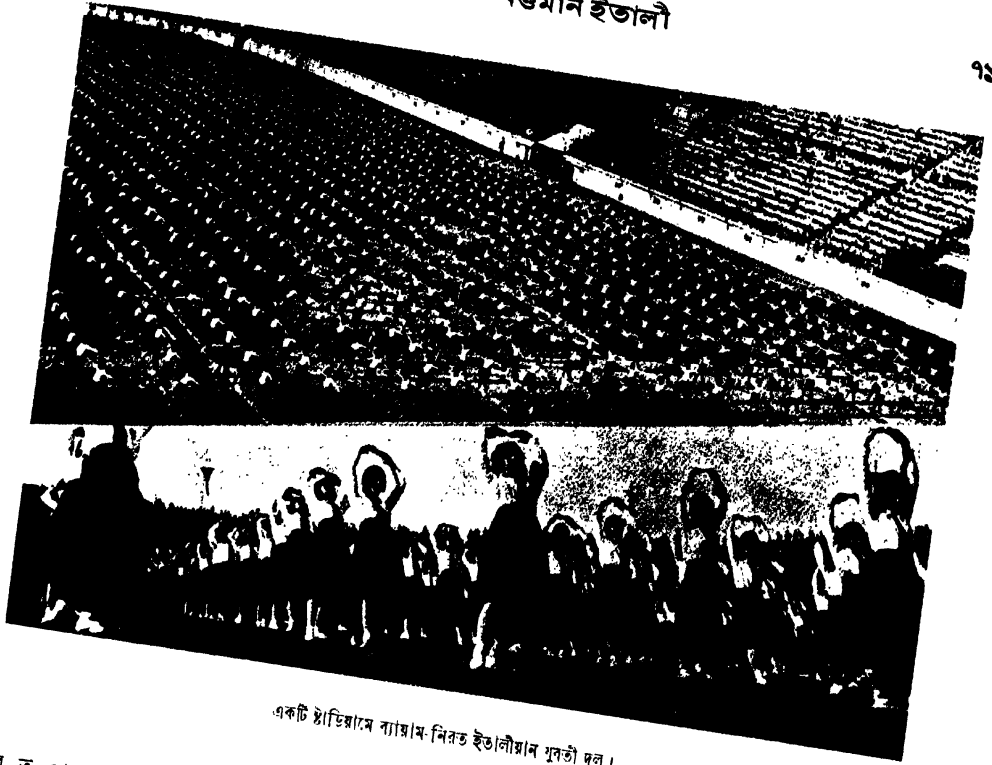
একটি ষ্টাডিয়ামে ব্যায়াম-নিরত ইতালীয়ান যুবতী দল।

এ সব ত গেল বাহ্যিক সম্পদের বিবরণ। এই সম্পদের অধিকারী ও উৎপন্নকারী যারা তাদের পরিচয় সংক্ষেপে নেওয়া যাক্।

শৈশব থেকে নিজের জাতকে মুসোলিনী গ'ড়ে তুলছেন। স্ত্রী-শ্রমিকদের শিশুদের জন্য কারখানায় নার্সারী আছে, তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাঁটি দুধ, খোলা হাওয়া, হাসপাতাল প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। সদ্যজাত শিশুর জননীদের জন্যও রাষ্ট্র-পরিচালিত নানা প্রতিষ্ঠান আছে। ১৯২৬ সালের য়ারি থেকে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৩৩,০১৮ জন মা ও তাদের শিশুরা রাষ্ট্র-সাহায্য লাভ করেছে, এর জন্য রাষ্ট্রের ব্যয় হয়েছে ৫৪৮,৬৮১,১৭৯ লিরা। ,৬৩৮টি শিশু রাষ্ট্র কর্ত্তৃক গ্রীষ্মাবাসে (Summer colony) প্রেরিত হয়েছে। শিশুদের জন্য রাষ্ট্র-পরিচালিত ১৩১২টি স্বাস্থ্যনিবাস আছে; এর মধ্যে ২১৬টি সমুদ্রতীরে, ২৩৭টি পর্ব্বতের বুকে, ১৭৯টি নদীর ধারে ও ৬৩৫টি সূর্য্য-চিকিৎসার (sun cure) জন্য। এই সব স্বাস্থ্যনিবাসে শিশুদের খেলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে, চিকিৎসক আছে, এখানে নিয়মিত এদের ওজন নেওয়া হয়।

ছেলেরা একটু বড় হ'লেই তাদের ব্যালিলায় ও বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে য়্যাডভান্স গার্ড, ইয়ং ফাসিষ্ট প্রভৃতি দলে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয় এবং ছোট থেকে সামরিক কায়দায় তাদের মানুষ করা হয়। বিভিন্ন দেশ-বিদেশে এদের ঘুরিয়ে আনা হয় ও নিজের দেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এদের বিমান-চালনা, জাহাজ-পরিচালনা, সামরিক ড্রিল প্রভৃতি শেখান হয়। বর্ত্তমানে (১৯৩২) ব্যালিলার (পুরুষদের দল) সংখ্যা ১,০৮১,৯৪৭, য়্যাডভ্যান্স গার্ডের (পুরুষদের দল) সংখ্যা ৪২১,৫২৯; লিট্‌ল ইতালীয়ানের (মেয়েদের প্রতিষ্ঠান) সংখ্যা ৬৯০,১৮৩ ও ইয়ং ইতালীয়ানের (মেয়েদের) সংখ্যা ৯৮,৮৯২ জন। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এই সব প্রতিষ্ঠানের শাখা আছে। ছেলেরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ব্যালিলা ও য়্যাডভান্স গার্ডের গণ্ডী পেরিয়ে 'ইয়ং ফাসিষ্ট' হয় এবং এই দলে নানা বিষয়ে প্রায় সামরিক

পদ্ধতিতে জীবন কাটিয়ে তবে ফাসিষ্টের তকমা ও রাইফেল পায়। এই থেকে কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে ফাসিষ্টরা কি ধাতুতে তৈরি। বর্ত্তমানে দেশের অধিকাংশই ফাসিষ্ট। ফাসিষ্ট শ্রমিকদের অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থার জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠান ১৯২৫ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিকদের নৈতিক ও দৈহিক উন্নতিই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠান নানা রকমের খেলাধুলো, ভ্রমণ, কলাশিল্পের চর্চ্চা, বেড়ান (excursion) প্রভৃতির ব্যবস্থা করে এবং যারা কোন বিশেষ জিনিষ শিখতে ইচ্ছুক তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এই প্রতিষ্ঠানটির ১৬,১৯২টি শাখা আছে ও সভ্যসংখ্যা ১,৭৭৭,০৩৫ জন শ্রমিকের চিত্তবিনোদনের জন্য বহু চলন্ত রঙ্গালয় ও ছায়ামঞ্চ আছে। Carro di Tespi নামে এমনি একটি রঙ্গালয় ৬৬টি বিভিন্ন শহরে মোট ৬০০,০০০ জন দর্শকের সামনে ১৪৭বার কাব্যগাথা (lyrical performance) এবং ৪৮১টি বিভিন্ন শহরে ১,৬৫০,০০০ জন দর্শকের সামনে ৮৭৭ বার নাট্যাভিনয় করে। শ্রমিকরা যাতে অল্পব্যয়ে দেশ ভ্রমণ করতে পারে বা স্বাস্থ্যান্বেষণে অন্যত্র যেতে পারে এজন্য ট্রেনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। মাত্র চার মাসে ১৮৯৬টি ট্রেনে ৮৩৩,৯৪৩ জন যাত্রী এই ব্যবস্থায় দেশ ভ্রমণ করেছে। মুসোলিনীর আমলে সিনেমার প্রচলনও ইতালীতে যথেষ্ট হয়েছে। সরকারী তত্ত্বাবধানে জনশিক্ষার জন্য ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১১৫২টি মূক ও সবাক চিত্র এবং ১১৮০টি সাপ্তাহিক সংবাদ চিত্র নির্ম্মিত হয়েছে।

খেলাধুলোর জন্যে ইতালীর সর্ব্বত্র ফোরাম ষ্টাডিয়াম প্রভৃতি ক্রীড়াক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সমগ্র ইতালীর ক্রীড়া ও ব্যায়াম পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য ন্যাশন্যাল ইতালীয়ান অলিম্পিক কমিটি আছে। এর সঙ্গে ২১টি ফেডারেশন যুক্ত, সভ্য-সংখ্যা ১,০৫২,৩৫৩ জন।

মতিলাল

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

'চোত-পরব' অর্থাৎ গাজনের সং বাহির হইয়াছিল। ঢাক ঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রার মধ্যে বাবা বুড়া শিবের দোলা চলিয়া গেল—তাহার পিছনে পিছনে সঙের দল চলিতেছিল। এক জন বাজীকর সাজিয়াছে, সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বড় ভালুক—একটা হনুমান, বাজীকরের বগলে একটা সাপের ঝাঁপি। এই বাজীকরের পিছনেই যত ছেলের ভিড়। কৌতুকেরও সীমা নাই, অথচ ভয়ও আছে, একটু দূরে দূরে কোলাহল করিতে করিতে তাহারা চলিয়াছে। ভালুকটা প্রকাণ্ড বড়—বোধ হয় বুড়া—গায়ের রোঁয়াগুলা অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে, ছেলের পাল সেটাকে লক্ষ্য করিয়াই বাজীকরের অলক্ষ্যে ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িতেছিল। বুড়া ভালুকটা কয়েক বার এমনিভাবে আঘাত পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গোঁ-গোঁ করিয়া উঠিল। সভয়-কৌতুকে ছেলের দল এদিকে-ওদিকে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ভালুকটা খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া আবার বাজীকরের সঙ্গে চলিতে লাগিল।

ছেলেদের দলের অগ্রগামী পার্ব্বতী তাহার পার্শ্বচর মদনকে বলিল—মানুষ রে মানুষ; হাসছে। সেজেছে।

মদন বলিল—ধেৎ! নারাণবাবুদের কাছারীতে জরে কাঁপছিল দেখিস নি! ভালুক না হ'লে জর আসে—কাঁপে! গাঁজা খেলে—!

চোটা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্যামগোপাল বাবুর বৈঠকখানাটা সম্মুখেই—সেখানে তখন শ্যামগোপাল বাবু ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাপত্র দেখিতেছিলেন। বাজীকরের হনুমানটা 'উপ্' শব্দে লাফ দিয়া দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিল, ভালুকটাও একটা প্রণাম করিয়া ধপ্ করিয়া সেইখানে পড়িয়া জরে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। হনুমানটা প্রেসিডেণ্ট

বাবুকে দাঁত দেখাইয়া ঘন ঘন চোখ মিট্-মিট্ করিতে আরম্ভ করিল।

শ্যামবাবু অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন—বেশ, বেশ! ওবেলায় এসে পয়সা নিয়ে যাস্।

বাজীকর জোড়হাত করিয়া বলিল—আজ্ঞে, এই বেলাতেই পেলে—।

শ্যামবাবু বলিলেন—যাঃ বেটা, দেখছিস না এখন সরকারী কাজ করছি।

বাজীকর আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, সে প্রণাম করিয়া ফিরিল। শ্যামবাবুর খোট্টা চাপরাশীটা পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল—আরে ভাল্‌কো ত বহত লড়াই করে রে—দেখে তেরা কেমন ভাল্‌কো।

বলিতে বলিতেই সে ধাঁ করিয়া ভালুকটাকে বেশ কায়দা করিয়া জাপটাইয়া ধরিল। অতর্কিত আক্রমণে ভালুকটা বেকায়দায় নীচে পড়িয়া গেল।

বাজীকর চটিয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল—ই-কি করন তোমার সিংজী; বলেহার বেটা, বলেহার বেটা ভালুক রে!

ভালুকটা নিজের অসতর্ক অবস্থা তখন অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে। চারিদিকে দর্শক জমিয়া গিয়াছিল। সম্মুখেই দাঁড়াইয়া পার্ব্বতী আর মদন যুধ্যমান ভালুক ও চাপরাশীটার প্যাঁচ-কষাকষির সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন দেহ লইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া উঠিতেছিল, কখনও দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া বলিতেছিল—দে—দে—দে—!

শুধু মদন আর পার্ব্বতী নয়—ওরূপ ধারায় মুখভঙ্গী করিতেছিল আরও অনেকে, মায় শ্যামগোপাল বাবু পর্য্যন্ত। ভালুকটা যখন চাপরাশীটাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিল তখন তিনি ধনুকের মত বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দর্শকরা হাসিবার উপক্রম করিতেছিল এমন সময় হনুমানটা চট করিয়া উঠিয়া পরাজিত চাপরাশীটার মুখের উপর বাঁ-পায়ের একটা মৃদু লাথি মারিয়া দিয়া দর্শকদের একবার দাঁত দেখাইয়া দিল। দর্শকদের মধ্যে হাসির একটা হাঁড়ি যেন সশব্দে ফাটিয়া পড়িল। পার্ব্বতী পথের উত্তপ্ত ধূলার উপরেই একটা ডিগবাজী মারিয়া দিল।

চাপরাশীটা অপমানে চটিয়া উঠিয়াছিল—শ্যামবাবুও চটিয়াছিলেন কিন্তু এতগুলি লোকের সহানুভূতির বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। শুধু গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন—হনুমান সেজেছে ওর নাম কি রে? কানে ধর ত বেটার—এই চৌকীদার!

ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল—আসছে বারে ভোট দোব না কিন্তু!

অত্যন্ত রুষ্ট কণ্ঠে শ্যামবাবু কহিলেন—কে?

বক্তা আসিয়া সম্মুখে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন—প্রভু—আমি!

শ্যামবাবু ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—বক্তা তাঁহার এক আত্মীয় এবং বন্ধু—হবুকাকা!

শ্যামবাবু কহিলেন—এস, এস তামাক খাও খুড়ো!

হবুকাকা বলিলেন—যা, যা—সব, যা এখন।

সঙের দল চলিয়া গেল। সমস্ত গ্রামখানা ঘুরিয়া বাজীকর যখন শিবতলায় ফিরিল তখন বেলা প্রায় চারিটা। দর্শক-দলের বেশী কেহ আর তখন সঙ্গে ছিল না—শুধু পার্ব্বতী তখনও পিছন ছাড়ে নাই। গাজনের পাণ্ডা হরিলাল পাত্র দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ছিল, বিরক্তিভরে সে বলিল—ওঃ, আমোদ তোদের আর শেষই হয় না! নে বাপু, নৈবিদ্যি নিয়ে যা। সঙ্গে সঙ্গে হনুমান ভালুক বাজীকর এক এক গামছা খুলিয়া বসিল। হরিলাল সেরখানেক করিয়া চাল, কয়টা কলা ও সামান্য কয়েকখানা বাতাসা বিতরণ করিয়া দিয়া বলিল—এইবারে আমি খালাস বাবা! পার্ব্বতী আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল—সে আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল যখন বাজীকর জানোয়ার দুইটাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। হনুমানটাও একদিকে চলিয়া গেল, ভালুকটাও পাশের গ্রামের পথ ধরিল। ভয়ে সে দূরত্ব একটু বাড়াইয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে ভালুকটার পিছন ধরিল।

খানিকটা মাঠ পার হইয়াই 'মৌলকিণী' পুকুর, ভালুকটা পুকুরের ঘাটে নামিয়া বসিল—তার পর হাত পা মুখ ও দেহ হইতে একে একে খোলসগুলি ছাড়াইতে আরম্ভ করিল।

পার্ব্বতীর আমোদের সীমা-পরিসীমা ছিল না—তাহার অনুমানই সত্য হইয়াছে! সে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল—মানুষই বটে, মানুষই বটে! ওরে বাবা রে!

শব্দ শুনিয়া ভালুক তাহার দিকে চাহিয়া পরমানন্দে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল। কিন্তু সে কি

ভীষণ মূর্ত্তি! হাঁড়ির মত প্রকাণ্ড মাথা, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, আলকাতরার মত কাল রং, নাকটা থ্যাবড়া, চোখ দুইটা আমড়ার আঁটির মত গোল এবং মোটা, দুই গালের থল্‌থলে মাংস খানিকটা করিয়া চোয়ালের নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মুখগহ্বরের পরিধি আকর্ণ বিস্তৃত, সেই মুখগহ্বর মেলিয়া বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া সে হাসিতেছিল—দেখিয়া পার্ব্বতী সভয়ে ছুটিয়া পলাইল। ভালুক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—ও খোকাবাবু—ও খোকাবাবু!

পার্ব্বতী একবার দাঁড়াইয়া ফিরিয়া চাহিল। ভয় অপেক্ষা বিস্ময়ের মাত্রা তাহার অনেক গুণ অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। এত লম্বা এত মোটা আর এত কাল লোক সে কখনও দেখে নাই! সমস্ত গা বহিয়া কাল আঠার মত কি ঝরিতেছে! বুকও গুর্‌ গুর্‌ করিতেছিল—ভালুক, না ভূত! না তার চেয়েও বেশী মেলে গয়লাদের কাদামাখা মহিষগুলার সঙ্গে! লোকটা একখানা বাতাসা হাতে তুলিয়া তখনও তেমনি হাসিতে হাসিতে ডাকিতেছিল—পেসাদ—পেসাদ—শিবের পেসাদ! পার্ব্বতী সভয়ে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল—ভালুকের কথা শুনিয়া সে দুই পা পিছাইয়া গেল। ভালুক এবার কয় পা তাহার দিকে আগাইয়া আসিয়া আরও খানিকটা বেশী হাসিয়া বলিল—ভয় কি খোকাবাবু, এস—।

পার্ব্বতী নিমেষের মধ্যে পিছন ফিরিয়া ছুটিল এবং পথপার্শ্বের জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভালুক হাসিতে হাসিতে ঘাটে ফিরিয়া নৈবেদ্যের পুঁটুলীটা খুলিয়া বসিল। সমস্তসুদ্ধ গামছাটা জলে ভিজাইয়া লইয়া চাল কলা ও বাতাসায় মাখিয়া প্রকাণ্ড বড় বড় গ্রাসে অল্প কিছু ক্ষণের মধ্যে শেষ করিয়া ফেলিল। উচ্ছিষ্টলোভী কয়টা কাক দূরে বসিয়াছিল, শূন্য গামছাখানা সে বার-কয়েক তাহাদের দিকে সজোরে ঝাড়িয়া দিয়া বলিল—ওই লে—ওই লে! তার পর গামছাখানা জলে কাচিয়া লইয়া ভালুকের পোষাক ঘাড়ে ফেলিয়া সে পথ ধরিল। ডোম-পাড়ায় পৌঁছিয়া একটা বাড়িতে ঢুকিয়া ডাকিল—ভোবন—আজ যে মজা, বুঝলি কি না!

'ভোবন' অর্থাৎ ভুবনমোহিনী ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—জালাস না আমাকে আর—আপন জালাতে বলে ম'লাম আমি। ভাতের হাঁড়িটা নামা দেখি!

ভুবনমোহিনী ওই লোকটিরই যেন ছায়া বা দর্পণের মধ্যের নারীরূপিণী প্রতিবিম্ব। অমনি কাল, অমনি দৈর্ঘ্যে, অমনি পরিধিতে, তাহার উপর মাথায় সম্মুখেই সিঁথী জুড়িয়া এক টাক—প্রকাণ্ড বড় মুখের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র দুইটি চোখ, লম্বা নাক, তাহার উপর উপরের ঠোঁটের এক পাশের খানিকটা মাংস নাই, সেদিক দিয়া দুইটা দাঁত নীচের ঠোঁটের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে।

ভালুকের পোষাকটা ঘাড় হইতে ফেলিয়া পুরুষটি ভাতের হাঁড়ি নামাইতে চলিল।

ভুবন বলিল—আমার মাথা বলে খসে গেল। ওষুদ নাই পত্তর নাই আর বাঁচব না আমি। ও মা!

পুরুষটি কোন উত্তর দিল না, কোথা হইতে একটা পোড়া বিড়ি বাহির করিয়া উনানের আগুনে সেটাকে ধরাইতে বসিল। ভুবন তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল—তু ঘরে ব'সে থাকবি কেনে বল? একা মেয়েমানুষ আমি কত রোজকার করব?

ভালুক নিজের কুনুইটা দেখিতে দেখিতে বলিল—তাই বলি জ্বলছে কেনে! মাস ছেড়ে গিয়েছে, 'দলকাছাড়া' হ'য়ে।

তার পর ভুবনের দিকে চাহিয়া বলিল—বাবুদের ওই খোট্টা চাপরাশী—বেটা আচমকা আমাকে চেপে ধ'রে কায়দা ক'রে ফেলিয়েছিল আর 'টুকুচে' হ'লে!

ভুবন বলিল—'ত্যাল' লাগা খানিক। বলিয়াই সে মাটির উপর শুইয়া পড়িল—আঃ, গা-গতর যেন টিঁকিতে ফুটছে! বাবা—!

ভালুকের কথা তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতেছিল—তেমনি দিয়েছি বেটাকে ঠিক ক'রে—আমাকে পারবে কেনে বেটা—আমার ক্ষ্যামতায় আর—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ভুবন বলিল—তাইত বলছি—ওই ক্ষ্যামতায় খাটলে যে রোজকার হয়! আচ্ছা, কেন খাটিস না বল দেখি!

ভালুক বলিল—উ গাঁয়ে একটি কি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে—বুঝলি ভোবন—

ভুবন ভুলিল না, সে বাধা দিয়া বলিল—তোর ভাত আমি জোগাতে পারি! খাটুনীকে এত ভয় কিসের তোর?

—ভয় আবার কি?

—তবে?

নিজের বিশাল দেহের দিকে চাহিয়া ভালুক কহিল—খাটতে গেলে 'গতর' দেখে সব। বলে গতর দেখ আর খাটছে দেখ! খুঁড়ে খুঁড়ে আমার গতর কমে গেল। উঁ-হু—উ-সব হবে না। দত্তকাকা বলেছে কলকাতার যাত্রার দলে ঢুকিয়ে দেবে আমাকে!

এ কথা ভুবনের বহুবার শোনা কথা। বহু কাণ্ড এই লইয়া হইয়া গেছে—ভুবন চুপ করিল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ যেন তাহার কি মনে পড়িয়া গেল—সে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সং সাজলি তার পয়সা কই—নৈবিদ্যি কই?

ভালুক বলিল—পয়সা এখনও ভাগা হয় নাই।

—নৈবিদ্যি? বলি নৈবিদ্যি কি হ'ল?

ভালুক ডাকিল—আয় আয় গোবরা—আয়।

গোবরা এক বিশালকায় কুকুর—এ পরিবারটির উপযুক্ত জীব। শুধু গোবরা নয়—'গোবর গণেশ' উহার নাম। সদাই ঘুমায়—চোর আসুক, ডাকাত আসুক কোন আপত্তি নাই তাহার—সে কাহাকেও কিছু বলে না।

ভুবন সরোষে বলিল—বলি—নৈবিদ্যি কি হ'ল?

—খেয়ে দিয়েছি। যে খিদে—বাবাঃ।

ভুবন আবার শুইয়া পড়িয়া কাতরাইতে লাগিল। ভালুক ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া ফেলিয়া বলিল—আজ আর খিদে নেশ নাই। নৈবিদ্যি খেয়ে খিদে প'ড়ে গেল।

ভুবন বলিল—আমি টাকা দোব, তু গরু কেন এক জোড়া, লেগে চাষ—।

ভালুক মধ্যপথেই ভুবনকে বাধা দিয়া বলিল—ধ্যেৎ! টাকা টাকা ক'রেই মরবি তু। ছেলে নাই পিলে নাই—দুটো পেট শুধু—বেশ ত চলছে!

ভুবন বলিল—হা রে মুখপোড়া গাদা মোষ, বলি খেটে খেটে যে আমার গতর প'ড়ে গেল।

ভালুক হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—তোর গতরের এক সরষেও কমে নি, ভোবন। দাঁড়া একখানা বড় আরসী এনে দোব তোকে। একটা টাকা দিস দেকিনি।

হাতের কাছেই পড়িয়াছিল একটা শুকনা গাছের ডাল—ভুবন স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে সেটাকে ছুঁড়িয়া মারিল। ভালুক কিন্তু ভুবনের মতলব পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল—সে একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। ডালটা বোঁ শব্দে ডাক ছাড়িয়া উঠানের পেয়ারা গাছে প্রতিহত হইল।

ভালুক হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতেই বলিল—ওইটো যদি লাগতো, ভোবন! শেষে ত তোকেই 'ত্যাল' মালিশ করতে হ'ত।

ভুবন বলিল—ওই ছিরিতে আর দাঁত বার ক'রে হাসিস্ নে বাপু! আহা-হা!

ভালুক হা হা করিয়া হাসিয়া ঘরখানা ভরাইয়া দিল।

ভুবনও না-হাসিয়া পারিল না, সেও সলজ্জ ভাবে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

* * * *

কথাটা পুরাতন দিনের কথা।

ভালুকের নাম মতিলাল, জাতিতে সে হাড়ি। এ গ্রামের বাসিন্দা তাহারা নয়; এখান হইতে ক্রোশ-পাচেক দূরে তাহার পৈতৃক বাস। এ গ্রামে তাহার মাতুলালয়—নিঃসন্তান মাতুলের ভিটায় সে ভুবনকে লইয়া বৎসরখানেক আসিয়া বাস করিতেছে।

ভুবন কিন্তু এই গ্রামের মেয়ে। তাহাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী ভুবনের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় প্রথম বিবাহ হয়। তখন তাহার ঠোঁটের পাশটা কাটা ছিল না।

বৎসর-দশেক বয়সের সময় গাছে গাছে 'ঝাল্লু' খেলিতে গিয়া ঠোঁট কাটিয়া দাঁত বাহির হইয়া গেল। তখন সে ছিল লম্বা—কিন্তু খিটখিটে পাতলা। এগার বৎসর বয়স হইতেই দেহে তার জোয়ার ধরিতে আরম্ভ হইল। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর। সেবার জামাইষষ্ঠীতে বাপ তাহার জামাই লইয়া আসিল। জামাইটি দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, সচরাচর নিম্ন শ্রেণীর জোয়ান যেমন হইয়া থাকে তেমনি। শাশুড়ী জামাইকে পরমাদরে বসাইয়া পা ধুইতে এক ঘটি জল নামাইয়া দিল। ভুবনের বাপ গিয়াছিল মাছের সন্ধানে। মাও তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল তেলের বোতল হাতে, ভুবনের চুলটা বাঁধিয়া দিতে হইবে। ছেলেটি পা না ধুইয়াই এদিক-ওদিকে চাহিতেছিল ভুবনের সন্ধানে। ঠিক এই সময়টিতেই

ভুবন আসিয়া বাড়ি ঢুকিল। কাঁখে এক প্রকাণ্ড বড় কলসী! গ্রাম হইতে মাইলখানেক দূরের ঝর্ণার জল আনিতে গিয়াছিল সে।

বাড়ি ঢুকিয়াই সে স্বামীকে প্রশ্ন করিল—কে বটিস রে তু—কোথা বাড়ি?

বাপের ফিরিবার কথা ছিল সন্ধ্যায়; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহারা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই আসিয়া পড়িয়াছে। ভুবনের স্বামী অবাক হইয়া বিপুলকায়া ভুবনের কুৎসিত মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

ভুবন আবার প্রশ্ন করিল—রা কাড়িস না কেনে রে ছোঁড়া,—কোথা বাড়ি তোর?

তেলের বোতল হাতে মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—মাথায় কাপড় দে হারামজাদী—জামাই রয়েছে!

দারুণ লজ্জায় সহাস্যে পুরু জিবটা এতখানি বাহির করিয়া ভুবন দুম্ দুম্ শব্দে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। মাও তাহার পিছন পিছন ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ব'স্, চুল বেঁধে দি তোর আগে। ও-বাবা কানাই, হাতমুখ ধোও বাবা—শ্বশুর তোমার আইচে বলে।

অল্প কিছুক্ষণ পর ভুবনের বাপ মাছ-হাতে বাড়ি ঢুকিয়া বলিল—কই কোথা গেলি গো? কানাই কোথা গেল?

শাশুড়ী বাহিরে আসিয়া বলিল—এই হেথাই ত—।

—কানাই—অ বাবা!

কেহ কোথাও ছিল না—জলের ঘটিটা পর্য্যন্ত তেমনি পূর্ণ অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া আছে। ধুলা পায়েই কানাই পলাইয়াছে। সে আর আসে নাই, আবার সে বিবাহ করিয়াছে।

তাহার পর কত সম্বন্ধ যে ভুবনের বাপ করিল তাহার হিসাব নাই। কিন্তু ভুবনকে দেখিয়া সকলেই একরূপ পলাইয়া গেল।

ভুবনকে দেখিলেই পাড়ার ছেলেরা ফিক্ করিয়া হাসিত। ভুবন সে ব্যঙ্গ-হাসির জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিত। একদিন সে ক্রোধে আপনার কপালে নোড়ার ঘা মারিয়া রক্তে মুখ ভাসাইয়া ফেলিল।

মামার অসুখের সংবাদ পাইয়া মতিলাল সেদিন এই গ্রামে আসিয়াছিল। তখন তাহার তিনটি বিবাহ হইয়া গেছে—কিন্তু গৃহ গৃহিণীশূন্য! গ্রামে ঢুকিবার পথেই ভুবনের সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। তাহার রূপের কারুকার্য্য দেখিয়া মতিলাল না হাসিয়া পারিল না।

ভুবন ঘৃণার সহিত বলিল—ওই ছিরিতে আর দাঁত বার ক'রে হাসিস্ না বাপু! আ হা হা!

মতিলাল হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার কয়েক দিন পরই ভুবনের সহিত মতিলালের বিবাহ হইয়া গেল। মতিলাল ভুবনকে লইয়া ধুমধামের সহিত আপনার ভিটায় গিয়া সংসার পাতাইয়া বসিল। প্রথম দিনই সন্ধ্যায় সে ভুবনকে ডাকিয়া বলিল—শোন্, একটা কথা বলি।

সে আসিয়া বলিল—কি?

—ব'স, একটা জিনিষ এনেছি দেখ। তোকে কেমন সোন্দর ক'রে দি দেখ!

মতিলাল খানিকটা খড়ির মত সাদা গুঁড়া জলে গুলিতে বসিল। ভুবন আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল—উ-কি?

মতিলাল অহঙ্কারভরে বলিল—যাত্রায় সব মুখে মাখে দেখিস নাই? কাল-কুচ্ছিতও এতে সোন্দর হয়! বলিয়া সে ভুবনকে রং মাখাইতে বসিল। তার পর আয়না মুখের সম্মুখে ধরিয়া বলিল—দেখ্!

ভুবন তাহার হাত হইতে আয়নাখানা টানিয়া লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে বসিল। তার পর সহসা আয়নাখানা রাখিয়া দিয়া বলিল—আয় তোকে মাখিয়ে দি আমি।

গম্ভীর ভাবে মতিলাল বলিল—উঁ-হু—তু পারবি না। ই সব ভাগমাপ শিখতে হয়। দে আমি মাখি।—বলিয়া সে নিজেই রং মাখিতে বসিল।

ভুবন কিন্তু অভিমান করিল। সেটুকু আবিষ্কার করিয়া মতিলাল বলিল—তোকে শিখিয়ে দোব—তু একদিন মাখিয়ে দিস্!

ভুবন বলিল—তু কোথা শিখেছিস্, শুনি?

মতিলাল হাসিয়া বলিল—যাত্রার দলে শিখেছি। তা ছাড়া আমি কত রকম সাজতে পারি বলে! দেখবি?

সে তাহার একটা ঝাঁপি খুলিয়া বাহির করিল—বস্তার তৈয়ারী ভালুকের খোলস,—পেত্নী সাজিবার ছেঁড়া কাঁথা, আরও কত কি!

তাহার পর ক্রমশঃ ভুবন আবিষ্কার করিল—মতিলালের

ওই পেশা। খাটুনীর নাম নাই—খায়-দায় ঘুমায়, যাত্রার দলের ভার বয়, তামাক সাজে আর মাঝে মাঝে সং সাজিয়া বেড়ায়।

ভুবন কিন্তু দারুণ পরিশ্রমী মেয়ে, শরীরে শক্তিও তাহার বিপুল; সে ধান ভানিয়া, ঘুঁটে দিয়া, ঘাস বেচিয়া স্বচ্ছন্দে আহারের প্রাচুর্য্যে বিপুলকায় মতিলালকে আরও স্ফীত এবং কুৎসিত করিয়া তুলিল—সঙ্গে সঙ্গে নিজেও তাই হইয়া উঠিল। মতিলালকে সে অহরহ তিরস্কার করে রোজকারের জন্য, মতিলালের সেই এক উত্তর—খাটতে গেলে গতরে লজর দেয় সব—উ হবে না। যাত্রার দলে এইবার মাইনে হবে। আর ছেলেপিলে হোক—তখন না হয়—। ছেলে না হ'লে কি ঘর!—বলিয়া সে পুলকে হি হি করিয়া হাসে।

ভুবন বলিল—হবে ত ছেলেপিলে।

মতিলালের মনে পুলক বাড়িয়া গেল—দাঁড়া, আজ মাদুলী এনে দোব তোকে!

মাদুলী সে আনিয়াও দিল, একটা নয়—একটা-একটা করিয়া পাঁচ-ছয়টা মাদুলী ভুবনের বুকে এখন ঝোলে।

বেশ চলিতেছিল। কর্ম্মপরায়ণা ভুবনের কর্ম্মের মধ্যেই দিন কাটিয়া যাইত। সেদিন সহসা তাহার দৃষ্টিতে পড়িল—পুকুরের ধারে মতিলাল বসিয়া হি হি করিয়া হাসিতেছে—আর যাত্রার দলের কয়টা ছেলে তাহাকে কাদা মাখাইতেছে। এক জনের কথাও তাহার কানে আসিল—সে মতিলালকে বলিতেছিল—গাঙের পলি যদি মাখতে পারিস—তবে রং ফরসা হবে নিশ্চয়। এতেও হবে, তবে ফিট গোরা হবে না।

সে কথার দিকে মতিলালের মন ছিল না—সে দূরের কতকগুলা ছোট ছেলের কথা শুনিয়া হাসিতেছিল।

তাহারা হাততালি দিয়া নাচিতেছিল আর সুর করিয়া গাহিতেছিল—আয় রে কাল মোষ—কাদা মাখ্‌বি বোস!

ভুবনের অঙ্গ জলিয়া গেল। সে মতিলালকেই ডাকিল—ও মুখপোড়া, বলি শোন্‌!

মতিলাল হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিল। যাত্রার দলের এক জন বলিল—মাধব তাঁতীর লীলেবতী।

ক্রোধে ভুবনের চোখে জল দেখা দিল, মতিলাল কিন্তু হাসিয়া বলিল—বলুক কেনে; তোরও যেমন!

ইহার পর ক্রমশঃ ভুবন আবিষ্কার করিল—এ কথা এ গ্রামের সকলেই বলে—কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে ভুবন এতদিন শুনে নাই, বা শুনিতে পায় নাই! ভুবন জেদ ধরিয়া বসিল—এখানে সে থাকিবে না। মতিলাল বলিল—মামার ভিটেতে মোটে এইটুকুন ছোট ঘর—ছেলেপিলে হ'লে কুলোবে কেনে?

ভুবন বলিল—ঘর ক'রে লিবি—অত বড় হাঁদা মুনিষ—

প্রবল আপত্তি করিয়া মতিলাল বলিল—উঁহু, সি আমি পারব না। বাবা—ঘর তোলা কি সোজা কথা!

ভুবন তবু মানিল না, সে বলিল—ঘরের খরচ আমি দোব। আর বাবা আছে দাদা আছে!

বাধ্য হইয়া বৎসরখানেক পূর্ব্বে মতিলাল মাতুলালয়ে আসিয়া বাস আরম্ভ করিল। ভুবনের চেষ্টায় ও অর্থে ঘর হইয়াছে। মতিলাল এখানকার পাঁচালীর দলে এখন তামাক সাজে। দত্তকাকার দরবারে নিয়মিত হাজিরা দেয়—দত্তকাকা তাহাকে কলিকাতার যাত্রার দলে চাকরি করিয়া দিবেন। ভুবন যেমন খাটিত তেমনি খাটে। তাহার পরিশ্রমে এখানেও স্বচ্ছন্দ সংসার, কোন অভাব নাই। বলিতে ভুলিয়াছি, এখন ঘরের কাজ, ভাত রাঁধা, জল তোলা এগুলি মতিলালকেই করিতে হয়। বাড়িতে পা দিলেই ভুবনের শরীরে অসুখ দেখা দেয়!

* * *

ঐ চৈত্র-সংক্রান্তির দিনই।

মতিলাল রান্নাবান্না শেষ করিয়া স্নান করিয়া আসিল। দুইখানা গামলায় হাঁড়ির ভাত ঢালিয়া ডাকিল—ভোবন ওঠ! ভুবন উঠিয়া বসিল।

মতিলালের গামলার দিকে চাহিয়া বলিল—এই যে বললি খিদে নাই আজ! চারটি ভিজিয়ে রাখলে কালকের মুড়ি আসান হ'ত। থাবা ভরিয়া গ্রাস তুলিতে তুলিতে মতিলাল বলিল—আবার লেগেছে খিদে!

ভুবন বলিল—তোর ওই কুকুরের ভাত আমার হেঁনসেল্‌ থেকে দোব না, আজ তোর ভাত থেকে তু দে। লইলে লৈবিদ্যি আন।

মতিলাল হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—দেখবি—রেতে চেঁচাবে খিদেতে—ঘুম হবে না তোর!

ভুবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের দৃষ্টিতে যেন অগ্নি বর্ষণ করিয়া বলিল—নেতার মেরে দোব তা হ'লে আজ ওর!

মতিলাল সকাতর কণ্ঠে বলিল—আহা-হা—ভোবন-কেষ্টের জীব! আর জানিস, তোর যখন ছেলে হবে, তখন দেখবি কত কাজ করে গোবরা! ভুবন উষ্মা ভরেই কহিল কি করবে কি শুনি?

—এই ছেলে শুয়ে থাকবে, গোবরা পাহারা দেবে, কাক তাড়াবে। সত্য, গোবরগণেশের ওই গুণটি আছে—বাড়িতে কাক নামিতে দেয় না। ভুবন শুধু বলিল হুঁ!

মতিলালের দৃষ্টিতে পড়িল—পার্ব্বতী ও মদন দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। সে গাল ভরিয়া হাসিয়া বলিল—এই দেখ্ ভোবন—এই ছেলেটির কথা ব'লেছেলাম। পার্ব্বতী মদনকে বলিতেছিল—ওই দেখ্।

ভুবন মুখ ফিরাইয়া তাহাদের দেখিয়া বলিল—এস খোকা-বাবুরা—প্যায়রা আছে দোব—ব'সো!

—ওরে—বাবা রে! ধরবে ভাই! বলিয়া মদন ছুটিয়া পলাইল। পার্ব্বতী তখনও দাঁড়াইয়াছিল—মতিলাল বলিল—প্যায়রা খাবে এস খোকা বাবু! যাবার সময় আমি হাতী সেজে পিঠে ক'রে দিয়ে আসব তোমাকে। বলিয়াই সে মাটিতে হাত পাড়িয়া চতুষ্পদ সাজিয়া পার্ব্বতীকে দেখাইল। মদন পিছন হইতে ডাকিল—পালিয়ে আয় রে ধরবে! পার্ব্বতী আর থাকিতে সাহস করিল না—পলাইল।

পরদিন কিন্তু সকালেই তাহারা আসিয়া হাজির! ঢেঁকিশালে ভুবন দুম্ দুম্ শব্দে ধান ভানিতেছিল। মতিলাল দাওয়ায় বসিয়া মুড়ি খাইতেছিল।

দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া পার্ব্বতী বলিল—ভালুক—প্যায়রা দিবি?

মুখে এক মুখ মুড়িসুদ্ধই মতিলাল দাঁত বাহির করিয়া বলিল—এস—এস—খোকাবাবু এস!

মদন বলিল—ওখান থেকে ছুঁড়ে দে। তুই ভূত! সে রাক্ষুসী কই—সেই দাঁত বার ক'রে! বলিয়াই সে দাঁত বাহির করিয়া দেখাইয়া দিল। মতিলাল হা-হা করিয়া হাসিয়াই সারা হইল।

—কে—রে—খালভরা ছেলে!—

ভুবন ঢেঁকিশাল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পার্ব্বতী ও মদন ছুটিয়া পলাইল। ভুবন আপন মনেই বকিতেছিল—ভদ্দনোকের ছেলে—ভদ্দনোক সব—বাক্যি দেখ্ দেখি! ভূত রাক্কুসী! অঃ!

মতিলাল তখন সবলে পেয়ারা গাছটাকে নাড়া দিতেছিল। সে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—তুও যেমন ভোবন—বলুক কেনে!

ভুবন ঝঙ্কার দিয়া বলিল—না—বলবে কেনে, কিসের লেগে। ছেলের কথা দেখ দিকি নি!

গ্রামের ধারে দাঁড়াইয়া মদন তখন পার্ব্বতীকে বলিতেছিল—না, যাস না ভাই, শুনিস নাই রাক্কুসীর গল্প! ওরা ঠিক ভূত আর রাক্কুসী! মানুষ সেজে আছে।

—খোকাবাবু—ও খোকাবাবু প্যায়রা নিয়ে যাও!

আঁচলে করিয়া পেয়ারা লইয়া মতিলাল হাসিতে হাসিতে তাহাদের ডাকিতেছিল। মদন বলিল—ওইখানে ঢেলে দে! তুই সরে যা! মতিলাল হাসিয়া পেয়ারাগুলি ঢালিয়া দিয়া সরিয়া গেল। পেয়ারাগুলি তুলিয়া লইয়া পার্ব্বতী বলিল—ভালুক হয়ে যা দেখি! সেই কালকের মত!

মতিলাল হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—দাঁড়াও তোমরা আসছি আমি।

কয়েক মিনিট পরেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনিয়া পেয়ারা খাইতে ব্যস্ত মদন ও পার্ব্বতী দেখিল—ভালুক আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মদন প্রচণ্ড বেগে ছুটিল। পার্ব্বতীও তাহার অনুসরণ করিল। ভালুক উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—অ—খোকাবাবু!

* * *

ছেলে দুইটির সঙ্গে মতিলালের একটু আত্মীয়তা হইল, কিন্তু সে আত্মীয়তা নিবিড় হইল না। তাহারা পেয়ারার জন্য রোজ আসে, কিন্তু মতিলালকে ধরা দিল না।

মতিলাল হাসিমুখে ডাকে, তাহারা খানিকটা সরিয়া গিয়া বলে—না!

মতিলাল তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে—কত সাজতে পারি আমি, তোমাদিগে দেখাব।

মদন বলে—ছাই। বস্তা গায়ে দিয়ে—ভালুকের রোঁয়া নাই—যাঃ।

পার্ব্বতী বলে—ভূত সাজ্‌তে পার?

হাসিতে হাসিতে মতিলাল বলে—হুঁ! দুধ খাও ত—না খেলে আমি ভূত সেজে ধরব!

—কই সাজ দেখি ভূত!

—সেই ধরমপূজোর সময়। আর দেরি নাই।

—বাঘ সাজ্‌তে পার?

—হুঁ।

—সব সাজতে পার তুমি?

—হুঁ!

ভীত অথচ মুগ্ধ-বিস্ময়ে ছেলে দুইটি মতিলালের দিকে চাহিয়া থাকে।

মতিলাল ডাকে—শোন—শোন—একটা কথা বলি। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই আগাইয়া আসে। ছেলে দুইটি সভয়ে ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

ভুবন বলে—তোর যেমন আদিখ্যেতা! উ কি তোর স্বভাব!

মতিলাল হি হি করিয়া হাসিয়া বলে—ওরা ভয় করে—আমার ভারী ভাল লাগে ভোবন! আমি আবার বলি কি জানিস—দুধ খাও ত—না-খেলে আমি ধরব! এক দিন পেত্নী সাজব দাঁড়া!

ভুবন বলিল—ভূত ত সেজেই আছিস—আর পেত্নী সাজতে হবে না বাপু—থাম!

মতিলালের হাসি আর থামিতে চায় না!

* * *

রাঢ় দেশ। বৈশাখ মাসে বুদ্ধ-পূর্ণিমায় ধর্ম্মরাজের পূজা, নিম্নজাতির এক বিরাট উৎসব। মতিলালের গ্রামে—মহুগ্রামে ধর্ম্মরাজের পূজার উৎসবে প্রচুর ধুমধাম হয়। মহুগ্রামের ধর্ম্মদেবতা নাকি ভারী জাগ্রত। চার-পাঁচখানা গ্রামের নিম্নজাতির সকলেই এই ধর্ম্মরাজের পূজা-অর্চ্চনা করে। এবার উৎসবের আড়ম্বর খুব বেশী। পাশের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে স্বর্ণকাররা পাল্লা দিয়া নাকি উৎসব করিবে। এবার ঢাক আসিল ত্রিশ খানা। মহুগ্রামে বরাদ্দ হইয়াছে পঁয়ত্রিশ খানা। সংবাদটা কিন্তু গোপন রাখা হইয়াছে। ও গ্রামের ভক্তের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ—পঞ্চাশ পূর্ণ করিবার জন্য খুব চেষ্টা হইতেছে। মহুগ্রামের ভক্তের সংখ্যা ষাট ছাড়াইয়া গেছে।

চুলওয়ালা দত্তখুড়োর সঙ্গে মতিলাল মহা উৎসাহে তদ্বির-তদারক করিতেছিল। দত্তখুড়ো বলিল—তুইও এক জন ভক্ত হলি না কেন মতিলাল?

মতিলাল হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—উপোস করতে লারব খুড়োমশায়। উ—হবে না।

দত্তখুড়ো হাসিয়া বলিলেন—পেটটি না ভরলে মতিলালের আমার চলবে না—না কি বল মতিলাল?

মতিলাল হাসিয়া বলিল—ভোবন কি বল্‌লে জান—বল্‌লে—প্যাটে ছুরি মার তু!

দত্ত বলিল—তা বেশ। তোকে কিন্তু ইদিকের কাজ ডাক-হাঁক সব করতে হবে। 'বোলানে'র দল সব আনতে হবে। আর—সং এবার কিন্তু খুব আচ্ছা বঁঢ়িয়া রকমের হওয়া চাই!

মতিলাল একমুখ হাসিয়া বলিল—পাঁচ জুতো খাব উ গাঁকে হারাতে না পারি ত!

সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে যে-তিথিতে অর্দ্ধ জগতের ধর্ম্মগুরু মহামানব বুদ্ধ সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া স্নানান্তে মরণ-পণে তপস্যায় বসিয়াছিলেন সেই পূর্ণিমার ঠিক প্রথম লগ্নে উৎসবের প্রারম্ভ—সেই দিন হয় 'মুক্তিস্নান'।

দলে দলে ভক্তরা 'মুক্তচান' করিয়া উত্তরী পরিতেছিল। ঢাকের বাজনায় সচকিত পাখীর দল কলরব করিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছিল—কোন স্থানে বসিতে তাহাদের সাহসই ছিল না। হনুমানের দলও দ্রুতবেগে বিপুল শব্দ করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতেছিল।

মতিলাল আপনার সঙের পোষাকের থলি বাহির করিয়া বসিয়াছিল, দুই টুক্‌রা শোলাকে সে ধারাল ছুরি দিয়া চাঁচিতেছিল।

ভুবন বলিল—আ মরণ তোর, দেশের লোক গেল 'মুক্তচান' দেখতে—আর পেটুক রাক্কসের কাজ দেখ!

সাদা শোলা দুই টুকরা দুই গালে দুই দিকে পুরিয়া মতিলাল হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিল—ধঁরব—খাঁব তোকে!

ভুবনও দুই পা সরিয়া গিয়া বলিল—এই দেখ্—ভাল হবে না বলছি।

মতিলাল হিহি করিয়া হাসিতে লাগিল। ভুবন বলিল—দেখ দেখি—মানুষকে ভয় লাগিয়ে দেয়! খোল্ বাপু তোর দাঁত খোল্।

মতিলাল পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রশ্ন করিল—তোরও ভয় লাগল ভোবন?

ভুবন বলিল- হ্যাঁ—ভয় লাগতে আমার দায়! কিন্তু তু যে বল্লি ধম্মরাজের মাতুলী এনে দিবি?

ট্যাঁক হইতে খুলিয়া মাতুলী বাহির করিয়া দিয়া মতিলাল বলিল একটো পাঠা কিনে রাখতে হবে আবার। ছেলে হ'লে পাঠা লাগবে দেবাংশী বলেছে।

পরদিন পূর্ণিমার অবসান সময়ে ব্রতের উদ্যাপন। ঢাক শিঙা কাঁশী কাঁসরঘণ্টা শঙ্খ বাজাইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইল। প্রথমেই এক দল ঢাক ও বাদ্যভাণ্ড—তাহার পরই শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বার-চৌদ্দ সারি ভক্তের দল ভাঁড়াল মাথায় করিয়া চলিয়াছে। ভাঁড়াল এক-একটি জলপূর্ণ মঙ্গল-কলস. কলস-গুলির গলায় ফুলের মালা—ভক্তের দলেরও প্রত্যেকের গলায় মোটা মোটা কল্কে আউচ ও গুলঞ্চ ফুলের মালা। ভক্ত-দলের চারি পাশে সারি সারি ধূপদানী হইতে ধূপের ধোঁয়া উঠিতেছে। তাহারা ঢাকের বাজনার তালে তালে ভক্ত-নাচ নাচিয়া চলিয়াছে। আবার পিছনে এক দল ঢাক। তাহার পিছনে দশখানা গ্রামের নিম্নশ্রেণীর নরনারী কাতারে কাতারে চলিয়াছে।

মহুগ্রামের 'ভাঁড়াল' আসিয়া বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামখানায় প্রবেশ করিল। মহুগ্রাম এই গ্রামের বাবুদেরই জমিদারী, চিরকাল ভাঁড়াল এ গ্রামে আসে। রাস্তার দুই পাশের ঘরের দাওয়ার উপর ভদ্র নর-নারীতে পরিপূর্ণ। ভাঁড়ালের দলের ভক্তদের সঙ্গে তালে তালে তাহাদেরই মত নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে কত ছেলে; তাহার মধ্যে অগ্রবর্ত্তী পার্ব্বতী ও মদন।

আপনাদের দাওয়া হইতে পার্ব্বতীর মা ডাকিল—ওরে ও হতভাগা উঠে আয়। এই বোশেখ মাসের দুপুরে রোদ—উঠে আয়! পার্ব্বতী নাচিতে নাচিতেই মাকে এক ভেংচী কাটিয়া দিল। সমস্ত দলের পিছনে একখানা ঢাকের বাদ্যধ্বনি অকস্মাৎ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ার্ত্ত কলরব! পিছনের দিক হইতে ভিড় ভাঙিয়া চতুর্দ্দিকে সব ছুটিয়া পলাইতেছিল। বামনবুড়ী গুল্পী মাত্র হাত দুই লম্বা, সে পলাইতে না পারিয়া একটা বাড়ির দেওয়ালে মুখ গুঁজিয়া মুদিত চোখে কাঠের মত লাগিয়া গেল!

ভয়েরই কথা! ঢাকের সম্মুখে তালে তালে নাচিতে নাচিতে আসিতেছিল—বিকট এক মূর্ত্তি! মাথায় এক আঁটি খড়ে কাল রং মাখাইয়া পরচুলা পরিয়াছে, বিকটাকার মুখে দুই গালের পাশে গজদন্তের মত দুই দাঁত, রাজ্যের ছেঁড়া কাথা পরনে -জানু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে দুই স্তন—সর্ব্বোপরি ভয়াল তাহার দুই হাত প্রত্যেকটি চার পাঁচ হাত করিয়া লম্বা। এক হাতে এক ঝাঁটা!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভক্তদল ও বাদ্যভাণ্ড ছাড়া রাস্তা পরিষ্কার হইয়া গেল। মদন যে কোথায় পলাইল তাহার সন্ধান পার্ব্বতী পাইল না। সে ছুটিয়া আসিয়া ঢুকিল মায়ের পিছনে।

মাও ভয় পাইয়াছিল, তবু সে বলিল—যাবি, যাবি আর? ডাকব ঝাঁটাবুড়ীকে! শোন শোন—ও ঝাঁটাবুড়ী!

ঝাঁটাবুড়ী ঘুরিয়া দাঁড়াইল। পার্ব্বতীকে ঠেলিয়া সম্মুখে আনিয়া মা বলিল—এই দেখ—রাস্তায় পেলেই ধরবি একে।

ঝাঁটাবুড়ী পরমানন্দে নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে বিচিত্র নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল সেইখানে।

হারুবাবুর মা খপ্ করিয়া পার্ব্বতীর চোখ ও কপাল আবৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—পালাও, তুমি পালাও!

নাচিতে নাচিতে ঝাঁটাবুড়ী চলিয়া গেল।

হারুবাবুর মা তখন বলিতেছিলেন—জল—জল—পাখা—পাখা!

* * *

মতিলাল বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে বকশিশ পাইল দুই টাকা। বাবু ভারী খুশী হইয়াছিলেন। তিনি নিজে ভয়ে বু-বু করিয়া উঠিয়াছিলেন।

বাড়িতে সে তখন পোষাক ছাড়িতেছে—দত্তখুড়ো বাড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া তারিফ করিয়া বলিলেন—খুব ভাল হয়েছে মতিলাল। সবিনয়ে মতিলাল হি হি করিয়া হাসিল শুধু!

দত্ত বলিল—বামন গুল্পী বুড়ী থাকতে থাকতে ধপাস্ ক'রে পড়ে গেল। মুখুজ্জেদের পার্ব্বতীর চেতন করাতে ত ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। আর বাঁড়ুজ্জে-কত্তা ত—। চমকিয়া উঠিয়া মতিলাল প্রশ্ন করিল—পার্ব্বতীর চেতন হইছে?

দত্ত বলিল—হ্যাঁ—তবে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। ওর মায়ের যেমন!

পোষাক-পরিচ্ছদ সব পড়িয়া রহিল—মতিলাল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া পেয়ারার গাছ ঝরাইয়া এক কোঁচড় পেয়ারা লইয়া সে বাহির হইয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া কতকগুলা কি লইয়া চলিয়া গেল।

পার্ব্বতী শুইয়াছিল—তাহার মা শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছিল। বাপ ফলু মুখুজ্জে ক্রমাগত আপন মনে তিরস্কার করিতেছিল পত্নীকে।—হুঁঃ— আক্কেল দেখ দেখি—হুঁঃ—।

বাহির হইতে কে ডাকিল— বাবু!

—কে?—ফলু মুখুজ্জে বাহিরে আসিয়া আঁতকাইয়া ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হইতে সাড়া আসিল—আজ্ঞে ভয় নাই—আমি মতিলাল। খোকাবাবুকে ডেকে দেন—ভালুক সেজে এসেছি আমি—ভালুক দেখলে তার ভয় ভেঙে যাবে!

দরজা খুলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মতিলালের মাথায় পড়িল এক লাঠি। লাঠি মারিয়া মুখুজ্জে বলিল—বেরো শালা—বেরো!

* * *

এক লাঠিতে মতিলালের কিছু হইবার কথা নয়—হয়ও নাই—খানিকটা মাথার চামড়া কাটিয়া গিয়াছিল শুধু। পরদিন সে দত্তখুড়োর বাড়িতে বসিয়া প্রশ্ন করিতেছিল—না খেলে শরীর হাঁজবে কাকামাশায়? আর রং ফরসা হয় কি সাবানে বলেন দেখি?

বেণী ডোম চৌকীদার আসিয়া তাহাকে ডাকিল—তোকে ডাকছে মতিলাল—পেসিডেনবাবু!

—কেন? মতিলাল অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল।

বেণী বলিল—কাল তোকে লাঠি মারে নাই ফলুমুখুজ্জে? তাই লালিশটালিশ করতে বলবে তোকে হয়ত।

মতিলাল হাসিয়া বলিল—উ আমার লাগে নাই বেনো-জেঠা। লালিশ আবার করে নেকি—ওই নিয়ে!

—তাই বলে আয় গিয়ে বাপু!

মতিলাল উঠিল। পথে ছেলের পাল সভয়-কৌতুকে দূরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল—ঝাঁটাবুড়ী, ও ঝাঁটাবুড়ী!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিতেছিল।

পথে নারাণ বাবুর বাড়ির ভিতর কে বলিতেছিল—দুধ খাও খুকু—ডাকব ঝাঁটাবুড়ীকে!

মতিলাল বিনা দ্বিধায় বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া একমুখ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—দুধ খাও খোকাবাবু!

ছেলেটা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। মা ছেলেকে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল—বেরিয়ে যাও, তুমি বেরিয়ে যাও! মতিলাল বাহির হইয়া আসিতেই বেণী জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল কি তোর মতিলাল—এ্যাঁ? মতিলাল—মতে!

* * *

মতিলাল বাড়ি ফিরিল প্রহারজর্জ্জরিত দেহে।

ভুবনের চোখে আজ জল দেখা দিল—সে তাড়াতাড়ি তেলের বাটি লইয়া বসিয়া বলিল—কি হ'ল—কে মেলে?

মতিলাল ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল—ছোট ছেলে আমাকে দেখে প্যাঙাস পারা হয়ে গেল ভোবন!

ভুবন প্রশ্ন করিল—কে মেলে কে তোকে?

—পেসিডেন বাবুর চাপরাশী। গাঁ ঢুকতে বারণ হয়ে গেল—ছোট ছেলেতে ভয় পাবে আমাকে—। কণ্ঠস্বর তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল।

ভুবন চকিত হইয়া বলিল—ওকি মাদুলী ধ'রে টান্‌ছিস কেনে—ওই—! পট্ করিয়া মাদুলীর সুতা ছিঁড়িয়া লইয়া মতিলাল বলিল—আমাদের ছেলে—আমাদেরই মত কুচ্ছিত হবে ত ভোবন! কাজ নাই!

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

২৩

এক বৎসর কাটিয়া গেল। থার্ড ইয়ারের আরম্ভ।

সকলে আশা করিয়াছিল, অরুণ আই-এ পরীক্ষাতেও স্কলারশিপ পাইবে, কোনমতে সে প্রথম বিভাগে পাস করিল। সেকেণ্ড ইয়ারে সে কলেজ-পাঠ্য পুস্তক কিছুই পড়িত না, পরীক্ষার পূর্ব্বে দেড় মাস রাত্রি জাগিয়া নোট মুখস্থ করিয়া পাস করিল। শিশির সেন স্কলারশিপ পাইল, ইতিহাসে অরুণের অনেক উঁচুতে ভাল মার্ক পাইয়া পাস করিয়া গেল। অরুণ সেজন্য কিছুই ক্ষুণ্ণ নয়।

জয়ন্ত ইংরেজীতে ফেল করিল। তজ্জন্য সে-ও মোটেই দুঃখিত নয়। পৃথিবীর কোন্ বড় কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ঠিকমত পাস করিতে পারিয়াছেন?

আই-এ পরীক্ষার পর পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। অরুণ প্রেসিডেন্সীতেই বি-এ পড়িতে লাগিল, ইতিহাসে অনার্স লইল; শিশির সেন ইংরেজীতে অনার্স লইল। জয়ন্ত রিপন কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারে গিয়া ভর্ত্তি হইল, পড়াশোনা করিবার ইচ্ছা তাহার বিশেষ নাই। ভুঁদো বৃন্দাবন মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইল, সে বড় সার্জ্জন হইবে, ইহাই তাহার জীবনের স্বপ্ন। চালিয়াৎ চট্টো সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করিয়া সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজে বি-এ পড়িতে গেল; কলেজের ফাদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া যদি ইউরোপে যাইবার সুবিধা হয়। তাঁদের নিকট সে ফরাসী ভাষাও শিখিবে। দ্বিজেন খুব ভালভাবে পাস করিয়া ইংলণ্ডে পড়িতে চলিয়া গেল, তাহার পিতার ইচ্ছা, লণ্ডনে ম্যাট্রিক দিয়া লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবে, আই-সি-এস-এর জন্য চেষ্টা করিবে। অরুণের স্কুল-সহপাঠিগণের মধ্যে প্রেসিডেন্সীতে বি-এ ক্লাসে রহিল সুহাস, মোহিত, বাণেশ্বর ও হরিসাধন।

অজয় আই-এস্‌সি পাস করিয়া বি-এস্‌সি ক্লাসে ভর্ত্তি হইল। তাহার ইচ্ছা শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হয়, কিন্তু ইহাতে হেমবাবুর বিশেষ অমত। তিনি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, অজয় কোনমতে গ্রাজুয়েট হইতে পারিলে বড় সাহেবদের ধরিয়া গভর্ণমেণ্টের কোন চাকরির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ইহাতে অজয়ের আপত্তি। মাঝে মাঝে পিতাপুত্রে বচসাও হইয়া গিয়াছে। সে স্বাধীন ব্যবসা করিতে চায়। বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়ার হইবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ, বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার সে হইবে বাহক, পুরোহিত। ঘরবাড়ি তৈরি নয়, দুর্গম বনপথে গিরিগাত্রে রেল-লাইন পাতা, ঝর্ণার নদীর জল বাঁধিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরি করা, লোহা-তৈয়ারির বড় কারখানা চালান, সেই কারখানায় লোহা হইতে চাষীর লাঙল হইতে ধনীর মোটরকার, এরোপ্লেন সকল জিনিষ প্রস্তুত হইবে। অতি অনিচ্ছার সহিত অজয় বি-এস্‌সি ক্লাসে ভর্ত্তি হইল। মনে মনে ঠিক করিল, বি-এস্‌সি পাস করিয়াই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইবে।

ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সম্বন্ধে অরুণের সহিতও অজয়ের বহু তর্ক হইয়া গিয়াছে। অরুণ এই যান্ত্রিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিরোধী। সে বলে এই যন্ত্রপ্রধান বণিকসভ্যতা মানবাত্মার অমঙ্গলকর, তাহার বীভৎস কদর্য্যতা, হিংস্র লোলুপতায় পৃথিবী পীড়িত, তাহার চরম ফল জাতিতে জাতিতে মহাযুদ্ধ। অরুণের মতে, এই ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অজয়কে সে এই যন্ত্র-দানবের পূজারী হইতে দিতে চায় না। অরুণের যুক্তি শুনিয়া অজয় হাসে, বলে, স্বপ্নবিলাসী কবি, বাস্তব পৃথিবীতে একবার নেমে এস।

বস্তুতঃ, থার্ড ইয়ারে উঠিয়া অরুণের যেন নবজীবন আরম্ভ হইল। কলেজের বই পড়া সে ছাড়িয়া দিল, বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত যোগও বিশেষ রহিল না। সে হইয়া উঠিল কল্পলোকের অধিবাসী, নানা যুগের নানা দেশের কাব্য-সাহিত্যের চিরন্তন রসসমুদ্রে সুধাপান করিয়া কল্পনার পাল উড়াইয়া তরী

ভাসাইয়া দিল, সাহিত্যলোকের সহিত বাস্তব পৃথিবী মিশিয়া একাকার হইয়া স্বপ্ন রঙীন হইয়া উঠিল।

পরবর্ত্তী জীবনে অরুণ ভাবিয়া দেখিয়াছে, তাহার উনিশ বছরটির মতন এমন আনন্দময় স্বপ্নময় কাল জীবনে আর কখনও আসে নাই, কখনও আসিবে না। উনিশ বৎসর বয়সে সতেজ তরুণ শালবৃক্ষের মত সে সুঠাম দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কল্পনাক্তি অতি প্রখর, অনুভূতি অতি সূক্ষ্ম, হৃদয়াবেগ অত্যন্ত আকুল হইয়াছে। জলে স্থলে জীবনধারায় পরমানন্দ পরিব্যাপ্ত।

মহাকাব্য, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস, পৃথিবীর নানা কালের নানা জাতির সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাগণের সুখ-দুঃখের সহিত তাহার জীবন সমবেদনায় জড়িত হইয়া যায়।

শকুন্তলার দুষ্মন্তচিন্তা, দময়ন্তীর বিরহকাতরতা, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ, অর্জ্জুনের বৈরাগ্য, শ্রীকৃষ্ণের সারথ্য, রঘুর দিগ্বিজয়। হেলেনের রূপবহ্নি, ইউলিসিসের সমুদ্র-ভ্রমণ, ফিডিয়াসের পারথেনন, সক্রেটিসের বিষপান। চণ্ডীদাসের পদাবলী, চেঙ্গিস খাঁর রক্তনদী, রবসপিয়ারের গিলোটিন, গুরুগোবিন্দের তপস্যা, সেণ্ট হেলেনায় নেপোলিয়ান। সিডনি কার্টুনের প্রেম, 'নেলুডফ' (Nehludof)-এর নবজন্ম, 'বাজারফ' (Bazarov)-এর মৃত্যু, 'টেস্' (Tess)-এর আত্মসমর্পণ, 'চেঞ্চি' (Cenci)-র পাপ-লালসা, রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী। বিটোফেনের বধিরতা, বায়রণের যুদ্ধযাত্রা, সমুদ্র-ঝঙ্কার, শেলীর প্রয়াণ।

ছবির পর ছবি তাহার চারিদিকে বাস্তব মূর্ত্তিময় হইয়া ওঠে, বাস্তব-জীবন ছায়াছবি হইয়া যায়।

পদ্মনিভেক্ষণা সুকেশিনী শকুন্তলা কণ্বের আশ্রমপার্শ্বে প্রবাহিতা মনোরমা তরঙ্গিনী মালিনী তীরে পুষ্পিত শাল-তরুতলে দুষ্মন্তবিরহকাতরা ক্ষীণনিতম্বিনী। নলবিচ্ছেদবিহ্বলা কমললোচনা দময়ন্তী অর্জ্জুন, শাল্মলী, কিংশুক, ইঙ্গুদ, ইত্যাদি নানা বৃক্ষপূর্ণ জনশূন্য ব্যাঘ্রভল্লুকসঙ্কুল গহন অরণ্যে একাকিনী।

মহাভারত বন্ধ করিয়া অরুণ ইলিয়ড খুলিয়া বসে : Sing, goddess, the wrath of Achilles Peleus' son, the ruinous wrath that brought on the Achaians woes innumerable...অন্ধকার রাত্রে ট্রয়ের প্রাসাদ-গবাক্ষ হইতে হেলেন যখন দূরে সমুদ্রতীরে গ্রীকসৈন্যগণের তাঁবুর আলোগুলি দেখিতেন, তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইত!

ইলিয়ড অপেক্ষা ওডেসি পড়িতে ভাল লাগে, অজানা ভীতিসঙ্কুল সমুদ্রে যেন নিরুদ্দেশ-যাত্রা :

> Onward thence as we sailed, our hearts
> sore laden with sorrow
> Spent was the soul of the men by the
> grievous labour of rowing.

লোটাস-ইটার ও সাইক্লোপস্‌দের দেশ ছাড়াইয়া, 'সারসি'র বাড়ি ছাড়াইয়া অকূল সিন্ধুপথে যাত্রা, স্বদেশের সন্ধানে। এই ভ্রমণের দুঃখবেদনা অরুণ অনুভব করে না, যাত্রার দুঃসাহসিকতার নবদেশ-দর্শনের আনন্দে সে মুগ্ধ হইয়া যায়।

টেল অফ টু সিটিজের আরম্ভটি বড় সুন্দর। প্যারিসের পথে একটি মদের পিপে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ফরাসী-বিপ্লবের প্যারিস! অরুণ ভাবে, যদি সে ফরাসী-বিপ্লবের প্যারিসে জন্মগ্রহণ করিত, দেমুল্যার মত সে প্যালে রইয়ালের বাগানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিত।

নেলুডফ (Nehludof)-এর আত্মার জাগরণ কি চমৎকার! মাস্‌লোভার সহিত সে সাইবেরিয়ার বন্দী-জীবন বরণ করিয়া লইল। সে যে এক পতিতা নারীর সহিত সকল সুখসম্পদ ত্যাগ করিয়া চলিল, তাহা কি কেবল নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে, অথবা মাস্‌লোভাকে সে ভালবাসে? ভাল না বাসিলে এমন আত্মত্যাগ দুঃখবরণ কি সম্ভব?

প্রেমের মিলনের সুখসম্ভোগের রূপ নয়, আত্মত্যাগের মৃত্যু-বরণের রূপ অরুণকে মুগ্ধ করে।

এমনি নানা উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্রের সুখদুঃখসমস্যা অরুণের নিজ জীবনের সুখদুঃখের প্রশ্ন হইয়া ওঠে। কোন্ অত্যাশ্চর্য্যকর প্রক্রিয়ায় ইহাদের জীবনধারা তাহার জীবনের সহিত মিশিয়া তাহার সত্তাকে মহিমান্বিত করিয়া তোলে, বই পড়িবার পূর্ব্বে সে যে-মানুষ ছিল, বই পড়িবার পর সে-মানুষ থাকে না, তাহার ব্যক্তিত্ব গভীরতর হয়। কিন্তু ইহা কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার মত নয়। বিভিন্ন চরিত্র-বিরুদ্ধ মতবাদ, বিচিত্র সভ্যতা তাহার মনে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষমা-

মণ্ডিত ঐক্যলাভ করে না, কারণ সে কিছুই বর্জ্জন করে না, সকলই গ্রহণ করিয়া জমা করিয়া রাখিতে চায়। বাণেশ্বরের মনের সহিত অরুণের মনের এইখানে প্রভেদ। সত্য ও সভ্যতার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে বাণেশ্বরের একটি স্পষ্ট ধারণা, নিজ মত আছে। কিছু পাইলেই সে বিচার করে, বিশ্লেষণ করে। সে নিজ মতের প্রভাবে পরিবর্ত্তন ঘটাইতে চায়, নিজে পরিবর্ত্তিত হইতে চায় না।

অরুণের মধ্যে দুইটি মানুষ যেন ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল, একটি প্রতিদিনের কলেজে-পড়া সাধারণ অরুণ, আর একটি নিত্যকালের স্বপ্ন-দ্রষ্টা কল্পলোকবাসী অরুণ; তাহার বাস্তব জীবনের খাদের উপর কল্পলোকের রসধারা প্রবাহিত হইয়া চলিল, স্বর্ণশস্যভরা মাঠের মধ্য দিয়া ভাদ্রের ভরানদী যেমন বহিয়া যায়। আর এই কল্পনাজগতের উপর জাগিয়া রহিল উমার আনন্দকর সপ্রেম দৃষ্টি, শরতের আলোভরা আকাশের সুনির্ম্মল স্বচ্ছ নীলিমার মত।

প্রেম ছিল বলিয়া অরুণের দ্বৈতজীবনে কোন সংঘাত ছিল না; নতুবা বাস্তব তটভূমিতে ভাবধারার আঘাতে ঘোর আবর্ত্তের সৃষ্টি হইত, অরুণকে কোন্ অশান্ত অতলতায় ডুবিয়া মরিতে হইত।

উমার একটু হাসিভরা চাউনিতে সমস্ত দিনটি প্রসন্নতাভরা হয়, উমার মুখের একটু বিষণ্ণতায় সূর্য্যের আলো ম্লান হইয়া আসে। উমা যেদিন ভাল করিয়া কথা কয় না, অরুণের দিনরাত্রি নিরানন্দময়, উমা যেদিন ডাকিয়া গান শোনায়, অরুণের ইচ্ছা করে কোন মহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া দেয়।

সে চণ্ডীদাস খুলিয়া পড়িতে বসে --

"পীরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর
এ তিন ভুবন সার।"

অরুণ বুঝিতে পারে না, কেন একদিন উমা গল্পোচ্ছ্বাসে হাস্যময়ী, আবার অন্যদিন গম্ভীরা স্বল্পভাষিণী। উমা তাহার কাছে রহস্যময়ী হইয়া ওঠে। নদীর স্রোতের জোয়ার-ভাঁটার মত উমার মনের অবস্থায় যে আনন্দস্রোত কখনও প্রবল, কখনও মৃদু হয়, তাহার রহস্য অরুণ কিছুই জানে না। অরুণ ভাবে উমা দিন দিন বড় 'মূডী' (moody) হইয়া উঠিতেছে। তাহার মন খারাপ হইয়া যায়।

অরুণের অন্তরও মধ্যে মধ্যে বিষণ্ণতার ভারে আনত হইয়া পড়ে। এ বিষাদের সে কারণ খুঁজিয়া পায় না। সৃষ্টির মূলে কোন না-পাওয়ার বেদনা আছে, এ বুঝি 'এলিমেণ্টাল মেলান্‌কলি' (elemental melancholy), গভীর আনন্দের সহিত এ বেদনা ছায়ার মত জড়িত; এ-বিষণ্ণতা কবি শেলীর জীবনেও ছিল।

শেলী অরুণের অতি প্রিয়, শেলীকে তাহার পূজা করিতে ইচ্ছা করে,—শেলীর প্রেম, সমাজ-বিদ্রোহ, ভাবুকতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, উদাসতা, আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তৃষ্ণা,— শেলীর মনের সহিত তাহার মনের গভীর মিল আছে, সে যদি শেলীর মত কবিতা লিখিতে পারিত!

যৌবনের উচ্ছলিত আনন্দে বিষাদের অন্ধকার কাটিয়া যায়। চারিদিকে যেন কোন্ অভাবনীয় রহস্য, মাধুর্য্যের আবর্ত্ত।

দিন অপেক্ষা রাত্রি তাহার ভাল লাগে। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সে বই পড়ে। ঠাকুমা মাঝে মাঝে আসিয়া বলিয়া যান, এখনও পড়ছিস, যা ঘুমোতে যা।

অরুণ বই বন্ধ করে, কিন্তু ঘুমাইতে যায় না। বারান্দায় চুপ করিয়া বসে অথবা বাগানে নামিয়া যায়!

মেঘহীন পাণ্ডু আকাশে চন্দ্র একাকী, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত নীলিমার বিস্তার, ফাল্গুন রাত্রির নিস্তব্ধ উদার শুভ্রতা, ছায়াসুপ্ত তরুশ্রেণীর গন্ধভরা অন্ধকার, জ্যোৎস্না-নিশীথের নৈঃশব্দে সে নিজ হৃদয়ের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া যায়, বাহিরের সকলে অজানা, কোন্ রহস্যময় জীবনপথে সে একাকী পথিক। আম্রবন তালবন মর্ম্মরিত হইয়া ওঠে, সমস্ত আকাশ যেন কি কথা বলিতে চায়, অব্যক্ত বেদনায় পাণ্ডুর। অরুণের চোখে জল আসে।

কোন চৈত্রের রাত্রে যৌবনের মত্ততা লাগে। ইচ্ছা হয়, সমস্ত রাত্রি নিদ্রাহীন কাটাইয়া দেয়। মধ্যাহ্ন রৌদ্রের প্রখর শুভ্রতার মত জ্যোৎস্না। কোন্ বিশ্বব্যাপিনী মায়াবিনী অবগুণ্ঠন খসাইয়া তাহাকে ইঙ্গিত করে। প্রাচীন উদ্যানের ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার খুলিয়া অরুণ মাঝে মাঝে সুপ্তসৌধ কলিকাতার জনবিরল স্তব্ধ পথে বাহির হইয়া যায়। কল্পনা করে, এই বুঝি কালিদাসের উজ্জয়িনীর রক্তাশোক ও বকুলতরুর বীথিকা, কুসুমস্তরঞ্জিত বস্ত্রপরিহিতা কোন অভিসারিকা

কুঙ্কুমপুষ্পরঞ্জিত অঙ্গবাসে চন্দনলিপ্ত বক্ষ ঢাকিয়া তাহার পাশ দিয়া চঞ্চল পদে চলিয়া যাইবে, কণ্ঠে নবকর্ণিকার মালা, কেশে নবমল্লিকার হার দুলিবে, মুখমণ্ডল লোধ্ররেণু-মাখা। অথবা, এ বুঝি হারুন্-অল-রশিদের বোগদাদের বক্র সঙ্কীর্ণ ষড়যন্ত্রসঙ্কুল পথ, পথপার্শ্বের কোন রহস্যাবৃত প্রাসাদের গোপনদ্বার খুলিয়া সুন্দরী শাহারজাদী তাহাকে উপন্যাস শোনাইতে আহ্বান করিবে, জাফ্‌রান-রঙের পায়জামা-পরা কাফ্রী খোজার উন্মুক্ত তরবারি অন্ধকারে ঝিকিমিকি করিবে।

স্বপ্নাবিষ্টের মত ঘুরিতে ঘুরিতে অরুণ কোন রাত্রিতে অভয়দের বাড়ির নিকট আসিয়া চমকিয়া ওঠে, কোন রাত বা জয়ন্তকে ডাকিয়া বাহির করে, দুই জনে নিরুদ্দেশ হাঁটিতে হাঁটিতে গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। নিস্তরঙ্গ নদীজলে নৌকাগুলি, জাহাজগুলি যেন সমুদ্রগামী বিহঙ্গের দল ডানা মুড়িয়া নিদ্রিত, জলস্থলে শুভ্র গভীর শান্তি। যৌবনবেদনা-স্পন্দিত অন্তরে অরুণ এ গভীর শান্তি অনুভব করে, অতলস্পর্শ আনন্দ। ফিরিবার সময় জয়ন্ত জোরে চলিতে পারে না, ফিটন-গাড়ী ভাড়া করিয়া বাড়ি ফিরিতে হয়।

কোন রাত সে লিভিংষ্টোনের জীবনী, নেপোলিয়ানের জীবনী বা ইনসারফ ও এলেনার করুণ প্রেমকাহিনী পাঠে নিমগ্ন হইয়া যায়।

রাত্রে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরিলে, শিবপ্রসাদ অরুণকে গল্প করিতে ডাকেন। আইয়োনিক থামওয়ালা আলো-ছায়াময় প্রশস্ত বারান্দায় বসিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প হয়।

—কি পড়ছিস্ খোকা, 'ডাওডেনের শেলী', বইখানা আমার ভাল লাগে না। শেলীর ঠিক বিচার হয় নি।

—কিন্তু অক্সফোর্ডে তোমরা তাঁর যা বিচার করেছিলে!

—শেলী অক্সফোর্ডে ছিলেন, ঠিক, ইউনিভারসিটি কলেজে, পাগল শেলী!

—পাগল বইকি! অত বড় কবিকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিলে!

—আরে তখন কে জানত ওই পাগল অত বড় কবি হবে।

—ওই ত, যৌবনকে তোমরা সম্মান কর না। আচ্ছা, তোমার কোন্ কলেজ ছিল কাকা?

—বেলিয়ল। তোরা শুধু বই পড়েই মরিস, ইউনিভারসিটি-জীবনের আনন্দের স্বাদ পেলি না।

শিবপ্রসাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, বেলিয়লের তোরণ-দ্বার, বুরুজ, গীর্জ্জার চূড়া। যৌবনের অক্সফোর্ড, স্বপ্নের মত মনে হয়।

—আমার ভারি ইচ্ছে করে কাকা, অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে গিয়ে পড়ি। দ্বিজেন কেম্ব্রিজে ভর্ত্তি হয়েছে।

—এখানকার পড়া আগে শেষ কর। আমার মোটেই ইচ্ছে নয় তুমি ইংলণ্ডে যাও।

—কেন কাকা?

—ইউরোপ যেন মোহিনীর মত সবাইকে ডাকে, তুমিও একদিন যাবে জানি। শোন, অক্সফোর্ডের গল্প বলি।

অক্সফোর্ড! কত স্বপ্ন কত স্মৃতি! ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে স্থাপিত প্রাচীন কলেজগুলি! সুন্দর প্রাচীন, গীর্জ্জাগৃহ, তোরণ, কলেজ-হল! ক্ষুদ্র নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে, এদেশ ও নদীকে খাল বলিবে, ওই ছোট নদীতে নৌকা বাহিবার কি ধুম! সেণ্ট মেরী দি ভার্জ্জিন গীর্জ্জার চূড়াটি বড় সুন্দর, শীতের প্রভাতে কুয়াসার মধ্যে পাথরের গীর্জ্জা স্বপ্নের মত দেখায়। সন্ধ্যায় হাই ষ্ট্রীট!

অক্সফোর্ডের গল্প বলিতে শিবপ্রসাদ মাতিয়া ওঠেন। ঘড়িতে বারটা বাজে, অরুণ শুইতে চলিয়া যায়। শিবপ্রসাদের ঘুম আসে না।

ষ্টেলা ছিল তাঁহার সহপাঠী বন্ধু মরিসের ভগ্নী। অক্সফোর্ড 'এইট উয়িক্স' (Eight Weeks)-এর উৎসবে তাহাদের প্রথম দেখা হইয়াছিল। সকলে তাঁহার ঘরে লাঞ্চ খাইয়াছিল। সে যেন কোন্ পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি। তখন কত উদ্যম, কত আশা, কত প্রেমস্বপ্ন। জীবন যে এরূপভাবে ব্যর্থ তুচ্ছ হইবে, কে ভাবিয়াছিল!

২৪

সর্ব্বক্ষণ কল্পলোকে বাস করা চলে না। সংসারে রোগ দুঃখ নানা সমস্যা রহিয়াছে।

পূজার ছুটি শেষ হয়-হয়। শেষরাতে প্রতিমা আসিয়া অরুণকে ঠেলিয়া জাগাইল।

—দাদা, দাদা, শীগগীর ওঠ।

চমকিয়া জাগিয়া অরুণ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—কি হয়েছে, কি ডাকাত পড়ল নাকি!

—ঠাকুমার বড় অসুখ।

—ঠাকুমার?

ঠাকুমাকে কখনও অসুস্থ হইতে দেখা যায় নাই। প্রতিমার পাংশু মুখের দিকে অরুণ ভীতভাবে চাহিল।

—হাঁ, ঠাকুমার শেষরাত থেকে বমি হচ্ছে।

—জ্বালালে।

অরুণ বিছানা হইতে উঠিয়া চোখ মুখ ধুইয়া পাঞ্জাবীটা খুঁজিতে লাগিল।

—ডাক্তার এসেছে?

—না, কাকাকে এখনও জাগান হয় নি। তুমি একবার হরিসাধন-দাদাকে ডেকে পাঠাও।

—হরিসাধন কি করবে?

বিরক্তির সহিত অরুণ প্রতিমার দিকে চাহিল। প্রতিমা কি তাহাকে অপদার্থ মনে করে! হরিসাধনের উপর তাহার এত নির্ভর বিশ্বাস! অবশ্য হরিসাধন রোগীর সেবা করিতে অত্যন্ত পারদর্শী।

অরুণ দরোয়ানকে ডাকিয়া ডাক্তার বসুর নিকট চিঠি পাঠাইল, কাকাকে জাগাইয়া তুলিল, হরিসাধনকেও একটি চিঠি লিখিতে হইল। প্রতিমার মনে সে ব্যথা দিতে পারে না।

সমস্ত বাড়িতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

বয়সবৃদ্ধির সহিত ঠাকুমা লোভী হইয়া পড়িয়াছেন। গত রাত্রে কোন দোকানের বাসী মিষ্টান্ন অধিক পরিমাণে খাইয়াই এই কাণ্ড!

ঠাকুমা সারিয়া উঠিলেন, শিবপ্রসাদের অসুখ হইল।

কিছুদিন হইতেই তাঁহার শরীর ভাল যাইতেছিল না। পূজার সময়ে সকলে চেঞ্জে যাবার কথা ছিল, কেন যে যাওয়া হইল না, অরুণ বুঝিতে পারিল না।

জ্বর কয়েক দিন ধরিয়া চলিল, ছাড়িতে চায় না। রক্তপরীক্ষা করিয়া দেখা গেল ম্যালেরিয়া নয়। টাইফয়েড় নয় ত?

শিবপ্রসাদ হাসিয়া বলেন—জ্বরটা কি জন্যে জানি, লিভার লিভার। কিন্তু কোন উপায় নেই ডক্টর বোস্।

ডাক্তার বসু বলিলেন—এবার মদটা ছাড়তে হবে।

শিবপ্রসাদ বলিলেন—তার চেয়ে আত্মহত্যা করতে বলুন।

শিবপ্রসাদ অসুস্থ হওয়াতে অরুণ তাঁহাকে অত্যন্ত নিকটে পাইল। অন্য সময় তাঁহার সহিত দেখা, গল্প করা অধিক ক্ষণ হইয়া ওঠে না।

অবসর পাইলেই অরুণ শিবপ্রসাদের রোগশয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিত, গ্রামোফোন বাজাইত, বই পড়িয়া শোনাইত, বেহালা বাজাইত, নানা গল্প হইত। অরুণের মনে হইত, শিবপ্রসাদের জীবনে কোথায় ব্যর্থতা, গভীর বেদনা আছে। অল্প বয়সে সে তাঁহার জীবনের রহস্য বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, এখন কিছু বুঝিতে পারে। কাকার প্রতি তাহার গভীর প্রীতি ও সমবেদনা জাগিত।

রাত বারটা হইবে। অরুণ শুইয়াছিল, ধীরে বিছানা হইতে উঠিল। ঘুম আসিতেছে না। অন্ধকার আকাশ। সমস্ত দিন অবিশ্রাম বৃষ্টি হইয়াছে। এখন বৃষ্টি থামিয়াছে। বারিসিক্ত বৃক্ষশাখাগুলিতে ঝোড়ো বাতাস ক্ষ্যাপা কুকুরের মত আর্ত্তনাদ করিতেছে, সার্শীর কাচ ঝন ঝন শব্দে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

সহসা ছকু খানসামা দরজায় টোকা মারিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

—খোকা বাবা, সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

—কাকা? আমায় ডাকছেন?

—হাঁ জল্‌দি আসতে বললেন।

অরুণের বুক কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ কাকার কি অসুখ বাড়িল। আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সে কাকাকে নিদ্রিত দেখিয়া আসিয়াছে।

বৃহৎ শয়নগৃহ অল্পালোকিত। পুরাতন পল্থের কাজ-করা মলিন দেওয়ালে খাটের, চেয়ারের, আলমারীর কালো ছায়া পড়িয়াছে। ক্লারেট-রঙের ভারী পর্দ্দাগুলি কালো দেখাইতেছে।

শিবপ্রসাদ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—খোকা আয়, একটা বিশেষ কথা আছে। ছকু খানসামাকে তিনি চলিয়া যাইতে বলিলেন। অরুণ ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে হতভম্বের মত দাঁড়াইল। শীতল স্তব্ধ গৃহ। বাহিরে জলো বাতাসের একটানা হু হু শব্দ।

—আয় কাছে আয়।

অরুণ শিবপ্রসাদের মাথার নিকট আসিয়া বলিল,—শরীরটা কি খারাপ মনে হচ্ছে?

—না, না, ভালই আছি। এই চাবিটা দিয়ে আমার ডেস্কের নীচের ড্রয়ারটা খোল্ ত।

রোল-টপ বৃহৎ ডেস্ক। চাবি দিয়া অরুণ নীচের ড্রয়ার খুলিল।

—চিঠির বাণ্ডিলের তলায় একটা ফটো দেখ্‌বি, নিয়ে আয় ত—ওই ফ্রেমে-বাঁধানোটা নয়, আর একটা ছোট ফটো।

অরুণ একটি পোষ্টকার্ড ফটো বাহির করিল।

—হাঁ, ওইটা, মাথার আলোটা জেলে দে।

শিবপ্রসাদ ফটোটি দৃঢ় হস্তে ধরিয়া কিছুক্ষণ দেখিলেন, তার পর অরুণের হাতে দিলেন।

সমুদ্রতীর। তটভূমিতে তরঙ্গগুলি ভাঙিয়া পড়িতেছে। সমুদ্রনীলনয়না সুরূপা এক ইংরেজ-ললনা একটি ছোট পাথরের পাশে দাঁড়াইয়া, বাতাসে তাহার চুল উড়িতেছে, স্কার্ট উড়িতেছে। তাঁহার পার্শ্বে কোটপ্যাণ্ট-পরিহিত একটি ভারতীয় যুবক।

—ওই তোর কাকী।

—কাকী?

—হাঁ, আমার স্ত্রী। এটা ওর বিয়ের আগের ফটো, আমরা টর্কিতে তুলিয়েছিলুম।

অরুণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—ওই রূপার ফ্রেমে বাঁধান ছবিটাও নিয়ে দেখ।

চিঠির বোঝা হইতে অরুণ ফটোটি আনিল। আলোকের তলায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, ওই ইংরেজ-মহিলার ফটো, মাথায় কৃত্রিম ফুলভরা টুপি, কলকাওয়ালা কাশ্মীরী শাল হইতে দেখি জামা ও স্কার্ট। ইনি অরুণের কাকীমা!

এখন কোথায় ইনি? কেন ইনি কাকার সঙ্গে আসেন নাই? হয়ত ইনি জীবিত নাই।

অরুণ কিন্তু কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—ছবিগুলো রেখে দে ডেস্কের ভেতর। কথাটা তোকে জানিয়ে রাখলুম, যদি হঠাৎ মরে যাই।

—কি যে বলো কাকা!

—না, এ অসুখটা কিছু না, সেরে উঠব, কিন্তু আমার হঠাৎ মৃত্যু হবে দেখ্‌বি। জীবন ত এই বুকের ধুক্‌ধুকানি, পাম্পের মত হার্ট সারাক্ষণ চলছে, কল একটু যদি বিগড়ায়, ব্যস্—ফিনিস্—সব আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেম স্বপ্ন শেষ!

—কাকা!

—ডেস্কটা বন্ধ কর। চাবিটা ওইখানেই রাখ। আচ্ছা, শুতে যা। আমি বেশ ভালই আছি। ভয় নেই। আর দেখ্ একথা কাউকে আর জানাবার দরকার নেই।

—নিশ্চয়।

—আর ছকু খানসামাকে ডেকে দে। ওই জানালাটা খুলে দে।

—বাইরে বড় ঠাণ্ডা বাতাস, আবার বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল দেখছি।

—আচ্ছা ছকুকে ডেকে দে। গুড্ নাইট।

অরুণ ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইল। ছকুকে ডাকিল না। ছকু গেলেই, মদ আনিবার হুকুম হইবে।

শুধু নিজ পরিবারের নয়, বন্ধুবান্ধবদের পরিবারের নানা সমস্যার সমাধান করিতে হয়।

এক সন্ধ্যায় মামীমা অরুণকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন—উমা ত কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না।

অরুণ বিস্মিত জিজ্ঞাসুভাবে মামীমার দিকে চাহিল, যেন উমার এ মতের জন্য অরুণ দায়ী।

—ওঁর ইচ্ছা, উমার শীগগীর বিয়ে দিয়ে দেন। একটি ভাল ছেলেও পাওয়া গেছে।

ছেলেটি কে অরুণ জিজ্ঞাসা করিল না। একটি নূতন উকীল তাহার মামার মোটর হাঁকাইয়া প্রায়ই আসে। কালো, মোটা, বেঁটে, মুখে কথার খই ফুটিতেছে, সে যে অত্যন্ত চালাক, ইহাই সবাইকে বোঝাইতে চায়। সে হইবে উমার স্বামী!

অরুণ ধীরে বলিল—কি বলে উমা?

—ও বলে বি-এ পাস না ক'রে বিয়ে করবে না। আর উনি বলছেন, বি-এ পাস করলে উমার পছন্দ হয়ে যাবে উঁচু, সে আর সহজে বিয়ে করতে চাইবে না।

—তোমার কি মত মামী?

—বাবা, আমার আবার মত? তবে ও মেয়ে যা একগুঁয়ে, ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া চলবে না।

অরুণ ধীরে বলিল—উচিতও হবে না। ওকে পড়তে দাও মামী, বিয়ে ত সবাই করছে, ওর হয়ত জীবনের অন্য কোন আদর্শ আছে।

মামীমা বলিলেন—আমারও তাই মনে হয়। সব মেয়ে যে ঘরসংসার করবে এমন কোন কথা নেই। তবে, তার চেয়ে বড় কাজ যদি থাকে, তবেই ত বিয়ে না-করা ঠিক হবে।

সংসারের নানা দুঃখ চিন্তা কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া যাইবার একটি অপূর্ব্ব স্থান অরুণ একদিন অত্যাশ্চর্য্যকরভাবে আবিষ্কার করিল।

শীতের সন্ধ্যা। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হইতেছে। পথ কাদায় ভরা। অরুণ মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যাইতেছিল, কোন নূতন ইংরেজী উপন্যাস বা ম্যাগাজিন কিনিবে।

সহসা ঝম-ঝম করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। জলসিক্ত ধূম্রকুণ্ডলী নিরানন্দ নগরের উপর আতঙ্কের মত।

সম্মুখে একটি বায়স্কোপ-হল দেখিয়া অরুণ তাহার বারান্দায় উঠিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইল। বড় একা, বড় মন খারাপ লাগে।

টিকিট কিনিয়া সে বায়স্কোপ-গৃহে প্রবেশ করিল। ছবি দেখান কিছুক্ষণ সুরু হইয়াছে।

অন্ধকার বিরাট গৃহ। সাদা পর্দ্দার ওপর সাদায়-কালোয় নানা ছায়াছবি, মানবের কামনা, লালসা, ঈর্ষা, বেদনার অত্যাশ্চর্য্যকর মূক অভিনয়। অর্দ্ধনগ্না নারীদের সিন্ধু-তরঙ্গে স্নানলীলা, রসভারাক্রান্ত দ্রাক্ষাফলের মত যুবতী-তনু; তন্বী নটীগণের রঙ্গমঞ্চে নৃত্যোৎসব; প্রেমিক-প্রেমিকার মত্ত উল্লাস; আবেগময় ভঙ্গী, ভাবের অত্যুক্তি, অতিরঞ্জিত অভিনয়। এ যেন এক মদিরামত্ত অবাস্তবলোক। প্রতি-দিনের তুচ্ছতা, বিষাদ, বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে এই অন্ধকার গৃহে ছায়াচিত্রের জগৎ অনাস্বাদিত চঞ্চল পুলকময়।

কোন দিন মন খারাপ হইলে অরুণ বায়স্কোপে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল।

সবদিন একা যাইতে ভাল লাগে না।

একদিন সে উমাকে নিরালায় বলিল—উমা, চল, বায়স্কোপ যাবে?

উমা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিল—কি বলছ?

—বলছি, বায়স্কোপ দেখতে যাবে, একটা ভাল ফিল্ম এসেছে।

কলেজের এক সহপাঠিনীর কাছে ফিল্মটির খুব সুখ্যাতি শুনিয়াছে। উমা চুপ করিয়া রহিল।

—শোন, গাড়ী এনেছি, মামীমাকে ব'লে আসি তুমি আমার সঙ্গে মার্কেটিং করতে যাচ্ছ, তোমার ত কি সব কেনবার ছিল।

—লোভ হচ্ছে বটে।

—চল, বেশ ভাল লাগবে।

বায়স্কোপ দেখিয়া তাহারা বহুক্ষণ মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে ঘুরিল, কেক, ফল কিনিল, ইংরেজী সচিত্র মাসিক পত্রিকা কিনিল। তাহারা যেন কোন স্বপ্নের ঘোরে চলিয়াছে। আলোক বড় উজ্জ্বল, জীবন উল্লাসময়।

বাড়ির সিঁড়িতে চন্দ্রা অরুণকে বলিল—অরুণদা, জানি তোমরা কোথায় গেছলে?

উমা একটু ভয় পাইয়া বলিল—কোথায় রে?

চন্দ্রা গম্ভীর ভাবে বলিল, বায়স্কোপ।

অরুণ চন্দ্রার হাতে কেক ও ডালমুটের ঠোঙা দিয়া বলিল—যা, আমরা ত মার্কেটিং করছিলুম।

ডালমুট পাইয়া চন্দ্রা বলিল—আচ্ছা, আমি মাকে বলব না, আমায় এক দিন নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

উমা বলিল—কি পাকা মেয়ে।

চন্দ্রা বলিল—তাই ত! কেকগুলি বেশ!

ইহার পর অরুণ উমাকে একা বায়স্কোপে লইয়া যাইতে সাহস করিত না, অজয় ও শীলাকেও লইয়া যাইতে হইত। একা বায়স্কোপ যাইতেও তাহার ভাল লাগিত না।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদক, পরিভাষা সমিতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাঙ্গালা ও অন্যান্য বিবিধ প্রাদেশিক ভাষায় দীর্ঘকাল ধরিয়া বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের কার্য বিক্ষিপ্তভাবে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু দেশীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনার প্রয়োজন ও প্রচলন অতি অল্পমাত্র হওয়ায় এই কার্য জন-সাধারণের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, এই কার্যে ব্যাপৃত মুষ্টিমেয় কয়েক জন ব্যক্তির মধ্যেই ইহার আলোচনা নিবদ্ধ ছিল। সাহিত্যিক সমাজে এই পরিভাষার তেমন চাহিদা না থাকায় এই কার্যে ব্রতী পণ্ডিতবর্গকে সাধারণের মুখ চাহিয়া কার্য করিতে হয় নাই;—রচিত পরিভাষা সর্বজন-গ্রাহ্য হইবে কি না,—সুবিধাবাদী কাঠিন্য-বিরোধী জন-সাধারণের ইহা মুখরোচক এবং সাধারণ সাহিত্যে প্রয়োগের উপযুক্ত হইবে কি না এরূপ বিচার অনেক স্থলে তাঁহাদের করিবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই। ফলে, বৈজ্ঞানিক সাহিত্য যখন অল্পবিস্তর রচিত হইয়াছে তখন রচয়িতার রুচি অনুসারে এক-এক গ্রন্থে এক-এক রূপ পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞানাদি বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইতেছে। সুতরাং পঠিতব্য পুস্তকে কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ কিছুদিন হইল পরিভাষা-সঙ্কলন কার্যে অবহিত হইয়াছেন। কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর ভার দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন নাই বা কোন প্রতিষ্ঠানবিশেষ হইতে বা কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রচারিত পরিভাষা নির্বিচারে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে বিবেচনা করেন নাই। পরিভাষা-সঙ্কলনব্যাপারে বিশ্ব-বিদ্যালয় কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহার ফলে কার্য কিরূপ ভাবে অগ্রসর হইতেছে সাধারণের অবগতির জন্য এই স্থলে তাহা নির্দেশ করা যাইতেছে।

গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। প্রত্যেক বিষয়ে পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য সেই সেই বিষয়ের পণ্ডিতগণকে লইয়া এক-একটি ক্ষুদ্র শাখা-সমিতি গঠিত হয়। কার্য যাহাতে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষকদিগকে লইয়াই এই সকল শাখা-সমিতি গঠিত হয়। বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্রিকায় পণ্ডিতবর্গ এ পর্যন্ত যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ প্রচার করিয়াছেন শাখা-সমিতি সেই শব্দগুলি সংগ্রহ করেন। এই শব্দগুলির মধ্যে যে যে শব্দ এই শাখা-সমিতি সঙ্গত বলিয়া বিচার করিয়াছেন সেই সেই শব্দ তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন এবং যে সকল স্থলে কোন শব্দ পাওয়া যায় নাই বা প্রস্তাবিত শব্দগুলির মধ্যে কোনটি সুসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই সেস্থলে সমিতি নূতন শব্দ প্রণয়ন করিয়াছেন।

তৎপরে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে পরিভাষা কেন্দ্রীয় সমিতি বিভিন্ন শাখা-সমিতির প্রস্তাবিত শব্দগুলি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। কেন্দ্রীয় সমিতি যখন যে শাখা-সমিতির শব্দ বিচার করেন তখন সেই শাখা-সমিতির সদস্যগণ উপস্থিত থাকিয়া কার্যের সহায়তা করেন। এই কেন্দ্রীয় সমিতি কেবল বৈজ্ঞানিক সদস্য লইয়া গঠিত নহে। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও অন্যান্য সাহিত্যে অভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তিও এই সমিতির সদস্য। প্রস্তাবিত শব্দ বিজ্ঞানশাস্ত্রে পরিগৃহীত অর্থ প্রকাশ করে কি না, অধ্যাপনাকালে বা সাহিত্যরচনায় ঐ শব্দ ব্যবহার করিতে কোন অসুবিধা হইবে কি না, ব্যাকরণের কোনও রূপ দোষ ইহাকে কলুষিত করিয়াছে কি না, শব্দশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে ইহা প্রস্তাবিত অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ কি না, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সমিতির বিভিন্ন সদস্য স্বতন্ত্র ও সম্মিলিত ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেন।

তাহা ছাড়া শব্দগুলি যাহাতে যথাসম্ভব শ্রুতিমধুর ও সংক্ষিপ্ত হয় সেদিকে সমিতিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে। শ্রুতিকঠোর দীর্ঘ শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা অসুবিধাজনক। শিক্ষার্থীদিগের পক্ষেও এরূপ শব্দ কণ্ঠস্থ করা সুসাধ্য নহে। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সকল স্থলে সমিতির এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার পারিভাষিক শব্দগুলিও যে সকল স্থলেই শ্রুতিসুখকর ও হ্রস্বাকৃতি তাহা নহে। দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে সেগুলিকে এখন আর শ্রুতিকঠোর বা দীর্ঘ মনে হয় না। আশা করা যায়, সমিতি-প্রস্তাবিত বাঙ্গালা শব্দগুলিও পরিচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সুমধুর না হউক সুসহ হইয়া আসিবে, আর সুকঠিন বিজ্ঞানশাস্ত্রে কেবল মধুর শব্দের আশা করিলেই বা চলিবে কেন?

যে-সকল শব্দের মধ্য দিয়া অপেক্ষিত পারিভাষিক অর্থ ব্যক্ত হইতে পারে সমিতি যথাসম্ভব সেই সকল শব্দ সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পারিভাষিক শব্দকে তাঁহারা যথাসম্ভব অন্বর্থক করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। এই উদ্দেশ্যেই কতকগুলি প্রচলিত শব্দ ত্যাগ করিয়া তাহাদের স্থানে নূতন শব্দ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ গণিতের Practice শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালায় ইহা সাঙ্কেতিক নিয়ম নামে পরিচিত হইলেও ইহার মধ্যে কোনওরূপ সঙ্কেতের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না। তাই এস্থলে, চলিত নিয়ম প্রস্তাব করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এইরূপ প্রক্রিয়াই জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এবং মেয়েলি হিসাব নামে চলিত ভাষায় ব্যবহৃত। তবে সকল সময় পারিভাষিক বা সংজ্ঞাসূচক শব্দের অপেক্ষিত সম্পূর্ণ অর্থ কোনও একটি মাত্র শব্দের প্রচলিত বা আভিধানিক অর্থ হইতে প্রতীতি হইতে পারে না। তাই এরূপ স্থলে নিরর্থক বর্ণসমষ্টির সাহায্যে বা কোনও অর্থযুক্ত শব্দের অর্থকে লক্ষণাশক্তির বলে ব্যাপক বা সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিয়া পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিবার প্রথা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তথা পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যেও চলিয়া আসিতেছে। সমিতিকেও অনেক ক্ষেত্রে এই প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিতে হইয়াছে। তাহার ফলে অনেক পরিচিত শব্দের অর্থের সঙ্কোচ ও প্রসার করিতে হইয়াছে—কোন কোন স্থলে 'স্বার্থে' ব্যবহৃত 'ক' প্রত্যয়ের দ্বারা শব্দের পারিভাষিক রূপ দেওয়া হইয়াছে, আবার একার্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে কিছু কিছু পার্থক্যের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে Energy, Power, Efficiency প্রভৃতি এক জাতীয় কিন্তু বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক পারিভাষিক শব্দগুলির প্রতিশব্দরূপে শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা প্রভৃতি সাধারণত একার্থবোধক শব্দের ব্যবহার করিতে হইয়াছে। তবে পারিভাষিক অর্থের সহিত যে-শব্দের অর্থের কোন যোগ নাই এরূপ কোনও শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই।

যে-সকল স্থলে প্রচলিত শব্দের সাহায্যে পারিভাষিক অর্থ ব্যক্ত হইতে পারে না সেই সকল স্থলে নূতন শব্দ গঠন করিতে হইয়াছে। শব্দ গঠনের সময় ব্যাকরণ শুদ্ধি ও শব্দ-মাধুর্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। শব্দগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকার প্রদান করিবার জন্য কোথাও নাম ধাতুর আশ্রয় লইতে হইয়াছে যথা, Acceleration ত্বরণ, Retardation মন্দন। কোথাও ভাববাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় ব্যবহার করিয়া সংক্ষিপ্ত বিশেষ্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। 'ণক' ও 'ষ্ণিক' প্রত্যয় আধুনিক বাঙ্গালায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইলেও 'ণিনি' 'ঈয়' প্রত্যয়ের যোগে শব্দ অনেক সময় শ্রুতিমধুর ও সংক্ষিপ্ত হয় বলিয়া বহুস্থলে উহা গ্রহণ করা হইয়াছে। 'ষ্ণিক' প্রত্যয় ব্যবহারে উভয় পদ বৃদ্ধি হওয়ায় শব্দ উৎকট আকার ধারণ করে এবং উভয় পদ বৃদ্ধির অভাবে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন হয়। এই দ্বিবিধ দোষই ইংরেজী হইতে অনূদিত অধুনা-প্রচলিত অনেক বাঙ্গালা শব্দে দেখিতে পাওয়া যায়। 'ঈয়' প্রত্যয় ব্যবহারে এই উভয় দোষের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং কথঞ্চিৎ শ্রুতিমধুর হয় বলিয়া তত প্রচলিত না হইলেও তাহা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ-স্বরূপ, গতীয় (dynamic), স্থিতীয় (static), একতলীয় (co-planer) প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে গতি শব্দের পরিবর্ত্তে গত এবং স্থিতি শব্দের পরিবর্ত্তে স্থিত শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। তাই গত ও

স্থিতকে বিশেষ্য ধরিয়া তাহা হইতে গতীয়, স্থিতীয় শব্দ নিষ্পন্ন করিলে গাতিক, স্থৈতিক প্রভৃতি উৎকট শব্দ ব্যবহার না করিলেও চলিতে পারে। এইরূপ একতলীয় শব্দ ঐকতলিক্ বা ঐকতালিক শব্দ অপেক্ষা সুষ্ঠু সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন কালের প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ যথাসম্ভব বহাল রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই, তবে যে-সকল শব্দ নিতান্ত শ্রুতিকঠোর বা যেগুলি আধুনিক সাহিত্যে অর্থান্তরে প্রচলিত থাকার দরুণ পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইলে সাধারণের সহজে বুঝিবার অসুবিধা হইতে পারে সেরূপ শব্দ গৃহীত হয় নাই। উদাহরণ-স্বরূপ একটি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রুতিকঠোর 'শ্রেঢ়ী' (series) শব্দের পরিবর্তে 'শ্রেণী' গৃহীত হইয়াছে।

বানান সম্বন্ধে যে-সমস্ত নিয়ম অনুসরণ করা হইয়াছে তাহাদের সকলগুলিই নূতন নহে। রেফ-যুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব ও বর্গের পঞ্চম বর্ণের সহিত অন্য বর্ণকে সংযুক্ত করিবার প্রথা বাঙ্গালা দেশেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গের বাহিরে এ প্রথা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, বঙ্গের বাহিরের এই প্রথা সকল স্থলে ব্যাকরণানুগত নহে সত্য, তবে ইহাতে মুদ্রণ-কার্যের সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। তাই ব্যাকরণানুমোদিত স্থলে বঙ্গের বাহিরের নিয়মের অনুসরণ করা হইয়াছে। আপাততঃ এই রীতি দৃষ্টিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু কালক্রমে ইহাই সুন্দর হইয়া দাঁড়াইবে আশা করা যায়।

'Z' এর উচ্চারণ দ্যোতক বর্ণ ভারতীয় বর্ণমালায় নাই। বঙ্গের বাহিরে অধোবিন্দু যুক্ত 'জ' কারের দ্বারা এই উচ্চারণ সূচিত হয়, মুদ্রণকালে এই অধোবিন্দু ভাঙ্গিয়া যাইবার বা স্খলিত হইবার সম্ভাবনা অত্যধিক। তাই অধোবিন্দুর স্থলে অধোরেখার কল্পনা করা হইয়াছে।

বহু ইংরেজী শব্দ, বিশেষতঃ International Scientific Nomenclature-এর অঙ্গীভূত শব্দ যথাযথ গৃহীত হইয়াছে। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে প্রকাশ করা সহজ নহে, কিছু কিছু বিকার অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষার্থীকে শুনিয়া শিখিতে হইবে এবং শব্দের অর্থ হইতে প্রকৃত উচ্চারণ বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালী 'অ' বর্ণের সংবৃত (cot-এর o) উচ্চারণেই অভ্যস্ত। ক্লাব (club) লিখিলে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পড়িবে clawb, ক্লাব লিখিলে পড়িবে claab। তাহার পক্ষে অকার বা আকার কোনওটি প্রকৃত উচ্চারণের দ্যোতক নহে। এস্থলে হয় নূতন বর্ণ সৃষ্টি করিতে হইবে নতুবা অ বা আ— একটির দ্বারা কাজ চালাইতে হইবে। হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় অ-বর্ণের বিবৃত (cut-এর u) উচ্চারণই প্রচলিত, সেজন্য ক্লব লিখিলে উচ্চারণের ভুল হয় না। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে শিক্ষিত বাঙ্গালী এই উচ্চারণ বুঝিত এবং বিদেশী শব্দে যথাস্থানে অ-বর্ণের বিবৃত উচ্চারণ করিত। তখন 'পায়োনিয়র' 'অপার' 'সবজজ' প্রভৃতি বানান প্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পূর্বে 'কটলেট' লিখিয়াছেন, তাঁহার নবপ্রকাশিত 'চার অধ্যায়' পুস্তকেও 'থর্ড ক্লাস' 'ফর্ষ্ট ক্লাস' লিখিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সমিতির মতে একটি নূতন বর্ণ সৃষ্টি না করিয়া অ-বর্ণের বিবৃত উচ্চারণ পুনর্বার চালাইলে হানি নাই, বরং তাহাতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করা হইবে। অ-বর্ণের বিবৃত উচ্চারণ সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত। আ-বর্ণ দীর্ঘ, তাহাকে জোর করিয়া হ্রস্ব করা অন্যায় ও অনাবশ্যক।

বক্র আ (cat-এর a) বুঝাইবার জন্য সাধারণত য়া লেখা হয়। আদ্যস্বরের অ্যা, এ্যা, য়্যা প্রভৃতি অদ্ভুত রূপ দেখা যায়। বাঙ্গালা ভাষায় য-কারের উচ্চারণে ও প্রয়োগে যে বিকার জন্মিয়াছে তাহার অধিকতর প্রসার বাঞ্ছনীয় নহে। হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় য-কারের মূল উচ্চারণ প্রায় অবিকৃত আছে এবং বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী সংস্কৃত পাঠকালে য-কারের শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করেন। কেন্দ্রীয় সমিতির মতে নব গৃহীত বিদেশী পারিভাষিক শব্দে য়া অপপ্রয়োগ না করিয়া একটি নূতন স্বরের প্রচলন করা যুক্তিসঙ্গত। এই উদ্দেশ্যে তাহারা অ্য বর্ণ এবং তাহার যোজ্য চিহ্ন ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এ-কারের কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিলেও চলিত, কিন্তু ে চিহ্নের দোষ এই যে তাহা ব্যঞ্জনের পরে না বসিয়া পূর্বে বসে। এই স্বর-চিহ্নের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত নহে।

দীর্ঘকালব্যাপী প্রযত্ন ও পরিশ্রমের পরেও সমিতির কার্য সর্বথা নির্দোষ বা পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে এরূপ স্পর্দ্ধা করিতে পারা যায় না। বিশাল শব্দশাস্ত্রের মধ্যে কোথায় কোন্ প্রয়োজনীয় শব্দটি রহিয়াছে তাহা সকল সময় নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। তাহা ছাড়া, ভারতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রগুলি অত্যন্ত

অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে—তাহাদের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও অল্পপরিচিত সন্দেহ নাই। তাই অনেক স্থলে হয়ত সমিতির অনুমোদিত শব্দ অপেক্ষা যোগ্যতর শব্দ প্রস্তাবিত ও গৃহীত হইতে পারে। সেই সমস্ত শব্দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হইতেছে।

মুক্তি

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

ইহাকেই বলে 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র'! দার্জ্জিলিং গিয়া দেখিলাম বটে যথারীতি মেঘ ও কুয়াশায় দশদিক আচ্ছন্ন, কিন্তু কোথায় জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে শিলাসীনা গৈরিকবসনাবৃতা বস্ত্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীর প্রেমকাহিনী শুনিব, না লুইস জুবিলি স্যানাটরিয়ামের ভোজনাগারে মান্দ্রাজী উকিল শিবস্বামী আচারিয়ার কবলে পড়িলাম। কথাটি শুনিতে সহজ, কিন্তু ইহার পরিণাম আমার পক্ষে বড় বিষময় হইয়াছিল।

আমি তখন সদ্য পত্নীবিয়োগের পর আমিষ ত্যাগ করিয়া গীতা গ্রহণ করিয়াছি এবং আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত রূপরস-গন্ধশব্দস্পর্শময়ী বসুন্ধরাকে বহু দূরে ফেলিয়া শৈলপ্রবাসের নির্জ্জন নীড়ে অবস্থান করিতেছি। প্রাতরাশের পরে প্রথামত এক বাটি দুধ খাইতেছিলাম। আচারিয়া আমার সম্মুখের টেবিলে বসিয়া একটি ক্ষুদ্র ডিম্বের অভ্যন্তর ভাগ ক্ষুদ্রতর চামচের সাহায্যে মুখবিবরস্থ করিতেছিল। সে আমার দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া কহিল, "মহাশয় মনে কিছু করিবেন না। আপনার নাম জানিতে পারি কি?"

নাম বলিলাম।

"আমি শিবস্বামী আচারিয়া। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের এডভোকেট; বর্ত্তমানে উপার্জ্জনশূন্য; ভবিষ্যতে অনেক হইবে আশা করি। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"অনায়াসে।"

আচারিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ম্যানেজারের কাছে জানিলাম, আপনি নিরামিষাশী। একথা প্রথমে বিশ্বাস করি নাই; বাঙ্গালীরা সকলেই মাছ-মাংস খায়। আপনিও দুধ ছাড়িতে পারেন নাই।"

আমি নিজেও বড় বিস্মিত কম হইলাম না। দুধের সহিত আমিষের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ক্ষমা করিবেন, আমাদের ত জানা ছিল দুধ নিতান্তই নিরামিষ খাদ্য। আমাদের দেশে বিধবারা ত নিয়মিত ভাবে দুধ পান করে।"

"অনেক নিরামিষাশী দুধ খায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া দুধকে কোন্ হিসাবে নিরামিষ খাদ্য বলেন? যে-খাদ্যের মধ্যে শতকরা তিন ভাগ ছানাজাতীয় পদার্থ, চার-দশমিক এলবুমেন ও পৌনে চার ভাগ চর্ব্বি রহিয়াছে তাহা কি নিরামিষ হইতে পারে?"

তাহার যুক্তির অকাট্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলাম না, কিন্তু তখন আমার তর্ক করিবার মনোভাব ছিল না। জানিতাম আচারিয়া নিরামিষাশী, অথচ সে নির্ব্বিবাদে ডিম খাইতেছে। ডিম কোন্ জাতীয় পদার্থ কত ভাগ লইয়া গঠিত জানিতাম না, অতএব নীরব থাকিতে হইল।

এই সামান্য আলাপ উপলক্ষ্য করিয়া আচারিয়ার সহিত সৌহার্দ্দ্য জমিয়া উঠিল। সত্য বলিতে কি তাহার প্রখরবুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল ও সুকুমার নাসিকা আমাকে আনন্দদান করিল। তার অদম্য উৎসাহ এবং অবিশ্রান্ত বাক্যালাপের পশ্চাতে একটি আত্মপ্রত্যয়ের মহিমা আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। আমার শোকমূঢ় মন তখনও বিষয়বস্তুতে তেমন করিয়া সংলগ্ন হয় নাই, কিন্তু সেই নিরবয়ব কুয়াশা-মলিন মেঘরাজ্যে

এমন একটি বিধিবদ্ধ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আমি অল্প উৎসাহ ও বিস্তর কৌতূহল অনুভব করিলাম, ভাবিয়াছিলাম জীবনকে আর তাড়না করিব না; একটা অলসস্বচ্ছন্দ ঔদাসীন্যে পর্ব্বতবনানীর শোভা অবসরমত একটু একটু করিয়া ভোগ করিব। কিন্তু আচারিয়ার সে অবসর ছিল না। সে মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছে। তাহার মেয়াদ তিন দিন। এই তিন দিনের মধ্যে দার্জ্জিলিঙের যাহা-কিছু দ্রষ্টব্য, যাহা-কিছু জ্ঞাতব্য, যাহা-কিছু ক্রেতব্য সে সারিয়া ফেলিতে চায়। অতএব আমাকেও বাহির হইতে হইল।

অবজারভেটরি পাহাড়ে যাইবার পথে আচারিয়া ভূতত্ত্ববিদ্যার আলোচনা আরম্ভ করিল। আমি প্রথমেই স্বীকার করিলাম যে এক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করা ছাড়া তাহার সম্বন্ধে আমি কোন খোঁজই রাখি না। কিন্তু সে সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে, ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যই যে প্রাচীন ভূমি, হিমালয়ের জন্ম যে সেদিনকার কথা, সমুদ্রগর্ভে যে মহা মহাদেশ নিমজ্জিত রহিয়াছে ইত্যাদি তত্ত্ব সে নানাবিধ পুঁথিপত্রের উক্তিদ্বারা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইল। আমি ঈষৎ হাসিয়া প্রথমেই সমস্তটা স্বীকার করিয়া লইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে নিরস্ত হইল না। এই সব বৃহৎ বৃহৎ অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্য ছাড়িয়া সে ক্রমশ ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভূবিদ্যার যুগ-বিভাগ, স্তরীভূত আগ্নেয় ও পরিবর্ত্তিত প্রস্তরের বয়স ও সংস্থিতি প্রভৃতি নিতান্ত নীরস বিষয়ের অবতারণা করিল। বাধ্য হইয়া বলিলাম, "আচারিয়া, তুমি অন্য বিষয়ের আলাপ কর।"

আমরা তখন পাহাড়ের উপরে উঠিয়াছি এবং যথারীতি কুয়াশাচ্ছন্ন দিঙ্‌মণ্ডলের দিকে হতাশভাবে তাকাইয়া শিখর-সমূহের পরিচয়জ্ঞাপক মানচিত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু আচারিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া পার্ব্বত্য দেশে মেঘ ও কুয়াশার স্থিতি ও সংঘটন, বায়ুচাপ ও সূর্য্যকিরণের তারতম্য, আলোকরশ্মির রাসায়নিক গুণাগুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহিল। অন্য লোক হইলে এত ক্ষণ সহ্য করা দায় হইত, কিন্তু সত্য বলিতে কি আচারিয়ার এই সব তথ্য বলিবার মধ্যে এমন একটি সহজ স্বচ্ছন্দতা থাকিত যে মুহূর্ত্তের জন্যও মনে হইত না সে নিজের বিদ্যা ফলাইতেছে। এমন ভাবে সে বলিয়া যাইত যে এগুলি নিতান্তই অবশ্যজ্ঞাতব্য তত্ত্ব, পৃথিবীর সকলেই জানে আমি কেবল বিনয় বশতঃ স্বীকার করিতেছি না। সে স্পষ্টই স্বীকার করিল যে সে আমার সৌজন্যে এবং বিশেষ করিয়া আমার পোষাক পরিবার অনাড়ম্বর শালীনতায় মুগ্ধ হইয়াছে।

সমস্ত রাস্তা ধরিয়া সে কেবলই 'কোনিফেরাস' ও 'এম্বুলা'র বৃক্ষের পার্থক্য, হিমালয়ে শাল, পাইন, ম্যাগনোলিয়া রডোডেনড্রন প্রভৃতির সংস্থান, মস্‌, লিচেন ও ফার্ণ ইত্যাদির ইতরবিশেষ সম্বন্ধে আলোচনা করিল। আমি কথার স্রোত ফিরাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না; অবশেষে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম।

"আচারিয়া তুমি কি বিবাহিত?"

"না।"

"কাহাকেও নিশ্চয়ই ভালবাসিয়াছ; তাই এত দিন বিয়ে কর নাই।"

আচারিয়া গম্ভীর হইল এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হয়ত।

হঠাৎ সন্দেহ হইল এই ক্ষিপ্রগতি, ক্ষুরধারবুদ্ধি সরল-প্রকৃতি বহুভাষী মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ যুবকটি হয়ত শুধুই কেবল ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা কিংবা পদার্থবিদ্যা নহে, তাহার জীবনে হয়ত একটা প্রকাণ্ড রহস্য লুকাইয়া আছে। তাই কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচারিয়া তোমার ভালবাসার কাহিনী বলিবে?"

"তুমি নিজে কি বিবাহ করিয়াছ?"

"হাঁ।" একবার ভাবিলাম ব্যাপারটা খুলিয়া বলি। পরক্ষণেই মনে হইল, লাভ কি? এ বিশ্বসংসারে দুঃখ দারিদ্র্য ও ক্রন্দন লাগিয়াই আছে, কিন্তু নিজের করুণ কাহিনী পরের নিকট বর্ণনা করিয়া তাহার সহানুভূতি উদ্রেক করিবার মত হাস্যকর আর কি হইতে পারে। বিশেষতঃ মানুষের মনে সময়ে সময়ে আত্মগোপন করিবার একটা অহেতুক আকাঙ্ক্ষা জন্মে। যাহা মিথ্যা বলিয়া জানি তাহাই নানা যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করি।

আচারিয়া আমাকে নীরব দেখিয়া আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাস?"

"নিশ্চয়ই। জান না আচারিয়া স্ত্রীর ভালবাসা জীবনে কত বড় আশীর্ব্বাদ। জীবনের শত দুঃখ দারিদ্র্য উপেক্ষা

করা যায় শুধু তাঁর ভালবাসার জোরে। জান ত দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর করিয়া জীবন অতিবাহিত করা কত কঠিন। নারীর ভালবাসা না থাকিলে তা একেবারেই অসম্ভব হইত।"

আমার বঞ্চিত বিবাহিত জীবন তখন সদ্য স্ত্রীবিয়োগ-বিধুর। আচারিয়া তাহার কিছুই জানিল না, কিন্তু আমার কণ্ঠস্বরের আর্দ্রতা ও মুখের ভাববৈষম্য সে লক্ষ্য করিল এবং ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তুমি এক জন মস্ত বড় প্রেমিক দেখিতেছি, কিন্তু স্ত্রীকে কেন সঙ্গে আন নাই।"

"না ভাই সে আসিতে চাহিল না, ছেলেবেলায় সে দার্জ্জিলিঙে মানুষ হইয়াছে তাই আর সে দার্জ্জিলিং আসিতে চায় না।"

"আশ্চর্য্য ত!" কথাটা সে এমন হঠাৎ ও বিস্মিতভাবে বলিল যে আমার মনে কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, আশ্চর্য্য কি? অনেক বড়লোকের মেয়ে ত হিল-স্কুলে পড়ে।"

আচারিয়া নিতান্ত অপটুভাবে দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া কহিল, "না ভাই এম্‌নি বলছিলাম।"

"এমনি কোন বাজে কথা বলবার পাত্র তুমি নও; যদি ব্যাপারটা খুলিয়া বল সুখী হইব।"

আমরা তত ক্ষণে ভিক্টোরিয়া-উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছি। মধ্যগগনেই সূর্য্য অস্ত যাইতেছে এবং সমস্ত দিন ব্যাপিয়া যে পাতলা কুয়াশার প্রলেপ দিঙ্‌মণ্ডল অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল তাহা হঠাৎ নীল পাইন গাছগুলিকে আশ্রয় করিয়া গাঢ়তর হইবার লক্ষণ প্রকাশ করিল। আমরা একখানি বেঞ্চিতে বসিলাম। আচারিয়া বলিল, "তুমি বাস্তবিকই সুখী, কিন্তু তোমাকে আমি হিংসা করি না। আমি যদি আমার হতভাগ্য জীবনের ইতিহাস তোমাকে খুলিয়া বলি, তুমি হয়ত হাসিবে; কিংবা ভাবিবে আচারিয়াটা একটা আস্ত পাগল।"

মনে মনে ভাবিলাম, যাহা হউক ঔষধ ধরিয়াছে। দার্জ্জিলিঙের কুয়াশামলিন ভিক্টোরিয়া-উদ্যানে বসিয়া মান্দ্রাজী উকিলের প্রেমকাহিনী শুনিবার তেমন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু ভূবিদ্যা, উদ্ভিদতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার কোন উপায়ও ছিল না; তাই বলিলাম, "আচারিয়া সে সন্দেহ বৃথা। নিজের জীবনে যে ভালবাসার আশীর্ব্বাদ পাইয়াছে সে কি কখনও পরের ভালবাসাকে উপহাস করিতে পারে? বিশেষতঃ তোমার সঙ্গে পরিচয় জীবনে এই প্রথম, আর হয়ত এই শেষ। আমরা যখন পরস্পরের কর্ম্মভূমিতে ফিরিয়া যাইব, তুমি যখন প্রবল পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় প্রবীণ বিচারকের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইতে চেষ্টা করিবে, আমি যখন বাংলা দেশের মাঠে-ঘাটে জরিপ করিয়া রামের জমি শ্যামের নামে তালিকাভুক্ত করিব, তখন কাহারও কথা কাহারও মনে থাকিবে না। তুমি প্রাণ খুলিয়া তোমার প্রেমকাহিনী বল; অবশ্য যদি তোমার কোন বাধা না থাকে।"

"কিছু না, তবে আমি ভাবিতেছিলাম ব্যাপারটা এতই সামান্য আবার এতই অদ্ভুত যে তোমার কাছে হয়ত বিরক্তিজনক মনে হইবে। বিশেষতঃ সে এখন কোথায় আছে জানি না; হয়ত স্বামী ও পুত্রপরিবারপরিবৃতা হইয়া ইহারা মহাসুখে আছে। তাহাকে একদিন ভালবাসিতাম একথা বলাও হয়ত পাপ।"

"কাহাকেও ভালবাসার মধ্যে কোন পাপ নাই।"

"তবে শোন। আমার দাদা তখন পূর্ণিয়া জেলাতে একটা নূতন রেল-লাইন নির্ম্মাণের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমি তখন বি-এ পড়ি, এক ছুটিতে দাদার কাছে বেড়াইতে যাই। বলিলে বিশ্বাস করিবে না, আমাদের এই ভারতবর্ষে এমন অমনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য থাকিতে পারে জানিতাম না। কোশী নদী একটা বিরাট অক্টোপাসের মত সমস্ত দেশটাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। কোশী যেমনই অস্থিরমতী পাগলী, তেমনই বর্ষাবিশেষে প্রচণ্ড স্রোতময়ী। দুই-চারি বৎসর একটা খাদ দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে; দুই তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম গড়িয়া উঠে, তার পর হঠাৎ পার্ব্বত্য দেশে প্রচণ্ড বারিপাতের ফলে ক্ষীণকায়া ক্ষুদ্র নদী পঙ্কিল জলোচ্ছ্বাসে ফুলিয়া উঠে। তল ও তীরদেশ কাটিয়া ভাঙিয়া উপছাইয়া, গ্রাম দেশ নিমজ্জিত করিয়া, মানব ও পশু ভাসাইয়া ও কর্ষিত ক্ষেত্রের উপর রাশি রাশি অনুর্ব্বর বালুকা নিক্ষেপ করিতে থাকে। আশপাশে দশ-বিশ মাইল ব্যাপী গ্রাম জনপদের কোন চিহ্ন থাকে না। সেই অনুর্ব্বর অভ্রালু বালুকারাশি হইতে রস গ্রহণ করিয়া কেবল পাতলা কাশবন ও চার

বাবুলের গাছ বাঁচিয়া থাকে। তার পর নদী হঠাৎ একদিন কোন পরিত্যক্ত পুরাতন খাদে চলিয়া যায় কিংবা স্রোত-তাড়নে নূতন খাদ খুঁড়িয়া লয়। সমস্তটা দেশ ব্যাপী পাগ্‌লী নদীর এই তাড়ন চলিতেছে, কালী কোশী, জিয়াগঞ্জ কোশী, বেলাগঞ্জ কোশী, পাকিলপাড়া কোশী এমন কত কি মরা নালা পড়িয়া আছে।

ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা কঠিন হইল। কহিলাম, "আচারিয়া, আমার বিশ্বাস ছিল তুমি তোমার প্রেমকাহিনী বলিবে, কোশীপ্রান্তরের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত বইয়েতেও পড়িতে পারিতাম।"

"ভাই আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু জায়গাটা এমনই নির্ম্মম নীরস, অনুর্ব্বর সমতল যে তাহার স্মৃতি কিছুতেই মুছিতে চায় না। এইরূপ দেশে সময় কাটান কঠিন হইল, দাদা ও বাঙালী এক্‌জিক্যুটিভ এঞ্জিনিয়ার, সমস্ত দিন কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। আমি ভোর ও সন্ধ্যায় কখনও অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্বের পাঠ্যপুস্তক পড়িতে চেষ্টা করিতাম আর দ্বিপ্রহরে দাদার আলমারী-বোঝাই ডিটেকটিভ উপন্যাস গলাধঃকরণ করিতাম। কিন্তু দেখিলাম বেহারের শুষ্কবায়ু ও কোশীর অনুর্ব্বর বালুভূমি 'এডগার ওয়ালেস্' ও 'ওপেনহাইম' হইতেও সমস্ত রস নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে। ভাবিলাম চলিয়া যাইব, কিন্তু একদিন বৈকালে এক্‌জিক্যুটিভ্ এঞ্জিনিয়ারের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হইল। নামটা গোপন করিয়া তাহাকে 'শীলা' বলিয়া উল্লেখ করিব। শীলার বয়স তখন ১৪ হইবে, দার্জ্জিলিঙের কোন মেয়েস্কুলে পড়ে। স্কুলের ছুটিতে বেড়াইতে আসিয়াছে। মাঝে মাঝে আলাপ করিতে ইচ্ছা না হইত এমন নহে, কিন্তু কুড়ি-একুশ বয়সটা পুরুষের পক্ষে একটা অসম্ভব বয়স। নারীর সাহচর্য্য লাভ করিবার জন্য সমস্ত মন তখন উন্মুখ হইয়া থাকে, কিন্তু নারীর সম্মুখে আসিলেই অভিমান, আদর্শবাদ ও লজ্জা মুখ চাপিয়া ধরে। আজ বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই, প্রারব্ধ যৌবনে কোশী-অধ্যুষিত সেই নির্জ্জন নীরস বালুকাপ্রান্তরে পাগ্‌লী চতুর্দ্দশী আমার চতুর্দ্দিকে একটি মায়াজগতের সৃষ্টি করিয়াছিল।

মালির সঙ্গে বাগানে ফুলের চারা বসাইতেছিলাম। শীলা অত্যন্ত সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ আচারিয়া, 'জিনিয়া'র চারা আপনি কিছু অসময়ে বসাইতেছেন না কি?"

প্রথমে একটু বিস্মিত হইলাম কিন্তু তাহা সাম্‌লাইয়া বলিলাম, "হয়ত মিস্ চ্যাটার্জ্জি, কিন্তু যেমন করিয়া হোক সময় ত কাটান চাই।"

এইরূপে শীলার সাথে আমার আলাপ জমিয়া উঠিল এবং আমি তাহার অবৈতনিক গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। কখনও আমি তাহাদের বাড়িতে যাইতাম, কখনও সে আমাদের এখানে আসিত। কখনও আমরা কোন পায়ে-চলা পথ ধরিয়া বহু দূর চলিয়া যাইতাম। জ্যৈষ্ঠের দগ্ধ আকাশকে ধূসর করিয়া লম্বা কাশ ও চারা বাবুলের বনে সূর্য্য অস্ত যাইত; মনে হইত প্রকৃতি কত সুন্দর; সমুদ্রতটে বসিয়া নিরবচ্ছিন্ন বীচিভঙ্গ গণিয়াছি, নীলগিরির পুষ্পসম্ভৃত সানুদেশ দেখিয়াছি, মান্দ্রাজের অট্টালিকাবহুল রাজপথে বিচরণ করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃতির এখন নিরবয়ব নিরলঙ্কার আপনার মূর্ত্তি দেখি নাই!

শীলার সহিত যে কত আলাপ হইত তাহা মনে নাই। ইংরেজীতে আলাপ করিয়া সুখ হইত না। আমার বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকে ধূলি সঞ্চিত হইতে থাকিল, আমি কোন সাহেবের লিখিত "Bengli Self-taught" লইয়া পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। এ বিষয়ে শীলা আমার শিক্ষক হইল।

যে সময় একটা পাথরের মত চাপিয়া থাকিত তাহা স্রোতজলের মত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমাদের আলাপ-পরিচয় অভিভাবকগণের অগোচর রহিল না এবং ইহা উপলক্ষ্য করিয়া আমার অবিবাহিত দাদা আমার প্রতি যে-সব ঠাট্টাবিদ্রূপ বর্ষণ করিতেন তাহাতে সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত এমন বলা চলে না। আমার ছুটি ফুরাইয়া আসিল; শীলার কাছে কথা লইলাম যে সে আগামী ছুটিতেও এখানে বেড়াইতে আসিবে। কলেজে যাইতাম, অর্থনীতি ও দর্শনের বক্তৃতা শুনিতাম, নোট লিখিতাম, কিন্তু বাড়িতে বসিয়া 'Bengali Self-taught' পড়িতাম এবং দার্জ্জিলিঙ জেলার সমুদয় তত্ত্ব সংগ্রহ করিতাম। বঙ্গভাষা আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত যে পরিশ্রম করিয়াছিলাম তাহার অর্দ্ধেক শ্রমে সমুদয় বঙ্গতরুণীর অনুগ্রহ লাভ করা অসম্ভব হইত না, কিন্তু ধাতুরূপে আসিয়া সেই যে আটকাইয়া গেলাম আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। অগ্রসর হইতে না পারিলেও দুঃখ ছিল না, কিন্তু

ভাষাশিক্ষা বিষয়ে আমার পশ্চাৎবর্ত্তন হইতে লাগিল। উত্তম পুরুষের সর্ব্বনামের সহিত অধম পুরুষের ক্রিয়াপদ মিশাইয়া আমি যে-সব প্রেমবাক্য রচনা করিলাম তাহা যে-কোন উচ্চশ্রেণীর বঙ্গভাষা উত্তীর্ণ ইংরেজেরও গৌরবের বিষয় হইত না।

আমার মান্দ্রাজমর্ত্ত্যনিবাসী মন দার্জ্জিলিং-ত্রিদিবনিবাসী দেবকন্যার ধ্যানে নিযুক্ত রহিল। দার্জ্জিলিং পাহাড়ের বনানী প্রস্তর, ফুলফল, পশুপক্ষী রাস্তাঘাট সম্বন্ধে এত তথ্য সংগ্রহ করিলাম যে কেবলমাত্র একখানা দার্জ্জিলিং-ভ্রমণ-কাহিনী লেখা বাকী রহিল। পরীক্ষার বৎসর বলিয়া দাদা তাহার কাছে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং পূর্ণিয়াপ্রান্তর যে মান্দ্রাজের যুবজন-খ্রীষ্টীয় হোষ্টেলের কামরা হইতে বি-এ পরীক্ষার পড়া তৈরি করিবার পক্ষে বেশী উপযুক্ত স্থান সে-যুক্তি অগ্রাহ্য করিলেন। শীলার সহিত দেখা হইল না।

পরীক্ষার পরে আর কোন যুক্তিই রহিল না। দাদার কাছে গেলাম এবং শীলার সহিত দেখা হইল। এই এক বৎসরে তাহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আগের বার তাহাকে দেখিয়াছি নিতান্ত বালিকাবয়সী। সেই নিরাবরণ, নিরাভরণ উন্মুক্ত প্রান্তরের মত তাহার মনটিও ছিল অত্যন্ত সরল। আমাদের এই বর্ত্তমান আলাপ-পরিচয়ের সহজতার মধ্যে যে ভবিষ্য জীবনের একটা জটিলতর প্রশ্ন লুকাইয়া থাকিতে পারে তাহা তাহার মনে হইত না। সে তাহার শৈলপ্রবাসের কত গল্পই না করিত।

কিন্তু এবার দেখিলাম তাহার দেহে যেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার মনেরও তেমনি অপূর্ব্ব রূপান্তর ঘটিয়াছে। সে আর এখন তেমন সহজ ভাবে যখন-তখন আমার সহিত বেড়াইতে বাহির হইতে চাহিত না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আরক্ত ও আনতমুখ হইত। আমি তখন প্রারব্ধ যৌবনের সমস্ত রঙীন স্বপ্ন দিয়া আমার মানসীমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছি। হৃদয়তটভূমিতে এত সব পরিপূর্ণ ভাবের তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিত যে এক-এক দিন অভিভূত হইয়া পড়িতাম। মনে হইত পৃথিবীতে যাহাকে ইচ্ছা সর্ব্বস্ব দিতে পারি, যাহার জন্য ইচ্ছা প্রাণ দিতে পারি, যে-কোন দুঃসাধ্য কার্য্য করিতে পারি, যে-কোন নীচতাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারি। যদি আমার মানসলোকের সেই কল্পলক্ষ্মীকে শুধু এ কথাটুকু জানাইতে পারি, হে দেবী, এ শুধু তোমারই জন্য।

লোষ্ট্রকাষ্ঠেবদ্ধ পৃথিবী হইতে স্বপ্ন ছুটিয়া গিয়াছে, সাত-সমুদ্র তের-নদীর পারে শায়িতা রাজকন্যারা রাজপুত্রদের শৌর্য্যবীর্য্যে শাপমুক্তা হয় না, কিন্তু আজও পৃথিবীব্যাপী যুবকেরা নারীর অনুগ্রহলাভের জন্য প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করে। আদিমযুগের রাজপুত্র এখনও একটা বিশিষ্ট বয়সে পুরুষের মনে জাগিয়া উঠে। সত্য বলিতে কি, তুমি আমাকে হয়ত একটি আস্ত গর্দ্দভ মনে করিবে, কিন্তু আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম হয় শীলাকে লাভ করিব, নচেৎ জীবন দান করিব।"

হাসিয়া উত্তর দিলাম, "মোটেই না আচারিয়া, তবে মনে করিলেও ক্ষতি ছিল না। নারীর ভালবাসা বা ছলনা দ্বারা গর্দ্দভ বনে নাই এমন পুরুষের সংখ্যা পৃথিবীতে বেশী নয়।"

"একদিন সন্ধ্যার পর দাদা আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকাইলেন এবং অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "শিব, তোমার বয়স হইয়াছে। শীলার সহিত তোমার আচরণ কিছু গর্হিত হইয়াছে এমন কথা বলি না কিংবা দেশ ভাষা আচার ইত্যাদির বাধা সত্ত্বেও তোমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না এমন কথাও বলিতে চাহি না। কিন্তু তোমাকে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে হইবে। তুমি যদি শীলাকে সত্যই ভালবাস, তবে তাহাকে লাভ করিবার যোগ্যতা তোমাকে অর্জ্জন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে শীলার মা-বাপের সহিত আমার কথা হইয়াছে। শীলার বাবা সরকারী চাকরির বাঁধা পথ ধরিয়া জীবনযাত্রা যাপন করেন, সমাজ ও সংস্কার তুচ্ছ করিয়া তোমার হস্তে একমাত্র কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন, তুমি যদি অন্ততঃ একটা প্রদেশীয় চাকরিও লাভ করিতে পার। অতএব এখন হইতে প্রেম-চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া তোমাকে প্রতিযোগী-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, এবং আপাততঃ শীলার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিতে হইবে। শীলার মা'র এই ইচ্ছা" এই বলিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া আমার পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া উৎসাহ দিলেন।

অনেক দিন অনেক কথা মনে হইয়াছে ; ভাল মন্দ ও অসার বহুবিধ চিন্তা করিয়াছি। সে চিন্তার কোন ধারা ছিল না। দাদার এই বাক্য কয়টি আমার চিন্তাধারাকে একটা বিশিষ্ট

প্রেস, কলিকাতা

পূর্ণকুম্ভ

শ্রীভবানীচরণ গুই

প্রবাহে চালিত করিল। প্রথমটা মনে বড় ক্ষোভ হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যান্ত যে দু-একটা পরীক্ষা দিয়াছি তাহার ফল বিশেষ মন্দ হয় নাই; শৈশব অবধি কেহ বোকা বলে নাই, চেহারা দেখিতে ভাল বলিয়া জানিতাম। কিন্তু আমার বিদ্যাবুদ্ধি স্বাস্থ্য চরিত্র—ইহার কোনটার বিশেষ মূল্য শীলার মা বাবার নিকট রহিল না। শীলার মা'র উপর রাগ হইল; শীলার প্রতিও কেমন একটি অভিমান হইল। কিন্তু ক্রমে যখন উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল হইল, নিজের আত্মগরিমার কুয়াশা কিছু কাটিয়া গেল, ভাবিলাম সত্যই ত বড়লোকের একমাত্র সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যা লাভ করিবার এমন কি যোগ্যতা আমার আছে?

এমন সময় বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল। পরীক্ষাতে অবশ্যই বঙ্গধাতুমালা কিংবা দার্জ্জিলিং-বিবরণী-বিষয়ক কোন প্রশ্ন ছিল না, ফলে দেখা গেল মান্দ্রাজ খ্রীষ্টীয় হোষ্টেলের প্রকোষ্ঠে বসিয়া যে পরিশ্রম করিয়াছি তাহার মূল্য মূর্খ পরীক্ষকগণ বুঝেন নাই; শিবস্বামী আচারিয়ার নাম অনার্স শ্রেণীর প্রথম কিংবা দ্বিতীয় কোন বিভাগেই নাই। সাধারণ ভাবে পাস হইলাম।

মনে বড় লাগিল। জীবনের জটিল প্রশ্ন তখনও বহুবিধ মূর্ত্তি ধরিয়া প্রতারণা করিতে আসে নাই। সমস্যা মাত্রেরই যে সমাধান নাই এ জ্ঞানও তখন হয় নাই, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতাকে নিতান্ত অগৌরবের বলিয়া মনে হইল। বিশেষতঃ মনে তখন কেবল এই চিন্তাই হইতেছিল যে এই পরীক্ষার মধ্য দিয়াই শীলাকে লাভ করিতে হইবে।"

আচারিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখস্থ সীমাহীন অন্ধকারের দিকে চাহিল। স্তরে স্তরে তখন পর্ব্বতগাত্রে বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কুয়াশা-মলিন নৈশান্ধকারে বনানী পর্ব্বত একাকার হইয়া লেপিয়া গিয়াছে। ভিক্টোরিয়া-উদ্যানের দ্বাররক্ষক তাড়া দিল যে এখন বাহির হইতে হইবে; সে ফটক বন্ধ করিবে।

গল্পটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল; শীত আরও বেশী। বৈকালে যে 'চেষ্টারফিল্ডে'র বোঝা অনর্থক বহিয়া বেড়াইতেছি বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহাই এখন আরাম প্রদান করিতে লাগিল। দরোয়ানকে কিছু বকশিশ দিয়া আচারিয়াকে কহিলাম, "আচারিয়া, তোমার এই ভালবাসার পরিণাম কি হইল, শীঘ্র বলিতে হইবে!"

"পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে রৌদ্রদগ্ধ আকাশে যখন ঈষৎ মেঘসঞ্চার হইয়াছে, উত্তপ্ত বালুকা-প্রান্তর হইতে ধরণীর দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিতেছে, এমন সময়ে শীলা আমার ঘরে প্রবেশ করিল। দাদার সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণের পর হইতে শীলার সহিত আর আলাপ হয় নাই। শীলা আসিয়া বলিল, "চল বেড়াইতে যাই।" দিবা দ্বিপ্রহরে কোশী-প্রান্তরের সেই বালুকাবদ্ধ শুষ্ক উত্তাপ যে-কোন প্রেমিকের প্রেমরস মুহূর্ত্তে বাষ্পীভূত করিয়া দিতে পারে। আমার মন ভাল ছিল না; বলিলাম, 'বৃষ্টি আসিতে পারে। বিশেষতঃ জান ত শীলা, আমাদের অভিভাবক আমাদিগকে বেশী মিশিতে নিষেধ করিয়াছেন।' সে বলিল, 'তা জানি, সে জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি, চল বেশী দূর যাইব না, কালী কোশী পর্য্যন্ত।'

মনে আশা ও আশঙ্কার আলোড়ন উঠিল। গল্পে উপন্যাসে প্রেমোপাখ্যানের যে নাটকীয় পরিণতির কথা পড়িয়াছি আমার জীবনে কি তাহাই ঘটিবে। সেদিনের আমার সেই যুবক মনে কি কি ভাব উঠিয়াছিল আজ তাহা বলিতে গিয়া শুধু হয়ত বিশ্লেষণ করিব। মোটের উপর ধরিয়া লইতে পার পঞ্চদশী বাঙালী তরুণী একবিংশবর্ষীয় মান্দ্রাজী যুবকের নাসারন্ধ্রে একটি রজ্জু প্রবেশ করাইয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।

আমরা কালী কোশীর যে জায়গাটাতে উপস্থিত হইলাম, সেখানে নদী দুই দিকে বিভক্ত হইয়া মধ্যস্থলে একটি দ্বীপভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। সৃষ্টি করিয়াছে হয়ত বলা চলে না; কিছু বৃক্ষসমাবেশের নিমিত্তই হউক কিংবা মৃত্তিকার স্বাভাবিক কাঠিন্যের জন্যই হউক, নদী দুই দিকের বালুভূমিকে নির্দ্দয় ভাবে খুঁড়িয়া আপনার পথ তৈয়ার করিয়াছে, কিন্তু মধ্যভূমিকে উৎসাদিত করিতে পারে নাই। নদীতল হইতে পাড় একবারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। সেই দারুণ গ্রীষ্মেও অতি ক্ষীণ স্বচ্ছ জলধারার যথেষ্ট স্রোতবেগ রহিয়াছে। আমরা জল পার হইয়া নদীর মধ্যস্থিত উচ্চভূমিতে উপস্থিত হইলাম। জায়গাটা বাবলাগাছে একেবারে গাছে ফুল ফুটিয়াছে। ক্ষুদ্র হলদে ফুলের

মৌমাছিরা দিগ্বিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে; কেমন একটা মৃদু মাদক গন্ধে স্থানটি ভরিয়া গিয়াছে।

আমরা বসিলাম। শীলা হঠাৎ অত্যন্ত আবেগভরে কহিল, 'আচারিয়া, আজই তোমাকে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। বল যাইবে—।'

বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ নিজেকে অপমানিত মনে করিলাম। বলিলাম, 'কেন শীলা, আমি এমন কি গর্হিত আচরণ করিয়াছি যে আমাকে এ জায়গা ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আমি তোমাকে ভালবাসি, একথা তুমি জান; তোমার বাবা মা জানেন; আমার দাদা জানেন। কিন্তু আমার জীবনে যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ তাহার নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি সে ভালবাসার মধ্যে কিছুমাত্র খাদ নাই। আমার ধমনীতে অবিমিশ্র মান্দ্রাজ ব্রাহ্মণের রক্ত প্রবাহিত; আমার কথা বিশ্বাস কর তোমার সম্বন্ধে কোনদিন কোন নীচ চিন্তা করি নাই।' আরও কত কি বলিতে যাইতেছিলাম কিন্তু দেখিলাম শীলার চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। শীলা বলিল, 'আচারিয়া, তুমি পুরুষ, নারীহৃদয়ের সব কথা বুঝিবে না।' এই বলিয়া সে আমার হাত ধরিল এবং বলিল, 'আমি বলিতেছি তোমাকে ভালবাসি; তোমার জন্য অপেক্ষা করিব, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর আজই এখান হইতে চলিয়া যাইবে।'

সেই দিন অবারিত আকাশের নিম্নে চিরচঞ্চলা অস্থির-মতি কোশীর বুকে বাঙালী তরুণী মান্দ্রাজী যুবকের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিল, সর্ব্বদর্শী দিগ্‌দেবতা, উচ্চ কাশবন আর ঘনসন্নিবিষ্ট বাবুল ছাড়া তাহার আর কোন সাক্ষী ছিল না; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি শীলা তাহার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে নাই।"

"কি করিয়া জানিলে?"

"আমি সেদিনই চলিয়া আসিলাম। তার পর আমার যৌবনের সেই মহিমান্বিত দিনগুলি প্রতিযোগী-পরীক্ষার পড়া তৈরি করিতে করিতে নষ্ট হইতে লাগিল। তুমি হয়ত জান না সে কি একঘেয়েমি। কত অনাবশ্যক তত্ত্ব, কত অসম্ভব কাহিনী, কত পল্লবগ্রাহিতা দরকার হয় এই সব পরীক্ষাতে। একে একে বহু পরীক্ষা দিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। প্রতিবারেই অল্পের জন্য আমার জীবনের সাফল্য হাতের কাছে আসিয়া ফস্‌কাইয়া যাইতে লাগিল। পরীক্ষাগৃহে প্রশ্নের উত্তর লিখিতাম আর মনে মনে ভবিষ্য জীবনের স্বপ্ন দেখিতাম। মনে হইত এই পরীক্ষার ফলের উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। এত বড় পণ লইয়া কেহ কোন দিন কোন পরীক্ষা দেয় নাই।

"তার পর কি হইল?"

"এক দিন খবর পাইলাম মহা ধুমধামের সহিত এক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত শীলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। একবার ইচ্ছা হইল তাহার সহিত দেখা করিয়া তাহার প্রতিজ্ঞা হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিই। কিন্তু পরীক্ষার অকৃতকার্য্যতা আমাকে এতই লজ্জিত করিয়াছিল যে মনে করিলাম আত্মহত্যা করিব। নিজ গৌরবে নারী লাভ করিতে না পারিয়া আত্মবিসর্জ্জন করা পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া মনে হইল না. ভাবিলাম হায় রে নারীর মন! কেনই বা তুমি আমাকে এমন প্রলুব্ধ করিলে, কেনই বা তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে? ভালবাসার চেয়ে ডেপুটিগিরির মূল্য বেশী সে সত্য তখন জানিতাম না, তবু শীলার এই আচরণকে অসতীতুল্য বলিয়া মনে হইল। অপরিচিত অ-দৃষ্ট সেই ডেপুটির মুণ্ডপাত করিয়া ধৈর্য্য সহকারে আইন অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম।"

উঠিয়া পড়িলাম এবং দু-জনে ধীর পদক্ষেপে স্যানাটরিয়মের দিকে অগ্রসর হইলাম। আচারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কিছু বলিবার আছে?"

"কিছু না, কোন্ বিড়াল মাছ ভালবাসে না, কোন্ স্ত্রীলোকের কাছে স্বর্ণের আদর নাই?

সমস্ত রাস্তাটা আর কোন কথা হইল না। আচারিয়ার মত বাক্‌পটু লোকও যেন সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার যাহা-কিছু বলিবার ছিল তাহা যেন নিঃশেষে বলা হইয়া গিয়াছে। হিমালয়ের গাত্রবিসারী সেই গহন শীতল অন্ধকার সমস্ত বিদ্যুৎ-আলোক অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের অন্তর-বাহির নিৰ্জ্জীব কঠিন করিয়া দিল।

* * * *

পরদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর আচারিয়া যখন আমার কামরায় প্রবেশ করিল আমি তখন বাক্স-বিছানা গুছাইতেছি। সেদিন মনে আর কোন ভয় ছিল না। জানিতাম এই

তেজোদীপ্ত প্রখরবুদ্ধি যুবকের অন্তরস্থিত চিন্তাচাপ কল্যকার সন্ধ্যার সেই প্রেমকাহিনীর সেফটি-ভাল্‌ভ দিয়া সম্পূর্ণ রূপে নির্গত হইয়া গিয়াছে; এখন সে নিতান্তই বাষ্পাগ্নিবিহীন সাধারণ মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি ব্যাপার? জিনিষপত্র গুছাইতেছ যে?"

"আজই চলিয়া যাইতেছি, ভাল লাগিতেছে না।"

"তুমি না এখানে দু-সপ্তাহ থাকিবে?"

"ইচ্ছা ছিল কিন্তু একা ভাল লাগিতেছে না।"

সে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাই বল। তখনই জানি যে স্ত্রীকে যখন সঙ্গে আন নাই থাকিতে পারিবে না। তা বেশ, যাও।"

প্রতিবাদ করিলাম না।

যখন ষ্টেশনে যাইব দেখিলাম আচারিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। "মনে কিছু করিও না, এই কয়েকটি জিনিষ তোমার স্ত্রীকে উপহার দিলাম" বলিয়া সে ইংলণ্ডে তৈয়ারী একটি হিমালয়ান ওয়ালনাট কাঠের ক্ষুদ্র বাক্স, ডেনমার্কে প্রস্তুত দুই গাছি দার্জ্জিলিং নেক্‌লেস্ এবং ইটালী হইতে আমদানী একখানি তিব্বতী শাড়ী বাহির করিল। তাহার পাগলামি দেখিয়া হাসি পাইল। বলিলাম, "এ কি কুকাণ্ড করিয়াছ? তোমার কি মেলা টাকা? দু-দিনের পরিচিত বন্ধুর অপরিচিত স্ত্রীকে এত উপহার?"

"তোমার সহিত পরিচয় দু-দিনের বটে কিন্তু তবু কি জান জীবনে চলিতে চলিতে এমন দু-এক জনের সহিত দেখা হয় যাদের দেখিলেই মনে হয় এ বহু দিনের পরিচিত। মনে কিছু করিও না।"

জানিতাম তর্ক করা বৃথা, বলিলাম,"আচ্ছা আচারিয়া, এখন যাও, ষ্টেশনে দেখা হইবে।" আচারিয়া চলিয়া গেল; কোনরূপে উদ্‌গত অশ্রু সংবরণ করিয়া পত্র রচনা করিতে বসিলাম।

যথাসময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম আচারিয়া আগেই সেখানে গিয়াছে। গাড়ীতে উঠিলাম। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আচারিয়া বলিল, "ভাই তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখাইতেছে কেন? আমি কি কোন অজ্ঞাত কারণে তোমার মনে ব্যথা দিয়াছি?"

"না, আচারিয়া তুমি হতভাগ্য সন্দেহ নাই কিন্তু মনে রাখিও নারীকে না-পাওয়ার বেদনার চেয়েও তাহাকে জোর করিয়া পাইবার ব্যথা অনেক বেশী।"

এঞ্জিন চীৎকার করিল। গাড়ী চলিতে লাগিল। আচারিয়া বলিল, "বন্ধু তোমার স্ত্রীর সহিত শুভমিলন হউক।"

আমি তাড়াতাড়ি একখানি খাম তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, "পড়িয়া দেখিও।"

অল্পকাল মধ্যেই হিমালয়ের একটা প্রকাণ্ড কঠিন শীতল পাষাণস্তূপ দার্জ্জিলিং শহরকে দৃষ্টির অগোচর করিয়া ফেলিল। পাতলা কুয়াশার অস্পষ্ট আস্তরণ আমার মনকে নিতান্ত নিরবলম্ব করিয়া দিল। আচারিয়া তখন বোধ হয় আমার চিঠি পড়িতেছিল :—

"ভাই শিবস্বামী, আমাকে ক্ষমা করিও। প্রথমে নিতান্ত নিরর্থক ভাবেই আত্মপরিচয় গোপন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পর আর ভাঙিয়া বলিবার সাহস ছিল না। তুমি নাম গোপন করিবে বলিয়াও শীলার যথার্থ নামই ব্যবহার করিয়াছিলে; না করিলেও ক্ষতি ছিল না, সহজেই তাহাকে চিনিতে পারিতাম, আমি শীলাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, তোমার সহিত পরিচয় হইবার পূর্ব্বে তাহার অদ্ভুত আচরণের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতাম না। কেনই বা সে তোমাকে ভালবাসিয়াছিল আর আমাকে বিবাহ করিয়াছিল জানি না, (নারী-চরিত্র কেইবা কবে জানিয়াছে!) তুমি বলিয়াছিলে শীলা তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে নাই। তাহার বিচারকর্ত্তাও আমি নই, তবে এ-কথা বলিতে পারি যে আমি তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম বটে কিন্তু মন বা দেহ গ্রহণ করিতে পারি নাই। এই সত্যে তোমার কিছু লাভ হইবে কিনা জানি না, তবে আমার পক্ষে জীবনে যে-স্ত্রীকে পাই নাই মৃত্যুর পরে তাহার আলেখ্য পূজা করিবার উপায় রহিল না। সাত দিন পূর্ব্বে শীলা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, অতএব তোমার উপহার তাহার নিকট পৌঁছাইবার উপায় না থাকাতে ম্যানেজারের নিকট গচ্ছিত রহিল। ইতি—"

নারীর অধিকার

শ্রীনিরুপমা দেবী

হে নারী কি চাহ তুমি? কোন্ অধিকার
জগতের দরবারে? পুরুষের কোন্ সাধনার
যজ্ঞে তুমি করিয়াছ দাবি?
জ্ঞানকক্ষ উন্মোচিতে তুমি চাহ কোন্ গুপ্ত চাবি?
মুক্ত সভাতলে তুমি পাতিবারে চাহ
যে তব আসন, বিশ্বের প্রবাহ
যেথা চলে, যেথা চলে রাজ্য ভাঙা-গড়া
অধিকারে অধিকারে ঠেলাঠেলি ঠোকাঠুকি কত ওঠা-পড়া
সেথা তুমি নিতে চাও যে আপন স্থান
আমি নারী চিনি তারে আমি তারে করেছি সম্মান!

তবু মনে আজ লয়
বাহিরের দাবি লয়ে যুঝিবার আসে নাই এখনও সময়!
হায় আজও অন্তরের মাঝে
ভিতরের দাবি কাঁদে নতশির লাজে!
যে দাবি যে অধিকার
জনম লভিল এই জীবনে আমার
যার লাগি
লাঞ্ছনা সহি নি কভু, অপমানভাগী
করিবারে পারে নাই কেহ
দিল যাহা নারী-দেহ
দিল নারী-মন
আপনি যা নারী-মনে পাতিল আসন!
যে দাবিতে নারী নারী হয়
সে দাবির যে গৌরব সে ত ছোট নয়!

নারীর যে অধিকার
মাধুর্য্যে সৌন্দর্য্যে রসে জীবনেরে পূর্ণ করিবার
কল্যাণীর দুটি শুভ কর
প্রেমের চন্দন দিয়ে ব্যথার উপর
যে প্রলেপ দিতে পারে
তারে একেবারে
ক'রো না ক'রো না অস্বীকার!
কল্যাণ-প্রতীক তুমি তোমার যে প্রাণের প্রসার
তোমার যে শান্ত শুভজ্ঞান
সৌন্দর্য্যের রসধ্যান,
যাহা তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর
মায়ারূপে পার তাহা করিবারে অপূর্ব্ব সুন্দর
এরে তুমি করিও স্বীকার
এ মহা সাধনক্ষেত্রে আছে তব পূর্ণ অধিকার!

মানবজীবন-রণে যারা লয় স্থান
সেই সব মানবের বীরের সন্তান
গড়িবার
আছে তব স্বত্ব অধিকার
বিন্দু বিন্দু সুধা দিয়ে সত্য দিয়ে তারে
মানুষের সর্ব্ব গুণে সর্ব্ব তেজ ভারে
সর্ব্ব শুভ জ্ঞানে বলে
সর্ব্ব শুভ বুদ্ধি ঢালি হৃদয়ের তলে
মানুষ করিয়া তোলা হে জননী সে তোমার কাজ
স্বীকার করিতে তাহা কেন এত লাজ?

জীবনের রঙ্গভূমে
ফুটিয়া উঠিছে যাহা বিচিত্র কুসুমে
তারি পরিকল্পনায়
একান্তে বসিয়া ঐ যবনিকা-পারে নিরালায়
চুপে চুপে আঁকিবার
আছে তব বিধাতার হাতে পাওয়া পুণ্য অধিকার!
তুমি কি বুঝেছ মনে
এরে তুমি কর্ম্মের সাধনে
জীবনে দিয়াছ নারী পরিপূর্ণ স্থান
বাহিরে খুঁজিয়া তাই ফিরিছ সম্মান?

পুরুষের অধিকারে অধিকার চাও
আগে তুমি দাও
জগতের দাবি যাহা আছে তব 'পরে
আগে তুমি নারী হও মাতা হও অন্তরে অন্তরে
আপনি দেখিবে যত তুচ্ছ অধিকার
মন্ত্রবলে অবনত চরণে তোমার।

স্বরলিপি

"হৈ হৈ সঙ্ঘের জাতীয় সঙ্গীত"

কাঁটাবন-বিহারিণী সুরকাণা দেবী
তাঁরি পদ সেবি করি তাঁহারি ভজনা ;
বদ্‌কণ্ঠ-লোকবাসী আমরা কজনা।
আমাদের বৈঠক বৈরাগী পুরে
রাগরাগিণীর বহুদূরে।
গত জনমের সাধনেই, বিদ্যা এনেছি সাথে এই গো,—
নিঃসুর-রসাতল তলায় মজনা ॥

সতেরো পুরুষ গেছে ভাঙা তম্বুরা
রয়েছে মরচে ধরি' বেসুর-বিধুরা ;
বেতার সেতার দুটো
তবলাটা ফাটাফুটো
সুরদলনীর করি এই নিয়ে যজনা ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

II [ধ]র্সা -া র্সা -া । র্সা র্সা র্সা র্সা I র্সনা -র্রা র্সা -া । না র্সা র্সা র্সা I
কাঁ ০ টা ০ ব ন বি হা রি০ ০ ণী ০ সু র কা ণা

I [র্স]না -া পা -া । না না র্সা না I [ধ]না -া [ধ]পা -া । ধা না না না I
দে ০ বী ০ তাঁ রি প দ সে ০ বি ০ ক রি তাঁ হা

॥

I [ধ]না -া না ধা । পা -া -া -া I ধা না না না । [ধ]না -া ধা পা I
রি ০ ভ জ না ০ ০ ০ ব দ্‌ ক ন্‌ ঠ ০ লো ক

I [ম]পা -া [ম]গা -া । -া -া -া -া I গা -পা পা -া । পা পা পা -া I
বা ০ সী ০ ০ ০ ০ ০ আ ম রা ০ ক জ না ০

I [প]না না না না । [ধ]না -া না ধা I পা -া -া -া । -া -া -া -া II
ক রি তা হা রি ০ ভ জ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II { সা -[স]মা মা মা । মা -পা পা পা I সা -মা মা মা । মা -পা পা -া I

আ মা দে র বৈ ০ ঠ ক বৈ ০ রা গী পু ০ রে ০

I সা -মা মা মা । মা -পা পা পা I মা -পা পা -া । -া -া -া -া } I

রা গ রা গি গী র ব হু দূ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I পা ধা [ধ]র্সা র্সা । [ন]র্সা র্সা র্সা র্সা I নর্সর্রা র্সা না -া । -া -া -া -া I

গ ত জ ন মে র সা ধ নে০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I [ন]না -র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা না I [ধ]না না [ধ]পা -া । না -া র্সা র্সা I

বি ০ দ্যা এ নে ছি সা থে এ ই গো ০ নিঃ ০ স্ব র

I র্সা র্সা র্সা না । না -া র্সা -না I [ধ]না না [ধ]পা -া । না না না না I

র সা ত ল ত ০ লা য় ম জ না ০ ক রি তা হা

I [ধ]না ... II

রি ভ জ না— ইত্যাদি

II সমা মা মা মা । মা মা পা পা I পা ধা না না । [ধ]না -া [ধ]পা -া I

স০ তে রো পু রু ষ গে ছে ভা ঙা ত ম্ বু ০ রা ০

I পা -দা দা দা । দা দা দা পা I মা পা পা ধা । [ম]পা -া মগা -মা I

র য়ে ছে ম র্ চে ধ রি বে সু র বি ধু ০ রা০ ০

{ [র্সা -র্গা র্রা র্সা]

I পা ধা না না । [ধ]না -া [ধ]পা -া I { [ন]র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা -া র্সা র্সা I

ভা ঙা ত ম্ বু ০ রা ০ বে ০ তা র্ সে ০ তা র্

I র্সা -া র্সর্রা -া । না -া -া -া I না র্সা র্সা র্সা । র্সা -া না -া I

ছু ০ টো০ ০ ০ ০ ০ ০ ত ব লা টা ফা ০ টা ০

I [ধ]না -া [ধ]পা -া । -া -া -া -া } I [প]র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা র্রা I

ফু ০ টো ০ ০ ০ ০ ০ সু র দ ল নী র ক রি

I [ন]র্সা র্সা র্সা -না । [ধ]না না না -া I [ধ]ন না না র্সা । [ধ]না না [ধ]পা -া I

এ ই নি য়ে য জ না ০ আ ম রা ০ ক জ না -া

I ... ... II II

করি তাহারি ভজনা ইত্যাদি ...

গান

মনে হ'ল যেন পেরিয়ে এলেম
অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে,
মরুতীর হ'তে সুধাশ্যামলিম পারে।
পথ হ'তে আমি গাঁথিয়া এনেছি
সিক্ত যূথীর মালা,
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ-ঢালা,
লজ্জা দিয়ো না তারে ॥
সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে বনে বনে
পথহারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে।
দূর হ'তে আমি দেখেছি তোমার
ঐ বাতায়ন-তলে,
নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে,
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখী
ঝড়ের অন্ধকারে ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **স্বরলিপি—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ**

[জ্ঞরা জ্ঞা রসা] [-া -া -া] ॥
II সা সা -রা । সা রজ্ঞা [স]রা I সা -া -া । -া সা ন্‌া I সা [স]পা পা ।
ম নে ০ হ ০০ ০ ল ০ ০ ০ যে ন পে রি য়ে

। পা পা পা I মা -জ্ঞা -রা । [র]সা [স]জ্ঞ রা I সা -া সা । গা গা গা I
এ লে ম্ অ ন্ ত বি হী ন প ০ থ্ আ সি তে

I মা পা পধা । [ম]পা মরা মজ্ঞা I জ্ঞরা জ্ঞা রসা । সা রজ্ঞা [স]রা I সা -া -া ।
তো মা র্০ দ্বা রে০ ০০ ম০ নে ০০ হ ০০ ০ ল ০ ০

: পা ধা ণা I র্রা র্রা র্সা । [ণ]র্সা র্সা ণা I ধা পা পধা । মপা মরা মজ্ঞা II
ম রু তী র্ হ তে সু ধা শ্যা ম লি ম০ পা০ রে০ ০০

II না না না । না না না I না না -পা । না না -র্সা I র্সা -া -া ।
প থ হ তে আ মি গাঁ থি য়া এ নে ০ ছি ০ ০

। -া -া -া I র্সা -া [স]র্রা । র্রা র্সণা ণা I ধা ণা -া । -া -া -া I
০ ০ ০ সি ক্ ত যূ থী০ র মা লা ০ ০ ০ ০

I ধা ণা ণা । ণা ণা ণা I ণা ণা ধা । পা ধা ণা I পধা ধপা -া ।
স ক রু ণ নি বে দ নে র গ ন্ ধ ঢা লা ০

। পা ধা র্ণর্রা I র্রা র্রর্সা র্সা । ণর্সা ণধা পা I ণা মা -া । পা ধা ধণা I
ল জ্ জা০ দি য়ো ০ না দি০ য়ো০ না ০ ০ ০ ল জ্ জা০

I ণা ধা পধা । মপা মরা মজ্ঞা II
দি য়ো না০ তা০ রে০ ০০

II { ন্া ন্া ন্া । ন্া ন্া সা I সা সা সা । সা সা সন্া I সা -া জ্ঞা ।
স জ ল মে ঘে র ছা য়া ঘ নাঁ ই ছে ব ০ ০

। জ্ঞা -া রা I জ্ঞা -া -া । -া -া -া I মপা পা পা । পা পধা ণর্সা I
নে ০ ব নে ০ ০ ০ ০ ০ প থ হা রা নো০ ০র

I ণর্সা র্সা ণা । ধা পা পধা I মপা মরা মজ্ঞা । রা সা -া } II
বা জি ছে বে দ ন০ স মী০ ০০ র গে ০

II না না না । না না না I ধনা না না । না না -র্সা I ধনা না না ।
দূ র্ হ তে আ মি দে খে ছি তো মা র ঐ ০ বা

। র্সা র্সা র্রা I না র্সা -া । -া -া -া I না র্সর্রা র্রা । র্সা র্সণা ণা I
তা য় ন ত লে ০ ০ ০ ০ নি ভৃ০ তে প্র দী প

I ধা পা -া । পা পা ধা I ণর্রা র্সা র্সা । ণর্সা ণা ণা I ধা পা পধা ।
জ লে ০ তো মা র এ০ আঁ খি উ০ ৎ সু ক পা০ খী০

। মা পা পা I মা ণা পধা । পা মরা মজ্ঞা II II
ঝ ড়ে র অ ন্ ধ০ কা রে০ ০০

আলোচনা

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনিয়র বিলিয়ম্‌সের অভিধানে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ও তাহার আনুষঙ্গিক শব্দের ইংরেজি কয়েকটি প্রতিশব্দ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। বর্তমান আলোচ্য প্রসঙ্গে যেগুলি অনাবশ্যক সেগুলি বাদ দিয়েছি।

কৃষ্ট—ploughed or tilled, cultivated ground।

কৃষ্টি—men, races of men, learned man or pandit, ploughing or cultivating the soil

সংস্কার—making perfect, accomplishment, embellishment।

সংস্কৃত—perfected, refined, adorned, polished, learned man।

সংস্কৃতি—perfection।

মাটি

শ্রীসুশীল জানা

বনগ্রামের বাঁধের সীমানা লইয়া দুই সরিকের বিবাদ আজও থামে নাই।

বহুদিন যাবৎ ঝগড়া-বিবাদ, লাঠালাঠি, মামলা-মোকদ্দমা হইয়া আসিতেছে; এখনও চলিতেছে, কবে যে ইহার শেষ মীমাংসা হইবে তাহা জানা নাই—বংশানুক্রমিক চলিয়াছে। আদালতে মোকদ্দমা করিয়া যে হোক এক পক্ষ হারিয়াছে কিন্তু সে হার—হার নয়। পরদিনই হয়ত আবার এই বাঁধের সীমানার মুখে কাপড় উড়াইয়া দুই পক্ষের দস্তরমত লাঠালাঠি হইয়া গিয়াছে। তার পর ফৌজদারী রুজু। এমনি করিয়া পুরুষানুক্রমে দুই সরিকের রেশারেশি চলিয়া আসিতেছে। এই বাঁধের জন্য স্বরূপ-লাঠিয়াল গত হইয়াছে এবং আরও কত জন। হুগলী নদীর ম্যাবোলিশ এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট বাঁধটার পাশে পাশে খুঁড়িয়া গেলে কত মড়ার মাথা যে বাহির হইবে তার ঠিক নাই। সম্প্রতি নদীটা বাঁধের একাংশ গ্রাস করায় নরকঙ্কাল বাহির হইয়া শ্মশানক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে।

রাজার কড়া আইনে মারামারি, কাটাকাটিটা এখন থামিয়াছে সত্য, কিন্তু কলহটা থামে নাই। মৌখিক কলহের ফলে যদি কোন শারীরিক ক্ষতি হইতে পারিত তাহা হইলে দুই পক্ষই এতদিনে নির্ব্বংশ হইয়া যাইত। কারণ নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন কলহটা চলিতেছে। সম্প্রতি আবার একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। যাতায়াতের রাস্তাটা চিরকালই এজমালি ছিল, কিন্তু সেটা আজকাল এক সরিকের হইয়া গিয়াছে। সেটেলমেণ্ট আসিয়াছিল, ছোট তরফ অসুস্থ দেহ লইয়াও আমিনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু এক সময়ে নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় ঘরে আসিয়া বাম করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। সেই সুযোগে বড় তরফের বুড়া মহেন্দ্র কুণ্ডু কিছু ঘুষ দিয়া দুই পক্ষের নাম কাটিয়া নিজের নামে করিয়া লইয়াছিল।

ভূষণ জ্যোতিষ উপস্থিত ছিল, বলিয়াছিল—মিছামিছি আর কেন বাবাজী! বয়সটাও ত সোত্তরের কোঠায় পৌছল প্রায়! কদ্দিনই বা বাঁচবে আর…ভোগ করবেই বা কে?—ছেলে-পিলে ত নেই।…

—এসব তুমি বুঝবে না কাকা। বুড়া মহেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়াছিল।

—তা না বুঝি বাবাজী, কিন্তু অত মারামারির শেষেও সেই ত হাত-চারেক জায়গার মামলা।

মহেন্দ্র কুণ্ডু ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করিয়াছিল। বলিয়াছিল—এক ছটাক মাটিও ত কোন দিন কেন নি, কিন্‌লে মাটির মূল্য বুঝতে। এ রকম না ক'র্‌লে জমি-জায়গা হয় না।

—কি জানি বাবাজী? তবে পরকালটা আছে সেই ভয়ে ওর ভেতরে যাই নে। আর তোমাকেও তাই বল্‌ছি…

—কি বল্‌ছ? তার পর যে ছেলেটাকে রেখেছি তার জন্যেও ত এসব করা কর্ত্তব্য?

—কে, ফটিক? সে ত তোমার আর নিজের ছেলে নয়? পাপের ভাগটা নেবে কে? ঠ্যাঙাড়ে রত্নাকরের উপাখ্যানটা মনে আছে ত?

—হুঁ—হুঁ, সব মনে আছে—সব মনে আছে। তুমি চুপ কর কাকা।

জমিদারী গিয়াছে, নবাবী আমলের আসবাবপত্র গিয়াছে, এক কথায় সমস্তই গিয়াছে, যায় নাই কেবল পুরানো ভদ্রাসনটুকু আর গণ্ডগোলের সেই বাঁধটা। জমিদারী ভড়ংটাও যায় নাই। ভদ্রাসনের সবটাই ক্রমশঃ ঝরিয়া খসিয়া পর পর পড়িয়া যাইতেছে—সংস্কারও সম্ভব নয়। লোকে বলিলে বলে, যাক্ প'ড়ে—এতগুলা ঘরে থাক্‌বে কে?

ছোট তরফের যোগেশ পুরানো ভদ্রাসন ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছে। যে-বাঁধ লইয়া গোলমাল তাহার দুই পাশের

অধিকাংশ জমি হাতছাড়া হইয়াছে—তবু বাঁধ লইয়া মোকদ্দমা থামে নাই।

সেদিন বুড়া মহেন্দ্র কুণ্ডু ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া কাঠ চিরিতেছিল এমন সময় ছোট সরিকের বংশধর বলরাম বন্ধ কপাটে ধাক্কা দিয়া ডাকিল—দাদু—ওগো দাদামশাই।

বৃদ্ধ কপাট খুলিয়া দিল। বলরাম সবিস্ময়ে বলিল—দাদা মশাই, কুড়ুল কি হবে! আবার কা'কে মারতে যাবে? মারামারি ক'রো না দাদামশাই···বালক বৃদ্ধের কোমর জড়াইয়া ধরিল।

বৃদ্ধ অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না রে না—দেখছিস্ নে, কাঠ চেরা হচ্ছে···

বালক আশ্বস্ত হইল। তাহার ভয় করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কতদিনই ত তাহার বাবার সহিত আর এই দাদা-মশায়ের সহিত কলহ হইয়াছে, অবশেষে মারামারিও ঘটিয়াছে। ওপাশ হইতে তাহার বাবা বুড়া জ্যাঠাকে নিকাশ করিবার অভিপ্রায়ে লাঠিসোঁটা লইয়া বাহির হইয়া আসিত—এপাশ হইতে বৃদ্ধ দাদামশাই ভাইপোকে যমালয়ে পাঠাইবার অভিপ্রায়ে ঠিক এই কুঠারটা লইয়াই বাহির হইয়া আসিত।

বলরাম সবিস্ময়ে বলিল—এই এত কাঠ তুমিই চিরেছ নাকি দাদামশাই?

—তবে কি তোর বাবা চিরে দিয়ে গেল নাকি?

—কই বাবা ত কাঠ চিরে না!

—তোর বাপের পয়সা কত?—মহেন্দ্র কুণ্ডু অপমানিত হইয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল।

—কত হবে দাদামশাই? বৃদ্ধ দাদামশায়ের নিকট হইতে গল্প শুনিয়া শুনিয়া বালকের ধারণা অদ্ভুত হইয়াছে। প্রায় পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বে তাহাদের যখন একান্নবর্ত্তী সংসার ছিল, তখন তাহারা নাকি দুই তিন জালা যখের ধন পাইয়াছিল—এইরূপ প্রবাদ। সেই টাকা লইয়াই নাকি তাহারা এত বড় জমিদার। বালক এই সব শুনিয়া শুনিয়া অন্তরে এই ধারণা পোষণ করিয়াছে যে তাহার অন্তত একটা জালা তাহার পিতার কাছে নিশ্চয়ই আছে। দাদামশায়ের কাছেও যে কিছু নাই এমন নয়—সেই চোরা কুঠরিটার ভিতরে কিছু আছেই।

বালক চুপ করিয়া বসিয়া মহেন্দ্র কুণ্ডুর কাঠচেরা দেখিতে লাগিল। বৃদ্ধ গলদঘর্ম্ম হইয়া এক-একবার কুঠারটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কপালের ঘাম মুছিতেছিল। বলরাম তাহা দেখিয়া বলিল—দাদামশাই, বাইরে যাও না কেন? গায়ে বাতাস লাগ্‌ত।···

—হ্যাঁরে শালা শত্তুর—গায়ে বুঝি রোদ লাগবে না?

—কিন্তু এদিকে পাকা সানটা যে ফেটে গেল।

—তা যাক···বলে ঘরকে ঘর পড়ে যাচ্ছে, মেরামত করতে পারছি নে তার আবার সান—! মহেন্দ্র কুণ্ডু উঠিয়া পড়িয়া আবার কাঠ চিরিতে লাগিল।

এই ঘরের ভিতরে কাঠ চিরিবার একটা কারণ আছে। বাহিরে সকলের সাম্‌নে প্রবলপ্রতাপান্বিত গজেন্দ্র কুণ্ডুর বংশধর মহী কুণ্ডু কাঠ চিরিবে—এ হইতেই পারে না!

বলরাম বলিল—অন্ধকারে তুমি দেখতে পাচ্ছ দাদামশাই? পায়ের উপর কুড়ুল প'ড়ে যাবে যে!

—না না, তুই সর্ দেখি। বলে আমার যে চোখের জোর তোর বাপেরও তা নেই। বলিয়া বৃদ্ধ একটা কাঠ ঠাহর করিয়া কোপ বসাইল।

—লোক ডেকে ত কাঠ চেরাতে পারতে দাদামশাই?

—সে তোর বাপ পারে। কেন, আমার গায়ে কি জোর নেই?···

—তোমার কষ্ট হচ্ছে ত দাদামশাই?

—ছাই হচ্ছে। একে আবার কষ্ট বলে নাকি? তোর বাপের মত ত আর হিঞ্চেশাক খেয়ে জোর করি নি! আমাদের সময়ে দস্তুরমত ঘি-দুধ ছিল—আর মাছ? ওই কুমীরমারির খালে কি মাছটাই না উঠত! এখন একটা চাঁদামাছেরও মুখ দেখ্‌তে পাস্ নে। তোরা ত এখন দুধ বিক্রী ক'রে পচা চিংড়ী খাস্।

বলরাম বলিল—বাবার গায়েও খুব জোর দাদামশাই। এই সেদিন ঢেঁকিটা একাই তুলে বসালে—লোক ডাক্‌তে আর হ'ল না।

—তা নয় রে শালা—পয়সা নেই, তাই লোক ডাক্‌তে পারে নি। দায়ে পড়লে সব ক'রতে হয়। কই দিক দেখি তোর বাপ এই গাছের গুঁড়িটাকে নাড়িয়ে! হুঁ, তবে ব'লব জোর। এই আমি বুড়ো হয়েছি কিন্তু এখনও তোর বাপের কব্জি চেপে ভেঙে দিতে পারি—জানিস? এই গায়ে

এখনও জোর আছে। বুড়া বক্ষ স্ফীত করিয়া দাঁড়াইল। বলরাম সবিস্ময়ে একবার আগাগোড়া বৃদ্ধকে চোখ বুলাইয়া দেখিল। শিশুমনে ভাবিতে চেষ্টা করিল, এই লম্বাচওড়া বৃদ্ধটির আগে কত জোর ছিল এবং কি রকম চেহারা ছিল।

প্রকৃতপক্ষে যৌবনে বৃদ্ধের দেহে অসীম শক্তি ছিল। বর্তমানের জরা-জীর্ণ দীর্ঘাঙ্গ গৌরবর্ণ দেহটার দিকে তাকাইলে যৌবনে সে যে সুপুরুষ এবং বলিষ্ঠ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

. বৃদ্ধ কুঠার ফেলিয়া বলরামের নিকট আসিয়া বসিল। মহী কুণ্ডু যৌবনের স্বপ্নে শত্রু-মিত্র সমস্ত ভুলিয়া গেল। তাহাদের বংশে কেহ কখনও যে দুর্ব্বল ছিল না এই স্পর্দ্ধা বুড়াকে মাতাইয়া দিল। বলিতে লাগিল—তোর বাপের গায়েও কম জোর নয়। এই ত ক-বছর আগে বড় বাঁধের উপরে সে যে তাগদটা দেখিয়েছে—বাপ রে, বাঘের মত একাই এক রকম সব লেঠেলের সঙ্গে লড়েছে। তবে একা আর কত পারবে?···

বৃদ্ধ বালক-শ্রোতাকে যৌবনের কাহিনী বলিতে লাগিল—ওই যেখানে গাছের গুঁড়িটা প'ড়ে আছে, ওইখানে তোর ঠাকুদ্দা, আর ওই যে কুড়ুলটা—ওইখানে স্বরূপ-লেঠেল আর আমি যেন এইখানে। ঠকাঠক্··লাঠির উপরে লাঠি, স্বরূপ-লেঠেল ঘায়েল হ'ল—সবাই পেছিয়ে পড়েছে। তার পর···আমার লাঠিটা দেখেছিস ত? শোবার ঘরে ঝুলান আছে যেটা, সেটা ছিল আমার হাতে। ছুটে না গিয়ে দিলাম তোর ঠাকুর্দ্দার মাথায় এক ঘা বসিয়ে। বাস্···সেই যে উল্‌টিয়ে পড়ল আর উঠল না। এক ঘায়েই খতম।

বলরাম বিস্ফারিত নয়নে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে শুনিতে বলিল—তার পর?···

—তার পর আবার কি—মামলা। পর-পর ত লেগেই আছে।

বৃদ্ধ মহী কুণ্ডুর মনটা সেদিন অত্যন্ত খারাপ ছিল। সকালে এজমালি গাছের কয়েকটা ডাব লইয়া বিশ্রী একটা কলহ হইয়া গিয়াছে। সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র অনেক কিছু বলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে বিশেষ কিছুই বলিয়া উঠিতে পারে নাই। কিছুই যে বলে নাই এমন নয়, কিন্তু বলার চেয়ে বেশী কথাই সে শুনিয়াছে। এখন কোন্ উপায় অবলম্বনে আঘাতটা সুদে-আসলে ফিরাইয়া দেওয়া যায় তাহাই সে তামাক টানিতে টানিতে ভাবিতেছিল। মানহানির মোকদ্দমা করিবে, কি আর কিছু করিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

বলরাম বড় নিরাশ হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। কাল সে সংবাদ পাইয়াছে—বৃত্তি লাভ করিয়া সে মাইনর পাস করিয়াছে। পড়িবার ইচ্ছা প্রবল থাকায় পিতার নিকটে দরবার করিতে গিয়াছিল, কিন্তু পিতা হাঁকাইয়া দিয়াছে—আর পড়িবার প্রয়োজন নাই।

বলরাম সসঙ্কোচে ডাকিল—দাদামশাই!···আমি পাস ক'রেছি আর···আর পাঁচ টাকা বৃত্তি···

—সত্যি? স'রে আয়, স'রে আয়—দেখ্‌লি ত আমার কথার ঠিক আছে কি না? বেঁচেবত্তে থাক ভাই। আরও ঐরকম পাসটাস কর—বংশের নাম রাখবি···

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল—কেন তার বাপের কি? সে কুলাঙ্গার মানা করবার কে?—তুই পড়। দেখ্‌লি ত আজ সকালের কাণ্ডটা? জ্যাঠামশায় ব'লে একটু রেয়াদ ক'রে কথা কইলে সে! আমি শাপ দিচ্ছি, তোর বাপ মরবে··· মরবে, ঠিক মরবে। তুই পড়···আমি টাকা দেবো।

—ইস্কুলে ভর্ত্তি হবো তাহ'লে দাদামশায়?

—আলবৎ হবি। সে বাধা দেবার কে? মারপিট যদি করে—আমার কাছে আসিস্। দেবো ফৌজদারী রুজু ক'রে। মহী কুণ্ডু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া বলিল—দেবো বাছাধনকে ঘানিতে জুড়ে—নইলে আমার নাম মহী কুণ্ডু নয়। বংশের ভিতরে একটা ছেলে, তাও আবার মুখ্যু ক'রে রাখবে। আর একটা যে আছে সেটা মরবে কি বাঁচবে তার ঠিক নেই!—তুই পড়। চিরদিন শত্রুতা ক'রে আসছে, তার স্বভাব ঐরকম··· আমি টাকা দেবো, তুই পড়। মহীকুণ্ডু খড়মের শব্দ তুলিয়া পূজার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বলরাম শহর হইতে ছ-মাস পরে ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধ দাদামশায়ের কাছে আসিয়া শহরে সে কি কি নূতন জিনিষ দেখিয়া আসিয়াছে তাহাই গল্প করিতেছিল।

বৃদ্ধ তার কথার স্রোতের মাঝখানে বলিল—থাম বলা,

বলে কতবার শহর থেকে ঘুরে এলাম—তুই আমাকে নতুন কি শেখাবি? কতবার যে মোকদ্দমা করতে যেতে হয়েছে তার ঠিক নেই। হ্যাঁ রে···তোর বাপ জানে তোকে আমি টাকা দিই?

—না ত!···

—বেশ ভাই, খবরদার বলিস্ নে। তা হ'লে আমার অপমান হবে বুঝলি?

—কিসের অপমান দাদামশাই?

—সে তুই বুঝবি নে। তার পর···হ্যাঁ রে, শহরে গিয়ে লেখাপড়া করেছিলি না লক্কা পায়রার মত ওই সব ঘুরে ঘুরে দেখেছিস? দ্যাখ্ দাদা, ভাল ক'রে পড়াশোনা করিস কিন্তু···নইলে টাকা দেবো না আমি। তোর বাপ ত এই রকম···আমাকে ত মানেই না। শুনিস ত—কি রকম কথাগুলো বলে। লেখাপড়া করবি—মানুষ হবি—যত টাকা লাগে আমি দেবো···

হঠাৎ বৃদ্ধ উত্তেজিত হইয়া হুঁকা-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলরামের দিকে তর্জ্জনী নাড়িয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—ফের শালা তুই যদি এদিক মাড়াবি। শালা শত্তুর, ঘর ভাঙা বিভীষণ···বেরো শালা, বেরো এক্ষুনি তুই। আর যদি তুই আমার সীমানায় আসিস ত ঠ্যাং ভেঙে দেবো। ওঠ বলছি দুয়োর থেকে···বৃদ্ধ বলরামকে ঠেলিয়া প্রাঙ্গণ হইতে নামাইয়া দিল।

বিমূঢ় বিস্মিত বলরাম নামিয়া আসিল। বলরাম বুঝিতে পারে না—বৃদ্ধ এমন করে কেন! কত দিন যে এই রকম হইয়াছে তার ঠিক নাই। বৃদ্ধ তাহাকে খুব বেশী ভালবাসে। বেশ হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে, কিন্তু হঠাৎ যদি তাহার বাবাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে এই রকম চীৎকার করিয়া গালাগালি দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। অভিমানে সে আর আসে না, কিন্তু কয়েক দিন পরে হয়ত বৃদ্ধ এমনি তাহার আদরের মাত্রাটা বাড়াইয়া দেয় যে নিজেই সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। কত দিন বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে—কেন এরকম সে হয়?—কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

যোগেশ কুণ্ডু ছাতা বগলে চাপিয়া কোথা হইতে আসিতেছিল—বৃদ্ধের এই গালাগালিতে অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বিস্মিত বলরামের কান ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল। বৃদ্ধ মহেন্দ্র তখন ঘরের ভিতরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—যগো কুণ্ডুর ছেলে—সে আবার কত হবে। কুপুত্তুর, কুপুত্তুর···কেমন বাপের ব্যাটা, আসুক দেখি আর একবার আমার সীমানায়—ফৌজদারী আসামী ক'রে না যদি জেল খাটাই তবে আমার নাম মহী কুণ্ডু নয়।

বলরাম শহরে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ সেদিন তাহাকে পত্র দিয়াছে যে সেদিন সে খেয়ালের মাথায় তাহাকে গালাগালি দিয়াছিল। টাকা সে নিয়মিত যেমন পাইতেছিল তেমনি পাইবে; চিন্তার কোন কারণ নাই।

মহেন্দ্র কুণ্ডুর আশ্রয়ে থাকিয়া এক পিতৃ-মাতৃহারা বালক পালিত হইতেছিল। বৃদ্ধ বহু দিন হইতেই ভাবিতেছিল, এই যে ছেলেটি—যাহার কেহ কোথাও আপন বলিতে নাই, তাহাকে পোষ্য লওয়া সম্ভব কি না। বিষয়আশয় যাহা-কিছু আছে সেটা হয়ত রক্ষা পাইবে। তাহার নামটাও রক্ষা হইবে, ছোট তরফের বংশধর বলরাম বিষয় পাইলে তাহার এত দিনের উঁচু মাথাটা কেবল নামিয়াই যাইবে। মহী কুণ্ডু ঠিক করিয়াছিল—ফটিককে সে পোষ্যই লইবে। কিন্তু, কেন কি জানি, বলরামের কথা স্মরণ করিয়াই হোক কি আর অন্য যে কারণেই হোক—সেটা আপাতত বন্ধ রহিয়া গেল।

ফটিককে লইয়া সেদিন বৃদ্ধ যাতায়াতের রাস্তাটার উপরে বেড়া দিতেছিল। কারণ গোটা রাস্তাটা আপাতত তাহার নামেই আছে। যোগেশ কুণ্ডু এত সব জানিত না যে বৃদ্ধ ভিতরে ভিতরে এই সব কাণ্ড করিয়াছে। সে লাঠি-সোঁটা লইয়া ছুটিয়া আসিল। চীৎকার করিয়া প্রচার করিতে লাগিল যে যাহার তিন কাল গিয়া এক কাল ঠেকিয়াছে তাহার এতখানি জুয়াচুরি আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। ভগবান কোন দিনই তাহার ভাল করিবেন না।

মহী কুণ্ডু ফটিককে লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে বেড়া দিয়া যাইতে লাগিল। যোগেশ আর সহ্য করিতে পারিল না। তাল ঠুকিয়া লাঠি বাগাইয়া একটানে সব উপড়াইয়া ফেলিল। ছেলেটার কান ধরিয়া পেটে একটা লাঠির গুঁতা দিয়া বলিল—নবাবপুত্তুর বাপের জায়গায় বেড়া দিচ্ছে!—ভাগে হিঁয়াসে···

মহী কুণ্ডু রুখিয়া দাঁড়াইল—তবে এটা তোর বাপের জায়গা নাকি? খবরদার বল্‌ছি ওর গায়ে হাত দিস্ নে··· আমিনের কাছে রেকর্ড দেখে আয় আগে কার নামে এ রাস্তা।

—তবে তোমারই এ কাণ্ড! জোচ্চোর···ছোটলোক···

মারামারিটা আর হইল না। মহেন্দ্র কুণ্ডু সোজা থানায় গিয়া ডায়েরী করিয়া আসিল যে যোগেশ বাড়ি-চড়াও হইয়া মারামারি করিয়া গিয়াছে। এদিকে যোগেশ পুরানো কাগজ-পত্র লইয়া আদালতের দিকে নালিশ করিতে রওনা হইল।

মহেন্দ্র কুণ্ডু বিষম চিন্তায় পড়িল। আজ খবর পাইয়াছে যে যোগেশ মোকদ্দমা জিতিয়া আসিয়াছে। আসুক—ক্ষতি নাই, আপীল চলিবে কিন্তু টাকার যে টানাটানি! কিন্তু তবু আপীল করিতেই হইবে। শত্রুর সঙ্গে পাল্লা দিয়া তাহাদের বংশে কেহ কখনও হারে নাই—সে-ই বা হারিবে কেন? ব্রাহ্মণকে দিন দিন চালকলা দিতে হয় বলিয়া গৃহদেবতাকে ব্রাহ্মণের ঘরে রাখিয়া আসিল। বিদায় দেওয়ার সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া বার-বার মাথা খুঁড়িয়া বলিতে লাগিল, ঠাকুর অপরাধ নিয়ো না—সুদিন হ'লে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌ব। ঘরের সোনা গাইয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল, খরচ দিয়ে আর ত তোকে রাখতে পারি নে মা, যেখানে যত্ন পাবি সেইখানে যা। নির্ব্বোধ পশু ব্যাপারী দেখিয়া সেই যে শুইয়া পড়িয়াছিল কিছুতেই খাড়া হইয়া দাঁড়াইল না। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত বিদায়ই তাহাকে লইতে হইল।

গরু বিক্রী করিয়া ঘটী-বাটি বন্ধক দিয়া কোন রকমে আপীল করিবার টাকা জোগাড় হইল, কিন্তু বলরাম হঠাৎ শহর হইতে ফিরিয়া আসিয়া গণ্ডগোল বাধাইল। বলিল—দাদা-মশাই—আমার পরীক্ষার ফীর টাকা জমা দিতে হবে।

—ফী আবার কি!

-হাঁ দিতে হয়, না হ'লে পরীক্ষা দিতে দেবে না।

—এখন আমি টাকা দিতে পারব না—যা···

—বা রে! তাহ'লে কি আমি পরীক্ষা দেবো না নাকি! টাকা যে দিতেই হবে!

—মানে? জোর ক'রে টাকা নিবি না কি! আমি দেবো না—সোজা কথা। শত্রুকে আবার টাকা কিসের!

—ফীর টাকা যে দিতেই হবে দাদু, নইলে···

—পারব না বললুম যে একবার! তবু বলবি চাই? শালারা এই সময়ে যত ঝামেলা করবে। না পরীক্ষা দিতে পারলে ত বয়ে গেল বড়। তোর বাপের কাছ থেকে টাকা নিগে যা। শালারা এদিকে আমার সর্ব্বনাশ ক'রবে—ওদিকে আবার টাকা চাই। পারব না আমি দিতে।

—টাকা যে দিতেই হবে দাদামশাই!

—পারব না, পারব না—এক-শ বার বলছি পারব না। বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল, তোর বাপ ক'রবে মোকদ্দমা—ছেলে আসবে টাকা চাইতে! আমি টাকা না দিলে ওর পরীক্ষা হবে না। সব শালা জোচ্চোর—ঠগ্। নিগে যা শালা—নিগে যা, আমাকে তোরা বাপ-বেটায় মিলে না ডুবিয়ে ছাড়বি নে। টাকা তোর এই সময়েই যত দরকার—তবে নে। যেমন বাপ তার তেমনি ব্যাটা···নে সব, আর দে এখানে ছুরি চালিয়ে। বৃদ্ধ গলা বাড়াইয়া দিল। অবশেষে আপীলের সমস্ত টাকাকড়ি ছড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মহী কুণ্ডু খবর পাইল, বলরামের অসুখ করিয়াছে—খুব শক্ত অসুখ নাকি। ওপাশের দিকে যাইতে পারে না, সমস্ত ক্ষণ উৎসুক হইয়া থাকে—বলরাম এখন কেমন আছে! টাকাগুলা মিথ্যাই গেল—এ অসুখে নাকি পরীক্ষা দিতে পারে! বুড়া বিড় বিড় করে, আহা—ভগবান বাঁচিয়ে রাখুন। তামাক টানিতে টানিতে ফটিককে শোনাইয়া শোনাইয়া বলে, ছেলেটাকে মেরে ফেল্‌বে—আমি ব'লে দিলুম। মহী কুণ্ডুর কথার নড়চড় নেই -ওষুধপত্র দেয় না, হবে না!

—কে বললে বাবা—ডাক্তার ত রোজ আসে?

বুড়া আগ্রহসহকারে বলিল—ডাক্তার রোজ আসে? কোন্ ডাক্তার রে—নিবারণ নাকি! তার সঙ্গে আমার যে একটু দরকার রে···কখন আসে?

—এই ত এক্ষুনি গেল।

—এক্ষুনি গেল! কই আমাকে বলিস্ নি ত। বুড়া উঠিয়া পড়িল। লাঠিহাতে রাস্তার দিকে ছুটিল। বহুদূরে আসিয়া ডাক্তারের নাগাল পাইল। চারিদিকে একবার দেখিয়া লইয়া বলিল—এঁ্যা নিবারণ, বলরামের অসুখ এখন কেমন?

—ভাল নয় কুণ্ডুমশাই।

—বাঁচবে ত?

—আশা কম—ডবল নিমুনিয়া। তবে যদি বড় ডাক্তার আনায়···

—আনায় না কেন তবে? ছেলেটাকে মেরে ফেলবে তা ব'লে!

—টাকা কোথায় পাবে কুণ্ডুমশাই, বলে একটু ফলের রস দিতে পারে না তার আবার···

—কেন? আচ্ছা ধর, আমি যদি দিই তবে তুমি আনিয়ে দিতে পার না?

—আপনি দেবেন!

—কেন দেবো না—আলবৎ দেবো, কুণ্ডু-বংশে টাকা নেই না কি! কিন্তু খবরদার বাবা নিবারণ, আমি দিয়েছি ব'লে যগোর কাছে ব'লো না যেন। আচ্ছা হাঁ্যা নিবারণ—বলরাম আমার নাম-টাম করে না?

—বিস্ময়াবিষ্ট নিবারণ অন্যমনস্ক ভাবে হুঁ দিয়া চলিয়া গেল।

বুড়ার তবু আশঙ্কা কাটিল না। বলরামকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে জানালার ধারে উঁকি মারিল। ঘরে তখন কেহ ছিল না—বলরাম একা শুইয়া আছে। বৃদ্ধ মৃদু কণ্ঠে ডাকিল—বলরাম, এখন কেমন আছিস্ দাদা?

নির্জ্জীব বলরাম কোন উত্তর দিল না। বুড়া আবার ডাকিল—ও বলরাম!···

হঠাৎ এই সময়ে বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া সশঙ্ক কণ্ঠে কে বলিল—কে ওখানে দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ খড়ম-জোড়া ফেলিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে নিজের ঘরের দিকে ছুট দিল। যোগেশ চোর চোর বলিয়া বুড়ার ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। মহী কুণ্ডু তখন ঘরের ভিতরে চীৎকার করিতে সুরু করিয়াছে যে তাহার খড়ম-জোড়া যে চুরি করিয়াছে তাহার ছেলের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কে চোর—কাল সকালেই দেখা যাইবে। আজ সে ঠাকুরঘরে মানত করিয়া রাখিল—ইত্যাদি।

ভোরের সময়ে শহর হইতে লোক আসিয়া খবর দিল—মহেন্দ্র কুণ্ডু আপীলে জয়লাভ করিয়াছে। বৃদ্ধ তোড়জোড় করিয়া রাস্তা বন্ধ করিবার জন্য বাঁশ কাটিতে লাগিয়া গেল। ওপাশের যোগেশ ভাবিল, বলরাম সারিয়া উঠুক—তখন দেখা যাইবে। বড় বাঁধটা লইয়া আর এক তরফা জুড়িয়া দিব।

করুণ একটা ক্রন্দনের শব্দে মহী কুণ্ডু গভীর রাত্রে সশঙ্কিত হইয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিল। ওপাশের সীমার মধ্যে পা দিতে কুণ্ঠা বোধ করিল। নিজের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কিসের যেন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিছু ক্ষণ পরে বলরামের শবদেহ লইয়া তাহার সম্মুখ দিয়াই তাহারই বিজিত অংশের পথ দিয়া কয়েক জন চলিয়া গেল। মহী কুণ্ডু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—লাঠি লইয়া আজ আর ছুটিয়া আসিল না। বলরামের শব অদৃশ্য হইয়া গেল। মহী কুণ্ডু গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া মন্দিরের ভিতরে ঢুকিল। গৃহদেবতা মন্দিরে ছিল না। তবু বেদীটার উপরে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে কাতর কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—ঠাকুর এ ত আমি চাই নি—তবে কেন এমন হ'ল দেবতা?

তখন যথেষ্ট বেলা হইয়াছে। মহী কুণ্ডু শূন্য বেদীর উপরে মাথা ঠুকিয়া ঘুমাইতেছিল—রোদের তীব্রতায় উঠিয়া বসিল। বিগত রজনীর কথা স্মরণ হইতে লোলচক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। বলরাম আর নাই—কোন ছলেই সে আসিবে না। বৃদ্ধ চক্ষু মুছিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিতেই আপীলে-জয়-করা রাস্তাটার দিকে নজর পড়িল।

ফটিক তখন সেই রাস্তাটার উপরেই যোগেশের কঙ্কালসার কনিষ্ঠ সন্তানের সহিত কলহ করিতেছিল। খেলিতে খেলিতে তাহাদের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে। ফটিক যোগেশ কুণ্ডুর ছেলেকে গলা ধাক্কা দিয়া বলিতেছে—বেরো তুই আমাদের জায়গা থেকে। এ ত আমাদের রাস্তা—হাঁটিস না একবার এই রাস্তা দিয়ে! ঠ্যাং যদি না ভেঙে দিই তবে···মহী কুণ্ডুর ছেলে আমি নই।

ছেলেটা বলিতেছে—দেবো ইট ছুঁকে। পোষ্য পুত্তুর শ্···মহী কুণ্ডুকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া ছেলেটা ভয়ে ছুটিয়া পলাইল।

খলিফা আবদুল্লা অল্‌-মামুন

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

১

মুসলমান-জগতে যে-সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, খলিফা হারুণ-অল-রশিদের জ্যেষ্ঠপুত্র মামুন তাঁহাদের অন্যতম। ইতিহাসে তিনি মুসলমান যুক্তিবাদিগণের অগ্রণী বলিয়া প্রসিদ্ধ। মামুনের চিন্তাধারার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা আধুনিক সমাজে প্রশংসনীয় হইলেও সেকালের মুসলমান জনসাধারণ ও ইমামদের কাছে মনে হইত ধর্মে স্বেচ্ছাচার, চিন্তার দুর্ব্বলতা ও শাশ্বত সত্যের অবমাননা। মামুন আমাদের আকবর কিংবা দারাশুকো নহেন। কিন্তু উভয়ের দোষ-গুণ দু-ই তাঁহার মধ্যে ছিল। মোটামুটি বলিতে পারা যায় ভারতবর্ষে যেমন দ্বিতীয় আকবর জন্মগ্রহণ করেন নাই, ভারতবর্ষের বাহিরে দ্বিতীয় মামুন আবির্ভূত হয় নাই। শাসকের আসনে বসিয়া ইঁহারা মুসলমান রাষ্ট্র ও সংস্কৃতিকে এক নূতন রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন যাহা সনাতনপন্থী মুসলমান বিংশ শতাব্দীতেও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে পারে নাই; তাঁহারা ভবভূতির মত "কালোহয়ম্‌ নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী"—এই সান্ত্বনা লইয়াই সমাজের নিন্দা ও অপবাদকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কাল যদি কোন দিন জ্ঞানের সংস্কার-বন্ধন ছিন্ন করে, আচারের মরু-বালুকা-রাশিকে যুগান্তকারী ভাবের ঝঞ্ঝায় অপসারিত করিয়া বিচার-বুদ্ধিকে মুক্ত করে, তখনই আকবর ও মামুনের প্রতি মানব-সমাজ সুবিচার করিতে পারিবে। কাল-ধর্ম্ম লঙ্ঘন না করিলে মানুষ প্রাকৃত-জনের উর্দ্ধে স্থান পায় না; অথচ কালধর্ম্মের বিরোধিতা সমাজের উপর কখনও কখনও নিন্দনীয় অত্যাচার। আকবর ও মামুন ছিলেন অপ্রতিহত-প্রভাব স্বেচ্ছাচারী সম্রাট; সাম্য ও সত্ত্বের উপাসক হইলেও স্বভাবতঃ রজোগুণী। ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে তাঁহাদের অহিংস-নীতি ও যুক্তিবাদ যেখানে বাধা পাইয়াছে সেখানেই তাঁহারা শাসকের স্বমূর্ত্তি ধরিয়াছেন। যাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে সর্ব্বধর্ম্মের প্রতিপোষক ছিলেন, পরমতসহিষ্ণুতা যাঁহাদের চরিত্রকে মহনীয় করিয়াছিল, দেখা যায় তাঁহারা দু-জনেই তাঁহাদের কুলধর্ম্ম ইস্‌লাম ও তদানীন্তন মুসলমান-সমাজের প্রতি কোন কোন বিষয়ে অবিচারও করিয়াছেন। ইহাই আকবর ও মামুন চরিত্রের কলঙ্ক।

খলিফা মামুনের রাজত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণা বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন পুস্তকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। মৌলানা শিবলী নুমানী অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অপরিসীম সহৃদয়তার সহিত মামুনের জীবন-চরিত উর্দ্দু 'অল্‌-মামুন' গ্রন্থে সমালোচনা করিয়াছেন। ব্রকম্যান্‌ সাহেব কৃত সুয়ুতীর 'তারিখ-উল্‌-খোলাফা'র ইংরেজী অনুবাদে মামুনের চরিত্র ও রাজত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। মোটামুটি এই দুখানা পুস্তক অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত।

২

১৭০ হিজরীর প্রথম রবিউল মাসের মাঝামাঝি সময় (৭৮৬ খ্রীঃ)। হারুণ তখনও খলিফা হন নাই। তাঁহার ভাগ্যাকাশ নিরাশা ও আশঙ্কার ঘটায় সমাচ্ছন্ন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাদি তাঁহার উত্তরাধিকারিত্বের দাবি উচ্ছেদ করিয়া জীবন-নাশের সঙ্কল্প মনে মনে পোষণ করিতেছেন। শাহ্‌জাদা হইয়া যাহার শাহী-তক্তে বসিবার দাবি নাই, তাহার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারও নাই। তিনি সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন; প্রেমোদ্যানে তখনও কুসুমোদ্গম হয় নাই। এই মাসের ১৬ তারিখ শুক্রবার রাত্রিতে চিন্তাক্লিষ্ট হারুণ বিছানায় শুইয়া আছেন; এমন সময় উজীর-ই-আজম্‌ ইয়াহা বরমকী আসিয়া তাঁহাকে দুটি সুখবর দিলেন—হাদি মারা গিয়াছেন; তিনি খেলাফতের মালিক। ঘটনা এমনই অপ্রত্যাশিত যে হারুণ সহসা ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। হাদি ও হারুণের মাতা ক্ষমতালোলুপ সম্রাজ্ঞী খাইজুরাণের চক্রান্তে সেই রাত্রেই হাদির বিলাস-সঙ্গিনীগণ তাঁহাকে বিছানায় শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল।

হারুণ ইহার কিছুই জানিতেন না। হারুণ নিজ সৌভাগ্যের কথা ভাবিতেছেন এমনই সময়ে হারেমের খোজা আসিয়া তৃতীয় সংবাদ নিবেদন করিল—তাঁহার উত্তরাধিকারী ভূমিষ্ঠ; খোরাসানী ক্রীতদাসী মরাজিল একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছে। হারুণ পুত্রের নাম রাখিলেন আবদুল্লা। মরাজিল পুত্র প্রসব করিবার অল্প সময়ের মধ্যে মারা যান; মামুন মাতৃহারা হইলেও পিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন নাই।

৩

পাঁচ বৎসর বয়সে মামুন কোরাণ-শরীফ্ পাঠ আরম্ভ করেন। স্বনামখ্যাত আরবী ব্যাকরণবেত্তা কিসাই নহ্বী মামুনকে কোরাণের পাঠ দিতেন। ইহা ছাড়া মৌলনা ইজিদী ছিলেন মামুনের আতালিক (guardian tutor)। তাঁহার উপর ভার ছিল শুধু পড়ান নয়, বালকের চাল-চলন আদব-কায়দা দুরস্ত করা। একদিন ইজিদী পড়ার ঘরে উপস্থিত হইয়াছেন; মামুন তখনও অন্দরমহলে। গোলামেরা সুবিধা পাইয়া ইজিদীকে বলিল আপনি যখন থাকেন না, সাহেবজাদা সকলের উপর বড় জুলুম করেন। শাহজাদা হইলেও মাষ্টারের হাত হইতেও নিস্তার ছিল না। মামুন হাজির হইলেই ইজিদী তাহাকে পাঁচ-সাত ঘা বেত বসাইয়া দিলেন। এমন সময় চাকর খবর দিল খলিফা হারুণের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রধান মন্ত্রী জাফর বরমকী শাহ্জাদার সহিত দেখা করিতে চান। মামুন তৎক্ষণাৎ চোখের জল মুছিয়া নিজের ফরাসের উপর বহি খুলিয়া বসিল; যেন কিছু ঘটে নাই। উজীর ভিতরে আসিয়া শাহজাদার সঙ্গে অনেক ক্ষণ নানা কথা বলিলেন। এদিকে ইজিদীর প্রাণটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। উজীর চলিয়া যাওয়ার পর আশ্চর্য্য হইয়া তিনি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি বেত-মারার কথা বলিলে না? মামুন বলিলেন, আপনার শাসন আমার পক্ষে কত উপকার-জনক তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? ইজিদীর শিক্ষায় মামুন অল্প বয়সে অসাধারণ বক্তা ও তর্ককুশল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইজিদীর পুত্র মহম্মদের কাছে মামুন ফেকা বা মুসলমান-ব্যবহারশাস্ত্র পড়িয়া উহা সম্যক আয়ত্ত করেন। ইহার পর তিনি হদিস্ বা হজরত-কথামৃত (যাহাকে ইসলামীয় স্মৃতিশাস্ত্র বলা যাইতে পারে) পাঠে মনোযোগী হইলেন।

সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হদিস্-বেত্তা (মুহাদ্দিস্) ছিলেন কুফাবাসী মালিক ইবন্ আনিস্। হারুণ তাঁহার কাছে লিখিলেন—তিনি বোগদাদে পদার্পণ করিয়া শাহ্জাদা মামুন ও আমীনকে হদিস্ শিক্ষা দিলে খলিফা অনুগৃহীত হইবেন। জ্ঞান-গর্ব্বিত, নির্ভীক, নির্লোভ পণ্ডিত প্রত্যুত্তরে খলিফাকে জানাইলেন, বিদ্যা লোকের কাছে উপযাচক হইয়া উপস্থিত হয় না; মানুষই বিদ্যার কাছে যায়। দারিদ্র্যে অমলিন পাণ্ডিত্যের স্পর্দ্ধার নিকট হারুণের সাম্রাজ্যগর্ব্ব স্বেচ্ছায় পরাজয় মানিল। তিনি পুত্রদ্বয়কে মালিকের শিষ্যত্ব-গ্রহণের জন্য কুফায় পাঠাইয়া দিলেন। অসাধারণ মেধাবী ও জ্ঞানপিপাসু মামুন অল্প বয়সে "সর্ব্বশাস্ত্র পারংগম" হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ ইসলামীয় ব্যবহারশাস্ত্র (ফেকা), সাহিত্য, ও আরব জাতির প্রাচীন ইতিবৃত্তে তিনি সে-সময়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সমকক্ষ গণ্য হইতেন।

৪

লোকের চক্ষে প্রতীয়মান হইলেও জগতে প্রকৃত সুখী বোধ হয় কেহ নাই। আরব্যোপন্যাসের নায়ক হারুণও সুখী ছিলেন না। তাঁহার অবস্থা ছিল অনেকটা আমাদের সম্রাট্ শাহ্জাহানের অপেক্ষাও শোচনীয়। আমীনের মাতা সম্রাজ্ঞী জুবেদার চক্রান্তে মিথ্যা সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া হারুণ নিজ রাজত্বের ঊনবিংশ বর্ষে বরমকী-পরিবারকে সমূলে ধ্বংস করিলেন। ঐশ্বর্য্যের ভাঙা হাটে তিনি তখন নিতান্ত একক ও অসহায়; মামুন আমীন প্রভৃতি পুত্রচতুষ্টয়ের কাছে তাঁহার জীবন সুদীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার নৈশপরিক্রমার বিশ্বস্ত সঙ্গী মসরুর মামুনের ও বিশ্বাসী চিকিৎসক গেব্রিয়ল আমীনের গুপ্তচর রূপে তাঁহার শ্বাসবায়ু গণিতেছিল।

ইহার চার বৎসর পরে নৈরাশ্য ও আশঙ্কার আঁধারে হারুণের শেষযাত্রা সমাপ্ত হইল খোরাসানের পথে পারস্তের তুস্ শহরে (২৩শে মার্চ্চ, ৮০৯ খ্রীঃ)।

৫

হারুণ-অল্ রশিদের ইচ্ছা ছিল মামুনকে অখণ্ড সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবেন। কিন্তু নিজ জ্ঞাতিগণের অনুরোধে

তিনি হাশিম-বংশীয়া রাজকুমারী জুবেদার গর্ভজাত পুত্র আমীন কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহাকেই খেলাফতের অধিকার দিয়াছিলেন। তবে ইহাও নির্দ্দেশ ছিল মামুনের পূর্ব্বে যদি আমীন মারা যায়, মামুনই সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিকারী হইবেন। মামুন ১৮২ হিঃ অর্থাৎ ৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে খোরাসানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হারুণের মৃত্যুর পর আমীন খলিফা হইলেন। মামুনকে খোরাসান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে আমীন মামুনকে খোরাসান হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য এক বৃহৎ অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত মামুন নিজ সেনাপতি তাহের খোরাসানীর যুদ্ধকৌশল ও মন্ত্রী ফজল বিন সহলের কূট রাজনীতির বলে জয়ী হইলেন; আরব-বিদ্বেষী তাহের বন্দী আমীনকে মামুনের বিনানুমতিতে হত্যা করিয়া স্বীয় প্রভুর ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করিল।

৬

মামুন ৮১৩ হইতে ৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসর তিনি খোরাসানের রাজধানী মরু নগরে বাস করিতেন। পণ্ডিত ও ভাববিলাসী রাজদণ্ডের অধিকারী হইলে যাহা হয়, মামুনের বিশাল সাম্রাজ্যে তাহাই ঘটিতে লাগিল; সর্ব্বত্র বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলতা—কুফা, মক্কা, মেসোপোটেমিয়া, এমন কি বাগদাদ হইতে তাঁহার শাসন-কর্ত্তারা বিতাড়িত হইল। এই সময় তিনি মন্ত্রী ফজল্ বিন্ সহলের হাতের পুতুলের মত ছিলেন। লোকে বলে রাজধর্ম্মের অভিধানে কৃতজ্ঞতা শব্দ নাই; অন্ততঃ আব্বাসী খলিফাগণের কাছে ইহা অজ্ঞাত ছিল। বিশ্বস্ত আরব-সেনাপতিকে মন্ত্রী ফজলের চক্রান্তে প্রকাশ্য রাজদরবারে হত্যা করা হইল। সুচতুর তাহের ফাঁদে না-পড়ায় রক্ষা পাইল। ইহা ছাড়া মামুন আরও একটি রাজনীতিবিরুদ্ধ কাজ করিয়া বসিলেন। আব্বাসী ইমামেরা শীয়াদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খেলাফৎ অধিকার করিয়াছিলেন। মামুন মনে করিলেন, এ অবিচারের প্রতীকার করা কর্ত্তব্য; ন্যায্যতঃ (শীয়াদের মতে) আলীর বংশধরেরাই খেলাফতের প্রকৃত মালিক। এই ভাবিয়া তিনি পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ আলী-অল্ রেজাকে পোষ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কন্যাদান করিলেন এবং তাঁহার পরে খেলাফৎ উনিই পাইবেন এ হুকুম জারি করিলেন। সুন্নী আরব-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মামুনের পক্ষে ইহা পায়ে কুঠারাঘাত তুল্য। কিছুদিন পরে মামুনের চৈতন্য হইল। ফজল মামুনের ইঙ্গিতে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইল, হঠাৎ আলী-অল্ রেজার মৃত্যু হইল; কেহ কেহ সন্দেহ করেন মামুন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে গোপনে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মামুন বোগদাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং সাম, দান, দণ্ড, ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বত্র নিজের প্রভুত্ব ও শান্তিস্থাপন করিলেন।

৭

আব্বাসী খলিফাগণের রাজত্ব ইস্লামের পররাজ্য-জয়-যাত্রার ইতিহাস নহে। ইহার বৈশিষ্ট্য মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার; ইস্লামের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ভাণ্ডারে অফুরন্ত দান। খলিফা মামুন বিচারবুদ্ধি আপ্ত-বাক্যের নাগপাশ ও সংস্কার মুক্ত না হইলে জ্ঞানরাজ্যজয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এই জন্য মামুন এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইলেন। আব্বাসী-বংশের খেলাফৎ-প্রাপ্তির পর হইতে মুসলমান মোতাজেলা বা যুক্তিবাদী সম্প্রদায় ইস্লামের কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মমত আক্রমণ করিয়া মোল্লা-সম্প্রদায়ের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছিল। খলিফা হারুণের হস্তে ধর্ম্মে-তর্কজাল-বিস্তারকারী জিন্দিক বা বেইমান দার্শনিকের নিস্তার ছিল না। বিশর্-বিন-মারিবশীর কোরাণ সম্বন্ধে মোতাজেলা-মতানুযায়ী টিপ্পনীর কথা হারুণের কাছে পৌঁছাইলে তিনি বলিয়াছিলেন বিশরকে হাতে পাইলেই মাথা লইবেন। কিন্তু হারুণের পুত্র মামুন সেই মোতাজেলা-মত নিজে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট রহিলেন না। তাঁহার রাজ-শক্তির সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সমস্ত মুসলমানকে মোতাজেলাবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, কোরাণের ও খোদাতালার সম্বন্ধ, হজরত রসুলাল্লার সশরীরে খোদাতালার সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন (মিহ্‌রাজ-ই-জিস্‌মানী) এবং কিয়ামতের (প্রলয়) দিন মুসলমানের সৃষ্টিকর্ত্তার মুখদর্শন—এই কয়টি বিষয়ের ব্যাখ্যা লইয়াই বিশ্বাসবাদী সনাতন মুসলমান-সমাজ ও যুক্তিবাদী মোতাজেলাদের মধ্যে বিরোধ ছিল।

মোতাজেলারা বলেন কোরাণ কদীম অর্থাৎ শাশ্বত—

সৃষ্টিপর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ খোদাতালা আদিতে ছিলেন, অন্তেও এক মাত্র তিনিই থাকিবেন; কোরাণকেও যদি কদীম মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে দুইটি শাশ্বত বস্তুর অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়—ইহা দ্বৈতবাদ (Dualism) যাহা ইস্‌লামের বিরোধী। মুসলমান দর্শনে ইহার কি মীমাংসা আছে জানি না, কিন্তু আর্য্যদর্শন মতে কোরাণকে বলা যায় বেদ ও যাঁহা হইতে এই বেদ নির্গত হইয়াছে তিনিই নাদ-ব্রহ্ম। কোরাণ খোদাতালার সৃষ্ট; অন্তিমে অবিনশ্বর কোরাণ খোদাতালাতেই লয় হইবে—ইহা মানিয়া লওয়া খাঁটি মুসলমান দোষাবহ মনে করে।

আকবর বাদ্‌শা নাকি এক দিন বলিয়াছিলেন মাটি হইতে এক পা উঠাইয়া আমি অন্য পাখানি উঠাইতে পারি না; হজরত মহম্মদ কি করিয়া রাত্রে বিছানা হইতে জেরুসালেম গিয়া সেখান হইতে সশরীরে আসমানে চড়িলেন এবং খোদাতালার সঙ্গে দেখা করিয়া আবার মক্কায় নিজ বাড়িতে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন দরজার কড়া তখনও নড়িতেছে এবং বিছানার লেপখানিও গরম আছে? আকবর স্থূল-জগতের বিজ্ঞানসম্মত কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু হজরত রসুলাল্লার সশরীরে স্বর্গে গমনাগমন অধ্যাত্ম-রাজ্যের ব্যাপার, যেখানে জড়-বিজ্ঞানের নিয়ম খাটে না। যাহা হউক, মামুন আকবরের মত এতটা অবিশ্বাসী ছিলেন না। মোতাজেলারা বলেন, মিহ্‌রাজ ব্যাপারটা মিথ্যা নয়; কিন্তু হজরত স্থূল শরীরে আসমানে উঠেন নাই; ঘটনাটি স্বপ্ন কিংবা ভ্রম নহে। সূক্ষ্ম-শরীরে তিনি সপ্তম স্বর্গে খোদাতালার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন। মোতাজেলারা সে যুগে আধা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়া জনসাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়াছিলেন। মোতাজেলাদের মতে কিয়ামতের দিন ইমান্‌-দারেরা খোদাতালার মুখ পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইবে বটে, কিন্তু এই পৃথিবীর চর্ম্মচক্ষে নয়।

৮

২১৮ হিঃ (৮৩৩ খ্রীঃ) অর্থাৎ নিজ রাজত্বের শেষ বৎসর এক ফতোয়া জারি করিয়া মামুন জোরজবরদস্তি করিয়া অধিকাংশ কাজী ও উলেমাগণকে কোরাণ সৃষ্ট এই কথা স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার এই মত গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে নিছক গালাগালি দ্বারা ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করিলেন। এই সমস্ত উলেমা অনেকটা আকবরের সময়কালীন শেখ্‌ আবদুন্নবী ও মোল্লা আবদুল্লা সুলতানপুরীর ন্যায় ছিলেন। ধর্ম্মের পাণ্ডা হইয়া ধর্ম্মকে ফাঁকি দিতেন।*

মামুন বোগদাদের কোতোয়ালের কাছে লিখিলেন—অমুক ব্যক্তি যদি খলিফার ফতোয়ায় দস্তখত করিতে নারাজ হয়, বলিও সরকারী গোলা হইতে ধান চুরি করায় বোধ হয় তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে; অমুক মিশরে কাজীগিরি করিয়া এক বৎসরে কত টাকা জমাইয়াছে আমীর-উল-মোমিনিন্‌ ভাল রকম জানেন; অমুকের জন্মের ঠিক নাই; আবুনছর খেজুর বিক্রী করে, বুদ্ধিও তাহার তদ্রূপ; সুদ খাইয়া ইবন্‌ নুহ ও ইবন্‌ হাতেমের আকল্‌ ও ইমান্‌ ইহুদীর মত হইয়াছে; মদ্যভাণ্ড বেপারীকে বলিও ঘুষ ও সওগাত লওয়াতেই বুঝা যায় তাহার ইমান্‌ কতখানি ঠিক, ইত্যাদি। যাহা হউক, মোতাজেলা-বাদ খলিফা মামুনের পরবর্ত্তী দুই খলিফার সময় প্রবল ছিল। অবশেষে আওরঙ্গজেব-রূপী খলিফা মোতোয়াক্কেল মোতাজেলাগণকে ধ্বংস করিয়া পুনরায় খাঁটি সনাতন ইস্‌লামকে রাহুমুক্ত করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের স্বাধীন চিন্তা ও অমুসলমানী জ্ঞানচর্চ্চা ও গবেষণার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইল।

৯

ইমাম হিসাবে মামুন মোতাজেলা-মত-বিরোধীদিগকে কঠোর শাসন করিলেও তাঁহার রাজনীতি উদার ছিল, খলিফা হারুণের মত তিনি খ্রীষ্টান প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করেন নাই। ভারতবর্ষে এক মাত্র আকবরের রাজত্বকাল ও ভারতের বাহিরে মামুনের শাসনকালেই মুসলমান-রাজ্যের অমুসলমান প্রজারা ধর্ম্মবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীনতা ভোগ করিত। কিন্তু মামুন আকবরের মত অন্যধর্ম্মাবলম্বিগণকে রাষ্ট্রে সমান অধিকার দেন নাই—ইচ্ছা থাকিলেও দেওয়া অসম্ভব ছিল। প্রাচীন পারস্য-রাজগণের ন্যায় মামুনও বিভিন্ন

* ইহাদের এক জন জাকাৎ (ধর্ম্ম-দান) না দেওয়ার জন্য প্রতি বৎসরের নবম মাসে সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে কবল (বিক্রী) করিয়া আবার নূতন বৎসরের প্রথম মাসে স্ত্রীর নিকট হইতে নিজের নামে কিনিয়া লইতেন।

ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রাধান্য ও অন্য ধর্ম্মে যুক্তিবাদের ত্রুটি প্রমাণ করিবার জন্য তর্ক-সভা আহ্বান করিতেন, আকবরের ইবাদৎখানাও এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। লাহোর ও দিল্লী প্রভৃতি স্থানে আর্য্যসমাজের পণ্ডিত ও জমিয়তেরগণের উলেমাগণের মধ্যে ধর্ম্ম-বিচার ও তর্কযুদ্ধ এই ধারা প্রচলিত রাখিয়াছে। ইহা ভারতবর্ষে নূতন নহে; বুদ্ধদেবের পূর্ব্বকালীন* আর্য্য পরিব্রাজক হইতে চৈতন্যদেব পর্য্যন্ত এই ধারা প্রচলিত ছিল। তবে হিন্দু সমাজ ছাড়া অন্য কোন সমাজে সেই spirit of chivalry দেখা যায় না যেখানে বিচারে অপদস্থ পণ্ডিত দিগ্বিজয়ীর দার্শনিক কিংবা ধর্ম্মমত দ্বিধাশূন্যমনে গ্রহণ করিয়া প্রকৃত যোদ্ধার মত প্রতিপক্ষের সম্মান করিতেন। কথিত আছে, কোন হাশিমী মৌলানা অল-কিন্দী নামক তাহার এক জন নিতান্ত অন্তরঙ্গ খ্রীষ্টান বন্ধুকে পবিত্র ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। উহার উত্তরে অল-কিন্দী ইসলাম-ধর্ম্মের অসারতা প্রমাণ করিয়া আঁধার হইতে আলোকে আনিবার আশায় বন্ধুকে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। অল-কিন্দীর এই পত্র *Apology of Al-Kindy* নামে স্যর উইলিয়ম মিউর ইংরেজীতে প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদকের উদ্দেশ্য বোধ হয় সাধু ছিল না; ইসলাম-বিরোধী খ্রীষ্টান পাদরীদিগের পক্ষে উপযোগী হইবে বলিয়া তিনি এ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এই *Apology*র তুলনায় এইচ. জি. ওয়েলসের হজরত মহম্মদের নিন্দা নিছক গালাগালি মাত্র; ইহাতে অল-কিন্দীর গভীর ইতিহাসজ্ঞান ও যুক্তির প্রখরতা কিছুই নাই। অল-কিন্দীর "ক্ষমাপ্রার্থনা" খলিফা মামুনের ধর্ম্মে সাম্যনীতি ও সে-যুগের মুসলমান সমাজের পরমত-সহিষ্ণুতার পরিচায়ক। আপাতদৃষ্টিতে ইহা ইসলামের গৌরব-ললাটে কলঙ্ক-রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ এই হলাহল কণ্ঠে ধারণ করিয়া ইসলাম দেবাদিদেব নীলকণ্ঠের ন্যায় গৌরবমণ্ডিত হইয়াছে।

মামুন ইসলামের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কিংবা বিশ্বাসীর মনে আঘাত দেওয়ার ইচ্ছায় তাঁহার রাজ্যে অল-কিন্দীর মত পণ্ডিতগণকে উৎসাহ দিতেন না। প্রত্যেক মুসলমানের মত মামুনের অস্থিমজ্জাগত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইসলাম শাশ্বত ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য—ভঙ্গুর কাচ নহে। কিন্তু তিনি জানিতেন যে সত্য বিচার-ভীরু, দুনিয়ার বাজারে যাহার যাচাই হয় নাই, তাহা জগতে আদৃত হয় না।

খলিফা মামুনের জীবনীর অবশিষ্টাংশ, তাঁহার চরিত্র বিলাসব্যসন, সঙ্গীত-চর্চ্চা, অনুবাদের সাহায্যে ইসলামের জ্ঞানভাণ্ডারে অফুরন্ত দান।

* Rhys David's, *Buddhist India*.

পশ্চিম-সীমান্তে

শ্রীপ্রমোদনাথ রায়

মে মাসের শেষ দিকে যখন কলকাতায় গরম পড়েছিল হাতে কাজও তেমন বেশী ছিল না—এক সন্ধ্যাবেলায় [illegible] যাওয়ার খেয়াল মাথায় এল। এ খেয়ালে যোগ দিয়েছিলেন আমার এক বন্ধু, তাঁর ব্যবসার আড্ডা হ'ল ডালহৌসী স্কোয়ারের পূব দিকে, আমি থাকি পশ্চিমে। নূতন দেশ দেখা ছাড়া অন্য মতলবও আমাদের ছিল, কিছু কলকারখানার কারবারের ফিকির। অনেক ক'রে ভারত-সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে পাসপোর্ট জোগাড় হ'ল। আফগানিস্থান যাওয়ার হুকুম ভারতীয়দের পক্ষে পাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। আফগান-সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন।

গরম কাপড় আর ঠাণ্ডা কাপড়ে বাক্স বোঝাই ক'রে একদিন সন্ধ্যাবেলায় দিল্লী মেল গাড়ীতে ওঠা গেল। গরম আর ধুলো বিলক্ষণ ছিল সারারাত, তবু ঘুম হ'ল

ভালই। রাত কাটলো—সকাল হ'তেই খাবারের চেষ্টায় আমার বন্ধু মনোযোগ দিলেন। বন্ধুটি আমার মোটা মানুষ, আহারে পটু, এটাওয়ার পুরি আর আলুর তরকারী তিনি হাজির করলেন সের-দুই আর যতরকম ঝুরিভাজা ডালমুট—যেসব জিনিষ খেলে মানুষ সাধারণতঃ বাঁচে না। যাহোক এ যাত্রা আমরা বেঁচে গেলাম। তার পর দিনের গরম বেড়ে চললো, সূর্য্যদেবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের ডাকগাড়ী পশ্চিম অভিমুখে ছুটে চললো। সারা দিনটা বরফ সোডা আর জলে ডুবে থাকা গেল। আমার বন্ধুটি প্রকাণ্ড এক বরফের স্তূপের উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকলেন।

ধ্যানমগ্না

যে-রাস্তা দিয়ে আমরা গেলাম সে-পথ সকলেরই পরিচিত, তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সন্ধ্যায় দিল্লী পৌঁছে গাড়ী বদল ক'রে পেশোয়ার মেলে ওঠা হ'ল। খাওয়া হ'ল ভাতের বদলে রুটি আর মাছের বদলে মাংস। এবারকার পাড়ি রাওলপিণ্ডি। দুপুরে গিয়ে হাজির হলাম—এই রৌদ্র আর ধুলোর শহরে। টোঙ্গাওয়ালা নিয়ে গেল একটি হোটেলে। বেশী ভিড় ছিল না—কাশ্মীরের পথে রাওলপিণ্ডি···কাশ্মীরের যাত্রীর ভিড় যখন হয় তখন এখানকার সব হোটেল ভর্ত্তি হয়ে যায়। দিনের আলো থাকতে আমাদের ব্যবসার কাজ শেষ ক'রে সন্ধ্যায় ক্যাণ্টনমেণ্ট-পাড়া ছেড়ে শহর দেখতে যাওয়া গেল। দূরের পশ্চিমে শহর বাজার সরাই, মাটির জিনিষ, পায়ের জুতো, ফল, মাথার পাগড়ী, মেয়েদের উড়ানী, পুরুষের নাক, মেয়েদের চোখ—যেটুকু দেখা যায় সবই বাংলার কাছের পশ্চিমের থেকে ভিন্ন—এ পশ্চিম যেন একটু আসল। ফুলের মালা কেনা হ'ল, পান খাওয়া হ'ল অনেক। টোঙ্গা ক'রে উঁচুনীচু পাহাড়ী রাস্তা—অলিগলি বেয়ে হোটেলে ফেরা হ'ল। পরদিন সকালে আমরা এটক অয়েল রিফাইনারি দেখতে গেলাম—বিশাল এক খনিজ তেলের কারখানা। দুপুরে ফিরে আবার পেশোয়ার মেলে রওনা হলাম। পঞ্চনদের অনেক নদী, শস্যশ্যামলা তীরভূমি পার হয়ে পাহাড় জঙ্গল ভেদ ক'রে গাড়ী চললো। নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে এই অংশটিতে অনেক সুরঙ্গ, ব্রিজ ইত্যাদির কেরামতি দেখিয়েছে। তক্ষশিলা পার হয়ে চললাম মাটির পাহাড়ের দেশ দিয়ে। মাটির ঢিপি পাহাড় আর তার গায়ে গুহা তৈরি ক'রে ঘর করেছে। বিনা পয়সার ঘর, গরমের সময় ঠাণ্ডা, শীতকালে বোধ হয় গরম থাকে। তার পর এটক পৌঁছলাম—যেখানে সিন্ধু আর কাবুল নদী মিলেছে। সিন্ধু নদীর গভীর খাদের ওপর প্রকাণ্ড ব্রিজ পার হয়ে কাবুল নদীর পাশ দিয়ে গাড়ী চললো। এইখানে নদীর ধারের পাহাড়ের উপর একটি সুন্দর ছবির মত দুর্গ আছে। বোধ হয় পূর্ব্বে কোন হিন্দু রাজার ছিল···পরে হয়ত কোন মুসলমান বাদশাহ অধিকার করেছিলেন। একটা ছবি নেবার চেষ্টা করা গেল চলন্ত গাড়ী থেকে, সফল হই নি। নওশেরায় গাড়ী থামলো—সীমান্ত প্রদেশের ছাউনি—বিলাতী আর দেশী পল্টনের আড্ডা, রাজপুত, শিখ, ডোগরা, জাঠ, গুর্খার ভিড়, পাঠানের অন্ত নাই। গাড়ী ছাউনির পাশ দিয়ে যায়—কামান, বন্দুক, কুচকাওয়াজের আয়োজন দেখে মনে হয় যেন যুদ্ধ লেগেছে।

কোহাটের পথে -মুখার্জ্জি ও গোলাম নব

খাইবার উপত্যকা

জামরুদ দুর্গ

বালকেরা ফল তুলিতে যাইবে

আজাদ ইলাকার একটি গ্রাম

পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে আমরা রেলওয়ে যাত্রা শেষ ক'রে নামলাম। আমাদের সম্বর্দ্ধনার জন্যে একটি ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন। সরকারের তরফে তিনি যে বিভাগের তার নাম করলাম না। যাহোক আমরা তাঁর হাতে আমাদের আর মালপত্রের ভার দিলাম, কোন ভাল থাকবার জায়গায় পৌঁছে দেবার জন্যে। টোঙ্গা-যোগে স্থানীয় সরকারী ডাকবাংলোয় হাজির হলাম। এখানে 'ডীন্‌স্ হোটেল' ব'লে বড় হোটেল আছে, খরচ বেশী শুনলাম কিন্তু পরে দেখলাম আমাদের ডাকবাংলো নামেই সস্তা, দামের বেলায় কম যান না। পেশোয়ারের সন্ধ্যা গরমে আর ধূলোর ঝড়ে অন্ধকার হয়ে এল। সামান্য কাবাব রুটি খেয়ে বারাণ্ডায় খাটিয়া পেতে গরমের সঙ্গে লড়াই করতে করতে রাত কাটান গেল। সকালবেলায় আফগান পাসপোর্ট আপিসে হাজির হলাম আমরা দু-জনে। কাবুলীওয়ালার আড্ডা, অসম্ভব ভিড়, পস্তু ভাষায় হট্টগোল চলেছে। ভাষায় অনভিজ্ঞ আমরা আন্দাজে কোনরকমে যথাস্থানে পৌঁছলাম। সেখানে শুদ্ধ ফারসী ভাষায় কারবার, ইংরেজীর চলন নাই, আর আমাদের ভাঙা উর্দ্দু তাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য না হ'লেও তাদের ফারসী বোঝা আমাদের অসম্ভব। শেষে আমাদের নিয়ে গেল তর্জ্জমান সাহেবের কাছে। এই সাহেবের পেশা তর্জ্জমা করা। ইনি ভাল ইংরেজী বলেন, ভারতীয় অন্য ভাষাও বেশ বুঝতে পারেন। ইনিই শেষে আমাদের অকূলের কাণ্ডারী হলেন। ইনি দুরাণী-বংশধর, ইঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ আফগানের আমীর ছিলেন। ইনি পাসপোর্ট আপিসে বিদেশীয়দের সাহায্য করেন আফগান সরকারের তরফ থেকে। যাহোক এই ভদ্রলোক খোঁজখবর ক'রে আমাদের জানালেন যে আমাদের আফগান-সীমান্ত পার হবার অনুমতি আফগান-সরকার পাঠান নাই। আমরা মাথায় হাত দিয়ে পড়লাম। সেদিন সকালবেলায়ই ছাড়পত্র নিয়ে কাবুল রওয়ানা হবার মতলব ছিল। মোটরের বন্দোবস্তও ক'রে আসা হয়েছিল। সব পণ্ড হ'ল। তর্জ্জমান সাহেব বললেন যে, আমাদের কাবুলের ব্যবসায়ী বন্ধুরা বোধ হয় আফগান-সরকারের কাছে অনুরোধ জানাতে ভুলেছেন, তাই কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। তাছাড়া এ সব বন্দোবস্ত হ'তে দুই-তিন সপ্তাহ লাগে, পূর্ব্বে অনেক বিদেশী যাত্রী

জামরুদ: জনৈক খাসদার

মাসাবধি অপেক্ষা ক'রে হুকুম পেয়েছে। চিঠি লিখে উত্তর পেতে আট-দশ দিন লাগে—'তার' করা ঠিক হ'ল, তাছাড়া কাবুলের বন্ধুদের পেশোয়ার আপিসে খোঁজ করলে কাজ এগোতে পারে জানা গেল। তর্জ্জমান সাহেবকে রাত্রে খানায় নিমন্ত্রণ ক'রে আমরা শহরে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে দেখি চারদিকে খুব হুলস্থূল লেগে গেছে—খোঁজ নিয়ে জানা গেল কোয়েটার ভূমিকম্পের ব্যাপার। রাত্রে যখন কম্প হয়েছিল আমরা বুঝতে পারি নি। খবরের কাগজে জানলাম কি ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে। পেশোয়ার কোয়েটা হ'তে এমন বেশী দূর নয়, কিন্তু কম্পের কোন চিহ্নও দেখা গেল না এই পুরনো শহরে। আমরা শহর বাজার টোঙ্গা ক'রে ঘুরে কাজ শেষ ক'রে ক্যাণ্টনমেণ্ট ডাকবাংলোয় ফিরে গেলাম ঘর্ম্মাক্ত কলেবর আর হতাশ হয়ে। কাবুল বন্ধুদের পেশোয়ার আপিস থেকে বোঝা গেল আমাদের কাবুল যাওয়া খুবই কঠিন হবে।

আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে অগত্যা কিছুদিন পেশোয়ারে অপেক্ষা করা স্থির করলাম।

এই শহরে সকাল সন্ধ্যা ছাড়া বাইরে বড়-একটা কেউ বেরোয় না। দিনে প্রচণ্ড গরম। শহরটি ভারত-সম্রাট কনিষ্ক স্থাপনা করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'পুরুষপুর'। গরমের সময়ের রাজধানী ছিল এই শহর, তার পর হস্তান্তর হয়ে এখন ইংরেজ-সরকারের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী হয়েছে। পুরনো শহরের সঙ্গে জোড়া হয়েছে ক্যাণ্টনমেণ্ট, এও একটা বেশ বড় আধুনিক শহর। বাজার, বায়স্কোপ, দেশী ও বিলাতী খাবারের দোকান, চওড়া রাস্তা আর বাগানে ভর্ত্তি। এ ছাড়া বেশীর ভাগ বাড়ি পল্টনের আড্ডা।

এখানকার যাদুঘর প্রসিদ্ধ। পেশোয়ার অঞ্চল পুরাকালে গান্ধার ব'লে পরিচিত ছিল। গান্ধারের ইতিহাস আড়াই হাজার বছরের উপর পুরনো। পারসিক, গ্রীক, শক, হিন্দু সকলেই প্রভুত্ব ক'রে গেছেন গান্ধারে। ভারত-সম্রাট অশোকের যুগে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয়। গ্রীক-বৌদ্ধ আর্টের সৃষ্টি হয়েছিল এই অঞ্চলে। যাদুঘরে অনেক মূর্ত্তি, শিলালিপি, তা ছাড়া স্তূপ থেকে পাওয়া মুদ্রা অলঙ্কার ইত্যাদি রক্ষিত আছে। পেশোয়ার থেকে কয়েক মাইলের মধ্যে স্বাধীন পাঠানদের দেশ। দুর্গম পাহাড় আর মরুভূমি, সামান্য ফসল হয়ত জন্মায়, লুটতরাজ ক'রে এরা খায়। ভারত আর আফগান সীমান্তের মাঝখানে এরা প্রভুত্ব করে। এদের কেউ বশ মানাতে পারে নি এপর্য্যন্ত। এই দুই দেশের সরকারদের বিশেষ বেগ পেতে হয় এদের উৎপাতে। গোলমাল লেগেই আছে, এদের মুল্লুকে নিজেদের মধ্যেও এরা এক জাত অপরের সঙ্গে লড়াই করে। ভারত-সীমান্তে পল্টন ছাউনি বন্দুক কামানের সমারোহ এদের দমিয়ে রাখবার জন্যেই বেশীর ভাগ।

আমরা একদিন ভোরে কোয়েটার রাস্তায় কোহাটের দিকে রওনা হলাম কোহাট পেশোয়ার থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল দূর, এখানে ব্রিটিশ আর ভারতীয় পল্টনের প্রকাণ্ড ছাউনি আছে। পথে প্রায় দশ মাইল চওড়া পাঠান-এলাকা পার হ'তে হয়। রাস্তাটুকু অবশ্য ইংরেজ-সরকারের। সেখানে বিপদের সম্ভাবনা কম, কিন্তু রাস্তা ছেড়ে নীচে নামলেই ভয়ের

পাঠানী রাইফেল

কারণ আছে, এই রকম আমাদের পেশোয়ারী সঙ্গীদের কাছে শুনলাম। সুন্দর পাকা রাস্তা, আমাদের মোটর ছুটলো কোহাটের দিকে। পেশোয়ার থেকে কয়েক মাইল পর্য্যন্ত গাছ-পালা সবুজ ফসলে ভরা—রাস্তায় মাটির প্রাচীর দেওয়া দুটি ছোট দুর্গের মতন দেখলাম পেশোয়ার শহরতলীতে। শুনলাম পূর্ব্বে এই জায়গায় পাঠান ডাকাতরা এসে লুকিয়ে থাকত রাত্রে লুটতরাজ করবার জন্যে। এখন অবশ্য এ-সব উৎপাত আর হয় না। ক্রমশঃ রাস্তা পাহাড়ী জমিতে

উঠলো। আমরা পাঠান-এলাকায় পৌছলাম। এখানে শান্তিরক্ষার জন্যে একটি ছোট দুর্গ আর কিছু পুলিসপল্টন আছে। এরা আমাদের খুব সাদর অভ্যর্থনা করলে। ঠাণ্ডা জল আর ফল খাওয়া হ'ল। আমরা এদের ফটো নিলাম আর সীমান্তের উপর যে সাইনবোর্ড আছে তার সামনে দাঁড় করিয়ে আমার বন্ধুদের ফটো তুললাম। এখানকার পল্টনের এক জমাদার সাহেবের কোহাটে নিজের কাজ ছিল। তাঁকে আমাদের গাড়ীতে তুলে নিয়ে আমরা আবার কোহাটের দিকে রওনা হ'লাম। জমাদার সাহেব সঙ্গে থাকাতে নিজেরা একটু নিরাপদও হ'লাম।

রাস্তায় বন্দুকওয়ালার ছড়াছড়ি, সকলেই ঘাড়ে রাইফেল নিয়ে চলেছে—বেশ তেলমাখানো বন্দুকগুলি যেমন আমাদের অঞ্চলে বাঁশের লাঠিতে তেল মাখিয়ে রাখে। কোন কোন বন্দুকের বাঁট চিত্রবিচিত্র করা পিতল, তামা, পাথরের টুকরো দিয়ে। ভেড়া চরায়, গাধা হাঁকায়, কাঁধে রাইফেলটি ঠিক আছে।

রাস্তায় শুনলাম যে পাঠানী রাইফেলের কারখানা আছে দেখবার জিনিস।

আশ্চর্য হ'লাম দেখে—অতি সাধারণ জঙ্গলী উপায়ে রাইফেলের মতন একটা কেরামতির জিনিস তৈরি করছে। একটি তৈরি বন্দুক দেখলাম বোঝবার উপায় নাই হাতে-তৈরি না বিলাতী কলে তৈরি—দাম চাইলে পঁচিশ টাকা। আমরা বন্দুকের গ্রাহক নই। তাদের নিজের তৈরি বন্দুক ছুঁড়ে দেখাতে বললাম। একটা টিনের চাকতি অনেক দূরে রেখে একটা টাকা বকশিশ আর গুলির দাম কবুল ক'রে ছুঁড়তে দেওয়া হ'ল। নিমেষের মধ্যে উড়ে গেল টিনের চাকতি। আমাদের ঘিরে ফেললো পাঠান বন্দুকওয়ালারা আরও বকশিশের জন্যে। আরও কিছু টাকা দিয়ে ফটো তুলে আমরা সরে পড়লাম কোহাটের দিকে।

পাঠান-এলাকা পার হয়ে রাস্তায় পাহাড়ের উপর আবার ইংরেজের দুর্গ। এখান থেকে কোহাট দেখা যায়।

আমরা পাহাড়ের ঘোরানো রাস্তা দিয়ে কোহাটে নামলাম, ফলে ফুলে ভরা শহর। এও এক বড় ছাউনি, এখানকার সব দোকানপাট পল্টনের রসদ জোগাবার জন্যে। আমরা আতিথ্য গ্রহণ করলাম এক সৈয়দ নবাব সাহেবের। তাঁর গরমের সময় থাকবার বাড়িটি একটি ঝর্ণার উপর তৈরি। ঘরের নীচে যেখান দিয়ে ঝর্ণার জল যায় তার উপর দুপুর-বেলায় খাট পেতে বিশ্রাম করেন এঁরা। খাটের নীচে দিয়ে ঠাণ্ডা জল চলে, বেশ আরামের বন্দোবস্ত। সৈয়দ সাহেবের ছেলের সঙ্গে অনেক গল্প করা গেল। ইনি অবশ্য ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করলেন। বিকালবেলায় পরোটা কাবাব চা, সরবতের প্রচুর আয়োজন হ'ল। আহারান্তে কোহাটের দোকান বাজার দেখে আমরা বিদায় নিলাম। কোহাটের জুতার কারখানা প্রসিদ্ধ। ওই অঞ্চলের চপ্‌লি জুতা বেশীর ভাগ কোহাটে তৈরি।

ফেরবার সময় শুনলাম যে আমরা ৫টার পর আর পাঠান-এলাকা পার হ'তে পারব না, ইংরেজ-সরকারের নিষেধ আছে। বিশেষ ক'রে ইউরোপীয়দের সন্ধ্যার সময় পার হ'তে দেওয়া হয় না। আমাদের দেরি হয়ে গিয়েছিল, পেশোয়ারী বন্ধু পরামর্শ দিলেন টুপি আর 'টাই' খুলে রাখ্‌তে, যাতে সন্ধ্যার অন্ধকারে আমাদের "সাহেব লোগ্‌" ব'লে মনে না করে। এই ক'রে আমরা ফাটকের সিপাইয়ের কাছ থেকে ছাড়া পেলাম। পাহাড়-কাটা আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে নেমে আবার পাঠান-এলাকায় পড়লাম। আমাদের বন্ধু এক মাটির কেল্লা দেখালেন দূর থেকে। এক দুর্দান্ত সর্দারের আড্ডা ছিল এইটি—তিনি এখন পলাতক। রাস্তার আশপাশে বন্দুকওয়ালারা গুলতান করছে দেখলাম মোটেই সুবিধার লাগ্‌ছিল না। শুনলাম এরা থামতে বললে মোটর-ছোটানো ভুল, এরা চাকায় গুলি মেরে ফুটো ক'রে গাড়ী থামায়। যাহোক, এ যাত্রা আমাদের উপর অনুগ্রহ হয় নি—আমরা নিরাপদে আবার পেশোয়ার ফিরলাম।

পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণ-ঘাতকের খড়্গে করিতে ধিক্কার
হে মহাত্মা, প্রাণ দিতে চাও আপনার,
তোমারে জানাই নমস্কার।

হিংসারে ভক্তির বেশে দেবালয়ে আনে,
রক্তাক্ত করিতে পূজা সঙ্কোচ না মানে।
সঁপিয়া পবিত্র প্রাণ, অপবিত্রতার
ক্ষালন করিবে তুমি সঙ্কল্প তোমার,
তোমারে জানাই নমস্কার॥

মাতৃস্তনচ্যুত ভীত পশুর ক্রন্দন
মুখরিত করে মাতৃ-মন্দির প্রাঙ্গণ।
অবলের হত্যা অর্ঘ্যে পূজা-উপচার—
এ কলঙ্ক ঘুচাইবে স্বদেশ মাতার,
তোমারে জানাই নমস্কার॥

নিঃসহায়, আত্মরক্ষা-অক্ষম যে প্রাণী
নিষ্ঠুর পুণ্যের আশা সে জীবেরে হানি,'
তারে তুমি প্রাণমূল্য দিয়ে আপনার
ধর্ম্মলোভী হাত হ'তে করিবে উদ্ধার—
তোমারে জানাই নমস্কার॥

১৫ ভাদ্র, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের পত্র

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আমার শরীর অশক্ত। বিস্তারিত ক'রে মত ব্যক্ত করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। সম্প্রতি একটি পত্রের উত্তরে এ সম্বন্ধে যা লিখেছি আপনাকে পাঠাই। শক্তিপূজায় এক সময়ে নরবলি প্রচলন ছিল, এখনও গোপনে কখনও কখনও ঘটে থাকে। এই প্রথা এখন রহিত হয়েছে। পশুহত্যাও রহিত হবে এই আশা করা যায়। ইতি ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫।

ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...বড় চিঠি লেখার মতো শক্তি ও উৎসাহ আমার নেই, সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলি। জনসাধারণের মধ্যে চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও ব্যবহারের অন্যায় বহুব্যাপী, সেই জন্যে শ্রেয়ের বিশুদ্ধ আদর্শ ধর্ম্মসাধনার মধ্যে রক্ষা করাই মানুষের পরিত্রাণের উপায়। নিজেদের আচরণের হেয়তার দোহাই দিয়ে সেই সর্ব্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শকে যদি দূষিত করা যায় তাহ'লে তার চেয়ে অপরাধ আর কিছু হ'তে পারে না। ঠগীরা দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যাকে তাদের ধর্ম্মের অঙ্গ করেছিল। নিজের লুব্ধ ও হিংস্রপ্রবৃত্তিকে দেবদেবীর প্রতি আরোপ ক'রে তাকে পুণ্য শ্রেণীতে ভুক্ত করাকে দেবনিন্দা বলব। এই আদর্শ-বিকৃতি থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে যিনি প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রবৃত্ত, তিনি তো ধর্ম্মের জন্যেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত; শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্যেই প্রাণ দিতে স্বয়ং উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশই রামচন্দ্র শর্ম্মা পালন করছেন। সাধারণ মানুষের হিংস্রতা নিষ্ঠুরতার অন্ত নেই—স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ তাকে সম্পূর্ণ রোধ করতে পারেন নি—তবুও ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে হিংস্রতার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গের মতো দুষ্কর পুণ্যকর্ম্ম আর কিছু হ'তে পারে না; তাতে আশুফল কিছু হ'তে পারে কি না জানি নে কিন্তু সেই প্রাণ-উৎসর্গই একটি মহৎ ফল। রামচন্দ্র শর্ম্মা আপনার প্রাণ দিয়ে নিরপরাধ পশুর প্রাণ-ঘাতক ধর্ম্মলোভী স্বজাতির কলঙ্ক ক্ষালন করতে বসেছেন এই জন্যে আমি তাঁকে নমস্কার করি। তিনি মহাপ্রাণ ব'লেই এমন কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ইতি ২৪ ভাদ্র, ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমবেত জীবন-বীমা

ডাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

গত ত্রিশ বৎসরে জীবন-বীমা ব্যবসায় সমগ্র পৃথিবীতে অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং তাহার ফলে ইহার নিয়মকানুন ইত্যাদির বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বৃদ্ধবয়সে একটু স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করা ও স্ত্রীপুত্র-পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার স্বাভাবিক চিন্তা হইতেই জীবন-বীমার উদ্ভব। মানুষের নিজের চেষ্টায় যতটুকু ভবিষ্যতের সংস্থান করা সম্ভব, জীবন-বীমা সেই পথ দেখাইয়াছে এবং বর্ত্তমান সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের এই চিন্তার ফলে নানাবিধ নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে।

কিন্তু সমগ্র জগতের বর্ত্তমান আর্থিক পরিস্থিতির ফলে জনসাধারণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই এ পর্য্যন্ত জীবন-বীমার সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেছে। ব্যক্তিগতভাবে জীবন-বীমা করিয়া ভবিষ্যতের সংস্থান করিতে যাহারা সমর্থ তাহাদের মধ্যেও আমাদের দেশে অনেকেই সে সুযোগ গ্রহণের আবশ্যকতা এখনও হৃদয়ঙ্গম করেন না।

অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বৃদ্ধবয়সের জন্য এবং পরিবারের জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। নিজের অবর্ত্তমানে প্রিয়পরিজনদিগের জন্য ব্যবস্থা যদিও স্বার্থ-গত, তবু শুধু স্বার্থসিদ্ধিই ইহার সব নয়। জীবনধারণের জন্য পরিজনবর্গকে যাহাতে ভবিষ্যতে পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয় তাহার বন্দোবস্ত করা প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে সমাজসেবা। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও সর্ব্বত্রই উপায় হয় না। আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও বহু লোক অর্থাভাবে বীমাপত্র ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না। পশ্চিমে "সমবেত-বীমা"র প্রচলনে এ সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে বীমা করার সম্ভাবনা হইতেই "সমবেত-বীমা"র উদ্ভব।

সাধারণ জীবন-বীমার সহিত সমবেত-বীমার তফাৎ এই যে, সমবেত বীমায় একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধীন সমগ্র কর্ম্মচারী একসঙ্গে এক বৎসরের জন্য বীমা করে। এস্থলে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বীমা কোম্পানীর চুক্তি হয়··· যাহাদের জীবন-বীমা হয় তাহাদের সঙ্গে নহে। প্রত্যেককে নামমাত্র চাঁদা দিতে হয়। এই বীমার ধরণ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সম্প্রতি এরূপ দেখা যাইতেছে যে অনেক ক্ষেত্রে এই স্বল্প চাঁদার হারও কর্ত্তৃপক্ষ বহন করেন। এক বৎসরের মধ্যে কাহারও মৃত্যু অথবা স্থায়ী অক্ষমতায় দাবির উৎপত্তি হয়।

সমবেত-বীমায় জীবন-বীমার সুবিধা অল্প ব্যয়ে পাওয়াই ইহার একমাত্র আকর্ষণ নহে। সমবেত-বীমায় ডাক্তারী পরীক্ষা নাই। যে ব্যক্তি সাধারণ অবস্থায় উপযুক্ত স্বাস্থ্যের অভাবে জীবন-বীমা করিতে পারিত না, সেও এক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে জীবন-বীমার সুযোগ লাভ করে।

সমবেত-বীমা সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্য হয় এবং পরে বৎসর-বৎসর চলিতে থাকে। অন্ততঃ পঞ্চাশ জনকে লইয়া একটি দল (group) হয় এবং প্রত্যেকের জন্য কমপক্ষে এক শত পাউণ্ড অথবা এক বৎসরের বেতনের জন্য কোম্পানী দায়িত্ব গ্রহণ করে। একখানা মাত্র বীমাপত্র দেওয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে কর্ত্তৃপক্ষেরও প্রত্যেকের জীবন-বীমা হয়। কি কি সুবিধা দেওয়া হইবে বীমাপত্রে তাহার উল্লেখ থাকে এবং বৎসরান্তে নূতন বীমাপত্র প্রদানকালে প্রয়োজনবোধে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সর্ত্তাদির পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। প্রত্যেককে বীমাসম্পর্কে একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তাহাতে বীমার সর্ত্ত ও সুবিধা আদি লিখিত থাকে।

ডাক্তারী পরীক্ষা না থাকিলেও দলের সভ্য হইতে হইলে একাদিক্রমে অন্ততঃ তিন মাস কাজ করিয়াছে এরূপ কর্ম্মচারী প্রয়োজন। কারণ ইহাতে উক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করা চলে। নূতন নিযুক্ত লোকও তিন মাস পরে সরাসরি বীমার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়ে; শুধু বৎসরান্তে হিসাবে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। কেহ যদি ইতিমধ্যে কর্ম্মত্যাগ করে তবে সে সঙ্গে সঙ্গে দলের বাহিরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু ইচ্ছা

করিলে ত্রিশ দিনের মধ্যে ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত সাধারণ জীবন-বীমাপত্র গ্রহণ করিতে পারে।

কর্ত্তৃপক্ষ এই ভাবে কর্ম্মচারীদের পাইকারী দরে বীমার সুবিধা দিতে পারেন। চাঁদার হার দলের আকারের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ ইহা বীমা-মূল্যের শতকরা ১ হইতে ১$\frac{১}{২}$ এর মধ্যে থাকে। অর্থাৎ কর্ত্তৃপক্ষ যেখানে বেতন হিসাবে এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন, সেখানে এক হাজার হইতে বার শত টাকায় সকল কর্ম্মচারীর সমবেত-বীমা হইতে পারে। এরূপ স্বল্প ব্যয়ে সম্ভব বলিয়া গ্রুপ-বীমা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইতেছে। নিম্নে কোন সমৃদ্ধ কোম্পানীর এই শ্রেণীর বীমার চাঁদার হার উদ্ধৃত হইল।

(১) পরবর্তী জন্মদিনে	(২) চাঁদা			(১)	(২)		
বয়স	পা	শি	পে	বয়স	পা	শি	পে
১৯		১০		৪৫	১	১	১১
২০		১০	২	৪৬	১	২	৯
২১		১০	৬	৪৭	১	৩	৯
২২		১০	৯	৪৮	১	৫	০
২৩		১০	১১	৪৯	১	৬	৬
২৪		১১	১	৫০	১	৮	৫
২৫		১১	৩	৫১	১	১০	৮
২৬		১১	৪	৫২	১	১৩	১
২৭		১১	৫	৫৩	১	১৫	৯
২৮		১১	৬	৫৪	১	১৮	৫
২৯		১১	৯	৫৫	২	১	১
৩০		১২	০	৫৬	২	৩	১০
৩১		১২	৬	৫৭	২	৬	১০
৩২		১৩	০	৫৮	২	১০	২
৩৩		১৩	৭	৫৯	২	১৪	২
৩৪		১৪	২	৬০	২	১৮	১০
৩৫		১৪	৮	৬১	৩	৪	২
৩৬		১৫	২	৬২	৩	১০	১
৩৭		১৫	৯	৬৩	৩	১৬	৫
৩৮		১৬	৪	৬৪	৪	৩	১
৩৯		১৭	০	৬৫	৪	১০	০
৪০		১৭	৮	৬৬	৪	১৭	১
৪১		১৮	৫	৬৭	৫	৪	৯
৪২		১৯	২	৬৮	৫	১৩	৪
৪৩	১	০	০	৬৯	৬	৩	১
৪৪	১	১	০	৭০	৬	১৪	৫
৭১	৭	৭	২	৭৬	১১	৬	৯
৭২	৮	১	৩	৭৭	১২	৫	৯
৭৩	৮	১৬	৪	৭৮	১৩	৬	০
৭৪	৯	১২	২	৭৯	১৪	৭	৬
৭৫	১০	৮	১০	৮০	১৫	১০	৭

সমবেত-বীমা পাশ্চাত্য দেশে বহুল প্রচার লাভ করিলেও ভারতবর্ষে এ-পর্য্যন্ত এদিকে কোন চেষ্টাই হয় নাই। এদেশের কারখানা অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে মৃত্যু, আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতির সংখ্যাগুলি পাওয়া কঠিন। সর্ব্বত্র শ্রমিকেরা কর্ম্মস্থলের স্থায়ী বাসিন্দাও নহে। এমতাবস্থায় ইউরোপ আমেরিকায় বীমা-কোম্পানী তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিতে পারে এদেশে তাহা সম্ভব নহে। তথাপি এ শ্রেণীর বীমার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া কোন ভারতীয় কোম্পানী এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইতে পারেন। কারখানার মজুররা স্থায়ী না হইলেও এবং তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর হার ইত্যাদি অবগত হওয়ার উপায় না থাকিলেও সাধারণ জীবনবীমার ক্ষেত্রে যেরূপ হইয়াছে সেরূপ ভাবে কার্য্যোপযোগী চাঁদার হার স্থির করিয়া লওয়া অসাধ্য নহে।

এতদ্ব্যতীত কেবল যে কারখানার মজুরদের মধ্যেই সমবেত-বীমা সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই। এ দরিদ্র দেশের মধ্যবিত্ত লোকের আর্থিক অবস্থা বিলাত আমেরিকার মজুরদের অবস্থা অপেক্ষা বেশী উন্নত নয়। অধিকাংশ গরিব কেরাণী এবং স্কুলমাষ্টারের পক্ষে দুর্ম্মূল্য জীবন-বীমার সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এই সকল দিকে ভারতের ভবিষ্যৎ সমবেত-বীমা কোম্পানীর বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে সন্দেহ নাই। অধুনা নিত্য-নূতন প্রভিডেণ্ট ও জীবন-বীমা কোম্পানীর উদ্ভব হইতেছে; অথচ যেখানে উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এদিকে আমি ভারতীয় বীমা-কোম্পানীসমূহের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ভরসা করি শীঘ্রই কেহ এই দিকে কাজ আরম্ভ করিয়া একসঙ্গে সমাজসেবা ও স্বয়ং লাভবান্ হইবার পথে অগ্রসর হইবেন।

এভারেষ্ট-অভিযান ও ভারতীয় শের্পা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

ভারতবর্ষের উত্তর দিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় হাজার মাইল জুড়িয়া হিমালয় পর্ব্বতমালা অবস্থিত; ইহার অগণিত শৃঙ্গ বা শিখর, তন্মধ্যে এভারেষ্ট সর্ব্বোচ্চ। ইহার উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট। এভারেষ্ট-শৃঙ্গকে গৌরীশঙ্কর বা গৌরীশৃঙ্গ বলিয়া কেহ কেহ ভ্রম করেন। বস্তুতঃ গৌরীশঙ্কর বা গৌরীশৃঙ্গ এভারেষ্টের পশ্চিমে পাঁচ হাজার ফুট নিম্নে অবস্থিত।

মাকালু হইতে এভারেষ্ট শৃঙ্গের দৃশ্য

হিমালয়ের শিখরসমূহের নাম সকলই স্থানীয় ভাষায়, যথা – কৈলাস-পর্ব্বত, কামেট-শৃঙ্গ, গৌরীশঙ্কর, ধবলগিরি, নঙ্গাপর্ব্বত, নন্দাদেবী, কাঞ্চনজঙ্ঘা। তবে এই শৃঙ্গটির নাম এভারেষ্ট কেন দেওয়া হইল তাহা আমাদের জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এই সম্বন্ধে নানা জনে নানারূপ মনোরম গল্প রচিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতার একটি ছেলেদের মাসিকে এক জন প্রসিদ্ধ লেখক এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ্জ এভারেষ্ট এই শৃঙ্গটি আবিষ্কার করেন এবং এই জন্য ইহার নাম এভারেষ্ট রাখা হইয়াছে। ইহা একেবারে ভুল। জর্জ্জ এভারেষ্ট গত শতাব্দীর প্রথমে গোলন্দাজ সৈন্যরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় বৃহৎ ত্রিকোণমিতিক জরীপ-বিভাগের (Great Trigonometrical Survey of India) অধ্যক্ষ কর্ণেল ল্যামবার্টের সহকারী নিযুক্ত হন। কর্ণেল ল্যামবার্ট এই বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, জর্জ্জ এভারেষ্ট অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার গুণপনার পরিচয় প্রদান করেন, এবং কর্ণেল ল্যাম্বার্টের মৃত্যুর পর তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। ইহা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ১৮৪৩ সন পর্য্যন্ত এভারেষ্ট সাহেব জরীপ-বিভাগের অধ্যক্ষের

কার্য্য করিয়া ঐ সনেই অবসর গ্রহণ করেন। কর্ণেল ল্যামবার্ট ভারতীয় ত্রিকোণমিতিক জরীপ-কার্য্যের প্রবর্ত্তক হইলেও এভারেষ্টের অদম্য উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিভাগ সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। এভারেষ্ট প্রায় তেইশ বৎসর অবসর-জীবন যাপন করিয়া ১৮৬৬, ১লা ডিসেম্বর গ্রীনউইচে পরলোকগমন করেন।

জর্জ্জ এভারেষ্টের অধীনে কার্য্য করিয়া তাঁহারই অনুসৃত পদ্ধতিতে পারঙ্গম হইয়াছিলেন এক জন বাঙালী—তিনি রাধানাথ শিকদার। তাঁহার বিষয় ইদানীং অল্পবিস্তর সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। কখনও জরীপ-কার্য্যে, কখনও বা জরীপের ফলাফল গণনায় তিনি এভারেষ্টের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে (১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে) ভারত-সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত জরীপ-বিষয়ক পুস্তকের (*The Manual of Surveying*) বহু অংশ তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। জর্জ্জ এভারেষ্ট সহকারী রাধানাথকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহা রাধানাথের পিতা তিতুরাম শিকদারকে লিখিত তাঁহার পত্র পাঠে সম্যক জানা যায়।* ভারত-সরকারের পক্ষ হইতে সম্প্রতি হিমালয় ও তিব্বতের ভূগোল ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে রাধানাথ যে চীফ কম্পিউটার বা প্রধান গণনাকারী ছিলেন ইহাই বার-বার উল্লেখ করা হইয়াছে।† রাধানাথ শিকদার শুধু কম্পিউটার বা গণনাকারীই ছিলেন না, তিনি জরীপ-কার্য্যেও নিযুক্ত ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ্ ডিরেক্টর্স ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এভারেষ্ট কৃত একখানি পুস্তক রাধানাথ শিকদারকে উপহার দেন। এই পুস্তকখানি রাধানাথের ভ্রাতুষ্পুত্র অশীতিপর-বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ শিকদারের নিকট আমি দেখিয়াছি। উপহারদান-সম্পর্কে ইহাতে হস্তাক্ষরে লেখা আছে, "Babu Radhanath—Presented by the Court of Directors of the East India Company in acknowledgment of his active participation in the survey." এরূপ ক্ষেত্রে রাধানাথ শিকদারকে শুধু গণনাকারী বা প্রধান গণনাকারী বলিলে মৃত ব্যক্তির উপর অশ্রদ্ধা প্রদর্শনই হইবে না, পরন্তু সত্যেরও অপলাপ হইবে।

এভারেষ্ট-অভিযান প্রসঙ্গে রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে এত কথা বলিবার একটি সঙ্গত কারণ আছে। বৎসর-তিনেক পূর্ব্বে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' মাসিকে রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে ইংরেজী ও বাংলা তিনটি প্রবন্ধ লিখি। তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাও বলিয়াছিলাম যে, রাধানাথই সর্ব্বপ্রথম গণনা করিয়া বাহির করেন এভারেষ্ট-শৃঙ্গের ন্যায় সমউচ্চতাবিশিষ্ট পর্ব্বত এ জগতে আর দুইটি নাই। এই প্রসঙ্গে ১৯০৪, ১০ই নবেম্বরের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 'নেচার' পত্রে প্রকাশিত একটি প্রামাণিক প্রবন্ধ ও ভারতীয় জরীপ-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব পদস্থ কর্ম্মচারী, অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক এবং সুপ্রসিদ্ধ বার্ষিক 'হিমালয়ান জর্ণ্যালে'র সম্পাদক মেজর কেনেথ মেসনের বক্তৃতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি। উক্ত সরকারী পুস্তকে এই সকল প্রস্তাব মনোরম গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে! একথা সত্য যে, একমাত্র রাধানাথ শিকদারকেই এভারেষ্টের আবিষ্কর্ত্তা বলা ভ্রমাত্মক। বস্তুতঃ আমিও একথা কুত্রাপি বলি নাই। এভারেষ্টের ভারতবর্ষ ত্যাগের পর তাঁহারই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া নানা দিক হইতে অন্য-গুলির ন্যায় এই শৃঙ্গটিরও উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য পর্য্যবেক্ষণ চলিতেছিল। এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফল কলিকাতার সার্ভে আপিসে তৎকালীন সার্ভেয়র-জেনরল স্যর এণ্ড্রু ওয়্'র অধীনে গণনা আরম্ভ হয়, এবং ১৮৫২ সনে রাধানাথ শিকদার সর্ব্বপ্রথম এভারেষ্ট সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ জানিয়া তাঁহাকে জানান। এই শৃঙ্গটি এযাবৎ 'কে পঞ্চদশ' (K. XV) নামে অভিহিত হইতেছিল। স্থানীয় নামের অভাবে ভারতীয় জরীপ-বিভাগের নিয়ামক জর্জ্জ এভারেষ্টের নামে অতঃপর ইহার 'এভারেষ্ট' নামকরণ হইল। অদ্যাবধি ইহা এভারেষ্ট নামেই পরিচিত।

২

ইদানীং কয়েক বৎসর ধরিয়া হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি

---

* *The Modern Review* for September, 1933, ২৯২ পৃষ্ঠা।

† পুস্তকের নাম—*A Sketch of the Geography and Geology of Himalaya Mountains and Tibet.* By Burrard and Hayden. ১২৪-১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
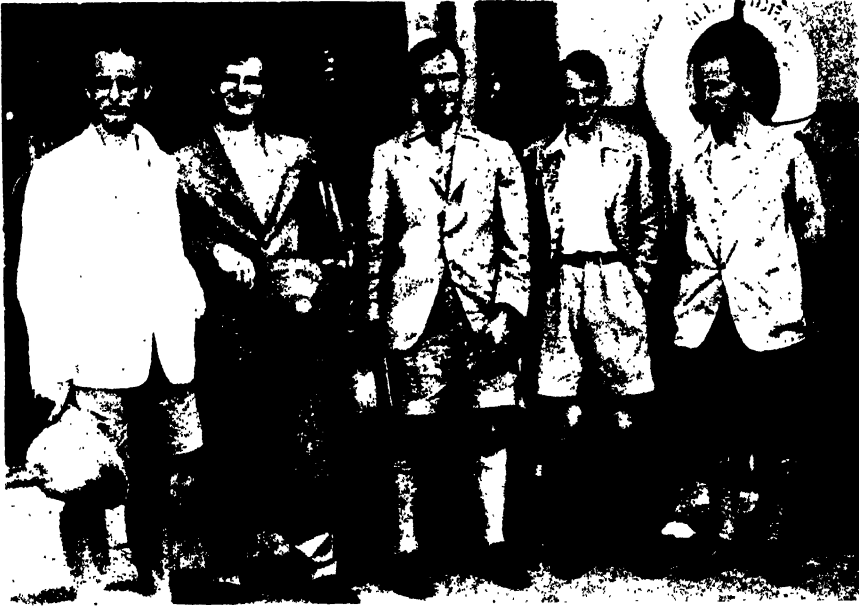
এ বৎসর এভারেষ্ট-শৃঙ্গের পথ-পর্য্যবেক্ষণে
বাম দিক হইতে—ই ই শিপ্‌টন (নায়ক), এম স্পেণ্ডার, ই এইচ্ এল্ উইগ্রাম, ডাঃ সি ওয়ারেন ও কেম্পসন

আরোহণের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। হিন্দুকুশ কারাকোরাম হইতে নন্দাদেবী, নঙ্গাপর্ব্বত, কামেট, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি পর্য্যন্ত মহাসমারোহে বিজিত হইয়াছে। কিন্তু এভারেষ্ট-শৃঙ্গে এপর্য্যন্ত কেহই পৌঁছিতে পারেন নাই। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহাতে আরোহণ করিবার প্রথম জল্পনা হয়। এভারেষ্টের দক্ষিণ হইতে ওদিকে অগ্রসর হইবার সুবিধা নাই। ১৯০৩-৪ সনে স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাসব্যাণ্ডের নেতৃত্বে এক দল ইংরেজ তিব্বতে গমন করেন এবং ইহার সহিত ব্রিটিশ সরকারের মিত্রতা স্থাপনে সমর্থ হন। ইহার পর হইতে তিব্বতে ইংরেজ প্রভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিলাতের অভিযানকারী লোকেরা সুযোগ বুঝিয়া এভারেষ্ট কমিটি নামে একটা সমিতি ১৯২০ সনে গঠন করেন। সেখানকার রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি ও আল্পাইন ক্লাবের সভ্যগণ ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। এখন তিব্বত হইয়া এভারেষ্ট আরোহণ সম্ভব কি-না, এবং সম্ভব হইলে কোন্ পথে যাওয়া যাইবে তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও বিবেচনা করিবার জন্য এভারেষ্ট কমিটি ১৯২১ সনে কর্ণেল বি কে হাওয়ার্ড-ব্যুরির নেতৃত্বে এক দল পর্য্যবেক্ষক প্রেরণ করিলেন। জি এইচ মেলরি নামে এক ব্যক্তিও এই দলে ছিলেন। এই দল তিব্বতের ভিতর দিয়া রঙ্‌বাক উপত্যকা ধরিয়া এভারেষ্টের উত্তরে চাং লা বা নর্থ কল নামে একটি আল (ridge) আবিষ্কার করেন। এই ব্যাপারে মেলরির কৃতিত্ব অসাধারণ। বিশেষ করিয়া তাঁহারই চেষ্টায় এই আল আবিষ্কৃত হয়।

মোটামুটি পথ নির্ণয়ের পর ১৯২২, ১৯২৪ ও ১৯৩৩ এই তিন সনে তিনটি দল এভারেষ্ট-বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরে ১৯২১ সনের মত আর এক দল পর্য্যবেক্ষক প্রেরিত হইয়াছেন। প্রকাশ, আগামী বৎসর এক দল অভিযানকারী এভারেষ্ট-শৃঙ্গ আরোহণের পুনর্ব্বার চেষ্টা করিবেন।

উক্ত তিন বৎসরের অভিযানের কথা সমসাময়িক নানা পত্রে ও পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে। এভারেষ্ট-শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট, কাহারও কাহারও মতে ২৯,১৪০ ফুট দ্বিতীয়টি এখনও অবিসংবাদিত রূপে গৃহীত না হওয়ায় প্রথমটিই আমরা ইহার উচ্চতা বলিয়া ধরিয়া লইব। অভিযানকারীদের কেহ কেহ প্রথম বার ২৭,০০০ ফুট, দ্বিতীয় বার ২৮,১৪০ ও তৃতীয় বারেও অনুরূপ উ-

আরোহণ করিতে সমর্থ হন। ১৯৩৩, ৩রা এপ্রিল বিমানপোত এভারেষ্ট-শৃঙ্গের উপরে তিন-চারি শত ফুটের মধ্যে উড়িয়া আসিয়াছিল। বিমানপোত হইতে গৃহীত বহু আলোকচিত্রও পরে প্রকাশিত হইয়াছে। বিমানপোতে এভারেষ্ট-শৃঙ্গ দর্শন এক কথা, আর পায়ে হাঁটিয়া তুষারাবৃত ঝটিকাবিক্ষুব্ধ শৃঙ্গের দেশে গমন স্বতন্ত্র কথা। সাতাশ হাজারই হউক, কি আটাশ হাজারই হউক, অত উচ্চে উঠা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

বৎসরে মাত্র মে-জুন মাসেই এভারেষ্ট-আরোহণ সম্ভবপর। কাজেই অভিযানকারীদের এপ্রিল মাসেই যাত্রা করিতে হয়। পর্ব্বত-আরোহণে শেপা-কুলিরা অভ্যস্ত। প্রত্যেক বারেই বহুসংখ্যক শেপা সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। পর্ব্বতের জলবায়ুর উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, তাঁবু, দড়িদড়া, জিনিসপত্র প্রভৃতি বহু ভারী ভারী মালপত্র সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। প্রত্যেক বারই রঙ্‌বাক উপত্যকায় ১৬,৫০০ ফুট উচ্চে 'বেস্ ক্যাম্প' (বা ভিত্তি-তাঁবু) খাটানো হইয়াছিল। ১৯২৪ ও ১৯৩৩ সনে পথিমধ্যে কত উচ্চে কোন্ তারিখে কোন কোন্ তাঁবু খাটানো হইয়াছিল তাহার একটি তালিকা এখানে দিলাম। ১৯২২ সনের তাঁবুর অবস্থান ১৯২৪ সনের অনুরূপ :—

	১৯২৪		১৯৩৩
'বেস ক্যাম্প'	১৬,৫০০ ফুট	২৯এ এপ্রিল	১৭ই এপ্রিল
১নং তাঁবু	১৮,০০০ "	৩০এ "	২১এ "
২নং তাঁবু	১৯,৭০০ "	২রা মে	২৬এ "
৩নং তাঁবু	২১,০০০ "	৪ঠা "	২রা মে
৪নং তাঁবু	২৩,০০০ "	২০এ "	১৫ই "
৫নং তাঁবু	২৫,০০০ "	২রা জুন	২২এ " (২৫,৭৫০ ফুট)
৬নং তাঁবু	২৬,৭০০ "	৩রা "	২৯এ মে (২৭,৪০০ ফুট)

প্রত্যেক বারই রঙ্‌বাক উপত্যকায় 'বেস ক্যাম্প' খাটানো হয়, ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এখানে একটি বৌদ্ধ মঠ আছে। এই মঠের লামা ইংরেজ ও ভারতীয়-নির্ব্বিশেষে সকল অভিযানকারীকে সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় বারের অভিযানের সময় শীত এত অত্যধিক হইয়াছিল যে, অভিযানকারীরা কিছুতেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাঁবু খাটাইতে পারিতেছিলেন না। প্রথম তাঁবুতে কয়েক দিন অতীত হইলে ইঁহারা

রঙ্‌বাক বৌদ্ধ মঠ। পশ্চাতে এভারেষ্ট শৃঙ্গ

সকলেই রঙ্‌বাক মঠে ফিরিয়া গেলেন, এবং লামার আশীর্ব্বাদ লইয়া পরে নির্বিঘ্নে কার্য্যে অগ্রসর হন।

তাঁবুগুলির অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেকটি দেড় হইতে দুই হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। রঙ্‌বাক উপত্যকার যেখানে বৌদ্ধ মঠ অবস্থিত সেখানে লোকের বসতি আছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, জগতের যে-সব উচ্চ স্থানে লোকজনের বসতি আছে তাহার মধ্যে ইহা একটি। কিন্তু এই স্থান হইতে যতই ঊর্দ্ধে উঠিবেন ততই লোকের বসতি বিরল। পথ ক্রমশঃ বন্ধুর, পিচ্ছিল ও তুষারাচ্ছন্ন। আবার পাহাড় কখনও ঢালু, কখনও বা একদম খাড়া। এভারেষ্টের চিত্রই শুধু মনোরম নহে, এভারেষ্ট-আরোহণের চিত্র যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারেন না। পাহাড়গাত্রে যেখানটা খুব মসৃণ সেখানেও পরস্পরে

দড়ি বাঁধিয়া কুঠারহস্তে তুষার কাটিতে কাটিতে লাগিয়াই আছে। বৎসরে মে মাসে তবু খানিকটা অগ্রসর অগ্রসর হইতেছেন, দড়ি বাঁধিবার কারণ পাছে পিচ্ছিল হওয়া যায়। কিন্তু কখনও কখনও মৌসুমি বায়ু মে মাসের পথে পা হটিয়া যায়। আবার যখন ঢালু জায়গা শেষেই আবির্ভূত হয়। তখন আর কিছুতেই সম্মুখে অগ্রসর ধরিয়া উপরে উঠিতে হইবে, শের্পা কুলিরা প্রথমে হওয়া যায় না। ১৯২৪ ও ১৯৩৩ সনের অভিযান মৌসুমি স্থানে স্থানে খুঁটি পুঁতিয়া দড়ি টাঙাইয়া দিয়া যায়, অভিযানকারীরা ইহা ধরিয়া ধীর পদক্ষেপে উর্দ্ধে উঠিতে থাকেন। আর একটি দৃশ্য বড়ই মনোরম। ধরুন পাহাড়ের খাড়াই দিয়া উপরে উঠিতে হইবে। এক্ষেত্রে শের্পারা মোটা দড়ি দিয়া একরূপ মই তৈরি করে ও ঐ অঞ্চলে শক্ত করিয়া খাটাইয়া যায়, অভিযানকারীরা তাহা বাহিয়া উপরে উঠেন।

এই ত গেল এভারেষ্ট-আরোহণের কথা। এখন ঐ অঞ্চলের জলবায়ু কিরূপ দেখা যাক্। দিগ্‌দিগন্তে শুধু তুষার, আর তুষার। পঁচিশ হাজার ফুট উপরে তুষার গলে না। ইহার নিম্নেই অবশ্য তুষার খানিকটা গলিতে

এভারেষ্ট শৃঙ্গের পথে। ৫ নং তাঁবু।

দেখা যায়। তুষার-সমুদ্রের নিম্নভাগ গলিয়া বিরাট স্রোত যখন বহিতে আরম্ভ করে সে দৃশ্য বড় ভীষণ। তাহার সম্মুখে সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি তখন যাহা-কিছু পড়ে সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়। ১৯২২ সনের অভিযানে সাত জন শের্পা ইহাতে আত্মাহুতি দিয়াছিল। অত উচ্চে ঝড়, ঝঞ্ঝা বায়ুর আশু আবির্ভাবের ফলেই প্রধানতঃ বিফল হইয়াছিল। শেষোক্ত অভিযানকালে আলিপুর মানমন্দিরের ডক্টর সেন ও চট্টোপাধ্যায়ের মৌসুমি বায়ুর আশু আবির্ভাবমূলক ভবিষ্যৎ-বাণী সকলেরই বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল।

শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে হইলে যে-পরিমাণ অক্সিজেন দরকার, যত উর্দ্ধে উঠিবেন ততই ইহা হ্রাস পাইতে থাকিবে। পঁচিশ হাজার ফুট উপরে শ্বাস-প্রশ্বাসের উপযোগী অক্সিজেনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র পাওয়া যায়। বাকী দুই-তৃতীয়াংশ অক্সিজেন-যন্ত্র হইতে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সব সময় অক্সিজেন-যন্ত্রের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়। সেই জন্য পাহাড় অঞ্চলে গমনাগমনে যাহাতে অভ্যস্ত হওয়া যায় সেদিকেও আজকাল অভিযানকারীদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। অক্সিজেন-যন্ত্র একবার বিকল হইলে ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই। শের্পারা কিন্তু বিনা কৃত্রিম অক্সিজেনেই সাতাশ হাজার ফুটের উপরে উঠিয়া তৃতীয় বারে ষষ্ঠ তাঁবু খাটাইয়াছিল।

পাহাড়স্থিত অভিযানকারীদের চিত্র দেখিলে বুঝা যায়, কিরূপ পুরু পোষাকে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিতে হয়। হিমের প্রকোপে সময় সময় মনে হইতে থাকে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বুঝি বন্ধ হইয়া গেল, ফুস্‌ফুস্ বুঝিবা শুকাইয়া গিয়াছে। চক্ষে গগ্‌লস্ নামে পুরু চশ্‌মা থাকিলেও তুষার প্রবেশ করিয়া ইহার জ্যোতি নষ্ট করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় বারের অভিযানের নেতা নর্টন যখন ২৮,১৪০ ফুট আরোহণ করিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন তখন একেবারে অন্ধ হইয়া যান। ইহাকে ইংরেজীতে 'snow-blindness' (অর্থাৎ তুষারের আঘাতে অন্ধতা) বলে। ইহা অবশ্য সাময়িক। নর্টন

পুনরায় চক্ষুষ্মান হইয়াছেন। এত উচ্চে উঠিবার কালে এক পা অগ্রসর হইতে আপনাকে সাত-আট বার গভীর ভাবে শ্বাস লইতে হইবে। ধরুন একটি সিগারেট ধরাইতে হইবে। আপনি অতি কষ্টে দিয়াশলাইয়ের কাঠি জালিলেন, কিন্তু সিগারেটে সংযোগ করিয়া টানিতে আর আপনার সামর্থ্য থাকিবে না; ততটা পরিমাণ শ্বাস টানা আপনার পক্ষে অসম্ভব!

যেখানকার জলবায়ু এইরূপ, সেখানে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও বিরাট তুষার-স্রোতে প্রথম বারে সাত জন শের্পার জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারে মেলরি ও আর্ভিন নামে দুই জন বিখ্যাত অভিযানকারী নিরুদ্দেশ হন। গত ১৯৩৩ সনের অভিযান কালে ওয়েজার সাহেব মেলরি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত তুষার-কুঠার উদ্ধার করিতে সমর্থ হন! মেলরি ও আর্ভিনের সন্ধান এখনও মেলে নাই।

৩

উপরে প্রসঙ্গক্রমে শের্পাদের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের বীরত্ব, সাহস ও কর্ম্মতৎপরতার প্রশংসায় অভিযান-কারীরা পঞ্চমুখ। এভারেষ্ট-অভিযানকারীদের যতগুলি বিবরণ পাঠ করিয়াছি তাহাতে ইহাদের সাহসের বিষয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা হইয়াছে। তাঁহারা ইহাদের নাম দিয়াছেন 'টাইগার্স'—ব্যাঘ্র। শের্পাদের আদিভূমি তিব্বত, এখন দার্জ্জিলিং ও নেপাল অঞ্চলের অধিবাসী। ইহারা বহু ভাষাবিৎ। তিব্বতী, নেপালী, ভুটানী, উর্দ্দু ইহারা বেশ জানে। শের্পারা পাহাড়-অঞ্চলে গমনাগমনে অভ্যস্ত। এভারেষ্ট অঞ্চলের প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও বহু রকমের ভারী ভারী জিনিষ ইহারা ঘাড়ে বহিয়া সানন্দে লইয়া যায়। বন্ধুর পিচ্ছিল পাহাড়ে পথে ইহারা প্রত্যেকে এক মণ দেড় মণ পর্য্যন্ত জিনিষপত্র বহন করিয়া থাকে। তৃতীয় বারে বহুসংখ্যক শের্পা অভিযানকারীদের অনুগমন করিয়াছিল। এখানে 'অনুগমন' শব্দটি মূল অর্থে ধরিলে বড়ই ভুল করা হইবে। প্রকৃত পক্ষে ইহারা অভিযানকারীদের অগ্রগমনই করিয়া থাকে। 'বেস ক্যাম্প' হইতে ষষ্ঠ তাঁবু পর্য্যন্ত পাহাড়ে পিচ্ছিল ঢালু ও খাড়াই পথে ভারী ভারী মাল বহিয়া লইয়া যায়, অত

দুইজন শের্পা। ইহারা ২৭,৪০০ ফুট উচ্চে ভারী ভারী মালপত্র লইয়া উঠিয়াছিল। অভিযানকারীরা ইহাদিগকে "টাইগার্স" (ব্যাঘ) আখ্যা দিয়াছেন।

উচ্চে বাসোপযুক্ত তাঁবু খাটায়, পথিমধ্যে দড়ি খাটাইয়া ও মই বসাইয়া বসাইয়া যায়, ঝড়ঝঞ্ঝা ধুলা তুষার হিম কিছুই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারে না। এই সব সত্ত্বেও যদি ইহাদিগকে অগ্রগামী না বলি তবে কাহাকে বলিব? আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাহাদের এই সব বিপদ-আপদে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই, মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া চলিতে থাকে। তৃতীয় বারের অভিযানের নেতা হিউ রাটলেজ তাঁহার "এভারেষ্ট ১৯৩৩" নামক ইংরেজী পুস্তকে (পৃঃ ১০৯-১১০) শের্পাদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ভারতীয়দের প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—

"I have never seen a finer body of men. As to shelter for the night anything would do. After a merry salute, and with no pause for rest, they fell to upon the moraine boulders, rolling them into position to make sangars—A few outer flies from whymper tents were stretched overhead, and soon the smoke began to rise from the few sticks of firewood they had brought

এভারেষ্ট-শৃঙ্গের পথে এই সকল শের্পা ও অভিযানকারী ৬ নং তাঁবু খাটাইয়াছেন

... the tsampa was cooking in the pots, song and laughter proceeded from every sangar, and the whack of the dice-box of its leathern banged down from a with a shout of optimistic import, showed tha well and that Shola Khombu was thoroughly Would they carry up to Camp III? Of cou would and higher...... They were a grand lo vious to cold and fatigue, and apparently unaffe any superstitious dread of the mountain."

তৃতীয় বারের অভিযানে নেপালের সোলা খোম্বু অঞ্চল হইতে ছেচল্লিশ জন শের্পা আসিয়া দ্বিতীয় তাঁবুতে অভিযান-কারীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। অভিযানকারীদের নেতা রাটলেজ সাহেব বলেন, তাহাদের মত সুন্দর সবল লোক তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তাহারা আসিয়া সেলাম দিয়া বড় বড় প্রস্তরখণ্ড টানিয়া সমান করিতে লাগিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ধোঁয়া দেখা গেল। তখন রন্ধন আরম্ভ হইয়াছে। গানে হাসিতে ইহারা মশগুল। সাড়ে উনিশ হাজার ফুট উঁচু স্থানকে তাহারা যেন নেপালের গৃহকোণ করিয়া লইয়াছে! বস্তুতঃ শীত ও ক্লান্তিতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। পাহাড়ের ভয়ও তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে নাই।

তৃতীয় তাঁবু একুশ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানেও শের্পারা নির্বিকার। তাঁবু ত ইহারাই খাটাইয়াছে। শের্পাদের প্রফুল্লতাও এতটুকু হ্রাস পায় নাই। রাটলেজ সাহেব লিখিতেছেন,—

"The porters were entirely unimpressed and made merry in their bell tent. In the occasional lulls we could hear the roar of the Primus, and their never-ending talk. Not once did they fail to bring tea and soup at the right moment. There would come a yell outside, the tent-opening would be unlaced, and the faithful Tewang dragged bodily in accompanied by about half a ton of snow." (পৃঃ ১১১।)

শের্পারা হাসিয়া খেলিয়া মনের আনন্দে সাহেবদের জন্য চা তৈরি করিতেছিল। রাটলেজ বলেন, এই নিদারুণ শীতে, আকস্মিক বিপৎপাতের মধ্যেও শের্পারা সময়মত চা দিতে কখনও ত্রুটি করে নাই। তাহাদের এই কর্ত্তব্যপরায়ণতার কথা ১৯২২ সনের অভিযানের বিবরণেও উল্লিখিত আছে। তখন একদিন ২৫,৫০০ ফুট উঁচুতে অভিযানকারীরা রহিয়াছেন। পূর্ব্ব দিনের পরিশ্রমে বড়ই ক্লান্ত, পানীয়ের অভাবে মৃতপ্রায়।

এদিন সমস্ত সকাল-দুপুর তুষার-ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। অভিযানকারীরাও ক্লান্ত দেহে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। সন্ধ্যার দিকে দেখা গেল, কয়েকজন শের্পা উষ্ণ পানীয় লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত। এই ঘটনার বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে,—

"The climbers were heroic, but no words of praise can be too high for those native porters who risked their lives to take them warming drinks."

'অভিযানকারীরা বীর বটে, কিন্তু ভারতীয় শের্পাদের বীরত্বের প্রশংসার ভাষা নাই। এই দুর্যোগের মধ্যেও তাহারা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করিয়া উষ্ণ পানীয় লইয়া আসিতে ইতস্ততঃ করে নাই।'

চতুর্থ তাঁবু ২২,০০০ ফুট উচ্চে খাটানো হইয়াছিল। দলপতি রাটলেজ কার্য্যপদ্ধতি বুঝাইয়া দিবার জন্য শের্পাদের তাঁবুতে গেলেন। রাটলেজের কথা শেষ হইলে শের্পারা যাহা বলিয়াছিল তাহা বড়ই বীরত্বব্যঞ্জক। রাটলেজ লিখিয়াছেন,—

One can treat these porters as fellow mountaineers, and I explained the whole plan to them. They responded at once. "Don't be anxious. We mean to do our bit and carry those loads as far as we possibly can. You'll see to-morrow. Then it's up to the sahibs to climb the mountain." There was no noisy demonstration, just a quiet statement of fact and a complete self-confidence. (পৃঃ ১১৫)

শের্পারা পর্ব্বত-আরোহণে তাঁহাদের সমান পটু—রাটলেজ সাহেব এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। রাটলেজের কথায় শের্পারা বলিয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের অংশ (অর্থাৎ ভারী মালপত্র উচ্চতর স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া) নিশ্চয়ই করিবে। ইহার পরেই কিন্তু সাহেবদের আরোহণের পালা!

শের্পাদের সাহস, বীরত্ব ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার বিষয় প্রসঙ্গতঃ যৎসামান্যই এখানে উল্লেখ করিলাম। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, এভারেষ্টের ন্যায় পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ আরোহণেও ভারতীয়েরা অপটু নহে। যুগে যুগে শত সহস্র সমতলস্থ ও পাহাড়ে অঞ্চলের ভারতবাসী বিদেশী অভিযানকারীদের মত পর্ব্বত আরোহণ করিয়া আসিতেছে। তীর্থভ্রমণ ব্যপদেশে প্রতি বৎসর পুণ্যার্থীরা কেদারনাথ-বদ্রিনাথ, এমন কি কৈলাস ও মানস-সরোবর পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'হিমালয়পারে কৈলাস ও মানস-সরোবর' পুস্তকখানি ইহার আংশিক প্রকাশ মাত্র। গত বৎসর শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মানস-সরোবর পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া আলোকচিত্র সহযোগে বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। শিবাজী ও তাঁহার সৈন্যরা কিরূপ পর্ব্বত আরোহণে পটু ছিলেন তাহা মোগল-দরবারে তাঁহাদের "Mountain Rats" বা 'পার্ব্বত্য মূষিক' আখ্যা হইতে বুঝা যায়। এখন এমন বৎসর যায় না যে, হিমালয়ের কোন-না-কোন শৃঙ্গ আরোহণে পাশ্চাত্য অভিযানকারীরা গমন না করিয়া থাকেন। আগামী বৎসর এভারেষ্ট-শৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টা পুনরায় করা হইবে বলিয়াছি। ইহা ছাড়া, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী ও নেদারল্যাণ্ডস্ হইতে তিন দল অভিযানকারী হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের অন্য কতকগুলি শৃঙ্গ আগামী বৎসর আরোহণ করিবার অনুমতি ভারত-সরকারের নিকট হইতে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এভারেষ্ট-আরোহণের তথ্য বহুলাংশে আমাদের এখন জানা। ভারতবাসী অভিযানকারী কোন দল কি এভারেষ্ট ও অন্যান্য শৃঙ্গ আরোহণ করিতে অগ্রসর হইবে না?
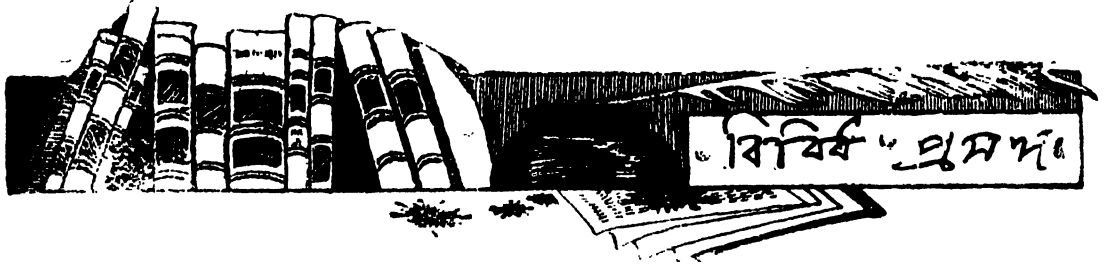
সর্ সামুয়েল হোরের মিথ্যা স্বজাতিশ্লাঘা

জেনিভাস্থিত রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি-সভার (লীগ অব্ নেশান্সের এসেম্ব্লীর) গত ১১ই সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান পররাষ্ট্রসচিব ও ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব সর্ সামুয়েল হোর যে বক্তৃতা করেন, রয়টরের টেলিগ্রাম অনুসারে তাহার মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি ছিল।

In accordance with what we believe to be the underlying principles of the League we steadily promote the growth of self-government in our own territories. For example, only a few weeks ago, I was responsible for helping pass through the Imperial Parliament a great and complicated measure to extend self-government to India.

তাৎপর্য্য। যে সমুদয় নীতি রাষ্ট্রসংঘের ভিত্তিভূত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, তদনুসারে আমরা আমাদের অধিকৃত দেশসমূহে অবিচলিত-ভাবে ক্রমাগত স্বশাসন বৃদ্ধির চেষ্টা করি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কয়েক সপ্তাহমাত্র পূর্ব্বে, আমি ভারতবর্ষকে স্বশাসন দিবার নিমিত্ত সাম্রাজ্যিক পার্লেমেণ্টে একটি মহৎ (বা বৃহৎ) ও জটিল আইন পাস করিতে সাহায্য করিবার নিমিত্ত দায়ী ছিলাম।

নূতন যে ভারত-শাসন আইন এই বৎসর ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে পাস হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভারতবর্ষে স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যদি তাহার পূর্ব্বে স্বশাসন অল্প পরিমাণে ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে এই নূতন আইনের দ্বারা তাহার পরিমাণ বাড়ানও হয় নাই। অতএব, কোন অর্থেই সর্ সামুয়েল হোরের কথা সত্য নহে।

—

সর্ সামুয়েল হোরের কথার প্রতিবাদ আবশ্যক

জেনিভার রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি-সভায় যে কয় জন ভারতীয় "প্রতিনিধি"র কাজ করেন, তাঁহারা ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের প্রতিনিধি। তাঁহারা যদি ভারতবর্ষের জনপ্রতিনিধি হইতেন, যদি তাঁহারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সর্ সামুয়েল হোরের এই মিথ্যা বড়াইয়ের প্রতিবাদ করিতে পারিতেন ও করিতেন। তাহা তাঁহারা করিতে পারিবেন না, করিবেন না। যদি তাঁহারা সর্ সামুয়েলের মিথ্যা কথার সমর্থন করেন, তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মিথ্যা কথার প্রচার এই নূতন হইতেছে না। বহু বৎসর হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে। কখন কখন কোন কোন দেশের সরকারী লোকদের দ্বারা এই অসত্য প্রচার হয়, কখন কখন তাহারা পশ্চাতে থাকিয়া অন্য লোকদের দ্বারা ইহা করায়, কখন বা লাভের লোভে অন্য দেশের লোকেরা ব্রিটিশ লোকদের উৎসাহ ও প্রশ্রয়ে ইহা করে। ভারতবর্ষের লোকদের এরূপ জনবল, অর্থবল ও বিদেশে সত্য সংবাদ প্রেরণের স্বায়ত্ত উপায় নাই, যাহার দ্বারা এই সমস্ত মিথ্যা কথার, সম্পূর্ণ প্রতিকার না হউক, অন্ততঃ যথাসময়ে ও যথাস্থানে প্রতিবাদ হইতে পারে। সত্য সংবাদ প্রেরণের স্বায়ত্ত উপায়ের কথা এই জন্য উল্লেখ করিয়াছি, যে, ভারতবর্ষ হইতে ডাকযোগে বা তারযোগে প্রেরিত সত্য সংবাদ বাহিরে না পৌঁছিতে পারে।

ভারতবর্ষের স্বশাসনলাভ-প্রচেষ্টা অবশ্য প্রধানতঃ, প্রায় সম্পূর্ণ রূপে, ভারতবর্ষেই চালাইতে হইবে, ইহা যেমন সত্য, তেমনি ইহাও সত্য, যে, জগতের সভ্য জাতিসমূহকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অবিকৃত প্রকৃত কথা জানান আবশ্যক। যাঁহাদের মানস দৃষ্টি ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের সভ্য জগৎ উভয়ত্র প্রসারিত, তাঁহারা অনেক বৎসর হইতে ইহা অনুভব করিয়া আসিতেছেন। গত কয়েক বৎসর স্বশাসন-লাভ-প্রচেষ্টা বলবতী হওয়ায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা ও কুৎসার প্রচারচেষ্টাও খুব বাড়িয়াছে। সেই জন্য, তাহার প্রতিকার ও প্রতিবাদের ইচ্ছাও ভারত-হিতকামীদিগের মনে প্রবল হইয়াছে। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া পরলোকগত বিঠলভাই পটেল তাঁহার উইলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে

এক লক্ষ টাকা এই প্রকার কাজের জন্য দিয়া যান। কিন্তু তাঁহার অছিরা এই টাকা না দিবার চেষ্টাই করিতেছেন। কংগ্রেস যদিও ভারতবর্ষের বৃহত্তম প্রতিনিধিসমষ্টি, তথাপি অনুরুদ্ধ হইয়াও ইহা এ বিষয়ে কিছু করিতে পারেন নাই বা করেন নাই।

এ অবস্থায় জেনিভায় ও সুইটজার্ল্যাণ্ডের অন্যত্র এবং অন্য সব সভ্য দেশে সর্ সামুয়েল হোরের অসত্য কথার প্রচার হইবা মাত্র তথাকার বেসরকারী ভারতীয়দের তাহার প্রতিবাদ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। সংবাদপত্রে লিখিয়া বা প্রকাশ্য সভায় মৌখিক ইহার প্রতিবাদ হইতে পারে।

—

সর্ সামুয়েল হোরের স্বজাতিশ্লাঘা কেন ভিত্তিহীন

নূতন ভারতশাসন আইন দ্বারা ভারতবর্ষকে স্বশাসন-অধিকার দেওয়া হইয়াছে বা ঐ অধিকার আগে হইতে কিছু থাকিলে তাহা বিস্তৃততর করা হইয়াছে, এরূপ কথা যে অসত্য, তাহা এদেশে সংবাদপত্রের পাঠকদের নিকট নূতন নহে। কারণ, যত দিন ধরিয়া বিলাতী পার্লেমেণ্টে এই আইনের খসড়ার আলোচনা হইতেছিল, তত দিন বার-বার খবরের কাগজে দেখান হইয়াছে, যে, আইনটার ধারাগুলার দ্বারা স্বশাসন-অধিকার প্রদত্ত বা বিস্তৃততর হইতেছে না। তথাপি, এখন সমগ্র আইনটা দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিবার সময় আসিয়াছে। উহা গত ৯ই সেপ্টেম্বরের গেজেট অব্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে প্রচারিত হইয়াছে, তা ছাড়া এক টাকা মূল্যে পুস্তকের দোকানে উহা কিনিতেও পাওয়া যায়। যাঁহারা ইংরেজী বুঝেন তাঁহাদের বহিখানা পড়িয়া দেখা উচিত।

সর্ সামুয়েল আইনটাকে "গ্রেট" বলিয়াছেন। এই ইংরেজী শব্দের মানে মহৎ বা বৃহৎ দুই-ই হইতে পারে। ইহা বৃহৎ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্য কোন দেশের এত বড় কন্‌স্‌টিটিউশ্যন আইন বা মূল শাসনবিধি ("Constitution Act") আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। ইহার ধারার সংখ্যা ৪৭৮। তাহার অনেকগুলার উপধারা ও প্রধারা আছে। তাহার পর আছে ষোলটা তপসীল। তপসীলগুলা ছাপিতে ১৩১ পৃষ্ঠা লাগিয়াছে।

এই আইনটা এত বড় কেন হইল? তাহার কারণ আমরা বুঝিয়াছিলাম, এবং বিলাতী যে-সব পার্লেমেণ্ট-সভ্য তথাকার গবন্মেণ্টপক্ষীয় নহেন তাঁহারাও বলিয়াছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বশাসনক্ষমতা দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য হইলে তদনুরূপ আইন অল্প কয়েকটি ধারায় অল্প কথায় বিধিবদ্ধ হইতে পারিত। ভারতবর্ষ স্বশাসনক্ষমতা পাইবে না ইহা স্পষ্ট ভাষায় জানান অভিপ্রেত হইলে তাহাও অল্প কথায় বলা যাইতে পারিত। কিন্তু বাস্তবিক স্বশাসনাধিকার দেওয়া হইতেছে না, অথচ বিলাতী দাতারা মনে করেন বা অন্য সকলকে বুঝাইতে চান, যে, মস্ত একটা চীজ দেওয়া হইতেছে, এই জন্য বহু বাক্যের ব্যয় আবশ্যক হইয়াছে। সেই কারণে ইহা জটিলও হইয়াছে।

অতএব ইহা যে একটা বৃহৎ আইন তাহা ভারতীয়েরাও স্বীকার করে। কিন্তু ভারতীয়েরা ইহাকে মহৎ বলিতে পারে না। যদি অন্যকে বঞ্চিত করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায়কে "মহৎ" বলা ইংরেজী অভিধান-সম্মত হয়, তাহা হইলে ইংরেজরা ইহাকে মহৎ বলিতে পারে।

স্বশাসনের অধিকার কোন দেশকে সম্পূর্ণ দেওয়া হইয়াছে প্রমাণ করিতে হইলে দেখাইতে হইবে, যে, সেই দেশের স্থায়ী বাসিন্দা জনগণ, জনপ্রতিনিধিগণ, কোন একটা শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোক, কিংবা অন্ততঃ এক জন মানুষ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের অধিকারী হইয়াছে। ভারতবর্ষে সেরূপ কিছু ঘটে নাই। যদি প্রমাণ করিতে হয়, যে, কোন দেশ আংশিক স্বায়ত্তশাসন পাইয়াছে, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে, যে, অন্ততঃ একটি কোন বিভাগে বা বিষয়ে সেই দেশের লোকেরা, প্রতিনিধিরা বা অন্ততঃ এক জন কেহ চূড়ান্ত ক্ষমতা পাইয়াছে। ১৯৩৫ সালের নূতন ভারতশাসন আইন সেরূপ কোন অবস্থার সৃষ্টি করে নাই। সকল বিভাগেই গবর্ণর, গবর্ণর-জেনার্যাল, ভারতসচিব, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট প্রভু। যদি প্রমাণ করিতে হয়, যে, ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন নূতন আইনের ফলে বিস্তার লাভ করিবে, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে, আগে যে-যে বিষয়ে বা যে-বিষয়ে দেশের লোকদের বা দেশের কাহারও চূড়ান্ত ক্ষমতা ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক বিষয়ে তাহাদের চূড়ান্ত ক্ষমতা ঘটিবে। কিন্তু নূতন আইন সেরূপ কোন পরিবর্ত্তন সাধন করে নাই। সত্য বটে, এখন কয়েকটা বিভাগের পরিবর্ত্তে সব বিভাগ মন্ত্রীদের হাতে "হস্তান্তরিত" হইবে। কিন্তু তাহা নামে মাত্র। তাঁহারা

কোন চূড়ান্ত অধিকার পাইবেন না। তাঁহাদিগকে শুধু যে গবর্ণরের কৃপার ভিখারী থাকিতে হইবে, তাহা নহে, সিভিলিয়ান সেক্রেটরীদের, সিভিলিয়ানদের এবং পুলিসের ইন্সপেক্টর-জেনারাল্যালের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে।

অন্য দিকে, আইনটার খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারা জানেন, এই আইনে গবর্ণর-জেনার‍্যাল ও গবর্ণরদিগকে এমন সব ক্ষমতা দিয়াছে, যাহা এপর্য্যন্ত তাঁহাদের ছিল না, এবং যাহা ব্রিটিশ সম্রাটের, কোন সভ্য স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশের রাজার, জাপানের সম্রাটের, আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের প্রেসিডেণ্টের, ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্টের, প্রভৃতির নাই। তাহা পরে বলিতেছি।

গবর্ন্মেণ্টের কাজ, রাষ্ট্রীয় কাজ, টাকা নইলে চলে না। সুতরাং কোন দেশ স্বশাসন-অধিকার পাইয়াছে বলিলে আর্থিক বিষয়ে ইহাই বুঝায়, যে, ঐ দেশ নিজের রাজস্ব কি প্রকারে ব্যয়িত হইবে তাহা নিজেই স্থির করিবে। কিন্তু নূতন আইনে সে অবস্থা ঘটায় নাই। যদি বলেন, স্বশাসন-অধিকার আগে যতটুকু ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত হইল, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে, যে, আগে রাজস্বের শতকরা যত অংশের ব্যয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা দেশ-প্রতিনিধিরা করিতে পারিতেন, এখন তাহা অপেক্ষা বেশী অংশের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। নূতন আইনের ফলে তাহাও ঘটিবে না।

সামরিক পররাষ্ট্রিকাদি যে-যে বিভাগের ব্যয়, এবং উচ্চ কর্ম্মচারীদের বেতন, পেন্সান, সুদ প্রভৃতি নামঞ্জুর বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভার থাকিবে না, তাহাতেই এখন রাজস্বের শতকরা ৮০ টাকা খরচ হয়। বাকী শতকরা কুড়ি টাকার ব্যয়েও ব্যবস্থাপক সভা চূড়ান্ত ভাবে হ্রাস বা নামঞ্জুর করিতে পারিবে না; কারণ গবর্ণর-জেনার‍্যাল তাঁহার বিশেষ শক্তি ("special power") অনুসারে ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা নামঞ্জুর-করা বা কমান বরাদ্দ বজেটে আবার বসাইয়া দিতে পারিবেন। সুতরাং আর্থিক সব ব্যাপারে গবর্ণর-জেনার‍্যাল দেশের লোকদিগকে ও দেশ-প্রতিনিধিদিগকে গম্ভীরভাবে বলিতে পারিবেন, "ঘরকন্না, সর্ব্বস্ব, তোমাদের; কেবল সিন্দুকের চাবিটি আমার।"

কোন দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিলে বুঝায়, সেখানকার লোকেরা দেশরক্ষার অধিকার পাইয়াছে; উহা বিস্তৃততর হইয়াছে বলিলে বুঝায়, আগে দেশরক্ষাবিষয়ে তাহারা যাহা করিতে পাইত, এখন তাহা অপেক্ষা আরও কিছু করিতে পাইবে। এই দুইটির মধ্যে কোনটিই ঘটে নাই, ঘটিবে না, বরং অন্য দিকে, এখন তবু সামরিক-বিভাগের ভারতীয়তাপাদনের ("Indianization"এর) কথা শোনা যায়, কিন্তু নূতন আইনে সেরূপ কোন কথার লেশমাত্রও নাই।

নূতন আইন অনুসারে গবর্ণর-জেনার‍্যাল ও গবর্ণরেরা অর্ডিন্যান্স জারি করিতে ত পারিবেনই, একা একা এরূপ সব আইন করিতে পারিবেন, যেগুলা ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সাহায্যে ও মারফতে প্রণীত আইনসমূহের সমান বলবৎ ও স্থায়ী হইবে। তা ছাড়া, গবর্ণর-জেনার‍্যাল বা কোন গবর্ণর ব্যবস্থাপক সভা ও মন্ত্রীটন্ত্রী সকলের হাত হইতে সব ক্ষমতা নিজের হাতে লইয়া সকল বিভাগের কাজ বা কোন কোন বিভাগের কাজ যেরূপ খুশী চালাইতে পারিবেন। তাঁহার মতে কোন সময়ে এরূপ করা দরকার মনে হইলেই তিনি তাহা করিতে পারিবেন। অবশ্য গবর্ণর-জেনার‍্যাল ও গবর্ণরেরা ব্রিটিশ জাতীয়ই হইবেন—ক্বচিৎ কোন ভারতীয় গবর্ণর হইলেও তিনি ব্রিটিশ জাতির সম্পূর্ণ অনুগ্রহজীবীই হইবেন।

এবম্বিধ শাসনকে স্বশাসন বলা অসঙ্গত।

প্রত্যেক স্বশাসক দেশ অন্যান্য স্বশাসক দেশের সহিত বাণিজ্যাদি বিষয়ে এবং পরস্পরের অধিবাসীরা কিরূপ সর্ত্তে পরস্পরের দেশে যাতায়াত-বসবাসাদি করিতে পারিবে বা পারিবে না তদ্বিষয়ে সন্ধি চুক্তি প্রভৃতি করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকদের, তাহাদের প্রতিনিধিসমষ্টি ব্যবস্থাপক সভাসমূহের, এই প্রকার পররাষ্ট্রসম্বন্ধীয় কোন কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। এই বিভাগ গবর্ণর-জেনার‍্যালের সম্পূর্ণ অধীন থাকিবে।

এরূপ বন্দোবস্তকেও ত স্বশাসন বলা যায় না।

প্রত্যেক স্বাধীন বা স্বশাসক দেশ সময়বিশেষে ও অবস্থাবিশেষে নিজ বাণিজ্য, বাণিজ্যজাহাজ এবং পণ্যশিল্পের কারখানা আদি রক্ষার জন্য, কিংবা তৎসমুদয় গড়িয়া তুলিবার জন্য কিংবা তৎসমুদয়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিজের দেশের লোকদিগকে এমন সব সুবিধা দিয়াছে বা দিয়া থাকে যাহা বিদেশীদিগকে দেওয়া হয় না। এই উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে আমদানী জিনিষের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসান হয়। ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের কথাই ধরুন। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যেকে নিজের নিজের সুবিধার জন্য এখনও এই নীতি অনুসারে কাজ করিতেছে। ব্রিটেন যে বাণিজ্যে, পণ্যশিল্পে, বাণিজ্যজাহাজ নির্ম্মাণ ও চালান বিষয়ে এত অগ্রসর, সেও এখনও এই নীতি অনুসারে কাজ করিতেছে। এই সেদিনও ব্রিটিশ বাণিজ্যজাহাজসমূহকে সাহায্য দিবার জন্য দুই নিযুত পৌণ্ড (প্রায় তিন কোটি টাকা) মঞ্জুর হইয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভা এইরূপ কিছু করিতে গেলে, যদি গবর্ণর-জেনার্যাল মনে করেন, যে, তদ্দ্বারা ব্রিটিশ বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পাদির ক্ষতি হইবে, তাহা হইলে তিনি নিজের খুশী অনুসারে ভারতীয় বাণিজ্য, পণ্যশিল্পাদিকে সাহায্য করিবার এরূপ চেষ্টা বন্ধ করিতে পারিবেন—তাঁহাকে কোন কারণ দেখাইতে বা কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না।

মনে রাখিতে হইবে, কোম্পানীর আমলে নানা অন্যায় উপায়ে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প লৌহশিল্প বাণিজ্যজাহাজ প্রভৃতির প্রভূত ক্ষতি, প্রায় উচ্ছেদ, করা হয় ঐ ঐ ব্রিটিশ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য। অথচ এখন ভারতবর্ষকে ঐ সব ও অন্যান্য শিল্পের পুনরভ্যুদয় সাধনার্থ ফলপ্রদ কিছু করিবার পথে বাধা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা গবর্ণর-জেনার্যালকে দেওয়া হইয়াছে। শুধু তাই নয়। যদি কোনক্রমে কোন ভারতীয় পণ্যশিল্পকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াই যায়, তাহা হইলে ব্রিটিশ-মানুষদের ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত কারখানা সে সাহায্য পাইতে পারিবে, নূতন ভারতশাসন আইনে এইরূপ ব্যবস্থা আছে!

এবম্প্রকার ব্যবস্থাকেও সর্ সামুয়েল হোর স্বশাসন অধিকার মনে করেন!

দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। কিন্তু আপাততঃ এই বলিয়া এই খানেই থামি, যে, বর্ত্তমান বৎসরের ভারতশাসন আইন ভারতবর্ষকে স্বরাজ দেওয়া বা স্বরাজের দিকে একটি ছোট ধাপও অগ্রসর করা দূরে থাক, স্বরাজের বিপরীত দিকেই তাহাকে লইয়া গিয়াছে। —

সর্ সামুয়েল হোরের বক্তৃতার অযৌক্তিকতা

ভারতবর্ষকে স্বশাসন-অধিকার দিবার বড়াইয়ের পরেই সর্ সামুয়েল বলেন :—

"Following the same line of thought, we believe that small nations are entitled to collective protection for the maintenance of their national life."

তাৎপর্য্য। "ঐ চিন্তারেখার অনুসরণ করিয়া আমরা বিশ্বাস করি, যে, ক্ষুদ্র জাতিরা তাহাদের জাতীয় জীবন বজায় রাখিবার নিমিত্ত শক্তিসমষ্টির দ্বারা রক্ষিত হইবার যোগ্য।" [ইহা কি সত্য, যে, প্রবল কোন শক্তির অধীনে পরাধীন কোন দেশের জাতীয় জীবন বজায় থাকে? প্রবাসীর সম্পাদক।]

কিন্তু ভারতবর্ষ ত কতকগুলি শক্তির সমষ্টি দ্বারা "রক্ষিত" হইতেছে না, একটি শক্তির, ব্রিটিশ শক্তির, দ্বারা, "রক্ষিত" হইতেছে। যদি বলেন, ভারতীয়েরা 'ক্ষুদ্র" জাতি নহে, অতএব সর্ সামুয়েলের যুক্তি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খাটে না, তাহা হইলে তাহার উত্তর নানা রকম হইতে পারে। জাতির লোকসংখ্যা অনুসারে তাহাকে গ্রেট (বড়) বা স্মল (ছোট) বলা হয় না। ব্রিটিশ জাতির লোক-সংখ্যা, জাপানী জাতির লোকসংখ্যা, ভারতীয় জাতির লোকসংখ্যার চেয়ে অনেক কম। কিন্তু তাহারা গ্রেট পাওয়ার্স (বৃহৎ শক্তি), ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র জাতি, গ্রেট বা স্মল কোন রকম পাওয়ারই (শক্তিই) নহে। সুতরাং সর্ সামুয়েল হোর যখন আবিসীনিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, যে, তাহা শক্তিসমষ্টি দ্বারা রক্ষিত হইবার যোগ্য, তখন মুসোলিনী বলিতে পারেন, "বহুৎ আচ্ছা, আপনাদের জমিদারী ভারতবর্ষকে শক্তিসমষ্টির তত্ত্বাবধানে আনুন, তাহা হইলে আবিসীনিয়াকেও শক্তিসমষ্টির তত্ত্বাবধানে স্থাপনে আমি আপত্তি করিব না।" উত্তরে সর্ সামুয়েল বলিতে পারেন, "আমরা ত একাই ভারতবর্ষের হেপাজত করিতেছি এবং তাহাকে স্বশাসনে পৌছাইয়াছি, শক্তিসমষ্টি দ্বারা রক্ষিত হওয়া ভারতের পক্ষে অনাবশ্যক।" প্রত্যুত্তরে মুসোলিনী বলিতে পারেন, "তাহা হইলে ইতালীও একা আবিসীনিয়ার তত্ত্বাবধান ও 'রক্ষা'র ভার লইতে প্রস্তুত ও রাজী আছে এবং পৌনে দুই শত বৎসর উহার মালিক থাকিবার পর ইতালী 'আবিসীনিয়া-শাসন আইন' দ্বারা তাহাকে ২১১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বশাসনে পৌছাইয়া দিবে।

ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র জাতি নহে, একথা অবশ্য সর্ সামুয়েল হোর বলিতে পারেন, এবং তর্ক করিতে পারেন, যে, যে-হেতু ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র জাতি নহে অতএব উহা শক্তিসমষ্টির তত্ত্বাবধানে থাকিবার যোগ্য নহে। তাহার উত্তরে মুসোলিনী বলিতে পারেন, "ভারতবর্ষ বড় দেশ বলিয়া যেমন বিশাল

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতি ব্রিটেনের তত্ত্বাবধানে থাকিবার যোগ্য, তেমনি আবিসীনিয়া ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ইতালীয় সাম্রাজ্যের প্রভু ইতালীর তত্ত্বাবধানে থাকিবার যোগ্য।"*

—

এসিয়া ও আফ্রিকার কাঁচা মালের ভাগাভাগি

এসিয়া ও আফ্রিকার অশ্বেত জাতিদের পক্ষে পরম সান্ত্বনাদায়ক আর একটি কথা সর্ সামুয়েল হোর বলিয়াছেন। যথা—

"As regards colonial raw materials, it is not nnatural for the existing state of affairs to arouse ars of exclusive monopolies at the expense of ries not possessing colonial empires. It may be, problem has been exaggerated, but we will be dish to ignore it. Britain should be ready te cipate in the investigation of these matters."

তাৎপর্য্য। ঔপনিবেশিক কাঁচা মাল সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, বর্ত্তমান অবস্থায়, যে-সব দেশের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য নাই তাহাদের পক্ষে অসুবিধাজনক তদ্রূপ সাম্রাজ্যশালী অন্য দেশসকলের দ্বারা কাঁচামাল-সমূহে একচেটিয়া অধিকারের আশঙ্কার উদ্রেক অস্বাভাবিক নহে। হইতে পারে, যে, এই সমস্যাটিকে বাস্তবের চেয়ে বড় করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব না মানা আমাদের পক্ষে মূঢ়তা হইবে। এই সব ব্যাপারের তদন্তে যোগ দিতে ব্রিটেনের প্রস্তুত থাকা উচিত।

উপনিবেশের ঠিক্ অর্থ সেই দেশ যাহা অন্য দেশ হইতে আগত লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছে—যেমন কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি। কিন্তু ইউরোপীয়েরা যে-সব দেশ দখল করিয়াছে অথচ তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হয় নাই, সেগুলাকেও তাহারা চলিত ভাষায় উপনিবেশ বলিয়া থাকে; যেমন ভারতবর্ষ, জাভা, কাম্বোডিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশ। সর্ সামুয়েল হোরের উল্লিখিত সমস্যাটা এই, যে, ব্রিটেন ফ্রান্স হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ তাহাদের "উপনিবেশ"গুলি হইতে যেরূপ সহজে ও বেশী পরিমাণে কাঁচা মাল আহরণ করিয়া তাহা হইতে তাহাদের কারখানার সাহায্যে তৎসমুদয়কে মূল্যবান পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়া বিক্রী করে, ইতালী ও অন্য কোন কোন দেশ তাহা করিতে পারে না। অতএব ইতালী বলিতে পারে, "তোমাদের সাম্রাজ্যের কাঁচা মালে তোমাদের একচেটিয়া অধিকার আছে; কাঁচা মাল সংগ্রহের জন্য আমাদিগকেও ঐরকম একটা সাম্রাজ্য অর্জ্জন করিতে দাও।" সর্ সামুয়েল বলিতেছেন, এই রকম বিষয়ের আলোচনায় যোগ দিতে ব্রিটেনের প্রস্তুত থাকা উচিত। বটেই ত!

মেজর বামনদাস বসু তাঁহার কোন কোন গ্রন্থে ও প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "colonization means displacement." "উপনিবেশস্থাপনের অর্থ আদি বাসিন্দাদিগকে স্থানচ্যুত করা।" কোন কোন মহাদেশে ও দেশে এই স্থানচ্যুতি সংসাধিত হইয়াছে নির্ম্মূলীকরণ বা প্রায় নির্ম্মূলীকরণ দ্বারা—যেমন উত্তর আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায় ও আফ্রিকার অনেক দেশে। ভারতবর্ষের মত দেশে এই রকমের স্থানচ্যুতি সম্ভবপর হয় নাই। এখানকার কাঁচা মাল যাহাতে প্রধানতঃ ব্রিটেন প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের লোকেরা কারখানায় দামী জিনিষ তৈরি করিবার জন্য ব্যবহার করিতে পারে তাহার চেষ্টাই করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোকেরা আগে যেমন ভাল চাষী ছিল, তেমনি সুদক্ষ পণ্যশিল্পীও ছিল। বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত কারখানার যুগেও তাহারা সেইরূপ সুদক্ষ পণ্যশিল্পী হইতেই পারিত; কিন্তু তাহাদিগকে তদুপযোগী শিক্ষা ও সুবিধা দেওয়া হয় নাই, বরং অসুবিধা ও বাধারই সৃষ্টি হইয়াছে, এই বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা এখানে হইতে পারে না। বিস্তারিত বৃত্তান্ত মেজর বামনদাস বসু প্রণীত "রুইন্ অব্ ইণ্ডিয়ান ট্রেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ" নামক পুস্তকের সদ্য প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে দ্রষ্টব্য।

এখানে কেবল ইহা বলিলেই চলিবে, যে, ইউরোপীয়েরা বরাবর এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছে, যে, এসিয়া ও আফ্রিকা তথাকার আদি অধিবাসীদের সম্পূর্ণ ব্যবহারের জন্য নহে। ইউরোপীয়েরা তথাকার যে-যে অঞ্চলে বসবাস করিতে পারে, তথায় তাহা করিবে। যদি তদর্থে বা তাহার ফলে আদি অধিবাসীরা নির্ম্মূল বা দাসবৎ হয়, তাহা হইবে। যে-সব অঞ্চল ইউরোপীয়দের বসবাসের যোগ্য নহে, তথাকার অধিবাসীরা ইউরোপীয়দের জন্য কাঁচা মাল উৎপন্ন করিবে—তাহারা সেগুলা নিজেদের কারখানায় মূল্যবান পণ্যে পরিণত

* রাষ্ট্রসংঘের (League of Nations-এর) ব্যবহার অনুসারে স্মল নেশুন বা ক্ষুদ্র জাতির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মডার্ণ রিভিয়ুর গত জুন সংখ্যার ৭২৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

করিবে, ইহা ইউরোপীয়দের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ ও কল্পনার অতীত। *

এই জন্য সর্ সামুয়েল বলিয়াছেন, যে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যাধিকারীরা সব কাঁচা মাল একা গ্রাস করিবে, অন্য ইউরোপীয়েরা তাহা পাইবে না—এরূপ আশঙ্কা অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার কিংবা অন্য ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞদের একথা মনে উদিত হয় না, যে, ইউরোপীয়রা যে-সব দেশ দখল করিয়াছে, তথাকার আদি অধিবাসীরা এখন বা ভবিষ্যতে নিজেরাই সব কাঁচা মাল কারখানাপণ্যে পরিণত করিতে চায়। ইউরোপীয়েরা অশ্বেত জাতিদিগকে বলিতে পারে, "তোমরা ত তোমাদের খনির তেল, কয়লা, লোহা, তামা ইত্যাদি কাজে লাগাইতে পারিতেছ না; সুতরাং আমাদিগকেই ব্যবহার করিতে দাও।—অবশ্য, রাজী না হও, ত, ছলে-বলে-কৌশলে ব্যবহার করিবই।" অশ্বেতরা বলিতে পারে, "তাহা হইলে কি যাহারা যে-দেশে জন্মিয়াছে সে-দেশে তাহাদের কোনই স্বাভাবিক অধিকার নাই? যদি না-থাকে তাহা হইলে ইউরোপের এক দেশ প্রবলতর হইলে দুর্ব্বলতর অন্য দেশকেও ত তাহারা স্বাভাবিক সম্পত্তি হইতে বেদখল করিতে পারে—যেমন ফ্রান্স বহু বৎসর জার্মেনীকে করিয়াছিল, জার্মেনী বেলজিয়ামকে বেদখল করিতে চাহিয়াছিল, কারণ ইউরোপেরও কোন দেশেরই লোকেরা বলিতে পারে না, যে, তাহারা স্বদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সম্পূর্ণ ব্যবহার এপর্য্যন্ত করিয়াছে বা এখন করিতেছে।"

বস্তুতঃ, "জোর যার মুলুক তার," বাক্যটা শ্বেত অশ্বেত অখ্রীষ্টীয়ান নির্বিশেষে সকলের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়ানরা জানিয়া রাখুন, জাপানীরা সেইরূপ প্রয়োগের জন্য কতকটা প্রস্তুত হইয়াছে এবং আরও প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতে ভারতীয়দের স্বাধিকার স্থাপনে বাধা

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় সমুদয় ব্যাপারে ও বিভাগে, কারখানা-শিল্পে, কুটীরশিল্পে, কৃষিতে, বাণিজ্যে, যানবাহনে স্বভাবতঃ ও ন্যায়তঃ ভারতীয়দেরই সম্পূর্ণ অধিকার। এখন অনেক দিকে ও অনেক বিষয়ে অন্যেরা তাহাদের স্থানে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতীয়দিগকে সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে স্বাধিকার স্থাপন করিতে হইবে। বর্ত্তমান ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন যেমন রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহে ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে নাই, সুদূর ভবিষ্যতেও স্বরাজস্থাপনের কোন আশা বা আভাস দেয় নাই, তেমনি বাণিজ্যিক আদি আর্থিক সব বিষয়েও ভারতবর্ষে ভারতীয় ও ব্রিটেনদিগকে সমান অধিকার দিবার অছিলায় ভারতীয়দের ন্যায্য স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় বাধা জন্মাইয়াছে। এই বাধাগুলা আইনটার ১১১ হইতে ১২১ ধারায় বর্ণিত আছে। অন্য সব দেশের স্থায়ী বাসিন্দারা স্বদেশে বিদেশীদের তুলনায় স্বভাবতই কিছু বেশী সুবিধা পাইয়া থাকে, এবং তাহা ন্যায্য—যদিও তথায় বিদেশীরা তাহাদিগকে স্থানচ্যুত না-করিয়া থাকিতে পারে এবং বস্তুতঃ অধিকাংশ স্থলেই করে নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে ভারতীয়েরা ব্রিটনদের দ্বারা নানা দিকে স্থানচ্যুত হইয়া থাকিলেও, এদেশে ব্রিটন ও ভারতীয়কে সমান সুবিধা দিতে হইবে; না দিলে তাহা হইবে "ডিসক্রিমিনেশ্যন"! এবং এ রকম "ডিসক্রিমিনেশ্যনে"র বিরুদ্ধে মানুষের বুদ্ধিতে যত রকম ফন্দী আসে, আইনে তাহা অবলম্বিত হইয়াছে।* ভারতবর্ষে সব বিষয়ে ব্রিটন ও ভারতীয়দিগকে নামতঃ সমান করিবার ন্যায্যতা কি জানেন? শুনুন—

"There is no legal or administrative discrimination of that kind against Indians in this country."—Mr. Hugh Molson in *The Asiatic Review* for July 1935, p. 457.

অর্থাৎ "এদেশে (বিলাতে) আইনে বা শাসকদের ব্যবহারে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ওরূপ কোন ডিসক্রিমিনেশ্যন নাই।"

ইংরেজরা স্বদেশে সব রাষ্ট্রীয় এবং বাণিজ্যিক ও অন্যবিধ আর্থিক ব্যাপারে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভারতীয়েরা

* "There is no time in the future to which we can look forward where India will be producing the higher grades of manufactured goods."—Mr. Hugh Molson, M. P., in *The Asiatic Review* for July, 1935, p. 458.

* "Under the Bill there are as full and complete prohibitions of discrimination as the ingenuity of the Parliamentary draftsmen, prompted by the greater ingenuity of the European community's legal advisers, has been able to devise,........"—Mr. Hugh Molson, M.P., in *The Asiatic Review* for July, 1935.

তাৎপর্য্য। "পার্লেমেন্টের আইন-মুসাবিদাকারীদের চাতুরী ভারতপ্রবাসী ইউরোপীয়দের আইনবিষয়ক পরামর্শদাতাদের তীক্ষ্ণতর চাতুরীর প্রেরণায় ডিসক্রিমিনেশ্যনের বিরুদ্ধে যত প্রকার সম্পূর্ণনিষেধ-ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছে, (এক্ষণে আইনে পরিণত) ভারত-শাসন বিলে তাহা আছে।"

সেখানে গিয়া কোন্ স্থান পাইবে? অথচ ভারতীয়দিগকে বলা হইতেছে, "তোমরা বিলাতে আসিয়া যে-কোন পদ পার দখল কর, যে-কোন ব্যবসা চাও চালাও—আমরা ত আইন দ্বারা কোন বাধা দি নাই, অন্য বাধাও নাই!" এদিকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক প্রধান সব ব্যাপারে ইংরেজরা প্রতিষ্ঠিত, এবং বলিতেছেন, "আমাদিগকে এই সব স্থান হইতে নড়াইবার চেষ্টা করিও না!' তাহা হইলে ভারতীয়েরা যায় কোথা?"

যদি ভারতবর্ষের কোন লোক ব্রিটেনের সম্রাট হইতেন, এবং ভারতবর্ষের লোকেরা ব্রিটেনের প্রধান সেনাপতি ও প্রায় অন্য সব সেনাপতি, নৌসেনাধ্যক্ষ ও অন্য সব নৌসেনাপতি গবর্ণর-জেনার‍্যাল, গবর্ণরসমূহ, প্রায় সব জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রায় সব প্রধান বাণিজ্যতরীর মালিক, প্রায় সব বড় বণিক, প্রায় সব বড় খনির মালিক, প্রায় সমুদয় ব্যাঙ্কার ইত্যাদি হইত, তাহা হইলে ভারতীয়েরা "ব্রিটেন-শাসন আইনে" ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ডিসক্রিমিনেশুন যাহাতে না-হয় তাহার ব্যবস্থা করিত কি না, এরূপ অনুমান ও তন্মূলক আলোচনা কল্পনাশক্তির ও বুদ্ধিশক্তির অপব্যবহার হইবে। কিন্তু যদি মনে করা যায়, যে, ভারতীয়েরা সেরূপ ব্যবস্থা করিত, তাহা হইলে ইহাও মনে করা যাইতে পারে, যে, ব্রিটেনবাসীরা তাহা পছন্দ করিত না।

—

শিক্ষামন্ত্রীর সহিত বেঙ্গল এডুকেশ্যন লীগের আলোচনা

এসোসিয়েটেড্ প্রেস্ খবরের কাগজে এই সংবাদ যোগাইয়াছেন, যে,

"বাংলা দেশে শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে যে সরকারী প্রস্তাবগুলি গত ১লা আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নানারূপ সমালোচনা হইতেছে। বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের শিক্ষামন্ত্রীর আহ্বানে বেঙ্গল এডুকেশুন লীগের কয়েক জন সদস্য উক্ত লীগের সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বেশ হৃদ্যতার সহিতই প্রায় সমস্ত প্রস্তাবের বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা চলে। অনেক বিষয়ে সন্দেহ নিরসন হইয়াছে, এবং নূতন প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইয়াছে। তিন দিন আলোচনা চলিয়াছিল।"

খবরটি সম্ভবতঃ সরকার-পক্ষ হইতে এসোসিয়েটেড প্রেসকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা আশ্বিনের প্রবাসীর ৯১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম:—

"আলোচনাটি হইলে, আশা করি, প্রত্যেকের মতামত ও তাহার কারণ প্রকাশিত হইবে। তাহা হইলে সেগুলি প্রকাশ্যভাবে আলোচিত ও বিবেচিত হইতে পারিবে। নতুবা যদি আধা-সরকারী ভাবে কেবল এই গুজব রটিত হয়, যে, বঙ্গের সমুদয় চিন্তাশীল ও শিক্ষা-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি স্কীমটির অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণ তাহা গ্রাহ্য না করিতেও পারে।"

আমরা যেরূপ অনুমান করিয়াছিলাম, কতকটা সেইরূপ ঘটিয়াছে।

আলবার্ট হলে সর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের ও পরে সর্ নীলরতন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে শিক্ষাসংস্কার-সম্পর্কীয় প্রস্তাবগুলির প্রতিবাদ করিবার জন্য ২৫শে আগষ্ট সর্ব্বসাধারণের বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়, তাহার একটি প্রস্তাব অনুসারে বেঙ্গল এডুকেশুন লীগ স্থাপিত হইয়াছে। সেই জন্য, লীগের সভাপতি মহাশয় লীগের পক্ষ হইতে যাহা করিয়াছেন তাহা তিনি বা সম্পাদক মহাশয়েরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইলে ভাল হয়। এক তরফা কোন সংবাদে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না।

—

ফৌজদারী আইন সংশোধন বিলের বিবেচনা নামঞ্জুর

তিন বৎসরের জন্য যে সংশোধিত ফৌজদারী আইন প্রণয়ন ও জারি করা হইয়াছিল, এই বৎসরের শেষে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে। সেই জন্য তাহার কোন কোন ধারা বাদ দিয়া ও নূতন কিছু তাহাতে বসাইয়া এই দমনাস্ত্রটি চিরস্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে একটি বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারপক্ষ হইতে উপস্থিত করা হয়। সরকারপক্ষ হইতে এই প্রস্তাব করা হয়, যে, বিলটি বিবেচিত হউক। কয়েকদিন-ব্যাপী তর্কবিতর্কের পর নির্ব্বাচিত বেসরকারী সভ্যদের ভোটাধিক্যে এই প্রস্তাব নামঞ্জুর হইয়াছে। ইহার বিপক্ষে দশটি ভোট অধিক হয়।

গবর্ন্মেণ্টের এই পরাজয়ে গবর্ন্মেণ্ট অবশ্য নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন না, কোন-না-কোন উপায়ে বা বিলাতে নিজ অভিপ্রায়ানুরূপ একটা আইন করিবেন বা করাইবেন। প্রথমতঃ বিলটা আবার ব্যবস্থাপক সভার পুনর্বিবেচনার জন্য বড়লাটের সুপারিশসহ উহার নিকট যাইবে। বড়লাট সভাকে উহা পাস করিবার সুপারিশ করিবেন। তাহা অগ্রাহ্য হইবারই

সম্ভাবনা। তাহার পর উহা কৌন্সিল অব ষ্টেটে পেশ হইবে এবং তথায় উহা পাস হওয়া এক রকম নিশ্চিত। ব্যবস্থাপক সভায় গবর্মেণ্টের পরাজয়ে লাভ এই হইল, যে, সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজরা বলিতে পারিবে না, যে, আইনটা অধিকাংশ দেশপ্রতিনিধির মতানুসারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে—যাহা তাহারা বঙ্গের কোন কোন দমনমূলক আইন সম্বন্ধে বলিবার সুযোগ পাইয়াছে। ইহা তুচ্ছ লাভ নহে।

—

খোর্দ-গোবিন্দপুরের নরপিশাচদের শাস্তি

রাজসাহী, ১২ই সেপ্টেম্বর

অদ্য রাজসাহীর সেসন জজ মিঃ এস্. এস্. আর. হাক্কিয়ানগাদী, আই-সি-এস, খোর্দ-গোবিন্দপুর মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে জুররগণ বলিয়াছিলেন যে, ৪২ জন আসামীর মধ্যে দুই জন নির্দ্দোষ এবং অপর ৪০ জন দোষী। সেই দিনই জজ সাহেব দুই জন আসামীকে মুক্তি দিয়াছিলেন। অদ্য তিনি অপর ৪০ জনের প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন।

আসামীদলের অধিনায়ক বলিয়া বর্ণিত এরফান, দুখন, সেরা, নেছার, পালান, লেকু, আমির এবং ময়েজ—এই আট জন আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

অবশিষ্ট ৩২ জনকে দশ বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ড দান করা হইয়াছে।

নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার, অনধিকার-প্রবেশ, জোর করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ, ষড়যন্ত্র, বে-আইনী জনতা করা ইত্যাদি নানা রকমে একটি সমগ্র হিন্দু পরিবারের উপর দৌরাত্ম্য করিবার অপরাধে আসামীগণের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের কতিপয় ধারা অনুসারে চার্জ গঠিত হইয়াছিল।

অদ্য রায়প্রদানের সময় আদালতগৃহে বহু উকিল, মোক্তার ও দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল।

দণ্ডাদেশ শুনিয়া আসামীদের মধ্যে অধিকাংশই একান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে কেহ কেহ আদালতগৃহেই করুণভাবে ক্রন্দন করিয়াছিল। —এ. পি.

আসামীরা যাহা করিয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত দৈনিক ও সাপ্তাহিক অনেক কাগজে সবিস্তার ছাপা হইয়াছে। এই প্রকার দুর্বৃত্ততাকে প্রায়ই পাশবিক অত্যাচার এবং দুর্বৃত্তদিগকে নরপশু বলা হয়। কিন্তু তাহাতে পশুদের প্রতি অবিচার ও তাহাদের অপমান হয়, কারণ তাহারা এরকম কাজ করে না। যদি পিশাচ নামে অভিহিত কোন জীব থাকে, ত, তাহাদের দ্বারা এরূপ কাজ হইতে পারে বটে। জজ মহাশয় যেরূপ শাস্তি দিয়াছেন, তাহা ঠিক্ হইয়াছে।

—

শিক্ষামন্ত্রীর নূতনতম প্রস্তাব

১৩ই সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষা এবং কিয়ৎপরিমাণে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। তাহাতে নূতনতম একটি প্রস্তাব আছে বটে। তাঁহার ১লা আগষ্টের বিবৃতিতে ১৬০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ছিল। ২৫শে আগষ্টের বিজ্ঞপ্তিতে তাহা বাড়িয়া ৪৮০০০ হাজারে পরিণত হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর যে প্রস্তাবের উল্লেখ শিক্ষামন্ত্রী করেন, তাহাতে মনে হইতেছে, এখন উচ্চপ্রাথমিক ও নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মোট সংখ্যা ৬৪০০০ হইবে, অর্থাৎ বর্ত্তমানে যত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে প্রায় তত। ইহা হইলেও অবশ্য যথেষ্ট হইবে না।

সমালোচনার প্রভাবে শিক্ষামন্ত্রী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া যে বার-বার প্রস্তাব পরিবর্ত্তন করিতেছেন, একগুঁয়েমি করিয়া ভ্রান্তমতে দৃঢ় থাকিতেছেন না, ইহা প্রশংসার বিষয়। তবে, ইহাও বলিলে অন্যায় হইবে না, যে, তিনি ১লা আগষ্টের বিবৃতিটি বাহির করিবার আগে ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে ও বে-সরকারী কোন কোন লোকের সঙ্গে আলোচনা করিলে তাঁহাকে বার-বার প্রস্তাব পরিবর্ত্তন করিতে হইত না, এবং খবরের কাগজের সম্পাদকদিগকে ও অন্য শিক্ষিত লোকদিগকে তাঁহার কাঁচা প্রস্তাবগুলির বার বার সমালোচনা করিতে ও তাহা করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে হইত না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ছাড়া শিক্ষামন্ত্রী এসোসিয়েটেড প্রেসকে আর যাহা বলিয়াছেন, তাহা ১লা আগষ্টের ও ২৫শে আগষ্টের বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তিতে অপরিস্ফুট আকারে ছিল। সে-সব বিষয়ে আমরা নূতন করিয়া কিছু বলিতে চাই না।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষাদানের ব্যবস্থা বঙ্গের প্রাইমারী এডুকেশ্যন আইনে কিরূপ আছে দেখি নাই। যেমনই থাক্, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ছাত্র বা ছাত্রী যে বিদ্যালয়ে পড়ে বা পড়িবে, সেখানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত সেই সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী, ইহার জন্য সরকারী রাজস্ব হইতে অর্থব্যয়েরও আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে কারণ লিখিয়াছি। কোন একটি মাত্র সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা কোন বিদ্যালয়ে

পড়িলে ও সেই সম্প্রদায় ইচ্ছা জানাইলে, তাহার ব্যয়ে (সরকারী ব্যয়ে নহে) তাহার ছাত্রছাত্রীদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়টির আলোচনা সংক্ষেপে করা সম্ভবপর নহে। কতকগুলি মত কণ্ঠস্থ করান ও গেলান সোজা, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম বুঝান ও শিখান সহজ নহে।

—

আয়ুর্বেদ ও বাংলা-গবর্মেণ্ট

চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নাই। সুতরাং সরকারী রাজস্ব হইতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিবার বা তদনুযায়ী হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করিবার সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা আমাদের পক্ষে উচিত হইবে না। কিন্তু নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে অবান্তর এরূপ দু-একটা কথা বলা যাইতে পারে।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে আয়ুর্বেদের জন্য গবর্মেণ্ট কিছু করিয়াছেন। ১৯২৬ সালে মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্ট মান্দ্রাজে একটি আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের চেয়ে বঙ্গের আয়ুর্বেদসম্মত চিকিৎসার প্রচলন অধিক, বিখ্যাত কবিরাজ অন্য সব জায়গার চেয়ে বঙ্গে বেশী, বে-সরকারী আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়ও এখানে যত আছে অন্য কোথাও তত নাই। অথচ বঙ্গে গবর্মেণ্ট আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে এখনও কিছু করেন নাই। শুধু তাই নয়। ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরীর এই প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা গ্রহণ করেন, যে, বঙ্গে আয়ুর্বেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য যাহা আবশ্যক গবর্মেণ্ট তাহা করুন। এই প্রস্তাব অনুসারে গবর্মেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদের সাক্ষ্য লইবার পর ১৯২৪ সালে রিপোর্ট দাখিল করেন। রিপোর্টে কমিটির সভাপতি ডাঃ এস্ এন্ বাঁড়ুজ্যে, সম্পাদক কর্ণেল চোপরা (এখন ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের প্রিন্সিপ্যাল), বঙ্গের সার্জন-জেনার‍্যাল কর্ণেল গোইল, এবং পাঁচ জন বড় কবিরাজের স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু বাংলা-গবর্মেণ্ট ঐ রিপোর্ট অনুসারে কাজ করা দূরে থাক্, উহা প্রকাশ পর্য্যন্ত করেন নাই। উহাতে ত কোন পোলিটিক্যাল গুপ্ত কথা নাই, এবং উহা ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরের সুবিখ্যাত হাঙ্গামাও নয়। তবে উহা কেন প্রকাশিত হয় নাই এবং হইবে না?

—

মিঃ গৌবার ভ্রান্ত উক্তি

পঞ্জাবের মিঃ হরকিষণ লালের পুত্র মিঃ কান্‌হাইয়া লাল গৌবা কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মুসলমান হইয়াছেন। তাঁহার মোহম্মদীয় নাম মনে নাই, তবে এখনও তাঁহাকে মিঃ কে এল গৌবা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তিনি সম্প্রতি লাহোরের ঈষ্টর্ণ টাইম্‌স্ কাগজে মুসলমানদিগকে কেবল মুসলমানদের তৈরি জিনিষ কিনিতে পরামর্শ দিয়াছেন; কারণ, তাঁহার মতে হিন্দুরা "স্মরণাতীত কাল হইতে" ("from time immemorial") "হিন্দুর জিনিষ ক্রয় কর" ("Buy Hindu") এই নীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। তাহা হইলে লাঙ্কেশায়ারের কাপড়ের কলের মালিকরা ও তাঁতীরা সবাই নিশ্চয়ই হিন্দু! কেন না, হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী বলিয়া বিলাতী কাপড় যত কেনে মুসলমান খ্রীষ্টিয়ানরা তত কেনে না। জাপানী মিলওয়ালারাও বোধ করি হিন্দু, কারণ তাদের কাপড়ও হিন্দুরা কেনে। বিদেশ হইতে লৌহ আদি ধাতু ও অন্য পদার্থ হইতে নির্ম্মিত যত জিনিষ ভারতের হিন্দুরা কেনে, সবগুলাই বিদেশের হিন্দুরা প্রস্তুত করে!

কিন্তু মিঃ গৌবার আসল উদ্দেশ্য বোধ হয় এই বলা, যে, ভারতীয় মুসলমানরা যেন হিন্দুদের তৈরি জিনিষ না কেনে। এই ব্যক্তির জানা উচিত, যে, বঙ্গে (যেখানে অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেশী) স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে মৈমনসিং প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলির মুসলমান তাঁতীদের কাপড় হিন্দুরা খুব কিনিত এবং এখনও কেনে, মুসলমানদের তৈরি ও মুসলমানদের দোকানে রক্ষিত জুতা হিন্দুরা কেনে, দরজি অধিকাংশ মুসলমান ও তাহারা প্রধানতঃ হিন্দুদের জামা তৈরি করে, দপ্তরীরা প্রায় সব মুসলমান এবং হিন্দুদের বহি বাঁধাই তাহাদের আয়ের প্রধান উপায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। উত্তর-বঙ্গে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে ভীষণ বন্যা হয়, তাহাতে বিপন্ন হইয়াছিল প্রধানতঃ মুসলমানেরা এবং সাহায্য করিয়াছিল প্রধানতঃ হিন্দুরা—চরকা ও তুলা জোগাইয়া এবং উৎপন্ন

সুতা ও কাপড় কিনিয়া। বঙ্গের কোন কোন কাপড়ের মিলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ডিরেক্টর আছেন।

মিঃ গৌবা জানিয়া রাখুন, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক যদি কেবল স্বস্ব সম্প্রদায়ের তৈরি বা উৎপন্ন জিনিষ কেনে, তাহা হইলে হিন্দুরা ঠকিবে না, ঠকিবে মুসলমানেরা। কারণ, হিন্দুদের সংখ্যা বেশী, কিনিবার সামর্থ্য বেশী, এবং এমন কোন পণ্যশিল্প নাই যাহা সকল হিন্দুরই পক্ষে চিরকাল নিষিদ্ধ ছিল। এখন ত কোনটিই কোন হিন্দুর অকরণীয় নহে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে-কোন জিনিষ দরকার, কোন-না-কোন হিন্দু জাতি তাহা প্রস্তুত করে এবং চির-কাল করিয়া আসিতেছে। মিঃ গৌবা লিখিয়াছেন, "আধুনিক সময়ে হিন্দুরা গো-চর্ম্ম-নির্ম্মিত বুট ও জুতার ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।" আধুনিক সময়ে নহে, স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু চর্ম্মকারেরা (মুচি ও চামারেরা) জুতা প্রস্তুত ও বিক্রী করিয়া আসিতেছে। আধুনিক সময়ে অবশ্য অন্য জাতির হিন্দুরাও জুতা নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করিতেছে। ইহা হিন্দু মহাসভার অনুমোদিত।

স্বকীয়নাসিকাচ্ছেদনপূর্ব্বক অন্যদীয়যাত্রাভঙ্গোদ্যম সমীচীন নহে এই কারণে, যে, স্বীয় নাসিকাটির ছেদন যেরূপ ধ্রুব, অন্যের যাত্রাভঙ্গটি তদ্রূপ ধ্রুব না-হইতেও পারে।

—

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের দেয় হ্রাস

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, যে, ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রসংঘকে (লীগ অব নেশ্যন্সকে) বার্ষিক যত টাকা দিতে হয়, তাহা এক য়ুনিট কমান হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কমান হইবে কিনা তাহা বিবেচনাধীন। ভারতবর্ষের দেয় যে এক য়ুনিট কমিয়াছে, তাহা ১৯৩৪ সালের "দি লীগ ফ্রম ইয়্যার টু ইয়্যার" পুস্তকের ১৮৭ পৃষ্ঠায় আছে। এক-আধ য়ুনিট কমার জন্য আমরা ব্যগ্র নহি। লীগ ভারতবর্ষের পক্ষে অকেজো, ইহাও ঠিক। ব্রিটেনের লাঙ্গুলে বাঁধা অবস্থায় ভারতবর্ষের লীগে থাকায় লাভের চেয়ে লোকসান বেশী, তাহা ত সহজেই বুঝা যায়। যদি লীগে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়, যদি লীগের কৌন্সিলে ভারতবর্ষের এই প্রকারে নির্ব্বাচিত এক জন প্রতিনিধিকে সদস্য করিয়া লওয়া হয়, এবং যদি লীগের আফিসের দায়িত্বপূর্ণ কাজে ও কেরাণীদের মধ্যে উপযুক্তসংখ্যক ভারতীয়কে লওয়া হয়, তাহা হইলে লীগের শক্তিহীন অবস্থাতেও ভারতবর্ষের লীগের সভ্য থাকা অবাঞ্ছনীয় হইবে না। কারণ, অন্য কোন লাভ হউক বা না-হউক, জেনিভায় রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধির সভাদির অধিবেশন উপলক্ষ্যে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের বড় বড় রাজনীতিজ্ঞেরা, অর্থতত্ত্বজ্ঞেরা, স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞেরা ও সমাজতত্ত্ববিদেরা একত্র হন। তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় ও ভাব-চিন্তার আদানপ্রদান লাভজনক ও বাঞ্ছনীয়।

লীগে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্বন্ধে একটা কথা অনেকেরই জানা নাই, যে, সেখানেও আগা খাঁ ও বেগম শাহ্ নেওয়াজ মুসলমান বলিয়াই (যোগ্যতম বলিয়া নহে) মুসলমান উমেদারদেরই চাকরী পাইবার পক্ষে অপ্রকাশ্য ভাবে ওকালতী জুড়িয়া দিয়াছেন।

--

ইতালী-আবিসীনিয়া সমস্যা উপলক্ষ্যে রুশীয় প্রতিনিধির বক্তৃতা

ইতালী ও আবিসীনিয়ার বিবাদ উপলক্ষ্যে লীগ অব্ নেশ্যন্সে যে-সব আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইতেছে, তাহার মধ্যে এক দিন ইতালীর প্রতিনিধি আবিসীনিয়ার আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা করেন। এ-সব বর্ণনার উদ্দেশ্য পৃথিবীকে জানান আবিসীনিয়ার সম্রাট সুশাসক ও যোগ্য শাসক নহেন, অতএব ইতালীকে সেই দেশের রক্ষক ও উদ্ধারকর্ত্তা করা হউক। কিন্তু ইউরোপের শ্বেতকায়েরা আমেরিকা ও আফ্রিকায়, কিংবা এসিয়াতেই, কোথাও বাস্তবিক রক্ষক রূপে গিয়াছেন কি? ইহা নিশ্চিত যে ইতালীকে আবিসীনিয়ার রক্ষক করিয়া দিলে সে ভক্ষক হইবে।

ইতালী কর্ত্তৃক আবিসীনিয়ার দুরবস্থা বর্ণনা উপলক্ষ্যে রাশিয়ার প্রতিনিধি মিঃ লিটভিনফ স্বাধীনচিত্ততা ও ন্যায়-পরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন। রয়টরের টেলিগ্রাম অনুসারে তিনি সেদিন বলেন :—

"Nobody sympathized with the internal regiment of Abyssinia as demonstrated by the Italian document; but no internal conditions could deprive a state of its right to integrity and independence."

তাৎপর্য্য। "ইতালীয় দলিলটির দ্বারা প্রমাণিত আবিসীনিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালীর সহিত কেহ সহানুভূতি করে না; কিন্তু কোন আভ্যন্তরীণ অবস্থাই কোন রাষ্ট্রকে তাহার অখণ্ডত্বের ও স্বাধীনতার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।"

লিটভিনফ আরও বলেন—

"The League should stand firm on principle. No fighting should occur except in absolute self-defence."

তাৎপর্য্য। "লীগের নিজের নীতিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষার জন্য ব্যতীত কোন যুদ্ধ ঘটা উচিত নয়।"

লিটভিনফের সমগ্র বক্তৃতাটি রয়টার টেলিগ্রাফ করে নাই। উহা পাওয়া গেলে পড়িবার যোগ্য হইবে। ঐ বক্তৃতারই কোন কোন অংশ মান্দ্রাজের ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস কাগজের জেনিভা হইতে প্রাপ্ত টেলিগ্রামে এইরূপ আছে:—

"M. Litvinoff admitted that he did not sympathize with Ethiopia as described in the Italian memorandum, but that it was indispensable to protect the independence of a member of the League. There were measures other than military which could be used to civilize Ethiopia by Italy. He admitted that peace was threatened.

"M. Litvinoff, invoking Articles X, XI and XV, said that Russia joined the League to collaborate in the cause of peace and advised the Council not to shrink from the necessary decisions."

তাৎপর্য্য। "মিঃ লিটভিনফ স্বীকার করেন, যে, ইতালীয় স্মারক-লিপিতে বর্ণিত ইথিয়োপিয়ার সহিত তিনি সহানুভূতি করেন না, কিন্তু লীগের এক সদস্যের (অর্থাৎ ইথিয়োপিয়ার) স্বাধীনতা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। ইথিয়োপিয়াকে সভ্য করিবার নিমিত্ত সামরিক ভিন্ন অন্যান্য উপায় এরূপ আছে যাহা ইতালী কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইতে পারে। তিনি স্বীকার করেন, যে, শান্তিবিনাশের আশঙ্কা ঘটিয়াছে।

"লীগের কভেনাণ্টের ১০, ১১ ও ১৫ ধারার দোহাই দিয়া লিটভিনফ বলেন, শান্তিরক্ষাপ্রচেষ্টায় সহকর্ম্মী হইবার নিমিত্ত রাশিয়া লীগে যোগ দিয়াছে, এবং আবশ্যক নির্দ্ধারণসমূহে উপনীত হইতে পশ্চাৎপদ না হইতে লীগ-কৌন্সিলকে পরামর্শ দেন।"

—

বন্যায় বিপন্ন লোকদের সাহায্য

আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে লিখিয়াছি, যে, ভারতবর্ষের একাধিক প্রদেশের অনেক জেলার লোক বন্যায় বিপন্ন হইয়াছে, অনেকে গৃহহীন ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। ইহাদের সকলেরই সাহায্য পাওয়া আবশ্যক ও উচিত। যাঁহাদের শক্তি অধিক, আয়োজন বৃহৎ, তাঁহারা নানা স্থানে সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের যত অর্থাগম হয় ততই ভাল।

—

বাঁকুড়ায় অন্নাভাবে ও বন্যায় বিপন্ন লোকদের সাহায্য

আমাদের শক্তি অল্প, আয়োজন ক্ষুদ্র; এই জন্য আমরা বাঁকুড়া-সম্মিলনীর পক্ষ হইতে কেবল বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি গ্রামে সাহায্য দিবার চেষ্টা করিতেছি। এই সকল স্থানে আগে হইতেই, অজন্মা বশতঃ, অত্যন্ত অধিক অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছিল। আমরা তখনই সাধ্যমত সাহায্য দিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহার পর বন্যায় অনেক গ্রামের শত শত গৃহ বিধ্বস্ত হওয়ায় ও ভাসিয়া যাওয়ায় বিপন্ন লোকদের দুঃখ সাতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাহায্যদান এখনও কয়েক মাস চালাইতে হইবে। যাঁহারা এ-পর্য্যন্ত সাহায্য পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আশা করি তাঁহারা ডাকঘরের বা বাঁকুড়া-সম্মিলনীর রসীদ পাইয়াছেন। যাঁহারা এ-পর্য্যন্ত কিছু সাহায্য পাঠাইতে পারেন নাই তাঁহারা কিছু পাঠাইলে বাধিত হইব। যথেষ্ট টাকা আমরা এখনও পাই নাই। দাতারা শীঘ্র সদয় হউন।

—

ত্রিকালব্যাপী স্বদেশপ্রীতি

ইংরেজ কবি টেনিসনের একটি কবিতায় অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালে ব্যাপ্ত স্বদেশপ্রীতির একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি উপদেশ দিয়াছেন:—

"Love thou thy land, with love far-brought
From out the storied Past and used
Within the Present, but transfused
Thro'h future time by power of thought."

তাৎপর্য্য। কীর্ত্তিকাহিনীগৌরবমণ্ডিত অতীত হইতে সুদূর বর্ত্তমানে আনীত প্রেমের সহিত তোমার দেশকে ভালবাসিয়ো এবং বর্ত্তমানে সেই প্রেমকে প্রযুক্ত করিয়ো, কিন্তু মননশক্তির দ্বারা তাহাকে ভবিষ্যতেও সঞ্চারিত করিয়ো।

আমাদের প্রত্যেকের সহিত কোনও পূর্ব্বপুরুষের কোনও পিতামহ মাতামহী প্রমাতামহ প্রপিতামহীর, ঠিক্ সাদৃশ্য না-থাকিলেও, ইহা যেমন নিশ্চিত যে আমরা দেহমনে তাঁহাদের সকলেরই অল্লাধিক পরিমাণে উত্তরাধিকারী, তেমনি ইহাও নিশ্চিত আমাদের দেশ অধুনা যাহা তাহা অল্লাধিক পরিমাণে, অতীতে দেশ যাহা ছিল, তাহা হইতে উদ্ভূত। অতীতের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ আছে এবং তাহার পরবর্ত্তী নানা ঐতিহাসিক যুগ আছে। বর্ত্তমানের স্বদেশের

প্রতি প্রীতি অতীতের স্বদেশের প্রতি প্রীতির অনুবৃত্তি।

সেই অতীতকে জানিতে হইলে অতীতের ইতিহাসের রাজারাজড়ার যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা ঐতিহাসিক পাঠ্যপুস্তকে লিখিত তৎকালীন আচার-ব্যবহারের বৃত্তান্ত পাঠই যথেষ্ট নহে। ব্যাপক অর্থে প্রাচীন সাহিত্যে যাহা আছে, তৎসমুদয়ের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের এই প্রাচীনতম সাহিত্য সংস্কৃত ও তাহার জ্ঞাতি প্রাকৃত ও পালিতে লিখিত। তাহার সহিত পরিচয় চাই। মূলগ্রন্থ পাঠ করিবার মত প্রাচীনভাষাজ্ঞান সকলের থাকা সম্ভবপর নহে, কিন্তু আধুনিক বাংলা বা অন্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার অনুবাদের সাহায্যে প্রাচীন সাহিত্যের সহিত পরিচয় ঘটিতে পারে। তাহা হইলেও প্রাচীন ভাষার কিছু জ্ঞান থাকা নানা দিক দিয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রাচীন সাহিত্য ব্যতীত প্রাচীনস্তম্ভ, শিলালেখ, তাম্রশাসন, প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রাচীন গুহাচিত্রাদি প্রভৃতির সহিতও পরিচয় বাঞ্ছনীয়।

সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার জ্ঞান কেবল অতীত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যই যে আমাদের থাকা আবশ্যক তাহা নহে; বাংলার সহিত সংস্কৃতের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ, সংস্কৃতের উপর বাংলা এত বেশী নির্ভর করে, যে, বাংলার ব্যাপক গভীর ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্য কিছু সংস্কৃত না জানিলে চলে না। বাংলায় যিনি আধুনিক জ্ঞানগর্ভ যে-কোন বিষয়েই কিছু লিখুন না—তাহা গণিত, রসায়নীবিদ্যা, বেতারবার্ত্তা, আকাশযান, বা অন্য কিছুই হউক না—তাঁহাকে নূতন শব্দ কিছু রচনা করিতে হইবে, কিংবা অন্যের রচিত নূতন শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। নিজে নূতন শব্দ গড়িতে হইলে তাহা সংস্কৃত ধাতু হইতে গড়িতে হইবে, কারণ সেইরূপ শব্দই বাংলা ভাষার অধিকাংশ অন্য শব্দের সহিত সমঞ্জসীভূত হইবে। যদি তিনি অন্যের গড়া নূতন শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহা ঠিক্ হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিতে হইলে কিছু সংস্কৃত জানিতে হইবে।

বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ প্রাচীনকালে সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণে তাহার রচয়িতাদিগের উচ্চারণবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিজ্ঞানের জ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ভাষাবিজ্ঞানের এইরূপ নানা শাখার অনুশীলন করেন, সংস্কৃতাদি ভারতীয় ভাষা তাঁহাদের জানা থাকিলে তাহা খুব কাজে লাগে। সংস্কৃত গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষা যে ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাহার তুলনামূলক চর্চ্চার জন্য সংস্কৃতের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। গণিতের কোন কোন শাখার, জ্যোতিষের, রসায়নীবিদ্যার, উদ্ভিদবিদ্যার এবং আরও কোন কোন বিদ্যার কতকগুলি বিষয়ের প্রাচীন ভারতীয়েরা চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তাহার জ্ঞান এই সকল বিদ্যার বর্ত্তমান অনুশীলকদের কাজে লাগিতে পারে। দর্শনের ত কথাই নাই। যাহা ইউরোপীয়েরা নূতন মনে করেন বা করিতেন এরূপ কোন কোন দার্শনিক মত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আছে।

আমরা যদি দেশহিতকর কোন চেষ্টায় নিযুক্ত থাকি, তাহার ফল অনেক সময় হয়ত আমাদের জীবিতকালে ফলিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এখন ফল দেখিতে না-পাইলেও ভবিষ্যতে এই চেষ্টার ফলে দেশ কেমন হইবে, জাতি কেমন হইবে, তাহা কল্পনা করিয়া আমরা তৃপ্ত হই—যেমন কেহ বনস্পতিবহুল উদ্যানরচনা আরম্ভ করিয়া ইহা ভাবিয়া সুখী হইতে পারেন, যে, তাঁহার পৌত্রপৌত্রীরা দৌহিত্র-দৌহিত্রীরা এই উদ্যানের আনন্দ সম্ভোগ করিবে। ভবিষ্যতের স্বদেশের প্রতি প্রীতি বস্তুটি কি, তাহা আমরা এই প্রকারে কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি।

যে-দেশের অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ এক সূতায় গাঁথা মণিহারের মত, ধন্য সেই দেশ। এই প্রকার আদর্শ দেশ বস্তুতঃ একটিও নাই। এমন দেশ একটিও নাই যাহার অতীত কেবলই গৌরবের বস্তু, যাহার বর্ত্তমান নিষ্কলঙ্ক এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের প্রস্রবণ, এবং যাহার ভবিষ্যৎকে দুঃখের, কালিমার, অশুভের বোঝা বহিতে হইবে না। অতীতের উপর আমাদের হাত নাই। অতীত হইতে আমরা যেমন আনন্দের ও গৌরবের কিছু, কল্যাণকর কিছু পাইয়াছি, তেমনি দুঃখের, অগৌরবের, অকল্যাণের ও লজ্জার জনয়িতা কিছুও পাইয়াছি। কিন্তু আমরা যদি ভাল যাহা কেবল সেগুলিকেই পোষণ ও রক্ষা করি, তাহা হইলে কেবল যে আমাদের দেশের বর্ত্তমান ভাল হইবে, তাহা নহে, ভবিষ্যৎও ভাল হইবে। আমরা অতীত হইতে

ভাল যাহা পাইয়াছি, তাহার রক্ষণ ও বিকাশসাধন ছাড়া নূতন কিছু ভালও আমাদিগকে করিতে হইবে—তাহা করিবার শক্তি বিধাতা আমাদিগকে দিয়াছেন। আমাদের পক্ষে যাহা বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ বংশাবলীর পক্ষে তাহাই হইবে অতীত। আমরা যদি আমাদের অতীতের কেবল ভালগুলিই রক্ষা ও বিকাশ করি এবং মন্দ কিছু নূতন না করিয়া নূতন ভালই করি, তাহা হইলে ভবিষ্যতের স্বদেশের লোকেরা আমাদের নিকট হইতে ভাল পাইয়া ও মন্দ না পাইয়া উপকৃত হইবে। এহেন ভবিষ্যৎস্বদেশের মূর্ত্তি কল্পনার চক্ষে দেখিয়া প্রীতি ও আনন্দ অনুভব করিতে পারা সৌভাগ্যের বিষয়।

নিরবচ্ছিন্ন ভাল কিছু রক্ষা করা কিংবা অবিমিশ্র ভাল নূতন কিছু করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য—হয়ত অসাধ্য। কিন্তু অধম যাহা তাহাকে বর্জ্জন ও পরিহার করিবার চেষ্টা কাহারও সাধ্যাতীত নহে।

ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতি

কেহ কেহ হয়ত এরূপ ভাবিতে পারেন, যে, ভারতীয়েরা যখন প্রাচীন কালে বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার করিয়াছিল এবং আমরা যখন তাহার গর্ব্ব করিয়া থাকি, তখন বর্ত্তমানে ইউরোপীয়েরা বিদেশজয় দ্বারা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিদেশে বিস্তারের চেষ্টা করিলে তাহার নিন্দা করা আমাদের উচিত নয়। এই বিষয়টির একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব চীনে কোরিয়ায় জাপানে ফিলিপাইন্সে অনুভূত হইয়াছিল। তাহার স্পষ্ট চিহ্ন এখনও রহিয়াছে। এই সকল দেশ ভারতীয়েরা জয় করিয়া তাহাদের অধিবাসীদিগকে অধীনতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিল ইতিহাস এরূপ বলে না। এই সকল দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তারের সহিত হিংসা ও লোভের কোন সম্পর্ক নাই। অতএব ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তারের ইতিহাসের এই অংশটি হইতে আমরা অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করিতে পারি।

জাভা প্রভৃতি কয়েকটি ভূখণ্ড ভারতীয়বংশোদ্ভূত রাজারাজড়ার করায়ত্ত কিরূপে হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত সঠিক্ ইতিহাস কেহ উদ্ধার ও রচনা করিয়াছেন কি-না, অবগত নহি। যদি এরূপ ইতিহাস থাকে, ও তাহার মধ্যে ভারতীয়দের হিংসা ও লোভের প্রমাণ থাকে, তাহা অবশ্যই নিন্দনীয়। তাহা গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু তাহা হইলেও আধুনিক পাশ্চাত্য বিদেশজয় ও উপনিবেশ-স্থাপন নীতির সহিত প্রাচীন ভারতীয় রীতির পার্থক্য মনে রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য যে-জাতি ইউরোপের বাহিরে যে-দেশ জয় করে, তথাকার ধনসম্পদ বিজেতাদের স্বদেশেই প্রধানতঃ নীত, ব্যবহৃত ও সম্ভুক্ত হয়। ভারতীয় কোন কোন রাজা যদি জাভা প্রভৃতি জয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা রহিলেন পাটলিপুত্রে, অযোধ্যায় উজ্জয়িনীতে বা কাঞ্চীতে এবং জাভা প্রভৃতির ধনসম্পদ প্রধানতঃ ভারতবর্ষেই আসিতে লাগিল, এরূপ ঘটে নাই। ভারতীয় বিজেতারা বিজিত দেশেই বসবাস করিলেন, বিবাহাদি দ্বারা সেখানকারই মানুষ হইয়া গেলেন, সেখানে একটি মিশ্র নূতন সভ্যজাতি গড়িয়া উঠিল। ইহা অগৌরবের বিষয় নহে। পাশ্চাত্য এবং অত্যাধুনিক জাপানী এক্সপ্লয়টেশ্যন-বর্জ্জিত এই প্রাচীনভারতীয় জয়যাত্রা আধুনিক এক্সপ্লয়টেশ্যন-প্রধান বিদেশজয়ের সহিত তুলনীয় নহে।

ভারতীয়দের বিদেশে উপনিবেশস্থাপনের সহিত ইউরোপীয়দের বিদেশে উপনিবেশস্থাপনের আর একটি প্রভেদ লক্ষণীয়। আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকার নানা দেশে ইউরোপীয়েরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তথাকার আদিম বহু জাতির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ বা প্রায় উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, এবং নিজেরা আলাদা একটি প্রভুজাতি হইয়া, কোন আদিম লোক অবশিষ্ট থাকিলে তাহাদিগকে দাসরূপে বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর শ্রমিকরূপে ব্যবহার করিতেছে। নিজেদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হইতে উদ্ভূত মিশ্র লোকদিগকেও তাহারা নিকৃষ্ট মনে করিয়া থাকে; অশ্বেতদের সহিত শ্বেতদের বৈধ সম্মানকর বিবাহ তাহাদের নিকট হইতে উৎসাহ পাওয়া দূরে থাক্, অনেক স্থলে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ এবং সর্ব্বত্র শ্বেতদের চক্ষে লজ্জাকর।

ভারতীয়দের জাভা প্রভৃতিতে উপনিবেশস্থাপনের সহিত এই প্রকার নানাবিধ নিন্দনীয় ব্যাপার জড়িত নহে।

প্রাচীনভারতীয় বিজেতা ও উপনিবেশস্থাপকদের একটি গৌরবের জিনিষ আছে, যাহা বিজেতা ও উপনিবেশ-স্থাপক কোন আধুনিক ইউরোপীয় জাতির নাই। জাভায়,

কাম্বোডিয়ায়, প্রভৃতিতে ভারতীয় ও তত্রত্য মানুষদের মিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্কর লোকেরা স্থাপত্যের ও মূর্ত্তিশিল্পের যে-সকল নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির মাতৃভূমি ভারতবর্ষেও তাহা নাই। বোরোবুদরের, আঙ্কোরবটের, প্রম্বাননের মত মন্দিরাবলী; বুদ্ধের নানা মূর্ত্তি, প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্ত্তি, প্রস্তরমন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ রামায়ণাদি কথার ছবি—ভারতীয় উপনিবেশগুলির এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তির সহিত তুলনীয় কিছু ভারতবর্ষেও নাই।

ইউরোপের সম্বন্ধে কি ইহা বলা যায়, যে, আফ্রিকার নিগ্রোরা, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিরা, আমেরিকার লাল ইণ্ডিয়ানরা ইউরোপীয় সংস্কৃতি সম্পূর্ণ নিজের করিয়া লইয়া ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হইয়া ইউরোপেও যাহা নাই এমন সব ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে, এমন সব প্রস্তর ও ধাতু মূর্ত্তি গড়িয়াছে, প্রস্তরমন্দিরগাত্রে ইউরোপীয় মহাকাব্যের দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ করিয়াছে? ইউরোপে যাহা নাই তাহা করা দূরে থাক্, ইউরোপে যাহা আছে তাহার সমতুল্য কিছু করিতেও তাহাদিগকে ইউরোপীয়েরা শিখায় নাই, শিখিবার সুযোগ দেয় নাই, শিখিতে উৎসাহিত করে নাই।

জাভার লোকেরা মনে করে, রামায়ণ মহাভারত তাহাদের, ঐ দুই মহাকাব্যের ঘটনাবলী তাহাদের দেশে ঘটিয়াছিল। ঐ দুই মহাকাব্যের অন্ততঃ কোন কোন অংশের প্রাচীন পুঁথি জাভায় পাওয়া গিয়াছে; গীতা পাওয়া গিয়াছে।

ইউরোপীয়দের দ্বারা বিজিত কোন আদিম জাতি হোমরের, বর্জিলের, দান্তের, শেক্সপীয়রের কোন মহাগ্রন্থকে এই রূপে আত্মসাৎ করিয়াছে কি?

অতএব, প্রাচীন ভারতীয়দের বিদেশজয় ও বিদেশে উপনিবেশস্থাপন, ইউরোপীয়দের তদ্বিধ কার্য্যের সমশ্রেণীস্থ নহে।

—

আবিসীনিয়া ঠিক্ অসভ্য দেশ নহে

ইতালীর লোকেরা আবিসীনিয়াকে সভ্য করিবে বলিতেছে! ইউরোপীয়দের ইউরোপের বাহিরের লোকদিগকে সভ্য করার অর্থ আমরা জানি, বুঝি। তাহার আলোচনা অনাবশ্যক।

অসভ্য দেশ ও জাতি বলিলে যাহা বুঝায়, আবিসীনিয়া ও তাহার লোকেরা ঠিক্ তাহা নহে। ইংরেজী একাধিক সাইক্লোপীডিয়ায় এবং অন্য বহিতে এই দেশের বৃত্তান্ত ও বর্ণনা দ্রষ্টব্য। তা ছাড়া এলাহাবাদে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ কয়েক দিন পূর্ব্বে একটি বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন সংক্ষেপে তাহা হইতেও আবিসীনীয়দের প্রাচীনত্ব ও পূর্ব্ব ইতিহাসের কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন:—

> "The Abyssinians are not, however, a savage or barbarous people, as the recent speeches of Signor Mussolini seemed to convey. They have a history and a civilization which can be traced to hoary antiquity. The present king, Haile Selassie I, traces his descent from King Solomon of Jerusalem, who married the Queen of Sheba, ruler of Abyssinia, and founded the race of Abyssinian kings who are still ruling the country. The better class of Abyssinians belong to the Semitic stock. At one time the Abyssinians ruled Egypt and Arabia and had extended trade with Persia and India. The great Abyssinian nobles, Malik Kafoor and Malik Ambar, played important parts in Indian history. Such is the country and people Signor Mussolini wants to "civilize" and thus fulfil Italy's share of the "White man's burden."

তাৎপর্য্য। মুসোলিনীর আধুনিক কয়েকটা বক্তৃতায় এই ধারণা জন্মায় যেন আবিসীনীয়রা একটা অসভ্য বা বর্ব্বর জাতি; তাহা ঠিক্ নয়। সুপ্রাচীন কাল পর্য্যন্ত যাহার সূত্র অনুসরণ করা যায়, তাহাদের এরূপ ইতিহাস ও সভ্যতা আছে। বর্ত্তমান সম্রাট প্রাচীন ইহুদী রাজা সুবিখ্যাত সলোমন যে রাণী শেবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশজাত বলিয়া কথিত আছে। শেবার বংশজাত রাজারা বরাবর এ-যাবৎ আবিসীনিয়ায় রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। আবিসীনিয়ার উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা (আরব ও ইহুদীদের মত) সেমিটিক জাতীয়। আবিসীনীয়রা এক সময়ে মিশর ও আরব দেশের শাসক ছিল এবং পারস্য ও ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। মালিক কাফুর ও মালিক অম্বর নামক সম্ভ্রান্ত হাবসী সামন্তেরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাই সেই দেশ ও জাতি যাহাকে মুসোলিনী "সভ্য" করিতে এবং তদ্দ্বারা "শ্বেত মনুষ্যের বোঝা বহনে"র ইতালীয় অংশ সংসাধন করিতে চান।

—

বাঙালী কনষ্টেবলও পাওয়া যায় না?

১৯৩৪ সালের কলিকাতার পুলিস-বিভাগের কার্য্যবিবরণ সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি, ঐ বৎসর ১১৭ জন নূতন কনষ্টেবল নিযুক্ত করা হয়। তাহার মধ্যে বাঙালী মুসলমান ১৫ জন এবং বাঙালী হিন্দু ৩৬ জন—মোট বাঙালী ৫১ জন। বাকী ৬৬ জন বাঙালী নহে। কনষ্টেবলী করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি স্বাস্থ্য ও গায়ের জোর ৫ কোটির উপর বাঙালীর বাসভূমি বঙ্গে পাওয়া গেল না? ইহা কখনই হইতে পারে না। সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালীর

মধ্যেই বেকার লোক হাজার হাজার আছে। কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট চেষ্টা করেন না বলিয়াই কনষ্টেবলী করিবার মত যথেষ্ট বাঙালী পান না। অথবা কোন অপ্রকাশিত কারণে ইচ্ছা করিয়াই কনেষ্টবলীর সব কাজে বাঙালী নিযুক্ত করা হয় না।

—

ছাত্রদের বিদেশ যাত্রা

বিলাতে ভারতবর্ষের ব্যয়ে একটি সরকারী ডিপার্টমেন্ট, আফিস বা বিভাগ আছে, তাহার উদ্দেশ্য ও কাজ ভারতীয় ছাত্রদের "তত্ত্বাবধান" এবং তাহাদিগকে "সাহায্য দান"। এই বিভাগ হইতে প্রতিবৎসর একটি রিপোর্ট বাহির হয়। এবারও হইয়াছে। তাহাতে এই একটি মামুলী কথা আছে, যে, যত ছাত্র বিলাত যায়, তত না যাওয়া ভাল। আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে বলিতেছি। তাহাও খুব সাধারণ কথা।

বিলাতে যিনি যেখানে থাকিয়া যাহা শিখিতে চান, তথায় থাকিবার গ্রাসাচ্ছাদনের ও শিক্ষার ব্যয় ঠিক্ নিয়মমত তিনি ভারতবর্ষ হইতে পাইবেন, এরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া কাহারও বিলাত যাওয়া উচিত নয়। সেখানে রোজগার করিয়া স্বাবলম্বী হইবার দুরাশা এক জনেরও পোষণ করা উচিত নহে। এই সব কথা বিলাত ছাড়া অন্য সব ইউরোপীয় দেশের পক্ষেও সত্য। জাপানে খরচ কিছু কম বটে, কিন্তু তাহা মাসিক ৭৫৲ বা ৮০৲ টাকার কম নহে, এবং সেখানেও স্বাবলম্বী হইবার আশা করা উচিত নয়। আমেরিকায় আগে কেহ কেহ স্বাবলম্বী হইয়া কৃতীও হইয়াছিলেন বটে। কিন্তু এখন স্বাবলম্বী হওয়া যায় না।

যিনি যে-দেশে কিছু শিখিবার জন্য বিদ্যার্থী হইয়া যাইবেন, তাঁহার সেই দেশের ভাষা ভারতবর্ষে থাকিতেই শিখিয়া যাওয়া ভাল ও উচিত।

যদি কোথাও কিছু শিখিবার জন্য কেহ যাইতে চান তাহা হইলে তাঁহার বাঞ্ছিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য শিক্ষালয়ে স্থান পাইবেন সে বিষয়ে দেশে থাকিতেই নিঃসন্দেহ হইয়া তবে ভারতবর্ষ হইতে রওনা হওয়া উচিত।

কোন পণ্যশিল্প শিখিতে চাহিলে তদুপযুক্ত কারখানায় নিশ্চয়ই ভর্ত্তি হইতে পারিবেন ঠিক্ জানিয়া তবে দেশ হইতে যাওয়া উচিত।

যাহা ভারতবর্ষেই শিখা যায়, তাহা শিখিতে বিদেশ যাওয়া উচিত নয়। দেশভ্রমণ দ্বারা অভিজ্ঞতালাভ ছাত্রাবস্থার পরে হইতে পারে। তাহার জন্য ছাত্ররূপে বিদেশে যাওয়া অনাবশ্যক ও অপব্যয়। এক আধ মাস ভ্রমণ আলাদা কথা।

বিস্তর জিনিষ ভারতবর্ষে শিখা যায় না, বিস্তর জিনিষ ভাল করিয়া শিখা যায় না। সুতরাং অনেক বিষয় শিখিবার জন্য এখনও বিদেশে যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু যাইবার আগে উপরের কথাগুলি মনে রাখা ভাল।

—

ভারতের অখণ্ডত্ব সম্বন্ধে লর্ড উইলিংডন

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর লর্ড উইলিংডন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের সম্মিলিত অধিবেশনে একটি বক্তৃতা করেন। ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেস-পক্ষীয় সদস্যেরা তাহা হইতে দলবলে অনুপস্থিত ছিলেন। এবং তাঁহারা গবর্মেণ্টের বিরোধী অন্যান্য সদস্যের সহযোগিতায়, ফৌজদারী আইন সংশোধন বিলটা পাস করিবার বড়লাটের সুপারিশ অগ্রাহ্যও করিয়াছেন। যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ইহা অবান্তর কথা।

তাঁহার উল্লিখিত বক্তৃতার মধ্যে তিনি বলেন :—

"It is a matter of great satisfaction to me that during my Viceroyalty there has been made possible a consummation of age-long efforts not only of the British Government but of all great rulers in India from Asoka onwards, namely, passage of the Act, which for the first time in the history of India consolidates the whole of India and for the purposes of common concern under a single Government, India for the first time can become one great country."

তাৎপর্য্য। "ইহা আমার পক্ষে মহা সন্তোষের বিষয় যে আমার সম্রাট-প্রতিনিধিত্বের আমলে বহুযুগব্যাপী একটি চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। সেই চেষ্টা কেবল যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট করিয়াছেন, তাহা নহে, অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতে সব শাসনকর্ত্তা করিয়াছেন। এই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে, সেই আইনটি পাস করিয়া যাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম সমগ্র ভারতবর্ষকে তাহার সকল অংশের সাধারণ ব্যাপারসমূহের জন্য একই গবর্মেণ্টের অধীনে অখণ্ড সত্তা দান করিয়াছে। ভারতবর্ষ এই প্রথম একটি বৃহৎ দেশ হইল।"

বড়লাট অবশ্য স্বরাজলাভেচ্ছু দেশভক্ত ভারতীয়দিগকে দুঃখ দিবার জন্য এই কথা বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার অভিপ্রেত না হইলেও তাঁহাদের মনে দুঃখকর স্মৃতি জাগিবে।

ভারতবর্ষ অতীত কালে কখন এক ছিল কিনা, এবং

এই আইন পাস হইবার পূর্ব্বে আধুনিক সময়েও ভারতবর্ষের কোন প্রকার সত্য ও গভীর অখণ্ডত্ব ছিল কিনা—এবম্বিধ প্রশ্নসমূহের আলোচনা করিব না। বড়লাট অশোকের কথা তুলিয়াছেন বলিয়া প্রাচীন কালের কথা কিছু বলিতে হইবে।

যদি মানিয়া লওয়া যায়, যে, ভারতবর্ষ এখন অখণ্ড সত্তা হইল, তাহা হইলেও অশোকের সময়কার ও এখনকার অখণ্ডত্বের মধ্যে প্রভেদ যাহা আছে তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

লর্ড উইলিংডনের বাক্যটির মধ্যে ইহা উহ্য রহিয়াছে, যে, যদিও ভারতবর্ষকে অখণ্ড একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। আগেই বলিয়াছি এইরূপ ঐতিহাসিক প্রশ্নের আলোচনা করিব না। কিন্তু অন্য কথা কিছু বলিব।

অশোক ভারতীয় ছিলেন। বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট এবং তাঁহার দেশের পার্লেমেণ্ট ও তন্নিযুক্ত ভারতসচিব ও গবর্ণর-জেনারাল প্রভৃতি রাজপুরুষ ভারতীয় নহেন। অশোকের সময়ে ভারতবর্ষের সব অংশ অশোকের বা অন্য কাহারও শাসনাধীন থাকিলে তাহা ভারতীয় শাসনাধীনই ছিল এবং ভারতীয় কর্ত্তৃক প্রণীত আইনই মানিতে বাধ্য ছিল। এখন যদি ভারতবর্ষ এক গবর্ন্মেণ্টের অধীন হইয়া অখণ্ডত্ব লাভ করিয়া থাকে, তাহার অর্থ এই যে সমগ্র ভারতবর্ষকেই এখন অভারতীয় একটি আইনের অধীন হইতে হইল। অশোকের সময়ে সমগ্র ভারতের, ভারতের অধিকাংশের, বা কোন অংশের অশোকের অনুশাসন মানিয়া চলা এবং অতঃপর সমগ্র ভারতবর্ষের ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে প্রণীত ১৯৩৫ সালের "ভারতশাসন আইন" মানিয়া চলার মধ্যে এই প্রভেদটি লর্ড উইলিংডন মনে না রাখিতে পারেন; কিন্তু আমরা ভুলিয়া থাকিতে পারি না।

দ্বিতীয় স্মর্ত্তব্য কথা এই, যে, অশোকের সময়ে নেপাল ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিবেচিত হইত এবং বস্তুতঃ ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল—এখনও উহা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের অধীন না-হইলেও ভারতবর্ষেরই একটি দেশ। সেখানে ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় ধর্ম্ম, ভারতীয় আচার-ব্যবহার ও ভারতীয় পরিচ্ছদ প্রচলিত। নেপাল যে অশোকের সময়ে ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল, তাহার প্রমাণ নেপালে অবস্থিত লুম্বিনীর ও কপিলবস্তুর অশোকস্তম্ভ।

সুতরাং সমগ্র ভারত এখনও একরাষ্ট্রভুক্ত হয় নাই। অবশ্য, ভারতবর্ষের অন্য সব (ও অধিক) অংশ যে ভাবে ও যে অর্থে একত্ব পাইয়াছে আমরা সে-ভাবে নেপালের আমাদের সহিত যুক্ত হওয়া চাই না। হয়ত দূর কোন ভবিষ্যতে স্বরাট নেপাল ভারতের অন্য সকল স্বরাট অংশের সহিত একরাষ্ট্রভুক্ত হইবে।

তৃতীয় স্মর্ত্তব্য কথা এই, যে, অশোকের সময়ে, যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ও তৎপরবর্ত্তী মোহম্মদীয় ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় নাই, তখন, ভারতীয় মহাধর্ম্মের এক শাখা বৌদ্ধ ধর্ম্ম যেমন ভারতের নানা অংশে তেমনি বর্ত্তমানে আফগানিস্থান নামে পরিচিত দেশেও প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ তখন ঐ দেশ—অন্ততঃ তাহার ভারতসংলগ্ন এক অংশ—ভারতবর্ষেরই একটি প্রদেশ ছিল। (উহা আবার ভারতবর্ষের সামিল হউক, এরূপ কোন ইচ্ছা হইতে ইহা লিখিতেছি না।) সুতরাং অশোকের সময়কার ভারতীয় সাম্রাজ্যের ও বর্ত্তমান ভারতীয় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সীমা এক নহে।

চতুর্থ স্মর্ত্তব্য কথা এই, যে, মানুষ হিসাবে অশোকের সমান সম্রাট আর কেহ হইয়াছেন কি-না সন্দেহ। তিনি বড় যোদ্ধা ও বিজেতা ছিলেন। কিন্তু হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হওয়ায় অহিংসা সাম্য ও মৈত্রীর উপদেশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত করেন। তাঁহার অহিংসা ছিল শক্তিমানের অহিংসা, দুর্ব্বলের অহিংসা নহে। এখন শক্ত অ-শক্ত সকলেই হিংসার ও হিংসা হইতে আত্মরক্ষার উপায় লইয়া ব্যস্ত।

—

"বিপর্য্যাসক প্রচেষ্টাসমূহ এখনও সক্রিয়"

বড়লাটের বক্তৃতার শেষ অংশে তিনি ফৌজদারী আইন সংশোধক বিলের পক্ষে ওকালতী করিয়া বলেন :—

"Dangerous, subversive movements are still active in the country. The communal unrest, as I have already said, is unfortunately a more serious danger than for many years past."

তাৎপর্য্য। "দেশে বিপজ্জনক, বিপর্য্যাসক প্রচেষ্টাসমূহ এখনও সক্রিয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুর্ভাগ্যবশতঃ সাম্প্রদায়িক অশান্তি গত অনেক বৎসরের চেয়ে এখন গুরুতর বিপজ্জনক।"

অতএব, তিনি এবং প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টসমূহ এই-

গুলাকে দমন করিবার নিমিত্ত বিলটাকে স্থায়ী আইনে পরিণত করিতে চান।

বে-সরকারী পক্ষ হইতে অনেক বার বলা হইয়াছে, যে, যে-বঙ্গে বিভীষিকা-পন্থা ও সন্ত্রাসবাদের প্রাদুর্ভাব বেশী তথাকার গবর্ণর বার-বার (এবং অল্প দিন আগেও) বলিয়াছেন সন্ত্রাসবাদীরা এখনও নিজেদের দলে নূতন লোক জুটাইতেছে ও পাইতেছে, অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ মরে নাই; তাহার মানে এই, যে, দমনমূলক আইন দ্বারা সন্ত্রাসবাদের বাহ্য উপসর্গ বন্ধ হইয়া থাকিলেও সন্ত্রাসবাদটা মরে নাই। সেই জন্য বে-সরকারী লোকেরা বলেন, দমনমূলক আইন দ্বারা যখন সন্ত্রাসবাদের উচ্ছেদ হয় নাই, অতএব তাহা বাতিল হইতে দেওয়া হউক; সাধারণ আইন দ্বারা অপরাধদমন বেশ হইতে পারে এবং তাহা চলুক; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক দিক দিয়া দেশের অবস্থার এরূপ উন্নতি করিবার চেষ্টা হউক যাহাতে বিপ্লবপ্রয়াসী ও সন্ত্রাসবাদীদের মনে উহার স্থান আর না থাকে।

প্রত্যুত্তরে গবর্ন্মেণ্ট-পক্ষের জবাব যাহা, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি এবং তাহার অসন্তোষজনকতার আভাস দিতেছি।

সরকারপক্ষ বলেন, নরহত্যার ও চুরি-ডাকাতীর বিরুদ্ধে আইন সব সভ্য দেশে শত শত বৎসর থাকাতেও ঐ সব অপরাধের উচ্ছেদ হয় নাই। তা বলিয়া কিন্তু আইনগুলা উঠাইয়া দেওয়া হয় নাই। সুতরাং বিপ্লববাদ সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি দমনের জন্য অভিপ্রেত আইনগুলা দ্বারা ঐ সব মত ও তৎপ্রসূত অপরাধের উচ্ছেদ হয় নাই বলিয়া ঐ আইনগুলাই তুলিয়া দিতে হইবে, এরূপ তর্ক অযৌক্তিক।

আমরা বলি, নর-হত্যা চুরি-ডাকাতী সব দেশের সব সময়ের অপরাধ। বিপ্লববাদ ও সন্ত্রাসবাদ তাহা নহে, কোন কোন সময়ে কোন কোন দেশে উহার আবির্ভাব হয়। সুতরাং চিরন্তন ও সর্ব্বদেশীয় অপরাধসমূহের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য আইনগুলি যেরূপ স্থায়ী, দেশ-বিশেষে কাল-বিশেষে প্রাদুর্ভূত অপরাধের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য বিশেষ আইনের সেরূপ স্থায়িত্ব চাওয়া অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক। সাধারণ আইন থাকিতে পারে।

অনেক দেশ হইতে নর-হত্যার জন্য প্রাণদণ্ড রহিত হইয়াছে।

নরহত্যা চুরি-ডাকাতী বন্ধ করিবার বা কমাইবার চেষ্টা কেবল যে শাস্তি দ্বারা সভ্যদেশসমূহে করা হইয়াছে তাহা নহে। শিক্ষার দ্বারা, সভ্যতা বৃদ্ধির দ্বারা, স্বাস্থ্যের উন্নতির দ্বারা, দূষিত সামাজিক প্রথার সংশোধন বা উচ্ছেদ দ্বারা, এবং সকল শ্রেণীর লোকদের আর্থিক উন্নতির দ্বারা উক্ত অপরাধ-সমূহের মূলীভূত কারণাবলীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান হইয়াছে। আমাদের দেশেও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ও বিভীষিকা পন্থানুসরণের উচ্ছেদ করিতে হইলে তাহার রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক কারণগুলা বিনষ্ট করিতে হইবে।

ইহার উত্তরে সরকারপক্ষ বলেন, "আমরাও ত কতকগুলি ছোকরাকে ছাতা সাবান ছুরী কাঁচি জুতা ইত্যাদি তৈরি করিতে শিখাইয়া বেকারসমস্যার সমাধান করিতেছি ও লোকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতেছি।" ইহার উত্তরে বেসরকারী লোকেরা বলেন, "আপনারা যাহা করিতেছেন তাহা ভাল। কিন্তু তাহা নিতান্ত অযথেষ্ট—তাহা সমুদ্রে শক্তুমুষ্টি নিক্ষেপ।" বেসরকারী লোকেরা আরও বলেন (শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত সংক্ষেপে ও স্পষ্ট ভাষায় সম্প্রতি বলিয়াছেন), বৈপ্লবিক চেষ্টা স্বাধীনতার ক্ষুধা ও অন্নের ক্ষুধা হইতে উৎপন্ন; সুতরাং অন্নের ক্ষুধা নিবৃত্তির মত স্বাধীনতার ক্ষুধা নিবৃত্তিরও যথেষ্ট ব্যবস্থা করিতে হইবে; ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে সে ব্যবস্থা নাই। ভারতীয় বৈপ্লবিক কোন প্রচেষ্টার সমর্থন আমরা করি না; আমরা ভারতীয় বিপ্লবীদিগকে উৎকৃষ্ট কোন পন্থার অনুসরণ করিতেই বলি। কিন্তু গবর্ন্মেণ্টকেও আমরা বলি, যে, তাঁহারা যদি বা দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হন—তাঁহাদের বর্ত্তমান চেষ্টা-সকলের ফল সেরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা আমরা দেখিতেছি না—তাহা হইলেও দেশের লোকদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার ও ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় দেওয়া আবশ্যক হইবে।

—

আবিসীনিয়ার ইতালীয় দলিলের প্রতিবাদ

যে-সব দলিলের দ্বারা লীগ অব নেশুন্সে ইতালী আবিসীনিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, আবিসীনিয়ার পক্ষ হইতে তৎসমূহের ভ্রম ও নির্ভরের অযোগ্যতা দেখান হইয়াছে

একটা ইতালীয় দলিলে তারিখের ভুল আছে নাকি হাজার বৎসরের!

—

সাম্প্রদায়িক অশান্তি আগেকার চেয়ে বেশী

স্বরাষ্ট্রসচিব সর্ হেনরী ক্রেক তাঁহার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, সাম্প্রদায়িক অশান্তি এখন যে গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, গত ২৫ বৎসরে তিনি সেরূপ দেখেন নাই;— এবং সেই জন্য কোন এক রকম দমন-আইন চান। বেসরকারী লোকেরা বলেন, সাম্প্রদায়িক অশান্তি বৃদ্ধির প্রধান কারণ সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা ও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট অন্যান্য সরকারী ব্যবস্থাও। সুতরাং সাম্প্রদায়িক অশান্তি দমন করিতে হইলে প্রধান কারণগুলির বিনাশ প্রথমে আবশ্যক।

—

ভুবনডাঙ্গা প্রসাদ-বিদ্যালয়

আশ্বিনের প্রবাসীতে "শান্তিনিকেতনের মুলু" শীর্ষক প্রবন্ধে যে ভুবনডাঙ্গা প্রসাদ-বিদ্যালয়ের উল্লেখ আছে, তাহার একটি আধুনিক ফটোগ্রাফের প্রতিলিপি অন্যত্র দেওয়া হইল। ইহার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা এখন ৪০; বালক ৩৩, বালিকা ৭। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ৩২ জন ও মুসলমান ৮ জন। ৫ হইতে ১২ বৎসর বয়সের ছাত্রেরা এখানে পড়ে। কাহারও নিকট হইতে কোন বেতন লওয়া হয় না। এখানে বাংলা সাহিত্য, ইংরেজী, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখান হয়; মাটির হাতের কাজ, আসন-বোনার কাজ, ও বাগানের কাজও শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীহরিপদ পাল ও শ্রীত্রিবিক্রম মণ্ডল শিক্ষা দেন। এই বিদ্যালয়ের কুড়ি জন ছাত্রকে লইয়া একটি ব্রতী বালক দল গঠন করা হইয়াছে। ব্রতী বালকদিগকে সপ্তাহে দু-দিন বৈকালে শরীর-চর্চ্চা করান হয় ও সপ্তাহে এক দিন পল্লীসেবার কাজ করান হয়। মুষ্টি-ভিক্ষা আদায় ও দুঃস্থকে দান, ডোবা-ভরাট নর্দ্দমা-কাটান, মশাবিনাশের জন্য ডোবায় কেরোসীন দেওয়া, ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করা, রোগীর সেবা, ইত্যাদি পল্লীসেবার অন্তর্গত।

বাঙালী-বর্জ্জন?

গেজেট অব্ ইণ্ডিয়ার গত ১০ই সেপ্টেম্বরের একটি অতিরিক্ত সংখ্যায় একটি বিশেষ ট্যারিফ বোর্ড গঠনের সংবাদ আছে। তাহার সভ্য হইবেন—

সর্ আলেগজাণ্ডার মরে, সভাপতি;
মিঃ ফজল ইব্রাহিম রহিমতুলা, সভ্য;
দেওয়ান বাহাদুর এ রামস্বামী মুদালিয়র, সভ্য।

১৯৩৩ সালে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালাদের ও ব্রিটিশ বয়নশিল্প মিশনের (British Textile Mission-এর) মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল, তৎসম্পর্কীয় নানা বিষয়ের আলোচনা এই বোর্ড করিবেন।

বিদেশী কাপড়ের উপর শুল্ক সম্বন্ধে আলোচনাও এই বোর্ড করিবেন। তাহা করিতে হইলে কাপড় যাহারা বোনে ও কাপড় যাহারা কেনে উভয় পক্ষের কথাই শুনা উচিত। ভারতবর্ষের অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বঙ্গের লোকসংখ্যা বেশী। সেই কারণে বিলাতী, জাপানী ও বোম্বাইয়ের কাপড় বঙ্গে যত বিক্রী হয়, অন্য কোন প্রদেশে তত হয় না। তা ছাড়া, বঙ্গে মিলও কয়েকটি চলিতেছে এবং আরও স্থাপিত হইতেছে। হাতের তাঁতেও বঙ্গে নিতান্ত কম কাপড় উৎপন্ন হয় না। এই সকল কারণে নবগঠিত বিশেষ ট্যারিফ বোর্ডের এক জন সভ্য বাঙালী হওয়া খুব উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯২৪ সালে যখন ট্যারিফ বোর্ড গঠিত হয়, তখন হইতে এ পর্য্যন্ত এক জন বাঙালীকেও উহাতে লওয়া হয় নাই। শুধু তাই নয়। সরকারী সভ্য এ-পর্য্যন্ত ঐ বোর্ডে যত লওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে এক জনও বাংলা দেশে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত লোক নহেন।

সরকারী বেসরকারী যে-সব লোককে এ পর্য্যন্ত অন্য কোন কোন প্রদেশ হইতে লওয়া হইয়াছে, তাহার সমকক্ষ কেহই বাংলা দেশে ছিলেন না বা নাই, ইহা সত্য নহে।

বাঙালীর সহিত সংস্রব না-রাখাই যদি বাঞ্ছনীয় মনে হয়, তাহা হইলে বাঙালীর নিকট হইতে রাজস্বসংগ্রহও বন্ধ করা আবশ্যক নহে কি?

শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আবেদন

প্রধানতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ১লা আগষ্ট একটি, ২৫শে আগষ্ট একটি এবং ১২ই সেপ্টেম্বর (এসোসিয়েটেড প্রেসের সহিত ইণ্টারভিউ আকারে) একটি—এই তিনটি বিবৃতি, বিজ্ঞপ্তি বা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি বঙ্গের কয়েকটি জায়গায় বক্তৃতা উপলক্ষ্যে এই বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন। এই সমস্ত মন্তব্য ও বক্তৃতায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সব কথার মধ্যে মিল ও সামঞ্জস্য নাই—অন্ততঃ আমরা আবিষ্কার করিতে পারি নাই। অবশ্য তিনি একাধিক বার লিখিয়াছেন ও বলিয়াছেন বটে, যে, কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ("final decision") করা হয় নাই, এবং তৎপূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণকে "গঠনমূলক" প্রস্তাবও করিতে বলিয়াছেন। আমরাও সেই অভিপ্রায়ে (এবং দোষত্রুটি দেখাইবার জন্যও) তাঁহার নিকট এই আবেদন উপস্থিত করিতেছি, যে, তিনি তাঁহার বর্ত্তমান অচূড়ান্ত সব প্রস্তাবগুলি একত্র প্রকাশ করুন।

—

মান্দ্রাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর চিত্র উন্মোচন

বাঙালীদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে এবং ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের অনেক লোকের মধ্যেও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া সম্মানিত। যাঁহারা তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক বক্তৃতা আদি শুনেন নাই, পড়েন নাই, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উপন্যাস কাব্য জীবন-চরিত ও প্রবন্ধের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা বাংলা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে তাঁহাকে উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী হলে তাঁহার চিত্র আছে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদেও আছে। মান্দ্রাজে সম্প্রতি রায় বাহাদুর এম্ বেঙ্কটাপ্পার ব্যয়ে তাঁহার একটি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাকার প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী দে, এম্-এ, ডি-এসসি, চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন।

—

রাষ্ট্রসংঘ ও ভারতবর্ষ

রাষ্ট্রসংঘ (লীগ অব নেশুন্স) যে ভারতবর্ষের কোন কাজে লাগে না, তাহা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই; কারণ তিনি সরকার-পক্ষের লোক নহেন বলিয়া সত্য গোপন করিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু আগা খানের মত গবর্ন্মেণ্টের ও ইংরেজদের অনুগৃহীত লোক ভারত-গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক সংঘের প্রতিনিধি-সভায় তাহার প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াও এইরূপ কথা বলিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখন অবস্থা যেরূপ আছে, তাহাতে ভারতবর্ষের পক্ষে লীগের সভ্য থাকিয়া বার্ষিক চাঁদা দেওয়া অপব্যয়। অবস্থার পরিবর্ত্তন কিরূপ হইলে ভারতবর্ষের সভ্য থাকা কতকটা লাভজনক হয় তাহা আমরা আগে অন্য এক পৃষ্ঠায় বলিয়াছি।

সুভাষ বাবু সম্প্রতি লীগের সংবাদ-সরবরাহ-বিভাগের ডিরেক্টরকে কোন কোন বিষয়ে সংবাদ জানিবার জন্য প্রশ্ন করেন। গোপনীয় বলিয়া ডিরেক্টর প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়া একখানা বহি সুভাষ বাবুকে পাঠাইয়া দিয়াছেন যাহা আগে হইতেই তাঁহার ছিল। সুভাষ বাবু এই একটা খবর জানিতে চাহিয়াছিলেন, যে, লীগের সভ্য কোন্ দেশের কত জন লোক কত বেতনে লীগের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কাজ করে। এই সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লীগেরই একখানা রিপোর্ট হইতে একটা কর্ম্মচারী-সংখ্যার তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের বেতনের পরিমাণ কোন রিপোর্টে পাই নাই। কর্ম্মচারী সকলের চেয়ে বেশী ছিল ব্রিটিশ-জাতীয় এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বেশী ছিল ব্রিটেনের ও ফ্রান্সের। সুইস্ কর্ম্মচারীও অনেক আছে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা বেশীর ভাগ চাপরাসী পিয়াদা দারোয়ান ইত্যাদি। এখনও অবস্থা বোধ হয় এইরূপ আছে। উল্লিখিত রিপোর্ট আমি লীগ আফিস হইতে পাই নাই। এস্থলে বলা আবশ্যক, যে, ১৯২৬ সালে লীগের সাক্ষাৎ নিমন্ত্রণে যখন আমি জেনিভা যাই, তখন লীগ আমার ব্যয়—অন্ততঃ আংশিক ব্যয়—দিতে চাওয়ায় তাহা আমি লই নাই। একাধিক বার আমাকে টাকা লইতে অনুরোধ করায় আমি শেষে বলিয়াছিলাম, "আচ্ছা, আপনারা যদি আমার প্রতি সৌজন্য দেখাইতে চান, তাহা হইলে লীগের প্রকাশিত ও আমার

আবশ্যক পুস্তক ও রিপোর্টগুলি আমাকে উপহার দিবেন।" তাহাতে তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের একখানা পুস্তকতালিকা পাঠাইয়া দেন। আমি তাহা হইতে বাছিয়া একটা ফর্দ পাঠাই। যাহা চাহিয়াছিলাম, সব পাই নাই মনে আছে। ম্যাণ্ডেট সম্বন্ধীয় একখানি রিপোর্টও চাহিয়া পাই নাই, ইহা আমার মনে আছে, আমার ফর্দের অন্য কি পাই নাই, এখন মনে নাই। লীগের আমাকে টাকা দিবার ইচ্ছার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না, তবে তাহা যে নিছক্ সৌজন্য বা ন্যায়নিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কেন না, যদিও আমি লীগের নিমন্ত্রিত অতিথি ছিলাম এবং তাহার সংবাদসরবরাহ-বিভাগের তৎকালীন কর্ত্তা কমিং সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লীগের তৎকালীন সেক্রেটরী-জেনার‍্যাল সর্ এরিক ড্রমণ্ডের সহিত আমার সাক্ষাৎকারের দিন ও সময় স্থির করেন, তথাপি আমি লীগ আফিসে ঠিক্ সেই সময়ে গেলে ঐ ড্রমণ্ড অতিব্যস্ততার ওজুহাতে আমার সহিত দেখা করিতে অসামর্থ্য জানায়!

এ-কথা সুভাষ বাবু ঠিক্‌ই বলিয়াছেন, যে, লীগ-প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য গুপ্ত রাজনৈতিক কথাবার্ত্তার (secret diplomacyর) পরিবর্ত্তে প্রকাশ্য আলোচনা চালান, অথচ সেই লীগ এখন গোপনীয় বলিয়া কোন কোন সংবাদ দিতে চায় না! ভারতীয় দেশী রাজ্যের রাজারা লীগের ভারতীয় চাঁদার কোন অংশ দেয় না, অথচ তাহাদের কেহ-না-কেহ বরাবর লীগে ভারতীয় প্রতিনিধি মনোনীত হয়, ইত্যাদি আর যে-সব কথা সুভাষ বাবু বলিতেছেন, এইরূপ নানা সমালোচনা আমি জেনিভা যাওয়ার পর হইতে করিয়াছি। সেই সব কথার কিছু কিছু ভারত-গবর্ন্মেণ্টের মনোনীত প্রতিনিধিরাও পরে বলিয়াছেন।

—

পেন্সিলভেনিয়ায় শ্বেত-অশ্বেতের সাম্য

পেন্সিলভেনিয়া আমেরিকার যুনাইটেড্ ষ্টেটসের একটি রাষ্ট্র, তাহাতে যেমন শ্বেত অধিবাসী আছে, তেমনি সাড়ে চারি লক্ষ নিগ্রোও আছে। আমেরিকার নিগ্রোদের দাসত্ব ১৮৬৫ সালে আইন অনুসারে বিলুপ্ত হইয়া থাকিলেও, তাহারা দেশের সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে প্রতিষ্ঠানে ও স্থানে শ্বেতদের সমান ব্যবহার পায় না। পেন্সিলভেনিয়া রাষ্ট্র সম্প্রতি আইন করিয়াছে, যে, এই অসাম্য দূরীভূত হইবে। আইন অনুসারে প্রত্যেক হোটেলে শ্বেতদের সঙ্গে সমান সর্ত্তে তাহারা প্রবেশ ও স্থান লাভ করিবে। কোন সাধারণ স্নানাগার ও সন্তরণাগার তাহাদের প্রবেশে বাধা দিতে পারিবে না—যেরূপ বাধা সম্প্রতি লণ্ডনে ভারতীয় কোন কোন ছাত্রকে পাইতে হইয়াছে। রেলওয়ে ট্রেনে ও 'বসে তাহারা ভাড়া দিয়া যেখানে ইচ্ছা বসিতে পারিবে। থিয়েটারে ও অন্য সব সাধারণ আমোদাগারে তাহারা টাকা দিয়া কোন শ্বেত নারীর পাশের আসনে বসিলেও ম্যানেজার আসিয়া তাহাদিগকে উঠাইয়া দিতে পারিবে না। গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এই আইন জারি হইয়াছে।

উপরের বিবৃতি হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, দাসত্বমোচনের পরেও আমেরিকায় নিগ্রোদের সামাজিক অনধিকার অনেক দিকে ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যদের অনধিকারের চেয়ে বেশী বই কম নহে। অন্ততঃ একটি রাষ্ট্রে এই সামাজিক অসাম্য অন্ততঃ আইনের পাতায় লুপ্ত হইল, ইহা সন্তোষের বিষয়।

—

লণ্ডনে বাঙালী পুস্তক-বিক্রেতা

শ্রীযুক্ত ডক্টর শশধর সিংহ, পিএইচ-ডি (লণ্ডন), এক জন কৃতবিদ্য বাঙালী যুবক ও সুলেখক। তিনি গতানুগতিক কিছু না-করিয়া লণ্ডনে পুস্তক-বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। বিলাতী ও অন্য ইউরোপীয় নূতন বহিও তিনি জোগাইবেন, কিন্তু পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ ও জোগানর দিকেই তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। বিলাতে অনেক ভাল বহিও অনেকে কিনিয়া পড়িয়া তাহার পর অল্পমূল্যে বিক্রী করে। এই জন্য প্রকাশের কয়েক মাস পরেই অনেক ভাল বহিও প্রায় নূতন অবস্থায় কম দামে পাওয়া যায়। তা ছাড়া দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান পুরাতন পুস্তকও পাওয়া যায়।

শশধর বাবুর ব্যবসার কথা আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় লেখায় তিনি ইতিমধ্যেই অর্ডার পাইতেছেন, লিখিয়াছেন। তাঁহার দোকানের ঠিকানা—2 Great Ormond Street, London, W. C. 1. সর্ত্ত আদি মডার্ণ রিভিয়ুর বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

—

বাঙালীর একান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি

মহাত্মা গান্ধী যে সমগ্রভারতীয় গ্রামোন্নতি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার বঙ্গীয় শাখার কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে। বঙ্গের লোকদের—এবং তাহা বলিলে গ্রামপ্রধান বঙ্গে প্রধানতঃ গাঁয়ের লোকদিগকেই বুঝায়—একান্ত আবশ্যক কি কি, সে বিষয়ে সম্প্রতি তিনি এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফৎ নিজের মত জানাইয়াছেন।

খাদ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন, আমাদের দুঃখ তিন রকমের। জমীর উর্ব্বরতা কমিয়া যাওয়ায় বঙ্গে যথেষ্ট খাদ্য উৎপন্ন হয় না, যাহা উৎপন্ন হয় তাহা ঠিকমত ব্যবহৃত হয় না, এবং তাহার কতক অংশ আবার আমরা বাহির হইতে এইরূপ অনেক জিনিষ কিনিবার জন্য বঙ্গের বাহিরে বিক্রী করি, যাহা আমরা নিজেরা উৎপন্ন করিতে পারি ও আমাদের করা উচিত।

জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি ও তাহা হইতে যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন কঠিন, বৃহৎ সমস্যা, কিন্তু তাহারও সমাধান ক্রমে ক্রমে করিতে হইবে।

কিন্তু উৎপন্ন খাদ্যের যথাযোগ্য ব্যবহার তত বড় ও কঠিন সমস্যা নহে। সমিতির কর্ম্মীরা তাহাতে মন দিতেছেন, তাঁহারা একবারও পালিশ না-করা চালের ব্যবহার, চিনির পরিবর্ত্তে গুড়ের ব্যবহার, এবং ঘানির তেলের ব্যবহার সমর্থন ও প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। সিদ্ধ এবং এক বা একাধিক বার পালিশ-করা চাল ব্যবহার করিলে তাহার অনেক পুষ্টিকর অংশ নষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন, ভাতের ফেন বা মাড় গালিয়া ফেলায় অনেক পুষ্টিকর অংশের অপচয় হয়। ইহা প্রফুল্ল বাবু গণনা দ্বারা দেখাইয়াছেন। পালিশ না-করা আতপ চালের ভাত ফেন না ফেলিয়া দিয়া খাইলে চাল হইতে যতটা পুষ্টির সম্ভাবনা তাহা পাওয়া যায়।

চিনি—বিশেষতঃ খুব শাদা পরিষ্কার দানাদার চিনি—পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে গুড়ের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। অতএব পরিষ্কার ভাল গুড়ই চিনির বদলে ব্যবহার্য্য। আকের গুড় ছাড়া খেজুর-গুড় এবং তালের গুড়ও আরও বেশী করিয়া উৎপাদন ও ব্যবহার করা উচিত। তালের গুড় বঙ্গে উৎপন্ন কম হয়, কিন্তু অনেক জায়গায় হইতে পারে। অনেক জেলায় খেজুরগাছ হয় কিন্তু লোকে তাহা হইতে গুড় প্রস্তুত করে না। রাত্রে ও দিনে উভয় সময়ে সংগৃহীত খেজুর-রস হইতে কি প্রকারে ভাল গুড় হইতে পারে, প্রফুল্ল বাবু তাহারও আভাস দিয়াছেন।

সমিতির লোকেরা তসরের কাপড় আরও যাহাতে উৎপন্ন ও চলিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। চামড়া কষ করিয়া তাহা হইতে নানাবিধ পাদুকা নির্ম্মাণ দ্বারা মুচিদের আয় বাড়ান এবং স্থানীয় লোকেদের পাদুকা জোগানও তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ত্রিপুরা ও ফরিদপুর জেলায় ঘানি চালাইবার বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। ঢাকার একটি গ্রামে (বোধ হয় আড়িয়লে) এক জন বিজ্ঞান-গ্র্যাডুয়েট হস্তনির্ম্মিত কাগজের উন্নতি সাধনের চেষ্টায় আছেন।

রেশম সম্বন্ধেও তথ্য সংগৃহীত হইতেছে। হাতে পাটের সুতা ও দড়ি কাটিয়া তাহা হইতে হাতের তাঁতে চট বুনিবার ও থলি সেলাই করিবার পরীক্ষাও হইতেছে।

সুরুলের শ্রীনিকেতন হইতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামে গ্রামোন্নতির যে নানা চেষ্টা হইতেছে এবং যাহার আরম্ভ মহাত্মা গান্ধীর সমিতি স্থাপনের বহুপূর্ব্বে হইয়াছে, তাহার খবর প্রফুল্ল বাবু সবিশেষ জানেন কি-না বলিতে পারি না। কিন্তু আশা করা যাইতে পারে, যে, মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মী ও অনুকর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে যে-সব ভাল কাজে হাত দিয়াছেন ও দিবেন, তাঁহারা এরূপ মনে করিবেন না, যে, তাঁহারাই ঐসব কাজের গোড়াপত্তন করিতেছেন। বঙ্গে এরূপ এবং অন্যবিধ গ্রামোন্নতিবিধায়ক কাজ আগে হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সকলের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা ও পরস্পরের নিকট হইতে শিখিবার ইচ্ছা বাঞ্ছনীয়।

—

ভারতে ও বঙ্গে তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল

লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটী অব্ আর্টসের ভারতীয় শাখায় গত ২৭শে জুন ডক্টর শ'এর লেখা ভারতীয় তৈল-বীজ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং তাহার আলোচনা হয়। তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। উদ্ভিজ্জ নানাবিধ তৈল হইতে উদ্ভিজ্জ ঘী, চর্বি প্রভৃতির উৎপাদনে, গবাদি

পশুর খাদ্য এবং জমীর সার রূপে খইলের ব্যবহারে, প্রভৃতি নানা প্রকারের তৈল-বীজ ব্যবহৃত হওয়ায় উহা প্রচুর পরিমাণে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়। তাহাতে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হয় না, তাহা নহে। তাহা পরে বলিতেছি। ১৯৩২-৩৩ সালে ১১৩১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭৩৩০০০ টন বীজ ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হয়, ১৯৩৩-৩৪ সালে রপ্তানী হয় ১৩৬৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ১১২৪০০০ টন বীজ। এখন রপ্তানী আরও বাড়িয়া থাকিবে। এই চৌদ্দ-পনের কোটি টাকার বীজ বিদেশে গিয়া তৈলে, উদ্ভিজ্জ ঘৃত ও চর্বিতে, খইলে ও অন্য নানা রকম অধিকতর মূল্যের জিনিষে পরিণত হইয়া অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও আবার আসে ও বিক্রী হয়। অতএব, তৈলবীজসমূহ রপ্তানী না-করিয়া ভারতবর্ষেই তাহা তৈল উদ্ভিজ্জঘৃতাদি ও খইলে পরিণত করা শ্রেয় কি-না বিবেচ্য।

ডক্টর শ'র প্রবন্ধে ইহার সপক্ষে ও বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :—

সপক্ষে (১) খইল বেশী পরিমাণে দেশেই রক্ষিত হইয়া জমীর এবং গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবে। (২) তৈলনিষ্কাশনাদি ব্যবসার লাভ ভারতবর্ষে থাকিবে এবং বিস্তর ভারতীয় লোক কাজ পাইবে। (৩) ভারতেই বীজগুলি পিষ্ট হইলে তাজা ও উৎকৃষ্টতর তৈল উৎপন্ন হইতে পারিবে।

বিরুদ্ধে—(১) ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিজীবী দেশ, অতএব এখানে শস্য বাড়াইয়া উৎপন্ন শস্য বৃদ্ধি ও তাহার রপ্তানীতে মন দেওয়াই ভাল। (২) তৈল নিষ্কাশন ব্যবসা ভারতে বিস্তৃত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও চাষীরা তৎপরতার সহিত সাররূপে খইল ব্যবহার করিবে না, সুতরাং জমির উপকৃত হইবে না। (৩) এখনই ভারতবর্ষ অনেক তেল ও খইল রপ্তানী না করে; তাহা হইতে বুঝা যায়, যে, ভারতে এই জিনিষগুলির চাহিদা যথেষ্ট মিটাইয়া তবে রপ্তানী হয়; সুতরাং এদেশে তৈল নিষ্কাশন ব্যবসার অধিকতর বিস্তৃতি অনাবশ্যক। (৪) ইউরোপ যেরূপ খুব রিফাইন-করা তেল চায় তাহা উৎপন্ন করিতে ভারতবর্ষের এখনও অনেক সময় লাগিবে, সুতরাং তৈল নিষ্কাশন ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। (৫) তৈল অপেক্ষা তৈল-বীজ রপ্তানী করা সহজ।

পাঠকেরা দেখিবেন, বিপক্ষের যুক্তিগুলা অখণ্ডনীয় নহে। প্রবন্ধপাঠের পর তর্কবিতর্কের সময় মিঃ বি টি মুলওয়ানী (Mr. B. T. Mulwani—বোধ হয় সিন্ধী) বিরুদ্ধযুক্তিগুলির সমুচিত জবাব দেন। ভারতবর্ষ এখন প্রধানতঃ কৃষিজীবী দেশে পরিণত হইয়া থাকিলেও বরাবর তাহা ছিল না—তৈলের ব্যবসাতেই ত অসংখ্য ঘানি ছিল, তৈলের কল অনেক স্থাপিত হইয়াছে, আরও হইতে পারে। ভাল সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক যন্ত্র আমদানী বা প্রস্তুত করাইয়া বিশেষ যোগ্য বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিলেই খুব রিফাইন-করা তেল উৎপন্ন হইতে পারে। বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে বিস্তর কৃত্রিম সার আমদানী হইতেছে, তাহাতে কালক্রমে জমীর উর্ব্বরতা নষ্ট হইতে পারে। তৈলনিষ্কাশন ব্যবসা ভারতে আরও প্রচলিত হইলে গবাদি পশু খইল খাইয়া বেশী দুধ দিবে ও চাষের কাজের বেশী যোগ্য হইবে, এবং একটু চেষ্টা করিলেই চাষীরা বিদেশাগত কৃত্রিম সার ব্যবহার না-করিয়া খইল ব্যবহার করিবে। তাহাতে জমীর উর্ব্বরতা স্থায়ী ভাবে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইবে। তৈলনিষ্কাশন ভারতেরই একটি বড় ব্যবসাতে পরিণত হইলে অনেক বেকার লোক কাজ পাইবে, এবং দেশের টাকা দেশে থাকিবে।

তৈল-বীজের মধ্যে প্রবন্ধটির পরিশিষ্টে তিসি, রাই ও সরিষা, এবং তিলের বিস্তারিত হিসাব ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের জন্য দেওয়া হইয়াছে। চীনে-বাদাম, কার্পাস-বীজ, ও রেড়ীর উল্লেখ আছে। নারিকেলেরও উল্লেখ আছে। গুঞ্জা বা সুরগুঞ্জার উল্লেখ দেখিলাম না। তিসি, রাই ও সরিষা এবং তিলের যে হিসাব ১৯২৫-২৬ হইতে ১৯৩২-৩৩এর দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গে কোন বীজেরই উৎপন্নের পরিমাণ কমে নাই, বরং কিছু বাড়িয়াছে দেখা যায়। বর্ত্তমান অবস্থা জানি না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ১৯৩২-৩৩ সালে এই বীজগুলির উৎপন্ন পরিমাণ টনে দিতেছি।

প্রদেশ।	তিসি।	রাই ও সরিষ।	তিল।
বাংলা	২৫০০০	১৫৪০০০	৩৬০০০
বিহার-উড়িষ্যা	৯৭০০০	১৪০০০০	২৯০০০
বোম্বাই	১৩০০০	২৮০০০	২৭০০০
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	৮৩০০০	১৫০০০	৪৭০০০
পঞ্জাব	৩০০০	১৫০০০	১১০০০
আগ্রা-অযোধ্যা	৩৯০০০	৫৭০০০	৪১০০০
„ (মিশ্র ফসল)	১০৮০০০	৪৩৮০০০	৯০০০

১৯৩২-৩৩ সালে মান্দ্রাজে তিল ১১২০০০ টন উৎপন্ন হইয়াছিল।

—

"শান্তিরক্ষা ও সুশাসনের ভারার্পণের অনুকূলতম অবস্থা"

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার উভয় কক্ষের সম্মিলিত অধিবেশনে বড়লাট সম্প্রতি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে

নানা বিষয়ের মধ্যে তিনি ফৌজদারী আইন সংশোধক বিলটা কেন পাস করাইতে চাহিয়াছেন তাহা বলেন। নূতন ভারতশাসন আইন জারি হইলেই,

"The primary responsibility for the maintenance of peace and good government in the provinces will be transferred to ministries responsible to the legislatures. I consider it my imperative duty to use such powers as I possess to secure that that transfer takes place in the most favourable conditions possible to the stability and success of these new Governments."

তাৎপর্য্য। "নূতন আইন জারি হইলেই, ব্যবস্থাপকসভাসমূহের নিকট দায়ী মন্ত্রিমণ্ডলের হাতে প্রদেশগুলিতে শান্তিরক্ষা ও সুশাসন রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব হস্তান্তরিত হইবে। সেই হস্তান্তরীকরণ যাহাতে এই নূতন প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলির দৃঢ়প্রতিষ্ঠা ও ফলবত্তার অনুকূলতম অবস্থায় ঘটে তাহার নিমিত্ত আমার ক্ষমতাসমূহ ব্যবহার করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।"

এবং সেই জন্য তিনি এই আইনটাকে স্থায়ী রূপ দিতে চাহিয়াছেন।

তাঁহার এই উক্তি হইতে ইহা অনুমান করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার হইবে না, যে, তাঁহার মনের সংজ্ঞানিক (conscious) বা আন্তর্জ্ঞানিক (sub-conscious) কক্ষে এই উপলব্ধিটা আছে, যে, নূতন ভারতশাসন আইনের ফলে দেশে অসন্তোষ ও অশান্তি লোপ পাইবে না বা কমিবে না, বরং বাড়িবে, এবং সেই অসন্তোষ ও অশান্তি দমন করিবার ও চাপা দিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত একটা আইন চাই, ও তদ্রূপ আইন দ্বারা প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহ (এবং কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টও) দৃঢ়প্রতিষ্ঠা ও ফলবত্তা লাভ করিবে।

কিন্তু ইতিহাস বলে না, কোন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ বলেন না, যে, দমন দ্বারা অসন্তোষ ও অশান্তি বিনষ্ট হয় এবং দমনকারী গবর্মেণ্ট সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় ও রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

—

ইতালী-আবিসীনিয়ার ব্যাপারে পাশ্চাত্য নিরপেক্ষতার গূঢ় অর্থ

আমরা ২৯শে আগষ্ট প্রকাশিত মডার্ণ রিভিয়ুর সেপ্টেম্বর সংখ্যার ৩৭৬ পৃষ্ঠায় ইতালী ও আবিসীনিয়াকে অস্ত্র বিক্রয় না-করা সম্বন্ধে ব্রিটেন ফ্রান্স ও আমেরিকার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার কয়েকটি কথা এই :—

"Italy has munition factories of her own and has already despatched considerable quantities of war materials. Ethiopia has no such advantage. So occidental 'neutrality' will go against Ethiopia."

তাৎপর্য্য। ইতালীর নিজেরই অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা আছে এবং সে (নিজের তৈরি ও অন্যান্য দেশ হইতে ক্রীত) বিস্তর যুদ্ধ-উপকরণ আফ্রিকায় পাঠাইয়াছে। আবিসীনিয়ার এরূপ কোন সুবিধা নাই। এই হেতু পাশ্চাত্যদেশগুলার তথাকথিত 'নিরপেক্ষতা' আবিসীনিয়ার বিরুদ্ধে যাইবে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা তাহার শত্রুতাই করা হইবে।

আমাদের এই মন্তব্য প্রকাশিত হইবার পর আমরা দেখিয়া প্রীত হইয়াছি, যে, অন্ততঃ একখানি বিলাতী কাগজ, ম্যাঞ্চেষ্টর গার্ডিয়ান, এই রকম কথা আগষ্ট মাসে লিখিয়াছিলেন। যথা—

The Abyssinian Minister in Paris has addressed a letter to the League protesting, in the name of his country, against the action of all League members that refuse to permit the export of arms to Abyssinia. If States and nations share the human attribute of conscience at all, this protest should find it out. Though no law forbids it and common justice commands it, though there is yet no war and technically no threat of war, though Italy, the open aggressor, masses her men and munitions on the Abyssinian frontiers and is helped by half the countries in Europe to do so, Abyssinia herself, the wronged, the innocent, the appealer to arbitration, cannot get so much as a single bullet for the defence of her independence. This just and generous example has been set by the Governments of France and Britain, both bound by a treaty actually designed to enable the Emperor of Abyssinia to obtain all the arms and munitions necessary for the defence of his country, on the ground that to permit the export of arms might prejudice the chances of a peaceful solution. Firm ground and fine chances these, but even were they so no chance can weigh against the plain alternatives of right and wrong. The British Government is now safely out of range of questions in the House of Commons, but not from the judgment of those it governs. It does not stop India from sending grain and camp equipment to the Italian troops; why, then, should it stop the export to Abyssinia of the first necessities of war? By September it may be too late. The embargo should be lifted now. To maintain it is nothing but sham justice, sham friendship, sham right, and sham neutrality.

তাৎপর্য্য। লীগের সভ্য যে-সব দেশ আবিসীনিয়াতে অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি করিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের এই কাজের প্রতিবাদ করিয়া পারিসস্থিত আবিসীনীয় মন্ত্রী লীগকে একটি চিঠি লিখিয়াছেন। যদি রাষ্ট্রসমূহের ও জাতিসমূহের ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেক নামক মানবিক সদ্গুণ থাকে, তাহা হইলে এই প্রতিবাদের ফলে তাহা আবিষ্কৃত হওয়া উচিত। যদিও আবিসীনিয়াকে অস্ত্র রপ্তানী কোন আইন নিষেধ করে না, যদিও সাধারণ ন্যায়বুদ্ধি ইহা করিতে বলে, যদিও এখনও যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, যদিও প্রকাশ্যভাবে আততায়ী ইতালী আবিসীনিয়ার সীমানায় প্রভূত সৈন্য ও যুদ্ধসম্ভার উপস্থিত করিতেছে এবং ইউরোপের অর্দ্ধেক জাতি ইতালীকে তাহা করিতে সাহায্য করিতেছে, তথাপি নির্দোষ, অত্যাচারিত ও সালিসীর জন্য আবেদক আবিসীনিয়া তাহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি মাত্র গুলি পাইতে পারে না। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের গবর্মেণ্টদ্বয় এই ন্যায়পরায়ণ ও

ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যদিও উভয় দেশই এমন একটি সন্ধিতে আবিসীনিয়ার সহিত আবদ্ধ যাহার উদ্দেশ্যেই হইতেছে আবিসীনিয়ার সম্রাটকে স্বদেশরক্ষার জন্য আবশ্যক সমুদয় অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ পাইতে সমর্থ করা তথাপি তাহারা তাঁহার জন্য অস্ত্র রপ্তানী করিতে দিতেছে না এই ওজুহাতে, যে, তাহাতে ইতালী-আবিসীনিয়া সমস্যার শান্তিময় সমাধানের সম্ভাবনায় ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। চমৎকার এই ওজুহাত এবং খাসা এই সম্ভাবনা! কিন্তু যদি বাস্তবিকই সেগুলা তাহা হইত, তাহা হইলেও এরূপ কোন সম্ভাবনাই ন্যায়ান্যায়বুদ্ধির স্পষ্ট নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না। পার্লেমেণ্টের অধিবেশন এখন হইতেছে বলিয়া ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট এখন হৌস অব কমন্সে প্রশ্নবাণের নাগালের বাহিরে নিরাপদ, কিন্তু যাহাদিগকে ঐ গবন্মেণ্ট শাসন করে, তাহাদের বিচারের অতীত নহে। এই (বিলাতী) গবন্মেণ্ট ইতালীয় সৈন্যদিগকে শিবিরসজ্জা ও খাদ্যশস্য প্রেরণ করিতে ভারতবর্ষকে নিষেধ করিতেছে না; তবে কেন ইহা যুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক যাহা আবিসীনিয়ায় তাহার রপ্তানী বন্ধ করিয়াছে? সেপ্টেম্বর নাগাদ এরূপ সাহায্য অতিবিলম্বিত হইতে পারে। যুদ্ধসম্ভার রপ্তানীর নিষেধ এখনই প্রত্যাহার করা আবশ্যক। এই নিষেধ বলবৎ রাখা মিথ্যা ন্যায়পরায়ণতা, মিথ্যা বন্ধুত্ব, মিথ্যা ধর্ম্মানুগত্য এবং মিথ্যা নিরপেক্ষতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষ্যে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ব্যয়

অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষ্যে সমুদয় যাত্রীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির জন্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটী যে সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা শুধু কলিকাতার লোকদের জন্য নহে। বঙ্গের সব জেলা হইতে বিস্তর, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতেও কিছু, যাত্রী আসিয়াছিল। সুতরাং বাংলা-গবর্মেণ্টের এই ব্যয়ের অংশ দিতে অস্বীকার করা অন্যায়। রেল কোম্পানীগুলার আয় এই উপলক্ষ্যে খুব বাড়িয়াছিল। কিন্তু সরকারী রেলের লাভ ভারত-গবর্মেণ্ট পান। সুতরাং কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ব্যয়ের কিয়দংশ ভারত-গবর্মেণ্টেরও ন্যায়তঃ দেওয়া উচিত।

—

প্রায়োপবেশক পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা

কালীঘাটে ছাগবলি (বা অন্য পশু বলি) বন্ধ করিবার জন্য যে পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা প্রায়োপবেশন করিয়াছেন তাঁহার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে। দুঃখের বিষয়, তিনি প্রায়োপবেশনের গুরু মহাত্মা গান্ধীর যুক্তিযুক্ত অনুরোধেও উপবাস ত্যাগ করেন নাই। বলি বন্ধ করাইতে হইলে শাস্ত্রীয় আলোচনা এবং ন্যায়-ও-দয়ামূলক যুক্তি প্রয়োগই প্রশস্ত পন্থা। যিনি নিজে পশুপক্ষী-বলিতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহার পক্ষে ইহার অপ্রচলন চাওয়া অবশ্যই সদিচ্ছা। কিন্তু এজন্য যেমন কোন প্রকার বাহ্য বলপ্রয়োগ অবিধেয়, তেমনি মনের উপর কোন চাপ দেওয়া রূপ যে জবরদস্তী ("moral coercion"), তাহাও অবিধেয় এবং ব্যর্থ। মহাত্মা গান্ধীর যে প্রায়োপবেশনের ফলে পুণা-চুক্তি হইয়াছিল, সেই প্রায়োপবেশনের বিরুদ্ধেও আমরা এই যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার সহিত আমাদের কিছু তর্কবিতর্কও হইয়াছিল। আমাদের যুক্তি-সমূহের পুনরাবৃত্তি বর্ত্তমান উপলক্ষ্যে আগে করি নাই, এখনও করিব না। পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা উপবাস ত্যাগ করিলে ও পশুবলি বন্ধ হইলে আমরা সুখী হইব।

"আশুতোষ সংস্কৃত অধ্যাপক"

"আশুতোষ সংস্কৃত অধ্যাপকে"র পদ আগে যখন খালি হয়, তখন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের যোগ্যতমতার বিষয় অন্য কেহ কেহ লিখিয়াছিলেন, আমরাও লিখিয়াছিলাম। তাহার ফল এই হইয়াছিল, যে, তিনি যোগ্যতম হইলেও কাজটি পান নাই। পদটি আবার খালি হইয়াছে। "তুমি লিখিয়াছ বলিয়াই তিনি কাজটি পাইলেন না," যাহাতে এরূপ কথা কেহ বলিতে না পারে, সেই জন্য আমরা আগে যাহা লিখিয়াছিলাম, এবার তাহা লিখিব না। ইতি।

—

হিন্দুত্ব, ও সংস্কৃতের চর্চ্চা

হিন্দুত্ব সংকীর্ণ অর্থে বুঝিলেও, যে-সকল শাস্ত্রের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার সংখ্যা অনেক, এবং সকলের উপদেশ এক নহে। ব্যাপক অর্থে ভারতবর্ষে জাত সকল ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মের নানা শাখা-প্রশাখার ও ভারতবর্ষজাত অন্য সব ধর্ম্মের মত ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আন্দোলন ও তর্কবিতর্ক

অনেক হয়, হইতেছে ও হইবে। এই সকল তর্কবিতর্ক ও আন্দোলনে ব্যাপৃত ও উত্তেজিত হইয়া কিন্তু এই সকল মতাবলম্বী কাহারও একটি মহৎ বস্তু ভুলিয়া থাকা উচিত নহে। তাহা সংস্কৃতের ও সংস্কৃতের জ্ঞাতিভাষাসমূহ এবং তৎসমূহে নিবদ্ধ বিস্তৃত গ্রন্থাবলী। এই সকলের চর্চ্চা ব্যতিরেকে ভারতীয় প্রাচীন কোন ধর্ম্মই বাঞ্ছিত অবস্থায় থাকিতে পারে না, অতএব, অবান্তর নানা বিষয়ে যিনি যত ইচ্ছা তর্ক, ঝগড়া, আন্দোলন, করিতে চান করুন, কিন্তু মূল ও প্রধান বিষয়টি সম্বন্ধে যেন একমত একপ্রাণ থাকেন। অবশ্য ধর্ম্মরক্ষা ছাড়াও সংস্কৃত প্রভৃতির চর্চ্চার অন্য নানা মহৎ প্রয়োজন আছে। আগে তাহা লিখিয়াছি।

বঙ্গে সংস্কৃত আদির চর্চ্চার একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান সংস্কৃত কলেজ। তাহার পুঁথি সংগ্রহাদির জন্য বৎসরে মাত্র এক হাজার টাকা বরাদ্দ আছে। ইহা বাড়ান একান্ত আবশ্যক। তাহার পর, সংস্কৃত কলেজটিকে অঙ্গহীন ও ও পঙ্গু করিয়া ক্রমশঃ উহা উঠাইয়া দিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কলহকারীদের এদিকে দৃষ্টি আছে ত?

—

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চিত্র উন্মোচন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদে সুখী হইলাম। এই তৈলচিত্রটি নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া পরিষদকে দান করায় ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয় বাঙালীদের, ভারতীয়দের, এবং সমুদয় প্রাচ্যবিদ্যানুরাগীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য, সংস্কৃত ও সংস্কৃতের জ্ঞাতি প্রাচীন ভারতীয় ভাষাসমূহ ও তাহাদের সাহিত্যের চর্চ্চার জন্য এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বানুশীলনের জন্য শাস্ত্রী মহাশয় যাহা করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখও সম্ভবপর নহে।

—

সন্তরক রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ সন্তরক রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ কাল জলে সাঁতার দিয়া এ পর্য্যন্ত যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে উচ্চতম রেকর্ড ছিল ইতালীয় পেদ্রো কন্দিওত্তির। তাহা ছিল ৮৭ ঘণ্টা ১৯ মিনিট; রবীন্দ্রের রেকর্ড ৮৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট।

—

বিদ্যাসাগর কলেজে বীরেন্দ্রনাথ সাসমলের ছবি

পরলোকগত নেতা বীরেন্দ্রনাথ সাসমল বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র ছিলেন। সেই জন্য এই কলেজের কমন-রুমে তাঁহার চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। কলেজ এতদ্দ্বারা নিজের একটি কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। দেশনায়করূপে সাসমল মহাশয় যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্মৃতি রক্ষার্থ সর্ব্ব-সাধারণের ব্যবহৃত কোন হলে তাঁহার চিত্র রক্ষিত হওয়া উচিত।

গ্রামনগরাদির মধ্যে আসন বণ্টন

স্বরাজলাভের জন্য এবং অন্যবিধ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চালাইবার জন্য যে-সব শ্রেণীর লোককে সকলের চেয়ে যোগ্য উদ্যোগী কষ্টসহিষ্ণু ও ত্যাগী বলিয়া জানা গিয়াছিল, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুনা-চুক্তি দ্বারা তাহাদিগকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শক্তিহীন করা হইয়াছে। কিন্তু আরও শক্তিহীন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। আদালত ও সরকারী আফিসসমূহ, কলেজ ও স্কুলসমূহ, বড় বড় কারবার, ইত্যাদি প্রধানতঃ শহরগুলিতেই অবস্থিত; শহরে রোজগারের উপায় নানাবিধ; শহরে আধুনিক সভ্যজনোচিত জীবন যাপনের সুবিধা অধিক; রোগে চিকিৎসার সুবিধা শহরে

অধিক; মোটের উপর বঙ্গের বিস্তর গ্রাম অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর;—এই প্রকার নানা কারণে শিক্ষিত শ্রেণীসমূহের যোগ্য লোক গ্রামের চেয়ে শহরেই, বিশেষ করিয়া কলিকাতায়, বাস করে। এই জন্য, শিক্ষিত লোকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব কমাইবার নিমিত্ত, শহরের চেয়ে গ্রাম অঞ্চলকে ব্যবস্থাপক সভায় বেশী করিয়া আসন দেওয়া হইতেছে, এখানকার ক্ষুদ্রতর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতার যত আসন আছে, ভবিষ্যৎ বৃহত্তর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতাকে তাহা অপেক্ষা কম আসন দেওয়া হইতেছে।

ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যাম্‌জি ম্যাকডন্যাল্ড, কতকটা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছিলেন, যে, বঙ্গের বাণিজ্যিক ১৯টা আসনের ১৪টা ইউরোপীয় ব্যবসাদারদিগকে ও ৫টা দেশী ব্যবসাদারদিগকে দেওয়া হইতে পারে। এরূপ আসন বণ্টনের মূলে কোন ন্যায্য কারণ ছিল না, এবং নূতন ভারতশাসন আইনে ইহা স্থানও পায় নাই। তথাপি বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদের প্রস্তাবে মিঃ ম্যাকডন্যাল্ডের ঐ উক্তিটা অনুসারে কাজ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু ও সুধাংশুমোহন বসু ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, দেশী খবরের কাগজসমূহেও প্রতিবাদ হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে কেবল রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটেরা (যাহাদের সংখ্যা কম) ভোট দিতে পারিবে, ইহাও একটা কুব্যবস্থা।

—

ছোটনাগপুরে হিন্দুধর্ম্ম ও আদিম জাতিদের ধর্ম্ম

হিন্দু মহাসভার ও আর্য্য সমাজের কোন কোন কর্ম্মী ছোটনাগপুরে হিন্দু ও আদিম জাতির লোকেরা যাহাতে ভারতীয় ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে ও খ্রীষ্টীয়ান হইয়া থাকিলে আবার স্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসে তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ইত্যাদি ওজুহাতে বিহার-গবর্ন্মেণ্ট এই সব কর্ম্মীর ছোটনাগপুরে কাজ করা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন! "নিষিদ্ধ" কর্ম্মীদের মধ্যে জীবিত ও মৃত উভয়ই আছেন!! খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিলে কোন দোষ হয় না?

—

পূজার ছুটি

শারদীয় পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে প্রবাসী-কার্য্যালয় ১৬ই আশ্বিন হইতে ২৯শে আশ্বিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা ৩০শে আশ্বিন কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪২। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
প্রবাসীর স্বত্বাধিকারী।

বাংলা

গেণ্ডারিয়া মহিলা-সম্মিলনী ও জুড়ান শিক্ষা মন্দির

গেণ্ডারিয়া মহিলা সম্মিলনী ঢাকা শহরের একটি মহিলা সমিতি। ১৩৩১ সনে এই সমিতির স্থানীয় কয়েক জন মহিলার চেষ্টাতে গঠিত হইয়া আজ এগার-বার বৎসর যাবৎ নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে। বিশেষ সভা ও অধিবেশনাদির মধ্য দিয়া মহিলাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ব্যবস্থা ভিন্ন ইহার স্বাস্থ্যবিভাগ, শিল্পবিভাগ ও শিক্ষাবিভাগ ইত্যাদির কাজও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিবৎসরই মহিলাদের উদ্যোগে এই সমিতিতে একটি খদ্দর ও স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। দুইটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ও এই সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "জুড়ান শিক্ষামন্দির" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঢাকা শহর হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী জুড়ান নামে একটি নমঃশূদ্র ও ঋষি-পল্লীতে পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বে সমিতির মহিলা কর্ম্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্কুলটি আরম্ভ হয়। এই গ্রামটি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল। মহিলারা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া ছাত্র ও ছাত্রী সংগ্রহ করিয়া উঠানে চাটাই পাতিয়া বসিয়া প্রথম ইহাদের মধ্যে শিক্ষার সূত্রপাত করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈকা সহৃদয়া নমঃশূদ্র কৃষক-দুহিতা তাহার নিজ ভিটাবাড়ির কতকাংশ স্কুলের জন্য প্রদান করায় সেখানে জনৈক সহৃদয় ভদ্রলোকের অর্থ-সাহায্যে একখানি প্রশস্ত স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে ও অনেক ছাত্র-ছাত্রী ইহাতে শিক্ষালাভ করিতেছে। দুই-তিন বৎসর যাবৎ এই স্কুল হইতে উচ্চশিক্ষা-লাভার্থ শহরের হাই স্কুলে ছাত্র ভর্ত্তি করা হইতেছে। ঋষিপল্লীর একটি ছেলেকে কয়েক মাস হইল সমিতি হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের "চর্ম্ম কুটীরশালাতে" প্রেরণ করা হইয়াছে। সে শিক্ষালাভ করিয়া ফিরিয়া

জুড়ান শিক্ষা মন্দির

সমিতিতে সমিতি হইতে জুড়ান গ্রামে ঋষিদের মধ্যে চামড়া পাকা করার ব্যবস্থা করা হইবে। এই স্কুলটি সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা এই যে গেণ্ডারিয়ার অত্যন্ত গোঁড়া বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ মহিলারাও এই স্কুল ও গ্রাম পরিদর্শন ও গ্রামবাসীদের সহিত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা অস্পৃশ্যতার ভাব তাঁহাদের অন্তর হইতে ক্রমশঃই কিরূপ দূর হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে।

১৩৩৬ সনে (ইং ১৯৩০) লবণ-সত্যাগ্রহ ও আইন-অমান্য আন্দোলনে গেণ্ডারিয়া মহিলা-সমিতির কয়েকজন মহিলা কর্ম্মী যোগ দিয়া ঢাকা জেলার শতাধিক গ্রামে পরিভ্রমণ ও এই জিলায় মহিলা আন্দোলন পরিচালনা করেন। সেইজন্য ১৩৩৮ সনে (ইং ১৯৩২) এই সমিতি সরকার কর্ত্তৃক বে-আইনী ঘোষিত হয়। এই সময় ঐ সব মহিলা-কর্ম্মীর আন্দোলনের ফলে ঢাকা বিক্রমপুরের বহু মহিলা অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য ও কারাবরণ করেন। সেজন্য নানা অসুবিধার মধ্য দিয়া ঐ কয় বৎসর এই স্কুলটিকে চালাইতে হইয়াছে। আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর উক্ত সমিতির বে-আইনী ঘোষণাও রদ করা হইয়াছে এবং মহিলারা এই স্কুলটির জন্য আবার উপযুক্তরূপ খাটিতে পারিতেছেন। দুই মাইল রাস্তা গ্রীষ্মের দিনে হাঁটিয়া ও বর্ষাতে নৌকায় পার হইয়া মহিলারা এই স্কুলটিতে শিক্ষাদানের কাজ চালান। আশা করি অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে মহিলাদের এই চেষ্টা জনসাধারণের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইবে।

পরলোকে যামিনীমোহন মিত্র—

বিগত ২৭এ আগষ্ট বঙ্গীয় সমবায় বিভাগের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার রায় বাহাদুর যামিনীমোহন মিত্র মহাশয় তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। এই সংবাদে বাংলার তথা ভারতের কৃষকসম্প্রদায়ের শুভানুধ্যায়িগণ মর্ম্মাহত হইবেন সন্দেহ নাই। ৮৮১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর বর্দ্ধমান জেলায় যামিনীমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন মিত্র বিচারবিভাগে সাব-জজের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শৈশবে ও যৌবনে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া মাত্র উনিশ মাসের মধ্যেই কৃতিত্বের সহিত এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া যামিনীমোহন ১৯০৩ সালে সরকারী কার্য্যে যোগদান করেন।

১৯০৯ সালে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে তিনি বঙ্গীয় সমবায় বিভাগের প্রথম বাঙালী রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। ১৯১৭ সনে স্বীয় প্রতিভাবলে ভারত-সরকারের শিক্ষাবিভাগে অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী ও পরে ডেপুটি সেক্রেটারী পদে উন্নীত হন। পারিবারিক কারণে তিনি কলিকাতায় থাকা একান্ত প্রয়োজন বোধ করেন ও ভারত সরকারের অধীনে উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নপদ "কীপার অফ্ ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস্" এর পদ গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসেন। বাংলা-সরকারের বিশেষ অনুরোধে তিনি ১৯২২ সনে পুনরায় বঙ্গীয় সমবায় বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। ১৯২ সনে ব্রিটিশ এম্পায়ার এক্‌জিবিশনে 'বেঙ্গল কোর্ট'-এর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে ইংলণ্ড গমন করেন, এবং ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রেজিষ্ট্রারের পদে যোগদান করেন। এই সময়ে সমবায় আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় বলিয়া তাঁহার নাম ভারত ও ইউরোপের সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। যাঁহারা সমবায় সম্বন্ধে বহু মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন, উল্ফ প্রমুখ সেই সকল মনীষীর সুচিন্তিত গ্রন্থসমূহে সমবায়ের ক্ষেত্রে যামিনীমোহনের অবদান একবাক্যে স্বীকার করা হইয়াছে। যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই সসম্ভ্রমে যামিনীমোহনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন; তাঁহার অনুপ্রেরণায় সহকর্ম্মিগণ আত্মবিস্মৃত ও স্বার্থশূন্য হইয়া কার্য্য করিতে উৎসাহিত

যামিনীমোহন মিত্র

হইতেন। ১৯২৮ সনে সিমলায় বিভিন্ন প্রদেশের সমবায়-বিভাগের রেজিষ্ট্রারমণ্ডলীর যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, বহুদর্শী ও বিচক্ষণ বিবেচিত হইয়া তিনি তাহার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। পরবর্ত্তী বৎসর 'ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়াইরি কমিটির' অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেও, অসুস্থতার জন্য উহার অধিবেশনসমূহে যোগদান করিতে অসমর্থ হন। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের আতিশয্যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং ১৯৩০ সনে তিনি অবকাশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

সর্ব্বদা দায়িত্ববহুল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও দেশের কৃষক ও শিল্পীদিগের অশেষ কল্যাণ সাধন করা সম্ভব,—যামিনীমোহন তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রচার ও সংগঠনের কার্য্যে যখন তিনি বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিতেন, তাঁহার উদারতায় কৃষকগণ তাঁহাকে তাহাদেরই একজন মনে করিত। পাট বাংলার অতুলনীয় সম্পদ;—এই সঙ্গতির সম্পূর্ণ সুযোগ লইয়া, অসহায় কৃষকসম্প্রদায়কে সমবায়ের আদর্শে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্যের সম্পূর্ণ অধিকারী করিবার যে বিরাট পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন, পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য তাহাতে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই; সেই চরম সন্ধিক্ষণে তাঁহাকে অবকাশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দেশহিতৈষিতায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি বাংলার কৃষককুলের, তথা বাঙালী জাতির, সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

কৃতী মহিলা—

শ্রীমতী সাধনা সেনগুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় ধনবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি গৌহাটির এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাঃ কে এম সেনগুপ্তের কন্যা।

ভুবনডাঙ্গা প্রসাদ বিদ্যালয়
এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

রগজ শহরের স্বাস্থ্যনিবাস

বিদেশ
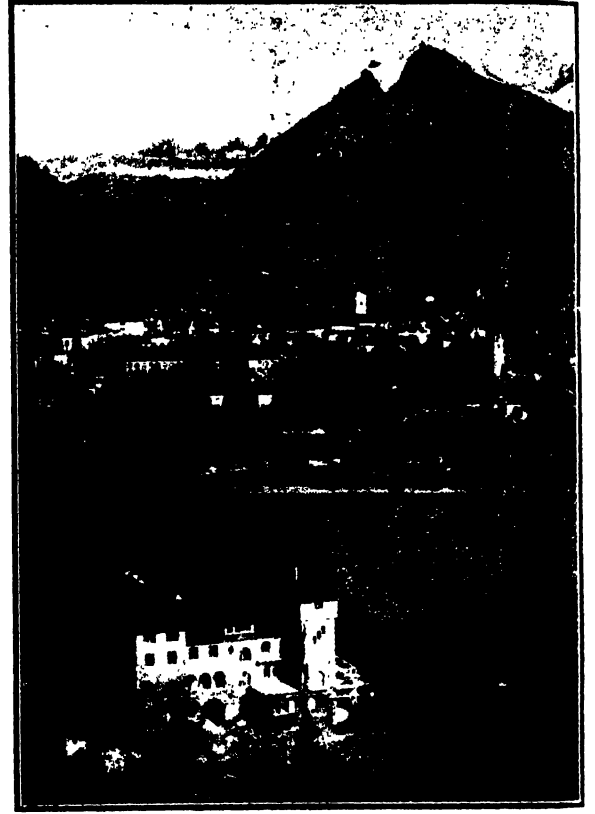
সুইজারল্যাণ্ডে স্বাস্থ্যাবাস—

ডাঃ কে পি ভৌমিক লিখিতেছেন বহুকাল অবধি সুইজারল্যাণ্ডের স্বাস্থ্যনিবাসগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যকামীদের আবাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা দ্বারা এই অনুমান হয় যে, এখানে কিছুকাল অবস্থান করিলে রুগ্ন ব্যক্তিদের দ্রুত উপকার হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা ও অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্যলাভ সম্ভব বলিয়া স্বাস্থ্যনিবাসগুলিতে অধিক লোকের সমাগম হয়।

কিন্তু একই স্থানে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য সমবেত হওয়া মোটেই সমীচীন নহে। উপকার না হইয়া ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে অপকার হইতে দেখা যায়। এ প্রকার ভুলের জন্য আমাদের অজ্ঞতাই দায়ী। অনেক সময় আমরা অপরের নিকট হইতে শুনিয়া স্বাস্থ্যলাভের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লই।

এই চিত্রখানি সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত রগজ (Ragaz) শহরের স্বাস্থ্যনিবাসের একটি দৃশ্য। রাইন ও টামিনা নদীর সঙ্গমস্থলে রগজ অবস্থিত। দূরবর্ত্তী পাহাড়ের স্নিগ্ধ বাতাস, চতুর্দ্দিকে পাইন বৃক্ষের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, সম্মুখে ধাতুজ গুণবিশিষ্ট হ্রদের মনোরম বারিরাশি—এই সকল কারণে রগজ স্বাস্থ্যলাভের একটি উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া এখানে গণ্য। ১১৫০ লোকের স্থান এই স্বাস্থ্যনিবাসে দেওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্মের দিক দিয়া এখানে রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যাণ্ট গির্জ্জা আছে। রেলযোগে জুরিক বা অন্য স্থান হইতে অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছান যায়। কোন কুয়াসা নাই অথচ বৎসরের সকল সময় সূর্য্যকিরণের অভাব হয় না। স্বাস্থ্যের জন্য অনেকে রগজ হ্রদে স্নান করেন। স্বাস্থ্যনিবাসগুলিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বন্দোবস্ত থাকায় সর্ব্বদাই তাঁহাদের পরামর্শ লওয়া যাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ রোগীর নষ্ট স্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে রচিটোন সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ইহাতে স্বাস্থ্যকামী যে দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন কেবল তা নয়, পরন্তু ইহা সেবনে শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা দূর হয়, রক্ত সতেজ হয়, এক কথায় রোগী পুনর্যৌবন লাভ করেন।

—

দ্রষ্টব্য

গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে "মহিলা-সংবাদ" বিভাগে "শ্রীমতী সুধীরা দে এই বৎসর মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্‌সি পরীক্ষায় জ়ুলজী (Zoology)তে "সসম্মানে (with honours) প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন" বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি অনার্স লন নাই ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথমও হন নাই। অবশ্য প্রবাসী বাঙালী মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম জ়ুলজী শিক্ষা করিয়াছেন।

সর্পদংশনে মৃত্যু ও তাহার প্রতিষেধ—

অপঘাত মৃত্যুর সংখ্যা বাংলা দেশে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্পদংশনে মৃত্যু অস্বাভাবিক। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রায় প্রত্যহ, বিশেষতঃ বর্ষাকালে, সর্পদংশনে মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হয়। অথচ ইহার প্রতিষেধের বিজ্ঞান-সম্মত: উপায় নির্ণীত বা অবলম্বিত হইতেছে না। অবশ্য, বাংলা দেশের পল্লীতে সাপুড়িয়া বা ওঝা দেখিতে পাওয়া যায়। দুই-একটি ক্ষেত্রে বিষ নামধেয় কাল রক্ত বাহির করিতে এবং রোগী আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ওঝার মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস না

দুই বার পায়ে কামড়াইবার পর সর্প-বিষ চুসিয়া লইবার বাটি প্রয়োগ করা হইয়াছে

দংশন-রত সর্প

করিলেও; তাহার যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। ধরুন বিষধর সর্প পায়ের চেটোয় দংশন করিয়াছে। নিকটবর্ত্তী লোকের ক্ষতস্থানের খানিকটা উপরে ও হাঁটুর উপরিভাগে দড়ি দিয়া শক্ত বাঁধন দেয়। তাহার পর, ওঝা আসিয়া পা জোরে নিম্নদিকে রগড়াইতে থাকে। কিছুক্ষণ . ... যায়, ক্ষতস্থান হইতে কাল রক্তের ন্যায় একটি পদার্থ বাহির হইতেছে।

তবে ওঝার কার্য্যে অনেক ক্ষেত্রে ফল পাওয়া যায় না। মার্কিনে টেক্সাস প্রদেশের অন্তর্গত সান এনটনিও শহরে সর্পদংশন সম্পর্কে ডাঃ ডাডলি জ্যাকসনের নেতৃত্বে এক দল চিকিৎসক পরীক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। পূর্ব্বে সর্পদংশনে সীরামের প্রয়োগ বলবৎ ছিল। ইঁহাদের মতে সীরামের প্রয়োগ অত্যাবশ্যক নহে। যখন রোগীর আরোগ্যলাভে বিলম্ব হয় বা সর্পের বিষ দেহে ছড়াইয়া পড়ে

সর্প-বিষ চুষিয়া লইবার বাটি ও অন্যান্য যন্ত্র

তখন ইহার প্রয়োগে কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে। ইঁহারা বলেন, হাতে কিম্বা পায়ে বা শরীরের যেখানে সর্প দংশন করে সেইখানে ও তাহার চারি পার্শ্বে প্রথমে ক্ষুরধার অস্ত্র দিয়া গভীর করিয়া কাটিতে হয়। এই সকল স্থানে বিসাক্ত রক্ত চুষিয়া লইবার জন্য কতকগুলি বাটি লাগান হয়। এই বাটিগুলিকে ইংরেজীতে 'suction cups' বলে। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর, অন্ততঃ দুই দিন ধরিয়া, এই বাটিগুলি লাগাইতে হয়।

গত সাত বৎসর যাবৎ এই প্রণালীতে সর্পদংশন-চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে সেখানে সর্পদংশনে মৃত্যুসংখ্যা অত্যধিক ছিল, সীরাম প্রয়োগেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমান প্রণালীতে চিকিৎসা আরম্ভ করায় মৃত্যুসংখ্যা শতকরা দুই জনেরও কমে দাঁড়াইয়াছে। মার্কিন সরকার এই চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ওঝাদের সংশয়মূলক প্রণালীর পরিবর্ত্তে এখানেও উক্ত প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা উচিত।

বিধ্বস্ত চীনা বিমান-ঘাঁটি, শাংঘাই

১৯৩২ সালে শাংঘাইতে জাপানী বিমানপোত হইতে বোমা-নিক্ষেপের ফলে ধ্বংসলীলার দৃশ্য

২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বর ও বধূ

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

২য় সংখ্যা

পৃথিবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে।

মহাবীর্য্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে ;
মানুষের জীবন দোলায়িত করো তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ করো সুধা
বাম হাতে চূর্ণ করো পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত করো অট্টবিদ্রূপে ;
দুঃসাধ্য করো বীরের জীবনকে, মহৎজীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে করো দুর্ম্মূল্য,
কৃপা করো না কৃপাপাত্রকে।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্ত্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্ত্তা॥
তোমার নির্দ্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
তার ত্রুটির পূর্ণ মূল্য শোধ হয়েছে বিনাশে।

তোমার ইতিহাসের আদিপর্ব্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জ্জয় ;
সে পরুষ, সে বর্ব্বর, সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জ্জিত ;
গদা-হাতে মুষল-হাতে মশাল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্ব্বত ;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড় রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।

দেবতা এলেন পর-যুগে
মন্ত্র পড়লেন দানব-দমনের,
জড়ের ঔদ্ধত্য হ'ল অভিভূত ;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
উষা দাঁড়ালেন পূর্ব্বাচলের শিখরচূড়ায়,
পশ্চিম সাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।
নম্র হ'ল শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্ব্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা,
তোমার স্বভাবের গর্ত্ত থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।
তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।
দেবতার মন্ত্র উঠছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে
দিনেরাত্রে
উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।
তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগ-দানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে,
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে।
শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
বিরাট প্রাণ, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে-মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব্ব দেহে মনে।

অগণিত যুগযুগান্তরের
অসংখ্য মানুষের লুপ্তদেহ
পুঞ্জিত তার ধূলায়।
আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি
আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম,
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়গ্রাসী
নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে।
অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
একদিকে আপকধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র,
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।
অস্তগামী সূর্য্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী—
"আমি আনন্দিত।"
অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।
বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেন পাখীর মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার ল্যাজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে।
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকলছেঁড়া কয়েদী-ডাকাতের মতো।
ফাল্গুনে দেখেছি তোমার আতপ্ত দক্ষিণে হাওয়া
ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহ মিলনের স্বগতপ্রলাপ
আম্রমুকুলের গন্ধে।
চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে
স্বর্গীয় মদের ফেনা।
বনের মৃত্যুমর্ম্মর থেকে থেকে উচ্ছ্বসিয়া উঠেছে
অধীর কলকল্লোলে॥

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞ হুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে,
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ—
বিনাবেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জ্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।

জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোট ছোট পিঞ্জরে।
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা
সব কীর্ত্তির অবসান।
আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসি নি তোমার সম্মুখে,
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবী করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্য্য প্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হ'তে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো একটি আসনের সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় ক'রে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে ;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে-রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে ॥

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্ম্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি ॥

শান্তিনিকেতন
১৬ অক্টোবর
১৯৩৫

ছাত্রদের প্রতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি যখন আশ্রমে ছাত্রদের আরো কাছাকাছি বাস করতুম, তখন তাঁদের কাঁচা বয়সের কাঁচা লেখার পরিচয় পাওয়া আমার পক্ষে ছিল সহজ। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সুযোগ এখন আর আমার নেই। তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করার শক্তি ও সময় আমার নেই। কিন্তু আজকের এই সভায় এসে তোমাদের চিন্তাধারার একটু পরিচয় পাওয়ার সুযোগ ঘটল।

তোমরা যে-সব লেখা পড়লে, সেগুলো নানা বিচিত্র ধরণের রচনা। তার মধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলেম— তোমরা গল্প, কবিতা এবং বর্ণনাচ্ছলে যা-কিছু লিখেছ তার প্রায় সবগুলোই রসসাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে।

তোমাদের রচনাতে একটা জিনিষের অভাব—সে চিন্তার উপাদানের। আজ পৃথিবীতে নানা সমস্যা দুর্ব্বার হয়ে উঠেছে, চারিদিকে প্রলয় তাণ্ডবের গর্জ্জন—এ অবস্থায় মন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। মানুষের ভাগ্য যখন ঘটনাসংঘাতে প্রবলভাবে নাড়া খেয়ে ওঠে তখন ভাবী পরিণামচিন্তায় মন স্বভাবতই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সাধারণত এসম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্যের অভাব দেখতে পাই। মনে হয় তার একটা কারণ আমরা অদৃষ্টবাদী—সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব দৈবের হাতে সমর্পণ করে নিশ্চেষ্ট থাকা আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অভ্যাস। চারদিকে দৃষ্টিকে সজাগ রেখে কান পেতে থাকার উদ্যম আমাদের ক্ষীণ। কিন্তু মানব-ইতিহাসের ঢেউয়ের ধাক্কা থেকে উদাসীনভাবে নিজেকে সরিয়ে রাখা আজ আর শোভা পায় না। একটা প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী জনসমুদ্রে, যেন সমস্ত সভ্যজগৎকে এক কল্প থেকে আর এক কল্পে উৎক্ষিপ্ত করবার মন্থন ব্যাপার সুরু হয়েছে। আমরা আছি কালের রুদ্রলীলাক্ষেত্রের নেপথ্যকোণে। বর্ত্তমান মানবসমাজের বড়ো আন্দোলনে যোগ দেবার সম্যক উপলক্ষ্য আমাদের আসে নি, তার বজ্রগর্জ্জন দূর ব্যবধানের মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণভাবে পৌছয় আমাদের কানে। কিন্তু আমরাও তো সুখে নেই। ঐতিহাসিক চক্রবাত্যার লেজের ধাক্কা বাইরের থেকে আমাদের বাসায় এসে লাগে, আবার ভিতরের থেকেও দুর্গতি বিচিত্র আকারে দিনে দিনে উঠছে দুঃসহ হয়ে। দেখতে পাচ্চি আমাদের বর্ত্তমানের ম্লানদিগন্তে ভবিষ্যৎ রাত্রির অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে। সমস্যার পর দুর্জ্জয় সমস্যা এসে অভিভূত করেছে দেশকে, কিসে তার সমাধান, আমরা জানি না। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আজ যে পরস্পর বিচ্ছেদ ও বিদ্রোহ উত্তাল হয়ে উঠেছে, যদি দেখতেম, এর সহজ নিষ্কৃতি আছে তবে চুপ করেই থাকতেম। কিন্তু তার মূল প্রবেশ করেছে গভীরে, সহজে এর সমাধান হবে না। আর যদি সমাধান না করতে পারি, তবে আসবে "মহতী বিনষ্টি"। এখন চুপ ক'রে থাকবার সময় নয়। আমাদের ভাবতে হবে, বড়ো করে ভাবতে হবে— ভাবাবিষ্ট আর্দ্রচিত্তে নয়, বুদ্ধিপূর্ব্বক চিন্তা ক'রে। দেশের সম্বন্ধে, সমস্ত মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের ভাবতে হবে। ভাববার কারণ হয়েছে। সেই ভাবনার অভাব দেখলাম তোমাদের রচনায়।

আমরা ভাঙনধরা নদীর কূলে বসে আছি, এক মুহূর্ত্তেই তা একেবারে ভেঙে ধ্বসে পড়তে পারে। এই যে চারদিকে গ্রামগুলো আমাদের বেষ্টন করে আছে, সেখানে প্রবেশ করলে তোমরা দেখতে পাবে, মরণদশা ধরেছে তাদের। দুঃখদারিদ্র্যের সহচর ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা সমস্ত জাতির জীবনী-শক্তিকে আক্রমণ করে চারদিকে বিস্তার লাভ করেছে। এর প্রতিকার কোথায়, সে কথা ভাবতে হবে আমাদের— নির্ব্বোধের মতো নয়, ভাববিহ্বল ভাবে নয়। অধ্যয়ন, পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা ক'রে সমস্যাগুলোকে যথোপযুক্ত আয়ত্ত করতে হবে। মৃত্যুদূতের দ্বারা আক্রান্ত দেশের বিপন্নতার বেদনা কেন পৌছবে না তোমাদের চিন্তায়, কর্ম্মে? তোমরা স্কুলবিভাগের ছাত্র হ'লে তোমাদের এ সব কথা

বলতাম না। তোমরা বড়ো হয়েছ, কলেজবিভাগে প্রবেশ করেছ, মানবজাতির দুরূহ দায়িত্বের দুর্গম পথে সদ্য তোমরা পা দিয়েছ, কিন্তু যাত্রার জন্যে এখনও মন প্রস্তুত হ'ল না কি? মোহাবেশ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পৌরুষের সঙ্গে সমস্ত সমস্যাকে তার সকল গ্লানিসত্ত্বেও স্বীকার ক'রে নাও। এই পণ ক'রে তোমাদের চলতে হবে—পরাস্ত যদি হ'তেই হয়, তবে বিরুদ্ধতার আঘাতকে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতে করতেই মরব। অর্থাৎ কাপুরুষের মতো প্রতিকূল অবস্থার কাছে হাল ছেড়ে দিয়ে মরব না—অথবা নির্বোধের মতো নির্বিচারে আত্মহত্যার পথে ছুটব না।

ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতি পরিমাণে, হৃদয়াবেগ অতি সহজেই আমাদের মনকে অভিষিক্ত ক'রে তোলে। তার উত্তেজনাকে আমরা ব্যবহার করতে চাই নিজেকে কাজে প্রবৃত্ত রাখবার জন্যে। ক্রমে উত্তেজনার মাদকতা হয় মুখ্য, কর্ত্তব্য হয় গৌণ। এমন ক'রে নিজেকে না ভুলিয়ে নিছক সত্যের প্রেরণায় কোনো কাজে আমাদের মন যায় না। দেশের একটা কাল্পনিক স্বরূপের অসামান্য উৎকর্ষের অত্যুক্তি সাজিয়ে তুলে' তার পশ্চাতে আমাদের দৈন্য গোপন ক'রে কেবল লজ্জা আছে, লাভ নেই। অবাস্তবের বাষ্পাচ্ছন্ন ভাবালুতার মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অভাব অসম্পূর্ণতা মূঢ়তা কদর্য্যতা সব-কিছুকে সুস্পষ্ট ক'রে জেনে তৎসত্ত্বেও প্রমাদহীন দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তে অবমানিত করছে সেখানে আপন ঘরগড়া অহঙ্কারে নিজেকে এবং অন্যকে ভোলানো ছেলেমানুষী, দুর্ব্বল চিত্তের সেইটেই সব চেয়ে বড়ো দুর্লক্ষণ। সত্যকার কাজ আরম্ভ করবার মুখে একথা মানা চাই যে, আমাদের নিজের সমাজে আমাদের স্বভাবে আমাদের অভ্যাসে আমাদের বুদ্ধিবিকারেই গভীর ভাবে নিহিত হয়ে রয়েছে আমাদের সর্ব্বনাশ। দুর্ভাগ্যের সেই মূলে, বহুপ্রাচীন প্রথার প্রাচীরভিত্তিতে আমাদের অধ্যবসায় নিযুক্ত করতে হবে আত্মীয়পরের সমস্ত কঠিন বাধার বিরুদ্ধে। তা না ক'রে যখনই আমাদের দুর্গতির সকল দায়িত্ব বাহিরের অবস্থার এবং অপর পক্ষের প্রতিকূলতার প্রতি আরোপ ক'রে বধির শূন্যের অভিমুখে তারস্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি তখন হতাশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের মতো মন ব'লে ওঠে "তদা নাসংশে বিজয়ায় সঞ্জয়,"—আপনি যার সব চেয়ে বড় শত্রু বাহিরের শত্রু বারেবারেই তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে।

জীবনের সার্থকতার জন্যে আমি রসের প্রয়োজনকে খুবই মানি কিন্তু রসের প্লাবনকে মানি নে। তার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন সত্যকে মানতে হবে চিন্তাশক্তির সহযোগে। তোমাদের রচনায় এবং কাজে আমি এই দেখতে চাই যে, নির্ম্মল আনন্দের ক্ষেত্রে যেমন তোমরা বিশ্বের অন্তরঙ্গ মন নিয়ে সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করো তেমনি মানবসমাজের বিচিত্র ব্যাপারের প্রতি ঔৎসুক্য নিয়ে তোমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক চিন্তা করো, অন্বেষণ করো, বিচার করো এবং আপন জীবনের লক্ষ্য অবধারণ করো।*

---

* বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর সভার সভাপতির অভিভাষণ
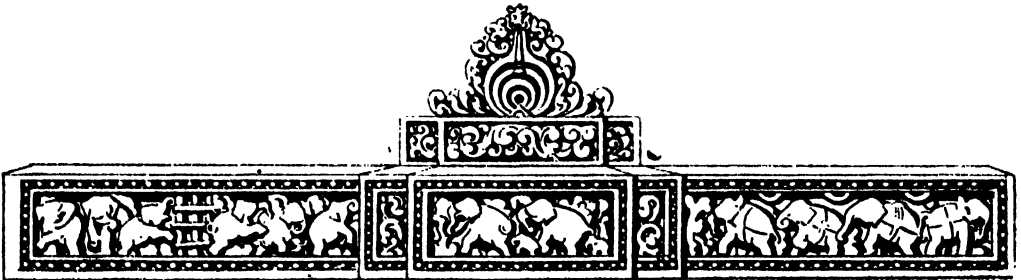
মঠ ও আশ্রম

অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জাবাল-উপনিষদে একটি শ্রুতি আছে, তাহাতে আমরা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থাটি পাই।—"ব্রহ্মচর্য্য শেষ করিয়া, গৃহী হইবে; গৃহী হইয়া পরে বানপ্রস্থ হইবে; তার পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।" ইহাই শ্রুতি-স্মৃতির প্রাচীন ব্যবস্থা। কিন্তু ইহার পরক্ষণেই জাবাল-উপনিষদ্ বলিতেছেন—"যদি অন্য রকম হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা যায়, অথবা গার্হস্থ্য কিংবা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা যায়। যেদিন সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সে দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিবে।"

এই শেষোক্ত মতটি ঠিক শ্রুতি-স্মৃতির আশ্রম সম্বন্ধে সাধারণ ব্যবস্থার অনুযায়ী নহে। "যেদিন বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সে দিনই সন্ন্যাসী হইতে পারিবে" -এ অধিকার ধর্ম্মশাস্ত্র কাহাকেও দেয় নাই। এ সম্বন্ধে মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা এই;—"গৃহস্থ যখন নিজের চর্ম্ম লোল এবং কেশ পক্ক দেখিবে এবং যখন সে তার সন্তানের সন্তান দেখিবে, তখন সে অরণ্য আশ্রয় করিবে।" আর কিছু কাল বনে বাস করিবার পর যখন সে অনুমিত আয়ুর চতুর্থ ভাগে উপনীত হইবে, তখন সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক হইবে।৬।৩৩। মনু এই আশ্রম-ক্রমের ব্যত্যয় কখনও অনুমোদন করেন নাই। মনুর মতে—

> অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্।
> অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥
>
> —মনু, ৬।৩৭।

অর্থাৎ দ্বিজাতি বেদাদি পাঠ না করিয়া এবং গৃহী না হইয়া এবং যজ্ঞাদি কর্ম্ম না করিয়া যদি মোক্ষলাভ করিতে চান (অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন), তবে তিনি অধঃপাতে যাইবেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে, আশ্রমের যে ক্রম সাধারণতঃ অনুসৃত হইত, তাহাই মনুর অভিপ্রেত। যে কোন সময়ে সন্ন্যাস কিংবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা ইহার অনুমোদিত নহে।

বিষ্ণু-সংহিতায়ও আমরা এই প্রকার ব্যবস্থাই দেখিতে পাই (৯৪ অঃ)। সেখানেও এই একই কথাই বলা হইয়াছে যে, গৃহী যখন লোল-চর্ম্ম ও শুক্ল-কেশ হইবে কিংবা নাতির মুখ দেখিবে, তখনই বনে যাওয়ার কথা ভাবিবে, তার পূর্ব্বে নয়। অবশ্যই, তার পরেও আর গৃহে থাকা দ্বিজাতির কর্ত্তব্য নয়।

এই সব বিধি হইতে বুঝা যায় যে, হিন্দুর প্রাচীন রীতি অনুসারে যথাক্রমে চারিটি আশ্রম অবলম্বন করাই ঈপ্সিত ছিল, ইহার কোন একটি অতিক্রম করিয়া আর একটি অবলম্বন করা ঠিক সাধারণ ভাবে শাস্ত্রসম্মত নয়। জাবাল-উপনিষদে যে শ্রুতি কখনও কখনও আশ্রম-চতুষ্টয়ের ক্রম-ভঙ্গ অনুমোদন করা যায় বলিয়া মত দিয়াছেন, তাহাও সাধারণ নিয়ম নয়। চারিটি আশ্রমেরই প্রয়োজন আছে এবং প্রত্যেকটিরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ও আছে; যখন যেটি খুশী গ্রহণ করা শাস্ত্রসম্মত নয় এবং কোনও একটি গ্রহণ না-করাও শাস্ত্রকারদের অভিমত নয়।

বিশেষতঃ গৃহস্থ আশ্রম অবহেলা করার কোনও যুক্তিই নাই। বরং ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং মহাভারতাদি গ্রন্থে গৃহীর এত প্রশংসা রহিয়াছে, যে, সে আশ্রম গ্রহণ না করা দস্তুরমত অবৈধ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত জাবাল-শ্রুতি হইতে মনে হয়, একটা বিরুদ্ধ মত ক্রমশঃ মাথা উঁচু করিতেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই মত আরও প্রবল আকার ধারণ করে।

বুদ্ধ নিজে অসময়ে—অশাস্ত্রীয় সময়ে—সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং তিনিই আবাল্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তার পর, হিন্দুসমাজেও ইহার অনুকরণ দৃষ্ট হয়। এবং যাঁহাকে অন্ত কারণে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিয়া তিরস্কার করা

হইয়াছে, সেই শঙ্করাচার্য্যও আবাল্য সন্ন্যাসী ছিলেন। শঙ্কর অবশ্যই বুদ্ধের দৃষ্টান্তের দোহাই দেন নাই; তাঁর পক্ষে "যেদিন বৈরাগ্য হইবে সেদিনই সন্ন্যাসী হইতে পারিবে,"—এই জাবাল-শ্রুতিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এই জাবাল-শ্রুতির বিরুদ্ধে এত শাস্ত্রের বচন রহিয়াছে যে, ইহাকে একটা নূতন মতবাদের ক্ষীণ সমর্থন ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, যে-কোন বয়সে এবং যে-কোন অবস্থা হইতে যাঁরা সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁরা ঠিক শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া তাহা হন নাই। শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস দ্বিজাতির চতুর্থ আশ্রম, প্রথমও নয়, দ্বিতীয়ও নয়; আর, এই সন্ন্যাসে তাঁরই অধিকার আছে যিনি বাকী তিনটি আশ্রম যথাক্রমে অবলম্বন করিয়াছেন।

এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম হিন্দুসমাজে অনেক দিন হইল চলিয়া আসিতেছে। এখনও অনেক—বহু লক্ষ—হিন্দু সন্ন্যাসী ভারতে রহিয়াছে যাহারা সন্ন্যাস ছাড়া আর কোন আশ্রমই অবলম্বন করে নাই। অর্থাৎ যাহারা কখনও বিদ্যা অর্জ্জন করে নাই, কখনও গৃহীর কর্ত্তব্য যজ্ঞাদি ও অতিথি-সেবা ইত্যাদিও করে নাই, যাহারা বনে বাস করিয়া কঠোর তপস্যা করে নাই—অথচ শুধুই সন্ন্যাসী! সংসারের বন্ধনে ইহারা পড়ে নাই, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে,—ইহাই ইহাদের বড় গর্ব্ব! এবং কোন বিদ্যা অর্জ্জন করে নাই, আর, অর্থের ব্যবহার করিলেও অর্থ উপার্জ্জন করে নাই,—ইহাই ইহাদের একটি বড় গুণ। হিন্দুসমাজে ইহাদের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্র ইহাদের অস্তিত্ব অনুমোদন করে বলিয়া ত মনে হয় না!

আরও একটা কথা। বুদ্ধের পর তাঁহার ধর্ম্ম যাহারা গ্রহণ করিল তাহাদের ভিতর বিহার ও চৈত্যের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইল। এই সব বিহার নিতান্তই পর্ণকুটীর ছিল না; যেখানে ইঙ্গুদী-তৈলের প্রদীপ জ্বলিত এবং যেখানে স্নানান্তে আশ্রমবাসীরা গাছের ডালে আর্দ্র বল্কল শুকাইতে দিত, এ সব বিহার সে-রকম দীনভাবাপন্ন ছিল না। সারনাথ প্রভৃতি যে-সব বিহারের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, অনেক সময় এই সব বিহার রাজোচিত অট্টালিকার শোভা বহন করিত। অবশ্য এই সব বিহারে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা অ-গৃহী অর্থাৎ সন্ন্যাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা বাস করিতেন ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত বিরাট অট্টালিকায়। সন্ন্যাসীর পক্ষে এই প্রকার সৌধে বাসও হিন্দুর আশ্রম-ধর্ম্মের অননুমোদিত।

সন্ন্যাস চতুর্থ আশ্রম। তাহার পূর্ব্বে বনে বাস বিহিত হইয়াছে। ধর্ম্মান্বেষী কিংবা মুক্তিকামী যখন সংসার ত্যাগ করিবে, তখন আর তাহার সৌধে বাস করা শাস্ত্র অনুমোদন করে নাই। বনবাসের এবং সন্ন্যাসের যে বিধি মনু-যাজ্ঞবল্ক্য দিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করিতে হইলে অনেক 'সাধু-বাবা'র আশ্রমই আর টিকিতে পারে না। বনবাসী গ্রাম হইতে সামান্য আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া খাইবে; আট গ্রাসের বেশী খাইবে না; ফল, মূল, পত্র, শাক, এই সবই তাহার আহার্য্য হইবে; সে তপস্যা দ্বারা শরীরকে শোষিত করিবে; বর্ষায় আকাশতলে শয়ন তাহার কর্ত্তব্য, আর, হেমন্তে আর্দ্র বস্ত্রে থাকা (বিষ্ণু-সংহিতা, ৯৪ ও ৯৫ অধ্যায়)। ধর্ম্মশাস্ত্রে কোথাও দেখা যায় না, যে, বনবাসী পাকা কোঠা-বাড়িতে থাকিবে, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত এবং ঘন গোদুগ্ধ ব্যবহার করিয়া দেহটিকে পুষ্ট করিবে, কাবুলী মেওয়া এবং বিলাতী 'রক্ষিত ফল' ভক্ষণ করিবে, অসুখ হইলেই বড় বড় চিকিৎসককে তলব করিবে।

সন্ন্যাস বা চতুর্থ আশ্রম সম্বন্ধে শাস্ত্রের নিয়ম আরও কঠোর। এ সময়টা মৃত্যু এবং মোক্ষের প্রতীক্ষার সময়। এ সময়ে যতি ভিক্ষাদ্বারা জীবন যাপন করিবে। সায়াহ্নে অলক্ষিত ভাবে গ্রামে ভিক্ষার জন্য যাইবে। ভিক্ষা না পাইলে ব্যথিত না হইয়া ফিরিয়া আসিবে। সাত বাড়ির বেশী ভিক্ষার জন্য গমন করিবে না। মৃন্ময়, দারুময়, কিংবা বংশ ও অলাবুর পাত্র ছাড়া অন্য কোন প্রকার পাত্র ব্যবহার করিবে না। বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে কিংবা দেবগৃহে কিংবা গ্রামের প্রান্তে কোথাও শয়ন করিবে। কোথাও দীর্ঘকাল বাস করিবে না। একলা থাকিবে। সামান্য আচ্ছাদন মাত্র ব্যবহার করিবে। জীবনে এবং মরণে সমদৃষ্টি হইয়া যোগাভ্যাস ও তত্ত্বাভ্যাস করিবে। মৃত্যু আসিয়া দেহের বন্ধন ছিন্ন না-করা পর্য্যন্ত এই ভাবে সময় কাটাইবে। চতুর্থ আশ্রমের ইহাই বিধি। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সংহিতায় আমরা এই বিধিই দেখিতে পাই।

বর্ত্তমানে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর তফাৎ উঠিয়া গিয়াছে এবং নানা শ্রেণীর অশাস্ত্রীয় সন্ন্যাসীতে হিন্দু সমাজ ভর্ত্তি হইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই মূর্খ, অনধীতবেদ, সুতরাং সন্ন্যাসে অনধিকারী। ইহাদের ধূনা, গাঁজা এবং চিম্‌টা ও ভস্ম ছাড়া আর কিছুই জানা নাই। তীর্থে ভিড় করিয়া গৃহস্থের উপর অত্যাচার করিয়া এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা এখনও বেশ সুখে চলাফেরা করিতেছে। ইহারা বিনা-ভাড়ায় রেলে চড়ে, বিনা উপার্জ্জনে ভাল খায় এবং নিশ্চিন্ত মনে স্বাস্থ্যবান্ দেহে দীর্ঘ জীবন উপভোগ করে।

আর এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা বড় বড় কোঠা-বাড়ির মালিক। মখমলে মোড়া বাঘের চামড়ায় তাকিয়া ঠেস্ দিয়া ইঁহারা বসেন এবং শিষ্য-পরিবৃত হইয়া অপরাহ্ণ কাল সুখে কাটান। অন্য সময়ে একটু জপ, তপ ও পূজা-অর্চ্চনাও হয়ত করেন। ইঁহাদের অনেকেই সোনা-রূপার বাসনপত্র ব্যবহার করেন এবং খাটে পালঙ্কে ভাল ভাল বিছানায় রাত্রি যাপন করেন। ইঁহাদের অনেকেই 'মহারাজ' এই উপাধি গ্রহণ করেন এবং মহারাজেরই মত ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া থাকেন। এমন কি, এঁদের অনেকেই বহু লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদও গণিয়া থাকেন।

শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যদের প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহের বর্ত্তমান অধিকারীরা ঠিক রাজার মতই চলেন। রূপার ছত্র-চামর তাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বত্র যায়; এবং যেখানেই তাঁহারা উপবেশন করেন, সেখানেই তৎক্ষণাৎ ছত্রধারী তাঁহাদের মাথায় ছত্র ধরে এবং চামরধারীরা চামর ঢুলায়! অবশ্য ইঁহারা অবিবাহিত, সুতরাং অগৃহী; এবং গৃহস্থোচিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম ইঁহারা করেন না। কিন্তু অনেক গৃহীর চেয়ে অধিক ধনসম্পত্তির ইঁহারা মালিক এবং এই সম্পত্তির জন্য মামলা-মোকদ্দমা করিতেও ইঁহারা পরাঙ্মুখ নহেন!

ইহা ছাড়া আরও এক শ্রেণীর তথাকথিত সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ আমরা হিন্দুসমাজে পাই। ইঁহারা তীর্থের মোহন্ত, 'গিরি', 'পুরী' ইত্যাদি আখ্যাধারী, বিরাট সম্পত্তির মালিক, অকৃতদার, ভোগবিলাসী! ইঁহাদিগকেও সন্ন্যাসীই বলিতে হয়, কেন-না ইঁহারা গৃহস্থও ঠিক নহেন এবং গৃহস্থের বর্ণাশ্রমোচিত সকল কাজও করেন না। কিন্তু চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাসীও ইঁহারা ঠিক নহেন। ইঁহারা বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে রাত্রিযাপন করেন না, কোঠাবাড়িতে নফর-ভৃত্যের-সেবায় সুখে নিদ্রা যান; কাঞ্চনের প্রতিও ইঁহাদের কোন জুগুপ্সা নাই, কেন-না প্রভূত ধনসম্পত্তি ইঁহারা ভোগ করেন এবং নানা প্রকারে অর্জ্জনও করেন; আর, বৈধভাবে দার-পরিগ্রহ ইঁহারা করেন না সত্য কিন্তু নারীর সান্নিধ্য একেবারে বর্জ্জন করিয়াও চলেন না।

বর্ত্তমানে আবার আরও এক নূতন শ্রেণীর অ-সংসারী লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহাদের ধর্ম্মই একমাত্র কাম্য নহে। তীর্থে কিংবা অ-তীর্থে কোন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ইঁহারা শিষ্যপরিবৃত হইয়া জীবনযাপন করেন, আর ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গেরই আরাধনা করিয়া থাকেন। সাধারণ গৃহস্থের মত জীবন ইঁহাদের নয়, সুতরাং নানাবিধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ইঁহাদের কথাও ভাবিতে হয়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহারা প্রকাশ্যেই কোন-না-কোন রাষ্ট্রীয় আদর্শের সাফল্য কামনা করেন এবং তাহার জন্য পরিশ্রমও করিয়া থাকেন; আবার অনেকে আছেন যাঁহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একেবারে নির্লিপ্ত থাকিয়া শুধু কোন-না-কোন দার্শনিক বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রচার চেষ্টা করেন এবং সমাজ-সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অকৃতদার খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মপ্রচারকদের অনুকরণে ইঁহাদের জীবন-পদ্ধতি এবং কার্য্য-প্রণালী অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই হিসাবে ইঁহারা প্রাচীন আদর্শ ঠিক অনুসরণ করেন না এবং প্রাচীনপন্থী সন্ন্যাসীদের দোষও ইঁহাদিগকে ততটা স্পর্শ করিতে পারে নাই।

এই সব আশ্রম অনেক সময় পুলিস কর্ত্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর আগে আসাম প্রদেশে একটি আশ্রমে পুলিসকে জোর করিয়া প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, একথা বোধ হয় অনেকেরই মনে আছে; এবং কি কারণে পুলিসকে সেখানে হানা দিতে হইয়াছিল, তাহাও সকলের অজানা নয়। প্রকাশ্যে আইন-ভঙ্গ না-হওয়া পর্য্যন্ত পুলিস কিছু করিতে পারে না। সুতরাং এই সব আশ্রমের মধ্যে অধিকাংশই এভাবে পুলিস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। কিন্তু পুলিসের সঙ্গীন এড়াইলেও সমাজহিতৈষীরা সন্দেহের চক্ষে দেখেন এরূপ আশ্রমের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়।

একটা কথা এইখানে সাধারণভাবে আমাদিগকে মানিয়া

লইতে হইবে। হিন্দুর শাস্ত্র অনুযায়ী সন্ন্যাসী ইঁহাদের মধ্যে কেহই নহেন। শাস্ত্রমত যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে সে শিষ্য সংগ্রহ করিবে না, কোম্পানীর কাগজ কিনিবে না, কোঠাবাড়ি করিবে না, কোন মত-প্রচারও করিবে না; সে শুধু নির্জ্জনে ভগবচ্চিন্তা করিবে এবং মৃত্যুর প্রতীক্ষায় কালযাপন করিবে। সুতরাং যত সব 'গিরি', 'পুরী', 'মহারাজ', 'মোহন্ত', 'সিদ্ধবাবা' ও 'অর্দ্ধসিদ্ধ দাদা' বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্র পুরাপুরি মানিতেছেন, একথা বলিবার অধিকার কাহারও নাই। সুতরাং শাস্ত্র-বিশ্বাসী হিন্দু যদি মনে করেন যে, এই সব সন্ন্যাসী শাস্ত্রানুযায়ী সন্ন্যাসী, তবে তিনি প্রতারিত হইতেছেন,—একথা আমাদের না বলিয়া উপায় নাই। ইহা অবশ্যই মানি যে, ইঁহারা যাহা হইয়াছেন তাহা হইবার অধিকার তাঁহাদের আছে এবং যেরূপভাবে ইঁহারা জীবন যাপন করিতেছেন সেরূপ করিতে আইনের কোন বাধা নাই; কারণ, আইনের বাধা থাকিলে 'জগৎসি' আশ্রমের মত ইঁহাদের আশ্রমও পুলিস জোর করিয়া ভাঙিয়া দিত। কিন্তু আইনের বাধা না থাকিলেই হিন্দুর শাস্ত্র তাহা অনুমোদন করে, এমন কথা অতি-বড় মূর্খও বলিবে না। সুতরাং বিরাট সম্পত্তির অধিকারী এবং অসংখ্য শিষ্য পরিবৃত হইয়া যে-সব মহারাজ একসঙ্গে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি এবং ঐহিক সুখ লাভ করিতেছেন, তাঁহারা মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের বিধি মানিয়া চলিতেছেন না।

এই সঙ্গে আরও একটা কথা আমরা মানিয়া লইব যে, হিন্দুর শাস্ত্র অনুমোদন না করিলেই সে কাজ অধর্ম্ম বা অন্যায় হইয়া যায় না। হিন্দুর শাস্ত্র অনুসারে নিষিদ্ধ কর্ম্মকেও আজ আমরা ন্যায়ানুমোদিত মনে করিতে সাহস পাইতেছি; তা না হইলে বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, সমুদ্র-যাত্রা প্রভৃতির পক্ষে এত তুমুল আন্দোলন সম্ভবপর হইত না। কাজেই, গিরি-পুরী-মহারাজরা শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাস লন নাই বলিলেই তাঁহাদিগকে অধার্ম্মিক কিংবা অনৈতিক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয় না। তথাপি, ইঁহারা অশাস্ত্রীয় সন্ন্যাসী একথা যে আমরা বার-বার বলিতেছি, তাহার কারণ অনেকে অন্যরূপ ভাবেন এবং অনেকের শ্রদ্ধা শাস্ত্র-বিধির উপরই নির্ভর করে। তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর করা দরকার। সন্ন্যাসীদের অনেকেই তীর্থের আশ্রয়ে থাকেন, শাস্ত্রের বুলি কপ্চান এবং সাধারণ লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসকে মূলধন করিয়াই কারবার চালান। তাঁহাদের এবং তাঁহাদের ভক্তদের জানা দরকার যে শাস্ত্র তাঁহাদের অনুকূল নয়।

যে অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান কোনও ধর্ম্মমতের অঙ্গীভূত তাহার সম্বন্ধে বিচার সাধারণ ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিতে করা সব সময় সম্ভবপর নয়। তাহা করিতে গেলেই ধর্ম্ম-বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব; এবং সেটা আইনের চক্ষে অপরাধ। কিন্তু যে-সব জিনিষ এরূপ ধর্ম্মবিশেষের অঙ্গ নয়—যেমন, ট্রামগাড়ীতে চড়া, বিলাতী কাপড় ক্রয়, কিংবা দোক্তা দিয়া পান খাওয়া—সেগুলির সম্বন্ধে বিচারে আমাদের স্বাধীনতা বেশী। হিন্দু সমাজে বর্ত্তমান মঠ ও আশ্রম ইত্যাদির কথা অতঃপর আমরা নির্ভয়ে আলোচনা করিতে পারি।

সন্ন্যাস—সন্ন্যাসীদের মঠ ও আশ্রম ইত্যাদি—হিন্দুসমাজের একান্ত নিজস্ব জিনিষ নয়। অন্য সব দেশে, অন্য সব সমাজেও এ-সবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেদিন হইতে মানুষ বর্ব্বরতা অতিক্রম করিয়াছে এবং যেদিন হইতে মানুষের ধর্ম্মানুভূতি জাগিয়াছে, প্রায় সেই দিন হইতেই সংসারে বাস এবং ধর্ম্মোন্নতি এ দুইয়ের ভিতর একটা বিরোধ অনুভূত হইয়া আসিতেছে। তাহার ফলে সংসার-ত্যাগ এবং সন্ন্যাসের একটা বিশিষ্ট মূল্যও কল্পিত হইয়া আসিতেছে। যে-সমাজের ধর্ম্মানুভূতি যত প্রবল, সেই সমাজের চিন্তাধারায় সংসারের প্রতি বিদ্বেষও সেই পরিমাণে প্রবল; এবং সেই সমাজে সন্ন্যাসীদের প্রভাবও তত বেশী। কিন্তু সন্ন্যাসী কম-বেশী সব সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সকলেই পীর, ফকির, পুরী, গিরি প্রভৃতির প্রাধান্য মানিয়া লইয়াছে।

খ্রীষ্টান-জগতে প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক অনেক মঠ ও আশ্রম আবির্ভূত হইয়াছিল। কি ভাবে দীর্ঘ কাল ধরিয়া সেগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার ইতিহাস এখানে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটা সময় আসিয়াছিল যখন রাজার আদেশে এই সব মঠ ও আশ্রমের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল এবং জোর করিয়া অনেক মঠ ও আশ্রম ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দারিদ্র্যহীন ভোগ বড় মারাত্মক জিনিষ। যাহারা নিজে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ভোগ করে,

তাহাদের ভোগে কতকটা সংযম থাকে ; কারণ, তাহাদিগকে উপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু যাহারা পরের উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করে, তাহাদের সংযমের প্রয়োজন কম। বিশেষতঃ এই অর্থ যদি অযাচিত ভাবে অপরিমিত পরিমাণে আসিতে থাকে, তাহা হইলে সেখানে সংযমের ছায়াও থাকে না। ঠিক এই জিনিষটি খ্রীষ্টান-জগতে সন্ন্যাসীদের বেলায় ঘটিয়াছিল। অনেক মঠে এত পাপ আচরিত হইত, যে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। কোন কোন মঠে পুরুষের বেশে স্ত্রীলোক যাতায়াত করিত ; অথচ মঠাধীশরা সবই কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত হইতেন। এই সব পাপাচরণ যখন আবিষ্কৃত হইল, তখন জোর করিয়া রাজার আইন মঠগুলি সব ভাঙিয়া দিতে বাধ্য হইল। *

এদেশেও দু-চারটা মোহন্তের মোকদ্দমা হইয়াছে ; এবং সেখানেও অন্তরালে, প্রকাশ্যে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সন্ন্যাসীদের গুপ্ত পাপাভিনয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এদেশেও দু-একটা আশ্রম পুলিসকে সঙ্গীনের সাহায্যে ভাঙিয়া দিতে হইয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টান-জগতে মঠ ও আশ্রমে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সহিত আমরাও অপরিচিত নহি।

এত সহজে এদেশে মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং এত সহজে লোকের বৈধ কিংবা অবৈধ উপার্জ্জনের অর্থ এই সব মঠ ও আশ্রমে প্রবেশ করে যে, অনাচার ও পাপাচার মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এত দেব-বিগ্রহ হিন্দু সমাজে আছে এবং ইহাদের ধনসম্পত্তি এত প্রচুর যে, এসবের প্রকৃত মালিক যাহারা—অর্থাৎ মোহন্ত, পাণ্ডা প্রভৃতি—তাহারা সহজেই ভোগ-বিলাসের পথে প্রলুব্ধ হইতে পারে। 'হইতে পারে' বলিলেই যথেষ্ট বলা হইল না ; কারণ, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, একাধিক স্থলেই এ-সব অর্থ ভোগ- বিলাসেই ব্যয়িত হয়।

শিষ্য ভক্তি করিয়া গুরুকে নানা দ্রব্য উপঢৌকন দেয় ; গুরুর পায়ে অর্থের থলি নিঃশেষে ঢালিয়া দেয় ; ইহাতে শিষ্যের ভক্তির পরিচয় হয়ত পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী এই অর্থ গ্রহণ করেন, তদ্দ্বারা ইমারত নির্ম্মাণ করেন, এবং সেই ইমারতে বাস করিয়া শিষ্য-শিষ্যাণীর হাত-পাখার হাওয়া উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে ভগবদারাধনা করেন,—এটা কোন্ রকমের সন্ন্যাস ? ত্যাগ ও ভোগের এই বিকৃত সমন্বয় কি করিয়া যে শিক্ষিত লোককে মোহিত করে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না ; কিন্তু লোককে মোহিত হইতে দেখি।

অর্থের মালিক এবং অর্থের ব্যবহর্ত্তা সন্ন্যাসী নন। এই সোজা কথাটা বিস্মৃত হওয়া অমার্জ্জনীয়। সুতরাং যে-মঠ ও আশ্রম ধনসম্পত্তির আশ্রয়, সেই মঠ ও আশ্রমের অধিপতিরাও সন্ন্যাসী নহেন। অন্য ধনীকে সমাজ যে-চক্ষে দেখে, ইহাদিগকেও সেই চক্ষে দেখিবার অধিকার সমাজের আছে।

বর্ত্তমানে রাষ্ট্র ও সমাজের পুনর্গঠন জগতের সম্মুখে একটি বিরাট প্রশ্ন। ভারতীয় সমাজও এই প্রশ্ন অবহেলা করিতে পারিবে না। সমাজে সঞ্চিত অর্থের যথাযথ বণ্টন অর্থনীতির একটা বড় সমস্যা। কোনও দেশের সমস্ত সম্পত্তির দশ ভাগের নয় ভাগ সে দেশের এক-দশমাংশ লোকে ভোগ করিবে, আর বাকী নয়-দশমাংশ লোক এক-দশমাংশ অর্থ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে,—এটা এখন যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা কঠিন। সুতরাং মঠ ও আশ্রম-সমূহের অধিকারে যে প্রভূত সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহার ব্যবহার লইয়া একটা প্রশ্ন সমাজকে তুলিতেই হইবে। কিছু দিন আগে তারকেশ্বরে যে সত্যাগ্রহ হইয়াছিল তাহার মধ্যে মোহন্তের সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহারের কথাটাই ছিল বড় কথা। তারকেশ্বরের ব্যাপার সম্প্রতি অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু দেব-বিগ্রহের এবং মঠ ও আশ্রমের অধিপতিদের অধিকারে যে বিপুল সম্পত্তি প্রতিদিন সঞ্চিত হইতেছে, তাহার কথা ভারতীয় ব্যবস্থাপক, রাষ্ট্রনেতা এবং অর্থনীতিবিদ্‌কে এক দিন ভাবিতেই হইবে। ভারতের সমুদয় দেবোত্তর-সম্পত্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আইন-প্রণয়নের চেষ্টা একবার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় হইয়াছিল। তখন কথাটা চাপা পড়িয়াছিল এই যুক্তিতে যে, ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা ভারতে ইংরেজ-শাসনের নীতির বাহিরে। নিজেদের হাতে শাসনশক্তি পাইলে কোন ভারতবাসী আর এ যুক্তি ব্যবহার করিতে পারিবে না। কাজেই মঠ ও আশ্রম ইত্যাদির ধনসম্পত্তির কথাটা অদূর ভবিষ্যতে একটি অনিবার্য্য প্রশ্ন।

---

* Burnet—***History of the Reformation of the Church of England***, p. 142.

তমসা-জাহ্নবী

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বহুরূপী আলোকের ক্লান্ত আমি রূপ দেখে দেখে,
নিরাশ্বাস অন্ধকারে দুদণ্ড বসিব নিরুৎসাহে—
তুমি বস কাছে মোর হাতে তব হাতখানি রেখে।
মনে কর সূর্য্য নাই, নাই শশী, নাই তারাদল;
পথ ভুলি এ আঁধারে পশে না পথিক ধূমকেতু;
খসে না জ্বলন্ত উল্কা; প্রান্তরের আলেয়ার মত
খেলে না বিদ্যুৎ-বিভা আকাশের প্রাঙ্গণ চিরিয়া।
আলোরশ্মিস্পর্শহীন অনন্ত আদিম অন্ধকারে
বসে আছি দুই জনে, এইটুকু শুধু জানিয়াছি—
আলোকের সম্ভাবনা ঝলসে যোজন কোটি দূরে।
সেথা হতে নিরন্তর রশ্মিমুখে আসিছে ছুটিয়া,
অন্ধ মূক অন্ধকারে আসিছে সরল রেখা টানি,
পঁহুছিবে হেথা আসি হয় তো বা কোটি জন্মান্তরে,
পরশ করিবে স্নেহে আমাদের প্রস্তর-পঞ্জর;
ভবিষ্য আলোর দূত গাহিবে মোদের জয়গান,
তমসা-তীর্থের কবি খ্যাত হবে আলোকের যুগে।

আজ সখি, আপনারে ভুলাব না আশার আলোকে;
প্রেমের উৎসব শেষ, আলোর উৎসাহ গেছে চলি—
পর্ব্বতের গুহাগর্ভে ধূমে বহ্নি নির্ব্বাপিত প্রায়;
তার কথা থাক্ আজি। তুমি কি গাহিবে সখি, গান,
অতি ক্ষীণ ব্যর্থতার চুপে চুপে কেঁদে-ফেরা সুর?
একদা জাহ্নবীতীরে গেয়েছ যা বিষণ্ণ সন্ধ্যায়—
পদতলে অবিরাম কলভাষে গৈরিক প্রবাহ,
শিয়রে মেঘের স্তূপ নদীজলে ফেলে কালো ছায়া।
যেন আমি বসে আছি বাত্যাক্ষুব্ধ বারিধির কূলে—
সুরের তরঙ্গাঘাতে যেন ভেসে চলে গেছি দূরে,
অতলে ডুবিয়া গেছি, বাড়ায়ে গানের বাহু দুটি
অনন্ত অসীম শূন্যে তুমি মোরে ধরেছ তুলিয়া।
গানে তবে কাজ নাই, তুমি কি কহিবে সখি, কথা—
যে কথা বলিয়াছিলে একদা প্রভাত-রৌদ্রকরে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বতচূড়ে, খরজলপ্রপাতের মুখে—
চূর্ণ চূর্ণ জলধারা নীচে পড়ে ধোঁয়ার আবেশে,
না-বলা-কথার তোড় বাষ্প হয়ে ভরে দুই চোখ,
গুঁড়া গুঁড়া সে কথার অর্থ আমি বুঝেছি সেদিন!
সে কথা আজিকে নহে, তোমার নীরব করাঙ্গুলি,
আমার আঙুল ছুঁয়ে রক্তস্রোত চাপুক গোপনে।

আলোহীন, শব্দহীন, দিশাহীন, স্তব্ধ অন্ধকারে
বিশ্রাম লভিব মোরা, আলো আর শব্দের আঘাত
সহিতে পারে না প্রাণ, আলোশব্দে লোভের সংঘাত—
চোখে লাগে, বাজে কানে, শিহরিয়া চমকিয়া উঠি,
খ্যাতির ছোঁয়াচে মন তলে তলে কাঁদে গুমরিয়া,
আলোক ঝলসি উঠে প্রাণে প্রাণে হিংসার আকারে।
তার চেয়ে এস সখি, ছিদ্রহীন অন্ধকারে বসি
অতীতের রৌদ্রে তোলা ছবি যত দেখি অনুভবে!

কুলুকুলু মহানন্দা, দুই তীরে শান্ত জনপদ—
এপারে দাঁড়ায়ে এক ক্ষুদ্র শিশু গণে জল-ঢেউ
এক, দুই, তিন, চারি; কাঠের গোলার আশেপাশে
সঙ্গীরা প্রসন্ন মনে খেলিতেছে লুকাচুরি খেলা।
আকাশ আঁধার করি ওঠে মেঘ, নামে জলধারা,
জলশরবিদ্ধ হয়ে পরপার ঝাপ্‌সা দেখায়।
স্নানার্থী এসেছে যারা তারা কলকোলাহল তুলি
আছাড়ি সাঁতারি খেলে বরষার নবীন উল্লাসে।
নদীপাড়ে শিশুমনে সহসা সে অপর্ব্ব প্রকাশ—
টাপুর টুপুর বৃষ্টি কোন্ সে নদীতে এল বান,
গান তার ভেসে এল, শিহরিল বিহ্বল বালক।

সে গানের রেশ টানি এল শীর্ণ অজয়ের তীরে,
বালি-কাঁকরের পথ, লালমাটি ছোট গ্রামখানি,

পূর্ব্বপুরুষের ভিটা ; গিরিনদী গৈরিক বন্যায়
সহসা ফুলিয়া উঠে, কৈশোরে ছাপিয়া যায় কূল !
এলোমেলো কতগান, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথের,
অদূরে নান্নুর গ্রামে রচে পদ বড়ু চণ্ডীদাস—
মেদুর মেঘের মায়া আবার ঘনায়ে এল নভে !
গুচ্ছে গুচ্ছে থরে থরে নদীচরে ফোটে কাশফুল,
শীর্ণ হ'ল জলধারা, বালুরাশি নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

বালুচরে পদচিহ্ন মুছে গেছে, সে কিশোর কবি
দেখা দিল, নুড়ি ছুঁয়ে যেথা ধীরে বহে গন্ধেশ্বরী,
পৌষসংক্রান্তির উষা, মেশে আসি দ্বারকা-ঈশ্বরে।
দূরে আকাশের গায় কালোছায়া বৃদ্ধ শুশুনিয়া—
কিশোর কবির মনে ঘনাইল পাহাড়ের মায়া,
শাল ও পলাশবন, ধূধূ মাঠ দিগন্তপ্রসারী।

নেশা না কাটিতে তার, বসন্তের সায়াহ্নে একদা
বিশাল পদ্মার তীরে এল যেথা কাঁপে ঝাউবন ;
সুপক্ব কুলের লোভে গুটি গুটি খরগোস দল
চমকিয়া পদ শব্দে ছোটে দীর্ঘ কান খাড়া করি।
সেখানে পাড়ের গায়ে, ক্ষণে ধ্বসে-পড়া খাড়া পাড়
গর্ত্তে গর্ত্তে উঁকি মারে লাল ঠোঁট পাখীদের ছানা ;
ইলিশ ধরার নৌকা সার বাঁধি চলে জাল ফেলে,
বহুদূরগামী যত ষ্টীমারেরা যায় ধোঁয়া ছেড়ে,
পাশে পাশে উড়ে চলে জলচর পাখী সারি সারি।
মাঝ গাঙে বালুচর, দুই পাশে কলকল জল
তার ছন্দ সেইদিন শুনেছিল যে মুগ্ধ বালক,
পদ্মার আবর্ত্তে পড়ি সেই জন হ'ল দিশাহারা,
বহু বৎসরের পরে, মেঘনা করিয়া অতিক্রম—
কালো আর রাঙা জল যেথা কষ্টে এক হয়ে মেশে।
মিলালো পদ্মার ছায়া, স্বচ্ছজল চপল কাঞ্চন,
কিশোরীর বেণী যেন, হাঁটুজল শহরের ধারে ;
ভুলে-যাওয়া কবিতার অকস্মাৎ আবৃত্তির মত—
গান গেয়ে ওঠে প্রাণ, কৈশোর যৌবনে আসি মেলে ;
রেললাইনের সাঁকো, পোড়ো বাড়ি আমের বাগান,
নির্জ্জন সন্ধ্যায় যেথা মেঘে মেঘে রঙের বিলাস,
গানে গানে উন্মাদনা ; স্নান করি শান্ত নদীজলে
দেবতা-মন্দিরে যেন দেখা দিল তরুণ পূজারী।

সে পূজা হয়নি শেষ, মলিনা এ ভাগীরথী তীরে
যৌবনের যত বাঞ্ছা, যত ক্লান্তি, রাখি যত গ্লানি ;
শুচিস্নান করি আজো পূজা সারি যাচিনু প্রসাদ।
কালো কলঙ্কের স্পর্শে জেগে ওঠে আবর্ত্ত পঙ্কিল,
কল ও মিলের ধোঁয়া, জেটি-নৌকা-ষ্টীমার বন্ধন,
এরই মাঝে কুলুকুলু কলকল বহে জলধারা।
সাবধানী মানুষের হাতে রচা ফুলের বাগান—
বয়া ভাসে সারি সারি আলো তাতে জ্বলে আর নেবে।
সহজ গানের ধারা বাধা পায় তবু গান জাগে,
মিনারের চূড়ে চূড়ে তবু সুর ভাসিয়া বেড়ায়।

সে সুরের আধখানা তোমারে শুনায়েছিনু, সখি,
পঙ্কিল আবর্ত্তে যেথা জাহ্নবীর বিষদুষ্ট জল
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে। শুনেছিনু সে জাহ্নবীতীরে
আধখানি গান তব, সে অর্দ্ধেক আজি অন্ধকারে
উঠুক সম্পূর্ণ হয়ে। কৃষ্ণধারা তমসার তীরে
নীরবে বসিয়া দোঁহে একমনে করি অনুভব—
যেন মোরা চলে গেছি, পার হয়ে লক্ষ জন্মান্তর,
সেথা হতে শুনিতেছি, সাঙ্গ যত অসম্পূর্ণ গান-
পূর্ণ অসম্পূর্ণ প্রেম ; আলোরে আড়াল করি দিয়া
আড়াল করিয়া দিনু জীবনের আশা ও আশ্বাস।

হে সখি, মোদের নয় আলোক-উজ্জ্বল ভাগীরথী ;
দুজনে বসিয়া আছি, বহে ধীরে তমসা-জাহ্নবী—
আবর্ত্ত রচিছে কি না আঁখি মেলি দেখিতে না পাই,
অনুভব করি শুধু অবিরাম চলে জলধারা—
সম্মুখ পিছন নাই, উর্দ্ধ অধঃ না হয় ঠাহর,
আলো হবে একদিন এ আঁধার এইটুকু জানি,
আর জানি মোরা দোঁহে বাঁচিয়া রব না ততদিন।
মোদের অগীত গান, না বলা মোদের কথাগুলি,
তমসা-জাহ্নবী তীরে চিরদিন বেড়াবে ভাসিয়া,
অন্ধকার কভু আসি উদিবে না আলোকের তীরে ;

জন্মস্বত্ব

শ্রীসীতা দেবী

(১৫)

মমতা স্কুলের চাঁদার ঝুলিতে দশ টাকার নোটখানা ফেলিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহার মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। তাহার আরও ঢের বেশী দেওয়া উচিত ছিল। একে ত সে অন্যদের চেয়ে ধনী পিতার কন্যা, তাহার উপর তাহাদের ধন যাহাদের পরিশ্রমের ফলে অর্জ্জিত, সেই মানুষগুলিই আজ বন্যাপীড়িত। মায়ের হাতে ত টাকা থাকে ঢের, কিন্তু তিনি যে যথেচ্ছ খরচ করিতে পারেন না, তাহা মমতা জানে। বাবাকে সে ভালবাসে, সন্তানের যেমন ভালবাসা উচিত, কিন্তু এখন মমতার জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ্বরের দোষত্রুটিগুলিও তাহার চোখে পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি যেন বড় বেশী স্বার্থপর, বড় বেশী জেদী। মমতার এক-একবার ইচ্ছা করে, বাবার সঙ্গে খোলাখুলি এই বিষয়ে আলোচনা করে, কিন্তু আবার সঙ্কোচ বোধ হয়, একটু ভয়ও করে। পিতার সঙ্গে এভাবে কথা বলিতে কোনদিনই তাহারা অভ্যস্ত নয়। তিনি যদি খুব বেশী বিরক্ত হইয়া ওঠেন ?

মা শুধু তাহার মা নহেন, সঙ্গিনীও বটেন। মমতার যত গোপন মনের কথা, সব হয় মায়ের সঙ্গে। আর একটি বোন থাকিলে যে জায়গা নিতে পারিত, বোনের অভাবে মা হইয়াও যামিনীকে সেই স্থান অধিকার করিতে হইয়াছে।

কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, মায়ের ঘরে গিয়া মমতা দেখিল তিনি কাহাকে যেন চিঠি লিখিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এখন খুব বেশী ব্যস্ত আছ মা ?"

যামিনী চিঠির কাগজের প্যাডটা সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "না মা, এই ত হয়ে গেল।"

মমতা খাটে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি দশ টাকা দিয়ে এলাম মা, কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না। কালকের সেই মিটিঙে আমরা যাব ত মা ?"

যামিনী বলিলেন, "সেই জন্যেই ত তোর মামীমার কাছে চিঠি লিখছি, দেখি সে কিছু ব্যবস্থা করতে পারে কি না।"

মমতা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কি পারবেন মা ব্যবস্থা করতে ?"

যামিনী হাসিয়া বলিলেন, "দেখাই যাক না, পারতেও পারে।"

মমতা পুরাপুরি আশ্বস্ত না হইলেও, খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কাপড়চোপড় বদলাইতে চলিয়া গেল। আকাশ জুড়িয়া ঘন কাল মেঘের রাশি ফুলিয়া ফুলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বাগানে বেড়ান আজ আর হইবে না। হঠাৎ হয়ত ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিবে, আর ভিজিয়া মরিতে হইবে। তাহার চেয়ে ছাদেই বেড়ান যাক্।

নিজের চুলবাঁধাটা এখনও মমতার ভাল করিয়া আসে না। যামিনীর মেয়েরই উপযুক্ত চুল হইয়াছে তাহার, যেমন গোছে, তেমনই লম্বায়। এত একরাশ চুল নিজে সে ভাল করিয়া গুছাইয়া বাঁধিতে পারে না। কোনদিন মা বাঁধিয়া দেন, কোনদিন বিন্দুপিসীমা, অভাব পক্ষে নিত্যঝি। আজ আর তাহার কাহারও কাছে আবেদন করিতে ইচ্ছা হইল না। কোনোমতে একটা বিনুনী ঝুলাইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ছাদে একলা ঘুরিতে ভাল লাগে না, কিন্তু আর কোথায়ই বা সে যায় ?

আজ ক্লাসে ছায়া বলিতেছিল, তাহাদের পাড়ার ছেলের অনেকেই স্বেচ্ছাসেবক হইয়া বন্যাপীড়িতের সাহায্যার্থ যাইতেছে। অমরেন্দ্রও যাইবে হয়ত। তাহাকে এক দিনের পরিচয়ে মমতা যতখানি চেনে, তাহাতে মনে হয় এ সব কাজে সেই সবার আগে অগ্রসর হইয়া যাইবে। মমতা কেন যে নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল তাহার ঠিকানা নাই। যদি পুরুষ হইত, তাহা হইলে সেও ত যাইতে পারিত। সুজিতটা ত একেবারে অপদার্থ, কোনরকম ভাল কাজে তাহার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নাই। খালি বাবুগিরি করিতে আ

আভিজাত্য ফলাইতে তাহার ভাল লাগে। মমতা ছেলে হইয়া সে মেয়ে হইলে মন্দ হইত না। মেয়েদের পরের ইষ্ট করিবার ক্ষমতা যেমন কম, অনিষ্ট করিবার ক্ষমতাও তেমনই কম।

যামিনী প্রভাকে চিঠি লিখিয়া তৎক্ষণাৎ ড্রাইভারকে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সোজাসুজি সভায় যাইতে গেলে সুরেশ্বর চেঁচাইয়া হাট বসাইয়া দিবেন। কিন্তু ভাইয়ের বাড়ি যাইতেছেন শুনিলে কিছুই বলিবেন না, যদি না মেজাজটা বেশী রকম খারাপ থাকে। প্রভার সঙ্গে যামিনীর সম্পর্কটা খুব যে মধুর তাহা নয়, মনে মনে কেহই কাহাকেও পছন্দ করেন না, কিন্তু দু-জনেই দু-জনের কাজে লাগেন, সময়ে অসময়ে, কাজেই খানিকটা মানাইয়া চলিতেই হয়। যামিনী ধনী গৃহিণী, প্রয়োজনমত টাকাকড়ি চাহিলে সর্ব্বদাই পাওয়া যায় এবং টাকা শোধ করিবার জন্য তিনি কোনদিনই পীড়াপীড়ি করেন না। যামিনীও ভাইয়ের বাড়ি গিয়া অনেক কাজ উদ্ধার করিয়া আসেন, যাহা নিজের বাড়ি বসিয়া করা যায় না।

প্রভা চিঠি পাইয়াই হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আপদ যাহোক! মানুষটাকে যেন সোনার খাঁচায় পুরে রেখেছে, একটু পা নাড়বার জো নেই।"

মিহির তখন কাজ হইতে ফিরিয়া চা খাইতে বসিয়াছিলেন, তিনি চিঠিখানার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "দেখি? কে আবার কাকে সোনার খাঁচায় পূরল?"

প্রভা চিঠিখানা স্বামীর হাতে আগাইয়া দিয়া বলিল, "কে আবার, তোমার দিদিটি। টাকার উপর বসে আছে, কিন্তু মানুষটার কোন সুখ নেই বাপু।"

সুখ যে নাই তাহা মিহিরের অজানা নয়। যামিনীর বিবাহের সময় সকল কথা বুঝিবার মত বয়স না হইলেও, বেশ খানিকটা বুঝিবার বয়স মিহিরের হইয়াছিল। যামিনীর বিবাহিত জীবনের গলদ কোথায় তাহাও জানিতে মিহিরের বাকী নাই। প্রতাপ তাঁহারই গৃহশিক্ষকরূপে এ বাড়িতে আসিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহাকে যে ভাবে বিদায় করা হইল, তাহার অর্থ তখন না বুঝিলেও পরে মিহির বুঝিয়াছিলেন। যামিনীর মন যে তখন হইতে একেবারে ভাঙিয়াছে, এবং সুরেশ্বরকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিয়াও সে-ভাঙা কোনদিনই জোড়া লাগে নাই, একথা বুঝিতে দেরি হয় না। কিন্তু স্ত্রীর সহিতও এ-সব কথা তিনি বেশী আলোচনা করেন না, যা হইবার তা ত হইয়াই গিয়াছে, পুরাতন ক্ষত খোঁচাইয়া লাভ কি? যামিনী এখন সন্তানের জননী, বৃহৎ সংসারের গৃহিণী, তাঁহার প্রথম যৌবনের দুঃখ-নিরাশার কাহিনী হয়ত তাঁহার নিজেরই এখন ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, অন্যেরও ভুলিয়া যাওয়াই উচিত।

চিঠিখানা পড়িয়া তিনি স্ত্রীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? টাকার উপর ব'সে থাকলেও তোমাদের জাতের সুখ নেই? আমি ত মনে করি, এ ছাড়া আর কিছুতেই তোমাদের সুখ নেই।"

প্রভাকে বেশ টানাটানি করিয়াই সংসার চালাইতে হয়, কারণ মিহিরের আয় বেশী নয়। এই লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে বচসারও অন্ত নাই।

খোঁচা খাইয়া প্রভাও ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। বলিল, "তোমাদের বুঝি ট্যাঁক খালি থাকলে সুখের সীমা থাকে না? যাকে ভোগ ভুগতে হয় সেই বোঝে। কোন ঝক্কি ত ঘাড়ে নাও না, ঠাট্টা করা কাজেই তোমাদেরই সাজে।"

মিহির তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "যাক্ গে ও তর্কে আর দরকার নেই, ও ভাবনা ত সারা-জীবনই চল্‌বে। এখন দিদি যা লিখেছেন তাই কর। দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাও, তাঁর গাড়ীখানা থাকলে তুমিও বেশ খানিক বেড়িয়ে আসতে পারবে। মিটিঙে যেতে চাও, তাই যাবে, না হয় অন্য কোথাও ঘুরে আস্‌বে। এমনিতে তোমার ত ঘর ছেড়ে বেরনোই হয় না। লুসও বাঁচবে মমতাকে পেয়ে।"

এ সব ক'টা সম্ভাবনার কথাই প্রভা আগে ভাবিয়া লইয়াছে। সুতরাং দেরি না করিয়া সে যথাবিহিত নিমন্ত্রণ করিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল। কাল একটু বাজার খরচ বেশী করিতে হইবে, তা আর কি করা যাইবে বল?

সুরেশ্বরের মধ্যরাত্রির আগে শুইতে যাওয়া কোন-কালেই অভ্যাস ছিল না। এখন ডাক্তারের উৎপাতে বন্ধুবান্ধব সব বাড়িতে আসা বারণ হইয়া গিয়াছে, আনুষঙ্গিক আমোদ-প্রমোদ সব বন্ধ। যদিবা লুকাইয়া কিছু করিবার সম্ভাবনা ছিল, তাও স্ত্রীর জ্বালায় কিছু হইবার জো নাই। তিনি যেন সারাক্ষণ সেপাইয়ের মত দরজা আগলাইয়া

আছেন। এত খবরদারি সহাও যায় না, আবার বিদ্রোহ করিবারও উপায় নাই, শাস্তি নিজেকেই পাইতে হয়। অসুখটা সুরেশ্বরের নিতান্তই সত্য, তাহার ভিতর কাল্পনিক কিছু নাই, পান হইতে চূণ খসিলে তাঁহারই অসোয়াস্তি ও যন্ত্রণার সীমা থাকে না।

তবু আজ সন্ধ্যার সময় তিনি নীচে নামিয়া আসিয়াছিলেন। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও গুটি দুই বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই মানুষ ক'টির যাইবার কোন স্থান নাই, সুরেশ্বরের আড্ডা ভাঙিয়া যাওয়ায় ইঁহারা চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলেন। আরও দু-একবার ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করিয়া প্রবেশের চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন, কিন্তু নীচে হইতেই ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। আজ গৃহস্বামী নীচে থাকাতে ঢুকিবার সুবিধা হইল। সুরেশ্বর মহোৎসাহে তাঁহাদের ডাকিয়া বসাইলেন। আর কিছু না হোক একটু গল্প ত করা যাইবে, খানিকটা তাসও ত খেলা যায়? সময়মত শুইতে গেলেই হইবে।

এমন সময় প্রভার চিঠি আসিয়া হাজির। সুরেশ্বর ড্রাইভারকে ডাকিয়া চিঠিখানি চাহিয়া লইলেন। সব চিঠি খুলিয়া পড়া তাঁহার রোগ, অবশ্য তাঁহার চিঠি খুলিবার হুকুম কাহারও নাই।

প্রভা চিঠিখানা যথেষ্ট সাবধান হইয়া লিখিয়াছে। সুরেশ্বর বুঝিলেন যামিনী এবং মমতার নিমন্ত্রণ কি একটা মেয়ে-মজলিশে। যাইতে বারণ করাও যায় না, আবার ভালও লাগে না। ঘরের গৃহিণী ঘরের বাহিরে গেলেই সুরেশ্বরের মেজাজ খারাপ হইয়া যায়, অবশ্য ঘরেও তাঁহার সহিত সুরেশ্বরের মুখ দেখাদেখি নাই। চিঠি পড়িয়া, আবার তিনি পত্রবাহকের হাতে ফিরাইয়া দিলেন, সে উপরে চলিয়া গেল।

তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া এক জন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু খারাপ খবর নাকি?"

সুরেশ্বর ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিলেন, "নাঃ খারাপ আর কি! তা কালও একবার এস এই সময়, একটু চা-টা হবে।" যামিনীই যখন ফূর্ত্তি করিতে যাইতেছেন, তখন তিনিই বা কেন একটু না করেন? সাবধান হইয়া চলিলে আর ভাবনা কি? ডাক্তাররা সর্ব্বদাই বাড়াবাড়ি করে, তাহাদের সব কথা অত মানিয়া চলা যায় না।

যামিনী চিঠি পড়িয়া, মমতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে তোর মামীমা কাল দুপুরে আমাদের খেতে বলেছে। লুসির সঙ্গে খুব গল্প করবার সুবিধা হবে।"

মমতা ব্যাপারটা বুঝিল, তবে সে-বিষয়ে কিছু মন্তব্য করিল না। বলিল, "বেশ ত, কাল রবিবার আছে, অনেক ক্ষণ থাকতে পারব।"

যামিনী সুরেশ্বরের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘর তখনও অন্ধকার, নীচে সমানে আড্ডা চলিতেছে। আজ বাড়াবাড়ি করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলে, সুরেশ্বর কাল আর যামিনীকে বাড়ির বাহির হইতে দিবেন না। কি করা যায়? যামিনী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মমতা তাঁহার মনের কথা বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাকে নীচের থেকে ডেকে আনব মা?"

সুরেশ্বরের বন্ধুর দল শিশু-অবস্থা হইতে মমতাকে দেখিতেছে, অনেকে কোলে পিঠেও করিয়াছে। কাজেই তাহাদের সামনে মমতাকে পরদা বাঁচাইয়া চলিতে হয় না। মানুষগুলিকে বিশেষ পছন্দ করে না বলিয়া সে বড় তাহাদের সামনে যায় না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে না যাইতে পারে এমন নয়। আজ সে চটিজোড়া পায়ে দিয়া, সশব্দে নীচে নামিয়া চলিল। সিঁড়ির পাশেই সুরেশ্বরের খাস বসিবার ঘর, বড় ড্রয়িংরুমটি একটু সামনে।

পায়ের শব্দে সকলেই চাহিয়া দেখিল। সুরেশ্বর একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলছ মা?"

মমতা বলিল, "বেশী রাত হয়ে যাচ্ছে, তাই তোমায় ডাকতে এসেছি। খাবার সময় হয়ে গিয়েছে।"

সুরেশ্বর মনে মনে চটিলেও এতগুলি মানুষের সামনে কিছু বলিলেন না। আর মমতাকে কিছু বলা তাঁহার নিয়মও ছিল না। একেই তাহার বাপের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি বিশেষ নাই, যদি আরও কমিয়া যায় সেই এক ভয়। হয়ত যামিনীই মেয়েকে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু সে-কথা মমতাকে জিজ্ঞাসা করা চলে না। অগত্যা তাঁহাকে উঠিতে হইল। বন্ধুদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "কত অভিভাবক জুটেছে দেখছ ত? কাল তাহ'লে এস এখন," বলিয়া মমতার সঙ্গে উপরে উঠিয়া চলিলেন। বন্ধুর দল বিদায় হইয়া গেল।

মমতা কাছে বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইল, এবং শোবার ঘরে

পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বাতি নিবাইয়া তবে বিদায় হইল। মেয়ের যত্নে সুরেশ্বরের মন একটু নরম হইল বটে, কিন্তু যতটা হইতে পারিত, ততটা হইল না। এই ভাবিয়া যে সমস্তটাই যামিনীর শেখান, এবং ইহার তলে তাহার একটা মতলব আছে।

পরদিন সকাল-সকাল স্নান করিয়া কাপড় পরিয়া মমতা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল। যামিনী তাহার উৎসাহ দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার সকালে অনেক কাজ, সে-সব শেষ না করিয়া তিনি নড়িতে পারিবেন না। বিকালের সব ব্যবস্থাও ভাল করিয়া বিন্দু-ঠাকুরঝিকে বুঝাইয়া দিয়া যাইতে হইবে, না হইলে সুরেশ্বর আর রক্ষা রাখিবেন না।

সভায় ত যাইবেন, কিন্তু সেখানে গিয়া কি দিবেন, কি ভাবে দিবেন ইহাই সারা সকাল যামিনী ভাবিতেছিলেন। কিছু ভালরকম না দিলে মমতা অত্যন্তই মুষড়াইয়া পড়িবে, এবং না দিলে যাইবারই বা প্রয়োজন কি? যামিনীর গহনা-গাঁটি নিজস্বও অনেক আছে, যাহা তিনি বাপের বাড়ি হইতে বা অন্যত্র হইতে উপহার পাইয়াছিলেন। তাহা দান করিবার অধিকার তাঁহার যথেষ্টই আছে, কিন্তু সুরেশ্বর তাহা বুঝিবেন না, এবং জানিতে পারিলে মহা কোলাহলের সৃষ্টি করিবেন। গহনা দিলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বেশী, কারণ তাহা চেনা যায়। টাকা দেওয়া সহজ, কারণ টাকার গায়ে নাম লেখা থাকে না। তবে টাকা দিবার অধিকার তাঁহার নিজের কতটা আছে, তাহা যামিনী বুঝিতে পারিতে-ছিলেন না। সাধারণ ভাবে স্বামীর অর্থে স্ত্রীর অধিকার আছে বটে, কিন্তু তাঁহার আর সুরেশ্বরের সম্বন্ধ সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মত নয়। টাকা তাঁহার কাছে থাকে যথেষ্টই, সুরেশ্বর হিসাব কিছু বোঝেন না, কাজেই টাকাকড়ি নিজের কাছে রাখিতেও চান না।

ভাবিয়া ইহার কিছু কিনারা হইল না। কোন অন্যায় কার্য্যে ব্যয় করিতেছেন না, ইহাই যথেষ্ট স্থির করিয়া যামিনী অবশেষে এক তাড়া নোটই বাহির করিয়া লইয়া হাতব্যাগের ভিতর রাখিলেন, এবং স্নানাদি করিয়া মেয়েকে লইয়া যাত্রা করিলেন। সুরেশ্বর নিজের শুইবার ঘরে বসিয়া ছিলেন, মমতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকার নেমন্তন্ন নেই?"

মমতা বুদ্ধি করিয়া বলিল, "আজ খালি মেয়েদের ব্যাপার বাবা, তা ছাড়া খোকাকে মামীমা ডাকলেও ও যেতে চায় না।"

সুজিত বাপের পছন্দগুলি অনেকটাই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে। মা বা মায়ের আত্মীয়স্বজন কাহারও প্রতি তাহার প্রীতি নাই। সুরেশ্বর ইহাতে ছেলের উপর খুশীই, তবে সে যে পড়াশুনায় একেবারে মন দেয় না, ইহা তাঁহার ভাল লাগে না। সত্য বটে তাহাকে চাকরি করিয়া খাইতে হইবে না, কিন্তু আজকাল শুধু টাকার গুণে মানুষের কাছে খাতির পাওয়া যায় না। তাহারা সামনে খোশামোদ করে বটে, কিন্তু আড়ালে বিদ্রূপ করে। সুরেশ্বরের আগে তাঁহাদের বংশে পড়াশুনার বেশী রেওয়াজ ছিল না, কিন্তু তাঁহারা দুই ভাইই কলেজের পড়া প্রায় শেষ করিয়া-ছিলেন। ছেলেটা যদি ম্যাট্রিকও পাস না করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার নাম থাকিবে না। যামিনীর ইহাতে যথেষ্টই ত্রুটি আছে, তিনি ছেলের পড়াশুনা দেখেন না কেন?

"সবাই আছে নিজের তালে, ছেলেটা যে বয়ে যেতে বসেছে সেদিকে খেয়ালই নেই," বলিয়া তিনি বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করিয়া পাশ ফিরিয়া একখানা খবরের কাগজে মন দিলেন।

(১৬)

প্রভা বাহির হইয়া আসিল ননদকে অভ্যর্থনা করিতে, লুসি ত ছুটিয়া আসিয়া মমতাকে দুই হাতে জড়াইয়াই ধরিল। বলিল, "বাপরে বাপ্, তোমার আর দেখা পাবারই জো নেই, একেবারে ডুমুরের ফুল।"

মমতা বলিল, "আর তুমি বুঝি রোজ রোজ আমাকে দেখা দিতে যাও?"

লুসি বলিল, "আমার কি গাড়ী আছে তোমার মত?"

মমতা বলিল, "আহা গাড়ীখানা যা আমার! তা আর বলে কাজ নেই। একবার চড়ে কলেজে যাই, এইমাত্র গাড়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক।"

প্রভা বলিল, "আচ্ছা, এখন গাড়ীর তর্ক থামিয়ে স্নানটা

সেরে এস দেখি চট ক'রে। রান্নাবান্না কবে সেরে, আমি হাঁ ক'রে ব'সে আছি।''

লুসি স্নান করিতে চলিল। মমতা বাড়িময় ঘুরিতে লাগিল, যামিনী বসিয়া ভাজের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন।

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "সভায় যেতে এত ব্যস্ত যে দিদি? তোমার ভাইটি ত একেবারে নারাজ, বলেন দিদির পয়সা আছে ব'লে কি ক'রে ওড়াবে তাই খালি ভাবছে।"

যামিনী বলিলেন, "খুকী ছাড়ে না, তা ছাড়া আমিও কিছু দেওয়া দরকার মনে করছি। পয়সা যাদের দৌলতে, তারাই মরতে বসেছে, এ সময় কিছু না-করাটা অমানুষের কাজ। উনি ত নিজের শরীর নিয়ে এমন ব্যস্ত যে কিছু করবার কথা ভাবতেই পারেন না।"

প্রভা বলিল, "তা ত ঠিকই। তোমরা যদি গরিব-দুঃখীকে না দেবে ত দেবে কে? আমাদের না-হয় ক্ষমতাই নেই, কিন্তু দেওয়া যে কতখানি দরকার তা ত বুঝি। নিজেরা যারা অভাবে থাকে, তারাই বোঝে অভাবগ্রস্তের দুঃখ।"

প্রভার অবশ্য দু-হাতে ছড়াইবার টাকা নাই, তাই বলিয়া হাঁড়ি চড়ে না, এমন অবস্থাও তাহার নয়। কিন্তু সুবিধা পাইলেই যামিনীকে সে নিজের দুঃখের কথা জানাইয়া রাখে। কখন কাজে লাগিয়া যায় বলা যায় কি?

ইতিমধ্যে লুসি স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল। সকলে মিলিয়া খাইতে বসিলেন। প্রভা বলিল, "আজ মাছটা লুসি রেঁধেছে, কেমন হয়েছে দিদি?"

যামিনী বলিলেন, "বেশ ত হয়েছে, লুসি ত দেখি কাজকর্ম্ম দিব্যি শিখছে। খুকী ত এখনও রান্নাবান্না পারে না।"

মমতা বলিল, "তুমি শেখাও না কেন? আমি ত শিখতেই চাই।''

প্রভা বলিল, "তোমার দরকারই বা কি? রাজরাণী হবে, কোনদিন হাঁড়ি হাতেও করতে হবে না। আমাদের ছেলেপিলেকে খেটে খেতে হবে, তাদের সবই জানাশোনা দরকার।"

যামিনীর মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "অমন আশীর্ব্বাদ ক'রো না বৌ। রাজরাণী যেন ওকে না-হ'তে হয়, দুঃখের ভাত সুখের ক'রে খেতে পারে তাহলেই ঢের।''

মমতা আলোচনাটায় একটু অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া গেল। বাস্তবিক রান্নাবান্না শিখিবার তাহার সখ খুবই, কিন্তু মা বিশেষ কিছু তাহাকে বলেন না, তাই তাহারও শিখিবার চাড় হয় না। মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল সে বিন্দুপিসীর কাছে কালই রান্না শিখিতে আরম্ভ করিয়া দিবে।

খাওয়া হইয়া গেল। প্রভার দিনে ঘুমান অভ্যাস, যামিনী কখনও দিনে ঘুমান না। তাঁহাকে বসাইয়া রাখিয়া নিজে ঘুমান ঠিক হইবে কি না ভাবিয়া প্রভা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। যামিনী অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন, "তুমি একটু গড়িয়ে নাও বউ, আমি একটু এই বইগুলো নাড়ি-চাড়ি।''

লুসি এবং মমতা খাটে শুইয়া গল্প জুড়িয়াছিল। প্রভা নিজের ঘরে শুইতে চলিয়া গেল। যামিনী একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া মাসিক-পত্র উল্টাইতে লাগিলেন। সভা হইবে বিকালবেলায়, সে এখনও ঢের দেরি। চা খাইয়া বাহির হইলেই চলিবে।

দেখিতে দেখিতে বেলা গড়াইয়া আসিল। প্রভা উঠিয়া চায়ের আয়োজন করিয়া ফেলিল। লুসি মমতাকে বলিল, "দিদি তুমি কাপড়খানা ছাড়বে ত? বড্ড যে ধামসে গিয়েছে, প'রে বেরনো যায় না।''

সত্যই মমতা এত গড়াগড়ি দিয়াছে যে শাড়ীখানির দুর্গতির আর কিছু বাকী নাই। অগত্যা তাহাকে লুসির শাড়ীই একখানা পরিতে হইল। যামিনী সারা দুপুর বসিয়াছিলেন, তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ ভালই ছিল। যথাসময়ে তাঁহারা যামিনীর গাড়ী চড়িয়া সভাস্থলে যাত্রা করিলেন।

পার্কে তখন রীতিমত ভীড় জমিয়া গিয়াছে। ভলাণ্টিয়ারদের সাহায্যে অনেক কষ্টে তাঁহারা চার জন মেয়েদের দিকে গিয়া বসিলেন। যামিনী একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন, কাছাকাছি তাঁহার চেনাশোনা কেউ আছে কি না। দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন যে কেহই নাই। বাস্তবিক তাঁহাকে চেনেই বা কে? কোথাও তিনি নিজে যান না, মানুষের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কই চুকিয়া গিয়াছে

কুমারী অবস্থায় যাও বা দু-চার জন বাহিরের মানুষের সঙ্গে তাহার আলাপ-পরিচয় ছিল, এখন তাহাদেরও দেখিলে চিনিতে পারেন কিনা সন্দেহ। নিজের বাপের বাড়ির আত্মীয় কয়টি ছাড়া, তাঁহার বাড়িতেও বিশেষ কেহ যায় না।

মমতা এধার-ওধার চাহিয়া আবিষ্কার করিল, কলেজের মেয়েরা কয়েক জন আসিয়াছে। তাহার ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে ছায়াকে কাছে দেখিতে পাইল। দুই জনে চোখে চোখে সংবাদের আদানপ্রদান একটু হইল বটে, কিন্তু লোকের ভীড় ঠেলিয়া কাছে যাওয়া আর ঘটিয়া উঠিল না।

সভার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু গোলমাল সারা ক্ষণই চলিতেছিল, কাজেই বক্তাদের সব কথা ভাল করিয়া শোনা যাইতেছিল না। লাল চাঁদার ঝুলি হাতে এধারে-ওধারে মানুষ দাঁড়াইয়া আছে, কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঝুলিতে টাকাটা-সিকিটা ফেলিয়া দিতেছে। বেশীর ভাগ অপেক্ষা করিয়া আছে, কাছে আসিয়া চাঁদা চাহিলে তখন দিবে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সভার উদ্যোক্তারা বুঝিতে পারিলেন ইহার পরে লোকজন চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং এইবার চাঁদা-আদায়ের কাজ আরম্ভ হইল। মমতা উৎসুকভাবে চারি দিকে দেখিতে লাগিল। সব মানুষই কিছু কিছু দিতেছে। মা কি আনিয়াছেন, তাহা সে ঠিক জানিত না। নিশ্চয়ই ভালরকম কিছু আনিয়াছেন। কিন্তু নিজে সে খালি-হাতে আসিয়াছে বলিয়া তাহার দুঃখ হইতে লাগিল। যখন তাহার সম্মুখে আসিয়া চাঁদার ঝুলি ধরিবে, তখন তাহাকে কেমন অপ্রস্তুত হইতে হইবে? মা ত অনেকখানি দূরে বসিয়া, এখন তাঁহার কাছ হইতে কিছু সংগ্রহ করাও কঠিন।

হঠাৎ তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। অনেকগুলি মানুষ টাকা সংগ্রহ করিতেছিল, সকলের মুখের দিকে মমতা অত চাহিয়া দেখে নাই। হঠাৎ এক জন যুবক ঝুলি হাতে করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। মমতা চাহিয়া দেখিল সে অমরেন্দ্র। ইহাকেও কিনা রিক্তহাতে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে? ছিঃ, মমতাকে কি সে মনে করিবে? সে ত জানে মমতা ধনীর কন্যা। নিশ্চয়ই অমর মনে করিবে. মমতা অতি অমানুষ, হৃদয়হীনা, গরিবের আর্ত্তের দুঃখে তাহার মনে কিছুমাত্রও বেদনার সঞ্চার হয় না।

বিস্ফারিত নেত্রে সে অমরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। কত লোকে কত কি দিতেছে। একটি মেয়ে হাত হইতে একগাছি চুড়ি খুলিয়া ঝুলির ভিতর ফেলিয়া দিল। এইবার মমতার পালা, অমর ঠিক তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মমতা চোখ তুলিয়া চাহিয়া চাহিতে পারিল না, ভাল করিয়া ভাবিবার ক্ষমতাও যেন তাহার চলিয়া গেল। কম্পিত হস্তে গলার হার ছড়া খুলিয়া ঝুলির মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হারটা ঝুলিতে দিয়াই কি একটা অদৃশ্য শক্তির টানে সে আবার চোখ তুলিয়া চাহিল। অমরেন্দ্র তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু তখনই সে মমতার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। মমতা তাহার চোখের দৃষ্টিতে কি দেখিল তাহা সে-ই জানে। কিন্তু কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল কি যেন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়া গেল। মমতার সমস্ত অস্তিত্বের উপর দিয়া একটা অনির্ব্বচনীয় পুলকের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে, কেন যে তাহা সে বুঝিতে পারে না। বুকের কম্পন তাহার থামিতে চাহে না কেন? এমন ত কিছু ঘটে নাই, তবু মমতার শরীর মন এমন করিয়া থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে কেন?

যামিনী দূর হইতেই মমতার দান দেখিতে পাইলেন। তিনি ঝুলিতে পাঁচ শত টাকার নোট ফেলিয়া দিলেন, মমতার আর কিছু না দিলেও চলিত। কিন্তু দিয়াছে যে তাহার জন্য দুঃখ নাই, এখন সুরেশ্বর জানিতে পারিয়া চেঁচামেচি না করেন তাহা হইলেই হয়।

যে-ছেলেটির ঝুলিতে তিনি টাকা দিয়াছিলেন, সে একখানা খাতা বাহির করিয়া বলিল, "যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটা একবার লিখে নিতে চাই।"

যামিনী বলিলেন, "নাম দিতে আমি চাই না, 'জনৈক মহিলা' বলেই লিখে নিন্।" যুবক অগত্যা সরিয়া গেল।

সভা এইবার ভাঙিবার মুখে, লোকজন অনেকেই উঠিয়া হুড়াহুড়ি করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। মমতা উঠিয়া পড়িয়া,. লোক ঠেলিতে ঠেলিতে যামিনীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "আমি কি কীর্ত্তি করেছি জান মা?"

যামিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখলাম ত।"

মমতা বলিল, "তুমি রাগ কর নি ত মা?" যামিনী বলিলেন, "আমি রাগ করি নি মা, খুশীই হয়েছি, তবে তোমার বাবা জান্‌লে হয়ত বিরক্ত হবেন।"

মমতা ক্ষুব্ধভাবে চুপ করিয়া রহিল। বাবার কথা তখন তাহার একেবারেই মনে ছিল না। ভাল কাজেও বিরক্ত হওয়া তাঁহার এক স্বভাব। কি আর করা যাইবে? অদৃষ্টে বকুনি থাকে বকুনি খাইতে হইবে। বকুনি খাইলে সে কিছু মরিয়া যাইবে না, বরং দান করার জন্য কিছু দুঃখ যে তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, ইহাতে দানটা সার্থকই হইবে। কিন্তু বাবা যদি ইহার জন্য মায়ের উপর জুলুম করেন, তাহা হইলে মমতার পক্ষে তাহা অত্যন্তই দুঃখের বিষয় হইবে। বাবার যা স্বভাব, তাহাই ঘটিয়া বসা আশ্চর্য্য নয়।

মেয়ের চিন্তাকুল মুখের দিকে চাহিয়া যামিনী বলিলেন, "থাক, অত ক'রে ভেবে আর কি হবে? তুমি ত অন্যায় কাজ কিছু কর নি? যাতে ওটা তোমার বাবার চোখে না পড়ে তারই চেষ্টা করতে হবে আর কি।"

মমতার মুখের অন্ধকার খানিকটা কাটিয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি দিলে মা?"

যামিনী বলিলেন, "পাঁচ-শ টাকা দিয়েছি।" লুসি এবং প্রভা অনেক চেনা মানুষ খুঁজিয়া পাইয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল, যামিনী মমতাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ্‌ ত তোর মামীমাকে এদিকে আন্‌তে পারিস কিনা। বাড়ি ফিরতে বেশী রাত হ'লে উনি আবার বকাবকি করবেন।"

লুসির সাহায্যে মমতা গিয়া প্রভাকে ডাকিয়া আনিল। প্রভা কাছে আসিয়াই বলিল, "মা মেয়ে মিলে খুব কাণ্ডই করলে যাহোক্‌।"

যামিনী বলিলেন, "তোমার চোখে কিছুই এড়ায় না দেখি। এখন চল ত, রাত হয়ে আসছে।"

প্রভা গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিল, "যাক্‌, আমি যে বিশেষ কিছু দিতে পারি নি, তার জন্যে কোন দুঃখ রইল না। বোনের দেওয়াও যা, ভাইয়ের দেওয়াও তাই।"

তাঁহার দানের গৌরবটা প্রভাকে বেদখল করিতে দিতে যামিনীর কিছু আপত্তি ছিল না, কিন্তু প্রভা পাছে সকলের কাছে বলিয়া বেড়ায় সেই এক ভয়। অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল, "সে ত ঠিকই, এক জন দিলেই হ'ল, যে হোক্‌। তুমি কিন্তু ভাই এ-কথাটা কাউকে যদি না বল ত ভাল হয়। জান ত ওঁকে, অল্পেই এখন ওঁর মেজাজ যায় বিগ্‌ড়ে, আর তাহ'লেই শরীরও তখনই খারাপ হ'তে আরম্ভ করে।"

প্রভা বলিল, "ওমা, তুমি আমাকে কচি খুকী পেয়েছ নাকি? লোককে বল্‌তে যাব কেন? আমার পেট থেকে কথা বার করা অমনি সহজ ব্যাপার নয়।"

প্রভা এবং লুসিকে নামাইয়া দিয়া, যামিনী বাড়ি ফিরিয়া চলিলেন। মমতা সারাটা পথ আর কোন কথাই বলিল না। হার-দেওয়ার ব্যাপারটা তাহাকে বড় বেশী বিচলিত করিয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই তাহার মানস চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল অমরেন্দ্রের চোখের গভীর দৃষ্টি, আর হৃৎপিণ্ডের গতি তাহার যেন দ্রুততর হইয়া উঠিতে লাগিল।

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখা গেল, নীচের ঘরে মহোৎসাহে সুরেশ্বর আড্ডা জমাইতেছেন। এ-রকম বাড়াবাড়ি করিলে শরীর খারাপ হইতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হইবে না। কিন্তু যামিনীর হাত নাই কিছু ইহাতে। এক রকম তাঁহার উপর শোধতোলার উদ্দেশ্যেই যখন আড্ডাটি আহ্বান করা হইয়াছে, তখন তাঁহার অনুরোধে সুরেশ্বরকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যাইবে না। তবে তাঁহারা ফিরিবামাত্রই যে ছুটিয়া আসিয়া সুরেশ্বর হৈ চৈ বাধাইয়া দিলেন না, ইহাতে যামিনী খানিকটা আশ্বস্তও হইলেন।

উপরে উঠিয়া গিয়া তিনি তাড়াতাড়ি লোহার সিন্দুক খুলিয়া বাছিয়া বাছিয়া আর এক ছড়া হার বাহির করিলেন। এটিও অনেকটাই মমতার আগের সেই হারটিরই মত। মেয়ের গলায় সেটা পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "প্রায় এক রকমই দেখ্‌তে।"

সুরেশ্বরের ইচ্ছা ছিল সেদিন বেশ ভাল করিয়া রাত করেন, এবং খাওয়াদাওয়ার অনিয়মও খানিকটা করেন। কিন্তু হঠাৎ মাথাটা ধরিয়া ওঠাতে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। বন্ধুদের বিদায় করিয়া দিয়া উপরে শুইতে চলিয়া গেলেন।

চাকর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার খাবার এই-খানেই নিয়ে আসব কি ?"

সুরেশ্বর তাহাকে ধমক দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। তিনি খাইবেন না।

চাকর গিয়া যামিনীকে খবর দিল। যামিনী একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিজেই খবর লইতে আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "খেতে চাইছ না কেন ? শরীর কি বেশী খারাপ বোধ হচ্ছে ?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "এত রাত্রে খেলে আর রক্ষা থাকবে ? ভুগে মরন ত আমিই ?"

যামিনী মৃদুস্বরে বলিলেন, "সময়মত খেলেই হ'ত।"

সুরেশ্বর গলা চড়াইয়া বলিলেন, "মানুষগুলো এল, তাদের ফেলে চলে আসা যায় কখনও ? একটা সাধারণ ভদ্রতা ত আছে ? আর একলা-একলা জেলের কয়েদীর মত মানুষ থাকতেও পারে না। লোকের মুখও ত একটু দেখতে ইচ্ছা করে ?"

এত রাত্রে খাইলে সত্যই হয়ত আরও শরীর খারাপ হইবে ভাবিয়া যামিনী চলিয়া আসিলেন। এক রাত নাই-বা খাইলেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। সকালবেলাটা কাটাইয়া দিতে পারিলে তাঁহারও বিপদ কাটিয়া যায়। খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস সুরেশ্বরের খানিকটা আছে। আজকার সভার বিবরণ পড়িয়া, তাঁহার মনে যদি কোন সন্দেহ হয় এবং তিনি সোজাসুজি যামিনীকে প্রশ্ন করিয়া বসেন, তাহা হইলেই মুস্কিল। তাঁহার কাছে কথা লুকান চলে, কিন্তু একেবারে মিথ্যা উত্তর দেওয়া ত যামিনীর দ্বারা ঘটিয়া উঠিবে না, মেয়েকেও সে-পরামর্শ দিতে তিনি পারিবেন না।

ক্রমশঃ

দিনেন্দ্র-স্মৃতি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঘন মেঘের স্বনে
বিদ্যুতের চমকনে
সবে সুরু বরষা-বোধন,
কেতকী কদম্ব বনে
হের এ ভরা শ্রাবণে
উৎসবের পূর্ণ আয়োজন।
'নাটের কাণ্ডারী', আজি
তব পথ চেয়ে আছি,
'সুরের ভাণ্ডারী', ধর সুর,
আশা ও উদ্বেগ প্রাণে
ধৈর্য্য আর নাহি মানে
দেহ মন রসতৃষাতুর।

অঝোর বাদল-ধারে
বনানীর বীণা-তারে
মল্লার হবে না মর্ম্মরিত ?
গোপন মর্ম্মের তলে
বেদনার ধারা-জলে
কোন্ সুর আজি উচ্ছ্বসিত !
নাটমঞ্চে ধরণীর
তুলি পাট, হে অধীর,
নটেশের আপন অঙ্গনে
উদার অক্ষয় যেথা
জীবন-উৎসব, সেথা
আহ্বান কি পেলে সঙ্গোপনে ?

শারদ-উৎসবে যবে
ছুটির বাঁশরী-রবে
ঘরে মন বাঁধন না মানে
কিশোর প্রাণের সাথে
যে প্রবীণ গানে মাতে
যাদু যার বনপথে টানে
এবার ধানের ক্ষেতে
শ্যামল অঞ্চল পেতে
কাশের রাশিতে হাসি আঁকি
অনুনয় জাগে যবে
"সে কোথায় ?"—মোরা সবে
কি ভাষায় তারে দিব ফাঁকি ?
জ্যোৎস্না-রজনীর মায়া
কণ্ঠে তব ধরি কায়া
ক্লান্তিহীন রসের প্লাবনে
পূর্ণিমার পাত্র ভরি
সহস্র ধারায় ঝরি
তৃপ্ত করে তুচ্ছ অকিঞ্চনে .
বাসন্তী-পূর্ণিমা রাতে
শিহরিত মধুবাতে
এবার নিঃশ্বাস শুধু ফেলা,
সে কোন্ নূতন দেশে
বুঝি নব পরিবেশে
হ'ল সুরু উৎসবের মেলা ।

ফাল্গুনের শালবীথি
মঞ্জরিত হয়ে নিতি
ধূলায় পাতিবে পুষ্পাসন
পলাশে অশোক-শাখে
অনুরাগরক্ত-রাগে
জাগিবে পুঞ্জিত সম্ভাষণ,—
সে আনন্দে নিখিলের,
সেই নব ফাল্গুনের
ললাটে কুঙ্কুম দিতে আঁকি
হে চির-আনন্দময়
তোমারে না হ'লে নয়,—
ভোল নিদ্রা, খোল খোল আঁখি !
সুরের ভাণ্ডার খুলি
কোন্ পথে গেলে ভুলি,
কে ভোলা এমন দিল ডাক ?
কাহারে সঁপিতে প্রাণ
কণ্ঠে নিলে শেষ গান
সে কি সুন্দরের অনুরাগ ?

হে সুরেন্দ্র গেছ চলে
জানি সুর-সভা তলে
নন্দনের আনন্দ ভবনে,
প্রাণের ভ্রমর বুঝি
এতদিনে পেল খুঁজি
চির মধু বাণীপদ্মবনে ?

রাখিপূর্ণিমা.
১৩৪২

বৃহত্তর ভারতে বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রভাব

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা বৌদ্ধদের লীলাক্ষেত্র ছিল এবং তখন এই স্থানকেই কেন্দ্র করিয়া "বাংলা ও মগধের বৌদ্ধ কোষ, বৌদ্ধ ব্যাকরণ, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য" প্রভৃতি সমগ্র ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে। বৌদ্ধদের এই গৌরবময় যুগ যখন ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল তখনও দেখা যায় এই বঙ্গ-মগধই ছিল তাহাদের প্রচারের প্রধান কেন্দ্রস্থান। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গের বৌদ্ধ ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সওদাগর, বণিক প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া স্থাপত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতিতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভারত কিরূপ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল সেই সম্বন্ধেই এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিব।
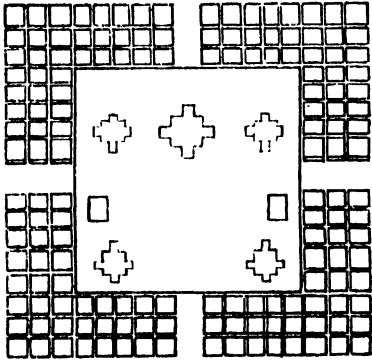
চণ্ডী লোরো-জংগ্রাং-এর ভিত্তিভূমি

যদিও কোন কোন মনীষিবৃন্দের মতে ভারহুত ও সাঁচী স্তূপের ভাস্কর্য্য বোম্বাই ও পুনার মধ্যবর্ত্তী কার্লে চৈত্যগৃহ কিংবা অজন্তার চৈত্যগুহা ও তৎসংলগ্ন কিছু চিত্রাবলী বঙ্গের বাস্তুশিল্পের অনুকরণে কিংবা প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল কিন্তু ইহার কোন বিশেষ ঐতিহাসিক প্রমাণ ও উপকরণ না-থাকার দরুণ এই সম্বন্ধে আলোচনা একরূপ পরিত্যাগ করিয়াই আমরা চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলায় পাহাড়পুর যে অপূর্ব্ব স্থাপত্য শিল্প রাখিয়া গিয়াছে এবং যাহাকে বলা হয় no single monastery of such dimensions has yet come to light in India—সেই স্থানে নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতে পারি।
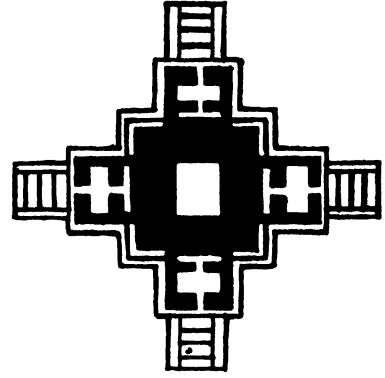
চণ্ডী সেউ মন্দিরের ভিত্তিভূমি

প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে এই স্তূপ খননে আবিষ্কৃত মন্দির সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল, "মন্দিরের গঠন নিতান্ত সরল। ইহা একটি ত্রিতল মন্দির। নিম্নাংশ ক্রুশের আকারে নির্ম্মিত। এই ক্রুশের দীর্ঘতম বাহু ছিল উত্তর দিকে। নিম্নতলে কোনও গৃহাদি নাই, একেবারে ভরাট গাঁথনি। তাহার উপরে দ্বিতলটি একটি নিরেট গাঁথা পোতার উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতলের পোতার চতুর্দ্দিকে একটি সুবিস্তৃত প্রদক্ষিণ পথ। পথটি বাহিরের দিকে আবক্ষ-উন্নত নিম্ন প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এই প্রাচীরের বহির্ভাগ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মূর্ত্তি-ফলকদ্বারা বিচিত্রিত। * * * মন্দিরের প্রধান বেদীটি একটি খিলান-করা ছাদবিশিষ্ট কক্ষমধ্যে রক্ষিত। কক্ষটির উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে স্তম্ভপরিবৃত এক-একটি সুবৃহৎ মণ্ডপগৃহ। প্রত্যেক মণ্ডপের তিন পার্শ্বে সুউচ্চ সংকীর্ণ

দালান। উত্তরের মণ্ডপটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার; উহা ন্যূনাধিক ২৭ ফুট্ লম্বা ও ২৩ ফুট্ ৫ ইঞ্চি চওড়া।"

ইহার পরে পাহাড়পুরের চতুর্ম্মুখ বিহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দীক্ষিত একটি বিবরণী প্রস্তুত করেন।

(মর্ম্মানুবাদ) "মন্দিরটি বর্ত্তমানে যেমন আছে তাহাতে উহা উত্তর-দক্ষিণে ৩৬১ ফুট লম্বা এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৩১৮ ফুট বিস্তৃত ছিল দেখা যায়। বর্গক্ষেত্রের আকৃতিতে মন্দিরটি নির্ম্মিত কিন্তু প্রত্যেক ধারেই কতকটা অংশ বর্দ্ধিত আছে। উত্তর ধারের বর্দ্ধিত অংশ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, কারণ উহার
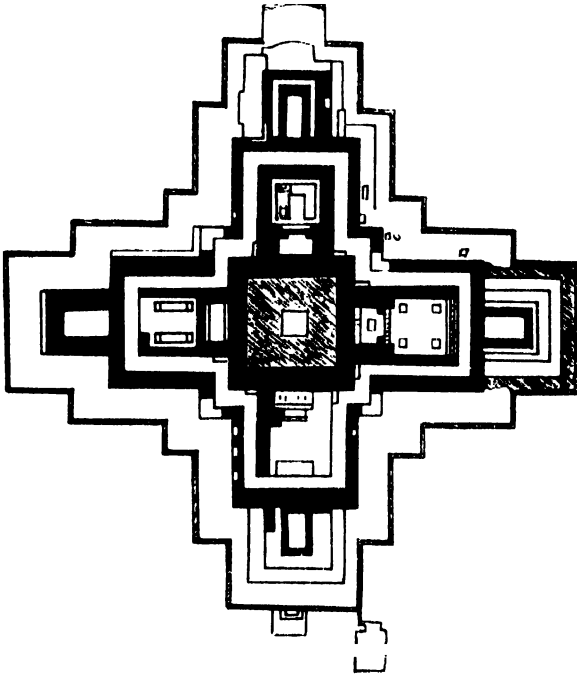
পাহাড়পুর মন্দিরের ভিত্তিভূমি

উপর দিয়া সিঁড়ি গিয়াছে। তিনটি ক্রমহ্রস্বায়মান তলে মন্দিরটি সম্পূর্ণ। উত্তর দিকের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া উপরের তলগুলিতে উঠা যায়।" তাঁহার মতে পাহাড়পুরের প্রস্তর মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কয়েকটির কারুকার্য্য গুপ্ত-রাজত্বের শেষাশেষি সময়ের ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই মূর্ত্তিগুলি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা অনায়াসে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পাহাড়পুরের পরিকল্পনা ও গঠনপ্রণালী যাহা এতদিন ভারতে অজ্ঞাত ছিল, গুপ্ত-রাজত্বের সময় শুধু বাংলায় তাহা প্রকাশিত হয়।

পাহাড়পুরের আবিষ্কারে তৎকালীন বাংলার সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধেও আমরা অনেক তথ্য জানিতে পারিতেছি। এখানে যে-সমস্ত 'টেরা-কোটা' বা পোড়া মাটির জিনিষ, প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এইস্থান একসঙ্গে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও জৈনদের লীলাক্ষেত্র ছিল। ইহা তৎকালীন ভারতের আকর্ষণের বস্তু
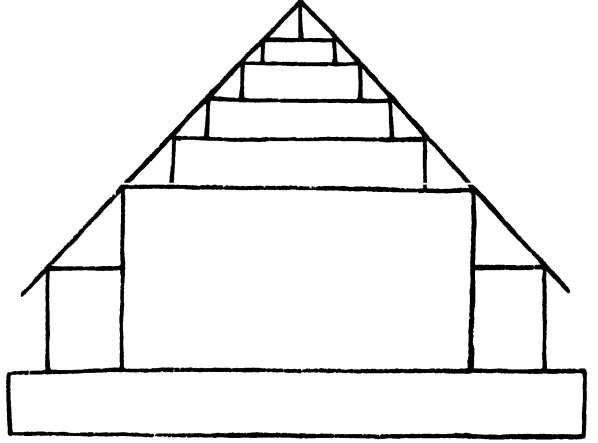
আটচালা ঘরের নকশা

ছিল বলিয়া বিভিন্ন দূরদেশ হইতে শিক্ষার্থী ও তীর্থযাত্রী আসিত। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত পাহাড়পুর একটি প্রসিদ্ধ নগরে পরিণত হইয়াছিল এবং পাল-রাজত্বের বহু পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গবাসীরা শুধু ভারতে নয় সুদূর পূর্ব্ব-খণ্ডেও গমনাগমন করিতেন। এমন কি আনন্দ কুমারস্বামী তাঁহার *History of India and Indonesian Art* পুস্তকেও লিখিয়াছেন, "দ্বীপময় ভারতের সহিত পূর্ব্বভারতের গমনাগমন পঞ্চম ও নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই খুব শক্তিশালী হইয়াছিল এবং ইহারই ফলে তদ্দেশীয় চিত্রকলা, স্থাপত্য, ধর্ম্ম ভারতীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়।"

আরবেরাও শ্রীবিজয়ের (সুমিত্রা) শৈলেন্দ্র রাজাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তাঁহারা বাংলার পাল রাজা এবং দক্ষিণের চোল রাজাদের সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।" মালয় উপদ্বীপে প্রাপ্ত ভিয়েং সা (Vieng Sa) খোদিত লিপিতেও আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীবিজয়ের শাসনকর্ত্তারা মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা বাংলার পাল রাজা দেব

:লের অনুমতিতে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

ডক্টর বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার *India and Java* পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বেদীর ভিতরকার মূর্ত্তিগুলি (পূর্ব্ব-জাভার চণ্ডী পনতরন্ মন্দিরের রামায়ণের নক্সাবলী) বিশুদ্ধ ভারতীয় নিদর্শন এবং ইহার অনেক মূর্ত্তিতে খোদিত লিপি বর্ত্তমান। উত্তর-ভারতীয় অক্ষরের সহিত এই অক্ষরের সাদৃশ্য আছে ; আবার নাগরী অপেক্ষা যে বাংলা অক্ষরের সহিত ইহার বেশী মিল আছে তাহাও দেখিতে পাইয়াছি।" ঐ পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে যে শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র রাজাদের মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে অত্যন্ত আসক্তি ছিল। অধ্যাপক ক্রোম তাঁহার 'ইন্দো-জাভার ইতিহাসে' উল্লেখ করিয়াছেন যে, সুমাত্রায় যে স্বর্ণ-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রত্যয় ও চিহ্নসকল অতি বিচিত্র। অধ্যাপক কার্ণও বলিয়াছেন যে নালন্দার প্রসিদ্ধ গুরু ধর্ম্মপাল তাঁহার শেষ জীবন সুমাত্রায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বঙ্গ ও মগধের সহিত এই সব স্থানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই ইহার মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ঐ সব প্রদেশ হইতে আসে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বঙ্গ ও মগধেই পাল-রাজত্বের সময় মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। এইখানেই মহাযানের সহিত তন্ত্রযান যুক্ত হয় এবং ঠিক অনুরূপ বৌদ্ধ ও তন্ত্রযান-যুক্ত মত সুমাত্রা জাভা এবং কাম্বোডিয়ার কোন কোন অংশে দেখিতে পাওয়া যায়।

শরৎ চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার *Indian Pandit in the Land of Snow* পুস্তকে লিখিয়াছেন, "কয়েক জন সদাগরের সঙ্গে একটি বৃহৎ অর্ণবপোতে প্রসিদ্ধ বঙ্গ-ভিক্ষু দীপঙ্কর (অতীশ) সুবর্ণদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই যাত্রা কয়েক মাস ব্যাপী দীর্ঘ ও একঘেয়ে হইয়াছিল এবং ইহার মধ্যে তাঁহারা কয়েকবার ঝড়ের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সেই সময়ে সুবর্ণদ্বীপ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং ইহার ভিক্ষু ধর্ম্মকীর্ত্তি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত ছি[illegible] দীপঙ্কর (অতীশ) বুদ্ধদেবের পবিত্র উপদেশবাণী শিক্ষা ধর্ম্মকীর্ত্তির সহিত বার বৎসর কাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি তাম্রদ্বীপ (সিংহল) হইয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন।"

দীপময় ভারতের এই সময়কার পুঁথির লেখার সঙ্গেও বাংলা অক্ষরের অনেক দিক দিয়াই সাদৃশ্য আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠায় বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "কাম্বোডিয়া এবং জাভার এই উত্তর-ভারতীয় অক্ষরের সহিত দেবনাগরী
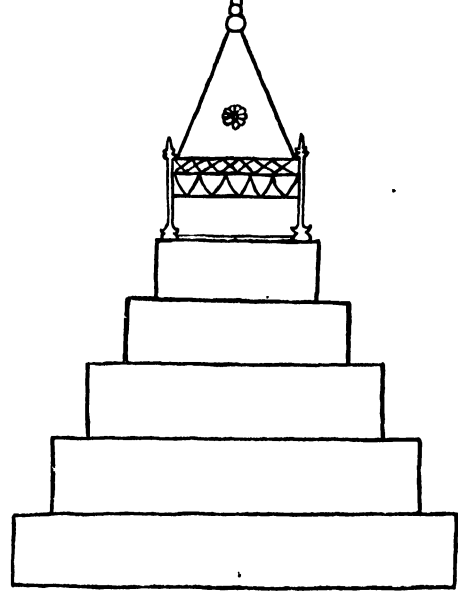
দোলমঞ্চ

অপেক্ষা বাংলা অক্ষরের বেশী সাদৃশ্য আছে। এই সব এবং কাম্বোডিয়া, জাভা ও সুমাত্রায় এখন যেরূপ মহাযান ও তন্ত্রযান-যুক্ত বৌদ্ধমত ও শৈবধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে আমার মনে হয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সুদূর পূর্ব্বখণ্ডে দক্ষিণ-ভারতীয় প্রভাব ক্ষীণ হইয়া আসে এবং ইহার ধর্ম্ম ও চারুচিত্র ক্রমশঃই পালবঙ্গ ও মগধের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে থাকে।" (অধ্যাপক ক্রোমেরও এই মত)।

যদিও সুদূর পূর্ব্ব-খণ্ডের প্রাচীন ঔপনিবেশিকেরা দক্ষিণ ভারত হইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু 'কলসন্' (Kalasan) খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় পরবর্ত্তী কাল সম্বন্ধে আর উক্ত কথা খাটে না। বিজনবাবুর উক্ত পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই যে, এই খোদিত লিপি অনুসারে (কলসন্ খোদিত লিপি ৭০০ শকাব্দ) মগধ প্রভাব এই সব স্থানে পরবর্ত্তী কালে প্রবল হইয়াছিল। এই উত্তর-ভারতীয়

প্রভাব বিশেষ ভাবে জাভা এবং সুমিত্রায় শ্রীবিজয় শাসনকর্ত্তাদের সময়ে মহাযান খোদিত লিপিতে দৃষ্ট হয়। এই সব স্থানে মহাযান বৌদ্ধমত ও উত্তর-ভারতীয় অক্ষরমালা উভয়ই পালবঙ্গ ও মগধ হইতে আসে।

পেগান-মন্দিরের দেওয়াল চিত্র

এখন কিছু বলিবার পূর্ব্বে এই 'কলসন্' খোদিত লিপি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। বিজন বাবু তাহার উক্ত পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায় এই সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) * কেদুতে (মধ্য-জাভা) আবিষ্কৃত কাভি খোদিত লিপিতে আমরা সঞ্জয় (চংগাল—Canggal খোদিত লিপির নির্ম্মাণ) হইতে আরম্ভ করিয়া মতরং (মধ্য-জাভা) রাজাদের ধারাবাহিক নাম পাই। এই ধারাবাহিক তালিকা অনুসারে সঞ্জয়ের উত্তরাধিকারী মহারাজা পনংকরং, যাহাকে ডক্টর ষ্টুটেরহাইম্ কলসন্ খোদিত লিপির মহারাজা পনংকরং-এর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করেন।

কিন্তু কলসন্ খোদিত লিপির পনংকরং শ্রীবিজয়ের (সুমাত্রা) রাজবংশোদ্ভূত একজন শৈলেন্দ্র রাজকুমার। জাভায় শৈলেন্দ্র রাজারা যে কি ভাবে আসিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই এবং তাঁহারা যে যুদ্ধ করিয়া এই রাজ্য জয় করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কিন্তু ডক্টর ষ্টুটেরহাইমের মতে মতরং-এর সঞ্জয়, যাহার প্রশংসা চংগাল খোদিত লিপিতে আছে তাহা পাঠ করিয়া দেখা যায় তিনি নিজেই এক জন শৈলেন্দ্র রাজা ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মতে জাভাতেই তাঁহাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহা শ্রীবিজয়ে নহে। ষ্টুটেরহাইম্ একখানি কাভি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে সঞ্জয়, ক্ষের, মালয়, কেলিং দেশে পরাজিত বলিয়া বর্ণিত আছেন কিন্তু সং শ্রীবিজয় তাঁহার নিকট পরাজিত হন এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ চংগাল খোদিত লিপিতে (৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ) বর্ণিত লিঙ্গ-উৎসর্গের সময় তাঁহার এই বিজয়লাভ ঘটে। ইহার পরে ডক্টর ষ্টুটেরহাইম খুব সাহসের সহিত নূতন ভাবে নালন্দা খোদিত লিপি বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নালন্দা মঠের অর্থদাতা সুমাত্রার মহারাজা বালপুত্র তাঁহার পিতামহকে (জাভার রাজা) উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন 'বেরবৈরিমথন' অর্থাৎ ইহা তাঁহার পিতামহের নামের অর্থ সূচিত করে। বালপুত্রের পিতাকে বলা হইয়াছে 'সমরাগ্র' এবং তাহার মাতার নাম 'তারা' লিখিত আছে। কথিত আছে তারা রাজা ধর্ম্মসেতুর কন্যা। এখন ডক্টর ষ্টুটেরহাইম্ প্রসিদ্ধ বিজেতা সঞ্জয়কে বালপুত্রের পিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহা হইলে সঞ্জয়ের উত্তরাধিকারী পনংকরং বালপুত্রের পিতা এবং তারা পনংকরং-এর মহিষী হইবেন। কলসন্ খোদিত লিপি (৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) আবিষ্কারে ইহার সত্যতা আরও স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত করে। এই খোদিত লিপিতে দেখিতে পাই পনংকরং তারার নামে একটি মন্দির উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রাণীর মৃত্যুর পরে তারাদেবীর মন্দির (কলসন্) প্রস্তুত হয়। বোধ হয় ইহা

* Comments on the inscriptions of Canggal, Kedu, Kalasan and Nalanda by Dr. Stutterheim in the Tijdscrift 1927, and in 'A Javanese Period in Sumatran History'—1929.

তাহারই স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং এই তারা দেবী ও রাণী তারা অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। (রাজা ও রাণীর মৃত্যুর পর তাঁহাদিগকে দেব-দেবী বলিয়া বর্ণিত করা জাভায় অনেক সময়েই দৃষ্ট হয়)। ইহা ছাড়া কলসন্ ও কেলুরক (৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ) খোদিত লিপিতে ধর্ম্মসেতু কথাটি পাওয়া যায় এবং এই সেই ধর্ম্মসেতু যিনি রাজা ও যাহার কন্যা বালপুত্রের মাতা তারা বলিয়া নালন্দা খোদিত লিপিতে বর্ণিত আছেন। ডক্টর ষ্টুটেরহাইম্ খুব সাহসের সহিত এই ধর্ম্মসেতু ও বাংলার প্রসিদ্ধ পাল-রাজা ধর্ম্মপালকে একই রাজা ছিলেন বলিয়া সাব্যস্ত করেন। সুতরাং তাঁহার মতে জাভায় পনংকরং-এর সহিত বঙ্গরাজকুমারী ধর্ম্মপালের কন্যা তারার বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই মহাযান বৌদ্ধমত জাভায় ইতঃপূর্ব্বেই অবস্থিত শৈবধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ লাভ করে। ডক্টর ষ্টুটেরহাইমের মতে ধর্ম্মপাল পনংকরং-এর গুরু ও শ্বশুর ছিলেন।

(খ) † কেলুরকের (মধ্য জাভার প্রাম্বানামের নিকটে) খোদিত লিপি নাগরী অক্ষরে বর্ণিত এবং ইহা ৭০৪ শকাব্দের অর্থাৎ ৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বের। এই খোদিত লিপিখানির কিছু অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে গুরুর প্ররোচনায় তাঁহার মন্দির ও মূর্ত্তি শৈলেন্দ্র রাজা কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঠিক ইহা কেলুরক খোদিত লিপিতেও বর্ণিত আছে যে রাজগুরু গৌড়দ্বীপ (বাংলা) হইতে মধ্যজাভায় শৈলেন্দ্র রাজার নিকট আসিয়া মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ডক্টর ষ্টুটেরহাইম্ বিশ্বাস করেন কলসন্-খোদিত লিপিতে যে গুরুর কথা উল্লিখিত আছে তিনি বাংলার চিরস্মরণীয় পালরাজা ধর্ম্মপাল ভিন্ন অন্য কেহ না। কেলুরক খোদিত লিপিতে যে রাজগুরুর কথা উল্লেখ আছে তাহা কুমার ঘোষ বলিয়া মনে হয়। যদিও তিনি বাংলার কোন রাজা ছিলেন না কিন্তু তিনি এক জন পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন এবং বঙ্গদেশ হইতে জাভায় মহাযান প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন।

† The inscription of Kelurak and the visit to Java of the Mahayanist Rajguru from Bengal (from the article by Dr. Bosch in the Tijdscrift Voor Indische Teal Laanden Volken Kunde. Lxviii. 1928)].

কেলুরক খোদিত লিপিতে আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দেখিতে পাই। আমরা পূর্ব্বেই নালন্দা খোদিত লিপিতে দেখিতে পাইয়াছি যে, শৈলেন্দ্ররাজা বালপুত্র তাঁহার পিতামহকে স্বনামে অভিহিত না করিয়া উহার অর্থে বলিয়াছেন 'বেরবৈরি মথন'। এই কথাটিই বাড়াইয়া কেলুরক খোদিত লিপিতে বলা হইয়াছে 'বৈরি-বর-বেরবিমর্দ্দন'।

বুদ্ধগয়া
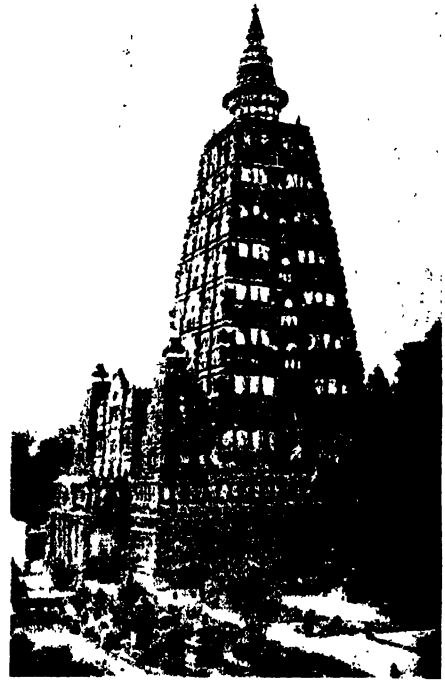
সুতরাং তাহাকে বালপুত্রের পিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা বোধ হয় অসমুচিত হইবে না। বাংলার পালরাজা দেবপালের সমসাময়িক বীতপালের রাজত্ব-সময় অনুমান ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ এবং কেলুরক খোদিত লিপির তারিখ ৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং দেখা যায় ডক্টর বোস্, ডক্টর ষ্টুটেরহাইমের সহিত একমত যে, কেদু-রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা পনংকরং এবং কলসন্ খোদিত লিপির মহারাজা পনংকরং একই ব্যক্তি ছিলেন।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, এই ভাবে বঙ্গদেশ পাল রাজত্বের বহুপূর্ব্ব হইতেই সুদূর পূর্ব্বখণ্ডের সহিত অনেক

দিক দিয়া যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল এবং আজ অনেক মনীষী জাভার অষ্টম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দীর অনেক মন্দিরকে পহ্লবদেশীয় না করিয়া উত্তর-ভারতীয় মন্দির বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। আনন্দ কুমারস্বামী তাঁহার *History of India and Indonesian Art* পুস্তকের ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, "পাল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য যাহাকে

পেগান-মন্দিরের ফ্রেস্কো চিত্র—পদ্মপাণি মূর্ত্তি

'পূর্ব্ব-বিভাগ' বলা হয়, নালন্দায় তাহা আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল। মুসলমানদের আক্রমণের (১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পালশিল্পের প্রসিদ্ধ মসৃণ কালো পাথরের মূর্ত্তি নালন্দায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় এবং ইহার ব্রোঞ্জের বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলিও প্রসিদ্ধ। বোধ হয় তারনাথ কর্ত্তৃক উল্লিখিত প্রসিদ্ধ শিল্পিদ্বয় ধীমান ও বীতপাল এই স্থানে নবম শতাব্দীর শেষভাগে কাজ করিতেন। দেবপালদেবের তাম্রশাসনেও দেখিতে পাওয়া যায় যে নালন্দা তাহার বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিল্পপদ্ধতির প্রভাবে নবম শতাব্দীতে সুমাত্রা ও জাভা সহিত পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং আর উল্লিখিত আছে যে, সুবর্ণদ্বীপের বালপুত্র ৮৬০ শকাব্দে প্রসিদ্ধ মঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।"

বঙ্গদেশ ও জাভার সহিত এই সব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ব্যতীত যে সেই সময়ের জাভার স্থাপত্য বঙ্গদেশের স্থাপত্য হইতে অনুপ্রেরণা পাইয়াছিল তাহা পাহাড়পুর আবিষ্কারের পর আর কোন সন্দেহ করিবার উপায় নাই। পাহাড়পুর আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে জাভার ক্রুশ-চিহ্নিত ভিত্তির মূল ভারতে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই এবং সেই জন্য অনেক মনীষী ইহাও বলিয়াছেন যে উহা জাভার নিজস্ব স্থাপত্যধারা। কিন্তু এই সব খোদিত লিপি, তাম্রশাসন পত্রের বিবৃতি এবং অন্যান্য স্থলপথে ও জলপথে বঙ্গদেশের সহিত দ্বীপময় ভারতের যোগাযোগ এবং এই মন্দিরগুলি হইতে তিন-চারি শত বৎসরের পূর্ব্বের পাহাড়পুর আবিষ্কৃত হওয়ার পর উক্ত কথা বলিবার আর উপায় নাই। দীক্ষিত মহাশয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বার্ষিক বিবরণীর (১৯২৬-২৭) ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "স্থাপত্য শিল্প-শাস্ত্রে ভারতীয় মন্দিরের প্রধান তিনটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি নাগরী, দ্বিতীয়টি দ্রাবিড় এবং চালুক্য অর্থাৎ বেশর এবং তৃতীয়টি সর্ব্বতোভদ্র। এই সর্ব্বতোভদ্র ধারার অর্থাৎ যথানুপাতিক ত্রিতল অথবা চতুস্তল মন্দির পাহাড়পুর ভিন্ন ভারতের অন্য কোন প্রদেশে পাওয়া যায় নাই এবং বোধ হয় উহার নির্ম্মাণ-পদ্ধতি বহু পূর্ব্বেই অন্যান্য প্রদেশবাসী ভুলিয়া গিয়াছিল। ভারতীয় এই বিশিষ্ট স্থাপত্য পদ্ধতি সুদূর পূর্ব্বখণ্ডে বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশ, জাভা এবং কাম্বোডিয়ার স্থাপত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। পাহাড়পুরের পরিকল্পনা ও গঠনপ্রণালীর নিকটতম আদর্শ কেবলমাত্র এ পর্য্যন্ত মধ্যজাভায় প্রাম্বানামে সন্নিকটস্থ চণ্ডী-লোরো-জংগ্রাং এবং চণ্ডী-সেউ মন্দিরের স্থাপত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডী-লোরো-জংগ্রাং মন্দিরের বর্দ্ধিত কোণ, অর্দ্ধপিরামিডাকৃতি এবং অলঙ্কৃত সমতল ভারতীয় মন্দিরের বিশিষ্ট পদ্ধতিকে প্রদর্শন করে। চণ্ডী-সেউ মন্দিরে ভিতরকার নক্সার সহিত পাহাড়পুরের প্রধান মন্দির ও দ্বিতীয় পোতার আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলি নবম শতাব্দীর অর্থাৎ পাহাড়পুর হইতে এ

তিন শতাব্দীর পরে নির্ম্মিত। সুতরাং ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে ভারতীয় এই বিশিষ্ট পদ্ধতি এই মন্দিরগুলির মূল আদর্শ।"

একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ক্রমহ্রস্বায়মান তলসংযুক্ত মন্দির ও ইহার ক্রুশ-চিহ্নিত ভিত্তি এখনও বাংলার বাস্তুশিল্পে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং আশা করি উহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

সাধারণতঃ বাংলাঘরের উপরে দ্বিতলঘর তৈরি করায় অসুবিধা আছে বলিয়া চৌরীঘরের উপর দ্বিতল ঘর বাংলায় তৈরি করা হইয়া থাকে। এই দ্বিতল ঘরের প্রথম ভিত্তিকে বলা হয় কোলডোয়া (এখানে 'ডোয়া' বোধ হয় 'দাওয়া' শব্দেরই অপভ্রংশ। যে ভাবে আমি কথাগুলি শুনিয়াছি ঠিক সেই ভাবে এখানে উল্লেখ করিলাম)। এই কোলডোয়ার উপরে চতুষ্পার্শ্ব হইতে কিছুটা স্থান বাদ দিয়া একতল ঘর তোলা হয়। এই ঘরের শীর্ষদেশে একতল ঘর হইতে ক্ষুদ্র করিয়া দ্বিতল ঘর তোলা হয় এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে ঘোরানো বারান্দা করা হয়। ইহা বোধ হয় ঘরের সমতা রক্ষা করে। ইহা ছাড়া বাংলার দোলমঞ্চের কথা বোধ হয় অনেকে জানেন এবং দেখিয়াছেনও ইহা কিরূপ ভাবে ধাপে ধাপে প্রস্তুত করা হয়। ইহার নির্ম্মাণ-পদ্ধতিতেও আমরা প্রথমে দেখি 'কোল-ডোয়া' তারপর 'ডোয়া', ইহার উপর ধাপে ধাপে ক্রমহ্রস্বায়মান ভাবে বহু 'ডোয়া' উঠিয়া গিয়াছে এবং বড় বড় আটচালা ও নাটমন্দিরের নক্সাও অতি কৌতূহলোদ্দীপক। ইহাতেও ঐ ক্রমহ্রস্বায়মান পদ্ধতি আছে। অন্যত্র একখানি আট-চালা ঘরের নক্সা প্রদত্ত হইল। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় পল্লীগ্রামে এখনও বাস্তুভিটার পূজা কিংবা বনদুর্গার প্রভৃতি ব্রতকথার বেদীগুলিতে ক্রুশচিহ্নিত ভিত্তি হয়। এই সমস্ত মন্দির ও বাস্তুশিল্পের বিচার করিলে আমাদের মনে হয় ভারতীয় এই বিশিষ্ট পদ্ধতির ধারা কেবল মাত্র বাংলায় প্রচলিত ছিল।
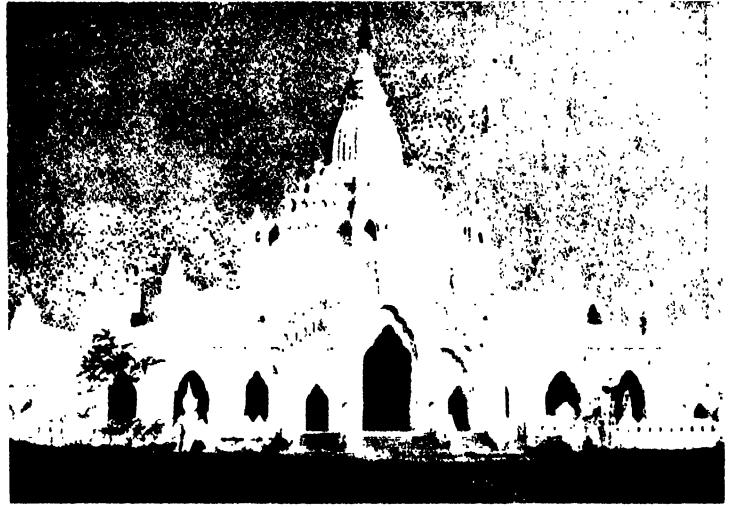
আনন্দ মন্দির—পেগান

এখনও দ্বীপময় ভারতের সাধারণ ঘরগুলি পর্য্যন্ত ঠিক বাংলা ঘরের মত হইয়া থাকে। ভূপ্রদক্ষিণকারী শ্রীযুক্ত রমানাথ বিশ্বাস সেদিন দ্বীপময় ভারত হইতে আসিয়া লিখিয়াছেন, "বলিদের গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি ঠিক বাঙালীর মত। সাতসমুদ্র পার হইয়া কিরূপে আমাদের গৃহনির্ম্মাণ প্রথা ওরা অবলম্বন করিয়াছে, তার ঠিক সিদ্ধান্তে এখনও আমি আসিতে পারি নাই।" ('প্রবর্ত্তক', কার্ত্তিক, ১৩৪১)। ইহারা বাংলার অনুরূপ লুঙ্গি এখনও পরিয়া থাকে। বাংলার লুঙ্গি অথবা 'তপন' প্রাচীন কালে বৌদ্ধেরা ব্যবহার করিতেন এবং বাংলায় প্রাচীন যত টেরা-কোটা, চিত্র কিংবা প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রত্যেক মূর্ত্তির পরিধানেই কয়েকটি রেখাযুক্ত এই লুঙ্গি আছে। আমার 'বঙ্গের পট-চিত্র' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, অজন্তার ও বাংলার মূর্ত্তিগুলির বক্ষ সাধারণতঃ উন্মুক্ত, শুধু কটিদেশ বস্ত্রাবৃত এবং উহাও আবার মাত্র কয়েকটি রেখার সমাবেশে পূর্ণ। কিছুদিন পূর্ব্বেও বঙ্গে স্ত্রীলোকেরা তাঁতীর তৈরি রঙীন ডুরে শাড়ী পরিতেন এবং প্রাচীন চিত্র এবং অনেক কবির বর্ণনা দেখিয়া আমাদের মনে হয় বাংলার স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বে শুধু বস্ত্র ভিন্ন সাধারণতঃ দেহে অন্য বিশেষ কিছু রাখিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এখনও, আধুনিক কালের রুচির সংস্পর্শে আসিয়াও, বলিদ্বীপবাসীদের ঐ অনুরূপ শুধুমাত্র

মন্দির-পথে যবদ্বীপবাসিনী

"বার্থের মতে জাভা এবং কাম্বোজের অক্ষরলিপির উত্তরভারতীয় অন্যান্য অক্ষরলিপি হইতে বঙ্গ-অক্ষরের সহিত অধিক সাদৃশ্য আছে।"

কাম্বোজের সহিত বাংলার এই সম্বন্ধ আমরা আরও অনেক দিক দিয়া দেখিতে পাই। ইৎসিং উল্লেখ করিয়াছেন, "শ্রীবিজয়ের রাজাদের অর্ণবপোত ভারত এবং সুমাত্রার মধ্যে যাতায়াত করিত এবং তিনি নিজে রাজার একখানি জাহাজে তাম্রলিপ্তাভিমুখে (তমলুক) যাত্রা করেন।" চীনদেশীয় ইতিবৃত্তেও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশের সহিত ইন্দোচীনের সর্ব্বদা যোগাযোগ ছিল।

কটিদেশে বস্ত্র পরিধান করিতে দেখা যায় এবং এখানে যে চিত্রখানি প্রকাশিত হইল তাহাতে ইহাদের মুখাবয়ব বাঙালী বলিয়া বিভ্রম ঘটে।

জাভার এই মন্দিরগুলির আলোচনা করিবার সময় ঠিক আমাদের আর একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে জাভা হইতে দ্বিতীয় যয়বর্ম্মণ কাম্বোজে উপনীত হন এবং সোলোক কক্ থম্ (Solok Kak Thom) অনুশাসন-পত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেক নূতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে। এই মূল্যবান অনুশাসন-পত্রে লিখিত আছে, "দ্বিতীয় যয়বর্ম্মণ জাভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হরিহরালয়, অমরেন্দ্রপুর এবং মহেন্দ্রপর্ব্বত নামে তিনটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া শেষ জীবন হরিহরালয়ে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।" এবং দ্বিতীয় যয়বর্ম্মণের সঙ্গে মহাযান ও তন্ত্রযান জাভা হইতে কাম্বোজে উপনীত হয়। আমরা যশোবর্ম্মণের খোদিত লিপিতেও দেখিতে পাই উত্তর-ভারতীয় অক্ষর লিখিত। বার্থের মতে এই উত্তর-ভারতীয় অক্ষর জাভা হইয়া কাম্বোজে উপনীত হয় এবং উত্তর-ভারতীয় পুঁথিগুলির বর্ণমালা হইতে ইহাদের বর্ণমালার পরস্পর সাদৃশ্য অনেক বেশী। এই অনুশাসন-পত্র সম্বন্ধে বিজন বাবু তাঁহার *Indian Cultural Influence in Cambodia* পুস্তকের ২৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,

ইহা ছাড়া বিজনবাবুর উক্ত পুস্তকের ২৫৬ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই যে হুয়েন সাং লিখিয়া গিয়াছেন, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কর্ণ-সুবর্ণের (দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ) রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধদের ভীষণভাবে উৎপীড়ন করেন। সম্ভবতঃ এই উৎপীড়নের ফলে বৌদ্ধেরা দলে দলে এই দেশ হইতে সুদূর পর্ব্বতখণ্ডে চলিয়া যাইতে থাকেন। মঁসিয় সেনার (M. Senart) ও শ্রী সান্থর (Srei Santhor) খোদিত লিপি বিচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে তারনাথ বহু বৌদ্ধের মগধদেশ হইতে অষ্টম শতাব্দীতে ইন্দো-চীনে আসিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহ সত্ত্বেও কর্ণ-সুবর্ণে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। হুয়েন সাং নিজেই এই স্থানে রক্তমৃত্তিকা নামে একটি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (Watters, Translation, vol. II, p. 191)। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সব স্থানকে বর্ত্তমানেও বলা হয় রাঙামাটি। মালয়-উপদ্বীপে প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন খোদিত লিপিতেও রক্ত-মৃত্তিকা কথাটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই খোদিত লিপির প্রণেতা একজন ধার্ম্মিক বৌদ্ধ সদাগর ছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা ভাগীরথী-তীরের এই বৌদ্ধমঠকে নির্দ্দেশ করে। এমন কি হুয়েন
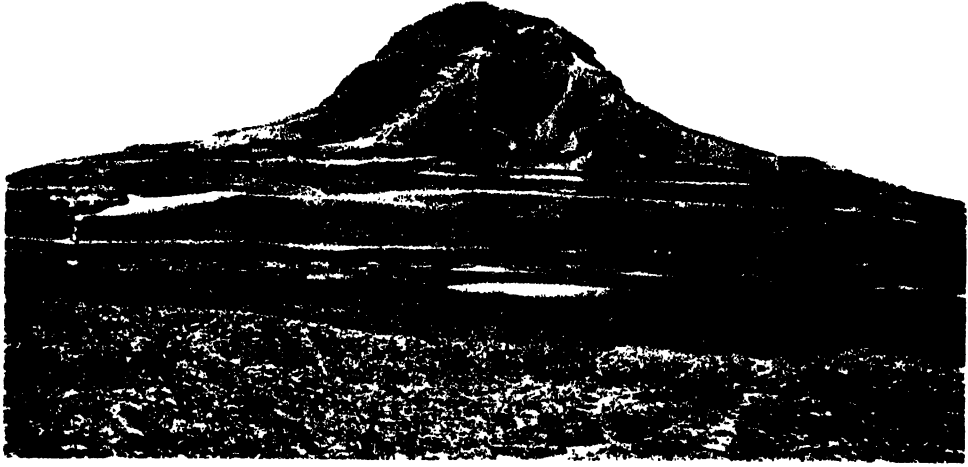
পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত স্তূপ

সাং সমতটে (গোমুখী) আসিয়াই শ্রীক্ষেত্র (প্রোম), দ্বারাবতী (শ্যাম), ঈশানপুর (কাম্বোজ) এবং মহাচম্পা দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত ইহা শুনিতে পান। তিনি বলিয়াছেন যে, সুমাত্রা ছাড়িয়া এই দেশগুলি তাঁহার দেখা হয় নাই, কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে সবিস্তার সমতটে আসিয়া শুনিতে পাইয়াছিলেন (Watters, Yuan Chwang, Vol. II, p. 187) তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সমতটের লোকদের সহিত এই সুদূর পূর্ব্বখণ্ডের হুয়েন সাং-এর আগমনের পূর্ব্ব হইতেই একটি গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং কাম্বোজকে ঈশানপুর বলা হইয়াছে ইহা উল্লেখযোগ্য কেন না সেই সময় অথবা ইহার কিছু পূর্ব্বে ঈশানবর্ম্মণ তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এইরূপ ভাবে ধর্ম্মের সঙ্গে ও জলপথে সুদূর পূর্ব্বখণ্ডের সহিত বাংলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ব্যতীত আমরা অন্যান্য বিষয়েও পরস্পর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের পরিচয় পাই। বিজন বাবু তাঁহার উক্ত পুস্তকে কাম্বোডিয়ার একটি গল্প তুলিয়া দিয়া লিখিয়াছেন যে কাম্বোডিয়ায় ভোরুবং ও সৌরীভং নামে প্রসিদ্ধ একটি গল্প প্রচলিত আছে। বিভিন্ন মন্দিরের প্রায় ৫০০ শত পুঁথি ঘাঁটিয়া পেভি (M. Pavie) এই গল্পটির সম্পূর্ণ উদ্ধার করিয়া 'কোঁতে দু কাম্বোজ' (Contes du Cambodge, pp. 169-263) পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে এই গল্পটি পদ্যে লিখিত। সংক্ষেপে গল্পটি এই।--

সৌরভীং ও ভোরুবং-এর বিমাতা তাঁহার নিজ পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য রাজার নিকট উহাদের নামে দোষ দিয়া বলেন যে তাহারা তাঁহাকে অপমান করিয়াছে। রাজকুমারদ্বয়ের ইহাতে মৃত্যুদণ্ড হয়, কিন্তু পরে দয়াবশতঃ তাহাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়। কিন্তু রাজপুত্রদ্বয় ছিলেন বোধিসত্ত্ব এবং সেইজন্য ইন্দ্র ও অন্য একটি দেবতা তাহাদের সাহায্যার্থে দুইটি মোরগরূপ ধারণ করিয়া যে বৃক্ষের নীচে রাজকুমারদ্বয় ঘুমাইতেছিলেন, সেইস্থানে পরস্পর মারামারি করিতে লাগিলেন। একটি মোরগ বলিতে লাগিল, "যে তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে সে সাত বৎসর কাল পরে দুই রাজ্যের রাজা হইবে" এবং অপরটি বলিতেছিল, "যে তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে সে সাত মাস পরে একটি রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে।" এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ মারামারি করিবার পর

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মূর্ত্তি

খুঁজিতে লাগিলেন। ওদিকে সৌরীভং তাঁহার ভ্রাতাকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন কিন্তু তাঁহার কোন খোঁজ মিলিল না। সৌরীভং-এর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইল।

ভোরূবংও অন্য একটি দেশে (থর্ণনীত্ রাজার) আসিয়া একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং বৃদ্ধা তাহার হস্তে হীরকাঙ্গুরীয় দেখিয়া চোর মনে করিয়া রাজপ্রহরীকে বলেন। রাজকুমারকে একটি খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া ছয় বৎসরকাল সমুদ্রতীরে থাকিতে হইবে এইরূপ আদেশ করা হইল। এদিকে ইন্দ্র সেই রাজ্যের রাজকুমারী কেশীকে স্বপ্ন দেখাইলেন যে এই বন্দী লোকটিই ভবিষ্যতে তাঁহার স্বামী হইবেন। ইতিমধ্যে একটি দৈত্য নিকটস্থ সোতাত্ রাজার রাজ্যকে ভয় দেখাইতে লাগিল এবং তিনি থর্ণনীত্ রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও থর্ণনীত্ রাজার যুদ্ধজাহাজ জলে ভাসানো গেল না। কিন্তু বন্দী ভোরূবং তাঁহার সামান্য অঙ্গুলিস্পর্শে উহা জলে ভাসাইয়া দিলেন এবং ঐ রাজ্যে উপস্থিত হইয়া দৈত্যটিকে নিমেষের মধ্যে বধ করেন। ইহাতে রাজা সোতাত্ নিজ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া উহা ভোরূবংকে প্রদান করিলেন। কিছুদিন পরে রাজা থর্ণনীত্ও বৃদ্ধ হইয়া পড়ায় তিনি ভোরবংকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজকুমারী কেশীর সহিত তাহার বিবাহ দেন। কিন্তু একদিন যখন ভোরূবং ও

দুইটি মোরগই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৌরীভং দ্বিতীয় মোরগটির এবং ভোরূবং প্রথম মোরগটির মাংস ভক্ষণ করিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সন্ধ্যার সময় দুই ভ্রাতা একটি পরিত্যক্ত পান্থ-নিবাসে উপস্থিত হইলেন। সেই দেশের রাজা একটি পরমাসুন্দরী কন্যা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যোতিষীগণের কথানুসারে রাজহস্তীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং এই হস্তীটি সোজা যেখানে রাজকুমারদ্বয় ঘুমাইতেছিলেন সেইখানে আসিয়া সৌরীভংকে পৃষ্ঠে করিয়া রাজপ্রাসাদে চলিয়া আসে। এদিকে ভোরূবং জাগিয়া তাহার ভ্রাতাকে না দেখিয়া সমস্ত বনে

কেশী এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে আসিতেছিলেন তখন তাঁহাদের জাহাজ জলমগ্ন হয় এবং তাঁহারা বিভিন্ন হইয়া পড়েন। রাণী একটি বৃদ্ধ ব্যাধ ও তাঁহার স্ত্রীর কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেইখানে তাঁহার এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ব্যাধের স্ত্রীর অত্যাচারে রাণী সন্তানের প্রতিপালনের ভার অন্য একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের উপর দেন। স্বয়ং ইন্দ্রই এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ছিলেন। রাণী চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার নবজাত সন্তানের গলায় ভোর্‌বংএর স্বর্ণাঙ্গুরী বাঁধিয়া রাখিয়া যান। ইন্দ্র সন্তানটিকে লইয়া রাজপথে রাখিয়া দেন, কেননা ইহা সৌরীভং-এর রাজত্ব ছিল এবং তিনি এইপথে রাজহস্তীতে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। সৌরীভং ভ্রাতার স্বর্ণাঙ্গুরি চিনিতে পারিয়া তাহাকে রাজ-প্রাসাদে লইয়া যান এবং সেখানে এক বৃহৎ প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া সমস্ত দেওয়ালে দুই ভ্রাতার জীবনবৃত্তান্ত চিত্রিত করান। এদিকে ভোরবং স্ত্রীর অন্বেষণে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া চিত্রিত দেয়াল দেখিতে পান এবং সমস্ত ঘটনা স্মরণ হইয়া রাজপ্রাসাদে গমন করেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্রও কেশীকে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত করান। তখন সকলে মিলিত হইয়া বিমাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে বিমাতাকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের পিতাকে পুনরায় রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করান। এখনও কাম্বোডিয়ায় এই যুদ্ধ যে পাহাড়ে হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে তাহাকে ভোর্‌বং-সৌরীভং পর্ব্বত বলা হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় কাম্বোডিয়ার এই গল্পটির সঙ্গে বাংলার প্রসিদ্ধ শীত-বসন্ত গল্পের একটি হুবহু মিল দেখিতে পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের *Folk Literature of Bengal* পুস্তকের ১৬৬ পৃষ্ঠায় এই গল্পটিতেও দেখিতে পাই যে শীত-বসন্তও সৎমা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হন। এখানেও দোরগের যুদ্ধ ও তাহাদের ঐ অনুরূপ কথোপকথন আছে। একটি হস্তী ঘুমন্ত শীতকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া গিয়া রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। একজন সদাগর বসন্তকে বন্দী করিয়া রাখে। কিন্তু সদাগরের যে বাণিজ্য-পোত জলে ভাসানো যাইতেছিল না উহা বসন্তের স্পর্শে সম্ভবপর হইল। বসন্ত রাজকুমারীকে বিবাহ করেন কিন্তু সদাগর দুষ্টবুদ্ধিবশতঃ সমুদ্রযাত্রার সময়ে কন্যাকে জলে ফেলিয়া দেন এবং এই গল্পের শেষও ঠিক ভোরবং ও সৌরীভং গল্পের অনুরূপ। দীনেশবাবুর মতে এই গল্পগুলি প্রাচীন বৌদ্ধগল্প এবং উহা পালরাজত্বের সময় হইতেই এদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে অষ্টম শতাব্দীর শেষ-ভাগ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলার সংস্কৃতি কাম্বোডিয়া দেশকেও বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং এই সময়েই বাংলার স্থাপত্যশিল্প কাম্বোডিয়ায় প্রবর্ত্তিত হয়। বিজনবাবুর উক্ত পুস্তকের ২৭৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ উল্লেখ আছে, "ফরাসী পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন যে যদিও ফু-নানের স্থাপত্য শিল্পের সহিত (বিশেষভাবে অলঙ্কার খুঁটিনাটিতে) পহ্লবদেশীয় স্থাপত্যশিল্পের সাদৃশ্য আছে কিন্তু দ্বিতীয় যয়বর্ম্মণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত স্থাপত্যশিল্পের সহিত দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই।"

গ্রস্‌লিয়ার (Groslier) লিখিয়াছেন, "সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর হাঞ্চির (Hanchi, কাম্বোডিয়া), ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরের সহিত বুদ্ধগয়ার মন্দিরের ঘনিষ্ঠতম প্রকৃতিগত সম্বন্ধ আছে। দ্বিতীয় যয়বর্ম্মণের সময়কার নির্ম্মিত হাঞ্চিমন্দিরের অভ্যন্তরভাগ দক্ষিণ-ভারতীয় প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং ইহা বুদ্ধগয়া মন্দিরের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র।"* গ্রস্‌লিয়ারের সম্পূর্ণ এই মত যে সপ্তম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত কাম্বোজের স্থাপত্যশিল্প মগধ-প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এমন কি যখন এই ইষ্টকনির্ম্মাণ-পদ্ধতি রুচিহীন হইয়া পড়ে তাহার পরেও বেয়নের মন্দিরগাত্র ফলকে ইহা উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে দক্ষিণ-ভারতের শৈব স্থাপত্য কাম্বোজে মগধ-স্থাপত্যের স্থান করিয়া দিতে বাধ্য হয়।

এখন আমরা সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ইৎ সিং কর্ত্তৃক বিবৃত নালন্দার অবস্থা সম্বন্ধে দেখিতে চেষ্টা করিব। ইৎ সিং লিখিয়াছেন যে নালন্দার মন্দিরসংলগ্ন দ্বার খুব উচ্চ ছিল এবং উহা নানারূপ সুন্দর মূর্ত্তিদ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। চতুষ্কোণাকৃতি মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বর্দ্ধিত ছাদমণ্ডিত দীর্ঘ মঞ্চ ও অন্তর্ভাগে প্রশস্ত স্থান ছিল। ভিতরে আটটি মন্দির ছিল। মানমন্দিরের জন্যও বেদী ছিল। মন্দিরগুলির একটির

* Recherches Surles Cambodgiens, pp. 359.

উপরে আর একটি এইরূপভাবে ত্রিতল ধাপে নির্ম্মিত হইত এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য ইহার মধ্যে ইষ্টক-নির্ম্মিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ থাকিত। ইটের এইরূপ গড়নের উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত হইত। সর্ব্বোচ্চে একটি মানুষাকৃতি মস্তক নির্ম্মিত হইত এবং একটি পুকুর মন্দির পার্শ্বে ছিল তাহাকে বলা হইত সপক্ষ ভুজঙ্গের (নাগ ?) পুকুর। এই বিবরণটির সহিত নাগপুকুর-সংযুক্ত হরিহরালয় এবং অমরেন্দ্রপুরের মন্দিরগুলির হুবহু সাদৃশ্য আছে। ইহা ছাড়া হুয়েন সাংও মগধের বৌদ্ধমঠ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (Watters : Translation, Vol. II. p. 105) যে, এখানে চতুঃপ্রাঙ্গণবিশিষ্ট ত্রিতল মহাযান বৌদ্ধ মঠ ছিল। মধ্যদ্বারস্থ পথের অগ্রভাগে তিনটি মন্দির ছিল এবং ইহাদের পাদদেশে দোকানপসার থাকিত এবং দেয়াল ও সোপানশ্রেণী উদ্গাত খোদিত মূর্ত্তি-দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। হুয়েন সাং নালন্দা সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন (হুয়েন সাংএর জীবনচরিত-লেখক Beal, p. 111) যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ সৌধগুলি একত্রিত ছিল এবং বহিঃপ্রাঙ্গণ চারিটি উন্নত ধাপে নির্ম্মিত ছিল। (পাহাড়পুরের সহিত এই মন্দিরগুলিরও একটি সাদৃশ্য আছে দেখিতে পাই)। কাম্বোজের স্থাপত্য সম্বন্ধেও অনেকের মত যে ইহার মূলভিত্তি ভারতে কোথাও পাওয়া যায় না, সুতরাং কাম্বোজের ইহা নিজস্ব স্থাপত্য-পদ্ধতি কিন্তু উক্ত সব বিবরণ ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবে। ইহাও সত্য যে উত্তর-ভারতীয় মন্দির বিশেষভাবে পালযুগের মন্দিরগুলি প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা আছে তাহা এক পাহাড়পুর মন্দির ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন মন্দির এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। [সম্প্রতি 'অমৃতবাজার পত্রিকা', বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারী ১৪,১৯৩৫, সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে যে দিনাজপুরের বৈগ্রামে শিবমণ্ডপ নামে একটি স্তূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ডক্টর বসাক এইখানে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে এই মন্দিরটি শিবানন্দ কর্ত্তৃক ৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে (গুপ্তকাল ১২৮) নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও ইহার খননকার্য্য আরম্ভ হয় নাই এবং আশা করি এই স্তূপটিতেও আমরা অনেক নূতন তথ্য পাইব।]

যশোবর্ম্মণের সহিত নূতন স্থাপত্য-পদ্ধতিই শুধু কাম্বোজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, ইহারই রাজত্বকালে কাম্বোজে স্থাপত্য শিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হয়। এই সব মন্দিরেও যে অক্ষরলিপি পাওয়া গিয়াছে সেই সম্বন্ধে বিজনবাবু তাহার উক্ত পুস্তকের ১০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "যশোবর্ম্মণের সঙ্গে যে অক্ষরমালা কাম্বোজে উপনীত হয় উহা উত্তর-ভারতীয় অক্ষর। * * * সাধারণতঃ এই অক্ষরগুলি দেবনাগরীর মত অত বিস্তৃত নয় কিন্তু বঙ্গাক্ষরের মত দীর্ঘ, খাড়া ও অসরল। জাভা এবং কাম্বোজের এই নূতন অক্ষরলিপিতে খাড়াটান প্রায় সর্ব্বদাই দক্ষিণ দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বঙ্গাক্ষর ব্যতীত ভারতের আর কোন বর্ণমালায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বার্গেলেরও মতে এই অক্ষরগুলির সহিত বঙ্গাক্ষরের সাদৃশ্য আছে এবং ইহাছাড়া আর একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে কাম্বোজের এ-কার স্বরবর্ণ বঙ্গাক্ষরের মত ব্যঞ্জনবর্ণের বাঁ দিকে বাঁকাইয়া লেখা আছে উহা নাগরীর মত ব্যঞ্জনবর্ণের মস্তকে লেখা নাই।"

এই বঙ্গ-প্রভাব কাম্বোজে কতদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত কথাটি হইতেই উপলব্ধি করিতে পারি। রেমুশিও (Ramusio) লিখিয়াছেন, "In the middle of the 16th century there was a great demand in Kambuja for Bengal Muslin." অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাম্বোজে বঙ্গের মস্‌লিনের ভীষণ চাহিদা ছিল।

৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "বল্লাল সেনের রাজত্বকালে বাংলার বৌদ্ধেরা ভীষণভাবে নির্য্যাতিত হয় এবং সেইজন্য তাহারা যে যাহার মত দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারাই নানাদিকে বৌদ্ধ মত প্রচার করিত এবং সুদূর পূর্ব্বখণ্ডেও দক্ষিণ-এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালাইত।"* পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাংলার বস্ত্র, চিনি প্রভৃতি বিদেশে চালান যাইত এবং এই সব দেশের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল উহা প্রাচীন বাংলার কবি কর্ত্তৃক লিখিত 'মনসার ভাসান,' 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' প্রভৃতি কাব্যেও উল্লেখ আছে দেখিতে পাই।

কাম্বোজের প্রায় এই সময়ের অধিকাংশ মন্দিরের স্থাপত্য অভিজ্ঞান বঙ্গদেশের স্থাপত্য এবং প্রসিদ্ধ আঙ্কোরভাট এই বঙ্গ স্থাপত্য হইতে প্রভাবান্বিত হইয়াছি

* Introduction to Modern Buddhism and its Followers in Orissa by N. N. Vasu.

বলিয়াই বোধ হয়। বিজনবাবু তাঁহার উক্ত পুস্তকের ১৪২ পৃষ্ঠায় আরও একটি নূতন কথা লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মরাক্ষসের মন্দির (কাম্বোজ) উল্লেখ বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। ব্রহ্মরাক্ষস দেবতা নয়, প্রবাদ অনুসারে একজন ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিলে তাহার সেই আত্মা ব্রহ্মরাক্ষসরূপ ধারণ করে। যতদূর জানা যায় সম্ভবতঃ ভারতের কোন মন্দির এই প্রেতাত্মার প্রতি উৎসর্গ করা হয় নাই কিন্তু ব্রহ্মরাক্ষস কেবলমাত্র বাংলার চলিত গল্পে একটি প্রধান ভূমিকা অধিকার করিয়া আছে।"

এই ভাবে আমরা আজ দেখিতে পাই দ্বীপময় ভারত ও ইন্দোচীন কিরূপভাবে বাংলার সংস্কৃতি দিয়া অনুপ্রাণিত হইয়াছে। অনেকের মতে এই সংস্কৃতি স্থলপথেও গিয়াছিল এবং ইহা আমরাও বিশ্বাস করি।

ডক্টর কুমারস্বামী তাঁহার *History of India and Indonesian Art* পুস্তকের ১৬৯ পৃষ্ঠায় ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, "সম্ভবতঃ মৌর্য্যযুগেই ভারতের সহিত জলপথে ও স্থলপথে ব্রহ্মদেশের যোগাযোগ স্থাপন হইয়াছিল এবং উক্ত পুস্তকের ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে তগঙ্ (Tagaung) ব্রহ্মদেশের শাসনকর্ত্তাদের সুপ্রাচীন নগর ছিল এবং ইহার ভারতীয় সংস্কৃতি দক্ষিণ হইতে আসে নাই, মণিপুর এবং আসামের মধ্য দিয়াই এখানে উপনীত হইয়াছিল।"

ফারগুসানও তাঁহার *History of Indian and Eastern Architecture* পুস্তকের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন, "ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের দক্ষিণ বঙ্গের স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে আর জানিবার উপায় নাই, এবং এই স্থাপত্য-পদ্ধতিই বহু পূর্ব্বেই পেগু ও প্রোমে উপনীত হইয়াছিল।"

প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পে ব্রহ্মদেশের মধ্যে পেগানের মন্দির-গুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সম্বন্ধে ফারগুসান উক্ত পুস্তকের ৩৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বঙ্গদেশের বুদ্ধগয়া মন্দিরের অনুকরণে ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নন্দাঙ্-মিয়া-মিন্ (Nandaung Mia Min) কর্ত্তৃক মহালদি (Mahalaudi) মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটি সমচতুর্ভুজাকার এবং ইহার দুই তিনটি শ্রেণীবদ্ধ কুলুঙ্গী-বিশিষ্ট একতলের ভিত্তি খুব উচ্চ। মধ্যে গোলাকৃতি বেদী বাদ রাখিয়া ইহা পিরামিডাকৃতি সমতলবিশিষ্ট মন্দির। এই মন্দিরটির সহিত বুদ্ধগয়া মন্দিরের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে।"

ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামীও তাঁহার *History of India and Indonesian Art* পুস্তকের ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "পেগান মন্দিরের স্ফীত ও সমগোলাকার গঠন আমাদের সারনাথ ও পাল-যুগের উৎসর্গীকৃত স্তূপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। নান্ পায়া (Nan paya) ফলকগুলি ও হ্লাং গ্যাং (Hlaung Gyaung) মন্দিরে উৎকীর্ণ দশ-অবতারের প্রস্তরমূর্ত্তি খাঁটি ভারতীয় এবং একাদশ শতাব্দীর ব্রোঞ্জ ও বিশেষতঃ প্রস্তর মূর্ত্তিগুলি বঙ্গ অথবা বিহার হইতে আমদানী হইয়াছিল।" আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সব মন্দিরগাত্রে যে ফ্রেস্কো চিত্রাঙ্কিত আছে উহার সহিত বাংলার ফ্রেস্কোর একটি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পেগানের পদ্মপাণি ও দেবতা ফ্রেস্কো চিত্র আলোচনা করিতে গিয়া কুমারস্বামী উক্ত পুস্তকের ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "এই ফ্রেস্কো চিত্রাঙ্কণ রীতির সহিত বাংলা ও নেপালের একই প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের রঞ্জিত পুঁথি (নেপাল ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দ), এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুঁথি (নেপাল ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দ) ১৪৬৪ এবং ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কেম্ব্রিজে রক্ষিত পুঁথি (বাংলা একাদশ শতাব্দীর বোষ্টনে রক্ষিত পুঁথি) প্রভৃতি বিচার করিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।" (মন্দিরগাত্রে এইরূপ ধরণে অঙ্কিত ফ্রেস্কো বীরভূমের বহু ভগ্ন মন্দিরে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়)।

কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক বিপ্লবে বাংলার এই বহিঃসংযোগ থামিয়া যাইতে থাকে এবং মুসলমানদের আক্রমণে ইহা সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়।

মহাকাল

শ্রীশান্তা দেবী

দর্পনারায়ণ চক্রবর্তীর দুই পুত্রবধূ, সুরেশ্বরী আর চন্দ্রজ্যোতি। খুব বড়ঘর হইতেই চক্রবর্তী-মহাশয় ছেলেদের বউ আনিয়াছিলেন, কিন্তু বধূমাতারা পিতৃগৃহ হইতে ধনরত্ন যতই আসুন না কেন, বড় মন আনিতে পারেন নাই। দুই জায়ে প্রকাশ্যে কলহবিবাদ বড় দেখা যাইত না বটে, কারণ সেটাতে লোকের কাছে খাটো হইতে হয়, শ্বশুরের কাছেও ধরা পড়িয়া যাইতে হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যা ভাব ছিল তাহাকে অহি-নকুলের সৌহার্দ্য বলিলেও চলে। সুরেশ্বরী আর চন্দ্রজ্যোতি শুধু যে দশ জনের ভয়েই প্রকাশ্য ঝগড়াটা যথাসাধ্য চাপিয়া যাইতেন তাহা নয়, পরস্পরকে তাঁহারা হিংসার সহিত কিছু পরিমাণ ভয়ও করিয়া চলিতেন।

শাশুড়ী বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁচিয়া থাকিতেই সুরেশ্বরীর বিবাহ হইয়াছিল, এবং তাহা শাশুড়ীর বিশেষ ইচ্ছাতেই হইয়াছিল। সুরেশ্বরী দেখিতে সুন্দরী ছিলেন না, রসনাও ছিল তাঁহার ক্ষুরধার। সেই জন্য অন্যান্য ভগিনীদের তুলনায় এবং সেকালের বাঙালীর ঘরের তুলনায় তাঁহার বিবাহ হইতে যথেষ্টই দেরি হইয়া গিয়াছিল। পনের বৎসরের মেয়ে অত বড় প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণের ঘরের বলিয়াই লোকে সহ্য করিত, অন্য ঘর হইলে এত দিনে সমাজে মহা প্রলয় বাধিয়া যাইত। যাহাই হউক, সুরেশ্বরীর মাতা আহার-নিদ্রা ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া পিতা শেষ চেষ্টা স্বরূপ দর্পনারায়ণের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়েই মানী লোক, কেহ কাহারও কথা সহজে ঠেলিতে পারিবেন না; কিন্তু তবু দর্পনারায়ণ বলিলেন, "বাঁড়ুজ্যেমশায়, আমার ঐ প্রথম সন্তান, বয়সও বেশী নয়, একটি ছোটখাট সুন্দরী মেয়ে দেখে দেবারই সকলের ইচ্ছা।"

সুরেশ্বরীর পিতা বলিলেন, "আমি কন্যার পিতা, তাই আজ আপনার দ্বারস্থ হয়েছি এবং আপনি আমাকে এত সহজে প্রত্যাখ্যান করতে পারছেন, নাহ'লে এমন লোক এ তল্লাটে কে আছে যে আমি একবার ডাক দিলে মুখ ফেরাতে সাহস করে? যাই হোক, রাণীজীর মতটা একবার নিন। তিনি যদি আমার মা সুরেশ্বরীকে গ্রহণ না করেন, আমি আর দ্বিতীয় কথা বলব না।"

দর্পনারায়ণ অন্দরে গিয়া গৃহিণীর কাছে কথা পাড়িলেন। আগে-ভাগে তাঁহাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিলেন, "দেখ, আমাদের অমন কন্দর্পের মত ছেলে, কিইবা তার বয়স, দেখে শুনে লক্ষ্মীঠাকরুণের মত বউ আমি তোমায় এনে দেব। এ বিয়ের কথা তুমি কানে তুলো না। মেয়ে শুনেছি, পাঁচ জনের সামনে বার করবার মতই নয়। নইলে কি আর ও টাকার কুমীরের মেয়ের বিয়ে হয় না?"

গৃহিণী বলিলেন, "কিন্তু অমন ঘর যে আর মাথা খুঁড়লেও পাব না। যেদিন থেকে ইন্দির আমার কোলে এসেছে, সেইদিন থেকেই আমার ঐ ঘরের উপর নজর। তা এমনই অদেষ্ট, যে, ছেলে আমার বিয়ের যুগ্যি হবার আগেই ওদের সব ক'টা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। গিন্নীর এই ত কোলের মেয়ে, আর ত হবে না। এঘরে বিয়ে দিতে হ'লে ঐ মেয়েকেই আমায় নিতে হবে, তা কালোই হোক্ আর কুচ্ছিতই হোক।"

দর্পনারায়ণ দর্পভরে মাথা ঝাড়া দিয়া বলিলেন, "গিন্নী, তুমি কি এমনই হা-ঘরের মেয়ে না বউ যে বড়ঘরের মেয়ের লোভে তোমার জিভে জল গড়াচ্ছে? পদ্মনারায়ণ চক্রবর্তীর ঘর স্পর্শমণি, যা ছোঁবে তাই সোনা হয়ে যাবে, ছোট বড় বিচার করা কি তোমার সাজে? যাদের সাত কুল ফোঁপরা, তারাই জাতে উঠবার জন্যে বড়ঘর খুঁজে বেড়ায়, তোমার কোন্ কুলে কি খুঁৎ আছে যে তুমি ঢাকা দেবার জন্যে সোনা-দানার ঘর দেখ্‌ছ? ছেলে ত তোমার শ্বশুরঘর করবে না, বউই করবে।"

গৃহিণী ফাঁদি নথ নাড়া দিয়া বলিলেন, "তা হোক, আমার

ছেলে যাকে তাকে শ্বশুর শাশুড়ী ব'লে ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে পায়ের ধুলো নিতে পারবে না।"

দর্পনারায়ণ এবার হাসিয়া উঠিলেন, "ওরে আমার নবাব-পুত্তুর রে!"

কালো মেয়েকেই বিষ্ণুপ্রিয়া বউ করিলেন; কিন্তু এবাড়িতে কালো বউ কখনও আসে নাই বলিয়া কর্ত্তার মনে দুঃখ থাকিয়া গেল। তিনি বলিয়া রাখিলেন, "বড় ছেলের বউ তুমি করলে তোমার মনের মত, ছোট ছেলের বউ আনবার ভার কিন্তু আমার। দেখো, শঙ্করের যে বউ আন্‌ব, তার রূপে আঁধার ঘরেও আলো জ্ব'লে উঠবে। তোমাকে হার আমি মানাব।"

একথা সুরেশ্বরীর কানে গিয়াছিল। একে শ্বশুর, তাহাতে আবার অতবড় প্রতাপ, কাজেই সুরেশ্বরী মুখের উপর কিছু বলিতে পারিলেন না; কিন্তু রাগে ও অপমানে তাঁহার বুকে যেন আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। বাপের বাড়িতে চিরকাল শুনিয়াছেন, রূপের অভাবে তাঁহার বিবাহের দেরি হইয়া গিয়াছিল; রূপবতী জ্যেষ্ঠা ভগিনীদের কাছে এ অপমান তবু না-হয় মাথা নীচু করিয়া সওয়া যায়, কারণ তাঁহারা ত সুরেশ্বরীর অপেক্ষা দরিদ্র পিতার কন্যা নন! কিন্তু তাই বলিয়া দর্পনারায়ণের কন্যাপুত্রের মুখেও কি ওই কথা শুনিতে হইবে? রূপ ত লক্ষ্ণৌয়ের বাইজীদেরও আছে, কিন্তু বংশ-মর্য্যাদা তাঁহার মত বাংলা দেশে কয় জন দেখাইতে পারে? ঘর ছোট হইলেই লোকে জাঁক দেখাইবার জন্য রূপ রূপ করিয়া মরে। রূপবতীর হাতের জল বেশী মিষ্ট, না চালচলন বেশী উঁচু? দেখা যাইবে শঙ্করের বউ আসিলে।

শঙ্করনারায়ণের বিবাহের সময়ও হইয়া আসিল। বৈঠকখানা-বাড়িতে দর্পনারায়ণের শয়নকক্ষে পাথরের কুঁজায় জল ও চন্দনের পাখা লইয়া পট্টবস্ত্রপরিহিতা গৃহিণী যখন প্রতি সন্ধ্যায় স্বামী-সম্ভাষণে যাইতেন, তখন দর্পনারায়ণ ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "এবার যা সুন্দরী বউ আনব গিন্নী, দেখে নিও, তোমার রূপের খ্যাতি একেবারে ঢাকা প'ড়ে যাবে। বড় ছেলের বউ এনে কান ভ'রে দু-বেলা নিজের রূপের ব্যাখ্যান শুনেছিলে, এবার সে সাধ তোমার আর পূরবে না।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিতেন, "তাই ক'রো গো, তাই ক'রো, বুড়ো বয়সে বউ-মেয়ের রূপের হিংসা না ক'রে আর আমার কোনও কাজ নেই কিনা, তাই আমার উপযুক্ত শাস্তি দিও।"

বিলাসপুরের জমিদারের বড় ছেলের মেয়ে, নাম চন্দ্রজ্যোতি, কাজেও তাই। মেয়ের রূপ নয় ত পূর্ণিমার আলো; লোকে বলিত, 'মেয়ের গায়ে সোনার গহনা দিলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বিধাতা যে স্বয়ং তাহাকে সোনা দিয়াই গড়িয়াছেন।' দর্পনারায়ণ লোকমুখে খবর পাইয়া বলিলেন, "এই মেয়ের সঙ্গেই শঙ্করের বিয়ে দেব।"

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "বেশ হবে, তোমার মনের মত হলেই আমি খুশী। একটু দূরদেশ বটে, কিন্তু ঘরেও ত বড় বৌমার চাইতে ছোট হবে না।"

বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক হইতে হইতেই কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া সিন্দূর ও রক্তচেলী পরিয়া তাঁহার সাধের সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। দর্পনারায়ণ আপনার দর্প-রক্ষা করিতে পারিলেন না, নূতন বউ আনিয়া গৃহিণীকে হার মানানো গেল না। শেষ বিদায়ের সময়ও মুখে মুখে এই কথাই চারিধারে রটিল, "এত বয়সেও এত রূপ এ-বংশে কোনও বউ-ঝির কখনও দেখা যায় নি। শ্মশানের আগুনও যেন ছুঁতে ভয় পাচ্ছিল।"

তার পর আসিল চন্দ্রজ্যোতি, তাহার রূপের কিরণে চতুর্দ্দিক্ হাসাইয়া। সুরেশ্বরীই তখন বাড়ির গৃহিণী, বধূবরণ করিবার সময় রূপার থালায় দুধআলতা গুলিয়া কনেকে দাঁড় করাইতে পা দুখানি যেন সত্য সত্যই রক্তপদ্মের মত ফুটিয়া উঠিল। সুরেশ্বরী ঈর্ষিত দৃষ্টিতে দেখিলেন, সত্যই এমন রাজরাজেন্দ্রাণীর মত রূপ মানুষের চোখে না লাগিয়া যায় না। সকলে চোখে আঁচল দিল, "আহা, এমন প্রতিমার মত বউ শাশুড়ী দেখলেন না।" সুরেশ্বরী মুখে কিছু বলিলেন না, মনে মনে বলিলেন, "পোড়া বিধাতা, মেয়েমানুষ ক'রে যদি পাঠালে ত ঐটুকু বাদ দিয়ে কেন পাঠালে?"

একেই ত তাহার রূপের অভাবটা বংশমর্য্যাদা অপেক্ষা বড় করিয়া দেখাতে শ্বশুরবাড়ির উপর সুরেশ্বরী প্রসন্ন ছিল না; তাহার উপর আবার এমন চোখ-ঝল্‌সানো রূপ দেখিয়া প্রথম দিন হইতেই সে চন্দ্রজ্যোতির উপর বিরূপ হইয়া বসিল।

মেয়েটা আর কোনও দিক্ দিয়া যদি তাহার চেয়ে নীচু হইত, তাহা হইলেও সুরেশ্বরী তাহাকে একটু দাক্ষিণ্যের সহিত দেখিতে পারিত। কিন্তু তাহাও যে কপালদোষে হইল না। পিতৃগৌরব, পতিগৌরব, আত্মগৌরব, কোনও দিক্ দিয়াই সে সুরেশ্বরীর ছোট নয়, বরং এই একটা সর্ব্বজন-ঈপ্সিত দিকে সে সুরেশ্বরীর চেয়ে অনেক ঊর্দ্ধে স্থান করিয়া লইল ঘরে পা দিবা মাত্র। সুরেশ্বরীর অজ্ঞাতেই তাহার মনটা বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল, কি করিয়া চন্দ্রজ্যোতিকে এই উচ্চাসন হইতে নামানো যায় সেই চেষ্টায়।

বধূবরণের পর ঘরে ঢুকিয়াই সুরেশ্বরী স্বামীকে বলিল, "রূপসী বউ ত এলেন, ঘরে ঢুক্‌বার আগেই শাশুড়ীকে খেয়েছেন, এবার আবার কার মাথা খাবেন কে জানে?"

ইন্দ্রনারায়ণ দুঃখিত হইয়া বলিল, "ছিঃ, ও ছেলেমানুষ নূতন বউ আজ ঘরে পা দিয়েছে মাত্র, অমন ক'রে ওর নামে বল্‌ছ কেন? আমাদের দুরদৃষ্ট, তাই মা আমাদের ঘর অন্ধকার ক'রে চ'লে গেলেন। ও বেচারী এ মুল্লুকে ছিল না, ওর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?"

সুরেশ্বরী জলিয়া উঠিয়া বলিল, "রূপ দেখেই গ'লে গেলে ত! পুরুষমানুষ হয়েছ আর তবে কি করতে? ঐ রূপের লাথি যখন ভাইয়ের পিঠে পড়বে দুম্ দুম্ ক'রে, তখন বুঝবে রূপসীর মহিম্ন!"

ইন্দ্রনারায়ণ বলিল, "তুমি রক্ষেকালী হয়েও ত আমার পিঠে দিবারাত্রি চন্দন বুলোচ্ছ না? ও যদি রূপসী হয়েও না বুলোয় তাতেই বা এমন ক্ষতি কি?"

সুরেশ্বরীর এত রাগ হইল, যে, মুখ দিয়া কথাই যেন বাহির হয় না। তবু সে বলিল, "আচ্ছা, এখনই দিন ফুরোয় নি, দেখা যাবে কে চন্দন বুলোয় আর কে বিছুটি বুলোয়।"

সুরেশ্বরীর স্বরূপ চিনিতে চন্দ্রজ্যোতির বেশী দিন লাগিল না। বয়স তাহার বেশী হয় নাই, কিন্তু বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণধার। বড় জা তাহার উপর প্রসন্ন ত নহেনই, প্রথম দিন হইতেই তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন বুঝিবামাত্র চন্দ্রজ্যোতিও রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিল। শ্বশুরের ভিটায় বড় বৌরাণীকে মুখের উপর অসম্মান সে করিবে না, কিন্তু তাই বলিয়া কাহারও জুতার সুখতলা হইয়া থাকিবার জন্য সে জন্মগ্রহণ করে নাই।

তিনমহলা প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রথম মহলে কাছারী, যত আমলা-গোমস্তার ভীড়, তার পর বকুল, কৃষ্ণচূড়া, শিরীষ ফুলের বড় বড় গাছের বাগান, তার পর বৈঠকখানাবাড়ি, তার পর আবার ফুলের বাগান, করবী, টগর, রঙ্গন, গন্ধরাজ, চাঁপা, কল্কে, জবা, শিউলি, হাজার ফুলের মেলা। সর্ব্বশেষ অন্দর-মহল, তাহারই দক্ষিণে এই ফুলের বাগান বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ হাতে করিয়াছিলেন। মালী তাঁহার ছিল বটে, কিন্তু তবু অষ্টপ্রহর রাণীমা এই বাগান লইয়াই কাটাইতেন। কোনও গাছের তলায় একটি পাতা পড়িয়া থাকিবার জো নাই, কোনও পথে ঝড়বৃষ্টির অত্যাচারে সুরকির রং একটু ময়লা হইবার জো নাই, গাছের ডালে মরা পাতা কি শুক্‌না কাঠি, ঝরা ফুল থাকা একেবারে নিষিদ্ধ। নন্দনকাননের মত তাঁহার ফুলবাগান সারাক্ষণ যেন আকাশ ও মাটি আলো করিয়া থাকে, এইদিকে বিষ্ণুপ্রিয়ার কড়া নজর ছিল। বাগান ছাড়িয়া যখন ঘরে আসিতেন, তখনও সর্ব্বদা দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া খুঁটিনাটি তদারক করিতেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মৃত্যুর পর দক্ষিণের ঘর ও বারান্দার সারি চাবি দেওয়াই থাকিত। ছেলেরা বলিত, "ওঘরে বাস করতে গেলে কোনও দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না; দেয়ালে মেঝেতে আসবাবে কড়িতে বরগায় মায়ের নিঃশ্বাস, মায়ের দৃষ্টি মাখানো রয়েছে, অথচ মা নেই; অমন ক'রে অনুক্ষণ মায়ের মৃত্যুকে জীবন্ত ক'রে রাখতে পারব না; একটু দূরে থেকে মরণকে ভুলতে দাও।"

কিন্তু চন্দ্রজ্যোতি আসার পর সুরেশ্বরী বলিল, "ছোট-বৌ ত শাশুড়ীকে দেখে নি, আমরা যদি দক্ষিণের ঘরগুলো অমন ক'রে ফেলে রাখি ত দু-দিন পরেই ওরা সব দখল ক'রে নেবে।"

কাজেই চন্দ্রজ্যোতি দ্বিরাগমনের পর আসিয়া দেখিল, সমস্ত দক্ষিণ-মহল বড় বৌরাণী অধিকার করিয়াছেন, একখানা ঘরও তাহার জন্য বাকী নাই। ওধারের ঘরে যে চাবি বন্ধ থাকিত এবং তাহা যে শাশুড়ীর ঘর তাহা চন্দ্রজ্যোতি বিবাহের সময়ই দাসীর মুখে শুনিয়া গিয়াছিল। উত্তরের ঘরগুলির কোলেও প্রকাণ্ড দালান, মাঝখানে চকমিলানো উঠান, আলে

গাওয়া যে আসে না তাহা নয়, বড় বৌরাণী সমস্ত দক্ষিণ বেদখল না করিলে চন্দ্রজ্যোতি হয়ত এখানে থাকিতে কিছুই আপত্তি করিত না। কিন্তু বড়র কাছে হার মানিবে না বলিয়াই সে দুই দিন বাদেই বাজুবন্ধ দোলাইয়া বলিল, "এ চোর-কুঠরীর মত অন্ধকার সব ঘরে আকাশের আলো গাছের পাতা কিছু দেখা যায় না, আমার এমন ঘরে থাকা অভ্যাস নেই, মাথা ধ'রে ম'রে যাচ্ছি। তুমি এর একটা যা হয় ব্যবস্থা কর।"

শঙ্করনারায়ণ রূপবতী পত্নীর অনুগত স্বামী, অত্যন্ত বিড়ম্বিত মুখ করিয়া বলিল, "কি ব্যবস্থা করব, বৌদিদির সঙ্গে লাঠালাঠি করব?"

ছোট বৌরাণী বলিলেন, "লাঠালাঠি কেন করবে? তুমিও ত রাজার ছেলে, বাগানের মধ্যে আমার জন্যে দুখানা ঘর তুলে দিতে পার না?"

শঙ্কর কি আর করে? পিতার কাছে দূত পাঠাইল, উত্তরের ঘরে বধূর স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে, বাগানে ঘর তুলিতে হইবে। দর্পনারায়ণ বাগানে ঘর তুলিতে খুব যে উৎসাহী ছিলেন তা নয়, কিন্তু এ বউকে তিনি অনেক খুঁজিয়া সাধ করিয়া ঘরে আনিয়াছেন, তাহার প্রথম অনুরোধই উপেক্ষা করিতে পারেন না। অগত্যা ঘর উঠিতে লাগিল। সুরেশ্বরীকে কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। অকস্মাৎ একদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাগানের মাঝখানে চূণ সুরকির পাহাড় দেখিয়া তিনি কালনাগিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন; তখনই ছোট দেওয়ানকে তলব হইল, "কার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে বলা নেই, কওয়া নেই, রাণীমার বাগানের মাঝখানে ঘর তুলতে বসেছে? এখনই সমস্ত জিনিষ এখান থেকে সরাবার হুকুম হোক।"

ছোট দেওয়ান তটস্থ হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, রাজা বাহাদুর স্বয়ং হুকুম দিয়েছেন, ছোট বৌরাণীর জন্য বাগানে ঘর তুলে দিতে। আমার সাধ্য কি যে আমি জিনিষ সরাই।"

সুরেশ্বরী মনে মনে বলিলেন, "বুঝেছি, ঘরের শত্রু বিভীষণ ঘরে পা দিয়েই ঘর ভাঙাতে সুরু করেছেন।" দেওয়ানকে কিছুই বলা হইল না, রাগিয়া ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মত তিনি নিজের গায়েই নিজে ছোবল মারিতে লাগিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ কলিকাতা হইতে ছোট বৌরাণীর মত রতন-চূড় গড়াইয়া গৃহিণীকে উপহার দিতে আনিয়াছিলেন; গৃহিণী হাতে করিয়াই সরোষে পাথরের মেঝেতে গহনা আছড়াইয়া দিলেন, শুভ্র মসৃণ শ্বেতপাথরের উপর মণিমুক্তা গড়াইয়া ঘরের দিকে দিকে চলিয়া গেল। সুরেশ্বরী বলিলেন, "বাগানের মাঝখানে ইমারৎ তুলে যে ছোট মহারাণী সমস্ত বাড়িখানা কানা ক'রে দিলেন তা তোমাদের চোখে পড়ল না, এখন গয়না গড়াবে মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে।"

ইন্দ্রনারায়ণ খানিকটা ক্রুদ্ধ ও খানিকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "গয়নার কথাই বড় মহারাণী বলেছিলেন, ইমারৎ ভাঙবার হুকুম ত হয় নি।"

দর্পনারায়ণের হুকুম—বাড়ি যেমনকে তেমনই বাড়িতে লাগিল, সুরেশ্বরীর কিছু বলিবার মুখ নাই। কাহার উপর তিনি শোধ তুলিবেন? রাগে অভিমানে স্বামীর সঙ্গেই দুই-তিন দিন মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গেল।

সুরেশ্বরী দিন গুণিতে লাগিলেন, ইহার শোধ তিনি একদিন লইবেনই। সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইলে মিলিতে বেশী দেরি হয় না। চন্দ্রজ্যোতির কোলে ছেলে হইতেই নূতন এক সমস্যা উঠিল। পাড়াগাঁয়ের ঝি-চাকর ছেলে মানুষ করিতে জানে না, বাড়িতে শাশুড়ী-ননদও নাই যে একটু সাহায্য করে। চন্দ্রজ্যোতির নাওয়া-খাওয়া ঘুচিয়া গেল, ছেলের যত্ন করিতে গিয়া। শঙ্কর বিরক্ত হইয়া কলিকাতা হইতে সুশিক্ষিতা নার্স লইয়া আসিল, মাসে চল্লিশ টাকা বেতন দিয়া। অন্দরের লোকজনের মাহিনা দিবার ভার বড় বৌরাণীর। মাহিনা দিবার দিনে দেখা গেল, খোকার নার্সের নামে বেতন আসিয়াছে দশ টাকা। সে ত চটিয়া একেবারে শঙ্করনারায়ণের সম্মুখেই গিয়া হাজির। শঙ্কর তখন আবলুস কাঠের খাটে বসিয়া চন্দ্রজ্যোতির সহিত তাস খেলিতেছেন। স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত আলাপের মাঝখানে ছেলের ধাত্রীকে দেখিয়া দু-জনেই ভ্রূভঙ্গী করিয়া উঠিলেন। সে তাহাতে গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, "আপনারা কি মনিব হয়ে আমার সঙ্গে তামাসা করছেন? চল্লিশ টাকা মাহিনায় আমার কাজ ঠিক হ'ল, আর আজ মাস-কাবারে মাহিনা পেলেম দশ টাকা?"

চন্দ্রজ্যোতি ফোঁস করিয়া উঠিল, "কি, যত বড় মুখ নয়

তত বড় কথা? তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ জান?"

ধাত্রী বলিল, "আমি তা জানতে চাই না। আমি কলকাতার নার্স, খাটব খুটব টাকা রোজগার করব। আপনারা আমার পাওনা টাকা দিয়ে দিন, আমি আজই চ'লে যাচ্ছি।"

চন্দ্রজ্যোতি তাহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করে আর কি? শঙ্কর উঠিয়া বলিল, "দাঁড়াও, আগে ব্যাপার কি হয়েছে দেখতে দাও, তার পর যা করবার ক'রো।"

খাজাঞ্চিখানায় খবর গেল, কেন এমন গোলমাল? খাজাঞ্চি বলিল, "বড় বৌরাণী প্রতিমাসেই সকলের বেতন লিখিয়া পাঠান, এবারেও তিনিই লিখিয়া দিয়াছিলেন—দশ টাকা। আমরা বলাতে তিনি বললেন, ছেলের ঝিয়ের মাইনে এযাবৎ কখনও খাস থেকে দশ টাকার বেশী দেওয়া হয় নি, আজ হঠাৎ হবে কেন? তোমরা ঐ টাকা পাঠিয়ে দাও, যে বেশী চায় সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।"

শুনিয়া চন্দ্রজ্যোতি বলিলেন, "এমনি ক'রে আমাকে আমলা-গোমস্তার সভায় অপমান করা? আমি যে ওকে চল্লিশ টাকা মাইনে ব'লে রেখেছি তা বড় বৌরাণী বেশ জানেন, কেবল তাঁর পায়ে ধ'রে অনুমতি নিয়ে আসি নি, এই আমার অপরাধ।"

খাজাঞ্চিদের গোলমাল এবং ধাত্রীর ঔদ্ধত্যের দোহাই দিয়া দুই পক্ষকেই অকারণ যথেষ্ট বকুনি দিয়া ধাত্রীকে বিদায় দেওয়া হইল, কারণ তাহাকে রাখিতে গেলে প্রকাশ্যে সুরেশ্বরীকে সমস্ত গোলযোগের জন্য দায়ী করিতে হয়। নিরপরাধ খাজাঞ্চি ইতিমধ্যেই এবাড়ির হালচাল বুঝিয়া গিয়াছিল। সে বুঝিল, ইহা ঝিকে মারিয়া বৌকে শিক্ষা দেওয়া মাত্র; সুতরাং বড় বৌরাণীর পরামর্শ না লইয়াও অতঃপর সে ছোট তরফের সমস্ত দেনা-পাওনা চন্দ্রজ্যোতিকে দিয়াই লিখাইয়া লইয়া যাইত। কিন্তু নিরপরাধিনী নার্স বেচারী আপনার দোষ কোথায় না দেখিতে পাইয়া সারা কলিকাতায় জমিদার-বাড়ির ন্যায়বিচারের কাহিনী জয়ঢাক পিটাইয়া প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দুই পক্ষে মন-কষাকষি চলিতে লাগিল, পরস্পরের ত্রুটি আবিষ্কারের জন্য পরস্পর সহস্র চক্ষু মেলিয়া চারি দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে এখনও চন্দ্রজ্যোতি বিকালবেলা গা ধুইয়া ছোপানো কাপড় পরিয়া পানের বাটা হাতে সুরেশ্বরীর বারান্দায় সাতরাজ্যের গল্প ফাঁদিতে ও পান বিনিময় করিতে যান; সুরেশ্বরীও সকাল হইলেই পূজাপাট সারিয়া ছোট জা'র খোকাকে কোলে লইয়া আদর করিয়া আসেন।

কিন্তু যেদিন ভিতরের আগুন অকস্মাৎ ঠিকরাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল, সেদিন একেবারে দাবানল ঘটিয়া গেল।

সন্তানাদি হইবার পর রাজবাড়ির বউরা সকলেই মন্ত্র লইয়া থাকেন, এ বাড়ির এই রীতি। চন্দ্রজ্যোতির ছেলে বছর দুই-তিনের হইলে তিনি শিবমন্ত্র লইলেন এবং বলিলেন, "শুধু মন্ত্র নিয়ে আমার মন ওঠে না, মন্ত্রই যখন আমি নিলাম তখন আমার নামে আমি মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে চাই। চিরকাল যেন মানুষ আমার নাম করে, এমন কিছু ক'রে যাবার আমার বড় সাধ হয়।"

স্বামী শঙ্কর বলিলেন, "মন্দির প্রতিষ্ঠা না করলেই কি আর তোমার নাম থাকবে না। তুমি বড়রাণী সুরেশ্বরীর ছোট জা, এইতেই দেখো তোমার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

চন্দ্রজ্যোতি বলিল, "থাক্, আর বেশী রসিকতায় কাজ নেই। অমন নাম হওয়ায় আমি খ্যাংরা মারি। তোমায় আমার মন্দির ক'রে দিতেই হবে। রূপাই নদীর ধারে ভাঙা মন্দিরে যে মহাকালের মূর্ত্তি শ্যাওলা ধ'রে প'ড়ে রয়েছেন, সেই মূর্ত্তি আমি আমার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে যাব, তুমি আগে তাঁকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা কর।"

শঙ্কর আয়োজন আরম্ভ করিলেন। জোয়ান জোয়ান লাঠিয়ালদের ডাকিয়া বলিলেন, "বাঁকে ক'রে তোরা মহাকালকে তুলে নিয়ে আয়। আমি আমাদের পুকুর-পাড়ে কুলুঙ্গি বাঁধিয়ে তাঁকে নামাব, তার পর ঘটা ক'রে প্রতিষ্ঠা হবে।"

চন্দ্রজ্যোতি বলিল, "কিন্তু সাবধান, বড়রাণী যদি জানতে পারেন যে তাঁকে ডিঙিয়ে আমি শিব প্রতিষ্ঠা করছি, তাহলে ছিষ্টি উল্টে দেবেন।"

শঙ্করনারায়ণের প্রিয় লাঠিয়াল গোপীনাথ বুক ঠুকিয়া
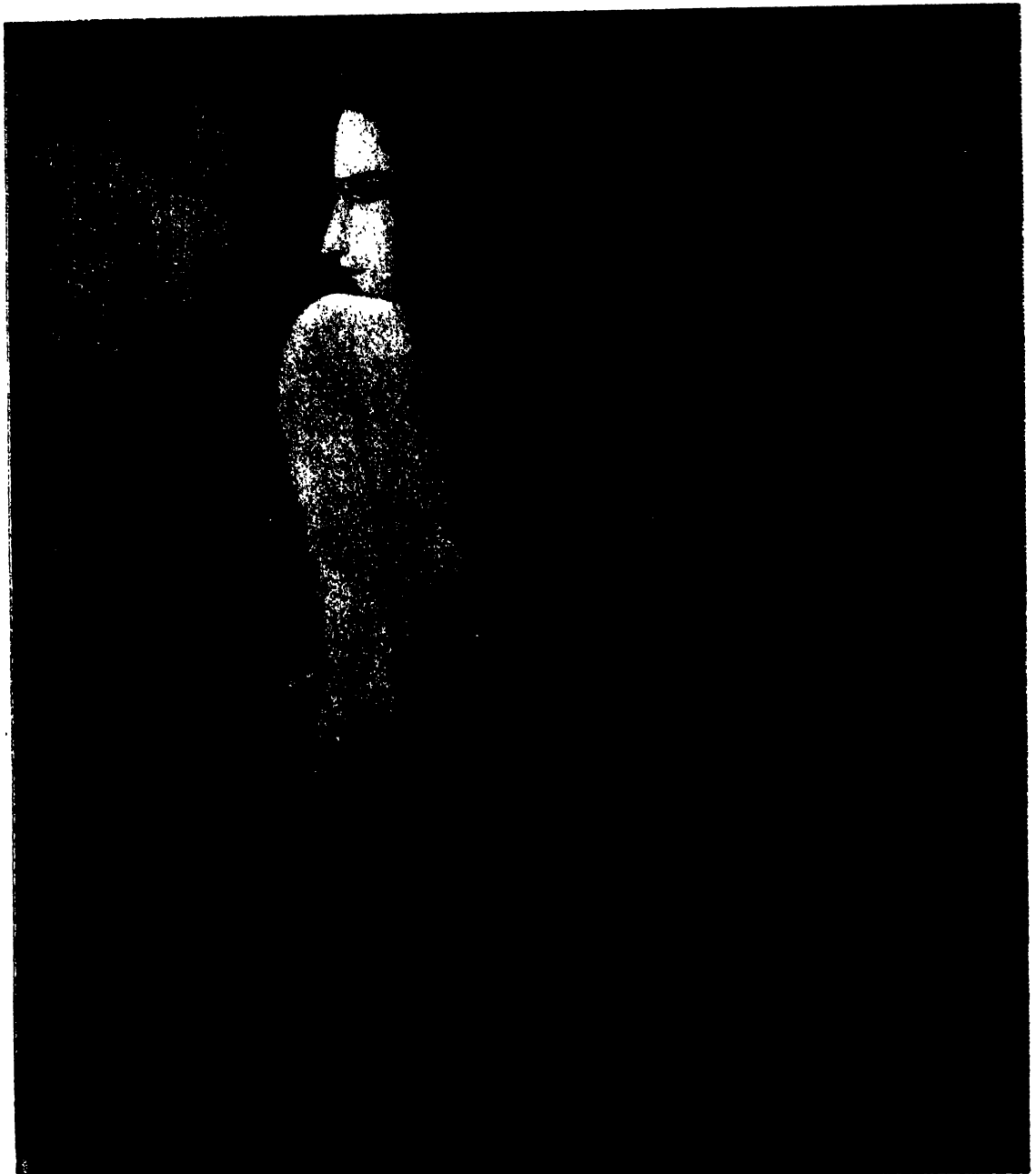
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

'রয়েছে দীপ না আছে শিখা'

শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

বলিল, "আজ্ঞে, যা হবার আমার বুকের উপর দিয়ে হবে, বৌরাণীমা ভয় পাবেন না, আপনার ঠাকুর আমি ঠিক এনে দেব।"

চন্দ্রজ্যোতি বলিলেন, "আচ্ছা, আনিস্ আনিস্, রেতে-ভিতেই আনিস্, যাতে মিথ্যে হাঙ্গাম একগাদা না হয়। চুপেচাপে ঠাকুর বসিয়ে দিলে ভোরে উঠেই আমি ফুল-বিল্বিপত্তর দিয়ে পুরুত ডেকে তখনকার মত লোক-জানাজানি ক'রে দেব।"

চুপি চুপি পরামর্শ হইল, কিন্তু পুকুর-পাড়ে কুলুঙ্গি গড়িতে দেখিয়াই সুরেশ্বরীর কৌতূহল উগ্র হইয়া উঠিল, "এই আবার ছোট গিন্নির কি কুবুদ্ধি মাথায় খেলতে লেগেছে। দিনে রেতে ঘুম নেই, কি ক'রে আমাকে লোকের কাছে ছোট করবে কেবল সেই ভাবনা।"

এদিক্ ওদিক্ চরদূত পাঠাইয়া তিনি আসল খবর বাহির করিয়া লইলেন। নিজে গিয়া চন্দ্রজ্যোতিকে বলিলে হয়ত সে কথা শুনিবে না, শুধু শুধু তাহার কাছে ছোট হইতে হইবে। তাহার চেয়ে ভালমানুষ সাজিয়া শ্বশুরকে গিয়া ধরিলে হয়। সুরেশ্বরী দর্পনারায়ণকে গিয়া বলিল, "রূপাই নদীর তীরের মহাকালকে মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে রাখি, আমাদের বড় সাধ। আমাদের দুই জায়ের নামে মন্দির করলে কেমন হয়, আপনি একবার ওদের ব'লে দেখুন না।"

দর্পনারায়ণ ভাবিলেন, অবসর-মত কাজ হইলেই চলিবে। তবু চন্দ্রজ্যোতিকে একবার ডাকিয়া পাঠাইলেন, কথাটা পাড়িবেন বলিয়া। চন্দ্রজ্যোতির টনক নড়িয়া উঠিল, বুঝিলেন কি উদ্দেশ্যে তলব, বলিলেন, "আজ আমার শরীর বড় কাহিল, কাল আমি নিশ্চয় দেখা করিব।"

শঙ্কর তখনই গোপীনাথকে হুকুম করিল, আর দেরি নয়, আজ রাত্রেই ঠাকুর আনিয়া ফেলা চাই। রাত্রে ডুলি লইয়া গোপীর দল চলিল নদীর ধারে জঙ্গলে। পল্লীগ্রামের পথ, প্রথম রাত্রেই প্রায় জনহীন, তার উপর নদীর ধীরে মনুষ্য-বসতিহীন বনভূমিতে। গোপীনাথের বুকটা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। দূরে সেট্‌ল্‌মেণ্টের তাঁবু পড়িয়াছিল, সাহেবের কুকুরগুলা গোপীর ডুলি দেখিয়া অন্ধকারে ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আসিল। তাঁবু হইতে আমিনরা বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রে বনের ধারে ডুলি নিয়ে কোথা যাও?"

গোপী ভয়ে ভয়ে বলিল, "জমিদারের কাজে যাচ্ছি।"

আমিনরা ঠাট্টা করিয়া বলিল, "চুরিচামারি নয়ত!"

গোপী সাহস করিয়া বলিল, "চুরি করতে কি আপনাদের চোখের সামনে দিয়ে যাব?"

তখনকার মত ব্যাপার চুকিয়া গেল। গোপারা যখন ঠাকুর লইয়া ফিরিল তখন রাত্রি গভীর, সেট্‌ল্‌মেণ্টের তাঁবু, বড়রাণীর মহল, সব ঘুমে নিস্তব্ধ। শুধু শঙ্কর ও চন্দ্রজ্যোতি জাগিয়া। গোপীদের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সেই রাত্রে গিয়া কুলুঙ্গি হইতে একটু দূরে একটা গর্ত্তে অন্য কয়েকখানা পাথরের সঙ্গে মিশাইয়া পাথরের মহাকালকে রাখিয়া আসিল। কাল ভোরে গোপীই পুরোহিতকে ডাকিয়া আনিয়া কুলুঙ্গির ভিতর যথাস্থানে ঠাকুর রাখিবে ও চন্দ্রজ্যোতি আসিয়া প্রথম পূজা দিবে।

সারারাত চন্দ্রজ্যোতির ভয়ে ঘুম হয় নাই। কি জানি যদি সুরেশ্বরী তাহার ঠাকুর লুকাইয়া ফেলে। তাহা হইলে তাহার এত চেষ্টা সব বৃথা যাইবে। ভয়ে ভাবনায় রাত্রি জাগিয়া ভোরের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অল্প একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সূর্য্যের আলো ঘরে আসিয়া পড়িতেই শঙ্কর তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল, "ওঠ ওঠ, আজ বেলা ক'রে উঠে সব কাজ পণ্ড ক'রে দিও না।"

চন্দ্রজ্যোতি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সারা আকাশ রৌদ্রে ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি কোনও রকমে স্নান সারিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া সে পুকুরপাড়ে চলিল, ঠাকুরকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে। ইহারই মধ্যে সেখানে গোপীনাথ ও পুরোহিত-ঠাকুর সদলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন দৃষ্টি দেখিয়াই চন্দ্রজ্যোতি বুঝিতে পারিল, যে, কিছু একটা অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। চন্দ্রজ্যোতি ব্যগ্র হইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে গোপী, তোমরা অমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন?"

গোপী জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ্ঞে, ঠাকুর কোথায় লুকালেন, তাঁকে ত দেখতে পাচ্ছি না। সব জায়গায় দেখলাম, কোথাও নাই, এ তাঁর লীলাখেলা, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।"

চন্দ্রজ্যোতি দপ করিয়া আগুনের মত জলিয়া উঠিল,

"ঠাকুরের লীলাখেলা নয়, এ বড়বৌরাণীর ভেল্কিবাজি! হাড় ছোটলোকেরা ওৎ পেতে সব বসেছিল, কাকপক্ষী ওঠবার আগে ঠাকুরটি চুরি করেছে। ঠাকুর যদি আমি না বার করাই ত আমার নাম নেই।"

চন্দ্রজ্যোতি রূপার বাসনে সাজানো পূজার আয়োজন সব ধূলায় ফেলিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া চলিল। ঘেরাটোপ দেওয়া প্রকাণ্ড চতুর্দ্দোলা লইয়া বেহারারা হন্ হন্ করিয়া ছুটিল। সদ্যজাগ্রত গ্রামবাসীরা ভীত বিস্মিত দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। পুরোহিত মাথায় হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল।

সুরেশ্বরী সবে ঘর হইতে বাহির হইয়াছেন, ইন্দ্রনারায়ণ তখনও শয্যার আলস্য কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। চন্দ্রজ্যোতি আসিয়া ঘরের দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার ঘোমটা পর্য্যন্ত খসিয়া পড়িয়াছে। সুরেশ্বরী তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া বলিলেন, "ও কি, ছোট বৌ! ঘরে ভাসুর রয়েছেন, তুমি দোর আগলে এসে দাঁড়ালে যে।"

চন্দ্রজ্যোতি রণরঙ্গিণীর মত ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল, "শ্বশুর-ভাসুর কিছু আমি শুনতে চাই না, তুমি আমার ঠাকুর বার কর আগে।"

সুরেশ্বরীও ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, "কিসের ঠাকুর, কার ঠাকুর তার ঠিক নেই, সক্কালবেলা উঠে তুমি আমাকে চোর ধরতে এলে যে, আক্কেলের মাথা কি একেবারে খেয়ে হজম করেছ?"

চন্দ্রজ্যোতি বলিল, "আক্কেলের মাথা কে খেয়েছে, তা তুমি জান আর তোমার ইষ্টদেবতা জানে! ঠাকুর চুরি ক'রে মিথ্যে কথা বলছ, তোমার প্রাণে কি ভয়ডর কিছু নেই?"

সুরেশ্বরী আর এক পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "ভয়ডর কি দেখাচ্ছ ছোটবৌ? তুমি বড়মানুষের সুন্দরী মেয়ে ব'লে কি ঠাকুরও তোমার হাতে ধরা? তুমি শাপমন্যি দিতে চাও দাও, আমরাও দিতে জানি।"

ঘরের ভিতর হইতে ইন্দ্রনারায়ণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "শঙ্কর, তোমার স্ত্রীকে এখানে মেছো হাটা বসাতে বারণ কর; এখানে বিলাসপুরের চালচলন না দেখিয়ে হরিহরপুরের মানসম্ভ্রম বজায় রেখে চলতে হবে, সেটা যেন মনে থাকে।"

চন্দ্রজ্যোতি ভাসুরের মুখের উপর উত্তর দিল না। কিন্তু ঘরে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, "কি! আমার ঠাকুর চুরি ক'রে আমাকেই বাপ-পিতামহ তুলে গাল দেওয়া? এ বাড়িতে আর আমি এক মুহূর্ত্ত থাকব না। নিয়ে এস আমার পাল্কী, আমি এই এক কাপড়ে চললাম এখান থেকে।"

অপমানপীড়িতা চন্দ্রজ্যোতি সত্যসত্যই পাল্কী ডাকাইয়া পাঠাইল। সমস্ত বাড়ি যেন হঠাৎ শ্মশানপুরীর মত নিস্তব্ধ হইয়া গেল। হরিহরপুরের ছোটবৌরাণী কাহাকেও না বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, ইহাতে 'না' বলে এমনও কাহারও সাহস নাই, 'হাঁ' বলে এমনও কেহ নাই। পাল্কী-বেহারারা কাহার অনুমতিতে যাইবে? ফিরিয়া আসিলে দর্পনারায়ণ কি তাহাদের ঘাড়ে মাথা রাখিবেন? তাহারা ঘর হইতে বাহির হইতে চায় না। বৌরাণীর জন্য তাহারা প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু ঐ কাজটি পারিবে না।

ইন্দ্রনারায়ণ পর্য্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন, কি জানি যদিই স্ত্রী না বলিয়া ঠাকুর সরাইয়া থাকে, শেষে পিতার কাছে সব জানাজানি হইলে তাহার অপমানের শেষ থাকিবে না। শঙ্কর, চন্দ্রজ্যোতি, সুরেশ্বরী, সকলেই যখন আপন আপন খোট ধরিয়া নীরবে বসিয়া আছেন, তখন ইন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "বৌমাকে বল, আমি ঠাকুরের খোঁজ করাচ্ছি। এসব কথা যেন বাবার কানে না ওঠে।"

চন্দ্রজ্যোতি কথার উত্তর দিল না, ইন্দ্রনারায়ণ দিকে দিকে পাইক বরকন্দাজ ছুটাইলেন, ঠাকুর উদ্ধার করিয়া আনিতে। কিন্তু কোথাও ঠাকুর মিলিল না।

দিনের বেলায় চন্দ্রজ্যোতি কাহারও কথার কোনও উত্তর দিল না, কেহ তাহাকে আর ঘাঁটাইতেও সাহস করিল না। সন্ধ্যায় সে আপনার দাসীকে বলিল, "তুই আমার সঙ্গে হেঁটে ষ্টেশনে যেতে পারবি ত চল্, আমি একাই বাপের বাড়ি চ'লে যাব।"

দাসী একহাত জিভ কাটিয়া বলিল, "বল কি বৌরাণী! তুমি রাজবাড়ির ছোট-বৌ, পথে পা দেবে? ইষ্টেশনে ট্রেন থেকে মাটিতে পা দাও না, চতুর্দ্দোলা উঁচু ক'রে ধরলে তবে

নাম, আর আজ তুমি পথে হেঁটে যাবে ? আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা মা ?"

চন্দ্রজ্যোতি বলিল, "তোর ভয় কি লক্ষ্মীছাড়ী ? তুই ত যাবি আমার সঙ্গে। আর পথে আমি বেরোই না সে ত ভালই, পথের লোক আমাকে চিন্‌বে না। যাবি ত চল্, নইলে আমি অন্য উপায় দেখব। নেহাৎ পথ চিনি না, তাই তোকে সাধছি।"

দাসী কাঁদিতে লাগিল। "এ জন্মে যে আর এমুখো হ'তে পারব না মা। এখনই ত দিন ফুরোয় নি।"

চন্দ্রজ্যোতি গলার হারটা খুলিয়া তাহার কোলে ফেলিয়া দিল, "এই নে, বিলাসপুরে গিয়ে আমি নিজেই তোকে বেচে দেব এখন, অনেক কাল আর ভাত-কাপড়ের ভাবনা ভাবতে হবে না।"

দাসী তবু কাঁদিয়া কাঁদিয়াই বলিল, "বল্‌তে নেই মা, কিন্তু এমন ক'রে যে বাড়ি ছেড়ে যেতে চাইছ, যদি শ্বশুর তোমায় আর না নেয় ?"

দর্পিতা চন্দ্রজ্যোতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "না নেয় না নেবে। তোকে ত আর খাওয়া-পরার জন্য দায়ী করব না ? আমার ভাবনা আমি ভাবতে জানি, তোর তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।"

অন্ধকারে কালো কাপড় পরিয়া এক গলা ঘোমটা দিয়া চন্দ্রজ্যোতি সাহস করিয়া দাসীর সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। ছেলেটাকে কি করিয়া ফেলিয়া যায় ? তাহাকেও দাসীর কোলে চড়াইয়া লইল।

শঙ্করের জানিতে দেরি হইল না। যখনই ঘরে আসিয়া চন্দ্রজ্যোতিকে দেখিতে পাইল না, তখনই তাহার সন্দেহ হইল, নিশ্চয় সে বিলাসপুর চলিয়া গিয়াছে। এঘর ওঘর সাত ঘর খুঁজিল কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, পাছে লোক-জানাজানি হইয়া যায়। শেষে নিজেই ঘোড়া ছুটাইয়া বিদ্যুৎবেগে ষ্টেশনের দিকে দৌড়াইল, যদি সেখানে চন্দ্রজ্যোতিকে ধরিয়া ফেলিতে পারে। ষ্টেশনে তখন ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছে। প্ল্যাটফর্মে জনপ্রাণী নাই। শঙ্কর ষ্টেশন-ঘরে উঁকি মারিতেই যাহারা ছিল, শশব্যস্তে বাহির হইয়া আসিল, "কি চাই কুমার বাহাদুরের ?"

শঙ্করের মুখে কথা বাধিয়া গেল, সে বলিতে পারিল না, "আমার স্ত্রীকে দেখেছ ?" বলিল, "কিছু না, এদিকে ঘোড়া চ'ড়ে এসেছিলাম, তোমাদের দেখে গেলাম।"

তাহারা কৃতার্থের হাসি হাসিয়া বলিল, "রাজা বাহাদুরের রাজ্যে আমাদের আর দুঃখ কি ?"

শঙ্কর বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না। অন্ধকার রাত্রেই ধীরে ধীরে ঘোড়া চালাইতে লাগিল। মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া তাহার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিতেছিল। ভাবিল, এখন যদি বাড়ি ফিরিয়া যাই, সব কথা বাহির হইয়া পড়িবে, হয়ত চন্দ্রজ্যোতিকে আর দর্পনারায়ণ ঘরে লইবেন না। তার চেয়ে আমি যদি না ফিরি, লোকে জানিবে আমারই সঙ্গে সে গিয়াছে, বাবা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবার ভয় দেখাইলেও বউকে ছাড়িতে হইবে না। কিন্তু রাত্রে ষ্টেশনে থাকিলে লোকে যে নানা প্রশ্ন করিবে ?

শঙ্কর মাঠের ভিতর দিয়া অনেক মাইল চলিয়া যখন পরের ষ্টেশনে আসিল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাবলা কাঁটা, চোরকাঁটায় ঘোড়ার পা ক্ষত-বিক্ষত, শঙ্করের কাপড়ও ছিন্ন ভিন্ন। ভোরের ট্রেন যাইতে আর এক ঘণ্টা দেরি আছে। শঙ্কর ঘোড়াটাকে মাঠের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া ট্রেনের আশায় দূরে দূরে ঘুরিতে লাগিল। ঠিক সময়ে টিকিট কাটিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, লোকে বিস্মিত হইয়া তাকাইলেও তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিল না।

অকস্মাৎ চন্দ্রজ্যোতিকে এমন ভাবে ছেলে কোলে করিয়া দাসীর সহিত আসিতে দেখিয়া তাহার পিতামাতা আকাশ হইতে পড়িলেন। শত প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু বলিল, "আমি আর সে বাড়ি যাব না।"

মা বলিলেন, "ঝি পোড়ারমুখীকে এখুনি হেঁটেকাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেল্‌ব, কোন্ আক্কেলে তুই রাজার বাড়ির বউকে পথে বার ক'রে নিয়ে এলি ?"

চন্দ্রজ্যোতি বলিল, "ওকে যদি কিছু বল ত তোমার সামনে গলায় দড়ি দিয়ে মরব। ও ছিল তাই মেয়ে পেয়েছ, না হ'লে আমার মুখ আর এজন্মে দেখতে হ'ত না।"

বাবা বলিলেন, "তেতে-পুড়ে এসেছে, কিছু একটা দুঃখ পেয়েছে, এখন মেয়েটাকে জালিও না ; চুপচাপ জামাইয়ের

কাছে এখুনি চিঠি দিয়ে লোক পাঠাচ্ছি, মেয়ে এখানেই আছে ব'লে। সে চিঠি আর কারুর হাতে দেবে না। লোকে কিছু জান্‌তে পারবে না।"

মা বলিলেন, "হাঁ, এখনও লোকের জান্‌তে বাকী আছে কিনা কিছু? ছি-ছিক্কার উঠে গেছে সারা জমিদারীতে।"

পিতা বলিলেন, "তবু আমার যা কর্ত্তব্য আমি ক'রে দেখি।"

লোক বাহির হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রজ্যোতি শুধু এক গ্লাস সরবৎ খাইয়া ঘরের ভিতর দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে। দাসীটা ভয়ে কোনও দিকে যায় নাই। চন্দ্রজ্যোতিরই পায়ের কাছে ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। মা ডাকাডাকি করিয়া মাঝে মাঝে ছেলের খাবার দিয়া যাইতেছেন, অন্য দু-জন খায়ও না, ঘরের বাহিরেও আসে না।

সহসা দরজায় ধাক্কা পড়িল। মা ডাকিতেছেন, "হ্যাঁরে, জামাই সঙ্গে ছিল, ট্রেন ধরতে পারে নি, সে কথা বল্‌তে হয়। দু-জনে কি রাগারাগি হয়েছে, আর একটা কথা এখানে ভাঙা নেই, দাঁতে কুটো দিয়ে সেই ভোর থেকে প'ড়ে আছে।"

শঙ্কর বলিল, "রাগারাগি ক'রেই আমরা বেরিয়েছিলাম, দু-দিন আপনার কাছে থাক্‌লে ওর রাগ প'ড়ে যাবে, এখন বেশী ঘাঁটাবেন না। শুধু বাবাকে লিখে দিন যে আমরা এখানে।"

* * *

তার পর দিন শ্বশুরবাড়ি বসিয়া খবরের কাগজে শঙ্কর পড়িল—সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার মিঃ স— ভোরবেলা ঘোড়ায় চড়িয়া হরিহরপুরের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেখানে একটা পাথরের ঢিপির তলা হইতে ৫০০ শত বৎসরের পুরাতন এক মহাকাল মূর্ত্তি তিনি আবিষ্কার করিয়া আনিয়াছেন। শীঘ্রই তাহার সম্মুখ ও পার্শ্বের ছবি বাহির হইবে।

শঙ্করের ঘরদ্বার সব খোলা পড়িয়া, ঘোড়াটা মাঠে মাঠে ঘুরিয়া আস্তাবলে ফিরিয়া গিয়াছে, শ্বশুরবাড়ি হইতে একটা লোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, আর একটা রহস্যপূর্ণ চিঠিতে শঙ্কর ও চন্দ্রজ্যোতির খবর। দর্পনারায়ণ ভাবিতেছেন, কলিই উল্টাইয়া গেল, না তাঁহারই মস্তিষ্কবিকৃতি হইল? সুরেশ্বরী ও ইন্দ্রনারায়ণ বলে, তাহারা এসবের কিছুই জানে না।

৭

বাঙালীর পল্লীজীবন-পুনর্গঠনে ডাক-চরিত্রের উপকারিতা

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

লক্ষ্মীছাড়া হইয়াও বাঙালী কিছুই করিতে পারিল না। সে এবার গৃহে ফিরিতে চায়। প্রাচীন পুঁথির স্তূপ ঠেলিয়া ডাক-চরিত্র বাহির করিলাম। দুঃখলক্ষণ দেখা যাক।—

অবিরত দুঃখ যার ভাত নাই ঘরে।
* * *
তাহার অধিক দুঃখ যার বস্ত্রহীন।
* * *
তাহাকে অধিক দুঃখ যার দুইতে নাই গাই।
তাহাকে অধিক দুঃখ যার হিংসা করে ভাই।
ইত্যাদি।

বাঙালীর এখন দুঃখের কাল। অন্ন, বস্ত্র এবং পানীয় চাই। চাকরি নাই। চাষবাস করিতেই হইবে।

চাষ বাস সবার সার।
দুরুক্ষকালে করে নিস্তার।
বলে ডাক চাষের গুণ।
জার চাষ তার ধন।

যাঁদের জমা বেশী তাঁরা রাজা। রাজারা জমি বিলি করিবেন। জমাহীন ব্যক্তিগণ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা চাষ করিবেন। ধনীদিগের পক্ষে বাড়িতে চাষ রাখা সুবিধাজনক নহে। 'ধন নষ্ট বাড়ীর চাষ'।

চাষ করিতে হইলে বাস চাই। চাষ করাইতে হইলেও তাই। শহরে বসিয়া চাষ হয় না। ধনীনির্ধন-নির্ব্বিশেষে পল্লীতে ফিরিতে হইবে। কোনও সুনির্ব্বাচিত পল্লীতে স্থায়ী ভাবে বাস করিতে হইবে। 'পরিহর গারড় গাঁয়ের বাস'। 'পরিহর দুই গ্রামের বাস'।

রাজা প্রজাপালক এবং ধার্ম্মিক হইবেন। প্রজাগণেরও রাজ-সেবায় অনুরাগ থাকা চাই। বসত-প্রকরণ :--

যোথা রাজা প্রজা পালে।
তোথা বসত করিবেক ভালে॥
ধার্ম্মিক রাজাতে সুখ পাই।
নিত্যি রাজা সেবিতে চাই॥
যেমন রাজা তেমন বেশ।
যেথানে জিয়ে সেথানে দেশ॥
ইত্যাদি।

বাস্তুর স্থান নির্ব্বাচন দরকার। পল্লীর যে-কোনও অংশে গৃহনির্ম্মাণ চলে না। পল্লীজীবন যাপনের সুবিধা-অসুবিধা দেখিতে হইবে। বিপদ-আপদের কথা ভাবিতে হইবে। বাসবাটী সম্পূর্ণ নিজের হইবে। 'পরিহর পরগৃহে বাস।' 'বসত করিবে মধ্য গ্রামে।' 'তাহার অধিক দুঃখ যার জল কানা বাড়ী।' 'পরিহর নদীতীরে বাসা।' 'পরিহর বাস্তুর কাছে বন।' 'পরিহর নিকটে হাট।' ইত্যাদি।

জমি চষিয়া লোহালক্কড়, ইটপাথর উৎপাদন করা যায় না। ধনসঞ্চয় এবং ধনরক্ষা মানুষ মাত্রেরই করা কর্ত্তব্য। বড় বড় দালান কোঠা পল্লীগ্রামে শোভাও পায় না। মাটি, বাঁশ এবং খড় হইলেই পল্লীগ্রামে অতি অল্প খরচে বা বিনা-খরচে উত্তম বাসগৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে। বাঁশ পুঁতিলেই গাছ। চাষ থাকিলে খড়ও মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না। চারিদিকে প্রাচীর দিয়া, প্রশস্ত উঠান রাখিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়।—'মন যদি হয় স্ফুর উঠান দিয়া তুলিহ ঘর।' 'তাহাকে অধিক দুঃখ যার বাড়ী দিয়া বাট।'

গৃহিণী লইয়াই গৃহ। গৃহিণীগণ যদি সন্তান গর্ভে ধারণ করিতেও নারাজ হন, তাহা হইলে অবশ্য পুরুষদের গৃহবাস না করিলেও চলিতে পারে। ধর্ম্মের মূলসূত্র কিন্তু মানুষ কোন দিন হারাইবে না। পুরুষদের যাযাবরত্বও নারীদিগের পক্ষে হানিকর। পাশ্চাত্য আদর্শে গৃহস্থ-সংসার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সন্তান-প্রতিপালনে নারীদিগের কর্ত্তব্যের সীমা নাই। বংশোন্নতি বলিয়াও একটা কথা আছে। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বৌ, ঝি লইয়া, ভাই ভাই একত্রবাস--গৃহস্থ-লক্ষণ। 'গৃহস্থ নষ্ট যোথা ছুরি।' গৃহস্থের প্রতিটি স্ত্রীলোক শতকর্ম্মান্বিতা হইবেন। 'বিবাহ করিব যার মাতা ভালি। শতকর্ম্মান্বিতা তার ঝিয়ালী॥' পুরুষেরা একযোগে চাষ করিয়া ধান্য, তুলা, তরিতরকারি উৎপাদন করিবেন। স্ত্রীলোকেরা ঢেঁকির দ্বারা ধান্য হইতে চাউল তৈয়ার করিবেন, রান্না করিবেন, সুতা কাটিবেন। 'যার ঘরে নাই ঢেঁকির মুসল। তার ঘরে কি উপজিবে কুশল॥' 'মিষ্ট রাঁধে সরু কাটে। তার ঘর কভু না টুটে॥'

গৃহশান্তি চাই। স্ত্রীলোকগণ আয় দেখিয়া ব্যয় করিবেন। 'আয় দেখিয়া করিবেক ব্যয়। তার দুঃখ কভু না হয়॥' অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারেও ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইবে। 'রৌদ্রে কাটা কুটাতে রাঁধে। কাষ্ঠ, খড় বর্ষাকে বাঁধে॥' 'খায় ফেলায় সব প্রচুর। ডাক বলে নিকাল দূর॥' 'রৌদ্রে রাঁধে কাষ্ঠ পড়ে। বর্ষা হইলে চাল কাঁড়ে॥ ভিজাহাতে লবণ কাঁড়ে। তার ঘর লক্ষ্মী ছাড়ে॥' 'যে দেখে তাই কিনে প্রচুর। তার স্বামী হয় দূর॥' স্বামী-ভক্তি স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ম্ম। 'বড় বংশে যার জন্ম। স্বামি-ভক্তি তার ধর্ম্ম॥' ইহা শুধু অন্তরে রাখিলেই চলিবে না। '...স্বামি ভজে প্রদীপ জ্বালি॥ স্বামির সেবা সাঁঝে বাতি। বলে ডাক স্বর্গে স্থিতি॥' 'স্বামির পিঁড়ি পায়ে টালে' 'স্বামির শয্যা পায় তোলে' 'এমন স্ত্রীতে যার বাস। সুখ নাহি তার পাশ॥' লজ্জা, পরিচ্ছন্নতা, অল্প এবং মৃদুবচন সুগৃহিণীর লক্ষণ। 'অতিথি দেখিয়া মরে লাজে' 'কাঁখে কলসি জলকে যায়। হেঁট মাথায় কারো পানে না চায়॥' 'গৃহিণী হইয়া কুবোল বলে' 'এক বলিতে অনেক বলে' 'উচিত কহিতে পাড়ে গালি। পুত্র, ঝি, বৌকে বলে বিরালী॥' 'হেন গৃহে যার বাস। সুখ ছাড়ুক জীবনের আশ॥' 'তাহার অধিক দুঃখ যার মুখরা নারী'। গৃহিণী-গণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকর্ম্মে রত হইবেন। 'উদ উঠিতে দেই ছড়া'—অলক্ষণ। আপন আপন কর্ম্মসম্পাদনে যথাসম্ভব পরের আশা ত্যাগ করিবেন।

'পরিহর যত্নে পরের আশ'। নিজেরাই জল আনিয়া রন্ধনে বসিবেন; আপন আপন শিশুসন্তানদিগের নিজেরাই তত্ত্বাবধান করিবেন; সকলকে খাওয়াইয়া নিজেরা খাইবেন; ভালমন্দ দ্রব্য স্বামী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতির মুখে আগে দিবেন।—'অতিথিজনকে আগে ভুঞ্জায়। সবাকে দিয়া পাছু খায়॥' 'যেমন যায় তেমন আসে। পানি লঞা রন্ধনে বসে॥ সেই স্ত্রী না করে যার। বলে ডাক এই সার॥' 'ভাল দ্রব্য আপনি খায়। কোলের শিশু দূরে ফেলায়॥ বলে ডাক এই দড়। এমন স্ত্রীতে সুখ ছাড়॥' স্বামী, পুত্র-কন্যা, শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাস্বর, দেবর প্রভৃতির সেবা ছাড়া পশুপালন ব্যাপারেও স্ত্রীলোকদিগের অনেক কর্ম্ম আছে। স্ত্রীলোকদিগের সভাসমিতিতে যাওয়া, গান বাজনা ইত্যাদি করা গৃহস্থগণের পক্ষে ক্ষতিকর। 'কান্দন শুনিতে কুলিকে ধায়। নাট গীত শুন্তে সভাকে যায়॥ পাড়া পড়সীর ঘর ঘন ঘন যায়। নারী হইয়া গীত গায়॥ এ নারীতে যার বাস। তার কিবা জীবনের আশ॥'

বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়া পল্লীবাসের প্রধান অন্তরায়। অন্যান্য রোগব্যাধিও আছে। ধর্ম্মকে দূরে রাখিয়া পল্লীসংস্কার অসম্ভব। ধর্ম্মসাধনে শরীররক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পুষ্করিণীখনন, পঙ্কোদ্ধার ইত্যাদি ব্যাপারে ধর্ম্মবুদ্ধি চাই। 'ধর্ম্ম করিতে শুনহ বাণী। পুষ্কণী দিয়া রাখিহ পাণি॥' 'যে দিয়ে তাই পাই। পরলোকে সুখে খাই॥' জানিতে হইবে। 'পাপ যদি করে ডর। তবে না খায় কাল অন্তর॥' উপযুক্ত আলো, উত্তম জল এবং বায়ুর কথা ভাবিতে হইবে।—'জল নষ্ট যথা হাঁস'। 'ছাগল পায়রা পোষে হাঁস। সীমার মাঝে রোপে বাঁশ॥—ডাক বলে কি বলিব তারে'। তাজা এবং পুষ্টিকর খাদ্য হইলেই শরীররক্ষা হয় না। ভোজ্য-গ্রহণে কালাকাল বিচার করিতে হইবে।

ভক্ষণ-লক্ষণ :--

কার্ত্তিকে খায় তৈল আগনে আদা।
পৌষে খায় কাঁজি দেহ হয় সুন্দা॥
মাঘে খায় কটু তেল।
ফাগুনে খায় পাকা বেল॥
চৈত্রে খায় তিঁতা।
বৈশাখে নিম নালিতা॥
জ্যৈষ্ঠে খায় ঘোল পটল।
তবে হবেক দেহ শীতল॥
আষাড়ে খায় পাকা তাল।
সুখে থাকে সর্ব্বকাল॥
আশ্বিনে খায় দাড়িম্ব ফল।
বলে ডাক দেহের কুশল॥
হরিদ্রা গুণ্ডি আর জোবালি।
তার সঙ্গে মিত মিতালি॥
হরিতকি খায় নিশি পিয়ে।
ডাক বলে সে শতেক জিয়ে॥

*   *   *

বর্ষাকালে কুব্যঞ্জন খায়।
সন্ধ্যাকালে শুঞা নিদ্রা যায়॥

ইত্যাদি অস্বাস্থ্যকর।

স্ত্রীলোকগণ খাদ্যপ্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিবেন।

অন্নপ্রকরণ :—

পুরাতন সুক্তা কাসুন্দির ঝোল।
তৈল উপর দিয়া তোল॥
পল্‌তার শাক রুহিত মচ্ছা।
ডাক বলে ব্যঞ্জন রুচ্ছ্যা॥
মদ্‌গুর মচ্ছ্য দায়ে কাটিয়া।
হিঙ্গ আদা তাহাতে দিয়া॥
তৈল হরিদ্রা তাতে দিব।
ডাক বলে ব্যঞ্জন খাব॥
পনা মচ্ছা জামির রসি।
কাসুন্দি দিয়া তাহা পবশি॥
ইহা খাইলে অরুচ্চা পালায়।
আছুক মনুষ্যের কাযা দেবতা লোভায়॥
চিচলা মচ্ছা তৈলে ভাজিয়া।
পাতি লেম্বুর রস তাহাতে দিয়া॥
যাহাতে দিএ তাহাতে মিলে।
হিং মরিচ আদা দিয়াবে ভালে॥
চালু দিহ যত তত।
পানি দিহ তিন সুত॥
ভাত উৎলাল্যে দিহ কাঠি।
জাল করিবে উজান ভাটি॥
তবে যদি থাকে চালু।
ডাক বলে আমি বালু॥

যন্ত্রপাতি লইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিবার কাল দূরে। উপস্থিত উক্ত ব্যাপারে আমাদিগকে পূর্ব্বপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। যে-কোন জমিতে যে-কোনরূপ বলদের দ্বারা চাষ করিলেই হইবে না। জমিনির্ব্বাচন দরকার। 'চাষ করিবে গ্রামের শতানিক ভূমে' 'না ছাড়িবে পখুর মুয়ান'। দামড়ার চাষ সুবিধাজনক নহে। 'ভূমি নষ্ট দামড়ার চাষে।' 'পরিহর বিনি বলদের চাষ।' বলদ

কিনিতে হইলেও লক্ষণ-অলক্ষণ দেখিতে হইবে। গরু কিনিবার প্রকরণ :—

গরু কিনিহ বড় বিশাল।
রাত্রি দিনে দেখিতে ভাল ॥
দেখিয়া কহেলাবালবা।
বাছ্যা কলু মুঁড়ী ধোবা ॥
হরিণ জিনিয়া যাহার কান।
সেই গরু কিনিয়া আন ॥
ন ঘর ছ ঘর ভাগ্যে পাই।
সাওল দেখিয়া দূর পালাই ॥
সমর্থ গরু কিনিয়া আনি।
দশ মাসা না পায়্যা কিনি ॥
বুড় গরু যে জন আনে।
বাইবার বেল কান্দে মনে মনে ॥
বুড়া ছাড়্যা বাছুর কিনে।
পরের লক্ষ্মী ঘরকে আনে ॥

* * *

গরু কিনিবেক লাবা লবা।
বাছ্যা কলু মুঁড়ী ধোব ॥
খন নেঙ্গুড় নাড়ে।
পালের আগু চরে ॥
ছয় ছোটা চারি মট।
চাবুক লেজা লোম খাট ॥
তবে জানিবে গরু গটা ॥

গরু নষ্ট প্রকরণ :—

আক্ষা পাক্ষা সুচক্ষা চালি।
পাট পড়শী আগু খাব গোসাঞি খাব কালি ॥
দেউড় গড়্যা বলে আমি আস ধরি।
পাখ্যা বলে য়ামি ধাইতে পারি ॥
সে পাখিয়া বলে আমি গিরস্ত খাই।
চালি বলে আমি চালিয়া যাই ॥

ধান্যের চাষে সম্পূর্ণরূপে দেবতার উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্ষালক্ষণ জানিতে হইবে।--

লক্ষণ বুঝিব বর্ষাকালে।
কৃষিকে পুছিব জোতিষ ভালে ॥
চৈত্রে শিতাশিত পড়ে যত।
ভাল বর্ষা জানিবে তত ॥
মাঘ মাসে হয় পানি।
তবে বর্ষা ভালে জানি ॥
মেদিনী ভরিয়া যায় পানি।
যাহাতে উপজে শুন বাণি ॥
পৌষে খরা চৈত্রে লেখা।
আষাড় শুদ্ধা নবমী লেখা ॥
তাহাতে পানি দেই দেবরাজ।
চৌপাশের সাপ গাড়ে বীজ ॥
চৈত্রের চতুর্দ্দশী হয় সমতুল।
ডাক বলে বর্ষা অতিদূর ॥
দমু ছাড়িয়া মকরে যায়।
তাহাতে বর্ষা অবশ্য পায় ॥
মাঘে গ্রীষ্ম বৈশাখে জাড়।
মেঘ বর্ষে না পুরে গাড় ॥
মাঘ মাসে যদি খেতে নয় পানি।
তবে মন্দ বর্ষা জানি ॥
ডাঙ্গা ভূমির গন্ধে পানি।
তাহাতে দিহ নানা ধান্যি ॥
তবে যদি না হয় শালি।
তবে দিহ ডাকে গালি ॥

* * *

তবে বর্ষা ভালে জানি।
মাঘ হইতে মেঘ দেই পানি ॥
যদি বর্ষে মকরে।
ধান হয় টীকরে ॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।
ধন্যি রাজার ধন্যি দেশ ॥
ফাগুনের মাটী সোনার মুঠি।
চৈত্রের মাটী রূপার পাটা ॥
বেশাখে চাষ রঙ্গে।
জৈাষ্ঠে চাষ রোসে টাঙ্গে ॥
শতেক চাষে মূলা।
তার অর্দ্ধেক তুলা ॥
তার অর্দ্ধেক ধান।
তার অর্দ্ধেক পান ॥

উক্ত বচনটি হইতে কোন্ জমি কিরূপ ফসলের উপযোগী, কোন্ ফসলের জন্য কয়টি চাষ দিতে হয়, কিরূপ বর্ষা হইলে কোন্ জমিতে কিরূপ ফসল দিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ও জানা যাইতেছে।

রোদবৃষ্টিতে চাষ করার ফলে অগ্নিমান্দ্য, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি রোগ জন্মাইতে পারে। তাহারও ব্যবস্থা :—

বড় ইচল্যা খণ্ড খণ্ড কাটি।
হিঙ্গ দিয়া তৈলে ডাঁটি ॥
উলটি পালটি দিহ পিষ্ট।
হস পাইলে যোজন দিষ্ট ॥
রৌদ্রে বারাইয়া বেড়াইয়া আস্তে।
অন্ন ভাত কাশুন্দি চুসে ॥
মস্ত্যা পোড় লবণ প্রচুর।
আর ব্যঞ্জন ফেলাহ দূর ॥
পাকা তেঁতুল বিজ্জ বোদালি।
অধিক করা দিহ জালি ॥
কাঠি দিয়া করহ ঝোলে।
খাবার বেলা মুখ না তোলে ॥

দৃষ্টিলক্ষণ :—

জোগা সিমুলি ছাগল দুগ্ধ।
বিহান হইলে মাথায় আরব্ধ ॥

সুখান হইলে পোখরে ধোব।
তবে দেহ ঠাণ্ডা হব ॥
স্নান করিয়া ভুপ্তে থিরে।
তবে দৃষ্টি যায় দূরে ॥

* * *

কর্পূর কিছু হাতে থুঞা।
তাহা মাড়িহ শিশির দিয়া ॥
ময়ূর পাখে দিহ আঙ্কে।
ইহা দিলে দূরকে দেখে ॥
মধু মরিচ শীলে ছিঁচিয়া।
অগ্নিভাতি কন্যার হাতে দিয়া।
টেঙ্গনার পাখে দিহ আগে।
ইহা দিলে যত্নে রাঙ্কে।
হেনঞ্চার শাক রন্ধন করিয়া।
ভোজন করিহ তাহা দিয়া ॥
অলবণে যে জন খায়।
তবে দূরে দৃষ্টি যায় ॥

স্ত্রীলোকদিগের সন্তানপ্রসব ব্যাপার আজকাল গুরুতর। পল্লীগ্রামে হাসপাতাল বা বড় বড় ডাক্তার-কম্পাউণ্ডার নাই। চাষবাসে পয়সাকড়িও কম। যে-সকল স্ত্রীলোককে বাধ্য হইয়া নাকের জলে চোখের জলে পল্লীতে ফিরিতে হইতেছে তাঁহারা জন্মপ্রকরণ দেখিয়া লউন।—

জন্ম মাত্র বলে ডাক।
পো এড়া পোয়াতি রাখ ॥
থুঞা পুছা দেই কোলে।
যদি ফুল পড়ে ভালে ॥
নাভি ছেদিয়া দেই জয় জয়।
ডাক বলে এই হয় ॥
শুষ্ক কাষ্ঠ করিয়া এক।
যেমন ইচ্ছা তেমন সেক ॥
দুই উপাসে দিহ আড় গঙ্গ।
দড় হব পোয়াতির মজ্জা ॥
বিরচনা করিয়া দিহ পথ্য।
তবে হবে পোয়াতির গত্য ॥
সিঁটার মূল বিছুতির বিচি।
দাইকে দিয়া শীলে সিঁচি ॥
সক্তি ধরিয়া ঔষুদ্ধি দিব।
তবে পোয়াতি দড় হব ॥
অপরাজিতা ইসর মূল।
পরশ দিহ দশমূল ॥
পর পুরুষে তাহা না দেখিব।
কোলে শোয়াইয়া ছাওয়াল থোব।
দুষ্ট দেখিয়া চারি পানে।
রাত্রি হইলে শোয়াবে সাবধানে।
নয় দিবসে ভাল প্রহরী দিহ।
একুশ দিবসে মন করিহ।

পল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন প্রকৃতির সহিত যোগস্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে। আদানপ্রদানে জগত চলিতেছে। আত্মীয়স্বজন, কুটুম্ব, প্রতিবেশী, ইতর, অভদ্র, কুলি-মজুর লইয়া, সুখে শান্তিতে পল্লীবাস করিতে হইলে কতখানি উদারতা, কতদূর শিক্ষার প্রয়োজন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অনুমান করিতে পারিবেন। সমস্ত বিষয়ে প্রস্তুত হইয়া পল্লীতে ফিরিব বলিলে আর পল্লীতে ফেরা হয় না। উপস্থিত বাঙালীর পল্লীতে ফেরা ভিন্ন গত্যন্তর নাই বলিয়া, জ্ঞাতব্য বোধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ও ডাক-চরিত্র হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

মনুষ্য-প্রকরণ : —

পরের সনে কোন্দল করে।
ডাক বলে কি বলিব তারে ॥
বুদ্ধি নষ্ট গুনন বিনে।
নৌকা থাকিতে সাঁতরে বানে ॥
পরের বোলে নাশ হয়।
ডাক বলে তার বিনাশ হয় ॥
কুলীন হঞা পরস্ত্রী হরে।
ডাক বলে সে আপুনি মরে ॥

* * *

চোর গাই বাঁজা ছাগলী।
ঘরে আছে দুষ্ট মেনি ॥
খল পড়সী পুত্র মূর্খ।
ডাক বলে ই বড় দুঃখ ॥
বিনি ছলে গুয় খায়।
সাঁতারু মধ্যে থাঞা যায় ॥
ঘাট এড়িয়া কুঘাটে লায়।
শোকে কান্দিয়া রাত্রি পুহায় ॥
হাতে ভাতে গীত গায়।
মাগু মরণে শ্বশুর ঘর যায় ॥
ভাত হৈলে করে রোষ।
এই লোক মলো নাই দোষ ॥
পরের রমণীর করে আশ।
ঘর থাকিতে পরের ঘরে বাস ॥
গুরুজনকে করে উপহাস।
ডাক বলে তার সর্ব্বনাশ ॥

* * *

চোর সেবক চোর গাই।
মূর্খ পুত্র দুষ্ট ভাই।
দুষ্ট নারী পুত্র অভক্ষ।
ডাক বলে সেজনার কি লক্ষ।
ইত্যাদি।

পরিহার-প্রকরণ :—

পরিহর নারী স্বামি নাই।
পরিহর সেবা দুই গোসাঞী॥
পরিহর ঘরের চঞ্চল নারী।
পরিহর খল কুল বহুনারী॥

* * *

পরিহর ব্যঞ্জন বাসি সুপ॥
পরিহর দুর বাপের খ্যাতি।
পরিহর নারী দুর্জ্জন মতি॥

* * *

পরিহর নদীতীরের গাছ।
পরিহর মাতৃ বিহনে বাছা॥

* * *

পরিহর পুষ্করণীর পিছল ঘাট॥

* * *

পরিহর যত্নে ভাঙ্গা খাট।
পরিহর দুয়ারের ভাঙ্গা কপাট॥
পরিহর বিনি টাকায় কিনে ঝারি।

* * *

পরিহর যত্নে ঋণ শেষ।
পরিহর বিধবানারীর বেশ॥

* * *

পরিহর নালিশী যার মন।
পরিহর যত্নে খল ব্রাহ্মণ॥
পরিহর পুত্রে ভাত না দিয়া পুষে।
পরিহর কন্ত মাতৃগণ হিংসে॥
পরিহর যত্নে ঝাঁট কাপড়ের বাসি।
পরিহর উচ্চদন্তের হাসি॥
পরিহর ঠেঁটা গুড়ের খাজা।
পরিহর পাইক বিহনে রাজা॥
পরিহর অপুত্রকের ধন।

* * *

পরিহর রাজা জমাহীন।
পরিহর মৈত্র ভাববিহীন॥
পরিহর গুরু দানে হিনে।

* * *

নষ্ট কায়েত না পড়ে পাট॥
ইত্যাদি।

নষ্ট-প্রকরণ :—

পুরুষ নষ্ট যার দুই স্ত্রী।
গাড়ি নষ্ট যাতে সামায় ছুরি॥
অক্ষর নষ্ট গল্লি লেখে পাতি।
মেঘ নষ্ট চাঁদনি হয় রাতি॥
বর পড়ে মুখ নষ্ট পাপে নষ্ট গারি।
স্বামি বিনে নারী নষ্ট রোগে নষ্ট দাড়ি॥
মোহর নষ্ট তামাচিক কাট।
রাজ নষ্ট যে না জানে লেখা জোখা।
বাণিজ্য নষ্ট না ফলে কর্ম্ম।
বিচার নষ্ট যেথা অধর্ম্ম॥
ভাজন নষ্ট যে যন্তাভন সঙ্গ।
পথুর নষ্ট যার নিকট বহে গঙ্গ॥
স্ত্রী নষ্ট পরের ঘরে যায়।
গুয় নারিকেল নষ্ট দক্ষিণ বায়॥
সজ্জন নষ্ট অসজ্জন সঙ্গ।
পুরুষ নষ্ট পরস্ত্রী রঙ্গ॥
পবন যোগে নষ্ট ধী।
পরের ঘরে নষ্ট ঝি॥
অক্ষর নষ্ট লেখে দশে পাচে।
ঘর নষ্ট গৃহিণী না আছে॥
জীবন নষ্ট জলে ঝাঁপ।
দেহ নষ্ট দেই সাঁপ॥

* * *

ধন নষ্ট যোথ দারি॥

* * *

মাংস নষ্ট ঘন টানে।

* * *

অশ্ব নষ্ট নিত্য গমনে।
রাজা নষ্ট কুজ্ঞানে॥

* * *

কুজনার সনে না কর রঙ্গ॥
বলে ডাক এই শিক্ষা।
আপুনি দড় সকলি মিথ্যা॥

ইহা ছাড়া আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ডাক-চরিত্রে আছে। জ্ঞানশিক্ষার জন্য যেমন চাণক্য-শ্লোকের প্রয়োজন, গৃহস্থালী শিক্ষার জন্যও তেমনই ডাক-চরিত্রের প্রয়োজন। এখনও বাংলার স্কুলে পাঠশালায় চাণক্যশ্লোক পড়ান হয়। এমন দিন আসিবে যখন ডাক-চরিত্রেরও চারিদিক হইতে ডাক পড়িবে। কিন্তু, তখন কি ডাক-চরিত্রকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে?

লটারীর টিকিট

শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তফী

সব কথাতেই বড়বাবু ধমকে বলেন, না পোষায়, চাকরি ছেড়ে দাও।

শিশিরকে আপিস করতে যেতে হয় শ্যামবাজার থেকে, এই পথটা সে প্রায়ই পায়ে হেঁটে যাবার চেষ্টা করে, অতটা পথ যেতে একটু দেরি হয়ই। তা ছাড়া মেয়েটা একদিন কোথা থেকে কি খেয়ে এসে এমন কাণ্ড সুরু করলে যে শিশির তার পরের দিন আপিসে যেতে পারলে না। চারিদিকেই তখন কলেরা হচ্ছিল। কিন্তু এ সমস্ত কথা সকরুণভাবে বড়বাবুকে ব'লে কোন লাভই নেই, তাঁর ঐ এক কথা, না পোষায়, চাকরি ছেড়ে দাও। সে ক্ষমতা যে শিশিরের নেই, তাই না রোজ এই অপমান সয়েও টিকে থাকা!

রোজকার মত সেদিনও সন্ধ্যা ছ'টার সময় শিশির যখন ডালহৌসী স্কোয়ারে এসে দাঁড়াল, দেখলে কত লোক ট্রাম কিংবা বাস্ লক্ষ্য ক'রে দৌড়চ্ছে। সেদিন সকাল থেকেই শিশির সুস্থ বোধ করছিল না, পাছে বাড়াবাড়ি হ'য়ে আপিস কামাই হয় তাই ভাতও খায় নি, তার ওপর সারা দিনের খাটুনি, কাজেই সেই দুর্ব্বল দেহে হেঁটে যাওয়া সম্ভব হবে না ব'লে সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে উঠে পড়ল। এও তবু একটু সুখ! শরীরের কোন পরিশ্রম নেই, শুধু চুপচাপ ব'সে থাকা, হয় বাইরের দিকে চেয়ে দেখ, কত অসংখ্য দোকান, বিচিত্র জনস্রোত, অদ্ভুত গোলমাল, নয় ত ট্রামের ভিতরে দেখ, কত লোকের কত রকম কথা—সর্ব্বসুদ্ধ কেমন একটা অস্পষ্ট আবেশে সমস্ত মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকে, মন্দ লাগে না।

বাড়ি এসে শিশির একেবারে ধপ ক'রে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে। মেয়েটা জুতোর ফিতে খুলতে থাকে, স্ত্রী পাশেই দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে করতে জিজ্ঞাসা করে, এখন কেমন আছ?

এও তবু একটু সুখ! শিশির উত্তর দেয়, ভাল।

—তা'হলে রাত্রে খাবে ত? যাই, ব্যবস্থা করিগে।

সেই এক কথা। রান্না আর খাওয়া আর আপিস যাওয়া। এই ভাবে একঘেয়ে জীবনটাকে আর কতদিন ব'য়ে বেড়াতে হবে কে জানে! আপিসে হলধর বাবু বলছিলেন, লটারীর টিকিট্ কিনতে। লটারীতে টাকা পাওয়ার ভাগ্য কি আমাদের? টাকা পাবে সাহেবের খানসামা কিংবা রেঙ্গুনের কোন দপ্তরী। হলধর বাবু বল্‌ছিলেন, প্রথম পুরস্কার নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা। চুলোয় যাক্ প্রথম পুরস্কার, যদি হাজার পাঁচেক টাকাও পাই, তা'হলে সকলের আগে এই চাকরিটা ছেড়ে দি। বড়বাবুর খিঁচুনি খেয়ে খেয়ে ত আর পারা যায় না। মনে কর যেদিন টাকাটা পেয়েছি। 'না পোষায়, চাকরি ছেড়ে দাও'—'এই দিলাম ছেড়ে আপনার চাকরি। চাকরির নিকুচি করেছে—আমাদের কি মনে করেন আপনি, চাকর না আর কিছু?' বড়বাবু ত অবাক্। সেই শিশির, বলে কি? ব্যস্। তার পর ফার্ষ্ট ক্লাস ট্রামে চ'ড়ে বাড়ি আসা, কমলাকে খবর দেওয়া, তখনই বাজার থেকে ভাল মন্দ কিছু কিনে এনে রাত্রের জোগাড় করা! তার পর একদিন কল্‌কাতার বাস উঠিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া, নইলে ও টাকায় চিরকাল ত চল্‌বে না। ছেলেবেলায় শিশির একবার রূপনারাণপুর গিয়েছিল, সেকথা এখনও ওর বেশ মনে পড়ে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ, মাঝে মাঝে শাল শিমুল দাঁড়িয়ে, তাদের ওপরে মুক্ত আকাশ—সর্ব্বত্র প্রাণের একটা অবাধ সহজ বিস্তার। সেখানে নিজেদের একটা ছোট কুঁড়ে বানানো যাবে, কিছু জমি নিয়ে চাষবাস সুরু ক'রে দিতে হবে। নিজেদের তৈরি তরিতরকারী, তাতে যেমন ভিটামিন্ তেমনি সস্তা। কয়েকটা ফুলের গাছ, কমলার ফুলের গাছের খুব সখ। শোবার ঘরের দরজার কাছে একটা টবে গোলাপগাছ লাগিয়েছিল, তা সে কিছুতেই বাঁচল না। ছেলাবেলায় কমলার খুব পাখীরও সখ ছিল। ক্রমে সব হবে। প্রথমে এই চাকরি না ছেড়ে দিলে আর বেঁচে সুখ নেই। একেবারে অমানুষ ক'রে দিলে। এই ক'টা টাকা নইলে যে স্ত্রী পুত্র নিয়ে না খেতে পেয়ে ম'রে যাব,

তাই না ঐ বড়বাবুর ধমক্ খেয়ে আপিসের মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকা। 'না পোষায়, চাক্‌রি ছেড়ে দাও'। ওঃ ভারী আমার বড়বাবু রে! অমনি মুখের ওপর তুড়ি মেরে চ'লে আস্‌তে পারি। এদিকে ধারও হ'য়ে যাচ্ছে অনেক। কমলার হারটা বাঁধা দেওয়ার পর থেকে মনে আর শান্তি নেই। উপায়ই বা কি? সেবার কোলের ছেলেটার এমন অসুখ করল যে বাঁচবার আশা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। বড় ডাক্তার আন্‌তে হ'লে খরচও অনেক। কমলা নিজেই যদি গলা থেকে না খুলে দিত, তাহলে আর বেশী দিন ওকে ছেলের মা হ'য়ে থাক্‌তে হ'ত না। এখানকার দেনাপাওনা সব চুকিয়ে কল্‌কাতা ছেড়ে একেবারে দূরে কোথাও চ'লে যেতে পারি তবেই মনে শান্তি পাওয়া যায়। সেই রূপ-নারাণপুর! আজও মনে করলে সেখানকার দূরপ্রসারী উদার আকাশকে সহসা এই ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে পাওয়া যায়, সেখানকার মুক্ত বাতাস চোখে মুখে এসে লাগে। সেখানকার সরু রাস্তাগুলো এঁকে-বেঁকে কোথায় যে গেছে, কোথায় কোন্ দূর অগোচরের মধ্যে নিজেদের যাত্রা শেষ করেছে। তাদের সঙ্গে মনও যেন সেই নিরুদ্দেশের উদ্দেশে বেরিয়ে যেতে চায়। চারিদিকে একটা সুপ্রচুর অবকাশ, সমস্ত প্রকৃতি নীরবে ধীরে ধীরে আপনার কাজ ক'রে চলেছে, সূর্য্য সেখানে রাত্রির আবরণ থেকে মুক্ত হ'য়ে ক্রমে আপনার মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে, রাত্রি সেখানে নিদ্রার মত পৃথিবীর চোখ দুটিকে জড়িয়ে ধর্‌তে থাকে। শহরে সমস্তই তাড়াতাড়ি, এখানে হঠাৎ দেখা যায় দশটা বাজে, আপিসের দেরি হ'য়ে যায়।···

ঘরের ভিতর থেকে কমলা একটু ঝাঁঝালো কণ্ঠে বল্‌লে,—এই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? উঠে হাতমুখ ধুয়ে সকাল সকাল খেয়ে নাও না।

বেচারী কমলা! শিশিরের সংসারে এসে ওর আর খাটুনির অন্ত নেই, তার ওপর ছেলেমেয়েদের জ্বালা আছে। আগের চেয়ে খিট্‌খিটে হ'য়ে পড়েছে, বড় শীঘ্র চ'টে যায়। ওরই বা দোষ কি? চিরকালই ত কমলা এমন ছিল না। সেই কমলা! প্রথম যখন সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় ঘোম্‌টা দিয়ে একটি মনোহর লজ্জার দ্বারা নিজের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ক'রে এই সংসারে পদার্পণ করেছিল সেই নববধূটি আজ কোথায়? সেই পুরাতন দিনগুলি আপনাদের মৃত্যু-উৎসব কোথায় কি ভাবে সম্পন্ন করছে? কমলা! কেরানীর বউ কমলা! সুন্দরী ও কোন কালেই ছিল না কিন্তু ওর ছেলেমানুষের মত হাসি, অনর্গল কথা বলা, হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে অত্যন্ত অসম্ভব কথাও বিশ্বাস করা, সমস্ত জড়িয়ে ওকে এমন ভাল লাগত যে ওর কাছে এলে মনের মধ্যে ভারী তৃপ্তি পাওয়া যেত।

এদিকে কমলার ডাকাডাকি ক্রমেই তীব্র হ'য়ে ওঠাতে শিশির আলস্য ত্যাগ ক'রে উঠে পড়ল। সে-রাত্রে ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এলোমেলো বক্‌তে লাগ্‌ল, রূপনারাণপুর··· কমলা···পাখী···ফুলের গাছ···না পোষায়, চাক্‌রি ছেড়ে দাও···দিলাম ছেড়ে···

রেস্থাসে'র খবর শীঘ্রই বেরুবে শুনে পর্য্যন্ত শিশির আর নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারছে না। কিছুই যে হবে না সে-কথা সে নিশ্চয় জানে, তবু কেমন যেন একটা ঔৎসুক্য। হয়ত বা···বলা কি যায়? নানারকম কল্পনা ক'রে ওর মাথা গরম হ'য়ে উঠ্‌তে লাগল। হয়ত সেখানে জোচ্চুরি হয়, হয়ত তার নামটা সাহেবের নয় ব'লে সেখানে তাকে বাদ দিয়েছে, হয়ত হলধরবাবু পাঠান্ নি, পাঠালেও হয়ত দেরি হয়ে গেছে কিংবা রাস্তায় কোথাও প'ড়ে গেছে, ছি-ছি, এই সব হুজুগে প'ড়ে আমার দুটো টাকাই গেল, আমার আট দিনের বাজার খরচ—দূর হোক্‌গে লটারী, ঐ দুটো টাকাও যদি এখন ফেরৎ পাওয়া যায়···

কিন্তু শিশিরের বরাতে সেবার তৃতীয় পুরস্কারটা ছিল। বড়বাবু সেদিন সকাল-সকাল বাড়ি চ'লে গেছেন, শিশির নিজের টেবিলের কাছে দু-তিন জনের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে এমন সময় সেই খবর। শিশিরের চারিদিকে জটলা বেড়ে গেল, সকলেই অভিনন্দন জানাতে লাগল, হলধরবাবু বার-বার মনে করিয়ে দিতে লাগলেন যে তিনিই জোর ক'রে টিকিট কিনিয়েছিলেন, দরোয়ানরা বকশিশ চাইতে লাগল, কেরানীরা সন্দেশ চাইতে লাগল, শিশির আনন্দে কোন কথা বল্‌তে পারছিল না, অবিশ্রান্ত অর্থহীনভাবে হাস্‌তে লাগল। বাড়ি ফেরবার সময় হলধরবাবু সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর এলেন, শিশির তাঁর কাছে নিজের মনের কথা বল্‌তে

লাগল, কালই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেবে, তার পর এখানকার দেনাপাওনা চুকিয়ে রূপনারাণপুর চ'লে যাবে, সেখানকার যেমন স্বাস্থ্য তেমনি সস্তাগণ্ডার দেশ, সেখানে চাষবাস ক'রে সুখে-স্বচ্ছন্দে ক'টা দিন এক রকম ক'রে কাটিয়ে দেবে।

কমলা ত প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইলে না। সাড়ে বারো হাজার টাকা! যখন সমস্ত ব্যাপারটা সত্যি ব'লে বুঝলে তখন কেঁদে ফেল্‌লে। স্বপ্নেও সে এ সৌভাগ্যের সম্ভাবনা দেখে নি, কল্পনাও করে নি যে তার এই বর্ত্তমান জীবনযাত্রার কখনও কোন পরিবর্ত্তন হ'তে পারে।

তখন ধীরে ধীরে তার জীবনের সমস্ত অতীত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠতে লাগল। তার বাপ-মা-ভাই-বোনের সংসারে আনন্দে খেলাধুলো ক'রে দিন কাটান, তা'র বিয়ের জন্যে বাপমার চিন্তা, তার পর সেই প্রথম বিয়ের রাত্রি, কত লজ্জা কত আনন্দ কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার পর নিজের সংসার, স্বামীপুত্রকন্যা নিয়ে কত কষ্টের সংসার করা; ছেলেমেয়েদের নিয়ে কখনও প্রাণ খুলে আমোদ করতে পারে নি, স্বামীর মুখে কখনও ভালমন্দ কিছু দিতে পারে নি, নিজের গয়নাটা পর্য্যন্ত বাঁধা। কিন্তু এত টাকা, একি সত্যি?

সে-রাত্রে আর তারা ঘুমতে পারলে না। শিশির যে কমলাকে কিছু না ব'লে হলধরবাবুর কাছ থেকে টিকিট কিনেছিল এই গল্প আবার একবার শুনে কমলা বলতে লাগল, এত দিনে ছেলেমেয়েগুলোকে সাজিয়ে-গুজিয়ে তৃপ্তি পাব, পাঁচ জনের সাম্‌নে বের করতে পারব। কি কষ্টেই এত দিন গেছে! মনে মনে ঠাকুরদেবতা'কে কত ডেকেছি, এত দিনে তাঁরা মুখ তুলে চাইলেন। আর তাঁরা কত কষ্ট দেবেন আমাদের? হ্যাঁ, ভাল কথা। আমার সেই হারছড়াটা ছাড়িয়ে এনো এবার। হাতের চুড়িগুলো ত ক্ষয়ে ক্ষয়ে আর কিছুই নেই বললেই হয়। এবার কিন্তু আমার আর মেয়েটার জন্যে পাঁচগাছি ক'রে চুড়ি গড়িয়ে দিতে হবে। পাশের বাড়ির দিদির হাতে সেদিন নতুন প্যাটার্ণের চুড়ি দেখছিলুম, ভারী সুন্দর দেখ'তে, তোমায় এনে দেখাব-'খন্। এ-সব ত এক রকম হবে, এতে আর খরচ কি বল? হ্যাগা, সত্যি কি সাড়ে বারো হাজার টাকা পেয়েছ? ভগবান্, আমাদের দুঃখ কি এত দিনে বুঝেছ? (কমলা একটু কাঁদলে) দেখ তোমার মনে কি সাধ আছে আমি জানি না কিন্তু একটি ছোট দেখে বাড়ি এবার করতেই হবে। সবসুদ্ধ পাঁচ-ছ হাজার খরচ করলে জায়গা নিয়ে ছোট একটা একতলা বাড়ি বেশ হবে'খন্। পাশের বাড়ির দিদির জামাই বালিগঞ্জে সেদিন বাড়ি করলে, খরচ ঐ রকমই পড়েছে। তবু ত নিজেদের একটা আস্তানা হবে, মাথা গোঁজবার একটু জায়গা হবে। ছেলেদের কি আর দিয়ে যাবে বল? তবু বাড়িটা থাক্‌লে এর পর পথে বসতে হবে না। তার পর ধর মেয়েও বড় হ'য়ে উঠেছে। আস্‌ছে ফাল্গুনে চোদ্দয় পড়বে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কত বড়ই হ'য়ে উঠ্‌ল। ওর জন্যে আমার ভাবনার অন্ত ছিল না, কি ক'রে মেয়েটাকে পার করি, কি ক'রে যে ওর একটা গতি করি, তার ওপর ওর ঐ গায়ের রং আর ঐ উঁচু দাঁত। দিদি বলছিলেন তাঁর এক বোনের বিয়েতে বাপকে মেয়ের উঁচু দাঁতের জন্যে আলাদা সাত-শ টাকা ধ'রে দিতে হয়েছিল। তাহলেই ধর তত্ত্বতাবাস্ সমস্ত নিয়ে পাঁচ হাজারের ধাক্কা, ওর কমে আজকালকার দিনে ভাল ছেলে পাওয়া যায় না। যাই বল, যার-তার হাতে ওকে সঁপে দিতে পারি নে, ভগবান যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, একটি ভাল পাস্-করা কিছু উপায় করছে এমন ছেলে দেখে বিয়ে দেব।...

শিশির স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগ্‌ল। এসব কথা কিছুই সে ভাবে নি অথচ এর একটাও উড়িয়ে দেবার জো নেই। তাই ত, সে মনে মনে এত ক্ষণ কি পাগলামি করেছে! কোথায় রূপনারাণপুর, কোথায় কমলার জন্যে ফুলের গাছ, কোথায় তার অলস সময় যাপন! মেয়ের বিয়ে, সে ত না হ'লে নয়। একটা ছোটখাট বাড়ি যে এই সময় করা উচিত তা'তে কোন সন্দেহ নেই। ক্রমে শিশিরের মনে পড়তে লাগল, ছেলেটাও যখন বড় হবে তার পিছনে খরচ কম নেই। তার পড়াশুনো আছে ত! রূপনারাণপুরে গিয়ে চাষবাস ক'রে ছেলেটাকে চাষা বানানো চলে না। তা ছাড়া নিজেদের সুখ-অসুখ আছে, কখনও কারুর যদি কিছু হয়, তখন আবার কোথায় কা'র কাছে হাত পাততে যাব? এইবেলা কিছু টাকা জমিয়ে রাখা ভাল।

শিশির বললে—জান কমলা, প্রথমে খবরটা পেয়ে আমার এমনি ফূর্ত্তি হয়েছিল যে মনে হ'ল, কালই চাকুরি ছেড়ে দেব। তখন বুঝলে কি না, আমিই বা কে আর রাজাই বা কে···ব'লে টেনে টেনে হাসতে লাগল।

শুনে কমলাও হাসল।

আপিসে বড়বাবু মাঝে মাঝে ধমক্ দিয়ে বলেন—না পোষায় ছেড়ে দিলেই পার।

বসন্তদূত

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

বসন্ত এনেছে লিপিখানি
অনন্তের অন্তরের বাণী ;
বনানীর পুষ্পকিসলয়ে সুন্দরের অনিন্দ্য ইঙ্গিত ;
পল্লবে পল্লবে তার উদ্বেলিত বরণ-সঙ্গীত !
দিকে দিকে শ্যামসমারোহ,—
আনন্দসন্দোহ,
বক্ষে মোর তরঙ্গিল অহরহ দুঃসহ বিরহ !
মর্ম্মরিত বেণুকুঞ্জ মাঝে,
মুখর মঞ্জীর কার বাজে !
আম্রমঞ্জরীর গন্ধে, কেতকীর সুরভি নিশ্বাসে,
সজিনার ফুলে, আর বাতাবীর সুবাস-উচ্ছ্বাসে,
মলয়বীজনাকুল বনশ্রীর উল্লোল অঞ্চলে,
যেন কার রভস উছলে ;
যেন কার অঙ্গপরিমল
হরষপরশরসে চিত্ত মোর করিল বিকল !
যারে চাই তবু নাহি পাই,
ক্ষণে পেয়ে তখনি হারাই,
সে আমার হারানিধি দিল বিধি আজি কি মিলায়ে ?
তাহারই বারতা এল মলয়ের মধুময় বায়ে ?

অশোকে কিংশুকে হাসে কার রক্ত-রাঙা চীনাংশুক,
তরঙ্গের লীলারঙ্গে হেরি কার উরস উৎসুক,
বনব্রততীর অঙ্গে কে দিল রে হেন পেলবতা,
বান্ধুলি বিম্বিল কা'র অধরের তপ্ত অধীরতা ?
হেরিলাম অনন্তের মহামহোৎসব,
আকণ্ঠ করিনু পান আগ্রহের উদগ্র আসব !
কোকিলের কলকণ্ঠে, দোয়েলের বিভোল উল্লাসে,
তটিনীর মধুচ্ছন্দে, লীলায়িত নীলিম আকাশে,
কী আভাস ভাসে !
গ্রহতারা, দূর নীহারিকা—
অসীমের ললাটের জ্যোতির্ম্ময় টীকা—
রুদ্ধকক্ষ খুলিল হিয়ার,
দেখাল বিস্মৃতজনে অনুপ সে শ্রীমুখ প্রিয়ার !
হে বসন্ত-দূত,
সুধাবিষে-মিশা তব লিপিকা অদ্ভুত !
অমরার অমৃত সিঞ্চিয়া রচিয়াছ তোমার বারতা ;
বেদনার অবদানে উদ্দীপিয়া বিরহের ব্যথা
উদ্‌ঘোষিছ দিশে দিশে বর্ণে গন্ধে রসে আর গানে,
প্রদোষে বিহানে,
এক বাণী তীব্র, তীক্ষ্ণ, উদাত্ত, মোহন—
বসন্তের মধুৎসবে সুন্দরের শুভ নিমন্ত্রণ !

প্রাচীন রাজস্থানী লোকগীতি*

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

বোধ হয় টড সাহেবের রাজস্থানের ইতিহাস বা তাহার অনুবাদ হইতে বাঙলায় রাজস্থানের রাজপুত + ও চারণ-গণের রচিত ঐতিহাসিক বিবরণ ও কবিতার প্রথম পরিচয় লাভ হয়। কিন্তু যদিও ইংরেজীতে এই বঙ্গদেশেই ইহার কিছু আলোচনা হইয়াছে তথাপি বাঙলা ভাষায় এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। বাঙালী পাঠক ইহার তেমন সুযোগ পান নাই, যদিও ইচ্ছা করিলে তাহা পাইতে পারিতেন। যাহাই হউক, যে সকল বাঙালী পাঠক কিছু হিন্দী জানেন, তাঁহারা এখন অনায়াসেই এই সুযোগ পাইতে পারেন।

জয়পুরের অন্তর্গত হণোতিয়া গ্রামের বারহট বালাবখ্‌শজীর বহু দিবস হইতে ইচ্ছা ছিল যে, প্রাচীন রাজস্থানীতে রচিত ইতিহাস ও কবিতা-সমূহ প্রকাশিত করিয়া হিন্দী সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি কিছু টাকা কাশীর নাগরীপ্রচারিণী সভার হাতে সমর্পণ করিয়া এই নির্দ্দেশ করেন যে, উহার আয়ের দ্বারা "বালাবখশ রাজপূত চারণপুস্তকমালা" এই নামে রাজপুত ও চারণ-গণের রচিত ঐতিহাসিক ও কবিতা গ্রন্থ-সমূহ প্রথমে প্রকাশিত করিতে হইবে। আলোচ্য পুস্তকখানি ঐ গ্রন্থমালার ষষ্ঠ গ্রন্থ।

ঢোলা-মারুরা দূহা রাজস্থানী ভাষার একখানি প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ কাব্য। এই নামটিকে বাঙলায় ঢোলা ও মারুর দোহা বলা যাইতে পারে। কাব্যের নায়কের নাম ঢোলা, আর নায়িকাটির নাম মারু। ইঁহাদের প্রণয়-কাহিনী দোহা ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে দূহা। রা হইতেছে পশ্চিমী রাজস্থানী (মারবাড়ী) ভাষায় সম্বন্ধ-সূচক (পুংলিঙ্গের বহুবচনে)। সংস্কৃত দুর্লভ অবহট্‌ঠ অর্থাৎ অপভ্রষ্ট বা অপভ্রংশে ক্রমশ ঢোল্ল, এবং তাহা হইতে ঢোলা। ইহা রাজস্থানীতে 'নায়ক,' 'পতি,' বা 'বীর' অর্থে খুবই প্রচলিত। মারু হইয়াছে মরু শব্দ হইতে। মরু দেশে জাত বলিয়া এই নায়িকার নাম মারু। ইহার ভিন্ন ভিন্ন রূপও পাওয়া যায়; যেমন, মারুরী, মাররী, মারুরণী, মাররণী, ইত্যাদি। রাজকন্যা বা রাজরাণীদের নাম অনেক স্থলে সেই-সেই দেশের অথবা দেশের রাজার নামে হইয়া থাকে, যেমন, মৈথিলী, বৈদেহী, পাঞ্চালী, ইত্যাদি। রাজস্থানেও এইরূপ অনেক যেমন, মীরাকে বলা হইত মেড়তণী রাণী (মেড়তাবালী রাণী)। বর্ত্তমান নায়ক ঢোলার দ্বিতীয় রাণী মালবা প্রদেশের ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল মালবণী।

আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদকগণ মনে করেন ঢোলা এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইনি জয়পুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। জয়পুরের কছবাহা রাজবংশ প্রথমে নরবর-নামক নগরে রাজ্য করিতেন। রাজা নল ইহা স্থাপন করেন। এই নলের পুত্র ঢোলা। ইঁহার সময় আনুমানিক কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক ১০০০ বিক্রমাব্দ। ইঁহার দুই স্ত্রী ছিলেন, একটি মারবাড়ের ও অপরটি মালবার।

এই গ্রন্থখানিকে রাজস্থানের জাতীয় কাব্য বলিয়া মনে করা হয়; রাজস্থানে এমন আর কোনো লোকগীতি নাই যাহার ইহার ন্যায় সাধারণের মধ্যে প্রচার আছে। সেখানে এমন পুস্তকালয় দুর্লভ যাহাতে এই কাব্যখানি নাই। বহু শতাব্দী হইতে রাজস্থানে ইহা চলিত হইয়া আসিতেছে, এবং এখনো অনেকের মুখে ইহা রহিয়াছে। এই কাব্যের বর্ণিত ঘটনাবলীকে অবলম্বন করিয়া রাজস্থানে বহু চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। যোধপুরের সরদার মিউজিয়মে ইহার ১২১ খানি চিত্র আছে। আলোচ্য সংস্করণে উহা হইতে তিন খানি প্রকাশ করা হইয়াছে। রাজস্থানের বহু গৃহে এখনো উটের উপরে ঢোলা ও মারুর চিত্র পাওয়া যাইবে। মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচংদজী বলিয়াছেন, তিনি এক ঐতিহাসিক যাত্রায় বহির্গত হইয়া অলবর রাজ্যের এক গ্রামে ঢোলা ও মারুর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি ন্যূন পক্ষে দুই শত বৎসরের পুরাতন হইবে।

ঢোলা-মারু কাব্য লোকগীতি (Ballad)। প্রথম হইতেই ইহা লোকের মুখে-মুখে ছিল, এবং সেই জন্যই ইহার যে অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাহা হইয়াছে। সময়ে সময়ে নানা স্থানে নানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পুরাতন দোহা কোনো কোনো স্থানে নষ্ট হইয়াছে, আবার নূতন দোহাও প্রবেশলাভ করিয়াছে। কোনো প্রাচীন ঘটনা হয়তো লুপ্ত হইয়াছে, আবার নূতন ঘটনাও তাহাতে স্থান পাইয়াছে। মনে হইতে পারে প্রথমে ইহা কোনো এক ব্যক্তির রচনা ছিল। কিন্তু পরে বহু জনের রচনা হইয়া পড়িয়াছে। মূলত ইহার রচয়িতা কে, বা কবে ইহা রচিত হইয়াছিল ইহা বলা শক্ত। ঢোলার সময় কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক ১০০০ বিক্রমাব্দ বলা হইয়াছে, অতএব এই কাব্যখানি তাহার পূর্ব্বের হইতে পারে না। কালক্রমে কাব্যখানির দোহাবলী ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ায় কথাভাগও ছিন্নভিন্ন হয়। বিক্রমাব্দ ১৬০০ শতকের কাছাকাছি সময়ে জেসলমেরে কুশললাভ নামে এক জৈন কবি ছিলেন। ঢোলা-মারু দূহা ঐ সময়ে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু সম্ভবত তিনি ইহা সম্পূর্ণ পান নাই। তাই জেসলমেরের রাবল হরিরাজের আদেশে তিনি যতটা পাইয়াছিলেন একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং কথা-সূত্র মিলাইবার জন্য উহাতে মধ্যে-মধ্যে কতক চৌপাঈ রচনা করিয়া জুড়িয়া দিয়াছিলেন। ইনি স্পষ্টত লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঐ দূহা বা দোহাগুলি খুব পুরাতন ("দূহা ঘণা পুরাণা অছৈ")। খুব পুরাতন বলিতে যদি অন্তত এক শত বৎসরও পূর্ব্ব ধরা যায়, তবে বলিতে পারা যায় এই মূল গ্রন্থখানি বিক্রমাব্দের প্রায় পঞ্চদশ (১৫০০) শতকে রচিত হইয়া থাকিবে। ভাষা আলোচনা করিলেও বুঝা যায় ইহা প্রায় ৫০০ বৎসরের প্রাচীন হইবে।

আলোচ্য সংস্করণে সম্পাদকগণ ঢোলা-মারু কাব্যের যে প্রাচীন

---

* ঢোলা-মারুরা দূহা, রাজস্থানীকা এক সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন লোক-গীত, পাঠান্তর, হিংদী অনুবাদ, টিপ্পনী, শব্দকোষ, পরিশিষ্ট ঔর প্রস্তাবনাকে সাথ সংপাদিত। সংপাদক রামসিংহ, এম. এ. বিশারদ, সূর্যকরণ পারীক, এম-এ., বিশারদ, ঔর নরোত্তম দাস স্বামী, এম-এ., বিশারদ। প্রকাশক নাগরীপ্রচারিণী সভা, কাশী। পৃষ্ঠা ২১৩+৬৬৪। মূল্য ৪৲।

+ বাঙলায় আমরা বলি ও লিখি রাজপুত, তিন, দুধ, ইত্যাদি; কিন্তু হিন্দী প্রভৃতিতে রাজপূত, তীন, দূধ, ইত্যাদি। ইহাই ঠিক।

রূপ অর্থাৎ দোহাবলা তাহাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অতি যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়াছেন, চৌপাঈ-গুলিকে পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। এই সংস্করণে ষোল-সতেরখানি পুঁথি মিলান হইয়াছে, এবং ১৬৬৭ ও ১৭২০ সংবতে লিখিত দুইখানি পুঁথিকে সংস্করণের আধারস্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই দোহাগুলির ভাষা রাজস্থানী সাহিত্যে প্রচলিত কৃত্রিম ভাষা নহে; ইহা সেই সময়ে ঐ দেশে প্রচলিত কথ্য ভাষা।

ঢোল-মারু কাব্যের কথাবস্তু চার রূপে প্রচলিত আছে। উহার একটি স্থুলত এই :—পুগল দেশের রাজার নাম পিঙ্গল। এক সময়ে দেশে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হওয়ায় রাজা পুগল নলবর-নামক নগরে গমন করেন। নলবরের রাজা নল তাঁহাকে পরম আদর-সৎকারে গ্রহণ করেন। রাজা নলের ঢোলা নামে এক পুত্র ছিল। পিঙ্গলের রাণী ইহাকে দেখিয়া নিজের কন্যা মাররণীর সহিত ইহার বিবাহ প্রস্তাব করেন, এবং সেই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। মাররণীর বয়স ঐ সময়ে অত্যন্ত অল্প অর্থাৎ দেড় বৎসর ছিল, (আর ঢোলার বয়স ছিল তিন বৎসর)।* তাই পিঙ্গল যখন নিজের দেশে প্রত্যাগমন করেন তখন মাররণীকে শ্বশুরালয়ে না রাখিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। পরে কালক্রমে ঢোলার মাররণী বা তাঁহার সহিত নিজের বিবাহের কথা মনে থাকিল না। মালবণী নামে এক কন্যার সহিত তাঁহার পুনর্ব্বার বিবাহ হইল। এদিকে যৌবনাবস্থায় প্রবেশ করিলে মাররণী নিজের পতি ঢোলাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তাঁহার বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পিঙ্গল জামাতাকে আহ্বান করিবার জন্য লোকজন প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মালবণীর ষড়যন্ত্রে তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। পরে কোনো সময়ে এক সওদাগর আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে ঢোলাকে মাররণীর সহিত তাঁহার বিবাহের কথা শুনায়। এমন সময়ে রাজা রাণার পরামর্শে এক ভিক্ষুককে প্রেরণ করেন। এই ভিক্ষুক মালবণীর কৌশল অতিক্রম করিয়া ঢোলার বাসগৃহের নিকটে থাকিয়া রাত্রিকালে করুণ স্বরে মারুর সংবাদ গান করিতে লাগিল। ঢোলা ইহা শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এক দিন প্রাতে তিনি ঐ ভিক্ষুককে নিজের পাশে ডাকিয়া সমস্ত বিবরণ শুনিলেন, মাররণীর সহিত মিলনের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিল।

সম্পাদকগণ ঢোলা ও মারুর সম্বন্ধে অপর তিনটি গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে নিম্নে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করা হইতেছে, কিন্তু বলিতে পারি না, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তথাপি আশা করা যায়, পাঠকগণ ইহা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

মাররণী স্বপ্ন দেখিয়া বলিতেছেন—

> সুপনই প্রীতম মুঝ মিল্যা, হূঁ লাগী গলি রোই।
> ডরপত পলক ন খোলহী, মতিহি বিছোহউ হোই। ৫০২।।

(হে সখি,) স্বপ্নে প্রিয়তম আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার গলায় লাগিয়া গিয়াছিলাম। ভয়ে আমি পলক খুলি নাই, পাছে বিচ্ছেদ হয়।

> সুপনই প্রীতম মুঝ মিল্যা, হূঁ গলি লগ্গী ধাই।
> ডরপত পলক ন ছোড়হী, মতি সুপনউ হই জাই।। ৫০৩।।

স্বপ্নে প্রিয়তম আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, আমি দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার গলায় লগ্ন হইয়াছিলাম। ভয়ে আমি পলক ছাড়ি নাই, পাছে ইহা স্বপ্ন হইয়া যায়।

> আজ জ সূতী নিসহ ভরি, প্রীয় জগাঈ আই।
> বিরহ ভুয়ংগমকী ডসী, লরথরতী গল লাই।। ৫০৪।।

আজ যে, রাত ভর শুইয়াছিলাম, (মনে হইতেছিল যেন) প্রিয় আসিয়া জাগাইয়াছেন; তাঁহার বিরহ-ভুজঙ্গমের দংশনে কম্পিত হইয়া আমি তাঁহাকে গলায় জড়াইয়া ধরিয়াছি।

> জব জাগূঁ তব একলী, জব সোঊঁ তব বেল।
> সোহণা, থে মনে ছেতরী, বীজী বীজী বেল। ৫১১।

যখন জাগিয়া থাকি তখন একলা, আর যখন শুই তখন দুই হই। হে স্বপ্ন, তুমি নূতন-নূতন খেলা করিয়া আমাকে ঠকাইয়াছ।

> জিম সুপনংতর পামিযউ, তিম পরতথ পামেসি।
> সজ্জন মোতীহার জ্যূঁ, কংঠ গ্রহণ করেসি।। ৫১৩।।

যেমন স্বপ্নের মধ্যে পাইয়াছি তেমনি যদি প্রত্যক্ষ পাই, তবে সজ্জনকে (অর্থাৎ প্রিয়তমকে) মোতির মালার মত কণ্ঠে ধারণ করিয়া রাখি।

ঢোলা ও মাররণীর মিলনের একটি কবিতা এই :—

> মন মিলিয়া, তন গডিয়া, দোহগ দূরি গযাহ।
> সজ্জন পাণী-খীর জ্যূঁ, খিরোখিল থয়াহ।। ৫৫৩।।

মন মিলিল, তনু গলিল, দুর্ভাগ্য হইল দূর। প্রিয়তম ও প্রিয়তমা দুধ আর জলের মত মিলিয়া এক হইল।

মররণী—

> হিয়মা করই বধামণা, সহী ত সীধা কাজ।
> জে সুপনংতর দীখতা, নয়ণে মিলিয়া আজ। ৫০৭।

হৃদয়ে মনে করিলেন, সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহাকে স্বপ্নে দেখা গিয়াছিল, (আজ) তিনি চোখে মিলিত হইয়াছেন।

> জিণনূঁ সুপনে দেখতী, প্রগট ভয়ে প্রিয় আই।
> ডরতী আঁখ ন মূঁদহী, মত সুপনউ হুয় জাই। ৫৫৮।।

যাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতেছিলাম (সেই প্রিয়তম) আসিয়া প্রকট হইয়াছেন। ডরে আমি আঁখি মুদি না, পাছে ইহা স্বপ্ন হইয়া যায়।

বর্ষার কথা হইতে এই কয় পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে :—

> ফৌজ ঘটা, খগ দামণী, বূঁদ লগই সর জেম।
> পাবস পিউ বিণ বল্লহা, কহি জীবীজই কেম।। ২৫৫।।

ঘনঘটা ফৌজ, দামিনী খড়্গ, বৃষ্টির বিন্দু যেন শর। হে বল্লভ, এই বর্ষায় প্রিয় বিনা কিরূপে বাঁচা যায়।

> জিণ রুতি বহু বাদল ঝরই, নদিয়াঁ নীর প্রবাহ।
> তিণ রুতি সাহিব বল্লহা, মো কিম রয়ণ বিহায়। ২৫৯।

যে ঋতুতে বহু বাদল (মেঘ) ভরিয়া আসে, নদীতে জলের প্রবাহ হয়, সেই ঋতুতে, হে নাথ, হে প্রিয়, (তোমা বিনা) আমার রাত কিরূপে যাইবে।

> জিণ দীহে পাবস ঝরই, বাবীহউ কুরলাই।
> তিণি দিনকউ দুখ বল্লহ, মই কাউ সহণউ জাই।। ২৬১।।

যে দিন বর্ষা ঝরিতে থাকে, পাপিয়া করুণ শব্দ করে, হে বল্লভ, সে দিন আমার দুখ কেমনে সহা যায়।

> মহি মোরাঁ মংডব করই, মনমথ অংগি ন মাই।
> হূঁ এক লড়ী কিম রহউ, মেহ পধারউ মাই। ২৬২।

মহীর উপর ময়ূর (পেখম ধরিয়া) মণ্ডপ করিয়াছে, মন্মথ অঙ্গে আর ধরে না। হায় মা! তুমি মেঘের দিনে চলিয়া যাইতেছ।

> জিণ দাহে রণ হর ধরই, নদী খলক্কই নীর।
> তিণ দিন ঠাকুর কিম চলই, ধন কিম বাঁধই ধীর।। ২৬৫।।

যে দিন বন হরিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে, নদীতে নীর কলকল

* দ্রষ্টব্য দোহা ৪৫০।

করিয়া চলিয়াছে, সেই দিন ঠাকুর আমার কিরূপে চলিয়া যান, ধনী (প্রিয়া) তাঁহার কিরূপে ধৈর্য্য বাঁধিতে পারে।

উত্তর আজ স উত্তরউ, পালউ পড়ই অসেস।
দহিসী গাত জু বিরহিণী, জাক প্রী পরদেস। ২৯২।

আজ উত্তর পবন আসিয়াছে, বড় ঠাণ্ডা পড়িয়াছে; যাহার প্রিয় পরদেশে সেই বিরহিণীর গা দহিয়া যাইবে।

ঢোল মারবণীর নিকট চলিয়া গেলে মালবণী বিলাপ করিতেছেন—

সজ্জণ চাল্যা হে সখী, বাজ্যা বিরহ নিসাণ।
পালংগী রিসহর ভঈ, মংদির ভয়উ মসাণ। ৩৫২।

হে সখি, সজ্জন (অর্থাৎ প্রিয়তম) চলিয়া গেলেন, বিরহের নাগরা বাজিয়া উঠিল। পালঙ্ক আমার বিষধর হইয়াছে, আর মন্দির হইয়াছে মশান।

সজ্জণ চাল্যা হে সখী সূনা করে আবাস।
গলের ন পাণী উতরই হিয়ে ন মাবই সাস। ৩৫৮।

হে সখি, আবাস আমার শূন্য করিয়া আমার সজ্জন (প্রিয়) চলিয়া গেলেন; আজ গলা হইতে জল নীচে নামে না, আর শ্বাসও হৃদয়ে ধরে না।

সযণা, পাঁথাঁ প্রেম কী তইঁ অর পহিরী তাত।
নয়ণ কুরংগউ জ্যূঁ বহই, লগই দীহ নই রাত। ৩৬৪।

হে সজ্জন (প্রিয়), তুমি আজ প্রেমের সতেজ পাথ ধারণ করিয়াছ। আর আমার নয়ন যেন কুরঙ্গ হইয়া (তোমার পেছনে) দৌড়িতেছে। এ দিবসেও লাগে (থামে) না, রাত্তেও লাগে না।

সাল্হ চলংতই পরঠিয়া আঁগণ বীখড়িয়াঁহ।
কূবাকেরী কুহড়ি জ্যূঁ, হিয়ড়ই হুই রহিয়াঁহ। ৩৬৭।

সাল্হ (=ঢোলা) চলিবার সময় আঁগিনাতে পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কূপের কুহরের মত আমার হৃদয়ে রহিয়াছে।

সজ্জণ গুণে সমুদ্দ তূঁ, তর তর থকী তেণ।
অবগুণ এক ন সংভরই, রহু বিলংবী জেণ। ৩৭৬।

হে সজ্জন (প্রিয়), গুণে তুমি সমুদ্র, তাহাতে সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে আমি থাকিয়া গিয়াছি। তোমার একটিও অপগুণ নাই, যাহাকে (একটু) আশ্রয় করিয়া রহিতে পারি।

মালবণী বিরহে কাতর হইয়া ঢোলাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নিজের শুক-পক্ষীকে বলিলেন যে, সে যেন ঢোলাকে কৌশলে আমন্ত্রণ করে; যদি তিনি আসিতে না চান তবে যেন তাঁহাকে শুনায় যে, মালবণীর মৃত্যু হইয়াছে। ঢোলা উষ্ট্রপৃষ্ঠে মারবণীর নিকট যাইতেছিলেন। পথে চংদেরী ও বূঁদী নগরের মধ্যে এক সরোবরের তীরে তিনি যখন দাঁতন করিতেছিলেন সেই সময়ে শুক তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াও ফল না পাওয়ায় বলিল যে, মালবণীর মৃত্যু হইয়াছে। ঢোলা বলিলেন—

সূবা সগুণ জ পংখিয়া, মূঁহাকউ কহউ করে জ।
নব মণ চংদণ মণ অগর, মালবণী দাগে জ। ৪০৫।

হে শুক, তুমি গুণবান্ পক্ষী, আমার কথা করিও, নয় মণ চন্দন আর এক মণ অগুরু দিয়া মালবণীর দাহ করিও।

শুক যখন দেখিল ঢোলা কিছুতেই ফিরিবেন না, তখন বলিল—'আপনি যান, সিদ্ধি হউক, আশা পূর্ণ হউক, আর বিয়োগে যে জন কাতর হইয়া আছে, তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহার চিত্তে উল্লাস দান করুন ("দিয়উ উল্হাস")।

এই প্রেমগীতিখানি এত সুন্দর যে, পড়িতে আরম্ভ করিলে থামিতে ইচ্ছা করে না। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে এ সম্বন্ধে সমস্ত বক্তব্য প্রকাশ করা অসম্ভব। তাই আমরা আর কয়েকটি দোহা তুলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

মারবাড়ে জলের বড় কষ্ট। এ সম্বন্ধে বড় চমৎকার বর্ণনা করা হইয়াছে। ঢোল পথে যাইতে-যাইতে দেখিলেন কূপ হইতে এক জন জল তুলিতেছে। কূপের গভীরতা দেখিয়া তিনি বলিলেন সে কেমন করিয়া জল তুলিবে। লোকটি উত্তর করিল—

তূ্ঁ জারউ ঘর আপনই, মূহারী কেহী তাত।
দীহে দীহ উসারিস্যাঁ, ভরিস্যাঁ মাঁঝিম রাত। ৫২৫।

তুমি আপনার ঘরে যাও। আমার জন্য তোমার তাপ কেন? দিবস-ভর জল উঠাইব, আর মাঝ রাত (পাত্রটি) ভরিব।

ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণনা আর কি হইতে পারে? আরো দুই একটি দোহা তুলি—

বালউ বাবা দেসড়উ, পাণিসংদী তাতি।
পাণী কেরই কারণই প্রী ছংডই অধরাতি। ৬৫৬।

বাবা, সেই দেশকে পোড়াইয়া দি, যেখানে জলের কষ্ট, যেখানে জলের (অর্থাৎ জল তুলিবার) জন্য প্রিয় আধ রাতেই ছাড়িয়া যান।

বাবা ম দেইস মারুবাঁ, বর কূঁআরি রহেসি।
হাথি কচোলউ, সিরি ঘড়উ সীচংতী য় মরেসি। ৬৫৯।

বাবা, মারবাড়ে আমাকে দিবেন না, বরং কুমারী রহিব। (জল তুলিবার জন্য) হাতে বাটী, আর মাথায় ঘড় (জল) টানিতে-টানিতেই মরিব।

মালব দেশের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

বালূঁ বাবা দেশড়উ জঁহা ফীকরিয়া লোগ।
এক ন দীসই গোরিয়াঁ ঘরি-ঘরি দীসই সোগ। ৬৬৫।

বাবা, সেই দেশকে পোড়াইয়া দি, যেখানে লোকের ফিকা (নীরস) যেখানে একটিও গৌরাঙ্গী দেখা যায় না, এবং যেখানে (মলিন বস্ত্র পরিধান করায়) ঘরে-ঘরেই শোক।

নিম্নে উদ্ধৃত দোহা দুইটিতে মারবাড়ের প্রশংসা করা হইয়াছে—

মারুদেস উপন্নিয়াঁ, সর জ্যাঁউ পধ্ধরিয়াঁহ।
কড়বা ক দে ম বোলহী, মীঠা বোলনিয়াঁহ। ৬৬৭।

মরুদেশে উৎপন্ন স্ত্রীলোকেরা শরের মত সরল। ইঁহারা কখনো কটু কথা বলেন না, ইঁহারা মিষ্ট কথা বলেন।

দেস নিবাণূঁ সজল জল, মীঠা-বোলা লোই।
মারু-কামিণি দিখণি ধর হরি দীয়ই তউ হোই। ৬৬৮।

এই দেশে শস্য হয় (?), জল সরস, ও লোক মিষ্টভাষী। যদি হরি দেন তবেই মরুদেশের কামিনীকে দক্ষিণ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

আলোচ্য পুস্তকখানি সর্ব্বপ্রকারে পাঠোপযোগী করিবার জন্য সম্পাদকগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। বৃহৎ ভূমিকায় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ হইতে রাজস্থানীর বিকাশের কথাও আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা রাজস্থানী পড়িতে চাহেন তাঁহারা ইহাতে উহার ব্যাকরণ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। শব্দকোষেও ইঁহাদের অনেক উপকার হইবে। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, এবং পাঠকগণকে ইহার রস আস্বাদন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। সম্পাদক মহাশয়গণ ও কাশীর নাগরীপ্রচারিণী সভার নিকট সমগ্র সাহিত্যসমাজ কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা ভবিষ্যতে এইরূপ আরো উপহার লাভ করিব।

পরিশেষে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহ শিক্ষার পরিচালকগণের নিকট একটি নিবেদন। এই বিভাগে প্রতি বৎসরেই বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া উপাধি লইয়া যান। মনে প্রশ্ন জাগে, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা শিখিয়া তাঁহারা ঐ ঐ সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে নিজ-নিজ মাতৃভাষায় কতটা কি সংগ্রহ করিতে পারিলেন? ইহার একটা হিসাব লইলে ভাল হয়। ইচ্ছা করিলে এই বিভাগের ছাত্রেরা আয়াসে আলোচ্য পুস্তকখানির মত বহু পুস্তক বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় আমাদিগকে দিতে পারেন। ধরা যাউক না, যদি এই ঢোল-মারুর দুহাকে হিন্দীর ন্যায় বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া মূলের সহিত প্রকাশ করা যায়, তবে কত না ভাল হয়। এই পদ্ধতিতে চলিলে দেখা যাইবে অল্প কালেই বঙ্গভাষায় কত সমৃদ্ধি হইয়াছে। বাঙালীরা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাকে এখনো আদর করিল না, কেমন যেন তাঁহাদের একটা অবজ্ঞা আছে। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য।

জলতরঙ্গ

শ্রীমনোজ বসু

নূতন নূতন ঘর ও গোলা বাঁধা ত্রিলোচন দাসের এক নেশা। ঘরের আর অন্ত নাই, আনাচে-কানাচে সকল জায়গায় ঘর; পৈতৃক আমলের প্রশস্ত উঠান ইদানীং এক গোলকধাঁধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—একবার ঢুকিয়া পড়িলে বাহির হইবার পথ পাওয়া দায়। আবার খুঁজিয়া পাতিয়া পথ নিতান্ত যদি মিলে, ত্রিলোচন অমনি আগলাইয়া আসিয়া দাঁড়াইবে। বলে—হুঁঃ, যাওয়া বললেই হ'ল? ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলে নাকি? ব'সো—ব'সো—তামাক খাও—চান ক'রে একসঙ্গে ব'সে দুটো শাকভাত খাওয়া যাবে।—তার পর যেও।

ফুলকুমারী ত্রিলোচনের দ্বিতীয় পক্ষের বউ। বয়স বেশী নয়—ছেলেপুলে হয় নাই আজও। তা হইলে কি হয়—সে ইতিমধ্যেই বিশপঁচিশটি শিশুর মা হইয়া মহা ভারিক্কি চালে চলিতে লাগিয়াছে। ত্রিলোচনের আগের সংসারের ছেলে-মেয়ে দুটি—হারাণ ছোট, সে ত রাত-দিন মায়ের পিছনে লাগিয়াই আছে; আর মেয়ে পটেশ্বরী—অতদূর নয় যদিও—তবু খেলাধূলার ফাঁকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রায় একবার করিয়া তার মাকে দেখিয়া যাইতে হয়। ওদিকে ন-পিসীর দুই মেয়ে; বাণীর দু-বছরের খোকা একটি, সদুর মা, গোলাপী—ইহাদের সব ছেলেমেয়ে—শেষরাত হইতেই এঘরে ওঘরে দুই-এক করিয়া জাগিয়া উঠিয়া শিশুরা তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতে সুরু করে। ঐ যে চলিল, সমস্ত দিন ও রাত্রি এক প্রহরের আগে তার বিরাম নাই। মাঝে মাঝে খণ্ডযুদ্ধ চলে, ব্যাপার তুমুল হইয়া উঠিলে ফুলকুমারীকে রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া পড়িতে হয়।

সে-বার কি একটা যোগ ছিল, পাড়া ভাঙিয়া মেয়েপুরুষ সব কলিকাতায় গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। সকালবেলা কি কাজে ত্রিলোচন ঘরে আসিয়াছে, ফুলকুমারী চট করিয়া ঢুকিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। রান্না করিতেছিল, আগুনের তাপে মুখ লাল। একটু হাসিয়া বলিল—একটা কথা বলব?

—কি?

—রাখ ত বলি। নইলে মিছিমিছি—। তার পর স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া চোখ বড় বড় করিয়া কৌতুকভরা স্বরে কহিল—বল দিকি কেমন! যদি বলতে পার বুঝব তবে—

ত্রিলোচন গবেষণা করিয়া কহিল—কাঁচা লঙ্কা এনে দিতে হবে বোধ হয়।

—ঐ তোমার কথা। তোমার কেবল সংসার সর্ব্বস্ব। বধূ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটু পরে গম্ভীর হইয়া বলিল—দেখ, সংসারের কচকচি নিয়ে আছি ত রাত-দিন। পরকালের একটু কাজ ক'রে আসি। মোক্ষদা-দিদি বলছিল—বউ, চল্ না কেন—একটা ডুব দিয়ে আসবি।

ত্রিলোচন কহিল—খুব একটা সহজ বুদ্ধি বাতলে দিতে পারি। ফুলকুমারী উৎসুক চোখে চাহিয়া আছে। ত্রিলোচন বলিতে লাগিল—একটা ডুব বইত নয়? [illegible]

'জয়গঙ্গা' ব'লে এই দুধমতীতেই নেমে পড়ো। কোথাও যেতে হবে না···কোন হাঙ্গাম পোয়াতে হবে না···ওই ভাল—

বধূ বলে—ঐ নোনা গাঙ হ'ল তোমার গঙ্গা ?

'শত যোজন দূরে থাকি যদি গঙ্গা বলে ডাকি—' ভুলে গেছ শিশুবোধকের কথা ? নোনা গাঙ—তা কি হয়েছে। বলিতে বলিতে ত্রিলোচনের কণ্ঠ গভীর হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল—হ'লই বা নোনা গাঙ—তিন সন্ধ্যে আমাদের অন্ন যোগাচ্ছে। দেখে এসো গে একবার ঐ কুশখালি ন'হাটা অঞ্চলে। এক কোশ দু-কোশ সব মাঠ পড়ে রয়েছে,—এক চিটে ধান নেই—বর্ষায় অথই জলে তলিয়ে থাকে, গাঙ্ নেই, তাই জল নিকেশ হয় না। বউ, ঐ দুধমতী আমাদের গঙ্গা—মা গঙ্গা—খাইয়ে দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখছে—ওকে ঘেন্না ক'রো না।

ফুলকুমারী মুখ ঘুরাইয়া বলে—তাই বলছি বুঝি। খালি কথা যোয়ানো তোমার। আমি ওদের সঙ্গে যাব কলকাতা। দুটো ভাল-মন্দ দেখব শুনব—একটু হাঁপ ছেড়ে বেড়াব। রাত-দিন হাঁড়ী-বেড়ী ঠেলতে পারি নে তোমার !

আয়োজন চলিতে লাগিল। ফুলকুমারীর স্ফূর্তির অবধি নাই। কাজের একটু ফাঁক পাইলেই এটা-সেটা গোছাইয়া মোট বাঁধে। মোটঘাটের পাহাড় হইতে লাগিল। রকম দেখিয়া ত্রিলোচন কহিল—ব্যাপার কি বউ ? পুরোদস্তুর একটা সংসার নিয়ে চলেছ—পাকাপাকি গঙ্গাবাস করবার মতলব নাকি ?

ফুলকুমারী কথা গায় পড়িতে দিবার মেয়ে নয়—বলিল মন্দ কি। সংসার, স্বামী, ছেলেপুলে—সমস্ত সাধ ত ভগবান পুরোলেন। আমার মত ভাগ্যি কার ? এসো না, বুড়োবুড়ী দু-জনে গঙ্গাতীরে থেকে পরকালের কাজ করি গে—

ত্রিলোচন সত্রাসে চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল—মা গঙ্গা মাথায় থাকুন। বাপ রে বাপ ! অঘ্রাণ মাসে পিসির বাড়ি গিয়ে শেষ একটা বেলাতেই পাগল হয়ে যাই আর কি··· চারিদিক চুপচাপ, কি রকম যেন—মনে হচ্ছিল, কে যেন বুকের উপর বিশমণী পাথর চাপিয়েছে—

ফুলকুমারী যেন কত মুরুব্বী মানুষ। তেমনি ভাবে কহিল—সত্যি। বড্ড বেশী মায়া তোমার। আমি ত অবাক হয়ে যাই। দুপুরবেলা নন্দ এসে চুল টানবে, পটু বুকের উপর ঝাঁপাবে, খোকা আগড়ুম-বাগড়ুম বকবে, তিন্নু টুনি সব দল বেঁধে ঘরের মধ্যে কানামাছি সুরু করবে, তবে বাবুর ঘুম আসবে। আচ্ছা এক অভ্যেস করেছ কিন্তু—

ত্রিলোচন কহিল—ও বিষয়ে তুমি একেবারে পরমহংস ; মায়ামমতা মোটে নেই। সবাই কি অমন পারে ? কিন্তু বউ, তা যেন হ'ল। তোমার নন্দ পটু ওদের চুল টেনে কি আগড়ুম বাগড়ুম ব'কে সত্যি সত্যি ত পেট ভরবে না। তার ব্যবস্থা কি ক'রে যাবে শুনি।

—একটা কিছু হবে নিশ্চয়। বলিয়া বধূ আড়চোখে চাহিয়া স্বামীর মুখভাবটা দেখে, আর মুখ টিপিয়া হাসে। বলে—তুমি রইলে কি করতে মশায় ? ওদের খাওয়াবে, নাওয়াবে, নিয়ে শোবে—আর—আর ঘেন্না করলে ছেলে মানুষ করা যায় না গো—সমস্তই করতে হবে। আর শুনে নাও ভাল করে—পটুর সর্দ্দি করেছে, ওর ভাত বন্ধ—যদ্দিন না সারে দুধসাগু। হারাণ পেটরোগা, ওর দুধে জল মিশিয়ে দিও। নন্দর একবেলা ভাত, একবেলা খই। মাছ-টাছ গুচ্ছেরখানেক কাউকে না দেয়—বায়না ধরলে, খুব ক'সে এক তাড়া দিও। সমস্ত মনে থাকবে ত ? কি বল ?

ত্রিলোচন মহা উৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—খুব খুব। এ আর বেশী কথা কি। হারাণের দুধখই, নন্দর দুধসাগু, পটু মাছ খাবে না···সে সব ঠিক আছে, কিছু ভেবো না বউ। কিন্তু রাত পোহালে তোমার বাড়িতে আরও খানপঞ্চাশেক পাতা পড়ে, তাদেরও কি ঐ রকম ব্যবস্থা ?

ফুলকুমারী হাসি চাপিয়া বলিল—ঠিক ঐ রকম। যাক দুর্ভাবনা ঘুচলো আমার।

ত্রিলোচন কহিল—কিন্তু আমার ঘুচবে না। আমায় ফেলে গেলে, রাত-দিন এমন ব'সে ব'সে ভাবব—পথ ত মোটে সুবিধের নয় কিনা···খাল দিয়ে, গাঙ দিয়ে, রেলগাড়ী দিয়ে—বিস্তিরি।

মুখ ঘুরাইয়া বধূ বলিল—ওঃ, ভাবনায় কি পার আছে ! গাঙের পথ ঐ ষ্টেশন অবধি। আর রেলগাড়ীতে পুরো একটা বেলাও লাগে না—

ত্রিলোচন বলিতে লাগিল—আহা, খবর ত রাখ না।

দুধমতীতে নতুন পুল হয়েছে—গুমগুম ক'রে গাড়ী তার ওপর দিয়ে চলে যাবে। ঝুপ ক'রে তোমার গাড়ীখানা যদি ছিঁড়ে পড়ে গাঙের জলে। ...কিংবা ধরো—তুমিই যদি গাড়ীর জানালা দিয়ে যাও প'ড়ে...

বধূ কিন্তু ভয় পায় না; ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে। বলে—মুস্কিল তা হ'লে তোমার বটে। আবার ছালনাতলায় গিয়ে নতুন শালীশালাজের ঠোনা খেতে হবে। না?—বলিয়া তাকাইয়া থাকে। আবার বলিয়া ওঠে—সে ভয় নেই গো। পড়ি ত ডুববো না কিছুতে, ভেসে উঠব। দুধমতী মেয়েমানুষ—আমিও। সে আসবে মেয়েমানুষের সঙ্গে লাগতে—ভয় নেই মনে মনে?

একটা মজার গল্প এ অঞ্চলের ঝি-বউ বলাকওয়া করিয়া থাকে। গল্পটা নদীর ঐ পুলের সম্বন্ধে। সত্য হইলে, মেয়েমানুষ সম্পর্কে দুধমতীর ভয় থাকিবার কথাই বটে। লোহালক্কড়ের জালে আবদ্ধ নদী; বুকের উপর সেতুর জগদ্দল পাথর লইয়া এই বছরখানেকের মধ্যেই তার উদ্দাম তরঙ্গ বেশ শান্ত ও ভদ্রতাসঙ্গত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ জলের বেগ কমাইতে কোম্পানী বাহাদুর জলের মত টাকা ঢালিয়াছেন, কত লোকজন আসিয়াছিল, এপার ওপার ছাউনী করিয়াছিল, ছোটসাহেব বড়সাহেব কত আসিল, তাদের ক্লান্তিহীন অবিরাম চেষ্টা দুধমতী বুদ্বুদের মত, একটি কলমী-ডগার মত, তীরবর্ত্তী অসহায় বাবলা-শিশুগুলার মত, অবহেলায় ডুবাইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইত। শেষে ত কোম্পানী রাগিয়া খুন...সাহেবের চাকরি থাকে না এমনি গতিক,—হঠাৎ কোথা হইতে একদিন মেমসাহেব আসিয়া হাজির। গাছ-কোমর বাঁধিয়া মেমসাহেব নদীর পাড়ে কোন্দল করিতে আসিল—দেখি দুধমতী, তোর আস্পর্দ্ধা কেমন! আমার বরের চাকরি খাবি? মেমসাহেব নিজে সাহেবের পাশে থাকিয়া লোহালক্কড় বসাইতে লাগিল। দুধমতী সেই হইতে এতটুকু। গাঙ বাঁধা হইয়া গেল। মেয়েমানুষকে পুরুষে জব্দ করে করিতে পারিয়াছে...মেয়ে নইলে হয় না ওসব।

রওনা হইবার আগের দিন খুব রাগ করিয়া আসিয়া ফুলকুমারী বলিল—ডিঙি তোমায় কে ঠিক করতে বলেছে, শুনি?

নির্ব্বিকার কণ্ঠে ত্রিলোচন বলিল—ভেবেছিলাম, সত্যি সত্যিই যাবে বুঝি। না যাও ত বল, মানা ক'রে পাঠাই—

ফুলকুমারী কহিল—হ্যাঁ, ডিঙি মানা করে বড় দেখে পানসী ভাড়া কর গে। নন্দ যাবে, পটু যাবে, হারাণও যাবে... শোন একটা মজার কথা—কাল নন্‌পিসি এমনি একবার হারাণকে বলেছে, তোকে নিয়ে যাবে না কলকাতায়—ছেলের সেই থেকে মুখের ভাব যদি দেখ—কিছুতে শান্ত করতে পারি নে—

—তিনু, টুনি, সন্তু—ওরাই বা দোষ করলে কি, বউ? ওদের নেবে না?

মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বধূ কহিল—তাই ত ভাবছি। রাতদিন যা করে বেড়ায়—আমি টিকটিক ক'রে মরি। না নিয়ে গেলে দেখবে কে? তোমার হাতে দিয়ে যাব, ভেবেছ?

ত্রিলোচন হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—আমিও তাই বলি বউ, হয় দলসুদ্ধ রওনা হও; নয়ত আর দিনকতক সবুর করো, ছেলেপিলে তোমার বড় হোক।—কিন্তু যে রকম সব শান্ত শিষ্ট—দলসুদ্ধ নিয়ে পথে ঘাটে সামলাতে পারবে ত?

ফুলকুমারী রাগিয়া উঠিল। বলিল—আমার বয়ে গেছে। আমি যাব তীর্থ করতে, সঙ্গে পল্টন নিয়ে যাব! ভারী আমার ইয়েরা কিনা, একটাকেও নেব না।

দ্রুতপদে সে চলিয়া গেল। রাত্রে ত্রিলোচন আসিয়া খবর দিল—এই মস্ত বড় পান্সী, একেবারে চার টাকা আগাম দিয়ে এলাম। তোমার সবসুদ্ধ স্বচ্ছন্দে ধরে যাবে বউ,—

ফুলকুমারীর তবু আপত্তি। বলে—উন্মাদের সঙ্গে যাচ্ছি না, তা ব'লে। ছেলেপিলে নিয়ে...ও বলে নিজেই এক ছেলেমানুষ। তোমাকে যেতে হবে।

ত্রিলোচন স্বীকার করিল—আচ্ছা।

ফুলকুমারী তবু ভাবিতে লাগিল। বলিল—সকালে উঠে তিনু সন্তুকে গরম মুড়ি ভেজে দিই; নন্দ মুড়ি খায় না, খালি দুধ। তোমার কলকাতায় দুধ-মুড়ি পাওয়া যায় ত?

ত্রিলোচন কহিল—যায় বোধ হয়।

ফুলকুমারী কহিল—আন্দাজী বললে ছেলেপিলে নিয়ে যাই কোন্ ভরসায়? তুমি একটু খবরও নিতে পার নি? আবার

মুস্কিল এমনি, পটুটার সর্দ্দি কিছুতে যাচ্ছে না; রাস্তাঘাটে ঠাণ্ডা না লাগে।

ত্রিলোচন বলিল—গরম কাপড় গায়ে থাকবে। আর ঠাণ্ডা একটু-আধটু লাগলেই বা কি হচ্ছে? সমস্ত ঠিকঠাক, পানসীর চার টাকা বায়নাও দেওয়া হয়ে গেছে—

ফুলকুমারী আগুন হইয়া উঠিয়া বলিল—টাকাটা দেওয়া হয়েছে ত কি হয়েছে? টাকার জন্য ছেলেপিলে ত বিসর্জ্জন দিয়ে আসতে পারি নে। পানসী মানা করে লোক পাঠাও—যায় টাকা, যাক গে—

ত্রিলোচন ইতস্তত করিয়া কহিল—সেটা কি ঠিক হবে বউ? বিবেচনা ক'রে দেখ—চার-চারটে টাকা। ও ত ফেরৎ দেবে না।

আরও অধীর হইয়া ফুলকুমারী বলিল—টাকা আমি হাতের বাউটি বেচে দেব। আমি যাব না, মানা ক'রে পাঠাও। আর না পার ত বল, গোবিন্দকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

—গোবিন্দ খুঁজে পাবে না…

—কেন? ঘাটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে—

ত্রিলোচন মাথা চুলকাইয়া বলিল—ঘাটে পান্‌সী একখানাও নেই…

ফুলকুমারী কহিল—তাই বলি। পান্‌সী হয়েছে—হেনো হয়েছে—তেনো হয়েছে—মিছিমিছি আমায় শাসিয়ে আসছ। আমি যাব, আর পয়সা খরচ ক'রে তুমি করবে পান্‌সী ভাড়া: আ আমার কপাল। তোমার পরাণ-জেলের ঐ নড়বড়ে বিনি-পয়সার ডিঙি ব'লে রেখেছ নিশ্চয়। ওতে আমি যাব না, কখনো যাব না—এই ব'লে দিলাম।

অপরাধীর ভাবে ত্রিলোচন কহিল—তাও হয়ে ওঠে নি বউ, পরাণ মাছ ধরতে নাবালে চলে গেছে—

—জানি—জানি—এবার বধূ রাগিয়া উঠিল—আমি কোথাও যাই সে কি তোমার ইচ্ছে? আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছ।

ত্রিলোচন বলিল—তোমাকেও জানি ত। বায়না দিয়ে অনর্থক টাকা নষ্ট করব কেন? বেশ ত বউ, গঙ্গা শুকিয়ে যাচ্ছে না, ছেলেপিলে বড় হোক, তখন আমরা পুণ্যি করতে যাব—

নিশ্বাস ফেলিয়া বধূ কহিল—সে আর পোড়া অদৃষ্টে আছে! পায়ের এক-শ গণ্ডা বেড়ী। আমিও এই বললাম, মরুক বাঁচুক—মারামারি খুনোখুনি ক'রে মরে যদি সবগুলো, আমি আজ থেকে তাকিয়েও দেখব না।—সবাই সগ্‌গে বাতি দেবেন কি না?

বাড়ির দক্ষিণে পুকুর ও নারিকেল বাগান, তার পর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা, তার ওদিকে দিগন্তবিসারী বিল। ঐ বিলের মধ্যে ত্রিলোচনের জোতজমি সমস্ত। বিলের এক দিকে মধুমতী, আর এক দিকে খাল। বেশ চলিতেছিল, হঠাৎ ঐ খালের গতিকে সব উল্টা হইয়া দাঁড়াইল। খালের কি হইল, মানুষের সঙ্গে যেন আড়ি দিতে লাগিয়া গেল। আষাঢ় শ্রাবণে ধান দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়, শ্যামল চিক্কণ বড় বড় গোছা…যেদিকে তাকাও বিলের কোনখানে ফাঁক নাই। কোটালের মুখে হঠাৎ এক সাংঘাতিক খবর পাওয়া গেল, খালের জল অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে, সেদিকের বাঁধ কিছুতে রাখা যাইতেছে না। খালের পার্শ্বে পেরেক-আঁটা জারুল কাঠের প্রকাণ্ড কবাট ফেলা থাকে, বর্ষার জলে বিল বেশী ভরিয়া গেলে, ভাঁটার সময় কবাট তুলিয়া দেওয়া হয়। বাড়তি জল সরিয়া গিয়া ধানের মাথা জাগিয়া ওঠে। বছরের পর বছর খাল এমনি করিয়া বিলের জল মধুমতীতে বহিয়া দিতেছে। হঠাৎ সে যে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া বিদ্রোহ করিয়া বসিবে, এ অঞ্চলের দশটা গ্রামের লোক এমন কথা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই।

ত্রিলোচন ছুটিয়া জমিদারের কাছারী চলিল। প্রজাপাটক সকলেই ছুটাছুটি লাগাইয়াছে। খবর মিথ্যা নয়। নায়েব কাছারীতে নাই, খালের ধারে নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাঁধে মাটি ফেলার তদারক করিতেছেন। এদিকে বিলের জল, ওদিকে খালের জল বাঁধের গায়ে ছলছল করিয়া আঘাত করিতেছে, সুবিপুল জলরাশির মধ্যে সামান্য একটি রেখার মাত্র ব্যবধান। কাছাকাছি মাটি কোথাও নাই, অনেক দূর গ্রামের দিক হইতে মাটি কাটিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া বাঁধে ফেলা হইতেছে। দিনভোর জলকাদার মধ্যে নায়েবের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ত্রিলোচন বাড়ি ফিরিল। গভীর ঘুম আসিয়াছিল, রাত্রের খবর কিছুই জানে না। সকালে উঠিয়া দেখে, নারিকেল-বাগানে জল। পুকুর

ডুবাইয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার উপর দিয়া জলস্রোত একেবারে বাহিরের উঠান অবধি ধাওয়া করিয়াছে। বাঁধের কোথাও চিহ্নমাত্র নাই, বন্যার জলে সমস্ত একাকার।

ক্ষেতে সে বছর এক টিটাও মিলিল না। বছর ঘুরিতে পঞ্চম গোলাটার তলা অবধি নিঃশেষ হইল। জমিদারের তরফ হইতে চেষ্টার ত্রুটি নাই। খাল হইতে রশি দুই সরিয়া আসিয়া পর পর দুই সারি নূতন করিয়া বাঁধ দেওয়া হইল। ফসলও হইয়াছে মন্দ নয়। কিন্তু বর্ষার মাঝামাঝি আবার সেই বিপদ। বাঁধ ভাসিয়া ক্ষেতের মধ্যে নোনাজলের তুফান ওঠে। তার পর জল সরিতে আরম্ভ করে, ধানের চারাও লাল হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। নায়েব নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন সমস্ত কলিকালের ফল রে, বাবা—বামুন কায়েত কৈবর্ত্ত সব এক মাদুরে ব'সে হুঁকো টানছে—এক বেঞ্চিতে রেলগাড়ী চেপে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক ক'রে বেড়াচ্ছে—হবে না? আরও কত হবে—

তা বলিয়া খাজনা মাপ হয় না। নায়েব হাঁ হাঁ করিয়া ওঠেন। ও কথা ব'লো না বাবারা, ও কি একটা কথার মত কথা? মালেকের মাল খাজনা—বলি, বিঘেয় যখন তিন কাহন ক'রে ফলত, খাজনা কি তখন বেশী দিতে? বরঞ্চ দু-দশ দিনের সময়···কিন্তু তা-ও ত—

ঐ কিস্তুটিও বড় সহজ নহে; কিস্তর সমস্যা মিটাইতে সিকি বছরের খাজনা চলিয়া যায়। তাই করিয়া কেহ কেহ কিছু সময় লইল। ত্রিলোচনের গোলার তলায় তখনও ধান আছে। রাগে রাগে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া ব্যাপারী ডাকিয়া সে গোলার চাবি খুলিয়া দিল। খাজনা শোধ হইল এক রকম।

বনবিবিতলা বাঁধের ভিতর দিকে। ভারী জাগ্রত দেবতা। গ্রামসুদ্ধ সকলে মিলিয়া বনবিবির পূজা দিল, ঢাকঢোল বাজিল, অনেক পাঁঠা পড়িল। কিন্তু বনবিবি ঠেকাইতে পারিলেন না। খাল একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। মানুষে গাঙ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, দুধমতী বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে দিন দিন, ওদিকে পারিল না, খাল এখন সেই আক্রোশে কূল ভাঙিয়া, ধানবন ডুবাইয়া প্রমত্ত তরঙ্গাঘাতে এই দিক দিয়া প্রতিহিংসা লইতে লাগিয়াছে। পরের কোটালে দেখা গেল, বনবিবিতলাতেই নৌকা চলিবার মত হইয়াছে, টিলার উপরে হাতখানেক জলের কম নয়, দেবতার স্থান বলিয়াও খাল একটু খাতির রাখে নাই।

স্বয়ং বুড়া জমিদার চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে সাহেবী পোষাক-পরা এক জন লোক। লোকটি গাঙের ধারে ধারে ক-দিন খুব ঘোরাঘুরি করিল। শেষে ঘাড় নাড়িয়া রায় দিল, উপায় নাই। পুলে দুধমতীর স্রোত আটকাইয়াছে, স্রোত এখন খালের মুখে চলিয়াছে, খাল বড় নদী হইয়া যাইবে।

কর্ত্তা বলিলেন—কোন উপায় নেই?

সাহেব ভাবিয়া-চিন্তিয়া কহিল—খালের মুখে বাঁধ দিয়ে একদম খাল বন্ধ করে দিতে পারলে হয়। তাহ'লে ওপারে শুঁটকির খালের দিক দিয়ে স্রোত ঘুরে যেতে পারে।

—সে কি সহজ কথা?

সাহেব ঘাড় নাড়িয়া কহিল—সহজ মোটেই নয়। কাঁচা বাঁধ দিয়ে আগে জল আটকাতে হবে। শেষে চাই কি—বিশ-ত্রিশটা জয়েষ্ট বসিয়ে একদম সিমেন্টের গাঁথনী···তাও এখন নয়, এখন ঠিক ক'রে বলাও যাচ্ছে না কিছু। শীতকালের দিকে জল খুব কমে যাবে, তখনকার কথা—

—সে যে লাখ টাকার ফের। প্রজাপাটক নিশ্বাস নিরুদ্ধ করিয়া আলোচনা শুনিতেছিল, তাহাদের দিকে ফিরিয়া হতাশ ভাবে কর্ত্তা বলিলেন—শুনলে ত সকলে? উপায় নেই।

সন্ধ্যা গড়াইয়া গেল। একে একে সকলেই চলিয়া গিয়াছে, আছে একা ত্রিলোচন। ত্রিলোচন নাছোড়বান্দা হইয়া বসিল—উপায় আমার একটা ক'রে দিতেই হবে। কর্ত্তার পা ধরিতে যায়। মাতব্বর প্রজা বলিয়া সকলেই তাকে জানে, এ অঞ্চলের মধ্যে কত বড় মানী ঘর! কর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ত্রিলোচন বলিতে লাগিল—আপনার এলাকায় আমার তিন পুরুষে দু-শ বিঘে খামার জমি; তার উপর নিজে সে-বার আঠাশ-শ দিয়ে আঠাশ বিঘে নিয়েছি।··· আপনার জমি আপনার থাকুক কর্ত্তা, আর পারছি নে—আমি এবার অব্যাহতি চাই। গোলা খাঁ খাঁ করছে, গাঁটের পয়সা গুণে কাঁহাতক খাজনা টেনে বেড়াই?

আট-দশ দিন ঘোরাঘুরি করিয়া সমস্ত জমাজমি ইস্তফা দিয়া ত্রিলোচন নির্ঝঞ্ঝাট হইয়া বসিল। বাড়িতে ইদানীং

মানুষজনের ভিড় নাই, রাণী ও-বছর শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, তার ছেলেমেয়ে সব গিয়াছে, সেই হইতে খবরবাদও সে বিশেষ কিছু দেয় না...গোলাপী গিয়াছে, টুনিরাও গিয়াছে; অতগুলা ঘর, সমস্ত মাকড়শার জাল আর ইঁদুরের গর্তে ভর্তি, দিন অন্তর সব ঘরে এক বার করিয়া ঝাঁটা দিবারও লোক নাই। বাহিরের লোকের মধ্যে রহিয়াছে এক মোক্ষদা। ত্রিলোচন বাড়ি আসিয়া চুপচাপ দাওয়ায় পা ঝুলাইয়া বসিল।

হঠাৎ মোক্ষদাকে দেখিয়া এক ধরণের হাসি হাসিয়া বলিল—সবাই স'রে পড়ল। তুমি যে বড় এখনও রয়ে গেছ, মোক্ষদা-দিদি। তোমায় নিতে আসবে কবে?

ম্লানমুখে মোক্ষদা কহিল—কোন্ চুলোয় কে আছে যে নিতে আসবে। যদ্দিন আছি, আমায় আশ্রয় দিয়ে রেখো—আমার ঠাঁই নেই।

ঘাড় নাড়িয়া ত্রিলোচন কহিল—বেশ, বেশ! কিন্তু একাদশী আর মাসে দুটোয় চলবে না দিদি, তা ব'লে দিচ্ছি। আমরাও আরম্ভ করব। পাল্লা দিয়ে এবার একাদশী চলবে...

কোথায় ছিল পটেশ্বরী, সাড়া পাইয়া বাবা, বাবা করিয়া ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িল। আদুরে মেয়ে। বলিল—তামাক খাবি, বাবা?

ত্রিলোচন হাসিয়া কহিল—আন্ দিকি কেমন।

মেয়ে বলিল—আচ্ছা। ঘরের মধ্যে গেল, আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—এই নে। খালি হাত। হাসিয়া ত্রিলোচন তার হাত হইতে মিছামিছি হুঁকা লইল।

পটেশ্বরী কহিল—আর কি নিবি?

—এবারে তেল আন্, খুকু। নাইতে যাব।

—এই নাও। হাত উপুড় করিয়া খুকী বাপের হাতের উপর রাখিল। বলিল—মাখিয়ে দিই?

কচি কচি হাত দুখানি বাপের বুকে-পিঠে বুলায়। ফুলের মত নরম হাত। ত্রিলোচন আদর করিয়া মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইল। ফুলকুমারী কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে আসিল। সত্যকার ধোঁয়া উড়িতেছে, খুকীর মত মিছামিছি নয়—ত্রিলোচন চোখ বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিল। হাসিমুখে ফুলকুমারী বাপের কোলে মেয়ে দেখিতে লাগিল।

পটেশ্বরী বলিল—আমায় দিবি নে, বাবা?

যেন চমক ভাঙিয়া ত্রিলোচন চোখ খুলিল। বলিল—কি দেব, মা? তামাক?

মেয়ে মুখ বাঁকাইয়া বলিল—উঁহু। তামাক বুঝি ভাল; তামাক ছাই। হাত পাতিয়া ধরিয়া বলিল—তুই ভাত দে, ডাল দে—এই এখানে।

ত্রিলোচন ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সে দেওয়ার দিন যে এবার ফুরিয়ে গেল মা। ফুলকুমারী দেখিল, স্বামীর দু-চোখ দিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। হঠাৎ ত্রিলোচন তার দিকে চাহিয়া বলিল—শুনেছ বউ, জমি দিয়ে এলাম—

—কাকে?

—দুধমতীকে, এত আক্রোশ হয়েছে যাঁর। তার পর কান্নারই মত হাসি হাসিয়া বলিল—মোক্ষদা-দিদির কাছে একাদশীর খবর নিচ্ছিলাম। তুমি সধবামানুষ, স্বামীর সঙ্গে মিলেমিশে একাদশী করলে খুব পুণ্যি হবে। পাজিতে আছে দেখো। এবারে পাল্লা দিয়ে পুণ্যি করা যাবে। ধান তোমার আর ক-খুঁচি আছে, বউ?

বধূ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ইঃ, আমার ঘরসংসারের কুচ্ছো করতে আসেন! ভয়ানক ঝগড়া হয়ে যাবে কিন্তু। বলি, চানটান করবে না আজ? বেলা হয় না? আমারই যে খিদে পেয়ে গেল।

ফুলকুমারীর কিন্তু মনে মনে ভয় হইয়া গেল। এতটা বয়স খাটিয়া-খুটিয়া যা-কিছু করিয়াছিল, সর্ব্বস্ব দিয়া ও-বছর আঠাশ বিঘা জমি লইয়াছে। সেই নূতন জমি এবং পৈতৃক খামার জমি—এ সব লইয়া ত্রিলোচনের আশা-ভরসার অন্ত ছিল না, সমস্ত চুকাইয়া দিয়া সে যেন এক এক দিনে দশ বৎসর বুড়া হইয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত দিন বসিয়া বসিয়া তামাক টানে; আর বেড়াইতে যায় ত খালের ধারে, লোকালয়ের ত্রিসীমানায় নয়। গতিক দেখিয়া ফুলকুমারী কহিল—নিত্যি নিত্যি খালে গিয়ে কি হয়?

—পা ধুতে যাই।

—এই এক কোশ পথ হেঁটে পা ধোওয়া, পায়ের ত সখ কম নয়। কেন, গ্রামের মধ্যে কি জল মেলে না?

ত্রিলোচন বলে—বউ, দু-একটা কথাবার্ত্তাও হয় খালের সঙ্গে। বলি—রাক্ষুসী, সর্ব্বস্ব গ্রাস ক'রে ত আছিস, কবে ফিরিয়ে দিবি, তাই বল। তার পর রাগ হয়ে যায়। খালের মুখে লাথি মেরে ফিরে আসি।

একদিন বধূ বড় ধরিয়া বসিল—দেখ, এক কাজ করলে হয়—

—উঁহু, কিছু করব না। ফুলকুমারী চুপ করিয়া গেল, ত্রিলোচন কিন্তু সপ্তমে চড়িয়া উঠিল। বলিতে লাগিল—কেন কাজ করব? চিরটা কাল কেবল কাজ আর কাজ—। আর কিছু পারব না। বয়স বাড়ছে না কমছে?

হারাণ উঠানের উপর পেয়ারাতলায় হামাগুড়ি দিতে দিতে থাবা ভরিয়া পেয়ারা-পাতা মুখে পুরিল। ত্রিলোচন কহিল—দেখ, দেখ—কি খায় আবার··· দেখ না গো—

খোকা কি সহজ ধন! আঁকিয়া-বাঁকিয়া পলাইতে চেষ্টা করে, তার পর হাতে-নাতে ত্রিলোচন ধরিয়া ফেলিল ত মাথা নাড়িয়া কিছুতে মুখে হাত দিতে দিবে না।

—রও দুষ্টু ছেলে···মুখ তোল্, এই খোকা—তোল্—

দুষ্ট ছেলে মিটিমিটি হাসে, তার পর হাসিমুখে দাঁতে দাঁত চাপিয়া মুখ ঘুরায় আর বলে—নেই···নেই, নেই···

সংসার চলে। কি করিয়া চলে, সে জানেন অন্তর্য্যামী, আর জানে ফুলকুমারী। সে যে কোথা দিয়া কি করে তার সংসারের খবর সে কাহাকেও বলিবে না। বছর ঘুরিয়া আসিল, অগ্রহায়ণ মাস। উঠান ফাঁকা, ধানের গাদা নাই, গোটা গ্রামের মধ্যেই ধান-গোয়ালের সম্পর্ক নাই। ত্রিলোচন দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া তামাক খায় আর ভাবে। এই সময়ে একদিন ফুলকুমারী বলিল—দেখ, আমার কথা শোন, গোলা খাঁ খাঁ করছে—ধান নিয়ে এস দিকি কতকগুলো—

ঠাট্টা করিতেছে নাকি? খোঁচাইয়া সে স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া আর লাভ কি? স্ত্রীর দিকে সে চাহিয়া দেখিল। চাহিলে আজকাল বড় কষ্ট হয় মনে। সর্ব্বাঙ্গ নিরাভরণ, চোখে কালির রেখা পড়িয়াছে, মুখের হাসি কিন্তু নিবে নাই। ফুলকুমারী বলিতে লাগিল—উপায় আমি ব'লে দিচ্ছি। কিছু খাটনি নেই। শোন আমার কথা—

ত্রিলোচন ধরা গলায় কহিল—খাটনি কি আমি ভয় করি বউ,—না করেছি কোন দিন?

ফুলকুমারী কহিল—পান সুপারী কিনে গামালে বেরোও—ঐ রূপগঞ্জের দিকে।

দু-জনে অনেক পরামর্শ হইল। কথাটা মন্দ নয়। রূপগঞ্জের দিকে শনির দৃষ্টি পড়ে নাই, সেখানকার আবাদে লক্ষ্মী অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন। এখন শীতকালে সচ্ছল গৃহস্থের ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা। চাষীরা যখন ক্ষেত-খামারে কাজে লাগিয়া থাকে, তখন ডালা ভরিয়া পান সুপারী, পুঁথির মালা, ঘুনসী, কাঠের চিরুণী ও আর দশটা সৌখীন জিনিষ গ্রামের মধ্যে ফিরি করিয়া বেড়াইবার সময়। চাষা-বৌরা স্বামী-শ্বশুরদের লুকাইয়া এটা-সেটা কিনিবেই; নগদ পয়সার কারবার নয়, হাতে কারও পয়সা নাই, চুরি করিয়া আঁচল ভরিয়া ধান চাল আনিয়া ফেরিওয়ালার ডালায় ঢালিয়া দিবে। এই ব্যবসা আরও দু-এক জনে ধরিয়াছে, এই করিয়া মোটামুটি তাদের সংসার চলিয়া যায়।

কিন্তু ইহার মূলধনও চাই তিন-চার টাকা। ফুলকুমারী অভয় দিয়া কহিল—সে ঠিক হয়ে যাবে।

ত্রিলোচন বলিল—তা হবে। তোমার হাতে রূপোর বাউটি-জোড়া আছে এখনও—

ফুলকুমারী চটিয়া কহিল—ঠিকই ত। রূপোর বাউটি আমি আর পরব না ত। ও উঠে গেছে—কেউ পরে না। আমায় তুমি সোনার বাউটি গড়ে দিও, তাই পরব। পরিবে না বলিয়াই বোধ করি সে বাউটি খুলিয়া ত্রিলোচনের কাছে ছুঁড়িয়া দিল। হাতে শাঁখা দুটি সম্বল রহিল।

পটেশ্বরী পুতুল খেলিতেছিল। সেও রোখে রোখে পুতুল আনিয়া বাপের কোলে ফেলিয়া দিল। বলিল—পুতুল বেচে ফেল, বাবা। আমি সোনার পুতুল খেলবো—।

ত্রিলোচন আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—বউ, তোরা মা-মেয়ে এমন শত্রুতা সাধতে লাগলি। সত্যি সত্যি আমার চোখের জল ফেলিয়ে ছাড়বি তবে,—

চলিতে লাগিল মন্দ নয়। কাজটায় লাভ আছে, আর সে অনুপাতে খাটুনি সামান্যই। দুপুরে ফিরিবার সময়

ধানচালের ভারে ত্রিলোচনের কাঁধ বাঁকিয়া যায়। অনেক দিনের পরে মুখ ভরিয়া সকলের হাসি ফুটিল।

বাড়ির এক রশি তফাতে থাকিতেই পটেশ্বরী কেমন করিয়া জানিতে পারে, বাবা—বাবা করিয়া দু-হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আগাইয়া আসে। ত্রিলোচনের রৌদ্র-কাতর মুখ পলকের মধ্যে হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাড়াতাড়ি দাওয়ার উপর বোঝা নামাইয়া বলে—আয় খুকী, কোলে আয় —আসবি? খুকীর আপত্তি নাই; কিন্তু রান্নাঘর হইতে ফুলকুমারী বাহির হইয়া সব মাটি করিয়া দেয়। মেয়েকে তাড়া দিয়া বলে—সোহাগ থাক্ এখন। থতমত খাইয়া মেয়ে থামিয়া যায়।

ত্রিলোচন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠে—ঐ রে, গন্ধ বেরুচ্ছে কেমন বউ, তোমার লাউয়ের ঘণ্ট ধরে গেল বুঝি। শিগ্‌গির যাও—

ফুলকুমারী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে। বলে—তা যাচ্ছি। কিন্তু মেয়েকেও নিয়ে যাচ্ছি, নাওয়াতে হবে এখন—

ত্রিলোচন বলে—আমি নাওয়াবো। হঠাৎ সে গম্ভীর হইয়া যায়। বলে—তোমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে বউ, এক জনের উপর সমস্ত···দুখানা হাতের এক তিল জিরোন নেই। যা পারি, দেও না আমায় কিছু কিছু করতে। তাতে ক্ষয়ে যাব না—

ফুলকুমারী কহিল—এক জন কেন? মোক্ষদা-দিদি ত আছেন। আর একা হই, যা-ই হই তোমার কাছে ত কোন দিন নাকে কাঁদতে যাই নি কর্ত্তামশাই? আমার সংসারে কেন তুমি কথা বলতে আসবে? কেন? ভয়ানক ঝগড়া হয়ে যাবে একদিন—

খাল আর বিল একঢালা হইয়া আছে আজকাল। কাছারীর চাল ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে, নায়েব বরকন্দাজ কেহই সেখানে নাই, থাকিবার প্রয়োজনও নাই। জোয়ারের বেলা খালের জল ধাওয়া করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা অবধি আসে, কোটালের মুখে কখনও কখনও রাস্তা ছাপাইয়া যায়, রৌদ্রালোকে অবাধ নোনাজল ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে, রাস্তায় দাঁড়াইয়া এখানে-সেখানে জাল ফেলিয়া পাড়ার লোক মাছ ধরিয়া থাকে। ত্রিলোচন এসব দিকে তাকাইয়াও দেখে না। সদর রাস্তা দিয়া গতায়াত ইদানীং সে এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছে।···

পুকুর ধারে গাবগাছের তলায় কালীঘর, পাড়ার ছেলে-মেয়েরা জুটিয়াছে, মহা সমারোহে কালীপূজার আয়োজন চলিয়াছে। পটেশ্বরী হইয়াছে স্বয়ং কালী-ঠাকরুণ, জিভ মেলিয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে। দাসের বাড়ির সোনা কামার হইয়া তালপাতার খাঁড়া লইয়া হাড়িকাঠের সামনে প্রস্তুত, এখন একটা কোন পাঁঠা পাইলে হয়। সমস্ত দুপুর পাঁচ-ছয় জনে মিলিয়া মাঠে ছুটাছুটি করিয়াও সত্যকার পাঁঠা ধরিতে পারে নাই। হারাণ এমনি সময়ে থপথপ করিতে করিতে আসিল।

—দিদি, দিদি গো—

কামার চঞ্চল হইয়া উঠিল—ঐ, ঐ···হারাণ হবে পাঁঠা—

হারাণ খুব খুশী, ঘাড় নাড়িয়া রাজী হইল। পটেশ্বরীর প্রস্তাব ভাল লাগে না। অমন সোনার মত ভাই—পৈতা পরিয়া পুরুত হইলে বরঞ্চ মানাইত তাকে, পাঁঠা হইতে সে যাইবে কেন? ডেডাং করিয়া গলায় কোপ মারিবে, জোরে যদি মারে তার কত ব্যথা লাগিবে···কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে, কালী হইয়া এখন সে কথা বলে কি করিয়া? তার পর সিঁদুরের অভাবে কাদার ফোঁটা দিয়া পুরুত যখন সত্য সত্যই পাঁঠা উৎসর্গের আয়োজন করিতে লাগিল, কালীর পক্ষে আর জিভ মেলিয়া দাঁড়াইয়া থাকা চলিল না। ভাইকে লইয়া একছুটে চলিয়া গেল। আর সবাই হতভম্ব; খেলা ঐ পর্য্যন্ত।

সেইদিন শেষ রাত্রে আকাশ ভরিয়া তারা ঝিলমিল করিতেছে। হঠাৎ খোকা মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সারাদিনের শ্রমক্লান্ত ফুলকুমারী সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া অঘোর ঘুম ঘুমাইতেছে, সে জাগিল না, খোকা রহিয়া রহিয়া কাঁদিতেছে। ও ঘরে মোক্ষদা জাগিয়া উঠিয়া ডাকিতে লাগিল—ও বউ, বউ! দেখ ত ত্রিলোচন, খোকা কাঁদছে কেন এত?

সকালবেলা ছেলে নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষু হইয়াছে আগুনের ভাঁটা; ক্রমশঃ সে ঝিমাইয়া আসিতে লাগিল, ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে এক-একবার বলে—জল!

মোক্ষদা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে, বউ খোকাকে কি খাইয়েছিলে? কি বিষ হাতে তুলে দিয়েছিলে কালকে?

পটেশ্বরী মুখ চূণ করিয়া ঘুরিতে লাগিল; বাপের হাঁটু ঝাঁকাইয়া কহিল—বাবা, দাদুধন অমন ক'রে রইল কেন? ডাকলাম, তা উত্তর দেয় না।

এ দরজা দিয়া হারাণকে বাহির করা হইল, ওদিকে মা-মেয়ে দুজনেই সেই বিছানা লইল। পাড়ার মানুষ-জন উঠানে দাঁড়াইয়া ত্রিলোচনকে খুব সাহস দিয়া এখন যে যার মত সরিয়া পড়িয়াছে। আছে একলা হরিপদ। প্রবীণেরা যাইবার মুখে চোখ ঠারিয়া তাহাকেও সাবধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ—ফুলকুমারীর বাপের বাড়ির কি একটা সম্পর্কও যেন ছিল, তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকে,—কাহারও হিত কথা না মানিয়া ওলাওঠার মধ্যে সে রহিয়া গেল। পাঁচ সাত গ্রামের মধ্যে আছে এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, তিনি একবার দেখিয়া এক ফোঁটা করিয়া ঔষধ দিয়া গিয়াছেন। দিনসাতেকের মধ্যে আর ঔষধের আবশ্যক হইবে না, সাত দিনের পর খবর দিতে বলিয়াছেন। মোক্ষদা বাহির হইতে হাতছানি দিয়া ডাকিল, হরিপদ উঠিয়া গেল।

মোক্ষদা কহিল—ভাসুরপোরা নাছোড়বান্দা কি করি বল, তাদের সংসার অচল—আর এ অবস্থায় ত্রিলোচনকেই বা বলি কি ক'রে···সব সেরে সুরে উঠুক, জিজ্ঞাসা করলে ব'লো, আমি চৌগাছায় চলে গেছি···

তিক্ত কণ্ঠে হরিপদ বলিল—যাও দিদি, শিগ্‌গির শিগ্‌গির চলে যাও—চৌগাছার পথ যম ত চেনে না। বিরক্ত মুখে রোগীর পাশে আসিয়া সে বসিল। ত্রিলোচন দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে।

দুপুরের দিকে খুব মেঘ করিয়া বৃষ্টি নামিল। ফুটা চালে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতেছে। ত্রিলোচনের যেন সম্বিৎ নাই, উবু হইয়া এক জায়গায় বসিয়া বসিয়া ভিজিতে লাগিল। আর হরিপদ বিছানাসমেত রোগীদের সমস্ত ঘর টানিয়া টানিয়া বেড়ায়, যেখানে যায় সেইখানেই জল; আবার সরাইয়া লইতে হয়। বাহিরে ঢেঁকিশালের কাছে শিশুর শব পড়িয়া পড়িয়া ভিজিতেছে, আগলাইবার একটা লোক নাই।

কাঁধে ঝাঁকি দিয়া ত্রিলোচনকে হরিপদ ডাকিল—ও দাদা, শোন একটা কথা। ওঠো। উঠোনে ওটা পড়ে পড়ে ভিজছে—একটা গতি ক'রে আসা যাক—তুমি এদিকে একটু নজর রাখ—আমি আসি গে—

ত্রিলোচন হরিপদর হাত আঁটিয়া ধরিয়া বলিল—একটুখানি সবুর কর্‌ ভাই। সবসুদ্ধ এক চিতেয় হয়ে যাবে। বার-বার টানাটানি করতে হবে না।

ঘটিলও তাই। মানুষ-জন ডাকিয়া কাঠকুটার জোগাড় করিয়া তিনটি শব খালের ধারে শ্মশানে লইয়া যাইতে পরদিন বেলা দুপুর হইয়া গেল। ত্রিলোচন শান্তভাবে শেষ কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিল। খালের জলে জমি ভাসাইয়া একদিন যেমন ঘরে ফিরিয়াছিল, তেমনি।

হরিপদর সাধাসাধিতে সন্ধ্যার সময় তার বাড়িতে গিয়া চারিটি ফ্যানসা ভাতও মুখে দিয়া আসিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। আবার ত্রিলোচন ফিরি করিতে সুরু করিয়াছে।—পান নেবে গো, চিকি গুয়ো।

রূপগঞ্জের দিকে যায় বটে, কিন্তু পাড়ার মধ্যে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। খাল তাহাকে টানিতে থাকে। কোন-গতিকে দু-চার পয়সার বিক্রী হইলেই, পাড়া ছাড়িয়া সে খালের ধারে আসে। কূলে কূলে জোর গলায় হাঁকিয়া যায়। জলতরঙ্গ যেন তার খরিদ্দার। নিস্তব্ধ দুপুরে সমস্ত গ্রাম যখন ঝিমাইয়া পড়ে বহু দূরের খালধার হইতে ত্রিলোচনের কণ্ঠ অস্পষ্ট ভাসিয়া আসে—ঘুনসী চাই, আয়না চাই, পুতুল চাই রাঙা রাঙা—আ—আ—

হরিপদ মাঝে মাঝে বলে—দাদা ওখানে হাঁক পেড়ে কাদের শোনাও?

ত্রিলোচন হাসিয়া হাসিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দেয়। নৌকো ক'রে দেশ-বিদেশের মানুষ যায় জানিস? পথ চলতি মানুষ—তাদের কাছে দর-দাম নেই, এক পয়সার মাল চার পয়সা—বড্ড লাভের কাজ—

অবিশ্বাসের ভাবে মাথা নাড়িয়া হরিপদ বলে—কটাই বা যায় নৌকা! এ্যাদ্দিনে কত বেচেছ, বল ত শুনি।

ত্রিলোচন বলে—তুই তার জানবি কি! ব্যবসা ধর্‌ আগে, তখন বুঝবি কোথায় কি মজা।

আর এক কাণ্ড হইল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, ত্রিলোচন লোকজন ডাকিয়া ঢেঁকিশালের চাল নামাইয়া

চারিদিকের বেড়া খুলিয়া হৈ হৈ করিয়া খালের পাড়ে চরের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া বুড়া একলাই দশ-বারোটা খুঁটি পুতিয়া ফেলিল। শুনিয়া হরিপদ আসিল। আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—গ্রাম ছেড়ে এখানে এসে কুঁড়ে বাঁধছ, মতলবটা কি বল ত দাদা।

—শোন্, তবে তোকেই বলি—কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া ত্রিলোচন বলে—কাউকে বলবি নে কিন্তু। ফিরি ক'রে বেড়িয়ে আর তেমন জুত হয় না। নতুন ব্যবসা ধরব ভাবছি। রাত্রে মাছের নৌকো খাল দিয়ে যায়, সস্তায় মাছ কিনে রাখব—সকালের বাজারে বিক্রী হবে। তুই জানিস নে হরিপদ, বড্ড লাভ এতে।

হরিপদ বলিল—এই শ্মশান-ঘাটের উপরে বসে রাত্তিরে তুমি মাছের নৌকোর খোঁজ করবে? ভূত-পেত্নীতে কোন্‌দিন ঘাড় ভাঙবে তোমার!

হাসিয়া হাসিয়া বুড়া বলে—ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি রাম লক্ষ্মণ মাথার উপর—করবে আমার কি? জানিস হরিপদ, আমার কত কষ্টের জমি এই সব, ধান হয় না আজকাল, চর পড়ে গেছে; আর কিছু না হোক চরের উপর শুয়ে ব'সে তবু ত উশুল হবে খানিক—

হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ বিষণ্ণ ও উদাস হইয়া উঠে।

চরের উপর ত্রিলোচন পাকাপাকি বসবাস সুরু করিল। মাছের নৌকা সম্পর্কীয় কথাটা মিথ্যা নয়। দশানি, বৌ-মারির বিল প্রভৃতি অঞ্চলে মাছের আবাদ। মাছ-বোঝাই বিস্তর নৌকা রাত্রের জোয়ারে উজান বাহিয়া খাল দিয়া বাহির গাঙে পড়ে; গঞ্জে সকালের বাজারে সেই মাছ বিক্রী হয়। রাত্রে ঝুড়ি হিসাবে তার কতক কিনিয়া রাখিয়া খুচরা বেচিতে পারিলে লাভের কথাই বটে। কিন্তু তাও বড় সুবিধা হইল না; মাছের নৌকা সোরগোল করিয়া খাল দিয়া যখন চলিয়া যায়, ত্রিলোচনের সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

ঠিক দুপুরে মণ্ডলপাড়ার গণশার বউ রাঙা শাড়ী পরিয়া ভাইয়ের সঙ্গে খালধার দিয়া বাপের বাড়ি চলিয়াছে। বউটি অল্পবয়সী; স্বভাব বড় চঞ্চল; বাপের বাড়ি চলিয়াছে, তা যেন নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। ত্রিলোচন তখন দাওয়ার খুঁটি ঠেস দিয়া মহানন্দে গোপীযন্ত্র বাজাইতেছে। বউ একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। উঁকি মারিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিল, সে ইহার এক জন খরিদ্দার। রাস্তা হইতে জিজ্ঞাসা করিল—ও বুড়ো, পান-সুপারি বেচ না আজকাল?

—উহুঁ—বলিয়া ত্রিলোচন বাজনা রাখিয়া চট করিয়া রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

বউটি বলিল—তাই দেখতে পাই নে আজকাল। তা বেচ না কেন?

—আর মা, সে কি হবার জো আছে? হাতের ইসারায় সে ঘরের দিকে দেখাইয়া দিল। বলিতে লাগিল—বলো কেন মা,—পঙ্গপালের দল, খেয়ে-দেয়ে ফেলে-ঝেলে, সমস্ত একাকার। সব পুঁজি খোয়া গেছে—

বউটি অতশত জানে না। অতি জীর্ণ নিঃশব্দ কুঁড়েখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল—কই, ছেলেপিলে কাউকে দেখছি না ত?

বুড়াও এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল—ছিল ত সব এইখানে। কোন্‌দিকে গেছে হয়ত। একদণ্ড স্থির হয়ে থাকবার জো আছে? বলো কেন মা, কর্ম্মভোগ। হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—একটা পান দিতে পার গো ভালমানুষের মেয়ে? সঙ্গে আছেটাছে নাকি? কদ্দিন যে খাই নি···সব নিয়ে পালিয়ে চলে যায়—

সধবা মানুষ, একবেলার পথ যাইতেছে, আঁচলে বাঁধা পান-চূণ-সুপারি সমস্তই ছিল। বউটির ইচ্ছা হইতেছিল, ঐখানে বসিয়া একটা পান সাজিয়া দেয়। সঙ্গের ভাই কিন্তু তাড়া দিয়া উঠিল—নে, নে, চল্। যেতে হবে কদ্দুর, হুঁস আছে?

ত্রিলোচনের বিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া মণ্ডলপাড়ার বউটি বলিল—তোমার খাওয়া হয়েছে, বুড়ো? হয় নি এখনও, না?

—আচ্ছা বোকা ত! পান চাচ্ছি কেন তবে? পেটে ভর না থাকলে ফুর্ত্তি আসে এত? বলিয়া ফূর্ত্তির চোটে ত্রিলোচন একেবারে অট্টহাসি হাসিতে সুরু করিল।

রাত্রে এক-এক দিন সত্য-সত্যই ভারি ফূর্ত্তি জমিয়া আসে। ত্রিলোচনের ঘরের পাশে অনেকখানি জুড়িয়া বালুচর। জোয়ারের বেগে জল খলবল করিয়া চরের উপর

লুটাইয়া পড়ে। ত্রিলোচন তখন ঘরের মধ্য হইতে হাঁকিতে থাকে—এই!—এইও! হঠাৎ বা চীৎকার করিয়া গালি দিয়া ওঠে—ওরে হারামজাদারা, ঘুমুতে দিবি নে আজ? জলতরঙ্গ থামে না। তার পর বড় অসহ্য হইয়া উঠিলে লাঠি লইয়া বাহির হয়, উন্মাদের মত চরের উপর জলে জলে তাড়া করিয়া বেড়ায়, যেদিকে জলোচ্ছাস প্রবল হয় লাঠি লইয়া ছুটে, আবার বা হিহি করিয়া হাসিতে হাসিতে লাঠি ফেলিয়া বালুর উপর একেবারে লুটাইয়া পড়ে। হয়ত বা এমনি সময়ে দূরে মানুষের কথাবার্ত্তা শোনা যায়, মাছের নৌকা সব আসিতেছে, কখনও বা ঝুপঝাপ দাঁড় পড়ে, কখনও বা গুণ টানিয়া আনায় গুণটানা মানুষের হাতে হেরিকেনের আলো দুলিয়া দুলিয়া চলে। ত্রিলোচন অমনি ভালমানুষ হইয়া দাওয়ায় আসিয়া ওঠে, হুঁকা-কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসে, আপন মনে গজ-গজ করে—চিরটা কাল এক ভাবে গেল। শুয়ে স্বস্তি নেই বেটাদের জালায়। দুপুর রাতেও জড়াজড়ি ক'রে মরছে, ঘুম নেই একটু চোখে? চুপ করতে পারিস নে, ওরে হারামজাদারা?

নৌকাগুলি সরিয়া গেলে, আবার শাসাইয়া চীৎকার করিয়া ওঠে—র'—জব্দ করছি। কালই যাব ঐ রূপগঞ্জের দিকে। বলছিল ত নেত্য মোড়ল—জায়গা দিচ্ছি, এস, ঘর বাঁধো। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হয় তা হ'লে। দেখি তখন কাকে জালাতন করিস। কেঁদে পথ পাবি নে—হ্যাঁ।

জোরে জোরে টানিয়া তামাক শেষ করিয়া বিরক্ত মুখে সবশেষে বুড়া শুইয়া পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা এক দল পশ্চিমী কুলী অনেক ঝুড়ি কোদাল লইয়া আসিল; সঙ্গে নায়েব-মশায় আসিয়াছেন। অনেক দিনের পর দেখা, ব্রাহ্মণ মানুষ,···ত্রিলোচন গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

নায়েব বলিলেন—খবর ভাল, ত্রিলোচন? আঁরে আরে একি চেহারা হয়েছে তোমার? আবার এইখানে এসে কুঁড়ে বেঁধেছ,—বলি, বাড়ির সঙ্গে বচসা হয়েছে বুঝি?

ত্রিলোচন কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—খেতে পাচ্ছি না, নায়েব-মশায়।

নায়েবের মনে বড় লাগিল। মনে ত আছে, এই মাতব্বর প্রজার কি প্রতাপ ছিল একদিন! সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—আর দুঃখ থাকবে না, বাপু। কর্ত্তাবাবুকে জপিয়ে জপিয়ে রাজী করেছি। মঞ্জুর হয়ে গেছে, খাল বাঁধা হয়ে লক-গেট হবে এইখানে। আজকে ভাঁটা কখন রে?

হিসাব করিয়া দেখা গেল, ভাঁটা পড়িতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যাইবে।

নায়েব সঙ্গের লোকজনকে হুকুম দিলেন—তবে বাঁশগুলো এই এখানে এনে জমায়েৎ কর্। আজকের দিনটে খোঁটা পুঁততেই যাবে। মাটি পড়বে কালকের থেকে।

এদিকে নদীর পথে চূণ-সুরকী ও লোহালক্কড় বোঝাই নৌকা আসিয়া জমিতে লাগিল। নৌকা খালের মধ্যে আনিয়া বাবলাগাছে বাঁধা হইল। মাটির বাঁধ দেওয়া হইয়া গেলে এসব তার পর লাগিবে।

নায়েব বলিলেন—আর ভাবনা কি, ত্রিলোচন। যার যে জমি ছিল, সব জরীপ আলবন্দী ক'রে দেওয়া হবে। এক ছটাক এদিক-ওদিক হবে না। বাবু আমাদের সদাশিব। তিনি একেবারে লিখিত হুকুম দিয়ে দিয়েছেন। এই ধর—পাঁচ-সাত মাস, তার পর লেগে যাও চাষবাসে।

চোখের উপর সে নিরন্ন ভিখারী হইয়া গেল, একবাড়ি মানুষ একে একে সব মরিয়া গেল, ত্রিলোচন নির্জ্জনে কি করিত কে জানে, কিন্তু মানুষের সামনে কেহ তার চোখে এক ফোঁটা জল দেখে নাই। এতদিন পরে কি হইল—নায়েবের সামনে একেবারে সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—চাষ করব নায়েব-মশায়—খাবে কে? রাক্কুসী গাঙ জমি ফিরিয়ে দেবে, মানুষ ত ফিরিয়ে দেবে না আর—।

একটা-একটা করিয়া সমস্ত কাহিনী সে বলিয়া গেল। নায়েব তামাক খাইতে খাইতে নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন—ভগবানের মার, তুমি আমি করব কি? যাই হোক—কুছ পরোয়া নেই। বয়সটা আর কি তোমার! চল্লিশ পেরোয় নি—বিয়ে-থাওয়া কর আবার। আমি তোমার বিয়ে দিয়ে দেব; টাকা না থাকে, বিঘে দুই জমি ছেড়ে দিও··· হু হু ক'রে জমির দাম বেড়ে যাবে এখন—

ত্রিলোচন হাঁ না কিছু বলিল না। কাছারী-ঘরের খড় উড়িয়া গিয়াছে, বেড়া খসাইয়া লোকে ভাঙিয়া লইয়া গিয়াছে, নূতন ঘর না-বাঁধা পর্য্যন্ত কাছারীতে গিয়া দাঁড়াইবার

উপায় নাই। ত্রিলোচনের কথায় নায়েব সেই বেলাটা তার ঘরের মধ্যে রান্নাবান্না করিলেন। বিকালে তিনি রূপগঞ্জের এক কুটুম্বের বাড়ি চলিলেন, রাত্রিটা সেখানে কাটাইবেন। বলিলেন—এক কাজ কর, ত্রিলোচন। কাছারী-টাছারী হবার ত দেরি আছে—যে ক'দিন না হচ্ছে, আমায় ছুটো-ছুটি করতে হবে এই রকম। দু-বেটা বরকন্দাজ এনেছি, কিচ্ছু বোঝে না, নোনা দেশে তারা এই প্রথম এল। কাজকর্ম্ম সমস্ত তুমি দেখাশুনো কর। আমি এ-সম্বন্ধে ব্যবস্থা করব।

কৃতার্থ হইয়া ত্রিলোচন ঘাড় নাড়িল।

এখন গাঙে টান বেশী নাই। ত্রিলোচন শুইয়া শুইয়া অনেক দিনের পর আশার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। নাকে কেমন কেমন যেন ধানের জোলো গন্ধ আসে। ঘরের পাশে বালুচরের উপরে নৈশবাতাসে ধানের পাতার শির্ শির্ শব্দ ভাসিয়া আসে, শুইয়া শুইয়া দৃষ্টির সম্মুখে দেখে ঘননীল ধানের সমুদ্র আবার দিগন্ত অবধি চলিয়াছে। ঠক্ঠক করিয়া তার মধ্য দিয়া তীর-গতিতে তালের ডোঙা ছুটিয়াছে, কত সাপ্‌লা ফুটিয়াছে, কত কলমীফুল শোলার ঝাড়—আলের উপরে ঝির্ ঝির্ করিয়া জল যায়, খলসে পুঁটি সব খলবল্ করিয়া উজাইয়া উঠে। ...উঠান ঢাকিয়া ফেলিয়া আবার ঘর উঠিয়াছে, গোলা উঠিয়াছে; রূপার খাড়ু পায়ে বউ এঘর-ওঘর করিতেছে, ন-পিসি, রাণী, তারিণী, ফুলি যে যেখানে ছিল সব আসিয়াছে, ছেলেপিলের চীৎকারে গণ্ডগোলে ঘুমাইবার আর জো থাকিল না; লাঠি-হাতে একলাফে ত্রিলোচন ঘরের দাওয়ায় নামিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—ওরে হারামজাদারা।

সব হারামজাদারা ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে, নিঃশব্দ, নির্জ্জন, খালের ধারে অপরূপ বিজনতায় শেষরাত্রি থম্ থম্ করিতেছে। জলেরও টান নাই, কেমন যেন চুপচাপ ভাব। ত্রিলোচন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—বড্ড যে জালাতন ক'রে মারিস্, ওরে হারামজাদারা। এখনও হয়েছে কি! বাঁধ আগে হয়ে যাক, তখন টের পাবি—।

কাঁচা বাঁধ শেষ হইতে হইতে আবার কোটাল আসিয়া গেল। বিকালবেলা দেখিয়া শুনিয়া নায়েব খুশী মুখে রায় দিয়া গেলেন—নাঃ, আর ভয় নেই। কাজ বাকী থাকলে ভয়ের কথা ছিল বটে। কোটালে সব মাটি ভাসিয়ে নিয়ে যেত। তোমার জন্যেই হ'ল ত্রিলোচন। দিন-রাত খেটেছ, লোক খাটিয়েছ, তবেই হয়েছে। নিজের একটু ইয়ে না থাকলে, ভাড়াটে লোক দিয়ে হয় এ-সমস্ত, বাবুকে আমি লিখে দেব তোমার কথা।

বাঁধ নদীর একেবারে মোহনার কাছে। পূর্ণিমায় সেদিন নদী বড় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাবেলা ত্রিলোচন নূতন বাঁধের উপর দিয়া ঘরে ফিরিতেছিল, বাঁধের গায়ে জলতরঙ্গ তখন অপরূপ নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি সাগরপারের শিশু—জীবন্ত, প্রাণচঞ্চল—হাসিয়া নাচিয়া কতরূপে তারা মন ভুলাইতে চায়। ত্রিলোচন অন্যমনস্ক হইয়া চলিয়াছিল, তরঙ্গ আসিয়া হঠাৎ পা ভিজাইয়া পরনের কাপড় ভিজাইয়া দিয়া খলবল করিয়া পলাইয়া গেল। ত্রিলোচন ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল—কেমন রে? কেমন? কেমন জব্দ এবার বল দিকি, ওরে হারামজাদারা!

সে রাত্রে ত্রিলোচনের ঘুম নাই। রাত্রি বাড়িতে লাগিল, চাঁদ মাথার উপরে, চারিদিকে অতল নিঃশব্দতা, সেই অনেক দিন আগেকার পিসির বাড়ির মত। পৃথিবীর বুকের শেষ স্পন্দনটুকুও যেন এ রাত্রে থামিয়া গিয়াছে। তার মনে কিন্তু আনন্দের আর পার নাই; আনন্দভরা মনে বার-বার ভাবিতেছিল—আর কি, আর ত কোন অসুবিধা রহিল না। ধানে ধানে ক্ষেত ভর্ত্তি, গোলা ভর্ত্তি; মানুষে মানুষে বাড়ি ভর্ত্তি; আর ভাবনা কি?...তার পর উঠিয়া তামাক সাজিয়া লইল, ফড় ফড় করিয়া তামাক খাইতে লাগিল, সে তামাক শেষ হইয়া গেল। পায়ে পায়ে সে খালের ধারে আসিল। হো হো করিয়া হাসিয়া গাঙ-পার অবধি শুনাইয়া শুনাইয়া সে চেঁচাইয়া বলিল—ওরে হারামজাদার দল, বড় যে জ্বালিয়ে মারতিস! থাক্ আটকা পড়ে ঐদিকে।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় শেষে শীত ধরিয়া যায়। ঘরে আসিয়া কাঁথা মুড়ি দিয়া পড়িল। মানুষ-জন নাই, হাওয়া নাই, জলের কলধ্বনি নাই, এমনি রাত্রে ত ঘুমের সুবিধা। কিন্তু ঘুম আজ কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রি ত্রিলোচন একবার ঘর —একবার খালধার—এই করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিশি-পাওয়া লোকের মত চাঁদের আলোয় খালের ধার দিয়া অনেক দূর অবধি চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে।

তার পর হঠাৎ কি হইয়া গেল, হাওয়া ছিল না, হঠাৎ কোথা হইতে এক ঝলক হাওয়া বহিয়া গেল, খালের জল ছল ছল করিয়া নাচিয়া উঠিল, বাদুড়ের ঝাঁক কালো ছায়া ফেলিয়া মাথার উপর উড়িতে লাগিল। চমক ভাঙিয়া ত্রিলোচন সেই মুহূর্ত্তে শুনিল—হু-হু-হু-হু—অনেক দূরের বিরামবিহীন একটা একটানা শব্দ। ঘুমের দেশে কোথায় বিপ্লব বাধিয়া গেছে, শত সহস্রে মিলিয়া মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিতেছে—বাতাসে চাঁদের আলোর ক্ষীণতম করুণতম কান্না। গ্রহ-গ্রহান্তরের কোটি কোটি ক্রোশ পার হইয়া আসা কান্না,—নিশীথ রাত্রি নিরালা পৃথিবী মেঘহীন আকাশ একসঙ্গে গলা মিলাইয়া কাঁদিতে বসিয়াছে—মৃত্যুপুরীর কঠিন কালো কপাটের ফাঁক হইতে কান্না অনেক কষ্টে গলিয়া গলিয়া যেন বাহির হইয়া আসিতেছে।…যে রাত্রে চাঁদ বড় উজ্জ্বল হইয়া মাথায় জাগিয়া থাকে, কিছুতে কোন রকমে চোখের পাতা এক হইতে চায় না—অনন্ত-আয়তন সৌরজগতের মধ্যে ক্লান্ত শ্লথ চরণ নিঃসঙ্গ পৃথিবীর একটি মাত্র অধিবাসী—সেই ইহা শুনিতে পায় কখনও কখনও। ত্রিলোচন শুনিতে লাগিল; সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ করিয়া অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিল,…মাঠের পারে, গাঙের ধারে কারা আসিয়া জমিয়াছে, কেউ করুণ শান্ত চোখে তাকাইয়া থাকে, কেউ মাথা নাড়িয়া ইসারা করে, কেউ হাততালি দেয়, কেউ বা অস্পষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠে অথচ প্রাণপণবলে ডাকাডাকি করে—

বাবা—বা-বা-গো-ও-ও-ও—

—যাই।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ত্রিলোচন ছুটিল। ছুটিয়া নদীতীরে নূতন বাঁধের ধারে আসিল। জোয়ার আসিয়াছে। ভরা পূর্ণিমার প্রমত্তবেগ জোয়ার। জলতরঙ্গ অধীর আবেগে বাঁধের গায়ে মাথা ভাঙিতেছে। জলভূমি হইতে দূরে নিস্তব্ধ নদীকূলে ভয় পাইয়া তারা খালের পথে গ্রামে গিয়া ঢুকিতে চায়। কঠিন মাটি পথ দিবে না। ছুটিয়া আসিয়া লাফাইয়া এক-এক বার বাঁধ পার হইতে চায়, আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায়; উঁচু বাঁধ কিছুতে পার হওয়া যায় না। বাঁধের একেবারে উপরে গিয়া ত্রিলোচন দাঁড়াইল। থালার মত চাঁদ পশ্চিমে ঢলিয়াছে। অনেক বার সে ইতস্তত করিল, অনেকক্ষণ বাঁধের এপার-ওপার ঘুরিয়া বেড়াইল। তার পর এদিক-ওদিক চাহিয়া একটি মাটির চাঁই তুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিল। ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল—আয়, গুঁড়ি মেরে আয়—ওরে হারামজাদারা, সাবধান—বাঁধ ভাঙে না যেন। পারলি নে? আয়—আয়—

আর একটা—তার পর আবার আরও—আরও—। বিশ-ত্রিশটা চাঁই ফেলিয়া দিতে আর তাহাকে কষ্ট করিতে হইল না, জলধারা পথ পাইয়া গেল। অসীম শ্রমে এতদিন ধরিয়া এত লোকে মিলিয়া বাঁধ দিয়াছে, বাঁধ ভাঙিল, গোটা অঞ্চলটা জুড়িয়া মানুষের আশা ভাঙিল, ধান, বাড়ি ঘর দোরের সমস্ত স্বপ্ন জলস্রোতে নিঃশেষ হইয়া গেল। তার পর সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—নন্দ আসিল, পটম্বরী আসিল, হারাণ তিনু টুনি সকলে আসিল, অনন্ত কাল ধরিয়া তিনু-টুনির মত যত খোকা-খুকু নদীর জলে গিয়া রহিয়াছে তিনুর হাত ধরাধরি করিয়া শ্মশানঘাটা হইতে তারাও সব উঠিয়া আসিল। অতল জলতল…পাতালপুরী…সাপের মাথার মাণিক চুরি গিয়াছে, তাই আলো নাই…হাজার শিশু আসিয়া হাজার হাজার বাহু দিয়া স্নেহ-বুভুক্ষু বুড়াকে চাপিয়া ধরিয়াছে, কেহ ধরিয়াছে গলা, কেহ হাত, কেহ পা…জলতরঙ্গ নাগপাশের মত বেড়িয়া ধরিয়াছে।

—ওরে হারামজাদারা, ছাড়্ ছাড়্—লাগে…

কে কার কথা শোনে? বিপুল আনন্দ-বন্যায় জলোচ্ছ্বাসে কুটার মত তারা বুড়াকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

ঢাকা প্রবেশিকা পরীক্ষার একখানি বাংলা পাঠ্যপুস্তক*

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৩৯ সালের বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "মক্তব মাদ্রাসার বাংলা ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির ফলে আমাদের মাতৃভাষাও কিরূপে বাঁটোয়ারার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রমাণ দিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধে এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যই শাসনক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রভুত্ব বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত "মুসলমানী" বাংলা অ-মুসলমানদিগের উপরও চাপাইবার চেষ্টা হইতে পারে। আলোচ্য পুস্তকখানি ঐ আশঙ্কার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে।

পুস্তকখানির নাম "প্রবন্ধ-মালা", প্রথম ভাগ। লেখক "খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক, বি-টি।" মলাটের মাথায় "Prescribed for High Schools and High Madrasahs under the Board of Intermediate and Secondary Education, Dacca, for 1937," এই কথাগুলি ছাপা আছে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকখানির তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই তৃতীয় সংস্করণ অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখা হইতেছে।

পুস্তকখানি যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা উপরে লিখিত ইংরেজী কথাগুলিতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে। High School অর্থাৎ উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে সমস্ত না হইলেও, বেশীর ভাগ ছাত্র হিন্দু, এবং উচ্চ মাদ্রাসাগুলিতে (যেমন নিম্ন মাদ্রাসাগুলিতেও) সমস্ত বালকই মুসলমান, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

মাদ্রাসা (এবং মক্তব) সমূহের জন্য যে-সকল বাংলা পুস্তক পাঠ্য করা হয়, সেগুলির বাংলা ভাষাকে যে ইচ্ছা করিয়াই বিকৃত রূপ দেওয়া হয়, এবং কেন দেওয়া হয়, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই অস্বাভাবিক লিখিত ভাষাকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রিয় মনে করিয়া, অপর সম্প্রদায়ের উপর চাপানোর চেষ্টা ঘোর অন্যায়। খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক মহাশয়ের পুস্তকখানি ঐ অন্যায় চেষ্টার পরিচায়ক। উক্ত খান বাহাদুর সুন্দর, বিশুদ্ধ, অবিকৃত বাংলা লিখিবার যোগ্যতা রাখেন, ইহা অনেকেই জানেন। বর্ত্তমান পুস্তকেও তাঁহার সেই যোগ্যতার প্রমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। "এই মহাত্মার জীবনে যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে" (পৃষ্ঠা ১), "শৈশবেই তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়" (পৃ. ঐ), "স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল", (পৃ. ১৬), "বেদুইনগণের আতিথেয়তা ও দয়ার উপরই নির্ভর করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হইত" (পৃ. ১৮); "দুগ্ধফেননিভ শুভ্র" (পৃ. ঐ); "রাজকন্যাদিগের" (পৃ. ৭৬); "মণিরত্নভূষিত" (পৃ. ৭৬); "রক্তচিহ্নিত" (পৃ. ঐ); ইত্যাদি বাংলা শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে লেখক ইচ্ছা করিলে পুস্তকখানির প্রত্যেক পঙক্তি শিষ্ট বাংলায় লিখিতে পারিতেন। ঐ ঐ স্থলে, তিনি পাদরেখ শব্দগুলির পরিবর্ত্তে যথাক্রমে, "তাজ্জব", "বাবজান," "এন্তেকাল," "খোয়াব," "মেহমানি," "মেহেরবানি," "জানধারণ" (জলপথের পরিবর্ত্তে "পানিপথ" হইতে পারিলে, ইহাও হইতে পারে), "সফেদ," "জওয়াহরভূষিত" ও "খুনচিহ্নিত" লিখেন নাই। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, পুস্তকখানি মাদ্রাসার জন্যও উদ্দিষ্ট। সুতরাং, মাদ্রাসার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত বাংলা ভাষা পুস্তকের মধ্যে আনিতে হইবে। উক্ত লক্ষণযুক্ত বাংলা ভাষা আর কিছুই নহে, শিষ্ট বাংলার উন্নত নাক কান কাটিয়া ভোঁতা করিয়া দিলেই (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) আবশ্যক সুলক্ষণগুলি দেখা দিয়া থাকে। আলোচ্য পুস্তকেও তাহাই করা হইয়াছে। সুন্দর শিষ্ট ভাষার অঙ্গে স্থানে স্থানে এক এক পোঁচ দিয়া যেন জাত রক্ষা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে, নিম্নলিখিত স্থলগুলি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"দামেস্কের সাহজাদাগণের" (পৃ. ১)। "আহা, ইহারা এতিম" (পৃ. ২) (এতিম=পিতৃমাতৃহীন)। "আমি কসম করিয়া বলিতে পারি" (পৃ. ৩) "শাহজাদা আবার গশ্‌ৎ ফিরিতেছেন" (পৃ. ৪)। "আল্লাহতা'লার মরজীতে" (পৃ. ৫)। "সকলে হাত ধুইয়া দস্তরখানে বসিল" (পৃ. ৫)। "প্রথম লোক্‌মা মুখে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের তরবারির আঘাতে মেহমানগণের ছিন্ন মস্তক দস্তরখানে গড়াগড়ি খাইতে লাগিল" (পৃ. ৫)।

"তাহার চাচা" (পৃ. ৮)। "টাকাকড়ি ও জওাহেরাত" (পৃ. ১২) (ও'কারে আ'কার যুক্ত করা হইয়াছে)। "উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া চুলের ঘুঙ্গুর থাকিবে" (পৃ. ১৩)। (আমরা ঘুঙ্গুর নামক শব্দকারী অলঙ্কারের কথা জানিতাম। যাহা হউক, লেখক "চুলে"র স্থানে "পশমে"র না লিখিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন)।

"আপনি অনর্থক গোনাগার হইবেন" (পৃ ১৪)। "তাহা হইলে তগদীর ত রদ হইবার নহে" (পৃ. ঐ)। ইহার পরেই আছে—"ইহারই অদৃষ্টে" ইত্যাদি (তগদীর=অদৃষ্ট)। "খোদার কাছে শোকর করিলেন" (পৃ. ২৬)। "ইঁহাদিগকে কতল করেন" (পৃ. ২৭)। "একটা সোলেহ করিবার জন্য" (পৃ. ২৮)। "রফার প্রস্তাবের দফা একেবারে রফা হইয়া গেল" (পৃ. ২৯)। "তাহার এবারত বড় চমৎকার হইত" (পৃ. ২৯) (এবারত=রচনা)। "ইহারা কিমিয়া জানে" (পৃ. ৬৩)। "সুন্নী খেলাফত বাতিল ও শিয়া খেলাফত ও ইমামত জারি করেন" (পৃ ৭৯)। "একদিন গোছলখানায় আছাড় খাইয়া মারা পড়েন" (পৃ. ৮০)। "জওয়াহেরাত খচিত" (পৃ. ৮১) (এখানে ও'কারে আ'কার নাই)। "পিতার নিযুক্ত ওস্তাদ" (পৃ. ৮১) (ওস্তাদ=শিক্ষক)। "খাজনাখানার মালিক" (পৃ. ঐ)। "মগ্‌রেবী আমীরকে প্রতিনিধি হইয়া প্রভুত্ব করিতে দেখিয়া মশ্‌রেকী আমীরগণের চোখ টাটাইতে লাগিল" (পৃ. ৮২) (মশরেকী মগ্‌রেবী=পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয়)। "তাহারা দলে দলে আসিয়া......জমা হইতে লাগিল" (পৃ. ৮৩)। "শরাবের কারবার একেবারেই বন্ধ করিয়া দিলেন"

---

* পুস্তকখানি যে প্রবেশিকার পাঠ্য তাহা উহাতে লেখা নাই; আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি মাত্র। যদি আমার সংবাদ সত্য নাও হয়, তথাপি প্রবন্ধের বক্তব্য অসঙ্গত হইবে না। লেখক

(পৃ. ৮৫)। "বাজে-আপ্ত করিয়া নীল দরিয়ায় ঢালিয়া দিলেন" (পৃ. ৮৫)। "হারাম নাপাক জানোয়ার একটিও দেশে রাখা হইল না" (পৃ. ৮৬)। "খালিফার হেক্‌মতে" (পৃ. ৮৬)। "কাহাকেও রেয়াৎ করিতেন না" (পৃ. ৮৭)। "বিখ্যাত আলেমের আবির্ভাব" (পৃ. ৯০)। "বহু আলেম দার-উল্ হেক্‌মতে আসিয়া সমবেত ("জমা" নহে?) হইলে, খালিফা হাকিমের খেয়াল চাপিল, সকলকে প্রাসাদে দা'ওৎ করিয়া খাওয়াইবেন" (পৃ. ৯০) (দা'ওৎ=নিমন্ত্রণ)। "খোদ খালিফার হুকুম" (পৃ. ৯০)। "বহুমূল্য খেলাত দিয়া" (পৃ. ৯১)। "স্বস্থানে সহি-সালামতে আছে কিনা" (পৃ. ৯১) (অর্থাৎ অক্ষত, ঠিক ঠিক আছে কি না) "শিয়াগণ দীদার পাইবার জন্য…" (পৃ. ৯৩) ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সঙ্গে স্থানে স্থানে সাধারণ ভাষার ব্যতিক্রম বলিয়া যাহা মনে হইয়াছে তাহাও দুই-একটি উল্লেখ করিতেছি, যথা—

"এখানে ওখানে বিদ্রোহী চেতিয়া উঠিতে লাগিল" (পৃ. ৯১)। "খুঁটিনাটি লইয়া তিনি যেরূপ ঝকাঝকি করিতেন" (পৃ. ৮৬)। "হাকিম নিজে পাক্কা মুসলমানি ধরণের উৎকট নিষ্ঠাবান ছিলেন" (পৃ. ৮৫)। "স্বভাবের উৎকেন্দ্রতা" (পৃ. ৮৩)।

অবশ্য, শেষোক্ত বিষয়ে আমার ভুল হইতে পারে। এসম্বন্ধে ভাষাবিদ-গণের মত শিরোধার্য্য।

যাহা হউক, উপরি লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, বাংলা ভাষাকে বিদেশী (আরবী-ফার্সী) ছাঁচে ঢালিয়া বিকৃত রূপ দিয়া উহা হিন্দু-মুসলমান বালকদিগকে গলাধঃকরণ করিতে দেওয়া হইয়াছে। যে-সকল মুসলমান * মনে করেন, যে, বিধাতার কুচক্রের ফলে তাঁহারা আরব, কি তুরস্ক, কি মধ্য-এশিয়া হইতে অপহৃত হইয়া হতভাগ্য বঙ্গদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের জন্য এবং নিজেদের সন্তানসন্ততির জন্য এক নূতন অপরূপ ভাষা সৃষ্টি করিয়া লইতে চাহেন লউন, কিন্তু দেশের মাতৃভাষাকে লাঞ্ছিত করার অধিকার তাঁহাদের নাই। আর, যাঁহারা এই দেশকেই একমাত্র মাতৃভূমি মনে করেন, প্রাচীনকাল হইতে যে-ভাষা এ দেশেরই ভাষা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাকেই যাঁহারা একমাত্র মাতৃভাষা বলিয়া জানেন সেই হিন্দু বাঙালীগণের উপর জোর করিয়া ঐ অপভাষা চাপানোর চেষ্টা অনুচিত।

মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যে-সমস্ত কথা তাঁহারা নিজেদের মধ্যে সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই সব বৈশিষ্ট্যযুক্ত শব্দ পুস্তকেও ব্যবহার করিতে হইবে। কথিত ভাষার কতটা কি অবস্থায় লিখিত ভাষায় ব্যবহারযোগ্য তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহা বলা যাইতে পারে যে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে সচরাচর ব্যবহার হয় না, এমন অনেক বৈদেশিক শব্দ আছে। তাহার প্রমাণ পুস্তকের পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টের ৩১ পৃষ্ঠা হইতে ৩৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত "আরবী ও পারসী শব্দগুলির অর্থ" দেওয়া আছে। কঠিন ও স্বল্পব্যবহৃত শব্দকে বুঝাইবার জন্য সহজ ও সচরাচর ব্যবহৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অন্ততঃ বাংলা ভাষা সম্বন্ধে (যেমন অন্য সব ভাষা সম্বন্ধে) এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে, তবে এই জন্যই, "মুসলমানী বাংলা"র সম্বন্ধে ইহার বিপরীত নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে কিনা জানি না। যাহা হউক, যে-সকল "আরবী-পারসী" শব্দ ও অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ এই :—

"মরহুম—বাংলাতে মৃত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিতে '৺' এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়। আরবীতে মৃত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিতে 'মরহুম' শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'মরহুম' অর্থ 'তাহার প্রতি (?) শান্তি হউক।" "এতিম পিতৃহীন কিংবা মাতৃহীন কিংবা উভয় (?) হীন।" "কসম—শপ" (শাপ?)। "গশৎ—ইংরেজীতে যাহাকে round দেওয়া বলে। গশৎ অর্থ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা…।" "মরজ্জা—ইচ্ছা; মেহমানগণ—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ।" "গোনাগার—…পাপী; তগদীর—অদৃষ্ট।" "যুল্‌ফ—কোঁকড়ান চুলের পেঁচ।" "কতল—বধ।…রফা—মিটমাট।" ইত্যাদি।

উদ্ধৃত শব্দগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই অর্থরূপে প্রদত্ত সাধারণতঃ ব্যবহৃত, সহজ বাংলা শব্দগুলি অপেক্ষা কম প্রচলিত অথবা একেবারেই অপ্রচলিত, ইহা বলা বাহুল্য। দু-একটি শব্দ শিষ্ট বাংলায় অপ্রযোজ্য। তথাপি, ঐরূপ বিদেশী শব্দ জোর করিয়া প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য কি পুস্তকের বাংলা ভাষাকে একটু "মক্তবী মাদ্রাসী" গন্ধযুক্ত করা? সেই ভাষা আবার হিন্দু বালকগণকে জোর করিয়া গিলাইবার ব্যবস্থা করিয়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-কর্ম্মচারীরা কি যথেচ্ছাচারের পরিচয় দেন নাই? অচির ভবিষ্যতে বাংলা দেশে যে সাম্প্রদায়িক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে হিন্দু বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে আলোচ্য পুস্তকখানি তাহারই একটু আভাস দিতেছে কি না, কে বলিবে?

পুস্তকখানির ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার সঙ্গে উহার বিষয় সম্বন্ধে কিছু না বলিলে পাঠকের ধারণা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। পুস্তকে চারিটি প্রবন্ধ আছে:- "আবদুর রহমানের কীর্ত্তি" (৪০ পৃষ্ঠা), "ফ্রান্সে মোস্‌লেম অধিকার" (২১ পৃষ্ঠা), "আল্‌হামরা" (১৮ পৃষ্ঠা), এবং "পাগলা খলিফা" (১৯ পৃষ্ঠা)। প্রথম প্রবন্ধটির শিরোনাম পড়িয়া, কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় কোন কোন সিনেমায় প্রদর্শিত "কেলোর কীর্ত্তি" নামক প্রহসনের কথা মনে পড়ে। যাহা হউক, পুস্তকখানিতে ভারতবর্ষের কোন সামান্য কি অসামান্য ব্যক্তি অথবা বিষয় স্থান পায় নাই। আরবের মুসলমানেরা স্পেনে ও ফ্রান্সে এবং মিশরে কি করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা দ্বারা বাঙালী মুসলমান বালক-দিগের মনে অনুপ্রাণনার বিফল চেষ্টা করা হইয়াছে। এক স্থলে, মিশরের এক জন মুসলমান পণ্ডিত "মাধ্যাকর্ষণের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা" লিখিয়া পাদটীকায় বলা হইয়াছে—"ভারতীয় পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য ইহার এক শত বৎসর পরে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন।" অর্থাৎ ঐ বৈজ্ঞানিক সত্যটি প্রথম আবিষ্কারের গৌরব ভারতের নহে, বিদেশী মুসলমানের, এই আনন্দদায়ক উক্তিটি † মুসলমান ছাত্রদিগকে শিখাইয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে। এই প্রকারে, ছাত্রদিগের মনে স্বদেশভক্তি জন্মাইবার চেষ্টা না করিয়া, উহার বিপরীতই করা হইয়াছে। বোধ হয়, ইহারই নাম Extra-territorial patriotism অথবা Pan-Islamism। সোজা কথায় মুসলমান বালকেরা শিখুক যে স্বদেশী অ-মুসলমান অপেক্ষা বিদেশী মুসলমানও তাহাদের নিকটতর আত্মীয়! বিদ্যালয়েও যদি এই মনোভাব প্রচারিত ও প্রতিপালিত হয়, তবে দেশের পক্ষে তাহার ফল কত ভয়াবহ, বুদ্ধিমান হিন্দু ও মুসলমান বাঙালী তাহা বিচার করুন। এ দেশের মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা পাঠ্যপুস্তকে কোন হিন্দু

* "ত্বকছেদিত ভদ্রলোক" বলা যায় কি? আলোচ্য পুস্তকের লেখক নবীনের পুস্তকে ব্যবহৃত "Circumcised people" (মুসলমান এই অর্থে) কথার "ত্বকছেদিত জনমণ্ডলী" অনুবাদ করিয়াছেন। (পরিশিষ্ট ২২ পৃ.)।

† এই উক্তির ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই।—লেখক

মহাপুরুষের নামও আমি দেখি নাই; বিদেশীয় বহু মুসলমানের জীবনকথায় সেগুলি পরিপূর্ণ। যদি দু-একখানা ঐ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য-পুস্তক থাকে, যাহাতে আমার উক্তি ভুল প্রমাণ হয়, তবে আমি সুখী হইব। অথচ, সাধারণ বিদ্যালয়ের (অর্থাৎ যেখানে হিন্দু ছাত্রই অত্যধিক) কোন বাংলা সাহিত্যপুস্তক পাঠ্য নির্ব্বাচিত হয় না, যদি তাহাতে কোন মুসলমানের, অন্ততঃ, কেবল স্বসম্প্রদায়ের হিতকারী মহম্মদ মহসীনের গল্পটি না থাকে।

কাজী ইমদাদুল হক খানবাহাদুর মহাশয়ের আলোচ্য পুস্তকের আর একটি বিষয়-বৈশিষ্ট্য—কাটাকাটি, মারামারি, রক্তারক্তি ইত্যাদি ঘটনার বাহুল্য। এ উহার মাথা কাটিল, একে অপরের হাত-পা কাটিয়া ফেলিল, কেহ কাটামুণ্ড শত্রুকে উপহার পাঠাইল -ইত্যাদি ঘটনা-বাহুল্য বালকদিগকে সুসভ্য, শান্তিপ্রিয় করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হওয়ার কোন কারণ নাই। স্বদেশ, স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া অথবা তদনুরূপ কোন মহান্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সাহস ও বীরত্ব দেখাইলে, সে বিবরণ পাঠের সার্থকতা আছে। নতুবা জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে রাজ্য লইয়া কাটাকাটি মারামারির ৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণনা, অথবা উন্মত্ত রাজার যথেচ্ছাচারের ফলে, নিত্য বাল-বৃদ্ধ-যুবকের মুণ্ড কাটার বর্ণনা ইত্যাদির সার্থকতা বুঝা কঠিন (অবশ্য, যদি ভবিষ্যতে দাঙ্গা, লুঠতরাজ, ও গুণ্ডামি করিবার প্রবৃত্তি জন্মানোর উদ্দেশ্য না থাকে লেখকের সে উদ্দেশ্য নাই, ইহা বিশ্বাস করি)।

বীভৎস বর্ণনাগুলির কয়েকটি নমুনা দিতেছি :—

"আবানকে বন্দী করিয়া তাঁহার হাতপা কাটিয়া ফেলা হয় এবং তদবস্থায় তাঁহাকে এক গাধার উপর সওয়ার করিয়া সিরিয়া দেশের নানা গ্রাম ও নগরের মধ্য দিয়া লোক যেমন করিয়া কোন অদ্ভুত জানোয়ার নানাস্থানে দেখাইয়া বেড়ায় তেমনি করিয়া দেখান হইয়াছিল।" (পৃ. ৪)

"প্রথম লোক্‌মা (=গ্রাস) মুখে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের তরবারির আঘাতে মেহমানগণের ছিন্নমস্তক দস্তরখানে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।" (পৃ. ৫)।

"তারপর আবদুর রহমান এক ভীষণ কাণ্ড করিলেন। বনি আব্বাস দলের প্রধান প্রধান মৃত ব্যক্তির মাথা কাটিয়া লইয়া, পরিষ্কার করিয়া, লবণ এবং কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য দিয়া উত্তমরূপে মাখিয়া, থলিতে ভরিয়া এক বিচিত্র পার্সেল বাঁধিলেন।...অতঃপর এক বণিককে বহু অর্থ দিয়া এই পার্সেলটি কায়রোয়ানে লইয়া গিয়া বাজারের মধ্যে রাখিয়া দিতে রাজী করাইলেন।" (পৃ. ৩৩)।

"তুর্কীরা উহার প্রাসাদ লুঠতরাজ করিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল, এবং অবশেষে একদিন তাহার মাথাটি আস্ত কাটিয়া সটান খলিফার হাতে গিয়া উপহার দিয়া আসিল।" (পৃ. ৮২)।

"ঘরে ঢুকিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল।...খলিফা একটি অতি সুশ্রী সুস্থ সবল শিশুকে নিজ হস্তে খুন করিয়া একাগ্র মনে তাহার দেহ ব্যবচ্ছেদ করিতেছেন। অল্‌-ফজল্ হঠাৎ দেখিয়া ফেলিয়াছেন, আর উপায় নাই; কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহারও দিন ফুরাইয়াছে...ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খলিফা-প্রেরিত ঘাতকের তরবারির নীচে মাথা পাতিয়া দিলেন।" (পৃ. ৮৯)। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কিরূপে প্রচারিত ও প্রোৎসাহিত হইতেছে, তাহা 'প্রবাসী'তে একাধিকবার আলোচিত হইয়াছে। এবং দেখান হইয়াছে, যে, পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া, আমাদের মাতৃভাষাকেও সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য পৃথক্ করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকমের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা যথেষ্ট দূষণীয়। কিন্তু, একই পরীক্ষার জন্য এক স্থানে সমবেত হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদিগকে প্রকারান্তরে সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দেওয়া অধিকতর গর্হিত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯৩২ সালের প্রাইমারী ফাইনাল্ (Primary-Maktab-Final Examination) অর্থাৎ উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আমার সম্মুখে রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে মক্তবের (অর্থাৎ মুসলমান) ছাত্রদের জন্য প্রশ্নপত্রের রং সবুজ; এবং অন্য (non-Maktab) ছাত্রদের প্রশ্নপত্র শাদা রঙের। দুই প্রশ্নপত্রের শিরোভাগে "প্রেসিডেন্সি ডিভিশন (Presidency Division)" এবং "বঙ্গসাহিত্য" লেখা আছে। প্রত্যেক পত্রেই প্রশ্নসংখ্যা ৯। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য প্রশ্নগুলি ভিন্ন রকমের, যথা—

সবুজ প্রশ্ন	শাদা প্রশ্ন
১। ভাবার্থ লিখ :— বেঁচে থাকুক কাস্তে লাঙ্গল ... ... খোদা যারে সুস্থ রাখেন ইত্যাদি	১। ভাবার্থ লিখ :— আমি চাই ছোটঘরে বড় মন লয়ে ইত্যাদি
২। রাবেয়া দীনতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। ইত্যাদি অথবা কোরাণ শরীফের শিক্ষায় ইসলাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষ নবীর প্রতি উহা অবতীর্ণ। ইত্যাদি	২। চিরদুঃখিনী সীতা যে কোন যুগের যে কোন সমাজে আদর্শ স্থানীয়া। ইত্যাদি অথবা যদি বাল্যে পিতা পুত্রকে খাদ্য ও পানীয় দান না করিতেন ইত্যাদি।
৩। নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাগুলির যে কোন দুইটি সংক্ষেপে লিখ :— সোলতান গিয়াসউদ্দীনের বিচার, সাহজাদী জাহানারার পিতৃভক্তি, হজরত আবুবকরের ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং খলীফা হারুণ আল্ রশীদের ন্যায়পরায়ণতা।	৩। ... ... বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি, ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, কর্ণের দান ও চৈতন্যদেবের প্রেম।
৪। মোহম্মদ মহসীনের অথবা স্যার সৈয়দ আহম্মদের 'সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখ।	৪। রামমোহন রায় অথবা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখ।
৫। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তোমার মক্তব সম্বন্ধে একখানা সংক্ষিপ্ত পত্র লিখ।	৫। ... ... পাঠশালা সম্বন্ধে ... ...
৭। এক একটি লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :— ফজল, কবুল, আরজ ও দোজক।	৭। ... ... গবেষণা, প্রচলন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও স্বাবলম্বন।

৮। নিম্নলিখিত স্থানগুলি তোমার প্রিয় ও গৌরবের বস্তু কেন সংক্ষেপে লিখ :—
মক্কা, আগ্রা, গৌড়, খানজাহানিয়া ও আজমীর শরীফ।

৮। একাকার, বিধূদয়, চলচ্ছক্তি ও এতদ্দেশীয়—এই পদগুলির সন্ধি-বিচ্ছেদ কর।

কারক কাহাকে বলে?

(৮ নং ও ৯ নং প্রশ্ন উভয় পত্রেই এক)

একই কেন্দ্রে পরীক্ষার্থ সমবেত ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধির বীজ বপন করিবার ইহা অপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে?* মক্তবের বাংলা পরীক্ষা-পত্র মুসলমান ব্যতীত আর কেহ পরীক্ষা করিতে পারিবেন না, ইত্যাদি আর কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের কথা এক্ষেত্রে আলোচনা করিলাম না।

সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার ফলে যদি মক্তব ও পাঠশালা এক হইয়া যায়, তবে সুখের বিষয় হইবে। কিন্তু, আমাদের আশঙ্কা এই যে, "সবুজ পত্র" পরিণামে "শাদা পত্রকে" গ্রাস করিয়া না ফেলে!

সাম্প্রদায়িক ভেদ বজায় রাখিবার জন্যই কি কোন কোন বাংলা শব্দের অদ্ভুত বানান সৃষ্টি হইতেছে? একখানি বিজ্ঞাপন-পত্রে কিছুকাল পূর্ব্বে দেখিয়াছি :

"একতাই শক্তি! একতাই শক্তি!
জসর টাউনে
ডিষ্ট্রীকট মুসলিম ষ্টুডেণ্টস ইউনিয়ন"

কনভেনার
মহম্মদ মসিহুর রহমান।
জসর।

বিনীত :—
ছাত্রবৃন্দ, জসর।

হসন্ত চিহ্ন দেওয়া-না-দেওয়ার কথা ছাড়িয়া দিয়া, "জসর" এই শব্দের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—হিন্দুরা "যশোহর" অথবা সংক্ষেপে "যশোর" লিখেন বলিয়াই কি নূতন বানানের দরকার হইয়াছে? সম্প্রতি আর একখানি বিজ্ঞাপন-পত্র দেখিলাম। "ময়মনসিংহে মুসলিম ছাত্র সম্মিলনী" সম্বন্ধে। (৩১ আগষ্ট ও ১লা সেপ্টেম্বর) রচনাটি বেশ; কিন্তু দুই স্থানে খটকা লাগিল—"ভাবের আদান প্রদান ও সংহিত সাধনের জন্য এই শ্রেণীর সম্মিলনী যে কত প্রয়োজন" ইত্যাদি। এবং "দলে দলে ইহাতে যুগদান করিবেন"। চিহ্নিত শব্দ দুইটি ছাপার ভুল ভিন্ন অন্য কিছু নহে ত?

* পরে যে এই নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাই নাই—লেখক।

হিন্দু-মুসলমানের একতা ব্যতীত এদেশের মঙ্গল নাই, ইহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত সত্য। কিন্তু দেশের ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ইহাদের প্রতি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সমান মমত্ব-বোধ এ-বিষয়ে অত্যাবশ্যক। কিছুদিন পূর্ব্বে মৌলবী সেরাজ-উল-হক "বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সঙ্ঘে"র বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"ভ্রাতৃগণ, আজ তুরস্ক, ইরান, পারস্য প্রভৃতি নিজ নিজ দেশের প্রাচীন স্মৃতি স্মরণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব গৌরবের সংবোধ ও সংবেদ লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে।...পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্থান, আরব গৌরবের কাণাকড়িও গ্রহণ না করিয়া স্বকীয় অ-মুসলমান পূর্ব্বপুরুষদের অতীত যুগের কীর্ত্তি-কাহিনীর, গৌরব-কাহিনীর স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়া... নূতন রাষ্ট্রজীবন গঠন করিতেছে।...কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণই ভারতের প্রাচীন গৌরবময় মহিমাকে একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। ...কেহ কেহ কৃত্রিম ভাবে আপনাদিগকে মোগল, পাঠান, শেখ, সৈয়দ বলিয়া দাবি করিলেও মন তাহাতে মোটেই জোর পাইতেছে না।...

"সেই প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবের মহাজ্যোতিঃ হইতে ভারতীয় মুসলমানদিগকে বঞ্চিত রাখিলে মুসলমানেরা কখনও ভারতবক্ষে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। এজন্য হিন্দুকে শুধু আপনার মনে করিলে চলিবে না, তাহার সমস্ত গৌরবকেই হিন্দুর ন্যায় কুক্ষিগত করিয়া লইতে হইবে।" (প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৩৯)

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিরূপে কবি কায়কোবাদ বলিয়াছিলেন :—

"যাঁহারা বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য এক প্রকারের বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালী হিন্দুর জন্য অপর এক প্রকারের বাংলা ভাষার প্রচলন দেখিতে চান আমি তাঁহাদের কেহ নহি। আমি বাংলার হিন্দু ও বাংলার মুসলমানের জন্য এক মিলিত ভাষা চাই।...আমরা যাহা রচনা করি তাহা যেন আমাদের প্রতিবেশীরাও অনায়াসে বুঝিতে পারেন, সে-বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।" (প্রবাসী—মাঘ, ১৩৩৯)

যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ এই ভাবের ভাবুক হইতেন, তবে দেশের অনেক অশান্তি চিরকালের জন্য দূর হইত। কিন্তু প্রধানতঃ রাজনৈতিক লাভের আকর্ষণে মনোবৃত্তি যেন বিপরীত দিকেই চলিতেছে।

পরিশেষে হিন্দু বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, প্রাচীন আদর্শধারা এই সকলের উপরই প্রচণ্ড আক্রমণ আসিতে পারে, হয়ত এমন দিন আসিতেছে। তাহার প্রতিকার কি, চিন্তা করা দরকার। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করা এবং সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপন যে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্য ব্যতীত সম্ভব নহে, ইহা এখন বোধ হয় কাহারও বুঝিতে বাকী নাই।

রামভাউয়ের মেয়ে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

সহ্যাদ্রির উপরে একটি নির্ম্মল শীতের দিনের স্মৃতি আমার মনে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

এক দেশী রাজ্যের রাজধানীর উপকণ্ঠে, রাজার বাগান-বাড়িতে, এক জন মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর সহিত আমি রাজ-অতিথি-রূপে বাস করিতেছিলাম। প্রতিদিনের মত সেদিনও প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলাম। ঋতু অনুসারে ভরা-শীত, কিন্তু বাংলার অগ্রহায়ণের প্রথম ভাগের মত অতি সামান্য শৈত্য।

গাছের পাতায় পাতায়, তৃণগুল্মে শিশিরকণা ছড়াইয়া আছে। স্বচ্ছ নীল আকাশের উপর কুয়াশার ক্ষীণ আবরণ, পূর্ব্বাকাশে উষার মৃদু দীপ্তি। তাহার নীচে মাথা তুলিয়া ধূসর পাহাড়শ্রেণী দাঁড়াইয়া। মধ্যে সুদূর বিস্তৃত উপত্যকা স্থানে স্থানে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নভূমিতে খর্ব্বকায় বৃক্ষসকল দল বাঁধিয়া রহিয়াছে।

সমস্ত আকাশ বাতাস একটা অপরিসীম নির্ম্মলতায় ভরিয়া গিয়াছে। সে নির্ম্মলতা মনে করাইয়া দেয় সদ্যঃস্ফুট পুষ্প-রাজির কথা, সদ্যোজাত তৃণাঙ্কুরের কথা, শিশুর উচ্ছ্বসিত হাসির কথা, নিষ্কলুষহৃদয়া কুমারীর শুভ্র মুখমণ্ডলের কথা। মনে হয়, যেন কিশোরী ধরিত্রী ব্রতশুদ্ধ চিত্তে ধ্যানস্থা হইয়া আছে।

ধীরে ধীরে প্রত্যুষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চারিদিক হইতে কলরব উঠিতে লাগিল। প্রথম উঠিল পাখীর কাকলি। কিছুক্ষণ পরে তাহা অতিক্রম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিয়া উঠিল কৃষক বালক-বালিকাগণের কোমল কণ্ঠের চীৎকার। তাহারা জোয়ারী খেতের মাচানে দাঁড়াইয়া পাখী তাড়াইতেছে।

ধীরে ধীরে দিগন্তের কুয়াশার আবরণ কাটিয়া গেল। পাহাড়ের প্রতি চূড়া উদ্ভাসিত করিয়া তরুণ সূর্য্য উদিত হইল। দেখিতে দেখিতে উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ সমস্ত উপত্যকায় ছড়াইয়া পড়িল।

সে-কিরণের স্পর্শে যেন প্রতি জীবের শিরায় শিরায় লোহিত রক্ত নৃত্য করিয়া উঠিল। মেষের দল রাখালদের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া সারা মাঠময় ছড়াইয়া পড়িল। মহিষের বাছুরগুলি দুরন্তভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ঝাঁকে ঝাঁকে বনচড়ুইরা জোয়ারী ক্ষেতে গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, সেখানে তাড়া খাইয়া সোনালী রোদে পাখা মেলিয়া গা ভাসাইয়া দিল। শিশুকণ্ঠের কোলাহলের মধ্যে যেন একটা অদম্য উল্লাস ফুটিয়া উঠিতেছিল।

আমাদের বাগানবাড়িটা একটা পাহাড়ের ঢালুতে। উপর হইতে চওড়া রাস্তা আসিয়া নামিয়াছে। তাহা আমাদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া ক্রমশ নীচের দিকে গিয়া কিছু দূরে একটা ঝরণা অতিক্রম করিয়া আবার পাহাড়ের উপরে উঠিয়াছে। যতদূর দেখা যায় সোজা চলিয়াছে এবং সর্ব্ব-শেষে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে রাস্তা দিয়া দু-চার জন করিয়া স্ত্রীপুরুষ যাতায়াত করিতে সুরু করিল। শহরের বাহিরে বলিয়া সে রাস্তায় লোকচলাচল কম।

সহসা পাহাড়ের উপরের দিকটায় বহু অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। দেখিতে দেখিতে উপর হইতে এক দল অশ্বারোহী লোক ছুটিয়া আসিল। তাহাদের গায়ে লাল কোর্ত্তা, মাথায় গাঢ় নীল পাগড়ী, পায়ে খাকি রঙের পট্টি জড়ানো। তাহারা অগ্রসর হইলে, অশ্বের ক্ষুরধ্বনি ডুবাইয়া দিয়া একটা ঝনৎকার উঠিল। দেখা গেল অশ্বারোহীদের পিছনে শ্রেণীবদ্ধভাবে এক দল শৃঙ্খলিত লোক আসিতেছে। তাহাদের হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ী, বাঁ হাত ও বাঁ পায়ের মধ্যে লম্বা শিকল ঝোলানো। সে শিকলেরই ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হইতেছে। অধিকাংশ লোকই সবল, দীর্ঘাকৃতি। প্রথম-দর্শনে মনে হয় যেন কোনও বিজয়ী বীর বিপক্ষ সেনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া যাইতেছে।

অশ্বারোহীর দল আমাদের বাগানে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বন্দীর দলও আসিল। বাগানের এক পাশে গিয়া

সকলে দাঁড়াইল। অশ্বারোহীরা অবতরণ করিয়া বাংলার বারান্দার ভিত্তির সঙ্গে গাঁথা লোহার আংটার সঙ্গে যার যার ঘোড়া বাঁধিল। বন্দীদের কয়েক জন মাথা হইতে ঝুরি নামাইল, তাহা হইতে অনেকগুলি কোদাল ও সাবল বাহির হইল। আশ্বারোহিগণের নির্দ্দেশমত বন্দীরা মাটি কাটিতে ও পাথর খুঁদিতে লাগিয়া গেল।

জানিলাম ইহারা জেলখানার কয়েদী, রাজার বাগান তৈরি করিতে আসিয়াছে।

বাগানবাড়ির বারান্দায় বসিয়া বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাহাদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া সাবল দিয়া বড় বড় পাথরের ডেলা তুলিতে লাগিল। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলাম, এক স্থানে চারিটি লোক গভীর অভিনিবেশের সহিত কাজ করিতেছে। তাহাদের কালো, দীর্ঘাকার দেহ, স্থির গম্ভীর মুখ, দৃঢ় পদক্ষেপ ও কর্ম্মের ঐকান্তিকতা দেখিলে তাহাদিগকে মোটেই কয়েদী বা অপরাধী বলিয়া মনে হয় না। এক-এক বার বোধ হইতেছিল, কেমন একটা অব্যক্ত গর্ব্বে যেন তাহাদের শির উন্নত হইয়া আছে।

দ্বিপ্রহরের আহারের পর যখন আবার বারান্দার দিকে আসিলাম, তখনও দেখিলাম তাহাদের কাজ অবিরত ভাবে চলিয়াছে। সিপাহীরা পাথরের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কয়েদী দলের নেতারা অপর কয়েদীদিগকে কাজ দেখাইয়া দিতেছে, তাহারা দৃঢ়মুষ্টিতে সাবলের ঘা দিতে দিতে পাথর খুঁড়িয়া তুলিতেছে।

বারোটা বাজিতেই তাহাদের খাইবার ছুটি হইল। জেলখানা হইতে ঝুরিভরা জোয়ারীর রুটি আসিল, সিপাহীদের জন্য কাহারও ছেলে, কাহারও মেয়ে কাপড়ে বাঁধিয়া রুটি তরকারী লইয়া আসিল, কেহ-বা নিজের সঙ্গে আনীত পুঁটলি খুলিল।

কালো দীর্ঘাকৃতি লোক-চারিটি এক জন সিপাহীর তত্ত্বাবধানে দল ছাড়িয়া আমাদের বাড়ির অপর দিকে আসিয়া একটা আমগাছের নীচে বসিয়া খাইতে লাগিল।

আমি ও আমার মারাঠা বন্ধুটি তখন বারান্দায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম। আমি কাগজ ফেলিয়া কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলাম, লোকগুলি কেমন করিয়া একটু একটু রুটির টুকরা বহু ক্ষণ ধরিয়া চিবাইতেছে। খাওয়া শেষ করিয়া তাহারা আমাদের কাছে আসিয়া জল চাহিল এবং অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিতে লাগিল।

লোকগুলির অপরাধের বিষয় জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হইল। আমার বন্ধুটি সে কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টায় অগ্রসর হইল। সর্ব্বাপেক্ষা বয়স্ক লোকটিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কত দিনের সাজা ?"

সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "পাঁচ বছরের। সাড়ে তিন বছর হয়ে গেছে, আর আঠার মাস বাকী আছে। আমাদের তিন জনেরই এক রকম।"

"তোমাদের কেন কয়েদ হ'ল ? কি করেছিলে ?"

সে সহজভাবে বলিল, "তার কারণ রামভাউয়ের মেয়ে।"

আমরা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। তাহার পাশের একটি লোক বলিল, "রামভাউ আমাদের জাতের মোড়ল।"

"তোমাদের কোন্ জা'ত ?"

"আমরা কর্ম্মকার—লোহার।"

রামভাউয়ের মেয়ের জন্য তোমাদের কেন কয়েদ হ'ল ? সে কি খারাপ মেয়েমানুষ ছিল ?"

সহসা বয়স্ক লোকটির দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, হাতের পাঞ্জা শক্ত হইয়া পড়িল। সে কতকটা উদ্ধতভাবে বলিল, "সরকার, আপনারা সে কথা বলতে পারেন। উকীল সাহেবেরাও বার-বার তা বলেছেন। কিন্তু দেখুন, আমি সাড়ে তিন বছর জেল খেটেছি, আরও আঠার মাস খাটব,—আঠার মাস কেন, আঠার বচ্ছর খাট্‌তে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ধড়ে প্রাণ থাকতে রামভাউয়ের মেয়ের সম্বন্ধে ওরকম কথা স্বীকার করব না। সে কথা মিথ্যে!"

তাহার কথার ওজস্বিতা দেখিয়া দু-জনেই অবাক হইলাম। এ-বিষয়ে যে একটা কৌতূহলজনক রহস্য আছে তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

জানা গেল কয়েদীদের খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য দুই ঘণ্টা ছুটি। বন্ধুটি তখন সিপাহীদিগকে বারান্দায় একটা কম্বল পাতিয়া বসাইয়া তাহাদের জন্য পান আনিতে ভৃত্যকে আদেশ করিল, এবং পাশে একটি চাটাই পাতিয়া কয়েদীদিগকে বসিতে

দিল। বৃদ্ধটি বসিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল; তাহার সঙ্গী এক জন বলিল, "বসি চল, দত্তোবা!"

আমার বন্ধু আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "গল্পটা নিশ্চয়ই লম্বা-চওড়া হবে; শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য থাকবে ত, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী?" আমি আশ্বাস দিলে বন্ধু লোকটিকে বলিল, "দত্তোবা, তুমি মিথ্যে বললেই আমরা মিথ্যে ব'লে মেনে নেব? আমাদের রামভাউয়ের মেয়ের কথা আগাগোড়া শোনাও, তাহ'লে বুঝতে পারব কোন্‌টা ঠিক।"

লোকটি আমাদিগকে আপীলের কোর্ট মনে করিয়াছিল কি না জানি না। তবে একটা নিখুঁত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকুল ইচ্ছা তাহার প্রতি কথায় ব্যক্ত হইতেছিল। সে গভীর আগ্রহে নিজেদের কাহিনী বলিয়া যাইতে লাগিল।

এগার ক্রোশ দূরে তাহাদের গ্রাম বটগাঁও। গাঁয়ে ব্রাহ্মণ আছে, মারাঠা আছে, শিম্পী (দর্জ্জি) আছে, আর লোহারেরা আছে, একটা মস্ত পাড়া লোহারদের, গাঁয়ের এক পাশে। রামভাউ সে জাতের নেতা। সকলে তাহাকে শুধু মানে না, আন্তরিক বিশ্বাস করে। রামভাউয়ের তিন কুড়ি বৎসরের জীবনের মধ্যে এক দিনের তরেও কেহ বলিতে পারিবে না যে সে কাহাকেও প্রবঞ্চিত করিয়াছে। তাহার যেমন কথা তেমন কাজ। একবার দত্তোবাকে ডাকিয়া বলিল, "দত্তু, পাণ্ডুরং তোকে খারাপ লোহা দিয়েছে। এবার থেকে কোলাপুর গিয়ে নিজেরা লোহা কিনে আনব।" রামভাউ বাইশ মাইল নিজের বলদের গাড়ী হাঁকাইয়া গেল, পথে গাছতলায় দুই জায়গায় রাত্রি কাটাইল, পাঁচ দিনের দিনে লোহা লইয়া বাড়ি ফিরিল। দত্তোবার দ্বারের গোড়ায় লোহার ঢিবি দেখিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "এসব কোত্থেকে এল?" দত্তোবা সগর্ব্বে বলিল, "রামভাউ এনেছে, কোলাপুর থেকে।"

রামভাউ জাতভাইদের বলিত, "অমন ক'রে জলের দরে মাল বেচিস নে, এক বাজারে না-হয়, আর এক বাজারে কাটবে।" একবার সে গ্রামের তিন জন লোহারকে লইয়া চল্লিশ ক্রোশ পথ মোটরা মাথায় করিয়া কোঁকনে গিয়াছিল; সেখানে প্রত্যেকে এক মাসে তিন মাসের রোজগার করিয়া আসিয়াছিল।

রামভাউ ভয়ে বা লাভের আশায় কোনও দিন কাহারও কাজ নষ্ট করে নাই। একবার গাঁয়ের কুলকর্ণী আসিয়া বলিল, "রামভাউ, আমাদের ঘরের দরজা লাগাতে হবে, কাল সকালের মধ্যে হাঁসকল চাই।" রামভাউ বলিল, "দাদা, তা হচ্ছে না। দামু পাটিলের লাঙল করছি, পরশু তা দিতে হবে, সে কাজ শেষ না ক'রে অন্য কাজে হাত দিতে পারব না।" কুলকর্ণী চটিয়া গেল। বলিল, "তোর কাছে পাটিল হ'ল বড়? দেখাচ্ছি, রোসো।" রামভাউ বলিল, "তা দেখাবে রাওসাহেব, তবে পাটিলের কাজ হাতে নিয়েছি তা আগে শেষ করতেই হবে।" কোনমতেই কুলকর্ণী তাহাকে টলাইতে পারিল না।

রামভাউয়ের বরাতটা মোটেই ভাল ছিল না। প্রথম স্ত্রী অকালে মারা গেল। দ্বিতীয় বার আলতার গণু যাদবের বেটীকে বিবাহ করিল। যাদবের বেটী যখন স্বামীর ঘর করিতে আসিল, তখন রামভাউয়ের চুলে পাক ধরিয়াছে। যাদবের বেটী রূপে কামারপল্লী আলো করিয়া দিল। এমন সুন্দর বৌ এ জাতের মধ্যে কমই আসিয়াছে। কিন্তু রামভাউয়ের কর্ম্মের ফলে তিন বছরের একটি মেয়ে রাখিয়া তাহার স্ত্রী প্লেগে মারা গেল।

সমস্ত "ভাইবন্ধু" মিলিয়া যাদবের বেটীকে দাহ করিয়া আসিল। যাহাদের চোখে কেহ কোনদিন জল দেখে নাই তাহারাও সেদিন কাঁদিল—রামভাউ আর তাহার ছোট্ট মেয়ে ধোণ্ডীর জন্য। লোকে বলে জাঁকালো নামের প্রতি দেবতার দৃষ্টি যায়, তাই রামভাউ মেয়ের নাম রাখিয়াছে, 'ধোণ্ডী'—পাথরের টুকরা!

রামভাউয়ের পত্নীবিয়োগ হইলে তাহার সংসার আর তাহার ছোট মেয়েটিকে দেখিতে আসিল তাহার পঁচাশি বছরের মাসী-কুণ্ডু। কুণ্ডুমাসী ছিল—এখনও সে বাঁচিয়া আছে—পুরানো অশ্বত্থগাছের মত। পায়ের আঙুলগুলি ঠিক যেন শিকড়। গায়ের চামড়া ঠিক যেন গাছের ছাল। মাথাভরা উস্কখুস্ক চুল, শাদা হইয়া তার পরে ধোঁয়াটে রং ধরিয়াছে। কুণ্ডুমাসী চার কুড়ি পাঁচ বছরের মধ্যে চার কুড়ি পাঁচ বার স্নান করিয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সে-কথা বলিলে সে বাঘিনীর মত তাড়া করিয়া আসিত। কুণ্ডুমাসীর গায়ের হাড় কয়খানা ছিল অক্ষয়; সে রোজ ইঁদারা হইতে রামভাউয়ের বাড়ির জন্য বড় বড় ঘড়ায় করিয়া

জল ভরিয়া আনিত। রামভাউয়ের জন্য ভোরে চারটায় উঠিয়া জোয়ারীর রুটি তৈরি করিত। আর সারাদিন ধোণ্ডীকে লইয়া খেলা করিত।

সেই পঁচাশি বছরের বুড়ী আর তিন বছরের নাতনীর খেলা দেখিতে লোক দাঁড়াইয়া যাইত। ধোণ্ডী ছিল ঠিক যেন নূতন ভুট্টার শীষ, কোমল ডগ্‌ডগে। রামভাউ তাহার জন্য কোলাপুর হইতে ঝুটা রেশমের অতি চকচকে সবুজ কাপড় আনিয়া দিয়াছিল, গজানন শিম্পী তাহা দিয়া তাহার জন্য একজোড়া সুন্দর ঝগা-পোল্‌কা (ঘাঘরা ও ব্লাউজ) তৈরি করিয়াছিল। ধোণ্ডী তাহা পরিয়া যখন কুণ্ডুমাসীর কোলে বসিত, তখন মনে হইত যেন কাঠকয়লার ঢিপির উপর বর্ষার জল পড়িয়া একটা দোপাটি গাছ গজাইয়া ফুলে ফুলে ভরিয়া আছে।

ধোণ্ডী যখন ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিল তখন কামার-পাড়ার লোকেরা অবাক হইয়া দেখিল, যাদবের বেটীর যে রূপ আগুনে পোড়াইয়া দিয়া আসিয়াছিল, তাহা আবার ধীরে ধীরে মেয়ের মধ্যে ফুটিয়া বাহির হইতেছে!

পাড়ার লোকেরা দেখিত এক-এক দিন কুণ্ডুমাসী ঘরের দাওয়ায় বসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া কাঁপা হাতে ধোণ্ডীর কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলিতে তেল মাখাইয়া দিতেছে। তেল মাখানো হইয়া গেলে বুড়ী একখানা পুরানো কাঠের চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়াইয়া বেণী বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে কাপড়ের ফুল ঝুলাইয়া দিত। কপালে ছোট্ট সিঁদুরের টিপ কাটিত। গায়ের ঝগা-পোল্‌কা ছাড়াইয়া ছোট লাল একটি শাড়ী পরাইয়া দিত। শাড়ীর উপর রূপার একটি চন্দ্রহার কোমরবন্ধের মত শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধোণ্ডী বাপের সঙ্গে মাঠে কাজ করিতে যাইত।

সকালে সে একটা ছোট্ট লাঠি হাতে লইয়া মোষ তাড়া করিত, আর মোষের বাছুরেরই মত আনন্দে মাঠের উপর ছুটিয়া বেড়াইত। মোষের বাচ্চা ধোণ্ডীকে দৌড়ে হার মানাইত সত্য, কিন্তু ধোণ্ডী যখন আনন্দে হাততালি দিয়া নাচিতে থাকিত আর তাহার মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিত, তখন দেখা যাইত জানোয়ারে আর মানুষে কি প্রভেদ! জানোয়ারের শক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সে শিশু ও নারীমুখের মধুর হাসি পাইবে কোথায়?

একদিন সন্ধ্যায় রামভাউ দত্তোবাকে ডাকিয়া বলিল, "দত্তু! এবার ধোণ্ডীর বিয়ের খোঁজ দেখতে হয়।" দত্তোবা অবাক হইয়া বলিল, "এখনই? মেয়ের ত দশ হয় নি।"

রামভাউ বলিল, "বয়স দেখে কি হবে দত্তোবা? ঘরে মা নেই। মানুষের জীবনে বিশ্বাস কি? তাকে বিয়ে না-দেওয়া পর্য্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই।"

বহু খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে ধোণ্ডীর বর স্থির হইল, নয় ক্রোশ দূরে নির্সী গ্রামে। জমি-জারাৎ আছে, বাপের কারবার আছে, ছয় ভাইয়ের ভাই। বিবাহের দিন ঠিক করা হইল। রামভাউ খুব ঘটা করিয়া মেয়ের বিবাহ দিল। তের টাকা খরচ করিয়া পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে ঢাক আর সানাইয়ের বাদ্য আনিয়াছিল। লোকে এখনও সে বাজনার কথা ভুলিতে পারে নাই।

দেবতা ভাল লোককে কষ্ট দিতে আনন্দ পায়। ধোণ্ডীর বিবাহের পর স্বামীর বাড়ি যাইতে তখনও বহু দেরি; এক দিন খবর আসিল, মারুতী কর্ম্মকারের তৃতীয় ছেলে সখারাম, রামভাউয়ের জামাই, আগুনে পা পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। একটা উত্তপ্ত লোহা আগুন হইতে উঠাইয়া আনিবার সময় পায়ের উপর পড়িয়া গিয়াছিল। গাঁয়ের কথামত নানা রকম ঔষধ দেওয়া হইল, কিন্তু ঘা সারিল না, বরং ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। আর এক দিন খবর আসিল ঘা দূষিত হইয়াছে।

রামভাউ বলিল, "দত্তোবা, এবার যেতে হয়। খবরটা আমার কাছে ভাল লাগছে না।"

রামভাউয়ের মধ্যে কেমন একটা শক্তি ছিল, কোন বিষয় ঘটিবার পূর্ব্বেই সে তাহার একটা আভাস পাইত। ধোণ্ডীর মা মরিবার পূর্ব্বেও এমনই হইয়াছিল। তখন যাদবের বেটী সুস্থ, সবল। এক দিন রামভাউ বলিল, "দত্তোবা, হরিবার ছেলেটা যে মরেছে, তা'তে আমার সন্দেহ হচ্ছে। হাত-পায়ের জোড়ায় 'গাঁট' উঠেছিল। ও নিশ্চয় পিলেগ। আমার মনে হচ্ছে এবার আমাদের গাঁয়ে পিলেগ হবে। কে যায় কে থাকে দেবতা জানে!" দত্তোবা মুহূর্ত্তের তরেও ভাবে নাই যে, রামভাউয়ের গৃহেই সে প্লেগের আবির্ভাব হইবে।

পরদিন ভোরে রামভাউ ও দত্তোবা দু-জনে কাপড়ে

ভাক্‌রী বাঁধিয়া নির্সীর দিকে রওনা হইল। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, দু-জনেই ঘোংড়ী (দেশী কম্বল) দিয়া মাথা ও শরীর মুড়িয়াছে। আট ক্রোশ পথ চলিবার পর দেখে বর্ষায় নদী ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। পাহাড় হইতে লাল জল প্রবল স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে। রামভাউ বলিল, "দত্তোবা, এখন উপায়?" দত্তোবা বলিল, "রামভাউ, এত পথ যখন এসেছি, তখন যাবই।"

দু-জনে পরিবার কাপড় ও ভাক্‌রী ঘোংড়ীর ভিতর পোঁটলা করিয়া বাঁধিয়া হাতের উপর উঁচু করিয়া ধরিয়া লেংটি পরিয়া জলে নামিয়া পড়িল, এবং পরপারে, প্রায় আধ মাইল নীচে গিয়া উঠিল। তার পর বহু পথ পর্য্যন্ত নদীতীরের কালো জমির উপর লাল লাল পায়ের চিহ্ন ফেলিয়া তাহারা নির্সীর দিকে অগ্রসর হইল।

নির্সী গিয়া জানিল সখারামকে শহরের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তখন রামভাউ বলিল, "দত্তোবা, এবার কোলাপুর যেতে হয়, চল রেলে যাব।" অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও রামভাউ বেহাইয়ের বাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করিল না। ষ্টেশনের দিকে যাইতে যাইতে দত্তোবা বলিল, "রেলে যে যাবে রামভাউ, পয়সা এনেছ?" রামভাউ ট্যাঁক হইতে নগদ এক টাকা এগার আনা খুলিয়া দেখাইল।

দু-জনে গাড়ীতে বসিয়া ভাক্‌রী খাইল, কোলাপুর ষ্টেশনে নামিয়া নল হইতে জল খাইল। হাসপাতালে গিয়া দেখিল, সখারাম ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না, একটা লোহার খাটের উপর শুইয়া আছে। রামভাউয়ের হাতে তখন এক টাকা ছয় আনা বাকী ছিল, তাহা হইতে জামাইকে দুধ খাওয়াইবার জন্য এক টাকা দিয়া, বাকী ছয় আনায় দুই জনে তিনদিন কোলাপুরে থাকিয়া, চতুর্থ দিন ভোর রাত্রে রওনা হইয়া বেলা এক প্রহরের সময় বটগাঁয়ে গিয়া পৌছিল।

বাড়ি আসিয়া রামভাউ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। দত্তোবা বলে, "রামভাউ ঘাবড়াচ্ছ কেন?" এমন দুর্ব্বলতা রামভাউয়ের মধ্যে দত্তোবা কোনও দিন দেখে নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে ক্ষেত্রের সীমানা লইয়া কামার আর মারাঠাদের মধ্যে লাঠালাঠি হইয়া গিয়াছে, রামভাউ দলের নেতা হইয়া দারুণ ভাবে লাঠি চালাইয়াছে, মনে হইয়াছে তাহার যেন অসীম ক্ষমতা। কিন্তু আজ যেন সে শিশুর মত দুর্ব্বল।

কিছু দিন বাদে যখন রামভাউ আর দত্তোবা আবার কোলাপুরে গেল, তখন গিয়া দেখিল, হাসপাতালের কালো খাটটা খালি পড়িয়া আছে।—চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ না হইতেই ধোণ্ডী বিধবা হইল।

কয়েক দিন পর্য্যন্ত ধোণ্ডী হাসিল না, মাঠে গেল না, ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাই মরিয়া গেলে বাছুর যেমন হাম্বা হাম্বা ডাকে, অথচ কি হইয়াছে বলিতে পারে না, সে রকম। শুধু বুড়ী কুণ্ডুমাসী এক-এক বার বিলাপ করিয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু কিছু দিন পরে ধোণ্ডী সব ভুলিয়া গেল। রীতিমত কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল, যেন কিছুই হয় নাই। দুপুরে সে রামভাউয়ের ভাক্‌রী লইয়া ক্ষেতে যাইত। এখন কুণ্ডু-মাসীকে আর ভাক্‌রী তৈরি করিতে বা জল ভরিতে হয় না, সবই ধোণ্ডী করে। সে মাঠে আসিয়া খুব যত্ন করিয়া রাম-ভাউকে খাওয়াইত। দত্তোবাকে মাঝে মাঝে বলিত, "দত্তু মামা, তোমাকে একটু লোঞ্চা (আচার) দেব? এইটে খেয়ে দেখ, আমি নিজে করেছি।" দত্তোবা খাইয়া খুশী হইত, সেই অবধি বাড়ি হইতে পুঁটলী বাঁধিয়া দুইখানার জায়গায় আড়াইখানা ভাক্‌রী আনিত।

ধোণ্ডী বিধবা হইবার পর রামভাউ বিশেষ করিয়া তাহার জন্য রাঙা রাঙা শাড়ী আর রং-বেরঙের কাচের চুড়ি আনিয়া দিত। শুধু তাহার কপালটি খালি থাকিত—তাহাতে সিঁদুর পরিত না।

বছরের পর বছর ধোণ্ডী বাড়িয়া চলিল, আর তাহার মায়ের মুখশ্রী তাহার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এক দিন দত্তোবাই তাহাকে চিনিতে পারে নাই। সেবার ধোণ্ডী দেবরের বিয়েতে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছিল, মাস-তিনেক পরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এক দিন দত্তোবা দেখিল মাঠ হইতে একটি মেয়েমানুষ একঝাঁকা ঘাস মাথায় লইয়া যাইতেছে। মুখের দুই দিকে ঘাস ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মাঝখানে ঠিক যেন গাছের পাতার ভিতরে চাঁদের মত একটি গৌরবর্ণের মুখ শোভা পাইতেছে। দত্তোবা ভাবিল, এগাঁয়ে এমন রাঙা বৌটি কে? কিছু ক্ষণ ঠাহর

করিতে পারিল না। কাছে আসিয়া ধোণ্ডী তাহার শাদা দাঁত-গুলি বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "দত্তমামা, আজ তোমার এত দেরি কেন?" রামভাউয়ের মেয়ে ছাড়া ওরকম মিষ্টি হাসি সে গাঁয়ে আর কোনও মেয়ে ছিল না—ব্রাহ্মণের মধ্যেও নয়।

তার কিছু দিন পরে এক দিন দত্তোবা রামভাউকে বলিল, "রামভাউ, এবার মেয়ের একটা পাটবিয়ের যোগাড় কর, ওভাবে ক'দিন আর থাকবে?" রামভাউ গম্ভীর হইয়া বলিল, "ভাই, সেবার তোমার কথা না-শুনে তাড়াহুড়া করলুম, ফলটা যা হ'ল দেখলে। এবার আর তাড়াতাড়ি করছি নে।'

বর্ষা গেল, শীত আসিল। তখন শীতের মাসগুলি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। চাষারা শেষ ফসল চিনেবাদাম খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছে। রামভাউয়েরও জোয়ারী ও ভুট্টা উঠিয়া গিয়া একটি চিনেবাদামের ক্ষেত মাত্র বাকী ছিল। তাহা তুলিবার দুই দিন পূর্ব্বে রামভাউ পাড়ার বাপুকে লইয়া এক ভিন্ন গাঁয়ের বাজারে সওদা লইয়া গেল।

সেদিন সকালে দত্তোবার স্ত্রী মোষ দোহাইয়া, ওপাড়ায় রোজের দুধ দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, দত্তোবা হরিকে লইয়া কারখানা-ঘরে একটা লাঙ্গলের ফাল তাতাইয়া তার মাথায় ঘা মারিতেছে, এমন সময় দেখিল, ঘরের পাশ দিয়া রামভাউ চলিয়াছে, পিছনে বাপু। রামভাউয়ের মাথার বোঝাটা দেখিয়া মনে হইল, বেশ ভারী। রামভাউয়ের মুখটা বিষণ্ণ। সে বলিল, "দত্তোবা, এবার ব্যবসায়ে বড় মন্দা পড়েছে, এখন লোহারদের ক'রে খাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।" তার পর বলিল, "আমি পাঁচ-সাত দিনের জন্য চল্লাম, তুমি আমার বাড়িঘর দেখবে।"

ধোণ্ডী ভোরবেলা মজুরীনদের লইয়া ক্ষেতে কাজ করিতে যায়। সেদিন রামভাউ বাহিরে যাইবে বলিয়া যাইতে দেরি হইল। রামভাউ চলিয়া যাইবার কিছু ক্ষণ পরেই দেখা গেল সে ভাকরীর পুঁটলী লইয়া মাঠে চলিয়াছে। দত্তোবা দুপুরবেলা রামভাউয়ের বাড়িতে গিয়া দেখিল, ফুগু-মাসী ঘড়াতে জল লইয়া রামভাউয়ের কারখানা-ঘরটা নিকাইতেছে। বাড়ি ফিরিয়া দত্তোবা তাহার বেগুন-ক্ষেতের কাজে লাগিল। ঘাস উঠাইয়া বেগুনগাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী ঝাঁকা ঝাঁকা ছাই আনিয়া ক্ষেতের একধারে ফেলিতেছিল। পাশের রাস্তার উপর পাড়ার ছোট ছেলেরা ডাণ্ডাগুলি খেলিতেছিল। দত্তোবার বাড়ির পাশে, হরিবার ঘরের সামনে, হরিবার মেয়ে মঞ্জী আর দত্তোবার দৌহিত্রী হাউসী গান গাহিতে গাহিতে "ফুগড়ী" নাচ নাচিতেছিল।

দত্তোবা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্ষেতে কাজ করিল। যখন দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন তাহার বাড়ির পাশের পথ দিয়া চলিতে চলিতে ও-পাড়ার নারায়ণ ভটজী বলিল, "কি হে দত্তোবা, এবার তোমার বেগুন-ক্ষেতটাই দেখছি সবার সেরা হবে।" দত্তোবা মুখে বলিল, "বামুনঠাকুর, তোমার কৃপা।" কিন্তু মনে মনে ভাবিল, নারাণ ভটের দৃষ্টিটা বড় সুবিধার নয়। ক্ষেতের ভাগ্যে কি আছে কে জানে?

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মাঠ হইতে মোষের দল ফিরিয়া আসিতে লাগিল। গাঁয়ের যে-সকল মেয়ে-পুরুষ মাঠে কাজ করিতে গিয়াছিল তাহারা দলে দলে ফিরিতে লাগিল। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার কতকটা ঘনাইয়া আসিয়াছে তখন দত্তোবা দেখিল কুলওয়াড়ীদের চিকুবাঈ এক দল মেয়ে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছে। কাজ শেষ করিয়া মাঠ হইতে ঘরে ফিরিবার সময় চিকু নানা রকম উপকথা বলে; মেয়েরা ঝাঁকা-মাথায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহা শুনিতে শুনিতে চলে। কোন কোন গল্পে এমন হাসির কথা থাকে যে মেয়ের দল হাসিয়া ভাঙিয়া পড়ে। তাই চিকু ও তাহার দলের মজুরীনদের ফিরিতে দেরি হয়।

তাহারা ফিরিলে মনে করিতে হইবে যে মাঠে আর কেহ নাই।

তার কিছু ক্ষণ পরে, সন্ধ্যার অন্ধকার আরও কতকটা ঘনীভূত হইলে, হঠাৎ মাঠের দিক হইতে একটা অস্পষ্ট কান্নার শব্দ শোনা গেল। দত্তোবা ইঁদারার ধারে হাত-পা ধুইতেছিল, সে কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। আবার শুনিল সে-কান্না নারী-কণ্ঠের। কে যেন কান্নাটাকে সবলে চাপিয়া রাখিতেছে। দত্তোবা তাহার ক্ষেতের কাঁচিটা ধুইয়া পাশে রাখিয়াছিল, তাহা হাতে লইয়া মাঠের দিকে ছুটিল।

কিছুদূর পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখিতে পাইল না। দত্তোবা তখন সোজা না গিয়া ডান হাতের পথ ধরিয়া চলিল। সে-পথে গ্রামের মধ্যপাড়ায় যাইতে হয়। সে-পথে কতক অগ্রসর হইয়া দেখিল, দামু পাটিলের ছেলে বাবু মাঠ হইতে বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। বাবু গাঁয়ের এক জন গুণ্ডা ছেলে। দত্তোবা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কি রে বাবিয়া ?" বাবু উত্তর না দিয়াই চলিতে লাগিল। দত্তোবা আগাইয়া গিয়া তাহার হাত ধরিতে গেলে বাবু পাশ কাটাইয়া যাইতে চাহিল। এমন সময় দত্তোবা পিছন হইতে একটা কোলাহলের মত শুনিল। দত্তোবা বাবুর হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, "বল্ বেটার ছেলে, কার মাথায় মেরেছিস্।" বাবু হাত ছিনাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। না পারিয়া হঠাৎ দত্তোবার কোমরে ডান পা দিয়া অতি জোরে এক লাথি মারিল। ইহাতে দত্তোবা ক্রুদ্ধ হইয়া দুই হাতে তাহাকে সাপটাইয়া ধরিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া পাড়ার লোককে ডাকল। দুই জনে ধস্তাধস্তি চলিল।

দেখিতে দেখিতে পাড়ার হরিবা, দত্তোবার মেয়ের জামাই কৃষ্ণা, আর বাপুর ছোট ভাই নানা ছুটিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে মাঠের অপর দিক হইতে কলরব করিতে করিতে আসিল রামভাউয়ের ক্ষেতের মজুরীন ভাগু বাঈ আর রামভাউয়ের মেয়ে ধোণ্ডী। দত্তোবা ধোণ্ডীকে প্রথম তাহার গলার শব্দে, তার পর চেহারায় চিনিল। তাহার মাথায় ঘোমটা নাই, চুল এলোমেলো। সে পাগলের মত চেঁচাইয়া বলিল, "ঐ পাট্‌লা।" ভাগু তীব্র কণ্ঠে বাবু পাটিলকে গালি দিতে লাগিল। বলিল, "আজ রামভাউ থাকলে তোকে কেটে কুটি কুটি করত।"

দত্তোবা বলিল, "কি হয়েছে, ধোণ্ডী বল্।" তত ক্ষণে হরিবা ও নানা আসিয়া বাবুকে ধরিয়াছে, দত্তোবা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ধোণ্ডী ক্ষিপ্ত স্বরে বলিল, "সন্ধ্যা হ'লে কাজ শেষ করে দেখি, আমার ঝাঁকাটা নেই। ভাগুকে ক্ষেতের পূব দিকে পাঠিয়ে আমি পশ্চিম দিকে গেলাম। মাঠের কোণে গিয়ে দেখি জোয়ারীর শুক্‌না ডাঁটার উপর ঝাঁকাটা রেখে পাট্‌লা তার ওপর ব'সে আছে। তখন মাঠ খালি হয়ে গেছিল। আমাকে দেখে পাট্‌লা হাস্‌তে লাগল। আমি বললাম, 'ওরে পোড়ার মুখো, তুই আমার ঝাঁকাতে বসেছিস কেন ?' ও বললে, 'তুই এখানে আস্‌বি ব'লে।' আমি রেগে বললাম, 'আমার ঝাঁকা দে।' সে তখন হঠাৎ এসে আমায় আক্রমণ করলে,"—বলিতে বলিতে ধোণ্ডী উন্মাদের মত পাটিলের দিকে চলিল।

পাটিল ধোণ্ডীকে অশ্লীল গালি দিয়া তাহার দিকে পা তুলিল। দত্তোবার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সে কৃষ্ণাকে বলিল, "কৃষ্ণা, শীগগির ফট্‌কাটা নিয়ে আয়। কৃষ্ণা ক্ষেতের বেড়া হইতে ফট্‌কাটা (ক্যাক্‌টাস্) আনিতে গেল। তখন সকলে ধরিয়া বাবু পাটিলকে মাটিতে চিৎ করিয়া ফেলিল। নানা হাত আর হরিবা পা চাপিয়া ধরিল, দত্তোবা বুকের উপরে বসিয়া বলিল, "আন্ ফট্‌কাটা।" কৃষ্ণা ফট্‌কাটা আনিয়া দত্তোবার হাতে দিল। দত্তোবা কৃষ্ণাকে বলিল, "তুই মাথাটা ধর, যেন নড়তে না পারে।" কৃষ্ণা মাথা চাপিয়া ধরিল। তখন দত্তোবা ফট্‌কাটা দ্বারা প্রথম বাবুর ডান চোখ তার পর বাঁ চোখ অন্ধ করিয়া দিল।

বাবু পাটিল ষাঁড়ের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দত্তোবা বলিল,—"ছাড়্।" তাহারা ছাড়িয়া দিলে সে রক্তে গড়াগড়ি খাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

দত্তোবা ধোণ্ডীকে হাতে ধরিয়া তাহার বাড়িতে লইয়া গেল। অন্যেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাহারা বাড়ি ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের লোক আসিয়া সোরগোল করিতে আরম্ভ করিল।

পরদিন দত্তোবা, তাহার তিন জন সঙ্গী, এবং পাড়ার আরও পাঁচ জন লোক পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হইল। বাবু পাটিলকে হাসপাতালে দেওয়া হইল। দত্তোবা ও তাহার সঙ্গীরা নিজেদের দোষ স্বীকার করাতে অন্যেরা খালাস পাইল। তাহাদের পাঁচ বৎসর করিয়া কয়েদ হইল। বাবু অনাথালয়ে গেল।

রামভাউ তাহার ঘটিবাটি, অবশেষে ক্ষেত-পাথর বিক্রী করিয়া উকিল লাগাইল। দত্তোবাদের জেল হইতে বাঁচাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিল। তাহাদের পক্ষের উকিলেরা হাকিমকে অনেক বুঝাইল, অনেক কথা বলিল। ফলে শুধু পাঁচ জন বাজে লোক মুক্তি পাইল।

কিন্তু দত্তোবা এখনও বুঝিতে পারে না, হরিবা কৃষ্ণা আর নানার কেন কয়েদ হইল। তাহারা ত নিজে কিছু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা তরুতলে শ্রীকিরণবালা সেন

করে নাই, তাহার কথামত কাজ করিয়াছে। তাহাদের কাজের জন্য ত সে-ই দায়ী। সুতরাং তাহাকে জেল দিয়া আবার তাহাদিগকে জেল দিবে কেন?

দত্তোবার কাহিনী শেষ হইলে আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের দৃঢ় পেশীগুলি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। তার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি যে ও-রকম ক'রে তার চোখ নষ্ট করলে, তোমার মনে একটুকুও লাগল না?" দত্তোবা জিজ্ঞাসু ভাবে আমার মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুটির দিকে চাহিয়া বলিল, "উনি কি বলছেন?"

সে আমার বাংলা স্বরের মারাঠী ঠিক ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারে নাই। বন্ধুটি তাহাকে প্রশ্নটা আবার বলিলে সে উত্তেজিত হইয়া বলিল, "মায়া হবে ঐ পিশাচের ওপর, যে মেয়েমানুষের সতীত্ব নাশ করে?"

আমার বন্ধুটি বলিল, "আচ্ছা দত্তোবা, সে মেয়েটি যে বাস্তবিকই সতী ছিল, তা তোমরা কি ক'রে জান? তার বয়স হয়েছিল, সে ত নিজ ইচ্ছায়ও গিয়ে থাকতে পারে?"

হঠাৎ দত্তোবার চক্ষু দুটি জ্বলিয়া উঠিল। সে তীব্র কণ্ঠে বলিল, "নিজ ইচ্ছায়? রামভাউয়ের মেয়ে? সাহেব, তোমরা রামভাউকে জান না, তাই ওরকম কথা বলছ। উকিল সাহেবরাও পয়সা খেয়ে মানুষের মুখে যা না-আসে তাই বলেছে।"

তার পর অতিশয় ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, "বাবুসাহেব, তোমরা বড়লোক, যা ইচ্ছে তা বলতে পার। আমরা তিন বৎসর জেল খেটেছি আরও আঠার মাস খাটব। আঠার মাস কেন, আরও আঠার বৎসর জেল খাটতে প্রস্তুত আছি, তবু রামভাউয়ের মেয়ে খারাপ, একথা স্বীকার করব না।"

তখনও দুইটা বাজে নাই। তথাপি হঠাৎ চারি জন কয়েদী উঠিয়া দাঁড়াইল। পুলিসের দিকে চাহিয়া বলিল, "চল।" মনে হইল তাহারা যেন অপমান বোধ করিয়া আমাদের নিকট হইতে অবজ্ঞাভরে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে, শেষবার দাঁড়াইয়া আমার বন্ধুটির মুখের দিকে চাহিয়া দত্তোবা বলিল, "সাহেব, আলতার গন্থু যাদবের নাতি তুকারামের সঙ্গে ধোণ্ডীর পাট-বিয়ে হয়েছে, গিয়ে খোঁজ করে দেখ সে সতী মেয়ে কি না।"

একথা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া, প্রায় উদ্ধতভাবে সে সঙ্গীদের লইয়া সেস্থান ত্যাগ করিল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাগানে কয়েদীদের শিকলের ঝন্‌ঝন্ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। ছয়টা বাজিলে তাহারা কাজ ছাড়িয়া প্রভাতের মত শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইল। প্রথমে অশ্বারোহীর দল চলিল, তার পরে কয়েদীর দল। অশ্বের ক্ষুরধ্বনি অতিক্রম করিয়া কয়েদীদের শিকলের ঝনৎকার বাজিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে-ধ্বনি পাহাড়ের কোলে মিলাইয়া গেল।

আমার মনে বার-বার জাগিতে লাগিল দত্তোবার কথাগুলি, "রামভাউয়ের মেয়ে! তার জন্যে আরও আঠার মাস কেন, আঠার বছর জেল খাটতে প্রস্তুত আছি!"

...রামভাউয়ের মেয়ে!*

* সত্যঘটনামূলক।

অন্তঃশীলা—শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক, ভারতী-ভবন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

সাধারণ পাঠক ও সমালোচক নূতন ধরণের বই পড়িতে চাহেন না, বিশেষ করিয়া যে বই পড়িতে বুদ্ধি খরচ করিতে হয়। যে বই একনিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলা যায়, যাহার প্রথম পাতাতেই শেষ পাতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যাহার নায়ক-নায়িকার কাহিনী আমাদের জীবনেরই অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিণতিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ফলে আমাদের জীবনেরই মত সুস্পষ্ট ও সহজভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে সে বই পড়িতে থামিতে হয় না, ভাবিতে হয় না। এই জন্যই বাজারে এই ধরণের বই সংস্করণের পর সংস্করণ কাটে, ডেলি প্যাসেঞ্জারের ট্রেন-সঙ্গী, প্রবীণা গৃহিণীর সুনিদ্রার সহায়, বিবাহের উপহার, নববধূর বাক্সপেটরা সাজাইবার উপকরণরূপে বহুল প্রচার লাভ করে। সমালোচকেরা সাধারণতঃ এই ভাবের বই চান, কারণ এ-ধরণের বইয়ের সমালোচনা করা সহজ, না-পড়িয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমালোচনা সারা যায়।

"অন্তঃশীলা" এই ধরণের বই নহে, ইহাই তাহার প্রথম পরিচয়। পড়িতে গিয়া একই অংশ একাধিক বার পড়িতে হইয়াছে, সমগ্র বইটি দুই বার পড়িয়াছি। এ কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে রচনাভঙ্গীর দোষে এরূপ করিতে হইয়াছে। থামিয়া থামিয়া যে পড়িতে হইয়াছে তাহার কারণ পদে পদে ভাবিতে হইয়াছে, বুঝিতে হইয়াছে। অন্তঃশীলা সম্বন্ধে না-ভাবিয়া না-বুঝিয়া লেখা চলে না। ধূর্জটিবাবু যেভাবে যে-কথাগুলি লিখিয়াছেন সেভাবে সে-কথা লইয়া সাধারণতঃ কেহ এদেশে উপন্যাস রচনা করে না। অন্তঃশীলার বিষয়বস্তুও নূতন, রচনা-শৈলীও নূতন। প্রকাশকের নিবেদন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন হইয়া থাকে, কিন্তু অন্তঃশীলার প্রকাশক যে নিবেদন করিয়াছেন তাহার অনেকখানি স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ হয় না।

দুই শ্রেণীর লোকে নূতন কথা বলে, তাহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর উদ্দেশ্য শ্রোতার মনে চমক লাগান— সে নূতনের জীর্ণত্ব ধরা পড়িতে দেরি হয় না। আর এক শ্রেণীর লোক নূতন কথা বলেন অন্তরের তাগিদে। তাঁহারা যে জ্ঞাতসারে বলেন তাহা নহে, তাঁহারা যাহা বলিতে চাহেন তাহা অন্যভাবে বলা যায় না, এই জন্যই। ধূর্জটিবাবু তাঁহার ষ্টাইলটি জ্ঞাতসারে গড়িয়া তুলিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার কথাই তাহার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী খুঁজিয়া লইয়াছে, স্রোতস্বিনী নদী যেমন আপনার গতিপথ আপনিই খনন করিয়া চলে।

ধূর্জটিপ্রসাদ বাংলার অন্যতম চিন্তাশীল মনস্বী লেখক; ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বলিতে যাঁহাদের বুঝায় তিনি তাঁহাদেরই গোষ্ঠীভুক্ত। তাঁহারা চিন্তার রাজ্যের অধিবাসী, বুদ্ধির ব্যাপারী। জগতের সকল প্রকার চিন্তাসাধনা, বুদ্ধির বিচিত্র প্রয়োগের সহিত তাঁহাদের পরিচয়। সে পরিচয় কোন বিশেষ বিষয়ে নিবদ্ধ নহে (অবশ্য তাঁহারা নিজ নিজ বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞও বটেন।) দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রনীতি, মনোবিজ্ঞান, ললিতকলা, সঙ্গীত, সিনেমা, এমন কি টেনিস খেলা পর্যন্ত সকলই তাঁহাদের পরিচয়ের বিষয়ীভূত। এক কথায় তাঁহারা জীবনরসের রসিক; জীবনের যত কিছু বিচিত্র প্রকাশ সকলেরই প্রতি তাঁহাদের গভীর আগ্রহ, পরিপূর্ণ দরদ। কিন্তু দুঃখ এই যে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এই রসবোধ শুধু বুদ্ধির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়; সমগ্র জীবন, সমগ্র সত্তা দিয়া রসানুভূতি নহে, মাত্র বুদ্ধির সাহায্যে রসগ্রহণ চলে। ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজমের ইহাই সবচেয়ে বড় অপূর্ণতা ও ট্রাজেডি।

অন্তঃশীলার নায়ক খগেন্দ্রনাথ সেই ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজমেরই প্রতীক। নিছক বুদ্ধিবাদের যে ট্রাজেডি তাহার জীবনের ট্রাজেডিও তাহাই। সে খুঁজিয়াছিল বুদ্ধির মধ্যে মুক্তি, কিন্তু মুক্তিলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, কারণ মুক্তি ত সমগ্র সত্তার; ব্যক্তি বলিলে ত শুধু বুদ্ধিই বুঝি না; ব্যক্তির মধ্যে যে আরও অনেক কিছু রহিয়াছে যাহাদের সকলের সমষ্টিতে তাহার ব্যক্তিত্ব।

এইখানে বোধ করি এই উপন্যাসের কথাবস্তু সংক্ষেপে বলিতে পারি। কিন্তু বলিতে গিয়াই বিপদে পড়িতে হয়; কারণ, ইহার আখ্যানভাগ একান্তই সামান্য এবং সামান্য হওয়ার সাফাই গাহিয়াছেন লেখক স্বয়ং। গ্রন্থের এক স্থলে খগেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "সত্যকারের নভেলের গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে; হয়ত কোন সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটসের negative capability থাকবে; তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে,... অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হ'ল pure নভেল, কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়।" এ কথা খগেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া বলাইলেও মনে হয় ইহা লেখকেরই অভিমত। এই মত সর্বাংশে স্বীকার করিতে গেলে সাধারণ পাঠক সাধারণ ঔপন্যাসিক (যাঁহাদের রাজ্যে সম্রাট বাদশা ইত্যাদি থাকেন) ও প্রকাশকগুলি ত মারা পড়িবেন। তাঁহারা ঐ ইঙ্গিতটাই বড় করিয়া চান, চিন্তাটা সেখানে অবান্তর, বিশেষ করিয়া শুদ্ধ চিন্তা।

কিন্তু ধূর্জটিবাবু যাহাই বলুন, তিনি অন্তঃশীল মনের অন্তঃশীল গতির যত বড় চিত্রই আঁকুন, সেই ইঙ্গিতটিকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই: করিলে তাহা সাইকলজির গ্রন্থ, Association of ideasএর উদাহরণ হইত, উপন্যাস হইত না। তাঁহার অন্তরে যে রসিক শিল্পী আছে তাহাই তাঁহাকে সে দুর্ভোগ হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং অন্তঃশীলা সত্যই উপন্যাস হইয়াছে। অবশ্য ইহার অনেকটা স্থানই অবচ্ছিন্ন চিন্তার মনের গতির কথা জুড়িয়া বসিয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যেই আখ্যানের বিকাশের পরিচয়ও রহিয়াছে—সে বিকাশের ধারা ব্যাহত হয় নাই। কোথাও কোথাও হয়ত গল্পের গতি কিছু ঢিমে হইয়াছে এবং তাহা গল্পানুরাগী পাঠকের অনুযোগের কারণ হইয়াছে, কিন্তু সে ধারা কোথাও একেবারে বন্ধ হয় নাই।

গ্রন্থের আরম্ভ হইল করোনারের কোর্টে, করোনার রায় দিতেছেন খগেন্দ্রনাথের স্ত্রী সাবিত্রী ক্ষণিক উন্মাদনার বশে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

সাবিত্রীর সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয় গ্রন্থে হইল না, তাহার সমস্ত পরিচয়ই পাওয়া গেল খগেন্দ্রনাথের চিন্তায় ও আলাপে এবং সাবিত্রীর বন্ধু রমলার সহিত খগেন্দ্রের কথোপকথনের মধ্যে। তাহাতে মনে হয় সে ছিল অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে, তাহার প্রবৃত্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা সকলই ছিল সাধারণ মেয়ের মত এবং সাধারণ মেয়ের যে অসাধারণত্ব আছে সাবিত্রীরও সেই অসাধারণত্ব ছিল যাহা খগেন্দ্রের চোখে প্রথমটা ধরা পড়ে নাই। খগেন্দ্রনাথ তাহাকে ভালবাসেন নাই, তাঁহার আদর্শ সাবিত্রীকে ভালবাসিয়াছিলেন, নিজের বুদ্ধি দিয়া প্রকৃত প্রাকৃত সাবিত্রীকে অতিপ্রাকৃত করিতে চাহিয়াছিলেন; সাবিত্রী যে অঙ্কের নিকট শিখিতে প্রস্তুত ছিল না তাহা নহে বন্ধু রমলার প্রভাব তাহার জীবনে নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল কিন্তু তবুও সে খগেন্দ্রের নিকট কিছু শিখিতে চাহে নাই। কেন? ইহার উত্তর খগেন্দ্রনাথই দিয়াছেন গ্রন্থের শেষে; তাঁহার সকল চেষ্টাই সাবিত্রীর মধ্যে বিরুদ্ধভাব contrariant attitude জাগাইয়া তুলিয়াছিল আর কিছু পারে নাই।...যে প্রেম তিনি বাহ্যতঃ সাবিত্রীকে দিয়াছিলেন তাহা তাহার স্বকৃত আদর্শ সাবিত্রীর সুতরাং তাঁহার নিজেরই উদ্দেশে গোপনে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সেই বিরোধই সাবিত্রীর মৃত্যুর মূল কারণ। সাবিত্রীর আত্মহত্যা খগেন্দ্রনাথের সমগ্র চেতনাকে আলোড়িত করিয়াছিল, তাঁহার মন চিন্তার বিক্ষোভে ও অবচেতনার তরঙ্গাঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইল। এমন সময়ে সাবিত্রীর মৃতদেহের সৎকার উপলক্ষে রমলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয়। গ্রন্থের প্রথম দিকে রমলার যে পরিচয় পাই তাহা কতকটা এইরূপ; তিনি সম্পূর্ণ আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন, আত্মপ্রতিষ্ঠ; সাবিত্রী বন্ধুমহলের একচ্ছত্র নেত্রী। পরে শুনি যে তিনি স্বামীর কলুষিত ব্যবহারের জন্য পৃথক্ বাস করেন, এবং দাম্পত্যজীবনের প্রতি তাঁহার সুগভীর বিরাগ। ক্রমে রমলার আরও পরিচয় পাই; তিনি সহজসেবানিপুণা, অন্যায়ের প্রতি তাঁহার যেমন একটা গভীর বিরাগ আছে, দুঃখের প্রতি তেমনি তাঁহার একটা অপরিসীম সহানুভূতি আছে এবং সে সহানুভূতি বিচারবুদ্ধি দ্বারা মার্জিত ও সংযত। রমলার জীবনে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সামঞ্জস্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহার পরিচয় খগেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে পান নাই। রমলার নিকটেই খগেন্দ্রনাথ সুজন বলিয়া একটি ছাত্রের পরিচয় পান যে আধুনিক ধরণের বুদ্ধিবাদী হইয়াও রমলার স্পর্শে উচ্চতর একটা সাম্যের সন্ধান পাইয়াছিল। এই নূতন পরিচয়ের সংঘর্ষের ফলেই খগেন্দ্রনাথের জীবনে অভিনব সূচনা ঘটিল। এতদিন তিনি একান্তই বুদ্ধির ব্যাপারী ছিলেন; কিন্তু বুদ্ধি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, শান্তি দিতে পারিল না; যে-বুদ্ধি সর্ব্বপ্রকাশক সে ত সাবিত্রীর মৃত্যুর রহস্য তাহার নিকট প্রকাশ করিতে পারে নাই। তবে কি বুদ্ধিই সব নহে? এই চিন্তাই খগেন্দ্রনাথকে নূতন করিয়া অন্তর্মুখী করিয়া দিল; তাঁহার নিজেকে অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা হইল। একান্তে সেই আত্মবোধের উদ্দেশ্যে তিনি রমলার নিকট হইতে দূরে কাশী গেলেন; সেখান হইতে রমলার সহে পত্রবিনিময় হয় ও তিনি তাঁহাকে নিজের ডায়েরী পাঠাইয়া দেন। তাহাতেই রমলা বুঝিতে পারে খগেন্দ্র রমলাকে কিভাবে দেখিয়াছেন এবং সে তাঁহার জীবনে কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গ্রন্থের শেষ দৃশ্যে দেখি নিরুদ্দিষ্ট খগেন্দ্রের সন্ধানে রমলা চলিয়াছে সুজনকে সঙ্গে লইয়া; সুজন রেলে তাহার হাতে খগেন্দ্রের কাছে লেখা একখানা চিঠি দিয়া গেল তাহাতে খগেন্দ্রের শেষ স্বীকারোক্তি, last will and testament, তাঁহার বুদ্ধিবাদের হার স্বীকারও নূতন higher synthesisএর সন্ধানের ও লাভের ইঙ্গিত রহিয়াছে। য়ুং (Jung) মানুষকে দুইটি সাধারণ শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, introvert ও extrovert; এই দুইটি শব্দের প্রতিশব্দ করা যাইতে পারে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। যাহাদের মন বহির্মুখী তাহারা ঘা খাইলে ঘা ফিরাইয়া দেয়, ঘায়ের কথা বসিয়া বসিয়া চিন্তা করে না। কিন্তু অন্তর্মুখীর সকল ঘাতপ্রতিঘাত চলে চেতনারাজ্যে এবং ধীরে ধীরে তাহার জগৎ সঙ্কুচিত হইয়া মাত্র মনোজগতে পরিণত হয় এবং সে মনোজগত একমাত্র তাহারই মনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে। অন্তর্মুখী মানুষ বাহিরের আঘাত পাইলে অন্তরের অন্তরালে আশ্রয় লয় এবং ক্রমে বাহিরের জগৎ তাহার নিকট মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। ইহারই বিকৃতি 'ফ্যানটাসী' ও পরিণতি 'নিউরোসিস্'।

খগেন্দ্রনাথ বুদ্ধিজীবী এবং introvert। Introversion-এর এমন সুন্দর উদাহরণ সাহিত্যে, এমন কি মনস্তত্ত্বের গ্রন্থেও দুর্লভ। তিনি জীবন হইতে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে আত্মরক্ষা হইল না; তাঁহার সকল তত্ত্বই আঘাতে চুরমার হইয়া গেল, জীবনে কোন ঐক্যের সন্ধান তিনি পাইলেন না। তাঁহার সকল কর্ম্মপ্রবৃত্তি অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং খগেন্দ্রনাথই শেষে স্বীকার করিতেছেন "কর্ম্মপ্রবৃত্তি অবরুদ্ধ হ'লে মানুষ বুদ্ধিজীবী হয়।" সেই বুদ্ধিবাদই তাঁহাকে তাঁহারই ভাষায় Egotist করিয়া তুলিয়াছিল যাহার জন্য তিনি মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখেন নাই, তাঁহার সুখ সাধনের উপাদান হিসাবে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিজীবী প্রেম প্রেমাস্পদকে মুক্তি দিতে পারে নাই। এই কথাই তিনি এতদিনে বুঝিয়াছেন। তাই তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন বুদ্ধি সার্থক নহে যদি তাহা বন্ধ্যা হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ থাকে, কল্যাণকে জন্মদান না করে; এই জন্যই বিরোধের শান্তি, জীবনের সার্থকতা বুদ্ধিবাদের মধ্যে নয় পূর্ণপরিণতিতে, মুক্তিতে এবং সে মুক্তির মন্ত্র একত্ব নহে একতা, মৈত্রী; যে মৈত্রী বুদ্ধিকে অস্বীকার করে না তবে তাহার ঊর্দ্ধে ওঠে, যাহার সাধনায় ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না, যাহা জনতায় আত্মবিসর্জন নহে। এই মৈত্রী মানুষকে সম্বন্ধসৃষ্টির জন্য অনুপ্রাণিত করে, যে সম্বন্ধসৃষ্টিই জীবন এবং যাহা জীবনেরই সাধনা। ইহাই creative unity, higher synthesis। এই মৈত্রীর আদর্শই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তিতে, হরপার্ব্বতীর পরিকল্পনায়।

খগেন্দ্রনাথের জীবনের এই পরিণতি দেখানই এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। ইহার মধ্যে ঘটনা-বৈচিত্র্য নাই, চরিত্র-সমাবেশও নাই; ইহার অমূল্য অবদান চিন্তাসমাবেশ; ধর্ম্ম, সমাজ, আদর্শ, আর্ট, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকলের সংঘাতের ফলে খগেন্দ্রনাথের চিত্তসমুদ্র মথিত হইয়া যে তরঙ্গ আলোড়িত হইয়াছে সুনিপুণ কথাশিল্পী তাহাই অনবদ্যভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

রামচরিতমানস—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও অনূদিত। প্রকাশক খাদি প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮২৪। মূল্য কাগজ ও বাঁধাই অনুসারে দুই হইতে চারি টাকা।

ভক্তকবি তুলসীদাসের অমর কাব্য রামচরিতমানস হিন্দীভাষা-ভাষীগণের পরম আদরের বস্তু, মহামূল্য ভক্তিগ্রন্থ। উত্তর-ভারতের কোটি কোটি নরনারীর পক্ষে ইহাই একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এখনও সেখানকার প্রায় প্রতিগৃহে ইহার নিত্যপাঠ ও আলোচনা হয়; শত শত লোক হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বলিতে যাহা বোঝে তাহা এই গ্রন্থের সাহায্যেই বোঝে। বস্তুতঃ বাংলাদেশে কাশীরামদাস কৃত্তিবাস যত পরিচিত হিন্দীভাষীগণের নিকট রামচরিতমানস তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিচিত।... তাহারা

দু-একটি দোহা-চৌপাই জানে না এমন লোক কম। হিন্দীভাষীদের ইহাই জাতীয় কাব্য; এই কাব্য তাহাদের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

যে-কোন কারণেই হোক্ বাংলা দেশের লোকের সাধারণতঃ প্রাদেশিকতাবোধের জন্য অন্যান্য প্রদেশের ভাষা সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে উদাসীন। অথচ অর্থনৈতিক ও অন্য নানাভাবে এই প্রদেশগুলির সহিত আমাদের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যাহাদের সহিত আমাদের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যাহারা আমাদের প্রতিবেশী এবং যাহাদের লইয়া আমাদের প্রতিদিন ঘর করিতে হইবে তাহাদের ধর্ম্ম, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন হইলে চলে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে যে পরস্পর আত্মীয়তাবোধ একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে তাহা জাগ্রত করিতে হইলে পরস্পরের ভাষা সাহিত্য ইত্যাদি আলোচনা করিতে হইবে। হিন্দীভাষীদের জানিতে, তাহাদের সহিত আলাপ করিতে, আত্মীয়তা পাতাইতে তুলসীদাসের মত এমন উপায় আর নাই। সুতরাং সেই গ্রন্থটির সহিত বাঙালী পাঠকের পরিচয়ের সুযোগ করিয়া দিয়া সতীশবাবু বাঙালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

তুলসীদাসের অনুবাদ বাংলায় ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে, কিন্তু এমন সুন্দর সুলভ সংস্করণ ইহার পূর্ব্বে বাহির হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

অনুবাদ সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। মাঝে মাঝে দু-একটি ভুল দেখিয়াছি কিন্তু সেগুলি না ধরিলেও চলে; তবে আশা করি সতীশ-বাবু পরবর্ত্তী সংস্করণে সে ত্রুটিও সারিয়া লইবেন। অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধেও একথা বলা যায়, দু-এক জায়গায় ভাষা পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়।

গ্রন্থের প্রারম্ভে সুদীর্ঘ ভূমিকায় অনুবাদক তুলসীদাসের গ্রন্থে বর্ণিত মুখ্য চরিত্রগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তুলসীদাসের জীবনীও আলোচিত হইয়াছে। ভূমিকাটি পাঠ করিয়া পাঠক উপকৃত হইবেন। রামচরিতমানস যে ব্রজভাষায় লেখা হইয়াছিল অনুবাদক একথা কোথা হইতে পাইলেন? তুলসীদাসের রামায়ণের ভাষায় ব্রজভাষার কিছু প্রভাব থাকিলেও তাহা মূলত অবধী বা পূরবী হিন্দীতে রচিত।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

বিশ্বকোষ—দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা।

এই মহাকোষখানি সুসম্পাদিত ও নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ২৫শ সংখ্যায় প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার সহিত ইহার প্রধান প্রধান শব্দ সম্বন্ধে লেখকগণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় প্রধানতঃ তাঁহার একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ বসুর উৎসাহে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই পুত্র এখন পরলোকে। তাঁহার একটি চিত্র ও জীবনী ২৫শ সংখ্যায় আছে। তাঁহারই স্মারক এই বৃহৎ ও অত্যাবশ্যক গ্রন্থখানি হইবে, এই সঙ্কল্প লইয়া সম্পাদক মহাশয় ইহার দ্রুত ও নিয়মিত প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক।

জলচারী—শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম-এ, পিএইচ-ডি, প্রণীত। ৫০, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এসসি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২॥০ আনা।

আমাদের দেশে পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানবান্ কোন ভারতীয় আছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। তাঁহার জ্ঞান কেবল পুস্তক হইতে লব্ধ নহে। ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য ও সমতল নানা অঞ্চলে ভ্রমণ ও বাস করিয়া তিনি সাক্ষাৎ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিজ জ্ঞানসম্ভার বৃদ্ধি করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন, কলিকাতার নিকটস্থ আগড়পাড়ায় তাঁহার উদ্যান-বাটিকায় যে পক্ষি-নিবাস আছে, তাহাও তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ ও জ্ঞানবৃদ্ধির একটি প্রধান উপায়।

এই পুস্তকখানিতে অম্বুকুক্কুট, ডাহুক ও তাহার জ্ঞাতি, জলপিপি, সারস, টিট্টিভ, কাদাখোঁচা, পানকৌড়ি, গগনবেড়, হাড়গিলা, বক, হংস, ও ডুবুরি—এই জলচারী পাখীগুলির মনোরম ও কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় আছে। ইহা পাঠ করিলে তাহাদের সম্বন্ধে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য কথা জানা যাইবে। কিন্তু যদি অন্ততঃ কোন কোন পাঠকও ইহা পড়িয়া পক্ষিবিজ্ঞান সম্যকরূপে অনুশীলন করিতে উৎসাহী হন, তাহা হইলে গ্রন্থকার নিশ্চয়ই আরও প্রীত হইবেন।

ইহার ছাপা অতি পরিপাটী, কাগজ উৎকৃষ্ট। যে-কয়টি ছবি ইহাতে আছে, তাহার অঙ্কন ও মুদ্রণ নিখুঁত। দেখিয়া পাঠকেরা প্রীত হইবেন। তবে, আমাদের অভিলাষ এই, যে, গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে প্রত্যেকটি পাখীর যদি পৃথক্ ও বৃহত্তর ছবি দেন, তাহা হইলে আরও ভাল হয়। রঙীন ছবি হইলে ত কথাই নাই। কিন্তু এই প্রকার পুস্তক সুখপাঠ্য এবং জীবজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য আবশ্যক হইলেও বাংলা দেশে তাহার ক্রেতা যথেষ্ট আছে কিনা, জানি না। সুতরাং পাঠকদের বেশী লোভ না-করাই ভাল। তবে, ব্যয় বৃদ্ধি না করিয়াও দ্বিতীয় সংস্করণে যাহা হইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করি। গ্রন্থকার পাখীদের যে ইংরেজী নামগুলি মধ্যে মধ্যে দিয়াছেন তাহা বাংলা অক্ষরেও দেওয়া আবশ্যক মনে করি। সেইরূপ, ইংরেজী বাক্যগুলির অনুবাদ বা তাৎপর্য্য বাংলায় দিলে ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকারা এইরূপ বৈজ্ঞানিক বহি পড়িতে আরও উৎসাহিত হইতে পারেন।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন, জেলা বীরভূম "ক" অক্ষরাদি শব্দগুলি চলিতেছে।

এই উৎকৃষ্ট বৃহৎ অভিধানখানির পরিচয় আগে কয়েক বার দিয়াছি। ইহা যদি একাধিক বিদ্বান্ ব্যক্তি সমবেতভাবে পরিশ্রম করিয়া সঙ্কলন করিতেন এবং কোনও বিত্তশালী ব্যক্তিবিশেষের বা সমিতির বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে ইহা প্রকাশিত হইত, তাহা হইলেও তাঁহারা প্রশংসাভাজন হইতেন। কিন্তু ইহার সঙ্কলনকর্ত্তা ও প্রকাশক বিত্তশালী নহেন, এবং সকল কাজ তাঁহাকে একাই করিতে হইতেছে। সেই জন্য তিনি আরও প্রশংসনীয়। কিন্তু আমরা কাহাকেও সেই জন্য এই অভিধানখানির ক্রেতা হইতে বলিতেছি না। ইহার উৎকর্ষ ও প্রয়োজনীয়তার জন্য সমুদয় বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং শিক্ষিত গৃহস্থদিগকে ইহার গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিতেছি।

অমর কথা—শ্রীসরোজিনী দত্ত প্রণীত ও তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখিকা অল্প বয়সে বিধবা হন এবং তাহার অল্পকাল পরে একটি মাত্র সন্তান কন্যাটিকে হারান। "Stunden dor Andacht"

নামক জার্ম্যান বহি অবলম্বন করিয়া ফ্রেডেরিকা রাওয়্যান (Frederica Rowan) "Meditations on Death and Eternity" নামক যে ইংরেজী গ্রন্থখানি রচনা করেন, লেখিকা তাহা পাঠ করিয়া সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ করেন। সেই পুস্তকখানির মর্ম্মকথা তিনি উচ্ছ্বাসপূর্ণ ও কবিত্বময় ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শোক যাঁহারা পাইয়াছেন এবং মৃত্যু যাঁহাদের কাছে রহস্যময়, চিন্তাশীল এরূপ লোকেরা ইহা পড়িলে উপকৃত হইবেন। ইহার যে-কোন পৃষ্ঠায় পড়িতে আরম্ভ করিয়া যে-কোন স্থানে থামা যাউক না-কেন, চিন্তনীয় কিছু পাওয়া যায়।

লেখিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া এখন বেথুন কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপিকার কাজ করেন। তাঁহার বহিখানি পড়িয়া এই ধারণা হইতে আনন্দ পাওয়া যায়, যে, বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিলেই মানুষ ভক্তিহীন হয় না।

চ.

সাতরাজার ধন—শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবী প্রণীত। শিল্পী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন অঙ্কিত প্রচ্ছদপট ও বহু চিত্র সংবলিত। ১০৩ পৃষ্ঠা। ফুলস্কেপ সাইজ। ২৮৩, দরগা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা ও সমস্ত প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য দেড় টাকা।

কেবলমাত্র বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে নয়, বাংলা শিশু-সাহিত্যে শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবীর বিশেষ স্থান আছে। ছোট ছেলে-মেয়েদের বই তাঁহারা অত্যধিক লেখেন নাই, কিন্তু যে কয়টি লিখিয়াছেন, সেগুলি ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়াই লিখিয়াছেন। বহু দিন পূর্ব্বে 'হিন্দুস্থানী উপকথা" পড়িয়াছিলাম। হিন্দুস্থানের বালক-বালিকারা মা-ঠাকুমার মুখে যে-সকল গল্প কত শত বৎসর ধরিয়া শুনিয়া আসিয়াছে সেই শিশু-চিত্তরঞ্জক আখ্যায়িকাগুলি সহজ সুন্দর রচনা-ভঙ্গীতে বাংলা ভাষায় যেন নবজন্ম লাভ করিল। শ্রীশান্তা দেবী-প্রণীত 'হুক্কাহুয়া," শ্রীসীতা দেবী লিখিত "আজব দেশ" "নিরেট গুরুর কাহিনী" প্রভৃতি বইগুলিতে শিশু-সাহিত্য রচনার চমৎকার প্রতিভা দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলা শিশু-সাহিত্যে যেন বইয়ের মনসুন নামিয়াছে। বালক-বালিকাদের জন্য প্রকাশিত বহুসংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক বই ছেলেমেয়ের মানসিক আহারের পক্ষে উপযোগী দেখা যায়। ছেলেমেয়েদের মনে গল্প শুনিবার, গল্প পড়িবার ক্ষুধা দারুণ প্রবল। সেজন্য তাহারা নির্ব্বিচারে সকল বই-ই পড়িতে চায় বটে, কিন্তু খুশী হইয়া বার-বার পড়িবার মত বই অধিক খুঁজিয়া পায় না। তাহারা নূতন নূতন বই কিনিতে চায়। পিতা-মাতারাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না কি বই কিনিয়া দিবেন।

আলোচ্য বইখানি প্রকাশিত হওয়াতে, ছেলেমেয়ের হাতে উপহার দিবার উপযোগী একখানি সুন্দর বই পাওয়া গেল। এ বই হাতে করিয়া, এ বই পড়িয়া ছোট ছেলেমেয়েরা খুশী হইবে। গল্প বলিবার ভঙ্গীতে সহজ ভাষায় লেখা, সরল কল্পনা, অসম্ভবের স্বপ্ন, সহজ হাস্যকৌতুক, আজগুবি ব্যাপার, শিশু-সাহিত্যে যে-সকল গুণ থাকা দরকার, শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবীর রচনায় সেগুলি আছে বলিয়া "সাতরাজার ধন" ছেলেমেয়েদের আনন্দবর্দ্ধক গ্রন্থ হইয়াছে।

"সাতরাজার ধন" গ্রন্থে আটটি ছোট গল্প আছে। রূপকথা উপকথা, দুঃসাহসিকতার কাহিনী, ভূতের গল্প, শিশুমনের বেদনা ও অদ্ভুত কল্পনার কথা, গল্পগুলির বিষয়-বস্তুতে গ্রন্থকর্ত্রীদ্বয় বিচিত্র সমাবেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভোজে একই প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করিলে নিমন্ত্রণ তৃপ্তিদায়ক হয় না।

মধু ছিল পাহাড়পুর গ্রামের রাখাল ছেলে; "আকাশমুখো" বলিয়া সকলে তাহাকে ঠাট্টা করিত; সে কিরূপে বিক্রমগড়ের রাজসভায় প্রবেশ করিল, রাজপুত্রদের হারাইয়া রাজকন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করিল, সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী। ডানপিটে সুবল মিত্তিরদের শিব-মন্দিরের দেওয়াল ভাঙিয়া কিরূপে গুপ্তধন আবিষ্কার করিল, সে এক দুঃসাহসিকতার গল্প। ছোট মেয়ে বেণু মাকে মোটর কিনিয়া দিতে চায় সে পুঁতির মোটর গাড়ীর গাছ। রাজপুরীতে থাকে রাজকুমারী চন্দ্রাননা, তার অসংখ্য খেলনা, কিন্তু খেলার সাথী নাই বলিয়া তাহার ভাল লাগে না, বাজারে খেলনা কিনিতে গিয়া সে সঙ্গে আনিল এক ছোট ফুটফুটে মেয়েকে তাহার খেলার সঙ্গিনী করিয়া, তর্জ্জন সিংএর গর্জ্জনের তোয়াক্কা করিল না। "সাতরাজার ধন" এমনি নানা শিশুচিত্ত-তোষিণী গল্পে ভরা। প্রচ্ছদপটের বিচিত্র বর্ণের ছবিটি সুন্দর। প্রাসাদের ঘাটে ময়ূরপঙ্খী নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, গল্পের আনন্দময় কল্পলোকে লইয়া যাইবে।

পরিষ্কার ঝরঝরে ছাপা ও শোভন বাঁধাই।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

পথের কথা—শ্রীবিজয়কান্ত রায়চৌধুরী প্রণীত। মেসার্স আর, সি, দধি এণ্ড সন্স, মিহিজাম কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম বার আনা। পৃঃ ১২৭+১৬।

বইখানিতে গ্রন্থকারের লিখিত পনেরটি ও পরিশিষ্টে অন্যান্য লেখকের চারিটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে। বাংলার অত্যাবশ্যক অর্থনীতি, পল্লীসমস্যা, কৃষি, আহার্য্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় লইয়া এগুলি লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি কয়েকটি গুণের জন্য উপভোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থকার যে-সকল বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েক বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা প্রাঞ্জল; এবং ইহাতে শুধুই যুক্তিতর্ক নাই, বহু তথ্যের সমাবেশে ইহা যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান হতাশার যুগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে কাজ করিলে, সমবায়-শক্তির দ্বারা যে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে বাংলার আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে পারি, পুস্তকখানি পড়িলে সে শিক্ষা লাভ করা যায়। আত্ম-নির্ভরশীলতার শিক্ষা আজ বাংলা দেশে বিশেষ প্রয়োজন; সেই জন্য আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা

মানুষের ধর্ম্ম—মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, এম্-এ, বি-এল প্রণীত; কলিকাতা মুসলিম পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকখানি কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি; প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ছয়টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে—মানুষের ধর্ম্ম, ধ্রুব কোথায়, জড়বাদ, চৈতন্য, বস্তু-রূপ ও জীবন-প্রবাহ। প্রবন্ধগুলি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক, সর্ব্বত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদের আলোচনা ও তাহাদের তুলনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এমন সুবোধ্য ভাষায় ও সরল ভঙ্গীতে বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঠকগণ প্রবন্ধগুলি পাঠে বিশেষ আনন্দলাভ করিবেন। বিশেষতঃ

"জড়বাদ" ও "বস্তু-রূপ" শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি অতি উপাদেয় হইয়াছে; হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সর্ব্বপ্রকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতগুলির সমন্বয়ে এমন চিত্তাকর্ষক ভাবে লিখিত রচনা বাংলা ভাষায় খুব অল্পই প্রকাশিত হয়। লেখকের ভাষায় ফারসী শব্দের উৎপাত নাই এবং অযথা উচ্ছ্বাসও নাই। ভাষা সর্ব্বত্র সরল, বিষয়োপযোগী ও সুখপাঠ্য। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই বেশ সুন্দর।

আলো—বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; পি. সি. সরকার এণ্ড কোং লিমিটেড কর্ত্তৃক ১৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

ইহা একখানি উপন্যাস। এই গ্রন্থে প্রথম হইতেই লেখক মানবের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থের নায়ক সতীশ বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু সে সুখী হয় নাই। কেন সে সুখী হয় নাই, লেখক সামাজিক ঘটনার আলোচনায় তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং তাহার জীবনের মর্ম্মান্তিক অন্তিম ঘটাইয়াছেন। সতীশের বিবাহিত স্ত্রী শোভার জীবনকে লেখক একটি অকালে ঝরিয়া-পড়া ফুলের মত দেখাইয়াছেন। সুধীরার চরিত্রাঙ্কনে লেখক বর্ত্তমান প্রগতিশীল সমাজের তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তা নারীর পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও গ্রন্থের আখ্যানভাগ হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। গ্রন্থের প্রথমাংশ কতকটা স্বাভাবিক হইলেও শেষাংশ এখনও আমাদের দেশের পক্ষে অস্বাভাবিক। গল্পাংশও শেষভাগে আদৌ জমে নাই; মনে হয় কোন বিদেশী গল্পের অনুবাদ পাঠ করিতেছি। ভাষা তেমন সরল নয়, স্থানে স্থানে অযথা ভারাক্রান্ত। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ভাল।

মানবত্ব কি—শ্রী ··· প্রণীত; ৭০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীপূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

লেখকের মতে মানবত্ব কি—তাহাই ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকের প্রকাশ। প্রথমে তিনি স্থান, কাল ও পাত্রভেদে মানবত্ব কি তাহাই বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, পরের দুই অধ্যায়ে প্রশ্নোত্তর ও সওয়াল জবাবে লেখক নিজের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের আদ্যোপান্ত গভীর দার্শনিক আলোচনায় পূর্ণ; বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে ভাষাও কতকটা গুরুগম্ভীর। ভাষা আর একটু সরল হইলে সাধারণ পাঠকের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইত। পুস্তকে যথেষ্ট ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

বঙ্গীয় মহাকোষ—প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। পঞ্চম সংখ্যা। প্রতিসংখ্যায় ৪০ পৃষ্ঠা থাকে। মূল্য আট আনা। কলিকাতার ৫৫ সংখ্যক আপার চিৎপুর রোডস্থিত ভবনে ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইনস্টিটিউটে প্রাপ্তব্য।

এই মূল্যবান্ মহাকোষখানি পূর্ব্ববৎ উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত হইতেছে। ইংরেজী যে-সকল এন্সাইক্লোপীডিয়া আছে, তাহাতে সকল স্থলে ভারতীয় নানা বিষয়ের সবিশেষ বর্ণনা, ব্যাখ্যা বা বৃত্তান্ত আমাদের প্রয়োজনানুরূপ পাওয়া যায় না। এই মহাকোষে তাহা পাওয়া যাইবে। অধিকন্তু ইংরেজী এন্সাইক্লোপীডিয়াতে সাধারণ পাঠকবর্গের জ্ঞাতব্য যাহা পাওয়া যায়, ইহাতে তাহাও আছে। ইহাতে সাধারণ অভিধানের মত শব্দার্থও আছে। বহু বিদ্বান ব্যক্তির সহযোগিতায় ইহা লিখিত, সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইতেছে। ইহা সর্ব্বসাধারণব্যবহার্য্য সমুদয় লাইব্রেরীতে, পারিবারিক লাইব্রেরীতে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে রক্ষিত হওয়া উচিত।

ইহা যত্নের সহিত মুদ্রিত হইতেছে। তথাপি "অক্ষয়কুমার দত্ত" প্রবন্ধে চারিটি এবং "অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়" প্রবন্ধে দুইটি ছাপার ভুল চোখে পড়িল। শেষোক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, যে, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সাধনা, ভারতী, সাহিত্য ও Journal of the Asiatic Societyতে প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত) প্রদীপে এবং প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুতেও অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

র. চ.

ইঙ্গিৎ—অমিয় রায় চৌধুরী (দাশগুপ্ত)। প্রকাশক সুভো ঠাকুর, ফিউচারিষ্ট পাবলিশিং হাউস, ৩৫ই, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৮৩ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা।

লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন, "আমার পূর্ণতার যতোটুকু আনন্দ সমস্তই নির্ভর করছে তাঁদেরই (পাঠকদেরই) উপর।" কিন্তু লেখায় পূর্ণতার পরিচয় নাই। লেখক অনেকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত ন্যাকা মেয়ে লইয়া গল্প লিখিয়াছেন। লেখকের ধারণা ইহারা শিক্ষিত। যতদূর সম্ভব অস্বাভাবিক ঘটনা-সমাবেশ এবং ততোধিক অস্বাভাবিক কথোপকথন দ্বারা লেখক আপন পূর্ণতার আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। যাহাদের সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত নাই, অথচ যাহাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও নাই, তাহাদের সম্বন্ধে গল্প লিখিয়া লেখক নিজের অনভিজ্ঞতা-প্রসূত সখ মিটাইতে চাহিয়াছেন; খরচ করিয়া বই ছাপাইলে অবশ্যই খানিকটা সখ মিটে।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

রাইকমল—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রঞ্জন প্রকাশালয়, ২৫, মোহনবাগান রো, কলিকাতা, মূল্য ১৲।

বইখানির বিশেষত্ব এই যে এটি প্রায় সম্পূর্ণ বৈষ্ণব আবেষ্টনীর মধ্যে বৈষ্ণব ভাব লইয়া লেখা। অন্যের পক্ষে প্রেম বিলাস—যৌবনের মোহ, বৈষ্ণবের পক্ষে ইহা জীবনের সাধনা। তাহার ধর্ম্ম হইতেছে সে ইহাকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়া তাহার দেবতার অভিমুখী করিবে। রাইকমলের জীবনে এই সাধনার প্রথম স্তরের রূপটি লেখক ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। একে জিনিষটাই সরস, তাঁহার হাতের গুণে আরও সরস হইয়া উঠিয়াছে। রাইকমলের চিত্তের আকুলি-ব্যাকুলি তাহার ভুলের মধ্যেও, তাহার সার্থকতার মধ্যেও আবার শেষে তাহার ব্যর্থতার মধ্যেও তাহার প্রেমকে অম্লান করিয়া রাখিয়াছে। আগাগোড়া প্রায় একই ভাবের, অথচ এমন অবিচ্ছিন্নরূপে সরস বই কমই দেখা যায়।

ছাপা বাঁধাই ভাল।

পদ্মা—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। রঞ্জন প্রকাশালয়, ২৫, মোহন-বাগান রো, কলিকাতা, মূল্য দুই টাকা।

জীবনের উপর আকস্মিকতার প্রভাব অতি প্রবল। যতক্ষণ জীবন একটানা ভাবে একটি প্রত্যাশিত পথ ধরিয়া চলে, আমরা তাহার একটি যুক্তিসঙ্গত পরিণতি কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি; তাহার পর হঠাৎ এক সময় আকস্মিকতা দেখা দেয়, সব জল্পনা-কল্পনা ছিন্ন করিয়া জীবনকে আমাদের কল্পনার অতীত এক নূতন পথে চালিত করে।

আকস্মিকতা-নিয়ন্ত্রিত (?) এই জীবনের উপর আমাদের য়্যাটিটিউড বা মনের ভাবটা কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে বহুলাংশে

আমাদের পারিপার্শ্বিকের উপর,—আমরা গড়িয়া উঠিয়াছি সভ্যতার মাঝে, না আদি জননী প্রকৃতির কোলে—তাহার উপর।

কলিকাতা ও পদ্মা—সভ্যতা ও প্রকৃতির এই দুইটি চরম প্রতীক ধরিয়া লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্যটি ফুটাইবার প্রয়াস করিয়াছেন—বিনয়ের জীবনকে উপলক্ষ্য করিয়া। এই গেল বইটির দার্শনিক অংশ।

রচনার দিক দিয়া—কল্পনার সমৃদ্ধিতে, ভাষার ওজস্বিতায় এমন বই সচরাচর হাতে পড়ে না। জীবন সম্বন্ধে মন্তব্যগুলি খুবই জোরাল—ইংরেজীতে যাহাকে বলা চলে compelling। সব সময় যদি বা মতের মিল নাও হয়, লেখক সম্ভ্রম জাগান নিশ্চয়—বোধ হয় শিল্পীর পক্ষে এটা আরও বড় গুণ। ত্রুটির মধ্যে প্রধান এই যে এই মন্তব্যগুলি এক এক জায়গায় বড় দীর্ঘ এবং ঘন ঘন।

সবচেয়ে সুন্দর এর প্রধান পটভূমি—পদ্মা, যেখানে এই পুস্তকবর্ণিত জীবন-নাট্যের আদি ও অবসান।

কলিকাতার অংশটি তেমন জমে নাই; কয়েকটি অংশ একটু অসংলগ্ন এবং অতিরঞ্জিত হইয়া গিয়াছে।

ছোটখাট এই রকম কয়েকটি ত্রুটি সত্ত্বেও বইখানিকে উপেক্ষা করা চলিবে না।

ছাপা বাঁধাই ভাল।

আজব বই—সম্পাদক শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী। দেব সাহিত্যকুটীর, ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

লিখিতে পড়িতে জানে এমন সব কিশোরের মন আজকাল পূজা উপলক্ষ্যে জুতা, কাপড়, পিরাণের সঙ্গে উপযুক্ত বইয়ের জন্যও উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। এই সুযোগে, আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেয় এমন বই যত বেশি হয় ততই ভাল। আলোচ্য বইখানি এই ধরণের। হাল্কা, মজার গল্প, কবিতা, গানের সঙ্গে প্রাণিবিজ্ঞান, বস্তুবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোলের নানা প্রবন্ধ-কাহিনীতে বইখানি পূর্ণ এবং প্রায় সবগুলিই বেশ সুলিখিত। মলাট থেকে মলাট পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট ছবিতে ভরা—কয়েকখানি পাতাজোড়া এবং রঙীন। ছাপা বাঁধাইও চিত্তাকর্ষক। মূল্য ১৷৹ বেশী হয় নাই।

সাগর দোলায় ঢেউ—শ্রীনবগোপাল দাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রেম সর্ব্বজয়ী, তাহা ভিন্ন অসীম সমুদ্রের উর্ম্মিদোলায় একটা বোধ হয় বাঁধন-ভাঙার সুর আছে, এই দুইয়ের জন্য, বিলাতযাত্রার পথে মোহিত তাহার জাতিগত সংস্কারসত্ত্বেও ইংরেজ-দুহিতা শীলা এণ্ডার্সের প্রণয়ে পড়িল। বম্বে হইতে নেপল্‌স্—যাত্রার এইটুকুর মধ্যে এই প্রণয়ের সবটুকু কাহিনী শেষ; কিন্তু এরই মধ্যে লেখক এত দরদ দিয়া বাধা-সঙ্কোচ, মিলন-বিরহের সুরটি ফুটাইয়াছেন যে বইখানি সত্যই বড় উপভোগ্য হইয়াছে। রসটি লিরিক এবং ভাষাটিও তাহারই উপযোগী,—হালকা অথচ ঝঙ্কৃত। প্রসঙ্গক্রমে পথের যে বর্ণনা আসিয়া পড়িয়াছে সেগুলিও খুবই সজীব। সর্ব্বসাকল্যে বইখানি বেশ উপাদেয় হইয়াছে এবং আশা করা যায় রসিক-সমাজে আদর লাভ করিবে।

ছাপায় অল্পস্বল্প দোষ থাকিয়া গিয়াছে। কাগজ বাঁধাই ভাল। মূল্য ১৷৹।

মিলন-সমাধি—সৈয়দ জাফর আহমদ, এম-এ। প্রাপ্তিস্থান—মুখভূমি লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বইখানি কাঁচা হাতের লেখা, সেই জন্য লেখকের শক্তির পরিচয় মাঝে মাঝে নিঃসংশয় ভাবে থাকিলেও কয়েকটি দোষ একটু বেশী রকম চোখে পড়ে—তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে অতিরিক্ত ফেনানো এবং নাটকীয় ভাবে অপ্রত্যাশিতের হঠাৎ আবির্ভাব—এই দুইটির উল্লেখ করা চলে।

বইয়ের মূল ভাবটি কিন্তু বড়ই পবিত্র এবং মনোরম—সেটি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য,—আর লেখক সেটি এতই দরদ দিয়া, এতই সবল বিশ্বাসের সহিত ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। তিনি শিক্ষিত, সুতরাং এ শুধু তাঁহার ভাব-বিলাসিতা নয়, গভীর উপলব্ধির জিনিষ। বাংলার এই দুর্দ্দিনে এই মিলন-মন্ত্রই যদি তাঁহার সাহিত্যের ব্রত হয় ত সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সফলতা কামনা করি।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

টাকার কথা—শ্রীঅনাথগোপাল সেন প্রণীত। প্রকাশক, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১১৭ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ সিকা।

নাম হইতেই বইখানার বিষয় ও পরিধি কতকটা বুঝিতে পারা যায়। অর্থশাস্ত্রে 'টাকার কথা' একটি জটিল অথচ অত্যাবশ্যক প্রশ্ন। অনাথ বাবু সেই প্রশ্নটির নানা দিক দিয়া সহজ ভাষায় সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। পরিভাষার ঘনঘটায় বিষয়টিকে ঘোরালো না করিয়া এবং বিশেষজ্ঞদের গুরুগম্ভীর দুর্ব্বোধ বৈশিষ্ট্যের আশ্রয় না লইয়া সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ভাষায় অনাথবাবু তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং অবিশেষজ্ঞেরও এই বই সম্বন্ধে মতপ্রকাশের অধিকার আছে। সাধারণ পাঠক হিসাবে বইখানা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। স্বর্ণমান (gold standard) প্রভৃতি বিষয়ের সরল বাংলায় এত সুন্দর আলোচনা হইতে পারে, অনাথবাবুর বই না পড়িলে অনেকেই তাহা হয়ত বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না।

ছাপায় দুই-এক জায়গায় একটু গোলযোগ হইয়াছে, যেমন ২১ পৃষ্ঠার পাদটীকা ২২ পৃষ্ঠায় চলিয়া গিয়াছে। তবে এ-সব ভুল মারাত্মক নয়। বইখানার গুরুত্ব বিবেচনা করিলে এ-সব ভুলের উল্লেখ না-করাই উচিত।

বইখানা শুধু যে একটা কঠিন আলোচনায় সহায়তা করিয়াছে, তাহা নয়; বাংলা ভাষারও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। আজকাল বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাপ্রদানের চেষ্টা ক্রমশঃ আরম্ভ হইতেছে; অর্থনীতির প্রাথমিক পাঠ্য হিসাবে এই বইখানাকে বিশ্ববিদ্যালয় যদি তালিকাভুক্ত করিয়া দেন তবে ছেলেদের প্রভূত উপকার হইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি

গান

কী বেদনা মোর জানো সেকি তুমি জানো
ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা,
আজি এ নিবিড় তিমির যামিনী বিদ্যুৎ-সচকিতা ॥
বাদল বাতাস ব্যেপে
হৃদয় উঠিছে কেঁপে,
ওগো সেকি তুমি জানো ?
উৎসুক এই দুখ জাগরণ
একি হবে হায় বৃথা ॥
ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা
আমার ভবন দ্বারে
রোপণ করিলে যারে,
সজল হাওয়ার করুণ পরশে
সে মালতী বিকশিতা,
ওগো সেকি তুমি জানো ?
তুমি যার সুর দিয়েছিলে বাঁধি
মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি
ওগো সেকি তুমি জানো ?
সেই যে তোমার বীণা, সে কি বিস্মৃতা ?
ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

II র্সা -া র্গা । র্গা -া র্ঋা I র্ঋা র্সা -া । মা মা মা I মা মা মা ।
কি ০ ০ বে ০ দ না ০ ০ ০ মো র্ জা নো সে

। মা মা গা I গপা মা -া । -া মা গা I পা মা -া । -া মা -গা I
কি তু মি জা নো ০ ০ ও গো মি তা ০ ০ মো র্

I মা মা র্সা । র্সা না মা I মা মা -া । -া মা গা I মপা মা ০ ।
অ নে ক্ দূ রে র মি তা ০ ০ ও গো মি তা ০

। -া -া -া I সমা মা মা । মা পা গা I মা ধমা ধা ।
০ ০ ০ আ০ জি এ নি বি ড় তি মি০ র

। না র্সা র্সা I র্সা -া র্গা । র্গা র্ঋা র্সা I না না -া । মা মা -া I
যা মি নী বি ০ দ্যু ত স চ কি তা ও গো ০

I মা মা -া । -া মা মা I মা মা সর্া । সর্া না মা I মা মা -া ।
মি তা ০ ০ মো র্ অ নে ক দূ রে র মি তা ০

। মা গা -া I মপা মা -া । -া -া -া II
ও গো ০ মি তা ০ ০ ০ ০

II ধা ধা নধা । না সর্া ঋর্া I না সর্া -া ।
বা দ ল্ বা তা স ব্যে পে ০

। -া -া -া I না সর্া ঋর্া । ঋর্া ঋর্া সর্া I না সর্া -া । -া মা মা I
০ ০ ০ হৃ দ য় উ ঠি ছে কেঁ পে ০ ০ ও গো

I মা মা -া । মা মা গা I মপা মা -া । -া -া -া I
সে কি ০ তু মি ০ জা নো ০ ০ ০ ০

I সর্া -গর্া গর্া । গর্া গর্না -পর্া I গর্া মর্া গর্া । ঋর্া ঋর্া সর্া I না সর্া ঋর্া ।
উ ৎ স ক এ ০ ই তু ষ জা গ র ণ এ কি ং

। ঋর্া সর্া -সর্া I না না -া । মা মা -গা I পা মা -া । -া -মা -গা I
বে হা য় র থা ০ ও গো ০ মি তা ০ ০ মো র

I মা মা -সর্া । সর্া -না মা I মা মা -া । -া মা গা I মপা মা -া ।
অ নে ক দূ রে র মি তা ০ ০ ও গো মি তা ০

। -া -া -া II
০ ০ ০

II -া সা মা । মা মা -া I -া মা মা । মা মা মা I মা -গা পা ।
০ ও গো মি তা ০ ০ মো র অ নে ক্ দূ রে র্

। পা মা -া I -সা -মা -মা । মা মা মা I মা মা পা । গা- -া -া I
মি তা ০ আ মা র ভ ব ন দ্বা রে ০ ০ ০ ০

I গা গাপা মপা । গা গা গা I ঋা সা -া । সা সা মা I
রো প০ ণ০ ক রি লে যা রে ০ স জ ল

। মা -পা গা । মা ধমা ধা I না সর্া সর্া । না সর্া ঋর্া I ঋর্া ঋর্া সর্া ।
দাও য়া র্ ক রু ণ প র শে সে মা ল তী বি ক

। না না -া I মা মা -া । মা মা -া I মা মা গা । গপা মা -া I
শ তা ০ ও গো ০ সে কি ০ তু মি ০ জা নো ০

I -া ধা ধা । ধা ধা না I না সর্া সর্া । সর্া সর্া সর্া I
ঃ মি যা র্ স্ব র্ দি য়ে ছি লে বাঁ ধি

I র্সা র্গা র্গা । র্ঋা র্সা র্সা I না র্সা র্ঋা । র্সা না না I মা মা -া ;
মো র কো লে আ জ উ ঠি ছে সে কাঁ দি ও গো ০

। মা মা গা I ^মপা মা -া । ^নর্সা গা গা I গা গর্মা পা । গা র্মা গা I
সে কি ০ জা নো ০ সে ই যে তো মা০ র্ বী ণা সে

I র্ঋা র্সা -া । না না -া I মা মা গা । ^গপা মা -া I -া মা মা ।
কি রি ০ স্মৃ তা ০ ও গো ০ মি তা ০ ০ মো র

। মা মা -র্সা I না না না । মা মা -া I -া মা গা । পা মা -া II
অ নে ক দূ রে র্ মি তা ০ ০ ও গো মি তা ০

বাংলার পাল-শিল্পের ক্রমবিকাশ

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ

এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত চিত্রগুলি হইতে গুপ্ত-যুগে সারা ভারতের শিল্পধারার রূপ সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া

নাগিনী—গুপ্ত যুগ, পঞ্চম শতাব্দী—মনিয়ার মঠ, বিহার

দুর্গা মহিষাসুরমর্দ্দিনী—অষ্টম শতাব্দী, বোড়াম, মানভূম

বুদ্ধ নবম শতাব্দী, সারনা

বুদ্ধ দশম শতাব্দী বঙ্গদেশ, (বোষ্টন চিত্রশালা)

দেবমূর্ত্তি তারা ?)—সপ্তম শতাব্দী—ললিতগিরি, উড়িষ্যা

দুর্গা—সপ্তম শতাব্দী বিহার (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম)

দণ্ডায়মান বুদ্ধ গুপ্ত যুগ, পঞ্চম শতাব্দী—(রাজশাহী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালা)
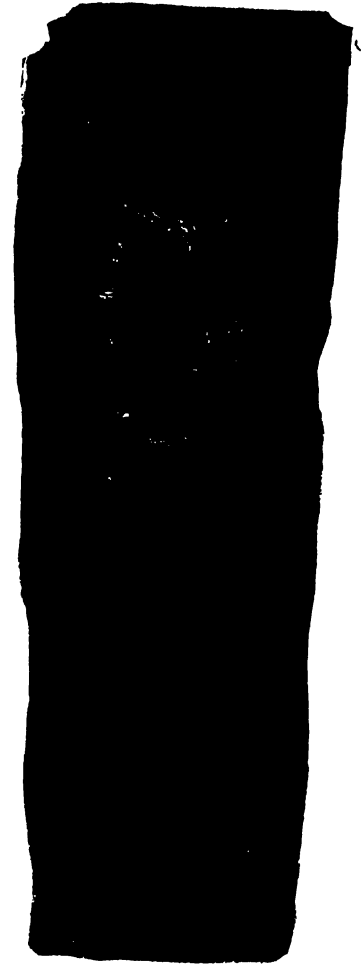
নারীমূর্ত্তি—নবম-দশম শতাব্দী—খিচিং, ময়ূরভঞ্জ

যাইবে। এই ধারার উৎস ছিল বারাণসীর অনতিদূরে অবস্থিত পুণ্যভূমি সারনাথে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর ভারত খণ্ড-খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল এবং কালক্রমে সৃষ্ট হইল নব নব শিল্পরীতি। আর্য্যাবর্ত্তে পাল, কলিঙ্গ, চন্দেল ও রাজস্থানী এবং দাক্ষিণাত্যে চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পহ্লব, চোল ও হয়সল রীতি এই রূপেই উদ্ভব হইল। কিন্তু বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন রাজশক্তির আনুকূল্যে পুষ্ট বিভিন্ন শিল্পরীতিসকল বিকশিত হইতে লাগিল প্রায় দুই শত বৎসর কাল। এই দুই শত বৎসর ধরিয়া নানা দেশের নানা শিল্পী গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিল গুপ্ত-যুগের ধ্যানসম্মত অম্লান কলাদর্শকে আধার করিয়া জাতীয় শিল্প। অষ্টম শতাব্দী হইতে মধ্যযুগের আরম্ভ বল

যাইতে পারে। এই সময়েই গৌড় মগধে পাল-শিল্পের, উড়িষ্যায় কলিঙ্গ-শিল্পের, তামিল দেশে পহ্লব-শিল্পের ও কর্ণাটকে চালুক্য-রাষ্ট্রকূট শিল্পের সূচনা হয়। কিন্তু এই সকল শিল্পধারার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও গুপ্ত-কলাদ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের অল্পবিস্তর আকারগত ও রসগত সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যই ইহাদের ভারতীয়তাকে আরও নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। প্রাদেশিক প্রভাব ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের গুণে কোথাও একটা কিছু অভিনব বা ছন্নছাড়া শিল্পাদর্শ তৈয়ারী হয় নাই। খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা দেশে পাল ও সেন বংশের রাজাদের আমলে শিল্পকলার যে দীর্ঘ চার শত বৎসরের ইতিহাস পাই তাহার মূলও নিহিত গুপ্ত-যুগের অতুলনীয় শিল্পপ্রথায়। গুপ্ত-আদর্শে উদ্ভাসিত হইয়া বাংলার পাল-শিল্প তাহার প্রথম যুগে প্রতিবেশী অন্যান্য প্রদেশের রূপভঙ্গীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কিরূপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল ছবিকয়খানি দেখিলে তাহার সামান্য আভাস পাওয়া যাইবে।

ইন্দ্রাণী—সপ্তম শতাব্দী—কোটা, গোয়ালিয়র চিত্রশালা
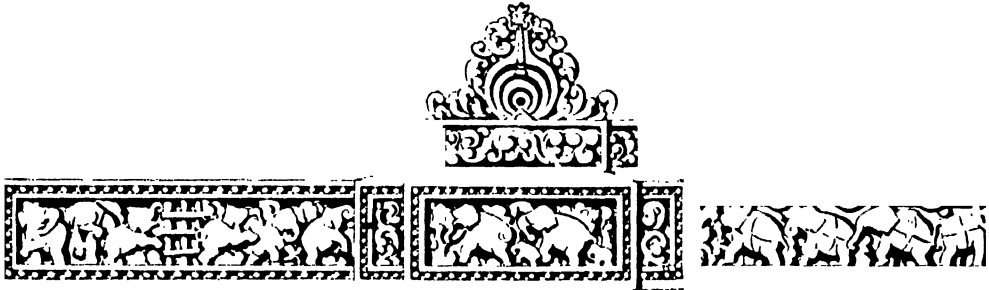
পশ্চিমযাত্রিকী

শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ

(৩)

ট্রেনে চলছি. ট্রেনগুলি আমাদের দেশের আসাম মেলের ধরণের। সমস্ত গাড়ীটিতে করিডর অথবা বারান্দা আছে। গাড়ীর গদিগুলি বেশ আরামের, নরম ভেলভেট দেওয়া। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী, আর এক প্রথম শ্রেণীর আছে। তা'তে বড় বড় রথী-মহারথীরাই যান। আমাদের মত সাধারণ ব্যক্তিরা এই দ্বিতীয়তেই যাতায়াত করে। রাত্রে সারারাত ট্রেনে ভ্রমণ করবার দরকার হ'লে পয়সাওয়ালা

ইউং ফ্রাউ পর্ব্বতচূড়

লোকেরা স্লিপিংকার ব্যবহার করেন। এতে গদী, তোষক, কম্বল, বালিস, মুখ মোছবার তোয়ালে সবই থাকে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাত্রিবাস করতে করতে যারা চায়, তারা কুশান-চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে যেতে পারে। যদি কারুর বালিস একটা দরকার হয় ত তার ব্যবস্থাও আছে। প্রত্যেক ষ্টেশনে বালিস ভাড়া পাওয়া যায়। তুমি দুই-এক লীরা দাম দিয়ে একটি ছোট কুশানের আকারের সাদা ওয়াড়-পরানো ভূষির বালিস কেন। তার পর তোমার গন্তব্যস্থানে পৌছে, নামবার সময় বালিসটাকে ফেলে যেও, সেই ষ্টেশনের বালিস-কোম্পানীর লোক আবার তাকে তুলে ওয়াড় বদলে ভাড়া খাটাবে, এই বন্দোবস্ত। যাদের জিনিষ তারাই ফিরে পায়। অন্য লোকে টান মারে না। সমস্ত কন্টিনেন্টেই এই রকম ব্যবস্থা দেখেছি।

আমাদের এক পরিচিত ভদ্রলোক কিছুদিন যাবৎ ভারতবর্ষের বাহিরে ছিলেন। এই রকম দেখে তাঁর বোধ হয় ধারণা ছিল আমাদের এখানেও ওই রকম বালিস পাওয়া যায়। আমরা খবর পেয়েছিলুম তিনি একবার কাশী থেকে কলকাতা আসবার সময় ষ্টেশনে বালিস বালিস ক'রে চেঁচিয়েছিলেন।

আমরা এখন ইটালীর সীমান্ত অতিক্রম ক'রে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে ঢুকছি। পথের দৃশ্য অতি সুন্দর। পাহাড়, ঝরণা ও ইটালীর লেকের ধার দিয়ে দিয়ে ট্রেন চলছে। আমি বাইরের দৃশ্য দেখবার জন্য করিডরে রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলেছি। লেকের এপারে ট্রেন, লেকের উপরে ষ্টীমার আর অপর পারে মোটর চলছে। আমার মত অনেক লোক দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে চলেছে। সকলেই একবার ক'রে আমাকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে, আর মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে। "গান্ধীটেগোরে, ইণ্ডিয়ানো।" অর্থাৎ ভাবে বুঝলুম আমরা যে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইণ্ডিয়ার দেশের লোক, তাই বলছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে আমি চলেছি, পথের দু-ধারে ফুলের রাজত্ব, পাহাড়ের গায়ে, মাঠে, লোকের বাড়িতে দেওয়ালে, জানালায়, কার্ণিসে, যেদিকে চাও সেই দিকেই কেবল নানা রঙের ফুল। মাঝে মাঝে ষ্টেশনে গাড়ী থামলে স্তুপ-

চেরী ফল কাগজের প্লেট সমেত কিনে খেতে খেতে চলেছি। আইসক্রীমওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে, "জেলাতী, জেলাতী" অর্থাৎ যা জিলেটীন দ্বারা তৈরি হয়েছে। কয়েক দিন ধ'রে ইটালীতে ঘোরাঘুরির ফলে দু-চারটা ইটালীয়ান বুলি মুখস্থ করেছি। কোন জিনিস কেনবার সময় ফেরীওয়ালাকে ব'লে বসলুম, "কন্ ত্রে লীরা" অর্থাৎ কত লীরা দাম? সে বললে, "দুয়ে লীরা," অর্থাৎ দুই লীরা। এরা 'ট'কে দু উচ্চারণ করে। এই কথাটিতে অনেকটা আমাদের উচ্চারণের সঙ্গে মিল আসে। আমরা ইটালীর রাজত্ব পেরিয়ে এলুম,
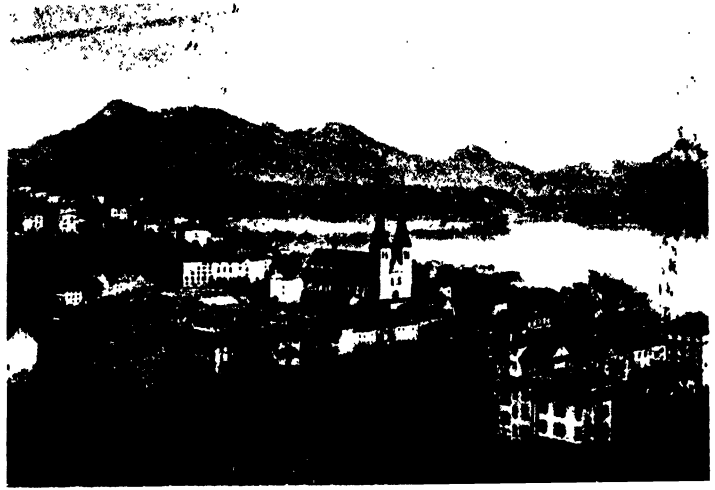
লুসার্ণ হইতে রিগির দৃশ্য

সুতরাং কোন-একটা ষ্টেশনে গাড়ী একবার থামবার পর কাষ্টমসের লোকেরা আমাদের জিনিসপত্র তদারক করবার জন্য এল, সব দেখে শুনে সন্তুষ্ট হয়ে পকেট হাতড়ে জিজ্ঞাসা করলে, "টাবাক?" অর্থাৎ তামাক, সিগার সিগারেট ইত্যাদি তামাক-জাতীয় কিছু সঙ্গে আছে কিনা। ওসব বালাই কিছু না পেয়ে জবাকুসুমের শিশিটা নাড়াচাড়া ক'রে দেখলে, সেটা অর্দ্ধেক ব্যবহার করা, তবুও জিজ্ঞাসা করলে সেটা কোন জাতীয় স্পিরিট। ইসারায় বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল মাথায় মাখতে হয়। তবুও নিস্তার নেই। এবার আমাদের খাবার জলের গ্যালন জারটির দিকে দৃষ্টি পড়ল। সেটায় টান মারতেই তার কল খুলে জল বার করে দেখিয়ে দিলুম। তখন নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

কোন দেশের সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করবার সময় কাষ্টমস অফিসাররা এসে সব বাক্স-প্যাটরা ঘেঁটেঘুঁটে দেখবে, যদি তার ভেতরে কোনরকম স্পিরিট বা এসেন্স-জাতীয় কোন জিনিস থাকলে, যথা হেয়ার-লোশন, ইউডি-কলোন, সেণ্ট, কোন রকম তামাক-জাতীয় জিনিস, যথা, সিগারেট, চুরুট, নস্য ইত্যাদি থাকলে, বেশী পরিমাণে সিল্কের কাপড়-চোপড় কিছু থাকলে, ক্যামেরা বায়নোকুলার ইত্যাদি জিনিষ থাকলে এ সবের জন্য কাষ্টম অফিসরদের কাছে অনেক ক্ষণ ধ'রে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তবে এসব যদি ব্যবহার করা জিনিস হয় ও মেয়েদের বাক্সে যদি কিছু সিল্কের কাপড়চোপড় থাকে তাহ'লে তাদের পীড়াপীড়িটা কিছু কম হয়। সিগারেট এক জন পঞ্চাশটির বেশী সঙ্গে নিতে পারবেন না। কর্ত্তাদের মন সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ, বুঝিবা ব্যবসার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এক পরিচিত ভদ্রলোকের ধূম-পানের প্রবল আসক্তি থাকায় তিনি এক ফন্দি খাটিয়েছিলেন, পঞ্চাশটি সিগারেট নিজের বাক্সে রেখে, বাকি পঞ্চাশটি স্ত্রীর বাক্সে জমা রেখেছিলেন; এ-সম্বন্ধে কাষ্টমওয়ালাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হ'লে তিনি বলতেন, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই সমান ধূমপান করেন। আমাদের সঙ্গে সিগারেট না দেখে তারা ভেবেছিল আমরা হয়ত তাহ'লে কোনও পানীয় জিনিসের ভক্ত। সেই জন্য জলের জারটি ধ'রে অত টানাটানি করলে। শুধু 'প্লেন' জল দেখে বোধ হয় আমাদের অপ্রাপ্ত-বয়স্ক লোক মনে ক'রে থাকবে। কেননা তেষ্টা পেলে জল খুব কম লোকই খেয়ে থাকে, সাধারণতঃ কমদামী বীয়ারদ্বারা ছেলেবুড়ো সকলেই তৃষ্ণা নিবারণ করে। আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজন মিলানে থাকতে শেষ ক'রে ট্রেনে চড়েছিলুম।

যখন লুগানো পৌছলুম তখন বিকেলবেলা। ট্রেন একটু খানির জন্যই থামলে। এসব জায়গায় আবার বেশী কুলী পাওয়া যায় না। এক জন যতটা পারলুম সঙ্গে ক'রে বয়ে নিয়ে নেমে

লটার ব্রুনেন

পড়লুম, আর এক জন ট্রেনের করিডরের কাঁচ নামিয়ে ফেলে বড় বড় বাক্সগুলিকে নামিয়ে দিলে। এখানেও ষ্টেশনে হোটেলের লোক ছিল, তার সাহায্যে জিনিষপত্র গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে হেঁটেই আমরা হোটেলে উঠলুম। হোটেলে এসেই দেখি একেবারে লেকের গায়েই হোটেল। বুড়ো ম্যানেজার আমড়াগাছি ক'রে বললে, তোমাদের খুব সস্তা ক'রে লেকের উপরেই ঘর দিয়েছি, যাতে ভাল দৃশ্য দেখতে পাও। আমি কিন্তু ঘরের বারান্দা দিয়ে দেখলুম হোটেলের যে ঘরের বারান্দাতে দাঁড়াই না কেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সকল দিকেই সমান, কমবেশী কোন দিকে নেই। হোটেল চালাতে হ'লে হোটেলের যাত্রীদের খুশী রাখবার জন্য ম্যানেজারকে অমন মনযোগানো কথার অভ্যাস করতে হয়। আমরা এখানে এক রাত্রি রইলুম। শোবার ঘরগুলির বন্দোবস্ত খুব ভাল, লুগানোর হোটেলে আমরা 'টেরাসে' ব'সে দিনের আলোয় ডিনার খেলুম। ডিনার খাবার পর সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা কাছেপিটে একটু বেড়িয়ে এলুম। বেড়াতে বেড়াতে একটি ছোট্ট মনোহারী দোকানে ঢুকলুম, সেখানে দু-চারটি ছোট জিনিষ কিনেছিলুম। সেখান থেকে রাস্তা একটু নেমে গেছে। ধীরে ধীরে যাচ্ছি, এমন সময় শুনি রাস্তার ধারের বাড়ির জানালা থেকে মেয়েরা বলছে, "ইণ্ডিয়ানো"। লুগানোর এই হোটেলটির নাম হোটেল উইজা কুজ। এখানে থাকবার সময় হোটেলের ঝি আমাদের জলের গ্যালন-জারটির কল ভেঙে দেওয়ায় ম্যানেজারকে জানাতে ঝি অস্বীকার ক'রে বললে সে এটা ভাঙে নি। ম্যানেজারের নিকট মেরামত করতে দেওয়া হয়েছিল, সে আমাদের কাছে এর জন্য আলাদা দাম নিলে।

সকালবেলা প্রাতরাশ শেষ করবার পর ম্যানেজারকে বলা গেল, আমরা একটা চক্র দিতে চাই, বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পার? ম্যানেজার বললে—বেশ, এখানকার রাস্তা খুব ভাল, তোমরা মোটরে ক'রে লেকের ধার দিয়ে দিয়ে খানিকটা বেড়াও, শেষে মোটর থেকে নেমে ফিউনিকুলার রেল চ'ড়ে সালভাটোরে বেড়িয়ে এস। মোটরকার এল। হল-পোর্টার আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা ইটালীয়ান জান? জবাব না। ফরাসী ত বলতে পার? জবাব—না, ইংরেজী জানি। পোর্টার ব'লে—তবেই ত। শেষে বললে—আচ্ছা, সোফারকে সব ব'লে দিচ্ছি। আমরা মোটরে চড়লুম। মোটরে ক'রে লেকের ধার দিয়ে ধার দিয়ে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য
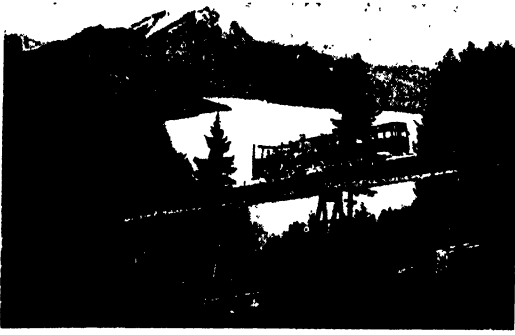
রিগি—পার্ব্বত্য রেলপথ

উপভোগ করতে করতে সালভাটোরে যাবার ষ্টেশনে পৌঁছলুম। ষ্টেশনে আমাদের মত আরও অনেক লোক এসে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছিল। উপরের পাহাড় থেকে একটি গাড়ী গড় গড় ক'রে নেমে এল, গাড়ীখানা দেখতে ট্রাম ও বাসের মাঝামাঝি। তাতে আমরা সবসমেত চড়ে বসলুম। মোট যাত্রী প্রায় জন-চব্বিশ হবে। বসবার সিটগুলিতে দুই জন ক'রে বসা যায়। গাড়ীখানি ইলেকট্রিসিটির দ্বারা হেলানভাবে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল। কিছুদূর উঠেই একটি সমতল ছোট জায়গায় এসে থামলে, দেখি সেখান থেকে উপরে যাবার জন্য আরও একটি ওই রকম গাড়ী আছে। আমরা সবাই নেমে তাইতে চড়লুম ও অন্যান্য যাত্রীরা যারা নীচেয় যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল, তারা আমাদের আগেকার গাড়ীখানিতে উঠল। তারা নীচেয় নামতে লাগল, আর আমরা টিকটিকির দেওয়ালে চড়ার মত এবার একদম সোজাভাবে ওপরে উঠতে লাগলুম। আগেকার গাড়ীখানিতে সিটগুলি মুখোমুখি ছিল, কিন্তু এবারকার গাড়ীটি একেবারে সোজাভাবে ওঠার দরুণ বসবার সিটগুলিকে দেওয়ালে পোঁতা তাকের মত তৈরি করতে হয়েছে। যতই উপরে উঠি, নীচেকার দৃশ্য তত আরও ছোট ছোট দেখাতে লাগল ও অনেক দূরে দূরে বরফে-ঢাকা পাহাড়ের চূড়াগুলি বেশ স্পষ্ট দেখতে পেতে লাগলুম। এরই নাম ফিউনিকুলার ট্রেন। একেবারে ওপরে এসে গাড়ী থাম্‌ল। আমরা সবাই নেমে পড়লুম। শুনলুম ঘণ্টাখানেক পরে আবার নীচে নামবার জন্য ট্রেন ছাড়বে। পাহাড়ের ধারে ধারে লোহার রেলিঙ বসিয়ে বেড়ার মত ক'রে দিয়েছিল। তাই ধ'রে আরও খানিকটা উপরে এসে চারিদিককার দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলুম। অনেক দূরে বরফে-ঢাকা পাহাড়ের চূড়াগুলি রোদ লেগে ঝকঝক করছে। অনেক নীচুতে লুগানো শহরের ঘরবাড়ি ও গীর্জ্জার চূড়াগুলি তাসের বাড়ির মত দেখাতে লাগল। চারিদিকে নীল হ্রদ, তার ধার দিয়ে মোটর চ'লে যাচ্ছে, দেখলে মনে হয় ছোট ছেলের খেলবার মোটর গাড়ী চলছে। ট্রেন যাচ্ছে, কে যেন দম দিয়ে খেলনার রেলগাড়ী চালিয়ে দিয়েছে। ফসলের ক্ষেতগুলিকে সবুজ রঙের কারপেটের মত দেখাতে লাগল। স্যালভাটোরের উচ্চতা সমুদ্র থেকে ৬,০০০ ফুট। আমাদের সহযাত্রী এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি ইংলিশম্যান নন; কোন্ দেশী

রিগি ও পিলেটাসের দৃশ্য

লোক তখন শুনেছিলুম, এখন ভুলে গেছি। তিনি ইংরেজী বলতে পারেন দেখলুম। আমাদের সঙ্গে আলাপ হ'তে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি খুব ছোট বয়েস থেকে ইংলণ্ডের স্কুলে লেখাপড়া শিখেছ? তা না হ'লে এত ভাল ইংরেজী বল কি করে? দেখ, আমি সামান্য ইংরেজী

পিলেটাসের উপর হইতে দৃশ্য

ঠিক পাচ্ছি না। পথে ষ্টেশনে ষ্টেশনে গাড়ী থামলে চেরীফল কিনে আমরা খুব খাচ্ছি। অতি সুন্দর খেতে। আমাদের ট্রেন লুসার্ন এসে পৌঁছল। আমরা ১১ই জুন কলকাতার বাড়ি ছেড়েছি, আজ ২৬শে জুন হ'ল। এই পনর দিনের মধ্যে কত দূরে কত জায়গায় চলে এলুম। ষ্টেশন থেকে আমরা এখানকার 'হোটেল ড্যু লাক' নামে হোটেলে এসে উঠলুম। আমাদের হোটেলের পিছন দিকে লুসার্নের লেক দেখা যাচ্ছিল। সামনে রাস্তা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সুইস গোয়ালা গুটিকতক নধরকান্তি সোজা পিঠওয়ালা গরুবাছুর নিয়ে আমার ঘরের বারান্দার নীচে দিয়ে চলে গেল। আমরা স্নান ক'রে কাপড় ছেড়ে নীচেয় এলুম। ম্যানেজারের অফিস-রুমে আসতেই দেখি আমাদের জাহাজের এক জন পরিচিত লোক তার সঙ্গে কথা বলছেন। শুনলুম তিনি অন্য হোটেলে আছেন, এখানে কি জানবার জন্য ম্যানেজারের কাছে এসেছিলেন। ক'দিন পরে এক জন পরিচিত লোককে দেখে আমরা খুশী হলুম। এই হোটেলটি মস্তবড় সাজসজ্জাওলা, আমাদের একটু বেশী খরচা পড়ল। টমাস কুক কোম্পানী আমাদের এই সব হোটেলের ঠিকানা দিয়েছিল। এ সব জায়গায় আবার নিজস্ব বাথরুমওয়ালা শোবার ঘর সব হোটেলে থাকে না। যে হোটেলে থাকে সে-সব হোটেলে কাজেই খরচা বেশী পড়ে। যারা শুধু শোবার ঘর নেয় তাদের ঘরে একটি ক'রে ওয়াশ-বেসিন থাকে, ঠাণ্ডা ও গরম জল কল খুললেই পাওয়া যাবে, চারখানা ক'রে ছোট তোয়ালেও থাকে। সমস্ত ঘরগুলিতে গরম জলের পাইপের বন্দোবস্ত আছে, বেশী শীতের সময় ঘরগুলি বেশ গরম থাকে। সাবান কন্টিনেন্টের কোন হোটেলেই দেয় না। সাবান দিলে এর জন্য আলাদা দাম দিতে হয়। আমরা খাবার ঘরে এসে দেখলুম মাত্র এক জন লোক খেতে বসেছে, আর কেউ কোথাও নেই। ম্যানেজার বললে, এখন হোটেলে আমাদের দু-জন ও সেই লোকটি মোট

জানি, আমার স্ত্রী কিছুই জানে না।" আমরা তাকে বললুম, আমাদের ভারতবর্ষে ইংরেজীটা সকলকেই পাচ রকম কারণে শিখতে হয়। তবে আমি নিজে যে ভাল জানি তা নয়। 'হোগা যাগা' ক'রে হিন্দী কথা কইবার মত কোন রকমে চালাচ্ছি। তিনি বললেন, "তোমাদের দেশের বিখ্যাত কবি টেগোরের গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ আমি পড়েছি।" শুনে খুশী হলুম। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা হোটেলে ফিরে এসে, দেনা-পাওনা মিটিয়ে ষ্টেশনে গিয়ে লুসার্ন যাবার গাড়ী ধরলুম।

লুসার্নের পথে চলেছি। আমাদের গাড়ী মাঝে মাঝে টানেলের ভেতর দিয়ে চলছে। তখন গাড়ীর মধ্যে সব আলো জ্বেলে দেওয়া হয় ও সব জানালার কাচ তুলে দেওয়া হয়। এক-একটা টানেল পাঁচ-সাত মাইল লম্বা, একটি আবার পুরো নয় মাইল, গাড়ী অনেকক্ষণ চল্‌ল এর ভেতর দিয়ে। এই টানেলেরই নাম সেণ্ট গথার্ড টানেল। তা ছাড়া ছোট, বড়, মাঝারি কত যে আছে তার ঠিক নেই। ট্রেন সমানেই টানেলের ভেতর দিয়ে চলছে। পথের দৃশ্য এত চমৎকার যে দেখে শেষ ক'রে উঠতে পারছি না। রাস্তার দু-পাশেই পাহাড়, তার মাথার ওপর বরফ ঝকমক করছে। পাহাড়ের গায়ে ঝরণাতলায় নদী ও নদীর ধারেই আঙুর, চেরী ও অন্যান্য ফলফুলের গাছ ফলফুলে ভর্ত্তি। পাহাড়ের রং, ফুলের বাহার, কাকে ফেলে কাকে দেখব

লটার ব্রুনেন

এই তিন জন আছি। খাবার সময় হোটেলের সর্দ্দার বামুনকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আমাদের জন্য মটন-কারি তৈরি ক'রে দিতে পার?" প্রথমটা সে ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থেকে তার পর বল্‌লে, "সে কি জিনিষ?" ব'লে দিলাম কারি পাউডার দিয়ে রান্না করতে হয়। তখন হেসে বল্‌লে, "ও ক্যারি ক্যারি দ্যাট আই নো ভেরি ওয়েল।" শুনলুম এক জন কে ভারতবর্ষীয় মহিলা লুসার্নে এই হোটেলে কিছুদিন আগে ক-দিনের জন্য ছিলেন, তিনি হোটেলের রাঁধুনীকে মুরগী, মটন ও খরগোসের কারি বানাতে ও পোলাও রান্না করতে শিখিয়ে গেছেন। একটা কারি পাউডারের বোতল এনেও দেখালে। এই সব দেখেশুনে মনে বিশ্বাস জন্মাল তবে ঠিক রাঁধতে পারবে। আমরা খাওয়া শেষ ক'রে পরদিনের জন্য কারি ভাত রান্না করবার হুকুম দিয়ে উপরে শুতে গেলুম।

২৭শে জুন সকালবেলা উঠে আমরা হেঁটে বেড়াতে গেলুম। তার পর একটি ট্যাক্সী ভাড়া ক'রে চারিদিক ঘুরে দেখতে গেলুম। লুসার্ন শহরটি পাহাড়ের ওপরেই, কাজেই মোটর, ট্রাম, বাস, সমস্ত পাহাড়ের ওপর আনাগোনা করছে। গাড়ী ও ড্রাইভার খুব মজবুত। আমরা লুসার্নের লেকে ষ্টীমার চ'ড়ে জলের ওপর দিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে চললুম। জলের দু-ধারেই হোটেল, সেখানে বৈকালিক চা-পান ও নৃত্য হয়, তা ছাড়া সাঁতার দেবার জায়গা ও তার ক্লাব, ফুলের বাগান, এই সব দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা ভিজলাউ নামে একটি জায়গায় এসে নামলুম। এখান থেকে সোজা পাহাড়ের উপর লুগানোর মতন ফিউনিকুলার-ধরণের ট্রেন চ'ড়ে রিগি পাহাড়ের চূড়ার ওপর ওঠা হ'ল। এর উচ্চতা ৫৯০৫ ফুট। ওঠবার সময় মাঝে মাঝে আমার কানে কি রকম তালা লাগছিল। ওপরে এসে দেখি বেশ প্রশস্ত জায়গা, সেখানে একটি খুব বড় হোটেল রয়েছে। হোটেলের ভিতরকার হলে ও বাইরের কম্পাউণ্ডে নানা রকম জিনিষের দোকান, ছোট ছোট কাঠের জিনিষ, পুঁতির মালা, স্থইটজারল্যাণ্ডের দৃশ্য আঁকা নানা রকম কাঠের বাক্স ট্রে ছবি ইত্যাদি বিক্রী হচ্ছে। আমি দোকান থেকে দুটি ছোট ছোট কাঠের খেলনার বুড়ো কিনলুম। বাইরের কম্পাউণ্ডে মস্ত বড় বড় ছাতা মাটিতে পোঁতা রয়েছে, তার তলায় টেবিল চেয়ার দিয়ে চা খাবার বন্দোবস্ত ছিল। আমরা একটি ছাতার তলায় ব'সে চা ও কেক দিয়ে জলযোগ শেষ করলুম। এখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে বরফে ঢাকা সারি সারি পাহাড়ের চূড়াগুলি

লটার ব্রুনেন

সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। আমাদের দেশে এই রকম ধরণের পুরনো বাড়ি অমন ঢের আছে, কিন্তু বংশপরম্পরায় কেউ এমন ভাবে একই ধরণে সাজিয়ে রাখে না এবং তার জন্য দর্শকেরও ভিড় হয় না।

তার পরে আমরা আর একটি জায়গায় গেলুম। এর ভেতরটি ঈষৎ অন্ধকার। একটি বড় গোল দেওয়ালে যুদ্ধের দৃশ্য আঁকা সুন্দর ছবি। ছবিখানির আয়তন ১২,৪০০ স্কোয়ার ফুট। এই ছবির পেছনে ইলেকট্রিক

দেখতে পেলুম, তলায় নীলবর্ণের লেক ও নানা রকম সবুজ রঙের ঝাউ গাছের শ্রেণী বড় সুন্দর দেখতে। শুনলুম আকাশ আরও পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে নাকি জার্ম্মেনীর বিখ্যাত ব্ল্যাক ফরেষ্টও নজরে পড়ে। আমরা এখানে খানিক ক্ষণ থেকে সেই একই রাস্তা দিয়ে আবার হোটেলে ফিরে এলুম। রাত্রে খেতে ব'সে সুইস বামুনকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "কই গো কারি ভাত কেমন রেঁধেছ দেখি।" সে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ট্রে ক'রে যা আনলে দেখে ত চক্ষুস্থির। একটি বড় প্লেটে ধূমায়মান আধসিদ্ধ মাংস ও ভাত এবং একটি বড় পেয়ালায় খানিকটা কারি পাউডার জলে-গোলা, এই তার ভাল কারি রাঁধতে জানা। ওদের ধারণা, জলে-গোলা কাঁচা কারি পাউডার আধসিদ্ধ মাংসের সঙ্গে মাখলেই ইণ্ডিয়ান কারি তৈরি হয়। আমি দেখেশুনে হতভম্ভ হয়ে শেষে ভাবলুম, আমারই অন্যায়, এসব দেশ দেখতে এসে কারি খাবার লোভ ত্যাগ করাই উচিত।

২৮শে জুন। তার পর দিন আমরা আবার একটি ভাড়া-করা 'বাসে' ক'রে বেড়াতে গেলুম। সঙ্গে টমাস কুকের এক জন গাইডও ছিল। আমরা প্রথমে একটি এক-শ বছরের পুরাতন বাড়িতে গেলুম। এটি সেই অনেক কাল আগে যে-ভাবে সাজানো ছিল, এখনও সেই রকম ক'রে সেই সব পুরাতন আসবাব ও রান্না ও খাবার বাসন সব দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে। এটি দেখলে এক-শ বছরের আগেকার সুইটজারল্যাণ্ডের লোকজনের রুচি

আলোর বন্দোবস্ত আছে, ও সেই আলো ছবির ওপর এমন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ছবির সমস্ত লোকই সজীব। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসী ও প্রুশিয়ার সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়েছিল, ছবিতে সেই যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। ছবিতে দেখলুম ফরাসী সেনানায়ক বুর্বাকি তাঁর বিপুল সৈন্য-বাহিনী নিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে প্রবেশ করছেন। একদিকে সুইস ও ফরাসী এবং অপর দিকে প্রুশিয়ার সৈন্যদলের মধ্যে ঘোর সংঘর্ষ বেধে গেছে। চতুর্দ্দিকে য্যাম্বুল্যান্স গাড়ী। হাত-পা-কাটা মৃত সৈন্য ও ঘোড়াগুলি ইতস্ততবিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দু-একটি সত্যকার য্যাম্বুল্যান্স গাড়ী ও সৈন্যসামন্তের পোষাক, ঘোড়ার সাজ যা বাস্তবিক এই যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয়েছিল, সেগুলিকে এমন ভাবে ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাজানো হয়েছে যে দেখলে মনে হয় এগুলিও ছবির অংশ। গাইড আমাদের এ-সব কথা ব'লে না দিলে আমরা হয়ত আসলে ও ছবিতে তফাৎ বুঝতে পারতুম না। আমাদের সঙ্গে বোধ হয় পাঁচ-ছয় রকম জাতের লোক ছিল। তার ভেতর ফরাসী, ইটালীয়ান, জার্ম্মান ও ইংরেজকে চিনতে পারলুম। গাইড প্রত্যেক ভাষায় একবার ক'রে লেকচার দিয়ে গেল। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে এবারে আর এক জায়গায় গেলুম। রাস্তার ওপরেই শ্বেত পাথরের তৈরি এক মৃত সিংহের মূর্ত্তি, এটি খোদাইয়ের কাজ। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ল্যুকাস আহোইন (Luc-

Ahoin) নামক সুইস খোদাইকার এটি নির্ম্মাণ করেন। ১০ই আগষ্ট ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীর জনগণ ষোড়শ লুইয়ের টুইলারিস্ নামক প্রাসাদ আক্রমণ করে। প্রাসাদরক্ষার ভার সুইস্-গার্ডদের ওপর ছিল। সম্রাট সপরিবারে গুপ্তদ্বার দিয়ে চুপি চুপি পলায়ন করেন, রক্ষীরা একথা জানত না। তারা জীবন পণ ক'রে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লড়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তাদের এই সিংহবিক্রমে যুদ্ধ ও আত্মদান স্মরণ ক'রে এই মর্ম্মর-কেশরী-মূর্ত্তি গঠিত হয়েছে। এখানে আরও অন্যান্য জিনিষ যা দেখেছিলুম সে-সব তেমন মনে নেই, সুতরাং লুসার্নের কথা আর কিছু লিখতে পারলুম না। আমরা এখানে দু-রাত্রি ছিলুম। তিন দিনের দিন ইণ্টারলাখেনের উদ্দেশে যাত্রা করলুম।

লুসার্ন লেকের উপর পুরাতন সেতু

ইণ্টারলাখেন যাবার সময় আমাদের কিছু লাগেজ-ভাড়া পড়ল। জেনোয়া থেকে লুসার্ন পর্য্যন্ত আমাদের লাগেজ-ভাড়া কিছুই লাগে নি। ইণ্টারলাখেনের খানিকটা পথ পার্ব্বত্য রেলের পথ, বেশী মালপত্র নিলে রেলগাড়ী ভারী হয়ে ওঠে, তাই এর জন্য অতিরিক্ত দিতে হয়। সুইটজারল্যাণ্ডের সমস্ত ট্রেনই ইলেকট্রিসিটিতে চলে। এর এন্‌জিন নেই, পাহাড়ের উপর সোজা ভাবে মড় মড় শব্দে উঠে যায়। এ সময় ট্রেনে মোটে দাঁড়াতে পারা যায় না। দাঁড়াতে গিয়ে দেখলুম কোমরে ও বুকে কি রকম ধাক্কা লাগতে লাগল। ট্রেন চলেছে, দু-পাশের দৃশ্য ক্রমশই এত সুন্দর হ'তে লাগল যে কোন্‌দিকে যে চেয়ে দেখব তার ঠিক পাচ্ছিলুম না। চারিদিকে সবুজ গাছে ভরা পাহাড়, মাথার ওপরে সাদা বরফ ধপ ধপ করছে, লেকের ঃ ঠিক তুঁতে গুলে দিয়েছে। তখন বরফগুলি সব গলতে শুরু হয়েছে, সমস্ত পাহাড়ের গায়ে এখানে-সেখানে বরফ জমে রয়েছে, যেন ধোপার বাড়িতে সাদা কাপড় শুখচ্ছে। সামনেই দেখছি সেই সব বরফ গলে গলে ঝর্ণা হয়ে নামছে। ক-দিনের ঘোরাঘুরিতে শরীর বড়ই ক্লান্ত হয়েছিল, মাঝে মাঝে সেজন্য বড় ঘুম আসছিল। কতবার ভাবলুম একটু ঘুমই, কিন্তু পাছে এমন সুন্দর দৃশ্য ফসকায় সেজন্য চোখ ব্যথা করা সত্ত্বেও চেয়ে বসে রইলুম। সেদিন বিকেলবেলা আমরা ইণ্টারলাখেন পৌঁছলুম। এখানকার এই হোটেলটিরও নাম 'হোটেল ডু লাক'। শীত এখন আমাদের দেশের খুব বেশী শীতের মত। সেদিন আর কোথাও বেড়াতে গেলুম না, কাপড়চোপড় বদলে নীচে গিয়ে খেয়ে এসে শুয়ে পড়লুম।

২৯শে জুন। সকালবেলা আমরা কোথায় কোথায় বেড়াতে যাব ঠিক ক'রে ফেললুম। আমরা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে দুপুরের খাওয়াটা সঙ্গে নিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেনে ক'রে লটার ব্রুনেন যাবার জন্য যাত্রা করলুম। পথের দু-ধারেই পাহাড়ের ওপর থেকে ঝরণা পড়ছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছি। আমাদের গাড়ীতে একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক ও আঠার উনিশ বছরের একটি ছেলে যাচ্ছিল। ছেলেটি এগিয়ে এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমরা কি ভারতবর্ষের লোক?' আমরা বললুম, 'হ্যাঁ, তুমি কি আমাদের দেশে কখনও গিয়েছিলে? আমাদের চিনলে কি ক'রে?' তার কাছে শুনলুম, তারা আমেরিকা থেকে এসেছে, দেশ বেড়াবার জন্য। একবার আমাদের দেশে এসে সব দেখেশুনে গেছে। তাদের খুব ভালই লেগেছিল। ছেলেটি তার মা'র সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলে

বল্‌লে, 'তোমরা বুঝি এই প্রথম সুইটজারল্যাণ্ডে এসেছ?' আমি বললুম, 'আমার স্বামী এর আগে ঘুরে গেছেন একবার, আমার এই প্রথমবার আসা।' ছেলেটি বল্‌লে, 'তাই তোমাদের এত ভাল লাগছে, কিন্তু তোমাদের দেশের কাশ্মীরের মত কি সুন্দর? আমরা কাশ্মীর বেড়িয়ে এসেছি, আমাদের ত কাশ্মীর আরও ভাল লেগেছিল।' এবার ঠকে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, 'না, কাশ্মীর দেখা এখনও হয় নি।' ভাবলুম একটি বিদেশী লোক এসে আমাদের ভূস্বর্গ কাশ্মীর দেখে গেল, আর আমরা এখনও দেখি নি। মনকে বোঝালুম একবারে ত সব সম্ভব হয় না নিজের দেশের ত অনেক দেখেছি, কাশ্মীরও এক সময় ঠিক দেখা হবে। ট্রেন লটার ব্রুনেনে এসে থামলো। আমরা সেই মা ও ছেলের কাছে বিদায় নিয়ে নেমে পড়লুম। এখান থেকে মোটরে

ট্রুমুল ব্যাক প্রপাতের একটি দৃশ্য

ক'রে কিছুদূর গিয়ে হাঁটতে সুরু ক'রে শেষে ট্রুমুল ব্যাক ফলস্‌ ঝরণার কাছে এসে পৌঁছলুম। এই ঝরণাটি অতি সুন্দর, পাঁচটি ধাপে পাঁচ রকম দৃশ্য। দেখবার সব রকম সুবিধা আছে। ধাপে ধাপে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন, বারান্দা, ওভার-ব্রিজ সব আছে। যত খুশী দেখ। ঝরণাটি দেখে আমরা মোটরে ক'রে সাইডেক এসে পৌঁছলুম। এখানে একটি হোটেল আছে। হোটেলটির নাম 'সাইডেক হোটেল।' একটি টেবিল ঠিক ক'রে ব'সে পড়া গেল। এবার খেতে হবে একটু। ভাল দৃশ্য দেখবার জন্য বারান্দার নীচে টেবিল নিয়ে বসেছি, টেবিলের পাশেই মাটিতে জমীর ওপর খানিকটা বরফ জমে রয়েছে। আমি একটু ভেঙে দেখতে লাগলুম যেন ময়রার দোকানের ঘিয়োড়ের টুকরা। সামনেই বরফের পাহাড়, রোদের আলো প'ড়ে ঝলমল করছে, এর চূড়ার নামই সাইডেক। এখান থেকে রোন গ্লেসিয়ার দেখতে যাবার জন্য ট্রেনের বন্দোবস্ত আছে। ট্রেনের গার্ড গাড়ী ছাড়বার আগে 'বাস'-কণ্ডাকটারের মত হাঁকতে লাগল, "রোন গ্লেসিয়ার, রোন গ্লেসিয়ারস্‌," তার পর ট্রেন ছেড়ে দিলে। হোটেলে ব'সে ব'সেই দেখছি ট্রেনখানি সাদা বরফের ওপর উঠতে উঠতে শেষে একটি সুড়ঙ্গের ভেতর মিলিয়ে গেল। আমাদের এই গ্লেসিয়ারস দেখা হয় নি। খাওয়া হ'লে আমরা এখান থেকে একটি ফিটন গাড়ী ভাড়া করলুম। ঘোড়াটি খুব উঁচু ও কাল রঙের, বেশ তেজের সঙ্গে ঘাড় বেঁকিয়ে ছুটতে লাগল। গাড়ীর কোচম্যান ফরাসী, সুইস ও ইংরেজী ভাষা জানে। তার সঙ্গে চুক্তি করা হ'ল সে আমাদের দেড় ঘণ্টার মধ্যে গ্রিণ্ডেলওয়াল্ড গ্লেসিয়ারস দেখিয়ে আবার সাইডেক হোটেলে পৌঁছে দেবে, আমরা তার পর আবার ইণ্টারলাখেনের ট্রেন ধরতে পারব। আমাদের গাড়ী গ্রিণ্ডেলওয়াল্ড গ্লেসিয়ারসের কাছে থামলে, আমরা হেঁটে চলতে সুরু করলুম। পথের দু-পাশে ঘাসের ওপর নানা রঙের ফুল ফুটে যেন রঙীন গালচের মত দেখাচ্ছিল। গাড়োয়ান আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলল। রাস্তার দু-পাশেই ঝরণা বয়ে যাচ্ছে, সুন্দর দেখতে। আমরা গ্রিণ্ডেলওয়াল্ড গ্লেসিয়ারসের কাছে এসে দাঁড়ালুম। গ্লেসিয়ারসটিকে দেখে মনে হ'ল দুটি পাহাড়ের মাঝখানের উপত্যকার ওপর বরফ পড়ে পড়ে উপত্যকাটি বরফে বোঝাই হয়ে পাহাড় দুটির উচ্চতায় সমান হয়ে গেছে।

গ্রিণ্ডেলওয়াল্ড গ্লেসিয়ারসের সুড়ঙ্গের অভ্যন্তর

দেখতে ঠিক খড়ির পাহাড়ের মত। লোকে বরফ-কাটা সাবলের দ্বারা এই কঠিন বরফের স্তরকে কেটে গুহা তৈরি করেছে, আমরা এই গুহার ভেতর যাব ব'লে একটি স্থানীয় লোককে গাইড করলুম। গাইডদের আলপাইন গাইড বলে, এ ইংরেজী জানে। গাইডের পারিতোষিক চার সুইস শিলিং। গুহার কাছে একটি ছোট টিনের ঘর, এর ভেতর বরফের ওপর স্কেট করবার সরঞ্জাম, কাঁটাওয়ালা জুতা লাঠি ও কম্বল থাকে। আমরা দু-জনে দুটি কম্বল গায়ে দিয়ে হাতে একটি ক'রে লাঠি নিলুম, গাইড একটি বরফ-কাটা সাবল হাতে নিয়ে আমাদের সঙ্গে চললো। গুহার ভেতরটি নিরেট বরফের। মাথা থেকে অনবরত বরফ গলে গলে গাছের শেকড়ের মত ঝুরি নেমেছে। দুটো-একটা ভেঙে দেখলুম, বেশ কাঁচের নলের মত। সমস্ত গুহাটি থেকে নীল রঙের আভা বেরুচ্ছে, বরফের ওপর রোদ পড়ে এ রকম দেখতে হয়। চলবার সময় পা পেছলায় ব'লে মাঝে মাঝে সরু সরু কাঠের তক্তা পাতা, দু-পাশে নর্দ্দমা কাটা, তাই দিয়ে হুড় হুড় ক'রে বরফ-গলা জল যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ছোটবড় নানান আকারের বরফের টুকরোও ভেসে চলেছে। এর ভেতর গাছপালা ও ফুল দেখে প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। শেষে বুঝলুম বাইরে থেকে তুলে এনে ভেতরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বরফের ভেতর কোন জিনিষ নষ্ট হয় না, কাজেই বেশ টাট্‌কা আছে। আরও দু-চার জন গুহার শেষ পর্য্যন্ত গেল। আমি কিন্তু পারলুম না। শীতে নাকের ডগা এমন আড়ষ্ট বোধ হ'তে লাগল যে খানিকটা গিয়েই পালিয়ে এলুম। গাড়ীর গাড়োয়ানের কাছে শুনলুম গুহাটিকে দু-তিন দিন ছাড়া কেটে ঠিক করতে হয়, কেননা বরফ জমে জমে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, বেশী শীতের সময় এসব চলে না। লোকে তখন পায়ে চাকাওয়ালা জুতা প'রে বরফের ওপর স্কেটীং করে, এরই নাম উইণ্টার স্পোর্টস্‌ আমরা এবার গাড়ীতে উঠে বসলুম, গাড়োয়ান জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে।

৩০শে জুন। সকালবেলা উঠে আমরা জিনিষপত্র গোছাতে সুরু ক'রে দিলুম। আজকের দুপুরে গাড়ীতেই প্যারিস যাব। গোছগাছ করতে করতেই বেলা এগারটা বেজে গেল। ট্রেন দুপুর বারটায়। এখানে একটি সুন্দর বাগান আছে। আমি শুনেছিলুম সেই বাগানে একটি আশ্চর্য্য রকম ঘড়ি আছে, এটি ফুল ও ফুলের গাছ দিয়ে তৈরি। সুইটজারল্যাণ্ডের ঘড়ি যে বিখ্যাত সে-কথা সকলেই জানেন। দোকানে নানা রকম ঘড়ি দেখেওছি কিন্তু ফুলের বাগানে ফুলের তৈরি ঘড়ি কখনও দেখি নি, কাজেই এটির নাম শোনা পর্য্যন্ত এটিকে দেখবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ ছিল, কিন্তু তখন হাতে মোটে সময় নেই, সেজন্য সঙ্গী-মহাশয় মহা আপত্তি তুললেন, শেষে আমার চেঁচামেচিতে নিম-রাজি হ'তেই তাঁকে হাত ধ'রে রাস্তায় বের ক'রে ফেললুম। আমরা বেশ জোরেই হন হন ক'রে হাঁটতে সুরু ক'রে দিলুম। সুইটজারল্যাণ্ডের একটি সুবিধা আছে, এখানে বেশীর ভাগ লোকই ইংরেজী কথা বুঝতে পারে। রাস্তায় একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলুম, ফুলের ঘড়িওয়ালা বাগানটা কোন্‌

দিকে। সে আমায় পাশেই একটি ফটক দেখিয়ে দিলে। ঢুকেই দেখি ফটকের সামনেই ফুলের ঘড়িটি রয়েছে। মাটির ওপর একটু সামান্য উঁচু জায়গায় নানান রকম ফুল ও ফুলের ছোট্ট ছোট্ট পাতাওয়ালা গাছ বসিয়ে ঘড়ির হরফ তৈরি করা হয়েছে। ঘড়ির পেণ্ডুলাম ও কাঁটা কোন ধাতুর তৈরি, ঘড়ির মাথার ওপর দুটি শাদা দাড়ীওয়ালা কাঠের বুড়ো ব'সে আছে। আমার কপাল ভাল, সেখানে দেখতে দেখতেই ১১৷৷ টার ঘণ্টা পড়ল। অমনি ছোট বুড়োটা দেখলুম তার হাতের ছোট হাতুড়ীটি দিয়ে তার ঢাকের ওপর ধাঁ ক'রে একটি ঘা বসিয়ে দিলে। বড়টা কিছু করলে না। আমি আন্দাজে বুঝলুম ছোটটা আধ ঘণ্টায় ঘা দেয় ও বড়টা পুরো ঘণ্টায় কাজ করে। বাগানে আরও অনেক দেখবার জিনিষ ছিল, কিন্তু সময়াভাবে কোন দিকে নজর না দিয়ে হোটেলে এসে জিনিষপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ষ্টেশনে পৌঁছে প্যারিস যাবার ট্রেনে উঠে পড়া গেল।

শ্রেষ্ঠ মহন্ত বাঙ্গালী সন্তদাস বাবাজী

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

ত্রিমূর্ত্তির দুই গিয়া রহিলাম এক আমি। ছাত্রাবাসে বিপিনচন্দ্র পাল, তারাকিশোর চৌধুরী এবং আমি, এই তিন জনকে বলিত ব্রহ্মের ত্রিমূর্ত্তি। আমরা তিন জনই ছিলাম ব্রাহ্ম। সেকালে এক এক জেলার লোক লইয়া গঠিত হইত ছাত্রাবাস। আমরা শ্রীহট্টবাসী।

ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী

আমি তখন থাকিতাম নিমুখানসামার গলিতে। এই গলি এখন ইডেন হাসপাতাল ষ্ট্রীটের অন্তর্গত। বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি সকলে আমরা প্রাতে হালুয়া পূরী ভোজনে প্রবৃত্ত, এমন সময় আসিলেন খর্ব্বকায়, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ তারাকিশোর চৌধুরী ক্যানভ্বাস্ ব্যাগ হস্তে। পরম নিষ্ঠাবান; শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করেন না; ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ না করিয়া জল পান করেন না।

তখন ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক। সেই কলেজে ভর্ত্তি হইয়া তাঁহারই সংস্পর্শ ও উপদেশ ঘর্ষণে তারাকিশোরের ব্রহ্মণ্যের বন্ধুরতা ক্ষয় হইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন অগষ্ট কমৎ মন্ত্রে দীক্ষিত। তারাকিশোর চৌধুরীও বলিতেন, ঈশ্বরের আবার পূজা কি? মানুষকেই পূজা করা উচিত। ছিলেন নিরামিষাশী। প্রচার করিতে লাগিলেন মুরগীর হাড়ের মহিমা। হাড়ে ফসফারাস আছে।

সুরেন্দ্র নাথের প্রভাবে তিনি রাজনৈতিক কার্য্যে যোগ দিতেন। ১৮৭৬ সালে কলিকাতা মিউনিসিপালিটি নির্ব্বাচনে

অধিকার প্রাপ্ত হইলে বিপিন চন্দ্র পাল এবং আমার সঙ্গে নিত্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কর্পরেশনে প্রবেশ করিবার জন্য। ৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত কেহই রাজী হন নাই। ইদানীং যদিও রাজনীতি সম্বন্ধে নির্ব্বাক ছিলেন, তাঁহার অন্তর ছিল পুরো স্বদেশী।

আমাকে ভালবাসিবার মাত্রা ছিল কিছু বেশী; কতকটা ঔপন্যাসিক। রেড়ীর তেলের প্রদীপের আলোয় পাঠ করিবার অভ্যাস ছিল। তেল জলের গ্লাস ঢাকা থাকিত কাচের লণ্ঠনে। এক দিন সকলে দেখিল লণ্ঠনের গায়ে যে কালো ভুসো লাগিয়া আছে, তাহাতে হিজিবিজি কাটা, আর এক জায়গায় লেখা 'সুন্দরীমোহন'। ছাত্রাবাসে হৈ চৈ। তিলোত্তমা লিখেছেন—লতা, পাতা, হিজিবিজি, কুমার জগৎসিংহ। ভালবাসার ফলেই হউক, আর যে কারণেই হউক, তারাকিশোর উপবীত ত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন ব্রাহ্মধর্ম্ম। পিতা পাঁঠা বলির খড়্গ লইয়া কাটিতে গেলেন; ভীত হইলেন না বালক তারাকিশোর।

মনোবিজ্ঞানে এম্-এ। তর্কশক্তি অসীম। ব্রাহ্ম কেহ কোন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, তাঁহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইত মীমাংসার জন্য তারাকিশোর চৌধুরীর নিকট। এই জন্য আমার স্ত্রী তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন তর্ককিশোর।

কিছুদিন পরে শুষ্ক জ্ঞানে হইল অনাস্থা। সেই সময় ব্রাহ্মসমাজ-প্রাঙ্গণে বহিতেছিল এক প্রবল ভক্তির স্রোত। মজিলপুরের জমিদার ৺কালীনাথ দত্ত মহাশয় এক গৃহস্থ সাধুর নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রেম-যোগ-মন্ত্র। তাঁহারা গঠন করিলেন এক অসাম্প্রদায়িক সাধকমণ্ডলী। গুরু দীক্ষা দিয়া করেন শক্তি সঞ্চার। মন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয় সর্ব্বাঙ্গে এক আনন্দতড়িৎ স্রোত। তাঁহাদের নাই কোন বাহ্যিক সাম্প্রদায়িক চিহ্ন। তিলক, মালা, শিখা, গৈরিক নিষিদ্ধ। গানের সঙ্গে সঙ্গে চলে সাধনা। গানের অধিকাংশ যদিও রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-সম্বন্ধীয়, কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করিতেন পরব্রহ্মের অতুলনীয় গভীর প্রেমই ব্রজলীলাকাব্য আকারে বর্ণিত। কেহ যদি শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এই প্রেমের লেনা-দেনা কারবার আছে যাহার, তিনি বেদ-বিধির অতীত। তাঁহার জাত পাত বিচারের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা সর্ব্বত্রই দেখেন শ্রীক্ষেত্র :—

অন্ত্যবর্ণৈ হীনবর্ণৈঃ সঙ্করপ্রভবৈরপি।
স্পৃষ্টং জগৎপতেরন্নং ভুক্তং সর্ব্বাঘনাশনম্॥

আদিস্থান ঘোষপাড়ায় একাদশী দিবসে ব্রাহ্মণ বিধবারা ঘোষ মহাশয়ের প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। নিষেধ এই চারটি —মিথ্যা কথা, ব্যাভিচার, উচ্ছিষ্ট এবং মাংস ডিম।

তারাকিশোর একদিন আমাকে গোপনে বলিলেন, এক জায়গায় গেলে ভক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কিঞ্চিৎ কুসংস্কার আছে, যথা উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ নিষেধ ইত্যাদি। আমার অনুমতি চাহিলেন। আমি বলিলাম, ঐ একটুক কুসংস্কার-মূল্যে যদি এত বড় একটা দুর্লভ বস্তু পাওয়া যায়, তাহাতে আপত্তি কি? তখন স্বর্গীয় দ্বিজদাস দত্তের বাড়ীতে বসিত পূর্ব্বোক্ত সাধকমণ্ডলীর বৈঠক। তারাকিশোর যোগদান করিলেন। মাঝে মাঝে ঘোর তর্ক জুড়িয়া দিতেন। আমার স্ত্রীও সেই মণ্ডলীভুক্ত ছিলেন। সেখানে তিনিই তাঁহাকে তর্ককিশোর উপাধি দান করিয়াছিলেন।

মণ্ডলীর নায়কেরা বিভূতি প্রকাশ করিতেন না। সময়ে সময়ে অলক্ষিতে বিভূতির প্রকাশ হইত। তারাকিশোর বিভূতির পক্ষপাতী ছিলেন। প্রয়াগে কুম্ভ মেলায় নাকি দেখিয়াছিলেন বৃন্দাবনের কাঠিয়া বাবা খড়ম-পায়ে নদী পার হইতেছেন। সেই সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইলেন। এই নবদীক্ষার ফলে পূর্ব্ব সংস্কারের অনেক পরিবর্ত্তন হইল। উপবীত গ্রহণ করিয়া নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন।

হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায়ে উচ্চস্থান যখন অধিকার করিলেন, তখনও পূজার ছুটি উপলক্ষে কম্বল গায়ে নিমকাঠের লাঠি হাতে বৃন্দাবনে যাইতেন। তারাকিশোর ছিলেন পূর্ণ বিশ্বাসী। যখন যে ধর্ম্মে বিশ্বাস, পূর্ণ রূপে সেই বিশ্বাসানুযায়ী নিয়ম পালন করিতেন।

তাঁহার বিশ্বাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় নিম্বার্ক মণ্ডলী। তাঁহারই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তির একখানা গ্রন্থ আমাকে দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল কেশব কাশ্মীরী নামক নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের জনৈক নেতা তর্কে ভারতবর্ষের পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। সেই দিগ্বিজয়ীর তর্কে শ্রীচৈতন্য পরাস্ত

হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে মূলতানে দিগ্বিজয়ীর সমাধি হয়। আমি প্রমাণ করিলাম এই বৃত্তান্ত ভ্রান্ত। চৈতন্যের সমসাময়িক ভক্ত পণ্ডিতেরা যে দৈনন্দিন লিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ দিগ্বিজয়ী চৈতন্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের গুরু কেশব ভারতী; কেশব কাশ্মীরী নহেন। কেশব ভারতীর সমাধি এখনও কাটোয়ায় বিদ্যমান। এত প্রমাণ সত্বেও তারাকিশোরের মত অটল। তিনি তাঁহার গুরুর নিকট শুনিয়াছেন কেশব কাশ্মীরী সম্বন্ধে ঐ সমুদয় বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ সত্য।

তাঁহার ওকালতি পরিত্যাগ সঙ্কল্প জানিয়া জজ উড্রোফ, তাঁহাকে বলিলেন, শীঘ্রই তাঁহার জজ হইবার সম্ভাবনা। "বড়লাট হইলেও আর নয়", এই উত্তর শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন।

এই ত্যাগী সন্ন্যাসী, গুরুর দেহত্যাগের পর যখন সন্ন্যাসীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন,—বৃন্দাবনের সর্ব্বপ্রধান মহন্তের গদি আরোহণ করিলেন, বঙ্গবাসী আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিল। কিন্তু সেই ত্যাগী সন্ন্যাসী গৃহী অপেক্ষাও গৃহী হইয়াছিলেন। সামান্য গৃহীর পরিবার সাত-আট জন লইয়া। সন্তদাস বাবাজীর পরিবার বহু। পরিক্রমার সময় সাত-আট শ' সন্ন্যাসীর আহার যোগাইতে হইত। কেবল আহারের ব্যবস্থা নয়, শাসনের ব্যবস্থারও প্রয়োজন হইত। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে বড় বড় হাকিম, এমন কি ঐ প্রদেশের ছোটলাটও দেখা করিতে আসিতেন। এই জন্যও বোধ হয় দুরন্ত সন্ন্যাসীরা ভয়ে তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিত।

এই বৃহৎ পরিবার রক্ষার জন্য তাঁহাকে প্রণামী গ্রহণ করিতে হইত। এই প্রণামীর অর্থ হইতেই এত বড় শিবপুরের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

শারীরিক অসুস্থতাবশতই হউক বা যে কারণেই হউক কলিকাতায় ইদানীং আমার সঙ্গে দেখা হইত না। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক প্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি আনন্দধামে আনন্দে আছেন। এ প্রকার ব্যক্তির মৃত্যু হয় না। তবু বন্ধুবিচ্ছেদের সাময়িক আঘাত যে অনুভব করি নাই তাহা নহে।

যখন যে গ্রন্থ রচনা করিতেন, আমাকে পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার 'দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা', 'ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত' এবং 'শ্রীমদ্ভগবগীতা' গভীর চিন্তার পরিচায়ক। তাঁহার গীতার শব্দসূচী অতি মূল্যবান। 'ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা' গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন "এক্ষণকার ভারতবর্ষীয় জাতি বিভাগ অবৈজ্ঞানিক" (১৩০ পৃঃ)। পুরাকালে জাতি গুণগত, শ্রুতি ও মহাভারত তাহার প্রমাণ (১১৩ ও ১১৬ পৃষ্ঠা)।

সুদূর শ্রীহট্টের এক অজ্ঞাত গণ্ডগ্রামে যাঁহার জন্ম, তাঁহার খ্যাতি বঙ্গ ও বিহারের নানা স্থানে সুবিস্তৃত। বৃন্দাবনে অর্দ্ধলক্ষ ব্যয় করিয়া যিনি এক সুন্দর কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; শিবপুরে লক্ষাধিক ব্যয়ে নির্ম্মিত যাঁহার প্রাসাদে আধুনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-পূর্ণ ব্যবস্থার অভাব ছিল না; যাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর সংখ্যা তিন হাজার ছিল; আজ বৃন্দাবন যাত্রার পথে অল্প সংখ্যক শিষ্যের সম্মুখে তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যকামীদের প্রতি নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! কিন্তু সন্তদাস ছিলেন নির্লিপ্ত বৈরাগী। কুম্ভ মেলায় তাঁহাকে হাতীর উপর চড়াইয়া সাম্প্রদায়িক ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। তিনি সে সমুদয় ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া পদব্রজে গিয়াছিলেন।

এই জড়বাদপ্রধান যুগে সন্তদাসের ন্যায় বিশ্বাসী জ্ঞানী ভক্ত দুর্লভ। আজ শান্তিধামে অবস্থিত তাঁহার সেই শান্ত মূর্ত্তি কলহপূর্ণ জগতকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বলিতেছে পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের চরণাশ্রয় ভিন্ন সুখ ও শান্তি লাভের আর কোন উপায় নাই।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(২৫)

শিবপ্রসাদ সারিয়া উঠিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সজীবতা, সহজ আনন্দহাস্য আর রহিল না। হঠাৎ তিনি বুড়া হইয়া পড়িলেন। শুধু তাঁহার দেহের নয়, তাঁহার মনেরও যেন কোথায় ভাঙন ধরিয়াছে। কোন-কোন দিন তিনি বাড়ি হইতে কোথাও বাহির হন না, পাজামার ওপর হলদে-কালো ডোরা-কাটা ড্রেসিং গাউন পরিয়া শীতের দিনগুলি বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুইয়া কাটাইয়া দেন। হাতে কোন ফরাসী বা ইতালীয়ান উপন্যাস বা কবিতার বই থাকে বটে কিন্তু বই পড়াতে মন থাকে না। অরুণ শঙ্কিতভাবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, কাকা তোমার শরীরটা আজ ভাল নেই? শিবপ্রসাদ হাসিয়া বলেন, না, না, আমি বেশ আছি, আজ কোর্টে যেতে ইচ্ছে করছে না। তুই কারডুচি পড়েছিস? Hymn to Satan কবিতাটি চমৎকার।

অরুণ শিবপ্রসাদের সহিত নানা গল্প করিতে চায়, গল্প জমে না, কথা কহিতে কহিতে শিবপ্রসাদ অন্যমনস্ক হইয়া যান। কখন অরুণের মুখের দিকে চুপ করিয়া বিষণ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকেন, অরুণের কেমন ভয় করে।

সন্ধ্যার সময় প্রায়ই মাড়োয়ারী, ইহুদী নানা প্রকারের লোক আসে। নীচে লাইব্রেরী-ঘরে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়। কখন শিবপ্রসাদ রাগিয়া যান, কখন তাহারা চেঁচাইয়া ওঠে। অরুণ ভাবে, তাহারা শিবপ্রসাদের মক্কেল। কিন্তু পূর্ব্বে কাকাকে মক্কেলদের সহিত এরূপ বাকবিতণ্ডা করিতে সে কখনও দেখে নাই।

সন্ধ্যার পর কিন্তু শিবপ্রসাদ বাড়ি থাকেন না, সান্ধ্য-সজ্জা করিয়া মোটর চড়িয়া বাহির হন। গভীর রাত্রে মত্তাবস্থায় বাড়ি ফেরেন। পূর্ব্বে অরুণ শিবপ্রসাদের আসিবার পূর্ব্বেই শুইয়া পড়িত। কিন্তু এখন শিবপ্রসাদ বাড়ি না ফিরিলে তাহার ঘুম হয় না। তাহার কেমন ভয় করে।

থার্ড ইয়ারের শেষ ভাগে হঠাৎ এক অসুস্থতায় অরুণের জীবনের গভীর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

শীতের শেষে ঋতুপরিবর্ত্তনের সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া অরুণের জর হইল, বুকে সর্দ্দি বসিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এখন নিউমোনিয়া হয়ে না দাঁড়ায়।

সমস্ত দেহে অসহনীয় বেদনা, স্নায়ু ও মাংসপেশীগুলি যেন কে টানিয়া পাকাইয়া মোচড়াইয়া কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়। নিদারুণ ব্যথায় তিন দিন অর্দ্ধঅচৈতন্যভাবে কাটিয়া গেল। চারি দিকে অবাস্তব কালো ছায়া; মলিন দেওয়ালে কাহাদের বিভীষিকাময় কৃষ্ণমূর্ত্তিগুলি নাচিয়া বেড়ায়; বৃহৎ খাটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অরুণ গোঙাইয়া পাক খাইয়া ঘোরে, ছায়াগুলি অট্টহাস্যে তাণ্ডবনৃত্য সুরু করে। ভীত হইয়া অরুণ উঠিয়া বসিতে চায়, ঠাকুমা তাহাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দেন, ব্যথিত স্বরে বলেন, অরু বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা? অসুখ হওয়ার পর হইতে ঠাকুমা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অরুণের নিকট বসিয়া আছেন। ভয়ে তাঁহার বুক দুরু দুরু কাঁপে। বড় দুর্ভাগিনী তিনি।

অরুণের বাষ্পভরা বেদনাবিহ্বল চোখের উপর ঠাকুমার করুণ শীর্ণ মুখের আবছায়া মাঝে মাঝে ভাসিয়া ওঠে, আরও কত মুখ স্রোতের মত বহিয়া যায়। কাকার শুষ্ক শঙ্কিত মুখ, প্রতিমার ভীতিবিহ্বল মুখ, দিদির অশ্রুসিক্ত মুখ, মামীমার স্নেহস্নিগ্ধ মুখ, নানা মুখের ছায়ামূর্ত্তি। কখন কখন অরুণ স্থির নয়নে চাহিয়া থাকে, এই বুঝি উমার অনুপম চিরবাঞ্ছিত মুখকান্তি। সে মুখ খুঁজিয়া পায় না। চোখ বুজিয়া সে বালিশে মুখ গুঁজিয়া গোঙাইয়া ওঠে। অরুণের কাতরধ্বনি শুনিয়া ঠাকুমা চোখের জল রাখিতে পারেন না। খাটের মাথায় দক্ষিণ দেওয়ালে অরুণের মাতার বৃহৎ অয়েল-পেন্টিঙের দিকে চাহিয়া তিনি মনে মনে প্রার্থনা করেন, বৌমা তোমার অরু ঘোষ-বংশের শেষ-প্রদীপ, একে তুমি এত শীগগির ডেকে নিও না।

চতুর্থ দিনে জ্বর ছাড়িয়া গেল, বেদনারও উপশম হইল। সপ্তম দিনে অরুণ রুটি ও মুরগীর সুপ খাইল। দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল। ডাক্তার বলিলেন, হার্ট একটু খারাপ হয়েছে, কোনরূপ নড়াচড়া করলে চলবে না, কিছুদিন বিছানাতে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে।

ক্ষীণদেহে কর্ম্মহীন রোগশয্যায় শুইয়া থাকিয়া অরুণ এক নব জীবনানুভূতি লাভ করিল। অতি ক্ষীণদেহ হইতে তাহার তীক্ষ্ণ কল্পনাপ্রবণ মন যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তেমনি তাহার সত্তা চারিদিকে প্রবহমান জীবনস্রোতের তীরে স্থির, একাকী, অচঞ্চল দ্রষ্টার মত বসিয়া। ঠাকুমা ঔষধ খাওয়ান, ছকু খানসামা সুপ লইয়া আসে, প্রতিমা গান গায়, অজয় আসিয়া গল্প করে, পলাশ গাছে একটি পাখী ডাকে, একটি বোলতা ঘরে ভন্ ভন্ করিয়া ঘোরে, তালগাছের ওপর চাঁদ ওঠে, এ সকল ঘটনা যেন কোন বৃহৎ রঙ্গমঞ্চে পুতুলনাচের মত ঘটিয়া যায়, সে শুধু স্তব্ধ দর্শক।

এই বিজনতা, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্নতা একাকিত্বের অনুভূতি অরুণের চিত্তে অসুস্থতার পর হইতে গভীরভাবে জড়াইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় অনেক বন্ধুবান্ধব দেখিতে আসে, ঘরে আড্ডা বসিয়া যায়। জয়ন্ত, অজয়, বাণেশ্বর, হরিসাধন, দিদি, মামীমা, চন্দ্রা,—রীতিমত ভীড় হয়। উমাও মাঝে মাঝে আসে। ইহাদের মধ্যে বাণেশ্বর ও চন্দ্রা নিয়মিত ভিজিটার।

চন্দ্রা ঘরে প্রবেশ করিলেই অরুণ জিজ্ঞাসা করে, মামী এলেন না?

চন্দ্রা গম্ভীর ভাবে বলে, মা বলেছেন আজ আর আসতে পারবেন না, অনেক কাজ, বাবার শরীর ভাল নেই কি না।

অরুণ তখনও খোলা দরজার দিকে চাহিয়া থাকে। মামীমার সহিত উমা আসে। আজ সে আসিল না।

চন্দ্রা অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া বলে, দিদির ত কলেজ থেকে এসেই মাথা ধরেছে, তার ঘরে শুয়ে আছে। কেমন আছ আজ অরুণ দা?

অরুণ আনমনা হইয়া যায়। উমার ঘরের দরজার খয়ের রঙের পর্দ্দাটি তাহার চোখের সম্মুখে দুলিতে থাকে। ওই পর্দ্দার আড়ালে ছোট ঘরটিতে সে কখনও প্রবেশ করে নাই। ইচ্ছা করে, একবার সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া চুপ করিয়া একটু বসিয়া থাকিবার অধিকার পায়।

চন্দ্রা বলে, অরুণ-দা, তুমি আরব্যোপন্যাস আনতে বলেছিলে, এই নাও।

রোগশয্যায় শুইয়া অরুণের কোন আধুনিক উপন্যাস পড়িতে ভাল লাগে না। ছেলেবেলায়-পড়া রূপকথা উপকথা অসম্ভব উপাখ্যান সব পড়িতে ভাল লাগে।

রাতে অরুণের ঘুম ভাঙিয়া যায়। অন্ধকার স্তব্ধ গৃহ। চাঁদের আলো শার্সীর কাচে ঝকমক্ করে। মাকড়সার জালের মত অতি সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া কল্পনা কি মায়াজাল বুনিতে চায়! অরুণ ভাবে, প্রেম কি? কেন এক যুবক এক তরুণীকে ভালবাসে? কেন ভালবাসি? এ যেন কোন অন্ধ নির্ম্মম শক্তি, হৃদয় ভাঙিয়া পড়ে, জীবন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, তবু ভালবাসি। প্রেমের রহস্য যে জানিতে পারিবে সে জীবনের রহস্য জানিতে পারিবে। ভাবিতে ভাবিতে সে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

একদিন অরুণ বলিল, বাণেশ্বর বলতে পার প্রেম কি?

বাণেশ্বর হাসিয়া উঠিল, কার মত জানতে চাও?

—আমি তোমার মত জানতে চাই।

—Love is a divine mystery.

—বল কি তুমি, এ যে জয়ন্তের কথা, কবির কথা। আচ্ছা তুমি কখনও প্রেমে পড়েছ?

—কেন, আমি তর্ক করি ব'লে কি কাউকে ভালবাসতে পারি না?

—প্রেমে যে বিচার, তর্ক চলে না। এ এক বিচারহীন হৃদয়-আবেগ। ঠিক বলেছ, প্রেম মহারহস্য, মৃত্যুর মত।

—এ সব কথা না ভেবে, তোমার বোনকে ডাক, গান শোন।

—না, আজ গান নয়। গান মনকে বড় উদাস ক'রে তোলে।

—কিন্তু আমাকে ভাবতে সাহায্য করে।

বাণেশ্বর খোলা দরজার দিকে বার-বার চাহিতে লাগিল।

অরুণ নিজ চিন্তায় এত মগ্ন ছিল যে সে লক্ষ্য করিল না, প্রতিমা ঘরে প্রবেশ করিতে বাণেশ্বরের মুখ কিরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

(২৬)

পুরাতন বাড়ির সিমেণ্ট-ওঠা বড় উঠান ঘেরিয়া তিন দিকে ঘরের সারি। দোতলায় পূর্ব্বদিকে কোন ঘর নাই, খোলা ছাদ, ছাদের দেওয়াল উঁচু উঠিয়া গিয়াছে।

উমার ঘরটি দোতলায় পূর্ব্ব-উত্তর কোণে, ছোট্ট ঘর। পূর্ব্বে উহা বাক্স-পেটরা রাখিবার ঘররূপে ব্যবহৃত হইত। দোতলায় আর খালি ঘর নাই। একতলার ঘরগুলি স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার। সেজন্য এই ছোট ঘরখানিই উমাকে লইতে হইয়াছে। স্কুলে পড়িবার সময় তিন বোন এক বড় ঘরে শুইত। কলেজে ভর্ত্তি হইয়া উমা বলিল, তাহার আলাদা ঘর না হইলে পড়ার বড় অসুবিধা হয়, তাহাকে অধিক রাত্রি জাগিয়া পড়িতে হয়, ঘরে আলো জ্বলিলে শীলার ঘুম হয় না।

সরু ছোট ঘরটিতে এক ছোট তক্তাপোষ, এক ছোট টেবিল, একখানি চেয়ার ও একটি নীচু আলমারী ঠাসাঠাসি করিয়া রাখা। আলমারীতে অর্দ্ধেক বই ও অর্দ্ধেক শাড়ী ভরা। পূর্ব্বে ও উত্তরে দুই ছোট জানালায় পুরাতন সিল্কের শাড়ীর সোনালী পাড়-দেওয়া নীল পর্দ্দা টাঙান। উত্তরের জানালা দিয়া পাশের বাড়ির ভাঁড়ার-ঘর দেখা যায়, সেজন্য জানলাটি সারাদিন বন্ধ থাকে। পূবের জানালা দিয়া দেখা যায় খানিকটা পোড়ো জমি, সরু গলির প্রান্তে ল্যাম্প-পোষ্ট, একটি অযত্ন-বর্দ্ধিত আমগাছ। দক্ষিণমুখী দরজায় খয়ের রঙের পর্দ্দা সর্ব্ব সময়ে ঝোলে। এই পর্দ্দা তুলিয়া ঘরে প্রবেশের অধিকার কাহারও নাই, এই পর্দ্দা সরাইয়া প্রিয়া তরুণীর আশা-ভরা খুশী-ভরা সাজানো ঘরটিতে ক্ষণিকের জন্য শান্তভাবে বসিয়া থাকিবার আনন্দলাভ করিতে অরুণ তৃষিত। অরুণ কিন্তু ঠাট্টা করিয়া বলে, উমার 'ডেন্'।

উমা এই ক্ষুদ্র গৃহটি অধিকার করিয়াছে কেবলমাত্র পড়াশোনা করিবার জন্য নয়। গৃহের সম্মুখে চওড়া ঢাকা বারান্দাতেই বেশী ক্ষণ পড়াশোনা করিতে হয়। এই গৃহটি উমার শান্তির আশ্রয়, স্বাধীনতার প্রতীক, a room of one's own। এই গৃহে সে আপন খুশীমত বসিতে, শুইতে, ভাবিতে, পড়িতে পারে। পূবের জানালা খুলিয়া দিয়া বিছানায় এলাইয়া শুইয়া নানা আজগুবি চিন্তা করিতে পারে। এখানে সে হঠাৎ গান গাহিয়া ওঠে, মুখ গম্ভীর করিয়া বসে, আয়নায় নিজের মুখ যতক্ষণ ইচ্ছা দেখে, আপন মনে হাসিয়া ওঠে, চুলের বিনুনী খুলিয়া যেমন ইচ্ছা চুল বাঁধে, হাসি পাইলে হাসে, কান্না পাইলে মন খুলিয়া কাঁদিতে পারে, কেহ প্রশ্ন করিবে না, বারণ করিবে না, অযথা সহানুভূতি দেখাইয়া বা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে না তাহার কি হইয়াছে। যুবতী-চিত্তের নানা চাঞ্চল্য প্রকাশের এখানে কোন বাধা নাই। এখানে মা আসিয়া বলিতে পারেন না, কি ব'সে ব'সে ভাবছিস; শীলা গলা জড়াইয়া বলিতে পারে না, দিদি শরীর ভাল নেই বুঝি, মাথাটা টিপে দেব; চন্দ্রা আসিয়া জ্বালাতন করিতে পারে না, দিদি অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও। এ ছোট ঘরে সে স্বতন্ত্র, স্বাধীন।

মাঝে মাঝে উমার বড় শ্রান্তি বোধ হয়, চারি দিকের লোকজন বিরক্তিকর মনে হয়, নিজ পরিবারের জীবনধারা হইতে সে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চায়। কলেজ-জীবন আরম্ভ হইবার পর হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্যবোধ উগ্র হইয়াছে। সে এই ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে। অকারণে তাহার কান্না পায়। আবার কোনদিন তাহার মন অজানা খুশীতে ভরিয়া ওঠে, হৃদয় আনন্দে উপছিয়া পড়িতে চায়। তাহার কোন চিত্তচাঞ্চল্য বাহিরে প্রকাশ করিতে চায় না, ছোট ঘরখানি সে মোছে, ঝাড়ে, গান গাহিয়া ওঠে।

মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-গাড়ীর চাকার ঝনঝনানিতে বা গলিতে জল-দেওয়ার শব্দে উমার ঘুম ভাঙিয়া যায়। বাহিরে তখন অন্ধকার, জানালার গরাদের কাছে তারাগুলি দপ্‌দপ্‌ করে, আমগাছে কয়েকটি কাক ডাকিয়া ওঠে, পশ্চিম দেওয়ালে ঝুলান মিলের (Millet) গ্লিনারস্ (Gleaners) ছবিখানির উপর ভোরের আলো ঝকমক করে। উমা চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসে, বড় ঘড়ির কাঁটাগুলির দিকে তাকায়, চুলগুলি কুণ্ডলী পাকাইয়া বাঁধিয়া লয়, একটা চটি খুঁজিয়া পায় না, শুধু-পায়েই বারান্দায় বাহির হইয়া যায়।

সমস্ত বাড়ি নিদ্রিত, নিস্তব্ধ। পূর্ব্বাকাশে রাঙা আলো। কবিত্ব করিবার সময় নাই। লজিকের নোট মুখস্থ করিতে

হইবে। আই. এ. পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করিয়া স্কলারশিপ্ পাইতে হইবে। স্কলারশিপ পাইয়াছিল বলিয়াই ত সে পড়িতে পারিতেছে। বারান্দায় ও ছাদে ঘুরিয়া উমা লজিকের নোট মুখস্থ করে।

পাশের বাড়ির রান্নাঘরে আগুন পড়ে। উত্তরের জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। চাকর যদু একতলায় উনানে আগুন দেয়, ছাদ ধোঁয়াতে ভরিয়া ওঠে। দরজার পর্দ্দা ফেলিয়া উমা তাহার ঘরে প্রবেশ করে। এই যে পর্দ্দা পড়ে, সারাদিন আর পর্দ্দা ওঠে না; গভীর রাতে শোবার আগে সে পর্দ্দা তোলে।

লজিকের নোট মুখস্থ শেস করিয়া অঙ্কশাস্ত্র চর্চ্চার পূর্ব্বে একবার চা খাওয়ার তদারকে যাইতে হয়। স্বর্ণময়ীর শরীর ভাল নয়, সর্দ্দি হইয়াছে, ডাক্তার সকালে উঠিতে বারণ করিয়াছেন। রঘু ঠিকমত চা তৈরি করিতে পারে না। চন্দ্রাকে একবার ডাকিলে ওঠে না, ঠেলিয়া তুলিতে হয়। সকলে ঠিক সময় না উঠিলে, ঠিক সময়ে সকালে চা না খাইলে, সমস্ত দিনের কাজ বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। হেমবাবুর ঔষধ ও পথ্য সম্বন্ধে লীলার কিছুই মনে থাকে না, কিন্তু পিতাকে সেবা করিবার উৎসাহ তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উমাকে গিয়া ঔষধ খাওয়াইতে হয়। চা খাইবার টেবিলেও তাহার উপস্থিতি প্রয়োজন। হেমবাবুর বিশেষ ইচ্ছা সকল পুত্রকন্যা তাঁহার সহিত একসঙ্গে চা খায়। পিতার এ ইচ্ছা উমা যথাসম্ভব পালন করিতে চেষ্টা করে। তাড়াতাড়ি সকলকে চা খাওয়াইয়া রঘুকে বাজারে পাঠাইতে হয়।

তার পর উমা নিজ ঘরে আসিয়া অঙ্কশাস্ত্রে মনোনিবেশ করে। নির্ম্মল নীলাকাশ প্রভাতের আলোয় ভরিয়া ওঠে, আমগাছের পাতাগুলি ঝিক্‌মিক্ করে, ছোট ঘর তাতিয়া ওঠে। ঘড়ির কাঁটাগুলি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলে।

সকালে বেশী ক্ষণ পড়া হয় না। কলেজের গাড়ী দশটার আগেই আসে। তাড়াতাড়ি স্নান করিতে যাইতে হয়। সকল রান্না হইয়া ওঠে না। উমা অতি অল্প আহার করে। এই অল্পাহার লইয়া স্বর্ণময়ী প্রথমে বকাবকি করিতেন, এখন হাল চাড়িয়া দিয়াছেন। চন্দ্রা কিন্তু প্রতিবাদ করিতে ভোলে না, দিদি আজ কিছু খেলে না মা। হেমবাবু বলেন, মা, একটু দুধ খেয়ে যা। উমা বলে, দুধ খেলে আমার গা ঘিন-ঘিন করে বাবা, আমি দই দিয়ে খাচ্ছি। কলেজের গাড়ী অনেক বাড়ি ঘুরিয়া যায়, যেন কলিকাতা শহরে চর্কিপাক খায়, বেশী খাইয়া গেলে গাড়ীতে উমার গা-বমি করে।

কলেজের ঘণ্টাগুলিতে উমার যেন নিশ্বাস ফেলিবার সময় থাকে না। লেকচার শোনা, নোট টোকা, লাইব্রেরীতে পুস্তকের সন্ধান করা, ছাত্রী-জীবনের কঠোর জ্ঞান-সাধনা। মাঝে মাঝে সে হাঁপাইয়া ওঠে, ক্লান্তি লাগে। ছুটি পাইলে উমা অমলাদিদির ঘরে চলিয়া যায়। অমলাদিদিকে তাহার বড় ভাল লাগে।

কলিকাতার বহু পল্লী প্রদক্ষিণ করিয়া অপরাহ্নে যখন সে বাড়ি ফেরে, অতি শ্রান্ত, প্রায়ই মাথা ধরে। কিন্তু খাইতে ইচ্ছা করে না। তাড়াতাড়ি চা খাইয়া সে নিজের ছোট ঘরে আশ্রয় লয়, বিছানায় এলাইয়া শুইয়া পড়ে। কাহারও সহিত কথা কহিতে বিরক্তি লাগে। মাথা দপ দপ করে। প্রফেসারের বক্তৃতা, অমলাদিদির গল্প-হাস্য, মায়ের বকুনী, নানা কথা মাথায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, জানালা দিয়া তারা দেখা যায়। ধীরে উমার মাথাধরা সারিয়া যায়, শরীর খুব হাল্কা বোধ হয়, খিদেও পায়। পর্দ্দা সরাইয়া সে দেখে, অরুণ ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কি না।

সন্ধ্যার সময় অরুণ প্রায় প্রতিদিনই আসে। গত অসুখের পর হইতে সে যেমন রোগা তেমনি চঞ্চল হইয়াছে। পূর্ব্বে সে হেমবাবু বা স্বর্ণময়ীর সহিত বহু ক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া গল্প করিত। এখন সে চঞ্চলভাবে এঘর-ওঘর ঘুরিয়া বেড়ায়, অধিক ক্ষণ থাকে না, মাঝে মাঝে ছাদে ঘুরিয়া যায়, দেখিয়া যায় উমা তাহার 'ডেন্' হইতে বাহির হইল কি না। বেচারা অরুণ!

ছাদে অরুণের পদশব্দ শুনিলেই উমা ঘর হইতে বাহির হয়।

—হালো অরুণ, গুড্ ইভনিং।

অরুণ ম্লান হাসে। উমার এই ক্লান্তকরুণ মুখখানি দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত দুলিয়া ওঠে। সে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কি বলে, উমা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

—কি, চা খাবে?

উমার সুন্দর মুখের দিকে অরুণ চায়, এই অনুপম মুখে কি যাদুমন্ত্র আছে।

অরুণ আবেগের সহিত উত্তর দেয়, নিশ্চয় খাব, তুমি খেয়েছ?

—একবার খেয়েছি, তবে তোমার সঙ্গে আর একবার খেতে আপত্তি নেই।

চায়ের সঙ্গে নানা খাবার আসে। উমাকেও খাইতে হয়। উমা বলে, আশ্চর্য্যি, তোমার সঙ্গে চা খেতে বসলে, আমার ভয়ানক খিদে পায়।

—অর্থাৎ সন্ধ্যেবেলায় তোমার খিদে পায়। খাও বেশী ক'রে।

—হাঁ, এখন বেশী ক'রে খেলে রাতে খেতে পারব না, তখন মা বকাবকি করবেন।

—তা এখনই রাতের খাবার খেলে পার।

—তা আর হচ্ছে কই।

সন্ধ্যাটি অরুণের নিকট বড় মধুর মনে হয়।

গ্রীষ্মের রাতে ছোট ঘরে পড়া অসম্ভব। বাহিরের বারান্দায় উমা পড়ার বন্দোবস্ত করে। অরুণ নিঃশব্দে বিদায় লইয়া চলিয়া যায়। অরুণ যে কখন নীরবে চলিয়া যায় উমা বুঝিতেও পারে না।

কোনদিন উমা বলে, অরুণ, ব'স, আজ পড়তে মন লাগছে না, একটু গল্প করা যাক।

—না বাপু, শেষকালে স্কলারশিপ কম টাকার হ'লে আমাকে দোষ দেবে।

—খুব ঠাট্টা যে। তোমার শরীর কেমন?

—কেন বেশ ভালই ত।

অরুণ বেশী ক্ষণ বসে না। সে যেন স্থির হইয়া বেশী ক্ষণ বসিতে পারে না; তাহার দেহে মনে এ কি চাঞ্চল্য। তাহার সহজ স্বাভাবিক শান্তভাব কোথায় গেল?

অরুণ নীরবে চলিয়া যায়। তাহার জন্য উমার বুক কেমন টন্‌টন্ করিয়া ওঠে। কেন অরুণ এত বিমর্ষ? তাহার কিসের বেদনা, অসুখের পর তাহার চোখ বড় কালো দেখায়। ওই গভীর কালো টানা চোখ দুইটিতে কোন অজানা জীবনের কাতরতা ভরা।

বেশী ক্ষণ এ-সব ভাবিলে চলে না। ইংরেজীর নোট মুখস্থ করিতে হয়।

খাওয়ার পর উমা ঘরে পড়িতে বসে। ভয়ানক ঘুম পায়। চেয়ারে সোজা হইয়া বসে। চোখে ঘুম ভরিয়া আসে।

কিন্তু মজা এই, বিছানাতে শুইলে ঘুম কোথায় চলিয়া যায়। কত অসম্ভব আশা, অদ্ভুত কল্পনা, আজগুবি চিন্তা, বাতাসে পর্দ্দাটা কাঁপে, জানালার গরাদের মধ্য দিয়া দেখা যায় সপ্তমীর চন্দ্র শাণিত রক্ত তরবারির মত।

উমা ভাবে, বড় হইলে সে কি করিবে; বি-এ পর্য্যন্ত ত পড়িবে, তার পর? কোন স্বাধীন জীবিকা অথবা সেই সনাতন বিবাহ? হয়ত বিবাহ করিবে, কিন্তু মায়ের মত সমস্ত দিন ডাক্তারি করিবে না। বিবাহ করিবে কিনা, পরে ঠিক করিলেই হইবে। এখন সে কিছুতেই বিবাহ করিতেছে না। One must see life. দেশভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করে। সে যদি অক্সফোর্ডে বা প্যারিসে গিয়া পড়িতে পারিত! সে ইউরোপ দেখিবে, আমেরিকা দেখিবে, সাউথ সি'র দ্বীপগুলিতে ঘুরিবে। রুপার্ট ব্রুকের কবিতাটি বড় সুন্দর। যদি কোন বড় য়্যাভিয়েটারের সহিত তাহার বিবাহ হয়, এরোপ্লেনে করিয়া তাঁহারা দু'জনে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে। সে কি মাথামুণ্ড ভাবিতেছে। ঘুম যে চোখে আসে না।

কিন্তু অরুণের মধ্যে কি একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

উমা ভাবে অরুণ তাহাকে ভালবাসে। অরুণকে তাহারও ভাল লাগে, কিন্তু অরুণকে তাহার প্রেমিকরূপে, তাহার স্বামীরূপে কল্পনা করিতে পারে না। তাহার কৈশোর যৌবনের দিনগুলির সুখ-দুঃখের সহিত অরুণ বড় বেশী জড়াইয়া গিয়াছে। অরুণ তাহার বন্ধু। 'কমরেড' কথাটি বেশ। রাশিয়ায় এখন সকলে কমরেড বলে। গর্কীর "মাদার" উপন্যাসখানি অরুণকে কাল ফেরৎ দিতে হইবে।

চোখে ঘুম আসে না। উমা ধীরে উঠিয়া পর্দ্দা তুলিয়া অন্ধকার নির্জ্জন ছাদে আসিয়া দাঁড়ায়। একটা অব্যক্ত বেদনা বুক ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। অরুণের অশান্ত হৃদয়াবেগ কি তাহারও হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল! তাহার বুক দুলিয়া ওঠে। রাত্রির তারাভরা অনন্ত আকাশ রিমঝিম করে। অরুণের হৃদয়ের বেদনা সে কিছু বুঝিতে পারে কি?

স্বপ্নও মাঝে মাঝে সত্য হইয়া ওঠে, কিন্তু পূর্ণরূপে সত্য হয় না, ইহাই জীবনের ট্র্যাজেডি।

ছুটির দিন। আতপ্ত দিনের শেষে দক্ষিণ-সমীর-স্নিগ্ধ সন্ধ্যা রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বাকাশ সিঁদুর-রঙের মেঘে ভরা।

বাড়িটি নিস্তব্ধ। উমার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় অরুণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

উমা ঘরের ভিতর হইতে স্নিগ্ধস্বরে ডাকিল—অরুণ!

—এই যে আমি, বারান্দায়।

—এস, ঘরে এস।

—যাব?

—হাঁ, এস ঘরের ভেতর।

খয়ের-রঙের পর্দ্দার দিকে অরুণ চাহিয়া রহিল। ওই পর্দ্দার আড়ালে উমার ছোট ঘরটি দেখা, যেন তাহার স্বপ্ন। আজ উমার আহ্বান শুনিয়া সে কম্পিত পদে অগ্রসর হইল।

—কই এস।

ধীরে পর্দ্দা তুলিয়া অরুণ ছোট ঘরটিতে প্রবেশ করিল।

—অসুখ করেছে নাকি?

—অসুখ করতে যাবে কেন? ব'স চেয়ারটায়। ঘরে খুব বেশী স্থান নেই, দেখতেই পাচ্ছ।

—বা, কি সুন্দর ঘর।

—বল, স্বপ্নের মত, ওইটি ত তোমার ফেবারিট্ উপমা।

—সত্যি, এই রকম বেশ ছোট সাজান ঘর আমার বড় ভাল লাগে।

—বা, দাঁড়িয়ে রইলে যে, ব'স। মিলের ছবিখানা তুমিই ত দিয়েছিলে। এর কাচটা ফেটে গেছে।

—কাল দিও, সারিয়ে দেব।

—কি এত হাঁ ক'রে দেখছ। লক্ষ্মীটি, আমার বইগুলি ঘেঁটো না, খুলো না খাতা। ওই জন্যেই ত তোমায় ঘরে আসতে দিই না। বই-ঘাঁটা তোমার রোগ।

—আচ্ছা, এই চুপ করে বসলুম।

—চুপ ক'রে বসতে কে বলছে।

জীবনের গভীর কাতরতা তৃষ্ণায় ভরা অরুণের কালো চোখ দুইটির দিকে চাহিয়া উমার কেমন ভয় হইল।

স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বলিল, তোমার কি হয়েছে বল ত অরুণ, কি একটা তোমার হয়েছে।

রক্তিম মুখে অরুণ বলিল, কি হবে, কিছুই না, শরীরটা তেমন ভাল নাই।

ব্যগ্রকণ্ঠে উমা বলিল, না, আরও কিছু, আমি বুঝতে পারছি।

অরুণ ধীরে বলিল, যদি বুঝতে পেরে থাক, তবে বলার আর দরকার কি?

—কি যে কবিত্ব করো?

—কবির কাছে কবিত্ব তার সত্যিকার জীবন নয় কি?

অরুণের রক্তহীন মুখের দিকে উমা ছলছল চোখে চাহিয়া রহিল। মুখে কোন কথা আসিল না।

দুই জনে স্তব্ধ বসিয়া রহিল।

অরুণ ভাবিতে লাগিল, উমা কি শুনিতে চায়? উমা কি শুনিতে চায়, অরুণ বলিবে, উমা তোমাকে আমি ভালবাসি, আমার সমস্ত আত্মা দিয়া তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু এ কথা ত উমা জানে, এ কথা ত উমা বুঝিতে পারিতেছে।

অরুণ কিছু বলিতে পারিল না। এ তাহার ভীরুতা, তাহার লজ্জা নয়। অরুণ ভাবিতেছিল, 'তোমাকে ভালবাসি' এই দুইটি কথায় জীবনের গভীরতম হৃদয়াবেগকে কতটুকু প্রকাশ করা যায়? যাহাকে ভালবাসি, সে-কথা নিজ অন্তরে সে যদি না অনুভব করিয়া থাকে তবে কথা দিয়া তাহাকে কি বুঝাইব! কথা ত অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করে না, না-বোঝার আড়াল সৃষ্টি করে।

আর উমা কি ভাবিতেছিল তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। শুধু বুকে একটা অজানা বেদনা অনুভব করিতেছিল, হৃৎপিণ্ডের রক্তচলাচলের ছন্দ যেন বার-বার কাটিয়া যাইতেছে।

বিহ্বলমুখে অরুণের দিকে চাহিয়া উমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

—চল ছাদে, ঘরে বড় গরম।

—তোমার ঘরটি বড় ভাল লাগল। মাঝে মাঝে আসতে ডেকো।

সুসময় বহিয়া গেল। আমগাছের আড়ালে চতুর্দ্দশীর চন্দ্র উঠিল। বাতাসে কালো পর্দ্দা কাঁপিতে লাগিল।

অরুণ চুপ করিয়া রহিল। কোন কথা বলা হইল না।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

বিদেশী শব্দের বাংলা বানান

শ্রীবীরেশ্বর সেন

শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে "পারিভাষিক শব্দের বানান" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিলাম যে বাংলা পরিভাষা সঙ্কলনের নিমিত্ত যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা বিবৃত অ স্থলে আ লেখার পক্ষপাতী নহেন। অতএব তাঁহাদের মতে ইংরেজী upper শব্দ বাংলায় 'অপার' রূপে লেখা উচিত। কিন্তু আমার বোধ হয় যে তাঁহারা এইটা ভাবিয়া দেখেন নাই যে বাংলায় সংস্কৃত অ-কারের উচ্চারণ অর্থাৎ far এবং father এর a-র উচ্চারণ প্রায়ই নাই। দৃষ্টান্ত—আমি, আমার, তোমার, তাহার প্রভৃতি সর্ব্বনামগুলির একটারও অ-কার দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হয় না। মা, তাল, কাক প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের অ-কার আমরা দীর্ঘরূপে উচ্চারণ করি কিন্তু মামা, কাকা, বাবা প্রভৃতি শব্দের অ-কার ও সর্ব্বনামগুলির অ-কার বিবৃত অ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহারা এ সকল কথা পূর্ব্বে ভাবেন নাই তাঁহারা হয়ত আমার এই মত শুনিয়া সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিবেন। তাঁহাদিগকে আমি প্রথম সর্ব্বনামটার অ-কারের মাত্রা হ্রস্ব কি দীর্ঘ পরীক্ষা করিতে বলি। যদি বাংলা ভাষায় সংস্কৃত মালিনী ছন্দে একটা কবিতা লেখা যায় এবং তাহার প্রথম শব্দটা যদি 'আমি' থাকে তাহা হইলে পড়িবার সময় কিছুমাত্র ছন্দঃপতন অনুভূত হইবে না। যথা—আমি যদি জলমধ্যে লোকযাত্রা বিসর্জ্জি। ইহাতে কিছুমাত্র ছন্দের ব্যাঘাত হয় না, কেননা 'আমি যদি জলমধ্যে' পড়িতেও যত ক্ষণ 'তুমি যদি জলমধ্যে' পড়িতেও তত ক্ষণ লাগে। সুতরাং তুমির উ-কারটার যেমন হ্রস্ব, আমির অ-কারটাও তেমনি হ্রস্ব। অর্থাৎ এই অ-কারটা বিবৃত অ কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ সকল স্থলেই যখন বাংলায় আ লেখা হয় তখন বাংলায় upper শব্দ 'আপার' রূপে লেখা উচিত। Upper শব্দের প্রথম স্বর এবং 'আমার' শব্দের দুইটা স্বরে যে কোনরূপ প্রভেদ আছে তাহা আমার বোধ হয় না। আমার এই যুক্তি অনুসারে club, sir বাংলায় লিখিতে হইলে ক্লাব ও সার্ লেখা উচিত। হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় অপর্, ক্লব ও সর্ লেখা উচিত, কেননা সেই সেই ভাষায় অ-কারের প্রকৃত উচ্চারণই বিবৃত।

আর ইয়র্ক, লণ্ডন প্রভৃতি শব্দে আকার দেওয়া উচিত নহে। হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় র-কারের পর অনর্থক দ্বিত্ব নাই। কিন্তু আমাদের কর্ত্তা ও কর্তায় উচ্চারণে প্রভেদ আছে। প্রথমটায় আমরা দুইটা 'ত' ই উচ্চারণ করি। র-কারের পরস্থিত বর্ণ মাত্রই আমরা দ্বিত্ব অথবা অভ্যস্তরূপে উচ্চারণ করি। তবে যে তর্ক, মূর্খ, গর্ব, দুর্ঘট, নির্ঝর, অর্পণ, গর্ভ প্রভৃতি শব্দে র-কারের পরবর্ত্তী বর্ণগুলিকে অভ্যস্তরূপে উচ্চারণ করিলেও সেগুলি দ্বিত্ব করিয়া লিখি না, তাহার কারণ এই যে তাহাতে আয়াস ও সময় ব্যয়িত হয়। কিন্তু কর্ত্ত, সূর্য্য প্রভৃতি লিখিতে তেমন আয়াস এবং সময় লাগে না। পূর্ব্বকালের বাংলা ছাপার বইতে 'র্ক' ও গর্ভ দেখিয়াছি।

বিদেশী হসন্ত শব্দের শেষে হস্ চিহ্ন দেওয়াই ভাল বোধ হয়, কেননা না দিলে স্বরান্ত শব্দও ব্যঞ্জনান্তরূপে অনভিজ্ঞ লোক পড়িতে পারে। Bye-law বাংলায় বাইল্ বলিয়া লিখিত হয়। আমি আসামের কোন কোন লোককে বাংলা বা আসামীতে কথা বলিবার সময় বাইল্ বলিতে শুনিয়াছি। Bernard Shaw বাংলায় লিখিলে বার্ণার্ডশ্ পড়িতে পারে এই জন্য বিদেশী শব্দের যেখানে হসন্ত সেইখানেই হস্ চিহ্ন দেওয়া উচিত।

মাকড়সা শব্দটি বালকেরা কখনও কখনও মাকড়স', কখনও কখনও মাকড় স' পড়িয়া থাকে। বাংলা অক্ষর দিয়া বাংলা সাধু ভাষা এবং সংস্কৃত প্রায় ঠিক্ ঠিক্ই লেখা যায়, কিন্তু বাংলা কথিত ভাষা সম্পূর্ণরূপে লেখা যায় না। অবশ্য যখন এইরূপ তখন যে বিদেশী কোন ভাষা বাংলা অক্ষরে ভাল করিয়া লিখিতে পারা যাইবে এরূপ আশা হয় না। গারো ভাষা পূর্ব্বে বাংলা অক্ষরে লিখিত হইত। এখন তাহা হয় কি না জানি না। খাসিয়া ভাষার জন্য প্রথমে পাদ্রীরা বাংলা অক্ষরই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তাহাতে সুবিধা হইল না দেখিয়া পরে তৎস্থলে রোমান অক্ষর গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু আশা করা যায় যে আমাদের শুভদিন নিকট—আর অধিক দিন আমাদিগকে বাংলা অক্ষর লইয়া দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে না। বিদ্বত্তম কয়েক ব্যক্তি কিছুদিন হইতে এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে আমাদের বাংলা অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া রোমান অক্ষরই গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইলে কেবল যে আমাদের বানানের উন্নতি ও সংশোধন হইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার এবং আমাদের জাতিরও উন্নতি হইবে। শিশু বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য বিদেশে যাইবে ইহা শুনিয়া মাতার মনে যেমন প্রথমে একটা আঘাত লাগে, অনেক বাঙালীরও সেইরূপ বাংলা অক্ষর পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাবে স্বদেশ-প্রেমে আঘাত লাগিবে। কিন্তু সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে দেশ যেমন আছে তেমনই থাকুক—এরূপ ইচ্ছা বাস্তবিক স্বদেশপ্রেম নহে, কিন্তু দেশ যেমন আছে তাহা অপেক্ষা ভাল হউক এরূপ ইচ্ছাই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম। বর্ত্তমান সময়ে গাজী কামালপাশা অপেক্ষা কেহই অধিকতর স্বদেশপ্রেমিক নহেন। সেই জন্য তিনি আতাতুর্ক নাম পাইয়াছেন। ইহার অর্থ তুর্কদিগের পিতা। তিনি সম্প্রতি স্বদেশে তুর্কী বর্ণমালার পরিবর্ত্তে রোমান বর্ণমালা প্রচলিত করিয়াছেন। তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা সর্ব্বপ্রকার শুভ সংস্কার গ্রহণ করিব, কবে আমাদের তেমন সুবুদ্ধি হইবে।

পুনশ্চ। অশুদ্ধ শব্দের আরও দুইটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

'সত্যকার' শব্দটা যে অশুদ্ধ তাহা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু আমরা 'প্রকৃত', 'বাস্তবিক', 'সত্যসত্য' প্রভৃতি শব্দ থাকিতে নারীভাষা হইতে 'সত্যকার' এই অশুদ্ধ শব্দটা ব্যবহার করিতেছি।

সংস্কৃত 'ঘর্ম্ম' এবং তাহার অপভ্রংশ 'ঘাম' শব্দের প্রকৃত অর্থ তাপ। হিন্দীতেও তাপকে ঘামই বলিয়া থাকে। ঘর্ম্ম শব্দটা যে কেবল সংস্কৃতের সম্পত্তি তাহা নহে; ইহা ইংরেজীতে warm, পার্শী, হিন্দী এবং বাংলায় গরম, গ্রীকে থার্ম্‌স্ হইয়াছে, কিন্তু বাংলায় আমরা ঘর্ম্ম

এবং ঘাম দুইটা শব্দই স্বেদ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। স্বয়ং কালিদাসও বোধ হয় এই স্বেদ অর্থে মেঘদূতের ১৬১ শ্লোকে ঘর্ম্ম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যদিও সকল টীকাকারই সেখানে তাপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু তাপ অর্থ অপেক্ষা স্বেদ অর্থ তথায় অধিক সঙ্গত বলিয়া অন্তত আমার বোধ হয়।

বঙ্গের পল্লীগ্রাম ও কুটীরশিল্প

শ্রীসত্যভূষণ দত্ত

বিগত আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় "বঙ্গের পল্লীগ্রাম ও কুটীরশিল্প" শীর্ষক মন্তব্যের শেষাংশে কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্যাদির কাটতির সুব্যবস্থা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতি মূল্যবান। সরকারী ও বে-সরকারী যাঁহারা বঙ্গের কুটীর-শিল্পের উন্নতিকল্পে ব্রত আছেন বা হইতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রথমেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পল্লীসমূহের লুপ্ত শিল্প উদ্ধার করতঃ ঘরে ঘরে কতকগুলি শিল্পী তৈয়ার করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। শিল্প-বিভাগ হইতে পল্লীগ্রামসমূহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা প্রকার কুটীরশিল্প শিক্ষা দিবার জন্ম উপযুক্ত শিল্পী দ্বারা গঠিত কয়েকটি দল (Demonstration party) আছে। তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশমত যখন যেস্থানে আবশ্যক সেখানে গিয়া হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের জিনিষ বিক্রয়ের ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া দিতে পারেন না। এ-বিষয়ে শিল্প-বিভাগেরও কোন ব্যবস্থা নাই। তজ্জন্যই অনেক স্থলে দেখা যায় যে মূলধনবিহীন দরিদ্র শিল্পীর সামান্য মূলধন তাহার নির্ম্মিত অবিক্রীত জিনিষে আটকাইয়া পড়িলে ভগ্নমনোরথ হইয়া সে তাহার যন্ত্রপাতি হয় বিক্রয় করিয়া ফেলে নতুবা তাহা ঘরের কড়ি-বরগায় স্থান পায়। সামান্য জিনিষ লইয়া পল্লী হইতে শহরে গিয়া ফেরী করিয়া বিক্রয় করাও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। ইহা আমার কাল্পনিক কথা নহে, সতর বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ খাঁটি সত্য কথা।

এখানে কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা ভাল। ১৯২১ সালে বাংলার অধিকাংশ স্থলেই চরকায় সূতা কাটার প্রচলন দেখা গিয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে একমাত্র "অভয় আশ্রম," "খাদি প্রতিষ্ঠান" বা আরও কয়েকটি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান ভিন্ন, প্রায় সব জায়গার চরকাই অচল হইয়া বাড়ির আনাচে-কানাচে স্থান লাভ করিয়াছিল। অভয় আশ্রমের বিশিষ্ট কর্ম্মীদের মুখে শুনিয়াছি এক সময় তাঁহাদের বরকামতা-কেন্দ্রে এত সূতা কাটা হইত যে প্রতি সপ্তাহে কাটুনীদের বিস্তর টাকা নগদ দিতে হইত। বহু পরিবার একমাত্র সূতা কাটিয়াই কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; যাহারা বরাবর সূতা কাটিত তাহারা বরাবরই নগদ পয়সা পাইত।

আমার কতিপয় উৎসাহী প্রাক্তন ছাত্র কুটীরশিল্পের কাজে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া সাধারণ ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু বহু দরিদ্র শিক্ষার্থী শুধু জিনিষ বিক্রয় ও মূলধনের অভাবে তেমন ভাবে কাজ করিতে পারিতেছে না। আমি বছরের পর বছর ধরিয়া এসব পল্লীশিল্পীদের জিনিষ প্রচার করিবার ও বাজারে চালাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। প্রতি বৎসর বাংলার নানা স্থানের প্রদর্শনী ও নানা শহরে জিনিষ ফেরী করিয়া জিনিষ বিক্রয়ের জন্য কর্ম্মিগণকে পাঠাইয়া থাকি। তদ্ভিন্ন আমি ১৯৩৪ সালের মাসে কলিকাতা গিয়া বেঙ্গল ইমিউনিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া "বেঙ্গল ষ্টোর্স"কে আমাদের প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয়ের জন্য (বেত-বাঁশের বিভাগের) এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সেখানেও আশানুরূপ কিছুই বিক্রয় হইতেছে না।

শুধু জিনিষ বিক্রয়ের ব্যবস্থার দরুণই আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কতকগুলি জিনিষসহ সরকারী শিল্প-বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনাক্রমে জিনিষগুলি সেখানে রাখিয়া আসি। তৎপরে শিল্পবিভাগের মন্ত্রী মাননীয় নবাব শ্রীযুক্ত কে. জি. এম. ফারুকী মহোদয়কেও এ প্রস্তাব দিলে তিনিও সাগ্রহে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বলেন সরকার হইতে ইহার কোন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কিনা তিনি দেখিবেন।

ভারত-সরকারের মঞ্জুরী এক কোটী হইতে বাংলাকে যে উনিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিবার বরাদ্দ হইয়াছে, তাহা হইতে কতক টাকা পল্লী-কর্ম্মীদের দাদন দিয়া তাহাদের জিনিষ নিয়মিত বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কিনা তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভারত-পল্লী-সঙ্ঘের বাংলার ভারপ্রাপ্ত ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কয়েক জন কর্ম্মী ত্রিপুরা সেন্ট্রাল কমিটির অধীনে এ অঞ্চলে একটি কেন্দ্র করিয়া পাটের সূতা কাটা ও বস্তা ছালা ইত্যাদি প্রস্তুত করাইয়া লোককে সাহায্য করিতেছেন। মাসে প্রায় পাঁচ শত ছোট-বড় ছালা প্রস্তুত হইতেছে। ছালাগুলি বিক্রয়ার্থ সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতা চালান হইতেছে এবং কর্ম্মিগণও প্রত্যেক জিনিষ প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নগদ পয়সা পাইতেছে। ইহাতে কর্ম্মীর সংখ্যাও বাড়িবে এবং উৎসাহ উদ্যম ম্লান হইবে না।

মোট কথা জিনিষ বিক্রয়ের ব্যবস্থা না হইলে কুটীরশিল্পের উন্নতি 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'।

কুণ্ডা শিল্প-বিদ্যালয়,
ত্রিপুরা।

"শব্দগত স্পর্শদোষ"

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

বীরেশ্বর বাবু ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ব'লেছেন, "এইরূপ উলটপালট ...রচনা করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। অর্থাৎ তাঁর মতে যে বিপর্য্যস্ত শব্দ বক্তার মুখ থেকে অকস্মাৎ বেরোয় সেটা Spoonerism এর নিদর্শন নয়, যে-শব্দ বক্তা অপরের হাস্যোদ্রেক করবার জন্যে স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে রচনা করেন তা-ই কেবল Spoonerismএর অন্তর্গত। কিন্তু Oxford Dictionaryতে Spoonerism শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে :—An *accidental* transposition of the initial sounds or other parts of two or more words. এই অর্থ মেনে নিলে "কাপর পড়" ও "সিঙারা কচুড়ি"কেও Spoonerismএর অন্তর্গতই ব'লতে হবে। যিনি পৃথক্ ভাবে র ও ড় এই দুটি বর্ণই উচ্চারণ করতে পারেন, তিনি যদি হঠাৎ "ক্ষীড়ের পেরা" ব'লে বসেন তা হ'লে তাকে "accidental transposition" ছাড়া আর কি বলব? উইয়ের স্থানে

দুই এ শ্রেণীর ভুল নয়। শাব্দিকেরা একে prothosis বা আদ্যাগম বলেন।

বীরেশ্বর বাবু ব'লতে চেয়েছেন স্বরভক্তিহেতু 'মনোর্থ' মনোরথ হ'য়েছে। সে কথা শাস্ত্রী-মহাশয়ের পুনরুক্তি মাত্র। মনোরথ যে বিপ্রকৃষ্ট শব্দ তা আমি কোথাও অস্বীকার করি নি। আমি ব'লতে চাই--স্বরভক্তি লৌকিক সংস্কৃতে বড় একটা প্রচলিত ছিল না। থাক্‌লে শাস্ত্রী-মহাশয় দরশন তরপণ শব্দের নজির না দিয়ে নিশ্চয় সংস্কৃত থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রে দিতেন। লৌকিক সংস্কৃতের বৈয়াকরণরা স্বরভক্তিকে ব্যাকরণের কোন বিধান ব'লেই মানতেন না। তা হ'লে আরও অনেক বিপ্রকৃষ্ট সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যেত। প্রাকৃত থেকে দু-একটা এলে তাদেরও সংস্কার ক'রে নেওয়া হ'ত। মনোরথ শব্দটা তা হ'লে সংস্কৃতে থাকল কেমন ক'রে? এর কারণ, (অ)রথের রথ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ গতি এবং বেগ মন ও রথের সমান ধর্ম্ম হওয়ায় রথ মনের পাশে এমন ভাবে ব'সে গেল যে, সে যে (অ)রথের রথ সংস্কৃত বৈয়াকরণরা তা ঠাহর করতে পারলেন না। অর্থের স্থানে রথ বসেছে ধ্বনিসাম্যের ফলে। ভাব-সাম্যও কিছু আছে। কিন্তু অর্থ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে সে অরথ হয় নি।

বীরেশ্বর বাবু স্পর্শদোষের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন তা সম্পূর্ণ নয়। তিনি ব'লেছেন, "দুইটা শব্দে ধ্বনিগত...বাস্তবিক স্পর্শদোষ হয়।" স্পর্শদোষের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক। স্পর্শদোষ শুধু ধ্বনিসাম্যের ফলে নয় অর্থসাম্যের ফলেও হয়; যেমন, blot = blemish + spot, blunt = blind + stunt, etc.—Jesperson কৃত Language গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। "একটা বলিতে গিয়া আর একটা বলিয়া ফেলিলে" স্পর্শদোষ হয়, আবার দুই শব্দের সংমিশ্রণে তৃতীয় একটা রূপের উৎপত্তি হ'লেও স্পর্শদোষ হবে। উল্লিখিত শব্দগুলিই তার প্রমাণ।

'গেতে' শব্দে Spoonerism আছে এমন কথা আমি বলি নি। এস্থলে সম্ভবত বীরেশ্বর বাবুর একটু অনবধানতা ঘটেছে। তবে স্পর্শদোষ অবশ্য হয়েছে খেতে যেতে প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে আকৃতিগত সাম্যের ফলে।

'নিয়াছি' রূপটা যে ভুল একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায়। বাংলা ভাষায় 'নিয়াছি' ব'লে কোন রূপই নেই, না সাধুভাষায়, না চলিত ভাষায়। চলিত ধাতুর সঙ্গে সাধু ভাষার বিভক্তি যোগ করার ফলে এই বিকৃত শব্দটি জন্মলাভ করেছে।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীযুক্তা মৃন্ময়ী রায় লণ্ডনের সুবিখ্যাত মারিয়া গ্রে ট্রেনিং কলেজ হইতে কিণ্ডারগার্টেন টিচার সার্টিফিকেট লাভ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে শিশুবিদ্যালয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে বিদেশে গিয়াছিলেন এবং লণ্ডনে শিক্ষাসমাপ্তির পর স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ভিয়েনা, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি স্থানে শিশুশিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্তা রায় তাঁহার পরলোকগত পুত্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে, বিশেষ করিয়া মাতৃহীন শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা মৃন্ময়ী রায়

শ্রীযুক্তা কোমলতা দত্ত

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ও পাঠ্য গ্রন্থাবলী নির্দ্দেশ করিবার জন্য এক-একটি বিভাগীয় বোর্ড অব ষ্টডিজ্ থাকে। সেই সমিতিগুলির কয়েক জন সদস্য ও এক্-এক জন মুখ্য সদস্য (head) থাকেন। তিন জন মহিলা নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, ভূগোল, ও সংগীত বিভাগের বোর্ডের মুখ্য সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। সংগীত-বিভাগের নেত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন শ্রীমতী কোমলতা দত্ত। ইংলণ্ডেও ইঁহার সংগীতজ্ঞানের খ্যাতি আছে। ইনি সর্ আলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা, সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও সর্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের দৌহিত্রী।

শ্রীমতী নাথীবাঈ দামোদর ঠাকরসী ভারত-মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সম্মিলন

দ্বিতীয় সারিতে উপবিষ্ট বাম হইতে দক্ষিণে :—

(১) শ্রীযুক্তা সুশীলাবাঈ আপাবেল (২) শ্রীমতী কৃষ্ণরাজ এম্ ডি. ঠাকরসী (৩) ডক্টর শ্রীমতী ইরাবতী কার্ভে, এম্-এ, পিএইচ-ডি. রেজিষ্ট্রার (৪) শ্রীযুক্ত এস্ এস্ পাটকর, চ্যান্সেলর (৫) শ্রীযুক্ত পাটকর (৬) মাননীয়া লেডী ব্র্যাবোর্ণ (৭) লেডী প্রেমলীলা বিঠলদাস ঠাকরসী (৮) শ্রীমতী আনন্দীবাঈ কার্ভে (৯) অধ্যাপক ডি কে. কার্ভে, ভাইস্-চ্যান্সেলর (১০) ডক্টর শ্রীমতী কমলাবাঈ দেশপাণ্ডে, বি-এ., পিএইচ-ডি, প্রিন্সিপাল

শ্রীযুক্তা শোভা বসু

কানপুর বালিকা-বিদ্যালয় ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা শোভা বসু যুক্তপ্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা-সম্মিলনীর গত চতুর্দ্দশ অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রীর কার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্তা বসু উক্ত সম্মিলনীর সহকারী সভানেত্রী এবং তাঁহারই উদ্যোগে উহার মহিলা-বিভাগ সুগঠিত হইয়াছে। বঙ্গদেশ, বিহার ও আসামের বহু বালিকা-বিদ্যালয়ে তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি বর্ত্তমানে নিখিল-ভারত শিক্ষায়তন সংসদের (All India Federation of Educational Associations) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য আছেন।

শ্রীযুক্তা সুজাতা রায়

শ্রীমতী সুজাতা রায় এই বৎসর কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি গৌহাটীর অধ্যাপক পি-সি রায়ের কন্যা। বি-এ পরীক্ষাতেও ইনি ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স লইয়া প্রথম শ্রেণীতে সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিলেন।
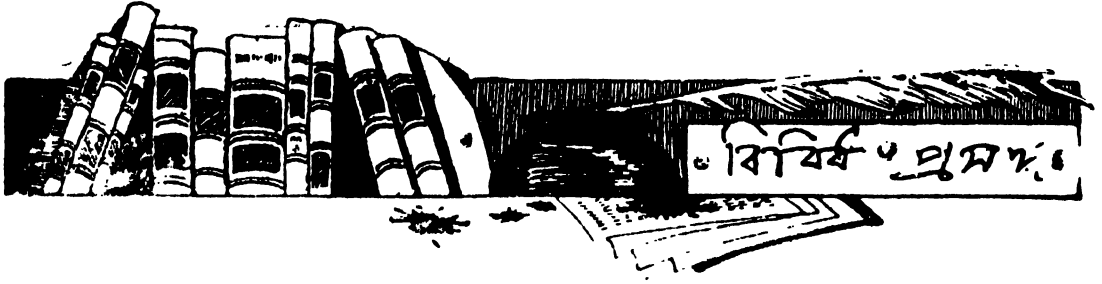
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভ্রান্তিজনক উক্তি

ভারতীয়দের বিবেচনায় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্তব্য ন্যায়পরায়ণতা ও মানবিকতার সহিত করেন না, অথচ যাহা করেন তৎসম্বন্ধে এমন সব কথা বলেন যাহাতে সভ্যজগতের অ-ভারতীয় লোকদের এই ভ্রম হইতে পারে যে তাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শুধু ন্যায়পরায়ণতার সহিত নহে অধিকন্তু মহানুভবতা ও সদাশয়তার সহিত কাজ করিয়াছেন।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর ব্রিটেনের ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব ও তাহার বর্ত্তমান পররাষ্ট্রসচিব সর্ সামুয়েল হোর জেনিভায় রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি-সভায় বলেন :—

"যে সমুদয় নীতি রাষ্ট্রসংঘের ভিত্তিভূত বলিয়া আমরা মনে করি, তদনুসারে আমরা আমাদের অধিকৃত দেশসমূহে অবিচলিত ভাবে ক্রমাগত স্বশাসন বৃদ্ধির চেষ্টা করি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কয়েক সপ্তাহমাত্র পূর্ব্বে আমি ভারতবর্ষকে স্বশাসন দিবার নিমিত্ত সাম্রাজ্যিক পার্লেমেণ্টে একটি মহৎ (বা বৃহৎ) ও জটিল আইন পাস করিতে সাহায্য করিবার নিমিত্ত দায়ী ছিলাম।"

১৯৩৫ সালের ভারত-গবর্মেণ্ট আইন দ্বারা যে ভারতবর্ষকে স্বশাসনক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, তাহা আমরা কার্ত্তিকের প্রবাসীতে ১৩২ হইতে ১৩৫ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি। পুনরুক্তি করিব না।

তাহার পর ১৬ই সেপ্টেম্বর ভারতের বর্ত্তমান ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনার্যাল লর্ড উইলিংডন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কৌন্সিল অব ষ্টেটের সম্মিলিত অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে করিতে বলেন :—

"ইহা আমার পক্ষে মহা সন্তোষের বিষয় যে আমার রাজ-প্রতিনিধিত্বের আমলে বহুযুগব্যাপী একবিধ বহু চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সেই সব চেষ্টা কেবল যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট করিয়াছেন তাহা নহে, অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বহু শাসনকর্ত্তা করিয়াছেন। এই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে সেই আইনটি পাস করিয়া যাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম সমগ্র ভারতবর্ষকে তাহার সকল অংশের সাধারণ ব্যাপারসমূহের জন্য একই গবর্মেণ্টের অধীনে অখণ্ড সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছে। ভারতবর্ষ এই প্রথম একটি অখণ্ড বৃহৎ দেশ হইল।"

লর্ড উইলিংডনের এই উক্তির ভ্রান্তিজনকতা আমরা কার্ত্তিকের প্রবাসীতে ১৪৬ ও ১৪৭ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি। আগে এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছি পুনর্ব্বার তাহা লিখিব না। কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, অশোকের সময় হইতে যে-সব ভারতসন্তান ভারতবর্ষকে অখণ্ড একটি রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা ভারতীয়ের দ্বারা শাসিত অখণ্ড ভারতবর্ষই চাহিয়াছিলেন, সমস্ত দেশটা সাতসমুদ্র তেরনদী উত্তীর্ণ হইয়া আগত বিদেশী কোন জাতির অধীন হইবে, এ প্রকার অভিলাষ ও কল্পনা তাঁহারা করেন নাই। সুতরাং বর্ত্তমান বৎসরের ভারতশাসন আইন দ্বারা ভারতীয়দের বহুযুগব্যাপী উদ্যম ও আশা পূর্ণ হইয়াছে বলা যাইতে পারে না।

অতঃপর বর্ত্তমান ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের পালা।

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ইংরেজদের পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের লণ্ডনে একটি কমিটি (India, Burma and Ceylon Newspapers' London Committee) আছে। প্রতি বৎসর তথায় তাহার একটি ভোজ হয়। এ বৎসর অক্টোবর মাসে সেই ভোজে ঐ কমিটিটার নাম বদলাইয়া "ভারতীয় ও প্রাচ্য সংবাদপত্র সমিতি" (Indian and Eastern Newspapers' Society) করা হইয়াছে। ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত সংবাদপত্রসমূহের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদকেরা এই কমিটি, সোসাইটি বা সমিতির সভ্য নহেন, অথচ নামটা এইরূপ!

যাহা হউক, এই সমিতির এই বৎসরকার ভোজে প্রধান নিমন্ত্রিত ব্যক্তি লর্ড জেটল্যাণ্ড যাহা বলেন, রয়টারের তারের খবরে তাহার এক অংশের সারমর্ম্ম এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :—

"Lord Zetland, after paying a tribute to the way in which the Press in India, Burma and Ceylon had undertaken the task of educating public opinion on the reforms, said that he had noted with great satisfaction the tendency observable on the part of those who opposed the passage of the Bill to accept Parliament's decision now that the Bill had been enacted and to produce a favourable atmosphere for bringing the scheme into operation."

লর্ড বাহাদুর বলিতেছেন, যে, তিনি খুব সন্তোষের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন, যে, যে-সব কাগজ বিলটা পার্লেমেণ্টে পাস হওয়ার বিরোধিতা করিয়াছিল, উহা পাস হইয়া যাইবার পর তাহারা পার্লেমেণ্টের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতেছে এবং যাহাতে ভারত-শাসন আইন অনুসারে কাজ হইবার অনুকূল জনমত গঠিত হয় তাহার চেষ্টা করিতেছে। অবাক কাণ্ড! লর্ড সাহেব কোন্ কোন্ কাগজের কথা বলিতেছেন? ভারত-শাসন **বিলের** বিরোধী ভারতীয়দের কোন্ কাগজ বিলটা আইনে পরিণত হইয়া যাইবার পর **আইনটার** অনুকূল জনমত গঠনের চেষ্টা করিতেছে? আমরা ত ভারতীয়দের এরূপ একটা কাগজেরও অস্তিত্ব অবগত নহি। অথচ ভারতসচিবের বক্তৃতায় অভারতীয় লোকদের মনে এই ধারণা জন্মিবে, যেন বিলটার বিরোধী ভারতীয়েরা এখন তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে এবং আইনটার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছে। ইহা মোটেই সত্য নয়।

ভারতীয়েরা যে-সব কাগজের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক, ভারতসচিব জানেন তাহারা আগে ভারতশাসন **বিলটার** বিরোধী ছিল এবং এখনও ভারতশাসন **আইনটার** বিরোধী আছে। সুতরাং তিনি যখন তাঁহার বক্তৃতায় নিম্নোদ্ধৃত কথা বলিয়াছেন, তখন ভারতীয়দের কাগজগুলির অস্তিত্ব যেন সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া কেবল এদেশে প্রকাশিত ইংরেজদের কাগজগুলার কথাই ভাবিয়াছেন, অথচ তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন "দি প্রেস অব ইণ্ডিয়া" ("ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহ") এই নামে! তিনি বলিয়াছেন:—

"The Press of India had supported the constitutional proposals of the British Government in a spirit of enlightenment and goodwill based clearly upon their knowledge of the India of today, and of the stirrings of the deep waters of Indian life, which were now taking place and which had been taking place for a number of years past, and above all upon their understanding of all that was at stake from the point of view of the relations between the people of the East and those of the West. The Press of Britain were quick—and wise—to take their cue from the Press of India."

ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই, যে, আজিকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এবং ভারতীয় জীবনের স্পন্দন ও আলোড়ন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকায় ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহ ভারতশাসন সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবন্মে´ণ্টের প্রস্তাবসমূহের সমর্থন করিয়াছে, এবং ব্রিটেনের সংবাদপত্রসমূহ বুদ্ধিমান্ ও বিবেচকের মত তাহাদের মত অবলম্বন করিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করিয়াছে।

ভারতীয়দের কাগজগুলি কখনও ব্রিটিশ গবন্মে´ণ্টের প্রস্তাবগুলার সমর্থন করে নাই, এবং ব্রিটিশ কাগজগুলাতেও ভারতীয়দের কাগজগুলির মত প্রতিধ্বনিত হয় নাই। ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo-Indian) কাগজগুলার সম্বন্ধেই ভারতসচিবের এই মন্তব্য সত্য। সুতরাং তাঁহার মতে ভারতীয়দের কাগজগুলা এতই নগণ্য যে না-থাকারই সমান এবং ভারতের সংবাদপত্রসমূহ বলিয়া উল্লেখ করিবার যোগ্য কেবল ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজসমূহ।

অতঃপর নবেম্বর মাসে প্রদত্ত লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের একটি বক্তৃতা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিব।

London, Nov. 9.

"The constitution of India Act of 1935 constitutes an outstanding landmark in what may perhaps be described as a new conception of co-operative Imperialism," said the Marquess of Zetland, Secretary of State for India, delivering a course of lectures on "India—retrospect and prospect" at the Nottingham University College.

He said that the conception came into existence when the old colonies of the British Empire became dominions of the British Commonwealth of nations.

Co-operative Imperialism constitutes surely a fine flowering of administrative genius of the British people. It is not complete. The day has not yet dawned when India will take its final place in the vast organism which will be the crowning achievement of this new conception but she is now far on the road on the ultimate goal—*Reuter.*

সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান উপলক্ষ্যে লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেন, যে, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন বিধি সহযোগিতামূলক সাম্রাজ্যবাদের নূতন ধারণার একটা

বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পুরাতন উপনিবেশগুলি যখন জাতিসমূহের ব্রিটিশ প্রজাতন্ত্র-রাষ্ট্রমণ্ডলের অন্তর্গত স্বশাসক ডোমীনিয়ন হইয়া যায়, তখন এই নূতন ধারণার উদ্ভব হয়। সহযোগিতামূলক সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয়-কার্য্যপরিচালনবিষয়িণী প্রতিভা-তরুর শোভন ফুলকুসুম। ইহা এখনও সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নাই। সেই দিন এখনও প্রভাত হয় নাই, যেদিন ভারতবর্ষ সেই বৃহৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ রাষ্ট্রমণ্ডলে নিজের চরম স্থান অধিকার করিবে, যে-রাষ্ট্রমণ্ডল এই নূতন ধারণার চূড়ান্ত অবদান। কিন্তু ভারত সেই শেষ লক্ষ্যস্থলের পথে এখন বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। [হয় নাই। প্রঃ সঃ]

আমরা ভারতসচিবের কথার তাৎপর্য্য যে-ভাষায় দিলাম, তাহা বাংলা ভাষা এবং সহজবোধ্য বাংলা এরূপ দাবি করিতেছি না। তাহার কারণ, তিনি ইংরেজীতে যাহা বলিয়াছেন তাহাও সহজবোধ্য নহে। ইংরেজীর শব্দসম্পদ বাংলার চেয়ে অনেক বেশী। ফরাসী ভাষায় ও ইংরেজীতে যে একটা কথা আছে, "নিজের মনের ভাব গোপন করিবার জন্য মানুষকে ভাষা দেওয়া হইয়াছে", তাহা বাংলা অপেক্ষা ইংরেজী ভাষার প্রতি বিশেষ প্রযোজ্য। লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড বোধ হয় নিজের বক্তব্যটা বিশদ ভাবে ব্যক্ত করিতে চান নাই, এই জন্য শব্দাড়ম্বরের আশ্রয় লইয়াছেন। ইহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে, ব্রিটেনের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধের কথা বলিতে হইলে ইংরেজরা সাধারণতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কথা দুটি ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহার সহিত কানাডা প্রভৃতির সম্পর্কের কথা বলিতে হইলে বলেন, তাহারা জাতিসমূহের ব্রিটিশ প্রজাতন্ত্ররাষ্ট্রমণ্ডলের অন্তর্গত।

আমরা ভারতসচিবের উক্তির মর্ম্ম যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলিতেছি। ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি স্বশাসক ডোমীনিয়ন হইয়া যাওয়ায় সেগুলিকে এখন আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বলা যায় না। কারণ সাম্রাজ্য বলিলে একটা প্রভু দেশ কতকগুলা অধীন দেশের উপর কর্ত্তৃত্ব করে বুঝায়, কিন্তু কানাডা প্রভৃতি ডোমীনিয়নকে ব্রিটেনের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হয় না। এখন প্রধানতঃ ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়াই "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য" কথা দুটি ব্যবহৃত হয়; কারণ ব্রিটেন ভারতবর্ষের প্রভু ইহা কঠোর সত্য। কিন্তু ভারতবর্ষ এক দিন ডোমীনিয়ন হইবে, বহু বৎসর তাহাকে এই আশা দিয়া এখন তাহাকে স্পষ্ট ভাষায় "তুমি আমাদের দাস ও আমরা তোমার প্রভু" এককথা বলা কূটরাজনীতিসম্মত নহে। এবং ইংরেজরা ভারতবর্ষকে আবার ডোমীনিয়নত্বের আশা দিতেও চায় না। সুতরাং এখন এমন কিছু শব্দ প্রয়োগ করা দরকার যাহা স্বশাসক-ডোমীনিয়নত্ব নহে, আবার স্পষ্ট কথায় প্রভু ও দাসের সম্পর্কবোধকও নহে। এই সঙ্কটে ইংরেজী ভাষার শব্দসম্পদ কাজে লাগিয়াছে—লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড বলিতেছেন, ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের মত ভাগ্যবিশিষ্ট আরও কোন কোন অব্রিটিশ দেশ এমন একটা রাষ্ট্রমণ্ডলের অংশ হইবে যাহাতে ব্রিটেন ও ভারতবর্ষপ্রভৃতি দেশগুলার মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত হইবে।

এখন এই সহযোগিতার মানে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ব্রিটিশ জাতির লোকেরা অ-ইউরোপীয় ও অব্রিটিশ লোকদের কাছ থেকে সহযোগিতা চান কি অর্থে, তাহা বুঝা ভারতীয়দের পক্ষে খুব সোজা। আমাদের গবর্ন্মেণ্ট যখন আমাদিগকে সহযোগিতা করিতে বলেন, তখন তাহার মানে এ নয়, যে, সরকারী ইংরেজ ও বেসরকারী ভারতীয়গণ সমান সমান ভাবে পরস্পরের মত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন; তাহার মানে এই, যে, গবর্ন্মেণ্ট যাহা স্থির করিবেন আমাদিগকে তাহা ঠিক্ বলিয়া মানিয়া লইয়া তদনুসারে চলিতে হইবে।

সহযোগিতামূলক সাম্রাজ্যবাদের ভিতরের কথাটাও তাই। ব্রিটেন প্রস্তাব করিবেন, আইন করিবেন, আমাদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে ও মানিতে হইবে। ইহার নাম সহযোগিতা। আজ্ঞানুবর্ত্তিতা বলিলে কর্কশ শুনায়, সুতরাং সহযোগিতা কথাটার আমদানী করা হইয়াছে। এ কথাটা খুব পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, যে, লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের এবং তিনি যে দলের লোক তাঁহাদের অভিপ্রায় ইহা নহে, যে, ভারতবর্ষ কোন কালে স্বশাসক ডোমীনিয়ন হয়। সেই জন্য এই সহযোগিতামূলক সাম্রাজ্যবাদের রব তোলা হইয়াছে—যাহাতে লোকের মনে ধোঁকা জন্মে, যাহাতে লোকে মনে করে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা ডোমীনিয়নত্বের সমতুল্য একটা কিছু আদর্শ ভারতবর্ষের জন্য উদ্ভাবন করিয়া তাহাকে সেই আদর্শের দিকে লইয়া যাইতেছে। ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ অব নেশ্যন্‌সে আয়র্ল্যাণ্ড, কানাডার ফ্রেঞ্চরা, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বুঅর ও নিগ্রোরা ব্রিটিশ নহে।

—

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে কাহাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইবে, এই বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারীকে ও শ্রীযুক্ত শেঠ যমুনালাল বজাজকে অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা সভাপতি হইতে রাজী হন নাই। এখন দুই জন নেতার নাম উল্লিখিত হইতেছে।

কংগ্রেসের একাধিক দল আছে। কংগ্রেসের আফিস ও কংগ্রেস-যন্ত্রটি যে-দলের হস্তগত হইয়া আছে, তাঁহাদের ইচ্ছা, শ্রীযুক্ত জবাহরলাল নেহরুকে সভাপতি করা হউক। অন্য দিকে আসাম, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, মহাকোশল ও বাংলা দেশ হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে সভাপতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে। অন্ধ্রদেশের শ্রীযুক্ত পট্টাভি সীতা-রামায়্যারও নাম হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে বেশী লোকের উৎসাহ দেখা যায় নাই।

এই দুই জন নেতার মধ্যে যোগ্যতর কে তাহার বিচার করা অনাবশ্যক। প্রতি অধিবেশনে সমগ্রভারতে যোগ্যতম কংগ্রেসপন্থীকেই যে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে, তাহাও নহে। জবাহরলাল ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই যোগ্য। উভয়েই দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণ করিয়াছেন। জবাহরলাল একবার, ১৯২৯ সালে লাহোরে, সভাপতির কাজ করিয়াছেন। অন্য যোগ্য নেতা থাকিতে তাঁহাকে আবার সভাপতি করিবার প্রয়োজন নাই। তদ্ভিন্ন, তিনি ইতিপূর্ব্বেই আগামী লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। একই মানুষ অভ্যর্থনা-সমিতির ও অধিবেশনের, উভয়ের, সভাপতি হইতে পারেন না। এক প্রকার সভাপতি জবাহরলাল অন্য প্রকার সভাপতি জবাহর-লালের অভ্যর্থনা করিবেন কি? তা ছাড়া, কংগ্রেসের নিয়মা-বলীর মধ্যে কোন নিয়ম না থাকিলেও ১৮৮৫ হইতে ১৯৩৪ পর্য্যন্ত বরাবর এই রীতি অনুসারে কাজ হইয়া আসিতেছে, যে, অধিবেশন যেবার যে-প্রদেশে হয়, সভাপতি সেই প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত হন না, অন্য কোন প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ইহা একটা অর্থহীন অনাবশ্যক রীতি নহে। ইহার অনুবর্ত্তন দ্বারা এক প্রদেশ অন্য কোন প্রদেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন ও তদ্দ্বারা সমগ্রভারতীয় মহাজাতির একতাবন্ধন দৃঢ়তর হয়। আগামী অধিবেশনে এই রীতির ব্যতিক্রম করিবার কোন কারণ ও প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

সুভাষ বাবুকে আগামী অধিবেশনের সভাপতি করিবার পক্ষে একটি বড় যুক্তি এই, যে, তিনি দীর্ঘকাল ইউরোপ-প্রবাসী থাকিয়া তথাকার নানা দেশের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিল্পবাণিজ্য বিস্তারের পন্থা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। এই সব দেশের কোনটির অবস্থার সঙ্গেই অবশ্য ভারতবর্ষের অবস্থার ঠিক সাদৃশ্য নাই। কিন্তু কোন কোন দেশের কোন কোন সমস্যার সহিত ভারতবর্ষের কোন কোন সমস্যার মিল আছে। সুভাষ বাবু সেই সকল সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন ও চিন্তা করিয়াছেন এবং মোটের উপর বহুবর্ষব্যাপী জনসেবা হইতে তিনি যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সকল প্রদেশের প্রতিনিধিদের নিকট তাহা উপস্থিত করিবার সুযোগ তাঁহার পাওয়া উচিত। যদি অধিকাংশ প্রতিনিধি তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির সমর্থন করেন ও তদনুসারে কাজ হয়, তাহা হইলে দেশের উপকৃত হইবার সম্ভাবনা।

কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে যাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদী তাঁহাদের কংগ্রেস হইতে পৃথক্ হইয়া সরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সুভাষ বাবুর মত সমাজতন্ত্রবাদের অনুকূল বা তৎসদৃশ মনে হয়। তাঁহাকে সভাপতি করিলে সমাজতন্ত্রবাদীরা কংগ্রেস না-ছাড়িতে পারে, এবং এই প্রকারে কংগ্রেসের বলক্ষয় নিবারিত হইতে পারে।

এখন যাঁহারা কংগ্রেস-যন্ত্রের অধিকারী, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে যে মত ও যে ভাব পোষণ করেন, কংগ্রেস জাতীয় দলের মত ও মনোভাব তাহার বিপরীত, এবং কংগ্রেস জাতীয় দল বঙ্গে প্রবল। বাংলা দেশকে কংগ্রেস-যন্ত্রের অধিকারীদের পছন্দ না করিবার ইহা একটি কারণ। যখন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রকাশিত হয় নাই, এবং কংগ্রেস জাতীয় দল গঠিত হয় নাই, তখনও যে ঐ অধিকারীরা বাংলা দেশকে ও বাঙালীদিগকে পছন্দ করিত, এমন নয়। যে-কারণেই হউক, মহাত্মা গান্ধীর গোঁড়া অনুচরেরা বাংলা দেশকে ভাল চোখে দেখেন না। কংগ্রেসী বাঙালীদের দলাদলি তাঁহাদিগকে বঙ্গের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের সুযোগ

দিয়াছে—যদিও অন্য সব প্রদেশেই অল্পাধিক পরিমাণে কংগ্রেসী দলাদলি আছে।

যে-যে কারণেই হউক, বঙ্গের কংগ্রেসপন্থীরা তাঁহাদের প্রতি অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেসপন্থীদের তাচ্ছিল্যের ভাব অনুভব করিয়া কংগ্রেস হইতে—অন্ততঃ মনে মনে—সরিয়া পড়িতেছেন বা তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া কাজ করা হইতেছে, কতকটা এই প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র-ভারতীয় মহাজাতির তুলনায় বাঙালীরা যতই অল্পসংখ্যক বা অল্পবল হউন, তাঁহাদিগকে সঙ্গে না রাখিয়া চলিলে এই মহাজাতির শক্তি নিশ্চয়ই কমিবে, এবং ইহাও ঠিক্, যে, বাঙালীরা অন্য সকল ভারতীয়ের সহিত মিলিয়া কাজ করিতে না পারিলে তাঁহাদেরও শক্তির হ্রাস হইবে। অতএব, কংগ্রেসকে এমন সব ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বাংলা দেশ কংগ্রেসের সঙ্গে থাকে। তাহা করিতে হইলে কোন বাঙালী নেতার সাহায্যে করিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় সুভাষ বাবু সেই নেতা। তিনি সভাপতি হইলে বঙ্গকে কংগ্রেসে রাখিবার উপায় বলিতে পারিবেন। তিনি সভাপতি হইলে বাঙালীরা খুশী হইবে, এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপায় বঙ্গে সহজে অবলম্বিত হইতে পারিবে।

আমরা কংগ্রেসের কোন দলভুক্ত নহি, এবং সুভাষ বাবুরও সকল মতের সমর্থক নহি। কংগ্রেস শক্তিশালী থাকে ও ভারতবর্ষের অন্য সব অংশের সহিত বঙ্গের যোগ থাকে, আমরা ইহা চাই বলিয়া এই সকল কথা লিখিতেছি।

আর একটি কথাও মনে রাখিতে হইবে। ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার পর বঙ্গের অধিবাসী কোন বাঙালীকে কংগ্রেসের সভাপতি করা হয় নাই। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ১৯২৫ সালে কানপুরে সভানেত্রী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পিতামাতা বাঙালী হইলেও তিনি বঙ্গে থাকেন না, বাংলা বলেন না, এবং বঙ্গের ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ কোন যোগ নাই। বঙ্গের মত একটি জনবহুল প্রদেশ হইতে এত বৎসর ধরিয়া একজনকেও সভাপতি না করা সুবিবেচনার কাজ হয় নাই।

—

কংগ্রেসী ঝগড়া

কাহারও কোন দোষ থাকিলে সে ইহা বলিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করিতে পারে না, যে, অন্য লোকদেরও সেই দোষ আছে। কিন্তু একই রকম দোষ অনেকের থাকিলেও যদি কেবল এক জন দোষীরই বিচার বা বিচার ও শাস্তি হয়, তাহা হইলে তাহা ন্যায়সঙ্গত হয় না। অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেসওয়ালারা সাধু সাজিয়া কেবল বঙ্গেরই বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করিতে ব্যগ্র। কিন্তু আমরা আগে লিখিয়াছি, কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যে অল্পাধিক ঝগড়া সব প্রদেশেই আছে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে যেরূপ ঝগড়া হওয়ায় কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন লক্ষ্ণৌয়ে না করিয়া অন্যত্র করিবার কথা উঠিয়াছে, তাহা নূতন নহে, অনেক আগে হইতে চলিতেছে। বোম্বাইয়ের কংগ্রেসওয়ালারা কিছু বেশী রকম মুরুব্বিয়ানা করিয়া থাকেন। সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্টবক্তা মিঃ হর্নিম্যান তাঁহার সম্পাদিত "বম্বে সেন্টিনেল" কাগজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক শব্দ অভ্রান্ত না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার মন্তব্য মোটের উপর সত্য। তিনি লিখিয়াছেন :—

Nowhere do we see such sacrifice and willingness or self-effacement as Mahatma Gandhi enjoined on his followers. On the other hand, they are all plotting and defying each other to get hold of offices and power for personal aggrandizement. In the United Provinces there is apparently complete anarchy in the Congress fold. The U. P. Congress Committee and the reception committee are at logger-heads and have discarded all sense of dignity and decency in their quarrels. In Bombay the meanest subterfuges were resorted to by the Congress bureaucrats to keep out people whom they did not want. In any ordinary election such sharp practices would have resulted in unseating the successful candidates and disqualifying them for some years. But in the Bombay Provincial Congress Committee, we have an altogether different standard of morality and public honesty, and a long casuistical defence had to be penned by the president of the B. P. C. C. after shilly-shallying for several months. In these circumstances, to say that the direction of Congress affairs seems to have got into the hands of political cranks and crooks seems a very justifiable rhetorical indulgence. Facts have to be faced and it must be a matter of great regret to all well-wishers of the Congress that valuable time and energy are being dissipated in these never-ending wranglings. The most insistent duty and task that face the Congress today are to fight the new constitution which has been imposed on the country against the wishes of the vocal and politically-minded Indians, instead of carrying on these vendettas against each other and conspiring for offices of power for themselves and their friends, and at the same time resorting to questionable and dishonest methods

to keep out their rivals. Can any honest Congressman say today that the masses are represented in the Congress, or that it is democratic even in the remotest sense of the term when the real power is being concentrated in the hands of a few people whose methods and manners of capturing it would not stand investigation? Plain-speaking is needed to open the eyes of the public and induce Congressmen to purge their organizations of office-hunters and publicity-mongers.

মান্দ্রাজ প্রদেশে কংগ্রেসের প্রভাব অপ্রতিহত বলা যায় না। কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সেখানে ভ্রমণকালে নানা জায়গায় তাঁহাকে কৃষ্ণ পতাকা দেখাইয়া ফিরিয়া যাইতে বলা হইয়াছিল। ইহা করা অবশ্য ঠিক্ হয় নাই, বঙ্গের নিন্দায় অবাঙালী অনেক কংগ্রেসওয়ালা পঞ্চমুখ। কিন্তু বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এখানে আসিলে কোন দল দলবদ্ধ ভাবে তাঁহাকে কৃষ্ণ পতাকা দেখাইবে না।

—

জ্যোতিষিক কন্‌ফারেন্স

ইন্দোরে একটি সমগ্রভারতীয় জ্যোতিষিক কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। নানা দিক দিয়া প্রসিদ্ধ ও লোকপ্রিয় এইরূপ এক জন মানুষকে সভাপতি করা সুপরামর্শ বটে; কিন্তু ভারতবর্ষের সব অংশ হইতে বিশেষজ্ঞদিগের সমাবেশ না হইলে তিনি কি করিবেন? এই কনফারেন্সের একটি কাজ হইবে পঞ্জিকাসংস্কার সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে বাঁকুড়ানিবাসী অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিশেষ জ্ঞান আছে। উদ্যোক্তারা তাঁহাকে লইয়া যাইতে না-পারুন, তাঁহার দ্বারা কিছু লিখাইয়া লইতে পারিলে তাঁহাদের কাজের সুবিধা হইবে।

—

গোরক্ষা

গত মাসে বেহালায় ভারত গোশালা কমিটির উদ্যোগে গোরক্ষা ও গোজাতির উন্নতিকল্পে একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে কলিকাতায় ও তাহার আশেপাশে গোচারণের জমী ইজারা লইয়া গোয়ালা ও অন্য গোরক্ষকদিগকে তাহা বিনামূল্যে ব্যবহার করিতে দিবার কথা হয়, এবং কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎকৃষ্ট জা'তের বৃষ রক্ষা করিয়া গোবংশের উন্নতি সাধনের প্রসঙ্গ হয়।

দেশের সর্ব্বত্র গোরুর খাদ্য উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। অনেক জমী আছে যাহাতে ধান কিংবা তদ্রূপ অন্য কোন ফসল হয় না, কিন্তু গোরুমহিষের সুখাদ্য নেপিয়ার ঘাস প্রভৃতি ঘাস হইতে পারে। তাহা উৎপাদনের জন্য জলসেচনাদি বিশেষ কোন যত্নেরও প্রয়োজন নাই।

আমাদের দেশে গোজাতির অবনতির একটি কারণ গোচারণের মাঠের ক্রমিক হ্রাস এবং অন্য একটি কারণ গ্রামে গ্রামে পূর্ব্বের ন্যায় ঘানী না-থাকা। আগে খুব ছোট গ্রামেও কোলুর ঘানী দেখিয়াছি। ঘানী থাকায় লোকে কেবল যে টাটকা খাঁটি তেল পাইয়া উপকৃত হইত তাহা নহে, কোলুর নিকট হইতে খইল কিনিয়া গোরুকে খাইতে দিতে পারায় তাহারাও পুষ্ট হইত। এখন সরিষা, তিল প্রভৃতি তৈলবীজ খুব বেশী পরিমাণে বিদেশে চালান হইতেছে, ঘানী কমিয়া গিয়াছে, গ্রামে গ্রামে খইল পাওয়া যায় না। মানুষ ও গবাদি পশু উভয়ের পক্ষে অনিষ্টকর এই অবস্থার সুপরিবর্ত্তন কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহার উপায় চিন্তনীয় ও অবলম্বনীয়।

—

মাড়োয়ারীদের মধ্যে পরদার বিরোধিতা

কলিকাতায় মাড়োয়ারীদের একটি পরদাবিরোধী সভা আছে। মূলচাঁদ আগরওয়ালা, বসন্তলাল মুরারকা, প্রভুদয়াল হিমৎসিংকা, ভগীরথমল কানোড়িয়া, সীতারাম সেকসরিয়া, মোতিলাল লাঠ, গঙ্গাপ্রসাদ ভোটিকা প্রভৃতি তাহার নেতা। গত মাসে তাঁহারা "পরদাবিরোধী দিবস" পালন করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারী ভদ্রমহিলা এই দিন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় মাড়োয়ারী ভিন্ন অন্য অনেক লোকও উপস্থিত ছিলেন।

—

বধির-মূক চিত্রকর

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চৌধুরী বধির-মূক; কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি, সাহস ও অধ্যবসায় এরূপ, যে, তিনি চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য লণ্ডন গিয়াছিলেন। সেখানে রয়্যাল কলেজ অব্ আর্টে শিক্ষালাভ করিবার পর এ-আর-সি-এ উপাধি পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

—

ধলভূমে গ্রামোন্নতির চেষ্টা

ধলভূমের প্রধান স্থান ঘাটশিলা। এই স্থানটি স্বাস্থ্যকর, ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর, ইহার এক দিকে সুবর্ণরেখা ও অন্য দিকে খরস্রোতা প্রবাহিত, কলিকাতা হইতে কয়েক ঘণ্টায় এখানে পৌঁছান যায়। এই সব কারণে এখানে ক্রমশঃ দু-এক জন বাঙালী অন্য জায়গা হইতে আসিয়া বাড়িঘর নির্ম্মাণ করিতেছেন। ঘাটশিলাকে বাংলা দেশের বাহিরে ফেলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা বঙ্গের অন্তর্গত। বহুকাল হইতে এখানে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যাঁহাদের বাস তাঁহারা প্রধানতঃ সাঁওতাল ও বাঙালী। ধলভূমের রাজা বাঙালী, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাঙালী ছিলেন। এখন তিনি জমিদার, কিন্তু পূর্ব্বে এই রাজবংশ শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

গত মাসে ঘাটশিলার সর্ব্বোচ্চ স্থানটিতে ২৫ বিঘা পরিমিত ভূখণ্ডে সর্ব্বসাধারণের বায়ুসেবন ও আমোদ-প্রমোদের জন্য ডেভিস জুবিলি পার্ক নামক একটি উদ্যানের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। মিঃ ডেভিস সিংহভূম জেলার ডেপুটি কমিশ্যনার। জমী রাজা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র দেও ধবলদেব দান করিয়াছেন, অনুষ্ঠানে সমবেত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের জন্য প্রচুর জলযোগ ও অন্যান্য ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ তাঁহার ব্যয়ে হইয়াছিল। উদ্যানের জন্য যাহা-কিছু ব্যয় হইবে, তাহাও তিনিই দিবেন। এই উপলক্ষ্যে ধলভূমরাজের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ করেন, যে, ধলভূমের গ্রাম্য লোকদের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। আপাততঃ কুড়ি বিঘা জমীতে কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে ও তাহাতে উন্নততর কৃষিপ্রণালীর পরীক্ষা হইবে। এই পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান কৃষিজীবী সব লোকের মধ্যে বিস্তার করা হইবে। এইরূপ আরও পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে, নিরক্ষর লোকদিগকে লেখাপড়া শিখান হইবে, এবং তাহাদের নৈতিক অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হইবে। এই অঞ্চলে সাঁওতালদের ও অতিনিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে মদ্যপানের প্রচলন থাকায় এরূপ চেষ্টার প্রয়োজন আছে।

ঘাটশিলায় ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে সাধারণ ধানচাষ ছাড়া তরকারী ও নানাবিধ ফল উৎপাদন করিলে তাহার স্থানীয় ক্রেতা জুটিবে এবং রেলযোগে এক দিকে খড়্গপুর ও মেদিনীপুর ও অন্য দিকে টাটানগর, জমশেদপুর ও চাইবাসাতে চালান দেওয়া চলিবে। শাল পিয়াল আসন পলাশ প্রভৃতির বন রক্ষিত হইলে কেবল যে কাঠের ব্যবসার সুবিধা হইতে পারে, তাহা নয়। শালগাছের নির্য্যাস, পিয়ালের ফল, কেঁদ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, তসরের গুটি, লাক্ষা প্রভৃতির ব্যবসা চলিতে পারে। উক্তরূপ ব্যবসা সিংহভূম, মানভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অনেক স্থানেও চলিতে পারে।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ঘাটশিলার রাজার দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

—

ঘাটশিলায় পাইক নৃত্য

ঘাটশিলার ডেভিস জুবিলি উদ্যান প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সন্ধ্যাকালে গ্রাম্য হিন্দুদের নানা প্রকার "পাইক নৃত্য" হইয়াছিল। পরদিন স্থানীয় ধলভূম-রাজ কাছারীতেও এই নৃত্য হইয়াছিল। এই নাচগুলি সমস্তই সুরুচিসঙ্গত এবং গ্রাম্য নর্ত্তকেরা বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত নাচিয়াছিল। কেবল পুরুষেরাই নাচিয়াছিল—কতক পুরুষের বেশে, কতক নারীর বেশে। পুরুষবেশীদের কোন কোন নৃত্যে নৃত্য ও ব্যায়াম উভয়েই দক্ষতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিছু কিছু রণকৌশলও প্রদর্শিত হইয়াছিল—যেমন চক্রব্যূহ। মণিপুরী রাখাল-নাচের মত নৃত্যও ছিল। নারীবেশীদের নৃত্যে সাধারণ শোভন নাচ ছিল, আবার শ্রীকৃষ্ণচরিত-ঘটিত পৌরাণিক আখ্যায়িকা সম্বন্ধীয় নাচও ছিল, এবং কোন কোন অসুর বধের নাচও ছিল। তরবারি-হস্তে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া মহিষমর্দ্দিনীর মহিষাসুর-বধ দর্শকদের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। অন্য অধিকাংশ নৃত্যও প্রশংসিত হইয়াছিল।

শান্তিনিকেতনে যাঁহারা নৃত্য শিক্ষা দেন, ধলভূমের এই নাচ তাঁহাদের দেখা উচিত। শান্তিনিকেতনে একবার যে রায়বেঁশে নাচ দেখিয়াছিলাম, ধলভূমের পুরুষোচিত পাইক নাচ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হইল। ঘাটশিলার রাজার সহকারী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শান্তিনিকেতনে কিছু কাল ছাত্র ছিলেন। বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে লিখিলে

তিনি হয়ত শান্তিনিকেতনের নৃত্যশিক্ষকদিগকে ঘাটশিলায় এই নৃত্য দেখাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

—

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র সুচিকিৎসক ছিলেন। চক্ষু-চিকিৎসাক্ষেত্রে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার বাড়িতে রোগীর এরূপ ভীড় দেখিয়াছি, যে, তিনি অপরাহ্ণ তিনটা চারিটা পর্য্যন্তও কোন কোন দিন খাইবার

যতীন্দ্রনাথ মৈত্র

অবসর পাইতেন না। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তিনি কংগ্রেসপন্থী ছিলেন এবং দেশের কাজে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। কলিকাতার নাগরিক রূপে তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটির অন্যতম কৌন্সিলর নির্ব্বাচিত হন। অকালে তাঁহার মৃত্যু না হইলে তিনি কলিকাতার মেয়র হইতে পারিতেন।

—

বলবান্ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাপটেন্ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জননায়ক সর্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ইংলণ্ড গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টারী তাঁহার বৃত্তি ছিল। কিন্তু তিনি বঙ্গে দৈহিকবলবিশিষ্ট

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুষ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। আমরা যৌবনকাল হইতে তাঁহার বলশালিতার ও ইংরেজ ঠ্যাঙাইবার অনেক গল্প শুনিয়া আসিয়াছি। ব্যায়াম ও পুরুষোচিত ক্রীড়ায় উৎসাহ দিবার জন্য যখন যেখানে তাঁহার ডাক পড়িত সেখানেই তিনি উপস্থিত হইয়া উপদেশ দিতেন। তাঁহার চেহারা দেখিলেই লোকের ব্যায়ামে অনুরাগী হইবার ইচ্ছা হইত। দৈহিক উন্নতির চেষ্টায় উৎসাহ দিবার জন্য তিনি দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি রিপন কলেজ কমিটির সভাপতি ছিলেন।

—

আনন্দচন্দ্র রায়

ঢাকার প্রসিদ্ধ নেতা আনন্দচন্দ্র রায় গত মাসে ৯২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অতি বিখ্যাত উকীল ছিলেন। ৬০ বৎসর ওকালতি করিয়া এবং

রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি ১৯০৮ সালে ২৭ বৎসর আগে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অনেকে জানিতই না যে তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন। ওকালতিতে তাঁহার এরূপ পসার হইয়াছিল, যে, তিনি য়্যাডভোকেট-জেনার‍্যালের সমান ফী চাহিতেন ও পাইতেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হওয়ায় তিনি উহার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মী রূপে বিশেষ আগ্রহের সহিত যোগদান করেন। মিঃ (পরে সর্) কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত পিতার অমতে বিলাতে সিবিল সার্বিসের জন্য প্রস্তুত হইতে যান। আনন্দচন্দ্র রায় তাঁহার সব ব্যয়ভার বহন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, তিনি তাহার সভ্য মনোনীত হন। ঢাকা পীপলস্ এসোসিয়েশুন ও পূর্ব্ববঙ্গ ভূম্যধিকারী সভাদ্বয়ের তিনি মেরুদণ্ডের মত ছিলেন। উভয়ের কার্য্যালয় তাঁহার গৃহেই ছিল। তিনি জগন্নাথ কলেজের অন্যতম ট্রষ্টী ও তাহার কৌন্সিলের সভ্য ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আনন্দময়ীর নামে তিনি ঢাকায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অনেক দরিদ্র ছাত্র তাঁহার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়াছে। এখনও অনেক দরিদ্র পরিবার তাঁহার বাড়ি হইতে মাসিক সাহায্য পায়। সাংখ্যদর্শনের ছাত্রদের জন্য তিনি কয়েকটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

—

মনোমোহন পাণ্ডে

মনোমোহন পাণ্ডে কলিকাতায় একটি থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্র ও অন্য অনেক গরিব লোককে পালন করিতেন। কাশীতে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহার দ্বারা তীর্থযাত্রীদের ও অন্য হিন্দু কাশী-দর্শকদের বিশেষ সুবিধা হইবে। ইহা তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবে।

—

ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী

বৃন্দাবন যাইবার পথে ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজীর স্বর্গলাভ হইয়াছে। গার্হস্থ্যাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল তারাকিশোর চৌধুরী। তিনি শ্রীহট্ট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এম্-এ ও বি-এল পাস করিবার পর তিনি ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁহার বেশ পসার হয়। মনে বৈরাগ্যের উদ্রেক হওয়ায় তিনি বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি সুপণ্ডিত ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহার গুরু কাঠিয়া বাবার মৃত্যুর পর তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মোহান্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। কোন বাঙালী এ পর্য্যন্ত এরূপ সম্মানিত পদ পান নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বাংলা ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ আছে। জননায়ক বিপিনচন্দ্র পাল ও ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের সহিত যৌবনকাল হইতে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। ডাঃ দাস তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে নিজের যে জীবনচরিত লিখিতেছিলেন তাহাতে বন্ধু তারাকিশোরের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন।

—

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

ঈশানচন্দ্র ঘোষ যশোর জেলার একটি গ্রামে দরিদ্র এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অন্যের সাহায্যে তাঁহাকে বাল্যকালে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হয়। তিনি বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমশীলতা দ্বারা সকল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তিলাভ করেন। এই প্রকারে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হন। কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কিছু কাল ছাত্র পড়াইয়া ও খবরের কাগজে লিখিয়া নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন।

১৮৮৫ সালে তিনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগে প্রবিষ্ট হন। তিনি হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে উহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তিনি হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের হেডমাষ্টার ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল-ইন্সপেক্টর হইয়াছিলেন। কিছু কাল তিনি শিক্ষা-বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর ছিলেন। সরকারী কাজে যিনি এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাকে, পুলিসের সব-ইন্সপেক্টরের মত, রাস্

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

সাহেব উপাধি দেওয়াটা বিদ্রূপের মত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এই লাঞ্ছনা গায়ে মাখেন নাই, উচ্চতর উপাধিলাভের কোন চেষ্টাও করেন নাই।

তিনি অনেক বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহাতে নূতনত্ব ছিল। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বৌদ্ধ জাতক-সমূহের বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ করিবার জন্য তিনি পরিণত বয়সে পালি শিক্ষা করেন, এবং ইংরেজীতে যে অনুবাদ কয়েক জন বিদ্বান্ ব্যক্তি মিলিত হইয়া করিয়াছেন, বাংলায় তাহা তিনি একা ষোল আনার পরিশ্রম করিয়া সমাপ্ত করেন। ইহা প্রকাশ করিতে তাঁহার ন্যূনাধিক ১২০০০ টাকা খরচ হইয়াছিল। বিক্রয় হইতে তাহা যে তিনি ফিরিয়া পান নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। যদিও, জাতক গ্রন্থ গল্পের মত মনোরম অথচ উপদেশপূর্ণ ইহাও এবং ইহাতে বৌদ্ধ যুগের সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ থাকিলেও, বাঙালী পাঠকেরা ইহার সমুচিত সমাদর করেন নাই।

সংস্কৃত তিনি ভাল জানিতেন। ইতিহাস অধ্যয়নে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ হইয়াছিল। তাহার ছয় মাস পূর্ব্বেও তিনি প্রাচীন গ্রীক ইতিহাস পাড়তেছিলেন। ভৌগোলিক গ্রন্থ তাঁহার প্রিয় ছিল। স্বদেশের কালিদাস ও গ্রীসের হোমর তাঁহার প্রিয় কবি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কৃত কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীর বাংলা অনুবাদের হস্তলিপি এবং হোমরের ইলিয়ডের কিয়দংশের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে।

অধ্যয়নানুরাগী, বহুভাষাবিৎ ও সুলেখক ঈশানচন্দ্রের ব্যবসা-বুদ্ধিও প্রখর ছিল। অনেক ব্যবসাদার বাণিজ্যিক নানা বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন, এবং তিনি কয়েকটি বড় কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন যেমন করিয়াছিলেন, তাহার সদ্ব্যয়ও সেইরূপ করিয়াছিলেন। তিনি দাতা ছিলেন, অথচ তাঁহার দানের কথা তাঁহার জীবিত কালে লোকে জানিতে পারে নাই।

জন্মগ্রামের ম্যালেরিয়া দূর করিবার নিমিত্ত তিনি মশকবিনাশের জন্য অনেক হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন। সেখানে মায়ের নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও পিতার নামে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তথায় দুটি বড় পুকুর কাটাইয়া গিয়াছেন, একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, একটি নল-কূপ খনন করাইয়াছেন ও একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে উইলে যশোর জেলার আরও কয়েকটি অভাবমোচনার্থ টাকা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ কসৌলীর পাস্তুর চিকিৎসালয়ে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন, কেন-না তখন ক্ষিপ্তকুক্কুরদষ্ট বাঙালীর চিকিৎসার্থ কসৌলী না-গিয়া উপায় ছিল না। যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতালে তাঁহার পরলোকগতা কন্যার নামে একটি "শয্যা" দিয়া গিয়াছেন। খবরের কাগজে দেখিলাম, তাঁহার উইলে তিনি তাঁহার সম্পত্তির বৃহৎ অংশ জনহিতকর কার্য্যের জন্য দান করিতে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার পুত্র অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পিতার জীবিত কালে তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে প্রাচ্য মূল্যবান্ গ্রন্থসমূহের

বঙ্গানুবাদের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

ঈশানচন্দ্র জীবনে অনেক শোক পাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিচলিত হন নাই।

বাঙালীর সমুদ্রগামী জাহাজ

অতীত কালে বাঙালী যে নদী ও সমুদ্রে যুদ্ধ ও বাণিজ্যের জন্য জাহাজ নির্ম্মাণ ও ব্যবহার করিত, ইতিহাসে ও কাব্যে তাহার প্রমাণ আছে। সুতরাং নদীতে ও সমুদ্রে বাণিজ্যার্থ ষ্টীমার চালান বাঙালীর পক্ষে সাধ্যাতীত নহে। সেই জন্য সম্প্রতি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে জাহাজ চালাইবার যে চেষ্টা শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার ও শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী প্রমুখ একটি বাঙালী কোম্পানী আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সফল হইবেই না মনে করা যায় না; আশা করি সফল হইবে। সাফল্যের প্রধান অন্তরায় ব্রিটিশ কোম্পানীর ভাড়া হ্রাস করা। যদি সব বাঙালী ও ভারতীয় যাত্রী ও মালপ্রেরক শিক্ষিত ও স্বদেশানুরাগী হইতেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ জাহাজ ভাড়া কমাইলেও দেশী জাহাজ নিশ্চয়ই টিকিয়া থাকিবে বলিতে পারিতাম।

ভাড়া হ্রাস-যুদ্ধ নিবারণার্থ আইন প্রণয়নের চেষ্টা করিতে হইবে।

নদীতে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় জাহাজ চালাইয়া অনেক বৎসর অনেক হাজার টাকা লোকসান দিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ জয়লাভ করেন। নূতন সমুদ্রগামী জাহাজের বাঙালী কোম্পানীর পরামর্শদাতা ও উৎসাহদাতাদের মধ্যে তিনি আছেন। কোম্পানীটির সাফল্যের আশার ইহা একটি কারণ।

বাঙালীর মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ চেষ্টা

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সাহায্যে তাহার কারখানায় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস যে এঞ্জিন হইতে আরম্ভ করিয়া মোটর গাড়ীর সমুদয় অংশ নির্ম্মাণ করিয়া একটি গাড়ী প্রস্তুত করেন, তাহাতে সময় লাগিয়াছিল অনেক এবং অর্থব্যয়ও খুব হইয়াছিল; অথচ জিনিষটি চলনসই হইলেও উৎকৃষ্ট ও নিখুঁত হয় নাই—যদিও তাহাতে তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য প্রমাণিত হইয়াছিল। সময় ও অর্থ বেশী লাগিবার এবং জিনিষটি ভাল না হইবার কারণ, তাঁহার দক্ষতা থাকিলেও মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের সমুদয় প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্র ছিল না।

এক্ষণে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সরকার এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ডে মোটরশিল্পে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েক জন বাঙালী যুবক একত্র মিলিত হইয়া মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমেরিকা হইতে আধুনিক সমুদয় যন্ত্রের সাহায্যে করা হইবে শুনিতেছি। তাঁহারা আগামী জানুয়ারী মাসে "মোটর ম্যানুফ্যাকচ্যারার্স" নাম দিয়া একটি কোম্পানী রেজিষ্ট্রী করিবেন।

লণ্ডনে হিন্দু মন্দির নির্ম্মাণ

অনেক হিন্দু লণ্ডন যান। যাঁহারা যান, তাঁহাদের মধ্যে মন্দিরে গিয়া দেবতার পূজা করার অভ্যাস কয় জনের আছে, কয় জন তাহার প্রয়োজন অনুভব করেন, জানি না। যাঁহারা করেন, লণ্ডনে হিন্দু মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। কলিকাতার গৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তিহৃদয় বনের উদ্যোগে এইরূপ একটি মন্দির নির্ম্মিত হইবে এবং ত্রিপুরার মহারাজা ইহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, অবগত হইয়াছি। স্বামী ভক্তিহৃদয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন, যে, মন্দিরের সঙ্গে একটি হিন্দুনিবাস থাকিবে যাহাতে হিন্দুরা নিজেদের আচার রক্ষা করিয়া খাদ্যাদিতে বৈদেশিক ভাবাপন্ন না হইয়া থাকিতে পারিবেন। ইহা আবশ্যক বটে। এরূপ একটি আশ্রয়স্থল নির্ম্মিত ও সুপরিচালিত হইলে লণ্ডনপ্রবাসী হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুভাবে থাকিতে চান তাঁহাদের সুবিধা হইবে। এই উদ্যম সমর্থনযোগ্য।

জার্ম্মেনীতে অর্থনৈতিক বিষয়ে বাঙালীর বক্তৃতা

জার্ম্মেনীর ডয়েশ আকাডেমীর উদ্যোগে ডাঃ সুধীর সেন তথাকার ষ্টুটগার্ট ও ড্রেসডেন শহরে ভারতীয় অর্থনৈতিক বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি ঐ বিষয়ে জার্ম্মেনীর শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রসমূহে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং জার্ম্মেনীর এক পুস্তক-প্রকাশকের অনুরোধে আধুনিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জার্ম্যান ভাষায় একখানি বড় বহি লিখিতেছেন। ডাঃ সুধীর সেন ডয়েশ আকাডেমীর বৃত্তি পাইয়া জার্ম্মেনীতে শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

জার্মেনীতে ভারতীয় ছাত্রদের বৃত্তির মিয়াদ বৃদ্ধি

নিম্নলিখিত ভারতীয় ছাত্রদিগকে ডয়েশ আকাডেমীর প্রদত্ত বৃত্তি আরও এক টরমের (termএর) জন্য দেওয়া হইবে :—

ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে	ভি জি মেনন,
ঐ ঐ	এ কে মিত্র,
লাইপ্‌জিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে	বি কে কর,
হাইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে	কে পি মুখোপাধ্যায়
বন বিশ্ববিদ্যালয়ে	এন্ আই খান্,
ড্রেস্ডেনের শৈল্প বিশ্ববিদ্যালয়ে	পি নারায়ণমূর্ত্তি,
ড্রেসডেনের ঐ ঐ	এ কে ঘোষ।

ভারতবর্ষের প্রায় ৩৬ কোটি লোকের মধ্যে হিন্দু বাঙালীর সংখ্যা আড়াই কোটির কম। উপরের তালিকার সাত জন বিদ্যার্থীর মধ্যে চারি জন বাঙালী।

আমরা বাঙালী, কিন্তু আত্মপ্রতারিত হইবার জন্য, কিংবা অন্য ন্য বাঙালীকে অহঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত এই রকমের সংবাদ ছাপি না। বাঙালীর অবসাদ জন্মিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাহার প্রতিষেধকরূপে উৎসাহজনক সংবাদের উপযোগিতা থাকিতে পারে।

—

মহিলাদের বিমানচালনা শিক্ষা

গত মাসে একটি সরকারী জ্ঞাপনপত্র বহু সংবাদপত্রের মারফৎ পাঠকদিগকে জানাইয়াছিল ভারতবর্ষে বিমানযোগে যাতায়াতের বন্দোবস্ত কিরূপ বাড়িতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকদিগকে বিমানচালনা শিখাইবার আয়োজন কি আছে এবং তাহা বাড়িতেছে কিনা তাহার উল্লেখ তাহাতে ছিল না। বিমানচালনা শিখাইবার ব্যবস্থা ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় কিরূপ আছে, কোন ভারতীয় বৈমানিক তাহা সংবাদপত্রে লিখিলে ভাল হয়। এ বিষয়ে ভারতবর্ষ অন্য সব সভ্য দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ভারতবর্ষের বিদেশী গবর্ন্মেণ্ট এ বিষয়ে দেশী জনমতের প্রভাব অনুভব করেন নাই। বেসরকারী ব্যবস্থাও বিশেষ কিছু হয় নাই। এ অবস্থায়, বোমারিক দুর্ঘটনায় নিহত দাস ও রায়ের স্মৃতিরক্ষা তহবিল হইতে বিমানচালন শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যে বৃত্তি ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা সামান্য হইলেও উল্লেখযোগ্য। এই বৃত্তির জন্য একুশ জন বঙ্গমহিলার আবেদন পাওয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন আরও ষোল জন শিক্ষার্থিনী আছেন, শুনা গিয়াছে। আবেদনকারিণীদের মধ্যে আপাততঃ শ্রীহট্টের শ্রীমতী রমা গুপ্তা, লাহোরের শ্রীমতী ইন্দু মৌলিক ও কলিকাতার শ্রীমতী অঞ্জলি দাস এই তিন জনকে মনোনীত করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে বাছাই করিয়া প্রথমস্থানীয়াকে হাজার টাকা ও দ্বিতীয়স্থানীয়াকে পাঁচ শত টাকা বৃত্তি এই সর্ত্তে দেওয়া হইবে, যে, বৃত্তির সাহায্যে তাঁহারা বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের দমদমাস্থিত বিমান-ঘাঁটিতে "উড়িতে" শিখিবেন।

নির্দোষ সাহসের কাজে পুরুষ ও নারী উভয়েরই অগ্রসর হওয়া অন্য সকল জায়গার চেয়ে বঙ্গে কম আবশ্যক নহে।

—

"প্রাচ্য আলোকমালা" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার ইউরোপের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি Eastern Lights ("প্রাচ্য আলোকমালা") নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ইহা প্রেরণ করায় কবি উত্তরে লিখিয়াছেন :—

"তোমার Eastern Lights বইখানি যখন আমার হাতে এল, তখন বিশেষ ভাবেই পীড়িত ছিলাম। যে-বিষয়ে আমি অনভ্যস্ত ও অশিক্ষিত তাতে যথোচিত মন দেবার শক্তি তখন একেবারেই ছিল না—এখনো যে সম্পূর্ণ আছে তা বলতে পারি নে। তোমার বইয়ের আরম্ভভাগের কিছু অংশমাত্র পড়েছিলুম। সীমাকে একান্তই সীমা বলে জানা সংসারের কাজ চালাবার উপযোগী একটা মায়া বলেই আমি মনে করি। সেই সীমাকে যখন আনন্দরূপ বলে উপলব্ধি করি তখনি সৌন্দর্য্যের দৃষ্টিতে প্রেমের দৃষ্টিতে তার অসীমত্ব ধরা পড়ে। তোমার 'Beautiful' সংজ্ঞক অধ্যায়ে এই নিয়ে আলোচনা করেছ। "আর্ট"সম্বন্ধীয় আমার কোনো কোনো প্রবন্ধে আমি লিখেছি, যাকেই আমরা সত্য বলে উপলব্ধি করি (অর্থাৎ কেবল জানি মাত্র নয়) তাই আমাদের আনন্দ দেয়। সেই উপলব্ধির দ্বারা তার আর আমার মাঝখানকার ভেদসীমা দূর হয়ে যায়। আমার সেই পত্রে এই কথাটা আমি বলতে চেয়েছিলুম, আমার মতে সত্য উপলব্ধির

অভাবই সীমা। ইতিমধ্যে তোমার বইয়ে Cosmic Man থেকে সুরু করে বাকি অংশটুকু পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুকাল থেকে আমার কোনো কোনো রচনায় আমার মত ব্যক্ত করতে চেয়েছি—হয় তো স্পষ্ট বলতে পারি নি, কেন না, তত্ত্বের ভাষায় বলার ক্ষমতা আমার নেই। তাই তোমার ঐ অধ্যায়ে মানবের মধ্যে দৈবী আবির্ভাবের তত্ত্ব ব্যাখ্যা পড়ে আমি পরিতৃপ্তি লাভ করেছি। অবশেষে তোমার গ্রন্থে রামমোহন থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্য্যন্ত ভারতের বর্ত্তমান সাধকদের বাণীর যে বিশদ পর্য্যালোচনা করেছ, সে অত্যন্ত উপাদেয়। এতে তোমার যে নির্ম্মল উদার দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি বিশ্ব-মানবের ভূমিকায় মানবের মহিমা তোমার যথার্থ প্রত্যক্ষ-গোচর।

"তত্ত্বকথা সম্পূর্ণ করে অনুধাবন ও বিস্তারিত করে পর্য্যালোচনা করা আমার ক্লান্তশক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য। সংক্ষেপে তোমাকে জানালুম তোমার বইখানি থেকে উপকার প্রত্যাশা করি এবং সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

—

নির্ব্বাচনের অধিকার লাভের যোগ্যতা বিষয়ে হিন্দুর প্রতি অবিচার

বর্ত্তমান ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে যে ভারতশাসন আইন প্রণীত হইয়াছে তাহাতে সমগ্রভারতীয় মহাজাতির (নেশ্যনের) এই অপকার করা হইয়াছে, যে, ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে, "উচ্চ" ও "নীচ" জাত অনুসারে, বৃত্তিগত শ্রেণী অনুসারে, ইউরোপীয়, ভারতীয় ও ইঙ্গভারতীয় বংশ অনুসারে আলাদা আলাদা নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠন করিয়া ভারতীয় জনসমষ্টির মধ্যে যত ভেদ আছে তাহা স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং যেরূপ ভেদ নাই তাহা জন্মাইবার সম্ভাবনা ঘটান হইয়াছে। তাহার পর, সকলের চেয়ে বেশী অনিষ্ট করা হইয়াছে হিন্দুদের। তাহাদের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবিচার করা হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ভারতবর্ষে অন্য সব ধর্ম্মাবলম্বীর সমষ্টির চেয়ে বেশী, অথচ তাহাদিগকে তাহাদের সংখ্যা অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি ত দেওয়া হয়ই নাই, অন্য সকলের প্রতিনিধিদের সমষ্টির চেয়ে অন্ততঃ কিছু বেশীও দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ তাহারা যেমন সমগ্র লোকসমষ্টির অর্দ্ধেকের বেশী, তেমনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু প্রতিনিধির সংখ্যা সমগ্র প্রতিনিধি-সংখ্যার অর্দ্ধেকের কয়েক জন বেশী হইলেও বুঝা যাইত যে হিন্দুদের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করিবার ইচ্ছা আইনটার প্রণেতাদের ছিল। কিন্তু তাহাদিগকে অর্দ্ধেকের কিছু বেশী কিংবা অন্ততঃ অর্দ্ধেক প্রতিনিধি দেওয়া দূরে থাক্, তাহাদিগকে এক-তৃতীয়াংশেরও কম প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। উহা বাদে ভারতের লোকসংখ্যা ৩৩৯,৬২৫,৫৮৬। তাহার মধ্যে ব্রিটিশভারতেই হিন্দুর সংখ্যা ১৭৭,১৫৭,০৩৫, অর্থাৎ সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকের অধিক। অথচ য়্যাসেমব্লীতে ৩৭৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে ব্রিটিশভারতের হিন্দু প্রতিনিধির সংখ্যা ১২৪, এবং কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের ২৬০ জন প্রতিনিধির মধ্যে ব্রিটিশভারতের প্রতিনিধিদের সংখ্যা ৮১ জন।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাতেও হিন্দুর প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। মুসলমানরা যে প্রদেশেই সংখ্যালঘু সেইখানেই তাহাদিগকে তাহাদের সংখ্যানুসারে প্রাপ্য প্রতিনিধির চেয়ে অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুদের সম্বন্ধে এই নীতি সর্ব্বত্র অনুসৃত হওয়া দূরে থাক্, বঙ্গে হিন্দুদিগকে তাহাদের সংখ্যা অনুসারে প্রাপ্য প্রতিনিধিও দেওয়া হয় নাই।

হিন্দুর প্রতি অবিচার এইখানেই শেষ হয় নাই। আইনটা অনুসারে কাজ আরম্ভ করিবার আগে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে, নির্ব্বাচক যাহারা হইবে তাহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে বহু নিয়ম প্রণীত হইতেছে। এই সকল দ্বারাও হিন্দুদের প্রতি অবিচার করা হইতেছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :

সমগ্রভারতীয় কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উচ্চ কক্ষের (provincial upper house) প্রতিনিধিনির্ব্বাচকদের যোগ্যতা সম্বন্ধে বঙ্গের পক্ষে গবন্মেণ্ট এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন :—

পুরুষ।

সাধারণ (অর্থাৎ হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি অমুসলমান ও অখ্রীষ্টিয়ান)—প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগে—

জমীর খাজনা	২০০০ টাকা
সেস্	৫০০ টাকা

রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম
বিভাগে

জমীর খাজনা	১৫০০ টাকা
সেস	৩০০ টাকা

মুসলমান—

সমুদয় ডিভিজনে—

জমীর খাজনা	১৫০ টাকা
সেস	৫০ টাকা

স্ত্রীলোক।

সাধারণ (অর্থাৎ অমুসলমান ও অখ্রীষ্টিয়ান)—

সেই সব লোকদের স্ত্রীরা যাহারা বৎসরে প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগে

জমীর খাজনা দেয়	৭৫০০ টাকা
সেস দেয়	১৮৭৫ টাকা

রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে

জমীর খাজনা দেয়	৫০০০ টাকা
সেস দেয়	১৭৫০ টাকা

মুসলমান—

সেই সব লোকদের স্ত্রীরা যাহারা বৎসরে

সকল ডিভিজনে

জমীর খাজনা দেয়	৬০০ টাকা
সেস দেয়	১২৫ টাকা

ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে, যে, মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে খুব কম খাজনা ও সেস দিলেও তাহারা ও তাহাদের স্ত্রীরা তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবে। হিন্দুরা তাহার সমান টাকা দিলেও ত ভোট দিবার অধিকার পাইবে না, দুই তিন চারি পাঁচগুণ দিয়াও পাইবে না। এরূপ অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব সাতিশয় গর্হিত।

হিন্দুরা স্বরাজলাভের জন্য সমধিক আগ্রহান্বিত ও চেষ্টিত। [illegible] ইহা একটা অপরাধ নহে। যদি ইহা অপরাধ বিবেচিত [illegible] হইলেও তাহাদের প্রতি অবিচার দ্বারা তাহাদিগকে [illegible] প্রভুত্বের ভক্ত করা যাইবে, কোন ইংরেজ এরূপ মনে [illegible] থাকিলে তাহার মানবচরিত্রজ্ঞান অত্যন্ত কম। কোন ইংরেজ মনে করে, যে, হিন্দুরা মানুষ নহে, অতএব তাহাদের প্রতি অবিচার করিলেও তাহাদের কোন চিত্তবিকার জন্মিবে না, তাহা তাহার ভ্রম। যদি ইংরেজ বণিকরা মনে করে, হিন্দুদের প্রতি অবিচার করিলে তাহারা বিলাতী জিনিষ সমানই কিনিতে থাকিবে এবং সম্ভবতঃ বেশী কিনিবে, তাহা তাহাদের ভ্রম।

—

ইসলাম বিদেশী প্রভুত্বের অনুকূল কি না

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ব্যবহার লক্ষ্য করিলে মনে হইতে পারে, যে, ব্রিটিশজাতি মনে করে ইসলাম তাহার অনুচরদিগকে বিদেশীর প্রভুত্ব ভালবাসিতে শিখায়। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা বস্তুতঃ সেরূপ নয়। ইংরেজরা যে সকলেই এ বিষয়ে অজ্ঞ তাহা নহে। ষ্টুডেণ্ট ওয়ার্ল্ড (*Student World*) নামক পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় মিঃ এইচ ক্রেমার (Mr. H. Kraemar) একটি প্রবন্ধে ইসলাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন

> "In Islam, the absolute surrender of the servant, man, to the Sovereign, God, is inherently included in the vision of a society and a world ruled by the Law of Islam, which excludes any other Law.... The domination by peoples of a *foreign* religion is not only felt as politically or socially or morally hateful, it is repellent, because, religiously speaking, monstrous."

শেষ বাক্যটির তাৎপর্য্য দিতেছি।

"ইস্‌লামের মতে ভিন্ন ধর্ম্মীর প্রভুত্ব কেবল রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক বা নৈতিক দিক্ দিয়া বিদ্বেষার্হ নহে, ইহা বীভৎস ও বিরাগজনক, যেহেতু ধর্ম্মের দিক দিয়া বলিতে গেলে বিকট।"

—

বাঁকুড়া জেলায় অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ

কোথাও অন্নাভাবে মানুষ বিপন্ন হইলে সেই দুরবস্থাকে নাম যাহাই দেওয়া হউক, যদি বিপন্ন লোকেরা সাহায্য পায়, তাহা হইলেই সন্তোষের বিষয় হয়। সম্প্রতি খবরের কাগজে কেহ কেহ লিখিয়াছেন, যে, বাঁকুড়া জেলায় আর সাহায্য দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা সমগ্র জেলার বিষয় অবগত নহেন বলিয়াই এরূপ লিখিয়া থাকিবেন। এই জন্য আমরা কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে প্রত্যক্ষদর্শী সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিগণ যাহা স্বয়ং দেখিয়া-শুনিয়া লিখিয়াছেন, তাহা নীচে প্রকাশ করিতেছি। ইহা হইতে সর্ব্বসাধারণ বুঝিতে পারিবেন, যে, এখনও সাহায্যের খুব প্রয়োজন আছে।

—

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বাঁকুড়া সম্মিলনীর পরিদর্শনকারী কর্ম্মচারী ও সভ্যগণের রিপোর্ট

বাঁকুড়া জেলায় গত বৎসর সুবৃষ্টির অভাবে ভালরূপ শস্য না হওয়ায় গৃহস্থের সম্পূর্ণ খাবার জোগাড় ছিল না। তদুপরি এ বৎসরও যথাসময়ে বৃষ্টি না-হওয়ায় গত শ্রাবণ মাসের শেষ পর্য্যন্ত চাষ-আবাদ হয় নাই বলিলেই হয়। সেকারণ গত শ্রাবণ মাস হইতেই সাধারণ গৃহস্থ ও শ্রমজীবী সকলেরই তীব্র অন্নাভাব দেখিতে পাওয়ায় দুর্ভিক্ষ প্রশমনার্থে শ্রাবণ মাসে বাঁকুড়ার সরকারী কর্ম্মচারিগণ একটি রিলিফ কমিটী গঠন করেন এবং বেসরকারী রিলিফ কমিটীরও গঠন হয়। স্থানে স্থানে টেস্ট ওয়র্ক ও (test work ও) চলিতে থাকে। বাঁকুড়া সম্মিলনী একটি বেসরকারী রেজিষ্টারীকৃত সমিতি। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে জরুরি সাহায্যের জন্য আবেদন আসায় গত শ্রাবণ মাস হইতেই সম্মিলনী গঙ্গাজলঘাটী থানার চৌশাল কেন্দ্রে সাহায্য-কার্য্য আরম্ভ করেন।

এমন সময় শ্রাবণের শেষভাগে হঠাৎ দামোদরের বন্যা আসিয়া উত্তর বাঁকুড়াকে ধ্বংস করায় বন্যা- ও দুর্ভিক্ষ- জনিত অভাবের একটা ভয়ঙ্কর হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয় এবং সকলেই গৃহশূন্য অন্নবস্ত্রহীন ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ধাবমান হন। ধ্বংসকারী বন্যা-বিপ্লবের সঙ্গে বৃষ্টি হওয়ায় এই অসময়ের বৃষ্টি পাইয়াও অনেক চাষী ভাদ্র মাসে অনুপযোগী ধান-চারা রোপণ করিয়া কতক কতক জমিতে চাষ-আবাদ করেন। চাষী ভাবিয়াছিল কতক ধান্যও পাওয়া যাইবে কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ। তার পর আর বৃষ্টি না-হওয়ায় অনেক স্থানের অসময়ে রোপিত ধান্যও জল অভাবে মারা গেল। সুবৃষ্টি না-হওয়ায় অনেক স্থানে পুষ্করিণীতেও সম্পূর্ণ জলাভাব। কেহ কেহ খরচা করিয়া সেই সামান্য জল সেচন করিয়া ধান বাঁচাইতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ ধানই বাঁচিল না। শতকরা দশ বিঘার ধানও বাঁচিবে না। এদিকে চাষীর যাহা-কিছু ছিল নিঃশেষ হইয়া গেল।

বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশই ডাঙ্গা জমি, তাহাতে সাধারণতঃ আউশ কেলাশ ও নোয়ান ধান্য হয়। এই সব ফসল আশ্বিন কার্ত্তিকে কাটা হয়। কিন্তু এ বৎসর একেবারেই হইল না। অসময়ে ভাদ্র মাসে আমন ধান্য রোপণের পর আশ্বিন-কার্ত্তিকে বৃষ্টি না-হওয়ায় তাহারও আশা নাই। চাষী ছাড়া চাষে খাটিয়া খায় এমন মজুরদের লোকসংখ্যা প্রায় দুই-তিন লক্ষ। চাষের কাজের উপরই তাহাদের প্রাণধারণ নির্ভর করে। চাষের মাটি তৈয়ার, ধান্য রোপণ ও নিড়ান, ছেদন ও ঝাড়ান কার্য্যে বৎসরের অনেক সময়েই তাহারা খাটে। চাষ-আবাদ না হইলেই শুধু চাষী নয় এতগুলি মজুরও বেকার থাকে ও তাহাদের ভীষণ অন্নাভাব হয়। এই বৎসর তাহাই ঘটিয়াছে।

ভাদ্র মাসে আমন ধান্য রোপণের পর আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে আর বৃষ্টি না-হওয়ায় তাহারও আশা নাই। ঐ সকল শ্রমজীবীর পুনরায় ভীষণ অন্নাভাব হইয়াছে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ত কথাই নাই। সম্মিলনী চৌশাল কেন্দ্রে মাসাবধিকাল একটি রাস্তাতে প্রত্যেককে এক আনা হিসাবে মজুরী দিয়া কতকগুলির প্রাণরক্ষা করিতেছেন। তাহা ছাড়া শ্রাবণ মাস হইতে সাহায্য কার্য্য আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সাহায্য বিস্তার করিয়া কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়া—

মেজিয়া থানায় (১) রামচন্দ্রপুর ও (২) বানজোড় ইউনিয়নে—উত্তর গঙ্গাজলঘাটী থানায় (৩) বড়শাল (৪) নিত্যানন্দপুর (৫) পট্যাবনী (৬) পীড়রাবনি ইউনিয়নে, বড়জোড়া থানায় (৭) মালিয়াড়া (৮) বড়জোড়া ইউনিয়নে, ওন্দা থানায় (৯) জামজুড়ী (১০) রতনপুর ইউনিয়নে প্রায় ১৫০০ অসমর্থ ব্যক্তিকে গত সপ্তাহ পর্য্যন্ত সাহায্য দিয়াছেন। কোন কোন স্থানে সরকারী কর্ম্মচারী মারফৎ সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। কয়েকটি স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনও রিলিফ কার্য্য চালাইতেছেন। সাহায্য-কার্য্য চালাইবার জন্য বিশেষ অর্থের প্রয়োজন। সহৃদয় ব্যক্তির নিকট সাহায্য না পাইলে সম্মিলনীকে সাহায্য-কার্য্য বন্ধ করিতে হইবে। ফলে প্রাণহানির সম্ভাবনা। বহুস্থান হইতে করুণ আবেদন সম্মিলনীর নিকট আসিয়াছে, তাহার মধ্যে দু-একটার পরিচয় নিম্নে দিলাম। অর্থাভাবে সম্মিলনী সকল স্থানে উপস্থিত সাহায্য করিতে পারিতেছেন না।

এখানে একটু উল্লেখ করা আবশ্যক যে স্থানে স্থানে অসময়ে রোপিত যে সামান্য ধান্য জলসেচন দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে তাহার দ্বারা চাষীর দু-এক মাসের খোরাক হইতে পারে কেহ কেহ বলেন, এবং সেই সকল কার্য্যে সেই সে

স্থানে কতকগুলি শ্রমজীবীরও কিছু দিন খ.ট.লি মিলিতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্ত অভাবী গৃহস্থদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। সামান্য সামান্য ঐরূপ অসময়ে রোপিত ধান্যের অবস্থা দেখিয়া কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে এখনও তীব্র অন্নাভাব হয় নাই, কিন্তু তাহা ভ্রম। স্থানীয় চাষী ভিন্ন দানের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় কেহ দিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। এবিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ উত্থাপন করিলে অনশন-ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের আহারপ্রদানে বাধা দেওয়া হয় মাত্র।

সম্মিলনীর কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, উকিল, হাইকোর্ট, সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়, উকিল, আলিপুর, সভ্য শ্রীযুক্ত হরিপদ নন্দী, পত্তনীদার ও সভ্য, শ্রীযুক্ত সত্য-কিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসীর ম্যানেজার, ঐ সকল স্থান পরিদর্শনকালে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি স্কুল-মাষ্টার ইউনিয়নবোর্ড প্রেসিডেণ্ট ও সরকারী কর্ম্মচারিগণ, বাঁকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় ব্রাউন সাহেব সহ আলোচনা করিয়া বলেন—অনেক স্থানেই দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে। বিপন্ন লোকদের মৃত্যুর পূর্ব্বে সাহায্যের প্রয়োজন। মরিতে আরম্ভ করিবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না। সম্মিলনীর নিকট করুণ আবেদনের মধ্যে দু-একটার পরিচয় এই:—

ওন্দা থানার ৮ নং ইউনিয়নের ইউনিয়নবোর্ড প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্মিলনীর সভাপতির নিকট আবেদনপত্রে জানান—

"ওন্দা ৮ নং ইউনিয়নের জামজুড়ী প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে নিবেদন—১৩৪১ সালে সুবৃষ্টি হয় নাই। ১৩৪২ সালে বৃষ্টি হয় নাই, শতকরা পাঁচ বিঘা জমিও আবাদ হয় নাই, এখানকার সকলেই কৃষিজীবী, ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

"গত ভাদ্র মাসে ডিঃ বোর্ড এখানে টেস্‌ট রিলীফ ওয়ার্ক খুলিয়া প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালককে দৈনিক ক্রমে /১৫, /১০, /০ হিসাবে মজুরি দিয়া একটি প্রায় ৮ মাইল রাস্তা প্রস্তুত করিয়া ৮০০৲ খরচা করিয়াছেন। উপস্থিত শ্রমিকগণের কোন কার্য্য নাই। মধ্যবিত্ত দুঃস্থ পরিবার ভিক্ষা করিতে অক্ষম, সাহায্য করিতে না পারিলে অন্নাভাবে মারা যাইবার সম্ভাবনা। এখানে ইউনিয়ন বোর্ড দৈনিক প্রত্যেককে এক পোয়া হিসাবে চাউল দিয়া একটি সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তাহা বন্ধ হইয়াছে" ইত্যাদি।

ওন্দা কুমারডাঙ্গা নিবাসী, প্রবাসী অফিসের ম্যানেজার ও সম্মিলনীর সভ্য শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"এই দরখাস্তের বিবরণ সত্য। আমি জামজুড়ী গ্রামে গিয়াছিলাম এবং দুঃস্থগণের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। গ্রামের শ্রমজীবিগণ অর্থাভাবে খাইতে না পাইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া আসিয়াছি।" ১১।১৩৫

বাঁকুড়ানিবাসী পত্তনীদার ও সম্মিলনীর সভ্য শ্রীযুক্ত হরিপদ নন্দী মহাশয় ঐস্থানে সাহায্যের জন্য সম্মিলনীর প্রেরিত চাউলসহ গিয়া লিখিতেছেন—

"আমি জামজুড়ী গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে ধান্য আবাদ নাই বলিলেই হয়। আমি ৭/০ মণ চাউল দুই সপ্তাহের জন্য দিলাম। প্রতি সপ্তাহে ৩॥০ মণ চাউলে হইবে না, ক্রমশঃ বাড়াইতে হইবে। পুনরায় ধান্য না হওয়া পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে হইবে। অনেক ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপ মধ্যবিত্ত লোকের অভাব।"

বড়জোড়া থানার মালিয়াড়া ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট জমীদার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও মালিয়াড়া উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রসময় বিশ্বাস এবং বড়জোড়া ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাজলঘাটী থানার চৌশাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী যে-সকল আবেদনপত্র পাঠাইয়াছেন তাহাতেও তীব্র অন্নাভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

সম্মিলনীর কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এডভোকেট হাইকোর্ট, সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়, উকিল, আলিপুর, ও সভ্য শ্রীযুক্ত হরিপদ নন্দী বন্যা- ও দুর্ভিক্ষ- প্রপীড়িত স্থান পরিদর্শন কালে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, স্কুলশিক্ষক ও গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় এবং সরকারী কর্ম্মচারী সার্কেল অফিসারের সহিত আলোচনা করিয়া উপরে লিখিত তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সরকারী কর্ম্মচারীর হস্ত দিয়া বড়জোড়া ও পীড়রাবণি ইউনিয়নে সাহায্যও প্রেরণ করেন।

[উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কিংবা তাহার তাৎপর্য্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকেরা কৃপা করিয়া মুদ্রিত করিলে বিপন্ন লোকদের উপকার হইবে।—প্রবাসী সম্পাদক।]

—

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের মধ্যে বাংলার চর্চ্চা

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের মধ্যে বাংলার চর্চ্চা কিরূপে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই চিন্তিতব্য। এই বিষয়টির আলোচনা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের প্রত্যেক অধিবেশনে হইয়া থাকে। এই সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন আগতপ্রায়। বঙ্গের বাহিরে যাঁহারা এরূপ বিষয়ের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা সংক্ষেপে নিজ নিজ চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়া সম্মেলনে

উপস্থিত হইয়া তাহা পাঠ করিলে ভাল হয়। তাঁহারা স্বয়ং নব-দিল্লী যাইতে না পারিলে প্রবন্ধটি ডাকে পাঠাইয়া দিতে পারেন। পাঠাইবার ঠিকানা প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন-বিষয়ক সংবাদের মধ্যে দেওয়া আছে।

আমরা, অনেক দিন হইল, এই বিষয়ে রাঁচী হইতে এবং উড়িষ্যার ভদ্রক হইতে দুটি চিঠি পাইয়াছি। চিঠিগুলিতে কোন বাজে কথা নাই, কিন্তু দীর্ঘ বলিয়া প্রত্যেকটির অল্প অংশ মাত্র নীচে ছাপিতেছি। রাঁচীকে আমরা বঙ্গের বহির্ভূত মনে করিতে ক্লেশ পাই। তথাকার বাঙালীরা বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চা খুব করেন।

রাঁচী হইতে তথাকার বালিকা-শিক্ষাভবনের সেক্রেটরী ও শিশু-বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত লালমোহন ধর চৌধুরী লিখিয়াছেন :—

বহু চেষ্টার পর গত ১৯৩৪ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে বাঙ্গালী মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান আমরা স্থাপিত করিয়াছি। তাহাতে সম্প্রতি দুইটি ক্লাস খোলা হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পড়ান হইতেছে। কিন্তু বিপদ হইয়াছে স্কুলের রিকগ্নিশন (Recognition) লইয়া। দুই এক বৎসরের মধ্যেই এই স্কুলের ছাত্রীরা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত হইবে কিন্তু ইতিমধ্যে যদি স্কুলটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত না হয় তবে মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সমূহ অসুবিধায় পড়িতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদি অন্ততঃ ছাত্রীদিগকে বাংলা দেশে যাইয়া পরীক্ষা দেওয়ার দায় হইতে মুক্তি দিয়া তাহাদের স্ব স্ব প্রবাসে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন তবুও কতকটা সুবিধা হয়। প্রবাসে পরীক্ষা পরিচালনের লোকের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অনেক বড় বড় সরকারী চাকুরে, উকীল প্রভৃতি আছেন যাঁহারা অনায়াসে পরীক্ষা পরিচালনা করিতে পারেন। এই বিষয়ে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেজন্য স্বদেশবাসী মহাশয়গণকেই চেষ্টা করিতে হইবে।

যিনি ভদ্রক হইতে চিঠি লিখিয়াছেন তিনি তাঁহার নাম প্রকাশ করিবার অনুমতি দেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

আমাদের ভদ্রক শহরের অন্তর্গত বাউদপুর ও সখিয়া নামে দুইটি পল্লী আছে, তাহার অধিকাংশ অধিবাসীই বাঙ্গালী। সখিয়া গ্রামে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নীলাচল গমনের পথে বিশ্রাম করিয়াছিলেন ও উক্ত গ্রামের ৺মদনমোহন ঠাকুরের বাঙ্গালী সেবায়েৎ গোস্বামী-বংশ এখনও চৈতন্যদেবের ব্যবহৃত কাপা ও কাষ্ঠ-পাদুকা সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। উক্ত গ্রামে অনেক উচ্চপদস্থ ও ইংরেজীশিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি থাকিলেও তাঁহারা মিশ্রিত "কের." ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন ও উড়িয়া ভাষায় পাঠাভ্যাস করিয়া থাকেন। পুত্রকন্যাকে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষিত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও উৎসাহ সুযোগ ও অর্থাভাবে তাহাদের বাঙ্গালা শিখিবার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করিতে পারেন না। বাউদপুরের সংলগ্ন জানুগঞ্জ নামক গ্রামে বহু বাঙ্গালী তন্তুবায়ের বসবাস। কথিত আছে যে কৃষ্ণনগর অঞ্চল হইতে কোম্পানীর আমলে অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহারা এখানে পলাইয়া আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তাঁহারাও মিশ্রিত ভাষায় কথোপকথন ও উড়িয়া ভাষায় পাঠাভ্যাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাদান ও বাঙ্গালীভাবাপন্ন করিয়া করিয়া তোলা আবশ্যক। এই তিনটি গ্রাম সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া পরীক্ষাস্বরূপ ভদ্রককে কেন্দ্র করিয়া যদি বাঙ্গালা ভাষা প্রচারের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে সুফল হইবে আশা করি। ইঁহাদের মনোভাব এরূপ হইয়াছে যে ইঁহারা সহজে বাঙ্গালী সমাজে মিলামিশা করেন না। অথচ সংখ্যালঘিষ্ঠতাহেতু বৈবাহিক আদানপ্রদান এরূপ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে সে অতি নিকট আত্মীয়ের মধ্যেও বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিতে বাধ্য হইতেছেন। আমার মনে হয় এই পুনরুদ্ধারের (reclamation এর) কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই বেশী সুফলপ্রদ হইবে কারণ অন্তঃপুরে মহিলাদের সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলে আসল কার্য্য অনেক সুগম হইয়া আসিবে। জননীগণকে বাঙ্গালী করিতে পারিলে পুত্রকন্যাগণও বাঙ্গালী হইতে বাধ্য।

এই বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য যদি কলিকাতায় কোনও সংঘ গড়িয়া তুলিয়া তথা হইতে এখানে মহিলা-প্রচারক প্রেরণ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে আমার সাধ্যমত সাহায্য দান করিব। আমার বিষয় যদি কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, এ বিষয়ে আমি কি কি কার্য্য করিয়াছি জানা আবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের নিকট হইতে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

কংগ্রেসের পঞ্চাশৎবর্ষপূর্ত্তি উৎসব

আগামী ২৮শে ডিসেম্বর দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেসের পঞ্চাশৎবর্ষপূর্ত্তি উৎসব সম্পন্ন হইবে। উৎসব কি কার্য্যক্রম অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবে, আচার্য্য কৃপালানী সম্প্রতি তদ্বিষয়ে একটি নির্দ্দেশপত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে এই উৎসব সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, যে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে-সকল রাষ্ট্রনৈতিক দল বা কর্ম্মী কংগ্রেসে ছিলেন অথচ এখন নাই, ইহাতে তাঁহাদেরও নিমন্ত্রণ করা উচিত, শুধু বর্ত্তমান কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যেই ইহা আবদ্ধ রাখা উচিত নহে। আচার্য্য কৃপালানীও তাঁহার নির্দ্দেশপত্রে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে এইরূপ অনুরোধ জানাইয়াছেন।

কংগ্রেসের জুবিলি উপলক্ষ্যে নানারূপ সংগঠনমূলক কাজ ও আনন্দোৎসব ব্যতীত, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও সামাজিক নানাবিষয়সম্বন্ধে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কতকগুলি পুস্তকপুস্তিকাও ছাপা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ইহা সুখের বিষয়, যদিও অনেক পূর্ব্বেই ইহা হওয়া উচিত ছিল। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বা দুরভিসন্ধিশালী অনেক লোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা ও পুস্তকরচনা করিয়া বিদেশে প্রচার করিয়া আসিতেছে এবং তাহাতে নানাভাবে এ দেশের অনিষ্ট হইতেছে। কেন-না, এই সকল পুস্তকের অনেকগুলি অসত্য ও অর্দ্ধসত্যপূর্ণ ও একদেশদর্শী। গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে কয়েক বৎসর যাবৎ যে-সকল পুস্তিকা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহাও যে নির্ভুল নিরপেক্ষ, এমন নহে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে লিখিত পুস্তকগুলি যদি অভিজ্ঞ-

ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হয় ও বহুল পরিমাণে তৎসমুদয়ের প্রচারের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে দেশের ও বিদেশের লোকেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক খাঁটি তথ্য জানিতে পারিবে।

—

ইরাকপ্রবাসী ভারতীয়গণের বিপদ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে ইরাক হইতে সম্প্রতি এক জন ভারতীয় প্রবাসী ভারতীয়গণকে সেই দেশ হইতে তাড়াইবার চেষ্টার কথা জানাইয়া একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। এই চিঠি হইতে জানা যায়, যে, ইরাক গবর্মেণ্ট অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ীকে ইরাক ছাড়িয়া যাইবার জন্য তিন মাসের (কোন কোন ক্ষেত্রে আরও কম সময়ের) নোটিস দিয়াছেন। বসোরাস্থ ব্রিটিশ বাণিজ্যদূতের কাছে আবেদন করায় তাঁহার চেষ্টায় কোন কোন ক্ষেত্রে নোটিস তুলিয়া লওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার নোটিসও দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে প্রবাসী ভারতীয়দের মনে অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে। "লেবার প্রটেকশন" (শ্রমিক রক্ষা) আইন নামে একটি নূতন আইন শীঘ্রই জারি হইবে; তখন ভারতীয়দের দুর্গতি আরও বাড়িবে বলিয়া পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন।

ইরাক যে ভারতবর্ষের নিকট কত ভাবে ঋণী, এবং বর্ত্তমানেও যে ভারতবর্ষের নিকট ইরাক কত সুবিধা লাভ করিতেছে, পত্রপ্রেরক তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইরাক বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র রাজ্য। যে "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকা উক্ত পত্রপ্রেরকের তথ্যে কিছু কিছু ভ্রান্তি ও অতিরঞ্জন আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছে, সে কাগজও এ-কথা স্বীকার করিয়াছে যে, ভারতবর্ষই বলিতে গেলে ইরাকের মুক্তিদাতা। ৭০,০০০ ভারতীয় সৈনিক যুদ্ধ না করিলে ইরাকের বর্ত্তমানে স্বাতন্ত্র্যলাভ হয়ত ঘটিয়া উঠিত না। আর্থিক দিক দিয়াও ভারতবর্ষের তাহাতে কম ব্যয় হয় নাই। এই ত গেল অতীতের কথা। বর্ত্তমানেও প্রতি বৎসর কুড়ি-একুশ হাজার ভারতীয় মুসলমান তীর্থযাত্রী ইরাকে গিয়া ... লক্ষ টাকা ব্যয় করে, এবং ইরাক না গিয়া এখান হইতেও বহু সংখ্যক মুসলমান তথায় দানখয়রাতের জন্য প্রভূত অর্থ প্রেরণ করে। অযোধ্যার একটি রাজ হইতেই তিন লক্ষ টাকা ...। ভারতবর্ষে ইরাকের লোকদের সম্বন্ধে কোনো বিশেষ নিষেধ নাই। ইরাকীরা অবাধে এদেশে নানা প্রকারে ...জন করে। ব্যবসাবাণিজ্যের দিক দিয়াও ইরাক ...তের বাজারে অনেক লাভ করিয়া থাকে। ইরাকের ...ব ও অন্যান্য জিনিষ ভারতে অনেক বিক্রী হয়।

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত এই সমস্যা লইয়া ভারতীয় ...পক সভার অধিবেশন স্থগিত করিবার একটি প্রস্তাব আনিবেন বলিয়া নোটিস দিয়াছেন। ভারতবর্ষে অন্যদেশীয়দের অর্থাৎ অবশ্য মুখ্যতঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাহাতে কোনরূপ ভেদসূচক ব্যবস্থা না হইতে পারে, এজন্য যাঁহারা আটঘাট বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, অন্য দেশে ভারতবর্ষীয়দের বিরুদ্ধে তদ্রূপ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা কি বলেন, গবর্মেণ্টের উত্তর হইতে তাহা জানা যাইবে।

গবর্মেণ্ট এ পর্য্যন্ত ইরাক হইতে কিছু জানিতে পারেন নাই বলিয়া সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে।

—

রামমোহন শতবার্ষিকীর বৃত্তান্ত

আঠার শত তেত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে ১৯৩৩ সালে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে যে-সকল সভার অধিবেশন ও অন্যবিধ অনুষ্ঠান হয়, তাহার একটি বৃত্তান্ত বৃহৎ একখানি গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা যে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমরা যথাস্থানে ইহার পরিচয় দিতে পারিলাম না। এখানেও বিস্তারিত কিছু লিখিবার সময় ও স্থান নাই। সামান্য কিছু পরিচয় দিতেছি।

গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫৮, দ্বিতীয় অংশের ৫৬২; তদ্ভিন্ন ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সূচী আছে। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রবাসীর এক এক পৃষ্ঠার অন্ততঃ সমান লেখা আছে—অধিকাংশ স্থলে বেশীই আছে। অধিকাংশ লেখা ইংরেজীতে। বাংলাতেও অনেক লেখা আছে। চিত্রের সংখ্যা তের, তন্মধ্যে একখানি বহুবর্ণ। হস্তলিপির প্রতিলিপি ৪ খানি।

প্রথম ভাগে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও স্থানের সভা আদি অনুষ্ঠানের বৃত্তান্ত আছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের ও স্থানের অনুষ্ঠানসমূহ এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার অনুষ্ঠানগুলির বৃত্তান্ত ইহাতে আছে।

দ্বিতীয় ভাগে শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রবন্ধ, অভিভাষণ ইত্যাদি আছে। তৎপরে রামমোহনের সমসাময়িকদের তাঁহার সম্বন্ধীয় লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে। পরলোকগত ও জীবিত অন্য অনেক মনীষীর উক্তিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বশেষে শতাধিক অভিভাষণ, সংবাদপত্রাদির প্রবন্ধ প্রভৃতি আছে।

গ্রন্থখানিতে রামমোহন রায় সম্বন্ধে এত কথা ও এত মত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে তাহার একটি একটি করিয়া উল্লেখ করিতে গেলেও প্রবাসীর কয়েক পৃষ্ঠা লাগিবে।

রামমোহন রায় শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, বিশেষ পরিশ্রম করিয়া যত্নের সহিত এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়াছেন। ইহার মূল্য পাঁচ টাকা, ডাকমাশুলাদি এক টাকা। শতবার্ষিকীর সাধারণ কমিটির সভ্যদের জন্য মূল্য চারি টাকা। ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের জন্য মূল্য চারি টাকা এবং সাধারণ

কমিটির সভ্যদের জন্য সাড়ে তিন টাকা; ডাকমাশুলাদি আলাদা। ২১০-৬, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ঠিকানায় রামমোহন শতবার্ষিকীর সম্পাদকের নিকট পাওয়া যায়।

বাংলা লেখাগুলির মধ্যে আছে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভারত-পথিক রামমোহন রায়," মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের "রাজা রামমোহনের প্রভাব ও বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ," শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকারের "যুগসারথি রামমোহন," বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের "মুসলিম নারীর অব্য," শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর "উৎকৃষ্ট নমুনার মানুষ," শ্রীযুক্তা সরলা বালা সরকারের "নব্যবঙ্গগঠনে রামমোহনের প্রভাব," শ্রীযুক্তা সরোজিনী দত্তের "রামমোহনের তপস্যা," শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর "রামমোহন রায় ও বাংলা গদ্য," পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, এম্-এ-র "যোগক্ষেত্র ভারতের পূর্ণসাধক রামমোহন," এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রামমোহনের মত প্রাণবান হও"।

—

নব-দিল্লীতে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

আমরা নব-দিল্লীর প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন কার্য্যালয় হইতে নিম্নমুদ্রিত সংবাদগুলি পাইয়াছি।

"প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন এ বৎসর কাশীধামে হইবে, এরূপ কথা ছিল। কিন্তু কয়েকটি অপ্রত্যাশিত কারণে কাশীতে এবার সম্মেলনের অধিবেশন হওয়া সম্ভবপর হইল না। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে, উক্ত অধিবেশন আগামী বড়দিনের অবকাশে নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে।

"অধিবেশনের তারিখ এবং মূল সভাপতির নাম শীঘ্রই জানানো হইবে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, বৃহত্তর বঙ্গ, ললিতকলা, সঙ্গীত, শিক্ষাবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্মেলনের অঙ্গ হইবে। বাংলার এবং বাংলার বাহিরের যে-সকল মনীষী অধিবেশনে নেতৃত্ব করিবেন, তাঁহাদের নাম যথাসম্ভব শীঘ্র জানানো হইবে। একটি পৃথক মহিলা-বিভাগও থাকিবে। কোন বিদুষী মহিলা ইহার নেত্রীত্ব গ্রহণ করিবেন। এই উপলক্ষ্যে প্রত্যেক বাঙালীর শুভাগমন প্রার্থনীয়। সম্মেলনে পঠনীয় প্রবন্ধ ও কবিতা এবং প্রবাসী বাঙালীদের হিতকর প্রস্তাবাদি সাদরে গৃহীত হইবে। কোন বিষয় জানিতে হইলে মেজর শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আই-এম্-এস্, ৬নং অশোক রোড, নিউ দিল্লী—এই ঠিকানায় পত্র প্রেরিতব্য।"

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন আমাদের অতি প্রিয় প্রতিষ্ঠান। বঙ্গের রাজধানী ও ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কলিকাতায় ইহার অধিবেশনের পর ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজধানী নব-দিল্লীতে ইহার অধিবেশন হইতে যাইতেছে। কলিকাতায় বাঙালীর সংস্কৃতির পরিচয় সম্মেলন দিয়াছিলেন ও পাইয়াছিলেন। নব-দিল্লীতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে, আশা করিতেছি।

—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থানীয় বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচন

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্ব্ব চক্রের স্থানীয় বোর্ডের পাঁচজন সভ্যের নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রিজমোহন বিড়লা, শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রসাদ জৈন, শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মাড়োয়ারীদের বাহাদুরী আছে। দূর রাজপুতানা হইতে তাহারা বঙ্গে আসিয়া ব্যবসাবুদ্ধি, উদ্যোগিতা, শ্রমশীলতা ও জোট বাঁধিবার ক্ষমতার বলে বাঙালীদের মাতৃভূমিতে বাণিজ্যক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে এবং এরূপ বিত্ত, প্রতিপত্তি ও প্রভাবের অধিকারী হইয়াছে, যে, বহুপরিমাণে বাঙালীদের সাহায্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে প্রথম দুটি স্থান অধিকার করিয়াছে। বাঙালীদের সাহায্য বলিতেছি এই জন্য, যে, সর্ব্বপ্রথম আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই নির্ব্বাচন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ব্রিজমোহন বিড়লাকে ভোট দিবার জন্য সকল অংশীদারকে অনুরোধ করেন এবং, আমরা অবগত হইলাম, ধনী বাঙালী অংশীদাররা অনেকেই তাঁহাকেই ভোট দিয়াছিলেন। যোগ্য বাঙালী প্রার্থীদের প্রতিও অবশ্য আচার্য্য রায় তাঁহার কর্ত্তব্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা শ্রীযুক্ত ব্রিজমোহন বিড়লার অনুকূলে সুপারিশ করিবার পর। শেঠ বিড়লা যে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে অনেকগুলি তৃতীয় প্রেফারেন্স ভোট দিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। দ্বিতীয় প্রেফারেন্স ভোটগুলি তিনি শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রসাদ জৈনকে দিয়াছিলেন। ইনি নিজে কেবল একটি ভোট পাইয়াছিলেন কাগজে এইরূপ দেখিলাম। শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিড়লার ন্যায়, নিজের প্রাপ্ত প্রথম ভোটের জোরেই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

যাহা হউক, বাঙালীরা যে নিজ মাতৃভূমিতে পাঁচটির মধ্যে তিনটি পদও পাইয়াছে, তাহা মন্দের ভাল। পাঁচটিই তাহাদের পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ব্যাঙ্কিঙে বাঙালীরা যেরূপ হটিয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনটি স্থান পাওয়াও সৌভাগ্য বলিতে হইবে। বাঙালীরা মাড়োয়ারীদের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা করুন, যাহাতে ভবিষ্যতে ফল আরও ভাল হয়। যে তিন জন বাঙালী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

—

ইটালী ও আবিসীনিয়া

ইটালী ও আবিসীনিয়ার মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে আবিসীনিয়াকে অনেক অসুবিধার মধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে ও যুদ্ধ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। যুদ্ধের জন্য আধুনিক যে-সব অস্ত্রশস্ত্র আবশ্যক, আবিসীনিয়ায় তাহা প্রস্তুত হয় না। তাহা ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আমদানী করিতে হয়। পক্ষান্তরে ইটালীতে সেরূপ সামগ্রী অনেক প্রস্তুত হয় এবং স্থলপথে ও জলপথে তৎসমুদয় আমদানী করাও ইটালীর পক্ষে সহজতর।

এই উভয় দেশের মধ্যে যখন বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন ইটালী বিস্তর যুদ্ধসম্ভার সংগ্রহ করিয়া সৈন্যসমেত আফ্রিকায় চালান করিতেছিল, কিন্তু তখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা এবং অন্য কোন কোন অস্ত্রশস্ত্রনির্ম্মাতা দেশ নিরপেক্ষতার ওজুহাতে আবিসীনিয়াকে সে-সব জিনিষ বিক্রী করিতেছিল না। যখন ইউরোপের এই নিরপেক্ষ দেশগুলি আবিসীনিয়াকে অস্ত্রশস্ত্র যোগাইবার নিষেধ প্রত্যাহার করিল, তখন ইটালী আপাদমস্তক রণসজ্জায় সাজিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আবিসীনিয়া সেরূপ সজ্জিত হইবার সুযোগ পায় নাই। এই তথাকথিত নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বিলাতী দৈনিক ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা কার্ত্তিকের প্রবাসীর ১৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি।

ইউরোপ ও আফ্রিকার এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধে সুতরাং আবিসীনিয়ার পরাজিত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। যে-সব টেলিগ্রাম আসিতেছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইলে ইটালী খুব জিতিয়া চলিতেছে বলিতে হইবে। আজ ২৮শে কার্ত্তিক ইটালীর একটা বৃহৎ পরাজয়ের সংবাদ আসিয়াছে। ইহাতে ভারতীয় মাত্রেরই খুশী হইবার কথা। হাবসীরা খুব সাহসের সহিত লড়িতেছে। তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা পাইলে সমুদয় পরাধীন জাতি আনন্দিত হইবে। তাহাদের সম্রাট ও তাহারাও, আশা করি, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া, যন্ত্রনির্ম্মাণের বিদ্যা শিখিয়া এবং স্বদেশে দাসত্ব-প্রথা ও অন্যান্য কুরীতির উচ্ছেদ করিয়া ইউরোপীয় দেশসকলের সমকক্ষ হইতে ও থাকিতে চেষ্টা করিবে। রাশিয়ার প্রতিনিধি লিটভিনফ জেনিভায় যে বলিয়াছিলেন, যে, কোন দেশে কুপ্রথা থাকিলে ও তাহা কুশাসিত হইলেও অন্য দেশের তাহার স্বাধীনতা হরণ করিবার অধিকার নাই, তাহা সত্য। কিন্তু নৈতিক অধিকার অনুসারে ত প্রবল জাতিরা কাজ করে না। আত্মরক্ষায় সমর্থ যে-যে জাতি নহে, তাহাদের দেশ লোভনীয় হইলে প্রবল জাতিরা তাহা দখল করে। অতএব আত্মরক্ষার সামর্থ্য চাই, এবং সে সামর্থ্য নির্ভর করে প্রত্যেক জাতির জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রগতি, যন্ত্রনির্ম্মাণ-বিদ্যায় পারদর্শিতা, সামাজিক কুপ্রথাশূন্যতা ও সুপ্রথাশালিতা, এবং রাষ্ট্রিক সুশাসনের উপর। লীগ অব নেশ্যন্সের উপর ও শান্তিরক্ষার অনুকূল সন্ধি ও চুক্তির উপর নির্ভর করিলে চলে না। ইটালীকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থাসমূহ ১৮ই নবেম্বর আরম্ভ হইবে; কিন্তু আবিসীনিয়ার সম্রাট ও হাবসীরা স্বাধীনতাপ্রিয় ও সাহসী না হইলে এবং আবিসীনিয়া দেশটি পার্ব্বত্য ও অরণ্যসঙ্কুল না হইলে তৎপূর্ব্বেই ইটালী তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিত।

—

ডাঃ আম্বেদকরের ভয়প্রদর্শন

ডাঃ আম্বেদকর বোম্বাই অঞ্চলের "অস্পৃশ্য" ও অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের অন্যতম নেতা। তিনি এক সভায় বলেন, যে, হিন্দুসমাজে তাঁহারা সামাজিক অসাম্যে লাঞ্ছিত ও নানা অসুবিধাগ্রস্ত; অতএব যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহারা সামাজিক সাম্যের অধিকারী হইবেন, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহারা সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। ইহাতে কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক তাঁহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

অবনত ও অস্পৃশ্য শ্রেণী মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ও শিখদের মধ্যেও আছে। সুতরাং ঐরূপ কোন একটি ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই যে অবনত হিন্দুরা প্রকৃত সামাজিক সাম্য পাইবেন এমন মনে হয় না—বিশেষতঃ যখন কোন সমাজে মানুষের উচ্চ বা নীচ স্থান বহুপরিমাণে তাহার আর্থিক ও শৈক্ষিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। হিন্দু সমাজে বহুযুগ ধরিয়া অবনত শ্রেণীর লোকেরা লাঞ্ছিত ও নানা অধিকারে বঞ্চিত। সুতরাং তাহাদের ক্রুদ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। সেই জন্য এপর্য্যন্ত কয়েক কোটি হিন্দু অহিন্দু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আরও দশ-পনের হাজার অবনত হিন্দু মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান হইয়া গেলেই যে বাকী কয়েক কোটি অবনত হিন্দুর সামাজিক উন্নতি হইয়া যাইবে, ইহা সত্য নহে।

অবনত শ্রেণীর অধিকাংশ নেতা ডাঃ আম্বেদকরের ভয়প্রদর্শন নীতির সমর্থন করেন নাই। কিন্তু তিনি এখনও নাকি বলিতেছেন, হিন্দু মহাসভার পুনায় আগামী অধিবেশনে যদি জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত ও গৃহীত না হয়, তাহা হইলে তিনি সদলে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। এরূপ ধমকও ব্যর্থ। যদি হিন্দু মহাসভা সেরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও হিন্দু সমাজ অবিলম্বে তদনুসারে কাজ করিবে, মনে করি না। এরূপ পরিবর্ত্তন সময়সাপেক্ষ। তাহা বলিয়া আমরা ইহা বলি না, যে, সময়েই সব হইবে। মানুষকে চেষ্টা করিতে হইবে, তবে ফল ফলিবে। এখন আগেকার চেয়ে অনেক বেশী হিন্দু অস্পৃশ্যতার ও বংশগত অসাম্যমূলক জাতিভেদের অপকারিতা বুঝিয়াছেন। এখন সমগ্র হিন্দু সমাজকে দ্রুত শুভ পরিবর্ত্তন খুব ব্যাপকভাবে ঘটাইবার জন্য অবিরত সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন সম্বন্ধে সংবাদ

আমরা মনে করিয়াছিলাম, যে, যাহাকে যে পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, তাঁহার তাহা গ্রহণে সম্মতি অসম্মতি জানিয়া তবে আমরা তদ্বিষয়ক সংবাদগুলি প্রকাশ করিব। কিন্তু তাহার পর দেখিতেছি, কোন কোন সংবাদ খবরের কাগজে ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য আমরা আরও এতকগুলি সংবাদ নীচে দিলাম। কিন্তু সম্মেলনের সাধারণ সভাপতি ও ভিন্ন ভিন্ন শাখার সভাপতি হইবার জন্য কাহাকে কাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে তাহা আমাদের জানা থাকিলেও এখন ছাপিলাম না।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার হইয়াছেন। ডাঃ জ্ঞানদাকান্ত সেন, রায় বাহাদুর নিশিকান্ত সেন, রায় বাহাদুর দেবপতি দত্ত, রায় বাহাদুর সন্তোষ-কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ১৫ জন সহকারী সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। কর্ম্মসংঘের অধিনায়ক হইয়াছেন রায় বাহাদুর অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এবং সহকারী সভানায়ক শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার সেনগুপ্ত; প্রধান কর্ম্মসচিব মেজর অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আই-এম-এস; প্রচার-বিভাগের অধিনায়ক এসোসিয়েটেড্ প্রেসের শ্রীযুক্ত উমানাথ সেন। ইহা ছাড়া কাজের সুবিধার জন্য এবং বহু ব্যক্তির সহযোগিতা পাইবার জন্য আটটি সব-কমিটি গঠিত হইয়াছে।

আমরা সম্মেলনের সম্পূর্ণ সাফল্য আশা করিতেছি।

অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী

গত মাসে পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভীর মৃত্যু হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়, তিব্বতীয় ও চৈনিক প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। এই সকল বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ তাঁহার সমসাময়িক কেহ

ছিলেন না। তিনি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন, এবং তাহার প্রারম্ভিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। যে-সব ভারতীয় ছাত্র পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বিভাগে শিক্ষালাভ করিতে যাইত, তিনি তাহাদিগকে যে কেবল শিক্ষা দিতেন তাহা নহে, থাকিবার জায়গা এবং ন্যায্য কম মূল্যে তাহারা যাহাতে ভাল আহার্য্য পায়, যত্নপূর্ব্বক তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া দিতেন। তাঁহার পত্নীকেও ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি সস্নেহ

সিলভাঁ লেভী

ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। একবার অধ্যাপক লেভী সস্ত্রীক কলিকাতায় তাঁহার এক ছাত্রের সহিত দেখা করিতে আসেন। যখন কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন মাডাম লেভী একটি শিশুর পা বিছানা হইতে বাহির হইয়া আছে দেখিয়া তাহাকে আনিতে বলেন। কোলে লইয়া "আমি দিদিমা হই" বলিয়া তাহাকে আদর করেন। এই বাংলা কথাগুলি তিনি শান্তিনিকেতনে থাকিতে শিখিয়াছিলেন। শিশুটির তখনও কথা বুঝিবার বয়স হয় নাই।

—

জাপানের অধ্যাপক য়োনেজিরো নোগুচী

জাপানের কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক য়োনেজিরো নোগুচী ইংরেজী কবিতা ও অন্যান্য রচনার দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজী শিক্ষা প্রধানতঃ আমেরিকায় হয়। তিনি কলিকাতা

জাপানের অধ্যাপক য়োনেজিরো নোগুচী

বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে বক্তৃতা দিতে আসিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভও হইয়া গিয়াছে। প্রথম বক্তৃতাতে তিনি প্রাচ্য—বিশেষতঃ জাপানী—ও প্রতীচ্য কবিতা সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করেন। তিনি অন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা করিবেন। ভারতবর্ষের দ্রষ্টব্য নানা স্থান এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বহু কীর্ত্তিও তিনি দেখিবেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের সহিত জাপানের বহু শতাব্দীর সম্পর্ক। বুদ্ধগয়া তিনি দেখিবেন। জাহাজ হইতে নামিয়াই তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে বলেন, "আমি শিখিতে আসিয়াছি, শিখাইতে আসি নাই। সন্তান তাহার মাতাকে শিখাইতে পারে না।"

তিনি তাঁহার ভারত আগমন সম্বন্ধে কয়েক মাস পূর্ব্বে আমাদিগকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, যে, তিনি রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রবাসীর সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত গোল্ডেন বুকে কবিকে অর্ঘ্য দিয়াছিলেন। পরের চিঠিতে আমাদিগকে এক জন প্রসিদ্ধ জাপানী চিত্রকর সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন। তাহা মডার্ণ রিভিয়ুর নবেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর তিনি আমাদিগকে নিজের যে ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এখানে মুদ্রিত হইল।

—

ভারতবর্ষ

"চাউতালন" উৎসব—

ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আমহার্ষ্ট' জেলার মৌলমিন শহর হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে চাউতালন নামক একটি গ্রাম আছে। তাহা মৌলমিন-আমহার্ষ্ট' নামক যে দীর্ঘ রাজপথ আছে তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত।

চাউতালন-পূজার একটি স্ত্রীলোক

এই লোকটির সমস্ত শরীর শলাকাবিদ্ধ হইয়া ছত্রাকার ধারণ করিয়াছে

চাউতালন মন্দিরের দৃশ্য

এই চাউতালনে হিন্দুদের একটি প্রাচীনমন্দির আছে, মন্দিরটি প্রায় তিন শত ফুট উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মন্দিরে উঠিবার একটি ভাল সিঁড়ি ও যাত্রীদের সুবিধার জন্য মধ্যে মধ্যে বিশ্রামাগারও আছে। চৈত্র-সংক্রান্তিতে একটি মেলা হয়। মন্দির হইতে প্রায় সওয়া মাইল দক্ষিণে "বিনহ্লাইন" (Binhlin) নামক একটি পবিত্র সরোবর আছে। তাহাতে যাত্রীরা স্নান করিয়া নিজকে পবিত্র মনে করে। যাহারা মন্দিরে পূজা দিতে আসে তাহারা প্রায়ই সেখানে স্নান করিয়া মন্দিরে পূজা দিতে যায়। ইহা কেবল হিন্দুদের নিকট পবিত্র নয়, ইহা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকটও পবিত্র, বৌদ্ধরা ইহার 'তীরে মন্দির নির্ম্মাণ' করিয়া ইহার পবিত্রতার সাক্ষ্য দিতেছেন। বৌদ্ধদের বিশ্বাস যে এখানে

CUTEX
Natural
LIQUID POLISH
CUTEX
LIQUID POLISH

দৈত্যরা বাস করে। তাই তাহাদের রমণীগণ নিজেদের মঙ্গলের জন্য এই মন্দিরে পূজা দেয়।

বৎসরান্তে এখানকার উৎসবে বহুলোকের সমাগম হয়। চাউতালনের পাহাড়ের নিম্নে বিশ্রামাগার আছে ও উৎসবের সময় অনেক অস্থায়ী বিশ্রামাগার নির্ম্মিত হয়; পানীয় জলের অসুবিধা থাকায় বহু ধনী লোক সেইখানে পানীয় জল দান করিয়া যাত্রীদের অসুবিধা দূর করেন।

এ মন্দিরে পূজারও একটি বিশেষত্ব আছে—বয়স্ক ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই হলুদে রঙের কাপড় পরিয়া সোনা ও রূপার শলাকা নিজ জিহ্বা ও উভয় গালে বিদ্ধ করিয়া আসে; আবার কেহ কেহ সমস্তশরীরে ছোট বড় লোহার শলাকা বিদ্ধ করিয়া নিজ বুকে ও পিঠে বঁড়শি দ্বারা নারিকেল ইত্যাদি ঝুলাইয়া পূজা দিতে আসে—ইহা দেখিলে মনে হয় সত্যই বুঝি ইহারা দৈত্যরাজের পূজা করিতে যাইতেছে।

মৌলমিনে সন্তরণবীর প্রফুল্লঘোষ—

গত জুন মাসে সন্তরণবীর প্রফুল্ল ঘোষ সিঙ্গাপুর যাইবার পথে মৌলমিনে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টীমার ঘাটে বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত হন। ঘোষ মহাশয় ২৫এ জুন মঙ্গলবার রুকমানন্দ বাগানে চব্বিশ ঘণ্টা হাতে শিকল পরিয়া সাঁতার কাটিয়াছিলেন। শহরের নিকটবর্ত্তী অন্য কোনও স্থানে জলের সুবিধা না থাকায় তাঁহাকে শহর হইতে প্রায় চার মাইল দূরে গিয়া সাঁতার কাটিতে হয়। স্থানটি শহর হইতে দূরে থাকা সত্ত্বেও সহস্র সহস্র নরনারী

প্রফুল্ল ঘোষ বিশ ঘণ্টা সাঁতারের পর

সেখানে সমবেত হইয়া প্রফুল্লবাবুকে উৎসাহিত করেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার, সেসন জজ, সিভিল সার্জ্জন প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীযুত পঞ্চানন ভৌমিক, শ্রীযুত ধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় সাঁতারু ও ডুবুরীদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা হইয়াছিল।

চাউতালন উৎসব ও সন্তরণের ফোটোগ্রাফগুলি শ্রীঅজেন পুরকায়স্থ-কর্ত্তৃক গৃহীত।

প্রভাতী সঙ্ঘ—

পাটনাস্থ প্রবাসী বাঙালী ছাত্র-সমিতি প্রভাতী সঙ্ঘ নামে পরিচিত। এই সঙ্ঘ কর্ত্তৃক একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পক্ষ হইতে শ্রীযুত ধীরেন্দ্রমোহন চৌধুরী প্রতিযোগিতার ফলাফল এইরূপ জানাইয়াছেন,—

প্রবন্ধ: শ্রীশান্তি বসু (রেঙ্গুন), মঙ্গলময় নন্দী (কলিকাতা), পুষ্পলতা গুহ (পূর্ণিয়া)

সন্তরণ দেখিতে সমবেত জনতা

ছবি আঁকা: আদিনাথ মুখোপাধ্যায় (পুরুলিয়া)

কবিতা: সমীরকুমার ঘোষ, অবন্তীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পাটনা), বিজলী শীল, সুশীল লাহা (কলিকাতা)

গল্প (ছাত্রীদের): লক্ষ্মী সিংহ (পাটনা)

ইহা ব্যতীত ঢাকার শ্রীমতী রাবেয়া খাতুনকে একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। ইনি সকল বিভাগেই বেশ ভাল লেখা ইত্যাদি পাঠাইয়াছেন।

নিম্নলিখিত কয়েকজন প্রভাতী সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন—অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ সেন, ডক্টর সুবিমল সরকার, শ্রীযুক্তা বনলতা দে (গার্লস্ স্কুলের অধ্যক্ষ), শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মিত্র, অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার পি. আর. এস. ও শ্রীযুক্ত রথীন হালদার।

প্রফুল্ল ঘোষ ও গোল্ডম্যান, কাষ্ট্রো প্রভৃতি সাঁতারুগণ

বাংলা

ডাক্তার প্রভাসচন্দ্র বসু—

তরুণ নৃতত্ত্ববিৎ ডাক্তার প্রভাসচন্দ্র বসু, এম্-বি., এম্-এস-সি., পি-আর-এস মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বি-এস্‌সি. ও এম্-এস্‌সি পরীক্ষা সসম্মানে ও সর্ব্বপ্রথম হইয়া উত্তীর্ণ

ন। এই স্বল্পস্থায়ী জীবনে ডাঃ বসু পোষ্টগ্রাজুয়েট, জুবিলি, বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গবর্ন্মেণ্ট রিসার্চ স্কলারশিপ, বহু সুবর্ণপদক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রভাসচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার দাশগুপ্ত, এম-এসসি

...র সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের সহিত ... বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং নৃতত্ত্ববিষয়ক তাঁহার বহু গবেষণা-... প্রবন্ধ সুধীসমাজে সমাদৃত হইয়াছে।

...লোকে ক্ষত্রিয় নেতা পঞ্চানন বর্ম্মা।—

রংপুরের পঞ্চানন বর্ম্মার পরলোকগমনে রাজবংশী ক্ষত্রিয়সমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। 'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা' ইঁহারই সম্পাদকতায় ১৩১৩ হইতে ১৩১৮ সন পর্য্যন্ত প্রকাশিত ও সাহিত্যিক সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল। তাঁহার প্রচেষ্টায় উত্তরবঙ্গের

ক্ষত্রিয়সমাজের নানাবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। ১৯২০ সাল হইতে বহুবর্ষ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন এবং অন্যান্য নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিতও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

পঞ্চানন বর্ম্মা

কৃতী প্রবাসী বাঙালী ছাত্র—

শ্রীপ্রভাতকুমার দাস হাজরা ১৯৩১ সালে ভূতত্ত্ববিদ্যায় উচ্চশিক্ষা-লাভার্থ জয়পুর রাজ্য হইতে একটি বৃত্তি লইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের

শ্রীপ্রভাতকুমার দাস হাজরা

অন্তর্ভুক্ত ইম্‌পীরিয়াল কলেজ অব সায়ান্স এণ্ড টেক্‌নলজিতে প্রবেশ করেন এবং সাধারণতঃ যে পাঠক্রম সমাপ্ত করিতে চারি বৎসর লাগে তাহা তিন বৎসরে শেষ করিয়া এ-আর-সি-এস্‌ ও বি-এসসি (জিয়লজি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ভবানীপুর শাখা—

দেশের আর্থিক উন্নতির সহিত ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচালিত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে ভবানীপুরে একটি শাখা খুলিয়াছেন, ইহা সুসংবাদ।

শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার দাশগুপ্ত, এম-এসসি, এই শাখার এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরিচালনায় উত্তরোত্তর এই শাখাটির শ্রীবৃদ্ধি হইবে আশা করি।

বয়নশিল্পী ফণীভূষণ দত্ত—

ত্রিপুরা কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয়ের দক্ষ বয়নশিল্পী ফণীভূষণ দত্ত কিছুকাল পূর্ব্বে পরলোকগমন করিয়াছেন। শিল্পোন্নতির জন্য তিনি বহুবিধ প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন; তন্মধ্যে আসামপ্রদেশে পাটশিল্পের প্রচলনের উদ্যোগ ও হবিগঞ্জ শহরে একটি বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদেশ

বিদেশে বাঙালী সুধীর সম্মান—

জার্ম্মেনীর সুপ্রসিদ্ধ 'ডয়েশ আকাডেমি'র সিনেটের গত বার্ষিক সভায় সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা করেসপণ্ডিং মেম্বর (corresponding member) নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

উক্ত আকাডেমি জার্ম্মেনীতে বিবিধ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সহায়তার জন্য ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগকে কয়েকটি বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ডক্টর তারকনাথ দাসের পঞ্চাশৎবর্ষপূর্ত্তি উৎসব উপলক্ষে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে ঐ সকল বৃত্তির একটি অতঃপর তারকনাথ দাস-দম্পতী বৃত্তি বলিয়া অভিহিত হইবে। ভারতবর্ষ ও জার্ম্মেনীর মধ্যে সংস্কৃতিগত সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধির জন্য ডক্টর দাসের প্রচেষ্টাকে স্মরণীয় করিবার জন্য এই বৃত্তি।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সুরের মোহ

শ্রীশৈলেন্দ্রভূষণ দে

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৪২

৩য় সংখ্যা

হাটে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে
অস্ত-সমুদ্রে সদ্য স্নান ক'রে।
মনে হ'ল, স্বপ্নের ধূপ উঠছে
নক্ষত্রলোকের দিকে।
মায়াবিষ্ট নিবিড় সেই স্তব্ধ ক্ষণে—
—তার নাম করব না—
সবে সে চুল বেঁধেছে, পরেছে জাফরাণী রঙের শাড়ি,
খোলা ছাদে গান গাইছে একা।
আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম পিছনে
ও হয়তো জানে না, কিম্বা হয়তো জানে।

ওর গানে বলছে সিন্ধু কাফির সুরে—
—চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে
ডাকব না ফিরে ডাকব না,
ডাকি নে তো সকালবেলার শুকতারাকে।

শুনতে শুনতে স'রে গেল সংসারের ব্যাবহারিক আচ্ছাদনটা,
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরলো
অগোচরের অপরূপ প্রকাশ ;
তার লঘু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে ;
অপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘনিঃশ্বাস,
দুরূহ দুরাশার সে অশ্রুত ভাষা।

একদা মৃত্যুশোকের বেদমন্ত্র
তুলে ধরেছে বিশ্বের আবরণ, বলেছে—
পৃথিবীর ধূলি মধুময়।
সেই সুরে আমার মন বললে,—
সঙ্গীতময় ধরার ধূলি।
আমার মন বললে,—
মৃত্যু, ওগো মধুময় মৃত্যু,
তুমি আমায় নিয়ে চলেছ লোকান্তরে
গানের পাখায় ॥

আমি ওকে দেখলেম—
যেন নিকষবরণ ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে
অরুণবরণ পা-দুখানি ডুবিয়ে বসে আছে অপ্সরী,
অকূল সরোবরে সুরের ঢেউ উঠেছে মুহুমুহু,
আমার বুকের কাঁপনে কাঁপন-লাগা হাওয়া
ওকে স্পর্শ করেছে ঘিরে ঘিরে ॥

আমি ওকে দেখলেম,
যেন আলো-নেবা বাসরঘরে নববধূ,
আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তায়
দেহের সমস্ত শিরা স্পন্দিত।
আকাশে ধ্রুবতারার অনিমেষ দৃষ্টি,
বাতাসে সাহানা রাগিণীর করুণা ॥

আমি ওকে দেখলেম
ও যেন ফিরে গিয়েছে পূর্ব্বজন্মে
চেনা অচেনার অস্পষ্টতায়।

সে যুগের পালানো বাণী ধরবে ব'লে
ঘুরিয়ে ফেলছে গানের জাল,
সুরের ছোঁওয়া দিয়ে খুঁজে খুঁজে ফিরছে
হারানো পরিচয়কে ॥

সমুখে ছাদ ছাড়িয়ে উঠেছে বাদামগাছের মাথা,
উপরে উঠল কৃষ্ণচতুর্থীর চাঁদ।
ডাকলেম নাম ধ'রে।
তীক্ষ্ণ বেগে উঠে দাঁড়াল সে,
ভ্রূকুটি ক'রে বললে, আমার দিকে ফিরে,—
"এ কী অন্যায়
কেন এলে লুকিয়ে"
কোনো উত্তর করলেম না।
বললেম না, প্রয়োজন ছিল না এই তুচ্ছ ছলনার।
বললেম না, আজ সহজে বলতে পারতে, এসো,
বলতে পারতে,—খুশী হয়েছি।
মধুময়ের উপর পড়ল ধূলার আবরণ ॥

পরদিন ছিল হাটবার।
জানলায় ব'সে দেখছি চেয়ে।
রৌদ্র ধূ ধূ করছে পাশের খোলা ছাদে।
তার স্পষ্ট আলোয় বিগত বসন্ত রাত্রের বিহ্বলতা
সে দিয়েছে ঘুচিয়ে।
নির্ব্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠেবাটে,
মহাজনের টিনের ছাদে,
শাক্‌সব্‌জীর ঝুড়ি চুপ্‌ড়িতে,
আঁটিবাঁধা খড়ে,
হাঁড়িমালসার স্তূপে,
নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে।
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল
মহানীম গাছে ফুলের মঞ্জরীতে ॥

পথের ধারে তালের গুঁড়ি আঁকড়ে উঠেছে অশথ,

অন্ধ বৈরাগী তারি ছায়ায় গান গাইছে হাঁড়ি বাজিয়ে

—কাল আসব ব'লে চলে গেল

আমি যে সেই কালের দিকে তাকিয়ে আছি।—

কেনাবেচার বিচিত্র গোলমালের জমিনে

ঐ সুরের শিল্পে বুনে উঠ্‌ছে

যেন সমস্ত বিশ্বের একটা উৎকণ্ঠার মন্ত্র—

"তাকিয়ে আছি।"

একজোড়া মোষ উদাস চোখ মেলে

বয়ে চলেছে বোঝাই গাড়ি,

গলায় বাজছে ঘণ্টা,

চাকার পাকে পাকে টেনে তুলছে কাতর ধ্বনি।

আকাশের আলোয় আজ যেন মেঠো বাঁশির সুর মেলে দেওয়া।

সব জড়িয়ে মন ভুলেছে।

বেদমন্ত্রের ছন্দে

আবার মন বললে—

মধুময় এই পার্থিব ধূলি।

কেরোসিনের দোকানের সামনে

চোখে পড়ল একজন এ-কেলে বাউল।

তালিদেওয়া আলখাল্লার উপরে

কোমরে-বাঁধা একটা বাঁয়া।

লোক জমেছে চারদিকে।

হাসলেম, দেখলেম অদ্ভুতেরও সঙ্গতি আছে এইখানে,

এ-ও এসেছে হাটের ছবি ভর্ত্তি করতে।

ওকে ডেকে নিলেম জানলার কাছে,

ও গাইতে লাগল—

হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে,

সবাই ধরে টানে আমায়, এই যে গো এইখানে॥

শান্তিনিকেতন

২৫ অক্টোবর, ১৯৩৫

ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে (১৩৪২) ভাষাশিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতামূলক একটি প্রবন্ধ পড়ে মনে হ'ল নিম্নলিখিত পত্র দুখানি সময়োপযোগী। তাই প্রবাসীতে পাঠানো গেল।

১

এম, এ, আজ্জানকে লিখিত।

সবিনয় নিবেদন,

সর্ব্বপ্রথমে ব'লে রাখি আমার স্বভাবে এবং ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশেরই অগৌরব ব'লে মনে ক'রে থাকি।

ভাষামাত্রেরই একটা মজ্জাগত স্বভাব আছে, তাকে না মানলে চলে না। স্কট্‌ল্যাণ্ডের ও ওয়েল্‌সের লোকে সাধারণত আপন স্বজন-পরিজনের মধ্যে সর্ব্বদাই যে-সব শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকে তাকে তারা ইংরেজী ভাষার মধ্যে চালাবার চেষ্টামাত্র করে না। তারা এই সহজ কথাটি মেনে নিয়েছে, যে, যদি তারা নিজেদের অভ্যস্ত প্রাদেশিকতা ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে চালাতে চায় তা হ'লে ভাষাকে বিকৃত ও সাহিত্যকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলবে। কখনো কখনো কোনো স্কচ্‌ লেখক স্কচ্‌ ভাষায় কবিতা প্রভৃতি লিখেছেন কিন্তু সেটাকে স্পষ্টতঃ স্কচ্‌ ভাষারই নমুনা স্বরূপে স্বীকার করেছেন। অথচ স্কচ্‌ ও ওয়েল্‌স্‌ ইংরেজের সঙ্গে এক নেশনের অন্তর্গত।

আয়রল্যাণ্ডে আইরিশে ব্রিটিশে ব্ল্যাক্‌ এণ্ড ট্যান্‌ নামক বীভৎস খুনোখুনি ব্যাপার চলেছিল কিন্তু সেই হিংস্রতার উত্তেজনা ইংরেজী ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে নি। সেদিনও আইরিশ কবি ও লেখকেরা যে ইংরেজী ব্যবহার করেছেন সে অবিমিশ্র ইংরেজীই।

ইংরেজীতে সহজেই বিস্তর ভারতীয় ভাষার শব্দ চলে গেছে। একটা দৃষ্টান্ত jungle—সেই অজুহাতে বলা চলে না, তবে কেন অরণ্য শব্দ চালাব না! ভাষা খামখেয়ালি, তার শব্দ-নির্ব্বাচন নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা বৃথা।

বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসী আরবী শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু যে সব পারসী আরবী শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা হয়তো কোনো এক শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্ব্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলে নি, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল।

উর্দ্দু ভাষায় পার্সী ও আরবী শব্দের সঙ্গে হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দের মিশল চলেছে—কিন্তু স্বভাবতই তার একটা সীমা আছে। ঘোরতর পণ্ডিতও উর্দ্দু লেখার কালে উর্দ্দুই লেখেন, তার মধ্যে যদি তিনি 'অপ্রতিহত প্রভাবে' শব্দ চালাতে চান তা হ'লে সেটা হাস্যকর বা শোকাবহ হবেই।

আমাদের গণশ্রেণীর মধ্যে য়ুরেশীয়েরাও গণ্য। তাঁদের মধ্যে বাংলা লেখায় যদি কেউ প্রবৃত্ত হন এবং বাবা মা শব্দের বদলে পাপা মামা ব্যবহার করতে চান এবং তর্ক করেন ঘরে আমরা ঐ কথাই ব্যবহার ক'রে থাকি তবে সে তর্ককে কি যুক্তিসঙ্গত বলব? অথচ তাঁদেরকেও অর্থাৎ বাঙালী য়ুরেশীয়কে আমরা দূরে রাখা অন্যায় বোধ করি। খুশী হব তাঁরা বাংলা ব্যবহার করলে কিন্তু সেটা যদি য়ুরেশীয় বাংলা হয়ে ওঠে তা হ'লে ধিক্কার দেব নিজের ভাগ্যকে। আমাদের ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে ওঠে তবে এর অভিসম্পাত আমাদের সভ্যতার মূলে আঘাত করবে। ইতি ১১ চৈত্র ১৩৪০।

ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

শ্রীযুক্ত আলতাফ্ চৌধুরীকে লিখিত।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

"রূপরেখায়" তোমার চিঠিখানা প'ড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা চল্‌ছে তার মতো বর্ব্বরতা আর হ'তে পারে না। এ যেন ভাইয়ের উপর রাগ ক'রে পারিবারিক বাস্তুঘরে আগুন লাগানো। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখেছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত নিজের দেশ-ভাষাকে পীড়িত করবার উদ্যোগ কোনো সভ্য দেশে দেখা যায় নি। এমনতর নির্ম্মম অন্ধতা বাংলা প্রদেশেই এত বড় স্পর্দ্ধার সঙ্গে আজ দেখা দিয়েছে ব'লে আমি লজ্জা বোধ করি। বাংলা দেশের মুসলমানকে যদি বাঙালী ব'লে গণ্য না করতুম তবে সাহিত্যিক এই অদ্ভুত কদাচার সম্বন্ধে তাঁদের কঠিন নিন্দা ঘোষণা ক'রে সান্ত্বনা পেতে পারতুম। কিন্তু জগতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশপ্রসূত এই মূঢ়তার গ্লানি নিজে স্বীকার না ক'রে উপায় কি? বেলজিয়মে জনসাধারণের মধ্যে এক দল বলে ফ্লেমিশ, অন্য দল ফরাসী; কিন্তু ফ্লেমিশভাষী লেখক সাহিত্যে যখন ফরাসী ভাষা ব্যবহার করে, তখন ফ্লেমিশ শব্দ মিশিয়ে ফরাসী ভাষাকে আবিল ক'রে তোলবার কথা কল্পনাও করে না। অথচ সেখানকার দুই সমাজের মধ্যে বিপক্ষতা যথেষ্ট আছে। উত্তর-পশ্চিমে, সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাব নেই। সে সকল প্রদেশে অনেক হিন্দু উর্দ্দু ব্যবহার ক'রে থাকেন, তাঁরা আড়াআড়ি ক'রে উর্দ্দু ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অসঙ্গতভাবে মিশল করতে থাকবেন, তাঁদের কাছ থেকে এমনতর প্রমত্ততা প্রত্যাশা করতে পারি নে। এ রকম অদ্ভুত আচরণ কেবলই কি ঘটতে পারবে বিশ্বজগতের মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশে? আমাদের রক্তে এই মোহ মিশ্রিত হ'তে পারল কোথা থেকে? হতভাগ্য এই দেশ, যেখানে ভ্রাতৃবিদ্রোহ দেশবিদ্রোহে পরিণত হয়ে সর্ব্বসাধারণের সম্পদকে নষ্ট করতে কুণ্ঠিত হয় না। নিজের সুবুদ্ধিকে কলঙ্কিত করার মধ্যে যে আত্মাবমাননা আছে দুর্দ্দিনে সে কথাও মানুষ যখন ভোলে তখন সাংঘাতিক দুর্গতি থেকে কে বাঁচাবে? ইতি ১৭ই বৈশাখ, ১৩৪১।

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৃষিকার্য্য-পরিচালনার আধুনিক প্রণালী*

শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি-এসসি

১। কৃষিকার্য্যে যন্ত্রের ব্যবহার

পশুপক্ষী-প্রতিপালন এবং জমির চাষ—এই দুইটি লইয়া মনুষ্য-সভ্যতার উৎপত্তি। অবশ্য এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি আগে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় নাই। খুব সম্ভব, জমির চাষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন কোন জন্তু প্রতিপালিত হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জমির চাষের সঙ্গেই যে মানবসভ্যতা অধিকতর সংশ্লিষ্ট তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

মনুষ্য-সভ্যতার প্রথম যুগে কৃষিকার্য্যে যে-সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হইত বর্ত্তমানে তাহার বহু উন্নতি হইয়াছে সেই সকল পুরাতন যন্ত্র আজকাল সাধারণতঃ মিউজিয়মে দেখান হয়। কৃষিকার্য্যের একটি আদিম যন্ত্র হইতেছে

* শ্রীমান্ সত্যপ্রসাদ সর্ তারকনাথ পালিত বৃত্তি লইয়া বিখ্যাত রথামষ্টেড্ (Rothamsted) কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া উন্নত কৃষিপদ্ধতি শিক্ষা করিতেছেন। আমার অনুরোধে তিনি তত্রস্থ জ্ঞানলব্ধ কয়টি প্রবন্ধ দিতেছেন।—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

খনন-যষ্টি। এই খনন-যষ্টির সাহায্যে সহজেই জমির ভিতর হইতে বৃক্ষের শিকড় উৎপাটন করা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণ এখনও এই প্রকার যষ্টি ব্যবহার করিয়া থাকে। ফিজি ও দক্ষিণ-আফ্রিকার আদিম অধিবাসিগণ ঝোপ ও উইয়ের ঢিপি পরিষ্কার করিবার জন্য এই যষ্টি এখনও ব্যবহার করিয়া থাকে।* খনন-যষ্টির পরের অবস্থা হইতেছে কোদাল। পৃথিবীর অনেক জায়গায় আদিম অধিবাসিগণ কোদালকে মৃত্তিকাখনন এবং কৃষিকার্য্যে কর্ষণ-স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। সভ্যজগতে কৃষিকার্য্যে উহা কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। তবে বাগানে চাষ করিবার পক্ষে কোদাল খুব সুবিধাজনক যন্ত্র।

বিজ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে জমি চাষ করিবার জন্য ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে। অবশ্য এই সকল যন্ত্র পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমভাবে
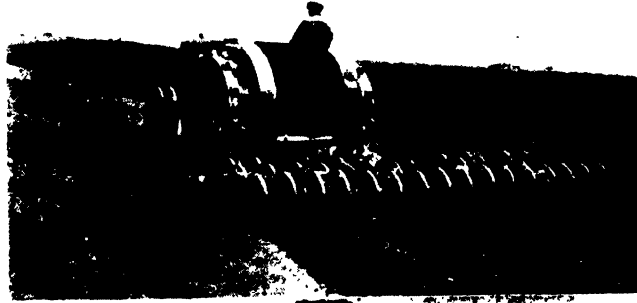
আধুনিক মোটর-লাঙ্গল

মোটর চালিত আধুনিক সুবৃহৎ বীজবপন-যন্ত্র

আধুনিক শস্যচ্ছেদন-যন্ত্র
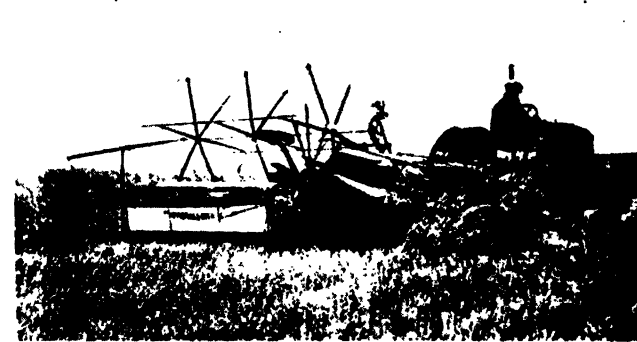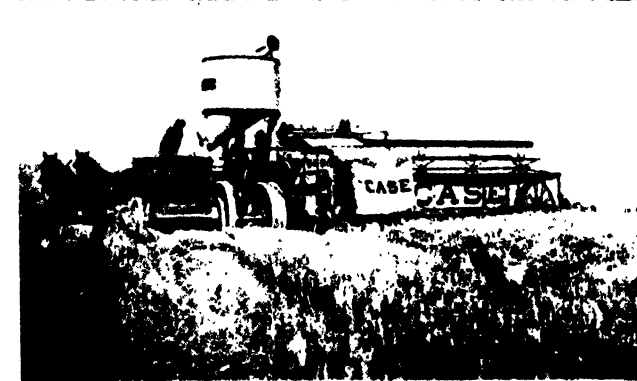
আধুনিক শস্যসংগ্রাহক-যন্ত্র। ইহার সাহায্যে যুগপৎ শস্যচ্ছেদন এবং শস্যের দানাগুলি খড় হইতে পৃথক করা সম্ভব

রাশিয়াতে এরোপ্লেনের সাহায্যে বীজবপন প্রণালী

* এখনও "ভুমিয়া" চাষ ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড় অঞ্চলে বর্ত্তমান দেখা যায়।

অষ্ট্রেলিয়াতে ঘোটক-চালিত চক্রাকৃতি লাঙ্গলের সাহায্যে জমিতে চাষ দেওয়া হইতেছে

কৃষিকার্য্যে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধা এই যে, যন্ত্রপাতি সহজেই ব্যবহার করা যায় এবং কৃষক জমির অবস্থা বুঝিয়া ইচ্ছামত সময়ে যন্ত্রের চালনা করিতে পারে। বলা বাহুল্য, যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিকার্য্য খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়—তিন জন কৃষকে প্রায় বিয়াল্লিশ জন কৃষকের সমান কাজ করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া নির্ব্বিশেষভাবে কৃষিকার্য্যে ট্রাক্টর, রোটারী টিলার এবং নানাবিধ শস্যসংগ্রাহক যন্ত্রের ব্যবহার বর্দ্ধিত করিলে অদূর ভবিষ্যতে বেকারের সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে। ভারতবর্ষের পক্ষে কৃষিকার্য্যে যন্ত্রবাহুল্যের বিরুদ্ধে এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কেননা ভারতবর্ষে চাষের জন্য জমির আয়তনের তুলনায় কৃষক-সম্প্রদায়ের সংখ্যা খুব বেশী। হাঙ্গেরীর কৃষক সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পাদক ইম্‌রে রোথ্‌মায়ার (Imre Rothmeyer) হাঙ্গেরীর সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলিয়াছেন।* কিন্তু ইংলণ্ড, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে, যেখানে চাষের জমির তুলনায় কৃষকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, সেই সকল দেশে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক। এই সকল দেশে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত অনেক প্রকারের যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। অবশ্য ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে যে-সকল মোটর-লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়, তাহা ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে উপযোগী নহে, কারণ শীতপ্রধান দেশের মোটর-লাঙ্গলের এঞ্জিনের উত্তাপ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সহজে শীতল হইবে না। তা ছাড়া আরও একটি ভাবিবার কথা আছে। এদেশে কৃষকদের ক্ষেত্রগুলির পরিমাণ সাধারণতঃ খুব কম এবং ঐ সকল ছোট ছোট ক্ষেত্রের পক্ষে মোটর-লাঙ্গল আদৌ ব্যবহৃত হইতেছে না। ভারতবর্ষে চাষীরা বলদের সাহায্যে লাঙ্গল চালনা করিয়া জমিতে চাষ দেয়। ইউরোপে এবং অষ্ট্রেলিয়ার অনেক জায়গায় ঘোড়ার দ্বারা লাঙ্গল পরিচালনা করিয়া জমিতে চাষ দেওয়া হয়। উপরের চিত্র হইতে এই ভাবে জমি কর্ষণ করিবার প্রণালীর খানিকটা আভাস পাওয়া যাইবে। এই ছবিতে অষ্ট্রেলিয়ার একটি বৃহদায়তন গমের ক্ষেত্র কি প্রকারে একসঙ্গে অশ্বদ্বারা পরিচালিত অনেকগুলি লাঙ্গলের সাহায্যে কর্ষিত হয় তাহা দেখান হইতেছে।

ক্যানাডা, আমেরিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশে আজকাল এঞ্জিন-চালিত মোটর-লাঙ্গল অথবা ট্রাক্টর দ্বারা জমি চাষ করা হয়। লাঙ্গলের সাহায্যে জমি কর্ষিত হইবার পর জমির ঢেলাগুলি ভাঙিয়া উঁচুনীচু স্থানগুলি সমতল করিয়া দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে সাধারণতঃ মই অথবা বিঁদের দ্বারা ইহা করা হয়। এই সকল যন্ত্র বলদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং বলা বাহুল্য বিশেষ আয়াসসাধ্য, যদিও ছোট ছোট ক্ষেত্রের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ক্যানাডাতে সুবৃহৎ দীর্ঘতৃণাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তর ব্যাপিয়া গমের চাষ করা হয় এবং এঞ্জিন-পরিচালিত ট্রাক্টর দ্বারা কি প্রকারে একসঙ্গে কর্ষণ এবং জমির ঢেলা ভাঙিয়া সমতল করা হয় অন্যত্র চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল। এই বিপুল শক্তিশালী মোটর-লাঙ্গলের সহিত অনেকগুলি ধাতুনির্ম্মিত ধারাল দাঁত সংযুক্ত থাকে। তাহারা ঢেলাগুলিকে ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেয়।

* International Congress for Scientific Management, London, 1935, Agricultural Section Papers, p. 2— "Unemployment would suffer an increase if the use of harvesting machines became more general In Hungary the harvest is reaped by manual labour."

কার্য্যকরী নহে। উপরিউক্ত প্রভৃত শক্তিশালী কৃষিযন্ত্রাদি কেন যে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয় নাই তাহার আরও একটি প্রধান কারণ হইতেছে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা। ভারতবর্ষের ভূমি বিশেষ কঠিন নহে, এবং এই সকল কোমল ভূমিতে চাষ করিবার জন্য শক্তিশালী কৃষিযন্ত্রাদির অভাব ও আবশ্যকতা কখনও অনুভূত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের কৃষকেরা "চাষা" বলিয়া চিরকাল সমাজের নিকট অবনত হইয়া আছে। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায় জমিদারবর্গের নিকট হইতে তাহারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের জন্য কদাচিৎ কোনও সাহায্য পাইয়া থাকে।

কৃষিযন্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশেরই কর্ত্তৃপক্ষীয়দের কতকগুলি বিষয় ভাবা উচিত :—

১। যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় ব্যাপার এবং অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে অধিকতর শক্তিশালী যন্ত্রের উদ্ভাবন।

২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যক্ষেত্রের মালিকেরা যাহাতে অল্প খরচে কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা এবং এই উদ্দেশ্যে যৌথব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন।

৩। কৃষক-সম্প্রদায়কে সাধারণভাবে যন্ত্রবিদ্যা শিখান আবশ্যক।

৪। স্থান ও অবস্থা বিশেষে কৃষিকার্য্যের পদ্ধতি ও কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার শৃঙ্খলাবদ্ধ করা প্রয়োজন।

৫। দেশবিশেষে কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করিলে কি প্রকার সামাজিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি লইয়া সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১। কৃষিযন্ত্রের প্রসার ও উন্নতিসাধন :—ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অল্পব্যয়ে অধিকতর কার্য্যকরী কৃষিযন্ত্রের উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা হইতেছে এবং এই প্রকারে কৃষিযন্ত্রগুলি ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী এবং কার্য্যক্ষম হইতেছে। আজকাল অনেক জায়গায় কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত শকটাদির চাকাতে বায়ুপূর্ণ রবারের নল ব্যবহার করা হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই উপায়ে যন্ত্রাদি বাবদ ব্যয় শতকরা ৩০৲ টাকা কমাইতে পারা যায়। আজকাল শুষ্ক ঘাসাদি ঘোড়া গরু প্রভৃতি জন্তুর পক্ষে আহারোপযোগী করিয়া রাখিবার জন্য অধিকতর উন্নত প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কৃষকদিগের মধ্যে ইহার ব্যবহার ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। গোময়, গোমূত্র, অশ্ববিষ্ঠা প্রভৃতি গৃহজাত সার ক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার জন্য নূতন নূতন উন্নত প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে। জার্ম্মেনীতে কৃষিযন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য উচ্চশ্রেণীর ইস্পাতের ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে।

জমিকর্ষণ, শস্যবপন, শস্যকর্ষণ প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের জন্য ট্রাক্টর, রোটারি টিলার প্রভৃতি উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলির উন্নতিসাধন বিভিন্ন উপায়ে করা সম্ভব। কোন স্থলে এক ফালি (one furrow) লাঙ্গলের বদলে তিন অথবা চারি ফালির লাঙ্গল ব্যবহার করা প্রয়োজন। কখন বা ভূমিকর্ষণ, শস্যবপন এবং সার-বিতরণ পর-পর একই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়। অনেক সময়ে যন্ত্রের কার্য্যকারিতা বর্দ্ধিত করিবার জন্য উহার গতিশক্তি বাড়াইয়া দেওয়া দরকার। শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে যন্ত্রকে এরূপ উপাদানে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক যাহাতে উহা ভূমিকর্ষণের উপযোগী বল ধারণ করিতে পারে। কারণ যে লাঙ্গল ঘণ্টায় দুই মাইল জমির চাষে উত্তমরূপে সাহায্য করিতে পারে তাহাদের দ্বারা ঘণ্টায় চারি মাইল জমির চাষের জন্য চেষ্টা করিলে পূর্ব্বের মত সন্তোষজনক ভাবে জমির চাষ হইবে না। এইরূপ স্থলে এঞ্জিনীয়রদিগের গবেষণা কৃষিকার্য্যে প্রভূত উপকারে আসিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইউরোপের অধিকাংশ দেশে, আমেরিকা ও ক্যানাডায় সকল প্রকার কৃষিকার্য্যের জন্য ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী এঞ্জিনের ব্যবহার হইতেছে এবং যে-সকল স্থানে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার বিশেষ ব্যয়-সাপেক্ষ নহে সেই সকল স্থানে বৈদ্যুতিক মোটরের ব্যবহার কৃষিযন্ত্রের পরিচালনাকে বিশেষ সহজসাধ্য করিয়াছে। নিম্নে কতকগুলি আধুনিক কৃষিযন্ত্রের চিত্র দেখান হইল।

২। কৃষিযন্ত্রের প্রচলনের জন্য যৌথ ব্যবসায়ের উপকারিতা :—অনেক সময়ে ছোট ছোট ক্ষেত্রের মালিকদিগের পক্ষে আধুনিক কৃষিযন্ত্রাদি উপকারী হইলেও বহুব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এই সকল স্থানে ভাল বন্দোবস্ত থাকিলে একই যন্ত্রের সাহায্যে কয়েক জন

কৃষক উপকৃত হইতে পারে। এই জন্য যেখানে অনেক দরিদ্র কৃষক কাছাকাছি জায়গায় বসবাস করে সেখানে কৃষিযন্ত্রের ব্যবহারের জন্য কোন প্রকার যৌথ ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা বিশেষ ফলপ্রদ হইবে। ভারতবর্ষের পক্ষে এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

৩। কৃষক-সম্প্রদায়কে সাধারণভাবে যন্ত্রবিদ্যা শিখান আবশ্যক :—যন্ত্র-ব্যবহারের একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে, যদি হঠাৎ কোন যন্ত্র বিকল হয় তাহা হইলে উহাকে পুনরায় কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য উপযুক্ত কারিগরের প্রয়োজন। কিন্তু কৃষকদিগের মধ্যে যদি যন্ত্রের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকে তাহা হইলে অন্ততঃ ছোট ছোট মেরামতি কাজ তাহারা নিজেরাই করিতে পারে। ইহার জন্য বড় বড় জমিদারীতে একটি করিয়া বিচক্ষণ কারিগর রাখা এবং গবর্ন্মেণ্টের তরফ হইতে কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষিযন্ত্র-বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারের জন্য সম্পূর্ণ সুবিধা করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

৪। স্থান- ও অবস্থা-বিশেষে প্রচলিত কৃষিকার্য্যের পদ্ধতি ও কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার শৃঙ্খলাবদ্ধ করা দরকার :—ক্ষেত্র আয়তনে ছোট হইলে অনেক সময়ে ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজ-বপন, শস্যচ্ছেদন প্রভৃতি কার্য্য কৃষক-পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এইরূপ স্থলে যন্ত্রের ব্যবহারে কৃষকের কোন সুবিধার সম্ভাবনা নাই, কারণ যদিও ইহাতে কৃষক, কৃষকপত্নী ও পরিবারভুক্ত অন্যান্য লোকের কায়িক পরিশ্রম কিছু লাঘব হইতে পারে কৃষকের পক্ষে ইহা বিশেষ ব্যয়সাধ্য হইবে। তবে এইরূপ স্থলে যন্ত্র ব্যবহার করিয়া কৃষক যদি অনেক বেশী ফসল অথবা অল্প শ্রমে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শস্য উৎপন্ন করিতে পারে, তবেই যন্ত্র-ব্যবহার সমর্থন করা যায়।

যেখানে জমিদারী বড় এবং কৃষিক্ষেত্রগুলি খুব প্রশস্ত, সেখানে কোন প্রকার শস্যোৎপাদনের জন্য যন্ত্র ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ঐ শস্য সম্বন্ধে নানা স্থানের ফলাফল বিশেষ-ভাবে পরীক্ষা করা উচিত। অবশ্য কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে বিভিন্ন স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শস্যবপনের সময় ও কৃষিকার্য্যের প্রণালী বিবেচনা করা আবশ্যক।

বলা বাহুল্য, কৃষিযন্ত্রের বিস্তারের জন্য সকল দেশেই গবর্ন্মেণ্টের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, কৃষিকার্য্যে রাশিয়াতে নূতন যুগ আসিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাশিয়াতে সমস্ত কৃষিকার্য্য রাজসরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। রাশিয়ার অনেক জায়গায় আজকাল এরোপ্লেনের সাহায্যে বিস্তৃত উর্ব্বর জমির উপরে বীজ বপন করা হয়। ৬ নং চিত্রে তাহা দেখান হইল।

৫। কৃষিযন্ত্র-ব্যবহারের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ :—অধিকাংশ স্থলেই কৃষকদিগের মধ্যে আধুনিক কৃষিযন্ত্র-ব্যবহারের প্রচলন না-হওয়ার প্রধান কারণ—কৃষক-দিগের দারিদ্র্য। ভারতবর্ষ, হাঙ্গেরী প্রভৃতি অনেক দেশে কৃষিক্ষেত্রের আয়তনের তুলনায় কৃষিকর্ম্মীদিগের সংখ্যা খুব বেশী। এই সকল দেশে সাধারণ কৃষিকার্য্যে আধুনিক কৃষিযন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার আরম্ভ করিলে বেকারের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে—যাহা সামাজিক মঙ্গলের দিক হইতে আদৌ বাঞ্ছনীয় হইবে না।

তৃষ্ণা
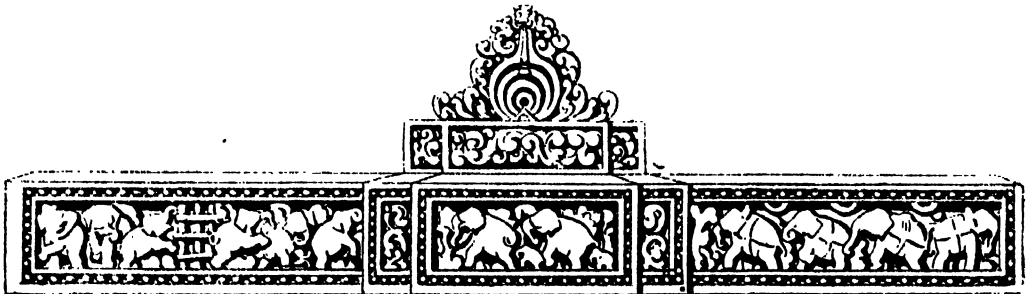
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ মাসের সকাল।

শেষরাত্রি হইতে বৃষ্টি নামিয়াছে। আকাশের পানে চাহিয়া মনে হয়, দিন-কয়েক ধরিয়া এই বর্ষণের বিরাম হইবে না। পাড়াগাঁর রাস্তা; গ্রীষ্মে যেখানে ছিল হাঁটুভোর ধূলা, বর্ষায় সেখানে জমিয়াছে পা-পিছলানো কাদা। যে-কয় জন এই দারুণ দুর্যোগে কাজের দায়ে পথে বাহির হইয়াছে, অকরুণ দেবতার উদ্দেশে তাহারা উচ্চকণ্ঠেই শাপান্ত করিতেছে। কিন্তু খড়ো ঘরের দাওয়ায় বসিয়া হরিশ ঘোষ যে-কোলাহল জমাইয়াছে তাহার স্বরে বৃষ্টির শব্দ, মেঘের ডাক ও পথচারীর মন্তব্য ডুবিয়া গিয়াছে।

হরিশের অভিযোগ অনেক। এক দফা দেবতার উদ্দেশে, এক দফা মানুষের আর এক দফা অদৃষ্টের বিরুদ্ধে। মাটির দেওয়াল, খড়ের চালা বছর কতক পূর্ব্বের ছাওয়া। দুখানি মাত্র ঘর; ঘরের কোলে দাওয়া। দাওয়ার খানিকটা ধ্বসিয়া উঠানে গিয়া মিশিয়াছে। জীর্ণ চালার উপরেও দেবতার কোপটা যেন বেশী। কয়েক জায়গায় জল পড়িতেছে। যেখানটায় বেশী জল পড়িতেছে সেখানে দুর্গা বহুকালের পুরাতন এক পিতলের বোক্‌নো পাতিয়া দিয়াছে; টুং টাং শব্দে তাহার উপর জল পড়িতেছে। ছেলে-মেয়েগুলির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। কেহ মা বাপের নিষেধ না মানিয়া ছাঁচতলায় দিয়াছে মাথা পাতিয়া, কেহ সরু বাখারি দিয়া জল ভর্ত্তি বোক্‌নোয় জলতরঙ্গ বাজাইতেছে।

বড় ছেলে ফণি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতেছে,

আয় বৃষ্টি চেপে—

ধান দেব মেপে—

হরিশ ছেলেদের আনন্দ দেখিয়া যেন ক্ষেপিয়া গেল। টপ্ করিয়া ফণির কান ধরিয়া মুখ ভেংচাইয়া বলিল,—বড্ড গোলাভরা ধান ঘরে, নয়? হারামজাদাকে সেই থেকে বলছি,—যা, যা, দুটো শসা তুলে নিয়ে আয়—গেরাহ্যি নেই?

দশ বছরের ছেলে। ধৃতকর্ণ হইয়া ও বাপের এবম্বিধ মন্তব্য শুনিয়া দমিল না। সমান তেজে মুখ বিকৃত করিয়া কহিল,—তুমি যাও না, বুড়ো মিন্সে।

—কি, যত বড় মুখ নয়—তত বড় কথা! তোর ছেলের নিকুচি করেছে—

কিন্তু আস্ফালনই সার। উদ্যত চড়ের অবস্থা হইল—ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভের মত। অভয়া-মূর্ত্তিতে দুর্গা সন্তানের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন।

—তা মন্দ কি ব'লেছে! বুড়ো মিন্সে নিজে যাও না। নিজের নেই এক কড়ার যুগ্যতা, ছেলেকে ক'রছেন শাসন?

নিষ্ফল আক্রোশে হরিশও গর্জ্জন করিতে ছাড়িল না,—আমি যাব? আমি? যাবার উপায় থাকলে ওর খোশামোদ করি? হঠাৎ দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া পা ছাড়াইয়া দিল।—দেখ দেখি পায়ের তলাটা। পরশু ভূঁই থেকে কুমড়ো আনতে গিয়ে গেল বাব্‌লা-কাঁটা ফুটে। তোলবার অবসর পেলাম না। এক ব্যাটা যাচ্ছিল পথ দিয়ে। বললে, 'কতয় কিনলেন'

বললাম, 'এক আনা।'

বললে, 'ঠকেছেন। হাটে ওর চেয়ে সুবিধে পেতেন, বড়-জোর তিন পয়সা। আপনার এতটা পথ হাঁটাই সার ঘোষ-মশায়।

মনে মনে বললাম, লাভ যা আমিই জানি, কিন্তু লোকসানটা ওই পায়ের ব্যথা।

কাঁটা তখন চামড়ার মধ্যে। বাড়ি এসে নরুণ দিয়ে কাঁটা তুলে চুণ দিলে লেপে, এখন পা পাততে পারছি নে।

—যেমন অসাবধানী, তেমনি ফল। জিনিষ আনতে গেলে একটু হুঁস থাকা দরকার। তা যাক, ওকে শসা আনতে কোথায় পাঠাচ্ছিলে?

—হিল্লী-দিল্লী নয়, ওই বোসেদের বাড়ি। পরশু দেখলাম মাচা-ভর্ত্তি নধর শসা ফলে রয়েছে।

দুর্গা বলিল, যদি দেখতে পায় ?

—হাঁ, দেখতে পাবে! ঘরের পেছন দিকে বাগান। চিতের বেড়া দেওয়া—দিব্যি ডিঙিয়ে যাবে।

—উঁচু মাচা, যদি নাগাল না পায় ?

—কি যে বল, মাচা বড়-জোর আমার গলা-সমান। ওঃ, ত ক্ষণে—বাঁ-হাত তুলে দাঁড়া।

ছেলেকে টানিয়া হরিশ সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল। —দেখলে ত ?

দুর্গা হাসিয়া বলিল, তাই বুঝিয়ে বল, না ধমক-ধামক। যা ত বাবা, যে-ক'টা পারিস নিয়ে আয়। আমি চট্ ক'রে দু-খোলা চাল ভেজে ফেলি।

ফণি বলিল, বাঃ রে, সেদিন সন্ধ্যেবেলায় যাই নি বুঝি ? বেড়া ডিঙিয়ে যেমন মাচার কাছে গেছি অমনি ভুষণো এসে কঞ্চি দিয়ে সপাসপ্ সপাসপ্…এই দেখ না পিঠটায় হাত দিয়ে।

দুর্গা তার পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল,—দূর বোকা, অমন সময় যেতে আছে ? দেখতে পাবে যে। আজ যে বৃষ্টি, আস্তে আস্তে গিয়ে চার দিক না দেখে বেড়া গলাবি। ওদের ঘরের পেছনে জানালা নেই, কেউ দেখতে পাবে না।

ছেলে চলিয়া গেলে হরিশ বলিল,—আজ খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

দুর্গা হাত নাড়িয়া বলিল, আমারও ত মনে হ'চ্ছে ইলিশ-মাছ-ভাজা খাই। কিন্তু সেই কথায় বলে না,—

মুরোদের নেই সীমে—
রথ দিয়েছে নিমে।

আমাদের হয়েছে তাই। ঘরে যে ডাল নেই।

অগত্যা হরিশ চুপ করিল।

* * *

শসা আসিবার আগেই আসিল একখানি পত্র। সাদা কাপড় দিয়া ছাওয়া ছাতা মাথায় পিওন পথ দিয়া যাইবার সময় দাওয়ার উপর চিঠিখানা ফেলিয়া দিল।

পথের পরেই বাড়ির সীমানা, কোথাও বেড়া বা প্রাচীরের চিহ্ন নাই, কাজেই ঘর-বার সমান। এদিকটায় লোকের বসতি কম ও পিছন দিকে খানিকটা জঙ্গল বলিয়া ইহাদের আলাপ-আলোচনা কাহারও কর্ণগোচর হয় না।

চিঠিখানা হাতে করিয়া হরিশ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া খানিক চাহিয়া রহিল। এমন অঘটন এ-বাড়িতে বছর-তিনেকের মধ্যে ঘটে নাই। অবশ্য দাদা যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, মাসের প্রথমে পিওন আসিয়া মনিঅর্ডার দিয়া যাইত। টাকার সঙ্গে মিলিত—এক চিলতা কুপন, তাহাতে থাকিত—শুধু লাইন-দুই জড়ানো লেখায় কুশল প্রশ্ন ও আশীর্ব্বাদ। তার পর তাঁরই মৃত্যু-সংবাদ বহিয়া এক দিন আসে একখানি পোষ্টকার্ড। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে পড়িয়া সেখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের খামের মধ্যে যে ছাপানো কার্ড আসিয়াছিল—ঘর খুঁজিলে সেখানা এখনও মিলিতে পারে, কিন্তু হাতে-লেখা চিঠি—একখানিও নাই।

বিস্ময় কাটাইয়া হরিশ পত্র পড়িতে লাগিল। ওদিকে দাওয়ায় ওপাশে উনান জ্বালিয়া দুর্গা খোলা চাপাইয়া চাল ভাজিতেছে। পিওনের হাঁকে পিছন ফিরিয়া একবার এদিকে চাহিয়াই আপন কাজে মনোনিবেশ করিল। চিঠি পড়িয়া স্বামী যে তাহাকে ডাকিয়া এখনই সমস্ত কথা বলিবে এ দৃঢ় প্রত্যয় তাহার ছিল। কলহে বা আনন্দে দু-জনে দিবসরাত্রির দণ্ডে দণ্ডে যে কোলাহল তুলিয়া থাকে তাহা একান্তভাবে উভয়েরই উপভোগের জিনিষ। পিছনের ওই বসতিহীন স্বল্প জঙ্গলাবৃত পোড়ো জমির পটভূমিতে সামনের খোলা রাস্তার দিকে মুখ করিয়া ভগ্নগৃহের দাওয়ায় বসিয়া ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল দাম্পত্য আলাপে যে নীরব মুহূর্ত্তগুলি মুখর হইয়া উঠে সে যেন এই অপরূপ প্রতিবেশেরই সামগ্রী। নিকটে কোন প্রতিবেশী নাই, স্বগতোক্তিতে দুর্গা তাহার অভাব পূরণ করিয়া লয়। স্বামী যখন বাহিরে থাকে দুর্গা দাওয়ায় বসিয়া উচ্চকণ্ঠে আপন পিতৃবংশের ও শ্বশুরকুলের মহিমাকীর্ত্তন করিয়া হয়ত আকাশকে শোনায়, পিছনের বনকে শোনায় ও সামনের পথকে শোনায়। স্বামী বাড়ি আসিলে সেই মহিমার আলো ধিক্কারে নিবাইয়া সে শাপাগ্নি বর্ষণ করিতে থাকে।

বেচারী হরিশ ঠিকা মুহুরিগিরি করিয়া যে সামান্য টাকাক'টি পায়, ওই টাকায় কি করিয়া সংসার চলে তাহা হয়ত অনেকেই জানে না।

এদিকে ফণি গোটা-চারেক নধর শসা আনিয়া দাওয়ায়

রাখিয়াছে। ছোট ছেলে দুটি শসার কাছে বসিয়া নখ দিয়া শসার গা খুঁটিতেছে আর জিহ্বা লেহন করিয়া মাকে শসা ভাগ করিয়া দিবার জন্ত তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। দুর্গার চাল ভাজা শেষ হইল। ধামিতে করিয়া ভাজা চাল লইয়া সে ছেলেদের কাছে আসিয়া বসিল। বড়ছেলে বঁটি আনিয়া মাকে দিল।

হরিশের কিন্তু এ-সব দিকে নজর নাই। চিঠির সামনে দুই একাগ্র চক্ষুর দৃষ্টি মেলিয়া সে ঠায় বসিয়া আছে।

দুর্গা শসা কাটিতে কাটিতে বলিল, ভূতে পেলো নাকি? অমন কাঠের পুতুলের মত ব'সে ভাবছ কি?···

হরিশ চিঠিখানা দুর্গার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

দুর্গা বঁটিখানা কাৎ করিয়া রাখিয়া ঝাঁজালো গলায় বলিল—লজ্জা করে না? কখনও পেরথম ভাগ কিনে দিয়েছিলে একখানা? কখনও আখর লিখতে শিখিয়েছিলে?

হরিশ হাসিল। এ যেন তাহারই কর্ত্তব্য। দুর্গার মহিমান্বিত সম্রান্ত পিতৃকুলের এ-বিষয়ে কোন দায়িত্বই বুঝি ছিল না!

হরিশের হাসি দুর্গার অঙ্গে বিষ ছড়াইয়া দিল। চিঠিখানা হরিশের মুখ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া সে বলিল,

বেহায়ার বালাই দূর
কাটা কানে চাঁপার ফুল!

আবার হাসছেন!

দুর্গা বহুদিন এ সংসারে আসিয়াছে। তাহার মেজাজ ও আচরণের মাত্রা সম্বন্ধে হরিশের বুদ্ধি কিছু প্রখরই ছিল।

এই বাদল-দিনে উপবাসী থাকিতে সে অনিচ্ছুক; সম্মুখে ভাজা চাল ও কাটা শসার সুগন্ধ। তাড়াতাড়ি সে বলিল—স্থির হও; শোন। আমার ভাই-ঝি চিঠি লিখেছে।

দুর্গা আকাশ হইতে পড়িল; ভাই-ঝি!

—হাঁ গো, আমার দাদার মেয়ে। দাদা, যিনি টাকা পাঠাতেন।

—বুঝেছি গো বুঝেছি, আর বাখ্যানাতে কাজ নেই। টাকা পাঠাতেন ত মাথাই কিনতেন! অক্ষম ভাইকে টাকা দেওয়ায় কি আদিখ্যেতা আছে! আমার দাদা—

—তবে তোমার দাদার কথাই বল।

—বলব আবার কি, জান না? তাদের রীত, ব্যাভার··· হঠাৎ থামিয়া বলিল,—তা ভাই-ঝি কি লিকছেন?—

হরিশ বলিল—চমৎকার। সে এখানে আসতে চায়।

সমস্ত ভাষা আসিয়া দুর্গার বিস্ফারিত চক্ষুকে আশ্রয় করিল।

হরিশ বলিল,—সত্যি সে আসছে। হয় আজ—নয় কাল।

দুর্গা চোখ মেলিয়া বিস্ময় দমন করিয়া কহিল,—ওঃ।

—ওঃ মানে, বুঝলে কিছু?

—তা বুঝব কেন—আমরা ধান খাই কিনা!

—কি বুঝলে?

—তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু অনেক দিন পরে চিবুতে আসছেন?

—সে কি?

দুর্গা হাসিয়া বলিল,—পুরুষমানুষের দশ-হাতে কাছা হ'লে কি হবে, বুদ্ধির গোড়া আলগা। আ মর, হাঁ ক'রে চাইছে দেখ না! নাও, আগে একগাল ভাজা-চাল মুখে দাও তার পর শুনো'খন।

একটু থামিয়া বলিল,—কিন্তু যাই বল, উনি যে বুকে ব'সে দাড়ি ওপড়াবেন সে হবে না। কুলোর বাতাস দিয়ে যে-পায়ে আসবে সেই পায়ে বিদেয়।

হরিশ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তুমি যা ভাবছ তা নয়।

—না বইকি! ও সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। জমির ভাগ নিতে আসছে না?

—না।

এবার বিস্মিত হইবার পালা দুর্গার। কিন্তু সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল,—তবে কি রূপ দেখাতে আসছেন?

—শোন। ওদের একটা সমিতি আছে, তারা দেশে যেখানে স্কুল নেই, সেখানে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্তে ইস্কুল খুলতে চায়। সেই জন্তেই মায়া এখানে আসছে।

—ওঃ! বলিয়া তাচ্ছিল্য-ভরে ঠোঁট উল্টাইয়া দুর্গা তেল দিয়া চাল-ভাজা মাখিতে লাগিল।

চালভাজা খাইতে খাইতে হরিশ বলিল,—তাহ'লে সে আসবে?

দুর্গা পরম উদাসীনের মত উত্তর দিল,—আসতে হয় আসুক।

—এখানে থাকবে কোথায়? হরিশ প্রশ্ন করিল।

—সে খুড়ো বুঝুক—আর ভাই-ঝি বুঝুক।

* * * *

বুঝিতে সকলকেই হইল।

পরের দিন। তখনও টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছে। একখানা ছইঘেরা গরুর গাড়ী আসিয়া হরিশদের ভাঙা চালার সামনে দাঁড়াইল।

দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া দুর্গা ছেলেগুলি লইয়া সেই দিকে চাহিয়া ছিল। হরিশ বাদল-দিনের সুযোগে খোঁড়া পা লইয়া কোথায় 'বাণিজ্য' করিতে গিয়াছে।

গাড়ী হইতে নামিল একটি ছিপ্‌ছিপে পাতলা মেয়ে, পায়ে জুতা নাই, হাতে ছাতা নাই। মাথায় একটু লম্বা, রংটাও খুব উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইল না। বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া মুখখানি বর্ষার জলভরা পুকুরে ঈষৎ আন্দোলিত পদ্মপাতার মত চক্ চক্ করিতেছে। কাপড় পরিবার ধরণটাই যা একটু অভিনব, নতুবা আর সব দিক দিয়াই এই ভাঙা কুঁড়ের আতিথ্য গ্রহণ করা তার পক্ষে কিছুমাত্র অশোভন নহে।

নামিয়া সে গাড়োয়ানকে বলিল,—সুটকেস আর বিছানাটা ওই দাওয়ার ওপর দিয়ে এস। আর রসগোল্লার হাঁড়িটা। এই বাড়ি ত? আচ্ছা। বলিয়া হন-হন করিয়া দাওয়ায় আসিয়া উঠিল।

দুর্গা বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছে, এমন সময় সে তাহার পায়ের গোড়ায় হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

অগত্যা বিরক্তি দমন করিয়া দুর্গাকে বলিতে হইল,—থাক, থাক, মা—জন্ম এয়োস্ত্রী হও। হাতের নোয়া—

মেয়েটি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া অল্প একটু হাসিয়া বলিল,—ও আশীর্ব্বাদ এখন ত ফলবে না, কাকীমা; আমার বিয়েই হয় নি।

দুর্গা হাঁ করিয়া মেয়েটির পানে চাহিয়া রহিল। এতবড় মেয়ে এখনও বিবাহ হয় নাই! আবার নিজের বিবাহের কথা গুরুজনের সামনে কেমন হাসিয়া অসঙ্কোচে বলিতেছে। বেহায়ার একশেষ।

গাড়োয়ানকে বিদায় দিয়া মেয়েটি বলিল,—আমার নাম মমতা। যেন নাম সংক্ষেপ করবার জন্য মিশরের 'মমি' ক'রবেন না, যেমন কলেজের মেয়েরা ক'রে থাকে। কি খোকা, কি দেখছ? কোলে আসবে?

খোকা মায়ের পিছনে সরিয়া গিয়া ডান পাখানি তুলিয়া ও মুখ ভেংচাইয়া সে কথার প্রত্যুত্তর দিল।

মমতা রাগ করিল না। হাসিয়া বলিল,—ছি! দিদি হই, লাথি দেখাতে আছে? পাপ হয়।

খোকা বলিল,—হয় বইকি! এই লাথি—এই লাথি—

দুর্গা ছেলেকে নিষেধ করিল না। মমতার প্রতি চাহিয়া নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিল,—থাকবে কোথায়?

মমতা হাসিমুখে বলিল, মা যেখানে মেয়েও সেইখানে। হ'লই বা ভাঙা চালা, আপনাদের যদি জায়গা হয় আমার হবে না?

দুর্গা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল,—হ'লেই ভাল। তোমরা ত দাসীবাঁদীর মত শাকচচ্চড়ি দিয়ে মোটা চালের ভাত খেতে পারবে না। দুধ-ঘি, মাছ-মাংস—

মমতার বেশ কৌতুকবোধ হইল। কহিল—পোলাও, কালিয়া, চপ, কাটলেট—

দুর্গা নীরস স্বরে বলিল—ও-সব নবাবী কলকাতায় চলতে পারে, আমরা গরিব মানুষ, হাতী পোষবার ক্ষমতা আমাদের কোথায়?

মমতা দেখিল খুড়ীমা রহস্যের ধার দিয়াও যাইতেছেন না, মুখে কেমন যেন অপ্রসন্ন ভাব। বুদ্ধিমতী মেয়ে। আর কথা না বাড়াইয়া সে বলিল—ওই শাক-ভাতই আমার যথেষ্ট। আপনাদের সঙ্গে ভাগ ক'রে খাব এর চেয়ে আনন্দ আর কি আছে? কি খোকা, রসগোল্লা খাবে? বলিয়া হাঁড়ির ঢাক্‌না খুলিতে লাগিল।

ছেলেগুলির আর সঙ্কোচ রহিল না। মমতার চারি দিক ঘিরিয়া কলরব তুলিল—আমি খাব, আমি খাব।

দুর্গাও কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মমতা সকলের হাতে দুইটা করিয়া রসগোল্লা দিতে যাইতেছিল, দুর্গা তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া হাঁড়ি কাড়িয়া লইল। বলিল—সর। ও-রাক্ষসদের যত দেবে ততই গিলবে। তুমি ব'স, জিরোও।

সকলের হাতে একটি করিয়া রসগোল্লা দিয়া সে হাঁড়িটি ছোট ঘরের শিকায় তুলিয়া রাখিল।

রসগোল্লা মুখে পুরিয়া ছেলেগুলা তখন মাকে যে-ভাষায় শাপান্ত করিতেছে তাহা শুনিয়া মমতা ত অবাক!

দুর্গা বাহিরে আসিয়া গলা ফাটাইয়া চীৎকার তুলিল—শুয়োরের পাল, আভরা ফাঁড় নিয়ে এসেছ এখানে মরতে! মর, মর, আপদ যা—দু-দণ্ড হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্দি হই।

বড় ছেলে ফণি বলিল,—তুই মর—নোলাদাগী—

—তবে রে ড্যাক্‌রা—বলিয়া দুর্গা তাড়াইয়া গেল।

ফণি অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে সেই বৃষ্টির মধ্যেই কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

মমতার প্রতি চাহিয়া দুর্গা বলিল—এসেছ যখন থাক দু-দিন। দিন সুখে দুঃখে যাবেই। ওই ভাঁড়ার ঘরে শুয়ো। একঘর হাঁড়ি-কুঁড়ি, তা ছোট তক্তার ওপর শুতে পারবে। ও বাক্‌সোটা আমার ঘরেই থাক।

যাহা হউক, মমতার আশ্রয় মিলিল।

হাত-মুখ ধুইয়া সে ভাঁড়ার-ঘরে গিয়া ঢুকিল। গিয়া দেখে কথাটা মিথ্যা নহে; যত রাজ্যের আধভাঙা হাঁড়ির রাশি। ঘুণ-ধরা তক্তাপোষটায় পা দিতেই ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হইতে লাগিল ও সেটা দুলিতে লাগিল। চারিদিকে আরশুলার নাদি, দিনের বেলায় ছোট ছোট ইঁদুর ছুটাছুটি করিতেছে—কোথাও জানালা নাই—একটা ভাপসানি গন্ধ বাহির হইতেছে। কিন্তু ইহা ছাড়া মাথা গুঁজিবার স্থান এই ছোট পাড়াগাঁয়ে কোথায়ই বা মিলিবে? কষ্ট জানিয়াই স্বেচ্ছায় সে পল্লীমায়ের সেবা করিতে ছুটিয়া আসিয়াছে।

হাঁড়ি, পেতে ও ভাঙা লোহার কড়াই ইত্যাদি এধারে-ওধারে রাখিয়া মমতা তক্তাপোষের উপর একটু জায়গা করিয়া লইল।

বিছানাটা টানিয়া ঘরে আনিতেছে—এমন সময় দুর্গা গঙ্গাজলের ঘটি হাতে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল,—দাঁড়াও, আগে শুদ্ধু ক'রে নাও ওগুলো। রোদ হ'লে কেচেকুচে নিতে পারতে। গুরুগঙ্গা—গুরুগঙ্গা—বলিয়া বিছানার উপর জল ছিটাইতে লাগিল।

মমতা নিরাপত্তিতে শুদ্ধীকৃত আধভিজা বিছানা লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

এমন সময় বাহিরে হাঁকডাক শোনা গেল। ওরে ফণে, পাজীটা গেল কোথায়? ধর না রে, একরাশ ডাঁটা, ঝিঙে, পটোল, নাঃ—খোঁড়া পা···

দুর্গা দাওয়ার উপর হইতে মুখে আঙুল দিয়া হরিশকে চেঁচাইতে নিষেধ করিল।

হরিশ সে ইঙ্গিত গ্রাহ্যই করিল না, মর মাগী—এসে ধর্ না। মুখে আঙুল দিয়ে আবার ইসারা হচ্ছে! এদিকে আমি মরছি—

—তুমি মর—বলিয়া দুর্গা নামিয়া ডাঁটাগুলি হাতে লইল।

অনেকগুলি জিনিষ পাইয়া হরিশের আনন্দ ধরিতেছিল না। বেশ একটু উচ্চকণ্ঠেই বলিল—ক্ষেত্তর ঘোষের ক্ষেত থেকে তুললাম পটোল, কালু শেখের জমির ঝিঙে—

—আর বকর-বকর ক'রতে হবে না, থাম। বলিয়া দুর্গা দাওয়ার একপাশে ডাঁটাগুলি আছড়াইয়া ফেলিল।

হরিশ বলিল—না, বকবো কেন? সাত দিনের খোরাক ঘরে তুলে এনে দিলাম কিনা—

দুর্গা হরিশের কানের কাছে মুখ আনিয়া চাপা ক্রোধে দাঁতে দাঁত রাখিয়া বলিল—ঘটে যদি একরত্তি বুদ্ধি থাকে, ভেঙ্কু কোথাকার!

ঘরের পানে কটাক্ষ হানিয়া বলিল—এসেছে যে—

বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া হরিশ প্রশ্ন করিল—কে?

—তোমার যম। বলিয়া দুর্গা সরিয়া গেল।

ইহাদের আলাপ-আলোচনা কিছু কিছু মমতার কানে গিয়াছিল। তত ক্ষণে সে বিছানা গোছাইয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কাকাকে প্রণাম করিতে।

দুর্গা সরিতেই সে তাহাকে প্রণাম করিল।

হরিশের মূঢ় ভাব তখনও কাটে নাই দেখিয়া মমতা বলিল,—কালই আসবার কথা ছিল, পারলুম না। সেই ছোটবেলায় একবার আপনাকে দেখেছিলুম, আপনি ডাকতেন মায়া ব'লে। বাবার মুখে শুনেছি আপনি নাম রেখেছিলেন, যোগমায়া। নয়?

হরিশ মাথা নাড়িয়া বলিল,—সে-কি আজকের কথা, একটা যুগ। তা মায়া—

মমতা হাসিল, আজ আপনার 'মায়া' 'মমতায়' দাঁড়িয়েছে। নামটা বড্ড বড় ব'লে মা বদলে দিলেন। যাই হোক দুটো জিনিষের একই মানে।

হরিশ মানে না বুঝিয়াও হাসিল,—তা বেশ, বেশ, দিব্যি হয়েছে। ওগো, আজ না-হয় খিচুড়িই রাঁধ। মায়া এসেছে—

দুর্গা মমতার পিছনে দাঁড়াইয়া মুখের এক অপরূপ ভঙ্গী করিয়া দু-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া ধরিল।

মেজছেলে কেষ্ট হাততালি দিয়া বলিল,—বাবা, মা তোকে কলা দেখালে! এই এমনি এমনি ক'রে। বলিয়া নিজের ছোট বুড়ো আঙুল দুটি হরিশের মুখের উপর দোলাইতে লাগিল।

মমতা শাসনের স্বরে বলিল,—ছিঃ, বাবাকে ও-রকম করতে নেই। কেষ্ট দাঁত মেলিয়া বলিল,—তুই বাঁদরী—

মমতা ভ্রূকুটি হানিয়া বলিল,—আবার অসভ্যপনা?

কেষ্ট এতটুকু দমিল না, সমান তেজে বলিল,—তুই অসভ্য।

মমতা আসিয়া তাহার কান ধরিতেই কেষ্ট চীৎকার করিয়া উঠিল।

দুর্গা ঘরের ভিতর হইতে চেঁচাইয়া বলিল,—খুব হয়েছে, ভিটেয় পা দিতে না-দিতেই গুরুমশাইগিরি করতে হবে না। বলে 'মার চেয়ে ব্যথিনী তারে বলে ডান'।

কেষ্টর কান ছাড়িয়া মমতা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল।

হরিশ বলিল,—ও-ছেলেগুলোই একটু বেয়াড়া, মা। বললে কথা শোনে না। মরুক গে ওরা—

মমতা মৃদুস্বরে বলিল,—আপনি শাসন করেন না কেন কাকা?

হরিশ অসহায় ভয়ার্ত্তের মত চারিদিকে চাহিয়া বলিল,—ভাল ক'রে দুটো খেতেই দিতে পারি নে, তার শাসন! আর নেহাৎ ছেলেমানুষ—একটু বড় হ'লে আপনিই বুঝবে। বলিয়া ম্লান হাসিল।

মমতা বলিল,—এখন থেকে না দাবে রাখলে শেষকালে শোধরাতে পারবেন না। কি পড়ে?

হরিশ মাথা চুলকাইয়া বলিল,—আরও দুই-এক বছর যাক ভর্ত্তি ক'রে দেব ইস্কুলে। তেমন অবস্থা ত নয়—

মমতা স্নিগ্ধস্বরে বলিল,—বাবা ছেলেপুলেকে লেখাপড়া না শিখতে দেখলে ভারি চটতেন। শুনেছি এই জন্যে তিনি মাসে মাসে আপনাকে কিছু পাঠাতেনও।

হরিশ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া চোখে কাপড় তুলিয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল,—আর দাদাই আমাদের মায়া কাটালেন! অমন শরীর, যেমন জোয়ান—তেমনি বিদ্বান্—দেখতে দেখতে ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেলেন।

মমতা বুঝিল, এখানে যুক্তি দিয়া বুদ্ধিকে শাণিত করিতে যাওয়া মিথ্যা। বহুদিনের সংস্কার বদ্ধমূল বটবৃক্ষের মত ইহাদের হৃদয়ে বহু দিক দিয়া শিকড় নামাইয়াছে, জটের মতই ঘন শাখা-প্রশাখা মেলিয়া এই সংসার বাহিরের উদার বিস্তৃত আকাশের বর্ণকে ঢাকিয়া দিয়াছে, এই আজন্মপোষিত সংস্কার এক নিমিষে কাটাইয়া দেওয়া তার সাধ্য নহে। কিন্তু চেষ্টা সে করিবে। ইহাদের মধ্যে বাস করিয়া, স্নেহ দিয়া, প্রীতি দিয়া, শ্রদ্ধা দিয়া, সে তমসাবৃত রাত্রিকে আলোকের পারে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে। যে-দীপের আলোয় অন্ধকার ক্ষয় হয়—সেই প্রদীপ জ্বালিয়া এই ধ্বংসোন্মুখ শ্রীহীন সংসারের আরতি সে করিবে।

* * *

হরিশকে ঘরে ডাকিয়া দুর্গা চাপা গলায় বলিল,—সাধে বলি বুদ্ধি কম! গরিব—হেন-তেন-সাত-সতেরো ওর কাছে বলবার কি দরকার? এসেছে দু-দিনের জন্যে, চলে গেলে কি কাকা ব'লে পুছবে ভাবছ?

হরিশ বলিল,—না, মেয়েটা তেমন নয়—শান্তই। কথাগুলো যেমন মিষ্টি তেমনি ব্যাভার।

দুর্গা বলিল,—ওই মিষ্টি কথা আর ব্যাভার খেয়েই থাক। যখন চুল চিরে জমির ভাগ নেবে তখন টের পাবে কত ধানে কত চাল! আবার কথা কয়—শোন। বলিয়া দুর্গা ধমক দিল।

মমতা না থাকিলে হরিশও সে ধমকের প্রত্যুত্তর দিতে ভুলিত না। নেহাৎ মেয়েটা কি ভাবিবে বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল,—ওর কাছে যেন গুপপনা প্রকাশ ক'রো না। ব'লো বাজার থেকে তরকারী কিনে আনলাম—ভারি শস্তা। যদি বলতে না পার চুপ ক'রে থেকো—যা বলবার আমিই

বলবো। ক'টা দিন বই ত না। অগত্যা হরিশ ঘাড় নাড়িল।

ঘাড় নাড়িল—কিন্তু কেমন যেন ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। দাদার ওই ছোট্ট মেয়েটিকে সে একদিন কোলে করিয়া কত আদর করিয়াছে—কত ধমক দিয়াছে—শাসন করিয়াছে, আজ সেই মেয়েকে দেখিয়া তাহার সঙ্কোচ! মেয়েটির হাসি-হাসি মুখ, অকুণ্ঠ আচরণ ও আপন-করা স্বভাবের পরিচয় পাইয়া অবধি মনটা তাহার কিসের অভাব প্রবল ভাবে অনুভব করিতেছে। কিসের অভাব? জীর্ণ চালায় সহস্রধারা ঝরিতেছে অভাব সে-জন্য নহে, ঘরে অন্নের অপ্রতুলতা—সে অভাব অন্য প্রকারের, নিজেদের ময়লা ছেঁড়া কাপড়, গৃহস্থালীর চারিদিকে প্রকট দৈন্য স্নেহ-সম্পর্কীয়ের কাছে—তাহাতেই বা এমন কি আসে যায়? কিন্তু তথাপি যে দুনিবার লজ্জা বার-বার আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে সঙ্কোচের কালি লেপিয়া দিতেছে সে কি ওই অসাধু উপায়ে আহরিত আনাজ-পাতির মধ্যে দিনের দিন পুঞ্জীভূত মালিন্যে গাঢ়তর হইয়াছে? বর্ষার আকাশকে যেমন তীক্ষ্ণ চক্ষুর দৃষ্টিতে ধরিয়া ছুঁইয়া পাওয়া যাইতেছে না, দূরের মাঠ বৃষ্টিধারায় যেমন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে—তেমনই দিশেহারা মনের মধ্যে এ তরঙ্গ যে কোথা হইতে উঠিল, কে জানে?

দুর্গা আসিয়া দুটি রসগোল্লা হরিশের হাতে দিয়া বলিল—খাও।

—তুমি খেয়েছ?

—খাও ত আগে। এই জল রইল।

জলের ঘটি হরিশের সামনে রাখিয়া দুর্গা বলিল,—কিছু ব'ললে?

—কি আবার ব'লবে?

—ওই জন্যেই ত রাগ ধরে। বলি জমিজমা ভাগের কথা?

—ভয় নেই, ও সে জন্যে আসে নি।

—আসে নি ত ব'ললে কেন এখানে পাঠশালা করবে?

—এখানে মানে—এই গাঁয়ে।

—এই গাঁয়ে কার মরণ নেই যে জায়গা দেবে। তুমি দেখো ঠিক চুল চিরে জমি ভাগ ক'রে সেইখানেই ঘর তুলবে।

—তুমি বড় ছোট—

—কি?

ত্রস্ত হইয়া হরিশ বলিল,—থাম, মেয়েটা শুনতে পাবে যে।

—শুনুক। আমি ছোটলোক!

—আঃ, কি জ্বালাতন! বলছি আমরা যেমন ছোট বিষয় ছাড়া ভাবতে পারি নে, ওরা তা নয়।

—ওরা তবে কি?

—কি যে আমি জানি নে। আমি যে ওর কাকা, পূজ্য—আমাকেই ওর কাছে কেমন ছোট মনে হচ্ছে। ভাব দেখি একবার কিসের অভাব ওর? কেন এসেছে ভাঙা কুঁড়ের এত কষ্ট সহ্য ক'রতে? থাকার কষ্ট, খাওয়ার কষ্ট, দেহের কষ্ট—কোন কষ্ট কি ঠাঁই দিয়েছে মনে? ইস্কুল করবে—ছোট ছেলেদের মানুষ করবে—ভাব দেখি কত বড় মনের কাজ এটা?

দুর্গার পিত্তসুদ্ধ জ্বলিয়া উঠিল, কহিল,—তাই যাও এক ঘটি তেল নিয়ে মালিশ কর গে পায়ে! ও-সব 'তুলোমুখী টঙ্কা' আমরা অনেক দেখেছি। ইস্কুল করবে, না জমি-দখলের ফন্দী?

—যাক, মিছে কথা-কাটাকাটি ক'রে লাভ নেই, ভাত চড়াও গে।

—যাচ্ছি। কিন্তু এই ব'লে রাখলাম, পূবের সূর্য্য যদি পশ্চিমে ওঠে ত আমার কথা মিথ্যে হবে না।

হরিশ মনে মনে বলিল—গুরুবাক্য কি না।

* * *

বিছানা গোছগাছ করিয়া মমতা আসিয়া কাকার কাছে বসিল। বলিল,—দেখুন কাকা, আমার ইচ্ছে ফণি, কেষ্ট ওদের সব স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিই।

হরিশ আনন্দিত হইয়া বলিল, বেশ ত, মা।

মমতা বলিল,—আপনার চালের যা অবস্থা বর্ষা থামলেই ওটা ছাইয়ে নেওয়া দরকার।

উত্তর না দিয়া হরিশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মমতা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—আমাকে এখন এখানে থাকতে হবে; মনে করছি চালাটা আমিই ছাইয়ে নেব। আপনার কোন আপত্তি নেই ত?

আনন্দের আতিশয্যে হরিশের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

শুধু এ-পাশ ও-পাশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল আপত্তি তাহার নাই।

—মমতা একটু থামিয়া বলিল,—সামনের ওই জমিটাতেই স্কুল-ঘর তোলা যাবে, কি বলেন ?

হরিশের মনে দুর্গার কথাগুলি এইবার ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। তবে কি ছদ্ম সৌজন্যের আবরণে মেয়েটি আপন কার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছে ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে মমতার পানে চাহিল।

মমতা হাসিয়া বলিল,—আপনি ভাবছেন গোলমাল হবে বাড়িতে, দিনের বেলায় হয়ত ঘুমুতে পারবেন না !

অতিকষ্টে হরিশ হাসিল।

মমতা বলিতে লাগিল,—সে ভয় আপনার মোটেই নেই। আমাদের পড়াবার ধরণই আলাদা। সে আপনাকে দেখিয়ে দেবো'খন।

হরিশের কপালে কয়েকটি রেখা ফুটিয়া উঠিল, কোন উত্তর সে দিল না।

মমতা বলিল,—জল থামলেই ওখানে একখানা আটচালা তোলা যাবে।

হরিশের আর বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না, দুর্গার কথাটাই বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল। মমতার গোপন স্বার্থের এই সুষ্ঠু প্রকাশে হরিশ ক্রুদ্ধ হইল না, দুঃখিত হইল। স্বার্থ এই সদানন্দময়ীর কথায় বা আচরণে শোভা পায় না। যদি দুর্গার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইত !

মমতা ছোট মেয়ের মতই মিষ্ট কণ্ঠে বলিল,—কথা কইছেন না যে, কাকা ?

হরিশ নিশ্বাস গোপন করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—তা ত হয় না, মায়া।

—কি হবে না ?

—ওখানে ঘর তোলা।

—কেন কাকা ?

—কেন, মানে বিষয়ের একটা ভাগ সাব্যস্ত—

মমতা শিশুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল,—বিষয়ের ভাগ আবার কিসের ? ও ত আপনার জমি—আপনারই থাকবে।

কথাটা বলিতে গিয়া গলায় বাধিল, কিন্তু না বলিলেও মেয়েটা বুঝিবে না। বার-কয়েক কাসিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া হরিশ বলিল,—কি জান, তোমার বাবা আর আমি—দু-জনের সম্পত্তি এটা। একটা রফা হ'লেই—

মমতা অবুঝের মত বলিল,—রফা আবার কিসের ? ওর সবটা আপনার, বাবার এক কড়াও নয়।

—আইন তা ব'লবে না, মায়া।

—আইন জানি নে, কাকা ; আমি বাবার একমাত্র মেয়ে—আমি বলছি, এ-বিষয় আপনার, আর কারও নয়। যদি বলেন লেখাপড়া ক'রে—

লজ্জা ত বটেই—হরিশের আনন্দেরও যেন কূলকিনারা রহিল না। মমতার পানে চাহিতে গিয়া চোখ দুটি জলভারে টল টল করিতে লাগিল।

বারংবার মাথা নাড়িয়া সে বলিতে লাগিল,—জানি, জানি, মায়া—আমি জানি।

* * *

এ-বেলার আহারাদি মিটিল, মেঘ-দেবতা কিন্তু প্রসন্ন হইলেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে বর্ষণের বেগ বাড়িয়া উঠিল।

মমতা দাওয়ায় বসিয়া হরিশের সঙ্গে বাল্যকালের গল্প করিতেছে আর দুর্গা কাজের ছুতায় এ-ঘর ও-ঘর ছুটিতেছে, কিন্তু কান পাতিয়া রাখিয়াছে ইহাদের আলাপ-আলোচনার দিকে। রাঁধিবার সময় হরিশের সঙ্গে মমতার যে-সব কথা হইয়াছে তাহার একবর্ণও দুর্গা শুনিতে ভুল করে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য, মেয়েটা যেন হরিশকে আগলাইয়া ফিরিতেছে ! সেই হইতে এমন নিরালা মুহূর্ত্ত দুর্গা পায় নাই যাহার আশ্রয়ে কণ্ডুয়িত রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া গোটাকয়েক সদুপদেশ সে হরিশকে দেয়। এইবার ঘর হইতে বাহির হইয়া সে বলিল,—রাত্তিরে কে কি খাবে বল, এইবেলা জোগাড় দেখি।

হরিশ উদরে হাত দিয়া একটা ঢেঁকুর তুলিল।

মমতা বলিল,—বাস্ রে, রাত্রিতে এর ওপর খেলে বাঁচব না। এ-বেলাটা নাইবা রাঁধলেন, কাকীমা। একটু বিশ্রাম করুন।

দুর্গা ঠোঁট উল্টাইয়া জবাব দিল,—বিশ্রাম ! আ আমার কপাল রে। বলে না 'ঢেঁকি স্বগ্‌গে গিয়েও ধান ভানে', আমারও তাই। তা খাওয়ার ল্যাটা যদি নাই হয় সকাল-সকাল শুয়ে পড়। গল্প ত ফুরোয় নি, কাল ক'রো।

মমতা বলিল, পাড়াগাঁর বর্ষা সন্ধ্যা বেশ লাগছে। আপনিও একটু বসুন না, কাকীমা।

দুর্গা ঈষৎ ঝাঁজালো স্বরে বলিল,—বসবার সময় আমার কত! দেখছ না, সারাদিন শুয়ে-ব'সে কাটছে! এ-দিকে ঘরে তেল নেই—সে হুঁস আছে?

হরিশ শুষ্ক মুখে বলিল,—তা বটে। তুই শুগে যা, মায়া। কাল হয়ত ভাল ঘুম হয় নি, যা।:

মমতার একান্ত অনিচ্ছা—এত শীঘ্র ওই অন্ধকূপে গিয়া ঢুকিতে। অন্ধকারে তেলাপোকা, ইঁদুর এবং আরও কত নাম-না-জানা পতঙ্গের সঙ্গে পড়িয়া থাকা, মনে হইতেই গায়ে কাঁটা দিতেছে!

এখানে একলা বসিয়া বৃষ্টিতে একাকার পথ মাঠ বনের অন্ধকার মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে কেমন ভয়-মিশ্রিত আনন্দ জাগিতেছে। কি বিচিত্র ভেকের একটানা আনন্দ-রাগিণী। পৃথিবীতে আর কিছুর অস্তিত্ব নাই, এই নিশ্ছিদ্র নিবিড় অন্ধকার, রহিয়া রহিয়া বায়ুর শোঁ-শোঁ শব্দ, বৃষ্টির রিমিঝিমি-মাঝে দর্দ্দুরী-নির্ঘোষ। উঠানের সঞ্চিত জলে যখন একটা কুকুর বা শিয়াল চলিয়া যাইতেছে—তাহার ছপ্‌ছপ্ শব্দ, চারিদিকে দৈত্যপুরীর ভয়াবহতা। এমন সময় গৃহের মাঝে ক্ষুদ্র এক দীপশিখাকে কেন্দ্র করিয়া গল্পের আসর বসিবে—খেয়ালখুশীভরা গল্প—অদ্ভুত অবাস্তব গল্প—বুদ্ধির আলোয় যার ফাঁক ধরিয়া উদ্দাম তর্কপ্রবাহ ছুটিবে না, সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া যে কাহিনীর অপমৃত্যু ঘটিবে না, সাহিত্য বা আর্টের দোহাই দিয়া যে রচনাকে জঞ্জাল বলিয়া কেহ উড়াইয়া দিবে না—তেমন অনাড়ম্বর কাহিনী এই ঘনীভূত অন্ধকারের সঙ্গে বিরামহীন বৃষ্টিধারার তালে দর্দ্দুরী-ঐকতানে সমতা রাখিয়া উর্ণনাভের মত সে কাহিনী অফুরন্ত সূত্র বিস্তার করিতে থাকিবে।...

হরিশ উঠিয়া গিয়াছে, ছেলেরা খাইয়াই শুইয়াছে। মমতা একা কত ক্ষণ বসিয়া থাকিবে? প্রাচীরহীন পুরী,—সংবাদপত্রের বহু লজ্জাজনক সংবাদ মনে আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে—মমতা অগত্যা নির্জ্জন কারাগৃহে গিয়া ঢুকিল।

এ-দিকের ঘরেও দীপ জ্বলে নাই, কথা চলিতেছে ফিস্‌ফাস্ শব্দে।

—কেমন, যা ব'লেছিলাম হ'ল কি না? শেষে এ-জনার কথাই ফলে।

মুখ দেখা যায় না, হরিশও নীরব।

অধৈর্য্য দুর্গা তার গায়ে চিমটি কাটিয়া বলিল,—বাক্যি হ'রে গেল যে! কথাই বল।

—উঃ—বলিয়া হরিশ সরিয়া বসিল।

দুর্গা ছাড়িবার পাত্রী নহে। সেদিকে সরিয়া আসিয়া বলিল,—বল। বেহায়া কোথাকার, ভাই-ঝি দেখে একেবারে গ'লে গেছেন। টাকা দেবে, জমি দেবে, ছেলে পড়াবে, তবে আর কি! ও-সব ভুজুংভাজাং না দিলে—সঙ্গে সঙ্গে হরিশের গায়ে ঠেলা মারিয়া বলিল, যা বলছি, সত্যি কিনা? হরিশ বিরক্ত হইয়া বলিল,—সত্যি, সত্যি, তোমার কথা কি মিথ্যে হ'তে পারে?

—হয়ই না ত। কিন্তু আজ রাত্তিরেই মজা দেখাবো।

হরিশ ভয়ে ভয়ে বলিল,—কি ক'রবে?

দুর্গা বলিল,—কি করি দেখ না। ঐ বাক্‌সোটায় আছে ভোমরা-ভুমরীর প্রাণ, ওতেই রাক্ষুসীর যত আস্ফালন—

—বাক্‌সো ভাঙবে নাকি? হরিশের স্বর আতঙ্কে ঘনীভূত। দুর্গা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হরিশ অন্ধকারে তাহার হাত ধরিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—না দুর্গা, দোহাই তোমার, ওইটি ক'রো না। ওকে না হয় কালই চ'লে যেতে ব'লব।—

দুর্গা বলিল,—যাবার জন্তে ওর দায় পড়েছে।

হরিশ অকাতরে বলিল,—যাতে যায় আমি তাই ক'রবো। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—সত্যি-সত্যি-সত্যি। আমরা নীচ বটে, লজ্জাও নেই—কিন্তু ওর কাছে খাটো হ'তে পারব না।

বিস্মিতা দুর্গা আর কথা বাড়াইল না। কাঁথাখানা বুক পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল। বলিল,—আচ্ছা গো, আচ্ছা। এখন শোও।

হরিশের কণ্ঠ হইতে এমন আর্ত্তধ্বনি যে বাহির হইতে পারে ইহা দুর্গার কল্পনাতীত! এত সামান্য বিষয়ে এত অনুনয়! যেন এই মেয়েটার কাছে ছোট হইয়া গেলেই হরিশের মৃত্যু অনিবার্য্য। উঞ্ছবৃত্তি করিতে যাহার এক তিল দ্বিধা জাগে না, পরের জমির সামান্য ফসল অবলীলাক্রমে

যে প্রতিদিন ঘরে আনিতেছে, ধরা পড়িয়া গাল খাইয়া হাসিমুখে যে লাঞ্ছনার কাহিনীতে গৌরবের রং ফলাইতে বসে—সে আজ একরাশ টাকা হাতে পাইয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে? ঐ বাক্সটায় নিশ্চয় টাকা আছে—অনেক টাকা। সেগুলি হাতে আসিলে নূতন কাপড় কেনা হইবে, জীর্ণ চালে নূতন খড় উঠিবে, উঠানে একটা মড়াই বাঁধিয়া সারা বৎসরের চাউল কিনিয়া উহাতে সঞ্চিত করিয়া রাখিবে, উঠানের সীমানায় শক্ত করিয়া বেড়া দিবে। ছোট গোয়াল, একটি দুগ্ধবতী গাভী তাহাতে থাকিবে, তার পাশে ঢেঁকিশাল। দুর্গার মনে একের পর একটি করিয়া সংসারের কত সুচারু ছবিই ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা—বুকের মধ্যে প্রচণ্ড তৃষ্ণা। রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের যেমন বৃষ্টি প্রবল হইয়া উঠিতেছে—তেমনই বর্দ্ধিত-বেগ চিন্তার প্রহারে দুর্গা পাগল হইয়া উঠিল।

শিয়রের গোড়ায় সুটকেসটা রাখিয়াছে—উহার মধ্যে দুর্গার সারাজীবনের তপস্যার ফল,—সারা জীবন দুঃখ-দৈন্যের মধুর স্বপ্ন,—বুকফাটা তৃষ্ণার সুপেয় সলিল। হাত বাড়াইয়া দুর্গা সেটাকে ছুঁইল। ঠাণ্ডা ষ্টিলের দেহ—উত্তপ্ত হাতখানি আঃ—কি স্নিগ্ধতায়ই না ভরিয়া গেল। দুর্গার সারাদেহে রোমাঞ্চ জাগিল। পুনঃ পুনঃ সে হাত দিয়া ষ্টিলের কঠিন দেহ স্পর্শ করিতে লাগিল। আরও নিবিড় ভাবে—সমস্ত আকাঙ্ক্ষা—সমস্ত স্নেহ—সমস্ত সুখসাধকে স্পর্শের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া দুর্গা অপরিমেয় আনন্দসাগরে অবগাহন করিতে লাগিল।

* * *

অবশেষে সে রাত্রি প্রভাত হইল, ধারাবর্ষণ একভাবেই চলিয়াছে। ছেলেরা খাবারের জন্য বায়না ধরিয়াছে, দুর্গার মুখে কিন্তু গালির প্রবাহ ছুটিল না। রসগোল্লার হাঁড়ি আনিয়া সে ছেলেদের মিষ্ট দিল, একটি নহে—দুটি করিয়া, ছেলেরা মহাখুশী। হরিশের জন্য গাড়ু ও গামছা দাওয়ার একপাশে রাখিয়া দুর্গা উনুনের ছাই তুলিতে লাগিল।

একমাত্র যা বৃষ্টিপতনের শব্দ শান্ত প্রভাতের শান্তি ভঙ্গ করিতেছে, নতুবা এই গৃহের কোথাও বিদ্রোহের বহ্নি-ধূম দেখা গেল না।

হরিশ উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিতে গেল।

মমতা দুর্গার পিছনে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া খানিক দুর্গার কাজ লক্ষ্য করিল, তার পর বলিল,—কাকীমা, আমার সুটকেসটা কি আপনার ঘরে আছে? কাপড় ছাড়তে হবে—

দুর্গা হেঁট হইয়া কাজ করিতে করিতে জবাব দিল,—ঐ ঘরে যাও, নাও গে।

ঘরে ঢুকিয়া মমতা ত তাহার সুটকেসের অবস্থা দেখিয়া অবাক! কেষ্ট উহার ডালা খুলিয়া খান দুই কাপড় বাহির করিয়াছে; ছোট আয়না, চিরুণি, টুথব্রাশ অনেক কিছুই সেই সঙ্গে বাহিরে আসিয়াছে। কাপড় বিছাইয়া কেষ্ট ও তাহার ছোট ভাই আনন্দে তাহার উপর উলট-পালট খাইতেছে।

মমতা ছুটিয়া আসিয়া সুটকেসের পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার মধ্যে হাত চালাইয়া দিল। কাপড়, জামা এবং অন্যান্য অনেক কিছু বাহির করিয়াও প্রার্থিত জিনিষটি মমতা খুঁজিয়া পাইল না। পাংশু মুখে সে কেষ্টকে প্রশ্ন করিল,—এই, আমার টাকার ব্যাগ কোথায়? বল্, কোথায় রেখেছিস?

কেষ্ট মাথা নাড়িয়া বলিল,—আমি কি জানি?

মমতা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল,—তুই বাক্সো খুলিস নি?

কেষ্ট বলিল, হ্যাঁ—খুলেছে বইকি!

মমতা আদর করিয়া বলিল,—লক্ষ্মী সোনা, ব্যাগটা আমায় দাও, তোমায় একটা টাকা দেব।

—আমি কি জানি!—বলিয়া কেষ্ট ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মমতা সেই ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কাপড়, জামা, সাবান, আয়না ইত্যাদির সম্মুখে বহুক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। ললাট ও ভ্রূর কুঞ্চন দেখিয়া বোঝা গেল, মমতা বুদ্ধির আলোকে এ রহস্যের তল খুঁজিতেছে।

তার পর বুকের মাঝে অতিকষ্টে একটি ভারী নিশ্বাস লুকাইয়া সে কাপড়-জামা সুটকেসে গুছাইয়া তুলিতে লাগিল। মমতার তরী কূলে ভিড়িয়াছে।

তালাভাঙা সুটকেস বন্ধ করা বড় কঠিন; বার-কয়েক সে-চেষ্টা করিয়া মমতা দুর্গার নিকট একটু দড়ি ভিক্ষা করিল।

দুর্গা সম্মুখে আসিল না, মোটা শক্ত এক টুকরা কাপড়ের পাড়ের ফালি মমতার কোলের কাছে টুপ করিয়া পড়িল। সেই ফালি দিয়া মমতা কষিয়া স্যুটকেসটাকে বাঁধিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়ু-হাতে হরিশ আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। বলিল,—ওকি মায়া, ওটাকে অমন ক'রে বাঁধছিস কেন?

মমতা মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, একটা জিনিষ ভুলে এসেছি, কাকা, আমায় আজই যেতে হবে।

হরিশ বলিল,—চিঠি লিখে না-হয় আনিয়ে নে। এই জলে যাবি কোথায়?

মমতা ঘাড় নাড়িল,—না কাকা, আজই যেতে হবে, নইলে অনেক লোকসান হবে। ক'টায় ট্রেন? আপনি বরঞ্চ কষ্ট ক'রে একখানা গরুর গাড়ী ডেকে দিন।

বিশেষ পীড়াপীড়ি না করিয়া হরিশ বাহির হইয়া গেল। কাল রাত্রিতে দুর্গার মুখে যে সঙ্কল্পের কথা সে শুনিয়াছে, কোন মতে মমতাকে সরাইতে পারিলে সে বাঁচে।

* * *

দুর্গা স্নান সারিয়া আসিয়া দেখিল, হরিশ মাথায় হাত দিয়া দাওয়ায় বসিয়া আছে। ছেলেরা ঘরের মধ্যে হুড়াহুড়ি করিতেছে, মমতাকে কোথাও দেখা গেল না। ছোট ঘরে সে নাই, দাওয়ায় নাই, বড় ঘরেও নাই। মমতা চলিয়া গিয়াছে—এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। যাক, মমতা চলিয়া গিয়াছে। পুকুরঘাটে দুর্গা অনেকখানি দেরি করিয়াছে। এ-দেরি তার ইচ্ছাকৃত নহে। বহুদিন পরে সাবান দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া সে গা মাজিয়াছে, মুখখানাও লাল হইয়া উঠিয়াছে। (অবশ্য দুর্গার বিশ্বাস আজও তার মুখে যত্ন করিলে গোলাপের বর্ণ ফুটিয়া উঠে!) বেশ সাবান, ভুরভুরে করবীর গন্ধ। হাতখানা কতবার নাকের কাছে তুলিয়া দুর্গা পরমপুলকে সে-গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছে। স্নানান্তে যেমন শরীর হাল্‌কা হইয়াছে, তেমনি নামিয়া গিয়াছে মনের বোঝা। বহুদিনকার বিস্মৃত একটা গানের কলি দুর্গার মনে পড়িতেছে। সানুনাসিক স্বরে দুর্গা বুঝি গুন্ গুন্ করিতেছে!

ঘরে আসিয়া দুর্গা কাপড় ছাড়িল। জরিপাড় শাড়ী হেনার গন্ধে ভরা। আঃ—আঃ—নাসিকা আজ পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাজ করিতেছে! দুর্গার বুকে চঞ্চল রক্তস্রোত অকারণে ঢেউ তুলিয়া আছাড় খাইতেছে, পা দুখানা যেন দেহের ভার বহিতে পারিতেছে না। দুর্গা কি করিবে? রূঢ় কথা সে জীবনে বলিবে না। খাওয়া, শোওয়া বা তুচ্ছ কথা লইয়া সে অনর্থক কাহারও সহিত কলহ করিবে না। ওই সহিষ্ণু মেয়েটির মত অতিবড় ক্ষতিতেও সে নিঃশব্দ রহিবে, লাঞ্ছিতা হইলেও হাসির আবরণে সে লাঞ্ছনাকে জয় করিবে। সে যে আজ পরিপূর্ণ। ওই মেয়েটির মত সর্ব্বদিক দিয়াই পরিপূর্ণ।

সম্পদে শ্রীতে ক্ষমায় স্নেহে সৌন্দর্য্যে ও ভালবাসায় দুর্গার মহিমা ওই মেয়েটির চেয়ে কম কিসে? পুরাতন চালে নূতন খড় উঠিবে, উঠানের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া শক্ত বেড়ার বেষ্টনী পড়িবে, নূতন গোলায় নূতন ধান, ঢেঁকিশালে ঢেঁকি, গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভী, নবপরিচ্ছদে ভূষিত ছেলেদের হাসি হাসি মুখ—আর দাওয়ায় বসিয়া সে আর হরিশ এই অবিশ্রান্ত বর্ষণকে সম্মুখে রাখিয়া কত কি বলিবে—প্রথম দিনের প্রথম পরিচয় যে-ভাবে সুরু হইয়াছে—অতীতের সেই অলকাবাঞ্ছিত আনন্দ অকারণ উচ্ছহাসির তরঙ্গে নির্বাধে তর তর করিয়া বহিবে। বাহুতে বাহু—কণ্ঠে কণ্ঠ—অধরে—

হরিশ ডাকিল,—শুনছ? আজ রান্না হবে না?

দুর্গা ভাঙা আরসীটা হাতে লইয়া ঘরের মধ্য হইতে উত্তর দিল,—এই চট্ ক'রে খিচুড়ি চাপিয়ে দিই, তুমি ইলিস মাছের চেষ্টা দেখ।

হরিশের মেজাজ ভাল ছিল না। রুক্ষ কণ্ঠে বলিল,—ঠাট্টা পরে ক'রো, মেয়েটাকে তাড়িয়ে তোমার যেন রঙ্গ লেগেছে, আমার ত তা নয়।

দুর্গা কোমল কণ্ঠে বলিল,—সত্যি বলছি—ঠাট্টা নয়। দুঃখু তোমারই আছে—আমার বুঝি নেই।

হরিশ অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিল,—ব্যাপার কি? তোমার গলার স্বর পর্য্যন্ত বদলে গেল নাকি? তুমি কি নতুন হয়ে এলে?

দুর্গা মিষ্ট হাসিয়া বলিল,—নতুন মনে কর ত নতুন। এই নাও টাকা—লক্ষ্মীটি—শীগ্‌গির এস।

ঠং করিয়া টাকাটা দাওয়ার উপর পড়িতেই হরিশের ক্ষণিকের মোহ ভাঙিয়া গেল। বিদ্যুৎমাখা চাবুকের ঘা খাইয়া সে সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মমতার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের একটা সূত্র সে যেন খুঁজিয়া পাইয়াছে।

ঘরের দুয়ারে আসিয়া দেখিল, বহুদিনকার পূর্ব্বের দুর্গা যেন বধূবেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। আরসীর সামনে প্রসাধনের দ্রব্য লইয়া সে মনোমোহিনী সাজিয়াছে। ঘন ভ্রূর সমান্তরালবর্ত্তী করিয়া আঁকিয়াছে সূক্ষ্ম এক সিন্দুরের টিপ, আবেণীসংবদ্ধ কেশশ্রীতে অগ্নিবর্ণের জরিপাড়ের আধঘোমটা, তীব্র সুগন্ধে ঘর গেছে ভরিয়া। পাশের ছোট কৌটা হইতে আঙুলে করিয়া সাদা 'স্নো' লইয়া দুর্গা বিবর্ণ মুখের সৌন্দর্য্যসাধনে যত্নবতী।

মুগ্ধ হইবার অবসর হরিশের ছিল না। ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে সে ডাকিল,—দুর্গা।

হরিশের ক্রুদ্ধকণ্ঠে দুর্গা মুখ ফিরাইল। মুখ ফিরাইয়া চক্ষুর কোমল ভঙ্গি করিয়া অধরে হাসি মাখাইয়া সলজ্জ কণ্ঠে কহিল,—কি?

হরিশ মুখ ভেংচাইয়া বলিল, কি? যেন ক'নে খুকী! ন্যাকামী রাখ—সত্যি কথা বল।

দুর্গা চোখ নাচাইয়া বলিল, মিথ্যে বলার আমার দরকার!

হরিশ বলিল, তুমি রাত্রিতে মায়ার বাক্স ভেঙেছ?

দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া আদুরে মেয়েটির মত অসঙ্কোচেই বলিল,—হাঁ।

—তার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করেছ!

—টাকা ত? নিয়েছি।

—তোমার একটু লজ্জা হ'ল না, ঘেন্না হ'ল না। তার কাপড় প'রে—তার স্নো মুখে মাখছ? চোর কোথাকার!

দুর্গা শান্তস্বরে বলিল,—চোর কে নয়? যে নেয়—সেই চোর। কেউ মনে মনে নেয়—কেউ সত্যি সত্যি হাত দিয়ে নেয়। নিজের ভালর জন্যেই ত লোকে নেয়।

অসহ্য ক্রোধে হরিশ কাঁপিতে লাগিল।

দুর্গা মুখ ফিরাইয়া কোমল কণ্ঠে বলিল,—কাঁপছ কেন, ব'সো। মমতা বোকা নয়—সবই বুঝেছে, তাই চলে গেল।

একটু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা এ-সব মাখলে আমায় এখনও বেশ মানায়, না!

হরিশের আর সহ্য হইল না, হাতের টাকাটা দুর্গার কপাল লক্ষ্য করিয়া সে সজোরে ছুঁড়িল।

কপাল কাটিয়া দরদর ধারে রক্ত ঝরিতে লাগিল।

দুর্গা একবার মাত্র 'উঃ' বলিয়া গামছাখানা তুলিয়া লইয়া ধীর ভাবে রক্তাক্ত স্থানটা মুছিতে লাগিল।

হরিশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তাহার নাই। সে ত এখন বর্ষাবারিধারাসিক্ত জীর্ণ চালাঘরের অধিবাসিনী অলক্ষ্মীরূপিণী দুর্গা নহে,—বিশ বৎসরের বহু বাধা অতিক্রম করিয়া অতীতের স্বর্ণশতদলোপরি আসীনা প্রীতিমতী বধূ সে।

রক্তধারা নিঃশেষে মুছিয়া আঙুলে করিয়া 'স্নো' তুলিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন মনেই দুর্গা প্রসাধনে মনোনিবেশ করিল।
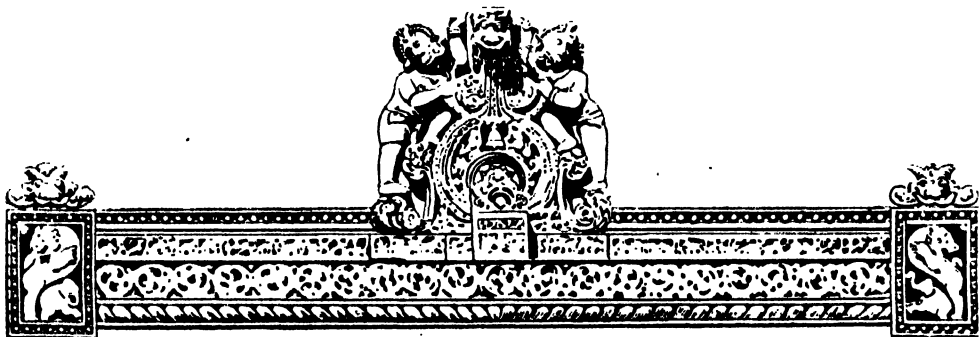
পশ্চিমযাত্রিকী

শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ

(৪)

১লা জুলাই। ৩০শে জুন বেলা ১২টার ট্রেনে চ'ড়ে রাত ১০টার সময় প্যারিসে এসে পৌছলুম। বর্ষাকালের মত টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তার দু-পাশে বড় বড় বাড়ি ও দোকান। সুইটজারল্যাণ্ডের সৌন্দর্য্য তখনও মনে ভাসছিল, কাজেই এখানে এসে প্রথমে এই আবহাওয়ার ভেতর প'ড়ে প্যারিসকে তেমন সোনার চোখে দেখ্‌তে পারলুম না। এখানে দিন-পাঁচেক থাকবার পর তবে এর স্বরূপ বুঝেছি।

ষ্টেশনে নেমে কুলী পাই না। অনেক ডাকাডাকির পর দুটি কুলী পাওয়া গেল তাদের মুখে উগ্র সুরার গন্ধ। কুলীদের বলা গেল আমাদের একটা ট্যাক্সিতে তুলে দাও। এখানে ট্যাক্সি গাড়ীকে 'অটোমবিল' বলে। অটোমবিল আমাদের রু-দু- কামারটিনে হোটেল সেণ্ট-পিটার্সবার্গে পৌছে দিলে। এই হোটেলটি সুইটজারল্যাণ্ডে থাকতেই ঠিক করেছিলুম। আমরা একটা বড় ঘর পেলুম, ভাড়া ৯০ ফ্র্যাঁ ক'রে। প্যারিসে আমরা কয়েকটা জায়গা দেখলুম। লুভ্‌র্ মিউজিয়ম, রোদ্যাঁ মিউজিয়ম, এফেল টাওয়ার, লুক্সেমবার্গ বাগান, বোয়াদে বুলোন বাগান, ইত্যাদি। এক দিন প্যারিস থেকে ভার্সাইয়ের বাগানও দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। আর এক দিন প্যারিসের চিড়িয়াখানা দেখা হয়েছিল। প্যারিসের পশুশালাটি বড় নোংরা, জন্তু-জানোয়ারও তেমন সুবিধার নয়, সব যেন ধুঁকছে। এফেল টাওয়ারের উপর উঠেছিলুম। এর উচ্চতা ১০০০ ফুট। উপরে উঠবার জন্য লিফ্‌টের বন্দোবস্ত আছে। উপরে ফটোগ্রাফার পাওয়া যায়, দোকান খুলে ব'সে আছে, তোমার যেমন খুশী সেই রকম ভঙ্গীতে ব'সে দাঁড়িয়ে ছবি তোলাতে পার। দু-একটি অন্য দোকানও আছে। তাতে পিতলের ছোট্ট ছোট্ট এফেল টাওয়ার, পিকচার পোষ্টকার্ড ও অন্যান্য জিনিষ বিক্রী হয়। চায়ের বন্দোবস্ত আছে। পয়সা খরচ করলেই সব রকম পাওয়া যাবে। প্যারিসের বড় দোকান গ্যালারীর লাফেয়েতে একদিন গেলুম। আমাদের কলকাতার নিউ মার্কেটের চেয়ে অনেক ছোট, তবে এর বন্দোবস্ত অন্য ধরণের। লুভ্‌র্ মিউজিয়মের ছবির গ্যালারীর নামডাক সবাই শুনেছেন, ঘুরে ঘুরে দেখে পা ব্যথা হয়ে যায়। এই মিউজিয়মের ভেতর অনেক শিল্পীকে ব'সে ছবি আঁকতে দেখলুম। এরা সবাই বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা ছবি থেকে নকল করছিল। এক জন মহিলা-শিল্পী আমাদের দেখে আমাদের কাছে এসে বললেন যে, আমরা যদি রাজী হই ত তিনি আমাদের ছবি খুব ভাল ক'রে অয়েল-পেণ্টিং ক'রে দেবেন। আমরা তাঁর কাছে এর জন্য রোজ যাব, ও আমাদের এক মাস প্যারিসে থাকতে হবে। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে জানালুম আমরা মাত্র কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি, এখন ছবির কোনও সুবিধা হবে না। এখানে থাক্‌তে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলুম, রাস্তার ফুটপাথের ওপর সকাল থেকে রাত বারটা পর্য্যন্ত লোকের চেয়ার-টেবিল পেতে ব'সে পান ভোজন করা। এই ধরণের ব্যাপার কন্টিনেণ্টের প্রায় সকল জায়গাতেই দেখেছি, কিন্তু প্যারিসের মত এতটা নয়। এক দিন প্যারিসের অপেরা দেখলুম। এর ভেতর অভিনয় যা হ'ল তা সমস্তই গানের দ্বারা। আমরা ভাষা জানি না, তবে অভিনীত গল্পটি সমস্তই ইংরেজীতে তর্জ্জমা করা ছোট বই কিনতে পাওয়া গিয়েছিল, তাই থেকে সব বুঝতে পেরেছিলুম। এর দৃশ্যপট ও সাজ-সজ্জা অতি সুন্দর। ভার্সাইয়ের বাগান ও প্যালেস এক দিন দেখে আসা হ'ল। এর বাগান ও ফোয়ারা দেখবার মতন। এইখানে আমাদের এক দল টুরিষ্টদের নিয়ে ছবি তোলা হয়েছিল। প্যালেসের ভেতরের ছবি ও নানা ধরণের আসবাব ইত্যাদির কথা মুখে ব'লে শেষ করা যায় না। এক দিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা মোটর ক'রে চার ঘণ্টার জন্য প্যারিসে নৈশ জীবন দেখতে বেরুলুম। গাইড আমাদের

কয়েকটি জায়গায় দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালে। একটি ছোট্ট দোকানের মতন ঘর, তার দরজায় টোকা মারতেই একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক দরজা খুলে দিলে। ভেতরে ঢুকে দেখি অবাক কাণ্ড। ওই ছোট্ট ঘরটিতে প্রায় এক-শ লোক মেয়ে-পুরুষ ঠাসাঠাসি ক'রে নৃত্য করছে। চতুর্দ্দিকে হাসির হররা ও উৎকট মদের গন্ধ। নানা জাতের লোক আছে, তার ভেতর ছ'টি বাঙালী ছেলেকেও নাচতে দেখেছি। আমার মনে হ'ল এদের মা-বাপ জানেও না যে ছেলে বিদেশে এক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে এসে আর এক শিক্ষা করছে। অবশ্য নৃত্য জিনিষটা এখন আমাদের দেশে খুবই চলছে। এখানে দশ মিনিট থাকবার পর আমরা অন্য জায়গায় গেলুম। অনেক কাল আগে এটি কারাগার রূপে ব্যবহৃত হ'ত, এখন যত নিষ্কর্ম্মা লোকদের নৈশ আমোদ-প্রমোদের জায়গা হয়েছে। এর ভেতর নাচ, গান, থিয়েটার, ট্যাবলো সবই হচ্ছে। এখান থেকে আরও কিছুদূর গিয়ে একটি বড় বাড়ির সামনে নামলুম। বাইরে থেকে সমস্ত বাড়িটিকে দেখলে বোঝা যায় যে এক-এক তলায় এক একটি অফিস ও নানান জিনিষের দোকান ইত্যাদি আছে। কিন্তু এর সব চেয়ে নীচের তলায় অন্য ব্যাপার। এরও সদর দরজা বন্ধ ছিল। ঘণ্টা দিতেই চাকর খুলে দিলে। আমরা প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন লোক ভেতরের হলে এলুম। সেখান থেকে একটি বড় লিফ্‌টে ক'রে প্রায় দোতালার সমান নীচেয় নেমে এসে দেখি যেন একটি বড় শহর। তাতে দোকানপাট, নাচ, গান, থিয়েটার, সাঁতার দেওয়া, সব চলছে। কৃত্রিম হ্রদের উপর ইতালীর ভেনিসের নকলে তৈরি বাড়ি-ঘর। জলের উপর নৌকা চলছে, বাড়ির বারান্দায় ইতালীয় পোষাকে সজ্জিত প্রেমিকযুগলের প্রেমের গানও হচ্ছে। কয়েকটি নৃত্যপরা অপ্সরার অর্দ্ধনগ্ন পরিচ্ছদ ও ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'ল এরা বোধ হয় জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জাসরমে জলাঞ্জলি দিয়েছে। এ-সব নাচে বোধ হয় প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধার অধিকার নেই, কেন-না দেখলুম তারা আমাদেরই মত দর্শক মাত্র। সুদক্ষ নর্ত্তকের হাতে সুন্দরী নর্ত্তকীরা যেন খেলার পুতুল, তাদের নিয়ে লোফালুফি করা এবং কাঁধে ও মাথায় বসিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করা দেখে মনে হ'ল এদের শরীর যেন পালকের তৈরি, হাড় ব'লে কোন পদার্থ নেই!

খুব ছোটবেলায় আমাদের বাড়ির এক পুরাতন ঝিয়ের মুখে গল্প শুনেছিলুম, পেরথম পক্ষের ইস্তিরী সোয়ামীর পাতে ব'সে খায়। দ্বিতীয় পক্ষের সাথে ব'সে খায়, আর তৃতীয় পক্ষের হ'লে একেবারে কাঁধে চড়ে খায়। এখন এই নাচ দেখে মনে হ'ল যে-কোন পক্ষের স্ত্রী হোক, শুধু খাওয়া কেন, এদের মত শরীর সুগঠিত হ'লে বোধ হয় কাঁধে চড়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতেও পারা যায়। আমরা প্রায় সন্ধ্যা ছ'টার সময় হোটেলে ফিরে এলুম। রাত্রে এফেল টাওয়ারটি সমস্ত আলো দিয়ে সাজান হয়। প্যারিস শহরটিও রাত্রে বিজ্ঞাপনের আলোর মালাতে খুব ঝলমল করে। প্যারিস আমাদের দু-বার দেখা হয়েছিল। দু-বারের বিবরণ একবারেই মোটামুটি জানালাম। অনেক জিনিষ হয়ত বাদ পড়লো। প্যারিস সম্বন্ধে পাঁচ জনের কাছে গল্প শুনে ও বইয়ে প'ড়ে আমার ধারণা হয়েছিল, এদেশের লোক যেমন সৌখীন, হয়ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও নিজেরা তেমনই থাকে; কিন্তু ক'দিন বসবাস ক'রে বুঝলুম বাহ্যিক আড়ম্বর খুব বেশী। ট্রেনে যাচ্ছি, দেখি এক সুবেশা যুবতী চলেছেন, পরনে দামী সিল্কের লেসের গাউন, ভেতরের জামা যে কত দিন কাচা হয় নি তার ঠিক নেই, পাশে বসতেই সুন্দরীর গায়ের বোট্‌কা গন্ধে প্রাণ আনচান ক'রে উঠল। তার নিজের কায়দা ঠিক আছে কিন্তু, গন্তব্য স্থানে নামবার আগে ঠোঁটে লাল বাতি ঘসে, চোখে কাল কালি টেনে, আঙুলের নখে নখে লাল অর্দ্ধচন্দ্র ক'রে হাতের তেলোতে ও গালে উৎকৃষ্ট পুষ্পসার মাখ্‌তে কোথাও ভুলচুক হ'ল না। পুরুষমানুষের গায়েও এমন ধারা গন্ধ পাওয়া যায়, তাদের আর এই ধরণের উপরি প্রসাধনের উপকরণ সঙ্গে থাকে না। এখানে প্রত্যেক লোকই যে এ-রকম তা নয়, তবে শতকরা আশী জন ত বটেই। এখানে পাঁচ দিন থাকবার পর আমরা ট্রেনে ক'রে ক্যালে গেলুম। ঘণ্টাখানেক ধ'রে ইংলিশ-চ্যানেলে সমুদ্রযাত্রা ক'রে ইংলণ্ডের তীরে ডোভার বন্দরে নামা হ'ল। ইংলিশ-চ্যানেলের জলের রং ঠিক শ্যাওলার মত।

ডোভারে নামবার পর কাষ্টমস্‌ পরীক্ষার পালা। আমাদের বাক্স-পেঁটরা সব খুলে দেখালুম। বাইনোকিউলার দেখে জিজ্ঞাসা করলে এটা কোথায় ও কবে কেনা। জবাব দিলুম, এটা আমার শ্বশুরের ছিল, আমার স্বামী ১৯২৩ সালে ইংলণ্ডে পাঠ্যাবস্থায় যখন ছিলেন তখনও এটা তাঁর সঙ্গে

ছিল। ক্যামেরা সম্বন্ধেও সেই প্রশ্ন। আমার স্বামী বললেন ১৯২৪ সালে দেশে ফিরে যাবার সময় সেলফ্রিজের দোকানে কিনেছিলেন। ছুটো জবাবে সন্তুষ্ট হ'ল। প্রশ্ন—সেণ্ট, লোশান ইত্যাদি কিছু আছে? সঙ্গে কিছু পরিমাণ ইউডিকলোন ছিল। দেখে বললে,—আচ্ছা। রেহাই পাওয়া গেল। কাষ্টমস্ পরীক্ষার সময় লাগেজ টেবিলে সারবন্দী ক'রে রাখবার বন্দোবস্ত আছে। লাগেজ-পরীক্ষক ছু-তিন জন ক'রে থাকে। আমাদের যখন লাগেজ পরীক্ষা চলছিল, তখন দেখি পাশে একটি ইংরেজ-মহিলাকে পরীক্ষক হেস্তনেস্ত করছে। তিনি কাষ্টমের সব জিনিষ 'ডিক্লেয়ার' করেন নি। ডিক্লেয়ার করার ব্যাপারটি এই;—কাষ্টমের একটি তালিকা আছে। সেই তালিকার জিনিষ কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। ইংরেজ-মহিলা প্যারিস থেকে মস্ত এক শিশি লোশান এনেছিলেন। সেটি তাঁর ডিক্লেয়ার করা উচিত ছিল, তা তিনি করেন নি কেন, সেজন্য জবাবদিহি করতে হ'ল। শেষে কি হ'ল জানি না।

প্যারিস থেকে রেলে আসতে আমাদের কামরায় একটি বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি ট্রেনে উঠবার সময় আমাদের না দেখতে পেয়ে খুঁজছিলেন। দেখে ব'লে উঠলেন, শিগ্‌গির উঠুন, উঠুন বলছি, ট্রেন ছেড়ে দেবে। আমরা কোনো ক'রে লাগেজ নিয়ে উঠে পড়লুম। ট্রেনটি পুলম্যান ট্রেন। বৈকালিক চা-পান এই ট্রেনেই সেরে নেওয়া হ'ল। ট্রেনের দুপাশেই ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম দেখতে দেখতে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে ফসলের ক্ষেতের মাঝখানে 'বীচামস্-পিলে'র বিজ্ঞাপনও দেখছি। এই বীচামস্-পিলের বিজ্ঞাপনটি যেন আমাদের দেশের 'জারমলীন জরের যমে'র মত। আর একটি বিজ্ঞাপন দেখে হাসি পেয়ে গেল। সেটি একটি হৃষ্টপুষ্ট গাভীর মাথার ছবি, তলায় লেখা "হোম-কিল্ড, এস, এক টুকরা কিনে দেখ।" এত দিন হোম-মেড্ কথাটা শুনেছিলুম, আজ এই 'হোম-কিল্ডে' নূতনত্ব বোধ হ'ল।

কিছুদূর যাবার পর লণ্ডনের টেম্‌স্ নদীর সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন চলল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। এই টেম্‌স্। আমাদের এক পরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক লণ্ডনে বেড়াতে এসে এক দিন দোতালা বাসের উপর থেকে এই টেম্‌স্ নদী দেখে, তাঁর জামাতাকে চীৎকার ক'রে ডেকে ব'লে উঠেছিলেন, "ও সুধাংশু, এই কি তোদের টেম্‌স্ নদী নাকি?" আজ এই টেম্‌স্ নদী দেখে সেই কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের দেশের নদীর কাছে এসব খাল মাত্র। ট্রেন লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌছল। চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা,

প্যারি—বিশ্ববিদ্যালয়

বাড়িঘরদোর সব অন্ধকার রং। টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, মনকে বোঝালুম লণ্ডনের ধরণই এই। বন্ধু আর্থার হাণ্টার ষ্টেশনে আমাদের নিতে এসেছিলেন। তাঁর কাছে শুনলুম, তিনি লণ্ডনের কেনসিংটন পার্কের পাশে রয়েল প্যালেস হোটেলে আমাদের থাকবার জন্য ঘর ঠিক করেছেন। তাঁর কাছে আরও খবর পেলুম আমরা জেনোয়া থেকে যে-সব লাগেজ সোজা লণ্ডনে পাঠিয়েছিলুম, তার ভেতর থেকে দু'টি বড় সুটকেস লণ্ডনের কাষ্টমস্ অফিসে আটকে রেখেছে। তার ভেতর নাকি দুটি সিল্কের রোল্ পাওয়া গেছে। আমাদের এর জন্য কাষ্টমস্ অফিসে গিয়ে জবাবদিহি ক'রে তবে আনতে হবে। আর সব জিনিষ হোটেলের ঘরেই পাওয়া গেল। ঘরটি বেশ ভাল ছিল। সেদিনের মত খাওয়া চুকিয়ে বিছানা নিলুম। রাত তখন

দশটা, বিছানায় রোদ এসে পড়েছে, এগারটার সময় ঠিক সন্ধ্যে হয় তখন।

দু-এক দিন পরে আমরা লণ্ডনের শহরের বাইরে কাষ্টমস্ অফিসে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটি ক'রে বাক্স দু'টি নিয়ে এলুম। তাদের এ দুটিকে আটক রাখবার কারণ, একটি বাক্সে আমার দুটি শাড়ীর পাড় ছিল, এই দুটোকেই তারা সিল্কের রোল্ বলছে। আর একটিতে একটি তাঁতের গোদাবরী শাড়ীকে আর্টিফিশিয়াল সিল্ক ব'লে দিলে। সিল্ক সম্বন্ধে জ্ঞান খুব টনটনে বলতে হবে। বাক্সে এক কৌটা খড়ির গুঁড়া

প্যারি—প্যানথিয়ন
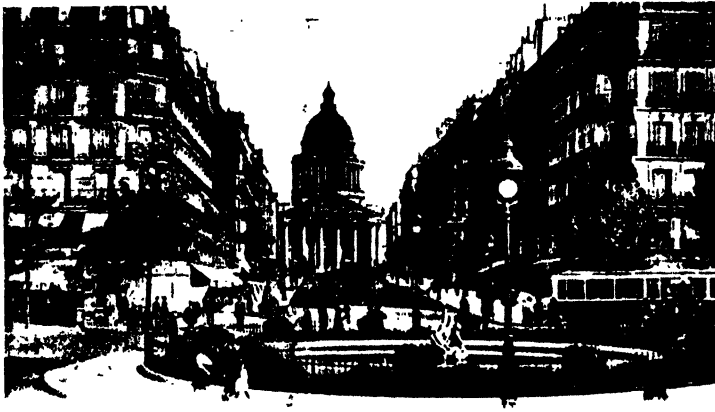
ছিল দাঁত মাজবার জন্য। সেটিকে ব'লে দিলে, এটা কি কোকেন? চ'টেম'টে ব'লে ফেললুম, এটিকে তোমরা নিয়ে নাও, আমার চাই না, কোন ল্যাবরেটারীতে পাঠিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করাও। এ-কথার উত্তরে আর কিছু না ব'লে সব দিয়ে দিলে। এখানে দু-দিন শীত একটু বেশী পড়েছিল। আবার রোদ উঠে সেটা কমে গেল। এখানকার আবহাওয়ার কোন স্থিরতা নেই। কখনও বেশ গরম বোধ হয়, আবার একটু বৃষ্টি পড়লেই স্যাঁতসেঁতে ভাব হয়।

কয়েক দিন পরে আমার বাবার বন্ধু বিখ্যাত মনোবিৎ ডাক্তার আরনেষ্ট্ জোন্সের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি আমাদের দেশের অনেক খবরাখবর নিলেন। আমার বাবাকে লণ্ডনে আসবার জন্য তাঁর নাম ক'রে অনুরোধ ক'রে চিঠি লিখে জানাতে বল্লেন। এক দিন লাঞ্চ খাবার জন্য নিমন্ত্রণও করলেন। এখানে পাঁচ রকম কথার প্রসঙ্গে ডাক্তার জোনস্ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমাদের এই লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ত তোমাদের ভারতবর্ষের জিনিষ অনেক আছে তোমাদের যদি কখনও স্বরাজ লাভ হয়, তাহ'লে সে-সব হয়ত ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? উত্তর দিয়েছিলুম, তখন কি করবো ব'লতে পারি না। তাঁর কাছে খবর পেলুম, রাঁচীর মেণ্টাল হস্‌পিটালের ডাক্তার কর্ণেল বার্কলিহিল যখন লণ্ডনে আসেন, এঁর কাছেই এখানে থাকেন। ডাক্তার জোন্সের কাছে আমরা অনেক বিষয় জানতে পারলুম। তিনি আমাদের যথেষ্ট আদর-যত্ন করেছিলেন।

এক দিন লিঙ্কন্স-ইন ও ল-কোর্ট দেখে এলুম। আমাদের দেশের হাইকোর্টের ভেতর কি হয়, আমরা মেয়েরা বড়-একটা দেখতে পাই না, এখানে সে সুবিধা হওয়াতে দেখবার সুযোগ ছাড়ি নি। এক দিন প্রিভিকাউন্সিল দেখতে গেলুম। তখন আমাদের দেশের একজনদের কি এক বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে বিচার চলছিল; জজ সাহেব কৌঁসুলীর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ কথার মাঝখানেই প্রশ্ন ক'রে বস্‌লেন, "তুমি যে বলছ ব্রজকিশোর আঠার-উনিশ বছরেই মারা গেছে, তবে আবার তার ছেলের কথা তুলছ কেন? আঠার বছর বয়সের লোকের আবার ছেলে কি?" কৌঁসুলী সাহেব বল্‌লেন, "শুনেছি ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে আগে চৌদ্দ-পনর বছরের ছেলের বিয়ে হ'ত, সুতরাং আঠার বছরে ছেলের বাপ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।" এ-কথায় একটা হাসির ধুম পড়ে গেল। এ সময় স্বর্গীয় স্যর দিন-শ মুল্লাকেও সেখানে এক জজের আসনে উপবিষ্ট দেখেছিলুম।

এখানকার পুলিস একটা দেখবার জিনিষ। পুলিস হ'তে গেলে ৬ ফুট লম্বা হওয়া চাই। রাস্তাঘাটে কোথাও কোন জায়গার সম্বন্ধে জানবার থাকলে পুলিসের সাহায্যে সম্ভব হ'তে পারে। রাস্তায় মানুষ ও গাড়ীর চলাচল অত্যন্ত বেশী জানালা দিয়ে দেখেছি কাতারে কাতারে লোক, গাড়ীঘোড়া, ট্রাম, বাস, মোটর চলছে, টুঁ শব্দ নেই। পুলিস এ-স

বেশ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালন করছে। রাস্তায় গাড়ীঘোড়ার চলাচল বেশী ব'লে লোকের যাতে রাস্তা পার হবার অসুবিধা না-হয় তার সুবিধাও আছে; রাস্তার নীচে দিয়ে অপর ফুটপাথের উপর যাওয়া যায়, নামবার জন্য সিঁড়ি আছে। ভেতরটি সব বাঁধান ও ইলেকট্রিক আলোর দ্বারা আলোকিত। ভেতরে দেখলে উপরকার ব্যাপার কিছু বোঝবার জো নেই। সেখানে খবরের কাগজের দোকান, বইয়ের দোকান, ফলের দোকান ও বিলাতের সোয়ান এণ্ড এডগার ইত্যাদি বড় বড় দোকানের ব্রাঞ্চও আছে। কারুর বাথরুমে যাবার দরকার হ'লে তার বন্দোবস্তও আছে। বাথরুমের দরজাটি সব সময়ে বন্ধ থাকে। দরজার ফুটাতে একটি পেনী ফেললে দরজা আপনা হ'তেই খুলে যাবে। দরজার সামনে পেনী-ওয়ালী বুড়ী ব'সে আছে, পেনীগুলি তারই প্রাপ্য, সে এই সব বাথরুম পরিষ্কার রাখে। বুড়ীর বড়ই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ব'সে ব'সে সেলাই বোনাও করে, আবার নজরও রাখে কে পেনী না-দিয়ে দরজা খোলবার চেষ্টা করছে। আমাদের এক পরিচিত লোক একবার না-জেনে পেনী না-দিয়েই দরজা কি রকম ভাবে খুলে ফেলে ঢুকেছিলেন। শেষে বেরিয়ে আসবার সময় পথে বুড়ী তাকে গ্রেপ্তার ক'রে পেনী আদায় করেছিল।

এখানকার বাস্‌গুলি বেশ, বস্‌বার সীট অতি আরামের, নরম গদীওয়ালা। সব বাসই দোতালা। যাঁরা ধূমপান করেন, তাঁদের উপরে বসবার নিয়ম। যাতে গাড়ীর মধ্যে ধোঁয়া বেশী হয়ে অপরের অসুবিধা না হয়, সেজন্য এই ব্যবস্থা।

লণ্ডনে আসবার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত অবনীনাথ মিত্র [illegible]কে এক দিন বার্লিন থেকে এসে পড়লেন। আমরা বহুদিন [illegible] আবার এই পরিচিত আমুদে লোকটিকে পেয়ে বড় খুশী [illegible]লুম। এক দিন তাঁদের সঙ্গে এখানকার মিউজিয়মগুলি [illegible]তে গেলুম। রাস্তার নাম একজিবিশন রোড। এই রাস্তার [illegible]শের বড় বড় বাড়িগুলিতে সব একজিবিশন ও মিউজিয়ম। [illegible]রা ওয়ার মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া এলবার্ট মিউজিয়ম [illegible]রল হিষ্টরী মিউজিয়ম ইত্যাদি দেখে এলুম, এগুলি সবই দেখবার জিনিষ।

একদিন বাসে ক'রে কোথায় যাচ্ছিলুম। পাশে এক ইংরেজ-মহিলা তাঁর ছোট ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ছেলেটি খেলা করতে করতে তার গালে কি রকমে একটু কাদা লাগিয়ে ফেলেছিল। শিক্ষিতা জননী তৎক্ষণাৎ তাঁর রুমাল বার ক'রে নিজের মুখের থুথুর দ্বারা এক কোণ ভিজিয়ে ছেলের
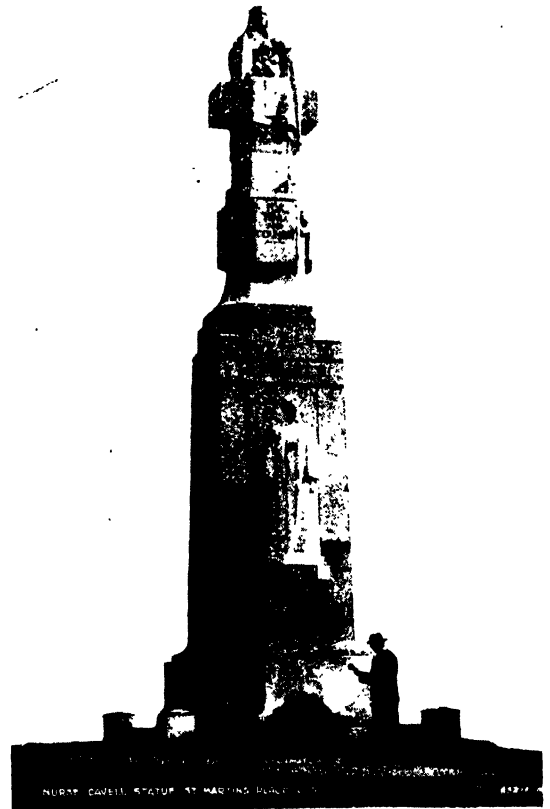
নর্স এডিথ ক্যাভেলের মর্ম্মর-মূর্ত্তি

গালের কাদা তুলে দিলেন। আর একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এক জায়গায় গোটাকতক কুলী শাবল নিয়ে রাস্তা খুঁড়ছিল। হঠাৎ থুথুফেলার আওয়াজ হ'তেই আমি সেদিকে চেয়ে দেখলুম; ভাবলুম পথেঘাটে ত থুথু ফেলার নিয়ম নেই, তবে কোথায় ফেলে দেখি। ও হরি! দেখি তার হাতে কালি লেগেছে, সেই হাত দুখানি অঞ্জলি ক'রে মুখের সামনে ধ'রে অনবরত ওয়াক থু ক'রে হাতের তেলোর ওপরেই থুথু ফেলে হাতে সাবান দেওয়ার মতন হাত কচ্‌লাতে লাগলো। তার

পর পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে মুছে ফেললে। এসব ছাড়া অন্য কাজেও, যথা, খামের উপর টিকিট-মারা, ওভারকোটের দাগ ওঠানো, খাম বন্ধ করা ইত্যাদিতে ভদ্রলোককেও থুথু ব্যবহার করতে দেখেছি। এরাই সভ্য ও শিক্ষিত ব'লে অহঙ্কার করে। আমাদের দেশের ধাঙড় ও মেথর—যারা অনবরত ময়লা পরিষ্কার করছে—তাদের ভেতরেও বোধ হয় থুথুর দ্বারা ছেলের মুখ মোছানো, নিজের হাত ধোয়ার ইচ্ছা কোন দিন হবে না। রাস্তায় একটি ছোট গরিবের ছেলেকে এক দিন মুখে কালিমাখা দেখে ভাবলুম বেচারীর মুখখানা আজ থুথুতে ভরে যাবে হয়ত।

রাস্তায় সব সময় বেশী ভিড় থাকা সত্বেও লোকের গায়ে-পড়াপড়ি নেই। কেউ কাউকে ধাক্কা দিয়ে অযথা সময় নষ্ট ক'রে গালিগালাজ করে না। রাস্তার মাঝখানে ফলের খোসা, ছেঁড়া কাগজের টুকরা প'ড়ে থাকে না। তার জন্য গাছের গায়ে জালের খাঁচা করা আছে। থিয়েটার, সিনেমার টিকিট-ঘরের সামনে লোকের হুড়াহুড়ি নেই, সবাই নিঃশব্দে কলের পুতুলের মত লাইন ক'রে পরের পর এগোতে থাকে, তার জন্য যত ক্ষণ সময় লাগুক, বিরক্তি নেই তাতে। এই সব ধরণ শেখ্‌বার মত।

কেনিলওয়ার্থ-কাস্‌ল

বিলেত-ফেরৎ অনেক পরিচিত ছেলে ও মেয়ের কাছে অনেক সময় শুনতুম বিলাতের মেয়েরা যেমন খাটতে পারে, আমাদের দেশের মেয়েরা তেমন পারে না। তাদের এ-বিষয়ে বাহাদুরী খুব। শুনে পর্য্যন্ত এই সব মেয়ের কাজ করা'র ধরণ দেখে শেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। এখানে এসে দেখলুম এরা খুবই খাটতে পারে সে কথা সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের মতন ক'রে কাজ করতে হ'লে কিছুতেই পেরে উঠত না। কেন পারত না তার গোটাকয়েক কারণ বলব।

প্রথম কারণ, এটা শীতপ্রধান দেশ, ঠাণ্ডায় পরিশ্রম যেমন সহজসাধ্য, গরমে তা চলে না, কাজেই মেয়ে-পুরুষ সকলেই সারাদিন পরিশ্রম করতে কষ্ট বোধ করে না। দ্বিতীয় কারণ, আমাদের দেশে সাধারণতঃ একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকতে হয়। নিজের মতের অনুযায়ী কাজ করতে পারলে কাজ যতটা শীঘ্র সম্ভব হয়, পাঁচ জনের সঙ্গে থেকে তাদের সুখ-সুবিধা দেখে ও গুরুজনের মতের অপেক্ষা ক'রে কাজ করতে একটু দেরি হবেই। আর আমাদের খাওয়া-দাওয়ার কোন নিয়ম নেই। বাড়ির বাবুরা রোজই হয়ত এক নিয়মে খেয়ে ছুটির দিন এমন বেলায় নাওয়া-খাওয়া করেন যে হাঁড়ি-হেঁসেল তুলতেই বেলা কাবার। এই-সবে খানিকটা সময় নষ্ট হয়। ওদের ওখানে সে-সব হবার জো নেই, যে রান্না ও পরিবেশন করবে তার সুবিধা ও সময়মত খেতেই হবে। এক জন বেলা একটায়, আর এক জন বেলা দশটায় খাচ্ছি, সে সব চলবে না।

রান্নার সময় রকমারি তরকারি কোটা, ও তার রকমারি মশলা পেষার হাঙ্গাম নেই। তার জন্য আলাদা লোকের তাই দরকার হয় না। একটা সুপ, একটু মাছ কিংবা মাংস ও তরকারী ভাজা সিদ্ধ ও একটা পুডিং হ'লেই দুপুরের খাওয়া হয়ে গেল। তার পর সকড়ির বাছবিচার নেই। রান্না করতে করতে চোদ্দ বার হাত ধুতে হয় না। আঁশ-নিরামিষের বিচার নেই, যা রান্না হ'ল সধবা, বিধবা ও কুমারী সব ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে ব'সে খেয়ে নিলে; মাছ-মাংস খায় না এমন লোকও আছে, সে ফল ও শব্জী হয়ত খেলে, কিন্তু তার জন্য বিচার ক'রে হাত ধুয়ে আলাদা বাসনে যে খেতে দিতে

হবে, সে নিয়ম নেই। এই সব কারণে কাজ করতে আমাদের তুলনায় এদের সময় কম লাগে। কেউ যেন মনে না করেন আমি এ-সব লিখলুম ব'লে আমাদের দেশের সব নিয়ম-গুলিকেই খারাপ বলছি। আমাদের কাজে সময় কেন বেশী লাগে, শুধু সেইটুকু বলবার উদ্দেশ্যে এর অবতারণা করেছি। বিলাতে বাড়ির কর্ত্তা অফিসে গেলেন, গিন্নী সংসারের কাজকর্ম্মের ভেতর বাড়ির নীচের তলার জন্য ভাড়াটে জোটাচ্ছেন, বাগানের ফুল বিক্রী করতে পাঠাচ্ছেন, তার জন্য তাঁর কাছে বাইরের পাঁচটা লোক আসছে। এতে অবরোধ-প্রথা নেই, কর্ত্তা এ-সব ব্যাপারে কিছুই নজর দেন না, সারাদিন পরে অফিস থেকে এসে স্ত্রী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন হাওয়া খাবার জন্য। মেয়ে-পুরুষ শরীরের যত্ন ঠিক বোঝে। স্বাস্থ্যের জন্য যতটুকু পরিশ্রম দরকার, সেই অনুযায়ী আমোদ-প্রমোদেও যোগ দেওয়াতে আপত্তি নেই।

আমাদের দেশে সকল বাড়িতে এ-সবের প্রয়োজন ক'টা লোক বোঝে? রাস্তায় বেড়াতে গিয়ে অনেক সময় তরিতরকারি ও মাংসের দোকানে ঢুকে দেখেছি কি রকম ব্যাপার। বাছুরের পাঁজরা থেকে সুরু ক'রে নাড়ী-ভুঁড়ি, লিভার, জিব, ইত্যাদি সমস্তই কাঁচের আবরণের ভেতর বাঁধা-কপির পাতার সঙ্গে বিক্রীর জন্য সাজিয়ে রেখেছে। আনারসের দাম তিন শিলিং ক'রে এক-একটি। একটি পিচ এক শিলিং, কলা এক-একটি ছয় পেনী ক'রে। ভাজা আলু পাতলা কাগজের খামে প্যাকেট ক'রে পাওয়া যায়।

এদেশের লোকেদের সকল জিনিষের ওপর মায়া বোধ হয় কিছু কম। তা হবে নাই বা কেন? কারুরই নিজের ব'লে কিছু নেই। একটি বড় হোটেলের বাড়িখানি হয়ত এক জনের, আর্ণিচার অপরের ও বিছানাপত্র তোয়ালে ইত্যাদি অন্য লোকের। নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদও শুনেছি ইচ্ছামত ভাড়া পাওয়া যায়, সত্য মিথ্যা জানি না।

ছেলেমেয়ে যত দিন না কার্য্যক্ষম হ'ল মা-বাপ দেখাশোনা করলেন, তার পর বড় হয়ে বিয়ে হ'লে ছেলে সস্ত্রীক আলাদা রইল, মেয়েও স্বামীর ঘর করতে গেল। এর পর ছেলের কিংবা মেয়ের মা'র বাড়িতে থাকবার দরকার হ'লে, বেশীর ভাগ বাপ-মা'ই পুত্র-কন্যাদের কাছে ভাড়া ও খাওয়ার খরচা চাইবেন।

আমরা এক দিন বিস্কুটের ফ্যাক্টরী দেখ্‌বার জন্য লণ্ডন থেকে ট্রেনে ক'রে য়্যাক্টন গিয়েছিলুম। সেদিন নাইস বিস্কুট তৈরি হচ্ছিল। একটি বড় কাঠের ডাবার মধ্যে পরিমাণ অনুযায়ী ময়দা, চিনি, ডিম, মাখন ও নারকোল-গুঁড়োর সংমিশ্রণে একটি মাখা-ময়দার স্তূপে পরিণত হচ্ছে। তার পর বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে তাকে বেলে একটি ছোট তোষকের মত হ'ল। তার পর বড় ছুরির দ্বারা তাকে চার ভাগে কেটে

ডোভার

এক-একটি ভাগ অন্য যন্ত্রের তলায় ফেলে তাকে পাতলা ক'রে বেলা হ'তে লাগলো। এই বেলা-ময়দার সরু চাদরটি সমানে চলতে চলতে আর একটি করাতওয়ালা যন্ত্রের তলায় ঢুকছে, ও সেখানে এটি নাইস বিস্কুটের আকারে কাটতে কাটতে একটি বড় আলমারীর মত জায়গায় যাচ্ছে। এইখানে বিস্কুটগুলি সেঁকা হয় ও পরে ট্রে-সুদ্ধ বয়ে বার ক'রে নেওয়া হয়। যত ক্ষণ এই রকম ভাবে ময়দা বেলা চলতে থাকে, সমানে এক জনকে কলের কাছে দাঁড়িয়ে ময়দার উপর চিনি ছড়াতে হয়। হাত কামাই দেবার উপায় নেই। যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে চিনি ছড়াচ্ছিল আমি দেখলুম, তার এই অনবরত হাত-নাড়ার ফলে হাতের গড়নটি বড় সুন্দর। আমাদের

দেশের স্থূলকায়া মহিলাগণ যাঁরা সুন্দর গড়নের পক্ষপাতী, তাঁরা এই রকম হাত-নাড়া অভ্যাস ক'রে দেখ্‌তে পারেন। কলের সমস্ত মহিলা-শ্রমিক সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত সমানে কাজ করছে। মধ্যে জলযোগের জন্য বোধ হয় দু-এক ঘণ্টা বিশ্রামের সময় দেওয়া হয়। ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ কিছু সদ্যঃপ্রস্তুত বিস্কুট আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। এর স্বাদ সাধারণ বিস্কুট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

লণ্ডনের জেরাড ষ্ট্রীটের সোফিস্ রেস্তরাঁ নামে এক হোটেল আছে। এই হোটেলের অধ্যক্ষ যিনি ছিলেন তিনি মুসলমান, তাঁর নামে এই রেস্তরাঁ। সোফিস রেস্তরাঁ নাম দিয়ে তাঁর বিধবা ইউরোপীয়ান স্ত্রী এখন চালাচ্ছেন। এখানে ওয়েটাররা সকলেই ভারতবর্ষীয় মুসলমান। মাছের কালিয়া, কারী, পাতুড়ী, মাংসের কোপ্তা কাবাব, সামীকাবাব, বিরিয়ানী পোলাও, লুচী, দু-রকমের চপ, রুটী পরটা জিলিপী ও ছানার পিঠা সব তৈরি হয়। সব জিনিষ খুব গরম গরম দেয়, ব্যবহার খুব ভদ্র। আমরা এক দিন গরম কচুরী ও বেগুন-চিংড়ী তরকারী খেয়েছি। রান্না মন্দ নয়। এই হোটেলে খেতে গিয়ে দেখেছি যতটা খেতে পারব আশা ক'রে টেবিলে বসেছিলুম, তার সিকি ভাগও খেতে পারলুম না। দুখানা রুটি খেয়েই পেট যথেষ্ট ভ'রে গেল। কিন্তু আমাদের দেশে যে-সব সাহেব চাকুরী করতে আসেন তাঁদের কারি ভাত খেয়ে খেয়ে মুখের তার এমন হয়েছে, যে, এখানে এসে তাঁদের আর এ দেশের খাওয়া পছন্দ হয় না। আমি যেদিনই এই হোটেলে খেতে যেতুম, ভারতবর্ষীয় লোক অপেক্ষা এই ধরণের সাহেব-মেমের ভীড় ও খাওয়ার আগ্রহ বেশী দেখেছি। আমাদের চার জনের খাওয়া তাদের এক জনকে খেতে দেখেছি। এখানে খাওয়ার খরচা একটু বেশী পড়ে। জন-পিছু চার শিলিং (অর্থাৎ দু-টাকা বারো আনা) ক'রে ত বটেই।

আমরা এক দিন ক্রয়ডন, ঈষ্টবোর্ণ ও ব্রাইটন দেখে এসেছি। ক্রয়ডন থেকে এরোপ্লেনে লোকে করাচী পর্য্যন্ত যায়। ঈষ্টবোর্ণ ও ব্রাইটন সমুদ্রের ধারের জায়গা। ঢেউয়ের লাফালাফি নেই, সমুদ্র কিছু ম্যাদামারা-গোছের। লোকে এখানে সান্-বাথ করবার জন্য আসে।

একদিন কেম্ব্রিজ বেড়াতে গেলুম। দশ-বারোটি কলেজ নিয়ে এই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। কিংস কলেজ, ইম্যানুয়েল কলেজ, ডাউনিং কলেজ ইত্যাদি দেখলুম। ছাত্রদের প্রতি কড়া আদেশ জারি করা আছে রাত্রি দশটার পর প্রকাশ্য রাজপথে বেরুলে হোষ্টেলের অধ্যক্ষের কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হয়। সাঁতার, ফুটবল, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদিতে কেম্ব্রিজ সর্ব্বদাই উৎসুক। কিংস কলেজ ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী নির্ম্মাণ করেন। এখানে ইংরেজ কবি বায়রন, টেনিসন্ প্রভৃতি সকলেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। এখানে এঁদের ছবি আছে। লণ্ডনে প্রায় সব সময় টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি হয়। রোদ খুব সামান্যই পাওয়া যায়। যেদিন রোদ বেরোয় সেদিন এ-দেশের বড় শুভদিন, ছোট ছেলে-মেয়েরা বগল-কাটা জামা প'রে মাঠে বেড়াতে যায়। বড়রা সব কাজকর্ম্ম ফেলে যেখানে একটু রোদ পায় সেইখানেই চিংপাত হয়ে শুয়ে সান্-বাথ করে, মাঝারি প্রেমিক ও প্রেমিকারা জলের উপর নৌকা-বিহারে যান, আর নবীনাদের ত কথাই নেই, অর্থাৎ লোক যত রকমে পারে আমোদ ক'রে নেয়। কয়েক দিন পর-পর একটু চড়া রোদ হওয়াতে গরম বোধ হ'তে লাগল। রাস্তায় এ-সময় হ্যাপি-বয় ধরণের আইসক্রিম-গাড়ীর যাতায়াতের সীমা ছিল না। এই সামান্য গরমেই লোকে অস্থির হয়ে উঠ্‌ল, খবরের কাগজে খুব বড় বড় হরফে 'হিট ওয়েভ' সম্বন্ধে লেখালিখি সুরু হ'ল। সাঁতারের পোষাকের দোকানে খুবই কাট্‌তি। মেয়ে-পুরুষ সকলেই রীজেণ্ট পার্কের জলাশয়ে সারাদিন সাঁতার দিলে। একটি মেয়ে এক দিন গরম সহ্য করতে না পেরে প্রকাশ্য দিনের আলোতে ট্রাফালগার স্কোয়ারের ফোয়ারার জলে নামে। পুলিস তাকে ধরেছিল শুনেছি।

এক দিন এখানকার কিউ গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলুম। দেখতে আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেনের মত, চতুর্দ্দিকে ফুলের খুব বাহার, একটি প্যাগোডাও আছে। লণ্ডন শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে একটি পশুশালা আছে। এটির নাম হুইপ্‌স্নেড জুলজিক্যাল গার্ডেন। পশুপক্ষীদের সব খোলা রাখা হয়েছে। এটি দেখতে সারাদিন কেটে গিয়েছিল। বেশ দেখবার জিনিষ। বেশী শীতের সময় শুনলুম জন্তু-জানোয়ারগুলিকে লণ্ডন শহরের রীজেণ্ট পার্কের পশুশালায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রীজেণ্ট পার্কের পশুশালা দেখেছি, মন্দ নয়। এখানে বাঘ ও সিংহকে খাবার দেবার সময় কাঁচা

মাংসের সঙ্গে নুন ও বাঁধাকপির পাতা দিতে দেখেছি। সাহেবদের মত বাঘেরও বোধ হয় স্যালাড খাবার অভ্যাস আছে। এই রীজেন্ট পার্কের চিড়িয়াখানাটি মন্দ নয়। তবে আমাদের আলিপুরের চিড়িয়াখানার কাছে অনেক বিষয়ে ছোট। এর ভিতর একোয়েরিয়ামটি সত্যই দেখবার জিনিস। নদী, সমুদ্র ইত্যাদির মাছ ও কাঁকড়া, কাছিম প্রভৃতিকে এমন ভাবে রাখা হয়েছে, যাতে তারা তাদের প্রকৃত বাসস্থানের সঙ্গে কোন পার্থক্য বুঝতে না পারে। সমুদ্রের মাছগুলির জায়গায় অনবরত নূন-মেশানো টাট্‌কা জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

নদীর মাছগুলির ঘরে শুধু পরিষ্কার জলের বন্দোবস্ত। সমুদ্রের প্রবালের ঘর-সংসার অতি সুন্দরভাবে রাখা আছে। একোয়েরিয়াম দেখতে হ'লে এর জন্য স্বতন্ত্র টিকিট করতে হয়। এর ভেতরটি অন্ধকার, খালি দ্রষ্টব্য জায়গাগুলিতে আলোর বন্দোবস্ত আছে। মাছগুলির গায়ে চিত্র-বিচিত্র নক্‌শা, অতি সুন্দর দেখতে, এবং এদের রঙের বৈচিত্র্য দেখলেও অবাক হ'তে হয়। এর ভেতর ধূমপান নিষেধ।

আমরা এক দিন ট্রেনে ক'রে কভেনট্রি গেলুম। তার পর সেখান থেকে মোটর-কোচে ক'রে কেনিলওয়ার্থ-কাস্‌ল দেখতে যাওয়া হ'ল। কেনিলওয়ার্থ-কাসল সম্বন্ধে স্যর ওয়ালটার স্কটের কেনিলওয়ার্থ নামক উপন্যাস সকলেই পড়েছেন। এটিকে অনেকটা আমাদের লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীর ধরণের দেখতে। তার পর এ্যাভন নদীর ধারে কবি শেক্সপীয়রের জন্মভূমি ষ্ট্র্যাটফোর্ডে যাওয়া হ'ল। এখানে তাঁর জন্মস্থান দেখা হ'ল। কবির নিজের হাতের লেখা চিঠিপত্র ও অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিষ সমস্ত এই ঘরটির ভেতর মিউজিয়ম ক'রে সাজানো আছে। ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে একটি থিয়েটার আছে। এর নাম শেক্সপীয়ার মেমোরিয়াল থিয়েটার। এটি কয়েক বৎসর আগে আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার নূতন ক'রে করা হয়েছে। এখানে কবির স্বরচিত নাটকগুলি অভিনীত হয়। সেখান থেকে আবার কভেনট্রিতে ফেরবার সময় ওয়ারউইক-কাস্‌ল দেখা হ'ল। এই ওয়ারউইক-কাস্‌ল বাইরে থেকে এবং ভেতর থেকে দেখ্‌তে বড় সুন্দর। এ-সব দৃশ্য সেকালের কথা মনে করিয়ে দেয়। লণ্ডন ও তার উপকণ্ঠ দেখলে পুরাতন ঐতিহাসিক চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। ওয়ারউইক-কাসল কিন্তু ঐতিহাসিক।

এই কাস্‌লের ইতিবৃত্ত এই—আলফ্রেড দি গ্রেটের মেয়ে এথেলফ্রেডা ডেন্সদের লুণ্ঠনের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য ওয়ারউইক শহরে এ্যাভন নদীর তীরে এই দুর্গটি নির্ম্মাণ করেন। 'বিজেতা উইলিয়াম' দুর্গের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেওয়ালগুলি ভাল ক'রে গাঁথিয়েছিলেন, কিন্তু তৃতীয় এডওয়ার্ডই নূতন ক'রে দেওয়ালগুলি করেন ও চূড়াগুলি মজবুত করেন।

আমরা এই দুর্গমধ্যে ঢুকলুম। করিডরে এক দল দাঁড়িয়ে আছি, সামনে কল্‌-বেল। বেলের কাছে লেখা আছে, Wait for guide। খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করবার পর গাইড এসে আমাদের দলকে এক এক ক'রে একতলা দোতালার সব ঘর দেখিয়ে বেড়ালে। হলটি বড়। রেড ড্রয়িংরুম ও ষ্টেট বেডরুমটি সবচেয়ে দেখবার। লাল বসবার ঘর থেকে এ্যাভন নদীর দৃশ্য দেখতে মন্দ নয়। খাবার ঘরটি চমৎকার! দেওয়ালের তৈলচিত্রগুলি পছন্দসই। ওয়ারউইক-কাসল দেখে আমরা কভেনট্রিতে ফিরে এসে ট্রেন ধরলুম। লণ্ডন পৌছতে প্রায় রাত্র ন'টা হ'ল। হোটেলে এক হপ্তা থাক্‌বার পর আমরা এর চেয়ে কম খরচার একটি জায়গা খুঁজে জোগাড় করেছিলুম। একটি গৃহস্থবাড়িতে জায়গা পেলুম, দুটি ঘর পেয়েছিলুম, সপ্তাহে পাঁচ দিন খাবারও পাওয়া যেত, কিন্তু বাথরুম ও পায়খানা নিজস্ব পাওয়া যায় নি। লণ্ডনের প্রায় সকল বাড়িতেই এটি লক্ষ্য করেছি, বাড়ি বেশ বড়, হয়ত ঘরও অনেক, কিন্তু পায়খানা ও স্নানের ঘর মাত্র একটি থাকবে তাতে। আমাদের দেশে বড় পরিবার হ'লে, সবাইকেই এক কল-পায়খানা ব্যবহার করতে হয়; তবুও সেটা পারা যায়, কেন-না আমরা ওদের অপেক্ষা অনেক পরিষ্কার। আমাদের কল-পায়খানায় ইচ্ছামত জল ঢেলে তখনই ধুয়ে নেওয়া চলে, ওদের সে উপায় নেই। স্নানের ঘরে বা পায়খানার মেঝেতে জল পড়লে, কোথাও দিয়ে তা বেরবার নর্দ্দমা নেই। ঘর পরিষ্কার করবার দরকার হ'লে, লম্বা বুরুষের তলায় ভিজে ন্যাতা রেখে, ঘষে ঘষে পরিষ্কার করা হয়। মুখ ধোবার জন্যে বেসিন ও স্নানের জন্য বড় বাথ। এই দুটির ভেতরের দিকে জলের কল থাকবে। সুতরাং পাঁচ জনের ব্যবহার করা বাথের মধ্যে নেমে স্নান করতে

প্রবৃত্তি হয় না। হোটেলেও অবশ্য একই বাথ সকলেই ব্যবহার করে, তবুও সেখানে দেখেছি তারা পরিষ্কার রাখে খুব, ও বাথরুমসমেত ঘর নিলে যে ক'দিন সেখানে থাকৃছি কেবলমাত্র নিজেরাই ব্যবহার করতে পারি, এবং এ-রকম বাথরুম আমরা নিজেরা ভাল ক'রে ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে ব্যবহারও করেছি। আমাদের কিছুদিন থাকৃবার পর, অসুবিধা বোধ হওয়াতে আবার হোটেলে ফিরে এলুম।

প্রত্যেক সপ্তাহেই টমাস কুকের অফিসে দেশের চিঠি-পত্র আনতে যেতুম। সেখানে ব'সে বাড়িতে চিঠিপত্র লেখাও যায়। টেবিল, চেয়ার, কালি, কলম, খাম, কাগজ সব সাজানো আছে, খালি টিকিটের দামটি দিতে হয়।

লণ্ডন শহরে বাঙালী ছাত্র অনেক আছে, মাঝে মাঝে রাস্তায় দু-এক জনের সঙ্গে দেখা হয়। এখানে শহর অপেক্ষা শহরের বাহিরের দৃশ্য দেখ্‌তে অনেক সুন্দর। ছোট ছোট পল্লীগ্রামের বাড়িঘর ও ফুলের বাগানগুলি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানে থাকৃতে থাকৃতে বেশ গরম প'ড়ে গেল। আমাদের দেশের ফাল্গুন-চৈত্রের মত। এখানকার লোকের কাছে খবর পেলুম, অনেক কাল পরে এবার এ-রকম গরম পড়েছে। সঙ্গে যা গরম কাপড়চোপড় এনেছিলুম, বিশেষ কিছু দরকার হ'ল না।

রাস্তাঘাটে, ট্রামে, বাসে ঘোরাঘুরির সময় লক্ষ্য করতুম পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের ভীড়ই বেশী, বাসে ত্রিশ জন লোক থাকলে তার মধ্যে পঁচিশ-ছাব্বিশ জন স্ত্রীলোক হবেই। এখানকার লোকদের মুখে শুনেছি গত মহাযুদ্ধের সময় অনেক পুরুষের জীবন নষ্ট হওয়াতে লণ্ডনের মেয়ের সংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে গেছে। কণ্টিনেণ্টেও এটা দেখতে পেয়েছিলুম।

ভারত-প্রত্যাগত সাহেব-মেম অপেক্ষা এদেশের এরা অনেক কম খায়, বিশেষ মেয়েগুলি। তারা সারাদিনে হয়ত দু-চার গেলাস বীয়ার ও একটি আপেল ও দু-টুকরা রুটি খেয়ে থাকে। সকলেই যে এরকম খায় তা নয়, তবে বেশীর ভাগই। কলকাতার আমাদের পাড়ার একটি ছেলে লণ্ডনে পড়তে গিয়েছিল। সে আমার কাছে লণ্ডনের অতি সাধারণ মেয়েদের ধরণ সম্বন্ধে যে-রকম ভাষায় গল্প করেছিল, আমি ঠিক সেই রকম ভাবেই বলছি। এটা হ'ল অতি সাধারণ মেয়েদের ধরণ—"সকাল হ'ল, কোন রকমে এক বাটী চা খেয়েই পরনের ময়লা জামাটির উপরে একটি চকচকে কোট প'রে ভেতরের জামাটিকে ঢেকে দিলে, তার পরে গালে রুজ লাগিয়ে, ঠোঁটে লাল রং দিয়ে, মাথায় টুপি এঁটে নিজের কর্ম্মস্থানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন খেটে দুখানি মাত্র বান্ হজম ক'রে সন্ধ্যাবেলা ঘরে এল। তার পর তার ছেলে-বন্ধু এল। আবার সাজগোজ ক'রে বেরিয়ে গেল। বাড়িতে রান্নার পাট নেই। ছেলে-বন্ধু তাকে কোন সস্তা হোটেলে নিয়ে গিয়ে দু-শিলিং খরচা ক'রে খাওয়াল। তার পর তার সঙ্গে সারারাত নাচল। রাত চারটায় বাড়ি এল" ইত্যাদি।

লণ্ডনের আনডার-গ্রাউণ্ড সাব্‌ওয়ে বা রাস্তার নীচে দিয়ে লোক-চলাচলের ব্যবস্থার কথা আগেই বলেছি। এবার আনডার-গ্রাউণ্ড টিউব রেলওয়ের কথা বলব। লণ্ডন শহরটি আগা-গোড়া ফাঁপা বল্‌লেও চলে। মাটির নীচে দিয়ে লোকচলাচল করছে। এর নাম আনডার-গ্রাউণ্ড সাব-ওয়ে। এ ছাড়া এক রকম ট্রেন-চলাচল করে মাটির নীচে দিয়ে, তার নাম মেট্রোপলিটান রেলওয়ে। এই ট্রেনের মাত্র দু-একটি কামরা ছাড়া আর সবগুলিতেই ধূমপান নিষেধ। এটি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলে। ট্রেনের ভেতর ইলেক্‌ট্রিক আলোর বন্দোবস্ত আছে। মাঝে মাঝে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দিনের আলোও দেখতে পাওয়া যায়। এর নীচে আর একটি ব্যাপার আছে, সেটি টিউব-ষ্টেশন। এটি কত হাজার ফুট নীচু তা জানি না। আগে এখানে নামবার দরকার হ'লে রাস্তার উপর থেকে লিফ্‌টে ক'রে নামা যেত, এখন বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়ায় লিফ্‌ট তুলে দিয়ে এসকেলেটার বা চলন্ত সিঁড়ির প্রচলন হয়েছে। তোমাকে কষ্ট ক'রে অত সিঁড়ি ভাঙতে হবে না। তুমি শুধু সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা ঠিক ক'রে দাঁড়াও, তার পর সিঁড়ি তোমায় নামিয়ে নিয়ে চলল। সেই প্ল্যাটফরমের উপর পৌঁছে সিঁড়ির ধাপ মিলিয়ে যাবে। এই সময় শরীরে একটা মৃদু ঝাঁকুনি অনুভব হয়। নীচে অন্ধকার সুড়ঙ্গ সরীসৃপের মত এঁকেবেঁকে শহরের সর্ব্বত্র, এমন কি টেম্‌সের তলদেশ পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে চলে গেছে। এরই নাম টিউব। এর ভেতর দিয়েই ট্রেন চলে। পাঁচ মিনিট অন্তর একটি-দুটি ট্রেন হুড়মুড় ক'রে এসে থামছে। প্রত্যেক

কামরার দরজা আপনা হতেই খুলছে ও ঝপাৎ ক'রে বন্ধ হচ্ছে। সকলকেই এই সামান্য সময়ের মধ্যে ক্ষিপ্রগতিতে নামা-উঠা করতে হয়। এর ভেতরও ধূমপান "ষ্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড' লেখা আছে। এই রকম টিউব ট্রেন মাটির নীচে তিন-চার ধাপে ধাপে চলছে। মাটির নীচে এই ব্যাপার, শত শত যাত্রীর যাতে নিশ্বাসের কষ্ট না হয়, তার জন্য প্রত্যেক টিউব ষ্টেশনে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের বন্দোবস্ত আছে। প্ল্যাটফরমের জায়গা-বিশেষে দাঁড়ালেই এই হাওয়া অনুভব করতে পারা যায়। মনে হয় ঠিক যেন ঝড়ের ঝাপটা আসছে। আমরা একবার ট্রেনে উঠবার পর দুটি সাত-আট বছরের ছেলে সঙ্গে সঙ্গে উঠতে এল, একটি উঠবার পরই দুম ক'রে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অন্য ছেলেটি প্ল্যাটফরমের উপর দাঁড়িয়েছিল, সে চীৎকার ক'রে তার সঙ্গীকে ডেকে ব'লে দিলে তুমি আমার জন্য পরের ষ্টেশনে অপেক্ষা ক'রো। আমাদের দেশে এ রকম হ'লে বোধ হয় ছেলে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেলতো। ওদের বাপ-মা ছোট থেকে ছেড়ে দেয় ব'লে ওদের এ রকম উপস্থিত-বুদ্ধির অভাব হয় না।

টিউবে যাতায়াত করলে গন্তব্য স্থানে খুব চটপট পৌঁছে যাওয়া যায়। সেজন্য এতে সব সময় লোকের অত্যধিক ভীড় থাকে। অনেক সময় বসবার জায়গা পাওয়া যায় না, তখন দাঁড়িয়ে যেতে হয়। ধরবার জন্য বসবার সীটের দু-পাশের ছাদের উপর থেকে চামড়ার হাতল ঝুলছে, লোকে তাই ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দে যেতে পারে।

রাস্তার ভিখারী ও ভিখারিণীদের প্রকাশ্যভাবে ভিক্ষা চাইবার হুকুম নেই। লোকের কাছে হাত পাতবার বদলে একটা কিছু শুনিয়ে, ক'রে বা দেখিয়ে লোকের মনোরঞ্জন করতে হবে। ফুটপাথে চলবার সময় দেখেছি দু-একটি লোক নানান রকম রঙীন খড়ির সাহায্যে রকমারি ফুলপাতা বা দৃশ্যাবলীর ছবি ফুটপাথের উপরেই এঁকে যাচ্ছে। এই ছবি দেখে খুশী হয়ে কেউ-না-কেউ কিছু দিয়ে থাকে। অনেক সময় ভিখারীরা দল ক'রে কনসার্ট-পার্টি করে। এরা এক দল রাস্তার মাঝে নানা রকম বেহালা, বাঁশী, ঢাক, ব্যাণ্ড ইত্যাদি অতি সুন্দরভাবে বাজায়। এরা একটু উঁচুদরের ভিখারী। প্রথম প্রথম এ রকম হ্যাট-কোট-টাই-ধারী ভিখারী দেখে আশ্চর্য্য বোধ হ'ত। আরও একটি প্রথা আছে। সেটি একটি বড় ডালায় বা ট্রেতে ক'রে গুটীকয়েক দেশলাইয়ের বাক্স সাজিয়ে গাছতলায় বা পথের মোড়ে দু-একটি ভিখারিণীকে দাঁড়াতে দেখেছি। এদের ভিক্ষা দেবার নিয়ম এই যে, তোমাকে দেশলাই কিনতে সে অনুরোধ করলে, তাকে তোমার যা খুশী দাও এবং সেই সঙ্গে দেশলাই-বাক্সটিও ফেরৎ দাও। এক জন বাঙালী ছেলে একবার একটি বেহালা-বাদক ভিখারীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি এত সুন্দর বাজাও, কোন থিয়েটারে কাজ নিলে ত পার। ভিখারী জানিয়েছিল, সে থিয়েটারে রোজগার করলে যা পেত, এতে তার তিন-ডবল আয় হয়।

পথেঘাটে ইণ্ডিয়ান কারি-পাউডারের বিজ্ঞাপনও খুব। ছবিতে দেখতে পেয়েছি, এক ঝুঁটিবাঁধা উড়ে বামুন শিল-নোড়া নিয়ে ব'সে ব'সে বাটনা বাটছে।

এক দিন অবনীবাবু ও তাঁর স্ত্রীর সহিত টেম্‌স্ নদীর সুড়ঙ্গ দেখতে গেলুম। রাস্তা থেকেই টিউব বসিয়ে সুড়ঙ্গ করা হয়েছে। ভেতরটি ইলেক্‌ট্রিক আলোর দ্বারা আলোকিত। এর ভেতর ট্রাম, বাস, গাড়ীঘোড়া, লোকজন সব যাতায়াত করছে। উপরে যে নদীর জল থৈ থৈ করছে, তা কিছুমাত্র বোঝবার জো নেই। ভেতরটি সমস্ত পাথর দ্বারা বাঁধানো। আমরা কিছুদূর যাবার পর সুড়ঙ্গ শেষ হ'ল ও রাস্তার উপরে উঠবার জন্য লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দেখতে পেলুম। উপরে উঠতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িও গুণতে আরম্ভ করলুম। সব-সমেত সিঁড়ি বোধ হয় দু-শ পঁচাত্তরটা হয়েছিল। উপরে এসে এক পাল কুচো ছেলের পাল্লায় পড়লুম। ছেলেগুলো 'পেনি দাও' 'পেনি দাও' ক'রে অস্থির ক'রে তুললে। তাদের বেশভূষা ও ধরণধারণ দেখে মনে হ'ল তারা নিম্নশ্রেণীর বস্তির ছেলেপিলে। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় তারাও পেছু নিলে। যত এগোতে থাকি তারাও ক্রমশ দলে ভারী হ'তে হ'তে সঙ্গে সঙ্গে আসতে সুরু করলে, মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার "লুক এ্যাট দেম্ জন, দে আর ইণ্ডিয়ান।" তাদের বাপ-মা মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে থামাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কোথায় কে কার কথা শোনে, দল কিছুমাত্র কমলো না। দু-একটি ছোট মেয়ে আমাদের শাড়ীতে হাত দিতে দিতে বলতে লাগলো—

"বিউটিফুল"। ছেলেগুলোর কোনদিকে নজর নেই, খালি সেই 'পেনি দাও' 'পেনি দাও' বুলি। এক জনকে দিলে সবক'টাই হাত পাতে। রেহাই পাবার জন্য অবনীবাবু মাঝে মাঝে তাঁর লাঠি উঁচু করতেই তারা একটু তফাতে সরে, আবার কিন্তু যে-কে-সেই। ছোটদের মত বড়দেরও কৌতূহল কিছু কম নয়, তবে একটু সংযত ভাব। রাস্তার দু-পাশের বাড়িগুলির সব জানালা খুলে যেতে লাগল আমাদের দেখবার জন্য। যেন রাস্তা দিয়ে ভালুক-নাচওয়ালা ভালুক নিয়ে যাচ্ছে। শেষ-পর্য্যন্ত বাসে উঠে তবে বাঁচি।

এক দিন লণ্ডনের হিপ্পোড্রম থিয়েটারে গিয়েছিলুম। সেদিনকার অভিনয় আমাদের আরব্য-উপন্যাসের "কলসী ও দৈত্যের গল্প"। একটি ছোট সবুজ কুঁজার ভেতর থেকে গাঢ় সবুজবর্ণের ধোঁয়ার সঙ্গে এক সবুজ দাড়িওয়ালা দৈত্য বা জিন্ বেরল। তার পর দেখি সে ষ্টেজের উপর থেকে শূন্যে উড়তে উড়তে একেবারে সব দর্শকদের মাথার উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমার মাথার উপর যখন এল, বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখলুম সে বোধ হয় বিশ হাত তফাতে ঝুলছে। কিন্তু কিসের উপর নির্ভর ক'রে এমনভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে, তা মোটেই বুঝতে পারি নি।

লণ্ডনে আর এক রকম নৃত্য, গীত ও অভিনয় হয়ে থাকে, এর নাম নন্-ষ্টপ্ ভ্যারাইটি। কোন-একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুরু হয়ে রাত বারোটা পর্য্যন্ত চলে। এতে নাচগান, থিয়েটার, ট্যাবলো সবই হয়ে থাকে। যখন হোক একবার টিকিট ক'রে ঢুকলে সেই রাত বারোটা পর্য্যন্ত দেখতে পারি। কিন্তু একবার বেরিয়ে এসে আবার ঢুকতে চাইলে নূতন ক'রে টিকিট করতে হয়। এতে এক রকম অভিনয় দেখেছিলুম, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা শুধু অঙ্গভঙ্গী ও ভাবপ্রকাশের দ্বারা অভিনয় ক'রে যেতে লাগল ও অপর এক ব্যক্তি ষ্টেজের এক-ধারে দাঁড়িয়ে সমস্ত গল্পটি দর্শকদের বই পড়ে শোনাতে লাগল। আর এক দিন একটি থিয়েটারে ক্যাসানোভা নামক অভিনয় দেখেছিলুম। সমস্ত ষ্টেজটি ঘুরতে লাগলো। ষ্টেজের উপরে ঘরবাড়ি, নদীতে নৌকাচলাচল সব এই ঘূর্ণায়মান অবস্থাতেই দেখিয়ে দিলে। এই সময় প্রায় শতাধিক অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে একসঙ্গে ষ্টেজের উপর অভিনয় করতে দেখেছি।

এক দিন ম্যাডাম টুসোর একজিবিশন দেখতে গিয়েছিলুম। ম্যাডাম টুসো নামে এক জন ফরাসী মহিলা অনেকগুলি সুন্দর মোমের প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ারী করেন, সেগুলি সাজিয়ে এই একজিবিশন করা হয়েছে।

এই একজিবিশন দেখতে হ'লে টিকিট ক'রে ঢুকতে হয়। এর মোমের প্রতিমূর্ত্তিগুলি এত স্বাভাবিক যে, সত্যই সজীব ব'লে ভ্রম হয়। আমি উপরে যাবার সময় সিঁড়ির কাছে যে পুলিস প্রহরী দাঁড়িয়েছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "একজিবিশন হলে যাবার রাস্তাটা কোন্ দিকে?" সে কোন উত্তর দিলে না, তখন নজর ক'রে দেখলুম তার চোখে পল্লব পড়ছে না। হলের ভেতর রাজপরিবারের সকলের মূর্ত্তি আছে, মহাত্মা গান্ধীও আছেন, ইউরোপের বড় বড় সাহিত্যিক, কবি, খেলোয়াড় লেখক সকলেই আছেন! এগুলি বেশ দেখ্‌বার জিনিষ, এর নীচের তলা বা বেসমেণ্টের হলে যাবার জন্য আলাদা টিকিট করতে হয়। এর নাম চেম্বার অফ হরার। টিকিট কেটে নামলুম। এবার ভাল ক'রে পুলিসের মুখের দিকে তাকালুম। দরজার দু-পাশে দু-জন পুলিস ব'সে আছে। এক রকম দেখতে, পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্ত এক। কে সজীব বোঝবার জো নেই; কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে ভাল ক'রে বোঝবার আগেই সজীব পুলিস হেসে রাস্তা দেখিয়ে দিলে। আমাদের মত সকলেরই সেখানে গেলে এই অবস্থা হয়।

নীচেকার দৃশ্য দেখে মন বড় দমে গেল। যত ঠগ্, জুয়াচোর, খুনী, ডাকাত, এদের সব মূর্ত্তি। তা ছাড়া সেকালে এই সব দোষী ব্যক্তিকে কি ভাবে কঠোর দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল তাও মডেল ক'রে দেখান আছে। কাউকে ফাঁসিতে ঝুলানো হচ্ছে, কারুর কুঠারে শিরশ্ছেদ হবে, তাদের আতঙ্কে মুখের ভাব যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। কবে কে লণ্ডন শহরের একটি শিশুকে হত্যা করে। পেরাম্বুলেটরের মধ্যেই দেহটি পাওয়া গিয়াছিল। সেই ছোট ছেলেটির মাথার খুলি ও তার জীর্ণ জামাকাপড় এখনও সেই পেরাম্বুলেটর-খানির সঙ্গে সাজিয়ে রেখেছে। এসব দৃশ্য দেখলে কার না মন খারাপ হবে! কতকগুলি এই ধরণের দৃশ্যে পর্দ্দার গায়ে লেখা থাকে, "একমাত্র বড়রাই এ জিনিষ দেখবার অধিকারী।" কৌতূহল দমন করতে না পেরে এরকম একটি পরদা তুলে

দেখলুম। একটি লোককে শূলে বিদ্ধ ক'রে আটকে তার মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে শরীরটাকে ঘুরপাক দিয়ে দেওয়া হয়েছে ও তার বুক থেকে অবিরত লাল রক্তের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে তার মুখ ও মাথার চুল সিক্ত ক'রে তুলছে। এই সব দেখে-শুনে সেদিন মন বড়ই খারাপ হয়ে গেল। রাত্রে মাঝে মাঝে এই বীভৎস চেহারাগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। অদ্ভুত বিলাতী রুচি! এ সব জিনিষেরও প্রদর্শনী হয়। শ্রীযুক্ত রঙীন হালদার মহাশয়ের ভাষায় একে "অসুইরা প্রবৃত্তি" বলা যেতে পারে।

আমরা মাঝে মাঝে রীজেন্ট পার্কে বেড়াতে যেতুম। এখানে অনেক বড় বড় গাছ আছে, তাতে অসংখ্য পায়রা বাস করে। এখানকার লোকদের সকলেরই পশুপক্ষীর উপর একটা প্রবল আসক্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা ঝোঁক কুকুর ও কালো বেরালের ওপর। ওদের বিশ্বাস কালো বেরাল বড়ই সুলক্ষণা, যার কাছে থাকে তার সুখ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। এই পার্কে দেখেছি নিজেরাও ভ্রমণে বেরিয়েছে, সঙ্গে ছেলেমেয়ে আছে, কুকুর-বেরালও বাদ নেই। এখানে বাঙালী ছেলেদের কাছে শুনেছিলুম, একটি ছেলে একবার তার শোবার ঘরে বেরাল দেখতে পেয়ে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়। তাতে বাড়িওয়ালী বুড়ী রেগে গিয়ে অভিশাপ দিয়েছিল, "তুমি কখনও এগজামিন পাস করতে পারবে না।" তার কুকুর বেরাল দুই-ই ছিল। সকালে কুকুর বেড়াতে যেত ও তার জন্য বাজার থেকে মাংস আসত, বিকালে বেরাল ঠেলা-গাড়ীতে বেড়াত ও তার জন্য মাছের বন্দোবস্ত ছিল। এক দিন রীজেন্ট পার্কে বেড়াতে বেড়াতে দেখি একটি লোক বেঞ্চে ব'সে চিনাবাদাম খাচ্ছে, তার পায়ের তলায় একরাশ পায়রা বকম্ বকম্ ক'রে চলে বেড়াচ্ছে। সে খাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে দাঁত খিঁচিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকছে। ভাবলুম এ আবার কি? দাঁত-খিঁচুনো সভ্যতা আবার কেমন ধারা? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদি ব্যাপারটা দেখি, তাহ'লে ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয়, কাজেই কাছেই একটা বেঞ্চে ব'সে পড়লুম। দেখি সে দাঁতের ফাঁকে একটি ক'রে চিনাবাদাম চেপে ধ'রে ও-রকম ক'রে বসে আছে, আর পায়রা তার কাঁধে উড়ে বসে মুখের ভেতর ঠোঁট ঢুকিয়ে বাদাম খাচ্ছে। এতেই আনন্দ, এতেই সুখ! এ রকম ভাবে ব'সে থাকতে অনেক লোককেই দেখেছি। ছোট ছেলে-মেয়েরা সব সময় দৌড়াদৌড়ি করে। তাদের তেষ্টাও পায় বেশী। তাদের জল পান করবার জন্য এই পার্কে জলের কল আছে। এই কল দিয়ে সমস্ত ক্ষণ জল পড়ছে। কলের গায়ে একটি চেন-সংলগ্ন বাটী আছে। ছেলেপিলেরা সকলেই সেই একটি বাটীতে ক'রে জল খাচ্ছে। এটি কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। রীজেন্ট পার্কে লোকে মাঝে মাঝে বক্তৃতাও দেয়।

এক দিন ওয়েষ্টমিনষ্টার য়্যাবি দেখতে গিয়েছিলুম। দেখতে মন্দ নয়, তবে ইতালীর গীর্জ্জা দেখে এসে এ-সব চোখে লাগে না। এই গীর্জ্জার ভিতর সাধারণের, সম্ভ্রান্তবংশীয়দের ও রাজপরিবারের বিবাহ হয়ে থাকে। রাজারাজড়ার সমাধিও আছে। এমন কি ভেতরের সমস্ত হলটির মেঝেতে পর্য্যন্ত অনেক লোকের কবর আছে। সে সব সমাধির উপর বেদী গাঁথা নেই, খালি সিমেন্টের উপর নাম দেখে বোঝা যায়। লোকে এর উপর দিয়ে মাড়িয়েই চলছে। আমার কি রকম সংস্কারে বাধছিল, আমি যতটা পেরেছি পাশ কাটিয়ে চলেছিলুম। মৃত লোকের উপর দিয়ে চলা এই প্রথম দেখলুম। ওয়েষ্ট-মিনষ্টার য়্যাবি ছবিতে যতটা ভাল দেখায়, দেখতে তেমন নয়।

গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ

শ্রীঅমৃতলাল আচার্য্য

মণ্ডপের গোড়ায় হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়া গেল।

কেশব মুখুজ্জ্যে বালকের গণ্ডদেশে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—বল্, করবি আর এমন কাজ? করবি কখনও? তোর ছোট জাতের—

ভয়ে বনমালী আগে হইতেই কাঁপিতেছিল। চাপড় খাইয়া তাহা আরও বাড়িয়া গেল এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া শুধু প্রবলভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল—না, এমন কাজ আর কখনও করিবে না সে।

মুখুজ্জ্যেদের এই মণ্ডপঘরে অন্যান্য সময় গাঁয়ের ছেলেদের পাঠশালা বসে। কেবলমাত্র রটন্তী কালিকাপূজা উপলক্ষে বালকেরা দিন-কয়েকের ছুটি পায়। নিত্যানন্দ সাহার সাত বছরের ছেলে বনমালী এইখানেই পড়িত এবং আজও সেই অভ্যাসবশে বারান্দার এক কোণায় উঠিয়া পড়িয়াছে।

প্রতিমা দেখিতে পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে জড়ো হইয়াছে—তারিণী চক্রবর্ত্তী, হরিশ মজুমদার প্রমুখ বয়স্করাও আসিয়াছে দু-চার জন।

বড়-বৌ নৈবেদ্য সাজাইতেছিল, আকস্মিক এই গণ্ডগোলে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। নীচু গলায় সে বলিল—আহা ছেলেটাকে ছেড়ে দিতে ব'ল দিদি—ওর কি দোষ···জানেই বা কি, একরত্তি ছেলে···

বিধবা ননদ মানদা ছোট জাতের মুখে অগ্নি-সংস্কার করিতে করিতে ঘট ও কোশাকুশির জল পুনরায় বদলাইবার আয়োজন করিতেছিল। বড়-বৌয়ের কথায় ঝাঁজিয়া উঠিল—কি বললি বৌ, এক রত্তি ছেলে? পেটে পেটে কুবুদ্ধি ত কম নয় বাছা···কে বলেছিল অমন তড়াক করে লাফ মেরে ওকে মন্দিরে ঢুকতে? বজ্জাতের ধাড়ি···

পিতলের থালা ও বারকোশগুলি পুনঃপ্রক্ষালনের মানসে সজোরে বাহিরে নিক্ষেপ করিতে করিতে মানদা আপন মনেই চীৎকার করিয়া চলিল—ঠিক বলেছিস বড়-বৌ—ওর কি দোষ, ওদের আস্পর্দ্ধা ত আমরাই বাড়িয়ে দিয়েছি। একজ্রে চলাফেরা, আরও কত ঢঙ্, যাবে কোথা? বেঁচে থাকলে আরও কত দেখব···

খোঁচাটা যে তারিণী চক্রবর্ত্তীকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। তাহার বড় ছেলে শুভেন্দু গত আশ্বিনে সার্ব্বজনীন পূজার রব তুলিয়া গ্রামে দস্তরমত একটা হাঙ্গাম বাধাইয়া তুলিয়াছিল। বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতিকূলতায় তাহা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই সত্য, কিন্তু সেই অবধি শুভেন্দু যাহার-তাহার কাছে ব্রাহ্মণদের নানা রকম কুৎসা গাহিয়া বেড়ায়, আর পুত্রের এই অবিমৃষ্যকারিতার সমস্ত ঝড়ঝাপটা সহিতে হয় নিরীহ পিতাকে।

কেশব মুখুজ্জ্যের ছোট ভাই মাধব মুখুজ্জ্যে বস্তু-বিশেষের কৃপায় বারান্দার এক কোণে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। মানদার কথার সূত্র ধরিয়া সে কহিল—ঠিক বলেছিস মান্নুদি, তারিণীদাকে কত করে বললুম, ছেলেটাকে শুধ্‌রে নাও হে শুধরে নাও, নইলে গাঁয়ে বামুনের আর মুখ থাকবে না—তাই হ'ল ত? ছোঁড়া নাকি সবাইকে 'জলচল' করবে—এই ত সেদিন স্বচক্ষে দেখলুম হারাণ-পোদ্দারের—

তারিণী এত ক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার একটু টিপ্পনী কাটিয়া বলিল,—হ্যাঁ মাধব, ছেলেটা হারাণ-পোদ্দারের হাতে জল খায় মানি, তোমরা পাঁচ জনে মিলে একটা প্রাচিত্তিরের ব্যবস্থা দাও যদি তাও না-হয় মেনে নেব, কিন্তু হারাণ-পোদ্দারের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্রিবাস যে করে তারও শাস্তি দেবে ত?

কি কারণে জানি না মাধব আগুন হইয়া উঠিল।···কি? কি বললে তারিণী? অত ঘাঁটিও না বাপু—কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরবে। বাজারের কমলি-দাইয়ের ঘরে লক্ষ্মীপূজার কথাটা এরই মধ্যে ভুলে গেলে। প্রাচিত্তির ক'রে যে পাঁচ জন বামুন খাইয়েছিলে তাঁরা আজও বেঁচে আছেন। শুধু দয়া ক'রে মাথায় ঘোল ঢালি নি—প্রাচিত্তিরের ভয় তুমি কি দেখাও হে? মাধব মুখুজ্জ্যের অজানা নেই কিছু···

কেশব মনে মনে প্রমাদ গণিল। কেশব আর তারিণীতে ভাগ-বখরায় অনেক অ-শাস্ত্রীয় কাজই যা এত দিন নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছে; হঠাৎ মাধব যে ভাবে তাহাকে খোঁচা দিয়া বসিল, এখন কোন্ কথা হইতে কোন্ কথা উঠিয়া পড়িবে কে জানে? বিশেষতঃ পূজা উপলক্ষে দেশ-বিদেশ হইতে আগত আত্মীয়কুটুম্বের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। এই অবস্থায় কোন কেলেঙ্কারী ঘটিলে লজ্জার আর পরিসীমা থাকিবে না।···বনমালীকে ছাড়িয়া সে মাধবের দিকে অগ্রসর হইল। ছাড়া পাইয়া বনমালী চোখ মুছিতে মুছিতে একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল, তার পর সহসা অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

মুখুজ্জ্যে-বংশের কুলপুরোহিত গঙ্গাধর চূড়ামণি কেশবের সঙ্কটাপন্ন অবস্থাটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া কহিলেন—এসব কি সুরু করলে তোমরা? যা গেছে গেছে—

—বলুন ত প্রভু, জিজ্ঞেস করুন ত নিমকহারামকে, নিবারণ গয়লাকে ও ভিটে-ছাড়া করলে কার সাহায্যে? এই মাধবের মিথ্যে সাক্ষীই ওকে ডিক্রী পাইয়ে দিলে কি না··· আর বেইমান আমার নামে কুৎসা রটায়!

পুরোহিত কহিলেন—থাক্ মাধব, বাবা তারিণী রেখে দাও ওসব পুরনো কথা···ও কি মানদা? না—না—ফুল থাক্, পুষ্পে দোষ নেই, জলটা বদলে দাও শুধু।

কোলাহল আর বাড়িতে পারিল না। পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। মুখুজ্জ্যে-বংশের বহুকালের এই পূজা। পূর্ব্ব-পুরুষদের কোন ভাগ্যবানের শিয়রে স্বয়ং শ্রীরটন্তী দেবী স্বপ্নাদেশে পূজা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, একবার পূজায় কোন এক অনাচার হওয়ায় দেশসুদ্ধ মড়ক লাগিয়াছিল, এমনিতর রকমারি কাহিনী গাঁয়ের বৃদ্ধদের মুখে অদ্যাপি প্রচলিত।

পরের দিন।

ভোরের কুয়াশা কাটিয়া সবে মাত্র একফালি রোদ আঙিনায় পড়িয়াছে। পুরোহিত-ঠাকুর বাঁধানো হুঁকা-হাতে সেই দিকে পিঠ দিয়া একখানা জলচৌকীর উপর আসিয়া বসিলেন। পূজার শেষে গভীর রাত্রির নিদ্রা আর কাহারও ভাঙে নাই। ঝি কালীর মা এ-ঘর ও-ঘর হইতে বাসন-কোসনগুলি দুয়ারের এক কোণে জড়ো করিতেছে।

এমন সময় নিত্যানন্দের স্ত্রী নারায়ণী ছুটিয়া আসিয়া পুরোহিতের দুই পা জড়াইয়া ধরিল।

—কি গো নেত্যর বৌ?

সজল চক্ষে নারায়ণী কহিল—রক্ষে কর বাবাঠাকুর, দেবতার শাপমন্যি যেন—

—ও! তোমার ছেলের কথা! বাধা দিয়া চূড়ামণি কহিলেন, ওকে একটু শুধরে দিও বৌ···বল দিকিন্ কি কাণ্ডটা হ'ল কাল? ফের আনো জল, ধোও বাসন—সোজা হাঙ্গাম?

সামনের ঘর হইতে সহসা বাহির হইল মানদা। ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে তাহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। সদ্যঘুমভাঙা বিকৃতস্বরে সে কহিল—খুব ছেলে বানিয়েছিস নারাণী! তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকলুম, এমন অনাচার দেখি নি বাপু —ঠাকুরদেবতা নিয়ে খেলা—সইলে হয়···

নারায়ণী ডানহাতে পুরোহিতের পা-দুটি শক্ত করিয়া চাপিয়া বাঁ-হাতে চোখের জল মুছিতে লাগিল।

নিত্যানন্দের অবস্থা মন্দ নহে। হাটে নিজের একটি মুদি-দোকান—সংসারে স্ত্রী আর দুটি ছেলে। বড়ছেলে বিনয় জাফরাবাদের বাবুদের কাছারীতে কাজ করে—দিন-কয়েকের জন্য বাড়ি আসিয়াছে।

বিনয় কহিল—মুখুজ্জ্যেরা বনমালীর কি প্রাচিত্তিরের ব্যবস্থা দিলে মা?

—প্রাচিত্তির কিসের? বিস্মিত ভাবে নারায়ণী ছেলের মুখপানে চায়। বিনয়ের মুখে কৌতুক লক্ষ্য করিয়া সে বলিয়া উঠিল—সব কথা নিয়ে তামাশা করিস নে বিনু, দিন দিন যে কি হয়েছিস তোরা···

—প্রসাদ নাও গো সা-দিদি!

কেশব মুখুজ্জ্যের ছোট মেয়ে অলকা মেটে থালায় পূজার নৈবেদ্য লইয়া উপস্থিত হইল। পাড়াপড়শী সব বাড়িতেই প্রতি বৎসর এমনিভাবে প্রসাদ বিতরিত হয়।

—প্রসাদ ত তোমার বাবা কালকেই দিয়েছেন!

অলকা বিনয়ের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

—বুঝলে না? বামুনবাড়ির যে প্রসাদ আমাদের যথার্থই প্রাপ্য তা তোমার বাবা কালকেই দিয়েছেন যে —নিয়ে যাও এ আমরা নেব না—

ছেলের ক্রোধদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া নারায়ণী কাছে আসিল। কহিল—আচ্ছা, হয়েছে, এখন এখান থেকে সরে যা ত তুই! দাও গো মা…

অলকা নারায়ণীর হাতে প্রসাদ দিতে যাইতেছিল, মাঝখানে বিনয় বাধা দিবার জন্য হাত বাড়াইতে থালাসুদ্ধ প্রসাদ মাটিতে পড়িয়া গেল। নারায়ণী চীৎকার করিয়া উঠিল—এ কি করলি হতভাগা!

তৎক্ষণাৎ সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রসাদ কুড়াইতে লাগিয়া গেল।

পাড়া এইবার সরগরম হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল, নিত্যানন্দ সাহার বড়ছেলে বিনয় মায়ের প্রসাদ অলকার হাত হইতে লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

নিত্যানন্দ প্রথামত সন্ধ্যায় দোকানপাট বন্ধ করিয়া গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরিল। ভোরবেলাকার সমস্ত কথা সে দোকানে বসিয়াই শুনিয়াছে। কেশব মুখুজ্জ্যে শাসাইয়া গিয়াছে—এর প্রতিবিধান না-হওয়া পর্য্যন্ত এই দোকানের সওদা সে স্পর্শ করিবে না।…টাকার গরম থাকবে না হে—প্রপিতামহের আমলের জাগ্রতা দেবী, এ অনাচার সইবে না—সইবে না…

নিত্যানন্দ নিষ্ঠাবান মানুষ। মালা, তিলক, পূজা-অর্চ্চনা এমন কি দৈব-প্রাপ্ত "স্বপ্নলব্ধে"ও অগাধ বিশ্বাস। ভাবনায় তাহার সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। ফিরিবার পথে গ্রহাচার্য্য সনাতনের সঙ্গে দেখা। সে মলিন মুখে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

—এসব কি শুনি নেত্য?

নিত্যানন্দ কথা কহিল না। সনাতন বলিয়া চলিল—রতনপুরের মণীশ লাহিড়ীকে চেন ত? রাজা মানুষ! তার বিলাত-ফেরতা ছেলে মায়ের প্রসাদ অমনি হেলা ক'রে হাতে নিলেন না; বললেন—অন্তের মাথা চালকলা, ঘেন্না করে!…তিন রাত্রিও ত পার হ'ল না বাপু, পেট উঠল ফুলে—শহরের ডাক্তার-কবরেজে হ'ল টাকার শ্রাদ্ধ—কিছু না। শেষটায় ডাক পড়ল এই সনাতন-ঠাকুরের… হ্যাঁ, ছোঁড়া নাকি কোথায় ম্যাজিষ্টর হয়েছে, এই ত সেদিনও চিঠি লিখেছে তুমিই আমার পুনর্জন্ম দিয়েছ বাবা।

নিত্যানন্দের মুখে কথা জোগাইল না। ভাবী অকল্যাণের চিন্তায় চোখে তাহার বেদনার ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

সনাতন কহিল—দেবতার ক্রোধ অমনি সারে না হে—আর যে-সে নয়, মুখুজ্জ্যে-বাড়ির কাঁচা-খেকো রটন্তী… মনে নেই সেবারের কথা? কি বিষনয়নে চাইলে সর্ব্বনাশী—দিন-পনরর ভিতর দেশকে-দেশ একদম ফরসা…যা-হয় কিছু করো একটা!

নিত্যানন্দের বুক কাঁপিতে লাগিল। করজোড়ে সে কহিল—এ বিপদ থেকে আমায় উদ্ধার করুন বাবাঠাকুর—

বিনয়ের ঘুম ভাঙিল নারায়ণীর ডাকাডাকিতে।

বাহিরে আসিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল। উঠানের মধ্যখানটায় গোবরে নিকানো হইয়াছে। সেখানে ধূপ-দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার উপকরণ সজ্জিত আর সর্ব্বাঙ্গে ছাপ-ছোপ মাখিয়া কুশাসনে উপবিষ্ট গ্রহাচার্য্য সনাতন।

… —এ কি মা?

—কিছু নয়, পিঠের উপর ভিজাচুল ছড়াইয়া দিতে দিতে নারায়ণী কহিল—কিন্তু তুই আবার কোথাও বেরুস নে যেন… একটু সকাল-সকাল স্নান সেরে আয়…শান্তিজল আর কবচ নিবি…

ঘটনাটা মুহূর্ত্তে বিনয়ের কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল। পর-পর বনমালী ও বিনয়ের কুকার্য্যে সন্তানের কল্যাণকামী বাপ-মা সনাতন-ঠাকুরের স্মরণ না লইয়া থাকিতে পারেন নাই।

সেই দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি হানিয়া বিনয় গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া গেল। পিছন হইতে মা ডাকিল—কোথাও দেরি করিস নে কিন্তু!

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর সনাতনের পূজা ও উচ্চকণ্ঠে স্তবস্তোত্র-আবৃত্তি শেষ হইল। সকলে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু বিনয়ের দেখা নাই। নারায়ণী ছোট ছেলেকে ডাকিয়া কহিল—দেখে আয় ত বাবা তারিণী চক্কোত্তির বৈঠকখানাটা। ঐ শুভেন্দু ছোঁড়াই ত ওর মাথা বিগড়ে দিলে—

—কুশিক্ষার ফল মা, সনাতন-ঠাকুর বলিয়া চলিল—আমার জিতুই কোন্ একটা জজ-ম্যাজিষ্টর না হ'ত, খাসা মাথা ছিল। শিবু পণ্ডিত বললে, এ বয়সেই ছেলেটাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দিলে ঠাকুর-মশাই? বললুম, তোমার ইস্কুলে দূর থেকেই দণ্ডবৎ দি ভায়া, দু-পাতা ইঞ্জিরি প'ড়ে না-মানবে জাত-জন্ম, না-মানবে ধর্ম্মাধর্ম্ম!···দিয়েছি যতীন কবরেজের কাছে, কোন মতে নিদানের দুটো অধ্যায়—

বিনয় দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল, পিছনে বনমালী।

—এই যে এয়েছে বাবাজী, আরে হাজার হোক নিত্যানন্দের বেটা ত! দেব দ্বিজে অমন ভক্তি এই পোড়া কলিতে আর ক'টা লোকের···কিন্তু চট্ ক'রে অমনি ডুবটা দিয়ে এলে না কেন বাবা?

বিনয় রুখিয়া কহিল—তোমার এ ছাপ-ছোপে ছাগল-ভেড়ায় ভয় পাবে ঠাকুর-মশাই, মানুষে নয়···কিন্তু সাবধান ক'রে দিচ্ছি এ মুখো আর হ'য়ো না···

কথা বলিতে বলিতে বিনয় সোজা তার ঘরে ঢুকিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা বাহির হইল না।

নিত্যানন্দ আসিয়া ডাকাডাকি সুরু করিল এবং অবশেষে নিজের মৃত্যু কামনা করিয়া নারায়ণী দিল বিলাপ জুড়িয়া। কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়াশব্দ আসিল না।

—কি হবে বাবা?

—হবে আমার মুণ্ডু! সনাতন ঝাঁজিয়া উঠিল—আমরা ছাগলভেড়া বই ত নয়? কিন্তু তাও বলি নেত্যর বৌ, এ-অহঙ্কার চিরকাল থাকে না···বলরাম ঘোষের ছেলে প্রাণকৃষ্ণ—চেন নিশ্চয়, মনের দেমাকে তিনি কবচ নিলেন না! কিন্তু কার কি হ'ল শুনি—বছর না-ঘুরতেই ত সেই রেলের তলায় কাটা পড়লি!

নারায়ণী শিহরিয়া উঠিল। কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল—অমন কথা বলবেন না ঠাকুরমশাই, আমার বড় দুঃখেরী ছেলে বিনু—

সনাতন কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বিনয় ঘর হইতে বাহির হইল। পরনে পরিষ্কার পাঞ্জাবী ও ধুতি, বগলে থানদুই কাপড়ের ছোট্ট পুঁটুলী।

রাগে নিত্যানন্দ চীৎকার করিয়া উঠিল—কোথা যাচ্ছিস তুই?

—বাবুদের কাছারীতে, ছুটিও ত ফুরিয়ে এল···দিন-দুই আগে যাওয়াই স্থির করলুম।

দুই চক্ষু বড় বড় করিয়া সনাতন কহিল—এখন তোমার কি ক'রে যাওয়া হবে শুনি? রবৌবর্জ্জং চতুঃপঞ্চং এই বারবেলায়? যাত্রায়ং মরণং কালে—এ সনাতন-ঠাকুরের মনগড়া ব্যবস্থা নয় বাপু, তার চেয়ে অনেক বড় মুনি-ঋষিদের শাস্ত্রীয় বিধান। পাগলামি রাখ—তার চেয়ে—

কবচ-বন্ধনের আশায় সনাতন তাহার কাছে আগাইয়া আসে।

বিনয় তাহার পানে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু দুই পা না চলিতেই পিছনে একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া ফিরিতে হইল।

চাহিয়া দেখে, নারায়ণী বিলাপ করিতে করিতে দুয়ারের মধ্যখানে সর্ব্বাঙ্গ লুটাইয়া অবিরত কপাল ঠুকিতেছে। নিত্যানন্দ মাথা গুঁজিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, যেন এই মাত্র তাহার কি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

ভাবগতিক না বুঝিয়া বনমালীও প্রবল কান্না জুড়িয়া দিয়াছে।

বিনয় একবার স্থিরদৃষ্টিতে সনাতনের পানে চাহিল। একবার মনে হইল প্রাণপণে সে তাহার টুঁটিটা চাপিয়া ধরে।··· ওদিকে নারায়ণীর কপাল রক্তাক্ত হইল বুঝি। বিনয় সেই-খানেই বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত ক্রোধ জল হইয়া দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া দিল। নিঃশব্দে সে তাহার কম্পিত দক্ষিণ হস্তটি সনাতন-ঠাকুরের দিকে বাড়াইল।

সনাতন চেঁচাইয়া কহিল—ওঠ নেত্যর বৌ, ওঠ হে নেত্য, ছেলের সুমতি হয়েছে। সনাতন শর্ম্মার ঠেলায় কত ঘাগী ভূত সিধে হয়ে গেল, এ ত তোমার দুধের ছেলে।··· দেখ ত বাবা, সেই ত হ'ল, মিছেমিছি কি হাঙ্গামটাই বাধালে······

তার পর বিস্ময়বিমূঢ় স্বামী-স্ত্রীর পানে বিজয়-দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উচ্চকণ্ঠে স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে গ্রহাচার্য্য সনাতন নীলসূতায় বাঁধা কবচটি বিনয়ের হাতে বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

আকাশগঙ্গা বা ছায়াপথ

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম্-এ পিএইচ-

রাত্রিকালে নির্ম্মেঘ গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলেই দেখা যায় যে, কোন সময়ে না কোন সময়ে শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় ধূম্রাকারবিশিষ্ট অসংখ্য নক্ষত্ররাজির সমষ্টি ২০ অংশ প্রস্থ আলোকচ্ছায়ার মত আকাশপটে উদীয়মান রহিয়াছে। ইহাকেই আকাশগঙ্গা বা ছায়াপথ (The Milky Way) কহে। এই ছায়াপথ সমগ্র আকাশ বেষ্টন করিয়া একটি প্রশস্ত ধূমকুণ্ডলীর ন্যায় বলয়াকারে দৃষ্ট হয়। এই ছায়াপথ সম্বন্ধে নানা দেশে নানা প্রকার অদ্ভুত কিংবদন্তী ও গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ছায়াপথ অসংখ্য তারকার সমষ্টি; অতিশয় দূরত্ববশতঃ উহাদিগকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন জ্যোতিঃকণার ন্যায় না দেখাইয়া এক ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন আলোকপথের ন্যায় দেখা যায়। এই ছায়াপথ গগনমণ্ডলকে এমনভাবে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, ইহাকে ব্রহ্মাণ্ডের কটিবন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

গগনমণ্ডলে কোন কোন স্থানে এমন এক-একটি নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সাধারণতঃ নীহারিকার ন্যায় কোমল মেঘখণ্ডের মত আলোকরেখাবৎ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিশেষ তীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণ দ্বারা নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা বাস্তবিক বহু নক্ষত্রের সমষ্টি মাত্র; যেন অনেকগুলি নক্ষত্র একটি সঙ্কীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং পরস্পরের অতি সন্নিকটে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদিগকে "নক্ষত্রস্তূপ" কহে। এইরূপ নক্ষত্রস্তূপের বিশেষ দৃষ্টান্ত কৃত্তিকানক্ষত্রপুঞ্জ (Pleiades); সাধারণ চক্ষুতে দেখিলে দেখা যায় যে, কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জে ছয়টি নক্ষত্র পাশাপাশি অবস্থিত রহিয়াছে, কিন্তু একটি দূরবীক্ষণের সাহায্যে নিরীক্ষণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সংখ্যা পঞ্চাশেরও উপর। এই নক্ষত্রগুলি যথার্থই পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থিত, কিংবা ইহাদের দৃষ্টিরেখা প্রায় এক দিকে স্থাপিত হওয়ায় উহারা এইরূপ নিকটবর্ত্তী দৃষ্ট হয়, তাহা সকল সময়ে স্থির করা সুসাধ্য নহে। ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আকাশে "সাতভাই" নামক নক্ষত্রমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাকে এইরূপ স্তূপাকার দেখিতে পাইবে; কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন দর্শক অনায়াসে উহার নক্ষত্রগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন দেখিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, অনেক স্থলেই নক্ষত্রস্তূপ কেবল আমাদের দৃষ্টিভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু সকল নক্ষত্রস্তূপ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না, অথবা পরীক্ষার দ্বারা এইরূপ অনুমান সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। আবার পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন কোন নক্ষত্রস্তূপ প্রকৃতই পরস্পরের সন্নিকট কতকগুলি নক্ষত্রের সমষ্টি।

ছায়াপথ এইরূপ একটি বিশাল নক্ষত্রস্তূপ; ইহা সমগ্র আকাশের কটিবন্ধরূপে উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিৎগণ ইহাকে ধূম্রাকার দেখিয়া "ছায়াপথ" আখ্যা দিয়াছিলেন এবং কবিগণ ইহাকে আকাশগঙ্গা রূপে কল্পনা করিতেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণ ইহার শ্বেতাভ দর্শন করিয়া এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইহা দুগ্ধের নদীরূপে স্বর্গে প্রধাবিত হইতেছে, এইরূপ কল্পনা হইতেই ইউরোপখণ্ডে এখন পর্য্যন্ত ইহার নাম "দুগ্ধাবর্ত্ত" (Milky Way) বলিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ছায়াপথের প্রকৃত স্বরূপ প্রাচীন ঋষিগণ বা জ্যোতিষিগণ কেহই অবগত ছিলেন না। স্যর উইলিয়ম হর্শেল ও তাঁহার কৃতী পুত্র জন্ হর্শেল বহু পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা ছায়াপথের তথ্য নির্দ্ধারিত করিয়া বিজ্ঞানজগতে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্যর উইলিয়ম হর্শেল নামক জগদ্বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ সর্ব্বপ্রথমে নক্ষত্রতত্ত্বে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং স্বনির্ম্মিত দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্রদিগের স্থিতি ও স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বহুদিন ধরিয়া এই পর্য্যবেক্ষণের ফলে তিনি নক্ষত্রদিগের

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আবির্ভাব

মিঃ এ. ডা ফোনসেকা
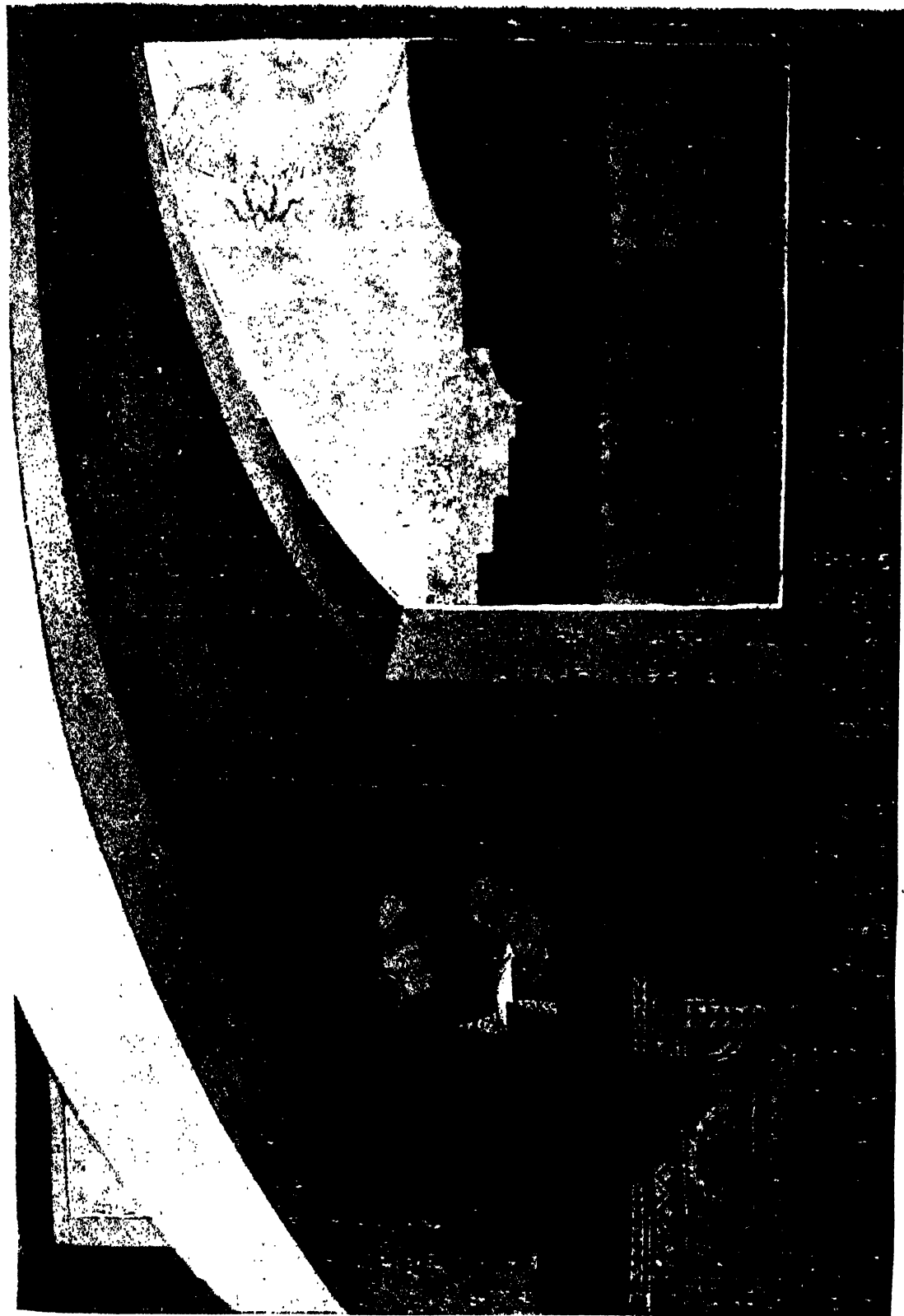
নির্ব্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এই সময়েই তিনি ইন্দ্র (ইউরেনাস) গ্রহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কোন কোন নক্ষত্রের দ্বিত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহা হইতে যমক নক্ষত্রের স্বরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। স্যর উইলিয়ম হর্শেল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন যে, আকাশে এমন কতকগুলি নক্ষত্র আছে যাহাদিগকে সহজ নেত্রে দেখিলে একটি নক্ষত্র বলিয়া মনে হয় কিন্তু তীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে তাহারা দ্বিখণ্ড হইয়া দুইটি নক্ষত্ররূপে প্রতিভাত হয়। বহুকাল পর্য্যবেক্ষণের ফলে তিনি এই জাতীয় নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিলেন। ইহাদিগকে 'যমকনক্ষত্র' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। স্যর উইলিয়ম হর্শেল সর্ব্বপ্রথমে এই প্রকার যমকনক্ষত্রের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তিনি পঁচিশ বৎসর একাগ্রচিত্ত পর্য্যবেক্ষণের ফলে উহাদের উক্তবিধ যমকত্ব সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

স্যর উইলিয়ম হর্শেল নক্ষত্র-তত্ত্বালোচনার ফলেই পূর্ব্বকথিত দুইটি বিখ্যাত আবিষ্ক্রিয়া জগতে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কার্য্যব্যপদেশে তিনি ছায়াপথের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ছায়াপথ সম্বন্ধে যাহা-কিছু জ্ঞান বৈজ্ঞানিকেরা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা প্রায় সমস্তই উইলিয়ম হর্শেল কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত এবং তাঁহার সুযোগ্য কৃতী পুত্র জন হর্শেল কর্ত্তৃক বিশিষ্টীকৃত হইয়াছিল। উইলিয়ম হর্শেল ইংলণ্ডে বাস করিয়া পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধ হইতে ছায়াপথের যে অংশ পর্য্যবেক্ষিত হইতে পারে, তাহা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্যোতির্ব্বিৎ জন হর্শেল ছায়াপথের অপরার্দ্ধ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থিত উত্তমাশা (Cape of Good Hope) অন্তরীপে গমন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে হর্শেল-বংশীয় পিতাপুত্রের সমবেত চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক জগৎ সমগ্র ছায়াপথের [illegible] ও স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছে।

এই বহুবর্ষব্যাপী বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদগণ [illegible] সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, ছায়াপথ বহুসংখ্যক তারকার সমষ্টি হইতে সমুদ্ভূত। ঐ সকল তারকার 'দৃষ্টিরেখা'-সমূহ পরস্পরের সহিত প্রায় মিলিত হইয়া যায়, অর্থাৎ কোনও দর্শকের নেত্র হইতে ঐ নক্ষত্রদিগের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন দৃষ্টিরেখা অঙ্কিত করিলে তাহাদিগের পরস্পর মধ্যবর্ত্তী কোণসকল অতি ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন হয়, তজ্জন্য ঐ নক্ষত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন তারকারূপে না দেখাইয়া এক ধারাবাহিক আলোকখণ্ডাকারে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল নক্ষত্র পরস্পরের সন্নিধানে অবস্থান করিয়া কোন প্রাকৃতিক নিয়মের শক্তিবলে একত্র সমাবিষ্ট নহে। ইহারা আসলে পরস্পর হইতে এত দূরে অবস্থিত যে,তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার আকর্ষণ বা অন্যবিধ নৈসর্গিক প্রক্রিয়া উপলব্ধি করা যাইতে পারে না। কিন্তু গগনমণ্ডলের যে স্থান অধিকার করিয়া ছায়াপথ বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই স্থানে দৃষ্টিপাত করিলে তথায় আকাশের অপরাপর প্রদেশ হইতে বহুল পরিমাণে অধিক সংখ্যক নক্ষত্র নেত্রগোচর হইয়া থাকে এবং উহাদের অবস্থিতি ও অধিকৃত প্রদেশের তুলনায় উহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, উহাদিগকে ঐ প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন তারকারূপে প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব, সুতরাং তাহারা একটি অখণ্ড আলোকাকারে প্রতীয়মান হয়। ইহাই ছায়াপথের প্রকৃত স্বরূপ।

এই স্বরূপ উপলব্ধি করা বাস্তবিকই কঠিন; উহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সুতীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণের প্রয়োজন। এইরূপ সুতীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যেই স্যর উইলিয়ম হর্শেল ছায়াপথের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এক সময়ে হর্শেল ছায়াপথের দিকে দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিয়া উহাকে ১৫ মিনিট কাল স্থির রাখিয়া ঐ সময়ের মধ্যে যত নক্ষত্র দৃষ্টিক্ষেত্রে আবির্ভূত ও দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হইতেছিল, তাহার সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ১৫ মিনিটের মধ্যে ১,১৬,০০০ নক্ষত্র তাঁহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়াছিল। হর্শেল দেখিয়াছিলেন যে, ছায়াপথের সকল স্থানে নক্ষত্রসংখ্যা সমান নহে এবং যে স্থানে যত অধিক নক্ষত্রের সমাবেশ, সেই স্থান তত শ্বেতাভ প্রতীয়মান হয়। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন যে, দুই-এক স্থান একেবারেই শ্বেতাভ নহে, সেই সেই স্থলে নক্ষত্রের সম্পূর্ণ অভাব অনুমিত হইয়া থাকে।

ছায়াপথ পর্য্যবেক্ষণকালে স্যর উইলিয়ম হর্শেলের তন্ময়তা একান্ত অদ্ভুত ছিল। এক আলোকোজ্জ্বল রজনীতে হর্শেল ছায়াপথের পর্য্যবেক্ষণে এত নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন

যে, প্রায় তিন ঘণ্টাকাল সংজ্ঞাহীনের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছিলেন; তাঁহার ভগিনী কুমারী কেরোলাইনা জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন এবং সকল পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে ভ্রাতার বিশেষ সহকারিণী ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত রাত্রিতে কুমারী কেরোলাইনা ভ্রাতাকে এইরূপভাবে তিন ঘণ্টাকাল নিস্পন্দ থাকিতে দেখিয়া স্থির করিলেন যে, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ আবিষ্ক্রিয়ার সূত্রপাত হইতেছে; তিনি নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণ-ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভ্রাতার ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে হর্শেলের ধ্যানভঙ্গ হইলে, তিনি ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"নক্ষত্রজগতে গহ্বর দেখা যাইতেছে, স্থলবিশেষে নক্ষত্রের কোন চিহ্ন দেখা যায় না।" জানা গিয়াছে, ঐ সকল গহ্বর আর কিছুই নহে, কেবল কোন কোন স্থলে কিয়ৎ পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া কোন নক্ষত্র বা নীহারিকার অস্তিত্বের লক্ষণ পাওয়া যায় না। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ছায়াপথের অন্তর্গত এইরূপ প্রায় চার-পাঁচটি গহ্বর পর্য্যবেক্ষণের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। হর্শেল এইরূপ গহ্বর আবিষ্কার করিয়া বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলেন, কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ছায়াপথ অসংখ্য তারকার ঘনসন্নিবেশ দ্বারা গঠিত; সুতরাং তাহাতে গহ্বর লক্ষিত হওয়া একটা একান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ছায়াপথের দক্ষিণাংশ

বহুবৎসরব্যাপী ভূয়োদর্শনের ফলে স্যর উইলিয়ম হর্শেল গগনের উত্তর গোলার্দ্ধ ও তাঁহার পুত্র স্যর জন হর্শেল গগনের দক্ষিণ গোলার্দ্ধ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নক্ষত্রদিগের যে-সকল স্থিতিবৈচিত্র্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দর্শনে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, নক্ষত্রগণ যতই বিশ্লিষ্ট ও অসম্বদ্ধ ভাবে গগনে প্রতিষ্ঠিত থাকুক না কেন, উহাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থিতিবিধান দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছায়াপথ আকাশ-গোলককে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত ভাগে বিভক্ত করিয়া রহিয়াছে, ইহাকে বিষুববৃত্তের ন্যায় একটি মহাবৃত্তের আকারে কল্পনা করিয়া উহার উভয় পার্শ্বের অংশ-বিভাগ গণনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল অংশ-বিভাগ আকাশ-গোলককে স্তরে স্তরে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই ছায়াপথের উভয় পার্শ্বে এক স্তর হইতে যতই স্তরান্তরে দৃষ্টি অপসারিত করা যায় ততই লক্ষিত হয় যে, ঐ সকল স্তরের দূরত্বানুসারে উহাদের অন্তর্বর্ত্তী নক্ষত্র সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। এই ছায়াপথের যদি মেরু কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, সেই স্থানের নক্ষত্রসংখ্যা আকাশের অন্য যাবতীয় অংশের নক্ষত্রসংখ্যা অপেক্ষা অতি বিরল। নক্ষত্রজগতের এইরূপ স্তরবিভাগ ছায়াপথের উভয় পার্শ্বেই সমভাবে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। যদি ইহা কল্পনা করা যায় যে, এক জন পর্য্যবেক্ষণকারী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াইয়া নক্ষত্রজগতের বহির্ভাগে কোনও স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে অনন্ত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বলিয়া ধারণা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার উভয় পার্শ্বে দেখিতে পাইবেন যে, নক্ষত্রমালা বায়ুতাড়িত ধূলিকণার ন্যায় ক্রমশঃ গভীর স্তর হইতে বিরলতর স্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া চলিয়াছে। আর যতই তিনি মধ্য স্তবক হইতে উভয় পার্শ্বে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, ততই তিনি নক্ষত্রের বিরলত্ব অত্যধিক অনুভব করিতে পারিবেন। এই মধ্য স্তবকটিই ছায়াপথের লক্ষণ। তীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণপ্রয়োগদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যত নক্ষত্র দৃষ্টিক্ষেত্রে একত্র পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নি-

পরিমিত উহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া যায় :—

ছায়াপথ হইতে দূরত্ব	দৃষ্টিক্ষেত্রে একত্র পরিলক্ষিত নক্ষত্রসংখ্যা
০°	১২২
১৫°	৩০
৩০°	১৮
৪৫°	১০
৬০°	৭
৭৫°	৫
৯০°	৪

এই যে নক্ষত্রের তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা সকল প্রকার দূরবীক্ষণ সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হইবে না। একটি ১২ ইঞ্চি দীর্ঘ ব্যাসযুক্ত দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলে যে-সকল নক্ষত্র দৃষ্টিক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবে, তাহারাই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দূরবীক্ষণের শক্তি অনুসারে সংখ্যারও তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু সকল স্থানেই দেখা যাইবে যে, স্তর-বিভাগের দূরত্বানুসারে নক্ষত্রসংখ্যা উপরিলিখিত ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। ইহা হইতে আমরা ধারণা করিতে পারি যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন একটি বিশাল নক্ষত্রাণুরাশির দ্বারা গঠিত এবং ছায়াপথ তাহার কটিবন্ধ, এই কটিবন্ধ-প্রদেশে কোন বিশেষ শক্তি প্রবলতম হইয়া নক্ষত্রগণকে সেই স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। অতএব সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এই কটিবন্ধের সহিত সমান্তরালভাবে আবর্ত্তন করিতেছে, এইরূপ কল্পনা করাও অযৌক্তিক হইবে না। পৃথিবীবক্ষে আমরা যাহা আকারে দেখিতে পাই,—যে বিঘূর্ণনবলে পৃথিবীর নিরক্ষ-প্রদেশ স্ফীত হইয়া পড়িয়াছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেই শক্তির অস্তিত্ব আরোপ করা অসমসাহসিকতার কার্য্য হইলেও যুক্তি-সঙ্গত নয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

এ পর্য্যন্ত ছায়াপথকে একটি প্রশান্ত বর্ত্ম বা চক্রের ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা যথার্থ নহে। গগনে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ছায়াপথ ঠিক সমভাবে বিস্তৃত নহে, আকৃতির যথেষ্ট তারতম্য ও পার্থক্য লক্ষিত হইবে। ছায়াপথ যেমন সর্ব্বাবয়বে সমগাঢ় নহে, তেমন উহার আয়তন, পরিসর ও আকৃতি সকল স্থানে একরূপ নহে। স্যর উইলিয়ম হর্শেলের পর্য্যবেক্ষণের ফল হইতে ছায়াপথের নিম্নলিখিতরূপ আকৃতি কল্পনা করা যাইতে পারে। দুই খণ্ড কাগজকে দুইটি সমান বৃত্তাকারে কাটিয়া লইয়া একটির অর্দ্ধাংশের সহিত অপরটির অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া দিয়া অসংলগ্ন বৃত্তার্দ্ধকে ঈষৎ ভিন্ন করিয়া ধরিলে যেরূপ দেখাইবে, নক্ষত্র-মণ্ডলের বহির্ভাগ হইতে ছায়াপথকেও সেইরূপ দেখাইয়া থাকে।
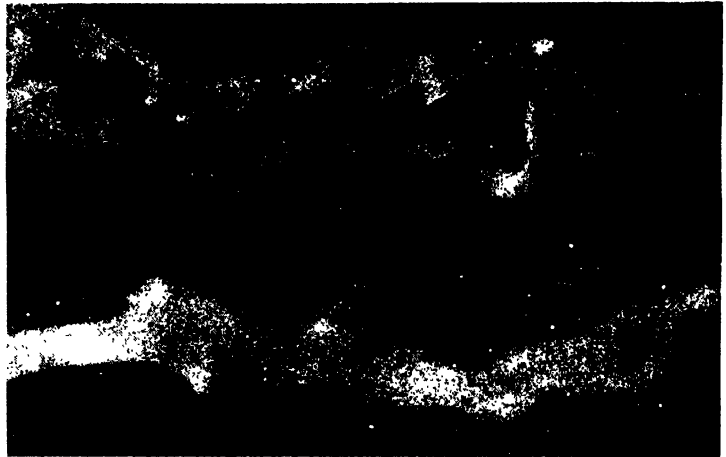
ছায়াপথের উত্তরাংশ

সৌরজগৎ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ছায়াপথের একার্দ্ধ গোলাকার ও অসমপরিসরবিশিষ্ট বর্ত্মের ন্যায় এবং অপরার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসরবিশিষ্ট ঈষৎ বক্রভাবে অবস্থিত এক নির্দ্দিষ্ট ব্যাসোপরি উপস্থাপিত দুইটি বৃত্তার্দ্ধের আকারতুল্য বর্ত্মের ন্যায়। স্যর উইলিয়ম হর্শেল সমগ্র নক্ষত্রজগৎকেই ছায়াপথের বিস্তৃতি বলিয়া কল্পনা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মতে নক্ষত্রজগৎকে অতি গাঢ় হইতে ক্রমশঃ পাতলা স্তরে বিন্যস্ত বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। স্যর উইলিয়ম হর্শেল মনে করিতেন যে, ছায়াপথের উভয় পার্শ্বে নক্ষত্রমালা এইরূপ গাঢ় হইতে অল্প গাঢ় স্তরে বিচরণ

করিতেছে এবং মধ্যপ্রদেশে অতি গাঢ় স্তর ছায়াপথরূপে বিস্তৃত রহিয়াছে।

আকাশমণ্ডলের ঘূর্ণনের সহিত ছায়াপথও ঘুরিয়া চলিতেছে। ইহার দক্ষিণ দিকের অংশ আমাদের ক্ষিতিজের উপর উদিত না হওয়ায় উহা আমরা দেখিতে পাই না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ছায়াপথ একটি প্রায় মহাবৃত্তে অবস্থিত, ছায়াপথ ও বিষুববৃত্তের ছেদবিন্দুদ্বয়ের বিষুবাংশ ৬ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট ও ১৮ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট। আর বিষুব-বৃত্তের সহিত ছায়াপথের অবনতি (inclination) প্রায় ৬৩ অংশ। ছায়াপথের পার্শ্বগুলি বড়ই অসমতল এবং অনেক দূর পর্য্যন্ত ইহা যেন দুই খণ্ডে লম্বালম্বি বিভক্ত হইয়াছে। দক্ষিণ ধ্রুবের নিকট ইহা এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত একটি কৃষ্ণবর্ণ রেখার দ্বারা দ্বিধাভিন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ছায়াপথের মধ্যে সূর্য্যের অবস্থান

এই বিশাল নক্ষত্রপথের অভ্যন্তরে কত বিশ্বের সহবাসে আমাদের ক্ষুদ্র সৌরজগৎ আপনহারা হইয়া ভাসিয়া আছে। এই সৌরজগতের কেন্দ্র যে সূর্য্য, যাহাকে আমরা কতই না বৃহৎ বলিয়া অনুভব করি, পর্য্যবেক্ষণের ফলে তাহাকে একটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নক্ষত্রে পরিণত করিয়াছে; কিন্তু এই ছায়াপথের সংস্পর্শে তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই বৃহৎ অগ্নিপিণ্ড ছায়াপথের অভ্যন্তরস্থ একটি সমুজ্জ্বল বালুকণার মত অতি ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হইবে। এই বৃহৎ আবেষ্টনীর মধ্যে সূর্য্যের অবস্থান সর্ব্বপ্রথম হর্শেলই স্থির করিয়াছিলেন। তিনি পর্য্যবেক্ষণের আরম্ভেই এই সমগ্র ছায়াপথের স্বরূপ বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, সর্ব্বতোভাবে ও অদ্ভুতরূপে বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রমণ্ডলী যাহা আপাতদৃষ্টিতে ছায়াপথের পরিধি হইতে কত দূরেই না অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে এই ছায়াপথেরই অঙ্গ এবং আমাদের সৌরজগতের অধিপতি মহাদ্যুতি দিনপতি এই ছায়াপথের পরিধির অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র অণুর ন্যায় উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ভাসমান রহিয়াছে। কত বিশাল এই ছায়াপথের পরিধি, তাহা একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে—আমাদের পরিজ্ঞাত সকল বস্তুর মধ্যে আলোকরশ্মির গতিই দ্রুততম, সেই আলোকরশ্মিও দর্শকের গোচরীভূত ছায়াপথের অংশ পরিভ্রমণ করিতে দশ সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল লইয়া থাকে। এই ছায়াপথ বিশ্বজগতের এক অপূর্ব্ব বিস্ময়, যাহার সম্মুখে কত বৃহৎ জ্যোতিষ্মান্ নক্ষত্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হইয়া আপন আপন বিশালতার অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে!

সামঞ্জস্য?

শ্রীহেমন্তকুমার বসু, বি-এ

হরিজন-আন্দোলন চলেছে; তার প্রবল আবর্ত্ত শহর ছাপিয়ে প্রান্তর ও বেণুকুঞ্জে দোলা দিয়ে ক্রমে এসে ঢেউ তুলেছে নিভৃত পল্লীর অন্তরের মাঝখানে।

রাণীগাঁ বৃহৎ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এর তরুণ সমাজে প্রবল চাঞ্চল্য তুলে দিয়েছে এই আন্দোলন। টো-টো কোম্পানীর জনকতক যুবক এবং স্থানীয় আই. জি. ইন্‌ষ্টিটিউশনের কতিপয় ছাত্র মরিয়া হয়ে উঠেছে এই আন্দোলনকে সার্থক ক'রে তুলতে। এদের কথা হচ্ছে, শুধু কথায় নয় কাজেও দেখাতে হবে যে আমরা আজ যথার্থই ভারতের তথাকথিত অস্পৃশ্য দলকে বুকে তুলে নিয়েছি।

বস্তুতঃ একথা যে যথার্থই ছিল এ দলের মর্ম্মবাণী, তা শীঘ্রই ্াদের কাজেও প্রকাশ পেল। অর্থাৎ পিতা-পিতৃব্য প্রভৃতির রক্তচক্ষু ও নিষেধ উপেক্ষা ক'রে বৃহৎ গ্রামের মুচি নমঃশূদ্র প্রভৃতিকে আহ্বানপূর্ব্বক এই তরুণদল একদিন তাদের সঙ্গে সগর্ব্বে পংক্তিভোজন ক'রে নিলে।

কিন্তু এর ফল যে খুব সুখকর হ'ল না তা বলাই বাহুল্য। যেদিন এ বিরাট ব্যাপার সংঘটিত হ'ল, ভোজনের আতিশয্যে উক্ত দিবস আহারের দরকার হয়েছিল কি-না জানা যায় না; কিন্তু পর দিন ক্ষুধার তাড়নায় এই সংস্কারক-দল যখন যথারীতি নিজ নিজ আলয়ে উপস্থিত হলেন, সেদিন যে তারা স্ব স্ব অভিভাবকগণ কর্তৃক সস্নেহে সংবর্দ্ধিত হলেন না, অধিকন্তু গৃহ হ'তে ধমক, অর্দ্ধচন্দ্র বা 'লাঠ্যৌষধি' যোগে তাড়িত হলেন এ সংবাদ দ্রুত প্রচার হ'তে বিলম্ব হ'ল না। ফলে অর্দ্ধাহার বা অনাহারে পুরো এক দিন কেটে গেল। আরও কিছু দিন হয়ত এরূপভাবেই যেতে পারত, কিন্তু পরদিন সকালবেলা শুষ্ক চিন্তিত মুখে 'আজকের দিন কিরূপে কাটানো যাবে' এই অতিজটিল সমস্যাপূর্ণ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন যুবকদের কাছে খবর এল জমিদার-বাড়িতে তাদের আহারের আয়োজন হয়েছে।

শোনবামাত্র বিস্ময়ে ও আনন্দে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে অস্নাত অভুক্ত তরুণরা দলে দলে কল-কোলাহলে স্থানীয় জমিদার-বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সেখানে এসে তারা শুনতে পেলে তাদের আহারের আয়োজন করেছেন জমিদার-কন্যা স্বয়ং কল্পনা দেবী।

কল্পনা জমিদার রমাপতি বাবুর একমাত্র কন্যা। বাল্যেই সে মাতৃহীন হয়েছিল। কিন্তু সে দুঃখও ভোলা যেত যদি না ...ের দু-তিন বছর যেতে-না-যেতেই সীমন্তের রক্তরাগ মুছে ... ফিরে আসত বাপের বাড়ি। মেয়ের দুর্ভাগ্য সর্ব্বক্ষণ ...াগ্নি জেলে রাখত রমাপতির প্রাণে। ফলে মেয়ে যাতে ...টুকু সুখও পায় এ রকম প্রার্থনা বা আব্দার পূর্ণ করতে ...পতি দ্বিধা করতেন না। কল্পনার পড়াশুনা ছিল যথেষ্ট। ...শের দুর্ভাগ্য ও ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সে প্রাণ দিয়ে অনুভব করত এবং এই দুর্ভাগ্য কিরূপে দূর হ'তে পারে, এই সমস্যার কিরূপে মীমাংসা হ'তে পারে, দেশের যাঁরা শ্রেষ্ঠ নেতা হয়ত বা তাঁদেরই ভাবনার ধারাকে অবলম্বন ক'রে তারও এ চিন্তা জেগে উঠত মনে মনে। কিন্তু এ চিন্তার সমুদ্রে কূল যেন সে খুঁজে পেত না, কোন সমস্যারই মীমাংসা হ'ত না। হরিজন-আন্দোলন যখন প্রথম প্রবর্ত্তিত হ'ল, কল্পনা ভাবল মহাত্মা হয়ত ভারতের যথার্থ মঙ্গলের পথটি এত দিনে খুঁজে পেয়েছেন। বাবাকে এই কথাটি জানিয়ে সে একদিন মহাত্মার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

রমাপতি মেয়ের কথায় ব'লে উঠলেন—কিন্তু মা, এই আন্দোলন সম্পর্কে মহাত্মার নিন্দেই যে শোনা যাচ্ছে বেশী। কল্পনা বললে—নিন্দে হচ্ছে? কেন বাবা? নিন্দে যারা করে তারা কি বলে শুনি? রমাপতি বললেন—তারা বলে, এই আন্দোলন তুলে মহাত্মা রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সরে এলেন। অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন এ হচ্ছে সামাজিক ব্যাপার। রাজনীতির যুদ্ধক্ষেত্র বিপদসঙ্কুল দেখে সেটা শত্রুকে সমর্পণ ক'রে মহাত্মা সমাজের শান্তিময় কোলে এসে আশ্রয় নিলেন একটা বাজে আন্দোলনের অজুহাতে। যেন বাড়ির কর্ত্তা বৈঠকখানায় দস্যুর উপদ্রব দেখে ভেতরে এসে হৈচৈ সুরু ক'রে দিলেন।

কল্পনা বিস্ময়ে ও ব্যথায় স্তম্ভিত হয়ে বললে—এমন বিশ্রী ক'রে তারা বলে বাবা, মহাত্মার নামে?

রমাপতি মৃদুহাস্যে বললেন—হাঁ, মা, তা বলে। তাদের মুখ কেমন ক'রে বন্ধ ক'রে রাখবে মা? আর দেখ মা—যারা বলে তাদের কথায় যে মোটেই সত্য নেই—এই বা কেমন ক'রে বলি? সত্যই ত মহাত্মাকে আর রাজনীতির ক্ষেত্রে পাচ্ছি নে আমরা!

ব্যথিত কণ্ঠে কল্পনা বললে—সে কি বাবা, তুমিও তাদেরই দলে? রমাপতি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—না মা, আমি কারু দলে নই, কথাটায় যে আংশিক সত্য আছে—তাই আমি তোকে বলছিলাম মাত্র।

কল্পনা দীপ্ত-কণ্ঠে বললে—এ তোমাদের বুঝবার ভুল বাবা, এ-কথায় এতটুকু সত্য নেই। মহাত্মা আদৌ রাজনীতি ছেড়ে দেন নি। সামাজিক ব্যাপারের অজুহাতে রাজনীতিকেই তিনি অনুসরণ করছেন। ভেবে দেখ বাবা—এই তেত্রিশ কোটী জাতির মধ্যে অস্পৃশ্যতা না ঘুচলে ঐক্য

সুদূরপরাহত কিনা? আর ঐক্য না হ'লে জাতির মুক্তির আশা স্বপ্নমাত্র কি না?

রমাপতি ভেবে বললেন—হয়ত এ সত্য। কিন্তু মা, মনে হয় না এ পথে মহাত্মা তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হবেন। এদেশে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের আশা আকাশকুসুম মাত্র।

কল্পনা ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাব্‌ল। পরে উজ্জ্বল দুটি চক্ষু পিতার মুখের উপর মেলে ধ'রে ব'লে উঠ্‌ল—একেই সত্য ক'রে তুল্‌তে হবে। শুধু এক জন মাত্র দেশনায়কের এক জীবনের চেষ্টায় এ যে সম্ভব হবে এমন আশা করা যায় না। ভারতের ন্যায় অধঃপতিত দেশকে টেনে তুল্‌তে হ'লে একাধিক শহীদের জীবনসাধনার প্রয়োজন, এবং আমার মনে হয় তাদের অনেককেই আত্মবিসর্জ্জন ক'রে যেতে হবে এই এক জাতিমিলনের কাজে। আচারে ধর্ম্মে ও সংস্কারে এ-রকম শতধা বিভক্ত হয়ে এক অখণ্ড জাতীয় মুক্তির অধিকারী হয়েছে, জগতের ইতিহাসে এরূপ একটি জাতিও দেখাতে পার বাবা?

রমাপতি ক্ষণকাল মৌন থেকে বললেন—হয়ত তা দেখান যায় না। কিন্তু কি ক'রে যে এদেশে এ মিলন-সাধনা সম্ভব হবে, এ যে আমি কিছুতেই ভেবে পাই নে কল্পনা!

এরই দিনকতক পরে রাণীগাঁয়ে হরিজন-আন্দোলন সুরু হ'ল, এবং কথিত তরুণ-দল নীচ জাতিদের সঙ্গে ব'সে ভুরিভোজন ক'রে নিলে। কল্পনা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে—তোমার কথায় বড় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এদেশেও যে নিখিল জাতির মিলন একেবারে অসম্ভব নয় তা এ গাঁয়ের এই ছেলেদের কাণ্ড থেকেই বুঝ্‌তে পারবে বাবা!

কিন্তু এই ব্যাপারের পর ছেলেরা যখন নিজ নিজ বাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে ফিরে এল, কল্পনার আশ্বস্ত মন নিদারুণ ব্যথায় ও হতাশায় ভ'রে উঠ্‌ল। কিন্তু মনের এই অবসাদকে মোটেই আমল না দিয়ে রমাপতিকে ডেকে সে বললে—আমার একটা কথা রাখ্‌বে বাবা?

জিজ্ঞাসু রমাপতি তার দিকে চাইলে সে বললে—আমি এই ছেলেদের খাওয়াতে চাই। ওদের অভিভাবকদের বুঝাতে চাই—যারা সত্যিকার সৎকাজে, জগতের মুক্তির কাজে এগিয়ে যায়—অনাহারে তাদের প্রাণ দেবার দরকার হয় না।

মেয়ের আব্দার রমাপতি কখনও ঠেলেন নি। তার এ-প্রার্থনাও অপূর্ণ রাখ্‌লেন না—যদিও এতে তাঁর নিজের ইচ্ছার চেয়ে অনিচ্ছাই হয়ত ছিল বেশী।

অতঃপর শান্ত-ক্রোধ অভিভাবকগণের আহ্বান না-আসা পর্য্যন্ত রাণীগাঁয়ের তরুণের দল দিনের পর দিন ভোজনোৎসবে কাটাতে লাগ্‌ল দেবতার অবতার তাদের জমিদার-বাড়িতে।

•

রমাপতির সঙ্কল্প ছিল কন্যার পুনর্বিবাহ দেবেন। মাতৃহারা কন্যা তাঁর। ওর নিরাভরণ দেহ ও শান্ত সুন্দর হাসিমুখখানির পানে চাইতে গিয়ে চোখে জল আসে। দেশ ও জাতির মঙ্গল বুঝেছে, কিন্তু তার চাইতেও ও ভাল বোঝে নারী-জীবনের ভালমন্দ। ওর শিক্ষিত মন ও উচ্চ প্রতিভার কাছে সহজভাবেই ধরা প'ড়ে গেছে নারী-প্রগতির সত্যকার পথটি। কল্‌কাতায় স্বামীর সঙ্গে যখন ছিল, অসহযোগ-আন্দোলনে নারী ভলাণ্টিয়ার হয়ে ও শুধু দোকানে দোকানে পিকেটিং ক'রেই ফেরে নি, নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনেও ছিল ওর নেতৃত্ব। একটা বিধবা-বিবাহ-সমিতি ছিল, যার পরিচালক ছিল স্বয়ং নিশানাথ এবং ও ছিল সেক্রেটারী। দু-জনে ওরা প্রায়ই তাঁকে জানাত বড় আশ্চর্য্য কাজ করছে ওদের এই সমিতি;—তাঁর আশীর্ব্বাদ চাইত, ওদের এ প্রতিষ্ঠান যেন বাংলার প্রত্যেক বালবিধবার দুঃখ ঘোচাবার শক্তি ক্রমশঃ অর্জ্জন করে।

যাদের দুঃখমোচনে ছিল ওর প্রাণপাত সাধনা, আজ ভাগ্যদোষে নিজেই ও তাদের এক জন। এ রিক্ততা, এ দুঃসহ দুর্ভাগ্য হ'তে ওকে বাঁচাতেই হবে। তিনি যা করতে চাইছেন, এতে যে ওর অমত হ'তে পারে না—এও তিনি ভাল ক'রেই জানতেন। কারণ এই যে ওর সত্যিকার মঙ্গল, ওর চাইতে কেই বা আর এ ধ্রুব নিঃসংশয়রূপে বিশ্বাস করে? আর একথাও ত ভাবতে হবে মৃত্যু-শয্যায় ওর হতভাগ্য স্বামীও তার মৃত্যুর পর ওকে এই পথটাই গ্রহণ করতে ইঙ্গিত ক'রে গিয়েছিল।

অস্পৃশ্য-আন্দোলনের দিনকতক পরে রমাপতির গৃহে দেখা গেল জনৈক আগন্তুককে। রমাপতির সম্মুখে চেয়ারে ব'সে তিনি বলছিলেন, স্ত্রী মারা যাবার পর যেমনটি খুঁজে আসছেন তাঁর মেয়েকে দেখে-শুনে তাঁর মনে হচ্ছে এত দিনে তেমনটিই তিনি খুঁজে পেয়েছেন। কল্পনাকে পেলে নিজেকে নাকি ধন্য মনে করবেন তিনি অতিরিক্ত রকমে।

রমাপতি কল্পনাকে নিভৃতে ডেকে বললেন—মা একটা কাজে বেরুচ্ছি. হয়ত রাত হবে ফিরতে। যে অতিথিটিকে রেখে যাচ্ছি ইনি আমার এক বন্ধুর ছেলে, সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এসেছেন বিলাত থেকে। ওঁর পরিচর্য্যার ভার তোমার ওপর রইল, দেখো অযত্ন কিছু না হয়।

অতিথিটি যে কে, কি তার উদ্দেশ্য, কল্পনা যে তা বোঝে নি একথা বললে ভুল হবে। তাই বাবার কথায় যেন একটা বিপুল অভিমানে তার অধরোষ্ঠ কেঁপে উঠল, কি যেন বলতে গিয়ে সে থেমে গেল। সংযতকণ্ঠে মৃদুস্বরে সে শুধু জবাব দিলে—আচ্ছা বাবা।

শীতের স্নিগ্ধ মধুর অপরাহ্ণে শিক্ষিতা অপূর্ব্ব সুন্দরীকে কাছে পেয়ে তরুণ ব্যারিষ্টার মিঃ এস রায় ওরফে শশাঙ্ক রায় অতিমাত্রায় উল্লসিত হয়ে উঠলেন এবং অবিশ্রান্ত মৃদুগুঞ্জনে কত কি যে তাকে ব'লে যেতে লাগলেন—এক জমিদারের মেয়ে বড় ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে ছিল তাঁর স্ত্রী। দু-জনের মনে এতটুকু মিল ছিল না তাঁদের। তারই বাবার খরচে বিলেত পড়ে এলেন তিনি ব্যারিষ্টারী। প্র্যাক্‌টিস্ সুরু হতেই কিন্তু বেচারী মরে গিয়ে গেল তাঁকে বাঁচিয়ে। আর এই তরুণী? তাঁর পিতৃবন্ধুর এই কন্যা? একে দেখবামাত্র……মিঃ রায়ের উচ্ছ্বাসে হঠাৎ বাধা পড়ে গেল। খালি-পায়ে খট্ খট্ করতে করতে যে আগন্তুক সম্মুখে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখবামাত্র কল্পনা উচ্ছ্বসিত আনন্দে ব'লে উঠল—রণদা যে? হঠাৎ কোত্থেকে? এস এস রণদা —ব'লে দুখানি ব্যগ্র বাহুর আন্দোলনে অভিনন্দিত ক'রে তাকে বসতে দিলে একখানি আরামকেদারা টেনে।

রণজিৎ ব'সে বললে—ভাল আছিস্ কল্পনা? তোকে 'কন্‌গ্র্যাচুলেট' করতে এলাম। বেশ কাণ্ড আরম্ভ করেছিস ত? কল্পনা বুঝ্‌তে না-পেরে তার পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে দিতেই রণজিৎ বললে—গাঁয়ের ছেলেরা তোর সাহায্যেই দেখ্‌ছি হরিজন-আন্দোলন সার্থক ক'রে তুল্‌বে। কাগজে তোর নাম দেখে আনন্দে আর বাঁচি নে।

এ-কথায় কল্পনার সর্ব্বাঙ্গ যেন ভরে এল খুশীর শিহরণে। আনন্দে ও আবেগে সে ব'লে উঠ্‌ল—এ তুমি কাগজে দেখেছ? সত্যি আমি ছেলেদের উৎসাহ দিয়েছিলাম, ভাল করি নি রণদা? রণজিৎ বললে—হাঁ, তোর উপযুক্ত কাজই হয়েছে। কিন্তু তোর মুখখানি অমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন রে?—ওহো ইনি কে, ব'লে অপ্রতিভ ভাবে সহসা মিষ্টার রায়কে নির্দ্দেশ করলে। কল্পনা সহজভাবে বললে—ইনি ব্যারিষ্টার রায়, আমার বাবার অতিথি। রণজিৎ দুঃখিত হয়ে বললে—'সরি', আপনাকে সম্ভাষণ করা হয় নি, মাপ করবেন, নমস্কার। প্রতিনমস্কার ক'রে ব্যারিষ্টার রায় চুপ ক'রে রইলেন। ক্ষণকাল পরে হঠাৎ কল্পনা ব'লে উঠ্‌ল—আমার পড়্‌বার ঘরে চল ত দাদা—একখানা নতুন ছবি এঁকেছি—নিভৃত হিমালয়ে বাঘের পিঠে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন ভারতজননী—চরণে তাঁর আরতি করছেন তাঁর ছেলেরা। সকলের দেওয়া আরতির আগুন থেকে একটা মাত্র দীপ্তশিখা জলে উঠে লুটে পড়্‌ছে মায়ের পায়ে। নিজে এঁকে নিজের কাছেই এ আমার খুব ভাল লেগেছে—বল্‌তে পারি তুমিও এ প্রশংসা না ক'রে পারবে না—দেখ্‌বে চল দাদা—বল্‌তে বল্‌তে সে উঠে পড়্‌ল, কিন্তু পরক্ষণেই পিছন ফিরে বললে—দয়া ক'রে অপরাধ নেবেন না মিষ্টার রায়, আমরা এক্ষুনি আস্‌ছি।—ব'লে সে এগিয়ে গেল এবং রণজিৎ তার পিছনে চলল।

পরদিন যাবার আগে ব্যারিষ্টার রায় রমাপতিকে জানিয়ে গেলেন, তিনি তাঁকে ডেকে ভুল করেছেন। রণজিৎ মিত্র ব'লে যুবকটি বেঁচে থাকতে তাঁর কন্যার আর কোথাও পুনর্বিবাহ দিতে গেলে ভুল হবে তাঁর, কারণ তিনি নাকি স্পষ্টই বুঝেছেন তাঁর কন্যা কথিত যুবকেই সমর্পিতচিত্তা।

হঠাৎ রমাপতির চোখের ওপর থেকে যেন একটা পর্দ্দা স'রে গেল। কথাটি যে শুধু পুরোপুরি বিশ্বাসই হ'ল তাঁর, তাই নয়, বিশ্বাসের পর তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস

ছেড়ে বাঁচলেন। সেই রণজিৎ যার সঙ্গে তাঁর কন্যা এক আত্মা ছিল ছেলেবেলা থেকে—বিবাহেরও কথা হয়েছিল ওর সঙ্গে কিন্তু ভাল স্কলার হ'লেও ওর সঙ্গে বিয়েতে তিনি মত দেন নি—ছেলেটি গরিব ব'লে। কিন্তু এখন ত ও গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রফেসর—মোটা টাকা মাইনে পায়। কল্পনাকে বিবাহ করতে পারে নি বলেই ও নাকি আজও অবিবাহিত। মিষ্টার রায় ঠিকই বুঝেছেন, পরস্পরকে ওরা এখনও ভালবাসে। সত্যই ছেলেবেলাকার প্রণয়ের কখনও লোপ হয় না। ওর সঙ্গে পুনর্বিবাহ হ'লে তাঁর দুঃখিনী কন্যা যে যথার্থই সুখী হবে এতে কোন ভুল নেই।

রমাপতি চুপ ক'রে বসেছিলেন। হঠাৎ কল্পনা এসে বললে—আচ্ছা বাবা বল ত কেন তুমি বার-বার আমায় এমন ক'রে অপমান করছ? রমাপতি আশ্চর্য্য হয়ে কন্যার উত্তেজিত সুন্দর মুখপানে চেয়ে বললেন—অপমান করছি, সে কি মা?

—নয় ত কি বাবা, সেদিন এসে আমায় বাজিয়ে গেলেন তোমার এক বন্ধুর ছেলে—আজ আবার তুমি কিনা রণদাকে ডেকে পাঠালে!

ব্যাপার বুঝে রমাপতি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। পরে বললেন—কিন্তু কল্পনা, শশাঙ্ককে ডাকা আমার ভুল হ'তে পারে, রণকে ডেকে পাঠিয়ে ঠিক করেছি বলেই যে আমার বিশ্বাস।

কল্পনা শান্ত ভঙ্গীতে বললে—তোমার দিক থেকে ঠিক হ'তে পারে, কিন্তু এ ব্যাপারে আমারও যে একটা দিক আছে বাবা।

—কিন্তু রণকে তোর আপত্তি হ'তে পারে না বলেই যে আমার ধারণা।

—কিন্তু বাবা যে কাজে ওঁকে অমত হবে না—তাইতেই যদি আমার আপত্তি থাকে? সে হ'লে কাউকে মিথ্যে ডাকায় তোমারও যে অপমান বাবা!

মেয়ের কথায় রমাপতি এবার ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। আশ্চর্য্য হয়ে মেয়ের দিকে চেয়ে তিনি বললেন—তোর অমত? নারী-জীবনের এই দুঃখ-মুক্তির কাজেই তুই যে এক দিন মনপ্রাণ উৎসর্গ করেছিলি, তুই ভুললেও আমি যে ভুলি নি মা। এতে যে তোর পূরো সমর্থন আছে, এ ত আমি ভাল ভাবেই জানি।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কল্পনা বললে হাঁ বাবা, তুমি ঠিকই বলেছ। নারীর এই দুঃখ মোচনের কাজে একদিন সত্যই আমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ছিল; দরকার হ'লে হয়ত এখনও থাকবে, কিন্তু বাবা—

—কিন্তু নিজেকে বুঝি এ দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে চাস্ নে, কেমন?

—হাঁ বাবা তাই।

—কিন্তু মা বুঝ্‌তে পারছি নে, তোর এ ভ্রান্তি কেন? মৃত্যুশয্যায় নিশানাথও যে ব'লে গেছে এ দুঃখের যেন অবসান করিস্।

—হাঁ বাবা, বলেছেন। হয়ত ব'লে গেছেন বলেই এ দুঃখে মুক্তির সাধ হয় না। না ব'লে গেলে হয়ত বাধতো না। ব'লে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে গাঢ় কণ্ঠে বলতে লাগল—বাবা, তুমি বললে নারী-জীবনের এ চরম দুর্ভাগ্যের মুক্তির কাজে আত্মপ্রাণ সমর্পণ করেছিলাম। কিন্তু নারীর দুঃখে এ দরদ কোথায় পেয়েছি এও ত তোমার অজানা নেই বাবা। যা-কিছু করেছি, বা করি স্বদেশের, সমাজের, নারী-জীবন-সংস্কারের জন্যে—তার মধ্যে আমার নিজের প্রেরণা কতটুকু। তাঁর দীক্ষায় দীক্ষিত আমি এ-সম্বন্ধে যা-কিছু বলি এ যে তাঁরই মুখের বাণী। জান ত তুমি কি পরিপূর্ণ ছিল তাঁর শিক্ষা! কি গভীর জ্ঞান রাখ্‌তেন—কত দেশ, জাতি, কত সমাজের নরনারীর অন্তরের! এ সব জেনেও চলে গেছেন বলে—আজ যা খুশী তাই ক'রে আমার মধ্যে তাঁর সঞ্চরমান আত্মার অপমান করতে কেন তোমরা আমায় এমন ক'রে উত্তেজিত কর বাবা—বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ দু-চোখ ওর হু হু ক'রে জলে ভরে উঠল।

রমাপতি মুগ্ধ স্তব্ধ হৃদয়ে কল্পনার কথা শুনছিলেন। কন্যার ভেতরকার এ মূর্ত্তি তাঁর সম্পূর্ণ অ-দৃষ্ট ছিল। হঠাৎ তার পানে চেয়ে তাঁর মনে হ'ল ও যেন সন্ধ্যাকাশের সুন্দর মেঘখণ্ড। ওর সূর্য্য চ'লে গেছে—আর যাবার বেলায় ফেলে-যাওয়া তার পরিপূর্ণ দীপ্তির রক্তরাগ বুকে ক'রে ও যেন ব'সে আছে অস্তাচলের অদূর বাতায়নে দু-চোখ মেলে।

অনেক ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন—সত্যি মা, না বুঝে তোকে অপমান করেছি—আমায় মাপ কর।—

কল্পনা চোখের জল মুছে তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের ধূলো

নিয়ে বললে—ছিঃ, ও-কথা ব'লো না বাবা, তুমি যে আমায় বুঝেছ এতেই আমি সুখী।

রমাপতি প্রণতা কন্যার হাত ধ'রে তুলে বললেন—আচ্ছা মা, রণ এলে আমি ব'ল্‌ব—ওরে তোদের দুভাই-বোনের ছেলেবেলাকার ভালবাসার ধাঁধায় পড়ে এ বুড়ো একটা ছেলে-মানুষী ক'রে ফেলেছে, তোরা নিজেরাই এ শুধ্‌রে নিস্‌।

হিন্দু সোসিয়ালিজম্‌?

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ইংরেজের কাছে পরাজিত হইবার পর বাঙালীর জীবনে অনেক রকম ঘটনা ঘটিয়াছে। হিন্দু কলেজের আমলে বাঙালী ইংরেজী সভ্যতাকে বড় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, বাঙালীর ছেলেরা হিন্দুত্ব ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে ইংরেজ হইবার চেষ্টা করিত। তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সেই সময় হইতেই একদল লোক ঘোর হিন্দু হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল ইংরেজের সবই খারাপ, এবং যাহা কিছু ভাল তাহা সবই প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল। এই উগ্র হিন্দুর দল হিন্দুত্বের আড়ম্বরপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলেও মনে মনে ইংরেজের কাছে হার মানিতেন। অবশ্য সকলে নয়। যাঁহারা যথার্থ হিন্দু সংস্কৃতির সারমর্ম্ম বুঝিয়া, অন্য দেশের প্রতি দ্বেষ না রাখিয়া হিন্দুত্ব রক্ষা করিতেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বাজারে বহু লোক খামকা ইংরেজকে গালাগাল দিবার জন্যই হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইতেন। ইহা তাঁহাদের কাছে শুধু ইংরেজকে গালি দিবার একটা অছিলামাত্র ছিল। ইঁহারা যে মনে প্রাণে ইংরেজের কাছে হার স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে তাঁহারা "ইংরেজী ভাষায়" কথা বলিতেন। কথাটা খুলিয়া বলি।

উনবিংশ শতাব্দী ইংরেজী সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট যুগ। বিজ্ঞানের উন্নতিতে ও প্রসারে সারা শতাব্দীটি উজ্জ্বল হইয়াছিল। বাজারের হিন্দুরা যখন সেইজন্য হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিতে গেলেন, তখন দেখা গেল যে তাঁহারাও বিজ্ঞানের দোহাই পাড়িতে লাগিলেন। তাঁহাদের মতে হিন্দুধর্ম্ম একটি প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মে পরিণত হইল। হিন্দুর শিখা, হিন্দুর গোবর সবেরই পিছনে একটি গূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্য লুক্কায়িত আছে দেখা গেল। ইহাকেই "ইংরেজী ভাষায়" হিন্দু-ধর্ম্মের রক্ষা বলা যাইতে পারে। এই সকল ব্যক্তির হাতে পড়িয়া হিন্দুধর্ম্ম শুধু বৈদ্যুতিক শক্তি, শিখা এবং গোবরে পরিণত হইল।

সুখের বিষয় দেশে সকলের সম্পূর্ণ বুদ্ধি লোপ হয় নাই। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীগণ হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে যাহা সত্যই শ্রেষ্ঠ তাহারই জ্ঞান দেশে বিকীরণ করিতে লাগিলেন। বাজারের খেলো আওয়াজ তাহার প্রভাবে কতকটা চাপা পড়িয়া গেল। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের মত সমান কল্যাণকর, অথবা তদপেক্ষা অধিক কল্যাণকর, বিদ্যা যে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত আছে, স্বামী বিবেকানন্দ সে কথা দেশের নিকট শুনাইতে লাগিলেন। স্বামীজীর গুণ ছিল এই যে তিনি হিন্দুত্বের বিচার করিতে গিয়া তাহার দোষের সম্বন্ধে অন্ধ থাকিতেন না। হিন্দুধর্ম্মকে তিনি শশধর তর্কচূড়ামণির ন্যায় কোনও খেলো সামগ্রীতে পরিণত করেন নাই। তাহার গুণের সম্বন্ধেও তিনি যেমন সজাগ ছিলেন, দোষের সম্বন্ধেও তেমনই। দোষের কথা তিনি হিন্দুদের কাছে ভারতবর্ষে বার বার বলিতেন, এবং গুণের কথা বিদেশে বিদেশীর কাছে তেমনই ভাবে শুনাইতেন।

কিন্তু বিপদ হয় তখনই যখন কোনও মানুষ স্বামী বিবেকানন্দের মত মুক্ত সন্ন্যাসীর মন না লইয়া ভারতবর্ষেই হিন্দুত্বের গুণ বার বার গাহিতে থাকেন। তখন হিন্দু নিজের আলস্যে খুশী হইয়া শুইয়া থাকে, এবং ধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে যাবতীয় দোষ কায়েমী হইয়া বসিয়া থাকে। এই রকমই একটা ব্যাপার কিছুদিন হইতে হিন্দু সভ্যতার আধুনিক ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে দেখা যাইতেছে। রাশিয়ায় সোসিয়ালিষ্ট রিপাবলিক স্থাপিত হইবার পর হইতে বাংলার আকাশ তাহার জয়-গানে ভরিয়া গিয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক কিছু নহে। কিন্তু অস্বাভাবিক না হইলেও দুঃখের বিষয় হইল এই যে হঠাৎ দু-এক জন গুণী লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে হিন্দুরা সোসিয়ালিজম্‌ জানিতেন এবং প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সোসিয়ালিষ্ট আদর্শে গঠিত ছিল।

অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাশ সম্প্রতি বর্ণাশ্রমের আদর্শকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টা করিলেই যে দোষ হয় তাহা নহে। কিন্তু সেই চেষ্টার মধ্যে সতত এইটুকু থাকা দরকার যেন প্রতিপক্ষকে যথাযথ হইতে ছোট করিয়া দেখান না হয়, এবং স্বপক্ষকে যথাযথ হইতে বড় করিয়া দেখান না হয়। অথচ আমাদের বিশ্বাস কালীপ্রসন্নবাবু তাঁহার "সোসিয়ালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ" নামক গ্রন্থে দুইই করিয়াছেন। অপর কেহ এরূপ করিলে দুঃখের কিছু ছিল না, অথবা চুপ করিয়া থাকিলেও চলিত; কিন্তু কালীপ্রসন্ন-বাবুর মত এক জন খ্যাতনামা অধ্যাপকের নিকটে এরূপ হইলে আমাদের দুঃখের কারণ আছে। এ সম্বন্ধে দেশে স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন আছে বলিয়াই বর্ত্তমান সমালোচনার অবতারণা করা হইতেছে।

সোসিয়ালিজম্‌ ও কমিউনিজমের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গ্রন্থকার অযথা সোসিয়ালিষ্টগণের প্রতি কতকগুলি দোষারোপ করিয়াছেন। ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে যে প্রভেদ আছে একথা যে কমিউনিষ্টগণ অস্বীকার করেন, তাহা নহে। আদর্শবাদী সকল সোসিয়ালিষ্টই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। যে হাতের কাজ ভাল পারে, হাতের কাজে যাহার মতি, তাহাকে সেই কাজেই নিয়োজিত করা যে সমাজের পক্ষে

কল্যাণকর একথা আদর্শবাদীমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু কমিউনিষ্টগণ ইহার সহিত আরও একটি কথা বলেন, তাহার উল্লেখ বর্ত্তমান গ্রন্থে কোথাও পাওয়া গেল না। তাঁহারা বলেন যে মানুষে মানুষে ক্ষমতার তারতম্য থাকিলেও সেই অজুহাতে তাহাদের হাতে অবশিষ্ট সকলের মঙ্গলামঙ্গলের সম্পূর্ণ ভার ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক নহে। অথবা ক্ষমতাশালী বলিয়াই আর সকলকে শ্রমের উচিত মূল্য হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া উচিত হইবে না। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। ধরুন, এক দেশে কয়েক জন এমন লোক জন্মিল যাহাদের সামাজিক শাসন করিবার বিষয়ে একটি সহজাত প্রবৃত্তি আছে। সেখানে সেই কয়জনকে স্বীয় বিদ্যা কাজে খাটাইবার সুযোগ দেওয়া সমাজের পক্ষে উচিত। ইঁহাদের ইঞ্জিনিয়ারের কাজে লাগাইলে দেশের ক্ষতি হইবে। সেইজন্য যে সমাজ ঐ সকল ব্যক্তিকে তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ দিতে পারে তাহা যে শুধু তাহাদের ব্যক্তিত্বের পুষ্টিসাধন করে তাহা নহে, বরং সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ করে। ইহ এক কথা। কিন্তু যদি সেই শাসনকার্য্যে দক্ষ কয়েক জন লোকের হাতেই দেশের রাষ্ট্রভার সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করা হয়, তবে যে তাহারা সেই ক্ষমতা স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থোদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে না তাহা কে বলিতে পারে?

অথচ রাষ্ট্রের কাজ চালাইতে হইলে কয়েক জন লোকের হাতেই কাজের ভার দিতে হয়। পাছে এই দলটি নিজেদের স্বার্থের অনুসরণ করে তাহার জন্য তাহাদের নিয়োগ করিবার ভার দেশের কোন-না-কোন শ্রেণীর উপরে সচরাচর ন্যস্ত হইয়া থাকে। সোসিয়ালিষ্টগণ ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন কখনও এই ভার পুরোহিতদের হাতে ন্যস্ত ছিল। কখনও বা তাহা যোদ্ধা সৈনিকদের হাতে ছিল, এখন প্রায় সমগ্র জগতে তাহা ধনিক ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের মধ্যে দেখা যায় যে এই সকল শ্রেণী প্রধানতঃ স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থপুষ্টির জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়োগ করিয়াছিল, অপরকে যাহা দিয়াছে তাহা প্রসাদী সুবিধামাত্র। রাষ্ট্রের মালিকেরা যাহা দয়া করিয়া দিয়াছেন, জনগণ তাহাই লাভ করিয়াছে। সে বিষয়ে কিছু বলিবার অধিকার তাহাদের কখন ছিল না।

মানুষের সহিত মানুষের বিভিন্নতা অস্বীকার করা এক জিনিষ, আর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ক্ষমতার তারতম্য দূর করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ। এই শ্রেণীগত প্রভেদ দূর করাই কমিউনিষ্টগণের লক্ষ্য। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে ক্ষমতার তারতম্য আছে, তাহার লোপসাধন করা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। অবশ্য আপদ্ধর্ম্মের কথা স্বতন্ত্র। যুদ্ধকালে অথবা রাষ্ট্রবিপ্লবে হয়ত এই নীতি সম্যক্রূপে অনুসৃত হয় না। কিন্তু তাহা আদর্শের দোষ নহে, সাধনের দোষ হইতে পারে।

কমিউনিষ্টগণ মনে করেন মানবের কল্যাণের জন্য শ্রেণীভেদ দূর করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহারই উপায়স্বরূপ তাঁহারা মনে করেন অন্ততঃ একবার প্রত্যেক দেশেই রাষ্ট্রকে ধনিক শ্রেণী, ক্ষত্রিয় শ্রেণী প্রভৃতির আধিপত্য হইতে মুক্ত করিয়া শূদ্র শ্রেণীর একাধিপত্য স্থাপন করিতে হইবে (Dictatorship of the Proletariate)। ইহাতে শ্রেণীগত শাসন দূরীভূত হইল না বটে, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর একাধিপত্য অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর আধিপত্য ভাল, তাহাতে অন্ততঃ বেশী লোকের স্বার্থপুষ্টি হয়। সম্পূর্ণরূপে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সুযোগসুবিধার ভেদাভেদ দূর করিতে হইলে দেশে সম্যক্ শিক্ষা ও ন মনোভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে। এবং সেই রকম শিক্ষা-বিস্তারের সুবিধার জন্যই শূদ্রগণের একাধিপত্য বিশেষ প্রয়োজন। শূদ্র ভিন্ন অন্য শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রশক্তি থাকিলে সেই শ্রেণী সাম্যের শিক্ষা বিস্তার করিতেই দিবে না বলিয়া কমিউনিষ্টগণ মনে করেন। কেন না তাহা তাহাদের শ্রেণীগত স্বার্থের পরিপন্থী হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থে সমাজতন্ত্রবাদের দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে এই দিকটি যথাযথভাবে ফুটিয়া উঠে নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

তার পর হিন্দু সমাজ গঠনের কথা। পুস্তকের শেষ কয়েক পৃষ্ঠায় এবং মধ্যস্থলেও গ্রন্থকার ইঙ্গিত করিয়াছেন যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের দ্বারা ভারতবর্ষে সাম্যের অথবা সাম্যের কাছাকাছি কোন অবস্থা প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান কালে ইংরেজী সভ্যতার মোহে পড়িয়া আমরা সে কথা ভুলিতে বসিয়াছি। ইহা সত্য হইলে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। হিন্দু সমাজব্যবস্থার মধ্যে যাহা যথার্থ ভাল ছিল, তাহা ভোলা আমাদের পক্ষে দূষণীয় হইবে। কিন্তু হিন্দুত্বের মোহেও যেন আমরা হিন্দুত্বকে সত্য অপেক্ষা বড় করিয়া না দেখি, এ-বিষয়ে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার ভারতবর্ষের প্রাচীন যৌথ পরিবারের প্রথাকে একটি আদর্শ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলিয়াছেন। তিনি এমনও বলিয়াছেন যে কমিউনিজমের যাহা আদর্শ যৌথ পরিবারের আদর্শ তাহারই ভারতীয় সংস্করণ। একটি পরিবারের মধ্যে হয়ত স্বার্থ-ত্যাগের দ্বারা সাম্যের ভাব আনা যায়, কিন্তু সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা এই ব্যবস্থার প্রয়োগের দ্বারা কি করিয়া মীমাংসা হইবে, তাহা বুঝা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা একটি পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যার সমতুল নহে। তদ্ভিন্ন যাহারা রক্ত-সূত্রে আবদ্ধ নহে সেরূপ একটি বৃহৎ জনতার মধ্যে একটি সাধারণ দেশ-মাতৃত্বের ধুয়া তুলিয়াও আত্মীয়তাবোধ আনা সম্ভব নয়।

আরও একটি কথা আছে। হিন্দুরা যে কোনও কালে কামার, কুমার, স্যাকরা, ব্যবসায়ী, চাষী সকলকে লইয়া একটা যৌথ পরিবার গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে পরিবারের মধ্যে সকলের আয় সম্মিলিত হইয়া অবশেষে বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনমত ব্যয়িত হইত, শাস্ত্রগ্রন্থে কোথাও তাহার প্রমাণ নাই। তবে মনুসংহিতা বা মহাভারত সমালোচনা করিলে একটি আশ্চর্য্য বিষয় পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণগণকে সমাজের দৃষ্টিতে অত্যধিক প্রতিপত্তি দিলেও তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিতে বলা হইত। তদ্ভিন্ন অপরাপর ধনীরাও যাহাতে সাধারণের উপকারার্থ অর্থ ব্যয় করেন, মন্দির, পথঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন বা কূপতড়াগাদি খনন করেন, সেই জন্য এই সকল কার্য্যকে খুব পুণ্যের কার্য্য বলিয়া বর্ণন করা হইত। বর্ত্তমান কালে ট্যাক্সের দ্বারা ধনীর হস্ত হইতে টাকা ছিনাইয়া লইয়া রাষ্ট্র অথবা মিউনিসিপ্যালিটি যে ভাবে সাধারণের কার্য্যে অর্থ ব্যয় করে প্রাচীন ভারতবর্ষে তেমন ব্যবস্থা ছিল না। তৎপরিবর্ত্তে স্বর্গের লোভ দেখাইয়া, অথবা সামাজিক মর্য্যাদা অতিরিক্ত পরিমাণে দিয়া ধনীদিগকে সেই কার্য্যে নিয়োজিত করা হইত। অর্থাৎ আইনের ভয়ে না ফেলিয়া বরং পুণ্যের আকর্ষণে ধনবৈষম্যের দোষ কতকাংশে কাটান হইত। কিন্তু যদি কেহ স্বীয় ধনসম্পদ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে না চাহিতেন, তাহা হইলে সমাজ বা রাষ্ট্র তাঁহার উপর কোনও জোর করিতে পারিত না। তাঁহাদের আয়ের তাঁহারাই মালিক ছিলেন, তাহার উপর দেশের লোকের কোনও দাবি আছে বলিয়া রাষ্ট্রের আইনে স্বীকার করা হইত না। আয়ের উপর দাবি ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে ধনোৎপাদনের যে-সকল সাধন আছে (means of production

সথা জমি, খনি, মূলধন প্রভৃতি) তাহার উপরে ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা স্বত্বই স্বীকার করা হইত। সেগুলিকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষে দেখা যায় না। সেই জন্ত হিন্দু সমাজ সংগঠন সাম্যবাদের আদর্শে গঠিত ছিল একথা বলা চলে না।

যাঁহারাই হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে কোল, ভীল, শবর প্রভৃতি জাতিকে ব্রাহ্মণেরা যেভাবে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেন, প্রাচীনকালে অপর কোনও দেশ তেমনভাবে করে নাই। খ্রীষ্টানেরা অথবা মুসলমানগণ লোককে নিজের সমাজভুক্ত করিতে হইলে ধর্ম্মে, আচারে, সামাজিক সংস্কারে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে পোষাক পরিচ্ছদেও বদলাইয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুর হিন্দু করিতে হইলে এরূপ নীতি অনুসরণ করেন নাই। চাতুর্ব্বর্ণ্যের আধ্যাত্মিক দিক যতই বড় হউক না কেন, তাহার একটা মোটা রকমের অর্থনৈতিক দিক ছিল। এক একটি জাতি যেমন হিন্দু হইতে লাগিল, অমনই তাহাদের এক একটি বৃত্তিও স্থানীয় চাহিদা অনুসারে বাঁধিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। বন্য জাতিগুলি হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কেহ বাঁশের কাজ ধরিল, কেহ মাটির কাজ করিতে লাগিল, কেহ জ্বালানি কাঠ যোগাইতে লাগিল, কেহবা আর কিছু ব্যবসায় গ্রহণ করিল। প্রত্যেক জাতি হিন্দু হইবার পূর্ব্বাবস্থায় নানাপ্রকার কাজকর্ম্ম করিত। কিন্তু হিন্দুদের বৃদ্ধি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বনজঙ্গল উড়িয়া গেল, বন্য পশুর শিকার বন্ধ হইল, অথবা অন্য উপায়ে তাহাদের প্রাচীন বৃত্তি লোপ পাইতে লাগিল। তখন হিন্দুরা তাহাদিগকে স্বীয় অর্থ নৈতিক সংগঠনের অঙ্গীভূত করিয়া তাহাদের এক একটি বিশেষ বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই সকল বৃত্তির সমষ্টি লইয়া দেশের অর্থ নৈতিক সংগঠন গড়িয়া উঠিল। রাজার কাজ ছিল এই যে, প্রত্যেকে যেন নিজের বৃত্তি অনুসরণ করিয়া খাইতে পরিতে পায় ইহা দেখা। একের বৃত্তি অপরে যাহাতে গ্রহণ না করে এ-বিষয়েও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। শুধু তাহাই নহে, ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকারের বশে যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন কারিগরগণ জিনিষের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি না করিতে পারে তাহার জন্য রাজাকে জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে, এইরূপ একটি নির্দ্দেশ মনুসংহিতার মধ্যে পাওয়া যায়। (অধ্যায় ৮, শ্লোক ৪১০-৪১৮)।

আপদ্ধর্ম্মের বশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বৃত্তি-বদল করিতে পারিতেন বটে কিন্তু শূদ্রের এ-বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না। বস্তুতঃ সমস্ত রাজধর্ম্ম বিষয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িলে দেখা যায় যে, চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রম রক্ষা করাই রাজশক্তির প্রধান কাজ ছিল।

বহু কাল ধরিয়া বহু জাতি এইভাবে এক একটি বৃত্তি লইয়া হিন্দু-সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনে স্থান পাইয়াছে। পাইবার পর সেই সকল জাতির মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে, ধর্ম্মানুষ্ঠানেও হিন্দুর সংস্পর্শের ফলে কোন কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইত। অঙ্গীভূত জাতিগুলির ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের বিষয়ে হিন্দুদের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কেবল সেই সকল ধর্ম্মের মধ্যে যদি কোনও হিন্দু-নীতিবিগর্হিত অনুষ্ঠান থাকিত তবে তাহারই মার্জ্জনা করিয়া লওয়া হইত। নরবলির বিকল্পে পশুবলি এইভাবে কয়েকটি তথাকথিত নিম্ন হিন্দুজাতির মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। হিন্দু হইবার পর ঐ সকল জাতির মধ্যে আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিত। তাহারা গরুর মাংস খাওয়া ছাড়িত, মুরগী অথবা শূকর বলি দেওয়া ছাড়িয়া দিত এবং সামাজিক সংস্কারে নিজেদের জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা বৈদিক দু-একটি অনুষ্ঠান করাইয়া লইত। বস্তুতঃ, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা ক্রিয়া করাইবার অধিকার লাভ করিলে তবে তাহারা সামাজিকভাবে হিন্দু বলিয়া গণ্য হইত। ইহাই ছিল হিন্দুত্ব লাভের সাধনোপায়।

এইভাবে যে সমাজ গঠিত হইল তাহার মধ্যে বহু জাতি স্থান পাইল বটে, নিজেদের পূর্ব্বতন ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা কোনও সোসিয়ালিষ্ট সমাজ গড়িয়া উঠে নাই। তাহার কারণ বিভিন্ন কারিগরদের মধ্যে আয়ের সমতা কখনও স্থাপিত হয় নাই। কামার, কুমার, অধ্যাপক, পুরোহিত, স্বর্ণকার, শিল্পী বা ব্যবসায়ীদের আয়ের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য ছিল। শুধু তাহাই নহে, ইহাদের লইয়া যে-কয়েকটি শ্রেণী ছিল, তাহারা আইনের চোখে, সামাজিক মর্য্যাদার ব্যাপারে, সকল বিষয়েই বিভিন্ন ছিল। কামার, কুমার প্রভৃতি শূদ্র অধ্যাপক, পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণ; স্বর্ণকার, শিল্পী প্রভৃতি হয় শূদ্র নয় বৈশ্য। ইহাদের মধ্যে আইনে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট তারতম্য স্বীকৃত হইত। চাতুর্ব্বর্ণ্য যে সোসিয়ালিজমের আদর্শে গঠিত ছিল না, ইহাই তাহার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

রাশিয়াতে বর্ত্তমান কালে যে সমাজ গঠন চলিতেছে, তাহার সহিত ভারতবর্ষের চাতুর্ব্বর্ণ্যের কোন কোন বিষয়ে মিল আছে। ভারতে কোন জাতি কোন্ বৃত্তি লইবে তাহ দেশের প্রয়োজন অনুসারে স্থিরীকৃত হইত। স্থানীয় চাহিদা অনুসারে প্রতি জাতি স্বীয় বৃত্তি ঠিক করিয়া লইত, রাষ্ট্রবৃত্তিনিরূপণে বোধ হয় সাহায্য করিত না। কিন্তু একবার যে জাতি যে বৃত্তি গ্রহণ করিত, বহু জন্ম ধরিয়া তাহাকে সেই বৃত্তি অনুসরণ করিতে হইত। সে বৃত্তিতে তাহার একাধিপত্য রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইত। স্বেচ্ছায় লোকে বৃত্তি গ্রহণ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিত না। রাশিয়াতেও তেমনই বৃত্তিগ্রহণ ব্যাপারে কেহ স্বেচ্ছাচারিতা করিতে পারে না। ইহা দুই দেশের মধ্যে একটি বড় মিল বলিতে হইবে।

অপর পক্ষে রাশিয়াতে দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন কি তাহা রাষ্ট্র-পতিরা ঠিক করিয়া দেন। যে-কোন বৃত্তি লইয়া গোলমাল সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাই। দেশের প্রয়োজন পূরণ করিবার ব্যাপারে একজন মজুর কাপড়ের কলে কাজ করিবে, কি লোহার কলে, এইটুকু বাছিয়া লইবার স্বাধীনতাই শুধু তাহার আছে। ভারতবর্ষে মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা জন্মের দ্বারা ও কতকটা দেশের চাহিদা অনুসারে স্থিরীকৃত হইত, দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ঠিক কি তাহা রাষ্ট্রপতির স্থির করিয়া দিতেন না। লোকের বিশ্বাস ছিল জন্মগত বৃত্তি অনুসরণ করিলেই, দেশের অভাব মিটিয়া যাইবে। দুই দেশের মধ্যে এইটুকু প্রভেদ ছিল। কিন্তু দুই দেশই মানুষের অর্থনৈতিক চেষ্টার উপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বীকার করিত।

ইহার পর আমরা আরও দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ এবং রাশিয়া উভয়েই মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অস্বীকার বা সঙ্কুচিত করিলেও জাতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধে যথেষ্ট স্বাধীনতা দান করিয়াছে। এইখানে দুই দেশের মিল। অবশ্য ব্রাহ্মণেরা যেমন সংস্কৃতিগত স্বাধীনতা দিয়াও "নিম্ন জাতি"র কাছে বেদবেদান্তের মহিমা ঘোষণা করিতেন, রাশিয়াতেও তেমনই জাতীয় সংস্কৃতির উপর আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির বিষয়ে যথেষ্ট প্রচার করা হইয়া থাকে। উজবেগ, তুর্ক প্রভৃতি জাতি রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া স্বচ্ছন্দে স্বীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার লইয়া কালযাপন করিতেছে। উপরন্তু ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির সম্বন্ধে বহু উপদেশ লাভ করিতেছে।

কিন্তু দুইটি বিষয়ে রাশিয়া এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ

বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম হইল, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সামাজিক সুবিধার ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার তারতম্য লইয়া ভারতবর্ষে যে শ্রেণীভেদ হইয়াছিল, রাশিয়া তাহা হইতে দিবে না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বিভিন্ন মানুষের ক্ষমতা অনুসারে আয়ের তারতম্য বর্ত্তমান রাশিয়াতে আছে, এবং হয়ত শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। কিন্তু তাহাকে আশ্রয় করিয়া কোনও শ্রেণীভেদ রাশিয়া হইতে দিবে না, ইহাই তাহার আদর্শ।

দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে থাকিলেও লেনিনের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে দেশের অসংখ্য পঞ্চায়েতের (soviet) মর্জ্জির উপরেই কমিউনিষ্ট পার্টির থাক-ন-থাক কতকটা নির্ভর করি তছে। অর্থাৎ দেশের মালিক কতকাংশে দেশের শূদ্রগণ হইয়া উঠিয়াছে। আপদ্ধর্ম্মের বশে কমিউনিষ্ট পার্টি সে ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে সোভিয়েটগুলির হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে নাই বটে, কিন্তু বাহিরে বিপদের মেঘ কাটিলে তাহারা সেই ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে দেশের জনগণের হাতে ছাড়িয়া দিবে, ইহাই হইল আদর্শ। ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ কোনও আদর্শ বা অভিলাষ ছিল তাহা দেখা যায় না।

এই দুইটি হইল চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং রাশিয়ার সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রভেদ। আজ রাশিয়াতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সুস্থ সমাজে যতটা দরকার তাহা-অপেক্ষা অধিক সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু আপদ্ধর্ম্মের কথা ভুলিলে চলিবে না। চতুর্দ্দিকে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত রাজ্যের মধ্যে আবৃত থাকিয়া যদি রাশিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যথাযথ মূল্য দিতে না পারে, তবে তাহা ইচ্ছার অভাবে শুধু নয়, অবস্থার বিপর্য্যয়েও বটে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সে বহুকাল মানুষকে দিবে না বটে, কিন্তু অন্য বিষয়ে সে মানুষকে পরে আরও বেশী স্বাধীনতা দিবার আশা রাখে। রাশিয়ার মহত্ত্ব হইল এই যে জগদ্ব্যাপী শূদ্রদের দুঃখ দেখিয়াই সে আজ শূদ্ররাজত্ব স্থাপন করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত সে নৈরাজ্য স্থাপনা করিবার অভিলাষ রাখে, কিন্তু কবে নৈরাজ্য সম্ভব হইবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই।

হিন্দুসমাজ রাষ্ট্রের দ্বারা যে কত দূর নিয়ন্ত্রিত ছিল তাহা যে-কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ খুঁজিলে জানা যায়। হিন্দুও বহু জাতিকে একত্র করিয়া ক্যাপিটালিষ্ট সমাজ অপেক্ষা একটি উৎকৃষ্ট সমাজ গঠন করিয়াছিল একথা ভাবিয়া আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতে পারি। হিন্দু সমাজ সকলের কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিত, অর্থনীতির ক্ষেত্র বাদে সকলের জাতীয় সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে পালন করিতে দিত, ইহা সত্যই গর্ব্বের বিষয়। কিন্তু তাই বলিয়া সেখানে সোসিয়ালিজমের আদর্শ ছিল, অর্থাৎ আয়ের সমতা স্থাপন করার চেষ্টা ছিল বা শ্রেণীগত সুযোগসুবিধার তারতম্য ছিল না, একথা বলিলে ঠিক হইবে না। অথবা আমরা যদি অহঙ্কার করিয়া বলি যে হিন্দুর সমাজ গঠন ও শিক্ষাপদ্ধতি এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল যে "রাষ্ট্রীয় দণ্ডনীতির বলে বাধ্য করিয়া লোককে ইহার অধীন রাখিবার প্রয়োজন কখনও হয় নাই" (পৃঃ ২৯১), তাহা হইলে ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। রামচন্দ্র শম্বুককে বধ করিয়াছিলেন ইহা ভুলিলে চলিবে না। হিন্দু যেটুকু করিয়াছিল তাহার জন্যই সে বড়, বড় প্রমাণ করিবার জন্য যাহা সে করে নাই, তাহাও আরোপ করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না।

বহু বেদনার ভিতর দিয়া শুধু ভারত নয় ইউরোপও আজ চলিয়াছে। মানুষ সর্ব্বত্রই মানুষ। ভারতেও তাহার দুঃখ আছে, ইউরোপেও আছে। দুই দেশেই এমন লোক আছেন যাঁহারা সমগ্র মানবজাতির দুঃখকে সমাজব্যবস্থার দ্বারা যতদূর সম্ভব ততদূর নিবৃত্ত করিতে চান। এবিষয়ে যে-দেশ যতটুকু সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে ততটুকুই মর্য্যাদা দিতে হইবে। একদেশের মাটির উপর অত্যধিক প্রেমবশতঃ সেখানকার অধিবাসীদের কীর্ত্তিকে অযথা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, দূরের মাটির বাসিন্দাদের কীর্ত্তিকে অযথা কমাইবারও দরকার কখনও হয় না।

মানুষের কীর্ত্তিকে সর্ব্বত্রই মুক্তদৃষ্টি লইয়া দেখিতে হইবে। তাহা না হইলে ঐতিহাসিক সত্যকে পাওয়া যায় না। সর্ব্বশেষে একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে জ্ঞান আহরণের জন্য আমাদের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে অনুরাগ এবং বিদ্বেষ হইতে মুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা ভারতবর্ষে যেমন করিয়া বলা হইয়াছিল অন্য কোন দেশে তেমনভাবে বলা হয় নাই।

সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা-প্রণালী

শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, এম-এ, বি-এল, বি-টি

সোভিয়েট রাশিয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সাময়িক পত্রিকাতেও বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে অনেকেই রাশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থার সংবাদ কিছু কিছু রাখেন কিন্তু শিক্ষাপ্রসারকল্পে সোভিয়েট রাশিয়া যে দেশব্যাপী বিরাট আয়োজন করিয়াছে সে-কথা অতি অল্প লোকই অবগত আছেন। শিক্ষা-সম্বন্ধে নূতন নূতন মতবাদ ও তথ্য লইয়া পরীক্ষা ব্যাপারে আমেরিকা পৃথিবীর সকল দেশের অগ্রগামী, কিন্তু রাশিয়ার মত নূতন শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া এমন ব্যাপক আন্দোলনের তুলনা আমেরিকাতেও নাই।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর যখন পুরাতনের যাহা-কিছু ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, তখন রাশিয়ার শ্রমিকরাষ্ট্র শিক্ষার নূতন ভিত্তি স্থাপনে উদ্যত হইয়া জগতের বিভিন্ন

দেশের শিক্ষাতন্ত্রে যাহা কিছু কার্য্যকর ও কল্যাণপ্রদ তাহা লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিল। মনোবিজ্ঞান, শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদানপ্রণালী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ জার্ম্মান, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা হইতে অনূদিত হইতে লাগিল। কিলপ্যাট্রিক, ডিউয়ি ও থর্নডাইক প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন শিক্ষাবিজ্ঞানবিৎ মনীষীদের নাম আজ রাশিয়ার সর্ব্বত্র সুপরিচিত। রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পণের কথা সকলেই জানেন। গত বর্ষে এই ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পুনরায় পাঁচ বৎসরের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র নূতন শিক্ষাব্রত ধারণ করিয়াছে, বিপুল উদ্যোগ ও অদম্য উৎসাহ লইয়া আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।

আমাদের দেশে স্বদেশী-আন্দোলনের সময় ও অসহযোগ যুগে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ব্যর্থতার কথা লোকের মনে স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে বহু "জাতীয় বিদ্যালয়ে"র সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান শিক্ষা নিষ্ফল তাহাই লোকে বুঝিয়াছিল, কিন্তু নূতন শিক্ষা যে কেমন হইবে সে-কথা কেহই চিন্তা করে নাই। ফল এই দাঁড়াইল যে শিক্ষার পরিবর্ত্তন কিছুই হইল না। মাত্র জাতীয় শিক্ষা নাম দিলেই ত আর শিক্ষা বদলাইয়া যায় না। এই তথাকথিত জাতীয় শিক্ষার পশ্চাতে কোন নূতন বা উন্নত আদর্শের প্রেরণা ছিল না, থাকিলে আজ এত শীঘ্র ইহার শোচনীয় অকাল মৃত্যু ঘটিত না। রাশিয়ায় নবশিক্ষা প্রবর্ত্তনের সময় এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা সৌভাগ্যবান্, তাই সমস্যার সমাধান সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছিল।

প্রত্যেক দেশের শিক্ষাপদ্ধতি অতীতের সহিত সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ। সেই জন্য শিক্ষাধারাকে নবীকৃত ও সজীব করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার দুশ্ছেদ্য নাগপাশ তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখে। পক্ষান্তরে দেশের অর্থনীতির উপরেও অনেকটা নির্ভর করিতে হয়। পুরাতনের কোন বালাই সোভিয়েটের ছিল না। সে পুরাতন প্রাসাদকে একেবারে ভাঙিয়া ধূলিসাৎ করিয়া শিক্ষামন্দিরের সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করিল। দেশের অর্থনীতির সঙ্গে দেশের সর্ব্ববিষয়ের ঘনিষ্ঠ যোগসাধন করিয়া আর্থিক সমস্যার সমাধান করিল।

নবজাগ্রত সমাজের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ইচ্ছানুরূপ শিক্ষাধারা রচিত হইতে লাগিল জীবনের যেদিক দিয়া যতটুকু পারা যায় জ্ঞানালোক লাভ করিতে হইবে—ইহাই হইল আজ রাশিয়ার চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মূলমন্ত্র।

সেখানে আজ শিক্ষা-সম্বন্ধে যে-সকল পরীক্ষা চলিতেছে তাহা কেবলমাত্র স্কুল-কলেজেই সীমাবদ্ধ নহে। শিক্ষার যে বিপুল কর্ম্মধারা প্রবাহিত হইতেছে, স্কুল-কলেজ তাহার একটি শাখামাত্র। এই বিরাট প্রবাহ অনন্ত বৈচিত্র্যে তরঙ্গিত হইয়া বহু যুগের পিপাসিত দেশকে স্নিগ্ধ ও তৃপ্ত করিতেছে।

পল্লীকেন্দ্র, কৃষিভবন, মাতৃমঙ্গল-সমিতি, শিশুশিক্ষায়তন, মিউজিয়ম, থিয়েটার, সিনেমা, লাইব্রেরী ও চলন্ত পাঠাগার, মুদ্রাযন্ত্র তথা সংবাদপত্র ও জীবন্ত সংবাদপত্র, ব্রতী বালকসঙ্ঘ, ট্রেড ইউনিয়ন, এমন কি সৈন্য-বিভাগ পর্য্যন্ত শিক্ষাপ্রসারের পরম সহায়ক প্রতিষ্ঠান। এগুলি ছাড়া স্বাস্থ্যবিভাগ, সমবায়-বিভাগ ও কৃষি-বিভাগ ত আছেই। ইহাদের দ্বারাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে গ্রামে গ্রামে জ্ঞানালোক বিতরিত হইতেছে।

জীবনের বহুবিধ দিক দিয়া শিক্ষাবিস্তারের এই যে অদম্য চেষ্টা, ইহার তুলনা অন্যত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃগণ দেশকে আর কোনও প্রকার অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখিতে চাহেন না। এমন এক দিন ছিল যখন জা'র-শাসিত রাশিয়ায় যাহাতে সকলের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না-হয় তাহারই চেষ্টা চলিত। কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শ্রমিক সম্প্রদায় ও সমাজের অধস্তন অংশ যাহাতে উচ্চশিক্ষা না পায় সেদিকে তদানীন্তন গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এ-বিষয়ে জা'র আলেকজাণ্ডারের মন্ত্রী শিশ্‌কভের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, 'লবণ মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু অধিক লবণ ব্যবহার যেমন অনিষ্টজনক, শিক্ষাও তেমনই মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু শিক্ষার বহুল বিস্তার সমাজের পক্ষে অহিতকর। দেশের অধিকাংশ লোক লেখাপড়া শিখিলে দেশের ইষ্ট না হইয়া অমঙ্গলই হইবে।' বিদ্যালয়গামী বালক-বালিকার সংখ্যা নগণ্য ছিল। ১৯০৪ সালে জার্ম্মান সাম্রাজ্যে বিদ্যালয়-গামীদের সংখ্যার অনুপাত ছিল শতকরা ১৯, ইংলণ্ডে ১৬,

ফ্রান্সে ১৫ আর রাশিয়ায় ছিল ৩'৩। পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন, বিষয়-নির্দ্ধারণ ও শিক্ষাদানের সময় নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়ে জা'র-সরকারের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। শিক্ষকদের অবস্থাও ছিল অতি শোচনীয়। বেতনের উপর নির্ভর করিয়া কেহই সংসার চালাইতে পারিত না। আর্থিক অসচ্ছলতার ত কথাই নাই, তাহার উপর শিক্ষকদের গতিবিধি, কথাবার্ত্তা ও শিক্ষাদান-প্রণালীর উপর গুপ্ত পুলিসের খর দৃষ্টি থাকিত। সামান্য কারণেই তাহাদিগকে লাঞ্ছিত হইতে হইত। সাধারণের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার রুদ্ধ থাকিত। উচ্চশ্রেণীর যে-সকল যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিত তাহাদের নৈতিক দুরবস্থার কথা টলষ্টয়-প্রমুখ সাহিত্যিকদিগের কথাসাহিত্যে যে-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই। ছাত্রগণ কোন সঙ্ঘগঠন করিতে পাইত না, সভাসমিতিতে যোগদান করিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সম্মতি লইতে হইত।

অতীতের এই অন্ধকারময়ী সুদীর্ঘ রজনীর অবসানে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় নূতন আশার প্রথম সূর্য্যালোক লোকচিত্তকে উল্লসিত করিয়া তুলিল। জনসাধারণের অধিকাংশেরই তখন পুস্তকের সহিত কোনও পরিচয় ছিল না; ইচ্ছা থাকিলেও শিক্ষালাভ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। বিপ্লবের পর জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত ও অবারিত করিয়া দেওয়া হইল। জ্ঞানার্থী নরনারী আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। বড় বড় পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ হইল। ১৯১৮ সালে মস্কো শহরে এক শিক্ষা-সম্মিলনীর অধিবেশন হইল। লুনাচার্স্কি, ক্রুপাস্ক্যা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নূতন রাষ্ট্রে শিক্ষা-সম্বন্ধে এক খসড়া প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করার মত অর্থ তখন একেবারেই ছিল না। দুর্ভিক্ষ, গৃহবিবাদ ও আর্থিক বিশৃঙ্খলতার বিভীষিকার মধ্যে আরও তিন বৎসর কাটিয়া গেল।

যখন কতকটা সুদিন আসিল তখন সোভিয়েট নেতৃগণ আবার আগ্রহের সহিত শিক্ষা-সম্পর্কিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ব্রেল্‌স্‌ফোর্ডের কথায় পৃথিবীর এই প্রথম শ্রমিকগণতন্ত্রকে জগতের মধ্যে গৌরবান্বিত ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন করিতে হইলে বর্ত্তমান বালক-বালিকাদিগকে সকল দেশের নরনারীর অপেক্ষা দেহমনে উন্নততর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে—এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া কম্যুনিষ্ট-দলপতিগণ রাশিয়ার শিক্ষা-আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। "নিরক্ষর দেশে শ্রমিক রাষ্ট্রগঠন সম্পূর্ণ অসম্ভব," ১৯২০ সালে লেনিন এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করেন। ১৯২৩ সালে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ১৯৩৩ সালের শেষে লিখনপঠনক্ষম লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৯০ জন। শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই যাহাতে শিক্ষালাভ করে তাহার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

প্রাচীনকালে স্পার্টানগণ শিশুর জন্মের পর হইতেই তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিত। সোভিয়েট রাশিয়াও শিশুর মঙ্গল সম্বন্ধে সজাগ। (অবশ্য আমেরিকার কোন কোন রাষ্ট্র এবং ইটালীও এ-বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে।) যে-সকল প্রসূতি কারখানায় কাজ করে তাহাদের সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ক্রেশ (creche) ও শিশুভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অল্প হইলেও এখানে প্রসূতিরা শিশুপালন ও মাতৃমঙ্গল সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করে। সহজে যাহাতে শিশুর শরীর পুষ্ট হয় এইরূপ খাদ্যও এই প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে এইরূপ শিশুভবন প্রতিষ্ঠার ফলে শিশুদের মৃত্যুর হার অনেক কমিয়া গিয়াছে।

তিন বৎসর বয়সে শিশুদের আসল শিক্ষার আরম্ভ হয়। তখন তাহাদিগকে প্রাগ্‌বিদ্যালয়ে (Pre-school) বা কুমার-কাননে (kindergarten) ভর্ত্তি হইতে হয়। কুমারকাননের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রোবেল বা শিশুশিক্ষা-ব্যাপারে যশস্বিনী মন্তেসরির শিক্ষাপদ্ধতির স্থান সোভিয়েট শিশুবিদ্যালয়ে নাই বলিলেই হয়। ফ্রোবেল ও মন্তেসরির মতে শিশুগণ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব চিত্তবৃত্তিগুলিকে বিকশিত করিবে। শিক্ষক পরোক্ষভাবে এই ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহায্য করিবে। কিন্তু রাশিয়ার শিক্ষকগণ শিশু যাহাতে ভবিষ্যতে মার্ক্সপন্থী হয় তদনুরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টিকার্য্যে ব্যস্ত থাকে। ভবিষ্যতে কম্যুনিষ্ট-মতবাদের বীজ বপন করিতে হইবে এই আশায় শিশুকে অনুকূল পরিবেষ্টনে আনিয়া ফেলিতে আরম্ভ করে। খেলাধূলায় ও সমবেত চেষ্টায় তাহাদের মনে যাহাতে

সহজে সামাজিকতার ভাব সঞ্চারিত হয় তাহার চেষ্টা করা হয়।

প্রাগ্‌বিদ্যালয়-আন্দোলনে হাত দিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নকে নূতন শিশুসাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইতেছে। পৃথিবীর সকল দেশেই রাজারাণী, রাক্ষস ও পরীর গল্প লইয়া শিশুসাহিত্য রচিত হয়। বাস্তব জগতের সহিত এই সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ থাকে না। তবে কল্পনাশক্তিকে বাড়াইবার জন্য যে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা ফ্রোবেলও স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ সাহিত্যের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, জগতে বহু অপূর্ব্ব রহস্যময় ব্যাপার আছে, যাহা সত্য অথচ কল্পনাশক্তি-উদ্বোধক। রাশিয়ায় শিশুসাহিত্য-রচনায় যাঁহারা হাত দিয়াছেন তাঁহারা এই মতাবলম্বী। তাই রুশীয় শিশুসাহিত্য একেবারে বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অথচ শিল্প ও সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহার মূল্য কম নহে। এই বিষয়ে ডাক্তার মন্তেসরি সোভিয়েট শিক্ষানীতিবিদ্‌গণের সহিত একমত। শিশু প্রাগ্‌বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর থাকে।

আট বৎসর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষার আরম্ভ ও বার বৎসর বয়সে ইহার সমাপ্তি। বিগত পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় দ্রুত ও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বালক-বালিকাদের মধ্যে নিরক্ষরতা নাই বলা যাইতে পারে। আমরা যেমন গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয় নির্ব্বাচন করি, সোভিয়েট শিক্ষকগণ তাহা না করিয়া তিনটি বিষয়কে মূলতঃ শিক্ষণীয় রূপে ধরিয়াছেন। এই তিনটি বিষয়, (১) প্রকৃতি, (২) শ্রম ও (৩) সমাজ। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিশ্বপ্রকৃতির যে বিচিত্র রূপ শিশুর নয়ন-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহার সহিত পরিচয়ই শিশুশিক্ষার অ, আ, ক, খ। আকাশ ছাইয়া মেঘ আসে, কলরোলে নদী বহিয়া যায়, ঋতুতে ঋতুতে তরুলতা নূতন ফলে ফুলে শোভিত হয়। ইহাদিগকে ঘিরিয়া শিশুর মনে সহস্র কল্পনা জাগে। শিশুর এই কৌতূহলপূর্ণ উৎসুক চিত্তে ইহাদের বার্ত্তা জানাইতে হইবে। তার পর শিশু গৃহে দেখিতে পায় তাহার পিতামাতা পরিশ্রম করিতেছে, তাহার সামনের মাঠে চাষীরা কাজ করিতেছে, চারি দিকে পশুপক্ষী আহারান্বেষণে ফিরিতেছে। ইহাদের কথা তুলিয়া শিশুকে শ্রমের মূল্য ও মর্য্যাদার কথা স্মরণ করাইতে হইবে। তৃতীয়তঃ, শিশু যে-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে-গ্রামে পালিত হইতেছে, যে-বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতেছে তৎসম্বন্ধে তাহার কিছু কিছু জানা প্রয়োজনীয় এইগুলি হইল শিশুশিক্ষার ভিত্তি।

দেশের জলবায়ু, ভূমির উৎকর্ষাপর্ষ, সাধারণ জড়বিজ্ঞান ও রসায়ন, রাশিয়ার ভৌগোলিক বিবরণ, দেশবাসীর জীবন-যাত্রাপ্রণালী, গ্রাম্য ও নাগরিক শ্রমিকগণের অবস্থা ও জীবিকার্জ্জনের উপায়, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অন্যান্য দেশের অবস্থার সহিত তাহার তুলনা, শ্রমিক-রাষ্ট্রের সাধারণ পরিচয় প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় শিশুকে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে হস্তলিখন, পুস্তকপাঠ ও গণিত শিক্ষা দেওয়া হয়।

নিখিল মানবের প্রথম ও প্রধান দুরূহ সমস্যা হইতেছে অন্নসমস্যা। সোভিয়েট শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যও তাই অন্ন-সমস্যার সমাধান করা। শিক্ষার্থীকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে অর্থার্জ্জন মানবজীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য। কিন্তু নীরস শুষ্ক অন্নান্বেষী জীবন লইয়া মানুষ বাঁচিবে কেমন করিয়া? মানুষে ও পশুতে আর পার্থক্য থাকিবে কোথায়? তাই কাব্যনাটকনৃত্যগীতচিত্রাদি ললিতকলাও সোভিয়েট শিক্ষাতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। বস্তুতঃ সোভিয়েট শিক্ষা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও বিশ্বকর্ম্মাকে একই মন্দিরে স্থাপিত করিয়াছে। এই বিষয়ে বিখ্যাত মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সারের পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতি তুলনীয়। তিনি প্রয়োজনীয়তার তারতম্য অনুসারে মানবজীবনে শিক্ষণীয় বিষয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে শরীর-রক্ষাই মনুষ্যজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। তাহার নীচে স্থান দিয়াছেন ধনার্জ্জনের। তাহার পর একে একে সন্তানপালন, সামাজিক জীবনযাপন ও আনন্দলাভের কথা বলিয়াছেন। (১) শরীর-রক্ষার জন্য শারীরবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যনীতি, (২) ধনার্জ্জনের জন্য জড়বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত ও অন্যান্য বিজ্ঞান, (৩) সন্তানের জন্য প্রজননবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ও সদাচার পদ্ধতি, (৪) সামাজিক জীবনযাপনের জন্য সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইতিহাস এবং (৫) আনন্দলাভের জন্য কাব্যনাটকনৃত্যগীতাদি ললিতকলা আলোচ্য বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদের এই পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে প্রয়োজনের

তারতম্য অনুসারে। সোভিয়েট এই নীতিরই অনুসরণ করিয়া শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্বাদির স্থান অতি উচ্চে ও কাব্যসাহিত্যাদির স্থান অতি নিম্নে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে।

এই বিদ্যালয়গুলি এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকরাজ্য বা বালকপরিবার। বিদ্যালয়ের অনেক শ্রমসাধ্য কাজই বালকবালিকারা সানন্দে সম্পন্ন করে। সকল কাজেই দুইটি বিষয়ের উপর সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। একটি বিষয় হইতেছে শ্রমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করা; দ্বিতীয়, সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার শক্তি সঞ্চয়। শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়াকৌতুক, নৃত্যগীত প্রভৃতি আনন্দলাভের ব্যবস্থাও প্রচুর থাকে। তরুণ মনের সহিত বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করাইবার জন্য শিক্ষার্থীদিগকে মাঝে মাঝে মিউজিয়ম, প্রদর্শনী, কারখানা ও কৃষিভবনে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম দিকে শিক্ষাদান-প্রণালীতেও কিছু বিশেষত্ব আছে। শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের এক একখানি নোট-বই আছে। শিক্ষক যে-সকল কথা বলেন বা ছাত্র নিজে যাহা চিন্তা করে সে এই নোট-বইয়ে ছবি আঁকিয়া তাহার ভাব প্রকাশের চেষ্টা করে।

প্রত্যেক ছাত্র শিক্ষককে এই নোট-বই দেখাইয়া বাহাদুরি লইবার জন্য ব্যস্ত। মৌলিক কৃতিত্বের গৌরব সকলেই চায়। তরুণ মনের কাছে অক্ষরের অপেক্ষা চিত্রই অধিক মনোহারী ও ভাবপ্রকাশক। এই প্রণালীতে ছাত্র আনন্দ বোধ করে ও স্বীয় শক্তির পরিচয় দিয়া গর্ব্ব অনুভব করে। কোন-কোন দিন ক্লাসের সকল ছাত্রকে ডাকিয়া স্কুল হইতে যে-কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত পথটা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আসিতে বলা হয়। পরদিন তাহারা সকলে মিলিয়া সেই পথের একখানি ছবি আঁকিয়া দেয়। বাংলা দেশের কথাসাহিত্যকরা এইভাবে "ভাগের পূজা," "বারোয়ারি" প্রভৃতি দু-একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বালকবালিকারা প্রায়ই এমন বারোয়ারি ছবি আঁকিয়া থাকে। তাহাদের সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা বাড়িয়া উঠে ও সঙ্গে সঙ্গে যৌথকার্য্যের শক্তি ও যুক্তিযুক্ততা অনুভব করে।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে আরও তিন বৎসর সাধারণভাবে কৃষি, সমবায়, শিল্প, কারখানা ও বিশেষ ভাবে সোভিয়েট শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে হয়। ইহাই সোভিয়েটের মাধ্যমিক শিক্ষা (secondary education)। তার পর অর্থকরী বিদ্যায় জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা। অর্থকরী বিদ্যা আহরণ করিয়া ছাত্রছাত্রী সংসারে প্রবেশ করিয়া রাষ্ট্রের সেবায় জীবন অর্পণ করে।

কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা পারদর্শী হইতে ইচ্ছা করিলে উচ্চশিক্ষায়তনে যাইতে হয়। সেখানে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কলেজের মত বক্তৃতা-সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নাই। ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ বিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান যাহাই আলোচনা করুক না কেন সাধারণতঃ তাহাদিগকে লেবরেটারী-প্রণালী বা ডালটন-পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করিতে হয়। আমাদের দেশের কলেজগুলিতে অনেকে ক্লাসে উপস্থিত থাকে না; আবার যাহারা থাকে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হাস্যকৌতুকে নিমগ্ন থাকে। রাশিয়ার কলেজগুলিতে বক্তৃতাদান-প্রণালী পরিত্যক্ত হওয়ায় সেখানে এইরূপ ছাত্রের আর স্থান নাই। যাহারা যথার্থ জিজ্ঞাসু তাহারাই উচ্চ শিক্ষায়তনে ভর্ত্তি হয়। জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে নিজেদের আহারবাসস্থানের ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য এবং সাধারণ নিয়মানুবর্ত্তিতার ভারও গ্রহণ করিতে হয়। ব্যষ্টির সুখসুবিধা কেমন করিয়া সমষ্টির জন্য বলি দিতে হয় ও কেমন করিয়া পরিণামে তাহা ব্যষ্টিরই সুখসুবিধার সৃষ্টি করে তাহা ছাত্রছাত্রীদিগকে বিশেষ ভাবে এই কলেজ-জীবনে বাস্তবতার মধ্যে অনুভব করিতে হয়। এই শিক্ষায়তনগুলিতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা এত বেশী যে এগুলিকে কলেজ বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় যেন জ্ঞানজগতের বড় বড় সমস্যা সমাধানে উন্মুখ শিক্ষকছাত্র-সম্মিলনী। শুধু যে প্রকৃত রাশিয়ায় এইরূপ ভাবে কাজ চলিতেছে তাহা নহে ককেসাসের পরপারে সুদূর সোভিয়েট রাষ্ট্রেও এই একই পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে।

সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা যে দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তারের ও শ্রমিকগণের উন্নতির উপরেই এই শ্রমিক-রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। তাই শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চেষ্টা মাত্র স্কুল-কলেজে সীমাবদ্ধ নাই। রাশিয়ার স্কুল-কলেজে আজ যে-সকল তরুণ-তরুণী আছে তাহারাই ভবিষ্যৎ রাশিয়ার একমাত্র ভরসা। তাহাদের উন্নতির কথা

সর্ব্বাগ্রে ভাবিতে হইবে। কিন্তু যাহারা স্কুল-কলেজে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই, আজ যাহারা রাষ্ট্রের হিতসাধনায় নিযুক্ত আছে তাহারাই বা বঞ্চিত হইবে কেন? তাহাদের শিক্ষায় ও উন্নতিতে শুধু যে তাহাদেরই লাভ তাহা নহে, তাহাদিগকে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা সমগ্র রাষ্ট্রেরই বলবৃদ্ধি হইবে। এইরূপ চিন্তা লইয়া সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষাক্ষেত্রকে যতদূর পারা যায় প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বয়স্ক ব্যক্তিদের এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা জার্ম্মেনীতে ও নব্য ইতালীতেও চলিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিক্ষাবিস্তারকল্পে রাশিয়ায় নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করিতেছে। কৃষিক্ষেত্রে যাহারা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত আছে, কারখানায় যাহারা মজুরি করিতেছে অথবা ছাউনিতে ছাউনিতে যাহারা যুদ্ধবিদ্যায় মনোনিবেশ করিয়াছে—সোভিয়েটের মতে তাহারাই শ্রমিক। এই শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য সোভিয়েট সরকার সতত ব্যস্ত। যে-সকল প্রতিষ্ঠান ইহাদের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছে তাহাদের উদ্দেশ্য ইহাদের কেবলমাত্র লিখনপঠনক্ষম করিয়া তোলা নহে, ইহাদের শরীর মন ও চরিত্রের উন্নতি তথা সমাজতন্ত্রবাদের বহুল প্রচারও এই সকল প্রতিষ্ঠানের কাম্য। দেশের সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর মধ্যে উপযুক্ত নেতার সৃষ্টি সম্ভাবনাও ইহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কৃষক যাহাতে কৃষির অধিক উন্নতি সাধন করিতে পারে, মজুর ও মিস্ত্রী যাহাতে কারখানার কলকব্জা ও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাঝে মাঝে এই সকল কৃষক ও শ্রমিককে সরকারী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, জ্ঞানকেন্দ্র ও মিউজিয়মে যাইতে হয়। যেখানে-সেখানে সান্ধ্যবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে চিত্তবিনোদন ও জ্ঞানলাভ দুই-ই হয়। শ্রমিকদের যে আড্ডায় আগে সন্ধ্যাকালে সুরার স্রোত চলিত সেখানে আজ সরস্বতীর কমলবন রচিত হইয়াছে। জ্ঞানামৃত-বিতরণে সোভিয়েট শ্রমিকদের কাঙালীভোজনের ব্যবস্থা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য সমাপন হইল বলিয়া মনে করে নাই—তাহাদিগকে বীণাপাণির ভবনে নিত্যনিমন্ত্রণেও আহ্বান করিয়াছে। সান্ধ্যবিশ্ববিদ্যালয়ও খোলা হইয়াছে, সেখানে বয়স্ক ব্যক্তিরা কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করিলে ভর্ত্তি হইতে পারে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কথকতা, যাত্রা, মেলা, তীর্থভ্রমণ, পূজাপার্ব্বণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের মূলে উদ্দেশ্য থাকিত লোকশিক্ষাবিধান। বর্ত্তমান যুগে সোভিয়েট রাশিয়া এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। জগতে আর এমন কোনও দেশ নাই যেখানে লোকশিক্ষার জন্য আয়োজন এত বিরাট ও চেষ্টা এত বিপুল। মিউজিয়ম, থিয়েটার ও সিনেমা এত দিন ধনীদের চিত্তবিনোদন করিত। আজ আপামর জনসাধারণের জন্য ইহাদের দ্বার উন্মুক্ত। প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক মিউজিয়মে যাইতেছে। সেখানে দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখাইয়া দেওয়ার ও শিক্ষণীয় বস্তু বুঝাইয়া দেওয়ার লোক আছে। প্রায় প্রত্যেক গণ্ডগ্রামে চলচ্চিত্রশালা স্থাপিত হইয়াছে। সেখানকার ছবিতে প্রেমের দৃশ্য বিরল—সেখানকার ছবি হইতে ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের কৌতূহলোদ্দীপক জ্ঞান লাভ করা যায়। পাঠগোষ্ঠী, আলোচনামণ্ডলী এবং সজীব সংবাদপত্র প্রভৃতির সাহায্যেও লোক দ্রুতভাবে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতেছে। গ্রামে গ্রামে ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে, তৎসংলগ্ন লাইব্রেরী আছে। সেখানে অন্যের সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজে কেমন করিয়া পড়িতে পারা যায়, কোন্ বই কি ভাবে পড়িতে হয়—এই সকল বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। যাহারা প্রতিদিন লাইব্রেরীতে আসিতে পারে না তাহারা ঘরে বসিয়া রেডিও-সাহায্যে বা চিঠিপত্রাদির দ্বারা নিজেদের সংশয় নিরসন করিয়া থাকে। সকল লাইব্রেরী ছাড়া চলন্ত পাঠাগার জ্ঞানের ভাণ্ডার লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিভবন, সমবায় কেন্দ্র ও স্থায়ী প্রদর্শনী স্থাপিত হইয়াছে। দূর গ্রাম হইতে কৃষক ও শ্রমিকেরা এখানে আসিয়া থাকিতে পায়। যাহা-কিছু দেখিবার, জানিবার ও শিখিবার তাহা দেখিয়া জানিয়া ও শিখিয়া আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া গিয়া নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে আয়ত্ত জ্ঞানের প্রয়োগ করে।

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকার্য্য দ্রুত পরিচালিত করার জন্য এক বিশাল কর্ম্মিসঙ্ঘ গঠিত হইতেছে। এই সঙ্ঘের কার্য্য রাশিয়ার সর্ব্বত্র প্রসারলাভ করিয়াছে।

সমগ্র দেশ হইতে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিবার জন্য যে সাধনা আরম্ভ হইয়াছে এই কর্ম্মিসঙ্ঘ সেই কঠিন সাধনার উত্তর-সাধক। নিজ নিজ বিদ্যালয়ে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে—দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ইহারা নবযুগের বাণী বহন করিয়া ফিরিতেছে। দেশের শিক্ষাবিস্তারে ইহারাই প্রধান সহায়ক। ইহাদের সহিত শান্তিনিকেতনের ব্রতী বালকদের ও শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারীদের অনেক সাদৃশ্য আছে।

অন্যান্য দেশে শিক্ষকদিগকে শিশুসম্বন্ধে ও শিশুর মনস্তত্ত্ববিষয়ে আলোচনা করিতে হয়। এখানেও শিশুমনস্তত্ত্ব আলোচ্য, কিন্তু সঙ্ঘের মধ্যে কার্য্য করিতে হইলে শিশুর চিত্ত কি ভাবে বিকশিত হয় তাহাই সোভিয়েট শিক্ষক আলোচনা করেন। এখানে এই আলোচ্য শাস্ত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে সামাজিক মনস্তত্ত্ব (social psychology)। অন্যত্র কোনও বিষয়ে পরীক্ষা (experiment) করিতে হইলে প্রথমতঃ ইতরজন্তু লইয়া করা হয়। রাশিয়ায় ক্লাসে বা খেলার মাঠে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে স্বভাবতঃ যে-সকল দল গঠন করে তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া গবেষণা-কার্য্য চলে। আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাতত্ত্ববিৎ স্কট নিয়ারিং বহুদিন সোভিয়েট রাশিয়ায় অবস্থান করিয়া সোভিয়েট-শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তাঁহার রাশিয়ায় অবস্থান কালে ছাত্রদের দলগঠন সম্বন্ধে সেখানে এক গবেষণা চলিতেছিল। এই গবেষণার ফলে রুশীয় শিক্ষকগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহা বিখ্যাত শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ম্যাগ্‌ডুগালেরই সিদ্ধান্তের অনুরূপ। যূথগঠন ও যৌথকার্য্যে পারগতা সোভিয়েট শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই জন্য শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা যৌথকার্য্যে প্রণোদিত করেন। এখানে শিক্ষক ক্লাসের দণ্ডদাতা বা পুরস্কারক বা সর্ব্বময় অধীশ্বর নহেন, এখানে তিনি ছাত্রদের যৌথকার্য্যে সহকর্ম্মী, উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক। তিনি সর্ব্বভাবে ছাত্রদের উন্নতিপথের অগ্রদূত।

বিদ্যালয়ে বা ক্লাসে নিয়মানুবর্ত্তিতারক্ষার সহিত শিক্ষকের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার ভার সম্পূর্ণরূপে ছাত্রদের উপর। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে রাশিয়ার স্কুলে কোন প্রকার শৃঙ্খলা নাই। হলঘরে, ক্লাসে বা অন্যত্র ছেলেরা নিজেদের কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে গোলমালের কোন অবসর থাকে না। কেহ বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করিলে সে বিষয় তৎক্ষণাৎ ছাত্রসমিতির নিকট উপস্থিত করা হয়। এই সমিতিই যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

সোভিয়েট-নীতি নিন্দনীয় হইতে পারে, সোভিয়েট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষাজগতে তাহার এই জীবনপণ চেষ্টার প্রশংসা কে না করিবে? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বিখ্যাত মার্কিন-শিক্ষক স্কট নিয়ারিং প্রমুখ প্রত্যেক প্রত্যক্ষদর্শী সোভিয়েট শিক্ষাধারার তথা সোভিয়েটের শিক্ষাপ্রসারে সোভিয়েটের সঙ্কল্পের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এ প্রশংসা সোভিয়েটের যথার্থতঃ প্রাপ্য। শিক্ষার জন্য এইরূপ ব্যাপক আয়োজন ও চেষ্টা জগতের ইতিহাসে অভিনব।

পুস্তক পরিচয়
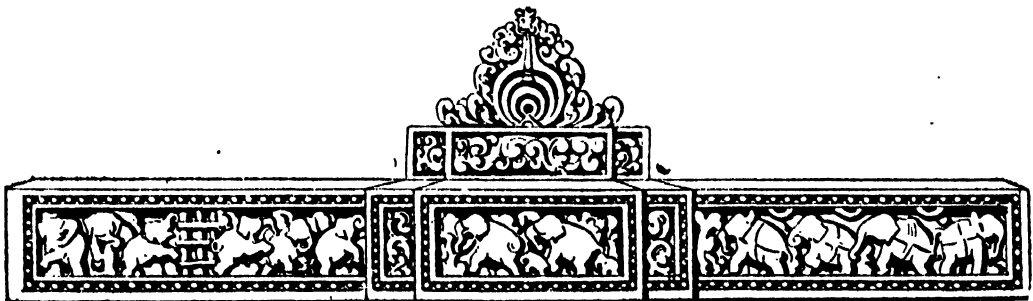
ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত—স্বামী সন্তদাস বাবাজী প্রণীত। প্রকাশক, চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেদান্তের যে যে সূত্রে সূত্রকার প্রধানতঃ জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থকার সেই সব সূত্রের নিম্বার্ক-কৃত ভাষ্যের সঙ্গে শঙ্কর ও রামানুজ কৃত ভাষ্যের তুলনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মূলতঃ নিম্বার্ক-কৃত ভাষ্যই সর্ব্ববাদি-সম্মত। ইহা হইতে এই অনুমান স্পষ্ট যে, নিম্বার্ক-প্রচারিত ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই প্রকৃত বেদান্ত। গ্রন্থকারের এই অভিমত সকলে হয়ত মানিবেন না; কিন্তু গ্রন্থখানিতে যথেষ্ট বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাড়তির পথে বাঙালী—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রণীত; ২১২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে বি, সিংহ এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় বহু বৎসর হইতে দেশ-বিদেশের অর্থনীতিক সমস্যা লইয়া নানা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন এবং আমাদের দেশে সে সমস্যার সমাধান কি প্রকারে হইতে পারে তাহারও ইঙ্গিত দিতেছেন। তিনি এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক, সুতরাং তাঁহার রচিত সকল গ্রন্থে শিখিবার ও ভাবিবার কথা অনেক থাকে। এই আলোচ্য পুস্তকেও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠা-ব্যাপী এই দীর্ঘ পুস্তকে তিনি নানাদিক হইতে বাঙালীর উন্নতির আলোচনা করিয়াছেন, কতটা ও কি ভাবে বাঙালী অর্থনীতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে এবং কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিলে আরও অগ্রগামী হইতে পারিবে, ইহা গ্রন্থকার অনেক দৃষ্টান্তাদি প্রয়োগে বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙালীর ব্যাঙ্ক-দৌলত, হাজারভুজা বাঙালীজাতি, বঙ্গসমাজে চাষী-মধ্যবিত্ত-জমিদার প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে বাঙালীর অর্থনীতিক ও সামাজিক মূলতত্ত্বগুলি এমন বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে যে পাঠকালে গ্রন্থকারের গবেষণার গভীরতায় মুগ্ধ হইতে হয়। বর্ণনার ভঙ্গীও গ্রন্থকারের নিজস্ব, উহা যেমন তেজস্বী তেমনই প্রাণস্পর্শী। এই উপাদেয় প্রবন্ধগুলির মধ্যে "গণশক্তির উদ্বোধন"-শীর্ষক কবিতাটি না থাকিলেই ভাল হইত, কারণ কবিতা-হিসাবে উহা নিষ্ফল রচনা। ভূমিকায় অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস মহাশয় গ্রন্থকারের বহুমুখী প্রতিভা ও কর্ম্মচেষ্টার একটি সরস পরিচয় দিয়া গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থের কাগজ, বাঁধাই ও মুদ্রণ বেশ সুন্দর।

ছেলেধরা—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৭৮, কাশীপুর রোড, বরাহনগর হইতে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য উপন্যাস। দুইটি বালক নদীর ধারে খেলা করিতে গিয়া ছেলেধরার হাতে পড়িয়াছিল। ছেলেধরার বাসস্থানে তাহাদের আর দুইটি বালকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই চারি জনে পরামর্শ করিয়া একবার ছেলেধরার কবল হইতে পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইল না। ধরা পড়িয়া তাহারা আফ্রিকার আবাদ-স্থানে প্রেরিত হইল। সেখানে প্রথম দুইটি বালক একই কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত হইল। কিছুদিন পরে বুদ্ধিবলে তাহারা একটি নৌকার সন্ধান পাইয়া অতি কষ্টে পলায়ন করিল। তার পর জলে ও স্থলে বহু বিপদের সম্মুখীন হইয়া চারিটি বালকই ভাগ্যগুণে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ভারতের একপ্রান্তে উপস্থিত হইল; সেখান হইতে তাহারা ক্রমে নিজদেশে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইল। ইহাই উপন্যাসখানির আখ্যানবস্তু। ইহার নূতনত্ব এই যে, গল্পের ভিতর দিয়া লেখক আফ্রিকার বনজঙ্গলের অনেক সংবাদ দিয়াছেন, উহা শিশুদিগের নিকট শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক হইবে, সন্দেহ নাই। কয়েক স্থানে আখ্যানভাগ একটু আজগুবি হইলেও তাহা মার্জ্জনীয়, কারণ শিশুপাঠ্য উপন্যাসে আজগুবি বর্ণনা একটা আর্যপ্রয়োগ-বিশেষ। মোটের উপর লেখা সরল ও সহজবোধ্য হইয়াছে এবং শিশুদিগের মনে কৌতূহল জাগাইয়া তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার উপযোগীও হইয়াছে। এইরূপ শিশুপাঠ্য উপন্যাসের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই বেশ সুন্দর।

আপদ—শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে 'আপদ' নামে ত্রি-অঙ্কিকা নাটিকা ও জলাতঙ্ক নামে একটি একাঙ্কিকা নাটিকা স্থান পাইয়াছে। আপদ নাটিকাটি প্রধানতঃ বাটীর একটি চাকরের ব্যবহার ও আচরণকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত। রচনা খুব সাবলীল ও সতেজ বটে, কিন্তু নাটকের গতি বড় মন্দ এবং নাটকীয় অবস্থাপরম্পরার সমাবেশও তেমন সুষ্ঠু হয় নাই। মধ্যে মধ্যে অযথা কথাবার্ত্তার বাহুল্য আছে এবং ইহাতে নাটিকাটি রচনা হিসাবে সুপাঠ্য হইলেও অভিনয়যোগ্য হয় নাই। জলাতঙ্ক প্রহসনটি এক জন ভদ্রলোককে কুকুরে কামড়ানো (আঁচড়ানো?) ব্যাপার লইয়া লিখিত। এই রচনাটি বেশ কৌতুকাবহ এবং ইহাতে হাস্যরসও যথেষ্ট ফুটিয়াছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে coarse humour (মোটা রস) ও একঘেয়ে হাস্যরস দেখা দিয়া রচনার সৌন্দর্য্য স্থানে স্থানে নষ্ট করিয়াছে। এই প্রহসনেও নাটকের গতি বড় মন্দ, সুতরাং অভিনয়ে অশোভন ঠেকিবে বলিয়া বোধ হয়। এই দুইটি নাটিকার এক-একটি অঙ্ককে এক-একটি দৃশ্য করার টেকনিক অবলম্বিত হইয়াছে; পাশ্চাত্য দেশের এই বর্ত্তমান টেকনিক নাট্যাভিনয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং কোন কোন নাট্যকার এখন এই টেকনিক অবলম্বন করিয়া নাটকের অভিনয়-সৌকর্য্য সাধন করিতেছেন। আপদে ছয়টি গান ও জলাতঙ্কে একটি গান

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; উহাদের স্বরলিপিও গ্রন্থের প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। সুর বেশ সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু গানের রচনা শব্দাড়ম্বরে ভারাক্রান্ত ও মধ্যে মধ্যে কবিত্বহীন। পুস্তকে যথেষ্ট ছাপার ভুল আছে, তজ্জন্ত গ্রন্থকারকে একটি বড় শুদ্ধিপত্র দিতে হইয়াছে। গ্রন্থের কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

নবজ্যোতি—শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন। বেঙ্গল পাবলিশিং কোং, ২৬, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। ১৩৩৯।

ত্রয়োদশ সর্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত কাব্য। আখ্যানভাগ মহাভারতের ত্রিশিরার উপাখ্যান হইতে গৃহীত, এবং পরিশিষ্টে এই উপাখ্যান দেওয়া আছে। পৌরাণিক কথাভাগের পিছনে তপস্যা ও ভোগ, অনলস কর্ম্ম ও অলস আরামপ্রিয়তা উভয়ের মধ্যে চিরন্তন সংগ্রামের একটা আভাস পাওয়া যায়। নিবেদন সুলিখিত; অশেষ-দোষে দুষ্ট উপন্যাস ও মেরুদণ্ডহীন গীতিকবিতা অপেক্ষা এরূপ কাব্যের ভাবনা ও রচনা প্রশংসার্হ, সন্দেহ নাই। কবি কাব্যসাধনায় গতানুগতিক পথে চলিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; গুরুবিষয়ের আলোচনায় তাঁহার এই রীতি মোটামুটি ভাল হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আলোচ্য কাব্যে কর্কশ বর্ণবিন্যাস বা যতির অসঙ্গতি যে একবারে নাই তাহা নহে। তাহা হইলেও দুই-চারিটি চরণ মনে করিয়া রাখিবার মত। দ্বিতীয় সর্গের শেষে নারদের আবির্ভাব হেমচন্দ্রের রচনারীতি স্মরণ করাইয়া দেয়। "নবজ্যোতি"-রচয়িতা পূর্ণচন্দ্র সেন ও "মহারাণা প্রতাপ"-রচয়িতা সুরেশচন্দ্র নন্দী আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের রেশ টানিয়া আনিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদভাজন।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

চিত্রে রুশ বিদ্রোহের ইতিহাস—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। পৃ. ৮৮, চিত্রসংখ্যা ৪৯। মূল্য ৸৹ আনা।

বইখানিতে কতকগুলি চিত্রের সাহায্যে রুশিয়ার বিদ্রোহের ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। ছবি ও ছাপা বেশ ভাল; ইহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে আদরের সামগ্রী হইবে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ বা গীতা—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, মূল্য ১৸৹।

আলোচ্য গ্রন্থখানি সরল ভাষায়, সহজবোধ্য করিয়া লেখা হইয়াছে। ইহাতে মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, সরল শব্দার্থ এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্রসমূহের উপদেশ সংবলিত কূটার্থ আছে।

দু-এক স্থানে দু-একটি ত্রুটি আছে, যথা চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকে "ভূতান্যশেষাণি" পদটি, শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী, "ভূতান্যশেষেণ" হইবে যদিও গ্রন্থকার শ্লোকের অন্বয়ে শ্রীধর স্বামীর পাঠ "অশেষেণ" শব্দের শব্দার্থ গ্রহণ করিয়া "অভেদেন" লিখিয়াছেন। নবম অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকের ("মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতি-মাশ্রিতা") অনুবাদ—"সাত্ত্বিকী প্রাপ্ত মহাত্মাগণ", না করিয়া ইহার স্থলে, "মহাত্মাগণ আমার দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া", করিলে শ্লোকের মর্ম্মার্থ বেশ ফুটিয়া উঠিত, কারণ মহাত্মাগণ "দৈবী প্রকৃতিকেই" অর্থাৎ দেবতাগণের প্রকৃতি অর্থাৎ শম, দম, দয়া, শ্রদ্ধাদি গুণ বা স্বভাব আশ্রয় করিয়া, ঈশ্বরকে ভূতগণের আদি কারণ ও অব্যয় জানিয়া ভজনা করেন।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে "বরাহপুরাণোক্ত গীতা-মাহাত্ম্য" সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র বরাহপুরাণটি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িলেও, উক্ত গীতা-মাহাত্ম্যটি তাহাতে পাওয়া যায় না। ইহার পরের সংস্করণে গ্রন্থকার মহাশয় এ বিষয়ে মনোযোগ দিলে সুখী হইব।

প্রতি অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারাংশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রতি অধ্যায়ের মর্ম্ম গ্রহণ করিবার পক্ষে সকলের বিশেষ সুবিধা হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

বাংলা বুককিপিং বা হিসাবনিকাশ—শ্রীতারাগোবিন্দ চৌধুরী প্রণীত। পৃষ্ঠা ৮০, মূল্য ॥৹

হিসাবনিকাশের পদ্ধতি সম্বন্ধে বই। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়, কিন্তু বিষয়টি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। এত সংক্ষেপে যথেষ্ট সুস্পষ্ট হয় নাই; স্পষ্ট করিতে হইলে আরও আলোচনা ও অনেক উদাহরণের প্রয়োজন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা

মৌন ও মুখর—কবিতার বই। মূল্য এক টাকা। শ্রীমমতা মিত্র প্রণীত। প্রকাশক, বিচিত্রা নিকেতন, ২৭।১ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহিলাদের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা যখন আমাদের সমাজে বিস্ময়ের বস্তু ছিল, তখন কোন মহিলা কবিতা লিখিলে তাহা মহিলা-কবির রচনা হিসাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। মনে হয়, বর্ত্তমান যুগে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে সেরূপ পক্ষপাতিত্বের প্রয়োজন নাই। সুতরাং কোন মহিলার লেখা কবিতা বা গল্প সম্বন্ধে অনুকম্পার সহিত কিছু না বলিয়া সাহিত্য-হিসাবে তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্তা মমতা মিত্র নানা সাময়িক পত্রে কবিতা লিখিয়া থাকেন। মৌন ও মুখরের অধিকাংশ কবিতা সেই সব কবিতার সংগ্রহ। নানারূপ বিচিত্র বিষয় কবিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। যথা, অহল্যা, পসারী, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, ভূমিকম্প প্রভৃতি। ইহা ছাড়া নিজের মনের কয়েকটি বিভিন্ন 'মুড'-এরও প্রকাশ আছে। কবির কল্পনা-শক্তি সঙ্কীর্ণ, অনুভূতি তীক্ষ্ণ নহে, আবেগ অগভীর। অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির গভীরতা না থাকিলে তাহার প্রকাশে কাব্যের দিক হইতে ত্রুটি রহিয়া যায়। তবে সুমিষ্ট ছন্দ ও শব্দ-বিন্যাসে কবিতাগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে; কবির মনে সুর আছে, সত্যকার প্রেরণা আসিলেই এ সুর সঙ্গীতে পরিণত হইবে এরূপ ইঙ্গিত কতকগুলি কবিতার ভিতর পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী

শ্রীপারুল দেবী

রামতারণ বাবু থাকেন শ্রীরামপুরে। পেন্সন লইয়াছেন কিছু দিন হইল; তাহার পর হইতে সকালবেলা হুঁকা-হাতে পাশের বাড়ির চাটুয্যেদের বৈঠকখানায় বসিয়া সংবাদপত্রের সমালোচনা, দ্বিপ্রহরে গৃহিণীর হাতের রান্না ডাল, মাছের চচ্চড়ি ও ঘরে-পাতা সামান্য একটু দই সহযোগে একথালা ভাত উদরস্থ করিয়া বেলা চারিটা অবধি একটু নিদ্রা ও বৈকালে গঙ্গাতীরে সান্ধ্যভ্রমণ, এই লইয়া নিরুপদ্রব জীবন কাটিতেছিল ভালই, এমন সময়ে গৃহিণী আবদার ধরিলেন, "আমি বোম্বাই যাব।"

রামতারণ বাবু সেইমাত্র প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণ সারিয়া ঘরে ফিরিয়াছিলেন; চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "বোম্বাই যাবে কি গিন্নি? বোম্বাই কি এখানে?"

গৃহিণী উত্তর দিলেন, "না-হয় না-ই হ'ল নাকের গোড়ায়, তাই ব'লে কি যেতে নেই? দুটি বেলা কেবল ঐ চাটুয্যেদের বাড়ি ধন্না দেওয়া ছাড়া আর যা করতে বলি তাইতেই ত দেখি তোমার চোখ কপালে উঠে যায়। কেন আমার কি একটু কোথাও বেড়াবার সাধ থাকতে নেই? আমি এবার যাবই বোম্বাইয়ে। ঐ দেখ না চিঠি, টুলু লিখেছে কত ক'রে— ঐ যে তাকে রয়েছে, নাও না পেড়ে, শকড়ি-হাত যে আমার। কোন চুলোয় ত যাবার ঠাঁই নেই—চাটুয্যের বৌ এই সেদিন হরিদ্বার কাশী কত জায়গায় বেড়িয়ে এল, তা আমার কপালে কি আর কোনকালে সে সব হবার জো আছে? মায়ের পেটের একটা বোন, দু-দিন যে তার কাছে গিয়ে জুড়োব তাও যদি ভাগ্যে একটিবার হয়ে ওঠে! কেবল এই হেঁসেল-ঘরেই জন্মটা কেটে গেল।"

গৃহিণীর সুদীর্ঘ বক্তৃতায় কর্ত্তা বুঝিলেন গৃহিণী আজ কৃতসঙ্কল্পা হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা। কিন্তু হইল কি? এই ত ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে তিনি বাড়ির বাহির হইয়াছেন, তখন ত বোম্বাই যাইবার কথা দূরে থাক, তাহার চিন্তাও বোধ করি গৃহিণীর মাথায় ছিল না; ইহার মধ্যে কি অঘটন ঘটিল তাহা তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। গৃহিণীর নির্দ্দেশমত চিঠিখানি পাড়িয়া নিকেল-করা ফ্রেমের চশমাজোড়া নাকে লাগাইয়া লণ্ঠনের নিকট ধরিয়া পড়িলেন,—

"শ্রীচরণকমলেষু—

দিদি, আমাদের মা নাই, বাপের বাড়ির আপনজন বলিতে এখন আমরা দুটি বোন শুধু আছি। কখনও যে তোমাদের পায়ের ধূলা আমাদের বাড়িতে পড়িবে এমন ভাগ্য করি নাই। যখনই তোমাকে আসিতে বলি তুমি বল জামাইবাবুর ছুটি নাই। কিন্তু এখন ত জামাইবাবুর পেন্সন হইয়াছে, এখন আর সে ওজর খাটিবে না; অতি অবশ্য অবশ্য করিয়া এবার তোমাদের একবার এখানে আসাই চাই। আজ প্রায় দুই বৎসর হইল আমাদের ইনি এখানে বদলি হইয়া আসিয়াছেন; কবে আবার যে কোথায় পাঠাইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব জামাইবাবুকে আমার মাথার দিব্য দিয়া বলিবে যে পত্রপাঠ যেন রওনা হইবার ব্যবস্থা করেন। বোম্বাই বড়ই চমৎকার শহর, ইহা একটা দেখিবার জিনিষ। তোমরা না আসিলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব। আমার মাথার দিব্য রহিল, আসিতেই হইবে। তোমরা আমাদের প্রণাম জানিবে। ইতি

সেবিকা টুলু।"

চিঠিখানা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া পড়িয়া হাসিমুখে কর্ত্তা বলিলেন, "তোমার বোন কেপ্পন বটে। পোষ্টকার্ডখানার আষ্টেপিষ্টে লিখেছে দেখ না—এক তিল জায়গা কোথাও ছাড়ে নি। এমন কেপ্পনের বাড়ি যে যাব, তা খেতে-দেতে পাওয়া যাবে ত? তুমি ত আবার আমার নানা রকম বদ্ অভ্যেস করিয়ে দিয়েছ—সময়ে স্নানের গরম জলটুকু চাই, ঘরে-পাতা দই না হ'লে খাওয়া হয় না—এ সব কি আর তোমার বোন এই বুড়ো জামাইবাবুকে যোগাবে? আগে হ'লে বা কথা ছিল।"

কর্ত্তার কথা শুনিয়া গৃহিণীর আশা হইল ছোট শ্যালিকার মিনতিতে তবে কর্ত্তার মন ভিজিয়াছে। তিনি বোম্বাই যাইবার জন্য কান্নাকাটি করিয়া যে কুরুক্ষেত্রের ব্যাপার বাধাইবেন মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেটা আপাততঃ বোধ করি মুলতুবী রাখা যাইতে পারে। বলিলেন, "ইস্—একবার গিয়েই দেখ না, তখন যত্নের চোটে আমার বোনের কাছ থেকে আর নড়তেই চাইবে না। তার হাতের মাছের ঝোল যে একবার খেয়েছে সে আর ভুলবে না কথ্‌খনো—এমন রান্না।"

আরও খানকয়েক চিঠিপত্র লেখালেখি ট্রেনভাড়া ইত্যাদি খরচের হিসাব-কষাকষির পর স্ত্রীর ভগিনীর নিমন্ত্রণে ও স্ত্রীর অনুনয়ে শেষ অবধি সত্য সত্যই রামতারণ বাবু একদিন তাঁহার বহু যত্নে রক্ষিত মোটা সোনার চেন-যুক্ত ঘড়িটি পকেটে ঝুলাইয়া সস্ত্রীক বোম্বাই শহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আসিবার মাসখানেক পরেই গৃহিণীর ভগিনীপতি অন্যত্র বদলি হইয়া চলিয়া যাওয়াতে রামতারণ বাবুর আর মুস্কিলের অবধি রহিল না। তাঁহার ইচ্ছা যে, যে-কয়দিন কুটুম্বের গৃহে মাছের ঝোল ভাত বিনা-পয়সায় জোটে সেই কয়দিনই বোম্বাই শহরের শোভা দেখা যুক্তিসঙ্গত। তাহার পর আবার নিজের বাড়িতে ফিরিয়া গিয়া পাঁচ পয়সার বাটা মাছের চচ্চড়ি সহযোগে ভাত খাইয়া জীবনযাপন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু গৃহিণী বোম্বাই শহরের আলোর আধিক্য, মালাবার হিলের বাগানের শোভা ও পুষ্করিণীর ন্যায় সমুদ্র দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে আর সেখান হইতে নড়িবার নাম করেন না। তাহার উপর আবার টুলু যাইবার সময়ে বলিয়া গিয়াছে, "ও দিদি, এখানে সোনার গয়না যা পাওয়া যায় সে আর কি বলব। এমন কাজ আমাদের দেশে মরে গেলেও পাবি নে—আর তেমনি সস্তা। কিছুতে ছাড়িস নে—জামাই বাবু না কিনে দিতে চান ঐ পাশের বাড়ির অমূল্য বাবুর বৌকে বলিস, ওদের নিজেদের স্যাকরার দোকান আছে, তোকে আনিয়ে দেবে যে-রকমটি চাস।...ইস্, ভারী টাকা! করবি কি টাকা নিয়ে? না একটা ছেলে, না একটা পুলে, টাকা কি সঙ্গে যাবে নাকি? এয়োস্ত্রী মানুষ, বলতে নেই শরীরও তোর আমার মত কাঠিটি নয়, সোনার গয়না তোকে দিব্যি মানাবে। জামাইবাবু যেন কি—কেবল টাকা আর টাকা।"

বোম্বাই শহরের এত রকম আকর্ষণ হইতে গৃহিণীকে নড়ান বড় সহজ হইল না, কাজেই পাশের একটা বাড়ির দুইখানা ঘর ভাড়া লইয়া রামতারণ বাবু আপাততঃ সেইখানেই রহিয়া গেলেন। কিন্তু এখন অবধি এক দিনও গৃহিণীর স্যাকরার দোকানে যাওয়াই ঘটিয়া উঠে নাই। বলিলে কর্ত্তা বলেন, "ওসব শহরের অলিগলিতে আজকালকার দিনে যাওয়া ঠিক নয় গো—তোমরা বোঝ না। সরকার থেকে হুকুম হয়েছে যে কোথাও একটু ভীড় দেখেছে কি অমনি পুলিস সায়েবেরা গুলি চালিয়ে দেবে। তোমরা ত ঐ অমূল্য বাবুর পরিবার, মাধব বাবুর গুষ্টি, সবাইকে না নিয়ে একলা যাবে না কোথাও—শেষে কি ঐ দলটি দেখে দেবে পুলিস গুলি চালিয়ে, যাবে কার পেট ফুঁড়ে গুলি বেরিয়ে, গয়না কিনতে যাবার মজাটা টের পাবে তখন।"

গৃহিণী গুলি-গোলার নামে ভয় পান, ভাবেন "কি জানি, হবেও বা। অমূল্য বাবুর বৌ ত সেদিন বললে ওর খুড়তুতো ভাইকে নাকি জেলে ধরে নিয়ে গেছে। যারা ভদ্দরলোকের ছেলেদের খামোকা ধরে নিয়ে জেলে পুরে দেয়, তাদের আর গুলি করাটাই বা আশ্চর্য্য কি? কালে কালে কতই দেখব—চোর নয় ছেঁচড় নয়, শুধু শুধু মানুষকে জেলে পুরছে, গুলি করছে—কই বাবু শ্রীরামপুরে ত আমাদের এমন হ'ত না।"

রামতারণ বাবু মোটা কাপড় বরাবরই পরিয়া থাকেন—স্বদেশী বলিয়া নয়, সস্তা বলিয়া। গৃহিণীর বেলায়ও সেই ব্যবস্থা। তিনি মাঝে মাঝে বলেন, "হ্যাঁ গা, ঐ চাটুয্যে-বাড়ির গিন্নি দেখি সর্ব্বক্ষণই কেমন পাতলা পাতলা শাড়ী প'রে থাকে—তুমি আমায় এমন চটের মত মোটা মোটা কাপড়গুলো কেন এনে দাও বল ত?" কর্ত্তা মনে প্রমাদ গণিয়া মুখে হাসেন। মধুর স্বরে উত্তর দেন, "সবাইকে সব জিনিষ মানায় না, জান গিন্নি? এই আজকালকার হাড়গিলে রোগা রোগা মেয়েরা দেখি হাতে ফিন্‌ফিন্ করছে একগাছি ক'রে চুড়ি প'রে বেড়ায় সব—তোমার হাতে যদি তেমনিধারা একগাছা চুড়ি পরান যায় তাহ'লে কেমন দেখায় বল ত? আরে ছিঃ, যাদের শরীরে কিছু নেই, ডিগ্‌ডিগ্

করছে চেহারা, ওসব সরু পাতলা জিনিষ তারাই প'রে। তোমার হাতে এক হাত ভারী চুড়ির গোছা, গায়ে চওড়া কস্তা-পাড় মোটাসোটা শাড়ী—দিব্যি মানায়। তোমাকে এবার বেশ মকরমুখো দু-গাছা মোটা বালা আমি গড়িয়ে দেব দেখো—আমার ঠাকুমা পরতেন—দিব্যি দেখাতো। মোটা শাড়ী, মোটা গয়না, এইতেই ত আমাদের ঘরের লক্ষ্মীদের শোভা।"

গৃহিণীর মুখে একমুখ হাসি দেখা দিত—"তা যা তোমরা ভাল বোঝ; তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ।"

বেঁটে-সেঁটে ধরণের প্রবীণ ব্যক্তি, মোটাসোটা বেঁটে-খাট ধুতি পরনে, দুই বেলা রাস্তা দিয়া যাওয়া-আসা করিতে করিতে রামতারণ বাবু পাড়ার ছেলেদের চোখে পড়িয়া গেলেন। তাহারা দল বাঁধিয়া আসিয়া ধরিয়া পড়িল, "আমাদের সভায় আপনাকে কিছু বলতে হবে। আমরা আপনাকে আমাদের সভায় সভাপতি করব।" হাতে কাজ নাই; শ্রীরামপুরের বন্ধুদের সঙ্গচ্যুত হইয়া অবধি রামতারণ বাবুর মুখ ত প্রায় বন্ধই হইয়া গিয়াছে। ভায়রা-ভাই থাকিতে সন্ধ্যাবেলাটা তাঁহার সহিত একটু-আধটু কথা-বার্ত্তা হইত বটে, কিন্তু সে ভদ্রলোক সারাটাদিন গাধার খাটুনি খাটিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলা তর্কাতর্কিতে বড়-একটা যোগ দিতে চাহিতেন না—তবু যাও-বা কথাবার্ত্তা কহিবার কিছু উপায় ছিল আজ মাসখানেক হইল তাহাও বন্ধ। একটা কিছু কাজ জুটিলে মন্দ হয় না, সময়টা কাটে ভাল। কিন্তু আবার দিনকাল যাহা পড়িয়াছে, ইহাতে সভাসমিতিতে যোগ দেওয়াও বড় নিরাপদ নহে। কে জানে কাহার মনে কি আছে।

ছেলেরা বলিল, "না, না, আমাদের এ সভা আন্-স-ফুল নয়—অন্ততঃ এখনও ত হয় নি—পরে হতেও পারে। নিয়ম-কানুনের ত মা-বাপ নেই আজকাল দেখতেই পাচ্ছেন। তবে আমরা ভাল কাজ করছি, ক'রে যাব; অত ভয় করতে গেলে ত আর চলে না।"

ছেলেদের কথায় রামতারণবাবুর মনে একটু খটকা লাগিলেও তাহাদের অনুরোধ ঠেলিতে পারিলেন না—সভাপতি হইবেন স্বীকার করিতে হইল। বলেন ভাল, কথার জোর আছে, তাঁহার বক্তৃতায় সতেজ ভঙ্গী দেখিয়া ছেলেরা ত মুগ্ধ। বলাবলি করিতে লাগিল, "প্রথমে ভদ্রলোককে বড় ভীতুগোছের ভেবেছিলাম রে, কিন্তু কথার তেজ দেখেছিস্? দেশের কথা বেশ মন দিয়ে ভেবেছেন ব'লে বোধ হয়।"

মুখের কথা ভাল করিয়া বলিতে টাকা খরচ হয় না এ একটা সুখের কথা—রামতারণ বাবুর বক্তৃতা ভালই হইতে লাগিল।

এমন সময়ে এক দিন সংবাদ আসিল দামোদরের বন্যায় ওদিকটা ভাসিয়া গিয়াছে, দেশে মহামারী উপস্থিত, সহস্র সহস্র ঘরবাড়ি ভাসিয়া গিয়াছে; নিরাশ্রয়দের আশ্রয় প্রয়োজন, ক্ষুধিতদের অন্ন আবশ্যক; তাহাদের জন্য টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে হইবে। মহা উৎসাহে ছেলের দল চাঁদা তুলিবার কার্য্যে লাগিয়া গেল; গৃহস্থদের উৎকণ্ঠার আর সীমা নাই। এই এক দল আসিয়া এক টাকা আদায় করিয়া লইয়া যায়, আবার আধ ঘণ্টা যাইতে-না-যাইতে অপর এক দল আসে, অন্ততঃ আট আনার কমে কিছুতেই ছাড়ে না। অমূল্য বাবুর সহিত মাধববাবুর আপিস যাইবার পথে দেখা হইলে বলেন, "চাঁদার খাতায় খাতায় একেবারে পাগল করলে মশাই। সকালবেলাটা আপিসের তাড়ায় নাইতে খেতে সময় পাওয়া যায় না, আর এই সময়টাতেই ঠিক পাড়ার ছেলেগুলো জ্বালিয়ে মারবে চাঁদা চাঁদা ক'রে। সকালে দেড়টা টাকা ত গেছেই—আবার দেখুন আপিস থেকে গিয়ে হয়ত শুনব মেয়ের দল দুপুরে বাড়ি চড়াও ক'রে গিন্নির কাছে টাকাটা-সিকেটা আদায় ক'রে নিয়ে গেছে। মেয়ে পুরুষে এমন ক'রে জ্বালাতন করলে আর বাঁচি কি ক'রে বলুন দেখি।"

মাধববাবু কোটের পকেট হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "আপনিও যেমন মশাই—এ সময়ে চাবিটাবিগুলো মেয়েদের কাছ থেকে একটু সামলে রাখতে হয়। এই দেখুন, ক্যাশ-বাক্সর চাবিটা গিন্নির কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি; ব'লে এলুম যে, আপিসের একটা বাক্স খোলা যাচ্ছে না, এইটে যদি কাজে লাগে দেখি। ওদের উপর এই সব দান-ধ্যানের ব্যাপার ছেড়ে দিলে আর কি রক্ষে আছে—ফতুর ক'রে ছাড়বে একেবারে। আমার ওরকম হাল্কা বুদ্ধি হ'লে আর এই সত্তর টাকা মাইনেতে কলকাতায় তেতালা বাড়ি তুলতে পারতাম না মশাই। হেঁ হেঁ—৪৫৲ টাকা ভাড়া

মাসে মাসে আসছে সে বাড়ি থেকে। রামধন মিস্ত্রির গলিতে বাড়ি—দেখাব যখন কলকাতায় যাবেন।

ওদিকে রেবতী বাবুর সহিত নিমাই পালের দেখা হইলেও ঐ একই কথা।

ছেলের দল আসিয়া তাহাদের সভাপতিকে ধরিয়া পড়িল, "চাঁদা ওঠে না—কেউ দিতে চায় না। বললে সকলে বলেন 'বাপু দেশে ও সব চিরকালই লেগে আছে, চিরকালই লেগে থাকবে দু-একটা ক'রে টাকা দিয়ে ও-সব ভগবানের মার নিবারণ করা কি মানুষের সাধ্য?' দেশের দুর্দ্দশার কথা বুঝিয়ে বলতে গেলে কানে তোলেন না কেউ; খবরের কাগজ হাতে নিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। সেগুলো দেখাতে গেলে বলেন সময় নেই অত পড়বার। আমরা বুধবার দিন একটা সভা করব ঠিক করেছি, সব বাড়ির মেয়ে-পুরুষদের নিমন্ত্রণ ক'রে আসব, এমন কি আমাদের সমিতির ফাণ্ড থেকে সেদিন উপস্থিত সকলকে চা এবং কিছু মিষ্টি দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে। আপনাকে সেদিন ভাল ক'রে বন্যাপীড়িত লোকদের দুরবস্থার কথা জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলতে হবে, যাতে সেদিন কিছু টাকা ওঠে। একবার মন ভেজাতে পারলে টাকা তুলতে দেরি হয় না, এ আমরা অনেক বার দেখেছি, কিন্তু লোকের মন ভিজোন সহজ নয়, ক্ষমতা চাই। দয়া ক'রে আপনি ভার নিন। এক হপ্তা হ'ল এতগুলো লোক আমরা খাটছি সাঁইত্রিশটি টাকা মাত্র উঠেছে। অন্ততঃ ৫০০৲ না পাঠাতে পারলে আমাদের সভারই লজ্জা একটা।"

রামতারণ বাবু বলিলেন, "বাপু যেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এ মাসে আমার টাকার বড়ই টানাটানি—তার উপর তিন টাকা চার আনা ত তোমাদের মঙ্গল-সভা, দেশ-হিতৈষিণী-সভা, কষ্ট-নিবারণী-সভা, নিস্তার-সমিতি, ভ্রাতৃ-সভা, এই পাঁচ ভূতে মিলে আদায় ক'রে নিয়ে গেছে; এর উপর আবার যে ঐ বন্যা-সভায় সেদিন কিছু দানধ্যান করতে হবে—তার মধ্যে বাপু আমি নেই। চাঁদার খাতা থেকে যদি আমার নামটা কেটে দাও ত আমি যেতে এবং তাছাড়াও যা করতে বলবে করতে রাজী আছি। ভদ্দরলোকের এক কথা।"

ছেলের দল বলিল, "আপনি সভাপতি, আপনার নাম যে প্রথমেই দেওয়া আছে। যে চাঁদা দেয় সে-ই প্রথমে জানতে চায় আপনি কত দেবেন; আপনার নাম কাটলে কি ক'রে চলবে? তবে বেশী কিছু না-হয় এবার আপনাকে দিতে হবে না; কিছু দিন্ যাতে আমাদের সভার মান থাকে।"

মুখের এক প্রকার ভঙ্গী করিয়া রামতারণ বাবু বলিলেন, "আরে রেখে দাও তোমার সভার মান। বন্যাপীড়িতদের দুর্দ্দশা দেখতে গিয়ে এদিকে বোম্বাইয়ের বাঙালীর দলকে যে ডুবোতে বসেছ তোমরা—সেটাও ত একটু দেখতে হয়। ছাপোষা মানুষ সব—নিত্যি নিত্যি অত পাব কোথা থেকে যে দেব? ভাল জ্বালাতন! আচ্ছা, লিখে রেখো আমার নামে একটা টাকা। দেব কিন্তু সেই আসছে মাসে।"

ছেলের দল ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "মোটে একটি টাকা?"

রামতারণ বাবু হাত নাড়িয়া বলিলেন, "তবে বাপু অন্য কাউকে দেখ, আমাকে দিয়ে হবে না। একটা টাকা নেব না, আট আনা পয়সা নেব না—টাকা-পয়সা কি ছেলের হাতের মোয়া নাকি? আরে, লোকটা দেবে কোথা থেকে সেটাও ত ভেবে দেখ।"

অগত্যা বলিতে হইল, "আচ্ছা যা ভাল বোঝেন দেবেন। আপনার নামের অঙ্কটা এখন না-হয় বসাব না, ব্ল্যাঙ্কই রেখে দেব, পরে যা বিবেচনা হয় করবেন। যাবেন কিন্তু বুধবার বেলা তিনটেয়, ভুলবেন না। বাড়ির মেয়েদেরও দয়া ক'রে আসতে ব'লবেন। আপনি একটু সকাল-সকালই যাবেন—সভা-ঘরটা একটু গোছগাছ করতে হবে—দেখবেন শুনবেন। আপনার উপরেই ভরসা আমাদের।"

ছেলের দল চলিয়া গেলে বাড়ির ভিতর যাইতে যাইতে রামতারণ বাবু মনে মনে বলিলেন, "হ্যাঁ, আবার মেয়েদের দয়া ক'রে যেতে বলবেন। তাহলেই হয়েছে। তার মানে আপনিও একটা টাকা দিন, ওদিকে গিন্নিটির কাছ থেকেও কিছু আসুক—এই আর কি। সেটি হচ্ছে না। আর মেয়েমানুষরা আবার সভাসমিতিতে যাবেই বা কি? বেটাছেলেরাই ত সভাসমিতি করে এই জানতাম চিরকাল। দিনে দিনে আব্রু-টাব্রু আর মেয়েদের কিছু রইল না। আরে ছিঃ!"

বুধবার দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর গৃহিণী বস্ত্রাঞ্চল মেজেতে বিছাইয়া একটু গড়াইতেছেন এমন সময়ে পাশের বাড়ির অমূল্য বাবুর স্ত্রী আসিয়া বলিলেন, "ওমা একি দিদি, এখনও

শুয়ে যে? যাবেন না?" গৃহিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে তাড়াতাড়ি শারীরিক কোনও কাজ করা বড়ই কষ্টসাধ্য, তাই আবার ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "এস এস। ক'দিনই ভাবছিলাম যে আস না কেন? আমার ভাই বোম্বাইয়ের জলহাওয়াটা কেমন যেন সহ্য হচ্ছে না, প্রায়ই গা টিস্ টিস্ করে, মাথাটা ধরে; দুপুরটা দুটো ভাত মুখে দিয়ে একটু না শুয়ে পড়লে শরীর যেন আর বয় না। তাই যাব-যাব মনে ক'রেও ক'দিন আর আমিও যেতে পারি নি। তা এস ব'স।...ওমা, ওমা, মাটিতে কেন? ঐ যে আসন রয়েছে। এই যে আমিই উঠে দিচ্ছি।"

গৃহিণীকে পুনর্ব্বার উঠিয়া বসিবার ভঙ্গী করিতে উদ্যোগী দেখিয়া অমূল্য বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "না, না, কেন কষ্ট করছেন? বসলামই বা মাটিতে—আমি ত ঘরের লোক। আচ্ছা, আচ্ছা, নিচ্ছি আসনখানা—আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

গৃহিণী বিশাল পেটে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "শরীরটা খাবাপ হয়ে কাহিল হয়ে প'ড়ে অবধি ভাই ঝট্‌পট্ যে কোন কাজ করব সে ক্ষমতা আর নেই। দেখ না উঠে নড়তেই যেন দিন যায়।"

অমূল্য বাবুর স্ত্রী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত দেখছি। তা'হলে দিদি কি আজ আমাদের পাড়ার সভায় যাবেন না?

গৃহিণী সভাসমিতির ধার ধারিতেন না; বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "সভা কিসের গো?"

অমূল্য বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "ওমা, সে কি কথা? আপনাদেরই ত সভা, আপনি জানেন না কি রকম? রামতারণ বাবু আজ বক্তৃতা দেবেন, প্রায় দু-শ বাঙালী মেয়ে-পুরুষ সভায় যাবে আজ; চিক টাঙিয়ে দিব্যি আড়াল ক'রে মেয়েদের বসবার জায়গা করা হয়েছে; ফুলপাতা দিয়ে সভাঘর সাজান হয়েছে শুনছি, আবার যে যাবে তাকে নাকি চা-মিষ্টিও দেওয়া হবে। আজ যে খুব হৈ চৈ হচ্ছে পাড়ায়—এই দেখলাম টুনু, লীলা, প্রতিভা, বীণা একগাড়ী মেয়ে গেল সবাই। আমি ভাবলুম দিদি ত যাবেনই, কেন আর দু-জনে আলাদা ক'রে মিছে গাড়ীভাড়া দেব—একসঙ্গেই যাই। তাই এলুম।"

গৃহিণী এত ক্ষণে উঠিয়া বসিলেন। আগ্রহের স্বরে বলিলেন, "ওমা, আমাদের ইনি বক্তিমে করবেন, কই সে কথা ত কিছু শুনি নি। ভাগ্যে তুমি এসে বললে ভাই খবরটা। তা তোমরা সবাই যখন যাচ্ছ, তখন আমি যাব বইকি। তুমি একটু ব'স—আমি কাপড়খানা ছেড়ে নি।... ওমা, কি হবে, আমায় একবার বলা নেই, কওয়া নেই, পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের কাছে অবধি লেকচার ঝেড়ে বেড়ান হচ্ছে। তা হ্যাঁ ভাই, বাংলায় বলবে ত, না ইংরিজী-মিংরিজী? তা হ'লে ত আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমার যাওয়াই মিথ্যে।"

বাংলায় লেকচার হইবে শুনিয়া আগ্রহে গৃহিণীর হাত-পা জোরে জোরে চলিতে লাগিল। বাক্স খুলিয়া বহুকালের পুরাতন একখানি বেনারসী বাহির করিলেন। সভাসমিতিতে যাওয়া—তাহার উপর আবার তাঁহারই স্বামী সেখানে বক্তা—উপযুক্ত কাপড়চোপড় পরিয়া না গেলে মানাইবে কেন? কিন্তু অমূল্য বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "ও দিদি, এখন বেনারসী বার করছেন কেন? এ রকম সভায় সাদামাটা শাড়ী প'রে যাওয়াই ভাল। এ যে বন্যের জন্তে চাঁদা তোলবার সভা—এখানে ভাল কাপড়চোপড় প'রে গেলে লোকে হাসবে যে।"

গৃহিণী বেনারসীখানি পরিবার সুযোগ বড়-একটা পান না। কালেভদ্রে বিবাহবাড়িতে বরণাদির সময়ে এক-আধ বার যা পরিবার সুযোগ হয়—কথাটা তাই তেমন পছন্দ হইল না। ভাবিলেন, "কেন হাসবে? হাসলেই হ'ল! ইস্। ভাল কাপড়চোপড় সভাসমিতি লোকসমাজে প'রে না ত মানুষ আবার কোথায় প'রে? পাঁচ জনে জুটবে, একটা সাদা শাড়ী পরে ট্যাং ট্যাং করতে করতে পাঁচ জনের সুমুখে যাওয়া, মাগো ছিঃ! বেশ মানাত ওখানা পরলে। কিন্তু অমূল্য বাবুর স্ত্রীর পরণের কাপড়খানির দিকে চাহিয়া বেনারসীখানা পরিতে লজ্জাও করিতে লাগিল; কাজেই ক্ষুন্নমনে বেনারসীখানা পুনরায় স্বস্থানে রাখিয়া একখানা ফরসা কস্তাপাড় সাদা শাড়ী পরিয়াই তাঁহার সাজসজ্জার সাধটা মিটাইতে হইল। শাড়ীর আঁচলে গোটা-দুয়েক সাজা-পান বাঁধিয়া দুইটা পান মুখে ফেলিয়া গৃহিণী বলিলেন, "চল ভাই। অনেক ক্ষণ তোমাকে বসিয়ে রাখলাম, আহা কত কষ্ট হ'ল।"

"কষ্ট আর কি" বলিয়া অমূল্য বাবুর স্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দিদি একটা ছোট ঘড়ি কি আছে বাড়িতে?

আমার কোলের ছেলেটাকে বাড়িতে রেখে এসেছি; এই ত সবে অসুখ থেকে উঠেছে কিনা। সাড়ে চারটেয় তার ওষুধ খাবার সময়, সে সময়ে আমাকে ফিরতেই হবে। ভীড়ের মধ্যে আবার কাকে সময় জিগ্‌গেস করব, নিজেদের কাছে একটা ঘড়ি থাকলে সুবিধা হ'ত। আমি আনতে ভুলে গিয়েছি।

গৃহিণী অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছা হাতে লইয়া বলিলেন, "আছে বইকি, এই যে দিই।...দেখেছ পোড়া আলমারীর চাবিটাই ঠিক খুঁজে পাচ্ছি নে। যেমন দশ গণ্ডা চাবি জুটেছে, এর মধ্যে একটা কিছু খুঁজে বার করাই দায়। তাড়াতাড়ির কাজ বাড়াবাড়ি কি না। আলমারীর চাবি খুঁজিয়া আলমারী খুলিবার পর আবার গহনার বাক্সের চাবি খুঁজিতেও মিনিট কয়েক গেল; তাহার পর ভেলভেটের বাক্স, লাল চামড়ার বাক্স, কাল চামড়ার বাক্স, নানা আকার-প্রকারের বিভিন্ন বাক্স খুলিয়া খুলিয়া ঘড়ি খুঁজিয়া বাহির করিতেও বড় কম সময় গেল না। অবশেষে মোটা সোনার চেন লাগান ঘড়িটি বাহির করিয়া গৃহিণী অমূল্য বাবুর স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন, "কায়েমী জিনিষটি ভাই। আমাদের এঁর বের সময়ে আমার বাপের বাড়ি থেকে যৌতুক দেওয়া হয়েছিল। কত বছর হয়ে গেল, কিন্তু এখনও ঠিক যেন নতুন জিনিষটি। হ্যাঁ, দম দিয়ে চালিয়ে নাও না। ঐ ওঘরে একটা বড় ঘড়ি আছে, মিলিয়ে নাও গে সময়টা। রোগা ছেলে ফেলে যাচ্ছ, সময়-মত ফিরতে হবে বইকি। চল আমি এই বাক্সটা বন্ধ ক'রে এলাম ব'লে। তাই কি ছাই শরীরের জুৎ আছে যে চটপট ক'রে সেরে নেব?"

চাকর গাড়ী ডাকিয়া আনিল। দুই জনে যখন সভায় গিয়া চিকের আড়ালে বসিলেন, তখন বক্তৃতা অনেক ক্ষণ সুরু হইয়া গিয়াছে। গৃহিণীর আয়তন দর্শনে মেয়েদের মধ্যে কানাকানি পড়িয়া গেল—হ্যাঁরে কে উনি? শরীর কাহিল ব'লে বোম্বাইয়ের সমুদ্দুরের ধারে চেঞ্জে এসেছেন নাকি? তার পর যখন জানা গেল যে ইনিই রামতারণ বাবুর স্ত্রী, তখন মনে একটু সম্ভ্রমের উদয় হইল। হ্যাঁ চেহারা বটে। অমন বলিয়ে-কইয়ে স্বামী, এমন জাঁদরেল স্ত্রী না হইলে মানাইবে কেন!

বক্তৃতা হইতেছে, "ঘর নাই বাড়ি নাই, মাথার উপর আশ্রয় বলিতে কিছুই নাই, স্বামীহারা বিধবা, পুত্রহারা জননীর আর্ত্তনাদে আমাদের সোনার বাংলা শ্মশান হইয়া গিয়াছে। এক দিন তাহাদের সকলই ছিল, কিন্তু করাল কাল আজি তাহার এতটুকু অবধি অবশিষ্ট রাখিয়া যায় নাই, ধুইয়া মুছিয়া তাহার শেষ আশ্রয়টুকু অবধি লইয়া গিয়াছে। সম্মুখে চাহিয়া অভাব অনশন ও মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি ছাড়া হতভাগ্য তাহাদের চোখে আর কিছুই পড়ে না। এক টুকরা খাদ্যদ্রব্য পাইয়া শিশু তাহা অধীর আগ্রহে মুখে পুরিতে যাইতেছে, ক্ষুধার তাড়নায় জননী শিশুর হাতের সেই খাবার কাড়িয়া লইল, এ ভীষণ দৃশ্যও সেখানে আজ বিরল নহে। মা জননীরা, আপনারা সকলেই সন্তানের জননী, আপনাদের নিকট করজোড়ে (রামতারণবাবু চিকের দিকে ফিরিয়া সত্য সত্যই হাতজোড় করিলেন এবং অন্তরালে গৃহিণী জিব কাটিলেন) ভিক্ষা জানাইতেছি, একবার আপনারা ভাবিয়া দেখুন শত শত শিশুসন্তানের ক্ষুধার যন্ত্রণা আপনাদের কোমল মাতৃহৃদয় বিচলিত করে কি না। আপনার সন্তান দূরের কথা—পরের শিশুসন্তান ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছে দেখিলে আমাদের পরদুঃখকাতরা বঙ্গ-গৃহলক্ষ্মীদিগের মুখে অন্ন ওঠে না, ইহা আমি বহুবার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। একটি নহে, দুইটি নহে, শত শত শিশু বালক-বালিকার ক্রন্দনে বাংলার আকাশ আজ ফাটিয়া গেল। সে ক্রন্দনধ্বনি এই এক সহস্র মাইল দূরে আসিয়া আমাদের জননীদিগের কানে পৌঁছিয়াছে, তাহা বুঝিতেছি, তাহা না হইলে আজ আমাদের এই ক্ষুদ্র সভা মা-জননীদের পদধূলিস্পর্শে ধন্য হইত না। বাংলা দেশের অগণিত নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতার অভাবনীয় দুর্দ্দশার সংবাদে সকলেই আজ অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন—নিজের নিজের সাধ্যমত সাহায্য করিয়া যিনি বিশ্বমাতা, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন। আপনাদের দ্বারে আজ ক্ষুধায় ক্লিষ্ট, অভাবে জর্জ্জরিত সন্তানগণ উপস্থিত, ভিক্ষা দিন জননীগণ,—তাহাদের উল্লসিত হৃদয়ের মঙ্গলকামনায় আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক।"

থালা হাতে লইয়া একটি ছোট ছেলে চিকের মধ্যে চলিয়া গেল। ঝনঝন করিয়া কাহারও অঞ্চল হইতে চার টাকা, কাহারও দুই টাকা, কাহারও এক টাকা, থালার উপর পড়িতে লাগিল। গৃহিণী স্বামীর জোড়হাত দেখিয়া ও

কাতরোক্তি শুনিয়া বিশেষ কিছু না বুঝিয়াই ফোঁপাইতে-ছিলেন; এত ক্ষণে চোখ মুছিয়া অমূল্য বাবুর স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাগা, তা এমন ব্যাপার তা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হয় আগে—আমি ত টাকা-পয়সা কিছুই সঙ্গে করে আনি নি। এদিকে কিছু না দিলেও ত ভাল দেখায় না—সবাই ত টাকাটা-সিকেটা ফেলছে দেখছি।"

অনেকে বলিলেন, "ওমা, আপনারই ত দেবার কথা, আপনিই ত বেশীটা দেবেন। তা সঙ্গে তেমন কিছু না এনে থাকেন ত না-হয় পরে পাঠিয়ে দেবেন।"

অমূল্য বাবুর স্ত্রী ব্যাপার জানিতেন। কিছু পাঠাইয়া দেওয়া গৃহিণীর পক্ষে সহজ নয় বুঝিয়া তিনি বলিলেন, "টাকা না-ই বা থাকল দিদি, নগদ টাকা কি আর সবাই দেয়? গয়না-গাঁটি কাপড়-চোপড় কত জিনিষ কত লোকে এসব কাজে দেয়। আপনি আপনার হাতের বালাজোড়া খুলে দিন না, আপনার উপযুক্ত দেওয়াই হবে।"

গৃহিণীর চোখের জল মুহূর্তে শুকাইয়া উঠিল। বাঘমুখো বালা, যোল ভরি সোনা আছে ইহাতে—ইহারা সব বলে কি! কি যে বলিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এদিক-ওদিক চার দিক হইতে মেয়েরা বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বেশ হবে। আমরা এক আধ টাকা যে যেমন পারি দিলাম, আপনার কি আর তা দেওয়াটা ভাল দেখায়? বেশ হবে, বালাজোড়া বিক্রী ক'রে দামটা আপনার নামে রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ওর দাম ত বড় কম হবে না—কত পরিবার খেতে পেয়ে বেঁচে যাবে। আহা যেমন সোয়ামী তেমনি পরিবার। পরের দুঃখে প্রাণ কাঁদে বটে সবারই—কিন্তু এত আর কে করে বল না?"

গৃহিণী দেখিলেন থালা হাতে ছেলেটি দাঁড়াইয়া আছে। মেয়ের দল তাঁহার বালাজোড়া সেই থালায় ফেলিবার জন্য এতই আগ্রহান্বিতা যে তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া নিজেরাই বুঝি বা খুলিয়া লয়। থতমত খাইয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, "তা হ্যাঁ ভাই ওই মোটা চেনওয়ালা সোনার ঘড়িটা দিলে হয় না? এ বালাজোড়া ছিল আমার শাশুড়ীর। আহা, মরা মানুষ—তাঁর শেষ দেওয়া জিনিষটে দিয়ে দেব? কেন, ও ঘড়িটার দাম ত কিছু কম হবে না।"

পার্শ্ববর্তী মেয়েরা কেহ বলিলেন, "তা বেশ ত, ঘড়িটা সোনার, দিব্যি মোটা চেনও আছে, ওরও দাম উঠবে কিছু কম নয়—" কেহ বলিলেন, "মরা শাশুড়ীর বালা এই রকম কাজে দান করতে পারলেই ত সার্থক হ'ত দিদি। তা দিন, যা আপনি ইচ্ছাসুখে দেবেন তাই ভাল। এ ত আর জোরজবরদস্তির কাজ নয়।"

গৃহিণী চারদিক চাহিয়া দেখিলেন ব্যাপার বড় সুবিধার নয়—এরা বড় রকম কিছু একটা আদায় না করিয়া ছাড়িবে না। ভাল জায়গায় আজ বেড়াইতে আসিয়া-ছিলেন—বেড়াইতে গেলে সকলে মিলিয়া চুড়িবালা ছিনাইয়া লইতে চায় এমন কথা ত তিনি বাপের জন্মেও শোনেন নাই। ভাগ্যে বেনারসীখানা পরিয়া আসেন নাই—ইহাদের যা গতিক, হয়ত বা সেখানা খুলিয়া লইবার জন্যই টানাটানি বাধাইয়া দিত। কষ্টে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "ঘড়িটা সায়েব-বাড়ি থেকে কেনা, দাম ঢের গা ওর—ওরকম জিনিষটি আর বাজারে আজকাল পাওয়াই যাবে না। কর্ত্তার বড় আদরের জিনিষ ওটি—তা আর কি করব বল, ঐটেই দিলাম। তাঁর যেরকম প্রাণ কেঁদেছে দেখলাম আজ, তাতে সেই ছেলেপুলেগুলোর জন্যে কিছু না দিলেও ত আর মনে স্বস্তি পাবেন না—এমন মানুষই নন ভাই। দিয়ে দিয়েই ফতুর! পরের কষ্ট যেন আমাদের এঁর একেবারে নিজের কষ্ট ব'লে মনে হয়। বরাবরই এই—একি আর আজ নতুন? কত লোকে কত কিই যে এসে এসে চেয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার কি কিছু হিসেব আছে?... এই নাও বাছা—ও খোকা, কোথায় গেলে গো? এই ধর ঘড়ি, দামী জিনিষ, ফেলো না যেন। পারবে ত নিয়ে যেতে? হ্যাঁ সাবধানে যেও।"

গৃহিণী গুরুগম্ভীর পাদক্ষেপে অমূল্য বাবুর স্ত্রীর সহিত গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন, হাতের বালাজোড়া যে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছেন ইহা মনে করিয়া তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ঘড়ি গিয়াছে, যাক্। যদিও জিনিষটা অনেক দিনের, দামও কম নহে, কিন্তু তবু বালাজোড়ার তুলনায় এ ক্ষতি অনায়াসেই সহ্য করা যায়।

হাজার হউক, জিনিষটা ত আর তাঁহার নিজের নয়—কর্ত্তার। যেমন গিয়াছেন সভার মাঝখানে বক্তৃতা দিতে! কোথাকার কে ঠিকমত খাইতে পাইতেছে না, তা লইয়া এত মাথাব্যথা, এত সভাসমিতি, এত গলাবাজি করিতে যাওয়াই বা কেন? ঠিকই হইয়াছে—যাঁহার মাথাব্যথা, তাঁহার জিনিষই দেওয়া হইয়াছে, কর্ত্তার ত ইহাতে সন্তুষ্টই হইবার কথা।

বাড়ি আসিয়া গৃহিণী ধোপদস্ত কাপড়খানা ছাড়িয়া সকালের পরিহিত অর্দ্ধ-মলিন শাড়ীখানা পরিতেছেন এমন সময়ে হাসিমুখে কর্ত্তা বাড়ি ফিরিলেন। বলিলেন, "আজ একেবারে যা ধন্য ধন্য করলে আমায় সব—জান গিন্নি? সভার ছেলেরা ত পায়ের ধূলো নিয়ে বললে আপনার দয়াতেই আজ এতগুলো টাকা উঠল। এমন বলা—" বলিতে বলিতে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে গৃহিণীকে এ সকল সভা-সমিতির কথা কিছুই বলা হয় নাই। থামিয়া আবার বলিলেন, "ঐ যে বাংলা দেশে বন্যে হয়েছে না? সেই কথা গো। তারা সেখানে খেতে পাচ্ছে না, দেশে বড় কষ্ট হয়েছে, দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তাই এখান থেকে চাঁদা ক'রে টাকা তুলে পাঠান হচ্ছে। সেই চাঁদা তোলবার সভাতে আমাকে ধরেছিল বক্তৃতা করতে—তাইতেই গিয়েছিলুম। তা উঠেছে অনেক টাকা। ওরা বলছিল মেয়েরা নাকি সব গয়নাগাঁটি অবধি গা থেকে খুলে খুলে দিয়েছে। বলবার কায়দা থাকা চাই—বুঝলে কিনা? এমন ক'রে গুছিয়ে দেশের দুঃখকষ্টের কথাগুলো বললুম যে মেয়েরা ত শুনছিলুম চিকের আড়ালে কেঁদেই অস্থির।"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাগা, তা তুমি কি দিলে?"

কর্ত্তা চাদরখানা আল্‌নায় খুলিয়া রাখিতে রাখিতে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তুমিও যেমন! ঐ সভাপতি হয়ে ব'লে-কয়ে যে অতগুলো টাকা যোগাড় করে দিলুম ঐ ঢের। লোক ভাড়া ক'রে বক্তৃতা দেওয়াতে আন্‌ত যদি ত তাকে টাকা দিতে হ'ত না? বিনা-পয়সায় এত ক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে মরলাম, তার দাম নেই? আমি আবার দেব কি?"

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা তা কি ভাল দেখায়? তুমি ত এমন ক'রে বক্তিমে করছিলে যে শুনে মনে হ'ল তুমি বুঝি ঐ সভার মাঝখানেই বা কেঁদে ভাসাও। ওরা সব বললে যে, তুমি যখন এ টাকা তোলবার ভার ঘাড়ে নিয়েছ, তখন তুমিই নাকি সব চেয়ে বেশী টাকা দেবে। তাই আমি তোমার সোনার ঘড়িটা দিয়ে এলুম। তা বাপু নগদ টাকা বার করার চেয়ে আমি ত বলি এই ভাল হ'ল। আমার নতুন মকরমুখো বালাজোড়া আবার হয়ে আসবে ঐ অমূল্য বাবুর দোকান থেকে—তার দামটা আবার নগদেই দিতে হবে ত।"

রামতারণ বাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "তুমি দিয়ে এলে? আমার সোনার ঘড়ি? তুমি কোথা থেকে জানলে? গিয়েছিলে নাকি?"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ। অমূল্য বাবুর বৌ এসে বললে যে দিদি তোমার সোয়ামী বক্তিমা করবেন, তুমিই যাবে না কি রকম? ব'লে ধরে নিয়ে গেল। তা আমি ত আর অতশত জানি নে। এদিকে পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের কানে লেকচার ঝেড়ে তাদের কাছে হাতজোড় ক'রে ক'রে বেড়ান হচ্ছে তা ত চোখেই দেখে এলুম এই-মাত্তর, তা আমার কাছে বুঝি মুখ খোলে না? আমি ত এসব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানতুম না। যাহোক্ আজ গিয়ে তবু শুনে এলুম—বেশ কথকতা করতে পার বাপু তুমি। ওমা, কেঁদে মরি সেখানে তোমার কথা শুনে। তোমার যে মনে মনে এত কষ্ট বন্যের কথা শুনে, তা কে জান্‌ত। দিয়ে এলুম তাই তোমার ঘড়িটা—ভাবলুম যাক্, ভাল কাজে গেল জিনিষটা, খুশী হবে তুমি।"

কর্ত্তা এত ক্ষণে ব্যাপার বুঝিলেন। মনে যাহা হইল, বোধ করি ভগবানই তাহা বুঝিয়া থাকিবেন। মাথায় হাত দিয়া ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "একটা টাকা চাঁদা দেবার জন্যে ধরাধরি করছিল, তাও কত কষ্টে ফাঁকি দিয়ে এলাম, আর তুমি শেষটা গিন্নি ঘরের লোক হয়ে আমায় এমন ক'রে ডোবালে?"

গৃহিণী উত্তর দিলেন, "কেন গা? এই ত ওখানে দাঁড়িয়ে বলছিলে জোর গলায় যে, যার যা আছে সব দিয়ে দিক্—এ পৃথিবীতে ঐ দানই হ'ল গিয়ে আসল বস্তু, আবার এখন অমন কর কেন? তোমার যে মুখে এক, মনে এক, তা কি ক'রে আমি জানব বল? ভাবলুম, সত্যিই বুঝি

তোমার বড় প্রাণটা কেঁদেছে, আহা দিয়েই দিই জিনিষটা। তোমারই মনের তৃপ্তির জন্যে আমার দেওয়া—না হ'লে আমার কি বল না? ও সব বন্যেকন্যে মুক্ষ্যুসুক্ষ্যু মেয়েমানুষ আমি, বুঝিও নে অত।"

কর্ত্তা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, "প্রাণ কেঁদেছে! বলি কবে কার জন্যে আমার এত প্রাণ কাঁদতে দেখেছ শুনি, যে বলা নেই কওয়া নেই আমাকে একবার শুধোতে নেই, আমার অমন ঘড়িটা দানছত্তর ক'রে দিলে? আমার ঘড়িটা ট্যাঁকে পুরে নিয়েই বা গিয়েছিলে কেন শুনি? এ সব আমাকে ঠকাবার ফন্দী—ঐ সভার ছোঁড়ারাই নিশ্চয় তোমাকে কানে মন্তর দিয়েছে। পাঁচ ভূতে মিলে আমাকে একেবারে খেয়ে ফেল তোমরা, তাহলেই আমার হাড় জুড়োয়। হ্যাঁ—আবার মকরমুখো বালা—আমার কাছে সব টাকার গাছ দেখেছ, না? বোম্বাই এনে আমাকে একেবারে নাজেহাল করলে গা। ঝকমারি হয়েছিল আমার তোমাদের দুই ভগ্নীর ফাঁদে পা দেওয়া—মেয়েমানুষের বুদ্ধিতে সায় দিয়ে যখনই বোম্বাই আসা ঠিক করেছি, তখনই জানি যে এই রকম কিছু একটা ঘটবে।"

জন্মস্বত্ব

শ্রীসীতা দেবী

(১৭)

মমতা দেবেশকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিলেও, দেবেশ তাহাকে একেবারেই যে ভোলে নাই, তাহার পরিচয় কয়দিন পরে আবার পাওয়া গেল। গোপেশবাবু সুরেশ্বরকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে তাঁহার ছেলে দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, শীঘ্রই তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে। মমতাকে ত তাহার খুবই পছন্দ হইয়াছে। আগের কালের কথা হইলে অতঃপর দই-সন্দেশের বায়না দিতে কোন বাধা থাকিত না। তবে এ-সব হইল আধুনিক যুগের ব্যাপার, বর এবং কনে দু-জনেই আধুনিক, সুতরাং তাহাদের মতামত খানিকটা না লইলে চলে না। তিনি ছেলের মত জানিয়াছেন, বিবাহে তাহার সম্পূর্ণ মত আছে। সুরেশ্বর কন্যার মত জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, তাহার পর একটা পাকাপাকি আশীর্ব্বাদ হইয়া যাক্। বিবাহ ত দেবেশ বিলাত ঘুরিয়া না আসিলে হইবে না, সুতরাং সম্প্রতি আর কিছু করিবার নাই। তিনি যদিও আধুনিক সমাজের নিয়মকানুন বিশেষ জানেন না, তবু তাঁহার মনে হয় দেবেশ এবং মমতাকে খানিকটা এখন মেলামেশা করিবার সুবিধা দেওয়া উচিত।

সুরেশ্বর চিঠি পড়িয়া, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু দেখিতে পাইলেন না। এ-সব ত জানা কথাই। দেবেশ বিলাত গিয়া আই-সি-এস্ হইয়া আসিবে, তিনি দশ-পনর হাজার টাকা তাহাকে দিবেন এবং সে মমতাকে বিবাহ করিবে, ইহা পূর্ব্ব হইতে স্থির হইয়া আছে। নিয়মমত তাহারা আসিয়া কন্যা দেখিয়াছে এবং পিতাপুত্র উভয়েই পছন্দ করিয়াছে। না করিবেই বা কেন? তাঁহার মেয়ের মত সুন্দরী, সুশিক্ষিতা মেয়ে ত অলিতে-গলিতে গড়াগড়ি যাইতেছে না? আর মমতা যদি সুন্দরী বা সুশিক্ষিতা নাও হইত, তাহা হইলেও কেবলমাত্র তাঁহার কন্যা বলিয়াই স্বচ্ছন্দে তাহার বিবাহ হইয়া যাইত। অবশ্য দেবেশের সঙ্গে না হইতে পারিত, কারণ সে যুবক, এবং যৌবনে পুরুষের চোখে সুন্দরী নারী অপেক্ষা কাম্য আর কিছুই থাকে না। ইহা সুরেশ্বর নিজে ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, এবং এই জাতীয়, নিজে পছন্দ করিয়া, বিবাহের উপর তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি সম্পূর্ণরূপে চটিয়া গিয়াছে। বিবাহ করিয়া তাঁহার না হইল সুখ, না হইল শান্তি। নামেই তাঁহাদের সংসার, নামেই তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী। ছেলে মেয়ে দুইটা না থাকিলে,

এত দিনে দুই জনে দুই পথে চলিয়া যাইতেন। সুতরাং তিনি এবং গোপেশবাবু কথাবার্ত্তা কহিয়া, বিবাহটা দিয়া ফেলিতে পারিলে, সুরেশ্বর সব দিক দিয়া খুশী হইতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা হইবার উপায় নাই, পাত্র নিজেই বিরোধী। সে নব্য যুবক, নব্য মতেই কোর্টশিপ্ করিয়া বিবাহ করিতে চায়। পাত্রীও নব্যা তরুণী, অন্ততঃ বয়সে। বিবাহ সম্বন্ধে তাহার কোন সুস্পষ্ট মতামত আছে কিনা তাহা সুরেশ্বর জানেন না। কিন্তু মমতার কথা ত পরে, এই বিবাহ, আধুনিক বা সনাতন, কোন ভাবেই হওয়ার পথে যে মস্ত একটি বাধা রহিয়াছে তাহা সুরেশ্বর ভুলিতে পারেন না। সে বাধাটি তাঁহার পত্নী যামিনী। দেবেশকে তাঁহার পছন্দ হয় নাই, তাহা সুরেশ্বর উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন, যদিও অপছন্দের কারণ যে কি তাহা তিনি আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই। যামিনীর কথা মনে হইবামাত্র তাঁহার মুখ ভ্রুকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল।

সকালবেলা হইতেই মেঘলা করিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, মধ্যে মধ্যে আবার একটুখানি ফরশা হইবারও লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এমন দিনে নিজের মনের ভিতর আনন্দের খোরাক যাহার কিছু সঞ্চিত নাই, তাহার মন ভার হইয়া থাকা বিচিত্র নয়। সুরেশ্বর ত রীতিমত বিরক্ত হইয়াই বসিয়া আছেন। এই চিঠি লইয়া যামিনীর সঙ্গে আর এক পালা ঝগড়া-বিবাদ করিতে হইবে, তাহা জানা কথা। তাঁহার তূণীরে যত চোখা চোখা বাক্যবাণ আছে সবই তিনি প্রয়োগ করিবেন, কারণ স্ত্রী সম্বন্ধে দয়ামায়া বা ভদ্রতা-জ্ঞান কোনটাই তাঁহার নাই। কিন্তু এত করিয়াও কোন বার ত নিজের জেদ তিনি রাখিতে পারেন না। যামিনী চেঁচানও না, গালও দেন না, তবু তাঁহার কথাই থাকে, সুরেশ্বরকে পিছন হটিতে হয়। ইহার কারণ, তিনি ছেলেমেয়েকে ভয় করেন, না হইলে যামিনী সামান্য নারী মাত্র, তাহাকে দমাইয়া দিতে আর কি লাগে? তাঁহাদের বংশে স্ত্রী কি করিয়া জব্দ করিতে হয়, তাহা সকলেই জানে, তিনিই কি আর জানেন না? কিন্তু মেয়েকে মা যে হাতের মুঠিতে রাখিয়াছে? মমতা যে জলভরা চোখে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিবে, তাঁহাকে নররূপী পশু মনে করিবে, ইহা সুরেশ্বর সহ্য করিতে পারিবেন না। এই মেয়েটিকে তিনি ভালবাসেন বেশী, না ভয় করেন বেশী, তাহা নিজেও সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ইহারই নীরব ভর্ৎসনার ভয়ে তাঁহাকে পদে পদে স্ত্রীর কাছে হার মানিতে হয়।

তাঁহার সকালের চা খাওয়া অনেক ক্ষণ হইল চুকিয়া গিয়াছে, বিছানার পাশে, ছোট টেবিলের উপর এখনও পেয়ালা, পিরিচ, প্লেট সব ছড়ান। চিঠিখানা পড়িয়া, নানা ভাবনা-চিন্তায় ডুবিয়া ছিলেন, তাই চাকরকে ডাকিবার কথা মনে হয় নাই। তাঁহার বিছানার পাশে সর্ব্বদাই ছোট একটি ঘণ্টা থাকে, তাহা বাজাইলে তবে চাকরবাকর ঘরে আসে। বিনা-আহ্বানে আসিয়া ঘট ঘট করিলে তিনি গালাগালি দিয়া ভূত ছাড়াইয়া দেন।

হঠাৎ কাক আসিয়া একটা পেয়ালা উণ্টাইয়া দিল। ভাগ্যে নীচে পড়িল না তাই, না হইলে দামী জিনিষটা ভাঙিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইত। এ সংসারের সব ব্যবস্থাই এইরূপ। নিজে যাহা না দেখিবেন, তাহা তখনই নষ্ট হইবে। বিরক্ত মুখে সুরেশ্বর ঘণ্টাটা অনাবশ্যক জোরের সহিত বার দুই টিপিয়া দিলেন।

চাকর আসিয়া পেয়ালা পিরিচ গুছাইয়া ট্রেতে উঠাইতে লাগিল। তাহার দিকে চাহিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুরেশ্বর বলিলেন, "তোদের মাকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।"

চাকর চলিয়া গেল। রান্নাঘরের সামনে বাসন মাজিবার স্থান। সেখানে ট্রেখানা নামাইয়া রাখিয়া আবার উপরে চলিল যামিনীর সন্ধানে। তাঁহাকে বারান্দায়, শয়নকক্ষে বা মমতার ঘরে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "দিদিমণি!"

মমতা ভিতর হইতে সাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডাকছ?"

চাকর বলিল, "বাবু মাকে একবার ডাকছেন।"

যামিনীর আজ মাথা ধরিয়াছিল, তাই তিনি সকাল-সকাল স্নান করিতে ঢুকিয়াছেন। চাকরকে দিয়া খবর পাঠাইলে হয়ত বাবা আবার চটিয়া বসিয়া থাকিবেন, এই ভয়ে মমতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল। চাকরকে বলিল, "আচ্ছা তুই যা। আমি যাচ্ছি বাবার ঘরে।"

যামিনীর আগমন-প্রত্যাশায় মুখখানা যথাসম্ভব বিরক্ত করিয়া, দরজার দিকে চাহিয়া সুরেশ্বর বসিয়া ছিলেন। মমতাকে ঢুকিতে দেখিয়া, তাঁহার মুখের উপরের ঘন মেঘের আবরণ অনেকখানিই যেন সরিয়া গেল। মেয়েকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "এস মা এস। চা-টা খাওয়া হয়েছে?"

মমতা বলিল, "হয়েছে বাবা। মা এখন চান করতে ঢুকেছেন, তুমি কি চাও, তাই দেখতে এলাম।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "চাইব আর কি? এই একখানা চিঠি এসেছে, গোপেশবাবুর কাছ থেকে, সেই বিষয়ে একটু কথাবার্ত্তা কইবার ছিল।" কথাটা বলিয়াই তিনি মেয়ের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। বিবাহের কথায় মমতার মুখখানা গোলাপফুলের মত রাঙা হইয়া ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া যেন আশঙ্কায় কালো হইয়া উঠিল। সুরেশ্বর আবার চটিয়া উঠিলেন। আগাগোড়া কুশিক্ষা দেওয়া হইতেছে, এ মেয়েকে। না হইলে সতের-আঠার বছরের মেয়ে, বিবাহের নাম শুনিলে খুশী হয় না, এমন বাঙালীর ঘরে কে কবে দেখিয়াছে? যা-তা পাত্র আনিয়া ধরিয়া দিতেছেন, তাহাও ত নয়? ভাল ঘরের সুন্দর, সুশিক্ষিত ছেলে, কালে ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে। ইহার চেয়েও বেশী মেয়ে কি চায় শুনি? তিনি কি তাহার জন্য আকাশের চাঁদ পাড়িয়া আনিবেন?

বিবাহ সম্বন্ধে মেয়ের সঙ্গে কোনদিন কোনও কথা সুরেশ্বর সোজাসুজি বলেন নাই। কিন্তু আজ রাগটা তাঁহার বড় বেশী হইয়াছিল। ইহার একটা হেস্তনেস্ত করিতে হইবে। মমতাকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার বর পছন্দ হইয়াছে কি না, আর যদি না হইয়া থাকে ত কেন হয় নাই?

বলিলেন, "গোপেশবাবুর ইচ্ছা দেবেশ আর তুমি একটু আলাপ-পরিচয় কর, তাই তাকে আর এক দিন ডাকব মনে করছি।"

মমতা দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার সরিয়া গিয়া জানলার পাশের চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িল, তাহার মুখ আরও যেন ম্লান এবং কাতর দেখাইতে লাগিল। মেয়েকে এই সব কথা বলিতে সুরেশ্বরের যথেষ্টই সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু আজ কিছুতেই পিছু হটিবেন না স্থির করিয়াই তিনি কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোনমতে যদি তিনি মমতাকে দিয়া বলাইয়া লইতে পারেন যে দেবেশকে তাহার পছন্দ হইয়াছে, বা পিতার নির্দ্দেশমত বিবাহ করিতে তাহার কোন আপত্তি নাই, তাহা হইলে যামিনীকে একেবারে উড়াইয়া দিতে তাঁহার কিছুমাত্র বাধিবে না। কন্যার বিবাহ দিবার মালিক তিনি, তাঁহার স্ত্রী ত নয়? মেয়ের অমতেও তিনি বিবাহ দিতে পারেন, তবে আজকালকার যা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ছেলেমেয়ে, ইহাদের উপর জোরজবরদস্তি করিতে গেলে অনেক সময় উল্টা উৎপত্তি হইয়া বসে, তাহার চেয়ে তাহাদের মতে কাজ করাই ভাল।

তিনি আবার সুরু করিলেন, "দেখ মা, তোমাকে কয়েকটা কথা বলছি, তাতে লজ্জা পেয়ো না। তুমি বড় হয়েছ, সব কথা বুঝতেও শিখেছ। দেবেশের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছে তা তোমার মায়ের কাছে শুনেছ বোধ হয়। ওরাও তোমায় দেখে খুবই পছন্দ করেছে। আগেকার কালে দুই পক্ষের অভিভাবকদের মত হ'লেই যথেষ্ট হ'ত, আজকাল আবার বড় বড় মেয়ে ছেলের বিয়ে হচ্ছে, কাজেই তাদের মতামতও জানতে হয়। দেবেশের সম্পূর্ণ মত আছে। তোমার মতটাও জানতে চাই। অবিশ্যি বিয়ে এখন হবে না তাও জান বোধ হয়। দেবেশ বিলাত গিয়ে আই-সি-এস পাস ক'রে এলে পর তখন বিয়ে হবে।"

মমতার চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, কিছু না বলিলে যদি চলিত, তাহা হইলে সে চুপ করিয়া থাকিত। পলাইতে পারিলে সে বাঁচে। কিন্তু উত্তরের আশায় যেমন উৎসুকভাবে বাবা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন, একটা কিছু না বলিলে তিনি কি ছাড়িবেন? বার-বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবেন বোধ হয়। অগত্যা কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, "আমি এম্-এ অবধি পড়িতে চাই বাবা।"

সুরেশ্বর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "অত পড়বার আমি ত কিছু দরকার দেখি না। তোমাকে ত আর প্রফেসর হ'তে হবে না, ব্যারিষ্টারও হ'তে হবে না। মেয়েমানুষ একেবারে পুরুষ হয়ে উঠুক এ কেউ চায়ও না, তাতে সংসারে সুখশান্তি কিছু বাড়ে না, কমেই। দেবেশ যত দিন বিলেতে থাকবে, তার মধ্যে তোমার আই-এ পাস করা হয়ে যাবে, তা হলেই ঢের। তা ছাড়া বাড়িতে ত তুমি গান-বাজনা, শেলাই, এ-সব

শিখছই। ইংরিজী কথাবার্ত্তাটা ভাল ক'রে অভ্যাস করবার জন্যে এক জন মেম রেখে দেব ভাবছি।"

মমতার বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এ কি দারুণ বিপদের মেঘ তাহার মাথার উপর ঘনাইয়া আসিতেছে? দেবেশকেই শেষে তাঁহার বিবাহ করিতে হইবে না কি? মাগো! বিবাহের অর্থ এখন ত সে কিছু কিছু বুঝিতে শিখিয়াছে। সে পারিবে না, কিছুতেই দেবেশকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। হঠাৎ সে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "না বাবা, আমি পারব না, আমি বিয়ে করব না।" মেয়েকে কাঁদিতে দেখিয়া সুরেশ্বর ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এই জাতিটির সঙ্গে পারিয়া ওঠা ভার। সব কথায় ইহারা কাঁদিয়া জিতিয়া যায়। নিজের বিবাহের পরও কতবার স্ত্রীর চোখের জলের কাছে পরাজয় মানিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে পড়িল। এখন অবশ্য যামিনী আর কাঁদেন না, তিনিও ওসব মায়াকান্নায় ভোলেন না, কিন্তু মমতার কথা স্বতন্ত্র। সে যে তাঁহার নিজের সন্তান, তাহার উপর ছেলেমানুষ। বলিলেন, "ও কি মা, ছিঃ। কাঁদছ কেন? কাঁদবার কথা ত আমি কিছু বলি নি? বাঙালী হিন্দু ঘরে কুড়ি বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়া নিয়ম, সেইটাই আমিও ভাল মনে করি। আর বিয়ে করবে না এ-সব ছেলেমানুষি কথা, ও-সব আমাদের দেশে চলে না।"

মমতা উত্তরে কি বলিত কে জানে? হয়ত শুধু কাঁদিয়াই আকুল হইত। কিন্তু উত্তর তাহাকে আর দিতে হইল না। হঠাৎ যামিনী ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিলেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার মেয়ের দিকে, একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একি? কাঁদছ কেন মা?"

মাকে দেখিয়াই মমতা চোখ মুছিতে আরম্ভ করিল। সুরেশ্বর যথেষ্টই অপ্রতিভ হইয়া গেলেন, সেটা ঢাকিবার চেষ্টায় বলিলেন, "কাঁদবার যে কি কারণ হয়েছে, তা ত বুঝলাম না। তোমার মেয়ের বয়সই হয়েছে শুধু, বয়সের উপযুক্ত জ্ঞানবুদ্ধি কিছু ত হয় নি।"

যামিনী তখনও বুঝিতে পারেন নাই, ব্যাপারখানা কি। একটা কিছু আন্দাজ করিয়া লইয়া বলিলেন, "ওকে কি জিগ্‌গেস করছিলে? আমায় বল্‌লেই ত হ'ত? যা খুকি, ঘরে যা।"

মমতা উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরেশ্বর বলিলেন, "কি আবার এমন হাতী-ঘোড়া জিগ্‌গেস করব? বিয়েতে তার মত আছে কিনা তাই জানতে চাইছিলাম। বয়স ত হয়েছে, মতটা ত তার জানা আবশ্যক?"

মমতা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যামিনী তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, "হঠাৎ ওকে ও-সব জিগগেস্ করবার কি এত তাড়া পড়ল? যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড! মেয়েটাকে একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছ। বিয়ে কি আজই হচ্ছে?"

মমতা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই সুরেশ্বরের রাগ একেবারে অগ্ন্যুৎপাতের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একেবারে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "খালি আছ বাদ সাধতে। কি হয় মেয়েকে এ সব বল্‌লে? তাকেই ত বিয়ে করতে হবে, তা কা'কে জিগ্‌গেস্ করব? আজ না হোক দু-দিন পরে ত হবে? তার জোগাড়-যাগাড় করতে হবে না? খুঁট ধ'রে ত ব'সে আছ, মেয়ে নিজে প্রেমে না পড়লে তাকে বিয়ে দেবে না, তা মেয়েকে সিন্দুকে তালা দিয়ে রাখলে সে প্রেমে পড়বে কি করে?"

যামিনী বলিলেন, "ভাল, তালা দিয়ে রাখতে চাই, আমি না তুমি? কোথাও মেয়েকে পাঠাবার নামে তোমারই না মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, পাছে সে ছুটো মানুষের মুখ দেখে ফেলে? তুমি যাকে টাকা দিয়ে কিনে এনে দেবে, তাকেই ওকে ভালবাসতে হবে, এই ত তোমার ইচ্ছা? মানুষের মন অত সহজ জিনিষ নয়।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "না তা বাসবে কেন? ভালবাসবে যত মায়ে-তাড়ান, বাপে-খেদান ভিখিরী ছোঁড়াদের। সেই হ'লে তুমি খুব খুশী হও, না? মা হয়ে সন্তানের ভালমন্দ বোঝে না, খালি নিজের জেদ রাখতে চায়, এ কেবল তোমার মধ্যেই দেখলাম। বুদ্ধিশুদ্ধি কি তোমার ঘটে একেবারে নেই? তিন কাল গিয়ে ত এক কালে ঠেকেছে, দুনিয়াটাকে চিনবে কবে?"

যামিনী চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, "সন্তানের ভালমন্দ আমি তোমার চেয়ে বেশী বুঝি বলেই তোমার ধম্‌কানিকে এবং অভদ্র কথাবার্ত্তাকেও আমি উপেক্ষা করতে পারি। নইলে তাইতে ভয় পেয়ে, শান্তি রাখবার জন্যে তোমার মতে মত দিতাম। দুনিয়াটাকে আমি বেশ চিনি,

অন্ততঃ মেয়েদের কাছে দুনিয়া যে কি, সেটা বেশ জানি। জানি বলেই বল্‌ছি যদি মেয়ে ভালবেসে সত্যি ভিখিরীর গলায়ও মালা দেয়, তাতেই আমি খুশী হব। ওতেই তার সুখ হবে, ধরে বেঁধে বড় মানুষ বরের সঙ্গে বিয়ে দিলেই মেয়ে একেবারে সুখের সাগরে ভাসতে থাকবে, এ যদি মনে কর ত সেটা তোমার ভুল, তুমিই এখনও দুনিয়াকে চিনতে শেখ নি।"

সুরেশ্বর বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "ও সব কথা থিয়েটারের ষ্টেজে দাঁড়িয়ে বল্‌লে বেশ শোনায়, হাততালিও খুব পাওয়া যায়, কিন্তু নিজের ঘরে ব'সে ওসব কথা কেউ বলে না, বল্‌লেও যারা শোনে, তারা বিশ্বাস করে না। কোনদিন অভাব কা'কে বলে তা ত জান্‌তে হয় নি, দু-হাতে মুঠো ক'রে টাকা উড়িয়েছ, আর পায়ের উপর পা দিয়ে পালঙ্কে ব'সে আছ, হাতধোবার জলটিসুদ্ধ দাসীতে এগিয়ে দিচ্ছে। তাই ওসব কাব্যি-রোগে ধরেছে আর কি? দু-বেলা হাঁড়ি ঠেলতে হ'ত, আর ছেলের কাঁথা কাচতে হ'ত, তাহলে বুঝতে কত ধানে কত চাল হয়, আর জগতে ভালবাসার মূল্য কতখানি।"

একটা ক্ষীণ হাসির রেখা যামিনীর মুখে ফুটিয়া উঠিতে-না-উঠিতেই মিলাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ঐ ভাবে থেকেও মানুষে সুখী হ'তে পারে। পালঙ্কে ব'সে আমি ত সুখের সাগরে ভাস্‌ছি। খুকীর অদৃষ্ট আমার মত না-হয়, এই আমি চাই।"

সুরেশ্বর চটিয়া আগুন হইয়া গেলেন, বলিলেন, "নিজের সৌভাগ্য বুঝতে পার সেটুকু বুদ্ধিও তোমার নেই। খুকীর কপাল তোমার মত হ'লে, জেন যে তার বহু জন্মের তপস্যা ছিল। তবে তুমি যা তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী শেষ অবধি কি ঘটিয়ে তুলবে তা ভগবানই জানেন।"

যামিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা মেয়ের মঙ্গল চায় না, এ ত সংসারের নিয়ম না? আত্মাভিমানে অন্ধ হয়ে আছ, তুমি তার কি বুঝবে? আমার মত কপালি সত্যিই যেন আমার মেয়ের না-হয়, তার চেয়ে সে যেন চিরকুমারীই থাকে, এই আমার প্রার্থনা।" বলিয়া নিজেকে সম্বরণ করিতে না পারিয়াই যেন তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সুরেশ্বর রাগে তখনও দাঁত কিড়মিড় করিতেছেন। কিন্তু রাগ রাখিবেন কাহার উপরে? নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, "কালই আমি উকীল ডেকে উইল্ ক'রে ফেল্‌ব। এত আস্পর্দ্ধা আর সহ্য হয় না। আমার মুখের উপরে এত বড় কথা!"

(১৮)

সারাটা দিন মমতার যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত কাটিয়া গেল। বুক খালি কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে, দুই চোখ শুধু শুধুই জলে ভরিয়া ওঠে! কি হইয়াছে তাহার? মায়ের সামনে বাহির হইতেও তাহার লজ্জা করিতেছে কেন? সে যেন ধরা পড়িয়া গিয়াছে তাঁহার কাছে।

মায়ের কাছে ধরা না পড়ুক, আসলে সে আজ নিজের কাছে অনেকখানিই ধরা পড়িয়াছে। বিবাহের নামেও তাহার ভয় হয় নাই, সেজন্য সে কাঁদেও নাই। হিন্দুর মেয়ে সে, আজ না হোক কাল বিবাহ তাহার হইবেই, সে ত জানা কথা? এ চিন্তা নিজে কতবার সে করিয়াছে, লুসির সঙ্গে গল্পও কত হইয়াছে, কই কখনও ত তাহার কান্না পায় নাই? যৌবনের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের স্বপ্ন, আনন্দময় বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন কোন্ কিশোরী বা তরুণী না দেখিয়াছে? তাহাতে দেহে মনে সুখের শিহরণই খেলিয়া যায়, এমন মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ে না ত?

আসলে বিবাহ করিতে মমতার আপত্তি নাই, তাই বলিয়া যাহাকে তাহাকে সে বিবাহ করিয়া বসিতে পারে না। দেবেশকে তাহার ভাল লাগে নাই, তাহাকে সে বিবাহ করিতে পারিবে না। কেন যেন ভাল লাগে নাই, তাহা ত বলা কঠিন। যামিনী দেবেশকে পছন্দ করেন নাই বলিয়া? সবটা তাহাও ত নয়? দেবেশ তাহাকে খুব পছন্দ করিয়াছে, ইহা ত মমতা শুনিয়াছে, সাধারণ অবস্থায় ইহাতেই তাহার মন দেবেশ সম্বন্ধে খানিকটা অনুকূল হইয়া উঠিত। ভালবাসাই ভালবাসাকে জন্ম দেয়। কিন্তু দেবেশের পছন্দের কথা শুনিয়াও মমতার মন একটুও নরম হইল না কেন? তবে কি তাহার মন অন্য কোনদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে? এইবার মমতার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, একটা আকুল পুলকের শিহরণ বুকের ভিতর খেলিয়া গেল, কিন্তু চোখে আবার জলও আসিয়া পড়িল।

মমতা কি সত্যই অমরেন্দ্রকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে? নিজের কাছে উহা সে অস্বীকারও করিতে পারে না, আবার স্বীকার করিতেও মন ভয়ে কাঁপিয়া ওঠে। ভয় কিসের? তাহাও সে ভাল করিয়া বোঝে না। কেমন অস্পষ্টভাবে শুধু মনে হয় এইবার তাহাকে অনেক ব্যথা পাইতে হইবে। ভালবাসার ভিতর আনন্দ যতখানি বেদনাও যে ততখানিই? সে কি পারিবে এত ব্যথা সহ্য করিতে? কে তাহাকে এখন পথ দেখাইবে? মাকে এতকাল সব কথা সে বলিতে পারিয়াছে, আজ কিন্তু এই নূতন অনুভূতিটিকে তাঁহার কাছ হইতে লুকাইয়াই রাখিতে সে চায়, তাঁহাকে ইহা জানাইতে মমতার বড় লজ্জা।

যামিনীও মেয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সকালে সুরেশ্বর তাহাকে যথেষ্ট জ্বালাইয়াছেন, এখন কিছু ক্ষণ তাহাকে মন শান্ত করিবার জন্য সময় দেওয়া উচিত ভাবিয়া তিনি দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরেও মেয়ের খোঁজ করিলেন না। কিন্তু বিকাল গড়াইয়া যায়, তবুও মমতা লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছে। ইহার কারণ কি? সুরেশ্বর অবশ্য মেয়েকে ঠিক কি বলিয়াছেন, তাহা শুনিবার অবসর যামিনীর হয় নাই, কিন্তু কি বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা ত তিনি শুনিয়াছেন? তাহার ভিতর এতখানি বিচলিত হইবার কি থাকিতে পারে? দেবেশের সহিত মমতার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে, তাহা ত মমতা জানেই? কনে দেখিতে যে মানুষ কি কারণে আসে তাহা কি আর সে বুঝে না? বিবাহ আজ বা কাল হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাও সে জানে। তবে এত ভাবনা কেন? মায়ের কাছেসুদ্ধ সে আসিতে পারিতেছে না, এমন কি তাহার হইয়াছে?

বিকাল হইয়া আসিল। নিত্যকে ডাকিয়া যামিনী বলিলেন, "ওরে খুকিকে ডেকে আন, চুলটা বেঁধে দিই।" নিজের অতবড় চুলের গোছা মমতা বাগাইতে পারে না, আবার ঝিদের চুলবাঁধা তাহার পছন্দও হয় না, তাই এ কাজটা এখন পর্য্যন্ত মায়ের হাতেই আছে।

নিত্য খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে ছাদের উপর গিয়া তবে মমতাকে আবিষ্কার করিল। বলিল, "ও মা দিদিমণি, একলাটি এই ছাদে কি করছ? মা ডাকছেন যে তোমায়; আমি সাত-বাড়ি খুঁজে তোমায় দেখতে পাই না।"

যামিনী তাহাকে ডাকিতেছেন, ইহার ভিতর অবাক হইবার কিছুই নাই, তবু মমতা যেন চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে?"

নিত্য বলিল, "কেন আবার? চুলটুল বাঁধতে হবে না? বেলা গড়িয়ে এল যে?"

মমতা তখন তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নামিয়া চলিল। ফিতা কাঁটা আনিবার জন্য নিজের ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, মা তাহারই ঘরে খাটের উপর বসিয়া আছেন। মেয়েকে দেখিয়া বলিলেন, "আয় চুলটা বেঁধে দিই। সারাটা দিন ছিলি কোথায়?"

মমতা উত্তর না দিয়া, ফিতা কাঁটা লইয়া চুল বাঁধিবার জন্য মায়ের সামনে গিয়া বসিল। যামিনী তাহার চুলে চিরুণী চালাইতে চালাইতে বলিলেন, "পড়াশুনো ত আজ কিচ্ছু করলি না, তার পর কাল সকালে উঠে তাড়াহুড়ো ক'রে মরবি। এদিকে ত আটটা বাজতেই ঘুমে চোখ ঢুলে আসবে।"

মমতা নীচু গলায় বলিল, "আজ আমার ভাল লাগছে না মা।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে, শরীর খারাপ নাকি?"

মমতার কোন কথা মায়ের কাছে লুকান সহজ নহে, কারণ জন্মাবধি কখনও মা তাহাকে কিছু লুকাইতে প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি ত শুধু মা নয়, সখী, সঙ্গিনী সবই তিনি। কাজেই মমতা বিপদে পড়িয়া গেল, একটু ক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "বাবা বড় সব কথা নিয়ে জেদ করেন মা, আমার ভাল লাগছে না, বড় ভয় করছে।"

যামিনী বিনুনী করিতে করিতে বলিলেন, "এক-এক জন মানুষের অমনি স্বভাব থাকে, তারা চায় জগতের সব মানুষ তাদের মতেই চলুক। কিন্তু তা ত আর হয় না? সব মানুষেরই নিজের মতামত আছে, আর সেই অনুসারে চলাই তাদের উচিত। ভয় করিস নে, ভয় ক'রে কিছু লাভ হয় না। মন শক্ত করতে চেষ্টা কর, বড় ত হচ্ছিস্?"

মায়ের কথা শুনিয়া মমতার ভয় আরও বাড়িয়া গেল। ভয়ের কারণ তাহা হইলে সত্য সত্যই কিছু ঘটিয়াছে? সবটাই তাহার কল্পনা নয়? মা ত কখনও এমন করিয়া

তাহার সঙ্গে কথা বলেন না? তবে বাবা কি সত্যই জোর করিয়া ঐ গোপেশবাবুর ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া দিবেন নাকি? সে জলভরা চোখে মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, বাবা কি সত্যি আমার এখনই বিয়ে দিয়ে দেবেন? আমি বিয়ে করব না মা।"

যামিনী বলিলেন, "এখনই বিয়ের কোন কথা হয় নি, শুনেইছিস ত ছেলেটি বিলাত যাবে। সেখান থেকে পাস ক'রে না এলে বিয়ে হবে না। বিয়ে করবি না কেন? বিয়ে না ক'রে বাঙালীর মেয়ে ক'টা আর ব'সে থাকে?

মমতা কি করিয়া সব কথা মায়ের কাছে খুলিয়া বলিবে? অমরেন্দ্র বলিয়া কেহ যে জগতে আছে তাহা কি তিনি জানেন? ছায়ার জন্মদিনে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া, মমতা কি তাহার কথা মায়ের কাছে বলিয়াছিল? সভাতে গিয়া হার যে সে অমরেন্দ্রের ঝুলিতে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা সে মাকে বলিতে পারে নাই। তিনি কি ভাবিবেন শুনিলে? মেয়ে বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে মনে করিবেন না ত?

বলিল, "আমার অনেক পড়াশুনো করতে ইচ্ছা করে মা! বিলেত বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা করে।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "সব ইচ্ছেই কি আর মানুষের পূর্ণ হয় মা? তা যাক্ গে, এখন ও নিয়ে অত মাথা ঘামাস্ না, ও ঢের পরের কথা। এখন পড়াশুনো করছিস্ কর, কেউ কিছু বল্‌লেই ভয়ে দিশাহারা হয়ে যাস্ নে। মা ত তোকে চিরকাল আগলে রাখতে পারবে না? নিজের ভার নিজেও এক সময় নিতে হবে। মনে জোর কর, যাতে নিজের মতে চল্‌তে পারিস্, না হ'লে দুঃখের অবধি থাকবে না।"

মা যদি তাহার দুঃখ দুর্ভাবনা ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দিতেন, ত মমতা বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু তিনি যেন আজ সমানে সমানে কথা বলিতেছেন, সত্যই তাহা হইলে অচিরে মমতাকে কোন একটা বাস্তব বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে? সে বিপদটা যে দেবেশকে বিবাহ সম্বন্ধেই তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে অবস্থায় কি করিবে সে? একলা কোন বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ত তাহার অভ্যাস নাই। চুলবাঁধা শেষ হইল বটে, কিন্তু আঁধার মুখে সে সেইখানেই বসিয়া রহিল।

যামিনী হাসিয়া তাহাকে ঠেলা দিয়া বলিলেন, "নে নে অত ভাবতে হবে না। নামে খুকি ত কাজেও খুকি। যা ছাদে বেড়াগে যা। লুসিটা তোর চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু খুব পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে।"

মমতা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "হুঁ, পাকা হওয়া বুঝি ভাল? তুমিও ত পাকামি করলে বকো?"

যামিনী বলিলেন, "তাই ব'লে চিরকাল কাঁচা থাকলেও ত চলে না? যে বয়সের যা নিয়ম সে-রকম ত হ'তে হবে? আমার মা আমাকে খেড়ে অবধি খুকি ক'রে রেখেছিলেন, তার ফলে আমার যা সুবিধে হ'ল তা আর ব'লে কাজ নেই।"

মমতা সরলভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা, কি অসুবিধে হয়েছে?"

কি যে অসুবিধা তাহা ত নিজের মেয়ের কাছে খুলিয়া বলা যায় না? যামিনী হাসিয়া বলিলেন, "সব কথা কি আর তোর কাছে খুলে বলা যায়? তবে নিজে যা ভাল বুঝেছিলাম, সে মতে কাজ করতে পারি নি, এইটুকু জেনে রাখ্। আর নিজের বিবেচনাকে বলি দিলে, সুখ কখনও হয় না, অন্ততঃ মেয়েদের হয় না, এইটাও জেনে রাখ্।

মমতা সব না বুঝুক, কিছু কিছু বুঝিল। মা যে সুখী নহেন, তাহা ত চোখেই সে দেখিতেছে। সুরেশ্বরের ব্যবহারকে ভুল বুঝিবার উপায় নাই, মমতার চেয়ে অনেক ছোট ছেলেমেয়ের চোখেও তাঁহার রূঢ়তা ধরা পড়ে। ইহার কারণ কি মমতা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। বাবা ত আর কাহারও সঙ্গে অমন ব্যবহার করেন না? অমন যে ভূতের মত সব বন্ধুবান্ধব তাহাদের সঙ্গেও তিনি দিব্য ভদ্র আর অমায়িক ব্যবহার করেন। আর মায়ের বেলাই অন্য মূর্ত্তি কেন? তাহার মায়ের খুঁৎ কোথায়? যে তাঁহাকে দেখে সেই মুগ্ধ হইয়া যায়, অথচ বাবা সারা ক্ষণ তাঁহার উপর অমন চটিয়া থাকেন কেন?

মমতা এখন জগৎ সম্বন্ধে ক্রমে সচেতন হইয়া উঠিতেছে, সংসারী মানুষের কত রকম দুঃখ, ব্যথা, অভাব-অভিযোগ থাকে, তাহাও বুঝিতে শিখিতেছে অল্পে অল্পে। কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত দেহে কিশোরী হইলেও মনে মনে শিশুই ছিল, সে মায়ের স্নেহ ছাড়া জগতের আর কিছু বুঝিত না। কিন্তু হঠাৎ তাহার জীবনে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। প্রেমের সোনার কাঠি তাহার হৃদয়ের সুপ্ত নারীত্বকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। আর

কলেজে ভর্ত্তি হইয়া, নানা রকম সঙ্গিনী জুটিয়াছে; তাহারাও মমতাকে কম জ্ঞান দান করে নাই। কত রকম কত গল্পই যে সে শুনিয়াছে, শুনিতে শুনিতে তাহার বুকের রক্ত চঞ্চল হইয়া নাচিয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বোপরি লুসি আছে, তাহার ত এ ছাড়া ভাবনাই নাই। রোমান্সের জগতেই সে বাস করে, রাত্রেও বোধ হয় প্রেমের স্বপ্ন ছাড়া অন্য স্বপ্ন দেখে না। কাজেই মমতারও সে শিশুভাব কাটিয়া গিয়া, তরুণীর মনোভাব ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে ঝাপসা ভাবে বুঝিতে পারে বাবা মায়ের ভিতর যে সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে সম্বন্ধ নাই। তাই কি মা এত অসুখী? হইতেই পারে। নারীর জীবনে সুখশান্তি কোথা হইতে থাকিবে, যদি প্রেমই না থাকে?

কিন্তু মাকে ত আর এ-সব বিষয়ে খোলাখুলি কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না? তাহার জিজ্ঞাসা করিতেও সঙ্কোচ হইবে, মায়েরও তাহাকে কিছু বলিতে সঙ্কোচ হইবে। এ-সব লুকান ব্যথা, লুকাইয়া রাখিতে দেওয়াই ভাল, জোর করিয়া টানিয়া আনিলে ব্যথা বাড়িয়া যায় বই কমে না।

তাই আর কিছু না বলিয়া মমতা উঠিয়া দাঁড়াইল। যামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ নিজেকে সম্বরণ করিতে না পারিয়াই যেন মমতা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "হ্যাঁ মা, নিজের মতে চলতে হ'লে যদি বাপ-মায়ের অবাধ্য হ'তে হয়, তাহ'লে কি করব?"

যামিনী থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও কঠিন। সোজাসুজি বলা চলে না যে অবাধ্য হও, কিন্তু এইমাত্র যিনি মেয়েকে উপদেশ দিলেন যে কষ্ট সহ্য করিয়াও নিজের মতে চলা ভাল, তিনি কি করিয়া বলিবেন যে মা-বাবার অবাধ্য কোন অবস্থাতেই হওয়া চলে না? একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "ছোটখাট বিষয়ে, অবাধ্যতা না করাই ভাল মা, কারণ বাবা মা তোমার যাতে মঙ্গল তাই চাইবেন, অমঙ্গল ত চাইবেন না? কিন্তু এমন কোন বিষয়ে যদি বাপ-মায়ের সঙ্গে মতবিরোধ হয়, যার সঙ্গে তোমার চিরজীবনের সুখশান্তি জড়ান রয়েছে, তখন অবাধ্য হওয়া ছাড়া গতি কি? এই এক জায়গায় একটা মানুষ আর এক জনের হয়ে বিচার ক'রে দিতে পারে না মা, তা অনেক ঠেকে শিখেছি। তোমার শরীর কি খেলে ভাল থাকে, কি ভাবে শিক্ষা পেলে তুমি মানুষের মত মানুষ হ'তে পার, এ সবই আমরা তোমার হয়ে ঠিক ক'রে দিতে পারি, শুধু পারি না ঠিক ক'রে দিতে ঐ একটি জিনিষ। কা'কে পেয়ে তুমি নিজেকে ধন্য মনে করবে, সে মানুষকে এক তুমিই বেছে নিতে পার মা।" বলিয়া যামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মমতা যাহা রাখিয়া-ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল, যামিনী স্পষ্টভাবেই তাহার উত্তর দিয়া গেলেন। বিবাহ-বিষয়ে নারীর নিজের মত বজায় রাখা উচিত, ইহাই ত তিনি বলিলেন। তবে আর মমতার ভয় কিসের? মা যদি কষ্ট না পান, তাহা হইলে আর সে কিছুকে ভয় করে না। তাহার অনভিজ্ঞ চোখে সংসার তখনও আনন্দেরই স্থান, কোন বিভীষিকার সন্ধান সে আজ পর্য্যন্ত পায় নাই।

যামিনী বুঝিতেছিলেন, আড়াল হইতে স্বামীর বিরুদ্ধতার সহিত যুদ্ধ করিবার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। সুরেশ্বর স্থির করিয়াছেন এবার তিনি গায়ের জোরে কাজ হাসিল করিবেন, সুতরাং যামিনীকেও এবার সমরাঙ্গণে নামিতে হইবে। এক্ষেত্রে সব কথা মমতাকে খুলিয়া না বলিলে চলিবে কিরূপে? তাহাকেই লইয়া যখন এ বিরোধ? মমতার মন যদি দেবেশের প্রতি প্রতিকূলই হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ বিবাহের প্রস্তাবে আর কিছুমাত্র অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। মমতা বাহিরের সমাজে বিশেষ ত মেশে না, কাজেই অন্য কাহাকেও তাহার ভাল লাগিয়াছে, ইহা তত সম্ভব নয়। কিন্তু হইতেও ত পারে? যামিনীর মাও যামিনীকে এমনই ঘরের কোণে, আঁচলের আড়ালে মানুষ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেমের দেবতা তাহারই ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া যামিনীকে কি কাঁদাইয়া যান নাই? তাঁহারই মেয়ে মমতা, অদৃষ্টও তাঁহারই মত হওয়া বিচিত্র নয়। যদি তাহার কাহাকেও ভাল লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে দেবেশকে ইহজন্মে কোনদিনও আর তাহার ভাল লাগিবে না, তবে মিছামিছি এই সব মেলামেশার আয়োজন, এই সব কোর্টশিপের ভড়ং করিয়া লাভ কি?

কিন্তু এ-সব কথা কাহাকে বা তিনি বুঝাইবেন? সুরেশ্বর যাহা বুঝিতে চান না, তাহা কোনদিনই বুঝিতে পারেন না। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে দেবেশের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেনই, যামিনীর বিরুদ্ধতায় তাঁহার জেদ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। মমতা যদি নিজের মুখে তাঁহাকে

আপত্তি জানায়, তাহা হইলে কিছু কাজ হইলেও হইতে পারে, যদিও সে-বিষয়েও স্থিরতা নাই। সুরেশ্বর টাকার বড়, পদমর্য্যাদার বড় জগতে আর কিছু দেখিতে পান না। যে কখনও ভালবাসে নাই, সে ভালবাসার মর্য্যাদা বুঝিবে কি করিয়া? যামিনীকে বিবাহ করিবার জন্য তিনি পৃথিবী উল্টাইয়া ফেলিবার যোগাড় করিয়াছিলেন বটে, সে কিন্তু কেবলমাত্র রূপের মোহে, নূতনত্বের মোহে। প্রকৃত প্রেম যে তাঁহার জীবনকে কোন দিনও স্পর্শ করে নাই, তাহা এত বৎসর ধরিয়া যামিনী হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। মেয়ের যেন এই স্বর্ণকারায় বন্দিনী হইবার দুর্ভাগ্য না হয়।

সুরেশ্বর সারাটা দিন দারুণ অসোয়াস্তির ভিতর দিয়া কাটাইয়া দিলেন। মেয়েকে ত কাঁদাইলেন, কিন্তু তাহার কাছ হইতে সোজাসুজি উত্তর ত কিছু পাওয়া গেল না? এম্-এ পড়িবে, কুমারী থাকিবে, ইত্যাদি বাজে কথা ত ঢের বলিল, কিন্তু দেবেশের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতে আপত্তি আছে কিনা, তাহা ত কিছু জানা গেল না?

আরও মুস্কিল যে সারাদিনের মধ্যে স্ত্রী বা মেয়ে কেহই তাঁহার ঘরের ছায়া মাড়াইল না। রাগিয়া তিনি বন্ধুদের দরজার গোড়া হইতেই বিদায় করিয়া দিলেন, এবং সন্ধ্যার খাবার সবটাই প্রায় ফেলিয়া দিলেন। তবু যামিনীর ঘরের দিক হইতে কোন সাড়াশব্দ আসিল না।

সুরেশ্বর রাগিয়া প্রায় পাগল হইয়া উঠিলেন। অন্যকে উপেক্ষা, অবহেলা, এমন কি অপমান করিতেও তাঁহার কোথাও একটুও বাধিত না, বিশেষ করিয়া স্ত্রীকে। কিন্তু নিজে ঐ তিনটি জিনিষের আঁচমাত্রও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, বিশেষ করিয়া যামিনীরই কাছ হইতে পারিতেন না। কিন্তু স্ত্রীকে জোর করিয়া তাঁহাকে ভালবাসাইবার বা শ্রদ্ধা করাইবার কোন উপায় তাঁহার জানা ছিল না, তাই নিজের মনে গজ্‌রাইয়া বেড়াইতেই বাধ্য হইতেন।

অবশেষে আর না পারিয়া রাত্রে তিনি যামিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মমতা, সুজিত, দুই জনেই তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, যামিনী বসিয়া সংসারের হিসাব লিখিতেছিলেন। কেন যে তাঁহার ডাক পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে তাঁহার দেরি হইল না, মনটা একবার যেন ভাঙিয়া পড়িবার মত হইল, আবার জোর করিয়া শক্ত হইয়া তিনি সুরেশ্বরের শয়নকক্ষের দিকে চলিলেন।

সুরেশ্বর ঘরের ভিতর পায়চারি করিতেছিলেন। স্ত্রীকে দেখিয়া বলিলেন, "এবার ঘরসংসার চালাবার ভারটাও কি আমি নেব?"

যামিনী বলিলেন, "কোন্ ভারটা আবার তোমায় নিতে কে বল্‌ল?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "তা নয়ত কি? এ-সব বিয়ে, বৌভাতের আয়োজন, উদ্যোগ করা ঘরের মেয়েদেরই কাজ। তা তুমি ত দেখি দিব্য হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছ। কি যে জগৎ উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত আছ, তাও ত কিছু বুঝছি না।"

যামিনী বসিয়া বলিলেন, "এ বিয়েতে আমার মত নেই বলেই হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছি।"

সুরেশ্বর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মত নেই কেন শুনি? ছেলে খুব ভাল, এ আমি তোমায় বল্‌ছি। মানুষ কি তুমি আমার চেয়ে বেশী চেন?"

যামিনী বলিলেন, "ও-সব পুরনো তর্ক আমি আর তুলতে চাই না বাপু। ও ছেলেকে আমার মেয়ের মনে ধরে নি, কাজেই এ বিয়ে আমি দিতে চাই না।"

সুরেশ্বরের মুখ একেবারে ঝড়ের আকাশের মত কালো হইয়া উঠিল। তিনি চাপা গলায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "মা মেয়েতে এই সব পরামর্শ হচ্ছে বুঝি? মেয়েটার মাথা একেবারে চিবিয়ে খেয়েছ? আচ্ছা, এ রোগের ওষুধ আমি জানি। তোমার গুণের মেয়েকে বল গিয়ে যে যদি আমার মতে বিয়ে করে তবে গহনাগাঁটি বাদে পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুক পাবে। সে এখনও নাবালিকা, ইচ্ছা করলে ঘাড় ধরে আজই আমি তার বিয়ে দিতে পারি যেখানে খুশী, কিন্তু সেটা করতে চাই না। এখন যদি বিয়ে নাও হয়, সাবালিকা হ'লেও আমার অমতে বিয়ে করলে তাকে এক কাপড়ে এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। জন্মে আমি আর তার মুখ দেখব না।"

যামিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা তাই তাকে বল্‌ব।"

সুরেশ্বর আবার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আর তোমার ব্যবস্থাও ভালমতে আমি ক'রে যাব, ভাবনা নেই।"

যামিনী উত্তর না দিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

রাজারাম রায়

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

রাজারাম লোকের অগোচরে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, এবং লোকের অগোচরে জীবনের পরপারে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্মরণীয় কোন কাজ করিয়া যান নাই, এবং, যতটা জানা যায়, বংশ রাখিয়াও যান নাই। এইরূপ নগণ্য ব্যক্তি বিস্মৃতির অতল তলে চিরশান্তি লাভ করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু রাজারামের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। তাহার কারণ রাজারাম রাজা রামমোহন রায়ের সহিত ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং ইতিহাস তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই। রাজারামের জীবনের একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা তাঁহার জন্ম। রাজারামের জন্মকথা রহস্যপূর্ণ। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এই প্রস্তাবে তাঁহার মতামত আলোচনা করিব।

ব্রজেন্দ্রবাবু ভারত-সরকারের দপ্তরের প্রাচীন কাগজপত্র হইতে Rajah Rammohun Roy's Mission to England (Calcutta 1926) নামক পুস্তিকায় Public Body Sheet অর্থাৎ সরকারের পাবলিক (বর্ত্তমান Home) ডিপার্টমেন্টের কার্য্যবিবরণীর আদেশগুলি (Orders) যে নথিতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে রামরতন মুখার্জি, হরিচরণ দাস এবং শেখ বকসুকে এলবিয়ন জাহাজে রামমোহন রায়ের অনুচররূপে ইংলণ্ডে যাইবার অনুমতি-বিষয়ক রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়াছেন। পাদটীকায় ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—

The Rajah was accompanied by a boy named Raja Ram whom he had brought up as his son. But Raja Ram's name does not appear in the orders for reception on board. Was Shaikh Bakshu the original name of Raja Ram, or was he the washerman who is said in *Some Anecdotes from the life of Rammohun Roy* (Bengali) by Nanda Mohan Chatterji (Cal. 2nd. ed., p. 63) to have accompanied Rammohun to England? There cannot be any doubt that Raja Ram was with Rammohun in England and that his name does not appear in the list of Rammohun's companions on board. It is inconceivable that this boy of about 12, an alleged offspring of the Rajah, went to England alone. The only solution of the riddle is to suppose that Raja Ram sailed under the name of Shaikh Bakshu.

এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পরে, ১৩৩৬ সনের (১৯২৯ সালের) অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী" পত্রে ব্রজেন্দ্রবাবু "রামমোহন রায় ও রাজারাম" নামক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন (২১৯-২২৯ পৃঃ)। ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ তিন অংশে বা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অংশের প্রতিপাদ্য, শেখ বকসু রাজারামের নামান্তর বা রাজারাম শেখ বকসুর ডাক নাম। দ্বিতীয় অংশের প্রতিপাদ্য, রামমোহন রায় যে বলিয়া গিয়াছেন রাজারাম তাঁহার পালিত পুত্র এই কথা অমূলক। তৃতীয় অংশের প্রতিপাদ্য, রাজারাম ওরফে শেখ বক্সু রামমোহন রায়ের মুসলমান-প্রণয়িনীর গর্ভজাত ঔরস পুত্র। প্রবন্ধের প্রথম অংশ লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে, এবং মূল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর ব্রজেন্দ্র বাবু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আরও যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধের প্রথম অংশের সহিত অপর দুই অংশের বস্তুগত কোন সম্বন্ধ নাই। পালিত পুত্র হিন্দুও হইতে, মুসলমানও হইতে পারে; এবং পালিত পুত্রের নাম বক্সুও হইতে পারে, রাজারামও হইতে পারে, এবং রাজারাম এবং বক্সু এই দুইও হইতে পারে। What is in a name? (নামে কি আছে?) প্রবন্ধের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশে ব্রজেন্দ্র বাবু রামমোহন রায়ের পুরাতন অপবাদ এবং পুরাতন প্রবাদের সহায়তায় প্রতিপাদ্য বিষয় সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা প্রথমতঃ প্রবন্ধের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশ আলোচনা করিয়া পরে প্রথম অংশের বিচার করিব।

১৮৩৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ডাক্তার কার্পেন্টার (Dr. Lant Carpenter) *A Review of the Labours, Opinions, and Character of Rajah Rammohun Roy, in a discourse on the occasion of his death; and a biographical memoir, to which is subjoined an examination of some derogatory statements in the Asiatic Journal (London and Bristol*, 1833) প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কোন ভারতবর্ষস্থ বন্ধুকে ঐ পুস্তিকায় ভুলচুক থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। এই বন্ধুর উত্তর ডাক্তার কার্পেন্টার ১৮৩৫ সালে পাইয়াছিলেন। কুমারী মেরী কার্পেন্টার তাঁহার *The Last days in England of the Rajah Rammohun Roy*, 1st edition, London, 1866) পুস্তকের পরিশিষ্টে (Appendix B) এই পত্রখানি ছাপিয়াছেন, কিন্তু পত্রলেখকের নাম প্রকাশ করেন নাই। এই পত্রে লিখিত হইয়াছে—

You ask me to give you any corrections that may appear necessary. One has been suggested to me by his native friends, as desirable to be made for the sake of Rammohun Roy's character. The boy *Rajah* (Rajaram) whom he took with him to England is not his son, not even an adopted son according to the Hindoo form of adoption; but a destitute orphan whom he was led by circumstances to protect and educate.

এখানে আভাস পাওয়া যায়, সেই সময়ে রাজারামের জন্মকথা লইয়া রামমোহন রায়ের উপর দোষারোপ আরম্ভ হইয়াছিল, এবং রামমোহন রায়ের দেশীয় বন্ধুগণ পত্রলেখককে এই কলঙ্ক মোচনের জন্য

রাজারামের প্রকৃত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তার পর, রাজারামের পূর্ব্ব বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, পত্রলেখক মুখবন্ধ করিয়াছেন—

I have distinct recollection of the particular circumstances under which, he stated to me, *Rajah* came into his hands. And my recollection is confirmed by others.

রাজারামের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, ডিক নামক কোম্পানীর এক জন শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারী হরিদ্বারের মেলায় এই শিশুটিকে পাইয়াছিলেন। ডিক সাহেব শিশুটির সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে পারেন নাই। তিনি শিশুর খোরপোষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবার সময় শিশুটিকে রামমোহন রায়ের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন। ডিক সাহেব আর ভারতবর্ষে ফিরেন নাই। পত্রলেখকের বিশ্বাস ("I believe") তিনি ইংলণ্ডের পথে মারা গিয়াছিলেন।

মিস্ কলেট (Miss Sophia Dobson Collet) তাঁহার সঙ্কলিত Life and Letters of Raja Rammohun Roy নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

Rammohun Roy also took with him an adopted son, a boy of about twelve years, who was known as Ram Roy or Rajaram. Malicious gossip did not spare this lad's origin. Chunder Sekhar Deb—the disciple who, it will be remembered, suggested the formation of the Brahmo Somaj—stated in conversation with a friend, R. D. H., at Burdwan, so late as January, 1863, that "rumour had it that at one time he (Rammohun) had a mistress; and people believed Rajaram was his natural son, though he himself said Rajaram was the orphan of a Durwan of some Saheb, and Rammohun Roy brought him up. (Chapter VII)

ব্রজেন্দ্র বাবু ডাক্তার কার্পেণ্টারের নিকট প্রেরিত পত্রের বিবরণ একেবারেই বিশ্বাস করেন না। তাহার কারণস্বরূপ তিনি লিখিয়াছেন—

(১) পত্রে নিবদ্ধ "গল্প" এবং চন্দ্রশেখর দেবের "গল্প" এই "গল্প দুইটির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল নাই—অথচ বলা হইতেছে, দুইটিই রামমোহন রায়ের মুখে শোনা। তবে এ পার্থক্য কেন?"

"গল্প" দুইটির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল না থাকুক, কতক মিল ত আছেই। গল্প দুইটির যে অংশে মিল আছে সেই অংশ ব্রজেন্দ্র বাবু উপেক্ষা করেন কেন? গল্প দুইটির কথনের সময়ের ব্যবধানের দিকে লক্ষ্য করিলেই দুইয়ের পার্থক্যের একটা কারণ পাওয়া যাইতে পারে। প্রথম গল্পসহ পত্র লিখিত হইয়াছিল ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজার মৃত্যুর পর প্রকাশিত ডাক্তার কার্পেণ্টারের পুস্তিকা ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পর, অর্থাৎ ১৮৩৪ সালের শেষার্দ্ধে। ইহার ২৯ বৎসর পর চন্দ্রশেখর দেব তাঁহার গল্প বলিয়াছিলেন। ১৮৩০ সালের নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগের কত পূর্ব্বে যে রামমোহন রায় চন্দ্রশেখর দেবকে এবং অন্যান্য বন্ধুকে রাজারামের পূর্ব্বকথা বলিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা অসাধ্য। মানুষের স্মৃতিশক্তি ভ্রমপ্রমাদের অতীত নহে, এবং কালের প্রবাহ অনেক কথা বিকৃত করিতে পারে। রামমোহন রায় যে বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন রকমের "গল্প" বলিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যায় না।

(২) ডাক্তার কার্পেণ্টারকে লিখিত পত্রের "গল্প"টি যে অসার ব্রজেন্দ্র বাবু ইহা মনে করিবার আর একটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন; সেই কারণটি এই, ১৮৩৯ সালে বিলাত হইতে প্রকাশিত Alphabetical List of the Bengal Civil Servants, from 1780 to 1838 পুস্তকে যে কয় জন ডিক সাহেবের নাম আছে তাঁহাদের কাহারও কর্ম্মজীবনের বিবরণের সহিত পত্রের কথিত ডিক সাহেবের হরিদ্বারের মেলায় অজ্ঞাতকুলশীল শিশুসংগ্রহ এবং ইংলণ্ডযাত্রার পথে মৃত্যু ইত্যাদি বিবরণ খাপ খায় না। এই পুস্তকের লিখিত বিবরণ যে ভ্রমপ্রমাদরহিত তাহা প্রমাণ করিবার ভার (burden of proof) ব্রজেন্দ্র বাবুর উপর। ব্রজেন্দ্র বাবু এই ভার স্বীকার করেন নাই। পুস্তকখানিকে "মূল্যবান" এবং "প্রামাণিক" ঘোষণা করিয়া ডাক্তার কার্পেণ্টারের এক জন বিশ্বস্ত বন্ধুর বিবরণ উড়াইয়া দিয়াছেন। যদি গল্পটি বানাওটি হয়, তবে যিনি গল্পটি বানাইয়াছিলেন তিনি অবশ্য গল্পটিকে জনসমাজের গ্রহণের যোগ্য করিয়া বানাইয়াছিলেন, সুতরাং এরূপ বানাওটি গল্পে কল্পিত মানুষের স্থান হইতে পারে না। এখন দেখা যাক ব্রজেন্দ্র বাবুর মতে এই গল্পের স্রষ্টা কে? ব্রজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"জনপ্রবাদ, রাজারাম (শেখ বক্সু) বিলাত হইতে ফিরিয়া রামমোহনের বিষয়ের উপর দাবি করেন। শেষে কিছু টাকা দিয়া নাকি তাঁহাকে বিদায় করা হয়। ইহার মূলে কিছু সত্য থাকা সম্ভব, কারণ হরিদ্বারের গল্পটি পড়িলেই মনে হয়, রাজারাম রামমোহনের নিজপুত্র নামে প্রচারিত হইলে পাছে কোনদিন সে বিলাত হইতে ফিরিয়া বিষয়-সম্পত্তি দাবি-দাওয়া করে, এরূপ একটা আশঙ্কাবশেই যেন তাহাকে রামমোহনের 'পালিত পুত্র' বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টা এই গল্পটির মধ্যে রহিয়াছে।"

পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে কোন পুত্রকে বঞ্চিত করাই যদি পালিতপুত্র-প্রতিপাদক গল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য হয় তবে আদালতে সপ্রমাণ হইতে পারে এমন গল্প সৃষ্টি করিতে হয়। পালিত পুত্রের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সম্বলিত যে গল্পের প্রধান পাত্র, শিশুর সংগ্রহকার, কল্পিত, সেই গল্প অবশ্য আদালতে সপ্রমাণ করিবার আশা করা যায় না; সুতরাং কোন বুদ্ধিমান লোক কখনও এরূপ গল্পের সৃষ্টি এবং প্রচার করিতে পারেন না। রাজা রামমোহন রায়ের আদালতে মামলা-মোকদ্দমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, এবং তিনি গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের এবং বর্দ্ধমানের মহারাজের আনীত দুইটি গুরুতর মোকদ্দমায় জয়ী হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে প্রমাণরূপে গ্রহণের অযোগ্য গল্প সৃষ্টি করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এমন অনুমান অসঙ্গত। রাজারামের জন্ম-সম্বন্ধীয় দুইটি গল্পই রামমোহন রায়ের মুখে শোনা কিনা এ-বিষয়ে ব্রজেন্দ্র বাবু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন (২২৬ পৃ.)। কিন্তু চন্দ্রশেখর দেব এবং কার্পেণ্টারের পত্রলেখক এইরূপ সন্দেহের অবসর রাখেন নাই। তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা রামমোহন রায়ের মুখে শোনা। একই গল্প যে কালক্রমে দুই মুখে দুই আকার ধারণ করিতে পারে, ব্রজেন্দ্র বাবু এই কথা হিসাব করেন নাই।

রাজারাম যে পালিত পুত্র, এবং তাঁহার নামও যে রাজারাম, এ বিষয়ে প্রবল প্রমাণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথিত বিবরণ। এই বিবরণ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে" (৪র্থ সংস্করণ, ১২৯-১৩৯ পৃঃ) মুদ্রিত হইয়াছে। এই বিবরণ আদৌ ইংরেজী ভাষায় ১৮৯৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরের কুইর

(The Queen) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং এই বিবরণ প্রকাশের সময় তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। রামমোহন রায় যখন ইংলণ্ড যাত্রা করেন তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স ১৩ বৎসর। শৈশবের এবং কৈশোরের কথা ৭৯ বৎসর বয়সের লোকের মোটামুটি মনে থাকা অসম্ভব নহে। রামমোহন রায় বিলাত যাওয়ার পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের মুখে এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মুখে রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়া থাকিবেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু ছিলেন। রামমোহন রায়ের সমাধির উপর এদেশীয় রীতিতে নির্ম্মিত শিখরযুক্ত সুন্দর মণ্ডপ উভয়েরই অক্ষয় কীর্ত্তি। রামমোহন রায়ের শেষজীবনের কোন ঘটনাই বোধ হয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের অগোচর ছিল না। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বিবরণে রাজারাম সম্বন্ধে দুইটি তথ্যই পাই; রাজারাম পালিত পুত্র, এবং রামমোহন রায় তাঁহাকে 'রাজারাম' নামে ডাকিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবৃতির রাজারাম সম্বন্ধীয় অংশ ব্রজেন্দ্রবাবু স্বীয় প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন (২২৪ পৃঃ)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা যে অনাদরের বস্তু নহে প্রকারান্তরে তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবরণ অনুসারে রাজারামের বয়সের হিসাব করিয়াছেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজারামের যে পরিচয় দিয়াছেন ব্রজেন্দ্রবাবু তাহা একেবারে উপেক্ষা করিয়া কার্পেণ্টারের পত্রপ্রেরকের কথিত ডিক সাহেব এবং চন্দ্রশেখর দেবের কথিত দারোয়ান কাটাকাটি করিয়া, যে মূল কথা (রাজারাম পালিত পুত্র) সম্বন্ধে সকলের ঐক্য আছে, তাহা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের তৃতীয় অংশের প্রতিপাদ্য বিষয়, রাজারাম, ওরফে শেখবক্সু, রামমোহন রায়ের মুসলমান-প্রণয়িনীর পুত্র। এই গুরুতর সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্রজেন্দ্র বাবুর প্রথম প্রমাণ, "বিলাত-প্রবাসকালে রামমোহন রাজারামকে পুত্র বলিয়াই পরিচয় দিতেন।" ব্রজেন্দ্র বাবু নিজেই এই প্রমাণের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, "অবশ্য পালিত পুত্রকে 'পুত্র' বলিলেও কোন ভুল হয় না।" তথাপি তিনি এই প্রমাণটি ফেনাইতে ত্রুটি করেন নাই (২২৬ পৃঃ)। তার পর মুখবন্ধ করিয়াছেন—

"এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রচলিত কিংবদন্তীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। সত্য বটে, জনপ্রবাদ ও কিংবদন্তী স্বয়ং প্রমাণ নহে; কিন্তু অন্য প্রমাণ বা অনুমানের সমর্থকরূপে তাহা গ্রহণ করা চলে" (২২৭ পৃঃ)।

ব্রজেন্দ্র বাবু এখানে ঠিক উল্টা কথা বলিয়াছেন। "কিংবদন্তী স্বয়ং প্রমাণ নহে," এ কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। যাহা স্বয়ং প্রমাণ নহে তাহা কোন প্রকারেই অন্য প্রমাণের সমর্থন করিতে পারে না, এবং কোন অনুমানও সমর্থন করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন অনুমান করা যাইতে পারে না। প্রমাণহীন অনুমানের মূল্য কি? প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া অনুমান করা হয়। একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বয়ং প্রমাণ। যে কিংবদন্তী প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় তাহার প্রামাণিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে; যে কিংবদন্তী প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত না হয়, তাহা অমূলক এবং প্রমাণ রূপে গণ্য হইবার অযোগ্য।

রাজারাম যে রামমোহন রায়ের পালিত পুত্র নহেন, প্রণয়িনীর পুত্র, তাহার সম্বন্ধে কিংবদন্তীর প্রথম বাহক চন্দ্রশেখর দেব। ব্রজেন্দ্র বাবু চন্দ্রশেখর দেবকে রামমোহন রায়ের "প্রধান শিষ্য" এবং "প্রিয় শিষ্য" বলিয়াছেন। ১৮৬৩ সালে চন্দ্রশেখর দেব যাহা বলিয়াছিলেন, মিস্ কলেটের পুস্তক হইতে তাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। চন্দ্রশেখর দেব বলিয়াছিলেন, "জনরব যে রামমোহন রায়ের এক সময় একটি প্রণয়িনী (mistress) ছিল এবং লোকে বিশ্বাস করে রাজারাম রামমোহন রায়ের ঔরস পুত্র।" রামমোহন রায়ের চরিতকারেরা লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডযাত্রার সময় রাজারামের বয়স ছিল ১২ বৎসর এবং ব্রজেন্দ্রবাবু এই বয়স স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্কলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", দ্বিতীয় খণ্ডে (৩৬৪ পৃঃ) ১৮৩৬ সালের ২রা জুলাই তারিখের "সমাচার দর্পণ" হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখা যায় বিলাত গমন সময়ে রাজারামের বয়স ছিল ১৪ বৎসর এবং ১৮৩৬ সালে বয়স ২০ বৎসর। আবার ১৮৩৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের "সমাচার দর্পণে" ১০ আগষ্ট তারিখের ইংলণ্ডীয় এক সংবাদপত্র অনুসারে বলা হইয়াছে, রাজারামের বয়স তখন ১৮ কিম্বা ২০ বৎসর। ১৮৩৬ সালে রাজারামের বয়স ১৮ বৎসর হইলে, ১৮৩০ সালে তাহার বয়স ১২ বৎসর পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাই রাজারামের সঠিক বয়স মনে হয়। এই হিসাবে রাজারামের জন্ম হইয়াছিল ১৮১৮ সালে। তখন রামমোহন রায় কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। সুতরাং রামমোহন রায়ের জনরবানুযায়ী প্রণয়িনী থাকিলে সে কলিকাতায় ছিল, এবং রাজারাম যদি এই প্রণয়িনীর গর্ভজাত হয় তবে সে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় ১৮১৮ সালে রামমোহন রায়ের প্রণয়িনী থাকিলে তাহা তাঁহার "প্রিয়শিষ্য" চন্দ্রশেখর দেবের অগোচর থাকিতে পারিত না, এবং এইরূপ প্রণয়িনীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি "জনরবে"র (rumourএর) দোহাই দিতেন না। সুতরাং এই জনরব পরবর্ত্তীকালে উদ্ভাবিত অমূলক জনরব। রাজারাম যদি কলিকাতাবাসিনী প্রণয়িনীর গর্ভজাত হইত তবে তাহার জন্মকথা রামমোহন রায়ের শিষ্যগণের অগোচর থাকিতে পারিত না এবং রামমোহন রায়ও রাজারামকে তাঁহাদের নিকট পালিতপুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করিতেন না। "রামায়ণে"র রাম যেমন নিজের অন্তরে সীতাকে শুদ্ধা জানিয়াও জনপ্রবাদ শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সম্ভবতঃ চন্দ্রশেখর দেবের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল।

রামমোহন রায়ের "প্রিয়শিষ্য" চন্দ্রশেখর দেবের সমর্থনে ব্রজেন্দ্রবাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এবং "আচার্য্য" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই আচার্য্য মহাশয় আবার দোহাই দিয়াছেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের; রাজারাম "পোষ্য পুত্র" কিনা এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল। "পোষ্যপুত্র" এবং পালিত পুত্র এক কথা নহে, এবং সন্দেহ প্রমাণ নহে সন্দেহের পোষণকর্ত্তা যিনিই হউন না কেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন পরবর্ত্তী কালের লোক। ১৮৪৫ সালের কলিকাতা রিভিউ পত্রে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত-লেখক (কিশোরীচাঁদ মিত্র) অসঙ্কোচে রাজারামকে রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র বলিয়াছেন। পূর্ব্বো-ল্লিখিত ১৮৩৬ সালের ২রা তারিখে "সমাচার দর্পণে" উক্ত হইয়াছে, "প্রথমে ঐ বেচারা (রাজারাম) পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে সিবিল সম্পর্কীয় শ্রীযুক্ত ডিক সাহেব কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং ঐ সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের অতি প্রণয় প্রযুক্ত সাহেবের লোকান্তরের পরে তাঁহাকে রায়জী পোষ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।"

রাজারাম ওরফে শেখ বক্সু যে রামমোহন রায়ের প্রণয়িনীর—মুসলমান-প্রণয়িনীর—পুত্র তাহার অনুকূলে ব্রজেন্দ্রবাবুর শেষ প্রমাণ, এবং প্রধান প্রমাণ, "সুরাপান ও ছাগমাংস-ভোজনের ন্যায়, যবনী-

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আশ্রম

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

গমনের দুর্নামও তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু-সমাজ রামমোহন রায়ের উপর আরোপ করিতেন।"

"ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" নাম ধারণ করিয়া কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহন রায়কে চারিটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রবাবুর মতে চতুর্থ প্রশ্নে ছিল, "লজ্জা ও ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান ও ব্যভিচার করেন, তাঁহারা বিরুদ্ধকারী কিনা?" ব্রজেন্দ্রবাবু চতুর্থ প্রশ্নের এই পাঠ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রামমোহন রায়ের জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন (৪র্থ সং, ২২৫ পৃঃ)। কোন্ পুস্তক হইতে নগেন্দ্রবাবু এই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা তিনি বলেন নাই; ব্রজেন্দ্র বাবুও সেই বিষয়ে আমাদিগকে কোন খবর দেন নাই। ৪র্থ প্রশ্নের এই পাঠে "যাঁহারা" শব্দটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই শব্দটি উপেক্ষা করিয়া, ব্রজেন্দ্রবাবু কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া লিখিয়াছেন, "তর্কপঞ্চাননের আক্রমণ রামমোহনকে উপলক্ষ্য করিয়া" (২২৮ পৃঃ) এবং নিজের সমর্থনে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"এই সকল প্রশ্নে, রামমোহন রায়ের কোন কোন মত ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল" (জীবনচরিত, ৪র্থ সং, ২২১ পৃঃ)।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন যে রামমোহন রায়ের কোন কোন মতের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন রামমোহন রায়ের পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনা পাঠ করিলে তাহা ধরা যায়। কিন্তু তিনি যে রামমোহন রায়ের কোন কোন ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? "যাঁহারা" বহুবচন। রামমোহন রায় যে এই বহুর অন্তর্গত, স্বতন্ত্র প্রমাণ না পাইলে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। রামমোহন রায়ের "চারি প্রশ্নের উত্তর" নামক পুস্তিকায় তর্কপঞ্চাননের চতুর্থ প্রশ্নের এই পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে—

"অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসগ্রস্ত হইয়া লোকলজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়দিগের কালিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য।"

এই প্রশ্নে কথিত "অনেক বিশিষ্ট সন্তান" এবং "তত্তৎ অনুষ্ঠাতৃ মহাশয়দিগের" মধ্যে রামমোহন রায়কে গণ্য করিবার আমাদের কি অধিকার আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রশ্নকর্ত্তার মত রামমোহন রায়ও এই সকল অনাচারকে নিন্দাই করিয়াছেন, কিন্তু তান্ত্রিকের পক্ষে শোধন করিয়া সুরাপান, মাংসভক্ষণ এবং শৈব বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের তান্ত্রিক আচারের সমর্থনকে কবুল জবাব মনে করিবারই বা আমাদের কি অধিকার আছে? স্বতন্ত্র প্রমাণ ব্যতিরেকে রামমোহন রায়কে শত্রুপক্ষের কথিত "অনেক বিশিষ্ট সন্তানে"র সামিল করা অসঙ্গত। দুঃখের বিষয় ব্রজেন্দ্র বাবু মিস্ কলেটের লিখিত জীবনচরিত হইতে চন্দ্রশেখর দেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু এই উক্তির উত্তরে মিস্ কলেট্ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আলোচনা দূরে থাকুক, তাহার উল্লেখও করেন নাই। চন্দ্রশেখর দেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া মিস্ কলেট লিখিয়াছেন—

This scandalous insinuation emerges here in our sources for the first time, and then some thirty years after Rammohun's death. We have not come across the remotest semblance of evidence to sustain the charge. True Mr. Deb was an intimate disciple; but the rest of his conversation shows him to be no loyal admirer of the deceased master. And even he advanced no scintilla of proof. He merely repeated the gossip as "rumour" and what people "believed". There is no need to question his veracity. Orthodox Hindus of the Dharma Sabha type were thirsting to show up the great apostate, as they regarded him, in the blackest of colours. The fact that his wives had deserted him, and the presence of this adopted son, offered a combination of circumstances which eager malice could scarcely fail to construe in its own way. Men who made attempts on Rammohun's life were not likely to scruple about attacking his reputation. And against this rumour, so easily explained, we have to set the unanimous testimony of British missionaries to Rammohun's pure moral habits. An intimate friend like Mr. William Adam, who was closely questioned by Unitarian correspondents about Rammohun's domestic relations, could scarcely have been mistaken in his uniformly high estimate of the Reformer's character. And his aggrieved Trinitarian opponents, even in the heat of controversy, never breatheda whisper against his fair fame. The reputation that has passed scatheless and stainless the ordeal of criticism by missionaries, Baptist and Unitarian, Presbyterian and Anglican, hostile as well as sympathetic, may afford to ignore stale Hindu gossip served up a generation afterwards." *

তাৎপর্য্য। "রামমোহন রায়ের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পরে আমরা এই কলঙ্কের কথার প্রথম আভাস পাই। ইহার সমর্থনে আমরা কিছুমাত্র প্রমাণ পাই নাই। চন্দ্রশেখর দেব রামমোহন রায়ের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অবশিষ্ট উক্তিতে দেখা যায় তিনি তাঁহার মৃত গুরুর গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন না। তিনি লোকাপবাদের এবং লোকে কি বিশ্বাস করে, তাহার পুনরুক্তি করিয়াছেন। ধর্ম্মসভার গোঁড়া হিন্দুগণ রামমোহন রায়কে অপদস্থ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। যে সকল লোক তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করা অসম্ভব নহে। এই লোকাপবাদের প্রতিবাদে আমরা খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের উল্লেখ করিতে পারি। উইলিয়ম আডাম রামমোহন রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রামমোহন রায়ের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। তিনি বরাবরই রামমোহন রায়ের চরিত্র বিশুদ্ধ এ কথা বলিয়াছেন। বিরোধী খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণও তাঁহার চরিত্রের কোন দোষের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। সুতরাং এক পুরুষ পরে প্রচারিত এই সকল বাজে গুজব অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে।"

মিস্ কলেট এখানে যে-সকল যুক্তি এবং প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা কিংবদন্তী এবং ব্যক্তিবিশেষের সন্দেহের উল্লেখের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না। কিন্তু ব্রজেন্দ্র বাবু সেরূপ কোন চেষ্টাও করেন নাই। তিনি নিজের মতের অনুকূল প্রমাণ বিস্তার করিয়াছেন

* S. D. Collet, *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Calcutta, 1913, pp. 161-162.

মাত্র। রামমোহন রায়ের প্রতিবাদীগণের মধ্যে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননই তাঁহার দলের লোকের উপর সাধারণ ভাবে যবনীগমন দোষ এবং ব্যভিচার দোষ আরোপ করিয়াছেন। মিস্ কলেট যে লিখিয়াছেন, the fact that his (Rammohun's) wives had deserted him, এ কথা ঠিক নহে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন ১৮১৭ সালে। সমপাঠী এবং খুব সম্ভব সমবয়স্ক রমাপ্রসাদও বোধ হয় সেই সালেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন রামমোহন রায় কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ধর্ম্মপ্রচারে রত। মিস্ কলেটের মতে রমাপ্রসাদ রায়ের জন্মাব্দ ১৮১২ (১০ পৃঃ)। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মিস্ কলেটকে লিখিয়াছিলেন, Rammohun lived apart from his wives simply because they were Hindus, and he was considered an outcaste by them. His wives did not like to live with him (p. 711). দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে রমাপ্রসাদের জন্মকাল যদি ১৮১৭ সাল হয় এবং নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত জীবনচরিতে যাহা লিখিয়াছেন* তাহা যদি ঠিক হয় (৪র্থ সং, ৪২২ পৃঃ) তবে রামমোহন রায় তাঁহার পত্নী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন এমন কথা বলা যায় না।

বিভিন্ন জনরব হইতে রাজারামের জন্মকাহিনী আবিষ্কার করিতে গিয়া ব্রজেন্দ্র বাবু আশ্চর্য্য যোজনাশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর দেব বলিয়া গিয়াছেন—

"জনরব, এক সময়ে রামমোহন রায়ের এক প্রণয়িণী ছিল; সাধারণের বিশ্বাস, রাজারাম তাহার গর্ভজাত।"

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"অনেক লোকের সংস্কার ছিল, রাজারাম মুসলমানের সন্তান। রামমোহন রায় তাহাকে গৃহে রাখিয়া সন্তানবৎ প্রতিপালন করিতেন বলিয়া পৌত্তলিকেরা তাঁহার সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিল" (৪৩৩ পৃঃ)।

চন্দ্রশেখর দেবের শ্রুত জনরব, রাজারাম রামমোহন রায়ের নিজের সন্তান। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রুত জনরব, রাজারাম মুসলমানের সন্তান এবং রামমোহন রায়ের দ্বারা সন্তানবৎ প্রতিপালিত। রামমোহন রায়কে দ্বিতীয় জনরবের মুসলমানের সহিত অভিন্ন স্বীকার না করিতে পারিলে এবং তার পর মুসলমানকে মুসলমানী মনে না করিলে এই দুইটি জনরবের একবাক্যতা সাধন করা যায় না। ব্রজেন্দ্র বাবু এই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। প্রথম জনরবের প্রণয়িণী মাতাকে তিনি দ্বিতীয় জনরবের মুসলমান পিতার সহিত সনাক্ত করিয়াছেন, এবং পরস্পরবিরোধী জনরবদ্বয়কে দৃঢ়বদ্ধ (cement) করিবার জন্য তৃতীয় এক জনরবের আশ্রয় লইয়াছেন। যথা—

"কিংবদন্তী—আজ পর্য্যন্ত রংপুরে রামমোহন রায়ের এই প্রণয়িণীর বংশ রহিয়াছে; রামমোহন ইহার গর্ভজাত এক কন্যারও তথায় বিবাহ দিয়াছিলেন।"

রংপুরের সেই প্রণয়িণী কেমন করিয়া কলিকাতাবাসিনী এবং রাজারামের মাতা হইলেন তাহাও ব্রজেন্দ্রবাবুর জানিতে বাকী নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

"আরও শোনা যায়, রামমোহনের বিলাতযাত্রার সঙ্গী রামহরিদাস বলিতেন, রামমোহন রংপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিলে তাঁহার প্রণয়িণীও এখানে আসেন। তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রে গোপনে আসিয়া রামমোহনের সংবাদ লইয়া যাইতেন।"

ব্রজেন্দ্র বাবু এই কাহিনী কাহার নিকট শুনিয়াছেন, এবং কেইবা ইহা রামহরি দাসের নিকট শুনিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া তিনি এ উপাখ্যানের চমৎকারিত্ব নষ্ট করেন নাই। কিন্তু এই উপাখ্যানের সাহায্যেও রাজারামের জন্মরহস্য উদ্ঘাটন করা যায় না। কেন না ব্রজেন্দ্রবাবু এ পর্য্যন্ত এমন কোন জনরববাহকের আবিষ্কার করিতে পারেন নাই যিনি বলিতে পারেন যে রামমোহন রায় রংপুর হইতে আগত প্রণয়িণীর সহিত অন্ততঃ ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতায় একত্র বাস করিয়াছিলেন।

ব্রজেন্দ্র বাবুর সংগৃহীত রাজারামের জন্মকাহিনীর ভিত্তি ভারত-সরকারের দপ্তরে রক্ষিত সাবেক দলীল-দস্তাবেজ। তাঁহার এই সকল দলীলের সংগ্রহরীতি এবং ব্যাখ্যানরীতি বড়ই বিচিত্র। এইখানে ভারত-সরকারের দপ্তরে রক্ষিত সাবেক দলীল-দস্তাবেজ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লওয়া আবশ্যক। গভর্ণর-জেনারেল বা বড়লাট এবং কাউন্সিল (Council) বা মন্ত্রীসভা লইয়া ভারত-সরকার গঠিত। ভারত-সরকারের নিকট কোনও চিঠি বা দরখাস্ত আসিলেই তাহা কাউন্সিলে পেশ করিতে হইত। কাউনসিলের বৈঠকে ঐ চিঠি বা দরখাস্ত বিবেচিত হইত, উহার সম্বন্ধে সরকারের আদেশ দেওয়া হইত এবং উহার জবাব মুসাবিদা করিয়া দেওয়া হইত। তার পর সেক্রেটারী ঐ আদেশ জারি করিতেন এবং চিঠির জবাব পাঠাইয়া দিতেন। যে চিঠি বা দরখাস্ত কাউনসিলে পেশ করা হইত তাহা O. C. (Original Correspondence) অর্থাৎ মূল চিঠি-পত্র নামে দপ্তরে রক্ষিত হইয়াছে। কাউন্সিলের কার্য্যবিবরণী (consultations or proceedings) পুস্তকে ঐ চিঠির নকল, কাউনসিলের হুকুম এবং জবাবের মুসাবিদা সহ রক্ষিত হইয়াছে। কাউনসিলের প্রত্যেক বৈঠকের হুকুম সকল Body Sheet নামক নথিতে সংগৃহীত এবং রক্ষিত হইয়াছে। এখন ব্রজেন্দ্রবাবুর এই সকল কাগজ-পত্র ব্যবহারের রীতি আলোচনা করা যাউক। ব্রজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"দপ্তরখানার কাগজপত্রের মধ্যে রামমোহন রায়ের ও তাঁহার সঙ্গীদের জাহাজে যাত্রী হইবার দুইখানি অনুমতি-পত্র ছিল। রামমোহনের অনুমতি-পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ:—

"রামমোহন রায় নামক জনৈক দেশীয় ভদ্রলোক 'আলবিয়ন' জাহাজে ইংলণ্ড যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাকে জাহাজে যাত্রী হইবার অনুমতি-পত্র এই মাসের [অক্টোবর ১৮৩০] ৭ই তারিখে মঞ্জুর করা হইয়াছে।" (২১৯ পৃঃ)

এই অনুবাদ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। ব্রজেন্দ্রবাবু পূর্ব্বোক্ত ইংরেজী *Rajah Rammohun Roy's Mission to England* পুস্তকে মূল ইংরেজী অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

The Secretary reports that an order for the reception on board the Albion of a native Gentleman named Rammohun Roy proceeding to England was granted on the 7th instant in an application duly made by him for the purpose. (*Public Body Sheet*, 21 Oct. 1830, No. 95).

---

* নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত "আর্য্যদর্শনে" প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে মৃতা পত্নীর শ্মশানে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক স্তম্ভ-নির্ম্মাণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "আর্য্যদর্শনে"র প্রবন্ধ "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প" পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে (২৬-২৭ পৃঃ)।

অনুবাদে ব্রজেন্দ্রবাবু the Secretary reports "সেক্রেটারী সংবাদ দিলেন," এই অংশটি একেবারে বাদ দিয়াছেন, এবং "অনুমতি-পত্র" এই কথাটি নূতন ঢুকাইয়াছেন। মূলে আছে, order for the reception on board Albion......was granted, "আলবিয়ন জাহাজে স্থান দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল"। সুতরাং মূল ইংরেজী পাঠ করিলে পাওয়া যায় এই কয় পংক্তি অনুমতি-পত্র (passport) বা তাহার নকল নহে, order বা সংবাদ মাত্র। বিদেশযাত্রী কোন জাহাজে স্থান দানের (berth reserved করিবার) অনুমতি ছাড়পত্র বা passport নহে। এই অনুমতি দিবার ভার ছিল সরকারের পাবলিক-বিভাগের সেক্রেটারীর উপর। সেক্রেটারী রামমোহন রায়কে আলবিয়নে স্থান দিবার আদেশ দিয়া কাউন্‌সিলের ১৮৩০ সালের ১২ই অকটোবরের বৈঠকে সেই সংবাদ জানাইতেছেন। এই তারিখে কাউন্‌সিলের পাবলিক (public), বর্ত্তমান Home, বিভাগ সম্বন্ধীয় বৈঠক হইতেছিল। এই ইংরেজী অংশের মূল কোন স্বতন্ত্র কাগজের ফর্দ্দে লিখিত হয় নাই, ঐ তারিখের কাউন্‌সিলের অন্যান্য হুকুমের সঙ্গে এক খানি নথির ৯৫ দফার শেষে লিখিত আছে। রামমোহন রায়ের অনুচরগণ সম্বন্ধীয় রিপোর্টের অবিকল নকল ব্রজেন্দ্রবাবু প্রকাশ করেন নাই। আমরা এখানে তাহা অবিকল প্রকাশ করিতেছি—

EXTRACT from Home Dept. Public Body Sheet, dated 16 Nov., 1830

The officiating Secretary reports that orders for the reception of Mr. Pringle as well as of the under-mentioned individuals as passengers proceeding to the Ports and places specified having been issued on applications duly made for the purpose by the individuals themselves or by others in their behalf on the dates subjoined.

Mr. I. A. Pringle, 11th November 1830, proceeding to England on the Ship Enchantress.

Mrs. C. S. Pringle and her servant named Janet Holliday—do—

Miss Mary Marshall, 12th November, proceeding to Liverpool on the Albion.

Ramrutton Mookerjee, Hurichurn Doss and Sheik Buxoo, 15th November, proceeding to England in attendance on Rammohun Roy on the Albion.

এই রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত অনুবাদেও ব্রজেন্দ্রবাবু পূর্ব্ববৎ ভুল করিয়াছেন; the officiating Secretary reports কথা বাদ দিয়াছেন, এবং "অনুমতি-পত্র" কথাটি ঢুকাইয়াছেন। এই পর্য্যন্ত আমরা ১৩৩৬ সনের অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্র-বাবুর মূল "রামমোহন রায় ও রাজারাম" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে বচন তুলিয়া আলোচনা করিয়াছি। রিপোর্ট এবং পাসপোর্ট যে এক পদার্থ নহে এই সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রবাবুর ভ্রম কালক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৩৪২ সালের আশ্বিন মাসের "প্রবাসী"তে তিনি লিখিয়াছেন—

"এই প্রসঙ্গে আমি ইহাও বলি যে, রামমোহন রায় ও তাঁহার সঙ্গীদের পাসপোর্ট সম্পর্কিত কাগজপত্র ভারত-সরকারের দপ্তরখানায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে এইরূপ মনে করিবারও কোন হেতু নাই। তবু নিশ্চিন্ত হইবার জন্য আমি বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিসে এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাইয়াছি। এখানে বলা প্রয়োজন, বিলাতযাত্রীদের জন্য কোম্পানী যে-সকল ছাড়-পত্র মঞ্জুর করিতেন তাহার নকল যথাসময়ে বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দপ্তর বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়া আপিসে রক্ষিত আছে। আমার অনুরোধে, এই দপ্তর বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া, মিস্ এল্ এম্ এন্‌ট্‌ যে তথ্য আমাকে পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।"

তারপর Public Consultation, 12 Octr, 1830 (entry following no. 95) এবং Public Consultations, 16 Novr. 1830 (entry following no. 36) উদ্ধৃত করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—

"ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ১৮৩০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত দপ্তর পরীক্ষা করিয়া ইণ্ডিয়া আপিসেও আমি যে দুইখানি পাসপোর্ট আবিষ্কার করিয়াছিলাম তাহা ভিন্ন অন্য কোন পাসপোর্টের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং দুখানি ছাড়া অন্য কোন ছাড়পত্র যে রামমোহন বা তাঁহার সঙ্গীদের জন্য লওয়া হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহ।" (৮২৯ পৃঃ)

ব্রজেন্দ্র বাবু যদি এত আড়ম্বর না করিয়া ইণ্ডিয়া আপিস হইতে প্রেরিত কাগজে কি লেখা আছে তাহা সাবধানে পরীক্ষা করিতেন তবে দেখিতে পাইতেন বিলাত হইতে প্রাপ্ত লেখা দুইটি তাঁহার দ্বারা আংশিক ভাবে প্রকাশিত Public Body Sheet, 12 Oct., 1830, no. 95 এবং Public BodySheet, 16 Nov. 1830, no. 36 এর অবিকল নকল।

ব্রজেন্দ্র বাবু অবশ্য জানেন কাউন্‌সিলের পাবলিক-বিভাগের বৈঠক আদৌ কলিকাতায় ঘটিয়াছিল, এবং সেই সকল বৈঠকের মূল কার্য্যবিবরণী Cosultations বা Proceedings কলিকাতায় ভারত-সরকারের রেকর্ড অফিসে রক্ষিত হইয়াছে, দেখিতে চাহিলেই অবিলম্বে দেখিতে পাওয়া যায়। রেকর্ড অফিসে যে সুন্দর সূচীপত্র (index) আছে তাহার সহায়তায় আবশ্যক কার্য্যবিবরণ সহজে বাহির করা যায়। ব্রজেন্দ্র বাবু কলিকাতায় ভারত-সরকারের রেকর্ড অফিসে রক্ষিত Political Consultations অর্থাৎ পররাষ্ট্র-বিভাগ সম্বন্ধে কাউন্‌সিলের কার্য্যবিবরণী হইতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ইংরেজী পুস্তকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি কি জানেন না যে মূল Public Consultations কলিকাতায়ই আছে?

কাউন্‌সিলের পাবলিক-বিভাগের বৈঠকের কার্য্যবিবরণীর অন্তর্গত সেক্রেটারীর রিপোর্টকে পাসপোর্ট বলিয়া ব্রজেন্দ্র বাবু পাঠকগণকে বিপদে ফেলিয়াছেন। পাসপোর্ট বলিতে এখন যে ছাড়পত্র লইয়া বিদেশে যাইতে হয় তাহাই বা তেমন কিছু বুঝায়। সুতরাং সেকালের সম্বন্ধে পাসপোর্ট শব্দটি ব্যবহার করিলে মনে হইতে পারে, সেকালেও একালের রীতিই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই, সেক্রেটারীর রিপোর্টে পাসপোর্টের নামগন্ধ নাই। সেক্রেটারীর রিপোর্টে আলবিয়ন জাহাজে জায়গা রাখার কথা আছে মাত্র। এই সহজ সংবাদকে পাসপোর্টে পরিণত করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবু গোলের সৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, রামমোহন রায়ের আলবিয়ন জাহাজে ইংলণ্ডযাত্রা সম্বন্ধে "গভর্ণমেণ্ট রেকর্ডস্ বর্ত্তমানে যে আকারে পাইতেছি তাহা সম্পূর্ণ নহে" (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪২, ৫১৫ পৃ.)। ব্রজেন্দ্র বাবু যদি কলিকাতা রেকর্ডস্ অফিসে রক্ষিত ১৮৩০ সালের অক্‌টোবর এবং নবেম্বর মাসের Public Consultations (Proceedings) পরীক্ষা করিতেন তবে দেখিতে

পাইতেন, রামমোহন রায়ের নিজের এবং অনুচরগণের আলবিয়ন জাহাজে জায়গা রাখার জন্য লিখিত দুইখানি চিঠির এবং সেক্রেটারীর জবাবের নকল তাহাতে নাই, এবং এই কার্য্যবিবরণী-সম্পর্কিত মূল কাগজের (O. C. র) মধ্যেও রামমোহন রায়ের মূল চিঠি দুইখানি এবং সেক্রেটারীর জবাবের নকল নাই। সুতরাং রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে রেকর্ডস আপিসের কাগজাদি যে অসম্পূর্ণ, এ কথা বলাই বাহুল্য।

ব্রজেন্দ্র বাবুর আর একটি মস্ত ভুল, "রামমোহনের সঙ্গীদের অনুমতি-পত্রের তারিখ ১৫ই নবেম্বর ১৮৩০, অর্থাৎ জাহাজ ছাড়িবার দিন'" (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬, ২১৯ পৃ.)। জাহাজে যাওয়ার অনুমতি-পত্র পাওয়া মাত্রই জিনিষপত্র গুছাইয়া সেই তারিখে জাহাজে উঠা সহজ নহে। সেক্রেটারীর জবাবের তারিখ ১৫ই নবেম্বর, ১৮৩০। সেই জবাব রামমোহন রায়ের এবং জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে ডাকে না হউক লোকমারফতে পৌঁছিতেও অবশ্য কিছু সময় লাগিয়া থাকিবে। সুতরাং ১৫ই তারিখে আলবিয়ন ছাড়া ঠিক হইলে সেক্রেটারী নিশ্চয়ই তাহার দুই-এক দিন আগে হুকুমনামা পাঠাইয়া দিতেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ১৮৪৫ সনের কলিকাতা রিভিউর লেখক কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, রামমোহন রায় ১৮৩০ সালের ১৫ই নবেম্বর আলবিয়ন জাহাজে চড়িয়াছিলেন, কিন্তু উঁহারা এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। অথচ মিস্ মেরী কার্পেণ্টার ১৮৩২ সালের জুন মাসের *Christian Reformer* পত্র হইতে এই প্রমাণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

We are pleased to find the following announcement at the close of some 'Preliminary Remarks': the Rajah had just stated that he sailed from Calcutta, Nov. 19, 1830, and arrived in England, April 8, 1831.*

মিস্ কলেটও ১৯শে নবেম্বর রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার তারিখ স্বীকার করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু যে কেন রামমোহন রায়ের নিজের উক্তি অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি না।

রামমোহন রায় আলবিয়ন জাহাজে তিন জন অনুচরের জায়গা চাহিয়া যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে রামরতন মুখুজ্জে (Ramrutton Mookerjee), হরিচরণ দাস (Hurichurn Doss) এবং সেখ্ বক্সুর (Sheikh Buxoo) নাম দিয়াছিলেন। তিনি কোন্ তারিখে যে এই দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না। দরখাস্ত অনুসারে এই তিন নামেই জাহাজে তিনখানি সীট seat) দিবার হুকুম বাহির হইয়াছিল। Public Consultations এবং Body Sheet এ রক্ষিত সেক্রেটারীর রিপোর্টে যে পর্য্যায়ে এই তিন জন অনুচরের নাম লেখা হইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। খুব সম্ভব এই পর্য্যায়েই রামমোহন রায়ের মূল দরখাস্তে এই তিন জনের নাম লিখিত হইয়াছিল। এই পর্য্যায়ে তিন জনের নাম দেখিয়া মনে হয় ইহাদের মধ্যে শেখ বক্সু সকলের নিম্ন স্তরের অনুচর ছিলেন। শেখ বক্সু এক জন সাধারণ চাকর না হইলে রামরতনের এবং হরিচরণের পরে তাহার নাম স্থান পাইত না। আমরা দেখাইব তাহার বক্স নাম (ডাকনাম বক্সু) তাহাই সূচিত করে।

এখন জিজ্ঞাস্য, আলবিয়ন জাহাজে রামমোহন রায় স্থান ঠিক করিলেন রামরতন মুখুজ্জে, হরিচরণ দাস এবং শেখ বক্সুর জন্য, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছিল রাজারাম, রামরতন মুখুজ্জে এবং রামহরি দাস। হরিচরণ দাস ও শেখ বক্সু কোথায় গেল, এবং রাজারাম ও রামহরি দাস কোথা হইতে আসিল? ভারত-সরকারের আপিসে Public Body Sheetএর মধ্যে রামমোহন রায় এবং তাঁহার তিন জন অনুচরের অনুমতি-পত্র বা পাসপোর্ট আবিষ্কার করিয়াছেন এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রজেন্দ্র বাবু এই সমস্যার সমাধানের জন্য এই প্রকার জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন—

"তবে রামমোহন কি হরিচরণ দাস ও শেখ বক্সুর নামে অনুমতি লইয়া রামহরি দাস ও রাজারামকে বিলাত লইয়া গিয়াছিলেন? এরূপ মিথ্যার আশ্রয় লইবার কারণ অথবা সম্ভাবনাই বা কি?

* * *

"তবে হরিচরণ দাস ও শেখ বক্সুই কি রামহরি দাস ও রাজারামের নামান্তর? কিন্তু তাঁহাদের নামের এরূপ পরিবর্ত্তন হইল কেমন করিয়া?"

তারপর ব্রজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"সুখের বিষয়, আমাদের সন্দেহ নিরাকরণের কিছু সূত্র আছে। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত, রামমোহন রায়ের প্রদৌহিত্র শ্রীযুক্ত নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "মহাত্মা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প" পুস্তিকায় আছে—

"রাজা রামমোহন রায়ের সহিত যাঁহারা ইংলণ্ড গমন করেন, তাঁহাদের প্রকৃত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আপন নামের যোগে নাম রাখেন।"

দুঃখের বিষয় নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তিকাখানি হইতে ব্রজেন্দ্র বাবু যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা অসম্পূর্ণ। রামমোহন রায় তাঁহার সঙ্গীদিগের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের নামের যোগে নাম রাখিয়াছিলেন, নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। যথা—

"রামরতনের পূর্ব্বনাম—শম্ভু এবং রামহরি দাসের পূর্ব্বনাম হরিদাস।"

এই পংক্তিতে শেখ বক্সুর নাম নাই বলিয়াই কি ব্রজেন্দ্র বাবু ইহা উদ্ধৃত করেন নাই? ১২৮৭ সনে মুদ্রিত নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তিকার ৫৭ পৃষ্ঠার তারকা-চিহ্নিত পাদটীকায় গ্রন্থকার এই নাম-পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই পাদটীকা তিন পংক্তিতে সমাপ্ত। ব্রজেন্দ্র বাবু দুই পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। তৃতীয় পংক্তিতে দুই জনের নাম পরিবর্ত্তনের কথা আছে, শেখ বক্সুর নাম পরিবর্ত্তনের কথা নাই. সুতরাং এই প্রমাণের বলে রামমোহন রায় শেখ বক্সুর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাজারাম নাম রাখিয়াছিলেন এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই প্রমাণের বলে আলবিয়ন জাহাজে জায়গার জন্য দরখাস্ত করার পরে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক কোন অনুচরের নাম-পরিবর্ত্তনও সিদ্ধ হয় না। ঐ দরখাস্তে রামরতন মুখুজ্জের নামই আছে, এবং দরখাস্তের হরিচরণ দাস এবং হরিদাস এক নাম নহে। নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় কোন্ প্রমাণের বলে যে দুইজনের নাম পরি-বর্ত্তনের কথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তিনি লেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার কথার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায় না। ব্রজেন্দ্রবাবুও বোধ হয় এইরূপই মনে করেন। কারণ যদিও তিনি লিখিয়াছেন, "সুতরাং নিজ নামের যোগে তিনি যে সহযাত্রীদের নাম করেন, ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে," তথাপি তিনিও

* Mary Carpenter, *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy*, 2nd edition, Calcutta, 1915, p. 120.

শেখ্ বক্‌সু সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, এবং লিখিয়াছেন—

"এমনও হইতে পারে যে, বিলাত যাইবার পূর্ব্বে শেখ বক্‌সুর ডাকনাম ছিল রাজারাম ; বাংলা-সরকারের নিকট হইতে তাহার প্রকৃত নামেই অনুমতি-পত্র চাওয়া হইয়াছিল" (২২১ পৃঃ)।

শেখ উপাধি, এবং 'বক্‌সু' 'বক্‌স' শব্দের অপভ্রংশ। বক্‌স অর্থ বক্‌সিস্, দান। কেবল 'বক্‌স' মুসলমানের নাম হইতে পারে না।* কিন্তু বক্‌সু ডাকনাম হইতে পারে, অর্থাৎ খোদাবক্‌সকে বক্‌সু বলিয়া ডাকা যাইতে পারে। বক্‌সু যেমন ডাকনাম ভিন্ন প্রকৃত নাম হইতে পারে না, তেমন 'রাজারাম' প্রকৃত নাম ভিন্ন ডাকনাম হইতে পারে না। ডাকনাম হইতে পারে 'রাজা' অথবা 'রামা'। 'রাজা' যে রাজারামের ডাকনাম ছিল তাহার প্রমাণ ডাক্তার কার্পেণ্টারের প্রাপ্ত পূর্ব্বোদ্ধৃত চিঠিতে এবং অন্যান্য কাগজপত্রে পাওয়া যায়।

শেখ বক্‌সু-রাজারাম প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্র বাবু যতগুলি ভুল করিয়াছেন তাহা যদি শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াও লওয়া যায়, অর্থাৎ যদি স্বীকার করা যায় ব্রজেন্দ্র বাবু ভারত-সরকারের দপ্তরে শেখ বক্‌সুর পাসপোর্টের নকল আবিষ্কার করিয়াছেন, নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় বলিয়া গিয়াছেন শেখ বক্‌সুর নামপরিবর্ত্তন করিয়া রাজারাম নাম রাখা হইয়াছিল, রাজারাম শেখ বক্‌সুর ডাকনাম ছিল, এবং ১৮৩০ সালের ১৫ই নবেম্বরই আলবিয়ন ছাড়িয়াছিল, তথাপি রাজারাম যে রামমোহন রায়ের পালিত পুত্র নয়, একথা প্রমাণিত হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শেখ বক্‌সু নামক ব্যক্তিরও পালিত পুত্র হওয়া সম্ভব। তবে শেখ বক্‌সু কোথায় গেল এবং রাজারাম কেমন করিয়া ইংলণ্ডে পৌঁছিল?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন্ তারিখে যে রামমোহন রায় রামরতন মুখুজ্জে, হরিচরণ দাস এবং শেখ বক্‌সুকে আলবিয়ন জাহাজে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না। ১৮৩০ সালের ১৫ই নবেম্বর সেক্রেটারী এই দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়াছিলেন, এবং তাহার চার দিন পরে, ১৯শে নবেম্বর, আলবিয়ন জাহাজ ছাড়িয়াছিল। ব্রজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"যে দিন জাহাজ ছাড়ে ঠিক সেই দিনই রামমোহনের সঙ্গীদের— রামরতন, হরিচরণ ও শেখ্ বক্‌সুকে জাহাজে যাত্রী হইবার অনুমতি-পত্র দেওয়া হয় ; পুনরায় সেই দিনই আবার শেখ বক্‌সুর নাম বাতিল করিয়া রাজারামের যাত্রী হওয়ার কথা মানিয়া লওয়া কতটা সঙ্গত হইবে জানি না" (২২০ পৃঃ)।

কিন্তু অনুমতি-পত্র বাহির হইবার চার দিন পরে জাহাজ ছাড়িলে শেখ বক্‌সুর পরিবর্ত্তে রাজারামকে (এবং হরিচরণ দাসের পরিবর্ত্তে রামহরি দাসকে) সঙ্গে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইতে পারে না। রামমোহন রায় তিন জন অনুচর লইয়া আলবিয়ন জাহাজে যাইবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, অর্থাৎ জাহাজে তিন জন অনুচরের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এমত অবস্থায় অপরিহার্য্য হইলে কোন এক জন অনুচরের পরিবর্ত্তে তাঁহার আর এক জন অনুচর সঙ্গে লইয়া যাইবার অনুমতি সহজেই পাওয়ার কথা। রামমোহন রায় যখন আদৌ তিন জন অনুচরের জন্য আলবিয়ন জাহাজে জায়গা চাহিয়া দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তখন রাজারামের যাওয়ার কথা ছিল না। তার পর যখন যাত্রার দিন ঘনাইয়া আসিল তখন পিতা-মাতা উভয়স্থানীয় পালক পিতার সঙ্গে যাইবার জন্য হয়ত রাজারাম বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িল, সুতরাং তাহাকে ফেলিয়া যাওয়া সহজ হইল না। রাজা রামমোহন রায় রাজারামের আবদার ঠেলিতে না পারিয়া অগত্যা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং এক জন ভৃত্যকে বাদ দিয়া তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানটি রাজারামকে দিয়াছিলেন। এইরূপ বন্দোবস্তে কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না।

যাঁহারা চন্দ্রশেখর দেবের জানা নয় কিন্তু শোনা অপবাদ বিশ্বাস করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে রাজারামের জন্মের অন্ততঃ ৪ বৎসর পূর্ব্বে ১৮১৪ সালে রামমোহন রায় যখন কলিকাতা আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর (১৭৭৪ সালে জন্ম হইলে ৪০ বৎসর)। কলিকাতা আসিয়াই তিনি এক বৎসরে শঙ্করভাষ্যের বাঙ্গালা মর্ম্মসহ "বেদান্ত গ্রন্থ" নাম দিয়া বেদান্ত সূত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি মূর্ত্তিপূজার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখনই সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। ১৮১৬ সালে প্রকাশিত সানুবাদ ঈশোপনিষদের অনুষ্ঠানে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন—

"বেদান্তের বিবরণ ভাষাতে হইবার পরে প্রথমতঃ স্বার্থপর ব্যক্তিরা লোক সকলকে ইহা হইতে বিমুখ করিবার নিমিত্ত নানা দুষ্প্রবৃত্তি লওয়াইয়াছিলেন। এখন কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে এ গ্রন্থ অমুকের মত হয়, তোমরা ইহাকে কেন পড় এবং গ্রহণ কর অর্থাৎ ইহা শুনিলে অনেকের অভিমান উদ্দীপ্ত হইয়া এ শাস্ত্রকে এক জন আধুনিক মনুষ্যের মত জানিয়া ইহার অনুশীলন হইতে নিবর্ত্ত হইতে পারিবেন। অত্যন্ত দুঃখ এই যে, সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা এমত সকল বাক্য কি রূপে কর্ণে স্থান দেন। কোনো শাস্ত্রকে ভাষায় বিবরণ করিলে সে শাস্ত্র যদি সেই বিবরণ-কর্ত্তার মত হয় তবে ভগবদগীতা যাহাকে বাঙ্গালি এবং হিন্দোস্থানি ভাষায় কয়েক জন বিবরণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির মত হইতে পারে ও রামায়ণকে কীর্ত্তিবাস আর মহাভারতের কতক কতক কাশীদাস ভাষায় বিবরণ করেন তবে এ সকল গ্রন্থ তাঁহাদের মত হইল আর মনু প্রভৃতি গ্রন্থের অন্য অন্য দেশীয় ভাষাতে বিবরণ দেখিতেছি তাহাও সেই সেই দেশীয় লোকের মত তাঁহাদের বিবেচনায় হইতে পারে, ইহা হইলে অনেক গ্রন্থের প্রামাণ্য উঠিয়া যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকল অনায়াসেই জানিবেন যে এ কেবল দুষ্প্রবৃত্তিজনক বাক্য হয়। এ সকল শাস্ত্রের শ্রমপূর্ব্বক ভাষা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহার মত জ্ঞান স্বদেশীয় লোক সকলের অনায়াসে হইয়া এ অকিঞ্চনের প্রতি তুষ্ট হয়েন কিন্তু মনোদুঃখ এই যে অনেক স্থানে তাহার বিপরীত দেখা যায়।"

এদেশে তৎকালে ভাষ্যসহ বেদান্ত দর্শনের পঠন-পাঠন ছিল না। কাজেই বিরোধী পক্ষ রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা বিবরণ সহ "বেদান্ত গ্রন্থের" মতামত গ্রন্থকর্ত্তার স্বকপোলকল্পিত বলিতে সাহস করিয়াছিলেন। বেদান্তে পারদর্শী অধ্যাপক না থাকায় অনুবাদ-কার্য্যে রামমোহন রায়কে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। উপনিষদ সকলের অনুবাদেও তাঁহাকে সেইরূপ পরিশ্রমই করিতে হইয়াছিল। যিনি এই প্রকার বহুশ্রমসাধ্য শাস্ত্রচর্চ্চায় এবং তৎকালে অভাবনীয় ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহার

* মুসলমানের মধ্যে 'বক্‌স' যোগে এই সকল নাম দেখা যায়, খোদাবক্‌স, এলাহিবক্‌স, রহিমবক্‌স, করিমবক্‌স, পীরবক্‌স ইত্যাদি। হিন্দুর মধ্যে শিববক্‌স, রামবক্‌স।

পক্ষে প্রণয়িনীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হওয়া বা শৈববিবাহ কতটা সম্ভব, তাহা নিরপেক্ষ সুধীজনের বিবেচ্য।*

* ব্রজেন্দ্রবাবু "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"র ২য় খণ্ডের ভূমিকায় (১।০ পৃঃ) ১৮৩০ সালের ৪ঠা এবং ৮ই নবেম্বর এই দুই তারিখের "সমাচার চন্দ্রিকা"র দুই সংখ্যা হইতে "দ্বিজরাজের খেদোক্তি" নামক কবিতার বিন্দুচিহ্নদ্বারা চারি অংশে বিভক্ত ২০ পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই কবিতায় দেখা যায়, "যবন আচার" দ্বিজরাজের "পরম সুন্দরী" "সুপ্রিয়বাদিনী" "যবনী প্রেয়সী" আছে। তাহার গর্ভজাত সুপুত্রকে তিনি "রাজা" নাম দিয়া নিকটে রাখিয়াছিলেন। তাহার (যবনীর) গর্ভে "সুলক্ষণা" "রূপে গুণে ধন্য" এক কন্যাও জন্মিয়াছেন। তারপর—

"এ সকল ছেড়ে ছুড়ে যাইতে হইল।
কেবল সুপুত্র রাজা সঙ্গেতে চলিল।"

এই কবিতাকার আমাদিগকে যে সকল সংবাদ দিয়াছেন তাহা তিনি কিংবদন্তীমূলক বলেন নাই, প্রত্যক্ষদর্শীর মত লিখিয়াছেন। কিন্তু এখানে যবনী প্রণয়িণীর পুত্রকে "বক্স" নাম দেওয়া হয় নাই, "রাজা" (রাজারাম) নামই দেওয়া হইয়াছে, এবং "রাজা" নামক সুপুত্র যে পিতার সঙ্গে যাইতেছেন এ সংবাদও দেওয়া হইতেছে। সুতরাং এই কবিতাকার আলবিয়ান জাহাজ ছাড়িবার অন্ততঃ ১১ দিন পূর্ব্বে (৮ই নবেম্বর) জানিতেন রাজারাম রামমোহন রায়ের সঙ্গে বিলাত যাইতেছেন। এই কবিতা উদ্ধৃত করিতে গিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "রাজারাম যে প্রকৃত প্রস্তাবে রামমোহনের মুসলমান প্রণয়িণীর গর্ভজাত সন্তান" "দ্বিজরাজের খেদোক্তি"তে "এ-বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।" রাজারাম বক্স নামে পরিচিত ছিল না এবং সে বক্স সাজিয়া বিলাত যায় নাই, এ-বিষয়ে যে এই কবিতায় স্পষ্টতর ইঙ্গিত আছে, ব্রজেন্দ্রবাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই। ১৮২৯ সালের শেষ ভাগে সতীদাহ রহিত হইলে গোঁড়া হিন্দু সমাজ ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, এবং সতীদাহের পুনঃ-প্রচলনের চেষ্টা করিবার জন্য "ধর্ম্মসভা" স্থাপিত হইয়াছিল। এই সভার সম্পাদক ছিলেন "সমাচার চন্দ্রিকা"র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে "সমাচার চন্দ্রিকা"র এই "খেদোক্তি" ক্ষেপার উক্তি। সমসময়ের 'সমাচার দর্পণে' ও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মা-ছাড়া

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়

আঁধার রাতের নিরালাতে
মনটা কেমন করে!
কত দূরে আছ, মা গো,
ফিরে এস ঘরে।
বেদন-বাঁশী নিঝুম রাতে
জানায় তোমার কথা,
উছলিত অশ্রুরাশি
জাগায় বুকে ব্যথা।
তারায় ভরা আকাশ পানে
শুধুই চেয়ে থাকি,
কত কথা জাগে বুকে,
তুমি বোঝ না কি?
ভোরের বেলা শিউলিতলে
ঝরা ফুলের রাশে,
তোমার মুখের সুধা হাসি
দেখি যে গো ভাসে!
কেমন ক'রে আমায় তুমি
ভুলে আছ, মা গো,
একটিবার কি আমার কথা
মনে পড়ে না গো?

উষা যখন আকাশ জুড়ে
পরে সোনার শাটী,
তোমার রূপটি ভাবি আমি
বসি একেলাটি।
বাদল-দিনে উদাস মনে
চাহি মেঘের পানে,
করুণ তোমার নয়ন যেন
কতই চমক হানে!
পূরবীতে বাজিয়ে বাঁশী
বিদায় মাগে রবি,
রাঙা আলো আকাশ-পারে
ফেলে তোমার ছবি!
লুটিয়ে আঁচল সন্ধ্যারাণী
নামে কাননতলে,
তোমার কথা স্মরণ-ভেলায়
ভাসে নয়নজলে!
স্নেহময়ী, মা গো আমার,
ফিরে এস ঘরে,
তোমায় ছেড়ে একলা আমি
সারা বিশ্ব'পরে!

বক্সা-ভ্রমণ

শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী, এম-এ

ভুটান-প্রান্তে ইংরেজ রাজ্যের শেষ সীমায় অবস্থিত পাহাড়-ঘেরা নিবিড় সৌন্দর্য্যভরা এই স্থানটি দেখার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। কুচবিহার হইতে সেখানকার কলেজের কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীবাবুর সঙ্গে সেখানে যাই। কুচবিহার হইতে এক দিন সকালে আহারাদি সারিয়া যথারীতি টিকিট কাটিয়া রেলে উঠিলাম। বসিয়া হাঁপ ছাড়িবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সত্য কথা বলিতে এই রেল-টেলগুলি আমাদের ভারতীয় ধাতে এখনও ভালরূপ বরদাস্ত হয় না; এর সবকিছুতেই যেন একটা তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ির ভাব লাগিয়াই আছে। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করলে কিন্তু মন্দ লাগে না, অবশ্য যদি বসিবার একটু জায়গা পাওয়া যায় এবং সঙ্গে লটবহর বেশী না থাকে। গাড়ীর গতিবেগের সহিত যখন বড় বড় মাঠ, ছোট ছোট ঝোপ, হরেক রকম গাছ, আর মাঝে মাঝে দুই-একটা গ্রাম এক-এক বার দেখা দিয়াই অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল, তখন ঘন ঘন দৃশ্যপট-পরিবর্ত্তনে একেবারে মন্দ লাগিল না। দুই-একটি ছোট নদীর পুলের উপর দিয়া যখন গাড়ী যাইতে লাগিল তখন দেখিলাম সেই আঁকাবাঁকা নদীর দুই ধারের ঝোপ লতাগুল্ম দুই দিক হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া জলের মধ্যে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিতে গিয়া যেন জায়গায় জায়গায় মাথা ঠেকাঠেকি করিয়া রহিয়াছে। জল তার নীচে খুব ধীর গতিতে চলিয়াছে, পাছে তাহাদের গোপন কথার ব্যাঘাত হয় যেন এই ভয়ে। ক্রমে গাড়ী বাণেশ্বর ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। ষ্টেশনের নিকটে একটি পুকুর ও তাহার পাড়ে শিবমন্দির গাড়ী হইতেই দেখা গেল। এখানে শিবরাত্রির সময় মেলা হয় ও বহু যাত্রীর সমাগম হয়। তার পর আমাদের গাড়ী চলিতে চলিতে একটি অপেক্ষাকৃত বড় নদীর পুল অতিক্রম করিয়া আলিপুর-দুয়ারে পৌছিল। এই নদীর এক-পারে কুচবিহারের এলাকা, আর এক পারে ইংরেজ-এলাকায় অবস্থিত ঐ আলিপুর-দুয়ার জলপাইগুড়ি জেলার একটি সবডিভিসন। লোকজন, গাড়ীঘোড়া, কাছারী প্রভৃতি সবডিভিসনের মহিমাব্যঞ্জক দ্রব্যের এখানে সমাবেশ আছে দেখিলাম।

গাড়ী আবার শব্দায়মান হইল। কয়েকটা মাঠ পাড়ি দিয়া দমনপুর আসিল। ষ্টেশনের চারি দিকে উলুখড়ে-ভরা জনবিরল বড় বড় মাঠ, আর গাড়ীর সম্মুখে কিছু দূরে মাঠের উত্তরে তরাইয়ের কৃষ্ণবর্ণ জঙ্গলরেখা উভয় দিকে যত দূর দেখা যায় বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। দমনপুর অতিক্রম করিয়া গাড়ী জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। কি গভীর সেই জঙ্গল! কোন জায়গায় ছেদ নাই। কত রকমের লতাপাতা ছোট বড় গাছ মিলিয়া এক বিরাট গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই দুপুরবেলায়ও যেন অন্ধকার হইয়া গেল। এক প্রকার ঝিল্লির গভীর ধ্বনিতে সমস্ত বনভূমি ঝঙ্কৃত হইতেছে। ক্রমে গাড়ী রাজাভাতখাওয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষ্টেশনের চারি দিকে অনেকখানি জায়গার জঙ্গল কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। সেখানে বিস্তর বড় বড় শালের গুঁড়ি সব গড়াগড়ি যাইতেছে। এই জায়গা শালকাঠ-রপ্তানীর একটি প্রধান কেন্দ্র। কয়েকটি বড় বড় কাঠের দোতলা বাংলো আছে; ফরেষ্ট অফিসের সাহেব অফিসার প্রভৃতি থাকেন। যুদ্ধের সময় কাঠের ছাল হইতে রং ও নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের একটি বড় কারখানা কোন সাহেব কোম্পানী কর্ত্তৃক এখানে স্থাপিত হইয়াছিল,—যুদ্ধের পর বাজার মন্দা পড়ায় কারবার ফেল হইয়া এখন শুধু ঘরবাড়ি আর কলকারখানা পড়িয়া আছে গাড়ী হইতেই দেখিলাম। রাজাভাতখাওয়া জংশন-ষ্টেশন। গাড়ী বদলাইয়া পার্শ্বস্থ জয়ন্তী-গামী গাড়ীতে আমাদের উঠিতে হইল। আর পরিত্যক্ত গাড়ীখানি এখান হইতে বরাবর গারোপাড়া, কালচিনি প্রভৃতি বহুবিস্তৃত চা-বাগানের মধ্য দিয়া এদিকের রেলের শেষ সীমা দালসিংপাড়া যাইবে। এই রাজাভাতখাওয়া নামের সহিত কিংবদন্তী জড়িত আছে যে কুচবিহারের বহু পূর্ব্ব কালের

কোন মহারাজা ভুটান হইতে ফিরিবার পথে এখানে আহারাদি সম্পন্ন করেন; সেই হইতে এখানকার নাম রাজাভাতখাওয়া।

আধ ঘণ্টা পরেই আমাদের গাড়ী বংশীবাদনপূর্ব্বক এবার গভীরতম জ লের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ছোটবেলায় "অস্তি গোদাবরীতীরে বিশাল শাল্মলীতরু"র কথা পড়িয়াছিলাম; আজ এই গহন বনে শালবৃক্ষ যে কিরূপ বিশাল হয় বিস্ময়-পুলকে দেখিতে লাগিলাম। লোকের ঘরবাড়ির চিহ্নমাত্র নাই, এ যেন জঙ্গলেরই রাজত্ব। আবার কোন কোন জায়গায় এমন নিবিড় যে 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন ভাতি চন্দ্রতারকম্'। এই সব জঙ্গলে বন্যহস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, বাইসন, বন্যমহিষ প্রভৃতি যথাসুখে বিচরণ করিয়া থাকে। এজন্য গাড়ী মাঝে মাঝে ষ্টীমারের সিটির মত জোরে জোরে বাঁশী দিতে দিতে চলিয়া থাকে। চলন্ত গাড়ীর মধ্যে বসিয়া বিবিধ তরুলতাগুল্মের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।

গাড়ী যখন বক্সারোড ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী তখন জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সামনের দিকে চাহিয়া অবাক্ হইলাম,—কি গভীর মেঘ করিয়াছে এই শীতকালে। কিছু উদ্বেগেরও কারণ ঘটিল, কেন না ষ্টেশন হইতে বক্সা প্রায় পাঁচ মাইল পথ এবং হাঁটিয়াই যাইতে হইবে। কিন্তু কালো মেঘের মধ্যে সাদা চতুষ্কোণ বড় কাগজের দোয়াতের আকারের ও দুটাট কি! ফণী বাবু দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ও মেঘ নয় পাহাড়, ঐ সাদা দুটো পাহাড়ের চূড়ার উপর অবস্থিত দুটো পিকেট, বক্সা-কেল্লা রক্ষার জন্য ওখান হইতে দূরবীণ দিয়া শত্রুর গতিবিধি দেখা হয়, আরও একটি পিকেট আছে এখান হইতে দেখা যাইতেছে না; ওখানেই ত আমাদের যাইতে হইবে।" ওঃ কি উঁচু! কিন্তু মেঘের মত নিবিড় অন্ধকার, ওই পাহাড়ে উঠিবার আনন্দে সে-কথা মনে স্থান দিলাম না। সাঁওতাল পরগণার ছোট-বড় অনেক পাহাড় দেখিয়াছি, কিন্তু স্তরের পর স্তর সাজান অসংখ্য উচ্চ পাহাড়ের এমন মেঘ-নিবিড় রূপ ত দেখি নাই। চোখ আর আমার ফিরিতে চায় না।

ষ্টেশনে নামিয়া ব্যাগ দুইটি ফণীবাবু এক জন পরিচিত ভুটিয়ার হাতে পৌঁছিয়া দিবার জন্য সমর্পণ করিয়া একটি রাস্তার উপর দিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে রওনা হইলেন। এই রাস্তাটি জনবিরল গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া বক্সার উপর দিয়া শিঞ্চুলা গিরিমালা পার হইয়া খাস ভুটান-রাজ্যে গিয়াছে। কিছু দূর অগ্রসর হইতেই আমরা বুঝিলাম ক্রমশঃ উঁচুতে উঠিতেছি—গতিবেগ কমিয়া আসিতে লাগিল এবং পৌষ মাসের দিনেও ঘাম ছুটিতে লাগিল। একটি বাঁকের মাথায় আসিয়া দেখিলাম আমরা অনেকখানি উপরে উঠিয়াছি। নীচে ঢালু জঙ্গলরেখা দেখা যাইতেছে, ছোট-বড় সব পাহাড় আমাদের আশপাশে রহিয়াছে। নীচে বনের মধ্য হইতে ঝম ঝম শব্দ পার্ব্বত্য ঝরণার পরিচয় জানাইতেছে। প্রায় তিন মাইল আসার পর একটি খোলা জায়গায় কতকগুলি কাঠের ঘর দেখিলাম। ইহা একটি ছোট পল্লী। এখানে আমরা বিশ্রাম করিয়া ঝরণার জলে হাত-মুখ ধুইয়া আবার যাইতে লাগিলাম। এবার কেবলই খাড়া চড়াই অতিক্রম করিবার পালা। পর্ব্বতের গা দিয়া পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া উপরে উঠিয়াছে। পাহাড়গুলি মাথা অবধি ঘন বনে ভরা। যে-দিকে তাকাই চোখ যেন আর ফিরিতে চায় না। কি সে রূপ! শ্যামস্নিগ্ধ কি সে কান্তি! ক্রমে এক জায়গায় পথের ধারে ঝরণার জলধারা দেখা দিল। পাথরের উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে প্রচুর জলকণার সহিত সুরের মূর্চ্ছনা ছড়াইয়া বনের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে স্বচ্ছ এই জলধারা।

সামনেই বক্সা পোষ্ট-অফিসের করোগেট-টিনমণ্ডিত দারুময় গৃহ দেখা দিল। আর একটু উপরে উঠিয়া কেল্লার সম্মুখে আসিলাম। কেল্লাটি নেহাৎ ছোট নয়; একটি পাহাড়ের মাথা কাটিয়া চৌরস করিয়া উচ্চ পাথরের প্রাচীরবেষ্টিত এই সীমান্ত দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভুটিয়াগণ যাহাতে আক্রমণ না-করিতে পারে এজন্য দুর্গম প্রদেশে এই পার্ব্বত্য দুর্গ। যুদ্ধের সময় এখানে অনেক গোরাসৈন্য ও সাহেব ক্যাপ্টেন ছিল। এখন সমস্তই হিন্দুস্থানী ও নেপালী গুর্খাসৈন্য, দেশীয় মেজরের অধীনে খাইয়া-শুইয়া দিন কাটাইতেছে। কেল্লার সম্মুখে খানিকটা ফুটবল খেলার জন্য খোলা মাঠ রহিয়াছে। এখানে এইরূপ একটি মাঠ তৈরি করা যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা চারি দিকের পাহাড়ের চেহারা দেখিয়াই বুঝিতেছি; কিন্তু ইংরেজের বৈশিষ্ট্যই এইখানে,—হাজার কঠিন হইলেও পরিপূর্ণ জীবন ভোগের কোন অনুষ্ঠানকেই খাপ গে

কুচবিহার প্রাসাদ

যাক্' বলিয়া সে ছাড়িয়া দেয় না। কেল্লার মাঠের আর এক দিকে ক্যাপ্টেন উড সাহেবের কুঠি,—পাথরের গাঁথনি করা হলদে-রঙের ছোট বাংলো। তাহার চারি পাশে ফুলফলের ছোট বাগান; কতকগুলি কমলালেবু পেয়ারা আর আমগাছও আছে। উড সাহেবের কুঠি ছাড়িয়া আমরা আরও উপরে উঠিয়া ফরেষ্ট অফিস এবং ফরেষ্ট অফিসের সাহেবের কাঠের দোতলা বাংলো ছাড়াইয়া, হেডক্লার্কবাবুর বাড়িতে আত্মীয়তা-সূত্রে আতিথ্যগ্রহণ করিলাম। এখানে জিনিষপত্র বেশী মেলে না। পেঁপে ও কচু এখানে ভাল হয় এবং সুস্বাদু; আর কোয়াশ নামক এক প্রকার তরকারি হয়, আনারসও

কুচবিহার—মুস্তফি-বাড়ি

ভাল হয়। কিছু দূরে কয়েকটি ভুটীয়া পল্লী আছে, সেখানে দুধ ও মাখন মেলে। কেল্লা হইতে মাইলখানেক দূরে একটি ছোট বাজার আছে, সেখানে কাপড় ঘি ময়দা চিনি চালডাল সুনতেল পাওয়া যায়, তবে দাম বেশী। দোকান কয়টিই মাড়ওয়ারীদের। এই দুর্গম প্রদেশেও মাড়ওয়ারীদের এই অধ্যবসায় দেখিয়া তাঁহাদের অর্থসাধনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এখানে মাড়ওয়ারীদের একটি ঠাকুরবাড়িও আছে; প্রকৃতির লীলাস্থল এই নির্জ্জন প্রদেশে সুন্দর মানাইয়াছে।

মাড়ওয়ারীদের এই ঠাকুরবাড়ি, উড সাহেবের কুঠি, ও কেল্লা ছাড়া সব বাড়িই কাঠের,—উপরে করোগেট-টিন-দেওয়া এবং মেঝে কাঠের পাটাতন-করা। আমাদের দেশের মত ঘরবাড়ি সমতল জায়গার উপর নয়,—এক বাড়ি হইতে অন্য বাড়ি যাইতে হইলে অনেক উঠা-নামা করিতে হয়। আমাদের

বক্সাদুয়ারের একটি দৃশ্য

এই বাসা হইতে পোষ্ট-অফিস যাইতে হইলে অনেক বার নামিয়া যাইতে হয়, বাজার যাইতে হইলে অনেক বার উঠা-নামা করিয়া দুই-একটা পাহাড় পাশ কাটাইয়া তবে যাওয়া যায়। অধিবাসীর মধ্যে ফরেষ্ট-অফিসের চার-পাঁচ জন কর্ম্মচারী, কেল্লার ডাক্তার বাবু ও পোষ্টমাষ্টার বাবু বাঙালী, কেল্লার বিশ-পঁচিশ জন গুর্খাও হিন্দুস্থানী সিপাহী এবং বাজারের কয় ঘর মাড়ওয়ারী। এঁরা সবাই এখানে 'উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন'। এখানকার আসল অধিবাসীদের দেখিতে হইলে এখান হইতে আধ মাইল উপরের ভুটীয়া পল্লী 'টাসিগাঁও', কিংবা পূবদিকে একটি পিকেটের পাশ দিয়া 'খাটালিং' কিংবা বাজার ছাড়াইয়া মাইল-দেড়েক

পশ্চিমে 'চুণাভাঁটী' নামক পল্লীতে যাইতে হয়। আমাদের চিরপরিচিত সোনার বাংলার পল্লী হইতে এই সব পল্লীর কতই না প্রভেদ! পাহাড়ের কোন বিস্তৃত ঢালু জায়গার কতক দূর জঙ্গল কাটিয়া পাশাপাশি অল্পাধিক উঁচুনীচুতে আট-দশ হইতে বিশ-পঁচিশটি ঘর এক-একটি

কুচবিহার—নৃপেন্দ্রনারায়ণের মূর্ত্তি

পল্লীর পরিধি। লোক-সংখ্যা দশ-বার জন হইতে বড়-জোর ত্রিশ-চল্লিশ জন। পালিত জন্তুর মধ্যে শূকর মুরগী গরু ভেড়া ছাগল প্রায় সব পল্লীতেই আছে। পেঁপে কচু কলা ভুট্টা মন্দ হয় না; কোথাও কোথাও গম এবং গিমাঘাসের মত এক প্রকার জৈ-জাতীয় ঘাসের শস্য পাহাড়ের গায়ে অতি কষ্টে জন্মিয়া থাকে। বনে গন্ধরাজ লেবুর গাছ বিস্তর জন্মিয়াছে। দুই-তিন মাইল দূরে নীচে পাহাড়ের গায়ে কমলালেবুর বাগান আছে। পাকা কমলালেবুতে ভরা বাগান দেখিবার জিনিষ। গাছ হইতে পাকা কমলালেবু পাড়িয়া খাইতে খাইতে নয়ন এবং রসনা যুগপৎ পরিতৃপ্ত হয়।

এই পল্লী তিনটির মধ্যে চুণাভাঁটিই বড়,—পচিশ-ত্রিশ ঘর লোকের বাস। এই সুদূর পল্লীতেও এক জন সাহেব মিশনরী ডেরা ফেলিয়া দিন কাটাইতেছেন। বক্সা এবং এই সব পল্লী প্রায় দুই হাজার ফুট উঁচু। পৌষ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত এই সব জায়গায় বড়ই জলকষ্ট। দূরের কোন পাহাড় হইতে ক্ষীণসলিলা ঝরণার চোয়ান জল বাঁশের নল পর-পর জোড়া দিয়া গ্রামের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়; এই জলেই সমস্ত গ্রামখানির জলের প্রয়োজন মিটাইতে হয়। বড় বড় ঝরণাগুলি বহু নীচে, সেখান হইতে জল আনা পোষায় না এবং ব্যাঘ্রাদি বন্যজন্তু ও ব্যাধির প্রকোপে সেখানে বাস করাও চলে না। বক্সা ও এই সব ভুটীয়া-পল্লীর স্বাস্থ্য শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে ভাল থাকে। বর্ষার সময় অত্যন্ত খারাপ। ভুটীয়াদের অনেকেরই গলগণ্ড রোগ আছে দেখিলাম। এখানে একটু চলাফেরা করিতে যেরূপ উঁচুনীচু পাড়ি দিতে হয় তাহাতে বেশ অঙ্গচালনা হয়। আমাদের ত প্রথম প্রথম হাঁপাইতে হইত।

বক্সার তিন দিক উঁচু পাহাড় বেষ্টিত, কেবল দক্ষিণ দিক ঢালু ও খোলা। আমাদের বারান্দার উপর বসিয়া বনভূমির উপর দিয়া বহু দূর বিস্তৃত উন্মুক্ত দৃশ্য দেখা যাইত। পূর্ব্ব আর পশ্চিম দুই দিকে উচ্চ তিনটি পাহাড়ের উপর তিনটি

বক্সাদুয়ার ষ্টেশন

পিকেট অবস্থিত। এই সব পিকেটে উঠিবার আঁকাবাঁকা প্রশস্ত রাস্তা আছে। পিকেটগুলি দৃঢ়নির্ম্মিত সাদা ব[illegible] দোতলা ঘর—দেওয়ালে দেখিবার ও গুলি চালাইবার জ[illegible] অনেক ছিদ্র আছে। এই সব পিকেটের উপর হইতে দৃ[illegible]

ড় চমৎকার, বিশেষতঃ সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময়। সামনে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম খোলা—উপর হইতে বহুদূরবিস্তৃত যত দূর নজর চলে নয়নাভিরাম দৃশ্য; আবার দূরে দিগন্তরেখায় কোন বড় নদীর আঁকাবাঁকা রেখা এবং তাহার কোথাও বা স্রোতজলে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া আগুনের মত ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। পিছনে উত্তর দিকে সারি সারি বিস্তৃত সু-উচ্চ পর্ব্বতশিখরগুলির বনানীমণ্ডিত স্নিগ্ধ নীরবতা; আর কত সময়ই না শিখরগুলিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া মেঘের অপূর্ব্ব লুকাচুরি দর্শককে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া থাকে।

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(২৭)

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই তিন মাসে অরুণের জীবনে ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। যে-চৈত্রসন্ধ্যায় সে উমার ছোট ঘরের নিভৃত নির্জ্জনতায় ক্ষণিকের জন্য প্রবেশ করিবার অধিকার পাইয়াছিল, সে-সন্ধ্যা কাল-সমুদ্রের অতলতায় শুভ্র মুক্তার মত বিলীন, কিন্তু অরুণের জীবনে সে-সন্ধ্যার রক্তিম লেখা দীপ্ত ম্লানহীন হইয়া রহিল। ঘটনাটি সামান্য। কিন্তু এই ঘটনার আঘাতে তাহার জীবন-ধারা যেন এক বাঁকে আঘাত পাইয়া দিশাহারা হইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিল।

সে-সন্ধ্যায় উমার সহিত অরুণের যদি একটা বোঝাপড়া হইয়া যাইত, হয়ত ভাল হইত। অরুণ ত শুধু পর্দ্দা সরাইয়া উমার ছোট ঘরটি দেখিতে চাহে নাই, সে চাহিয়াছে উমার রহস্যময় হৃদয়ের কথা জানিতে, উমা ত তাহার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিল না।

অরুণ ভাবে, সে যদি বলিত, উমা তোমাকে আমি ভালবাসি, উমা কি উত্তর দিত? উমাও কি মন খুলিয়া তাহার হৃদয়ের কথা বলিত? উমা কি তাহাকে ভালবাসে? হয়ত উমা হাসির সুরে বলিত, আজ যে খুব রোমান্টিক মুড দেখছি, আজকাল বুঝি খুব নভেল পড়ছ, অত নভেল পড়ো না। অথবা ব্যঙ্গের সুরে বলিত, ভালবাসা কা'কে বলে বল ত অরুণ, ডিফাইন্ করতে পার? একে তুমি ভালবাসা বল?

অরুণ ভাবে, উমার মানস প্রকৃতিতে কোথায় নিষ্করুণ কঠোরতা আছে, তাহার হৃদয় স্ফটিকের মত যেমন স্বচ্ছ তেমনই দৃঢ়। হৃদয়াবেগকে সে দুর্ব্বলতা ভাবে। শীলার মত তাহার যদি হৃদয়োচ্ছ্বাস থাকিত!

অরুণ স্থির করিল, ভালবাসাকে যে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ভাবে, সেন্টিমেণ্ট্যাল মূড্ বলে, তাহাকে প্রেমের কথা বলিলে প্রেমকে অবমাননা করা হয়। প্রেম থাকুক অন্তরে অন্তঃশীলা, বাহিরে তাহার আর প্রকাশ যেন না-হয়, জীবনের এই সত্যতম হৃদয়াবেগকে দমন করিয়া চলিতে হইবে।

অরুণ বুঝিতে পারে, উমা অরুণকে সুহৃৎ রূপে চায়, প্রেমিকরূপে নয়। সৌহার্দ্দ্যকে সে ক্ষুণ্ণ করিবে না। অরুণ উমার নিকট হইতে সরিয়া থাকিতে চায়, নিঃসঙ্গ থাকিতে চায়। উমা তাহাকে নিজ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে দেয় না। অরুণের উপর তাহার যেন দাবি, অধিকার আছে। নানা ফরমাশে সে অরুণকে খাটায়, নানা প্রকার হুকুম করে, মাঝে মাঝে ছোট মেয়ের মত আবদার করে, নানা জিনিষ উপহার দেয়। উমার সঙ্গ অরুণকে যেমন আনন্দ দেয় তেমনই হৃদয় উদাস করিয়া তোলে। এ সব ছোটখাট কাজ সে করিতে চায় না, সে চায় হৃদয় উজাড় করিয়া দিতে। সে হৃদয়ের তৃষ্ণা উমা বুঝিতে পারে কি?

অরুণের দ্বৈত জীবন আরম্ভ হইল। জীবন একটা অভিনয়। মুখ দেখিয়া কেহ যে মনের কথা জানিতে

পারে না, ইহা বড় সুবিধার। মুখোস পরিয়া পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া যাইতে হইবে। ভালবাসি, কিন্তু তুমি জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ভালবাসা কাহাকে বলে? উমার প্রতি তাহার হৃদয়ের গভীর ভাব কি ভালবাসা, অথবা পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা যে প্রবল যৌন-আকর্ষণের কথা বলেন, তাহাই ভালবাসা? কোন্‌টা সত্য?

অরুণের সত্তা যেমন কল্যাণময় ঐক্য হারাইল, তাহার প্রেমময় ভিত্তিভূমি খণ্ডিত হইয়া গেল, তেমনই তাহার ধীশক্তি অতি তীক্ষ্ণ, বিশ্লেষণ-প্রবণ হইয়া উঠিল। প্রতি হৃদয়াবেগ, অনুভূতিকে সে বিশ্লেষণ, বিচার করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে মানসিক আবেগের তীব্রতা রহিল না, পূর্ব্বে যাহা বহুমূল্য ভাবিত, তাহা তুচ্ছ মনে হইতে লাগিল। জীবন তরঙ্গহীন শান্ত নদীধারার মত প্রবাহিত হইয়া চলিল বটে, নদীর গভীরতলে যে দুর্নিবার প্রমত্ত স্রোত তটভূমির নীচের মাটি ধীরে ধীরে ভাঙিয়া চলিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

শুধু মাঝে মাঝে সে অনুভব করিত, জীবন বুঝি অর্থহীন অভিনয়, ইহার কোন সার্থকতা নাই। বইপড়া, বন্ধুদের সহিত তর্ক গল্প করা, তাহার ভাল লাগিত না। কোন বিজন সন্ধ্যায় সে ভাবিত, সে বড় একা, তাহার জীবনের পথ একা চলার পথ। কোন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া যাইত, বুকে একটা বেদনা খচ্‌খচ্‌ করিয়া উঠিত। হৃৎ-পিণ্ডের এই স্নায়বিক ব্যথা শারীরিক কোন অসুস্থতার জন্য নয়, ইহা সম্পূর্ণ মানসিক। অরুণ ভাবিত, এ ব্যথা হয়ত তাহার গত ইনফ্লুয়েঞ্জার জের।

মনের অবসাদ অধিক ক্ষণ থাকিত না। বিষাদকে সে রঙীন করিয়া তুলিত। মধুর বিষণ্ণতায় হৃদয় ভরিয়া উঠিত। আর উমার সম্মুখে সে কোনরূপ হতাশা প্রকাশ করিত না। বস্তুতঃ এই আনন্দময় জীবনকল্লোলপূর্ণ সুন্দরী পৃথিবীতে মানববিদ্বেষী হইয়া উঠিবার মত বয়স তাহার হয় নাই। জীবনের সহজ সুখে, মধুর স্বপ্নে তাহার অন্তর পূর্ণ।

কিন্তু দ্বৈত জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তে তাহার সত্তার ধীরে ধীরে ভাঙন ধরিল। মাঝে মাঝে সে দিশাহারা হইয়া যাইত। জীবনকে সে গ্রহণ করিয়াছিল সাধনারূপে, জ্ঞানের সাধনা, প্রেমের সাধনা, মানবকল্যাণের সাধনা। সে-সাধনায় সন্দেহ আসিল, হয়ত এ তপস্যা শূন্যের তপস্যা। তাহার মধ্যে যে তাপস এত দিন একাগ্র মনে সাধনা করিয়া আসিয়াছে, সে সকল নিয়ম-সংযমের শৃঙ্খল ভাঙিয়া বে-হিসাবী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে চাহিত।

বৈশাখের শেষে উমারা কলিকাতা ছাড়িয়া দার্জ্জিলিঙে চলিয়া গেল, অরুণ বাঁচিয়া গেল। উমার সান্নিধ্যে সে যে বেদনা অনুভব করিত, দূরত্বে সে বেদনা মধুর রঙীন হইয়া উঠিল।

হেমবাবু সারিয়া উঠিয়াছেন। ডাক্তার বসু বলিলেন, এখন একটা চেঞ্জ দরকার, বহুদিন কলিকাতায় আছেন। সৌভাগ্যক্রমে দার্জ্জিলিঙে এক বন্ধুর বাড়ি বিনা-ভাড়ায় পাওয়া গেল।

মামীমা অরুণকে তাঁহাদের সহিত দার্জ্জিলিং যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অরুণ রাজী হয় নাই। মামীমাও পীড়াপীড়ি করেন নাই। উমা কিন্তু অরুণকে কোন কথা বলিল না। উমা বলিলেও, অরুণ তাহাদের সহিত দার্জ্জিলিং যাইত না। কিন্তু উমা যে একবার অনুরোধও করিল না, এই ভাবিয়া অরুণ ব্যথিত হইল।

অরুণ দার্জ্জিলিঙে না-যাওয়াতে চন্দ্রা বড় দুঃখিত হইল। সে ভাবিয়াছিল, অরুণ নিশ্চয় তাহাদের সহিত যাইবে। চন্দ্রা যাইবার সময় বলিল—বা অরুণদা, তুমি না গেলে আমরা কিছু এঞ্জয়ই করব না; আচ্ছা, আমরা আগে যাই, তুমি পরে আসবে, কেমন! আর উমা গম্ভীরভাবে বলিয়াছিল, অরুণ বেশী টো-টো ক'রে ঘুরো না, তুমি কোথাও বেড়াতে গেলে পারতে, যা গরম পড়েছে এবার।

আষাঢ়ের ছিন্নমেঘাবৃত প্রভাত। সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়াছে। খোলা জানলা দিয়া এক ঝলক সূর্য্যালোক পঙ্খের কাজকরা বিবর্ণ দেওয়ালে আলমারীর কাঠে ঝকমক করিতেছে। অরুণ বিছানাতে পাশ ফিরিয়া একবার ঘড়ির দিকে চাহিল। পুরাতন ফ্রেঞ্চ ঘড়িটি একটা বাজিয়া বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঘড়িটি কিছুদিন হইল খারাপ হইয়াছে সারাইতে পাঠান হয় নাই। এলার্ম ঘড়িটিও বিকল হইয়া গিয়াছে। এখন আর ঘড়িতে এলার্ম বাজে না। অরুণ ভোরে উঠিয়া পাঠ মুখস্থ করে না। এখন সে যখন খুশী ওঠে, যখন খুশী

শুইতে যায়; কলেজে যাইতে প্রায়ই দেরি হয়। ভাল না লাগিলে, কোন কোন দিন সে কলেজেও যায় না। প্রতিদিন নিয়মানুবর্ত্তী জীবন যাপন করিতে শ্রান্তি লাগে।

দেওয়ালে রৌদ্র দেখিয়া অরুণ ক'টা বাজিয়াছে, স্থির করিতে চেষ্টা করিল। বোধ হয় সাতটা হইবে। এখনও আধ ঘণ্টা শুইয়া থাকা যাক। ছুটির দিন।

চাদরটা গায়ে টানিয়া লইয়া অরুণ ভাবিতে লাগিল, দার্জ্জিলিঙে এখন ত প্রায় সাতটা হইবে। উমা নিশ্চয় জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার সদ্যজাগরণফুল্ল অনুপম আনন্দে প্রভাতের আলোক আসিয়া পড়িয়াছে। জানলা খুলিয়া দেখিতেছে, পাইন-বন সূর্য্যালোকে ঝলমল, রজতকান্তি কাঞ্চনজঙ্ঘা অরুণালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে, মেঘের সমুদ্রে বিচিত্র বর্ণের লীলা। উমা কি তাহার কথা ভাবিতেছে?

হাঁ, দার্জ্জিলিং যাইতে ইচ্ছা করে, উমাকে দেখিতে নয়, টাইগার হিল হইতে এভারেষ্ট পর্ব্বতশৃঙ্গে সূর্য্যোদয়, মেঘলোকে অপরূপ বর্ণোৎসব দেখিতে। অরুণ আবার ভাবিতে লাগিল, না, সূর্য্যোদয় দেখিতে নয়, উমাকে দেখিতে দার্জ্জিলিং যাইতে ইচ্ছা করে।

অরুণ পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিয়া শুইল। প্রভাতালোক-দীপ্ত দার্জ্জিলিঙের একটি অপরূপ দৃশ্য কল্পনায় ভাবিতে চেষ্টা করিল।

প্রতিমা চঞ্চলপদে ঘরে প্রবেশ করিল।

—বা, দাদা এখনও ঘুমচ্ছ, আটটা বাজে।

—ঘুমচ্ছি কোথায়, শুয়ে আছি।

—ওঠ, না হ'লে এখুনি ঠাকুমা আসবেন। অত রাত জাগ কেন, কাল রাত দু'টোয় দেখি তোমার ঘরে আলো জলছে।

—কটা বেজেছে?

—বললুম ত আটটা। তোমার সব ঘড়ি বন্ধ। কি, শরীর ভাল নেই?

—না, অসুখ নয়, আমি উঠছি।

—তোমার চা এখানে এনে দেব?

—লক্ষ্মী-মেয়ে! প্লীজ্। কিন্তু শুধু চা।

—না, তাহ'লে আবার ঠাকুমা ব'কবেন। আমি সব আনছি, তুমি বরঞ্চ লুচিগুলো খেও না, বাগানে কোথাও ফেলে দিও। আর খাবে নাই বা কেন?

—আচ্ছা নিয়ে আয়।

রবীন্দ্রনাথের একটি প্রভাতী গান গাহিতে গাহিতে প্রতিমা চলিয়া গেল। স্নেহকরুণ নয়নে প্রতিমার দিকে চাহিয়া অরুণ বিছানা হইতে উঠিল।

প্রতিমাকে দেখিলে সে যেন নবজীবন লাভ করে। জীবনের সহজ সুখে, কৌতুকময় আনন্দে প্রতিমার অন্তর কানায় কানায় ভরা, কোন দ্বন্দ্ব নাই, আবেগের ঘূর্ণাবর্ত্ত নাই। ব্রাউনিঙের Pippaর কথা মনে পড়ে। অরুণ আবৃত্তি করিয়া উঠিল:

> Day!
> Faster and more fast,
> O'er night's brim, day boils at last;
> Boils, pure gold, o'er the cloud-cup's brim
> Where spurting and suppressed it lay;

রাত্রির নিকষকৃষ্ণ পাত্র ভাঙিয়া সোনার আলো যেমন চারি দিকে উপচাইয়া পড়িতেছে তেমনই তাহার হৃদয়ের পেয়ালা ভরিয়া আনন্দরস কবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে! কবিতাটির কিয়দংশ আবৃত্তি করিতে অরুণের মনের অবসাদ চলিয়া গেল। তাহার বক্ষে যেন কোন পাখী ডানা ঝটপট করিয়া জাগিয়া উঠিল, এখন সে সোনার আলো ভরা সুনীল গগনে দুই পক্ষ মেলিয়া উর্দ্ধে উড়িয়া যাইতে চায়।

প্রতিমা চা ও খাবার লইয়া আসিয়া বলিল, দাদা সকালে বেরুচ্ছ নাকি?

—হাঁ, একটু কাজ আছে।

—কাজ ত ছাই। শীগগির ফিরো বাপু।

—শীগগির?

—হাঁ, কাল ঠাকুমার একাদশী গেছে, তুমি না খেলে ত তিনি খাবেন না।

—ও, দেখ্ টুলি, ঠাকুমাকে ব'লে দিস্ আমি দুপুরে বাড়িতে খাব না, তিনি যেন শীগগির খেয়ে নেন।

—কোথায় খাবে শুনি?

—সে খাব'খন।

—কি যে তোমার টো-টো করতে ভাল লাগে, তা হ'লে বাপু দুপুরে খেয়ে বেরিও।

—না, না, আমায় এখনই বেরুতে হবে।

—দিদির ওখানে যাবে? হরিসাধন-দা ত অনেক দিন আসেন নি।

—হাঁ, দিদির ওখানেও একবার যেতে হবে। বা, বিষ্টি-ধোওয়া আকাশে কি সুন্দর আলো হয়েছে দেখ্। চল্ কোথাও বেড়াতে যাবি?

—মোটর গাড়ী ত বিগড়ে ব'সে আছে, তোমরা গ্যারাজেও পাঠাও না।

—মোটর গাড়ীতে কেন, ট্রেনে কোথাও চ'লে যাব, কোন অজানা গ্রামে।

—না, আমার অত টো-টো ভাল লাগে না।

—আচ্ছা, আমার বোধ হয় ফিরতে রাত হবে।

—দাদা, কোথাও যাও ত একা যেও না, তোমার কোন বন্ধুকে সঙ্গে নিও। আর এই নাও ছাতা, পরশু যা ভিজে এসেছিলে।

ছাতা-হাতে অরুণ বাড়ি হইতে বাহির হইল। বৃষ্টি-ধৌত আকাশে সুনির্ম্মল আলোকধারা তরুণীর দীপ্ত চাউনির মত।

ছুটির দিনগুলি অরুণ নিরুদ্দেশ ভাবে কলিকাতার বাহিরে ঘুরিয়া কাটায়। বাড়িতে স্থিরভাবে থাকিতে পারে না। ট্রেনে বা ষ্টীমারে সে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র শহরে বা গ্রামে চলিয়া যায়। কোনদিন জয়ন্ত বা বাণেশ্বরকে তাহার সঙ্গীরূপে লইয়া যায়, কোনদিন একাই চলিয়া যায়, কল্পনা তাহার সঙ্গিনী হয়। প্রতিমাকে লইয়া এক দিন সে ষ্টীমারে কোলাঘাট গিয়াছিল, এক দিন ট্রেনে চন্দননগর গিয়াছিল, প্রতিমা সহজ কৌতুকভরা চোখে পথদৃশ্য, জনতাস্রোত দেখিয়া বড় আনন্দ পায়। কিন্তু প্রতিমা সহজে যাইতে চায় না। রোদে তাহার মাথা ধরে। সে বাড়িতে বসিয়া গল্প করিতে, উপন্যাস পড়িতে ভালবাসে।

অরুণ জয়ন্তের বাড়ির দিকে চলিল। তাহার মেসো-মহাশয়ের অসুখ। পীতাম্বর কিছুতেই ডাক্তার দেখাইবেন না, পাড়ার এক কবিরাজ চিকিৎসা করিতেছেন বটে, কিন্তু কি অসুখ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন না, বোধ হয় তিনি ঠিক নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। জয়ন্তের দেখা পাওয়া যায় না। সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া রাধাবাজারে তাহাদের ঘড়ির দোকান দেখিতেছে।

পথে যাইতে যাইতে অরুণ ভাবিল, একটি নূতন ঘড়ি কিনিতে হইবে, জয়ন্তের যে ঘড়ির দোকান আছে, একথা কখনও পূর্ব্বে মনে হয় নাই।

জয়ন্তদের বাড়ির সম্মুখে আসিতে মণ্টু চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিয়া আসিল—দাদা বাড়ি নেই!

—কোথায় গেছে?

—ডাক্তারের বাড়ি।

—ডাক্তার?

—হাঁ, মাসীমা বড় কান্নাকাটি করেছেন, তাই মেসো-মহাশয় বলেছেন, আচ্ছা, ডাক্তার নিয়ে এস, কিন্তু তার ঔষধ খাব না আর দু-টাকার বেশী তাকে দেওয়া হবে না। তুমি ব'স অরুণদা, দাদা এক্ষুণি আসবেন।

অরুণ অনুভব করিল, দোতলার ঘরের জানলা হইতে কে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, তাহার কালো চক্ষের দৃষ্টি বড় স্নিগ্ধ। সে একটু উপরে চাহিল। দুর্গা জানলা হইতে সরিয়া গেল না, পাখীর ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিল। অরুণ মাথা একটু নত করিল। দুর্গা মণ্টুকে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

—ওই দিদি আমাকে ডাকছেন, আমি এক্ষুণি আস্‌ছি। মণ্টু ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—দিদি তোমাকে বসতে বললেন, মেসো-মশাই তোমার সঙ্গে কি কথা কইতে চান।

—না, আমার এখন সময় নেই। তোর দাদাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস, আজ সন্ধ্যেবেলা।

—আচ্ছা। শোন অরুণ-দা, একটা যুদ্ধের জাহাজ কলকাতায় এসেছে নাকি, সেটা কোন্ ঘাটে লেগেছে?

—আমি ত জানি না।

—তুমি কোন খবর রাখ না। আচ্ছা, এরোপ্লেনগুলো কোন্ জায়গায় নামে? খুব দূর এখান থেকে, হেঁটে যাওয়া যায়?

—ট্রামে গিয়েও অনেকখানি হাঁটতে হবে।

—সে আমি পারব, তুমি ব'লে দাও আমাকে।

—আচ্ছা, আমি নিয়ে যাব একদিন।

—ঠিক নিয়ে যাবে, এরোপ্লেনে চড়াতে হবে কিন্তু।

—আচ্ছা ভাই।

জয়ন্তের বাড়ি হইতে অরুণ হরিসাধনের বাড়ির দিকে চলিল। দিদির সঙ্গে বহুদিন দেখা হয় নাই। দিদির কাছে যাইতে তাহার কেমন ভয় হয়। দিদি মুখে কোন তিরস্কার করেন না, কিন্তু তাঁহার করুণ চক্ষের স্নেহময় চাউনিতে নীরব ব্যথাভরা ভৎ'সনা জড়িত; বর্ত্তমান বিষাদময় উদাসীন জীবন-

যাপনের জন্য অরুণ লজ্জিত হইয়া ওঠে। সমস্ত দিন দিশাহারা ঘুরিয়া সন্ধ্যায় শ্রান্ত হইয়া যখন সে এই পুণ্যবতী তাপসী নারীর পাশে গিয়া বসিয়াছে, দিদি সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়াছেন, সে যেন গভীর শান্তি লাভ করিয়াছে। অরুণ ভাবে, দিদির চরণপ্রান্তে বসিয়া সে যদি হরিসাধনের মত সেবাধর্ম্মে দীক্ষা লইতে পারে, হয়ত সে জীবনে শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহার সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। মানবকল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করা। কিন্তু তাহার সাহস হয় না। বোধ হয় তাহার মনের সে শক্তি নাই। সেবার পথে নয়, প্রেমের পথেই তাহাকে জীবনের আনন্দের সন্ধান করিতে হইবে।

শেয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট আসিয়া অরুণ ট্রাম হইতে হঠাৎ লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। দিদির কাছে সে যাইবে না। নগরের এ জনকল্লোলে রথঘর্ঘরে সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। নগরের বাহিরে উদার আকাশের তলে স্বর্ণশীর্ষ শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে নির্ম্মল নদীতটে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নির্জ্জনে মুখোমুখি বসিতে চায়। এখন যদি সে কোন সমুদ্রতীরে একা বসিয়া থাকিতে পারিত! সমুদ্র দেখিবার অদম্য বাসনায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্ত নীল জলরাশির উপর অসীম নীল আকাশ নত হইয়া পড়িয়াছে!

অরুণ ভাবিল, ডায়মণ্ডহারবার গেলে সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যাইবে, লোকে বলে, সমুদ্র তাহার খুব কাছেই। সে ডায়মণ্ডহারবার যাওয়া স্থির করিল।

বেলেঘাটা ষ্টেশনে গিয়া অরুণ ডায়মণ্ডহারবারের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিল। তৃতীয় শ্রেণীতে বড় ভিড়। সে নিঃসঙ্গ থাকিতে চায়।

ট্রেন প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ীতে বসিতেই ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি আসিল।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়া ট্রেন ছুটিয়া চলিল। এঞ্জিনের গর্জ্জন বারিপতন শব্দের সহিত মিশিয়া গেল।

বালীগঞ্জ ষ্টেশন পার হইবার পর বৃষ্টি প্রায় থামিয়া আসিল। মধ্যগগনে কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের যবনিকা সরাইয়া সূর্য্যালোকধারা হরিৎ শ্যামল দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে ঝরিয়া পড়িয়া চারিদিক অপূর্ব্ব দ্যুতিময় করিয়া তুলিল। নব নব সৌন্দর্য্যপ্রকাশিনী বিশ্বপ্রকৃতি রহস্যময় অবগুণ্ঠন খুলিয়া দীপ্ত চক্ষে অরুণের দিকে চাহিয়া রহিল।

অরুণ যখন ডায়মণ্ডহারবারে আসিয়া পৌছিল, টিপি টিপি বৃষ্টি সুরু হইয়াছে।

ষ্টেশনে নামিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, সমুদ্র কত দূর?

টিকিট-চেকার হাসিয়া বলিল, সমুদ্দুর এখান থেকে বহুদূর, তবে এখানে নদী এত প্রশস্ত যে সমুদ্রের মতই মনে হয়। নদীর তীর নিকটে, একটি ডাকবাংলোও আছে।

অরুণ ছাতা মাথায় দিয়া নদীর দিকে চলিল। টিকিট-চেকারটি চেঁচাইয়া বলিল, মশাই, আজই যদি কলকাতায় ফিরতে চান ত এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেন।

পথে চলিতে চলিতে অরুণ অনুভব করিল, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। এক মুদির দোকানে মুড়ি ও মোয়া ব্যতীত খাদ্যদ্রব্য বিশেষ কিছু মিলিল না।

নদীর তীরে এক বৃহৎ ঝাউগাছের তলায় সে বসিল। সে ভাবিতে লাগিল, উমা যদি এখন তাহার পাশে আসিয়া বসিত। দুই জনে পাশাপাশি প্রাচীন বৃক্ষতলে এই দিগন্ত-বিসারী চঞ্চল নদীজলধারার দিকে চাহিয়া আষাঢ়ের অপরাহ্নে স্তব্ধ বসিয়া থাকিত। উমা তাহার সঙ্গে নাই, কিন্তু নব-প্রস্ফুটিত কদম্বের মত প্রফুল্লিত নববর্ষার প্রকৃতিলক্ষ্মীর স্পর্শে তাহারই সঙ্গ, মেঘের কজ্জলে তাহারই নয়নের অঞ্জন। উমাকে সে কখনও এত নিকটে এমন গভীরভাবে পায় নাই।

গভীর রাতে অরুণ যখন বাড়ি ফিরিল, তাহার হৃদয় কোন্ আনন্দসুধায় কানায় কানায় ভরা।

দেখিল, পড়িবার টেবিলের ওপর একটি হাল্কা রঙের নীল খাম, উমার চিঠি। উমা সত্যই চিঠি লিখিয়াছে, উমাকে সে যতখানি হৃদয়হীনা ভাবিয়াছে, সে তত নিষ্করুণ নয়।

আকাশে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। দ্বাদশীর চন্দ্র নির্ম্মল গগনে। বহুদিন পর অরুণ পুরাতন বেহালাটি বাক্স হইতে বাহির করিয়া ছাদে বাজাইতে গেল।

সঙ্গীতলক্ষ্মী, আমাদের দুঃখময় পৃথিবীতে তুমি আনন্দনের সুধাধারা। কথাতীত গভীর বেদনাময় হৃদয়কে তোমার আনন্দ-স্পন্দিনী সুরস্রোতে স্নিগ্ধ কর। আমাদের আত্মার প্রেমের ব্যাকুলতাকে তোমারই সুর-ঝঙ্কারে অনন্ত তারালোকের অশ্রুত সঙ্গীতের সহিত সঞ্চারিত করিয়া দাও।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ সন্তদাসজী ব্রজবিদেহী মোহন্ত মহারাজ

শ্রীব্রজবল্লভ সাহা

বিগত ৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার বৈষ্ণবাচার্য্য পরম ভক্তিভাজন স্বামী শ্রীযুক্ত সন্তদাসজী ব্রজবিদেহী বাবাজী মহারাজের তিরোধান হইয়াছে।

অন্যন নয় বৎসর পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে জনৈক বিখ্যাত এটর্ণির নিকট শুনিয়াছিলাম, বৃন্দাবনে শ্রীযুক্ত স্বামী সন্তদাসজী বাস করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বাশ্রমে হাইকোর্টের প্রবীণ, চিন্তাশীল ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। নাম ছিল শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী। প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন কিন্তু পরদিনের সম্বল না রাখিয়া দরিদ্র-সেবায় নিঃশেষে সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। বহু ছাত্র তাঁহার আশ্রয়ে জাতিবর্ণ এবং আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইত। তাঁর ওকালতির বিশেষত্ব ছিল এই যে রাত্রিতে ব্যবসায়ের কাজ না করিয়া সাধনভজনে কাটাইতেন, এবং মোকদ্দমার কাগজ পড়িয়া যদি মনে হইত ইহাতে অন্যায় কিংবা অধর্ম্মের সংস্রব আছে, তবে সে মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন না। ফলে বিচারকমণ্ডলী ও ব্যবহারজীবীসমাজে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিপক্ষের কূট গ্রন্থি তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি, বিদ্যাবত্তা ও ভাষার সাবলীল গতিতে শিথিল হইয়া পড়িত। তাঁহার সমসাময়িক ব্যবহারজীবীদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি তিনি যখন বিচারকের উদ্দেশে কথা বলিতেন, অতি ধীরে অল্প কথায় সরল সহজ-বোধ্যভাবে যুক্তিসহকারে স্বীয় বক্তব্য শেস করিতেন। বিচারকমণ্ডলী তাহা শ্রদ্ধার সহিত উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন।

একবার কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে হাইকোর্টে তিনি হিন্দু আইনের কোন জটিল অংশের ব্যাখ্যা করিবেন ইহা পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, সেই দিন হাইকোর্টের সমস্ত বিচারপতি ও ব্যবহারজীবী তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। ভাষার লালিত্যে, যুক্তির অকাট্য প্রয়োগে, বিষয়ের গম্ভীরতায় এবং সেই দুরূহ সমস্যার পূর্ণ সমাধানে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচারনৈপুণ্য উপলব্ধি করিয়া বিষয়টি সকলেই উপভোগ করিয়াছিলেন।

শুনিয়াছিলাম, তিনি স্যর রাসবিহারী ঘোষের সময়ে হাই-কোর্টে ওকালতি করিতেন; তিনি বয়সে শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ের বহু কনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু প্রায় সমস্ত জটিল মামলাতেই স্যর রাসবিহারী ঘোষ ও শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় সংশ্লিষ্ট থাকিতেন এবং অনেকেরই অভিমত যে আইনের পাণ্ডিত্যে দুই জনেই সমতুল্য ছিলেন। আমি সংসারী লোক তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম দুই জনের আয়ও কি সমান ছিল? তাহাতে এক জন ব্যবহারজীবী বলিয়াছিলেন, পাণ্ডিত্য ও পয়সা অনেক সময়েই তুল্য-মানে পরিমিত হয় না। গৃহত্যাগের পূর্ব্বের কয়েক বৎসর তাঁহার মাসিক আয় গড়ে ৫০০০৲ ছিল এবং দৈনিক ৫১০৲ করিয়া মোকদ্দমার ফী লইতেন। তিনি আমাকে নিজে এক দিন বলিয়াছিলেন, যে-বৎসর তিনি গার্হ্যস্থাশ্রম ত্যাগ করেন সেই বৎসর গভর্ণমেন্টের তরফে কাজ করিয়া চট্টগ্রামে এক মোকদ্দমায় ৪৭০০০৲ ফী পাইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করার সময় আমি তুচ্ছ টাকা-পয়সার হিসাব করিতেছি একটা উদ্দেশ্য লইয়া। সংসারে বিদ্যা ধন ও মানের আমরা বড় কাঙ্গাল। যাঁহারা ইহাতে সম্পন্ন তাঁহাদের চরণে বিনা আয়াসে আমার মাথা নত করিয়া থাকি। যাঁহাদের তাহা নাই তাঁহাদের অন্তস্তলের মহামূল্য নিধি আমরা লক্ষ্য করি না বা করিবার দরকার বোধ করি না। যে যশোমানের কণামাত্র লাভে নিজেকে কৃতার্থ মনে করি, শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের তাহা সহস্র গুণে বর্ত্তমান ছিল। তবে কি প্রয়োজনে তিনি ১৯১৫ সালে খ্যাতি-বৈভব ত্যাগ করিলেন? পূজনীয় শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, এই সময় শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের পূর্ণ স্বাস্থ্যে প্রচুর ধনাগম হইলেও মুহূর্ত্তের জন্য মনে শান্তি ছিল না। ক

সংসার ত্যাগ করিবেন, এই ছিল প্রতিনিয়ত জল্পনা ও কল্পনা। এক দিন প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন, গোস্বামী প্রভুর রচিত গান "শান্তি আর কোথা আছে অমৃতসাগর বিনা" তাঁহাকে বড় সান্ত্বনা দিত।

সরস্বতী স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডপণ্ডিত পূজনীয় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ কাব্যতীর্থ সাহিত্যশাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সংসার-ত্যাগের স্মরণীয় দিনে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "সেদিন যেন আমি পুনরায় ভগবান বুদ্ধদেবের প্রব্রজ্যা স্বচক্ষে দেখিলাম। ঘর বাড়ি গাড়ী সব সাজান ছিল। বন্ধুবান্ধবকে যদৃচ্ছা দান করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিলেন, "তোমাদের যার যা প্রয়োজন হয় লইয়া যাইও।" শ্লথ বস্ত্রাঞ্চলে এক জন কয়েকখানি নোট বাঁধিয়া দিয়াছিল, ভাবেভোলা স্তিমিত নয়নে তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

কিসের এত টান? রবীন্দ্রনাথের মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম, মহাপুরুষেরা যখন দেহ গেহ ছাড়িয়া যান, যাহাকে আখ্যা দেওয়া হয় ত্যাগ, বস্তুত তাহা ত্যাগ নয়। তাঁহারা তখন আমাদের অবোধ্য ও অগোচর স্থানের অমূল্যনিধি লাভ করিয়া থাকেন।

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"

তাই শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্বাশ্রম ত্যাগ করিয়া ১৯১৫ সনে পূর্ণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন ও পরে ব্রজধামের মোহন্ত পদে অভিষিক্ত হন।

এই যে আচার্য্যের পদ তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ইহা একদিনে হয় নাই। তাঁহার প্রাণের কেন্দ্রস্থলে প্রতিনিয়ত ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে দারুণ পিপাসা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি সর্ব্বদা পূর্ণরূপে সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—তারাকিশোর বাবু যখন যে কাজে সংশ্লিষ্ট থাকিতেন তাহা পূর্ণাঙ্গরূপে কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ করিতেন। ষোড়শ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল অতি স্বাধীন ভাবে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন এবং যুক্তিবাদের পথে সন্দেহ ও সংশয় সম্বলে যাত্রা সুরু করিয়া শেষে "দৈবশক্তি ও ঋষিশক্তি প্রভাবে বহুবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রতি আস্তিক্যবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং নিজে আচরণ করিয়া তাহার যথার্থতা অনুভব করিয়াছিলেন।" "বস্তুতঃ আচরণ দ্বারাই ধর্ম্মের সারবত্তা যথার্থ রূপে অনুভব করিতে পারা যায়। কেবল বাহ্যিক যুক্তিতর্কদ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য করা অতিশয় কঠিন।"

তিনি স্বরচিত "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা"র ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "আহার করিলে যে শরীরে রক্তসঞ্চার হয় তাহা প্রত্যেক মনুষ্যই কার্য্যতঃ অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি বলেন যে নানাবিধ বর্ণ ও নানাবিধ গুণবিশিষ্ট আহার্য্য হইতে কিরূপে রক্ত, দুগ্ধ, অস্থি প্রভৃতি উৎপন্ন হয় তাহা বিচার দ্বারা তাঁহাকে না বুঝাইলে তিনি আহার করিবেন না, তবে কেবল বিচার দ্বারা সেই ব্যক্তিকে তাহা বোধগম্য করাইয়া আহারে প্রবৃত্তি জন্মান কত দূর কঠিন! তৎসহ তুলনায় জীবতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব যে অতিশয় কঠিন বিষয় ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত তর্ক-বিচার দ্বারা সকল অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিশ্বাস উৎপাদন করা যে সহস্র গুণে কঠিন তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নহে।"

তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পর্য্যন্ত সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন, এফ্-এতে ল্যাটিন লইয়াছিলেন, বি-এ-তে বিজ্ঞানবহুল তদানীন্তন বি কোর্স শেষ করিয়া ফিলজফিতে এম-এ পাস করিয়াছিলেন। নিজে ক্ষোভ করিয়া লিখিয়াছেন, "সাধারণ ব্যাকরণশাস্ত্রেও আমার ব্যুৎপত্তি নাই। তবে আমার ভাগ্য অতি অসাধারণ, কারণ মহৎ কৃপালাভ করিয়াছি। সেই কৃপাবলে অতি দুর্ব্বোধ্য দর্শনশাস্ত্র সকল স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাঁহাদের গোপনরক্ষিত জ্ঞানামৃত আমার নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমিই স্থানে স্থানে বিস্মিত হইয়াছি।"

এই যে মহৎকৃপা ইহা তামসিক অবসাদজড়িত কর্ম্ম-বিহীন অবস্থায় পাওয়া যায় না। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারসম বিঘ্নবহুল সেই তত্ত্বজ্ঞানের দুর্গম পথ। জড়তা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিদ্ গুরুকে লাভ কর, তাঁর কৃপায় নিখিল জ্ঞান আয়ত্ত হইবে। তদীয় গুরুদেবের জীবনচরিতের সপ্তম অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন, "বস্তুতঃ সদ্গুরুর কৃপা ভিন্ন যে প্রকৃত আস্তিক্য জন্মে না তাহা আমি নিজের জীবনে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।...ভগবান বলিলেই ত

সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া তিনি আছেন ইহা বুঝা যায়। তিনি আমার সমক্ষে তবে নিত্যই বর্ত্তমান আছেন, আমার সমস্ত কার্য্য ও সমস্ত চিন্তা দর্শন করিতেছেন; আমি যদি এই কথা যথার্থই বিশ্বাস করি তবে আমার দ্বারা কি প্রকারে কুকার্য্য সাধিত হইতে পারে এবং পাপচিন্তারই বা আমি কি প্রকারে মনে স্থান দিতে পারি? যখন আমি পাপকার্য্য ও পাপচিন্তা হইতে বিরত হইতে পারিতেছি না তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে আমার আস্তিক্যের গর্ব্ব বৃথা, এবং আমার প্রকৃত আস্তিক্য জন্মে নাই। দয়াল সদ্‌গুরু অনুগত শিষ্যের অন্তরে এই আস্তিক্যবুদ্ধি অল্পে অল্পে প্রবিষ্ট করান…এই জন্য কৃপা করিয়া নানা সময়ে তাঁহার অন্তর্য্যামিত্বের ও সামর্থ্যের পরিচয় আমাকে দিয়াছেন; নতুবা আমার মত শুষ্ক তার্কিকের কিঞ্চিৎ মাত্রও যথার্থ আস্তিক্যবুদ্ধি পাওয়া কঠিন হইত। কতকগুলি ঘটনা দ্বারা শ্রীশ্রীমদ্ বাবাজী মহারাজের অপার করুণা প্রকাশ পাইবে।"

"অথাতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" এই সূত্রের যে ইঙ্গিত "বিবেক বৈরাগ্য ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব" আচার্য্যদেব পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ করিয়া তৎসমুদয় লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা প্রদানের পূর্ব্বে আচার্য্য শিষ্যের কর্ম্মকুশলতা, সহিষ্ণুতা দাঢ্য প্রভৃতি বহুকাল বহু প্রকারে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত পাত্র নির্ণয় করিতেন। মুমুক্ষু শিষ্যকে অস্থিচর্ম্মসার শত গোবৎস দিয়া বলিয়াছেন, ইহারা সুস্থ সবল ও সহস্রসংখ্যক হইলে ফিরিয়া আসিও, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন তিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ধন্য হইতেন; কারণ জ্ঞান ও কর্ম্ম অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ। কর্ম্ম-বিহীন জ্ঞান বা জ্ঞানবিহীন কর্ম্ম এই মরজগতে শশশৃঙ্গবৎ অলীক।

সন্ন্যাসাশ্রমে তাই এ যুগের অপূর্ব্ব অতুলনীয় দৃশ্য দেখা গিয়াছে যখন দৈনিক ৫১০৲ ফীর তারাকিশোর বাবু দীনহীন বেশে আশ্রমে কাঠ কাটিতেছেন, গরুর জাবনা দিতেছেন, গোবরে কাণ্ডা তৈয়ার করিতেছেন, বড় বড় ডেক মাজিতেছেন, ও কাঁধে করিয়া বহু কলসী জল উঠাইতেছেন, ও স্বীয় হস্তে রসুই করিয়া ঠাকুরের ভোগ লাগাইতেছেন।

"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" ইহা গীতা উদাত্ত স্বরে গাহিয়াছেন। এই বাণী মুমুক্ষুর পক্ষে যেমন সত্য, বর্ত্তমানে এই পতিত দেশের জীবনসংগ্রামে আমাদের তাহা একান্ত অবলম্বনীয়। গুরু মিলে লাখ্ লাখ্ শিখ্ না মিলে এক। এহেন সুদুর্লভ শিষ্যের অন্তরে ব্রহ্মবিদ্ গুরুদেব কাঠিয়া-বাবা পূর্ণজ্ঞানের সঞ্চার করিয়াছিলেন। "তেন ব্রহ্ম-হৃদা যঃ আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।"

একদিন তিনি বলিয়াছিলেন ব্রহ্মবিদ্ প্রায় ব্রহ্মার মত সমস্ত শক্তির অধিকারী হন। সৃষ্টি প্রলয় তিনি করিতে পারেন না সত্য "জগৎ ব্যাপার বর্জ্জং।" অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি দেশকালের অতীত হন। যে-কোন বিষয় তিনি ইচ্ছামাত্র জানিতে পারেন। পার্থক্য এই, ব্রহ্মের জ্ঞানে সমস্ত বিষয় চিরন্তন বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মের আর স্বতন্ত্র ইচ্ছার দরকার হয় না। আচার্য্যদেব তদীয় গুরুদেবের জীবনীতে লিখিয়াছেন, "ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে গৃহস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই…। সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সাধনাদি করিলে তাহাতে নানাবিধ অলৌকিক শক্তি জন্মে এবং তদ্দ্বারা জগতের লোকের অনেক উপকার সাধন করা যায়; গৃহস্থাশ্রমে তৎসমস্ত শক্তি সচরাচর হয় না, এই মাত্র প্রভেদ। কেবল গুরুকৃপাতেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয়; তৎসম্বন্ধে উভয় আশ্রম তুল্য। সংসারে বিধিবিহিত কার্য্যকর্ম্ম করিতে ও অন্তরে সর্ব্বদা ভগবানের ভয় রাখিয়া চলিতে বলিতেন। ভগবান সর্ব্বদা সঙ্গে আছেন এবং দেখিতেছেন এই ধ্যান করিয়া কার্য্য করিলে জীব সহজে কল্যাণ লাভ করে।"

এ সমস্ত আলোচনার ফলিতার্থ এই যে নবযুগে আচার্য্য-দেব হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম যুগস্তম্ভ। রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও গোস্বামীপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুকে স্বীয় ধর্ম্মে শ্রদ্ধাশীল করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমৎ সন্তদাস দেব হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা ও শাস্ত্রবাক্যের পূর্ণ সত্যতা নিজ জীবন দ্বারা উপলব্ধি করিয়া তাহা তদীয় বহু গ্রন্থে সবিস্তারে প্রচার করিয়া আমাদের মত শুষ্ক তার্কিকের প্রাণ মন সরস করিয়া দিয়াছেন। ইদানীং শরীরের অসুস্থতার জন্য তিনি কথা কহিতে ক্লান্তিবোধ করিতেন। কিন্তু দেহ-ত্যাগের পাঁচ দিন পূর্ব্বে যেদিন বিখ্যাত অদ্বৈতবৈদান্তিক

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন সেদিন এত নিপুণতার সহিত দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী শ্রীনিম্বার্ক মতের ভেদাভেদবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন যে সমবেত শিষ্য- ও জন মণ্ডলী চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সেই সময়টুকুর জন্য সকলে মনে করিয়াছিলেন যে তিনি নিরাময় হইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়াছেন। এই বিষয় আলোচনার অব্যবহিত পরে তিনি এত অবসন্ন হইয়া পড়েন যে দুই-এক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ উত্থানশক্তিরহিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়াছিল কি করিয়া তিনি শীঘ্র বৃন্দাবনে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব গুরুর আশ্রমে পৌঁছিবেন। কাহারও বাধা তিনি মানিলেন না। স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু—যিনি প্রব্রজ্যার সময় বন্ধু-বান্ধবের বাধা-নিষেধ দূর করিয়া গন্তব্য পথ সরল করিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই, এক দিন প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে পাঠাইয়াছিলে, আজ পুনরায় সহায় হও। এবার দেহ থাকিবে না, এ সময়ে আমায় বৃন্দাবন পাঠাইয়া দাও।" তিনি মহাপরিনির্ব্বাণে সহায়ক হইয়া আচার্য্যদেবের অভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন।

আচার্য্যদেবের নিজের কথায় বলিতেছি, "তাঁহার দেহত্যাগ-কার্য্যও একটি লীলা মাত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" ... "তাঁহার যে মৃত্যু নাই এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যে অমরত্ব লাভ করেন বলিয়া শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে সেই অমরত্ব তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন।...এই ভারত ভূমি বস্তুতই ধন্যা; কারণ এবম্বিধ ব্রহ্মর্ষি এই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া লীলা বিস্তার করতঃ এই ভূমিকে পবিত্র করিতেছেন।"

অন্তরালে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

(নোগুচির *From the Eastern Sea* হইতে)

তপনেরে পূজি আমি,—নয় তার কিরণের তরে,
শুধু সেই ছায়া লাগি, তরু হ'তে যাহা সে আহরে।
সেই স্নিগ্ধ অনাতপ মায়াকুঞ্জ যেন দেবতার,
রচি স্বপনের মালা সুনিভৃত অন্তরালে তার।

নারীরে যে ভালবাসি, তার প্রণয়ের তরে নয়,
প্রেমের স্মৃতির লাগি, প্রেম মরে স্মৃতি মৃত্যুঞ্জয়।
সে স্মৃতি যে চিন্তামণি, চিরন্তন, অম্লান নবীন,
সে অতল কূপ হ'তে পান করি সুধা অনুদিন।

শুনি বিহগের গান, নয় কলকণ্ঠ তরে তার,
সেই স্তব্ধতার লাগি,—থামে যবে সুরের ঝঙ্কার
গানের গহনতলে ওঠে ফুটি নৈঃশব্দ্যের ফুল,
সেই অগমের পানে চেয়ে রয় শ্রুতি নিরাকুল।

আলোচনা

সিংহভূমকে উড়িষ্যাভুক্ত করিবার চেষ্টা

শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্ম্মা

গত আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী' পত্রে সম্পাদকীয় বিবিধ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে :—"উৎকলের অন্তঃপাতী অঞ্চলের কতকগুলি লোক সিংহভূমের জনসাধারণের মধ্যে উৎকলীয় ভাষা চালাইয়া উহাকে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টায় আছেন। যাহা যাহা অধুনা বাস্তবিক উড়িষ্যার অংশ উৎকলীয়েরা তাহা তাহা পাইয়াছেন। যাহা এখনও উড়িষ্যা নহে তাহাকে উড়িষ্যা বানাইবার চেষ্টা না করা ভাল।"

সিংহভূম জেলাকে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তত্রত্য উড়িয়ারা বহুদিন হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। সদাশয় গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন নিবেদন জ্ঞাত করিয়া এখনও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গত উড়িষ্যা বাউণ্ডারী কমিশনের নিকটে সিংহভূমের উড়িয়ারা যে মেমোর‍্যাণ্ডাম প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে এই আন্দোলনের বিষয় যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

সিংহভূম বহুকাল হইতে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্যকরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ আলোচনা করিলে জানা যায় যে সিংহভূম উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিংহভূমে বর্ত্তমান দুইটি দেশীয় রাজ্য আছে। সেই রাজ্যের রাজারা উড়িয়া। উড়িয়া ভাষাকে **court language** রূপে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সিংহভূমে যে-সব জমিদার আছেন, উড়িয়া ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষারূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি মারকুইস্ অব ওয়েলেস্‌লী সিংহভূমের তদানীন্তন রাজকুমার অভিরাম সিংহকে মিত্রভাবে এক পত্র দিয়াছিলেন। সিংহভূমে অনার্য্য, কোল, মুণ্ডা, ভূমিজ প্রভৃতি আদিম জাতির বাসস্থান। এই অনার্য্য জাতিদিগকে দমন করিবার জন্য ইংরেজ-সরকারের সহিত সিংহনামধারী রাজবংশীয়েরা বরাবর সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। সিংহনামধারী ক্ষত্রিয়েরা এই রাজ্যের রাজা-স্বরূপে বহুকাল হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের নামানুসারে ইহা সিংহভূম নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। সিংহভূমে হিন্দুস্থানী, বাঙালী, উড়িয়া ও প্রাচীন অধিবাসী 'হো'রা বাস করিয়া আসিতেছে। সিংহভূমে টাটা কোম্পানী ও অন্যান্য কোম্পানী ব্যবসা আরম্ভ করাতে এবং সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বাঙালীরা স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান ভাবিয়া ক্রমে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষেও 'হো' এবং উড়িয়া এই দেশের আদিম অধিবাসী। অন্যান্য জাতিরা ক্রমে ক্রমে এখানে আসিয়া থাকিতেছে। 'হো'দের সংখ্যা বেশী, কিন্তু ইহাদের সাহিত্য ও লিপি নাই। আদালতে ইহাদের ভাষা গৃহীত হয় না। আদালতে হিন্দী, বাংলা চলিতেছে, উড়িয়া ভাষা চলে না। বাঙালী, হিন্দুস্থানী অপেক্ষা উড়িয়ার সংখ্যা বেশী। তথাপি সিংহভূমে উড়িয়া-ভাষাকে স্থান দেওয়া হয় না, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় ?

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে **Mr. Odonnels** বেঙ্গল সেন্সস রিপোর্টে লিখিয়াছেন :—

"**Singbhum is the most polyglot district in the Lower Provinces, the Ho, dialect of Mundari being the parent tongue of 2,23,031 persons, Oriya of 1,44,402, Bengali 1,06,686, Santhali of 59,212, Hindi of 25,867 and Korwa of 15,533 persons."**

গত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সেন্সস্ রিপোর্ট হইতে বর্ত্তমান সিংহভূমের লোকসংখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

Total population of Singbhum :—9,29,802. Bengali —1,47,517, Hindusthani—(Hindi and Urdu) 81,047, Oriya—1,71,887, Bhumij—30,179, Ho—3,05,257, Mundari —54,408, Santali—1,03,703. Doubtful—85,530.

এই যে Doubtful 85,530 জন অধিবাসীর মধ্যে উড়িয়াদের স্থান কিরূপ তাহা অবগত করাইবার জন্য পাঠকদিগকে গত সেন্সস রিপোর্টের **Appendix VII—Language, Casteand Race in Singhum District**-এর বিষয় অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"But it is probably true that in doubtful cases (which were plentiful) the language entry made by a Bengali enumerator might not be the one which would have been made by an Oriya enumerator. For instance, in localities such as Baharagora the language in common use is a mixed dialect of Oriya and Bengali, and the proper method of recording it will often give rise to genuine perplexity. In that part of the district most of the enumerators were Bengalis, and it is likely that they sometimes used their descretion in this matter in a way which did not commend itself to Oriya sentiment."

বঙ্গের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে *Journal of Asiatic Society of Bengal* পত্রে উড়িষ্যার সীমানির্দ্ধারণ করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন পাঠকবর্গের অবগতার্থে নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। বাঙালী ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী সীমা, রাজ্য, উড়িয়ারা এক শাসনাধীনে পাইলে তাহাদের কল্পিত প্রদেশগঠন পূর্ণ হইবে, নচেৎ নহে। উড়িয়াদের দাবি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়া আমাদের নমস্য হইয়াছেন।

...The changes are perceptible even in the adjoining main tracts, and are most clearly marked in the parts of the Oriya-speaking area included in each province, *e. g.*, in Bengal, the southern parts of the Midnapur District, and the eastern and southern parts of the Singbhum District, in the Central Provinces, the Sambalpur District and the adjoining tributary States of Sonepur, Patna, etc., in

Madras Presidency—the entire north of the Ganjam District down to the Ichhapura including the hilly Zemindaris of the three Khemdis and the hilly Zemindari of Jeypore in the Vizagapatam District.

বর্ত্তমান সিংহভূমকে উজ্জ্বল করিয়াছে টাটা কোম্পানী। উড়িয়ারাজ্য ময়ূরভঞ্জ হইতে লৌহের উপাদান আনিয়া এই প্রকাণ্ড কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উড়িয়ারাজ্য ময়ূরভঞ্জ হইতে উপাদান সংগ্রহ করা হইতেছে মাত্র, কিন্তু উড়িয়াদের কোন প্রতিপত্তি তথায় বিদ্যমান নাই। উড়িয়াদের প্রাচীন বাসস্থান এখনও উড়িয়ারা এক শাসনাধীনে পান নাই। সকল অংশ একশাসনাধীনে পাইলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন। মেদিনীপুরে উড়িয়াদের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, গত ১৩৩৮ সালের চৈত্র মাসের প্রবাসীতে তাহা আমি প্রদর্শন করিয়াছি। সিংহভূমকে উড়িয়াদের নবগঠিত উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত সম্মিলিত করিলে উড়িয়াদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখান হইবে।

ভিতর ও বাহির

"বনফুল"

আমাদের মন সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বাহিরের—অন্য ভাগ ভিতরের। মনের যেদিকটা বাহিরের তাহা ভদ্র, তাহা সামাজিক এবং সভ্য। ভিতরের মনটা কিন্তু সব সময়ে সভ্য ও সামাজিক নয়—তাহার চাল-চলন চিন্তা-প্রণালী বিচিত্র। বাহিরের মনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ভিতরের মন কখনও হাসে, কখনও কাঁদে এবং ক্বচিৎ সায় দেয়। দুই ভাগের কলহও নিত্যনৈমিত্তিক।

রামকিশোরবাবুর ভিতরের মনটা বহুকালাবধি মৃতপ্রায়। বাহিরের মনের অত্যাচারে সেটাকে জরজর করিয়া ফেলিয়াছিল। রামকিশোরবাবু উকীল। খুনীকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা-সাক্ষী সৃষ্টি করিবার প্রয়াস, বড়লোক জমিদারের হইয়া গরিব প্রজার সর্ব্বনাশসাধন, জাল উইল সৃষ্টির পরামর্শদান ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই তিনি বাহিরের ব্যবহারিক মনটার সাহায্য লইয়াছিলেন। ভিতরের মনটা প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনেক অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল—আজকাল আর সে কিছু করে না।

সেদিন সকালে রামকিশোরবাবু তাঁহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক জন বিধবার সম্পত্তিঘটিত একটা মামলায় তাঁহাকে কিছুকাল যাবৎ বিব্রত করিতেছে। আজ কেসটা কোর্টে উঠিবে—সেজন্য তিনি একটু যেন উদ্বিগ্ন আছেন। অন্যমনস্ক ত বটেই।

এমন সময় আর এক জন প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন যে তিনি কোন বিষয়ে পরামর্শ লইতে চাহেন। রামকিশোরবাবু ভদ্রলোককে চিনিতেন না। সুতরাং অসঙ্কোচে বলিলেন, "আইন-সংক্রান্ত কোন পরামর্শ দিতে হ'লে আমি 'ফী' নিয়ে থাকি তা জানেন ত?"

"আজ্ঞে হাঁ।—কত দিতে হবে আপনাকে?"

"বত্রিশ টাকা।"

"আচ্ছা, বেশ—।"

উভয়ে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, "আমার এক জন আত্মীয় আছেন—তাঁর একমাত্র ছেলের বিবাহ হয়েছে আজ প্রায় দশ বৎসর। সন্তানাদি আজও কিছু হয় নি। সম্ভাবনাও কম।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?"

"হাঁ, তাঁদেরও মত যে ছেলেপিলে হওয়া শক্ত।"

"ছেলেটি বেশ স্বাস্থ্যবান ত?"

"হাঁ, ছেলের কোন রোগ নেই।

"আমার কাছে কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান" বলিয়া রামকিশোরবাবু একটি নস্যদানি হইতে এক টিপ্ নস্য গ্রহণ করিলেন।

"এ সম্বন্ধে আপনার কাছে শুধু এইটুকু জানতে আসা যে যদি বংশ লোপই পায়, তাহ'লে শেষ-পর্য্যন্ত সম্পত্তিটা কারা পাবে?"

নস্যের টিপটা নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইয়া রামকিশোরবাবু

বলিলেন, "ছেলে যখন স্বাস্থ্যবান তখন সে আবার স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে। হিন্দু ল' অনুসারে তাতে কোন বাধা নেই।"

"তা ত নেই। কিন্তু আইনের বাধা না থাক্‌লেও সব-সময় কি সব-জিনিষ করা সম্ভব?"

রামকিশোরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "সেন্টিমেন্ট অনুসারে চল্‌লে কি আর দুনিয়ায় চলা যায় মশাই! ওই সব বাজে সেন্টিমেন্ট নিয়েই ত আমরা ডুব্‌তে বসেছি!"

রামকিশোরবাবু সেন্টিমেন্টের অপকারিতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন। বাহিরের মন তাঁহার যুক্তি ও কথা জোগাইল। ভিতরের মন নির্ব্বাক।

আগন্তুক তখন বলিলেন, "ধরুন যদি ওঁরা ছেলের বিয়ে আর না দেন তাহ'লে সম্পত্তি কারা পাবে?"

আইন-অনুযায়ী যাহারা যাহারা উত্তরাধিকারী হইতে পারে—রামকিশোরবাবু তাহা গড়গড় করিয়া বলিয়া গেলেন।

পরিশেষে তাঁহার স্বকীয় মতটা পুনরায় তিনি বলিতে ছাড়িলেন না;—"ছেলের আবার বিয়ে দিন মশাই। বাঁজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কি? ছেলেপিলে না থাকলে সংসার ত শ্মশান! আমি মশাই যেটা উচিত মনে করছি, তাই আপনাদের বল্‌লাম—আপনার সেন্টিমেন্টে যদি আঘাত লেগে থাকে মাপ করবেন।"

আগন্তুক বলিলেন, "না না—কিছুমাত্র না। আপনি স্পষ্টবাদী লোক এবং মক্কেলের ঠিক সত্যিকার হিতৈষী—এই শুনেছি বলেই ত আপনার কাছে আসা।"

বত্রিশ টাকা ফী দিয়া ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

চার-পাঁচ দিন পরে একদিন একটি গাড়ী আসিয়া রামকিশোরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রামকিশোরবাবু বিপত্নীক। বাড়িতে ঠাকুর-চাকরের সংসার। দ্বিপ্রহরে বিশেষ কেহ নাই—একটা ছোঁড়া চাকর মাত্র আছে। রামকিশোরবাবু কোর্টে। ছোঁড়া চাকরটা ট্রাঙ্ক বিছানা প্রভৃতি নামাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। ট্রাঙ্কের উপর নাম লেখা—"সরোজিনী দেবী"।

ব্যবহারে বোঝা গেল, ছোঁড়া-চাকরটা সরোজিনী দেবীকে চেনে না। তা ছাড়া তরুণীটির ব্যবহারেও সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সরোজিনী ভিতরে বারান্দায় গিয়া বাক্স-বিছানা রাখিয়া চাকরটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায়?"

"কাছারীতে।"

"কখন আসবেন?"

"জানি না।"

তাহার পর তিনি বারান্দায় নিজের বাক্সটার উপর বসিয়া রহিলেন। বিষাদের প্রতিমা।

* * *

রামকিশোরবাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, "একি, সরি, তুই হঠাৎ খবর না দিয়ে এলি যে!"

"ও বাড়িতে থাকা আর পোষাবে না!"

"কেন? ব্যাপার কি?"

রামকিশোরবাবু কন্যার ব্যবহারে ক্রমশই বিস্মিত হইতেছিলেন।

"পোষাবে না, মানে?"

"ওরা ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছে! তুমিও ত মত দিয়েছ!"

"আমি মত দিয়েছি,—মানে?—"

"ওরা এক জন অচেনা লোক তোমার কাছে পাঠিয়ে তোমার ঠিক মতটা জেনে নিয়ে গেছে। অন্ততঃ তাই ত শুনলাম। তুমি নাকি বলেছ—ছেলের বিয়ে দেওয়াই ভাল—"

রামকিশোরের নেপথ্যবাসী ভিতরের মনটা তখন বাহিরের মনের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে।

হতবাক্ রামকিশোর তাঁহার একমাত্র কন্যার মুখের দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি তুমি বলেছ, বাবা?"

জবালা

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম-জননী জবালার যে কাহিনী রহিয়াছে, তাহা অনেকেরই সুপরিচিত। বৃত্তান্তটি এই :— জবালার পুত্র সত্যকামের বেদ পড়িতে ইচ্ছা হইয়াছে; গুরুর নিকট গেলেই তিনি তাহার গোত্র জানিতে চাহিবেন; সুতরাং সত্যকাম তাহার মাতার নিকট তাহারা কোন্ গোত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছে। মাতা গোত্র বলিতে পারেন না, শুধু এই মাত্র জানেন যে, যৌবনে সত্যকামকে তিনি লাভ করিয়াছেন; সত্যকামের পিতার কোন পরিচয় তাঁহার জানা নাই। গুরু পরিচয় জানিতে চাহিলে তাঁহার মতে সত্যকামের পক্ষে ইহা বলাই উচিত হইবে যে, তাহার মাতৃদত্ত নাম 'সত্যকাম'; আর, তাহার জননীর নাম 'জবালা' বলিয়া তাহাকে 'জাবালও' বলা চলে; সুতরাং তাহার পুরা নাম 'সত্যকাম-জাবাল'। ইহার বেশী পরিচয় আর তাহার নাই।

মাতার নিকট এই উপদেশ লাভ করিয়া সত্যকাম গৌতম-গোত্রীয় হারিদ্রুমত নামক ঋষির নিকট বেদ পড়িতে গেল। ভাবী গুরু যথারীতি গোত্র ও পরিচয় জানিতে চাহিলে সত্যকাম মায়ের শিক্ষামত উত্তর করিল, "আমার গোত্র কি জানি না; মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনিও বলিতে পারেন না। আমার মা'র নাম জবালা আর আমার নাম সত্যকাম; আমি জবালাপুত্র সত্যকাম; সুতরাং আমার সম্পূর্ণ নাম 'সত্যকাম-জাবাল'। ইহার বেশী পরিচয় আর আমার নাই।"

যুবকের এই সরল উত্তর শুনিয়া ঋষি হারিদ্রুমত সন্তুষ্ট হইলেন। "অব্রাহ্মণ কেহ এমন সরল উত্তর দিতে পারে না; সুতরাং তুমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হইবে। তুমি আমার শিষ্য হইতে পার, আমি তোমায় শিক্ষা দিব।" এই বলিয়া তিনি সত্যকামকে আশ্রমে আশ্রয় দিলেন।

উপাখ্যানটি অবশ্য এইখানেই শেষ হয় নাই। ইহার পর সত্যকাম যে ভাবে ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণও ইহাতে রহিয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার দিক্ দিয়া উপাখ্যানটির মূল্য অনেক এবং ইহা বহুধা আলোচিত। কিন্তু গল্পটি কবি ও সাহিত্যিকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সত্যকামের যে সরলতা ঋষির প্রশংসা লাভ করিয়াছিল, তাহা আধুনিক দৃষ্টিতেও অপ্রশংসনীয় নহে। তাহা ছাড়া, কবি-দৃষ্টি জবালার উক্তিতেও একটা অকপট-ভাব লক্ষ্য করিয়াছে, যাহা সচরাচর চোখে পড়ে না। জবালা যে সত্যকামের গোত্র জানেন না, তাহার মানে কি? সত্যসত্যই তিনি যদি কাহারও পরিণীতা স্ত্রী হইতেন এবং কখনও অল্পকালের জন্যও পতিকুলে বাস করিয়া থাকিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে পতি-পুত্রের গোত্র জানা কিছুতেই অসম্ভব হইতে পারিত না। অথচ এই গোত্রের কোন সংবাদই তিনি রাখেন না। সুতরাং আশঙ্কা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, সত্যকামের জনক হয়ত তাঁহার পরিণেতা ঠিক ছিলেন না। এই কথাটাই হয়ত তিনি ইঙ্গিতে পুত্রের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। পুত্রের সঙ্গে তাঁহার এই অকপট ব্যবহার অনেকেরই সমবেদনা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকই কি জবালা পরিণীতা না হইয়াও পুত্রলাভ করিয়াছিলেন? অনেক মনীষীই মনে করিয়াছেন যে, দুর্ভাগা জবালার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল।

পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত এই উপাখ্যানটি লইয়া তাঁহার *Lays of Ancient India* নামক গ্রন্থে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায়, তাঁহার মতে জবালা যৌবনে ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে সত্যকামের জন্ম হয়। সত্যকামের পিতার গোত্র কি ছিল তাহা যে তিনি জানিতেন না, তাহার কারণ সেই পিতার সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘ পরিচয় কিছু ছিল না এবং স্থায়ী সম্বন্ধও হয় নাই।*

---

* "Sinfully I long have wandered.
 And conceived thee in my youth!
And I know not who thy father,
 Know not of what race thou art,
By the name of thy poor mother,
 Call thyself, child of my heart!"
op. cit.: p. 57.

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "ব্রাহ্মণ" নামক কবিতায়ও জবালার ইতিহাস এই ভাবেই বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গোত্র-জিজ্ঞাসু পুত্রকে জবালা কহিতেছেন—

"যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি, তাত।"

এইখানে 'বহু পরিচর্য্যা করি' এই কথা কয়টির অর্থ একটু অস্পষ্ট। একের প্রভূত সেবা অথবা বহুর সেবা—এই দুই অর্থেই 'বহু পরিচর্য্যা' কথাটা প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু দারিদ্র্য-দুঃখের কথা সঙ্গে জড়িত থাকায় মনে হয় এখানে বহু লোকের সেবারই ইঙ্গিত করা হইতেছে। দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া বহু পুরুষের পরিচর্য্যা করে ভর্ত্তৃহীনা যে-সব যুবতী, সাধারণ ভাষায় তাহাদের যে নাম আছে তাহা এখানে স্মরণ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অনুসারে জবালা সম্বন্ধে আমাদের কি মনে করা উচিত, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। তবে, প্রশ্ন এই, সত্য সত্যই জবালা কি তাই ছিলেন?

ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষা এইরূপ—

"সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্ বেদ তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি।"

এইখানে 'বহু', 'চরন্তী' এবং 'পরিচারিণী' এই কথা কয়টির উপর নির্ভর করিয়াই রবীন্দ্রনাথ এই অর্থ করিয়াছেন যে, জবালা বহু পুরুষের পরিচর্য্যা যৌবনে করিয়াছিলেন, কাহারও পরিণীতা পত্নী তিনি ছিলেন না।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার টীকায় এই কথা কয়টির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। শঙ্কর বলেন—

"বহু ভর্ত্তৃগৃহে পরিচর্য্যাজাতমতিথ্যভ্যাগতাদি চরন্ত্যহং পরিচারিণী পরিচরন্তীতি পরিচরণশীলৈবাহং পরিচরণ চিত্ততয়া গোত্রাদিস্মরণে মম মনো নাভূৎ। যৌবনে চ তৎকালে ত্বামলভে লব্ধবত্যস্মি। তদৈব তে পিতোপরতঃ।"

শঙ্করের মতে জবালার পতিগৃহ ছিল এবং তিনি পরিণীতা স্ত্রীও ছিলেন। তাঁহার পতিগৃহে অতিথি-অভ্যাগতাদি সর্ব্বদা আসা-যাওয়া করিত এবং তাহাদের সেবায় জবালা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। যৌবন তাঁহার এইরূপ নানা প্রকার অতিথি-সেবাতেই কাটিয়াছে; পতিকুলের গোত্রের খবর লওয়ার অবসর তাঁহার হয় নাই। সেই সময় সত্যকামের জন্ম হয়; এবং তাহার পরই পতি মারা যান। পতির মৃত্যুর পর তিনি একেবারে অনাথা হইয়া পড়েন; হয়ত বা পতিকুলে তাঁহার আর কেহ ছিলও না। সুতরাং পতি-পুত্রের গোত্র সম্বন্ধে কোন সংবাদ লওয়া আর তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই।

শঙ্করের এই ব্যাখ্যা সকল প্রকার প্রশ্নেরই মীমাংসা করিয়াছে এবং সকল সন্দেহেরই নিরাকরণ করিয়াছে, এমন নয়। সেই জন্য শঙ্করের টীকাকার আনন্দগিরি ব্যাপারটা আরও একটু স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বামীর গৃহে নানা কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকায় গোত্রের খবর লওয়ার অবসর জবালার হয় নাই। তাহা ছাড়া, প্রথম যৌবনের লজ্জাও ত ছিল! সুতরাং স্বামীর সঙ্গে এই সব অবান্তর বিষয়ের আলোচনা সম্ভব হয় নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, যৌবন ত আর চিরস্থায়ী নয়, লজ্জাও নয়; এমন একটা সময় ত সকলেরই বিবাহিত জীবনে আসে, যখন স্বামী-স্ত্রীতে সহজ সরল ভাবে আলাপ হইতে পারে? কিন্তু জবালার সেই সময় আসিবার পূর্ব্বেই বৈধব্য আসিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং স্বামীর নিকট হইতে তিনি গোত্র জানিয়া রাখিতে পারেন নাই। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, অন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেও ত গোত্র জানা যাইত? ইহার উত্তর, বিধবা জবালা শোকে এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, গোত্রের খবর লওয়ার প্রবৃত্তি আর তাঁহার হয় নাই!

এই সব ব্যাখ্যার ভিতর কোন কষ্ট-কল্পনা নাই, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। শঙ্কর এবং তাঁহার টীকাকার উভয়েই প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন যে, জবালার মত এক জন ব্রাহ্মণকন্যা এবং ব্রাহ্মণের স্ত্রীর পক্ষে নিজের গোত্র না-জানাটা আশ্চর্য্যের বিষয় এবং ইহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াও প্রয়োজন। জবালা যে অল্প বয়সে অর্থাৎ একটি পুত্রের জন্মের পরই বিধবা হইয়াছিলেন, একথা উপনিষদ্ বলে নাই; ইহা ব্যাখ্যাকারদের কল্পনা। আর বৈধব্যের পরই তিনি এত অনাথা অথবা নির্বান্ধবা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পতিকুলের গোত্র বলিতে পারে এমন কাহারও সাক্ষাৎ তাঁহার জুটে নাই; কিংবা, তিনি এত শোকাভিভূত হইয়া

পড়িয়াছিলেন যে গোত্রের কথা আদৌ মনেই জাগে নাই; এ সবও শ্রুতিতে নাই, ব্যাখ্যাকারদের অনুমান মাত্র।

মূলের পরিচারিণী শব্দের অর্থ করা হইয়াছে পরিচর্য্যাশীলা। পরিচর্য্যার অর্থ সেবা। পতিগৃহে সমাগত অতিথিদের সেবাও পরিচর্য্যা; আর ভর্ত্তৃহীনা নারীর নিজগৃহে সমাগত পর-পুরুষের সেবাও পরিচর্য্যা নামে অভিহিত হইতে পাবে। শুধু এই কথাটা হইতে মূলের অর্থ আবিষ্কার করা কঠিন। মূলে যে 'বহু' কথাটা আছে তাহার লিঙ্গ হইতে বুঝা যায় যে, উহা ক্রিয়া-বিশেষণ মাত্র, 'বহু' পুরুষবাচক নয়; কারণ, তাহা হইলে উহার পুংলিঙ্গ হওয়া উচিত ছিল এবং শব্দটি হওয়া উচিত ছিল 'বহূন্'। ব্যাকরণ অনুসারে এই ব্যাখ্যা হয় যে, জবালা বহু পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন এই মাত্র। কিন্তু ইহা হইতে বলা চলে না যে, তিনি বহু লোকের সেবা করেন নাই। কারণ, একের বহু সেবা অথবা বহুর সেবা—দুই-ই 'বহু সেবা' বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের ভাষাও দ্ব্যর্থবোধক রহিয়া গিয়াছে। তাহার পর 'চরন্তী' কথাটাব মানে কি? রমেশচন্দ্র দত্ত ইহার অর্থ করিয়াছেন 'wandei' অর্থাৎ দেশদেশান্তর ভ্রমণ; শঙ্কর ইহাকে 'পরিচরন্তী' অর্থাৎ পরিচয্যাশীল অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন; এ অর্থও যে হয় না, এমন নয়। এই সমস্ত ব্যাখ্যার ভিতরে যে কথাটা স্পষ্ট এবং সর্ব্ববাদিসম্মত, সেটি এই যে, জবালাকে বহু পরিচয্যা করিতে হইয়াছিল। তবে সেটা কি একই গৃহে একই পুরুষের অধীনে বাস করিয়া তাহারই অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, না, স্বৈরিণী নারী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমাগত বিভিন্ন পুরুষের যে সম্বর্দ্ধনা করে তাই,—সে বিষয়ে সকলে একমত নন।

কিন্তু একটা কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, শুধু কথার ব্যাকরণ-সম্মত এবং কোষ-সম্মত ব্যাখ্যা করিলেই ঘটনার ব্যাখ্যা হয় না! ব্রাহ্মণ-কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী, ব্রাহ্মণের মাতা—অথচ, জবালা নিজের গোত্র জানেন না, ইহা কি খুব সম্ভব? শঙ্কর-আনন্দগিরির মনে রাখা উচিত ছিল, যে, ব্রাহ্মণের দশবিধ সংস্কারেই তাহার গোত্র উল্লেখ করিতে হয়, বিবাহের সময়ও হয়। বিবাহের পূর্ব্বেও গোত্রের খবর লইতে হয়, কেননা সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় জবালার পক্ষে স্বামীর গোত্র না-জানা একটু আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি? স্বামীর সঙ্গে গোত্র সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলার অবসর না-হয় তাঁহার হয়ই নাই; তথাপি, বিবাহের সময়ে, পূর্ব্বে এবং পরে যে কথাটা নিশ্চয়ই একাধিক বার আলোচিত হইয়াছিল, তাহা না-জানার ত কথা নয়! জবালাকে প্রথমে গৃহকর্ম্মে অত্যধিক ব্যাপৃতা, পরে অকাল-বিধবা এবং অনাথা মনে না করিয়া যদি শঙ্কর-আনন্দগিরি তাঁহাকে সোজা 'হাবা মেয়ে' বলিয়া কল্পনা করিতেন, তবে বরং তাঁহার এই অজ্ঞতার একটা বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎ হইত! কিন্তু তাহা তাঁহারা করেন নাই; তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, জবালার কথাগুলি ঠিক হাবার মত নয়!

জবালা সন্তানের মা; তাঁহার ছেলের শিক্ষা আরম্ভ করিতেই গোত্রের পরিচয় প্রয়োজন হইবে, এ-কথা তিনি জানিতেন। আজকাল ছেলেদের ইস্কুল-কলেজে ঢুকিতে হইলে গোত্র বলিতে হয় না; সুতরাং আজকাল কোন মা যদি ছেলের গোত্র বলিতে না-ও পারেন, তবু তিনি নিন্দনীয় হইবেন না। কিন্তু আজকাল ছেলেদিগকে তাহাদের পদবী বলিতে হয়, এবং সেটা নিশ্চয়ই মায়েরা জানেন।

আবও একটা কথা। জবালা কি গৃহকর্ম্মে এতই ব্যস্ত থাকিতেন যে, তিনি তাঁহার স্বামীর নামটি পর্য্যন্ত জানিবার অবসর পান নাই? কই, তিনি ত স্বামীর নামে ছেলেকে নিজের পরিচয় দিতে উপদেশ দিতেছেন না! সে সময়ে অবশ্যই মায়েব নামে পরিচিত হওয়ার রীতিও ছিল; কিন্তু বাপের নামে ছেলের নাম হওয়ার নিয়মটাই প্রবল ছিল। যুধিষ্ঠির 'কৌন্তেয়'ও বটেন, 'পাণ্ডব'ও বটেন। রামচন্দ্রের বাপের নাম অনুসারে নাম 'দাশরথি', মায়ের নাম অনুসারে তাঁহার কোন প্রসিদ্ধ নাম নাই। উপনিষদের যুগে ব্রাহ্মণদের নাম পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে পিতার নামে পরিচিত হওয়ারই প্রথা ছিল। সর্ব্বত্র না হইলেও প্রায় সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। গৌতম, ভারদ্বাজ, ভার্গব, গার্গ্য, আরুণি, আরুণেয় ইত্যাদি সমস্ত নামই পিতৃনামানুযায়ী। এই যদি তখনকার দিনে ব্রাহ্মণদের সাধারণ রীতি হইয়া থাকে, তবে জবালার পুত্রের পরিচয়ও ত মায়ের নামে না হইয়া বাপের নাম অনুসারেই হওয়া উচিত ছিল!

বিবাহ হইয়াছিল, ছেলেও হইয়াছে; পতি-গৃহে নিপুণা গৃহিণীর মত নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া কিছুকাল বাসও

করিয়াছেন ; অথচ এই স্ত্রীলোকটি স্বামীর গোত্র ত জানেনই না, তাঁর নামটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন ! সশিষ্য শঙ্কর শপথ করিয়া বলিলেও এই নারীটিকে বৈধভাবে বিবাহিত অবস্থায় সন্তানের জননী বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। টীকাকারদের নানা প্রকার কৈফিয়তের চেষ্টা হইতেই বোঝা যায় যে, ব্যাপারটা একটু ঘোরালো। তাহা ছাড়া, উপনিষদ্ ত একথা বলে না যে, জবালা 'ভর্ত্তৃহীনা' ছিলেন না। উপনিষদের যুগে এইরূপ অপরিণীতা নারীর সন্তান যে জ্ঞান-গরিমায় প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, এমনও ত নয়। স্বয়ং বেদব্যাস পরিণয়-প্রসূত সন্তান ছিলেন না। সত্যকামের জন্মও যদি সেই ভাবেই হইয়া থাকে, তাহাতে তেমন আশ্চর্য্যের বিষয় ত কিছুই নাই !

যে গুরুর নিকট সত্যকাম শিক্ষার জন্য গিয়াছিল, তিনিই বা এত উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন কেন যে, "অব্রাহ্মণ এমন কথা বলিতে পারে না ?" এক বিধবা ব্রাহ্মণী, স্বামীর নাম জানেন না, গোত্র জানেন না, ছেলেকে নিজের নামে পরিচয় দিতে শিখাইয়া দিয়াছেন—ইহাতে এমন উচ্ছ্বসিত হইবার কি আছে ? যাহা গোপন করা স্বাভাবিক তাহা যে সরল ভাবে প্রকাশ করিয়া দেয় তাহারই অকপটতা প্রশংসার যোগ্য। সত্যকামের গুরু যে তাহার সরলতার প্রশংসা করিয়াছেন তাহাও এই জন্যই। মাতাপুত্র উভয়েই অতীতের একটা লজ্জাজনক ব্যাপার ভানের সাহায্যে গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া যে সরল সত্যের পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, উদার-দৃষ্টি ঋষির কাছে তাহাই প্রশংসনীয় বিবেচিত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্কর যাহাই বলুন না কেন, সত্যকামের জন্ম উদ্বাহ-বন্ধনের বাহিরেই হইয়াছিল ; এবং কবির ভাষায় জবালা পুত্রকে ঠিকই বলিয়াছিলেন— "জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে" !

সমুদ্রের প্রতি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

(নগুচির *From the Eastern Sea* হইতে)

হে ভীষণ বিশালতা, হে বিস্ময়বিকম্প্র বিস্তার !
হে অকূল ধবলিমা, মহাশান্তি তলতটহীন !
হেরি তব সৌম্যমুখে আশীর্ব্বাণী যেন বিধাতার,
কী অমোঘ প্রত্যাদেশ ধরে তব গহন তুহিন !
স্থলচর আমাদেরে শুনাও তোমার রুদ্রবীণা,
মানবের বৈতালিক, চিরন্তন সত্যের উদ্গাতা !

তোমার সঙ্গীত-রবে ভুলে যাই মোর বাহুলীনা
প্রেয়সীরে, ভুলি গৃহ সুখশয্যা যেথা মোর পাতা।
অমৃতের উৎসধারা তোমা মাঝে হয় আত্মহারা,
ত্রিদিবের মহাশক্তি ঘনীভূত তব নীলজলে।
বিস্ময়-বিহ্বল মোর ভীরু হিয়া কপোতের পারা
ওড়ে তব বক্ষোপরি, ছায়া তার ভাসে উর্ম্মিদলে।

কাব্যে শরৎ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল মৈত্র

রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণী' কাব্যপুস্তকের অন্তর্গত 'নটরাজ ঋতু-রঙ্গশালা' নামে একটি রূপক কাব্য-নাটিকা আছে। তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্ত্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হ'তে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।" প্রকৃতির এই বিরাট রূপকল্পনা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোন কবিই করেন নি। কালিদাসের কাব্যে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে যে সহমর্মিতার পরিচয় পাই তা যেন বন্ধুজন-সুলভ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এই বিশ্বলোক জুড়ে নটরাজের নৃত্য চলেছে। সে নৃত্যে ছন্দে ছন্দে ক্ষণে ক্ষণে যে রূপলোকের আবির্ভাব হয়, তাই ষড়ঋতুর মূর্ত্তি ধরে আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। যাঁকে বাক্যদ্বারা পাওয়া যায় না, যিনি 'অপ্রাপ্য মনসা সহ,' বন্ধনমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে কবি সেই নটরাজের লীলানৃত্য উপলব্ধি ক'রে আমাদের কাছে তাঁর লীলা বর্ণনা করেছেন।

এই ঋতুরঙ্গশালায় কবি ষড়ঋতুকে বিশ্বের লীলা-প্রাঙ্গণের মাঝে একে একে প্রবেশ করিয়েছেন। এর মাঝে আমরা শরৎকালের যে রূপ পাই তা যেন ঠিক ঋতুরূপে নয়, যেন নটরাজেরই একটি বিশেষ রূপের ভঙ্গিমা। বস্তুতঃ সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে শরতের এমন পরিপূর্ণ রূপ আর কোথাও পাই নি। পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ শরৎঋতু-সম্বন্ধে বহু গান কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু তা যেন কবির একটা ক্ষণিক অনুভূতিকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা। এখানে যে ভাবে শরতের দেখা পেলাম তা যেন ফুলদানীতে রাখা পুষ্পগুচ্ছ নয়, কুমুদ, কহ্লার, শতদলে আকীর্ণ সরোবরের একটি পরিপূর্ণ ছবি। তার কোরকে, উদ্ভিন্নতায়, পূর্ণপ্রস্ফুটিত দলে মিলে যে একটি সমগ্রতার সৃষ্টি করে, নটরাজের শরতে যেন সেই রূপের সাক্ষাৎ পেলাম।

কবিদের কাছে বসন্তঋতু হ'ল শ্রেষ্ঠ ঋতু। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী কবিতা, প্রধানতঃ যার সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয়, তার মধ্যে বসন্তঋতুর জয়গানই কবিদের লেখনীতে পেয়েছে প্রথম স্থান, তার পর পেয়েছে বর্ষা। শরৎ ঋতু অবশ্য উপেক্ষিত হয় নি কিন্তু প্রধান স্থানের দাবিও কখনও করে নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক ইংরেজ কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীট্স, হুড প্রভৃতি শরৎ সম্বন্ধে কবিতা লিখেছেন বটে কিন্তু তা যেন শরৎবন্দনা নয়, এক রকম শীতঋতুরই আবাহন। সংস্কৃত কবিদের মধ্যে কালিদাসের ঋতুসংহারে আমরা শরতের যে মূর্ত্তি দেখেছি, তা আমাদের মনে তৃপ্তি দেয় না। ঋতুসংহার কালিদাসের প্রথম জীবনের রচনা। প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে যে ভাবান্তর হয় কালিদাস তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক ঋতুবর্ণনাতেই একটা আদিরসাত্মক ভাব থাকায় কাব্যরসিকের মনকে যেন নির্ম্মল পুষ্পগন্ধে সুরভিত ক'রে তোলে না। ঠিক এই কারণেই কালিদাসের শরৎবর্ণনা আমাদের আনন্দ দেয় না। রবীন্দ্রনাথের শরৎঋতুর কবিতাগুলির মধ্যে যে একটি অসীমের ভাব আছে তার কারণ আছে। কারণ শরৎঋতু বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ ঋতু। এ ঋতু যে শুধু সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ তাই নয়, এ ঋতুর সঙ্গে বাঙালীর প্রাণের যোগ আছে। সুতরাং বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কবির লেখনীতে এ ঋতুর অন্তর-বাহির সৌন্দর্য্য মহনীয় হয়ে দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

প্রকৃতি চিরদিনই কবিদের কাব্যে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। প্রতি ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির মাঝে যে পরিবর্ত্তন হয়, কবিদের চিত্ত তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। শরৎ ঋতুও কবিচিত্তে নূতন ভাবসম্পদ এনে দিয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে ইংরেজ কবিদের চেয়ে ভারতীয় কবিরা অধিক দূর অগ্রসর। কারণ ভারতবর্ষে, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে, শরৎ ঋতুর প্রকাশ সুস্পষ্ট। ইংলণ্ডে শরৎ যেন শীতেরই অগ্রদূত। পাতা-ঝরানোর গানই যেন শরতের মনের গান। কিন্তু বাংলা

দেশে শরৎ যেন একটা পরিপূর্ণ রূপের ছবি। বর্ষার ধারা-বর্ষণ তখন বন্ধ হয়ে শষ্পদলে, বনবীথিকায় শ্যামলের নির্ম্মল সমারোহ, গগনে মেঘস্পর্শহীন উজ্জ্বল নীলিমা, স্রোতস্বিনী আপন পরিপূর্ণতায় অলসগমনা। সংস্কৃত কবিরা শরৎ ঋতুর মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই দেখেছেন, আর মানবচিত্তে তার কি রকম প্রভাব তাই বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ তাঁরা যেন এ-ঋতু সম্বন্ধে সে-রকম উচ্ছ্বসিত নন, যেমন বসন্ত-বর্ণনা ও তার গুণগানে তৎপর।

পূর্ব্বেই বলেছি শরৎ ঋতুদের মধ্যে প্রধান হবার দাবি করতে পারে নি। তার কারণ এ নয় যে, শরৎ ঋতু অন্যান্য ঋতুর চেয়ে সৌন্দর্য্যে ন্যূন। বস্তুতঃ বসন্ত ঋতুর মধ্যে এমন একটি ভাব আছে যাতে কবিচিত্ত সহজেই আনন্দ-চঞ্চল ও উন্মনা হয়। প্রত্যেক কবিই এই ঋতু-বর্ণনায় মুখর। কঠিন কঠোর শীতে পাখীর কণ্ঠে গান ফুরিয়ে গেছে, দিকে দিকে ঝরাপাতায় আকীর্ণ। এমন সময় ঋতুরাজ বসন্ত এলেন রাজসমারোহে। বিদ্যাপতির কাব্যে এই রাজসিক ভাব সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবার ইংরেজ কবি বসন্তকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলছেন, "যে আশা দিনে দিনে সপ্তাহে সপ্তাহে হৃদয়ের মধ্যে গোপনে বেড়ে উঠেছে সেই তোমার আগমনে কত বিবর্ণ ও বিশীর্ণ মুখ আজ স্বাস্থ্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।"

আবার যখন আষাঢ়ের প্রথমে "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈনক্তং" অথবা যখন অশ্রান্ত ঝর ঝর ধারায় আকাশ ঝরে পড়ছে সেই সময় অন্তরতম প্রিয়ের জন্যে কবিচিত্ত বিরহব্যাকুল হয়ে ওঠে। হৃদয়ের এই তৃপ্তিহীন আর্ত্তিই বর্ষা ও বসন্ত ঋতুকে কবিদের কাছে প্রিয় ক'রে তুলেছে। কিন্তু শরৎ ঋতু এই দুই ঋতু থেকে ভিন্ন প্রাণাবেগ-ধর্ম্মী। বর্ষাঋতু যেমন বিরহের ঋতু, শরৎ তেমনই মিলনের ঋতু। কালিদাস মেঘদূতে এই কথাই বলেছেন, "পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষং নির্ব্বেক্ষ্যাবঃ পরিণত-শরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু।" প্রকৃতপক্ষে শরৎ হচ্ছে পরিপূর্ণতার ঋতু। সে যেমন ফুলের ঋতু তেমনই ফসলেরও। এই ফুল ও ফসলের একত্র সম্মিলনেই শরতের যথার্থ গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে।

বাংলা দেশে বর্ষারম্ভ বৈশাখ থেকে হ'লেও, অগ্রহায়ণ মাসকেই বর্ষের প্রথম ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। এ কল্পনা যে একান্ত অমূলক তা নয়। অগ্রহায়ণ মাস থেকে শীত আরম্ভ। প্রকৃতি যেমন এক দিকে তার সমস্ত আবরণ ত্যাগ ক'রে নিঃস্ব হ'তে থাকে অপর দিকে সে পাকা ফসলে ধরণী ভরিয়ে দেয়। এক দিক দিয়ে যেমন তার মৃত্যু, আর এক দিকে তেমনই তার নবজন্মের সূচনা। সুতরাং অগ্রহায়ণ যদি বর্ষারম্ভ হয়, তা হ'লে শরৎকে হ'তে হয় বর্ষশেষ। প্রতি ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতি যে নব নব ভাব ধারণ করে, তারই একত্র সম্মিলন হয়েছে শরৎ ঋতুতে।

শরৎ ঋতু ফুল ও ফসলের ঋতু। অন্যান্য কবিরা এই ফুলের দিক অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের দিকটাই বেশী ক'রে লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁদের কাব্যে শুধু সৌন্দর্য্য-বর্ণনাই প্রধান স্থান পেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শরৎ কবিতায় সৌন্দর্য্যের বর্ণনা থাকলেও তা যেন বহির্লোকের নয় অন্তর্লোকের। সৌন্দর্য্যবোধের এদিক দিয়ে ইংরেজ কবি কীট্‌সের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। কীটস তাঁর প্রসিদ্ধ "Ode on the Grecian Urn"এ বলেছেন—

"Beauty is truth, truth beauty,"—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে সৌন্দর্য্য বলতে অস্কার ওয়াইল্ডের মত শূন্যগর্ভ নিরর্থ কথা নয়—"They are the elect to whom beautiful things mean only beauty." তাঁর কাছে সৌন্দর্য্য হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির নাড়ী-চলাচলের নিবিড় যোগ।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শরৎ কবিতাগুলির মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট ধারা আছে। প্রথমটি এই শরৎ ঋতুতে প্রকৃতি যে আপনার ভাণ্ডার বিশ্বজনের সামনে খুলে দেয় তারই অন্তর-সৌন্দর্য্য আপন সর্ব্বানুভূতি দিয়ে গ্রহণ করা। রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের কবিতাগুলির মধ্যে এমন একটা ঝলমলে আনন্দ শিহরণের ভাব আছে যা অন্য কোন কবির কাব্যেই একান্ত দুর্লভ। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চিত্রগুলি ত প্রকৃতির ঠিক হুবহু ফোটোগ্রাফ নয়, প্রকৃতির মধ্যে যে একটি বৃহৎ আর্টের স্থান আছে, সেই আর্টকেই আপন কল্পনা-ঐশ্বর্য্যে মহনীয় রূপে প্রকাশ করেছেন। ছবি আঁকা যেমন ফোটোগ্রাফির সামিল নয়, তাতে কত জিনিষ বাদ দিতে হয়,

কল্পনায় কত জিনিষকে যোগ দিতে হয়, এক-একটি তুলির টানে কত অপ্রত্যক্ষ জিনিষকে প্রত্যক্ষ করা হয়, এক-একটি রঙের সমাবেশে কেমন বর্ণ-উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়, কবির কাজও সেই আর্টিষ্টের কাজ। প্রকৃতির বাইরের রূপ নিয়ে আর্টিষ্টের কাজ নয়, তার ভেতরের কথাটুকু নিয়েই আর্টিষ্টের কাজ। অর্থাৎ আর্টিষ্টের কাজ প্রকৃতির অনুকরণ নয়, প্রকৃতির মর্ম্মগ্রহণ। রবীন্দ্রনাথ এক জন দক্ষ শিল্পী। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে আপন কল্পনা দিয়ে এমন মহনীয় ক'রে তুলেছেন যে তা নিছক অনুকরণ হয় নি, আপন ঔজ্জ্বল্যে ঝল্‌মল্ করছে। রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমি কিছু বল্‌তে চাই নে, কারণ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মানুষকে এত সহজেই আনন্দ দেয় যে তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, যাতে আমার ধারণা, শরৎ ঋতুর চিরন্তন সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ হয়েছে।—

> শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
> ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
> শরৎ তোমার শিশির-ধোয়া কুন্তলে
> বনের পথে লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে
> আজ প্রভাতে হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।
> মাণিক গাঁথা ওই যে তোমার কঙ্কণে
> ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
> কুঞ্জছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
> ওড়না ওড়ায় এ কী নাচের ভঙ্গীতে
> শিউলি বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি।

নটরাজের শরৎ কবিতাগুলি দ্বিতীয় ধারা। তার মর্ম্ম এই যে, শরৎকালে যেমন প্রবাসী বিরহবেদনাবিধুর হৃদয়ে গৃহে এসে মিলিত হয়, তেমনই এই প্রকৃতি সেই মিলন-উৎসবে যোগদান করে। সে আসে বর্ষার নবীন মেঘের থেকে জন্ম নিয়ে বীর বালকের বেশ ধ'রে। এসেই সে ডাক দেয় পথের দিকে। কারণ মিলন যেখানে স্থিতিশীল, সেখানে তার মৃত্যু। সেই জন্যে সে বালক মিলনের রূপে এসে বিচ্ছেদের ডাক দেয়।

সুতরাং শরৎকাল যেমন মিলনের কাল তেমনই বিচ্ছেদেরও কাল। কারণ মিলনের ভিতর যদি বিচ্ছেদ না থাকে তবে সে মিলন মিলনই নয়। আবার যার সঙ্গে মিলিত হবে সে যদি আয়াসলভ্য হয় তবে সে মিলনের সার্থকতাই নেই। মিলন হবে শক্তির মধ্যে দিয়ে, দুঃখের মধ্যে দিয়ে; জয়ের মধ্যে দিয়ে; তবেই সে মিলনের সার্থকতা। বিচ্ছেদই বারংবার মিলনের রূপ ধ'রে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধে এই মূল সুরটি প্রকাশ পেয়েছে। "আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া, সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরে একটা কথা লাগিয়া আছে যে বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়, তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড় উৎসব।" নটরাজের কবিতাগুলিতে রূপকের মধ্যে দিয়ে এই সুর স্পন্দিত হচ্ছে।

নটরাজের প্রথম কবিতা 'শরৎ'। আকাশে বাতাসে আগমনীর বীণা বেজে উঠেছে। কাজল মেঘের আবরণ অপসারিত হয়ে স্বর্ণ আলোর দূত এসেছে দ্বারে। প্রকৃতির মিলনোৎসবের মাঝে বীর বালকের জয়যাত্রার বাণী ধ্বনিত হচ্ছে। তার পর শরতের প্রবেশ। তার বাঁশীতে বেজে উঠ্‌ল, ঘর-ছাড়ানো কাজ-ভোলানো সুর। সে আহ্বানে অলস মেঘ দলে দলে ভেসে চল্‌ল, নদী অধীর হয়ে বইতে লাগল, ধানের ক্ষেতে বাতাস অধীর হয়ে উঠল। সে সুরে এই কথাই ধ্বনিত হ'ল—"চলিগো চলিগো যাইগো চলে পথের প্রদীপ জ্বলে গো গগনতলে।"

কিন্তু শরতের প্রাণের সুর এ হ'লেও তার মূর্ত্তির একটা অভিনব রূপ আছে। বস্তুতঃ রূপের মধ্যে দিয়ে আমরা যা দেখি তা অরূপেরই অভিব্যক্তি। অরূপের সেই বিচিত্র লীলাকে নানা রূপে লীলায়িত কথাই কবির কাজ। 'শরতের ধ্যানের' কিয়দংশ উদ্ধৃত করলুম—

> শরৎ বাণীর বীণা বাজে কমলদলে
> ললিত রাগের সুর ঝরে তাই শিউলিতলে।
> তাই তো বাতাস বেড়ায় মেতে
> কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে
> বনের প্রাণের মরমরানির ঢেউ উঠালে।

রবীন্দ্রনাথের শরতের এই রূপের পাশে কয়েক জন কবির শরৎকবিতা তুলে ধরতে ইচ্ছে করে। কালিদাস ঋতুসংহারে শরৎকে নববধূরূপে কল্পনা ক'রে বিশ্বপ্রাঙ্গণে এনে উপস্থিত করেছেন।

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা
সোন্মাদহংসরব নূপুরনাদরম্যা
আপক্কশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা।

—কাশপুষ্প যার বস্ত্র, প্রস্ফুটিত পদ্ম যার মুখ, উন্মত্ত হংসকাকলী যার নূপুরধ্বনি, ঈষৎপক্ক শালিধান্য যার দেহযষ্টি সেই শরৎকাল সুন্দর নববধূবেশে এসে উপস্থিত হয়েছে।

শরৎ-আগমনে ধরণী যে রূপ ধারণ করেছে বর্ণনা ও রূপের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাও অনবদ্য।

কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো
হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ
শুক্লীকৃতান্যু পবনানি চ মালতীভিঃ।

—পৃথিবী কাশফুলে শুভ্রবর্ণ ধারণ করেছে, রাত্রি চন্দ্রালোকে শুক্লা, শ্বেতহংস নদীর জলকে সাদা করেছে; সরোবর কুমুদপুষ্পশোভায়, বনান্ত সপ্তপর্ণী বিকাশে এবং উপবন মালতীফুলে শুভ্র হয়েছে।

এক জন বাঙালী কবি শরতের যে রূপবর্ণনা করেছেন তাও মনোহর।

কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে
শিশির জমী জমিয়ে ঠোঁটে শরৎরাণী পান খেয়েছে
মেশামেশি কান্নাহাসি সরম তাহার বুঝবে বা কে
এক চোখে সে কাঁদে যখন, আর একটি চোখ হাসতে থাকে।
(সত্যেন্দ্রনাথ)

এই হ'ল ভারতবর্ষের শরতের রূপবর্ণনা। অবশ্য আরও অনেক কবি থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে লোভ সংবরণ করলাম। এই পশ্চিমের কবি বলেন শোনা যাক্। শেলী শরৎ বর্ণনা করছেন—

The warm sun is failing, the bleak wind is wailing
The bare boughs are sighing, the pale flowers are dying,
And the year
On the earth her deathbed, in a shroud of leaves dead,
Is lying.

উষ্ণ সূর্য্যকিরণ কমে এল, তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস আর্ত্তনাদ ক'রে ফিরছে, দেউলে কুঞ্জবন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, বিবর্ণ ফুল ঝরে ঝরে পড়ছে। পৃথিবী হয়েছে মৃত্যুশয্যা, ঝরাপাতার শবাচ্ছাদনীতে ঢেকে বৎসর শুয়ে আছে।

শরতের এই রূপ ধরা পড়েছে টমাস হুডেরও চোখে।

I saw old Autumn in the misty morn
Stand shadowless like Silence, listening
To silence, for no lonely bird would sing
Into his hollow ear from woods forlorn.

কুহেলি-আচ্ছন্ন প্রভাতে আমি দেখলাম শরৎ দাঁড়িয়ে আছে ছায়াহীন নিস্তব্ধতার মত; নিস্তব্ধতার বাণী শুনছে। কারণ পরিত্যক্ত অরণ্যে আর কোন পাখীই তাকে গান শোনাবার নেই।

এই দুটি কবিতা পড়বার পর কীট্‌সের কবিতাটি পড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। তাঁর শরৎবন্দনার শেষ অধ্যায়টি তুলে দিলাম:—

Where are the songs of Spring? Ah, where are they?
Think not of them, thou hast thy music too,
While barred clouds bloom the soft-dying day,
And touch the stubble-plains with rosy hue;
Then in a wailful choir the small gnats mourn
Among the river sallows, borne aloft
Or sinking as the light wind lives or dies;
And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn
Hedge-crickets sing; and now with treble soft
The red-breast whistles from a garden-croft;
And gathering swallows twitter in the skies.

বসন্তের গান কোথায়? কোথায় গেল তারা? সে ভাবনায় আর কাজ নেই। তোমার মধ্যেও সঙ্গীত আছে। যখন দিনশেষে মেঘদল আকাশে এসে শস্যশূন্য ক্ষেত গোলাপী রঙে রাঙিয়ে দেয়, তখন নদীধারে আগাছা জঙ্গলের মধ্যে মশাদের সমস্বরে বিলাপসঙ্গীত মৃদুলবাতাসে কখনও বাড়ে কমে। আবার তখন পূর্ণযৌবন মেষগুলি পাহাড়ের উপর থেকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে থাকে, ঝিঁঝিপোকা কোমল স্বরে গান গাইতে থাকে, বাগান থেকে শ্যামাপাখী শিস্ দেয়; আর এক ঝাঁক বাবুই আকাশে কিচির-মিচির করে।

এই তিন জন কবির মধ্যে কীট্‌সই শরতের মর্ম্মগত রূপটি ধরেছেন। কিন্তু ওদেশের শরৎ আর আমাদের শরতে অনেক তফাৎ। ওদের শরৎ শীতেরই অগ্রদূত, আমাদের শরৎ পরিপূর্ণ জীবনের একটি প্রশান্ত ছবি। ওদের শরৎ মৃত্যুর একটি বিবর্ণ স্তব্ধতা, আমাদের শরৎ নির্ম্মল রৌদ্র আলোর নবজীবন। ওদের শরৎ স্থির নিশ্চল, আমাদের শরৎ গতিশীল। ওদের শরতে শ্বেতহিম-রাশির সুতীক্ষ্ণ আলোকে চোখ জ্বালা করে, আমাদের শরতে সবুজ মাটির দিকে চেয়ে চোখ দৃষ্টি কোমল হয়ে

আসে। আমাদের সঙ্গে মিল এইখানেই যে ওদের শরৎও ফসল-ক্ষেতের ঋতু। ওয়ার্ডসওয়ার্থও কীট্‌সের প্রতিধ্বনি করেছেন—"While the fields with ripening harvest prodigally fair অথবা Who hath not seen thee amid thy store ?

আমাদের শরতের বিদায়-অভিসারটুকুই বা কত মধুর। শীত আস্‌তে ত আর দেরি নাই। হেমন্ত তার পাকা ফসলে ধরণী ভরিয়ে দেবে তার পরই আস্‌বে শীত। শরতের আগমনী-গান ক্ষণিকের, সেই হাসির মধ্যেই বিচ্ছেদের শিশিরাশ্রু লেগে আছে। "মাটির কন্যার আগমনী-গান এই ত সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছুদিন হইল ধরাজননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর ত দেরি নাই; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া তাকে ত ফিরাইয়া দিবার জো নাই;—হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।"

শরতের এই বিদায়-অভিসার নটরাজের শরতের শেষ কবিতায় সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সম্পূর্ণটুকু উদ্ধৃত ক'রে প্রবন্ধ শেষ করলাম।—

কেন গো যাবার বেলা
গোপনে চরণ ফেলা
যাওয়ার ছায়াটি পড়ে যে হৃদয়মাঝে,
অজানা ব্যথার তপ্ত আভাস রক্ত আকাশে বাজে।
সুদূর বিরহ তাপে
বাতাসে কী যেন কাঁপে
পাখীর কণ্ঠে করুণ ক্লান্তি ভরা
হারাই হারাই মনে ক'রে তাই সংশয়ম্লান ধরা।
জানি নে গহন বনে
শিউলি কী ধ্বনি শোনে,
আনমনে তার ভূষণ খসায়ে ফেলে।
মালতী আপন ঢেলে দেয় শেষ খেলা তার খেলে।
না হ'তে প্রহর শেষ
হবে কী নিরুদ্দেশ
তোমার নয়নে এখনো রয়েছে হাসি
বাজায়ে সোহিনী এখনো মোহিনী বাঁশি ওঠে উচ্ছ্বাসি।
এই তব আসা যাওয়া
এ কী খেয়ালের হাওয়া
মিলন পুলক তাতেও কী অবহেলা,
আজি এ বিরহ ব্যথার বিষাদ এও কি কেবলি খেলা।

জাতীয়তার উদ্বোধন

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

কোহি কুদকে সাগর উতারা, কোহি কিয়া মিৎ।
কোহি ওখ্‌ড়া গিরি দরখৎ, কোহি শিখায়া নীৎ।
ক্যা কহুঁ সীতানাথকো, ময়্‌নে কিয়া চোরি।
সোহি কুল উদ্ভব রো, বেদিয়া খিঁচে ডোরি।

তুলসীদাস

বেদিয়া বানর-শিশু সঙ্গে লইয়া দ্বারে দ্বারে নাচ দেখাইয়া বেড়াইতেছিল। সেই বানর-শিশু মনের দুঃখে বলিতেছিল: এই বানর-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে কেহ বা অবহেলে এক লম্ফে সাগর পার হয়েছিল; কেহ বা রঘুপতির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল; কেহ বা ভুজবলে বৃক্ষ পর্ব্বত উৎপাটন করেছিল; কেহ বা নীতিবিশারদ হয়ে জগৎকে নীতি শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু আমি সীতাপতিকে জিজ্ঞাসা করি, আমি এমন কি চুরি করেছিলাম, যাতে আমি সেই বংশেই উদ্ভূত হলেও বেদিয়া আমার গলায় দড়ি বেঁধে দিয়ে আমাকে দ্বারে দ্বারে টেনে নিয়ে বেড়াচ্চে ?

জীবমাত্রেই চায় বন্ধন হইতে মুক্তি। সে বন্ধন শরীর সম্বন্ধেই হউক, কি মন সম্বন্ধেই হউক। মানুষের কাম্যবস্তু বন্ধনমুক্তি, সে বন্ধন ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধীয় হউক, কি সমাজ-নীতি বা রাজনীতি সম্বন্ধীয়ই হউক। এই বাংলা দেশে প্রায় পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে সেই সুদূর শ্রীহট্টের এক গণ্ডগ্রামে এক দ্বাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-কুমার তুলিয়াছিলেন মুক্তিমন্ত্রের পতাকা।

দীপান্বিতা উৎসবদিনে সেই বালক কমলাক্ষকে রাজা আদেশ করেন কালীকে প্রণাম করিতে।

কমলাক্ষ প্রণাম না করিয়া বলেন—

… … … পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান।
তিঁহো মোর সাধ্য বস্তু নহে কেহ আন।

পিতা রাজমন্ত্রী কুবের তর্কপঞ্চানন বলেন কালী জগন্মাতা; তাঁহাকে প্রণাম করিতে হয়। কমলাক্ষ বলেন—

তেঁহ যদি জগন্মাতা জগৎ তাঁর পুত্র।
সন্তান বধিতে কিবা আছে যুক্তি শাস্ত্র।

পিতা বলেন—

যজ্ঞার্থে পশুর বধ সেহ নহে হিংসা।
মুক্ত হইয়া স্বর্গে যায় পাইয়া প্রশংসা।

কমলাক্ষ বলেন—

… … … অনায়াস সিদ্ধোপায় সত্বে।
কেনে কষ্ট পায় পিতৃমাতৃ উদ্ধারিতে।

"কষ্ট করিয়া গয়ায় পিণ্ডদান না করিয়া কালীর নিকট বলিদান করিলেই ত হয়।"

যাহা হউক, রাজার আদেশে কালীর নিকট অদ্বৈতের মস্তক অবনত হইল, কিন্তু তাঁহার হৃদয় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিল। পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বে সেই বালক হেজাজ করিলেন, সেই রাজার রাজ্য ছাড়িয়া দুর্গম পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া, উপনীত হইলেন শান্তিপুরে—প্রকৃত মুক্তির সন্ধানে।

সুদূর শ্রীহট্টে যে-মুক্তির মন্ত্র উচ্চারিত হইল, অল্পকালের মধ্যে সমস্ত বাংলায় সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বহুলোক গতানুগতিক ভাব বর্জ্জন করিয়া এক নবপ্রেমে মাতিয়া উঠিল। শ্রীচৈতন্য শূদ্র রামানন্দের মুখ দিয়া প্রচার করিলেন:

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

হিন্দু-মুসলমান এক হরিনামে মত্ত হইল।

মুসলমান-যুগে যে মুক্তির সূত্রপাত ধর্ম্মরাজ্যে, ইংরেজ যুগে তাহার সংঘবদ্ধ ভাবে পূর্ণপ্রচার ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে। সেই মুক্তিযুগ-প্রবর্ত্তক রামমোহন রায়। তাঁহার মুক্তিমন্ত্র যে কেবল ধর্ম্মরাজ্যে ধ্বনিত হইয়াছিল তাহা নহে। যে সরল ভাবে চায় মুক্তি, তাহার মুক্তির পথ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। পার্লিয়েমেণ্টের সমক্ষে রাজার সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম-সমাজে সেই সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির ভাব আরও উজ্জ্বলতর রূপে ফুটিয়া উঠিল।

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার।
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার।

এই "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার"র মন্ত্র শিক্ষিত সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মানন্দ কেশব সিংহ-গর্জ্জনে সেই সাম্য মন্ত্র প্রচার করিয়া বলিলেন:—

Does brotherly love subsist between the conquering and the conquered races? Do the former recognize Jesus as their guide and master in their dealings with the latter and exercise on them the influence of true Christian life? Alas, instead of mutual good feeling and brotherly intercourse we find bitterest rancour and hatred and ceaseless exchange of reviling vituperation and slander.

এক দিকে তদানীন্তন ইংরেজদের শ্রেষ্ঠতার দাবি, আর এক দিকে আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠতা প্রচার। এই উভয় মতের সংঘর্ষণে উৎপন্ন হইল স্বজাতিপরিচয়ের জন্য এক প্রবল উৎসাহানল। নব হিন্দুধর্ম্ম-পুনরুত্থান আন্দোলন তাহাকে ইন্ধন জোগাইল। দেশীয়দের মুখ ফিরিল দেশের দিকে। জাগিয়া উঠিল প্রাণে প্রাণে জাতীয়তার ভাব। সংবাদপত্র, গ্রন্থ এবং রঙ্গালয় সেই ভাবের মাত্রা বৃদ্ধি করিল।

তরুণ হৃদয়ে আসিল চাঞ্চল্য। সেই চাঞ্চল্যের গতি সুপথে এবং নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালন করে কে? প্রশ্নের মীমাংসা স্বরূপ আসিলেন ১৮৭৫ সালে এক মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, পাশ্চাত্য স্বাধীনতাসমর-ইতিহাসাভিজ্ঞ, তেজদীপ্ত এক যুবক, তরুণমণ্ডলী পরিচালনার কামনা লইয়া। আনন্দমোহন বসু যে 'ছাত্রসমাজ' সংস্থাপন করিয়া ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব জাগ্রত করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যুৎবর্ষিণী ভাষায় সেইভাবে তরুণ হৃদয় উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঐ ভাব প্রচার করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মিলিত চেষ্টায় স্থাপিত হইল ভারতসভা। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক বাগ্মী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাহির হইলেন ভারত-ভ্রমণে ঐ সভার প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য। চলিল প্রবল বেগে জাতীয়তার প্রবল স্রোত, পুরাতন শিথিলতা ও দাসমনোবৃত্তি ভাসাইয়া লইয়া।

নদীর একটানা স্রোতের যেমন বৃদ্ধি হয় প্রস্তরখণ্ডের বাধা প্রাপ্ত হইয়া, তেমনই উৎসাহ-স্রোতের বৃদ্ধির জন্যও সময়ে সময়ে প্রয়োজন হয় স্রোতের মুখে বাধাদানের প্রচেষ্টা। বিধির বিধানে সেই বাধাস্বরূপ আসিলেন লর্ড লিটন। তাঁহার আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হইল শিক্ষা। তিনি বলিলেন, বিশ্ব-

বিদ্যালয় বিপ্লব-বৃক্ষ গজাইবার প্রধান ক্ষেত্র। শিক্ষিতেরা শাসনকার্য্যে অধিকার চায়। কমাইতে হইবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স। শিক্ষিতেরা সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া বিদ্রোহ প্রচার করে। দেশীয় সংবাদপত্রের বাক্‌রোধ করিতে হইবে। দেশে দুর্ভিক্ষ। তাহাতে কি? দিল্লীতে দরবার বসাইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীকে ঘোষণা করিতে হইবে ভারতসম্রাজ্ঞী। ভারতবাসীদের উপর অবিশ্বাস জানাইতে হইবে আত্মরক্ষার অস্ত্রধারণের অধিকার রহিত করিয়া।

দিল্লীর দরবারে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি সমবেত হইয়া ভাবিলেন একটা সমারোহ উপলক্ষে যদি বড়লাট সমগ্র ভারতের লোককে একত্র করিতে পারিলেন, তাঁহারা মাতৃসেবার আয়োজনের জন্য কি ভারতসন্তানদের একত্র করিতে পারেন না?

সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের এই আরম্ভ। ভারতসভার পক্ষে বাগ্মী লালমোহন ঘোষ বিলাতে গিয়া ভারতের দুঃখ জানাইলেন। ১৮৭৯ সালে গ্লাডষ্টোন লিটনের স্থলে পাঠাইলেন লর্ড রিপনকে ভারতবাসীর ক্ষতস্থানে স্নিগ্ধ প্রলেপ দিবার জন্য। তিনি স্বায়ত্তশাসন-বিধি যখন প্রবর্ত্তিত করেন সেই সময় আমি শ্রীহট্টে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচন-প্রথা-প্রচলনবিষয়ে বক্তৃতা করি। সমস্ত জেলায় এক উৎসাহের তড়িৎ সঞ্চার হয়। সংবাদপত্রের বাক্‌রোধবিধি রহিত এবং ইলবার্ট বিল উপস্থাপিত করিয়া লর্ড রিপন যখন ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিতেছিলেন, তাঁহার দেশবাসীরা ঐ বিলের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করিল বটে কিন্তু দেশে মাতৃসেবীদের হৃদয় উদ্বেলিত হইল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ভারতের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।

১৮৮৩ সালে কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলন (National Conference) ১৮৮৫ সালের প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের অগ্রদূত।

সেই কংগ্রেসের পরবর্ত্তী ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে বলা নিষ্প্রয়োজন যে ভীষণ বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, আপনাদিগকে বিপন্ন করিয়া, নিদ্রিত ভারতকে যাঁহারা জাতীয়তার ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহাদেরই ত্যাগ ও চেষ্টার সুফল ভোগ করিতেছি।

বাংলার জাতীয়তার ইতিহাস ১৯২১ সালে আরম্ভ হয় নাই, আরম্ভ ইহার বহুপূর্ব্বে। ১৯০৫ সালে একত্রীভূত বাংলা যে শক্তি প্রদর্শন করিয়া দ্বিখণ্ডিত দেহকে জোড়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল, দলাদলি ভুলিয়া কি আমরা আবার সেই শক্তির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব না? ভগবানের আশীর্ব্বাদে কংগ্রেসের সুবর্ণ-জয়ন্তী এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করুক।

সেই চিরস্মরণীয় ১৯০৫ সালে ধর্ম্মপ্রাণ ও দেশপ্রাণ আনন্দমোহন বসু চিকিৎসক ও পরিবারবর্গের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া এবং রোগশয্যা পরিত্যাগ করিয়া ফেডারেশন-ক্ষেত্রে নগ্নপদে আসিয়া যে বক্তৃতা সুরেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া শুনাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই বক্তৃতা জাতীয়তার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। উপসংহারে সে বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না:—

"I come amongst you, as one almost risen from the dead, to see this moment of a national upheaval and of national awakening. The official separation has drawn us closer together and made us stronger in united brotherhood. In spite of every other separation of creed, the creed of the common Motherland will bring us nearer, heart to heart and brother to brother." "I hope this Hall (Federation) will be a place where all that uplifts and regenerates the national character, and trains it up to manhood, and every noble impulse shall always find their place, and to its shrine shall come, as for worship, every member of the Bengali nation."

বাংলার কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ অবহিত হইয়া শুনুন আনন্দ-মোহনের সেই মধুর কণ্ঠের মধুর বাণী, আজও স্বর্গ হইতে আসিতেছে আকাশপথে ত্রিংশ বর্ষের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, তাঁহার শিষ্যদের অন্তরে মধুর অতীত-স্মৃতি জাগরিত করিয়া, এবং বর্ত্তমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া। ধর্ম্মনিষ্ঠা ভিন্ন কর্ম্মনিষ্ঠা হয় না, ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন ভিন্ন সমষ্টিগত জাতিগঠন অসম্ভব, এই জয়ন্তী উপলক্ষে আনন্দমোহন অমরধাম হইতে তাহাই বলিতেছেন। সাময়িক নৈরাশ্য ভেদ করিয়া উঠুক ভারতময় সেই ধ্বনি

বন্দেমাতরম্।

কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসর

আগামী ১২ই পৌষ ২৮শে ডিসেম্বর ভারতবর্ষীয় জাতীয় মহাসমিতির (ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের) পঞ্চাশবর্ষ পূর্ণ হইবে ও এই উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে। কংগ্রেসের এই পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসই মূলতঃ বর্ত্তমান ভারতবর্ষের রাষ্ট্রচেতনার বিকাশের ইতিহাস। এই পঞ্চাশ বৎসরে কংগ্রেসের গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহ ও কর্ম্মপদ্ধতির মাত্র উল্লেখ করিলেই দেশের রাষ্ট্রচিন্তা ও জীবন কি ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই ভারতবর্ষের শিক্ষিত-সাধারণ রাষ্ট্রীয় সমস্যাসমূহের আলোচনা ও আন্দোলনের জন্য মহাসঙ্ঘস্থাপনের প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে থাকেন এবং এই অভাবপূরণের জন্যই ভারতবন্ধু আলান অক্টেভিয়াস হিউমের উদ্যোগে কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়। সেই হিসাবে হিউম সাহেবই কংগ্রেসের সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম রাষ্ট্রসভার উদ্যোক্তার আসন ও গৌরব দিতে হয়। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বেই ১৮৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে কলিকাতায় একটি রাষ্ট্রসভার (National Conference) অধিবেশন হয় ও তৎপর সুরেন্দ্রনাথ উত্তর-ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৮৮৫ সালে এই কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ও বঙ্গের বাহির হইতেও ইহাতে কয়েকজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। পরে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগ দিলে ন্যাশন্যাল কন্ফারেন্সও উহার অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

১৮৮৫, বোম্বাই, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন ২৮ ডিসেম্বর, সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী বিচারের জন্য রয়্যাল কমিশন নিয়োগন, ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব ষ্টেটের ইণ্ডিয়া কাউন্সিল তুলিয়া দেওয়া, ভারতবর্ষে সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা প্রবর্ত্তন ও কাউন্সিলের সংস্কার সম্বন্ধে অনুরোধ করিয়া এই অধিবেশনে প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়। প্রথম কংগ্রেসে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীযুক্ত দীনশা এদুলজী ওয়াচা এখনও আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন।

১৮৮৬, কলিকাতা, সভাপতি দাদাভাই নওরোজী, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়িয়া বাংলা দেশে কংগ্রেস শক্তিসঞ্চয় করিতে পারিবে না বুঝিতে পারিয়া এই বৎসর হিউম সাহেব তাঁহাকে কংগ্রেসে আহ্বান করেন। সুরেন্দ্র-নাথই এ-বারের সর্ব্বপ্রধান প্রস্তাব (স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে) উপস্থিত করেন; সমর্থকদের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ছিলেন।

১৮৮৭, মান্দ্রাজ, সভাপতি বদরুদ্দিন তায়েবাজ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রাজা সর্ টি মাধব রাও। কংগ্রেসের নিয়মাবলী গঠনের জন্য এই বৎসর একটি কমিটি গঠিত হয়।

১৮৮৮, এলাহাবাদ, সভাপতি জর্জ্জ ইউল, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত অযোধ্যানাথ। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর সর্ অকলাণ্ড কলভিনের বিরুদ্ধতার মধ্যেই একরূপ এই অধিবেশন হয়।

১৮৮৯, বোম্বাই, সভাপতি উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ফিরোজশাহ্ মেহ্‌তা। দীনবন্ধু ব্রাড্‌ল সাহেব এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

১৮৯০, কলিকাতা, সভাপতি ফিরোজশাহ্ মেহ্‌তা, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোমোহন ঘোষ।

১৮৯১, নাগপুর, পি. আনন্দ চার্লু, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সি. নারায়ণস্বামী নাইডু।

১৮৯২, এলাহাবাদ, সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ।

১৮৯৩, লাহোর, সভাপতি দাদাভাই নওরোজি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সর্দ্দার দয়াল সিং।

১৮৯৪, মান্দ্রাজ, সভাপতি আলফ্রেড্ ওয়েব, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রঙ্গিয়া নাইডু।

১৮৯৫, পুনা, সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এস্. এম. ভিডে।

১৮৯৬, কলিকাতা, সভাপতি রহিমতুল্লা সিয়ানী, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সর্ রমেশচন্দ্র মিত্র।

১৮৯৭, অমরাবতী, সভাপতি চিত্তুর শঙ্করণ নায়ার, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি জি. এস. খাপর্দে। এই অধিবেশনে, বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের তিনটি রেগুলেশনের বলে যে বিনা-বিচারে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে তাহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৮৯৮, মাদ্রাজ, সভাপতি আনন্দমোহন বসু, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এন্ সুব্বারাও।

১৮৯৯, লক্ষ্ণৌ, সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বংশীলাল সিং। এই অধিবেশনে সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসের বিধিব্যবস্থা স্থির হয়, কংগ্রেসের মূলনীতি বা ক্রীড এই সময়ে ছিল—আইনসম্মত উপায়ে ভারতসাম্রাজ্যের অধিবাসীদিগের স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গলবিধান (The object of the Indian National Congress shall be to promote by Constitutional means the interest and well-being of the people of the Indian Empire)

১৯০০, লাহোর, সভাপতি নারায়ণ গণেশ চন্দাভরকর, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কালীপ্রসন্ন রায়।

১৯০১, কলিকাতা, সভাপতি দীনশা এতুলজী ওয়াচা, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়।

১৯০২, আমেদাবাদ, সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অম্বালাল দেশাই। এই সময়ে লর্ড কার্জ্জন জনমতবিরোধী নানা প্রস্তাব কার্য্যকর করিতে চেষ্টিত। এই সময় কয়বৎসরই কংগ্রেসে লর্ড কার্জ্জনের বিভিন্ন প্রস্তাবের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের এই যুগের বিভিন্ন অধিবেশনে ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার ও বিস্তার সরকারের শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, ভারতবর্ষে সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষার ব্যবস্থা, সরকারী চাকুরীতে অধিক সংখ্যক ভারতবাসীদের নিয়োগ সম্বন্ধে অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯০৩, মাদ্রাজ, সভাপতি লালমোহন ঘোষ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নবাব সৈয়দ মহম্মদ।

১৯০৪, বোম্বাই, সভাপতি সর্ হেনরী কটন, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ফিরোজশাহ্ মেহ্তা। এই অধিবেশনে লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

১৯০৫, কাশী, সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখ্লে, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মুন্সী মাধোলাল। ইতিপূর্ব্বে জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের সরকারী বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে ও বাংলা দেশে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ও বঙ্গে প্রবর্ত্তিত দমনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হয়। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লালা লজপৎ রায় বাংলা দেশকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় নবযুগের প্রবর্ত্তক বলিয়া অভিনন্দিত করেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ যাহাতে বাংলার অনুসরণ করিয়া বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করে এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করাইবার চেষ্টা এই অধিবেশনে হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস তৎপরিবর্ত্তে কেবল বাংলা দেশেই বিদেশী-বর্জ্জনের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া ক্ষান্ত থাকেন।

১৯০৬, কলিকাতা, সভাপতি দাদাভাই নওরোজি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। "স্বরাজ" কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া' এই বৎসর ঘোষিত হয়। বঙ্গে বিদেশী বর্জ্জন অনুমোদন ও দেশবাসীকে স্বদেশী গ্রহণ করিতে অনুরোধ মূলক প্রস্তাবও এই অধিবেশনে গৃহীত হয়।

১৯০৭, সুরাট, সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ত্রিভুবনদাস মালবী। চরমপন্থী ও মধ্যপন্থীদিগের কলহে এই অধিবেশন সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। দেশের নবজাগ্রত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক জাতীয়তাবাদিগণ এই বার কংগ্রেস হইতে বহুকালের জন্য অপসৃত হন। কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাইবার পরদিন প্রাচীনপন্থী নেতৃগণ একটি কনভেনশন আহ্বান করেন। এই কনভেনশনে নিযুক্ত একটি কমিটি ১৯০৮ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের একটি নিয়মাবলী ও ক্রীড প্রস্তুত করেন ও পরে বাঁকীপুর কংগ্রেসে এই সকল নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিতরূপে গৃহীত হয়। এই ক্রীডে আইনসম্মত উপায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসক দেশমণ্ডলীর অনুরূপ শাসনব্যবস্থা লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির হয় ও কংগ্রেসে যোগ দিতে হইলে এই উদ্দেশ্য মানিয়া লইতে হইবে, ইহাও সিদ্ধান্ত হয়।

১৯০৮, মান্দ্রাজ, সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণস্বামী রাও। বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া ও বিনা-বিচারে নির্ব্বাসনের প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারেও কংগ্রেস আনন্দজ্ঞাপন করে।

১৯০৯, লাহোর, সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হরকিষণ লাল। বঙ্গভঙ্গের পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সময় যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধেও এই অধিবেশনে সহানুভূতি জ্ঞাপিত হয়।

১৯১০, এলাহাবাদ, সভাপতি উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত সুন্দরলাল।

১৯১১, কলিকাতা, সভাপতি বিষণ নারায়ণ দার, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু।

১৯১২, বাঁকীপুর, সভাপতি রঙ্গনাথ মুধোলকর, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মজহরল হক।

১৯১৩, করাচি, সভাপতি নবাব সৈয়দ মহম্মদ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হরচাঁদ রায় বিষেণদাস।

১৯১৪, মান্দ্রাজ, সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সর্ এস্. সুব্রহ্মণ্য আয়ার। এই বৎসর সুবিখ্যাত "হোমরুল"-আন্দোলনের নেত্রী অ্যানি বেসাণ্ট কংগ্রেসে যোগ দেন, এবং পরে প্রধানতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায় চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী দুই দল পুনরায় কংগ্রেস-ক্ষেত্রে একত্র হন। এই মিলন সম্ভবপর করিবার জন্য এই সময় একটি কমিটি হয়।

১৯১৫, বোম্বাই, সভাপতি সর্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি দীনশা এদুলজী ওয়াচা। এই বৎসর স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপস্থিত করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অ্যানি বেসাণ্ট, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তাহা সমর্থন করেন। অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি, মুসলমানদিগের রাষ্ট্রসভা মোসলেম লীগের সহিত একযোগে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব ১৯১৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রস্তুত করিবেন, এই সিদ্ধান্তও হয়।

১৯১৬, লক্ষ্ণৌ, সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত জগৎনারায়ণ। এই কংগ্রেসে নেতৃবর্গের দুই পক্ষ পুনরায় একত্র হন। স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের যুক্ত প্রস্তাব (কংগ্রেস-লীগ স্কীম) এই অধিবেশনে স্বীকৃত হয়; উহা লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট বলিয়া খ্যাত।

১৯১৭, কলিকাতা, সভাপতি অ্যানি বেসাণ্ট, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন। হোমরুল আন্দোলনের নেত্রী ও ঐ সম্পর্কে অন্তরায়িত অ্যানি বেসাণ্টকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া কংগ্রেস তাঁহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

১৯১৮, বোম্বাই, বিশেষ অধিবেশন, সভাপতি সৈয়দ হাসান ইমাম, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বিঠলভাই পটেল। এই বৎসরের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কারসম্পর্কে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়; সে সম্বন্ধে বিবেচনার জন্যই আগষ্ট মাসে এই বিশেষ অধিবেশন। ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের প্রস্তাবে কংগ্রেস উহা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

১৯১৮, দিল্লী, সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হাকিম আজমল খাঁ। বোম্বাইয়ের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ এই অধিবেশনে পুনর্গৃহীত হয়।

মহাযুদ্ধের অবসানে মার্কিন যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি উইল্‌সনের স্বাধিকারনির্ণয়ের (Self-determination) বাণী এই সময় বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে। এই কংগ্রেসে অ্যানি বেসাণ্টের প্রস্তাবে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতেও এই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবি করা হয়, ও রাষ্ট্রীয় আলোচনার স্বাধীনতায় যে-সব আইনগত বাধা আছে তাহা তুলিয়া দিবার দাবি জানানো হয়। ইতিপূর্ব্বে জুলাই মাসে রৌলট কমিটি বিপ্লবদমন সম্বন্ধে প্রস্তাব সহ যে রিপোর্ট দেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বিপিনচন্দ্র পালের প্রস্তাবও এই কংগ্রেসে গৃহীত হয়।

১৯১৯, অমৃতসর, সভাপতি পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। এই বৎসর রৌলট বিলের প্রতিবাদের জন্য মহাত্মা গান্ধী যে-সত্যাগ্রহ আন্দোলন উপস্থিত করেন ও জালিয়ানওয়ালা বাগে যে-ঘটনা

গ্রেসের সভাপাত

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(বোম্বাই—১৮৮৫, এলাহাবাদ—১৮৯২)

চিত্তরঞ্জন দাশ
(গয়া—১৯২২)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
(বেলগাঁও—১৯২৪)

মতিলাল নেহেরু
অমৃতসর—১৯১৯, কলিকাতা—১৯২৮)
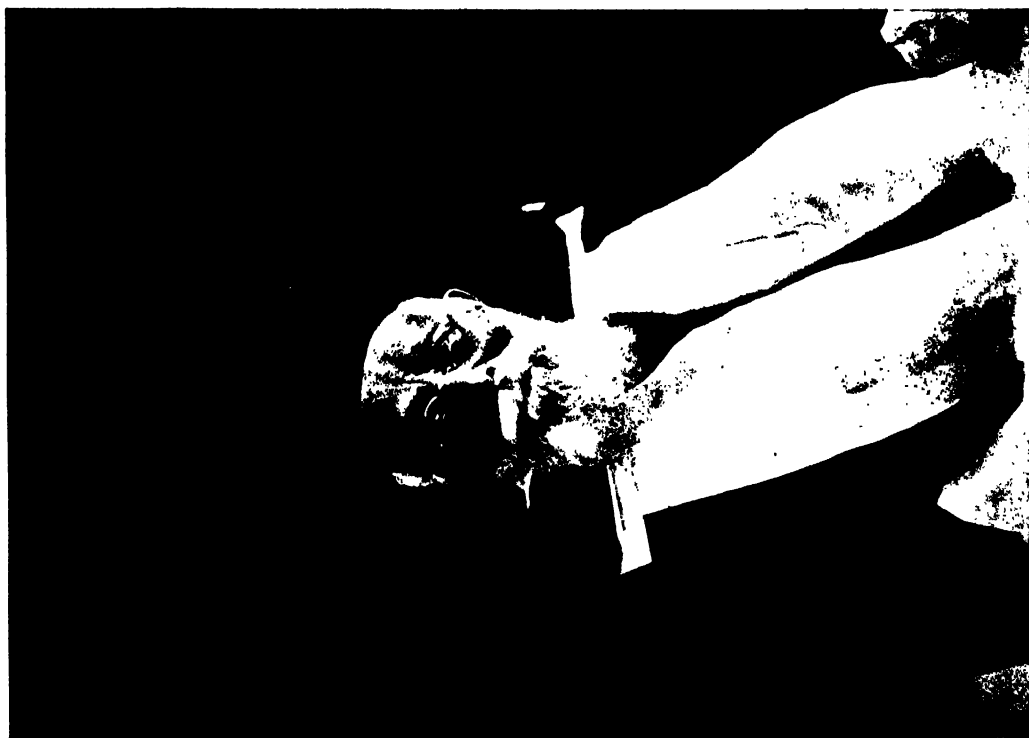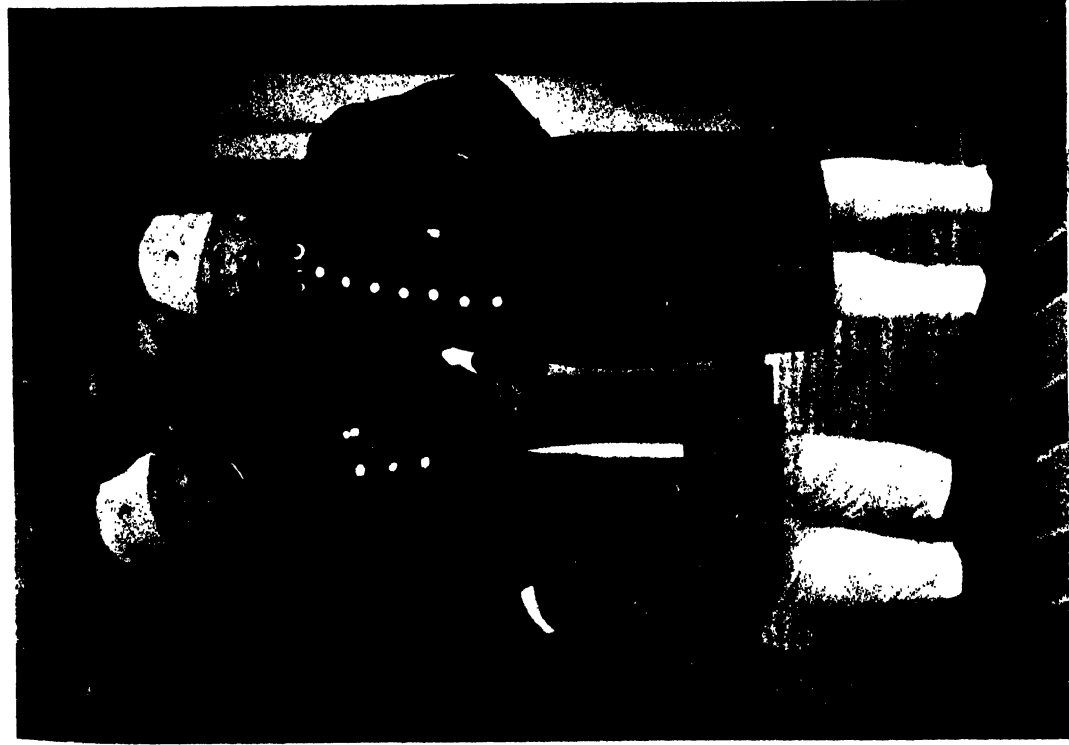
মহম্মদ আলি (কোকনদ—১৯২৩)
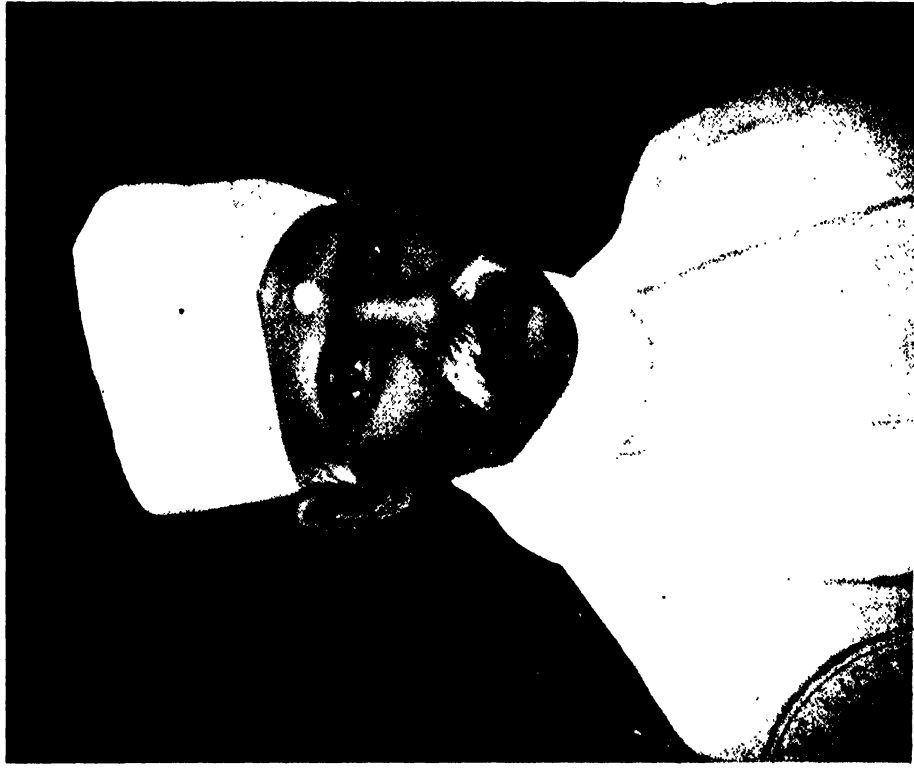
মদনমোহন মালবীয় (লাহোর—১৯০৯, দিল্লী—১৯১৮)

আনন্দমোহন বসু (মান্দ্রাজ—১৮৯৮)

জবাহরলাল নেহেরু (লাহোর—১৯২৯)
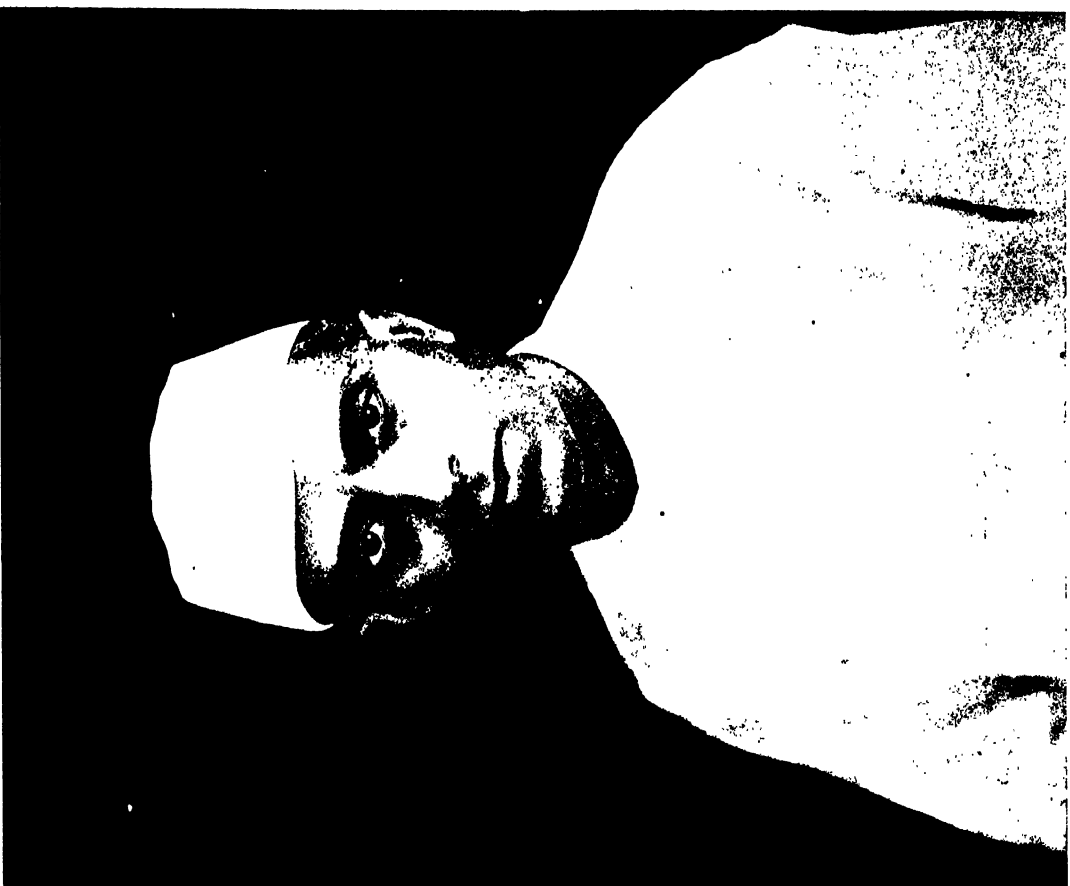
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(পুনা—১৮৯৫, আহ্মদাবাদ—১৯০২)

য়্যানী বেসাণ্ট
(কলিকাতা—১৯১৭)

মহম্মদ আলি আন্‌সারি
(মান্দ্রাজ—১৯২৭)

রাসবিহারী ঘোষ
(সুরাট—১৯০৭, মান্দ্রাজ—১৯০৮)

আবুল কালাম আজাদ
দিল্লী (বিশেষ)—১৯২৩

সরোজিনী নাইডু
(কানপুর—১৯২৫)
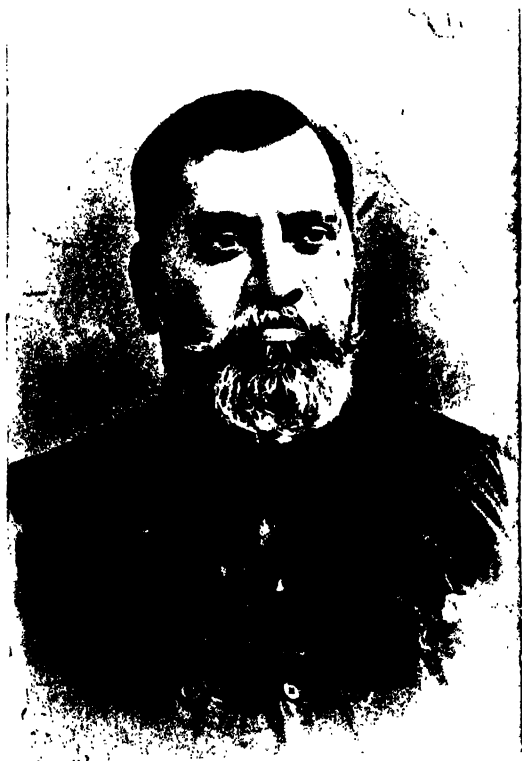
ভুপেন্দ্রনাথ বসু
(মান্দ্রাজ—১৯১৪)

দিনশা এদুলজী ওয়াচা
(কলিকাতা—১৯০১)

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
(বোম্বাই—১৯১৫)

বল্লভভাই পটেল
(করাচী—১৯৩১)

রাজেন্দ্রপ্রসাদ
(বোম্বাই—১৯৩৪)

লালমোহন ঘোষ
(মাদ্রাজ—১৯০৩)

রমেশচন্দ্র দত্ত (লক্ষ্ণৌ—১৮৯৯)

াজশাহ্ মেহতা (কলিকাতা—১৮৯০)
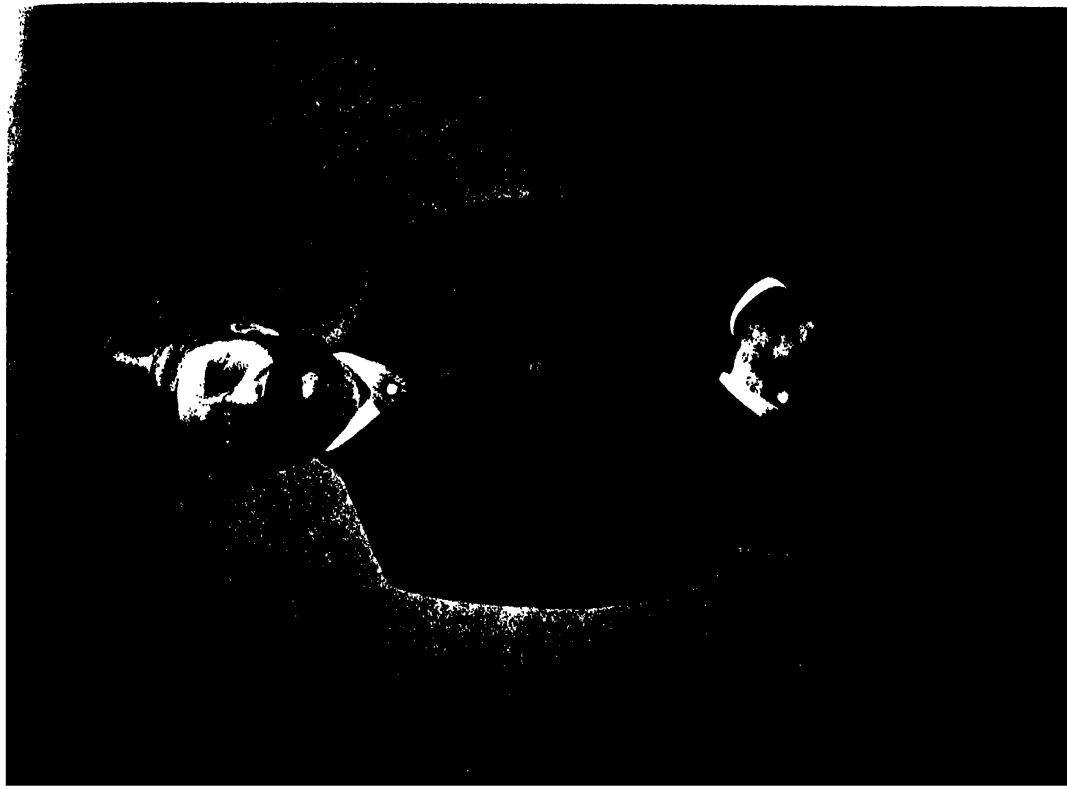
লালা লজপৎ রায়
কলিকাতা (বিশেষ) —১৯২০

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার
(গৌহাটি —১৯২৬)

ঘটে তাহা সুবিদিত। সেই স্মৃতিবিজড়িত বলিয়াই এইবার অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন দাশ এই অধিবেশনে প্রস্তাব করেন যে গত দিল্লী অধিবেশনের এই বিষয়ে গৃহীত প্রস্তাব বর্ত্তমান অধিবেশন স্থির রাখিতেছে ও সংস্কার-আইনকে অযথেষ্ট, অসন্তোষকর ও নৈরাশ্যজনক ('Inadequate, unsatisfactory and disappointing') বলিয়া মনে করিতেছে। গান্ধীজী এই প্রস্তাবের "নৈরাশ্যজনক" কথাটি তুলিয়া দিতে চাহেন, এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে বর্ত্তমান শাসন-সংস্কারকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার প্রস্তাবও এই সঙ্গে জুড়িয়া দিতে চাহেন। দুই দলের মধ্যে আপোষ হইয়া, গান্ধীজীর সংশোধনের শেষ অংশ কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া দাশ মহাশয়ের মূল প্রস্তাবের শেষে জুড়িয়া দেওয়া হয়। লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে ভারতে রাজপ্রতিনিধির কার্য্য হইতে অপসারণ করা হউক, এই মর্ম্মের প্রস্তাবও এই কংগ্রেসে গৃহীত হয় এবং খিলাফৎ সমস্যা সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের বিরূপ মনোভাবেরও প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হয়।

১৯২০, সেপ্টেম্বর, কলিকাতা, বিশেষ অধিবেশন, সভাপতি লালা লজপৎ রায়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী। খিলাফৎ সমস্যা ও পাঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতীকারের জন্য, মহাত্মা গান্ধী এই সময় তাঁহার পূর্ব্বতন সহযোগ-পদ্ধতি বর্জ্জনপূর্ব্বক সরকারের সহিত অসহযোগের প্রস্তাব করেন; তাহারই সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন। মহাত্মা গান্ধী এই মর্ম্মে প্রস্তাব উপস্থিত করেন (এবং তাহা কংগ্রেসে গৃহীত হয়) যে, খিলাফৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদের প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন ও পাঞ্জাবের দুর্ঘটনার সম্বন্ধে কোন সুবিচার না করিয়া যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া ঐরূপ অন্যায়ের কোনও প্রতিকার সম্ভব নয়। স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য দেশকে গবর্ণমেণ্টের সহিত অহিংসভাবে অসহযোগ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় এবং নিম্নলিখিত কর্ম্মপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করা হয়।

(১) সরকারী উপাধি ইত্যাদি এবং সরকারী দরবার প্রভৃতি বর্জ্জন, (২) সরকারী ও সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় বর্জ্জন ও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, (৩) সরকারী আদালত বর্জ্জন, (৪) নূতন আইন-সভা বর্জ্জন, (৫) বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন, (৬) স্বদেশী ও চরকা-খদ্দর প্রচলন।

১৯২০, নাগপুর, সভাপতি সি. বিজয় রাঘবাচারিয়া, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ যমুনালাল বাজাজ। বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত অসহযোগ-কর্ম্মপদ্ধতি পুনর্গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের মূলনীতি বা ক্রীড পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্নলিখিত রূপ হয়:—

"সর্ব্ববিধ বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবাসিগণ কর্ত্তৃক স্বরাজ্য লাভই ভারতবর্ষীয় জাতি মহাসমিতির উদ্দেশ্য"—(The object of the Indian National Congress is the attainment of Swarajya by the people of India by all legitimate and peaceful means)।

পূর্ব্বের মূলনীতিতে Constitutional বলিয়া যে কথা ছিল তাহার পরিবর্ত্তে Legitimate and Peaceful বসানো হইল। কংগ্রেসের নিয়মাবলীও এইবারে পরিবর্ত্তিত হয়।

১৯২১, আমেদাবাদ, সভাপতি হাকিম আজমল খাঁ (নির্ব্বাচিত সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবর্ত্তে), অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বল্লভভাই পটেল। ইতিপূর্ব্বেই দেশময় অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, প্রধান প্রধান নেতৃগণ (কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি পর্য্যন্ত) বহু সহস্র লোক কারারুদ্ধ হইয়াছেন; ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করার আন্দোলনের উদ্যোগ হইয়াছে। এই অধিবেশনে কলিকাতা ও নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত অসহযোগ-পদ্ধতি পুনর্গৃহীত হয় ও অষ্টাদশ বর্ষ এবং তদূর্দ্ধ বয়সের সকলকেই জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সমিতিতে যোগদান পূর্ব্বক কারাবরণ করিতে অনুরোধ করিয়া ও দেশব্যাপী আইন-অমান্যের নির্দ্দেশ দিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধীকে এই কংগ্রেসে সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া স্থির করা হয়।

এই অধিবেশনে সর্ব্বপ্রথম পূর্ণস্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বীকার করিয়া প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, প্রস্তাবক ছিলেন হসরৎ মোহানী। মহাত্মা গান্ধী ইহার বিরুদ্ধতা করেন ও ইহা পরিত্যক্ত হয়।

১৯২২, গয়া, সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ, অভ্যর্থনা-সমিতির

সভাপতি ব্রজকিশোর প্রসাদ। ইতঃপূর্ব্বেই চৌরীচৌরার ব্যাপারের জন্য মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আইন-অমান্য আন্দোলন পরিত্যক্ত হয় ও তিনি গঠনমূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে দেশকে পরামর্শ দেন; গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে তাঁহাকে রাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধও করেন; আইন-অমান্য সম্বন্ধে ও কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কংগ্রেসের নিযুক্ত কমিটি কাউন্সিল দখল করিতে নির্দ্দেশ দেন। এই কংগ্রেসে সি. রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাবে পুনরায় কাউন্সিল-বর্জ্জন নীতিই স্থির থাকে এবং শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের সংশোধন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। কাউন্সিল-প্রবেশ সমস্যা লইয়া কংগ্রেস-নেতৃবর্গের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হইল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মোতীলালের নেতৃত্বে কাউন্সিল-প্রবেশকামী দল গয়া কংগ্রেসের পরে কংগ্রেস-স্বরাজ্যদল গঠন করিলেন।

১৯২৩, বিশেষ অধিবেশন, দিল্লী, সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাঃ এম্.এ. আন্সারী। কাউন্সিল-বর্জ্জন প্রশ্ন লইয়া দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেস-কর্ম্মীদের মধ্যে মীমাংসা করিবার জন্যই এই অধিবেশন হয়। মৌলানা মহম্মদ আলির প্রস্তাবে কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকে ব্যবস্থাপক সভা সমূহের পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে ভোট দিতে ও নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে অনুমতি দেওয়া হইল।

১৯২৩, কাকিনাড়া (Cocanada), সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পা। দিল্লীর আপোষ-প্রস্তাব এই অধিবেশনে পুনর্গৃহীত হয় ও উহাদ্বারা ত্রিবিধ বর্জ্জননীতি পরিত্যক্ত হয় নাই এই কথাও ঘোষিত হয়। গঠনমূলক কর্ম্মপ্রণালীও দেশকে অনুসরণ করিতে নির্দ্দেশ জ্ঞাপিত হয়।

১৯২৪, বেলগাঁও, সভাপতি মহাত্মা গান্ধী, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গঙ্গাধররাও দেশপাণ্ডে। মহাত্মা গান্ধী এই বৎসরের প্রথমভাগে মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত স্বরাজ্যদলের ইতিমধ্যে একটি চুক্তি সাধিত হইয়াছে। কংগ্রেসের অধিবেশনে এই চুক্তি সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবানুসারে অসহযোগ-পন্থা স্থগিত থাকে (বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের প্রস্তাব ব্যতীত); স্বরাজ্য দল কংগ্রেসের অঙ্গস্বরূপ বিবেচিত হইয়া আইনসভায় কাজ চালাইবেন এবং কংগ্রেসের সব দলই গঠনমূলক কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেন; খদ্দর পরিধান না করিলে এবং প্রতিমাসে ২০০০ গজ হাতে-কাটা সূতা না দিলে কেহ কংগ্রেসের সভ্য হইতে পারিবেন না।

১৯২৫, কানপুর, সভাপতি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাঃ মুরারিলাল। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে কংগ্রেসের খদ্দরপ্রচার-কর্ম্ম স্বতন্ত্র একটি নিখিল-ভারত কাটুনি-সঙ্ঘের হাতে দেওয়া হয় এবং স্বরাজ্যদলকে আরও অধিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়। স্বরাজ্য দলের কর্ম্মপদ্ধতি এইবার কংগ্রেস প্রায় সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লন। ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বরাজ্য ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল একযোগে গবর্ণমেণ্টকে যে-দাবি জানাইয়াছেন তাহার সুমীমাংসা না-হওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অধীনে পদ ইত্যাদি গ্রহণ করিবেন না ও বাধাপ্রদান-নীতি গ্রহণ করিবেন ইহাও সিদ্ধান্ত হয়। পণ্ডিত মালবীয় এই প্রস্তাবের সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, প্রয়োজন অনুসারে কাউন্সিলে সরকারের সহিত বিরোধ বা সহযোগ দুই-ই করিবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু এই সংশোধন-প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

১৯২৬, গৌহাটি, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভাপতি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি তরুণরাম ফুকন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রস্তাবে ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদলের কর্ম্মপদ্ধতি অনুমোদন করিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ও স্বরাজ্যদল মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবেন না ও ব্যবস্থাপক সভায় বাধাপ্রদান করিবেন ইহাও স্থির থাকে।

১৯২৭, মান্দ্রাজ, ডাঃ আন্সারি সভাপতি, শ্রীমুথুরঙ্গ মুদালীয়র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি। জবাহরলাল নেহরুর প্রস্তাবে পূর্ণস্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। আইন-সভায় নির্ব্বাচনে যুক্তনির্ব্বাচন পদ্ধতির (প্রয়োজন হইলে কোন কোন সম্প্রদায়ের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া) প্রস্তাবও এই অধিবেশনে গৃহীত হয়।

১৯২৮, কলিকাতা, সভাপতি পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। এই অধিবেশনের সর্ব্বপ্রধান প্রস্তাব, এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়নত্ব দিতে স্বীকৃত হন, তবে কংগ্রেস নেহরু রিপোর্ট অনুযায়ী শাসনপ্রণালী গ্রহণ করিবেন; তাহা না হইলে কংগ্রেস পূর্ণস্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে অসহযোগ আরম্ভ করিবেন। নয় শত প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করেন।

১৯২৯, লাহোর, সভাপতি জবাহরলাল নেহরু অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাঃ সৈফুদ্দীন কিচলু। এই অধিবেশনে, কলিকাতা অধিবেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ডোমিনিয়নত্বপ্রাপ্তি স্বীকৃতি না পাওয়াতে, পূর্ণস্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হয়।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রারম্ভিক কর্ম্ম হিসাবে কংগ্রে[illegible] কাউন্সিল-বর্জ্জন প্রস্তাব গ্রহণ করেন, এবং দেশ প্রস্ত[illegible] হইলে নিরুপদ্রব আইনভঙ্গ আরম্ভ হইবে এইরূপ নির্দ্দে[illegible] দেন। তদনুসারে মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালের ২রা মা[illegible] বড়লাট লর্ড আরউইনকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাস[illegible] ও ভারতের আর্থিক দুর্গতির সম্বন্ধে এক দর্ঘ [illegible]

লিখিয়া অবশেষে বলেন যে, এই সকল দুর্গতির অবসানের কোন ব্যবস্থা না হইলে তিনি তাঁহার আশ্রমের সহকর্মীদের লইয়া লবণ-আইন ভঙ্গ করিতে ব্রতী হইবেন এবং লর্ড আরউনের নিকট হইতে ইহার কোনও সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া ("On bended knees I asked for bread and I have received stones instead") তিনি লবণ-আইন অমান্যের জন্য, সুবিখ্যাত ডাণ্ডি-যাত্রা আরম্ভ করেন এবং এই সময় হইতে দেশের বিভিন্ন স্থানে আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়।

এই বৎসর হইতে কংগ্রেসের অধিবেশন কাল ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি-মার্চ্চে পরিবর্ত্তিত হয়। ১৯৩০ সালে কোন কংগ্রেসের অধিবেশন এই জন্য হয় নাই।

১৯৩১, করাচী, সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি চৈৎরাম গিদোয়ানী। আইন-অমান্য স্থগিত করিয়া মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড আরউনের মধ্যে যে-চুক্তি হয় তাহা এই কংগ্রেসে সমর্থিত হয় ও তাহার ফলে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবেন স্থির হয়।

ইহার পর ১৯৩৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য কংগ্রেসের কোন নিয়মিত অধিবেশন হইতে পারে নাই।

১৯৩১ সালের শেষ ভাগে মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠক হইতে ফিরিয়া দেশে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার ও নানারূপ অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ দেখিলেন; ১৯৩২এর প্রথমভাগে পুনরায় আইন অমান্য আরম্ভ হয়। ১৯৩২ সালে দিল্লীতে শেঠ রণছোড়লাল এবং ১৯৩৩ সালে কলিকাতায় শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিধিবহির্ভূত অধিবেশন হয় বলিয়া বর্ণিত।

১৯৩৪ বোম্বাই, সভাপতি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কে. এফ. নরীম্যান। সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে এই কংগ্রেস না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতিবলম্বন করেন ("neither accepts nor rejects") ও ইহা লইয়া দেশময় বিরুদ্ধ আলোচনা আরম্ভ হয়। নূতন শাসন-সংস্কারে বাধা দিবার জন্য কংগ্রেসের লোকেরা পুনরায় ব্যবস্থাপকসভার সদস্যপদ গ্রহণ করিবেন এই সময়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়; নিরুপদ্রব আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ থাকে। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভারতীয় পল্লীশিল্পসঙ্ঘের কর্ম্মভার গ্রহণ করেন এবং এই সঙ্ঘস্থাপন কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। কংগ্রেস যাহাতে অধিকতর সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতে পারে সেই লক্ষ্য রাখিয়া উহার নিয়মাবলী বহুলভাবে পরিবর্ত্তিত হয়।

মহিলা-সংবাদ

পরলোকগত বৈমানিক দাস-রায়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে স্থাপিত স্মৃতিভাণ্ডার হইতে মহিলাদিগের বিমান-বিদ্যাশিক্ষাকল্পে যে-বৃত্তি দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম বৃত্তিটি স্কটিশ-চার্চ্চ কলেজের কুমারী অশোকা রায়কংকে প্রদত্ত হইবে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীহট্টের উকিল শ্রীবরদামোহন দাশগুপ্তের কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী দাশগুপ্তা বি-এ সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীমতী দাশগুপ্তা সঙ্গীত ও শিল্পকলায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন ও কলিকাতার অনেক-ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন।
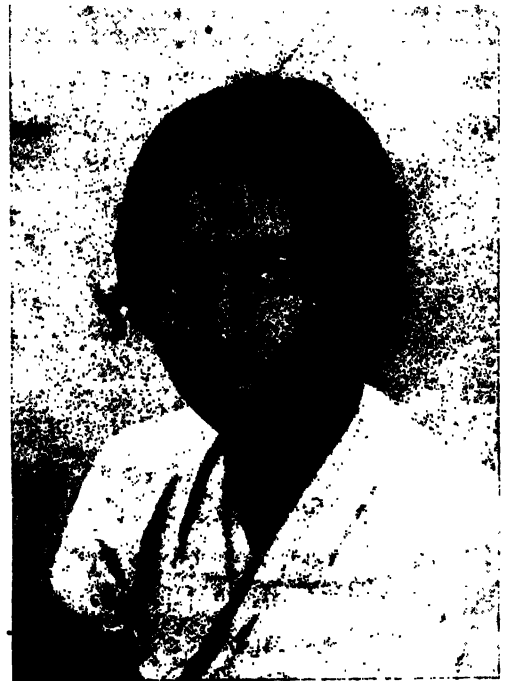
শ্রীমতী বাসন্তী দাশগুপ্তা
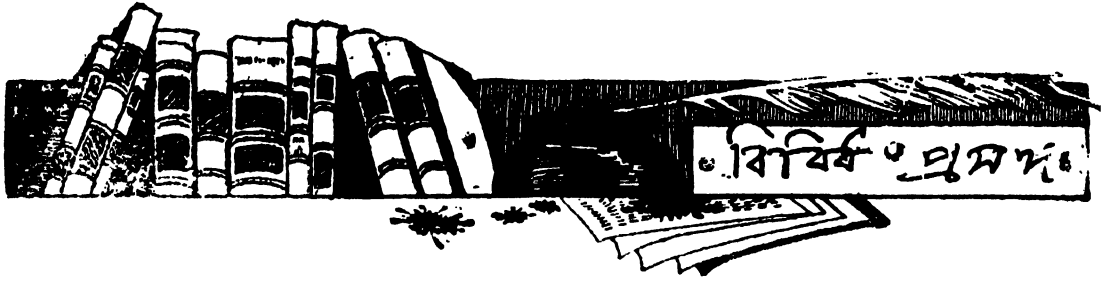
ইটালীর আবিসীনিয়া আক্রমণ

ইটালী যে আবিসীনিয়া দখল করিবার জন্য তাহার অধিবাসী হাবসীদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, ইহা ইউরোপের ইতিহাসে অসাধারণ ও নূতন অপরাধ নহে। ইউরোপের অন্য প্রবলপরাক্রান্ত জাতিরা পূর্ব্বে এইরূপ অপরাধ করিয়াছে এবং, দরকার হইলে, আবার করিবে। ইটালীও আগে এরূপ দস্যুতা করিয়াছে। ইহা আধুনিক অপরাধ এবং মধ্যযুগের অপরাধও বটে। কিন্তু প্রাচীন কালের ইতিহাসেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে, এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে এইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিত। ইউরোপের আলেকজাণ্ডার, ইউরোপের সীজর ইহা করিয়াছিলেন। ইহা যে কেবল ইউরোপের জাতিদের একচেটিয়া দোষ, তাহাও নহে। এশিয়ার নানা জাতিও ইহা করিয়াছে। বহু প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, মোঙ্গোল ও তাতারেরা ইউরোপের বহু দেশ আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিল। মোহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর আরব ও তুর্করা এশিয়া ও ইউরোপের বহু দেশ জয় করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি লামাবাদ-অবলম্বী জঙ্গিস্ খাঁ বহু মুসলমান দেশ ও ইউরোপের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। তৈমুর লং, নাদির শাহ প্রভৃতির বিদেশ-জয় সুবিদিত। উনবিংশ শতাব্দীর সকলের চেয়ে বিখ্যাত বিদেশজেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

ভারতবর্ষের রাজারা যে কখনও পররাজ্য আক্রমণ করেন নাই, এমন নয়। অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ করিবার অধিকারী হইতে হইলে রাজাকে দিগ্বিজয় করিতে হইত। কালিদাসের রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়-বৃত্তান্তে দেখিতে পাই, তিনি পারসীকদিগকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত জলপথে যাত্রা করিয়াছিলেন ("পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে জলবর্ত্মনা")। রঘুবংশ ইতিহাস নহে, কিন্তু ইহা সর্ব্বাংশে কবিকল্পনা না-হইতে পারে। অন্ততঃ ইহা বলিতে পারা যায়, যে, পুরাকালে ভারতীয়দের স্থলপথে ও জলপথে বিদেশযাত্রা করিয়া তাহা জয় করিবার রীতি ছিল। ব্রহ্মদেশ, আনাম, কাম্বোডিয়া, শ্যাম প্রভৃতি এশিয়া মহাদেশের অংশসমূহে ও জাভা বলী সুমাত্রা আদি এশিয়ার দ্বীপে হিন্দু সভ্যতার বিস্তার ইহার সাক্ষ্য দেয়।

হিন্দুর যেমন দিগ্বিজয়, মুসলমানের তদ্রূপ মুল্ক্‌গিরি। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যাহা প্রাচীন কাল হইতে নানা দেশে বিদ্যমান ছিল ও আছে, তাহাকে দুষ্কর্ম্ম কেন বলা হয়। বলা হয় এই জন্য, যে, কোন রীতি, প্রথা, কার্য্য চিরাগত ও প্রাচীন বলিয়াই তাহা নির্দ্দোষ হইতে পারে না। চুরি প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা সমুদয় সভ্যদেশের নীতিতে ও আইনে গর্হিত বিবেচিত হয়। সেইরূপ ভবিষ্যৎ অন্তর্জাতিক নীতি ও আইনে বিদেশ আক্রমণ এবং জয়ও গর্হিত বিবেচিত হইবে। বর্ত্তমান কালে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে।

এমন সময় ছিল যখন বিদেশ-আক্রমণকারী রাজাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইত না, কোন কারণ দেখাইতে হইত না। "আমার শক্তি আছে, অতএব আক্রমণ করিব", ইহা ছাড়া কোন কৈফিয়ৎ ছিল না। খ্রীষ্টীয় রাজারা প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের পবিত্র তীর্থ রক্ষা বা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, এইরূপ বলিয়াছিলেন; আবার অনেক মুসলমান বিজেতা মোহম্মদীয় ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়াছিলেন। তবে, প্রাচীন কালের সম্বন্ধে মোটের উপর বোধ হয় ইহা সত্য, যে, কারণ-প্রদর্শনের রীতি ছিল না, তাহা আবশ্যক হইত না।

বর্ত্তমান কালে বিদেশ-আক্রমণকারী লীগ্ অব্ নেশুন্সের সদস্য হইলে তাহাকে কারণ দেখাইতে হয়, এবং "সভ্য" জগৎকেও বুঝাইতে হয়—আক্রমণকারীর কোন দোষ নাই,

দোষটা আক্রম্য বা আক্রান্ত দেশের;—আক্রমণকারী-দেশে ক্রমবর্দ্ধমান লোকসমষ্টির স্থান সংকুলান হইতেছে না, অতএব উপনিবেশ চাই; আক্রমণকারী-দেশের কারখানাসমূহের জন্য যথেষ্ট কাঁচা মাল পাইবার সুবিধা নাই, অতএব কাঁচা মাল সংগ্রহের নিমিত্ত কোন কোন দেশ করায়ত্ত করা চাই; আক্রমণকারী জাতি আক্রম্য বা আক্রান্ত দেশের লোকদিগকে সুশাসিত, সভ্য ও সুখী করিতে চায়;—এবম্বিধ নানা কারণ দেখান হইয়া থাকে।

ইহার মধ্যে, কোন বিদেশকে সভ্য ও উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে তাহা জয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ খাঁটি ভণ্ডামি। কারণ, পরাধীন কোন সভ্য দেশের লোকেরা স্বাধীন সভ্যদেশসমূহের মধ্যে অনগ্রসর দেশসমূহের লোকদেরও সমান হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, সরকারী রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে, যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও ধনশালিতায় ভারতীয়েরা ইউরোপের অনগ্রসর লোকদেরও পশ্চাতে পড়িয়া আছে। অন্য যে-সব কারণ দেখান হয়, তাহাও সব সময়ে সত্য নহে; এবং যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও একটা দেশের সুবিধার জন্য অন্য দেশের স্বাধীনতাহরণ কখনও ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ হইতে পারে না।

যদি কোন দেশ হইতে কাঁচা মাল চাও, তাহা হইলে তাহার সহিত বাণিজ্যিক সন্ধি বা চুক্তি কর। তোমার দেশ যদি ঘনবসতি হয়, তাহা হইলে তাহার কৃষি, পণ্যশিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া তাহাকে অধিকসংখ্যক লোকের ভরণপোষণে সমর্থ কর এবং বিরলবসতি কোন দেশের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সেখানে কতক লোক চালান কর। এবম্বিধ কারণে ও প্রয়োজনে বিদেশের উপর দস্যুতা গর্হিত কাজ।

অন্য কোন কোন দেশের সম্বন্ধে যেমন বলা হয়, যে, তথাকার দেশী গবর্ন্মেণ্ট বড় খারাপ, অতএব তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গবর্ন্মেণ্ট স্থাপন করা উচিত, আবিসীনিয়া সম্বন্ধেও তাহা বলা হইতেছে। কিন্তু কোন দেশের গবর্ন্মেণ্ট খারাপ বলিয়া তাহার স্বাধীনতা লোপ করা গর্হিত। তাহার স্বাধীনতা লোপ না-করিয়াও তাহার গবর্ন্মেণ্টের উন্নতি সাধন করা যায়। গবর্ন্মেণ্টের উৎকর্ষ অপকর্ষ আপেক্ষিক শব্দ। ইউরোপেরও কোন কোন দেশের গবর্ন্মেণ্ট অন্য কোন কোন দেশের গবর্ন্মেণ্টের চেয়ে কোন কোন বিষয়ে ভাল বা মন্দ। কিন্তু ইউরোপীয় কোন দেশ ইউরোপীয় অন্য কোন দেশকে কি সেই কারণে আক্রমণ ও অধিকার করে?

—

আবিসীনিয়ার দশা কি হইবে

লীগ অব নেশুন্সের সভ্য যে-সকল দেশের সাম্রাজ্য নাই—বিশেষতঃ আফ্রিকার কোন দেশ যাহাদের অধীন নহে—তাহারা যে ইটালীর বিরোধিতা করিতেছে, তাহা স্বার্থপরতাপ্রসূত নহে। কিন্তু যে-সব দেশের সাম্রাজ্য আছে—বিশেষতঃ আফ্রিকায় যাহাদের অধীন দেশ আছে—তাহারা যে আবিসীনিয়ার স্বাধীনতারক্ষার জন্য ইটালীর বিরোধিতা করিতেছে, তাহা নহে, নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য করিতেছে। সেই জন্য, যদি তাহারা নিজেদের স্বার্থের হানি না করিয়া ইটালীকে আবিসীনিয়ার কতক অংশ দিয়াও তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহা তাহারা করিবে। আবিসানিয়ার বড় একটা অংশ ইটালীকে দিয়া তাহার সন্তোষ উৎপাদন পূর্ব্বক শান্তি স্থাপনের একটা প্রস্তাব ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ হইতে উঠিয়াছে। আবিসীনিয়ার সম্রাট্ ইহাতে রাজী নহেন। তাহাই স্বাভাবিক। অবশ্য, আবিসীনিয়ার কোন অংশ কাহাকেও দিবার অধিকার কোনও বিদেশী জাতির নাই। কিন্তু আবিসীনিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। সুতরাং তাহার ক্ষতি করিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিতে কোন কোন বিদেশী জাতি পশ্চাৎপদ হইবে না।

শেষ পর্য্যন্ত আবিসীনিয়ার ভাগ্যে কি ঘটিবে, বলা যায় না। কিন্তু হাবসীরা যেরূপ স্বদেশপ্রিয়তা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও শৌর্য্যের সহিত লড়িতেছে, তাহাতে নিরপেক্ষ জাতি-মাত্রেরই সহানুভূতি তাহাদের দিকে।

—

ইটালীর সাম্রাজ্য কি অযথেষ্ট?

মুসোলিনির একটা উক্তি এই, যে, ইটালীয়দের বাড়িবার জায়গা চাই—তাহাদের স্বদেশে যথেষ্ট জায়গা নাই; সেই জন্য আবিসীনিয়া দখল করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন গৃহস্থের যদি খুব বংশবৃদ্ধি হয় এবং ঘরবাড়ি যথেষ্ট বড় না হয়, তাহা

হইলে তাহার পক্ষে অন্য কোন গৃহস্থের ঘরবাড়ি দখল করা ন্যায়সঙ্গত!

ন্যায়ান্যায়ের বিচার ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাক, ইটালীর লোকদের বাড়িবার জায়গা বর্ত্তমান সময়ে আছে কি-না।

আফ্রিকায় তাহার এখন চারিটি বড় উপনিবেশ আছে। (চারিটিই অনেক বৎসর পূর্ব্বে দস্যুতা দ্বারা অধিকৃত।) চারিটির নাম—ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ড, এরিট্রিয়া, ট্রিপলিটানিয়া ও সাইরেনৈকা। এই চারিটির মোট আয়তন ৮,৭৫,৪৮৫ বর্গমাইল। ইটালী দেশটির নিজের আয়তন ১,১৯,৭১৩ বর্গমাইল। তাহার অধীন দেশগুলির মোট আয়তন ইটালীর প্রায় আট গুণ। এই অধীন দেশগুলির লোক সংখ্যা ২৩,৬৯,২৫৪—অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে তিন জন। এরিট্রিয়ার ইউরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যা ৩৬০০, ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের ১৬৫৮, ট্রিপলিটানিয়া ২৯৭৪৯ এবং সাইরেনৈকার ১৯০০০। ইটালী যদি এই উপনিবেশগুলিতে ইটালীয় লোক পাঠাইয়া প্রতি বর্গমাইলে ৫০ জন লোক বসায়, তাহা হইলে ইটালীতে এক জন লোকও থাকিবে না। ইটালীতে প্রতি বর্গমাইলে ৩৪৪ জন লোক আছে। ইংলণ্ডে আছে প্রতি বর্গমাইলে ৬৫০র কিছু বেশী। সুতরাং ইটালীতে আর মানুষ ধরে না, ইহা সত্য নহে, এবং, যদিই না ধরে, তাহা হইলে তাহার বর্ত্তমান উপনিবেশগুলিতে মানুষ বসাইবার যথেষ্ট স্থান আছে। তদ্ভিন্ন, আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে যত লোক পাঠাইতে ইটালী অধিকারী, এখনও তত পাঠায় নাই; সুতরাং সেখানেও লোক চালান করিতে পারে।

ইটালীর উপনিবেশগুলিতে সোনার খনি আছে। কেরোসীন ও অন্য তেল আছে। তথায় কার্পাস ও শস্য উৎপাদন করা যায়। অন্য যে-কোন রকম কৃষি, পশুপালন ও পশুচারণ চলিতে পারে। ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডে ১১০০ মাইল বিস্তৃত সমুদ্রতট ভারত-মহাসাগরের সম্মুখীন, এবং বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। ট্রিপলিটানিয়া ও সাইরেনৈকায় তাল-বন, জলপাইয়ের বাগান, লেবু, বাদাম ও ডুমুরের গাছ বিস্তর আছে। প্রচুর দ্রাক্ষাক্ষেত্র আছে এবং আরও প্রস্তুত করা যায়। তা ছাড়া গম, যব, ধান প্রভৃতি খাদ্যশস্য জন্মিতে পারে।

সুতরাং বসবাসের জন্য কিম্বা কাঁচা মাল উৎপাদন ও সংগ্রহের জন্য ইটালীয়দের যথেষ্ট স্থান নাই, ইহা মিথ্যা কথা। তবে ইহা অবশ্য সত্য, যে, ইটালীর সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্য ও বেলজিয়ান সাম্রাজ্যের চেয়ে ছোট। পুরাকালে রোমের সাম্রাজ্য খুব বড় ছিল। ইউরোপে তখন কোন দেশ ইটালীর সমকক্ষ ছিল না। মুসোলিনি ও ইটালীয়রা সেই পূর্ব্ব প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য আবার চান। তা ছাড়া, গত শতাব্দীতে আডোয়ার যুদ্ধে হাবসীদের হাতে পরাজয়ের অপমান তাঁহাদের পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব। অতিলোভ, অতিদর্প ও প্রতিহিংসা ইটালীর আবিসীনিয়া-আক্রমণের কয়েকটি কারণ।

—

যুদ্ধ সম্বন্ধে ভাবপরিবর্ত্তন

এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পুরাকালে করিত, এখনও করে। অধিকন্তু বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধে মানুষ মারিবার উপায় আগেকার চেয়ে অনেক বেশী সাংঘাতিক ও যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে। সুতরাং মনে হইতে পারে, যুদ্ধ সম্বন্ধে মানবসভ্যতা বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু বাস্তবিক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সভ্য দেশসমূহে কতকগুলি লোক দেখা দিয়াছেন যাঁহারা যুদ্ধের বিরোধী, যুদ্ধকে গর্হিত ও অসভ্যতার চিহ্ন মনে করেন। পুরাকালে এইরূপ কতকগুলি লোক বিদ্যমান ছিলেন না। অবশ্য কোন স্বাধীন দেশেরই অধিকাংশ লোক এখনও যুদ্ধের বিরোধী হয় নাই, এবং কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করে নাই। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ (League of Nations) যুদ্ধের প্রতিকূল এই মনোভাবের প্রভাবে নিয়ম করিয়াছেন, যে, যে-সব রাষ্ট্র লীগের সভ্য, তাহাদের মধ্যে কোন বিবাদ হইলে আলোচনা সালিসী প্রভৃতি দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে হইবে, পরস্পরের সহিত যুদ্ধের দ্বারা নহে, এবং লীগের সভ্য কোন রাষ্ট্র এই নিয়ম না-মানিলে অন্য সব রাষ্ট্র-সভ্য তাহাকে শাস্তি দিবে। সত্য বটে, লীগ জাপানকে এই নিয়ম মানাইতে পারে নাই এবং চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অপরাধে জাপানের কোন শাস্তির ব্যবস্থা করে নাই। ইটালীকেও লীগ এই নিয়ম মানাইতে পারে নাই; কিন্তু, বিলম্বে এবং

অতি মন্থর গতিতে হইলেও, লীগ ইটালীকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী কয়েকটি দেশের মধ্যে বিবাদ লীগ সালিসী দ্বারা মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাও কিঞ্চিৎ লাভ।

এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারে, যে, লীগের প্রধান সভ্য যে-সব শক্তিশালী স্বাধীন দেশ, তাহাদের গবর্মেণ্ট অকপট ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে লীগের যুদ্ধবিরোধী নিয়মের সমর্থক নহে। তাহা হইতে পারে। কিন্তু তাহারা মনে মনে যুদ্ধবিরোধী না হইলেও যে যুদ্ধের প্রতিকূল নিয়মে মত দিয়াছে এবং সেই নিয়ম চালাইবার অন্ততঃ ভান করিতেছে, ইহা হইতেই বুঝা যায় যুদ্ধবিরোধী মত ও আদর্শ কিরূপ প্রবল হইয়াছে। কপটাচারী ভণ্ড লোকেরা যে কপট আচরণ করে, তাহাতে কোন উচ্চ নীতি ও আদর্শের উৎকর্ষ অপ্রমাণিত হয় না, বরং প্রমাণিতই হয়। যে মিথ্যাবাদী সে যে সত্যবাদী বলিয়া লোকের কাছে পরিচিত হইতে চায়, তাহাতে সত্যকথনরূপ আদর্শের প্রভাবই প্রমাণিত হয়। মিথ্যাবাদী ত ইহা বলিতে সাহস করে না, "আমার খুশী আমি মিথ্যা বলিব।" সেই রূপ জাপান চীনকে যখন যখন আক্রমণ করিয়াছে তখনই জগৎকে বুঝাইতে চাহিয়াছে, যে, সে কোন ন্যায্য কারণে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার অস্ত্রসজ্জা, বাহুবল, রণকৌশল ও সামরিক নির্ভীকতা থাকা সত্ত্বেও ইহা বলিবার সাহস তাহার হয় নাই, "আমার জোর আছে সেই জন্য অন্যায় করিতেছি ও করিব।" অধর্ম্ম করিবার সময় অধার্ম্মিক যে ভণ্ডামি করিয়া ধার্ম্মিক সাজে, তাহাতে বুঝা যায় সে ধর্ম্মের কাছে মাথা নত করিতেছে।

এখনও যুদ্ধের প্রকাশ্য সমর্থক আছে বটে, কিন্তু যুদ্ধ-বিরোধিতা বিষয়ে মানুষ অতীত কালে যে স্তরে ছিল এখন তদপেক্ষা উচ্চতর স্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি।

—

জাপান ও চীন

চীন যে পাশ্চাত্য কোন দেশের বা কোন কোন দেশের সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই, তাহার কারণ পাশ্চাত্য দস্যুজাতিরা চীনের কোন্ ভাগ কে লইবে সে বিষয়ে একমত হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্য এই সব জাতিদের পরস্পর ঈর্ষ্যাবিবাদ চীনের সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু যখন চীনের উপর জাপানের লুব্ধ দৃষ্টি পড়িল, তখন পাশ্চাত্য জাতিদের এই অনৈক্য বশতই জাপানের দস্যুতায় তাহাদের দ্বারা কোন বাধা পড়িল না; সুযোগ বুঝিয়া জাপান মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি হস্তগত করিল।

ইহা কয়েক বৎসর আগেকার কথা। মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি গ্রাসে বাধা না পাইয়া জাপানের লোভ ও সাহস বাড়িয়া গিয়াছে। এখন ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ ইটালী-আবিসীনিয়ার যুদ্ধ লইয়া বিব্রত। এখন জাপান আবার চীনের বৃহৎ একটা অংশ হাত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

পূর্ব্বে মাঞ্চুরিয়া গ্রাসের চেষ্টার মত বর্ত্তমানে চীনের উত্তরাংশ গ্রাসের চেষ্টাতেও গ্রাসরীতির নূতনত্ব আছে।

গুরু যতটুকু শিখাইয়াছেন শিষ্য যদি তাহার বেশী কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে মানবসমাজ এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া থাকিত এবং অনেকটা একঘেয়ে হইত। কিন্তু গুরুর মত শিষ্যেরও ত বুদ্ধি আছে। সেই জন্য, মানবসমাজ নূতন কথা শুনিতে, নূতন উপায় দেখিতে, পায়।

কেমন করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে হয়, তাহার নানা উপায় ও কৌশল জাপান পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যাধিকারী জাতিদের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু জাপান নূতন উপায়ও উদ্ভাবন এবং অবলম্বন করিয়াছে। মাঞ্চুরিয়া চীন সাধারণ-তন্ত্রের একটি প্রদেশ ছিল। জাপান ইহাকে বাহ্যতঃ নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিল না, কিন্তু ইহাকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া তাহার সিংহাসনে চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাটকে বসাইয়া দিল। সেই সম্রাট সাক্ষীগোপাল মাত্র। তাঁহাকে জাপানের আজ্ঞা অনুসারে চলিতে হয়। সুতরাং মাঞ্চুরিয়া নামে স্বাধীন ও পৃথক্ রাষ্ট্র হইলেও বাস্তবিক উহা জাপান-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে আবার জাপান চীনের উত্তরাংশের কয়েকটি প্রদেশকে পৃথক্ পৃথক "স্বাধীন" রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাহিতেছে। তাহারা যদি নিজের চেষ্টায় স্বাধীন হইত, এবং পৃথক্ পৃথক রাষ্ট্র হইত, তাহা হইলেও তাহা চীনের পক্ষে ভাল হইত না। জাপানের প্ররোচনায় ও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ আদেশে তাহাদের পৃথক হওয়া চীনের

পক্ষে আরও খারাপ। কারণ, তাহাতে তাহারা কার্য্যতঃ জাপানের অধীন হইবে, অধিকন্তু চীন আগেকার চেয়ে ছোট ও হীনবল দেশ হইয়া যাইবে।

—

প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও সমগ্রদেশের পরাধীনতা

কোন দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পৃথক থাকিলে অংশগুলিকে ও সমগ্রদেশটিকে জয় করিয়া অধীন করা যে সহজ, তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ যে বার-বার বিদেশীর দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়াছে, তাহার একটি প্রধান কারণ এই, যে, ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি স্ব স্ব প্রধান ছিল। সমগ্রভারতবর্ষ একটি মাত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের আকারে থাকিলে এত বার এত সহজে পরাধীন হইত না।

ব্রিটিশভারতবর্ষকে অনেকগুলি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া যে প্রত্যেককে অনেকটা স্বতন্ত্র ভাবে অতঃপর শাসন করা হইবে, তাহাতে ভারতবর্ষের একত্ব যতটুকু আছে বা জন্মিয়াছে, তাহা হ্রাস পাইবে, এবং ভবিষ্যতে ভারতের স্বরাজ লাভে বাধা জন্মিবে। বলা হইতেছে বটে, যে, প্রদেশগুলিকে "প্রভিন্‌শ্যাল অটনমি" অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বরাজ দেওয়া হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক প্রদেশগুলির অধিবাসীরা স্বরাজ পাইবে না, গবর্ণর এবং সিবিলিয়ানগণ ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টগণ স্বরাজ পাইবেন, এবং প্রত্যেক প্রদেশ অনেকটা বিভিন্নভাবে শাসিত হওয়ায় তাহাদের পরস্পরের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইবে।

—

চীনে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ

সকল দেশেই বয়োবৃদ্ধদের চেয়ে যুবকদের কর্ম্মশক্তি বেশী, উৎসাহ বেশী, সাহস বেশী, স্বাধীনতাপ্রিয়তা বেশী এবং সাংসারিক ক্ষতিলাভগণনা কম। সুতরাং স্বদেশ শৃঙ্খলিত না-থাকিলে ও শৃঙ্খলিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত রাখিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা তাহাদের বেশী হয়, স্বদেশ শৃঙ্খলিত থাকিলে তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতেও তাহাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা অধিক হয়। সুতরাং চীনের সহিত জাপানের আগেকার সব যুদ্ধে যে জাপানী যুবক ও বালকেরা অসাধারণ সাহস ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছিল এবং বর্ত্তমানে চীনের আসন্ন অঙ্গচ্ছেদে যে তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহা স্বাভাবিক। তাহাদের নেতাদের মধ্যে ধরপাকড় হইয়াছে, এবং ৫০০০ চীন ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

নানা দেশের ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখিয়া যেমন মুগ্ধ হইতে হয়, তেমনই প্রাণে বড় বেদনাও হয়। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের এবং জীবিত বহু বয়োবৃদ্ধের দোষে তাহাদিগকে আত্মবলি দিতে হয়, অথচ অনেক স্থলে আপনাদের আত্মোৎসর্গের কোন সুফল তাহারা দেখিয়া যাইতে পারে না।

—

মিশরে অশান্তি

মিশর নামে স্বাধীন কিন্তু বস্তুতঃ ব্রিটিশ প্রভুত্ব তথায় বিদ্যমান। ব্রিটেন নিজের প্রভুত্ব ছাড়িতে চায় না, মিশরের পক্ষে—বিশেষতঃ মিশরের যুবজনের পক্ষে—তাহা সহ্য করা কঠিন। এই জন্য পুলিসের সঙ্গে তথায় ছাত্রদের সংঘর্ষ হইতেছে।

ইহা মুদ্রিত হইবার কিঞ্চিৎ আগে কতকটা সুসংবাদ আসিয়াছে।

কায়রো, ১২ই ডিসেম্বর

ওয়াফদী ও উদারনৈতিক দলের মিলনের ফলে মন্ত্রিসভা ১৯২৩ সালের প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন-প্রণালী অবিলম্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী নাসিম পাশা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। রাজা এক রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা ১৯৩০ সালে প্রত্যাহৃত ১৯২৩ সালের শাসন-প্রণালী পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে সম্মত হইয়াছেন। ১৯২৩ সালের প্রণালীতে এইরূপ বিধান আছে যে, ১০০ সদস্য লইয়া সিনেট বা উর্দ্ধতন রাষ্ট্রপরিষদ গঠিত হইবে; ইহার মধ্যে ৬০ জন সদস্য রাজা কর্ত্তৃক মনোনীত ও ৪০ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। প্রতিনিধি-পরিষদ বা নিম্নতন রাষ্ট্রপরিষদ ১৫০ জন নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। নাসিম পাশার মন্ত্রিসভা বর্ত্তমানে রহিয়াছে বটে, কিন্তু নির্ব্বাচনের পর উহার কোন সদস্য থাকিতে পারিবেন আশা করা যায় না।—রয়টার

কায়রো, ১২ই ডিসেম্বর

রেসিডেন্সী হইতে নাসিম পাশাকে জানান হইয়াছে যে, ১৯২৩ সালের রাষ্ট্রতন্ত্র পুনঃপ্রবর্ত্তনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপত্তি করিবেন না। ছাত্রগণ ইতিমধ্যেই এই ঘটনা স্মরণীয় করিবার জন্য উৎসব করিতেছে।—রয়টার

কায়রো, ১২ ডিসেম্বর

১৯২৩ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্ত্তনসূচক এক ঘোষণাপত্রে রাজা ফুয়াদ স্বাক্ষর করিয়াছেন।

—

কৃষকদিগকে ঋণমুক্ত করিবার আইন

কৃষকদিগকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা নূতন নহে, আগেও বোম্বাই ও অন্য কোন কোন প্রদেশে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব ও বঙ্গে ইহার জন্য আইন হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল আইনের মধ্যে একদেশ-দর্শিতা দেখা যাইতেছে। কৃষকেরা ঋণমুক্ত হয়, ইহা সর্ব্ব প্রকারে প্রার্থনীয়। কিন্তু তাহাদিগকে ঋণমুক্ত এরূপভাবে করা উচিত, যাহাতে মহাজনরা কর্জ্জ দেওয়া আসল টাকাটা এবং অন্ততঃ আধাসরকারী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কসমূহ যত সুদ লইয়া থাকে সেই হারে সুদটা পায়, এবং নিশ্চয় ও শীঘ্র পায়। কিন্তু আইন এ-রকম হইতেছে যেন মহাজনদের কর্জ্জ দেওয়া টাকাটা শোধ দেওয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং তাহা তাহারা পাইলে বহু বৎসর পরে পাইবে। দুষ্ট, ফন্দীবাজ, উচ্চহারে সুদখোর মহাজন এক জনও নাই বলিতেছি না। কিন্তু মহাজনরা ত জোর করিয়া খাতকদিগকে টাকা ধার লইতে বাধ্য করে না, খাতকরা যে কারণেই হউক স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া ধার করে। এবং টাকা ধার দেওয়া আর দশটা ব্যবসার মত একটা ব্যবসা। সুতরাং ব্যাঙ্কের টাকা ধার লইলে খাতকরা যেমন তাহা শোধ করিতে ধর্ম্মতঃ ও আইনতঃ বাধ্য, মহাজনদের নিকট ধার লইলেও খাতকরা তেমনই তাহা শোধ করিতে ধর্ম্মতঃ ও আইনতঃ বাধ্য। আইন অবশ্য বদলান হইতেছে; কিন্তু আইন যেমনই করা হউক, মহাজনদের টাকাটা যে ন্যায়তঃ তাহাদের প্রাপ্য, এই সত্য লুপ্ত হইতে পারে না।

নূতন আইনের ফলে মহাজনরা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহারা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবে, এবং সহজে কৃষকদিগকে টাকা ধার দিবে না। অবশ্য গবর্ন্মেণ্ট যদি ভবিষ্যতে কৃষকদের আবশ্যকমত ঋণ পাইবার সরকারী ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে মহাজনরা ধার না দিলেও কৃষকদের অসুবিধা হইবে না। কিন্তু বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের এ প্রকার তেজারতী করিবার টাকা কোথায়?

গবর্ন্মেণ্টের এ বিষয়ে তিন প্রকার কর্ত্তব্য আছে। মহাজনদের আসল টাকা ও কিছু সুদ কৃষকদের দ্বারা দেওয়ান, কিংবা তাহারা অসমর্থ হইলে স্বয়ং তাহা দেওয়া গবর্ন্মেণ্টের উচিত, এবং যাহা দেওয়া হইবে তাহা শীঘ্র দেওয়া উচিত। মহাজনদিগকে সুদের কতকটা অংশ ছাড়িয়া দিতে বলা—এমন কি অবস্থাবিশেষে বাধ্য করাও—উচিত হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্ববিধ অসুবিধা ও লোকসানের ঝুঁকি মহাজনদের ঘাড়ে চাপান অনুচিত। মহাজনরাও গবর্ন্মেণ্টের প্রজা, তাহাদের প্রতিও গবর্ন্মেণ্টের কর্ত্তব্য আছে। তাহাদের দোষ যতই থাক্, তাহাদের তেজারতীর সাহায্যে গ্রাম্যজীবন-যন্ত্র এ-পর্য্যন্ত কোন প্রকারে চলিয়া আসিতেছে। গবর্ন্মেণ্টের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, কৃষকরা অতঃপর যাহাতে অল্প সুদে কর্জ্জ পাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা; কারণ আইন যেরূপ হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে মহাজনরা কৃষকদিগকে টাকা ধার দিবে না। সরকারের শেষ ও প্রধান কর্ত্তব্য, কৃষকদের ঋণী হইবার কারণ নির্ণয় ও ভবিষ্যতে যাহাতে তাহাদিগকে ঋণী হইতে না-হয় গ্রাম্য-জীবনের বাহ্য সর্ব্ববিধ অবস্থার এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন সাধন এবং তাহাদের শিক্ষালাভের এমন ব্যবস্থা করা যাহাতে তাহারা অঋণী থাকিতে ইচ্ছা করে ও সেই ইচ্ছা অনুসারে চলিবার বুদ্ধি ও মানসিক বল তাহাদের হয়।

কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তি

১৮৮৫ সালে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। সে পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। এই পঞ্চাশ বৎসরে ইহার ভুলচুক হইয়াছে, চেষ্টার ব্যর্থতাও হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে, দেশহিতৈষণা বরাবর ইহার কাজে বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে। ইহার অর্থ এ নয়, যে, প্রত্যেক সাধারণ কংগ্রেসওয়ালা ও প্রত্যেক ছোট-বড় কংগ্রেসনেতা কংগ্রেস সম্পর্কে যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র দেশহিতৈষণা দ্বারা চালিত হইয়া করিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য এই, যে, কোন কোন বা কতকগুলি মানুষের দোষ ত্রুটি যাহাই থাকুক, কংগ্রেস নামক সমিতিটির উদ্দেশ্য বরাবর ছিল এবং এখনও আছে দেশের উন্নতি এবং ইহা চেষ্টাও তাহার জন্য করিয়াছে—যদিও অবলম্বিত উপায় সকল স্থলে সুনির্ব্বাচিত হয় নাই এবং চেষ্টা যাহাদের দ্বারা করা হইয়াছে সেই কর্ম্মীদের মনোনয়নেও অনেক স্থলে ভুল হইয়াছে।

কংগ্রেস ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ব্যাপক, শৃঙ্খলাবদ্ধ

এবং অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান, এবং ইহা চলিতেছেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৎসর ধরিয়া। ইহা কোন একটি বা কয়েকটি প্রদেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বা পরিচালিত হইতেছে না—যদিও কখন কখন নানা কারণে ইহাতে কোন কোন প্রদেশের নেতাদের প্রাধান্য লক্ষিত হইয়াছে।

এই সমস্ত কারণে বর্ত্তমান ১৯৩৫ সালের বর্ত্তমান মাসের শেষ সপ্তাহে ইহার পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠান হইবে, তাহাতে সকল প্রদেশের, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও সকল শ্রেণীর লোকদের যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

—

কংগ্রেসের ইতিহাস

কংগ্রেসের যে ইতিহাস ইংরেজীতে ও ভারতবর্ষের কয়েকটি ভাষায় প্রকাশিত হইবে, তাহাতে সকল প্রদেশের কর্ম্মীদের কর্ম্মিষ্ঠতা ও আত্মোৎসর্গের প্রতি সমভাবে সুবিচার হইবে কি না, বলা যায় না। নিরপেক্ষ ভাবে এরূপ একটি ইতিহাস লেখা বড় কঠিন। যিনি বা যাঁহারা লিখিবেন, তাঁহার বা তাঁহাদের কোন এক বা একাধিক প্রদেশের কংগ্রেসকার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান বেশী, তাহার প্রতি অনুরাগ বেশী থাকিতে পারে। সুতরাং অন্য সব প্রদেশের প্রতি তথাকার লোকদের মতে সুবিচার না হইতে পারে। কিন্তু তাহা লইয়া প্রদেশে প্রদেশে বিন্দুমাত্রও ঈর্ষাদ্বেষ হওয়া উচিত নয়। কেহ ইচ্ছা করিয়া কোন প্রদেশকে খাট করিবার চেষ্টা করিতেছে, এরূপ মনে করা উচিত নয়।

প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেসকর্ম্মেরও এক-একটি আলাদা ইতিহাস লিখিত হইলে ভাল হয়। তাহাও যে সকলের মতে নিরপেক্ষ হইবে, এরূপ আশা করা উচিত নয়—যদিও, যিনিই লিখুন, তাঁহারই উহা নিরপেক্ষ ভাবে লিখিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইবে। এক-একটি প্রদেশের কংগ্রেসকর্ম্মের ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে লেখা কত কঠিন, তাহা বিবেচনা করিলেই সমগ্রভারতের কংগ্রেসকর্ম্মের ইতিহাস লেখা আরও কত কঠিন, তাহা উপলব্ধ হইবে, এবং সেই উপলব্ধি আমাদিগকে প্রাদেশিক ঈর্ষ্যাদ্বেষ মনোমালিন্য হইতে রক্ষা করিবে। এক-একটি প্রদেশের মত এক-একটি জেলারও কংগ্রেসকর্ম্মের ইতিহাস লিখিত হইতে পারে।

অবিখ্যাত কংগ্রেস-কর্ম্মীদের কথা

দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় কংগ্রেসের যে-সব বৃত্তান্ত বাহির হইবে, পুস্তকাকারে কংগ্রেসের যে সমগ্র ভারতীয় ও প্রাদেশিক ইতিহাস প্রকাশিত হইবে, তাহাতে অবিখ্যাত অথচ আত্মোৎসৃষ্ট কর্ম্মীদের উল্লেখ থাকা একান্ত আবশ্যক। বঙ্গের এইরূপ এক জন কর্ম্মী ছিলেন—

পরলোকগত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়।

তিনি কংগ্রেসের প্রথম দুই বৎসর নিজের ক্ষতি করিয়া দেশের কাজে এরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যে, বলিতে গেলে তাহারই ফলে ৩৮ বৎসর বয়সে অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। গত মাসে কলিকাতার আলবার্ট হলে, কংগ্রেসের সহিত বরাবর যোগরক্ষাকারী বঙ্গের প্রাচীনতম কংগ্রেস-ওয়ালা ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সভাপতিত্বে কংগ্রেস-জুবিলির আয়োজনে সর্ব্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে অন্যতম বক্তা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গিরিজাভূষণ বাবুর নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা কংগ্রেস-কর্ম্মীদের মধ্যেও অল্প লোকেই জানেন। এই জন্য গিরিজাভূষণ বাবুর সম্বন্ধে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে যাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহা এখানে প্রকাশ করিতেছি।

"কংগ্রেসের কনকজয়ন্তী উৎসব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে বিখ্যাত সিভিলিয়ান এ. ও. হিউম সাহেবের চেষ্টায় তদানীন্তন বাঙালী সমাজে যে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই ফলে কংগ্রেসের জন্ম হয়। বোম্বাই প্রদেশে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন কালে মোট ৭২ জন দর্শকের মধ্যে বাংলা দেশ হইতে মাত্র ৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিরূপে এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরারে'র সুযোগ্য সম্পাদক ৺নরেন্দ্রনাথ সেন ও 'নববিভাকর' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক পরলোকগত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় সদস্যরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"গিরিজাভূষণ বাবু উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নরেন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয়ের ন্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে যশ অর্জ্জন করিবার সৌভাগ্যলাভ করেন নাই। মাত্র

৩৮ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইয়াছিল। কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যে তিনি যে-পরিমাণ দেশ-সেবা করিয়া গিয়াছিলেন, অনেকে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াও তাহা করিতে পারেন নাই। পঞ্চাশৎ বৎসর পরে তাঁহার জীবনবৃত্তের আলোচনায় তরুণ কংগ্রেসকর্ম্মীদের মনে যুগপৎ কৌতুক ও বিস্ময় জাগিতে পারে, কিন্তু সময় ও সুযোগ না আসিলে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি সম্ভবপর হয় না।

"কনকজয়ন্তী উৎসবে কংগ্রেসের ইতিহাস নূতন করিয়া সঙ্কলিত হইবে এরূপ বিঘোষিত হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকল্পে যাঁহারা প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নাম ও জীবনবৃত্ত ইতিহাস-অঙ্গে না থাকিলে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সেই আশায় তদানীন্তন সংবাদপত্র হইতে গিরিজা বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া কংগ্রেসের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের তথ্য হিসাবে প্রকাশিত হইল।

"গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত মুখোপাধ্যায়-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় তদানীন্তন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিভ্রাতারা রাজসরকারের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু সে-সকলের উল্লেখ এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

"১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর তারিখের 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' তাঁহার সম্বন্ধে যে দীর্ঘ মন্তব্য করিয়াছিলেন বাংলায় তাহার তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

'এই শহরের গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ আমাদের নিকট অশনিপাতের ন্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিতেছি এবং বঙ্গদেশও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লাভ করেন। স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করিতে চাহিলে তিনি তাঁহার স্বাধীন ব্যবসায় ওকালতির অজুহাতে উহা গ্রহণ করেন নাই। এশিয়াটিক সোসাইটির তিনি যোগ্য সভ্য ছিলেন, হিন্দু ফ্যামিলি এন্যুয়িটী ফণ্ডের পরিচালক-সমিতির মধ্যে থাকিয়া তাহার অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য তিনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেন্ট্রাল টেক্সট-বুক কমিটি ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনেরও তিনি এক জন কর্ম্মঠ সভ্য ছিলেন। কংগ্রেসের বোম্বাই প্রদেশে প্রথম ও কলিকাতায় দ্বিতীয় অধিবেশনকালে গিরিজা বাবু বিপুল উদ্যমে উহার কার্য্যকরী-সমিতির মধ্যে থাকিয়া উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। দিল্লী শহরে ইম্পিরিয়াল এসেম্ব্লেজের জন্য যে প্রেস এসোসিয়েশন গঠিত হইয়াছিল গিরিজা বাবু তাহাতে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গিরিজা বাবু দীর্ঘ আট মাস কাল কংগ্রেসের রাজনীতি-প্রচারকরূপে সমগ্র বাংলার নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজের মনকে কংগ্রেসের রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কারের উপযোগী করিয়া তুলিতেছিলেন। নানা অস্বাস্থ্যকর স্থানে ঘুরিয়া কঠোর শ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া মাত্র ছয় দিনের জ্বরে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ধীর স্থির ও নীরব কর্ম্মী ছিলেন, কোনরূপ আড়ম্বর ও হুজুগের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বহু বর্ষ যাবৎ "নববিভাকর" পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। "নববিভাকর" পত্রিকা তাঁহার তত্ত্বাবধানে উদার ও পক্ষপাতশূন্য মতের জন্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।'

"১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকা বলিয়াছেন :—

'গিরিজা বাবু বঙ্গদেশীয় ন্যাশানল লীগের এক জন অগ্রণী সভ্য ছিলেন এবং কলিকাতায় কংগ্রেসের যে দ্বিতীয় অধিবেশন গত বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের সে বৎসরের সফলতা একমাত্র তাঁহারই চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়াছিল।'

"সন ১২৯৪ সালের ৬ই কার্ত্তিকের "বঙ্গবাসী" বলিতেছেন :—

'৯ আইনের দরুণ 'সোমপ্রকাশে'র পতন হইলে গিরিজা বাবু 'নববিভাকর' বাহির করেন। গিরিজা বাবুর তত্ত্বাবধানে ও যত্নে নববিভাকর বাঙ্গলা সংবাদপত্র মহলে বিশেষ প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। সম্প্রতি তিনি বর্ত্তমান রাজনীতি-আন্দোলনে বিশেষ মাতিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান লীগের তিনি এক জন কর্ম্মঠ সভ্য ছিলেন। দেশের লোককে রাজনৈতিক শিক্ষা দিবার জন্য তিনি ঐ লীগ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। গিরিজা বাবু বিনাড়ম্বরে অথচ ধীরে ধীরে এই কার্য্য সমাধা করিতেছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে ওকালতি প্রায় একরূপ ছাড়িতে হইয়াছিল। বিরোধী মতবাদীদের সঙ্গে তাঁহার বিদ্বেষ ভাব ছিল না। অমায়িকতা গুণে তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।'

"নাগপুরের স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁহার "Stray Thoughts on some Incidents in my Life" নামক গ্রন্থের ১৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

'গত বৎসর বোম্বাই প্রদেশে প্রথম কংগ্রেস বসে। ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় বসিবে এরূপ ঘোষিত হইয়াছিল। আমার কলেজের সহাধ্যায়ী বন্ধু গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় ঐ কংগ্রেসের এক জন সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তখনকার কালে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা বিশেষ সাহসের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। কংগ্রেস তখন সবেমাত্র জন্মলাভ করিয়াই দেশের আমলাতন্ত্রের সহানুভূতি হারাইতেছিল। গিরিজাভূষণ অচিরকালমধ্যে নিষ্ঠুর কালগ্রাসে পতিত হইলেন, তাঁহার বিয়োগে আমার স্বদেশ (বাংলা) এক জন উচ্চাভিলাষী যুবক ও নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিক হারাইল।'

"সরকারী শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন বড়কর্ত্তা স্যর্ এলফ্রেড ক্রফ্‌ট সাহেব ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে গবর্ন্মেণ্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—

'যে-সকল সভ্য এই কমিটির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন

তাঁহাদের মৃত্যুজনিত আমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে তন্মধ্যে গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ. বি-এল্ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কাজ উচ্চদরের এবং বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল।'

"এ হেন নীরব কংগ্রেসকর্ম্মীর নাম কংগ্রেসের ইতিহাস-পৃষ্ঠায় না থাকিলে দেশবাসীর প্রত্যবায় আছে।"

গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আত্মোৎসর্গের ও মূল্যবান কার্য্যের কথা আমরা যেমন জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি, সেইরূপ অন্য কাহারও কাহারও কথাও জনসমাজে অবিদিত থাকিতে পারে। তাঁহাদের যথাযোগ্য উল্লেখ ও কার্য্যের বৃত্তান্ত কংগ্রেসের ইতিহাসে থাকা উচিত।

—

কংগ্রেসের চেষ্টার ফলাফল

অনেকে মনে করেন, কংগ্রেস পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিল, অথচ এখনও স্বরাজলাভ করিতে পারিল না, এবং এইরূপ মনে করায় তাহার প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখান। অন্য কোন কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে হয়ত তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরী তাহার কিয়দংশ জয় করেন। অন্যান্য অংশও পরে ইংলণ্ডের রাজারা জয় করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ডকে ইংলণ্ডের রাজ্যভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন এই বিংশ শতাব্দীতে আয়ার্ল্যাণ্ডের উত্তরাংশের কিছু ভূখণ্ড ছাড়া বাকী আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে স্বরাজ পাইয়াছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় নাই। ডি ভ্যালেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

আয়ার্ল্যাণ্ডে ভারতবর্ষের মত নানা ভাষা, নানা ধর্ম্ম প্রচলিত নাই। ইহা ভারতবর্ষের মত সভ্যতার নানা স্তরে অবস্থিত বহু জাতির (races) ও তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক জা'তের (castesএর) বাসভূমি নহে। সেখানে ঐক্য ও দলবদ্ধ চেষ্টা ভারতবর্ষ অপেক্ষা সহজ, যদিও নিতান্ত সহজ নহে। তথাপি আইরিশরা যতটুকু স্বরাজ পাইয়াছে, তাহা পাইতে তাহাদের বহু শতাব্দী লাগিয়াছে। তদ্ভিন্ন, তাহাদের চেষ্টা, তাহাদের দুঃখবরণ ও দুঃখসহন, তাহাদের আত্মোৎসর্গ ও আত্মবলিদান কিরূপ, এবং আমাদেরই বা কিরূপ, তাহা মনে রাখিতে হইবে। তাহাদের লোকসংখ্যা লক্ষে গণনা করিতে হয়, আমাদের সংখ্যা কোটিতে গণিতে হয়।

তাহার পর ইটালীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করুন। এই দেশ চৌদ্দ শত বৎসর ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল, এবং অনেক খণ্ড কোন-না-কোন সময়ে পরাধীন ছিল। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইটালী এক ও স্বাধীন হয়। এই দেশে ভারতবর্ষের মত বহু ভাষা, বহু ধর্ম্ম, বহু জাতি নাই। তথাপি ইহাকে এক ও স্বাধীন করিতে চৌদ্দ শত বৎসর লাগিয়াছে। ইটালীর চেয়ে ভারতবর্ষ অনেক বড় দেশ। ইটালীর লোকসংখ্যা চারি কোটি, ভারতবর্ষের ৩৫ কোটি। চারি কোটিকে এক করা অপেক্ষা ৩৫ কোটিকে এক করা অনেক কঠিন।

আমরা স্বরাজলিপ্সু কাহাকেও নিরুৎসাহ করিবার জন্য এই সকল কথা লিখিতেছি না। আমাদের কাজ যত কঠিন, আমাদের চেষ্টা তত অধিক হওয়া উচিত; আমাদের হতাশ হইলে চলিবে না;—ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

কংগ্রেস আর কিছু না করুন, নিরক্ষর কতক লোকের মধ্যেও যে রাজনৈতিক জাগরণ আনিয়াছেন, ইহা কম কাজ নয়। অন্তঃপুরিকাদিগকেও বাহিরে আসিয়া স্বরাজ-প্রচেষ্টায় যোগ দিতে কংগ্রেস প্রবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন, ইহা কম সাফল্য নয়। কংগ্রেসের প্রভাবে স্বদেশহিতৈষণার প্রেরণায় অন্ততঃ লক্ষাধিক লোকও যে নির্ভীক হইয়া সর্ব্ববিধ দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও আদর্শ ত্যাগ করেন নাই, অনেকে প্রহৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াও পতাকা বর্জ্জন করেন নাই, ইহা কংগ্রেসের নিষ্ফলতার প্রমাণ নহে। সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত বহু অন্তঃপুরিকাও লোকচক্ষুর অগোচরে জীবন যাপন ছাড়িয়া দিয়া নির্ভয়ে কংগ্রেসের পতাকার তলে সমবেত হইয়াছিলেন, কারাগারে বাস ও অন্যবিধ দুঃখ বরণ করিয়াছিলেন, ইহা কংগ্রেসের কম কৃতিত্ব নহে। সাধারণ সংগ্রামের মত, অহিংসার পথে স্বরাজলাভসংগ্রামের জন্যও প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। অন্তত কতকগুলি মহিলা ও পুরুষকে কংগ্রেস যে এই অহিংস সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে, ইহা তাহার একটি অবদান।

—

কংগ্রেসের অধিবেশনে আমার উপস্থিতি

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের যখন বোম্বাইয়ে প্রথম অধিবেশন হয়, তখন প্রবাসীর সম্পাদক ছাত্র। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় হয়। তখনও আমি ছাত্র। এই অধিবেশনের অন্য কিছু মনে নাই, কেবল একটা এই অস্পষ্ট স্মৃতি আছে, যে, ইহাতে এক জন বাঙালী প্রতিনিধি পঞ্জাব হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার লম্বা দাড়ী বিনুনী করিয়া কানের উপর দিয়া লইয়া গিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন,—যেমন "পশ্চিমা" অনেক লোক সেকালে করিত, এখনও করে। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা যুবকেরা কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম—এইরূপ মনে পড়িতেছে, যে, আমরা ভাবিয়াছিলাম তিনি শিখ হইয়া গিয়াছেন।

ইহার পর যে কংগ্রেসে আমি উপস্থিত ছিলাম, তাহা ১৮৯০ সালের কলিকাতা কংগ্রেস। ফিরোজশাহ মেহতা ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ইহা টিভোলী গার্ডেনে হইয়াছিল। আমি তখন সিটি কলেজের অধ্যাপক। ইহাতে আমার সহধর্ম্মিণী ও আমি—আমি প্রতিনিধিরূপে—উপস্থিত ছিলাম। ফিরোজশাহ মেহতা কার্ডিন্যাল নিউম্যানের "Lead, Kindly Light" কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া তাঁহার অভিভাষণ শেষ করেন। ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ইহাতে একটি প্রস্তাব সমর্থন করেন। তাঁহাকে তাঁহার স্বামী ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ বক্তৃতামঞ্চে লইয়া যান।

অতঃপর ১৮৯২ সালের এলাহাবাদ কংগ্রেসে আমি কলিকাতার অন্যতম প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলাম। মিঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন এক জন প্রতিনিধি তাঁহার বক্তৃতায় গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়ের উল্লেখ করেন "মিস্টার গোখেল" বলিয়া। গোখলে মহাশয় উত্তর দিতে উঠিয়া প্রথমেই বলেন, "আমি গোখেল নহি, আমি গোখলে," এবং পরে পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার যুক্তি-তর্কের উত্তর দেন। এই কংগ্রেস আলফ্রেড পার্কের নিকটস্থ, ঐ সময়ে দরভঙ্গা কাস্‌ল্‌ নামে পরিচিত, অট্টালিকার প্রাঙ্গণে হইয়াছিল। এক দিন বিষয়নির্ব্বাচন-কমিটির অধিবেশনে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মিঃ ডিগবীর বিলাতী কংগ্রেসপত্র "ইণ্ডিয়া" প্রভৃতি সম্পর্কীয় "গোলমেলে" হিসাব বুঝাইয়া দেন—অবশ্য ইংরেজীতে; এবং ব্যাখ্যা হইয়া গেলে বাংলা করিয়া সমবেত বাঙালী প্রতিনিধিদিগকে বাংলায় এই মর্ম্মের কথা বলেন: "একটা গোলমেলে হিসেব যদি বুঝিয়ে দিতে না পারব, তা হ'লে বৃথাই এতদিন ব্যারিষ্টারী করেছি"!

১৮৯৮ সালে মান্দ্রাজে যে অধিবেশন হয়, তাহাতে আমি এলাহাবাদের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলাম। সে বৎসর পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় অসুস্থতা বশতঃ কংগ্রেসে যাইতে পারেন নাই। উত্তরপশ্চিম (এখন আগ্রা-অযোধ্যা) প্রদেশ হইতে সেবার লক্ষ্ণৌয়ের পরলোকগত মুন্‌শী গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, কাশীর শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ক্ষত্রিয়, লক্ষ্ণৌয়ের একটি কাশ্মীরী ভদ্রলোক এবং এলাহাবাদ হইতে আমি, এই চারি জন প্রতিনিধি গিয়াছিলাম। ক্ষত্রিয় মহাশয় বড় গোছালো লোক। যাতায়াতের প্রত্যেক দিনের জন্য নিজের (ও সঙ্গীদের) দাঁতন (দন্তকাষ্ঠ) লইয়াছিলেন, এবং খাদ্যসম্বন্ধে "আচারনিষ্ঠ" ছিলেন বলিয়া তাঁহার বাড়ির তৈরি কিঞ্চিৎ অম্লমিশ্রিত ঘৃতপক্ক এরূপ কচুরী আদি লইয়াছিলেন, যাহা যাইবার সময়ও তিনি প্রতিদিন খাইলেন এবং আসিবার সময়ও খাইলেন—তখনও নষ্ট হয় নাই। আমরাও ভাগ পাইয়াছিলাম। আমরা জব্বলপুর, মনমাড় প্রভৃতি ষ্টেশন দিয়া গিয়াছিলাম। মনমাড় জংশনে পুনার দিক্‌ হইতে বালগঙ্গাধর টিলক প্রভৃতি প্রতিনিধিদিগকে লইয়া ট্রেন আসিল। টিলক মাল্যবিভূষিত হইলেন, "জলযোগ" করিতে অনুরোধ করায় জুতা খুলিয়া জলযোগ করিলেন। রেণীগেণ্ট্‌ ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে কংগ্রেসপক্ষ হইতে কতকগুলি ভদ্রলোক কিছু আহার করিবার জন্য প্রতিনিধিদিগকে নামিতে বলিলেন। বর্ম্মাজী ও ক্ষত্রিয়জী অজ্ঞাত ব্যক্তির রান্না খাইবেন না বলিয়া খাইতে গেলেন না। আমি বাঙালী গেলাম। পরিষ্কার কলাপাতার উপর গরম গরম ভাত ডাল দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম ও ভোজন করিলাম। কিন্তু ডালে খুব পেঁয়াজ ছিল বলিয়া মুখ পরদিন পর্য্যন্ত বিস্বাদ ছিল। মান্দ্রাজে আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত—এক বৃহৎ অট্টালিকায়—খুব ভাল ছিল, কিন্তু শৌচের ব্যবস্থা অতি জঘন্য—শ্লীলতা রক্ষার পর্য্যন্ত উপায় ছিল না! আহার্য্য জিনিষগুলি ভালই ছিল, কিন্তু ডাল তরকারীতে ঝাল বড় বেশী। আমার দুর্দশা দেখিয়া এক জন ভলাণ্টীয়ার তাঁহাদের বাড়িতে আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে

আয়োজন বেশ ছিল, কিন্তু আমি ঝালের আতিশয্যে খাইতে পারিতেছি না দেখিয়া ছেলেটির মাতা ও ভগ্নী তাহার মারফৎ আমাকে তরকারীতে বেশী করিয়া ঘী মিশাইয়া লইতে বলিলেন; তাহাতে কিছু সুবিধা হইল। ছেলেটি আমাকে ইংরেজী করিয়া বলিলেন, "মা ও দিদি বলিতেছেন, আপনি বাঙালী বলিয়া ঝাল কম দেওয়া হইয়াছে, তাহাও আপনি খাইতে পারিতেছেন না। আমরা এমনই ঝাল কম খাই; মাদুরার বরযাত্রীরা মান্দ্রাজ আসিলে তাহারা সঙ্গে মরীচের গুঁড়া আনে, কেন-না মান্দ্রাজী রান্নার ঝাল তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে"!

মান্দ্রাজের এই অধিবেশনে সভাপতি আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের অভিভাষণ এবং শেষ দিনের শেষ বক্তৃতায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা মহাশয় মান্দ্রাজ পৌঁছিয়াই পীড়িত হইয়া পড়ায় আমাকেই সেবার পরিবর্ত্তী অধিবেশনের স্থান লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসকে নিমন্ত্রণ করিতে হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌয়ের এই অধিবেশনে প্রতিনিধিরূপে আমি উপস্থিত ছিলাম। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি ছিলেন। এই অধিবেশনে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে প্রথম চাক্ষুষ দেখি, তাঁহার সহিত পত্রের দ্বারা পরিচয় আগেই ছিল।

কলিকাতায় ১৯০১ সালে যে কংগ্রেস হয় তাহাতে আমি, বোধ হয় প্রতিনিধিরূপে, উপস্থিত ছিলাম। ইহা যদি বীডন স্কোয়ারে হইয়া থাকে ও স্বর্গীয় পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ জোষীর ভানুতাপ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যের উত্তাপে ভাজা লুচি যদি ইহাতে বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ইহাতে উপস্থিত ছিলাম। এদুলজী দীনশা ওয়াচা সভাপতি ছিলেন। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রারম্ভিক সংগীতের গায়কদের নেতা ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯০৪ সালের বোম্বাই কংগ্রেসে প্রতিনিধিরূপে গিয়াছিলাম। সর্ হেনরী কটন সভাপতি ছিলেন। মান্দ্রাজী প্রতিনিধিদের শিবিরে একদিন মিঃ চিন্তামণির নিমন্ত্রণে কফি ও নুন-লঙ্কা-দেওয়া হালুয়া খাইয়াছিলাম। বঙ্গের বাঙালী প্রতিনিধিরা খুব সামুদ্রিক মাছ খাইয়াছিলেন।

১৯০৫ সালের কাশীর কংগ্রেসে গোপালকৃষ্ণ গোখলে সভাপতি ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার ভার আমার উপর ছিল—আমি তখনও এলাহাবাদের একটি কলেজে কাজ করি। আমি বক্তৃতা লিখিয়া পড়িয়াছিলাম। সপরিবারে গিয়াছিলাম। আমার প্রতিনিধির টিকিট ছিল, অন্য সকলের জন্য দর্শকের টিকিট কিনিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে লর্ড কার্জনের নীতির সহিত আওরঙ্গজেব বাদশাহের নীতির তুলনা করিয়াছিলেন, মনে হইতেছে। বঙ্গের মিঃ গজনবী ("ঠিক" কিংবা বেঠিক গজনবী, বলিতে পারি না) একটি প্রস্তাব সম্বন্ধে ইংরেজীতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলে অনেক শ্রোতা "উর্দু, উর্দু" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। তাহাতে তিনি বলেন, "আমি বাঙালী," এবং ইংরেজীতেই বক্তৃতা শেষ করেন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তাহার কয়েক মাস আগে সেপ্টেম্বর মাসে আমি এলাহাবাদের চাকরীতে ইস্তফা দিয়াছিলাম, কিন্তু তখনও এলাহাবাদ ছাড়িয়া আসি নাই। এলাহাবাদ হইতে প্রতিনিধি হইয়া কলিকাতায় আসি। ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। কিন্তু যখন কলিকাতার কংগ্রেসে আসি, তখনই এই প্রথম সংখ্যা ছাপাইয়া কয়েক খানি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। কলিকাতার এই কংগ্রেসে দাদাভাই নওরোজী মহাশয় আধুনিক কংগ্রেস-রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রথম "স্বরাজ" শব্দ ব্যবহার করেন। স্বরাজ শব্দটির যে সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা তিনি তাঁহার অভিভাষণে দেন, সে সম্বন্ধে পরে কিছু লিখিতেছি।

১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসের জন্য আমি প্রতিনিধি রূপে সুরাট যাই। কিন্তু যেদিন পৌঁছি সেইদিনই রাত্রে জ্বরে পড়ি ও অনেকদিন সুরাটেই ভুগি। সুতরাং অধিবেশনের দিন যে গোলমাল হইয়াছিল, তাহা দেখি শুনি নাই। রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় সভাপতি ছিলেন।

১৯১০ সালে সর্ উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতেও বোধ হয় আমি এক জন প্রতিনিধি ছিলাম; কিন্তু ঠিক্ মনে নাই।

ইহার পর আমি কোন কংগ্রেসে প্রতিনিধিরূপে যাই নাই, কিন্তু কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। তাহার কেবল উল্লেখ করিতেছি:—১৯১১ সালের কলিকাত

কংগ্রেস, সভাপতি পণ্ডিত বিষণ নারায়ণ দার ; ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস, সভাপতি পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু ; ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেস, সভাপতি পণ্ডিত জবহরলাল নেহরু ; ১৯৩১ সালের করাচী কংগ্রেস, সভাপতি সর্দার বল্লভভাই পটেল ; ১৯৩৪ সালের বোম্বাই কংগ্রেস, সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এই সকল অধিবেশনের বিষয়ে আমরা প্রবাসীতে যথাসময়ে অনেক কথা লিখিয়াছি।

—

দাদাভাই নওরোজীর স্বরাজের সংজ্ঞা

স্বরাজ বলিলে পাছে স্বাধীনতা না বুঝায়, সেই জন্য, এবং অনেকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটস্ অর্থে স্বরাজ শব্দটি ব্যবহার করায়, স্বাধীনতা বুঝাইবার নিমিত্ত "পূর্ণ-স্বরাজ" কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ কংগ্রেসী রাজনৈতিক সাহিত্যে স্বরাজ শব্দের প্রবর্ত্তক দাদাভাই নওরোজী ঐ শব্দটি কেবলমাত্র ব্রিটিশ-ঔপনিবেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব অর্থে ব্যবহার করেন নাই। মডার্ণ রিভিয়ুর দ্বিতীয় সংখ্যা (১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যা) হইতে আমরা ইহা অনেক বার লিখিয়াছি। ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে (২০৮-৯ পৃষ্ঠায়) দাদাভাই নওরোজীর ১৯০৬ সালের কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পঠিত অভিভাষণ সম্বন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম :—

The great merit of the address lies in the fact that it states in clear and unequivocal language our chief political demand, namely, Swaraj or self-government.

অতঃপর আমরা অভিভাষণটি হইতে নীচের কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।

"(1) Just as the administration of the United Kingdom in all services, departments and details is in the hands of the people themselves of that country, so should we in India claim that the administration in all services, departments and details should be in the hands of the people themselves of India.

"This is not only a matter of right and matter of the aspirations of the educated—important enough these matters are—but it is far more *an absolute necessity* as the only remedy for the great inevitable economical evil which Sir John Shore pointed out a hundred and twenty years ago, and which is the fundamental cause of the present drain and poverty. The remedy is absolutely necessary for the material, moral, intellectual, political, social, industrial and every possible progress and welfare of the people of India.

"(2) As in the United Kingdom and the Colonies all taxation and legislation and the power of spending the taxes are in the hands of the representatives of the people of those countries, so should also be the rights of the people of India.

"(3) All financial relations between England and India must be just and on a footing of equality, *i. e.*, whatever money India may find towards expenditure in any department—Civil or Military or Naval—to the extent of that share should Indians share in all the benefits of that expenditure in salaries, pensions, emoluments, &c., materials, &c., as a partner in the Empire, as she is always declared to be. We do not ask any favours. We want only justice. Instead of going into any further divisions or details of our rights as British citizens, the whole matter can be comprised in one word—"Self-government or *Swaraj* like that of the United Kingdom or the Colonies."

অভিভাষণটি হইতে উপরে মুদ্রিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়া আমরা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম :—

Some of us have concluded in a mood of either hasty appreciation or of equally hasty fault-finding that Mr. Naoroji is in favour of self-government on colonial lines, but not of absolute autonomy. But the actual words that he uses, "self-government or Swaraj like that of the United Kingdom or the colonies"—do not warrant any such conclusion. There is nothing to prevent us from interpreting his words to mean that he desires absolute autonomy like that of the United Kingdom, but would be content to have self-government on colonial lines under British suzerainty.

আমরা দাদাভাই নওরোজীর অভিভাষণ হইতে যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই :—

(১) যেমন সমুদয় সরকারীচাকরীসমষ্টিতে, বিভাগে ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিলাতের রাষ্ট্রীয় সমুদয় কার্য্য সেই দেশের লোকদের হাতে, তেমনই ভারতেও আমাদের দাবি করা উচিত যে এখানেও সকল সরকারী বিভাগ, চাকরীসমষ্টি ও অন্য সরকারী সব ব্যাপার ভারতের লোকদের হাতে থাকা উচিত।

প্রত্যেক দেশের লোকদের ইহা একটা রাষ্ট্রীয় অধিকার, এবং শিক্ষিত ভারতীয়দের এই অধিকার পাইবার উচ্চ অভিলাষ আছে। ইহা যে একটি অধিকার এবং তাহা পাইবার ইচ্ছা যে শিক্ষিত ভারতীয়দের আছে, তাহা তাচ্ছিল্য করিবার জিনিষ নহে। কিন্তু কেবল সেই জন্যই যে ভারতীয়দের এই অধিকার পাওয়া চাই, তাহা নহে। সর্ জন শোর ১২০ বৎসর পূর্ব্বে (১৭৮৬ সালে) যে অবশ্যম্ভাবী মহা অর্থনৈতিক অমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং যাহা ভারতের বাহিরে ধন চলিয়া যাওয়ার ও ভারতের দারিদ্র্যের মূলীভূত কারণ, তাহার একমাত্র

প্রতিকাররূপে ইহা একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষের লোকদের ধনসম্বন্ধীয়, নৈতিক, বুদ্ধিসম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, পণ্যশিল্পসম্বন্ধীয় এবং অন্য সকল প্রকার প্রগতি ও কল্যাণের জন্য এই প্রতিকার একান্ত আবশ্যক।

(২) বিলাতে এবং তাহার উপনিবেশসমূহে সমুদয় ট্যাক্স বসান কমান বাড়ান ও রদ করা এবং সমুদয় আইন প্রণয়ন পরিবর্ত্তনাদি, এবং সমুদয় ট্যাক্স খরচ করিবার ক্ষমতা যেমন সেই সেই দেশের লোকদের প্রতিনিধিদের হাতে আছে, ভারতবর্ষের লোকদেরও সেইরূপ অধিকার থাকা উচিত।

(৩) ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে সমুদয় আর্থিক সম্বন্ধ ন্যায্য এবং উভয় পক্ষের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ সিবিল, মিলিটারী (সৈনিক), বা রণতরীসম্পর্কীয় কোন বিভাগের ব্যয়ের জন্য ভারতবর্ষ যত টাকা দিবে, ব্যয়ের সেই অনুপাতে ভারতবর্ষ কর্ম্মচারীদের বেতনে, পেন্স্যনে ও ভাতা আদিতে এবং সামগ্রী আদিতে অংশী হইবে সাম্রাজ্যের অংশীদাররূপে, যে অংশীদার বলিয়া ভারতবর্ষকে সর্ব্বদা ঘোষণা করা হয়। আমরা কোন অনুগ্রহ চাই না। আমরা কেবল ন্যায্য ব্যবহার চাই। দফা দফা করিয়া আমাদের সব অধিকারের উল্লেখ না করিয়া সমস্ত বিষয়টি এই এক কথায় নিবদ্ধ করা যায়— আমরা চাই 'ব্রিটেনের বা উপনিবেশ-সমূহের মত স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ'।

আমরা এই বিষয়টি একটু বিস্তারিত করিয়া লিখিলাম এই জন্য, যে, কংগ্রেস যে উৎসবে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহার অনুষ্ঠানের সময় সাবেক কংগ্রেসওয়ালা ও বর্ত্তমান কংগ্রেসওয়ালা উভয় পক্ষেরই মনে রাখা উচিত, যে, কংগ্রেস এখন যাহা চান, ত্রিশ বৎসর আগেও সারতঃ তাহাই চাহিয়াছিলেন। গান্ধীজী যে স্বাধীনতার সার বস্তু ("substance of independence") চান, দাদাভাই নওরোজীও তাহাই চাহিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটেনের মত বা উপনিবেশসমূহের মত স্বরাজ চাহিয়াছিলেন, এবং কি কি অধিকার এই স্বরাজ কথাটির অন্তর্গত সংক্ষেপে তাহাও বলিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন ব্রিটেনের মত স্বরাজ অর্থাৎ নামে কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা, বা, উপনিবেশসমূহের মত স্বরাজ, অর্থাৎ স্বাধীনতার সার বস্তু। তিনি জানিতেন, এক ধাপে পূর্ণ স্বাধীনতা তখন পাইবেন না, এই জন্য স্বাধীনতার সার বস্তু আগে চাহিয়াছিলেন।

সাবেক কালের কংগ্রেসের ও একালের কংগ্রেসের দাবি সারতঃ এক। মনোভাবে ও পন্থায় অবশ্য প্রভেদ আছে। সাবেক কংগ্রেসওয়ালারা আবেদন নিবেদন প্রতিবাদ ও আন্দোলনের উপর নির্ভর করিতেন। পরবর্ত্তী কংগ্রেস অসহযোগ, অহিংস আইনলঙ্ঘন, ও অহিংস প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করেন। আগেকার কংগ্রেসনেতারা যে সকলেই সব অবস্থাতেই প্যাসিভ্ রিজিষ্ট্যান্স বা "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের"— যেমন ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করার (No-Tax campaignএর)—বিরোধী ছিলেন, তাহা নহে। সাবেক কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যে গোপালকৃষ্ণ গোখলে একমাত্র দেশসেবাকেই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। তিনি প্যাসিভ রিজিষ্ট্যান্সকে চরম বৈধ উপায় বলিয়া মানিতেন। এই চরম উপায় কি অবস্থায় কখন অবলম্বনীয়, সে সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত কিছু লিখিয়া বলিয়া গিয়াছেন কি না, আমরা অবগত নহি।

—

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

এবারের প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন কাশীতে হইবার কথা ছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ এ বিষয়ে তথাকার প্রধান উৎসাহী নেতা ললিতবিহারী সেন রায়ের শোচনীয় অকালমৃত্যুতে

শ্রীমতী শৈলবালা দেবী

সেখানে উহা হইতে পারে নাই, নিউ দিল্লীতে হইবে তথাকার কর্ম্মীরা সভাপতি আদি পাইবার চেষ্টা করিতে যথেষ্ট সময় পান নাই। তথাপি, খুব চেষ্টার ফলে

যোগ্য লোকই পাইয়াছেন। অন্য সব আয়োজন ও বন্দোবস্ত যে খুব ভাল হইবে, সে বিশ্বাস আমাদের আছে। মহিলাদের জন্য বন্দোবস্ত শ্রীমতী শৈলবালা দেবী খুব ভালই করিবেন।

আমরা নিউ দিল্লী হইতে ২৭শে ও ২৮শে অগ্রহায়ণ যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা নীচে মুদ্রিত করিলাম।

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

আগামী ১০ই, ১১ই, ১২ই পৌষ (ইংরাজী ২৬শে, ২৭শে, ২৮শে ডিসেম্বর) দিল্লীতে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন হইবে।

প্রবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

সাধারণ সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক।

সাহিত্য—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য, কানপুর সনাতন ধর্ম্ম কলেজের অধ্যক্ষ।

বিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত নীলরতন ধর, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

ইতিহাস—শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র তালুকদার, আগ্রা সেণ্ট জন্‌স্‌ কলেজের অধ্যাপক।

বৃহত্তর বঙ্গ—শ্রীললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ, গোরক্ষপুর সেণ্ট এন্‌ড্রুজ কলেজের অধ্যাপক।

দর্শন—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

ললিতকলা ও শিল্প—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন, লক্ষ্ণৌ গবর্ন্মেণ্ট স্কুল অব্‌ আর্টসের অধ্যাপক।

শ্রীজীবনচন্দ্র তালুকদার

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীবীরেশ্বর সেন

হেমন্তকুমারী চৌধুরী

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মেজর অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আই-এম-এস

সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

মহিলা বিভাগের সভানেত্রী—শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরানী, দেরাদুন।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন প্রবাসী বাঙালীগণের একটি মহামিলনের ক্ষেত্র। এই সম্মেলন উপলক্ষে প্রত্যেক বাঙালীর শুভাগমন প্রার্থনীয়। সম্মেলনের প্রথানুসারে প্রতিনিধিগণের চাঁদা ৫৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ছাত্র প্রতিনিধিগণের চাঁদা ৩৲ টাকা মাত্র। মহিলা প্রতিনিধিগণকে কোন চাঁদা দিতে হইবে না। প্রতিনিধিগণের বাসস্থান ও আহারাদির বন্দোবস্ত স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতি করিবেন। মহিলা প্রতি-নিধিগণের বাসস্থান ও আহারাদির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইবে।

দিল্লী ও নিউ দিল্লী ষ্টেশনে স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রতিনিধিগণের সেবার জন্য উপস্থিত থাকিবেন। রায়সিনা বেঙ্গলী হাই স্কুলে সম্মেলনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং প্রতিনিধিগণের থাকিবার ব্যবস্থাও সেইখানেই করা হইয়াছে।

সম্মেলনে পঠনীয় প্রবন্ধ ও কবিতা এবং প্রবাসী বাঙালী-গণের হিতকর প্রস্তাবাদি আগামী ৪ঠা পৌষের (ইংরেজী ২০শে ডিসেম্বরের) পূর্ব্বে সম্মেলনের প্রধান কর্ম্মসচিব মেজর শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আই-এম্-এস্ ৬ নং অশোক রোড, নিউ দিল্লী—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

—

ব্রহ্মদেশে বাংলা মাসিকপত্র

ব্রহ্মদেশে বিস্তর বাঙালীর বাস। অনেকেই তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁহারা বাংলা দেশের সহিত সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ রাখিতে আগ্রহান্বিত, এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্গের বাঙালীদেরও সেইরূপ আগ্রহ থাকা উচিত।

বঙ্গের সংস্কৃতির সহিত ব্রহ্মদেশের বাঙালীদের যে যোগ রক্ষা করিবার ইচ্ছা আছে, তাহার একটি নিদর্শন সেদিন পাইলাম—আগেও অবশ্য অনেক বার আঁরও নিদর্শন পাইয়াছি। এই নিদর্শনটি "যুগের জ্যোতিঃ" নামক একখানি সচিত্র বাংলা মাসিকপত্রের দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যা। ইহার আগে প্রকাশিত ব্রহ্মদেশের কোন কোন বাংলা মাসিকপত্র দেখিয়াছি। সবগুলি এখন চলিতেছে না। কোনটিই চলিতেছে কিনা, জানি না। "যুগের জ্যোতিঃ" স্থায়ী হইলে সুখী হইব। ইহার লেখক-লেখিকাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছেন।

—

উড়িষ্যার মূকবধির চিত্রকর

উড়িষ্যার মূকবধির চিত্রকর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চৌধুরী লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অব আর্টে শিক্ষা সমাপ্ত

শ্রীবিপিনবিহারী চৌধুরী

করিয়া এ আর্ সি এ উপাধি পাইয়াছেন, এই সংবাদ অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে দিয়াছিলাম। তাঁহার কৃতিত্ব অসামান্য সাহস, উদ্যম ও প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁহার চেহারাও বুদ্ধির আলোকে দীপ্ত।

—

পরলোকগত অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি

গত মাসে আমরা লিখিয়াছিলাম, নানাপ্রাচ্যভাষাবিৎ, ভারতবর্ষ চীন ও তিব্বতের পুরাকালীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে অন্যতম প্রধান আচার্য্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরলোকগত সিলভ্যাঁ লেভি কিছুকাল শান্তিনিকেতনে

সস্ত্রীক অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি

অধ্যাপক ছিলেন। তখন তিনি ও তাঁহার পত্নী বাঙালীর পরিচ্ছদও পরিতেন। ইহাতে সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার তাঁহাদের সুবিধা হইত। তাঁহাদের লোকপ্রিয় হইবার ইহাও একটি কারণ।

রবীন্দ্রনাথের "রাজা" অভিনয়

কলিকাতায় দুই দিন রবীন্দ্রনাথের "রাজা" অভিনয় হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ঠাকুরদাদা সাজিয়াছিলেন। টিকিট কিনিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় আমি টিকিট পাই নাই, সুতরাং আমার অভিনয় দেখা শুনা হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিলাম, অভিনয় সাজসজ্জা আলোকপাত ও নৃত্যগীত অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক, সকলেই এইরূপ বলিয়াছেন। অতি উৎকৃষ্ট হইবারই কথা। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যেরূপ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, অভিনয় শিক্ষা দিতেও তিনি তদ্রূপ অতিশয় দক্ষ। নাটকটির বিষয় বা গল্প এইরূপ :—

"সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন, সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্ব্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না;—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায়, তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারি দিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

"এই নাট্য-রূপকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।"

দর্শকদের মধ্যে যাঁহারা মননশীল ও ভাবুক, আশা করি অন্ততঃ তাঁহারা নাট্য-রূপকটির অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন।

অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ

গত ২৭শে নবেম্বর পাটনা বিহার ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্, মহাশয়ের পরলোকগমনে পাটনার প্রবাসী বাঙালীদের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রবলে যে কয় জন বাঙালী বাংলার বাহিরেও সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হইয়া দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, পরলোকগত ঘোষ মহাশয় তাঁহাদের এক জন। আশৈশব দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বাবলম্বী ঘোষ মহাশয় এম্-এ পাস করেন এবং বিহার ন্যাশন্যাল কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাটনায় বাস করিতে থাকেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সৃষ্টি হইতেই তিনি

অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ

তাহার সিনেটের সভ্য ছিলেন এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছিলেন। গত মার্চ মাসে তিনি বিহার ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং এই অল্পকাল মধ্যেই তিনি এই বৃহৎ কলেজের নানাবিধ উন্নতি সাধন করেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুনে তাঁহা অপেক্ষা অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর কেহই ছিল না। তাঁহার সরলতা, নির্ভীকতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁহাকে পাটনার শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট আসন দান করিয়াছিল। নানা শ্রেণীর নানা জাতীয় লোক তাঁহার শবানুগমন করিয়াছিল।

অধ্যক্ষ নবকৃষ্ণ রায়

রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব পরিচালক এবং মহারাজার কলেজের অধ্যক্ষ নবকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের সম্প্রতি কলিকাতায় মৃত্যু হইয়াছে। বাংলা ১২৭১ সনে তাঁহার জন্ম হয়। আমি যখন বাঁকুড়া হইতে কলিকাতায় পড়িতে আসি, তিনি তাহার কিছুকাল পরে আসেন এবং আমাদেরই (বোধ হয় শোভারাম বসাকের লেন স্থিত) মেসে আসিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি জয়পুর গিয়া তাঁহার বাসায় ছিলাম, তখন তাঁহার

অধ্যক্ষ নবকৃষ্ণ রায়

মুখে শুনি, যে, তিনি ছাত্রাবস্থায় গোঁড়া ও সমাজসংস্কার-বিরোধী ছিলেন (আমার ইহা মনে ছিল না)। পরিণত বয়সে তাঁহার মত কোন কোন দিকে সমাজসংস্কারের অনুকূল হয়।

তিনি বি এ পাস করিবার পর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের স্কুল-বিভাগে তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে তিনি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের মীরাট কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আমি যখন এলাহাবাদের একটি কলেজে ইংরেজী পড়াইতাম, তখন ইণ্টারমীডিয়েট

পরীক্ষার জন্য পাঠ্য একখানি ইংরেজী বহির নবকৃষ্ণ বাবুর লেখা ব্যাখ্যা-পুস্তকে তাঁহার ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের এবং দর্শনের জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণা জন্মে। মীরাটে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখার এবং নাট্যসমিতির সভাপতি ছিলেন। অতঃপর তিনি জয়পুরে মহারাজার কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার পাণ্ডিত্য কার্য্যদক্ষতা ও চরিত্রগুণে তাঁহার পদোন্নতি হয়, ও তিনি শিক্ষা-বিভাগের পরিচালক ও কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সুখ্যাতির সহিত এই দুই কাজ করিয়া গত ১৯২৮ সালে তিনি পেন্স্যান গ্রহণ করেন। তিনি যদিও কেবল বি-এ ছিলেন, তথাপি পাণ্ডিত্যবলে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও বি-এ পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক হইতেন।

—

কর্ম্মবীর গোপালকৃষ্ণ দেবধর

কর্ম্মবীর গোপালকৃষ্ণ দেবধরের মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পুণার সেবাসদন নামক মহিলাদের নানাবিধ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি। তাঁহার হৃদয় যেমন বড়, স্বভাব তেমনই শান্ত ধীর ছিল। তিনি ভারতভৃত্য-সমিতির (Servant of India Societyর) সভাপতি ছিলেন। এম এ পাস করিবার পর এই সমিতির সভ্য হন। এই সমিতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় দেশ-সেবার জন্য স্থাপন করেন। ইহার সভ্যদিগকে অনন্যকর্ম্মা হইতে হয়। দেবধর মহাশয় জাতিধর্ম্মশ্রেণীদলনির্ব্বিশেষে সকলের হিত করিতেন। তিনি বোম্বাইয়ের সোশ্যাল সার্ভিস লীগ স্থাপন করেন, বহু বৎসর ভারতীয় সমাজসংস্কার কন্‌ফারেন্সের সেক্রেটরী ছিলেন, মালাবারে মোপলা-বিদ্রোহে উৎপীড়িত ও সর্ব্বস্বান্ত লোকদের স্থায়ী সাহায্য ও বিপন্মোচনের জন্য প্রভূত চেষ্টা করেন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে কো-অপারেটিভ্ প্রচেষ্টার অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন ও মান্দ্রাজ মহীশূর ত্রিবাঙ্কুড় ও কোচীনের কয়েকটি কো-অপারেটিভ অনুসন্ধান কমিটির সভ্য ছিলেন, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন, বোম্বাইয়ের ঋণভার-প্রপীড়িত লোকদের ঋণশোধ-সমিতি স্থাপন করেন, "অস্পৃশ্য"দের সামাজিক দুর্গতির বিরুদ্ধে বরাবর যুদ্ধ করিতেন, মহারাষ্ট্র-হরিজন-সংঘের সভাপতি ছিলেন, দাক্ষিণাত্য-কৃষি-সমিতির সভাপতি ছিলেন, সরকারী কৃষি-গবেষণা কৌন্সিলে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক তিন বার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বন্যা বা দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্যের অনেক বার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

গোপালকৃষ্ণ দেবধর

—

জননায়ক শ্যামাচরণ রায়

ময়মনসিংহের গৃহীতাবসর ব্যবহারাজীব ও জননায়ক শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের ৯১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মহৎ ও বিশুদ্ধ চরিত্র এবং নানা সৎকর্ম্মের জন্য জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ১৮৭২ সাল হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত ওকালতী করেন। তিনি উকীল সভার সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। চল্লিশ বৎসর মিউনিসিপাল কমিশনার, ছয় বৎসর মিউনিসি-পালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান ও একুশ বৎসর উহার চেয়ারম্যান ছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার সমুদয় জনহিতকর কাজে অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া তিনি যুক্ত ছিলেন। তথাকার আনন্দমোহন কলেজের তিনি সম্পাদকও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তথাকার লিটন মেডিক্যাল স্কুলও প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যোগে স্থাপিত হয়। উহার হাসপাতাল, শহরের জলের কল ও টাউন-হল তাঁহার উদ্যোগিতা ও শ্রমশীলতার সাক্ষ্য দেয়। কর্ম্মজীবনের প্রথম অংশে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন। তিনি নেত্রকোণায় জেলা কন্‌ফারেন্সের সভাপতি এবং বঙ্গীয়

প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের ময়মনসিংহ অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

—

চিত্রকর রামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা

বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্ম্মা কলিকাতার গবর্মেণ্ট আর্টস্কুলে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চিত্রাঙ্কণ তাঁহাদের কৌলিক বৃত্তি। তিনি জীবিত আছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কৃতী

রামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা

পুত্র রামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে চিত্রবিদ্যায় শিক্ষা পাইবার পর তিনি ইংলণ্ড যান এবং ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্য কোন কোন দেশে পাঁচ বৎসর শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। সেখানে তাঁহার কাজের প্রশংসা হইয়াছিল। তিনি জন্মভূমি বিহারে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এবং পাটনায় একটি কলাভবন স্থাপন করিতে ব্যগ্র ছিলেন।

—

শ্রীমতী স্বর্ণলতা বসু

শ্রীমতী স্বর্ণলতা বসুর আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলা দেশ নানাগুণসমন্বিতা একটি মহিলা-কর্ম্মীর সেবা হইতে বঞ্চিত

স্বর্ণলতা বসু

হইল। সরোজনলিনী-নারীমঙ্গল-সমিতির শিল্পবিদ্যালয়ে আমরা তাঁহার কাজ প্রথম দেখি ও তাঁহার সহিত পরিচিত হই। তিনি সেখানে নানাবিধ ভাঙা ফেলা জিনিষ হইতে সুন্দর সুন্দর প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রস্তুত করিতেন ও করিতে শিখাইতেন। এই সব শিল্পদ্রব্যের (waste productsএর) একটি প্রদর্শনীও তিনি একবার করিয়াছিলেন। তাহার সচিত্র বৃত্তান্ত প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি স্বগ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং একটি অনাথ বালককে পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতেন।

—

আচার্য্য অমৃতলাল গুপ্ত

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডক্টর" উপাধি পান, কিংবা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন, তাঁহাদিগকে আচার্য্য বলিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় সে অর্থে আচার্য্য ছিলেন না। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক জন ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন এবং নিজের সাধু জীবন ও ভক্তিদ্বারা অনেকের কল্যাণ সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষা তাঁহার বিশেষ কিছু হয় নাই, কিন্তু প্রধানতঃ বাংলা পুস্তক ও পত্রিকাদির সাহায্যেই তিনি নানা বিষয়ে আধুনিক চিন্তাধারা ও ভাবধারার সহিত পরিচিত ছিলেন

এবং তাহার সহিত যোগ রক্ষা করিতে পারিতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী বিশেষ শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রবাসীতে তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত। তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষক ছিলেন এবং তাহাদিগকে মনোহর গল্প বলিয়া আনন্দ দান করিতে পারিতেন। তাহাদের গৃহপাঠ্য তাঁহার রচিত কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে। তিনি গৃহী ছিলেন না, একা একা থাকিতেন।

—

সর্ ব্যাম্‌ফীল্ড ফুলার

স্বদেশী যুগে ৩১ বৎসর পূর্ব্বে সর্ ব্যামফীল্ড ফুলার পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের গবর্ণর ছিলেন। সম্প্রতি ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ছোটলাট হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি হয় নাই। কিন্তু তিনি মানুষটি মন্দ ছিলেন না। আমি তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে প্রথম এলাহাবাদে দেখি। তিনি তখন তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জে যে অনাথাশ্রম ছিল, তিনি তাহা সস্ত্রীক দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমি তখন তাহার সম্পাদক ছিলাম। তাঁহারা অনাথ বালকবালিকাদের সহিত সস্নেহ আলাপ করেন, এবং আশ্রমে কিছু দান করিয়া যান।

—

ভারতীয় সমর-বিভাগের নাম পরিবর্ত্তন

ভারতীয় যুদ্ধসংক্রান্ত বিভাগের নাম এ-পর্য্যন্ত "সমর-বিভাগ" ছিল। আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "ভারতরক্ষা-বিভাগ" হইবে।

রক্ষা কাহার জন্য? ব্রিটিশ জাতির, না ভারতীয় জাতির জন্য?

—

সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে অপ্রমাণিত অভিযোগ

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারতসচিব মিঃ বাটলার বলিয়াছেন, বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত সম্পর্ক থাকায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে আটক রাখা আবশ্যক হইয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীরা অনেক লোকের বিরুদ্ধে এমন অনেক কথা বলেন যাহা তাঁহারা প্রমাণ করেন না, প্রমাণ করিবার চেষ্টাও করেন না। সুতরাং এখন আর এ-সব কথায় লোকে বিশ্বাস করে না। এরূপ কথা না-বলাই ভাল। সুভাষবাবুর দাদা শরৎবাবুর বিরুদ্ধেও এই রকম কথা বার-বার বলা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বিচারের দাবি করেন। গবর্মেণ্ট বিচার না করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন! ইহাতে কি প্রমাণ হয়?

যে নিন্দার জন্য নিন্দিত ব্যক্তি নিন্দাকারীর নামে আদালতে নালিশ করিতে অধিকারী নহে, সেরূপ নিন্দা নিন্দাকারীর পৌরুষের প্রমাণ নহে।

—

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সরকারী নিন্দা

বর্ত্তমান ১৯৩৫ সালের নবেম্বর মাসে ১৯৩৩-৩৪ সালের যে সরকারী বঙ্গীয় শাসনবিবরণ (Report on the Administration of Bengal 1933-34) বাহির হইয়াছে, তাহার প্রথম ভাগের পঞ্চম পৃষ্ঠায় আছে :—

During the third week of January Pandit Jawaharlal Nehru paid a short visit to Calcutta and after consultations with the leaders of most of the subversive movements in Bengal, prescribed a militant programme based mainly on his own extreme socialist views and designed primarily to attract the peasant masses. This agitation was to be carried on under the guise of anti-untouchability activities and with the money collected for "Harijan" work.

ইহাতে বলা হইয়াছে, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কলিকাতায় আসিয়া "হরিজন"দের হিতসাধনের নিমিত্ত সংগৃহীত অর্থের দ্বারা অস্পৃশ্যতা-বিরোধী কার্য্যের ছদ্ম-আবরণে চরম সমাজতান্ত্রিক গবর্মেণ্ট-বিপর্য্যাসমূলক কাজ চালাইবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি জার্মেনী হইতে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রকাশ্য এক উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা গোপনীয় অন্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কাজ তিনি করিতে পারেন, এরূপ নিন্দা ইতিপূর্ব্বে কেহ তাঁহার করে নাই।

সরকারী রিপোর্টে তথ্য, ইতিহাস, সরকারী মত ও মন্তব্য থাকিতে পারে; কিন্তু কাহার মনে কি গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে বা না-আছে তাহা অনুমানপূর্ব্বক লিখিয়া রিপোর্ট-লেখকের সবজান্তা না সাজাই ভাল। বঙ্গীয় এই রিপোর্ট গবর্মেণ্টের সাধারণ অনুমোদন অনুসারে প্রকাশিত, কিন্তু ইহার প্রত্যেক মত সরকারের নিশ্চয় অনুমোদিত বলিবার জো নাই। রিপোর্ট যে কে লিখিয়াছেন তাহাও লেখা নাই! ইহার উপক্রমণিকায় লিখিত আছে :—

The Report is published under the authority and with the approval of the Government of Bengal, but this approval does not necessarily extend to every particular expression of opinion.

নেহরু মহাশয়ের এই কল্পিত নিন্দার বাংলা-গবর্মেণ্ট অনুমোদন করেন না বলিবেন কি?

বোম্বাই প্রাদেশিক হিন্দুসভা ও জাতিভেদ

বোম্বাই প্রাদেশিক হিন্দুসভার এবং বোম্বাই শহরে স্থিত তাহার শাখাসমূহের কর্ম্মীদের দ্বারা আহূত একটি কন্‌ফারেন্সে জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়া পুনায় নিখিলভারতীয় হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

Whereas the caste system, based on birth, as at present existing, is manifestly contrary to universal truth and morals, whereas it is the very antithesis of the fundamental spirit of the Hindu religion, whereas it flouts the elementary rights of human equality, and whereas Varnashram of the shastras from which it derives its authority is to-day non-existent in practice, this All-India Hindu Mahasabha sessions declare their uncompromising opposition to the system and calls upon the Hindu Society to put a speedy end to it.

জন্মগত জাতিভেদের (casteএর) উচ্ছেদে আমাদের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা তাহাতে মত দিবেন কিনা, তাহা কিন্তু সন্দেহস্থল।

—

নারীশিক্ষাসমিতির শিল্পপ্রদর্শনী

নারীশিক্ষাসমিতির বার্ষিক শিল্পপ্রদর্শনী দ্বারা মহিলারা নানা শিল্পকার্য্যে উৎসাহ পাইতেছেন, প্রয়োজনমত কাহারও কাহারও উপার্জ্জনের পথও খুলিতেছে। গত প্রদর্শনীর পুরস্কার-বিতরণ সেদিন হইয়া গিয়াছে। দরজির কাজ, কাপড়-রঙান, সূচিশিল্প, চামড়ার কাজ, বয়ন, মৃণ্ময়মূর্ত্তি-গঠন, প্রভৃতির জন্য অনেক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

—

পাট-চাষের বিপৎ-সম্ভাবনা

গুজব রটিয়াছে, বাংলা-গবন্মেণ্ট বঙ্গে আর যাহাতে নূতন পাটের কল স্থাপিত না হয়, তাহার নিমিত্ত আইন করিবেন। এরূপ আইন হইলে তাহার নানা কুফল ফলিবে। কোন প্রকার কাঁচা মাল যে-দেশে জন্মে সেই দেশেই কারখানায় তাহা হইতে নানা পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হওয়া সেই দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। এরূপ আইন হইলে বঙ্গে আর পাটের কল হইবে না, বিদেশে হইবে, ও তাহাতে ভবিষ্যতে বঙ্গের সম্ভাবিত শ্রীবৃদ্ধি বন্ধ হইবে। বর্ত্তমানে প্রায় সব পাটের কল অ-বাঙালীদের—অধিকাংশ ব্রিটিশ জাতির, কিছু ভারতীয় অবাঙালীর। উল্লিখিত আইন হইলে ভারতীয়েরা ও বাঙালীরা এই প্রভূত লাভের কাজ ভবিষ্যতে আর বেশী করিয়া করিতে পারিবে না, তাহা বিদেশীদের একচেটিয়া থাকিয়া যাইবে। এ পর্য্যন্ত বিদেশী পাটকলওয়ালারা দলবদ্ধ হইয়া পাটের দর কমাইয়া রাখিয়া সস্তায় পাট কিনিয়া খুব বেশী লাভ করিয়াছে, এবং পাটচাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উল্লিখিত আইন হইলে পাটকলওয়ালাদের চাতুরীতে পাটের দাম বাড়িতে পারিবে না, পাটচাষীরা তাহাদের মুঠার মধ্যে থাকিবে এবং পেটভাতায় খাটিয়া মরিবে।

এই সকল কারণে এই প্রকার আইন হওয়া কোন মতেই উচিত নয়।

—

কচুরিপানা বিনাশার্থ আইন

কচুরিপানা বিনাশের জন্য আইনের খসড়া কলিকাতা গেজেটে বাহির হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য জনসাধারণকে কচুরি পানা নষ্ট করিতে বাধ্য করা। আমরা সাধারণভাবে ইহার সমর্থন করিতেছি। আসামে ও বিহারেও এই পানা আছে ও বাড়িতেছে। অতএব ঐ দুই প্রদেশেও এইরূপ আইন হওয়া উচিত।

—

ম্যালেরিয়া দূরীকরণার্থ কার্য্যপদ্ধতি

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়-মহাশয়ের নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাবটি, গবন্মেণ্টের সহানুভূতি প্রকাশ সহকারে গৃহীত হইয়াছে।

"ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য নিবার্য্য রোগের প্রকোপ হইতে বাংলা দেশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে একটি ব্যাপক কার্য্যপদ্ধতি প্রস্তুত হউক এবং গবন্মেণ্ট ঋণ করিয়া তদনুসারে কাজ করুন।"

ইহা খুব দরকারী প্রস্তাব। দেখি কাজে কি হয়।

—

বেকার নৌবিদ্যা-জানা যুবকদের সংখ্যা

সরকারী 'ডাফরিন' জাহাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও পাস করা ভারতীয় যুবকদিগকে জাহাজ কোম্পানীরা কাজ দিবে, সরকার এইরূপ আশা দিয়াছিলেন। ভারতের ৩৫ কোটি লোকদের মধ্যে ৩৫ জনও ইহাতে এখনও শিক্ষা পায় নাই। কিন্তু তাহার মধ্যেই ছয় জন বেকার। দেশী সিন্ধিয়া কোম্পানী ২১ জনকে কাজ দিয়াছেন, বি আই এস্ এন্ কেবল ৪ জনকে, বাকী বড় বড় ব্রিটিশ কোম্পানী ১ জনকেও না!

সহকারী ভারতসচিব মিঃ বাটলার সেদিন লণ্ডনের রণতরী-কন্‌ফারেন্সে নাম-সার "ভারতীয় রাজকীয় রণতরী-পুঞ্জের" হাস্যকর বড়াই করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারটা বাদ যায় কেন? ইহারও একটা প্রশংসা করুন না।

বাংলা

কৃতী বাঙালী

সাংবাদিক মিঃ বি বি রায়চৌধুরী ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া বিদেশে নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়েছেন। আয়ার্লণ্ডে ভারতবর্ষীয় জাতীয় মহাসমিতির একটি শাখা গঠন করিতেও তিনি ব্রতী হইয়াছেন।

মিঃ বি বি রায়চৌধুরী

শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়

অন্ধ যুবক শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সুবোধচন্দ্র আট বৎসর বয়সে অন্ধ হন; কিন্তু স্বীয় অধ্যবসায় ও কৃতিত্বের বলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীসেরাজুল ইসলাম

CUTEX *for Gifts*

Genuine Leather CUTEX

CUTEX Compact

কিউটেক্স ম্যানিকিওর সেট্‌ সর্ব্বদাই মনোহর উপহার।
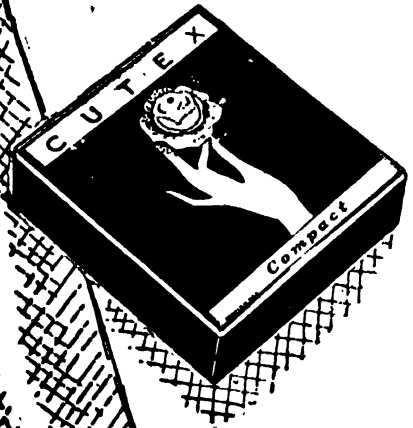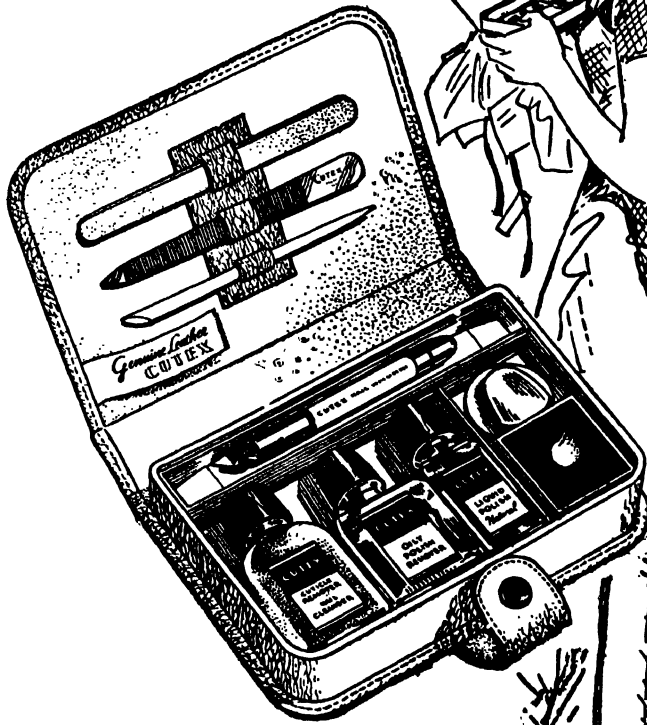
তাঁহাকে সাচ্চা চামড়া-বাঁধাই সেট্‌ই দিন—বা অন্য বিভিন্ন প্রকার যে মনোরম সেট্‌ আছে তাহারই একটি দিন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আপনার উপহার আদৃত হইবেই।

কিউটেক্সের সকল সেটেরই মূল্য সমীচীন এবং প্রসাধন-সামগ্রীর দোকানমাত্রেই: পাওয়া যায়।

শ্রীসেরাজুল ইস্‌লাম ১৯২৮ সন ভারতীয় সরকারী রেল-বিভাগে এঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করেন। পরে জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য ১৯৩৩ সনে তিনি সরকারী বৃত্তি লইয়া বিলাতে যান। দুই বৎসর বিলাতে থাকিয়া একটি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ইনষ্টিটিউট অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার্স এণ্ড ইনষ্টিটিউট অব লোকোমোটিভ ইঞ্জিনীয়ার্স-এর সভ্যপদ লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিরক্ষা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিন বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ একটি শাখা-সমিতি গঠিত করিয়াছেন। পরলোকগত শাস্ত্রী মহাশয়ের বিক্ষিপ্ত ইংরেজী ও বাংলা মহামূল্য প্রবন্ধাবলী একত্র সংগ্রহ করিয়া মুদ্রণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই কার্য্যে আনুমানিক ৮০০০৲ প্রয়োজন ও শাখা-সমিতি ইহার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। পরলোকগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহাশয়ের নামে একটি স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপন করিয়া তাহার অর্থে ভারত-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ-লেখককে পুরস্কার দান ও শাস্ত্রী-মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপনও এই শাখা-সমিতির কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। শাস্ত্রী-মহাশয় আজীবন গবেষণা ও সাহিত্যসাধনা করিয়া দেশকে ঋণবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁহার ছাত্র, বন্ধু ও অনুরাগীবর্গের শ্রদ্ধার দান হরপ্রসাদ-স্মৃতিসমিতির সম্পাদক, ৬৯ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৯০৯ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর যে স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয় তাহাতে "রমেশভবন" বলিয়া একটি লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম-গৃহ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংলগ্ন সাত কাঠা জমি দান করেন, তাহাতে ১৯১৭ সালে রমেশভবনের প্রথম সূচনা হয়। ইতিমধ্যে রমেশভবনের জন্য বহু চিত্র পুঁথি ইত্যাদি সংগ্রহ হওয়াতে অবিলম্বেই উহার দ্বিতলনির্ম্মাণ আবশ্যক হইয়াছে। এজন্য আনুমানিক ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। সম্প্রতি রমেশচন্দ্রের মৃত্যুবার্ষিকী সভার এই উপলক্ষ্যে অর্থসংগ্রহের আয়োজন হইয়াছিল; সভায় নিম্নলিখিতরূপ অর্থসংগ্রহ হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১০০০৲; শ্রীজ্ঞানাঙ্কুর দে কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১০০০৲; বর্দ্ধমানাধিপতি, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু প্রত্যেকে ৫০০৲; সর্‌ এ-এইচ গজনবী ২৫০৲ (প্রথম কিস্তি) সর্‌ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও মিঃ এ. কে. রায় প্রত্যেকে ২৫০৲; কুমার হিরণ্যকুমারমিত্র ২০০৲; শ্রীমতী সরলা দেবী সারাভাই ও মিঃ ডি. সি. ঘোষ প্রত্যেকে ১৫০৲; সর্‌ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়কুমার বসু প্রত্যেকে ১০০৲।

রমেশভবনের জন্য দেয় অর্থসাহায্য লেডী প্রতিমা মিত্র, ৫ আউটরাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রেরণীয়।

ভারতবর্ষ

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর সাহিত্যানুষ্ঠান

বাংলার বাহিরে যে-সকল বাঙালী আছেন তাঁহাদের সাহিত্যচর্চ্চা ও অনুষ্ঠানের বহু সংবাদ আমরা পাইয়াছি।

বেসিন প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সমিতির উদ্যোক্তৃবর্গ

বেসিন-প্রবাসী কয়েক জন বাঙালী যুবকের উদ্যোগে বেসিনে একটি প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সমিতি সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে। বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন এবং প্রবাসী বাঙালী ও ব্রহ্মদেশবাসী অন্যান্য জাতির সহিত সংস্কৃতিগত ঐক্যসাধন এই সমিতির উদ্দেশ্য।

রাঁচি হিন্দু ফ্রেণ্ড্‌স্‌ ইউনিয়ন ক্লাবের সাহিত্যসম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন গত অক্টোবর মাসে রাঁচিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সাহিত্য সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ পাঠ করেন।

পাটনা-প্রবাসী বাঙালী ছাত্র-সমিতি "প্রভাতীসঙ্ঘে"র বার্ষিক সম্মেলনের অধিবেশন গত ১লা ও ২রা অগ্রহায়ণ পাটনায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় "আধুনিক বাংলার সাহিত্য ও জীবন" সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ পাঠ করেন।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সখীপরিবৃতা শকুন্তলা

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৪২

৪র্থ সংখ্যা

সার্থক আলস্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চোখ ঘুমে ভরে আসে,
মাঝে মাঝে উঠ্‌ছি জেগে।
যেমন নববর্ষার প্রথম পস্‌লা বৃষ্টির জল
মাটি চুঁইয়ে পৌঁছয় গাছের শিকড়ে এসে
তেমনি তরুণ হেমন্তের আলো ঘুমের ভিতর দিয়ে
লেগেছে আমার অচেতন প্রাণের মূলে।
বেলা এগোলো তিন প্রহরের কাছে।
পাৎলা সাদা মেঘের টুকরো
স্থির হয়ে ভাসছে কার্ত্তিকের রোদ্দুরে—
দেবশিশুদের কাগজের নৌকো।
পশ্চিম থেকে হাওয়া দিয়েছে বেগে,
দোলাদুলি লেগেছে তেঁতুলগাছের ডালে।
উত্তরে গোয়ালপাড়ার রাস্তা,
গোরুর গাড়ি বিছিয়ে দিল গেরুয়া ধুলো
ফিকে নীল আকাশে।

মধ্যদিনের নিঃশব্দ প্রহরে
অকাজে ভেসে যায় আমার মন
ভাবনাহীন দিনের ভেলায়।
সংসারের ঘাটের থেকে রসি-ছেঁড়া এই দিন
বাঁধা নেই কোনো প্রয়োজনে।
রঙের নদী পেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় অদৃশ্য হবে
নিস্তরঙ্গ ঘুমের কালো সমুদ্রে।

ফিকে কালিতে এই দিনটার চিহ্ন পড়ল কালের পাতায়,
দেখতে দেখতে যাবে সে মিলিয়ে।
ঘন অক্ষরে যে সব দিন আঁকা পড়ে
মানুষের ভাগ্যলিপিতে
তার মাঝখানে এ রইল ফাঁকা।
গাছের শুকনো পাতা মাটিতে ঝরে—
সেও শোধ ক'রে যায় মাটির দেনা,
আমার এই অলস দিনের ঝরা পাতা
লোকারণ্যকে কিছুই দেয় নি ফিরিয়ে।

তবু মন বলে
গ্রহণ করাও ফিরিয়ে দেওয়ার রূপান্তর।
সৃষ্টির ঝরণা বেয়ে যে-রস নামছে আকাশে আকাশে
তাকে মেনে নিয়েছি আমার দেহে মনে।
সেই রঙীন ধারায় আমার জীবনে রঙ লেগেছে
যেমন লেগেছে ধানের ক্ষেতে,
যেমন লেগেছে বনের পাতায়,
যেমন লেগেছে শরতে বিবাগী মেঘের উত্তরীয়ে।
এরা সবাই মিলে পূর্ণ করেছে আজকে দিনের বিশ্বছবি।
আমার মনের মধ্যে চিকিয়ে উঠল আলোর ঝলক,
হেমন্তের আতপ্ত নিঃশ্বাস শিহর লাগালো
ঘুম-জাগরণের গঙ্গা-যমুনায়—
এও কি মেলে নি এই নিখিল ছবির পটে ?

জল স্থল আকাশের রসসত্রে
অশথের চঞ্চল পাতার সঙ্গে
ঝলমল করছে আমার যে অকারণ খুশী
বিশ্বের ইতিবৃত্তের মধ্যে রইল না তার রেখা,
তবু বিশ্বের প্রকাশের মধ্যে রইল তার শিল্প।
এই রসনিমগ্ন মুহূর্ত্তগুলি
আমার হৃদয়ের রক্তপদ্মের বীজ,
এই নিয়ে ঋতুর দরবারে গাঁথা চলেছে একটি মালা.
আমার চিরজীবনের খুশীর মালা।
আজ অকর্ম্মণ্যের এই অখ্যাত দিন
ফাঁক রাখে নি ঐ মালাটিতে,—
আজও একটি বীজ পড়েছে গাঁথা॥

কাল রাত্রে একা কেটেছে এই জানলার ধারে।
বনের ললাটে লগ্ন ছিল শুক্লপঞ্চমীর চাঁদের রেখা।
এও সেই একই জগৎ,
কিন্তু গুণী তার রাগিণী দিলেন বদল ক'রে
ঝাপ্‌সা আলোর মূর্চ্ছনায়।
রাস্তায়-চলা ব্যস্ত যে পৃথিবী
এখন আঙিনায় আঁচল-মেলা তার স্তব্ধ রূপ।
লক্ষ্য নেই কাছের সংসারে,
শুনছে তারার আলোয় গুঞ্জরিত পুরাণ কথা।
মনে পড়ছে দূর বাষ্পযুগের শৈশবস্মৃতি।
গাছগুলো স্তম্ভিত,
রাত্রির নিঃশব্দতা পুঞ্জিত যেন দেহ নিয়ে।
ঘাসের অস্পষ্ট সবুজে সারি সারি পড়েছে ছায়া।
দিনের বেলায় জীবযাত্রার পথের ধারে
সেই ছায়াগুলি ছিল সেবাসহচরী;
তখন রাখালকে দিয়েছে আশ্রয়,
মধ্যাহ্নের তীব্রতায় দিয়েছে শান্তি।
এখন তাদের কোনো দায় নেই জ্যোৎস্নারাতে;

রাত্রের আলোর গায়ে গায়ে বসেছে ওরা,
ভাইবোনে মিলে বুলিয়েছে তুলি
খামখেয়ালী রচনার কাজে।
আমার দিনের বেলাকার মন
আপন সেতারের পর্দ্দা দিয়েছে বদল ক'রে।
যেন চলে গেলেম পৃথিবীর কোনো প্রতিবেশী গ্রহে,
তাকে দেখা যায় দূরবীনে।
যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হ'ল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ ক'রে।
ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জগাছগুলি
এক হ'ল, বিরাট হ'ল, সম্পূর্ণ হ'ল
আমার চেতনায়।
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে,
অলস কবির এই সার্থকতা॥

শান্তিনিকেতন
কার্ত্তিক শুক্লষষ্ঠী
১৩৪২

দ্বিজ চণ্ডীদাস

শ্রীশিবরতন মিত্র

সম্প্রতি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ গৌরীহর মিত্র, বি-এল, সিউড়ী মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম পল্লী সুড়াই গ্রামের শ্রীযুক্ত গুরুচরণ ঠাকুরের বাটী হইতে আমাদের রতন লাইব্রেরীর পুঁথিশালার জন্য কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। এই পুঁথিগুলি নিতান্তই বিশৃঙ্খলভাবে ছিল। সেগুলি গুছাইয়া দেখিলাম যে তাহার মধ্যে ১১৭৮ সালের লিখিত 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'আত্মজিজ্ঞাসা', গোবিন্দ দাসের 'একান্ন পদ' এবং সংস্কৃত 'শ্রীমদ্ভাগবত' আছে। আর আছে, সদানন্দ রসসিন্ধু বিরচিত সমগ্র শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার পয়ারানুবাদ। এই গ্রন্থখানির শেষ দুই পত্রের বাম দিকের কিয়দংশ ছিন্ন।

এই গীতার অনুবাদ গ্রন্থখানিতে অনুবাদক সদানন্দ রসসিন্ধু মহাশয় যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনে হয় তাহার দ্বারা বর্ত্তমান চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হইয়া যাইবে।

দ্বিজ চণ্ডীদাস যে ভিন্ন ব্যক্তি—তিনি যে নান্নুরের আদি বা বড়ু চণ্ডীদাস নহেন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সম্ভবতঃ আর বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানমূলক বা আভ্যন্তরীণ বিচার-মূলক আলোচনার আবশ্যক হইবে না। আদি চণ্ডীদাস বিবাহিত ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার সাক্ষাৎ বংশ লোপ পাইয়াছে। কিন্তু আমরা সদানন্দ রসসিন্ধু রচিত গীতার যে পয়ারানুবাদ গ্রন্থ পাইতেছি, তাহাতে তিনি তাঁহার প্রপিতামহ দ্বিজ চণ্ডীদাসের সগৌরবে উল্লেখ করিয়া বংশপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বংশলতা এই—

(৪) দ্বিজ চণ্ডীদাস, (৩) রত্নেশ্বর, (২) জয়ন্তী (ঘটক রায়) ও (১) সদানন্দ বা সদাশিব রসসিন্ধু।

গ্রন্থকার পুস্তকের শেষ পত্রে (৩৪ পত্র) বা পুষ্পিকায় আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

> জন্ম বিপ্রবংশে ... ...।
> হইএ ব্রাহ্মণ কিন্তু জন্ম গেল দুখে।
> আছিল প্রপিতামহ দ্বিজ চণ্ডীদাস।
>
> * * *
>
> তাহার নন্দন দ্বিজ রত্নের ঈশ্বর।
> ঠাকুর যজন্তি নাম তাহার কোঙর॥
> ঘটক বিক্যাতি আজ্ঞা দান ধর্ম্মসিল।
>
> * * *
>
> নাস্তি দান গুণ ধর্ম্ম ভজন পূজন।
> একান্তিকে না ভজিনু তোমার চরণ॥
>
> * * *
>
> জয়ন্তি নন্দন সদা। নন্দ ভনে পাত্র।
> সমাপ্ত ভগবত গীতা অষ্টাদশাধ্যায়॥

ইতি ভগবত গীতা সমাপ্ত * * সন ১২১২ সাল তাং ২৫ চৈত্রা রবিবার॥

অন্যত্র এই গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষে এইরূপ লিখিত আছে—

> দ্বিজ চণ্ডিদাসের মহেসপুত।
> রত্নেশ্বর দ্বিজ চণ্ডি দাসের সুত॥
> শ্রুত জয়ন্তি ঘটক রায়।
> তৎসুত সদানন্দ ভনে পায়॥
> রসসিন্ধু নাম পাবন বিজ।
> তার অকিঞ্চন অনাথ দ্বিজ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের পৌত্র এক জন খ্যাতনামা ঘটক ছিলেন এবং তাঁহার প্রপৌত্র "রসসিন্ধু"-উপাধিধারী গীতার অনুবাদ করিবার মত এক জন শক্তিশালী গ্রন্থকার ছিলেন। এই গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের নিবাসের পরিচয় নাই—ছিন্নাংশে ছিল কি না জানা যায় না।

এই গ্রন্থখানির লিপিকার একাধিক ব্যক্তি। সন ১২১২ সাল ২৫এ চৈত্র রবিবার তারিখে ইহার লিপিকার্য্য সমাধা হয়। এই গ্রন্থের রচনাকাল অন্ততঃ তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে ধরিতে হয় এবং এই হিসাবে চারি পুরুষ ধরিলে দ্বিজ চণ্ডীদাসের সময় আরও ১২০ বৎসর পূর্ব্বে হয়। অর্থাৎ, দ্বিজ চণ্ডীদাস অন্ততঃপক্ষে ১০৯২ সাল বা ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। এই কাল-নির্দ্দেশ অসঙ্গত বলিয়া মনে

হয় না। সুতরাং আমরা অনুমান করি, যে, পদকর্ত্তা দ্বিজ চণ্ডীদাস ও বর্ত্তমান পুঁথিতে উল্লিখিত দ্বিজ চণ্ডীদাস অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নহে—পরন্তু সম্ভাবনাই অধিক। এই অনুমান ঠিক হইলে, আদি চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী বিযুক্ত করিয়া লইলে, চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানকল্পে পথ অনেক সুগম হইয়া গেল।

ফসলের উন্নতি

শ্রীরামপ্রসাদ রায়, বি·এজি·

দেশে কৃষি ও কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে একটা সাড়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ এই উন্নতিকল্পে কৃষিকর্ম্মে লাগিয়া গিয়াছেন, কেহ বা তাহার উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন। কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি ও বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে উন্নত প্রণালীর কৃষিই একমাত্র উপায়। ভদ্রলোক কৃষককে দেশ-বিদেশে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর চাষ অবলম্বন করিয়া কাজে নামিতে হইবে, তবেই তাঁহারা সফলকাম হইবেন। উন্নত প্রণালীর কৃষি বলিতে অনেক কিছু বুঝায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদ্ভিদের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনশীলতা, এক জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর সম্মিলনে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি, এবং বিশিষ্ট গাছ ও বীজ নির্ব্বাচন করিয়া কি উপায়ে ফসলের উন্নতি করা যাইতে পারে, তাহাই আলোচিত হইবে।

উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অনুভব-শক্তি আছে। তাহাদের পক্ষে কি হিতকর বা অহিতকর, সে-বিষয়েও তাহারা বেশ সচেতন। জীব-জগতের সহিত তাহাদের পার্থক্য এই যে, তাহারা জীবের ন্যায় যথাতথা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না। প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে, যাহাদের প্রাণ আছে, তাহাদের কোনটিই এক রকমের হয় না; প্রত্যেকের মধ্যে কিছু-না-কিছু প্রভেদ থাকে। প্রকৃতির এই নিয়মের ব্যতিক্রম প্রাণহীন পদার্থের মধ্যে দেখিতে পাই—যেমন লৌহ বা স্বর্ণের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) বা অন্যান্য গুণ সকল সময়েই সমান।

যেখানে পরিবর্ত্তন আছে, সেখানেই উন্নতি সম্ভবপর। উদ্ভিদ এবং প্রাণিগণের মধ্যে (এখানে উদ্ভিদের কথাই বলা হইতেছে) কতকগুলি গুণ দেখা যায়। সেই গুণসমূহ কিন্তু সকলে সমভাবে প্রতিফলিত হয় না। প্রত্যেকটির মধ্যে এই গুণের পরিমাণের ইতর-বিশেষ লক্ষিত হয়। ইহা হইতে ভালমন্দ বাছিয়া লইয়া উদ্ভিদের উন্নতি করা যাইতে পারে। উদ্ভিদ-জগৎ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া এক দিকে যেমন উহার উন্নতিসাধন সম্ভবপর, অন্য দিকে তেমনই অবনতির আশঙ্কাও যথেষ্ট।

সাধারণতঃ একই জাতীয় উদ্ভিদে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা ঐ জাতীয় উদ্ভিদের প্রত্যেকের মধ্যে গুণের বিভিন্নতাজনিত নয়, বস্তুতঃ গুণের পরিমাণের কমবেশীর জন্য। এই যে গুণের ন্যূনাধিক্য, তাহা দুই রকমে হয়। প্রথম প্রকারে পরিবর্ত্তনশীলতার ক্রম (gradation) এত কম যে, সহসা ধরা পড়ে না; যেমন গাছের বৃদ্ধি, উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি। ইহা নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন (continuous variation) নামে অভিহিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার বিচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনে (discontinuous variation)। ইহাতে পরিবর্ত্তনশীলতার ক্রম এত বেশী যে, দুইটি জিনিষের প্রভেদ সহজেই বুঝা যায়; যেমন কোন-একটি সংখ্যা ও তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যা, যথা— ১ [illegible] এবং ১ এক। নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনশীলতা-প্রযুক্ত উদ্ভিদ-জগতের উন্নতিসাধন বৈজ্ঞানিকগণের অনেকটা আয়ত্তাধীন; কিন্তু যেখানে বিচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনশীলতার প্রভাব প্রবল, সেখানে তাঁহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ।

উদ্ভিদের দেহে সচরাচর চারি প্রকারের পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

(১) আকার-অবয়বঘটিত পরিবর্ত্তন (Morphological variation): বৃক্ষের পত্রের বা ফলের আকারের পরিবর্ত্তন। কোন-একটি গাছকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে একই গাছে বিভিন্ন আকারের পত্র দেখা যায়।

(২) বস্তু (বা গুণ) বিষয়ক পরিবর্ত্তন (Substantive variation): আস্বাদ ও বর্ণের প্রভেদ। একই গাছে ফলের মিষ্টতার তারতম্য এবং বর্ণের প্রভেদ হইয়া থাকে।

(৩) গঠন-নির্ম্মাণগত পরিবর্ত্তন (Meristic variation): ইহার দ্বারা ফুলের ১০টি পাপড়ির স্থানে ১২টি পাপড়ি বা জোড়া ফুল হয়। যেমন মানুষের পাঁচের পরিবর্ত্তে ছয় অঙ্গুলি।

(৪) আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া জনিত পরিবর্ত্তন (Functional variation): যেমন বৃক্ষ-কাণ্ডের কোন এক স্থান কীট-দষ্ট অথবা আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইলে কিছু দিন পরে দেখা যায়, উক্ত স্থানের উপর একটি কঠিন আবরণ পড়িয়াছে।

এতদ্ব্যতীত উদ্ভিদ-রাজ্যে আর এক প্রকার পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। কোন ফুলের বাগানে এক জাতীয় ফুলের বীজ বপন করা হইল। গাছ বড় হইয়া যথাকালে ফুল ফুটিলে দেখা গেল, একটি গাছে একটি ফুল সেই গাছের অপর ফুল ও অন্যান্য গাছের ফুল অপেক্ষা বড় এবং ভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট হইয়াছে। সেই নূতন ফুলটির বীজ লইয়া পরের বৎসর বপন করা হইলে দেখা গেল, কতকগুলি গাছে নূতন ফুলটির মত ফুল হইয়াছে, আর কতকগুলি গাছে আগেকার ফুলের মত ফুল হইয়াছে। আগের ফুলের মত যে গাছে ফুল হইয়াছে, তাহা নষ্ট করিয়া নূতন ফুলের গাছগুলি রাখা হইল। এইরূপ পরিবর্ত্তনের নাম মিউটেশন (Mutation)। এই পরিবর্ত্তনে কোন ক্রম নাই। ইহাতে কোনরূপ মধ্যবর্ত্তী আকার বা বর্ণ হয় না। ইহা হঠাৎ হয়। এই পরিবর্ত্তন বিচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। এইরূপে জগতে অনেক ফুল ও ফলের সৃষ্টি হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, উদ্ভিদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদের জন্য মিউটেশন হয়। আবার কাহার কাহার মতে Gametic Composition-এর পরিবর্ত্তন জন্য এইরূপ হইয়া থাকে এবং শেষোক্ত মতাবলম্বিগণ পরীক্ষা দ্বারা সুন্দররূপে তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। ডক্টর হিউগো ডে ভ্রিস (Dr. Hugo de Vries) মিউটেশন-এর আবিষ্কর্ত্তা। তিনি এই বিষয় লইয়া বিস্তর পরীক্ষার পর স্থির করেন যে, মিউটেশনই এক জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তির অন্যতম কারণ।

এই সকল পরিবর্ত্তনের সাহায্যে ফুল ও ফলকে বড় এবং ফলকে মিষ্টতর করা যায়। কিন্তু পরীক্ষাক্ষেত্রে সতর্ক পর্য্যবেক্ষণ ও বিপুল ধৈর্য্যের একান্ত প্রয়োজন; এবং ইহা সময়সাপেক্ষও বটে। কোথাও একটু সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। ডক্টর হিউগো ইহা লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেন।

এখন দেখা যাক, সঙ্কর জাতির উৎপত্তিতে কিরূপে ফসলের উন্নতি করা যাইতে পারে। এক জাতীয় দুইটি বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট উদ্ভিদের সংমিশ্রণের নাম সঙ্করীকরণ (hybridization)। এই সংমিশ্রণের দ্বারা যাহাদের উৎপত্তি হইল, তাহাদের মধ্যে পুং স্ত্রী উভয় জাতীয় গুণ বর্ত্তমান থাকিবে।

সঙ্কর জাতি তিন প্রকারের হয়; যথা—

(১) Varietal hybrid, যেমন সাদা ও হল্‌দে ফুল-বিশিষ্ট কার্পাসের সংমিশ্রণ।

(২) Specific hybrid, যেমন কুমঠা কার্পাস ও খান্দেশী কার্পাসের সম্মিলন।

(৩) Generic hybrid, যেমন খচ্চর (mules)।

মনীষী গ্রেগর মেন্‌ডেল (Gregor Mendel) এই সঙ্করীকরণের উদ্ভাবন করেন। মেন্‌ডেল বলেন, প্রথম সম্মিলনে Gametes-এর বিয়োজন (segregation ও পুনর্ম্মিলন (re-combination) হয়। এই সম্মিলনের ফলে যাহাদের উৎপত্তি, তাহাদের মধ্যে তিন প্রকার গুণবিশিষ্ট তিনটি জাতি দেখা যায়। কতকগুলি পুং-জাতীয় ও কতকগুলি স্ত্রী-জাতীয় গুণবিশিষ্ট; আর কতকগুলি মিশ্র-জাতীয়, ইহাদের মধ্যে পুং এবং স্ত্রী উভয় জাতিরই গুণ বর্ত্তমান থাকে। বাহ্যদৃষ্টিতে এই মিশ্র জাতি পুং বা স্ত্রী জাতীয় লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আবার যখন এই সঙ্কর জাতির মধ্যে সম্মিলন হয়, তখন এক ভাগ পুং ও এক ভাগ স্ত্রী জাতীয় লক্ষণবিশিষ্ট হয়; এবং আর দুই ভাগে পুং ও স্ত্রী উভয় জাতির গুণ সংযুক্ত থাকে।

এইরূপ সঙ্করীকরণের সাহায্যে দেশ-বিদেশে ফসলের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের মনের মত অনেক ফুল ও ফল উৎপন্ন করিতে পারিয়াছেন। যেমন এক প্রকার কার্পাসের ফলন খুব বেশী, কিন্তু তাহার আঁশ খুব ছোট; এবং অন্য আর এক প্রকার কার্পাসের ফলন কম তবে আঁশ লম্বা ও মসৃণ। এই দুইয়ের সম্মিলনের ফলে উপরিউক্ত দুইটি গুণই একের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এইরূপ সংমিশ্রণের দ্বারা লক্ষ্যে পৌছিতে অনেক সময় লাগে ও অতি সাবধানে কাজ করিতে হয়।

কৃষকগণ নির্ব্বাচন-প্রণালী অবলম্বনেও তাঁহাদের ফসলে উন্নতিসাধন করিতে পারেন। ফসলের উন্নতি অর্থে কি বুঝায়? অর্থাৎ ফসলের উৎপন্নের প্রাচুর্য্য এবং শস্যের আকারের বৃদ্ধি। কোন-একটি ক্ষেত্র হইতে কৃষকের আশানুরূপ ফল পাইতে হইলে প্রয়োজন কতকগুলি হৃষ্ট-পুষ্ট সতেজ গাছ মনোনীত করিয়া সেই গাছের বীজ লইয়া চাষ আরম্ভ করা; প্রত্যেক বারেই নির্ব্বাচিত গাছগুলি রাখিয়া বাকীগুলি নষ্ট করিয়া দেওয়া। এইরূপে কিছুদিন নির্ব্বাচনের ফলে কৃষক তাঁহার লক্ষ্যে পৌছিতে পারেন।

নির্ব্বাচন-প্রণালীর কাজ দুই রকমে হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারে ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি গাছ মনোনীত করিয়া লইয়া তাহাদের বীজ একত্রে বপন করা হয়। এই প্রকার নির্ব্বাচনের ফলে যে-ক্ষেত্র হইতে বীজ আহৃত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা ফসল ভাল হয় বটে, কিন্তু মনোনীত গাছের ফলন অপেক্ষা ফসল নিকৃষ্ট হয়। এইরূপ নির্ব্বাচনের নাম সাধারণ নির্ব্বাচন, (mass selection)। বিশিষ্ট নির্ব্বাচনে (individual selection) কতকগুলি গাছ নির্ব্বাচন করিয়া প্রত্যেকটির বীজ পৃথক পৃথক বপন করা হয়। ইহার সুবিধা এই যে, প্রত্যেক গাছের উপর বিশেষভাবে মনঃসংযোগের অবসর পাওয়া যায়। নিকৃষ্ট গাছগুলি অনায়াসেই বাছিয়া নষ্ট করা যায়। সুতরাং বিশিষ্ট নির্ব্বাচনে অল্প সময়ের মধ্যে একটি উন্নত-জাতীয় ফসল পাওয়া যাইতে পারে।

এই নির্ব্বাচন-প্রণালীতে আর এক দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হয়, তাহা যৌন-মিলন বিষয়ে। (১) কতকগুলি ফসলের স্বকীয় যৌন-মিলন (Self-fertilization) হয়। (২) কতকগুলির পরকীয় যৌন-মিলন (Cross-fertilization) হয় বটে, কিন্তু স্বকীয় যৌন-মিলনও ঘটিতে পারে। (৩) আর কতকগুলি ফসলের সকল সময়েই পরকীয় যৌন-মিলন হয়। প্রথম প্রকারে সঙ্কর জাতির উৎপত্তির ভয় থাকে না। তবে যদি কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা উদ্ভিদের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য হইতে পারে, অথবা মিউটেশনের জন্যও হইতে পারে। মিউটেশনে যাহার উৎপত্তি, তাহা যদি কৃষকের আশানুরূপ হয়, তবে তাহা লইয়া চাষ করা যাইতে পারে এবং জগতে এক নূতন জাতীয় ফসলের সৃষ্টি হইল মনে করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রকারে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে ফসলের পরকীয় যৌন-মিলনের অবসর না ঘটে, তদনুরূপ ব্যবস্থাও করিতে হইবে। কারণ পরকীয় যৌন-মিলন হইলে সঙ্কর জাতির উদ্ভব সুনিশ্চিত। তৃতীয় প্রকার ফসলের ফুল প্রায় একলিঙ্গবিশিষ্ট হয়; কোনটি পুংলিঙ্গ, কোনটি বা স্ত্রীলিঙ্গ বিশিষ্ট। এখানে সর্ব্বকালেই পরকীয় যৌন-মিলন সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ফসলের নির্ব্বাচন-প্রণালী দ্বারা উন্নতি করা সহজসাধ্য নহে।

উদ্ভিদের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনশীলতা, সঙ্কর জাতির উৎপত্তি, এবং নির্ব্বাচন-প্রণালীর সাহায্যে বিশেষজ্ঞগণ ফসলের অনেক উন্নতি করিয়াছেন ও করিতেছেন। অনেক নূতন জিনিষের সৃষ্টি হইয়াছে। রোগ-নিরোধক (disease-resisting) ফসলের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে ফসল একেবারে নষ্ট হইবার আশঙ্কা অনুপাতে কমিয়াছে। আবার জলাভাবে অসুবিধা এড়াইবার উপযোগী নীরসতা-প্রতিষেধক (drought-resisting) ফসলেরও উদ্ভব হইয়াছে।

উনবিংশতিকোটীর মন্দির *

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশাল গুর্জ্জর-প্রতীহার সাম্রাজ্য অনন্তে বিলীন হইয়া গেলে উত্তরাপথের রাজনৈতিক গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তুর্কী যখন শস্যশ্যামলা হিন্দুস্থানের জনপদসমূহের প্রতি বুভুক্ষু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে যে-শক্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আর্য্যাবর্ত্তের তোরণ-রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, নির্ম্মম ভাগ্যবিধাতার অখণ্ডনীয় আদেশে তাহা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইল। হিমাচল হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত এবং সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত যে বিশাল ভূখণ্ডের উপর ভোজ ও মহেন্দ্র পাল তাঁহাদের প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা বহু রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। মালবে পরমার-বংশীয় নৃপতিগণের রাজ্যারম্ভ হইল, বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্লগণ, ত্রিপুরীতে হৈহয়-রাজবংশ, গুজরাট এবং বোম্বাই প্রদেশে চৌলুক্যগণ, অন্তর্ব্বেদী ও অযোধ্যায় গাহড়বালেরা স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন।

কাহারও কাহারও মতে পরমার-বংশের প্রথম পুরুষ, উপেন্দ্র, দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া মালব অধিকার করেন। ইহা অনুমান মাত্র, এই মত সমর্থিত হইবার উপযুক্ত প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। উপেন্দ্রের বংশ উত্তরকালে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পরমার-বংশীয় নৃপতিগণ, কেবল যোদ্ধৃ হিসাবে নহে, সাহিত্য ও শিল্পের পরিপোষক রূপে, ভারতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন; ভোজের নাম এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মহারাজ উদয়াদিত্যের সময়ে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে লিখিত আছে যে মহারাজ ভোজ তাঁহার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শত শত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধ চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি বিপর্য্যস্ত ধারা নগরী (মধ্যপ্রদেশের

চৌবাড়া ডেরা মন্দির (১ নং)

* এই প্রবন্ধে প্রকাশিত চিত্রগুলি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বর্ত্তমান ধার-রাজ্যের রাজধানী) পুনর্নির্ম্মিত করেন। সুপ্রাচীন উজ্জয়িনী নগরী পুনরায় নবযৌবনশ্রী লাভ করিয়াছিল। মহারাজাধিরাজ ভোজ স্বয়ং 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধার' নামক স্থাপত্যবিষয়ক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে মালবে এক নূতন রকম মন্দির-শিল্প তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন তুর্কীর অস্ত্রাঘাতে পরমার-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল তখন বিভিন্ন নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সহস্র সহস্র দেবালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

মহাকালেশ্বরের মন্দির (১ নং)

বিক্রমাদিত্যের রাজধানী, কালিদাস ও ভবভূতির নামে পূত, অমর উজ্জয়িনী, এখন বিশাল মৃন্ময়-স্তূপে পরিণত হইয়াছে। সরস্বতীর লীলাক্ষেত্র, মধ্যযুগের ভারতবর্ষের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধারা নগরীতে এখন আর পরমার-রাজগণের অমর কীর্ত্তি কিছু নাই, যাহা আছে তাহা সমস্তই মুসলমানের। মালবের বর্ত্তমান অধিবাসীরা বলেন যে বহু দুর্গম প্রদেশে ভোজ-নির্ম্মিত-মন্দির অক্ষতদেহে এখনও বর্ত্তমান আছে; কিন্তু দীর্ঘ চারি বৎসর মালবের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া এক নেমাবর, উদয়পুর ও উনবিংশতিকোটা বা বর্ত্তমান উনগ্রাম ব্যতীত আর কোথাও পরমার-রাজগণের বাস্তুশিল্পের নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উনবিংশতিকোটার মন্দিরগুলির বর্ণনা করিব।

পরমার-বংশীয় নৃপতিগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অন্যান্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। তাঁহাদের রাজত্বের সময়ে জৈনধর্ম্ম মালবে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। অমিতগতি ও ধনেশ্বর নামক দুই জন জৈন পণ্ডিত মহারাজ মুঞ্জ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিলেন। প্রভাচন্দ্র সূরী ভোজের এক জন প্রিয়পাত্র ছিলেন। নরবর্ম্মণের সময় সমুদ্র ঘোষ ও বল্লভ নামক এক জন জৈন মুনি সময়ে সময়ে মালব-রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। জৈনেরা রাজসভায় প্রাবল্য লাভ করিলেও বৈদিক ধর্ম্মের প্রাধান্য খর্ব্ব করিতে পারেন নাই। মেরুতুঙ্গ লিখিয়া গিয়াছেন যে উজ্জয়িনীতে অবস্থিত মহাকাল মন্দিরের পতাকা উড্ডীয়মান করিবার সময় উপস্থিত হইলে, রাজ্যের সমস্ত জৈন-মন্দিরের পতাকা নামাইয়া লইতে হইত।

উনগ্রামটি বর্ত্তমান ইন্দোর-রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবস্থিত,—ইহার প্রাচীন নাম উনবিংশতিকোটী। এখানে পৌছিতে হইলে বি-বি-সি-আই রেলওয়ের মাইল দূরে অবস্থিত খারগাঁও নামক শহরে গমন করিতে হয়। খারগাঁও হইতে ১৮ মাইল দূরে উন অবস্থিত। মোটরে যাওয়া যায় তবে রাস্তার অধিকাংশই কাঁচা। গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে মধ্যযুগে ইহা জৈন এবং হিন্দুদের বিশেষ তীর্থ

ছিল, কারণ কেবল খর্জ্জুরবাহক বা বর্ত্তমান খাজুরহো ব্যতীত আর কোথাও একত্র এতগুলি মন্দিরের সমাবেশ দেখি নাই। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উনের গৌরবও অন্তর্হিত হইয়াছে। জনবহুল ভারতের নগরসমূহ হইতে বহু দূরে অবস্থিত এই তীর্থস্থানে আর বড় একটা যাত্রীসমাগম হয় না। যে পরমার-বংশের প্রসাদে নগণ্য উনবিংশতিকোটী গ্রাম ভারতের স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছে, তাহাদের বিজয়শ্রী অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উনও বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। নেমাবরের ন্যায় উন মুসলমানের হস্ত হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় নাই, এবং একটি মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল।

নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির

গ্রামের অবস্থা বড়ই মন্দ। লোকের বসতি নাই বলিলেই হয়। মন্দিরগুলি সবই জরাজীর্ণ অবস্থায় পতিত আছে, দুই এক ঘর ব্রাহ্মণ, পিতৃপিতামহের পূজিত দেবমূর্ত্তি ত্যাগ করিতে না পারিয়া সেই শ্মশানের মধ্যে পর্ণকুটীরে বাস করিতেছেন। সিদ্ধনাথ মহাদেবের মন্দিরের ন্যায় এই গ্রামের কোন দেবালয়ই প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা বাঈয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তদনীন্তন হোলকার কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দোর-রাজ্যের বিভিন্ন প্রাচীন কীর্ত্তি পরিদর্শন করিবার সময় এই মন্দিরগুলি কালের করাল কবল হইতে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-সম্বন্ধে কার্য্য কত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। এই স্থানের আরও একটি বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। কয়েকটি জৈন-মন্দিরও হিন্দুর দেবাবাসের পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছে। মন্দিরগুলির নির্ম্মাণকৌশল ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে সেগুলি বিভিন্ন যুগের নহে, প্রায় একই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে সাম্প্রদায়িকতা মধ্যযুগের ভারতীয়গণের সামাজিক জীবন কলঙ্কিত করে নাই।
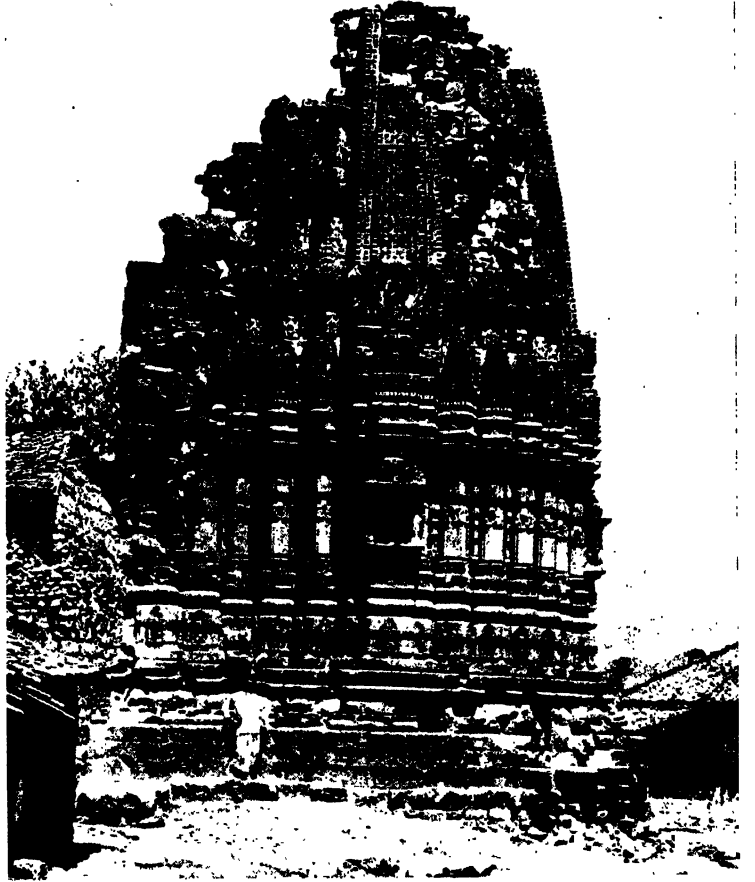
চৌবাড়া ডেরা (১নং) মন্দির :—উনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ মন্দিরটির নাম চৌবাড়া ডেরা। ইহার সম্মুখে একটি সভামণ্ডপ, এবং অন্য তিন দিক দিয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিবার পথ অর্দ্ধমণ্ডপযুক্ত। মন্দিরটি পূর্ব্বদিকে

মহাকালেশ্বরের মন্দির (২ নং)

পরমার-রাজ উদয়াদিত্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অন্তরালের সঙ্কীর্ণ পথ যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে আর একটি দ্বার আছে। এই দ্বার দিয়া পূর্ব্বকালে গর্ভগৃহে প্রবেশ করা যাইত, কিন্তু ইহা এখন পাথর দিয়া বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহার কারণ আমাদের যাইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন নিকটবর্ত্তী একটি বর্ত্ম মেরামত হইতেছিল, তখন ভারপ্রাপ্ত কণ্ট্রাক্টর মহোদয় এই প্রাচীন মন্দিরের শিখরের এবং পাষাণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণের প্রস্তরসমূহ চূর্ণ করিয়া খোয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দ্বারের কবাটে নৃত্যশীল শিব ও সপ্তমাতৃকা মূর্ত্তি আছে।

এই মন্দিরের উত্তর দিকে আর একটি ক্ষুদ্রকায় শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু বর্ণনার যোগ ইহার আর কিছুই নাই।

মহাকালেশ্বর মন্দির (১ নং):— উপরিউক্ত ক্ষুদ্রকায় দেবালয়ের উত্তর

মুখ করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং এই দিকের অর্দ্ধমণ্ডপের উপর শিব ও সপ্তমাতৃকা মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের কারুকার্য্য অত্যন্ত যত্নসাধ্য এবং গোয়ালিয়রে অবস্থিত শাস্‌বহু মন্দিরের তক্ষণশিল্পের ন্যায়। মণ্ডপের ভিতরে চারিটি নাতিবৃহৎ মনোরম স্তম্ভের উপর একটি চতুষ্কোণ খর্ম্মিকা স্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহার উপর একটি অষ্টকোণ এবং তদুপরি একটি দ্বাদশকোণ খর্ম্মিকা স্থাপিত করিয়া মণ্ডপের ছাদ বৃত্তাকারে নির্ম্মিত করা হইয়াছিল। সভামণ্ডপের ছাদের নির্ম্মাণ-পদ্ধতি ও অভ্যন্তরের কারুকার্য্য নেমাবরের সিদ্ধনাথ মহাদেবের মন্দিরের ন্যায়। মণ্ডপের পশ্চিম দিকে একটি দ্বারের মধ্য দিয়া অন্তরালে প্রবেশ করিতে হয় এবং এই দ্বারের 'সর্দ্দালে' (lintel) গণেশ, ব্রহ্মা, মহাদেব, বিষ্ণু এবং সরস্বতীর মূর্ত্তি খোদিত করা হইয়াছিল। অন্তরালের প্রাচীরে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে

দিকে একটি সুবৃহৎ মন্দির কালের সহস্র অত্যাচা[র] বক্ষে ধারণ করিয়া এখনও দণ্ডায়মান আছে। গ্রামের অধিবাসীরা ইহাকে মহাকালেশ্বর বা মহালোকেশ্[বর] (মহাদেব) মন্দির বলিয়া জানে। অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় ইহাও এক কালে গর্ভগৃহ, শিখর ও মণ্ডপসমন্বিত ছিল কিন্তু মণ্ডপটি এখন বিলুপ্তপ্রায়, কেবল গগনভেদী চূড়া[র] পার্শ্বে দক্ষিণ দিকের অর্দ্ধমণ্ডপের স্তম্ভগুলি স্বস্থানে দণ্ডায়মা[ন] থাকিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইখানে বলিয়া রাখা দরকার যে শিল্পশাস্ত্রানুসারে প্রাচীন ভারতে[র] মন্দিরগুলির তিনটি প্রধান অংশ ছিল। বিগ্রহমূর্ত্তি যে-গৃহে পূজিত হইত তাহার নাম 'গর্ভগৃহ' এবং মন্দিরের উপরে [যে] সুউচ্চ চূড়া থাকিত তাহার নাম 'শিখর' এবং গর্ভগৃহে[র] সম্মুখের অংশটিকে 'মণ্ডপ' বা 'সভামণ্ডপ' বলা হইত। সময়ে সময়ে সভামণ্ডপ হইতে গর্ভগৃহে প্রবেশ করিবার জন্য একটি

সঙ্কীর্ণ পথ থাকিত। ইহার নাম 'অন্তরাল'। মহাকালেশ্বর-মন্দিরের মণ্ডপের যে অংশটুকু এখন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে এই মণ্ডপটি এক সময়ে বেশ সুদৃশ্য ছিল। মণ্ডপ অদৃশ্য হওয়ায় ভগ্নপ্রায় শিখরের অভ্যন্তর-ভাগ এখন মানুষের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এবং তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে এই সকল শিখরের নির্ম্মাণ-প্রণালী গয়া জেলায় টীকারীর নিকটস্থ কোঞ্চ গ্রামে অবস্থিত ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরের শিখরটির ন্যায়। অন্তরালের প্রাচীরে কুলুঙ্গী কাটা হইয়াছিল এবং তাহাদের দুইটিতে শিব ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি অবস্থান করিতেছে। গর্ভগৃহের বাহিরের প্রাচীরের তিনটি কুলুঙ্গীতে চামুণ্ডা, নটরাজ এবং ত্রিপুরার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

চৌবাড়া ডেরা মন্দিরের সভামণ্ডপ

বল্লালেশ্বরের মন্দির :—মহাকালেশ্বর-মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে একটি বিচিত্র দেউল আছে। ইহার নাম বল্লালেশ্বরের মন্দির। দেবালয়টির আকার ও গঠনপ্রণালী মসজিদের ন্যায়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা এখন মহাদেবের মন্দির ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনুমান হয় যে মালব দেশ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পর কোন সময়ে এই মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করা হইয়াছিল। তাহার পরে মারাঠার অস্ত্রাঘাতে মালবে মুসলমানাধিকার লুপ্ত হইলে ইহা পুনরায় হিন্দুর দেবদেউল রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এই মন্দিরের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে প্রাচীন মন্দিরের কারুকার্য্যখচিত দ্বারের 'বাজু' ও 'সর্দ্দাল' ইহার প্রবেশপথে ব্যবহৃত হইয়াছে।

নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির :—উপরে যে-সব মন্দিরের বর্ণনা করা হইল, তাহারা বর্ত্তমান উনগ্রামের বাহিরে অবস্থিত। গ্রামের ভিতরে একটি জীর্ণ মন্দির আছে, ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার নাম নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব। মণ্ডপের আর চিহ্নমাত্র নাই, তাহার স্থলে কয়েকটি পুরোহিতের পর্ণকুটীর বিদ্যমান। শিখর প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। গর্ভগৃহের ভগ্নপাষাণ ও বালুর মধ্যে প্রোথিত দেবাদিদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি এখন আর পূজিত হন না। শিখরহীন গর্ভগৃহের প্রাচীরে চামুণ্ডা ও নটরাজের মূর্ত্তি আছে।
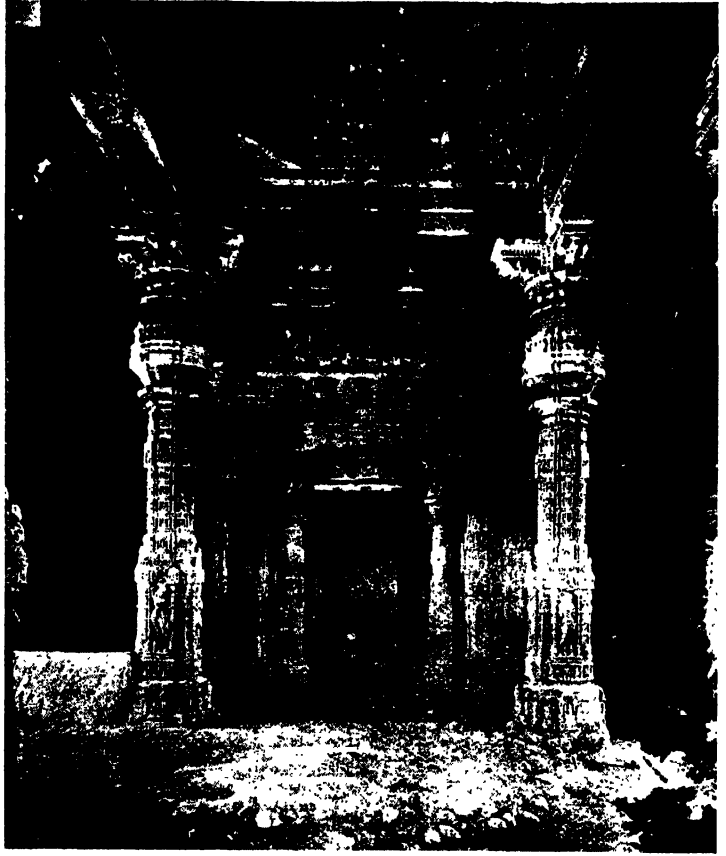
গুপ্তেশ্বর এবং মহাকালেশ্বর (২ নং) মন্দির :—নীলকণ্ঠেশ্বর-মন্দিরের নিকটেই আর একটি শিবমন্দির আছে, তাহার নাম গুপ্তেশ্বর। এরূপ দেউল মালবে কোথাও আর দেখি নাই। মন্দিরটির গর্ভগৃহের মেঝের সমতা (floor-level) নিকটবর্ত্তী নীলকণ্ঠ-মন্দিরের গর্ভগৃহের মেঝে হইতে প্রায় ১৩ ফুট নিম্নে। দেবালয়ের শিখর ও মণ্ডপ বহুকাল পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু গর্ভগৃহস্থ লিঙ্গমূর্ত্তি এখনও

চৌবাড়া ডেরা মন্দির (২ নং)

পূজিত হইয়া থাকেন। খারগাঁও হইতে যে রাস্তা দিয়া উনে যাইতে হয়, তাহার উপর আর একটি শিবমন্দির আছে। ইহার নাম মহাকালেশ্বর বা মহালোকেশ্বর (২ নং); মণ্ডপ নাই তবে চূড়াবিহীন শিখর এখনও গর্ভগৃহের উপর দণ্ডায়মান আছে।

চৌবাড়া ডেরা (২ নং) মন্দির :—প্রথম চৌবাড়া ডেরা ও দ্বিতীয় মহাকালেশ্বর মন্দিরের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত জৈন-মন্দির অবস্থিত। ইহার মণ্ডপটির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। নেমাবরের সিদ্ধনাথ মন্দিরের এবং এই স্থানের অন্যান্য দেবালয়গুলির সভামণ্ডপের ন্যায় তিন দিক অর্দ্ধমণ্ডপযুক্ত এবং উন্মুক্ত নহে। ইহা প্রাচীর-বেষ্টিত একটি গৃহ, চতুর্দ্দিকে চারিটি দ্বার আছে, তাহার মধ্যে একটি দিয়া গর্ভগৃহে প্রবেশ করা যায়।

শিল্পশাস্ত্রানুসারে প্রাচীন ভারতে তিনটি বিভিন্ন মন্দির- নির্ম্মাণ-প্রণালী ছিল। ইহাদের নাম নাগর, বেশর এবং দ্রাবিড়। নাগর-পদ্ধতি উত্তরাপথ ও পূর্ব্বভারতে প্রচলিত ছিল, মহারাষ্ট্র ও খান্দেশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের মন্দিরগুলি বেশর-প্রণালীতে নির্ম্মিত হইত এবং মাদ্রাজ অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় যে-সমস্ত প্রাচীন দেবালয় এখনও দৃষ্টিগোচর হয় সেগুলি দ্রাবিড়-প্রণালীতে নির্ম্মিত। চৌবাড়া ডেরায় যেরূপ সভামণ্ডপের বর্ণনা করা হইল সেইরূপ মণ্ডপ দাক্ষিণাত্যের দেবালয়গুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়, পরমার-রাজগণের সময় উত্তরাপথের এই সুদূর প্রান্তে বেশর ও নাগর পদ্ধতির সংমিশ্রণ হইয়াছিল। ভিতরে আটটি স্তম্ভ আছে এবং তাহাদের উপরে মণ্ডপের ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গোয়ালেশ্বরের মন্দির :—উনের সর্ব্বশেষ মন্দিরের নাম গোয়ালেশ্বর। ইহাও একটি জৈন-মন্দির, কিন্তু ঝড় ও বর্ষার সময় রাখালেরা এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে বলিয়া অধিবাসীরা ইহার নামকরণ করিয়াছে গোয়ালেশ্বর। দ্বিতীয় চৌবাড়া ডেরার ন্যায় ইহার মণ্ডপও প্রাচীরবেষ্টিত এবং চারিটি দ্বারযুক্ত। গর্ভগৃহের মেঝের সমতা সভামণ্ডপের মেঝে অপেক্ষা প্রায় দশ ফুট নিম্নে। অবতরণের নিমিত্ত সোপান আছে। গর্ভগৃহের ভিতরে সারবন্দী তিনটি

গোয়ালেশ্বরের মন্দির
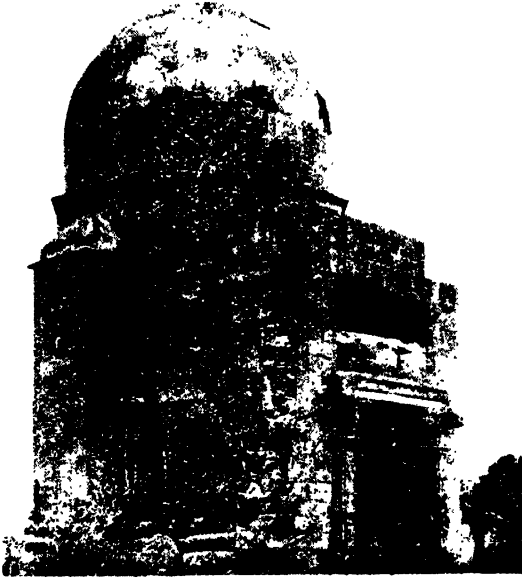
বল্লালেশ্বরের মন্দির

বৃহদাকার দিগম্বর জৈনদের 'তীর্থঙ্কর' মূর্ত্তি অবস্থিত। মধ্যেরটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রায় সাড়ে-বার ফুট উচ্চ। শ্রেণীবদ্ধ মূর্ত্তিগুলির দুই পার্শ্বে এবং গর্ভগৃহের প্রাচীরের গাত্রে সোপানশ্রেণী রহিয়াছে, মনে হয়, পূজারিগণ মূর্ত্তিগুলিকে স্নান করাইবার সময় ইহার উপর উঠিয়া জলধারা ঢালিয়া দিতেন। খাজুরহো এবং গিরনার পর্ব্বতের জৈনমন্দিরের মূর্ত্তিগুলি এখনও এই পদ্ধতিতে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। গোয়ালেশ্বর-মন্দিরের শিখরটি উনের অন্যান্য মন্দিরের মত নহে বরং খাজুরহোর পার্শ্বনাথ-মন্দিরের শিখরের ন্যায়।

রসায়নশাস্ত্রে নোবেল-পুরস্কার

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীপুলিনবিহারী সরকার ও শ্রীভবেশচন্দ্র রায়

রসায়নশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠতম মৌলিক গবেষণার জন্য পিয়ের কুরী ও মাদাম কুরীর কন্যা মাদাম ইরেন কুরী-জোলিও এবং তাঁহার স্বামী মঁসিয়ে জঁা ফ্রেডারিক জোলিও এ বৎসর নোবেল-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ১৯০৩ সালে বিশ্ববিশ্রুত কুরী-দম্পতি হেনরী বেকারেলের সহিত একযোগে এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। পুনরায় ১৯১১ সালে একক মাদাম কুরীকে নোবেল-পুরস্কার প্রদান করা হয়। একমাত্র মাদাম কুরী ব্যতীত দ্বিতীয় বার এই পুরস্কার লাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

যে দুরূহ গবেষণার জন্য সমগ্র বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার জোলিও-দম্পতিকে অর্পিত হইয়াছে তাহার একটা আভাস দিতে হইলে প্রথমেই কুরী-দম্পতি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে প্যারিসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে পিয়ের কুরী জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোর এবং যৌবনে যথারীতি শিক্ষালাভপূর্ব্বক

কুরী-পরিবার

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Dr. e's. Sc. উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং প্যারিসেই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

মাদাম কুরীর জন্ম হয় পোল্যাণ্ডের ওয়ার-শ বিদ্যালয়ের গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ স্কোলদোয়াস্কির গৃহে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর। বাল্যেই মাতৃহারা হওয়ায় পিতার সযত্নস্নেহে তাঁহার গবেষণাগারেই এই মহীয়সী মহিলার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় এবং নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে উচ্চতর শিক্ষালাভার্থ তিনি প্যারিসে

তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক সাধনা—জ্ঞান-পিপাসা। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস নগরীর এক জনবহুল পথ অতিক্রমকালে অধ্যাপক পিয়ের কুরী শোচনীয় মোটর-দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিলেন। শোকাকুল বিধবা মাদাম কুরী দুইটি শিশুকন্যা ইরেন ও ও ইভকে বুকে করিয়া জনকোলাহল হইতে বহুদূরে রেডিয়াম্ ইন্‌ষ্টিটিউটের বিজ্ঞানাগারে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বিজ্ঞানালোচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। জননীর এই অচঞ্চল সাধনাই কন্যার মনে জাগাইয়া দিয়াছে বিজ্ঞানসাধনার এক অকৃত্রিম প্রেরণা।

ফেডারিক জোলিও

ইরেন কুরী-জোলিও

আসিয়া তত্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ছাত্রী-জীবনের অপরিমেয় বাধা এবং অপরিসীম অর্থাভাবের মধ্যেও বিজ্ঞান-সাধনার প্রেরণা মেরীর সমস্ত অন্তরকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মেরী অধ্যাপক পিয়ের কুরীকে বিবাহ করিয়া বিজ্ঞান-সাধনায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন। অধ্যাপক সুৎজেন বার্জ্জারের চেষ্টায় পিয়ের ও মাদাম কুরীর একত্রে এক গবেষণাগারে গবেষণা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। বিবাহের পর কুরী-দম্পতি যে পারিবারিক জীবন গড়িয়া তুলিলেন তাহার মূলে রহিল

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রশ্মিবিকীরণের (radio-activity) আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মনীষীবৃন্দ এই অত্যদ্ভুত প্রাকৃতিক রহস্যের উদ্ঘাটনে যত্নবান হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের প্রাণপাত পরিশ্রমে গবেষণার যে অপরিমিত ক্ষেত্র এবং সুযোগ গড়িয়া উঠিল, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ও গবেষণা মুখ্যতঃ এই বিষয় লইয়াই আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল গবেষণার ফলে মানুষের পরমাণু সম্বন্ধে জ্ঞান স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে—ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা গিয়াছে যে পরমাণু একটি সরল পদার্থ নহে, পরন্তু বিশেষ জটিল।

পরমাণুর গঠনতত্ব সম্বন্ধে যে আভাস আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় পরমাণুর সম-ওজনের ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা (protons) কয়েকটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণার (electrons) সহিত সংযুক্ত অবস্থায় পরমাণু-কেন্দ্রে (nucleus) অবস্থিত। এই কেন্দ্রাণুর চতুষ্পার্শ্বে ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা স্বতঃ-উৎসারিত বেগে ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

মাদাম কুরীর আবিষ্কৃত রেডিয়াম নামক মৌলিক ধাতু সাধারণতঃ সর্ব্বদাই অপেক্ষাকৃত একটু গরম থাকে। কুরী-দম্পতি প্রমাণ করেন এই স্বতঃ-উৎসারিত তাপ রেডিয়ামের রূপান্তরের ফল। রেডিয়ামের ভারী-পরমাণু হইতে স্বতঃই তিন প্রকার রশ্মি নির্গত হইতেছে এবং তাহার ফলে রেডিয়াম রূপান্তরিত হইয়া পরিশেষে সীসায় পরিণত হইতেছে। এই তিন প্রকার রশ্মির প্রথমটি ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তিবিশিষ্ট আলফা-রশ্মি (Alpha rays), দ্বিতীয়টি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-কণা (Beta rays) এবং তৃতীয়টি সূক্ষ্ম তরলধারা (Gamma rays)। নানা প্রকার জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে এই কেন্দ্রাণুর বিভিন্নতাতেই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের প্রভেদ। যদি কোন প্রকারে পারদের কেন্দ্রাণু হইতে একটি প্রোটনকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তবে পারদ সোনায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। এই প্রোটন ধনাত্মক হাইড্রোজেন পরমাণু মাত্র।

১৯১৯ সালে অধ্যাপক রাদারফোর্ড লক্ষ্য করেন যে লঘুতর নাইট্রোজেন গ্যাসের উপর আলফা-রশ্মির আঘাত করিলে উহা হইতে একটি প্রোটন বাহির হয় এবং সম্ভবতঃ নাইট্রোজেন অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয়। পরবর্ত্তী সময়ে বেরিলিয়াম ধাতুকে এইভাবে আঘাত করিয়া দেখা গেল যে প্রোটনের পরিবর্ত্তে ইহা হইতে এক প্রকার সুদূরপ্রসারী (penetrating) রশ্মি নির্গত হয়। কুরী-জোলিও এই নবাবিষ্কৃত রশ্মি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন এবং ইহার নানা প্রকার বিশেষত্বও লক্ষ্য করেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করার কৃতিত্ব লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহাদের হয় নাই। সে সৌভাগ্য লাভ করেন ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যাডউইক্। তিনি লক্ষ্য করেন, এই রশ্মি বৈদ্যুতিকশক্তিবিহীন এবং ইহার নাম দেন "নিউট্রন"। বিজ্ঞানের এই নবাগত অতিথির সর্ব্ববিধ স্বরূপ আবিষ্কারের জন্য এ বৎসর স্যাডউইক্ পদার্থবিদ্যায় নোবেল-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

মৌলিক পদার্থগুলির বিষয় ব্যাপক গবেষণায় দেখা গিয়াছিল যে রেডিয়াম্, ইউরেনিয়াম্, পোলোনিয়াম্ প্রভৃতি ধাতুর স্বতঃ-রূপান্তর (spontaneous disintegration) এবং রশ্মি-বিকীরণ (radio-activity) ক্ষমতা থাকিলেও অপেক্ষাকৃত লঘু ওজনের মৌলিক পদার্থগুলি এ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদ্বারা কোন পদার্থে এ শক্তি সঞ্চার করাও অসম্ভব।

জোলিও-দম্পতি 'নিউট্রন' আবিষ্কারের গৌরব হইতে বঞ্চিত হইলেও তাঁহারা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পদার্থগুলিতে এই শক্তি সঞ্চার করা অসম্ভব নহে। ফলে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় মৌলিক পদার্থের রূপান্তর করা সম্ভব ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখাইয়াছেন এলুমিনিয়ামকে আলফা-রশ্মিদ্বারা আঘাত করিলে হাইড্রোজেন বাহির হয় এবং এলুমিনিয়াম দুইটি পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ফস্‌ফরাস্ এবং ফস্‌ফরাস্ হইতে সিলিকনে রূপান্তরিত হয়। এই নূতন মৌলিক পদার্থ দুইটির ভিতর কৃত্রিম রশ্মি-বিকীরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। অসীম ধৈর্য্য এবং অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাঁহারা নবজাত মৌলিক পদার্থগুলির এই কৃত্রিম শক্তির প্রমাণ করিয়াছেন। আঘাতের পর এলুমিনিয়াম খণ্ডটিকে এসিডে গলাইয়া তাঁহারা ফস্‌ফরাস এবং সিলিকনের অস্তিত্ব এবং তাহাদের কৃত্রিম রশ্মি-বিকীরণ-শক্তির প্রমাণ করেন। এই স্বল্পসময়ের মধ্যেই লঘুতর পরমাণুর এই প্রকার রূপান্তর এবং কৃত্রিম রশ্মি-বিকীরণের প্রায় চল্লিশটি উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

রেডিয়াম প্রভৃতির রূপান্তরে মানুষের কোন হাত নাই—ইহা প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে স্বতঃ-সংঘটিত। জ্ঞানপিপাসু মানুষ আজ প্রকৃতির এই খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। অনন্ত কাল হইতে ধনোন্মাদ মানুষ সোনার খোঁজে ছুটিয়াছে অন্ধকার খনির গুহায়—"ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর"। বৈজ্ঞানিক চলিয়াছে প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কারের নেশায়। কে জানে তার যাত্রাপথের এই মহান্ আবিষ্কার একদিন সকল সন্ধানের শেষ করিতে পারিবে কি না!

রশ্মি-বিকীরণের ক্ষেত্রে জোলিও-দম্পতির এই আবিষ্কার এবং এই প্রমাণিত তথ্য পরমাণুর গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সন্ধান দিতে পারিবে ইহা আশা করা যায়। বর্ত্তমান কালে পদার্থ- এবং রসায়নশাস্ত্রে বিভিন্ন গবেষণায় পরমাণুর সাধারণ গঠন সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরমাণুকেন্দ্রস্থ প্রোটন এবং ইলেকট্রনের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই, চ্যাডউইক্, জোলিও-দম্পতি, এণ্ডারসন প্রমুখ মনীষিগণের সাধনায় পরমাণু-গঠনের তত্ত্ব অচিরেই বোঝা যাইবে ইহা দুরাশা নহে।

সুলেখার ক্রন্দন

"বনফুল"

সুলেখা কাঁদিতেছে।

গভীর রাত্রি—বাহিরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক্ ফুটিতেছে। এই স্বপ্নময় আবেষ্টনীর মধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় উপুড় হইয়া শুইয়া ষোড়শী তন্বী সুলেখা অঝোরে কাঁদিতেছে। একা!—ঘরে আর কেহ নাই। চুরি করিয়া এক ফালি জ্যোৎস্না জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রবেশ করিয়া এই ব্যথাতুরা অশ্রুমুখী রূপসীকে দেখিয়া সে যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেন এ ক্রন্দন?

প্রেম? হইতে পারে বইকি! এই জ্যোৎস্না-পুলকিতা যামিনীতে সুন্দরী ষোড়শীর নয়ন-পল্লবে অশ্রুসঞ্চারের কারণ প্রেম হইতে পারে। সুলেখার জীবনে প্রেম একবার আসি-আসি করিয়াছিল ত! তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। অরুণ-দা নামক যুবকটিকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। অতীব সঙ্গোপনে এবং মনে মনে। এই শ্রদ্ধাই হয়ত স্বাভাবিক নিয়মে প্রেমে পরিণত হইতে পারিত—কিন্তু সামাজিক নিয়ম তাহাতে বাধা দিল। সামাজিক নিয়ম অনুসারে অরুণ-দা নয়, বিপিন নামক জনৈক ব্যক্তির লোমশ গলদেশে সুলেখা বর-মাল্য অর্পণ করিল!

হয়ত এই গভীর রাত্রিতে জ্যোৎস্নার আবেশে সেই অরুণ-দা'কেই, তাহার বার-বার মনে পড়িতেছে। নির্জ্জন শয্যায় তাহারই স্মরণে হয়ত এই অশ্রু-তর্পণ! তবে ইহাও ঠিক যে তাহার গোপন হৃদয়ের ভীরু বার্ত্তাটি সে অরুণ-দা'কে কখনও জানায় নাই এবং মনে মনে তাহার যে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল বিবাহের পর তাহা ধীরে ধীরে কালের অমোঘ নিয়মানুসারে আপনিই নিবিয়া গিয়াছে।

বিপিন যদিও অরুণ-দা নয় কিন্তু বিপিন,—বিপিন।—একেবারে খাঁটি বিপিন! এবং আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও ইহা সত্য কথা যে বিপিনের বিপিনত্বকে সুলেখা ভালও বাসিয়াছিল। ভালবাসিয়া সুখীও হইয়াছিল। সহসা আজ নিশীথে সেই বিস্মৃত-প্রায় অরুণ-দা'কে মনে পড়িয়া আঁখি-পল্লব সজল হইয়া উঠিবে, সুলেখার মন কি এতটা অতীত-প্রবণ?

হইতে পারে। নারীর মন বিচিত্র। তাহাদের মনস্তত্ত্বও অদ্ভুত। সে সম্বন্ধে চট্ করিয়া কোন মন্তব্য করা উচিত মনে করি না। বস্তুতঃ স্ত্রী-জাতির সম্বন্ধে কোন-কিছু মন্তব্য করাই দুঃসাহসের কার্য্য। যে রমণীকে দেখিয়া মনে হয় বয়স বোধ হয় উনিশ-কুড়ি—অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে তাহার বয়স পঁয়ত্রিশ। এতদনুসারে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া পুনরায় কাহারও বয়স যখন অনুমান করিলাম পঁচিশ—প্রমাণিত হইয়া গেল তাহার বয়ঃক্রম পনর বৎসরের এক মিনিটও অধিক নয়!

সুতরাং নারী-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে বেকুবের মত ফস্ করিয়া কিছু-একটা বলিয়া বসা ঠিক নয়। সর্ব্বদাই ভদ্রভাবে ইতস্ততঃ করা সঙ্গত। ইহাই সার বুঝিয়াছি এবং সেই জন্যই সুলেখার ক্রন্দন সম্বন্ধে সহসা কিছু বলিব না। কারণ আমি

জানি না। এই ক্রন্দনের শোভন ও সঙ্গত কারণ যতগুলি হওয়া সম্ভব তাহাই বিবৃত করিতেছি।

গভীর রাত্রে একা ঘরে একটি যুবতী শয্যায় শুইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া চলিয়াছে—ইহা একটি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়ও হইতে পারে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, তাহা নয়। পাঠক-পাঠিকাগণ এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হউন। বিপিন এবং সুলেখাকে যত দূর জানি তাহাতে তাহাদের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হইবার মত যোগ্যতা আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং আপনারা আশ্বস্ত হউন।

অরুণ-দা'র কথা ছাড়িয়া দিলে সুলেখার ক্রন্দনের আর একটি সম্ভাবনার কথা মনে হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সুলেখার একটি সন্তান হইয়াছিল। তাহার প্রথম সন্তান। সেটি হঠাৎ মাস-দুই পূর্ব্বে ডিপথিরিয়াতে মারা গিয়াছে। হইতে পারে সেই শিশুর মুখখানি সুলেখার জননী-হৃদয়কে কাঁদাইতেছে। কিছুই আশ্চর্য্য নয়! শিশুটির মৃত্যুর পর সুলেখার দুই দিন 'ফিট্' হয়—ইহা ত আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি। চিরকালের জন্য যাহা হারাইয়া গিয়াছে তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও ফিরিয়া পাইবার আকুলতা কঠোর পুরুষের মনেও মাঝে মাঝে হয়। কোমল-হৃদয়া রমণীর অন্তঃকরণে তাহা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ক্রন্দনের কারণ পুত্রশোক হইতে পারে। অবশ্যই হইতে পারে!

কিন্তু হ্যাঁ,—আর একটা কারণও ত হইতে পারে। পুত্রশোক-প্রসঙ্গের পর এই কথাটি বলিতেছি বলিয়া আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন—কিন্তু সুলেখার ক্রন্দনের এই তুচ্ছ সম্ভাবনাটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না! বিগত কয়েক দিবস হইতে একটি নামজাদা ছবি স্থানীয় সিনেমা হাউসে দেখান হইতেছে। পাড়ার যাবতীয় নর-নারী সদলবলে গিয়া ছবিটি দেখিয়া আসিয়াছেন এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু বিপিন লোকটি এমনই বেরসিক যে, সুলেখার বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে সুলেখাকে উক্ত ছবি দেখাইতে লইয়া যায় নাই। প্রাঞ্জল ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুলেখার যাহা ভাল লাগে প্রায়ই দেখা যায় বিপিনের তাহাতে রাগ হয়। আশ্চর্য্য লোক এই বিপিন! কিছু ক্ষণ আগেই সিনেমার "লাস্ট্ শো" হইয়া গিয়াছে। সুলেখার শয়নঘরের বাতায়নের নীচে দিয়াই সিনেমাতে যাইবার পথ। দর্শকের দল খানিক ক্ষণ আগেই এই রাস্তা দিয়া সোল্লাসে হল্লা করিতে করিতে বাড়ি ফিরিল। হয়ত তাহাতেই সুলেখার সিনেমা-শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে একা কেন? বিপিন কোথায়! সে কি বেগতিক দেখিয়া এই গভীর রাত্রেই কল্যকার জন্য "সীট্ বুক" করিতে গিয়াছে?

হইতে পারে! তরুণী পত্নীকে শান্ত করিবার জন্য মানুষ সব করিতে পারে। হোক্ না বিপিন লোমশ—সে মানুষ ত! তাহা ছাড়া বিপিন সুলেখাকে সত্যই ভালবাসিত—ইহাও আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি। কারণ আমরা—লেখকরা—অনেক কথাই বিশ্বস্তসূত্রে অবগত থাকি। সুতরাং এই ক্রন্দন সিনেমা-ঘটিত হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

সবই হওয়া সম্ভব! বাস্তবিক যতই ভাবিতেছি ততই আমার বিশ্বাস হইতেছে সুলেখার ক্রন্দনের হেতু সবই হইতে পারে। এমন কি আজই সন্ধ্যাকালে সামান্য একটা কাপড়ের পাড়-পছন্দ-করা প্রসঙ্গে সুলেখার সহিত বিপিনের সাংঘাতিক মতভেদ হইয়া গিয়াছে। রূঢ়ভাষী পুরুষমানুষেরা সাধারণতঃ যাহা করে বিপিন তাহাই করিয়াছে। গলার জোরে অর্থাৎ চীৎকার করিয়া জিতিয়াছে। মৃদুভাষিণী তরুণীগণ সাধারণতঃ যে উপায়ে জিতিয়া থাকেন সুলেখা সম্ভবতঃ তাহাই অবলম্বন করিয়াছে—অর্থাৎ কাঁদিতেছে!

কারণ যাহাই হউক ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে করুণ! রাত্রি গভীর এবং জ্যোৎস্না মনোহারিণী হওয়াতে আরও করুণ,—অর্থাৎ করুণতর! কোন সহৃদয় পাঠক কিংবা পাঠিকা যদি ইহাকে করুণতমও বলেন তাহা হইলেও আমার প্রতিবাদ করিবার কিছু থাকিবে না। কারণ সুলেখা তরুণী। রাত্রি যতই নিবিড় এবং জ্যোৎস্না যতই আকাশপ্লাবিনী হউক না কেন এ-বিষয়ে খুব সম্ভবতঃ আমরা একমত যে এই রাত-দুপুরে একটা বালক কিংবা একটা বুড়ী কাঁদিলে আমরা এতটা আর্দ্র হইতাম না। উপরন্তু হয়ত বিরক্তই হইতাম।

সুলেখা কিন্তু তরুণী। মন সুতরাং দ্রব হইয়াছে এবং একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সুলেখার ক্রন্দনের কারণ না-নির্ণয় করা পর্য্যন্ত স্বস্তি পাইতেছি না।

এমন কি অরুণ-দা'কে জড়াইয়া একটা শস্তা-গোছের কাব্য করিতেও মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। মন বলিতেছে, "কেন নয়? এমন চাঁদিনী-রাতে কৈশোরের সেই অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত প্রণয়-প্রসূন সহসা পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইতে পারে না কি? ওই ত দূরে 'চোখ গেল'-পাখী অশ্রান্ত সুরে ডাকিয়া চলিয়াছে! সম্মুখের বাগানে রজনীগন্ধাগুলি স্বপ্ন-বিহ্বল—চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্নার পাথার! এমন দুর্লভ ক্ষণে অরুণ-দা'র কথা মনে হওয়া কি অসম্ভব, না অপরাধ?" মনের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া কপাটটা হঠাৎ খুলিয়া গেল। ব্যস্ত-সমস্ত বিপিন প্রবেশ করিল। মুখে শঙ্কার ছায়া। সিনেমার টিকিট পায় নাই সম্ভবতঃ। কিন্তু এ কি!

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—"দাঁতের ব্যথাটা কমেছে?"

"না! বড্ড কন্‌কন্‌ করছে।"

"এই পুরিয়াটা খাও তাহ'লে। ডাক্তার বাবু কাল সকালে আসবেন বললেন। কেঁদে আর কি হবে! এটা খেলেই সেরে যাবে। খাও লক্ষীটি!—"

জ্যোৎস্নার টুক্‌রাটি মুচকি মুচকি হাসিতেছে!

দেখিলেন ত? বলিয়াছিলাম—সবই সম্ভব!

বাঙালীর পল্লীজীবনে রূপের সাধনা

জসীম উদ্‌দীন

শহর হইতে বহুদূরে পল্লীর শান্ত ছায়াতলে কলালক্ষ্মী যে কত সুন্দর করিয়া তাঁহার শতদলের আসনখানি মেলিয়া ধরিয়াছেন বর্ত্তমান সভ্যতার আলোকে বসিয়া আমরা অনেকেই তাহার সন্ধান জানি না। কারণও আছে। আমাদের বর্ত্তমান বাঙালী সভ্যতা কতকটা গড়িয়া উঠিয়াছে এদেশের অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে। তাই আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য ও শিল্প অনেকখানি ক্ল্যাসিক্যাল। এই ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য ও শিল্পের সহিত এদেশের জনসাধারণের বিশেষ যোগ নাই।

আজকাল প্রত্যেক সভ্য দেশেই লোকসাহিত্য ও গ্রাম্য চিত্রকলার আদর হইতেছে দেখা যায়। রাস্কিন আর্টের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ আর্ট তাহাই যাহা দীর্ঘতম কাল ধরিয়া অধিকতম লোককে মহত্তম আনন্দ দান করে। এই সংজ্ঞা অনুসারে আর্টের বিচার করিতে গেলে আমাদের অভিজাত শিল্পকলা ও সাহিত্যের মূল্য অনেকখানি কমিয়া যায়, কারণ তাহা অধিকসংখ্যক লোককে আনন্দ প্রদান করিতে পারে না।

গ্রাম্য শিল্প যে বহু লোককে আনন্দ দিয়া অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমাদের দেশের আলপনা ও পিঁড়ি চিত্রের কথা বলা যাইতে পারে।

এই জন্য আজকাল কেহ কেহ বলিতেছেন, আমাদের অভিজাত শিল্পকলা অনেকখানি কৃত্রিম। মানুষকে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা ইহার কম। আজ অনেক বড় বড় শিল্পীর চক্ষু তাই গ্রাম্য শিল্পকলার দিকে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী শিল্পী গগ্যাঁ তাঁহার শেষ বয়সে সকল প্রকার অভিজাত শিল্পের মোহ কাটাইয়া আদিম আর্টের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই পাগল শিল্পী টাহিটি-দ্বীপে দাঁড়াইয়া আদিম মানবের দৃষ্টি লইয়া সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। অভিজাত শিল্পের সহিত গ্রাম্য শিল্পের তারতম্য লইয়া ঝগড়া করিবার অবসর এখানে নাই। আমরা বাঙালী জাতিকে ভালবাসি। প্রত্যেক জাতির মনের প্রকাশ হয় তাহার শিল্পে সাহিত্যে। বাংলা দেশের জনসাধারণের মনের সহিত যাঁহারা পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহারা এদেশের গ্রাম্য চিত্রকলার আলোচনা করিলে যে কতকটা প্রেরণা পাইবেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

সুদীর্ঘ দিবস বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমি

যে-সকল গ্রাম্য শিল্পের সন্ধান পাইয়াছি তাহারই কিছু পরিচয় এখানে দিতে চেষ্টা করিব।

ইতিপূর্ব্বে একবার আমরা প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধে নক্সী-কাঁথা, শিকা, খড়ের ঘর, পিঁড়ি, আলপনা, গাজীর পট, কাঠের কাজ, বেতের ঝাঁপি, প্রাচীর-চিত্র প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছিলাম। এবারে পল্লীশিল্পের আরও কয়েকটি বিভাগের আলোচনা করিব।

প্রথমেই ফুলের কথা ধরা যাক। ফুলের প্রতি ভালবাসা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অসভ্য বর্ব্বর জাতির মধ্যেও ফুলের আদর দেখা যায়। তাহাদের মেয়েরা ফুল কুড়াইয়া খোঁপায় গোঁজে, হাতে পায়ে ফুলের অলঙ্কার পরে। ধূলায় গড়াইয়া যে শিশু খেলা করে, তাহাকেও দেখিতে পাই কোথা হইতে একরাশ ফুল আনিয়া জড়ো করিয়াছে। হজরৎ মহম্মদ বলিয়াছেন, যদি সামান্য কিছুও সঞ্চয় করিতে পার তাহার কতকটা দিয়া ফুল ক্রয় করিও।

যদি জোটে মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
দুটি যদি জোটে তবে অর্দ্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী।
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

তাই নানা দেশের লোক নানা ভাবে ফুলের আদর করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

আজকাল ফুলের অলঙ্কার তেমন কেহ পরে না। আগে রাজমহিষীরা পর্য্যন্ত হীরা-মাণিকের অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ফুলের গহনা পরিয়া ফুল-রাণী সাজিতেন। ফুলের মালায় কত রকমেরই না কারুকার্য্য থাকিত। আজকালও ত্রিপুরা জেলায় ফুলের নানারূপ গহনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংরেজ-শাসনের প্রারম্ভে এদেশের রাজ-রাজড়ারা লক্ষ লক্ষ টাকার ফুল কিনিয়া উৎসব-গৃহ সাজাইয়াছেন এরূপও শোনা যায়। রূপকথায় আমরা পাই নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাও ফুলের মালার উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিয়া কত রাজকুমারের মন হরণ করিয়াছেন। চন্দ্রাবতীর পালায় আমরা পাই

পরথমে লিখিল পত্র চন্দ্রার গোচরে,
পুষ্পপত্রে লেখে পত্র আড়াই অক্ষরে।

আগে এরূপ ফুলের মালায় আড়াই অক্ষরে কত করুণ কাহিনীর উদ্ভব হইত। আজকাল সাহেব-বাড়ি হইতে আমরা যে-সব ফুলের মালা কিনিয়া লই, শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্র-নাথ বলেন যে এই ধরণের মালা গাঁথার প্রণালী আমাদের দেশেও অজানা ছিল না। অদ্ভুত রামায়ণে আমরা পাই, শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চরূপা নামে মালা গলায় পরিয়া অম্বরিকা রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই পঞ্চরূপা-মালা, পুষ্প, পত্র, ত্বক, ফল ও মূল দিয়া তৈরি হইত।

ইহা ছাড়া দেহকে সুন্দর করিবার জন্য আগে মেয়েরা নানারূপ উল্কি ব্যবহার করিত। আজও নিম্নশ্রেণীর কোন-কোন মেয়েরা উল্কি ব্যবহার করে। তাহার মধ্যে অধুনা-লুপ্ত অনেক প্রাচীন গহনার পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন আমাদের দেশের মেয়েরা কত রকম জাপানী খোঁপা, ইহুদী খোঁপা পরিয়া কেশ-সজ্জা করেন, কিন্তু আগে আমাদের দেশের মেয়েরাই কত রকমের খোঁপা তৈরি করিতেন। এখানে আমার সংগৃহীত ওতলা সুন্দরীর পালা হইতে আগেকার খোঁপা-রচনার একটি বিবরণ উদ্ধৃত করিব। রাজকন্যাকে তাহার দাসীরা নানা রকমের খোঁপা পরাইতেছে। একটিও রাজকন্যার মনের মত হয় না।

প্রথমে বান্দিল খোঁপা আড়িয়া চামর
দেখিতে যেন খোঁপা ময়ূরের পেখম।

কিন্তু রাজকন্যার মনের মত হয় না

তার পর বান্দিল খোঁপা নামে মেনাটুপি,
পিন পিন্তা দেওয়ায় যেমন খোঁপায় আটু পাপি।

এ খোঁপা পরিয়া রাজকন্যার আরও রাগ,

তার পরে বান্দিল খোঁপা নামে তার কুই;
ঘরতনে বারঐলি যেন খোঁপায় চাইল টুই।

কিন্তু রাজকন্যার মন এবারেও উঠিল না, শত হইলেও রাজকন্যা ত। এইবার সকল সহচরী মিলিয়া যুক্তি করিয়া খোঁপা রচনা করিলেন।

চিরলে চিরিয়া কেশ বামে বানল খোঁপা,
খোঁপার উপরে তুইলা দিল গন্ধরাজ চাঁপা।
পরাইল পরাইল খোঁপা শ্বেত কাঞ্চনের ফুল,
দেখিতে খোঁপা যেন সোনার সমতুল।

এই খোঁপা পরিয়া তবে রাজকন্যার মন উঠিল। আজও হয়ত দূর নিভৃত পল্লীর কোলে কোন এক অজানা কৃষক-ললনা এরূপ নানা ছাঁদে খোঁপা বাঁধিয়া আরসিতে নিজের মুখ দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হয়। হয়ত আজও দূর পল্লীগ্রামে কোন বর্ষীয়সী মহিলা এর চেয়েও অনেক ভাল খোঁপা রচনা করিতে জানেন। কিন্তু সেই রাজকুমারীরা আজ

কোথায়? যাহাদের এমনি করিয়া বেণী না বাঁধিলে কেশ-সজ্জা সম্পূর্ণ হইত না?

খোঁপা-বাঁধার কথা মনে করিতেই শাড়ীর কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। কত রকমেরই না শাড়ী ছিল আমাদের দেশে। ঢাকায় অনুসন্ধান করিলে আজও হয়ত কত সুন্দর সুন্দর শাড়ীর নাম পাওয়া যাইতে পারে। আমার পল্লীগীতি সংগ্রহ হইতে কয়েকখানা শাড়ীর বর্ণনা উদ্ধৃত করিব।

এবারে রাজকন্যাকে শাড়ী পরান হইতেছে

প্রথমে আনিল শাড়ী পিনল বড় ঠাটে,
নীমা সামের কালে যেমন সূর্য্য বইল পাটে।
এই শাড়ী পরিয়া কন্যা শাড়ীর পানে চায়,
মনমত না হইলে দাসীকে পিন্দায়।

তখন রাজকন্যাকে গঙ্গাজল-শাড়ী পরান হইল, সে শাড়ী হাতের উপর লইলে জললহরীর মত টলমল করে, আবার

হাতে তে লইলে শাড়ী হাতেতে মিশায়,
মিরতিকায় থুইলে শাড়ী মিরতিকায় পায় লয়।

কিন্তু সে শাড়ীতেও রাজকন্যার মন ওঠে না। সখীরা হিত নামে এক শাড়ী রাজকন্যাকে পরাইলেন, সেই শাড়ীর এমন গুণ ছিল যে

হাজারও দুঃখীতে পরলে তারও আইএ গীত।

কিন্তু তাহাও রাজকন্যার মনে ধরে না। সখীরা গুয়াকুল নামে শাড়ী পরাইলেন। মেলিলে তাহা এক শত হাত লম্বা কিন্তু মুঠার মধ্যে ধরা যায়। সে শাড়ীও রাজকন্যার মন-মত হইল না, তখন সখীরা মিলিয়া

তার পরে পরাইল শাড়ী নামে তার হিয়া,
সেই শাড়া পরিয়া হইছিল চল্লিশ কন্যার বিয়া।

যে শাড়ী পরিয়া চল্লিশ কন্যার বিবাহ হইয়াছে তাহা রাজকন্যার মনের মত না হইয়াই যায় না, সেই শাড়ীখানার বর্ণনা সকলকে শুনাই,

মাথার উপরে লেখছে শাড়ীর আল্লা নিরাঞ্জন,
বুকের উপর লেখছে শাড়ীর নবিজীব আসন।
পৃষ্ঠেতে লেখছে দুর্গা ভবানী,
শাড়ীর অঞ্চলে লেখছে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
শাড়ীর মধ্যে লেখ্যা থুইছে হাঁসাহাঁসীর জোড়া,
শাড়ীর মধ্যে লেখ্যা থুইছে আশী ডাঙর ঘোড়া।
শাড়ীর মধ্যে লেখ্যা থুইছে রামের ভাই লক্ষ্মণ,
শাড়ীর মধ্যে লেখ্যা থুইছে বীর বিভীষণ।
শাড়ীর মধ্যে লেখ্যা থুইছে কেল কদম্বের গাছ,
ডালে বইসে ঠাকুর কৃষ্ণ বাঁশী বাজায় তাত।
হাঁস লেখেছে কবুতর লেখছে হরিণ পালের পাল,
শাড়ীর মধ্যে লেখ্যা থুইছে সিঙ্গী জানোয়ার।
বগা বগী লেখ্যা থুইছে মারিয়া আধার করে,
শোলা শোলী লেখ্যা থুইছে নোনা লয়ে চলে।
অড্‌ট্যা মড্‌ট্যা লেখছে সদা অড় অড় করে,
মুরগী আওড্ডা লেখ্যা থুইছে অসক্যা অসক্যা চলে।
অডা লেখছে হাঁসা হাঁসী সোণাসার টিয়া,
নল গুঙ্গী কাম কুড়া ডাক সাতই করিয়া।
ওডই পোডই লেখ্যা থুইছে গরগর চড়া,
উকা বারই লাউয়া বারই বারই পিয়ারা।
কুঞ্চন দৈগল লেখছে যার বুক কাল,
কয়ার কুকুয়া লেখছে রাও শুনিতে ভাল।
আরও যত পক্ষী লেখছে শোস্তে উড়িয়া যায়,
চড়া চড়ি লেখ্যা থুইছে বেড়ী যার পার।
বায়ার ভেল্লুয়া লেখছে যার বড় রাও,
আড়গিলা লেখ্যা থুইছে যার লম্বা পাও।

কবিকঙ্কণচণ্ডীতে এই ধরণের একখানা শাড়ীর নমুনা পাই ভগবতীর কাঁচুলির বর্ণনায়। এদেশের বালুচরের শাড়ীও কতকটা এই ধরণের ছিল। আজকাল ছাপমারা নানা ছবি সম্বলিত শাড়ী বাজারে বিক্রী হয়। পূর্ব্বে শাড়ীর উপরে সূতার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য হইত। ঢাকার মসলিনের উপর অধিকাংশ কারুকার্য্যই সূচ সূতা দিয়া বুনট করিয়া দেওয়া হইত।

এই শাড়ী পরিয়া রাজকন্যাকে কেমন দেখাইতেছে, অবান্তর হইলেও তাহা উদ্ধৃত করিব—

সীঁথেতে সিন্দুর পরে রক্তের ধারা—
নয়নে কাজল পরে শশীকুলের তারা।
কাজলে মাজিয়া আঁখি অরুণ দুটি ফুল,
আলোকের চিত্র যেন হাতের দশাগুল।
সকল সাজ সাজিয়া দিল কাজলের রেখা
নবীন মেঘের আগে যেমন চান্দে দিল দেখা।
সাজন করিয়া কন্যা ঘরের বাহির হয়,
লজ্জা পাইয়া চন্দ্র সূর্য্য আবের নীচে যায়।
চন্দ্রে ডাকিয়া বলে সূর্য্য ওরে ভাই,
মুনিষ্য হইয়া দিল চান্দের মুখে ছাই।

এই ত গেল রূপকথার যুগের সাজ-পোষাকের কথা। ঢাকার মসলিন উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু আজও অনেক ভাল ভাল শাড়ী আমাদের দেশের তাঁতিরা তৈরি করিয়া থাকে। মেঘডম্বুর, গঙ্গাযমুনা, ধূপছায়া, কাকডিমে, জামরাজা, চম্পাই, আনারসী, চুমকি, গুলবাহার প্রভৃতি শাড়ী আজও বাজারে পাওয়া যায়। বাংলা দেশে বালুচর বলিয়া এক রকমের শাড়ী তৈরি হইত।

ইহার গায়ে যেমন কাজ হইত তেমন বেনারসী শাড়ীর গায়েও হইত না। বালুচরের শাড়ি রেশম দিয়া তৈরি হইত।

আমরা এবার ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত কতকগুলি শাড়ীর নাম করিব। তাহাদের বর্ণনা দিব না। নাম শুনিলেই, তাহাদের রূপ মনে মনে কল্পনা করা যাইবে।

পাছাপেড়ে শাড়ী, কাদীরের শাড়ী, কালপীন, গান পাইড়, চুনারী, জলেভাসা, এক পাছুল্লা, কাঁচ পাইড়, বাঙ্গনি গরদ, জামদানী, জামের শাড়ী, ফরাসী শাড়ী, বাইশ পাড়, চোদ্দরসী, কাঁকড়ার ছোপ, আয়না ফোটা, সোনাঝুরী, গোলাপ ফুল, কুসুম ফুল, লক্ষ্মীবিলাস, মধুমালা, বাওই ঝাঁক, রাসমণ্ডল, কৃষ্ণনীলাম্বরী, যামিনী শাড়ী, নটরিয়া, মনখুশী, দিলখুশী, কাজল লতা, সোনালতা, কলমীলতা।

এই সব শাড়ীর মূল্যও এমন বেশী কিছু নয়। পাঁচ-ছয় টাকায় এক জোড়া পাওয়া যায়। আজও এই সব কাপড় পরিয়া সুদূর ময়মনসিংহের পল্লীপথ আলো করিয়া কৃষাণ-ললনারা বিচিত্র কলকাকলিতে পল্লী-লক্ষ্মীর ভগ্ন দেউল মুখরিত করিয়া তুলে।

মেয়েদের কাপড় পরিবার প্রণালীতে আজও তেমন পরিবর্ত্তন আসে নাই। কিন্তু পুরুষদের কাপড়-পরার প্রণালী এখন কবিত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেই সাহেবী পোষাক পরিবার জন্য লালায়িত। অনেক বড় বড় সাহেবও বাঙালীর ধুতি পরার অজস্র প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আগে বাড়ির মেয়েরা গিলা দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ধুতিকে খুব মিহি করিয়া কোঁচাইয়া রাখিত। পুরুষেরা তাহা নানা ভাবে পরিধান করিত। কোমরের দুই ধারে কোঁচান পাড়ের খানিকটা ফুলের মত দুলিত।

বাংলা নদীর দেশ; বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব-বাংলা। এদেশের নৌকার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। চৌদ্দডিঙা মধুকর বাহিয়া এদেশের সওদাগরেরা একদিন সপ্তসাগর পাড়ি দিয়া আসিত। বাংলা দেশের রূপকথা এই সব সওদাগর ও নৌকার কথায় ভরপুর। আমার সংগৃহীত কেশম সাধুর পালা হইতে চৌদ্দডিঙার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিব।

প্রথমে ভাসিল ডিঙা আল্লা করমান,
সেই ডিঙাতে বানছে সাধু কিতাব আর কুরান।
তার পরে ভাসিল ডিঙা তার নাম আসন,
দামদল কাটিয়া নৌকা কইরা যায় ময়দান।
তার পরে ভাসিল ডিঙা মাদারের আসন,
সেই ডিঙাতে বানছে সাধু হাড়ীয়া চামার।
তার পরে ভাসিল ডিঙা নামে খালইপেটি,
জিনিষ না হইলে বোঝাই, কাইটা তোলে মাটি।
তার পরে ভাসিল নৌকা নামে চুয়াঠুটি,
সেও ডিঙার গলুইতি লেখা কৃষ্ণ ঠাকুরাণী।
তার পরে ভাসিল ডিঙা কালীর আসন

* * *

তার পরে ভাসিল নৌকা নামে হুরমুর,
দুইকূলে ঠেসিয়া চলে আসমান মাস্তুল।
তার পরে ভাসিল নৌকা নামেতে কল্যান,
আগা নায়ে ঝড় তুফান পাছা নায়ে খরান।
তার পরে ভাসিল নৌকা তার নাম সরু,
খাড়া গুরার তলে তলে বাঘে মারে গরু।
তার পরে ভাসিল নৌকা নামে কটুই রাণী,
সেও ডিঙাতে বইসা রইছে ষোলশ গোপিনী।
তার পরে ভাসিল নৌকা নামেতে হাজারী,
আগে নায়ে হাট বাজার পাছে নায়ে কাছারী।
তার পরে ভাসিল নৌকা নামেতে ফসীদ,
সেও ডিঙার গলুইতি লেখা মক্কার মজীদ।
তার পরে ভাসিল ডিঙা নামে সরবর,
সেই ডিঙাতে বইসা আছে কেশম সওদাগর।

বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ কাব্যে আমরা এইরূপ একটি নৌবহরের বর্ণনা দেখিতে পাই।

এই সব নৌকায় বাংলার পণ্যের সহিত বাংলার শিল্প দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া আসিত। উপরের বর্ণনায় কিছু বাহুল্যদোষ আছে। তাহা হইলেও অদ্যাবধি চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেক বড় বড় নৌকার সন্ধান পাওয়া যায়। এরূপ নৌকা বাংলার যে-সব বারুই সূত্রধরেরা তৈরি করিয়া থাকে দেশের লোক তাহাদের ছোটলোক বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিলেও ফেনিলোচ্ছ্বাস মহাসমুদ্র তাহাদের তৈয়ার নৌকাগুলির যাত্রা-পথের সম্মুখ হইতে অতি সম্ভ্রমে ক্ষ্যাপা ঢেউগুলিকে সরাইয়া লইয়া যায়। এরূপ অনেকগুলি বড় বড় নৌকার ছবি ময়মনসিংহ-গীতিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে এই ধরণের অনেক নৌকা দেখা যায়। আমাদের ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর অঞ্চলে দশহরার দিন নৌকাবাচ হয়। প্রায় অধিকাংশ গ্রাম হইতেই চাষীরা দৌড়ের নৌকা সাজাইয়া

বাচ খেলিতে মেলায় আসে। এই সব নৌকার আকৃতি নানা রকমের। কোন নৌকা চিতল মাছের মত। পিছনের গলুইয়ের সহিত সুদীর্ঘ পিতলের পাত চিতল মাছের লেজের মত দুলিতে থাকে। কোন কোন নৌকা ময়ূরের মত। এই সব নৌকার গলুইতে নানা প্রকার পিতলের কারুকার্য্য করা থাকে। নৌকার উপর সড়কি, লাঠি, ঢাল ঘুরাইয়া এক দল লোক নৃত্য করিতে থাকে। তাহারই তালে তালে বৈঠা ঠেলিয়া মাল্লারা নৌকা বহিয়া যায়। ভাঙ্গা হইতে মাদারীপুর পর্য্যন্ত এই পথটার বহু স্থানে দশহরার মেলার দিন এইরূপ নৌকাবাচ হইয়া থাকে।

গ্রামের এই সব উৎসব-আনন্দের ব্যাপারগুলি আমাদের দেশ হইতে ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। এখন আমরা পিতলের তৈরি সুন্দর পাত্রাদি ছাড়িয়া টিন ও এনামেলের কুদর্শন পাত্রের অধিক সমাদর করি। আমাদের গৃহের যে-স্থানে মাটির প্রদীপ জ্বলিত, সেখানে আজ কেরোসিনের কুপী জ্বলিয়া চারিদিকে ধূম উদ্গীরণ করে।

সেকালের যানবাহন

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার জননীর মুখে গল্প শুনিয়াছি যে, তাঁহার বয়স যখন আট বৎসর, তখন আমাদের চন্দননগরে প্রথম ঘোড়ার গাড়ী হয়। সে আজ বিরাশী বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তাহার পূর্ব্বে, ধনবান এবং ভদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-মহিলারা বাটী হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে পাল্কীতে যাতায়াত করিতেন, সাধারণ গৃহস্থ-মহিলারা গরুর গাড়ী ব্যবহার করিতেন। সুতরাং গরুর গাড়ীই ছিল সেকালে স্ত্রীলোকদিগের প্রধান যান। পাল্কীর ভাড়া ছিল অধিক, গরুর গাড়ী অনেক অল্প ভাড়ায় পাওয়া যাইত, সেই জন্য দরিদ্র ব্যক্তিদিগের পক্ষে পাল্কী ব্যবহার করা কষ্টসাধ্য ছিল।

সেকালে কি শহরে আর কি মফঃস্বলে, সকল ধনবান ব্যক্তিই বাটীতে পাল্কী রাখিতেন। অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরও পাল্কী ছিল। সেকালে পাল্কীর প্রচলন ছিল বলিয়া সকল স্থানেই বাহকের ব্যবস্থা ছিল। পারিশ্রমিক দিলেই বাহক পাওয়া যাইত। যে-সকল ধনবানের সর্ব্বদাই পাল্কী আবশ্যক হইত, তাঁহাদের বেতনভোগী বাহক থাকিত। পাল্কী বহিবার জন্য চারি জন বাহক আবশ্যক। চারি জন লোককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া রাখা ধনবান ব্যতীত অন্যের পক্ষে সুসাধ্য ছিল না। সেকালে দুলেরাই প্রধানতঃ পাল্কী বহন করিত। যাহারা পাল্কী বহিত তাহাদিগকে লোকে "কাহার," "বেহারা" বা "বেয়ারা" বলিত; সেই জন্য প্রায় সর্ব্বদাই দুলে ও বেয়ারা একই শব্দরূপে ব্যবহৃত হইত। দুলে জাতি হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য ছিল, সেই জন্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণ ও উচ্চবর্ণের নিষ্ঠাবতী মহিলারা যে-বস্ত্রে পাল্কীতে আরোহণ করিতেন, সেই বস্ত্র পরিবর্ত্তন না-করিয়া পূজা, আহ্নিক বা আহার করিতেন না। অন্যূন দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, চন্দননগরে ফরাসী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্থানীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে নিষ্ঠাবান হিন্দুর পালনীয় সকল আচারই পালন করিতে হইত। তিনি প্রত্যহ পাল্কীতে করিয়া বাটী হইতে তাঁহার কর্ম্মস্থল "দে অর্ল্যাঁ" নামক দুর্গে গমন করিতেন। অস্পৃশ্য দুলের দ্বারা বাহিত পাল্কীতে বসিয়া তাম্বূল-চর্ব্বণ ব্রাহ্মণের পক্ষে অনুচিত বলিয়া তিনি উড়িষ্যা হইতে এক দল গোপজাতীয় বাহককে আনাইয়া চন্দননগরে স্বীয় বাটীর কাছে বাস করাইয়াছিলেন। গোয়ালারা অস্পৃশ্য নহে, সুতরাং উৎকলীয় গোয়ালাদিগের দ্বারা বাহিত পাল্কীতে আরোহণ করিয়া চৌধুরী-মহাশয় তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে প্রত্যহ কর্ম্মস্থলে গমন করিতেন। সেই সকল উড়িয়া বেহারা যে-পল্লীতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, উত্তরকালে সেই পল্লীই চন্দননগরের মধ্যে ভাড়াটিয়া পাল্কীর প্রধান

কেন্দ্র বা আড্ডা হইয়াছিল। চৌধুরী-বংশের অবনতির পর ঐ সকল উড়িয়া বেহারার বংশধরগণ পাল্কী বহন করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করিত। তাহারা যে-পল্লীতে বাস করিত তাহা এখনও "উড়িয়া-পাড়া" বা "বেহারা-পাড়া" নামে অভিহিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সেই পল্লীতে উড়িয়া-ভাষাভাষী এক জন লোকও নাই; সেই সকল উড়িয়ার বংশধরদিগের মধ্যে দুই-এক জন এখনও তথায় বাস করে বটে, কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ বাঙালী হইয়া গিয়াছে। এখন চন্দননগরে একখানিও পাল্কী নাই।

সেকালে যে-সকল ধনবান গঙ্গার ধারে বাস করিতেন, তাঁহারা জলপথে ভ্রমণের জন্য বজরা রাখিতেন। পাল্কী রাখা অপেক্ষা বজরা রাখা অধিক ব্যয়সাধ্য ছিল, কারণ প্রথমতঃ একখানি পাল্কী অপেক্ষা একখানি বজরার মূল্য অনেক অধিক ছিল; দ্বিতীয়তঃ বজরার মাঝি ও দাঁড়ি বেতন দিয়া রাখিতে হইত। পারিশ্রমিক দিলে পাল্কীর বেহারা পাওয়া যাইত, কিন্তু ঠিকা দাঁড়ী-মাঝি পাওয়া যাইত না। সেই জন্য বিশিষ্ট ধনবান ব্যতীত আর কেহই বজরা রাখিতেন না, বা রাখিতে পারিতেন না। ধনবানদিগের বজরা কিরূপ ছিল, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'দেবী চৌধুরাণী' নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সেকালে জলপথে দ্রুত গমনের জন্য "ছিপ" নামক এক প্রকার নৌকার প্রচলন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'তে সেই ছিপের বর্ণনাও করিয়াছেন।

এখনও মফঃস্বলে অনেক স্থানে "ডুলি" নামক এক প্রকার যান দেখিতে পাওয়া যায়। পাল্কীর মত ডুলিও বাহকের দ্বারা বাহিত হয়। পাল্কীবহনের জন্য চারি জন বাহক আবশ্যক, ডুলি দুই জন লোকেই বহন করে। ডুলি পাল্কীরই সাধারণ সংস্করণ। কলিকাতাতে এখন ডুলির অস্তিত্ব না থাকিলেও, পল্লীগ্রাম হইতে ডুলি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার জননীর মুখে শুনিয়াছি যে যখন চন্দননগরে প্রথম ঘোড়ার গাড়ী আমদানী হয় তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর। বাঙালী ভদ্রমহিলার ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণ সেকালের লোকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠেই বুঝিতে পারা যাইবে। চন্দননগরে ঘোড়ার গাড়ী আমদানী হইলে, আমার মাতামহী আমার জননীকে সঙ্গে লইয়া কোন আত্মীয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দুই-চারি দিন তাঁহাদিগকে নানা প্রকার বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কোন বর্ষীয়সী মুখরা প্রতিবেশিনী আমার মাতামহীকে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "কি বুকের পাটা তোমার বৌমা! গেরস্তর বৌ হ'য়ে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়তে তোমার ভয় হ'ল না?" আমার মাতামহী হাসিয়া বলিলেন, "ভয় হবে কেন? সে ত ঠিক পাল্কীর মত। পাল্কী মানুষে কাঁধে ক'রে নিয়ে যায় আর গাড়ী ঘোড়াতে টেনে নিয়ে যায়, তাতে ভয়ের কি আছে?" উত্তরে সে প্রাচীনা গৃহিণী বলিয়াছিলেন, "তা হোক্ মা, যে মেয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়তে পারে, সে ঘোড়াতেও চড়তে পারে। বাঙালীর ঘরের বৌমানুষ ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে, বাপের বয়সে এমন কথা শুনি নি—" ইত্যাদি। এইরূপ সমালোচনা আমার মাতামহীকে উপর্য্যুপরি তিন-চারি দিন একাধিক গৃহিণীর নিকট শুনিতে হইয়াছিল। অনুরূপ মন্তব্য আমার জননীকেও শুনিতে হইয়াছিল।

চন্দননগরে ঘোড়ার গাড়ী আসিবার বৎসর দুই পরে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম রেলপথ খোলা হয়। প্রথমে হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত এবং কিছুদিন পরে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যাত্রীগাড়ী যাতায়াত করে। প্রথমে যে-সকল গাড়ীতে যাত্রী লওয়া হইত, সেই সকল গাড়ীর ছাদ ছিল না, বসিবার জন্য বেঞ্চের ব্যবস্থা ছিল না। এখন যেরূপ গাড়ীতে কয়লা, পাথর বা মাটি বোঝাই করা হয়, সেইরূপ অনাচ্ছাদিত মাল-গাড়ী বা open truck যাত্রীবহনের জন্য দেওয়া হইত। অবশ্য তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের জন্যই open truck দেওয়া হইত, অন্য শ্রেণীর গাড়ী কিরূপ ছিল তাহা শুনি নাই। সেই খোলা এবং বেঞ্চবিহীন গাড়ীতে যাত্রীদিগকে রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ছাতা মাথায় দিয়া বসিতে হইত। এরূপ ব্যবস্থা অধিক দিন ছিল না, বোধ হয় এক বৎসরের মধ্যেই ছাদ ও বেঞ্চওয়ালা গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছিল।

আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি যে, প্রথম যখন কলের গাড়ী চলিতে আরম্ভ হয়, তখন রেলপথ হইতে চার-পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেও শত শত লোক, কেবল কলের

গাড়ী দেখিবার জন্য, রেলপথের নিকটে আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিত। গরু নাই, মহিষ নাই, ঘোড়া নাই, কেবল আগুনের জোরে গাড়ী চলে, এই অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিবার জন্য যে রেলপথের উভয় পার্শ্বে বিপুল জনসমাগম হইত, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। যে-সকল মোহজাল বিস্তার করিয়া ইংরেজ এ-দেশের লোককে,—বিশেষতঃ অজ্ঞ জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কলের গাড়ীই বোধ হয় তাহার মধ্যে প্রধান। কেবল আগুন ও জলের সাহায্যে যাহারা গাড়ী চালাইতে পারে, তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই, নিশ্চয়ই তাহারা দেবতার অংশ, এই ধারণা সেকালের বোধ হয় শতকরা নব্বই জনের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সেকালের বাঙালী তাই কলের গাড়ীকে "পুষ্পক রথ" বলিতে ইতস্ততঃ করে নাই। সে-কালের অজ্ঞ প্রাচীন-প্রাচীনারা কলের গাড়ীকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। হাওড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত প্রথম কলের গাড়ী চলিবার কয়েক দিন পরে আমাদের কোন প্রাচীনা প্রতিবেশিনী আমার পিতাকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহাকে কলের গাড়ী দেখাইয়া আনিতে হইবে। সেই বৃদ্ধা আমার পিতার "ঠানদিদি" বা পিতামহী-পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন। আমাদের বাটী হইতে ষ্টেশন এক মাইলের মধ্যে। বৃদ্ধার অনুরোধে আমার পিতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া এক দিন ষ্টেশনে গিয়া প্লাটফর্মে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন একখানা আপ্ ট্রেন আসিবার সময়। রেল-কর্ম্মচারীরা যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করিলেও আপ এবং ডাউন উভয় প্লাট-ফর্মেই শত শত দর্শকের জনতা হইয়াছিল। যথাসময়ে গাড়ী আসিবার সঙ্কেতসূচক ঘণ্টাধ্বনি হইল, সমবেত জনতা উদ্‌গ্রীব হইয়া সুদূর দক্ষিণে রেলপথের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দণ্ডায়মান রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, এঞ্জিন দৃষ্টিগোচর হইবা মাত্র সকলে উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। ভীষণ গর্জ্জন সহকারে ধূম উদ্‌গীরণ করিতে করিতে গাড়ী প্লাটফর্মে প্রবেশ করিবামাত্র জনতার শত শত ব্যক্তি করজোড়ে গাড়ীকে নমস্কার করিল, সেই বৃদ্ধা এবং আরও অনেকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল!

যখন হাওড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইল, তখন বর্দ্ধমান জেলার লোকেও ঐরূপ আগ্রহ সহকারে কলের গাড়ী দেখিবার জন্য রেলপথের উভয় পার্শ্বে সমবেত হইত। সেকালে, যাহারা কলের গাড়ী দেখে নাই, তাহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করিত না যে কলের গাড়ী এক ঘণ্টায় এক দিনের পথ যাইতে পারে। পল্লীগ্রামের যে-সকল ভাগ্যবান গাড়ী চড়িবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে স্বগ্রামে ফিরিয়া গিয়া কলের গাড়ী সম্বন্ধে কত অদ্ভুত এবং অতিরঞ্জিত গল্পই করিত। কলের গাড়ীতে ভ্রমণকালে কানে তুলা দিয়া এবং বক্ষে দৃঢ় করিয়া একখানা কাপড় বাঁধিয়া বসিতে হয়, নতুবা গাড়ীর শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায় এবং বাতাসের ধাক্কা লাগিয়া বুক ফাটিয়া যায়, এইরূপ কত কথাই সেকালের অজ্ঞ পল্লীগ্রামবাসীদিগকে শুনিতে হইত।

'হিতবাদী'র ভূতপূর্ব্ব প্রুফ-রীডার এবং সুবিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত ৺ধীরানন্দ কাব্যনিধি মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যে-সময় প্রথম কলের গাড়ী হয়, সেই সময় বর্দ্ধমান জেলায় তাঁহাদের গ্রাম হাটগোবিন্দপুরে এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি দৃষ্টিশক্তি এবং চলচ্ছক্তিহীন হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান-কালনা রোডের উপরেই তাঁহার বাটী ছিল। তিনি প্রত্যহ সকালে এবং বৈকাল হইতে রাত্রি আটটা-নয়টা পর্য্যন্ত পথের ধারে তাঁহার বাটীর দাওয়াতে বসিয়া থাকিতেন। গ্রামস্থ সকলেই সেই অতি-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। কেহ গ্রামান্তরে কোন কার্য্যউপলক্ষে গমনকালে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইত আবার গ্রামান্তর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিত। এক দিন তিনি প্রাতঃকালে দাওয়াতে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক জন গ্রামবাসী তাঁহার পদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিলে তিনি তাহার নাম এবং সে কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি বলিল, "আমি কলিকাতায় যাইতেছি।" সন্ধ্যার পর সে কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলে ব্রাহ্মণ তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি নাম বলিলে বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি যে সকালে বলিলে কলিকাতায় যাইতেছ, কলিকাতায় কি যাও নাই?" সে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ কলিকাতাতে সকালে গিয়াছিলাম, এখন কলিকাতা হইতে আসিতেছি।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অতিমাত্রায়

বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কলিকাতা এখান থেকে তিন দিনের পথ, সকালে কলিকাতায় গিয়া সন্ধ্যার সময় কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে, ব্যাপার কি?" তখন সেই লোকটি যথা-সাধ্য কলের গাড়ীর বর্ণনা করিয়া বলিল যে, বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত লোহার পাটি পাতা আছে, তাহার উপর দিয়া গাড়ী যায়। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,"আমি গ্রাম-সম্পর্কে ঠাকুরদাদা হই বলিয়া কি আমার সঙ্গে তামাশা করিতেছ? আমরা ঘরে মশারি খাটাইবার জন্য একটা লোহার পেরেক খুঁজিয়া পাই না, আর গাড়ী চালাইবার জন্য বর্দ্ধমান থেকে কলিকাতা পর্য্যন্ত লোহার পাটি পাতা হইয়াছে! এত লোহা পাবে কোথায়?"

সেকালের রেলগাড়ীর সহিত একালের রেলগাড়ীর আকৃতি, বর্ণ এবং গঠনগত অনেক প্রভেদ হইয়াছে। অবশ্য আমি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের গাড়ীর কথা বলিতেছি। এখনকার বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে—১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি প্রথমে আমার জ্ঞানে রেলগাড়ীতে আরোহণ করি। আমার পিতা কটক হইতে বীরভূম সিউড়ীতে বদলি হইলে আমরা চন্দননগর হইতে রেলপথে সাঁইতে ষ্টেশনে গিয়া তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া সিউড়ী যাই। তখন অণ্ডাল-সাঁইতে রেলপথ কাহারও কল্পনাতেও উদিত হয় নাই। সেকালের সেই রেলগাড়ীর প্রত্যেক "ক্যারেজে" ছয়টি করিয়া কক্ষ থাকিত। স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক কক্ষের কোন ব্যবস্থা ছিল না, কোন গাড়ীতেই পাইখানা ছিল না; লোহার গরাদে দ্বারা একটি কক্ষ অন্য কক্ষ হইতে পৃথক করা ছিল। কোন ভদ্রলোক যদি সপরিবারে ট্রেনে কোথাও যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একটি কক্ষ "রিজার্ভ" করিতে হইত, নতুবা অন্য পুরুষ-যাত্রীর সহিত একসঙ্গে অন্তঃপুরচারিণীদিগকে ভ্রমণ করিতে হইত। রিজার্ভ-করা কক্ষের আব্রুরক্ষার জন্য একখানা বিছানার চাদর বা মোটা কাপড় পর্দ্দা করিয়া গরাদেতে টাঙাইয়া দেওয়া হইত।

সেকালের রেলগাড়ীর প্রত্যেক কক্ষে (তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীতে) দুই খানা করিয়া বেঞ্চ থাকিত। প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচ জন করিয়া যাত্রীর বসিবার নিয়ম ছিল। সেই জন্য প্রত্যেক কক্ষের ভিতরে, দ্বারের উপরে, একখানা লম্বা কাগজে বড় বড় অক্ষরে বাংলায় লেখা থাকিত "প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচ জন বসিবে।" এখন সেরূপ দশ জন আরোহী বসিবার কক্ষ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-কোম্পানীর কোন গাড়ীতে নাই এবং "প্রত্যেক বেঞ্চে দশ জন বসিবে" লেখা কাগজও নাই। এখন গাড়ী বড় হইয়াছে, কক্ষগুলিও বড় হইয়াছে, এবং কোন্ কক্ষে কত জন আরোহী বসিবে তাহা প্রত্যেক কক্ষের ভিতরে দেওয়ালে তেলের রঙে লেখা থাকে।

পূর্ব্বে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে সকল ট্রেনেই শ্রেণী অনুসারে গাড়ী রঙ করা হইত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী সাদা, মধ্য শ্রেণী লাল এবং তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী সবুজ রঙের হইত। তখন মধ্য শ্রেণীর গাড়ীতে গদি ছিল না, গাড়ীর রঙ দেখিয়া মধ্য শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর পার্থক্য বুঝিতে হইত। সেকালের লোকে জানিত "লাল গাড়ী দেড়া মাশুল।" এখনকার তৃতীয় শ্রেণীর অজ্ঞ আরোহীরা মধ্য শ্রেণীর গাড়ীতে গদি দেখিয়া বুঝিতে পারে গদিওয়ালা গাড়ী তাহাদের নহে।

আমাদের বাল্যকালে ষ্টেশনের সংখ্যা এত অধিক ছিল না। আমার পিতা সিউড়ী হইতে বর্দ্ধমানে আসিলে আমরা বহুবার চন্দননগর হইতে বর্দ্ধমানে যাতায়াত করিয়াছি। সেকালে হাওড়ার পর বালী, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর (ভদ্রেশ্বরও অপেক্ষাকৃত আধুনিক), চন্দননগর, হুগলী, মগরা, খন্যেন, পাণ্ডুয়া, বৈঁচী, মেমারী, শক্তিগড় ও বর্দ্ধমান এই কয়টি ষ্টেশন ছিল। এখন হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত প্রতি দুইটি ষ্টেশনের মধ্যে একটি, অনেক স্থলে দুইটি, ষ্টেশন হইয়াছে। সেকালে ট্রেনের সংখ্যাও অধিক ছিল না। এখন পকেট টাইম-টেব্‌ল্ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হইয়া এক পয়সা মূল্যে বিক্রীত হয়, সেকালে পকেট টাইম-টেবল্ ছিল একখানি পোষ্ট কার্ডের মত, উহার এক পৃষ্ঠায় আপ্ এবং অন্য পৃষ্ঠায় ডাউন ট্রেনের সময় লিখিত হইত। তখন নিউ কর্ড, তারকেশ্বর ব্রাঞ্চ, নৈহাটি ব্রাঞ্চ বা ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লাইন ছিল না বলিয়া একখানি ক্ষুদ্রায়তন কাগজের উভয় পৃষ্ঠাতেই হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সকল ষ্টেশনের নাম ও সকল ট্রেনের সময় লিখিত হইত। এই পকেট টাইম-টেব্‌ল্ বিনামূল্যে ডেলি প্যাসেঞ্জার-দিগকে দেওয়া হইত। পরবর্ত্তী কালে উহা ছোট পুস্তিকার

আকারে প্রকাশিত হইবার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত বিনামূল্যে বিতরিত হইত।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের ফলে এদেশে সন্ত্রাসবাদের আবির্ভাব হয়। সেই সময় ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান ও ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের কলিকাতার সন্নিহিত কোন কোন স্থানে গতিশীল ট্রেনের উপর লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইত। রেলকর্ত্তৃপক্ষ অনুমান করিলেন যে, শ্বেতাঙ্গ আরোহীরা প্রধানতঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সেই জন্য বিপ্লববাদীরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী লক্ষ্য করিয়াই লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে; যদি সকল শ্রেণীর গাড়ীর বর্ণ একরূপ করা হয়, তাহা হইলে বিপ্লববাদীদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। এইরূপ অনুমান করিয়াই গাড়ীর বর্ণ-বৈষম্য রহিত করা হইল।

সেকালে এক্সপ্রেস ট্রেন ছিল না। লোকাল ট্রেন, থ্রু ট্রেন এবং মেল ট্রেন এই তিন প্রকার গাড়ী ছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে হুগলী, পাণ্ডুয়া এবং বর্দ্ধমান হইতে ডাউন লোকাল ট্রেন ছাড়িত এবং আপ্ লোকাল ঐ তিনটি ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইত। লোকাল ট্রেনগুলিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক আরোহী হইত বালী ষ্টেশনে। তখন এক বালী ষ্টেশনে ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, বালী, বেলুড় এবং গঙ্গার পরপারে দক্ষিণেশ্বর, এঁড়েদহ প্রভৃতি স্থানের যাত্রীরা ওঠানামা করিতেন। ইহার পর ষ্টীমার সার্ভিস হওয়াতে এবং উত্তরপাড়া, বেলুড় ও লিলুয়াতে নূতন ষ্টেশন হওয়াতে বালীর যাত্রীসংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। তদুপরি এখন বাস যাতায়াত করাতে বালীর যাত্রী আরও কমিয়া গিয়াছে। এখন যেরূপ সকল ষ্টেশনেই মন্থলী টিকিট বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। এক মাত্র হাওড়া ষ্টেশনেই মন্থলী টিকিট বিক্রয় হইত। সেকালের হাওড়ার পুরাতন ষ্টেশনে মন্থলী টিকিট বিক্রয় করিবার জন্য অনেকগুলি উইণ্ডো বা জানালা ছিল। উহার মধ্যে পাঁচ-ছয়টিতে বালীর মন্থলী টিকিট বিক্রয় হইত, অন্য উইণ্ডোগুলির প্রত্যেকটিতে চারি-পাঁচটা ষ্টেশনের টিকিট পাওয়া যাইত। হাওড়ার পুরাতন ষ্টেশনে প্রথমে মাত্র দুইটি প্লাটফর্ম ছিল, পরে আর একটি প্লাটফরম নির্ম্মিত হয়। এই তিনটি প্লাটফর্মই হাওড়া ষ্টেশনে তখন যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহার পর বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ হাওড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে হাওড়ার নূতন ষ্টেশন নির্ম্মিত হয়। এই নূতন ষ্টেশনে এখন এগারটি প্লাটফর্ম আছে, কিন্তু তাহাতেও সকল গাড়ীর স্থান হয় না বলিয়া কোন কোন প্লাটফর্মে একসঙ্গে, অগ্রপশ্চাৎ করিয়া দুইখানি করিয়া ট্রেন রাখিতে হয়।

আজকাল হাওড়া ষ্টেশনে মোটর গাড়ী, বাস, ঘোড়ার গাড়ী এবং রিক্শ যাত্রী লইবার জন্য উপস্থিত থাকে, সেকালে সেইরূপ ঘোড়ার গাড়ী এবং পাল্কী থাকিত। মোটর গাড়ী তখন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, রিক্শর নামগন্ধও ছিল না। কলিকাতার ভিতরে, সর্ব্বত্রই পাল্কীর আড্ডা ছিল। কলিকাতার বড় বড় রাজপথে ট্রাম চলিত, তাহাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। সে ট্রামগাড়ী ঘোড়ায় টানিত। প্রায় এক মাইল অন্তর ঘোড়া বদল করিবার আড্ডা ছিল। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে, দারুণ গ্রীষ্মের সময় প্রায় প্রত্যহই ট্রামের দুই-একটা ঘোড়া সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মারা যাইত। সেকালে কলিকাতায় মাল বহনের জন্য মহিষের গাড়ী অপেক্ষা গরুর গাড়ীর সংখ্যা অধিক ছিল।

এখনকার পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে বাইসিক্‌ল প্রায় দেখা যাইত না। এখন যেরূপ বাইসিক্‌লের দুই খানি চাকাই সমান, সেকালে প্রথমে যে-সকল বাইসিক্‌লের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা অন্যরূপ ছিল। তাহার একখানি চাকা বড়—তিন হাত বা সাড়ে তিন হাত ব্যাসের, আর একখানি অতি ক্ষুদ্র নয় ইঞ্চ বা দশ ইঞ্চ ব্যাসের। বড় চাকার উপর আরোহী উপবেশন করিত, ছোট চাকাখানা বড় চাকার পশ্চাতে থাকিত। এই ছোট চাকার সাহায্যে বাইসিক্‌লকে মোড় ফিরাইতে পারা যাইত। এই বাইসিক্‌লের নাম ছিল 'হাই হুইল বাইসিক্‌ল' বা উচ্চ-চাকাযুক্ত বাইসিক্‌ল। এই বাইসিক্‌লে আরোহণ করা বড়ই কঠিন ছিল। আরোহণ অভ্যাস করিবার সময় আরোহীকে যে কতবার আছাড় খাইতে হইত তাহার সংখ্যা নাই। সেই জন্য হাই হুইল বাইসিক্‌লের প্রচলন অতি অল্পই ছিল। সেকালে বয়স্ক ব্যক্তিদের আরোহণের জন্য 'ট্রাইসিক্‌ল' ছিল। একালে শিশু ও অল্পবয়স্ক বালকদিগের জন্য যেরূপ ট্রাইসিক্‌ল দেখিতে পাওয়া যায়, সেকালে ঐরূপ বড় ট্রাই-

সিকলে বয়স্ক ব্যক্তিরা আরোহণ করিতেন। এখনকার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যখন পার্ক ষ্টীটে থাকিতেন, তখন তিনি প্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে ট্রাইসিক্‌লে আরোহণ করিয়া গড়ের মাঠে ভ্রমণ করিতেন। আমি তাঁহাকে চারি-পাঁচ দিন ঐরূপ প্রাতঃকালে ট্রাইসিক্‌লে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি।

সেকালে আপিস-অঞ্চলে প্রত্যেক বড় বড় আপিসের সম্মুখে শত শত ঘোড়ার গাড়ী দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন মোটর গাড়ী সেই সকল ঘোড়ার গাড়ীর স্থান অধিকার করিয়াছে। সকল আপিসেরই মোটা বেতনের শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় কর্ম্মচারীরা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আপিসে যাইতেন। আপিসের বাঙালী "বড়বাবুদে"র অনেকেই পাল্কী করিয়া আপিসে যাইতেন। শ্বেতাঙ্গগণের মধ্যে অনেকের ঘোড়া ছিল, তাঁহারা অশ্বারোহণে আপিসে যাতায়াত করিতেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এক জন শ্বেতাঙ্গ একদিন অশ্বারোহণে আপিসে আসিয়া অশ্ব হইতে নামিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে জিন্‌টা একটু ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তিনি সহিসকে জিন্‌টা দেখাইয়া বলিলেন, "অমুক সাহেব-কোম্পানীর দোকান হইতে জিন্‌টা মেরামত করিয়া আনিও।" সহিস ভাবিল, সাহেব-কোম্পানী হয়ত মেরামত করিতে দুই টাকা চাহিয়া বসিবে অথচ লালবাজারে যে-কোন মুচি চারি আনায় মেরামত করিয়া দিবে। এই ভাবিয়া সে লালবাজারে দেশী মুচির দ্বারাই জিন্‌টি মেরামত করাইয়া আনিল। বৈকালে আপিস বন্ধ হইলে সাহেব ঘোড়ায় চড়িবার সময় জিন্ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "কত খরচ হইল ?" সহিস উত্তর করিল, "বার আনা।" সাহেব-কোম্পানী বার আনা মাত্র পারিশ্রমিক লইয়া জিন মেরামত করিয়াছে শুনিয়া সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করিলে সহিস বলিল যে সাহেব-কোম্পানী দুই টাকা মজুরী চাহিয়াছিল, লালবাজারের দেশী মুচি বার আনায় মেরামত করিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র সাহেব ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া হস্তস্থিত চাবুক দ্বারা সহিসকে প্রহার করিতে করিতে বলিলেন, "শূয়ার, তুই আমার বার আনা বরবাদ করিয়াছিস্; সাহেব-কোম্পানী দুই টাকা লইলে সে টাকা আমার দেশে যাইত। এই বার আনার সমস্তই এদেশে থাকিয়া যাইবে।" এই ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ইংরেজদের স্বাদেশিকতা ও আমাদের স্বাদেশিকতার মধ্যে কিরূপ প্রভেদ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার পিতা কটক হইতে সিউড়ীতে বদলী হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৬৮ বা ৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কটকে গিয়াছিলেন, তখন আমার বয়স এক বৎসর মাত্র, সুতরাং সেকথা আমার মনে নাই। কটকে প্রায় পাঁচ বৎসর অবস্থান করিবার পর তিনি একবার শীতকালে কয়েক মাসের ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন। ছুটির শেষে তিনি যখন দ্বিতীয় বার কটকে যান, তখন কলিকাতা হইতে উড়িষ্যার চাঁদবালী পর্য্যন্ত জলপথে ষ্টীমারে গিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম আমরা 'মেরী গ্রাণ্ট' নামক একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমারে বঙ্গোপসাগর দিয়া ধামরা নদীর মোহনা পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম এবং তথা হইতে নৌকা- ও শকট- যোগে, বোধ হয় তিন-চারি দিনে কটকে গিয়াছিলাম। সেই ষ্টীমার-যাত্রার কথা আমার এখন এই বৃদ্ধ বয়সে বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের মত অল্প অল্প মনে পড়ে। আমার পিতা প্রথমে যখন কটকে যান তখন ষ্টীমারে করিয়া উড়িষ্যায় যাইবার ব্যবস্থা ছিল না, স্থলপথে মেদিনীপুর, বালেশ্বর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া পদব্রজে বা গোশকটে করিয়া যাইতে হইত। ছুটির শেষে কটকে গিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আমার পিতাকে সেখানে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই, বোধ হয় এক বৎসরের মধ্যেই তিনি সিউড়ীতে বদলী হইয়া চিরকালের জন্য উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এক বৎসরের মধ্যে দুই বার স্থলপথে উড়িষ্যা হইতে বাংলায় আসাতে সেই আগমনের কথা আমার কিছু কিছু মনে আছে। অধিকন্তু দেশে আসিবার পর আমার পিতা এবং জননী আত্মীয়-বন্ধুদের নিকটে উড়িষ্যার পথের দুর্গমতার কথা, সুবিধা-অসুবিধার কথা বর্ণনা করাতে আমার মনেও সেই পথের স্মৃতি এখন পর্য্যন্ত অনেকটা জাগরূক আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের পুরী এক্সপ্রেসে পুরীতে গিয়াছিলাম, তখন মহানদীর পুল পার হইয়া শেষরাত্রিতে ট্রেন কটক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে আমার মনে হইল—এই সেই কটক, যেখানে আমার পিতা বাষট্টি-তেষট্টি বৎসর পূর্ব্বে দুইটি শিশুপুত্র, পত্নী, এক জন বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী এবং বালক-ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া চন্দননগর হইতে বাইশ দিনে কটকে আসিয়াছিলেন, আজ আমি সেই

কটকে, হাওড়া হইতে সাত-আট ঘণ্টায় গাড়ীতে ঘুমাইতে ঘুমাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেকালে দূর দেশে গমন যে কিরূপ ব্যয়সাধ্য এবং কষ্টসাধ্য ছিল, তাহা এখনকার যুবক ও প্রৌঢ় লোকেরা বোধ হয় ধারণা করিতেও অসমর্থ। আমার অনেক সময় মনে হয়, আরও পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পরে যখন বিমান বা নব-আবিষ্কৃত অন্য কোনরূপ যানের সাহায্যে লোকে ঘণ্টায় এক শত দেড় শত মাইল বা তাহারও অধিক গমন করিবে, তখন তাহারা বিস্মিত হইয়া ভাবিবে, দিল্লী, এলাহাবাদ, কাশী, পুরী যাইতে হইলে সেকালের লোকে কি করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ীতে বসিয়া থাকিত? না জানি তাহাদের কত কষ্টই হইত!

আমার পিতা কটক হইতে বদলী হইয়া বাংলায় আসিবার সময় কিরূপে সুদীর্ঘ পথ অতিবাহন করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি আমার মনে জাগরূক আছে। তিনখানি গরুর গাড়ী দৈনিক পারিশ্রমিক হিসাবে ভাড়া করা হইয়াছিল। সে পারিশ্রমিক কত তাহা আমি জানি না। প্রাতঃকালে আহারাদির পর আমরা অর্থাৎ আমার জননী, আমার তিন সহোদর এবং একটি ভগিনী এই পাঁচ জনে আমরা একখানি গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। আমার মাতুল অন্য একখানি গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার গাড়ীতে কয়েকটি বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি ছিল। তৃতীয় গাড়ীতে কেবল মালপত্র বোঝাই করা হইল। পূর্ব্বদিন কটক-প্রবাসী বাঙালী বাবুরা বাবাকে বিদায় দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের যাত্রার সময় আমাদের বাসাতে আসিয়াছিলেন। আমার পিতার ছাত্রগণ আমাদের বাসাতে আসিয়া একটি উড়িয়া কবিতায় বিদায়-অভিনন্দন সুর করিয়া পাঠ করিলেন এবং সেই অভিনন্দনপত্রখানি বাবার হাতে দিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন, বাবাও প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ এবং আলিঙ্গন করিলে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইল। ছাত্রগণ বলিলেন যে তাঁহারা আমাদের সঙ্গে মহানদীর তীর পর্য্যন্ত যাইবেন। সেই জন্য বাবা গাড়ীতে না উঠিয়া ছাত্রদের সঙ্গে পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। আমাদের বাসা হইতে মহানদীর দূরত্ব প্রায় এক ক্রোশ।

মহানদীতে জোড়া-নৌকায় খেয়া পার হইত। দুইখানি অতি-বৃহৎ নৌকা পাশাপাশি বাঁধা থাকিত। সেই নৌকাতে একসঙ্গে পাঁচ-সাতখানা গরুর গাড়ী, পাঁচ-সাত জোড়া বলদ, বিশ-পঁচিশ জন আরোহী এবং মালপত্র বোঝাই করিতে পারা যাইত। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে সেই নৌকা কত বড় ছিল। আমরা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নৌকা আমাদের জন্য ঘাটে অপেক্ষা করিতেছে, তিন-চারিখানা গরুর গাড়ী, গরু এবং বহু যাত্রী তখন নৌকায় উঠিয়াছে। নৌকায় প্লাটফর্ম বা চাতাল হইতে ডাঙ্গা পর্য্যন্ত খুব লম্বাচওড়া এবং পুরু তক্তা পাতা ছিল, তাহার উপর দিয়া মালপত্রসহ গাড়ীগুলি নৌকার উপরে উঠানো হইল। নৌকার উপর গাড়ী উঠাইবার সময় নৌকায় দাঁড়ী-মাঝিরাও প্রাণপণশক্তিতে গাড়ীগুলি ঠেলিয়া গরুগুলিকে সাহায্য করিল। তাহার পর আমরা নৌকার উপর উঠিলাম, বাবা তখনও নদীর তীরে তাঁহার ছাত্রগণের সহিত কথা কহিতেছিলেন। অবশেষে আর এক বার প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গনের পর বাবা অশ্রু-সিক্তনয়নে ধীরে ধীরে চিরকালের জন্য ছাত্রগণের নিকট বিদায় লইয়া নৌকাতে উঠিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল। সরলপ্রাণ উড়িয়া ছাত্রগণ তীরে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাবাও নৌকায় উঠিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বে নৌকায় উঠিবার সিঁড়ি-স্বরূপ তক্তাগুলি টানিয়া নৌকার উপর তোলা হইল, এবং নৌকায় যেস্থানে তক্তা লাগানো হইয়াছিল, সেই স্থানটায় রেলিং বা বেড়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

উড়িষ্যাতে নদী পার হইবার জন্য যে-সকল খেয়ানৌকা ছিল, তাহার প্লাটফর্মের চতুর্দ্দিকই বেড়া দিয়া ঘেরা থাকিত। গরু, গাড়ী ও যাত্রীদের ওঠা-নামার জন্য দুই পার্শ্বের খানিকটা অংশ খোলা থাকিত, নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বে সেই স্থানটাও বেড়া দেওয়া হইত। উড়িষ্যায় অধিকাংশ নদীতেই ভয়ানক কুম্ভীরের উপদ্রব ছিল। অনেক সময় তাহারা নাকি নৌকার উপর হইতে মানুষ টানিয়া লইয়া যাইত। সেই কুম্ভীরের আক্রমণ হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় সকল নৌকাতেই ঐরূপ বেড়া দেওয়া হইত। আমি পূর্ব্বে নৌকার দাঁড়ী-মাঝির উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু দাঁড়ী শব্দটা ব্যবহার করা ঠিক হয় নাই। কারণ সে নৌকায় দাঁড় ছিল না। দুই জন মাঝি দুইখানা নৌকার হাল ধরিয়াছিল, আর অন্য নাবিকেরা "লগি" বা সুদীর্ঘ বাঁশের সাহায্যে নৌকাকে

ঠেলিতে ঠেলিতে এক পার হইতে অন্য পারে লইয়া যাইত। নৌকার উপরে কোনরূপ আচ্ছাদন ছিল না, আরোহীরা রৌদ্র-বৃষ্টি মাথায় করিয়া বসিয়া থাকিত। আমরা গাড়ীর ভিতরে গিয়া আশ্রয় লইলাম, আমার পিতা ছাতা মাথায় দিয়া নৌকার উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার ছাত্রগণকে দেখিতে লাগিলেন।

বোধ হয় দুই তিন ঘণ্টা পরে, নদীর পরপারে নৌকা উপস্থিত হইলে, বেড়া খুলিয়া তক্তা পাতা হইল, একে একে গরু, গাড়ী, আরোহী সকলে তীরে অবতরণ করিল। আমরা ডাঙ্গায় উঠিয়া দেখিলাম, অনেক যাত্রী ও কয়েকখানা গাড়ী, দুইখানা পাল্কী নদী পার হইবার জন্য তীরে অপেক্ষা করিতেছে। আমরা নৌকা ত্যাগ করিলে আবার তাহাদিগকে নৌকায় উঠাইবার পালা আরম্ভ হইল। মহানদীর উত্তর তীরে আসিয়া আমার পিতা একখানা গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। আমাদের আবার যাত্রা আরম্ভ হইল।

যে-রাজপথ দিয়া গাড়ী চলিতেছিল, তাহা পুরী রোড নামে প্রসিদ্ধ। ঐ রাজপথ নাকি বর্দ্ধমান হইতে পুরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক প্রভৃতি নগরের ভিতর দিয়া ঐ পথ পুরী পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেকালে যখন ষ্টীমার বা রেলপথ ছিল না, তখন প্রত্যহ শত শত লোক ঐ পথ দিয়াই উড়িষ্যা এবং বঙ্গদেশের মধ্যে যাতায়াত করিত। এখন বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ হওয়াতে ঐ পথ একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে; স্থানীয় অধিবাসী ব্যতীত আর কেহ ঐ পথে যাতায়াত করে না। সেই পথ ধরিয়া আমাদের গাড়ী সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটা "চটী"তে উপস্থিত হইল। এই চটী সেকালের যাত্রীদিগকে দিগন্তবিস্তৃত পথে আশ্রয় দিত। চটিগুলি একখানা বা দুইখানা দোকান এবং কতকগুলি তৃণাচ্ছাদিত কুটীর ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাজপথের এক পার্শ্বে বা উভয় পার্শ্বে কতকগুলি চালাঘর, তাহার মধ্যে একখানা বা দুইখানা দোকান। সেই দোকানে চাল, ডাল, তরিতরকারী, হাঁড়ি, কাঠ, ঘুঁটে, তেল, নুন প্রভৃতি বিক্রয় হইত। দোকানদারই চটীর মালিক, সেই-ই যাত্রীদিগকে ঘরভাড়া দিত এবং তাহাদের আহার্য্য সরবরাহ করিত। পুরী রোডের উপর তিন-চারি, কোথাও বা পাঁচ-ছয় ক্রোশ অন্তর এক-একটা চটী ছিল।

আমরা কটক হইতে যাত্রা করিবার সময় চাল, ডাল, ঘি, নুন, তেল প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম; তরি-তরকারীও কয়েক দিনের মত ছিল। আমাদের গাড়ী চটীতে উপস্থিত হইলে বাবা দুইখানি ঘর দেখিয়া লইলেন, এবং চটীওয়ালা বা দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে চটীতে রাত্রিযাপন করে কি না। যাঁহারা সেকালে উড়িষ্যার পথে দুই-চারি বার যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রশ্নের সার্থকতা বুঝিতেন। চটীওয়ালা চটীতে রাত্রিযাপন করিবে শুনিলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন। যে চটীতে চটীওয়ালা রাত্রিযাপন করিত না, সেই চটীতে রাত্রিকালে প্রায়ই চুরি এবং ডাকাতি হইত। অনেক সময় চটীওয়ালারাই চোর ও ডাকাতদিগকে সংবাদ দিত। চটীওয়ালা যদি সন্দেহ করিত যে যাত্রীদের নিকটে টাকাকড় এবং অলঙ্কারাদি আছে, তাহা হইলে সেই চটীওয়ালাই ডাকাতের দলে সংবাদ দিত। যে-সকল চটী গ্রামের নিকটে ছিল, সেই সকল চটীতে প্রায়ই ডাকাতি হইত না, কারণ সেই চটীতে ডাকাতি হইলে পুলিস আসিয়া গ্রামবাসীদিগকে পীড়ন করিত, কিন্তু সকল চটী গ্রামের নিকটে ছিল না, অনেক চটী গ্রাম হইতে তিন-চারি ক্রোশ দূরেও থাকিত।

উড়িষ্যায় ডাকাতেরা কেবল যাত্রীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, তাহারা যাত্রীদিগকে টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া রাখিয়া যাইত, শিশু, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক সকলকেই হত্যা করিত। এই ভীষণ প্রকৃতির ডাকাতগণ উড়িষ্যার পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী, অসভ্য অনার্য্য। তাহারা যেরূপ নিষ্ঠুর, তেমনই নির্ভীক। ডাকাত পড়িলে কোন যাত্রী পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবে, তাহারও উপায় ছিল না, কারণ ত্রিশ-চল্লিশ জন দস্যু গভীর রাত্রিতে চতুর্দ্দিক হইতে চটী বেষ্টন করিয়া যাত্রীদিগকে আক্রমণ করিত। তাহাদের এক হাতে প্রজ্জ্বলিত মশাল ও অন্য হাতে উন্মুক্ত তরবারি থাকিত। লুণ্ঠনের পর তাহারা চটীর সন্নিহিত বন, জঙ্গল, জলাশয়, ধান্যক্ষেত্র প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া দেখিত যে কেহ লুকাইয়া আছে কি না। চটীওয়ালারা অনেক সময় যাত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিত যে তাহারা কোথা হইতে আসিতেছে এবং কোথায় যাইবে। ঐরূপ প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাত্রীরা যদি কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে

আগমন এবং কোন দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতেছে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট পাথেয় হিসাবেও অধিক টাকা থাকিবার সম্ভাবনা, চটীওয়ালারা এইরূপ অনুমান করিত।

আমরা প্রথম চটীতে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন খুব ভোরে, এমন কি অন্ধকার থাকিতে থাকিতে, যাত্রা আরম্ভ করিয়া বেলা সাড়ে নয়টা-দশটার সময় আর এক চটীতে উপস্থিত হইলাম। এই চটীতে হাঁড়ি ও কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আর রন্ধন হয় নাই, মা কটক হইতে খাবার প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। সকল চটীতেই দুধ এবং অনেক চটীতে মাছ কিনিতে পাওয়া যাইত। চটীওয়ালারা দুধ ও মাছ রাখিত না, গ্রামান্তর হইতে স্ত্রীলোকেরা দুধ ও মাছ চটীতে বিক্রয় করিতে আসিত। তাহারা জানিত যে বেলা দশটা-এগারটায় এবং সন্ধ্যার সময় চটীতে যাত্রীরা আসিয়া থাকে, সেই জন্য তাহারা ঐ সময় নিজ নিজ পণ্য লইয়া চটীতে উপস্থিত হইত। যে দুগ্ধ বিক্রয় হইত, তাহা কাঁচা দুগ্ধ নহে, জাল-দেওয়া দুগ্ধ। অনেক সময় পথিমধ্যেও ঐরূপ জাল-দেওয়া দুগ্ধ কিনিতে পাওয়া যাইত। যে-সকল গরুর গাড়ী উড়িষ্যা হইতে মেদিনীপুরে যাতায়াত করিত, সেই সকল গাড়ীর গাড়োয়ানেরা জানিত যে কোন্ চটীতে রাত্রিযাপন নিরাপদ, কোন চটীতে ভাল তরিতরকারী পাওয়া যায়। সেই জন্য অনেক সময় তাহাদের প্রস্তাব অনুসারে চটীতে রাত্রিযাপন বা পরবর্ত্তী চটীর জন্য তরিতরকারী সংগ্রহ করা হইত। প্রাতে আহারাদির পর মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম এবং বেলা তিনটা সাড়ে-তিনটার সময় আবার যাত্রা আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার সময় আর এক চটীতে আশ্রয় গ্রহণ, এইরূপে আঠার-উনিশ দিন অতিবাহনের পর মেদিনীপুর হইতে কটক বা কটক হইতে মেদিনীপুরে যাতায়াত হইত।

শেষবারে কটক হইতে আসিবার সময় আমরা একবার ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরের অপার করুণায় আমরা রক্ষা পাইয়াছিলাম। সেই কাহিনী বিবৃত করিয়া আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বালেশ্বর এবং মেদিনীপুর জেলার মধ্যে দাঁতন নামক একটা স্থান আছে। আমরা সন্ধ্যার পর সেই দাঁতনের চটীতে উপস্থিত হইলাম। আমার পিতার প্রশ্নের উত্তরে চটীওয়ালা বলিল যে, সে চটীতেই রাত্রি যাপন করে। তাহার কথা শুনিয়া পিতা নিশ্চিন্ত হইলেন, মা রন্ধনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার মাতুল লক্ষ্য করিলেন যে আমাদের উপস্থিতির পর এক জনের পর এক জন ভীষণাকৃতি লোক সেই চটীওয়ালার সহিত অস্ফুট স্বরে বাক্যালাপ করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার মনে সন্দেহ হইল যে লক্ষণ শুভ নহে। রাত্রি প্রায় নয়টার সময় চটীওয়ালা আসিয়া বলিল, তাহার বাড়ি হইতে লোক ডাকিতে আসিয়াছে, তাহাকে বাড়িতে যাইতে হইবে। মামা তাহাতে আপত্তি করিলেন, বাবা পুলিসের ভয় দেখাইলেন, কিন্তু সে কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রস্থান করিল। আমাদের চটীতে উপস্থিত হইবার কিছু পরে মেদিনীপুরের দিক হইতে তিনখানা গাড়ী আসিয়া চটীর উত্তর দিকে আশ্রয় লইয়াছিল, আমরা চটীর দক্ষিণ প্রান্তে ছিলাম। সেই গাড়ীর আরোহীদের সহিত কথাবার্ত্তার অবসর হয় নাই, সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় আমাদের এক জন গাড়োয়ান আসিয়া সংবাদ দিল যে ডাকাত আসিতেছে! সেই কথা শুনিয়া বাবা এবং মামা পথে বাহির হইয়া দেখিলেন, চটী হইতে অনেক দূরে, পথের উত্তরে ও দক্ষিণে দুই সারি আলোক জ্বলিতেছে এবং সেই আলোকমালা ধীরে ধীরে চটীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহা দেখিয়া বাবা চটীর উত্তর দিকে সমাগত যাত্রীদিগকে সংবাদ দিতে গেলেন।

বাবা গিয়া দেখিলেন, এক জন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক এবং তাঁহার ছয় জন দ্বারবান তথায় রহিয়াছেন। বাবা সেই মারোয়াড়ী ভদ্রলোককে ডাকাতদলের আগমন-সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, "আপনাদের কোন ভয় নাই। আমি রেশমী কাপড়ের ব্যবসা করি, সর্ব্বদা পাঁচ-সাত হাজার টাকা মূল্যের কাপড় লইয়া আমাকে এই পথে যাতায়াত করিতে হয় বলিয়া ছয় জন দ্বারবান সঙ্গে রাখি। উহাদের প্রত্যেকের এবং আমার সঙ্গে দুই-নলা বন্দুক আছে। ডাকাত-দিগকে এই চটীতে পঁহুছিতে হইবে না। এই বলিয়া তিনি দ্বারবানদিগকে বন্দুক লইয়া প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন এবং আমার জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বাবার সঙ্গে আমাদের বাসার কাছে আসিলেন। ডাকাতেরা তখন অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। তিনি আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা

করিয়া দ্বারবানদিগকে বন্দুকের মুখ আকাশের দিকে করিয়া আওয়াজ করিতে বলিলেন। বন্দুকের শব্দ শুনিবামাত্র ডাকাতেরা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। পাঁচ-ছয় মিনিট পরে আবার বন্দুকের শব্দ হইলে দস্যুদল মশাল নিবাইয়া অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গেল! পাছে তাহারা অন্ধকারে আসিয়া আক্রমণ করে, সেই জন্য প্রভুর আদেশে দ্বারবানেরা সমস্ত রাত্রি পথে টহল দিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বন্দুকের শব্দ করিতে লাগিল। আমার মনে পড়ে, প্রথম বার বন্দুকের শব্দ হওয়াতে আমি ও দাদা ডাকাত পড়িয়াছে মনে করিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলাম।

পরদিন ভোরবেলা আমাদের প্রাণরক্ষাকারী সেই মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বাবা বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনিও পথে আর কোথাও ডাকাতের ভয় নাই বলিয়া আমার জননীকে আশ্বস্ত করিয়া দক্ষিণ মুখে সদলে প্রস্থান করিলেন, আমরাও নির্বিঘ্নে বাংলায় প্রবেশ করিলাম।

এক পয়সার লেবু

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দশটায় আপিস ছুটিতেছিলাম। নেহাৎ খাওয়ার পরই ছুটাছুটি করিতে পারি না বলিয়া ট্রামে একটি আনি সেলামী দিতে হয় প্রত্যহ। পয়সা দিয়াও কিন্তু ছুটাছুটির দায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই না। এদিকে ট্রাম ধরিতে খানিকটা রাস্তা হাঁটিতে হয়, ওদিকে ট্রাম হইতে নামিয়াও দশ-বারো মিনিট পা চালাইতে হয়। মাঝে মিনিট-কুড়ির পথ এক আনা দক্ষিণা দিয়া পাঁচ মিনিটে পার হই। ওই টুকুই যা বিশ্রাম!

ট্রামে উঠিয়াই দেখি, গোঁফ-কামানো বরেন ও-দিকের কোণে বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছে ও চারি-চক্ষু হইয়া পথের ও-পারের দৃশ্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। এই মনোনিবেশের অর্থ বুঝি। কণ্ডাক্টার আসিয়া যখন ওই সারিতে টিকেটের জন্য আরোহীদের কাছে হাত পাতে, বরেন তখন বিশ্বজগৎ ভুলিয়া পথের পানে চাহিয়া থাকে; কণ্ডাক্টারের মৃদু কথা বরেনের কানে পৌছায় না। কিন্তু বিবাদ বাধে চেকার উঠিলেই। সে আরোহীদের তন্ময়তা ভাঙাইতে সুদক্ষ। কথার জবাব না পাইলে গায়ে হাত দিয়া আত্মবিস্মৃতের ধ্যান ভঙ্গ করে। সে ধ্যানভঙ্গের ফলে ব্যাগের পয়সা-কটিই নষ্ট হইয়া যায়!

কণ্ডাক্টার আসিল এবং চলিয়া গেল। ফাঁড়া কাটিয়া যাওয়ায় উল্লসিত বরেন আমায় ডাকিল,—এদিকে আসুন দাদা, একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাই।

হতভাগাটার উপর রাগ হইল। দিব্য ফাঁকি দিয়া চলিয়াছে, আর আমি ট্রামের পাদানিতে পা দিয়াছি কি কণ্ডাক্টারের প্রসারিত হাত চোখের সামনে। একই আপিসে কাজ করি, মাহিনাও সমান, ট্রামে চাপি দু-জনেই, এক জনের বাঁচে শুধু সময়, অন্যের বাঁচে তার সঙ্গে অর্থ। রাগ ইহাতে কাহার না হয়? ইচ্ছা হইল কণ্ডাক্টারকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিয়া দিই। কেরানীর মনোভাব কেরানী হইয়া না বুঝিলে বৃথাই উপরওয়ালার মন জোগাইয়া আপিসের চাকরি করা। বরেন আমার মুখের বিরক্তিতে নিজের বিপদ আশঙ্কা করিয়াই বোধ করি সমাদরে কাছে বসিতে ডাকিতেছে! ছোকরার বুদ্ধি আছে।

কি করি, ডাকাডাকিতে বরেনের কাছে গিয়াই বসিলাম। যেমন বসা সঙ্গে সঙ্গে 'গেল গেল' রবে ঘ্যাচ করিয়া ট্রাম গেল থামিয়া।

দেখিতে দেখিতে চারি দিকে লোক জমিয়া গেল। ব্যাপার কি?

এক রিক্‌শওয়ালা চলন্ত ট্রামের সামনে দিয়া ওপারে যাইবার চেষ্টা করাতেই এই দুর্ঘটনা। ট্রাম বাঁধিতে-না-বাঁধিতে রিক্‌শখানি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, চালকের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

কিন্তু তদপেক্ষা আশঙ্কাজনক আমার অবস্থা। আপিসে ইতিমধ্যেই তিন দিন লেট হইয়াছে, আজ হইলে একদিনের ছুটি কাটা যাইবে। ছুটিতে না কুলাইলে মাহিনায় টান ধরে, কৈফিয়ৎও উপরন্তু। হতভাগা বে-হিসাবী জানোয়ার (জানোয়ার নহিলে আর গাড়ী টানে কে?) ট্রামের লাইনটা ছাড়িয়া চলিতে কি ভূতে ধরে? ওপারে এক জন আরোহী দেখিয়াছে কি মরণ-বাঁচন তুচ্ছ করিয়া চলন্ত ট্রামের সম্মুখেই দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে! আর যত গোলযোগ আপিস যাইবার মুখে। ট্রাম কত ক্ষণ দাঁড়াইবে, কে জানে! হাঁটিয়া গেলেও 'লেট' বাঁচিবে না।

বসিয়া বসিয়া লোকটার মুণ্ডপাত করিতে লাগিলাম। কত লোক 'আহা' বলিল, কত লোক নামিয়া লোকটাকে দেখিতে গেল। কিন্তু 'আহা'ই বলুন আর নামিয়াই দেখুন—আন্তরিকতা কাহারও মধ্যে দেখিলাম না। যিনি 'আহা' বলিতেছেন তিনি পরক্ষণে হাসিয়া উহাদের জ্ঞানহীনতার উল্লেখ করিয়া ধিক্কার দিতেছেন, যাঁহারা নামিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা উঠিয়া আসিয়া লোকটার চেহারা, আঘাতের গুরুত্ব, রিক্‌শর অবস্থা ইত্যাদি বলিয়া পাশের লোকগুলিকে বিস্ময়ে হাবুডুবু খাওয়াইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন।

আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল বরেনের কথায়,—দেখলেন, দাদা, কাণ্ড! যত বাধা আপিস যাবার বেলায়? আইন করা উচিত ট্রাম-লাইন দিয়ে অন্য গাড়ী চললে মোটারকম জরিমানা হবে। তবে ব্যাটারা জব্দ হয়!

অনেকে এ কথায় সায় দিলেন। ট্রামটা এই সময়ে কেরানীকুলেই ভর্ত্তি থাকে কিনা!

আপিসে সেদিন কাজও যা আসিল মেজাজ বিগড়াইবার মত। দুর্ঘটনার গল্পটায় বিশেষ রঙের পোঁচ দেওয়া গেল না, বাজার-দর বা গৃহের সংবাদও রহিল আলোচনার বাহিরে।

ভূষণ নূতন লোক। প্রত্যেক দিন কাজ বুঝিতে আমার পাশের টুলটিতে আসিয়া বসে। আজও বসিল।

বসিয়া বলিল,—কি কাজ করতে হবে, দাদা?

মুখ না তুলিয়া বলিলাম,—জানি না। ক'দিন ত শেখালুম, দেখে নিন।

সে নরম গলায় বলিল,—আপনি একটু বুঝিয়ে না দিলে—

রুক্ষ কণ্ঠে বলিলাম,—তা হ'লে আমার কাজ ফেলে আপনাকে নিয়েই থাকি! ভারি আমার চাকরি! দেখে-শুনে বুঝে নিন।

চাপরাশী গ্লাসে জল দিয়া গিয়াছিল। তাহাকে ধমকাইয়া বলিলাম,—নবাবপুত্তুর, ক'দিন গেলাস মাজ নি কেন? যা, ভাল ক'রে গেলাস ধুয়ে জল দে।

রমেন বাবু প্রবীণ লোক। হাসিয়া বলিলেন,—যোগেনের কি আজ শরীর ভাল নেই?

তাঁহাকেও বেশ একটু জোর গলায় বলিলাম,—দেখুন না, একরাশ কাজ—ওঁরা এলেন বক্ বক্ করতে। কাজ করি, না বকি?

তার পর সাহেবের ঘরে গিয়া মেজাজ একেবারে বদলাইয়া গেল। লম্বা সেলাম, মুখখানিতে হাসিমাখানো, বেশ একটা চটপটে ভাব। কাজ যত কর না-কর সাহেবের সামনে সর্ব্বদা সপ্রতিভ থাকিবে ও চঞ্চল হইয়া ঘোরাফেরা করিবে—এই উপদেশ দিয়াছিলেন আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়বাবু প্রথম যখন আপিসে আসি। সেলাম বার-কয়েক বেশী করিলেও লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। পঁচিশ বৎসরে বুঝিয়াছি ওই উপদেশমালা বাঁধাইয়া প্রত্যেক কেরানীর শয়নকক্ষে টাঙাইয়া রাখা উচিত। আরও অনেকগুলি উপদেশ আছে, কিন্তু সেগুলি 'কেরানী কথামৃত' বলিয়া একখানি বই যদি কেহ কোনদিন প্রকাশ করেন তাঁহাকেই বলিবার ইচ্ছা রহিল। লেখক হইলে এত দিন বই লিখিয়া প্রকাশকের দ্বারস্থ হইতাম।

আপিসের একঘেয়ে কথা অনেকের ভাল না লাগিতে পারে সুতরাং এ কথা যাক।

বাড়ি আসিতেই মেজমেয়ে করুণা নাকি সুরে বায়না ধরিল,—বাবা,—বাবা—

তাহাকে একটা চড় কসাইয়া দিতেই সুর গিয়া তারাগ্রামে উঠিল। গৃহিণী আসিয়া কি বলিবার উপক্রম করিতেই বলিলাম,—শরীরটা ভাল নেই, ঘরে দোর দিয়ে খানিকটা ঘুমবো—কেউ যেন ডেকে বিরক্ত ক'রো না।

মেয়েটার মাথায় হাত দিয়া আদর করিলাম,—কাঁদে না, লক্ষীটি। কাল তোর বাঁশী এনে দেব।

ঘরে দুয়ার দিয়া বিছানাটি পাতিয়াছি অমনি মৃদু করাঘাত।

—কে রে?—

—বাবা, ফণিবাবু ডাকছে।—বড় মেয়ের গলা।

—বল, বাড়ি নেই।

মেয়ে অমনি চেঁচাইতে সুরু করিল,—বাবা ব'ললে—

দুয়ারে ধাক্কা দিয়া হাঁকিলাম, এই পোড়ারমুখী—

পোড়ারমুখী তখন সবটা বলিয়া ফেলিয়াছে।

ফণিবাবু মেয়ের কথায় চলিয়া গিয়াছেন। কি বুঝিলেন জানি না, কাল রহস্যের বাতাসে আজিকার গ্লানিটুকু কাটাইয়া দিব। আট বছরের মেয়ে, একটুও বুদ্ধি নাই!

চোখ বুজিয়াছি কি—

—ওগো, এ বাড়িতে বিনোদবাবু আছে?

খোলা জানালা দিয়া চাহিলাম। জানালার নীচে সরু গলি, মিউনিসিপ্যালিটির কৃপাবর্জ্জিত, রাস্তা কাঁচা—আলো জ্বলে না। গলির ধারে সারি সারি অনেকগুলি খোলার ঘর। যাহারা তথায় বসতি করে আলোহীন গলির সঙ্গে সমতা তাহাদের যথেষ্টই। জানালার নীচেই যে-বাড়িখানি তাহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটি পনর-ষোল বছরের ছেলে—সঙ্গে তাহার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের এক যুবক। কণ্ঠস্বর যুবকের।

—ওগো শুনছ?

—কি গো? বলিয়া এক যুবতী দুয়ারের ও-পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

—বিনোদ ব'লে কেউ এখানে থাকে?

—না গো।

—ঠিক ক'রে বল।

—থাকে না।

—থাকে না? তাহ'লে বাড়ির ভেতরটা আমায় দেখতে হবে।

—বেশ ত দেখুন না।

পরে বাড়ির অন্যান্য সকলকে উদ্দেশ করিয়া হাসিয়া বলিল,—ওলো, তোদের ওখানে বিনোদ কেউ আছে? বিনোদ-ঠাম—

লোকটি এবার ধমকের সুরে বলিল,—যখন বাড়ি সার্চ্চ হবে তখন বুঝবে। এই, সিপাই বোলাও।

এবার দুয়ার গোড়ায় অনেকগুলি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—কি গো বাবু—কি হয়েছে?

বালকটিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া লোকটি বলিতে লাগিল,—এই ছেলেটা গড়গড়ার নল বেচছিল, এক-একটা চার আনা। তোমাদের বিনোদ চারটে নল নিয়ে দাম দিচ্ছি ব'লে এই বাড়িতে এসে ঢুকেছে।

চারিদিকে উঠিল মিশ্র কলধ্বনি,—এই বাড়িতে? না ত, বাবু! সে তাহ'লে জুয়োচোর। ওই চোরাগলি দিয়ে ভেগেছে। আপনি ত পুলিসের লোক, একটু দেখুন না। কত লোক এই গলি দিয়ে ওই দিকের রাস্তায় গিয়ে পড়ে। ইত্যাদি।

—তোমাদের, এখানে বিনোদ কেউ নেই?

—মা-কালীর দিব্যি—কেউ নেই। বিনোদ! কই ও-নামের কেউ ত কখনও আসে নি। আপনি দেখবেন আসুন না, বাবু।

রোরুদ্যমান ছেলেটিকে লইয়া লোকটা চলিয়া গেল। বোকা ছেলে! শহর কলিকাতা—দাম না লইয়া জিনিষ ছাড়িয়া দিলি কোন্ হিসাবে? তেমনই ভোগো প্রতিফল। ঠিক হইয়াছে। সেদিন রাধাবাজারের মোড়ে একটা লোকের নিকট হইতে একটি নল ছ-আনা দিয়া কিনিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বলিল, ঠকিয়াছি। অসাধু বিক্রেতা ভাল মানুস পাইলেই গলায় ছুরি বসাইতে কসুর করে না। চারিটা নল গিয়াছে, ভারি ত লোকসান! কয়েকটি খদ্দেরের মাথায় এই লোকসানের বোঝা চাপাইতে কত ক্ষণ! বেশ হইয়াছে।

একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিলাম। খানিকটা না পড়িতেই গলিতে সোরগোল উঠিল।

—চোর—চোর।

জানালা দিয়া মুখ বাড়াইলাম।

—চোর—চোর—চোর।

প্রথমে ছুটিয়াছেন এক ভদ্রলোক, তার পর দুই এক করিয়া বিভিন্ন জাতের ছেলে বুড়া যুবার দল।

চারি দিকে শব্দ উঠিয়াছে; চোর—চোর—

চোরা গলি, সর্ব্বত্র আবছা অন্ধকার—তস্কর কোথায় আত্মগোপন করিয়াছে সন্ধান পাওয়া শক্ত।

এক দিকে চীৎকার উঠিয়াছে—'চোর' 'চোর', অন্য দিকে হতাশ লোকগুলির ক্ষোভজনক মন্তব্য; আর চোর! সে বেটা এতক্ষণ ভেগেছে! আমি ধরেছিলুম মশায়, ভদ্রলোক ব'লে ছেড়ে দিলুম। উঃ, তখন যদি জানতুম?

অচিরেই সকলের ক্ষোভ দূর হইল, মুখগুলি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই ভদ্রলোকটি,—পুলিসের হাত ধরিয়া পিছনের লোকের কিল চড় খাইতে খাইতে দিব্য নির্ব্বিকার ভাবে নিরীহের মত চলিয়াছেন। ক্ষুব্ধ লোকগুলি একে একে হাতের চাঞ্চল্য দমন করিতে লাগিলেন—মুখে মধুর সম্বোধন। দোতলার জানালায় আমিও বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। হাত খানিকটা বাড়াইলাম, কিন্তু স্থূলশরীরে হাত যে অতদূর গিয়া পৌঁছায় না! এ সময়ে যদি একবার সূক্ষ্মশরীর পাইতাম? নীচে গিয়া দুই-এক ঘা দিয়া আসিব নাকি? দুয়ারের কাছে আসিতেই সহসা মনে হইল, হাতের কাজ আপাতত মুলতুবি থাক, সাক্ষীর সমন আসিলে সর্ব্বদেহেই প্রবল সুখানুভব করিতে পারিব। কাজ কি ছেড়া ল্যাটা জড়াইয়া। তাহার চেয়ে কিছু খাইয়া নিদ্রার আয়োজন করা যাক।

ও-বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিল। পাশ ফিরিয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছি, অল্প একটু তন্দ্রাও আসিয়াছে।

সহসা 'গেল', 'গেল' 'ও মাগো'—নাকি সুরে কান্না। তন্দ্রা টুটিয়া গেল।

খোলার বাড়ির মধ্যে বিনাইয়া বিনাইয়া একটি রমণী কাঁদিতেছে;—ও মাগো, এই যে রেখে গেনু, বলি এসেই ঢাকা দেব'খন। মুখপোড়া বেরাল যে ওই চালে ব'সেছিল গো। যেমন গেছি ঝপ্‌ ক'রে নেমে তুলে নে গেল গো। ওগো একটা নয় গো, দুটো গো।

অনেকগুলি স্ত্রীলোক জিহ্বাদ্বারা 'চুক্‌' 'চুক্‌' শব্দ করি[illegible] পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, আহা! আহা!

অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া নিদ্রাঘাতী 'চুক্‌' 'চুক্‌' শব্দ আর 'আহা'-ধ্বনি চলিতে লাগিল। বিনাইয়া বিনাইয়া রমণীও কাঁদিতে লাগিল। সহানুভূতি পাইয়াছে—কান্নার ত চার দুয়ার খোলা। ব্যাপার মাথা আর মুণ্ডু। দুটি গিনি-পিগের বাচ্চা বিড়াল লইয়া গিয়াছে। আপদ গিয়াছে। মাত্র একটি আছে। ওটিকেও যদি লইয়া যাইত ত আর এক রাত্রির রোদন ও 'আহা'র দায় হইতে রেহাই পাইতাম।

বহুক্ষণ ধরিয়া বিনিদ্রভাবে এপাশ-ওপাশ করিলাম। ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ শুনিতেছি আর নক্ষত্রভরা আকাশের পানে সকোপ দৃষ্টি হানিতেছি, আর সকাল হইতে যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছে সেইগুলি মনে হইতেছে। ভোরের দিকে ঘুম আসিল।

একটু বেলায় উঠিতেই দেখি, গরম জল ও লেবুর রস শিয়রের গোড়ায় কে রাখিয়া গিয়াছে।

প্রত্যহ একটি করিয়া লেবু রস করিয়া গরম জল মিশাইয়া সেবন করি। লেবুর রস গিলিয়া ধাতস্থ হইলাম এবং মনে পড়িল, কাল এই সময়ে চাকরটা লেবুর রস করিয়া যেমন দিতে আসিয়াছিল অমনই তাহার হাত হইতে গ্লাসটি পড়িয়া সবটুকু রস নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফলে মেজাজে কেমন একটা রুক্ষতা আসিয়াছিল। এবং শুধু রুক্ষতাই আসে নাই, আমার আমিত্বটুকু প্রখর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

প্রফুল্লমনে সেই জানালার ধারে আসিয়া বসিলাম। অনেকখানি বিস্তীর্ণ আকাশ চোখে পড়িল, মধুর একটি সুখস্পর্শ বহিয়া বায়ু আমায় অভিনন্দন জানাইল। ও[illegible] সুবিস্তীর্ণ নীলের পানে চোখ রাখিতেই গতকল্যের সঙ্কী[illegible] ধূমভরা খানিকটা বাষ্প বদ্ধ অন্তর হইতে যেন বাহির হইয়া গেল।

জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত সেই মরণোন্মুখ হতভাগ্য রিক্‌শওয়ালার কথা মনে পড়িল। আহা বেচারী! দু-পয়সার জন্য ট্রাম বাস তুচ্ছ করিয়া মুখে রক্ত তুলিয়া কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি বা শীত কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়ায়।

ঘরে তাহার বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে, আর আছে প্রকাণ্ড অভাব। যে-অভাবের তাড়নায় সারাদিন ও অর্দ্ধরাত্রি চলে তাহার ছুটাছুটি। উপার্জ্জনের প্রবল বাধা ট্রাম আর বাস। যেখানে ট্রাম চলে না, বাস মাথা গলায় না, সেইখানেই ঘণ্টা বাজাইয়া গরিবরা দু-পয়সা ট্যাঁকে গুঁজিতে পারে। হতভাগারা পরিশ্রমকে গ্রাহ্য করে না, মরণকে মানে না। ওপারে যাত্রী দখল করিতে গিয়া ট্রামের তলায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিল! আমাদের তুচ্ছ, আপিসের তুচ্ছতম হিসাব-নিকাশের পাশে তার জীবনকে মিলাইতে গিয়া দেখিলাম, মনের মধ্যে সত্যবোধের যে রং ধরিয়াছে তাহাতে ওই দিকটাই হইয়াছে উজ্জ্বল।

সন্তানবাৎসল্যে গিনিপিগের বাচ্চাগুলিকে পালন করিয়া যে নারী তাহাদের বিয়োগব্যথায় কাল রাত্রিতে হায় হায় করিয়া মরিতেছিল, তুচ্ছ নিদ্রার ব্যাঘাতে সে ব্যথা কাল মনে ঠাঁই পায় নাই, আজ তাহা অন্তর দিয়া গ্রহণ করিলাম।

নলবিক্রেতা ছেলেটির দুঃখও বুঝিতেছি। নির্ম্মম মহাজনের কোপ-দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ তাহার অন্ধকারে ডুবিতেছে।

আর তস্করের লুব্ধতা আমাদের মত সাধুদের অন্তরে যে প্রতিনিয়ত চাপা আগুনের মত জলিতেছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

নষ্ট হইয়াছিল এক পয়সার লেবু, সামান্য মাত্র স্বার্থের ক্ষতি; সেই অন্ধকারের তলায় কত বৃহৎ ক্ষতি তলাইয়া গেল।

হায় রে এক পয়সার লেবু!

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

কামনার কল্প-লোকে সুন্দরের স্বপন-পশারি
হে কবি, তোমারে নমি, অরূপের রূপের পূজারি!
যে অনাদি উৎস হ'তে আনন্দের অসীম অমৃত
সঙ্গীতের সুর-রশ্মি দিকে দিকে করে বিকীরিত,
যে শাশ্বত সদ্ম হ'তে নিত্যকাল অম্লান গৌরবে
ভরিয়াছে বিশ্বভূমি নন্দনের মন্দার-সৌরভে
তুমি তার পেয়েছ সন্ধান; অক্ষরের অক্ষয় বন্ধনে
বেঁধেছ অলখ ধনে। অপরূপ এই রূপায়ণে
অরূপে করেছ বন্দী; ছন্দে গানে করেছ বন্দনা!
সুরের তরঙ্গ-ঘাতে জাগায়েছ মূর্চ্ছিত চেতনা!
ছায়া-ভীত মূঢ় অন্ধে পরায়েছ প্রেমের অঞ্জন,
আশার আলেখ্যখানি হৃদি-রক্তে করিলে অঙ্কন।
ধরার মানুষ, তবু নাহি জানি কোথা তব ধাম;
অনন্ত-তীর্থের গুরু, পথিকের লহ গো প্রণাম!

পশ্চিমযাত্রিকী

শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ

২৩শে আগষ্ট তারিখে লণ্ডন ছেড়ে আবার প্যারিসের উদ্দেশে যাত্রা করলুম। আমাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন সস্ত্রীক ছিলেন। প্যারিস থেকে ভিয়েনা পর্য্যন্ত আমরা একসঙ্গে ভ্রমণ করেছিলুম; আমরা এই চারটি বাঙালী মিলে নিজেদের মধ্যে যত ইচ্ছা বাংলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতুম। সকাল এগারটার সময় লণ্ডন থেকে রওনা হয়ে, বিকেল ছয়টা দশ মিনিটে প্যারিসে এসে পৌছলুম। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে মিঃ হাণ্টার, অবনী বাবু ও আরও অন্যান্য পরিচিত লোক আমাদের তুলে দিতে এসেছিলেন। ফরাসী মুল্লকে এসে আবার সেই বাক্স-পেটরা পরীক্ষা ও ছাড়পত্র দেখাদেখি চল্‌ল। প্যারিসে এবার তিন দিন ছিলুম। চার দিনের দিন আবার ব্রাসেল্‌স রওনা হলুম। সকাল ন'টার সময় বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্‌স শহরে এসে পড়া গেল। ষ্টেশন থেকে হোটেলে পৌছে খাওয়া-দাওয়া ক'রে মোটর-বাসে ক'রে বেড়াতে বেরলুম। আমাদের এবারের এই গাইডটি খুব ফুর্ত্তিবাজ লোক। সমস্ত রাস্তা নানা রকম রসিকতা ক'রে পথ সরগরম করতে করতে চলল। বেলজিয়ামের রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমাদের মোটর-বাস এখানকার ন্যাশনাল ফরেষ্টের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। দৃশ্য বেশ সুন্দর। রাস্তার দু-পাশেই বড় বড় গাছেভরা জঙ্গল। সমস্ত রাস্তাটি পিচ-ঢালা। দু-পাশের ঘন বৃক্ষশ্রেণীর উপর রোদ প'ড়ে রাস্তায় বেশ একটি সবুজের আভা বেরচ্ছিল। আমাদের বাস নেপোলিয়ানের যুদ্ধক্ষেত্র ওয়াটার্লুতে এসে পৌছল। একটি প্রকাণ্ড বড় মাঠ, এখানেই যুদ্ধ হয়েছিল। কাছাকাছি তিন-চারটি বড় সাদা বাড়ি দেখলুম, সেগুলি যুদ্ধের সময় হাসপাতাল-রূপে ব্যবহৃত হ'ত। লুসার্নে যেমন একটি বড় যুদ্ধের ছবি দেখেছিলুম, এখানেও সেই রকম বিখ্যাত ওয়াটার্লু-যুদ্ধের ছবি (panorama) আঁকা আছে। এখানকার এক জন গাইড ছবি সম্বন্ধে বোঝাবার জন্য এল। আমাদের দলের মধ্যে পাঁচ রকম জাতের লোক ছিল, আমরা চার জন বাঙালী, তিন-চার জন ইংরেজ, দুটি ইটালীয়ান, পাঁচ-ছয় জন জার্ম্মান ও গুটিকতক ফরাসী মহিলা। এই অল্পবয়সী মেয়েগুলি সব সময়ই হাসি-তামাশা ক'রে কলরব করাতে গাইড বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা কি কিছু দেখ্‌তে-শুনতে এসেছ, না শুধুই হট্টগোল করতে চাও? একথা বলবার পর সুফল ফলেছিল, মেয়েগুলি শান্ত হওয়াতে গাইড নির্ব্বিবাদে ছবি সম্বন্ধে বোঝাতে লাগ্‌ল।

ব্রাসেল্‌স—ধর্ম্মাধিকরণ

ওয়াটার্লুর স্ত্রীলোকেরা সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রটির জমির উপরের এক পরদা মাটি তুলে তুলে একটি পিরামিড তৈরি করেছে এটি যুদ্ধে নিহত মৃত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ। এর উপর

উঠবার জন্য ৩১৪টি সিঁড়ি আছে, ও উপরে সম্রাট নেপোলিয়ানের প্রতিমূর্ত্তি আছে।

কংগ্রেস-স্তম্ভ ব্রাসেল্‌স

ব্রাসেল্‌সের যুদ্ধের মিউজিয়ম একটি দেখবার জিনিষ। এই মিউজিয়মে ইউরোপের বিগত মহাযুদ্ধের সময় যা অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হয়েছিল সবই সাজান আছে। সৈন্যরা কি ভাবে ট্রেঞ্চের ভিতর থাকত, বিষাক্ত গ্যাস কি রকম ভাবে ব্যবহার করা হ'ত, এই সব বেশ ভাল ক'রে বোঝানো আছে। এই যুদ্ধের সময় এক জন ইংরেজ সৈনিককে শুশ্রূষা করার অপরাধে (?) জার্ম্মান নার্স এডিথ কেভেলকে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে তাঁর প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়। গাইড আমাদের একটি খোলা মাঠ দেখিয়ে বল্‌লে, "এইখানেই এডিথ কেভেলকে গুলি ক'রে হত্যা করা

রাইনল্যাণ্ড

হয়েছিল।" নার্স এডিথ কেভেলের মর্ম্মর-প্রতিমূর্ত্তি লণ্ডনে থাকৃতে দেখেছিলুম। এখানে একটি ছোটখাট নদী আছে, শহরের রাস্তার তলা দিয়ে নদ্দমার মত ব'য়ে যাচ্ছে। উপর থেকে দেখলে কিছু বোঝবার যো নেই। আমাদের হোটেলটির নাম স্প্লেন্‌ডিড হোটেল। আমরা যেখানেই যেতুম,

রাইনল্যাণ্ড

রাত্রে শোবার সময় দরজার বাইরে আমাদের জুতাগুলি খুলে রেখে দিতুম। হোটেলের ঝি তার সময়-মত বুরুশ ক'রে সেখানেই রেখে যেত। এখানেও রাত্রে শোবার সময় তাই ক'রে শুয়েছি, সকালে উঠে দরজার কাছে জুতা পাই না। পাশের ঘর থেকে মিসেস সেন বেরিয়ে এসে জানালেন

তাঁদেরও জুতা নেই। তখন ভাবলুম এক্ষুণি হয়ত নিয়ে গেছে, একটু পরেই পাওয়া যাবে। খানিক ক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও যখন জুতা এল না, তখন ঘণ্টা দিয়ে ঝিকে ডাকা হ'ল। সে এক মুস্কিল, জার্ম্মান ভাষা জানি না যে তাকে বোঝাব, বড়-জোর জের ট্রাগে (অর্থাৎ ভয়ানক কুড়ে) পর্য্যন্ত বলতে পারি। শুধু সে কথা বল্‌লে আমাকে পাগল ঠাওরাবে। শেষে তার জুতা ও আমাদের পা দেখিয়ে ইসারা

রাইনল্যাণ্ড

ক'রে বোঝান হ'ল। তখন সে হেসে ঘরের একটি ছোট দেয়াল-আলমারি খুলে জুতা বের ক'রে দিলে। আমরা অবাক হয়ে গেলুম। এ আবার কি? সারারাত দরজায় চাবি দিয়ে শুয়েছি, কখন আবার ঘরে ঢুকে আলমারিতে জুতা রেখে গেল। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলুম সব ঘরের দরজার পাশে পাশে ছোট্ট ছোট্ট দেওয়াল-আলমারি রয়েছে। প্রত্যেক আলমারির দুটি ক'রে দরজা আছে। আমরা জুতা বাইরে না রেখে যদি আলমারিতে রেখে দি, তা হ'লে হোটেলের ঝি বাইরে থেকে তার অন্য দরজাটি খুলে জুতা বের ক'রে নিয়ে পালিশ ক'রে আবার জুতা সেইখানেই রেখে দেবে। আমরা ঘরের ভেতরের দিকের দরজা খুলে জুতা পাব। জুতা খুঁজে না-পাওয়ার কারণটা তখন বুঝতে পারলুম।

পট্‌সডাম—নূতন প্রাসাদ

ব্রাসেলসের পুলিস বেশ চটপটে। রাস্তায় যে-সব পুলিস যানবাহন-চলাচলের ব্যবস্থার তদারক করে, তাদের দাঁড়াবার জন্য চৌরাস্তার উপর উঁচু প্ল্যাটফর্ম্ম তৈরি করা আছে। পুলিস এর উপর দাঁড়িয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখে ও খুব দক্ষতার সহিত সব রকমের গতিবিধি পরিচালন করে।

আজ ২৭শে আগষ্ট সোমবার। সকাল সাড়ে সাতটার গাড়ীতে ব্রাসেলস্ থেকে আমরা কলোনের উদ্দেশে রওনা হলুম। ট্রেন ছাড়বার একটু আগে মিষ্টার সেন জলপান করতে চাইলেন, আমি আমার গ্যালন-জার থেকে জল ঢেলে তাঁকে দিয়ে নিজেরাও পান করছি এমন সময় আমাদের লাগেজবাহী বেলজিয়াম কুলী দুটি চেঁচামেচি ও ইসারা ক'রে বার-বার আমাদের কি বলতে লাগল। প্রথমটা বুঝতেই পারি না, তারাও নাছোড়বান্দা; শেষে খালি জলের দিকে আঙুল দেখায় আর ইসারা ক'রে সব জল খেয়ে নিতে বলে। মাঝে মাঝে বিকট মুখ ভঙ্গী ক'রে "কাষ্টুম, কাষ্টুম" ক'রে চেঁচাতেও লাগল। তখন আমরা বুঝতে পারলুম যে আমাদের এই জল-খাওয়া দেখে সে ভাবছে আমরা বুঝি এই গ্যালন-জারে ক'রে কোন মদ্য-জাতীয় পানীয় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি; একসঙ্গে এতখানি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আহরণ

বি. এন. ত্রিজ্যা

স্পিরিট সঙ্গে নেওয়া ঠিক নয়। কাষ্টম অফিসাররা গাড়ীতে পরীক্ষা করতে এলে এই জারসুদ্ধ সমস্ত মদটি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে, তার চাইতে আমরা সবাই যেন এইবেলা এটা খেয়ে শেষ ক'রে দিই। ঐ কথাটি বোঝাবার জন্য সে বেচারীকে অত হাতমুখ নেড়ে ইসারা করতে ও "কাষ্টুম কাষ্টুম" ক'রে চেঁচাতে হয়েছে। আমরা বিদেশী লোক। আমাদের এ-রকম ভাবে সাবধান ক'রে দেওয়ার জন্য এই কুলী দুটি প্রশংসার যোগ্য।

ট্রেনে ভ্রমণ করবার সময় অনেক সহযাত্রীকে পথে ষ্টেশনে-ষ্টেশনে লাঞ্চ-বাস্‌কেট কিনে খেতে দেখেছি। একটি বড় সাদা রঙের পুরু কাগজের ব্যাগ, তার ভেতর এক বোতল 'রেড-ওয়াইন্,' এক থোলো আঙুর বা অন্য কোন দু-একটি ফল, দুখানি বান্ পাউরুটি, তিন-চার টুকরা সিদ্ধ-করা শূকর-মাংস, একখানি কাগজের ন্যাপকিন ও একটি কাগজের রেকাবী। এরই নাম লাঞ্চ-বাস্‌কেট, প্রায় সমস্ত কন্টিনেণ্টেই ট্রেনে যাবার সময় লোকে এরকম বাস্‌কেট কিনে দুপুরের খাওয়াটা শেষ করে। বেলা বারটার সময় আমরা জার্ম্মান দেশের কলোন শহরে পৌঁছলুম। হোটেলে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে ও নিজেদের জিনিষপত্র গোছগাছ ক'রে আমরা চার জনে কলোন্ শহর দেখবার জন্য বেলা আড়াইটার সময় বেরিয়ে পড়লুম। এখানকার রাইন নদী দেখতে বেশ। কলোনের ক্যাথিড্রেলও দেখবার মত। এর ভেতর যে রঙীন কাচের কারুকার্য্য আছে, শুনলুম তা থেকে কাচগুলিকে বিগত মহাযুদ্ধের সময় খুলে রাখা হয়েছিল। ঐ যুদ্ধের সময় এক দিন এরোপ্লেনের উপর থেকে এর উপর গোলাবর্ষণও হয়ে গেছে। তার চিহ্ন এখনও আছে। আমরা এখানকার ইউনিভার্সিটি দেখে তার পর ওডিকলোনের ফ্যাক্টরী দেখতে গেলুম। কলোনের ওডিকলোন বিখ্যাত। ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ আমাদের বললেন এই ওডিকলোন তৈরি করার জন্য গ্রীস ও ইটালী থেকে সুগন্ধি ফুল সংগ্রহ করা হয়, তার পর সেই সব ফুল, স্পিরিট এবং জল এই তিনটি জিনিষ একত্র ক'রে ছ-মাস এক-একটি হাওয়াশূন্য বন্ধ কাঠের পিপার ভেতর রাখা হয়। ছ-মাস পরে পিপার গায়ে সংলগ্ন কল খুলে এই জলীয় পদার্থটি বের ক'রে আবার অন্যান্য ঔষধের দ্বারা একে রিফাইন করা হয়। এরই নাম ওডিকলোন। এর প্রস্তুত-প্রণালী বিশদ ভাবে সকলের কাছে বলা নিয়ম নয়। আমরা যা শুনলুম তা অতি সংক্ষেপেই বলা হয়েছিল। মিসেস সেন ও আমি দু-জনে দুটি শিশি ওডিকলোন উপহার পেয়েছিলুম।

বার্লিন—বিদেশযাত্রী ওমনিবাস

কলোনে একটি বড় পার্ক আছে। এটিকে দেখলে মনে হয় অনেকগুলি ছোটখাট পাহাড় এর ভেতর আছে। আসলে কিন্তু তা নয়, পাহাড়গুলি সবই কৃত্রিম। যুদ্ধের পর অনেক লোক বেকার হয়ে পড়ে। জার্ম্মান গবর্ণ্মেণ্ট এই বেকার লোকদের রোজ-মজুরী দিয়ে তাদের দ্বারা এই ছোট ছোট পাহাড় দিয়ে সাজানো কলোন ন্যাশনাল পার্কটি তৈরি করান।

আমাদের এদেশে বেকার লোক এমন কতই আছে, তাদের এরকম রোজ-মজুরী দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার ব্যবস্থা আছে কি না আমার জানা নেই।

পরদিন ৩০শে আগষ্ট বেলা সাড়ে আটটার সময় হোটেল থেকে প্রাতরাশ শেষ ক'রে রাইন নদীর ধারে এলুম। আমাদের এখান থেকে ষ্টীমারে ক'রে মেন পর্য্যন্ত যাবার কথা ছিল।

তখন ষ্টীমার ছাড়তে সামান্য দেরি ছিল। আমরা লাগেজ-সমেত ষ্টীমারে উঠে পড়লুম, দোতালায় ডেকের উপর ব'সে ব'সে দেখতে লাগলুম নদীর ধারে ঠেলাগাড়ী-বোঝাই পিচ বিক্রী হচ্ছে। এক-একটি টেনিস-বলের মত। আমরা গোটাকয়েক পিচ কিনেছিলুম। আমাদের জাহাজটি সারাদিন ধরে চলতে লাগল। রাইন নদীর দু-পাশের দৃশ্য অতি সুন্দর। দু-পাশেই ট্রেন ও মোটর চলছে, আঙুরের গাছে অজস্র আঙুরও ফলেছে দেখলুম। ভারতবর্ষ ছাড়বার
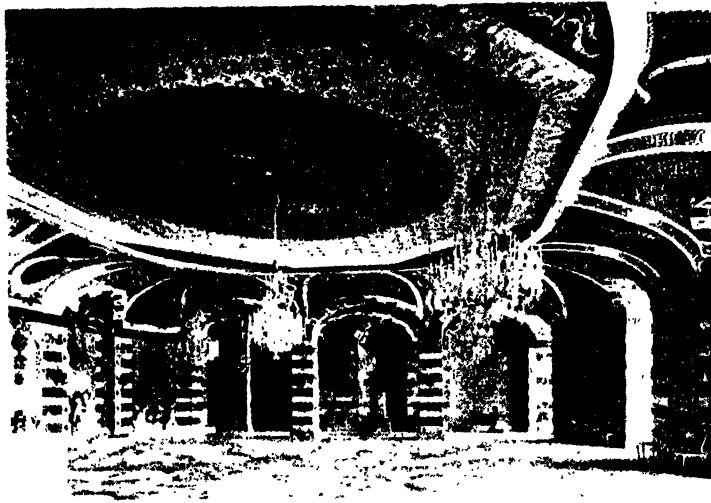
প্রবালকক্ষ পট্‌সডাম প্রাসাদ

পর আজ এই রাইন নদীকে দেখে তবু নদী ব'লে মনে হ'ল। দু-পাশে পাহাড় ও গাছ থাকাতে এর সৌন্দর্য্য ফুটেছে। অবশ্য আমাদের দেশের হৃষীকেশের লছমনঝোলার গঙ্গার তুলনায় এর বাহার কিছুই নয়। নদীর দু-ধারের জায়গাগুলিকে রাইনল্যাণ্ড বলা হয়।

আমরা সারাদিন ধ'রে এই রাইনল্যাণ্ডের দৃশ্য দেখতে দেখতে যখন মেন পৌঁছলুম, তখন রাত্রি হয়ে গেছে। ষ্টীমারেই রাত্রের খাওয়া সেরে নিয়েছিলুম। মেন পৌঁছে ষ্টেশনে গিয়ে আবার ট্রেনে ক'রে কিছু ক্ষণ গিয়ে ফ্রাঙ্কফার্ট পৌঁছলুম। তখন শরীর বড় ক্লান্ত। ঘুমে চোখ ঢুলছে। হোটেলে পৌঁছে ঘর ঠিক ক'রে কাপড়চোপড় ছেড়ে একেবারে বিছানায় প্রবেশ ও নিদ্রা।

১লা সেপ্টেম্বর। ভোরবেলা আবার গোছগাছ ক'রে খেয়েদেয়ে বার্লিন রওনা হবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়ালুম। আমরা চার জনে একটা ট্যাক্সিতে উঠলুম। তিন-চারটি জার্ম্মান কুলী আমাদের বড় বড় স্যুটকেসগুলিকে একটি ঠেলা-গাড়ীতে চাপিয়ে ঠেলে নিয়ে চলল। তারা অন্য দিক দিয়ে চলে যায় দেখে আমি বাংলাতে চেঁচিয়ে ব'লে ফেললুম, "ওমা ওরা যে অন্য রাস্তায় যাচ্ছে।" একটি কুলী বোধ হয় আমার কথা বলার ভাবে কিছু বুঝেছিল, সে হেসে ফেলে ব'লে গেল, "বান হফ্, বান হফ্", অর্থাৎ ষ্টেশনেই যাচ্ছি। ষ্টেশনকে জার্ম্মান ভাষায় বান হফ' বলে।

সকাল থেকে উঠে নিজেদের খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য গোছগাছ করতে খানিকটা সময় কেটে গিয়েছিল। তখনও হাতে কিছু সময় ছিল ব'লে আমরা রাস্তায় বেড়াতে গিয়ে কিছু কলা ও পিচ কিনে নিয়েছিলুম। এখন বেলা বারটায় ট্রেনে উঠেছি, সারাদিনই ট্রেনে কাটবে। ফলগুলি বেশ কাজে লাগবে। সারাদিন ধ'রে মিসেস সেন ও আমি সেলাই বোনা ক'রে গাড়ীতে সময়টা কাটালুম। যখন বার্লিনে পৌঁছলুম, রাত হয়ে গেছে। আমরা যে হোটেলে উঠেছিলুম তার নাম *Christl. Hospiz St Michael.*

২রা সেপ্টেম্বর। সকালবেলা আবার মোটরবাসে ক'রে বেড়াতে যাওয়া হ'ল। আজ সারাদিন মোটর-বাসে ঘুরে ঘুরে শহরের সব দেখে তার পর পট্‌সডাম যাবার রাস্তা ধরলুম। এই পট্‌সডামে জার্ম্মান-সম্রাট কাইজার তাঁর গ্রীষ্মাবাস তৈরি করান। এর বাগান-বাড়ি ও ফোয়ারা অতি সুন্দর। আমরা বাসে ক'রে কিছুদূর গিয়ে হাভেল নদীর ধারে এলুম। সবাই বাস থেকে নেমে এক মোটরলঞ্চে চড়লুম। দুপুরের খাওয়া এ মোটরলঞ্চেই হ'ল। কিছু ক্ষণ যাবার পর আবার নেমে অন্য একটি বাসে চড়লুম, বাস্ নদীর ধার দিয়ে ও সুন্দর বাগানের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। একটি বাগানে দেখলুম কতকগুলি শ্বেত-পাথরের তৈরি মেয়ে ও পুরুষ

মূর্ত্তি হাত-ধরাধরি ক'রে গোলাকার ভাবে দাঁড় করান আছে। পুতুলগুলি সমস্তই নগ্ন, কিন্তু তাদের শরীরকে বেষ্টন ক'রে নানা রকম ফুলের লতানে গাছ লাগানো আছে। তাতে রকমারি রঙের ফুলও ফুটেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন পুতুলগুলিকে রঙীন ফুলদার সবুজ রঙের ছিটের পোষাক পরানো হয়েছে। এর নাম অরেঞ্জারি।

প্রাহ ঘটিকাগৃহ। মধ্যে লেখিকা

রাজপ্রাসাদের বাগানও অতি সুন্দর। পাহাড়ের ধাপে ধাপে যেন নেমে গেছে। তা ছাড়া প্রাসাদের শয়নকক্ষ, সঙ্গীতকক্ষ, প্রবালের ঘর ইত্যাদি সমস্তই দেখবার মত। এই প্রবাল-ঘরের ছাত বা সিলিং সামুদ্রিক জন্তু—কুমীর, হাঙ্গর ইত্যাদির মূর্ত্তি দ্বারা সজ্জিত। এ-সব জানোয়ারের গায়ের আঁশ সত্যিকার ঝিনুক বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ঘরের দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে বড় বড় পোখরাজ, চুনি, পান্না, মুক্তা, এমেথিষ্ট ইত্যাদি মূল্যবান্ প্রস্তরখণ্ড বসানো আছে। এসব মহামূল্য রত্নাদি জার্ম্মান-সম্রাট্ কাইজার নানা দেশ থেকে উপহার পেয়েছিলেন। প্রাসাদের ভেতর ঢুকে দেখ্‌তে হ'লে, জুতার উপর আর এক জোড়া ভারী বড়

সেণ্ট নিকোলস গীর্জ্জা প্রাহ
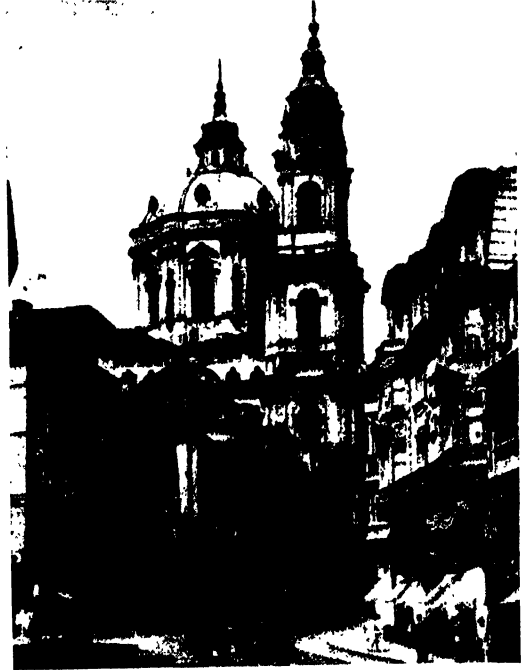
বনাতের জুতা পরতে হয়, কেন-না প্রাসাদের ভেতর মেঝেয় খুব পালিশ। শুধু জুতায় চললে পালিশ নষ্ট হবার ও পা হড়কে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকায় এই ব্যবস্থা। যুদ্ধের আগে এ সমস্ত জার্ম্মান-সম্রাট্ কাইজারের ছিল। রাজবাড়ির ভেতরেই থিয়েটার হ'ত। তার ষ্টেজ ও লোক ব'সে দেখবার জন্য সুন্দর গ্যালারী আছে। এ সব দেখে যখন চলে আসছি তখন পুলিসের ডাকে তার দিকে ফিরে চাইতেই সে আমার পায়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। তখন দেখি যে সেই ভারী জুতা সমেতই আমি গাড়ীতে উঠবার জন্য এগোচ্ছি। তখন সবাই হাসাহাসি

লাগিয়ে দিলে। আমি জুতা ফিরিয়ে দিয়ে গাড়ীতে উঠলুম। বার্লিনের চিড়িয়াখানাটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানে অনেক বড় বড় শীলমাছ আছে, একোয়ারিয়ামেও আছে। আর একটা কথা, বার্লিনে থাকৃতে সেখানকার প্রত্যেক বাড়িরই জানালার কার্নিসে কার্নিসে ফুটন্ত ফুলের টবের বাহার নজরে পড়েছিল। আমাদের দেশে এ রকম ক'রে গাছ সাজালে ঝড়ের দাপটে উল্টে যাবে ও অর্দ্ধেক তার আগেই চড়াই পাখীর পেটে যাবে।
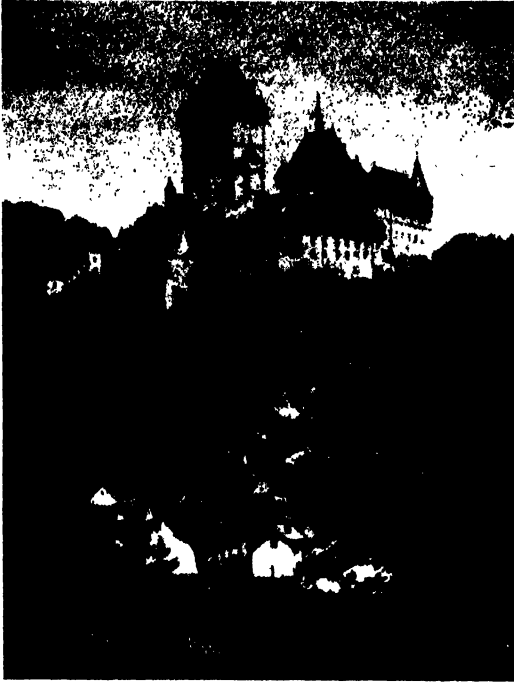
কার্লষ্টাইন প্রাসাদ—প্রাহা

৩রা সেপ্টেম্বর। সকালবেলার গাড়ীতে ভিয়েনা যাবার জন্য বার্লিন থেকে রওনা হলুম। বার্লিন থেকে ভিয়েনা অনেক দূর। সেজন্য আমরা ঠিক করলুম পথে চেকোস্লোভেকিয়ার রাজধানী প্রাগ্ বা প্রাহা শহরে নেমে রাত্রিতে বিশ্রাম ক'রে যাব। তাহ'লে রাত্রিটা আর ট্রেনে কাটাতে হবে না। বেলা দেড়টার সময় প্রাগে পৌছলুম। জুতার নামজাদা ব্যবসায়ী বাটা কোম্পানীর দেশ এই প্রাগ শহর। এখানে আমরা দু-রাত্রি ছিলুম। এ দু-দিনে এখানকার যা দ্রষ্টব্য তা মোটামুটি দেখেছিলুম, কিন্তু তা ভাল মনে না থাকায় কিছু লিখতে পারলুম না।

রেডিয়ম স্নানাগার—প্রাহা

৫ই সেপ্টেম্বর। সকালের ট্রেনে রওনা হয়ে আমরা বিকাল চারটায় অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় পৌছলুম। মিষ্টার ও মিসেস সেন ষ্টেশন থেকেই অন্য জায়গায় উঠলেন। আমাদের এখানে কিছুদিন থাকৃবার কথা ছিল, সেজন্য আমরা একটু সুবিধা দরের জায়গায় গেলুম। আমাদের এ হোটেলটার নাম *Hospiz Rosserlande*, হোটেলের স্বত্বাধিকারিণী আমাদের ষ্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিলেন। তাঁকে আগে থাকৃতে আমাদের এখানে আসবার কথা লিখে জানিয়েছিলুম। আমরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই হোটেলটিতে এলুম। ঘরদোর সব ঠিক ক'রে তিনি তাঁর সেক্রেটরীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ক'রে দিয়ে বললেন, তাঁকে কোন বিশেষ কাজে ভিয়েনার বাইরে যেতে হচ্ছে, সুতরাং এই সেক্রেটরীই তাঁর অবর্ত্তমানে আমাদের দেখাশোনা করবেন। ইনি ভাল ইংরেজী বলতে পারেন না, কিন্তু সবই বুঝতে পারেন। সেক্রেটরী মেয়েটি বেশ। লম্বা একহারা চেহারা ও সর্ব্বদাই হাসিখুশী ভাব, কিসে আমাদের খুশী রাখবে সেজন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকৃত।

কলকাতা থেকে আসবার সময় আমার বাবা ভিয়েনার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিৎ অধ্যাপক ডাক্তার সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের নামে একখানি পরিচয়-পত্র দিয়ে আমাদের ব'লে দিয়েছিলেন, যে আমরা যদি কখনও ভিয়েনায় যাই, তাহ'লে অধ্যাপক ফ্রয়েডের সঙ্গে যেন আলাপ করি। তিনি আমাদের অনেক বিষয়ে সাহায্য করতে পারবেন। হোটেলের স্বত্বাধিকারিণীর

সাহায্যে টেলিফোন ক'রে অধ্যাপক ফ্রয়েডের খবর পেলুম। তিনি আমাদের পরিচয়-পত্রোক্ত ঠিকানায় এখন থাকেন না। এখন এখানকার গরমের সময়, এ সময়টা তাঁর গ্রীষ্মাবাসে থাকেন। তাঁর এ-বাড়ির ঠিকানাও পেলুম। কিন্তু খবর পেলুম তিনি বাইরের লোকের সঙ্গে নিতান্ত দরকারী কথা না হ'লে দেখা করেন না। তখন সেক্রেটরীকে বললুম, তুমি টেলিফোনে ভাল ক'রে বল যে আমরা কলিকাতা থেকে ডাক্তার বোসের পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছি। এ-কথার পর খবর পেলুম ফ্রয়েড আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী হয়েছেন ও তাঁর কাছে যাবার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট

ওরান্ত প্রাসাদ—ক্রালোভানি

সময়ও আমাদের দিয়েছেন। আমরা যথাসময়ে সেক্রেটরীর কাছ থেকে রাস্তার ম্যাপ এঁকে নিয়ে এবং ট্রামের রুট-নম্বর নিয়ে ফ্রয়েডের সন্ধানে চললুম। রাস্তায় যেতে যেতে নজরে পড়ল মোড়ের মাথায় একটি ছোট ঝাঁপওয়ালা দোকান, তাতে ছাড়ানো পাকা শশা ও বড় সরবতি লেবু, আরও দু একটা কি ফল বিক্রী হচ্ছে। বুড়ো দোকানদার তার লম্বা বুরুষওয়ালা ঝাঁটা নিয়ে দোকানের সামনের রাস্তাটা ঝাঁট দিচ্ছিল। আমাদের সামনে দিয়ে যেতে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল, বোধ হয় শাড়ী-পরা দেখে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম অধ্যাপক ফ্রয়েডের বাড়িটা কোন্ দিকে? সে বোধ হয় প্রথম বার কিছুই বুঝলে না, আর এক বার বলতেই হেসে এগিয়ে এসে বল্‌লে, "ইয়া ইয়া প্রফেসর ফ্রয়েড?" ব'লে রাস্তার এক দিকে হাত দেখিয়ে দিলে। আমরা সেই রাস্তা ধ'রে গিয়ে একটি পুরাতন বাগানবাড়ি দেখতে পেলুম। বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম মিলিয়ে বোঝা গেল এখানেই অধ্যাপক ফ্রয়েড থাকেন। কিন্তু দরজার উপরে কোন রকম নাম দেখতে পেলুম না। বাড়ির ঝি বাগানের রাস্তা পরিষ্কার করছিল, সে আমাদের দেখে একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তাকে বললুম, খবর দাও, অধ্যাপক ফ্রয়েডের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সে কোন কথা বুঝতে পারলে না, কেন-না ইংরেজী জানে না, কিন্তু শুধু প্রফেসর ফ্রয়েড কথাটি শুনেই ভাবে বুঝলে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তখন সে আমাদের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে "বিটেস্থন"। এখানে থাকতে "বিটেস্থন" কথাটা খুব শুনতে পেতুম। সকালবেলা খাবার টেবিলে বসলেই ঝি কথা কইবার আগেই 'বিটেস্থন' বললে। তার পর দরজা দিয়ে যখন বাইরে যাচ্ছি তখন তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতে দিতে একবার "বিটেস্থন" বললে। রাত্রে শোবার সময় ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে চলে যাবার সময় ঝি ব'লে গেল "বিটেস্থন"। আমি মাঝে মাঝে ভাবতুম "বিটেস্থনটা" কি? পরে জেনেছি "বিটেস্থন" ইংরেজদের *please*এর মত।

তার পর দরজার বোতাম টিপতেই অন্য এক জন ঝি এসে দরজা খুলে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল। ভেতরে

পিষ্টানি স্নানাগার রাটিসলাভা

ঢুকে দেখি দোতলায় উঠবার সিঁড়ির নীচে নানা রকম ছবি ও চেয়ার টেবিল সাজিয়ে বসবার ঘর করা হয়েছে। অত বড় এক জন মনস্তত্ত্ববিৎ ডাক্তার, তাঁর এই বস্‌বার ঘর দেখে আশ্চর্য্য হলুম। ওসব দেশে লোকে অল্পের মধ্যে এমনি করেই থাকে। যত কিছু বাবুয়ানি তা আমাদের এই গরিব দেশে এসেই করে। লণ্ডনে থাকতে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ বাইরে থেকে দেখেই বুঝতে পারতুম যে আমাদের

দেশের লাটসাহেবের প্রাসাদ ও চোরবাগানের মল্লিক-বাড়ি এর চেয়েও অনেক বড়।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করবার পর অধ্যাপক ফ্রয়েড নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সম্ভাষণ করলেন। আমি এই থপ-থপে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে ভাবলুম ইনিই বিশ্ববিখ্যাত মনোবিৎ সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড যাঁর কথা কাগজে ও মাসিকপত্রে প'ড়ে লোকটির সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল যে ইনি এক জন হোমরা-চোমরা দেখতে হবেন হয়ত। তা নয় একেবারে নিতান্ত সাদাসিদা মানুষ, হাতে একটি জলন্ত সিগার ও সমস্ত দাঁতগুলি সোনা দিয়ে বাঁধান। আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "তুমিই ডাক্তার বোসের মেয়ে? তোমার বাবার সঙ্গে কাগজে-কলমে অনেক আলাপ,

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড
শিল্পী নেমোঁ-গঠিত ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি

কিন্তু তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় কখনও হয় নি। তাঁকে দেখবার আগেই তোমাকে দেখলুম। তিনি কেমন দেখতে? কবে ভিয়েনায় আসবেন? কেমন আছেন?" ইত্যাদি। তার পর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁর বাগানে বেড়ালুম। বাড়ি ও বাগান অনেক কালের পুরাতন। ফ্রয়েডের কাছে শুনলুম বাড়ি তাঁর নিজের নয়। বাড়ির মালিক এক সময় অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এখন গরিব হয়ে গেছেন। বাগানে অনেক আপেল গাছ আছে। ফ্রয়েড তাঁর স্ত্রী ও শালীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। এঁরা ইংরেজী বলতে পারেন না, কিন্তু বুঝতে পারেন। ফ্রয়েডের মেয়ে মিস্ এ্যানা ফ্রয়েড তখন ভিস্‌বাডেনে সাইকো-এ্যানালিটিক কংগ্রেসে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। শুনলুম তিনি বেশ ইংরেজী জানেন ও পিতার একরূপ সেক্রেটরী বললেও চলে। আমাদের বাগান বেড়ান হ'লে ঘরের মধ্যে এসে বসলুম। দুটি রোমওয়ালা বড় কুকুর ছুটে এসে একটি ফ্রয়েডের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, অপরটি আমার কোলে উঠবার জন্য কোলের উপর দু-পা তুলে দিলে। আমি ত ভয়ে কাঠ। কুকুর নিয়ে ঘরকন্না করা কি অভ্যাস আছে? ভদ্রতার খাতিরে চুপ ক'রে রইলুম। ফ্রয়েড আমাকে তাঁর টেবিলের উপর একটি হাতীর দাঁতের বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়ে বললেন, "এটি তোমার বাবা আমাকে এক সময় পাঠিয়েছিলেন।" এই সময় কুকুরটা ভেউ ক'রে ডেকে আমার কোলে লাফিয়ে উঠল। আমিও স্থান-কাল-অবস্থা সব ভুলে তাকে কোল থেকে ফেলে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলুম। ওদেশের কুকুরের অতিথি-অভ্যাগতদের কাছ থেকে আদর খাওয়াই অভ্যাস, সে এ-সব শুনবে কেন? সে আমাকে বেরসিক বুঝতে পেরে বেজায় হাঁকডাক সুরু ক'রে দিলে। ফ্রয়েড আমার অবস্থা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি কুকুর দুটিকে একটা ঘরে পূরে দরজা বন্ধ করলেন। কুকুরগুলি প্রাণপণে চেঁচাতে চেঁচাতে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। ফ্রয়েড আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বুঝি কুকুরকে বড় ভয় করে?" বললুম, "হ্যাঁ, আমার কুকুর নেই। কুকুরকে বড় ভয় করি।" বললেন, "কেন, একে ভয় কিসের? আমি কুকুরকে নিজে কোলে বসিয়ে খাওয়াই। তোমার বাবা লোকের মনের চিকিৎসা করেন, তোমার এ কুকুরের ভয় সম্বন্ধে তিনি জানেন?" ব'লে দিলুম, "হ্যাঁ জানেন বইকি? তিনি নিজেও কুকুর পছন্দ করেন না। তাঁরও কুকুর নেই।" ফ্রয়েড শুনে আশ্চর্য্য হলেন।

আমি নিজে মনে মনে ভাবলুম যে, আমি যদি ইংরেজীতে বেশ ভাল ক'রে কথা বলতে পারতুম, তাহ'লে অধ্যাপক ফ্রয়েডকে একবার জিজ্ঞাসা করতুম তাঁর নিজের এই কুকুরপ্রীতির মানে কি ? তিনি এক জন বিখ্যাত মনোবিৎ হ'য়ে এ-বিষয়ে কি বলেন ? আমাদের এক জন ভাল ডাক্তারের কাছে যাবার দরকার ছিল। আমরা শুনেছিলুম ভিয়েনা শহর সুদক্ষ চিকিৎসক ও চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত। ফ্রয়েডকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে তিনি তাঁর জানা ডাক্তার ফেলিক্স ডয়সের ঠিকানা আমাদের দিলেন। ডাক্তার ডয়েস আমাদের ইটালীর ট্রিয়েষ্টের নিকটবর্ত্তী স্থান পোর্টো রসোতে গিয়ে কিছুদিন থাকতে বল্‌লেন।

ভিয়েনা শহরে বেশীর ভাগ ভদ্রলোকের পেশা ডাক্তারী কিংবা প্রফেসারী।

পথচারী

শ্রীশান্তি পাল

ডুবিছে রাঙা রবি,
বেলা যে বয়ে যায়,
একেলা পথহারা
চলেছি নিরুপায়।
অসহ বেদনায়
ভরেছে সারা বুক,
কিছুতে নাহি তোষ,
কিছুতে নাহি সুখ।
দিনের শেষ ছায়া
বুলায়ে বনময়,
সহসা চলে গেল
এমনি নিরদয়।
নিঝুম হয়ে আসে
বিজন পথঘাট,
কেমনে যাব বল
সমুখে ধূ ধূ মাঠ ?
এ-পারে ধানক্ষেত,
ও-পারে তালীবন,
আমারে ইসারায়
ডাকিছে অনুখন।
পথের ব্যথা যত
হরিয়া নিতে চায়,
পথিক বঁধুবেশে
সাঁঝের অবেলায়।

রহিতে নারি আর
ভুলেছে মনপ্রাণ,
ভাসিয়া আসে ওই
উদাস মেঠো গান।
আজি এ নিরালায়
সকলি ফাঁকা-ফাঁকা,
সুদূর নভতল
তরল মেঘে ঢাকা।
আঁধার নামে ধীরে
বনের তরুশিরে,
চল্ রে পথভোলা
চাস্ নে পিছু ফিরে।
বৃথা এ আয়োজন,
পথের কোথা শেষ !
যেথায় যেতে চাই
কোথায় সেই দেশ ?
নীরবে বকুলের
নিয়ত ঝরে ফল
জোনাকি-দীপ জ্বলে
আকাশে তারাকুল ;
চল্ রে চল্ সেথা
থেমেছে কোলাহল,
নীরবে দুই ফোঁটা
ফেলিগে আঁখিজল।

উদ্বোধন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের জীবনে দুটো দিক আছে ; এক দিকে আমাদের প্রতিদিনের প্রাণধারা, অপর দিকে আমাদের চিরদিনের আশ্রয়। এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন না করতে পারলে আমাদের জীবন অবরুদ্ধ কলুষিত হয়ে ওঠে। আমাদের ঘরের হাওয়া বদ্ধ, সে ঘরের দ্বার যদি রুদ্ধ করি, উত্তাপে আবর্জ্জনায় তবে ঘরকে কলুষিত করে। কিন্তু দরজা খুললেই প্রাণের সমীরণ সমীরিত হয়, বাতাস থেকে বিষবাষ্প দূর হ'তে থাকে। সেই রকমের মুক্তির পথ আছে আমাদের অন্তরে। প্রতিদিন আমাদের জীবনে আসে নানা আঘাত-অভিঘাত, ধনিয়ে ওঠে অসত্য, সংশয়, দ্বেষ-ঈর্ষা, উদ্দাম হয়ে ওঠে কলুষিত কামনা কাড়াকাড়ি হানাহানি। এইখানেই কি চরম? তা নয়। পরিত্রাণ আছে, শোধন আছে আমাদেরই অন্তরের অন্তরতম নিভৃতে ; যে নিভৃতে অসীমের আহ্বান ; সেখানে প্রতিদিন যদি একবার প্রবেশ না করি তবে প্রতিদিনের কর্ম্মের কলুষ অপগত হয় না ; জমে উঠে চিত্তকে জীর্ণ করে।

প্রভাতে চোখ মেললে, দেখলেম বাইরে কোথা থেকে তরুলতা পেয়েছে শ্যামলশ্রী, কোন্ আনন্দে ফুটেছে ফুল, পাখী গান গেয়ে উঠেছে। আনন্দস্বরূপের জ্যোতি লোকে লোকান্তরে উদ্ভাসিত, বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যে পরমানন্দ রূপের আবির্ভাব—এ না হ'লে পৃথিবী মরু হ'ত। এই তরুলতা এ যে শুধু মাটি থেকে রস আকর্ষণ ক'রে বেঁচে আছে তা নয়, সমস্ত জগৎকে উৎসবের ক্ষেত্র করেছে। কোথায় উৎসারিত হচ্ছে এই অমৃতের উৎস? কত হতভাগ্য চিরজীবন স্পষ্ট ক'রে তাকায় নি এই সৌন্দর্য্যবিকাশের দিকে। এই আকাশের নীলিমা কত সৌন্দর্য্যকাণার চোখে পড়েছে শুধু, অন্তরে প্রবেশ করে নি। বাইরে এই প্রকাশকে দেখতে গেলে অন্তরে প্রবেশ করতে হয় যেখানে আছে সেই সোনার কাঠি যা চিত্তকে জাগায়। কত দুঃখ আসে আমাদের মুহ্যমান করে ; আঘাতে অধীর হয়ে পড়ি। কিন্তু সে কতটুকু! বিশ্বের জ্যোতির্লোকে অমৃতলোকে তাতে কী চিহ্ন পড়ে। আমাদের জীবনের যত হাহাকার তাই যদি একান্ত সত্য হ'ত তবে সৃষ্টির অমৃতধারাকে বহমান রাখত কিসে? তাহ'লে ফুলের বাগান কালো হয়ে উঠত। আজও তো আছে শিশুমুখের হাসি, আজও তো পৃথিবীতে ভালবাসার রস শুকিয়ে যায় নি। অনুভব করছি মহাসমুদ্রে যেমন ক'রে নদী মিলিত হয় তেমনি আমার অন্তরের আনন্দ-উৎস বিশ্বের আনন্দ-উৎসে নিরন্তর মিলিত হচ্ছে। ত্যাগে প্রেমে মঙ্গলকর্ম্মে কঠোর দুঃখের আবরণ ভেদ ক'রে যে আনন্দ উদ্ঘাটিত হয় তার পরিচয় তো ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নয়। প্রতিদিনের নানা সম্বন্ধে নানা সাধনায় নানা সেবায় ঘরে ঘরে সুখে দুঃখে বিরহে মিলনে রসের স্রোত নানা প্রণালীতে মুক্ত হচ্ছে। তাদের সকলেরই যোগ সেই পরমানন্দ-সমুদ্রের সঙ্গে উপনিষদে যাঁর কথা বলেছেন, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। চৈতন্যের মধ্যে প্রত্যহ সেই যোগকে উপলব্ধি করা অসীম রসনির্ঝরধারায় স্নান করা, তাতে লোভ দ্বেষ কামনার কলঙ্ক ধৌত হয়ে যায়, মন থেকে নিন্দার বিষ যায় কেটে, ক্ষমা করা সহজ হয়, আত্মাভিমানের আলোড়ন হয় শান্ত।

এমন কিছু আছে আমাদের জীবনে যার সঙ্গে মেলে প্রভাতের অরুণচ্ছটা, মেলে সূর্য্যাস্তের মহিমা। সেই কথা বলবার জন্যই আজ আমাদের এই উৎসব। প্রত্যহ নব সূর্য্যোদয়ে আমাদের জীবনের সঙ্কীর্ণ অবরোধ বারে বারে খুলে যাক, নির্ম্মল আলোকে আলোকিত হোক আমাদের অন্তরনিলয় ; বাইরে চলে আসি প্রত্যহের সব ক্ষয় ক্ষতিকে অতিক্রম ক'রে। সেই চলা জয়যাত্রায় চলা, সকল ক্ষুদ্রতাকে পায়ের তলায় আনন্দে মাড়িয়ে দিয়ে চলা। প্রতিদিন প্রভাতে এই আনন্দের পাথেয় আমাদের জীবনের পাত্রকে নূতন ক'রে পূর্ণ করুক।

বিমল আনন্দে জাগো রে
মগন হও সুধাসাগরে। *

৭ই পৌষ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

* শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে আচার্য্যের উদ্বোধন। প্রবাসীর পক্ষ হইতে অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত।

যাত্রী মানব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষ যাত্রী। জন্তু যেখানে জন্মেছে সেখানেই স্থির হয়ে আছে—তার যা পাথেয় তা অর্জ্জনের জন্যে তাকে অগ্রসর হ'তে হয় না, চিরদিন একই স্থানে রয়ে গেল তার চিত্তবৃত্তি। মানুষ কোন্ আদিযুগে এগোতে আরম্ভ করেছে, চলা আর শেষ হ'তে চায় না। বস্তুত থামলেই সে হয় অকৃতার্থ, থামাটা তার প্রকৃতিসঙ্গত নয়। তার সম্মুখে তার দৃষ্টির বাইরে দিগন্ত পেরিয়ে যে একটা লক্ষ্য আছে—যদি সেটা সত্য হয় তবেই সে বাঁচল, আর যদি সে মিথ্যা হয় তবেই তার সর্ব্বনাশ।

সামনে একটা সত্য আছে এই কথাটা নিজের গোচরে বা অগোচরে তার মনের মধ্যে কাজ করে, সেই জন্যেই কেবলই তাকে লড়াই করতে হয়, বাধা উত্তীর্ণ হবার চেষ্টায় কেবলই দুঃখ সইতে হয়, কিন্তু কিছুতে তার চুপ ক'রে থাকবার হুকুম নেই। প্রথমে সে চলা সুরু করলে প্রধানত জীবিকার ক্ষেত্রে। সেই ক্ষেত্রে আজও তাকে ভাবতে হচ্ছে, খুঁজ্‌তে হচ্ছে, বানাতে হচ্ছে। অর্থাৎ এগোতে হচ্ছে। যেখানেই সেই চেষ্টা সত্য, সেই চেষ্টা প্রবল, সেখানেই প্রাণধারণের বিপুল আয়োজনে মানবসভ্যতা সার্থক। এই জীবিকার ক্ষেত্রই জন্তুদের একমাত্র ক্ষেত্র, নূতন উদ্ভাবনা দ্বারা এই ক্ষেত্রকে প্রশস্ত ও প্রভাবশালী করবার দায়িত্ব তারা উপলব্ধি করে না।

আমাদের শাস্ত্রে পৃথিবীকে বলেছে অন্ন। মানুষ তো শুধু খেয়ে বাঁচে না, এই পৃথিবীর আলোক বাতাস সব নিয়ে সে স্বাস্থ্যসম্পন্ন। বস্তুরাজ্যের সমস্ত-কিছু নিয়ে এই অন্নরূপিণী পৃথিবীর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক সত্য হয়েছে তারা হয়েছে শক্তিশালী, আর যাদের সঙ্গে এই যোগ সত্য হয় নি এই বিরাট অন্নক্ষেত্রে তাদের কেবল উচ্ছিষ্ট নিয়েই খুশী থাকতে হচ্ছে।

অন্নের ক্ষেত্র ছাড়া আমাদের জীবনে আরেকটা দিক আছে—মন বুদ্ধির দিক।—জন্তুর তো কোনো প্রশ্ন নেই; মানুষের সমস্যা অসংখ্য, প্রশ্নের উত্তর তাকে দিতে হবে। মানুষ তাতে ভুল করছে, কিন্তু নিরস্ত হচ্ছে না। দৃষ্টিকে ভাবনাকে অলীক সংস্কারে আবিল ক'রে, কত জাতির ধ্বংস হয়ে গেছে, তার হয়ত চিহ্নও নেই। তাদের মনে সাধনা সজাগ ছিল না, সকল প্রশ্নের তারা উত্তর দিতে পারে নি। তারা মন্ত্র নিয়েছে কানে, তার অর্থ আছে কি নেই তার পরীক্ষা করেই নি, বুদ্ধি দিয়ে তার যাচাই করবে এমন সাহস ছিল না। এমন কত মূঢ় সংসারে পিছিয়ে গেল, এ তো চোখের সামনে দেখছি। তপস্যার দ্বারা মানুষকে বিশ্বপ্রশ্নের উত্তর দিতে হয়—তারই সত্যতায় সে হয় বিশ্বজয়ী, আর যারা রইল মূক, কিংবা কথা বলল অবোধের মত, বিশ্বমানবসমাজে তারা অবজ্ঞাত, সত্যের পথে জ্ঞানের সাধনায় তারা অকৃতী ব'লে পরিগণিত।

তবে এও 'তো দেখ্‌ছি, জ্ঞানের সম্পদে যারা বিশ্বকে পেয়েছে তারাও তো সার্থকতা লাভ করে নি। বিনাশের আগুন তারা জ্বালিয়েছে চারি দিকে—বিজ্ঞান তার থেকে রক্ষা না ক'রে সেই আগুনে ইন্ধন জোগাতে লাগল। অন্নক্ষেত্রে জ্ঞানক্ষেত্রে যারা জয়ী, আত্মার ক্ষেত্রে কী ভীষণ বর্ব্বরতার পরিচয় তারা দিচ্ছে! তারা নিরন্তর যে বিশ্বতত্ত্বের উদ্ভাবনা করছে—সেই তত্ত্বমন্দিরেই তারা বিশ্বের মৃত্যুবাণ তৈরি করছে। কেন এমন হয়? আত্মাকে তারা বিশ্বাস করে নি। অন্নক্ষেত্রে জ্ঞানক্ষেত্রে সত্যের যেমন অসীমত্ব আছে, যার প্রতি লক্ষ্য ক'রে উপনিষদ বলেছেন অন্ন ব্রহ্ম, আত্মাকে ধারণ ক'রেও কি তেমনি কোনো অসীম সত্য নেই? সেই সত্যকে বিদ্রূপ ক'রে মানুষ আজ বিশ্বাস করছে কেবল অন্নকে, বস্তুতত্ত্বকে। তাই তার বিপুল ঐশ্বর্য্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করেছে মহতী বিনষ্টি। কেবল হিংস্র হয়ে উঠছে তার বিশ্বব্যাপী লোভ। মানুষ বলতে পারছে না

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

সর্ব্বব্যাপী পরম সত্য থেকে আত্মার অমৃত দান আসছে, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—সেই দান ভোগ করো। সমস্ত শক্তি নিয়ে মানুষ আজ মারছে মানুষকে, সে বলতে পারছে না, ত্যাগের মধ্যেই আনন্দকে পেতে হবে। পরিপূর্ণ স্বরূপকে আত্মায় পেলে কোনো ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই। সেই কথাই আজ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবার দিন এল—বলতে হবে মাগৃধঃ, বল্‌তে হবে, ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্। কাড়াকাড়ি হানাহানিতে তাঁকে পাবে না, লোভে তাঁকে পাবে না, তাঁকে পাওয়া যায় কেবল উদার ত্যাগের মধ্যে।

আমার পিতৃদেব একদিন যখন মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না, তখন বাতাসে একটি ছিন্নপত্র তাঁর সামনে উড়ে এসেছিল—পণ্ডিতকে ডেকে সেই পত্রলিখিত ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্ শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ক্রমশঃ এই শ্লোকের সব কয়টি শব্দের অর্থই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তাঁর জীবনের পাতার পর পাতায় সেই অর্থ ফুটে উঠতে লাগল—এই একটি মাত্র শ্লোক ধীরে ধীরে তাঁর সংসারকে জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল, আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে ক্রমে তিনি নির্ম্মল আনন্দের অধিকার লাভ করলেন। আজ ৭ই পৌষে তারই উৎসব।

যেমন এই শ্লোকটি উড়ে এসেছিল পরম দুঃখের দিনে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি আজ এই বিষম বিপত্তির যুগে উড়ে পড়ুক না পৃথিবীর সর্ব্বত্র—দানবিক হিংসা, পাশবিক লোভের হলাহল-মন্থনের মধ্যে। বহন ক'রে নিয়ে যাক এই অনুশাসন মা গৃধঃ, লোভ ক'রো না। পড়ুক না সেই বাণী আজ দিকদিগন্তরে ছড়িয়ে!*

৭ই পৌষ, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

---

* শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে আচার্য্যের উপদেশ। প্রবাসীর পক্ষ হইতে অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত।

অকালবোধন

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

(১)

কাল পূজার ছুটি। পরশু সকালে 'চটাগং-মেলে' রওয়ানা হইব। মাত্র সাত দিনের ছুটি।

পরশু বাড়ির চিঠি পাইয়াছি,—স্ত্রীর চিঠি। লিখিয়াছে, কোলের ছেলেটা 'বাবা' বলিতে শিখিয়াছে; আর ছোট মেয়ে পুঁটির ডান হাতে একটা ফোড়া হইয়াছে।

বয়সের মাপকাঠিতে স্ত্রীর আমার যৌবন না-কি অনেকখানিই অবশিষ্ট আছে। তবু বহু আগেই সে 'প্রিয়তমা' হইতে 'কল্যাণীয়াসু' হইয়া গেছে। সুতরাং সেখানে আর ভয় নাই।

বিপদে ফেলিয়াছে আমার এগার বছরের বড়মেয়ে মিনি। গেল বড়দিনের ছুটিতে তার মা না শুনিতে পায় এমনই ভাবে আমার কানে-কানে ফরমাশ করিয়াছিল, "আসছে পূজোয় মুখুজ্যেদের খেঁদীর ভায়লা শাড়ির মত আমায় একখানা দিও বাবা—কি যে ছাই কাপড় আন তুমি, ও কি পরা যায়—ছালার চট।"

গরিবের ঘরে ঘোড়া-রোগ! তবু পিতা আমি কথা দিয়াছিলাম। তখন কি আর জানিতাম আমার ইহলোকের ভাগ্যবিধাতা একটি কলমের আঁচড়ে আমার পঞ্চাশকে চল্লিশে নামাইয়া দিবেন। যাক্ তবু চাকুরীটা বজায় আছে।

মিনির ভায়লা শাড়ী! সে আর এবার না।

মেসের পাওনা, চাকরটার পূজার বকশিস সংসার-খরচের মাসিক টাকাটা, আমার যাতায়াতের রেল-ষ্টীমার ভাড়া, এ সব ধরিয়া মোটে সাত টাকা অবশিষ্ট থাকে। তাহাই লইয়া সন্ধ্যার পর বাহির হইয়া পড়িলাম। ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় কেনা আজই সারিয়া রাখি।

পূজার বাজারে রাজধানী কলিকাতা আজ নানা ছাঁদে

সাজিয়াছে। দোকানে দোকানে সাজানো শো-কেস্। আলোগুলির শক্তি বাড়িয়াছে চার গুণ। চোক ধাঁধায়। রাস্তায় জনতার জোয়ার ঠেলিয়া চলিতে হয়। রাত এগারটার আগে ভাঁটা দেখা দেয় না।

পূজা সেল্! পূজা সেল্! রক্তের মত লাল কাপড়ে সাদা হরফে শুভ আমন্ত্রণ ঝুলিতেছে।

কলেজ ষ্ট্রীটের দুই পাশে বুইক্, প্লিমাথ, ক্যাডিলাক, বেবি-অষ্টিন্ সার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। টালা হইতে টালিগঞ্জের বড় ঘরের গৃহলক্ষ্মীরা দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া পূজার বাজার করিতে আসিয়াছেন।

চোক্-ঝলসানো শো-কেস্। কাচের মধ্যে ঢাকাই, কাশ্মীরী, ফরাসডাঙা, ভাগলপুরীর জড়াজড়ি; নীল, ফিকে-নীল, লাল, গোলাপী, বেগুনী, ফিরোজার ঝলমলানি; ভাঁজ-করা, ভাঁজ-খোলা মুগা-তসর-সিল্কের বিক্ষিপ্ত বিন্যাস। জরির জ্যাকেট, বিবির ব্লাউস্, পরীর পোষাক। জলুশের জল্সা! উগ্র আলোয় কাচের কারাগারে বন্দী হইয়া আছে কামনার শিল্প-সুন্দরীরা। ঐ ভঙ্গুর ব্যবধানটুকু তো এক নিমেষে ভাঙিয়া ফেলিতে জানি! মোড়ে ঐ পুলিশ খাড়া আছে না?…

মিনির ভায়লা শাড়ী। ঐ সিল্কের শাড়ীখানার দামটা লেখা আছে কত? আঠার টাকা! গত সপ্তাহে বৌবাজারের গির্জ্জায় যে লটারীর টিকিটখানি কিনিয়াছিলাম তার নম্বর— ?—ডি. ৩০৯। ঠিক মনে আছে। ড্রয়িং ২৮শে নভেম্বর।…

'শ্যামবাজার, বাবু শ্যামবাজার, তিন পয়সা।' লোকটার নির্ঘাত যক্ষা হইবে। এত জোরেও কখনও চীৎকার করে!…

হুঁ, শুধু আমিই একা বুঝি! শো-কেসের সামনে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণনয়নে আরও ত কত লোক। কিনিবার জন্য দেখিতেছে না নিশ্চয়ই। আমারই সগোত্র। আমারই মত লটারীর টিকিটে দুর্গা, কালী, হরি, লক্ষ্মী ছাড়িয়া, তার পর মিনি, পুঁটি, খোকন, সরযূ শেষ করিয়া অবশেষে হতভাগা, অলক্ষ্মী, আন্-লাকী প্রভৃতি নম-ডি-প্লুম ওরাও বুঝি লিখিতে সুরু করিয়াছে।…

পূজা সেল! পূজা সেল! রক্তের মত লাল কাপড়ে বড় হরফে শুভ আমন্ত্রণ।

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী হইতে কাপড় কিনিয়া ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিলাম। পুরনো পাঞ্জাবীটা ভিজিয়া শপশপে।

আর ঘণ্টা পঁয়ত্রিশেক। পরশু সকাল সাতটায় চিটাগং-মেল।…খোকা না-কি 'বাবা' বলিতে শিখিয়াছে।

(২)

বেলা পাঁচটায় ষ্টীমার ছাড়িয়া নৌকায় উঠিলাম। বাড়ি পৌছিতে ঘণ্টা-তিনেক লাগিবে।

নৌকা চলিয়াছে পদ্মার কোল ঘেঁষিয়া। রাক্ষসী এখন ধ্বংসলীলায় পরিশ্রান্ত হইয়া পাড় হইতে অনেকখানি নামিয়া আসিয়াছে। তটপ্রান্ত ধরিয়া সর্ব্বনাশীর নিষ্ঠুর অত্যাচারের করুণ-কাতর আঘাতচিহ্নগুলি হাঁ করিয়া আছে। একটা দালানের অর্দ্ধেক ধ্বসিয়া ইট-বারকরা, বাকী অর্দ্ধেক আধ-মরার মত চুপ করিয়া রহিয়াছে। ঐ অশ্বত্থ গাছটার ভিত্তিমূল একেবারে ঝাঁজরা হইয়া গেছে। স্নেহার্দ্র মৃত্তিকা তবু তাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে অন্ততঃ এবারের মত বাঁচাইয়া রাখিল। ও-বাড়িটার উঠানের অর্দ্ধেক নাই, এ-গ্রামের জেলেপাড়াটাই শুধু বাকী, এখানে-সেখানে মেটে হাঁড়িকলসীর টুকরাগুলি ছড়াইয়া আছে। দেখিতে দেখিতে চলিলাম, স্থিতির ক্ষণভঙ্গুরতা। দুর্ব্বার গতিমুখে স্থাবর-অস্থাবরের নিরুপায় আত্মসমর্পণ। এবার বর্ষায় কি ভাঙাটাই না ভাঙিয়াছে!

পদ্মা এখন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। তার বিস্তীর্ণ বুকে দূরে দূরে পাল তুলিয়া চলিয়াছে ছোটবড় ডিঙিগুলি। নির্মেঘ আকাশের কোলে দল বাঁধিয়া এক ঝাঁক বক দিয়াছে এপার-ওপার পাড়ি।…মিনিদের কাপড়ের পাড়গুলি আর একটু ভাল দেখিয়া কেনাই উচিত ছিল।

নদী ছাড়িয়া নৌকা এবার খালের মুখ ধরিয়াছে।

মাঠের জল প্রায় নামিয়া আসিয়াছে। শূন্য পাটের ক্ষেতে এখানে-সেখানে কচুরি-পানা জমা হইয়া আছে। সামান্য বাতাসেই ধানক্ষেতে খস্খস্ শব্দ। বাঁ-দিকের গ্রামটার শেষে গাছের সারে দোয়েল-শ্যামা শিস্ তুলিয়াছে। খালের ডান পারে ঐ মাদার গাছটায় খঞ্জনটা নাচিতেছে ত বেশ! বেত-ঝোপের আড়ালে একটা ডাহুক আছে গা ঢাকা দিয়া। খালের বুকে আড়াআড়ি পাতা গড়াটার কাছে একটা লোক গোটা-চারেক ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের তেতলা মেসের স্যাঁৎসেঁতে মেঝে ছাড়িয়া একেবারে পূর্ব্ববঙ্গের শারদ প্রকৃতির মাঝখানে! পাশের বাসার দোতলার সেই কুঁদুলে বউটার তোলা-উনুনের ধোঁয়ার পরিবর্ত্তে মুক্ত উদার ছন্দোময় বায়ুহিল্লোল! কাল রাতে গলির বাঁকে কুল্‌পি বরফের বিশ্রী হাঁক, আর আজই গাছের ফাঁকে শালিকের অশ্রান্ত কিচিরমিচির। সকালের জলে-কাদায় কুশ্রী কালো মৃজাপুর ষ্ট্রীটের পরিবর্ত্তে বিকালেই দেখি, ঘোমটা-খসা সুকেশীর সরল সিঁথিরেখার মত ধানক্ষেতের বুক চিরিয়া একটানা 'দাঁড়া'টি আঁকিয়া-বাঁকিয়া চোখের আড়াল হইয়া মিলাইয়া গেছে।...ও, মিনি?—ভায়লা শাড়ী তাকে সামনের বছরেই কিনিয়া দিব।

খালটি এবার মাঠ ছাড়িয়া একটি গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। একটা বড় বাড়িতে পূজার ব্যস্ত আয়োজন, মণ্ডপে কুমার প্রতিমার চক্ষুদান করিতেছে।

সামনের বাড়িটায় তিন ভিটায় তিনখানি বড় টিনের ঘর, খালের দিকটা লাউয়ের মাচা ও কুমড়ার ঝাঁকায় ঢাকা পড়িলেও লতাইয়া-ওঠা ডাঁটাগুলির ফাঁকে ফাঁকে উঠানের মাঝখানটা চোখে পড়ে। আট-দশটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাতধরাধরি করিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্বরে গাহিতেছে, "হাঁটুখানি পানি ঝাকর ঝানি, হাঁটুখানি পানি ঝাকর ঝানি।"

নৌকা এবার দুইটি খালের সঙ্গমস্থলে আসিয়া বাঁ-দিকে মোড় ফিরাইল। ডান-দিকের খাল ধরিয়া উমেদপুর বাজারের পাশ দিয়া নদীতে পড়া যায়।

ছেলেমেয়েগুলির সম্মিলিত ছড়া-গান ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। কথাগুলি আর বোঝা যায় না। শুধু সুর বাজে কানে,—হাঁটুখানি পানি ঝাকর ঝানি, হাঁটুখানি পানি ঝাকর ঝানি। অর্থহীন সুন্দর ছড়া! বৃত্তাকারে ঘূর্ণ্যমান কি চমৎকার সহজ সরল আবর্ত্ত-নৃত্য!

চোখ-গেল পাখীটা যদি এখন থাকিত, আর ডাকিয়া উঠিত একটিবারের জন্য বউ-কথা-কও বিরহী বিহগবঁধু, তবেই না আজ কলিকাতা হইতে দু'শ মাইল দূরের এই প্রশান্ত পরিবেশটি পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিত। কোকিলের ডাক যে কতকাল শুনি না, পানকৌড়ি ত গড়ের মাঠে চোখে পড়ে না। গোলদীঘির জলের উপর কি আর মাছরাঙা উড়িয়া বেড়ায়! এরা সব গেল কোথায়? আজ আমি সবাইকে চাই,—সবাইকে,—আমার আশৈশবের নাম-জানা নাম-না-জানা বিজাতীয় বিভাষীয় সকল পরিচিত-অপরিচিত বন্ধুদের।

সন্ধ্যা হয়-হয়। মাঠের ওপারে বৃক্ষশ্রেণীর ঘনায়মান আবছায়ার অন্তরালে দিনান্তের সোনার থালাখানি পড়িল ঢলিয়া। ঘরে ঘরে বাতি জ্বলিয়াছে। রান্নাঘরে মিটি মিটি করে কেরোসিনের ডিবা।

এ পাড়ার পূজাবাড়িতে ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে। ভিন্ গাঁয়ের কাঁসরঘণ্টাগুলির শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। কাল পূজা। আজ বোধন। নিরানন্দ ঘরে দু-দিনের আনন্দরোল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমিও ত বাড়ি পৌঁছিব। খোকা নাকি বড় দুষ্টু হইয়াছে।

বিপরীত দিক হইতে একটা নৌকা আসিয়া পড়িয়াছে। কেরোসিনের ডিবার আলোয় ভাল করিয়া কিছু দেখা যায় না।

আমার মাঝি হাঁকিল, "আপন ডান?"

ও নৌকা হইতে জবাব আসিল, "আপন ডান।"

এ-তো আর কীপ্-টু-দি-লেফ্‌ট মানিয়া চলা কলিকাতার রাজপথ নহে। শীর্ণ খালের সর্পিল পথে অন্ধকারে এরা চিরকালই ডান-হাতি চলে।...পুঁটির ডান হাতের ফোড়াটা বোধ হয় এতদিনে সারিয়া গিয়াছে।

বিপরীত দিক হইতে আর একখানি নৌকা আসিল। আমার মাঝি প্রশ্ন করিল, "ও ভাই, ঝাউপাড়ার খালের মুখে নৌকা উঠ্‌বে ত?"

উত্তর আসিল, "একটু ঠেক্‌তে পারে।"

"টেনে নেওয়া চলবে তো?"

"ক'জন লোক?"

"একজন"।

"তা হ'লে জলে নামতে হবে না—কোন্ গাঁয়ে যাচ্ছ ভাই?"

কথার জবাব দিয়া মাঝি লগি বাহিয়া চলিল।

মাঝির ডাকে ঘুম ভাঙিল। চাহিয়া দেখি, চৌধুরীদের বাহির-বাড়ির ঘাটে নৌকা ভিড়িয়াছে।

আমার ডাক শুনিয়া মিনি টিম্‌টিমে হারিকেনটা হাতে

বাহিরে ছুটিয়া আসিল। তার পিছু পিছু শিথিল আঁচলটা মাথায় তুলিতে তুলিতে মিনির মা-ও।

সাড়া পাইয়া অপর সরিকের ঠানপিসিমা আসিলেন, আসিলেন তারিণীখুড়ো ও তাঁর বড় ছেলে মন্টু। পাশের বাড়ির সম্পর্কিত মহিমদা ও পদী-মাসীমা আসিলেন। আমাদের পুকুরের কোণে ধোপাবাড়ির নন্দা আসিয়া হাজির। প্রণাম করিয়া ও প্রণাম পাইয়া কুশল-প্রশ্নাদির পর্ব্ব শেষ করিলাম।

শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের দোতলা মেস-বাড়িটার চল্লিশ টাকার কেরাণী নহি আর। এখন আমি দস্তুরমত একটা পারসোন্যালিটি!

বিছানা-বাক্স ঘরে তুলিয়া মাঝিকে বিদায় দিলাম। মিনি আমার জুতার ফিতা খুলিয়া দিল। বাল্‌তির জলে পা ধোয়াইয়া গামছায় পা মোছাইল। মেয়ের আমার মুখে-চোখে আনন্দ আর ধরে না।

মিনির মা তার চাবিছড়া-বাঁধা আঁচলখানি গলায় জড়াইয়া আমার পায়ের ধূলা নিল।

কহিলাম, "বড্ড যে রোগা হয়ে গেছ।"

"বুড়ি হ'য়ে গেলাম—" বলিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল। আজকের মিনির মা'র মধ্যে বিশ বছর আগেকার সরযূ হঠাৎ একটু জাগিয়া উঠিয়া আবার মুহূর্ত্তমধ্যে মিলাইয়া গেল। জোয়ারজলে ভাঁটার ডাক আসিয়াছে বটে, যাই-যাই করিয়া যাইতে এখনও কতকটা দেরী আছে তবে!

সরযূ চৌকির কাছে গিয়া ডাকিল, "ও খোকন, ওঠ!—ও পুঁটি, ওঠ্, ওঠ্, দ্যাখ্ কে এসেছে!"

"থাক্ না, ঘুমুক", বলিয়া আমি চৌকির দিকে আগাইয়া গেলাম। বাঃ, দুটি শুকতারা যেন অঘোরে ঘুমাইয়া আছে। খোকনের কপালের উপর আলগোছে একটি চুমু খাইলাম।—কেরাণী-পিতার স্পর্শ-আশীর্ব্বাদ!

সরযূ কহিল, "পুঁটি কি আজ ঘুমুতে চায়! কেবলই, মা, বাবা আসবে কখন, কই এল না ত! এতক্ষণ থেকে থেকে এই তুমি আসবার একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

"ওর ফোড়া সেরেছে ত?"

"হাাঁ।"

মিনি বলিয়া উঠিল, "বাবা, খোকনমণি আমাদের হাঁটতে শিখেছে,—দেখবে কাল।"

"তুমি এখন শোও গে যাও।"

"আমার এখনো ঘুম পায় নি বাবা, শোব'খন পরে।"

"না মা, রাত অনেক হয়েছে। অসুখ করবে যে," বলিয়া মিনির মাথায় ডানহাতখানি রাখিলাম। তাই ত! মিনি যে বড় হইয়া উঠিতেছে! খোকনটা বড় ভুল করিয়া ফেলিয়াছে। এগার বছর আগে ওরই যে আসা উচিত ছিল। মিনির ত আজ আসিলেও চলিত। ভায়লা শাড়ীর ফরমাশটা দু-বছর পরে হইলেও ক্ষতি ছিল না। আগাগোড়াই যেন কিসের এক গরমিল হইয়া গেছে।

ঘরের মেঝেতে ভাত বাড়িয়া ঢাকা দিয়া রাখিয়াছে। সামনে ঠাকুরদাদার আমলের বড় পিঁড়িখানি পাতা। গাড়ু ও খড়মজোড়া যথাস্থানে সাজান। ছোট একটি পিতলের প্লেটে গুটিকয়েক পানের খিলি। পাশেই কাঁসার পিক্‌দানিটা। জলচৌকির উপর শুক্‌নো গামছাখানি ভাঁজকরা। কে বলে কেরাণী,—আমি মহারাজ, অন্ততঃ আজ একটি রাত্রে।

খাইতে বসিয়াছি। পাতের কাছে গোটা-পাঁচেক ছোট-বড় বাটি। বাটির চাপে গোল করিয়া বাড়া ভাত এখনও একটু একটু গরম আছে। উড়ে ঠাকুরের ঘ্যাঁট-খাওয়া মুখে শুক্‌তো-চচ্চড়ি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলাম। সরযূ সামনে বসিয়া আমাকে পাখার বাতাস করিতেছে। এটা খাও, ওটা খাও, আর একটু, যেন পেটে না ধরিলেও অনুরোধে গিলিতেই হইবে।

আজ আমি শাহান-শা বাদশা, সাম্রাজ্য আমার ষোল হাত দৈর্ঘ্যে ও এগার হাত প্রস্থের এই করোগেট-টিনের গৃহটি। ঐত রাজমহিষী সামনে বসিয়া পাখা হাতে, পরনে তাহার আধময়লা আটপৌরে শাড়ী, মণিবন্ধে দু-জোড়া শাঁখার চুড়ি, কপালে লাল ডগ্‌ডগে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিমূলে জলজল্ করিতেছে এয়োতির গর্ব্বচিহ্ন। কে বলে আমি সওদাগরি আপিসের চল্লিশ টাকার কেরাণী। আমি রাজাধিরাজ, অন্ততঃ এই একটি রাত্রে।

ভোজনান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে বিছানায় গা-এলাইয়া দিলাম। শুইয়া থাকিয়া স্ত্রীর মুখে গত নয় মাসের তেতো-মিঠে ইতিহাস শুনিতে লাগিলাম। মুখুজ্যেগিন্নী রাঙা টুকটুকে পুত্রবধূ ঘরে আনিয়াছে, হরিশ দত্তের এবার চার মেয়ের পর ছেলে হইল, শরিকী বিবাদ

আর সহ্য করা যায় না, টিনের চালার মাঝে মাঝে ফুটা হইয়া গেছে—এবার না সারাইলে সামনের বর্ষায় ছেলেপিলে লইয়া জলে ভিজিতে হইবে—আরও কত কি!

অবশেষে মুখভারের ভান করিয়া কহিল, "তোমার আর কি, তুমি ত দূরে সরে আছ—ঝঞ্ঝাট যত আমারই।"

কহিলাম, "আর ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না গো। এবার তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। একটি ঘর ঠিক করে এসেছি—বারো টাকা ভাড়া।"

কথাটা বিশ্বাস করিল না। কহিল, "হ্যাঁ; কতবারই অমন নেব-নেব করলে! কথায় বলে, পাপী যাবে গঙ্গাস্নান, কাঁটা জুড়োবে কে।"

"না গো, সত্যি তোমাদের নিয়ে যাব এবার। মা তার শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যেতে চাইত না, নইলে ত কবেই তোমাকে নিয়ে যেতাম।"

সরযূ চুপ করিয়া রহিল। এবার বোধ করি বিশ্বাস করিয়াও অবিশ্বাসের ভাব দেখাইতেছে।

হাসিয়া কহিলাম, "বিশ্বাস হচ্ছে না, না?"

গম্ভীর হইয়া কহিল, "মা কালী কি আমায় টান্‌বেন—"

হাসিয়া কহিলাম, "পুণ্যের জোর থাকে ত অবশ্যি টান্‌বেন।"

সরযূ খানিক চুপ থাকিয়া কহিল, "কিন্তু আমাদের ঘর-দোর দেখ্‌বে কে? সব যে যাবে নষ্ট হ'য়ে, লুটেপুটে খাবে ও-ঘরের ওরা।'

অপর শরিকের উপর ঝাঁজ তাহার কম নয়। আমি হাসিয়া কহিলাম, "সে চিন্তা ক'রো না, আমি সব বন্দোবস্ত করব। বিপিন লোধ আজ দু-বছর ধরে একটু জমি চাইছে। সে তার পরিবার নিয়ে বাড়িতে থাকবে, তদারক করবে, ফলফুলুরি সব খাবে-দাবে, খবর পেলে সে এক্ষুণি দৌড়ে আসবে।"

তবু সে চুপ করিয়া রহিল।

হাসিয়া কহিলাম, "বড্ড রোগা হয়ে গেছ সরু।"

"চুলও পেকেছে গো, রাত্রিবেলা দেখা যায় না, কাল সকালে দেখো," বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমিও হাসিয়া তাহার মুখের বেড়াটি তুলিয়া ধরিতেই সে বিছানার কোলে মাথা নোয়াইল। আমার বিশ বছরের পরিচিতা প্রিয়া হঠাৎ কেমন যেন এক নব-পরিচিতের মত মনে হইল। বিরহের পর মিলন-লগ্নের সহাস সুন্দর লজ্জাভূষণ ত এ নয়, সে মধুময় অভিজ্ঞতা আমার জীবনে কতবারই না ঘটিয়াছে। এ যে সম্পূর্ণ নূতন। এ কি পড়ন্ত বয়সের প্রকম্পিত ছায়া, না পতি-পত্নীর মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মাতৃত্বের ম্লানায়মান সহজ স্বাভাবিক সুন্দর ব্যবধানটুকু? ঐ ত আমাদের উভয়ের সম্মিলিত জীবনের অবিচ্ছেদ্য সীমান্তখানি,—সারি সারি শুইয়া আছে ঐ ত মিনি, ঐ যে পুঁটি, ঐ যে আমাদের শিবরাত্রির সলিতা খোকনমণি!

সরযূ ডাকিল, "ওগো শুনছ?"

"কেন?"

"মিনি ত বড় হয়ে উঠল—এখন থেকে..."

"ক্ষেপেছ! একরত্তি মেয়েকে তুমি যে জোর করে ডবল প্রমোশন দিতে চাও গো। সর্দা-আইনের সীমানা পার হ'তে এখনও চার-পাঁচ বছর বাকী।"

"এখন থেকে খোঁজ-খবর করতেই সময় হ'য়ে যাবে।"

বুঝিলাম প্রসঙ্গটা সহসা থামিবে না। কহিলাম, "কাল তোমার কথা শুন্‌ব সরু। শেয়ালদা থেকে গোয়ালন্দ অবধি ঠায় দাঁড়িয়ে এসেছি। একটুও বসতে পারিনি।"

"না গো, আমি আর কথা বলব না। তুমি ঘুমোও—আমি তোমার পা টিপে দি—তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে'খন।"

খানিকক্ষণ বাদে সরযূ আমার পায়ের নখগুলি খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, "ঘুমুচ্ছ?"

চোখ মেলিয়া হাসিয়া কহিলাম, "এই না বল্‌লে কথা বলবে না..."

"একটা কথা শুধু। তারপর আর বলব না। দেখ, তুমি আর—শুনছ ত?"

"হ্যাঁ গো।"

"—তুমি আর মিনির সামনে আমায় 'সরু' বলে ডেকো না যেন।"

"তবে কি বলে ডাকব?"

"কেন—মিনির মা।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

মাঝরাতে জাগিয়া দেখি, সরযূ আমার পায়ের তলায়

ঘুমাইয়া আছে। অযত্নে-বাঁধা শিথিল খোঁপাটি আমার দু-পা ছাইয়া ছড়াইয়া গেছে। তাহার আঁচলের নীচে বুকের নিয়মিত ওঠা-নামার তালে তালে পরিমিত নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মৃদুতর শব্দগুলি স্পষ্টই শুনিতেছি।

ঘুমাইয়া আছে সরযূ, না মিনির মা। বেসুর সেতার, বিমনা সেতারী। শুক-সারী আজ সুর ভুলিয়াছে। সুধাভাণ্ড ভরা কানায় কানায়, বাতাসে তার সৌরভ গেছে উবিয়া। অতীতের কুহেলিগুণ্ঠন ছিঁড়িয়া উঁকি দিতেছে দু-চারিটি স্মৃতিমধুর মধ্যরাত্রি।

এ তো বিদায় নয়, বিচ্ছেদ নয়, ব্যবধান নয়! এ যে নূতন করিয়া আর এক অরুণোদয়ের পূর্ব্বাভাস, আর এক নূতন জীবনের। এতদিন ছিল সীমাহীন বিস্তার, আজ আসিতেছে অথৈ গভীরতা। প্লাবন গিয়াছে নামিয়া, আজ দেখি ভারে ভারে পলিমাটি জমা। উদয়াস্ত দুই তীর এক হইয়া গেছে। পেলব পুষ্পের কোমল ফল-পরিণতি! সরযূর বিদায়, মিনির মা'র উদয়!

(৩)

সকালে ঘুম ভাঙিতেই দেখি তিন ভাই বোন নূতন কাপড় জামা লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। পুঁটি শক্ত করিয়া খোকনকে ধরিয়া রাখিয়াছে, আর মিনি ছোট ভাইটির বিস্তর আপত্তির বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহাকে রঙীন ফ্রকটা পরাইতে ব্যস্ত। শিশু খানিক ক্ষণ আপত্তিসূচক ক্রন্দনের পর শেষে তার মেজদির হাত ছাড়াইতে পারিয়া বড়দির সঙ্গে রীতিমত লড়াই সুরু করিয়া দিয়াছে।

"লক্ষ্মী মাণিক, কথা শোন, কেমন সুন্দর জামা তোমার,"—দিদির অধীর অনুনয়েও ভাই তাহার কথা শোনে না।

খোকন পরাজয় মানিয়াছে। আমি উঠিয়া সশব্দে তুড়ি দিয়া তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। দুষ্টু দুটি মিষ্টি চোখ দিদির দিকে চাহিয়া মিটি মিটি হাসিতেছিল। আমার দিকে তাকাইয়াই থমকিয়া গেল, আগন্তুক দেখিয়া ভয় পাইয়াছে বুঝি।

হাত বাড়াইলাম, ঘাড় ফিরাইল। গায়ে হাত দিলাম, দিদির কাঁধে মুখ লুকাইল। ভয় পাইবারই কথা। আমি যে অপরিচিত। চঞ্চল চোখদুটি আমার দিকে ক্ষণকালের জন্য পাতিয়া ধরিতেও ভরসা পায় না।

"যাও খোকন, বাবার কাছে যাও,—ওকি! কথা শোন লক্ষ্মীটি!" সে কি কথা বোঝে যে দিদির অনুরোধে বাবার কোলে যাইবে।

এবার সে ঝাঁপাইয়া পুঁটির কোলে গেল। ছ-বছরের দিদির কোলেও সে যায়, তবু পিতার কাছে ঘেঁষিতে চায় না।

ভাইকে নামাইয়া দিয়া পুঁটি আসিয়া আমার কোল জুড়িয়া বসিল। "বাবা খোকন হাঁটতে শিখেছে,—এই দেখ," বলিয়া মিনি ভাইয়ের বিদ্যার পরিচয় দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। দু-পা আগাইয়া শিশুর মেজাজ গেল বিগড়াইয়া। "হাঁটি হাঁটি পা পা,—হাঁটি হাঁটি পা পা, এই দুষ্টু ছেলে, কথা শোনে না।" বলিয়া মিনি যেই জোর করিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিল দুষ্টু ছেলে অমনি কাঁদিয়া ফাটিয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া হাত বাড়াইলাম। সে ছোট্ট হাত দুটি দিয়া ওই মিনিকেই শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিল, তবু আমায় সে আমল দিবে না।

পুঁটি তার রঙীন ডুরে শাড়িখানি পরিয়াছে। বাঃ, বেশ মানাইয়াছে ত। আবার তার মায়ের চাবি-ছড়াও আঁচলে বাঁধিয়াছে। মেয়ে আমার খুব গিন্নী হইয়াছে!

মিনিকে কহিলাম, "মা, তোর ভাল শাড়ি আনি নি বলে দুঃখ্ করিস্ নি। এবার ক'লকাতা গিয়েই কিনে দেব।"

মিনি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কেন বাবা, এই ত বেশ কাপড়, সুন্দর পাড়। পোষাকী কাপড় কি আর সব সময় পরা যায়—আর দু-দিনেই ত ছিঁড়ে যায়।"

বুঝিলাম, পিতার অক্ষমতার দুঃখ ঢাকিতে সে নিজের না-পাওয়ার দুঃখকে ভুলিবার শিক্ষা পাইয়াছে। খুশী,—হ্যাঁ, খুশী হইলাম বই কি।

মিনি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমার শাড়ি চাই নে বাবা। খোকনকে ওবাড়ির ন'বৌদির ছেলের মত একটা নিকারবকার কিনে দিয়ো—কলকাতা গিয়ে, কেমন?"

নীরবে বাহির হইয়া গেলাম।

গৃহিণী গোবরজলে পিঁড়ি লেপিতেছেন। আজ সপ্তমী পূজা। ঘর-দোর উঠান-হেঁসেল সবই তক্ তক্ করিতেছে।

হাতমুখ ধুইতে পুকুরঘাটে গেলাম। তালগাছের গুঁড়ির গোটা-আষ্টেক সিঁড়ি।

ওপারে চক্রবর্ত্তীদের রান্নাঘরের পিছনের গাছটায় ঝাঁকে ঝাঁকে স্থলপদ্ম ফুটিয়া আছে। পুকুরের জলে শাপলা-রূপসীরা গত রজনীর স্বপ্নাবেশে তন্দ্রাতুর। ঘাটের কোণায় অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছে শিথিল শিউলিবালারা। অথৈ অপার নীলিমার বুকে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাহির হইয়াছে শাদা মেঘের ছোট-বড়-মাঝারি ডিঙিগুলি হাল্‌কা হাওয়ায় ছিটান পেঁজা-তুলার মত। ভুবন-ছাওয়া সোনালি আলোয় ঝুর্ ঝুর্ করিয়া ঝরিয়া পড়ে রঙের গীতি, তাপের সুর, রেখার রিনিঝিনি। এই স্থল-জল, আকাশ-আলোর আশৈশব পরিচিত আবেষ্টন হইতে আমি কি-না নিষ্ঠুরের মত চাহিতেছি মিনিদের কলিকাতা লইয়া যাইতে,—বেলেঘাটার এক স্যাঁৎসেঁতে একতলা কোঠায়,—ধূলা-ধোঁয়ার বদ্ধ কারাগারে!

ঐ মুখুজ্যেবাড়ি ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে। গ্রামপ্রান্তের দত্তবাড়ির সানাইয়ের আওয়াজ এখান থেকেও শোনা যায়। পলাশপুরের বারোয়ারি পূজার বাজনা যদু কামারের বাড়ি ছাড়াইলেই স্পষ্ট শোনা যাইবে।

আজ পূজা! সারা বাংলায়, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে। পূজা আজ! সারাটা দুনিয়া যেন এক জমাটবাঁধা জীবন্ত আনন্দ। আজিকার দিনেও যে অভাগা দুটি দিনের জন্য সকল দুঃখ ভুলিতে শিখিল না তার বাঁচিয়া থাকাটাই মহা অপরাধ।

সরযূ দাওয়া লেপিতেছিল। ছেলেমেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করায় জানাইল, "ঠানপিসীমা ওদের ঠাকুর দেখাতে পূজো-বাড়ি নিয়ে গেছে।"

"কই মিনি ত যায় নি। ঐ যে তুলসীতলা লেপছে।"

"ও যাবে না।"

"কেন?"

সরযূ চুপ করিয়া রহিল।

আমি কহিলাম, "ওকে কেন কাজে আটকে রাখলে আজ? ছেলেমানুষ, আজ বছরকার দিনে—"

"আমি তোমার মেয়েকে আটকে রাখি নি গো।"

"তবে ও যায় নি যে?"

এবার সরযূ গলা খাটো করিয়া কহিল, "মেয়েকে তুমি কি বলেছিলে তা তুমিই জান। মাসেক ধরে মেয়ে তোমার দুবেলা পুকুরঘাটে খেঁদী, অপি, আন্নাদের কাছে ভায়লা শাড়ির গল্প করেছে। পূজোবাড়িতে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে সে-ভয়ে মেয়ে যেতে চাইছে না।"

চুপ করিয়া রহিলাম। বলিবার কি-ই বা আছে আর!

গৃহিণী বলিয়া চলিল, "মেয়ে তোমার অবুঝ নয় তাই ব'লে, বড় হয়েছে, এখন ও বোঝে সবই। তবে কি-না, কাল বিকালেও খেঁদীর কাছে—"

মিনি আসিয়া পড়িয়াছে। গৃহিণী এবার গলা চড়াইয়া দিল, "আমার সঙ্গে দুপুরণবলা প্রতিমা দেখতে যাবে'খন। মেয়ে যেতে চাইলেই ছেড়ে দেব কিনা। বড় হয়েছে, এখন যার-তার সঙ্গে যখন-তখন ছেড়ে দিলে লোকেই বা কি বলবে।"

মায়ে-ঝিয়ে চোখে চোখে কথা হইল। অভিনয়টুকু জমিল বেশ! খুশী হইলাম। মেয়ের আমার বুদ্ধি হইয়াছে! এগার বছরেই পিতার কাছে চিরকালের জন্য তার আব্দার করা শেষ হইয়া গেল! অবাঞ্ছিত বোঝার ভার! গরিবের ঘরে অকালবোধন!

নীল আকাশটা ঝাপ্‌সা দেখায় না? আর দক্ষিণ দিকের ঐ বকুল গাছটা? মেঘ করিয়াছে না-কি?

আমার উমার বুদ্ধি আছে!

ভুবন-ছাওয়া সোনালি আলোয় কার ঐ ব্যথার চিতা জ্বলে?

...ও কিছু না। দেখার ভুল।

কাল রাতে ছিলাম মহারাজ, আজ প্রভাতেই আবার সেই গরিব কেরাণী পিতা!

জন্মস্বত্ব

শ্রীসীতা দেবী

(১৯)

সাংসারিক অশান্তির আগুন ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে এইবারে শিখা বিস্তার করিয়া জলিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। যামিনী মনকে প্রাণপণে দৃঢ় ও সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কন্যার মঙ্গলের জন্য আজ যদি কঠিনতম দুঃখ ও অপমানও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে, তাহাও সহিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মমতাও রকম দেখিয়া বুঝিল, কঠিন একটা পরীক্ষা সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে তাহার এবং তাহার মায়ের। এবার নিজেকেও তাহার এই সংগ্রামে যোগ দিতে হইবে, শুধু মায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহাকে লইয়াই যখন এত কাণ্ড, তখন সে ত নির্লিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে না?

সুরেশ্বরের রাগটা এবার সত্যই মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এত দিন স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়াঝাঁটি, মনোমালিন্য যাহা হইয়াছে তাহা ঘরের ভিতরেই ঘটিয়াছে, এবং বেশীর ভাগ খুঁটিনাটি লইয়াই ঘটিয়াছে। বাহিরের লোকে এ-সবের খবর জানে নাই, বড়জোর যামিনীর বাপের বাড়ির লোকেরা কিছু কিছু জানিয়া থাকিতে পারে। এবারে কিন্তু যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধতায় তিনি কন্যার বিবাহ দেবেশের সহিত না দিতে পারেন, তাহা হইলে ত্রিসংসারে কাহারও সে-কথা জানিতে আর বাকী থাকিবে না। মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধের কথা যথেষ্ট লোকজানাজানি হইয়াছে। গোপেশ বাবু বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে ঘরে আনিবার সম্ভাবনায়ই আনন্দে আত্মহারা হইয়া কথাটা সর্ব্বত্র বলিয়া বেড়াইয়াছেন। সুরেশ্বরও ভাবী ম্যাজিষ্ট্রেটকে জামাইরূপে পাইবার আশায় কথা গোপন করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। এতখানি অগ্রসর হইবার পর যদি বিবাহ না হয়, তাহা হইলে কেন যে হইল না তাহা লোকে খোঁচাইয়া বাহির করিয়া তবে ছাড়িবে। তখন সুরেশ্বরের মান থাকিবে কোথায়? এত বড় প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার, এতগুলি প্রজার হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া, তিনি শেষে স্ত্রীর কাছে হারিয়া যাইবেন? মানুষজাতির মধ্যে নারীজাতি অধম, নিজের স্ত্রী যে, সে ত অধমেরও অধম, সে-ই কিনা সুরেশ্বরের উপর জয়লাভ করিবে? ভাবিতেই প্রায় সুরেশ্বরের গায়ের রক্ত মাথায় উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

উকীলবাবুকে সকালেই ডাকিয়া পাঠাইবেন কি না তাহাই ভাবিতেছিলেন। যামিনীকে অবশ্য তিনি কালই চরম শাসান শাসাইয়া রাখিয়াছেন, তিনিও যথেষ্ট আস্পর্দ্ধা দেখাইয়া উত্তর দিয়া গিয়াছেন। এখন সুরেশ্বর ইচ্ছা করিলেই উইল করিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু আর একবার বলিয়া দেখা উচিত কি না তাহাই তিনি ভাবিতেছিলেন। এ ত সত্য সত্য জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ নয়? পারিবারিক সংগ্রামে খানিকটা বুঝিয়া-সুঝিয়া চলিতে হয়, কারণ এক্ষেত্রে জেতা-বিজেতার সম্পর্ক যে চুকিয়া যাইবার সম্পর্ক নয়? মেয়েকে না-হয় রাগের মাথায় তিনি কিছু না-ই দিলেন, কিন্তু শাস্তি ত শুধু মমতা পাইবে না, মমতার বাবাকেও কিছু কিছু পাইতে হইবে। যামিনীকে শাস্তি দিতে অবশ্য সুরেশ্বরের সে-ধরণের কোন আপত্তি নাই। তিনি ব্যথা পাইলে সে ব্যথা সুরেশ্বরের বুকে কোনদিনই বাজে নাই। তবে তাঁহার স্ত্রী দীনহীন ভাবে ভাইয়ের সংসারে পড়িয়া থাকিলে, বা স্কুলে চাকরি করিয়া খাইলে, তাঁহার মানহানি হয় ত? আর যা গুণবতী স্ত্রী! যদি কোনমতে জানিতে পারে যে এই উপায়ে স্বামীকে লোকের চোখে খানিকটাও ছোট করিতে পারিবে, তাহা হইলে তখনই তাহা করিতে ছুটিবে। কাজেই পাঁচ বার না ভাবিয়া হট্ করিয়া একটা কাজ করিয়া ফেলা চলে না। যা তাঁহার শরীর, উইল করিবার পরদিনই যে তিনি মারা যাইবেন না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? যামিনীকে ডাকিয়া আর একবার অন্ততঃ ধমক-ধামক করা দরকার, এবং মমতাকেও একবার বুঝাইয়া বলা দরকার।

যামিনী সকাল হইতে নিজের অভ্যস্ত কাজকর্ম করিয়া যাইতেছেন। তিনি চিরদিনই স্বল্পভাষিণী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কাজেই দাসদাসীতে আজ তাঁহার বিশেষ কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না। শুধু মমতা বুঝিতে পারিতেছে মায়ের অন্তরে কি প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া যাইতেছে। তিনি গম্ভীর হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু মমতাকে দেখিলে ত তাঁহার মুখে হাসি ফোটে। আজ মেয়ের দিকে চাহিয়া তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছে কেন? রাজার মেয়েকে তিনি যে কাঙালিনী করিবার দায়ও ঘাড়ে লইতেছেন, ইহাতে কন্যার সত্যই মঙ্গল হইবে ত? না নিজের দারুণ আশাভঙ্গের দুঃখ তাঁহাকে ভ্রান্ত পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে?

নয়টা বাজে, মমতা মায়ের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আমি আজ কলেজে যাব ত?"

যামিনী একটু যেন বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা যাবে না কেন? শরীর ভাল নেই নাকি?"

মমতা বলিল, "না মা, শরীর ত ভালই আছে। কাল থেকে সবাই বাড়িসুদ্ধ কেমন যেন হয়ে রয়েছে, তাই বলছি।"

যামিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "ঝগড়াঝাঁটি আর কোন্ বাড়িতে না হয়? তাই ব'লে কি কাজকর্ম বন্ধ থাকে? তুমি যেমন কলেজে যেতে তাই যাও। বেলা হয়ে এল, যাও চান ক'রে এস।"

মমতা স্নান করিতে চলিয়া গেল। মা তাহাকে আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা সে বুঝিতে পারিল, কিন্তু মনের ভিতর তাহার সে আশ্বাস পৌঁছিল না। সত্যই এবার ছেলেখেলা নয়। ভগবান কোন এক নিদারুণ ভাবেই তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন যে সে আজ মায়ের কোলের শিশু নয়, সে আজ হৃদয়ব্যথাতুরা নারী। প্রিয়কে যদি সে লাভ করিতে চায়, নিজেই তাহাকে পথের কাঁটা মাড়াইয়া, বরণমালা বহিয়া লইয়া যাইতে হইবে। মা আজ আর কোলে করিয়া তাহাকে বিপৎসঙ্কুল পথ পার করিয়া দিতে পারিবেন না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র চলিতে পারিবেন।

কোন কাজেই তাহার মন লাগিতেছিল না। কাজেই অবশেষে সে যখন কলেজে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ক্লাসের ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে। কোন কোন ক্লাসে পড়ানও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা অধ্যাপকের আশায় মেয়েরা উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে। মমতার ক্লাসে তখনও ইংরেজীর অধ্যাপক প্রবেশ করেন নাই, সে নিজে রাস্তায় তাঁহাকে ট্রাম হইতে নামিতে দেখিয়া আসিয়াছে। ছুটিয়া ক্লাসে ঢুকিতে যাইতেছে, এমন সময় পিছনে পায়ের শব্দ শুনিয়া মমতা ফিরিয়া তাকাইল। ছায়া এত পরে আসিতেছে কেন? হাঁটিয়াই বা আসিল কেন? সে ত অন্যান্য দিন কলেজের গাড়ীতেই আসে?

ছায়া কাছে আসিবামাত্র মমতা ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোর এত দেরি কেন হ'ল রে? হেঁটে এলি নাকি?"

ছায়া বলিল, "আজ অমরদা চলে গেল যে। শেষ মুহূর্ত্ত অবধি তার মোটা মোটা খদ্দরের জামা সেলাই করতে গিয়ে বাস্ ধরতে পারলাম না। তাই ট্রামে ক'রে এত ক্ষণে ছুটতে ছুটতে আসছি।"

মমতার গলাটা একটু যেন কাঁপিয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেলেন?"

"সেই যে বন্যার কাজে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যাবে বলেছিল, সেইখানেই গেছে।"

আর কথাবার্ত্তা বলিবার সুবিধা হইল না, প্রফেসার ক্লাসে আসিয়া পড়িলেন। মমতা আর ছায়া তাড়াতাড়ি গিয়া নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট জায়গা দখল করিয়া বসিল। কিন্তু সমস্ত দিনের ভিতর মমতার আর কোন-কিছুতে মন বসিল না। কে পড়াইলেন, কি পড়াইলেন, কিছুই যেন সে দেখিলও না, শুনিলও না। বন্যাবিধ্বস্ত কোন অচেনা অদেখা গ্রামে তাহার মন কাহার সন্ধানে যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ক্লাসগুলি শেষ হইয়া গেল, ঘণ্টা বাজিয়া সেদিনকার মত কাজ চুকিল। মেয়েরা বাড়ি যাইবার জন্য উঠিল। তখন মমতা আবার ছায়াকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁরা কত জন স্বেচ্ছাসেবক গিয়েছেন ভাই? কোথায় গিয়েছেন?"

মমতার কথায় ছায়া একটু যেন অবাক হইল। তাহার চোখের দৃষ্টিতে সেটুকু প্রকাশ পাইল, মুখের কথায় নাই পা'ক্! মমতা তাহা বুঝিল, লজ্জায় যেন তাহার মাথা কাটা গেল,

তবু এই কথাক'টি জিজ্ঞাসা না করিয়া সে কিছুতেই যেন থাকিতে পারিল না।

ছায়া বলিল, "বিশ-পঁচিশ জন ত একসঙ্গে গিয়েছে।" কোন্ জায়গায় যে তাহারা গিয়াছে সেটার নামও সে বলিয়া দিল।

মমতার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। এ স্থান ত তাহার চেনা, এ যে তাহার পিতার জমিদারীর ভিতরেই। বাল্যকালে একবার সেখানে সে বেড়াইয়াও আসিয়াছে। সেখানকার মস্তবড় কাছারি-বাড়ি, পুকুর, মাঠ, ঘাট আজও তাহার অল্প অল্প মনে পড়ে।

তাহার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কাজেই মমতাকে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিতে হইল। বুকের ভিতরটা তাহার ব্যথায় টন্ টন্ করিতে লাগিল, কেন যে তাহাও সে ভাল করিয়া বুঝিল না। যাহাকে চোখে সে দু-তিন বারের বেশী দেখে নাই, দেখিবার কোন আশাও ছিল না, সে কলিকাতায় থাকিলেই বা কি, আর দূরে চলিয়া গেলেই বা কি? ভালবাসার জগতে তরুণী মমতার এই প্রথম প্রবেশ। এ রাজ্যের নিয়ম যে ব্যাবহারিক জগতের নিয়ম হইতে সম্পূর্ণ আলাদা, তাহা সে এখনও বুঝিতে শেখে নাই।

বাড়ির আবহাওয়া তেমনই থম্‌থমে হইয়া আছে, বাহিরেও শান্তি নাই, ঘরেও নাই। বেচারী মমতা যায় কোথায়? আজ লুসির জন্যও তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। সে থাকিলে ত দুইটা কথা বলিয়া মনের ভারটা অন্ততঃ হাল্‌কা করিয়া ফেলা যাইত। মায়ের কাছে এ দুঃখ লইয়া সে যাইতে ত পারে না! তাঁহার সহানুভূতিই সে পাইবে হয়ত, কিন্তু লজ্জা আসিয়া মমতাকে বাধা দেয়। নিজের ঘরেই সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, নিত্য তাহার জলখাবার ঘরেই পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

যামিনী খানিকবাদেই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মমতা ঘরে আসিতে বলিলেন, "চুলটা হয় নিজে বাঁধতে শেখ্, না-হয় নিজে এসে বাঁধিয়ে নিয়ে যা, আমাকে রোজ ডাকাডাকি করতে হয় কেন?"

মমতা উত্তর না দিয়া মুখ ভার করিয়া মায়ের সামনে গিয়া চুল বাঁধিতে বসিল। যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সত্যিই শরীর ভাল নেই নাকি? সকাল থেকে কেমন যেন হয়ে রয়েছিস্?"

মমতা প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কেমন আছেন মা?"

যামিনী বলিলেন, "ভালই আছেন বোধ হয়, খাওয়া-দাওয়া ত করেছেন।"

চুল বাঁধা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় মমতা হঠাৎ বলিয়া বসিল, "চল মা, আমরা কলকাতা থেকে অন্য কোথাও চলে যাই।"

যামিনী তাহার খোঁপায় কাঁটা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিলেন, "এটা ত চেঞ্জে যাবার সময় নয়? এখন যেতে চাস্ কেন? আর তোর বাবা ত কলকাতা থেকে কোথাও নড়তে চান না, তাঁকে ফেলে আমাদের যাওয়া ত শক্ত।"

মমতা বলিল, "বাবারই ত যাওয়া সব চেয়ে দরকার? তাঁর প্রজারা সব কি রকম কষ্টে আছে, তাদের সাহায্য করতে বাইরের কত লোক ছুটে যাচ্ছে। তাঁর ত গিয়ে একবার দেখাও উচিত?"

যামিনী বলিলেন, "ও-কথা ত পুরনো হয়ে গেছে বাছা। যা তিনি নিজে বুঝবেন না, তা তাঁকে বোঝাবে কে? জমিদারীতেই তুই যেতে চাইছিস্ নাকি?"

মমতা বলিল, "হ্যাঁ মা, বাবা না যান, খোকাকে আর তাঁকে রেখে চল আমরা গিয়ে দেখে আসি। ঘরে বসেও খানিক-খানিক সাহায্য ত মানুষকে করা যায়? তুমি যাবে মা?"

যামিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা করলেই কি আর আমি হুট্ ক'রে চলে যেতে পারি? তোমার বাবার মত ত দরকার?"

বাবার মত যে পাওয়া সহজ নহে, তাহা মমতার ভাল করিয়াই জানা ছিল। কথাগুলা সে বিশেষ কিছু ভাবিয়া বলে নাই, কেমন যেন মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কলিকাতায় তাহার প্রাণ কেন এমন ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহা নিজেও কি সে ভাল করিয়া বোঝে? এইখানেই তাহার জন্ম, এইখানেই সে বরাবর থাকিয়াছে, শৈশব হইতে বাল্যে, বাল্য হইতে কৈশোরে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুখ-দুঃখের বিচিত্র লীলা তাহার জীবনের উপর দিয়া খেলিয়া গিয়াছে,

এইখানেই। আজ কেন তবে কলিকাতাকে তাহার হুতাশন-বেষ্টিত গৃহের ন্যায় ভয়াবহ বোধ হইতেছে। প্রায় অচেনা একটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর সকল আলো, সকল আনন্দ এমন নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল কেমন করিয়া?

মনের কাছে না-হয় সে স্বীকার করিল, যে, অমরকে সে ভালই বাসে। কিন্তু অন্য লোকের কাছে এমন অদ্ভুত ভালবাসার কথা কি বলা চলে? অমরকে সে তিন বারের বেশী দেখে নাই, চার-পাঁচটার বেশী কথা সে তাহার সঙ্গে বলে নাই। ছায়ার কাছে অবশ্য অমরেন্দ্রের গল্প সারাক্ষণই শুনিতেছে। কিন্তু ইহাই কি ভালবাসার পক্ষে যথেষ্ট? দুটি মানুষ পরস্পরকে একেবারে না-জানিয়া না-চিনিয়া কি ভালবাসিতে পারে? দুই জনই বা কোথায়? অমর যে মমতার কথা ভুলিয়াও একবার মনে করে তাহার প্রমাণ কি? ক্ষণিকের চোখের দৃষ্টি মাত্র মমতার সম্বল। সে দৃষ্টির অর্থ মমতা ভুলও ত বুঝিয়া থাকিতে পারে? হয়ত আশাতীত দানলাভের কৃতজ্ঞতাই তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মমতা তাহাকে অন্য ভাবে বুঝিয়াছে। কে জানে? জানিবার উপায় ত কিছু সে ভাবিয়া পায় না। আবার না জানিয়াও প্রাণ যে কেবল ছট্‌ফট্ করে।

যামিনী মমতাকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "তুই দেখ না তোর বাবাকে একবার ব'লে? হয়ত রাজী হতেও পারেন।"

মমতা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মা, বাবার কাছে যেতে আমার ভয় করে।"

যামিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "ভয় আবার কিসের? তিনি ত তোকে কোনদিন কোন শক্ত কথা বলেন না?"

মমতা বলিলেন, "আবার যদি ঐ সব কথা তোলেন? কাল যা বলছিলেন?"

যামিনী বলিলেন, "তা তোলেন তুলবেন, তোর যা বলবার আছে বলবি। একটু শক্ত হ'তে শেখ্, দেখি। অত ভয় পেলে চলে? বিয়ে ত তোর জোর ক'রে দিয়ে দিতে পারবে না?"

মমতা বলিল, "কেন মা, এখনই এ সব কথা ওঠে? আমি পড়াশুনো শেষ করি আগে?"

যামিনী বলিলেন, "কথা নানা রকম ওঠেই আমাদের দেশে। তাতে কি?"

মমতা বলিল, "বাবা যদি খুব বেশী জেদ করেন, তখন কি করব?"

যামিনী বলিলেন, "তখন তোকেও জেদ করতে হবে। যা একমাত্র তোরই বুঝবার জিনিষ, তা তোর হয়ে অন্য কেউ বুঝে দিতে পারে না।"

মমতা হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর বিস্মিতা যামিনীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না দিয়াই উঠিয়া একেবারে ছাদে পলায়ন করিল। যামিনী হয়ত তাহার পিছন পিছন যাইতেন, এমন সময় নূতন এক উৎপাতের আবির্ভাবে শঙ্কিত হইয়া সেখানেই থাকিয়া গেলেন।

সুরেশ্বরের ঘর হইতে উচ্চকণ্ঠে তর্জ্জন-গর্জ্জনের শব্দ শোনা যাইতেছিল। কথাগুলি যে কি তাহা যামিনী বুঝিতে পারিলেন না, তবে সুরেশ্বর বেশ চটিয়া উঠিয়া কাহাকেও ধমক দিতেছেন তাহা বোঝা গেল। যা তাঁহার শরীরের অবস্থা, কোথা দিয়া কি ঘটিয়া বসে ঠিকানা নাই। যামিনী উঠিয়া ধীরে ধীরে সুরেশ্বরের ঘরের দিকে চলিলেন।

সিঁড়ির সামনে আসিতেই দেখিতে পাইলেন জমিদারীর এক নায়েব সদাশিব অতি বিরস বদনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতেছে। যামিনীর দিকে চোখ পড়িতে মাঝ-সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া সে নত হইয়া একটা নমস্কার করিল, কিন্তু কথা বলিবার জন্য না দাঁড়াইয়া যেমন নামিতেছিল, নামিয়া গেল।

যামিনী সুরেশ্বরের ঘরে না ঢুকিয়া আবার নিজের ঘরেই ফিরিয়া গেলেন। গোলমাল কোথাও একটা কিছু ঘটিয়া থাকিলে তাঁহার জানিতে দেরি হইবে না। স্বামীর সুখের ভাগ তিনি না পান, দুঃখ, যন্ত্রণা, উৎপাতের ভাগ পুরামাত্রায় বা তাহার চেয়ে বেশী মাত্রাতেই তিনি পাইয়া আসিতেছেন। এদিক দিয়া সুরেশ্বর তাঁহাকে সহধর্ম্মিণীর সম্মান হইতে কোনদিনই বঞ্চিত করেন নাই।

খানিক বাদেই রান্নাঘরের চাকর আসিয়া খবর দিল যে এক জন লোক বেশী খাইবে বলিয়া পিসীমা আবার ভাঁড়ারের চাবিটা পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। চাবির তাড়া চাকরের হাতে দিয়া যামিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে নায়েবকে

ডাকাইয়া তাহার আগমনের কারণ জানিতে চাহিবেন কি না। স্বচ্ছন্দেই ডাকিতে তিনি পারেন, ইতিপূর্ব্বে আমলা, কর্ম্মচারীদের বহুবার তিনি এমন ডাকিয়া কাজকর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সুরেশ্বর এখন যেমন মারমুখো হইয়া আছেন, আগে ততটা থাকিতেন না। এখন হঠাৎ চটিয়া উঠিতেও পারেন।

আবার একটি চাকরের আগমন হইল। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবুমশায় একবার ডাকছেন।"

যামিনী উঠিয়া আবার সুরেশ্বরের ঘরের দিকে চলিলেন।

(২০)

ঘরময় কাগজপত্র ছড়াইয়া সুরেশ্বর বসিয়া আছেন। সচরাচর ঘর গোছান এবং পরিষ্কার রাখা সম্বন্ধে চাকর-বাকরকে তিনি যথেষ্ট উপদেশ দেন এবং যামিনী যে দাসদাসীদের অতিশয় প্রশ্রয় দেন সে-বিষয়ে ইঙ্গিত করিতেও ছাড়েন না। তাঁহার বিশেষ রকম মেজাজ খারাপ না হইলে ঘরের এমন অবস্থা হইত না। ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য যামিনী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুরেশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলেন।

সুরেশ্বর বলিলেন, "আমি যেন বেড়া আগুনের মধ্যে পড়েছি, কোন দিকে আমার নিষ্কৃতি নেই। সব যদি আমি করব, আমি দেখব, তাহ'লে ম্যানেজার নায়েবই বা আছে কি করতে, আর স্ত্রী-পুত্রই বা আছে কি করতে? তার উপর এই ব্লড্‌প্রেশারের উৎপাত। মরলে হাড় জুড়োয়।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সদাশিবকে দেখলাম, ও কি করতে এসেছে?"

সুরেশ্বর নিজের মাথার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমার মাথা খেতে। আমাকে নাকি মহলে অতি-অবশ্য যেতে হবে, নইলে জমিদারী রক্ষা হবে না। প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে, খাজনা দিতে চাচ্ছে না। দু-চার জায়গায় মারপিটও হয়ে গেছে। বানের জলে তাদের নাকি সব ভেসে গেছে। জোচ্চোর বেটারা, গিয়ে সবাইকে দেখে নেব। খাজনা মাপ করাচ্ছি ভাল ক'রে। যত সব ঘুষ্‌খোরকে মাইনে দিয়ে পোষার ফল এই আর কি!"

যামিনী বলিলেন, "যাওয়াই ঠিক করেছ?" খানিক আগেই মমতা যাইবার জন্য কি রকম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়া তাঁহার অবাক লাগিতে লাগিল।

সুরেশ্বর বলিলেন, "ঠিক পেয়াদাতেই করিয়েছে। টাকাকড়িকে যতই তুচ্ছ কর, সেগুলি না হ'লে ত কারও চলবে না? কাজেই জমিদারী রক্ষা করার ব্যবস্থাও করতে হবে। কর্ত্তাদের আমলে হামেসা মহলে যাওয়া-আসা ছিল, প্রজারা সব তাতে বশে থাকত। আর আমরা সব সাহেব-মেম হয়েছি, যেদেশে ইলেক্‌ট্রিসিটি নেই, সেখানে যাবার নামেই মূর্চ্ছো যাই। কাজেই জমিদারীর এই হাল। একবার সবাইকে সেখানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে, তবে সব টের পাও। গরিব প্রজাদের দুঃখে ত সব গলে যাও, তারাও যে আদতে কিরকম পাজী, তাও তোমাদের জেনে রাখা ভাল।"

যামিনী শান্তভাবেই বলিলেন, "তা চল না নিয়ে। আমি ত যেতে কোনদিন আপত্তি করি নি। ছেলে-মেয়েরাও যেতে অরাজী নয়।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "হ্যাঁ, এইবার যাব সকলকে নিয়ে, পরশুই বেরব। তোমরা প্রস্তুত থেক। ছেলেমেয়ে দুটি ত দিব্যি ফিরিঙ্গী তৈরি হয়েছে, পাড়াগাঁয়ের পানাপুকুরের জল কিছু পেটে না পড়লে ওরা সায়েস্তা হবে না। ডাক্তার হতভাগাকে আবার সঙ্গে নিতে হবে। তাঁকে খবর দিই এখন। যা বনগাঁ, একটা গোবদ্যিও নেই সেখানে, ব্লড্‌-প্রেশার মাপবে কে?"

যামিনী বলিলেন, "চাকরবাকর যাবে ত সঙ্গে?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "না গেলে আর চলছে কই? খালি খাওয়া আর শোওয়া, এ ছাড়া কেউ ত কিছু করতে শেখ নি?"

যামিনী হাসি চাপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যামিনীকে মানুষ করার ভার অবশ্য সুরেশ্বরের উপর ছিল না, যামিনী যাহা হইয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার মা-বাবার শিক্ষাই সম্পূর্ণ দায়ী। কিন্তু মমতা আর সুজিতকে ফিরিঙ্গী শিক্ষা দিবার জন্য এবং সকল বিষয়ে বনিয়াদী ঘরের উপযুক্ত ভাবে মানুষ করিবার জন্য, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলার জন্য, সুরেশ্বর প্রথম হইতে স্ত্রীর

সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছেন। মমতা যে একেবারে অকেজো মোমের পুতুল হয় নাই, তাহা কেবলমাত্র যামিনীর প্রাণপণ চেষ্টায়। সুজিতকে অবশ্য সুরেশ্বর যেমন চাহিয়াছেন সেই শিক্ষাই দিয়াছেন, ফলে ইহারই মধ্যে সে একটি নররূপী বানরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ছেলেমেয়ের যেখানে যাহা খুঁৎ বাহির হইবে, তাহার জন্য যামিনীই যে একমাত্র দায়ী সুরেশ্বরের এ ধারণা যাইবার নয়। যামিনী প্রথম প্রথম তাঁহার এই সব অযৌক্তিক কথার প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু কোনই ফল হয় না দেখিয়া এখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। যামিনী নিজের শুইবার ঘরের আলোটা জ্বালিয়া দিয়া নিত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "খুকি কোথায় আছে খুঁজে দেখ দেখি, বল্ যে আমি ডাকছি।"

নিত্য খানিক বাদেই ছাদ হইতে মমতাকে ডাকিয়া আনিল। মা ডাকিলেই এখন মমতার কেমন ভয়-ভয় করে, না জানি তিনি কি জিজ্ঞাসা করিবেন। ভিতরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা ?"

যামিনী বলিলেন, "তোর উপর আজ ভগবান সদয় খুকি, কলকাতা ছেড়ে যেতে চাইছিলি তারই ব্যবস্থা নিজের থেকেই হয়ে গেল।"

মমতা বড় বড় চোখে বিস্ময় ভরিয়া মায়ের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে মা ? আমরা কোথায় যাব ?"

যামিনী বলিলেন, "উনি জমিদারী দেখতে যাচ্ছেন, আমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে। তোরা বড় হয়ে ত কখনও ওদিকে যাস্ নি, একবার গিয়ে সব দেখে আসা ভাল। কাছারি-বাড়িগুলি ত ভালই, থাকার অসুবিধা কিছু হবে না, তবে বর্ষাকাল, সময় ভাল না এই যা।"

মমতার বুকে তখন আনন্দের জোয়ার ডাকিয়া যাইতেছে, সে বলিয়া উঠিল, "কিছু অসুখ হবে না, তুমি দেখো মা, আমরা খুব সাবধানে থাকব, আর সব রকম ওষুধবিষুধ সঙ্গে নিয়ে যাব। কবে আমরা বেরব মা ? কলেজেও ত একটা চিঠি দিতে হবে বাবাকে ?"

যামিনী বলিলেন, "তা ত হবেই। বোধ হয় পরশু বেরনো হবে, ওর কথায় যত দূর বুঝলাম। জিনিষপত্র খানিকখানিক এখন থেকেই গোছগাছ করতে হবে। খোকা যেতে চাইবে কি না কে জানে ? যা সুখী স্বভাব ছেলের। কি কি নিয়ে যেতে হবে একটা ফৰ্দ্দ কর দেখি। আমিও একটা করছি। ওখানকার গরিব-দুঃখীদের কাজে লাগে এমন জিনিষ যদি কিছু বাড়িতে থাকে তাও নিয়ে যাওয়া ভাল। ঝিচাকরও গোটা দুই-তিন নিতে হবে। নিত্যটা বড় অকেজো, দৌড়-ধাপের কাজ মোটে পারবে না। ও থাক, তার চেয়ে মুখী, হরি আর রাঁধুনীটাকে নিলেই হবে।"

মমতা মায়ের কথা শুনিল কি না কে জানে। আপন মনে কি ভাবিতে ভাবিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল কাপড়ের আল্‌মারি, বইয়ের আল্‌মারি, বাক্স ডেস্ক খুলিয়া, জিনিষপত্র ছড়াইয়া এমন ধুম বাধাইয়া দিল যেন আজ রাত্রেই তাহাকে বাহির হইয়া যাইতে হইবে।

সুজিত খবর শুনিল, তাহার পরদিন সকালে। খবরটা দিল মমতাই, কারণ একমাত্র সে-ই এই বর্ষাকালে বন্যাবিধ্বস্ত পল্লীগ্রাম-যাত্রার ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখিয়াছিল। সুরেশ্বর যাইতেছিলেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া, আর যামিনী যাইতেছিলেন কর্ত্তব্যবোধে।

সুজিতের ত সুখবর শুনিয়া চোখ প্রায় কপালে উঠিয়া গেল। পড়িবার টেবিলের উপর এক কিল মারিয়া সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "Damn it ! যাব না আমি। বাবার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?"

মমতা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আহা কথার কি বা ছিরি ! বাবার মাথা খারাপ হোক বা নাই হোক, তোমার পুরোমাত্রায় হয়েছে, তা বেশ বুঝতে পারছি।"

সুজিত খ্যাকাইয়া উঠিল, "তুমি যাও দেখি এখান থেকে, লম্বা লম্বা লেক্‌চার ঝাড়তে হবে না। আমি না যাই যদি। আমার ইচ্ছে আমি যাব না সেই ধ্যাধধেড়ে গোবিন্দপুরে।"

মমতা বলিল, "বেশ ত আমি যাচ্ছি। তোমার মত গুণবানের সঙ্গে কথা ব'লে ত আমার সপ্তম স্বর্গ লাভ হবে আর কি ? বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া তুমিই ক'রো, তখন অত তেজ বজায় থাকে, তাহলেই বুঝি।"

মমতা চলিয়া গেল। বাপের কাছে তেজ দেখাইবার সাহস যে সুজিতের হইবে না তাহা সুজিতের নিজেরও জানা ছিল। কিন্তু অতখানি রাগ যে তাহার হইয়াছে, তাহা

একেবারে প্রকাশ না করিলেই বা চলে কি প্রকারে? কাজেই বোনকে খ্যাঁকাইয়া, চাকরকে গাল দিয়া, পোষা কুকুরটাকে লাথি মারিয়া, যতটা পারিল নিজের গায়ের ঝাল সে মিটাইয়া লইল। তাহার পর নিজের জিনিষ গোছানর ভার মা এবং চাকরের উপর দিয়া সে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

সারাটা দিন বাড়ির সকলে মিলিয়া প্রাণপণে খাটিয়া জিনিষপত্র গোছাইতে লাগিল। মমতা ত প্রায় নাওয়া-খাওয়াই ভুলিয়া গেল। পাড়াগাঁয়ে কি জিনিষের প্রয়োজন, কতখানি প্রয়োজন, সে-বিষয়ে তাহার স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, কাজেই পোঁটলা-পুঁটলির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিল। যামিনী তাহাকে বাধা দিলেন না, মেয়েটা নানা হাঙ্গামে যে-রকম মনমরা হইয়া আছে, একটা কিছু লইয়া খানিক ভুলিয়া থাকিলেই ভাল। সুরেশ্বরেরও এখন সমস্ত মন জুড়িয়া আছে, দুষ্ট প্রজাদের অনাচার, সম্প্রতিকার মত মেয়ের বিবাহের ভাবনা এবং স্ত্রীকে সায়েস্তা করার সঙ্কল্প দুই-ই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাদের যাইতে হইবে খানিক দূর ট্রেনে, খানিক নৌকায়, খানিক পাল্কীতে। সুরেশ্বরের জন্য হাতী আসিবে, তিনি সেটা তত পছন্দ করিতেছেন না। কিন্তু ওসব জায়গায় মোটর চলিবার মত রাস্তা সর্ব্বত্র নাই, কি আর করা যায়। সুজিত হুকুম করিয়াছে তাহার জন্য ভাল একটা ঘোড়া যেন তৈয়ারী থাকে। ওসব হাতীটাতি তাহার পোষাইবে না। ব্যাপারটা যদি পিক্‌নিকের মত খানিকটাও হয়, তাহা হইলে না-হয় কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার দুঃখ সে খানিকটা ভুলিতে পারে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সকাল-সকাল সারিয়া লইয়া সকলে বাহির হইয়া পড়িলেন। পিছনে ঠিকাগাড়ীর সারি, আগাগোড়া জিনিষপত্র বোঝাই হইয়া চলিল। যামিনী ঝি-চাকর তিন জন লইয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, কারণ সেখানে গিয়া খাটিবার লোক যথেষ্টই পাইবেন। সুরেশ্বর তাহার উপর আর এক জন চাকর যোগ করিলেন, তাহা না হইলে নাকি তাঁহার চলিবে না।

ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহাদের বেশ খানিক ক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল। সুরেশ্বর ভীতু মানুষ, ট্রেন পাছে ফেল হয়, এই ভয় যাত্রার আরম্ভেই তাঁহাকে পাইয়া বসিয়া থাকে, কাজেই ঘণ্টাখানেক আগে সর্ব্বদা ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হন। এখনও গাড়ী ছাড়িতে প্রায় এক ঘণ্টাই বাকী আছে দেখিয়া তিনি ওয়েটিং-রুমে বসিয়া সঙ্গের চামড়ার বাক্স খুলিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। যামিনী মেয়েকে এবং ঝিদের সঙ্গে করিয়া মেয়েদের ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়া গেলেন। সুজিত প্ল্যাটফর্ম্মে ঘুরিতে লাগিল।

মমতার বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না। সে বার-বার দরজার কাছে আসে আবার ফিরিয়া যায়। তাঁহাদের সঙ্গী ডাক্তারবাবু এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই, সুরেশ্বর তাহার জন্য মধ্যে মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম্মে আসিলে মমতা বাঁচে, গাড়ীতে চড়িয়া বসিয়া তবু কল্পনা করা যায় যে তাহারা সত্যই কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়াছে।

সুরেশ্বরের চিঠিলেখা খানিক পরে শেষ হইল। বাড়ির দরোয়ান জিনিষপত্রের খবরদারি করিতে সঙ্গেই আসিয়াছিল। চিঠি খামে বন্ধ করিয়া, তাহাকে ডাকিয়া সুরেশ্বর আদেশ করিলেন চিঠিখানা গোপেশবাবুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে।

মমতা কথাটা শুনিতে পাইল। তাহার বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে পলাইতে চায় কি সে সাধে? এখানে যে রাক্ষসের মত হাঁ করিয়া বসিয়া আছে ঐ গোপেশবাবু আর তাহার ছেলে, মমতাকে গ্রাস করিবার জন্য। বাবা কি ঐ মানুষগুলাকে কিছুতেই ভুলিতে পারিবেন না? কি যে তিনি তাহাদের মধ্যে দেখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। সংস্কৃতের একটি শ্লোক তাহার মনে হইল, অনেক সময় অনেকের মুখে সে ইহা শুনিয়াছে। পিতা নাকি কন্যার জন্য বিদ্বান পাত্র আকাজ্ক্ষা করেন, মাতা ধনবান পাত্র চান, আর কন্যার নিজের পছন্দ রূপবান পাত্র। তাহার ক্ষেত্রে সবই প্রায় উল্টা, ভাবিয়া মমতার হাসি পাইল। দেবেশের বিদ্যা কত দূর তাহা সে জানে না, যতই হউক, বিদ্যার জন্য সুরেশ্বর তাহাকে কামনা করিতেছেন না। মা ত তাহার ধনবান মানুষের নামেই এখন চটিয়া যান, ধনের অভিশাপ তাঁহার নিজের জীবনকে ত ছারখার করিয়া দিল। আর সে নিজে? সে যাহাকে চায় তাহাকে বাঙালীর ঘরে কেহই হয়ত রূপবান বলিবে না, কারণ তাহার রং ফরশা নয়। দেবেশের আর কিছু থাক বা নাই থাক,

রংটা ত ক্রুশ ? কিন্তু পাত্ররূপে তাহাকে কল্পনা করিতেই ত মমতার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

যাহা হউক, ট্রেন অবশেষে প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইল। মমতারা সকলে সুরেশ্বরের নির্দ্দেশমত গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, লোকজন সকলে মিলিয়া মহা সোরগোল করিয়া জিনিষপত্র তুলিতে লাগিল। সুজিত খালি অতি বিরক্ত মুখে, নিজের পোষা কুকুরটাকে লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ঘুরিতে লাগিল। এই দলটির যে সে কেহ নয়, তাহাই প্রমাণ করিতে সে মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

গাড়ী অবশেষে যখন ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা দিল, তখন সুজিত কুকুর লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং ডাক্তার-বাবুও সেই সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেশ্বর এত ক্ষণে তবু নিশ্চিন্ত হইলেন, ডাক্তার যে না যাইবার মতলবেই এত দেরি করিতেছেন, সে-বিষয়ে প্রায় তিনি নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। যামিনীর অবস্থা প্রায় ঢেঁকির স্বর্গবাসের মত। সুরেশ্বর সারাক্ষণই বক্‌বক্ করিতেছেন, এবং হাজার রকম ফরমাশ করিতেছেন। তবে ডাক্তার উপস্থিত থাকাতে মন খুলিয়া বকিতে পাইতেছেন না, এই টুকুই যা রক্ষা। সুজিত এক বোঝা ইংরেজী ম্যাগাজিন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, সে তাহারই মধ্যে ডুবিয়া আছে। ডাক্তারবাবু মাঝে মাঝে সুরেশ্বরের সঙ্গে গল্প করিতেছেন, মাঝে মাঝে একটু দিবানিদ্রা দেওয়া যায় কিনা, তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। ঝি-চাকরদের ভিতর, একটি খালি এ গাড়ীতে আছে কর্ত্তার হুকুম তামিল করিবার জন্য, অন্যরা গিয়া থার্ড ক্লাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

খালি মমতার প্রাণ যেন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যাহা দেখিতেছে, তাহারই উপর যেন কিসের অপূর্ব্ব আলো আসিয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার বাহিরের জগৎটাকে বেশী সে দেখে নাই বটে, কিন্তু একেবারেই যে দেখে নাই তাহা ত নহে ? এত ভাল ত তাহার কোনদিন লাগে নাই ? যাত্রার শেষে কি সে পাইবে, কাহাকে সে পাইবে, যাহার জন্য এমন পুলকের শিহরণ তাহার সমস্ত দেহমনের উপর দিয়া খেলিয়া যাইতেছে ? সে ভাল-বাসিয়াছে ইহাই যেন যথেষ্ট, ভালবাসা যে ফিরিয়া নাও পাইতে পারে, সে ভয় কি একেবারে তাহার নাই ?

মমতা সবে বাল্যাবস্থা হইতে যৌবনে পা দিয়াছে। ভালবাসার দেবতাটিকে এখনও সে ভালরূপে চেনে না, তাঁহার ভীষণ রমণীয়তাকে এখনও সে উপলব্ধি করিতে পারে না। তাঁহার এক হস্তে মালা আর এক হস্তে কৃপাণ। কোন্‌টা মমতার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহা সে জানে না। সে-ভয়ও বিশেষ তাহার নাই। এমন করিয়া যে তাহাকে ডাক দিয়া পথে বাহির করিয়াছে, সে কি তাহাকে চাহিবে না ? জগতে এত বড় নিষ্ঠুরতাও কি ঘটিতে পারে ? ভাগ্যবিধাতা এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা কি করিতে পারেন ?

চারি দিকের যে-সব মানুষের মধ্যে সে বাস করে, তাহাদের জীবনের অন্তরতম ইতিহাস জানা থাকিলে, মমতার এই বিশ্বাস, এই মুগ্ধ আনন্দ চূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু অল্পবয়সে জগতের মুখোসের পশ্চাতে যে কি আছে তাহা কয়টা মানুষই বা জানিতে পারে ?

ট্রেনের পালা শেষ হইয়া যখন নৌকার পালা সুরু হইল, তখন সকলেই অল্পবিস্তর অসন্তোষের গুঞ্জন তুলিল, খালি মমতার আনন্দ ইহাতেও ম্লান হইল না। সুজিত ত পারিলে সব কয়জনেরই মুণ্ডপাত করিয়া দেয়, এমনই হইল তার মেজাজ। এই বিশ্রী নোংরা বজরাটার মধ্যে, লোকজনের সঙ্গে গাদাগাদি করিয়া কত ক্ষণ সে থাকিতে পারে ? সবেমাত্র সে লুকাইয়া সিগারেট টানিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাদের সামনে ত খাইতে পারে না ? অথচ অসোয়াস্তির তাহার সীমা নাই। সুরেশ্বর ঝিচাকর, মাঝিমাল্লা, স্ত্রী সকলকেই বেশী করিয়া বকিতেছেন। তাঁহাকে যে এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইল, তাহার মূলে এই সব মানুষের অপদার্থতাই ত ? না হইলে সুরেশ্বরকে কেন কষ্ট পাইতে হইবে ?

যামিনী নীরবে বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে শুধু ঝি-চাকরদের বলিয়া, দলসুদ্ধর খাওয়া-দাওয়াব ব্যবস্থা করিতেছেন। গন্তব্য স্থানে পৌছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার কি রকম কি ব্যবস্থা আছে তাহা জানা নাই, কাজেই কলিকাতা হইতেই তিনি প্রচুর আয়োজন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতাটাকেই তিনি

কেন বহন করিয়া আনিতে পারেন নাই, তাঁহার এই অপরাধ তাঁহার স্বামী ও পুত্র কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না।

দুই তীরে বন্যার প্রকোপের চিহ্ন এখনও জাজ্বল্যমান। সুরেশ্বর ইচ্ছা করিয়া সে-সব দিকে তাকাইতেছেন না। যামিনীর চোখে ঐগুলিই অত্যন্ত বেশী করিয়া পড়িতেছে। মমতা উহা দেখিতেছে, কিন্তু ভাবিতেছে অন্য কথা। সুজিত অতিশয় বিরক্ত হইয়া ভাবিতেছে এই যমালয়ে কেন সে মরিতে আসিল। এখানে খাইতেও হয়ত ভাল করিয়া পাওয়া যাইবে না। আর রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, ঘোড়ায় চড়া যা হইবে, তাহা বুঝাই যাইতেছে। (ক্রমশঃ)

মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রণালী

রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল

বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য যে অত্যন্ত বিড়ম্বিত, তাহাদের ভবিষ্যৎ যে ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, তাহা চারি দিকের অবস্থা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে। এক দল নেতা তাহাদিগকে প্রগতিশীল সকলবিধ কর্ম্মপদ্ধতি হইতে নিয়ত প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন। এই সব নেতার প্রচারের ফলে মুসলমান আজ জাতীয় আন্দোলনে পশ্চাৎপদ, রাজনীতিতে অনগ্রসর এবং নারী-প্রগতির সকল কর্ম্মধারায় পরাঙ্মুখ। হিন্দুরা যেখানে স্বরাজ ও স্বাধীনতার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত আমাদের সমাজ সেখানে চাকরির উমেদারি করিবার জন্য লালায়িত। তার পর আর একটা অভিনব উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে তাহাদিগের শিক্ষাসমস্যা লইয়া। এ-বিষয়ে আমাদের তথাকথিত নেতারা যে-পন্থা অবলম্বন করিতে সমাজকে উপদেশ দিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল। ইহাতে সাধারণভাবে সমাজের জন্য উচ্চশিক্ষার পথ যে একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহা বুঝিবার মত দূরদৃষ্টি নেতাদের নাই। আর বুঝিবেনই বা কি করিয়া? নিজ নিজ সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়বর্গের জন্য ত এ ব্যবস্থা নয় যে সহজেই ভ্রম দূর হইয়া যাইবে—এ ব্যবস্থা হইতেছে আপামরসাধারণ মুসলমানদের জন্য। সাধারণের জন্য এক শ্রেণীর শিক্ষাপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া আর নিজেদের সন্তানসন্ততির জন্য উচ্চশিক্ষার সহজ পথটি সংরক্ষিত রাখিয়া আমাদের নেতারা এই যে সমাজের মধ্যে শিক্ষার বিভিন্নতা সৃষ্টি করিতেছেন, ইহাতে কিছুদিন নেতাদের সন্তানাদির চাকরিবাকরির পথ সুগম হইতে পারে, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত সমগ্র সমাজকে জ্ঞানগরিমা ও শিক্ষা-বিষয়ে দেউলিয়া না করিয়া ছাড়িবে না। আমি জোর গলায় বলিতে পারি, মক্তব-মাদ্রাসায় কি শিক্ষা দেওয়া হয়, সে-বিষয়ে আমাদের নেতারা কোন সংবাদই রাখেন না। যদি তাঁহারা তাহা স্বচক্ষে দেখিতেন, তবে বুঝিতেন, সেখানে যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা সমাজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ত নহেই, বরং ধ্বংসকর। তাঁহারা দেখিতেছেন, যখন হিন্দুরা উহার বিরোধিতা করিতেছে, তখন নিশ্চয় উহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। এইরূপ রেষারেষি ও জেদাজেদির বশীভূত হইয়া নেতারা সারা সমাজটার ক্ষতি করিতে বসিয়াছেন।

মুসলমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষানিকেতন ও বিশেষ পাঠ্যব্যবস্থার ওকালতি করিয়া এবং অবশেষে তাহাই সমাজকে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়া আমাদের নেতারা মুসলমান সমাজের যে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, তাহার জ্বালা সমাজ অচিরেই অনুভব করিবে। দেশে মক্তব-মাদ্রাসা ব্যাপকভাবে প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হইতে উচ্চশিক্ষা একেবারেই উঠিয়া যাইবে—জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন সাহিত্য প্রভৃতির প্রতি তাহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং সমগ্র সমাজে গোঁড়ামি, ভণ্ডামি ও অন্ধসংস্কারের প্রাবল্য বাড়িয়া যাইবে। হিন্দুরা বাধা দিতেছে, এই অজুহাতে যদি একটা অপদার্থ বিষয়কে সমর্থন করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা মূর্খতা ও আত্মঘাতী কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। অনেকে এই কারণে ইহাকে সমর্থন করেন তাই এই প্রথার অন্তর্নিহিত দোষগুণের বিচার করিবার মত ধৈর্য্য তাঁহাদের নাই। যখন বলা হয়, মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষাপদ্ধতিতে 'দীন-দুনিয়া', ধর্ম্ম ও সংসার সবই একাধারে পাওয়া যাইবে, তখন তাঁহারা বিনাবাক্যব্যয়ে ইহাকে সমর্থন করিতে অগ্রসর হন। তাঁহাদিগকে সানুনয়ে অনুরোধ করি ইহার ভিতরে কি আছে, না-আছে তাহা

দেখিবার জন্য একটু চেষ্টা করুন—সংস্কারমুক্ত হইয়া দেখিলে বুঝিবেন, ইহা একেবারেই অন্তঃসারশূন্য।

মক্তব-মাদ্রাসাগুলিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য সম্প্রতি মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক সাহেব কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা যেমন ছেলেমানুষী তেমনই ভয়ঙ্কর। মক্তব-মাদ্রাসায় পড়াইতে না পারিলে লোকেরা ছেলেদের মূর্খ রাখিবে, তবুও সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িতে দিবে না, অতএব তাহাই প্রচলিত রাখিতে হইবে!—কি চমৎকার যুক্তি, উপযুক্ত নেতার মত যুক্তি বটে। লোকের ধর্ম্মান্ধতার অনলে এই ভাবে ইন্ধন যোগাইতে না পারিলে দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাজের নেতা হওয়া যায়! কিন্তু সমাজের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার করা যে-সব নেতার কর্ত্তব্য তাঁহাদের মুখে এমন উক্তি শোভা পায় না। মক্তব-মাদ্রাসায় যেরূপ কুশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষাবিৎ নেতার ঠিক উল্টা কথাই বলা উচিত। বরং সমাজ আরও কিছুকাল অশিক্ষিত থাকুক সেও ভাল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যেন কিছুতেই মক্তব-মাদ্রাসার প্রচলন না হয়। বহু বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের সময় মৌলবী-মোল্লারা ত জোরগলায় বলিয়াছিলেন যে, সমাজ মূর্খ থাকিবে, তবুও ইংরেজী শিখিবে না। কিন্তু সে অহঙ্কার বেশী দিন থাকে নাই। সমাজকে ইংরেজী শিখিতে হইয়াছে, এবং মৌলবী-মোল্লার সন্তানসন্ততিরাও ইংরেজী শিখিয়াছে অথচ তাহারা কেহই কাফের বা খ্রীষ্টান হইয়া যায় নাই; তার পর কিছুদিন প্রবল ভাবেই ইংরেজী শিক্ষা চলিতে থাকে। ইংরেজীর প্রভাবে মুসলমানেরা ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিল। সমাজের চারি দিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইল। হিন্দুরা পূর্ব্ব হইতেই সাধারণ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথম প্রথম তাহার প্রভাবে সামান্য এক-আধটু কুফল দেখা দিলেও কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত তাহাতে হিন্দুদের উপকারই হইয়াছিল, বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে তাহারা বেশ অগ্রসর হইয়া উঠিল। মুসলমানদের বেলায়ও কিছুদিন সাধারণ বিদ্যালয়ে লেখা-পড়ার পর বুঝা গেল যে তাহারাও যদি এই শিক্ষা পাইতে থাকে, তবে তাহাদের মধ্যেও অচিরে চেতনার সঞ্চার হইবে।

কিন্তু হঠাৎ কাহার প্ররোচনায় জানি না, মুসলমানদের মনের গতি অন্য দিকে ঘুরিতে লাগিল। প্রথম প্রথম যে সরকার বাহাদুর এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারাও কি জানি কেন, মুসলমানদের জন্য মক্তব-মাদ্রাসার প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। এই জন্য তাঁহাদের বাছাই বাছাই কতকগুলি লোক নিযুক্ত হইল। সরকারের নিযুক্ত লোকের দ্বারা কোন বিষয়ে তদন্ত করিলে তাহার যে পরিণাম হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। এই সব মনোনীত লোক সরকার যাহা করিতে চাহেন তাহাতেই সমাজের নামে এবং নিজেদের স্বাধীনচিন্তার নামে অনুমতি দিয়া থাকেন। এই প্রকারে মক্তব-মাদ্রাসার উৎপত্তি হইল—সে অনেক দিনের কথা। বলা হইল মুসলমানরাই ইহার উদ্ভাবনকর্ত্তা এবং মুসলমানদেরই ইচ্ছানুযায়ী সরকার ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ভিতরের ব্যাপার তাহা নহে। কোন্ শ্রেণীর ধুরন্ধর এই সব মক্তব-মাদ্রাসাতে সায় দিলেন, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখিল না। বস্তুতঃ ইহা তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় ও নির্দ্দেশমতই হইয়াছে। এই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এই প্রলোভন দেওয়া হইল যে, ইহার দ্বারা সমাজ কোরআন, হাদীস ও শারাশরীয়ৎ শিখিতে পাইবে। তার পর নানা ভাবে ইহার স্বপক্ষে প্রচারকার্য্য চলিতে লাগিল। পশ্চিম-বঙ্গে মক্তব-মাদ্রাসা ততটা ব্যাপক না হইলেও অনতিবিলম্বে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র ইহা সংক্রামিত হইয়া পড়িল। ইহা ব্যাপক হইবার আর একটা কারণ, সরকার মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষাকে প্রবেশিকার মত মর্য্যাদা দিলেন, অথচ প্রবেশিকার মত উচ্চশিক্ষা ইহাতে মোটেই হয় না। এই ভাবে কিছুদিন বেশ চলিল, তার পর মোমিন-কমিটি মাদ্রাসা-পদ্ধতিকে চিরস্থায়ী রূপ প্রদান করিলেন। মোমিন-কমিটির শেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে মাদ্রাসাগুলি নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও মধ্যযুগীয় আদর্শ প্রাপ্ত হইল।

একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই নিকৃষ্ট পদ্ধতির প্রতি সরকারের আসক্তির কারণ কি? উত্তর অতি সহজ। সরকার এদেশের শিক্ষাপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্ণ অধিকার নিজহস্তে রাখিতে চান। নানা কারণে, বিশেষতঃ হিন্দুদের সতর্কতার কারণে, সরকার কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর পূর্ণকর্ত্তৃত্ব চালাইতে পারেন না, কিন্তু

তাই বলিয়া কি মুসলমানদের শিক্ষাপদ্ধতিকে স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে ছাড়িবেন? তাঁহারা যে মুসলমানদের সর্ব্ববিষয়ে মা-বাপ, বিশেষতঃ ধর্ম্মশিক্ষার নামে মুসলমানেরা যখন সেই কর্ত্তৃত্ব সরকারের হাতে একেবারেই ছাড়িয়া দিতে চায়। ব্যাপকভাবে সাধারণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়া হিন্দু যুবকগণ যেরূপ বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিয়াও কি সরকার শিক্ষালাভ করিবেন না? সুতরাং অর্থ দিয়া, মোটা মোটা পদ সৃষ্টি করিয়া, এই সব নিকৃষ্ট শ্রেণীর মক্তব-মাদ্রাসার প্রসারে সাহায্য করা হইতে লাগিল। সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা মক্তব-মাদ্রাসাকে সরকার যে অধিক সাহায্য করেন তাহার মূলে অনেক রহস্য আছে—তাহা মাননীয় নেতাদের ভেদ করিবার যোগ্যতা নাই।

মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের যুক্তি দেখিয়া বাস্তবিকই হাসি পায়। হক-সাহেব ভুল কথা বলিয়াছেন। মক্তব না থাকিলে মুসলমান মূর্খ থাকিবে না, কিন্তু থাকিলে সমাজ কুশিক্ষা ও নিকৃষ্ট ধরণের শিক্ষা পাইবে; ফলে তাহাদের অন্ধ গোঁড়ামি বাড়িয়া যাইবে। ধোঁকায় পড়িয়া এই সব নেতা নিজেরা মক্তব চান, অথচ তাহাই সমাজের নামে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যেখানে মক্তব নাই, সেখানে কি সাধারণ বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র পড়ে না? গরিবের ছেলেরাও সে-সব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে। আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, হক-সাহেব, খানবাহাদুর মোমিন-সাহেব প্রমুখ মহাভাগ নেতাদের ছেলেরা ও আত্মীয়েরা কোথায় লেখাপড়া শেখে? সমাজের দরিদ্র ছেলেরাও যদি সেইখানে লেখাপড়া শেখে তবে কি এমন ক্ষতি হইবে? আমাদের নেতাদের বাড়ির ছেলেপুলেরা কেহই মক্তব-মাদ্রাসায় পড়ে না, তবে সমাজের জন্য মক্তবের প্রতি এত টান কেন দেখান হইতেছে? তাই তাঁহাদের বলি সরকারী চাল ভেদ করিয়া একটু ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করুন, দেখিবেন মক্তব-মাদ্রাসায় শিক্ষার ফল সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

আমি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি—মক্তব-মাদ্রাসায় শিক্ষা কিছুই হয় না। দেখা গিয়াছে এক কোরআন-শরীফ পড়িতে অনেকের তিন-চার বৎসর লাগিয়াছে, অথচ সে ছেলে না জানে [illegible] অঙ্ক কষিতে। এইভাবে কত ছাত্রের [illegible] তাহার সংখ্যা নাই। তিন-চার বৎসর মক্তবে পড়ার পর যদি কোন ছেলে সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে তবে তাহাকে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা ব্যতীত উপায় থাকে না, কারণ সে কোরআন পড়া অথবা উর্দ্দুর দু-এক পাতা ব্যতীত অন্য কিছুই শেখে নাই। ধর্ম্মশিক্ষার নামে সমাজের ছেলেদের প্রথম জীবনের এই মূল্যবান বৎসরগুলি নষ্ট হইতে দেওয়া ঘোরতর অন্যায়। হক-সাহেব ও মোমিন-সাহেব সেদিকে লক্ষ্য রাখেন না। শুনা যায় নিউ স্কীম সিনিয়ার মাদ্রাসাগুলি প্রবেশিকা পরীক্ষার মর্য্যাদাপ্রাপ্ত। সরকারী নথিপত্র সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে, কিন্তু যোগ্যতার দিক হইতে উভয় পদ্ধতির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একটি সিনিয়ার-মাদ্রাসা-উত্তীর্ণ ছেলের সহিত প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ ছেলের তুলনা করিলে এই পার্থক্য বুঝা যাইবে। একটি দুইটি নয়, আমি কয়েক ডজন ছেলেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ ছেলে মাদ্রাসা-পাস ছেলে অপেক্ষা অধিক জ্ঞানশালী। আর একটা কথা ভাবিয়া দেখুন—একটি ছোট শিশুর উপর যদি কয়েকটি ভাষার চাপ দেওয়া যায় তবে সে তাহা কিরূপে সহ্য করিবে? বাংলা, উর্দ্দু, আরবী, ইংরেজী, আবার কোথাও কোথাও তৎসহ ফারসী—এই সব ভাষার সমুদ্র বাঙালী মুসলমানকে ডিঙাইতে হইবে! আমরা বাংলা দেশে কোন্ দুর্ভাগ্য লইয়া জন্মিয়াছি তাহা জানি না, কিন্তু আমাদের গুণধর নেতাদের কল্যাণে আমাদের এই সব প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিষয় আয়ত্ত করিতেই হইবে। বস্তুতঃ মাদ্রাসার শিক্ষার ফলে আমাদের ছেলেরা না-শেখে বাংলা, না-শেখে আরবী, না-শেখে বিজ্ঞান ও শিল্প,—সব-কিছুরই মিশ্রণে তাহারা হইয়া পড়ে একটা জগা-খিচুড়ী।

তাই আমরা করজোড়ে ফজলুল হক সাহেবদের অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এ-বিষয়ে আর অগ্রসর না হন; বরং প্রচলিত সাধারণ বিদ্যালয়ের যাহাতে উন্নতি হয় তাহারই চেষ্টা করুন। সেই শিক্ষাকে একটু উন্নতপ্রণালীর করিয়া লইলেই আপাততঃ যথেষ্ট। আমূল শিক্ষাসংস্কারের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত [illegible] প্রণালীতে ছেলেরা শিক্ষা পাইতে থাকুক—

আলোচনা

'মঠ ও আশ্রম'

(১)

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় মুদ্রিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুলিখিত 'মঠ ও আশ্রম' নামক প্রবন্ধটিতে যে-সব ব্যবসাদারী, জুয়াচুরি, কপটতা ইত্যাদি আমাদের ধর্ম্ম-জগৎকে কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে তিনি সে-সকলের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও সমাজগাত্র হইতে এ সব পঙ্কিলতাকে একেবারে ধৌত করা অসম্ভব, তথাপি ইহার দ্বারা অনেকের অনেক উপকার হইবে। তবে, এই প্রবন্ধের কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের প্রথমেই লিখিয়াছেন :—

"জাবাল-উপনিষদে একটি শ্রুতি আছে, তাহাতে আমরা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থাটি পাই—'ব্রহ্মচর্য্য শেষ করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইয়া পরে বানপ্রস্থ হইবে ; তার পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে,' ইহাই শ্রুতি স্মৃতির প্রাচীন ব্যবস্থা। কিন্তু ইহার পরক্ষণেই জাবাল-উপনিষদ বলিতেছেন—'যদি অন্য রকম হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা যায়।...যে-দিন সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সে দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিবে।"

তাঁহার উদ্ধৃত এই শেষ বচনটির উপর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বড়ই বিরাগ। তিনি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতাদের এবং মহাভারতাদি পুরাণের ব্যবস্থার দ্বারা এই অপৌরুষেয় বেদবাক্যকে দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি শ্রুতির বিরুদ্ধে যে-সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে বেদের স্পষ্ট প্রতিষেধ করা হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—"উপরে উদ্ধৃত জাবালশ্রুতি হইতে মনে হয়, একটা বিরুদ্ধ মত ক্রমশঃ মাথা উঁচু করিতেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই মত আরও প্রবল আকার ধারণ করে।"

অর্থাৎ যখন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য এবং মহাভারতাদির মতের সহিত মিল নাই তখন জাবাল-শ্রুতির এ মত অতীব ভ্রান্ত ; ইহা এতদিন শ্রুতির অভ্যন্তরে মাথা নীচু করিয়াছিল, বুদ্ধ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির প্রশ্রয় পাইয়া এই ভ্রান্ত মত ভারতবর্ষে মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ঐ কথার দ্বারা অনুমান হইতে পারে যে, এরূপ ভ্রান্ত মত বেদের মধ্যে আরও অনেক আছে, ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেই পাওয়া যায়।

অধ্যাপক মহাশয় আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, "যে-দিন বৈরাগ্য হইবে, সে দিনই সন্ন্যাসী হইতে পারিবে' এই জাবাল-শ্রুতির বিরুদ্ধে এত শাস্ত্রের বচন রহিয়াছে যে, ইহাকে একটি নূতন মতবাদের ক্ষীণ সমর্থন ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না।"

অর্থাৎ বেদ শুধু ভ্রান্ত মতের প্রশ্রয় দেয় না ; বেদের মধ্যে অনেক জিনিষ আছে যাহা নূতন অর্থাৎ হাতগড়া মতের সমর্থনের জন্য বেদব্যাস উহার মধ্যে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

এই প্রকারে ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির বা বেদবাক্যের প্রতিষেধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বহু মানবের উপাস্য দেবতা বুদ্ধদেব ও শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য বৈরাগ্য হইবামাত্র সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের উপরেও বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। ইঁহারা ব্যতীত বাঙালীর হৃদয়ের ধন চৈতন্যদেবও কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া এবং স্মৃতির বিধিনিষেধে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যুবতী স্ত্রী ও বিদ্যার খ্যাতিকে তৃণবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আরও অনেক মহাত্মার নাম করিতে পারা যায় যাঁহারা মনোমধ্যে সংসারে বৈরাগ্য হইবা মাত্র সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

বৈরাগ্য সামান্য বস্তু নহে। তাহা কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে হয়। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে-সমস্ত বিষয়-লোলুপ কপট "গিরি" "পুরী" "মহারাজ" "সিদ্ধবাবা" "অর্দ্ধসিদ্ধদাদার" বর্ণনা করিয়াছেন; আমি তাঁহাদের কথা লিখিতেছি না।

পরন্তু বেদ বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করিলেই বৈরাগ্য হয় না। আজকাল আমাদের দেশে বেদান্ততীর্থের, সাংখ্যতীর্থের অভাব নাই। কিন্তু এ সকল তীর্থের ভিতর অনুসন্ধান করিলে বিষয়ভোগের ইচ্ছা ছাড়া বড় কিছু মিলে না। হৃদয়ের তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি এবং সংসারকে তুচ্ছ বোধ না হইলে যথার্থ বৈরাগ্য হয় না। যাঁহারা ইহজন্মে যথার্থ বৈরাগ্যধনে ধনী হইয়াছেন, তাঁহারা আশ্রম-চতুষ্টয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একথা স্বীকার করিতে হইবে। গৃহস্থাশ্রম আমাদের বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু তাঁহাদের তাহা লাগে না। কর্ম্মজগতের অনেক উপরে বৈরাগ্যের, জ্ঞানের বা ভাবের রাজত্ব। তাঁহারা সেই দেশের মানুষ। সংসারের বিধিনিষেধ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

"যদি অন্য রকম হয়, ... যে দিন সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিবে"—এ ব্যবস্থা শ্রুতি এই "অন্য রকম" মানুষের জন্যই দিয়াছেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ বিষয়ে প্রণিধান না করিয়া অযথা শ্রুতিবাক্যে দোষারোপ এবং বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য্যের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন।

শ্রীনলিনীনাথ কবিরাজ

(২)

উমেশ বাবু অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মঠ ও আশ্রম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সেই বিষয়ে আমি মাত্র দু-একটা কথা বলিতে প্রয়াস পাইব।

শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাসগ্রহণ শাস্ত্রসম্মত নহে, একথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ জাবাল-উপনিষদ উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। কাজেই এ-সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

মঠ ও কোঠাবাড়িতে সন্ন্যাসীদের বাস সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই, বর্ত্তমান বেলুড় মঠের মত কোঠাবাড়ির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি সময়ে বহু মূল্যবান সুটও পরিয়াছিলেন, কোন সময়ে তিনি আচারাদি খাইবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি নিশ্চয়ই অসন্ন্যাসী নহেন।

শেষ কথা, শুধু বিদেশীর অনুকরণে মঠ ও আশ্রমের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া ধনী, ভূস্বামিগণ যাঁহারা পরের আপ্রাণ কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে বড় বড় কোঠাবাড়ি তৈয়ার করিয়া বাস করেন, তাঁহাদের প্রতিও স্বদেশ-হিতৈষীদের লক্ষ্য করা অনুচিত নহে।

শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী সরস্বতী

(৩)

অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "মঠ ও আশ্রম" প্রবন্ধের প্রথম কথা—ভারতবর্ষের সাধুসন্ন্যাসীরা, মঠধারীরা, মহন্তরা, আশ্রমবাসীরা মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান "পুরাপুরি" মানিয়া চলিতেছেন না। তাঁহার দুশ্চিন্তার কারণ, শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুরা এই সব সাধুসন্ন্যাসী আশ্রমবাসীদিগকে "শাস্ত্রানুযায়ী সন্ন্যাসী মনে করিয়া প্রতারিত হইতেছে।" তাঁহার দ্বিতীয় কথা—এত সহজে এদেশে আশ্রম ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং এত সহজে "বৈধ এবং অবৈধ" উপার্জ্জনের অর্থ এই সব মঠ ও আশ্রমে প্রবেশ করে যে অনাচার ও পাপাচার মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; একাধিক স্থলেই এই সব অর্থ ভোগবিলাসে ব্যয়িত হয়। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, লোকে স্ব-ইচ্ছায় তাঁহাদিগকে অর্থ দেয়, তাঁহারা চুরি-ডাকাতি করেন না। তাঁহার তৃতীয় কথা—কিন্তু তাঁহাদের ক্রীড্ "ত্যাগ"—তাঁহারা "সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী"—সন্ন্যাসী ত অর্থের মালিক ও ব্যবহর্ত্তা হইতে পারে না, সুতরাং লেখকের মতে, তাঁহাদের মতে ও আচারে সামঞ্জস্য নাই, তাঁহারা সন্ন্যাসীপদবাচ্য নহেন।

যাঁহাদিগের কথা তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অরুণাচল মিশনের প্রতি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। যে কেহ অরুণাচল মিশনকে জানে সেই বুঝিবে। লেখক এক স্থানে লিখিয়াছেন, "কয়েক বৎসর আগে আসাম প্রদেশে একটি আশ্রমে পুলিসকে জোর করিয়া প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, এ কথা বোধ হয় অনেকেরই মনে আছে; এবং কি কারণে পুলিসকে হানা দিতে হইয়াছিল তাহাও সকলের অজানা নয়। প্রকাশ্যে আইন ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত পুলিস কিছু করিতে পারে না। সুতরাং এই সব আশ্রমের মধ্যে অধিকাংশই এ ভাবে পুলিস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই কিন্তু পুলিসের সঙ্গীন এড়াইলেও সমাজ-হিতৈষীরা সন্দেহের চক্ষে দেখেন এরূপ আশ্রমের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়।" তার পর লেখক স্পষ্ট 'জগৎসী' আশ্রমের নামোল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "আইনের বাধা থাকিলে 'জগৎসী' আশ্রমের মত ইহাদের আশ্রমও পুলিস জোর করিয়া ভাঙিয়া দিত।" আসামের শ্রীহট্ট জেলার ক্ষুদ্র গ্রাম 'জগৎসী'তে একমাত্র অরুণাচল মিশনেরই আশ্রম ছিল এবং সেই আশ্রমই আক্রমণ করিয়া পুলিস জগতের কল্যাণকামনায় যে চারি মাসব্যাপী নাম-মহাযজ্ঞ চলিতেছিল, তাহা বন্ধ করে। এই ঘটনাকেই লেখক বার-বার উল্লেখ করিয়াছেন।

"কি কারণে পুলিসকে সেখানে হানা দিতে হইয়াছিল" তাহা লেখক খুলিয়া বলিয়া দিলেই সকলের সন্দেহ ভঞ্জন হইত। সত্য কারণটি কি, হয়ত তিনি নিজেও জানেন না। সেই স্বদেশী ও বোমার যুগে পুলিসের সন্দেহ হইয়াছিল, অরুণাচলের আশ্রমগুলি স্বদেশী ও বোমার গুপ্ত আড্ডা, ধর্ম্মের আবরণে রাজদ্রোহকর কিছু সেখানে হইতেছিল। বহুবার পুলিস আশ্রম ও নানা স্থানে ভক্তদের বাসস্থান সার্চ্চ করিয়াছিল, আশ্রমবাসীদের চলাফেরা পুলিস সর্ব্বদা লক্ষ্য করিত। আশ্রম সকলের নিকটই অবারিত দ্বার, তবুও পুলিসের সন্দেহ যায় না। একটি নাবালক ছেলেকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার ভাই এই অভিযোগ করে এবং এই অভিযোগ উপলক্ষ্য করিয়া পুলিস ও গুর্খাবাহিনী 'জগৎসী' আশ্রম আক্রমণ করে। ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া, পুকুরে উপর্য্যুপরি দুই দিন জাল ফেলিয়া গুপ্ত বোমা বা পিস্তলের অনুসন্ধান করে। শেষে ছেলেটি সাবালক, স্ব-ইচ্ছায় আসিয়াছে, কেহ তাহাকে আটক করে নাই প্রমাণিত হইলে মিথ্যা অভিযোগকারী আদালত কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়। "দাঙ্গা করিবার" অভিযোগে মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর দয়ানন্দ দেব দ্বাদশ জন ভক্তসহ ৩ মাস হইতে ২ বৎসর পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ হন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ইহার তীব্র প্রতিবাদ করার ফলে কমিশনার তদন্ত করেন, গভর্ণমেণ্ট-রেজোলুশ্যনে বলা হয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা হয় নাই, দেববিগ্রহ ভগ্ন করা সম্বন্ধে বলেন—"the image had no sanctity।"

অন্যত্র লেখক বলিতেছেন, "ইহাদের মধ্যে (আশ্রমগুলির) অনেকে কোন-না-কোন রাষ্ট্রীয় আদর্শের সাফল্য কামনা করেন এবং তাহার জন্য পরিশ্রমও করেন।" রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্তকেই ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ মনে করিয়া অরুণাচল মিশন আজ ২৮ বৎসর কাল বিশ্বশান্তির আদর্শ, পৃথিবীর সব দেশগুলিকে মিলিত করিয়া এক World Union গঠন, শ্রীভগবানের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়া জাগতিক অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া এক বিশ্বযৌথভাণ্ডার স্থাপনের প্রচার করিয়া আসিতেছে।

অরুণাচল মিশন যুদ্ধের বহুপূর্ব্ব হইতে ভগবানের নামের শক্তিতে জগতে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য জগৎসীতে চারি মাসব্যাপী নাম-মহাযজ্ঞ করিয়াছে, বিশ্বশান্তির আদর্শকে একমাত্র ধ্যানজ্ঞানরূপ করিয়া আজ ২৮ বৎসর অশেষ দুঃখদারিদ্র্যের ভিতর দিয়া চলিয়াছে।

লেখকের মূল বক্তব্য সম্বন্ধে, পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন শাস্ত্র-বিধিগুলি "পুরাপুরি" না মানিয়া ভারতের পঞ্চাশ লক্ষ সাধুসন্ন্যাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অপরাধী হইয়াছেন। দেশকালপাত্রের যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তখনকার বিধান যে আজ "পুরাপুরি" চলিতে পারে না, এই সহজ কথাটি অধ্যাপক-প্রবরের বুদ্ধিতে ধরা পড়ে নাই। মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা এরূপ আশাও করেন নাই। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সমাজ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ং কি তাহা করিতেছেন? নিশ্চয়ই না। তবে সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে এই অন্যায় দাবি কেন?

তার পর কোন্‌টা শাস্ত্র, কোনটা অশাস্ত্র? বেদ বিভিন্ন শাস্ত্র পরস্পর-বিরোধী, মানুষ মহাজনকেই অনুসরণ করিবে। এই অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রাণবান জীবন্ত মানুষ পদে পদে শাস্ত্রের পাতা উল্টাইয়া চলিতে পারে না। শাস্ত্রাপেক্ষা ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের প্রভাবই মানুষের মনের উপর বেশী। তাই মানুষ বুদ্ধকে, শঙ্করকে, রামানুজকে, শ্রীচৈতন্যকে অনুসরণ করিয়াছে। তাঁহারা কেহই শাস্ত্রের বিধান পুরাপুরি মানেন নাই। শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রাণহীন আচার নিয়ম পালনের কোনও প্রয়োজন নাই, 'হরের্নামৈব কেবলম্' মহাপ্রভু এই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রের বিধান বহুকাল হইতেই ভঙ্গ হইতেছে লেখক স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এ যুগেও মানবসমাজ ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহামানবকেই অনুসরণ করিয়া চলিবে।

অরুণাচল শাস্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান, শাস্ত্র মানিয়াই পূর্ব্ব-পিতামহগণের সাধনধারা ধরিয়াই সে চলিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্র যে অপরিবর্ত্তনীয় তাহা সে মনে করে না। অরুণাচল জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে স্ত্রীপুরুষকে আশ্রমে স্থান দিয়াছে। স্ত্রীলোককে বিভীষিকা মনে করিয়া, সাধনপথের বিঘ্নস্বরূপ মনে করিয়া দূরে রাখে নাই। অরুণাচলের ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা আশ্রমে বাস করেন তাঁহারা অধিকাংশই বিবাহিত, অনেকেই মা-বোন স্ত্রী-কন্যা লইয়া আশ্রমে বাস করেন। অরুণাচল স্ত্রীলোককে পুরুষের সহিত সমান অধিকার দিয়াছে, আশ্রমের মেয়েরা ঘোমটা দেন না, আশ্রমের যাবতীয় কর্ম্মে পুরুষের সহায়তা করেন, একসঙ্গে কীর্ত্তন করেন, শত শত লোকের সম্মুখেও সহজভাবে চলাফেরা করেন। অরুণাচল মুসলমান, য়িহুদী, খ্রীষ্টান ভক্তকে পরম সমাদরে বক্ষে স্থান দিয়াছে, আজ ২৮ বৎসর সকল শ্রেণীর হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মায়ের চরণে অঞ্জলি দিতেছে, প্রসাদে জাতিবিচার নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্রে একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে।

অধ্যাপক মহাশয় পাশ্চাত্য সাম্যবাদীদের অনুসরণ করিয়া ধনীদের ধনসম্পদ, মঠ ও আশ্রমগুলির "অতুল ঐশ্বর্য্য" কাড়িয়া লইয়া সমাজের দশ জনের মধ্যে বাঁটিয়া দিতে চাহিয়াছেন। ইহাও কি মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান? এক দিকে জগতের নূতন চিন্তাধারার সহিত যোগ রাখিয়া তিনি পরিবর্ত্তন চান, অথচ সাধুসন্ন্যাসীরা পুরাতন শাস্ত্রবিধি "পুরাপুরি" মানিয়া চলিবে এই দাবি করেন।

তাঁহাকে জানাইয়া দিতে চাই, অরুণাচলের কোনও ধনসম্পদ নাই, ঐশ্বর্য্য, বিষয়সম্পত্তি, সোনারূপার বাসনপত্র, কোম্পানীর কাগজ নাই। তাহার বৃত্তি অমৃতবৃত্তি, শ্রীভগবানে অনন্যচিত্ত হইয়া তাঁহারই উপর যোগক্ষেমের ভার অর্পণ করিয়া সে চলিয়াছে। আশ্রমভক্তরা সময় সময় উপবাসী, একাহারী, অর্থের অভাবে বহু অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন।

অরুণাচলের মতে ও কার্য্যে কোনও অসামঞ্জস্য নাই। তাহার মতে পূর্ণ আদর্শ মানুষ ভোগও করিবে, ত্যাগকেও সঙ্গে রাখিবে, ভোগটাও শ্রীভগবানের বিধান। অনাসক্ত হইয়া, অন্তরে ত্যাগকে রাখিয়া, প্রয়োজনমত ভোগ করিবে। "কোঠাবাড়ি" "ইমারতে" বাস করিলে কোনও ধর্ম্মহানি হয় না। লেখক মন্তব্য করিয়াছেন, "ত্যাগভোগের এ বিকৃত সমন্বয়"। প্রকৃত সমন্বয় কি? তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "এটা কোন্ রকমের সন্ন্যাস?" অনাসক্তিই প্রকৃত সন্ন্যাস। কৌপীন, বাহ্যিক নিয়মনিষ্ঠাই সন্ন্যাসীর প্রকৃষ্ট পরিচয় নহে।

লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধটি নিতান্ত একদেশদর্শিতার পরিচায়ক, ভারতের সাধুসন্ন্যাসীদের দ্বারা সমাজের কোনও উপকার তিনি দেখেন না। সকলকে একই পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। এ কথা বলিতে চাহি না, সাধুসন্ন্যাসীদের সমাজে, মঠে ও আশ্রমে, কোথাও কোনও অন্যায় অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে না। স্থানে স্থানে হয়ত কেহ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অপব্যবহার করিতেছেন। সাধুসন্ন্যাসীরা হয়ত প্রকৃত ধর্ম্মের পথ সমাজকে দেখাইতেছেন না। ইহার কারণ হিন্দু সমাজের যেমন, সাধুসন্ন্যাসীদের ভিতরেও তেমনি ধর্ম্মের আদর্শ মলিন হইয়া গিয়াছে, সত্যোপলব্ধি, ধর্ম্মের সহিত সাক্ষাৎ দর্শন নাই। হিন্দুর প্রাণের ভিতর ধর্ম্মের আগুন আজ জ্বলিতেছে না। ইহার একমাত্র প্রতীকার হিন্দুর প্রাণের ভিতর খাঁটি, সত্য, অনাবিল ধর্ম্মের আগুন পুনঃপ্রজ্বালিত করা। একমাত্র ধর্ম্মের দ্বারাই হিন্দুর প্রাণ জাগ্রত হইবে। হিন্দুকে আজ বেদপুরাণ শাস্ত্রবিধি আচার নিয়ম নিষ্ঠা ছাড়িয়া মূলে গিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

অরুণাচল মিশন — আলোকানন্দ মহাভারত

পুনরুত্থান

"For the Son of Man shall come in the Glory of his Father—"

বৃদ্ধ ষ্টিফেন বিশ্বাসের মাথা পুস্তকের উপর আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। উপবিষ্ট শ্রোতা-কয়টি যেন আরও একটু অগ্রসর হইয়া আসিল। অধীর আগ্রহে তাহারা এই অমৃতময় বাণীর প্রত্যেকটি শব্দ যেন পান করিয়া লইতে চাহিল। স্বল্পালোকিত জনবিরল কক্ষে বৃদ্ধ ষ্টিফেনের মৃদু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র গির্জ্জার চূড়া হইতে একটি ঘণ্টার ধ্বনি বিলম্বিত লয়ে একটি সুগভীর আনন্দময় বেদনার তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল ঢ—ঙ—ঢ—ঙ—ঢ—ঙ—

পত্নী মারিয়া এবং পালিতা কন্যা নলিনী চঞ্চল হইয়া উঠিল।...তিনি আসিয়াছেন! তিনি আসিয়াছেন! আজ এই সন্ধ্যায় আমাদেরই মধ্যে এইখানেই কোথাও মানবপুত্র আবির্ভূত হইয়াছেন।

খ্রীষ্টমাস ঈভ।

শীতটা বেশ জোর পড়িয়াছে। এমন শীত নাকি অনেক দিন পড়ে নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ সকাল হইতেই আকাশ মেঘাবৃত; এবং এলোমেলো হাওয়া চালাইয়াছে। এখনও রাস্তায় আলো জ্বলে নাই। শহরের শীতের অপরাহ্ণ ধূম-মলিন, এ ফুটপাথ হইতে ও ফুটপাতের লোক চিনিতে পারা যায় না—এমনই অবস্থা। তথাপি রাস্তায় লোকের অভাব নাই। র‍্যাপার মুড়ি দিয়া, ব্লেজার কোট চড়াইয়া, গরম স্যুট পরিয়া দলে দলে মানুষ চলিয়াছে। বড়-দিনের সন্ধ্যার আনন্দ উপভোগ হইতে বিরত থাকিতে কেহই ইচ্ছুক নয়। বাজারের ও সিনেমার দিকে ভিড় বেশী। মার্কেটে ইংরেজ, ফিরিঙ্গি, চীনা, বাঙালী, মুসলমান, আর্ম্মেনিয়ান, ইহুদী—সর্ব্বজাতির বিচিত্র সমাবেশ। উজ্জ্বল আলোকের চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট রঙীন-পক্ষ পতঙ্গদলের মত।...মানবের পাপের জন্য দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে

মানবপুত্র প্রাণ দিলেন—তাঁহার জন্মোৎসবের আনন্দ যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে তাহা রংচঙে রাংতা-মোড়া শোলার খেলনার মত লঘু এবং ক্ষণস্থায়ী।

এই দিকে জনতা অত্যন্ত বেশী। ফুটপাথে ভিড় ঠেলিয়া চলা দুঃসাধ্য। মিষ্টান্নলোভী বালকের প্রসারিত বাহুর মত অনেকগুলি দোকান ক্রম-বর্দ্ধিত হইয়া ফুটপাথের প্রায় অর্দ্ধেকটা গ্রাস করিয়াছে। রাস্তার উপরেই যেন বাজার বসিয়া গিয়াছে। ফেরিওয়ালারা সস্তা খেলনা ও মনিহারী জিনিয ভর্ত্তি ট্রে গলার সহিত ঝুলাইয়া হাঁকিতেছে, "যা লিবে তা দু-আনা—সব কিসিম লেও দু-আনা। একদল হাস্যমুখী ভুটিয়া বালিকা কলরব করিয়া সওদা করিতেছে এবং ইহারই মধ্যে খবরের কাগজের হকার বালকগণ এ ফুটপাথ হইতে ও ফুটপাথে ছুটিতেছে, "জোর লড়াই! ভারি জোর লড়াই! এক পয়সা ।"

দলে দলে নরনারী আনন্দের সন্ধানে ফিরিতেছে। সাহেব মেম-সাহেব মোটর হইতে নামিতেছে ও উঠিতেছে। তাহাদের মুখে হাসি ও পরিধানে মূল্যবান পোষাক। বাঁধাকপি, টার্কি ও ব্রাউন কাগজে মোড়া কেক সওদা করিয়া স্থূলকায়া মেম-সাহেব চলিয়াছে; ভাল সওদা করার আনন্দ তাহার মুখে পরিস্ফুট। ঠুং ঠুং শব্দে রিক্‌শ ছুটাইয়া চীনা সাহেব যাইতেছে। উদ্দেশ্যহীন দর্শকের মত অনেক বাঙালী বাবু ভিড় ঠেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। Wine & Provisions লেখা একখানা ছোট লরী অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে।

এখানে চারিদিকের জনস্রোত এত অদ্ভুত ও বিচিত্র, এই শহর-কেন্দ্রে প্রতিমুহূর্ত্তে এত অচিন্তনীয় ব্যাপার অতি সাধারণ ভাবে ঘটিতেছে, যে কোনও দিকেই কাহারও দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইতে পায় না। চৌরঙ্গীর মোড়ে পাঁচ মিনিট কেহ দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত, একটি বালক দ্রুত চলন্ত বাস হইতে নামিতে গিয়া পড়িয়া আহত হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই য়্যাম্বুলান্সের গাড়ী আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। একজন সার্জ্জেণ্ট দুইটি আলোকহীন সাইকেল-আরোহীকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল; এবং ইহার ঠিক দুই মিনিট পরেই ঢং ঢং শব্দে সকলকে সচকিত করিয়া রাস্তা কাঁপাইয়া তিনখানা ফায়ার-ব্রিগেডের ভারি গাড়ী দ্রুতবেগে পর পর চলিয়া গেল। অনেকেই মনে করিল কোথাও আগুন লাগিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। ইহারা অকারণে মাঝে মাঝে এমনি ছুটিয়া বাহির হয়। ইহা তাহাদের কার্য্যপটু রাখিবার একটা উপায় মাত্র।

ইতিমধ্যে কখন একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মনিব্যাগ হারাইয়াছে। একটা হৈ হৈ শব্দ উঠিল। কিন্তু তিন মিনিট পরে কেহ সেখানে আসিলে বুঝিতেই পারিত না যে একটা নির্দ্দোষ হিন্দুস্থানী বালক এখানে তিন মিনিট পূর্ব্বে চোরের ঠেঙানি খাইয়াছে, এবং এই মুহূর্ত্তে সে একতলা গৃহের ভিত্তিতলে তাহার অন্ধকার নীচু বাসস্থানে মলিন শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতেছে এবং ধুঁকিতেছে।

ইহার পরক্ষণেই দেখা গেল, ময়দানে মনুমেণ্টের পাদদেশে একটা জনতা জড় হইয়াছে, এবং মনুমেণ্টের ধাপের উপর উঠিয়া একটি দীর্ঘাকৃতি যুবক বাহু প্রসারিত করিয়া বক্তৃতা করিতেছে। সংঘবদ্ধ জনতার মধ্যে মাঝে মাঝে উত্তেজনার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে। তাহারা মুহুর্মুহু সমুদ্র-গর্জ্জনের মত জয়ধ্বনি করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে লাইনের মত লাল পাগড়ীর একটা রেখা ক্ষুদ্র দলটাকে ঘিরিয়া ফেলে। একটা উত্তেজিত কলরব, দুই-একটা চটাপট্ শব্দ, তাহার পরেই পুলিসের তীব্র হুইস্‌ল্‌-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খটাখট্ অশ্বখুর-ধ্বনিও শুনিতে পাওয়া যায়। মোড়ে মোড়ে যে অশ্বারোহী পুলিস প্রহরায় নিযুক্ত ছিল—তাহারা ছুটিয়া আসে। জনতার ভিতর ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। অনেকেই পলাইয়া বাঁচে; কেহ কেহ জখম হয় এবং নেতৃস্থানীয়দের তাহারা গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। কেহ বলে, "কিসের মিটিং হচ্ছিল ওখানে?" অপর কেহ বলে, "কি জানি! ডকের কুলি বুঝি—"

আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। কেহ বুঝিতেও পারে না—এখানে এইমাত্র একটা প্রহসন অভিনীত হইয়া গেল।

এই আনন্দপ্রয়াসী জনতা হয়ত এক মুহূর্ত্তের জন্য এই সকল ঘটনা-বুদ্বুদের প্রতি তাকায়; হয়ত তাকায় না। আশ্চর্য্য এই হৃদয়হীন ও মস্তিষ্কহীন জনতা। কিন্তু তাহার প্রত্যেকটি লোককে ধরিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে—সে তোমার আমার মতই মানবিকতায় পূর্ণ।

ষ্টিফেনের গৃহ শহরের অপেক্ষাকৃত জনবিরল অংশে। একটি ক্ষুদ্র গির্জ্জা এবং তাহার সংলগ্ন প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে কয়েকটি পুরাতন নীচু ছাদওয়ালা কুঠি। এখানে কয়েকটি দেশীয় খ্রীষ্টান-পরিবার বাস করে। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে নদীয়া জেলার নমঃশূদ্রেরা যে দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, ষ্টিফেন তাহাদেরই একজন। এই কম্পাউণ্ডের দুইটি কুঠরিতে বৃহৎ পরিবার লইয়া ষ্টিফেন বিশ্বাস অনেক দিন হইতে বাস করিতেছে। বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া এবং চরিত্র-মাধুর্য্যে সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করে।

বড়দিন। সকলেই নিজের নিজের গৃহ যথাসাধ্য সজ্জিত করিয়াছে। ছাদ হইতে রঙীন কাগজের মালা এবং কাগজের ফুল ঝুলিতেছে। টেবিলের উপরে একটা নীল কাচের ফুলদানীতে কয়েকটি মরশুমী ফুল। কুলঙ্গীতে আইকনের সম্মুখে দুইটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। ও ঘরে কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে কলরব করিতেছে। তাহারা কয়েকটি শস্তা খেলনা পাইয়াছে; এবং তাহারা জানে, আজ রাত্রে পায়েস খাইতে পাইবে। তাহাদের ছোট ছোট চোখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল।

কিন্তু এ-ঘরের সামান্য গৃহসজ্জার মধ্যে ম্লান আলোকে যেন একটা শঙ্কাকুল ব্যাকুলতার আভাস পাওয়া যায়। ষ্টিফেনের মৃদু কণ্ঠস্বর আবেগে যেন একটু কাঁপিতে থাকে, "And they shall kill him, and the third day he shall be raised again—"

"আর তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবে; এবং তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরুত্থিত হইবেন।"

আমেন।

ষ্টিফেন পুস্তকখানি শ্রদ্ধার সহিত মুড়িয়া রাখিল। কেহ কোনও কথা কহিল না। তার পর সে বেদনাপূর্ণ দৃষ্টিতে নলিনীর প্রতি এবং পরে মারিয়ার প্রতি চাহিল। তাহার অপরিসীম উদ্বেগে মারিয়ার ব্যাকুলতা আর বাধা মানিল না। অধীর ভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, "নেল, প্রশান্ত এখনও ফিরল না?"

ইহা প্রশ্ন নয়, মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা মাত্র। নলিনী নিরুত্তর রহিল।

এবার ষ্টিফেন প্রশ্ন করিল, "নেল, কখন সে ফিরবে, কিছু ব'লে গিয়েছে?"

নলিনী নতনেত্রে কহিল, "বলেছেন দেরি হ'তে পারে।"

ষ্টিফেন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। মারিয়া কহিল, "বছরকার দিনটাও সকলে একসঙ্গে কাটল না। সন্ধ্যার উপাসনায় সে বাদ রইল। খাবারের সময়ও হয়ত থাকবে না—"

ষ্টিফেন কহিল, "আজকের দিনটা অন্ততঃ সে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারত; উপাসনায় যোগ দিতে পারত।"

কিছু ক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিল। তার পরে মারিয়া কম্পিত কণ্ঠে পুনরায় কহিল, "কি কুক্ষণেই ডক ষ্ট্রাইক বেধেছিল। এখন ভালয় ভালয় চোদ্দই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কেটে গেলে বাঁচি। কি যে হবে—"

১৪ই ফেব্রুয়ারি সেণ্ট ভ্যালেণ্টাইন্‌স্ ডে। এই তারিখটা নলিনীর কানে যাইতে সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া পশ্চিমের জানালায় গিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে দিনের আলো বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। কেবলমাত্র পশ্চিমের আকাশে এখনও ঈষৎ আলোকের আভাস রহিয়াছে। এই পটভূমিকার উপর জানালার ফ্রেমে বাঁধানো বৃহৎ সিলুয়েট চিত্রের মত নলিনীর নিশ্চল মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই ষ্টিফেনের যেন সহসা ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তাহার স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠস্বরে একটু তীব্রতার শান লাগিল। কহিল, "কেন যে মানুষের এমন দুর্ম্মতি হয়, জানি না। যাঁরা অন্নদাতা, মনিব, চিরদিন প্রতিপালন করে এসেছেন—তাঁদের শত্রুতা করতে যাওয়া—"

মারিয়া এ-কথায় একটু আহত হইল। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "শত্রুতা করতে যাবে কেন? সে ত কারও শত্রু নয়। সে বললে, ন্যায়ের পক্ষে, নির্য্যাতিতের পক্ষে সে দাঁড়াবে। নইলে ষ্ট্রাইকারদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? সে ত অফিসার—"

ষ্টিফেন প্রবোধ মানিল না। যে একমাত্র উপার্জ্জনশীল পুত্রের উপর এই বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, এই নব-যৌবনা কুমারী বালিকা, পাশের গৃহের হাস্য কলরব-রত ছেলে-মেয়ে—এই সকল অসহায় শিশুর একান্ত নির্ভর—তাহার এই দুঃসাহসিকতাকে সে সমর্থন করিতে পারিতেছিল না। ধর্ম্মঘটীদের নেতৃত্ব করিবার লোক আর কেহ কি ছিল না? তাহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের নিষেধ অমান্য করিয়া আজিকার ময়দানের সভায়

বক্তৃতা করিতে যাওয়া! এ সকল তাহার মনে ভাল বোধ হইতেছিল না। সে কহিল, "তবু, মনিবদের বিরুদ্ধাচরণ না করলেই ভাল হ'ত। সুসমাচারে সদাপ্রভু স্বয়ংও ত বলেছেন, সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দাও। আজকালকার ছেলেদের ধর্ম্মবুদ্ধি কমে যাচ্ছে।"

এ-কথায় মারিয়া অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। সে ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "ও কথা ব'লো না গো। ছেলে আমার বড় ভাল; অধার্ম্মিক সে নয়। ঝোঁকের মাথায় সে ত কিছু করে নি। যারা দুঃখী, যাদের মুখের দিকে কেউ চাইলে না, তাদের জন্য ওর প্রাণ কাঁদে। তাদেরও ত ন্যায্য দাবি, তাদেরও ত বেঁচে থাকবার অধিকার আছে—"

ষ্টিফেন মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না, সে একটা কথা নয়; সে কথাই নয়—"

নলিনী জানালা হইতে উঠিয়া আসিল। চেয়ারে উপবিষ্ট বৃদ্ধের শুভ্র কেশের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "বাবা, কেন তুমি এত বিচলিত হচ্ছ। আজকে যাঁর আবির্ভাব তিনিও ক্রুশ বহন করেছিলেন, মানুষের পাপের জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁকেও তারা কাঁটার মুকুট পরিয়েছিল, এ-কথা যেন আমরা কখনই ভুলে না যাই—"

ষ্টিফেন লজ্জিত হইল। তাহার স্বাভাবিক সংযম, তাহার পরমবিশ্বাসী চিত্ত যে পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় এবং নিজেদের একান্ত অসহায়তা স্মরণ করিয়া ক্ষণেকের জন্যও বিচলিত হইয়াছিল এবং বিশ্বাস হারাইয়াছিল—ইহাতে সে অতিশয় অনুতপ্ত হইল। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল। তার পরে পুনরায় বাইবেলখানি টানিয়া লইয়া মৃদু কণ্ঠে কেবলমাত্র কহিল, "কিন্তু সে এখনও এল না কেন?" তার পরে ধীরে ধীরে আবার পাঠ আরম্ভ করিল;

"For I was an hungered, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:—"

নলিনী একটি মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিল। অস্ফুট স্বরে প্রায় মনে মনে কহিল, "তিনি আসবেন; নিশ্চয়ই তিনি আসবেন।"

গৃহের দরজা খুলিয়া গেল। একটি যুবক ত্রস্তে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকা তীব্র শীতের হাওয়ায় ছাদ হইতে ঝুলানো কাগজের মালাগুলি দুলিয়া উঠিল; এবং আইকনের সম্মুখে মোমবাতি দুইটা নিবিয়া গেল। ঝুলানো ইলেকট্রিকের বাতিটা দোল খাইতে লাগিল; তাহাতে উপস্থিত মানুষ কয়টির ছায়া পর্য্যন্ত সজীব এবং চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নলিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা বন্ধ করিল; এবং পুনর্ব্বার আইকনের সম্মুখের বাতি দুইটি জ্বালিয়া দিল।

আগন্তুক ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িল। সে হাঁপাইতেছিল। মারিয়া অতিশয় ব্যাকুলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল বাবা? প্রশান্ত কই?"

ইহাও প্রশ্ন নয়। বিশেষতঃ আগন্তুকের শ্রান্ত বিপর্য্যস্ত চেহারা, এবং তাহার একাকী ফিরিয়া আসা এ প্রশ্নের জবাব পূর্ব্বেই দিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেই মন মানিতে চাহে কি?

আগন্তুক কহিল, "প্রশান্তদা'কে ধরে নিয়ে গেল। এ ত জানতামই। কত লোক যে জখম হয়েছে, তার ঠিক নেই। আমি কোন রকমে পালিয়ে এসেছি। প'ড়ে গিয়ে হাঁটুতে এমন লেগেছে—উঃ—"

নলিনী আইয়োডিনে ভিজাইয়া একটু তুলা তাহাকে আনিয়া দিল। মারিয়া কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরা কি তাকে ছেড়ে দেবে না, বাবা?"

"কি জানি! বোধ হয় দেবে না। সকলেই বলছিল—"

যুবক বলিতে লাগিল, "ওর ওপরেই ত ওদের বেশী রাগ। নইলে ষ্ট্রাইক ভেঙে দিতে ওদের কত ক্ষণ লাগত? বলে,—কুলিদের ব্যাপারে ওর এত মাথাব্যথা কিসের?"

সে নত হইয়া হাঁটুর উপর আইয়োডিনের তুলাটা বুলাইতে লাগিল।

আর কেহ কোনও কথা কহিল না। গৃহের মধ্যে নিস্তব্ধতা আবার জমাট বাঁধিয়া উঠিল। নলিনী আবার ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়াইল। মারিয়া উঠিয়া আইকনের সম্মুখে গিয়া 'ক্রুশ' করিল; তার পরে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ষ্টিফেন বাইবেল খুলিয়া পুনরায় পাঠ আরম্ভ করিল। তাহার বার্দ্ধক্যভারে অবনত দেহ আরও অবনত দেখাইল। নিস্তব্ধ গৃহে তাহার স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠস্বর এবার আরও মৃদু শোনাইল।

"Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come—"

বাহিরের চেহারা তখন অন্য রকম।

জনতা আরও বাড়িয়াছে। কনকনে হাওয়াও তেমনই জোরে বহিতেছে। কিন্তু সেদিকে কেহ ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেছে না। সিনেমা হাউস এবং সার্কাসের তাঁবুর সম্মুখে লোকে লোকারণ্য। একটা সার্কাস-তাঁবুর প্রবেশপথের সম্মুখে একটি উদ্ভট পোষাক পরিহিত সং দাঁড়াইয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে দর্শক আকৃষ্ট করিতেছে। বার এবং রেস্তোরাঁ গুলার সম্মুখে মোটর এবং ইউরোপীয় পুরুষ ও সুবেশা নারীর ভিড়। তাহারা অর্দ্ধ-অনাবৃত-বক্ষ এবং উন্মুক্ত-পৃষ্ঠ সূক্ষ্ম কাপড়ের পোষাকের উপর বহুমূল্য ফার-কোট চড়াইয়াছে; এবং তীব্র শীত বায়ুকে উপেক্ষা করিয়া হাসিমুখে সঙ্গীর বাহু ধরিয়া দ্রুত যাইতেছে ও আসিতেছে।

একটা টমি একটা ফিরিঙ্গি বালিকার বাহুতে বাহু জড়াইয়া শিস্ দিতে দিতে চলিয়া যায়। নাচঘরে একটি মনোরম শাড়ী-পরিহিতা শ্বেতাঙ্গিনী উঠিয়া নিখুঁত ছাঁটের ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত জনৈক সম্ভ্রান্ত দেশীয় ব্যক্তির সহিত নাচিতে আরম্ভ করে।

পাশের কার্ণিভালগুলাতে জুয়ার আড্ডা পূরা দমে চলিয়াছে। একটি বাঙালী যুবক বিমর্ষ মুখে সঙ্গীর সহিত সেখান হইতে বাহির হইয়া আসে; সঙ্গীকে বলিতে বলিতে আসে, "যা-কিছু ছিল—সব হেরেছি।"

তাহারা মোড়ের উপর আসিয়া দাঁড়াইতেই একটা ফিটন গাড়ী হইতে লুঙ্গি-পরিহিত একটা লোক নামিয়া কাছে আসিয়া নিম্নস্বরে কিছু বলে। যুবক দুইটি একটু দাঁড়াইয়া শোনে; তার পর মাথা নাড়িয়া চলিয়া যায়।

একটু অগ্রসর হইতেই আর একটা লোক ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কানের কাছে নিম্নস্বরে বলিয়া যায়, ছবি লিবেন বাবু ?"

একটা মাতাল সাহেব বার হইতে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসে। সার্জ্জেণ্টের হাতে পড়িবার ভয়ে সে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার বৃথা চেষ্টা করে; এবং বলিতে থাকে, "আই আন্না ড্রাং—হু সেথ্ আ' ওয়াস্ ড্রাং ?" জায়গাটা মদের গন্ধে ভরিয়া যায়।

এই সন্ধ্যায় এই মহানগরীতে কেহ আমোদের সন্ধানে, কেহ বা শীকারের সন্ধানে ফিরিতেছে। সকলেই নিজের নিজের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় চলিয়াছে। অপরের প্রতি দৃকপাত করিবার সময় বা প্রবৃত্তি কাহারও নাই।

ইহারই মধ্যে তাহারা প্রশান্তকে লইয়া চলিয়াছে। তাহার পরিচ্ছদ ছিন্ন ও কর্দ্দমাক্ত, হাতে হাতকড়া। কোমরের চমৎকার সাদা দড়ি পিছনের এক জন ধরিয়া আছে—সে কিছু আহত এবং শ্রান্ত হইয়াছে।

তাহাকে লইয়া তাহারা মোড় অতিক্রম করিয়া, হোটেলের সম্মুখ দিয়া, সিনেমা গৃহের পাশ দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। কেহ তাহাদের লক্ষ্য করিল না। কেবল সেই মাতাল সাহেবটা একবার এই ক্ষুদ্র দলটিকে দেখিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "বাই জোভ! আজিকার পবিত্র দিনেও চুরি! হোয়াথ্ ইস্ দ্যা ওয়াল্ড খামিন্ থু!" তার পরে চট করিয়া আবার পানশালায় ঢুকিয়া পড়িল।

নাচঘরে নাচ তেমনই চলিতে লাগিল। মোড়ে মোড়ে দালালগণ তেমনই শীকারের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিল। অতৃপ্ত জনতা তেমনই সস্তা আমোদের সন্ধানে উৎসুক ভাবে ফিরিতে লাগিল। কেবল সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীত ও যান-বাহনের শব্দ এবং মানুষের কলরব ছাপাইয়াও বৃদ্ধ ষ্টিফেনের অতিমৃদু কম্পিত কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শোনা যাইতে লাগিল,

"Therefore be ye also ready; for in such an hour as ye think not—the Son of Man cometh…'

এই মহানগরীর জনাকীর্ণ পথ দিয়া এই ধূমমলিন শীতের সন্ধ্যায় মানবপুত্র চলিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে কণ্টকমুকুট; শলাকাবিদ্ধ দুই করতল রক্ত-রঞ্জিত। ফুটপাথের জনারণ্যের ভিতর দিয়া, উজ্জ্বল আলোকমালায় সজ্জিত বিপনিশ্রেণীর সম্মুখ দিয়া, বড় চৌমাথার মোড় অতিক্রম করিয়া তিনি চলিয়াছেন। উৎসবমত্ত জনতা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিল না। কেহই তাঁহাকে চিনিল না। কার্ণিভালের সম্মুখ দিয়া, মার্কেটের ভিতর দিয়া, পানশালার পাশ দিয়া, অতি সাধারণ মানুষের মত ভিড় ঠেলিয়া, মানব-পুত্র গ্যালিলির পথে চলিয়া গেলেন। কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। কারণ, যখন তাঁহার আসিবার সময় হয়, তখন কেহই ভাবিতেও পারে না।

ষ্টিফেনের মাথা ধীরে ধীরে পুস্তকের উপর নত হইয়া পড়িল।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ—দ্বিতীয় খণ্ড। গোবিন্দ-দাসের করচা। শ্রীচারুচন্দ্র শ্রীমানী, বি-ই প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—নীহার এণ্ড কোং। ৯ নং উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

'গোবিন্দদাসের করচা' নামক চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের বিবরণ-বিষয়ক বহুবিবাদাস্পদ গ্রন্থের অসারতা ও কৃত্রিমতা প্রতিপাদনই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার চৈতন্যচরিতামৃত ও করচার বিবরণের বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের বর্ণিত তীর্থস্থানগুলির মধ্যে অনেকগুলির বিবরণের ত্রুটি, অবর্ণিত বহু তীর্থের অসামান্য গৌরবনিবন্ধন তাহাদের উল্লেখ না করার সন্তোষজনক কারণের অভাব এবং গোবিন্দদাস-বিবৃত চৈতন্যদেবের আচরণের সহিত চরিতামৃতোক্ত ও পরম্পরাপ্রসিদ্ধ আচরণের বিরোধ গ্রন্থকার বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার উপস্থাপিত যুক্তিগুলি পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আলোচনা ও বিবেচনা করিয়া দেখিবার মত। তবে তিনি স্থানে স্থানে যে উষ্মা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা এ-জাতীয় গ্রন্থের পক্ষে উপযুক্ত নহে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

শের শাহ্—আবদুল কাদের, বি-এ। ইতিকথা বুক ডিপো, ৩৮ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

কালিকারঞ্জন কানুনগো ও ঈশ্বরীপ্রসাদের গ্রন্থ ও প্রাচীন ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ আশ্রয় করিয়া গ্রন্থকার বাল্য হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত শের শাহের জীবন-কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে সাসারামে শের শাহের সমাধিস্থানের স্থাপত্যের দিক হইতে যতটা আদর হওয়া উচিত ততট হয় নাই। আলোচ্য গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হইবে এবং বাংলা সাহিত্যের এই বিষয়ে অভাব পূরণ করিবে। বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে ইহার স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহার ভাষা ও আলোচনারীতি উভয়ই প্রশংসার যোগ্য। পুস্তকের সঙ্গে একটি মানচিত্র দিলে পাঠকের সঙ্গে বর্ণিত ঘটনা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইত।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সপ্তপর্ণ—শ্রীকিরণশঙ্কর রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹

ছোটগল্পের বই—গল্প শব্দটিকে যদি ব্যাপকভাবে ধরা যায়। দুইটি রূপক এবং পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া আখ্যান আছে। সবগুলিই বেশ সুলিখিত, তবে প্যারাগ্রাফগুলি এক-এক জায়গায় অতি দীর্ঘ করিয়া ফেলায় সেই সেই স্থানে পড়িতে একটু ক্লান্তি বোধ হয়। এই দোষটুকু পরে শোধরাইয়া লইলে ভাল হয়।

দু-এক কথায় মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা করিবার বেশ একটি ক্ষমতা লেখকের আছে। "সাহিত্য-সভা" গল্পটি সম্পূর্ণভাবে হাস্যরসাত্মক। সেখানে সাহিত্যচর্চ্চা ভিন্ন আর সবই হয় এবং অবশেষে সাহিত্যচর্চ্চার একটু সূচনাতেই সভাটির অপমৃত্যু ঘটিল। বেশ ভাল লাগিল গল্পটি। ছাপা, বাঁধাই কাগজ ভাল।

অবন্ধনা—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। প্রকাশক—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত। ৫৭এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹

চারটি ছোটগল্পের বই। লেখকের হাত এখনও বড় কাঁচা। যে-সব ঘটনা দিয়া চরিত্রগুলি ফুটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে সেগুলি প্রায়শঃ অসংলগ্ন, কাজেই চরিত্রগুলি বেশ সুসঙ্গত হয় নাই। গল্পের আখ্যানভাগও বিশেষত্ববর্জ্জিত।

শরৎ বাবুর অনুকরণে কতকগুলি চরিত্রকে খামখেয়ালি করিয়া গড়িবার চেষ্টা আছে। গভীর মনস্তত্ত্বজ্ঞানে এবং সুসমঞ্জস ঘটনাসমন্বয়ে শরৎ বাবুর হাতে এরূপ চরিত্রগুলি সুপরিণত হইয়াছে; লেখককে বেশ ভাল করিয়া তাহা অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

ছাপায় অল্প অল্প দোষ থাকিয়া গিয়াছে। কাগজ, বাঁধাই ভাল।

শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মহামায়া—শ্রীসীতা দেবী। এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ৩৯৯।

বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখিকা নিজের আসন অনেক দিনই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত এই উপন্যাসখানির গল্পাংশের মধ্যে তিনি যে নূতন বিষয়টির অবতারণা করিয়াছেন, এ ধরণের ব্যাপার লইয়া আমাদের দেশে আর কোন বই লেখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নূতন জিনিষের অবতারণা করা অনেক সময়েই লেখকের শক্তি ও সাহসের পরিচয়। কারণ, লেখক মাত্রেই জানেন পাঠককে সব কথা বিশ্বাস করানো যায় না সব সময়। সামান্য কথা বিশ্বাস করাইতেও নানা কৌশলের প্রয়োজন হয়। এ হিসাবে আলোচ্য গল্পটির মধ্যে মায়ার মূর্চ্ছারোগ ও তার ফলে তাহার স্মৃতিবিলোপ এবং পুরাতন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব একটি বোল্ড এক্সপেরিমেণ্ট এবং লেখিকা নিজের শক্তিবলে ঘটনাটি আমাদিগকে বিশ্বাস করাইয়াছেন। আমরা সম্পূর্ণ সহজভাবেই উহা গ্রহণ করি এবং মায়ার অমঙ্গলের আশায় ব্যাকুল হইয়া পড়ি।

সাবিত্রীর চরিত্র অঙ্কনে লেখিকা তাঁহার কৃতিত্বের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ সাবিত্রীকে একেবারে রক্তমাংসের জীব বলিয়া আমাদের মনে হয়। সাবিত্রীর স্বামী নিরঞ্জন বিদেশে গিয়াছে, ইংরেজী পড়িয়া তাহার আচার-ব্যবহার অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে, গোঁড়া হিন্দুর ঘরে প্রতিপালিতা সাবিত্রীর মতের সহিত তাহার খাপ খায় না। নিজের ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত বজায় রাখিতে সাবিত্রী জীবনের সুখ ত্যাগ করিল তবুও স্বামীর মতাবলম্বিনী হইতে পারিল না। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জেদ বজায় রাখিয়াই গেল। সাবিত্রীর ছবি আমাদের মনে যত সহানুভূতির উদ্রেক করে, অপ্রকৃতিস্থা মায়া বা হতাশ প্রেমিক প্রভাসের দুঃখও তত নয়। কন্যা মায়ার বিবাহের জন্য মৃত্যুশয্যায় তাহার প্রাণপণ চেষ্টা এবং ব্যর্থতা সত্যই মর্ম্মস্পর্শী। এই ঘটনার মধ্য দিয়া অভাগিনী পল্লীবধূটির জীবনের ট্র্যাজেডি আমাদের চোখের সামনে এক মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠে। ছোটখাট নারীচরিত্রগুলির মধ্যে জয়ন্তী ও নিস্তারিণী

ঠাকুরাণী অত্যন্ত স্পষ্ট। দেবকুমারের প্রতি মায়ার প্রেমের প্রথম আবির্ভাবের চিত্রে লেখিকা সত্যকার অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছি। নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে এমন কয়েকটি কথা আছে যাহা পাঠককে চিন্তাপ্রণোদিত করে। যে-কোন লেখকের লিপিকুশলতার ইহা যে একটি বড় পরিচয়, একথা না বলিলেও চলে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বরফের দেশ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স লিমিটেড। দাম আট আনা।

ছেলেমেয়েদের বই। এই বইখানিতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অধিবাসীদের বিচিত্র জীবনযাত্রার কথা, সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জীবজন্তুর কথা অতি সহজ ও মনোরম ক'রে বলা হয়েছে। বইখানি শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য। অনেকগুলি ছবি আছে। ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

জানোয়ারের গল্প—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স লিমিটেড। দাম দশ আনা।

জন্তু-জানোয়ারের কথা নিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য এই বইখানি লেখা হয়েছে। এ বইখানিতে বিশেষত্ব কিছু না-থাকলেও এর গল্পগুলি বেশ সুখপাঠ্য—ছেলেমেয়েদের বেশ ভালই লাগবে। ভাষা অত্যন্ত সরল, ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। ছবিগুলিও ভাল।

বার্ষিক শিশুসাথী—দশম বর্ষ, ১৩৪২ সাল। সম্পাদক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী। কলিকাতা ও ঢাকা। মূল্য দেড় টাকা।

ছেলেমেয়েদের উপহার দেওয়ার উপযোগী ক'রে শিশুসাথীর এই বার্ষিক সংস্করণটি প্রতিবৎসর প্রকাশিত হয়। বিষয়বস্তু সব ক্ষেত্রে শিশু-মনের উপযোগী না হ'লেও শিক্ষণীয় বিষয় এতে অনেক থাকে—এবারেও তা আছে। এর ভ্রমণকাহিনী, গল্প, কবিতা, নানা রকমের প্রবন্ধ থেকে ছেলেমেয়েরা প্রচুর আনন্দ পায়। প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠার বই। পাতায় পাতায় ছবি। কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। ছাপা অতি পরিপাটি।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের কথা—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। বালুরঘাট, ১৯৩৫। মূল্য বার আনা, পৃষ্ঠা ৵০+১৬৬।

বিগত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে স্বর্গীয় লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল এস্-পি, সর্ব্বাধিকারী, সি-আই-ই, আই-এম-এস্, এম-ডি মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোর নামে একটি স্বেচ্ছাসেবকের দল গঠন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান। বহু শতাব্দীর পর বাঙালী এই প্রথম সম্মুখসমরে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করে। যদিও যোদ্ধা হিসাবে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ হয় নাই পরন্তু তাহাদের চেয়ে মহত্তর উদ্দেশ্য লইয়া soldiors of morcy হিসাবে তাঁহারা যে সাহস, বীরত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক বাঙালী গৌরব অনুভব করিবে। যুদ্ধক্ষেত্রের সহিত বহু কাল পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও সেখানে তাঁহারা কিরূপ কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা দেশের অনেকেরই জানিবার সুযোগ হয় নাই। এই স্বেচ্ছাসেবকের দল কি অবস্থায় ও কি ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার মহাশয় যথেষ্ট বিনয়ের সহিত তাঁহার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের কার্য্যকলাপের একটি বেশ হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দিয়াছেন। এই বিবরণ পাঠের পর প্রত্যেক বাঙালীর মন বাঙালী জাতির গৌরবময় জীবনের অশ্রুত এই স্বেচ্ছাসেবক-দলের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিবে ইহা নিশ্চিত। আমরা প্রত্যেক বাঙালীকে এই পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

এ সম্বন্ধে একটি কথা শুধু আমরা না-বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। অত্যন্ত বেদনা ও দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আট জন বীর বঙ্গযুবক সুদূর মেসোপোটেমিয়াতে দেশের সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য জীবন দান করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহাদের সহকর্ম্মীরা কয়েক বার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহা কি সত্যই পরিতাপের বিষয় নহে?

স

দৃষ্টি-প্রদীপ—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। প্রকাশক পি. সি. সরকার এণ্ড কোং। মূল্য আড়াই টাকা।

বাংলা সাহিত্যে 'পথের পাঁচালী'র লেখক বিভূতিবাবুর পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বাংলার মানুষ ও বাংলার প্রকৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁহার উপন্যাসগুলির ভিতর দিয়া বাঙালীর মনকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করে। 'দৃষ্টি-প্রদীপ' বইখানি কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্লট লইয়া লিখিত উপন্যাস নয়, নায়কের জীবনের এক সারি চিত্রমালার মত। সেই চিত্রমালার ভিতর নায়ক, জিতুর মা, জ্যাঠাইমা ও সীতার ছবি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে। মাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে—সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা, ক্রূরভাষিণী, হৃদয়হীনা জ্যাঠাইমার ছবি। এই বইখানিতে নারীচরিত্র পুরুষচরিত্রগুলিকে অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে; বইখানি শেষ করিবার পর জিতুর বিকৃতমস্তিষ্ক অসহায় সর্ব্বজনপরিত্যক্ত পিতা ছাড়া আর কোনও পুরুষের কথা বড় মনে আসে না, কিন্তু নারীচরিত্রগুলি মনের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। অথচ তাহারা সাধারণ লেখকদের সৃষ্ট নারীদের মত একই চরিত্রের পুনরাবৃত্তি নয়। মা, সীতা, জ্যাঠাইমা, শৈলদি, ছোট বৌঠাকরুণ, বৌদিদি, মালতী, হিরণ্ময়ী সকলেই একেবারে স্বতন্ত্র চরিত্র। ভিন্ন ভিন্ন নারীচরিত্র যে জিতুর মনে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছায়া ফেলিয়াছে তাহাকে নিপুণ হস্তে ফুটাইয়া তোলা শিল্পীর বহুমুখী দৃষ্টির পরিচয়। এই ছবিগুলির রূপের সাতরঙা রশ্মিপাতে নায়ক জিতুও যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। নাট্যমঞ্চে ইহাদের আবির্ভাবের সহায়তা করিবার জন্যই বইখানিতে তাহার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। অবশ্য তাহার মনের ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব, তাহার তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি, তাহার যাযাবর প্রবৃত্তি ইত্যাদিও বইখানির ভিতর কিছু নূতনত্ব আনিয়াছে। কিন্তু লেখক এই নূতনত্বগুলিকে তাহাদের যথাযোগ্য মূল্য ও স্থান দেন নাই। 'দৃষ্টি-প্রদীপ' নামের সার্থকতা নায়কের তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি হইতে, এবং নায়কের দেশাচার-মুক্ত ধর্ম্মবুদ্ধিও গল্পের একটি বিশেষত্ব। কিন্তু এই দুইটি বিশেষত্বের কোনটিই গল্পটির পরিণতির পথে নায়ককে কোন সাহায্য করে নাই, গল্পটিকে কিংবা নায়কের চরিত্রকে কোন বিশেষ রূপ দান করিতে চেষ্টা করে নাই; তাহারা যেন একসময়ে আকস্মিক ভাবে নায়কের জীবনে আসিয়াছে, আবার আপনি মিলাইয়া গিয়াছে, ইহাতে পাঠককে একটু নিরাশ হইতে হয়। এই ধর্ম্মবুদ্ধি ও এই বিশেষ দৃষ্টি অন্যান্য বর্ণনাদির একটা অঙ্গ মাত্রই হইয়া না দাঁড়াইয়া গল্পটিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারিত।

সমগ্র বইখানির রচনাভঙ্গী সহজ, সুন্দর ও সাবলীল। ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। আধুনিকতাবর্জ্জিত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মালতীর কিছু আধুনিক ধরণের সুমিষ্ট রোমান্সটি মনোরম। তবে নায়কের মালতীকে ফেলিয়া পলায়নের কৈফিয়ৎটা বড় দুর্ব্বল। বইটির বাঁধাই ও চেহারা ভাল, কিন্তু ছাপার ভুল বেশী ও সম্পাদন-কার্য্যে ত্রুটি আছে।

শ্রীশান্তা দেবী

বঙ্গীয় মহাকোষ—ষষ্ঠ সংখ্যা। প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যা আট আনা।

এই মূল্যবান কোষখানি পূর্ব্ববৎ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতাসহকারে লিখিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইতেছে। কাগজ ও মুদ্রণ পূর্ব্ববৎ আছে। আলোচ্য সংখ্যাটিতে "অক্ষর" সম্বন্ধে প্রধান সম্পাদক-মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বাংলা শব্দতত্ত্ব—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য এক টাকা।

ইহা এই বহুমূল্য গ্রন্থখানির পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলা শব্দতত্ত্বের আলোচনা যথেষ্ট হয় নাই। অন্য অনেক বিষয়ের মত এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ পথপ্রদর্শক। এই পুস্তকখানিতে যে-সকল প্রবন্ধ একত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথমটি সন ১২৯৮ সালে অর্থাৎ ৪৪ বৎসর আগেকার লেখা, এবং শেষটি ১৩৪২ সালের ভাদ্রে লেখা। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে নানা দিকে আমাদের জ্ঞান বাড়াইয়া আসিতেছেন।

পুস্তকখানির গোড়ায় তিনি ভূমিকার পর "ভাষার কথা" শীর্ষক যে দীর্ঘ প্রবন্ধটি দিয়াছেন, তাহা যেমন বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, তেমনি সরস।

শিক্ষা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ১।০

আমাদের দেশে অন্য অনেক ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষাবিষয়েও তেমনই পাশ্চাত্যের গতানুগতিক অনুকরণ চলিয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রেও বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা নূতন আলোকপাত করিয়া আসিতেছেন এবং কার্য্যতও নূতন পথ দেখাইয়াছেন।

এই পুস্তকটিতে সঙ্কলিত লেখাগুলির প্রথমটি ৪৩ বৎসর আগে লেখা, সর্ব্বাধুনিক যাহা তাহা বর্ত্তমান বৎসরে লেখা।

শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান কেবল যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আবশ্যক তাহা নহে, প্রত্যেক পিতামাতার ও অন্য অভিভাবকের আবশ্যক, সাংবাদিকদের আবশ্যক, রাষ্ট্রনায়কদের ও পল্লীসংগঠকদের আবশ্যক, এবং—আশ্চর্য্যের বিষয়—শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তাদের ও শিক্ষামন্ত্রীর এবং গবর্মেণ্টেরও আবশ্যক। সুতরাং পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে অন্যতম শিক্ষা-পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথের লিখিত এই পুস্তকখানির পাঠকসংখ্যা হওয়া উচিত খুব বেশী। কিন্তু হইবে কি?

র. চ.

বাংলার কৃষিশিল্প ও পল্লীসংগঠন—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, বি-এসসি (লণ্ডন), এম-এল-সি প্রণীত এবং দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

আমাদের দেশের কৃষি এবং শিল্পের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন অনেকেই, কিন্তু এই আর্থিক অস্বাস্থ্য দূর করিবার জন্য কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা খুব কমই হইয়াছে। এ-বিষয়ে মিত্র-মহাশয় অগ্রণী—'দি রিকভারী প্ল্যান ফর বেঙ্গল' নামক এক বৃহৎ ইংরেজী পুস্তকে তিনি এ-বিষয়ে প্রথম চেষ্টা করেন। এ পুস্তকের বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন ছিল। মূল বইখানির আকৃতি ও মূল্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে বড়ই নিরুৎসাহজনক। সস্তা দামে এই বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করিয়া মিত্র-মহাশয় বাংলার দরিদ্র পাঠককে তাঁহার পরিকল্পনা আলোচনার সুযোগ দিয়াছেন।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমাদের আর্থিক দুরবস্থার পরিমাণ, হেতু ও প্রতিকারের উপায় আলোচিত হইয়াছে। বাংলা দেশের মূল শিল্প ও কৃষির বিষয় বিশদ আলোচনা এবং ধান, পাট ইত্যাদি প্রধান শস্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের বর্ত্তমান অবস্থা ও উন্নতির উপায় সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য তিনি সঙ্কলন করিয়াছেন। ফলের চাষ, সব্জীবাগান, পশুপক্ষী-পালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদি দ্বারা কিরূপে চাষীদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, তাহা হিসাব করিয়া দেখান হইয়াছে, সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি দ্বারা কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা যে সম্ভব তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থকার পল্লীঋণ সমবায়, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কয়েকটি সমস্যা লইয়া আলোচনা এবং কৃষকদিগকে মূলধন যোগাইবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকল স্থানে গ্রন্থকারের মতের সহিত পাঠকের মত হয়ত মিলিবে না, কিন্তু বাংলা দেশের আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা হিসাবে বইখানির বিশেষ মূল্য আছে।

এই বাংলা অনুবাদ সংস্করণের দায়িত্ব শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে তাঁহার রচনায় "তাহারা একদিনও আগে কাজ আরম্ভ করেন নাই" "ক্ষুদ্র কৃষক" "গুরুত্বপূর্ণ শস্য" "বৃহদাকার চালান" "তরুণ মুরগী" "দুগ্ধ-শিল্প" প্রভৃতি ভাষার বিকার দেখিতে পাইবার আশঙ্কা করি নাই।

বইখানির মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন, কাগজ উত্তম।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(২৮)

ফোর্থ ইয়ারের আরম্ভ।

অজয়রা যখন দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় ফিরিল তখন সব কলেজ খুলিয়া গিয়াছে।

দার্জ্জিলিঙে হেমবাবুর আশাতীত উপকার হইয়াছিল। স্বর্ণময়ীর ইচ্ছা ছিল, সকলে আরও কিছুদিন দার্জ্জিলিঙে থাকেন। অজয়ের ইহাতে কোন আপত্তি ছিল না। সে সকালে ব্রেকফাষ্ট খাইয়া বাহির হইত, সারাদিন ঘোড়ায় চড়িয়া বা বন্ধুদের বাড়ি ব্রিজ খেলিয়া, লাঞ্চ বা চা খাইয়া দল বাঁধিয়া পিক্‌নিক করিয়া কাটাইয়া দিত। একটি য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারের এক সুন্দরী তরুণীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা একটু অধিক হইয়া গিয়াছিল।

কলেজ খুলিয়া গেলে উমা অধিক দিন থাকিতে রাজী হইল না। সে বলিল, তোমরা সবাই দার্জ্জিলিঙে থাক, আমি কলেজের বোর্ডিঙে গিয়ে থাকি; অমলাদিরা যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে আমি বেশ যেতে পারব। ইহা লইয়া মাতা ও কন্যায় বোধ হয় একটা বিবাদ হইত। অত্যধিক বৃষ্টি সুরু হওয়াতে বাধ্য হইয়া সকলকে নামিয়া আসিতে হইল।

অজয়দের বাড়ি পৌঁছিতে চন্দ্রা ছুটিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। তাহার গলায় দার্জ্জিলিঙে-কেনা রঙীন কৃত্রিম পাথরের মালা। মালা দোলাইয়া সে বলিল—অরুণদা, দার্জ্জিলিঙে আমরা কেমন 'এন্‌জয়' করলুম, তুমি এলে না কেন?

অরুণ তাহার হাত ধরিয়া বলিল—খুব সুন্দর জায়গা?

চন্দ্রা উচ্ছ্বসিতা হইয়া উঠিল।

—ও চমৎকার, মেঘের রাজ্য, সে বর্ণনা করা যায় না। তোমার জন্য প্রজাপতি এনেছি।

অরুণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—প্রজাপতি?

—হাঁ, এক বাক্স প্রজাপতি, অবশ্য মরা। কি সুন্দর সব রং।

'সুন্দর' কথাটি সে এমন সুর করিয়া টানিয়া বলিল যে অরুণ হাসিয়া উঠিল।

—বা হাসলে যে?

—মরা প্রজাপতি আমি কি করব রে?

—নেবে না? দিদি বললে, তোর অরুণদার জন্যে কিছু নিয়ে যাবি না, তাই কিনলুম।

—নেব, নিশ্চয় নেব।

—বড় বাক্সে ভাল ক'রে বাঁধিয়ে রেখ, খুব সুন্দর দেখাবে।

—দিদি কোথায়?

—দিদি এই কলেজ থেকে ফিরল।

উমাকে দেখিয়া অরুণ বিস্মিত বিমুগ্ধ হইল। এ কোন্ লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি। তরুণী-তনুতে অপরূপ সৌন্দর্য্যচ্ছটা। এ তিন মাসে উমা যেন আরও লম্বা হইয়াছে। মুখখানি ছিল অনতিপক্ক পেয়ারা ফলের মত, সে-মুখ এখন রসভারাক্রান্ত দ্রাক্ষাফলের মত। গণ্ডের পাণ্ডুরতা, চিবুকের শীর্ণতা আর নাই। প্রভাতসূর্য্যের রক্তিম আলোকে শ্বেত তুষারকিরীটি কাঞ্চনজঙ্ঘা যেমন অপূর্ব্ব দ্যুতিময় হইয়া ওঠে, সেই কাঞ্চনদীপ্তি উমার আননে।

—হ্যালো অরুণ, দু-দিন হ'ল এসেছি, আজ মনে পড়ল।

অরুণের ইচ্ছা হইল সে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলে, তুমি স্তব্ধ হও, কি সুন্দর তুমি! তুমি কি অনুভব করছ না, কি সুন্দর তুমি। অন্ধকার রাত্রিশেষে শুভ্র পর্ব্বতলোকে অকলুষা রক্তাম্বরা ঊষার মত তোমার আবির্ভাব।

—কি দেখছ, চিন্‌তে পারছ না আমাকে!

সত্যই এ কোন্ মঞ্জুলা অপরিচিতা, মোহিনী মরীচিকা। বিজন প্রহরে একা বসিয়া উমার কথা ভাবিতে তাহার চোখের সম্মুখে উমার যে রূপ ভাসিয়া উঠিত, তাহার সহিত এ রূপের কত প্রভেদ।

অরুণ হাসিয়া বলিল—ক' পাউণ্ড ওজনে বাড়লে?

—মোটা হয়েছি বুঝি খুব? তুমি যে ওজনে কয়েক পাউণ্ড কমেছ তা দেখতেই পাচ্ছি।

—কল্‌কাতায় আর দার্জ্জিলিঙের 'ফগ' পাই কোথায়

—মা অত ক'রে লিখলেন, একবার ত আসতে পারতে।

—ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না।

—শোন বি-এ-তে কি কি নেব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। আমার ভারি ইচ্ছে বি-এস্‌সি পড়ি, কিন্তু কোথায় পড়ি?

—এসেই পড়ার কথা। অত প'ড়ে কি হবে?

—তাই বইকি! বাবার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। আমি পড়ব।

—মামী কি বলেন?

—মা 'নিউট্রাল'।

—আচ্ছা, আমিও 'নিউট্রাল' রইলুম।

—হুঁ, তোমার কথা কে শোনে! শোন, ইতিহাস খুব শক্ত হবে নাকি?

অরুণের কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। এই লাবণ্যময়ী তরুণীর সহিত কোন তুচ্ছ কথা কহিতে ইচ্ছা করে না।

অরুণ বলিল—দার্জ্জিলিঙের গল্প বল। কি করতে সারাদিন?

—গল্প আর কি। ভাগ্যিস অমলাদিরা গেছলেন। কি সুখে যে লোকেরা দার্জ্জিলিঙ যায়! দিনরাত শীতে হি হি কর, সারাক্ষণ ঝুপঝাপ বিষ্টি, আকাশ ত সারাক্ষণ মুখভার করেই আছেন। একটু রোদ হ'ল, আবার চারি দিক অন্ধকার। তুমি তা হ'লে হিষ্টরি নিতে বল।

উমার কথাবার্ত্তায় অরুণ কেমন ব্যথা বোধ করিতে লাগিল। অরুণের মন যেমন পরিণত, তাহার হৃদয়ে প্রেম সদাজাগ্রত, উমার সেরূপ নয়। সে গম্ভীর হইতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সে এখনও অপরিণতা বালিকা। প্রেমের স্পর্শে কিশোরীর হৃদ্‌পদ্ম মাঝে মাঝে কাঁপিয়া ওঠে, এখনও পাপড়ি মেলিয়া বিকশিত হয় নাই। অরুণ সে-কথা বুঝিতে পারে না। সে ভাবে, উমা নিষ্করুণা। অরুণ কেমন আছে, কি করিয়া ছুটি কাটাইল, কেন এত রোগা হইয়া গিয়াছে, এ-সব কথা উমা একবার জিজ্ঞাসাও করিল না। হৃদয়ের কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিবে না, এটা তাহার পোজ্‌।

অরুণ ধীরে বলিল—মামীমা কোথায়?

—মা, বোধ হয় রান্নাঘরে। আজ আবার চাকরটার হয়েছে জ্বর।

রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া অরুণ স্বর্ণময়ীকে প্রণাম করিল। সাধারণতঃ সে কাহাকেও প্রণাম করে না। কিন্তু আজ অন্তরের উদ্বেলিত আবেগকে এই স্নেহময়ী কল্যাণীর চরণে প্রণামরূপে মুক্তি দিতে চায়।

স্বর্ণময়ী অরুণের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—অরুণ, তোমায় বড় রোগা দেখাচ্ছে বাবা।

অরুণ হাসিয়া বলিল—আমার শরীর যে রোগাই মামী! কিন্তু তোমার শরীর ত তেমন কিছু সারে নি।

—আমার ওখানে গিয়ে বড় সর্দ্দিজ্বর হয়েছিল। চল ওঘরে, আমি দুধটা জ্বাল দিয়েই যাচ্ছি।

—না, এখানেই বেশ বসছি।

অরুণ একটি বেতের মোড়া টানিয়া রান্নাঘরের দরজার নিকট বসিল।

—তোমরা আর কিছুদিন থাকতে পারতে; মামাবাবুর বেশ উপকার হয়েছে মনে হ'ল।

—বড় বর্ষা নামল, তার পর সবার কলেজ খুলে গেল।

—এখানেও বর্ষা বড় কম নয়।

—আবার বুঝি বৃষ্টি এল, দরজাটা ভেজিয়ে দাও।

উনান হইতে দুধ নামাইয়া স্বর্ণময়ী ডাল চাপাইলেন। নানা কুশল-প্রশ্ন, পারিবারিক সংবাদ জিজ্ঞাসার পর স্বর্ণময়ী অরুণের একটু কাছে বসিয়া বলিলেন—শোন বাবা, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে চাই।

—কি, উমা বি-এ পড়বে কি না?

—না। ও মেয়ে বি-এ পড়ুক। সে কথা বলছি না। কথাটা শুনে তুমি অবাক হবে, আমার খুব মত নয়। কিন্তু ওঁর বড় ইচ্ছা, অজয়ের শীগগির বিয়ে দেন।

—অজয়ের?

—হাঁ। এখন নয়, বি-এস্‌সিটা পাস করুক, তার পর। ওঁর শরীর দেখছ ত। উনি বলছেন, শীতকালটায় কাজে একবার 'জয়েন' করবেন, দিল্লীতে বড়সাহেবদের সঙ্গে একবার দেখাশোনা করা দরকার। তার পর অজয় পাস করলে একটা কাজে ঢুকিয়ে দেবেন।

—অজয় কি বলে?

—নেহাৎ অনিচ্ছুক নয়। উনি বলছেন, আমার অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে হওয়া ভাল। ওঁর শরীরও ত দেখছ বাবা, বেশী দিন কাজ

পারবেন না। একবার নামমাত্র 'জয়েন' ক'রে তার পর যা-হয় পেনসনের ব্যবস্থা করতে হবে। অজয়ের শীগগির রোজগারে হওয়া দরকার।

—তা অজয় আগে পাসটা করুক; এত তাড়াতাড়ি কি। দার্জ্জিলিঙে কিছু ঘটেছে নাকি?

—সে আর ব'ল না। এক ফিরিঙ্গি মেয়ের সঙ্গে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিল। উনি বললেন, ওটা যৌবনের চঞ্চলতা, তোমার ছেলের এবার শীগ্‌গির বিয়ে দাও। তাই ভাবছি।

—তা বেশ ত।

—আর ওর যখন এক জায়গায় বিশেষ ইচ্ছে মনে হচ্ছে।

—তাই নাকি? কে?

—আচ্ছা, প্রতিমার বিষয় ও তোমায় কিছু বলে নি।

—প্রতিমার—না।

—আমাদের ইচ্ছা, প্রতিমার সঙ্গেই ওর বিয়ে দি।

প্রস্তাবটি শুনিয়া অরুণ স্তব্ধ হইয়া বসিল। স্বর্ণময়ী ভাবিয়াছিলেন, অরুণ অতি আনন্দের সহিত এ প্রস্তাব সমর্থন করিবে। তিনি একটু লজ্জিত ভাবে বলিলেন—আমার মনে হয় অজয় ওকে ভালবাসে।

কথাটা শুনিয়া অরুণ চমকিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য! অজয় প্রতিমাকে ভালবাসে, এ-কথা সে কোনদিন ভাবে নাই। সত্যই কি অজয় প্রতিমাকে ভালবাসে?

আর প্রতিমা? প্রতিমা এখন শিশু, ও ভালবাসার কি জানে? অজয়ই বা ভালবাসার কি জানে?

স্বর্ণময়ী ধীরে বলিলেন—ও নিয়ে আর ভেবো না বাবা। আমার মনের ইচ্ছা তোমায় বললুম। তবে এখন ও প্রস্তাব কারুর সঙ্গে আলোচনা ক'রে দরকার নেই। অজয় আগে পাস করুক। এমনই ত পড়ায় যা মন।

অরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল। আবেগের সহিত সে বলিল—না মামী, তুমি ঠিক বলেছ। অজয়ের সঙ্গে প্রতিমার—বেশ হবে, খুব ভাল হবে—বা, আমি এত দিন ভাবি নি, আশ্চয্যি, এদিকে ঠাকুমা ত প্রতিমার বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে গেলেন। ওর শীগ্‌গির বিয়ে দেওয়া দরকার, আর কি, ষোল হ'ল, ওর পড়াশোনায় মন নেই, আর কি হবে প'ড়ে। কাকাকে একবার বলতে হবে।

—না বাবা, এখন কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। অজয় পাসটা করুক।

—তুমি যা বল।

—প্রতিমার মনটাও একবার জানা দরকার।

—ওর আবার মন?

—না, না, তার ইচ্ছেটা জানা দরকার বইকি।

—অজয়ের প্রতি তার টান আছে।

স্বর্ণময়ী রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অরুণ আবার মোড়ায় বসিয়া উনানের আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল।

অজয়ের সহিত প্রতিমার বিবাহ! তাহার বুকটা কেমন খচ্‌ করিয়া উঠিল। সে অনুভব করিল, প্রতিমাকে সে কি গভীরভাবে ভালবাসে। অজয় কি প্রতিমাকে সুখে রাখিতে পারিবে? প্রতিমা যা আব্‌দারে, যা একগুঁয়ে, সংসারে অনভিজ্ঞা শিশু সে। দু-জনেই কি সরল প্রকৃতির। প্রতিমা মামীর স্নেহ পাইবে। বেশ হইবে।

নানা দিনের তুচ্ছ ঘটনা সব অরুণের মনে পড়িতে লাগিল। আশ্চর্য্য! সে নিজের প্রেমবেদনায় এত নিমগ্ন যে তাহার চক্ষের সম্মুখে দুইটি সরল তরুণ-তরুণীর সহজ কৌতুকভরা প্রেমলীলা চলিতেছে তাহা সে লক্ষ্যই করে নাই। একদিন টুলি বলিয়াছিল বটে, দাদা দেখ, তোমার বন্ধু চিঠি লিখেছেন দার্জ্জিলিং থেকে। চিঠিখানা অরুণ চাহিয়া পড়েও নাই। আজ সকালে টুলির গলায় একটি রঙীন পাথরের মালা ছিল। টুলি বলিয়াছিল, মালাটা বড় সুন্দর, নয়! মালাটি কোথা হইতে আসিল, সে-সম্বন্ধে অরুণ কোন প্রশ্ন করে নাই।

অরুণের মনে পড়িল, টুলি প্রায়ই বলিত বটে, দাদা তোমার বন্ধু এসেছিলেন, বাবা! আমার গান না শুনলে যেন তাঁর রাতে ঘুম হয় না। অরুণ যখন বাড়ি থাকিত না, ঠিক সেই সময়টি নির্ব্বাচন করিয়া অজয় কেন প্রায়ই অরুণের বাড়ি যাইত, কারণটি তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

তাহার মা-হারা একটি বোন। কিন্তু, একদিন ত টুলির বিবাহ দিতে হইবে। মামীমার মত শাশুড়ী সে কোথায় পাইবে?

অরুণ আপন মনে বলিয়া উঠিল—মামী, তুমি টুলিকে—, বলিয়া সে থামিয়া গেল। অরুণ বলিতে চাহিতেছিল, তুমি টুলিকে খুব ভালবাসবে মামী।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ব্যাকুলা শ্রীএস্ সেন রায়

রান্নার শব্দে স্বর্ণময়ী অরুণের কোন কথা শুনিতে পান নাই। তিনি বলিলেন—কি বলছ অরুণ?

—বিশেষ কিছু না।

—কি একটা বলছিলে।

—উমা তাহ'লে বি-এ পড়বে?

—হাঁ। ওঁর কিন্তু বড় অমত। ও মেয়ে ত কলেজে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। আমাদের আবার পূজোর পর চলেই যেতে হবে হয়ত।

—তোমরা কি শীগ্‌গির দিল্লীতে যাবে।

—ওঁর শীতকালে গিয়ে আপিসে 'জয়েন' করবার ইচ্ছে।

অরুণ স্বর্ণময়ীর মুখের দিকে চাহিল। রেখাঙ্কিত ললাটে কুঞ্চিত গণ্ডে উনানের আগুনের আভা ঝিকিমিকি করিতেছে। যৌবনে যে তিনি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। দুই চক্ষে কি স্নেহময় দৃষ্টি।

স্বর্ণময়ী ধীরে বলিলেন—তুমি কি ভাবছ বুঝেছি, অরুণ। অজয়ের আগে উমার বিয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু ওকে কিছুতেই মত করাতে পারলুম না। উনি বি-এ পড়বেন, ওঁর অমলাদিদির মত মাষ্টার হবেন বোধ হয়, স্বাধীন হবেন—ওর ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে তোমায় ব'লে দিলুম।

—কি যে বলছ মামী।

স্বর্ণময়ী অরুণের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ ছলছল করিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন—দেখ অরুণ, তোমার মা নেই। মায়ের স্থান কেউ পূর্ণ করতে পারে না। তবু, তোমাকে আমি কত স্নেহ করি, তুমি জান। আমরা মেয়েমানুষ পরাধীন, আমাদের সাধ পূর্ণ হয়না।

স্বর্ণময়ীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। চোখ মুছিয়া তিনি রান্নার কাজে মন দিলেন।

অরুণ ধীরে বলিল—মামী, তুমি কোন দুঃখ ক'রো না, তুমি আমায় কত স্নেহ কর জানি।

অরুণের দুই গণ্ড আগুনের আভায় আতপ্ত হইয়া উঠিল। রান্নাঘর বড় গরম বোধ হইতে লাগিল। চুপ [illegible]া সে প্রজ্বলিত উনানের দিকে চাহিয়া রহিল। উনানের শিক হইতে অঙ্গার নীচে খসিয়া পড়িতে লাগিল।

টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষারাত্রির আকাশ নিকষ-কৃষ্ণ। রুদ্ধ ক্রন্দনের মত আর্দ্রবাতাস গুমরিয়া উঠিতেছে।

অরুণ অজয়দের বাড়ি হইতে বাহির হইল। ভিজিতে ভিজিতে সে জোরে চলিল। বাড়ি ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। ইচ্ছা হইল, অবিরাম, শ্রান্তিহীন পথে চলে; এ পথ-চলার যেন শেষ না হয়।

গলি পার হইয়া সে বড়রাস্তায় আসিয়া পড়িল। বারিসিক্ত পথ আলোয় ঝিকিমিকি করিতেছে। দোকানে দোকানে আলোকের ঝলমলানি। চারি দিকের সজল অন্ধকার-যবনিকা মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের অগ্নিরেখায় কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই পথের জনস্রোত, আলো-অন্ধকারের ধারা অলীক মায়া, অবাস্তব। কোন মায়াবিনীর সৃষ্টি।

জোরে সে চলিতে লাগিল। ছুটিতে ইচ্ছা হইল। এক চলন্ত ট্রামে সে লাফাইয়া উঠিল। ট্রামের সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া জানলার শার্সী ফেলিয়া দিল। আর্দ্র বাতাসে তপ্ত ললাট শীতল হইল।

পথের দিকে সে চাহিয়া রহিল। ট্রাম-লাইনের লৌহদণ্ড, কালো পাথরগুলি আলোয় ঝিকিমিকি করিতেছে।

ট্রাম-ডিপো হইতে অরুণ অজানা অন্ধকার পথে চলিল। দুরন্ত বাসনার মত কোন্ অদম্য গতিশক্তি তাহাকে কেবল সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। দিশাহারা হইয়া সে ভিজিতে ভিজিতে চলিল।

প্রান্তর-ভরা অন্ধকার তরুণী পৃথিবীর আদিম রহস্যের মত। দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী যেন নিদ্রিত দৈত্যপুরীর স্তব্ধ প্রহরীর দল।

অরুণ একটি বৃক্ষের তলায় বসিল। ধীরে সে ভাবিতে চেষ্টা করিল। নানা চিন্তার খণ্ডিত সূত্রগুলিতে মাথায় একটা অদ্ভুত জট পড়িয়া গিয়াছে।

হাঁ, অজয়ের সহিত প্রতিমার বিবাহ দিলে প্রতিমা হয়ত সুখীই হইবে। দুই জনেই শিশুপ্রকৃতির। ঝগড়া হইলেও শীঘ্রই আবার ভাব হইবে। প্রতিমাকে অজয় দুঃখ দিতে পারিবে না।

জীবন কি কেবলমাত্র সুখের জন্য, দুঃখের জন্য নয়? যে গভীর দুঃখ পাইল না, সে জীবনের রহস্য জানিল কি? নারী পুরুষকে জীবনের যে-পথে আহ্বান করে সে ত নিছক

সুখের পথ নয়। জীবনের অনাস্বাদিত আনন্দরস পান করিতে হইবে।

উমা কি ভাবে?

উমার কথা ভাবিতে গিয়া অরুণের চিন্তার সূত্র বার-বার ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল।

আপন মনে সে হাসিয়া উঠিল। আকাশভরা অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

অরুণ চমকিয়া উঠিল। এক কালো ছায়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অবগুণ্ঠিতা নারীর মত।

বলিল—অরুণ তোমাকে আমি করুণা করি।

অরুণ তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল—করুণা? তোমার করুণা কে চায়, কে তুমি?

—আমি তোমার হৃদয়শতদলবাসিনী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

—তুমি মায়াবিনী, মানি না তোমাকে। আমি মানি আমার আত্মাকে ও মানবাত্মাকে।

—তোমার ভাগ্যে অশেষ দুঃখ দেখছি।

—দুঃখকে আমি ভয় করি না। আমার আত্মা বীর পথিক।

—তুমি আমার পূজা কর।

—তুমি অলীক মায়া, দুর্ব্বল ভীরুতা, কালো ছায়া আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। জীবনকে আমি বরণ করেছি, জীবনের সকল আনন্দ সকল বেদনাকে গ্রহণ করলুম। তোমার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করব।

আবেগের সহিত অরুণ দাঁড়াইয়া উঠিল। সে ছায়া-মূর্ত্তিও দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল। দেবদারু বৃক্ষগুলির শীর্ষ ছাড়াইয়া অনন্ত আকাশের অন্ধকারে তাহার বিরাট দেহ ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গেল।

এ-কি অপরূপ বিশ্বব্যাপিনী নারীমূর্ত্তি! নিবিড় তিমির প্রসারিণী ঘনকৃষ্ণকুন্তলরাশি অনন্তগগনে পরিব্যাপ্ত; কেশ-দামে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত তারকার মালা; দীপ্ত নয়নে বিদ্যুদ্দাম ঝলসিয়া নৃত্য করিতেছে; বজ্রগর্জ্জনে রুদ্র-ঝঞ্ঝায় তাহার অট্টহাস্য; সে হাস্যে সৃষ্টি বুঝি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

জীবধাত্রী পৃথিবী তাহার পদতল; সপ্তলোক তাহার বিরাট দেহ; ভূলোক ভুবর্লোকে পরিব্যাপ্তা শক্তিরূপিণী। অগ্নি তাহার চক্ষু, অন্ধকার তাহার ছায়া, তাহার দক্ষিণ করের স্পর্শে জীবন, বামহস্তের স্পর্শে মৃত্যু, এই মায়া-সৌন্দর্য্য তাহার হাস্য, মহাকাল তাহার গতি।

অরুণের মাথা নত হইয়া আসিল। নিস্তরঙ্গ শান্ত সমুদ্রের মত হৃদয় স্থির হইল।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ধীর স্নিগ্ধ বাতাস। পূর্ব্বপ্রান্তে বৃক্ষরাজির পুঞ্জীভূত অন্ধকারের উপর চন্দ্রোদয় হইল। অতি-স্নিগ্ধ তাহার আভা, অশ্রুসজল হাস্যের মত।

নিস্তব্ধ গভীর প্রকৃতির কি অপরূপ লাবণ্যমূর্ত্তি! এমন শোভা অরুণ জীবনে কখনও দেখে নাই।

রহস্যঘন দুঃখসঙ্কুল অন্ধকার পথ, তোমাকে আমি ভয় করি না। সুকল্যাণী সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর আনন্দ-হাস্য আমার জীবনের পাথেয়।

(২৯)

প্রথম যৌবনের প্রেম জীবনের মর্ম্মস্থলে নাড়া দেয়। সে প্রেম যদি সহজভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে তাহা হইলে জীবন সরল সুখে ভরিয়া যায়।

কিন্তু সে প্রেম যদি বাধা পায়, ঘূর্ণাবর্ত্ত রচনা করে, তবে তাহার অন্তঃশীলা দুর্নিবার স্রোতে অভাবনীয় ভাঙাগড়ার লীলা আরম্ভ হয়, পদ্মার স্রোত যেমন এক কূল ভাঙিয়া নূতন তীর গড়িয়া তোলে।

প্রেমিকের চির-আন্দোলিত অন্তরে শান্তি নাই। অপূর্ব্ব পুলক, অসহনীয় বেদনা। বিশেষতঃ প্রেমিক যখন কল্পনাবিলাসী আদর্শবাদী যুবক হয়, সে প্রেমাস্পদকে লাভ করিতে চায় না, সে চায় গভীর আত্মোপলব্ধি, আত্মোৎসর্গ করিতে।

কখনও প্রেমের কেন্দ্রাভিগ শক্তিতে সে আত্মস্থ হয়, বিজন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে একাকী সাধকের মত সে গভীর আনন্দে মগ্ন হয়। কখনও প্রেমের কেন্দ্রাতিগ শক্তি তাহাকে ব্যথিত উদাসী করিয়া তোলে, পৃথিবীর সকল দুঃখীর সহিত সমবেদনায় অন্তর ভরিয়া ওঠে, সকল অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করে।

অন্ধভক্ত যেমন দেবীমূর্ত্তির পিছনে দেবীকে ভুলিয়া বিগ্রহ লইয়া মাতিয়া ওঠে তেমনই প্রেমিক প্রেমাস্পদাকে লাভ করিবার কথা ভুলিয়া যায়, প্রেমাস্পদা তাহার নিকট প্রতীক মাত্র।

(ক্রমশঃ)

বর্ত্তমান জীবন-সমস্যার ভারতীয় মীমাংসা

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ শর্ম্মা

মানুষ যেদিন তাহার জীবনের মহত্ত্বকে আবিষ্কার করিয়া তাহারই চির-বন্ধুর সাধনপথে প্রথম পদার্পণ করিল, সেই-দিনই হইল সভ্যতার জন্মদিন। সভ্যতার স্বর্ণ-উষার উজ্জ্বল আলোকে, বিপুল পুলকে মাতিয়া যে মহান্ যাত্রীদল অমৃতের সন্ধানে প্রথম এই মৃত্যুময় সংসারকে অতিক্রম করিয়া চলিল, তাহারাই হইল সভ্যতার প্রবর্ত্তক বা অগ্রদূত। অনন্ত অসীম অজানাকে জানিবার, অচেনাকে চিনিবার মানব-মনের যে অদম্য আগ্রহ—তাহাই ছিল সেই স্বেচ্ছায় গৃহহারা দলের একমাত্র পাথেয়।

তাঁহাদের পায়ে পায়ে যে পথ রচিত হইল, তাহাই হইল মনুষ্যত্বের সনাতন পন্থা। তাঁহাদের বাণীই মানবতার বোধন-গায়ত্রী। চির-বিঘ্ন-মণ্ডিত এই মহত্ত্বের পথ। অথচ জাগ্রত মানবতার পক্ষে আকর্ষণ তার অলঙ্ঘনীয়। বুকে অগ্নিপ্লাবন বহিয়া ভীষণ ভৈরব জ্বালার জয়গান গাহিতে গাহিতে যুগে যুগে মানবসন্তান চলিয়াছে এই মহিমারই কণ্টকিত পথে। ইতিহাস এই বেদনাময়ী গতিজ্বালার স্মৃতি বহনে ধন্য, কাব্য ও শিল্পের ইহাই প্রাণবস্তু, দর্শন বিজ্ঞান এই গতিতত্ত্ব-বিশ্লেষণেই সার্থক। বাহিরে উদ্বেলিত সংসার-সমুদ্রের প্রলয়কল্লোলে এই গতিশীল আর্য্যদের ভয়বিবর্জ্জিত গতিবেগ কিছুমাত্র সংযত হয় নাই। বস্তুজগতের কোন বাধা না মানিয়া বাহিরের সকল সঞ্চয় দুই হাতে ক্ষয় করিতে করিতে সেই অধৃষ্য পথিকের দল পথের আনন্দবেগে চলিয়াছে অন্তর পূর্ণ করিয়া। অবশেষে একদিন পথের শেষে এই ব্যথার মধ্য হইতেই আপনার আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যকে সম্যকরূপে আবিষ্কার করিয়াই তাঁহারা ধন্য ও স্বরাট্ হইয়াছে। মহিমার সেই দিব্যানন্দ সাধককে আর ফিরিতে দেয় নাই এই ক্ষুদ্রতার জগতে, লইয়া গিয়াছে তাঁহাকে তুচ্ছ সাংসারিক লাভক্ষতির সতর্ক হিসাব-নিকাশের বহু ঊর্দ্ধে, অক্ষয়, অব্যয়, শাশ্বত অমৃতলোকে, আনন্দ হইতে আনন্দে, উৎসব হইতে উৎসবে।

সেদিন মানুষ শ্রমিক নয়, বণিক নয়, শাসক নয়, শাসিত নয়, প্রবৃত্তিমার্গের সেদিন সে আর কেহই নয়; সেদিন সে অকামহত শর্ম্মণ বা নিষ্কাম ব্রাহ্মণ। সেদিন প্রদানেই তার আনন্দ, আদানের কথা সে ভুলিয়া যায়। সেই মহামানবের চরণস্পর্শে ধরণীর ধূলি নিজের মলিনতা ভুলিয়া যায়, স্বর্গ পৃথিবীতে নামিয়া আসে। মানবসমাজ তাঁহার চরণে চিরপ্রণত। এই ধন্যতাই সভ্যতার লক্ষ্য, মনুষ্যত্বের ভিত্তি। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিঘ্নদলন ও পদে পদে আত্ম-শাসনই আর্য্যের জীবন। এ-পথের যাহা ক্ষয় ও লজ্জা, সুসভ্য মানবের তাহাই সঞ্চয় ও সজ্জা। এই বেদনার তীর্থযাত্রায় অপ্রস্তুত যে, ক্ষুদ্রাশয় অনার্য্য সে। সভ্যতার দাবি তার পক্ষে নিরর্থক। তুষার-ধবল শৈল-শিখরে, মরুভূর ধূ-ধূ-ধূ বালুকা বিস্তারে, উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রবক্ষে, নিভৃত পল্লীর বনান্তরালে যে মহতো মহীয়ান্ পুরুষের মহিমা-জ্যোতির নিত্যবিকাশ, স্বরূপতঃ মানুষ তাঁহারই উপাসক।

সভ্যতার উন্নতি-অবনতি অর্থে মানুষের বিত্ত-সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি নহে, চিত্ত-সম্পদের প্রকাশ। যে-সভ্যতার অধীনে মনুষ্য-জীবনের দায়িত্ব ও মহত্ত্ব বোধ যত প্রখরতা লাভ করিয়াছে, সেই সভ্যতা তত গরীয়সী। যেখানে উহার অভাব সেখানে সভ্যতার গৌরব নাই একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

ভাব ও বস্তুর সমাহারেই মনুষ্যজীবনের স্বাস্থ্য ও পূর্ণতা। তবে জীবনের সম্প্রসারণের জন্য উহার বাস্তব দিকটা ভাবানুগ হওয়া অত্যাবশ্যক। অতি-বাস্তবতার ফলে বর্ত্তমান সভ্যতার অধীনে মনুষ্যত্বের দৈন্য আজ সকল দিক্ দিয়াই স্ফুটতর হইয়া পড়িয়াছে। আজ আর এই অভিব্যক্ত দৈন্যকে কোনক্রমেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেখানে যত জোরে ইহাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা হইতেছে, সেখানে ততোধিক শক্তিতে ইহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্যের সন্নিপাতে মনের প্রকৃতিতে যে মহাবিকার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রভাবে মানবহৃদয়ের মঙ্গলময়ী বৃত্তিগুলি একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়ায়ই সর্ব্বত্র পশুত্বের জাগরণ সম্ভব হইয়াছে।

বিষয়ের ধূলিজালে মানবতার মহিমাজ্যোতিঃ ক্রমশ ম্লানতর হইয়া যাইতেছে। বস্তু-স্তূপের নীচে পীড়িত মানবাত্মার ক্ষীণ আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছে। সে আর্ত্তনাদ শুনিবার

মত কান ও বুঝিবার মত প্রাণ আজ মানবসমাজে বিরল। বস্তুপ্রাধান্যে ভাবের ক্ষীণতা-নিবন্ধন এই গর্ব্বিত সভ্যতার সকল বিভাগেই দেখা দিয়াছে লজ্জাকর কুণ্ঠা বা কার্পণ্য। এই কার্পণ্য মনুষ্যত্বের গ্লানি বা পতনের পথ। ইহাই মাদকতাময় প্রেয়োমার্গ। এই পথ বাহিয়াই অতীতের সুসভ্য জাতিনিচয় একে একে অবনতির অন্ধকার গহ্বরে নামিয়া গিয়াছে। এই কাঞ্চন-কৌলীন্যের যুগে মনুষ্যমহিমা সম্পূর্ণরূপে অর্থগত হওয়ায়, ধন অর্জ্জন ও অর্জ্জিত অর্থের বর্দ্ধন ও রক্ষণ চেষ্টায়ই মানুষের সমস্ত শক্তি পর্য্যবসিত হইয়াছে। বহির্জ্জগৎ-জয়ের প্রচেষ্টায় অবাধে মনুষ্যত্বের অপচয় চলিতেছে। সর্ব্বশক্তিমান স্বর্ণমুদ্রার মর্য্যাদা বাড়াইয়া মানুষ নিজের মর্য্যাদাকে শোচনীয় রূপে ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিতেছে। Nothing is unfair in war ইহাই বিংশ শতাব্দীর জীবন-সংগ্রামের একমাত্র নীতি। এই দুষ্ট নীতি বস্তুসম্পদের দিক দিয়া মানুষকে যে-পরিমাণে সম্পন্ন করিয়াছে, প্রাণ-সম্পদের দিক দিয়া ততোধিক পরিমাণে নিঃস্ব করিয়াছে। মানুষের অন্তরের মণিকোঠায় মহিমার যে মঙ্গলপ্রদীপ বিধাতা স্বহস্তে জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, তৈলাভাবে তাহা আজ নির্ব্বাপিত প্রায়। কীর্ত্তিহীন সিদ্ধির জন্য বিশ্বময় অভিচার-যজ্ঞ চলিতেছে। বৈষয়িক সিদ্ধি চাই, তাতে মনুষ্যত্ব থাকুক বা যা'ক তাহাতে কিছু যায়-আসে না; ইহাই আজিকার সিদ্ধিসেবী মানুষের প্রাণের বাণী। *ন্যায়, ধর্ম্ম, নীতি, মনুষ্যত্ব—সবার উপরে আজিকার সভ্যতায় প্রয়োজনের বিজয়পতাকা উড়িতেছে। ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে সর্ব্বত্র এক কথা, এক ধ্বনি, প্রয়োজন—প্রয়োজন—প্রয়োজন। এই প্রয়োজন অন্ধ, সে মানে না কোন বিবেচনা। কারণ যত-কিছু বিবেচনা সব তার পক্ষে মহাবিড়ম্বনা।*

বর্ত্তমান সভ্যতার যে কেন্দ্রস্থল হইতে এই মনুষ্যত্ব-বিধ্বংসী 'প্রয়োজনবাদ' প্রচারিত হইয়াছে, সেই খ্রীষ্টান ইউরোপের ধর্ম্মগুরুই একদিন বাহিরের প্রয়োজনভারে নিজেকে পীড়িত বোধ করিয়া কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,

'হে প্রভো, আমার অভাবসমূহ হইতে আমায় রক্ষা কর।' প্রয়োজন এই অভাবেরই নামান্তর।

দুর্লভ মনুষ্যত্বের বিনিময়ে ছলে, বলে, কৌশলে বিশ্বজগৎ শোষণ করিয়া যাহারা মেদ-রোগীর ন্যায় দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরই পরিত্রাতার আদেশ, 'তোমার সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া তবে আমার অনুসরণ কর।' বর্ত্তমান সভ্যতা চরিত্র চায় না, চায় দক্ষতা। পাশ্চাত্য মনীষা আজিকার এই অভাবাত্মিকা দক্ষতা ও অর্থগৃধ্নুতার প্রভাব সম্বন্ধে সখেদে বলিয়াছেন, For efficiency we have neglected character, for the almighty dollar we are destroying men। সভ্যতার প্রথম উন্মেষের সময় হইতে যে সমস্ত পবিত্র ভাবকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্যত্ব ক্রমপরিণতি লাভ করিয়াছে, এই অশিব দক্ষতার দুর্ব্বিনীত গর্ব্বে তৎসমুদয়ই আজ অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত। জীবনদর্শনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও বহু অভিজ্ঞতায় জীবনের যে-সব মহান্ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, প্রগতির নামে আজ তাহা নির্ভরের অযোগ্য কুসংস্কাররূপে পরিত্যক্ত। এই চঞ্চল মুখর সভ্যতার বিভিন্ন বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, উহার প্রবল স্রোতে ভাঁটা ধরিয়াছে। ইহার উদ্ভ্রান্ত গতিবেগ মন্দীভূত, সকল চাঞ্চল্য প্রতিক্রিয়া-মুখে অবসাদে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সূচনায় ইহার চতুর্দ্দিকে যে অপূর্ব্ব আলোকসজ্জা দেখা গিয়াছিল, একে একে সেই দীপালোকমালা নিবিয়া আসিতেছে। সকল দিক হইতে নিরাশার অন্ধকার ও মৃত্যুর বিভীষিকা ইহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছে। লোভের সারথ্যে, কাম ও ক্রোধ রূপ অশ্বদ্বয়-বাহিত এই জড়বাদী সভ্যতার বিজয়রথ মানবতাকে দলিত মথিত করিয়া বিকট রবে অন্ধ আবেগে বিশ্বের বুকে অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে। পীড়িত মানবতার অভিশাপে চির অভিশপ্ত, এই রথ-চক্রের অচিরে ধরণীগ্রস্ততার সম্ভাবনাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জীবনযাত্রার যথার্থ প্রণালী ও পবিত্র লক্ষ্য, এই উভয়ই শোচনীয়রূপে আজ বিপর্য্যস্ত। নির্লজ্জ ভোগ-প্রবণতার ফলে, মনুষ্যজীবনের সকল মাধুর্য্য ও সামঞ্জস্য অন্তর্হিত।

পারস্পরিক স্বার্থসংঘাতে মানবসমাজ আজ উন্মাদ ও বিচ্ছিন্ন। এই উন্মত্ততা ও বিভক্তির রন্ধ্রপথেই অনবরত প্রবেশ করিতেছে মৃত্যুর বিষবীজ।

Possessive instinct বা স্বাধিকার-মত্ততা, বর্ত্তমানের সভ্যতাভিমানী মানবকে অতিক্রান্ত যুক্তি হইতে শক্তিতে এবং সভ্যতা হইতে বর্ব্বরতায় ফিরাইয়া আনিতেছে। অরণ্যচর বর্ব্বরের সহিত সাধারণতঃ বর্ত্তমানের সভ্যমানবের পার্থক্যমাত্র

ছদ্মবেশ ও তুচ্ছ বহিরাচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে এই সামান্য বাহ্যিক বৈষম্য লোপ পাইতেও খুব বিলম্বের কারণ দেখা যায় না। মহাশ্মশানের গলিত শবলোলুপ ইতর প্রাণীর ন্যায় ভোগের উপাদান লইয়া বিশ্বের বুকে মানুষ কাড়াকাড়ি জুড়িয়া দিয়াছে। স্বগাত্ররুধিরমিশ্রিত শুষ্কঅস্থিখণ্ডচর্ব্বণনিরত আত্মতুষ্ট শৃগাল-কুকুরের ন্যায় মানুষ আজ নিজের শোণিত ঢালিয়া এখানে অপরের অস্থিচর্ব্বণে তৃপ্তিলাভ করিতেছে। দেহ আজ আত্মার সমাধিতে পরিণত, চৈতন্য জড়ের জঞ্জালে আচ্ছন্ন, ভাব বস্তুর চাপে স্তম্ভিত, মানুষের বিবেক পশুত্বের অনবরত আঘাতে অনন্ত মূর্চ্ছায় অভিভূত, ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রয়োজনে বৃহত্তর স্বার্থ উপেক্ষিত। এক কথায় হিংস্রপ্রবৃত্তি সঙ্কুল দেহ-সমুদ্রে আজ মানবাত্মা মোহনিদ্রামগ্ন। অন্তরের জঘন্য দৈন্য ঢাকিবার জন্য এ যুগের চিত্তহীন বিত্তশালীর দল বাহিরে বিচিত্র আড়ম্বর-আয়োজনের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সভ্যতার বাহিরে বিপুল চাঞ্চল্য, অন্তরে ভীষণ পক্ষাঘাত।

প্রাচ্যের মহাকবি এই সব প্রাণহীন আড়ম্বরকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন, 'সজ্জা যত লজ্জা ভরা চিত্ত যেথা নাই।' বাহিরের এই সব অনাবশ্যক বাহুল্য হইতে মুক্ত করিয়া শুধু মনুষ্যত্বের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে এ যুগের মনুষ্যত্ব দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে।

অখণ্ড মানবতার সেবক মহাপ্রেমিক ম্যাক্সিম গর্কি, বিশ্বব্যাপী ঘৃণা ও উত্তেজনার মধ্যেও যিনি অকম্পিত হস্তে লিখিতে পারিয়াছেন—Love is the mother of life, not hate, তিনি সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বর্ত্তমান মনুষ্যত্বের শোচনীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,

"All hearts are smitten in the conflict of interests, all are consumed with a blind greed, eaten up with envy, stricken, wounded and dripping filth, falsehood and cowardice. All people are sick, they are afraid to live, they wander about as in a mist. Everyone feels only his own toothache."

বর্ত্তমান সভ্যতার লক্ষ্য—সকলকে অতিক্রমপূর্ব্বক উন্নতি। পর্ব্বতশৃঙ্গ যেমন স্পর্দ্ধিত উন্নতির মধ্যে ক্রমসংকীর্ণতা লাভ করে, ইহার উন্নতির গতিও তেমন ক্রমাগত সংকীর্ণতার দিকেই চলিয়াছে। প্রাচীন সভ্যতাসমূহের আদর্শ ছিল বিস্তৃতি, তাই তাহাদের মধ্যে ছিল সকলের স্বীকৃতি, যথেষ্ট প্রেম ও বিনতি। প্রাচীন সভ্যতা ছিল সমাজ-প্রধান, সামাজিক দুর্নীতির ফলেই ঘটিয়াছে উহার পতন; আর বর্ত্তমান সভ্যতা রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রীয় ব্যভিচারের পথেই আসিতেছে ইহার পতন। সামাজিক আধিপত্যের বলে ভারতের বিপ্রজাতি বিরাট শূদ্র জাতিকে মনুষ্যত্বের অধিকারে বঞ্চিত করিয়া সেই পাতিত্যের আকর্ষণে নিজেরাও পতিত হইয়াছে। ভারতীয় সমাজ পতনের ইহাই ঐতিহাসিক কারণ। আর রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তির সাহায্যে এই যে পৃথিবীময় পতিত ক্রীতদাসের দল সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাদের আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রভাব এড়াইয়া আজিকার মুষ্টিমেয় আভিজাত সম্প্রদায় কি আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? History repeats itself এই কথাটির মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র সত্য থাকে তবে উহার ধ্বংস অনিবার্য্য। বিশাল গ্রীক ও রোমক সাম্রাজ্য একদিন কামনার সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিল। তাদের সেই dissolving of life in wine and woman-এর কথা ভুলিয়া,—উহাদেরই উত্তরাধিকারী পাশ্চাত্য ও তাহার প্রভাবাধীন সভ্যজগৎ কাম ও কাঞ্চনের অবাধ অনুশীলনে আত্মহারা।

বর্ত্তমান সভ্যতায় মানুষের মমত্ববুদ্ধি বিকৃত হইয়া জাতীয়তার ঘূর্ণাবর্ত্তে আবদ্ধাবস্থায় পাক খাইতেছে। মানবতার শঙ্খধ্বনি করিয়া, এই সঙ্কীর্ণ জাতিগত মমত্ব-বুদ্ধিকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার মত কোন শক্তিধর পুরুষের আবির্ভাব অদ্যাপি ইউরোপে না হওয়ায়, জাতীয়তাই তথায় চরম সত্যরূপে পরিগণিত এবং এই স্বাদেশিকতার বরেণ্য গরিমার অন্তরালেই ইউরোপের যাবতীয় দুর্বুদ্ধির অবাধ অনুশীলন চলিতেছে। এই জাতীয়তার দোহাই দিয়াই আজিকার মনুষ্যত্ব আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছে।

জন রাস্কিন জাতীয়-আত্মরক্ষার নামে মনুষ্যত্বের আত্মহত্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

The first reason for all wars and necessity of national defences is that the majority of persons high and low in all European countries are thieves.

কাউণ্ট টলষ্টয় এই স্বাদেশিকতাকেই বর্ত্তমান মনুষ্য-জাতির দুর্ভোগের অন্যতম প্রধান কারণ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন,

I have several times expressed the thought in our day that the feeling of patriotism is an unnatural irrational and harmful feeling and a cause of the great part of ills from which mankind is suffering.

লোকার্ণো কন্‌ফারেন্সে পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি এই স্বাদেশিকতাকে মানবপ্রীতিদ্বারা বিস্তৃত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'Love of country must be augmented by the love of humanity' কিন্তু তা হয় নাই, কারণ ক্ষুদ্র স্বার্থের আবেষ্টনীর মধ্যে বদ্ধাবস্থায় শোচনীয় আত্মহত্যাই বোধ হয় ইউরোপের বিধিলিপি।

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীতে স্বার্থ ও শক্তি সমন্বয় জন্য জাতিসঙ্ঘের সমস্ত চেষ্টাই একে একে ব্যর্থ হইয়াছে আন্তরিকতার অভাবে এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ ও নীচ অভিসন্ধির প্রভাবে।

জার্ম্মান যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় সমর-সম্ভারের অতি-বৃদ্ধি ভাবী মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বাভাসরূপে সমগ্র জগতকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। বিগত মহাসমরের মধ্যেই মনীষিবৃন্দ এই ক্রমবর্দ্ধমানা শোণিত-পিপাসার চূড়ান্ত বিকাশ অনুমান করিয়াছিলেন। এমন কি দার্শনিক বার্গসোঁর ন্যায় ব্যক্তিও আশ্বস্ত হৃদয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীময় ধর্ম্মের বন্যা প্রবাহিত হইবে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, মহাসমরের অজস্র শোণিতক্ষয়ের পর সামান্য বলাধানের ফলেই ইউরোপের হিংস্র প্রকৃতিতে আবার ভীষণতম সমর-প্রেরণা দেখা দিয়াছে। ভাবী-সংঘর্ষের ব্যাপকতা ও ভীষণতার পরিকল্পনায় বিশ্বের মনীষিমণ্ডল শিহরিয়া উঠিয়াছেন। নানা ছন্দে উচ্চারিত তাঁহাদের সাবধান বাণী কিছুতেই এই প্রলয়ঙ্করী মৃত্যুমাদকতার সমুদ্ধবেগ সংযত করিতে পারিতেছে না। সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কা ও নিরাশার কথা এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অতর্পণীয় ভোগলালসার বিরুদ্ধে পৃথিবীময় যে প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহাতেও সংঘর্ষ-মূলক স্বাতন্ত্র্যের ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই সব আন্দোলনের সাফল্যেও কোনরূপ ভাবান্তরের আশা নাই। প্রাণপ্রবাহের স্বাভাবিক ঊর্দ্ধগতি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বেলাহত সমুদ্রতরঙ্গের মত প্রতিহত প্রাণশক্তি অসহ ক্রন্দনে গতিপথ খুঁজিতেছে। সকলদিকে বস্তুর পাষাণ-প্রাচীরে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণধর্ম্মী কবি গাহিয়াছেন, 'চতুর্দ্দিকে মোর, একি কারাগার ঘোর'; বস্তুর ভারে প্রপীড়িত হইয়া কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণ পিঞ্জরে তব,
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব;
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরাণে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।'

প্রবৃত্তির অতি-মন্থনে এই যে মৃত্যুগরল উৎপন্ন হইয়াছে, মহেশ্বরের সন্তান ভিন্ন কাহারা স্বেচ্ছায় এই কালকূট পান করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিবে? দগ্ধ বিশ্বের উপর হৃদয়ের স্নিগ্ধমত ঢালিয়া কাহারা উহাকে শীতল করিবে? জীবনের বিশ্বরূপ ভুলিয়া, বাহিরে এই যে মানুষ—ধনের, জ্ঞানের, গুণের, শক্তির সহস্র ব্যবধান রচনা করিয়া মৃত্যুর পথে চলিয়াছে, সমস্ত মায়িক বৈষম্যের অন্তরের সেই মহান্ ঐক্যকে আবিষ্কার করিবার সাম্যবাদী সাধকগণ কোথায়? যাহারা এই ইহকাল-সর্ব্বস্ব জড়বাদের প্রবর্ত্তক, কামতন্ত্রের নির্লজ্জ সাধনা ও মিথ্যা মন্ত্রের বিমূঢ় উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিল তাহারা চলিয়া গিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নিষ্ঠাবান অনুবর্ত্তকগণও অসংখ্য সমস্যা দায়স্বরূপ রাখিয়া একদিন চলিয়া যাইবে। কিন্তু আজিকার নিরপরাধ যুবকের ভবিষ্যৎ জীবন অকারণে সকল শান্তি ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবল এই সব সমস্যার সমাধান চেষ্টায়ই বিড়ম্বিত হইবে।

অধিকার ও দায়িত্ব অভিন্ন পদার্থ। একের অভাবে অন্যের কোনই অর্থ থাকে না। উত্তরাধিকারসূত্রে বর্ত্তমানের এই সব জটিলতার দুর্ভোগের দায়িত্ব যখন যৌবনের, তখন এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার প্রতিকারাধিকারও তাহার স্বতঃসিদ্ধ। আজ বিশ্ব-মহাযৌবনের এই সহজ অধিকারকে শান্ত ও সংযতভাবে প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে।

বৃহতের সহিত সংযোগসূত্র হারাইয়াই মানুষ আজ দীনহীন হইয়া পড়িয়াছে, মানুষের সর্ব্বতোমুখী অহংত্বের মধ্যেই অপ্রধান এখন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং তাহাতেই প্রধানের প্রাধান্যও নষ্ট হইয়াছে। ইহারই নাম বিপর্য্যয়।

জগতের সর্ব্বপ্রকার বিপর্য্যয়ই চিরদিন যৌবনের সাধনায় সুপর্য্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। যৌবনের বংশীধ্বনিতেই যুগে যুগে বিশ্বমানবের বিপথগামী জীবন-যমুনা উজান বহিয়াছে। অনন্ত যৌবনের প্রতীক শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতেই মানুষ ভবের পথ ছাড়িয়া ব্রজের পথের পথিক হইয়াছে। আজিকার যৌবন কি বহুরাগাত্মিকা এই বিষয়মত্ততাকে সঙ্গীতমুগ্ধ করিয়া সত্য ও কল্যাণের পথে আকর্ষণ করিতে পারিবে না? হৃদয়কে বাদ দিয়া, পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত মস্তিষ্ক ও বাহুবলের চর্চ্চা পাশ্চাত্য জাতিগণ করিয়াছে। আজ যখন সহৃদয়তার প্রয়োজন সর্ব্বোপরি, তখন তাহারা একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। অসংখ্যসমস্যাসঙ্কুল সংসার-সমুদ্রের তীরে বিমূঢ় অবস্থায় পাশ্চাত্যের স্পর্দ্ধিত বুদ্ধি আজ বাঁচিবার পথ খুঁজিতেছে। আজিকার একান্ত প্রয়োজনীয় সহৃদয়তা ও তেজস্বিতার একমাত্র অধিকারী যৌবন। বুদ্ধির সীমার বাহিরে বধির জগতে দিব্য চৈতন্যের গহ্বরেই মহামানবের মিলনভূমি। চৈতন্যের সেই উচ্চস্তরে বিশ্বাত্মার স্পর্শ লাভ করিয়াই মানবাত্মা অল্পতার অভিশাপে মুক্ত হয়। বাঁচিতে হইলে জগতকে আজ বুদ্ধি হইতে বোধিতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এ যুগে মানবজীবনে শ্রীভগবানের আসন গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। জীবনের মহাকেন্দ্রে জীবনদাতা আনন্দময়ের অনধিষ্ঠান হেতু আজ জীবন উৎসবহীন এক দুর্ব্বহ অভিশাপ।

বর্ত্তমানে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা আছে, কিন্তু বিসর্জ্জন নাই। জীবনকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করিয়া সেই মহাযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবানকে এই সভ্যতা উৎসর্গ করিতে পারে নাই বলিয়া, ইহার অনুষ্ঠিত দক্ষযজ্ঞ সকল দিক দিয়াই বিশৃঙ্খল ও বিঘ্নবহুল হইয়া উঠিয়াছে। আজ চাই উৎসর্গ, নিজের জন্য নয়, পরিবারের জন্য নয়, সমাজ বা দেশের জন্যও নয়, সকলের উর্দ্ধে যার স্থান সেই মহতো মহীয়ান জগদীশ্বরের উদ্দেশে আত্মসমর্পণ। পশুত্বের নাশ ও মনুষ্যত্বের বিকাশ জন্যই যে শ্রেয়ের জন্য প্রেয় ত্যাগ। ভগবদ্‌বৈমুখ্যই এ যুগের একমাত্র সমস্যা এবং কল্যাণময় ভগবানের সহিত বিশ্বমানবের বিচ্ছিন্ন জীবনধারার পুনঃসংযোজনই উহার সমাধান। এই মহা সংযোজনই যৌবনের দায়িত্ব এবং উহা পালনের যোগ্যতায়ই তাহার মহত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে যৌবনকে রাজটীকা পরাইয়া বস্তুর গণ্ডী ভাঙিয়া ভাবজগতে প্রধাবিত হওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছেন,

'শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও,
ফিরে নাহি চাও,
যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু কর না সঞ্চয়
নাই শোক নাই মৃত্যু ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়;
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি,
পলকে পলকে
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে—
যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে
ক্লান্তিভরে দাঁড়াও থমকি
অমনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে।

সামাজিক ভাবে বিশ্বব্যাধির চিকিৎসা-ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের যুবকবন্ধুগণ দিয়াছেন এবং আধ্যাত্মিক প্রতীকার-ব্যবস্থার জন্য তাহারা প্রাচ্যের জাগ্রত যৌবনের নিকট আন্তরিকতার সহিত আবেদন করিয়াছেন। পশ্চিম হইতে আহ্বান আসিয়াছে। আজ ভারতের দ্বারে,—কে আছ, মনে প্রাণে খাঁটি ভারতবাসী, সাড়া দাও, সাড়া দাও, বিশ্ববাসীর মূর্চ্ছাতুর প্রাণে আজ অমৃত ঢালিতে হইবে। এই প্রাচীনতম সভ্যতার জীর্ণ বক্ষপুটে যে আনন্দরূপ অমৃত আছে, আনন্দহীন মুমূর্ষু জগৎ আজ তাহারই প্রার্থী। এই উচ্ছৃঙ্খল গতিজ্বালার মধ্যে সেই অচল বিমল ভূমানন্দকে সম্যকরূপে উদ্বোধিত করিতে হইবে। হে অমৃতের পুত্র! তোমার জীবনে নূতন জীবন লাভ করিয়াই যে মরণ-ক্লান্ত জগৎ আসন্ন মৃত্যুকে জয় করিবে। হে শর্ম্মন্, সকলকে বাঁচাইয়া বাঁচাই যে তোমার চিরন্তন আদর্শ। সুদীর্ঘকাল বস্তুবিলাসের মধ্য দিয়া মানবজাতি মরণ-সিন্ধুর তটপ্রান্তে উপনীত; হে অগ্রজ, সমুন্নত হিমাদ্রি-শিখর হইতে প্রাণধর্ম্মের দ্রবময়ী ভাবগঙ্গার মহাপ্লাবন রূপে নামিয়া এস এই মৃত্যুর লীলানর্ত্তনের মধ্যে।

এই ভারতের তপোবনে ও রাজাসনে একদিন যে প্রাণ স্বীয় মহিমায় দেদীপ্যমান ছিল এই চতুর্দ্দিকের প্রাণহীন নির্দ্দয়তার মধ্যে আজ তাহারই প্রয়োজন। যদিও বাহিরে আজ তুমি সর্ব্বহারা চিররিক্ত, তথাপি অন্তরে তুমি সবার পূজ্য চিরগরীয়ান।

তুমি জান মানুষের ঐশ্বর্য্য তার বাহিরের সজ্জায় নহে, অন্তরের পূর্ণতায়। তোমার সভ্যতা বাহ্যিক রিক্ততার অবকাশে তোমাকে অন্তর পূর্ণ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছে,

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়াছে যে ধন
বাহিরে তাহার অতি স্বল্প আয়োজন।

আত্মপরিগ্রহের অভাবে সর্ব্বত্র সমুত্থিত অশান্ত হাহাকারের মধ্যে তোমার কণ্ঠে ধ্বনিত হউক সেই আত্মপরিচয়ের মহাবাণী—আত্মানং বিদ্ধি। স্বীয় মহিমায় স্পন্দিত হইয়া বিশ্বমানবকে আজ তুমি মিনতি করিয়া বল, ভ্রাতৃগণ, ফের, এই ইন্দ্রিয়-তর্পণ মনুষ্যত্বের দুরপনেয় কলঙ্ক, এই মৃত্যুর সাধনা ভয়াবহ পরোধর্ম্ম, আত্মিকার স্ফীতি মহাব্যাধি, সিদ্ধি অকীর্ত্তির আকর।

Abandon self, flee to God, strengthened by God return to Thyself.

ইহাই বর্ত্তমান যুগপীড়ায় ভারতীয় যৌবনের ব্যবস্থাপত্র। কারণ, ভারতীয় সংস্কারে বিশ্বসমস্যার সমাধান একমাত্র বিশ্বশক্তির সাধ্যায়ত্ত। একমাত্র শ্রীভগবানের পদাঘাতেই পৃথিবীর এই ধ্বংসাভিমুখী গতি ফিরিয়া যাইতে পারে। এই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে উন্নততর শান্তি ও শৃঙ্খলার উৎপত্তি সম্ভব। ভারতীয় দর্শন বলেন,

Evil is a part of nature, and the energy of God is directed to the purging of our nature and raising us to a higher stage.

ভগবানকে বাদ দিয়া মানবের শান্তি ও ঘনিষ্ঠতা কোনমতেই সম্ভব নহে। তাঁহার ধ্যানে শক্তি জাগিবে, জ্ঞানে জাতিত্ব বিস্তৃতি লাভ করিবে, প্রেমে আত্মীয়তার সীমা সঙ্কীর্ণ দেশ-কাল-পাত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বভূতে ছড়াইয়া পড়িবে।

সর্ব্বভূতাধিবাস ও ব্রহ্মাণ্ডের একায়নরূপে বিশ্বপিতাকে স্বীকার করিতে পারিলেই, এই ভেদের পঙ্কে সৌভাগ্যের শুভ্র কমল স্বতঃই প্রস্ফুটিত হইবে। উহার স্নিগ্ধতায় মানব-জীবনের সকল উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য প্রশমিত হইবেই। ভাবশুদ্ধি ভিন্ন কর্ম্মোন্নতির আশা নাই। বর্ত্তমানের বিকশিত রাজসিক প্রাণশক্তিকে অতীতের সাত্ত্বিক ভাবসম্পদের অনুগত হইতে হইবে। এই আনুগত্যের ফলে কাহারও সত্তালোপের সম্ভাবনা নাই। পরস্পরের সহযোগিতায় অনুপ্রাণন ও শুদ্ধির ফলে এক মহাশক্তির উদ্ভব হইবে। বিশ্বমানবকে আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে—আমরা মন্দির চাই না, মসজিদ চাই না, গীর্জ্জা চাই না, মঠ চাই না; বেদ, কোরান, বাইবেল, পিটক, মোল্লা, পাদ্রি, পুরোহিত, শ্রমণ এ সব কিছুই চাই না। আমরা চাই, যিনি আমাদের আদি পিতা, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, যাঁহার সত্তায় আমরা সত্তাবান, যাঁহার প্রাণে আমরা সঞ্জীবিত, তাঁহাকে পাইতে, তন্ময় হইতে। যৌবনের পবিত্র কণ্ঠে আজ ঝঙ্কার উঠুক,

We must keep our minds open and free for God's truth, from whatever source it may come.

অখণ্ড ভাগবতচৈতন্যের ঐকান্তিক নির্ভরে পূর্ণ মনুষ্যত্বের জন্য এক ব্যাপকতম আন্দোলনের আজ প্রয়োজন হইয়াছে। যাহার নির্দ্দেশ হইবে, Be a man first and everything afterwards। প্রধানতম সংস্কার হইবে, What shall a man profit if he gains the whole world and loses his own soul? যাহাতে থাকিবে Culture ও Nature এই উভয়ের সামঞ্জস্য, সংসার ও পরমার্থ এই দুইয়ের স্বীকৃতি। যাহাতে অধ্যয়ন সার্থক হইবে আচরণে, অনুভূতি জীবন্ত হইয়া উঠিবে অনুষ্ঠানে। অনুমান চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতক্ষেত্রে যে মহাসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার মর্ম্মবাণী ছিল, 'ধর্ম্মার্থকামা সমমেব সেব্যা, যোহ্যেক বৃত্তয়ে স জনো জঘন্যঃ।' ইউরোপেও ইহার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল—

"The type of the wise who soar but never roam,
True to the kindred points of Heaven and home."

জীবনের উভয় দিকের এই সামঞ্জস্যই বিশ্ববিধান। ইহার লঙ্ঘনই পাপ এবং এই পাপ হইতেই পতন বা মৃত্যু। আভিমানিক আধ্যাত্মিকতার অমুচিত আতিশয্যে বাহিরকে উপেক্ষা করায়, ভারতবাসী আজ বিশ্বমানব মহাসমাজের পতিত হরিজন, আর ব্যবহারিকতার সর্ব্বগ্রাসিত্বে ইউরোপ চলিয়াছে পতনের পথে। সবলে মোড় ফিরিয়া একবার বাঁচার চেষ্টা না করিয়াই কি এতবড় একটা সভ্যতা নিষ্ক্রিয় অধঃপতনকে বরণ করিবে?

রামমোহন ও রাজারাম

[উত্তর]

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার 'রামমোহন রায় ও রাজারাম' শীর্ষক প্রবন্ধ ১৩৩৬ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। তাহার পর কয়েক মাস ধরিয়া এ-বিষয়ে আলোচনা চলে। সেই প্রবন্ধ প্রকাশ ও আলোচনার দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের মত প্রবীণ প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিককে রাজারাম-প্রসঙ্গের পুনরায় অবতারণা করিতে দেখিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছিলাম।

আমার এই আশা সফল হয় নাই। রমাপ্রসাদ বাবুর সুদীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে এমন একটি নূতন সংবাদ নাই যাহার দ্বারা রাজারাম সম্বন্ধে অকাট্য সত্যনির্দ্ধারণের কোন সহায়তা হইতে পারে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, রামমোহনের সহিত রাজারামের কি সম্পর্ক সে-সম্বন্ধে কোন সাক্ষাৎ-প্রমাণ নাই, বোধ করি কোন দিন আবিষ্কৃতও হইবে না। এ-অবস্থায় নানা দিক হইতে টুকরা টুকরা তথ্য সংগ্রহ করিয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি একটা সম্ভবপর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সেই যুক্তি-পরম্পরার চূড়ান্ত খণ্ডন বা চূড়ান্ত সমর্থন একমাত্র নূতন প্রমাণের দ্বারা হইতে পারে। পৌষের 'প্রবাসী'তে রমাপ্রসাদ বাবু এইরূপ কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই; শুধু আমার যুক্তির বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন, আমি রাজারাম সম্বন্ধে যে-অনুমান করিয়াছি তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। নূতন প্রমাণের অভাবে কেবল এই সকল যুক্তিতর্কে আমার পূর্ব্বমীমাংসার বিন্দুমাত্র খণ্ডন হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

আমার মূল প্রবন্ধে আমি তিনটি বিষয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সেগুলি এই :—

(১) রাজারামের অপর নাম শেখ বখ্‌শু, অর্থাৎ জাহাজে উঠিবার অনুমতি-পত্রে যে-শেখ বখ্‌শুর নাম পাওয়া যায় সে ও রাজারাম অভিন্ন ব্যক্তি; সুতরাং রাজারাম প্রকৃতপ্রস্তাবে মুসলমান।

(২) রাজারাম অজ্ঞাতজন্মা এবং রামমোহনের পালিত পুত্র মাত্র, এই মর্ম্মে যে-সকল কাহিনী প্রচলিত আছে সেগুলি কাল্পনিক।

(৩) রামমোহনের এক জন মুসলমান-প্রণয়িনী ছিলেন এইরূপ একটা জনশ্রুতি রামমোহনের সমকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; এই জনশ্রুতি সম্ভবতঃ সত্য এবং রাজারাম সম্ভবতঃ এই মুসলমান-প্রণয়িনীর গর্ভজাত রামমোহনের পুত্র। সাক্ষাৎ-প্রমাণ না-পাওয়া পর্য্যন্ত এই অনুমানেই সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন আমাদের উপায় নাই।

(১) রাজারাম ও শেখ বখ্‌শু কি একই ব্যক্তি?

সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে যে-যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম তাহা একটা সহজ হিসাব। রামরত্ন মুখুজ্যে, রামহরি দাস ও রাজারাম এই তিন জন রামমোহনের সহিত বিলাত গিয়াছিল ইহা একাধিক জীবনচরিতে উল্লিখিত আছে; ইহারা যে বিলাতে ছিল তাহারও সাক্ষাৎ-প্রমাণ আছে; ইহারা যে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহারও প্রমাণ আছে; সুতরাং রামমোহনের বিলাতযাত্রায় ও বিলাতপ্রবাসে এই তিন জন যে তাঁহার সঙ্গী ছিল, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। সরকারী দপ্তরে রামমোহনের তিন জন সঙ্গীর উল্লেখ পাইতেছি, কিন্তু উহাদের নাম দেওয়া আছে রামরত্ন মুখুজ্যে, হরিচরণ দাস ও শেখ বখ্‌শু। আমি আলোচনা করিয়া দেখাই যে, রামহরি দাস ও হরিচরণ দাস একই ব্যক্তি, সুতরাং শেখ বখ্‌শু রাজারাম ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না।

রামমোহনের সহিত তিন জনের অধিক সঙ্গী যায় নাই এবং সরকারী দপ্তরে যে অনুমতির উল্লেখ আছে উহাই রামমোহনের বিলাতযাত্রার প্রকৃত সঙ্গীদের অনুমতি-পত্র, এই দুইটি কথা মানিলে আমার যুক্তি অখণ্ডনীয়। সেজন্য যাঁহারা রাজারাম ও শেখ বখ্‌শু এক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে চান্ না তাঁহারা নানারূপ আপত্তি তুলিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, রামমোহনের সহিত উপরোক্ত তিন জন ছাড়া আরও দুই জন লোক গিয়াছিল ইহার উল্লেখ সংবাদপত্রে* আছে, এবং অনুমান করেন, সরকারী দপ্তর অসম্পূর্ণ বলিয়া উহাদের অনুমতি-পত্রের উল্লেখ বা নকল পাওয়া যাইতেছে না। নিম্নলিখিত কারণে এই অনুমান আমি ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করি :—

(১) ডাঃ কার্পেণ্টার রামমোহনের এক জন বিশিষ্ট বন্ধু; রামমোহনের শেষের দিনগুলি তাঁহারই সহিত ব্রিষ্টলে কাটিয়াছিল। ডাঃ কার্পেণ্টারের লেখা হইতে জানা যায়, এদেশ হইতে যাত্রা করিয়া রামমোহন যখন সর্ব্বপ্রথম লিভারপুলে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার সহিত তিন জন সঙ্গী ছিল। তিনি লিখিয়াছেন :—

> "On the 8th of April, 1831, the Rajah arrived at Liverpool, accompanied by his youngest son, Rajah Ram Roy, and two native servants, one of them a Brahmin ;..." (Mary Carpenter's *Last Days*, etc., p. 68.)

রামমোহনের সহিত যদি ইহার অপেক্ষা অধিকসংখ্যক পরিচারক গিয়া থাকে, ডাঃ কার্পেণ্টার তাহাদের উল্লেখ করিলেন না কেন? আমরা দেখিতেছি তিনি পরিচারকদের জাতি পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতেছেন।

(২) ব্রিষ্টলে রামমোহনের সমাধিকালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি তালিকার প্রতিলিপিতেও আমরা রামমোহনের তিন জন সঙ্গীরই—রামরত্ন, রামহরি ও রাজারামের—

* "Baboo Rammohun Roy and son, 4 servants."—*The John Bull*, Nov. 13, 1830.

নাম পাই। (*Ibid.*, p. 130.) রামমোহনের সহিত অতিরিক্ত কোন পরিচারক যদি বিলাত গিয়া থাকে, তবে এই ঘটনার সময় তাহারা কি অনুপস্থিত ছিল, না ইতিপূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল?

(৩) সরকারী অনুমতি-পত্র ব্যতীত জাহাজে বিদেশে যাইবার এখন যেমন উপায় নাই, তখনও তেমনই ছিল না। একখানি ছাড়পত্রে রামমোহনের নিজের এবং আর একখানি ছাড়পত্রে তাঁহার তিন জন সঙ্গীর বিলাত যাইবার অনুমতি আছে। তাহা হইলে আরও দুই জন লোক সরকারী অনুমতি ব্যতীত কোম্পানীর নিজ জাহাজে চড়িয়া বিলাত গেল কি করিয়া?

(৪) সংবাদপত্রের যে-বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া "পুত্র ও চারি জন পরিচারক সমভিব্যাহারে রামমোহন" বিলাত যাইতেছেন বলা হয়, তাহা ঠিক একই আকারে এদেশের একাধিক সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল। সংবাদটি কোন কাগজে ১৮৩০ সনের ১৩ই নবেম্বর, কোন কাগজে বা ১৫ই নবেম্বর প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে সংবাদটি যে মুদ্রণের জন্য ১৩ই নবেম্বরের এবং রামমোহনের যাত্রার পূর্ব্বেই সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে পৌঁছিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু রামমোহন সরকারের নিকট হইতে তাঁহার তিন জন সঙ্গীর অনুমতি-পত্র লন যাত্রার দিনই—১৫ই নবেম্বর। সুতরাং এই অনুমতিপত্র বাতিল করিয়া পুনরায় তিনি যে পুত্র ও চারি জন পরিচারকের জন্য নূতন ছাড়পত্র লইয়াছিলেন—এরূপ অনুমানের অবকাশ অতি অল্প। সুতরাং যে-কোন কারণেই হউক, শেষ-পর্য্যন্ত ঠিক ঐ সংখ্যক পরিচারকের যাওয়া হয় নাই।

বলা বাহুল্য, এই সকল প্রমাণ ও যুক্তি খণ্ডন করিতে হইলে রামমোহনের সহিত যে তিন জনের অধিক সঙ্গী গিয়াছিল তাহার সাক্ষাৎ-প্রমাণের প্রয়োজন। সে-প্রমাণ নাই। সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবু এই পথ না ধরিয়া অন্য পথ ধরিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন, আমি যে অনুমতি-পত্রের উল্লেখ পাইয়াছি উহা রামমোহনের যাত্রার প্রকৃত সঙ্গীদের অনুমতি-পত্র নয়, তাঁহার সহিত অন্য লোকও গিয়াছিল এবং অন্য অনুমতি-পত্রও লওয়া হইয়াছিল। তবে যদি আপত্তি উঠে পূর্ব্ব অনুমতি বাতিল করিয়া নূতন অনুমতি কেন লওয়া হইল, কি করিয়া এই নূতন অনুমতি লইবার সময় পাওয়া গেল, এবং এই নূতন অনুমতির উল্লেখ সরকারী দপ্তরে নাই কেন, তাহার খণ্ডনের উদ্দেশ্যে রমাপ্রসাদ বাবু বলিতেছেন :—

(ক) 'অ্যালবিয়ন' জাহাজ (যে-জাহাজে রামমোহন বিলাত যান তাহার নাম) ১৫ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা হইতে ছাড়ে নাই,—ছাড়িয়াছিল ১৯এ তারিখে, সুতরাং নূতন অনুমতি লইবার সময় ছিল;

(খ) আগে রাজারামের সঙ্গে-যাওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু যাত্রার দিন যখন ঘনাইয়া আসিল—অর্থাৎ ১৫ই তারিখে অনুমতি লওয়ার পরে—রাজারাম বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়াতে রামমোহন তাহাকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলেন।

(গ) সরকারী দপ্তর অসম্পূর্ণ বলিয়া উহাতে এই পরিবর্ত্তনের কোন উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না।

রমাপ্রসাদ বাবু এক স্থলে আমার দলিল সংগ্রহ ও ব্যাখ্যান রীতি "বড়ই বিচিত্র" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা প্রচলিত ধারণাকে বজায় রাখিবার জন্য নিজেদের পক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারিতেছেন না, অথচ যে-প্রমাণ হাতের কাছে রহিয়াছে তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া 'অন্য প্রমাণ ছিল কিন্তু তাহা লোপ পাইয়াছে' এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন, ও বালক রাজারাম কাঁদিতে বসিল এইরূপ কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের ইতিহাস-চর্চ্চা যে কিরূপ বিচিত্র তাহা বোধ করি তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। রমাপ্রসাদ বাবুর প্রত্যেকটি অনুমান যে ভিত্তিহীন তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি হইতে বুঝা যাইবে :—

(১) 'অ্যালবিয়ন' জাহাজ ১৮৩০ সনের ১৫ই নবেম্বর কলিকাতা হইতে ছাড়ে, আমার এই উক্তি রমাপ্রসাদ বাবুর মতে একটি "মস্ত ভুল"। তিনি বলেন, কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িয়াছিল ১৯এ নবেম্বর, কারণ এই মর্ম্মে মিস্ কার্পেন্টারের পুস্তকে রামমোহনের একটি উক্তি ("...he sailed from Calcutta, Nov. 19 1830") উদ্ধৃত হইয়াছে এবং "মিস কলেটও ১৯শে নবেম্বর রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার তারিখ স্বীকার করিয়াছেন।" রমাপ্রসাদ বাবু প্রশ্ন করিয়াছেন, "ব্রজেন্দ্রবাবু যে কেন রামমোহন রায়ের নিজের উক্তি অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি না।" রামমোহনের এই উক্তিটি ১৮৩২ সনে বিলাতে প্রকাশিত তাঁহার একখানি পুস্তকে* প্রথমে পাওয়া যায়। উহা ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পরে লিখিত স্মৃতিকথা। উহার উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতা হইতে জাহাজ-ছাড়ার সঠিক তারিখ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ-প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিবার কি বিপদ তাহা বোধ করি রমাপ্রসাদ বাবুর মত প্রবীণ ঐতিহাসিককে আমার বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু তিনি যদি আজ-পর্য্যন্ত তাহা না বুঝিয়া থাকেন, তবে রামমোহনের যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে যে সাক্ষাৎ-প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে উহা হইতেই তিনি বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 'অ্যালবিয়ন' জাহাজের যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে যে-সকল সমসাময়িক প্রমাণ আছে তাহা এই,—

(ক) ১৭ই নবেম্বর তারিখের ইংরেজী সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' পাই,—

> Departures
> Nov. 15, Ship *Albion* N. McLeod
> for Liverpool.

(খ) ১৯এ নবেম্বর তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' পাই,—

> Station of Vessels in the River.
> Nov. 17, 1830. Diamond Harbour. *Albion* and
> *Diederica* (D) passed down.

(গ) ঠিক ১৯এ নবেম্বর তারিখেই বঙ্গোপসাগরের মাথায় খিজ্‌রি বন্দর হইতে রামমোহনের নিজের লিখিত একখানি পত্র পাই ("Kedgeree, Nov. 19, 1830")।+ এই পত্রখানি শ্রীযুক্ত

---

* *Judicial and Revenue Systems of India*—Preliminary Remarks (Panini Office ed., p. 236.)

+ সে-যুগে কলিকাতা হইতে বিলাতগামী জাহাজের সঙ্গে খিজ্‌রি পর্য্যন্ত পাইলট্ যাইত। খিজ্‌রি হইতে পাইলট্‌কে বিদায় দেওয়া হইত, এবং সেই প্রত্যাগামী পাইলট ব্রিগ-এর সুযোগ লইয়া যাত্রীরা তাহার হাতে কলিকাতায় বন্ধুদের জন্য শেষ পত্র পাঠাইতেন। রামমোহনও এই ভাবেই তাঁহার শেষ চিঠি পাঠাইয়াছিলেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত ও পাণিনি আপিস হইতে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ৪৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

(ঘ) ২২শে নবেম্বর তারিখের 'জন্ বুল' ও 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' পাই,—

Station of Vessels in the River.

Nov. 20. Kedgoree. *Albion* and *Diederica*, (D), proceeded down.

(ঙ) ২৪শে নবেম্বর তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' পাই,—

The *Andromache*, *Albion*, and *Diederica*, (D), gone to sea from Saugor on the 22nd November.

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'অ্যালবিয়ন' জাহাজ কলিকাতা হইতে ১৫ই নবেম্বর তারিখে ছাড়িয়া, ১৭ই তারিখে ডায়মণ্ড-হারবার অতিক্রম করিয়া ১৯এ খিজ্‌রি পৌছে ও ২০এ তারিখে খিজরি হইতে ছাড়িয়া ২২এ তারিখে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। তখনকার দিনে কলিকাতা হইতে বঙ্গোপসাগরে পৌছিতে জাহাজের এই সময় লাগিত।

রমাপ্রসাদ বাবু যাহাকে "রামমোহনের উক্তি" বলিয়াছেন তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেন আমি ১৫ই নবেম্বরই রামমোহনের বিলাতযাত্রার প্রকৃত তারিখ বলিয়াছি তাহা বোধ করি তিনি এখন বুঝিতে পারিবেন। তবে তিনি যে এই প্রসঙ্গে কেন রামমোহনের নিজের গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া মেরী কার্পেণ্টারের পুস্তকের দোহাই দিলেন ও মিস্ কলেটকে সাক্ষী হিসাবে মানিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি কি রামমোহনের ইংরেজী গ্রন্থাবলী দেখেন নাই? এবং এই ব্যাপারের প্রমাণ-হিসাবে মিস্ কলেটের "দু-হাত-ফেরা" (secondhand) উক্তির কোন মূল্য নাই তাহা জানেন না?

(২) রামমোহনের কলিকাতা হইতে যাত্রার তারিখ যখন ১৫ই নবেম্বর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে তখন এই প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ বাবুর অন্য অনুমানের কোন ভিত্তি নাই। তবু দুইটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে রামমোহন ১৫ই নবেম্বর তারিখে তিন জন সঙ্গীর সম্বন্ধে যে অনুমতি পাইয়াছিলেন তাহা শেষ-মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য ব্যক্তির জন্য অনুমতি লইয়াছিলেন ও রাজারাম "ব্যাকুল হইয়া পড়াতে" এই পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছিল—এই দুইটি কথাই রমাপ্রসাদ বাবুর নিছক কল্পনা।

প্রথমে আমরা দেখিতে পাই, সেক্রেটরী রামমোহনের তিন জন সঙ্গীকে অনুমতি দেওয়ার কথা কাউন্সিলে বিবৃত করিতেছেন ১৬ই নবেম্বর, অর্থাৎ 'অ্যালবিয়ন' জাহাজ কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার পরদিন।*

PUBLIC DEPT. PROCEEDINGS, dated 16 November 1830, No. 36.

The Officiating Secretary reports that orders for the reception of......the undermentioned individuals as passengers proceeding to the ports and places specified have been issued on applications duly made for the purpose by the individuals themselves or by others in their behalf on the dates subjoined......

Ramrutton Mookerjee, Hurichurn Doss and Sheik Buxoo, 15th November, proceeding to England in attendance on Rammohun Roy on the *Albion*.

জাহাজ ছাড়িয়া যাওয়ার পরে সঙ্গীপরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই হয় নাই। সুতরাং শেষ-মুহূর্ত্তেও সঙ্গীপরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলে সেক্রেটরীর নিকট ১৬ই তারিখে তাহা অজ্ঞাত ছিল না। এ-অবস্থায় তিনি রামমোহনের প্রকৃত সঙ্গীদের অনুমতির কথা কাউন্সিলে না-বলিয়া, বাতিল অনুমতির কথা কেন বলিতে যাইবেন?

দ্বিতীয় কথা, রাজারাম হঠাৎ "ব্যাকুল হইয়া" পড়ার জন্য রামমোহন তাহাকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন ও শেষ-মুহূর্ত্তে—অর্থাৎ ১৫ই নবেম্বর তারিখে—তাহার জন্য নূতন অনুমতি লওয়া হইয়াছিল, উহা মানিলে, ধরিয়া লইতে হয় যে ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত রাজারামের যাওয়ার কথা ঠিক ছিল না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, "রামমোহনের পুত্র তাঁহার সঙ্গে বিলাত যাইতেছে" এ-সংবাদ ১৩ই নবেম্বর তারিখেই সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। এমন কি জাহাজ ছাড়িবার অন্ততঃ ১১ দিন পূর্ব্বে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত হয়,—"কেবল স্বপুত্র রাজা সঙ্গেতে চলিল" (রমাপ্রসাদ বাবুও তাঁহার প্রবন্ধের শেষে এ-কথার উল্লেখ করিয়াছেন অথচ ইহার মূল্য প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই!)। যখন যাত্রার এত দিন আগেই রাজারামের যাওয়ার কথা ঠিক ছিল এবং প্রচারিত হইয়াছিল, তখন ১৫ই নবেম্বর তারিখে অর্থাৎ যাত্রার দিন তাহার জন্য অনুমতি না লইয়া অন্য লোকের জন্য অনুমতি লওয়া হইয়াছিল ইহা ধরিতে হইলে কল্পনাশক্তিকে অসাধারণ ভাবে প্রসারিত করিতে হয়।

(৩) এইবার সরকারী দপ্তরখানার নথিপত্র অসম্পূর্ণ থাকার কথা বলিব। রমাপ্রসাদ বাবু যদি বলেন, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের আরম্ভ হইতে গবর্মেণ্টের নিকট যত চিঠি, যত আরজী প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের সকলগুলির মূল দপ্তরে রক্ষিত নাই, সুতরাং দপ্তর অসম্পূর্ণ, তাহা হইলে তাঁহার কথা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু এই আপত্তি আমাদের আলোচনার পক্ষে নিতান্তই অবান্তর। গবর্মেণ্ট যে-সকল সিদ্ধান্তে পৌছিতেন বা যে-সকল আদেশ দিতেন তাহার বিবরণ এখনও সম্পূর্ণ রক্ষিত আছে। কলিকাতা হইতে বিলাত যাইবার আদেশের বেলায়ও আমরা দেখিতে পাই, যখনই যে বিলাত যাইতেছে তাহার অনুমতিপ্রাপ্তির কথা সরকারী বৈঠকের কার্য্যবিবরণীতে (Proceedings) রহিয়াছে। অনুমতি দেওয়া হইয়াছে অথচ বৈঠকের কার্য্যবিবরণীতে তাহার উল্লেখ নাই এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং সরকারী কার্য্যবিবরণী যদি সম্পূর্ণ থাকে তাহা হইলে কোথাও-না-কোথাও অনুমতির কথা থাকিবেই। আমি ১৮৩০ সনের সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত পাবলিক-বিভাগের কার্য্যবিবরণী অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি উহা সম্পূর্ণ আছে এবং উহাতে আমি রামমোহনের ও তাঁহার তিন জন সঙ্গীর যে-দুইটি অনুমতির কথা আবিষ্কার করিয়াছি উহা ভিন্ন অন্য অনুমতির চিহ্নমাত্র নাই। সুতরাং অন্য অনুমতি যে লওয়া হয় নাই তাহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। তবে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, রামমোহনের মূল আরজী ইত্যাদি দপ্তরে নাই কেন, তাহার উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ এই সকল মামুলী আরজী দপ্তরে রাখিয়া দপ্তর ভারাক্রান্ত করা প্রয়োজন বিবেচনা করা হয় নাই। কেবল রামমোহনের ক্ষেত্রেই নয়, ১৮৩০ সালে অন্য যাহাদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মূল দরখাস্তও দপ্তরে রাখা হয় নাই,—রাখা হইয়াছে কেবল সেই সকল আরজী সম্বন্ধে Body Sheet বা সরকারী নির্দ্দেশ। এই Body Sheet আবার সরকারী বৈঠকের কার্য্যবিবরণীর (Proceedings) সংক্ষিপ্তসার।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজারাম যে শেখ বখ্শু নামে

বিলাতযাত্রার অনুমতি পাইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নাই। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, উহাই কি তাহার আসল নাম? সরকারী দরখাস্তে নাম ও জাতির আসল পরিচয় না-দিয়া অন্য পরিচয় দেওয়া আইনসঙ্গত নয়, সেজন্য আমি মনে করি, রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ দাস ও শেখ বখ্‌শু রামমোহনের বিলাতযাত্রার সঙ্গীদের আসল নাম। তবে উঁহাদের এক জন নিজ নামে এবং অপর দুই জন রামহরি ও রাজারাম নামে প্রচারিত হইল কেন ইহা জিজ্ঞাস্য। নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় বলিয়া গিয়াছেন, রামমোহন সঙ্গীদের নাম 'রাম'-যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ ঘটে।

রমাপ্রসাদ বাবু প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, "নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় কোন্ প্রমাণের বলে যে দুই জনের নাম পরিবর্ত্তনের কথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তিনি লেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার কথার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায় না।" রামমোহন রায়ের প্রদৌহিত্র নন্দমোহনের কথা অমূলক নহে। যাত্রার পর রামমোহন যে তাঁহার কোন-কোন সঙ্গীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এ-কথা পরে বাংলা-সরকারেরও কানে গিয়াছিল। ইহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে আলোচনায় দিয়াছি (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৬, পৃ. ৮৪৫-৬)।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই নাম-পরিবর্ত্তনের কারণ কি? সে-যুগের সংবাদপত্র পড়িয়া আমার ধারণা হইয়াছে, পাছে বিলাত যাওয়ার জন্য সঙ্গীদের জাতি গিয়াছে বলিয়া পরে কোন গোল হয়, সেজন্য রামমোহন সাধারণের নিকট উঁহাদের প্রকৃত নাম গোপন করিয়াছিলেন, এবং প্রকৃত সঙ্গীদের নাম যাত্রার পূর্ব্বে কোনরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িলে পাছে কোন বাধা উপস্থিত হয়, এই জন্য যাত্রার দিনই সরকারের নিকট হইতে তাহাদের বিলাতযাত্রার অনুমতি লওয়া হইয়াছিল।*

রাজারাম মুসলমানীর পুত্র বলিয়া তখনই সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল (ইহার প্রমাণ পরে দিতেছি), সুতরাং তাহার জাতি বাঁচাইবার ভাবনা নিরর্থক মনে করিয়া তাহার ডাকনাম বা আসল নাম কিছুই গোপন করা হয় নাই। রামরত্ন বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে 'শম্ভু' এই ডাকনামে এত পরিচিত ছিল যে তিন বৎসর পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও ধর্ম্মসভার মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' রামরত্ন আসলে যে কে, সে-সম্বন্ধে অনুমান ভিন্ন আর কিছু করিতে পারে নাই।† সুতরাং আসল নাম দিয়া তাহার পরিচয় যেরূপ গোপন করা হইল, কোন কল্পিত নামে উহার অপেক্ষা অধিক গোপন করা যাইত না। বাকী রহিল হরিচরণ দাস. তাহাকে 'হরিচরণ' বা 'হরি দাস' বলিয়া সকলে জানিত বলিয়া তাহার সম্পূর্ণ নূতন নামকরণ হইল রামহরি দাস।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত রমাপ্রসাদ বাবুর মূল বক্তব্যের ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করা হইল। কিন্তু তিনি ইহা ছাড়া আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। যে-কয়েকটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক কেবল মাত্র সে-সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ, রমাপ্রসাদ বাবু বলেন আমি সরকারী দপ্তরে যে-অনুমতির উল্লেখ আবিষ্কার করিয়াছি উহা পাসপোর্ট নহে, "জাহাজে স্থান দানের (berth reserve করিবার) অনুমতি"। ইহার অর্থ কি বুঝিতে পারিলাম না। রমাপ্রসাদ বাবু কি বলিতে চান এই অনুমতি টিকিট-কেনার মত সাধারণ ব্যাপার,—বিদেশে যাইবার আইনসঙ্গত অনুমতি নয়? তাহাই যদি ঠিক হইত, তাহা হইলে বার্থ-রিজার্ভেশনের নির্দ্দেশ যাত্রার তারিখে না হইয়া কয়েক দিন পূর্ব্বেই দেওয়া হইত—বিশেষ করিয়া আমরা যখন দেখিতেছি নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে রামমোহনের বিলাতযাত্রার কথা অক্টোবর মাসের পূর্ব্ব হইতেই স্থির রহিয়াছে।* কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবু ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বার্থ রিজার্ভ করার মত সামান্য ব্যাপারের কথা গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে বিজ্ঞাপিত করিবার কোন আবশ্যক ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখনকার দিনেও বিদেশযাত্রী মাত্রকেই জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে সরকারের অনুমতি লইতে হইত। আমি যে নির্দ্দেশ আবিষ্কার করিয়াছি, উহা যদি বার্থ-রিজার্ভেশনের আদেশ হইত, তাহা হইলে বিলাতযাত্রার অনুমতি কখন লওয়া হইল এবং উহার উল্লেখ সরকারী বৈঠকের কার্য্যবিবরণীতে নাই কেন? আমি সরকারী দপ্তরে অন্ততঃ তিন বৎসরের কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, উহাতে বিলাতযাত্রী অন্য কাহারও ক্ষেত্রে এই এক 'Order for the reception on board' ভিন্ন অন্য কোন অনুমতি-পত্র বা আদেশ নাই। সুতরাং এই অনুমতি-পত্রই বিলাতযাত্রার চূড়ান্ত অনুমতি। রামমোহনের সঙ্গীদের ক্ষেত্রে এইরূপ মনে করিবার আর একটি প্রবল কারণ, ১৫ই নবেম্বর অর্থাৎ যাত্রার দিনে এই অনুমতি লইবার পর আর অন্য কোন অনুমতি লইবার অবকাশ ছিল না। এই অনুমতির

---

* রামমোহনের সঙ্গীদের যাত্রার আয়োজন যে অতি গোপনে করা হইয়াছিল, তাহা ১৮৩১ সনের ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে :—

"শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের সঙ্গে যেং চাকর গিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদক তাহাদের নাম ধাম আমারদের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে আমরা স্পষ্ট উত্তর দি যে তদ্বিষয় আমরা কিছুই জানি না তাহারদের জন্ম কি পিতামাতার নাম কি বিদ্যাভ্যাস আমরা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহি...।" ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৪)

† রামমোহনের বিলাতযাত্রার তিন বৎসর পরে ১৮৩৩ সনের অক্টোবর মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন :—

"বিলাতগামি শ্রীরামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের বিবর।—এপ্রদেশ হইতে রামরত্ন মুখোপাধ্যায় যে বিলাত গমন করিয়াছেন এমত কথা আমরা শুনি নাই রামরত্ন মুখোপাধ্যায় এই নাম বাঙ্গালিভিন্ন অন্য দেশীয়ের নহে ইহা নিশ্চয় বটে কিন্তু বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের মধ্যে এমত কুল প্রদীপ কেহ জন্মেন নাই যে বিলাত গমন করেন কেবল রামমোহন রায় ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি অদ্যাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর হয় নাই অপর আমরা কএক সপ্তাহঅবধি বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম কেহই কহিতে পারিলেন না...।

তবে যে বিলাতের সম্বাদ পত্রে এবং বোম্বে দর্পণে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নাম এবং তাহার আত্মীয় বিবরণ এবং বিচারপতিদিগের তদ্বিষয়ে হুকুম প্রকাশিত হইয়াছে ইহা কি তাবৎ অলীক। উত্তর, আমরা তাহা তাবৎ অলীক বলি না তদ্বিষয়ে এই ঠিকানা করা গিয়াছে রামমোহন রায়ের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশীয় এক জন দীন ব্রাহ্মণের সন্তান... গিয়াছে তাঁহার পরিচর্য্যা কর্ম্ম করিবেক কিঞ্চিৎ বেতন পাইবেক সেই ব্যক্তির নাম রামরত্ন মুখোপাধ্যায় হইবেক।" ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭)

* "Having at length surmounted all the obstacles of a domestic nature that have hitherto opposed my long cherished intention of visiting England, I am resolved to proceed to that land of liberty by one of the vessels that will sail in November..."—Rammohun Roy to Governor-General Bentinck (Miss Collet's *Rammohun Roy*, 2nd. ed. p. 168.)

নাম সে-যুগে 'পাসপোর্ট' ছিল, কি অন্য কিছু ছিল, তাহাতে কিছুই যায়-আসে না, জিনিষটা আসলে যে পাসপোর্ট সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, কথাটা খুব স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও রমাপ্রসাদ বাবু যেন ইঙ্গিত করিতে চান যে অনুমতি-পত্রে উল্লিখিত "হরিচরণ দাস ও রামমোহনের সহযাত্রী রামহরি দাস এক ব্যক্তি নয়।" এই অনুমানের সপক্ষে রমাপ্রসাদ বাবু একটি মাত্র যুক্তি দিয়াছেন। তিনি বলেন, রামমোহনের সঙ্গীদের নাম-পরিবর্ত্তন-প্রসঙ্গে নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় "হরিদাস" নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, 'হরিচরণ দাসে'র উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং এই 'হরিদাস' ও 'হরিচরণ দাস' এক ব্যক্তি নয়। এই অনুমান যে কিরূপ অযৌক্তিক তাহা একটি প্রমাণ দিয়া বুঝাইব। রামহরি দাসকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব ভাল করিয়া জানিতেন, কারণ সে তাঁহার শান্তিনিকেতনের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিল। সে যে রামমোহনের কাজ করিত ও তাঁহার সহিত বিলাত গিয়াছিল, এ-কথাও তিনি বলিয়াছেন। তিনি সর্ব্বত্র (ছয় বার) 'রামহরি দাস'-কে 'রামদাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেজন্য কি ধরিয়া লইতে হইবে মহর্ষি কর্তৃক উল্লিখিত 'রামদাস' ও রামমোহনের বিলাত-প্রবাসের সঙ্গী 'রামহরি দাস' এক ব্যক্তি নয়?

রমাপ্রসাদ বাবুর তৃতীয় অনুমান এই যে, শেখ বখ্‌শু সকলের নিম্ন-স্তরের অনুচর, কেন-না তাহার নাম সেক্রেটরীর রিপোর্টে রামরত্ন ও হরিচরণের পরে স্থান পাইয়াছে। পদমর্য্যাদার উল্লেখ না থাকিয়া কেবল মাত্র সর্ব্বশেষে নাম থাকিলেই কাহাকেও সর্ব্বনিম্নস্তরের ব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া সঙ্গত নহে। নামের পর্য্যায় যেমন পদমর্য্যাদা-অনুসারে হইতে পারে, তেমনই আবার বয়স অনুসারেও হইতে পারে। রামরত্ন, হরিচরণ ও শেখ বখ্‌শুর নামের পর "in attendance on Rammohun Roy" এই কয়েকটি কথা আছে। ইহাতে সব সময়েই যে ভৃত্য সূচিত হয় তাহা নহে,—সহচর, পার্ষদ প্রভৃতিও বুঝায়।

পরিশেষে, মূল বক্তব্যের সহিত সাক্ষাৎ কোন সম্পর্ক না থাকিলেও রমাপ্রসাদ বাবুর আর একটি কথারও প্রতিবাদ না-করিয়া পারিলাম না। তিনি বলেন, শুধু 'শেখ বখ্‌শু' বা 'শেখ বখ্‌শ' কোন মুসলমানের নাম হইতে পারে না, কারণ 'শেখ' উপাধিবাচক ও 'বখ্‌শ' শব্দের অর্থ 'দান', কাহার দান না-বলিলে নাম সম্পূর্ণ হয় না; সুতরাং শেখ এলাহিবখ্‌শ, শেখ খোদাবখ্‌শ প্রভৃতি নাম হইতে পারে, শুধু শেখ বখ্‌শ বা বখ্‌শু নাম হইতে পারে না।

এই আপত্তিতে রমাপ্রসাদ বাবুর ফার্সী-জ্ঞান যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, লোকাচারের জ্ঞান তেমন প্রকাশ পায় নাই। তিনি কি জানেন না, ব্যক্তির নাম সকল সময়ে ব্যাকরণশুদ্ধ না-ও হইতে পারে। তাহা না হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত মহাপণ্ডিত ব্যক্তির পুত্রের নাম 'নারায়ণচন্দ্র' কি করিয়া হইল? শুধু 'প্রসাদ' (দান, অনুগ্রহ) কি করিয়া বাঙালী ছেলের নাম হয়? রমাপ্রসাদ বাবুর নিজের নামের অর্থ হয়, রাধাপ্রসাদ নামের অর্থ বুঝি, গোবিন্দপ্রসাদ নামের অর্থও বুঝি, কিন্তু প্রসাদ চৌধুরী বা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নাম কি করিয়া হয়? অথচ বাংলা দেশে এরূপ নাম বিরল নহে এ-কথা রমাপ্রসাদ বাবু ভাল করিয়াই জানেন। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও আমরা প্রায়শঃ 'আবদুল' এই নামটি পাই, কিন্তু শুধু 'আবদুল' এই কথার কোন অর্থ হয় না।

তবে রমাপ্রসাদ বাবুকে এ-কথাটা বলাও উচিত মনে করি, 'শেখ বখ্‌শ' বা আদরে 'শেখ বখ্‌শু' নামের যে অর্থ নাই তিনি বলিয়াছেন, উহা সত্য নহে। 'শেখ বখ্‌শ' অর্থাৎ 'শেখের দান'। কোন্ বিশেষ শেখের দান তাহার উল্লেখ না-ও থাকিতে পারে। উপাস্তের নাম উল্লেখ করিলে তাঁহার প্রতি অসম্মান দেখান হয়, পাপ হয়—এই বিশ্বাস গুরুপন্থী হিন্দু-মুসলমান জগতে কি একেবারে অজ্ঞাত বা বিরল? উত্তর-ভারতীয় মুসলমান-জগতে (এবং পশ্চিমের অনেক হিন্দুর মধ্যেও) এই বিশ্বাস আজ-পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে যে আজমীর-দরগার শেখ মুঈন্-উদ্দীনকে মানত করিলে বন্ধ্যা নারীরও পুত্রসন্তান হয়। সুতরাং উত্তর-ভারতে 'শেখের দান' এই অর্থবাচক নাম থাকিলে, এই শেখের প্রতি ইঙ্গিত বুঝা যাইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের শেখ—গুলবর্গায় সমাহিত গীসু-দরাজ। অন্য জায়গায়ও এমন কোন শেখ থাকিতে পারেন যিনি এই দুই শেখের মত বিখ্যাত না হইলেও স্থানীয় লোকের নিকট শেখ par excellence, সুতরাং শুধু শেখ বলিয়াই পরিচিত। শেখ বখ্‌শু তাঁহারই দান বলিয়া মানিয়া লইতে আপত্তি কি?*

(২) রাজারামের পরিচয় সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পগুলি কি বিশ্বাসযোগ্য?

রাজারামের পরিচয় সম্বন্ধে যে-সকল গল্প প্রচলিত আছে উহাদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধেও রমাপ্রসাদ বাবু সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারেন নাই। রাজারাম দৈবক্রমে রামমোহনের হাতে আসিয়া পড়ে এই মর্ম্মে তিনটি গল্প আছে। উহাদের প্রথমটির জন্য দায়ী ডাঃ কার্পেণ্টারের কোন অজ্ঞাতনামা বন্ধু, উহার তারিখ ১৮৩৩। দ্বিতীয়টির জন্য দায়ী চন্দ্রশেখর দেব, উহার তারিখ ১৮৬৩। তৃতীয়টির জন্য দায়ী অ্যাডামস্-পত্নী, উহার তারিখ ১৮৮৭।† ১৩৩৬ সনের অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে আমি তিনটি কাহিনীরই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাই, অ্যাডামস্-পত্নীর কাহিনী ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর কাহিনীরই রূপান্তরমাত্র, সুতরাং উহার স্বতন্ত্র মূল্য কিছুই নাই, আমি আরও দেখাই যে, অপর দুইটি কাহিনী পরস্পর-বিরোধী ও উহাদের প্রথমটিতে ডিক্ নামে যে সিবিলিয়ান সাহেবের উল্লেখ আছে, ঠিক তাহার সহিত মেলে এরূপ কোন ব্যক্তির উল্লেখ ডড্‌ওয়েল ও মাইল্‌স্-সঙ্কলিত এবং ১৮৩৯ সনে বিলাত হইতে প্রকাশিত ***Alphabetical List of the Honourable East India Company's Bengal Civil Servants (1780-1838)*** পুস্তকে নাই, সুতরাং গল্পগুলি কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। রমাপ্রসাদ বাবু আমার এই যুক্তি মানেন না। তিনি বলেন, দুইটি গল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও কতক মিল আছে; এই মিলটুকু উপেক্ষা করিবার নয়। আরও বলেন, উপরোক্ত ডডওয়েল ও মাইল্‌স্ সাহেবের পুস্তক যে ভ্রমপ্রমাদরহিত তাহার প্রমাণ আমি দিই নাই।

এই আপত্তি সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রথমেই দেখিতে পাই, ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর গল্প ও

* রমাপ্রসাদ বাবুকে হিন্দু নাম 'গুরুপ্রসাদ' ও মুসলমান নাম 'পীর বখ্‌শ' স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। এখানেও কোন্ গুরু বা কোন্ পীর তাহার উল্লেখ নাই। আশা করি তিনি এই দুইটি নাম অসম্পূর্ণ বলিয়া আপত্তি তুলিবেন না।

† ইহা ছাড়া ২ জুলাই ১৮৩৩ তারিখের 'সমাচার দর্পণে'ও রাজারামের জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গক্রমে মুদ্রিত হয় ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৪ দ্রষ্টব্য)। এই গল্পটি রমাপ্রসাদ বাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উহা ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর গল্পের পুনরাবৃত্তি মাত্র, সুতরাং ইহার স্বতন্ত্র মূল্য নাই।

চন্দ্রশেখর দেবের গল্পের মধ্যে মিল শুধু এইটুকুতেই যে দুইটি কাহিনীতেই আছে রাজারাম রামমোহনের পালিত পুত্র। অপর সকল বিষয়েই দুইয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অমিল। কোন অজ্ঞাতকুলশীল বালক যদি কাহারও নিকট পুত্রস্নেহে প্রতিপালিত হয় তাহা হইলে তাহার জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ করা লোকের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, সেই সন্দেহ অপনোদন করিবার জন্ম প্রতিপালকের বা তাঁহার বন্ধুবর্গের তাহাকে পালিত পুত্র বলিয়া প্রচার করাও তেমনই স্বাভাবিক। সুতরাং কথাটা ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধু, চন্দ্রশেখর দেব, বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনিই বলুন না কেন, রাজারামকে শুধু পালিত পুত্র বলিলেই তাহার জন্ম সম্বন্ধে সমস্তার নিরাকরণ হইবে না; রামমোহন উহাকে কোথায় কি-ভাবে পাইলেন তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ আবশ্যক। এই বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুই বলেন নাই; ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধু বলিয়াছেন, ডিক্‌ নামে এক জন সিবিলিয়ান তাহাকে হরিদ্বারে এক মেলায় কুড়াইয়া পান, তাহার পিতামাতা কে, জাতিকুল কি সে-সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই; চন্দ্রশেখর দেব বলিতেছেন সে এক সাহেবের দরোয়ানের পুত্র। এই বৈষম্য কেন?

ইহার উত্তরে রমাপ্রসাদ বাবু বলিতেছেন, চন্দ্রশেখর দেব ও ডাঃ কার্পেণ্টারের বন্ধু উভয়েই রাজারামের জন্মকাহিনী রামমোহনের নিকট শুনিলেও এক জন গল্পটি বলিয়াছেন ১৮৬৭ সনে ও অপর জন বলিয়াছেন ১৮৩৫ সনে; সুতরাং গল্পটি শুনিবার অন্ততঃ তেত্রিশ বৎসর পরে চন্দ্রশেখর দেবের স্মৃতিবিভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। কথাটা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। চন্দ্রশেখর রামমোহনের "intimate disciple" বলিয়া খ্যাত; রামমোহনের কলিকাতা-বাসের সময়ে তিনি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন: তিনিই ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপনের প্রস্তাব করেন বলিয়া প্রকাশ। তাহা ছাড়া রামমোহনের এক মুসলমান-প্রণয়িনী ছিলেন ও রাজারাম তাহার সন্তান—এই জনপ্রবাদ তাঁহার জানা ছিল; এই জনপ্রবাদ সত্য নয় তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। এ-অবস্থায় তিনি যদি রামমোহনের নিকট রাজারাম সম্বন্ধে কোন কথা শুনিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার পক্ষে আংশিক ভাবেও ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। সন-তারিখের কথা লোকে ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর গল্পে এমন কোন জিনিষ নাই যাহা বিশ-ত্রিশ বৎসর পরে মনে থাকিবার কথা নয়,—বিশেষতঃ যে-ব্যক্তি রাজারামের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছে তাহার পক্ষে। আরও একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত। যে-গল্প ডাঃ কার্পেণ্টারের বন্ধুর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল, তাহা চন্দ্রশেখর দেবেরও অজ্ঞাত থাকা সম্ভব নয়। তবু এই দুই গল্পের মধ্যে এই গুরুতর বৈষম্য কেন?

এই স্থলে ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর পত্রের একটি অংশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। এই পত্রলেখক বলিতেছেন, ডাঃ কার্পেণ্টারের পুস্তকে রাজারামকে রামমোহনের পুত্র বলিয়া যে উল্লেখ আছে পাছে তাহাতে রামমোহনের চরিত্রে কোন কলঙ্ক আরোপিত হয় সেজন্ম রামমোহনের এদেশীয় বন্ধুরা তাঁহাকে এই ভ্রম সংশোধন করিতে বলিয়াছেন। এই সাফাই উক্তিটি পড়িয়াই মনে প্রশ্ন জাগে, রামমোহনের সুনাম সম্বন্ধে আগ্রহশীল এই দেশীয়-বন্ধুরা কে, তাঁহারা আরও আগে এই প্রতিবাদ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না কেন? রামমোহনের জীবিতকালে এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজারামকে তাঁহার পুত্র বলিয়া অনেক বার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বিলাত-প্রবাসকালে রামমোহন রাজারামকে সর্ব্বত্র 'my son', 'my youngster', 'my little youngster' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ডাঃ কার্পেণ্টার রাজারামকে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া জানিতেন; রাজারামের চাকুরীর জন্ত বোর্ড অব কন্ট্রোলে যে দরখাস্ত গিয়াছিল তাহাতেও তাহাকে রামমোহনের পুত্র বলিয়াই পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে এদেশের বাংলা ও ইংরেজী সংবাদপত্রেও রামমোহনের পক্ষ হইতে তাহাকে "পুত্র" বলিয়াই প্রচার করা হইয়াছিল। এই শেষোক্ত বিজ্ঞাপনটির একটা বিশেষ মূল্য আছে। ১৮৩০ সনের ৪ঠা ও ৮ই নবেম্বর তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রকাশিত "দ্বিজরাজের খেদোক্তি" শীর্ষক একটি ব্যঙ্গ কবিতায় রাজারামকে রামমোহনের "যবনী-প্রেয়সী"র গর্ভজাত পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হয় এবং তাহার পরই বলা হয় "কেবল সুপুত্র রাজা সঙ্গেতে [বিলাতে] চলিল"। এই উক্তিটি রামমোহনের প্রতিপক্ষের উক্তি। ইহার কয়েক দিন পরই, অর্থাৎ ১৩ই ও ১৫ই নবেম্বর তারিখের *The John Bull* ও *India Gazette* নামক দুইখানি ইংরেজী সংবাদপত্রে যখন রামমোহনের পক্ষ হইতেও রাজারামকে "পুত্র" বলিয়াই বিজ্ঞাপিত হইল ("Baboo Rammohun Roy and son")* তখন কি ধরিয়া লওয়া যায় না যে রামমোহন নিজে রাজারামের পিতৃত্ব অস্বীকার করিতে কিছুমাত্র ব্যগ্র ছিলেন না। তখন তাঁহার দেশীয় বন্ধুরা এই বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার কলঙ্ক মোচন করেন নাই কেন? জীবিতকালে যদি তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত না হইয়া থাকে, তবে মৃত্যুর পর শুধু ডাঃ কার্পেণ্টারের উক্তিতে কি তাহার অপেক্ষা গুরুতর কোন কলঙ্ক হইবার কথা?

সুতরাং দেখা যাইতেছে, রামমোহনের জীবিতকালে রাজারাম রামমোহনের পুত্র বলিয়া প্রচারিত হইলেও কেহ তখন আপত্তি করেন নাই এবং রামমোহন নিজেও রাজারামকে পুত্র ভিন্ন অন্ত পরিচয় দেন নাই। রাজারাম যে রামমোহনের পুত্র নয়,—এক সাহেবের দ্বারা পালিত অনাথ বালক, এই কাহিনীর প্রথম উল্লেখ আমরা পাই রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পরে এক জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির পত্রে। এই পত্র যে রামমোহনের কোন-কোন দেশীয় বন্ধুর প্ররোচনায় লিখিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। এই বন্ধুরা কে, তাহাদের স্বার্থ কি, তাহা আমরা জানি না; এই পত্রলেখক কে, তিনি রামমোহনের নিকট কোথায়, কি ভাবে, কখন কাহিনীটি শোনেন তাহা আমরা জানি না। এই উক্তি ডডওয়েল ও মাইল্‌স্‌-সঙ্কলিত পুস্তকের অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ও অন্তান্ত সাক্ষ্যের বিরোধী হইলে গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। রমাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন, ডড্‌ওয়েল ও মাইল্‌স্‌-সঙ্কলিত পুস্তক যে ভ্রমপ্রমাদশূন্ত, তাহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব আমার। যে-সময়ের কথা হইতেছে সে-সময়ে ডিক্‌ নামে কোন সিবিলিয়ান হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী কোন জায়গায় কখনও ছিল তাহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ যদি তিনি উপস্থিত করিতে পারিতেন, তবেই এ-প্রশ্ন উঠিতে পারিত।

আমার মনে হয় গোড়া হইতেই একটি নিশ্চিত ধারণার বশে চলিয়াছেন বলিয়া রমাপ্রসাদ বাবু ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর উক্তিকে এত নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। রাজারাম সম্বন্ধে এই বন্ধুর পত্রে যাহা আছে তাহাকে তিনি রামমোহনের নিজের উক্তি বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। উহা ঠিক নহে। আমার মূল প্রবন্ধে ও পরবর্ত্তী আলোচনায় বলিয়াছি, রাজারাম-সম্পর্কীয় কাহিনীগুলি

* রামমোহনের বিলাতযাত্রার কয়েক দিন পরেই 'সমাচার চন্দ্রিকা'য়, এমন কি নিরপেক্ষ 'সমাচার দর্পণ' পত্রেও (২০ নবেম্বর) প্রকাশিত হয় যে রামমোহন "স্বীয় পুত্র" সহ বিলাত গমন করিয়াছেন।

রামমোহনের মৃত্যুর পরে প্রচারিত হইয়াছে। রামমোহন-সংক্রান্ত স্মৃতিকথার আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধু ও সঙ্গীরা তাঁহার মুখে শোনা বলিয়া এমন অনেক তথ্যের প্রচার করিয়াছেন যাহা অতি সহজেই অমূলক অথবা সন্দেহজনক বলিয়া প্রমাণ করা যায়। ইহার একাধিক দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি। সেজন্য আমি রামমোহন-সম্পর্কে তাঁহার বন্ধুবর্গ ও সঙ্গীদের যে-কোন স্মৃতিকথাকে নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর উক্তি এই ধরণের স্মৃতিকথা। এইবার চন্দ্রশেখর দেবের উক্তির কথা দেখা যাক্। রমাপ্রসাদ বাবু অবশ্য বলিয়াছেন, রাজারাম-সম্পর্কীয় কাহিনী যে রামমোহনের নিজের মুখে শোনা এ-বিষয়ে চন্দ্রশেখর দেব "সন্দেহের অবসর রাখেন নাই"। তিনি যদি এ-বিষয়ে মিস্ কলেটের রামমোহন-জীবনী হইতে তাঁহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত রাখালদাস হালদার কর্ত্তৃক ধৃত বাক্যটি ভাল করিয়া পড়েন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন রামমোহনের নিকট শুনিয়াছেন, এরূপ কোন উক্তি চন্দ্রশেখর দেব করেন নাই।*

তবু বলি, ডাঃ কার্পেণ্টারের অজ্ঞাতনামা বন্ধুর উক্তি ও চন্দ্রশেখর দেবের উক্তি অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও রাজারামের পক্ষে যেমন রামমোহনের পালিত পুত্র হওয়া অসম্ভব নয়, তেমনই আবার অপর পক্ষে তাহার রামমোহনের পুত্র হওয়াও অসম্ভব নয়। এখন দেখিতে হইবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রমাণ বিবেচনা করিলে এই দুইটি সম্ভবপর ঘটনার কোন্‌টি বেশী সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

(৩) রাজারাম ও তাহার মাতা

এইবার রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনী ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্র থাকা সম্বন্ধে কি-কি সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী সাক্ষ্য আছে তাহা দেখা যাক।

এই সকল সাক্ষ্যের আলোচনা করিতে গিয়া চন্দ-মহাশয় একটি গুরুতর ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "রাজারাম যে রামমোহন রায়ের পালিত পুত্র নহেন,—প্রণয়িনীর পুত্র, তাহার সম্বন্ধে কিংবদন্তীর প্রথম বাহক চন্দ্রশেখর দেব" (১৮৬৩)। ইহা ঠিক নহে, কারণ রামমোহনের জীবিতকাল হইতে পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত এই জনশ্রুতি ও অভিযোগ চলিয়া আসিয়াছে। এই সকল জনশ্রুতিতে তাঁহার যবনী-সংসর্গের প্রতি যে ইঙ্গিত আছে তাহা কখনও প্রচ্ছন্ন কখন-বা স্পষ্ট। এই সকল সাক্ষ্য ও জনশ্রুতি যে-সকল পুস্তক-পত্রিকাতে আছে নিম্নে তারিখ-অনুযায়ী তাহাদের নাম ও প্রকাশকাল দেওয়া গেল; স্থানের অল্পতাবশতঃ এই ইঙ্গিতগুলি এখানে মুদ্রিত হইল না:—

(১) ১৮২১ সনে রংপুর-প্রবাসী গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রামমোহনের মতামতের প্রতিবাদ-স্বরূপ 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। উহার পৃ. ১২৯-৪০ দ্রষ্টব্য।

(২) ১৮২২ সনে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" রচিত 'চারি প্রশ্নে'র চতুর্থ প্রশ্ন ('চারি প্রশ্নের উত্তর,' পাণিনি আপিস সংস্করণ, পৃ. ২৩৯) দ্রষ্টব্য।

(৩) ১৮২৩ সনে প্রকাশিত 'পাষণ্ডপীড়ন' (রামমোহনের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তকের প্রত্যুত্তর) গ্রন্থের পৃ. ১১৯, ১২৬-২৭, ১৪৮-৫৯ ও ১৬১ দ্রষ্টব্য।

(৪) ১৮৩০ সনের ৪ঠা ও ৮ই নবেম্বর তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত "দ্বিজরাজের খেদোক্তি" নামক ব্যঙ্গকবিতা:— 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ভূমিকা দ্রষ্টব্য। 'রাজা' বা রাজারাম যে রামমোহনের "যবনী-প্রেয়সী"'র সন্তান, এই কবিতায় তাহার উল্লেখ আছে।

(৫) ১৮৪৭ সনে 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা'-সম্পাদক নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য রচিত এবং ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত 'বিবাদভঞ্জার্ণব,' পৃ. ১৩ দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকের উদ্দেশ্য কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন' ও রামমোহনের 'পথ্যপ্রদান' এই দুই গ্রন্থের বিচার।

ইহা ছাড়া চন্দ্রশেখর দেব, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উক্তি আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি।

রমাপ্রসাদ বাবু উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে নিবদ্ধ উক্তির অনেকগুলি দেখেন নাই। কিন্তু যেগুলি দেখিয়াছেন সেগুলির সম্বন্ধে তিনটি অদ্ভুত আপত্তি তুলিয়াছেন।

প্রথমে তিনি বলেন, 'চারি প্রশ্নে'র চতুর্থ প্রশ্নে "অনেক বিশিষ্ট সন্তান" এবং "তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়দিগের" যে উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে রামমোহনকে গণ্য করিবার অধিকার আমাদের নাই, কারণ এই অভিযোগ ব্যাপকভাবে বহুবচনে করা হইয়াছে,—ব্যক্তিগত-ভাবে রামমোহনকে লক্ষ্য করিয়া করা হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, "দ্বিজরাজের খেদোক্তি" "ক্ষেপার উক্তি," উহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

তৃতীয়তঃ তিনি বলেন, রাজারামের বয়সের যে হিসাব আছে তাহাতে তাহার জন্ম রামমোহনের কলিকাতায় আসার পর হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়; চন্দ্রশেখর দেব তখন রামমোহনের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট; সুতরাং রাজারাম রামমোহনের কোন প্রণয়িনীর গর্ভজাত সন্তান হইলে চন্দ্রশেখর দেব প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই তাহা বলিতেন,—জনরবের দোহাই দিতেন না।

এই কয়টি আপত্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই:—

(১) বিচারে পরাস্ত ও অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যেই যদি কাহাকেও কোন প্রশ্ন করা হয় এবং সেই প্রশ্নে যদি চরিত্র বা বিশেষ কোন আচার-ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত থাকে, তাহা হ'লে শুধু উহা ব্যাপক-ভাবে বা বহুবচনে করা হইয়াছে বলিয়াই উহাতে প্রশ্নের লক্ষ্যীভূত ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত নাই, এই তর্ক যে কত দূর অযৌক্তিক রমাপ্রসাদ

---

* আমার মূল প্রবন্ধে চন্দ্রশেখর দেবের উক্তির যে বাংলা তাৎপর্য্য (ইংরেজী অংশ সমেত) দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে অনবধানতাবশতঃ একটি ভুল ছিল। রমাপ্রসাদ বাবু মিস্ কলেটের ইংরেজী বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু নিজে আমার বাংলা তাৎপর্য্যের ভুলটির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। বাক্যটি এই—

"Chunder Sekhar Deb—the disciple who, it will be remembered, suggested the formation of the Brahmo Somaj—stated in coversation with a friend, R. D. H., at Burdwan, so late as January, 1863, that 'rumour had it that at one time he [Rammohun] had a mistress; and people believed Rajaram was his natural son, though he himself said Rajaram was the orphan of a Durwan of some Saheb, and Rammohun Roy brought him up." (Miss Collet, 2nd ed., p. 169.)

শেষের "he himself" কথা দুইটিতে চন্দ্রশেখর দেবকে সূচিত হইতেছে,—রামমোহনকে নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে রামমোহনের নিকট হইতেই এই কাহিনী শুনিয়াছেন, এ-কথা চন্দ্রশেখর দেব বলেন নাই।

বাবু বোধ হয় তাহা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। অথচ ব্যক্তিগত আক্রমণ করিতে হইলে উহা সোজাসুজি না করিয়া ব্যাপক ভাবে করিতে হয় তাহা তর্কযুদ্ধের প্রথম সূত্র মাত্র এবং সকলেরই জানা। রমাপ্রসাদ বাবু নিজেও অন্যত্র এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। ('মাসিক বসুমতী', কার্ত্তিক ১৩৩৯, পৃ. ১৩১ দ্রষ্টব্য।)

'চারি প্রশ্নে'র ইঙ্গিত যে রামমোহনকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার দুইটি প্রমাণ দিতেছি। 'চারি প্রশ্ন' প্রথমে মিশনরীদের 'সমাচার দর্পণে' (৬ এপ্রিল ১৮২২) প্রকাশিত হয়। এই প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝাইবার জন্য একটি পত্রও সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই পত্রের এক স্থলে আছে, "প্রশ্ন চতুষ্টয় করিতেছি ইহাতে কোন ব্যক্তির নিন্দা কিম্বা দ্বেষ উদ্দেশ্য নহে কেবল বিশিষ্ট লোকের পাপ কর্ম্ম নিবারণ এবং তৎসংসর্গজ দোষ নিরাকরণ তাৎপর্য্য।" * এখানে "বিশিষ্টলোক" কথাটি বহুবচনে নাই। দ্বিতীয় প্রমাণ 'পাষণ্ডপীড়নে'র উক্তি। 'চারি প্রশ্ন' ও 'পাষণ্ডপীড়ন' একই ব্যক্তির রচনা। উহাতে পাই,—"কপট ব্রতাচারী ম্লেচ্ছবেশধারী ভাক্তবামাচারী মহাশয়, আপনারদিগের বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, জবনী গমন, সংপ্রতি স্বয়ং স্বমুখে স্বহস্তে ব্যক্ত করিয়া কেবল আপনারদিগের জবনাকারত্ব, মদ্যপত্ব, ও জবন-জাতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন" (পৃ. ১৫৮-৯)। "নগরান্তবাসির + অদ্যাপি জবনী গমনের চিহ্ন প্রকাশ হইতেছে, যেহেতু, নিজবাসস্থানের প্রান্তেই জবনীগমনের ধ্বজপতাকা রোপণ করিয়াছেন" (পৃ. ১৬৩)। সুতরাং 'চারি প্রশ্নে' যে রামমোহনের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছিল সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রকৃতপ্রস্তাবে এই সিদ্ধান্ত এতই স্বয়ংসিদ্ধ যে রমাপ্রসাদ বাবু নিজেও উহা অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে "রামমোহন ও তাঁর বাংলা রচনা" নামে একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন :—

> "১৮২২ সালে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণ করিয়া কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহন রায়কে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই চারিটি প্রশ্নেই রামমোহন রায়ের চরিত্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে।" ‡

আজ কি তিনি কেবলমাত্র তর্ক করিবার জন্যই অন্য কথা বলিতেছেন?

(২) রমাপ্রসাদ বাবু যে "দ্বিজরাজের খেদোক্তি"কে "ক্ষেপার উক্তি" বলিয়াছেন তাহাও তাঁহার প্রথম আপত্তি অপেক্ষা বেশী যুক্তিযুক্ত নয়। প্রতিপক্ষের উক্তি মাত্রকেই যদি "ক্ষেপার উক্তি" বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে রামমোহন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণকারীদের চরিত্রে এই ধরণের যে-সকল অপবাদ আরোপ করিয়াছেন তাহাও "ক্ষেপার উক্তি" বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে।

(৩) এইবার চন্দ্রশেখর দেবের উক্তি সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাক্। রমাপ্রসাদ বাবুর ধারণা রামমোহনের যদি কোন প্রণয়িনী বা প্রণয়িনী-গর্ভজাত পুত্র থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্রশেখর দেবকে নিশ্চয়ই তিনি সাক্ষী করিতেন। রমাপ্রসাদ বাবুর মত প্রবীণ ব্যক্তির মুখে এইরূপ কথা শুনিব তাহা সত্যই আশা করি নাই। প্রণয়িনী বা প্রণয়িনী-গর্ভজাত পুত্র সম্বন্ধে লোকে—বয়োকনিষ্ঠ শিষ্য দূরে থাকুক, বন্ধুকেও অনেক সময়ে কিছু বলে না। রমাপ্রসাদ বাবুর এবং আমার জীবিতকালেও বহু দেশ-বিখ্যাত ব্যক্তির সম্বন্ধে এমন কথা প্রচারিত হইয়াছে, যাহার সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধু ও সহকর্ম্মীরা সাক্ষাৎ-জ্ঞান হইতে কিছু বলিতে পারিবেন না। এ-বিষয়ে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে রামমোহনের মুসলমানী-সাহচর্য্য সম্বন্ধে সমসাময়িক যে-সকল সাক্ষ্য আছে তাহার বিরুদ্ধে রমাপ্রসাদ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। তবু এ-কথা আমি মানি যে, বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে রামমোহনের নামে কলঙ্ক আরোপ করা বা সেই কলঙ্ক অতিরঞ্জিত করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনী থাকা যে একেবারে অমূলক অপবাদ নয় তাহা মনে করিবার প্রধান কারণ,—রামমোহনের দিক হইতে স্পষ্ট প্রতিবাদের অভাব। মুসলমানী-সংসর্গ হিন্দুশাস্ত্র অনুসারেও দূষণীয় নয় এ-কথা রামমোহন বলিয়াছেন, কিন্তু কোথাও উহা অস্বীকার করেন নাই। অন্য অন্য বিষয়ে যখনই যে-কেহ রামমোহনের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ করিয়াছে তখনই তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে কিন্তু তিনি মুসলমানীর সাহচর্য্য অভিযোগের সত্যাসত্য সম্বন্ধে নীরব ও "শৈবধর্ম্মে গৃহীত স্ত্রী" যে "বৈদিক বিবাহিত স্ত্রী"র সমতুল্য তাহা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। এই অভিযোগ খণ্ডন করিবার উপায় থাকিলে রামমোহন কি নিরুত্তর থাকিতেন?

উপসংহার

আগে যাহা লিখিয়াছিলাম এবং এখন যাহা লিখিলাম, তাহা ছাড়া অন্য কোন সংবাদ বা প্রমাণ এখন-পর্য্যন্ত আমাদের জানা নাই। সুতরাং নূতন প্রমাণ আবিষ্কার না-হওয়া পর্য্যন্ত এ-বিষয়ে আর তর্কবিতর্ক নিতান্তই নিষ্ফল। তবে আমার মনে হয়, যে-সকল তথ্য আমাদের হাতে আছে তাহা হইতে চূড়ান্ত মীমাংসা হউক আর না-ই হউক, রাজারাম যে রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনীর পুত্র হইতে পারে, এই সম্ভাবনা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। রমাপ্রসাদ বাবু অবশ্য তাহা অস্বীকার করিয়া সুধীজনের সম্মুখে এক গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে-রামমোহন "বহুশ্রমসাধ্য শাস্ত্রচর্চ্চায় এবং তৎকালে অভাবনীয় ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহার পক্ষে প্রণয়িনীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হওয়া বা শৈববিবাহ কতটা সম্ভব, তাহা নিরপেক্ষ সুধীজনের বিবেচ্য।"

এই প্রশ্নে নৃতত্ত্ববিৎ রমাপ্রসাদ বাবুর মনুষ্যচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি বলিতে পারি না। শাস্ত্রচর্চ্চা কিংবা সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন করিলেই কাহারও পক্ষে প্রণয়িনীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড, পৃ ১৬৯।

+ "['পাষণ্ডপীড়নে'] 'পাষণ্ড,' 'নগরান্তবাসী ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী' ইত্যাদি মধুর বাক্যে তাঁহাকে [রামমোহনকে] সম্বোধন করা হইয়াছিল। 'নগরান্তবাসী'র দুই অর্থ; নগরের অন্তে যিনি বাস করেন; অর্থাৎ রামমোহন রায় মাণিকতলায় বাস করিতেন। উহার আর এক অর্থ চণ্ডাল।" ('মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত'—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩য় সং. পৃ. ১৪৩)

‡ 'বঙ্গলক্ষ্মী', ফাল্গুন ১৩৪০, পৃ. ২৩১। রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার এই প্রবন্ধের অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন :—"বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ পুস্তক প্রচার করিয়া রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল পুস্তকে রামমোহন রায়ের আচারের যথেষ্ট নিন্দা আছে।...এই সকল আক্রমণের উত্তরে রামমোহন রায় কখনও নিজের আচার সম্বন্ধে কোন কথা গোপন করেন নাই, এবং তাহা তন্ত্রের বিধির দ্বারা সমর্থন করিলেও কখন নিজের ত্রুটি স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই।"

হওয়া অসম্ভব হয় না। রামমোহন ভোগবাসনাত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন এ-কথা কেহ কখনও বলে নাই। রামমোহন নিজেও কখনও নিজেকে সর্ব্বত্যাগী বলিয়া প্রচার করেন নাই। তিনি গৃহী ছিলেন, পোষাকপরিচ্ছদ আচার-ব্যবহারে রাজসিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। যখন তিনি শাস্ত্রীয় বিচারে ও সমাজ-সংস্কারে রত তখনও তাঁহার গৃহে মুসলমান-বাঈজীর নাচ কখন কখন হইত।* তাঁহার পক্ষে স্ত্রীপুত্রে আসক্ত হওয়া অসম্ভবও নয়, নিন্দার বিষয়ও নয়।

তবু রমাপ্রসাদ বাবুর কোথায় আপত্তি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। প্রণয়িণীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হওয়া ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বা লম্পট হওয়া তাহার নিকট এক জিনিষ বলিয়া মনে হইতেছে। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক-ঘটিত ব্যাপারে যদি কেহ প্রচলিত সামাজিক রীতিকে লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলেই তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি—একথা বলা চলে না। রমাপ্রসাদ বাবু হয়ত এ-দুয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নিকট প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধাচারী মাত্রেই হয়ত ধর্ম্ম ও নীতিরও বিরুদ্ধাচারী; সুতরাং রামমোহন সামাজিক রীতি লঙ্ঘন করিয়া শাস্ত্রীয় আচারে বিবাহিতা নন এরূপ কোন স্ত্রীলোকে অনুরক্ত ছিলেন এ-কথা স্বীকার করিতে তাঁহার মন কিছুতেই সরিতেছে না। কিন্তু কোন উদারচিত্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত একমত হইবেন বলিয়া আমি মনে করি না। রামমোহন বিবাহিতা পত্নীর সাহচর্য্য বা প্রণয় বেশী পান নাই তাহা আমরা জানি। এ-অবস্থায় তাঁহার পক্ষে অন্য কোন রমণীতে অনুরক্ত হওয়া বিচিত্র নয়। তবু, জনশ্রুতিতে তাহাকে কখনও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বলিয়া প্রচার করা হয় নাই,—কোন মুসলমান-প্রণয়িনীতে অনুরক্ত বলিয়াই প্রচার করা হইয়াছে। এই রমণী শৈবমতে বিবাহিতা হউন, আর নাই হউন, রামমোহন যে তাঁহাতেই অনুরক্ত ছিলেন এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ একনিষ্ঠ ব্যক্তি সামাজিক আচার না মানিলেও একদার ব্যক্তি অপেক্ষা ধর্ম্মের চক্ষে বেশী নিন্দনীয়, এ-কথা কি জোর করিয়া বলা যায়?

আর একটি কথা। সাধারণ ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক বিবাহের বহির্ভূত সন্তানকে অজ্ঞাত অখ্যাত জীবন যাপন করিতে দেয়। রামমোহন যে রাজারামকে এইরূপে দূরে সরাইয়া না রাখিয়া অবস্থানুযায়ী শিক্ষা ও সম্মান দিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার চরিত্রবল ও মহত্ত্বের পরিচায়ক।

* *Wanderings of a Pilgrim* by Fanny Parkes, Vol. 1. Chap. IV (Residence in Calcutta, May 1823.)

[এই বিতর্ক সম্বন্ধে আমার মত আমি পরে প্রকাশ করিব।—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসীর সম্পাদক।]

কলিকাতার শিল্প-প্রদর্শনী

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

শিল্পকলা একদিন আমাদের দেশে অন্তরতর প্রাণধারার অঙ্গস্বরূপ ছিল—কি বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে, কি প্রাত্যহিক সংসারযাত্রায়। তার পর ক্রমশ আবার আমরা সকল দিকে পরাজয়ও মানিয়াছি, অন্তরের দৈন্যে আমাদের জীবন হইতে সুন্দরের স্পর্শও মুছিয়া গিয়াছে। সেই সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে, শিল্প-কলার জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাধক দেশে যাঁহারা, কলিকাতার বার্ষিক শিল্পকলা-প্রদর্শনীগুলি তাঁহাদেরই মিলন-মেলা; এই দিনগুলি তাই সকল শিল্পসৌন্দর্য্য-পিপাসুদের উৎসবের দিন।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত-শিল্পে যে নূতন উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন, যে নব ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার ও তাহার ফলাফলের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনাই হইয়াছে,—[illegible]প্রাণ ললিত-সুকুমার আধুনিক বঙ্গীয় শিল্পের অঙ্কন-পদ্ধতি, শুধু অতীতের ও অলোক-জগতের বিষয়বস্তু লইয়া এই শিল্পীদের কারবার, কল্পনাবিলাসের পরবশ হইয়া বর্ত্তমান জীবন-জগতের প্রতি তাঁহারা বিমুখ।

এই অভিযোগের কারণ অবশ্য অনেকের চিত্রে সত্যই ছিল ও আছে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শিল্পকলায় অর্দ্ধশিক্ষিত, বঙ্গীয় শিল্পের সাময়িক বহিরঙ্গকেই ইঁহারা একান্ত ভাবিয়া তাহার বিকৃত অনুকরণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এবং প্রধানতঃ ইঁহাদেরই চিত্রদ্বারা অসঙ্গতভাবে সমগ্র বঙ্গীয় শিল্পপদ্ধতির গৌরবের হানি হইয়াছে। বলা প্রয়োজন, বঙ্গীয় শিল্পী-প্রধানদের অনেকে, যেমন শ্রীনন্দলাল বসু ও শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণ্ডীর বাহির হইয়া বহু পরীক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেগুলি সকলে অভিনিবেশ করিয়া দেখেন নাই।

এই অভিযোগগুলি যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, এবারেও গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের প্রদর্শনীতে (১৬—২২ ডিসেম্বর) তাহার প্রভূত পরিচয় পাইয়াছি। এমন নয় যে, সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে বরণীয় কোনও প্রতিভার সন্ধান মিলিয়াছে; কিন্তু এ-কথা বলিতে হয় যে এখানকার ছাত্র ও শিক্ষকেরা সম্পূর্ণ গতানুগতিক হইয়া খুশী নহেন, দেশী ও বিদেশী বহু শিল্পকারু লইয়া চর্চ্চা করিতেছেন, যে-সকল বিষয়বস্তু ও পরিবেষ্টন আমাদের দেশে আমরা শিল্পের সীমানার বহির্ভূত বলিয়াই ধরিয়া রাখিয়াছিলাম ভরসা করিয়া তাহাও চিত্রপটে ধরিয়াছেন। কখন-কখন সে পট জীবন্ত এবং সৌন্দর্য্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বলও হইয়াছে। তরুণ শিক্ষার্থীদের কাজ অনেক সময়েই হয়ত আঙ্গিক-বিচারে ত্রুটিপূর্ণ অপূর্ণাঙ্গ রহিয়া গিয়াছে; তবুও এই বিদ্যালয়ের সকল বিভাগেই একটা প্রাণশীলতার ও সাগ্রহ জিজ্ঞাসুতার পরিচয় স্পষ্ট।

ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষকতার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন (Teachership Department), তাঁহাদের করা গ্রাফিক আর্টস অর্থাৎ উডকাট ও উড-এনগ্রেভিং, রঙীন ও একবর্ণ লিথোগ্রাফ, এচিং প্রভৃতি ছাপের ছবিগুলিই এই প্রদর্শনীর সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তু। রঙীন লিথোগ্রাফের মধ্যে শ্রীসুশীল সেনের "ট্রেনের যাত্রী" শ্রেষ্ঠস্থান লাভের যোগ্য। ট্রেনের কক্ষে সন্তান কোলে লইয়া উপবিষ্ট রমণীর বিলীয়মান-সুদূরে নিবদ্ধ উদাস দৃষ্টিতে সুদূর-যাত্রিণীর বিচ্ছেদকাতরতা লিথোগ্রাফের পাথরে শিল্পী পরম সমবেদনার সহিত ফুটাইয়াছেন, পার্শ্বে এক সহযাত্রীর অর্দ্ধাংশ আঁকিয়া শিল্পী দর্শককে বাস্তব জগতেও ধরিয়া রাখিয়াছেন, যাত্রিণীর দৃষ্টিপথ ধরিয়া উদাস হইয়া যাইতে দেন নাই। শ্রীইন্দু রক্ষিত রঙীন লিথোগ্রাফে বয়োভারনত কর্ম্মনিরত "মিস্ত্রী"কে দরদ দিয়া আঁকিয়াছেন, বৃদ্ধ মিস্ত্রীর অর্দ্ধ-প্রকাশিত অ-সুন্দর মুখাবয়বে, তাঁহার কাজকর্ম্মের যন্ত্রপাতিতে সৌন্দর্য্যের আভা লাগিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে এই শিল্পীর "মহানগরীর পথে" ছবিখানাও উল্লেখ করিতে হয়। অল্প পরিসরের মধ্যে বহুবিচিত্র যান-বাহন ও যাত্রিকের সমাবেশে ছবিখানাকে একটু অতিরঞ্জিত ও উৎকেন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহাতে ছবিটির বিষয়বস্তুটি বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একবর্ণ লিথোগ্রাফের মধ্যে শ্রীপূর্ণেন্দু বসুর "ফকির" ও শ্রীবাসুদেব রায়ের "বাউল" ও "নৌকা" উল্লেখযোগ্য।

কাঠ-খোদাইয়ের কাজে শ্রীবাসুদেব রায় ভবিষ্যতে বিশেষ কৃতী হইবেন, তাঁহার ছবি দেখিলে এইরূপ আশা হয়। শ্রীতারক বসুও অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য উডকাট ও লিনোকাট করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কতকগুলিতে অনাবশ্যক রেখাপাতে নিরর্থক জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীবাসুদেব রায়ের অল্প যে-কয়টি কাঠ-খোদাই আছে তাহাতে পরিমাণ-বোধ ও রেখাপাতের সার্থকতা বোঝা যায়—তাহার মধ্যে "পাল্কী" ও "হাঁস" উল্লেখযোগ্য। শ্রীতারক বসু "ফিল্‌ম-ষ্টুডিয়োর অভ্যন্তর" বলিয়া যে কাঠ-খোদাইটি করিয়াছেন তাহাতে, আলোর পিছনে অন্ধকারে রহস্যময় মনুষ্যমূর্ত্তিগুলি ও বিচিত্র আবেষ্টনের সমাবেশ ইহার ভবিষ্যৎ সার্থকতার সম্ভাবনা সূচিত করে।

আর্টস্কুলে ছাপের ছবিগুলি স্বতন্ত্র কক্ষে (Print Roomএ) প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিলে সাধারণের পক্ষে এগুলির রসগ্রহণের বেশী সুবিধা হইত।

ভারতীয় শিল্প-বিভাগের (Indian Painting Department) ছাত্রদের ছবি ইহার পরেই উল্লেখ করিতে হয়। আর্টস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যে বিষয়-বৈচিত্র্যের কথা প্রথমে উল্লেখ করিয়াছি, এই বিভাগের ছাত্রদের ছবিতেও তাহা প্রকট। একটা সময়ে আর্টস্কুলের ছাত্রেরা যে ছবি আঁকিতেন শস্তা দেওয়াল-পঞ্জীতেই তাহা মানাইত ভাল; Still Life ও কতগুলি বাঁধা-ধরা "ষ্টাডি"তেই তাহা পর্য্যবসিত ছিল, জীবন্ত করিয়া নয়, সাধারণ ফটোগ্রাফের মত করিয়া পোর্ট্রেট আঁকিতে পারিলেই যথেষ্ট ছিল—এখনও কোন কোন প্রদেশের আর্টস্কুল ইহার বেশী অগ্রসর হইয়া উঠিতে পারেন নাই। কলিকাতার আর্টস্কুলে, কোন মহাপ্রতিভাবান্ শিল্পী সৃষ্টি না হউক, এই শস্তা ভাবটা কাটিয়াছে, জড়তা ঘুচিতেছে। শ্রীমুকুলচন্দ্র দে মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় নূতন নূতন দিকে ইহার দৃষ্টি মেলিতেছে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য শিল্প-আলোচনায় সর্ব্বপ্রধান বিবেচ্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা একটি বিশেষ স্মরণ রাখিবার বিষয়, একথা স্বীকার্য্য। সাধারণভাবে আর্টস্কুলের ছাত্ররা, এবং ভারতীয়-শিল্প শ্রেণীর ছাত্ররা

জলদান—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির

স্নানের ঘাটে— শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

পদ্মচয়ন—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সূর্য্যালোক—শ্রীললিতমোহন সেন

জননী—শ্রীযামিনী রায়

ফিল্‌ম-ষ্টুডিয়োর অভ্যন্তর (উড্‌-এনগ্রেভিং)—শ্রীতারক বসু

ঘাট—শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাউল (লিথোগ্রাফ)—শ্রীবাসুদেব রায়

বৃদ্ধা—শ্রীঅবনী সেন

নৃত্য (ফ্রেস্কো)—শ্রীইন্দু রক্ষিত

থার্ডক্লাসের যাত্রী—শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদার

পদ্মা (ড্রাইপয়েন্ট)—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

খিদিরপুর ডক (ড্রাইপয়েন্ট)—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নব নগরীর পথে—শ্রীইন্দু রক্ষিত

মণিপুর-রমণী। উড্-এনগ্রেভিং)—শ্রীবাসুদেব রায়

বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনে যথেষ্ট ঔদার্য্য দেখাইয়াছেন, এবং সময়-সময় যথেষ্ট সাহসের পরিচয়ও দিয়াছেন। (অবশ্য এই বৈচিত্র্য ও সাহস তাঁহাদের বা তাঁহাদের শিক্ষকদেরই মাত্র আছে এমন নয়—শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ ও তাঁহার অনেক ছাত্রের নাম অগ্রে করিতে হয়।) আর্টস্কুলের ছাত্রেরা প্রথাগতভাবে দেবদেবীর ছবিও আঁকিয়াছেন—কিন্তু বাংলার শহর-পল্লী, হাট-ঘাট, ঘরকন্নার খুঁটিনাটির প্রতি তাঁহাদের দরদ বেশী। শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদারের 'থার্ডক্লাসের যাত্রী" ছবিতে তৃতীয়-শ্রেণীর টিকেট-ঘরের দৃশ্য ও বিভিন্ন ভঙ্গীতে যাত্রীদের গাড়ীর অপেক্ষা করিবার বাস্তব দৃশ্য চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ঘাট" চিত্রে পল্লীর একটি দৃশ্য মনোরম হইয়া ফুটিয়াছে। ইঁহার "চায়ের দোকান" ছবিটির বিষয়বস্তু যে শিল্পের অন্তর্গত হইতে পারে তাহাই এক সময় সম্ভবতঃ আমরা মনে করিতে পারিতাম না—তবু এ ছবিখানা স্বাভাবিকভাবেই আঁকা হইয়াছে, নূতনত্বে দৃষ্টিকে পীড়া দেয় না। এই বিভাগে শ্রীভূপতিনাথ চক্রবর্ত্তীর "শীতে" আগুন পোহাইবার ছবি, শ্রীঅরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "দিনান্তে" সাথ-সংলাপের চিত্র, ও শ্রীহেরম্ব গঙ্গোপাধ্যায়ের "গো-দোহন" ছাত্রদের ছবি হিসাবে উল্লেখযোগ্য। ছবিগুলিতে অবশ্য অনেক ত্রুটি আছে, তবে ছাত্রদের কাজ বলিয়া সে-কথা আর বিশেষভাবে উল্লেখ করি নাই।

বিষয়বস্তুর পরিধি যেমন বাড়িয়াছে তেমনই আর্টস্কুলে অঙ্কনরীতির বৈচিত্র্যও উৎসাহ পাইলে আনন্দের বিষয় হইবে।

বিজ্ঞাপনের চিত্র যে কিরূপ মনোহর হইতে পারে তাহা কমার্সিয়াল-বিভাগের কাজ দেখিলে বোঝা যায়। বিজ্ঞাপনচিত্র বিদেশে প্রায় শিল্পের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে, আমাদের দেশেও এখন তাহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উঠিতেছে। পোষ্টার, বইয়ের জ্যাকেট প্রভৃতির অনেকগুলি সুন্দর নিদর্শন এই বিভাগে ছিল। শ্রীমাখনলাল দত্ত গুপ্ত, সিতাংশু, কালী কর প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মডেলিং, ফাইন্ আর্টস্ ও প্রাথমিক বিভাগেও অনেকগুলি সুন্দর শিল্পনিদর্শন আছে।

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহের তেলরঙের ছবিতে নানা-রকম কম্পোজিশনে নূতনত্ব উল্লেখযোগ্য।

মিউজিয়ম-গ্যালারিতে ইণ্ডিয়ান ফাইন আর্টস অ্যাকাডেমির প্রদর্শনী (২১ ডিসেম্বর—৫ জানুয়ারি) এইবার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। ইহার উদ্যোক্তা শিল্পী শ্রীঅতুল বসু মহাশয়ের ইচ্ছা, সকল পদ্ধতির ও 'স্কুলে'র শিল্পীদের শিল্পকর্ম্ম যাহাতে একই প্রদর্শনীতে দেখিবার সুযোগ সর্ব্বসাধারণের ঘটে—এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন। প্রদর্শনীটি সুপরিসর ও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত।

"ভারতীয় পদ্ধতিতে" অঙ্কিত চিত্র-বিভাগে প্রদর্শিত শ্রীযামিনী রায়ের "মা ও শিশু" ছবিখানি প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ ছবি বলিয়া পুরস্কৃত হইয়াছে। ছবিখানিকে অবশ্য সম্পূর্ণ নূতন বলা যায় না—ইহা শিল্পীর সুপরিচিত, মা ও শিশুর প্রণতির অভিরাম চিত্রের পুনরাবৃত্তি—নূতন করিয়া আঁকিতে, তিনি এখন যে পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছেন, তাহার আভাসও লাগিয়াছে। পটের চিত্রণপদ্ধতির সীমা, ও বর্ত্তমানে তাহার গ্রহণযোগ্যতা কতখানি, শিল্পী-মনের সকল বিচিত্র ভাব ব্যক্ত করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট কিনা, এ আলোচনায় প্রবেশ না করিয়াও, মাত্র ক'টি সবল রেখায় আঁকা শ্রীযামিনী রায়ের "জননী," "চিন্তাকুলা" ছবি দু'খানি ভাল বলিয়া মানিতে দ্বিধা হয় না। সাধারণত চোখের বিভিন্ন ভঙ্গীতে শিল্পী নরনারীর মনের ভাব ফুটাইয়া তোলেন—এই ছবিগুলিতে তাহার সুযোগ নাই, তবুও জননীর স্নেহসুকরুণতা ও রমণীর চিন্তামগ্নতা প্রকাশ পাইতে একটুও বাধা পায় নাই, সহজেই দর্শকের মনে তাহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে। এই দুইটি ছবিতে অধরোষ্ঠের ভঙ্গীকে যেভাবে শিল্পী কথা বলাইয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়—সাধারণত পট বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে এই কৃতিত্ব সর্ব্বদা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। "যশোদা" ছবি-খানি দেখিলেই স্বভাবতই শ্রীনন্দলাল বসুর "চৈতন্যের জন্ম" ছবিখানির কথা মনে পড়ে, এবং বসু-মহাশয়ের ছবিখানার তুলনায় এখানিকে অনেকটা নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হইতে থাকে। যামিনীবাবুর "রাসলীলা" ছবিখানিও মনোহর; অন্য কতকগুলি ছবি পটের পুনরাবৃত্তি বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয় প্রচুর ছবি আঁকেন, যত্ন করিয়া আঁকেন—ভাল ছবিও আঁকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁহার

অনেকগুলি নিজের ছবির পুনরাবৃত্তি, আর অঙ্কনভঙ্গীতে তাঁহার কতকগুলি ম্যানারিজম দাঁড়াইয়া গিয়াছে যাহাতে তাঁহার একখানি ছবি হইতে আর একখানিকে চিনিয়া লওয়া মুসকিল হয়। কতকগুলি চিত্রে তিনি এমন অনর্থক অর্দ্ধ-নিরাবরণতা আঁকিয়াছেন যাহাতে চিত্রের সৌন্দর্য্যহানিই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই মুদ্রাদোষ-দুষ্টতা উকীল-ভ্রাতাদের ছবিতেও পরিস্ফুট দেখিতে পাই। ইহাঁদের সকলেই সুদক্ষ, খ্যাতনামা শিল্পী। কিন্তু, রেখাপাতের ও বর্ণযোজনার যে লালিত্য ও সৌকুমার্য্যের জন্য ইহারা সমাদৃত, তাহা যেন অতিমাত্র হইয়া উঠিতেছে, শুধুই "মৃদুসুরের খেলা"! শ্রীবরদা উকীলের "আওরংজেবের কোরাণপাঠ" ছবিখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের (অ্যাকাডেমি ও অন্য প্রদর্শনীতে) বীরভূম, পূর্ব্ববঙ্গ ও পার্ব্বত্য দৃশ্যগুলিতে অভিনবত্ব আছে। এই ছবিগুলিকে জল-রঙের স্কেচ বলা চলে—সামান্য রং ও চিত্রপটে প্রচুর অবসর রাখিয়া বীরভূমের দৃশ্যবিরল রুক্ষ চিত্র কৃতিত্বের সহিত তিনি আঁকিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের শ্যামল তরুলতা খাল-বিল নৌকা-মাঝির ছবিও মোটা মোটা টানে তিনি জীবন্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। আশ্চর্য্য এই, যে ছবিগুলি অনেক যত্ন করিয়া তিনি আঁকিয়াছেন বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সেগুলি বড় নীরস হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত ছবির সঞ্জীবতা তাহাতে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। অ্যাকাডেমি-প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ তাহার যত্নসাধ্য ছবি অপেক্ষা সহজ দৃশ্যচিত্রকেই সমাদর করিয়া পুরস্কৃত করিয়াছেন।

অ্যাকাডেমির ভাস্কর্য্য-বিভাগে গোয়ালিয়রের শ্রীসুধীর-রঞ্জন খাস্তগিরের রচনাগুলিই এবারে সর্ব্বপ্রধান। মাপজোখের বিচারে মূর্ত্তিগুলির মধ্যে খুঁৎ আবিষ্কার কেহ কেহ করিবেন। তবে কথা এই যে, শিল্পকলার ক্ষেত্রে অস্থি-সংস্থানের ত্রুটি অপেক্ষা চিত্ত-সংস্থানের ত্রুটি-সংশোধন কঠিন; সেই চিত্তদৈন্য পরিস্ফুট প্রদর্শনীর অন্য অনেক নিখুঁত ভাস্কর্য্য-রচনার মধ্যেই। খাস্তগির মহাশয় তাঁহার "শীত", "জলদান" "সখী" মূর্ত্তিগুলিতে সবলতা সঞ্জীবতা ও জিজ্ঞাসু পরীক্ষাপ্রিয় মনের পরিচয় প্রভূতভাবেই দিয়াছেন—এই গুণগুলি না থাকিলে, কোনও সুডৌল, মাপজোখে নিখুঁত, চিত্র বা মূর্ত্তির বিশেষ কোন মূল্য থাকে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীক্ষিতীশ রায় কর্ত্তৃক গঠিত সুন্দর "শকুন্তলা" মূর্ত্তি এইবার প্রদর্শনীতে সাধারণের দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। ১৯৩৩ সালে ইহা রয়াল অ্যাকাডেমিতে প্রথম প্রদর্শিত হয়—উক্ত অ্যাকাডেমিতে ইহাই সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়ের শিল্পনিদর্শন।

শ্রীপ্রদোষ দাসগুপ্তের মূর্ত্তিতে "বয়সের ভার"-পীড়িতের মুখপট ও অঙ্গবিন্যাসে বার্দ্ধক্যের ভাবটি শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচায়ক। শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য্যের "বাগ্মী" মূর্ত্তিটিও উল্লেখযোগ্য।

বিলাত হইতে প্রেরিত শিল্পী রিচার্ড গার্বের তরুণী-মূর্ত্তিটির নিরলঙ্কার তনুভঙ্গিমা সুগঠিত।

তেলরঙে-আঁকা ছবির মধ্যে শ্রীললিতমোহন সেনের ব্রহ্মদেশীয় বিবিধ বিষয় লইয়া আঁকা ছবিগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্বপূর্ণ। আলোর খেলা তিনি কতকগুলি ছবিতে বিশেষ চাতুর্য্য ও কৃতিত্বের সহিত দেখাইয়াছেন—"সূর্য্যালোক" ছবিখানি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন, "দুয়ারে" ছবিখানিও এই জন্য উল্লেখনীয়। লক্ষ্ণৌ শিল্পবিদ্যালয়ের তাঁহার কয়েকজন ছাত্রও এই ধরণে আলোকসম্পাত দেখাইয়া সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। বৌদ্ধ-মন্দিরের উপাসনার ও অন্যান্য নানা দৃশ্যও শ্রীললিতমোহন সেন সুকৌশলে আঁকিয়াছেন।

শ্রীকালিদাস করের "মধ্যাদিনের" ছবিখানি, শ্রীহরিসাধন দত্তের "সমস্যা" তেল-রঙে উল্লেখযোগ্য চিত্র। রান্নাঘরে শিশুগুলিকে সামলাইবেন কি রান্নার দিকে নজর রাখিবেন, প্রতিদিনকার এই সামান্য সমস্যায় দ্বিধান্বিতার চিত্রটি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীঅতুল বসুর কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যগুলি মনোরম। স্কেচগুলির মধ্যে শ্রীঅবনী সেনের বৃদ্ধার মুখ উল্লেখযোগ্য; শ্রীসরসী রায়ের সিংহের ছবি কয়েকটি টানে ভাল ফুটিয়াছে।

ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির প্রদর্শনীতে (৩০ ডিসেম্বর—১১ জানুয়ারি) অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের ছবি না দেখিয়া প্রথমেই মন ক্ষুব্ধ হয়—শ্রীনন্দলাল বসুও মাত্র একটি ছবি দিয়াছেন। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের একটি ছবি তাঁহার চিরাগত ধারায় অঙ্কিত সুন্দর ছবি।

লক্ষ্ণৌ শিল্পবিদ্যালয় হইতে অনেকগুলি ছবি ইত্যাদি এই প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল। শ্রীবীরেশ্বর সেনের ছোট দৃশ্যচিত্রগুলি উজ্জ্বল বর্ণসম্পাতে সুন্দর, তাঁহার সূক্ষ্ম তুলিকার

সু-অঙ্কিত। তাঁহার ছাত্রদের ছবিতেও এই সূক্ষ্ম তুলিকা, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু মনকে পূর্ণতর আনন্দ দিবার আয়োজন এগুলিতে নাই; সম্ভবতঃ সে উচ্চাশাও এ-ছবিগুলির নাই। শ্রীব্রজমোহন জিজ্যার পাহাড়ের দৃশ্য ও পাহাড়িয়া জীবনযাত্রা লইয়া অঙ্কিত ছোট ছবিগুলি সুন্দর—কিন্তু ইহার মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি বৃহত্তর পটভূমিকায় আঁকা হইবার অপেক্ষা রাখে—অল্প পরিধির মধ্যে, পাহাড়ের ও পাহাড়িয়া জীবনযাত্রায় উদার পরিসর ও উন্মুক্ততা পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। শ্রীপ্রণয়রঞ্জন রায়ের প্রসাধন ছবিটি রেখাবিন্যাসে ও ভঙ্গিমায় সুন্দর। শ্রীঅসিতকুমার হালদার এবারে প্রদর্শনীতে ছবি দেন নাই, কতগুলি সুগঠিত প্লাক দিয়াছেন।

শ্রীক্ষিতীশ রায়ের করা নগ্নমূর্ত্তিটি সোসাইটি-গৃহে বেসুরো ঠেকিল।

শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার ছবি দুইটিতে আলোছায়ার খেলা চাতুর্য্যের সহিত দেখাইয়াছেন।

সোসাইটির শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত, শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়, শ্রীনীরদ মজুমদার, শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্তের কয়েকটি ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শান্তিনিকেতনের শ্রীরামকিঙ্কর বেইজের ছবিখানিতে রবীন্দ্র-রীতি ও শ্রীনন্দলাল বসুর আধুনিক কতকগুলি ছবির প্রভাব দেখি। এই সুদক্ষ শিল্পী ভাস্কর্য্যেও কৃতী, তাঁহার নবতম পদ্ধতির মূর্ত্তির নিদর্শন কিছু প্রদর্শনীতে থাকিলে আনন্দের বিষয় হইত। শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের শিল্পচর্চ্চায় তাহার সবল স্বকীয়তা পারস্ফুট—এই বারে তিনি বেশী কিছু ছবি দেন নাই কিন্তু তাঁহার "হাওড়া ষ্টেশন" ও "লিথোপ্রেস" লিথোগ্রাফ দুইটিতেও তাহা প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীযমুনা বসুর "বিধবা" ছবিটি পরিমিত শোভন বর্ণবিন্যাসে ও স্থানপূর্ণ রেখাপাতে সুন্দর; তাঁহার "বর্ষা-উৎসব" ছবিখানিও দর্শনীয়। তাঁহার ছবিতে ও লিনো-কাটগুলিতে পটের ধারা স্পষ্ট আছে—এই রীতির কাঠ-খোদাইগুলির সহিত পাশাপাশি গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের ছাত্রদের কাঠখোদাইগুলির রীতি-পার্থক্য তুলনীয়। শ্রীনিবেদিতা ঘোষের চিত্রে উপবেশন-ভঙ্গী ও মুখাভাসে প্রিয়-প্রতীক্ষাব্যগ্র বধূর ছবি সুন্দর ফুটিয়াছে।

সোসাইটিতে প্রদর্শিত শান্তিনিকেতন কলাভবন ও আর্টস্কুলের রঙীন উড্‌কাট, এচিং ও লিথোগ্রাফগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল,—এখনও এই সকল কারুপদ্ধতির ছবিগুলি শিল্পীসমাজের বাহিরে যথাযথ সমাদর লাভ করে নাই। শ্রীবিশ্বরূপ বসু জাপান হইতে রঙীন উডকাটের পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার করা অবনীন্দ্র-নাথের "পদ্মপত্রে অশ্রুজল" নামক বিখ্যাত ছবির রঙীন উড্‌কাট-প্রতিলিপিতে মূল চিত্রের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ। এগুলির যথাযোগ্য সমাদর না হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে।

সোসাইটিতে প্রদর্শিত শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার ড্রাইপয়েণ্ট ও রঙীন কাঠখোদাইগুলিতে বাংলার নৌকার ও নদীতটের সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন রূপ দেখাইয়াছেন। রমেন্দ্রবাবু ইহা ছাড়া বারাণসীর কতকগুলি রঙীন স্কেচও দিয়াছেন। বস্তুত এই শিল্পী বিভিন্ন কারুপদ্ধতিতেই যে-ভাবে সহজ শক্তি দেখাইয়াছেন তাহা সকল শিল্পীতে সুলভ নয়।

এই সকল প্রদর্শনীতে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সুনির্ব্বাচিত চিত্র প্রদর্শনের দিকে ততটা লক্ষ্য রাখেন নাই, প্রদর্শনী বড় করিবার দিকেই ঝোঁক বেশী দিয়াছেন; ইহা পরিতাপের বিষয়। তৎসত্ত্বেও বাংলা দেশের আধুনিক তরুণ শিল্পীরা শুধু পূর্ব্ব রীতিতে আবদ্ধ না থাকিয়া বিদেশীয় কারু ও শিল্পরীতিরও চর্চ্চা করিতেছেন এই প্রদর্শনীগুলিতে তাহা লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তবে এই বিভিন্ন কারু ও পদ্ধতি তাঁহারা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারিবেন এরূপ আশা করি; প্রদর্শনীর অনেক ছবিতে তাহার পরিচয়ও আছে।

সেতু (উড্-এনগ্রেভিং)—শ্রীপূর্ণেন্দু বসু

বাংলা

শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসব

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্ম্ম-দীক্ষার স্মরণকল্পে প্রতিবৎসর ৭ই পৌষ তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমে উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে। শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্র ও অধ্যাপকগণও এই সময়ে তাঁহাদের বার্ষিক সম্মিলনে সমবেত হন। এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহা এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্রদের বার্ষিক উৎসবে সমবেত প্রাক্তন ছাত্রগণ ও রবীন্দ্রনাথ
(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশি কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

উৎসবান্তে "শ্যামলী" গৃহের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ
(শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সেন কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

"শ্যামলা" গৃহের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ
(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশি কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

পূর্ব্বতন ছাত্রদের প্রীতিসম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ
(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশি কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

৭ই পৌষের মেলার একটি দৃশ্য

স্বর্গীয় বিপিনবিহারী গুপ্তের চিত্র-প্রতিষ্ঠা

গত ৭ই ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় স্বর্গীয় বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। তৈলচিত্রটি মাননীয় বিচারপতি সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল শ্রীউপেন্দ্রলাল মজুমদার, শ্রীমোহিনীকান্ত ঘটক ও শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাঃ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত য়্যাকাউণ্টস্ অফিসার শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমণীন্দ্রকুমার মিত্র, জমীদার রমণীকান্ত রায় ও ডাঃ শ্রীঅন্নদাপ্রসন্ন ঘটক এই চিত্রখানি প্রেসিডেন্সি কলেজে উপহার দিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় বিপিনবিহারী গুপ্তের ছাত্রজীবনের ও কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলে, অধ্যক্ষ শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বাল্যবন্ধু হিসাবে, আচার্য্য সর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় সহকর্ম্মী হিসাবে, ব্যারিষ্টার মিঃ এস. এন. ব্যানার্জ্জি ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে ও রায়বাহাদুর গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অধীনস্থ কর্ম্মচারী হিসাবে

স্বর্গীয় বিপিনবিহারী গুপ্ত

বিপিনবাবুর জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অবশেষে শ্রীবিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল মহাশয় যে-প্রবন্ধটি পাঠ করেন তাহার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"অসামান্য প্রতিভাবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় পরীক্ষা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের অধ্যাপকের কার্য্যে তিনি ব্রতী হন। তখনকার সময়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ যুবকের পক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হওয়া সহজ কথা ছিল না। কেবল মাত্র আপনার প্রতিভা-বলেই তিনি এই উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ ১৮ বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপনা করিয়া তিনি ছোটনাগপুরের ইন্‌স্পেক্টার অব্ স্কুলস হন এবং তথা হইতে ১৯০১ সালে কটক কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া ৮ বৎসর তথায় অবস্থান করেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে কটক কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। উড়িষ্যার ইতিহাসে তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। উড়িষ্যার বিশ্ববিদ্যালয়-পরিকল্পনার বীজ তিনি বপন করেন। নবজাগরিত উড়িষ্যা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কটক কলেজ হইতে তিনি হুগলী কলেজে স্থানান্তরিত হন। হুগলী কলেজে যে যুবক একদিন বিদ্যার্থী হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, কে ভাবিয়াছিল একদিন তিনিই এই কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসিবেন।

তাঁহারই চেষ্টার ফলে সরকারী কলেজে কর্ত্তৃপক্ষ নির্দিষ্টসংখ্যক দরিদ্র ছাত্রদিগকে বিনা-বেতনে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপন শক্তির উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং এই বিশ্বাসের বলে তিনি জীবনে বহু প্রতিকূল ঘটনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া উন্নতির আসনে সমাসীন হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অকপট, সরল, শিষ্টাচারী, বিনীত, স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি বাঙালীর মধ্যে কেন, যে-কোন সমাজে বিরল।"

স্বর্গীয় ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু

সুপ্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাঃ বসু দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, চিকিৎসকে মহৎ জীবিকাকে তিনি কেবলমাত্র অর্থাগমের উপায় বলিয়াই গ্রহণ করেন নাই, ব্রত বলিয়া জানিয়াছিলেন।

ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বসু

আসাম-বঙ্গীয়-সারস্বত-মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেব

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী নিগমানন্দ বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ ৫৭ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তিনি আসাম প্রদেশে একটি ও বাংলা প্রদেশের পাঁচ বিভাগে পাঁচটি সারস্বত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্মস্থান নদীয়া কুতুবপুরে একটি উচ্চ-ইংরেজী-বিদ্যালয়, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও রোগীনিবাস স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেব

বৎসর তাঁহার গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্ত ও শিষ্যবর্গের মিলনের জন্য একটি ভক্ত সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ

প্রবাসে কৃতী বাঙালী

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য ঢাকার টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে বড়োদা সরকার তাঁহাকে তত্রত্য টিচার্স ট্রেনিং কলেজের পরিচালনার জন্ম আমন্ত্রণ করেন। এই নূতন কর্ম্মে ব্রতী হইয়া তিনি প্রভূত যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। প্রবাসী বাঙালীর এই সমাদরে সকল বাঙালীই আনন্দিত হইবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন বসু

বরোদা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যক্ষ শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য (মাল ভূষিত

রেঙ্গুন-প্রবাসী শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন বসু রেঙ্গুন মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম-বি, বি-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৩৪ সালের জুন মাসে বিদেশে গিয়া লণ্ডনে এম-আর-সি-এস, এল্-আর-সি পি ও ডি-টি-এম-এইচ পরীক্ষায় ও গত অক্টোবর মাসে এডিনবরায় এম-আর-সি-পি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহা তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

শ্রীপ্রভাতকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীঅনিলচন্দ্র মিত্র

শ্রীঅনিলচন্দ্র মিত্র ১৯৩২ সালে বিলাতে গিয়া এরোনটিক্যাল ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হন এবং পরে হাই-কমিশনারের সহায়তায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিমান-বিভাগে কাজ করেন। সমগ্র ইউরোপের এয়ার-লাইনের ইনজিনিয়ারিং কাজ দেখিয়া তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীপ্রভাতকুমার সেনগুপ্ত সম্প্রতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মৌলিক গবেষণার জন্য ডি-এসসি উপাধি লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি কোলাপুর রাজারাম কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা মহাশয়ের অধীনে কিছুকাল গবেষণা করেন এবং সেই গবেষণাপ্রসূত বহু প্রবন্ধ ও আলোচনা দেশে ও বিদেশে বৈজ্ঞানিক সমাজে সমাদৃত হইয়াছে।

শ্রীঅধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষীয় নৌ-বিভাগে সব্-লেফ্‌টন্যাণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি দুই বৎসরকাল ইংলণ্ডে নৌ-বিভাগে শিক্ষা লাভ করেন এবং ক্যাডেটশিপ পরীক্ষায় (Final Cadetship Examination) প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন।

—

বিদেশ

বিদেশে প্রাচ্যদেশীয় ছাত্রদের সম্মিলন

দুই বৎসর পূর্ব্বে রোমে যে প্রাচ্যদেশীয় বিদ্যার্থী-সংসদের সূচনা হয় এই বৎসর ওর্টিসিতে তাহার প্রতিনিধি-সভার একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার আলোচ্য বিষয় ছিল "প্রাচ্যদেশ-সমূহের সংস্কৃতিগত ঐক্য"। অক্সফোর্ডের শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিদিগের অধিনেতা ছিলেন। তিনি এই অধিবেশনে 'ভারতবর্ষ ও এশিয়ার সমস্যা' সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে নানাবিধ আলোচনা হয়। প্রাচ্যদেশীয় বিদ্যার্থীদের এইরূপ সম্মিলন শুধু তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে নয়, পরন্তু পূর্ব্ব-ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্যবৃদ্ধির পথ সুগম করিয়া তুলিবে।

সম্মিলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিবর্গ

সম্মিলনের প্রতিনিধিবর্গ

ভ্রম-সংশোধন

গত পৌষ মাসের "বিবিধ প্রসঙ্গে" ৪৩২ পৃষ্ঠায় "চীনে ছাত্রদের মধ্যে আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছিল" মুদ্রিত হইয়াছিল। তৎপরিবর্ত্তে "বি[illegible]" প্রসঙ্গে "জাপানী যুবক ও বালকেরা অসাধারণ সাহস ও... "চীন যুবক ও বালকেরা..." পড়িতে হইবে

বর্ত্তমান সভ্যতা ও ক্ষয়রোগ

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

সভ্যতার সত্য রূপ যে কি তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। পূর্ব্বে যাহা সভ্যতা ছিল, তাহা বর্ত্তমানে অসভ্যতা; এখন যাহা সভ্যতা ভবিষ্যতে হয়ত তাহাই আবার অসভ্যতা হইবে। 'সভ্যতা' কথাটিতে আমাদের মস্তিষ্কে কতকগুলি ভাবের উদয় হয়। কিন্তু সে ভাবগুলি দেশবিশেষে এবং মনুষ্যবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। শ্রীকৃষ্ণ কংসের সভায় প্রবেশ করিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখিয়াছিল। কিন্তু সত্যই শ্রীকৃষ্ণের আকৃতি একরূপই ছিল। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সমাজ-সংস্কারক—প্রত্যেকের নিকট সভ্যতার রূপ, কিয়ৎপরিমাণে ভিন্ন হইলেও প্রকৃতি প্রায় এক। প্রথমতঃ, যেদেশে যন্ত্রশক্তি যত বেশী সে-দেশ তত সভ্য। দ্বিতীয়তঃ, যেদেশে জীবিকা-অর্জ্জন যত কষ্ট-সাধ্য এবং জীবিকা-নির্ব্বাহ যত ব্যয়সাপেক্ষ, সে-দেশ তত সভ্য। তৃতীয়তঃ, যেদেশে মাতৃজাতি প্রকৃতির বিরুদ্ধে যত বেশী যুদ্ধ করিতেছেন এবং জয়লাভ করিতেছেন বলিয়া ভাবিতেছেন, সেদেশ তত বেশী সভ্য। প্রকৃত সভ্যতার রূপ এমনই কিনা কে জানে। একমাত্র কালের বিবর্ত্তন তাহা প্রমাণ করিতে পারে।

তথাকথিত সভ্যতার বর্ত্তমানকালীন রূপ ইহাই কল্পনা করিলে বেশী ভুল করা হয় না, এবং আমাদের দেশের পূর্ব্ব সভ্যতারও কোন গ্লানি করা হয় না। এই তথাকথিত সভ্যতার সহিত ক্ষয়রোগের অতি নিকট-সম্পর্ক। নিউ ইয়র্কের পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল স্কুলের ক্ষয়রোগতত্ত্বের অধ্যাপক প্রফেসার এডলফাস রুফ-মার্কিন ভিষগ্‌মণ্ডলীর দ্বিচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে, সভ্যতার সহিত ক্ষয়রোগে যন্ত্রণাভোগ এবং মৃত্যুর সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা-কালে মন্তব্য করেন,

"ক্রাফ্‌ট-এবিং এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে সভ্যতা ও উপদংশ উভয়েই একত্র অবস্থান করে। ক্ষয়রোগ সম্বন্ধেও আমার তাহাই বলিতে আকাঙ্ক্ষা, কারণ ক্ষয়রোগেরও প্রকৃতই সভ্যতার সহিত অভিন্ন স্থিতি।"*

কি কারণে সভ্যতার সহিত ক্ষয়রোগের এত প্রীতি?

সভ্যতার আগমনের সহিত তাহার কতকগুলি প্রিয় অনুচরও আগমন করে। যথা, কলকারখানা। অর্থাৎ ইণ্ডাষ্ট্রি এবং তাহার চিরসহচরবৃন্দ—ধূসরধূম্রধূলিমলিন দরিদ্র শ্রমিক, ধীরমস্তিষ্ক কূটবুদ্ধি অর্থশালী প্রভু, ধিক্কার, হাহাকার, ক্রন্দন প্রভৃতি। খনিতে কাজ করিতে দুর্ঘটনা হইতে পারে, তাই বলিয়া খনির কাজ বন্ধ হইতে পারে না। অথবা ধূম, ধূলি ও দূষিত বাষ্প নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া লোকে ক্ষয়রোগের গ্রাসে সহজেই পড়িতে পারে, সেজন্য কারখানা বন্ধ হইতে পারে না। আমাদের যে সভ্যতা তাহার আনুষঙ্গিক উপকরণ চাই!

যন্ত্রদানবের আগমনের সঙ্গে দেশে আরও কয়েকটি পরিবর্ত্তন হয়। যন্ত্রচালনার জন্য কিছু মানবশক্তিরও প্রয়োজন। এই শক্তি সরবরাহ করে দরিদ্র শ্রমিক। তাহারা পূর্ব্বে হয়ত গ্রামে বাস করিত, চাষ-আবাদ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিত, প্রকৃতির উন্মুক্ত বায়ু হইতে জীবনীশক্তি গ্রহণ করিত। হঠাৎ শহরের আবহাওয়া, জনসমাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর বস্তি, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও নিকৃষ্ট পল্লীর অন্যান্য অসংযমের মধ্যে আসিয়া, তাহা[illegible] সুদৃঢ় শরীর ভাঙিয়া যায়, রোগের সহজ লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়ে। ইহার প্রমাণ, আমেরিকায় যে-সমস্ত শ্রমিক ইতালী অথ[illegible] আয়ার্লাণ্ড হইতে আগমন করে, তাহাদের মধ্যেই ক্ষয়রো[illegible]

---

* "Krafft-Ebing once said that civilization a[illegible] syphilization go hand in hand. I am tempted to say [illegible] same of tuberculosis, for civilization and tuberculizat[illegible] do seem indeed to go also hand in hand" (The Effe[illegible] of Civilization on the Morbidity and Mortality of Tub[illegible]culosis—By S. Adolphus Knopf M.D. Read before [illegible] American Academy of Medicine at its 42nd annu[illegible] meeting in New York City, June 4, 1917. Medi[illegible] Records. New York, 1917, vol. xcii, pp. 94-97).

প্রাদুর্ভাব অতি বেশী। ইতালীর নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার লোকে উন্মুক্ত বায়ুতেই বেশী সময় থাকিতে অভ্যস্ত। ইহারা হঠাৎ জনবহুল, অসূর্য্যম্পশ্য, রুদ্ধবায়ু, অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে বাস করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে থাকায় সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। যাহারা সেই অবস্থাতেই থাকিতে অভ্যস্ত তাহারা কিঞ্চিৎ অধিক সহ্য করিতে পারে।

ইহারা কঠিন রোগাক্রান্ত ত হয়ই, ক্রমে মানুষ নামেরও অযোগ্য হইয়া পড়ে। এইরূপ একটি পরিবারের পুরুষের হয়ত ক্ষয়রোগ হইল। তাহার উপার্জ্জনের আর ক্ষমতা রহিল না। দুই তিনটি সন্তান সহ তাহার পরিবারের ভরণপোষণ চালায় কে? পরিবারের সব কয়টি প্রাণীর একই কক্ষে বাস। এইরূপ শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় রোগ যে সবগুলিকে আক্রমণ করিবে তাহাতে কোন ভুল নাই। পেটের দায়ে সকলে ভিক্ষায় বাহির হইল। রোগও বিস্তারলাভ করিবার সুযোগ পাইল। ইহা আরামকেদারাস্থিত তামাকুসেবী প্রভুর হয়ত কোন হানি করিল না, কিন্তু পশুর অপেক্ষাও হীন অবস্থায় একটি মানব প্রাণত্যাগ করিল। ইহার ব্যাঘাত ঘটাইতে কেহ অনশনব্রত-গ্রহণ আবশ্যক বিবেচনা করিল না।

এই সম্পর্কে নিউইয়র্কের জেনারেল সেসন্স কোর্টে চুরির অপরাধে ধৃত এক স্ত্রীলোকের বিচারের রায়ের সারাংশ উল্লেখ করিতেছি,

"এই স্ত্রীলোকের ক্ষয়রোগগ্রস্ত স্বামীকে কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্য-চ্যুত করিয়াছে। কেন-না, এই অবস্থায় সে শিশুদিগের বস্ত্র প্রস্তুত করিতে থাকিলে নির্দ্দোষ শিশুগণ ঐ রোগ-গ্রস্ত হইবে। ইহা আইনসঙ্গত। সুতরাং তাহার স্বামীর আজ চার বৎসর কোনও কাজ নাই। কিন্তু তাহার গৃহে সন্তান জন্মিতেছে, এবং সেই সন্তানদিগের ক্ষয়রোগগ্রস্ত না হইয়া উপায় নাই। তাহারা বড় হইতেছে এবং তাহারা তাহাদের পিতার পন্থাই অনুসরণ করিতেছে, তাহাতে আইন-ভঙ্গ হইতেছে না। ইহারা জন্মনিরোধ করিতে চেষ্টা করিলে আইনের সীমা লঙ্ঘিত হয়। প্রশ্ন মনে উঠে, এ বিষয়ে আমাদের উপযুক্ত আইন আদৌ আছে কিনা। আমার মনে হয়, আমরা এখন এমন বিপুল অজ্ঞতার মধ্যে বাস করিতেছি, যাহা ভবিষ্যতে অতি ভয়াবহ বলিয়া মনে হইবে। তাই আমরা এখানে একটি পরিবার দেখিতেছি, যাহার পুরুষ ক্ষয়রোগগ্রস্ত, স্ত্রীর কক্ষে একটি সন্তান এবং অঞ্চলপ্রান্তে আরও কয়েকটি। তাহাদের অর্থ নাই। পরিবারকে অনশন হইতে রক্ষা করিতে স্ত্রী ভিক্ষা করে। ভিক্ষা না পাইয়া সে চুরি করিয়াছে। আমি তাহাকে শাস্তি দিতে পারিব না। বিচার বন্ধ রহিল।"*

প্রকৃতই এই সব পরিবারের কষ্টের আর সীমা নাই। ইহাদের অবস্থা কঠিনহৃদয় বিচারকদিগকেও মাঝে মাঝে দয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য করে। এইরূপ দুঃখী অনেক দেশেই কিছু কিছু আছে। কিন্তু আমাদের দেশের তুলনায় তাহা নগণ্য। ইহাদের সংখ্যা ক্রমশ আরও বেশী হইবে। দেশ যতই সভ্য হইতে থাকিবে, কলকারখানা ততই বাড়িবে, শ্রমিক সংখ্যা আরও বেশী হইবে, সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যা প্রবলতর হইবে।

আমাদের দেশে কেবল শ্রমিক নহে, অধিকাংশ মধ্য-বিত্ত লোকেরও এই অবস্থা, তাহারও অন্যতম কারণ সভ্যতা। তথাকথিত সভ্যতার ইহাও একটি লক্ষণ যে মানুষ গ্রাম অপেক্ষা শহরে বাস করিতে ভালবাসে। কয়েকজনকে হয়ত বাধ্য হইয়াও বাস করিতে হয়। অথচ শহরে ভালভাবে থাকার উপযুক্ত অর্থ তাহাদের নাই। কাজেই ঠিক শ্রমিকদের অবস্থাতেই তাহাদের পড়িতে হয়। একটি মাত্র কক্ষে সমগ্র পরিবার বাস করে। অতি অস্বাস্থ্যকর যে কক্ষ। সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একমাত্র পুরুষের উপার্জ্জনে সকলের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। সকলের অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিতে হয়। তাহার উপর শহরে সংযমের বন্ধন ছিন্ন হওয়াও অতি সহজ। সুতরাং, সম্পূর্ণ পরিবারের বিসর্জ্জন। এই প্রকার পরিবারের প্রতি ক্ষয়রোগের আকর্ষণ অতি বেশী। মাতাই বেশীর ভাগ আক্রান্ত হয়। তার পরের পালা নির্দ্দোষ শিশুর। এই-সব পরিবারের শিশুরা বঙ্গের ভবিষ্যৎ। কিন্তু এইরূপে যাহাদের জন্ম ও গঠন, দেশ তাহাদের নিকট কি আশা করিতে পারে!

---

* Judgment of Hon. Judge William H. Wadhams of the Court of General Sessions—Med. Rec., 1917 N. Y. xcii.

ফ্রান্সে যখন এই সমস্যা উঠিয়াছিল, তখন গ্রাঁশে-পন্থীরা ("Oeuvre Grancher") তাহার কিছু সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জার্ম্মেনীতে তখন স্যানাটোরিয়াম একটির পর একটি করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাতে রোগ-গ্রস্তের চিকিৎসার কার্য্য এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে রোগ-বিস্তার-প্রশমনকার্য্য সম্পন্ন হইত বটে, কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ যাহারা,—শিশুদিগের কোনই উপকার হইত না। পিতামাতা স্যানাটোরিয়ামে থাকিলে সন্তানের অযত্নের আর সীমা থাকে না। জার্ম্মেনীতে যাহা অপূর্ণ ছিল, অধ্যাপক গ্রাঁশে তাহা পরিপূর্ণ করিতে একটি নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। পাস্তুর অলক্ষ্যে প্রেরণা দিলেন।

লুই পাস্তুর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রেশমশিল্পের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। তিনি রেশম-কীটের শিশু-অবস্থাতে মৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ঐ পতঙ্গের ব্যাধির কারণ একটি ক্ষুদ্র জীবাণু। প্রজাপতি সেই জীবাণুকে যে-পাতার উপর ডিম্বকোষ থাকে সেই পাতার উপর বহন করিয়া আনে। ডিম্বকোষ কাটিলে পতঙ্গশিশু বাহির হইয়া ঐ জীবাণু ভক্ষণ করে ও মৃত্যু বরণ করে। পাস্তুর দেখিয়াছিলেন যে উহারা জন্মাবধি রোগাক্রান্ত নহে। কেননা ডিম্বকোষ ফাটিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই যদি পতঙ্গের স্থান পরিবর্ত্তন করা যায়, তবে তাহার রোগও হয় না, মৃত্যুও হয় না।

এই দৃষ্টান্ত হইতে প্রফেসার গ্রাঁশে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছিলেন। শিশু ক্ষয়রোগ লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। পরে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় রোগাক্রান্ত হয়। কাজেই যে-সব পরিবার দুঃস্থ এবং তাহাদের কেহ ক্ষয়রোগগ্রস্ত, সেই পরিবারের শিশুকে স্থানান্তরিত করিলে, তাহারা ভালভাবে বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পায়। গ্রামে যদি কোনও পরিবার পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকে, এবং সেই পরিবারের স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র যদি ভাল হয়, এই সব শিশুর ভার তাহাদের উপর অর্পণ করা হয়। হয়ত মনে হইবে, ইহা অতি নিষ্ঠুর কার্য্য। কিন্তু তাহাই যদি হইবে, লোকে আমাদের দেশে পোষ্যপুত্র দান ও গ্রহণ করে কি করিয়া! সন্তান যাহাতে সুস্থ, সবল ও সুখী হয়, ইহা সকল পিতা-মাতারই কাম্য। গ্রাঁসেপন্থীগণের কার্য্য সার্থক হইয়াছে। তাহারা পরে আমেরিকান রেডক্রস হইতে সাহায্য লাভ করিয়া কার্য্য আরও অগ্রসর করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সব শিশু ফ্রান্সের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ *Apache* (লাল লোকের জাত)। উৎকৃষ্ট দৈহিক শক্তি ও উন্নত নৈতিক চরিত্র লইয়া ইহারা গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে।

সভ্যতার আর একটি নিদর্শন মাতৃজাতির বিদ্রোহ। প্রকৃতি-মাতার আইন অনুসারে তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য যে সন্তান পালন তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। জাগ্রৎ অবস্থায় নিদ্রিতের ভান করিলে কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ করা অসম্ভব। এ-দেশে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক-পত্রসমূহে, সিম্পাঞ্জী তাহার শাবককে কি ভাবে পালন করিতেছে, বাঘিনী তাহার শাবকদের লইয়া কি করিতেছে এমনই নানা প্রকার ছোট, বড়, রঙীন ছবি প্রকাশিত হয়। সকলেই বুঝে সন্তানপালনই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু তাহাতে কি? হয়ত আধুনিক নারীর সন্তানপ্রীতি সমানই আছে। কিন্তু অন্যান্য কর্ত্তব্যও ত আছে এবং একটু বেশী রকমেই আছে। সুতরাং ফিডিং বোতলেই সন্তানের তৃপ্তিলাভ হয়। অতি গরিব যাঁহারা, খাদ্যাভাবজনিত স্তন্যদুগ্ধাল্পতার জন্য ইচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহারা কর্ত্তব্যপালন করিতে পারেন না। কাজেই ধনী দরিদ্র উভয় সম্প্রদায়েরই অসহায় শিশুরা তাহাদের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুহূর্ত্তগুলি হইতে বঞ্চিত হয়। এই সব শিশুর ক্ষয়রোগ-আক্রমণচিহ্নের পরীক্ষা (Tuberculiu test) করিলে, শতকরা নব্বই জনের যে রোগচিহ্ন পাওয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

হয়ত নিয়মলঙ্ঘনরুষ্টা প্রকৃতিমাতার ইহা নিদারুণ প্রতিশোধ। মানব প্রকৃতিদেবীকে যতই অবমাননা করিতেছে, ততই নিজেদের ধ্বংস আনয়ন করিতেছে। অমানুষিক শক্তি মানুষ লাভ করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহা পরস্পরের ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। মানব প্রকৃতিদেবীকে বন্দিনী করিয়া বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইতেছে। কিন্তু আপনার অজ্ঞাতে নর সেই প্রকৃতিদেবীর পদমূলেই নরবলি দিয়া চলিয়াছে।

সভ্য দেশে পশুপ্রীতি প্রবল। তথায় পশুক্লেশ-নিবারণী-সমিতির (S. P. C. A) অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা।

ইংলণ্ডে রোগীর মঙ্গলের জন্তও একটি গিনিপিগ্ হত্যা করিতে হইলে বহুপ্রকার চেষ্টা করিতে হয় ও বহু আইন মানিয়া চলিতে হয়। সম্ভবতঃ, সভ্য দেশে মানুষের প্রাণ অপেক্ষা গিনিপিগের প্রাণের মূল্য বেশী।

সভ্য জগতে শিশুজীবনের প্রারম্ভ এইরূপ। শিশু রোগাক্রান্ত হইয়া রহিল। যখন যৌবন আসিল, তখন আর একবার তাহাদের অদৃষ্ট পরীক্ষার অবসর আসিল। এই দ্বিতীয়বার যদি তাহারা অধিক পরিমাণে জীবাণু গ্রহণ করিতে পারে, অথবা অনাহার, অসংযম, অতি-পরিশ্রম, দুঃখ, শোক, দূষিত বায়ু, সূর্য্যালোকের অভাব প্রভৃতির দ্বারা শরীরের রোগনিবারণী শক্তি এমনভাবে লোপ করিতে পারে যে, শৈশবে প্রথম যে-রোগ আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু শরীর তাহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল তাহা পূর্ণ বিক্রমে পুনরায় আক্রমণ চালায়, তাহা হইলে আমরা তাহাদের শরীরে ক্ষয়রোগের যে সর্ব্বজন-পরিচিত রূপ, তাহার প্রকাশ দেখিতে পাই। আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির অনেকের পক্ষে ইহা এক অশুভ কাল। তাহারা তখন অন্যরূপ জীবনে পদার্পণ করিতেছে। আর ক্ষয়রোগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রম জীবনের এই সন্ধিক্ষণেই।

যাহারা সেই কাল অতিক্রম করিতে পারিল, তাহারা যদি পরে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারিত, তবুও কিছু মঙ্গল ছিল। কিন্তু তাহা অসম্ভব। শৈশবেই যাহার অঙ্কুর শরীরে স্থান পাইয়াছে, শারীরিক কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি পাইলেই তাহার বিস্তার আরম্ভ হইবে। শৈশবাবস্থায়ই অধিক-সংখ্যক লোক এই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। তাহার দ্বিতীয় আক্রমণ নির্ভর করে দেশের স্বাস্থ্যসহায়ক প্রতিষ্ঠান এবং তাহাদের কার্য্যকলাপের উপর। যে দেশে স্বাস্থ্যরক্ষাকার্য্য ভালভাবে অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম্মীগণ প্রেরণা লইয়া কাজ করেন, সে দেশে দ্বিতীয় ও প্রধান আক্রমণ সহজে ঘটিতে পারে না। যে দেশে উহার শৈথিল্য যত বেশী সে দেশে ক্ষয়রোগের বিস্তারও সেই পরিমাণে অধিক।

কি উপায়ে উহার গতি শমিত করা সম্ভব, যাঁহাদের উপর ইহার ভার ন্যস্ত তাঁহারা তাহা ভালরূপেই জানেন। একটু লোকপ্রীতি ও একটু বেশী উৎসাহ লইয়া কার্য্য করিলে ইহার গতি যে প্রশমিত হইবে সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কেন-না প্রতি দেশেই ইহা ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। তথাপি একবার উপায়গুলি বিবৃত করিব, এবং তাহা তথাকথিত সভ্যতার মাপকাঠিতে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যদেশ যে আমেরিকা তাহার বৃহত্তম শহর নিউইয়র্কের বৃহত্তম ক্ষয়রোগ-শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যাপক প্রফেসার এডলফাস্ নফের ভাষায় প্রকাশ করিব,

"সর্ব্বপ্রথমেই জনসাধারণকে ক্ষয়রোগ নিবারণ সম্বন্ধে শিক্ষাদানের অধিকতর চেষ্টা করিতে হইবে। ক্ষয়রোগগ্রস্ত জনকজননীকে বুঝাইতে হইবে যে রোগের সক্রিয় অবস্থায় সন্তানজনন অনুচিত। সন্তানগণকে মাতৃদুগ্ধ দানের প্রেরণা মাতার মনে জাগাইতে হইবে। কৈশোরে শ্রমিকের কার্য্য দেশের পথে অমঙ্গলজনক বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে। স্কুলে পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী উচ্ছেদ করিয়া নূতন ঈষৎ পরিবর্ত্তিত গ্যারী প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং তৎসহিত উন্মুক্ত বায়ুতে অধিক সংখ্যক ক্লাস হওয়ার ব্যাবস্থা থাকিবে। কারখানার আবহাওয়া স্বাস্থ্যজনক করিতে হইবে। বস্তিসমূহ এবং বাসকক্ষগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে উহা স্বাস্থ্যের গ্লানিজনক কিনা। লোকহিতৈষণা লইয়া এবং রাষ্ট্র-শক্তির সাহায্যে চেষ্টা করিয়া গ্রামে চাষীর জীবন সুখ ও শান্তিময় করিয়া তুলিয়া জনসাধারণকে শহর হইতে গ্রামে যাইতে উৎসাহিত করিতে হইবে। শ্রমিক-সাধারণের বীমা করা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।"*

দেশে নানা সমস্যা। কিন্তু কীটপতঙ্গ ও জীবাণুর সহিত অবিরত সংগ্রাম করিয়া আমাদের জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। সম্ভবতঃ কেবল মাত্র মানবকে ধ্বংস করায় কি মানবের শক্তির শ্লাঘা? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট, পতঙ্গ, জীবাণু অলক্ষ্যে আনন্দ করে, করতালি দেয়, মানবের শক্তিকে উপহাস করে। অদৃশ্য দর্শক প্রকৃতিদেবী মহানন্দে দেখিতেছেন মদোন্মত্ত সিংহকে মশক বিনাশ করিয়া যাইতেছে। আমাদের কি করিবার কিছুই নাই?

* 'Among the first things, we must have a more intensive antituberculosis education among the masses. We must teach tuberculous parents not to procreate while actively diseased; encourage breast-feeding; do away with child labor as a curse of the nation; replace the old type of school curricula by a modified Gary System, including more open air classes; improve factory hygiene. We must institute sanitary supervision of tenement and lodging, encourage migration from city to country, by making farm life more profitable and attractive through wise statesmanship and philanthropy. Compulsory insurance of all working people."

স্তূপ

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

'—চল—'

কানে কথাটা বাজল, কিন্তু মনের তরফে কোনো সাড়া নেই। সকালের তীব্র চা-পিপাসার প্রথম ইন্‌ষ্টলমেণ্ট শোধ হয়ে গেছে, অনভ্যস্ত বাড়ি হলেও জানলার ধারের চেয়ারটায় ব'সে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়েছি, এবং কাল রাত্রে যে ভাবনাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাদের ঠেলে জাগাবার চেষ্টা করছি। এই ভাবনাগুলো আমার পোষা। সময় ভারী হয়ে উঠলে লোকে কুকুরের সঙ্গে কথা কয়ে সময়টাকে হাল্কা করে নেয়। আমার কুকুর নেই—ভালো কুকুর বড় দামী—এই ভাবনাগুলো আছে। এদের কিন্‌তে হয়নি, খেতে দিই দু'বেলা পাঁচ কাপ চা আর পনেরোটা সিগারেট। এতেই এদের এত তেজ যে মাঝে মাঝে রাত্রের নরম ঘুমে দাঁত বসিয়ে দেয়।

—ওঠো না সেজমামা, কাল তুমি বললে যাবে?

গম্ভীরগলায় বললাম, গেল-বছর যখন তোমাদের এই কাশীতে আসি টুলু, তখন তোমায় কি বলেছিলাম নিশ্চয় তোমার মনে নেই? তখন তোমায় বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছিলাম যে, 'দেখ টুলু, অমন ব্যস্ত হয়ো না।' সেই তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠছ তো? যাও—দেখ তোমার মা কি করছেন। উহুন যদি খালি থাকে তো চায়ের জল বসাতে বল।

আজ সপ্তাহখানেক যে ভাবনাটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, তার নাম হচ্ছে, 'হতে দাও'। তিনদিন আগে ছিলাম কলকাতায়। মার অসুখ, ছোট ভাইয়ের অসুখ; আমার এক খুড়তুতো ভাই বি-এ পাস ক'রে চাকরি খুঁজছিল, চাকরি এখানে মিলল না, অতএব অন্যত্র চেষ্টা দেখতে হ'ল—সেই 'অন্যত্র' যা এখনও ওয়্যারলেসের রেঞ্জে পাওয়া যায়নি। মনটা উদ্বেগে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতম হয়ে উঠছিল, বুকের মধ্যে ফুটছিল কাঁটার মত, এমন সময় যখন খবর পেলাম মেজদির ছেলে—যে আমার আবাল্য-সঙ্গী এবং বন্ধু—সে তাদের দুঃস্থ পরিবারের অন্নসমস্যা মোচন করেছে নিজে ম'রে, তখন মনের তীক্ষ্ণতাটুকুকে হঠাৎ ভেঙে ভোঁতা ক'রে দিলে এই বুনো দায়িত্বহীন 'হতে দাও'। মা কাঁদছিলেন, আমায় ডেকে বলতে এসেছিলেন, 'হ্যা বাবা, কি হবে?' রুখে উঠে বললাম, হতে দাও! খবরের কাগজে তখন মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে উঠছে—গঙ্গাসাগরে তুফান—বেহারে ভূমিকম্প! নিজে এগোতে পারি না, আমার ঐ পোষা ভাবনাটাকে এগিয়ে দিই। হঠাৎ কাশী থেকে 'তার' এল, 'গৌরীর অসুখ, এখনি এস।' অনেক কাজ ছিল আমার, তবু আমি ছাড়া যাবার লোক নেই। রাগ করলাম না। নির্ব্বোধ নির্ব্বিরোধে কাশী রওনা হলাম। তাড়াহুড়ো, টাকা জোগাড়, টিকিট কেনা, রেলের ভীড় আর গণ্ডগোল—এর মধ্যে দিয়ে নিয়তির শাসন-ক্লিষ্ট যে প্রাণীটি অবশ্যম্ভাবীভাবে চালিত হচ্ছে—তাকে যেন আমি আমার থেকে আলাদা ক'রে দেখতে পেলাম। ক্লান্তভাবে মনে মনে শুধু উচ্চারণ করলাম, 'হতে দাও।'

এখানে এসেছি আজ তিনদিন হ'ল। এসে দেখি ভয়ের কিছুই নয়, হঠাৎ ফেণ্ট হয়ে গিয়েছিল, এই মাত্র। ভেবেছিলাম, আজই কলকাতায় ফিরব, কিন্তু গৌরী কিছুতেই ছাড়বে না। আর টুলু কাল থেকে বায়না ধরেছে আমার সঙ্গে সারনাথ দেখতে যাবে।

কিন্তু আমার ঘোর কাটছে না। চার পাশের ঠেলায় যতদূর এগোই—হতে দিলে যতটা হয়—তার বেশী আর উৎসাহ নেই। এই তিন বার কাশীতে আসা হ'ল, অথচ সারনাথ দেখিনি, তা-ছাড়া কাল অন্যমনস্ক ভাবে কখন টুলুকে কথা দিয়ে ফেলেছি। ও কান্নাকাটি ধরবে না, জানি। কিন্তু আমার আড়ালে যে ওর চোখ সম্পূর্ণ শুকনো থাকবে না তার আভাস পেলাম। অতএব অবশেষে উঠেই পড়লাম।

'সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না। ওর হয়ত খিদে পেয়ে যাবে'—গৌরী আমার পাঞ্জাবীর পকেটে গোপনে

কয়েকটা বিস্কুট পুরে দিলে, 'ওকে আগে থাকতে দেখিও না, যেতে যেতেই তাহলে সব খেয়ে ফেলবে।'

টুলুর হাত ধ'রে পথে বেরোলাম। মনে হ'ল যেন ও ভয়ানক জীবন্ত। মুঠোর মধ্যে ওর হাতটাকে সামলানো যাচ্ছে না। বললাম, টুলু, পথে বেরিয়েছ; এখন ঠোঁট বুজে, হাত স্থির ক'রে গম্ভীর হয়ে যাও। নইলে টাঙ্গা-ওয়ালা রেগে উঠে বলবে, এতটুকু ছেলেকে হাম এত্তা দুর নেই লে যায়গা।

ভাড়া ঠিক ক'রে আমরা তিনজনে টাঙ্গায় উঠে বসলাম—টুলু, আমি আর আমার সেই ভাবনা। টাঙ্গা-ওয়ালার এই বোধ হয় আজ সকালের প্রথম ভাড়া। গাড়ী বেশ খোস্-মেজাজে চলতে লাগল।

মনের অবস্থা মোটেই ভাল নয়; কিন্তু সকালটি বেশ তাজা এবং উদ্‌গ্রীব। যেন অনেকটা ঐ টুলুর মত। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্রুত-বিলীয়মান পথের দু'একটা টুকরো ছবি চোখে পড়তে লাগল।

আগে যা দেখেছি তার চেয়ে কাশীর পথ এখন ঢের ভাল হয়েছে। গাড়ী বা লোকচলাচল যা হয় তার তুলনায় বেশ চওড়া পথ বলতে হবে। কলকাতার মত অত চতুর ব্যস্তবাগীশ পথ নয়। পথের লোকেরা দিনরাত প্রাণপণ ঠেলাঠেলি ক'রে অর্থের দিকে এগোচ্ছে না, এদের অনেকেই এগোচ্ছে পরমার্থের দিকে; হাতের চক্‌চকে পেতলের ঘটিতে সেই পরমার্থ ভ'রে নিয়ে আসবে, কিংবা হয়ত কপালের চন্দনলেখায় থাকবে তার দেনাপাওনার হিসেব। কাজে চলেছে যে, তারও তাড়া নেই; পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানবার সময় আছে, দোকানদারের সঙ্গে রসিকতা করবার সময় আছে, ফুরসুৎ আছে হঠাৎ গান গেয়ে ওঠবার।

টুলুর 'এটা কি, ওটা কি' ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। আমার অনিচ্ছা এবং অক্ষমতা বুঝতে পেরে হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানটা মহা উৎসাহে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলে।—খোকাবাবু, গোধুলিয়া তো ছেড়ে আইলো, ঐটা একটা হাসপাতাল আছে, ঐটা কি বলো তো? কালিজ। ওখানে তোমাকে পড়তে হোবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেনারস ক্যান্টনমেণ্টে এসে পড়েছি। একে আর শহর বলা যায় না। দুধারে মাঠ আর গাছ আর মাঝে মাঝে দু'একটা মেটে বাড়ি। তার মধ্যে দিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় গাড়ী ছুটেছে। হাওয়া আসছে যেন ঠিক বাংলা দেশের মত; বোধ হয় দূর গঙ্গা থেকে, নইলে এমন চেনা চেনা বোধ হবে কেন। টুলু কলকল করে বকছে, গাড়োয়ানটাকে বোঝাতে চাচ্ছে সেও কম জানে না—জানো, ঐ উটগুলো নিমপাতা বয়ে নিয়ে আসে। সেই নিমের ডালে দাঁতন হয়! হ্যাঁ, আমি দেখেছি। নয়, সেজমামা?

ওর দিকে চেয়ে দেখলাম। আসল বাঙালীর ছেলে। খাকীর প্যাণ্ট আর টুইলের সার্ট থেকে বেরিয়ে আছে সরু কচি চঞ্চল পা আর হাতগুলো। শরীরের তুলনায় মাথাটা বেশ বড়, এত বড় যে একজন আপিসের বড় বাবুর ঘাড়ে বসিয়ে দিলে আয়তনে বা গাম্ভীর্য্যে বেমানান হবে না। বয়স সবে সাত, কিন্তু এর মধ্যেই বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং কথাবার্ত্তা একেবারে লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লির উপযুক্ত। চোখ দুটি ডাগর এবং সরল। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। ছেলেবেলায় আমারও চোখ ঐ রকম ছিল—ফটো এবং মার মুখে তার সাক্ষ্য আছে।

মনে মনে হাসি পেয়ে গেল; বেশ সঙ্গীটি আমার জুটেছে যা-হোক! বললাম, কেমন টুলু, এ জায়গাটা তোদের কাশীর চেয়ে ভাল নয়?

এটা কি জায়গা?

এটা একটা গ্রাম।

গাম্?

গাম্ নয়, গাঁ বল্।

গাঁ কাকে বলে?

যেখানে কাশীর মত অনেক বাড়ি নেই, অনেক মাঠ আছে, গাছ আছে, আর ঐ রকম সব কুঁড়ে ঘর আছে, তাকে গাঁ বলে। তোর কেমন লাগছে?

টুলু গম্ভীর ভাবে রায় দিলে, বেশ ভাল জায়গা। সারনাথ কোথায়?

সে এখনো দেরী আছে। আচ্ছা টুলু, সারনাথে গিয়ে তোর যদি খিদে পায়? কি খাবি? সেখানে তো কিছু পাওয়া যায় না।

কি—চ্ছু পাওয়া যায় না?

কিচ্ছু না।

যদি তোমার খিদে পায়?

আমাদের মত এতবড় লোকের কখনও খিদে পায়? আর যদি একান্তই পায়, সিগারেট খাব।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে টুলু বললে, মাকে আনলে হত, না?

হাসি চেপে বললাম, কি হত? এই বুড়ো বয়সে মায়ের দুধ খেতিস্ নাকি?

—যাঃ। আমি নাকি দুধ খাই! মা থাকলে রাঁধতে পারত।

সে যখন হয়নি তখন আর কি হবে? খিদে চেপে থাকতে পারবি তো?

হুঁ। দেখ দেখ, গাছগুলো কি রকম চুপ ক'রে গেল, যেন ভয় পেয়েছে। আর আকাশটা কি রকম সরে সরে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে বললাম, বলিস্ কিরে টুলু, ত্রস্ত তরুলতা, পলাতক আকাশ! এ যে একেবারে মুঠো মুঠো transferred epithet। কবিতা লিখ্‌বি না কি?

টুলু উৎফুল্ল হয়ে বললে, আমি একটা কবিতা জানি। সেই যে তুমি শিখিয়ে দিয়েছিলে? সেইটে বললে আর রোদ্দুর লাগে না—না?

হুঁ, বল্ ত সেইটে একবার।

কচি গলাকে হাস্যকর ভাবে মোটা ক'রে টুলু বললে,

আকাশ! ঢেকে যাও মেঘে।
আরে, শেষে কি—অসুখ হবে রোদ লেগে?

কবিতাটা আমারই বটে। তবে edit করবার সময় টুলু একটু সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করে নিয়েছে। ঐ 'আরে' টুকু তার মৌলিক।

দেখলাম ভাল করিনি। টুলুকে উসকে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ধমক দিলেই অবশ্য চুপ ক'রে যেত, পথের লোক অবাক্ হয়ে অমন বিরক্তিকর ভাবে চেয়ে থাকতে পারত না—কিন্তু শৈশবের এই অহেতুক উদ্দামতাকে অকারণে বাধা দিতে মন ওঠে না। অতএব নির্ব্বিবাদে এবং মুক্তকণ্ঠে টুলুর কাব্যচর্চ্চা চলতে লাগল এবং এই কাব্যের জন্মদাতা স্বয়ং আমি ওর এই প্রবল উৎসাহে হাসব কি রাগ করব ভেবে পেলাম না। গরু দেখলেই ও চেঁচাতে লাগল, 'এই গরু, তোর ঠ্যাং দুটো কেন সরু?' ভেড়াকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বললে, 'ওরে ভেড়া, তোর মাথা একেবারে নেড়া!' ঘোড়াকে আঙুল দিয়ে শাসিয়ে মহাদম্ভে চীৎকার করে উঠল,

ওরে ঘোড়া,
তোর কেবল হাত পা ছোড়া,
দাঁড়া, ইট দিয়ে তোর ঠ্যাং ক'রে দোব খোঁড়া।

পথের এই নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির মধ্যে পরবর্ত্তী চরিত্র হচ্ছে একটি কুকুর। কুকুর সম্বন্ধে কোনো ছড়া টুলুকে শেখানো হয়নি। কিন্তু টুলু পথের সব প্রাণীকে সম্ভাষণ করার পরে সামান্য কুকুরের কাছে হার মানবার পাত্র নয়। 'এই কুকুর'—মহা উৎসাহে এইটুকু বলে ফেলে একটু থমকে গিয়ে অবশেষে গলাটা একটু নামিয়ে বললে, 'তোর ঠ্যাং দুটো কেন— পুকুর?'

হো হো করে হেসে উঠলাম। 'পুকুর' কি রে টুলু? 'ঠ্যাং দুটো পুকুর' এর কোনো মানে হয় না কি?

টুলু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। আমার হাতটা জড়িয়ে কাছে ঘেঁসে বসে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে কি বলব, ব'লে দাও?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, কুকুর দেখলেই খুব বিরক্ত হয়ে বলতে হয়—

ওরে বজ্জাত কুকুর,
তুই কোথায় কোথায় ঘুরিস্ সকাল দুকুর?
তোর মাথার ওপরে মেরে দোব নাকি মুগুর!

ভেবেছিলাম টুলু এ কবিতাটাও তাড়াতাড়ি আত্মসাৎ করবে। কিন্তু হঠাৎ তার ছড়া বলার স্পৃহা কমে এল। বিষণ্ণভাবে বললে, আমার সেই মখমলের খাপ-ওয়ালা তরোয়ালটা আনলে ঠিক হত না? আসবার সময় ভুলে গিয়েছি। আচ্ছা সেজমামা, এই সব এক-একটা 'গাম্', নয়? এই 'গামে' জন্তু-জানোয়ার সব থাকে? বাঘ, হরিণ, সিংঘ?

অন্যমনস্ক ভাবে বললাম, হাঁ, ছোটখাটো দু-একটা বাঘ থাকতে পারে বই কি।

—আমরা গাড়ী থেকে নাবলে যদি সেইগুলো বেরিয়ে আসে?

—তাই ত রে টুলু! তোর তলোয়ারটা থাকলে তবু অনেকটা ভরসা থাকত।

টুলুর কল্পনাশক্তি প্রবল হয়ে উঠল। কি রকম ক'রে সে তরোয়াল দিয়ে একবার একটা বককে খুঁচিয়ে মেরেছিল—সেই মিথ্যে গল্পের বর্ণনা এমন নিখুঁতভাবে এবং অঙ্গভঙ্গী সহকারে করতে লাগল যে স্পষ্টই বোঝা গেল, ওর এই স্বরচিত উপন্যাসে ওর নিজের অন্ততঃ পুরো বিশ্বাস আছে। ইতিমধ্যে আমার মনের সেই গুমোট ভাবটা কখন স্বচ্ছ হয়ে এসেছে জানতেও পারি নি। টাঙ্গার এক পাশ দিয়ে গায়ে রোদ্দুর লাগছে, মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় পথের দু-ধারের শ্যামলতায় দোলা লাগছে—আমার মনেও। কলকল ক'রে টুলু বকে চলেছে। রয়টারের সংবাদদাতার মত কান শুধু তার সারাংশটুকু নিয়ে মনের কাছে পাঠাচ্ছে। এর মধ্যে কখন যেন ঐ টুলুর মতই বানানো কথার মোহ লেগে গেল। অতি লজ্জাজনক ভাবে ইচ্ছা করতে লাগল, টুলুর মতন অমনি চেঁচাই, বাজে কথা বলি। 'হ'তে দাও' বলে কেন শুধু বসে থাকা! হ'তে দিয়েও কিছু করা যায় না কি? আর কিছুই না পারা যাক্, অন্ততঃ আমার সবে বাঁধা ঐ কুকুর সম্বন্ধে ছড়াটা দু-একবার সুর ক'রে বলতে ক্ষতি কি?

হঠাৎ টাঙ্গা থামল। এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি। এখন চেয়ে দেখি সাম্‌নেই সারনাথ। লজ্জিত হলুম নিজের লঘু-চিত্ততার কথা ভেবে। 'Motley is thy only wear' নিজেকে শাসিয়ে বললাম। পৃথিবীর ঘটনাসমাবেশকে যদি হেসে উড়িয়ে দেওয়া যেত তাহ'লে ক্লাউনই হ'ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফিলজফার! গম্ভীর হয়ে গেলুম। মনকে প্রস্তুত করবার চেষ্টা করলাম যাতে ঐ স্তূপের সঙ্কেত অনুভব করতে পারি। টুলুকে বললাম, টুলু, এইবার মুখটি বুজোতে হবে। ঐ দেখ্ সারনাথ। এখানে কথাবার্ত্তা কয়বার উপায় নেই। শুধু আমি যা করব তাই করবি, আমি যা ব'লে দোব তাই শিখে রাখবি।

নেমে নির্জ্জন মাঠের মধ্যে চলতে লাগলাম—টুলুর হাত আমার মুঠোর মধ্যে। সেও ঠিক আমার অনুকরণ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে যেন দুনিয়ার ভাবনা ভাবতে ভাবতে চলেছে। কোথাও কেউ নেই, মাঝে মাঝে শুধু ইটের স্তূপ-গুলো পুরনো বিহারের লুপ্ত অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে। সাম্‌নেই বিরাটকায় সারনাথ স্তূপ। ঠিক তার পিছনে একটি সুন্দর মন্দির, একেবারে আধুনিক কালের তৈরি। ডান দিকেও একটি মন্দির, তার মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। সেখান থেকে পূজার স্তবগান শোনা যাচ্ছে।

সারনাথের কাছে গিয়ে টুলুকে বললাম, এখানে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে হয়, নে প্রণাম কর্।

আমার সঙ্গে সঙ্গে টুলুও স্তূপে মাথা ঠেকালে। তার পর সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলে—এর ভেতর ঢুকবে না?

স্তূপের চার পাশে ঘুরিয়া সেটা যে অসম্ভব তা প্রমাণ করে দিলাম। টুলু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে যে মন্দিরের মত নয় যখন তখন লোকে এখানে কি করে?

বললাম, ধ্যান করে। ধ্যান কাকে বলে জানিস্ ত? ব'সে ব'সে ভগবানের কথা ভাবাকে ধ্যান বলে। তোর বাবা চুপচাপ ব'সে কি সব করে দেখেছিস ত? ঐ দেখ্, ঐ যে দেয়ালঘেরা গাছটা দেখ্‌ছিস্, ঐটে আগে খুব বড় ছিল। ওর তলায় ব'সে বুদ্ধদেব ধ্যান করেছিলেন। দেখ্‌ছিস্ না, ঐ নীচু দেয়ালটার ওপর কত লোক ফুল দিয়ে পূজো ক'রে গিয়েছে? আয় আমরাও ফুল দিই।

মনে মনে টুলুর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। একলা এলে নিজের অন্তরের শ্রদ্ধাটুকু একটু নতি, একটু নিবেদনের মধ্যে প্রকাশ করবার কোন ছলই মিলত না।

সেইখানে ঘাসের ওপর ব'সে পড়লাম। টুলুর মুখটা একটু শুক্‌নো শুক্‌নো। বোধ হয় খিদে পেয়েছে, কিন্তু পৌরুষের অহঙ্কারে কিছু বলতে পারছে না। বিস্কুটগুলো বার ক'রে দিতে একখানা পকেটে পুরে বাকিগুলো খেতে লাগল। পকেটেরটা বোধ হয় ফেরবার সময় টাঙ্গায় ব'সে খাবার ইচ্ছে।

বিস্কুট খেতে খেতে হঠাৎ—আচ্ছা সেজমামা বুদ্ধদেব কে?

—কেন, তুই পড়িস্ নি?

—না, কই এখনও পড়ি নি ত। আচ্ছা, বাড়ি গিয়ে একবার কথামালাটা খুঁজে দেখ্‌ব।

হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ক'রে জানলি. কথামালায় বুদ্ধদেবের কথা আছে?

গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে, হ্যাঁ গো, তুমি জান না। একবার মা একটা রাখালের কথা বলেছিল, কথামালা খুঁজে দেখি ঠিক রয়েছে।

—তাই দেখিস্। এখন একটু চুপ ক'রে বসে ভাব্ দেখি।

কল্পনার মধ্যে নিজেকে তলিয়ে দিলাম। মনে ক'রো সেইদিন যেদিন সিদ্ধার্থের তৃষিত আত্মা সত্যের সন্ধানে দেশবিদেশ ঘুরে অবশেষে এখানে এসে ধ্যানস্থ হ'ল। ঐ আকাশের কপালে এখনও যেন সেই ঐতিহাসিক ধ্যানের জ্যোতিঃ। আর ঐ ভগ্নস্তূপ ঘরগুলোয় যাবা থাকত তাদের উজ্জ্বল চীরাবৃত মূর্ত্তি! যেন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। মনে হ'তে লাগল এখনই যেন স্বচক্ষে দেখব একজন শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র হাতে বিহারে ফিরে আসছে। এখনই যেন শোনা যাবে সেই গম্ভীর আত্মনিবেদনের মন্ত্র—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। নিবে-যাওয়া প্রদীপশিখার মত সেই পুরোণো যুগকে যেন সামান্য অগ্নিস্পর্শে এখনই আবার প্রজ্বলিত ক'রে তোলা যায়—এমনি একটা আসন্ন সম্ভাবনার উৎকণ্ঠায় আমার বুকের স্পন্দন দ্রুত হ'য়ে উঠল।

দু' হাজার বছর আগে যে সমস্যা সমাধানের জন্যে সিদ্ধার্থ তপস্যায় ব'সেছিলেন, আজও সেই সমস্যায় পৃথিবী জটিল, দুরূহ হয়ে র'য়েছে। কিন্তু আজ আর তপস্যায় বসবার লোক নেই।

সাম্‌নের মন্দিরের বৃহৎ ঘণ্টা গম্ভীরনাদে বাজতে লাগল। তার প্রতিটি ঝঙ্কার আমার মনে ব্যথিত আর্ত্তনাদের মত এসে লাগল। হঠাৎ যেন ইসারায় দেখতে পেলাম, পৃথিবীর যুগ যুগ ব্যাপী বিরাট্ দুঃখের চিত্র। আর ঐ বিশাল সারনাথ স্তূপের দিকে চেয়ে দেখলাম তার মৌন প্রত্যুত্তর। এই চিরচঞ্চলতার মাঝখানটিতে ঐ হ'ল চুপ ক'রে বসা, এই ছিন্নপ্রাণের আর্ত্ত কলরবে ঐ হ'ল নিশ্চিন্ত সমাধি। হিংসা হ'ল ঐ স্তূপের প্রসন্ন গাম্ভীর্য্যকে। মনে হ'ল এই-ই সত্যি। বাইরেটাকে জমিয়ে পাথর করে ফেলে থাকতে হবে ঐ স্তূপের মত নির্ব্বিকল্প হয়ে। কেন শুধু পাওয়া আর হারানো, হাসা আর কাঁদা, থামা আর চলা—

স্থির হয়ে বোধ হয় অনেক ক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম সঙ্গে টুলু আছে। হঠাৎ ওর হাসির শব্দে চমক ভাঙল। টুলুর হাসিতে বেশ জোর আছে—তার দানাগুলি বেশ বড় বড় আর স্পষ্ট, খেয়াল গানের গিটকিরির মত। না শুনে উপায় নেই। চম্‌কে উঠলাম একটু বিরক্তও হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছিস্ কেন?

অনেক ক্ষণ ওকে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে, এখন আর ভ্রুকুর শাসনে ওকে থামিয়ে রাখা যাবে না। ও আরও জোরে হাসতে হাসতে বললে, সেই যে প্রথম ভাগে আছে; তুমি যেন ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছিলে—

প্রথমভাগে কি আছে? হাসিস্ নি—বল্, শীগ্‌গির—

সেই, ঋষিমশায় ব'সে পূজায়, ৯কার যেন ডিগ্‌বাজি খায়!

একবার ভাবলাম, জিজ্ঞাসা করি ও দুটোর মধ্যে আমায় কোনটা ঠাউরেছিস্। ঋষিমশাই, না ৯কার? কিন্তু তার আগেই ও মুরুব্বিয়ানা স্বরে বললে, বা চল, বেলা হয়ে যাচ্ছে না? কখন নাইবে আর কখন খাবে? মা বকবে অখন—দেখো—

মনে মনে টুলুর সমালোচনাটুকু নোট্ করলাম। ঐ বিরাটকায় স্তূপেরও একটি সহজ সরল জবাব ছিল ওর এই হাসিতে—যা ক্লাউনের হাসি ব'লে ভুল করবার উপায় নাই। পৃথিবীর যেখানে যত বৃদ্ধ বনেদি চিন্তা স্তূপীকৃত হয়ে আছে তাদেরই বিশাল বিষণ্ণ গম্ভীর ছায়ায় যেন দেখতে পেলাম শিশুর হাস্যপ্রফুল্ল মুখ। বহুদিনের গ্রথিত পরম শ্রদ্ধেয় পাষাণ-স্তবকে লাগল অকুণ্ঠ নির্ভীক কোমল হাসির ধাক্কা! ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারলাম না—কে জিত্‌ল।

পাঞ্জাবীর হাতায় টান পড়ল, সেজমামা, চল—

উঠে পড়ে বললাম, তোর হুকুম-মতই যখন এসেছি টুলু, তখন চল্ তোর হুকুম-মতই বাড়ি ফেরা যাক্।

কংগ্রেসের সভাপতি

(গত পৌষ মাসের প্রবাসীতে যে-সব কংগ্রেস-সভাপতির ছবি মুদ্রিত হয় নাই তাহা এবারে মুদ্রিত হইল)

আর. এন. মুধোলকর (বাঁকীপুর—১৯১২)
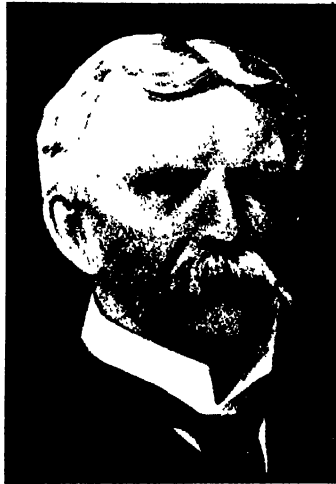
হেনরী কটন (বোম্বাই—১৯০৪)

উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ (বোম্বাই—১৮৮৯)

সৈয়দ মুহম্মদ (করাচী—১৯১৩)
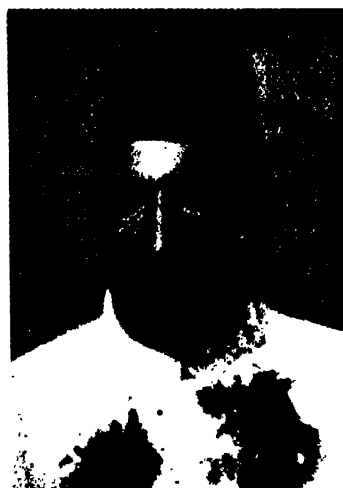
হাকিম আজমল খাঁ (আমেদাবাদ—১৯২১)

সৈয়দ হাসান ইমাম (বোম্বাই—১৯১৮)

শঙ্করণ নায়ার (অমরাবতী ১৮৯৭)

আলফ্রেড ওয়েব (মান্দ্রাজ—১৮৯৪)

আনন্দ চার্লু (নাগপুর ১৮৯১)

জর্জ্জ ইউল (এলাহাবাদ—১৮৮৮)

অম্বিকাচরণ মজুমদার (লক্ষ্ণৌ—১৯১৬)

বিষেণনারায়ণ দার (কলিকাতা—১৯১১)

রহিমতুল্লা সিয়ানী (কলিকাতা—১৮৯৬)

নারায়ণ চন্দভরকর (লাহোর—১৯০০)

বদরুদ্দিন তায়েবজী (মান্দ্রাজ—১৮৮৭)

বিজয়রাঘবাচারিয়' (নাগপুর—১৯২১)
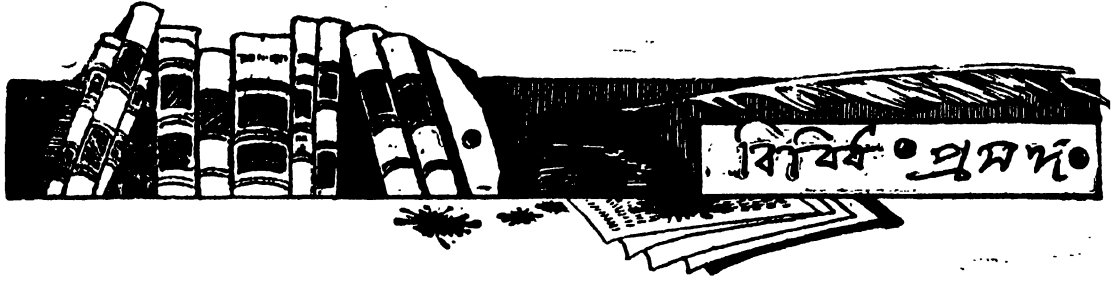
কংগ্রেস-জয়ন্তী

১৮৮৫ সালে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৯৩৫ সালে তাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের অগণিত গ্রাম ও নগরে উৎসব হইয়া গেল। কংগ্রেসের সাফল্য কোন্ কোন্ দিকে তাহা সংক্ষেপে পৌষের প্রবাসীতে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে দেখান হইয়াছে, যে, উৎসব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এই উৎসবে যত লোক যোগদান করিয়াছিলেন, সকলেই যে কংগ্রেসনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন দ্বারা স্বরাজলাভের একাগ্র চেষ্টা করিতে প্রস্তুত, তাহা নহে। উৎসবে যোগ দিলে সুখ পাওয়া যায়, স্বরাজলাভের আন্তরিক চেষ্টা করিলে অনেক সময় তাহার ফলে দুঃখ আসে। সুখ যত জন পাইতে চায়, দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত মানুষের সংখ্যা তত বেশী নয়। কিন্তু যে বিশাল জনসমষ্টি গ্রামসমূহে ও নগরসমূহে কংগ্রেস-জয়ন্তীতে যোগ দিয়াছিল, তাহা হইতে কংগ্রেসের লোকপ্রিয়তা বুঝিতে পারা যায়। যাহারা কংগ্রেসকে ভালবাসে, তাহারা এখনই হয়ত স্বার্থত্যাগে ও দুঃখবরণে প্রস্তুত না থাকিতে পারে। কিন্তু সৎদৃষ্টান্তের প্রভাব অপরিমেয়। যে-সকল কংগ্রেস-কর্ম্মী আচরণে দেখাইয়াছেন, যে, তাঁহারা স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণ করিতে সমর্থ, তাঁহারা অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার কাজ করিতে থাকুন। তাহা হইলে যাঁহারা কংগ্রেসকে ভালবাসেন, অথচ কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট কাজে প্রবৃত্ত হন নাই, তাঁহারাও কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কংগ্রেস-কর্ম্মীদের পক্ষে এখন আবার কর্ম্মিষ্ঠ হওয়া আগেকার চেয়ে সহজ। আগে তাঁহাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইত, এবং নানাবিধ দুঃখবরণ করিতেও হইত। এখন অহিংস আইনলঙ্ঘন স্থগিত থাকায় দুঃখ বরণ করিতে হইবে না। যাঁহারা কর্ম্মী নহেন, তাঁহাদের পক্ষে এখন কর্ম্মীদের দৃষ্টান্ত ও প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া কর্ম্মী হওয়াও পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ; কারণ এখন আগেকার মত দুঃখবরণের প্রয়োজন নাই, অথবা সামান্যই আছে।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে, বিপদের, দুঃখের, একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। সেই জন্য বিপদের মুখে লাফ দিয়া পড়িতে প্রস্তুত যাঁহারা, তাঁহারা বিপৎসম্ভাবনাবিহীন কাজে অনেক সময় অগ্রসর হন না। জনসমাজের বাস্তবিক বা অনুমিত প্রশংসমান দৃষ্টিও কাহাকেও কাহাকেও বিপৎসঙ্কুল পথে চলিতে প্রবৃত্ত ও সমর্থ করে। তথাপি, কংগ্রেস-কর্ম্মীদের আবার কর্ম্মিষ্ঠ হইবার এবং বহুসংখ্যক অন্য লোকের তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবার সম্ভাবনা এখন হইয়াছে, অভিজ্ঞ কংগ্রেস-কর্ম্মীরা এখন কর্ম্মিষ্ঠ হইলে নূতন কর্ম্মী অনেক পাওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু বঙ্গের কংগ্রেসী দলাদলি একটি শোচনীয় বাধা হইয়া রহিয়াছে।

কংগ্রেস ও অন্য স্বাজাতিক দল

উদারনৈতিকদের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে কংগ্রেসের প্রশংসা নূতন নয়। তিনি আগে আগেও কংগ্রেসের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি আবার করিয়াছেন। তিনি সত্যই বলিয়াছেন, যে, নূতন ভারতশাসন আইন অনুসারে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে যদি কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যদের সংখ্যা কম হয় বা অন্য কারণে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে কংগ্রেসপক্ষ দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে তাহা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে। স্বরাজ লাভ করিতে হইলে গবর্ন্মেণ্টের উপর চাপ দেওয়া আবশ্যক। আইনের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই হউক বা আইনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াই হউক, এই চাপ কংগ্রেস যে-ভাবে দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও দিতে পারেন, ভারতবর্ষের অন্য কোন রাষ্ট্রনৈতিক দল তাহা পারেন নাই ও পারিবেন না। সুতরাং ব্যবস্থাপক

সভার ভিতরে ও বাহিরে কংগ্রেসের দলে পুরু ও শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় উদারনৈতিকদের কংগ্রেসে যোগ দিবার ও সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবার কথাও তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে উদারনৈতিকদের কংগ্রেসে প্রবেশ করিবার বাধা আছে। কংগ্রেসের নিরুপদ্রব বা অহিংস আইনলঙ্ঘন নীতি একটি বাধা—উদারনৈতিকগণ এই নীতি অনুসরণ করেন না। কিন্তু এখন কংগ্রেস অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই নীতির অনুসরণ স্থগিত রাখিয়াছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে কংগ্রেস এই নীতি আবার অবলম্বন করিতেও পারেন, এই অনুমান কাহারও কংগ্রেসের সহিত এখন একযোগে কাজ করিবার বাধা বলিয়া মনে করা যায় না—অবশ্য যদি তাহার কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্যের সহিত ঐকমত্য থাকে।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় আর কয়েকটি বাধার কথাও বলিয়াছেন। পরিধানে সর্ব্বদা খদ্দর ব্যবহার করা এবং নির্দ্দিষ্ট কাল দৈহিক শ্রমসাধ্য কোন কর্ম্ম করা কংগ্রেসের সভ্য হইবার দুটি সর্ত্ত ও যোগ্যতা। কিন্তু কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভ্যদের মধ্যেও অনেকে এই সর্ত্ত দুটির বিরোধী, এবং হয়ত তাঁহাদের চেষ্টায় এ-দুটি উঠিয়াও যাইতে পারে। এরূপ মনে করিবার কারণ আছে, যে, অনেক কংগ্রেস-সভ্য খুব দৃঢ়তার সহিত এই দুটি সর্ত্ত পালন করেন না। তা ছাড়া, এ-দুটি সর্ত্ত পালন করা অসাধ্য, দুঃসাধ্য, ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ বা আইনবিরুদ্ধ নহে। সুতরাং কংগ্রেসের মহৎ উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া এই দুইটি সর্ত্ত পালন করিলে ভালই হয়।

একটি গোড়াকার কথা অবশ্য ভাবিয়া দেখিতে হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় তাহাও উদারনৈতিকদের কংগ্রেসে যোগদানে একটি বাধা বলিয়াছেন। কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য বৈধ উপায়ে "পূর্ণ স্বরাজ" লাভ। অর্থাৎ কংগ্রেস চান যাহাকে বলে পূর্ণ স্বাধীনতা, যাহা ইউরোপের ও আমেরিকার স্বাধীন দেশগুলির এবং এশিয়ার জাপান, পারস্য ও আফগানিস্থানের আছে। উদারনৈতিকেরা চান ডোমীনিয়নত্ব। কিন্তু ওয়েষ্টমিনষ্টার আইন (Westminster Statute) পাস হওয়ার পর এখন যে-কোন ডোমীনিয়ন ব্রিটিশসাম্রাজ্যনিরপেক্ষ ভাবেও কাজ করিতে পারেন। সুতরাং এখন শতকরা ৯৯টি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পূর্ণ স্বরাজ ও ডোমীনিয়নত্বে কোন বাস্তবিক প্রভেদ নাই। তদ্ভিন্ন ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, কংগ্রেসের প্রধান নেতা মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, যে, তিনি স্বাধীনতার সার অংশ ("substance of independence") লইতে প্রস্তুত এবং পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন। কংগ্রেস তাঁহার এই মতের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। ডোমীনিয়নত্ব পাইলে স্বাধীনতার সার অংশ পাওয়া হয়। সুতরাং কংগ্রেসের ও উদারনৈতিক সংঘের মূল উদ্দেশ্যে কোন বস্তুগত পার্থক্য নাই।

কংগ্রেস, উদারনৈতিক সংঘ এবং অন্য সকল স্বাজাতিক দল একযোগে কাজ করিলে বড় ভাল হয়। কংগ্রেস সকলের চেয়ে বড়, শক্তিশালী এবং কর্ম্মিষ্ঠ দল। কংগ্রেস অন্য সকল দলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করিতে আহ্বান করুন। কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মিলিতভাবে কাজ করা ঘটিয়া না উঠে, তাহা হইলেও পরস্পরের প্রতি দোষারোপ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া প্রত্যেক দলই যদি স্বরাজলাভচেষ্টায় একাগ্রভাবে নিযুক্ত হন, তাহাতেও প্রভূত মঙ্গল হইবে।

—

বাংলা-গবর্মেণ্টের পণ্ডিত জবাহরলালের নিন্দা প্রত্যাহার

১৯৩৩-৩৪ সালের সরকারী বঙ্গীয় শাসনবিবরণে এই মর্ম্মের কথা ছিল, যে, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কলিকাতায় আসিয়া, 'হরিজন'দের হিতসাধনের নিমিত্ত সংগৃহীত অর্থের দ্বারা, অস্পৃশ্যতাবিরোধী কার্য্যের ছদ্ম আবরণে, চরম সমাজ-তান্ত্রিক গবর্মেণ্ট-বিপর্য্যাসমূলক কাজ চালাইবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি জার্মেনী হইতে ইহার প্রতিবাদ করেন। প্রকাশ্য এক উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা গোপনীয় অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজ তিনি করিতে পারেন, তাঁহার এরূপ নিন্দা ইতিপূর্ব্বে কেহ করে নাই। বস্তুতঃ তিনি এরূপ নিন্দার পাত্র নহেন। তাঁহার প্রতিবাদে বাংলা-গবর্মেণ্ট বোধ হয় কর্ণপাত করিতেন না। কিন্তু বিলাতী ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান ও অন্য দু-একটি কাগজে তাঁহার কথা প্রকাশিত হয় এবং সম্পাদকেরা এই দাবি করেন, যে, হয় গবর্মেণ্ট এই নিন্দা সমূলক বলিয়া প্রমাণ করুন, নতুবা প্রত্যাহার করুন। বিলাতী পার্লেমেণ্টেও এই বিষয়ে প্রশ্ন হয় ও তাহার উত্তরে

সহকারী ভারতসচিব মিঃ বাটলার বলেন, যে, এ-বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য বাংলা-গবর্ন্মেণ্টকে বলা হইয়াছে।

এইরূপ চাপ পড়ায় বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার শেষ কথা এই, যে, বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট পণ্ডিত জবাহরলালের এই নিন্দার জন্য দুঃখিত এবং তাহা প্রত্যাহার করিতেছেন এবং ১৯৩৩-৩৪ সালের শাসনবিবরণের বহি এখনও গবর্ন্মেণ্টের হাতে যতগুলি আছে, সবগুলি হইতে ঐ নিন্দাসূচক অংশ বাদ দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞপ্তিটিতে অপ্রকাশিতনামা শাসনবিবরণলেখকের যে কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে, তাহা না দিলেই ভাল হইত। উহা মোটেই বিশ্বাস-উৎপাদক নহে—বস্তুতঃ উহা হাস্যকর। ঐ প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়াটাই আর একটা নূতন দোষ।

বিজ্ঞপ্তিটিতে গবর্ন্মেণ্টের পণ্ডিত জবাহরলালের নিকট ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট তাঁহার নিকট ক্ষমা চান নাই। এক জন (বেসরকারী) ভদ্রলোক অন্য এক জন ভদ্রলোকের অযথা নিন্দা করিলে ক্ষমা চাহিবার সুরীতি প্রচলিত আছে। সরকারী কোন লোক এইরূপ অপরাধ করিলে কেন ক্ষমা চাহিবেন না, তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ নাই। ক্ষমা না চাওয়াতে বিলাতী দৈনিক ডেলী হেরাল্ডও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯৩৩-৩৪ সালের বঙ্গীয় শাসনবিবরণীতে উপক্রমণিকার শেষে লেখা আছে :—

"The Report is published under the authority and with the approval of the Government of Bengal, but this approval does not necessarily extend to every particular expression of opinion."

অর্থাৎ কিনা, রিপোর্টটি বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের সাধারণ অনুমোদন অনুসারে প্রকাশিত, কিন্তু তার মানে এ নয়, যে, ইহাতে প্রকাশিত প্রত্যেক মতেরই অনুমোদন সরকার বাহাদুর নিশ্চয়ই করেন। এই ইংরেজী বাক্যটি গত ডিসেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে উদ্ধৃত করিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম, "nobody appears to be responsible for the opinions expressed therein", "ইহাতে প্রকাশিত মতগুলির জন্য দায়ী কেহই নহে মনে হইতেছে!" বস্তুতঃ, যাহার জন্য গবর্ন্মেণ্ট নিশ্চয় দায়ী নহেন, এরূপ বেনামী জিনিষ প্রকাশ করা অনুচিত। সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা যখন লেখকের নাম না ছাপিয়া কোন লেখা ছাপেন, তখনও তাঁহারা এরূপ লেখা ছাপার জন্য আইনের কাছে দায়ী থাকেন। সুতরাং বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট আবশ্যকমত দায়িত্ব এড়াইবার উপায়স্বরূপ ঐ বাক্যটা ছাপিয়া থাকিলেও, যাহা কিছু ছাপিয়াছেন তাহার জন্য দায়ী।

পৌষের 'প্রবাসী'তে ঐ ইংরেজী বাক্যটা উদ্ধৃত করিয়া আমরা "পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সরকারী নিন্দা" প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট নেহরু মহাশয়ের এই কল্পিত নিন্দার অনুমোদন করেন না বলিবেন কি?" সেইরূপ, জানুয়ারি মাসের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম :—

"Taking advantage of the latter part of this sentence (*i.e.*, 'this approval does not necessarily extend to every particular expression of opinion'), the Government of Bengal may say that their approval does not extend to the allegation made against the Pandit. But will they do it? Or will they stand up for the prestige of the nameless writer or writers of the Report?"

তাৎপর্য। বাংলা-গবর্ণমেণ্ট ঐ বাক্যের শেষ অংশের (অর্থাৎ রিপোর্টে প্রকাশিত প্রত্যেক মতের সরকার অনুমোদন নিশ্চয়ই করেন এরূপ নহে, এই অংশের) সুযোগ লইয়া বলিবেন কি যে পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধে প্রকাশিত এই মতের অনুমোদন করেন না? না, তাঁহারা রিপোর্ট-লেখকের মুখ রক্ষার চেষ্টাই করিবেন?

আমরা দেখিতেছি, বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট শাসন-বিবরণের উপক্রমণিকার ঐ বাক্যটার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু নিজ দায়িত্ব যে অস্বীকার করেন নাই তাহা ভাল।

বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট উচিত কাজ, পূর্ণমাত্রায় না করিলেও, যতটুকু করিয়াছেন, তাহাতে দেশী ও বিলাতী অনেক কাগজে সন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে; আমরাও তজ্জন্য গবর্ন্মেণ্টের তারিফ করি।

—

অরাজনৈতিক প্রচেষ্টার আবরণে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন

শাসনবিবরণে পণ্ডিত জবাহরলালের অমূলক নিন্দা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট আর একটা ব্যাপক নিন্দা করিয়াছেন। বলা হইয়াছে, যে, গবর্ন্মেণ্ট জানেন, অরাজনৈতিক বলিয়া ঘোষিত বহু প্রচেষ্টা রাজনৈতিক

উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ("ostensibly non-political movements have been exploited for political ends")। কোন্ কোন্ স্থানের কোন্ কোন্ অরাজনৈতিক প্রচেষ্টা কোন্ কোন্ সময়ে কাহার কাহার দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের উপায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, গবর্মেণ্টের তাহা বলা উচিত। নতুবা এইরূপ একটা সরকারী অভিযোগের ফলে সমুদয় অরাজনৈতিক প্রচেষ্টাই সন্দেহভাজন হইবে। অবশ্য বেসরকারী প্রত্যেক রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক প্রচেষ্টা গবর্মেণ্টের সন্দেহভাজন। ভারতবর্ষে যত দিন বৈদেশিক শাসন থাকিবে, এই সন্দেহও তত দিন থাকিবে। বৈদেশিক শাসনের আমলে তাহার প্রতীকার নাই। কিন্তু গবর্মেণ্টের এই অভিযোগে অন্যেরও সন্দেহের উদ্রেকের উদয় হইলে তাহা সব প্রচেষ্টার পক্ষেই অসুবিধাজনক ও ক্ষতির কারণ হইবে।

কোন প্রচেষ্টাকে বাহিরে অরাজনৈতিক বলিয়া প্রচার করিয়া গোপনে তাহার দ্বারা রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা গর্হিত। বস্তুতঃ, কোন প্রকার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এক রকম বলিয়া তাহার দ্বারা অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা মাত্রই নিন্দনীয়—প্রচেষ্টা রাজনৈতিক হউক বা না হউক। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মাত্রই যে খারাপ, বা তাহা সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা খারাপ, ইহা সত্য নহে।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, সাক্ষাৎভাবে যে প্রচেষ্টা অরাজনৈতিক তাহা সফল হইলে পরোক্ষভাবে তাহা রাজনৈতিক ফলপ্রদও হইতে পারে। পাইয়োনীয়ার কাগজ যখন ইংরেজদের ছিল এবং যখন উহা এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত, তখন তাহাতে একবার এই মর্ম্মের কথা লেখা হইয়াছিল, যে, গ্রীসের ও রোম সাম্রাজ্যের পতন অংশতঃ ম্যালেরিয়া প্রযুক্ত হইয়াছিল, এবং হয়ত অনেক বাঙালী বাবু স্বপ্ন দেখেন, যে, বাংলা দেশ ম্যালেরিয়াশূন্য হইলে স্বাধীন হইতে পারিবে। বঙ্গে ম্যালেরিয়ানাশার্থ অনেক সমিতি আছে, বাংলা-গবর্মেণ্টও বলেন, যে, ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছেন। তাহা হইলে এই ম্যালেরিয়া-নাশক সমিতিগুলি ও বাংলা-গবর্মেণ্ট কি অরাজনৈতিক প্রচেষ্টার ছদ্ম আবরণে রাজনৈতিক কাজ করিতেছেন?

কৃষির উন্নতির সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টা বঙ্গে ও ভারতবর্ষের অন্যত্র হইতেছে। যদি জমীতে বেশী শস্য উৎপন্ন হয় এবং দেশের সর্ব্বসাধারণ পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তাহা হইলে তাহাদের দেহ পুষ্ট হইবে এবং মানসিক স্ফূর্ত্তি ও শক্তি বাড়িবে। সে অবস্থায় তাহাদের যথেষ্ট রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির অর্থাৎ স্বরাজলাভের ইচ্ছা জন্মিতে পারে এবং স্বরাজলাভের চেষ্টাও তাহারা করিতে পারে। তাহা হইলে কৃষির উন্নতির সরকারী ও বেসরকারী সমুদয় চেষ্টাই গুপ্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত!

বস্তুতঃ, মানুষ মাত্রেই—এবং ভারতীয় মাত্রেই, যে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবার চেষ্টা করে, ইহা ভয়ানক বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য হইতে উদ্ভূত। অনশনে বা অর্দ্ধাশনে যে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোক থাকে, তাহা আরও ভয়ঙ্কর বৈপ্লবিক। কেন-না, অনেক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বলেন, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল ফ্রান্স দেশের জনসাধারণ যথেষ্ট খাইতে পাইত না বলিয়া।

অবশ্য গবর্মেণ্টের সপক্ষেও কিছু বলা উচিত এবং বলা যাইতে পারে। শুধু গবর্মেণ্টই যে বেসরকারী অরাজনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন দেখিতে পান, তাহা নহে; বেসরকারী লোকেরাও গবর্মেণ্টের অরাজনৈতিক কাজের মধ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধির অস্তিত্ব কল্পনা করে। সুতরাং সন্দেহ করা সম্বন্ধে উভয় পক্ষ সমান! গোটা দুই দৃষ্টান্ত দি।

মহাত্মা গান্ধী যখন রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্রামসমূহের উন্নতিসাধনের জন্য নিখিল ভারত গ্রাম্যশিল্পসমিতি স্থাপন করেন, তখন ভারত-গবর্মেণ্ট গান্ধী মহাশয়ের এই চেষ্টার মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া যে গোপনীয় সার্কুলার সব প্রদেশের সরকারীমহলে পাঠান, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহা বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রতি সরকারী সন্দেহের একটি দৃষ্টান্ত। তার পর, ভারত-গবর্মেণ্ট যখন ব্রিটিশ ভারতের গ্রামগুলির উন্নতির জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দ করিলেন, তখন আবার বেসরকারী লোকেরা সন্দেহ করিল, যে, গবর্মেণ্টের এই বরাদ্দটি গান্ধীজীর চেষ্টার জবাব—গান্ধীজী বা কংগ্রেস যাহাতে গ্রাম্য লোকদের

কাছে গবর্ন্মেণ্টের চেয়ে বেশী অনুরাগভাজন না হইয়া পড়ে তাহার চেষ্টা! গবর্ন্মেণ্ট যে নানা স্থানে বেতারবার্ত্তার কেন্দ্র স্থাপন করিতেছেন, সে সম্বন্ধেও বেসরকারী মন সন্দেহ করে, যে, সেগুলির দ্বারা গবর্ন্মেণ্ট নিজ পক্ষের ওকালতী কথা লিখন-পঠনক্ষম ও নিরক্ষর সকল লোককে শুনাইবেন। সুতরাং সন্দেহ করাটা কোন পক্ষেরই একচেটিয়া নহে।

সরকারী লোকদের একটা কথা মনে রাখা দরকার। তাঁহারা মনে করেন, বেসরকারী লোকদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টাই রাজনৈতিক। বস্তুতঃ, তাহা নহে। গবর্ন্মেণ্ট ও গবর্ন্মেণ্ট-পক্ষীয় লোকেরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং তাহা বাড়াইবার জন্য সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে যাহা-কিছু করেন, তাহা একটি বৃহৎ রাজনৈতিক প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত। তেমনই ভারতবর্ষের লোকেরা ভারতে ভারতীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিবার জন্য সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে যাহা-কিছু করেন, তাহাও জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত একটি বিশাল রাজনৈতিক প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত। সুতরাং সরকারী কর্ম্মচারী-দের আচরণ সম্বন্ধীয় আগেকার ও সংশোধিত আধুনিক নিয়মাবলীতে যে আছে, যে, তাঁহারা কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় যোগ দিতে পারিবেন না, তাহার অর্থ, তাঁহারা ভারতবর্ষে ভারতীয় প্রভুত্ব স্থাপনার্থ কোন প্রচেষ্টায় যোগ দিতে পারিবেন না, কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ও তাহা বাড়াইবার চেষ্টা তাঁহারা যে স্বচ্ছন্দে করিতে পারিবেন শুধু তাহাই নহে, সে-রকম চেষ্টা করা তাঁহাদের একটা কর্ত্তব্য। সুতরাং ভারতবর্ষের সরকারী অভিধানে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অনুকূল প্রচেষ্টা রাজনৈতিক প্রচেষ্টা নহে, ভারতীয় প্রভুত্বের অনুকূল প্রচেষ্টাই রাজনৈতিক প্রচেষ্টা।

কোন প্রকার প্রচেষ্টা বা সংস্কারকার্য্যই অন্য কোন প্রকার সংস্কারকার্য্যের সহিত নিঃসম্পর্ক নহে; যেমন মানবজীবনের কোন বিভাগই অন্য কোন বিভাগের সহিত সম্বন্ধহীন নহে, এবং যেমন মানব-মনও সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক্ খোপে বিভক্ত নহে। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতি, কৃষি শিল্প বাণিজ্যের দ্বারা আর্থিক উন্নতি, স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি প্রত্যেকের সহিত রাজনৈতিক সংস্কারের সম্বন্ধ আছে। মানুষ যেদিকেই উন্নত ও অগ্রসর হউক না কেন, সেই উন্নতি ও প্রগতির দ্বারা রাজনৈতিক প্রচেষ্টাতে শক্তির সঞ্চার হয়। সুতরাং অরাজনৈতিক কোন প্রচেষ্টা দ্বারা রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন অভিপ্রায় না থাকিলেও, সেই প্রচেষ্টা যতটুকু সফল হইবে তাহার দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণ সিদ্ধ হইবে।

—

বিলাতী ডেলী হেরাল্ডের একটি প্রশ্ন

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর যে সরকারী নিন্দা প্রত্যাহৃত হইয়াছে, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিলাতের শ্রমিক দলের দৈনিক পত্র ডেলী হেরাল্ড প্রশ্ন করিয়াছেন, যেরূপ প্রমাণে বঙ্গীয় শাসন-বিবরণের লেখক পণ্ডিত জবাহরলালকে সন্দেহ করিয়া তাঁহার নিন্দা করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রমাণেই কি বিস্তর লোককে সন্দেহ করিয়া বিনা-বিচারে বন্দী করা হইয়াছে?

—

ঝোলা গুড় জমীর উৎকৃষ্ট সার

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নী-বিদ্যার অধ্যাপক

ডক্টর নীলরতন ধর

ডক্টর নীলরতন ধর নানা রাসায়নিক গবেষণার দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যে জাতীয় বিজ্ঞান-পরিষদের (ন্যাশন্যা-

একাডেমী অব্ সায়েন্সেজের) কেন্দ্র এলাহাবাদে স্থিত তিনি তাহার বর্ত্তমান সভাপতি। গত মাসে এই পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি দেখান, যে, ঝোলা গুড় বা মাৎ গুড় জমীর উৎকৃষ্ট সার। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়াছেন ঝোলা গুড়ের সার না-দেওয়া জমীতে যেখানে প্রতি একরে ৮.১ মণ ধান হয়, সেখানে ঝোলা গুড় প্রয়োগ করিলে প্রতি একরে সাড়ে চৌদ্দ মণ ধান হয়।

বাংলা দেশে আকের চাষ বৃদ্ধির এবং অনেক চিনির কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন অন্য নানা দিক্ দিয়া যেমন বুঝা যায়, এই দিক্ দিয়াও তেমনি বুঝা যায়। ধান বাংলা দেশের প্রধান খাদ্য শস্য এবং বঙ্গে যত ধান হয় ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে তত হয় না। এখানে অনুর্ব্বর উষর জমীতেও যদি ঝোলা গুড়ের সার দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক বেশী ধান জন্মিতে ও কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু অন্য প্রদেশ হইতে ঝোলা গুড় কিনিয়া আনিয়া ব্যবহার করিতে গেলে খরচে পোষাইবে না, এবং তত খরচ করিবার ক্ষমতাই বা আমাদের চাষীদের আছে কোথায়? কিন্তু বঙ্গে চিনির কল স্থাপিত ও ইক্ষুর চাষ বিস্তৃত হইলে আমাদের চাষীরা অপেক্ষাকৃত সস্তায় ঝোলা গুড় পাইতে পারিবে।

—

বাঙালী চিত্রকরের বিলাতী সম্মান

দিল্লীপ্রবাসী বাঙালী চিত্রকর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ উকীল লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসের সদস্য (Fellow) নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়। তিনি "রূপলেখা" নামক ললিতকলাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদক। কয়েক মাস পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে দিল্লীর চিত্রকর উকীল-ভ্রাতাদের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। বাঙালীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ও শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসের সদস্য।

শ্রীবরদাচরণ উকীল

—

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের জয়ন্তী

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষীয় দার্শনিক কংগ্রেসের উদ্যোগে গত মাসে কলিকাতায় তাঁহার জয়ন্তী হইয়া গিয়াছে। ডাঃ সর্ নীলরতন সরকার মহাশয় এই জয়ন্তীর সভায় সভাপতি মনোনীত হন এবং আচার্য্য শীল মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার এই প্রশস্তি কোন কাগজ রিপোর্ট করে নাই। অন্য প্রশস্তিগুলিরও যে রিপোর্ট ঠিক ঠিক বাহির হইয়াছে তাহা নহে। মহীশূরের অধ্যাপক

অধ্যাপক দামলে, সর্ নীলরতন সরকার, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডক্টর এ. জি. হগ ও ডক্টর আর্কহার্ট

কে. ভি. মাধব, ঢাকার অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যে কিছু বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

আচার্য্য শীল মহাশয়ের প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা যেমন বহুমুখী, মননশক্তি যেমন অসাধারণ, স্বভাব তেমনি সরল এবং চরিত্র তেমনি উদার মহৎ ও পবিত্র। ইহা সাতিশয় ক্ষোভের বিষয় যে অবস্থাচক্রে এবং তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনস্বিতার অনুরূপ কোন গ্রন্থ তিনি লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা বিদ্বন্মণ্ডলীর পরিজ্ঞাত, যে, যেমন ছোট ছোট বহু ব্যাঙ্ক বৃহৎ ব্যাঙ্কের আনুকূল্যে নিজেদের কারবার চালায়, তেমনি বিদ্যার অনেক শাখার বহু গ্রন্থকার তাঁহার নিকট হইতে সঙ্কেত, উপদেশ ও চালনা প্রাপ্ত হইয়া যশস্বী হইয়াছেন।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও রবীন্দ্রনাথ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ সর্ মাইকেল স্যাড্‌লার আপনাকে শীল মহাশয়ের শিষ্য বলিয়া যে প্রশস্তিটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা জানুয়ারি মাসের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে আমাদের অনেক পাঠক দেখিয়া থাকিবেন।

রবীন্দ্রনাথ নিম্নমুদ্রিত কবিতাটি পাঠাইয়াছিলেন।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুহৃদ্বরেষু—

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্দ্ধে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখরশ্রেণী; যেথায় গহন গুহা হ'তে
সমুদ্রবাহিনী বার্ত্তা চলেছে প্রস্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি, যেথা মায়া-কুহেলিকা
ভেদি উঠে মুক্তদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তমোজয়-লিপি; যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্ত্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নিমণ্ডলের জপমালা; যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি, মর্ত্ত্যধরণীর দিগঞ্চলে
অনাবৃত করি দেন অমর্ত্ত্যরাজ্যের জাগরণ,

তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া—শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্ত পুরুষ
তমিস্রের পার হ'তে তেজোময়, যেথায় মানুষ
শুনে দৈববাণী। সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান,
দিক্‌সীমা প্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমানবের তপোবনে,
সত্যদ্রষ্টা, যেথা যুগ-যুগান্তরে ধ্যানের গগনে
গূঢ় হ'তে উদ্ধারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে
নিত্যসুন্দরের আমন্ত্রণ। সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে তব সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি
মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি ;
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্ব্বাদ, বিদায়কালের অর্ঘ্য মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোর॥

১ ডিসেম্বর, ১৯৩৫

সমুদয় অভিনন্দনের উত্তরে আচার্য্য শীল যাহা বলেন, তাহাতে প্রথমেই ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বিবাদকলহে গভীর ব্যথা প্রকাশ করেন। তৎপরে "জয়ন্তী"র বিদেশে ও দেশে ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলেন। শেষে তাঁহার জীবনের বাহ্য ফলহীনতা সম্বন্ধে শান্ত ও গম্ভীরভাবে প্রাণস্পর্শী কয়েকটি কথা বলেন।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

গত মাসে নব দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উদ্যোক্তাগণ সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নব দিল্লীর বাঙালী-বালক-বিদ্যালয় অধিবেশনের ও বাহির হইতে আগত পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়টি খোলা উঁচু জায়গায় সরকারী আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুনির্ম্মিত।

সমুদয় অভিভাষণ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় অনিবার্য্য কারণে অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে না

কানপুর সনাতন ধর্ম্ম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্য-শাখার সভাপতি

পারায় কলিকাতা হইতে সম্মেলনের প্রধান কর্ম্মসচিব মেজর অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিম্নমুদ্রিত পত্র লিখিয়া পাঠান।

প্রীতিভাজনেষু—

মেজর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এবারকার দিল্লীর অধিবেশনে আমি উপস্থিত থাকিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগকে এবং প্রতিনিধিবর্গকে নিজে সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীনিশিকান্ত সেন মহাশয়ের উপর এই ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। সম্মেলনের কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য আমার শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

সরকার মহাশয়ের কাজ অন্যতম সহকারী সভাপতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ও অধ্যাপক রায় বাহাদুর নিশিকান্ত সেন মহাশয় নির্ব্বাহ করেন।

দিল্লীর এই অধিবেশনে একটি নূতন কাজের সূত্রপাত হইয়াছে। প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে সংবাদ প্রভৃতি প্রচার

গোরক্ষপুরের কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর, বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতি

করিবার নিমিত্ত একটি মাসিক বিজ্ঞপ্তিপত্র (bulletin) অতঃপর প্রকাশিত হইবে।

সম্মেলনের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এবং ত্রয়োদশ অধিবেশন সম্বন্ধে ফাল্গুনের প্রবাসীতে বিস্তারিত ভাবে কিছু লিখিবার ইচ্ছা আছে।

—

আবিসীনিয়ার সহিত ইটালীর যুদ্ধ

আবিসীনিয়ার সহিত ইটালীর যুদ্ধ চলিতেছে। প্রাচীন কালে রোমের প্রসিদ্ধ নেতা ও সেনাপতি জুলিয়স সীজর খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৭ অব্দে পণ্টাসের রাজাকে পরাজিত করিবার সংবাদ রোমের ব্যবস্থাপক সভা সেনেটকে, "Veni Vidi Vici' (আসিলাম, দেখিলাম, জিতিলাম), কেবল এই তিনটি কথায় দিয়াছিলেন। রোমের বর্ত্তমান নেতা মুসোলিনিও বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন, ইটালীর সৈন্যদল আবিসীনিয়ায় পৌঁছিবামাত্র জয়লাভ করিবে। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। তিন মাস আগে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এখনও চলিতেছে। প্রথম প্রথম বরং ইটালীর সৈন্যেরাই জিতিতেছিল ও অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু তাহার পর হাবসীরাও জিতিতেছে এবং ইটালীর অধিকৃত কোন কোন স্থান আবার দখল করিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত যদি ইটালীই জিতে, তাহা হইলেও সে সহজে জিতিয়াছে বলা চলিবে না।

—

ইটালীর বর্ব্বরতা

যুদ্ধ জিনিষটাই বর্ব্বরতার একটা অবশিষ্ট অংশ। উহার পরিবর্ত্তে অবলম্বনীয় সুনীতিসঙ্গত, অহিংস ও নিশ্চয় সিদ্ধিপ্রদ কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট না-হওয়া পর্য্যন্ত অগত্যা বলিতে হয়, যে, আত্মরক্ষা ও দুর্ব্বলের রক্ষা এবং পরাধীন জাতিদের স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ অবলম্বনীয় হইতে পারে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে ও কারণে যুদ্ধের সমর্থন করা যায় না।

যে যে প্রকারে ও যে যে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করা হয়, তাহার মধ্যেও কম বর্ব্বর ও অধিক বর্ব্বর এই দুই শ্রেণীভেদ করা যাইতে পারে। যুদ্ধে ব্যাপৃত নহে এরূপ লোকদের উপর—বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের উপর—বোমা নিক্ষেপ, আহত ও পীড়িতদের হাসপাতালের উপর বোমা নিক্ষেপ, এবং বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার বিশেষ করিয়া বর্ব্বর রীতি। ইটালী আবিসীনিয়ার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান যুদ্ধে এই সকল প্রকার বর্ব্বর রীতিই অনুসরণ করিতেছে। অবশ্য বর্ব্বর জাতিরা কোন কালেই এই সব রীতির অনুসরণ করে নাই, "সভ্য" জাতিরাই করে। রীতিগুলাকে বর্ব্বর বলা হয় ইহা দেখাইবার জন্য, যে, সভ্য জাতিরা বর্ব্বরতায় অসভ্য জাতিদিগকে পরাস্ত করিতে পারে ও করে।

ইটালীর এই সব বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে আবিসীনিয়া জেনিভায় লীগ অব্ নেশুন্সের নিকট আপীল করিয়াছে। কিন্তু লীগ এখনও কিছু করিতে পারে নাই বা করে নাই। তাহার কারণ বুঝা কঠিন নয়। লীগের ত কোন স্বতন্ত্র সত্তা ও শক্তি নাই। যে-সব দেশ লীগের সভ্য, তাহাদের শক্তিতেই লীগ শক্তিমান্। কিন্তু লীগের প্রবলতম সভ্য যে-দেশগুলি, তাহারাও নিজেদের প্রয়োজন হইলে ইটালীরই মত বোমার ও বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার করিতে পারে। সেই জন্য তাহারা খুব আন্তরিকতার সহিত ইটালীর বিরোধিতা করিতে পারিতেছে না। লীগের সভ্যেরা ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়াও ইটালীকে হয়ত কতকটা সায়েস্তা করিতে পারে, যদি তাহারা ইটালীর খনিজ তেল পাওয়া বন্ধ করিতে

সমর্থ হয়। খনিজ তেল বন্ধ হইলে যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত ইটালীর জাহাজ, মোটর লরি ও আরোহী গাড়ী, এরোপ্লেন ও ট্যাঙ্ক অচল হইবে। কিন্তু ইটালীর তেল প্রাপ্তি বন্ধ করিলে ইটালী যুদ্ধ করিবে (প্রধানতঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে) বলিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে শেষ পর্য্যন্ত ইটালীর হারিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইটালীর এরোপ্লেনের সংখ্যা খুব বেশী। সুতরাং শেষে যাহাই ঘটুক, সদ্যসদ্য ইটালী ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে বিব্রত করিতে সমর্থ। বোধ হয় এই কারণে ব্রিটেন ও ফ্রান্স লীগের মারফৎ ইটালীর উপর খুব চাপ দিতেছে না। খুব চাপ না দিবার আরও কিছু কারণ আছে। ইটালী জার্ম্মেনী হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রিয়ার মারফৎ তেল পাইতে পারে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহিত ইটালীর যুদ্ধ ঘটিলে জার্ম্মেনী ইটালীর পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে।

খনিজ তেল আমেরিকায় ও রাশিয়ায় খুব বেশী উৎপন্ন হয়। তাহারা যে ব্যবসাবুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া ইটালীর বর্ব্বরতা নিবারণকল্পে ইটালীকে তেল জোগান বন্ধ করিবে এরূপ আশা হয়ত করা যায় না।

ধর্ম্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও চালিত মানুষ সব সভ্য দেশেই আছে, কিন্তু এরূপ কোন দেশ এখনও দেখা যায় নাই, যাহার অধিবাসী জাতি ও তাহার গবর্ন্মেণ্ট ধর্ম্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতার খাতিরে স্বার্থত্যাগ করিতে ও আপনাদিগকে বিপন্ন করিতে প্রস্তুত। সমগ্র মানবসমাজের উন্নতি হইতে হইতে ভবিষ্যতে এরূপ জাতি এবং গবর্ন্মেণ্টও দেখা দিবে, এই আশা পোষণ করা যাইতে পারে।

—

"বঙ্গীয় শব্দকোষ"

আমরা পূর্ব্বে কয়েক বার এই বৃহৎ বাংলা অভিধান-খানির পরিচয় দিয়াছি ও প্রশংসা করিয়াছি। গত মাসে ইহার উনত্রিংশ খণ্ড ও ৯২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে "কুলা" শব্দটি পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্ববৎ পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার সহিত সংকলিত ও সম্পাদিত হইতেছে, শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং বর্ত্তমানেও তথাকার অধিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার রচয়িতা ও প্রকাশক। তাঁহার নিকট ইহা পাওয়া যায়। ইহার উৎকর্ষ ও প্রয়োজনীয়তা হেতু সমুদয় বিদ্যালয়, কলেজ, বঙ্গের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষিত বাঙালী গৃহস্থের ইহা ক্রয় করিয়া ব্যবহার করা উচিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বঙ্গের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই জন্য এইরূপ একটি অভিধান এই সকল প্রতিষ্ঠানে থাকা আবশ্যক। সম্পূর্ণ হইলে ইহা বাংলা ভাষার বৃহত্তম অভিধান হইবে।

—

কংগ্রেসের ইতিহাস

অন্ধ্রদেশের অন্যতম কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত পট্টাভি সীতারামায়্যা ইংরেজীতে কংগ্রেসের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা বৃহৎ গ্রন্থ। মূল গ্রন্থখানিই হাজার পৃষ্ঠার উপর। তদ্ভিন্ন সূচী, কতকগুলি পরিশিষ্ট এবং কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের লিখিত উপক্রমণিকাতেও প্রায় দেড় শত পৃষ্ঠা লাগিয়াছে। সমুদয় কংগ্রেস-সভাপতির চিত্রও ইহাতে আছে। ইহাতে বিস্তর প্রয়োজনীয় তথ্য আছে। যে কেহ আধুনিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতিসম্বন্ধীয় আন্দোলন ও প্রচেষ্টার বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে চান, এই বহিটি তাঁহার কাজে লাগিবে। এরূপ বৃহৎ পুস্তকের দাম কেবল আড়াই টাকা রাখায়, ইহাকে যথাসম্ভব সুলভ করা হইয়াছে বলিতে হইবে।

—

পৌষের নানা সভাসমিতি

আগে পৌষ মাসের দ্বিতীয় তৃতীয় সপ্তাহে ভারতবর্ষে যে-সকল সভাসমিতির অধিবেশন হইত, তাহার মধ্যে কংগ্রেসই ছিল সকলের চেয়ে বড়। ১৯২৯ সালে লাহোরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় এবং যাহাতে পূর্ণস্বরাজ কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হয়, তাহাতে স্থির হয়, যে, কংগ্রেসের অধিবেশন অতঃপর শীতকালে না হইয়া ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চ্চ মাসের গোড়ার দিকে হইবে। কিন্তু এ বৎসর কংগ্রেস-জয়ন্তী হওয়ায় পৌষেও কংগ্রেসওয়ালারা উদ্যোগিতা দেখাইয়াছেন। তা ছাড়া নানা দেশী রাজ্যে, প্রদেশে ও শহরে অন্য বহু সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সকলগুলির কার্য্যকলাপের আলোচনা, মাসিকপত্রের কথা দূরে থাক্, দৈনিক পত্রের পক্ষেও অসাধ্য হইলেও একটা কথা বলা যায়, যে, দেশে এত রকমের সভাসমিতির অধিবেশন সজীবতার লক্ষণ।

মহীশূর রাজ্যে প্রাচ্য কন্ফারেন্স এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে নিখিল ভারত মহিলা কন্ফারেন্সের অধিবেশন গত মাসে হয়। পুনায় হিন্দু মহাসভার এবং অপর একটি ভারত-মহিলাদের কন্ফারেন্স হইয়াছিল। নাগপুরে জাতীয় উদার-নৈতিক সংঘের এবং নিখিল ভারত শিক্ষা কন্ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন ইন্দোর শহরে এবং দার্শনিক কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় হয়। এই সকলগুলিতেই বাঙালীদের যোগ ছিল। নিখিল ভারতীয় কোন সভাসমিতিতে যদি বাঙালী না থাকেন, তাহা কুলক্ষণ। সকলগুলিতেই অন্যান্য প্রদেশের লোকদের মত বাঙালীদের যোগ থাকা একান্ত আবশ্যক।

—

ভারত-মহিলাদের উদ্যোগিতা

গত ১৯৩৫ সালে ভারতের নানা প্রদেশে মহিলাদের কন্ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বশেষে হইয়াছে, ত্রিবাঙ্কুড়ে নিখিল ভারতীয় মহিলা কন্ফারেন্স। আবার শীঘ্রই কলিকাতায় মহিলাদের একটি আন্তর্জাতিক কন্ফারেন্স হইবে।

তাঁহাদের এই কর্ম্মিষ্ঠতা প্রশংসনীয়।

ভারতবর্ষে নারীজাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত কম হইয়াছে। নারীজাতির কল্যাণের জন্য বহু দিকে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি ব্যতিরেকে কোন কল্যাণ-চেষ্টাই সফল হইবে না। এই জন্য, নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির দিকে সমুদয় নেত্রীর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

—

মহারাজা গায়কোয়াড়ের জয়ন্তী

মহারাজা সয়াজী রাও গায়কোয়াড়ের ৬০ বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার প্রজারা বড়োদা রাজ্যে উৎসব করিয়াছে। তিনি যখন বড়োদার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি নাবালক, তখন তাঁহার বয়স ছিল ১২। সাবালক হইবার পর যখন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজ্যশাসন-ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তখন হইতেও অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর গত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালে বড়োদা রাজ্য শিক্ষায়, সমাজ-সংস্কারে, কৃষিশিল্পবাণিজ্যে, শাসন ও বিচার বিভাগের উন্নতিতে, প্রত্নতত্ত্ব ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ রকম প্রগতি দেখাইয়াছে। এই প্রগতির যশ মহারাজার, এবং তাঁহার পর তাঁহার মনোনীত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের ও তাঁহার প্রজাদের প্রাপ্য।

জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মহারাজা কতকগুলি কয়েদীকে কারাগার হইতে মুক্তি দিয়াছেন এবং চারি লক্ষ টাকা খাজনা রেহাই দিয়াছেন। বড়োদা রাজ্যের গ্রামসমূহের উন্নতির জন্য তিনি এক কোটি টাকা দান করিয়াছেন। রাজোচিত দান বটে। এই এক কোটি টাকা দানের সংবাদ কাগজে পড়িবামাত্র সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষে গ্রামোন্নতির জন্য ভারত-গবর্মেণ্টের এক কোটি টাকা বরাদ্দ স্বভাবতই মনে পড়িয়াছিল। বড়োদা রাজ্যের লোকসংখ্যা ২৪,৪৩,০০৭। ব্রহ্মদেশ সমেত সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা ২৮,৯৪,৯১,২৪১।

—

হিন্দু মহাসভা ও জাতিভেদ

নাগপুর হইতে "হিতবাদ" নামক একটি উৎকৃষ্ট ইংরেজী খবরের কাগজ সপ্তাহে তিন বার বাহির হয়। ইহা ২৫ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার সম্পাদক অহিন্দু নহেন, হিন্দু; ব্রাহ্ম সমাজের বা আর্য্য সমাজের লোকেরা যে-অর্থে হিন্দু সে-অর্থে হিন্দু নহেন, প্রচলিত অর্থে হিন্দু। এই কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

In the Subjects Committee of the Hindu Mahasabha Pandit Malaviya gave a ruling which will end in restricting the activities of the Sabha and its deliberations to a great extent. While ruling that the question of untouchability was in order, Pandit Malaviya held that inter-caste marriages and the abolition of castes were outside the sphere of the Mahasabha. The Hindu Mahasabha, if it excluded questions between castes, will handicap the growth and popularity of the institution and will become an instrument for the use of those who are interested in keeping the *status quo*....

তাৎপর্য। হিন্দু মহাসভার বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে তাহার সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলেন, যে, অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ও প্রস্তাব ধার্য্য করিবার অধিকার মহাসভার আছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ চালান এবং জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া মহাসভার কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে। এই মীমাংসা সভার কর্ম্মিষ্ঠতা ও আলোচনা বহু পরিমাণে সীমাবদ্ধ করিবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে যে-সব প্রশ্ন উঠে বা বিবাদ ঘটে, তাহা যদি মহাসভা আলোচনার বাহিরে রাখিয়া দেন, তাহা হইলে ইহার বর্দ্ধিষ্ণুতা ও লোকপ্রিয়তাতে বাধা পড়িবে, এবং হিন্দুসমাজকে ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় রাখা যাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আবশ্যক, ইহা তাহাদেরই স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ একটি প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, যে, জাতিভেদ একেবারে উঠাইয়া দিলে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুত্ব রক্ষা পাইবে না। আমরা তাহা মনে করি না। জন্মগত ও বংশগত জা'ত না মানিয়া যদি বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজ, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও সমাজ এবং মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজ টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে জন্মগত ও বংশগত জা'ত না মানিলে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজই বা কেন লোপ পাইবে? জন্মগত ও বংশগত জা'ত ছাড়া কি হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের আর কোনই বিশেষত্ব নাই? আমি যেবার সুরাটে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হইয়াছিলাম, সে-বার আমার অভিভাষণে বলিয়াছিলাম, জা'তহীন হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভবপর (It is possible to imagine the existence of a casteless Hindu society)। ইহাতে ত তখন বা তাহার পরেও হিন্দু মহাসভার কোন গোঁড়া সভ্য কোন আপত্তি করেন নাই বা বিতর্ক তুলেন নাই।

যাহা হউক, জন্মগত ও বংশগত জাতিভেদের উচ্ছেদ-বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনা মহাসভার কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে বলিয়া মানিয়া লইলেও, ভিন্ন ভিন্ন জা'তের মধ্যে বিবাহও যে তাহার আলোচনার বহির্ভূত, ইহা কখনও স্বীকার করা যাইতে পারে না। অতীত কালে হিন্দু সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জা'তের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। অনুলোম বিবাহ ত বেশ চলিত; প্রতিলোম বিবাহ তদপেক্ষা সংখ্যায় কম হইলেও তাহাও চলিত। উভয়বিধ বিবাহেরই দৃষ্টান্ত প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে কাব্যে পুরাণে পাওয়া যায়। তাহা হইলে কি আগেকার হিন্দুসমাজ হিন্দু ছিল না?

বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত দার্জিলিঙ জেলায়, এবং স্বাধীন নেপালের হিন্দুসমাজে ও অর্দ্ধ-স্বাধীন সিকিমের হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে। ব্রিটিশ ভারতের নানা প্রদেশে হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ, সংখ্যায় কম হইলেও, হইয়া থাকে। কলিকাতায় কালীঘাটে হরিশ চাটুজ্যের সড়কে ত্রিকোণেশ্বর মন্দিরে যে হিন্দু মিশনের কার্য্যালয় অবস্থিত, সেই হিন্দু মিশন একটি সুবিদিত প্রতিষ্ঠান। এই হিন্দু মিশন অসবর্ণ বিবাহ দিয়া থাকেন—কতকগুলি দিয়াছেন। হিন্দু সমাজে—অর্থাৎ প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজে—অসবর্ণ বিবাহ হইলে তাহা ব্রিটিশ আইন অনুসারে রেজিষ্টরী হইতে পারে, এবং তাহা আইনসঙ্গত। জন্মগত ও বংশগত জাতিভেদ হিন্দুসমাজ হইতে উঠাইয়া দেওয়া হউক বা না হউক, হিন্দুসমাজের সংহতি, ঘননিবিষ্টতা, দলবদ্ধতা উৎপাদন, রক্ষা বা বৃদ্ধির জন্য এবং তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজ সংরক্ষণের জন্য অসবর্ণ বিবাহ একান্ত আবশ্যক। এবং আর একটি সংস্কারও একান্ত অবশ্যক। তাহা, অমুক জা'ত বড় ও শুদ্ধ এবং অমুক জা'ত ছোট ও অশুদ্ধ—এইরূপ ভেদজ্ঞানের ও তদনুরূপ আচরণের উচ্ছেদ। এইরূপ ভেদজ্ঞান হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র-সমূহের উপদেশবিরুদ্ধ।

—

হিন্দু মহাসভা ও অস্পৃশ্যতা

পুনার অধিবেশনে হিন্দু মহাসভা অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন ও জাতিভেদের উচ্ছেদ এই দুটি বিষয়ের আলোচনা না করিলেও অস্পৃশ্যতাসম্পর্কীয় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবটি করবীর পীঠের শঙ্করাচার্য্য ডক্টর কুর্ত্তকোটি মহাসভার সমক্ষে উপস্থিত করেন। সর্ব্বসাধারণের জন্য অভিপ্রেত প্রতিষ্ঠানসমূহের ও স্থানসমূহের ব্যবহারে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের যে অধিকারহীনতা বিদ্যমান আছে, এই প্রস্তাব সেই অধিকারহীনতার উচ্ছেদ সাধন দ্বারা অন্য হিন্দুদের মত তাঁহাদেরও অধিকার স্থাপন করিতে হিন্দু-সমাজকে অনুরোধ করিয়াছে। মন্দিরাদি পূজার স্থান, কূপাদি জলাশয় প্রভৃতির ব্যবহারে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের অন্য হিন্দুদের সমান অধিকার এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রস্তাবটি যত দূর গিয়াছে, তাহা সন্তোষজনক মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার অর্থ লইয়া মতভেদ ও বাগবিতণ্ডা হইবে। তথাকথিত অস্পৃশ্য সকল জাতি মন্দিরের বাহির হইতে দেবদেবী-মূর্ত্তিকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সন্তুষ্ট না হইতে পারে—অনেকে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে না ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহারা স্বয়ং স্বহস্তে দেবদেবী পূজা করিতে চাহিবে। বস্তুতঃ, বঙ্গে যে কোন কোন স্থানে সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজা হয়, তাহাতে কোথাও কোথাও সকল জাতির লোকদেরই পৌরোহিত্য করিবার, ভোগ রাঁধিবার, এবং এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবার অধিকার—শুধু কথায় নহে, কাজেও—স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাতে হিন্দুসমাজ লোপ পায় নাই। বঙ্গের স্থানে স্থানে "তপশীলভুক্ত" জাতিদের এই যে দাবি স্বীকৃত হইয়াছে,

অন্য সব প্রদেশেও সেইরূপ দাবি হইবে বা হইয়াছে, এবং তাহাও মানিয়া লইতে হইবে। মানিয়া লইলে হিন্দু-সমাজের গৌরব, সংহতি ও শক্তি বাড়িবে।

—

অবনত হিন্দুদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্ভাবনা

হিন্দু সামাজিক প্রথা অনুসারে অবনত শ্রেণীসমূহের হিন্দুরা বহু সামাজিক ও সাধারণ মানবিক অধিকার হইতে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকিয়া আসিতেছে, অনেক লাঞ্ছনা, অসুবিধা এবং কখন কখন উৎপীড়নও ভোগ করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে মুসলমানের ও খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যাবৃদ্ধির তাহাই প্রধান কারণ। হিন্দুর সংখ্যার আপেক্ষিক হ্রাসেরও তাহাই কারণ। এই কারণে এখনও হিন্দুসমাজের ক্ষয় এবং অন্য দুই সমাজের বাড়তি চলিতেছে। কিছুকাল হইতে অবনত হিন্দুদের মধ্যে অনেকে আপনাদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা অনেকে বলিতেছেন হিন্দু-সমাজে অন্য সব হিন্দু জাতিদের সহিত তাঁহাদের সাম্য স্বীকৃত ও স্থাপিত না হইলে তাঁহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের অন্যতম নেতা ডাঃ আম্বেদকর ধর্ম্মান্তরগ্রহণাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। অন্য অনেক নেতা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। কিন্তু হিন্দুসমাজে অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের মর্য্যাদা অপর সকল হিন্দুদের সমান না হইলে কতক অবনত হিন্দুর ধর্ম্মান্তরগ্রহণ অনিবার্য্য। হিন্দুসমাজের ক্ষয় নিবারণ ও শক্তি-রক্ষার নিমিত্ত অবনত হিন্দুদের ধর্ম্মান্তরগ্রহণ অনাবশ্যক করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে সকল হিন্দু জাতির সামাজিক মর্য্যাদা সমান করিতে হইবে। কিন্তু হিন্দুসমাজকে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ও সংখ্যার দিক্ দিয়া বলিষ্ঠ রাখিবার জন্যই যে অবনত হিন্দুদের সাম্য আবশ্যক তাহা নহে। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব রক্ষার নিমিত্ত তাহা আবশ্যক। গোরু মহিষ ছাগল ভেড়া গাধা ঘোড়া ইন্দুর বিড়াল প্রভৃতি প্রাণী অস্পৃশ্য নহে। অথচ কতকগুলি জাতির মানুষ অশুদ্ধ বা অস্পৃশ্য, ইহা শ্রেষ্ঠ হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ নহে, হইতে পারে না।

এই হেতু পরম হিন্দু মহাত্মা গান্ধী শুধু অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নহে, জাতিভেদের বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করিয়াছেন—কয়েক সপ্তাহ হইল ইংরেজী সাপ্তাহিক "হরিজন" কাগজে লিখিয়াছেন "Caste must go," "জাতিভেদকে বিদায় দিতে হইবে"।

অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের সহিত অন্য হিন্দুদের বিরোধ ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে। এই বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য গত ২৮শে ডিসেম্বর অবনত হিন্দুদের প্রতিনিধিগণের সহিত পুনায় হিন্দু মহাসভার নেতাদের আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনা-সভায় ৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অবনত হিন্দুদের নেতারা এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে, হিন্দুসমাজ হইতে জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে হইবে, এবং অবনত জাতিদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতিবিধানের উপায় নির্দ্ধারণ ও অর্থসংগ্রহের জন্য উভয় শ্রেণীর লোকদিগকে লইয়া এক কমিটি গঠন করিতে হইবে। অবনত জাতিদের অন্যতম নেতা রাজভোজ বলিয়াছিলেন, হিন্দুশাস্ত্রে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে হীন করিয়া রাখিবার জন্য যে-সমুদয় ব্যবস্থা আছে তাহা শাস্ত্র হইতে উঠাইয়া দিতে হইবে। হিন্দু মহাসভার সভ্যগণ বলিয়াছিলেন—ঐ সকল প্রস্তাব বিষয়নির্ব্বাচনী সভায় আলোচনা করিয়া প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত করা হইবে।

হিন্দু মহাসভার যে-সকল সভ্য পুনায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা যদি বলিতে পারিতেন, যে, জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে হইবে, যদি শিক্ষাদান প্রভৃতি দ্বারা অবনত শ্রেণীর লোকদের উন্নতিবিধানের জন্য অর্থসংগ্রহ-কমিটি নিযুক্ত করিতে পারিতেন, এবং অবনত শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত কোন কোন গ্রন্থে যে-সব বচন আছে তাহা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপদেশের বিরুদ্ধ যদি বলিতে পারিতেন, তাহা হইলে অবনত শ্রেণীর লোকদের মন আশান্বিত হইত।

কোন গ্রন্থে যদি লেখা থাকে, যে, অদ্বিজেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহাদের জিহ্বা কাটিয়া ফেলিতে হইবে, তাহা সেই গ্রন্থের অগৌরবজনক। কিন্তু তদ্দারা বর্ত্তমানে কার্য্যতঃ কাহারও ক্ষতি হয় না। বিস্তর অদ্বিজ হিন্দু ও অহিন্দু আজকাল বেদ পড়ে, কিন্তু কাহারও জিহ্বা কাটা যায় না। ঐরূপ বচন উঠাইয়া দিলাম, কেহ বলিলেই ভারতবর্ষে ইউরোপে আমেরিকায় জাপানে ঐ বচনসংযুক্ত যত বহি আছে, তাহা হইতে উহা বর্জ্জিত হইবে না। সুতরাং বচনগুলি তুলিয়া দিতে বলার কোন সার্থকতা নাই।

—

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিক জন্মোৎসব

আগামী ফাল্গুন মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে বহু দেশে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিক জন্মোৎসব মহা সমারোহে ও বিপুল উদ্যমে অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের মনীষীদিগের বহু রচনা প্রকাশিত হইবে; বিদেশের অনেক মনস্বী ব্যক্তির নিকট হইতেও সহানুভূতিসূচক পত্র উদ্যোক্তারা পাইয়াছেন। রামকৃষ্ণ যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ভারতবর্ষের পরম গৌরব। হিন্দুজাতির ও ভারতবর্ষের নিন্দুকেরা যাহাই বলুক, এদেশে যে আধুনিক যুগেও মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হন, তাহাতেই প্রমাণ হয়, যে ভারতবর্ষ অধম দেশ নহে, হিন্দুজাতি অধম জাতি নহে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা

মহাপুরুষগণ যে কাজ করিয়া যান তাহার দ্বারাই তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষিত হয় ইহা সত্য বটে; কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য উপকৃত ও কৃতজ্ঞ জনমণ্ডলীরও চেষ্টা করা উচিত। ইহা সন্তোষের বিষয়, যে, গত মাসে আলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

"১৯৩৮ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইবে।

(১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি অট্টালিকা এবং হলগৃহ নির্ম্মাণ।

(২) সর্ব্ব ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলীপূর্ণ একটি পাঠাগার স্থাপন।

(৩) ছাত্রদের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা।

(৪) একটি ব্যায়ামাগার এবং

(৫) বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য একটি কারখানা স্থাপন।

কমিটি অবিলম্বে গঠন করিয়া অর্থসংগ্রহের চেষ্টা এখন হইতেই করা আবশ্যক।

কেশবচন্দ্র প্রধানতঃ ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়াই পরিচিত। আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্মের প্রচারে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। স্মৃতিসভায় ডাক্তার সর্ নীলরতন সরকার বলেন, "সর্ব্ববিষয়ে, বিশেষতঃ ধর্ম্মবিষয়ে, তাঁহার প্রতিভা আমাদিগকে বিস্মিত করে। সকল ধর্ম্মের মধ্যেই যে একটি অচ্ছেদ্য যোগ আছে, ইহা তিনি আমাদিগকে স্পষ্টরূপে ও প্রথম শুনান।"

ধর্ম্মবিষয়ে নেতৃত্ব ভিন্ন অন্য নানা দিকেও তাঁহার কৃতিত্ব আছে, তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'সুলভ সমাচার' সর্ব্বসাধারণকে রাজনীতিচর্চ্চার সুযোগ দিয়াছিল। তাঁহার 'সুলভ সমাচার' বঙ্গের প্রথম সস্তা খবরের কাগজ। শিক্ষাদান ও মাদকতা-নিবারণের ক্ষেত্রেও তিনি খুব কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাংলা বক্তৃতা ও উপদেশসমূহ কথিত বাংলার একটি তাৎকালিক আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য। বিলাতে তিনি তাঁহার অনতিক্রান্ত বাগ্মিতা সহকারে যে-সকল বক্তৃতা করেন, তাহার দ্বারা ইংরেজরা বুঝিতে পারে, যে, ভারতীয়েরা, বাঙালীরা, নিকৃষ্ট জাতি নহে। "আমরা অধম, আমরা নিকৃষ্ট" এইরূপ ধারণা রাজনৈতিক ও অন্যবিধ উন্নতির পথে একটি প্রধান বাধা। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা দ্বারা এই প্রকার ধারণা (অর্থাৎ inferiority complex) তৎকালে যে-পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছিল, সেই পরিমাণে পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রচেষ্টাও অজ্ঞাতসারে বললাভ করিয়াছিল—যদিও তিনি স্বয়ং রাজনৈতিক আন্দোলনকারী ছিলেন না।

আজকাল কিছুদিন হইতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আন্দোলন ও চেষ্টা হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রধান নেতা। এ-বিষয়ে তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসা তাঁহাকে আমরা পূর্ণমাত্রাতেই বরাবর দিয়া আসিতেছি এবং এখনও দি। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের দিক হইতে আমাদের কয়েকটি কথা মনে রাখা আবশ্যক।

অস্পৃশ্যতাবিরোধী প্রচেষ্টার কিছু পূর্ব্বকথা

অস্পৃশ্যতা জন্মগত ও বংশগত জাতিভেদের অপকৃষ্টতম ও সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর রূপ বটে। কিন্তু জাতিভেদ দূর না

করিলে অস্পৃশ্যতা সমূলে বিনষ্ট হইবে না। মহাত্মা গান্ধীও ইহা বুঝিয়াছেন বলিয়া সেদিন "হরিজন" পত্রে লিখিয়াছেন, "Caste must go," "জাতিভেদকে বিদায় দিতে হইবে।" আধুনিক যুগে মত প্রচার দ্বারা ও আচরণ দ্বারা হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ দূর করিতে প্রথম চেষ্টা করেন ব্রাহ্ম সমাজ। রামমোহন রায় মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য প্রণীত জাতিভেদ-বিরোধী "বজ্রসূচী" সানুবাদ প্রকাশ করিয়া, ব্যক্তিগত কোন কোন আচরণে জাতিভেদ না মানিয়া, এবং সমুদ্র পার হইয়া ইউরোপ গিয়া জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রথম কিছু করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজসংস্কার-ক্ষেত্রে সতীদাহ-নিবারণ এবং নারী জাতির অকল্যাণকর অন্য কোন কোন ব্যবস্থা ও প্রথার পরিবর্ত্তন লইয়াই তিনি প্রধানতঃ ব্যস্ত ছিলেন, অসবর্ণ বিবাহ আদির প্রচলন বা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সাক্ষাৎ চেষ্টা তিনি কিছু করেন নাই। আমরা যত দূর জানি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত আচরণে অস্পৃশ্যতা মানিতেন না, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎভাবে জাতিভেদ নষ্ট করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। সেই চেষ্টা কেশবচন্দ্রই নানা দিক্ দিয়া প্রথম করেন। অসবর্ণ বিবাহ আদি তিনি প্রথম চালান। স্বামী বিবেকানন্দ অবনত জাতিদের অভ্যুত্থান দ্বারা ভারতবর্ষ ও হিন্দুজাতি শক্তিশালী হইবে মনে করিতেন ও বলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের উপর তিনি খুব আস্থা রাখিতেন। কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই কেহ কেহ লিখিয়াছেন (এবং আমরাও দেখিতেছি) যে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার মতগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বিশেষ কিছু চেষ্টা করেন নাই, যদিও তাঁহারা আর্ত্তত্রাণে প্রভৃত প্রশংসনীয় চেষ্টা এবং শিক্ষাবিস্তারার্থ কিছু চেষ্টা করিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ কংগ্রেসের কৃত্যসমূহের অঙ্গীভূত করিতে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত বিঠল রাম শিন্দে মহাত্মা গান্ধীকে প্রবৃত্ত করেন। তাহার আগে হইতেই শিন্দে মহাশয় বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে অবনতশ্রেণীসহায়ক মিশন (Depressed Classes Mission) চালাইয়া আসিতেছিলেন। এই মিশন এখনও বিদ্যমান ও সক্রিয় আছে। ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীযুক্ত কে রঙ্গরাও কংগ্রেস এ-বিষয়ে মন দিবার আগে হইতেই মাঙ্গালোরে ঐ প্রকার কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও এই কাজ এখনও চলিতেছে। আর্য্যসমাজ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের অনেক চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

কলিকাতা খিলাফৎ কনফারেন্স

তুরস্ক যখন সুলতানের অধীন ছিল, যখন সেই দেশে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয় নাই, তখন তুরস্কের সুলতান মুসলমান ধর্ম্মের ও মুসলমান জগতের খলিফা ছিলেন। আতা-তুর্ক কমাল পাশার নেতৃত্বে যখন তুরস্ক সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়, তাহার পূর্ব্বেই সুলতান সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার খলিফাত্বও লুপ্ত হয়। বস্তুতঃ তাহার পর হইতে খিলাফৎও লোপ পাইয়াছে। কারণ কোনও স্বাধীন মুসলমান দেশের নৃপতি খলিফা নহেন, এবং কাহারও খলিফা হইবার সম্ভাবনাও এখন দেখা যাইতেছে না। কারণ, তুরস্কের মত পরাক্রমশালী কোন স্বাধীন মুসলমান দেশ নাই।

কিন্তু খিলাফৎ না থাকিলেও ভারতবর্ষে খিলাফৎ কনফারেন্স আছে। মুসলমানদের অধ্যুষিত অন্য কোন দেশে খিলাফৎ কনফারেন্স আছে কিনা. ও তাহার অধিবেশন হয় কিনা, আমরা তাহা জানি না। কিন্তু ভারতবর্ষে খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। গত মাসে কলিকাতা খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল।

খিলাফৎ কনফারেন্স নামটির সহিত বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘ নামটির এই সাদৃশ্য আছে, যে, এখন খিলাফৎ নাই অথচ খিলাফৎ কন্‌ফারেন্স আছে, এখন বর্ণাশ্রম নাই অথচ বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘ আছে।

"হরিজন"দিগের পাইকারী মুসলমানীকরণ

কলিকাতা খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সে ঢাকার নবাব সাহেব বক্তৃতা করেন ও বলেন, যে, ডাঃ আম্বেদকর যে সমুদয় হরিজনদের হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তরগ্রহণের প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে দল-কে-দল মুসলমান করিবার একটি "স্বর্ণ সুযোগ" উপস্থিত করিয়াছে। ডাঃ আম্বেদকর এইরূপ কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি সব হরিজনদের নেতা নহেন, এবং অন্য নেতারা তাঁহার মতে সায়

দেন নাই। যাহা হউক, তাঁহার অনুচর যাঁহারা তাঁহারাও যদি দলবলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহাদিগকে পাইবেন তাঁহাদের সংখ্যা কিছু বাড়িবে বটে।

নবাব সাহেব অতঃপর বলেন, হরিজনদিগকে মুসলমান করিবার নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ ও উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার জন্য একটি মুস্লিম মিশন স্থাপিত করিতে হইবে, এক কোটি টাকা ও এক লক্ষ জীবন-সভ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, অন্ততঃ কুড়ি বৎসর প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য এক হাজার প্রচারক জোগাড় করিতে হইবে, এবং সব হরিজনকে মুসলমান করিবার জন্য পঞ্চাশ বৎসর সময় লাগিবে।

প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই অন্য ধর্ম্মের লোকদিগকে নিজ ধর্ম্মে আনিবার অধিকার আছে। সুতরাং নবাব সাহেবের প্রস্তাব অন্যায় নহে। তবে তাঁহাকে ও তাঁহার মতাবলম্বীদিগকে দু-একটা কথা বলিবার আছে। অমুসলমানকে কলমা পড়াইয়া মুসলমান করাই যথেষ্ট নহে। মুসলমান ধর্ম্মের শাস্ত্রে কি আছে, তাহা তাহাদিগকে জানাইতে হইবে, জানাইতে হইলে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহা গেল ধর্ম্মের দিক্। সাংসারিক বিষয়েও যাহাতে তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য হয়, তাহা করিতে হইবে; অর্থাৎ বৃত্তিশিক্ষা দিতে হইবে, চাষবাস ও কারিগরী শিখাইতে ও তাহার মূলধন যোগাইতে হইবে, এবং রোগে ও দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন ভূমিকম্প আদি আকস্মিক বিপদে সাহায্য দিতে হইবে। বর্ত্তমানে যাঁহারা মুসলমান আছেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে ও সাংসারিক বিষয়ে এই রকম সাহায্য নবাব সাহেব ও অন্য নেতারা কি পরিমাণে দিয়াছেন, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

হরিজনদিগকে মুসলমান করিবার জন্য যেরূপ অর্থব্যয়ের অনুমান নবাব সাহেব করিয়াছেন, তাহাও পরীক্ষা করা আবশ্যক। সমগ্র ভারতবর্ষে হরিজনদের সংখ্যা হিন্দু-বিরোধীরা বলেন মোটামুটি ছয় কোটি। অন্যেরা চারি কোটির কম বলেন না। যদি তাহাদের সংখ্যা চারি কোটিই ধরা যায়, তাহা হইলে এক কোটি টাকার সুদ হইতে চারি কোটি লোককে মুসলমান করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। যদি এক কোটি টাকার সুদ হইতে না করিয়া মবলগ এক কোটি টাকাই চারি কোটি মানুষকে ধর্ম্মান্তরগ্রহণ করাইবার নিমিত্ত খরচ করা হয়, তাহা হইলেও মাথাপিছু চারি আনা খরচের জন্য পাওয়া যায়। মাথাপিছু চারি আনা ব্যয়ে কি তাহাদিগকে সামান্য সাধারণ শিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে? চাষবাস, কারিগরী ও ব্যবসাবাণিজ্যের মূলধন ত যোগান যায়ই না।

১৯২৩ সালে যখন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কাকিনাডা (Cocanada) শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন মৌলানা মোহম্মদ আলী তাহার সভাপতি রূপে এই রকম একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন এক জন ধনী মুসলমান (বোধ হয় আগা খাঁ) টাকা দিতে রাজী আছেন। তদনুসারে কোন কাজ হয় নাই।

মুসলমানেরা তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি কি প্রকারে করিবেন তাহা তাঁহাদের চিন্তিতব্য। হিন্দুদিগকে ভাবিতে হইবে, তাঁহারা কেমন করিয়া হরিজনদিগের উন্নতি বিধান করিয়া ও তাঁহাদিগকে সামাজিক মর্য্যাদা দিয়া হিন্দু রাখিবেন। হরিজন ও নিম্নশ্রেণীর লোক মুসলমানদের মধ্যেও আছে। আমরা যাহা দেখিয়া আসিতেছি, তাহা এই, যে, অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত হিন্দুরা অবনত হিন্দুদের জন্য নিজ কর্ত্তব্য যথেষ্ট না করিলেও যতটা করেন, অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত মুসলমানেরা অবনত মুসলমানদের জন্য ততটা করেন না, এবং হিন্দুসমাজে জনহিতৈষণা ও সার্ব্বজনিক কার্য্যে উৎসাহ সামান্য যতটুকু আছে, মুসলমান সমাজে তাহাও নাই। সুতরাং অবনত হিন্দুরা রাগ করিয়া মুসলমান হইলে তাঁহাদের কল্যাণ বা লাভ কি হইবে বুঝিতে পারি না। বঙ্গের হরিজনরা ব্যবস্থাপক সভায় ত্রিশটা আসন পাইয়াছেন। তাঁহারা মুসলমান হইলে মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে নিজেদের ভাগ হইতে ত্রিশটা আসন ছাড়িয়া দিবে কি?

যদি বলেন, মুসলমানরা একেশ্বরবাদী, অতএব মুসলমান হওয়া ভাল। তাহার উত্তর এই, যে, হরিজনরা ত একেশ্বর-বাদের জন্য মুসলমান হইবে না, সামাজিক সুবিধার জন্য হইবে। আর যদি কেহ একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য উপনিষদে গীতায় একেশ্বরবাদ আছে, ব্যাপক অর্থে যাহা হিন্দুসমাজ তাহার অন্তর্গত শিখদের, ব্রাহ্মদের ও আর্য্যসমাজীদের ধর্ম্মে একেশ্বরবাদ আছে, এবং তাহাদের ও বৌদ্ধদের ধর্ম্মে সামাজিক সাম্যও আছে।

স্বাধীনতা ও ডোমীনিয়নত্ব

ঢাকার নবাব সাহেব বলেন, স্বাধীনতা কেজো রাজনীতির বাইরে ("outside the pale of practical politics")। তিনি ডোমীনিয়নত্বের পক্ষপাতী। এই দুটির পরস্পর সম্পর্ক ও আপেক্ষিক মূল্য সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। মুসলমানেরা যদি ডোমীনিয়ন ষ্টেটাসই চান, তাহাও ত ভারতশাসন আইন দেওয়া দূরে থাক, তাহার নামও করে নাই। তাহা পাইবার জন্য মুসলমান সম্প্রদায় কি করিয়াছেন ? কি করিতেছেন ?

—

স্বরাজ ও সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

নবাব সাহেব বলেন,

"The political individuality of Indian Muslims must be recognized in any scheme of national self-government or swaraj."

"জাতীয় স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজের কোন পরিকল্পনায় ভারতীয় মুসলমানদের সমষ্টিগত রাজনৈতিক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।"

পৃথিবীতে যত বৃহৎ ও উন্নত স্বশাসক দেশে স্বরাজ আছে, তাহার কোথাও এক-একটা ধর্ম্মসম্প্রদায়কে এক-একটা রাষ্ট্রীয় দল মনে করা হয় না। রাজনৈতিক মত অনুসারে সেই সব দেশে রক্ষণশীল, উদারনৈতিক, প্রাগতিক, গণতান্ত্রিক ইত্যাদি দল হয়। আবার অর্থনৈতিক স্বার্থ অনুসারে ধনিক, শ্রমিক, চাষী প্রভৃতি দল হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয়বিধ নানা দলেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক থাকে। কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর যে প্রতিনিধিনির্ব্বাচন হয়, তাহাতে দেখা যায়, যে, দলগুলির সভ্যসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে। যে আগে রক্ষণশীল ছিল, সে হয়ত উদারনৈতিক হইয়াছে, এবং পরে আবার হয়ত গণতান্ত্রিক হইতে পারে ; যে শ্রমিক ছিল, সে চাষীর দলে যাইতে পারে, পরে আবার ধনিকের দলেও যাইতে পারে। কিন্তু কেবল ধর্ম্মমত অনুসারে দল গঠিত হইলে এরূপ আবশ্যক ও কল্যাণকর হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমানগণ

নবাব সাহেবের মতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে একটা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে এবং তাহাতে নিজেদের একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। কথাগুলা সত্য নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গবর্মেণ্টের প্রতিষ্ঠিত, ইহার আইনকানুন সরকারের অনুমোদিত, অধ্যাপক ও বড় কর্ম্মচারীদের নিয়োগ সরকারী অনুমোদন-সাপেক্ষ। ইহা নির্দোষ ও নিখুঁৎ প্রতিষ্ঠান নহে। কিন্তু ইহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দেয় না। বরং ইহা খ্রীষ্টীয়ানদের বাইবেল পড়ায়। সে-বিষয়ে ত মুসলমানেরা কোন উচ্চবাচ্য করেন না।

গবর্মেণ্ট মুসলমান, ফিরিঙ্গী ও ভারতবর্ষের বাসিন্দা ইংরেজদিগকে চাকরীর নির্দ্দিষ্ট ভাগ দিয়া তাহাদিগকে বিপথচালিত করিয়াছেন। ধর্ম্মমতনির্ব্বিশেষে কেবল যোগ্যতা অনুসারেই চাকরী দেওয়া উচিত।

সেনেটের অধিকাংশ সভ্য গবর্মেণ্ট মনোনীত করেন। সুতরাং তাহার জন্য হিন্দুদিগকে আক্রমণ করা অন্যায়। সীণ্ডিকেটের সভ্য নির্ব্বাচন করেন সেনেট।

সেনেট ও সীণ্ডিকেটের সদস্যের আসন ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে ভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব ভারতবর্ষের বাহিরে—ইউরোপ আমেরিকায়—কেহ কখনও করে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাই বিবেচিত হইবে, ধর্ম্মমত নহে। আর যদি প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়কে কতকগুলি করিয়া সদস্যের আসন দিতেই হয়, তাহা হইলে ভাগ করিবার সময় কোন্ সম্প্রদায়ে পুরুষ নারী শিশু যুবা বৃদ্ধ লিখন-পঠনক্ষম নিরক্ষর যত লোকে আছে, সকলের সংখ্যা বিবেচনা না করিয়া কোন সম্প্রদায়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত (যেমন গ্রাডুয়েট) কত আছে, তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে, এবং তদনুসারেই ভাগবাঁটোয়ারা করিতে হইবে।

মুসলমান সম্প্রদায় কেবল এইটাই ভাবেন, যে, হিন্দুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতগুলা অধ্যাপকতা ইত্যাদি পাইল ; এটা ভাবেন না, যে, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছে, তাহাদেরই বিদ্যাবত্তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কত বাড়িয়াছে, তাহারা বহু লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়াছে। মুসলমানেরা লইবার পাইবার প্রতিযোগিতায় অগ্রসর, কিন্তু খাটিবার দিবার প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ আছে, কিন্তু হিন্দুসমাজ তাহার জন্য দায়ী নহে। দোষের কারণ অন্য। তাহার আলোচনা আমরা বিস্তর করিয়াছি।

নবাব সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও চয়নিকাগুলির ("selections") ইসলাম-বিরোধী পলিসির কথা বলিয়াছেন। এরূপ কোন পলিসি নাই। চয়নিকাগুলিতে মুসলমান লেখকদের লেখাও আছে। হিন্দু লেখকদের লেখায় হিন্দুভাব ও দেবদেবীর উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক। সে সব যে আছে, তাহা হিন্দুত্ব প্রচারের জন্য নহে। যে-সাহিত্যের অধিকাংশ লেখক যে-সম্প্রদায়ের তাহাদের মতের ছাপ তাহাতে থাকিবেই। ইংরেজী সাহিত্যের অধিকাংশ লেখক খ্রীষ্টিয়ান। সুতরাং তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার না করিলেও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ছাপ অনেকের লেখাতে পাওয়া যায়। মিণ্টনের প্যারাডাইজ লস্ট্ ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমতে পূর্ণ। অথচ তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-তালিকার মধ্যে থাকে। তাহাতে মুসলমানরা আপত্তি করেন না। বাইবেল পড়ান হয়, তাহাতেও আপত্তি হয় না। গ্রীক ও রোমান দেবদেবী জুপিটার, এপলো, মার্স, ভীনস, মিনার্ভা, জুনো প্রভৃতির উল্লেখ ও বৃত্তান্ত বিস্তর ইংরেজী বহিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট কোন কোন পাঠ্যপুস্তকে আছে। সেগুলি সাহিত্য হিসাবেই অধীত হয়। কেহ মনে করে না, যে, তদ্দ্বারা গ্রীক ও রোমানদের ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

—

"বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জয়"

অতঃপর নবাব সাহেব বলেন—

"The remedy lay firstly in the conquest of the Bengali language and literature by Muslim men of letters; and secondly in the cultivation and promotion of Urdu in Bengal."

"প্রতিকারের উপায় দুটি। প্রথমতঃ, মুসলমান সাহিত্যিকদিগের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জয়ে; এবং দ্বিতীয়তঃ, বঙ্গে উর্দ্দুর অনুশীলনে ও প্রচারে।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জয় করা পদার্থটি কি, বক্তা তাহা খুলিয়া বলিলে ভাল হইত। দেশজয়ের মানে সহজে বুঝা যায়। দেশটা, তাহার জমী জায়গা ধনদৌলত, অন্য লোকের ছিল, হইয়া গেল বিজেতার। বিজেতা জিনিষ লুটিয়া লইল। ভাষা ও সাহিত্য জয় ত তেমন কিছু নয়। চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যগুলি কোন মুসলমান দখল করিতে পারিবেন না। করিলেও তাঁহার বড় বিপদ। কারণ, লোকে বলিবে, তিনি ঐ সকল কাব্যের হিন্দুভাব ও হিন্দু দেবদেবীর আরাধনা প্রভৃতি প্রচার করিতেছেন! মুসলমানের এরূপ অপবাদ হওয়া উচিত হইবে কি?—যদিও অতীত কালে কোন কোন মুসলমান কবি এই রকম কাজ করিয়াছেন।

অবশ্য, জীবিত মহাকবি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর আলমারীগুলি দখল করা চলিতে পারে। কিন্তু সেগুলিতেও হিন্দু ও বৌদ্ধ পৌরাণিক উপাখ্যান, হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ এবং হিন্দুভাব আছে।

হয়ত নবাব সাহেব ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন, যে, মুসলমান সাহিত্যিকদের এত বেশী করিয়া বাংলা বহি লেখা উচিত, যে, বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ মুসলমান লেখকদেরই সাহিত্য হইয়া উঠিবে। ইহা খুব ভাল পরামর্শ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যে, তাঁহারা যাহা লিখিবেন, তাহা সাহিত্য নামের যোগ্য হওয়া উচিত। অমুসলমান বাঙালীরাও যাহা কিছু লেখেন ও ছাপেন তাহা সাহিত্য হয় না এবং বাংলা সাহিত্যে স্থান পায় না। অন্যদের কথা বলা উচিত নয়। আমার নিজের কথাই বলি। প্রায় ৩৫ বৎসর ধরিয়া আমি 'প্রবাসী'তে প্রতি মাসে অনেক পৃষ্ঠা লিখিতেছি। তাহার আগে আমার সম্পাদিত 'প্রদীপে' এইরূপ লিখিতাম। তাহার পূর্ব্বে আমার সম্পাদিত 'দাসী'তে ও আমার সম্পাদিত 'ধর্ম্মবন্ধু'তে লিখিতাম। সর্ব্বসমেত পাঁচ ছয় হাজার পৃষ্ঠা লিখিয়া থাকিব। কিন্তু ইহার একটি পৃষ্ঠাও বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইবে কি না সন্দেহ। অতএব, শুধু লিখিলেই হইবে না; যাহা লিখিত হইবে, তাহা সাহিত্য হওয়া চাই।

বাংলা ভাষা জয় করাও হয়ত নবাব সাহেব এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, যে, মুসলমান লেখকেরা এত লিখিবেন, যে, তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দাবলীতেই বাংলা শব্দকোষ পূর্ণ হইয়া যাইবে। এখানেও বলি, তাহা হইবে যদি তাঁহারা বাংলা ভাষার মজ্জাগত স্বভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শব্দপ্রয়োগ করেন, জোর করিয়া কতকগুলি আরবী ফারসী শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকাইতে চেষ্টা না করেন।

শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানেরা এই প্রকারে বাংলা পড়া ও লেখার সমধিক চর্চ্চা করিলে ফল ভালই হইবে। কিন্তু তাঁহাদিগকে যদি নবাব সাহেবের পরামর্শের সমস্তটারই

অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অমুসলমান বাঙালী লেখকদিগকে বাংলার চর্চ্চায় ও বাংলা-রচনায় অতিক্রম কি প্রকারে করিবেন?

বাঙালী মুসলমানদিগকে ইংরেজী শিখিতে হইবে—অন্ততঃ যত দিন ভারতবর্ষ ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবে। তাহার উপর তাঁহাদিগকে ফারসী আরবী শিখিতে হইবে। বাংলাও শিখিতে হইবে। তদুপরি উর্দ্দু শিখিবার পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। তাহা হইলে বিজ্ঞান ইতিহাসাদি ভিন্ন শুধু ভাষাই শিখিতে হইবে তাঁহাদিগকে পাঁচটি। অমুসলমান বাঙালীদিগকে শিখিতে হইবে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী, এই তিনটি ভাষা। সুতরাং তাঁহারা বাংলা শিখিবার ও বাংলা সাহিত্যের সেবা করিবার সময় মুসলমান বাঙালীদের চেয়ে অনেক বেশী পাইবেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি হিন্দু বাঙালী সাহিত্যিকদের মনের ভাবের কিছু আভাস পাওয়া যায় তাঁহাদের ব্যবহৃত "সাহিত্যসেবী" কথাটি হইতে। ঢাকার নবাব সাহেবের মনের ভাবের পরিচয় তাঁহার প্রদত্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য "জয়" করিবার পরামর্শ হইতে। সেবা ও জয়ে প্রভেদ আছে। অবশ্য, নবাব সাহেব যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না; কারণ, তাঁহার নামের গোড়ায় ক্যাপ্টেন উপাধিটি রহিয়াছে। সুতরাং তিনি যদি কখন যুদ্ধ না-ও করিয়া থাকেন, তথাপি যোদ্ধমনোভাব পোষণ ও বৰ্দ্ধন তাঁহার কর্ত্তব্য বটে।

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ও পোর্ট ট্রাষ্ট

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ সদস্য এবং সম্পূর্ণ ইংরেজপ্রভাবাধীন কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট যথাক্রমে মিউনিসিপালিটীর ও পোর্ট ট্রাষ্টের সব চাকরীর সিকি অংশ মুসলমানদিগকে দিতে রাজী না-হওয়ায় মুসলমান সম্প্রদায় ও ঢাকার নবাব চটিয়াছেন। ইহা খুবই সম্ভব, যে, কখন কখন যোগ্য মুসলমান প্রার্থীদেরও দাবি মিউনিসিপালিটী ও পোর্ট ট্রাষ্ট উপেক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এই প্রকারে যোগ্য হিন্দুদের দাবিও অধিকতর স্থলে অগ্রাহ্য হইয়াছে—কারণ শিক্ষিত বেকার হিন্দু উমেদারের সংখ্যা শিক্ষিত বেকার মুসলমানদের সংখ্যার চেয়ে বেশী; এবং যোগ্য খ্রীষ্টীয়ানদেরও অনেকের দাবি অগ্রাহ্য হইয়াছে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই যেখানে সম্পর্কিত লোকদিগকে, নিজ নিজ দলের লোকদিগকে ও আশ্রিত লোকদিগকে চাকরী দিবার নিমিত্ত যোগ্য অন্য লোকদের দাবি অগ্রাহ্য না হয়। কিন্তু ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের লোকসংখ্যা অনুসারে চাকরী বাঁটিয়া দেওয়া ইহার প্রতীকার নহে; এরূপ বণ্টন হইলেও প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই যোগ্য অনেকের দাবি উপেক্ষিত হইতে থাকিবে। কেবলমাত্র যোগ্যতম প্রার্থীকে কাজ দিতে হইবে, এই আদর্শ অবিরত দৃঢ়তার সহিত অনুসরণই একমাত্র প্রতীকার। এই উপায়ই অগ্রসর ও উন্নতিকামী প্রত্যেক দেশে অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে, এই সকল দেশের কোথাও ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে চাকরীর ভাগবাঁটোয়ারা হয় নাই। এমন এক সময় ছিল, যখন ইংলণ্ডে রোমান কাথলিকরা, ইহুদীরা ও নন-কনফর্মিষ্টরা কেবল যে সরকারী চাকরী পাইত না, এমন নয়, আইনজীবী হইতে পারিত না, প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা পাইতে পর্য্যন্ত পারিত না। কিন্তু ইংরেজরা ভারতবর্ষের কল্যাণসাধন ও প্রধানতঃ মুসলমানদের সন্তোষের জন্য নানা দিকে যে ভাগবাঁটোয়ারা চালাইতেছেন, নিজের দেশে তাহা কখনও চালান নাই। নির্দ্দিষ্ট হারে সরকারী চাকরী মুসলমানদের জন্য রক্ষিত হওয়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের ইচ্ছা মন্দীভূত হইয়াছে, উচ্চশিক্ষালাভ অনেকটা অনাবশ্যক হইয়াছে, এবং তাঁহাদিগকে ইংরেজের অনুগ্রহের কাঙাল হইতে হইয়াছে।

—

ঈদের দিনে কলিকাতায় দাঙ্গা

কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কে অনেক মুসলমান ঈদের নমাজের জন্য প্রাতে একত্র হন। ঐ পার্কে কংগ্রেস-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সভা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রভৃতিরও আয়োজন হয়। কংগ্রেস ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহা কোন প্রকারে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধী ত নহেই, বরং ব্রিটিশ মন্ত্রীদের সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়োরা না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতি অবলম্বন দ্বারা মুসলমানদিগকে খুশী করিবার চেষ্টাই করিয়াছে। তথাপি পুলিস দুটি অনুষ্ঠানই একই পার্কে একই সময়ে করিতে না

দিলে ভাল হইত। পুলিস কেন অনুমতি দিয়াছিল বলিতে আমরা অসমর্থ।

কাহার দোষে কতকগুলি মুসলমান কংগ্রেস-জয়ন্তী সভার লোকদিগকে লাঠি লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ সভাপতি ছিলেন। তাঁহার বিবৃতি হইতে বুঝা যায়, কোন প্রকার আপোষ-মীমাংসার চেষ্টাই হয় নাই, মুসলমানদের যে কোন অভিযোগ আছে কেহ তাঁহাকে বলেও নাই। এই ঘটনাটার জন্য সমগ্র মুসলমানসমাজ দায়ী নহে। কিন্তু কতকগুলি মুসলমান যে মারপিট করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দেশবন্ধু পার্কে গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈদ একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ইহা দ্বারা সদ্ভাব বৃদ্ধি মুসলমান ধর্ম্মের অভিপ্রেত। এরূপ পর্ব্বে নমাজ করিতে যাইবার সময় এতগুলি লোকের লাঠি লইয়া যাইবার প্রয়োজন কেন অনুভূত হইল?

—

বাঙালীর বিদ্যাসাগর-বাসভবন ক্রয়

গত ৬ই পৌষ বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসভবনে রবিবাসর নামক সমিতির অধিবেশন হয় এবং সভাস্থলে তাঁহার একটি তৈলচিত্র রক্ষিত হয়। শ্রীযুক্ত জলধর সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আমরা অবগত হইয়া সুখী হইলাম, যে, সভাপতি মহাশয় সভাস্থলে বলেন:—

> এই গৃহে মিলিত হইবার আমাদের সৌভাগ্য হইয়াছে। ইহা কেবল বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের নহে কিন্তু বাঙ্গালী মাত্রেরই পবিত্র তীর্থ। অত্যন্ত লজ্জার কথা এই যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই গৃহ অবাঙ্গালীর নিকট বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। ৭০ হাজার টাকার জন্য বাঙ্গালী এই অমূল্য জাতীয় সম্পদ রাখিতে পারে নাই। কলিকাতাস্থ ধনী বাঙ্গালীগণ এদিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই পবিত্র গৃহ নদীয়ার অধিবাসী ও আমার নিকট-গ্রামবাসী শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ক্রয় করিয়াছেন।"

আশা করি ক্রেতা মহাশয় বাড়ীটির অন্ততঃ কোন অংশ এরূপ ভাবে ব্যবহার করিবেন বা ব্যবহারের বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে উহা প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মারক হয়।

—

বিজয়রাঘবাচার্য্য-জয়ন্তী

এখন যে-কয়জন ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস-সভাপতি জীবিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে দীনশাহ্ এডুলজি ওয়াচা বয়সে সকলের চেয়ে বড়। তাঁহার বয়স ৯০ বা তাহার কিছু অধিক হইবে। কিন্তু তিনি অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার পরই বর্ষীয়ান শ্রীযুক্ত সি বিজয়রাঘবাচার্য্য। তাঁহার বয়স ৮৩ পার হইয়া ৮৪ বৎসরে চলিতেছে। তিনি এখনও বেশ কর্ম্মিষ্ঠ আছেন। এলাহাবাদে সাম্প্রদায়িক মিলন সংসাধনের জন্য যে কন্‌ফারেন্স হয়, তাহাতে তিনি সাতিশয় ধৈর্য্য, স্বাধীনচিত্ততা, ও বিচক্ষণতার সহিত সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। গত বৎসর কানপুরে হিন্দু মহাসভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি প্রস্তাব করেন, যে, সম্রাট ৫ম জর্জ ঘোষণাপত্র দ্বারা ভারতবর্ষকে স্বরাজ প্রদান করুন। হরিদ্বারে শহরের সমুদয় ময়লা ও আবর্জ্জনা ফেলিয়া যাহাতে গঙ্গার জল দূষিত করা না হয়, তজ্জন্য তিনি স্বয়ং সব দেখিয়া শুনিয়া এই বিষয়ে প্রস্তাব গবর্মেণ্টের নিকট উপস্থিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাসনগর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সুদূর সালেম হইতে হরিদ্বার গিয়াছিলেন। তিনি ৫০ বৎসরেরও অধিক কাল সার্ব্বজনিক হিতকর কার্য্যে সময় ও শক্তি নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার জয়ন্তী হইয়া গিয়াছে। তিনি স্বাধীন মননশক্তিশালী। ভারতবর্ষকে এতগুলি প্রদেশে বিভক্ত ও খণ্ডিত করিয়া তৎপরে উহাকে একটা ফেডারেশ্যনে পরিণত করার তিনি বিরোধী। তিনি ভারতবর্ষকে অখণ্ড একতাসূত্রেবদ্ধ একটি মাত্র দেশ বলিয়া শাসনের পক্ষপাতী এবং তাহার অনুকূলে সুযুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন।

—

বাংলা বানানের নিয়ম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিভাষা-সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সমিতির একটি চেষ্টায় বাংলা-লেখকদের সাহায্য চাহিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ভাষায় দুই রীতি চলিতেছে—'সাধু' ও 'চলিত'। বহুকাল বহু প্রচারের ফলে সাধু-ভাষায় প্রযুক্ত শব্দসমূহের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চলিত-ভাষায় তাহা হয় নাই, বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রীতিতে বানান করেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে চলিত-ভাষা স্থান পাইয়াছে, পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের উত্তর চলিত-ভাষায় লিখিতে পারে এমন অনুমতিও কলিকাতা এবং ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় দিয়াছেন। বাঙলা শব্দের, বিশেষতঃ চলিত-ভাষায় প্রযুক্ত শব্দের, বানান-পদ্ধতি নিরূপণ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা শিক্ষক ও ছাত্র সকলকেই পদে পদে সংশয়ে পড়িতে হইবে। বানানের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম গৃহীত হইলে লেখকমাত্রেই সুবিধা বোধ করিবেন।

"বাঙলা বানানের নিয়ম সংকলনের নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সমিতির প্রথম কার্য—বিশিষ্ট লেখকগণের অভিমত-সংগ্রহ। এই উদ্দেশ্যে সংলগ্ন প্রশ্নপত্র গঠিত হইয়াছে।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেরও এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত।

—

ধানের রেলভাড়া

বঙ্গের অনেক গ্রামে যে ধান জন্মে, উৎপত্তিস্থানে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসকলে তাহার দাম এত কম, যে, তাহাতে মজুরী ও অন্য খরচ পোষায় না। যদি সর্ব্বত্র ভাল রাস্তা থাকিত, অনেক নদী ভরাট না-হইয়া গিয়া নৌচালনের উপযুক্ত থাকিত, এবং রেলভাড়া কম হইত, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী জায়গায় ধান চালান করিতে পারিলে চাষীরা বেশী দাম পাইতে পারিত। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ধানের ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও ঈষ্ট বেঙ্গল রেলওয়েরও ধানের ভাড়া কমান উচিত। তাহাতে শুধু যে চাষীদের সুবিধা হইবে, তাহা নহে; ধান্যের চালান বাড়ায় তাঁহাদেরও আয় বাড়িবে। তদ্ভিন্ন পরোক্ষভাবেও তাঁহাদের আয় বাড়িবে। চাষীদের হাতে পয়সা আসিলে তাহারা রেলে এখনকার চেয়ে বেশী যাতায়াত করিবে, এবং এমন সব জিনিষও কিনিবে যাহা রেলে নানা স্থান হইতে আসে; সুতরাং সেই সব জিনিষ বহন করিয়া রেলের আয় হইবে।

—

মনিঅর্ডার সম্বন্ধে গ্রাম্যজনের অসুবিধা

দরিদ্র লোকদের দু-চার টাকার মনি অর্ডার গ্রাম্য ডাকঘরে আসিলে ডাকঘরে খুচরা টাকার অভাবে অনেক সময় এই সব মনিঅর্ডার বিলি হয় না। তা ছাড়া কখন কখন মনিঅর্ডার বিলি করিবার সময় পিয়ন গ্রহীতার নিকট হইতে কিছু আদায় করে। এই দুই অভিযোগের প্রতীকার ডাক-বিভাগের করা উচিত।

—

রবীন্দ্রনাথ ঢেঁকির চালের পক্ষপাতী

জানুয়ারি মাসের "বিশ্বভারতী নিউসে" রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, চাল পালিশ করায় তাহার পুষ্টিকর আবরণ অংশ নষ্ট হয়, তাহার পর চাল সিদ্ধ করিয়া ফেন গালিয়া ফেলায় পুনর্ব্বার আর কতক পুষ্টিকর অংশের অপচয় হয়। এই জন্য তিনি ঢেঁকিতে ভানা ও ছাঁটা চালের ব্যবহারের এবং এ প্রকারে ভাত রাঁধার পক্ষপাতী যাহাতে ফেন আলাদা হইয়া না-থাকে ও ফেলিয়া দিতে না-হয়। চালের কলের পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববৎ আমাদের ঢেঁকি চালান একান্ত আবশ্যক। ফেন আলাদা হইয়া থাকিবে না, এরূপ রান্না করাও সহজ।

—

শিখদের কৃপাণ-সত্যাগ্রহ

কৃপাণধারণ শিখদের ধর্ম্মের একটি অঙ্গ। তাহাদের দীক্ষার জন্যও ইহা আবশ্যক হয়। কৃপাণ কাহারও অনিষ্ট করিবার জন্য বা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় না। অস্ত্র-আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে গবর্ণর-জেনের‍্যাল শিখদের কৃপাণকে অস্ত্রের পর্য্যায় হইতে বাদ দিয়াছেন, অথচ পঞ্জাবে সরকারী আদেশে কিছুকালের জন্য প্রকাশ্য স্থানে শিখদের কৃপাণধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। শিখরা ৫ জন ৫ জন করিয়া এই আদেশ অমান্য করিয়া জেলে যাইতেছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্ট লাহোরের রাস্তা দিয়া ষাট হাজার মুসলমানকে খোলা তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাদশাহী মসজিদে নমাজ করিতে যাইতে দিয়াছিলেন—যদিও নমাজের সঙ্গে অস্ত্রসজ্জার সম্পর্ক বুঝা কঠিন;—আর এখন সেই গবর্ণমেণ্ট বেচারা কৃপাণের উপর বিরূপ হইয়াছেন!

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৪২

৫ম সংখ্যা

পেয়ালী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাকে এনে দিল এই বুনো চারাগাছটি।
পাতার রং হল্‌দে সবুজ,
ফুলগুলি যেন আলো পান করবার
শিল্প-করা পেয়ালা, বেগুনি রঙের
প্রশ্ন করি, নাম কী,
জবাব নেই কোনোখানে।
ও আছে বিশ্বের অসীম অপরিচিতের মহলে
যেখানে আছে আকাশের নামহারা তারা।
আমি ওকে ধ'রে এনেছি একটি ডাকনামে
আমার একলা জানার নিভৃতে।
ওর নাম পেয়ালী।
বাগানের নিমন্ত্রণে এসেছে ডালিয়া, এসেছে ফুশিয়া,
এসেছে ম্যারিগোল্ড্,
ও আছে অনাদরের অচিহ্নিত স্বাধীনতায়,
জাতে বাঁধা পড়ে নি
ও বাউল, ও অসামাজিক।

দেখতে দেখতে ঐ খসে পড়ল ফুল।
যে শব্দটুকু হ'ল বাতাসে
কানে এল না।
ওর কুষ্ঠির রাশিচক্র যে নিমেষগুলির সমবায়ে
অণুপরমাণু তার অঙ্ক,
ওর বুকের গভীরে যে মধু আছে
কণাপরিমাণ তার বিন্দু।
একটুকু কালের মধ্যে সম্পূর্ণ ওর যাত্রা,
একটি কল্পে যেমন সম্পূর্ণ
আগুনের পাপড়ি-মেলা সূর্য্যের বিকাশ।
ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটো পাতার কোণে
বিশ্ব-লিপিকারের অতি ছোটো কলমে লেখা।

তবু তারই সঙ্গে সঙ্গে উদ্ঘাটিত হচ্ছে বৃহৎ ইতিহাস,
দৃষ্টি চলে না এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায়।
শতাব্দীর যে নিরন্তর স্রোত বয়ে চলেছে
বিলম্বিত তালের তরঙ্গের মতো,
যে-ধারায় উঠ্‌ল নাম্‌ল কত শৈলশ্রেণী,
সাগরে মরুতে কত হ'ল বেশ-পরিবর্ত্তন,
সেই নিরবধি কালেরই দীর্ঘ প্রবাহে এগিয়ে এসেছে
এই ছোটো ফুলটির আদিম সঙ্কল্প
সৃষ্টির ঘাতপ্রতিঘাতে।

লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে
সেই পুরাতন সঙ্কল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয় নি দেখা।
এই দেহহীন সঙ্কল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে?
যে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
যে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীতে ভবিষ্যতে॥

শান্তিনিকেতন
৫ নবেম্বর ১৯৩৫

গ্রামসেবার পথে

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

আত্রাই হইতে আজ অনেক দিন হইল বেঙ্গল রিলিফ কমিটির চিকিৎসা ও খাদি-কার্য্য চলিতেছে। খাদির কার্য্য খাদিপ্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে হয়। আত্রাইয়ের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে এত দিন স্ত্রীলোকেরা পয়সার জন্যই সুতা কাটিয়া আসিতেছিল, নিজেরা মিলের কাপড় পরিত। পরে তাহাদিগকে কিছু কিছু

তিলাবদুরী গ্রামের একটি কাপাস গাছ। এইটিতে ৪০০০ ফল এক সময়ে গুণতি করা হয়

খাদি ব্যবহারে অভ্যস্ত করান হয়। আদর্শের দিক দিয়া ইহা আবশ্যক যে তাহারা যেন নিজেদের সমস্ত বস্ত্রই নিজেদের সুতার বিনিময়ে করিয়া লয়। ইতিপূর্ব্বে এই দিকে বিশেষ অগ্রসর হওয়া যায় নাই। গত বৎসর হইতে খাদিপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবী ইহাদিগকে বস্ত্রে স্বাবলম্বী করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। প্রথমতঃ কাটুনীরা কেবল নিজেদের জন্য সুতা কাটিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও অন্ততঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবী উঁহাদিগকে সম্মত করান। পরীক্ষার ফল বড় ভাল হয়। এত দিন স্ত্রীলোকেরা সুতা কাটিয়া যে পয়সা পাইত বাড়ির পুরুষেরা সংসার-খরচের জন্য তাহা লইয়া যাইত, উঁহাদের হাতে কিছু থাকিত না, অথচ কাপড়ের জন্য পুরুষদের উপর নির্ভর করিতে হইত। কয়েক জন স্ত্রীলোক সুতা কাটিয়া তাহাদের ইচ্ছামত কাপড় পাওয়ার পর অন্য সকলের ভিতর কাপড় পাওয়ার জন্য আগ্রহের সঞ্চার হয়। এখন সকলেই চরখা চাহিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রহায়ণ-পৌষের ধান-তোলার কাজ শেষ হইলে সকলেই বস্ত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য চরখা লইবে।

এই অঞ্চলে ৮টি গ্রাম লইয়া বস্ত্রে স্বাবলম্বন কার্য্যে খাদিপ্রতিষ্ঠানের গ্রামসেবা নিবদ্ধ ছিল। এক্ষণে ২১ খানা গ্রামে এই কার্য্য আরম্ভ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রামগুলিতে বস্ত্র-স্বাবলম্বনের ও অন্য সর্ব্বপ্রকার সেবার আয়োজন করার জন্য গ্রাম্য বিবরণ সংগ্রহ করার প্রয়োজন

বাঁশবেড়ে গ্রামে কাপাস গাছের তলায় বসিয়া বুড়ী সুতা কাটিতেছেন। ছোট পরিবার, একটি গাছের তুলায় বাড়ির সমস্ত কাপড় হয়

হয়। এই সকল গ্রামবাসী কর্ম্মীর দ্বারা কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। কর্ম্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়া গৃহস্থদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া নির্দ্দিষ্ট ফর্ম্ম পূরণ করিয়াছে। জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল নাম, জাতি, পরিবারস্থ পুরুষ স্ত্রী ও বালক-বালিকার পৃথক পৃথক সংখ্যা; পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে কয়জন কি ভাবে উপার্জ্জন করে; জমির পরিমাণ, খাজনা, ট্যাক্স, উৎপন্ন ফসলের মূল্য, অন্যান্য আয়, মোট আয়,

ঋণ, গোধন—বলদ, ষাঁড়, গাভী, বাছুর; চরখা, ঢেঁকী, তালগাছ, তুলাগাছ, ইত্যাদির সংখ্যার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যেক পরিবারের ঘর পূরণ করা হয়। তাহার পর গ্রামের সমষ্টি বাহির করা হয়। এই সকল বিবরণ হইতে যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে সে-সম্বন্ধে না-আমাদের না ঐ গ্রামবাসী কর্ম্মীদের কোনও ধারণা ছিল। ঐ সকল তথ্য হইতে বিচার্য্য বিষয় যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা একটি মাত্র গ্রাম লইয়া আলোচনা করিতেছি।

বাঁশবেড়িয়া গ্রামখানি আত্রাই (রাজশাহী) হইতে ৫ মাইল উত্তরে ও রঘুরামপুর ই. বি. আর রেল ষ্টেশন হইতে ১ মাইল পূর্ব্বে।

দেউলা গ্রামের এই কাপাস গাছটি ঘরের ছাউনী নষ্ট করিয়া ফেলে

জনসংখ্যা:—বাঁশবেড়িয়ায় ৭০ ঘর লোকের বাস, ৩৪ ঘর মুসলমান, ৩৬ ঘর হিন্দু, মাহিষ্য। মোট জনসংখ্যা ৩৫৯। ইহাদের মধ্যে ১০ বৎসরের কমবয়স্ক বালকবালিকা ৯৬ জন।

জমি:—গ্রামের লোকেদের ১১২১ বিঘা চাষের জমি আছে। ইহার মধ্যে তিনটি বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারের, ২২ জন লোকের মধ্যেই জমি আছে ২৮০ বিঘা। মুসলমানদের মাথা-প্রতি জমি পড়ে পৌনে দুই বিঘা; আর তিন ঘর বাদে অবশিষ্ট হিন্দুদের পড়ে আড়াই বিঘা।

আয়:—জমি হইতে ও অন্য বৃত্তি হইতে গ্রামের মোট আয় ৯১৪৪ টাকা। মুসলমান বাসিন্দাদের জন-প্রতি বার্ষিক আয় ১৫ টাকা, আর হিন্দুদের জন-প্রতি বার্ষিক আয় ২৮ টাকা। এই আয় হইতেই খাজনা ও চাষের খরচা দিতে হয়।

সুতাকাটা:—৩৪টি মুসলমান পরিবারের মধ্যে ১৩টি পরিবারের ১৩ খানা চরখা আছে। ৩৬টি হিন্দু পরিবারের মধ্যে ৩১টি পরিবারে ৫২ খানা চরখা আছে। অর্থাৎ ৭০টি পরিবারের ভিতর ৪৪টি পরিবার বস্ত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে আছে।

তুলা:—এই বাঁশবেড়িয়া গ্রামে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কিছু দেবকাপাস গাছ লাগান হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ১১২টা গাছ আছে। দেবকাপাস হইতে প্রচুর তুলা পাওয়ার উত্তম সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ওয়ার্দ্ধা, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি নানা জাতের তুলা এই অঞ্চলে চাষ করা হইয়াছিল, কিন্তু এই স্থানে অতিশয় বৃষ্টি হয় বলিয়া গাছগুলি পাতায় ভরিয়া যায়, ফল খুব কমই হয়।

দেবকাপাস বিশেষ ভাবে ভাল ফল দিতেছে। কয়েকটি গাছের যত্নসহকারে হিসাব লওয়া হয়। একটি ৯ ফুট ব্যাসের গাছে এই অগ্রহায়ণ মাসে ৪০০০ ফল গুণিয়া পাওয়া যায়। উহার ৪০টা ফল হইতে ৩ তোলা বীজ-সমেত কাপাস ও উহা হইতে ১ তোলা তুলা পাওয়া যায়। ৪ হাজার ফল হইতে এই হিসাবে ১০০ তোলা অথবা সওয়া-সের তুলা পাওয়া যায়। বৎসরে দুইবার এই প্রকার ফল হওয়ায় এক বৎসরে ২॥ সের তুলা পাওয়ার কথা। যাহার গাছ সেও বলে যে বৎসরে আড়াই-তিন সের তুলা পাইয়া থাকে। অন্য গ্রামের তুলার গাছ হইতেও এই প্রকার ফলনেরই হিসাব পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে যদিও তুলার ফল পাকিতেছে তথাপি আবার নূতন ফুলও দেখা দিতেছে। বৎসরে প্রায় আট মাস কাল কিছু কিছু ফল পাওয়া যায়। এই প্রকার গাছ এক কাঠায় ৭টা ও বিঘায় ১৪০টা হইতে পারে। তাহা হইলে বিঘাপ্রতি ১৪০৲ টাকা আয় হইতে পারে। যদি বিঘাপ্রতি ইহার এক-তৃতীয়াংশ তুলাও পাওয়া যায় তথাপি প্রতিবিঘায় ৫০ টাকা আয় হইতে পারে। এই অঞ্চলে কোন জমি হইতে এত আয় করা সম্ভব নয়। তুলা চাষ করিয়া বস্ত্রে স্বাবলম্বী ত হওয়াই যায়, অধিকন্তু উদ্বৃত্ত তুলা বিক্রয় করা যাইতে পারে। তুলার জন্য অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হওয়া বাংলার

প্রয়োজন নাই—যদি বস্তুতঃ সর্ব্বত্র এই প্রকার দেবকাপাস হইতে ফল পাওয়া যায়। কোন্ জেলায় দেবকাপাস কি প্রকার ফল দেয়, সে-সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু এতাবৎ জানা যায় নাই।

দুই তিন টাকায় এইরূপ গরু বিক্রয় হয়।
বাজারে সঙ্গে সঙ্গে এক বা দেড় টাকায় মুচিরা জীবন্ত গরুর চামড়ার মূল্য দিয়া দেয়, পরে চামড়া লয়

যাহারা বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইয়াছে তাহাদের হিসাব হইতে দেখা যায় যে বালক ও বয়স্ক নির্ব্বিশেষে গড়ে ১২ গজ কাপড় লাগিতেছে। ১২ গজ কাপড়ে ১॥ সের তুলা লাগে। বাঁশবেড়িয়ার ৩৫৯ জন লোকের জন্য উহার দেড়া অর্থাৎ ৫৩৮ সের তুলা লাগে এবং তুলার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ২৭০টা তুলাগাছ লাগে। ঐ গ্রামে ১১২টা তুলাগাছ আছে, আর ১৬০টা তুলাগাছ হইলেই এই গ্রাম তুলা সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। এক-এক বাড়িতে পাঁচ-ছয় জন লোক থাকিলে আট-নয় সের তুলা লাগিবে, সেজন্য চার-পাঁচটা গাছই যথেষ্ট। কিন্তু শীঘ্র অধিক তুলা ফলানর জন্য সাত-আটটা গাছ প্রতি-পরিবারে জন্মান দরকার। এক কাঠা জমিতে সাতটা পূর্ণবয়স্ক গাছ থাকিতে পারে। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে যে তুলার জন্য বাড়ির সংলগ্ন জমিতে মাথাপিছু একটি করিয়া গাছ বা সাত-আট জনের পরিবারে এক কাঠা জমিতে সাত-আটটি গাছ জন্মাইলেই যথেষ্ট হইবে।

বাঁশবেড়িয়ার মত এত কাপাস গাছ অন্য গ্রামগুলিতে নাই। অন্য গ্রামগুলিতে বীজ বুনাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

ধানভানার আয়:—বাঁশবেড়িয়ার ৭০টি পরিবারের ভিতর ৬৭টি পরিবারে ঢেঁকি আছে। যে যাহার নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী ধান ভানিয়া লয়। কেহ কেহ ধান ভানিয়া উপার্জ্জন করে। কিন্তু যাহারা ধান ভানিয়া কিছু পাইতে চায় তাহাদের সকল সময় কাজ জোটে না। স্থানীয় হাটে চাউলের চাহিদা কম, তাহা ছাড়া বাহিরে যাহা প্রয়োজন সেজন্য ধানই রপ্তানী হয়—চাউল রপ্তানী হয় না। এমন

আত্রাই অঞ্চলে লোকে তালের রস লইতে জানে না—গাছগুলি হইতে কোন আয় নাই

অনেক সময় উপস্থিত হয় যে ধান ভানিয়া বাজারে লইয়া গিয়া দেখিতে পায় যে চাউলের দাম এত কম যে ভানার মজুরী কিছুই থাকে না—কখনও বা ধানের পড়তা অপেক্ষাও অল্প দরে বিক্রয় করিয়া আসিতে হয়। ইহার কারণ এই যে ধান ও চাউলের দাম বাহিরের বাজারের উপর নির্ভর করে। রেঙ্গুন হইতে সস্তা চাউল যদি বেশী পরিমাণ আসে তবে চাউলের দাম পড়িয়া যায়।

বর্ত্তমানে খাদিপ্রতিষ্ঠানের গ্রামসেবা-কার্য্যের ভিতর এই সকল গ্রাম হইতে ধান ভানাইয়া ঢেঁকিছাটা চাউল শহরে পাঠাইবার একটা আয়োজন চলিতেছে যাহাতে দুঃস্থ লোকেরা সুতাকাটা ছাড়া আরও একটা উপজীবিকা পায়। জনসাধারণ ঢেঁকিছাটা চাউল কলের চাউল অপেক্ষা অধিক মূল্যে লইতে প্রস্তুত হইলেই এই ভাবে গ্রামবাসীকে সাহায্য করা সম্ভব হইবে। এক মণ চাউল ঢেঁকিতে

ভানাইয়া প্রস্তুত করিতে আট আনা মজুরী পড়ে, কলে উহা চার আনায় হয়। কাজেই কলের সহিত প্রতিযোগিতায় ঢেঁকিছাটা চাউল চলিতে পারিবে না। তবে ঢেঁকিছাটা চাউল উপকারী বলিয়া এবং কুটীরজাত বলিয়া উহার জন্য লোকের আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে আশা হয় যে গ্রামবাসীরা তাহাদের অতিশয় ক্ষীণ আয় ধান ভানিয়া কিছু বাড়াইয়াও লইতে পারে।

ফসল :—বাঁশবেড়িয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী সকল গ্রামেই একটি মাত্র ফসল হয়। হয় ধান নয় পাট। রবিশস্য ইহারা উৎপন্ন করে না। জানে না এমন নয়। রবিশস্য হইলে হইতে পারে ইহা জানিয়াও ইহারা ঐ ফসল জন্মায় না। তাহার কারণ ধান উঠিয়া গেলেই উহারা সকলে মাঠে গরু ছাড়িয়া দেয়। তখন মাঠে কোন এক জনের ফসল রাখা অসম্ভব হয়। সমবেত চেষ্টা করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ গরু বাঁধিলে দ্বিতীয় ফসল হইতে পারে, কিন্তু সেই সমবেত শক্তিরই অভাব। ধান অপেক্ষা রবিশস্যের আয় অধিক। কাজেই রবিশস্য উৎপাদন করিলে চাসের আয় দ্বিগুণ হয়, গবাদিও গম, কলাই ইত্যাদি হইতে ভুনা খড় পাইতে পারে।

সমবেত চেষ্টায় গ্রামবাসীদিগকে প্ররোচিত করার জন্য এবার চারখানা গ্রামে চাসার নিকট হইতে কতক কতক জমি চাহিয়া লইয়া উহাতে গ্রামসেবকের সাহায্যে রবিশস্য দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমস্ত ব্যয় করিয়া ফসল উৎপন্ন করিবার পর উহা বেচিয়া যে আয় হইবে তাহা হইতে ব্যয় বাদে লাভ গৃহস্থকে দেওয়া হইবে। অপরের দ্বারা চাষ করাইলে ব্যয় অনেক পড়ে। চাষা নিজের জমি নিজে চাষ করিলে চাষ করাইবার মজুরী যদি তাহার ফসল হইতে উঠে তাহাই তাহার লাভ। ধানের বেলায় তাহাই তাহারা কোনও প্রকারে পায়, কিন্তু আশা আছে রবিশস্যে তাহারা অধিক পাইবে।

রবিশস্যের জন্য কতক কতক জমি চাষ করা আরম্ভ করাতেই একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীরা উৎসুক হইয়াছে। যখন তাহাদিগকে গরু বাঁধিতে ও চাষ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহারা ইহাই বুঝাইতে চাহিত যে ফসল করা যাইবে না—করা যায় নাই, কেহ গরু বাঁধে না,—ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু এক্ষণে বাহিরের চেষ্টায় তাহাদের জমিতে চাষ আরম্ভ করায় এবং খরচা করিয়া লোক রাখিয়া ও স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা পাহারা দেওয়া হইবে এই ব্যবস্থায় দৃষ্টান্তমূলক কার্য্য (demonstration) আরম্ভ করায় তাহাদের মন জাগ্রত হইয়াছে। যদি এই একটা গ্রামমণ্ডলের মাঠ হইতে দ্বিতীয় ফসল তোলা যায় তবে এই চাষাদের বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা বাড়িয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ উহাদের আয় দ্বিগুণ হইবে। যাহাদের মাথাপ্রতি বার্ষিক আয় ২৫৲ টাকা তাহাদের আয় আরও ২৫৲ টাকা বাড়ান যে কত বড় কথা তাহা সহজেই অনুমেয়।

এক পাল গরু, অধিকাংশই অতিশয় রুগ্ন

গোধন :—বাঁশবেড়িয়ায় ২৫১টি গোধন আছে, উহার মধ্যে ৮০টি গাভী। কতক চাসা গাভী দ্বারাও হাল দেওয়ায়। সেজন্য সবগুলি দুধ দেওয়ার বা সন্তান বহন করার যোগ্য নয়। অল্প কয়টিমাত্র গাভী দুধ দেয়। এই গ্রামের দুগ্ধবতী গাভী ও প্রাপ্ত দুধের বিবরণ এখনও হস্তগত হয় নাই। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বিবরণ হইতে অবস্থা বুঝা যাইবে। ইহার নিকটেই তিলাবদুরী গ্রাম। গ্রামখানি বড়। ৯৫৫ জন হিন্দু ও মুসলমানের বাস। গ্রামে ১০ বৎসরের কমবয়স্ক বালক-বালিকার সংখ্যা ২৫৩। গ্রামে ১৭০টি গাভী আছে। ইহারও কতক চাষে লাগান হয়। কিন্তু হিন্দুরা চাষ করায় না। বর্ত্তমানে এই অগ্রহায়ণ মাসে ১৭০টির মধ্যে মাত্র ১৫টি দুধ দিতেছে। দুধের পরিমাণ সব কয়টিতে মিলিয়া পাকী পাঁচ সের। যদি ঐ গ্রামের ২৫৩ জন বালক-বালিকাকেই কিছু দুধ দিতে চাই তাহা হইলে দেখা যাইবে যে কিছুই দেওয়া যায় না। ৫ সেরে ৮০ ছটাক দুধ ২৫৩ জন বালক-বালিকার মধ্যে কেমন করিয়া বাঁটা যায়?

এই অঞ্চল 'ভড়' অথবা নিম্ন অঞ্চল। নিকটেই "বারিন্দ" অথবা পুরাতন পলিমাটির উচ্চভূমি বা বরেন্দ্র-ভূমি রহিয়াছে। এই ভড় অঞ্চলে মাঠের জমিতে ডোবা কাটিয়া মাটি তুলিয়া বাস্তুজমি তৈয়ার করা হয়। কাজেই বাস্তুজমি খুবই সঙ্কীর্ণ। যেটুকু জমি আছে উহাতে ভিটা বাদে বাকীটা প্রয়োজনীয় গাছে, কতক বা আগাছায় ও বাঁশঝাড়ে পূর্ণ। গোচারণের জমি আদৌ নাই। এমন কি তরকারী উৎপন্ন করার জমি নাই বলিলেই চলে। গরুগুলি কাঁচা ঘাস কি তাহা জানে না। ছয় মাস জমি জলের নীচে থাকে, তখন আঙ্গিনায় গরুগুলির নড়াচড়ার জায়গাও থাকে না। বৈশাখে ধান

আত্রাই-কেন্দ্রে আচার্য্য রায়। জীবনের বাকী দিনগুলি প্রধানতঃ ইনি এই স্থানেই কাটাইতে ইচ্ছা করেন

বুনিলে তখনও মাঠে চরা বন্ধ হয়। কেবল পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র এই চারি মাস গরু মাঠে চরিতে পারে। কিন্তু এই সময় মাঠে ঘাস থাকে না। এই কালে যখন কিছু কিছু বৃষ্টি হয় তখন মাঠে একটু ঘাস উঠিতে থাকে। কিন্তু উহার খাদক এত বেশী যে ঘাস আর দেখা যায় না। ঘাস ভালরূপে না-গজাইতেই খাইয়া ফেলে, জমি প্রায় সাদাই থাকিয়া যায়, সবুজ হওয়ার অবকাশ বড় পায় না।

বৃষ্টির জল পড়িলে জমি খুবই নরম হয়। একটা মাত্র ধানের বা পাটের চাষ ত দরকার। নরম মাটিতে দুর্ব্বল গরু দিয়া ইহারা কাজ চালাইয়া লয়। গরুর প্রতি এত অযত্ন কোথাও দেখি নাই। প্রতিদিন যে বিচালী দেওয়া হয়—যাহা ইহাদের একমাত্র খাদ্য, তাহাও কদাচিৎ কুচাইয়া দেওয়া হয়। আস্ত বিচালী তাল পাকাইয়া জাবের গামলায় জলের নীচে কতক ডুবাইয়া দেয়। কতক বা গরু খায়, কতক বা টানিতে গিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়, গোবর ও মাটি লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ফলে গরু অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বল থাকে। এখানকার পূর্ণবয়স্ক গরুর কঙ্কাল ওজন করিয়া দেখিয়াছি, মাত্র ছয়-সাত সের হয়, অথচ বাংলার গরুর কঙ্কালের সাধারণ ওজন তের-চৌদ্দ সের। ঐ প্রকার ওজনের কঙ্কাল হইতে পারে এমন গরু এখানেও আছে—যেখানে যত্ন হয় সে বাড়ির গরুগুলি ঐ রূপ,

মাছ মারার যন্ত্রাদি প্রত্যেক বাড়িতেই থাকে ও বিনামূল্যে মাছ সংগ্রহ করা হয়।

কিন্তু প্রায় কোন বাড়িতেই যত্ন হয় না। কলুর বাড়িতে যত্ন হয়। কলুর আয় গরুর গায়ের জোরের উপর নির্ভর করে, সে জন্য তাহার গরুর যত্ন আছে, উহারা পুষ্ট ও সবল। চাষার গরুর জোর না থাকিলেও চাষ চলিয়া যায়, এজন্য চাষার গরু মৃতপ্রায়। কলুর বাড়ির বলদ দেখিলেই চেনা যায়। এত অযত্নে অনাহারে গরুর কিছুই থাকে না—কেবল কঙ্কালসার। চামড়া ওজন করিয়া দেখিয়াছি। যে-চামড়া লম্বায় কাঁধ হইতে মেরুদণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত ৩৷৷ হাত, তাহার ওজন মাত্র তিন সের, অথচ হওয়া উচিত ছয় সের।

গরুগুলি এতই অবহেলার বস্তু যে যখন কর্ম্মীরা যাহাদের ঘরে ঐ প্রকার মৃতপ্রায় গরু রহিয়াছে, তাহাদের বাড়ি বাড়ি গিয়া গবাদির সংখ্যা লইতেছিল তখন অনেক চাষাই তাচ্ছিল্যের সহিত প্রশ্ন করে যে উহাদের সংখ্যা গুণিয়া কি

নিম্নভূমির উপর পাহাড়ের মত মাটি তুলিয়া বাড়ি তৈরি হয়

একটা সমাধান হইতে পারে। কতকটা কলাই গরুর খাদ্য বলিয়া কাঁচা অবস্থায় কাটিয়া কাটিয়া ঘাসের মত খাওয়াইতে পারে। জমি ভিজা থাকিতে ধানের ক্ষেতে কলাই ছিটাইয়া দিয়া খেসারী যে উৎপন্ন করা যায় তাহা ইহারা জানে, করিতেও পারে, কেবল সমবেত চেষ্টার অভাবে করে না।

বাঁচে কেমন করিয়া?—লোকের বার্ষিক আয় কোথাও ১৫৲ টাকা, কোথাও ৩০৲ টাকা। অথবা মাসিক আয় ১৷০ হইতে ২৷০ টাকা। ইহা হইতেই খাজনা, মজুর ইত্যাদির খরচ কুলাইতে হয়। লোকে মাসিক দুই টাকা আড়াই টাকায় বাঁচিয়া আসিতেছে কি করিয়া? দারিদ্র্য যে খুব সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি গরুগুলি যেমন কঙ্কালসার মানুষ তেমন নহে। মানুষ তবু টিকিয়া আছে কিন্তু গরু টিকিয়া নাই। ১৭০টা গাভীর মধ্যে মাত্র ১৫টা দুগ্ধবতী, ইহাতে

লাভ—ইঁহাদের কি মূল্য আছে, উহারা আজ আছে কাল নাই। বস্তুতঃ একটি কঙ্কালসার গরুর মূল্য দুই-তিন টাকা, ভাল গরু পনর-ষোল টাকা। এখানে একটা প্রথার জন্য গরুগুলি তবুও কতকটা টিকিয়া আছে। এখানে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেই ধান-পাটের চাষ হয়। তাহার পর আর পৌষের পূর্ব্বে চাষের জন্য গরুর প্রয়োজন থাকে না। বারিন্দের লোকের চাষ আরম্ভ হয় আষাঢ় মাসে। তাহারা ভড়ের গরু চাহিয়া লইয়া যায়, ধার লওয়ার মত। আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ তাহারা গরু রাখে, চাষ করে, খাওয়ায়, যত্ন করে, পরে পৌষে ফিরাইয়া দেয়। তাহারা বিনা পয়সায় কেবল খোরাকী দিয়া গরুর ব্যবহার পায়—ভড়ের লোকেরাও বর্ষা ও শরৎ কালের কয়টা মাস গরু রাখার বোঝা হইতে অব্যাহতি পায়, কেন-না তখন গরু রাখার স্থান নাই, খাদ্য নাই, আবশ্যকও নাই। অবশ্য সকলেই এই প্রকার গরু ধার দেওয়ার সুবিধা পায় না। কেহ কেহ বর্ষার আরম্ভে নামমাত্র মূল্যে গরু বেচিয়া দেয়, বর্ষাশেষে পুনরায় ক্রয় করে। এমন করায় গরুর উপর মমত্ববোধও ইহাদের কম হইয়া গিয়াছে। গরুগুলি দুর্ব্বল বলিয়া চাষের ব্যয় বেশী পড়ে, গরুর বংশবৃদ্ধি হয় না, চাষা আরও দরিদ্র হয়।

এই অঞ্চলের গরুর জাত ভাল করার প্রশ্ন পরে আসিতে পারে। আজ চাই ইহাদিগকে খাদ্য দিয়া বাঁচান। রবিশস্য জন্মাইবার যে আয়োজন চলিতেছে, উহা সফল হইলে হয়ত

আত্রাই-কেন্দ্রে এই গাভীটি ৩ সের দুগ্ধ দেয়

প্রমাণ হয় যে গরুর প্রজননশক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মানুষ যে-ভাবেই হউক বাঁচিয়া ত আছে, এখন দেখা যাউক কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছে।

খাদ্য-হিসাবে ইহারা প্রধানতঃ চাউলই খায়। প্রত্যহ পূর্ণবয়স্কেরা গড়ে ১১ ছটাক চাউল খায়, ইহাতে মাসে

১৲ টাকা ব্যয় হয়। ডাল প্রায় খায়ই না, মাসে চার দিন বা আট বেলায় আট ছটাক মাত্র ডাল খায়। আর যাহা খায়, লবণ তেল গুড় লঙ্কা হলুদ তরকারী ইত্যাদিতে সর্ব্বসাকল্যে মাসে আর এক টাকা লাগে। খাদ্য-হিসাবে ইহার সহিত যথেষ্ট প্রোটিন বা ছানা-জাতীয় পদার্থ প্রয়োজন। মাছ হইতে ইহারা তাহা পায়। মাছ কিনিতে হয় না। প্রত্যেকেরই বাড়ির সংলগ্ন ডোবা আছে। বর্ষার প্রারম্ভেই মাঠ ভাসিয়া যায়, তখন হইতে ক্ষেতের আলে আলে ইহারা নানা যন্ত্র পাতিয়া প্রত্যেক পরিবারেই মাছ ধরে। মাছ নিত্য দুই বেলার খাদ্য। জল একটু কমিলে মাছগুলি আকারে বড় হয়, ধরাও পড়ে খুব। তখন কতক শুকাইয়া কতক জিয়াইয়া রাখা হয়। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত যেখানে-সেখানে মাছ ধরা চলে। তাহার পর পৌষ হইতে বৈশাখ এই কয় মাস ডোবার উপর নির্ভর করিতে হয়। মাঠের জল যখন নামিয়া যায় তখন মাছগুলি জলাশয়ে, ডোবায় আশ্রয় লয়। প্রতিবৎসরই ডোবাগুলি ভাসিয়া যায়, আবার মাছে পূর্ণ হয়। অনেকের ডোবা এত গভীর যে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত জল থাকে। উহাতে যে মাছ থাকে তাহাতেই শুষ্ক ঋতুর মাস কয়টা কাটিয়া যায়। যাহাদের ডোবা তত গভীর নহে তাহারা এই সময়ে মাছ উঠাইয়া আঙ্গিনায় গর্ত্ত করিয়া জল দিয়া জিয়াইয়া রাখে। দুই-এক দিন অন্তর জল বদলায়। কিন্তু মাছগুলিকে গরুর মতই অনাহারে রাখে বলিয়া উহারা জীবন্ত থাকে মাত্র, কিন্তু শরীরে মাংসপদার্থ বড় থাকে না। যাহাই হউক খুব যে দরিদ্র তাহারও মাছের ব্যবস্থা আছে, যদি মাছধরার লোক থাকে বা কাহাকেও দিয়া ধরাইয়া লইতে পারে।

মাছ ছাড়া কিছু সব্জী চাই, নচেৎ নীরোগ থাকা যায় না। ভাত মাছ ও তেল হইতে ইহারা খাদ্যের প্রয়োজনীয় ইন্ধন, ছানা-জাতীয় পদার্থ ও ধাতব পদার্থ পায়। ভিটামিন 'এ' এবং 'বি' পায় কিন্তু ভিটামিন 'সি'র অভাব থাকিয়া যায়। যাহারা শুঁটকী মাছ খায় তাহাদের রীতিমত সব্জী-বুভুক্ষা উপস্থিত হয়। কিছু শাকপাতা যেমন করিয়া হউক সংগ্রহ করে। এখানে তরকারী অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। যাহারা বাড়িতে সব্জী সংগ্রহ করিতে পারে না তাহারা কিনিয়া থাকে। ইহাদের জ্বালানী-খরচা লাগে না, ঘুঁটে বিচালী ও নাড়া, ডাল-পাতা জ্বালাইয়াই কাজ চালাইয়া লয়। মাসিক দুই টাকায় যে ধান ও অন্য সামগ্রী পায় তাহার সহিত প্রচুর মাছ সংগ্রহ করিয়া ইহারা কোন ক্রমে আহার জোটাইতে পারে। কিন্তু বৎসরে অন্ততঃ চার টাকার বস্ত্র লাগে। ইহার জন্য কোন সংস্থান দেখা যায় না। ঋণ করিতে হয় অথবা কম খাইয়া কাপড় কিনিতে হয়। দুই টাকায় অন্নবস্ত্র কুলায় না, এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয়।

বার্ষিক আয়ের ভিতর বিচালীর আয় ধরা হয় নাই। গরুর খোরাকও ধরা হয় নাই। যে বিচালী হয় তাহা গরুর পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। আবার জ্বালাইবার জন্য ইহারা সেই বিচালীতেই ভাগ বসায়। অভাবে পড়িয়া বেচিয়া ফেলে, অন্য অঞ্চলে রপ্তানি হইয়া যায়। এক শত গাভীর মধ্যে এখানে তিন বৎসরের কমবয়স্ক বাছুর মাত্র চল্লিশটি। ইহাতে দেখা যায় যে গাভীগুলির প্রজননশক্তি অর্দ্ধেক বা তাহারও কম হইয়া গিয়াছে। বলিতে হয়, এখানে মানুষ কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছে, কিন্তু গরু মরিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে মানুষের অবস্থা আরও হীন হইবে, আয়ও কমিবে।

তুলা উৎপাদন করিয়া, নিজের জন্য সূতা কাটিয়া ইহারা বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইতে পারে, কোন-কোন পরিবার হইয়াছে। জমিতে রবিশস্য উৎপাদন করিয়া ইহারা আয় বাড়াইতে পারে, গরুও বাঁচাইতে পারে। ধান ভানিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে হইলে ঢেঁকীছাঁটা চাউলের প্রতি শহরবাসীর আগ্রহ জন্মাইতে হয়। বস্ত্রে স্বাবলম্বী করিতে হইলেও ইহাদের একটি পরিবারের কাটা সূতার উদ্বৃত্ত কিনিতে পারে এমন দুইটি করিয়া ক্রেতা পরিবার দরকার।

মৃতপ্রায় গ্রামগুলিকে সজীব করিবার কতকগুলি অবলম্বন-সূত্র পাওয়া গিয়াছে। কর্ম্মীদের নিষ্ঠা, কুশলতা ও শহরবাসীর সহৃদয়তার উপর সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। ভবিষ্যৎ ঈশ্বরের হাতে।

রঙীন চশমা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমন্তের প্রভাত। ধূলিমালিন্যহীন আকাশ। গ্রামের পথে ধানের গাড়ী মৃদু মন্থর গতিতে চলিতে সবে আরম্ভ হইয়াছে। দোকানী ঘনশ্যাম দে সবে দোকানপাট খুলিয়া গদীতে ধূপধুনার অর্চ্চনা দিতেছে, এমন সময় রাইকিশোর গোঁসাই আসিয়া উপস্থিত হইল। সরলরেখার মত সোজা শীর্ণ মানুষটি—পুতুলের মত ছোট মুখ—চোখ দুইটি সর্ব্বদাই পিট্‌ পিট্‌ করে—ছোট মাথাটি জুড়িয়া একটি টাক—গোঁসাই-জীর গলায় দুকণ্ঠি তুলসীকাঠের মালা। লোকে গোঁসাইজীকে ডাকে সরু গোঁসাই।

দোকানের বারান্দায় উঠিয়া গলা খাঁকারি দিয়া গোঁসাই বলিল—রাধেগোবিন্দ—রাধেশ্যাম—বলি শিষ্য রয়েছ না কি?

ধূপদানিটা রাখিয়া ঘনশ্যাম বাহিরে আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—আসুন আসুন, গুরুদেব আসুন, বসতে আজ্ঞা হোক্!—বলিয়া সে বারান্দার বেঞ্চটা দেখাইয়া দিল।

গোঁসাই বসিয়া হাত তুলিয়া বলিল—আশীর্ব্বাদ—আজ চার আনা লোকসান হোক তোমার!

ঘনশ্যাম জোড়হাত করিয়া বলিল—আমার অপরাধ কি হ'ল প্রভু?

গোঁসাই বলিল—আমি নিরুপায়। চিত্ত আমার রুষ্ট হয়ে আছে। কাউকে ভস্ম করবার প্রবল বাসনা। তোমার গুরুমা সকালবেলাতেই আমাকে যাচ্ছেতাই—অর্থাৎ কটুস্তব ক'রেছেন। মনে মনে ইচ্ছা হ'ল—দিই পাপিষ্ঠাকে ভস্ম ক'রে, কিন্তু সম্মুখে অশুভ-দর্শন করলাম—মানে, তার হাতে দেখলাম ঝাঁটা—ঝাঁটাকে আবার কি বলে সাধু-ভাষায়? যাক্, সেই জন্য রোষ মনের মধ্যে চেপে চলে এলাম—সেইটা তোমার ওপর পড়ে গেল।

ঘনশ্যামের ভৃত্য দুই কাপ চা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। এক কাপ চা গোঁসাইয়ের হাতে তুলিয়া দিয়া ঘনশ্যাম বলিল—পান করুন প্রভু! কাপ হাতে লইয়া গোঁসাই বলিল—এঃ ভক্তিরস প্রেমরস দুয়েরই যে অভাব। আমরা আবার দেবলোকের ব্যক্তি—ও দুটো না হ'লে আমাদের চলে না। যা রে বেটা নিয়ে আয়—ইয়ে রে ইয়ে!

ঘনশ্যাম চাকরটাকে বলিয়া দিল—দুধ আর চিনির জন্যে বলছেন বোধ হয়—নিয়ে আয়।

ভৃত্যটা চলিয়া গেল।

ঘনশ্যাম বলিল—আন্দাজে বুঝলাম দুধ আর চিনি, কিন্তু কোন্‌টা ভক্তি—।

বাধা দিয়া গোঁসাই বলিল—মূর্খ! এখন অবধান কর—দুগ্ধ হ'ল ভক্তিরস। বৎস, দুগ্ধ যেমন দোহন না করলে পাওয়া যায় না—ভক্তিও ঠিক তাই, দোহন না করলে পাওয়া যায় না! আর প্রেমরস হ'ল চিনি—শৈত্যের স্পর্শেই গলায়মান—একেবারে জল, সঙ্গে সঙ্গে উথলিত। খোকার মা কাঁদল—অমনি খোকার বাবা বিগলিত।

ভৃত্যটা আসিয়া দুধ ও চিনি আরও খানিকটা মিশাইয়া দিল। গোঁসাই চুমুক দিল। দে বলিল—কি রকম এখনও যে মুখ কেমন কেমন করছেন—অ্যাঁ?

গোঁসাই বলিল—বৎস হে, পারিজাত-কাননের চা, সুরভির দুগ্ধ, বৈকুণ্ঠের ইক্ষুর চিনি, এই সহযোগে আমাদের চা খাওয়া অভ্যাস; আমাদের—।

তাড়াতাড়ি হাতজোড় করিয়া ঘনশ্যাম বলিল—প্রভু এক দিন অধম শিষ্যকে প্রসাদ এক কাপ—!

নিঃশেষে চা-টুকু পান করিয়া কাপটি নামাইয়া দিয়া গোঁসাই বলিল—সহ্য হবে না বৎস! উদরাময় হয়ে যাবে। লোভ সম্বরণ কর—জান ত 'লোভাৎ পাপ, পাপাৎ মৃত্যু!'

ঘনশ্যাম বলিল—প্রভু, মৃত্যু আমার সন্নিকট—কোষ্ঠীতে লিখেছে—

বাধা দিয়া গোঁসাই বলিল—কিন্তু পাপ,—পাপ-হেতু যে যমালয়ে কষ্ট পাবে বৎস! গুরু হয়ে সে কার্য্য আমি কি ক'রে করি! এমন সময় এক জন খরিদ্দার আসিয়া দাঁড়াইল।

—ধুতি এক জোড়া—

দে বলিল—এস এস কত্তা এস—যেমন ধুতি চাও তুমি—যেমন পাড়টি নেবে তেমনি পাবে—এস, এস।

গোঁসাই বলিল—তা হ'লে আমি এখন উঠি ?

ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে দে বলিল—বসুন বসুন, তামাক খান—এই দেখুন কল্কে গন্‌ গন্‌ ক'রে ধ'রে উঠেছে। এস হে কত্তা—ক-গজা ধুতি নেবে, পুরগজা চুয়াল্লিশ না কি ?

গোঁসাই হুঁকা-কল্কে লইয়া বসিয়া বলিল—তোমার শিবু কই হে—কোথাও গেল না কি ?

ঘনশ্যাম বলিল—বলেন কেন, আজকাল আসতে ভারী দেরি করছে। বলে, ধানকাটার সময়, একবার মাঠ ঘুরে আসতে হয়। এমন দেরি করলে আমিও মাইনে কাটব।

গোঁসাই হুঁকায় টান মারিয়া বলিল—হুঁ।

ঘনশ্যাম প্রশ্ন করিল—হুঁ কি রকম ?

হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে দিতে গোঁসাই বলিল—বলব, খদ্দের বিদেয় কর।

ক্রেতাকে লইয়া ঘনশ্যাম দোকানের ভিতরে প্রবেশ করিল। দোকানের সম্মুখেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, দুই-চারি জন করিয়া লোক চলিয়াছেই।

গোঁসাই তামাক খাইতে খাইতে পথিকদের দিকে চাহিয়া ছিল। ছায়াছবির মত কেহ যায় কেহ আসে।

দে তখন খরিদ্দারকে বুঝাইতেছিল—পয়সা ধর-গা যেয়ে তোমার এক আনা কম—কিন্তু কাপড় কম হ'ল দশ হাত দু-ইঞ্চি ক'রে। আঠার ইঞ্চিতে হাত—মানে এক-শ-আশী ইঞ্চি লম্বা—দু-ইঞ্চি চওড়া, এই এতটা কাপড়—ও তুমি চুয়াল্লিশই নিয়ে যাও।

গোঁসাইয়ের বসুধৈব কুটুম্বকম্‌ সে পথচারীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া চলে।

—কি রকম, উজীর সাহেব যে! সেলাম পৌঁছে খোদাবন্দ!

সম্বোধিত ব্যক্তিটি স্থানীয় জমিদার-বাড়ির নায়েব, সে হাসিয়া উত্তর দিল—প্রণাম গোঁসাইজী! তার পর কেমন আছেন ?

—যেমন রেখেছেন আপনারা—আপনারাই হলেন মালিক, আপনাদের রাজ্যেই আমাদের বাস।

নায়েব উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু হাসিতে লাগিল।

গোঁসাই বলিল—তার পর, কাল যে তোমাদের ইন্দ্রসভায় গিয়েছিলাম।

নায়েব আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

গোঁসাই বলিল—জ্যেষ্ঠ পুত্র কুলশ্রেষ্ঠ গো—বড়-হুজুর, তোমাদের বড়-হুজুরের আড্ডায়। ওঃ ইন্দ্রসভাই বটে রে বাবা। অনেক কথা হ'ল, বলব।

নায়েব বলিল—আসুন না বেড়াতে বেড়াতে একটু।

গোঁসাই উঠিল। নায়েব মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—আমার সম্বন্ধে কিছু শুনলেন না কি ?

—না, মানে, প্রকাশ্যে কিছু নয়, তবে—। গোঁসাই নীরব হইল। বিপুল ব্যগ্রতাভরে নায়েব বলিল—তবে ?

একটু ইতস্তত করিয়া গোঁসাই বলিল—না এমন ইয়ে ঠিক নয়—তবে আমার মনে হ'ল—ধর ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে কথা—দু-একটা যাকে বলে ফুঁকলে এসে কানে ঢুকল। তোমার নাম যেন বার-দুই, হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট শুনলাম।

—ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথা ? কে কার সঙ্গে কইলে ?

আরও একটু গলা নামাইয়া গোঁসাই বলিল—আমাদের তখন হররা চলছে। এমন সময় মেজকর্ত্তা এসে হাজির। তার পর দুই ভাই—মানে, বড়কে এক পাশে ডেকে—ফিস্‌ফিস্‌ করে—বুঝলে কি না—।

—ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলেন না ?

—ওই যে বললাম নাম তোমার বার-কয় হ'ল। আসল কথা কি জান, বিশ্বাস ত ওরা কাউকে করে না! স্বভাবই ওদের হ'ল ওই। আচ্ছা, ব্যস্ত হয়ো না তুমি, দু-এক দিনের মধ্যেই বড়-জনার কাছে আমি সব জানছি।

নায়েবের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তখন মেজবাবুর অসংখ্য ভ্রুকুটিকুটিল মুখচ্ছবি ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক ভ্রুকুটিটি যেন তাহারই দিকে উদ্যত হইয়া আছে। সে কাকুতি করিয়া গোঁসাইয়ের হাত দুটি ধরিয়া বলিল—কেনা হয়ে থাকব আপনার।

গোঁসাই বলিল—মা ভৈঃ! ভয় কি তোমার! তুমিও দুটো-চারটে এমন প্যাঁচ কষে রাখ—যেন তোমার হাতছাড়া সে-প্যাঁচ না খোলে। সাতচল্লিশ ফোঁটার খেলা—ও তোমার হাতের প্যাঁচেই আধ-দশ। বুঝেছ!

তার পর নীরবে দুইজনে আরও খানিকটা পথ অতিক্রম করিয়া গোঁসাই বলিল—তা হ'লে আমি এখন আসি—তুমি যাও।

নায়েব চিন্তিত মুখেই চলিয়া গেল। গোঁসাইও ফিরিল। পথেই পোষ্টাপিস—তখন ডাকবিলি সুরু হইয়াছে, লোকজনের ভিড় জমিয়া আছে। উত্তরপাড়ার ধ্বংসাবশিষ্ট কায়স্থ জমিদার-বংশের বড়কর্ত্তা একখানা চিঠি বার-বার ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পড়িতে পড়িতে ধীর পদক্ষেপে ঈষৎ কুব্জভাবে ঝুঁকিয়া পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলেন। গায়ে পুরাতন সার্জ্জের চায়না-কোট, গলায় কম্ফার্টার, হাতে লাঠি। গোঁসাই একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। চৌধুরী-বাড়ির বাবু নিজে পোষ্ট আপিসে!

সে একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—চৌধুরীমশায় না কি?

চৌধুরী-মহাশয় চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া চিন্তাব্যাপৃত মুখেই ঈষৎ নত হইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—প্রণাম। আপনাদের কুশল সব?—মা-ঠাকরুণরা ভাল আছেন?

গোঁসাই বলিল—নমস্কার, নমস্কার! হ্যাঁ, সব ভাল। এখন আপনাদের কুশল সব? কেমন যেন—সংবাদ সব ভাল ত? আপনি নিজে ডাকঘরে?—

চিন্তার ঘোর চৌধুরীমহাশয়ের কাটিল না, তাহারই মধ্যে মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন—আপনাদের আশীর্ব্বাদে সবই মঙ্গল। আর নিজে আসার কথা বলছেন—চাকরবাকর ত আর রাখতে পারি নে, কাজেই—।

গোঁসাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—গোবিন্দজীকে তাই আমি নিত্য বলি ঠাকুর করলে কি—এই কি তোমার বিচার? বিনা অপরাধে চৌধুরী-বংশের—

সবিনয়ে বাধা দিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া চৌধুরী-কর্ত্তা বলিলেন—অপরাধ কিছু হয়েছিল বই কি গোঁসাইজী, নইলে বিচার তাঁর অতি সূক্ষ্ম! আচ্ছা তা হ'লে এখন যাই—প্রণাম!

দীর্ঘাকৃতি প্রৌঢ় ঈষৎ কুব্জভাবে লাঠিগাছটির উপর ভর দিয়া ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইলেন। গোঁসাই পোষ্ট আপিসের দিকে ফিরিল। আপিসের বারান্দায় উঠিয়া বলিল—নমস্কার মাষ্টার-মশায়! দেবলোকের ডাক কিছু আছে না কি আজ? একটা বৈদূর্য্য মণি ইনশিওর হয়ে আসবার কথা কুবেরের কাছ থেকে—আর বৈকুণ্ঠ থেকে একটা রিপোর্ট আসবে রেজেষ্টারি হয়ে—।

পোষ্টমাষ্টার হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল—আসুন আসুন, দেবতা আসুন। কিন্তু দেবলোকের ডাক ত আজ নয়। তার পর মর্ণিংওয়াকে না কি?

গোঁসাই বলিল—হ্যাঁ, পুষ্পকরথ আজ ফিরিয়ে দিলাম। পৃথিবী আজ ভয়ানক ধরেছিল পায়ের ধূলোর জন্যে। পাপীতাপীর পদস্পর্শে তার বক্ষদেশে ভয়ানক দাহ উপস্থিত হয়েছে। দেখছেন না ভূমিকম্পের বহর। তাই আজ একটু পদব্রজেই বুঝলেন কি না—। তার পর আপনার এখানেও যে মহা মহা ব্যক্তিদের আগমন দেখছি। ব্যাপার কি মশায়!

মৃদু হাসিয়া পোষ্টমাষ্টার বলিল—একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন দেবতা—নরলোকের সামান্য ব্যক্তি আমরা!

গোঁসাই হাসিয়া বলিল—খোদ চৌধুরী-মশায় আপনার দরবারে এই সকালবেলায়! বলি এই বৃদ্ধ বয়সে আবার প্রেমপত্র-টত্র আসছে নাকি, অ্যাঁ!

পোষ্টমাষ্টারের মুখখানি সকরুণ ভাবে গম্ভীর হইয়া উঠিল, ব্যথিত কণ্ঠস্বরে সে বলিল—আহা-হা, মশায় ভদ্রলোক আজ ক-দিন থেকেই আসছেন একখানা চিঠির জন্যে। কন্যার বিবাহ নিয়ে ভদ্রলোকের আহার-নিদ্রাও ঘুচে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পোষ্টমাষ্টার আবার বলিল—এত বড় বংশের সন্তান—যার-তার ঘরেও ত আর কন্যাটিকেও দিতে পারেন না।

গোঁসাই বলিল—হ্যাঁ, তাই ত বটে, রাণীর বয়স ত অনেক হ'লই বটে! তা বছর ষোল-সতের ত হবেই। আজকাল ত আর দেখতেই পাই না—বেরোয় না ত ঘর থেকে।

পোষ্টমাষ্টার কহিল—মেয়েটিও পরমাসুন্দরী—লক্ষ্মী-প্রতিমার মত! সেদিন চৌধুরী-কর্ত্তা আমাকে নেমন্তন্ন ক'রেছিলেন। দেখা হ'লেই ত ওঁর খাওয়াবার ঝোঁক চাপে। তা মেয়েটিই আমাদের পরিবেশন করলে, রাঁধুনী ত আজকাল নেই।...ওঃ কি বাড়ি! কত কায়দা-করণ! এখন সব ভোঁ-ভোঁ করছে!...দেখে শুনে সংসারে ঘেন্না ধরে যায় মশায়। কিছুই থাকে না। এই আছে, এই নেই—এই ব'সে আছি—এখুনি হয়ত মরে যেতে পারি!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পোষ্টমাষ্টার নীরব হইল

গোঁসাই বলিল—সেই কথাই ত ভাবি মশায় মাঝে মাঝে—বলি, একা, জানা নেই শোনা নেই, আঁধারের মধ্যে যাব কি ক'রে ?

দুই জনেই নীরব হইয়া গেল—অকস্মাৎ যেন মনের মধ্যে বৈরাগ্য জাগিয়া উঠিয়াছে। ওদিকে পিওন ডাক বিলি করিতেছিল—

—আপনার আজ কিছু নাই গো চাটুয্যে-মশায়। থানার ডাক—থানা, এই নাও।

—আজ্ঞে—নিউনায়েন বোটের ডাক—।

পিওন ধমক দিয়া বলিল—ঘোড়াটা বাঁধ রে বাপু।

—আমার আছে—আমার—মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন মেরজা সাকিম ঘাটিতোড়— ?

পোষ্টমাষ্টারের ঘোরটাই আগে কাটিয়াছিল—টেলিগ্রাফের যন্ত্রটা টক্ টক্ করিয়া উঠিতেই সে চকিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। যন্ত্রের কাজ শেষ করিয়া সে বলিল—তা ভগবান ভদ্রলোকের ওপর মুখ তুলে চেয়েছেন মনে হচ্ছে। হুগলী জেলার লক্ষ্মীবাটীর জমিদার তাঁরা—তাঁরাই খবরাখবর পেয়ে বিনাপণেই মেয়েটিকে নিতে রাজি হয়েছেন।

গোঁসাই অন্যমনস্কভাবে চাহিয়াছিল একটা সাইনবোর্ডের দিকে, সেখানে লেখা ছিল 'এখানে বিনা পারিশ্রমিকে টেলিগ্রাম ও মনিঅর্ডার ফর্ম্ম লিখিয়া দেওয়া হয়'। মাষ্টারের কথায় চমক ভাঙিয়া সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—বিনা পণে—?

—হ্যাঁ। হরিতকী পণ, তবে মেয়েকে যদি এঁরা কিছু দিতে চান তবে তাতে তাঁদের আপত্তি নেই। তারাও ধরুন মস্ত বনিয়াদী ঘর—মানীর মান-অপমান সম্বন্ধে খুব নজর তাদের। ছেলেটিও ভাল—এবারই 'ল' পাস করেছে, হাইকোর্টেই প্র্যাকটিস করবে।

গোঁসাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—কেমন যেন! বিনা পণে—! হুগলী জেলার কোথায় বাড়ি বলুন ত ?

—লক্ষ্মীবাটীর সিংহবাবুরা পুরোনো ঘর—আত সজ্জন। আমি যখন চুঁচড়ো পোষ্টাপিসে কেরান ছিলাম, তাদের নামডাক খুব শুনেছি। লক্ষ্মীবাটীর পোষ্টমাষ্টারও খুব প্রশংসা করতেন তাঁর কাছেও শুনেছি।

গোঁসাই ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল—ও মশায় বাইরে থেকে অমনি শোনা যায়। এই ধরুন না চৌধুরী-বাবুদের বাড়ির কথা বলছিলেন ত—প্রকাণ্ড বাড়ি, এখন কায়দাকরণ অথচ পলেস্তারার ভেতরে সব কাদার গাঁথনি।

পোষ্টমাষ্টার বিস্মিত না হইয়া পারিল না, সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—বলেন কি মশায়—অ্যাঁ—বাইরে পঙ্কের কাজ করা, এক টুকরো বালিচুণ খসে নি আজও, ওই বাড়ি—।

বাকীটা শেষ করিয়া দিল গোঁসাইজী—কাদার গাঁথনি। তবে আর বলছি কি—'ওপরে চেকন-চাকন ভেতরে খড়-গোঁজা', এই মশায় সব জায়গায়, ও দুনিয়াই আপনার কাদার গাঁথনি—ওই লক্ষ্মীবাটীর বাবুরা—।

পোষ্টমাষ্টার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—না-না-না-মশায়, তারা হ'ল মস্ত ধনী লোক, দেশে জমিদারী, কলকাতায় বাড়ি আট-দশখানা, বাসনের ব্যবসা—তাদের অবস্থা খুব ভাল। আমি খুব ভাল ক'রে জানি। আমাদের স্বজাতি—দেশের মধ্যে একটা নামকরা ঘর—ওর মধ্যে কোথাও গলদ নেই।

গোঁসাইয়ের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না—সে নীরবে ওই কথাটাই চিন্তা করিতেছিল।

পোষ্টমাষ্টারই বলিল—এই কালকেই আসছেন তাঁরা—দেখতে পাবেন কেমন উঁচুদরের লোক। আজই সেই পত্র এসেছে। কাল মেয়ে দেখতে আসবেন—মেয়ে পছন্দ হ'লে এক সপ্তাহের মধ্যেই বিবাহ হয়ে যাবে।

গোঁসাই তবুও চিন্তা করিতেছিল।

পোষ্টমাষ্টার বলিল—ওঁদের যদি মেয়ে পছন্দ না হয় মশায়—মেয়ে অপছন্দ হ'তেই পারে না, তবুও ত বলা যায় না—মানুষের চোখের কথা। তা হ'লে আমার ভাইয়ের সঙ্গে ও মেয়ের বিয়ে দেব। ভাইটি আমার এম-এ পড়ছে—

—পোষ্টকার্ড দেবেন ত দুখানা। একজন গ্রাহক আসিয়া দাঁড়াইল। মাষ্টারের কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

এবার গোঁসাই বলিল—যাক্, তা হ'লে চৌধুরী-মশায়ের অদৃষ্ট ভাল বলতে হবে।

—এখন পরে যাই দাঁড়াক, এখন ত দেখে ভালই মনে হচ্ছে।...

—তা বেশ—তা হ'লে আমি যাই এখন।

পোষ্টমাষ্টার হাসিয়া বলিল—আপনার ইনশিওরটা এলে খবর দেব আপনাকে।

গোঁসাই বলিল—একটা টেলিফোন ক'রে দেবেন। টেলিফোনের নম্বরটা জানেন ত? কন্তা—শূন্য-শূন্য-শূন্য—তিন শূন্য আর কি।

পোষ্টমাষ্টার হাসিয়া আকুল হইয়া বলিল—বেশ বেশ!

গোঁসাই রাস্তায় নামিয়া আবার যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। মন যেন তাহার সহসা বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। পদক্ষেপে তাহার সে ক্ষিপ্রতা নাই, দৃষ্টিতে সে চঞ্চলতা নাই, দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে সে চলিয়াছিল। কে তাহাকে ডাকিল—প্রণাম গোঁসাইজী। আসুন তামাক খেয়ে যান। গোঁসাই দেখিল, ঘনশ্যামের কর্ম্মচারী শিবু তাহার আপন দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে। গোঁসাই হাসিয়া উত্তর দিল—কল্যাণ হোক—বৎসরে বৎসরে সন্তান লাভ কর। বলিয়া সে শিবুর দাওয়ায় চাপিয়া বসিল। ব্রাহ্মণের হুঁকাটা তাহার হাতে দিয়া শিবু হাসিতে লাগিল।

গোঁসাই বলিল—কই কাজে যাও নি যে?

শিবু বলিল—আর বলেন কেন—ভাইটাকে দিয়েছি একটা বেগুনী-ফুলুরীর দোকান ক'রে—মাঠে সে বেচতে যায়, তাই সকালে একবার দেখতে মাঠে গিয়েছিলাম—তার পর বাড়ি ফিরে দেখি ছেলেটার বিষম জ্বর, তাই আর আজ যেতে পারলাম না।

গোঁসাই বলিল—হুঁ।...তার পর মাইনে-টাইনে সব পেলে, না, খেটেই যাচ্ছ শুধু?

শিবু বলিল—মাইনে আমি ত নিই নি এখনও। আমার একটা দেনা আছে—তা ওই মাইনের টাকা থেকে শোধ করব ভেবেছি। ঘনশ্যাম অবস্থাপন্ন লোক—এক-মস্তেই নোব ওর কাছে।

গোঁসাই হুঁকাটা শিবুর হাতে দিয়া বলিল—রাখ।...বেশ তবে উঠি বৎস। প্রচুর ধন হোক তোমার—ডাকাতের ভয়ে নিদ্রাহীন হয়ে বেঁচে থাক। সুদ কষতে কষতে মস্তিষ্ক বিকৃত হোক তোমার।

শিবু ও কথায় কান দিল না, প্রশ্ন করিল—কিন্তু ও কথা হঠাৎ আপনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন?

—এই দেখ ছেলেমানুষী দেখ! ও—তোমাকে ধর ভালবাসি, সব কথা তুমি আমাকে বল—আমিই বা তখন তোমার সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছু শুনলে সে কথা জিজ্ঞেস না ক'রে থাকি কি ক'রে!

—কি, শুনলেন কি আপনি?...বলুন, বলুন। না—না—বলতেই হবে আপনাকে।

গলা নামাইয়া গোঁসাই বলিল—যেন তোমাকে রাখবার বেশ ইচ্ছা নেই দেখলাম। বলে, ইদানীং কাজটাজ কিছু করে না—শুধুই ফাঁকি, শুধুই ফাঁকি। এ করলে জবাবও দেব, মাইনেও এক পয়সা দেব না আমি।

শিবুর মুখখানা এক মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কাতর স্বরে বলিল,—ভগবান জানেন, আর আপনারাও ত পাঁচজনে দেখ্‌ছেন, আমি—।

—সে আমি খুব বলেছি ওকে। বেশ দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছি। ব'লে দিলাম বুঝেছ কিনা—আচ্ছা ক'রে।

সাগ্রহে শিবু বলিল—কি বল্‌লে তাতে?

—কি আর বলবে, বলবার আছেই বা কি? তবে কি জান ও-সব লোকের স্বভাবই ওই। আবার বলে, তুমি নাকি দোকান খুলবে, খদ্দের ভাঙাচ্ছ। আর ধর মাইনের টাকা এক পয়সা নাও না, অথচ সংসারই বা চলে কি ক'রে তোমার? এই সব আর কি।

আবার বিবর্ণ হইয়া শিবু বলিল—ঈশ্বরের দিব্যি ক'রে বলতে পারি—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার—

বাধা দিয়া গোঁসাই বলিল—আরে তার জন্যে এত ভাবছ কেন তুমি? বলি, আইন-আদালত ত কারুর বাবার নয়। কান ম'লে টাকা আদায় ক'রে নেবে তুমি। শিবু শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—উত্তর দিবার শক্তিও যেন তাহার লুপ্ত হইয়া গেছে। গোঁসাই বলিল—আচ্ছা, তা হ'লে উঠি বৎস। আমার আবার কত কাজ বাকী।

বিপরীত দিক হইতে আগন্তুক এক ভদ্রলোক হাসিয়া বলিল—আপনার কাজ কি দেবতা? এ যে—

সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাই বলিয়া উঠিল—কাজ? এই ত ধর কোয়েটায় ভূমিকম্পে এত লোকক্ষয় করার জন্যে শিবের সেশনে বিচার হবে—তাতে জুরী আছি। তার পর ধর—ইন্দ্রলোকে।

ভদ্রলোক তখন অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেছে। গোঁসাইও কার্য্যের তালিকা অসম্পূর্ণ রাখিয়া অগ্রসর হইল। আসিয়া উঠিল সে ঘনশ্যামের দোকানে।

ঘনশ্যাম বলিল—বেশ মশায়! আমি বলি গুরুদেব গেলেন কোথায়?

গোঁসাই হাসিয়া বলিল—গেলাম ডাকঘরে—তা তোমার পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে খানিকটা কথাবার্ত্তা কইতে দেরি হয়ে গেল।

দে বলিল—মাষ্টারমশায় লোকটি বড় ভাল।

মৃদু হাসিয়া গোঁসাই বলিল—হ্যাঁ, আছেন বেশ ভাল। ভদ্রলোক বেশ—যার নাম আর কি চতুর। বেশ দু-পয়সা উপরি—বুঝেছ!

দে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে বলিল—পোষ্টাপিসে আবার উপরি কিসে হবে মশায়?

বার-কয় ঘাড় দোলাইয়া গোঁসাই বলিল—বাপধন, জ্বালাতে জানলে জ্বলে, বাতি জ্বলে। শিখতে হয়, এ সব শিখতে হয়। এই ধর যারা লেখাপড়া জানে না তাদের মনিঅর্ডার লিখে দেওয়া, টেলিগ্রাম লিখে দেওয়া অথচ দেখ গিয়ে সাইনবোর্ড এক মেরে রেখে দিয়েছে যে 'বিনা পারিশ্রমিকে'—বুঝেছ।...তার পর ধর আজই তোমার সেভিংসব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করতে হবে—বুঝেছ।

ঘনশ্যাম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—লোকটিকে আমি খুব ভাল মনে করতাম মশায়—অ্যাঁ! মানুষের চরিত্র, অ্যাঁ!

গোঁসাই বলিয়া উঠিল—গোবিন্দ হে রাধেশ্যাম!...তার পর কই একটা বিড়ি দাও দেখি!

বিড়ি বাহির করিয়া দিয়া দে যেন সচেতন হইয়া প্রশ্ন করিল—তার পর শিবুর কথায় তখন যে কি বলব বলছিলেন?

নিতান্ত অনিচ্ছাজ্ঞাপক স্বরে গোঁসাই বলিল—হুঁ। তার পর সে বিড়িই টানিতে লাগিল।

দে বলিল—ব্যাপার কি বলুন দেখি?

—সে আর তোমাকে শুনতে হবে না। শুনে হাসবে তুমি। আমিও শুনে হেসে বাঁচি না। বলে, শিবু নাকি দোকান করবে—আর চাকরি করবে না। তোমার কাছে মাইনের টাকা মজুত আছে, ওই হবে মূলধন। তোমারই খদ্দের-টদ্দেরদের মধ্যে কে-কে না কি কথাও দিয়েছে যে ওরই দোকানে মাল-টাল নেবে।

ঘনশ্যাম ক্রোধে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তার পর বলিল—আচ্ছা, দেখা যাক।

গোঁসাই হাসিয়া বলিল—তুমিও যেমন, মাইনেই দিও না তুমি। হিসেব-নিকেশ বুঝিয়ে দিক তবে ত' মাইনে! বেশী কিছু করে—ব্যস্—এক অ্যাকাউণ্ট স্যুটেই কাজ খতম।

ঘনশ্যাম খুশী হইয়া উঠিল। সে আবার একটা বিড়ি বাহির করিয়া দিয়া বলিল—খান। নিজেও সে একটা ধরাইয়া বসিল।

বিড়ি টানিতে টানিতে গোঁসাই বলিল—আর একটা জবর খবর শুনেছ? তোমার রাজবাড়িতে যে মহাধুম—চৌধুরীকর্ত্তার মেয়ের বিয়ে—বিনাপণে মস্ত জমিদারের বাড়ি—ছেলে হাইকোর্টের উকীল, মাসে পাঁচ-সাতশ টাকা কামাচ্ছে এরই মধ্যে!

ঘনশ্যাম বলিয়া উঠিল—অতি মহৎ লোক ত তাহ'লে তাঁরা!

গোঁসাই বলিল—ভেতরে রহস্য আছে বৎস!

—মানে?

—মানে?—বংশে তাদের খুঁত আছে, বুঝেছ! কোন রকম একটা কেলেঙ্কারী-টেলেঙ্কারী, আর জমিদারী বংশ-দণ্ডটিও ঘুণ-ধরা। মানে পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণ। ছেলেরও তোমার স্বভাবচরিত্র খারাপ। তাই এখন সুন্দরী বউটউ পেয়ে যদি ছেলে শোধরায়—বুঝেছ? নইলে বিনাপণে—হুঁ!

মস্তব্যটা ঘনশ্যামের মনঃপূত হইল না, সে বিড়িটা না টানিয়া হাতে ধরিয়া অর্থহীন ভাবে সম্মুখের পথের দিকে চাহিয়া বোধ হয় ঐ কথাটাই ভাবিতে আরম্ভ করিল। গোঁসাইও নীরবে বিড়িটা টানিয়া ফু-ফু করিয়া ফুৎকারের জোরে যেন আকাশে ধোঁয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিল। অকস্মাৎ বিড়িতে একটা টান দিয়া ঘনশ্যাম বলিয়া উঠিল—তা আপনি কেমন ক'রে বলছেন? সংসারে কি ভাল লোকের একেবারে অভাব ঘটেছে না কি?

গোঁসাই ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল—হ্যাঁ, তা অবিশ্যি—। কথা সে শেষ করিল না। মনে যেন তাহার চিন্তা আসিয়া প্রবেশ করিল। ঘনশ্যামের বিড়িটা নিবিয়া গিয়াছিল, সে বার কয় বৃথাই টান দিয়া বলিল—দেন ত আপনার

বিড়িটা ধরিয়ে নি। যে দেশলাইয়ের দর, বিড়ি খাওয়া আর চলে না!

জ্বলন্ত বিড়িটা তাহার হাতে দিয়া গোঁসাই বিনা-ভূমিকায় উঠিয়া পড়িল। ঘনশ্যাম প্রশ্ন করিল—উঠছেন যে?

অন্যমনস্ক ভাবে গোঁসাই উত্তর দিল—হুঁ! সে ভাবিতেছিল—হ্যাঁ—তা—অবিশ্যি—ভাল লোক।

* * *

এখানকার চৌধুরীবংশের খ্যাতি বহুদিনের। বিনয়ে দানে সম্পদে চৌধুরী-বংশের প্রতিষ্ঠা বহুবিস্তৃত এবং বিপুলই ছিল। চৌধুরীবাবুদিগকে কেহ না কি আগে অভিবাদন করিতে পারে নাই—আজও পারে নাই। মানুষের সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র চৌধুরী-কর্ত্তাদের দেহ ঈষৎ নত হইয়া পড়ে, হাত দুইটি ললাট স্পর্শ করে, তার পর তাঁহারা সম্ভাষণ করেন।

জমিদারী তাঁহাদের খুব বড় ছিল না, মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন চৌধুরীবাবুরা। ভোগে বিলাসে অমিতব্যয়িতাও তাঁহাদের ছিল না। বৈষ্ণবমন্ত্র-উপাসক চৌধুরীদের কেহ কোন-দিন মদ্যমাংস স্পর্শ করেন নাই। চরিত্রগত দৃঢ়তাও তাঁহাদের প্রসিদ্ধ। অমিতব্যয়ী ছিলেন তাঁহারা দানে দেবসেবায়। আজ এখানে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব কেহ বসতবাটির খাজনা দিয়া বাস করে না। তাঁহাদের যাবতীয় বাস্তবাটী চৌধুরীবাবুদের প্রদত্ত সনন্দবলে লাখেরাজ। কেহ দেবতা প্রতিষ্ঠা করিলে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ বিঘা নিষ্কর ভূমি চৌধুরীবাবুদের দরবারে দানের ব্যবস্থা ছিল।

যাক্, সে-সব পুরাতন কথা। আজ ধূলিমলিন নিস্তব্ধ-পুরী চৌধুরী-বাড়ি ঈষৎ উজ্জ্বল ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড বড় বাড়িটার বড়-তরফের প্রবেশপথের সম্মুখ ভাগটা ঝাড়া মোছা হইয়াছে। বহুকালের শেওলার মালিন্য উঠে নাই, তবু ধূলার মালিন্য দূর হইয়াছে। যেন কোন উদাসী বৈরাগী তৈলহীন স্নান সমাপন করিল। ও-পাশে পরিত্যক্ত মধ্যম-তরফের বাড়িটার কিছু কিছু ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মধ্যম-তরফ দেশত্যাগ করিয়াছেন। তার পাশে সেজ-তরফের অংশও জনহীন—সেজ-তরফ নির্ব্বংশ সেজগিন্নী কাশীবাসিনী। তার পর ন' তরফ—ন'-কর্ত্তা জীবিত নাই, তাঁহার ছেলে দুইটি মাতুলালয়ে থাকিয়া পড়াশুনা করে। ছোটকর্ত্তা এখানেই আছেন, তিনিও আজ বড়-তরফের চাঞ্চল্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

বড়কর্ত্তার একমাত্র সন্তান রাধারাণীর আজ পাকা-দেখা। বাড়ির ভিতরে দুইখানা বড় ঘর ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজান হইতেছে। গালিচা ও কার্পেট পাড়িয়া বাছা হইতেছিল। সমস্তগুলিই জরাজীর্ণ, উপরের পশমের কারুকার্য্য নিঃশেষে উঠিয়া গিয়াছে—মধ্যে মধ্যে প্রায় ছিঁড়িয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। ছোটকর্ত্তা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বড়কর্ত্তা রন্ধনের পরিচর্য্যার তদ্বিরে ব্যস্ত হইয়া ফিরিতে-ছিলেন, ছোটকর্ত্তা সেখানে আসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ দাদা, গালচে-কার্পেট ত সমস্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে—একখানাও ত বার করা যায় না। একবার মুখ তুলিয়া বড়কর্ত্তা আবার মুখ নত করিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—একখানা সতরঞ্চি ভাল দেখে তা হ'লে পেতে দাও। নেই যখন—তখন—। আর তাঁদের কাছে ত আমরা অনুগ্রহপ্রার্থী আজ!

ছোটকর্ত্তার কিন্তু কথাটা মনঃপূত হইল না, তিনি বলিলেন—সেজদা খান-দুই নতুন গালচে কিনেছিলেন।

বড়কর্ত্তা বলিলেন—সেজ বৌমা ত নাই, বের ক'রে দিচ্ছে কে? কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ছোটকর্ত্তা বলিলেন—তালাটা ভেঙে ফেলি।

বড়কর্ত্তা বলিলেন—না।

ছোটকর্ত্তা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বড়কর্ত্তা বলিলেন—একটা কথা বলছিলাম তোমাকে, শুভকর্ম্ম যখন হবে তখন দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করালে হ'ত না!

ছোটকর্ত্তা নতমুখে পায়ের আঙুল দিয়া মাটি খুঁড়িতে-ছিলেন। তিনি বলিলেন—বল কা'কে কা'কে বলতে হবে।

ফর্দ্দ হইয়া গেল। ছোটকর্ত্তা ফর্দ্দখানা হাতে লইয়াও দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বড়কর্ত্তা বলিলেন—যাও তা হ'লে।...হ্যাঁ—পোষ্টমাষ্টার মশায়কেও বলতে হবে। কিন্তু তোমার পিওন দু-জনকে বাদ দেওয়া কি ভাল হবে? অ্যাঁ—?

ছোটকর্ত্তা মুখ তুলিয়া বলিলেন—ওদেরও বলা হোক।

তার পর সহসা যেন এতক্ষণের সঞ্চিত সংকল্প নিঃশেষে

প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—রাত্রে আলোও ত চাই দাদা। সেজদার নতুন আলোও আছে। তুমি কিছু বলতে পাবে না—আমি তালা ভাঙব।

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। বড়কর্ত্তা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চাকর আসিয়া বলিল—ঘনশ্যাম দে এসেছেন—আর সঙ্গে গোঁসাইজী রয়েছেন।

ব্যস্ত হইয়া বড়কর্ত্তা অগ্রসর হইয়া গেলেন।

—প্রণাম গোঁসাইজী, আসুন, আসুন—রাধারাণীর আমার পরম ভাগ্য!

চৌধুরী-কর্ত্তার সম্মুখে গোঁসাইজীর রসিকতা বেশ জমে না তবু সে বলিল—বৈকুণ্ঠ থেকে এই এখুনি টেলিফোন করছিলেন আমাকে, বলেন—তোমাদের মর্ত্ত্যধামে ব্যাপার কি, রান্নার এত সুগন্ধ আসছে কোথা থেকে। আমি ব'লে দিলাম—বলি পেটুক ঠাকুর, চৌধুরী-বাড়িতে রাধারাণীর পাকা-দেখা যে! বড়কর্ত্তার বন্দোবস্ত—গয়লার ছেলে এ সব পাবে কোথা?

দে গোঁসাইয়ের সহিত কর্ত্তার সম্ভাষণ-শেষের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, চৌধুরীকর্ত্তা গোঁসাইজীর কথায় শুধু একটু হাসিয়া, দে-কে নমস্কার করিয়া বলিলেন—নমস্কার দে-মশায়, আসুন, আসুন।

দে চমকিয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রণাম কর্ত্তাবাবু, আমি কিছু পাকা কলা এনেছি, আমার বাড়িরই গাছের, বাজারে দেখলাম আপনার লোক কলার সন্ধান করে পেলে না, তাই—। আনরে, আন্!

একটা মুটে মাথা হইতে একটা চাঙারি নামাইয়া দিল। চাঙারিতে সাজান পরিপুষ্ট মর্ত্তমান কলাগুলি সত্যই অতি চমৎকার। বড়কর্ত্তা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন—কি ব'লে যে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করব দে-মশায়,—আশীর্ব্বাদ করি, অন্তঃকরণ আপনার দিন দিন উঁচু হোক।

ঘনশ্যাম কর্ত্তাকে আবার প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলি লইল।

বড়কর্ত্তা জোড়হাত করিয়া গোঁসাইকে বলিলেন—বলতে ত সাহস হয় না গোঁসাইজী—যদি দয়া ক'রে আমার এখানে মধ্যাহ্নে সেবা গ্রহণ করেন তবে—।

গোঁসাই বলিল—বেশ—বেশ—বেশ!

বড়কর্ত্তা ঘনশ্যামকে বলিলেন—দে-মশায়—আপনি যদি।

হাতজোড় করিয়া দে কহিল—সে ত হুজুর না বললেও আসব। আমি ত আপনার মুদী, আমার বরাদ্দ ত বাঁধা আছে।

বড়কর্ত্তা চাকরটাকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন—দেখ, ময়রা, নাপিত, আর গয়লাকেও নেমন্তন্ন ক'রে আয়। আর কলু, ধোপা, সেকরা আর তোমার দাই এগুনি এদেরও বলতে হবে। বড়গিন্নীকে জিজ্ঞেস ক'রে নে, রাধারাণীর আঁতুড়ে এগুনি কে ছিল। এই বেলা সব ব'লে আয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেছুনীকেও বলতে হবে।

চৌধুরী-বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ঘনশ্যাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, এ বাড়িতে আমি আসি না, এলেই মন খারাপ হয়ে যায়। তাগাদায় পর্য্যন্ত কাউকে পাঠাই না।

গোঁসাই কোন উত্তর দিল না, আপনার বাড়ি আসিয়া উঠিল। তখন তাহার মা আপন-মনেই বকিতেছিল—সংসারে কর্ত্তা থেকেও নেই—চাল ফুরিয়েছে—সে কি ধান ভানতে দেব আমি?

গোঁসাই অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল—সে চাল এর মধ্যে ফুরিয়ে গেল?

মাও অবাক হইয়া গেল, বলিল—এরই মধ্যে হ'ল কিশোর? তিনটে পেটে খেতে ত হয়, হিসেব ক'রে দেখ না বাবা!

গোঁসাই মাথা নাড়িয়া বলিল—উঁ-হু!

তারপর এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল—তোমার বৌ কোথা গেল?

মা বলিল—ঘাটে গেছে, বাসন মাজতে।

গোঁসাই বলিল—তবে বলি শোন, তোমার বৌয়ের কীর্ত্তি এ।

সবিস্ময়ে মা প্রশ্ন করিল—কি?

—এই চাল—তোমার চাল ফুরোনোর কথা বলছি—চাল বেচে ও বেগুনী-ফুলুরী খায়।

* * *

চৌধুরীকর্ত্তার মেয়ে রাধারাণী অপছন্দ হইবার মেয়ে নয়। বর্ণে লাবণ্যে দেহসৌষ্ঠবে মেয়েটি প্রতিমার মত সুন্দরী। পাত্রপক্ষের অপছন্দও হইল না। পাত্রকর্ত্তা উচ্ছ্বসিত আনন্দে

বলিলেন—এ কন্যা যদি দয়া ক'রে আমার পুত্রকে দান করেন, চৌধুরী-মশায়, তবে সে আমার সৌভাগ্য।

গোঁসাইও আসরে বসিয়াছিল—সে বলিল, মিছে কথা নয় সিংহ-মশায়। সে দিন স্বর্গে গিয়ে দেখে এলাম দেবকুমারদের মধ্যে মহা বিপদ উপস্থিত—এ বলে আমি রাধারাণীকে বিয়ে করব ও বলে আমি বিয়ে করব। শেষ থামিয়ে দেওয়া হ'ল—নাঃ, তোমরা কেউ বিয়ে করতে পাবে না—নরলোকেই তার বিয়ে হবে।

রসিকতাটা ভাল জমিল না। চৌধুরী-মহাশয়ের ছল ছল চোখের দিকে তখন সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। চৌধুরী-কর্ত্তা কথার কোন জবাব দিতে পারিলেন না। পাত্রপক্ষের পুরোহিত তখনও চশমা-চোখে মেয়ে দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—একবার হাস ত মা-লক্ষ্মী!

রাধারাণী কিন্তু হাসিতে পারিল না—সে ঘামিয়া উঠিল।

গোঁসাই বলিয়া উঠিল—কিন্তু আমার গিন্নীর কাছে তোমার হার ভাই রাধারাণী। কেমন বাহারের দাঁত বল দেখি—খামচ কেটেই আছে, যেন মহিষাসুরমহিষী—অ্যাঁ—! বলিয়া সে নিজেই দাঁতে খামচ কাটিয়া দিল—সে ভঙ্গী দেখিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল, রাধারাণীও এবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

গোঁসাই বলিল—এই দেখুন হাসি ভটচাজ-মশায়, সত্যযুগ হ'লে এ হাসিতে মাণিক ঝরত।

পুরোহিত পাত্রকর্ত্তাকে বলিলেন—কন্যা আশীর্ব্বাদ ক'রে ফেলুন কর্ত্তা। এ কন্যা শুধু শ্রীমতীই নয়, মঙ্গলময়ী মেয়ে—আপনার মঙ্গল হবে।

পাত্রকর্ত্তা জোড়হস্তে চৌধুরী-মহাশয়কে বলিলেন—তা হ'লে অনুমতি করুন আপনি।

চৌধুরীবাবুরা দুই ভাই-ই করজোড়ে দাঁড়াইয়া ছিলেন—বড়কর্ত্তা বলিলেন—ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন, আমি দরিদ্র—

পাত্রকর্ত্তা আর বলিতে দিলেন না, চৌধুরী-কর্ত্তার দুটি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—ও কথা যদি বলেন, তবে আমাকে বিদায় দেন।

পুরোহিত তখন ধান্যদূর্ব্বা ও স্বর্ণালঙ্কার-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন—চলুন চলুন, গোবিন্দের দরবারে চলুন। শুভ সময় আবার বেশীক্ষণ থাকবে না। দিন স্থির হইয়া গেল এক সপ্তাহের মধ্যে।

* * *

বাড়িতে মা জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁরে মেয়ে পছন্দ হয়ে গেল?

গোঁসাই বিরক্তিভরে জবাব দিল—জানি না বাপু, জানি না—জল দাও দেখি এক গ্লাস।

জলের গ্লাস নামাইয়া দিয়া মা বলিল—তা ওই কি জবাবের ছিরি না কি? জিজ্ঞাসা করলাম—মেয়ে পছন্দ হ'ল কি না—।

জলপান করিয়া গোঁসাই বলিল—হয়েছে। যে তেষ্টা পেয়েছিল!

মা বলিল—যাক্। যে ভয় করছিল ওর মা—ভয়ের কথাই যে বটে! পোড় দাগ দেখতে ফুলের মতই লাগে! বিদেশী লোক—বিশেষ পাত্তরপক্ষ—তারা আগে খারাপটাই ধরবে।

গোঁসাই প্রশ্ন করিল—কি, কি, কি?

—এই রাণীর পায়ে গরম জল পড়ে পুড়ে গিয়েছিল—এই হাঁটুর ঠিক ওপরেই। দাগ অবিশ্যি সবই প্রায় মিলিয়ে গিয়েছে—তবু ছেরাকাটা ছেরাকাটা দাগ এখনও আছে। তাই ওর মায়ের ভয়।

গোঁসাই বলিল—তা বাপু ওদের কথাটা বলা উচিত ছিল।

মা বলিল—তার আর কি বলবে! আর বলেছে না বলেছে তাই বা জানছে কে? চৌধুরী-কর্ত্তা যে ধর্ম্মভীরু লোক! ওই দেখ, গরুতে শাকক'টা সব খেলে—। সে তাড়াতাড়ি বাড়ির বাহিরে শাকের ক্ষেত পানে বাহির হইয়া গেল।

স্ত্রী ঝাঁট দিতেছিল। গোঁসাই মৃদু অথচ বিরক্ত স্বরে বলিল—তোষামুদী করা আমার দু-চক্ষের বিষ!

স্ত্রী নীরবে তাহার পানে চাহিল—কোন প্রশ্ন করিল না।

গোঁসাই বলিল—মায়ের কথা বলছি। তোষামোদী করা ওর একটা স্বভাব। চৌধুরী-গিন্নীর এক নম্বরের মোসাহেব।

এবার স্ত্রী বলিল—কই মা ত ওদের বাড়ি যায় না—এই আজ কেবল—।

বাধা দিয়া গোঁসাই বলিল—না যায় না—তুমি জান!

ঘাটের পথে রোজ যায়—আর বৌ আর বেটার নামে—সে আমি সব শুনেছি।

গোঁসাই বসিয়া বসিয়া কেবল উঃ আঃ করিতেছিল। স্ত্রী বলিল,—এই দেখ অবেলায় মরা-পেটে চড়া দিয়ে খেয়েছ—একটু শোও। ঘুমলেই সেরে যাবে।

গোঁসাই বলিল—তাই দাও, কিন্তু একটু বেড়িয়ে এলে হ'ত।

একখানা মাদুর বিছাইয়া দিয়া বালিশটা দিতে দিতে স্ত্রী কহিল—না, একটু শোও। সারাদিনই ত টো-টো ক'রে ঘুরছ।

গোঁসাই শয়ন করিল—কিন্তু শরীর সুস্থ হইল না। কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া উঠিয়া বলিল—যাই একবার ইষ্টিশান ঘুরে আসি। লক্ষ্মীবাটীর বাবুরা যাবেন এই ট্রেনে দেখাটা করে আসি।

ঠিক এই সময় বাড়ির বাহির হইতে কে ডাকিল—গোঁসাইজী আছেন?

গোঁসাই তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—কে হে, হরেকেষ্ট না কি? হ্যাঁ, যাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল হরেকেষ্টই বটে। তাহাকে দেখিয়া সে অকারণে খুশী হইয়া উঠিল।

হরেকেষ্ট বলিল—তার পর সেই খবরটার কি হ'ল?

গোঁসাই বলিল—না ভাই, যাওয়া আর হয় নি। তার জন্যে তুমি এত ভাবছ কেন?

হরেকেষ্ট বলিল—ভাবনা আমার বিশেষ নেই গোঁসাইজী। আমরা হলাম চৌধুরী-বাড়ির জ্ঞাতি, আর ওদের সঙ্গে বিরোধ বলেই এ বাবুরা আমাকে চাকরি দিয়েছেন। ছাড়ান, নিজেরাই বুঝবেন। ও যতই ফুসফাস্ করুন—আমি-ভিন্ন চৌধুরীদের সম্পত্তি হজম করতে কেউ পারবে না।

গোঁসাই বলিল—আচ্ছা, তোমাদের বুঝি নেমন্তন্ন করে নি? রাধারাণীর পাকা-দেখা হয়ে গেল, কই তোমাদের বাড়ির কাউকে ত দেখলাম না!

হরেকেষ্ট উত্তর দিল—নেমন্তন্ন ছিল—ও আমাদের গুষ্টীতে ব্যতিক্রম হবার উপায় নাই। তবে আমার শরীর বেশ ভাল ছিল না, আর ধরুন এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া, মেয়েছেলের যাওয়ারও ভারী অসুবিধে।...

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার সে বলিল—তার পর সব ঠিকঠাক হয়ে গেল?

গোঁসাই বলিল—হ্যাঁ, আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল—আসছে সপ্তাহে—২৫শে অঘ্রাণ দিনও হয়ে গেল।

—আশীর্ব্বাদে কি দিলে? এ দিকে নাম-ডাক ত খুব ওদের আমাদের সমাজে।

গোঁসাই ঘাড় নাড়িয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—ঝাপ্‌টা একখানা। কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগল না দেখে। মরা সোনার গয়না, পানে ভরা—পাথরগুলো—কে জানে ভাই পাথর ত চিনি না—কিন্তু কাচের মতই মনে হ'ল আমার।

হরেকেষ্ট বলিল—সেকেলে গয়না, সোনা একটু নীরেসই হয়; কিন্তু পাথর বোধ হয়—সাচ্চাই হবে। লক্ষ্মীবাটির বাবুদের অনেক জহরত আছে।

গোঁসাই চুপ করিয়া রহিল। হরেকেষ্ট বলিল—আচ্ছা তা হ'লে—।

গোঁসাই বলিল—একটা কাজ কিন্তু ভাই চৌধুরী-কর্ত্তা ভাল করলেন না।

—কি?

—এই মানে—রাণীর পায়ে হাঁটুর ওপরে নাকি সাদা সাদা দাগ আছে। ওঁরা বলেন—পোড়া দাগ। কিন্তু—কে জানে ভাই কি। কিন্তু এর পর দেখে যদি ওরা 'ফুল', মানে শ্বেত-কুষ্ঠ-টুষ্ঠ ভাবে—অ্যাঁ—। বলা উচিত ছিল।...আর হয় ত—তাই-ই হবে—।

হরেকেষ্ট বলিল—রাধারাণীর পা পুড়ল কখন—? কই শুনি নি ত আমরা!

গোঁসাই বলিল—ওই দেখ, তোমরা জ্ঞাতি, তোমরাও জান না।

—তবে অবশ্য আমরা ও পাড়ায় থাকি, না জানতেও পারি।

—আর এক কাণ্ড জান?

—না, আবার কি কাণ্ড?

—সেজগিন্নীর বাড়ির তালা ভেঙে দুই ভাইয়ে প্রায় যথাসর্ব্বস্ব—বুঝেছ কি না গালচে বার করবার ছল করে—বাবা এই মহৎ—এত মহৎ—দেখ, ব্যাপার দেখ।

হরেকেষ্ট বলিল—আচ্ছা প্রণাম, চল্লাম। পারেন ত যাবেন আমাদের বড় বাবুর কাছে।

গোঁসাই বলিল—আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, বিড়িটিড়ি একটা খাও।

একটা বিড়ি গোঁসাইয়ের হাতে দিয়া হরেকেষ্ট বলিল—না, যাই। পোষ্টাপিস বন্ধ হয়ে যাবে আবার।

গোঁসাই বাড়ি আসিয়া বলিল—মাদুরখানা এরই মধ্যে তুলে ফেলেছ? দাও, বিছিয়ে দাও, একটু শুই।

স্ত্রী বলিল—মেজাজের অন্ত পাওয়া ভার। এই বললে একটু বেড়িয়ে আসি—।

—নাঃ বড় ঘুম পাচ্ছে। একটা হাই তুলিয়া মুখের কাছে তুড়ি দিতে দিতে গোঁসাই বলিল—রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ হে!

* * *

সন্ধ্যায় চৌধুরী-বাড়িতে কলরব উঠিতেছিল। রাধারাণীর আজ বিবাহ—রাত্রি এগারটায় লগ্ন। বর বরযাত্রী সব আসিয়া গিয়াছেন। আত্মীয়-কুটুম্বও অনেকে আসিয়াছেন।

কাশী হইতে সেজগিন্নী, প্রবাস হইতে মেজ-তরফ, ন'-তরফের গিন্নী ও ছেলেরা, সকলেই আসিয়াছেন।

মেজকর্ত্তার উপরে বরপক্ষের পরিচর্য্যার ভার। তাঁহার দুই ছেলে ও ন'-তরফের ছেলে দুইটি তাঁহার সহকারী হইয়া আছে। আসর, অভ্যর্থনা, আলো, বিদায় প্রভৃতির ভার লইয়া ছোটকর্ত্তা ব্যস্ত। তাঁহার সহকারী হইয়াছে হরেকেষ্ট—জ্ঞাতিত্বের বিরোধ ভুলিয়া সেও আজ আসিয়াছে। সেজ-গিন্নী কোমরে একটা থলিয়া গুঁজিয়া অন্দরমহলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যখন যে খরচ দরকার হইতেছে, বাহির করিয়া দিতেছেন। তিনিই কন্যাদান করিবেন, উপবাস করিয়া আছেন।

বড়কর্ত্তা বলিয়াছিলেন—সেজমা, উপবাস করতে হ'লে ত আমি মরে যাব—তুমি যদি এ ভারটা নাও মা, তবে আমি বাঁচি।

বিধবা আনন্দে ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—কিন্তু আমার মেয়ে-জামাইকে আমি যা-খুশী দেব, আপনি কিছু বলতে পাবেন না।

বড়কর্ত্তা বলিয়াছেন—অন্যায় অতিরিক্ত কিছু দেখলে বলব বইকি মা। শেষে স্থির হইয়াছে সেজকর্ত্তার বিবাহের পাত্রাভরণ—ঘড়ি চেন আংটি মাত্র দিতে তিনি পাইবেন।

বড়কর্ত্তা ব্যস্ত রন্ধনশালায়। একখানা চেয়ারে বসিয়া ক্রমাগত তিনি উপদেশ দিতেছিলেন—আবজুসের জলটা ঠিক সময়ে নামাতে হবে প্রসন্ন—নরমও না থাকে, কড়াও না হয়। তারণ, মাছের কালিয়ায় জাফরান দিতে হবে মনে থাকে যেন। চপের জন্য মাছের পূর কে তৈরি করছ হে!

ঘনশ্যাম আছে ভাণ্ডারে।

অকস্মাৎ বড়কর্ত্তার কি যেন মনে পড়িয়া গেল, তিনি এক জন চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন—ওহে, কি নাম তোমার, যাও ত বাবা ছোটবাবুকে একবার ডাক ত। বলবে—এক্ষনি যেন তিনি একবার এখানে আসেন।...উনানের আলটা একটু খাটিয়ে দাও বাবা কাশীনাথ, নরম আলেই পাক ভাল হয়।

ছোটকর্ত্তা আসিয়া দাঁড়াইলেন—দাদা।

বড়কর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—এই দেখ একটা কথা তোমাদের কারও মনে নেই, আমার আছে। কন্যাদানের পূর্ব্বে আমাদের রীতি, ব্রাহ্মণকে তলস্থ ভূমি সমেত একটি ফলবান বৃক্ষ দান করতে হয়, তা—তার ব্যবস্থা—!

ছোটকর্ত্তা বলিলেন—তাই কি ভোলে না কি? সে সমস্ত ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। ওই তোমার কলমের বাগানের এক কোণের ল্যাংড়া আমের গাছ একটা গাছটাও কচি, ফলও প্রচুর হয়—তলস্থ এক কাঠা জায়গা সমেত দলিল লিখে ঠিক করে রেখেছি। কেবল আমাদের সই আর ব্রাহ্মণের নাম বসাতে বাকী।

বড়কর্ত্তা বলিলেন—দেখ, আজ সকালে উঠেই কথাটা আমার মনে হয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি আমাদের গোঁসাইজীর মুখ মনে পড়ে গেল। তা—যখন ওঁকেই মনে মনে—অ্যাঁ কি বল তুমি?

ছোট ভাই হাসিয়া বলিলেন—ভদ্রলোক রোজই আসছেন, খবরাখবর করছেন, মনে হওয়া আর আশ্চর্য্য কি! তা বেশ ওঁরই নাম বসিয়ে আনি।

* * *

লগ্ন উপস্থিত হইল। গোঁসাই বরযাত্রীর আসরে বেশ জমাইয়া বসিয়া আছে, সেও যেন বরযাত্রী। ছোটকর্ত্তা তাঁহাকে

ডাকিয়া লইয়া সম্প্রদানের আসরে লইয়া গেলেন। বড়কর্ত্তা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দলিলখানি হাত দিয়া বলিলেন—এটি দয়া করে আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে। দক্ষিণে—দক্ষিণে—জেন্তু, দক্ষিণে নিয়ে এস। ছোটকর্ত্তা একটি টাকা বড়কর্ত্তার হাতে দিলেন। গোঁসাইজীকে দক্ষিণা দিয়া বড়কর্ত্তা আবার প্রণাম করিলেন।

গোঁসাই দলিলখানা পড়িতে আরম্ভ করিল। ও-দিকে তখন কন্যা সভাস্থ হইয়াছে। সম্প্রদান চলিয়াছে।

পাত্রকর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন—বেয়াই মশায় বিবাহ হয়ে গেল, তাই সাহস করছি দেখাতে। দেখুন, একখানা পত্র দেখুন, বেনামী পত্র আপনাদের এখান থেকেই কে লিখেছে। কুটিল লোকে একটা জায়গায় সরল লোকের কাছে হেরে যায়—তারা ভাবে সবাই বুঝি সব কথা গোপন ক'রে রাখে। আপনি যে আমাকে সব কথা বলেছেন তা বেচারী বুঝতে পারে নি।

একখানা খাম বাহির করিয়া তিনি চৌধুরী-কর্ত্তার হাতে দিলেন। ছোটকর্ত্তাও পাশ হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। হরেকেষ্ট ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল—সে মনে মনে চিঠিখানা যেন আবৃত্তি করিতেছিল—মহাশয়, আপনারা মহদ্বংশোদ্ভূত, তাই আপনাদের কল্যাণার্থে জানাই—চৌধুরীবাবুরা আপনাদের সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছেন। কন্যাটি সুন্দরী হইলেও ব্যাধিগ্রস্তা, পায়ে হাঁটুর উপরে শ্বেতকুষ্ঠ আছে। ইতি।

চৌধুরীকর্ত্তা বিবর্ণ পাংশুমুখে বলিলেন—বেয়াই—ভগবান—

পাত্রকর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন—আপনি ত আমায় পোড়া দাগের কথা বলেছেন বেয়াই—ও আমি বিশ্বাস ত করি নি।

ছোটকর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—একই হাতের লেখা—সেজ বৌঠাকরুণকেও এমনি এক বেনামী পত্র দিয়েছে—যে আপনার বাড়ির তালা ভেঙে—। কই সে পত্রখানা।

ছোটকর্ত্তার পাশে দাঁড়াইয়া গোঁসাই চিঠিখানা দেখিয়াছিল, সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। ছোটকর্ত্তা পত্রখানা মুড়িতে মুড়িতে বলিলেন—কার হাতের লেখা সন্ধান করতে হবে।

বড়কর্ত্তা বলিলেন—না, ও পত্র পুড়িয়ে দাও।

গোঁসাইয়ের মনে একটা কথা জাগিয়া উঠিল—সে সে-কথাটা কাহাকে বলিবে তাহাই ভাবিতেছিল। অবশেষে সে আসিয়া ভাণ্ডারে উপস্থিত হইল। ঘনশ্যাম তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল—শুনুন ত মশায়।

গোঁসাই বলিল—আরে কাণ্ডটা শুনেছ? এ কিন্তু ভাই তোমার ওই—।

রূঢ়ভাবে বাধা দিয়া ঘনশ্যাম বলিল—না, এ কাণ্ড আপনার—আমরা জানতে পেরেছি—হরে—মানে, কোন লোক বললে আমাকে।

অকল্পিত রূঢ় আঘাতের আকস্মিকতায় গোঁসাই যেন অচেতনের মত অবসন্ন হইয়া গেল। সে শূন্যদৃষ্টিতে ঘনশ্যামের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে সে বিবাহ-বাড়ি ত্যাগ করিয়া পথে নামিল। গভীর অন্ধকারের মধ্যে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিয়া সে ধীরে ধীরে চলিতেছিল।

চোখে তাহার জল আসিল। এমন জঘন্য হীন মিথ্যা মানুষের বিরুদ্ধে—হায় রে সংসার! কাল কিন্তু ঘনশ্যামের ভুল ভাঙিয়া দিতে হইবে—এ ওই দেখিতে ভালমানুষ পোষ্ট-মাষ্টারের কাজ—নিজের ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য—। নিশ্চয় ওই! ওই লোকটাই পত্র দিয়াছে!

বিক্রমপুর

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর পরগণা সুবিখ্যাত কিন্তু এই পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামক কোন নগর বা গ্রামের অস্তিত্ব নাই। মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে রামপাল নামে একটি গ্রাম অতীতের অনেক গৌরবচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া এখনও বিরাজিত। লোকের বিশ্বাস, এই স্থানই প্রাচীন বিক্রমপুর নগর। স্থানটি নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থান অপেক্ষা উচ্চ। শুষ্ক 'রামপালদীঘি' এবং প্রকাণ্ড পরিখাবিশিষ্ট বল্লালবাড়ি ইহার অন্তর্গত।

১৯৩৪ সনে আমরা রামপাল দেখিতে যাই। মুন্সীগঞ্জ হইতে পদব্রজে রামপাল যাইতে স্বল্পপরিসর লোক্যাল বোর্ডের রাস্তার স্থানে স্থানে প্রাচীন ইষ্টকাদির চিহ্ন নয়নগোচর হয়। বর্ত্তমান কালের সম্পদ্—রামপাল ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের বিখ্যাত কলা-বাগানগুলিও—দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরূপ উৎকৃষ্ট কলা বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কোথাও জন্মে না। কলার চাষে এতটা পরিশ্রমও বাংলা দেশে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পচা কর্দ্দম সাররূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া তাহার উপর চারাগাছ রোপণ করা হয় এবং জমির তেজ কমিয়া গেলে তাহাকে কিছুকাল আবশ্যকমত ফেলিয়াও রাখা হয়। অধিকাংশ কৃষকই মুসলমান। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা লক্ষ্য করা গেল। পাটের স্থান ক্রমশঃ অধিকার করিতেছে ইক্ষু—গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণের পূর্ব্বেই এই প্রচেষ্টা দেশের পক্ষে আশাপ্রদ। স্থানে স্থানে বাঁধাকপির আবাদও দেখা গেল। জানিলাম এ আবাদও এ স্থানের পক্ষে নূতন।

রামপালদীঘি এখন মৃত—ইহার মধ্যে রীতিমত চাষ-আবাদ চলিতেছে। দীঘিটি প্রায় $\frac{3}{4}$ মাইল লম্বা এবং $\frac{1}{4}$ মাইল চওড়া। বল্লালবাড়ি ইহার উত্তরে। বল্লালবাড়ি এখন একটি প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ, পরিমাণফল প্রায় ৩০০০ বর্গ-ফুট। ইহার চারি দিকের পরিখা প্রস্থে প্রায় ২০০ ফুট। একটি প্রাচীন কালের প্রশস্ত রাস্তা বল্লালবাড়ি হইতে বাহির হইয়া কতক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই বল্লালবাড়ির এক প্রান্তে ইতিহাসবিখ্যাত গজারীবৃক্ষ—এক্ষণে শুষ্ক।

একটি প্রবাদ আছে যে, রাজা আদিশূর বিশুদ্ধ প্রণালীতে যজ্ঞ করাইবার জন্য কোলাঞ্চ বা কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চগোত্রের পাঁচটি ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ব্রাহ্মণেরা চর্ম্মপাদুকা পরিধান করতঃ তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করেন এবং জলগণ্ডূষ হস্তে লইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। রাজা কিন্তু তাঁহাদের বেশ ও ব্যবহার দেখিয়া বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন এবং আসিতে বিলম্ব করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণেরা একটু বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের মন্ত্রপূত আশীর্ব্বাদের জল নিকটবর্ত্তী শুষ্ক কাষ্ঠের উপর নিক্ষেপ করেন—কাষ্ঠও অমনি গজাইয়া সজীব বৃক্ষ হইয়া উঠে—সেই বৃক্ষই এই গজারী গাছ। এখনও সিন্দুরাদি দ্বারা এই বৃক্ষের অর্চ্চনা হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, কোন ঐতিহাসিকই এই প্রবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না! কোন কোন ঐতিহাসিক এখন আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনীকে উপন্যাসের সমান বলিয়া মনে করেন। আদিশূর নামক কোন রাজা সেকালে বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি যে কোন কালে পূর্ব্ববঙ্গে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা অন্ততঃ সন্দেহজনক। আর, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদের বলে মৃত কাষ্ঠের পুনর্জীবনলাভ—এ কাহিনী যিনি বিশ্বাস করেন, বর্ত্তমান যুগ তাঁহাকে আর যাহাই বলুক ঐতিহাসিক বলিবে না।

এ ত গেল আদিশূরের কথা। এখন কথা হইতেছে, বিক্রমপুর প্রসিদ্ধি লাভ করিল কোন্ সময় হইতে এবং তাহার রাজধানীর নামই বা রামপাল হইল কেন? এ পর্য্যন্ত যত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিক্রমপুরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীচন্দ্র দেবের শাসনে। তাঁহার

পূর্ব্ববর্ত্তী, চট্টগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত, কান্তিদেবের তাম্রশাসনে বর্দ্ধমানপুরের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করেন এই বর্দ্ধমানপুরই বিক্রমপুরের পূর্ব্বনাম এবং শ্রীচন্দ্রদেব কান্তিদেবের নিকট হইতে এই স্থান বিক্রম দ্বারা অর্জ্জন করিয়া ইহার নাম বিক্রমপুর রাখেন।* শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয়ের এই অনুমান এত সূক্ষ্ম সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত যে ঐতিহাসিকের পক্ষে উহা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা চলে না। বিক্রমপুর যে বিক্রমাদিত্য-উপাধিধারী কোন রাজার স্থাপিত এই প্রবাদও কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

শ্রীচন্দ্রদেবের সময় মোটামুটি দশম শতাব্দীর শেষ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ধরা হইয়া থাকে। এই সময় হইতে ক্রমাগত রাজার পর রাজা শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে তাম্রশাসন বাহির করিতে থাকেন। শ্রীচন্দ্রদেবের চারখানি তাম্রশাসনের সকলগুলিরই উৎপত্তি-স্থান শ্রীবিক্রমপুর। কান্তিদেব ও শ্রীচন্দ্র উভয়েই বৌদ্ধ ছিলেন। বিক্রমপুরের নানা স্থান হইতে বৌদ্ধ যুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী পালবংশ ও পরবর্ত্তী চন্দ্রবংশের অধিকারের ফল বলিয়াই অনুমিত হয়।

চন্দ্র-বংশের পরই বর্ম্ম-বংশ বিক্রমপুরে অধিকার লাভ করেন এবং তাহার পর সেন-বংশ। এই উভয় বংশই হিন্দু। বর্ম্ম-বংশের যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সামলবর্ম্মা, হরিবর্ম্মা, ও ভোজবর্ম্মা প্রসিদ্ধ। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের এতটা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল যে আমরা হিন্দুরাজা সামলবর্ম্ম-কর্ত্তৃক বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে প্রজ্ঞাপারমিতার মন্দিরে ভূমিদান দেখিতে পাই।† হরিবর্ম্মার রাজত্ব চত্বারিংশ-বর্ষেরও অধিক কাল ছিল এবং বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ভুবনেশ্বরে বিখ্যাত অনন্তবাসুদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

চন্দ্র-বংশ ও বর্ম্ম-বংশ প্রধানতঃ বাংলার পূর্ব্ব ভাগেই আধিপত্য করিতেন বলিয়া মনে হয়। উত্তর-বঙ্গে তখনও পাল-বংশের প্রতাপ এবং পশ্চিম-বঙ্গে তখনও প্রাদেশিক সামন্তরূপে শূর-বংশের প্রাধান্য।

পাল-বংশ বৌদ্ধ ও বর্ম্ম-বংশ হিন্দু হইলেও পরস্পরের মধ্যে কুটুম্বিতা ছিল। সামলবর্ম্মার পিতা জাতবর্ম্মা ও তৃতীয় বিগ্রহপাল উভয়েই কলচুরি-বংশীয় কর্ণদেবের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

রাজা রামপাল উত্তর-বঙ্গে বিদ্রোহ দমনের পর খুব প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বঙ্গের বর্ম্ম-বংশীয় কোন রাজা হস্তী ও রথ উপঢৌকন দিয়া রামপালের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন এরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। এই রাজাটির নাম জানা যায় না। তবে মনে হয়, বর্ম্ম-বংশীয় রাজাদিগের রাজত্বের শেষের দিকে কোন দুর্ব্বল রাজা এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে রামপালের পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষরূপ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় খুব সম্ভবতঃ তাঁহার নাম হইতেই দীঘি ও নগরের নামের উৎপত্তি হয়। রামপাল নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য যে-সকল স্থানীয় কিংবদন্তী আছে তাহার কোন-কোনটি বালকোচিত বলিলেই হয়। বল্লালসেন দীঘি কাটাইলেন আর তাঁহার মুদী রামপালের নামে সেই দীঘি বিখ্যাত হইয়া গেল—কথাটা শুনিতেই কেমন কেমন লাগে। "মহাধনী" বৈদ্যরাজ রামের নাম হইতেও 'রামপাল' নামের উদ্ভব সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

রামপাল ও তাহার আশপাশে প্রাচীন রাজধানী ও তাহার উপকণ্ঠ গড়িয়া উঠিয়াছিল। অনেক স্থানে ভূগর্ভে প্রাচীন ইষ্টক, ইমারতের ভগ্নাংশ, দেবমূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানটি সমৃদ্ধ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু যে-স্থান বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল, যে-স্থান হইতে এত প্রাচীন তাম্রশাসন দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সে-স্থানে প্রাচীন অট্টালিকাদি ও রাজধানীর যতটা নিদর্শন দর্শক আশা করেন তাহা পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি? অবশ্য সেন-বংশের সহিতই বিক্রমপুরের নাম বিশেষভাবে জড়িত—বল্লালসেন ও লক্ষ্মণ-সেনের কীর্ত্তিকলাপ এখনও বিক্রমপুরবাসী নিজস্ব মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও দ্রষ্টব্য যে যদিও বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রশাসন, বল্লালসেনের (একমাত্র) সীতাহাটী তাম্রশাসন এবং লক্ষ্মণসেনের এতগুলি তাম্রশাসন বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত, ইহার একখানিও পূর্ব্ববঙ্গে আবিষ্কৃত হয় নাই। বিজয়সেন যে প্রথমে বরেন্দ্র অঞ্চলে

* ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩২।

† *Modern Review*, Nov. 1932.

প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহার দেওপাড়া-লিপিই তাহার প্রমাণ। তাঁহার নামাঙ্কিত লিপি বীরভূম জেলাতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে ক্রমে পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেন ইহাও ঠিক। তখন সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চন্দ্র ও বর্ম্ম-বংশীয় রাজাদিগের অনুকরণে বিক্রমপুরজয়স্কন্ধাবার হইতে তাঁহার তাম্রশাসন প্রচারিত হয়। লক্ষ্মণসেনের নামাঙ্কিত এক লিপি ঢাকায় এক বিগ্রহের পাদপীঠে বর্ত্তমান, কিন্তু তাঁহার তাম্রলিপি সমস্তই উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর তাঁহার বংশধরেরা পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় লন কিন্তু কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে আমরা বিক্রমপুরজয়স্কন্ধাবারের পরিবর্ত্তে "ফল্গুগ্রামপরিসরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার"এর উল্লেখ দেখিতে পাই। এই ফল্গুগ্রাম কোথায় ছিল তাহার সম্যক্ আলোচনা হয় নাই, তবে মনে হয় এই রাজারা পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় লওয়ার পর "সগর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্র" ইত্যাদি আড়ম্বরপূর্ণ উপাধিতে আপনাদিগকে ভূষিত করিলেও এবং বিক্রমপুর-ভাগে ভূমিদান করিলেও প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর নগরকে রাজধানীরূপে ব্যবহার করিতে সাহসী হন নাই।

এই সব কারণে বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের "বিক্রমপুর"এর অবস্থান সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দিহান হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় নদীয়া জেলায় দেবগ্রামের নিকট অপর এক বিক্রমপুরের সন্ধান পাইয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বিজয়সেন, বল্লাল-সেন প্রভৃতি এই স্থানেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের তাম্রফলকে উল্লিখিত জয়স্কন্ধাবার এই স্থান। এই মতে অভিনবত্ব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রমাণ এতই দুর্ব্বল যে আস্থাস্থাপনের অযোগ্য। পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর হইতে যে চন্দ্র ও বর্ম্ম-বংশীয় রাজগণ তাঁহাদের দানপত্র বাহির করিয়াছিলেন তাহা অবিসংবাদিত। পরে আবার দনুজমাধব দশরথকে এই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে দানপত্র বাহির করিতে দেখা যায়।* মধ্যে যে সেন-বংশীয় রাজাদিগের সহিত বিক্রমপুরের নাম এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, তাঁহারা যে একই রূপ শব্দবিন্যাস করিয়া তাঁহাদের অধিকৃত অন্য এক অপরিচিত বিক্রমপুরকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন এই অভিনব মতে কেহ সহজে আস্থাবান হইতে পারে না।

'বল্লালচরিতম্' নামে দুইখানি সংস্কৃত পদ্যগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। ইহার একখানি আনন্দভট্ট কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে বিরচিত বলিয়া উক্ত গ্রন্থেই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে বল্লালসেনের রাজধানী গৌড়, বিক্রমপুর ও স্বর্ণগ্রাম এই তিন স্থানে ছিল বলিয়া লিখিত আছে। বল্লালসেনের চর্ম্মকারকন্যাগ্রহণ, তজ্জন্য লক্ষ্মণসেন ও প্রজাবৃন্দের সহিত কলহ ইত্যাদি নানা বিষয় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বল্লালসেন ধবলেশ্বরীর তীরে বিচরণকালে নাকি এই কন্যার দর্শন পান। এই ধবলেশ্বরী বা ধলেশ্বরী রামপালের অনতিদূরে একটি প্রসিদ্ধ নদী। নদীয়া জেলার বিক্রমপুরের সহিত ইহার কোনই সংশ্রব নাই।

আর একখানি 'বল্লালচরিতম্' গ্রন্থে উহা গোপালভট্ট কর্ত্তৃক বিরচিত এবং তাঁহার বংশধর আনন্দভট্ট লিখিত পরিশিষ্ট-সংবলিত এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। আনন্দ-ভট্টের বল্লালচরিতে বল্লালের প্রকৃত বংশপরিচয় আছে। এই গ্রন্থে তাহা নাই, আছে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির গতানুগতিক ভাবে কিছু বিবরণ, নানা প্রকার তথাকথিত সঙ্করবর্ণের উৎপত্তির আজগুবি কাহিনী, সুবর্ণবণিক্ ও যোগী জাতির নির্য্যাতনের বিবরণ ইত্যাদি। পরিশিষ্টে বল্লালের চরিত্র ও তাঁহার জন্ম অতি হেয়ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এই অংশ আনন্দভট্ট কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিলেও অপর বল্লালচরিত গ্রন্থের সহিত নানা বিষয়ে অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শেষোক্ত গ্রন্থের মতে বল্লালসেনের রাজধানী ছিল গৌড়, বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রামে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পরিশিষ্টের মতে তিনি রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন সুবর্ণগ্রাম, গৌড় ও নবদ্বীপে। যে বিক্রমপুরের সহিত চর্ম্মকারকন্যার এতটা সংশ্রব তাহাকে এখানে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। উভয় বল্লালচরিতেই বল্লাল-সেনের সহিত বণিক্ বল্লভানন্দের বিরোধ ও সুবর্ণবণিক্-দিগের জাতিপাতনের উল্লেখ আছে।

* শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্ত্তৃক সংগৃহীত আদাবাড়ির তাম্রশাসন—*Inscriptions of Bengal* by N. G. Majumdar দ্রষ্টব্য।

দুইখানি বল্লালচরিতেই (একখানির মূলগ্রন্থে ও অপরখানির পরিশিষ্টে) বল্লালসেনের অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জ্জনের বিবরণ আছে, তবে বিবরণে কিছু কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। রামপালে বল্লালবাড়ির উপরে একটি গর্ত্তকে এখনও অগ্নিকুণ্ড বলা হয়। স্থানীয় প্রবাদ, বায়াদুম্ব বা বাবা আদম নামক এক মুসলমান নেতার সহিত যুদ্ধে জয়ের পর বল্লালসেনের অনবধানতাবশতঃ তাঁহার কপোত তাঁহার নিকট হইতে উড়িয়া রাজবাড়িতে ফিরিয়া যায়। পুরমহিলারা কপোত দেখিয়া রাজার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন এবং পরে বল্লালসেন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। আনন্দভট্ট-কৃত মূল বল্লালচরিতের মতে মুসলমানদিগের সহিত বল্লালের সংঘর্ষ ঘটিবার কারণ পুরোহিতদিগের মধ্যে কলহ। ঘটনাটি নাকি এইরূপ :—বল্লালের রাণী পদ্মাক্ষী মহাস্থানে মহাদেবের পূজা দিতে গিয়াছিলেন। সেখানে প্রাপ্তির ভাগ লইয়া বল্লাল-পুরোহিত বলদেব ও স্থানীয় মোহান্ত ধর্ম্মগিরির বিবাদ হয়, ফলে মোহান্ত পুরোহিতকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দেন। বল্লাল পুরোহিতের অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মগিরিকে নির্ব্বাসিত করেন। ধর্ম্মগিরি নিরস্ত হইবার লোক নহেন, তিনি গিয়া মুসলমান-নায়ক বায়াদুম্বকে সসৈন্যে বিক্রমপুরে লইয়া আসেন। বায়াদুম্বের সহিত যুদ্ধে বল্লাল জয়ী হইলেও তাঁহার পারাবত উড়িয়া আসিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করে। অন্য বল্লালচরিতের পরিশিষ্টাংশের মতেও মূল ঘটনাটি এইরূপ, তবে বায়াদুম্ব (নামটি এই গ্রন্থে বায়াদুম্ রূপে আছে) রামপালে আগত নিগৃহীত যোগী পীতাম্বরের শাপের ফলে—ধর্ম্মগিরির চক্রান্তে নহে।

এদেশে বেদব্যাসের আমল হইতে সাধারণতঃ যেভাবে ইতিহাস রচিত হইয়া আসিয়াছে বল্লালচরিত দুখানাতেও তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উপরন্তু আমরা এখানে কয়েকটি তারিখ পাইতেছি যাহার কোনটির সহিত কোনটির মিল নাই। আনন্দভট্ট-কৃত বল্লালচরিতের মতে বল্লালসেন ১০২৮ শকে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু অন্য বল্লালচরিতের মতে স্বয়ং বল্লালের আদেশে তাঁহার গৃহশিক্ষক গোপালভট্ট ১৩০০ শকে তাঁহার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন এবং আনন্দভট্ট ১৫০০ শকে তাঁহার পরিশিষ্ট যোগ করিয়া দিয়াছেন। আনন্দভট্টের নিজের বল্লালচরিত কিন্তু ১৪৩২ শকে লিখিত। ঐতিহাসিক গবেষণায় বল্লালসেনের রাজত্বের যে কাল নির্ণীত হইয়াছে তাহা ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দের বহু পরে এবং ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে।

প্রাচীন গজারী বৃক্ষ

আবার বায়াদুম্ব বা বাবা আদমের সমাধি ও তাঁহার স্মরণার্থ মসজিদ এখনও সশরীরে রামপাল হইতে কিছু দূরে বর্ত্তমান। এই মসজিদের উপর উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায়, ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে নির্ম্মিত।

নষ্টমূলা জনশ্রুতিঃ—এইরূপ একটা কথা আছে। জনশ্রুতির একটি মূল থাকিতে পারে, কিন্তু সেই মূলকে বিকৃত আকারে বিপথে লইয়া যাওয়াও জনশ্রুতির একটি কার্য্য।

প্রবলপ্রতাপশালী মহারাজ বল্লালসেন যে এই ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই তাহা সুনিশ্চিত। ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই এবং তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে মুসলমানগণ এতটা বিক্রান্ত হয় নাই যে দিবালোকে হঠাৎ রামপাল রাজধানীতে আসিয়া বঙ্গেশ্বরের সহিত সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারে। যে-দেশে রাজার সমকালে ইতিহাস রচিত হয় না সেখানে পরবর্ত্তী কালে নানা কাহিনী ও কিংবদন্তী স্তূপীকৃত হইয়া ঘটনাগুলিকে বিকৃত আকারে উপস্থিত করে। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনা অসম্ভব বলিয়া এবং কিংবদন্তী খুব প্রবল বলিয়া কোন কোন লেখক পরবর্ত্তী কালের দ্বিতীয় বল্লালসেন নামক এক রাজার উপর এই অগ্নিকাণ্ডঘটিত ব্যাপার চাপাইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু যেখানে ইতিহাস এত বিকৃত, সেখানে এরূপ কিছু ঘটিয়া থাকিলে, রাজার নামটাই যে বিকৃত হয় নাই এ-কথা কে বলিতে পারে ? বল্লালসেন বড় রাজা ছিলেন বলিয়া অনেক ক্ষুদ্র রাজার ক্ষুদ্র কার্য্য তাঁহার উপর আরোপিত হওয়া খুবই সম্ভব। লক্ষ্মণসেনের পরও পূর্ব্ববঙ্গ অনেক কাল পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। হয়ত কোন পরবর্ত্তী রাজার সময়ে রাজপুতানার সুপরিচিত জহরব্রত বিক্রমপুরে ক্ষুদ্র আকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সমসাময়িক ইতিহাস সে-সম্বন্ধে নীরব থাকায় পরবর্ত্তী কালে বল্লালসেনের উপর সমগ্র ঘটনাটি চাপাইয়া দেওয়া কিছু অসম্ভব নহে।
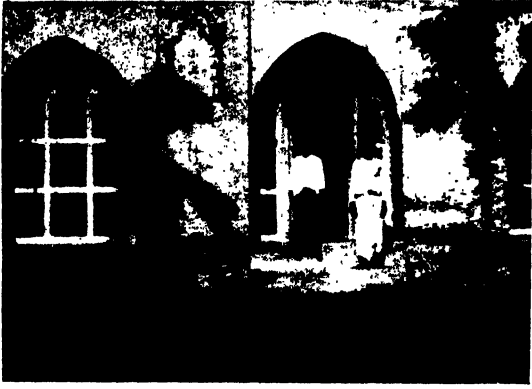
বাবা আদমের মসজিদ

যাঁহারা এই অগ্নিকুণ্ড হইতে এখনও কয়লা বাহির হইতে দেখেন তাঁহাদের সহিত আমাদের বিবাদ অনাবশ্যক। কিন্তু কপোতের পলায়ন ও তদ্দৃষ্টে পুরমহিলাগণের অগ্নি-কুণ্ডে প্রাণবিসর্জ্জন এদেশে এত অধিক স্থানে রাজাদিগের প্রাণত্যাগের কাহিনীর সহিত জড়িত যে ঐতিহাসিক এই সব কাহিনী গ্রহণ করিতে একটু অতিরিক্ত সাবধান হইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দশরথ দনুজমাধবের দানপত্র বিক্রম-পুর হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইনিই মুসলমান ঐতিহাসিকের দনৌজা বা সুজা। বিক্রমপুরে যদি মুসলমানের ভয়ে জহর-ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সম্ভবতঃ উহা তাঁহারও পরে। দনুজমাধব দিল্লীশ্বর বলবনের সমসাময়িক ছিলেন এবং বিদ্রোহী গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে মোগল-সৈন্যের পূর্ব্ববঙ্গ-অভিযানের সময়ে সম্রাটের সহায়তা করিয়াছিলেন। বাবা আদমের স্মৃতিরক্ষক মসজিদ দনুজমাধবের বহুপরবর্ত্তী।

বল্লালসেনের এক বাড়ির নিদর্শন মালদহের নিকট গৌড়ে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রাচীন নবদ্বীপেও তাঁহার নামে দীঘি আছে। উহার কোনটিই খুব জমকাল রাজধানীর চিহ্ন নহে। ইহাতে একটা সন্দেহ মনে আসে। গুপ্ত-বংশীয় সম্রাট্‌দের রাজধানী কোথায় ছিল সে-সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক আছে। পাটলিপুত্র নগরে তাঁহারা অনেক সময়ে থাকিলেও তাঁহাদের স্কন্ধাবার নানা সময়ে সাম্রাজ্যের নানা স্থানে সমাবাসিত হইত। সেন-বংশীয় রাজাদিগের 'জয়স্কন্ধাবার' সুরক্ষিত বিক্রমপুরে হইলেও মনে হয় যেন তাঁহারা অনেক সময়ই রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বসতি করিতেন। ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী গৌড় ও নবদ্বীপ দুই স্থানেই যে আড্ডা বসিত তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। ব্রহ্মপুত্র-সুরক্ষিত স্বর্ণগ্রামেও বসিবার কথা। নবদ্বীপেইত বৃদ্ধবয়সে লক্ষ্মণসেন একটি বীভৎস কাণ্ড ঘটাইলেন! নানা স্থানে বাসের জন্যই বোধ হয় কোন বিশেষ রাজধানী ততটা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল না। 'বিক্রমপুর' রাজধানীকে হয়ত প্রাধান্য দেওয়া হইত, তাই রাজাদিগের অন্যত্র অবস্থানের সময়ে অন্য স্থানে ভূমিদান স্থির হইয়া গেলেও তাহার রাজকীয় সম্পাদন হইত বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র, অন্য কারণও থাকিতে পারে।

পশ্চিমযাত্রিকী

শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ

(৬)

ভিয়েনায় আমরা মোট পাঁচ দিন ছিলুম। এখানকার যা দেখবার সবই দেখেছি। অষ্ট্রিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজাদের রাজ-প্রাসাদ শোনব্রুন বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। রাজপ্রাসাদের বাগান অনেকটা ভার্সাইয়ের বাগানের মত। কিন্তু অত সুন্দর নয়। ষ্টেট-কোচ বা রাজার বেড়াবার গাড়ীতে ষোলটি

শোনব্রুন প্রাসাদ—ভিয়েনা

ঘোড় জোতা আছে। ঘোড়াগুলি সমস্তই কাঠের তৈরি ও এদের চলবার ভঙ্গী ও গড়ন অতি সুন্দর। ঘোড়ার রং সাদা, সঙ্গে লাল ভেলভেটের জিন ও পিতলের গহনা। গাড়ীখানি একেবারে সেকেলে ধরণের, ব্রুহ'মের মত। এগুলি এবং অষ্ট্রিয়ার শেষ রাজারাণীর পোষাক-পরিচ্ছদ একটি বড় হল-ঘরে সাজানো আছে। লোকে দেখে যায়। এ-সব বাড়ীতে রাজার শোবার ঘর, লাইব্রেরী, খাবার ঘর, বসবার ঘর, ছবি ইত্যাদি সমস্তই আছে। সমস্তই দেখ্‌বার মত।

ভিয়েনায় থাকৃতে আমরা এখানে-ওখানে যেতে হ'লে ট্রামে ক'রেই যেতুম। অনেক জায়গায় ট্রাম দেখেছি, কিন্তু কলকাতা শহরের মত ভাল ট্রাম কোন জায়গায় নেই। এক-বার এ রকম ট্রামে ক'রে যাবার সময় এক জন লোক জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ি কি সুদানে? আমরা তাকে বল্লুম, আমরা সুদানদেশীয় নই, আমরা ভারতবাসী। মনে মনে ভাবছিলুম আমরা যতই কালো হই না কেন, এমন কালো নই যে আমাদের গায়ের চামড়া আফ্রিকার সুদানদেশীয় লোকের গায়ের চামড়'র সঙ্গে মিল আছে মনে করা যেতে পারে।

আমাদের হোটেলের ঘর ছয় তলার উপরে ছিল। নামাউঠা লিফ্‌টে করতুম। ঘরের জানালা দিয়ে ডানিয়ুব ক্যানাল দেখা যেত। ক্যানালের ধারে ছোট্ট একটুখানি পার্ক মত ছিল। বেলা বারোটা বাজলেই এই ডানিয়ুব খালের ধারে ও পার্কের ঘাসের উপর ছেলেবুড়া সকলকেই প্রায় নগ্নাবস্থায়

রৌদ্রস্নান করতে দেখেছি। আমাদের চোখে এ জিনিষটা বিসদৃশ ঠেক্‌তে পারে, কিন্তু ওদের দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে কেউ লজ্জাসরমের ধার ধারে না। বাড়ির কাছেই এক কেকওয়ালার দোকান ছিল। এর দোকান থেকে কেক ও রাস্তার অপর মোড়ের এক ফলওয়ালীর দোকান থেকে ভাল পিচ প্রায়ই কিনতুম। এক দিন রাস্তায় বেরিয়ে আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলি। পথে এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করলুম—কোন্ ট্রাম ধরলে আমাদের হোটেলের রাস্তায় পৌঁছতে পারব? সে লোকটি আমাদের বিদেশী লোক দেখে বললে—তোমরা বুঝি নতুন এসেছ, এখানকার কিছু জান না। ট্রামে না গিয়ে তোমরা আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেল দিয়ে যাও, খুব চট্ ক'রে পৌঁছতে পারবে। আমরা বায়না ধ'রে বসলুম,

ষ্টিফান গীর্জ্জা—ভিয়েনা

কোথায় আবার মাটির নীচে ষ্টেশন খুঁজতে যাব, তুমি এসে দেখিয়ে দাও। সে লোকটি আমাদের নিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলে চড়িয়ে নিয়ে চল্‌ল। শুনলুম তার এই ট্রেনের মাসিক টিকিটের বন্দোবস্ত আছে। ট্রেন যখন থামল, উপরে উঠে দেখি আমাদের হোটেলের সামনে ড্যানিয়ুব ক্যানালের পাশের পার্কের উপরে এসে পড়েছি। বাড়ির এত কাছে মাটির নীচে দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে, আমাদের জানা না থাকায় কতটা ঘুরতে হ'ত। সে লোকটি আমাদের বিদেশী লোক দেখে এই সাহায্য ক'রে যা উপকার করলে তা বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য।

বেলভিডিয়র প্রাসাদ—ভিয়েনা

ভিয়েনা ছাড়বার দিন দুই আগে মিস্ ফ্রয়েড ভিস্‌বাডেন থেকে এসে পড়লেন ও আমাদের দু-জনকে দুপুরে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি আমাদের টেলিফোন ক'রে জানালেন যে তিনি নিজে গাড়ী ক'রে আমাদের খাওয়াতে নিয়ে যাবেন। আমরা নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধু ডাক্তার রুথ ক্রন্‌সভিকের বাড়িতে উঠলুম। মিস্ অ্যানা ফ্রয়েড জানালেন যে তাঁর নিজের বাড়িতে তেমন সুবিধা না থাকাতে তিনি তাঁর বন্ধুর বাড়িতেই খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। বন্ধু ডাক্তার রুথ ক্রন্‌সভিকও মনস্তত্ত্ববিৎ, অধ্যাপক ফ্রয়েডের শিষ্যা। ইনি ডাক্তারী করেন। এঁর স্বামী সঙ্গীত-শিক্ষক। সমস্ত ক্ষণ পিয়ানোয় টুংটাং করেন। এঁদের একটি ছোট ফুটফুটে মেয়ে আছে। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে মিস্ ফ্রয়েড ও ডাক্তার রুথ ক্রন্‌সভিক দু-জনে আমাকে নিয়ে গল্প করতে বসলেন। পাঁচ রকম গল্পের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, ভারতবর্ষীয় মেয়েদের শাড়ী। এই শাড়ী-পরা ওঁদের বড়ই ভাল লেগেছিল। আমার পরনে একখানি কাবেরী নীল জরী জরিপাড় শাড়ী ছিল, তাই দেখেই দু-জনের এত পছন্দ। মিস্ ফ্রয়েড জানতে চাইলেন, "এ রকম পোষাক দর্জ্জিতে তৈরি ক'রে দেয়? কিন্তু তার পর কি ক'রে প'র? মাথা দিয়ে গলাও, না পা ঢুকিয়ে প'র? তাঁকে বললুম যে শাড়ী আমাদের দর্জ্জিকে পরবার মত তৈরি করতে হয় না।

আমরা নিজেরাই এ রকম ক'রে পরি। তার উত্তরে রুথ ক্রনসভিক জিজ্ঞাসা করলেন, এ সব শাড়ী কতখানি ক'রে লম্বা হয়? একটি শাড়ী বারো হাত অর্থাৎ ৬ গজ লম্বা হয় শুনে বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এত বড় কাপড়ের
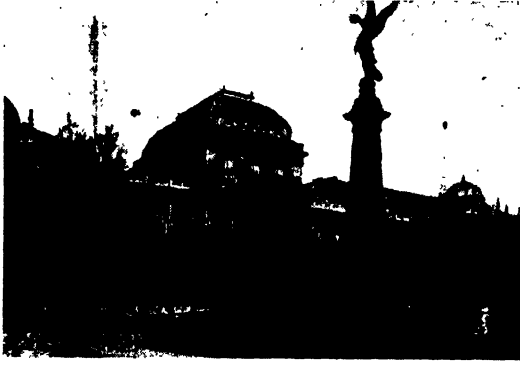
বিশ্ববিদ্যালয়—ভিয়েনা

টুকরাটা দর্জ্জির সাহায্য না নিয়ে সামলাও কি ক'রে?" মিস্ ফয়েড জানতে চাইলেন, "তোমরা কি সর্ব্বদাই এ রকম পোষাক প'র?" তাঁদের জানালুম, এটা আমাদের পোষাকী কাপড়, বাড়িতে আমরা অন্য ধরণে আরও সাদামাটা কাপড় প'রে থাকি। এবারে দু-জনে মিলে ধ'রে বসলেন যে তাঁদের এই দু-রকম ধরণের শাড়ী পরার কায়দাটা বড়ই দেখবার ইচ্ছা হয়েছে। অবশ্য আমি যদি কিছু মনে না ক'রে কি ক'রে কাপড় পরতে হয় একবার দেখাই তা'হলে তাঁরা বড় খুশী হন। আমি রাজী হ'তে দুই বন্ধু তৎক্ষণাৎ ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে, শাড়ীকে খুলে আবার পরা দেখ্‌তে সুরু ক'রে দিলেন। আমি আমাদের দু-রকম শাড়ী পরার ধরণ দেখালুম। দেখে দু-জনে বড়ই খুশী, এর জন্য আমাকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন। কিছুক্ষণ পরে মিস্ ফ্রয়েড তাঁর কি কাজের জন্য খানিক ক্ষণের জন্য কোথায় গেলেন। রুথ ক্রনসভিকের স্বামীও পিয়ানোয় সঙ্গীত-সাধনায় বসলেন। এ সময়টা ডাক্তার রুথ ক্রনসভিক তাঁর নিজের মোটরে ক'রে আমাদের ভিয়েনা শহরের বাইরেটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনলেন। মিস্ ফ্রয়েড ফিরে এলেন। আমরা ক্রনসভিক-দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিলুম। মিস্ ফ্রয়েড আবার আমাদের হোটেল পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

লণ্ডনে লোকে যেমন অনেক সময় বিশেষ বিশেষ কাজে থুথু ব্যবহার করে ভিয়েনাতেও সে-রকম কিছু নজরে পড়েছিল। আমাদের হোটেলের সেই সেক্রেটরী মেয়েটিকে খামে টিকিট আঁটবার সময় থুথু লাগাতে দেখেছিলুম। একবার কিছু ছবির বই ভারতবর্ষে আমার বাবার নামে পাঠাতে চেয়েছিলুম। বইয়ের প্যাকেটটি নিয়ে টিকিট কেনবার জন্য

ফ্লোরেন্স গীর্জ্জা
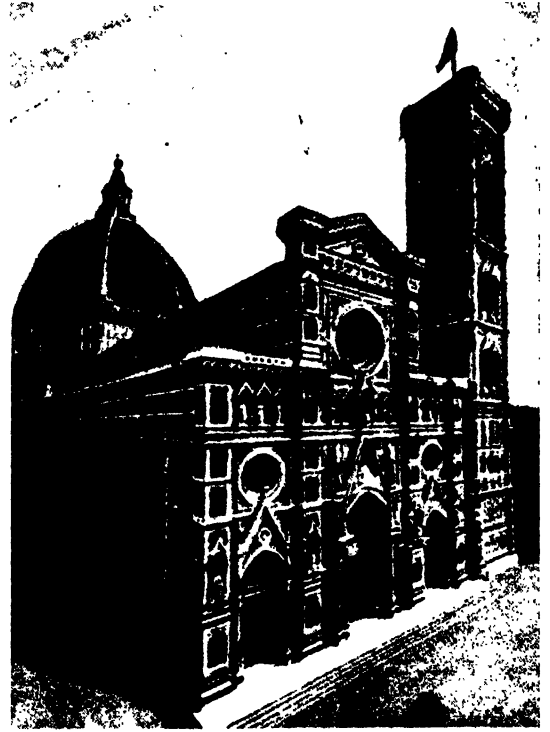
সেক্রেটরীর কাছে গেলুম, শুনলুম যে-ডাকটিকিট দরকার তা ফুরিয়ে গেছে, সুতরাং কমদামী আটখানি টিকিট আমাকে বইয়ের প্যাকেটের উপর লাগাতে হবে। আমি তাতেই রাজী হওয়াতে সে আটখানি টিকিট বের করলে, তার পর চটপট থুথুর দ্বারা ভিজিয়ে প্যাকেটের উপর আঁটতে সুরু ক'রে দিলে। আমি প্রথমটা চুপ করেই ছিলুম, কিন্তু শেষে পাঁচখানি টিকিট মারবার পর যখন দেখলুম আর থুথুতে কুলচ্ছে না এবং এর জন্য অনেক ক্ষণ জিব বের ক'রে তাতে

ফ্লোরেন্স—আরনো নদীর সেতু

ডাক্তারের রোগী দেখবার জায়গায় একটু জলের বন্দোবস্ত থাকে না, এটা একটু আশ্চর্য্যের কথা। সাধারণ লোকে যে জলের কৃপণতা করবে সে আর বিচিত্র কি?

ভিয়েনা পরিত্যাগ করবার আগে অধ্যাপক ফ্রয়েডের কাছে দেখা করবার জন্য গেলুম। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে আমরা বিদায় নিয়ে এলুম। আমরা বিদেশী লোক, ভিয়েনার কিছু জানা ছিল না। প্রফেসর সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড, মিস্ অ্যানা ফ্রয়েড, ডাক্তার ক্রনসভিক প্রভৃতি এঁরা সকলে আমাদের যা আদর-যত্ন করেছিলেন, তা চিরদিন মনে গাঁথা থাকবে। এঁদের সাহায্য না পেলে আমাদের এতটা সুখ সুবিধা হ'ত না।

এ সময় ভিয়েনায় বেশ গরম ছিল। গরম জামা পরবার দরকার হ'ত না। আমি রাস্তায় বেরবার সময় কিন্তু ওভারকোটটা প'রে নিতুম। তা না হ'লে শুধু শাড়ীপরা দেখলে লোকে বড্ড ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে ও একটু থামলেই সেখানে রীতিমত ভিড় জমে যায়। কোট ঢাকা থাকলে অনেকটা সুবিধা। শুনলুম শীতের সময় ভিয়েনা বেশ ঠাণ্ডা।

টিকিট ভেজাবার চেষ্টা চলছে, তখন থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলুম, তোমরা টিকিট মারবার জন্য একটি বাটি ক'রে জল রাখ না কেন? সে বোধ হয় এ রকম প্রশ্ন জীবনে এই প্রথম শুনলে। একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, চাকরে জল রাখতে ভুলে গেছে। তাকে বললুম, চাকরকে বল এক্ষুনি জল এনে দিক। আর কখনও ও-রকম ক'রো না। ও বড় বদ অভ্যেস। এ কথা বলবার পর যে কয়দিন ভিয়েনায় এই হোটেলে ছিলুম, দেখতুম টেবিলের উপর একটি ছোট পাত্রে জল থাকত।

আমার একটু দাঁতের কষ্ট থাকায় এক দিন ডাক্তার ফেলিক্স ডয়সের কাছে দাঁত দেখাই এবং তার জন্য আমাকে আঙুল দিয়ে দাঁতের মাড়ি খানিক ক্ষণ চেপে থাকতে হয়েছিল। দাঁত পরীক্ষা হয়ে গেলে আমার হাত ধোবার ইচ্ছা তাঁকে জানালুম। তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্য্যন্ত চোখ বুলিয়ে দেখে বললেন, 'জল ত এখানে নেই, জলের বড় মুস্কিল, আমি আপনার অন্য উপায়ে হাত পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছি। এই ব'লে তিনি তুলোতে একটু স্পিরিট নিয়ে হাতের আঙুল মুছিয়ে দিলেন। এক জন বড়

রিয়াল্টো সেতু—ভেনিস

১১ই সেপ্টেম্বর। সকালবেলা আমরা ভিয়েনা পরিত্যাগ ক'রে ইটালীর উদ্দেশে যাত্রা করলুম। ট্রেন সমস্ত ক্ষণ অষ্ট্রিয়ার আল্পস্-এর ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। ট্রেন মাঝে মাঝে টানেলের ভেতর দিয়েও চলছে। সব টানেলের ভেতর কিন্তু অন্ধকার নয়। দু-চারটি টানেলের দেওয়ালের পাথর কেটে খিলেন ও থামের মতন ক'রে দেওয়া হয়েছে। মনে হয় ট্রেন যেন থামওয়ালা দালানের মধ্যে দিয়ে চলছে। পাশেই বালির নদী। জল বিশেষ নেই। যেটুকু আছে, তার রং নীল। পাহাড়ের চূড়াগুলি দেখলে মনে হয় যেন বরফ পড়েছে। আসলে তা নয়। চূড়াগুলিতে বরফ নেই, শুধু পাথর ও বালি। তার উপর সূর্য্যের আলো পড়ে ওরকম দেখতে হয়।

ডজের প্রাসাদ ভেনিস

ট্রেনে এক জন জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি ইংরেজী জানেন। মহাত্মা গান্ধী তখন জেলে ছিলেন। ইনি সেই কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, ও বললেন,—এ রকম ভাবে আটকে রাখা ভারি অন্যায়; আমরা ইংরেজদের পছন্দ করি না, ওরা বড় ঠকায়।
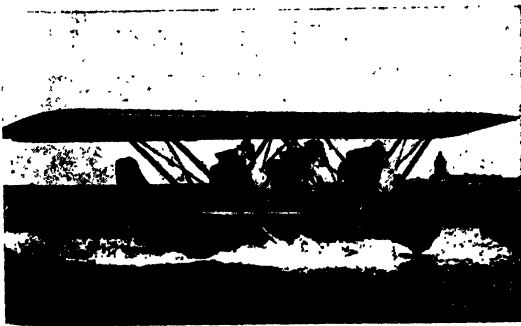
পোর্টোরসে-ট্রিয়েষ্টগামী এয়ারোপ্লেন

আর এক জনের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি ইটালীয়ান, গ্রীক ট্রিয়েষ্টে যাচ্ছিলেন। ইংরেজী খুব সামান্যই জানেন। আমরা ভেনিস গিয়ে পোর্টোরসো যাব শুনে তিনি বল্লেন,—তোমরা অত ঘুরতে যাবে কেন? তার চাইতে আজ ট্রিয়েষ্টে নেমে ষ্টেশনের কাছে যে হোটেল আছে সেখানে থাক ও পরদিন সকালবেলা ফেরী ষ্টীমার ক'রে দু-ঘণ্টার জন্য আড্রিয়াটিক সমুদ্র পার হ'য়ে পোর্টোরসো যেও। আমরা এই ব্যবস্থাই সুবিধামত হবে জেনে এতে রাজী হয়ে ট্রিয়েষ্টে নামলুম। ট্রিয়েষ্ট আড্রিয়াটিক সমুদ্রের ধারেই। সমুদ্রে মোটে ঢেউ নেই, জল লেকের মত স্থির। জলের রং ঘোর নীল। তখন চাঁদের আলোতে ট্রিয়েষ্ট বন্দর অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। ইটালীয়ান লয়েড ট্রিস্টিনো কোম্পানীর বড় বড় জাহাজগুলি সব বেশীর ভাগই এখান থেকে ছাড়ে। আমরা একটি হোটেলে উঠলুম। হোটেলের কর্ত্রী একটি শোবার ঘর ঠিক ক'রে দিলে। তখন ডিনার শেষ হয়ে গেছে। আমরা চা, রুটি মাখন ও জ্যাম দিয়ে রাত্রের খাওয়া শেষ করলুম। সকালে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে হোটেলওয়ালীর সঙ্গে গল্প করতে বসলুম। তখনও জাহাজ-ঘাটে যাবার অনেক দেরি ছিল। নানা কথার পর আবার সেই গান্ধীর কথাই উঠল এবং হোটেলওয়ালী শেষে প্রশ্ন ক'রে বসল,—গান্ধী তোমাদের স্বদেশজাত জিনিষ ব্যবহার করতে বলেন ও বিদেশী জিনিষ কিনতে বারণ করেন এতে আর এমন কি দোষ হয়েছে যে সেজন্য তাঁকে ও তাঁর ভক্তদের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আটক করেছেন? একাজ ত ভাল কাজ, নিজের দেশের উন্নতি ত সবাই চায়। তোমাদের গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিটা কি এতে? তাঁকে আমরা বললুম,—বিলাতের এক পাউণ্ড অর্থাৎ কুড়ি
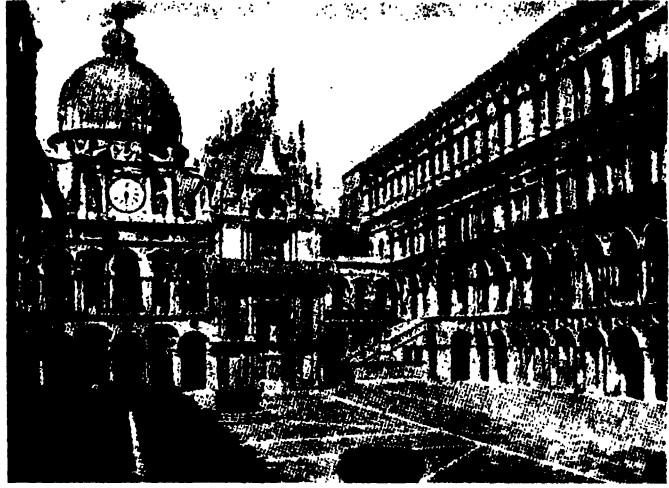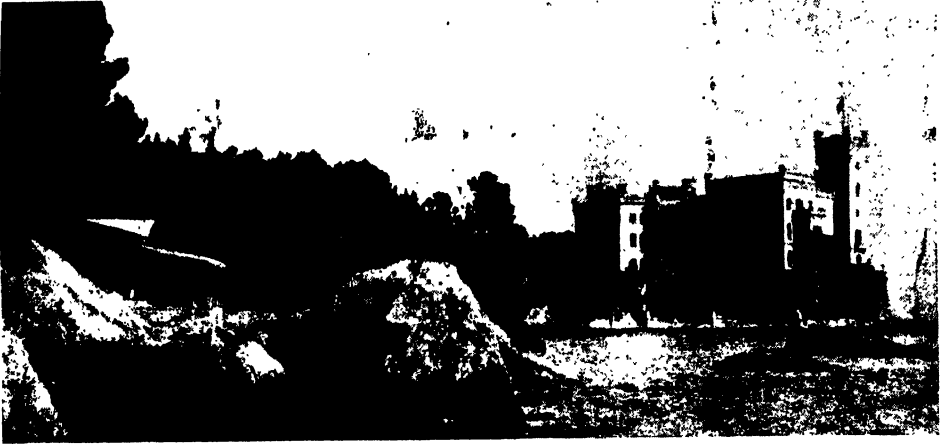
ট্রিয়েষ্ট

শিলিঙের ভেতর পাঁচ শিলিং এই ভারতবর্ষ থেকেই আয় হয়। আমরা যদি বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করি, তা'হলে এই পাঁচ শিলিং লোকসান হয়। কাজেই গবর্ণমেণ্টকে এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁদের নিজের সুবিধা দেখবেন বইকি। একথা শুনে হোটেলওয়ালী বল্‌লে,—বুঝেছি। মহাত্মা গান্ধী আমাদের দেশের লোক নন্ তবু আমরা তাঁকে নিয়ত মনে মনে পূজা করি।

খানিক ক্ষণ পরে জাহাজঘাটে যাবার জন্য হোটেলের বাস এসে পড়ল। আমরা লাগেজ-সমেত তাইতে উঠলুম। জাহাজ ছাড়বার আগে এক লীরা দিয়ে কিছু চিনেবাদামভাজা কিনে নিলুম। এক জন লোক জাহাজ-ঘাটে তা বিক্রী করছিল। জাহাজ ছাড়বার পর জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমরা চললুম। শুনলুম ক্যাপ্টেন অনেক দিন ধ'রে নানা রকম জাহাজে চাকরি ক'রে অবশেষে এই ট্রিয়েষ্ট-পোর্টোরসোর ফেরী ষ্টীমারে কাজ নিয়েছে। ট্রিয়েষ্ট থেকে পোর্টোরসো এয়ারোপ্লেনেও যাওয়া যায়; দু-ঘণ্টার জায়গায় পাঁচ মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায়। আমরা জাহাজে থাকতে থাকতে দু-তিনখানি এয়ারোপ্লেন যাতায়াত করলে। পোর্টোরসো পৌঁছে, হেঁটেই হোটেলে উঠলুম। এ জায়গাটি সমুদ্রের ধারেই, আশপাশে পাহাড় ও ছোট-বড় দ্বীপ। আমাদের হোটেলটির নাম পেন্‌সন হেলিও, একেবারে সমুদ্রের ধারেই। হোটেলওয়ালা তখন বাড়ি ছিল না। আমরা হোটেলে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে হোটেলের বাগানে এলুম। এখানে এসে দেখি সমুদ্রের ধারে বালির চড়ায় চেয়ার পেতে ও বালির উপর শুয়ে প'ড়ে লোকে সান্-বাথ্ করছে। পুরুষ অপেক্ষা মেয়ের ভিড় বেশী। সকলেরই পরনে গলা-কাটা হাতবিহীন স্নানের পোষাক, প্রায় অর্দ্ধনগ্ন বল্‌লেও চলে। একটি মেয়ে আমাদের কাছে উঠে এল। এ জার্ম্মান, কোন রকমে ভাঙা ইংরেজীতে জানালে ম্যানেজার কি কাজে ট্রিয়েষ্টে গেছে, বিকেলবেলা আসবে। সে নিজে আমাদের সাহায্য করতে পারে। তাকে জানালুম আমাদের একটি ভাল ঘরের দরকার কিছুদিন থাকতে চাই। সে আমাদের দোতালায় নিয়ে গিয়ে একটি ঘর ঠিক ক'রে দিলে। ছোটখাট ঘর সমুদ্রের ধারেই। হোটেলটিতে শুনলুম একটি মাত্র পায়খানা, তা সকলকেই ব্যবহার করতে হয়। বাথরুম ব'লে কিছুর ব্যবস্থা নেই। লোকে এখানে এসে সমুদ্রস্নানই করে। কাজেই বাড়িতে স্নানের ঘরের কোনও পাট নেই। পায়খানায় গিয়ে দেখি চেন-টানা জলের বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু অনেক বার টানবার পরও জল এল না; উল্টে অনেক কালের পচা ময়লা উপরে ভেসে উঠল! এতগুলি লোক কি ক'রে এখানে বসবাস করছে বুঝতে পারলুম না। তখন শরীর বড়ই ক্লান্ত, খিদেও পেয়েছে খুব, কাজেই সে-সব দেখা সত্ত্বেও নীচে নেমে এলুম খাবার জন্য। এখানে কেউ ইংরেজী জানে না। যে ঝি পরিবেশন করতে এল, তাকে বোঝাতেই পারি না কি খাব;
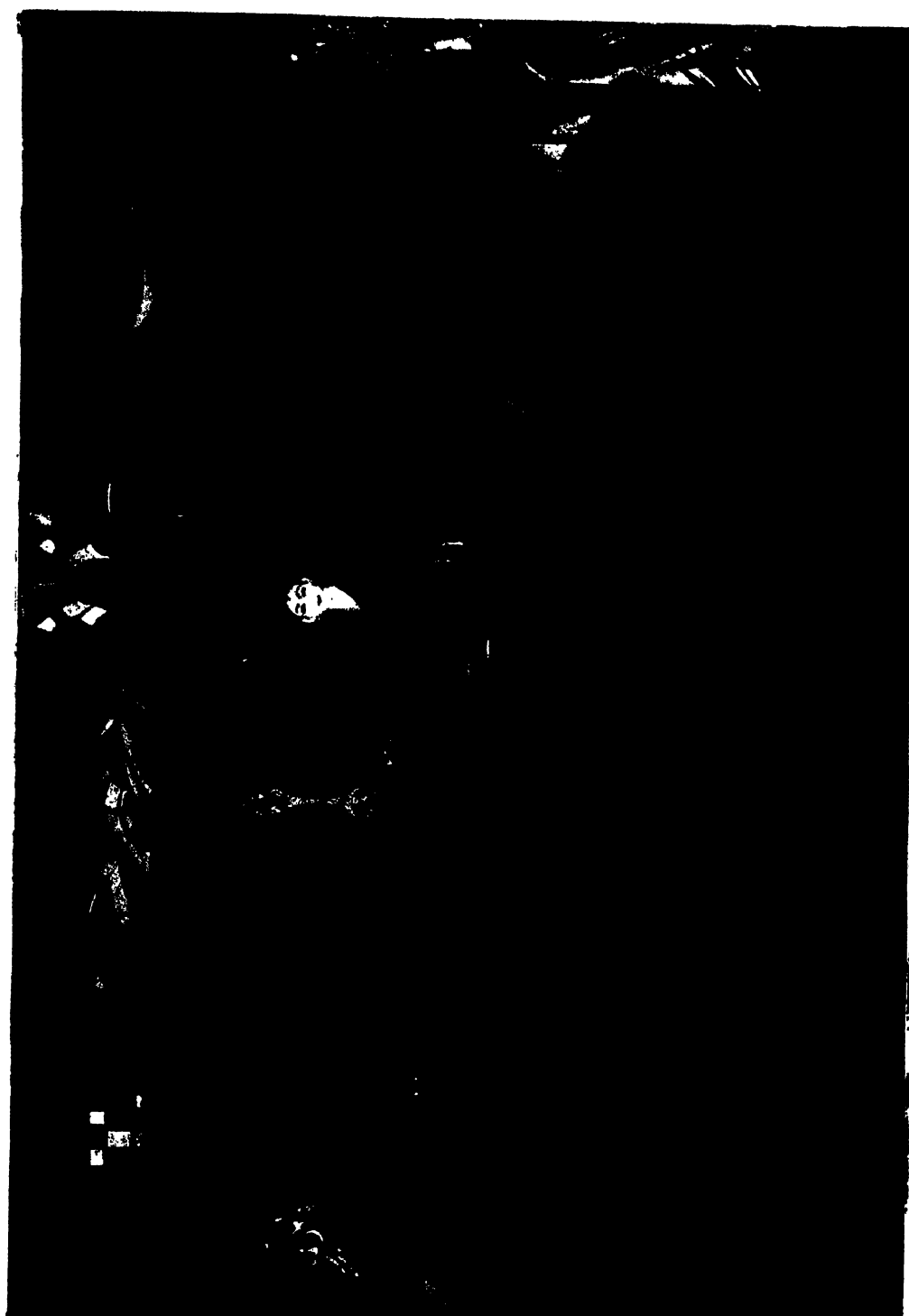
অনেক কষ্টে সেই জার্ম্মান মেয়েটির সাহায্যে বোঝালুম যে আমরা গরু-বাছুর খাই না, আমাদের একটু আলু ভেজে ও ডিম সিদ্ধ ক'রে দাও। সারাদিন ত গেল। রাত্রে প্রবল মশার উৎপাত, ঝাঁকে ঝাঁকে কানের কাছে এসে গান জুড়ে দিলে। রাত্রে মশা মারতে মারতে প্রতিজ্ঞা করলুম যে সকাল হ'লেই এখানে থেকে পালাব। জলের কষ্ট ও ঘুমের কষ্ট একসঙ্গে সহ্য করা অসম্ভব।

সকালে আমরা অন্য হোটেলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। দু-একটি দেখ্‌বার পর প্যালেস হোটেলটি সুবিধার মনে হওয়াতে এর ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে রাখলুম। শুনলুম রাত্রে মশার উৎপাতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এক রকম সূক্ষ্ম তারের জালের বন্দোবস্ত আছে। রাত্রে শোবার ঘরের জানালা খুলে রেখে এই জালের পর্দ্দা নামিয়ে দিলে মশা আটকায় কিন্তু হাওয়া বন্ধ হয় না। এখান থেকে ফিরে এসে ম্যানেজারকে বললুম যে আমরা কাছেই প্যালেস হোটেলে উঠে যেতে চাই। এখানে জলের বড় কষ্ট হচ্ছে। ম্যানেজার ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠল,—সে কি, তোমরা গরু খাও না ব'লে আমি অনেক কষ্টে মুরগীর যোগাড় করেছি। তার জন্য আমার বেশী দাম লেগেছে। যাবার আগে মুরগীর দামটা আমায় দিয়ে যেতে হবে। মুরগীর দাম দিয়ে দেবার পর ম্যানেজার খুশী হয়ে গোটাকয়েক খুব বড় বড় পিচ আমাকে দিয়ে দিলে আর বললে,—এগুলি খেয়ে দেখ, প্যালেস হোটেলে এ-রকম পিচ খেতে দেয় না, এখানে একমাত্র আমিই এরকম দিতে পারি।

প্যালেস হোটেলে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। এখানে মশার উৎপাত নেই, জলের কলে সব সময় জল পাওয়া যায়। পায়খানার বন্দোবস্তও বেশ ভাল। পোর্টোরসোতে লাল, কালো ও সাদা আঙুর পাওয়া যায়; পিচও খুব সস্তা। রাস্তায় রাস্তায় রকমারি কষ্টিউম ও সমুদ্রস্নানের উপযোগী অন্যান্য জিনিষের দোকান। ফটোগ্রাফেরও দোকান আছে। এয়ারোপ্লেনের আড়তও আছে। এখান থেকে রোজ এয়ারোপ্লেন ট্রিয়েষ্টে যাতায়াত করে। আমরা ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রোজ এয়ারোপ্লেনের ট্রিয়েষ্ট-যাত্রা দেখতুম। এয়ারোপ্লেন প্রথমটা ঢালু জায়গা দিয়ে চ'লে আড্রিয়াটিক সমুদ্রের উপর নামত, তার পর জলের উপর কয়েক মুহূর্ত্ত ফোয়ারার মত জল ছিটতে ছিটতে চ'লে ক্রমশঃ আকাশে উড়ত সমুদ্রের ধারে লোকে সারাদিন ধরে শুয়ে রোদে ভাজা-ভাজা হয় ও স্নান করে। আমরা এখানকার ট্রামে চ'ড়ে একদিন আরও কিছু দূর গিয়েছিলুম। এ জায়গার নাম পিরানো। অনেক কালের পুরাতন পল্লী। আমাদের সঙ্গে সেই জার্ম্মান মেয়েটি বেড়াতে এসেছিল। তার কাছে শুনলুম এটা আগে জলদস্যুদের আস্তানা ছিল। এখন মৎস্যজীবীদের আড্ডা হয়েছে। সমুদ্রের ধারে বালির চড়াতে অনেক মাছধরা নৌকা ও জেলেদের বড় বড় মাছের জাল শুকতেও দেখতে পেলুম। সমস্ত জায়গাটিতে একটা তীব্র আঁসটে গন্ধ বার হচ্ছিল। একটি ছোটখাট পাহাড়ের উপর অনেক কাল আগেকার তৈরি একটি দুর্গ আছে। এখান থেকে সমুদ্রের দৃশ্য অতি সুন্দর। চারি দিকে আড্রিয়াটিকের নীল স্থির জল। তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল। চারি দিকে ছোটবড় পাহাড়ওয়ালা দ্বীপ, আঙুরের গাছে ভরা। আঙুরের গাছগুলি জলের ধার পর্য্যন্ত নেমে এসেছে।

ইটালীর পুলিস্ একটি দেখবার বস্তু। এরা সব সময় জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায়। এদের সাজের পারিপাট্য খুব। জমকাল কালো রঙের পোষাক, তাতে সোনালী রূপালী বোতাম আঁটা। মাথার বাঁকা টুপিতে নানা রঙের পালক গোঁজা। সব সময় ঠোঁটে মৃদু মৃদু বাঁকা হাসি, চোখের চাহনিও চোরা চোরা। চলন একটু "গদাই লস্করী"-গোছের। মোট কথা, এদের চেহারা ও ধরণ দেখ্‌লে পুলিস ব'লে মানতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় কাচের আলমারীতে রাখলেই ভাল দেখাবে। হোটেলের সামনে রাস্তা, এর অপর পারে হোটেলেরই বাগান, বাগানে সুন্দর পাথরের রেলিং দিয়ে বাঁধানো ঘাট। আমরা রোজ বিকালে এই ঘাটে গিয়ে সমুদ্রস্নান করতুম। পোর্টোরসোতে থাকবার সময় এক জন ফরাসী বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। ইনি কষ্টেস্ষ্টে ইংরেজী বলতে পারতেন। আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করতেন। তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু বলতে হ'লে আমাদের কাছে My woman ব'লে স্ত্রীকে উল্লেখ করতে শুনেছি।

আমরা পোর্টোরসোতে মোট ন-দিন ছিলুম। তার পর

ট্রিয়েষ্টে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে ভেনিস চলে যাই। বিশেষকুশে সেপ্টেম্বর আন্দাজ ট্রিয়েষ্ট থেকে দুপুরের গাড়ীতে রওনা হয়ে সন্ধ্যাবেলা ইটালীর ভেনিস শহরে পৌছলুম।

ভেনিস শহরও আড্রিয়াটিকের তীরে। ইটালীর লোকেরা ভেনিসকে ভেনিজিয়া বলে। ভেনিস শহরের রাস্তার জায়গায় সমস্ত জল। আড্রিয়াটিক সমুদ্র থেকে খাল কাটা আছে। এটি একটি নদীর মত, এর নাম গ্র্যাণ্ড ক্যানাল। গ্র্যাণ্ড ক্যানাল থেকে ছোট বড় মাঝারি সরু, চওড়া প্রভৃতি অনেক খাল চারি দিকে চলে গেছে। বড় রাস্তা থেকে যেমন অনেক গলি-ঘুঁজির ভেতর যাওয়া যায়, এও তেমনি। এ-সব জলের রং নীল। দেখতে বেশ সুন্দর। কিন্তু ইটালীয়ানরা বড় নোংরা। যত কিছু আবর্জ্জনা—ঘর ঝাঁট দেওয়া ধুলা, ছেঁড়া কাগজ ও ন্যাকড়া, ন্যাতা-নিংড়ান জল, থুথু, তরিতরকারীর খোসা—সমস্তই এই জলের উপর, দু-ধারের বাড়ির জানালা থেকে ঝুপঝাপ ক'রে পড়ছে। দু-পাশের বাড়িগুলিতেও কোন রকম সৌখীনতা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নজরে পড়ে না। বাড়ির বারান্দায় হয়ত ফুলের গাছ লতিয়ে উঠেছে, কিন্তু তার পাশেই মরচে-ধরা টিন, ভাঙা ঝুড়ি, ছেঁড়া ন্যাকড়া, জামা কাপড় ইত্যাদি ঝুলছে। জলের মধ্যে নেংটি ইঁদুরও সাঁতরে পার হয়। আমাদের দেশের মতই রাস্তায় ছেলে বুড়ো সকলেই প্রস্রাব ত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। রাস্তায় ছেলেদের লুকোচুরি খেলা, মারপিঠ, লাট্টু ঘোরান সবই হয়। এ সব অন্য দেশে নজরে পড়ে নি। আমাদের দেশে যেমন বড় রাস্তায় ট্রাম ও বাস, এবং ছোট রাস্তায় ট্যাক্সি কিংবা ঘোড়ার গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা, এখানেও তেমনি গ্র্যাণ্ড ক্যানালের উপর ষ্টীমার ও মোটর-বোট সার্ভিস আছে। এর জন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক টিকিটের বন্দোবস্ত আছে। ছোট খালগুলিতে "গোণ্ডোলা" নামধারী ময়ূরপঙ্খী নৌকার ব্যবস্থা। এই নৌকাগুলি আড্ডায় ছ্যাকরা গাড়ী বা রিক্‌শ'র মত জলের এক জায়গায় জমায়েৎ হয়ে থাকে। জলের দু-ধারে বাঁধান রাস্তার উপর লোককে হেঁটে চলতে দেখলেই নৌকার মাঝি বা চালক "গণ্ডোলা গণ্ডোলা" ক'রে চেঁচিয়ে লোককে চড়বার জন্য অনুরোধ করে। লোকে এবাড়ি ওবাড়ি কিংবা রাস্তার অপর ফুটপাতে যাবার দরকার হ'লে ওভারব্রিজের উপর দিয়ে যায়। ওভারব্রিজ অনেকগুলি আছে। এর ভেতর রিয়াল্টো নামধারী ব্রিজটিই সর্ব্বপ্রধান, কবি শেক্সপীয়ারের 'মার্চ্চেণ্ট অব ভেনিসে' এই রিয়ালটো ব্রিজের উল্লেখ আছে। রাস্তার দু-পাশে বাঁধানো রাস্তা বা ফুটপাথ যা আছে, তার উপর দিয়ে যাতায়াত করলে গন্তব্য স্থানে পৌছতে অনেক সময় লাগে, লোকে সেজন্য জলপথই ব্যবহার ক'রে থাকে। এখানকার সবচেয়ে বড় চৌরাস্তার নাম "পিয়াজা সানমার্কো"। স্কোয়ারকে ইটালীয়ান ভাষায় পিয়াজা বলে। বড় বড় দোকান, ডজের প্যালেস, লয়েড ট্রিসটিনো কোম্পানীর আফিস ইত্যাদি, সমস্তই এই সান-মার্কোতে অবস্থিত। সঙ্গীতবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, শিল্পকলা ইত্যাদিতে ইটালী প্রসিদ্ধ। সানমার্কোতে বড় বড় দোকানের সামনের ফুটপাথের উপর রাস্তার পথিক ও দর্শকদের মনোরঞ্জন করবার জন্য কনসার্ট পার্টি বসে। এই গান-বাজনার জন্য প্রত্যেক দোকানের নিজস্ব স্বতন্ত্র বাদক-দল আছে। দোকানের সামনে চেয়ার-টেবিল পেতে চা, সোডা, আইসক্রিম ইত্যাদি খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে। লোকে পানভোজন ও গীতবাদ্য শ্রবণ একসঙ্গেই করতে পারে। এদেশের লোক যে অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় সে-কথা এক দিনেই বুঝতে পেরেছিলুম। রাত্রে হোটেলে খেতে বসবার পর রাস্তায় শতাধিক লোকের ছুটে চলে যাওয়ার পায়ের শব্দ পেয়ে হোটেলের চাকরকে জিজ্ঞাসা করলুম, রাস্তায় এত ভিড় কিসের? সে বললে, লোকে বিকেল থেকে এতক্ষণ ধ'রে সানমার্কোতে গানবাজনা শুনছিল, এখন আটটা বাজতে দোকান বন্ধ হওয়ায় সবাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। যখন কলকাতা শহরের মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট দিয়ে যাই আর রাস্তার দু-পাশের ফুটপাথের উপর মিষ্টান্নের দোকানের রেডিও শোনবার জন্য অনেক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, তখন এই সানমার্কোর কথা মনে পড়ে যায়। অবশ্য সান-মার্কোর বাজনা যে খুবই ভাল সে-কথা বলাই বাহুল্য।

কাচের নানা রকম পুঁতির মালা, আলোর রকমারি শেড্, সোনালী কাজ-করা টি সেট্, ফুলদান ও অন্যান্য অনেক রকম জিনিষ এখানে তৈরি হয়ে থাকে। ভেনিসের লেসও অতি সুন্দর। আড্রিয়াটিকের উপরে মুরানো ও বুরানো নামে দুটি দ্বীপ আছে, এখানে লেস-তৈরির জন্য স্কুল ও কাচের

নানা রকম জিনিষ তৈরির জন্য ফ্যাক্টরী আছে। এখানে অতি সুন্দর সুন্দর এমব্রয়ডারীর কাজ-করা স্প্যানিস শাল-পাওয়া যায়। দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ-রকম শালের উপর এমব্রয়ডারী করতে দেখেছি। এ-সব কাজ মেয়েরাই করে। এদের হাত খুব ক্ষিপ্রগতিতে চলে। নানা রকম চামড়ার দ্রব্যাদির জন্যও ভেনিস প্রসিদ্ধ। ইটালীর মার্ব্বেল-পাথরের জিনিষও বিখ্যাত। আমরা ভেনিসে পৌঁছবার পর হোটেলেরই এক জন লোক আমাদের খবর দিলে যে কাছেই এক জায়গায় ভেনিসের কাচের জিনিষের একজিবিশন হচ্ছে। আমরা হেঁটেই দেখতে যেতে পারি। রাত্রে খাবার পর দেখতে গেলুম। দেখবার মত একজিবিশন। চারি দিকে রকমারি শ্বেতপাথর, এ্যালাবাষ্টার পাথর ও কাচের সুন্দর সুন্দর জিনিষ দিয়ে এমনভাবে সাজিয়েছিল, যে খানিক ক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। এখানেও হোটেল ইউনিভার্সোয় রাত্রে মশার উৎপাতে মোটে ঘুমতে পারি নি। রাস্তার জলে যত মশার আড্ডা আছে। সকালে উঠে পাঁচ গ্রেন ক'রে কুইনাইন খেয়ে নিলুম। কি জানি যদি ম্যালেরিয়াই থাকে। আমাদের দেশে ফিরে যাবার জাহাজ ধরবার জন্য এখানে আবার আসতে হবে, সেজন্য এবার এসে যাতে রাত্রে মশার কামড়ে কষ্ট পেতে না হয় তার জন্য এর চাইতে ভাল হোটেল খোঁজ ক'রে এলুম। এর নাম হোটেল ম্যানিনও পিলসেন। একদিন গ্র্যাণ্ড ক্যানালের উপর একটি দোকানে গণ্ডোলা ক'রে গিয়েছিলুম। এর নাম স্যালভিয়াটি, এখানে কাচের জিনিষ তৈরি হয়। এটি দেখবার জিনিষ। একটি বড় উনানের মধ্যে গলিত কাঁচের পাত্র বসানো আছে। কারিগররা বড় বড় লোহার নলের আগায় এই তরল কাচ খানিকটা তুলে নেয়, তার পর নলের অপর দিকের ফুটোতে ফুঁ দিয়ে ইচ্ছামত ছোটবড় ক'রে কাচকে ফোলায়, তার পর একটি চিমটা ও একটি কাঁচির সাহায্যে এর থেকে নানা রকম লতাপাতা, ফল, মানুষ ইত্যাদি সব রকমই তৈরি করে। এটিকে না দেখলে ঠিক বোঝান সম্ভব নয়। আমরা এই দোকানের তৈরি কাচের দ্রাক্ষাকুঞ্জ দেখলুম, অতি সুন্দর। কাচের তৈরি আঙুর-লতা বড় বড় থামকে বেষ্টন ক'রে উঠেছে। পাতাগুলি নানা রকম সবুজ রঙের কাচের তৈরি ও আঙুর ফলের খোলোগুলিও ফিকা সবুজ, লাল ও বেগুনে রঙের। এ-সব আঙুরের খোলোগুলির ভেতরে ইলেকট্রিক বাল্‌ব জ্বলছিল।

ভেনিসে থাকতে একদিন আমরা সানমার্কো স্কোয়ারের ধারে অবস্থিত ডজের প্যালেস দেখতে গিয়েছিলুম। ইংলণ্ডের ডিউক বললে যাদের বোঝায় ডজেরা তাই।

প্যালেসের তলায় কারাগার। প্যালেস দেখলে মনে হয় অনেক দিনের পুরানো। দ্বারে দ্বারে প্রতিহারী দাঁড়িয়ে থাকে। ডজের প্যালেসে নানান জাতীয় পায়রা বাসা ক'রে আছে। এ-সব পায়রাকে প্রতিদিন বিকেলে সানমার্কোতে খাওয়ানো হয়। সে এক সমারোহ ব্যাপার।

ভেনিসের বিস্তর অলিগলি। এগুলির সঙ্গে কাশীর গলির তুলনা করা যেতে পারে। এক দিন ভেনিসে সান-মার্কোর একটি চামড়ার দোকান থেকে বেরিয়ে আমরা এক জন শাড়ীপরা মহিলাকে দেখতে পাই। এঁর স্বামীও সঙ্গে ছিলেন। এঁরাও আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। আমাদের সঙ্গে তাঁদের আলাপ হ'ল। এই ভদ্রলোকের নাম মিঃ লতিফ। এঁরা দু-জনে ইউরোপ বেড়িয়ে ফিরছিলেন। এঁরা হায়দ্রাবাদে থাকেন। বড় চমৎকার লোক। এঁদের দু-জনকে নিয়ে আমরা একটা দল করলুম ও এখান থেকে ফ্লোরেন্স ও রোম পর্য্যন্ত একসঙ্গে ভ্রমণ করেছিলুম। এখানকার গোটাকয়েক গীর্জ্জা দেখেছি। গীর্জ্জার ভেতর মার্ব্বেল-পাথরের কাজ বড় সুন্দর।

আমরা এখানে দু-রাত্রি ছিলুম। একদিন রাত্রে খেতে বসেছি, হঠাৎ নজরে পড়ল, এক জন ইটালীয়ান মহিলা আমাকে ডাকছে। আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম এ বোধ হয় আবার এক অসভ্যের পাল্লায় পড়ছি। এ রকম মনে করার কারণ ছিল। ইটালীর রাস্তাঘাটে বেরলে অনেক সময় এদেশের মেয়েগুলি ডেকে শেষে হাত উঁচু ক'রে বক দেখিয়ে দেয়। এ কিন্তু সে ধরণের লোক নয়। পরে আলাপ হ'লে জানলুম এরা স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই খুব ভাল বেহালা-বাদক। এক সময় এক দল ইটালীয়ান কনসার্ট-পার্টি কলকাতায় এসেছিল। এরা দু-জনেই সেই সঙ্গে আসে এবং ভারতবর্ষ বেড়িয়ে যায়। আমাকে শাড়ী-পরা দেখে ভারতবর্ষের মেয়ে ব'লে চিনতে পেরেছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কপালে লাল

কৌটা পর নি কেন ? তোমাদের দেশে লোকে খাওয়ার পর এক রকম পাতা খায়, তাতে ঠোঁট খুব লাল হয়। তুমি খাও না সে পাতা ? তাকে বললুম, সে পাতাকে পান বলে। সে জিনিষ সঙ্গে বেশী দিন নেওয়া যায় না। খানিক ক্ষণ গল্প হবার পর এর স্বামী বল্লে, তোমরা কি খাবে ? আমাদের সঙ্গে একটু শ্যাম্পেন খাও। আমরা জানালুম আমরা শ্যাম্পেন খাই না। তখন বললে, তাহ'লে কি হুইস্কি দিতে বলব ? তাও চলে না শুনে বল্লে, তবে শেরী খাও ? বললুম তাও খাই না। তবুও পোর্ট, বীয়ার ইত্যাদি সব রকম নাম ক'রে হতাশ হয়ে শেষে বললে, তোমরা কি এ-সব কিছুই খাও না ? না খেয়ে থাক কি ক'রে ? তেষ্টা পায় না ? আমরা বললুম তেষ্টা পেলে আমরা জল খেয়েই তৃপ্তি পাই। শেষে আমরা এক গেলাস ক'রে লেমনেড খেয়ে তবে তাদের ঠাণ্ডা করি।

আমরা চার জন বাইশে সেপ্টেম্বর বেলা এগারটার গাড়ীতে রওনা হয়ে বিকেল পাঁচটার সময় ইটালীর ফ্লোরেন্স শহরে পৌছলুম। আমরা যে জায়গায় উঠলুম সেটা একটি বোডিং-হাউস। এক জন বর্ষীয়সী জার্ম্মান মহিলা এর পরিচালনা করেন। এর মুখ সর্ব্বদাই হাসিতে ভরা এবং ব্যবহার বড়ই ভদ্র। আমরা যে তিন দিন এখানে ছিলুম এঁর আদরযত্নে মনে হ'ত না যে আমরা বিদেশে আছি। এমন কি এঁর কাছে যে কয়টি গরিব মেয়ে ঝিয়ের কাজ করে তাদেরও সঙ্গে ইনি নিজের কন্যার মত ব্যবহার করেন। আমাদের পরিবেশন করা হয়ে গেলে দেখতুম ইনি তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এক টেবিলে খেতে বসতেন। রান্নাঘরে গিয়েও দেখেছি ইনি তাদের কাজে সাহায্য করছেন।

এখানকার মোজায়েক পাথরের কারখানা দেখে এসেছি। ছোট্ট ছোট্ট নানা রকম রঙের পাথর বসিয়ে নানা রকম ফুল পাতা ও দৃশ্যাবলীর ছবি তৈরি হয়। ফ্লোরেন্সের মোজায়েক পাথর বিখ্যাত। ফ্লোরেন্স থারনো নদীর ধারে অবস্থিত। ইটালীয়ান কবি দান্তের এই জন্মভূমি। এখানে থারনো নদীর উপরে অনেকগুলি পুল আছে। যেটি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন তার দু-পাশেই সোনা-রূপোর গহনা, নানা রকম পাথর ও চামড়ার দ্রব্যাদির দোকান আছে। এক দিন এখানকার উফিজি গ্যালারী ও পিটি গ্যালারী দেখতে গিয়েছিলুম। এসব গ্যালারীতে ইটালীর বড় বড় চিত্রকর মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল, মুরিলো প্রভৃতির হাতে আঁকা ছবি ও বড় বড় শিল্পীদের খোদাইকরা মার্ব্বেল-পাথরের গড়া মূর্ত্তি আছে। সে-সব জিনিষ বড় সুন্দর।

আমরা রাস্তায় বেরলে মেয়ে-পুরুষের ভিড় লেগে যেত। সবাই বলত "ইণ্ডিয়ানো"। এক দিন মিসেস্ লতিফ ও আমাকে রাস্তায় একটু দাঁড়াতে দেখে এক জন ফট্ ক'রে ছবি তুলে নিয়ে সরে পড়ল। একবার জিজ্ঞাসাও করলে না তুলব কি না। এখানকার কুলী, মজুর, গাড়োয়ান খবরের কাগজওয়ালা সবাই বিদেশী লোক দেখতে পেলেই ঠকাবার চেষ্টা করে। কাগজের দোকানে একবার কাগজ কিনতে গিয়ে দোকানদারকে কাগজ নেবার পর জিজ্ঞাসা করা হ'ল, তোমার কাছে চেঞ্জ আছে ? সে বললে, হ্যাঁ আছে। তার পর বেশী টাকাটি নিয়েই বল্লে, চেঞ্জ আবার কি, দেব না। এ-সব কথা আমাদের বেশীর ভাগই ইসারায় ও ডিক্সনারি দেখিয়ে চলছিল। ইটালীতে ফরাসী ভাষা ছাড়া লোকে অন্য বিদেশী ভাষা জানে না। আমরা তখন তাকে তার কাগজ ফিরিয়ে দিয়ে বললুম আমরা কাগজ চাই না, তুমি সব টাকাটা দাও। তখন সে হেসে তার ন্যায্য দাম নিয়ে বাকী টাকা ও কাগজ আমাদের ফিরিয়ে দিলে। ফ্লোরেন্সকে ইটালীয়ান ভাষায় ফিরেঞ্জি বলা হয়।

তখন ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী জেলে উপবাস করছিলেন, সে-কথা নিয়ে ইটালীর নানা রকম খবরের কাগজে খবর বেরচ্ছিল। আমরা যেখানেই যেতুম লোকে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করত ভারতবর্ষের কি খবর ? ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'তে আর কত দিন লাগবে মনে হয় ? গান্ধী কত দিনে মুক্তি পাবেন ? ইত্যাদি।

'এক আনা'র ইতিহাস

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ছেলেটির নাম মণীশ। বয়স দশ। বয়স কম হইলেও মসৃণ ললাট ও উজ্জ্বল চক্ষু দেখিলেই বোধ হয়, ছেলেটি চটপটে ও বুদ্ধিমান। বাবা উকিল; পসার বা প্রসার খুব বেশী না হইলেও পাড়ায় কিছু নাম আছে। প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীতে মোটর গাড়ী কিনিবার পরামর্শ চলিতে থাকে, মণীশ কান খাড়া করিয়া সে-সব কথা শোনে। মাঝে মাঝে—বুইক্ ভাল, না শেভ্রোলে ভাল—এ-সম্বন্ধে তার মতামতও বাপমাকে জানায়। শহরের ছেলে, গাড়ী সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে বইকি!

সম্প্রতি মণীশের দাদামহাশয় এ-বাড়িতে অতিথি হইয়াছেন। দাদামহাশয় হইলেও লোকটির পাকা চুল বা নড়া দাঁত কিংবা মাথায় টাক—এ-সব পদোচিত মহিমা আজও সুপ্রকট হইয়া উঠে নাই। বয়সটাও পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি—মণীশ তাঁর প্রথম দৌহিত্র। সে যাহা হউক, এক দিক দিয়া দাদামহাশয় তাঁর নামের মাহাত্ম্য বজায় রাখিয়াছেন। গল্প বলিতে তিনি বিশেষ পটু; শিশুচিত্তের উপর তাই তাঁর অধিকার অপ্রতিহত।

লোকটি থাকেন পাড়াগাঁয়ে। সেখানকার বন-জঙ্গল, বাঘ শেয়াল, নদী নৌকা ও মাছ কুমীরের গল্প শহুরে ছেলে, মণীশের খুবই ভাল লাগে। এই শহরে কেবল মানুষ, কেবল ট্রাম, বাস, মোটর, রিক্‌শ, ধোঁয়া আর কুয়াশা! এখানকার ঘাট বাঁধা ও জাহাজ-নৌকাভরা গঙ্গা নিতান্তই যেন ঘরের নদী। বড় চৌবাচ্চার জমা জলের যা অবস্থা গঙ্গারও তাই। ঘরের বাহুল্য ও আলোর ঔজ্জ্বল্য এত বেশী যে, নীল আকাশ চোখেই পড়ে না। বনের কথা যা বইয়ে আছে, আর বাঘ শিয়ালের দেখা মেলে চিড়িয়াখানায়।

মণীশের দাদামহাশয়ের অবস্থা ভাল। চাকরি করিতেন কোন এক সওদাগরী আপিসে—মাহিনা ছিল মোটা। ব্যাঙ্কের খাতাখানায় কেহ কেহ বলেন—ছয়টি-সংখ্যক অঙ্কের হিসাব চলিতেছে। দাদামহাশয় দুঃখ করিয়া বলেন, আরও কিছু দিন চাকরি করিতে পারিলে হয়ত লোকের মুখে ফুলচন্দন পড়িতে পারিত, কিন্তু কেরাণী-ছাঁটাইয়ের কাঁচি উপর ঘেঁষিয়া যাওয়াতে সে আশা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। কম মাহিনায় আর কোথাও চাকরি না করিয়া দেশে গিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়াছেন। আশা আছে, বাণিজ্যের দ্বারাই লক্ষ্মীকে বাঁধিয়া ষষ্ঠ সংখ্যাকে অচিরাৎ পূর্ণ করিবেন।

নাতির পীড়াপীড়িতে দাদামহাশয় গল্প বলিতে সুরু করিয়াছেন। কলিকাতার ছেলে—মনভুলানো পরীকথা বা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প শুনিতে চাহে না। রাক্ষস-খোক্কসের অধিকার ছিল পাঁচ-ছয় বছর বয়সে—এখন ওই সব বাতিল হইয়া গিয়াছে। এদিকে পাড়াগাঁয়ের গল্পও এত পুরাতন হইয়াছে যে, একবার আরম্ভ করিলে নাতি মুখস্থ পড়ার মত বাকিটা গড় গড় করিয়া বলিয়া দাদামহাশয়কে অপ্রতিভ করিয়া দেয়।

দাদা মহাশয় রাগের ভান করিয়া বলেন,—তবে আমার গল্প নেই,—যা।

মণীশ মিনতি করে,—না দাদু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর একটা নতুন গল্প—খুব নতুন—বল।

দাদামহাশয় হাসেন,—নতুন আর তোর জ্বালায় রইল কই? সবই ত বাসি—পুরনো।

মণীশের মিনতি চলিতে থাকে,—ও শেয়াল-মারার গল্প অনেক বার শুনেছি যে! খেজুর-রস পাড়া, মটরশুঁটি খাওয়া, বাঘতাড়ানো, পাখীর বাচ্চা ধরা যার কাছেই ব'লতে যাই হেসে ওঠে সব। বলে, নতুন কিছু বল।...আচ্ছা দাদু, তোমাদের সেই যে খালটার কথা ব'লতে—যেটায় কুমীর আছে—পদ্মফুল ফোটে—ছিপ নিয়ে যেখানে বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে পুঁটি মাছ ধরতে—ঘাটের ধারে ধোপারা যেখানে 'হিস্' 'হিস' শব্দ ক'রে কাপড় কাচে—সেই খালের গল্পই বল না।

দাদামহাশয় হাসিলেন,—তাও ত তোর মুখস্থ যে, মণে।

তোদের মেধাটা যদি একটু কম হ'ত—আমরা গল্প বলিয়ের দল কিছুদিন বাজার বাঁচিয়ে চলতে পারতাম!

একটু থামিয়া ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—সে খালের এখন আছেই বা কি—গল্পই বা বলি কোথেকে? ছিল এক দিন—বর্ষায় দোতলা-সমান উঁচু পাড়ের সমান হ'য়ে জল উঠত ফুলে—চওড়ায় তোদের ওই কলকাতার গঙ্গা দুটো দাঁড়াত পাশাপাশি। এখন এই এতটুকু ফালি জমিতে জল আটকানো—কেবল পদ্ম আর শালুক ফোটে—কলমীদামে জল সব ঢেকে আসছে।

মণীশ আনন্দে বলিয়া উঠিল—বা রে! তোমাদের কলমী শাক কিনে খেতে হয় না!

দাদামহাশয় হাসিলেন,—ওরে, কিনে খেতে হ'লেও সে যে সুখের হ'ত। দশ-বিশ বছর বাদে ওখানে আর জল থাকবে না—মাঠে গরু চরবে যে! কেউ যদি খালটা কাটিয়ে দেয় ত গাঁয়ের লোকগুলো বেঁচে যায়।

মণীশ বলিল—তুমিই কেন কাটিয়ে দাও না, দাদু? তোমার ত মেলাই টাকা।

—দূর! টাকা থাকলে কি—

নাতি দাদামহাশয়ের কথার প্রতিবাদ করিল,—না, নেই বইকি? সে-বারে মাকে ব্রেসলেট গড়িয়ে দিলে।

—বোকা কোথাকার। ও রকম বিশটা ব্রেসলেট দিলেও যে ও-কাজ হয় না রে! হ্যাঁ, তবে আশা আমি ছাড়ি নি। সেই জন্যই ত মাসে—চার-পাঁচখানা ক'রে লটারীর টিকিট কিনি! সব ক'টাই দেশের নামে কিনি—সৎ কাজ করবার জন্য।

মণীশ বলিল, সে-বারে ত পাঁচ-শ টাকা পেয়েছিলে—সেই আমাদের সন্দেশ খাওয়ালে।

দাদামহাশয় হো হো করিয়া হাসিলেন,—ওর চেয়ে অনেক টাকা চাই—ঢের বেশী। কুড়ি-পঁচিশ হাজার পেলে সবটাই আমি খাল কাটাবার জন্য দেব।

—কুড়ি-পঁচিশ হাজার যদি না, পাও দাদু?

—না পাই—সে ত আমার ভাগ্য নয়—বুঝব দেশের লোকের কপাল! দেশের লোকের কপাল যদি ভাল হয়—লটারীতে টাকা আমি পাবই পাব।

মণীশ নিরুৎসাহ ভাবে বলিল—তবে খালের গল্প থাক—দাদু, যখন ওটা কাটাবে—তখন ওর গল্প শুনব। এখন আর একটা—

দাদামহাশয় বলিলেন,—তার চেয়ে এক কাজ কর দিকি—তোদের গোলদীঘি থেকে চারটি ফুল তুলে নিয়ে আয়—পুজোটা চট্ ক'রে সেরে নিই। তার পর খুব ভাল একটা গল্প ব'লব।

—বিকেলবেলায় পুজো ক'রবে?

—হাঁ রে,—তুই আন না।

মণীশ বুঝিতে পারিল না—গল্প-বলার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য দাদামহাশয় এই কৌশল করিতেছেন। সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

গোলদীঘিতে ঢুকিবার মুখেই মণীশের অপ্রত্যাশিত এক লাভ হইয়া গেল। গেটের পাশেই একটা চক্‌চকে আনি পড়িয়া রহিয়াছে—মণীশ তাড়াতাড়ি সেটা কুড়াইয়া লইল। কুড়াইয়া চারি দিকে একবার সচকিতে চাহিয়া দেখিল—কেহ লক্ষ্য করিয়াছে কি না! না, লক্ষ্য কেহ করে নাই। যে যাহার পথে হাসি গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। আনিটা লইয়া মণীশ কয়েক পা আগাইয়া আসিল। কি জানি, যাহার আনি হারাইয়াছে সে যদি আসিয়া পড়ে? আসিয়াই যদি বলে,—'এই খোকা, তোর হাতে ওটা কি? দেখি? বাঃ রে, ও যে আমারই আনি।'

আনি ত ছিনাইয়া লইবেই—সঙ্গে সঙ্গে গালাগাল।

তাড়াতাড়ি আরও খানিকটা আগাইয়া মণীশ অল্প একটু নিশ্চিন্ত হইল, ভয় তাহার গেল না। তখনও বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছে। আনিটা সে ফেলিয়া দিবে কি? 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ।' এ-কথা সে অনেক আগে দ্বিতীয় ভাগে পড়িয়াছে এবং মা, বাবা ও পূজনীয় ব্যক্তিদের মুখে শুনিয়াছে। চুরি করিলে সে-কালে ফাঁসি পর্য্যন্ত হইত—আর এ-কালে হয় জেল। কিন্তু ফাঁসি বা জেল না হইলেও চুরি জিনিষটা বড়ই খারাপ। যাঁহারা বই লেখেন তাঁহারা কত ভাল লোক—বড়লোক; মা-বাবা—তাঁহাদের চেয়ে ভাল লোক পৃথিবীতে কয়টিই বা আছে? ইঁহাদের কেহ ছাপার অক্ষরে লিখিয়া—কেহ মুখে নিষেধ

করিয়া এই জিনিষের কত নিন্দাই না করিয়াছেন; কত বইয়ে গল্প আছে চোরের কত রকমের সাজা হয়। এই যে আনিটা হাতে লইয়া বুক তাহার ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে—এ কেন হয়? কাজটা ভাল হইলে মনটা খুশীতে লাফাইতে থাকিত। যেমন ক্লাস-প্রমোশন পাইলে কেবলই লাফাইতে ও চেঁচাইতে ইচ্ছা হয়। ক্যারম খেলায় পয়েণ্ট পাইলে দুনিয়ার আর সব তুচ্ছ হইয়া যায়। রথে, দোলে বা সরস্বতী-পূজায় বাবা যখন একটা করিয়া টাকা পার্ব্বণী দেন তখনকার আনন্দের তুলনা আছে কি? বুকের মধ্যে তখনও লাফাইতে থাকে, কিন্তু এমন ঢিপ ঢিপ ত করে না! সে-আনন্দের ভাগ সকলকে ডাকিয়া চাখিয়া দেখাইতে ইচ্ছা হয়—আর এই পাওয়ার আনন্দকে—পড়ার সময় ঘুড়ি উড়াইবার মত—অত্যন্ত ভয়ে ও ভাবনায় লুকাইয়া রাখিতে প্রাণ বাহির হইতেছে! কাজ নাই, আনিটা যেখানে পড়িয়াছিল সেইখানে রাখিয়া আসা যাক।

মণীশ কয়েক পা আগাইয়া গিয়া আবার দাঁড়াইল। ভাবিল, ওটা যে চুরি—এ ভাবনাই বা আমার আসে কেন? বাবার পকেট হইতে পয়সা উঠাইয়া লওয়ার মত কিংবা স্কুলে রবির পকেট হইতে বনমালী সে-দিন যেমন পেন্সিল উঠাইয়া মাষ্টারের বেত খাইয়াছিল তাহারই সঙ্গে এই কাজটা সমান হইল কিসে? একটা ত আনি—টাকা নয়, গহনা নয়—বই, পেন্সিল—এমন কি সামান্য একটা ক্লিপও নয় যে আত্মসাৎ করার কাজ হইতে পারে! ছোট্ট একটা আনি—সে ফেলিয়া দিলে আর এক জন কুড়াইয়া লইবে। সে-ও কি মণীশের মত মিথ্যা ভয়ে আনিটা ওইখানে ফেলিয়া যাইবে? নিশ্চয়ই না। সে এটা পকেটে ফেলিয়া যে হারাইয়াছে তাহারই অসাবধানতা ও নির্ব্বুদ্ধিতাকে মনে মনে উপভোগ করিয়া আর পাঁচ জনের কাছে দিব্য গল্প করিবে—হাসিবে। বাবা ত প্রায়ই বলেন, কথার মালা গাঁথিয়া যে-উকিল মক্কেলের মন ভুলাইতে না-পারে তার ওকালতি পাস করাই বিড়ম্বনা। জগৎ বুদ্ধিমানের—বোকারা পদে পদে হয় লাঞ্ছিত আর প্রতারিত। চুরি অবশ্য খারাপ জিনিষ—বোকামীটাও তার চেয়ে কম খারাপ কিসে?

মণীশ মনকে বুঝাইল—চুরি যখন সে করে নাই তখন বোকামীও করিবে না। বরং এই কুড়াইয়া-পাওয়া আনিটার দ্বারা একটা সৎকাজ সে করিবে। যে-কোন ভিক্ষুককে এটা দিলে তার অভাব মিটিবে—লোকটা দু-হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে আর মণীশেরও কম পুণ্য হইবে না।

মুঠার মধ্যে আনিটা লইয়া সে আরও কয়েক পা আগাইয়া আসিল—কিন্তু মুঠা খুলিয়া দেখিতে তার সাহস হইল না। আনিটা নূতন না পুরাতন? সপ্তম এডওয়ার্ডের মুখ না মাননীয় পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিকৃতি? কোন্ সালের? মুঠার মধ্যে আঙুল বুলাইয়া যেটুকু বুঝা যায়—আনিটা নূতনই। আনির গায়ে ছাপা লেখাগুলা আঙুলে স্পষ্ট ঠেকিতেছে, এতটুকু মসৃণ নহে, ধারটা পলকাটা। চকচকে সুতরাং নূতন আনি হয়ত এই সালেরই। কিন্তু নূতন বলিয়াই ত খুলিয়া দেখিতে ভয় হয়। পাশে দাঁড়াইয়া কেহ যদি দেখিয়া ফেলে এবং বলিয়া উঠে,—'এই খোকা—এটা যে আমারই আনি—তুই পেলি কোত্থেকে?' যদি কান ধরিয়া এই এত লোকের সামনে লোকটা চড় মারে? যদি···

—'চাই চীনাবাদাম—গরমাগরম—'

চট্ করিয়া মণীশের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিল। সে নীচু গলায় ডাকিল,—এই বাদাম—চীনেবাদাম—

সে-ডাক মণীশের কানেই ক্ষীণ ভাবে বাজিল, অন্য লোকে শুনিতে পাইবার কথা নহে। কিন্তু ভগবান বাদাম-বিক্রেতাদের কান আলাদা করিয়া তৈয়ারী করিয়াছেন হয়ত! বুকের মধ্যে ধুক্‌ধুক্ শব্দটি খাবার ইচ্ছায় যখন অল্প একটু বাড়িয়া ওঠে তখন খাবারওয়ালারা অন্তর্যামীর মত সে-কথা কেমন বুঝিতে পারে! বালক মণীশ হয়ত জানে না, এই অন্তর্যামী খাবারওয়ালারা শিশুদের চোখের মধ্য দিয়া মনের ভাষা পড়িতে পারে অত্যন্ত অনায়াসে।

—ক' পয়সার বাদাম চাই, বাবু?

বাবু ডাকটি মণীশের বেশ মিষ্ট লাগিল। আজও পর্য্যন্ত শুধু 'বাবু' বলিয়া অনাত্মীয় কেহ ডাকে নাই। সে যে ছোট, সে যে খোকা—এই ধারণা বড়দের মনে বদ্ধমূল। শুধু এই লোকটাই তাহাকে বয়স্ক লোকের মর্য্যাদা দিয়া 'বাবু'র পূর্ব্বে 'খোকা' জুড়িয়া দেয় নাই। মণীশকেও এই পদের মর্য্যাদা রাখিতে হইবে! এক পয়সার বাদাম চাহিয়া লোকটার কাছে খাটো হইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা নাই।

—দো পয়সাকা দেও।—বেশ মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে মণীশ বলিল।

বাদামওয়ালা দুটি প্যাকেট মণীশের হাতে তুলিয়া দিতেই মণীশ টপ করিয়া আনিটা তাহার ডালার উপর ফেলিয়া দিল।

'বাবু'-ডাকের আত্মপ্রসাদে আনি সম্বন্ধে সতর্কতা কোন এক সময়ে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল!

পয়সা দুটা হাতে আসিতেই মণীশ নিশ্চিন্ত মনে বাদামের প্যাকেট খুলিয়া বাদাম খাইতে লাগিল।

সামনে একটা ছেলেকে দেখিয়া সে ডাকিল,—এই—এই অসিত, বাদাম খাবি?

অসিত মণীশদের নীচের ক্লাসে পড়ে—মণীশের চেয়ে বছরখানেকের ছোট। মাসখানেক আগে স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় দশ বছরের ছেলেদের দলে সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। মণীশ হইয়াছিল প্রথম। পাশাপাশি প্রাইজ লইতে গিয়া দুই জনের দৃষ্টিবিনিময় হয় এবং প্রথম হইতে পারে নাই বলিয়া মণীশ উহাকে কৃপার চক্ষে দেখে। সেই হইতে দু-জনের মধ্যে ভাসা-ভাসা আলাপ হইত—ভাবটা খুব জমাট বাঁধিতে পারে নাই। আজ ডাকিয়া বাদাম খাইতে দেওয়ায় অসিত অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করিয়া মণীশের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল ও বাদাম চিবাইতে চিবাইতে বলিল,—তুমি আসছে বারেও ফার্স্ট হবে।

মণীশ মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসিয়া বলিল,—দূর বোকা! আসছে বারে আমি এগারোয় প'ড়ব—তোদের ওপরের দলে নাম পড়বে।

আনন্দে ঘাড় নাড়িয়া অসিত বলিল,—তা হোক, ফার্স্ট তুমি হবেই।

—দেখা যাক।—বলিয়া মণীশ আরম্ভ করিল,—আমি বেরিয়ে গেলে ও গ্রুপে তোকে ঠেকায় কে? কি বলিস্?

অসিত মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

—চাই পেন্সিল—ভাল পেন্সিল—

অসিত পেন্সিল-বিক্রেতার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে দেখিয়া মণীশ বলিল,—নিবি নাকি রে?

—নেব ত, পয়সা কই?—অসিত শুষ্ককণ্ঠে বলিল।

মণীশ ঘাড় দোলাইয়া বলিল,—নেভার মাইণ্ড—আমি ধার দিচ্ছি। বলিয়া সে পেন্সিল-বিক্রেতাকে ডাকিল—এই পেন্সিল—পেন্সিল—সঙ্গে সঙ্গে পয়সাটা অসিতের হাতে দিয়া বলিল,—নে, যেটা তোর খুশী।

অসিত বলিল,—তুমি পছন্দ ক'রে বেছে দাও।

মণীশ অত্যন্ত খুশী হইয়া হাতের কাছে যেটা পাইল সেটা না লইয়া বাছাবাছি আরম্ভ করিল। মিনিট-চারেক বাছাবাছির পর একটা নীল-রঙের পেন্সিল তুলিয়া লইয়া বলিল—এইটে নে, বাবা ঠিক এই রকম পেন্সিলে লেখে।

অসিতের ইচ্ছা ছিল লাল-সবুজ মেশানো রঙের একটা নেয়, কিন্তু মণীশের বাবা যে-রঙের জিনিষ ব্যবহার করেন, সে-রঙের উপর লোভ না থাকিলেও ক্ষোভ প্রকাশ করা চলে না। পয়সাটাও এ-ক্ষেত্রে সে দেয় নাই।

অল্প একটু হাসিয়া সে বলিল,—এইটাই বেশ।

পেন্সিল-বিক্রেতা চলিয়া গেলে সে ম্লানমুখে বলিল,—কিন্তু ভাই, পয়সাটা কাল তোমায় দিতে পারব না ত। পরশু বাবা একটা পেন্সিল কিনে দিয়েছিলেন—সেটা হারিয়ে গেছে। এত শীগ্‌গির চাইতে গেলে—

মণীশ হাসিয়া বলিল—দূর বোকা। ধার বললাম ব'লে কি ধারই? ওটা তোকে একেবারে দিলাম।

এই কথায় অসিতের আনন্দের যেন সীমা রহিল না। পেন্সিলটা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া সে বার-বার বলিতে লাগিল—কি সুন্দর রঙ এটার ভাই,—সুন্দর!

দু-জনে এ-কথা সে-কথা বলার পর মণীশের ফুল লওয়ার কথা মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি সে গোটাকয়েক মরসুমী ফুল তুলিয়া অসিতকে বলিল,—তুই বাড়ি যা। কাল ইস্কুলে দেখা হবে।

অসিতের এত শীঘ্র মণীশকে ছাড়িবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মণীশ আর সেখানে দাঁড়াইল না।

গেটের বাইরে প্রকাণ্ড হাঁড়ি লইয়া ঘুগ্‌নীওয়ালা বসিয়া রহিয়াছে।

—চাই বাবু—গরম ঘুগ্‌নী—পাঁটার ঘুগ্‌নী—

দিব্য গরম মশলার ভুরভুরে গন্ধ বাহির হইতেছে। সেই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকটি অল্প বয়সের ছেলে ঘুগ্‌নী-ওয়ালার অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া লোলুপ দৃষ্টিতে ওই হাঁড়িটার পানে চাহিয়া আছে আর এক-এক বার চারি দিকে

চাহিতেছে। উহাদের যে অল্প পুঁজি ছিল সেটা ঘুগ্‌নীর হাঁড়িতে গিয়া জমিয়াছে এবং লোলুপ দৃষ্টির বহর দেখিয়া মনে হয় রসনা উহাদের অতৃপ্তই রহিয়াছে কিংবা সামান্য মাত্র স্বাদে লালসায় উগ্রতর হইয়া উঠিয়াছে। চারি দিকে চাহিবার অর্থ যদি কোন পরিচিত মুখ চোখে পড়িয়া যায় এবং সে বেচারীর সামান্য পুঁজিতে অতগুলি রসনার যৎকিঞ্চিৎ তৃপ্তিসাধন হয়!

নাসারন্ধ্রে সুগন্ধের দ্বারা যত না আকৃষ্ট হউক, ওই বঞ্চিতদের সামনে এতবড় একটা বীরত্ব দেখাইবার প্রলোভন মণীশ কিছুতেই দমন করিতে পারিল না।

বুক ফুলাইয়া ঘুগ্‌নীওয়ালার নিকটবর্ত্তী হইয়া সে চড়া গলায় বলিল—এই ঘুগ্‌নী—এক পয়সার—

ঘুগ্‌নীর আস্বাদ চমৎকার কিন্তু মণীশ মুখে দিয়াই বলিল—দূর তেরি—আজ্ কিস্‌স্যু হয় নি—কাল খুব ভাল ছিল। বলিয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে ছেলেগুলির মুখের পানে চাহিয়া যেন কতই না অনিচ্ছা ও অতৃপ্তির সঙ্গে উহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া ঘুগ্‌নীওয়ালাকে ধন্য করিতেছে এমন ভাব দেখাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। আহা বেচারীরা—যে জিনিষের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া আছে, মণীশের কাছে সেটা কতই না তুচ্ছ। মণীশ যে 'বাবু'—শুধু 'বাবু'—এটা অন্তত সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য!

—এ বাবু—রাজা বাবু—তিন রোজ ভুখা আছে—একটা আধেলা বাবু—আর একবার বিজয়ী মণীশ পকেটের মধ্যে হাত চালাইয়া দিল। কিন্তু 'আনি'টা তখন 'বাবু' মণীশের এলাকা ছাড়িয়া বহুদূরে উড়িয়া গিয়াছে—বালক মণীশের হাতে উঠিল দাদামহাশয়ের পূজার জন্য সংগৃহীত মরসুমী ফুল কতকগুলা।

বিজয়ী মণীশের মাথাটা অল্পে অল্পে নুইয়া পড়িল,—ভাল করিয়া ভিখারীটার পানে সে চাহিতেই পারিল না। প্রথম সঙ্কল্পের মুখে আনিটা সে ইহাকেই দান করিবে ভাবিয়াছিল।

কুড়াইয়া-পাওয়া আনিটা যেন ইহারই সম্পত্তি—এই গরিবদেরই প্রাপ্য—অন্যায় করিয়া নিজের মান বজায় রাখিতে সে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। যাহার পাওনা তাহাকে না দিয়া লুব্ধের মত, চোরের মত সে আত্মসাৎ করিয়াছে!

ভিক্ষুকটা বাঁধা বুলি ছড়াইতে ছড়াইতে আগাইয়া গেল। মণীশও নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল,—এবার যেদিন গোলদীঘিতে আনি কুড়িয়ে পাব—সেদিন বাদাম কিনব না, পেন্সিল কিনব না, ঘুগ্‌নীদানাও খাব না, ঠিক ওই ভিখিরীটাকে দেব। দেব—দেব—দেব।

মণীশের দাদামহাশয় দুঃস্থ গ্রামবাসীদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য মজা-খাল কাটাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া ঠিক ওই ভাবে মাসের পর মাস লটারীর টিকিট কিনিয়া চলিয়াছেন যেমন!

কিন্তু মণীশ ও তাহার দাদামশায়ের মধ্যে তফাৎ ততটা—যতটা কচি ডাবে আর ঝুনা নারিকেলে!

সুতরাং আশা করা যাইতে পারে ভবিষ্যতে গোলদীঘিতে আনি কুড়াইয়া পাইলে মণীশ তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় জোড়াসাঁকোর আদি ব্রাহ্ম সমাজে যখন উপাসনা করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই উপাসনাস্থলে উপস্থিত হন। ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, যে, এই ব্যক্তির ফাতনা ডুবিয়াছে; অর্থাৎ তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, যে, শ্রীকেশবচন্দ্র ব্রহ্মে তন্ময় হইয়াছেন। এই ঘটনাটির কিছুকাল পরে আর এক দিন পরমহংসদেব তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া কলুটোলায় শ্রীকেশব-চন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসেন। কলুটোলার বাড়িতে আসিয়া শুনিলেন, যে, বেলঘরিয়ার সাধন-কাননে তিনি ব্রাহ্ম সাধকদের সঙ্গে উপাসনা করিতে গিয়াছেন। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া একটি গাড়ী ভাড়া করিয়া বেলঘরিয়ায় যান। সেখানে উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা চলিতে লাগিল। তিন-চার ঘণ্টা এইরূপে কাটিল। এই ধর্ম্ম-প্রসঙ্গের ভিতর উভয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই যোগের পর ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের কথা, অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্মের জন্য ঐকান্তিকতা, তাঁহার নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতার কথা কাগজে লিখিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের লেখা পড়িয়া ও ব্রাহ্ম সাধকদিগের মুখে তাঁহার বিশেষ ধর্ম্মভাবের কথা শুনিয়া আমার মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল এবং অনেকগুলি শিক্ষিত লোকের মনও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইল। আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমি বোধ হয় পাঁচ বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে মিলিত হইয়াছি এবং প্রত্যেক বার চার-পাঁচ ঘণ্টা করিয়া তাঁহার কথা শুনিয়াছি ও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়াছি। সে-সকল কথা সব স্মরণ নাই। তবে বিশেষ বিশেষ কথাগুলি কিছু কিছু মনে আছে।

আমাদের আলোচনা আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনকে লইয়া আরম্ভ হইত। তিনি প্রথম আলাপনের দিনে বহুবার জোড়াসাঁকোর কথা বলিলেন; অর্থাৎ শ্রীকেশবচন্দ্রের মুখে উপাসনার সময় যে একটি অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহার সহিত যে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়, তাহা বলিলেন।

দ্বিতীয় দিবস বেলঘরিয়ার সাধনকাননে যে-সকল কথা হইয়াছিল, তাহারও কয়েকটি কথা যাহা স্মরণ আছে, তাহা এক্ষণে নিবেদন করিতেছি।

পরমহংসদেব বলিলেন, যে, "আমি বেলঘরিয়ায় গিয়া দেখি যে কেশবচন্দ্র উপাসনা শেষ করিয়াছেন। আমি যাইবামাত্র আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং আমার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, যে, তুমি নাকি ব্রহ্মকে দেখ এবং তাঁহার কথা শ্রবণ কর? সে কিরূপ? কেশব বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মদর্শনের কথা, তাঁর কথা, শুনিয়া আমার মনে হইল, যে, কেশব এক জন বিশেষ ব্যক্তি, কেশবের কথা শুনিয়া আমার ভাবাবেশ হইল। আমার মর্ম্মকে স্পর্শ করিল। একবার কেশব বলে, আমি শুনি, একবার আমি বলি, কেশব শুনে, এইরূপে চার-পাঁচ ঘণ্টা কাটিল।" পরমহংসদেব কমলকুটীরে প্রায়ই আসিতেন, সেখানেও তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি। তিনি আসিলেই আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহাকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। তিনি জিলাপি খাইতে ভালবাসিতেন। একদিন বহু ব্রাহ্ম সাধকদিগের নিকট বলিলেন, "যে সত্য কথা বলে না তার ধর্ম্ম হয় না, ফাঁকি দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না।" এই কথার পর প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। ভোজনের শেষ ভাগে একটি জিলাপি লইয়া মুখের সম্মুখে নাড়িতে লাগিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছেন, আমি আর খেতে পারব না, পেটে জায়গা নাই! কিন্তু জিলাপি দেখিয়া তিনি বলিলেন, একখানা দাও। ত্রৈলোক্য বাবু একটু রহস্য করিয়া বলিলেন যে, আপনার সত্য কথা রক্ষা পাইল না। পরমহংস বলিলেন, যখন কোন

মেলায় মানুষ যায়, গাড়ীতে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু লাট-সাহেবের গাড়ী এলেই রাস্তায় জায়গা হয়, এখন পেটে জিলাপির জায়গা হবে, এতে সত্য রক্ষায় ব্যাঘাত হবে না।

তিনি যে কিরূপ ভাবে সত্যরক্ষা করিতেন তাঁহার একটি কথা শুনিলেই লোকে বুঝিতে পারিবে। এক দিন আমি কয়েকটি বন্ধু লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। নানা বিষয়ে কথা-বার্ত্তার পর তিনি বলিলেন যে, দেখ আমি যদি বলি যে আজ থেকে দুবার শৌচে যাব, তা হ'লে আমার সন্ধ্যায় বেগ না হ'লেও আমি সত্য রক্ষার জন্য শৌচে যাই।

তিনি ছিলেন খাঁটি লোক, কঠোর সত্য বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ধর্ম্মের নামে কোন আড়ম্বর করাকে ঘৃণা করিতেন। বাহিরে গৈরিক ধারণ, মালা পরিধান ও তিলক ফোঁটা প্রভৃতি আড়ম্বর দেখিলে খুব গ্রাম্য ভাষায় তাহার নিন্দা করিতেন।

ধর্ম্মের জন্য তাঁহার নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। ভগবানকে পাইবার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা এত অধিক ছিল যে, একবার মুসলমানদিগের ধর্ম্মসাধন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ পাঁচ বার উপাসনা করিতেন, মুসলমানী খাদ্য গ্রহণ করিতেন, মুসলমানী পরিধান পরিয়া ব্রহ্ম অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন এই রূপ সাধনের পর তিনি একটি ভিজ্যান (vision) দেখিলেন, যে, মুসলমানী বেশ ও মুসলমানী পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এক মূর্ত্তি তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইল। ইহাতে তাঁহার সাধনা বিপথে যাইতেছে অনুভব করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। আরও এইরূপ অদ্ভুত ও উৎকট সাধন তিনি করিয়াছেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে তাঁহার সহসাধক ছিলেন আমরা তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বেলঘরিয়ায় দেখা হইবার পর মাঘোৎসবের সময় তিনি কীর্ত্তনের দিবস প্রায়ই কমলকুটীরে আসিয়া যোগদান করিতেন এবং শ্রীকেশবের হাত ধরিয়া নাচিতেন। কেশবচন্দ্রও তাঁহাকে পাইলে অতিশয় আনন্দিত হইতেন। একদিন কেশবচন্দ্র নাচিতে নাচিতে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, যে, 'তুমি শ্যাম আমি রাধা,' অমনি পরমহংসদেবও বলিলেন, যে, 'তুমি শ্যাম, আমি রাধা'।

তিনি যদিও জীবনের প্রথম ও মধ্য অবস্থায় এক জন হিন্দু সাধক ছিলেন, কিন্তু শেষ অবস্থায় তাঁহার বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এক দিন কমলকুটীরে আসিয়া শ্রীকেশবচন্দ্রকে বলিলেন, 'দেখ কেশব তোমার কাছে এলে আমার চৌদ্দপোয়া কালী নুনের পুতুলের মত গলে যায়, আমি নিরাকারবাদী হই।' তিনি ব্রাহ্মদের শ্রদ্ধা করিতেন। কেশবচন্দ্রের উপর পরমহংসের কোন কোন বিষয়ে প্রভাব যেমন পড়িয়াছিল, সেইরূপ পরমহংসদেবের উপর শ্রীকেশবের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মদর্শনের প্রভাব বিশেষ ভাবে পড়িয়াছিল। দু-তিন বার পরমহংস-দেবকে বলিতে শুনিয়াছি যে, "ব্রাহ্মদের ভিতর কেশব এক জন বিশেষ লোক, কেশব বইয়ের কথা বলে না, নিজের ব্রহ্মদর্শনের ও ব্রহ্মশ্রবণের কথা বলে।"

উভয়ের মধ্যে একটা প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা দেখা যাইত। চুম্বক যেমন লোহকে আকৃষ্ট করে ইহারা উভয়ে উভয়কে এইরূপে আকৃষ্ট করিতেন।

শেষ বয়সে ব্রহ্মজ্ঞানসাধন, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মশ্রবণ এবং ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ বিশেষ উৎসবে যোগদান করা তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল।

শ্রীকেশবচন্দ্রের পীড়ার সময় একদিন আসিয়া বলিলেন, "কেশব, তুমি যদি চলে যাও, আমি কার সঙ্গে কথা কইব ?"

শ্রীকেশবচন্দ্রের তিরোধানে তিনি বিশেষ ভাবে আহত হইয়াছিলেন, তাঁহার শরীর মন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

স্বরলিপি

গান
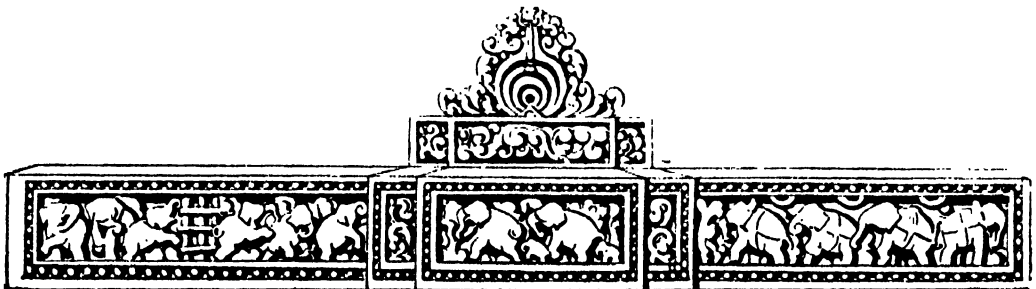
তোমায় সাজাব যতনে কুসুমরতনে
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে ॥
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা
কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা
সীমন্তে সিন্দুর অরুণ বিন্দুর
চরণ রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে ॥
সখিরে সাজাব সখার প্রেমে
অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে।
সাজাব সকরুণ বিরহ-বেদনায়
সাজাব অক্ষয় মিলন-সাধনায়
মধুর লজ্জা রচিব শয্যা
যুগল প্রাণের বাণীর বন্ধনে ॥
—"শাপমোচন"

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II না -া র্সা -া । -া -া -া দা I পা দা -র্সা না । দা দা পা -া I
তো ০ মা ০ ০ ০ ০ য্ সা জা ০ ব য ত নে ০

I মা পা -দা পা । মা পদপা মা গা I সগা গা -মা মা । মা -া মা গা I
কু সু ০ ম র ত০০ নে ০ কে য়ূ ০ রে ক ঙ্ ক ণে

I মা -ণা ণা ণদা । ণদা -া পা পা I গা মা পা দা । পা দা না র্সা I
কু ঙ্ কু মে চন্ ০ দ নে সা ০ ০ ০ জা ০ ০ ০

I নর্সা না দা পা । -া -া -া -া I না -া র্সা -া । -া -া -া -া I
ব০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তো ০ মা ০ ০ ০ ০ য্

I মা -দা দা দা । না -া র্সা র্সা I র্সর্রা -া র্রা র্রা । -র্সা না র্সা -া I
কু ন্ ত লে বে ষ্ টি ব স্ব র্ ণ জা ০ লি কা ০

I র্সা -ঋর্া ঋা ঋর্া । ঋর্া -া র্সা র্সা I না -া র্সা নর্সা । না দা পা -া I
ক ন্ ঠে দো লা ০ ই ব মু ক্ তা মা০ ০ লি কা ০

I গা মা পা দা । না র্সা জ্ঞর্া ঋর্া I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্স জ্ঞর্া জ্ঞর্া -া জ্ঞর্া । জ্ঞর্া -র্রা জ্ঞর্া জ্ঞর্া I র্রা জ্ঞর্া -র্মা জ্ঞর্া । জ্ঞর্া -ঋর্া ঋর্া র্সা I
সী ম ন্ তে সি ন্ দু র অ রু ০ ণ বি ন্ দু র

I ণা র্সা -জ্ঞর্া জ্ঞর্া । জ্ঞর্া -ঋর্া র্সা র্সা I না র্সা -া ঋর্সা । নর্সা না দা পা I
চ র ০ ণ র ন্ জি ব অ ল ক্ ত০ অ০ ঙ্ ক নে

I গা মা পা দা । পা দা না র্সা I নর্সা না দা পা । -া -া -া -া I
সা ০ ০ ০ জা ০ ০ ০ ব০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I না র্সা -া ঋর্সা । নর্সা -না দা পা I না -া র্সা -া । -া -া -া -া II
কে য়ূ ০ রে০ ক০ ঙ্ ক ণে তো ০ মা ০ ০ ০ ০ য়্

II সা সা -দা দা । দা দা পা -দা I মা পা -দা পা । মা পদপা মগা -া I
স খি ০ রে সা জা ব ০ স খা ০ র প্রে ০০০ মে০ ০

I গা গা -মা মা । মা -া পমা -গা I গা মা গা গা । ঋা -া সা -া I
অ ল ০ ক্ষ্য প্রা ০ ণে০ র্ অ মূ ০ ল্য হে ০ মে ০

I মা দদা -া দা । না না র্সা র্সা I র্স ঋর্া ঋর্া র্সা র্সা । না না র্সা -া I
সা জা ০ ব স ক রু ণ বি র ০ হ বে দ না য়

I সা ঋা -মা মা । মা -া পা মা I গা মা -গা গা । ঋা ঋা সা -া I
সা জা ০ ব অ ০ ক্ষ য় মি ল ০ ন সা ধ না য়্

I র্স জ্ঞর্া -া -া -া । ঋর্া -া র্সা -া I র্স জ্ঞর্া জ্ঞর্া -া জ্ঞর্া । জ্ঞর্া র্রা জ্ঞর্া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম ধু ০ র ল ০ জ্জা ০

I র্রা জ্ঞর্া র্রর্মা জ্ঞর্া । ঋর্া -া র্সা -া I ণা র্সা -জ্ঞর্া জ্ঞর্া । ঋর্া ঋর্া র্সা র্সা I
রু চি ০০ ব শ ০ য্যা ০ যু গ ০ ল প্রা ণে ০ র

I না র্সা -া ঋর্সা । নর্সা -না দা পা I গা মা পা দা । পা দা না র্সা I
বা ণী ০ র০ ব০ ন্ ধ নে সা ০ ০ ০ জা ০ ০ ০

I নর্সা না দা পা । -া -া -া -া I না -র্সা র্সা সঋর্া । নর্সা -না দা পা I
ব০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কু ঙ্ কু মে০ চ০ ন্ দ নে

I না -া সা -া । -া -া -া -া II II
তো ০ মা ০ ০ ০ ০ য়

বুধ্‌নী

"বনফুল"

(১)

জীবনের সহিত যদি প্রদীপের উপমাটা দেওয়া যায় তাহা হইলে বিল্টুর জীবন-প্রদীপের তৈল নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে— এ-কথা কিছুতেই বলা চলিবে না। কারণ বিল্টুর জীবন-প্রদীপে তৈল পূরাই আছে, সলিতাও ঠিক আছে, শিখাও উজ্জলভাবে জ্বলিতেছে। কিন্তু সে শিখা নিবিবে। একটি সবল ফুৎকারে তাহাকে নিবাইয়া দেওয়া হইবে। কাল তাহার ফাঁসি!

সে দোষী কি নির্দ্দোষ সে আলোচনা আমাদের অধিকারের বহির্ভূত। আইনের চক্ষে সে দোষী প্রমাণিত হইয়াছে এবং সমাজের মঙ্গলার্থে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। হয়ত তাহাকে লইয়া মাথাই ঘামাইতাম না, যদি সেদিন জেলখানায় বেড়াইতে গিয়া তাহার আর্ত্ত-করুণ চীৎকার না শুনিতাম!

"বুধ্‌নী,—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী।" ভীত মিনতিভরা কণ্ঠে সে ক্রমাগত চেঁচাইয়া চলিয়াছে। বুধ্‌নী তাহার স্ত্রীর নাম!

(২)

হাজারীবাগের পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস। এই পার্ব্বত্য পল্লীতেই একদা ধনুকধারী বিল্টু শিকার-সন্ধান করিতে করিতে বুধ্‌নীর দেখা পায় এক মহুয়া গাছের তলায়। নিকষ-কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরী বুধ্‌নী। সভ্য কোন যুবক আলো-ছায়া-খচিত মহুয়া তরুতলে কোন কিশোরীকে দেখিলে যে ঔদাসীন্য-ভরে চলিয়া যাইত, বিল্টু তাহা করে নাই। বন্য পশুর মত সে তাহাকে তাড়া করিয়াছিল। ত্রস্ত হরিণীর মত দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া বুধ্‌নী নিস্তার পায়। তখনকার মত নিস্তার পাইল বটে কিন্তু বিল্টু তাহাকে স্বস্তি দিল না। অসভ্যটা তাহাকে দেখিলেই তাড়া করিত।

(৩)

তাহার পর সেই বাঞ্ছিত দিবস আসিল।

ইহাদের মধ্যে বিবাহের এক বিচিত্র প্রথা প্রচলিত ছিল। মাঝে মাঝে প্রভাতে বিস্তীর্ণ মাঠে ইহাদের সভা বসিত। সেই সভায় কুমার এবং কুমারীগণের সমাগম হইত। একটা পাত্রে খানিকটা সিঁদুর গোলা থাকিত। কোন অবিবাহিত যুবক কোন কুমারীর পাণিপ্রার্থী হইলে তাহাকে সেই কুমারীর কপালে ওই সিঁদুর লাগাইয়া দিতে হইত। সিঁদুর লাগাইলেই কিন্তু যুবকের প্রাণ-সংশয়! সেই কুমারীর আত্মীয়-স্বজন তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ, সড়্‌কি, বল্লম লইয়া যুবাকে তাড়া করিবে এবং যুবা যদি আত্মরক্ষা করিতে না পারে—মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু সে যদি সমস্ত দিন আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহা হইলে সূর্য্যাস্তের পর আত্মীয়-স্বজনেরা মহা আনন্দে মাদল বাঁশী বাজাইয়া কলরব করিতে করিতে কন্যাকে বরের গৃহে পৌঁছাইয়া দিবে।

এই শক্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিল্টু বুধ্‌নীকে জয় করিয়াছিল। এই ত সেদিনের কথা! এখনও দুই বৎসর পূরা হয় নাই।

(৪)

অসভ্য বিল্টু জংলি বুধ্‌নীকে পাইয়া কি ভাষায় কোন্ ভঙ্গীতে তাহার প্রণয় প্রকাশ করিয়াছিল তাহা আমি জানি না। কল্পনা করাও আমার পক্ষে শক্ত। আমি ড্রইংরুম-বিহারী সভ্য লোক, বর্ব্বর বন্য-দম্পতীর আদবকায়দা আমার জানা নাই। যাহারা গুহা-নিবাসী সুপ্ত শার্দ্দূলকে ভল্লের আঘাতে হনন করে, মৃগের সঙ্গে ছুটিয়া পাল্লা দেয়, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে অহরহ অবলীলাক্রমে ওঠে নামে, পূর্ণিমা নিশীথে মহুয়ার মদে আনন্দের স্রোত বহাইয়া দেয়—তাহাদের প্রণয়লীলা কল্পনা করার দুঃসাহস আমার নাই।

শুধু এইটুকু জানি বিবাহের পর বিল্টু বুধ্‌নীকে এক দণ্ড ছাড়ে নাই। এক দণ্ডও নয়। বনে জঙ্গলে পর্ব্বতে গুহায় এই বর্ব্বর-দম্পতী অর্দ্ধনগ্ন দেহে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। বুধ্‌নীর খোঁপায় টকটকে লাল পলাশ ফুল—বিল্টুর হাতে বাঁশের বাঁশী। এই সম্বল!

(৫)

সহসা একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল।

বুধ্‌নী এক সন্তান প্রসব করিল। অসহায় ক্ষুদ্র এক মানবশিশু! বুধ্‌নীর সে কি আনন্দ! বর্ব্বর জননীরও মাতৃত্ব আছে, তাহারও অন্তরের সন্তান-লিপ্সা স্নেহময়ী জননীর কল্যাণী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধ্‌নী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল! বিল্‌টু দেখিল—একি! বুধ্‌নীকে দখল করিয়া বসিয়াছে এই শিশুটা! বুধ্‌নী ত তাহার আর একার নাই! অসহ্য!

(৬)

বিল্টুর ফাঁসি দেখিতে গিয়াছিলাম। সে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত চীৎকার করিয়া গেল—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী। ভগবানের নামটা পর্য্যন্ত করিল না।

নৃশংস শিশু-হত্যাকারীর প্রতি কাহারও সহানুভূতি হইল না।

প্রত্যূষ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একটি নিমেষ এল রজনীর অন্ধ-অবসানে
প্রত্যূষের প্রথম আভায়,
গাঢ় তমিস্রার স্রোতে শুচিশুভ্র ক্ষুদ্র শেফালিকা
কে বালিকা আদরে ভাসায়।
প্রশান্ত গগনপ্রান্তে এ নিমেষ নীরব গৌরবে
এল জানি মোরি মুখ চেয়ে,
অঞ্জলি বাড়ায়ে দিনু, গ্রহণ করিনু সযতনে,
তৃপ্ত তনুমন স্পর্শ পেয়ে।
রক্তধারে তারে তারে বাজিল মধুর রিণি রিণি,
রোমে রোমে মৃদু শিহরণ ;
ভয় ভক্তি ভালবাসা, গোপন আকাঙ্ক্ষা আশা যত
বিমুক্ত, প্রশান্ত এ লগন।
একাকী জাগিয়া আছি ঊষার উদার এ লগনে
চেয়ে দূর পূরব গগনে।
প্রভাতের প্রিয়া যেন হিয়া মোর আঁখি-বাতায়নে
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাল গণে।
শুনিতেছি সবে-জাগা পাখীর প্রথম কলগান
অস্ফুট জড়িত সুরমাখা,
ঈষৎ শিশিরসিক্ত স্নিগ্ধ বায়ু চোখে মুখে বুলে
কুহেলি-কোমল লঘু পাখা।

দেহ লঘুতর মোর বাতাসে কর্পূরসম ভাসে—
মুক্তবাধা প্রাণ-প্রস্রবণী,
হৃদয়স্পন্দন-ছন্দ প্রভাতী তারার স্পন্দনেতে
শোনে মাত্র মৃদু প্রতিধ্বনি।
অনিমেষ এ নিমেষ গতি নাই, নাই চঞ্চলতা
ভারমুক্ত মুগ্ধ অবসর,
জলে স্থলে ধরণীর সুবাসিত নবজাগরণে
পূজা-ধূপ দহে নিরন্তর।
এ লগনে প্রেম সে ত অন্তরের দেবতার পূজা
দেহ শুধু প্রদীপ-আধার ;
সুবর্ণ বর্ণের শিখা পূজারীর স্পর্শ অপেক্ষিয়া
ঊর্দ্ধমুখী জ্বলে অনিবার।
তুমি কি এসেছ পাশে, আভাসে দিয়েছ পরিচয়
প্রিয়া মোর কম্পিত দ্বিধায়—
কোমল কুন্তল-স্পর্শে, বিস্মৃত স্বপ্নের মোহ-মাখা
ম্লানমুখী রজনীগন্ধায় ?
তোমারে পড়ে না মনে ; নির্নিমেষ এ নয়ন দুটি
ছুটিয়াছে আলোর সন্ধানে,
ঊষার উদয়পথে উৎসুক হৃদয় তীর্থচারী
উদাসী সে দূর ঊর্দ্ধপানে।

আফ্রিকার ভীষণ সর্প 'মাম্বা'

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু, বি-এ

মাম্বা আফ্রিকার অতি ভয়ঙ্কর বিষধর। এদেশের লোকে যেমন কেউটিয়ার নাম শুনিলে চমকিয়া উঠে আফ্রিকার লোকেরা সেইরূপ মাম্বার নামে ভয়ে শিহরিয়া থাকে। সকল প্রকার বিষধর সর্পের মধ্যে সে-দেশের লোকেরা মাম্বাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে। দেখিতে ফণাবিহীন নিরীহ সর্পের মত হইলেও ইহারা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর সর্প তাহাই এই প্রবন্ধে বিবৃত করিব।

মাম্বার বৈজ্ঞানিক নাম ডেনড্রাস্‌পিস্ (Dendraspis)। আফ্রিকার উত্তর-সীমান্তের কয়েকটি স্থান ব্যতীত ঐ মহাদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এই বিষধরকে দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সকল স্থানে গুল্ম বা ক্ষুদ্র বৃক্ষের শ্রেণী থাকে সেই সকল স্থানেই নিঃসংশয়ে ইহাদের অবস্থিতি নির্ণয় করা যাইতে পারে। ইহাদের আকৃতি দেখিলে ইহাদিগকে সাধারণতঃ নির্ব্বিষ 'গেছো সাপ' বলিয়াই ভ্রম হইয়া থাকে। 'লাউডগা', 'বেত আঁচড়া' প্রভৃতি সর্পেরা যেমন সরু ও লম্বা হয় ইহারাও সেইরূপ সরু ও দীর্ঘাকার হইয়া থাকে। এক-একটি মাম্বা ৬।৮ ফুট দীর্ঘ হয় এবং এক জাতীয় মাম্বাকে দ্বাদশ ফুট অবধি দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। এরূপ দীর্ঘাকার হইলেও ইহাদের দেহ অত্যন্ত সরু। সাত ফুট লম্বা মাম্বার দেহ দেখিতে চাবুকের ছড়ির মত সরু।

ইহাদের অত্যুগ্র বিষের কথা চিন্তা করিলে ইহাদিগকে গোক্ষুরাদি সর্পের সমপর্য্যায়ভুক্ত না করিয়া থাকা যায় না। এই তীব্র বিষের জন্য আফ্রিকার লোকেরা অনুমান করে যে মাম্বারা এক সময়ে গোক্ষুর-জাতীয় সর্পই ছিল। বৃক্ষে উঠিতে শিখিয়া ও বৃক্ষের উপর ক্রমাগত অবস্থান করিয়া ইহারা কালক্রমে "গেছো সাপে" পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা যে কোন কালে গোক্ষুর-জাতীয় সর্প ছিল তাহা ইহাদের আকার দেখিলে আদৌ বিশ্বাস করা যায় না। তবে ইহাদের উগ্র বিষের কথা স্মরণ করিলে গোক্ষুরের সহিত ইহাদের যে কোন কালে জাতিগত ঐক্যের সম্ভাবনা ছিল তাহা অবিশ্বাস করিয়া একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা হয় না।

আফ্রিকায় চারি শ্রেণীর মাম্বা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 'দক্ষিণ-আফ্রিকার মাম্বারাই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মাম্বাদের সাধারণ বর্ণ ফিকে সবুজ। এই রক্ষণশীল বর্ণের সাহায্যে ইহারা এদেশের 'লাউডগা' সর্পের মত ঝোপ ও ক্ষুদ্র বৃক্ষাদির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া অনায়াসে শিকার ধরিয়া থাকে। লাউডগারা যেরূপ সরু ও দীর্ঘাকার হয় ইহাদের আকৃতিও অনেকটা সেইরূপ। দৈর্ঘ্যে ইহারা ছয় হইতে আট ফুট অবধি হইয়া থাকে। আর এক জাতীয় মাম্বাকে প্রায় দ্বাদশ ফুট অবধি দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর বর্ণ কৃষ্ণাভ হরিৎ। দেহের উপর সূর্য্যকিরণ না পড়িলে ইহাদের বর্ণ যে সবুজ তাহা অনুমান করা যায় না। এই কারণে ইহাদিগকে "কৃষ্ণ মাম্বা" বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

ইহাদের মস্তক সরু ও লম্বা ভাবের এবং চক্ষুর আকার বিশেষ বৃহৎ হইয়া থাকে। মুখের একেবারে পুরোভাগেই নাসারন্ধ্রের নিম্নে ইহাদের বিষদন্তের উদ্গম হইয়া থাকে। এই বিষদন্তের আকারও বেশ বৃহৎ হয়। ভয় পাইলে বা তাড়িত হইলে ইহারা মুখব্যাদান করিয়া থাকে। সেই সময়ে ইহাদের বৃহৎ বিষদন্ত দুইটি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বিষ যে কিরূপ উগ্র তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অনেকের মতে এই বিষ আফ্রিকার সকল বিষধরের বিষ হইতে উগ্র ও মারাত্মক। আফ্রিকার গোক্ষুর ও ভাইপারের বিষ নাকি ইহাদের বিষের মত তীব্র নয়। দংশন-কালে ইহারা মস্তক এবং দেহের পুরোভাগ অত্যধিক পরিমাণে পিছন দিকে হেলাইয়া দেয় এবং দংশনে যে বিষ ঢালিয়া দেয় তাহাতে অচিরেই জীবজন্তুর প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে। আফ্রিকায় গোক্ষুরের দংশনে যত লোকের প্রাণনাশ ঘটে, ইহাদের দংশনেও সেই পরিমাণ লোকের মৃত্যু হইয়া

থাকে। প্রজননকালেই ইহাদের দংশনের মাত্রা অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। এই সময়ে নিকটে লোক দেখিলেই ইহারা তীরবেগে ছুটিয়া দংশন করে। এরূপ ক্ষিপ্র গতিতে ইহারা ধাবন করে যে ইহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া কোন মতে সম্ভবপর হয় না। গোক্ষুররা যেরূপ দংশনের পূর্ব্বে 'ফোঁস্' শব্দ করিয়া জীবজন্তুকে উহাদের উপস্থিতি জানাইয়া দেয়, মাম্বারা সেরূপ কোন আভাস দেয় না। জনন-ঋতুতে ইহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ রুক্ষ হওয়ায় মানুষ দেখিলেই ইহারা একেবারে ছুটিয়া আসিয়া দংশন করে। অন্য সর্পের দংশন হইতে রক্ষা পাইবার উপায় থাকিলেও ক্ষিপ্রতা ও অত্যধিক ধাবনশক্তির নিমিত্ত ইহাদের কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। প্রজননকাল ব্যতীত অন্য কালে ইহাদের স্বভাব অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে। সে সময়ে মানুষের উপস্থিতি বুঝিলে ইহারা প্রায়ই পলায়নপর হইয়া থাকে।

আফ্রিকার ভীষণ সর্প মাম্বা।
মূকবধির শ্রীমণীন্দ্রনাথ পাল কর্ত্তৃক অঙ্কিত

গাছের উপর অথবা ভূমিতে ইহারা সমভাবেই ছুটিতে পারে। ইহাদিগকে বধ করিতে হইলে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ প্রথম আঘাতে বধ করিতে না পারিলে আক্রান্ত মাম্বারা দংশন না-করা পর্য্যন্ত আক্রমণকারীকে তাড়া করিয়া থাকে। এই সকল কারণে আফ্রিকার সমুদয় সর্পের মধ্যে মাম্বাকেই সকলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করিয়া থাকে এবং ইহাদিগকে সে-দেশের সকল বিষধরের মধ্যে সমধিক ভয়ঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করে।

মাম্বারা উহাদের গলদেশকে অল্প পরিমাণে প্রসারিত করিতে পারে। শিকারের প্রতি লক্ষ্য করিবার সময় ইহাদের গলদেশকে কথঞ্চিৎ বিস্তৃত হইতে দেখা যায়। যে-সকল স্থানে কাঠের গুঁড়ি ও তক্তা প্রভৃতি পড়িয়া থাকে সে স্থানে প্রায়ই বহু মাম্বাকে অবস্থান করিতে দেখা যায়। ঝোপ-জঙ্গলে বাস করিলেও ইন্দুর-শিকারের উদ্দেশে ইহারা মানুষের গৃহমধ্যেও প্রবেশ করে। বৃক্ষের উপর অবস্থানকালে শাখায় অবস্থিত ক্ষুদ্র পক্ষী ও নানাবিধ পোকামাকড় ধরিয়া ইহারা ভক্ষণ করে। বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ হইলে ইহারা বহুদিন জীবিত থাকে না। একবার একটি মাম্বাকে বাক্সের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় এক বৎসর কাল থাকিবার পর সর্পটি আপনা হইতেই আহার বন্ধ করিয়া দিয়া মরিয়া গিয়াছিল। মৃত মূষিকাদি যষ্টিতে সংলগ্ন করিয়া পালিত মাম্বার নিকট উপস্থিত করিলে উহারা গোক্ষুরাদি সর্পের রীতিতেই উহাকে ধরিয়া ভক্ষণ করে।

বরাবর পাহাড়ের প্রাচীন গুহা

শ্রীতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়

গয়া হইতে প্রায় ষোল মাইল উত্তরে প্রবর (আধুনিক নাম বরাবর) গিরিশ্রেণী। উহার প্রাচীন নাম খলতিক পর্ব্বত। সেখানে পর্ব্বতগাত্রে সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কতকগুলি প্রাচীন গুহা আছে বলিয়া শুনিয়াছিলাম। তাহা দেখিতে আমরা কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া মধুপুর হইতে ভোর সাড়ে চারিটার দিল্লী এক্সপ্রেসে রওনা হইলাম। আমরা যখন কিউল পৌছিলাম তখন বেলা প্রায় আটটা। এক্সপ্রেস লেট থাকায় গয়ার গাড়ী ধরা গেল না। খবর লইয়া জানিলাম পরের ট্রেন সেই বেলা প্রায় দুইটার সময় ছাড়িবে। অগত্যা মোটঘাট লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে গাছতলায় আশ্রয় লইলাম। কাছেই কিউল নদী। আধা বালি ও আধা জলে স্নান মন্দ হইল না। পরে গাছতলায় ষ্টোভ ধরাইয়া আহার ও বিশ্রাম। যথাসময়ে আবার ট্রেন ধরিয়া সারা দুপুরে ট্রেনে গরমে প্রায় অর্দ্ধ-সিদ্ধ হইয়া সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় গয়া পৌছিলাম।

(১) সুপিয়া বা কর্ণচৌপার গুহা।
(২) পাতালগঙ্গার পাশ দিয়া কর্ণচৌপার গুহার যাওয়ার রাস্তা।
(৩) কর্ণচৌপারের রাস্তা। দূরে সম্মুখে সিদ্ধেশ্বরনাথ

ষ্টেশনে নামিতে-না-নামিতেই সর্ব্বদিক হইতে "লাগিল পাণ্ডা নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।" তাহাদের প্রথম প্রশ্ন, "বাবুর কোন্ জিলা ঘর?" কলিকাতা বলিলে গোল বাড়িবে মনে করিয়া বর্ত্তমান আবাসস্থল মধুপুরের নাম করিলাম। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার পাইলাম না। মধুপুরেও নাকি তাহাদের অনেক যজমান আছে। শেষে অনেক কষ্টে বুঝাইলাম যে আমরা এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি মাত্র, কোনও ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মের জন্য আসি নাই। পাণ্ডাদের এইরূপে ঠাণ্ডা করিলে দ্বিতীয় সমস্যা হইল কোথায় গিয়া উঠা যায়। ষ্টেশনের নিকটেই একটি ধর্ম্মশালা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে স্থানাভাব। আমাদেরই মধ্যে এক জন পূর্ব্বে এই বরাবর পর্ব্বতগুহা দেখিতে একবার গয়ায় আসিয়াছিলেন। তিনিই আমাদের বর্ত্তমান দলের পথপ্রদর্শক। তিনি ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে গয়ায় ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের ধর্ম্মশালায় আমাদের লইয়া গেলেন। ধর্ম্মশালাটি দোতালা এবং বেশ ফাঁকার উপর অবস্থিত। এখানে প্রায় সবই বাঙালী যাত্রী। ধর্ম্মশালার চারি দিক বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ঘরগুলিও বড় বড়। আলো-হাওয়াও যথেষ্ট। এই

সেবাশ্রম-সঙ্ঘ গয়ায় আসিয়া অবধি যাত্রিগণের প্রতি পাণ্ডাদের অত্যাচার অনেক পরিমাণে কমিয়াছে এবং যাত্রীদের অনেক বিষয়ে সুবিধা হইয়াছে। সেই রাত্রেই বরাবরের জন্য গাড়ী ঠিক করিয়া রাখা গেল। সেভ্‌ন্‌-সিটার। বরাবর পাহাড় ঘুরাইয়া আনিবে। ভাড়া বারো টাকা লইবে।

পরদিন সকাল প্রায় সাতটার সময় আমরা মোটরে বরাবর-গুহা দেখিতে রওনা হইলাম। গাড়ী শহর ছাড়াইয়া রামশিলা-পাহাড়ের পাশ দিয়া পাটনা জাহানাবাদের রাস্তা ধরিয়া চলিল। রাস্তার দুধারে গম, যব, অড়হর প্রভৃতির ক্ষেত। তাহারও ওধারে একদিকে বালুকাময় শীর্ণকায়া ফল্গু এবং অন্য দিকে পাটনা-গয়া লাইন। গয়া হইতে পাঁচ-ছয় মাইলের পর রাস্তা বেশীর ভাগই কাঁচা। তাহার উপর আবার বর্ষার সময় গরুর গাড়ী চলিয়া গভীর খাল কাটিয়া গিয়াছে। গাড়ীর চাকা একবার তাহার মধ্যে পড়িলে ঝাঁকানির অন্ত নাই। চড়িয়া মনে হইতেছিল, বিহারে শুধু এক্কা কেন, যে-কোন যানেই প্রতিমুহূর্ত্তে গড়াগড়ি যাওয়ার যোল-আনা সম্ভাবনা আছে। তবে ভাগ্যগুণে ড্রাইভার নিপুণ হওয়ায় সে সম্ভাবনা কার্য্যত ঘটে নাই। এইরূপে প্রায় বার মাইল আসিয়া আমরা পাটনার রাস্তা ছাড়িয়া বেলা-ষ্টেশনের পাশ দিয়া পূর্ব্বদিকে চলিলাম। এ রাস্তা আরও খারাপ। স্থানে স্থানে গাড়ী উল্টাইবার ভয় হইতে লাগিল। দূরে বরাবর গিরিশ্রেণী দেখা যাইতে লাগিল। প্রায় ছয় মাইল গিয়া উত্তরে এক রাস্তা পাওয়া গেল। ধারে কাষ্ঠফলকে লেখা আছে, "টু দি বরাবর এণ্ড নাগার্জ্জুনী কেভ্‌স্‌—টু মাইল্‌স।" সেই রাস্তা ধরিয়া যখন পাহাড়ের তলদেশে গিয়া পৌছিলাম তখন বেলা প্রায় আটটা। এখানে গুহাসকল পাহারা দিবার জন্য সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত এক চাপরাসী থাকে। সে সব গুহা দেখাইয়া দিতে পারে। আমাদের নিজেদের পথপ্রদর্শক থাকায় আমরা তাহার সাহায্য লই নাই।

সম্মুখেই এক ছোট ঝর্ণা। দুই পাশে পাহাড় উঠিয়া গিয়াছে। মধ্যে বড় বড় পাথরের ফাটলের মধ্য দিয়া কুল্‌ কুল্‌ শব্দে ক্ষীণকায়া জলধারা নামিয়া আসিয়া তলায় এক কুণ্ডে পড়িতেছে। এই ঝর্ণার নাম পাতালগঙ্গা, জল পরিষ্কার ও সুস্বাদু। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে যদি কেহ ভবিষ্যতে এই সকল গুহা দেখিতে আসেন তবে যেন বরাবর পাহাড়, পাতালগঙ্গা যাইবেন বলিয়া গাড়ী ঠিক করেন। নচেৎ গাড়ীওয়ালা তাহাকে এই পাহাড়ের উল্টাদিকে হাতিয়াভোর নামক স্থানে লইয়া যাইতে পারে। তথা হইতে এখানে আসিতে গেলে অনেকটা চড়াই ভাঙিয়া আসিতে হইবে ও বহু শ্রম পণ্ড হইবে। ঝর্ণার পাশ দিয়া পশ্চিম দিকে পথ পাহাড়ের উপর চলিয়া গিয়াছে। ছিক দিন পূর্ব্বে কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী আসিয়াছিলেন বলিয়া পর্ব্বতগাত্রে স্থানে স্থানে ধাপ কাটা হইয়াছে। তাহাতে উপরে উঠিতে কিছু সুবিধা হইয়াছে। আমরা উঠিতে আরম্ভ করিলাম। চারিদিকে কেবল বড় বড় পাথর। মাঝে মাঝে বন্য কুল, বৈঁচি প্রভৃতি কাঁটাগাছের ঝোপ। জঙ্গল বলিতে কিছু নাই। এইরূপে প্রায় এক শত ফুট উঠিয়া আমরা এক বিস্তৃত অধিত্যকায় আসিয়া পৌছিলাম। ইহার চারিদিকে পাহাড় উঠিয়াছে। দূরে উত্তর-পশ্চিমে বরাবর গিরিশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে সিদ্ধেশ্বরনাথ শিবের মন্দির। নীচে হইতে তাহা ছোট সাদা বিন্দুর মত দেখাইতেছিল।

সাতঘরোয়ার সম্পূর্ণ গুহা।
প্রবেশ-পথটির ডান দিকে অশোকের লিপি আছে।

বিসমোরিয়া গুহা

সেই রাস্তায় আরও কিছু দূর গিয়া সম্মুখে সুপিয়া বা দরিদ্র কান্তার (আধুনিক নাম কর্ণ চৌপার) গুহার দ্বার

দেখা গেল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে শায়িত এক বৃহৎ প্রস্তর কাটিয়া এই গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে। গুহার প্রবেশদ্বার প্রায় ছয় ফুট উচ্চ এবং উত্তরমুখ। প্রাচীন মিশরীয় দ্বারের ন্যায় তাহা নীচের দিকে অধিক চওড়া। নীচে দুই ফুট নয় ইঞ্চি চওড়া এবং উপরে দুই ফুট তিন ইঞ্চি। গুহাটি প্রায় তেত্রিশ ফুট দীর্ঘ এবং প্রস্থে প্রায় চৌদ্দ ফুট। গুহার দেওয়াল ছয় ফুট উচ্চ এবং দুয়ারের নিকট প্রায় তিন ফুট মোটা। গুহার ছাদ বৃহৎ খিলানের ন্যায় গোল। তাহাতে মধ্যদেশে গুহার উচ্চতা প্রায় এগার ফুট হইয়াছে। কঠিন গ্র্যানাইট জাতীয় প্রস্তর কাটিয়া এই গুহাগুলি নির্ম্মিত। ভিতরে গুহার দেওয়াল দর্পণের ন্যায় মসৃণ। আজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরেও তাহা এরূপ আছে যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সারনাথের অশোকস্তম্ভের গাত্রের সহিত এই গুহার দেওয়ালের চিক্কণতার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। গুহার একধারে একটি মানুষ শুইতে পারে এরূপ একটি বেদী আছে। প্রবেশদ্বারের বহির্দ্দিকের লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে রাজা প্রিয়দর্শী (অশোক) তাঁহার

সাতঘরোয়ার অসম্পূর্ণ গুহা

অভিষেকের উনবিংশ বৎসরে (প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৪৫ অব্দে) খলতিক পর্ব্বতস্থ এই গুহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত আর্থার হাওয়েল* ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযু চারুচন্দ্র বসুও তাঁহার অশোক-অনুশাসন † গ্রন্থের এই লিপির বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উল্লিখিত স্থানে আমরা কোন লিপি দেখিতে পাই নাই। প্রবেশ-দ্বারের ভিতরে দেওয়ালে ইতস্ততঃ এক-আধ লাইন যে-সব লিপি খোদিত আছে তাহার কোনটাই অশোকের সময়ের নহে বলিয়া মনে হয়।

কর্ণচৌপার গুহার উল্টাদিকে তাদৃশ অন্য এক প্রস্তরে দক্ষিণ-দ্বারী আরও দুইটা গুহা আছে। গুহাদুইটির আধুনিক নাম সাতঘরোয়া গুহা। ইহাদের মধ্যে পশ্চিম দিকেরটি সম্পূর্ণ পূর্ব্বেরটি অসম্পূর্ণ। ইহাদের প্রত্যেকটি দুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রথম প্রকোষ্ঠটির মাপ প্রায় কর্ণচৌপার গুহার ন্যায়, তবে উচ্চতায় আরও কিছু অধিক। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটি গোলাকার। উহার ব্যাস প্রায় কুড়ি ফুট। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের সম্মুখে প্রথম প্রকোষ্ঠের একদিকের দেওয়ালে চালাঘরের 'ছেঁচে'র ন্যায় বরাবর একটি কার্ণিশ আছে। দেখিয়া মনে হয় দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটিকে তপস্বীদের পর্ণকুটীর কল্পনা করিয়া ঐরূপ করা হইয়াছে। পশ্চিমের গুহার প্রবেশদ্বারের ঢুকিতে-ডান-দিকে প্রাচীন পালি ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে এক লিপি আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে এই নিগোহ কুভা রাজা প্রিয়দর্শী কর্ত্তৃক অভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে নির্ম্মিত হইয়া আজীবকদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল (লাজিনা পিয়দসিনা দুবাডসবসাভিসিতেনা ইয়ং নিগোহ কুভা দিনা আজিবিকেহি)। দুর্ভাগ্যবশত যাইবার পূর্ব্বে ম্যাগ্নেসিয়ম তার প্রভৃতি কোন উজ্জ্বল আলোক জোগাড় করিতে না পারায় লিপিগুলির আলোকচিত্র আনিতে পারি নাই। এই আজীবক সম্প্রদায় অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। ইহাদের সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ইহারা নগ্ন থাকিতেন এবং ইহারাই গ্রীকদের জিম্‌নসফিষ্ট্‌। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে ইহাদের মত কিছু কিছু উদ্ধৃত পাওয়া যায়। লিপির মধ্যে

* Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, December, 1871.

† ইহার এবং অন্যান্য লিপির অনুবাদে চারুবাবুর উক্ত পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি।

'আজিবিকেহি' কথার খানিকটা কাটিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা পরবর্ত্তী অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা ঈর্ষ্যাবশে কৃত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মহারাজা অশোক নিজে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন আজীবকগণকে এই গুহাসকল দান তাহার অন্যতম প্রমাণ। এই গুহাগুলিতে পরে অন্য নানাধর্ম্মাবলম্বী সাধু বাস করিয়া গিয়াছেন এবং ইহাদের নূতন নূতন নামও দিয়া গিয়াছেন। সাতঘরোয়া গুহার অশোক-প্রদত্ত নিগোহ কুভা নাম ছাড়া পশ্চিমেরটিতে 'ক্লেশকান্তার' এবং পূর্ব্বের অসম্পূর্ণ গুহাটিতে 'বোধিমূল' এই নাম দুইটি উৎকীর্ণ আছে।

পাশের অসম্পূর্ণ গুহাটির দেওয়ালগুলি অন্য গুহার ন্যায় চিক্কণ, কিন্তু ছাদটি এব্ড়ো-খেব্ড়ো অবস্থায় অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। বোধ হয় তৈয়ারী করিবার সময় ফাটিয়া যাওয়ায় এরূপ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে এই গুহাটির প্রবেশদ্বারটি নানা কারুকার্য্যমণ্ডিত। এরূপ আর অন্য কোন গুহায় নাই। প্রবেশদ্বারের কিছু উপরে গোলভাবে একটি চওড়া কার্ণিশ করা হইয়াছে এবং তাহার তলে কতগুলি হস্তী খোদিত আছে। উহা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। দুয়ারের উপরে সংস্কৃত ভাষায় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মৌখরি-বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা যজ্ঞবর্ম্মার পৌত্র এবং শার্দ্দূলবর্ম্মার পুত্র রাজা অনন্তবর্ম্মার এক লিপি আছে। অনন্তবর্ম্মা এই গুহাতে কৃষ্ণমূর্ত্তি ("কৃষ্ণস্যাকৃষ্ণকীর্ত্তেঃ") স্থাপনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপূজার ইহাই বোধ হয় প্রাচীনতম নিদর্শন। লিপির মধ্যে গুহাগুলি "বিন্ধ্যস্যাপূর্ব্বগুহায়াং" অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বতের অপূর্ব্ব গুহাতে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এই গুহা কয়টি দেখিয়া আমরা আবার নামিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর আসিয়া ডান দিকে এক রাস্তা পাওয়া গেল। সেই রাস্তা ধরিয়া খানিক নামিয়া গিয়া বিসমোরিয়া বা খঝোপ্রী গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। গুহার সম্মুখে প্রবেশদ্বারটি প্রায় আট ফুট চওড়া এবং দশ ফুট আন্দাজ লম্বা। উচ্চতায় ছয় ফুট। ঢুকিতে ডান দিকে প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে অশোকের লিপি আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে অশোকের অভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে আজীবকগণের জন্য অশোক ইহা নির্ম্মাণ করেন (লাজিনা পিয়দসিনা দুবাডসবসাভিসিতেনা ইয়ং কুভা খলতিকপবতসি দিনা

বাপিয়া কুভা

নাগার্জ্জুনী গুহা।
গুহাদ্বারের উপরে দশরথের লিপি

আজিবিকেহি)। পূর্ব্ববর্ণিত লিপির ন্যায় এই লিপিরও 'আজিবিকেহি' শব্দটি কে উঠাইয়া দিয়াছে। প্রবেশপথটি বড় হইলেও মূল গুহাটি নিতান্ত ছোট এবং অসম্পূর্ণ।

বিসমোরিয়া গুহা দেখিয়া আমরা পাহাড় হইতে পাতাল-গঙ্গার ধারে আসিয়া নামিলাম। সেখানে খানিক ক্ষণ বিশ্রাম লইয়া পূর্ব্বদিকে নাগার্জ্জুনী গুহা দেখিতে চলিলাম। এই গুহাগুলি পাতালগঙ্গা হইতে প্রায় এক মাইল। পাহাড়ের ধার দিয়া, ধানক্ষেতের উপর দিয়া হাঁটা রাস্তা। মাঝে মাঝে তালবন। সমতলভূমি হইতে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উপরে নাগার্জ্জুনী গুহা। উঠিবার সিঁড়ি আছে। গুহাটি পূর্ব্ববর্ণিত গুহা গুলির ন্যায়, তবে মাপে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রায় ছেচল্লিশ ফুট লম্বা এবং কুড়ি ফুট চওড়া। গুহার দুই দিক অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার। গুহার দ্বারের উপরে লিপি হইতে জানা যায় যে ইহা অশোকের পৌত্র দশরথ (প্রায় খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ২১৪ অব্দে) আজীবক ভিক্ষুগণকে, যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ("আচন্দ্রি-মসুলিয়ে") তত দিনের জন্য, দান করিয়াছেন। এই লিপি ছাড়া গুহার প্রবেশদ্বারের বামদিকে অনন্তবর্ম্মার এক লিপি আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি এই গুহাতে কাত্যায়নী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। "উন্নিদ্রস্য সরোরুহস্য সকলমাক্ষিপ্য শোভাং রুচাঃ। দেব্যা মহিষাসুরস্য শিরসি ন্যস্তঃ ক্বণন্নূপুরপদম্॥ গুহামাশ্রিত্য কাত্যায়নী" ইত্যাদি।

ইহা শার্দ্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে সুন্দর শ্লোকে লেখা। দুঃখের বিষয় সময়াভাবে সমস্ত লিপি নকল করিয়া আনিতে পারি নাই। ইহা ছাড়া আর এক জায়গায় "আচার্য্য শ্রীযোগানন্দঃ প্রণমতি সিদ্ধেশ্বরং"—উৎকীর্ণ আছে। ইহা খুব সম্ভব অষ্টম শতাব্দীর লিপি। ইহা হইতে জানা যায় যে বরাবর পাহাড়ে সিদ্ধেশ্বরনাথ শিব তখনও বর্ত্তমান ছিলেন। কিছুদিন হইতে ইহা মুসলমানগণের দ্বারা দরগারূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

নাগার্জ্জুনী গুহা দেখিয়া ঐ পাহাড় বেষ্টন করিয়া আমরা আরও খানিক পূর্ব্ব দিকে গিয়া দুইটি গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইহার রাস্তা কাঁটা-জঙ্গলে সমাকীর্ণ। এই গুহা দুইটি এমন জায়গায় অবস্থিত যে পূর্ব্ব হইতে জানা না থাকিলে বা সঙ্গে পথপ্রদর্শক না থাকিলে খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর। যে অধিত্যকার উপর গুহাদ্বয় অবস্থিত তাহার প্রায় চারি দিকেই পাহাড়। তাহার মধ্যে উত্তর দিকের পাহাড়ের দক্ষিণ গাত্রে দুইটি পাথর কাটিয়া গুহাদ্বয় নির্ম্মিত। গুহা দুইটি আকারে ছোট। তন্মধ্যে পশ্চিমের গুহাটির নাম বাদিথি কুভা, অন্যটির নাম বাপিয়া কুভা। গুহার প্রবেশদ্বারের উপরে লিখিত লিপি হইতে জানা যায় যে ঐ দুইটি গুহাই দশরথের দ্বারা নির্ম্মিত। তাহা ছাড়া বাদিথি কুভাতে অনন্তবর্ম্মার লিপি আছে। অনন্তবর্ম্মা এই গুহাতে "বিম্বং ভূতপতেঃ" অর্থাৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাদিথি কুভা ইটের দেওয়াল দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। কোন মুসলমান ফকির কর্ত্তৃক প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। এই গুহাদ্বয়ের সম্মুখে অধিত্যকার উপরেই নয় ফুট চওড়া ইট দিয়া বাঁধান এক কূপ আছে। উহাও গুহানির্ম্মাণের সময় নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয় কারণ কূপের দেওয়ালের ইট নালন্দা, সারনাথ প্রভৃতির ইটের মত।

গুহাগুলির মধ্যে ঢুকিলে প্রথমে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। পরে সেই অল্প আলোকে চক্ষু অভ্যস্ত হইলে তখন সব দৃষ্টিগোচর হয়। গুহাগুলির আর এক বিশেষত্ব এই যে উহার মধ্যে সামান্য শব্দ হইলেই তাহা চারিদিক হইতে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। গুহাগুলি বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রোটেক্‌টেড মনুমেণ্ট য়্যাক্ট অনুসারে রক্ষিত। এখন আর সেখানে কেহ বাস করে না।

এই পাহাড়গুলিতে বাঘ আছে বলিয়া শুনিয়াছি। তাহা ছাড়া এখানে মাঝে মাঝে দস্যুরও ভয় আছে। অতএব এখানে আসিতে হইলে সকালের দিকে এবং লোকজন লইয়া আসাই শ্রেয়। সিদ্ধেশ্বরনাথ শিবের জন্য এখানে ভাদ্রমাসে এক মেলা বসে। তখন অনেক লোক সমাগম হয়।

সব দেখা সারিয়া আবার মোটরের ঝাঁকানি খাইতে খাইতে আমরা যখন গয়ায় ফিরিয়া আসিলাম তখন প্রায় বেলা তিনটা।

প্রথমা

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

তোমারে ভুলিতে হ'ল, সেকথা যে ভুলিবার নয় ;
আমার জীবন হ'তে আজ তুমি চির-নির্ব্বাসিতা,
কৈশোর-প্রাগুষা-লগ্নে শুকতারা সম বিকশিতা
অয়ি মোর প্রথমিকা, ফুরায়েছে তোমার সময়।

আমার আকাশে তুমি প্রেমময় প্রথম প্রভাত ;
কৃষ্ণপক্ষ-নিশান্তের স্নিগ্ধজ্যোতি তুমি গো কিশোরী,
মধুর মধুর তুমি, তবু হায় গিয়াছি বিস্মরি ;
আমার বসন্ত-বনে আসিবে না আর সেই রাত।

তুমি এনেছিলে প্রেম, তব চোখে হেরেছি তাহারে,
স্বপ্নের স্বর্গের প্রেম—স্পর্শ-ভীরু সে প্রেম তোমার,
নিশীথ-স্বপন-সম মিলায়েছে রেশটুকু তার ;
ক্ষীণায়ু প্রথম প্রেম,—তারে বল কে বাঁচাতে পারে ?

তবু তোমা ভুলি নাই, আজি তাই বাসর-শয্যায়
বধূরে জড়ায়ে বুকে, ওষ্ঠ হ'তে নিঙাড়ি অমিয়
স্মরণ করিনু এক বিস্মৃতির স্বপ্ন রমণীয়,—
সে স্বপ্ন তোমারে নিয়ে রচিয়াছি মিলন-জ্যোৎস্নায়।

অতিক্রান্ত লগ্ন তব, তবু তোমা ভুলিতে পারি নি ;
দুর্লভ স্বপ্নের মাঝে বেঁচে আছ হে অভিসারিণী।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের প্রতি

ওঁ

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ

আপনার রাজদত্ত সম্মান লাভের পর কিছুদিন বিলম্ব হয়ে গেল—যথোচিত অভিনন্দন পাঠাতে পারি নি তার কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। বিবাহ-উৎসবে বিধবার যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ—আমি উপাধিত্যাগী, কী আখ্যা দেবেন? অপাধিক? আপনার নব উপাধি-সম্প্রদান উপলক্ষ্যে শঙ্খধ্বনি হয় তো আমাকে শোভা পায় না। তবু আপনার রাজধানীর বন্ধুসভা থেকে দূরে এই অন্তরালে বসে রাজবুদ্ধির প্রশংসাবাদ জানাচ্চি। আমাদের এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর মধ্যে যতদিন ছিলেন ততদিন আপনার প্রকাশ অবরুদ্ধ ছিল, তাই রাজার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত ছিলেন—আজ প্রশস্ত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং সম্মানও পেয়েছেন তারই উপযুক্ত। আমরা আপনাকে নিতান্ত আটপহুরে শাস্ত্রী উপাধি দিয়েছিলেম দীন-জনোচিত সঙ্কোচের সঙ্গে, সেটা মানী সমাজে ব্যবহার্য্য নয়। সেটা আজ এখানকার ধূলিতেই স্খলিত হয়ে রইল।

ইতিমধ্যে দুই বার রোগের অভিঘাতে আমার জরার জীর্ণতা আরো বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। বিশ্রামের ইচ্ছা করে থাকি, কিন্তু সেটা আমার পক্ষে দরিদ্রের মনোরথেরই তুল্য হয়েছে। বিশ্রান্তির চরম উপাধি যিনি আমাকে দেবেন, তিনি আসন্ন হয়েছেন। ইতি ১৮ জানুয়ারি, ১৯৩৬

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য সুহৃদ্বরেষু

বিদ্যার তপস্বী তুমি। আজ তুমি যশস্বী ভারতে;
কবি তব জয়মাল্য সঁপি দিল তব জয়রথে।
এই আশীর্ব্বাদ করিঃ—তব যাত্রা হোক্ অগ্রসর
অপূর্ব্ব কীর্ত্তির পথে উত্তরিয়া দেশদেশান্তর
দূর হতে দূরে। একদিন যবে অখ্যাত নিভৃতে
স্তব্ধ ছিলে, অন্তর্লীন আনন্দের অদৃশ্য রশ্মিতে
সিদ্ধি ছিল মহীয়সী; ভারতীর প্রসাদবৃষ্টিতে
ছিল তব পুরস্কৃতি, ছিল না তা' লোকের দৃষ্টিতে।
জ্ঞানের প্রদীপ তব দীপ্ত ছিল ধ্যানের আড়ালে
নিষ্কম্প আলোকে। আজ জনারণ্যে চরণ বাড়ালে,
সেথা পরিচয় লাগি নাম মাগে উপাধির সীমা,
সেথা মহিমার চেয়ে মানে লোকে চিহ্নের গরিমা।
চিহ্ন না রহিতে তবু তোমারে চিনিয়াছিল যারা
তাদের সম্মানমাল্য জনতার কাছে মূল্যহারা।
যেথা যাহা প্রয়োজন তাই দিন্ সৌভাগ্য-বিধাতা,
পদবীর পরিমাপে হয় যদি হোক্ উচ্চ মাথা।
বিশ্বে তুমি দৃশ্য হও ভালে বহি রাজদত্ত টিকা,
বন্ধুচিত্তে থাকো লয়ে নির্লাঞ্ছন আত্মালোকশিখা॥

শান্তিনিকেতন
১২ মাঘ ১৩৪২

বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের বার্ষিক প্রদর্শনী

উপরের সারি : জেবউন্নিসা—শ্রীকালীপদ ঘোষাল বধূ—শ্রীনিবেদিতা ঘোষ স্বর্ণকুম্ভ—শ্রীনন্দলাল বসু

নীচের সারি : কুটীর—শ্রীতারক বসু প্যাগোডার ছায়াতলে—শ্রীললিতমোহন সেন

বোধিচর্য্যাবতার—শান্তিদেব রচিত। কাপিল মঠাচার্য্যকৃত অনুবাদ সহ। প্রথম হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয় ভাগ। গোবিন্দকুমার সংস্কৃত গ্রন্থাবলী—২। সম্পাদক শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্। শ্রীগোপেন্দ্রকুমার চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্ কর্তৃক প্রকাশিত। ৩২নং বিডন রো, কলিকাতা। মূল্য—৷৹ আট আনা।

এই গ্রন্থের শেষ অংশ (নবম পরিচ্ছেদ) 'প্রথম ভাগ' নামে ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা ১৩৪১ সনের জ্যৈষ্ঠমাসের প্রবাসীতে সমালোচিত হইয়াছে। প্রথমভাগের পদ্ধতি অবিকলভাবে দ্বিতীয় ভাগেও অনুসৃত হইয়াছে। সুতরাং, এই ভাগ সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার বিশেষ কিছু নাই। তবে বিষয়ের দিক দিয়া বিচার করিলে প্রথম ভাগ অপেক্ষা এই ভাগ সাধারণের পক্ষে বেশী চিত্তাকর্ষক। ইহার মধ্যে দুরূহ দার্শনিকতার লেশমাত্র নাই; পক্ষান্তরে ধর্ম্মভীরু সাধারণ গৃহস্থের জীবনে অনুসরণীয় নীতিই ইহার মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। যথাসম্ভব সরল, সুললিত ভাষায় গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে পাঠক পরিতৃপ্ত ও উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। তবে, অনুবাদের ভাষা মূলের ভাষার ন্যায় তেমন সুমধুর না হওয়ায় অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠক হয়ত ইহার পূর্ণরস উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইবেন। অনুবাদের অসঙ্গতি স্থানে স্থানে (২।২২, ৫।২৭, ৩৫, ৪৫, ৬।৭২, ৭।৭০ প্রভৃতি) সংস্কৃতজ্ঞ পাঠককেও বিচলিত করিয়া তুলিতে পারে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

সনাতন ধর্ম্ম—শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, শাস্ত্র-বিশারদ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান হিন্দুসভা, শ্রীহট্ট ও আর্য্যসমাজ, শ্রীহট্ট। মূল্য ৵৹ আনা। পৃঃ।৹+৩৯।

পুস্তিকাখানিতে বহু শাস্ত্রীয় বচনের দ্বারা লেখক প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থার সহিত বর্ত্তমান জাতিভেদের কোনও মিল নাই। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সামাজিক সংস্কারের বিপক্ষতা করিয়া থাকেন, তিনি তাহাদের মতকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি সফল হইয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তদ্ভিন্ন তিনি প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণত্বের যে আদর্শ ছিল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে আমাদের শিখিবার জিনিষও অনেক আছে।

আমরা পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

সূর্য্য-সাধনা ও প্রাণায়াম শিক্ষা—মণি ধর প্রণীত, মণি ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

ইহাতে আসন, মুষ্টিযোগ, সূর্য্য-প্রণাম ও প্রাণায়াম শিক্ষার কৌশল সচিত্র বিবৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা কিরূপে রোগমুক্ত হওয়া যায় সে কথাও আছে। বইখানি সুদৃশ্য।

হাতেম তাই—ছেলেদের নাটক। এ. এইচ. এম. বসির উদ্দিন বি. এ. প্রণীত। মুসাম্মাৎ জাহানারা খানম চৌধুরাণী কর্ত্তৃক রামনগর, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

মহৎ চরিত্রে জাতিভেদ নাই। হাতেম তাইএর মত সাধু চরিত্র সকল কালের আদর্শ। বইখানা ছেলেদের অভিনয়ের পক্ষে ভাল হইয়াছে। ইহার মুদ্রণকার্য্য পূর্ব্ববঙ্গে সম্পন্ন হওয়ায় কতকগুলি অনিবার্য্য উচ্চারণ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 'হা ভগবান', 'পাজী', 'বুক ফেটে যায়' ইত্যাদি। 'ড়'-এর স্থানে 'র' ব্যবহারও পূর্ব্ববঙ্গসুলভ। 'সঙ্গে' শব্দটি 'সঙে' হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

কাটার্স গাইড্ বা কাটছাঁট শিক্ষক—শ্রীঅমূল্যগোবিন্দ মৈত্র প্রণীত। মূল্য ২৷৹ টাকা। মহিলাগণ আজকাল নিখুঁতভাবে ছাঁটকাট শিক্ষা করিতে চান। কাটার্স গাইড্ তাঁহাদের এবং অন্য সকলেরও উপযোগী। কিন্তু যাঁহারা একেবারেই নূতন তাঁহাদের বিশেষ কোন কাজে আসিবে না।

টিপু সুলতান—লেখক আবদুল কাদের বি-এ। বইখানি ছোট হইলেও ইহাতে যথাসম্ভব সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে।

ঠাকুরের চিঠি—স্বামী নিগমানন্দের কয়েকখানি চিঠি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। চিঠিগুলি নানা উপদেশে পরিপূর্ণ।

বাহির ও ভিতর—শ্রীগোবিন্দ রামানুজ দাস মোহন্ত প্রণীত। গ্রন্থকার সাহসিকতার সহিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বহুবিধ দুর্নীতির আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা প্রশংসনীয় কিন্তু কোন কোন স্থানে তিনি চপলতার পরিচয়ও দিয়াছেন। তাহা না দিলেই ভাল হইত।

জাতিকথা—স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত। জাতিভেদ সম্বন্ধে বহু দার্শনিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া স্বামীজী দেখাইয়াছেন—জাতিভেদ মিথ্যা। কিন্তু মিথ্যা বলিলেই বা শোনে কে? জাতিভেদ ও ছুৎমার্গের উপর আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের তীব্র কশাঘাত, এখন দেখিতেছি প্রাণহীন প্রস্তরমূর্ত্তিকেই আঘাত করিয়াছে। হিমালয়ের মত পাথর হইয়া জাতিভেদ হিন্দুর বুকে বসিয়া আছে, তাহাকে টলাইবে কে?

মুক্তির রূপ—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত। নবীন সমাজ সৃষ্টির কল্পনা লইয়া বারীনবাবু তরুণদের ডাকিয়া বলিয়াছেন—"মানুষের বন্ধনই মুক্তি, আবার মুক্তিই বন্ধন।...কালো কৃষ্ণই বন্ধন আর গৌরাঙ্গী রাধাই মুক্তি, এই যুগল মিলনের মহারাসই জীবনকে ক'রে রেখেছে আনন্দ বৃন্দাবন।"

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

জন্মস্বত্ব

শ্রীসীতা দেবী

২১

নৌকাযাত্রা যখন শেষ হইল, তখন সূর্য্য অস্ত যাইতে বসিয়াছে। সন্ধ্যাসূর্য্যালোকপ্লাবিত চারি দিকের পল্লীদৃশ্য মমতার চোখে যেন স্বপ্নলোকেরই মত অপূর্ব্ব সুন্দর লাগিল। মস্ত বড় বাঁধাঘাটে নৌকা আসিয়া থামিয়াছে। তীরে বহু লোক সমবেত হইয়াছে ইঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য। সঙ্গে তাহাদের পাল্কী, ডুলি, ঘোড়া, হাতী কত কি। দেশের অবস্থা নিতান্ত খারাপ, জনসাধারণ বন্যাপীড়িত, বুভুক্ষু, না হইলে বাদ্যভাণ্ড, আতসবাজি কিছুরই অভাব হইত না।

কাছারীর নায়েব গোমস্তা সকলে নৌকায় উঠিয়া সুরেশ্বরকে প্রণাম করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিল। যামিনী মমতাকে লইয়া আড়ালেই রহিলেন, কারণ এখানে তাঁহাদের খানিকটা পর্দ্দানসীন্‌ভাবে থাকিতে হয়, না হইলে সুরেশ্বরের মর্য্যাদার হানি হয়। মমতা এখন তরুণী, তাহাকেও এখন কিছু কিছু পর্দ্দা মানিতে হইবে।

নৌকা হইতে দুই ধারে পর্দ্দা ঝুলাইয়া তবে মহিলারা নামিয়া গিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। দাসীদের জন্য ডুলি আসিয়াছিল, তাহারা তাহাতেই চড়িয়া চলিল। সুরেশ্বর হাতীতে উঠিলেন অনেক কষ্টে, ভয় যে কিছু না হইল তাহা নয়, তবে ডাক্তারবাবু সঙ্গে চলিলেন, ইহাই যা ভরসা। সুজিত ঘোড়াটির রূপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল, তবে কাদায়-ভরা রাস্তা দেখিয়া সে-সন্তোষ তাহার মুহূর্ত্তমধ্যে উবিয়া গেল। সঙ্গের লোকজন কতক হাঁটিয়া, কতক ঘোড়ায় তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

মমতার এমন সুন্দর জায়গায় বন্ধকরা ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কীতে যাইতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইতে লাগিল। পিতার রাগের সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া সে পাল্কীর দরজা ফাঁক করিয়া চারি দিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিল। যামিনীরও অবশ্য কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু এই লইয়া আবার স্বামীর সঙ্গে একটা হট্টগোল বাধিয়া যায়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কাজেই তিনি পর্দ্দা বজায় রাখিয়াই চলিলেন।

ঘণ্টা-দেড়েক এই ভাবে চলিয়া তাঁহারা কাছারি-বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিলেন। চারিদিক লোকে ভরিয়া উঠিয়াছে। সকলেরই একটু যেন ভীতসন্ত্রস্ত ভাব, সুরেশ্বর যে বিশেষ খোশ মেজাজে মহাল তদারক করিতে আসেন নাই, তাহা সকলেরই জানা ছিল।

কাছারি-বাড়িখানি মস্ত বড় দু-মহলা। আগে আগে কর্ত্তারা প্রায়ই এ সব দিকে আসিতেন, অনেক সময় সপরিবারেও আসিতেন, কাজেই অন্দরমহল একটা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এতকাল উহা বন্ধই পড়িয়া ছিল, অব্যবহার এবং মধ্যে মধ্যে অপব্যবহারে খানিকটা নষ্টও হইয়া গিয়াছিল। যামিনীদের আসিবার সংবাদ পাইয়া নায়েব-মহাশয় কয়েক দিনের মধ্যে ঘরগুলি যথাসাধ্য মেরামত ও পরিষ্কার করাইয়াছেন। তবু কলিকাতায় আজন্মপালিতা জমিদার-গৃহিণী এবং তাঁহার পুত্র-কন্যার হয়ত অত্যন্ত অসুবিধা হইবে মনে করিয়া তিনি অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন।

যামিনী পাল্কী হইতে নামিয়া একবার সমস্ত বাড়িখানা ঘুরিয়া দেখিলেন। ঘর তিন-চারখানা আছে, এবং আসবাব-পত্রও কাজচলা-গোছের রহিয়াছে। প্রজার দল এবং কর্ম্মচারীর দল এখন ঘণ্টা দুই সুরেশ্বরকে বাহিরেই আটক করিয়া রাখিবে, সুজিতও অন্ততঃ তামাশা দেখার খাতিরে সেইখানেই থাকিবে। ইহারই মধ্যে ঝি চাকর ও কন্যার সাহায্যে তাঁহাকে ঘরদোর গুছাইয়া এবং রাত্রির আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে, না হইলে সুরেশ্বর আর রক্ষা রাখিবেন না।

সঙ্গের বড় বড় পেট্রোম্যাক্স্‌ লণ্ঠনগুলি জ্বালাইবার আদেশ দিয়া তিনি মমতাকে লইয়া কে কোন্‌ ঘরে থাকিবে তাহা ঠিক করিয়া ফেলিলেন, এবং বিছানার পোঁটলা-পুঁটলি খোলাইয়া প্রথমেই শয়নের ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

শুইবার ঘর দুখানা বেশ বড় আছে, একখানায় তাঁহারা মাতা ও কন্যায় থাকিবেন, অন্যখানি সুরেশ্বরের জন্য প্রস্তুত করা হইল। মমতা বলিল, "ভালই হ'ল মা, বাবার ঘরটা অনেক দূরে, না হ'লে আমরা ঘরে ব'সে একটু মন খুলে কথাও বল্‌তে পারতাম না।"

যামিনী মেয়ের কথার উত্তরে শুধু হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, "খোকার ঘরটা বড় ছোট হ'ল, ও তাই নিয়ে আবার হৈ চৈ না করে।"

ভাই সম্বন্ধে মমতার সহানুভূতির যথেষ্ট অভাব ছিল। সে সুন্দর নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তা কি করা যাবে এখন। তার ভাল না-লাগে ত সে সামনের মহলে গিয়ে থাক।"

যামিনী বলিলেন, "তা কি আর হয়? একলা ঐ সব কর্ম্মচারীদের মধ্যে থাকতে পারবে কেন?"

তাহার পর রান্নার পালা। নায়েব-মহাশয়ের হুকুমে মাছ-মাংস, দুধ-ঘি, যেখানে যাহা সংগ্রহ করা গিয়াছে, সবই নির্ব্বিচারে তাঁহার লোকেরা আনিয়া হাজির করিয়াছে। যামিনী খানিকখানিক নিজেদের জন্য রাখিয়া বাকী লোক-জনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন, কারণ এত জিনিষ এক রাত্রে খাইবার ক্ষমতা তাঁহাদের কয়জনের একেবারেই ছিল না। সঙ্গের ঠাকুর উনান ধরাইয়া রান্নাবান্নার যোগাড় করিতে লাগিল। দাসীরা তাহার সাহায্য করিতে লাগিল।

মমতা মাঝে মাঝে মায়ের কাছে আসিয়া জুটিতেছিল, আবার থাকিয়া থাকিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া যাইতেছিল বা ছাদে উঠিয়া বসিতেছিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, বাহিরে কিছু একটা বড় দেখা যায় না। তবু এই ক্ষীণ আলোতেই চোখ বিস্ফারিত করিয়া মমতা কাহাকে যেন আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কোথায় সে আছে কে জানে? কাছারি-বাড়ির পরেই আমলা ও পাইকদের পাড়া, তাহার পর আসল গ্রামের আরম্ভ। এই গ্রামখানির পরে আরও কত গ্রাম পরে পরে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় তাহারা আছে কে মমতাকে বলিয়া দিবে? জিজ্ঞাসাই বা সে কোন্ লজ্জায় কাহাকে করিবে? ছায়া ত এই জায়গারই নাম করিয়াছিল। কিন্তু এত দিন কি স্বেচ্ছাসেবকের দল একই স্থানে আছে? না কাজের ঠেলায় অন্য কোন দিকে চলিয়া গিয়াছে? ছায়াকে কি অমর চিঠিপত্র লেখে? কে জানে? তাহা হইলে ছায়ার কাছে কিছু খবর মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু তাহাকেই বা খোলাখুলি অমরের কথা কি করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়?

নীচে হইতে মুখী ঝি চীৎকার করিয়া উঠিল, "দিদিমণি নীচে নেমে এস, মা-ঠাকরুণ ডাকছেন।"

মমতা নীচে নামিয়া গেল। ঘরদোর ইহারই ভিতর বেশ গোছান বাসযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। যেন মৃন্ময়ী প্রতিমার মধ্যে প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। কে বলিবে যে ইহা বহুকাল-পরিত্যক্ত পোড়ো বাড়ি? মানুষের কণ্ঠস্বরের এমন এক বিচিত্র শক্তি আছে যে মুহূর্ত্তের মধ্যে মাটির স্তূপকে সে আনন্দের নিকেতনে পরিণত করিতে পারে।

যামিনী বলিলেন, "কোথায় একলা গিয়েছিলে মা, অন্ধকারে? এ সাপখোপের দেশ, এখানে সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। অন্ধকারে কখনও কোথাও যেও না।"

মমতা হাসিয়া বলিল, "একটু ছাদে উঠেছিলাম মা। সাপ যে সত্যি কোথাও ছাড়া অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়, তা কেমন যেন আমার বিশ্বাসই হয় না। কলকাতায় ত চিড়িয়াখানা আর সাপুড়ের থলি ছাড়া সাপ কখনও দেখি নি।"

যামিনী হাসিয়া বলিলেন, "এখানেও বেশী না দেখতে হ'লেই ভাল। অনেক বছর এ দিকে আসি নি, কিন্তু সাপের উৎপাত ছিল তা এখনও মনে আছে।"

সদরে এতক্ষণ ধরিয়া সুরেশ্বরের দরবার চলিতেছিল, এখন বোধ হয় তাহা ভাঙিয়া গেল। আলো-হাতে চাকর তাঁহাকে আগ বাড়াইয়া আনিতে চলিল। সুজিতেরও এতক্ষণ কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এ-সব ব্যাপার তাহার কাছে একেবারেই নূতন, তাই গভীর মনোযোগ সহকারে সে এতক্ষণ সব ব্যাপার দেখিতেছিল। সভা ভাঙিয়া যাওয়ায় সেও চলিয়া আসিল।

ক্লান্তিতে সুরেশ্বরের শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িতে-ছিল, স্ত্রীর খুঁৎ ধরিবার মত শক্তিও তাঁহার অবশিষ্ট ছিল না। ঘরে আলো জ্বলিতেছে এবং পরিপাটী করিয়া বিছানাপাতা আছে দেখিয়াই তিনি বর্ত্তিয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া, কাপড় বদলাইয়া শুইয়া পড়িলেন। খাবারও

তাঁহাকে বিছানার পাশে ছোট টেবিলে আনিয়া দেওয়া হইল, কারণ খাইতে উঠিতেও তিনি আর রাজী হইলেন না।

সুজিত ছেলেমানুষ, অত দমিয়া অবশ্য যায় নাই, কিন্তু সেও ত সুখী মানুষ, পরিশ্রম করা বা অসুবিধা সহ্য করা তাহারও কোনদিন অভ্যাস নাই। কাজেই সেও খাইয়া শুইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। যামিনী, মমতা ও সুজিত সকলেই খাইয়া-দাইয়া শুইতে চলিয়া গেলেন, কারণ রাত্রের খাওয়া চুকাইয়া দিলে এই পল্লীগ্রামে আর কিই বা করা যাইতে পারে? এখানে বিজলীর বাতি নাই, চারি দিকে আঁধারের বান ডাকিতেছে। শব্দের মধ্যে শুধু শেয়ালের ডাক আর ঝিল্লীধ্বনি। থিয়েটার নাই, বায়োস্কোপ নাই, মোটরে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইবারও উপায় নাই। বন্ধুবান্ধব নাই যে রাত একটা অবধি জাগিয়া আড্ডা দেওয়া যাইবে, কাজেই ঘুমাইয়া পড়া ছাড়া গতি নাই। সুজিত কখনও এত সকাল সকাল ঘুমায় না, কিন্তু অবস্থাচক্রে তাহাকেও আজ ঘুমাইতে হইল। একলা ঘরে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া জাগিয়া থাকিতে পারে এক কবি, নয় যাহার প্রাণে শোকের আগুন জ্বলিতেছে সে। সুজিত কোন দলেই পড়ে না, সুতরাং মনের বিরক্তি মনেই চাপিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং এমনই নিস্তব্ধতার গুণ যে খানিক পরে ঘুমাইয়াও পড়িল।

কলিকাতায় আজন্ম বাস করা সত্ত্বেও যামিনীর বেশ ভোরে উঠা অভ্যাস ছিল। সূর্য্যোদয় না দেখিলে তাঁহার প্রাণে যেন তৃপ্তি আসিত না। তাই এখানেও তাঁহার ভোর-বেলায়ই ঘুম ভাঙিয়া গেল। অস্পষ্ট আলোয় ঘরের চারি পাশ দেখা যাইতেছে, পাশে মমতা তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছে। পথশ্রমে সেও কাল বড় কাতর হইয়াছিল, যদিও মনে আনন্দের জোয়ার ডাকিয়া যাওয়ায় সে ক্লান্তিকে আমল দেয় নাই। অন্য দিন সে প্রায় মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ওঠে, আজ আর ওঠে নাই। সস্নেহে একবার নিদ্রিতা কন্যার দিকে তাকাইয়া, মশারি তুলিয়া যামিনী বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন ঝি, চাকর, ঠাকুর সকলেই উঠিয়াছে বটে, তবে অভ্যস্ত কর্ম্মস্রোতে কলিকাতার বাড়িতে যেমন অনায়াসে সকলে গা ঢালিয়া দেয়, নূতন স্থানে তেমন পারিতেছে না, সকল দিকেই তাহাদের বাধিতেছে। যামিনীকে দেখিয়া সকলেই নানা রকম নালিশ লইয়া আসিয়া হাজির হইল।

এমন সুন্দর সকালবেলাটা ঝি-চাকরের কচকচি শুনিতে যামিনীর ভাল লাগিল না। "নূতন জায়গায় একটু অসুবিধে ত হবেই, দেখে-শুনে কাজ চালিয়ে নাও," বলিয়া তিনি মুখ ধুইতে চলিয়া গেলেন। তাহার পর ছাদে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কলিকাতার লৌহকারা হইতে বহু বৎসর তিনি মুক্তি পান নাই। ভিতরে ভিতরে কতখানি যে তিনি হাঁফাইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা আজ এই দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন। শহরে থাকিয়া থাকিয়া মানুষ কি খানিকটা যন্ত্রের মত হইয়া যায় না?

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিলেন; মমতা ইহারই মধ্যে উঠিয়া, মুখ ধুইয়া, মায়ের পিছন পিছন ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যামিনী বলিলেন, "আমি তোকে ডাকলাম না আর একটু ঘুমবি ব'লে, এরই মধ্যে উঠে পড়েছিস্?"

মমতা হাসিয়া বলিল, "এমন সুন্দর জায়গায় ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা করে না মা। দেখ দেখি পূবের দিকে চেয়ে। কি আশ্চর্য্য সুন্দর রং। এ রকম কলকাতার আকাশে দেখা যায় না। ঐ মাঠটায় নেমে গিয়ে বেড়ালে হয় না মা?"

যামিনী মেয়ের উচ্ছ্বাসে হাসিয়া বলিলেন, "তোর বাবা তাহ'লে ভয়ানক চটে যাবেন। এখানে একেবারে ঝুড়ি-চাপা হয়ে থাকা নিয়ম, না হ'লেই মান থাকে না।"

মমতা বলিল, "কি জ্বালা, বাপ্ রে বাপ। এ সব বোকামি কি করে যে প্রথমে মানুষের মনে এল তাই ভাবি। আমি ঠিক বল্‌ব বাবাকে।"

যামিনী বলিলেন, "তা বলিস্। একেবারে ভোরে না বেরলেই ভাল তবু, একটু ফরশা হ'লে যাস্।"

নীচে ঝি ডাকাডাকি করিতেছে। তাঁহাদের চা ইহারই মধ্যে প্রস্তুত। কলিকাতায় মা এবং মেয়ে সর্ব্বদা একসঙ্গে খান, সুরেশ্বর কখনও তাঁহাদের ছায়া মাড়ান না, সুজিত একদিন আসে ত পনর দিন আসে না।

নীচে একটি বড় হল-ঘর, তাহাই খাওয়ার ঘর, এবং

মেয়েদের বসিবার ঘর-রূপে ব্যবহার করা হইতেছে। সুরেশ্বরের ত বাহিরের বৈঠকখানা পড়িয়াই আছে। সুজিতের বসিবার ঘরের কোন প্রয়োজন হইবে না, কারণ এখানে তাহার বন্ধুবান্ধব কেহই নাই, এবং বসিয়া থাকিবার ইচ্ছাও বিশেষ নাই। যে ক'দিন বাধ্য হইয়া তাহাকে এখানে থাকিতে হইবে, তাহা সে ঘোড়ায় চড়িয়া, মাছ ধরিয়া, এবং সাঁতার শিখিবার চেষ্টা করিয়া কাটাইয়া দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

মমতা চা খাওয়ার আয়োজনের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "মা এরা কি মনে করে আমরা রাক্ষস? এত কখনও খাওয়া যায়?"

যামিনী বলিলেন, "এত যে খাই না তা তারা বেশ জানে। আদর-যত্ন করার আমাদের দেশে এই পদ্ধতি। যা দরকার তার দশ গুণ দিয়ে নষ্ট না করলে যথেষ্ট খাতির করা হয় না।"

যামিনী বলিলেন, "ডাক্তার বাবু বেচারা বেশ ও-মহলে একঘরে হয়ে আছেন। তাঁকে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিই।"

মমতা বলিল, "আগে ভজাকে জিগ্‌গেস কর যে তিনি উঠেছেন কি না।"

চাকর খবর দিল যে ডাক্তার বাবু উঠিয়া হাত মুখ ধুইতেছেন। যামিনী ছোট ট্রেতে করিয়া চা ও জলখাবার পাঠাইয়া দিলেন।

চা খাওয়া শেষ করিয়া মা ও মেয়ে আবার ছাদে বেড়াইতে গেলেন। মমতা বলিল, "এলাম ত চলে, এখন দিনগুলো কি ক'রে যে কাটাই তাই ভাবছি। কলেজও নেই, পড়াও নেই, চেনাশুনা মানুষও নেই।"

যামিনী বলিলেন, "মানুষ ঢের এসে জুটবে এখন তার জন্যে ভাবনা নেই, তবে তোর তাদের পছন্দ হবে কি না জানি না, ঠিক কলকাতার কলেজে-পড়া মেয়েদের মত তারা নয়। একটু বেলা হ'তে দে, তখন দেখিস্।"

মমতা বলিল, "এখানকার গ্রামের মেয়েরা ত? আমার তাদের ভালই লাগে মা, তবে বিয়ে হয় নি শুনে তারা এমন আকাশ থেকে পড়ে যে তাতেই বিরক্ত লাগে।"

যামিনী হাসিয়া বলিলেন, "অত অল্পে বিরক্ত হ'লে চলবে কেন? এখন ত সব জায়গায়ই মেয়েদের বড় বয়সে বিয়ে হয়, লোকের চোখে খানিক সয়ে গেছে। আমাদের কালে, আমরা যেখানে গেছি, লোককে একেবারে চমক লাগিয়ে দিয়েছি। এত বিশ্রী লাগত যে কোথাও যেতেই চাইতাম না।"

এতক্ষণে পরিবারস্থ পুরুষগুলির যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। সুরেশ্বর চাকরকে ডাকিতেছেন, সুজিতের সহচর কুকুরটিও একবার চেঁচাইয়া উঠিল তাহা প্রভুর লাথি খাইয়া কি অন্য কোন কারণে, তাহা ঠিক বুঝা গেল না।

যামিনী নামিয়া আসিলেন। সুরেশ্বরের কাছে পান হইতে চূণ খসিবার জো নাই, তাহা হইলেই কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইবে।

সুরেশ্বর উঠিয়া মুখ ধুইতেছেন, চাকর তাঁহার খাবার ঠিক করিতেছে। স্থানমাহাত্ম্য এমনই যে তিনিও সকাল-বেলাটায় অকারণেই একটু প্রসন্ন হইয়া আছেন। এমন কি যামিনীকে দেখিয়াও ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন না।

মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রে ভাল ক'রে ঘুম হয়েছিল ত বাবা?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "নূতন জায়গায় তেমন কি আর ভাল ঘুম হয়? দেখ না কত সকাল উঠে পড়েছি? এর পর সারাদিন হাঙ্গাম পোয়াতে হবে।"

যামিনী বলিলেন, "এক দিনেই বেশী বাড়াবাড়ি না করা ভাল।"

সুরেশ্বর বলিলেন, "বাড়াবাড়ি কার কি আর সাধে? একে প্রজারাই পাজি, তার পর এক দল কলকাতার ছোঁড়া এসে জুটেছে, তাদের উস্‌কবার জন্যে। সেগুলিকে আবার ঢিট করতে হবে।"

২২

স্নানাহার সারিতে একটু বেলা হইয়া গেল। এখানে ঝি-চাকরেও ঠিক সময়মত কাজ গুছাইয়া করিতে পারিতেছে না, মনিবরাও সারাক্ষণ ঘড়ির দিকে তাকাইয়া নাই, কাজেই সব কাজের সময়ই খানিক পিছাইয়া যাইতেছে। সুরেশ্বর সকালে চা খাইয়া বাহির বাড়িতে

গিয়া বসিয়াছিলেন, বারটা বাজিতে তবে ফিরিয়া আসিয়া স্নান করিয়াছেন। যামিনী স্নান আগেই সারিয়াছিলেন, তবে খাওয়াদাওয়া করেন নাই। এখানের মানুষগুলি গিন্নীকে কর্ত্তার আগে খাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলে এত অধিক মাত্রায় বিস্মিত হইবে যে তাহার ধাক্কা সামলান হইবে দুষ্কর।

কিন্তু ছেলেমেয়ের ত বাবার আগে খাইতে বাধা নাই, তাহাদের আর কেন দেরি করান? যামিনী সুজিতের খোঁজ লইয়া জানিলেন সারাদিন সে ঘোড়ায় চড়িয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া, এই সবে ফিরিয়া স্নানের ঘরে ঢুকিয়াছে। কিন্তু মমতা গেল কোথায়? সে তাঁহারই পরে স্নান করিতে গিয়াছিল, স্নান ত বহুক্ষণ শেষ হইয়াছে। ঘরে ত সে নাই? তবে কি এই দুপুর রোদে ছাদে গিয়া বসিয়া আছে? মেয়ে তাঁহার সকল দিকেই পাগল। মেয়ের সন্ধানে যামিনীও ছাদে উঠিয়া আসিলেন।

সত্যই মমতা ছাদেরই এক কোণে দাঁড়াইয়া আছে। যামিনী পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "এই রোদে দাঁড়িয়ে মাথাটার চাঁদি উড়ে যাবে যে? এখানে কি করছিস্?"

মায়ের গলার স্বরে চকিত হইয়া মমতা ফিরিয়া দাঁড়াইল। যামিনী বিস্মিত হইয়া দেখিলেন তাহার দুই চোখে জল টল্‌টল্ করিতেছে, মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা মনের আবেগে কি রোদের ঝাঁজে তাহা অবশ্য বোঝা যায় না। তাড়াতাড়ি মেয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পিঠে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে মা? চোখে জল কেন?"

মমতা নিজেকে সম্বরণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। তবু মায়ের কথার উত্তর দিতে তাহার গলা কাঁপিয়া গেল। বলিল, "বাবা কেন গরিবদের ওপর এত অত্যাচার করেন মা? নিজে ত তাদের জন্যে কিছুই করবেন না, অন্যে যদি তাদের সাহায্য করতে আসে, তাদেরও বাধা দেবেন?"

যামিনী বলিলেন, "কেন, এখানে আবার কি হ'ল?"

মমতা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল; যে-কোণটায় তাহারা দাঁড়াইয়া আছে, সেখান হইতে বৈঠকখানার বারান্দার একটা অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। বারান্দার উপরে বেঞ্চিতে কয়েক জন যুবক বসিয়া আছে, সকলেরই মুখ গম্ভীর। নীচে উঠানে এক দল প্রজা দাঁড়াইয়া আছে, কেহ বা চোখ মুছিতেছে, কেহ বা অপরের সঙ্গে হাত মুখ নাড়িয়া কথা বলিতেছে।

মমতা বলিল, "দেখ মা, এই ছেলেগুলি কত কষ্ট সহ্য ক'রে এই সব গাঁয়ের লোকদের সাহায্য করতে এসেছে। আর বাবা তাদের ডেকে ধমক-ধামক করছেন, এইটাই কি তাঁর উচিত হচ্ছে?"

যামিনী বলিলেন, "উচিত ত নয় মা। কিন্তু আমি কি করতে পারি বল? যা তোমার বাবা নিজে বুঝবেন না, তা তাঁকে কেউ বোঝাতে পারবে না, কাজেই বাধ্য হয়ে ওসব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকি।"

মমতা উত্তেজিত ভাবে বলিল, "আমি কিন্তু পারব না মা, আমি ঠিক বাবাকে বল্‌ব। তাতে তিনি আমায় যতই বকুন না কেন।"

যামিনী একটু অবাক হইয়া গেলেন। দীনদুঃখীর প্রতি সুরেশ্বরের সমবেদনা কোনদিনই নাই, মমতা তাহা বরাবর জানে। তাহাতে দুঃখ পায় বটে, লজ্জিতও হয়, কিন্তু এতখানি উত্তেজিত ত কোনদিন হয় নাই? এখানে আসিয়া হঠাৎ তাহার মনে এমন ভাবের কেন আবির্ভাব ঘটিল? মেয়েকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন, "ওঁকে ওসব ব'লে কিছুই লাভ নেই তা ত তুমি জানই মা! অনর্থক রাগারাগি ক'রে শরীরটাকে আরও বেশী ক'রে খারাপ করবেন।"

মমতা বলিল, "তবে তুমি ওদের ডেকে পাঠাও মা, বল যে আমরা তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করব। আমলাদেরও বারণ ক'রে দাও, তারা যেন ওদের উপর কোন অত্যাচার না করে।"

যামিনী বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিলেন, "আমার সাধ্যি কি মা? তাতে মন্দই হবে, উনি চটে যা তা করতে থাকবেন। এখন নীচে চল, খাওয়াদাওয়া করবে। অনেক বেলা হ'য়ে গেছে।"

মমতা তাঁহার সঙ্গে নীচে চলিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিল, "খেতেটেতে আমার কিচ্ছু ইচ্ছে করছে না মা।"

খাবার ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখা গেল, সুরেশ্বর কাছারি-ঘর হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকেও যথেষ্ট উত্তেজিত ও বিরক্ত দেখাইতেছে।

স্ত্রী ও কন্যাকে সামনে দেখিয়া তিনি সেইখানেই দাঁড়াইয়া গেলেন। বলিলেন, "কি, তোমাদের খাওয়াদাওয়া হয়েছে? আমি ত এখান থেকে প্রাণ নিয়ে আর ফিরব না বোধ হয়, যা এক দল ডাকাতের হাতে পড়া গেছে। তারা আমাকে ধনেপ্রাণে শেষ ক'রে তবে ছাড়বে।"

যামিনী বলিলেন, "খানিকটা গোলমাল সইতে হবে জেনেই ত এখানে আসা? যতটা পার সামলে চল। অনেক বেলা হয়ে গেছে, স্নান ক'রে খেয়ে নাও।"

সুরেশ্বর স্নান করিবার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া, একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "সামলে চলব কি, সবাই মিলে ষড়যন্ত্র সুরু করেছে কি ক'রে আমায় ফাঁকি দেওয়া যায়। এই কলকাতার ছোঁড়াগুলো সবার ওঁছা, ওদের যে কিছুতেই বাগ মানান যাচ্ছে না?"

মমতা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তারা কি করছে বাবা?"

সুরেশ্বর অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "দেশোদ্ধার করছেন, পরোপকার করছেন, অর্থাৎ আমার পিণ্ডির ব্যবস্থা করছেন। প্রজা ক্ষ্যাপানোর মতলব আর কি? আজ ডেকে পাঠিয়েছিলাম সবগুলোকে, তা পাঁচ-ছ'টা মোটে এল, সে কি বক্তৃতার ঘটা, যেন আমাকে কচি খোকা পেয়েছে।"

মমতা আরও কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, যামিনী সুরেশ্বরের অলক্ষ্যে ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বারণ করিয়া দিলেন। বলিলেন, "তোরা দু-জন খেতে ব'স্, বেশী বেলায় খেলে আবার অসুখ-বিসুখ করতে পারে। এ-সব ত কোনকালে অভ্যাস নেই।"

সুজিত স্নান করিয়া আসিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিল। সুরেশ্বরও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। মমতা আর সুজিতের খাবার আসিল, তাহারা খাইতে বসিল। যামিনী সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। চাকর বাহির-বাড়িতে ডাক্তার বাবুর খাবার পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

দুপুরে একটু না ঘুমাইলে সুরেশ্বরের চলিত না। তিনি খাইয়া-দাইয়া শুইয়া পড়িলেন। মমতা কেমন আনমনা হইয়া এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুজিত বন্ধুর অভাবে কয়েক জন পাইককে ডাকিয়া তাহাদের সঙ্গে ঘোড়া, কুকুর, বাঘ, ভালুকের গল্প জুড়িয়া দিল। যামিনী খাইতে বসিলেন সবার শেষে, তাঁহার খাওয়াদাওয়া শেষ হইতে হইতে বেলা একটা বাজিয়া গেল।

দুপুরে এখানে কিই বা করা যায়? কলিকাতা হইতে খান-কয়েক বই আনিয়াছিলেন, তাহারই একটা হাতে করিয়া খাটের উপর গিয়া বসিলেন। যদি একটু ঘুমাইতে পারেন ত মন্দ হয় না। নূতন জায়গায় আসিয়া পড়ার অস্বাচ্ছন্দ্যে কাল রাত্রে তাঁহার ভাল করিয়া ঘুমই হয় নাই।

হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ, চুড়িবালার শিঞ্জন, ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা-বলার আওয়াজ। যামিনী ফিরিয়া তাকাইলেন। দরজার কাছে পাঁচ-ছয়টি নারীমূর্ত্তি, ঘোমটায় মুখ ঢাকা, শুধু পানের রসে লাল ঠোঁটগুলি দেখা যাইতেছে, চেহারা যে কাহার কি প্রকার তাহা বুঝিবার উপায় নাই। পরনে চওড়া পাড়ের দিশী শাড়ী, পায়ে আল্‌তা, গায়ে সকলেরই কিছু কিছু গহনা আছে। সঙ্গে গুটিকয়েক শিশু, তাহারা অপরিসীম কৌতূহল চোখে ভরিয়া যামিনীর দিকে তাকাইয়া আছে। মুখী ঝি তাহাদের ভিড় ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া খবর দিল, "মা, এঁরা সব গ্রামের ভিতর থেকে এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

যামিনী বই সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "আসুন, ঘরের ভেতর আসুন। মুখী, এঁদের বসবার জায়গা দে।"

মেয়ের দল ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখী খুঁজিয়া পাতিয়া মস্তবড় একটা শতরঞ্চি আনিয়া ঘরের মেঝেতে পাতিয়া দিয়া বলিল, "বসুন আপনারা।"

ছেলেমেয়েগুলিই আগে বসিয়া পড়িল, তাহাদের মা-মাসীর দলও একে একে বসিল। চোখ কিন্তু সকলেরই যামিনীর উপর, যেন এক দণ্ডের জন্য অন্য দিকে চোখ ফিরাইলে কি একটা অঘটন ঘটিয়া যাইবে। ঘোমটাগুলিও অল্পে অল্পে সরিতে আরম্ভ করিল। নানা রকম, নানা বয়সের কতকগুলি নারীমূর্ত্তি এইবার ভাল করিয়া দেখা গেল।

যামিনী খাট হইতে নামিয়া তাহাদের দলে বসিবার জোগাড় করিতেই তিন-চার জন হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, "ওকি, ওকি, আপনি খাটের উপরে বসুন মা, নীচে কেন বসবেন?" জমিদার-গৃহিণীকে তাহাদের সঙ্গে একাসনে বসিবার উপক্রম করিতে দেখিয়া তাহারা একেবারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনেক ক্ষণই কথা না বলিয়া বসিয়া থাকিবার আদেশ

লইয়াই তাহারা বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল। শিক্ষিতা প্রভুপত্নীর সম্মুখে অনাবশ্যক বাচালতা যাহাতে প্রকাশ না পায়, সে-বিষয়ে সকলেই পতিদেবতাদের নিকট হইতে হুকুম শুনিয়াছে। কিন্তু যামিনীকে এমন অ-বনিয়াদী ব্যাপার করিতে দেখিয়া তাহারা সে-সব তালিম দেওয়া ভুলিয়া গেল।

যামিনী একটু হাসিয়া বলিলেন, "না নীচেই বসি। আপনারা পাঁচ জন এসেছেন, একসঙ্গে বসাই ভাল। মুখী যা ত রে, খুকী কোথায় আছে দেখ। তাকে ডেকে দে এখানে।"

যামিনী নীচেই বসিলেন। অভ্যাগতারা জড়সড় হইয়া এক কোণে ঘেঁষিয়া বসিল, যাহাতে যামিনীর মর্য্যাদার কোন হানি না হয়।

কেহই আর কথা বলে না, খালি হাঁ করিয়া তাকাইয়াই আছে। শিশুরা দুষ্টামি করিবার চেষ্টা করিলে, বয়োজ্যেষ্ঠারা অন্তরটিপুনি দিয়া তাহাদেরও ধীরস্থির করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। যামিনীর বসিয়া বসিয়া অতিশয় অস্বস্তি লাগিতে লাগিল। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা সব সামনের ঐ পাড়া থেকেই আসছেন, না?"

দুই-এক জন মাথা হেলাইয়া জানাইয়া দিল যে তাহাই বটে। একটি মুখরা বধূ আর থাকিতে না পারিয়া এক জন প্রৌঢ়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ইনি নায়েব-মশায়ের ভাজ।" স্ত্রীলোক হইয়া কত ক্ষণ স্ত্রীলোকের সামনে মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকা যায়?

এমন সময় মুখীর সঙ্গে মমতা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তৎক্ষণাৎ সবাইকার দৃষ্টি একযোগে গিয়া পড়িল তাহার উপর, যামিনীর সম্বন্ধে কাহারও আর কোন কৌতূহল রহিল না। অতগুলি চোখের দৃষ্টির আঘাতে বিব্রত হইয়া মমতা মায়ের কাছ ঘেঁষিয়া তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িল।

নায়েব-মশায়ের ভাজ একটু গুরুগম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইটি মেয়ে বুঝি?"

যামিনী বলিলেন, "হ্যাঁ।" যে বউটি প্রথম কথা বলিয়াছিল সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে হয় নি মা? কই সিঁদুর ত নেই মাথায়?"

মমতার মুখ বিরক্তিতে লাল হইয়া উঠিল। এই সুরু হইল উৎপাত। বিয়ে ছাড়া এই মেয়েগুলির কি বলিবার কোন কথাই নাই? যামিনী মেয়ের পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "না, ও এখনও কলেজে পড়ছে। পড়াশুনো শেষ হ'লে তবে বিয়ে হবে।"

আর এক জন শীর্ণকায়া মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর ছেলেপিলে কি মা?"

যামিনী বলিলেন, "ছেলে একটি আছে।"

একটি বছর তিন-চারের অত্যন্ত রোগা মেয়ে ক্রমাগত কাশিয়া চলিয়াছে। তাহার এমন চেহারা যে তাহার দিকে তাকাইলে কষ্ট বোধ হয়, কণ্ঠার হাড়গুলি দুই ইঞ্চি উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, পাঁজরগুলি গুণিতে পারা যায়। গায়ে পাতলা আধছেঁড়া একটা জামা, আর কোন পরিচ্ছদের বালাই নাই। মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "এর কি হয়েছে, এত কাশছে যে?"

নায়েব-মশায়ের ভাজ বলিলেন, "ওর জন্মাবধি এই রকম সর্দ্দির ধাত। শীতকাল বর্ষাকাল এই রকমই থাকে, গরম পড়লে সামলায়।"

যামিনী বলিলেন, "ওষুধপত্র খায় না কিছু?" সেই শীর্ণা মহিলাটি বলিলেন, "ওষুধ খেয়ে কি হবে মা? ওষুধে কি আর ধাত বদলায়। তা ছাড়া অবস্থা ভাল না, ওসব কোথা থেকে করবে। মা-টাও বারো মাস সূতিকায় ভোগে, দেখতে শুনতে পারে না। বছর বছর হচ্ছে, এর পরেও দুটো আছে। আমি আসছিলাম, তা আমার সঙ্গে দিয়ে দিলে, আমি ভাবলাম তা চলুক, মা-টার হাড় দু-দণ্ড জিরোক।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাঁয়ে এখন জ্বরজাড়ি খুব হচ্ছে বুঝি?"

নায়েব-মশায়ের ভাজই দলের নেত্রী হইয়া আসিয়াছেন, তিনি বলিলেন, "এখনও ততটা নয়, তবে বর্ষা শেষ হ'তে-না-হ'তে ঘরে ঘরে সব শয্যা নেবে। যা ম্যালেরিয়ার ঘটা! কোন ঘরে আর বিকেলে হাঁড়ি চড়াতে হয় না। এখনও হচ্ছে, তা সে-সব সর্দ্দি-জ্বর। কল্‌কেতার সব ছেলেরা এসেছে, ঘরে ঘরে ঘুরে ওষুধ দিচ্ছে, তাতেই ততটা বাড়াবাড়ি হয় নি।"

সেই বধূটি বলিল, "আর যা রাগ আমাদের পাঁচকড়ি কবিরাজের, বলে আমার ভাত মারবার জন্যে শহর থেকে

এই বারো ভূতের আমদানি হয়েছে। তাকে কেউ ডাকছে না কিনা ?"

কবিরাজ-মহাশয়ের একটি দূর-সম্পর্কের ভগিনী বসিয়াছিলেন, তিনি একটু চটিয়া বলিলেন, "তা বাছা বলবেই ত ? এই সময় যা একটু দু-চার পয়সা পায়, তাও লোকে বাদ সাধলে সহ্যি হয় ?"

মমতা অবাক হইয়া এই অপরূপ ঝগড়া শুনিতেছিল। এত ক্ষণ পর্য্যন্ত সে একটাও কথা বলে নাই। হঠাৎ বলিল, "যারা পরের উপকার করতে এসেছে তাদের এরকম ক'রে বলা উচিত নয়। নিজের স্বার্থের জন্যে ত আর তারা কারও ভাত মারছে না ?"

মেয়ের উত্তেজনায় যামিনী একটু বিস্মিত হইলেন। নায়েবের ভাজ বলিলেন "তা ত ঠিক মা, তবে ছোটলোকদের এরা বড় আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিচ্ছে, এটা ভাল কাজ না। এমনিতেই আজকাল নানা রকম কথা শুনে তারা নিজেদের বামুন কায়েত সবার সমান মনে করে।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে ছেলেগুলি আছে কোথায় ?"

একটি আট-ন বছরের মেয়ে চীৎকার করিয়া বলিল, "সব ত পছিমের মাঠে তাঁবু পেতেছে, ঘর বেঁধেছে, সেই হাড়িপাড়ার কাছে। মেজ খুড়ী বলে ওরা ভদ্দরনোক না, তাহ'লে হাড়িদের কাছে থাকবে কেন ?"

মেজ খুড়ী উপস্থিত ছিলেন, তিনি ভাসুরঝির কথায় অপ্রস্তুত হইয়া মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া দিলেন।

মমতার মন ক্রমেই ইহাদের উপর বিরূপ হইয়া আসিতেছিল। এই নাকি পল্লীগ্রামের বিখ্যাত সরলতা আর মানবপ্রীতি ? ইহার চেয়ে দেখি শহরের লোকও ভাল, তাহারা তবু একটু বুদ্ধিশুদ্ধি ধরে। ইহাদের উপকার করিতে আসাও ঝকমারির কাজ।

যামিনী বলিলেন, "এ-সব দিকে বানে খুব ক্ষতি করেছে, না ততটা নয় ?"

মহিলারা বুঝিলেন জমিদার-গৃহিণী এইবার কাজের কথায় নামিলেন, প্রজাদের আসল অবস্থা জানাই ইহার উদ্দেশ্য। নায়েব-মশায়ের ভাজ বলিলেন, "তা ক্ষেতি হয়েছে বইকি মা, খুবই হয়েছে, ঘরদোর পড়েছে, গরু-বাছুর ভেসে গেছে। ধান ত একেবারে গেল, কি যে এবার মানুষে খাবে তার ঠিকঠিকানা নেই।"

একটি কিশোরী বলিল, "জলটা ত প্রায় আমাদের কোঠার কাছাকাছি এসেছিল, আর একটু এগুলে, আমাদের ঘরও পড়ে যেত।"

সেই বধূটি বলিল, "নামোপাড়ায় যা কাণ্ড হ'ল। ঘরদোর ডুবে গেল, মানুষে গিয়ে চালে উঠ্‌ল। কলকাতার ছেলেগুলো শেষে নৌকো ক'রে এসে মই দিয়ে তবে তাদের নামায়। সে যা মুস্কিল।"

একটি বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "মুটকীপিসী কেমন কুমড়ো-গড়াগড়ি গেল মা ?"

যামিনী ঝিদের পানমশলা লইয়া আসিতে বলিলেন। কলিকাতার মানুষ হইলে চা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু এখানে সেটা চলিবে কিনা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তাহা ছাড়া তাঁহারা কায়স্থ, ইহাদের ভিতর ব্রাহ্মণকন্যাও কেহ থাকিলে থাকিতে পারে।

মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "আমি ছেলেমেয়েদের হাতে চকোলেট্ দেব মা ? কল্‌কাতা থেকে অনেক নিয়ে এসেছি।"

যামিনী বলিলেন, "দাও।" মমতা চকোলেট আনিতে অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

কলিকাতার স্বেচ্ছাসেবকের দল কোথায় আছে তাহা ত জানা গেল, কিন্তু কোনদিন অমরের সঙ্গে তাহার দেখা হইবে কি ? হইলেও বা কি চক্ষে সে মমতাকে দেখিবে কে জানে ? মমতার বাবা ত খোলাখুলি এখন তাহাদের শত্রুপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন, যথাসাধ্য তাহাদের কাজে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। মমতাকেও অমর শত্রুই মনে করিবে নাকি ? মমতার দুই চোখ এই কথা ভাবিতেই জলে ভরিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

কেনা জামাই

শ্রীশান্তা দেবী

রাত্রি অনেক হইয়াছে। গৃহিণী ক্রমাগতই উদ্বিগ্ন ভাবে ঘর বাহির করিতেছেন, এখনও কর্ত্তা ফিরিলেন না কেন। শয়নকক্ষেই মেঝের উপর গালিচার আসন পাতিয়া খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। কর্ত্তা খাইতে বসিলে গরম গরম লুচি ভাজিয়া দেওয়াই এ-বাড়ীর ঠাকুরের রীতি। কিন্তু সে ঠিকে বামুন, এতক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে কেন? কাজেই সে নিজের সময়মত কাজ সারিয়া খাবার গুছাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

দরজায় কড়া খট্ খট্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। একতলার বৈঠকখানা ঘরে নিদ্রাকাতর বৈজু তাহার ছিন্ন কন্থা ছাড়িয়া উঠিয়া মুদিত চক্ষেই দরজা খুলিয়া দিল। শ্রান্ত গৃহকর্ত্তা দিনশেষে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরে ঢুকিলেন। গৃহিণী আসনখানাকে ঘুরাইয়া পাতিয়া গেলাসে নূতন জল দিয়া অসহিষ্ণুভাবে এই কয়টা মুহূর্ত্ত কোনো প্রকারে কাটাইতে-ছিলেন। কর্ত্তা জুতা জামা ছাড়িয়া আসনে বসিতে-না-বসিতে গৃহিণী রাধারাণী বলিলেন, "কিছু করতে পারলে? এত রাত করে যখন ফিরেছ, কিছু কি আর একটা হেস্তনেস্ত হয় নি।"

কর্ত্তা রমাপ্রসাদ জলের গেলাসে হাত ধুইতে ধুইতে বলিলেন, "দাঁড়াও, হাতখানা ধোওয়ারও যে অবসর দিলে না!"

রাধারাণী বলিলেন, "দাঁড়িয়ে বসেই ত এত কাল কেটে গেল। আর আমি দাঁড়াতে পারি কই? মানুষের বয়স বাড়ে বই ত কমে না। এরি মধ্যে আমায় সব কাজ শেষ করে যেতে হবে ত! অদৃষ্ট এমন যে ছেলেও একটা নেই যার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

রমাপ্রসাদ ঠাণ্ডা লুচি ও মাছের কালিয়া মুখে পুরিতে পুরিতে বলিলেন, "চেষ্টা ত সবরকমই করলাম। তুমি যেমন বলেছ তেমনই সব কথা হ'ল। কিন্তু তারা যা ফর্দ্দ বার করলে খরচ দিতে দিতে আমাদের প্রাণান্ত হয়ে যাবে।"

রাধারাণী হাত উল্টাইয়া বলিলেন, "যায় যাক্ প্রাণান্ত হয়ে। চার-চারটে মেয়ের যে কিছু না দেখে বিয়ে দিলে তাতে কি তোমার খুব সাশ্রয় হয়েছে? অনেক টাকা বেঁচেছে, না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "বাঁচেনি বলেই ত এবার তোমার পরামর্শে চলছি। কিন্তু তাতেও সুবিধে করতে পারছি কই? দত্তরা বলছে যে ছেলে বিলেত থেকে এসে বিয়ে করবে কথা দিচ্ছে। লেখাপড়া চাইলে লেখাপড়া করে দিতেও রাজি। এখন খালি চার হাজার টাকা ধার বলে নিয়ে মেয়ে আশীর্ব্বাদ করে যাবে। আর মিত্তিররা বলে ছেলে বিয়ে করেই যাবে, কিন্তু বিয়ের রাত্তিরে তিন হাজার ছাড়া বিলেতে মাসে মাসে এক-শ খরচ দিতে হবে। এর ভিতরে কোন্‌টায় তুমি রাজি বল?"

রাধারাণী বলিলেন, "প্রথমটাতে রাজি নিশ্চয় নয়। মেয়ের ষোল সতের বয়স হয়ে গেল এখন আশীর্ব্বাদ সেরে বিয়ের আশায় হাত ধুয়ে বসে থাকব, আমি ত আর হাবা নয়। তার পর বাবাজী ফিরে এসে কোনো জজসাহেবের মেয়ে বিয়ে করে তোমার চার হাজার টাকা যদি গায়ের উপর ছুঁড়ে দেন তুমি ত আর নালিশ করে তাকে জামাই করতে পারবে না?"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "হ্যাঁ, তা ত সত্যি কথা। তা ছাড়া জাহাজ থেকে যদি শ্রীমান গাউন-পরা বৌ নিয়ে নামেন তাতেই বা আমি কি করতে পারব? আজকাল ত মেম-মা-লক্ষ্মীদের কৃপায় বাঙালীর মেয়ের বিয়ে হওয়াই দায় হয়ে উঠেছে। বাঙালীর মেয়ের সাত হাঙ্গামের উপর আবার জাত বাছ্‌তে হয়, এদের এদিকে বিলেত-ফেরত পুরুতরা শুদ্ধি করে যখন যা জাত দরকার ফরমাস মত তাই করে দেন। মুচি চাও মুচি, নৈকিষ্যি কুলীন চাও নৈকিষ্যি কুলীন। এক মুহূর্ত্তে মেরী রোজীরা সব মন্দাকিনী, রাজেন্দ্রাণী হয়ে উঠেছেন। মিত্তিরের পো বিয়ে করে যেতে রাজি হয়েছে, সে আমার কপাল, কিন্তু খরচ হবে এক গাদা।"

রমাপ্রসাদের পাঁচ কন্যা, পুত্র একটিও হয় নাই। রাধারাণীর সখ ছিল মেয়েদের বিবাহ দিয়া এমন সব সভা-উজ্জ্বল জামাই আনিবেন যে পুত্রের অভাববোধ চিরদিনের মত মন হইতে মুছিয়া যাইবে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কন্যাদের রূপ শশীকলার মত বৃদ্ধি না পাইয়া যখন শশীকলার মত ক্ষয় পাইয়া ক্রমে অমাবস্যার মূর্ত্তি ধরিল, তখন রাধারাণীর সকল আশা ঘুচিয়া গেল। বিবাহ হিন্দুর মেয়েদের দিতেই হইল, কিন্তু কোনও দিক দিয়াই মনের মত হইল না। বড় ঘরে কুটুম্বিতা হয় নাই, অথচ মেয়েরা সম্পন্ন ঘরের মেয়ে, অল্প টাকায় নানা অভাব তাহাদের পিছন পিছন অষ্টপ্রহর যেন হাঁ করিয়া ঘুরিতেছে। স্বামীরা কেহ সামান্য বেতনের চাকর, কেহ একদিন আনে ত পাঁচ দিন আনে না, কেহ বা একেবারেই বেকার। সুতরাং বাপমা-ই তাহাদের একমাত্র ভরসা। বাপের বাড়ি দুই দিনের জন্য আসিলে স্বামীরা লইয়া যাইবার কথা যেন বার মাসের মত ভুলিয়া যায়, বাপমাও কি করিয়া আর আপনা হইতে পাঠাইয়া দেন? ফলে চার কন্যা গলা হইতে নামাইয়া রমাপ্রসাদকে চারিটি পরিবার পৃষ্ঠে বহন করিতে হইতেছে।

কনিষ্ঠা কন্যার নাম মা সাবধান হইয়া রাখিয়াছিলেন কৃষ্ণা। কিন্তু দেখা গেল তাহারই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রূপে বসন্তশ্রী দিনে দিনে ফুটিয়া উঠিতেছে। রাধারাণী যখন-তখন কৃষ্ণার মুখখানি ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বলিতেন, "এ মেয়েকে আমি গেঁয়ো জামাইয়ের হাতে দেব না, বিলেত-ফেরত জামাই আন্‌ব।" রাধারাণী বাড়ীর অনেক কালের নিয়মভঙ্গ করিয়া মেয়েকে ইস্কুলে দিলেন, গান-বাজনার জন্য মাষ্টার রাখিলেন, পাড়ার নবীনাদের সঙ্গে ভাব করিয়া মেয়ের জন্য আধুনিক সাজপোষাকের ব্যবস্থা করিলেন। কেহ যদি কৃষ্ণার রূপের প্রশংসা করিত ত রাধারাণী গর্ব্বভরে স্বামীকে আক্রিয়া বলিতেন, "হ্যাগা, তুমি বল চারপাশে চারটি রক্ষাকালী দেখে দেখে আমার চোখের দৃষ্টি কালো হয়ে গেছে, কৃষ্ণা নাকি ওদের পাশেই কেবল সুন্দর, কিন্তু পাড়ার লোকের চোখেও কি দোষ হয়েছে? বল্‌লে তুমি বিশ্বাস করবে না কৃষ্ণাকে যে দেখে সেই দুদণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।"

রাধারাণী পণ করিয়াছিলেন এমন কন্যার উপযুক্ত রোজগারী জামাই না করিয়া ছাড়িবেন না। চার-চারিটা মেয়ের বিবাহ দিয়া তাঁহার সুখ যা হইয়াছে বলিবার নয়। মেয়েরা নিত্যনৈমিত্তিক সকল কাজে আসিয়া মা'র কাছে হাত পাতে। কিন্তু রমাপ্রসাদ ত মাসের শেষে হিসাব কড়াক্রান্তি না বুঝিয়া লইয়া স্ত্রীকে একটি টাকা দেন না, সুতরাং তিনি অন্নপূর্ণার মত চারি হাতে বিলাইবেন কোথা হইতে? অগত্যা বুড়া বয়সে পাপপুণ্যের হিসাব ভুলিয়া স্বামীর কাছে অগুন্তি মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাকে টাকা আদায় করিতে হয়। সন্তানের ক্ষুধা মিটাইতে জগতে কত মা ত ইহা অপেক্ষা কত বড় পাপই অনায়াসে করিয়াছে। বিধাতা কি আর রাধারাণীর এই সামান্য পাপগুলা ক্ষমা করিবেন না? তাহার জন্য নয়, বিধাতাকে তাঁহার ভয় নাই, পরপারের জবাব তাঁহার সব তৈয়ারী আছে, রাধারাণীর ভয় ইহলোকের এই স্বামীটিকে। মাসে পাঁচবার সাতবার কাঠগড়ার আসামীর মত স্বামীর জেরার তলায় যে নির্দ্দোষী হইয়াও তাঁহাকে দুর্গানাম জপ করিয়া কাঁপিতে হয় ইহা আর তাঁহার সহ্য হয় না। মেয়েদের অশ্রুসিক্ত শুষ্ক মুখ আর স্বামীর ক্রুদ্ধ রক্তচক্ষু চিরজীবন দেখিবেন এই কি তাঁহার অদৃষ্টে খোদাই করিয়া লেখা আছে? কৃষ্ণার মুখের হাসি চির-উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যদি যাইতে পারেন তবু তাঁহার এত কালের দুঃখকে না-হয় তিনি সার্থক বলিয়া মানিবেন।

স্বামীর কাছে অনেক সত্য মিথ্যা বলিয়া সংসারের খরচ ইহার পর অর্দ্ধেক করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া রাধারাণী মিত্রদের এম্-এ পাস ছেলেটিকেই কৃষ্ণার জন্য মনোনীত করিলেন। বিবাহের পর আড়াই বছর কি তিন বছর মাসে এক শত করিয়া টাকা জামাইকে বিলাতে পাঠাইতে হইবে, বিবাহরাত্রির সব দেনা-পাওনার পর ইহা লেখা-পড়া হইয়া গেল। রাধারাণীর মুখে হাসি ফুটিল, কিন্তু তাঁহার চারি কন্যা আঁধার মুখে গবেষণা করিয়া খোঁজ আরম্ভ করিলেন কোন্ বন্যার জল তাঁহাদের ভাসাইয়া রাধারাণীর ক্রোড়ে আনিয়া ফেলিয়াছে।

রাধারাণীর শেষ প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণার বিবাহের পর সংসারের খরচ অর্দ্ধেক কেন সিকি

করিয়া দিয়া তিনি আপনার বহু পুণ্য ও অল্প পাপের বোঝা লইয়া বিধাতার বিচারালয়ে হিসাব মিটাইতে চলিয়া গেলেন। ইহলোকে তাঁহার মিথ্যার বোঝা বাড়িতে পাইল না। পিতা যেখানে একাধারে কর্ত্তা ও গৃহিণী সেখানে কন্যাদের আর বেশীদিন সুবিধা হইল না, মাতৃঋণের স্মৃতি বুকে লইয়া তাহারা আপন আপন দুঃখের ঘরে ফিরিয়া গেল। রমাপ্রসাদের মনে একটা সান্ত্বনা রহিল যে স্ত্রীকে তিনি আজীবন ঐশ্বর্য্য-সমারোহের মধ্যেই রাখিতে পারিয়াছিলেন। না হইলে একটি মাত্র মানুষের মৃত্যুর পর সংসারের খরচ সিকি হইয়া যায় কি করিয়া ?

সংসারে এখন দুইটি মাত্র মানুষ—বিপত্নীক রমাপ্রসাদ ও তাঁহার স্বামী-বিরহিণী কন্যা কৃষ্ণা ! রোগে শোকে শেষ বয়সে রমাপ্রসাদের স্বভাবের উপরের কর্কশ আবরণটা অনেকখানি ক্ষয় পাইয়া মমতার ফল্গুধারা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য ঘরের একমাত্র সঙ্গী কৃষ্ণার সহিত আজকাল তাঁহার একটা সৌহার্দ্দ্য দেখা যায়। নিঃসঙ্গ জীবনে তাঁহার সকলদিকের আশ্রয় ও অবলম্বনই এখন কৃষ্ণা।

স্বামীর সঙ্গে কৃষ্ণার পরিচয় মাত্র দুই সপ্তাহের ; তাহার পরই সে সাগরপারে জ্ঞান ও অর্থের আকর বিলাতী ডিগ্রি সংগ্রহ করিতে চলিয়া গিয়াছে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে যখন অজস্র অর্থের জৌলুসে গৃহসংসার সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবে তখন রাধারাণী পাড়ার লোককে ডাকিয়া গর্ব্ব-ভরে জামাতার গুণপনা ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না এ দুঃখ রমাপ্রসাদ ও কৃষ্ণা দুজনেরই মনে আজও লাগিয়া আছে। কৃষ্ণার বয়স কম হইলেও সে জানিত যে পাঁচ জনের কাছে কুরূপা কন্যা ও অক্ষম জামাতাদের পরিচয় দিতে মায়ের মনে লজ্জার অবধি ছিল না। মা দিদিদের পিছনে রাখিয়া তাহাকে সর্ব্বদা সকলের সামনে আগে দাঁড় করাইতেন, ইহাতে দিদিরা কৃষ্ণার উপরেই চটিয়া আগুন হইত। নূতন জামাতাটিকেও পুরাতন জামাতাদের আগে আগে দাঁড় করাইতে মা আর নাই, ইহাতে পুরাতন জামাতাদের মনে যতই সান্ত্বনা থাকুক, মা নূতন আনন্দের মূল্যটুকু দিয়া পাওনা পাইবার আগেই যে চলিয়া গেলেন তাহাতে কৃষ্ণার দুঃখ চিরস্থায়ী হইয়া রহিল।

যে-বয়সে অধিকাংশ বাঙালীর মেয়ে সন্তানসন্ততি লইয়া বাস্তবজীবনের অসংখ্য খুঁটিনাটির ভিতর নিজেকে হারাইয়া ফেলে, সে-বয়সে কৃষ্ণার নিজের জীবনটা হইয়া উঠিল প্রায় সমস্তটাই ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কিন্তু পিতার জীবনের অধিকাংশই তাহাকে অবলম্বন করিয়া চলিত বলিয়া জীবনটাকে তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জাগরণ ও স্বপ্ন দুইয়ের জন্যই তৈয়ারী রাখিতে হইত। যতক্ষণ পিতার সম্মুখে থাকিত কি তাঁহারই কাজে থাকিত ততক্ষণ সকল দুঃখ ও ব্যথা হইতে পিতাকে কি করিয়া বাঁচাইয়া চলা যায় এই ছিল তাহার একমাত্র ভাবনা। আপনার গৃহরচনার স্বপ্ন ছিল তাহার অবসরবিনোদন। আপনাকে সেই গৃহ-বেদীতলে উৎসর্গ করিয়া দিবার জন্য সে যেন নানা আভরণে ভূষিত করিতেছিল। তাহার পিতৃগৃহের ঘরকন্না, তাহার বিদ্যাসঞ্চয়, তাহার বিলাস, তাহার প্রসাধন সকলেরই ছিল সেই এক লক্ষ্য।

প্রায় তিন বৎসর হইতে চলিল কৃষ্ণার স্বামী মিহির বিলাত গিয়াছে। রমাপ্রসাদের গৃহ এই কয় বৎসরেই প্রায় নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৃহৎ সংসার ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাঁহার কার্পণ্যেও কেমন একটা শৈথিল্য আসিয়াছিল। কৃষ্ণা টাকা চাহিলে তিনি বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক বেশী করিয়াই যেন ঢালিয়া দিতেন। মেয়ের বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছে, স্বামী বিলাত-প্রবাসী, এখন হইতে বড় রকম চালচলন না শিখিলে শ্বশুরবাড়ীতে মেয়ের মান থাকিবে না, তাঁহারও কুটুম্বজনের কাছে ছোট নজরের দুর্নাম হইবে। বিবাহের সময় কৃষ্ণাকে অলঙ্কার এবং জামাইকে অর্থ ছাড়া আর কিছু দিবার তাঁহার কথা ছিল না। কিন্তু তিনি বিলাতফেরত জামাইয়ের উপযুক্ত অভ্যর্থনার পাছে ত্রুটি হয় বলিয়া মেয়ের ঘর আসবাবে ভরিয়া দিয়াছেন। কাপড় রাখিবার আলমারী, আপাদমস্তক দেখিবার জোড়া আয়না, প্রসাধনের টেবিল, অবসরবিনোদনের অর্গ্যান, লেখাপড়া করিবার চামড়া-মোড়া টেবিল ও ঘূর্ণায়মান চেয়ার কিছুরই অভাব নাই। রমাপ্রসাদ যখন তখন বলেন, "আমি বুড়োমানুষ মা, আজকালকার সব জিনিষপত্রের নামও ত জানি না। যদি তুই ঠিক মত সব বলে দিস্ তবে ত আমি নিখুঁৎ করে মা'র ঘর সাজাতে পারি। তা তোর ত সব কথায় বুড়ো বাপের কাছেই লজ্জা।"

কৃষ্ণা চাহিতে বেশী না পারিলেও পাইলে খুশী হইত। ভবিষ্যতের গৃহরচনার কোনও এক পর্ব্বে সে তাহার প্রত্যেকটি সম্পদ ও বিদ্যার নির্দ্দিষ্ট স্থান মানসনেত্রে দেখিয়া রাখিয়াছিল; বর্ত্তমানে তাহাদের অপব্যয় কি অপচয় করিবার ইচ্ছা তাহার বিন্দুমাত্রও ছিল না। কৃষ্ণার নিজের মতন তাহার প্রাণহীন সমস্ত গৃহসজ্জাও যেন শুধু মিহিরের পথ চাহিয়া ছিল। তাহাদের বর্ত্তমান প্রয়োজন বলিয়া কোনও বালাই ছিল না।

আলমারী খুলিয়া কৃষ্ণা কাপড় সাজাইতেছিল। মাঝে মাঝে গোছগাছ না করিলে যে পোকামাকড়ে সব নষ্ট করিয়া দিবে। এই তাহার গায়ে-হলুদের ময়ূরকণ্ঠী বেনারসী, মিহির নিজেই নাকি ইহা পছন্দ করিয়া কিনিয়াছিল। কৃষ্ণা বছরে দুই-তিন বার ইহা রোদে দিয়া তুলিয়া রাখে, একদিনও পরে নাই। বাবা বলিয়াছেন, মিহিরের বোম্বাই পৌঁছিবার দিন জানিতে পারিলে তিনি কৃষ্ণাকে সঙ্গে করিয়া জামাইকে আনিতে বোম্বাই যাইবেন, সেই দিন বোম্বাইয়ের জাহাজ-ঘাটায় কৃষ্ণা এই শাড়ীখানা পরিবে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। ই আলতা-রাঙা সুতা ও সোনালী জরিতে বোনা শাড়ী তাহার ফুলশয্যায় মা পাঠাইয়াছিলেন; ট্রেন হইতে হাওড়া ষ্টেশনে নামিবার সময় এখানা পরিলে বেশ হয়। মিহিরকেও যদি সেই সঙ্গে সাহেবী পোষাক ছাড়াইয়া বিবাহের জোড়টা পরানো চলিত তাহা হইলে কৃষ্ণা অনায়াসে তাহা সঙ্গে লইতে পারিত। কিন্তু কি জানি হয়ত লোকে এমন ব্যাপার দেখিলে হাসিবে। শ্বশুরবাড়ীতে মাত্র যে আটদিন কৃষ্ণা ছিল, তাহার প্রত্যেকদিনই নূতন নূতন ঢাকাই কি মান্দ্রাজী শাড়ী পরিয়াছিল। সেই স্মৃতিসম্পদে সমৃদ্ধ দিনগুলিকে যেন এই শাড়ীগুলি আপনাদের ভাঁজে ভাঁজে লুকাইয়া রাখিয়াছে। কৃষ্ণা তাহাদের জমা করিয়া রাখিয়াছে, মিহিরের নিকট এক এক দিন এক একটি বিগত দিনের ইতিহাস ইহারা সৌরভে ও মাধুর্য্যে ভরিয়া আনিয়া দিবে বলিয়া। আজ তাহাদের দিকে চাহিয়া কৃষ্ণা অতীত ও ভবিষ্যতের সেই আনন্দময় দিনগুলির কথাই ভাবিতেছিল।

বাহির হইতে রমাপ্রসাদ ডাকিলেন, "মা লক্ষ্মী, কাল মিহিরের চিঠিতে কি খবর এল কিছু শুনলাম না ত? ওখানের সব খবর ভাল? পরীক্ষার ফল বার হতে আর কত দেরী?"

কৃষ্ণা কাপড়ের বোঝা ফেলিয়া সলজ্জ হাস্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "পরীক্ষার ফল বার হতে আর দেরী নেই বাবা; কিন্তু শুনছি ছ'মাস পরে আবার একটা কিসের পরীক্ষা আছে, সেটাও পাস করে আসা দরকার, তাই সেই সব পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত আছেন।"

রমাপ্রসাদ ক্ষুণ্ন হইয়া বলিলেন, "পরীক্ষা দেওয়া খুবই ভাল, কিন্তু আমার বুড়ো হাড়ের দিকেও ত তাকানো দরকার। আমি আর ক'দিন আছি? তোকে হাতে হাতে সঁপে দিয়ে যেতে না পারলে পরলোকেও যে শান্তি পাব না।"

অভিমানে কৃষ্ণার ঠোঁট ফুলিয়া চোখে জল আসিল সে যেন হইয়াছে সকলের পথের কাঁটা। স্বামীর জন্য বাবার কাছে তাহাকে কথা শুনিতে হয়, আবার বাবার জন্যও প্রতি মেলেই স্বামীর খোঁটা সহিতে হয়। রমাপ্রসাদ মিহিরকে তাড়াতাড়ি ফিরিবার জন্য তাগিদ দেওয়াতে সে যে লিখিয়াছে, "আর ছ'মাস যদি খরচ চালাতে না পারবেন তবে এত বড় একটা দায়িত্ব তিনি ঘাড়ে নিলেন কেন? তাঁর হুড়োহুড়ির জন্য আমি ত নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারি না।" একথা কৃষ্ণা ত বাবাকে বলিতে যাইবে না! কথাটা তাহাকেই হজম করিতে হইবে। চোখের জল চাপিয়া কৃষ্ণা বলিল, "এখন ত আমাকে ঘাড় থেকে ফেলবার জন্য মহা ব্যস্ত হচ্ছ। টেনে যখন কেড়ে নিয়ে যাবে তখন দেখা যাবে কত খুশী হতে পার।"

রমাপ্রসাদ ম্লান হাসিয়া বলিলেন, "তোর জন্যে শেষ বয়সে আমি সর্ব্বস্ব পণ করলাম, তুইও কি না আমাকে শেষে এই অপবাদ দিস্! ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে যাদের চেষ্টা করেছিলাম, তারা আমার কাছে সুদে আসলে দাম পুষিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তুই যেন রাজরাণী হয়ে নিজের সিংহাসন আলো করে চিরকাল থাকিস্, দেখে আমাদের চোখ জুড়োয়, মাথা উঁচু হয়, এই ইচ্ছাতেই না তোর মা ধনুকভাঙা পণ করেছিল। সে ত কিছুই দেখে গেল না, আমিও পাছে যাবার আগে তোদের পাশাপাশি না দেখতে পাই এই জন্যেই না এত কাকুতি-মিনতি! তুইও এটুকু বুঝবি না!"

কে যে বুঝে না তাহা কৃষ্ণাই জানে। কিন্তু বলিবার তাহার কোনও উপায় নাই। সে হাসিয়া বলিল, "বাবাঃ, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাওয়াও বিপদ। শেয়ালের

ঝগড়ার মত নিজেই আবার মিটোতে বস্তে হবে। হারলে আমার হার, জিতলে তোমার রাগ, কোন্ দিক্ দেখি বল ত।"

রমাপ্রসাদ খুশী হইয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণা কাপড়ের বোঝা পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া তুলিয়া আসবাবপত্রে কোথাও একবিন্দু ধূলা পড়িয়াছে কিনা দেখিয়া বাবার আহার্য্যের তদারক করিতে গেল। পরিধানে শাদা মিলের শাড়ী, হাতে মাত্র দুইগাছি সোনার চুড়ি। কৃষ্ণার বস্ত্র অলঙ্কারে পাছে কোনও ক্ষয়ের চিহ্ন ধরা পড়ে এই জন্য সেগুলি সে কখনও তেমন ভাবে ব্যবহার করে নাই। মিহির যাইবার দিন হইতেই প্রায় তুলিয়া রাখিয়াছে। তাহার ইচ্ছা মিহির আসিয়া তাহাদের আবার ঠিক সেই বিবাহের যুগের অবস্থায় দেখে। মাঝখানের এই তিনটি বৎসর যেন ছিল না এমন রূপ তাহাদের থাকা দরকার। দেশের মাটিতে ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া যেন মনে হয় তিন বৎসর আগেকার সেই স্বপ্ননিদ্রাশেষেই এ জাগরণ, মাঝের বিরহ শুধু স্বপ্ন, শুধু মায়া। কিন্তু দর্পণের দিকে চাহিয়া কৃষ্ণাই আবার ভাবে, তিন বৎসর আগেকার সংসারজ্ঞানশূন্যা শিশুপ্রকৃতি কৃষ্ণাকে কি আজ এই শোকভারানত কৃষ্ণার দৃষ্টির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়? পিতা মাতা যে কৃষ্ণাকে কাচের ঘরের পাহাড়ী ফুলের মত সকল তাপ হইতে দূরে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, সে যেমন সহজে মিহিরের হাতে আপনাকে সঁপিয়া দিয়াছিল, শোক দুঃখ ও সুকঠিন অভিজ্ঞতার আগুনে পোড়-খাওয়া আজিকার কৃষ্ণা কি তেমনি সহজ নিশ্চিন্ততায় আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে? কৃষ্ণা বস্ত্র অলঙ্কারের রূপে কোনও পরিবর্ত্তন সহিতে পারিতেছে না, কিন্তু যাহার জন্য কালের গতিকে এই ক্ষুদ্র স্মৃতিকণাগুলির ভিতর এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা সেই মিহিরের দেহ-মন কি কালকে জয় করিতে পারিয়াছে? পারিয়াছে ভাবিয়া চোখ বুজিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, কৃষ্ণা চোখ বুজিয়াই থাকিবে, তার পর বিধাতার ইচ্ছা।

কৃষ্ণা পিতার খাবার সাজাইয়া আসন পাতিয়া জল গড়াইয়া সম্মুখে বসিল। রমাপ্রসাদ বলিলেন, "তুই সাহেবের বৌ হবি, তবু তোর এ বদরোগ ঘুচ্‌ল না রে। বুড়ো মানুষ আমি, বাঁধানো দাঁত নিয়ে একটি দুটি করে চিবিয়ে খাব, তুই ততক্ষণ বসে থাক্‌বি? খেয়ে নিলেই ত হত এইসঙ্গে।"

কৃষ্ণা বলিল, "সাহেব যখন হব, তখন হব, এখন ত বাঙালীর মেয়ে আমি, বাঙালীর কর্ত্তব্য করতে দাও।"

রমাপ্রসাদের খাওয়ার পর কৃষ্ণা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তাহার পিয়ানোর বই, তাহার ইংরেজীর খাতা লইয়া বসিল। মেম শিক্ষয়িত্রী সন্ধ্যায় আসিবেন তাঁহার জন্য বাজনা ও পড়ার পাঠ তৈয়ারী রাখিতে হইবে ত! এ সকলই কৃষ্ণার ভবিষ্যৎ গৃহরচনার উপকরণ।

কৃষ্ণা তাহার লিখিবার টেবিলের কাছে বসিয়া কি লিখিতে ব্যস্ত। সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশ জুড়িয়া নামিয়াছে, কিন্তু ঘরে এখনও আলো জ্বলে নাই। টেবিলের উপর বিলাতী পোষাক পরা হাস্যমুখ মিহিরের ছবি। লিখিতে লিখিতে কৃষ্ণা ছবির দিকে চাহিতেছে, চোখের জলে তাহার দৃষ্টি যেন অবরুদ্ধ, লিখিবার কাগজও জলে কালিমাখা হইয়া গিয়াছে।

রমাপ্রসাদ ঘরের পরদা ঠেলিয়া ঢুকিয়া বলিলেন, "ছ'মাসও ত হয়ে গেল কৃষ্ণা, এবার মিহির কি বলে?"

পিতার পায়ের শব্দে কৃষ্ণা জলকালিমাখা কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "এবার খবর ভালই বাবা, তাঁর পরীক্ষা হয়ে গেছে।"

আনন্দে রমাপ্রসাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে কৃষ্ণাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে শিরশ্চুম্বন করিতে গিয়া বলিলেন, "এ কি রে, তোর চোখে জল কেন? সুখের দিনে চোখের জল ফেলে কি অমঙ্গল ডাকতে হয়?"

কৃষ্ণা ভাঙা গলায় বলিল, "তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে, এতে আর সুখ কিসের বাবা?"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "সকল মেয়েই একদিন বাপমাকে ছেড়ে যায়, তুই ত তবু একুশ বছর অবধি বুড়ো বাপকে আগ্‌লে বসে থাক্‌তে পেয়েছিস।"

কৃষ্ণা কথা বলিল না; তাহার চোখের জল অকস্মাৎ বানের জলের মত ছাপাইয়া উঠিল। রমাপ্রসাদ বিস্মিত দৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মা, তুই কি শেষে পাগল হলি? তুই যেখানেই যাস্ না কেন, তোর পিছন পিছন

আমিও গিয়ে হাজির হব। এইটুকুনের জন্য এত ভাবনা কিসের ?”

কৃষ্ণা এইবার শক্ত হইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠকে সংযত করিয়া বলিল, “তুমি বুঝতে পার নি, বাবা, আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে। তিনি পাস করেছেন বটে, কিন্তু এখনও তাঁর আসবার দেরী আছে। এ বছরটা সেখানে কাজ করলে তবেই এখানে এসে ভাল কাজ পাবার সম্ভাবনা আছে, নাহলে হয়ত অনেকদিন বসে থাক্‌তে হ'বে। তাই—তাই—” কৃষ্ণার গলার স্বর বুজিয়া আসিল। রমাপ্রসাদ বলিলেন, “তাই কি—বলে ফেল মা, বোঝার উপর শাকের আঁটিও সয়ে যাবে।”

কৃষ্ণা বলিল, “আমাকেই সেখানে যেতে হবে।”

রমাপ্রসাদ গম্ভীর মুখে বলিলেন, “এই মিহিরের বক্তব্য ? এই তোর ভাল খবর ?”

কৃষ্ণা কোন জবাব দিল না।

রমাপ্রসাদ বলিলেন, “যাবি যে, বড়লোক জামাই টাকা পয়সা কিছু পাঠিয়েছে ? না, সবই এই বুড়ো শ্বশুরের ঘাড়ের উপর দিয়ে ? শেষ রক্তটুকুও না শুষে নিয়ে আমায় বাবাজী ছাড়বেন না।”

কৃষ্ণা বলিল, “এ টাকা তোমায় কেউ দিতে বলে নি, বাবা। কিন্তু অন্য কোনও টাকা যখন নেই, তখন টাকার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। তোমার সর্ব্বস্ব এমন করে নষ্ট করতে আমি দেব না।”

রমাপ্রসাদ বলিলেন, “তুই কি এত পণ্ডিত হয়েছিস এরি মধ্যে যে বিলেত যাবার মত টাকা রোজগার করে আনবি ?”

কৃষ্ণা বলিল, “রোজগার কোথা থেকে করব, বাবা ? তোমারই দেওয়া জিনিষ বেচে টাকা আন্‌তে হবে। বিলেত গিয়ে এত গয়না পরবার আমার দরকার হবে না।”

রমাপ্রসাদ বলিলেন, “দেশে যখন ফিরবি, তখন তোর শ্বশুর শাশুড়ী কি আমায় আস্ত রাখ্‌বে তাহ'লে ?”

কৃষ্ণার জাহাজের খরচের ব্যবস্থা রমাপ্রসাদই জোর করিয়া করিলেন।

বোম্বাইয়ের যে জাহাজঘাটা হইতে স্বামীকে আনিতে যাইবে বলিয়া কৃষ্ণা গহনা কাপড় পর্য্যন্ত গুছাইয়া রাখিয়াছিল, সেই জাহাজঘাটা হইতে একলাই একদিন সে স্বামীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। রমাপ্রসাদ বোম্বাই পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণা বলিল, “বাবা, এত পথ, এত দূর আমায় যখন একলা যেতে হবে, তখন প্রথম দিন থেকেই আমায় শক্ত হ'তে দাও। তুমি আমার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না বাবা। তোমার এ মেয়েকে ভগবান ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবার জন্যে গড়েন নি।”

রমাপ্রসাদ বলিলেন, “তোর যে দেখি বড় জাঁক হয়েছে রে ? বিলেতের মাটিতে পা দিলে না জানি আরও কি হবি। কলিকালের মেয়ে, বুড়ো বাপকেও কথা শোনাতে ছাড়বি কেন ?”

কৃষ্ণা বলিল, “তোমাকে কথা শোনাবার যোগ্যতা আমার নেই বাবা, কিন্তু কলিকালের মেয়েকে কলিকালের মত চল্‌তে না শেখালে দুঃখ তাকেই বেশী করে পেতে হয়।”

পিতাকে কাঁদাইয়া ও আপনি কাঁদিয়া কৃষ্ণা একলাই চলিয়া গেল।

রমাপ্রসাদের শূন্যগৃহে আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই। বড় মেয়েরা মাঝে মাঝে আসিয়া মুখে কুশল প্রশ্ন করিয়া চলিয়া যায়, তাহার বেশী যোগ আর তাহাদের সঙ্গে নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া পিতামাতা তাহাদের জন্য যথেষ্ট করিলেও সে করা বাধ্য হইয়া করা, সাধ করিয়া করা নয়, এইজন্য কৃষ্ণার উপরেই তাহাদের একটা রাগ ছিল। কৃষ্ণার হইয়া পিতাকে সেবা করিলে পাছে কৃষ্ণারই কিছু একটা উপকার হয় এই রাগেই যেন তাহারা এ বাড়ীর সীমানা মাড়াইতে চাহিত না।

রমাপ্রসাদ বসিয়া বসিয়া রবিবারের আশায় দিন গুণিতেন। কৃষ্ণা পৌঁছিবার পর প্রথম যে রবিবারে তাহার চিঠি আসিল সেদিন রমাপ্রসাদ যেন আনন্দে আহার-নিদ্রাও ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কৃষ্ণাও কি না বিলাতে। দীর্ঘ সমুদ্রপথের কত বিচিত্র বর্ণনা তাহার চিঠিতে; অনন্ত বারিধির রূপ, অপূর্ব্ব সহযাত্রীদের কথা, অদেখা কত তটভূমির কোলাহল, সকলের ভীড়ে মিহির যেন কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। যাই হোক, মিহির ভাল আছে ত, তাহা হইলেই হইল। জামাইয়ের কথা শ্বশুরকে হয়ত সঙ্কোচের জন্যই কন্যা লিখিতে পারে নাই। পরের রবিবার কৃষ্ণার চিঠিতে খবর আসিল, মিহির ও কৃষ্ণা বেশ ভাল আছে। জাহাজ-

ভাড়ার টাকা কৃষ্ণা শীঘ্র ফেরত পাঠাইবে। আনন্দে রমাপ্রসাদের চোখে জল আসিল। দূরে থাক্, তবু তারা যে ভাল আছে, সচ্ছল আনন্দে আছে, এ কি কম সুখ? এই সুখের জন্যই ত এত দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা। চোখে তিনি না দেখেন দুঃখ নাই, রাধারাণীও চোখে দেখেন নাই।

টাকা একদিন আসিল, কৃষ্ণারই নামে কি ভাবিয়া রমাপ্রসাদ তাহা জমা করিয়া রাখিলেন। কিন্তু কৃষ্ণার চিঠিতে আর কোনও নূতন কথা নাই, কোনও বৈচিত্র্য নাই। বুড়া বাপকে কৃষ্ণা কি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে, না হইলে নিজেদের সুখের কথা তাঁহাকে দুই-চারিটা শুনাইলে তিনি যে কত সুখ পাইতেন তাহা সে বুঝিল না? জীবনে কৃষ্ণাই ত ছিল তাঁহার একমাত্র অবলম্বন, পিতাকে ছাড়িয়া যাওয়ার কথা ভাবিয়াই তাহারও চোখে বান আসিত, আজ নিজেদের সুখ-সৌভাগ্যের দিনে নিঃসঙ্গ শোকার্ত্ত বৃদ্ধ পিতাকে নিজেদের আনন্দের এক কণা ভাগও কি সে পরিবেশন করিতে পারিল না? রবিবারের পর রবিবার একই রকম চিঠি আসিত, "আমরা ভাল আছি, আশা করি তুমি ভাল আছ।" রমাপ্রসাদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চিঠি বন্ধ করিয়া রাখিতেন, এক বারের পর দুইবার আর খুলিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিত না। সংসারে কেহ কাহারও নয়, অনর্থক মায়া বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া কি লাভ? তাঁহার দিন ত ফুরাইয়া আসিয়াছে, অতীতকে ভুলিয়া এখন ভবিষ্যতের আবাসের কথা ভাবাই ভাল। যদি কন্যাজামাতার এই নবলব্ধ আনন্দের জালে তিনিও জড়াইয়া পড়িতেন তাহা হইলে হয়ত শেষ যাত্রাপথের কড়ি সংগ্রহে তাঁহার ভুল হইয়া যাইতে পারিত। বিধাতা ভালই করিয়াছেন, কৃষ্ণাকেও পিতৃস্নেহের কথা ভুলাইয়া দিয়াছেন। এখন তাঁহার অখণ্ড অবসর বিধাতার ধ্যানেই কাটিবে।

রবিবার সকালবেলা মনটা চঞ্চল হয় বলিয়া রমাপ্রসাদ সেই সময়টা আপনার ঘরে গীতা লইয়া বসেন। অন্যদিনের মত সেদিনও তাঁহার চিরপুরাতনভৃত্য বৈজু টেবিলের উপর একখানা চিঠি রাখিয়া গেল। মনকে কতখানি জয় করিতে পারিয়াছেন দেখিবার জন্য রমাপ্রসাদ বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, চিঠির দিকে তাকাইলেন না। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু শতবার পঠিত গীতার অর্থ কেমন যেন প্রতিবার উচ্চারণের সঙ্গেই মনের সম্মুখে অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। রমাপ্রসাদ গীতা বন্ধ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া রেশমের রুমালে বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিলেন। চিঠিখানা হাতে তুলিয়া খুলিতে কেমন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। খুলিলেই ত রহস্য স্পষ্ট হইয়া যাইবে। হয়ত দুই লাইন কুশল প্রশ্ন ও প্রণামাদি ছাড়া কিছু নাই। বন্ধ করিয়া তবু ভাবা যায় যে কৃষ্ণার সুদূরের গৃহস্থালীর সকল হাসিগানের সুর, সকল পুষ্পস্তবকের সৌরভ ইহার ভিতর বোঝাই হইয়া রহিয়াছে।

রমাপ্রসাদ চিঠি খুলিলেন। ছোট্ট চিঠি, বড় নয়, কিন্তু সেই পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি আর ইহাতে নাই। সম্পূর্ণ নূতন সংবাদ, কৃষ্ণা ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু মিহির সঙ্গে আছে কি নাই, চিঠি হইতে কোন কথাই ত বুঝা গেল না। সে যে একা আসিতেছে এমন কথাও ত স্পষ্ট লেখা নাই, সে যে মিহিরের সঙ্গেই ফিরিতেছে এরূপ ইঙ্গিতও চিঠিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রমাপ্রসাদ মহা বিপদে পড়িলেন। মিহিরের বাড়ীতে গিয়া খোঁজ করিবারও তাঁহার সাহস ছিল না, কারণ বাড়ীর কাহাকেও ঘুণাক্ষরে না জানাইয়া বৌকে সোজা বিলাতে ডাকিয়া লইয়া যাওয়াতে মিহিরের অপেক্ষা তাহার বধূর উপরেই সে বাড়ীর লোকের আক্রোশ বেশী। তাহাদের মতে এ সমস্ত ব্যাপারটাই কৃষ্ণার কারসাজি। এখন একথা তাহাদের কাছে তুলিলে বধূর বৃদ্ধ পিতাকে তাহারা কি প্রকার সুমিষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিবে কে জানে?

সাত দিন রমাপ্রসাদকে নীরবেই সকল উদ্বেগ সহিতে হইল। একেবারে একলাই তিনি গেলেন কন্যাকে লইয়া আসিতে। কি জানি কোথা হইতে কুটুম্বজনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহার চেয়ে তাহাদের দূরে রাখাই ভাল।

শীর্ণা নিরাভরণা ম্লানমুখী কৃষ্ণা নিঃসঙ্গ গাড়ী হইতে নামিয়া পিতার পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ভয়ে ও বিস্ময়ে রমাপ্রসাদের কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল। কৃষ্ণাকে তুলিয়া ধরিয়া অতি অস্পষ্ট ক্ষীণকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই কই মা?"

কৃষ্ণা কঠিন হইয়া বলিল, "তোমার ছোট জামাই নেই বাবা।"

পিতাপুত্রীতে আর কোনও কথা হইল না। কন্যাকে প্রায় বুকে করিয়া পিতা ঘরে লইয়া গেলেন। সেই পুরাতন গৃহ ও পুরাতন আবেষ্টনের মধ্যে আবার সেই দুটি মাত্র সঙ্গীহারা মানুষ পরস্পরের মুখ চাহিয়া বসিয়া। কিন্তু এ মুখ-চাওয়ার ভিতর আর কোনও সুদূরের আশার বাণী নাই, সকল আশা এই নীরবতার অন্তরালে চিরসমাধিলাভ করিয়াছে।

রমাপ্রসাদ মনে করিয়াছিলেন শ্রান্ত শোকার্ত্ত কন্যাকে আজ আর কোনও প্রশ্ন করিবেন না। বাছা বহু দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে, একটু চুপ করিয়া পড়িয়া কিছু ক্ষণের জন্যও অন্তত পিতৃগৃহের স্মৃতির ভিতর ও সকল দুঃখের কথা ভুলিয়া থাক্। কৃষ্ণাকে তাহার মা'র শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিতে দিয়া রমাপ্রসাদ বাহিরেব ঘরে চলিয়া গেলেন। স্বামীর শত স্মৃতিজড়িত নিজ কক্ষে সে আজ থাকে এ ইচ্ছা রমাপ্রসাদের ছিল না।

বাহিরে কাহার মোটরগাড়ী অসহিষ্ণু ভাবে ঘন ঘন হর্ণ বাজাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত হইয়া রমাপ্রসাদ দেখিলেন মিহিরের পিতা। তিনি উন্মত্ত পবনের মত ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, "মশায়, এই কি আপনাদের স্ত্রী-শিক্ষা! মেয়ে ত তুর্কী নাচন নেচে বিলেত চলে গেলেন, ছেলেকে একবার সেকথা লেখেনও নি পর্য্যন্ত। এখন আবার শুন্‌ছি দেশে ফিরে তার নামে যত কুৎসা রটাবার চেষ্টায় আছেন। স্বামীর সঙ্গে শক্রতা করে স্ত্রীলোকের জগতে কখনও উপকার হবে না, সেটা জেনে রাখ্‌বেন।"

রমাপ্রসাদের মস্তিষ্কে ইহার কোনও অর্থ প্রবেশ করিল না। তিনি ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "কারও কোন কুৎসা ত সে করেনি।"

বেয়াই বলিলেন, "আলবৎ করেছে, এই দেখুন তার চিঠি।—'আমার গোপন বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে আপনাদের বধূমাতা যে কুৎসা রটনা করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া জানিবেন। প্রয়োজন হইলে প্রমাণ দিতে পারি।' পড়াশুনো করতে ছেলে গিয়েছে তার নামে এই সব অপবাদ দেওয়া এই কি আপনাদের উপযুক্ত কাজ হচ্ছে?"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "আমি দেখুন কিছু জানি না, এ কথার কূলকিনারা কিছু করতে পারছি না। কৃষ্ণা আমায় এ ধরণের কোন কথা বলে নি।"

বেয়াই গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তবে কি বলেছে সে? মুখ সেলাই করে বসে আছে?"

কৃষ্ণা যাহা বলিয়াছিল তাহার পিতা তাহা বলিতে পারিলেন না, ছুতা করিয়া ভিতরে উঠিয়া গেলেন, বলিলেন, "সে শ্রান্ত হয়ে এসেছে, আমি তাকে কিছু প্রশ্ন করি নি, একবার জেনে আসি গিয়ে।"

মা'র খাটের উপর বসিয়া কৃষ্ণা কতকগুলা পুরাতন চিঠি ছিঁড়িয়া স্তূপ করিতেছিল, অকস্মাৎ পিতাকে ঘরের ভিতর দেখিয়া চমকিয়া তাহার উপর একটা বালিশ চাপা দিল। পিতা বলিলেন, "মা, তোমার শ্বশুর এসে তোমার নামে অনেক তম্বি করছেন। আমি তাঁকে কি যে জবাব দেব জানি না, তাই তোমার কাছে এলাম।"

কৃষ্ণা শ্রান্ত দৃষ্টি পিতার মুখের উপর তুলিয়া দেউলিয়া মহাজনের মত উদাস সুরে বলিল, "কোন্ কথাটার জবাব চাও বল, আমি যা জানি বল্‌ছি।" তাহার কথার ভিতর কিছু মাত্র আটঘাট বাঁধিবার চেষ্টা নাই।

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "তুমি আপনা থেকেই সেখানে গিয়েছিলে একথা তিনি অনেক দিনই বলেছেন।"

কৃষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, আমি আপনা থেকেই যাওয়া দরকার ভেবে তাই গিয়েছিলাম।"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "তবে তুমি যে আমাকে বলেছিলে—"

কৃষ্ণা বলিল, "আমি ত তোমাকে বলি নি যে আমি কারুর ডাকে যাচ্ছি।"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "জাহাজ থেকে নেমে তুমি যে বল্‌লে,—আর তিনি এদিকে আমাকে তাঁর ছেলের চিঠি দেখাচ্ছেন।"

কৃষ্ণা অধীর হইয়া বলিল, "তুমি বুঝ্‌তে পারছ না বাবা, তাঁর ছেলে ত তাঁরই আছে, তাই সে যা খুশী চিঠি লিখেছে। কিন্তু তোমার জামাই বলে সেখানে কেউ নেই। এবার বুঝেছ?"

রমাপ্রসাদ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। খানিক ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "তাঁর ছেলের

নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করা হয়েছে এবং তুমিই নাকি তা করেছ।"

কৃষ্ণা বলিল, "তুমি ত জান বাবা, আমি কিছুই রটনা করিনি। সেখানে আমার কেউ ছিল মনে করে গিয়েছিলাম, আমার যে কেউ সেখানে নেই দেখে ফিরে এসেছি, তার পর আমি নীরবেই আছি। তুমি তাঁকে বলে দাও আমার উপর তম্বি করবার তাঁদের আর কোন অধিকার নেই, তাঁদের কুৎসা রটনা করেও আমার কোন লাভ নেই। লোকসান শুধু তোমার হয়েছে, মূল্য যথেষ্ট দিয়েছ কিন্তু যাকে কিনেছিলে তাকে দখল করতে পার নি।"

আলোচনা

"মঠ ও আশ্রম"

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গত অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে আমি 'মঠ ও আশ্রম' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। মাঘের 'প্রবাসী'তে এবং অন্যত্রও ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা কিছু কিছু হইয়াছে। তাহার মধ্যে শাস্ত্রের তর্কও কেহ-কেহ তুলিয়াছেন। বাধ্য হইয়া বারান্তরে এবং প্রবন্ধান্তরে এ-সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা আমাকে করিতে হইবে। এখানে শুধু একটি কথার উত্তর দিতে চাই।

'অরুণাচল মিশন' নামক এক মিশনের পক্ষ হইতে আলোকানন্দ মহাভারতী মহাশয় আমাকে তাঁহাদের মিশনের বিরুদ্ধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন, যেখানেই নাম না-করিয়া কোন আশ্রম সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত করিয়াছি, সেখানেই আমি তাঁহাদের মিশনকেই লক্ষ্য করিয়াছি। তাহা নয়।

প্রথমতঃ, আমার আলোচ্য বিষয় 'মঠ ও আশ্রম', 'মিশন' নয়। মিশন ও মঠে তফাৎ আছে। মঠে সাধনাদি হয়, মিশন লোক-সেবা ও প্রচার ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকে। আমি কোনও মিশন সম্বন্ধেই কিছু বলি নাই। আর দ্বিতীয়তঃ, আমার আলোচনা সাধারণ; কোন মঠ-বিশেষ বা আশ্রম-বিশেষকে আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

অরুণাচল মিশন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি সামান্য এবং ইহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ। আলোচ্য প্রবন্ধ লিখিবার সময় এই মিশনের কথা আমার আদৌ মনে হয় নাই। মহাভারতী মহাশয় জানেন না, কিন্তু আসাম প্রদেশে আরও অপ্রসিদ্ধনামা আশ্রম অনেক হইয়াছে এবং গিয়াছে, তাহাদের দুই-একটার কুৎসাও আমার কানে পৌঁছিয়াছে। আমি সেগুলির কথাই ভাবিয়াছি।

'জগৎসি' আশ্রমের নাম আমি করিয়াছি সত্য, কিন্তু সেটা শুধু দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। জগৎসির দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বে-আইনী কিছু অনুষ্ঠিত হইলে পুলিস জোর করিয়া আশ্রম ভাঙিয়া দিতে পারে। অন্ততঃ পুলিসের দৃষ্টিতে বে-আইনী, এমন কিছু যে জগৎসিতে ঘটিয়াছিল তাহা ত স্বীকৃত। যাহা-কিছু বে-আইনী তাহাই পাপ নয়, আর পাপমাত্রই আইন-বিরুদ্ধ নয়। আইন অমান্য করার জন্য পুলিস জগৎসি আশ্রম ভাঙিয়া দিয়াছিল; অনেক আশ্রমাদিতে আইন ভঙ্গ হয় না, কিন্তু পাপ আচরিত হয়। সেগুলি পুলিস ভাঙিয়া দিতে পারে না, পারিলে সমাজের উপকার হইত।

মঠ ও আশ্রমের যে-সব অনাচারের কথা আমি ইঙ্গিত করিয়াছি, সে-সবই কিংবা তাহার কোনটি জগৎসিতে অনুসৃত হইত, একথা আমি ত কোথাও বলি নাই। আমার প্রদর্শিত মঠাদির সমস্ত দোষ মহাভারতী মহাশয় নিজের উপর টানিয়া লইয়া আমার প্রতি অনর্থক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের মিশন আমার আলোচনার লক্ষ্য নয়। আমার প্রবন্ধের সেরূপ অর্থ করিয়া মহাভারতী মহাশয় শুধু যে নিজে অকারণে মনে আঘাত পাইয়াছেন তাহা নয়, আমার প্রতিও অবিচার করিয়াছেন।

"বৃহত্তর ভারতে বঙ্গসংস্কৃতির প্রভাব"

শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে (১২৭ পৃ.) শ্রীযুত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় কম্বোজে প্রচলিত একটি গল্পের সহিত বাংলা দেশের শীত-বসন্ত গল্পের তুলনা করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে বাংলা দেশ হইতেই বৃহত্তর ভারতে ঐ গল্প প্রচারিত হইয়াছে। এই অনুমান সত্য হইতেও পারে, কিন্তু জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। কারণ শীত-বসন্তের গল্পটি বাংলা দেশের নিজস্ব নহে। সংযুক্ত-প্রদেশের মির্জ্জাপুর জেলার এক বৃদ্ধার নিকট হইতে একজন সাহেব এই গল্প প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই শুনিয়াছিলেন এবং ক্রুক (Crooke) সম্পাদিত North Indian Notes and Queries, vol. II, 1892 পত্রিকায় ৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বোধ হয় যে ভারতের বহু স্থলেই গল্পটি চলিত আছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর সাম্বৎসরিক দিন।

আমি যখন জন্মেছি তখন থেকে তিনি হিমালয়ে ও দূরে দূরে ভ্রমণ করেছেন। দু-তিন বছর পর পর তিনি যখন বাড়ি আসতেন, তখন সমস্ত পরিবারে একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করতুম—সেটা আমার অল্প বয়সকে ভয়েতে সম্ভ্রমে অভিভূত করতো। সেই আমার বালকবয়সে তাঁর সত্তার যে মূর্ত্তি আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল সে হ'চ্ছে তাঁর একক ও বিরাট নিঃসঙ্গতার রূপ। তাঁর এই ভাবটি আমায় খুব স্তম্ভিত করতো—এ আমার স্মরণে আছে। কেমন যেন মনে হ'ত যে নিকটে থাকলেও তিনি যেন দূরে দূরে রয়েছেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা যেমন সন্নিকটবর্ত্তী গিরিশৃঙ্গসমূহ থেকে পৃথক হ'য়ে তার উত্তুঙ্গ তুষারকান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—আমার কাছে ঠিক তেম্‌নি ভাবে আমার পিতৃদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। সমবেত আত্মীয়-স্বজন পরিবারবর্গ থেকে তিনি অতি সহজে পৃথক, সমুচ্চ, শুভ্র ও নিষ্কলঙ্করূপে প্রতিভাত হ'তেন। তখন আমি ছোট ছিলুম; ছোট ছেলেকে লোকে যেমন কাছে ডেকে ছোট প্রশ্ন সুধোয়, সেই রকম ভাবে তিনি তখন আমায় ডেকে দু-এক কথা জিজ্ঞেস করতেন। আমার অগ্রজেরা কেবলমাত্র নিজেদের জীবনসম্বন্ধে নয়, সংসারের নানাবিধ খুঁটিনাটি কাজসম্পর্কেও, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন ও তাঁর কাছ থেকে নানাবিধ নির্দ্দেশ পেয়েছেন,—সে সুযোগ প্রথম বয়সে আমার ঘটে নি। তবু পিতৃদেবকে দেখে আমার ক্রমাগত উপনিষদের একটি কথা মনে হয়েছে, "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক:" যিনি এক, তিনি এই আকাশে বৃক্ষের মত স্তব্ধ হয়ে আছেন।

এখন মনে হয় তাঁর সেই নিঃসঙ্গতার অর্থ যেন কিছু কিছু বুঝ্‌তে পারি। এখন বুঝতে পারি যে তিনি বিরাট নিরাসক্ততা নিয়েই জন্মেছিলেন। তাঁর পিতার বিপুল ঐশ্বর্য্যসম্ভার ছিল, বাহিরের দিক দিয়ে সেই ঐশ্বর্য্যের কত রকম প্রকাশ হ'ত তার ইয়ত্তা নেই। আহারে, বিহারে, বিলাসে, ব্যসনে কত ধুম, কত জনসমাগম। পিতৃদেব সেই ভিড়ের মধ্যে থেকেও ভিড় থেকে দূরে থাকতেন। আপনার ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা নিয়ে আপনাতে নিবিষ্ট থাকা—এই ছিল তাঁর স্বভাব। অথচ কর্ম্মেও তাঁকে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। আমার পিতামহের অধিকাংশ অর্থ যে ব্যাঙ্কে খাটত, সেইখানে তাঁরই নির্দ্দেশক্রমে সামান্য পারিশ্রমিকে আমার পিতাকে কাজ করতে হ'ত। যাতে তিনি বিষয়কর্ম্মে নিপুণ হয়ে ওঠেন তার জন্যে পিতামহ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতেন। যদিও দায়িত্বজনক অনেক কাজ তিনি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করতেন, তবু সমস্ত বিষয়-কর্ম্মের উপর তাঁর ঔদাসীন্য ও অনাসক্তি দেখে পিতামহ ক্ষুণ্ণ হ'তেন। তখন তাঁর যৌবনকাল, বাইরের আড়ম্বর ও চাকচিক্যে মুগ্ধ হ'য়ে পড়া, হয়তো তাঁর মত অবস্থায় বিশেষ আশ্চর্য্যকর হ'ত না; কিন্তু সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে জড়িত থেকেও তিনি সকল কর্ম্মের ঊর্দ্ধে ছিলেন। সামাজিক দিক দিয়েও আবিষ্ট হ'য়ে পড়ার মত অনুকূল অবস্থা তখন তাঁর প্রবল ছিল; অনেক পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক তখন পিতামহের কাছে বিষয় বা অন্যবিধ ব্যাপার নিয়ে নিত্য উপস্থিত হ'তেন। উপরন্তু দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বাড়ির এবং পাথুরেঘাটার রাজবাটীর আত্মীয়সমবায় নিয়ে, সেই বহুদূরপরিব্যাপ্ত সম্পর্কিত মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁকে সংস্পর্শে আসতে হ'ত। আমি ঠিক জানি নে অবশ্য, তবে নিশ্চিত অনুভব করিতে পারি যে, এই আর্থিক প্রতিপত্তি ও সামাজিক সমারোহের মধ্যেও তিনি সেই উপনিষদবর্ণিত একক পুরুষের মত বৃক্ষের স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা রক্ষা ক'রে চলতেন। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের তৎকালীন বিপুল ঐশ্বর্য্যের আমরা যথাযথ ধারণাই করতে পারি না, পিতৃদেবের মুখে শুনেছি যে পিতামহ যখন বিলাতে অবস্থান

করতেন তখন মাসিক তাঁকে লক্ষাধিক টাকা পাঠানো হ'ত। পিতামহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রকাণ্ড এক ভূমিকম্পের ফলে যেন সেই বিরাট ঐশ্বর্য্য এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সেই সঙ্কটের মধ্যেও পিতৃদেব অবিচলিত—বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ—। তখন তিনি মন্ত্র গ্রহণ করছেন, হয়তো তখনই সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেন উপনিষদ যে মহৎ বাণী প্রচার ক'রে গেছে—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

আমার অভিজ্ঞতার মধ্যেই দেখেছি, অনেক শোকাবহ ব্যাপারে, আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগে বিচ্ছেদে তিনি তাঁর সেই তেতালার ঘরে আত্মসমাহিত হয়ে একা বসে আছেন। কেউ সাহস করতো না তাঁকে সান্ত্বনা দিতে। বাইরের আনুকূল্যের তিনি কোনও দিন অপেক্ষা রাখেন নি; আপনি আপনার মধ্যে আনন্দ পেতেন।

আমার যখন উপনয়ন হ'ল, দশ বছর বয়সে—মুণ্ডিত কেশ, তার জন্য একটু লজ্জিত ছিলেম—তিনি হঠাৎ আমায় ডেকে বললেন, "হিমালয়ে যেতে ইচ্ছে কর?" আমার তখনকার কি আনন্দ, বলবার ভাষা নেই। সেকালে লুপ-লাইনটাই ছিল মেন্ লাইন—রাস্তায় আমাদের প্রথম বিরামের জায়গা হ'ল শান্তিনিকেতন। সে জায়গার সঙ্গে এখানকার এ জায়গার অনেক তফাৎ, ধূ ধূ করছে প্রান্তর, শ্যামল বৃক্ষছায়ার অবকাশ নেই প্রায় কোথায়ও; সেই উষর রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে, আজকাল যেটা অতিথিশালা, তারই একটা ছোট ঘরে আমি থাকতুম, অন্যটাতে তিনি থাকতেন। তাঁরই রোপণ-করা শাল-বীথিকা তখন বড় হ'তে আরম্ভ করেছে। তখন আমার কবিতা লেখার পাগ্‌লামো তার আদিপর্ব্ব পেরিয়েছে; নাট্যঘরের পাশে একটা নারিকেলগাছ ছিল, তারই তলায় ব'সে "পৃথ্বীরাজ-বিজয়" নামে একটা কবিতা রচনা ক'রে গর্ব্ব অনুভব করেছিলুম। খোয়াইয়ে বেড়াতে গিয়ে নানা রকমের বিচিত্র নুড়ি সংগ্রহ করা, আর এধারে ওধারে ঘুরে গুহা-গহ্বর গাছপালা আবিষ্কার করাই ছিল আমার কাজ। ভোরবেলায় উঠিয়ে দিয়ে তিনি আমায় শ্রীভগবদ্গীতা থেকে তাঁর দাগ-দেওয়া শ্লোক নকল করতে দিতেন, রাত্রে সৌরজগতের গ্রহতারার সঙ্গে পারচয় করিয়ে দিতেন। এ ছাড়া তখন তিনি আমাকে একটু-আধটু ইংরেজি ও সংস্কৃতও পড়াতেন। তবু তাঁর এত কাছে থেকেও সর্ব্বদা মনে হ'ত, তিনি যেন দূরে দূরে রয়েছেন। এই সময় দেখতুম্ যে, আশপাশের লোকেরা কথায়-বার্ত্তায় আলাপে-আলোচনায় তাঁর চিত্ত বিক্ষেপ করতে সাহসই করতো না। সকালবেলা অসমাপ্ত শুক্‌নো পুকুরের ধারে উঁচু জমিতে ও সন্ধ্যায় ছাতিম-তলায় তাঁর যে ধ্যানের আত্মসমাহিত মূর্ত্তি দেখতুম্ সে আমি কখনও ভুল্‌ব না।

তার পর হিমালয়ের কথা। তীব্র শীতের প্রত্যূষে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাঁকে দেখতুম, বাতি হাতে। তাঁর দীর্ঘ দেহ লাল একটা শালে আবৃত ক'রে তিনি আমায় জাগিয়ে দিয়ে 'উপক্রমণিকা পড়তে প্রবৃত্ত করতেন। তখন দেখতুম, আকাশে তারা, আর পর্ব্বতের উপর প্রত্যূষের আবছায়া অন্ধকারে তাঁর পূর্ব্বাস্য ধ্যানমূর্ত্তি, তিনি যেন সেই শান্ত স্তব্ধ আবেষ্টনের সঙ্গে একাঙ্গীভূত। এই ক'দিন তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য সত্ত্বেও এটা আমার বুঝতে দেরি হ'ত না যে, কাছে থেকেও তাঁকে নাগাল পাওয়া যায় না। তার পরে স্বাস্থ্যভঙ্গের সময় তিনি যখন কল্‌কাতায় ছিলেন, তখন আমার যুবক বয়সে তাঁর কাছে প্রায়ই বিষয়-কর্ম্মের ব্যাপার নিয়ে যেতে হ'ত। প্রতিমাসের প্রথম তিনটে দিন ব্রাহ্মসমাজের খাতা, সংসারের খাতা, জমিদারীর খাতা নিয়ে তাঁর কাছে কম্পান্বিত-কলেবরে যেতুম। তাঁর শরীর তখন শক্ত ছিল না, চোখে কম দেখতেন, তবুও শুনে শুনে অঙ্কের সামান্য ত্রুটিও তিনি চট্ ক'রে ধ'রে ফেল্‌তেন। এই সময়েও তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততা আমায় বিস্মিত করেছে।

আমাদের সকল আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তিনি ছিলেন তেমনি একা যেমন একা সৌরপরিবারে সূর্য্য—স্বীয় উপলব্ধির জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যে তিনি আত্মসমাহিত থাকতেন। তাঁর প্রকৃতিগত নিরাসক্তির প্রকৃত দান হ'ল এই আশ্রম; জনতা থেকে দূরে, অথচ কল্যাণসূত্রে জনতার সঙ্গে আবদ্ধ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে আনন্দ, এবং আত্মার আনন্দ, এই দুইয়েরও প্রতীক হ'ল এই আশ্রম। এই দুই আনন্দ মিলে তাঁর জীবনকে পরিপূর্ণ করেছিল। যে-চিত্তবৃত্তি থাক্‌লে মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায় সে তাঁর ছিল না। উপনিষদের মন্ত্র উপলব্ধির আনন্দ তাঁর অন্তরে নিহিত ছিল—সাধারণের জন্যে

সে আনন্দকে ছোট ক'রে বা জল মিশিয়ে পরিবেষন করতে পারেন নি। এই সকল কারণেই তাঁর চার দিকে বিশেষ কোনও একটা সম্প্রদায় গ'ড়ে ওঠে নি। আপনার চরিত্র ও জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জ্ঞান ও প্রেমের আদর্শ রেখে গেছেন। এর চেয়ে বেশী কিছু তিনি রেখে যান নি, কারণ জনতাকে বন্দী করার দুর্গপ্রতিষ্ঠা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল।

তাঁর প্রকৃত দান এই আশ্রম; এই আশ্রমে আসতে হ'লে দীক্ষা নিতে হয় না, খাতায় নাম লিখতে হয় না—যে আস্‌তে পারে, সেই আস্‌তে পারে, কারণ এ তো সম্প্রদায়ের নয়। এর ভিতরকার বাণীটা হ'ল "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম।" আশ্রমের মধ্যে যে গভীর শান্তি আছে, সেটা কেউ মুক্তভাবে নিতে পারে তো নেয়। মোহমুগ্ধ ক'রে তো সে আনন্দ দেওয়া যায় না। সেই জন্যেই কখনও বলেন নি যে, তাঁর বিশেষ একটা মত কাউকে পালন করতে হবে। তাঁর প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে আমার আধুনিকপন্থী অগ্রজেরা অনেক বিরুদ্ধতা করেছেন—তিনি কিন্তু কখনও প্রতিবাদ করেন নি। আমার মধ্যেও অনেক কিছু ছিল, অনেক মতবাদ, যার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয় নি, তবু তিনি শাসন ক'রে তাঁর অনুবর্ত্তী হ'তে কখনও আজ্ঞা করেন নি। তিনি জান্‌তেন যে, সত্য শাসনের অনুগত নয়, তাকে পাওয়ার হ'লে পাওয়া যায়, নইলে যায়ই না। অত্যাচার করেন অনেক গুরু, নিজেদের মতবাদ দিয়ে অনুবর্ত্তীদের আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন ক'রে; গিঁট বাঁধতে গিয়ে তাঁরা সোনা হারান। আমার পিতৃদেব স্বতন্ত্র ছিলেন, আমাদের স্বাতন্ত্র্যও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কোনও দিন বাঁধতে চান নি। মরবার আগে তিনি ব'লে গিয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতন আশ্রমে যেন তাঁর কোনও বাইরের চিহ্ন বা প্রতিকৃতি না থাকে। তাঁর এই অন্তিম বচনে সেই নিঃসংসক্ত আত্মার মুক্তির বাণী যেন ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন, যদি নিজেকে মুক্তি দিতে হয় তবে অন্যকেও মুক্তি দিতে হবে। যা বড়, কেবলমাত্র মুক্তির ক্ষেত্রেই তা থাকতে পারে; মুক্ত আকাশেই জ্যোতিষ্ক সঞ্চরণ করে, প্রদীপকেই কুটীরের মধ্যে সন্তর্পণে রাখতে হয়। এই মুক্তির শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি। তাঁর কাছেই শিখেছি যে, সত্যকে জোর ক'রে দেওয়া যায় না; বহু বিরুদ্ধতার ভিতর অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়।

এই আমার আজকের দিনের কথা।*

* ৬ই মাঘ (১৩৪২) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী তিথিতে শান্তিনিকেতন-মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায় কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

"সাহিত্য-বিজয় কাব্য"

রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল

বঙ্গদেশের খ্যাতনামা কবিগণ আপনাদের অপার সৃজনী-শক্তির প্রভাবে কয়েকখানি সুমধুর কাব্য রচনা করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে চিরস্থায়ীভাবে নিজস্ব প্রতিভার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাই আমরা "মেঘনাদবধ," "বৃত্রসংহার," "বীরাঙ্গনা," "পরিত্রাণ," "মহাশ্মশান" প্রভৃতি কাব্য ও মহাকাব্যের সহিত পরিচিত হইয়া নিজেদের ধন্য মনে করি। এই সব গ্রন্থ পৃথিবীর যে-কোনও দেশের গৌরবের ও গর্ব্বের সামগ্রী হইতে পারে। কিন্তু এবার এক জন নিতান্ত অকবি ও অসাহিত্যিক মহাপণ্ডিত যে "সাহিত্য-বিজয়কাব্য" রচনায় ব্রতী হইয়াছেন, তাহা সফল হইলে তিনি বোধ হয় সকল সাহিত্যিককে টেক্কা মারিবেন! সাহিত্যরসিক ব্যক্তিগণ বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এই অসাহিত্যিক মহাজনের "সাহিত্য-বিজয় কাব্য" না জানি কি অপরূপ বস্তু হইবে। বস্তুতঃ তথাকথিত খিলাফৎ-সম্মেলনের কর্ণধার-

রূপে ঢাকার নবাব সাহেব বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিজয় ("conquest of Bengali literature and language")-এর যে আভাস দিয়াছেন এবং মুরুব্বীহীন বাঙালী মুসলমানকে উর্দ্দু শিখিবার জন্য যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনি বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা না করিয়া ছাড়িবেন না। দেখা যাক, তাঁহার এই পরামর্শ অনুসারে এই সাহিত্য-বিজয়ের অভিযানে বাঙালী-মুসলমান কতদূর অগ্রসর হইতে পারে।

বঙ্গদেশের অধিবাসী হইয়াও ঢাকার নবাব সাহেব নিজে এক জন উর্দ্দুভাষী মুসলমান। বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং বাংলার কোলে লালিতপালিত, বর্দ্ধিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও বাঙালীজাতির ভাষার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অতি স্বল্প। বাঙালীর নিকট যে-উর্দ্দু একটা বিদেশীয় ভাষা তাহাই তাঁহার মাতৃভাষা। আর এই উর্দ্দুভাষায় তাঁহার কতটা দখল আছে, এবং সাহিত্যের যোগ্য তাঁহার কোন উর্দ্দু রচনা আছে কিনা তাহা আমরা জানি না। তবে তিনি যে-সভায় দাঁড়াইয়া তাঁহার গবেষণাময়ী বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার শ্রোতৃ-মণ্ডলীর অধিকাংশ ব্যক্তিই যে উর্দ্দুভাষী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সেই উর্দ্দুভাষী লোকদিগের সম্মুখে তিনি বাংলাভাষী মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়া ইংরেজী ভাষায় যে বক্তৃতা দিয়াছেন, বাংলা সাহিত্য ও ভাষাকে জয় করিতে হইবে বলিয়া যে আস্ফালন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কোন্ শ্রেণীর লোক উপকৃত হইবে তাহা হয়ত তিনি ভাবিয়াও দেখেন নাই। কিন্তু যাহাদের জন্য দয়া করিয়া তিনি এই অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন, তাহাদের যে বিশেষ কোন উপকার হইবে না, তাহা আমরা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি। বাংলার বুকে উর্দ্দুভাষার পুনঃ-প্রবর্ত্তনে মুসলমানদের স্কন্ধে আর একটা অতিরিক্ত বোঝা চাপান বই আর কিছুই হইবে না। অসাহিত্যিকের এই ভাবে সাহিত্যব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাকে আমরা অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়া মনে করি। নবাব সাহেবের এই অন্যায় হস্তক্ষেপ করাকে "সাহিত্য-বিজয় কাব্য" বলিয়া বর্ণনা করিলাম।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও ভাষার ক্রমবিকাশের ধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, অসাহিত্যিক ব্যক্তি কোনও কালে জোর করিয়া সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, আর কোনও দেশের সাহিত্য সেরূপ অন্যায় হস্তক্ষেপ কখনই বরদাস্ত করে নাই, সাহিত্য জয় করা ত দূরের কথা। অথচ সাহিত্য ও ভাষাকে যে জয় করা যায় না তাহাও নহে। এক সাহিত্যের উপর অন্য দেশের সংস্কৃতির জয়লাভ করিতে হইলে যে উপাদানের দরকার তাহা গায়ের জোর নহে, সাময়িক উত্তেজনা নহে, ক্ষণিকের ক্রোধ নহে, বিশেষ সুবিধা নহে। তাহার জন্য চাই যুগ-যুগব্যাপী সাধনা, অসাধারণ প্রতিভা, সাহিত্যসম্পর্কীয় প্রচুর রত্নসম্ভার, সাহিত্যের নিজস্ব সৌন্দর্য্য, জলন্ত জীবন ও সংরক্ষণ-ক্ষমতা। ইহার অভাবে অপরকে জয় করা অথবা প্রভাবান্বিত করা ত দূরের কথা, তাহার নিজেরই অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব; সে তখন অপরের চাপে অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে, অথবা কোনও রূপে অস্তিত্ব রক্ষা করিলেও অপরের দাস হইয়া পড়ে। জগতের অনেক সভ্যতা, কৃষ্টি ও সাহিত্য এই ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে।

এই সাহিত্য-বিজয়ের অভিযান আজ একটা নূতন কথা নহে। ইহার পূর্ব্বেও কয়েক বারই এইরূপ হইয়াছে এবং শক্তির অভাবে কেহ বিজিত হইয়াছে, আবার শক্তির প্রভাবে কেহ কেহ অপরকে মুষ্টিগত করিয়াছে। প্রবল রোমানগণ যখন বাহুবলে অপেক্ষাকৃত সুসভ্য গ্রীকদের চরণতলে প্রণত করিল, তখন তাহারা আশা করিয়াছিল রোমক সভ্যতার তরঙ্গে সমগ্র গ্রীসকে ভাসাইয়া দিবে। কিন্তু গ্রীস বিজয়ের অল্পকাল পরেই একেবারে বিপরীত ফল ফলিল—ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন—The captive Greeks captured the captor Romans—বিজিত গ্রীকগণ বিজেতা রোমানগণকে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দ্বারা জয় করিয়া ফেলিল। ফলতঃ গ্রীক সভ্যতা, সাহিত্য, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির সম্মুখে রোমান সভ্যতা টিকিতে পারিল না, বরং বহুলাংশে গ্রীক-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। গ্রীক সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের পার্শ্বে রোমান সাহিত্য পরিম্লান হইয়া পড়িল। কেটোর মত রক্ষণশীল ব্যক্তি, যিনি প্রথমে গ্রীক-সভ্যতাকে হেয়জ্ঞান করিতেন এবং দেশে গ্রীক-সভ্যতার স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনিও অবশেষে শেষজীবনে গ্রীক-সাহিত্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন—কারণ তিনি বুঝিলেন যে অমন সৌষ্ঠবসম্পন্ন সাহিত্যের প্রভাব পরিত্যাগ করা নিতান্ত ভুল।

বেশী উদাহরণের দরকার নাই—ইংরেজী সাহিত্যের কথা উল্লেখ করিয়া উদাহরণের পালা শেষ করিব। বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির আদিপুরুষ ছিল য়্যাংলো-স্যাক্‌সন জাতি। এই জাতির একটা নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য ছিল, তাহা ছিল নানা বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ, ঐশ্বর্য্যশালী ও আত্মরক্ষার সকল অস্ত্রে সজ্জিত। এই জাতি ইংলণ্ড বিজয় করিয়া তথায় নিজেদের ভাষাকেই প্রচলিত করিল এবং তাহারই সেবা করিতে লাগিল, ইহাতে ইংরেজী ভাষা আরও পুষ্টি লাভ করিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত বৈদেশিক জাতির আক্রমণের ফলে তাহারা সাময়িকভাবে স্বাধীনতা হারাইল। ডেনজাতি, নর্ম্মানজাতি প্রভৃতি দলে দলে ইংলণ্ডে আসিয়া জোর করিয়া নিজেদের সাহিত্য, সভ্যতা ইত্যাদি চালাইতে লাগিল। বিশেষতঃ নর্ম্মান প্রভুত্বের সময় দরবারে, বিচারালয়ে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে এমন কি গৃহস্থালীর ব্যাপারে সর্ব্বত্র নর্ম্মান ও ফরাসী ভাষার প্রভাব দোর্দ্দণ্ডভাবে চলিতে লাগিল। দেশের সর্ব্বত্র নর্ম্মান-সভ্যতাই হইল সভ্যতার মানদণ্ড। কিন্তু স্যাক্‌সন সভ্যতা ও সাহিত্য নিকৃষ্ট ছিল না বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই নর্ম্মান সভ্যতা বিজিত জাতির মধ্যে ডুবিয়া গেল। কতকগুলি শব্দ, বাক্যবিন্যাস প্রভৃতি যাহা নর্ম্মান-যুগের চিহ্ন-স্বরূপ ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে আজও বিদ্যমান আছে, তাহা এরূপভাবে ইংরেজীর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে যে ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ব্যতীত আর কাহারও ধরিবার উপায় নাই। মধ্যযুগে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের অনেক-কিছুই ইংরেজী সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইংরেজী সাহিত্য তাহার নিজস্ব সত্তা হারায় নাই, বরং উৎকৃষ্ট সাহিত্যের প্রবলতম প্রভাব অতিক্রম করিয়াও ইংরেজী সাহিত্য নিজস্ব ক্ষমতার গুণে তাহার প্রাচীন কাঠামোর উপর জীবন্ত প্রাণ ও আকার লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাই সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, "English language is essentially and fundamentally Anglo-Saxon"—বর্ত্তমান ইংরেজী ভাষার মূল ও সার স্যাক্‌সন ভাষা। উহার এই উন্নতির যুগেও উহাতে মূলতঃ প্রাচীন যুগের ছাপই রহিয়াছে। ইহার কারণ এই—উহার নিজস্ব গুণ থাকাতে উহাকে কেহই জয় করিতে পারে নাই। জয় করিতে আসিয়াছিল অনেকেই, কিন্তু উহারই বুকে ধ্বংসাবশেষ রাখিয়া পরাজিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ভাষার নিজস্ব গুণ না থাকিলে এরূপ সম্ভব হয় না। আমরা নবাব সাহেবকে বলি, এইরূপ ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি করুন, বাংলা ভাষা আপনি বিজিত হইবে, শুধু দর্প-দম্ভে বিজিত হইবে না।

সময় সময় প্রতিভাশালী লেখকের ছাপ সাহিত্যের উপর এমনভাবে পড়ে, পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য তাহার দ্বারা অনেকটা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে সেই শ্রেণীর লেখকের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু অল্প হইলেও তাঁহাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভার বলে তাঁহারা নিজেরাই যুগের হাওয়া বদলাইয়াছেন। হোমার, বাল্মীকি, কালিদাস, ভার্জ্জিল, দান্তে, শেক্সপীয়র, রুমি, হাফেজ এই শ্রেণীর লোক। অমর লেখক শেক্সপীয়ারের পাঠশালার লেখাপড়া বেশী ছিল না। তাঁহার যুগে কত কত পণ্ডিত লোক বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহারাও কতশত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনাগত যুগের সাহিত্যে তাঁহারা অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, আর সেই স্থলে অল্পশিক্ষিত শেক্সপীয়র নিজের অন্তর্নিহিত প্রতিভার প্রভাবে ইংরেজী সাহিত্য ও ভাষার অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। শেক্সপীয়রের ঋণ ভুলিতে না পারিয়া এক জন কৃতবিদ্য পণ্ডিত গর্ব্বভরে বলিয়াছেন, "আমরা বিশাল ভারতসাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তার বিনিময়ে শেক্সপীয়রকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না!" ঠিক এইভাবে দান্তেও স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়া গিয়াছেন। এ দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি লেখকগণ বাংলা ভাষাকে যে ভাবে সৌষ্ঠবশালী করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ বাঙালী কোন দিন পরিশোধ করিতে পারিবে না। বাংলা ভাষাকে জয় করিবার জন্য যে পন্থাই অবলম্বন করা হউক না কেন, ইঁহাদের প্রভাব কোনও দিন নষ্ট হইবে না। যদি কোন দিন হয় তবে বুঝিব সেদিন বাংলা সাহিত্যের সমাধি হইয়াছে।

নিজের কোনও প্রতিভা না থাকিলে, কেবল জয় করিবার বাসনা লইয়া সাহিত্য রচনা করিলে তাহা সাহিত্য হয় না। তাহা হয় বটতলার পুঁথি। তাহা না পারে জাতিকে বাঁচাইতে, না পারে নিজে বাঁচিয়া থাকিতে। সাহিত্য-জগতে এমন অনেক ভুঁইফোড় ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল

যাঁহারা চাহিয়াছিলেন নির্দ্দেশ দিয়া সাহিত্যকে একটা গন্তব্য পথে পরিচালিত করিতে কিন্তু অচিরেই তাঁহারা প্রতিভার সম্মুখে ম্লান হইয়া গিয়াছেন। স্যামুয়েল জন্‌সন্‌ এইরূপ এক জন লোক যিনি নিজের যুগে ছিলেন সাহিত্যের ডিক্টেটর। কিন্তু তাঁহার প্রভাব বেশীদিন টিকে নাই, তাই রোমান্টিসিজমের প্রভাবে তিনি দলবলসহ সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই নবযুগের আদর্শই হইল সাহিত্যের মানদণ্ড। কোলরিজ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স্‌, বায়রণ প্রভৃতি প্রতিভাশালী কবিগণ নিজস্ব প্রতিভার গুণে জগতের সকল যুগে বরণীয় বলিয়া পরিচিত এবং আজও ইংরেজী সাহিত্য তাঁহাদের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবান্বিত। সুতরাং কোনও দেশের সাহিত্যে চিরস্থায়ী ছাপ রাখিতে গেলে, অথবা "সাহিত্য-বিজয়" করিতে গেলে, প্রতিভাবান লেখকের প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে, অন্যথা তাহা সম্ভব হইবে না। আর যাহারা গায়ের জোরে অথবা অন্যায় প্রভাব বিস্তার দ্বারা সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিতে গিয়াছে, তাহারা সকল ক্ষেত্রেই উপকার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি করিয়াছে, সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, স্বাভাবিক গতির পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনার স্বাভাবিক গতিতে চলিতে চলিতে সাহিত্য যে স্থানে আসিয়া উপনীত হইত, এই বাধার জন্য সেস্থান হইতে অনেক দূরে পিছাইয়া পড়িয়াছে।

সুতরাং আমরা মনে করি, ঢাকার নবাব সাহেব যে বাঙালী মুসলমানদিগকে সাহিত্য-বিজয় করিতে বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা। আর বাস্তবিকই যদি তিনি তাহাই করিতে চান, তবে, মুসলমান সমাজকে তাঁহার বলা উচিত, প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি কর। আর নিজের পক্ষ হইতে তাঁহার উচিত ছিল প্রতিভাবান লেখককে উৎসাহ দেওয়া, অথচ এই দুইটার একটাও তিনি করেন নাই। আমরা এমন অনেক মুসলমান সাহিত্যিকের সংবাদ রাখি অর্থাভাবে যাঁহারা প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ পাইতেছেন না, তাঁহাদের প্রতি কি তিনি কোনও দিন দৃষ্টিপাত করিয়াছেন? অথচ সেই সব লেখক বাংলা ভাষাকে রীতিমত ভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারিতেন। তিনি যদি এই ভাবে বঙ্গসাহিত্য-বিজয়ে অগ্রসর হন তবে কেহই তাঁহাকে বাধা দিবে না। রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতাকে সাহিত্যক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিলে তাহাতে সাহিত্য-বিজয় হয় না, তাহাতে হয় সাহিত্যের হত্যাসাধন। যে কয়েক জন মুসলিম সাহিত্যিক আজ বাংলা দেশে শোভা পাইতেছেন, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সুবিধার পাশ-দরজা দিয়া এস্থান অধিকার করেন নাই, নিজস্ব প্রতিভার জোরেই তাঁহারা বড় হইয়াছেন আর এই প্রতিভাই তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবে। এই সাহিত্যক প্রতিভা না থাকিলে তাঁহারা কখনই বড় হইতে পারিতেন না। কারণ এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের বাহিরে আরও অনেক লেখক আছে, আরও অনেক গ্রন্থ আছে, কে তাহাদের সন্ধান রাখে? হিন্দুরা না হয় নাই রাখিল তাদের সন্ধান। মুসলমানরাও কি তাহাদের যত্ন করে? মোট কথা এই, প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করিতে না পারিলে, সমাজের দরদ দেখাইয়া কেহই অযোগ্য বস্তুর সমাদর করিবে না।

বঙ্গসাহিত্য-বিজয়ের জন্য ঢাকার নবাব সাহেব মুসলমানদিগকে যে পথ বাংলাইয়াছেন তাহা মারাত্মক ও আত্মহত্যাকর। তাঁহার বক্তব্য এই যে মুসলমানদিগকে উর্দ্দু শিখিতেই হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই শ্রেণীর আপ্‌কে ওয়াস্তে নেতারা বলিতেন যে উর্দ্দুকে বাঙালী-মুসলমানের মাতৃভাষা করিতে হইবে। এখন বোধ হয় আর সেই ধুয়া নাই। তবে উর্দ্দুর মোহ তাঁহারা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহারা এখন বায়না তুলিয়াছেন উর্দ্দুকে অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে অবশ্য অবশ্য শিখিতে হইবে, নহিলে "বঙ্গসাহিত্য-বিজয় কাব্য" যে অসমাপ্ত রহিয়া যাইবে। এই উর্দ্দু ব্যতীত আরবী, ইংরেজী, ফার্সী ও বাংলা ভাষা ত আছেই—অর্থাৎ এগুলির সহিত সমান্তরাল ভাবে উর্দ্দুকেও আয়ত্ত করিতে হইবে। একটা কচি ছেলে যে নিজের মাতৃভাষাই ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না, তাহারই স্কন্ধে সাহিত্য-বিজয়ের নামে এতগুলি ভাষার বোঝা চাপাইতে হইবে। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয় লইয়া আমাদের নেতারা এতদিন বাঙালী মুসলমানদের সহিত ছিনিমিনি খেলিতেছিলেন এইবার হইতে তাঁহারা তাঁহাদের অফুরন্ত প্রতিভাটুকু সাহিত্যবিষয়ে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমাজ যদি তাঁহাদের সকল বিষয়েই এই ভাবে নির্ব্বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে দেয়, তবে

সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। বুদ্ধি-বিষয়ে যে মুসলমান-সমাজ একেবারে দেউলিয়া হইয়া যাইবে তাহারই স্থচনা আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, বাঙালী মুসলমান-দিগের অতগুলি ভাষা শিখিবার কোন দরকার নাই, প্রাথমিক অবস্থায় কেবল বাংলা ও কিছু দিন ইংরেজী শিখিলেই চলিবে। আরবীটা অনেক পরে শিখিতে হইবে, কারণ ভাষা শিক্ষা অপেক্ষা অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। বহুবিধ ভাষার চাপে তাহাদের প্রতিভা নষ্ট হইলে তাহা আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইবে না। ইহাতে তাহারা এরূপ পঙ্গু হইয়া পড়িবে যে, সাহিত্য-বিজয় করা দূরের কথা জীবনসংগ্রামে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে।

বাংলা সাহিত্য ও ভাষার উপর নিজেদের বিজয়-বৈজয়ন্তী সগর্ব্বে উড্ডীন করিতে হইলে বাঙালী মুসলমানদিগকে কঠোর সাধনার সহিত বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে, সমাজের প্রত্যেক স্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন করিতে হইবে, মক্তব-মাদ্রাসার মোহ পরিত্যাগ করিয়া বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া ধর্ম্মকর্ম্মাদি শিক্ষা করিতে হইবে। সাহিত্য-সাধনা সামান্য ব্যাপার নহে। প্রাণপণ করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনার পর মানুষ যেমন পরমার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ বহু যুগের বহু সাধনার পর একটা উৎকৃষ্ট সাহিত্য গড়িয়া উঠে। সেই সাধনার অভাব যখন রহিয়াছে তখন দু-একটা সভায় ফাঁকা আওয়াজ করিয়া সাহিত্য-জয় করা সম্ভব হইবে না। সমগ্র প্রাণমন ঢালিয়া দিতে হইবে সাহিত্য-সাধনায়। আমরা বাঙালী-মুসলমানকে আহ্বান করিতেছি, সাহিত্যিকের প্রাণ ও কঠোর ব্রত লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর এবং প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হও। দেখিবে, তোমাদের সাধনা ফলবতী হইবে, সাহিত্য-বিজয় কাব্য মহা গৌরবে রচিত হইবে, কালের আক্রমণ তাহাকে গ্রাস করিতে পারিবে না, তাহা অনন্তকাল পর্য্যন্ত অমর অক্ষয় হইয়া রহিবে।

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(২৯)

অরুণ আপন অন্তরে উমার মানসী মূর্ত্তি যতই সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিল, বাস্তব উমার সহিত তাহার যোগসূত্র ততই শিথিল হইয়া যাইতে লাগিল। উমা যখন দূরে দার্জ্জিলিঙে ছিল, তাহার সঙ্গলাভের জন্য সে কাতর হইয়া উঠিত। এখন উমা নিকটে। সে উমার কথা ভাবে কিন্তু প্রতিদিন উমার সহিত দেখা করিবার জন্য আকুল হয় না। অজয়দের বাড়িতে গেলে, মামীমার সহিত গল্প করে, চন্দ্রার সহিত খুনসুড়ি করিয়া চলিয়া আসে, উমা কোথায়, তাহার খোঁজও লয় না।

উমাই এখন অরুণকে খুঁজিয়া দেখা করে। বাড়িতে অরুণের গলা শুনিলে সে নিজেই ছুটিয়া আসে অথবা চন্দ্রাকে ডাকিতে পাঠায়। অরুণ হয়ত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতেছে, চন্দ্রা পথ আটকায়, বলে, অরুণদা, দিদি ডাকছেন। তাহার মুখে দুষ্টামির হাসি। বিস্ময়ের ভান করিয়া অরুণ বলে, দিদি আছেন নাকি বাড়িতে? বারান্দা হইতে উমার কণ্ঠ শোনা যায়, আছি বইকি, জলজ্যান্ত এখনও রয়েছি, বড় মুস্কিল হ'ল তোমার।

সিঁড়ি দিয়া অরুণকে উঠিয়া আসিতে হয়।

উমা হাসির সুরে বলে, কি বড় উদাস দেখছি, আমাদের আর খোঁজখবরই নাও না। রাগ হ'ল নাকি আমার ওপর?

—হাঁ, রাগ, তবে সেটা অণু পরিমাণে।

—খুব ফাজিল হয়েছ। ব'স চেয়ারে।

—না, বেশীক্ষণ বসব না।

—ব'সই না বাপু একটু।

উমার হাস্যদীপ্ত মুখ দেখিতে যেমন ভাল লাগে, তাহার কৌতুকভরা কণ্ঠস্বর শুনিতে তেমনি বেদনা বোধ হয়।

অরুণ ভাবে, কেন এ অভিনয়! উমা ফ্লার্ট নয়, সে জানে। সে প্রেমের অভিনয় করিবে না। অরুণ ফ্লার্টিং সহ্য করিতে পারে না। প্রেমের অবমাননা! উমার এই সহজ সৌহার্দ্দ্য, তরুণীহৃদয়ের কৌতুকলীলাও সে চায় না। কিন্তু উমা ডাকিলে, ছুটিয়া আসিতে হয়।

অরুণ ধীরে বারান্দার কোণে বেতের চেয়ারে বসে। প্রথমে উমাই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে, অরুণ দু-চারটি কথায় উত্তর দেয় মাত্র। তার পর তাহার মনে সাড়া পড়িয়া যায়। উমার সকল কথার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করে। সে অনর্গল কথা কহিতে আরম্ভ করে, সাহিত্য, সমাজ, মানব-সভ্যতা নানা বিষয়ে বক্তৃতা সুরু করে। উমা প্রতিবাদ করে না, তর্ক করে না, চুপ করিয়া শোনে, শুনিতে শুনিতে ক্লান্তি লাগিলে হাসিয়া ওঠে। তখন অরুণের চেতনা হয়, উমা হয়ত তাহার কথাগুলি পাগলের প্রলাপরূপে উপভোগ করিতেছে।

এখন অরুণ আর মুখচোরা, শান্ত ছেলেটি নাই, সে প্রগল্ভ, অকারণে তর্ক জুড়িয়া দেয়।

উমা হাসিয়া বলে, বাবা, অরুণ আজকাল কি বক্তৃতেই পার। রাঙা সরু ঠোঁট দুইটির ফাঁকে দাঁতগুলি মুক্তার মত ঝিকিমিকি করিয়া ওঠে।

অরুণ উমার উপর রাগিয়া উঠিতে পারে না, সে একটু বিরক্তির সহিত বলে, না, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে লাভ নেই, তুমি কিছু শুনছ না, বুঝতেও চেষ্টা করছ না।

—মেয়েমানুষের বুদ্ধি, আমরা কি অত বুঝতে পারি?

—দেখ, সব বিষয়ে ঠাট্টা ক'রো না।

—আচ্ছা, তুমি বলছ ডষ্টয়ভস্কি হচ্ছেন টুর্গনিভের চেয়ে বড় লেখক। এখন আমার যদি টুর্গনিভকে বেশী ভাল লাগে, আমি কি করব বল—

—ডষ্টয়ভস্কিকে বোঝবার চেষ্টা কর। যিনি "ক্রাইম্ এণ্ড পানিশমেণ্টে"র মত বই লিখতে পারেন—

—কই, "ইডিয়ট" বইখানা আমায় দিলে না?

—আমি চাই তুমি নিজের ইচ্ছায় পড়, আমি বল্‌ছি বলে তুমি পড়বে কেন?

—আহা রাগ কর কেন!

উমার সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক ঝগড়ায় না হইলেও এরূপ একটা কথা-কাটাকাটিতে শেষ হয়। উমা যখন সকরুণ চোখে অরুণের দিকে তাকায় তার পর মৃদু হাসে, গণ্ডদেশ রাঙা হইয়া ওঠে, অরুণ মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার অন্তরের তাপ জুড়াইয়া যায়।

বস্তুতঃ উমার সহিত এইরূপ কথা-কাটাকাটির পর তাহার বুক হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া যায়। বর্ষণমুক্ত নির্ম্মল আকাশের মত তাহার হৃদয় অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে। অকারণে পথে পথে বহুক্ষণ ঘুরিয়া সে বাড়ি ফেরে।

এ ক্ষণিক শান্তি। অন্তরাকাশ জুড়িয়া আবার কাল মেঘ ঘনাইয়া আসে। শ্রাবণের বর্ষণমুখর রাত্রি নিদ্রাহীন, বেদনাময়।

মাঝে মাঝে অরুণের সন্দেহ জাগে। তাহার এ প্রেম অলীক মায়া। ঊর্ণনাভের মত তাহার তরুণ মন এ কোন্ রঙীন জাল রচনা করিয়া চলিয়াছে। এ জাল ছিন্ন করিয়া সে মুক্ত হইতে চায় কিন্তু বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার মত প্রাণশক্তি বুঝি তাহার নাই। মন্ত্রমুগ্ধের মত এ প্রেম-মায়াজালে জড়িত থাকিতে ভাল লাগে। ইহার বেদনাও সুমধুর। এ যৌবনস্বপ্ন যদি টুটিয়া যায়, তাহার জীবন যে শূন্য, ব্যর্থ, নিরর্থক হইয়া যাইবে।

অরুণের সত্তার এক অত্যাশ্চর্য্যকর বিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। এক দিকে সে প্রেমস্বপ্নমুগ্ধ ভাবলোকবাসী, আবার সে তর্কবিলাসী, বিশ্লেষণপ্রবণ তীক্ষ্ণধী, আপন বুদ্ধি দিয়া সকল মত বিচার করিতে, যাচাই করিতে চায়।

এ বিচারবুদ্ধি বিপ্লবী। তাহার জীবনের সরল বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়গুলি ভাঙিয়া যাইতে লাগিল।

ঈশ্বরের সত্যতা সম্বন্ধে অরুণ কোনদিন সন্দেহ করে নাই, এখন সে বাপেশ্বরের অপেক্ষাও জোর-গলায় বলিল, ঈশ্বর নাই, অন্ততঃ তোমরা যাঁহাকে ঈশ্বর বল তিনি নাই।

দেখা যাইত, ক্লাসে বা কমন্-রুমে বা কলেজের সম্মুখে দেবদারুবৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন পথে দাঁড়াইয়া যে-কোন স্বল্পপরিচিত

সহপাঠীর সহিত অরুণ হাত নাড়িয়া তর্ক করিতেছে, আপন মত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে।

কাহাকেও বলে, বাঁধা মত, বাঁধা বুলি ছেড়ে দাও, নিজের বুদ্ধি হচ্ছে মাপকাঠি। চিন্তা কর, বিচার কর।

কাহাকেও বলে, কেবল মাত্র সত্যের অনুসন্ধান নয়, সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শাসন, অনুশাসন কিছু মানব না। বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা আমাদের দেশে আজ সবচেয়ে বড় দরকার।

এক দিন সে শিশির সেনকে ডাকিয়া বলিল, আচ্ছা, লেনিন সম্বন্ধে তোমার মত কি?

শিশির সেন বলিল, লেনিন একটা থার্ড-রেট লোক, তবে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার দুর্ভাগ্যকর সম্মিলনের ফলে সে খুব শক্তিলাভ ক'রে নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত তাল রাখতে পারবে না দেখো।

—আমি বলছি, রাশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবের পর হ'তে মানব-ইতিহাসের এক নবযুগের আরম্ভ হ'ল। লেনিন সে-যুগের দ্বার খুলে দিলেন। তিনি মহাপুরুষ।

—চেঙ্গিস খাঁর বংশধর যদি মহাপুরুষ হন। তুমি কি কম্যুনিজমে বিশ্বাস কর?

—আমি কোন মতবাদে বিশ্বাস করি না। কোন স্থির মত মানা হচ্ছে সত্যকে গণ্ডীবদ্ধ ক'রে রাখা। ভাবী মানবের ধর্ম্ম কি হবে, বলতে পার?

—দেখ অরুণ, ভাবী যুগের ধর্ম্ম কি হবে তা ভাববার অনেক সময় আছে, কিন্তু পরীক্ষাটা বড় সন্নিকট। বি-এ-তে রেজাল্ট যাতে ভাল হয় সেই চেষ্টা করো। পরীক্ষার পর ওসব বইগুলো প'ড়ো।

—তোমার সারাক্ষণ পরীক্ষার কথা।

অরুণ বিপ্লববাদী হইয়া উঠিল। হয়ত ইহা তাহার প্রেমবিদগ্ধ মনের প্রতিক্রিয়া। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন দরকার। জনশক্তির কর্তৃত্ব রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে মানবসভ্যতার কল্যাণ নাই।

কেবলমাত্র চিন্তা করিয়া, একটা মত ভাঙিয়া নূতন মত প্রতিষ্ঠা করিয়া সে শান্তি পায় না। বাণেশ্বরের মত কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা করিয়া আনন্দ হয়। হৃদয় যে প্রেমতৃষিত।

কখনও সে হরিসাধনের দলে জুটিয়া সেবার কাজে লাগে। উৎসাহের সহিত নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়াইতে যায়। মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষপীড়িত বা বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামে গ্রামে গিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের দলে কাজ করে। সেবার কাজ বেশী দিন ভাল লাগে না। বর্ত্তমান মানব-সভ্যতাকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। কার্ল মার্কসের ক্যাপিটল্, কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের রোড্‌স টু ফ্রিডম্, লেনিনের ষ্টেট্ এণ্ড রেভল্যুশন, সোসিয়ালিজমের নানা প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ ধর্ম্মগ্রন্থের মত পাঠ করে, আবার বিচার করিতে বসে। ইঁহারা যা লিখিয়াছেন তাহা কি সত্য? কোন্ পথে মানবের কল্যাণ? এই সংগ্রাম, বিপ্লব ভাল লাগে না। ইচ্ছা করে সমস্ত জীবন প্রেমে সেবায় সৌন্দর্য্যে সুন্দর ফুলের মত, গানের মত বিকশিত করিয়া কোন দেবীর চরণে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিয়া দেয়।

কোথায় সে দেবী?

জীবন কি কেবল প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা, সত্যের জন্য শক্তির জন্য সংগ্রাম, অজানা দুর্গম পথে এগিয়ে চলা?

সমস্ত দিন অরুণ অশান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। কলেজে যায়, সকল ক্লাসে যোগ দেয় না। হোষ্টেলে, নানা বন্ধুর বাড়িতে, নানা আড্ডায় ঘুরিয়া রাত্রে শ্রান্ত হইয়া বাড়ি ফেরে। তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া দক্ষিণমুখী বারান্দায় বা ছাদের ছোট ঘরটিতে আলো জ্বালাইয়া বসে।

রাত্রে তাহার আর এক নূতন জীবন আরম্ভ হয়। দিনের অরুণের সহিত রাত্রের অরুণের যেন কোন যোগ নাই। প্রেমস্বপ্নমুগ্ধ কবি যুবকটি জাগিয়া ওঠে। সে তর্ক করে না, সোসিয়ালিজমের গ্রন্থ পড়ে না। ব্রাউনিঙের কাব্যগ্রন্থ, ডষ্টয়ভস্কির উপন্যাস, রাস্কিনের মডার্ণ পেণ্টারস্ খুলিয়া বসে। শেলী পড়িতে ভাল লাগে না। ব্রাউনিং তাহার প্রিয়তম কবি।

রাত্রি গভীর হয়। জীর্ণ পরিত্যক্ত উদ্যানের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মায়া চারিদিকে ঘনাইয়া আসে। সূর্য্যালোকের যবনিকা সরিয়া গিয়া অনন্তাকাশের নক্ষত্রলোক উদ্ভাসিত। এই ক্ষুদ্র পৃথিবী যে অসীম শূন্যে ঘূর্ণমান লক্ষ লক্ষ সূর্য্য

তারকার সহিত একই সূত্রে যুক্ত, একই ছন্দে চালিত, সে রহস্য প্রকাশিত হইয়া যায়।

সুগভীর স্তব্ধতা, নিস্তরঙ্গ সুপ্ত নদীজলের মত। নিশীথাকাশের নীচে দাঁড়াইয়া অরুণ সে স্তব্ধতা অশান্ত অন্তরে অনুভব করিতে চায়, হৃদয়ের পাত্রে সে স্তব্ধতার সুধারস কানায় কানায় ভরিয়া লইতে চায়। অমনি কোথায় চঞ্চলতা জাগে, শ্যামল তৃণ হইতে আকাশের তারায় তারায় বিদ্যুতের চমকের মত প্রাণের শিহরণ!

কোথাও একটু স্তব্ধতা নাই। পৃথিবীর ধূলিকণা হইতে নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী পর্য্যন্ত কত পদধ্বনি, অবিশ্রাম এগিয়ে চলার শব্দ। মাটির তলে অঙ্কুরগুলি প্রকাশের কামনায় কাঁপিতেছে, গাছে গাছে ফুলগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবার বেদনায় দুলিতেছে, নীড়ে নীড়ে পাখীগুলি ভোরের আশায় সচকিত হইয়া উঠিতেছে, আকাশের তারাগুলি অন্ধকারে কাহার অভিসারে ধাবমান, এই জগদ্ব্যাপী প্রাণস্রোত অরুণের রক্তধারায় প্রবাহিত, পথিক-বিশ্বের প্রগতির ছন্দে তাহারও বক্ষের রক্ত দুলিয়া ওঠে।

রাত্রির অন্ধকারে দাঁড়াইয়া অরুণ গভীর শান্তি লাভ করে।

(৩০)

অতি পুরাতন দীর্ঘিকা, এখন মজিয়া গিয়া ও পানায় ভর্ত্তি হইয়া ক্ষুদ্র পুষ্করিণী হইয়া গিয়াছে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে রাজবল্লভ চৌধুরী এই দীঘির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ এখন কেহ আই-সি-এস্, কেহ ব্যারিষ্টার, খ্যাতনামা ডাক্তার, কেহ বা গরিব কেরাণী। দীর্ঘিকাতীরে অবস্থিত তাঁহার বৃহৎ ভগ্ন প্রাসাদের সংস্কার করিবার কিন্তু কেহ নাই। যে বৃদ্ধা বিধবা এই ভগ্ন অট্টালিকার এক কোণে বাস করিতেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে; এখন ভগ্ন শিবমন্দিরে প্রতি সন্ধ্যায় আর প্রদীপও জলে না। প্রাসাদের মধ্যে সাপ, শেয়াল, বাদুড় নানা জন্তুর বাস। গ্রামের লোকেরা এই তৃণলতাবেষ্টিত ভগ্নস্তূপে প্রবেশ করিতে সাহস করে না। তবে, গ্রীষ্মকালে যখন গ্রামের পুষ্করিণীগুলিতে জলাভাব হয়, সকলে চৌধুরী-পুকুরে জল লইতে আসে। কোন সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদের গুণে ইহার জল কখনও শুকায় না।

বড় রাস্তা হইতে কিছু দূরে, গ্রাম হইতে সুদূরে অতি নিরালা স্থানে পুষ্করিণীটি। পূর্ব্ব-তীরে অতি প্রাচীন এক অশ্বত্থ বৃক্ষ চারি দিকে শাখাপ্রশাখা মেলিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার গভীর ছায়াতলে এক ভাঙা ঘাট।

অশ্বত্থ বৃক্ষের গুঁড়ির তলদেশ হইতে মোটা শিকড়গুলি মাটি ভেদ করিয়া তৃষিত কৃষ্ণ সর্পদলের মত জলাশয়ের দিকে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নামিয়া গিয়াছে। মোটর-গাড়ীর রাগ্ গুঁড়ির পার্শ্বে পুষ্করিণীর তীরে বিছাইয়া দিয়া অরুণ উমাকে বলিল—ব'স।

উমা মধুর হাসিয়া উঠিল। হৃদয়াবেগে তাহার অধর আরক্ত। স্কুল হইতে পলাতকা ছোট মেয়ের মত সে চঞ্চলা; নাচের ভঙ্গীতে চলিয়া সে বলিল, বা, কি চমৎকার, রোমাণ্টিক জায়গা, বসব কি! এত ক্ষণ ত মোটরে ব'সে এলুম। চল চারি দিকে ঘুরে আসি, বাড়িটায় ঢুকতে ইচ্ছে করছে, কেউ নেই নিশ্চয়।

বহুক্ষণ একটানা মোটর-গাড়ী চালাইয়া অরুণ শ্রান্ত। সে বলিল, না, না, এসব পুরনো বাড়িতে বড় বড় সাপ আছে।

উমা হাসিয়া উঠিল, কি ভয় তোমার! কি স্থির জল দেখ, আহা কি সুন্দর ছায়া পড়েছে গাছগুলোর, ওই নারিকেল গাছটার!

—মনে হয় যেন জলের তলে কোন সুন্দর সবুজের দেশ।

—ঠিক বলেছ, রূপকথার সেই পুষ্করিণীর মত; সাপের মণি হাতে ক'রে ডুব দিলে দু-ধারে জল সরে যাবে, পৌঁছাব কোন্ অপরূপা রাজকন্যার দেশে—চল ওদিকে একটু ঘুরে আসি।

উমা, 'ঘুরে আসি' বলিল বটে, কিন্তু রাগ্‌টিতে বসিয়া ঘাসের ওপর পা ছড়াইয়া দিল। অদূরে মোটর-গাড়ীর দিকে অরুণ অগ্রসর হওয়াতে উমা আবদারের স্বরে বলিয়া উঠিল, বা কোথা যাচ্ছ, যেও না, ব'স।

—খিদে পায় নি? কেকগুলো নিয়ে আসি।

—তুমি আবার কবি? এমন সুন্দর শোভা, একটু স্থির হয়ে ব'সে উপভোগ করবে, তা নয়, কেক্ খাব—আচ্ছা, নিয়ে এস শীগগির।

প্রশান্ত পুষ্করিণী কানায় কানায় ভরা। শরৎ-মধ্যাহ্নের স্বচ্ছ আলোক স্থির জলে দর্পণের মত ঝকঝক করিতেছে।

নির্ম্মল আকাশের নীলিমা, শান্ত মেঘস্তূপের শুভ্রতা, ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরুশ্রেণী, কত বিচিত্র বর্ণের প্রতিবিম্ব। বৃক্ষে তৃণে লতাজালে সবুজের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে দিগ্বধূদের শ্যামল অঞ্চল লুণ্ঠিত। দূরে স্বর্ণশীর্ষ ধান্যক্ষেত্রের হরিতশ্যাম পট আলোকে ঝলমল। চারিদিক মায়াময় নিঃশব্দ।

উমা মুগ্ধ হইয়া শরতের শোভা দেখিতেছিল। সে চমকিয়া চাহিল, অরুণ নাই। তাহার ভয় হইল, বুক দুলিয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া চেঁচাইল—অরুণ, কোথায়—কোথা তুমি ?

উমার কাতর কণ্ঠস্বরে অরুণ ভীতভাবে ছুটিয়া আসিল—কি, কি হয়েছে ?

উমা উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল—কিচ্ছু না। শোন, কি সুন্দর প্রতিধ্বনি হ'ল, ওই ভাঙা বাড়ি থেকে প্রতিধ্বনি আসছে—শোন—

উমা এবার দীপ্তকণ্ঠে চেঁচাইল—অরুণ।

ভাঙা বাড়ি হইতে প্রতিধ্বনি উত্তর করিল—অ—রু—ণ!

উমার প্রদীপ্ত আননের দিকে অরুণ মুগ্ধনেত্রে চাহিল। এই মধ্যাহ্ন-আলোকপ্লাবনে জলে স্থলে আকাশে যে মায়া পরিব্যাপ্ত তাহাই বুঝি উমার মধ্যে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিতে চায়।

—বা, আবার কোথায় যাচ্ছ ?

—গাড়ীর দরজাটা বন্ধ ক'রে আসি।

—না, না, ব'স। ডালমুটটা ওখানে রেখ না, এক্ষুনি পিঁপড়ে হবে।

—কেক্‌গুলো ধর।

—এইখানে বসি এস, বেশ জলের কাছে। পুকুরটাতে নিশ্চয় অনেক মাছ আছে, কেক্ দিলেই এক্ষুনি আসবে দেখ না।

ভাঙাঘাটের শেওলা-ধরা সিঁড়ির ছোট ইটগুলির উপর দুই জনে পাশাপাশি বসিল।

—আচ্ছা, মাকে কি ব'লে এলে ?

—বলে এসেছি, আমরা একটু মার্কেটে যাচ্ছি।

—বেশ মার্কেটিং করছ, নয়!

—ভয় নেই, ব'লে এসেছি; আমাদের ফিরতে দেরি হ'তে পারে, বইয়ের দোকানে যেতে হবে, একটা বায়স্কোপও দেখে আসতে পারি।

—তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যাক। কই, কোন মাছ আসছে না ত।

—জলের অত কাছে যেও না, সিঁড়ি বড় পেছল্—

—চুপ্, শোন, কি সুন্দর ডাক, কি পাখী বল ত ?

দক্ষিণের আম্র খর্জ্জুরবন হইতে একটি পাখীর আকুল কণ্ঠস্বরে স্তব্ধ বনভূমি সচকিত হইয়া উঠিল। উড়িতে উড়িতে একটি পাখী ধানক্ষেতের দিকে চলিয়া গেল। আবার চারিদিক নিস্তব্ধ।

—পা গেছল পিছলে, আর একটু হ'লে পড়তে জলে, উঠে এস লক্ষ্মীটি।

"ওরে সাবধানী পথিক বারেক পথ ভুলে মর ফিরে—" উমা কলহাস্যে গান গাহিয়া উঠিল। চঞ্চলপদে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের গুঁড়ি ঠেস দিয়া বসিল। ভাঙা ঘাটের উপর বসিয়া অরুণ মুগ্ধভাবে এ অপূর্ব্ব অজানা উমার দিকে চাহিয়া রহিল!

ঘটনাটি এইরূপ: ভাঙা মোটর-গাড়ীটি সারিয়া আসাতে অরুণ সেইটি লইয়া অজয়দের বাড়ি সকালে হাজির হইয়াছিল। গাড়ী দেখিয়া উমা বলিয়াছিল, মা মার্কেটে যাবে, অনেক জিনিষ কেনবার রয়েছে। স্বর্ণময়ী বলিয়াছিলেন, তুই যা অরুণকে নিয়ে, আমার হাতে অনেক কাজ; অরুণ তুমি আর বাড়ি ফিরো না, এইখানে খেয়ে যাও।

দুই জনে তাড়াতাড়ি খাইয়া মোটর-গাড়ীতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গেল, সামান্য খাবার জিনিষ ছাড়া বিশেষ কিছুই কিনিল না।

মার্কেট হইতে বাহির হইয়া অরুণ বলিয়াছিল, চল কোথাও ঘুরে আসা যাক। উমা বলিয়াছিল, আউটিং করবার মত দিন বটে, কোথা যাবে ? অরুণ হাসিয়া বলিয়াছিল, নিরুদ্দেশ-যাত্রা! তাহাদের বেশী দূর যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অরুণ যখন ষ্টিয়ারিং হুইল ধরিয়া বসিল, পার্শ্ববর্ত্তিনী উমার হাস্যের ছন্দে চক্ষের চাহনিতে আতপ্ত স্পর্শে তাহার দেহ-মনে গতির মাদকতা লাগিয়া গেল। বালীগঞ্জ পার হইয়া গড়িয়া-হাটা রোড ধরিয়া সে মোটরকার ছুটাইয়া দিল মাইলের পর মাইল। উমা বলিয়াছিল, আজ বড় সুন্দর মোটর চালাচ্ছ, কিন্তু কোথায় চলেছ ?

—Last drive together! Who knows but the world may end to-night?

—আচ্ছা, কবিতা আওড়াতে হবে না, পেট্রল আছে ত?

শরতের আলোভরা অজানা পথ দিয়া বহুক্ষণ মোটর-গাড়ী চালাইয়া কয়েকটি গ্রাম পার হইয়া, তাহারা এই প্রাচীন ভগ্ন প্রাসাদ ও পুষ্করিণীর সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছে।

গান শেষ করিয়া উমা বলিল, ক'টা বাজল বল ত?

—সৌভাগ্যক্রমে সঙ্গে ঘড়ি নেই, আর গাড়ীর ঘড়িটাও বন্ধ।

—বেশ দেরি যখন হয়েইছে, নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যাক। চারিদিক কি নিঝুম, মনে হয় যেন এখানে সময়ের চলা থেমে গেছে। আচ্ছা, অরুণ তোমার কবিতা পড়ে শোনালে না?

—শোনাব।

—আর কবে শোনাবে, যদি আজ সঙ্গে আনতে বেশ হ'ত। এমনি জায়গায় ব'সে কবিতা পড়তে হয়।

—তোমরা কি এ মাসের শেষে সত্যিই দিল্লী যাচ্ছ?

—এখন পর্য্যন্ত ত তাই ঠিক। আমি মাকে বলছি, আমি বোর্ডিঙে থাকব, তা কিছুতেই রাজী নন।

অরুণ চুপ করিয়া জলের ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া রহিল। উমা হাসিয়া বলিল, একটা ঢিল দাও ত, আমি আর উঠতে পাচ্ছি না, বেশ আরামে বসেছি।

—ঢিল কোথায়, দেখছি না, কি করবে?

—জলে ছুঁড়ব, আচ্ছা, একটা কেক্ দাও।

উমা একটি কেক্ লইয়া পুষ্করিণীর স্তব্ধ জলের মধ্যভাগে ছুঁড়িল। স্থির জল কাঁপিয়া উঠিল, একটি ক্ষুদ্র জলতরঙ্গ বৃত্তাকারে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া তীরে আসিয়া আঘাত করিল, গাছের ছায়াগুলি কাঁপিতে লাগিল।

—দেখ, অরুণ, কি সুন্দর দেখায়; ছোটবেলায় আমরা ভাঙা-কলসীর টুকরো নিয়ে খেলতুম, জলের ওপর ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে যায়।

—জলটি ছিল স্থির, আয়নার মত, শান্ত, তুমি দিলে কাঁপিয়ে, গুলিয়ে, শান্তি বুঝি তোমার সয় না।

—ঠিকই ত, আমরা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবার জন্যেই ত জন্মেছি। শান্তি নয়, জীবন চাই।

—শোন, তোমায় একটা কথা বলতে চাই—

—দেখ, অরুণ, এখানে আর বক্তৃতা সুরু ক'রো না, দিনটি বড় সুন্দর, বড় ভাল লাগ্‌ছে, বেশ আরামে বসেছি কিন্তু, কি বল—

—না, কিছু না।

—ওই ত তোমার দোষ, একটুতেই রেগে যাও, বলো। আমি এখন সব শুনতে রাজী আছি। এমন দিনে যত অসম্ভব কথা শুনতে ইচ্ছে করে, অদ্ভুত কল্পনা—

উচ্ছ্বসিত হইয়া উমা গাহিয়া উঠিল—"এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়—"

এক লাইন গাহিয়া সে থামিয়া গেল,—ও, এটা ত বর্ষা নয়, তবে বৃষ্টি আসতে পারে, ওদিকে সাদা মেঘগুলো কেমন কালো হয়ে যাচ্ছে দেখ।

প্রাচীন অশ্বত্থ গাছে ঠেস দিয়া উমা অর্দ্ধশায়িত ভাবে পা ছড়াইয়া বসিয়া, ঘনকৃষ্ণ ঈষৎ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ কালো গুঁড়ির সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে, রক্তকরবী-বর্ণের শাড়ীর জরির আঁচল গাঢ় সবুজ সিল্কের ব্লাউস হইতে খসিয়া তৃণভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিবার পর তাহার মুখে যে কাঞ্চনদীপ্তি ছিল তাহা ম্লান হইয়া গিয়াছিল, আজ শরতের শ্যামলশ্রীর মত পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ মুখের গণ্ডে কপোলে রক্তিম লাবণ্যোচ্ছ্বাস নিপুণ শিল্পীর তুলির টানের মত। অপরূপ তাহার চোখের চাহনি। দীর্ঘ অক্ষিপক্ষ্মের নীচে চক্ষুতারকাদ্বয় হইতে স্বপ্নময় দীপ্তি মরকতমণির জ্যোতির মত। ওই চোখের দিকে চাহিয়া বুঝি অসাধ্য সাধন করা যায়।

উমা হাসিয়া উঠিল, শুভ্র মুক্তার মত দাঁতগুলি ঝক্‌মক করিয়া উঠিল।

—কি, বল কিছু, চুপ করে রইলে যে।

—কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে।

—হা-হা, তবু একটা মনের কথা বললে—কিন্তু তুমি কি বলতে যাচ্ছিলে,—সুন্দর—মানে আমি সুন্দর নই, তবে এই সুন্দর দিনে সবই সুন্দর ঠেক্‌ছে

—সবেতেই তোমার পরিহাস।

—আচ্ছা, জীবনটা কি একটা পরিহাস নয়। জীবন সম্বন্ধে সিরিয়াস্‌লি ভাবতে বসলে আমি ত তার কোন অর্থ খুঁজে পাই না। কেন এত দুঃখ?

—আমরা জীবনের কতটুকু জানি, কতটুকুই বা বুঝি।

—হয়ত কোন এক গভীর অর্থ আছে, আমাদের সকল দুঃখ হয়ত একদিন সার্থক হবে, কি উদ্দেশ্য কি সার্থকতা তা আগে জানতে পারলে জীবনের দুঃখ সহজ হয়ে আসে না কি?

—জীবন সম্বন্ধে তুমি কি সত্যই ভাব?

—তুমি কি ভাব, জীবনে তুমিই দুঃখ পাও, আর কেউ পায় না। তোমার পাল্লায় পড়ে আমিও দার্শনিক হয়ে উঠছি দেখছি।

—আমি জানি তুমি সুখী নও—তোমাকে যদি জীবনে সুখী করতে পারতুম—ভেবে দেখেছ কি, দুঃখের দুটো রূপ আছে, একটা বাহিরের জীবনের, সংসারের দুঃখ, সে দুঃখ তুচ্ছ, কিন্তু আর একটা দুঃখ অন্তরের, আত্মার বেদনার, সে হচ্ছে আপনাকে প্রকাশের বেদনা, মিলনের বেদনা, সেইখানে যদি স্পর্শ করতে না পারি, সেই বেদনা যদি দূর করতে না পারি—থাক্ আজ বক্তৃতা দেব না, এই প্রসন্ন সুন্দর দিনের নৈর্ম্মল্য, শান্তি অন্তরে ভরে নিই।

—তোমার মত আমিও ভাবতে চেষ্টা করি। আমার মনে হয় এক জায়গায় আমরা বড় একা, সেখানে কেউ সঙ্গী হ'তে পারে না। প্রত্যেককে নিজ জীবনের দুঃখ একাই বহন করতে হবে। কি জানি, জীবনের এ-সব প্রশ্নের কি উত্তর?

—জীবনের প্রশ্নের উত্তর জীবনের সুখদুঃখ দিয়ে দিতে হবে, কথায় তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না।

—ঠিক বলেছ। দেখ দেখ কি সুন্দর পাখী, কি পাখী?

—মাছরাঙা মনে হচ্ছে।

—খুব কবি! পাখীদের নাম লেখ, একটাও চেন না। চল, কবিত্ব করা গেল, দর্শন-চর্চ্চা হ'ল। এখন ক'টা বাজল?

—আর একটু ব'স।

সূর্য্য পশ্চিম-গগনে হেলিয়া পড়িল। বৃক্ষপত্রান্তরাল হইতে কয়েকটি স্বর্ণরশ্মি উমার কেশে কপোলে কণ্ঠের স্বর্ণহারে ঝিকিমিকি করিতেছে; কয়েকটি পীতপত্র শাড়ির অঞ্চলে ঝরিয়া পড়িল। আম্রবন বাতাসে মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল। আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লীলা।

অরুণ বিমুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এ যেন রূপকথার মায়াপুরী।

সহসা ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি আসিল। ছুটিয়া মোটর-গাড়ীতে আশ্রয় লইতে হইল।

গাড়ীতে দুই জনে বসিল ঘেঁষাঘেঁষি। বারিবর্ষণের মধ্যে অরুণ মোটরকার ছুটাইয়া দিল।

ধীরে বৃষ্টি থামিয়া গেল। বারিস্নাত প্রকৃতির হরিতশ্যাম চিত্রপট অলৌকিক আলোকে সমুজ্জ্বল।

ফিরিবার পথে উমা প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে দু-এক লাইন গান গাহিতে লাগিল। অরুণ দু-একটি কথা বলিল মাত্র। শরতের ভরানদীর মত তাহার অন্তর কোন্ আনন্দরসে কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

(ক্রমশঃ)

রামকৃষ্ণ পরমহংস

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র

১৮৭১ সনে আমি প্রথম কলিকাতায় আসি। তখন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের নাম শুনি নাই। ইহার কয়েক বৎসর পরে পরমহংসদেবের নাম শুনিতে পাই।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম কলিকাতার অন্তর্গত সিন্দুরিয়াপটির শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে। সে বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ ছিল। প্রতি সপ্তাহে তথায় ব্রহ্মোপাসনা এবং বৎসরান্তে একবার ব্রহ্মোৎসব হইত। ব্রহ্মোৎসবের সময় বহু লোক নিমন্ত্রিত হইতেন। আমিও একবার নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে গিয়াছিলাম। সেখানেই সর্ব্বপ্রথমে পরমহংসদেবকে দর্শন করি।

তিনি নেপালবাবু ও গোপালবাবুকে বড় ভালবাসিতেন এবং মাঝে মাঝে ব্রহ্মোপাসনার সময় উপস্থিত থাকিতেন। ব্রহ্মোপাসনার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপদেশ দিয়াছিলেন। অবশেষে "কত ভালবাস গো মা মানবসন্তানে, মনে হ'লে প্রেমধারা ঝরে দুনয়নে" এই গান আরম্ভ হইয়াছিল। "কত ভালবাস গো মা মানবসন্তানে" শুনিবা মাত্র পরমহংসদেব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন কিন্তু ঐ গানের প্রথম ছত্র শুনিবামাত্র তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। অল্প ক্ষণ পরেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন।

তাঁহার ভাগিনেয় সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তিনি তাঁহার কর্ণে চীৎকার করিয়া "ওঁ, ওঁ," ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব বহু ক্ষণ পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন "আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাদের উপাসনায় বিঘ্ন করিয়াছি।" তাঁহার এই ভাবাবেশ দেখিয়া আমরা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলাম।

ইহার পর এক দিন তিনি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-উপাসনালয়ে অকস্মাৎ উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার ভাগিনেয়। সেদিন উপাসনা করিতেছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। সঙ্গীত করিতেছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ)। কি গান তাহা আমার মনে নাই। সেদিনও গান শুনিতে শুনিতে তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হয়। তাঁহার ভাগিনেয় তাঁহার কর্ণে পুনঃ পুনঃ ওঁ ধ্বনি করাতে তিনি উঠিয়া বসেন।

তৃতীয় বার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম কলিকাতার উত্তর দিকে পাইকপাড়ার নিকটবর্ত্তী সিঁথির এক উদ্যানে। উদ্যানের মালিক ছিলেন শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাল। রাধা-বাজারে তাঁহার এক দোকান ছিল। প্রতি বৎসর তাঁহার উদ্যানে ব্রহ্মোৎসব হইত। এখানে মহাসমারোহে উৎসব ও ভোজন হইত।

উপাসনা হইতেছে, কে উপাসনা করিতেছিলেন তাহা মনে নাই। পরমহংসদেব প্রতি বৎসরই এই উৎসবে আসিতেন এবং আনন্দের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিতেন। এই উদ্যানে আমি তাঁহাকে তিন-চার বার দেখিয়াছি। তিনি সকালে আসিতেন এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায় থাকিতেন। অন্যান্য স্থানে যেমন, তেমন এখানেও উপাসনার সময়ে অচেতন হইতেন। এই উদ্যানে মধ্যাহ্নকালে ভূরিভোজনের আয়োজন হইত। পরমহংসদেব নানা গল্প করিতে করিতে ভোজন করিতেন। আমাদের অনেকের অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী খাইতে পারিতেন। আহারান্তে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইত। একবার এই প্রসঙ্গ হইয়াছিল, "মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে জানিতে পারে কি না।" তিনি বলিয়াছিলেন, "বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও তেমনি আমার গায়ে ঠেকেন।" এই কথাটা এখনও আমার মনে আছে। আরও অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আমার মনে নাই।

"চণ্ডীদাস-চরিত"

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

(১) পুথী-প্রাপ্তি

প্রথম প্রবন্ধ আষাঢ়ের "প্রবাসী"তে বেরিয়েছে। গত পূজার পর পুথীর* বাকি পাতা পেয়েছি। পুথী-প্রাপ্তির, পুথীর ও কবির বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানতে পেরেছি।

সন ১৩২২ সালে বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। লোকের অন্ন-কষ্ট দূর ক'রতে নানা দয়ালু সংঘ উদ্যোগী হয়েছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতা-সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ হ'তে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ-আচার্য্য-প্রমুখ কয়েক জন ভিক্ষা দিতে এসেছিলেন। এঁরা ছাতনার দক্ষিণ-পশ্চিমে দুই ক্রোশ দূরে কেঞ্জাকুড়া গ্রামে বাসা করে'ছিলেন। মাস খানেক পরে এক ক্রোশ দক্ষিণে লখ্যা-(লখ্যা) শোল গ্রামে সেন-দের পাকা দুর্গামেলায় বাসা করেন। সেন-দের একজনের সঙ্গে ভিক্ষাদায়ক শ্রীযুত হরিদাস-মল্লিকের তর্কাতর্কি হয়। মল্লিক বলেন, চণ্ডীদাস বীরভূমের নান্নুর গ্রামে ছিলেন; সেন বলেন, তাঁরা চিরকাল শুনে আসছেন চণ্ডীদাস ছাতনায় ছিলেন। আর বলেন, আমাদের বাড়ীতে চণ্ডীদাসের পুথী আছে। মল্লিক সে পুথী দেখেন নি।

১৩৩৪ সালে শ্রীযুত মহেন্দ্র-সেন সে পুথীর এক নকল বাঁকুড়ার এক ডাক্তারকে, এবং পরে ১৩৩৭ সালে আসল পুথী এক হাকিমকে দিয়েছিলেন। হাকিম ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কে নিলে, কোথাও আছে কি গেছে, সেন কিছুই ব'লতে পারেন না। সেন-দের অনেক জ্ঞাতি। অনেকে বিদেশে থাকেন, পর্ব প'ড়লে বাড়ী আসেন। সম্প্রতি নকলই সম্বল। দেখছি, এতে প্রাপ্ত পুথীর প্রথম দশ পাতা, "জাগহ জনমভূমি" পর্য্যন্ত আছে। আর, রামী-চণ্ডীদাস ও রামী-রোহিণীর উক্তি-প্রত্যুক্তি অতিরিক্ত আছে। কৃষ্ণ-সেনের পুথী ধরে' তাতে রামী-চণ্ডীদাসের প্রথম মিলন রসাল করা হয়েছিল।

১৩৪০ সালের মাঘ মাসে ডক্টর শ্রীযুত সুনীতিকুমার-চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি কলিকাতায় ফিরে যেয়ে মল্লিকের নিকট পুথীর অস্তিত্ব শুনেছিলেন। তাঁর কাছ হ'তে শ্রীযুত রামানুজ-কর ও অপর দুই বন্ধু শুনেছিলেন। এঁরা শুনেছিলেন, মহেন্দ্রনাথ-চক্রবর্তীর বাড়ীতে পুথী আছে। কিন্তু লখ্যাশোল গ্রামে কোন চক্রবর্ত্তী নাই। শ্রীযুত রামানুজ-কর শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ-সেনের বাড়ীতে পুথীর সন্ধান পান। তখন সেনের নিকট পুথীর ১১, ১২র পাতা বাদে প্রথম কুড়ি পাতা ছিল। পাটায় বাঁধা ছিল। তিনি মাঝে মাঝে সে পুথী নিয়ে কেঞ্জাকুড়ায় যেয়ে শ্রীযুত কর ও অপরকে পড়ে' শোনাতেন। কিন্তু পুথী হস্তান্তর ক'রতে চান নি। এক দৈবযোগে আমরা পুথীখানি পেয়েছি। ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে এখানকার এক বাঙ্গালী বড় হাকিম এই পুথী পেতে ইচ্ছা করে'ছিলেন। সে কথা সেনের কানে দৈবাৎ পঁহুছে। সেন চিন্তিত হ'লেন। বড় হাকিম; চাইলে দিতেই হবে, হয়ত দেশান্তরিতও হবে। আমরা চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রছি, একথা শুনে তিনি কর-কে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। তখন ১১,১২র পাতা বাদে পুথীর ৪৪ পাতা ছিল। আমি সে বৎসর কলিকাতায় ছিলাম। সেখানে শ্রীযুত কর আমাকে এই সংবাদ দেন। আমি পূজার দিন কয়েক পূর্ব্বে বাঁকুড়া এসে পুথী পাই। শ্রীযুত সুনীতিকুমার-চট্টোপাধ্যায়ের নিকট সংবাদ না পেলে পুথী পেতে দেরি হ'ত, কিম্বা পুথী হস্তান্তরিত হ'ত। আমরা তাঁর সাধুবাদ ক'রছি। শ্রীযুত সেন বলে'ছেন, পুথীখানার জন্যে তাঁর বাড়ীতে গত পূজার সময় লোক যাতায়াত করে'ছিল।

---

* রাঢ়-দেশে পুঁ-থি শুনি, পুরাতন পুথীতে এই বানান আছে। আমি পু-থী বানান শুদ্ধ মনে করি। কারণ, (১) সং পু-স্তী হ'তে পু-থী, এসেছে। সং পু-স্ত-ক হ'তে পো-থা। পোথা শব্দ পূর্ব কালে প্রচলিত ছিল। এখন ওড়িয়াতে আছে। (২) পোথা বড়, পুথী ছোট। বাংলা ভাষায় ক্ষুদ্রার্থে 'ঈ' হয়। যেমন, কোপা কুপী, চালুনা চালনী।

শ্রীযুত মহেন্দ্র-সেন দয়া করে' তিন দিন বাঁকুড়ায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে'ছিলেন। তাঁর মুখে যা শুনেছি তা লিখছি। ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসের পূর্ব্বে তিনি এই পুথীর অস্তিত্ব জানতেন না। এক দৈবযোগে তিনি জানতে পারেন। ছাতনায় চৈত্র শুক্লসপ্তমীতে চণ্ডীদাসের মেলা হয়ে থাকে। ১৩৩৯ সালের চৈত্র মাসে শ্রীযুত সেন মেলা দেখতে গেছলেন। গিরি-বাকতী সঙ্গে ছিল। লখ্যাশোলের গায়ে হামুল্যা গাঁ। এই গাঁয়ে গিরির নিবাস। এখন তার বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর। পথে যেতে যেতে চণ্ডীদাসের কথা উঠে। গিরি বলে, সে যে সিন্দুক সেনকে দিয়েছে, তাতে চণ্ডীদাসের এক পুথী আছে। তিনি বাড়ী এসে কিছুদিন পরে সিন্দুকের এক রাশি কাগজ-পত্রের মধ্যে পুথীখানা দেখতে পান। তখন পাটায় বাঁধা ১৮ পাতা ছিল। এই সকল খুচরা কাগজের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, নারদ-সংবাদ, অমরকোষ, শব্দশিক্ষা ইত্যাদি পুথী ছিল।

গিরির পিতা শিবু ছাতনার রাজার এক দরোয়ান ছিল। সে লেখাপড়া তেমন জানত না। কিন্তু কথকদের মুখে ভাগবতাদি শুনে শুনে রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝত। গান-বাজনা ভালবাসত। রাজসেবা দ্বারা কিছু বিষয়ও করে'ছিল। ১২৬৪ সালে ছাতনার রাজা আনন্দলাল গুপ্তাঘাতে অকালে হত হন। গৃহ-বিবাদ জ্বলিয়া উঠে। সে সময় রাজ্যের কাগজ-পত্র যে পেয়েছে, সেই সরিয়েছে। (এই কারণে বর্ত্তমান রাজার ঘরে রাজবংশবৃত্তান্ত কিছুই পাওয়া যায় না।) বোধ হয় শিবুও অনেক কাগজ-পত্র এনেছিল। সেই সঙ্গে চণ্ডীদাসের পুথীও ছিল। সে কাঠের একটা নূতন সিন্দুকে রেখেছিল। সিন্দুকটি বড়। প্রায় চার হাত লম্বা, এক কোমরের উপর উচু। তার বাড়ীতে তখন ১০।১২ খানা তাঁত চ'লত। সে সুতা ও বোনা কাপড় ইত্যাদিও সে সিন্দুকে রাখত। শিবু দীর্ঘজীবী ছিল। তার মৃত্যুর পর গিরি হীনদশায় পড়ে।

গিরি-বাকতী শ্রীযুত রামানুজকে বলে'ছে, তার পিতা আনন্দলালের দ্বিতীয় রাণী আনন্দকুমারীর নিকট হ'তে পুথীখানা এনেছিল। ১৩১৮ সালে ৯৭।৯৮ বৎসর বয়সে শিবুর মৃত্যু হয়েছে। তার পর গিরির ঘর পুড়ে যায়, সিন্দুক রাখবার জায়গা ছিল না। টাকারও অভাব হয়। সে কাগজ পুথীপত্রসহ সিন্দুকটি ১৩২৫, কি ১৩২৮ সালে শ্রীযুত মহেন্দ্র-সেনকে বিক্রি করে। শ্রীযুত সেনের বাড়ীতে একটা পুরাতন বড় সিন্দুক ছিল। মেয়েরা সে সিন্দুকের মূল্যবান দ্রব্যাদি এই নূতন সিন্দুকে, আর ঘরের ভাঙ্গাচোরা জিনিস ও নূতন সিন্দুকের কাগজপত্র পুরাতন সিন্দুকে রাখেন। পুথীখানাও এই ভাবে এই সিন্দুকে পড়ে'ছিল। পুথীর পাতা, অন্য পুথীর পাতা ও কাগজ-পত্রের সঙ্গে মিশে গেছল। পুথীর পাটাবাঁধা পাতা বাদে অন্য পাতা খুজে খুজে বার ক'রতে হয়েছিল। শ্রীযুত সেন যে ৪৪ পাতার পুথী দিয়েছিলেন, তার নকল রাখেন নাই। পরে নকল রেখে রেখে পাতা দিয়েছেন। এই কারণেও দেরি হ'ত। তিনি গ্রামবাসী, সংসার-চিন্তায় ঘুরে বেড়ান। পুথীর পাতা-খোজা তাঁর আবশ্যক কর্ম মনে করেন নাই। আমাদের গ্রহ সুপ্রসন্ন ব'লতে হবে, পুথীখানা উদ্ধার হয়েছে। শ্রীযুত রামানুজের উদ্যম ও আগ্রহের প্রশংসাও ক'রতে হবে।

(২) পুথী

পুথী দু-পিঠে লেখা, ১০০ পাতায় সম্পূর্ণ। সব পাতা আড়ে সমান, কিন্তু দীর্ঘে সমান নয়। ১১ ও ১২-র পাতা বাদে প্রথম ২০ পাতা প্রায় ১৪৳০ ইঞ্চি লম্বা। কাগজের রং খড়ের মতন। ২০-র পাতায় মল্লেশ্বর গোপাল-সিংহের সহিত চণ্ডীদাসের কথা আছে। ১১ ও ১২-র পাতা ১৫৳০ ইঞ্চি লম্বা। এই দুই পাতায় শূন্যভারতী ও বাসলীর সহিত চণ্ডীদাসের উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে। কাগজ ও লিপি দেখে মনে হয় পাতা দুখানি পরে নিবিষ্ট হয়েছিল। হয়ত পুরাতন অনুবাদ ভাল হয় নাই, নূতন পাতায় নূতন অনুবাদ করা হয়েছিল। ২০-র পর ৭৭ পাতা ১৫ ইঞ্চি হ'তে ১৫৳ ইঞ্চি লম্বা। শেষের ৩ পাতা ছোট। কাগজের রং যেন ধুঁআ-লাগা। পাতার স্থানে স্থানে বড় বড় কাল দাগ আছে। ভিজা থাকতে থাকতে দুখানা পাতা চিটিয়ে একখানা করে' কাগজী তার ভারী পাথর চালিয়েছিল। কাগজ পুরু হবার এই কারণ। পাতার ধার ভাঙ্গা দেখে মনে হয়, কেহ যত্ন করে' রাখে নি। দু-পুরু কাগজ বলে' মাঝে মাঝে ছিড়ে যায় নাই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, রাজার মুনসী গাঁতা-ঘরে ১০০ খানা পাতা আড়ে দীর্ঘে পুরুতে সমান পান নাই। পূর্ব্বকালে দেশী কাগজের নাম

'বাঙ্গলা কাগজ' ছিল। পুথীখানি বাঙ্গলা কাগজে লেখা। হয়েছিল।

পুথীর সমুদয় পাতা পাকা হাতে লেখা।* এক হাতের লেখা বলে'ই মনে হয়। প্রথম খান কয়েক পাতায় যেন অক্ষরের মুক্তাপাতি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। লিপিকর শরের কলম সরু করে' বেড়ে শ্রদ্ধাভক্তিচিত্তে লিখতে আরম্ভ করে'ছিলেন। পরে কলমের মোচ মোটা হয়েছিল, লেখাও তাড়াতাড়ি হয়েছিল। আর একটা বিষয় লক্ষ্য ক'রবার আছে। প্রথম কয়েক পাতায় যত বর্ণাশুদ্ধি আছে, পরে তত নাই। র-ফলার পরের বর্ণে রেফ-যোগ থেমেছে। বোধ হয় কেহ পুথী প'ড়ছিলেন, লিপিকর শুনে শুনে লিখছিলেন। পরে কবিই দেখুন, আর কেহ দেখুন, ভুল হ'তে দেখে লিপিকর পুথীর শব্দ দেখে দেখে লিখেছিলেন।

অক্ষরের আকারে দেখছি, 'ড়' অক্ষরের তলে বিন্দু নাই। দু, যু, পু অক্ষরের 'উ'-কার 'ব' ফলার মতন। 'ঘু' দেখতে 'হু' র মত। 'জ্ঞ' বিচিত্র। 'কু' সেকেলে, আর 'কৃষ্ণ' শব্দ একটি অক্ষরে। পুথীর দূরবর্তী দুই পাতার লিপির ফটো দেওয়া গেছে। লিপি-তত্ত্ববিৎ মিলিয়ে দেখতে পারেন, পুথীর বয়সও নির্ণয় ক'রতে পারেন। আমি দেখছি, পুথীর ভাষা আগাগোড়া সমান। আর, সে ভাষা ছাতনা অঞ্চলের, তাতে সন্দেহ হ'চ্ছে না। পদ্যের ভাষা দেখে কালনির্ণয় কঠিন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ভাষা দুই শত বৎসরের পুরাতন মনে হয় না। কারণ সে ভাষা এখনও চ'লছে। কিন্তু যদি তিনি গদ্য লিখতেন, তা হ'লে সে ভাষা পুরাতন মনে হ'ত। "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথীর ভাষা রাঢ়ের এক প্রান্তদেশের, এই কারণে পদ্যেও পুরাতনের চিহ্ন রয়ে গেছে। বিশেষতঃ স্থানে স্থানে যে এক-আধটুকু গদ্য আছে, তার ভাষা শত বৎসরের পুরাতন ব'লতে সন্দেহ হয় না। পুথীতে 'জাগাত' একটা শব্দ আছে। রাজা হামীর-উত্তর বণিকের নিকট বাসলীর শিলাপট্ট নিয়ে তাকে বলে'ছেন, তোমাকে আর 'জাগাত' দিতে হবে না। এর অর্থ শুল্ক। বাঁকুড়ার কেহ এই অর্থ ব'লতে পারে না। শব্দটি ছাতনায় এখনও প্রচলিত আছে।

কিন্তু এই যে আছে, 'মোরাও মানুষ বটি নহি ছাগ মেষ'—এ যে ডি-এল-রায়ের "বঙ্গদেশ"! 'বাহিরিলা বামাকুল'—এ যে মাইকেল মধুসূদনের "মেঘনাদবধ"! 'অন্তরতম সুন্দর এস'—এ যে রবীন্দ্রনাথ! 'জাগ জাগহ জনমভূমি'—এ যে স্বদেশী গান! এইরূপ নবভাব আরও আছে। আমিও চমকে' উঠেছিলাম। বিশেষতঃ কয়েকটা গীতের ছন্দে কৃষ্ণ-সেনকে আধুনিক মনে হয়। রামীর "অন্তরতম সুন্দর" গীতটি তুলছি।

> অঞ্জনঅনআলোক আইস এস অন্তরজামী।
> অন্তরতম সুন্দর এস এসহে জীবনস্বামী।
> বস হৃদজ-কমলাসনে
> এ গহন সপন ভাঁগ,
> কোটিকল্পঅমানিসা ঢাকা প্রিয়তম মম জাগ।
> রুদ্ধ মরম আগল খোল,
> তুমার রূপের আলোক জ্বাল,
> তুমার অনাদি সঞ্চিত চাল,
> পরানে দিবস জামী।

কবি গীতটি 'সঙ্কীর্তন' বলে'ছেন। কিন্তু কোন্ দেবের? কবি 'তোমার' না লিখে 'তুমার' লিখেছেন। পুরাতনের এই রূপ অল্লাধিক লক্ষণ সর্বত্র আছে। ইহাও বলি, ইদানীর কবি পূর্ব কালে যেতে পারবেন না, লৌকিক অলৌকিক ব্যাপারে-পূর্ণ ১০০ পাতার এমন পুথী লিখতে পারবেন না। আর, কার বা মাথা ব্যথা পড়ে'ছিল? যাঁদের পড়বার কথা, তাঁরা উদাসীন ছিলেন। আমাদের উপদ্রবে পুথী বেরিয়েছে। পুথীখানা আছে, যাঁর ইচ্ছা তিনি দেখতে পারেন। পুথীখানা ছাপালে ৩০০ পৃষ্ঠার বই হবে। সাহিত্য-পরিষৎ পুথীখানা ছাপিয়ে চণ্ডীদাসের প্রতি অনুরাগ দেখাতে পারেন। পুথীখানা নানা বিষয়ে মূল্যবান।

(৩) কবি

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ-গীতাইত পুথীর শেষ তিন পাতায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন। যথা,

> নীলকণ্ঠের জ্যেষ্ঠপুত্র উদজনারান।
> আইসেছিলা ছত্রিনাজ ত্যজি রাইগ্রাম*।
> সর্ব্বসাস্ত্রে বুনিপুন চিকিত্সাকুসল।
> জানি স্থান দিলা তাঁরে ব্রাহ্মনমণ্ডল।
> বত্তসরেক ছত্রিনাজ করিজা বসতি।
> সাস্ত্রজ্ঞানে চিকিত্সাজ লভিলেন খ্যাতি।

* দোষ এই, শব্দের পরে পরে ফাঁক নাই, প'ড়তে কষ্ট হয়। 'সে নদের নাম শুনে' আমি 'সেনদের নাম শুনে' পড়ে' ভুল করে'ছি।

* বর্দ্ধমান জেলায় ছিল।

ক্রমে তিনি হইলেন রাজকবিরাজ।
দিলেন কিঞ্চিত রাজা তুমি লাখেরাজ॥
বাসুলীর স্তব তিনি করিজা বর্ণন।
করিতেন ছাত্রগনে আদো অধ্যাপন॥
একদিন শুনি সেই সুললিত গান।
বড়ই সন্তুষ্ট রাজা উত্তরনারান॥
তারপর নররাজ ডাকি তারে কন।
কর তুমি চণ্ডিদাস চরিত্রবর্ণন॥
তুমার তাহাতে জদি ক্ষতি কিছু হয়।
পুরন করিব আমি নাহি কোন ভয়॥
অর্থের সাহায্য তাহে হইলে প্রওজন।
সে অর্থ তুমায় আমি করিব অর্পন॥
তাহাতে প্রপিতামহ হইজা সংশ্রিত।
লিখিলেন চাণ্ডিদাসজীবনচরিত॥

উদয়-সেনের দুই পুত্র,—আনন্দ ও মহানন্দ। আনন্দ রাজার প্রধান অমাত্য ও মহানন্দ তাঁর মুন্সী ছিলেন। এক খুড়তাত ভাই বক্সী ছিলেন। আনন্দের তিন পুত্র,—হীরালাল, মতিলাল, ফতেলাল। হীরালাল বহুকাল রাজ-গস্তাইত ছিলেন। হীরালালের বিবাহ হ'ল, কিন্তু পুত্র হয় না। জ্যোতিষীরা ব'ললেন, ভদ্রাসন দোষযুক্ত। এই কারণে হীরালাল ছত্রিনা ছেড়ে অন্য গ্রামে যেয়ে বাসের সঙ্কল্প ক'রলেন। রাজা লছমীনারাণ এই কথা শুনে তাঁদিকে লথ্যাশোল নামক "বেছপ্পর" মৌজা কিঞ্চিৎ পঞ্চকে

জেই ক্ষনে চলে চন্দ্র রসের সমুখে।
পশ্চাতে থাকিআ গ্রহ পিছু নেত্রে দেখে॥

অর্থাৎ ১৬৯৩ শকে, ইং ১৭৭১ সালে, তিন সহোদরকে অর্পণ করেন। তখন সে সব অঞ্চলে বাঘভালুক ও দস্যুর ভয় ছিল। মাঝে মাঝে হাতীর পাল আসত। হীরালাল সে গ্রামে গেলেন না, পাশের হাসুল্যা গ্রামে বাসাবাড়ী ক'রলেন। সেখানে তিনি কার্তিকেয় পূজা আরম্ভ ক'রলেন, এবং বৎসরেক মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদের জন্ম হ'ল। চারি বর্ষ পরে কৃষ্ণপ্রসাদের হাতে-খড়ি হয়। ক্রমিক ১২ বৎসর পড়ে' ব্যাকরণ ও কাব্যজ্ঞান জন্মে। নানা শাস্ত্র দেখে চরক, সুশ্রুত, নিদানাদি বৈদ্যক পঞ্চশাস্ত্র পড়ে' নানা স্থান ঘুরে ফিরে পিতার নিকট ছত্রিনায় আসেন। ভাগ্যক্রমে তিনি রাজকুমার বলাইনারাণের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। পরে ইনি রাজা হ'লে

একদিন কন রাজা শুনহ প্রসাদ।
চণ্ডির চরিত্র কর বঙ্গে অনুবাদ॥
ক্ষতির পুরন পাইবা রাজকোস হইতে।
উদজসেনের পুথী আছে মোর সাঁথে।
রাজআজ্ঞা ধরি সিরে দেখি শুভক্ষণ।
দিনরাত বন্দি মাতা বাসুলীচরন॥
প্রনমি প্রপিতামহে বন্দি গুরুপাদ।
আরম্ভিনু চণ্ডিলীলা বঙ্গে অনুবাদ॥

* * *

সাম্মাসিক কাল গতে সেস কইনু পুথী।

রাজা বলাইনারাণ আদি-অন্ত শুনে অতিশয় প্রীত হ'লেন, কিন্তু কবি রাজপুত্র লছমীনারাণের নেত্রে বিষ-স্বরূপ হ'লেন। [এইখানে আত্ম-পরিচয় শেষ।]

এই পরিচয় হ'তে পাচ্ছি, উদয়সেন রাজা উত্তরনারাণের কবিরাজ ছিলেন। কিন্তু ছাতনায় নারায়ণ নামে অনেক রাজা ছিলেন। উদয়সেন কোন্ নারাণের কবিরাজ ছিলেন? কৃষ্ণসেনের অনুগ্রাহক বলাইনারাণ কখন্ রাজা হয়েছিলেন? প্রথমে কৃষ্ণসেন দেখি। পুথীতে আছে, ১ম লছমীনারাণের নিকট হীরালাল ১৬৯৩ শকে লথ্যাশোল গ্রাম পেয়েছিলেন। তার দুই এক বৎসর পরে, ধরি, ১৬৯৫ শকে কৃষ্ণসেনের জন্ম হ'য়েছিল। বর্ত্তমান শক ১৮৫৭, অতএব ১৬২ বৎসর পূর্বে। ১ম লছমীনারাণের মধ্যম পুত্রের নাম বলাই নারাণ ছিল। তাঁর প্রদত্ত তিন খানা সনন্দ হ'তে ১৭৫০, ১৭৫৮, ১৭৬১ শক পাচ্ছি, অতএব কৃষ্ণ-সেন প্রায় ১০৮ বৎসর পূর্বে বঙ্গানুবাদ করে'ছিলেন।

কৃষ্ণসেন বঙ্গানুবাদে উদয়সেনের পুথীসমাপ্তিকাল 'ইন্দুসর-সিন্ধুসর' শক লিখেছেন (পত্রাঙ্ক ৯৪।২)। ইহা হ'তে ১৫৭৫ শক আসে। কৃষ্ণসেন উদয়সেনের সংস্কৃত শ্লোকটিও তুলেছেন। তাতে আছে 'ইন্দুসরাব্ধিবাণে' (পরে সমুদয় শ্লোক দেওয়া যাবে।) 'অব্ধি' অর্থে ৭ কিম্বা ৪। কৃষ্ণসেন 'অব্ধি' অর্থে সিন্ধু=৭ ধরে'ছেন। এ হ'তেও ১৫৭৫ শক পাই। ১৬৯৫ শকে কৃষ্ণসেনের জন্ম। অতএব কৃষ্ণসেনের জন্মের ১২০ বৎসর পূর্বে, এবং এখন হ'তে ২৮২ বৎসর পূর্বে, উদয়সেন সংস্কৃত পুথী লিখেছিলেন।

কিন্তু উদয়সেনের পুত্র আনন্দ, আনন্দের পুত্র হীরালাল, হীরালালের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ। উদয়সেন ও কৃষ্ণসেনের মাঝে দুই পুরুষ। দুই পুরুষে ১০০ বৎসর প্রায় দেখা যায় না। 'অব্ধি' অর্থে ৪ ধ'রলে ১৫৪৫ শক আরও অসম্ভব হয়।

শ্রীযুত মহেন্দ্র-সেন বলেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের বিবাহ দুর্ঘট ছিল। ছাতনায় ঘরকয়েক বৈদ্যের বাস ছিল, তাঁরা

সগোত্র। এই হেতু পূর্বাঞ্চল হ'তে কন্যা আনতে হ'ত। পূর্বাঞ্চলবাসী কন্যাকে বনবাসে পাঠাতে চাইতেন না, পশ্চিমা বৈদ্যদিকে অবজ্ঞাও ক'রতেন। এই হেতু বরের বয়স বেড়ে যেত, পণ দিয়ে শিশুকন্যা কিনতে হ'ত। পূর্বকালে বরের বয়স ত্রিশের সেদিকে এবং কন্যার বয়স নয়ের এদিকে বিবাহ হ'ত না। ধরি, উদয়-সেন যখন পুথী লিখেছিলেন, তখনও তাঁর বিবাহ হয় নাই। পুথী লেখার ১০ বৎসর পরে তাঁর পুত্র আনন্দের জন্ম হয়। আনন্দের চল্লিশ বৎসর বয়সে পুত্র হীরালালের জন্ম হয়। হীরালালের বৃদ্ধ বয়সে কার্তিক পূজার ফলে, ধরি, ষাট বৎসর বয়সে কৃষ্ণ-সেনের জন্ম হয়। হীরালাল নিরানব্বই বয়সে গত হন। এইরূপে ১১০ বৎসর পাচ্ছি। হয়ত পিতার বেশী বয়সে আনন্দ ও হীরালালের জন্ম হয়েছিল। হয়ত প্রথম কয়েকটি সন্তান অকালে মারা গেছল। অথবা তাঁরা তাঁদের পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর পুত্র ছিলেন।

উদয়-সেন কোন্ রাজার কবিরাজ ছিলেন? কৃষ্ণ-সেনের পুত্র গঙ্গানারায়ণ রাজার দেওয়ান ছিলেন। এইরূপে সেনেরা উদয়-সেন হ'তে পাঁচ পুরুষ ছাতনার রাজপুরুষ ছিলেন। শ্রীযুত মহেন্দ্র-সেন অশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকে রচিত খণ্ডবিবেক-নারায়ণ পর্যন্ত এক রাজ-লতা দিয়েছেন। তাঁর একটা খাতায় লেখা আছে। খণ্ডবিবেক-নারায়ণের পরবর্তী রাজ-লতা অন্য কাগজ হ'তে দিচ্ছি।

ছাতনার রাজা ও রাণীদের নাম বর্তমান কাল পর্যন্ত

১। শঙ্খ রায়
২। ভবানী ঝোর্যাং*(ব্রাহ্মণ)
৩। দ্বাদশ সামন্ত রায়
৪। ঐ জামাতা হাম্বীর উত্তর (১২৮৫ শকে চণ্ডীদাস)
৫। বীর হাম্বীর
৬। নিশঙ্ক হাম্বীর
৭। নৃসিংহ নারায়ণ
৮। মোহান্ত রায়
৯। শঙ্কর নারায়ণ
১০। বিরিঞ্চি নারায়ণ
১১। রাণী চঞ্চলকুমারী
১২। উত্তর নারায়ণ (১৫৭৫ শকে উদয়-সেনের রাজা)
১৩। জটিল বিবেক
১৪। স্বরূপ নারায়ণ
১৫। খণ্ডবিবেক নারায়ণ (১৬৫৫ শকে বাসলীর দ্বিতীয় মন্দির)
১৬ ২য় স্বরূপ নারায়ণ
১৭ লক্ষ্মীনারায়ণ (১৬৯৩ শকে হীরালালকে গ্রাম দেন)
১৮ পুত্র ৩য় স্বরূপ নারায়ণ
১৯ ভ্রাতা কানাই নারায়ণ
২০ ভ্রাতা বলরাম নারায়ণ (কৃষ্ণ-সেনের রাজা)
২১ পুত্র ২য় লক্ষ্মীনারায়ণ
২২ পুত্র আনন্দলাল (১৭৭৯ শকে হত)
২৩। রাণী অক্ষয়কুমারী
২৪। রাণী আনন্দকুমারী
২৫। ভ্রাতুষ্পুত্র মহেন্দ্রলাল
২৬। পুত্র হেমেন্দ্রলাল (বর্তমান রাজা)

এই সকল রাজা পরে পরে পুত্র নহেন। এই কারণে পুরুষ গণে' কাল-নির্ণয়ের উপয় নাই। শ্রীযুত মহেন্দ্র-সেন বলেন, সংস্কৃত শ্লোকে একটা পর্যায় উলটা-পালটা হয়েছে। তাঁর মতে জটিল বিবেকের পুত্র উত্তরনারাণ, অপর পুত্র স্বরূপনারাণ। শ্লোকে আছে, "ততোত্তর নারায়ণ সুবিজ্ঞ। ধার্ম্মিক গোবিপ্রসেবানুরক্ত।" এরূপ রাজা উদয়-সেনকে দেশে দেশে পাঠিয়ে চণ্ডীদাস-চরিত সংগ্রহ করাতে পারেন। ১৫৭৫ শকটি উদয়-সেনের প্রপৌত্র মেনে নিয়েছেন। অতএব আমরা অবিশ্বাস করতে পারি না। এতে বীরভূমের দ্বিজ চণ্ডীদাস প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে যেয়ে প'ড়ছেন।

ভাগ্যক্রমে উদয়-সেনের পুথীর একখানি পাতা পেয়েছি বহুকষ্টে পেয়েছি। শ্রীযুত মহেন্দ্র-সেনের এক জ্ঞাতির বাড়ীতে ছিল। আর সব পাতা কোথায় গেল, কেহ ব'লতে পারে না। প্রাপ্ত পাতাখানার দশা দেখে বুঝছি, গৃহলক্ষ্মীরা পুথীখানার খুচরা পাতা অপর কাগজ-পত্রের সঙ্গে সার-কুড়ে ফেলে দিয়েছেন। সম্প্রতি অন্য কোথাও পাবার আশা নাই।

পাতাখানি অত্যন্ত পাতলা তুলাট কাগজের। মাঝে মাঝে ছিঁড়ে গেছে; এক এক স্থান অদৃশ্য হয়েছে। পত্রাঙ্ক স্থানটি শূন্য। বাঁ পাশে পুথীর নাম 'চণ্ডিচরিতামৃতম্' লেখা আছে। কয়েকটা অক্ষর নাগরীর মতন। দু পিঠে লেখা। প্রথম পিঠের লিপির ফটো দেওয়া গেল। লিপি-বিদেরা লিপির কাল নির্ণয় করুন।

এখানকার কলেজের সংস্কৃতবিদ্যার প্রোফেসার শ্রীযুত রামশরণ-ঘোষ পুথীর পাঠ যথাসাধ্য উদ্ধার করে' দিয়েছেন। এখানে প্রথম ছয়টি শ্লোক দিলাম

স্নাতুং নিত্যমগচ্ছৎ গঙ্গায়া নির্ম্মলোদকে।
তদর্থং হি ধৃতা চাহমনেন তান্ত্রিকেন চ।

*পদবী ঝোর্যাং। পুথীতেও ঝোর্যাং আছে। আমি বুঝতে না পেরে [ঝো]র্যাং করে'ছিলাম। 'ঝোর' অর্থে ঝর জল। ঝোর্যাং পানীয় জল [দি]তেন। পশ্চিমা ব্রাহ্মণ মনে হয়।

স মে হৃদ্দেবতা সত্যমধুনা কথয়ামি চ।
সাক্ষী তচ্চণ্ডিদাসশ্চ মাতা রাসমণি তথা।
কিন্তুৎকৃষ্টকুলে চাহং জাতাস্মি বিধিনা ততঃ।
অকুলীনবরেণাভূদ্বাহং বিহিতং মম।
সমৃদ্ধকুলশীলশ্চ পিতা সর্বমানার্হমে।
প্রাপ্তে তু মযি তদ্বাসং পিতুর্মানং বিনঙ্ক্ষ্যতি।
বীক্ষ্য মামীদৃশীং (পিতুঃ ?) ন সুখঞ্চ ভবিষ্যতি।
শ্বশুরস্ত পুরং গত্বা স্থাস্যাম্যাজীবনন্তথা।
জ্ঞাতং পত্যুরভিধানং চন্দননগরং তথা।
মৎ পিত্রো কুশলকান্তেঃ মামেব জ্ঞাপয়িষ্যসি।

কৃষ্ণসেনের অনুবাদ দিচ্ছি। (পত্রাঙ্ক ৬৬।১) [পাণ্ডুআ নগরে রমার উক্তি; কমলকুমারী শম্ভুনাথের স্ত্রী ও রমার ভগিনী]

জাইতাম স্নান হেতু নিতা তার নিরে।
তথা তেঁই পড়ি এই তান্ত্রিকের করে।
এখন আমার তিনি হৃদয়দেবতা।
সাক্ষী তার চণ্ডিদাস রাসমনি মাতা।
কিন্তু আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীনের মেঞে।
অকুলীন পাত্র সহ হইল মোর বিএ।
কুলে ধনে পিতা মোর সবার সম্মানী।
আমি গেলে তথা তার হইবা মানহানি।
আমায় দেখিআ কারো না জন্মিবা যুখ।
তেঁই তথা এজনমে না দেখাব মুখ।
দিদি২ দআমই কমলকুমারী।
ভুলনা আমারে তুমি চরণেতে ধরি।
আজীবন রব আমি শ্বশুরের ঘরে।
সুবিখ্যাত গ্রাম সেই চন্দন নগরে।

দেখা যাবে, কৃষ্ণ-সেন উদয়-সেনের সঙ্গে সঙ্গে গেছেন। উদয়সেন কোথায় কেমনে চণ্ডীদাসের চরিত জেনেছিলেন, সে কথা পরে আছে।

কৃষ্ণসেন নাটক লিখেন নাই, কিন্তু অনেক স্থানে নাটকের ভঙ্গি এনেছেন। মাঝে মাঝে গীত আছে, 'অমুকের উক্তি,' এই রূপ আছে। অসংখ্য স্থানে 'অমুক কহে,' এইরূপ আছে। আমি সংক্ষেপ নিমিত্ত সে-সে নাম পৃথক করে'ছি। আমার মনে হয়, কৃষ্ণ-সেন চরিতটি পালি-গানের উপযোগী করে'-ছিলেন। তাঁর পুথী কোথাও গাওয়া হ'ত কিনা জানি না। কিন্তু চণ্ডীদাসচরিত গান হ'ত। যাত্রার অধিকারী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় শুনেছিলেন, তাঁর পুত্র শ্রীযুত কমলাকান্তকে সে কথা বলে'ছিলেন। পালাটিতে রামীর সহিত চণ্ডীদাসের মিলন, জাতিপাত, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়াস, সিদ্ধ নামে খ্যাতি বর্ণিত থাকত। এর প্রমাণ "পর্যালোচন" প্রকরণে দেওয়া যাবে। শ্রীযুত মহেন্দ্র-সেনের বাড়ীর পুথী এইরূপ ছিল, প্রাপ্ত পুথীর তুল্য দীর্ঘ ছিল না। চণ্ডীদাস-চরিতের এই অংশ মাধুর্য, বিস্ময় ও করুণ রসে পূর্ণ। এই কারণে প্রচারিত হয়েছিল।

(৪) চণ্ডীদাসচরিত-উপাখ্যান

আষাঢ়ের প্রবন্ধে চণ্ডীদাস, রামী, রুদ্রমালী, রূপনারায়ণ ও বিদ্যাপতি কেন্দুবিল্বগ্রামে ভোরবেলায় পহুঁচেছেন। (পত্রাঙ্ক ৭৮।২)। তাঁরা ঘরে ঘরে অবিরল হরিধ্বনি শুনতে পেলেন। জয়দেব স্মরণ করে' চণ্ডীদাস ধ্যানমগ্ন হ'লেন। রুদ্রমালী দেখলে, শীর্ণকায় কে একজন দাঁড়িয়ে। শুনলে, সে দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা মেগে খায়, তার ছুটি সন্তান আছে, কিন্তু কোথাও ভিক্ষা পায় নাই। গ্রামে শ্রীহর্ষ নামে এক ধনবান আছেন, কিন্তু তিনি গালি দিয়ে দূর করে' দিয়েছেন।

রুদ্রমালী ॥ এত হরিনাম, অথচ দয়াশূন্য গ্রাম! তুমি চণ্ডীদাসের নাম শুনেছ? তিনি এখানে এসেছেন।

ব্রাহ্মণ ॥ এখানে জয়দেব জন্মে'ছিলেন; চণ্ডীদাসের নাম কেউ শোনে নি। কে সে?

রুদ্র ॥ চণ্ডীদাসী পদ শোননি?

ব্রাহ্মণ ॥ কি জানি, শুনেছি। কিন্তু হেথা তার চর্চ্চা নাই। চণ্ডীদাসকে কেউ আদর করে না। তার নাম ক'রলে এই গ্রামের অপমান।

চণ্ডীদাসের আদেশে রুদ্রমালী ব্রাহ্মণকে নিয়ে শ্রীহর্ষের দ্বারে যেয়ে ডাকলেন, "শ্রীহর্ষ আচার্যদেব, ঘরে আছেন কি?" রুক্ষস্বরে সাড়া প'ড়ল,—"কে তুমি, প্রত্যুষে ডাকাডাকি ক'রছ?" ভিক্ষা দিতে হবে শুনে ক্রোধান্ধ হ'য়ে

শ্রীহর্ষ ॥ "আমাছাড়া গ্রামে বুঝি আর কেহ নাই।" তোমার বাপু এত বাড়াবাড়ি কেন? তোমরা কে?

রুদ্র ॥ সিদ্ধকবি চণ্ডীদাস ও তাঁর উত্তর-সাধিকা নিয়ে আমরা পাঁচটি অতিথি। তোমার বাড়ীতে থাকব।

শ্রীহর্ষ ॥ সেই পাপাচারী চণ্ডে? এখনও তার সঙ্গে রজকঝিয়ারী আছে? যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, একথা কাকেও ব'লও না। কবি বটে, কিন্তু জয়দেবের জন্মস্থানে তার প্রশংসা সম্ভব কি?

রুদ্র ॥ চণ্ডীদাস শুধু কবি নহেন, তুমি তাঁর পিছু যত অর্থ ব্যয় ক'রবে, তার দ্বিগুণ পাবে। যত রূপা দিবে তার দ্বিগুণ সোনা পাবে।

এই কথা শুনে শ্রীহর্ষ নিজের বহুভাগ্য মেনে অতিথিদিকে বাড়ীতে রাখলেন।

এইখানে কবি এক অদ্ভুত কাহিনী দিয়েছেন। এক বটব্রহ্মদৈত্য "বকুণ্ডা"য় (বাকুণ্ডা, বাঁকুড়া) রামীকে ইচ্ছা করে'ছিল। কিন্তু চণ্ডীদাস কি মন্ত্র জানেন, তার কাছে সে যেতে পারত না। চণ্ডীর ভণ্ডামি ও সাধুপনা ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে মারতে পারলে তার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। সে ব্রাহ্মণ রূপ ধরে' গ্রামে এক কাণ্ড বাধালে। বিচার-সভা ব'সল, জয়দেবের আত্মা মধ্যস্থ হ'লেন, তিনি যে জয়দেব, শ্লোক-রচনা দ্বারা প্রমাণ ক'রলেন।* কিন্তু ব্রহ্মদৈত্যের মন্ত্রণা ব্যর্থ হ'ল। কেন্দুলীর ব্রাহ্মণসমাজ "সাধু সাধু চণ্ডীদাস ভক্ত-চূড়ামণি" প্রচার ক'রলেন।

কিছুদিন পরে রূপনারায়ণ ও বিদ্যাপতি মেলানি নিয়ে চলে' গেলেন। রামী চণ্ডীদাসকে বলে, "সঙ্কেতে জানাই। ভাঙ্গিতে ভবের খেলা বেশি দেরি নাই॥" কেন্দুবিল্বে আর না থেকে ছত্রিনায় চল।" রুদ্রমালী গ্রামে প্রচার ক'রলে, গ্রামবাসী দলে দলে এসে প্রভুর চরণ বন্দনা ক'রলে। তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ ক'রলেন।

চণ্ডীদাস॥ তুমি মা কল্যাণি, এক পাশে বসে' কাঁদছ কেন?

[এখানে কবি এক রোমাঞ্চকর কাহিনী দিয়েছেন। এটি উদয়-সেনের পুথীতে ছিল না। বিষ্ণুপুরের ঈশানকোণে ছয়ক্রোশ দূরে জামকুড়ি গ্রাম। গায়ে তেলিসায়ের গ্রাম। সেই গ্রামের এক বন্ধু—তেলিসায়েরে অনেক বৈদ্যের বাস আছে—কৃষ্ণসেনকে বিষ্ণুপুরের এক 'রাজপেতা' দিয়েছিলেন। তাতে কাহিনীটি ছিল। কৃষ্ণ-সেন সেই পেতা আশ্রয় করে' মল্লবংশের এক অজ্ঞাতপূর্ব ইতিহাস দিয়েছেন। এখানে সংক্ষেপ ক'রছি।] কল্যাণী ক্ষত্রিয়বালা, 'সোওদামিনী সমরূপে নবিন জোওবনা।' ব্যাঘ্রমুখে তার পিতার মৃত্যু হয়। সেই শোকে তার মাতারও মৃত্যু হয়। সে নিরাশ্রয় হ'য়ে শ্রীহর্ষের বাড়ীতে থাকত, চণ্ডীদাসের আশ্রম মার্জনা ক'রত। চণ্ডীদাস তাকে মা ব'লতেন। সে পিতার মৃত্যুর দুই তিন দিন পরে 'গুর্ব্বার ক্ষেপনী'* হাতে নিয়ে বাঘের সন্ধানে ফিরত। একদিন সমুখে এক বাঘও পড়ে'ছিল। তার ক্ষেপণীর আঘাতে বাঘ মরে' যায়। বাঘের পিঠে রাজবেশ-পরিহিত এক যুবা অচেতন অবস্থায় ছিল। কল্যাণী তার মুখেচোখে জল দিয়ে চৈতন্য সঞ্চার করে, এবং শ্রীহর্ষ উভয়ের বিবাহ দেন। কিন্তু এমন দৈব ঘটনা, জনকয়েক সৈন্য রাত্রে বাসর-ঘর হ'তে সেই যুবাকে কোথায় নিয়ে গেছে, কেউ জানে না। কল্যাণীও তার পতির নামধাম ভুলে গেছে। চণ্ডীদাস এত কথা জানতেন না। তিনি কল্যাণীকে পতিসেবার উপদেশ যতই দেন, সে ততই কেঁদে উঠে। চণ্ডীদাস হুঙ্কার ছেড়ে আঁখি মুদলেন। সে ভাব দেখে সকলে চমকে' উঠল। তিনি দেখলেন, মল্লরাজ্য ছারখারে যেতে বসে'ছে। মল্লেশ্বর কিসেন-গোপালসিংহ গত।[২৪] তাঁর বড় রাণী ১৫ বৎসরের পুত্র কালুকে ছোট রাণী জাহ্নবীর হাতে সঁপে' দিয়ে স্বামীর অনুমৃতা হয়েছেন। জাহ্নবী প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন ক'রছেন। জামকুড়ির রাজা মল্লভূমের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কিসেন-গোপালের বিদ্রোহী হ'য়ে সফলকাম হ'তে পারেন নাই। তাঁর পুত্র যুবরাজ বসন্ত গোপাল-সিংহের অন্তে বিদ্রোহী হ'য়ে গৌড়ের বাদসাহের সাহায্য প্রার্থনা ক'রতে পাণ্ডুআর দিকে যাচ্ছিলেন। কেন্দুলীর নিকটস্থ বনে যুবরাজ ব্যাঘ্রদ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে অচেতন হ'য়েছিলেন। সেই অবস্থায় কল্যাণী দেখেছিল। এদিকে জাহ্নবীর গুপ্তচর দূরে দূরে কিছু সৈন্য নিয়ে যুবরাজের পেছু পেছু যাচ্ছিল। সৈন্যেরা বসন্তকে বিবাহের বাসরঘর হ'তে বিষ্ণুপুরে ধরে' নিয়ে বন্দীশালায় রাখে। জাহ্নবীর আদেশে কারাধ্যক্ষ তাকে প্রত্যহ শতবেত্রাঘাত করে। চণ্ডীদাস কল্যাণীকে পতিসেবা ক'রতে বলে'ছিলেন। তাঁর এই আশীর্বাদ মিথ্যা হয়। যুবরাজের প্রতি অত্যাচারও অসহ্য। তিনি বাসলীকে

* শ্লোকগুলি অশুদ্ধ, পাঠোদ্ধার হ'ল না।

* গুর্ব্বা মাঝারি গাছ। কাঠ শক্ত ও ভারী। ছাতনার পুরাতন বনে আছে। আমি দেখিনি। এই গাছের সোজা ডালে শূল করে' হরিণ শিকার করা হ'ত। এই রকম শূল পুঁতে ক্ষেতের র'দ দেওয়া হ'ত, হরিণ লাফিয়ে ক্ষেতে ঢুকতে যেয়ে শূলবিদ্ধ হ'ত।

২৪) অভয়পদ-মল্লিক-কৃত মল্লভূমের ইতিহাসে এঁর নাম কালু। ইনি ইং ১৩৫৮ সালে গত হন। ইং ১৩৫৮ সালে চণ্ডীদাস পাণ্ডুয়ায় ছিলেন। সালে ঐক্য হ'চ্ছে।

ব'ললেন, "মা, তুমি আমাকে এই সকল নিদারুণ দৃশ্য দেখাতে সন্ন্যাসী করে'ছিলে কি?" যুবরাজের প্রাণ-সংশয়, জাহ্নবী সহজে ছেড়ে দিবেন না। চণ্ডীদাস প্রথমে জাহ্নবীর প্রতি সাম, দান উপায় প্রয়োগ ক'রলেন। কোন ফল হ'ল না। জাহ্নবী বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমি দিবেন না। কল্যাণী দুই হাতে দুই দণ্ড ঘুরাতে ঘুরাতে একাই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াল। শূন্যে বাসলী ও ভৈরব তাকে রক্ষা ক'রতে লাগলেন। কালু সেনাপতি হ'য়ে যুদ্ধ ক'রলেন। কিন্তু ক্লান্ত ও মূর্চ্ছিত হ'লেন। জাহ্নবী মদনমোহনের ভরসায় ছিলেন, কিন্তু মদনমোহন ভক্তাধীন। চণ্ডীদাস তাঁকে ধরে' রাখলেন। পরে জাহ্নবী যুবরাজ বসন্তকে মল্লভূমের একখানি পরগণা ছেড়ে দিলেন। দুই পক্ষের মিটমাট হ'য়ে গেল।[২৫]

কৃষ্ণ-সেন উদয়-সেনের পুথীতে এই কাহিনী পাননি। তাঁকে উদয়-সেনের পুথীর বঙ্গানুবাদ ক'রতে হয় নি। তিনি রাজধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যায় নিজের বিদ্যা দেখাবার প্রচুর অবসর পেয়েছেন। উদয়-সেন কুত্রাপি আদিরস আনেন নি, এমন কি কুত্রাপি নারীর রূপ বর্ণনাও করেন নি। কৃষ্ণ-সেন এই উপাখ্যান লিখতে হিন্দীভাষা ও ব্রজবুলী প্রচুর এনেছেন। কল্যাণীর রূপবর্ণনায় কাব্যালঙ্কারের স্রোতে পাতার দু-পিঠ ভরিয়েছেন। একটু দেখাই।

জলে ডুবে কমলিনী স্থলে রতি উন্মাদিনী
যুদ্ধেতে মোহিনী কেঁদে সারা।
লজ্জায় পবন বেগে উড়াব নিবিড় মেঘে
অতনুর ধনু গর্ব্বহারা।
শ্রীকৃষ্ণ অধরে বসি আলাপে বিলাপে বাঁসি
সফরী তরঙ্গে ভেসে জায়।
বিম্ব অঙ্গ তার ধারা অচেতন জ্ঞানহারা
মৃনাল কণ্টকে বিঁধে কায়।
দাড়িম্ব চম্পক টাট ভাঙ্গিআ ভবের হাট
সাখাসীন লুকায় পল্লবে।
কভু গিরি গর্ত্তে ধায় কভু পড়ে গোওরী পায়
হরির জীবন বাঁচে তবে।

ইত্যাদি।

বিষ্ণুপুরে এক বৎসর থেকে চণ্ডীদাস ও রামী ছত্রিনায় যাত্রা করেন। এখানে তাঁর অন্তলীলা সমাপ্ত হয়। কবি ভারতীর স্তোত্র করে' অন্তলীলা এইরূপ আরম্ভ করে'ছেন। (পত্রাঙ্ক ৯৪।১)

এস মা কল্পনাময়ি বাঁধি বক্ষে সিলা।
রচিব প্রভুর এবে অন্তিমের লিলা।
মগ্ন করি অমিআয় গরল উঠিবে তায়
গর্জ্জিবে অকাল-কাল-জলদ-গম্ভীর।
বহিবে নিস্বনে ঘন প্রচণ্ড সমীর।
অমার তমসা আসি ঘিরিবে মা দসদিসি
হাসিবে বিকট হাসি পিসাচের মেলা।
গ্রাসিবে সে পুর্ণমাসী শসী সোম কলা।
না ফুরিবে মধুমাখা বসন্তে বসন্তসখা
ছুটিবেনা মর্ত্তে আর মন্দার সুরভি।
না বাজিবে মনোমাতা সর্গের দুন্দুভি।
পাসান বেঁধেছি বুকে জা বলে বলুক লোকে
দেখাব এবার আমি সাজিআ' নিষ্ঠুর।
সুখের জীবনে দুখ কত সুমধুর।
নিয়তি ডাকেছে তায় আমি কি করিব ভাই
আইস সবে চল জাই এ ঘোর সঙ্কটে।
আঁকি লব মূর্ত্তি তাঁর স্মৃতি-চিত্রপটে।
সসীনেত্রপক্ষস্রুতি সকে জার অন্তর্হ্নতি
ইন্দুসরসিন্ধুসরে সরতুলি সবে।
মবে জে আবার কবি কল্পনাবাসরে।
তাহাতে তাহার ঘটে কতটুকু পাপ।
বুঝি ভাই দিবা তবে মোরে অভিসাপ।
কবে জেই আবাহন সেই দেঅ বিসর্জন
এই হইল জগতের সুচির প্রবাদ।
কহ তবে ইথে মোর কিবা অপরাধ।

এখানে কৃষ্ণসেন, পত্রাঙ্ক ৯৪।২, ৯৫।১

[উদঅসেন চণ্ডীদাস প্রভুর অন্তর্দ্ধান কাল ও তাঁহার পুঁথি সেস করিবার সময় এই রকম ভাবে লিখিত করিআছেন।

হিমাংসুনেত্রপক্ষস্রুতিভির্যুতে সকে জেনান্তর্হিতঃ।
ইন্দুসরাব্ধিবানে যুতে বা সকে পুনশ্চ কবিকল্পনআ।
ভবিষ্যতান্তর্ধানস্তুদেবম সম্ভাব্য পাপাদভিসপ্তোহম।

উদঅসেনের উক্তি

বেদপৃষ্ঠে দিআ বেদ পাই জত রাসি।
তত বর্ষ ছিলা প্রভু হইআ প্রবাসী।
রচিলাম আমি তাঁর জতটুকু লিলা।
সমুদ্রের সনে জথা গোষ্পদের তুলা।
আদ্যলিলা পাই হেতা জমাদার ঘরে।
মধ্যলিলা পাই গিআ' বনবিষ্ণুপুরে।
ততপর জাই আমি বাজীপৃষ্ঠে চড়ি।
ইতস্ততঃ করি সেস পাণ্ডুআ নগরী।
জেইখানে জেই সব পেএছি নিসান।
প্রানপন করি তার করেছি সন্ধান।
পাইআছি তাতে তার জতটুকু তথি।
লীলাচল তুলনায় সর্সপ জেমতি।
মল্লরাজপেতা কয় প্রভু আসে ফিরে।
বিআলিস বর্সগতে বনবিষ্ণুপুরে।

২৫) মল্লেশ্বর গোপাল-সিংহের (ইং ১৭৮২- ৭৯৮ সাল) মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র চৈতন্ত-সিংহ রাজা হ'ন। অপর পৌত্র দামোদর-সিংহ বিদ্রোহী হ'ন। জামকুড়ি গ্রামে এঁর বংশধরেরা বাস ক'রছেন। তাঁরা বলেন, দামোদর-সিংহই জামকুড়ির বন কাটিয়ে প্রথম বাস করেন। বোধ হয় দুই শত বৎসর পূর্বের কথা জানেন না।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

দেবদাসী

শ্রীপ্রভাসনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

বরসেক থাকি প্রভু ততপর হেতাঅ।
বিষ্ণুপুর ছাড়ি তবে জান ছত্রিনাঅ॥
না আসেন ফিরি আর মল্লপুরে কভু।
করিলেন দেহরক্ষা গিঞা তথা প্রভু॥
তদ্রূপ ভাসাজ এবে করি অনুবাদ।
রচিলা বিবিধ ছন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ॥২৬

তাঁরা ভোরবেলায় যুবরাজপুরে এসে পুরঞ্জনকে ডেকে তুললেন। চণ্ডীদাসের মাথায় জটা।

চণ্ডীদাস॥ বৎস, তোমার জননী কোথায়?

পুরঞ্জন॥ (সজল নয়নে) তিনি চিতারোহণে বহুকাল গত।

চণ্ডী॥ (মর্মাহত) কতদিন তোমার পিতা পরলোক-গত?

পুর॥ তিনি খুল্লতাত-সহ চল্লিশ বৎসর দেহ রেখেছেন। পূজ্যপাদ পিতার কি মাতার চরণ দেখেছি বলে' স্মরণ হয় না।

চণ্ডী॥ তা হ'লে শৈশবের কালে কে তোমাকে স্নেহ দিয়ে পেলেছেন?

পুর॥ (কৃতাঞ্জলি পুটে) কি কারণ ওসব কথা জিজ্ঞাসা ক'রছেন? আপনি কে হন, আগে বলুন।

চণ্ডী॥ আমার নাম চণ্ডীদাস। এই ছত্রিনায় আমার নিবাস ছিল। জরাজীর্ণ দেহে যতদিন প্রাণ রইবে, তোমার গৃহে থাকব বলে' এসেছি।

পুরঞ্জনের স্ত্রী করুণা ফণিনীর মত গর্জে'

মর মর ভণ্ড বুড়া একি বলে গো মা।
সঙ্গে আছে রাড়ী এক লজ্জা নাহি করে।
তারে লইঞা থাকিতে এ গৃহস্তের ঘরে।

সে রেগে ঠাকুরাণীকে ডাকতে গেল।

চণ্ডী॥ পুরঞ্জন, তবে কি আমি অন্যত্র গমন ক'রব?

পুর॥ কিন্তু এই গ্রামে বহুজন আছেন। কি কারণে আমার ঘরে এসেছেন?

চণ্ডী॥ তোর বংশে চণ্ডীদাস ছিলেন, কখনও সে কথা শোননি কি?

পুর॥ সেই নামে আমার খুল্লতাত ছিলেন। তিনি বহুকাল পরলোকগত। তাঁকে রাজদ্রোহী সন্দেহ করে' বাঙ্গলার বাদসাহ চোরাঘাতে হত্যা করে'ছেন।

চণ্ডী॥ (হাসিয়া) আমি সেই চণ্ডীদাস।

রাসমনি॥ আমি সেই রামী।

পুর॥ আমি সে কথা সত্য মানতে পারি না। সিকন্দর চণ্ডীর প্রাণহানি করে' রামীনীকে অঙ্কলক্ষ্মী করে'ছেন। তোমাদের মুখে আজ এই কথা শুনে আমার ভক্তির হানি হ'চ্ছে।

চণ্ডী॥ যদি আমি ভণ্ড চণ্ডীদাস, তবে আমাকে তোমার ঘরে রেখে কেন পূজবে?

পুর॥ পক্ষীরাজ চেনা বড় দায়। কিন্তু তার সেবাগুণে রাজা হওয়া যায়। সেই ভেবে যত পাখী আছে আমি সকলেরই সেবা ক'রব। আমি জানি, পক্ষীরাজ নিশ্চয়ই একদিন আসবে।

চণ্ডীদাসের চক্ষে পুলকাশ্রু বইল। তিনি পুরঞ্জনকে বুকে জড়িয়ে ধ'রলেন। ব'ললেন, সকলে তোর তুল্য হ'লে সন্ন্যাসে কি কাজ? আমি বিশ্ব ঘুরে যার আভাস পাই না, তুই ঘরে বসে' সে কথা জানলি!

রামী॥ আমি রজকের মেয়ে; আমাকে কেমনে তুমি তোমার ঘরে রাখবে?

পুর॥ যথা প্রভু তথা জগন্নাথ। সেথা জাতির বিচার নাই।

ইতিমধ্যে করুণা রোহিণীকে ডেকে এনেছে। রোহিণী চিনতে পারলে। আচম্বিতে উচ্চ রোল উঠল, চণ্ডীদাস ছত্রিনায় ফিরে এসেছেন। যুবকেরা বলে, চণ্ডীদাস কে? বয়োবৃদ্ধেরা উপহাস করে। প্রৌঢ়েরা বলে, দেখি নাই তবে নাম শুনেছি। রাধাকৃষ্ণের লীলা-গীত তাঁরই রচনা। পরে দলে দলে এসে চণ্ডীদাসের চরণে প্রণাম ক'রতে লাগল। হাজার হাজার লোক নিত্য আসে যায়। হামীর-উত্তর-রায় প্রভুর কাছে এসে অহর্নিশি তত্ত্বকথা শোনেন।

একদিন রাসমনি হেসে ব'ললে "পরশু অমৃতযোগ, শুভ

---

২৬) হিমাংশু=১, নেত্র=৩, পক্ষ=২, শ্রুতি=৪, ১৩২৪ শকে চণ্ডীদাসের অন্তর্ধান। কবিকল্পনায় ইন্দু=১, সর=৫, অব্ধি=৭, বাণ=৫,—১৫৭৫ শকে পুনশ্চ অন্তর্ধান। 'সর-তুলি' শরের কলম সরে, চলে। চণ্ডীদাস ৪৪ বর্ষ প্রবাসী ছিলেন। ৫২ বর্ষ গতে বনবিষ্ণুপুরে ফিরে আসেন। মল্লরাজপেতায় এইরূপ লেখা ছিল। মল্লরাজপেতা আছে কিনা, সন্দেহ। চৈতন্য-সিংহ ও দামোদর-সিংহের বিরোধের সময়ে যে যা পেয়েছে সরিয়েছে। হয়ত অগ্নিমুখে ও সারকুড়ে পড়ে'ছে। উদয়-সেন বাজীপৃষ্ঠে ঘুরেছিলেন। ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে অনেকের ঘোড়া থাকত। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র-সেন বলেন, তাঁর পিতারও ঘোড়া ছিল।

একাদশী, ভাস্কর উত্তর গগনে চলে'ছেন, আর অকারণে জীর্ণ দেহ বহা কেন ?'[২৭]

চণ্ডীদাস ॥ তুমি আমার সাধন-সঙ্গিনী ; তুমি কোথায় থাকবে ?

রামী ॥ তুমি যথা আমিও তথা।

চণ্ডীদাস ॥ তবে আয়োজন কর। আমি কাল সূর্য্যোদয় হ'তে মৌনী হব। কথা কইব না, অন্ন জল ছুঁব না। পুরঞ্জনকে বল,

দগ্ধ না করএ সব জেন চিতানলে।
নান্নুরের মাঠে রাখে মৃত্তিকার তলে।
তারি পাসে তোরে জেন করএে স্থাপন।
অহোরাত্র করে জেন হরিসঙ্কির্ত্তন।

(৫) পর্যালোচন

"চণ্ডীদাসচরিত" আখ্যান নয়, দৃষ্ট নয়,—ইহা উপাখ্যান, শ্রুত। চরিতটি লোকপরম্পরাগত, ইতিহ-মূলক ; অতএব ঐতিহাসিক। ইহার সবই কবি-কল্পিত নয় ; চণ্ডীদাস নয়, বাসলী নয়, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে চণ্ডীদাসের গীত-রচনাও নয় ; অতএব ইহা আখ্যায়িকা। উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা হ'তে ইতবৃত্ত উদ্ধার কঠিন। তথাপি যে কথা মানব-প্রকৃতির বিরোধী নয়, দেশ ও কালের বিরোধী নয়, যে কথা একাধিক লোক বলে'ছেন, বিশেষতঃ তাঁর দেশের লোক বলে'ছেন, সে কথা সত্য মানতে হয়। এই রকমে মহাভারত ইতিহাস। আমরা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, ভীষ্ম দ্রোণাদির চরিত সত্য মনে করি।

(১) উদয়সেনের পুথী হ'তে চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাল পাচ্ছি। তিনি ১২৪৬ শকের চৈত্র মাসে (ইং ১৩২৫ সালে) জন্মগ্রহণ করে'ছিলেন, এবং ১৩২৪ শকের মাঘমাসে (ইং ১৪০৩ সালে) ছত্রিনার নান্নুর বা নান্নুরের মাঠে ৭৮ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করে'ছিলেন। এই বয়স অসম্ভব নয়। উদয়-সেন চণ্ডীদাসের জন্মশক লেখেন নি, কত বয়সে চণ্ডীদাসের অন্তর্ধান, তা হিসাব করেন নি। কোন্ শকে তিনি পাণ্ডুআ গেছলেন, কোন্ শকে নিষ্ঠুর রাজা কিসেন-গোপালের মৃত্যু হয়, তাও মিলিয়ে দেখেন নি, তথাপি ইতবৃত্তীয় কালের সহিত ঐক্য আছে। জনশ্রুতি কেমনে মিথ্যা বলি।

কবি লিখেছেন, কেন্দুলীতে রামী চণ্ডীদাসকে বলে'ছিল, "ভাঙ্গিতে ভবের খেলা বেশী দেরি নাই।" এতে পাওয়া যায়, চণ্ডীদাস বৃদ্ধ বয়সে কেন্দুলী এসেছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুআ-যাত্রা ৩৪ বৎসর বয়সে হয়েছিল। উদয়-সেন ইচ্ছা ক'রলে এই বিসম্বাদ রাখতেন না। অতএব বুঝছি, তিনি যেখানে যেমন শুনেছিলেন, তেমনই লিখেছিলেন। তিনি পৌরাণিকের চিরপ্রসিদ্ধ রীতি মেনে চলে'ছিলেন।

(ক) ১৩২৪ শকে চণ্ডীদাসের অন্তর্ধান, এইরূপ জনশ্রুতি বহুকাল হ'তে চলে' আসছিল। ১৪০৭ শকে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। অতএব চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ৮৩ বৎসর পূর্বে অন্তহিত হ'য়েছিলেন। হারাধন-ভক্তিনিধিও এই কথা কোথাও পেয়েছিলেন, সেই মত লিখেছিলেন।

(খ) একটা ছড়ায় আছে,

বিধুর নিকটে বসি নেত্রপঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ।

ইহার অর্থ ১৩২৫ শকে চণ্ডীদাসের গীতসমাপ্তিকাল। অর্থাৎ এই শকে চণ্ডীদাস ইহলোকে ছিলেন না। যখন এই ছড়া রচিত হ'য়েছিল, তখন লোকে শুনেছিল চণ্ডীদাস ৬৯৯টি গীত বেঁধেছিলেন।

(গ) দেবীদাস ও চণ্ডীদাস, নিরঞ্জন-মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ছিলেন। উদয়-সেনের পুথীতে পাচ্ছি, দেবীদাসের পুত্রের নাম পুরঞ্জন ছিল। ১৩২৪ শকে পুরঞ্জনের বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। সংস্কৃত "বাসলীমাহাত্ম্যে" পাচ্ছি, ১৩৮৭ শকে পদ্মলোচন সে পুথী লিখেছিলেন। এখন দেখছি, পদ্মলোচন পুরঞ্জনের পুত্র এবং দেবীদাসের পৌত্র। ১৩২৪ শকে পদ্মলোচনের জন্ম হয় নাই। যদি ১৩২৭ শকে জন্ম হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তিনি ৬০ বৎসর বয়সে "বাসলী-মাহাত্ম্য" লিখেছিলেন। ইহাও অসম্ভব নয়। অতএব ১৩২৪ শকে চণ্ডীদাসের দেহরক্ষায় অবিশ্বাসের কোন হেতুই পাচ্ছি না।

এই পুথীতে আরও পাচ্ছি, ১৩২৪ শকে ছাতনার রাজা হামীর-উত্তর জীবিত ছিলেন। বোধ হয় তিনি বয়সে

২৭) চণ্ডীদাস একাদশীর দিন প্রাতঃকালে মহানিদ্রায় অচেতন হন। তখন সৌর মাঘ মাস। মাঘ মাসে সোম, বুধ, শুক্র, এই তিন বারে প্রথম ৪ দণ্ড অমৃতযোগ। দেখছি, ১৩২৪ শকে পৌষ-শুক্ল-চতুর্দশীতে মাঘ-সংক্রমণ এবং মাঘ মাসের শেষদিকে মাঘ-শুক্ল-একাদশী বুধবারে হয়েছিল। এই ঐক্য আকস্মিক হ'তে পারে, তথাপি চিন্তনীয়।

চণ্ডীদাস অপেক্ষা দশ বার বৎসরের ছোট ছিলেন। ছাতনার সামন্ত রাজবংশের কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস কিম্বা কাগজ পত্র নাই। শ্রীযুত মহেন্দ্র-সেন রাজ-লতা দিয়াছেন, কিন্তু রাজাদের রাজত্বকাল দিতে পারেন নি। তথাপি রাজ-পরম্পরায় হামীর-উত্তর অতি প্রাচীন রাজা। চণ্ডীদাস আর রাজা হামীর-উত্তর, এই দুই নাম গাঁথা আছে, একটি খ'সলে অপরটিও খ'সবে। ওমালী সাহেব বাঁকুড়া জেলার বিবরণে আর একরকম লিখেছেন, কিন্তু তাঁর লিখন বেদবাক্য নয়। ছাতনার বাসলীর আদি থানের প্রাচীরের ইটে ১৪৭৫ শক লেখা আছে। কিন্তু সে শক ইট-গড়ার, এইটুকু ব'লতে পারি। ইং ১৮৭২-৭৩ সালে বেগলার সাহেব ইটে চতুর্বিধ লেখ দেখেছিলেন। আমরা তিন রকম দেখেছিলাম। বেগলার সাহেব সব লেখ প'ড়তে পারেন নাই। আমরাও একটা লেখ পারি নাই। অপঠিত লেখে কি ছিল, তা না জানলে কেবল শক দেখে কিছুই ব'লতে পারা যায় না।

(২) সিকন্দর-সাহ চণ্ডীদাসকে হত্যার নিমিত্ত সৈন্যদ্বারা পাণ্ডুআয় ধরে' নিয়ে গেছলেন। অবিকল এইরূপ ঘটনা ভারতবর্ষের ইতবৃত্তে আছে। ইং ১৪৯৯ হ'তে ১৫০৩ সালের মধ্যে এক সময়ে দিল্লীর সিকন্দর-লোদী জৌনপুর হ'তে সম্ভল নামক স্থানে যেয়ে এক ধর্মসভা আহ্বান করেন। বিহারনিবাসী এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, নাম লোধন, প্রচার ক'রছিলেন মুসলমানধর্ম ও হিন্দুধর্ম দুই-ই সত্য। ব্রাহ্মণকে সেই ধর্মসভায় আনা হয়। মুসলমান উলেমারা বলেন, যদি দুই ধর্মই সত্য, তবে ব্রাহ্মণ মুসলমানধর্ম গ্রহণ করুক। ব্রাহ্মণ অস্বীকার ক'রলে তার প্রাণদণ্ড হয়*। চণ্ডীদাসের প্রাণদণ্ড হয় নাই। পরন্তু তিনি সিকন্দর-সাহকে হিন্দুর প্রতি ক্ষমাশীল ক'রতে পেরেছিলেন। তিনি এক তান্ত্রিককে, বিষ্ণুপুরের দুর্দান্ত রাজা কিসেন-গোপালকে, আরও অনেককে হরিভক্ত করে'ছিলেন। অতএব তিনি পাষণ্ডদলন করে'ছিলেন, এই যে একটা কথা আছে, সেটায় অবিশ্বাসের হেতু নাই। সন্দেহের মধ্যে তাঁর ভ্রাতুষ্পৌত্র পদ্মলোচন এ বিষয়ে কিছু লেখেন নাই।

(৩) "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" দেখছি, চণ্ডীদাস বাসলীর আদেশে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-গীতি গেয়েছিলেন। ইহা এক আশ্চর্য্য আদেশ; বাসলীদেবী বাসলী-মঙ্গল গাইতে ব'ললে আমরা বুঝতে পারতাম। কিন্তু এই আশ্চর্য্য আদেশ মিথ্যা ব'লতে পারি না। কারণ, চণ্ডীদাস নিজে বলে'ছেন এবং রাধা-কৃষ্ণের গীত গেয়েছেন। রাধা, কৃষ্ণের পরিণীতা নয়, পরকীয়া। বাসলীর আদেশ যে আরও অদ্ভুত। তিনি পরকীয়া-প্রীতি গাইতে আদেশ ক'রলেন! এর হেতু আমরা বুঝি না বুঝি, চণ্ডীদাসকে সে প্রীতি অবশ্য অনুভব ক'রতে হয়েছিল। অতএব চণ্ডীদাস-চরিতে রামীর প্রবেশ অসঙ্গত নয়।

কৃষ্ণসেনের পুথীতে দেখছি, রামী চণ্ডীদাসকে প্রেমমন্ত্র দিয়েছিল। চণ্ডীদাস সে মন্ত্র জ'পতে জ'পতে পাগল হ'য়ে গেছলেন। রাজা ও ব্রাহ্মণসমাজ রামীকে গ্রাম হ'তে তাড়িয়ে দিয়ে ভালই করে'ছিলেন। কুদৃষ্টান্ত সমাজের অহিতকর। পরে চণ্ডীদাসকে দণ্ড দেওয়া অন্যায় হয় নাই। তিনি গ্রাম হ'তে পালিয়ে গেছলেন। তথাপি চণ্ডীদাস রামীকে ভুলতে পারেন নাই। তীর্থভ্রমণ দ্বারাও মনের শান্তি পান নাই। দেশে ফিরে এসে দেখলেন, হাহাকার, গ্রাম দগ্ধ। রামীরও ঠিকানা পেলেন না। এই বিষাদের সময় বাসলী প্রবোধ দিলেন। ফল হ'ল না। পুথীর ১১।১২র পাতায় শূন্যভারতী ও বাসলীর উক্তিতে চণ্ডীদাস যে প্রত্যুক্তি করে'ছিলেন, তাতে চণ্ডীদাসের মনের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে। সে দীর্ঘ প্রবোধন এখানে তুলবার স্থান নাই। সব বুঝতেও পারলাম না। একটু তুলি।

শূন্যভারতি।

> এইবার তুমি বল দেখি সখা সত্য মরম কথা।
> প্রানের ভিতর পরান মানিক খুজতে গেছলে কোথা।
> আলোক আঁধারে ঘুরি ফিরি সখা কোনটি দেখিলে ভাল।
> কোনটি ধবল রক্তিম বল কোনটি দেখিলে কাল।
> ধরনীর গতি উজান বাহিআ পলাএে ছিলে তা জানি।
> ধরিআছি চোর পড়িআছি ধরা কেমন চতুরা আমি।
>
> বাষো বলিতে মানুস বুঝাজ ছাগো বলিতে তাই।
> আকাস পাতাল সকলি মানুস তা ছাড়া কিছু ত নাই।

* * *

* *Cambridge History of India*, vol. III, p. 240. শ্রীযুত নলিনীকান্ত-ভট্টশালী মূল পুথী হ'তে ব্রাহ্মণের নাম 'লোধন' ও নিবাস 'কনের' গ্রাম জানিয়েছেন।

সেই সে মানুস করি লও আপন তুমি কে বুঝিবা তবে।
কুকুর ঠাকুর বিচার বিধান সকলি চলিজা জাবে॥

বাসলীও অনেক বুঝালেন। তার পর ব'ললেন,

ওই হের বাছা ঘুঘুনিআ গিরি মনিমনোহর স্থান।
তথা রহে এক সিদ্ধ অবধুত আনন্দ তার নাম।
দিক্ষা জদি চাও জাই তার পাসে সদা আজ্ঞাধিন রবে।
মাআয় জিনিবে আপনা চিনিবে বাসনা পুরিবে তবে॥

চণ্ডীদাস। এ হেন আদেশ কেন মা দাসের প্রতি।
অমর করিতে গরলের বিধি দেন নিজে নিসাপতি॥
জাঅ জাঅ প্রান পিপাসাঅ জার সে জন কেমন করিআ।
মরুভূমে মাগো করে ছুটাছুটি মুরলার * করে ধরিআ॥
দিবস রজনী ভ্রমি জবে আমি তুমার আচল ধরিআ।
কে এমন সিবে মোরে দিক্ষা দিবে হৃদএর বাঁধ ভাঁঙ্গিআ॥
ইত্যাদি

লোকে এত কথা জানত না। কে বা হাটে বসে' তপস্যা করে? কে বা ঢাকঢোল পিটিয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করে? তারা দেখত, রামীর সাথে চণ্ডীদাস ফিরছেন, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম গান ক'রছেন। ফলে রামী-চণ্ডীদাস-সংসর্গ মুখে মুখে প্রচারিত হ'য়েছিল। এই সম্বন্ধে অনেক পুথীও লেখা হয়েছিল। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চম ভাগে "চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী" নামে দুখানা পুথী মুদ্রিত হয়েছে। একখানা বিষ্ণুপুর হ'তে দশ ক্রোশ দক্ষিণে কোতলপুরে ১০০৯ সালে লিখিত। সে ত ৩৩৩ বৎসর পূর্বের পুথী। উদয়-সেনের ৫০ বৎসর পূর্বের পুথী। আর এক খানার শব্দ দেখলে এইরূপ পুরাতন মনে হয়। তাতে আছে, রজকীসঙ্গতি-হেতু চণ্ডীদাস জাতি হারিয়েছেন। ভাই নকুল প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন ক'রছেন। কবি সে সুযোগে পরকীয়া প্রীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে'ছেন। বিষ্ণুপুরে "রামী-চণ্ডীদাস" নামে এক পুথী ছিল। পুথীর এই নামটি মাত্র পেয়েছি। চণ্ডীদাসের নামে "রাগাত্মিক" পদ প্রচলিত ছিল। কতকগুলা ছাপাও হয়েছে। 'রাগ' অর্থে অনুরাগ। এখানে বিশেষার্থ পরকীয়া প্রীতি।

প্রবৃত্তিমার্গ সুখাবহ, কা-কেও দেখাতে হয় না, কোনও 'ধ্যানে'র প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কিছুকাল গতে অন্তর্য্যামী প্রমত্তকে সংযত হ'তে বলেন। তখন সে অপদেশ দ্বারা দোষমার্জনা ক'রতে বসে। না পারলে গুরুপদ ভরসা করে, কেহ বা সংসার-বিরাগী হয়। চণ্ডীদাস-

* মুরলা গঙ্গা।

চণ্ডিদাসচরিতামৃতখ

"চণ্ডীদাসচরিতামৃত" পুথীর একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।

চরিতে এই ক্রম স্পষ্ট। উদয়-সেনের চণ্ডীদাস জগৎ ব্রহ্মময় আনন্দময় দেখতেন। তাঁর "মানুষ" পরম পুরুষ। কৃষ্ণকীর্ত্তনে দেখি, তিনি পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণকে ভক্তি ক'রতেন না। একটা মত ছিল, শক্তি পূজা ব্যতিরেকে বিষ্ণুভক্তির উদয় হয় না। বিষ্ণুভক্তি আর রাধাকৃষ্ণভক্তি এক নয়। এই তত্ত্ব কৃষ্ণসেনের পুথীতে অনেক স্থানে কীর্তিত হয়েছে।

আরও দেখতে পাই, চণ্ডীদাস তাঁর প্রায় ৩০ বৎসর বয়সের পরে নূতন গান বাঁধেন নাই। বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাতের সময় তাঁর বয়স ৩৪ বৎসর। তখন বিদ্যাপতি বলে'ছিলেন,

আর কেন সখা বাজে না সে বাঁসী নব নব রাগে মাতিআ।
আর কেন সখা না পিআও মোরে নূতন চাঁদের অমিআ॥

(৬) চণ্ডীদাসের নিবাস।

"পর্য্যালোচনে" চণ্ডীদাসের কাল পাওয়া গেছে। তাঁর নিবাস কোথায় ছিল? কৃষ্ণসেন ছাতনার যুবরাজপুরের পুরাতন নাম দুই স্থানে মুনুআ বা মুনুর, তিন স্থানে নান্নুর, ও এক স্থানে নান্নূর লিখেছেন। ছাতনায় মুনুর বা নান্নুর মাঠ, এই নাম এখনও আছে। কিন্তু বীরভূমেও নান্নুর নামে গ্রাম আছে। কেহ কেহ আদি ও বড়ু চণ্ডীদাসকে ও তাঁর শিষ্য দ্বিজ চণ্ডীদাসকে বীরভূম নান্নুরবাসী মনে করে' সংশয়ে রয়েছেন। বীরভূমের ও বাঁকুড়ার পক্ষে যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, সে সব বিচার ক'রলে তাঁদের সংশয় দূর হ'তে পারে। এই বিবেচনায় এখানে দুই পক্ষের তর্ক উপস্থিত ক'রছি। 'বীর' বীরভূম, 'বাঁকু' বাঁকুড়া।

বীর॥ আদি বড়ু চণ্ডীদাসের নিবাস বীরভূম নান্নুরে ছিল। যেহেতু কবি লিখেছেন,

বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে

আর,

নান্নুরের মাঠে হাটের নিকটে
বাশুলী বসয়ে যথা।

এখানে কবি নির্জ্জন স্থানে পর্ণকুটীরে থাকতেন। সারা বাঙ্গলা দেশে বীরভূম ছাড়া আর কোথাও নান্নুর নাই।

বাঁকু॥ বীরভূমে নান্নূর নামে গ্রাম কোথায়? পুথীতে নান্নূর আছে।

বীর॥ নান্নূর নামে গ্রাম নাই, নান্নুর আছে। যে নান্নূর, সেই নান্নুর। নান্নুর নাম পুরাতন।

বাঁকু॥ নান্নূর ও নান্নুর এক হ'তে পারে। কিন্তু পুথীর পাঠ পরিবর্ত্তন উচিত নয়। কিন্তু পুথীতে আরও আছে,

শালতোড়া গ্রাম অতি পীঠস্থান
নিত্যার আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা॥
নিত্যার আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নূর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে॥

এই সকল পদ হ'তে পাচ্ছি, (১) চণ্ডীদাস নান্নূর গ্রামে থাকতেন; (২) সে গ্রামে বাশুলী ছিলেন; (৩) সে বাশুলী নিত্যার সহচরী; (৪) শালতোড়া গ্রামে নিত্যার আলয় ছিল। এখন বল, তোমার নান্নুরে এই সব আছেন কি?

বীর॥ নান্নুরে বিশালাক্ষী আছেন। আর, যিনি বিশালাক্ষী তিনিই বাশুলী। নিকটে নিত্যার আলয় শালতোড়া গ্রাম নাই। সে গ্রাম বাঁকুড়া জেলায় আছে। ঋজু রেখায় নান্নুর হ'তে বিশ ক্রোশ বটে, কিন্তু দেবদেবীর পক্ষে দশ ক্রোশ আর বিশ ক্রোশ একই।

বাঁকু॥ নান্নুরে বিশালাক্ষীই বা কই? যিনি আছেন তিনি চতুর্ভুজা সরস্বতী। তিনি বৌদ্ধতন্ত্রের ও শাক্ততন্ত্রের পূজিতা শক্তি বটেন। কিন্তু বাসলী নহেন। সরস্বতী, বিশালাক্ষী ও বাসলী তিনের রূপ সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁদের ধ্যানমন্ত্রে তাঁদের রূপ বর্ণিত আছে। ("ধর্ম্মপূজা বিধান" দেখ)। সরস্বতী ও বাসলী যে এক, তার প্রমাণ কই?

বীর॥ সরস্বতীর এক নাম বাগীশ্বরী। 'বাগীশ্বরী' শব্দের 'গ' লোপে বাঈশ্বরী, বাশুলী হ'তে পারে। এই ভাষাতত্ত্ব প্রমাণ।

বাঁকু॥ এ যে আশ্চর্য্য কথা। 'হ'তে পারে' আর 'হয়েছে', এক কথা কি? তত্ত্ব অর্থে স্বরূপ। ভাষাতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি স্বরূপ-বর্ণন। যা হয়েছে তার বর্ণন। কি হ'তে পারত, তা বলবার সাধ্য নাই। বাগীশ্বরী শব্দ হ'তে বাসলী নামের উৎপত্তি-কল্পনাও নূতন। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধ 'বজ্রেশ্বরী' বাসলী নাম পেয়েছেন। ভাষাতত্ত্বও এর বিরোধী নয়। 'বজ্রেশ্বরী' শব্দের 'জ' লোপে বাসলী, বাসেলী হ'তে পারে। ওড়িয়াতে বাসেলী নাম প্রচলিত।

বৌদ্ধ দেব দেবী সম্বন্ধে পূজনীয় হরপ্রসাদ-শাস্ত্রী প্রাজ্ঞ ছিলেন। তিনি বাসলীকে বজ্রেশ্বরী মনে ক'রতেন।

বীর॥ আমরা বীণাপাণি মূর্তিকেই বিশালাক্ষী ও বাশুলী নামে শুনে আসছি।

বাঁকু॥ কতদিন হ'তে? এখনও ৫০ বৎসর হয় নাই। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মূর্তিটি পাওয়া গেছল। তার দু-চারি বছর পরে ১৩২৯ সালে মন্দির নির্মিত হয়েছে। (শ্রীযুত করালীকিঙ্কর-সিংহ-প্রণীত "চণ্ডীদাস", ১৩২৭)

বীর॥ লোকে বলে বিশালাক্ষীর পুরাতন মন্দির ভেঙ্গে পড়ে'ছিল। বর্ত্তমান মন্দিরের কাছে একটা বড় টিপিও আছে।

বাঁকু॥ বীরভূমে বিদ্যোৎসাহী সাহিত্য-রসিক ধনবান্ জমিদার আছেন। তাঁরা অক্লেশে সেই টিপি খুঁড়িয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রতে পারেন। বিশালাক্ষীর প্রতিমাও বেরিয়ে প'ড়তে পারে। যদি না পাওয়া যায়, নান্নুরের অপরিহার্য বাশুলী দেবীরও সাক্ষ্যের অভাব ঘ'টবে। বীরভূম বাসলীর দেশ নয়। বাসলী আর বিশালাক্ষী, দুই পৃথক দেবী।

বীর॥ তরুণীরমণ নামে এক পদকর্ত্তা ৩০০ বৎসর পূর্বে ছিলেন। তিনি কি লিখেছেন, শুন।

> নাম্বুড় গ্রামেতে বাশুলীর ঈশান কোণেতে।
> চণ্ডীদাসের বাসাঘর আছয়ে সেথাতে।

আমরা নান্নুর বলি, অশিক্ষিতেরা নান্বুড় বা নাদুর বলে। নান্নুর, নাদুড়,—লিপিকরপ্রমাদ।

বাঁকু॥ গ্রামের নামে প্রমাদ কেন ঘটে? যে পুথীতে ঐ কথা আছে তার বয়স নাকি ১০০ বৎসর (১৩৩৫ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা)। পুথীর ভাষাও পুরাতন নয়। এই পুথীতে বাশুলীর উক্তি আছে, আর আছে চণ্ডীদাস এক রাজার প্রিয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রামী রজকিনীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রীতি দেখে আকুল হ'য়ে নকুলঠাকুরকে চণ্ডীদাসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। অতএব নাদুড়ে বাসলী ছিলেন, সেখানে চণ্ডীদাস এক রাজার প্রিয় পণ্ডিত ছিলেন, আর, নকুল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সম্পর্কে চণ্ডীদাসের ভাই হ'তেন। নাদুড় গ্রামের কোন্ রাজা চণ্ডীদাসকে জাতে তুলতে বসে'ছিলেন?

বীর॥ পাঁচ-ছ শ বৎসরের কথা, এখন কি আর রাজার নাম জানা আছে? নান্নুর গ্রামে রাজা অবশ্য ছিলেন।

বাঁকু॥ রাজা অবশ্য ছিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাস সামান্য কবি ছিলেন না। তাঁর প্রতিপালক রাজার নাম লোকে সহজে ভুলে যেত কি?

বীর॥ যে জনশ্রুতি আবহমান কাল চলে' আসছে, সেটা মিথ্যা? নান্নুরে চণ্ডীদাসের ভিটা আছে, রামীর ভিটা আছে, ধোপাপুকুর আছে। এ সব মিথ্যা?

বাঁকু॥ চণ্ডীদাস ও রামী পর্ণকুটীরে থাকতেন। পাকা কোঠাঘরে থাকতেন না। ভিটা কেমনে আসে? জনশ্রুতি কত বৎসরের? ছ শ বৎসর পূর্বে আর কোথাও কি কোন গ্রামের নাম নান্নুর বা নান্নুর ছিল না? যে গ্রামে বিশালাক্ষী নয়, বাসলী ছিলেন; নিকটে নিত্যার আলয় শালতড়া গ্রাম ছিল; যে বাসলী-নগরের রাজা চণ্ডীদাসের নিমিত্ত আকুল হয়েছিলেন? যখন এতগুলা বিশেষণ আছে তখন সে গ্রাম বীর করা অসাধ্য নয়।

বীর॥ সে গ্রাম কোথায়? তোমার ছাতনা বুঝি? আমরা এ নাম কেউ শুনি নি। বছর দশেক হ'তে শুনছি। ছাতনা দেখেছি। বাঁকুরে জঙ্গলে দেশ। সে দেশে বাঘ ভালুক থাকতে পারে, অমর কবি চণ্ডীদাসের জন্ম অসম্ভব।*

বাঁকু॥ সত্য। সেদেশে বার্ত্তাবহ নাই, চণ্ডীদাসের স্মৃতিমন্দিরও নাই। কিন্তু সেখানে যতকাল বাসলী দেবী অধিষ্ঠিত থাকবেন, ততকাল তাঁর বড়ুর নাম থাকবে, বড়ুর প্রতিপালক রাজার নামও থাকবে। পূর্বকালে ছাতনায় এক নাম বাহুল্যা (বাহুলিয়া), অর্থাৎ বাসলীনগর ছিল। বাসলী, সামন্তভূমের অধিষ্ঠাত্রী। ছাতনা হ'তে পাঁচ ক্রোশ পূর্ব-দক্ষিণে শালতড়া গ্রাম আছে। সেখানে বাসলীর সহচরী নিত্যার আলয় আছে। সহচরীর আলয় বিশ ক্রোশ দূরে হয় কি? কিন্তু এখন ছাতনায় নান্নুর বা নান্নুর নামে গ্রাম নাই। ২৮২ বৎসর পূর্ব্বে উদয়-সেন লিখেছেন, বর্ত্তমান যুবরাজপুরের পুরাতন নাম নান্নুর ছিল। দ্বিজ চণ্ডীদাস ও অন্যান্য কবিও সে নাম শুনেছিলেন। এঁরা গ্রামের নাম নান্নুর কি নান্নুর ঠিক জানতেন না। ছাতনায় এই

* আমি বাল্যকালে (৯।১০ বৎসর বয়সে) বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে বাঁকুড়া জেলা সম্বন্ধে একটি পদ্য রচনা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলাম। তাহাতে চণ্ডীদাসকে বাঁকুড়ার গৌরব বলিয়া লিখিয়াছিলাম। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে স্কুলের ছাত্ররূপে একটি ইংরেজী রচনায় বঙ্গের চসার (Chaucer) চণ্ডীদাস বাঁকুড়া জেলায় জন্মিয়াছিলেন লিখিয়াছিলাম।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

নামের গ্রাম না পেলেও বড়ু চণ্ডীদাসের নিবাস খুঁজতে ছাতনায় আসতে হ'ত। অবধান কর,—

(১) কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা এই দেশের। (এই বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ম, ২য় সংখ্যা)।

(২) ছাতনার বাসলী সামন্তরাজ-বংশের কুলদেবী হ'লেও গ্রামদেবী।

(৩) বাসলীর ধ্যানের সহিত এই বাসলী-প্রতিমার ঐক্য আছে, এবং সে ধ্যানে এঁর নিত্য পূজা হ'চ্ছে।

(৪) যাঁরা পূজা করেন, তাঁদের পদবী দে-ঘরিয়া। যাঁরা পূজার ও ভোগের যোগাড় ক'রতেন, তাঁদের নাম বড়ু ছিল। এখন বড়ু নাম প্রচলিত নাই। কিন্তু বাঁকুড়া জেলাতেই সে-কেলে দে-ঘরিয়া নাম আছে, অপর জেলায় নাম পূজারী। দ্বিজ চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ, দেয়াসিনী সেজে-ছিলেন। এই নামটিও এই জেলায় প্রচলিত আছে, আর কোথাও নাই।

(৫) বাসলীর দেঘরিয়ারা বলেন, তাঁরা চণ্ডীদাসের অগ্রজ দেবীদাসের বংশ।

(৬) তাঁরা দেবীদাস হ'তে পুরুষ গণে' আসছেন। এখন ২৩ পুরুষ গত হয়েছে। অতএব দেবীদাস প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। এটা আশ্চর্য্য রকমের ঐক্য।

(৭) দেবীদাসের পৌত্র পদ্মলোচন ৪৭০ বৎসর পূর্বে (১৩৮৭ শকে) "বাসলী-মাহাত্ম্য" লিখেছিলেন। তাতে আছে ছাতনার রাজা হামীর-উত্তর দেবীদাসকে বাসলী পূজায় নিযুক্ত করেন। দেবীদাসের অনুজের নাম চণ্ডীদাস। আর, চণ্ডীদাস বড় কবি ছিলেন, "জয়তু স শ্রীচণ্ডীদাসঃ কবিঃ"।

(৮) প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে ছাতনার এক রাজার কবিরাজ উদয়-সেন সংস্কৃত "চণ্ডীচরিতামৃতম্" লিখেছিলেন। তাঁর প্রপৌত্র কৃষ্ণ-সেনের বঙ্গানুবাদ শুনেছ।

(৯) উদয়-সেন "চণ্ডীদাসচরিতে" কয়েকটা উপাখ্যান দিয়েছেন। তেমন উপাখ্যান অন্য কবিও লিখেছিলেন। একটা উপাখ্যানে আছে, যখন চণ্ডীদাস অবন্তীপুরে পাঠশালায় প'ড়তেন, অথবা পাঠশালার গুরুমশায়ি ক'রতেন, তখন রামীর সহিত তাঁর প্রথম মিলন হ'য়েছিল। উপাখ্যান যাই হ'ক, অবন্তীপুর বিষ্ণুপুরের নিকটস্থ এক গ্রাম। এখন লোকে অবন্তিকা বলে।

এই সকল প্রমাণ পরিগ্রহ ক'রলে চণ্ডীদাসের নিবাস যে ছাতনায় ছিল, তাতে সন্দেহ থাকে কি ?

বীর॥ ছাতনানিবাসী রাধানাথ দাস বাসলী-বন্দনা লিখেছেন। তাতে দেবীদাসের ভাই চণ্ডীদাস, এ-কথা ত নাই।

বাঁকু॥ জানি, ছাতনায় রাধানাথ দাস প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে ছিলেন। কৃষ্ণসেনের কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিভা হয়েছিল। তিনি বাসলী-বন্দনা লিখেছেন, চণ্ডীদাস-বন্দনা লেখেন নাই। বাসলী কি করে'ছিলেন সে কথাই লিখেছেন। দেবীদাস বাসলীর পূজা ক'রতেন, বাসলী দেবীদাসকে পিতা বলে'ছিলেন, ইত্যাদি। চণ্ডীদাসের সহিত বাসলীর কোন কথা হয় নাই, চণ্ডীদাসের নামও আসে নাই।

বীর॥ তুমি ব'লছ, দেবীদাস ও চণ্ডীদাস ভরদ্বাজ গোত্রের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু "কৃষ্ণকীর্তনে" চণ্ডীদাস বড়ু, এইটুকু জানি, তিনি কি জাতি ছিলেন তা জানি না।

বাঁকু॥ সংস্কৃত 'বটু' শব্দ হ'তে বড়ু। বটু শব্দের অর্থ বালক, কিশোর, ছোকরা। একা পূজক অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে ঠাকুরের পূজা ও ভোগরাগ ক'রতে পারেন না। ফুল তুলতে, চন্দন ঘ'ষতে, জল আনতে, ভোগের যোগাড় ক'রতে লোকের দরকার হয়। এই সকল লোককে বটু বা বড়ু বলা হ'ত। যেমন, পুরী মন্দিরে বড়ু, ভুবনেশ্বরের স্নান ও পূজার জল বইবার বড়ু আছে। ভুবনেশ্বরের বড়ুরা শূদ্র। "শূন্যপুরাণে" পুষ্পবটু ধর্মে'র পূজার ফুল তুলত। "ধর্ম্মপূজাবিধানে" পুষ্পবটু, পাত্রবটু, ভোগবটু আছে। একস্থানে ভোগবটুর নাম ভোগবড়ু আছে। এঁরা অবশ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কাজ-অনুসারে ব্রাহ্মণ কিংবা অব্রাহ্মণ বটু নিযুক্ত হ'ত। অতএব শুধু "কৃষ্ণকীর্তনে" নির্ভর ক'রলে চ'লবে না। যদি তাই কর, তা হ'লে নান্নুর নামও বাদ দিতে হবে। কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা জানতেন। অতএব ব্রাহ্মণ বলে'ই মনে হয়। বটু শব্দের অর্থ ব্রহ্মচারী আছে। বটু-করণ অর্থে উপনয়ন। যারা ঠাকুরঘরের কাজ ক'রত তাদিকে বড়ু বলা হ'ত। তারা বামুন হ'ত। যে একবার বড়ু হ'য়েছে, সে যুবা ও প্রৌঢ় হ'লেও তার বড়ু উপাধি থাকত। চণ্ডীদাস যুবা বয়সে বড়ু নিযুক্ত হয়েছিলেন, এইরূপ মনে হয়।

বীর ॥ গৌড় ব্রাহ্মণেরা বলেন, চণ্ডীদাস গৌড় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বাঁকু ॥ সন ১৩৪১ সালের আষাঢ় মাসের "গৌড় প্রভা" পত্রিকায় শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর-চক্রবর্ত্তী এই কথা লিখেছিলেন। ব্যাস ব্রাহ্মণদের মধ্যে বোঢ়ু নামে এক গোত্র আছে। এই হ'তে তাঁর কল্পনা, বোঢ়ু চণ্ডীদাস—বড়ু চণ্ডীদাস। তিনি ১৩৩৩ সালের "প্রবাসী"তে "ছাতনায় চণ্ডীদাস" পড়েন নি। বড়ু শব্দ যে বটু শব্দ হ'তে এসেছে, তাতে সন্দেহ নাই। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" 'বোঢ়ু' এই বিশেষণ কুত্রাপি নাই।

বীর ॥ চণ্ডীদাসের নিবাস ছাতনায় ছিল, একথা আট দশ বৎসর মাত্র শুনছি। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক শ্রীযুত বসন্ত-রঞ্জন-রায়ের নিবাস বাঁকুড়া জেলা। তিনি কথাটা বিশ্বাস করেন না।

বাঁকু ॥ কিন্তু ইং ১৮৭২ সালে সরকারী প্রত্নদ্রব্য বিভাগের বেগলার সাহেব ছাতনায় চণ্ডীদাস লিখেছিলেন। "প্রবাসী" সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ-চট্টোপাধ্যায় যখন ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প'ড়তেন, তখন এক ইংরেজী রচনায় বাঁকুড়ার গৌরব বর্ণনায় লিখেছিলেন, যে চণ্ডীদাস বাঙ্গলাসাহিত্যের 'চসার', তিনি ছাতনাবাসী ছিলেন। ১৫ বৎসর পূর্বে ছাতনা ইস্কুলের এক শিক্ষক শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র-সরকার "বাঁকুড়াদর্পণে" ছাতনায় চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি গত। তাঁর সংগৃহীত পুথীপত্রও গত। এঁর পূর্বে যাত্রা-সম্প্রদায়ের অধিকারী নীলকণ্ঠ-মুখোপাধ্যায় ছাতনা দিয়ে যাবার আসবার সময় চণ্ডীদাসের জপের আসন পাটটি শত প্রণাম ক'রতেন। তিনি চণ্ডীদাসকে সিদ্ধপুরুষ মনে ক'রতেন। পাঁচ-ছয় বৎসর হ'ল শ্রীমৎ সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বীরভূম ঘুরে ছাতনার নিকটে আশ্রম পেতেছেন। তিনি জেনেছেন, ছাতনা চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। শুশুনিয়া পাহাড়ে তাঁর যোগ-সাধনার আশ্রম ছিল। ১৩৮৭ শক হ'তে বর্ত্তমান ১৮৫৭ শক পর্যন্ত যে কথা পুথীতে শ্রুতিতে আছে, সেটা অবিশ্বাস ক'রলে সংশয় ঘুচবে না।

বীর ॥ তোমার কৃষ্ণসেনের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তিনি বীরভূমের নান্নুর গ্রামের নামটি চুরি করে'ছেন।

বাঁকু ॥ ছাতনায় নান্নুর নাম পুরাতন। রাজা হামীর-উত্তর নান্নুর গ্রামের নাম যুবরাজপুর রেখেছিলেন। এতে মনে হয়, নান্নুর বা নান্নুর নামের সংস্কৃত রূপ নন্দপুর ছিল। রাজনন্দ যুবরাজ। বিষ্ণুপুরের দিকে নাহুর, ছাতনার দিকে নন্দুআড়া নামে গ্রাম আছে। নাহুর নন্দপুর। নন্দুআড়া নন্দুআ—ড়া, অর্থাৎ নন্দ নামে কোন লোকের তড়া। ডাঙ্গার নাম তড়া। যেমন, সাল তড়া, শাল বনের ডাঙ্গা। লোকে সাদৃশ্য দেখেও পুরাতন নাম নূতনে প্রয়োগ করে। এর শত শত দৃষ্টান্ত আছে। ছাতনা নান্নুরে কবি চণ্ডীদাস ছিলেন। বীরভূমে এক কবি চণ্ডীদাস নাম নিয়েছিলেন। হয়ত সে সূত্রে সেদেশে নান্নুর নামটিও গেছল।

বীর ॥ তোমার উদয়-সেনের পুথী, কৃষ্ণ-সেনের পুথী, পদ্মলোচনের পুথী, সব কৃত্রিম।

বাঁকু ॥ এ সব পুথী লুপ্ত হয় নাই। কামনা বর্জ্জন ক'রে বিড়ে কষে' দেখতে আপত্তি কি আছে? বড়ু চণ্ডীদাস আর দ্বিজ চণ্ডীদাস মিশিয়ে ফেলে সংশয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। সংশয়ের বিষয় ব্যক্ত না হ'লে তার নিরাস হ'তে পারে না।
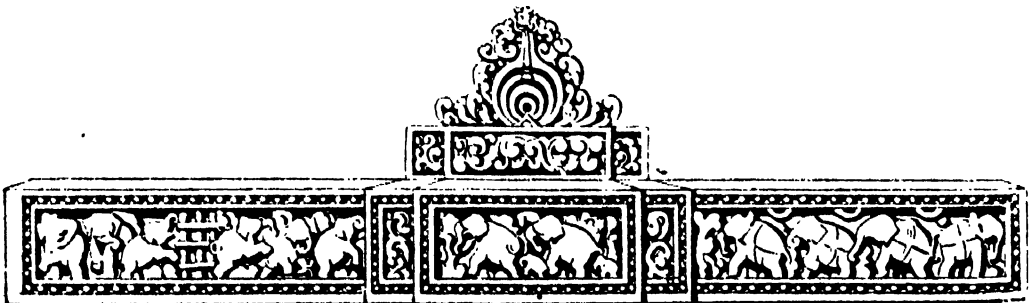
নয়া দিল্লীতে বাঙালীদের ব্যবসা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

নয়া দিল্লীতে বাঙালীদের যে ব্যবসার কথা লিখিতে যাইতেছি তাহা বৃহৎ ব্যাপার নহে। তথাপি এই বিষয়ে কিছু লিখিতেছি এই জন্য, যে, ক্ষুদ্র হইতেই বৃহতের ক্রমবিকাশ বা উৎপত্তি হয়। ইংরেজের আমলে যে-সব বাঙালী প্রথম প্রথম বঙ্গের বাহিরে কাজকর্ম্ম করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা বড়লাটের শাসনপরিষদের সভ্য, বড় ব্যারিষ্টার, বড় উকীল, হাইকোর্টের জজ, বড় ডাক্তার, বড় অধ্যাপক,

নয়া দিল্লীর মহামায়া ক্লোদিং ষ্টোর্স এবং মুখার্জ্জি এণ্ড ফ্রেণ্ডসের দোকান

ইত্যাদি রূপে যান নাই। তাঁহারা সরকারী আপিসের, রেলের, ডাকঘরের অল্প বেতনের কাজ লইয়া গিয়াছিলেন। উচ্চতর পদমর্য্যাদার, অধিকতর উপার্জ্জনের, অধিকতর প্রভাবশালিতার সুযোগ প্রবাসী বাঙালীরা পরে পাইয়াছিলেন। বাঙালীদিগকে বঙ্গের বাহিরে এখন থাকিতে হইলে নূতন নূতন কাজের ও উপার্জ্জনোপায়ের সন্ধান লইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে—বঙ্গেও যে তাহা করিতে হইবে তাহা এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় নহে। বাঙালীরা বঙ্গের বাহিরে যে-সব প্রদেশে এ পর্য্যন্ত যে রকম সব কাজ করিয়া আসিতেছেন, সেই সব প্রদেশে আগে হইতে যাঁহারা বাসিন্দা তাঁহারা ক্রমশঃ ইংরেজীশিক্ষায় অগ্রসর হওয়ায় সেই সব কাজ পাইবার সুবিধা প্রবাসী বাঙালীদের আগেকার মত নাই এবং পরে আরও কমিতে পারে। যাঁহারা বঙ্গের বাহিরে স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন, যোগ্যতা-অনুসারে তাঁহাদের কাজ পাইবার সুবিধা অবাঙালীদের সমান থাকা উচিত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা থাকিতেছে না, এবং এখন বাঙালী ও অবাঙালী যোগ্য উমেদারের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিতেছে। এই জন্য এখন প্রবাসী বাঙালীদের পূর্ব্বেকার সব কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণতর হইতেছে। ফলে, বাঙালীকে

নয়া দিল্লীর ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর্স প্রভৃতি

নূতন কার্য্যক্ষেত্র খুঁজিতে হইতেছে, এবং তাহা কর্ত্তব্যও বটে। ব্যবসাবাণিজ্যে বাঙালীকে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিবার অর্থ অবশ্য এরূপ পরামর্শ নহে, যে, তাঁহারা সরকারী চাকরী, ব্যারিষ্টারী, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি কার্য্যক্ষেত্রে আর যেন না যান। সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগকে যোগ্যতা ও প্রবৃত্তি অনুসারে সুপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে, অধিকন্তু অনেককে ব্যবসাবাণিজ্যেও প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বঙ্গের বাহিরে প্রাদেশিক সরকারী কাজ যোগ্যতা-অনুসারে পাইবার অধিকার স্থায়ী বাসিন্দা প্রবাসী বাঙালীদের তত্তৎ প্রদেশের লোকদের সঙ্গে সমান। ভারত-গবর্ণেমেণ্টের সরকারী চাকরীর সব বিভাগে অন্য যে-কোন প্রদেশের লোকদের যেমন অধিকার, বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালী-

দেরও সেইরূপ অধিকার আছে। এই সব অধিকার কোন মতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।

ব্যবসাবাণিজ্যে বেশী মন দিবার নানা কারণ আছে। একটি কারণ ত এই, যে, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ", বাণিজ্যেই উপার্জ্জন সবচেয়ে বেশী। কিন্তু বেশী উপার্জ্জনই একমাত্র

নয়া দিল্লীর গ্রেট ঈষ্টার্ণ ষ্টোরস এবং ভবানী বস্ত্রালয়

কারণ নহে। স্বাধীন দেশেও সরকারী চাকর্য়োদের সার্ব্বজনিক কাজে যোগ দিবার সুযোগ ও স্বাধীনতা বেসরকারী লোকদের চেয়ে কম; পরাধীন দেশের ত কথাই নাই। অতএব, প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে অন্ততঃ এমন কতকগুলি লোক থাকা আবশ্যক, যাঁহারা যোগ্যতা, শক্তি ও প্রবৃত্তি থাকিলে রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ সার্ব্বজনিক কাজে যোগ দিতে পারেন। তাহা হইলেই, বাঙালীরা ভারতবর্ষের যে প্রদেশেই থাকুন, তথাকার লোকদের সঙ্গে সব ভাল কাজে যোগ দিয়া দেশের সেবা করিতে এবং বাঙালীর প্রভাব বজায় রাখিতে পারিবেন। অবশ্য রাজনীতিক্ষেত্র ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে সরকারী চাকর্য়োদের কাজ করার নিষেধ নাই, কিন্তু অবাধ অধিকারও ক্রমশঃ নূতন নূতন নিয়ম দ্বারা সঙ্কুচিত হইতেছে। উকীল ব্যারিষ্টারদেরও অবাধ অধিকারে হস্তক্ষেপ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

এই দীর্ঘ উপক্রমণিকার পর আমি নিউ দিল্লী ট্রেডার্স এসোসিয়েশ্যনের সভ্য বাঙালী বণিকদের সম্বন্ধে কিছু বলিব।

১৯২৭ সালে এস্ এস্ ঘোষ এবং কোম্পানীর নাম দিয়া নয়া দিল্লীতে প্রথম বাঙালীর দোকান স্থাপিত হয়। তাঁহারা মিষ্টান্নের দোকান স্থাপন করেন। তাহার পর ১৯২৯ সালে রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর্স নাম দিয়া একটি ছোট মণিহারী দোকান স্থাপন করেন। তিনি ১৯২৬ সাল হইতে পাড়ায় পাড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি চা ও মোজা-গেঞ্জী ফেরি করিয়া বিক্রয় করায় অনেকেরই সহানুভূতি
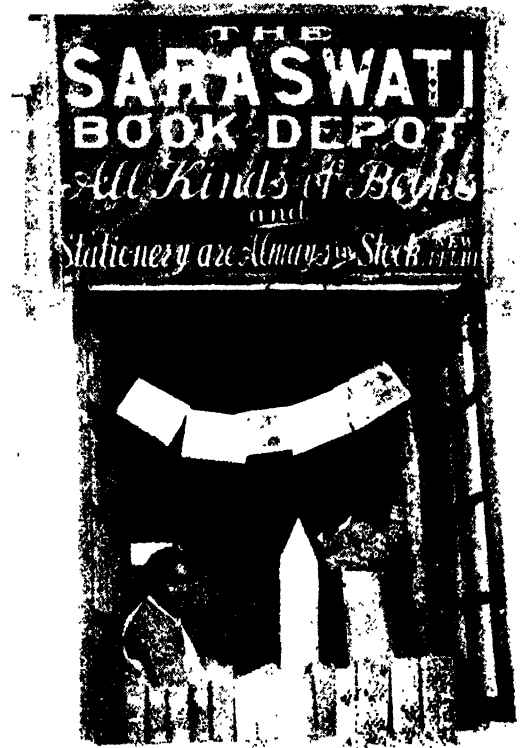
নয়া দিল্লীর সরস্বতী বুক ডিপো।

অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই জন্য দোকান খুলিবামাত্র সর্ব্বসাধারণের অধিকতর সহানুভূতি পাইলেন, দোকান ভাল চলিতে লাগিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অধিকতর বড় ঘরে দোকান লইয়া যাইতে পারিলেন। এখন তিনি মণিহারী জিনিষ ছাড়া পেটেণ্ট ঔষধ, গ্রামোফোন প্রভৃতিও রাখেন।

১৯২৯ সালে সুধীরচন্দ্র মণ্ডল মহামায়া ক্লোদিং ষ্টোর্স নাম দিয়া একটি কাপড়ের দোকান এবং গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মুখার্জ্জি এণ্ড ফ্রেণ্ডস্ নাম দিয়া একটি দর্জ্জির দোকান খুলেন। ১৯৩১ সালে ভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী কমলা

ভাণ্ডার নাম দিয়া একটি মুদীখানা খুলেন। তিনি ১৯২৯ সাল হইতে বাড়ি বাড়ি গিয়া জিনিষ ফেরি করিতেন বলিয়া লোকদের সহানুভূতির পাত্র ছিলেন এবং দোকান খুলিবার অল্প দিন পরেই কারবার বাড়াইতে সমর্থ হন। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রেট ঈষ্টার্ণ ষ্টোর্স নাম দিয়া অমরনাথ দত্ত একটি মণিহারী ও অয়েলম্যান ষ্টোর্সের দোকান স্থাপন করেন। তাঁহার দোকানও বেশ চলিতে থাকে। ক্রমশঃ বাইসিক্ল মেরামতের, অলঙ্কারের, পুস্তকের, খাবারের, মুদীখানার, ও মণিহারী দ্রব্যের আরও দোকান খুলিতে থাকে। বহির দোকানটির নাম সরস্বতী বুক ডিপো। নগেন্দ্রনাথ দাস উহার প্রতিষ্ঠাতা।

এখন নয়া দিল্লীতে, গোল বাজারে, বাঙালীদের দোকান উনিশ খানি আছে। তথাকার ব্যবসা বলিলে এখন বাঙালীদের দোকানগুলিই বুঝায় শুনিয়াছি। দোকানের মালিকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, ব্যবসার উন্নতির জন্য, এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে সখ্যবৃদ্ধির জন্য গত বৎসর মে মাস হইতে তাঁহারা নিউ দিল্লী ট্রেডার্স এসোসিয়েশ্যন নাম দিয়া একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। উনিশখানি বাঙালীর দোকানই এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত। পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ইহার প্রেসিডেণ্ট এবং রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটরী। সমিতি গঠনের পর এই সব বাঙালী বণিকের মধ্যে সখ্য খুব বাড়িয়াছে। এখন সমস্ত বাঙালীর দোকানই প্রত্যেকের নিজের দোকান বলিয়া মনে হয়। ইহাতে তাঁহাদের সকলেরই ব্যবসার উন্নতি আশা করা যায়।

নিউ দিল্লীর ট্রেডার্স এসোসিয়েশ্যনের সেক্রেটরী
শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

গত পৌষ মাসে নয়া দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে তাহার সভাপতি অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমি এই দোকানগুলি দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম। বঙ্গের বাহিরে অন্যত্রও বাঙালী যুবকেরা কেহ কেহ এইরূপ ব্যবসাবাণিজ্য করিলে কৃতিত্বলাভ করিতে পারিবেন আশা করি।
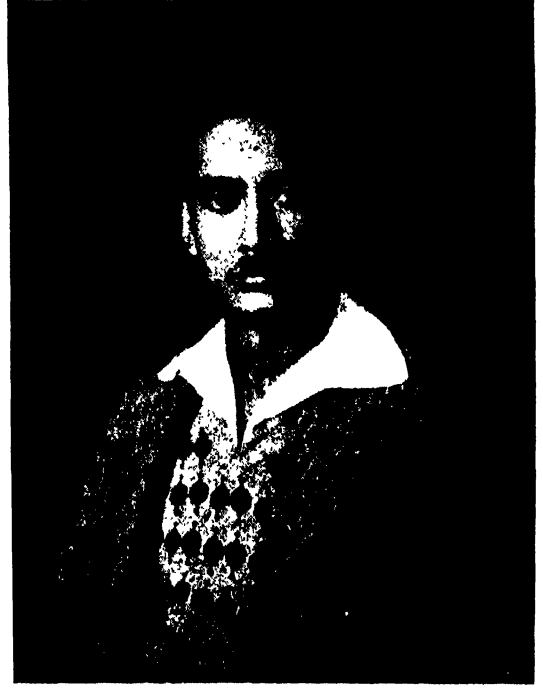
এই প্রবন্ধের ছবি ৫টি সৌরেন্দ্রকুমার মজুমদার সৌজন্যপূর্ব্বক তুলিয়া দিয়াছেন।

"রামমোহন রায় ও রাজারাম"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামমোহন রায়ের পালিতপুত্র রাজারামের জন্ম ও বংশ সম্বন্ধে ১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাহার পর আরও অনেকে ঐ বৎসরের প্রবাসীতে কিছু লিখিয়াছিলেন। আমিও কিছু লিখিয়াছিলাম। বর্ত্তমান বৎসরে শ্রাবণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কিছু লেখেন ও ব্রজেন্দ্রবাবু তাহার উত্তর দেন। ১৩৩৬ সালে ব্রজেন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছিলেন, গত পৌষের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তাহার সমালোচনা করেন। মাঘের প্রবাসীতে ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রত্যুত্তর বাহির হইয়াছে। আমি এই সমস্ত লেখা আবার দেখিলাম। সবগুলি সম্বন্ধে, অন্ততঃ প্রধান প্রধান সব কথা সম্বন্ধেও, আমি আলোচনা করিব না—তাহার কারণ, তাহা করা অনাবশ্যক,—সময়ের অভাবও আছে এবং প্রবাসীতে এবার যথেষ্ট জায়গাও নাই। কয়েকটি কথা মাত্র আমি বলিব। পরে আরও লিখিতে পারি, না-লিখিতেও পারি।

রাজারাম যে একটি অনাথ বালক, রামমোহন রায় তাহাকে পুত্ররূপে পালন করিয়াছিলেন, ব্রজেন্দ্রবাবু ইহা বিশ্বাস না-করিবার কারণ লিখিয়াছেন। রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে একটা অপবাদ ছিল, ইহার পরিবর্ত্তে তিনি সেই অপবাদ বিশ্বাস করিবার কারণও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য রাজারামের জন্ম ও বংশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই, তাহা তিনি বলিয়াছেন; কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন, তাঁহার অনুমানগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণের যোগ্য।

রামমোহন রায়ের বিপক্ষেরা কেহ কেহ তাঁহার যে কুৎসা রটনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক বিবেচক কোন লোক বিশ্বাস করিতেন কিনা আমি অবগত নহি। সমসাময়িক লোকদের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবার সুযোগ থাকে। কাহারও সম্বন্ধে কোন বিপক্ষ কোন নিন্দা রটনা করিলে তাঁহারা তাহার সত্যতা অসত্যতা অপেক্ষাকৃত সহজে পরীক্ষা করিতে পারেন। এই জন্য সমসাময়িক বিবেচক লোকেরা কোন্ কুৎসা বিশ্বাস করেন না-করেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

ব্রজেন্দ্রবাবুর দ্বারা সংকলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে (৩৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা) তিনি ১৮৩২ সালের ৩রা নবেম্বরের "সমাচার দর্পণ" হইতে নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই কাগজ তাঁহার মতে "নিরপেক্ষ"।

"শ্রীযুত রামমোহন রায়।—আমাদের দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মত্ততাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্ডীয় এক বিবিসাহেবকে বিবাহ করণার্থ উদ্যত হইয়াছেন। কলিকাতায় রায়জীর এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দু শাস্ত্রের কোন বিধি উল্লঙ্ঘন করাতে জাতিভ্রংশ বিষয়ে নিত্য অতি সাবধান হইয়া আছেন এতএব আমরা বোধ করি যে এই জনরব সমুদয়ই অমূলক ও অগ্রাহ্য। তিনি ঈদৃশাবস্থ অর্থাৎ স্ত্রী থাকিতে যদি কোন বিবিসাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি যে তাঁহার দৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যত গ্লানি তিরস্কারাদি করিয়াছেন সে সকলেরই তিনি উপযুক্ত পাত্র বটেন।"

পাঠকেরা উপরে উদ্ধৃত অংশে "উন্মত্ততাপূর্ব্বক" ও "রাগপূর্ব্বক" কথা দুটি লক্ষ্য করিবেন। দুটিই কুৎসাকারীদের অপ্রকৃতিস্থতাসূচক।

"সমাচার দর্পণ" রামমোহনের স্ত্রী থাকিতে বিবিসাহেবকে বিবাহ করিতে উদ্যত হওয়ার জনরব "উন্মত্ত" লোকের অমূলক রটনা বলিয়াছেন এবং তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাহার পর বলিয়াছেন, এমন মিথ্যা কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার "দৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যত গ্লানিতিরস্কারাদি করিয়াছেন সে সকলেরই তিনি উপযুক্ত পাত্র বটেন।" ইহার পরিষ্কার অর্থ এই, যে, রামমোহন রায়ের "দৃঢ়তর বিপক্ষেরা রাগপূর্ব্বক" যে সব কুৎসা রটাইয়াছেন "সমাচার দর্পণ" তাহা বিশ্বাস করেন না; কিন্তু উন্মত্তদের প্রচারিত রামমোহনের বিবিসাহেব বিবাহ করিতে উদ্যত হওয়ার "অমূলক ও অগ্রাহ্য" জনরব যদি সত্য হয় (অর্থাৎ মিথ্যা যদি সত্য হয়), তাহা হইলে অন্য গ্লানিতিরস্কারাদিও "সমাচার দর্পণ" বিশ্বাস করিবেন, নতুবা তাহা বিশ্বাস করেন না।

"সমাচার দর্পণ" রামমোহনের সমসাময়িক কাগজ, কিন্তু তাঁহার বা তাঁহার দলের কাগজ ছিল না।

রামমোহনের সহিত ঘোরতর তর্কযুদ্ধ করিয়াছেন নানা খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের এরূপ মিশনারীরাও এবং এরূপ অন্য খ্রীষ্টীয়ানেরাও তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে ইঙ্গিত মাত্রও করেন নাই, করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে রামমোহনের ইংরেজী জীবনচরিতলেখিকা কুমারী কলেট লিখিয়াছেন:—

"And his aggrieved Trinitarian opponents, even in the heat of controversy, never breathed a whisper against his fair fame. The reputation that has passed scatheless and stainless the ordeal of criticism by missionaries, Baptist and Unitarian, Presbyterian and Anglican, hostile as well as sympathetic, may afford to ignore stale Hindu gossip served up a generation afterwards."

রামমোহনকে কলিকাতায় যাঁহারা স্বয়ং দেখিয়াছেন ও তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন, এরূপ ইংরেজ ও ফরাসী লেখকদের তাঁহার চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা উদ্ধৃত করিব না। আমার বক্তব্য এই, যে, তাঁহার সমসাময়িক দেশী ও বিদেশী যে-সব বিবেচক লোকদের তাঁহার বিরুদ্ধে রটিত কুৎসার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবার সুযোগ ছিল তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহা বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নহে।

রামমোহন রাজারামকে যে এক জন ইংরেজের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা"র দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬৪ পৃষ্ঠায় "আগ্রা আখবর" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইরূপ সংবাদ ১৮৩৬ সালের ১৭ই মে তারিখের 'ক্যালকাটা কুরিয়্যার" কাগজে বাহির হয়। সদৃশ বৃত্তান্ত কুমারী কার্পেন্টারের

Last Days in England of Raja Rammohun Roy গ্রন্থে আছে। ইহা যিনি ডাঃ কার্পেন্টারকে পাঠান, তিনি লিখিয়াছিলেন, যে, তিনি বৃত্তান্তটি রামমোহনের নিজের মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন এবং "আমার যাহা মনে আছে অন্যেরা তাহা সমর্থন করেন" ("and my recollection is confirmed by that of others")। এই প্রকার বৃত্তান্ত সব উইলিয়ম ফষ্টার প্রণীত "জন কম্প্যানি" নামক পুস্তকেও আছে। বাহুল্যভয়ে এগুলি উদ্ধৃত করিলাম না। পরস্পরসদৃশ এই সব বৃত্তান্ত একই ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত বা সকল লেখক কোন এক জনেরই লেখা নকল করিয়াছেন, ইহা মনে করিবার মত কোন প্রমাণ আমি অবগত নহি।

যাহা হউক, এই প্রকার সব বৃত্তান্ত ব্রজেন্দ্রবাবু অবিশ্বাস করিয়াছেন। তাঁহার অবিশ্বাসের প্রধান কারণ, বা অন্ততঃ অন্যতম কারণ এই যে, ডিক্ নামক যে ইংরেজ সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট হইতে রামমোহন রাজারামকে পাইয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তগুলিতে* কথিত আছে, সেরূপ কোন ডিক্ তিনি "Alphabetical list of the Bengal Civil Servants, from 1780 to 1838" নামক বহিতে পান নাই। এই বহিটিকে তিনি প্রামাণিক মনে করেন—যদিও ইহাতে যে ভ্রমপ্রমাদ বা অসম্পূর্ণতা নাই বা থাকিতে পারে না, তাহা তিনি দেখান নাই। এরূপ কোন বহি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইলেও সম্পূর্ণ নির্ভুল ও অসম্পূর্ণতাশূন্য না হইতে পারে, কিন্তু বেসরকারী এরূপ পুস্তক অপেক্ষা বেশী নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়ই হয়। বহিটি ডডওয়েল ও মাইল্‌সের বলিয়া মুদ্রিত আছে। ১৮৩৯ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক সংকলিত ও ১৮৪৪ সালে কলিকাতার ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত "General Register of the Hon'ble East India Company's Bengal Civil Servants from 1790 to 1842" এইরূপ আর একখানি বহি।

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার রামমোহন রায় সম্বন্ধে সরকারী রেকর্ড আফিসে ও হাইকোর্টে অনেক কাগজপত্রের ও পুরাতন খবরের কাগজের অনেক নকল লইয়াছেন এবং রামমোহন সম্বন্ধে কিছু প্রবন্ধও আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন। তৎসমুদয় আমি এখনও মুদ্রিত করি নাই। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, সিবিলিয়ানদের উক্ত বর্ণানুক্রমিক তালিকা ("Alphabetical List") "অসম্পূর্ণ, অর্থাৎ উহাতে যে কয়জন ডিকের নাম পাওয়া যায় তাহা ব্যতীত কোম্পানীর অন্য সিবিলিয়ান ডিক্‌ও সেই সময় ছিলেন।...কাজেই ঐ তালিকাকে একেবারেই প্রামাণিক বা সম্পূর্ণ বলা যায় না। এমন কি যে সকল ডিকের নাম এই সিবিল লিষ্টে স্থান পাইয়াছে তাঁহাদেরও কর্ম্মনিয়োগ প্রভৃতির যে বিবরণ আছে তাহাও অসম্পূর্ণ দেখা যায়।" "একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, বাংলা সরকারের রক্ষিত রেকর্ডসে ইঁহাদের কর্ম্মনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল মূল চিঠিপত্র আছে, তাহার দ্বারা।"

অতঃপর ডক্টর মজুমদার লিখিতেছেন :—

"যাহা হউক, তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়াও লওয়া হয়, যে, এরূপ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও উপরোক্ত তালিকাপুস্তকে প্রাপ্ত ডিক্‌দের কাহারও রাজারামের পালক হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তথাপি অপর যে কয়জন ডিকের নাম গবর্ণমেণ্ট রেকর্ডসে পাওয়া যায় তাঁহাদের কেহ যে ঐ ডিক হইতে পারেন না তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট রেকর্ডসে প্রাপ্ত তিন জন ডিকের নাম করিতেছি যাঁহাদের নাম ঐ তালিকা-পুস্তকে পাওয়া যায় না। যথা—আর্ ডিক্, আর্ এইচ্ ডিক্, ও আর্ ডবল্যু ডিক্। দেখা যায়, আর্ ডিক্, ১৭৯৯ সালের ২৮শে জুন রামগড়ের কালেক্টর নিযুক্ত হন, আর্ এইচ্ ডিক্ ১৮০৩ সালের ২২শে মার্চ পুর্ণিয়ার কালেক্টর নিযুক্ত হন, এবং আর্ ডবল্যু ডিক্ ১৮০২ সালের ১৯শে জানুয়ারী যশোহরের কালেক্টর নিযুক্ত হন। গোবিন্দপ্রসাদের সহিত ১৮০৭ সালে রামমোহনের যে মামলা হয়, তাহার সাক্ষ্য হইতে পাওয়া যায় যে, বাংলা ১২০৬ সনে, ইংরেজী ১৭৯৯- ১৮০০ সালে, রামমোহন পাটনা, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে যাইবার জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন এবং তাহার অল্পকাল পরেই রামগড়, ভাগলপুর, রংপুর, যশোহর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে কর্ম্মসূত্রে ঘুরিয়া বেড়ান। সুতরাং এই সময় উল্লিখিত তিন জন ডিকের মধ্যে কাহারও না কাহারও সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।" এবং তাঁহার পরিচিত কোন ডিকের নিকট হইতে তিনি রাজারামকে পাইয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস্য নহে।

রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার "দৃঢ়তর বিপক্ষ"দের দ্বারা রটিত কুৎসাটা কেন বিশ্বাস্য নহে, এবং তিনি যে রাজারামকে ডিক্ নামক এক ইংরেজের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন, তাহা কেন বিশ্বাসের অযোগ্য নহে, তাহা উপরে লিখিলাম। আমি যাহা লিখিলাম, তাহা সকলে গ্রহণযোগ্য মনে না-করিতে পারেন। এই জন্য ব্রজেন্দ্রবাবু কেন সেখ বক্সু ও রাজারামকে অভিন্ন মনে করেন, সেই সমুদয় অনুমানও পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, আলবিয়ন জাহাজে রামমোহন রায়কে এবং রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ দাস ও সেখ বক্সুকে স্থান দিবার আদেশ সরকারী দপ্তরে পাওয়া যায়; কিন্তু যখন রামমোহন ইংলণ্ড পৌঁছিলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার সঙ্গে আছেন রাজারাম, রামহরি দাস ও রামরত্ন মুখোপাধ্যায়। তাহা হইলে সেখ বক্সুর কি হইল এবং রাজারাম কোথা হইতে আসিলেন? অতএব, রাজারামই সেখ বক্সু। ব্রজেন্দ্রবাবুর যুক্তি আমি সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলাম, অনাবশ্যক বোধে তাঁহার সব কথা বিস্তারিত উদ্ধৃত করিলাম না।

ব্রজেন্দ্রবাবু ধরিয়া লইয়াছেন, যে, সরকারী দপ্তরে যাহাদিগকে কোম্পানীর আমলে কোন জাহাজে স্থান দিবার আদেশ বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া আর কাহাকেও ওরূপ কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই; অর্থাৎ তদ্রূপ আদেশ সমস্তই এপর্য্যন্ত রক্ষিত আছে এবং এতদ্বিষয়ক সরকারী নথীপত্র সম্পূর্ণ আছে। কিন্তু তিনি মাঘের প্রবাসীর ৫৪৩ পৃষ্ঠায় ইহাও লিখিয়াছেন, "তবে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, রামমোহনের মূল আরজী ইত্যাদি দপ্তরে নাই কেন, তাহার উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ এই সকল মামুলী আরজী দপ্তরে রাখিয়া দপ্তর ভারাক্রান্ত করা প্রয়োজন বিবেচনা করা হয় নাই। কেবল রামমোহনের ক্ষেত্রেই নয়, ১৮৩০ সালে অন্য যাহাদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মূল দরখাস্তও দপ্তরে রাখা হয় নাই রাখা হইয়াছে কেবল সেই সকল আরজী সম্বন্ধে Body Sheet বা সরকারী নির্দ্দেশ। এই Body Sheet আবার সরকারী বৈঠকের কার্য্যবিবরণীর (Proceedingsএর) সংক্ষিপ্তসার।" ব্রজেন্দ্রবাবু কারণ যাহাই অনুমান করুন, কোন কোন জিনিষ যে রাখা হয় নাই, তাহা তিনি নিজেই বলিতেছেন, এবং বিস্তারিত কার্য্যবিবরণ না রাখিয়া কেবল তাহার সংক্ষিপ্তসার রাখা হইয়াছে, তাহাও তিনি বলিতেছেন। কেবল আরজীগুলি ছাড়া আর সবই আছে এবং সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া আবশ্যক কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহা কি প্রকারে প্রমাণিত হইবে? তাহার প্রমাণ ত পাইতেছি না। যাহা হউক, দপ্তরে কি নাই কেবল তদ্বিষয়ক অনুমান হইতে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যাইবে না! অতএব, কি নাই বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত অন্য প্রকার উপকরণের সন্ধান লইতে হইবে।

---

* ফষ্টারের বহিতে ডিক্ নামটি নাই, কোম্পানীর চাকরো একজন ইংরেজ বলিয়া উল্লেখ আছে।

এ বিষয়ে ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার তাঁহার অপ্রকাশিত প্রবন্ধটিতে লিখিয়াছেন :—

"রাজা রামমোহন রায় যে আলবিয়ান নামক জাহাজে বিলাত যাত্রা করেন তাহার যাত্রীদের নামের যে তালিকা তৎকালীন সংবাদপত্র-সমূহে প্রকাশিত হয় দেখা যায়, তাহার অল্পসংখ্যকের নামই এই গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে রক্ষিত তালিকায় পাওয়া যায়। কেবল ঐ জাহাজের যাত্রীদের নহে, ঐ সময় আরও যে সকল জাহাজ ছাড়ে তাহার যাত্রীদের পক্ষেও ইহা সত্য। এরূপও দেখা যায়, যে, হয়ত স্বামী স্ত্রী যাত্রী ছিলেন ; কিন্তু স্বামীর নাম গভর্ণমেণ্ট রেকর্ডে পাওয়া যায়, স্ত্রীর নাম পাওয়া যায় না। ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন যে, গভর্ণমেণ্টের রেকর্ডই অধিকতর প্রামাণিক হওয়াতে একথা বলা সঙ্গত হইতে পারে যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত জাহাজের যাত্রীদের নামের তালিকা ঠিক নহে, হয়ত ঐ সকল লোকের যাইবার কথা হইয়াছিল কিন্তু শেষ অবধি যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই ;—যদিও প্রমাণান্তরের অভাবে এই অনুমানের যৌক্তিকতা দেখা যায় না, তথাপি তর্কের খাতিরে ইহা মানিয়া লইলেও এ কথা বলিতে হইবে যে, আলবিয়ান জাহাজের যাত্রীদের নামের যে তালিকা গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে রক্ষিত তাহা অসম্পূর্ণ। কারণ রামমোহনের সহযাত্রী সুপ্রসিদ্ধ "বেঙ্গল হরকরা" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ সাদারল্যাণ্ডের নাম উক্ত গভর্ণমেণ্টের জাহাজে স্থান দেওয়ার আদেশসমূহের রেকর্ডে কোথাও পাওয়া যায় না।* সাদারল্যাণ্ড সাহেব যে রামমোহনের সহযাত্রী রূপে আলবিয়ন জাহাজে বিলাত যান নাই, একথা বলিবার উপায় নাই। কাজেই ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, যে, এ বিষয়ে যে গভর্ণমেণ্টের রেকর্ডের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ। সাদারল্যাণ্ডের নাম যখন গভর্ণমেণ্ট রেকর্ডে পাওয়া যায় না, তখন গভর্ণমেণ্ট রেকর্ডে যাহার নাম পাওয়া যায় পরিচয়বিহীন এরূপ অপর কোনও সাহেবকে কি সাদারল্যাণ্ড বানাইতে হইবে? সেখ বক্সুর পরিচয় না জানায় ও গভর্ণমেণ্টের রেকর্ডে রাজারামের নামের উল্লেখ না থাকায় সেখ বক্সুকে রাজারাম বানান অসঙ্গত।"

এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি এইরূপ অনুমান করি, যে, রামমোহন ১৫ই নবেম্বর কলিকাতা হইতে আলবিয়ন জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে কোন তারিখে বা ১৫ই ও ১৯শে নবেম্বরের মধ্যে কোন তারিখে ঐ জাহাজে রাজারামকে স্থান দিবার আদেশ লইয়াছেন, কিন্তু সেই আদেশ গবর্মেণ্টের দপ্তরখানায় নাই, এবং, যে কারণেই হউক, সেখ বক্সুর রামমোহনের সঙ্গে বিলাত যাত্রা ঘটিয়া উঠে নাই। গবর্মেণ্ট রেকর্ডসের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিলে আমার অনুমান যে অসঙ্গত হয় না, তাহা আমি দেখাইতেছি।

রামমোহনকে আলবিয়ন জাহাজে স্থান দিবার আদেশ ১৮৩০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে দেওয়া হয়। তাহার পর ১৫ই নবেম্বর আলবিয়ন জাহাজ ছাড়িবার দিন তাঁহার সঙ্গে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ দাস ও সেখ বক্সুকে স্থান দিবার আদেশ দেওয়া হয়। মধ্যে যে এক মাস সাত দিন সময় ছিল, তাহার কোন দিন রাজারামের জন্য আদেশ লওয়া অসম্ভব ছিল না। রাজারাম যে রামমোহনের সঙ্গে যাইবেন, এই সংবাদ ১৫ই নবেম্বর তারিখের আগেই কোন কোন খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। সুতরাং ১৫ই তারিখের পূর্ব্বেই আদেশ লওয়া হইয়াছিল, ইহা সম্ভবপর। তবে, খবরের কাগজের খবরটি অনুমানমূলক হইয়া থাকিলে ১৫ই হইতে ১৯শের মধ্যেও আদেশ লইবার সময় ছিল। ইহা বলিবার কারণ বলিতেছি।

ব্রজেন্দ্রবাবু প্রমাণ দেখাইয়াছেন, যে, আলবিয়ন জাহাজ ১৫ই নবেম্বর কলিকাতা ছাড়ে। ইহা ঠিক্। কিন্তু রামমোহন যে ১৯শে কলিকাতা হইতে রওনা হন ইহাও ঠিক্। ইহা রামমোহনের স্মৃতি-বিভ্রম নহে। ১৮৩২ সালের ক্রিশ্চ্যান রিফর্মার ছাড়াও এবিষয়ে অন্য প্রমাণ আছে। রামমোহন আলবিয়ন জাহাজে বিলাত পৌছেন, কিন্তু তিনি কলিকাতা হইতে ১৯শে নবেম্বর ফর্বস্ (Forbes) নামক ষ্টীমারে রওনা হইয়া আলবিয়ন জাহাজ ধরেন। আলবিয়ন পালের জোরে চলিত বলিয়া মন্থরগতি, তাহাকে ধরা ষ্টীমার ফর্বসের পক্ষে সুসাধ্য ছিল। ১৮৩০ সালের ২৩া ডিসেম্বরের বেঙ্গল ক্রনিক্‌ল্ নামক কাগজে ইহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা—

"Rammohun Roy and about fifteen native gentlemen of distinction who accompanied him, embarked on board the Steamer *Forbes*, on the 19th about ten in the morning, to proceed down to the *Albion* at Kedgree. As they did not get down to the ship until next morning, these native gentlemen experienced the greatest inconvenience, which was increased by a heavy shower of rain at night and the want of sleeping accommodation for so many. They bore it all however with the greatest good humour, although they had never proceeded so far down the river before. They did not leave their friend until they saw him safe on board the *Albion*. When the *Forbes* passed that ship on her return, conveying them back to Calcutta, they joined the Captain, officers and European passengers in three hearty cheers in honor of the distinguished individual of whom they had taken leave with every token of cordiality and esteem, and some with heavy hearts and tearful eyes. The cheer was returned from the ship and most deeply felt by Rammohun Roy, when it was explained to him that it was in honor of him and his novel and singularly bold undertaking. When our letters left the *Albion*, the *Andromache* was a short distance astern of her in tow of the Emulous. Rammohun Roy was in excellent health and spirits."

ব্রজেন্দ্রবাবুর মতে রামমোহন রায় কেন রাজারাম নাম ব্যবহার না করিয়া জাহাজে স্থান লইবার আরজীতে সেখ বক্সু নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "মিথ্যা নামে অভিহিত করিয়া" কাহাকেও বিলাত লইয়া গেলে "ধরা পড়িলে সাজা যাহাই হউক", ইত্যাদি। তাঁহার এই সব কথার আমি আলোচনা করিব না বলিয়া তাঁহার এই প্রসঙ্গে লিখিত সব কথা উদ্ধৃত করিলাম না, সংক্ষেপে ঠিক তাৎপর্য্যও দিলাম না। কেবল ধরা পড়া না-পড়া সম্বন্ধে কিছু বলিব।

---

* ডক্টর মজুমদার সরকারী দপ্তরখানায় সাদারল্যাণ্ড সাহেবের একটি দরখাস্ত ও তাহার উপর আদেশ পাইয়াছেন, কিন্তু তাহা আলবিয়নে বা কোন জাহাজে স্থান চাওয়া পাওয়া সম্বন্ধে নহে। তাহা এই :—

"Mr. Sutherland
To H. T. Prinsep, Esq.,
Secretary to Government, &c. &c.

Sir,

I beg you will please to submit this my application to the Rt. Hon'ble the Governor-General in Council for a certificate of good conduct during my stay in India to enable me to return to this country should circumstances render such a measure necessary.

I have the honour &c.

Calcutta 14th October, 1830. (Sd.) J. Sutherland.

The officiating secretary reports that the request preferred in the foregoing letter has been complied with.

জাহাজে স্থান রাখিবার বা করিবার আদেশগুলিকে ব্রজেন্দ্রবাবু পাসপোর্ট বা কার্য্যতঃ পাসপোর্ট অর্থাৎ বিদেশে যাইবার অনুমতিপত্র বা ছাড়পত্র মনে করেন। আমি তাহা মনে করি না। কেন, তাহা বলিতেছি।

আমাকে ১৯২৬ সালে ইউরোপ যাইবার জন্য পাসপোর্ট লইতে হইয়াছিল। গত ১৯৩৫ সালে আবার তথায় যাইবার নিমিত্ত পাসপোর্ট লইয়াছিলাম—যদিও যাওয়া হয় নাই। ইহাতে একটি পাতায় আছে—সব পাসপোর্টেই থাকে,

"These are to request and require in the Name of the Viceroy and Governor-General of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him (or her) every assistance and protection of which he (or she) may stand in need."

তাহার পর তারিখ, সরকারী ছাপ এবং "By order of the Viceroy and Governor-General of India" ইত্যাদি আছে ও থাকে।

যাহাকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়, পাসপোর্টে তাহার নাম, পেশা, জন্মের স্থান ও তারিখ, হাল সাকিম, উচ্চতা (height), চোখের রং, চুলের রং, কোন দৃশ্য পরিচায়ক-চিহ্ন, পিতার নাম, ও ধর্ম্ম লেখা থাকে। পাসপোর্টপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন্ কোন্ দেশ যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল, তাহাও পাসপোর্টে লেখা থাকে। পাসপোর্ট লইবার দরখাস্ত করিবার সময় দরখাস্তকারীকে নিজের দুইখানা ফোটোগ্রাফ দিতে হয় ও নিজের স্বাক্ষর দিতে হয়। পাসপোর্টে উহার একখানা ফোটোগ্রাফ আঁটিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার নীচে দরখাস্তকারীর স্বাক্ষরটিও আঁটিয়া দেওয়া হয়। যাত্রীর সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী থাকিলে তাঁহারও ফোটোগ্রাফ ও স্বাক্ষর আঁটিয়া দেওয়া হয়। দুইখানা ফোটোগ্রাফের মধ্যে, অনুমান করি, একখানা সরকারী দপ্তরে রাখা হয়।

কোম্পানীর আমলের জাহাজে স্থান করিবার আদেশ পাসপোর্ট বা তত্তুল্য কিছু হইলে উক্ত সব বর্ণনা আদি কোথায় ?

যাত্রী যখন বন্দরে নামে তখন জাহাজ হইতে নামিবার আগে জাহাজেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। তখন তাহার পরিচয় লওয়া ও পাসপোর্ট দ্বারা সনাক্ত করা হয় বা হইতে পারে। বন্দরে নামিবার সময় পাসপোর্ট খুলিয়া এই কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীকে নাম ও ফোটোগ্রাফ দেখাইতে হয়। তিনি যাত্রীদের মুখের দিকে তাকাইয়া চেহারাটা ফোটোগ্রাফের সঙ্গে মিলাইয়া লন। ১৮৩০ সালে ইহার মত সনাক্ত করিবার রীতি সম্ভবতঃ কিছু ছিল। সেখ বক্সুকে রাজারাম বানান গিয়া থাকিলে ইংলণ্ডে নামিবার সময় তাহাকে কোন নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। কাগজপত্রে ও পুস্তকে রাজারামের যত উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা দেখিয়া এই সিদ্ধান্তই হয়, যে, ভারতবর্ষে রামমোহনের বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত ব্যক্তি, শত্রু—কেহই—কখনও সেখ বক্সু নাম ব্যবহার করে নাই, জাহাজেও কেহ করে নাই, ইংলণ্ডেও কেহ করে নাই, তাহাকে বিলাতে চাকরী দেওয়া হয় রাজারাম নামে, সবাই সব সময়ে রাজারাম, রাজচন্দ্র, রাজা, রাজু, বা রাজী নাম ব্যবহার করিয়াছে, অথচ কেবল জাহাজে স্থান করিবার আদেশ লইবার জন্যই সেখ বক্সু নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল—ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব—অন্ততঃ অত্যন্ত কঠিন। এবং যে সেখ বক্সু নাম শত্রু মিত্র কেহই জানিত না, কেবল একবার তাহা ব্যবহার করিবার আবশ্যকই বা কি ছিল? ধরা পড়িবার ভয়? সেখ বক্সু নাম যখন অন্য কেহই জানিত না, তখন রামমোহনকে ধরাইয়া দিবে কে?

ব্রজেন্দ্রবাবু পাসপোর্টের কথা বলিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে যাহারা যে নামে বিদেশে যায়, স্বদেশে ফিরিবার সময় তাহাদিগকে যাইবার সময়কার পাসপোর্টের সাহায্যে যাইবার সময়কার নামেই ফিরিতে হয়। ১৮৩৮ সালে যখন রাজারাম "জাভা" নামক জাহাজে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাহার যাত্রীদের তালিকায় উল্লিখিত আছে—"Raja Ram Roy, the son of the late Raja Rammohon Roy"। রাজারাম সেখ বক্সু হইলে অন্ততঃ তখন সেখ বক্সু নাম ব্যবহার করিতে হইত, নতুবা নাম ভাঁড়াইবার অপরাধে তিনি দণ্ডনীয় হইতেন। যাত্রীদের তালিকায় যে তাঁহাকে রামমোহনের পুত্র বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, ব্রজেন্দ্রবাবু স্বীকার করিয়াছেন, যে, পালিত পুত্রকেও পুত্র বলা যায়

মাঘের প্রবাসীতে ব্রজেন্দ্রবাবু রমাপ্রসাদ বাবুর সমালোচনার যে উত্তর দিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনার্যালের কোম্পানীর আমলের মূল কার্য্য-বিবরণী কলিকাতাতেই আছে শুনিয়াছি। ব্রজেন্দ্রবাবু লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আফিস হইতে আনাইয়া তাহার নকল ছাপাইয়াছেন। দলীল সংগ্রহের এই প্রকার রীতি লক্ষ্য করিয়া রমাপ্রসাদ বাবু হয়ত তৎসম্বন্ধে "বিচিত্র" বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়াছেন, "Public Body Sheet, 21st October, 1830 No. 95"এর অনুবাদে ব্রজেন্দ্রবাবু গোড়ার কথা "The Secretary reports" বাদ দিয়াছেন এবং "অনুমতি পত্র" এই কথাটি আমদানী করিয়াছেন। প্রমাণের এইরূপ ব্যাখ্যাকেও রমাপ্রসাদ বাবু "বিচিত্র" বলিয়া থাকিবেন।

রাজারাম তাহার পালক পিতা রামমোহন রায়ের সহিত 'হয়ত' যাইতে ব্যাকুল হওয়ায় তিনি সেখ বক্সুর জায়গায় তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদবাবু এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। আমি এই অনুমানের সপক্ষে বা বিরুদ্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না ;—রাজারামের যাওয়া সম্বন্ধে আমি কিছু ভিন্ন রকম অনুমান আগে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবুর অনুমানের সমালোচনা করিতে গিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু রমাপ্রসাদ বাবুর এতদ্বিষয়ক বাক্যগুলির যে সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। রমাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছিলেন :—

"রামমোহন রায় যখন আদৌ তিনজন অনুচরের জন্য আলবিয়ন জাহাজে জায়গা চাহিয়া দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তখন রাজারামের যাওয়ার কথা ছিল না। তারপর যখন যাত্রার দিন ঘনাইয়া আসিল, তখন পিতামাতা উভয় স্থানীয় পালক পিতার সঙ্গে যাইবার জন্য হয়ত রাজারাম বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িল, সুতরাং তাহাকে ফেলিয়া যাওয়া সহজ হইল না।" (পৌষের প্রবাসী, ৩৯৩ পৃষ্ঠা।)

ব্রজেন্দ্র বাবু রমাপ্রসাদ বাবুকে বলাইয়াছেন, "কিন্তু যাত্রার দিন যখন ঘনাইয়া আসিল—অর্থাৎ ১৫ই তারিখে অনুমতি লওয়ার পরে—রাজারাম বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়াতে রামমোহন তাহাকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলেন।" (মাঘের প্রবাসী, ৫৪২ পৃষ্ঠা।)

রমাপ্রসাদবাবু যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার "হয়ত" কথাটির উপর আমি বেশী জোর দিয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার জায়গায়, "হয়ত" বাদ দিয়া, ব্রজেন্দ্রবাবু করিয়াছেন "রাজারাম 'বিশেষ' ব্যাকুল হইয়া পড়াতে।" রমাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছিলেন, "যখন যাত্রার দিন ঘনাইয়া আসিল"; ব্রজেন্দ্রবাবু তাহার মানে করিয়াছেন, "অর্থাৎ ১৫ই তারিখে অনুমতি লওয়ার পর"। কিন্তু যাত্রার দিন ঘনাইয়া আসার অর্থ (আলবিয়ন জাহাজের) যাত্রার দিন নহে।

এই প্রকার সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা অনুচিত। সাধারণ পাঠকপাঠিকা রমাপ্রসাদ বাবু ও ব্রজেন্দ্রবাবুর লেখা পাশাপাশি রাখিয়া পড়িয়াছেন বা পড়িবেন, আশা করা যায় না। সেই জন্য রমাপ্রসাদ বাবু ঠিক্ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করা উচিত ছিল। তাহা না-করায় তাঁহার উক্তি সম্বন্ধে ভ্রম উৎপাদিত হইয়া থাকিবার সম্ভাবনাই অধিক।

ব্রজেন্দ্রবাবু মাঘের প্রবাসীর ৫৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

"রমাপ্রসাদ বাবু যে 'দ্বিজরাজের খেদোক্তি'কে 'ক্ষেপার উক্তি' বলিয়াছেন, তাহাও তাঁহার প্রথম আপত্তি অপেক্ষা বেশী যুক্তিযুক্ত নয়। প্রতিপক্ষের উক্তি মাত্রকেই যদি 'ক্ষেপার উক্তি' বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে রামমোহন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণকারীদের চরিত্রে এই ধরণের যে-সকল অপবাদ আরোপ করিয়াছেন, তাহাও 'ক্ষেপার উক্তি' বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে।"

প্রতিপক্ষের উক্তি মাত্রকেই রমাপ্রসাদ বাবু 'ক্ষেপার উক্তি' বলেন নাই, বিশেষ একটা উক্তিকে বলিয়াছেন।

রামমোহনকে ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণকারীদিগকে নৈতিকসদ্গুণ-শালিতা ও বিবেচকতা বিষয়ে ব্রজেন্দ্রবাবু সমতুল্য মনে করেন কি না জানি না। আমি সমতুল্য মনে করি না। অবশ্য রামমোহনের বিপক্ষেরা সকলে দুষ্ট লোক ছিলেন, ইহা বলাও আমার অভিপ্রেত নহে।

যাহা হউক, আমরা শতাধিক বৎসর আগেকার মানুষদের সম্বন্ধে কি মনে করি, তাহার আলোচনা না করিয়া তখনকার সমসাময়িক "নিরপেক্ষ" লোক কি মনে করিতেন তাহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারি।

মাঘের প্রবাসীর ৫৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ব্রজেন্দ্রবাবু "সমাচার দর্পণ" কাগজখানিকে "নিরপেক্ষ" বলিয়াছেন। এই নিরপেক্ষ কাগজখানি রামমোহনের কতকগুলি বিপক্ষের আচরণ বর্ণনা করিতে গিয়া "উন্মত্ততাপূর্ব্বক" এবং "রাগপূর্ব্বক" এই দুটি কথা প্রয়োগ করিয়াছেন। ("সংবাদপত্রে সেকালের কথা", দ্বিতীয় খণ্ড ৩৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা।) রমাপ্রসাদ বাবু ইহার বেশী কিছু করেন নাই।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী তারাবাঈ কালুরামরাও উরানকার বাঙ্গালোরে নিখিল-ভারত ক্ষত্রিয়-মহিলা-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভানেত্রীর কার্য্য করেন।

শ্রীমতী লিঙ্গম্মল টিনেভেলী জিলা-বোর্ডে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীমতী তারাবাঈ কালুরামরাও উরানকার

শ্রীমতী লিঙ্গম্মল

শ্রীমতী মেরী মাণিকভাসগম্ মান্দ্রাজ-সরকার কর্ত্তৃক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীমতী মেরী মাণিকভাসগম্

শ্রীমতী ভাসিনী জগসিয়া

শ্রীমতী ভাসিনী জগসিয়া নিখিল-ভারত সঙ্গীত-সম্মেলনের দিল্লী অধিবেশনে দ্বাদশ হইতে ষোড়শবর্ষীয়া বালিকাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাণী শ্রীযুক্তা সেতু পার্ব্বতীবাঈ ত্রিবান্দ্রমে নিখিল-ভারত সম্মেলনের বিগত অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করেন।

মহারাণী শ্রীযুক্তা সেতু পার্ব্বতীবাঈ

শ্রীমতী রাজকুমারী অমৃত কাউর ভারত-সরকার কর্ত্তৃক কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বোর্ডে সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীমতী হবিবা রসুল আলিগড় জেলার সেকেন্দ্রারাও মিউনিসিপালিটীর সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। ইনি বাঙালী।

শ্রীমতী ডাঃ ইন্দুমতী আদারকর এম-বি-বি-এস, ডি-এল-ও (বোম্বাই) এম-আর-সি-এস (লণ্ডন) বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীমতী ইকবল-উন্নিসা হোসেন, বি-এ, ডিপ-এড (লীড্‌স্), বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করিতে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা দেশে আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি। পুরাতন যুগের আলো তখন ম্লান হয়ে আস্‌ছে কিন্তু একেবারে বিলীন হয় নি। পিছন দিক থেকে কিছু ইঙ্গিতে, কিছু প্রত্যক্ষ, তার কতকটা পরিচয় পেয়েছি। তার মধ্যে জীর্ণ জীবনের বিকার অনেক ছিল, এখনকার আদর্শে বিচার করতে গেলে নানা দিকে তার শৈথিল্য তার দুর্ব্বলতা মনকে লজ্জিত করতে পারে। কিন্তু তখনকার প্রদোষের ছায়ায় এমন কিছু দেখা গেছে যা অস্তসূর্য্যের আলোর মতো, সে দিনকার ইতিহাসের রোকড়ের খাতায় তাকে অন্ধকারের কোঠায় ফেলা চলবে না। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সে কালের জীবনযাত্রায় সঙ্গীতের সমাদর।

দেখেছি তখনকার বিশিষ্ট পরিবারে সঙ্গীতবিদ্যার অধিকার বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ বলে গণ্য হোত। বর্ত্তমান সমাজে ইংরেজী রচনায় বানান বা ব্যাকরণের স্খলনকে যেমন আমরা অশিক্ষার লজ্জাকর পরিচয় বলে চম্‌কে উঠি, তেমনি হোত যদি দেখা যেত, সম্মানী পরিবারের কেউ গান শোনবার সময় শমে মাথা-নাড়ায় ভুল করেছে, কিম্বা ওস্তাদকে রাগ রাগিণী ফরমাসের বেলায় রীত রক্ষা করেনি। তাতে যেন বংশমর্য্যাদায় দাগ পড়ত। সৌভাগ্য-ক্রমে তখনো আমাদের সঙ্গীত রাজ্যে বক্‌স্ হার্ম্মোনিয়মের মহামারী কলুষিত করেনি হাওয়াকে। তম্বুরার তারে নিজের হাতে সুর বেঁধে সেটাকে কাঁধে হেলিয়ে আলাপের ভূমিকা দিয়ে যখন বড়ো বড়ো গীত-রচয়িতার ধ্রুপদগানে গায়ক নিস্তব্ধ সভা মুখরিত করতেন। সেই ছবির সুগম্ভীর রূপ আজো আমার মনে উজ্জ্বল আছে। দূর প্রদেশ থেকে আমন্ত্রিত গুণীদের সমাদর করে উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতের আসর রচনা করা সেকালে সম্পন্ন অবস্থার লোকের আত্মসম্মান রক্ষার অঙ্গ ছিল। বস্তুত তখনকার সমাজ বিদ্যার যে-কোন বিষয়কেই শিক্ষণীয় রক্ষণীয় ব'লে জানত। ধনীরা তাকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্বকে গৌরব বলে গ্রহণ করতেন। এই স্বতঃস্বীকৃত ট্যাক্সের জোরেই তখনকার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা সমাজে উচ্চশিক্ষার পীঠস্থানের সৃষ্টি ও পুষ্টিবিধান করতে পেরেছেন। তখন ধনের অবমাননা ঘটত যদি সমাজের সমস্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবার মহাসমবায়ে কোন ধনীর কৃপণতা প্রকাশ পেত। সরস্বতী তখন লক্ষ্মীর দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি করতে এসে মাথা হেঁট করতেন না, লক্ষ্মী স্বয়ং যেতেন ভারতীর দ্বারে অর্ঘ্য নিয়ে নম্র শিরে। এমনি সহজেই আত্মগৌরবের প্রবর্ত্তনায় ধনীরা দেশে সঙ্গীতের গৌরব রক্ষা করেছেন; সে ছিল তাঁদের সামাজিক কর্ত্তব্য। এর থেকে বোঝা যাবে সঙ্গীতকে তখনকার দিনে সম্মানজনক বিদ্যা ব'লেই গ্রহণ করেছে।

যে বিদ্যার সঞ্চরণ অক্ষরের ক্ষেত্রে, উপর নীচে তার দুই ভাগ ছিল। এক ছিল শ্রুতি স্মৃতি দর্শন ব্যাকরণের উচ্চ শিখর, আর ছিল জনশিক্ষার নিম্নভূমিবর্ত্তী উপত্যকা। উভয়কেই চিরদিন পালন করে এসেছেন সমাজের গণ্য ব্যক্তিরা। নানা উপলক্ষ্যে তাঁদেরই নিবেদিত দানের নিরন্তর সাহায্যে নিঃস্বপ্রায় অধ্যাপকেরা বিনাবেতনে দুর্গম শাস্ত্র-ভাণ্ডারের সকল প্রকার বিদ্যা বিতরণ করে এসেছেন। বিশেষ বিশেষ স্থানে এই সকল বিদ্যার বিশেষ কেন্দ্র ছিল, আবার ছোট আকারে নানা স্থানে নানা গ্রামে এক একটি ছায়াঘন ফলবান বনস্পতির মতো এরা মাথা তুলেছে। অর্থাৎ দেশের উচ্চ শিক্ষাও দুটি-একটি দূরবর্ত্তী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবদ্ধ ছিল না, তার দানসত্র ছিল দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই। তেমনি আবার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালা প্রত্যেক গ্রামের প্রধানদের বৃত্তিতে পালিত এবং তাঁদের দালানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধনী দরিদ্রের ভেদ ছিল না। এর দায়িত্ব রাজার অধিকারে ছিল না, ছিল সমাজের আপন হাতে।

সঙ্গীত সম্বন্ধেও তেমনি ছিল দুই ধারা। উচ্চ সঙ্গীতের ব্যয়সাধ্য চর্চ্চার ক্ষেত্র ছিল ধনশালীদের বৈঠকখানায়। সে…

সঙ্গীত সর্ব্বদা কানে পৌছত চারদিকের লোকের, গানের সুর-সেচনে বাতাস হ'ত অভিষিক্ত। সঙ্গীতে যার স্বাভাবিক অনুরাগ ও ক্ষমতা ছিল সে পেত প্রেরণা, তা'তে তার শিক্ষার হ'ত ভূমিকা। যে-সব ধনীদের ঘরে বৃত্তিভোগী গায়ক ছিল, তাদের কাছে শিক্ষা পেত কেবল ঘরের লোক নয়, বাইরের লোকও। বস্তুত এই সকল জায়গা ছিল উচ্চ সঙ্গীত শিক্ষার ছোট ছোট কলেজ। বিখ্যাত বাঙালী সঙ্গীতনায়ক যদুভট্ট যখন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে; কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল, কেউ শিখত রাগরাগিণীর আলাপ। এই কলরবমুখর জনসমাগমে কোথাও কোনো নিষেধ ছিল না। বিদ্যাকে রক্ষা করবার ও ছড়িয়ে দেবার এই ছিল সহজ উপায়।

এই তো গেল উচ্চ সঙ্গীত। জনসঙ্গীতের প্রবাহ সেও ছিল বহু শাখায়িত। নদীমাতৃক বাংলা দেশের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যেমন ছোট-বড় নদী-নালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায়। বাঙালীর হৃদয়ে সে রসের দৌত্য করেছে নানা রূপ ধ'রে। যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কবির গান, কীর্ত্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। লোকসঙ্গীতের এত বৈচিত্র্য আর কোনো দেশে আছে কি না জানিনে। সখের যাত্রা সৃষ্টি করার উৎসাহ ছিল ধনী সন্তানদের। এই সব নানা অঙ্গের গান ধনীরা পালন করতেন, কিন্তু অন্যদেশের বিলাসীদের মতো এ সমস্ত তাঁদের ধনমর্য্যাদার বেড়া-দেওয়া নিভৃতে নিজেদেরই সম্ভোগের বস্তু ছিল না। বাল্যকালে আমাদের বাড়িতে নলদময়ন্তীর যাত্রা শুনেছি। উঠোন-জোড়া জাজিম ছিল পাতা, সেখানে যারা সমাগত তাদের অধিকাংশই অপরিচিত, এবং অনেকেই অকিঞ্চন, তার প্রমাণ পাওয়া যেত জুতো চুরির প্রাবল্যে। আমার পিতার [illegible] ছিল কিশোরী চাটুজ্জে। পূর্ব্ব বয়সে সে ছিল কোনো পাঁচালির দলের নেতা। সে আমাকে প্রায় বলত, দাদা, তোমাকে যদি পাঁচালির দলে পাওয়া যেত তা হ'লে— কিছু আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারত না। বালক [illegible]রও মন চঞ্চল হয়ে উঠত পাঁচালির দলে খ্যাতি অর্জ্জন [illegible] অসম্ভব দুরাশায়। পাঁচালির যে গান তার কাছে শুনতুম তার রাগিণী ছিল সনাতন হিন্দুস্থানী, কিন্তু তার সুর বাংলা কাব্যের সঙ্গে মৈত্রী করতে গিয়ে পশ্চিমী ঘাঘরার ঘূর্ণাবর্ত্তকে বাঙালী শাড়ীর বাহুল্যবিহীন সহজ বেষ্টনে পরিণত করেছে।—

"কাতরে রেখো রাঙা পায় মা, অভয়ে, দীনহীন ক্ষীণ জনে যা করো মা, নিজগুণে, তারিতে হবে অধীনে, আমি অতি নিরুপায়।"

—এই সুর আজো মনে পড়ে। সূর্য্যের কিরণচ্ছটা বহু লক্ষ যোজন দূর পর্য্যন্ত উৎসারিত হয়ে ওঠে, এই তার তানের খেলা। আর আমার শ্যামা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল প্রভাতের রূপোলী কল্কা আর সূর্য্যাস্তকালের সোনালী জরির আঁচলা নিয়ে তন্বীর গায়ে গায়ে ঘিরে ঘিরে দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁপতে থাকে। কিন্তু এও তো ঐশ্বর্য্য, এও তো চাই।

'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি নে"। এতে তানের প্রগল্ভতা নেই কিন্তু বেদনা আছে তো। এও যে নিতান্তই চাই সাধারণের জন্যে। শুধু সাধারণের জন্যে কেন বলি, এক সময়ে উচ্চ ঘরের রসনাও তৃপ্তির সঙ্গে এর স্বাদ গ্রহণ করেছে। মেয়েদের অশিক্ষিতপটুত্বের কথা কালিদাস বলেছেন, সরল প্রকৃতির লোকের অশিক্ষিত স্বাদ সম্ভোগের কথাটাও সত্য। যে ঘরের পাকশালার দূর পাড়া পর্য্যন্ত মোগলাই ভোজের লোভন গন্ধে আমোদিত, সেই ঘরেই বিধবা মাসীমার রাঁধা মস্‌লা-বিরল নিরামিষ ব্যঞ্জনের আদর হয়ত তার চেয়েও নিত্য হয়।—

"মনে রইল সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি-বলি আর বলা হোলো না।"—

এ যে অত্যন্ত বাঙালা গান। বাঙালীর ভাবপ্রবণ হৃদয় অত্যন্ত তৃষিত হয়েই গান চেয়েছিল, তাই সে আপন সহজ গান আপনি সৃষ্টি না ক'রে বাঁচেনি।

তাই আজো দেখতে পাই বাংলা সাহিত্যে গান যখন তখন যেখানে সেখানে অনাহূত অনধিকারপ্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এতে অন্যদেশীয় অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত রীতি ভঙ্গ হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের রীতি আমাদেরই স্বভাব-সঙ্গত। তাকে ভৎ'সনা করি কোন্ প্রাণে? সেদিন আমাদের নটরাজ শিশির ভাদুড়ী মশায় কোনো শোকাবহ

অতি গম্ভীর নাটকের জন্য আমার কাছে গান ফরমাস করে বসলেন। কোনো বিলাতী নাট্যেশ্বর এমন প্রস্তাব মুখে আনতেন না, মনে করতেন এটা নাট্যকলার মাঝখানে একটা অত্যুৎপাত। এখনকার ইংরেজী পোড়োরাও হয়ত এরকম অনিয়মে তর্জ্জনী তুলবেন; আমি তা করিনে, আমি বলি আমাদের আদর্শ আমাদের নিজের মন আপন আনন্দের তাগিদে স্বভাবতই সৃষ্টি করবে। সেই সৃষ্টিতে কলাতত্ত্বের সংযম এবং ছন্দ বাঁচিয়ে চলতে হবে, কিন্তু তার চেহারা যদি সাহেবী ছাঁচের না-হয় তবে তাকে পিটিয়ে বদল করতেই হবে একথা বলতে পারব না। বিদেশী অলঙ্কারশাস্ত্র পড়বার বহু পূর্ব্ব থেকে আমাদের নাট্য, যাকে আমরা যাত্রা বলি, সে তো গানের সুরেই ঢালা। সে যেন বাংলা দেশের ভূসংস্থানেরই মতো, সেখানে স্থলের মধ্যে জলের অধিকারই যেন বেশি। কথকতা যেটা অলঙ্কারশাস্ত্রমতে ন্যারেটিভ শ্রেণীভুক্ত, তার কাঠামো গদ্যের হ'লেও স্ত্রীস্বাধীনতা যুগের মেয়েদের মতোই গীতকলা তার মধ্যে অনায়াসেই অসঙ্কোচে প্রবেশ করত। মনে তো পড়ে একদিন তাতে মুগ্ধ হয়েছিলুম। সাহিত্যরচনার প্রচলিত পাশ্চাত্য বিধির কথা স্মরণ করে' উদ্বেল আনন্দকে লজ্জিত হয়ে সংযত করিনি তো।

যাই হোক, আমার বলবার কথা এই যে, আত্মপ্রকাশের জন্যে বাঙালী স্বভাবতই গানকে অত্যন্ত করে' চেয়েছে। সেই কারণে সর্ব্বসাধারণে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-রীতির একান্ত অনুগত হোতে পারে নি। সেই জন্যেই কানাড়া আড়ানা মালকোষ দরবারী তোড়ির বহুমূল্য গীতোপকরণ থাকা সত্ত্বেও বাঙালাকে কীর্ত্তন সৃষ্টি করতে হয়েছে। গানকে ভালবেসেছে বলেই সে গানকে আদর ক'রে আপন হাতে আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করতে চেয়েছে। তাই আজ হোক কাল হোক বাংলায় গান যে-উৎকর্ষলাভ করবে সে তার আপন রাস্তাতেই করবে আর কারো পাথরজমানো বাঁধা রাস্তায় করবে না।

যে সূত্রে এই প্রবন্ধ রচনা সুরু করেছিলেম সেই সূত্রটি এইখানে আর একবার ধরা যাক্। দেশের সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের প্রাধান্য ছিল, আমাদের বিদায়োন্মুখ পূর্ব্বযুগের দিকে তাকিয়ে সেই কথাটি জানিয়েছি। তার পরে বয়স যতই বাড়তে লাগল ততই অন্য এক যুগের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলুম যে-যুগে ছেলেরা প্রথম বয়স থেকে কলেজের উচ্চ ডিগ্রির দিকে মাথা উঁচু ক'রে নোট মুখস্থ করতে লেগেছে; তখন গানটাকে সম্মানীয় বিদ্যা বলে গণ্য করবার ধারণা লুপ্ত হয়ে এল; যে-সব বড়ো ঘরে গাইয়েরা আদর ও আশ্রয় পেয়ে এসেছে সেখানে সঙ্গীতের ভাঙা-বাসায় পড়ামুখস্থর গুঞ্জনধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠল, তখনকার যুবকদের এমন একটি শুচিবায়ুতে পেয়ে বসল যাতে দুর্গতিগ্রস্ত গানব্যবসায়ীর চরিত্রের সঙ্গে জড়িত করে' গান বিদ্যাটিরই পবিত্ররূপকে বীভৎস ব'লে কল্পনা করতে লাগল। বাংলা দেশের শিক্ষাবিভাগে সঙ্গীতকে স্বীকার করতে পারে নি। তাই সঙ্গীতে রুচি, অধিকার ও অভিজ্ঞতা না থাকাটাকে অশিক্ষার পরিচয় ব'লে কোনো লজ্জা বোধ করার কারণ তখনকার শিক্ষিতমণ্ডলীর মনে রইল না। বরঞ্চ সে দিন যে-সব ছেলে হিতৈষীদের ভয়ে চাপা গলায় গান গেয়েছে তাদের চরিত্রে হয়েছে সন্দেহ।

অপর পক্ষে সেই সময়টাতে অনেক সৎকাজের সূচনা হয়েছে সে কথা মানতে হবে। তখন আমাদের পলিটিক্স সাবধানে দুই কূল বাঁচিয়ে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে মাথা তুলছে, বক্তৃতামঞ্চে ইংরেজী বাণী হাততালি পাচ্চে, খবরের কাগজের মুখ ফুটতে সুরু করেছে, সাহিত্যে দুই একজন অগ্রণী পথে বেরিয়েছেন। কিন্তু দেশে বড়ো বড়ো প্রাচীন সরোবর বুজে গিয়ে তার উপরে আজ যেমন চাষ চল্‌ছে, তেমনি তখন সঙ্গীতের রসসঞ্চয় অন্ততঃ শিক্ষিত পাড়ায় প্রায় মরে এসেছে, তার উপরে এগিয়ে চলেছে পাঠ্যপুস্তকের আবাদ।

আপন নীরসতাকে শুচিতা ব'লে সম্মান দিয়েছিল যে-যুগ সে যে আজো অটল হয়ে আছে তা আমি বলি নে। বাঙালার প্রকৃতি আজ আবার আপন গানের আসর খুঁজে বেড়াচ্ছে, সুরের উপাদান সংগ্রহ করতে সৃষ্টি করচে। দেশের বিদ্যায়তন এই শুভ মুহূর্ত্তে তার আনুকূল্য করবে একান্ত মনে এই কামনা করি।

দৈবক্রমে যে সুযোগ আমি পেয়েছিলুম সে কথা মনে পড়চে। আমার ভাগ্যবিধাতাকে আমি নমস্কার করি। আমি যখন জন্ম নিয়েছি তখন আমাদের পরিবারের গ্রহ জনতার বাইরে। সমাজে আমরা ব্রাত্য। আমাদের পরিবারে পরীক্ষাপাসের সাধনা সেদিন গৌরব পায় নি।

আমার দাদারা দুই একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার একটুখানি পেরিয়ে ফিরে এসেছেন ডিগ্রিবর্জ্জিত নিভৃতে। সেটা ভালো করেছেন তা আমি বলি নে। কিন্তু তার ফল হয়েছিল এই যে, ডিগ্রিলাঞ্ছিত শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার আর কোনো পরিচয় গ্রাহ্য নয়, এই অন্ধ সংস্কারটা আমাদের ঘরে থাকতেই পারে নি। আমার ভাইরা দিনরাত নিজের ভাষায় তত্ত্বালোচনা করেছেন, কাব্যরস আস্বাদনে ও উদ্ভাবনে তাঁরা ছিলেন নিবিষ্ট, চিত্রকলাও ইতস্তত অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, তার উপরে নাট্যাভিনয়ে কারো কোনো সঙ্কোচমাত্র ছিল না। আর সমস্ত ছাড়িয়ে উঠেছিল সঙ্গীত। বাঙালীর স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতা কোনো বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মত উৎসারিত হয়েছিল। বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদীগানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি সকালে সন্ধ্যায় উৎসবে আমোদে উপাসনা-মন্দিরে তাঁর গান, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গান চর্চ্চা করেছেন, আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করেছেন বাংলা ভাষায়। এর মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই, চিরাভ্যস্ত সেই সব প্রাচীন গানের নিবিড় আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও তাঁরা আপন মনে যে-সব গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তার রূপ তার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, গীতপণ্ডিতদের কাছে তা অবজ্ঞার যোগ্য। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা নষ্ট করে' এখানেও তাঁরা ব্রাত্য-শ্রেণীতে ভুক্ত হয়েছেন।

গান বাজনা নাট্যকলাকে অক্ষুণ্ণ সম্মান দেবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম তার একটা বিশেষ পরিচয় দিই। আমার ভাইঝিরা শিশুকাল থেকে উচ্চ অঙ্গের গান বিশেষ যত্নে শিখেছিলেন। সেটা তখনকার দিনে নিন্দার্হ না হলেও বিস্ময়ের বিষয় ছিল। আমাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য নাট্যমঞ্চে তাঁরা যেদিন গান গেয়েছিলেন সেদিন সামাজিক হাওয়া ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তখনকার দিনের খবরের কাগজের বিষদাঁত আজকের মতো এমন উগ্র হয়নি, তাহ'লে অপমান মারাত্মক হয়ে উঠত। তার পরে এই জাতীয় অত্যাচার আরো ঘটেছিল। এর চেয়ে উচ্চ সপ্তকে নিন্দা পেয়েও সঙ্কোচ বোধ করি নি। তার কারণ কেবলমাত্র কলেজি বিদ্যাকে নয় সকল বিদ্যাকেই শ্রদ্ধা করবার অভ্যাস আমাদের পরিবারে প্রচলিত ছিল।

আমাদের দেশের শিক্ষা-বিভাগ কলাবিদ্যার সম্মানকে শিক্ষিত মনে স্বাভাবিক ক'রে দেবেন এই নিবেদন উপস্থিত করবার অভিপ্রায়ে এই ভূমিকামাত্র আজ প্রস্তুত ক'রে এনেছি। আর যা-কিছু আমার করবার আছে সে নানা অসামর্থ্য সত্ত্বেও আমার বিদ্যালয়ে আমি প্রবর্ত্তিত করেছি।

মানুষ কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করে নি, অনির্ব্বচনীয়কে উপলব্ধি করেছে। আদিকাল থেকে মানুষের সেই প্রকাশের দান প্রভূত ও মহার্ঘ। পূর্ণতার আবির্ভাব মানুষ যেখানেই দেখেছে কথায়, সুরে, রেখায়, বর্ণে, ছন্দে, মানব সম্বন্ধের মাধুর্য্যে, বীর্য্যে, সেইখানেই সে আপন আনন্দের সাক্ষ্যকে অমর-বাণীতে স্বাক্ষরিত করেছে; শিক্ষার্থী যারা তারা সেই বাণী থেকে বঞ্চিত না হোক এই আমি কামনা করি; শুধু উপভোগ করবার উদ্দেশে জগতে জন্মগ্রহণ করে' সুন্দরকে দেখেছি, মহৎকে পেয়েছি, ভালবেসেছি ভালবাসার ধনকে, এই কথাটি মানুষকে জানিয়ে যাবার অধিকার ও শক্তি দান করতে পারে এমন শিক্ষার সুযোগ পেয়ে দেশ ধন্য হোক, দেশের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা অমৃতঅভিষিক্ত গীতলোকে অমরত্ব লাভ করুক।*

* বাংলার নবশিক্ষাসঙ্ঘের প্রথম অধিবেশনে পঠিত। ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৩৩৭

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন*

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাস শব্দটি প্রাচীন। পঞ্চতন্ত্র রঘুবংশ অভিজ্ঞান-শকুন্তল উত্তররামচরিত ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতক প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রবাসী শব্দটিও পুরাতন। সুতরাং যখন ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি এলাহাবাদ হইতে এই মাসিকপত্রটি বাহির করিবার সঙ্কল্প স্থির করি, তখন আমাকে প্রবাসী শব্দটি রচনা করিতে হয় নাই। কিন্তু এই মাসিকপত্রটির এই নাম দিবার পূর্ব্বে আমাকে অন্যান্য কয়েকটি নামের বিষয়ও চিন্তা করিতে হইয়াছিল। শেষে যখন প্রবাসী নাম রাখাই স্থির করিলাম, তখনও যে উহার সমালোচনা শুনিতে হয় নাই, বা আমারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না, এমন নয়।

সম্মেলনের সভামঞ্চ। বীরেন্দ্রনাথ বসুর সৌজন্যে

যাহা হউক, এই কাগজখানার নাম প্রবাসী রাখায় পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া লোকমুখে ও ছাপার অক্ষরে প্রবাসী শব্দটির ব্যবহার যত বার হইয়াছে, আগে তত বার বোধ হয় ৩৫ বৎসরে কখনও হয় নাই। বঙ্গের বাহিরে যে-সকল বাঙালী স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বাস করেন, তাঁহাদিগকে প্রবাসী বাঙালী বলা হয়, তাঁহাদের বিষয়ে এই কাগজখানাতে যত বেশী বার যত বেশী লেখা হইয়াছে, ইহার জন্মের পূর্ব্বে ও পরে বোধ হয় কোন বাংলা পত্রিকায় তত বার তত লেখা হয় নাই। ইহার প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যার গোড়াতেই জয়পুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী পরলোকগত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছবি ছিল ও ভিতরে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লেখা ছিল। ঐ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় প্রবাসী বাঙালীর একখানি স্নেহাপ্লুত পরিহাসাত্মক ছবিও ছিল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" নামক যে

উদ্যান-সম্মেলন শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি

বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন এবং, আশা করি, যাহার আরও এক-খণ্ড তাঁহার বাংলা অভিধানের নূতন সংস্করণ বাহির হইয়া গেলে

* এই প্রবন্ধটির যে-সকল ছবির নীচে কোন ফোটোগ্রাফারের নাম নাই, সেগুলির ফোটোগ্রাফ শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রকুমার মজুমদার সৌজন্য-সহকারে তুলিয়া দিয়াছেন।

তালকটোরা উদ্যান-সম্মেলনে সভাপতিসমূহ প্রতিনিধিবর্গ প্রভৃতি দীর্ঘ ফোটোগ্রাফের বাম অংশ,

দীর্ঘ ফোটোগ্রাফের মধ্য অংশ,

এবং দীর্ঘ ফোটোগ্রাফের দক্ষিণ অংশ। শ্রীযুক্ত এ, আর্, দত্তের সৌজন্যে।

তিনি প্রকাশ করিতে পারিবেন, তাহারও উৎপত্তি "প্রবাসী" হইতে হয়। প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে বিজ্ঞাপিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রবাবু সেই পদকটি পান এবং তাঁহার প্রবন্ধটি "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয়। অতএব, প্রবাসী প্রবাসী বাঙালী প্রভৃতি কথার আধুনিক প্রয়োগ ও প্রচলনের দায়িত্ব ও অপরাধ আমি অস্বীকার করিতে পারি না। নয়া দিল্লীর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। যে-কেহ সেই প্রবন্ধ শুনিয়াছেন বা পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন, যে, ইহার জন্মের জন্য আংশিক দায়িত্বও আমার ছিল না, তাহার জন্য গৌরব ত নিশ্চয়ই আমার প্রাপ্য নহে; কিন্তু ইহার বর্ত্তমান নামটির জন্য পরোক্ষ দায়িত্ব হয়ত এই একটু ছিল, যে, ইহার নামকরণ যখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল, তখন হয়ত নামদাতারা আমার কাগজখানার নামের দ্বারা ও তাহাতে বহুবার ব্যবহৃত প্রবাসী বাঙালী শব্দ দুটি দ্বারা অজ্ঞাতসারে বিপথ-চালিত হইয়াছিলেন। উপরে শুধু আমার দায়িত্বের কথা বলি নাই, অপরাধের কথাও বলিয়াছি। তাহা বলিবার কারণ এই, যে, সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশনেই দেখিলাম কেহ-না-কেহ উহার "প্রবাসী" নামটির সমালোচনা করিয়াছেন, এবং, যদি নামটি পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও কেহ-না-কেহ করিবেন। যে নাম সমালোচনার কারণীভূত, তাহার জন্য পরোক্ষ দায়িত্ব খুব সামান্য থাকিলেও তাহা অপরাধ বিবেচিত হইতে পারে।

বঙ্গের বাহিরে যে-সব বাঙালী বাস করেন, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাদের কর্ম্মস্থানে ঘরবাড়ী করিয়া সপরিবারে বাস করেন; তাঁহাদের অনেকের বঙ্গে এখন ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত নাই বা না-থাকার মধ্যে। তাঁহাদিগকে ঠিক প্রবাসী বলা যায় না—বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের ও যাঁহাদের পিতৃপিতামহের জন্ম হইয়াছে বঙ্গের বাহিরে। যাঁহারা অস্থায়ী ভাবে বঙ্গের বাহিরে থাকেন, তাঁহাদিগকেও ঠিক প্রবাসী বলা চলে কি না তাহা নির্ণয় করিবার মত সংস্কৃত জ্ঞান আমার নাই; তবে বাংলায় হয়ত চলে। ইহার উপর আরও একটি তর্ক আছে—"ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, ভারতবর্ষের যেখানেই থাকি তাহা প্রবাস নহে।" ইহা রাষ্ট্রনৈতিক তর্ক, এবং সত্যও বটে। কিন্তু যে-সব বাঙালী বঙ্গের বাহিরে কোথাও স্থায়ী ভাবে ২।৩।৪ পুরুষ বাস করিতেছেন তাঁহারাও কি তত্রত্য পূর্ব্বতন ভিন্ন-ভাষাভাষী সেই সব বাসিন্দার সহিত মিশিয়া একসমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছেন যাঁহারা পুরুষানুক্রমে আরও দীর্ঘকাল সেখানে বাস করিতেছেন? ভারতভক্তিজাত ভাবুকতা হইতে আমরা যাহাই বলি না কেন, অতি অল্পসংখ্যক বাঙালী-অবাঙালী বিবাহ হইলেও, বাঙালীর ঔদ্বাহিক ক্রিয়াকলাপ বাঙালীর সঙ্গেই করিতে হইতেছে, এবং আরও কত দীর্ঘকাল করিতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। একটি সাধারণ ভারতীয় সংস্কৃতি (culture) এবং চিন্তা ও ভাবের ধারা থাকিলেও ভারতের প্রত্যেক ভাষাভাষীর এক একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি এবং ভাব ও চিন্তার ধারাও আছে। বাঙালীর সংস্কৃতি এবং ভাবচিন্তাধারা অন্যদের চেয়ে উৎকৃষ্ট এ দাবী করিতেছি না, কিন্তু তাহার নিকৃষ্টতাও স্বীকার করি না। যাঁহাকে বাঙালী সমাজে থাকিতে হইবে, তাঁহাকে বাঙালীর সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, ভাবচিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে ও তৎসমুদয়কে নিজের করিতে হইবে। প্রবাসী

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন দ্বারা এই উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হয়।

আমাদের এই সম্মেলনের প্রবাসী নামের বিরুদ্ধে যা-কিছু বলা যাইতে পারে, স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় ইহার গোরখপুরের অধিবেশনে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে সংক্ষেপে তাহা প্রায় সমস্তই বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবাসী নামটারও যে কিছু সার্থকতা আছে, তাহা তিনি মানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করি।

উদ্যান-সম্মেলনে মহিলা-বিভাগের নেত্রী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী ও তাঁহার কন্যা

যদিচ আমরা বাঙ্গালা দেশের বাইরে বাস করি, তবু নিজেদের প্রবাসী বল্‌তে আমি সঙ্কোচ করি। ভারতে বাস ক'রে ভারতবাসী নিজেকে পরবাসী কি ক'রে বলবে? সেটা বড়ই অশোভন। তাই আমি প্রথম থেকেই প্রবাসী আখ্যার বিরোধী। একবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার এ-সম্বন্ধে কথা হয়; তিনিও 'প্রবাসী' নামের পক্ষপাতী নন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'বহির্বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' বললে কি রকম হয়; তিনি বলেছিলেন—বেশ ভাল কথা, 'বহির্বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন' বলতে পার অথবা 'বঙ্গেতর সাহিত্য-সম্মেলন' বলতে পার। যদিও আমাদের এ সম্মেলনের একাধিক বার নাম পরিবর্ত্তন হয়েছে, তবু আমি এ-বিষয়ে পরিচালকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি। তবে এ-কথা বলতেই হবে, 'প্রবাসী' নামটা চলে গেছে, কেমন যেন ছাড়ানো যায় না। প্রবাস কথাটার মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙ্গালা দেশের বাইরে। প্রবাসী নামে যত কিছুই আপত্তি উত্থাপন করি না কেন, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে বাঙ্গালা দেশ আমাদের আপন দেশ, আমাদের মাতৃভূমি, বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। প্রতি বৎসর এ সম্মেলন আমাদের একথাটি নূতন ক'রে যেন মনে করিয়ে দেয়। এ দেশকে আমরা আপন দেশ বলে ম'নে করব, কিন্তু জন্মভূমি যে সকল দেশের চেয়ে আপন তা ভুললে চলবে কেন? তাতে এ দেশকে একটুও অবজ্ঞা করা হয় না। আমরা অনেক স্ত্রীলোককে 'মা' বলে সম্বোধন করি, তাতে মাতৃত্বের গৌরব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যে মা পেটে ধরেছে সে মা কিন্তু অন্য মা'দের চেয়ে একটু পৃথক, সে জননী, শুধু মা নয়। বাঙ্গালা জননী, এ-কথাটি মনে রাখা বড় দরকার।

উদ্যান-সম্মেলনে কার্য্যকরী সভার সভাপতি রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন আমার দেশের কয়েকটি ভাই আমাদের তাদের নবজাত পত্রিকার জন্য একটি কবিতা বা গান লিখে পাঠাতে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন। তখন আমার দেশের গ্রামখানির কথা মনে পড়ে গেল। সেই পদ্মানদীর ধার, সেই খোলা মাঠ, খোলা প্রাণ, পাখীর গান, বকুল ফুল, হরির লুটের বাতাস, মায়েদের ভালবাসা, ছেলেদের সঙ্গে খেলা, সব মনে পড়ে গেল। আমার সেই মিষ্ট দেশটি আমার চোখের সামনে আমার প্রাণের সামনে ভাসতে লাগল, ভাল করে মনে হ'ল আমি ভুলি নি ভুলিনি আমার দেশমাতাকে যদিও প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর সে গ্রামখানিতে যাই নি। দূর দেশে থাকলে কি হবে, মার টান বড় টান।

যদিও এ-দেশও আমাদের দেশ, এ-দেশেই আমরা অনেকে ঘর বেঁধেছি, নানা কাজে এ-দেশেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, এ-দেশের লোকদের বড় আপন মনে হয়, তাদের স্নেহ করি, তাদের স্নেহ পাই, তাদের সেবা করে আনন্দ পাই, কৃতার্থ হই, হয়ত এ-দেশেই ছাইটুকু রেখে যাব, তবু—তবু—সেই যে বড় বড় নদীর দেশ, বর্ষা ও ঝড়ের দেশ,

সেই যে ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট আমার ভাইবোনগুলি, আর সেই যে ভাটিয়ালী বাউল ও কীর্ত্তন গান, সেই যে ভাবপ্রবণ জাতিটি, আর সেই যে আমার অতি মিষ্ট বাঙ্গালা কথা ও বাঙ্গালা ভাষা, সে যে আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, তাকে ত ভুলতে পারি না।

তবে এ কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, যদিও আমরা জন্মভূমি থেকে দূরে রয়েছি, তবু এ-দেশও আমাদেরই দেশ, এ আমাদের জন্মভূমি না হলেও কর্ম্মভূমি অন্নভূমি। এ দেশই আমাদের জীবিকার সংস্থান করে দিচ্ছে। অনেক বাঙ্গালী আছেন যাঁদের এ দেশই জন্মভূমি। এ দেশের অধিবাসীরা আমাদের ভাইবোন; ভাইবোন ভেবেই এদের বুকে টেনে নিতে হবে। অন্তরের ভালবাসা এদের দেওয়া চাই। মনে বা মুখে এ দেশের লোকদের তাচ্ছিল্য করলে নিজেদেরই হীনতা ও অনুদারতা প্রকাশ পাবে। চাণক্য বলে গেছেন—'উদারচরিতানাম্ভ বসুধৈব কুটুম্বকম্'—মনে রাখবার কথা, জীবনে পালন করবার কথা।

তালকটোরা উদ্যান-সম্মেলনে প্রবাসী-সম্পাদকের একটি কাগজ দর্শন

অতুলপ্রসাদ ঠিকই বলিয়াছিলেন।

নয়া দিল্লীর অধিবেশনে শ্রীমতী শৈলবালা দেবী মহিলা-বিভাগের অভ্যর্থনা-সমিতির নেত্রীরূপে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও যথার্থ। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"যখন বাংলা দেশে ছিলাম তখন জন্মভূমিকেই একমাত্র স্বদেশ বলিয়া জানিতাম, কিন্তু প্রবাসে থাকিয়া আমাদের মনের প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে—

হইয়া প্রবাসী হয়েছে ধারণা
ভারত আমার দেশ,
স্বদেশ আমার বিশাল বিপুল
নরনারী নানা বেশ।
নহি আর আমি গণ্ডীর মাঝে
বাংলা দেশের আঁকা
হৃদয়ের টান হয়েছে আমার
সকল ভারতে মাখা।
মহান ভারত আমার স্বদেশ
আমি যে ভারতবাসী
তাহাতেই মনে গৌরব সাথে
জাগে আনন্দরাশি।
তবু মাঝে মাঝে জেগে উঠে তার
শ্যামল মূর্ত্তি খানি
কত অতীতের স্নেহ স্মৃতি আর
কত সুমধুর বাণী।

"যদিও অনেক কাল দেশছাড়া তবু সেই স্নেহ মায়া যে বাঙ্গালীর মুখে দেখিতে পাই, সেই সুমধুর বাণী যেন বাঙ্গালী[illegible] মুখে শুনি। আজ মনে হয় পুণ্যভূমি ভারতের যেখানে বা[illegible] করি সেই আমার দেশ। ভারতবাসী মাত্রেই আমা[illegible] স্বজাতীয়, আমাদের প্রীতি স্নেহ শ্রদ্ধা সকলের উপরে[illegible] রাখিতে হইবে। তবুও বাংলার সহিত অন্তরের নি[illegible] যোগ—সুমধুর মাতৃভাষা ও ভাবধারার ঐক্যের মধ্য [illegible] আগে আমরা বাঙ্গালী পরে ভারতবাসী। বাঙ্গালী [illegible] বাঙ্গালীর কত আপনার বাঙ্গালী-বিহীন দেশে গেলে [illegible] বুঝা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা কাশ্মীর গিয়াছিল[illegible]। ডিঙ্গিতে অবিরত নানা জাতীয় লোক ভ্রমণে বাহির হ[illegible] আমি বোটের জানালায় বসিয়া কিংবা বেড়াইতে বাহির [illegible] সর্ব্বদা বাঙ্গালী খুঁজিতাম। নানাদেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ[illegible] লোক চলিয়া যাইত, বাঙ্গালী কদাচিৎ চোখে পড়ি[illegible]। একদিন বেড়াইতে গিয়া দূর হইতে একখানি বোটে বাঙ্গা[illegible] মহিলা দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাদের সহিত আলাপ ক[illegible] গেলাম। তাঁহারাও আমাদের দেখিয়া খুব আনন্দিত হই[illegible]। তাঁহারা ছিলেন মুঙ্গেরপ্রবাসী। এই মনের টানের [illegible] কারণ আমাদের চিন্তার ধারা এক। এই যোগসূত্র য[illegible]

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের নয়া দিল্লী অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকগণ

ঘনিষ্ঠতর হয় ইহাই আমাদের এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা। এই জন্য প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন বাঙ্গালী জাতির বিশেষ কল্যাণকর। বৎসর বৎসর গুণী জ্ঞানী, চিন্তাশীল ও বিদ্বান লোকের মেলামেশা ও আলোচনা হয়, আমরাও বিদুষী মহিলাগণের আগমনে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করি এবং আগ্রহের সহিত আমরা এই মিলনের প্রত্যাশা করিয়া থাকি। আমরা জন্মভূমি হইতে যত দূরেই থাকি আমরা বাঙ্গালী। আমরা চাই আমাদের পুত্রকন্যারাও বাঙ্গালা হইবে, বাংলার প্রাণ হইতে, ভাবধারা হইতে, তাহারা যেন বিচ্যুত না হয়। এ বাংলা ভাষাকেই যেন তাহারা মাতৃভাষা বলিয়া মনে করে। যেন সুশিক্ষা দ্বারা তাহাদের মধ্যে যথার্থ মনুষ্যত্ব জাগিয়া ওঠে।"

কলিকাতায় সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং সর্ব্বাগ্রে স্মর্ত্তব্য। তিনি বলেন :—

"এমন এক দিন ছিল যখন বাংলা প্রদেশের বাহিরে বাঙালী পরিবার দুই এক পুরুষ যাপন করতে করতেই বাংলা ভাষা ভুলে যেত। ভাষার যোগই অন্তরের নাড়ীর যোগ,—সেই যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হলে মানুষের পরম্পরাগত বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। বাঙালীচিত্তের যে বিশেষত্ব, মানবসংসারে নিঃসন্দেহ তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেখানেই তাকে হারাই সেখানেই সমস্ত বাঙালী জাতির পক্ষে বড়ো ক্ষতির কারণ ঘটা সম্ভব। নদীর ধারে যে জমি আছে তার মাটিতে যদি বাঁধন না থাকে তবে তট কিছু কিছু করে ভেঙে পড়ে; ফসলের আশা হারাতে থাকে। যদি কোনো মহাবৃক্ষ সেই মাটির গভীর অন্তরে দূরব্যাপী শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এঁটে ধরে, তা হলে স্রোতের আঘাত থেকে সে ক্ষেত্রে রক্ষা পায়। বাংলা দেশের চিত্তক্ষেত্রকে তেমনি করেই ছায়া দিয়েছে ফল দিয়েছে নিবিড় ঐক্য ও স্থায়িত্ব দিয়েছে বাংলা সাহিত্য। অল্প আঘাতেই সে খণ্ডিত হয় না। একদা আমাদের রাষ্ট্রপতিরা বাংলা দেশের মাঝখানে বেড়া তুলে দেবার যে প্রস্তাব করেছিলেন সেটা যদি আরো পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে ঘটত তবে তার আশঙ্কা আমাদের এত তীব্র আঘাতে বিচলিত করতে পারত না। ইতিমধ্যে বাংলার মর্ম্মস্থলে যে অখণ্ড আত্মবোধ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে, তার প্রধানতম কারণ বাংলা সাহিত্য। বাংলা দেশকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় খণ্ডিত করার ফলে তার ভাষা তার সংস্কৃতি খণ্ডিত হবে, এই বিপদের সম্ভাবনায় বাঙালী উদাসীন থাকতে পারে নি। বাঙালী-চিত্তের এই ঐক্যবোধ সাহিত্যের যোগে বাঙালীর চৈতন্যকে ব্যাপক ভাবে গভীর ভাবে অধিকার করেছে। সেই কারণেই আজ বাঙালী যতদূরে যেখানেই যাক্ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলা দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙালীর ছেলে বিলাত গেলে ভাষায় ভাবে ও ব্যবহারে যেমন স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক অবাঙালীত্বের আড়ম্বর করত এখন তা নেই বললেই চলে,—কেন না বাংলা ভাষায় যে সংস্কৃতি আজ উজ্জ্বল তার প্রতি শ্রদ্ধা না প্রকাশ করা এবং তার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই আজ লজ্জার বিষয় হয়ে উঠেছে।"

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ প্রবাস শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সাতিশয় প্রণিধানযোগ্য।

"রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনার তরফ থেকে ভারতবর্ষে বঙ্গেতর প্রদেশের প্রতি প্রবাস শব্দ প্রয়োগ করায় আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু মুখের কথা বাদ দিয়ে বাস্তবিকতার যুক্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তার সাধারণ ভূমিকা পাওয়া যায় কিনা সে তর্ক ছেড়ে দিয়েও সাহিত্যের দিক থেকে ভারতের অন্য প্রদেশ বাঙালীর পক্ষে প্রবাস সে কথা মানতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের পার্থক্য এত বেশী যে অন্য প্রদেশের বর্ত্তমান সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলা সংস্কৃতির সামঞ্জস্যসাধন অসম্ভব। এ ছাড়া সংস্কৃতির প্রধান যে বাহন ভাষা, সে সম্বন্ধে বাংলার সঙ্গে অন্যপ্রদেশীয় ভাষার কেবল ব্যাকরণের প্রভেদ নয়, অভিব্যক্তির প্রভেদ। অর্থাৎ ভাবের ও সত্যের প্রকাশ কল্পে বাংলা ভাষা নানা প্রতিভাশালীর সাহায্যে যে রূপ ও শক্তি উদ্ভাবন করেছে অন্য প্রদেশের ভাষায় তা পাওয়া যায় না, অথবা তার অভিমুখিতা অন্য দিকে, অথচ সে সকল ভাষার মধ্যে হয়তো নানা বিষয়ে বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। অন্যপ্রদেশবাসীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বাঙালীর হৃদয়ের মিলন অসম্ভব নয়। আমরা তার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখেছি—যেমন পরলোকগত অতুলপ্রসাদ সেন।

উত্তর-পশ্চিমে যেখানে তিনি ছিলেন, মানুষ হিসাবে সেখানকার লোকের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল, কিন্তু সাহিত্য-রচয়িতা বা সাহিত্যরসিক হিসাবে সেখানে তিনি প্রবাসীই ছিলেন এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

"তাই বলছি আজ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন বাঙালীর অন্তরতম ঐক্যচেতনাকে সপ্রমাণ করবে। নদী যেমন স্রোতের পথে নানা বাঁকে বাঁকে আপন নানাদিক্‌গামী তটকে এক ক'রে নেয়, আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তেমনি করেই নানা দেশ প্রদেশের বাঙালীর হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকে এক প্রাণধারায় মিলিয়েছে। সাহিত্যে বাঙালী আপনাকে প্রকাশ করেছে ব'লেই, আপনার কাছে আপনি সে আর অগোচর নেই ব'লেই, সেখানে যাক আপনাকে আর সে ভুলতে পারে না, এই আত্মানুভূতিতে তার গভীর আনন্দ বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে নানা সম্মিলনীতে বারম্বার উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।"

আমিও প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে কিছু লিখিয়াছি। তাহার কোন কোন কথার পুনরাবৃত্তি করা এখানে একান্ত অনাবশ্যক হইবে না।

যাহাদের ভাষা এক, তাহারা যেখানেই থাকুক, তাহাদের পরস্পরের সহিত যোগ রক্ষা করা আবশ্যক। তাহারা যদি বৃহত্তর লোকসমষ্টির অঙ্গীভূত থাকে, যেমন বাঙালীরা বৃহত্তর ভারতীয় মহাজাতির অঙ্গীভূত, তাহা হইলেও তাহাদের নিজেদের মধ্যে সংহতি আবশ্যক। ইহার প্রয়োজন আরও বেশী করিয়া অনুভূত হয়, যদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর এই

ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকান্ত সেন

লোকসমষ্টি কোন প্রকারে অসুবিধাগ্রস্ত হয়। সেইরূপ অসুবিধা যে অধুনা বাঙালীদের ঘটিয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক। সমগ্রভারতীয় মহাজাতির সাধারণ যে-সব অসুবিধা আছে, বাঙালীদের তাহা ত আছেই। তদতিরিক্ত কতকগুলি স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক ও আর্থিক অসুবিধা বাঙালীদের ঘটিয়াছে। এই জন্য বাঙালীদের ঐক্য খুব বেশী হওয়া দরকার। বলা বাহুল্য, এই ঐক্যের উদ্দেশ্য অন্য কাহারও অনিষ্টসাধন নহে—ইহা কেবলমাত্র আপনাদের কল্যাণসাধনের এবং অপর সকলেরও কল্যাণসাধনের নিমিত্ত আবশ্যক।

ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের কোন জাতিই সমগ্রভারতীয় মহাজাতির অন্তর্ভূত অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। প্রত্যেক জাতিরই সমগ্র মহাজাতির অন্যান্য অংশের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতি হইতে কিছু শিখিবার, কিছু অনুপ্রাণনা লাভ করিবার আছে। আমরা বাঙালীরা বঙ্গে থাকিয়াও এই প্রকার কিছু শিখিতে ও অনুপ্রাণনা লাভ করিতে পারি; আবার যে-সব বাঙালী বঙ্গের বাহিরে বাস করেন, তাঁহাদের মারফতেও শিক্ষা ও অনুপ্রাণনা পাইতে পারি। ভারতীয় মহাজাতির অন্য সব অংশকে আমাদের যাহা দিবার আছে, তাহাও আমরা কিছু সাক্ষাৎভাবে, কিছু বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের হাত দিয়া দিতে পারি।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দ্বারা যদি কেবলমাত্র নানা প্রদেশের বাঙালীদের আলাপ-পরিচয় ও সদ্ভাব-বৃদ্ধির সুযোগ হইত, তাহা হইলেও তাহা কম লাভ হইত না। কিন্তু তদতিরিক্ত অন্য লাভও আছে। এই সম্মেলনে যে-সব অভিভাষণ ও প্রবন্ধাদি পঠিত হয়, তাহা এইরূপ অন্য সভার অভিভাষণাদি অপেক্ষা উৎকর্ষে হীন নহে। ইহাতে আলোচনাও যোগ্যতার সহিত হইয়া থাকে। সুতরাং নূতন নূতন স্থান দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিষয়ক জ্ঞানলাভের এবং চিন্তার উন্মেষের সুযোগও সম্মেলনে হয়।...

যাহা হউক, তাহা হইতে যদি ইহা বুঝিবার সুবিধা হয়, যে, বাঙালী যেখানেই থাকুন, সেখানেই বঙ্গের মানসিক পরিবেষ্টন কতকটা বিদ্যমান আছে, সেখানেই ছোট ছোট বঙ্গ বিরাজিত আছে, তাহা হইলে তাহাও কম লাভ নহে। জার্ম্যানদের একটি কবিতা আছে যাহা, "জার্ম্যানের পিতৃভূমি কোথায়? তাহা কি প্রুশিয়া? তাহা কি সোয়াবেন?" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ। উত্তর কতকটা এই মর্ম্মের যে, যেখানেই অধিবাসীদের মাতৃভাষা জার্ম্যান সেই স্থানই জার্ম্যানী। আমরাও বলিতে পারি, যেখানেই কোন বাঙালী বাস করে ও বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাহাই বাঙালীর পিতৃভূমিস্বরূপ ও বৃহত্তর বঙ্গের অংশ। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই সব অধিবাসীর মাতৃভাষা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন ছোট বড় অংশের মাতৃভাষা ভিন্ন ভিন্ন। এই জন্য তাহারাও যে-যে প্রদেশে বাস করে তাহা তাহাদের পিতৃভূমিস্বরূপ এবং বৃহত্তর গুজরাট, বৃহত্তর উড়িষ্যা, বৃহত্তর বিহার ইত্যাদির অংশ। এই প্রকারে ভারতবর্ষের সব অংশ সব ভারতীয়ের পিতৃভূমি।

দীর্ঘকাল হইতে যে-সব অঞ্চলে প্রধানতঃ বঙ্গভাষাভাষী লোকদের বাস, এ-রকম কয়েকটি ভূখণ্ড আসাম ও বিহারের সহিত জুড়িয়া দিয়া বাংলা প্রদেশকে ছোট করা হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশেরই কতকগুলি লোকের কোন-না-কোন কারণে অন্যান্য প্রদেশে গিয়া বসবাসের প্রয়োজন হয়। বাংলা প্রদেশের কতকগুলি লোকের এই প্রয়োজন অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশী। কারণ, এক দিকে আমাদের প্রদেশটিকে ছোট করা হইয়াছে, অন্য দিকে ইহার লোকসংখ্যা অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী। তাহা বড় প্রদেশগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যার নীচের তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে।

নয়া দিল্লীর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে ইঁহারা বিনোদন করিয়াছিলেন।
উপরে—সান্ত্বনা গুহ, দীপ্তি মজুমদার, নীলিমা চক্রবর্ত্তী, কল্যাণী বিশ্বাস, হেনা চাটুজ্যে, রেণু গাঙ্গুলী।
নীচে—মণি চৌধুরী, সান্ত্বনা চাটুজ্যে, কচি চাটুজ্যে, কৃকা চাটুজ্যে, ছবি চৌধুরী, অর্চ্চনা চাটুজ্যে।
উদ্যোক্তাগণ—সুধীরকান্ত সেন, বিভূতিভূষণ সেন, সুকুমার চাটুজ্যে।

প্রদেশ।	বর্গমাইলে আয়তন।	লোকসংখ্যা।
বাংলা	৭৭,৫২১	৫,০১,১৪,০০২
মান্দ্রাজ	১,৪২,২৭৭	৪,৬৭,৪০,১০৭
বোম্বাই	১,২৩,৫৭৯	২,১৮,৭৯,১২৩
আগ্রা-অযোধ্যা	১,০৬,২৪৮	৪,৮৪,০৮,৭৬৩
পঞ্জাব	৯৯,২৬৫	২,৩৫,৮০,৮৫১
বিহার উড়িষ্যা	৮৩,০৫৪	৩,৭৬,৭৭,৫৭৬
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	৯৯,৯৩৮	১,৫৫,০৭,৭২৩

এই জন্য অনেক বাঙালীর বঙ্গের বাহিরে যাওয়া ও থাকা একান্ত আবশ্যক। বঙ্গের বাঙালীরা ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা পরস্পরের কোন সাহায্য করিতে পারুন বা না পারুন, উভয়ের হৃদয়ের যোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। সংস্কৃতির যোগ তাহার পরিচায়ক ও পরিবর্দ্ধক এবং প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মত সম্মেলন—তাহার নাম যাহাই হউক—এই যোগ রক্ষার ও বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায়।

নয়া দিল্লীতে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল তথাকার বাঙালী বালকদের বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয় উঁচু খোলা প্রশস্ত জায়গায় নির্ম্মিত। বিদ্যালয়গৃহ বৃহৎ। ইহাতে মহিলা ও পুরুষ প্রতিনিধিদের থাকিবার জায়গা এবং অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় কাজের বেশ সুবিধা হইয়াছিল। সাধারণ কর্ম্মসচিব মেজর অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন। পৌষে দিল্লীতে খুব শীত। বিদ্যালয়টিতে খুব রোদ লাগিত বলিয়া প্রতিনিধিরা শীতে কষ্ট পান নাই। অন্যান্য ব্যবস্থাও ভাল হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁহাদের কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের হাতায় ঢুকিবার মুখে সাঁচী-স্তূপের তোরণের অনুকরণে একটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছিল। তালকটোরা-

উদ্যানে বৈকালিক সম্মিলন বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। বিদ্যালয়-গৃহেই মহিলাদের একটি স্বতন্ত্র প্রমোদ-মিলন হইয়াছিল। নৃত্যগীতাদি ও "রক্তকরবী"র অভিনয়ে আমি উপস্থিত থাকিতে পারি নাই।

অধিবেশনের সমুদয় বৃত্তান্ত দৈনিক কাগজে যথাসময়ে বাহির হইয়াছে। মূল সভাপতির, মহিলা-বিভাগের নেত্রীর এবং সমুদয় বিভাগীয় সভাপতিদের অভিভাষণ দৈনিক কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পক্ষ হইতে অন্যতম সহকারী সভাপতি ধীমান্ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাও দৈনিকে বাহির হইয়াছে। এই অধিবেশনের উদ্বোধন করিবার ভার ছিল প্রবাসীর সম্পাদকের উপর। তাঁহার সামান্য বক্তব্যেরও কিছু দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী নীরব কর্ম্মী সহকারী সভাপতি ডাঃ জ্ঞানদাকান্ত সেন মহাশয় বিদায় কালে যে হৃদয়গ্রাহী কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা কোন কাগজে দেখি নাই। বোধ হয় কেহ লিখিয়া লন নাই।

মহিলা বিভাগের সভানেত্রীর, তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির নেত্রীর, মূল অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতির এবং মূল সভাপতি ও বিভাগীয় সভাপতিদিগের বক্তৃতাগুলিও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সেগুলি সমস্তই দৈনিক কাগজে বাহির হওয়ায় বিস্তর লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। কোন মাসিক কাগজে এতগুলি অভিভাষণ যথাসময়ে ছাপিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু অভিভাষণগুলি শুধু দৈনিকে মুদ্রিত হওয়া যথেষ্ট নহে। তাহার প্রধান কারণ দুটি। দৈনিক কাগজ লোকে মুখ্যতঃ সংবাদের জন্য পড়ে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত দুরূহ বিষয়ের কোন আলোচনা থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পঠিত হয় না; আবার, যেদিনকার কাগজে তাহা থাকে তাহার পরদিন আবার আর একখানা কাগজ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আগেকার দিনের কাগজটি পড়িবার অবসর হয় না। সকল পাঠকের পক্ষে একথা না খাটিতে পারে, কিন্তু অনেকেরই পক্ষে খাটে। দ্বিতীয় কারণ, দৈনিক কাগজ সাধারণতঃ কেহ বাঁধাইয়া রাখে না, বড় বড় অনেক লাইব্রেরীতেও পুরাতন দৈনিকের ফাইল পাওয়া যায় না। সুতরাং অভিভাষণগুলি কেবল দৈনিকে ছাপা হইলে সেগুলির প্রতি অবিচার হয় এবং যাঁহারা ধীরে অবসরমত মন দিয়া সেগুলি পড়িতে চান, তাঁহাদের সুবিধা হয় না। ভবিষ্যতে কেহ সেগুলি দেখিতে বা পড়িতে চাহিলে পান না। এই জন্য দৈনিকে প্রকাশ ছাড়া সেগুলি সম্মেলনের রিপোর্টের আলাদা একটি খণ্ডরূপে মুদ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু সম্মেলনের সব ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া উদ্যোক্তাদের হাতে প্রায়ই এত টাকা উদ্বৃত্ত থাকে না যাহাতে তাঁহারা বিস্তারিত রিপোর্ট ও অভিভাষণগুলি ছাপিতে পারেন। আমরা কলিকাতার অধিবেশনের সব অভিভাষণ, এমন কি ভাল অন্য প্রবন্ধগুলিও, ছাপিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা করিতে পারি নাই। নয়া দিল্লীর অধিবেশনের অন্যতম অক্লান্ত কর্ম্মী সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোমের নিকট সংবাদ লইয়া অবগত হইয়াছি, তথাকার অভ্যর্থনা-সমিতি অভিভাষণাদি মুদ্রিত করিতে পারিবেন। ইহা সুখের বিষয়।

সম্মেলনের মহিলা-বিভাগের নেত্রী, মূল সভাপতি ও বিভাগীয় সভাপতিদিগের মধ্যে বাংলা দেশ হইতে দু-এক জন লওয়া ভাল। তাহাতে বঙ্গের বাঙালী ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মধ্যে যোগ রক্ষিত হয় এবং ভাবধারা ও চিন্তাধারার আদান-প্রদান হয়। কিন্তু অধিকাংশ সভাপতি বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মধ্য হইতে যে লওয়া হয়, তাহাই ঠিক্। আমি ত কয়েক বারের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছি; দেখিয়াছি বঙ্গের বাহিরের যে-সকল বাঙালী মূল বা বিভাগীয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের বেশ পড়াশুনা ও চিন্তাশীলতা আছে। এ বিষয়ে তাঁহারা বঙ্গের সমশ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের চেয়ে নিম্নস্থানীয় নহেন, বরং কখন কখন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিয়াছি।

যেখানে যেবার সম্মেলনের অধিবেশন হয়, অধিকাংশ সভাপতি সেখান হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু যাতায়াতে অনেক সময় লাগে, কষ্ট ও ক্লান্তি হয় এবং ব্যয়বাহুল্যও আছে বলিয়া বোধ হয় দূরের লোকদিগকে পাওয়া অনেক স্থলেই কঠিন হয়। ইহার কোন প্রতীকার হইতে পারে কি না, চিন্তিতব্য।

অতঃপর সম্মেলন যেখানে হইবে তথাকার উদ্যোক্তাদিগে

এবং সম্মেলনের পরিচালক-সমিতির নিকট আর একটি কথা নিবেদন করিতেছি। অনেকগুলি দেশী রাজ্যে বাঙালীর বাস আছে। কেহ কেহ আগে তথায় খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এখনও হয়ত কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। দেশী রাজ্যের বাঙালীদের মধ্যে কৃতবিদ্য ও চিন্তাশীল লোকও আছেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে মূল বা বিভাগীয় সভাপতি পাইবার চেষ্টা প্রতি বৎসরই হওয়া উচিত, এবং দেশী রাজ্যসমূহ হইতে মহিলা ও পুরুষ প্রতিনিধি যাহাতে অধিকতর সংখ্যায় সম্মেলনে উপস্থিত হন, তাহারও চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

উদ্যান-সম্মেলনে প্রবাসীর সম্পাদক প্রভৃতি।— শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

ভবিষ্যৎ সম্মেলনের উদ্যোক্তাদিগের নিকট আরও একটি নিবেদন আছে। সম্মেলনে সাহিত্য, সুকুমার শিল্প ও সংগীত, সংস্কৃতির এই তিনটি বাহ্য রূপ বা অঙ্গের আলোচনা হইয়া থাকে। এই তিন দিকেই বঙ্গের বিশিষ্টতা আছে। সাহিত্যের আলোচনা ভালই হইয়া থাকে—অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যের প্রতি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে তাচ্ছিল্য প্রকাশিত হয় না। কুরুচি, অশ্লীলতা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনা হয় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যের কোন প্রতিকূল সমালোচনা করা হয় না। কারণ, কুরুচি ও অশ্লীলতা কেবল যে কোন কোন বাঙালী লেখকদেরই দোষ, এমন নয়। সুকুমার শিল্পের আলোচনাও উত্তম রূপে হয়, কোন কোন অধিবেশনে চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থাও থাকে। সঙ্গীত সম্বন্ধে বঙ্গের প্রতি অবিচার, অন্ততঃ যথেষ্ট ন্যায্য বিচারের অভাব, আমি লক্ষ্য করিয়া থাকি—যদিও কোনও অধিবেশনের উদ্যোক্তারা তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন, এরূপ কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি সংগীতজ্ঞ নহি। সংগীত ভালবাসি বটে। অন্য কোন সাধারণ আনাড়ী লোকের এ বিষয়ে মতের যে মূল্য, আমার মতের মূল্য তাহা অপেক্ষা বেশী না হওয়াই সম্ভবপর। তথাপি দু-কথা আমাকে বলিতে হইতেছে।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিতার বিষয়, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির, এবং নাটক এবং ছোট ও বড় গল্পের ও তাহার রচনার রীতির অনাদর আমরা বাঙালীরা করি না। কিন্তু বাংলা কবিতা, নাটক, গল্প সব দিক দিয়া প্রাচীন কবিতা আদির ঠিক্ অনুসরণ করে না বলিয়া বাঙালীরা ও অন্যেরা বাংলা সাহিত্যকেও উপেক্ষা করেন না। কিন্তু সংগীতের বেলায় দেখিতে পাই, এমন বাঙালী ও অবাঙালী আছেন, যাঁহারা বঙ্গের নিজস্ব সংগীতকে হয় আমলই দিতে চান না, নয়ত খুব নিম্নস্থান দিতে চান। যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর করিয়াও বাংলা সাহিত্যের আদর করা যায়, তেমনি চিরাগত প্রাচীন হিন্দুস্থানী সংগীতের বিন্দুমাত্রও অনাদর না করিয়া বঙ্গের নিজস্ব সংগীতের আদর করা যাইতে পারে এবং করা উচিত। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রত্যেক অধিবেশনে এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যাহাতে সমবেত শ্রোতৃবর্গ বঙ্গের উৎকৃষ্ট সংগীত শুনিতে পান। বালিকারা বা বালকবালিকারা যে গীতনৃত্যাদির দ্বারা অভ্যাগতদের চিত্তবিনোদন করেন,—এবারও করিয়াছিলেন, সে ব্যবস্থা ভালই। কিন্তু তার চেয়ে অধিক নিপুণ লোকদের সংগীতেরও প্রয়োজন। বঙ্গের নিজস্ব সঙ্গীত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, এরূপ লোক পাওয়া গেলে আরও ভাল। ওস্তাদ বা ওস্তাদ বলিয়া বিবেচিত

লোকেরা যাহাই ভাবুন, আমরা সাধারণ লোকেরা এই জানি, যে, বঙ্গের রবীন্দ্রনাথ যত রকমের যত অধিকসংখ্যক উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে নানা বিচিত্র সুর বসাইয়াছেন, ভারতে আর কেহ তাহা করেন নাই—পৃথিবীতে কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না। অধিকন্তু হিন্দুস্থানী সংগীতে, তাঁহার শিক্ষা দস্তুরমতই হইয়াছিল এবং তিনি তাহার গুণগ্রাহীও বটেন। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, যে, কাব্যে তিনি যেমন স্রষ্টা, সংগীতেও তিনি তেমনই স্রষ্টা; পূর্ব্বতন কাব্যের দ্বারা যেমন তাঁহার কাব্যের বিচার হয় না, পূর্ব্বতন সংগীতের দ্বারাও তেমনই তাঁহার সংগীতের বিচার হয় না। যে-কোন লোক বা লোকসমষ্টি বঙ্গের সংস্কৃতির আদর করেন বলিয়া সত্য দাবী করিতে চান, তিনি বা তাঁহারা সঙ্গীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য সমুচ্চ স্থান দিতে বাধ্য।

আর অধিক লিখিবার স্থান নাই। এখন শেষ কথা লিখি। সম্মেলনের কথা বঙ্গের ও বঙ্গের বাঙালীদিগের মধ্যে প্রচার করিবার বিশেষ উপায় অবলম্বন করা খুব আবশ্যক। গত অধিবেশনে স্থির হইয়াছে, সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলীর প্রচারকল্পে একখানি মাসিক বার্ত্তাবাহিনী পত্রিকা (bulletin) প্রকাশ করা হইবে। শীঘ্রই এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। ইহার সর্ব্বত্র প্রচার সাতিশয় বাঞ্ছনীয়। ইহা বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের গৃহে স্থান পাইলে সুফল ফলিবে।

পূর্ণিমায়

শ্রীশান্তি পাল

সে দিন সে পূর্ণিমা-লগনে,
নিস্তব্ধ নির্জ্জনে—
মুক্ত অলিন্দের 'পরে পেয়েছিনু দেখা,
অকস্মাৎ একা,
মোর সেই আজন্মের তপস্যার ধনে।
সে বাঞ্ছিত ক্ষণে
পূর্ণতায় ভরেছিল তনু-মন-প্রাণ
বারম্বার গেয়েছিনু জয়োৎসব গান।
হে অভিমানিনী,
মর্ম্মরিত অনন্ত রাগিণী
মধুকণ্ঠ আজও বাজে কানে
পূর্ণিমার গানে।
আজি মোর মুক্ত শির 'পরে
বিন্দু বিন্দু ঝরে—
অকলঙ্ক চন্দ্রের গরিমা
অপরূপ জ্যোৎস্না মধুরিমা।
রাত্রি দিন ভাবি কুতূহলে,
একান্ত বিরলে—
দেহে-প্রাণে জাগে কত অতৃপ্ত পিপাসা
পরিপূর্ণ যৌবনের আশা।

হে বিশ্ববন্দিতা,
শুভ্র কপোতিকা সম প্রেম-বন্ধ ভীতা
মুহূর্ত্তের মাঝে দেখা দিয়া
কোন কথা নাহি কহি, নাহি সম্ভাষিয়া
কেন গেলে চ'লি—
চিরদিবসের তরে মোরে পায়ে দলি
ঝঙ্কারিয়া বীণাখানি তব?
লহ, লহ সব—
যাহা-কিছু আছে মোর, দিতেছি ঢালিয়া
উন্মথিয়া হিয়া;
রিক্ততায় ভরে যাক্ বুক,—
উদ্দাম উন্মুখ
ছুটুক্ সে অনিশ্চিত পানে
মর্ম্মভেদী বিরহের গানে।
আজি সেই পৌর্ণমাসী তিথি;—
বক্ষে লয়ে প্রীতি—
এস, এস ফিরে—
উদ্বেলিত বাসনার মহাসিন্ধুতীরে
বাজায়ে কিঙ্কিণী;
পুলক রভসে আজি—
এক হ'য়ে মিশে যাক্ আকাশ-মেদিনী।
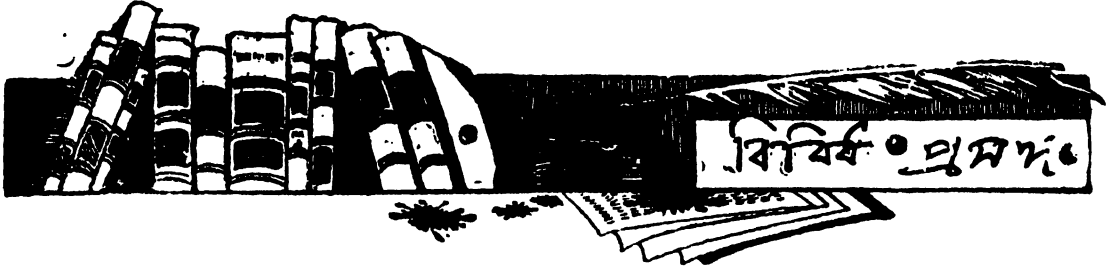
পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিক জন্মোৎসব

এক শত বৎসর পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেন। সেই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া এই মাসে তাঁহার শতবার্ষিক জন্মোৎসব আরম্ভ হইবে।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের ভবনে ভগবৎসঙ্গীতে বিভোর।
['প্রবুদ্ধ ভারতে'র চিত্র হইতে

ইহা এই মাসে ভারতবর্ষের প্রধান ঘটনা। উৎসব ভারতবর্ষের নানা স্থানে হইবে, তাহাতে বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোক যোগ দিবেন। বিদেশেও উৎসব হইবে। এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের ও বহু বিদেশের মনীষীদের রচনা-সম্বলিত যে বৃহৎ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে, তাহা অধ্যয়নযোগ্য হইয়া বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহার শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী ও বাংলা মাসিক পত্রের বিশেষ সংখ্যা এই সময়ে প্রকাশিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রবুদ্ধ ভারত ও বেদান্তকেশরী ইতিমধ্যে পাইয়াছি। উভয় পত্রিকাই বহু উৎকৃষ্ট রচনায় পূর্ণ। প্রবুদ্ধ ভারতের বিশেষ সংখ্যার গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত বন্দনাটি মুদ্রিত হইয়াছে।

To the Paramhansa
Ramkrishna Deva

Diverse courses of worship
from varied springs of fulfilment
have mingled in your meditation.
The manifold revelation of the joy of the Infinite has given form to a shrine of unity in your life
Where from far and near arrive salutations to which I join mine own.

RABINDRANATH TAGORE

রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার উপরের ইংরেজী বাক্যগুলির মর্ম্ম নিম্নমুদ্রিত বাংলা কবিতাটিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ দেখা দিল এ জগতে।
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি,
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমরা ১৯১০ সালে মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর রচিত পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করি। গত বৎসর রামকৃষ্ণজয়ন্তীর সূত্রপাত হওয়ায় আমরা চৈত্র সংখ্যায় সেই প্রবন্ধের অধিকাংশ অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলাম, এবং চেকোস্লোভাকিয়ার চিত্রকর ফ্রান্জ্ ডোরাক কর্ত্তৃক অঙ্কিত রামকৃষ্ণের চিত্র হইতে প্রস্তুত একটি ছবি ছাপিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় অন্য অনেক কথার মধ্যে রামকৃষ্ণকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা তাঁহার সম্বন্ধে দুটি ছোট প্রবন্ধ ছাপিলাম। একটি শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং অপরটি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের লেখা। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স এখন ৭৭, মিত্র মহাশয়ের বয়স ৮৫ বৎসরে চলিতেছে। ইঁহারা উভয়েই রামকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন।

আমি যখন কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিয়াছিলাম ও পরে অধ্যাপকের কাজ করিতাম, তখন রামকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন। কিন্তু আমার তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার কথা শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই। আমার যত দূর মনে পড়িতেছে, তাঁহার একটি সাধনার কথা আমি প্রথম শুনি বাঁকুড়া জেলা স্কুলের শিক্ষক স্বর্গীয় কেদারনাথ কুলভী মহাশয়ের মুখে। আমি ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। কুলভী মহাশয় বলিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ এক হাতে টাকা বা সোনা ও অন্য হাতে মাটি লইয়া গঙ্গার ধারে বসিয়া জিনিষ দুটি দুই হাতে অদল বদল করিতে করিতে বার বার বলিতেন, মাটি সোনা, সোনা মাটি। তার পর উভয়ের সমানত্ব উপলব্ধি হইলে দুই-ই জলে ফেলিয়া দিতেন। পরমহংসদেব সম্বন্ধে আর একটি কথাও কুলভী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম বলিয়া অস্পষ্ট স্মৃতি আছে। তাহা এই—

একবার কোন দুশ্চরিত্র ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি রামকৃষ্ণের নিকট উপদেশ লইতে আসে। তিনি তাহাকে তিরস্কার করেন নাই, নিবৃত্তিমূলক কোন উপদেশ দেন নাই। কেবল বলিয়াছিলেন, যখনই কোন সুখ অনুভব করিবে, তখনই স্মরণ করিবে, যে, সুখ অনুভবের শক্তি ভগবানের দান। ফলে ঐ ব্যক্তির হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয়। আমি কুলভী মহাশয়ের নিকট এইরূপ কথা শুনিয়াছিলাম কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; কারণ ইহা ৫০ বৎসরেরও আগেকার কথা, এবং ইহা আমি কোথাও লিখিয়া রাখি নাই। যদি এরূপ কথা শুনিয়া থাকি, তাহা হইলেও পরমহংসদেব যে-সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমি তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে পারিলাম না—কেবল তাৎপর্য্য দিলাম।

রামকৃষ্ণের মত মানুষ যে এখনও ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ভারতবর্ষ যে নিকৃষ্ট দেশ নহে এবং ভারতীয়েরা যে নিকৃষ্ট জাতি নহে, তাহার অন্যতম প্রমাণ। পুস্তকলব্ধ বিদ্যা যাহার ছিল না, এরূপ এক জন মানুষ যে-দেশে জন্মিয়া তাঁহার মত সিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁহার মত জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম মার্গের উপদেশ দিতে পারেন, সে-দেশ সামান্য নয়, সেই দেশের অধিবাসী জাতিও সামান্য নয়। সামান্য হইলে সে-দেশের মানসিক ও আত্মিক পরিবেষ্টনে এরূপ মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারিতেন না।

প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভ মেলা

প্রয়াগ হিন্দুদের তীর্থরাজ। প্রতি বৎসরই এখানে মাঘ মাসে বহু লক্ষ তীর্থযাত্রী গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করে এবং এখানে মেলা হয়। ইহাকে মাঘমেলা বলে। বার বৎসর অন্তর এখানে মাঘ মাসে কুম্ভমেলা হয়। তাহাকে পূর্ণকুম্ভ বলা হয়। মধ্যে ছয় বৎসর অন্তর অর্দ্ধকুম্ভ হয়। এ বৎসর গত মাসে অর্দ্ধকুম্ভ মেলা হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে প্রধান ও অপ্রধান স্নানের দিনগুলিতে মোট প্রায় ৫০ লক্ষ লোক স্নান করিয়াছে। মাঘ মাসে এই যে স্নান-উৎসব ও মেলা হয়, ইহার আরম্ভ কত হাজার বৎসর আগে হইয়াছিল, তাহার কোন ইতিহাস নাই।

এই মেলায় নানাবিধ পণ্যদ্রব্য বিক্রীর জন্য বণিকেরা দোকান খুলে এবং যাত্রীরা অনেকে তাহা ক্রয় করে। তীর্থক্ষেত্রের এই সব মেলা পূর্ব্বে বাণিজ্যের আরও ব[illegible] কেন্দ্র ছিল, এবং তাহা শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার বড় ব[illegible] সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারীরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ই[illegible] ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ১৮১৩ সালে বিলাতী পার্লেমেণ্টে কেমন করিয়া ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের ব্যবসা বাড়ান যায়, তাহা[illegible] উপায় আলোচিত হয়। ইংরেজ জাতির একটা রীতি [illegible] আছে, যে, তাহারা যখন ভারতবর্ষে নিজেদের কোন স্বার্থসিদ্ধি করিতে চায় ও তাহার উপায় অবলম্বন করে,

অর্দ্ধকুম্ভের সময় সঙ্গমে স্নান

হস্তিপৃষ্ঠে মহান্তদের শোভাযাত্রা

অর্দ্ধকুম্ভের সময় নাগা ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা

অর্দ্ধকুম্ভের একটি দৃশ্য।

তখন এইরূপ দেখাইতে চায়, যে, ভারতবর্ষের লোকদের উপকারের জন্য তাহারা তাহা করিতেছে। পার্লেমেণ্টের যে কমিটিতে ১৮১৩ সালে এই সব বিষয়ের আলোচনা হয়, সেই কমিটি অনেক ভারত-ফেরত ইংরেজের ও অন্য ইংরেজের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। মান্দ্রাজের অন্যতম গবর্ণর সর্ টমাস মনরোর সাক্ষ্য গ্রহণের সময় তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়:—

"Are not the natural habits and dispositions of the people of India such as would lead them to engage with great zeal and ardour as well in commercial as in other pursuits, were the means of gain or advantage open to them?"

তাৎপর্য্য। ভারতবর্ষের লোকদের স্বাভাবিক অভ্যাস ও প্রকৃতি কি এরূপ নয়, যে, লাভ বা সুবিধার উপায় তাহাদের অধিগম্য করিয়া দিলে তাহারা যেমন অন্য কাজে তেমনি বাণিজ্যেও খুব আগ্রহ ও উৎসাহে প্রবৃত্ত হইবে?

সেকালে সব ইংরেজ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে পারিত না। কেবল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তাহার ভৃত্যেরা পারিত। সকল ইংরেজ যাহাতে ভারতে অবাধ বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা পার্লেমেণ্টে হইতেছিল। সেই চেষ্টাটাকে এই আকার দেওয়া হইতেছিল, যে, বিলাতী জিনিষ অবাধে ভারতে পৌছিতে পারিলে ভারতীয়েরা তাহার ব্যবসা করিয়া লাভবান হইবে। সেই জন্য মনরোকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করা হয়। তাহার উত্তরে তিনি যাহা বলেন তাহার অল্প অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তাঁহার উত্তরের এই অংশে তিনি জানাইয়া দেন, যে, ভারতীয়দিগকে বণিক বানাইতে হইবে না, তাহারা ব্যবসা বেশ বুঝে। তিনি বলেন:—

"The people of India are as much a nation of shopkeepers as we are ourselves; they never lose sight of the shop, they carry it into all their concerns, religious and civil; all their holy places and resorts for pilgrims are so many fairs for sale of goods of every kind; religion and trade are in India sister arts, the one is seldom found in any large assembly without the society of the other." *Ruin of Indian Trade and Industries* by Major B. D. Basu, pp. 26–27.

তাৎপর্য্য। "ভারতীয়েরা আমাদেরই মত দোকানদারের জা'ত; তারা ব্যবসাটা কখনো ভুলে না, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও লৌকিক অন্য সব ব্যাপারের মধ্যে তারা ব্যবসা নিয়ে যায়; তাদের যত পবিত্র স্থান ও তীর্থযাত্রীর সমাগমের স্থান সকল রকম জিনিষ বিক্রীর এক একটা মেলা; ধর্ম্ম ও বাণিজ্য ভারতবর্ষের কর্ম্মক্ষেত্রে দুই সহোদরা, কোন বৃহৎ জনতার মধ্যে কচিৎ একটি আর একটির সাহচর্য্য ব্যতীত দেখা যায়।"

মনরোর উত্তরের এই অংশ হইতে বুঝা যায়, যে, ইংরেজরা যে দীর্ঘকাল হইতে রটাইতেছে, যে, ভারতবর্ষ বরাবর শুধু কৃষির দেশই ছিল, সেটা মিথ্যা কথা।

ভারতবর্ষ পূর্ব্বে দেশী লোকদেরই অতিবড় পণ্যশিল্পের ও বাণিজ্যের দেশ ছিল, এখন আর তা নাই, শিল্প ও বাণিজ্য এখন প্রধানতঃ ইংরেজদের হাতে গিয়াছে। সুতরাং মেলাগুলির ব্যবসাও কমিয়া গিয়াছে।

মাঘমেলা, অর্দ্ধকুম্ভ মেলা, পূর্ণকুম্ভ মেলা অবশ্য কেবল বা প্রধানতঃ বাণিজ্যের জন্য কখনও হই'ত না, এখনও হয় না। অন্য যা'হা হয়, তাহার খুব গুরুত্ব আছে। ধর্ম্মের সহিতই ইহার প্রধান সম্পর্ক।

এই উপলক্ষ্যে নানা হিন্দু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধু ও সন্ন্যাসীরা শিষ্য সমভিব্যাহারে প্রয়াগে আসেন। তাঁহাদের আখাড়ায় ধর্ম্মবিষয়ক ব্যাখ্যান ও আলোচনা হয়। তাহা শুনিয়া জ্ঞানার্থী ও ধর্ম্মপিপাসু লোকেরা উপকৃত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কখন কখন মহাপণ্ডিতও কেহ কেহ আসিয়া থাকেন। অবশ্য বাজে সন্ন্যাসীও অনেক আসে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে স্নানের প্রধান দিনে কোন্ সম্প্রদায়ের সাধুরা আগে সঙ্গমে স্নান করিবেন, তাহা লইয়া ঝগড়া বিসম্বাদ ও কখন কখন রক্তপাত পর্য্যন্ত হইত। নগ্নদেহ নাগা সন্ন্যাসী-দিগের যোদ্ধৃত্ব প্রসিদ্ধ ছিল। আজকাল ঝগড়া বিবাদ রক্তপাত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন আখাড়ার মহন্তদের এবং নাগা সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রার দৃশ্য চমৎকার। অনেক নাগা সন্ন্যাসীর সুগঠিত দেহ ও পৌরুষব্যঞ্জক সাবলীল গতিভঙ্গী দর্শকদের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। অনেক আখাড়ার এত অধিক সম্পত্তি ও আয় আছে, যে, তাহার মহন্তেরা লক্ষ লক্ষ টাকা ধার দিতে সমর্থ এবং রাজা মহারাজা ও অন্য ধনী ব্যক্তিদিগকে ধার দিয়া থাকেন। ইহাঁরা সোনালী ঝালর-বিশিষ্ট আস্তরণের উপরিস্থ হাওদায় হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সুশোভন ঝাণ্ডা (পতাকা) লইয়া মাঘমেলা, অর্দ্ধকু[illegible] মেলা ও কুম্ভমেলার শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া থাকেন।

অনেক কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসীকেও কখন কখন মেলায় দে[illegible] যায়। একখানা তক্তার উপর অনেক লোহার পেরেক পুঁ[illegible] সেই সূক্ষ্মাগ্র কীলকশয্যায় শয়ান সন্ন্যাসী কখন কখন দে[illegible] যায়। কেহ বা গঙ্গাযমুনার জলে দেহ নিমগ্ন করিয়া থাকেন এবং চারি পাশে খোঁটা পুঁতিয়া ও মাথার উপরে জ[illegible]র

কলসী রাখিয়া ক্রমাগত তাহা হইতে মাথায় বারিপাত সহ্য করেন। কেহ হয়ত ব্রত লইয়াছেন, যে, দু-পাঁচ বৎসর বা দু-দশ বৎসর দাঁড়াইয়াই থাকিবেন; যখন নিদ্রা আসে বা অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়, তখন গাছের ডালে বাঁধা দড়ি হইতে ঝুলান একখানা তক্তার উপর হাত রাখিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই বিশ্রাম করেন। ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। তাঁহারা একটি হাত উঠাইয়াই রাখেন, তাহার দ্বারা কোন কাজ করেন না। কালক্রমে হাতটি শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহা আর নামান চলে না, নখগুলিও খুব লম্বা হয়।

মাঘমেলা, অর্দ্ধকুম্ভ মেলা ও পূর্ণকুম্ভ মেলার সময় গঙ্গা-সৈকতে পর্ণকুটীরে এক মাস বাস ও নিত্য স্নান পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাকে কল্পবাস বলে। এখানে শীত খুব বেশী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৃদ্ধ বৃদ্ধারা কল্পবাস করিয়া থাকেন। আমি এলাহাবাদে থাকিতে আমার মাতৃদেবী কল্পবাস করিয়াছিলেন। আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীও কল্পবাস করিয়াছিলেন। নির্জ্জন বাসের সময় ভগবৎচিন্তায় কালযাপন করিতে পারিলে তাহা আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হইয়া থাকে।

মেলার সময় কোন কোন বৎসর সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়। এবার তাহা হয় নাই। অনেক বৎসর হইতে যাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এরূপ সুবন্দোবস্ত হইয়া আসিতেছে, যে, মেলার সময় পীড়ার প্রাদুর্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমিয়া গিয়াছে।

মেলার ছবি চারিখানি এলাহাবাদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু সৌজন্যপূর্ব্বক তুলিয়া পাঠাইয়াছেন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত বৎসর হইতে যে তাহার প্রতিষ্ঠাদিবসের উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হইয়াছে। এই উৎসবে ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের নিজ নিজ কলেজের পতাকা লইয়া দলবদ্ধভাবে গড়ের মাঠে যায়, এবং নানা প্রকার ব্যায়াম প্রদর্শন করে। ইহাতে তাহাদের উৎসাহ বাড়ে এবং সংহতিও বৃদ্ধি পায়। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বক্তৃতাও বেশ হইয়াছিল। তিনি ছাত্রছাত্রীদিগকে অজেয় হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠাদিবসের উৎসব যে-ভাবে সম্পন্ন হয়, তাহা ছাড়া আমরা আরও কিছু দেখিতে চাই। তাহা, এক কথায়, বিদ্বজ্জনসমাগম। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় জন্মিয়াছে বিদ্যার প্রসার ও উন্নতিসাধনের জন্য। উৎসবে যাহা করা হয়, তাহা অবশ্য অনাবশ্যক ত নহেই, বরং তাহা না হইলে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের পূর্ণতা জন্মিতে পারে না। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। বিদ্যার আদর্শ ও বিদ্যার ক্রমোন্নতির চিত্র প্রতিবৎসর তাহাদের সম্মুখে ধরা আবশ্যক।

ভারতবর্ষ আমেরিকা নহে। এদেশে আমেরিকার মত ধনশালী লোক নাই, এখানকার ধনশালী লোকদের মধ্যে দাতার একান্ত অভাব না থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা কম, আমেরিকার মত বেশী নহে। এই জন্য আমরা এমন কিছু করিতে বলিতেছি না, যাহাতে অনেক টাকা সংগ্রহ করা আবশ্যক। তাহা বাদ দিয়া, আমরা কি চাই, তাহার কতকটা আভাস আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিশতবার্ষিক উৎসবে যাহা করা হইবে, তাহা হইতে অনুমিত হইতে পারিবে। এ বিষয়ে শিকাগোর "য়ুনিটি" কাগজ লিখিয়াছেন :—

The President and Fellows of Harvard University have done an amazing thing. They have announced a plan for the celebration of the 300th anniversary of the founding of the College which has something to do with education. Not sports, or buildings, or rackets of any kind, but *mirabile dictu!* LEARNING is to be exalted in this festival: First of all, in the autumn of 1936, there is to be gathered in Cambridge (U. S. A.), from all countries of the world, the greatest assemblage of scholars this nation and these times have ever known. In meetings large and small, in enormous public conferences and little, quiet seminars, the content of modern knowledge is to be restated by the outstanding authorities of mankind. That this will be an event of almost overwhelming significance is certain. Secondly, there is to be established, through gifts from graduates and the general public, a 300th Anniversary Fund, for the service of two perpetual purposes, both aimed "to strengthen the intellectual and spiritual life and increase the usefulness of the University." On the one hand, the Fund is to create a number of new professorships, "intended to reinforce teaching and research by affording to teachers and scholars of unusual scope and ability broader opportunities than have heretofore been available in American universities." The idea is to get the best men in the field of learning, and to liberate them for the guidance of youth and the search for truth. On the other hand, the Fund is to establish new "Harvard National Scholar-

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবসে আশুতোষ কলেজের ছাত্রীগণ

ships," intended to "open the door of opp for study . . . . to more of the most promi th from every part of the country." This two-fol project is a thing to kindle the mind and lift the heart , would have been so easy, and so exciting, to have lebrated this third-century birthday with a great building program of stadia, clock-towers, gymnasia, and halls of learning! But Harvard has put all this aside, to serve and glorify learning itself. Never was there a nobler evidence of Harvard's unshaken and unshakable primacy among the universities of America. And thus early, Conant, whose dream this is, ranks himself with the immortal Charles William Eliot.

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর সম্মান

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তিনি সর্ব্বাংশে এই উপাধির যোগ্য। তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা আগেও ছিল, তাহা আমরা অন্য সূত্রে আগে জানিতাম। কিন্তু তখন তিনি সম্মত ছিলেন না। অবগত হইয়াছি, এবার তাঁহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে উপাধি দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য বা গৌরব বাড়িল না বটে, তবে উপাধিটি সার্থক হইল।

এই উপাধি লাভ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে চিঠি লিখিয়াছেন ও তাঁহার উদ্দেশে যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবার ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিয়াছেন—তাঁহাকে "আশুতোষ সংস্কৃত অধ্যাপক" নিযুক্ত করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছিলাম, যাহাতে লোকে এ কথা বলিতে না পারে, যে, "তুমি তাঁহার সপক্ষে লিখিয়াছিলে বলিয়াই তাঁহার কাজটি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী

হইল না," এই জন্য এবার কিছু লিখিব না। আমরা কিছু না-লেখার ফলেই কাজটি তিনি পাইলেন, আমরা অবশ্য সত্য সত্যই নিশ্চয় এরূপ মনে করি না। কিন্তু বলাও যায় না! কথায় বলে, বোবার শত্রু নাই!

পরলোকগত নৃপতি পঞ্চম জর্জ

পরলোকগত নৃপতি পঞ্চম জর্জ সাতিশয় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, এবং পৃথিবীব্যাপী শান্তি কামনা

করিতেন। তিনি সৌজন্যের জন্যও বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার স্বদেশ ব্রিটেনের লোকদের স্বাধীনতা রক্ষার তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতেন। পরাধীন ভারতবর্ষ স্বরাজলাভ করে, এরূপ ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিটেনের রাজা কন্সটিটিউশ্যনের নিয়ম অনুসারে চলিতে বাধ্য, মন্ত্রীরা যাহা করেন তাহার অতিরিক্ত বা বিপরীত কিছু তিনি করিতে পারেন না। ব্রিটিশ জাতি এ পর্য্যন্ত এরূপ পার্লেমেণ্ট-সভ্যসমষ্টি নির্ব্বাচন করে নাই যাহার প্রবলতম দলের নেতৃস্থানীয় মন্ত্রীরা ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিতে রাজী। সুতরাং ব্রিটিশ নৃপতির ইচ্ছা যাহাই থাক্‌, ব্রিটিশ জাতি, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট ও ব্রিটিশ মন্ত্রীরা ভারতবর্ষকে স্বরাজ দেন নাই।

আমরা সম্রাজ্ঞী মেরী, নূতন সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড এবং ব্রিটিশ রাজপরিবারের শোকে ব্যথিত।

—

পরলোকগত নৃপতি পঞ্চম জর্জ

নৃপতি অষ্টম এডোয়ার্ড

পঞ্চম জর্জের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্টম এডোয়ার্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তাঁহার স্বদেশের এবং স্বশাসক উপনিবেশসমূহের স্বার্থ রক্ষিত হইবে। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের হাউস অব কমন্সের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, যে, তিনি জনগণের স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করিবেন। ইহাও ইংরেজদের পক্ষে তৃপ্তিকর কথা। যাহাদের স্বাধীনতা আছে, তাহাদের স্বাধীনতাই রক্ষিত হইতে পারে। যাহাদের স্বাধীনতা নাই, যেমন ভারতবর্ষীয় লোকদের, তাহাদিগকে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে। ভারতবর্ষের লোকদের রাষ্ট্রীয় প্রগতি ও অধিকার সম্বন্ধে এখনও নূতন নৃপতি কিছু সাক্ষাৎভাবে বলেন নাই, হয়ত পরে বলিবেন। হয়ত তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় এই কথাই বলিবেন, যে, ভারতবর্ষ কালক্রমে স্বশাসন অধিকার লাভ করিবে। তাহা সত্য কথা। নূতন ব্রিটিশ নৃপতি ব্রিটিশ জাতি, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট ও ব্রিটিশ মন্ত্রীদিগের উপর এরূপ প্রভাব যদি বিস্তার করিতে পারেন, যে, তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা ভারতবর্ষের স্বরাজলাভচেষ্টার সহায় হইবেন, তাহা হইলে নূতন নৃপতির রাজত্বকাল চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

একটি গুজব রটিয়াছে, যে, নূতন নৃপতি এক বা দুই

বর্ত্তমান নৃপতি অষ্টম এডোয়ার্ড

বৎসর পরে ভারতবর্ষে আসিয়া দরবার করিবেন। ভারতবর্ষের যে-সব লোক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা করিতে পারে ও করিয়া থাকে, তাহারা এখন আর শুধু বাহ্য জাঁকজমকে কিম্বা ভবিষ্যতে উচ্চ আশা পূর্ণ হইবার প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। অতএব, ভারতবর্ষের গবর্ন্মেণ্টের ও লোকদের আর্থিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আড়ম্বরে অর্থব্যয় করা ঠিক হইবে না। তবে, যদি অবস্থাচক্রে ভারতবর্ষের স্বরাজলাভ ঘটে এবং তাহারই প্রারম্ভিক কোন ঘোষণার জন্য নৃপতি অষ্টম এডোয়ার্ড ভারতবর্ষে আসেন, তাহা হইলে তাহার সার্থকতা স্বীকৃত হইবে।

—

ইংলণ্ডে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু তুই বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ই তারিখে তাঁহার খালাস পাইবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী কমলা নেহরুর ইউরোপে পীড়া খুব বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার নিকট থাকিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আগেই খালাস দেওয়া হয়। তাঁহার স্ত্রীর স্বাস্থ্য কিছু ভাল হওয়ায় তিনি জার্ম্মেনী হইতে ইংলণ্ড গিয়াছেন, এবং সেখানে তাঁহার খুব অভ্যর্থনা হইয়াছে। বক্তৃতাও তিনি অনেকগুলি করিয়াছেন এবং তাহাতে অনেক স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। নূতন ভারতশাসন আইন সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোন কোন অংশ রয়টারের তারের খবরে এদেশে পৌঁছিয়াছে। রয়টারের খবরে জানা যায়, পণ্ডিতজীর মতে ঐ আইন তুচ্ছ ("trivial") এবং ভারতবর্ষের এখন যতগুলি সঙ্গীন সমস্যা আছে তাহার কোনটিরই সমাধান উহার দ্বারা হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে, ঐ আইনটি এরূপ যে উহাতে পরোক্ষ ভাবে মানুষকে বিদ্রোহপ্রবণ করিবে।

ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যোপাসক লোকেরা এ-রকম কথা শুনিতে প্রস্তুত নয়। এই জন্য পার্লেমেণ্টে প্রশ্ন হইয়াছে, যে, পণ্ডিত জবাহরলালের কারামুক্তির দিন যখন ১৫ই ফেব্রুয়ারী তখন তাঁহাকে তাহার পূর্ব্বে ইংলণ্ড আসিতে ও তথায় বক্তৃতা আদি দ্বারা স্বীয় রাজনৈতিক মত প্রচার করিতে কেন দেওয়া হইল। সহকারী ভারত-সচিব মিঃ বাট্‌লার উত্তরে বলিয়াছেন, মিঃ নেহরুকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত গবর্ন্মেণ্টের কিছু চিঠি লেখালেখি হয় এবং এইরূপ স্থির হয় যে ইউরোপে সর্ব্বত্র তাঁহার চলাফেরা ও মত প্রকাশাদির স্বাধীনতা থাকিবে। পণ্ডিতজীর ইউরোপ-যাত্রার সময় এরূপ কথা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল বটে, যে, তিনি কোন সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া মুমূর্ষু স্ত্রীকে দেখিতেও যাইতে রাজী নহেন। এইরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন যে ঠিক্ হইয়াছিল, এখন তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে।

জবাহরলাল ভারতবর্ষে পূর্ণস্বরাজ স্থাপন চান। সুতরাং তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক উক্তিসমূহ স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতীয়ের ভাল লাগিবে। সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারায় বঙ্গের বাঙালীদের খুব আপত্তির কারণ আছে তাহা তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। এই মর্ম্মের কথাও বলিয়াছেন, যে, বঙ্গে হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগকে প্রভাবহীন ও শক্তিহীন করা এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের অভিপ্রায়।

পণ্ডিতজীর মতে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক ঝগড়াবিবাদের মূল ধর্ম্মবিষয়ক অনৈক্য নহে, উহার কারণ অর্থনৈতিক। এই মত সম্পূর্ণ অমূলক নহে, সম্পূর্ণ সত্যও নহে।

পণ্ডিতজী সমাজতন্ত্রবাদী (socialist), তাঁহাকে সাম্যবাদীও মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং তিনি ধনিকদের ধন বাজেয়াপ্ত করা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। কিন্তু এই মত প্রকাশিত হওয়ায় বোম্বাইয়ের ধনিক মহলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। কংগ্রেসের কাজে তথাকার ধনিকরা এই জন্য টাকা না-দিতেও পারেন।

—

জবাহরলালের কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচন

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের ২১টি কংগ্রেস প্রদেশের মধ্যে ১৯টি দ্বারা কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাকী একটি—বাংলা প্রদেশ—প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারে নাই বলিয়া এ-বিষয়ে কোন মত বঙ্গের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হয় নাই। অপরটি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। তথায় এখনও সমুদয় কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান সরকারী হুকুমে নিষিদ্ধ সমিতির অন্তর্ভূত বলিয়া ঐ প্রদেশও এ-বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে পারে নাই। ১৯টি কংগ্রেস প্রদেশের কংগ্রেসওয়ালারা যে তাঁহাকে মনোনীত

করিয়াছে, তাহার দ্বারা তাঁহার লোকপ্রিয়তা প্রমাণিত হইতেছে। তিনি যে খুব যোগ্য লোক, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তিনি যে এখন যোগ্যতম, তাহা দেখাইবার চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন—তাঁহারা অনাবশ্যক চেষ্টা করিতেছেন। কারণ, প্রতিবৎসর যে যোগ্যতমকেই নির্ব্বাচিত করিতে হইবে, কংগ্রেসের নিয়মাবলীতে এরূপ কোন বিধান নাই, এবং কংগ্রেসের ইতিহাসে এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা সভাপতি হইয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই ও সকলেই যোগ্যতম তাহা হইতে পারে না।

পণ্ডিতজী আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের মানুষ। লক্ষ্ণৌতে আগামী অধিবেশনের সমুদয় আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত যে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে, তিনি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এখন আবার অধিবেশনেরই সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। সুতরাং এখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে।

তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করায় কয়েকটি প্রশ্ন স্বতই আমাদের মনে উদিত হইতেছে। আগে কংগ্রেসের মূল নিয়মাবলীতে একটি নিয়ম ছিল, যে, কংগ্রেসের অধিবেশন যে বার যে প্রদেশে হইবে সে বার সেই প্রদেশের কেহ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন না। এখন সে নিয়ম নাই বটে, কিন্তু কংগ্রেস ৫০ বৎসর ধরিয়া এই রীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, যে, সভাপতি অধিবেশনের প্রদেশের বাহির হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। এই রীতির একটি মাত্র ব্যতিক্রম মনে পড়িতেছে, কিন্তু তাহা আকস্মিক কারণে ঘটে, এবং সেবার কংগ্রেসের দস্তুরমত অধিবেশন হয় নাই। কলিকাতায় শেষ যে অধিবেশনের জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, সেবার তিনি কলিকাতা আসিবার পথে আসানসোলে গ্রেপ্তার হন এবং এই আকস্মিক কারণে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তাকে নেত্রী মনোনয়ন করা হয়; কিন্তু পুলিস সভারম্ভের অল্পক্ষণ পরেই বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক সভা ভাঙিয়া দেয়।

অবশ্য একথা বলা যাইতে পারে, যে, যাহা নিয়ম নহে কেবল রীতি মাত্র, বিশেষ কারণ থাকিলে তাহার ব্যতিক্রম করা যাইতে পারে। ইহা স্বীকার্য্য। এখন প্রশ্ন এই, কী বিশেষ কারণে এবার কংগ্রেস-সভাপতির নির্ব্বাচনে অর্দ্ধ-শতাব্দীর রীতি লঙ্ঘিত হইল। যদি বলেন, যোগ্যতমের নির্ব্বাচনের জন্য জবাহরলালকে মনোনীত করা আবশ্যক ছিল, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই, যে, প্রতিবৎসর যাঁহাকে মনোনীত করা হয় তিনিই যোগ্যতম, ইহা বলা যায় না। বিশেষ একটা কিছু কারণ দেখাইতে হইবে, যাহার জন্য রীতির ব্যতিক্রম আবশ্যক। আর কংগ্রেসের একটি বিশেষ বিশ্বাস ও নিয়ম সম্বন্ধে যিনি গোঁড়া নহেন, তাঁহাকে সকল কংগ্রেসওয়ালা যে যোগ্যতম মনে করেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। জবাহরলাল বলিয়াছেন, খদ্দরের প্রতি একান্ত অনুরাগ টিকিবে না। ইহা গোঁড়া বা নিষ্ঠাবান কংগ্রেস-ওয়ালার উক্তি নহে।

কংগ্রেসের এখন তিনটি দল—গোঁড়া দল (ইঁহাদের সংখ্যা বেশী), কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী (Congress Nationalist Party) এবং কংগ্রেস সমাজতন্ত্রবাদীর দল। দ্বিতীয় দল প্রায় বঙ্গের মধ্যে আবদ্ধ এবং এখন চুপচাপ আছেন। তৃতীয় দলের লোক অনেক প্রদেশে আছেন, এবং বেশ সরব। হইতে পারে, যে, এই দলকে সন্তুষ্ট করা আবশ্যক, নতুবা কংগ্রেস ভাঙিয়া যাইতে পারে। সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে কংগ্রেসের সভাপতি হইবার যোগ্য কেহই নাই, বলা যায় না; কিন্তু নিশ্চয়ই আছেন বলিতেও আমরা অসমর্থ। অথবা এমনও হইতে পারে, যে, কংগ্রেসের বৃহত্তম দলের নেতারা মনে করেন, যে, সমাজতন্ত্রবাদীদের দলভুক্ত নহেন অথচ সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ঝোঁক আছে কংগ্রেসের বৃহত্তম দলের এমন কোন যোগ্য লোক সভাপতি হইলেই ভাল হয়; তাহা হইলে জবাহরলাল ছাড়া যে এমন লোক আর কেহ নাই, ইহা কখনই সত্য নহে।

এই সব কথা বিবেচনা করিয়া আমরা ঠিক ধরিতে পারিতেছি না, যে, কী বিশেষ কারণে কংগ্রেসের চিরানুসৃত রীতি লঙ্ঘন করা হইল।

—

সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নূতন পদ

সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক অধ্যাপকের একটি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা ভারতীয়দের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

—

কামিনীকুমার চন্দ

গত ১লা ফেব্রুয়ারী শিলচরে নিজগৃহে বিখ্যাত উকীল ও জননায়ক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ হইয়াছিল। আমি যখন কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসি, তখন ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশুন নামক একটি সভা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সভ্যদের নেতা ছিলেন। এই সভার অধিবেশন হিন্দু স্কুলের একটি কক্ষে হইতে দেখিয়াছি। ঐ কক্ষে গ্যালারী ছিল। এখন আছে কি না জানি না। সেই সময় কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নেতৃস্থানীয় ও উৎসাহী যে-সব যুবক সুরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় দেশসেবায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, কামিনীকুমার চন্দ তাঁহাদের অন্যতম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি সাহিত্যিক সভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে যখন শিলচর গিয়াছিলাম, তখন চন্দ-মহাশয়ের বাড়িতে অতিথি ছিলাম। তখন তাঁহার সহিত সেকালের অনেক কথা হইত। আতিথ্য করিবার ভার তিনি ভৃত্যদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, স্বয়ং সর্ব্বদা অতিথির সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন।

তিনি বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। দেশের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে যোগ দিতেন এবং অনেক কাজে তিনিই অগ্রণী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন, পূর্ব্বে ইম্পীরিয়্যাল কৌন্সিলের ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য ছিলেন। গবর্মেণ্ট একবার তাঁহাকে উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই।

—

নির্ম্মলচন্দ্র সেন

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেনের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। তিনি শিক্ষা সমাপনান্তে কিছু কাল বিহার প্রদেশে সরকারী চাকরী করেন, পরে কুচবিহার রাজ্যে রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। শেষে তিনি ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের পরামর্শদাতা ও তত্ত্বাবধায়ক রূপে কাজ করিয়া রাজদত্ত সম্মানসূচক উপাধি লাভ করেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি পেন্সান লইয়া স্বদেশেই বাস করিতে-ছিলেন। ১৯২৬ সালে যখন আমি কয়েক দিনের জন্য লণ্ডনে ছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের বাড়িতে তাঁহার সহিত প্রথম পরিচিত হই। তখন তাঁহার সৌজন্য ও মিষ্ট আলাপে প্রীত হইয়াছিলাম।

—

শাপুরজি সাক্লাথওয়ালা

শাপুরজি সাক্লাথওয়ালার বিখ্যাত পারসী বণিক ও দাতা জমশেদজি টাটার সহিত নিকট সম্পর্ক ছিল। তিনি কর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভে টাটা কোম্পানীর এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন, মোটা বেতন পাইতেন। পরে যখন তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক মত পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি কম্যুনিষ্ট বা সাম্য-বাদী হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাকে স্থির করিতে হইল, তিনি নিজের মতের মর্য্যাদা রাখিয়া তাহাতেই দৃঢ় থাকিবেন, না মতটাকে বেমালুম হজম করিয়া চাকরীটাই রাখিবেন। এই মানসিক দ্বন্দ্বে তাঁহার মনুষ্যত্বেরই জয় হইল—তিনি চাকরী ছাড়িলেন। তিনি জীবনের শেষ কয় বৎসর ইংলণ্ডেই ছিলেন—ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান্ রাষ্ট্রনীতিবিৎ ও সুবক্তা ছিলেন। নিজের বুদ্ধিমত্তা, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান ও বাগ্মিতার বলে বিলাতী শ্রমিক দলের অন্যতম সভ্য রূপে পার্লেমেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষার জন্য সতত চেষ্টা করিতেন এবং ভারত যাহাতে স্বাধীন হয় তজ্জন্যও চেষ্টা করিতেন।

—

অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত

বিপিনবিহারী গুপ্ত নামের দুই জন অধ্যাপক বাংলা দেশে ছিলেন। এক জন বিখ্যাত গণিতাধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত—যাঁহার ছাত্র বঙ্গের অনেক বৃদ্ধ গণিতজ্ঞ ব্যক্তি (আমিও তাঁহার ছাত্র ছিলাম কিন্তু গণিতজ্ঞ নহি)। বহু বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আর এক জন রিপন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত। গত ২রা ফেব্রুয়ারী ৬১

বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বাংলার সুলেখক ছিলেন।

—

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন রীতিনীতি সম্বন্ধে বহু অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার সাধনার পরিচয় তাঁহার "জয়ন্তী" নামক পুস্তকে পাওয়া যায়।

—

বঙ্গে "শিক্ষাসপ্তাহ"

গত মাসে কলিকাতায় "শিক্ষাসপ্তাহে"র অয়োজন হইয়াছিল। ইহার বক্তৃতাগুলি যাঁহারা শুনিয়াছেন ও শুনিয়া সে-বিষয়ে চিন্তা করিতে পারিয়াছেন এবং যাঁহারা শিক্ষা দিবার নানা আধুনিক সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির প্রদর্শনী দেখিয়াছেন, শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান বাড়িয়াছে। সে-দিক্ দিয়া শিক্ষাসপ্তাহটি আংশিক ভাবে ফলপ্রদ হইয়াছে। কিন্তু সভ্য বিদেশসমূহে প্রচলিত আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি কিনিবার টাকা দেশের সাধারণ লোকের নাই এবং গবর্মেণ্টও শিক্ষার জন্য ব্যয় করা অপেক্ষা অন্য নানাবিধ ব্যয় বেশী আবশ্যক মনে করেন। সুতরাং, কোন দরিদ্র দেশে অর্দ্ধাশন-অনশনক্লিষ্ট ক্ষুধিত লোকদের জন্য যদি রাজভোগের প্রদর্শনী করা হয় এবং তাহার উৎকর্ষ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়, অথচ তাহাদের রাজভোগ পাইবার মত অর্থলাভের কোন ব্যবস্থা না থাকে, এই শিক্ষা-সপ্তাহও অনেকটা সেই প্রকার হইয়াছিল।

বঙ্গের গবর্ণর যে ইহার প্রারম্ভিক বক্তৃতা করেন, তাহাতে জানা যায়, যে, তিনি জানেন আমাদের বিদ্যালয়-সকলের শিক্ষকদিগকে যথেষ্ট বেতন দিবার টাকা নাই, তাহা দিয়া উদ্বৃত্ত কিছু থাকিলে তবে সাজসরঞ্জামাদি হইতে পারে; কিন্তু উদ্বৃত্ত হয় না, হইতে পারে না; গবর্মেণ্টের নিকট হইতেও এখনকার চেয়ে বেশী টাকা দেশ পাইবে না। সুতরাং শিক্ষাসপ্তাহটি এক দিক্ দিয়া যেমন কিছু ফলপ্রদ বলিয়াছি, অন্য দিক্ দিয়া তেমনই তাহাকে একটা অনভিপ্রেত বিদ্রূপও বলা যাইতে পারে।

শিক্ষাসপ্তাহ মুখ্যতঃ শিক্ষকদের জন্য এবং তাহার পর শিক্ষিত সাধারণের জন্য। কিন্তু খবরের কাগজে দেখিলাম, যে, যে যোল-সতর শত শিক্ষক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই প্রথম দিন প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই, অনেকে পুলিস দ্বারা দেহ ও পরিচ্ছদ হাতড়ানর পরেও ঢুকিতে পান নাই। তাহার কারণ, বঙ্গের গবর্ণরকে নিরাপদ রাখা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল। তাঁহার দেহ-রক্ষা ও প্রাণরক্ষা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা হইলে হয় শিক্ষকদিগকে নিমন্ত্রণ না-করা উচিত ছিল, কিংবা তাঁহাদিগকে অনুসন্ধানানন্তর ঢুকিতে দেওয়া উচিত ছিল, কিংবা গবর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতাস্থলে না আসিয়া প্রাসাদ হইতে রেডিওর সাহায্যে বক্তৃতা ব্রডকাষ্ট করা উচিত ছিল। মনে পড়ে, একদা একটি সরকারী অনুষ্ঠানে সর্ সৈয়দ শামসুল হুদার গাড়ী এক কনষ্টেবল অগ্রসর হইতে দেয় নাই; তাহাতে তাৎকালিক বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল স্বয়ং দুঃখ প্রকাশ করিয়া মাফ চাহিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি ছিলেন লর্ড কারমাইকেল এবং যাঁহার অগ্রগতি বাধা পাইয়াছিল তিনি মান্যগণ্য লোক, অজ্ঞাত অখ্যাত বিদ্যালয়ের শিক্ষক নহেন।

দেশে বিদ্যাদানের আয়োজন যে অতি সামান্য এবং সেই আয়োজনে মৌলিক ও অন্যবিধ দোষত্রুটি অনেক আছে, আশা করি শিক্ষাসপ্তাহের আড়ম্বরে সেই দুঃখকর, অনিষ্টকর ও লজ্জাজনক তথ্যটি চাপা পড়িয়া যাইবে না।

—

শিক্ষার নানা সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষাসপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার নানা সমস্যা সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাই এই অনুষ্ঠানটির প্রধান জিনিষ। এই বক্তৃতাটিতে তিনি যাহা বলেন, তাহা তাঁহার আগেকার অনেক কথার পুনরাবৃত্তি বটে, কিন্তু তাঁহার অনুকরণাতীত নিত্যনব অনবদ্য কথনভঙ্গী সেগুলিকে নূতনের বেশ দিয়াছে। আমরাও এইরূপ কোন কোন তত্ত্ব ও তথ্য অনেক বার বলিয়াছি, কিন্তু কবি তাঁহার কথাকে যে অলঙ্কারে সাজাইয়া মনোজ্ঞ করিতে পারিয়াছেন ও যে রসে আপ্লুত করিয়া উপভোগ্য

করিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাণ্ডারে নাই। গোড়াতেই তিনি বলেন :—

আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্তবিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল সেইটেই রয়েছে সব চেয়ে পর হয়ে, তার সঙ্গে আমাদের দড়ির যোগ হয়েছে নাড়ীর যোগ হয় নি; এর ব্যর্থতা আমাদের স্বাজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করছে, খর্ব্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে। দেশের বহুবিধ অতি-প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থায় অনাত্মীয়তার দুঃসহ ভার অগত্যাই চেপে রয়েছে; আইন, আদালত সকল প্রকার সরকারী কার্য্যবিধি, যা বহু কোটি ভারতবাসীর ভাগ্য চালনা করে, তা সেই বহু কোটি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ দুর্গম। আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের অনিবার্য্য অশিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনবিধির বিপুল ব্যবধানবশত পদে পদে যে দুঃখ ও অপব্যয় ঘটে তার পরিমাণ প্রভূত। তবু বলতে পারি এহ বাহ্য। কিন্তু শিক্ষা-ব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিষ না হওয়া তার চেয়ে মর্ম্মান্তিক। ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম অন্নে দেশের পেট ভরাবার মতো সেই চেষ্টা; অতি অল্পসংখ্যক পেটেই সেটা পৌঁছয়, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ রক্তে পরিণত করবার শক্তি অতি অল্প পাকযন্ত্রেরই থাকে। দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে; কেননা নিশ্চিত জানি, সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ শিক্ষায় পরধর্ম্ম।

আমাদের দেশে নিরক্ষর লোকদের অজ্ঞতা, নিম্নতম শিক্ষা, ও উচ্চতর শিক্ষা—এই তিন স্তরের মধ্যে যে যোগাযোগ নাই, নীচের স্তরের লোকদের উপরে উঠিবার ব্যবস্থা নাই, তাহা কবি প্রকাশ করেন এই রূপে—

একদা একজন অব্যবসায়ী ভদ্রসন্তান তাঁর চেয়ে আনাড়ি এক ব্যক্তির বাড়ি তৈরি করবার ভার নিয়েছিলেন। মালমসলার জোগাড় হয়েছিল সেরা দরের, ইমারতের গাঁথুনি হয়েছিল মজবুৎ, কিন্তু কাজ হয়ে গেলে প্রকাশ পেল সিঁড়ির কথাটা কেউ ভাবেই নি। শনির চক্রান্তে এমনতরো পৌরব্যবস্থা যদি কোনো রাজ্যে থাকে যেখানে একতলার লোকের নিত্যবাস একতলাতেই, আর দোতলার লোকের দোতলায়, তবে সেখানে সিঁড়ির কথাটা ভাবা নিতান্তই বাহুল্য। কিন্তু আলোচিত পূর্ব্বোক্ত বাড়িটাতে সিঁড়িযোগে উর্দ্ধপথযাত্রায় একতলার প্রয়োজন ছিল। এই ছিল তার উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়।

এ দেশে শিক্ষা-ইমারতে সিঁড়ির সংকল্প গোড়া থেকেই আমাদের রাজমিস্ত্রীর প্ল্যানে ওঠেনি। নীচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃস্বার্থ ধৈর্য্যে শিরোধার্য্য করে নিয়েছে, তার ভার বহন করেছে কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করে নি, দাম জুগিয়েছে, মাল আদায় করে নি।

আমার পূর্ব্বকার লেখায় এ দেশের সিঁড়ি-হারা শিক্ষাবিধানে এই মস্ত ফাঁকটার উল্লেখ করেছিলুম। তা নিয়ে কোনো পাঠকের মনে কোনো যে উদ্বেগ ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার কারণ অভ্রভেদী বাড়িটাই আমাদের অভ্যস্ত, তার গৌরবে আমরা অভিভূত, তার বুকের কাছটাতে উপর নিচে সম্বন্ধ স্থাপনের যে সিঁড়ির নিয়মটা ভদ্র নিয়ম, সেটাতে আমাদের অভ্যাস হয় নি।

আমাদের আশঙ্কা এই, যে, কবির যুক্তিগর্ভ তুলনার আমলাতান্ত্রিক উত্তর প্রস্তুত হইয়া আছে। আমলাতন্ত্র বলিবেন—দোতলাটাতেই ত তোমার আপত্তি? সেটা ভাঙিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত হইয়া আছে; এবং, চাই কি, একতলাটাও আরো ছোটখাট করা হইবে।

জীবিকা ও অন্নের অভাবে এবং শিক্ষা ও বিদ্যার অভাবে আমাদের দেশের যে শোচনীয় ও লজ্জাকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, শিক্ষাসপ্তাহের আয়োজনকর্ত্তারা এবং দেশের লোকেরা আশা করি কবির নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি হইতে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বেঁচে থাকার নিয়ত ইচ্ছা ও সাধনাই হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রকৃতিগত লক্ষণ। যে-সমাজে প্রাণের জোর আছে সে-সমাজ টিকে থাকবার স্বাভাবিক গরজেই আত্মরক্ষাঘটিত দুটি সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনের দিকে অক্লান্তভাবে সজাগ থাকে। অন্ন আর শিক্ষা, জীবিকা আর বিদ্যা। সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে-প'রে পরিপুষ্ট থাকবে আর নীচের থাকের লোক অর্দ্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন, এটাকে বলা যায় অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। এই অসাড়তার ব্যামোটা বর্ব্বরতার ব্যামো।

পশ্চিম মহাদেশে আজ সর্ব্বব্যাপী অর্থসঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে অন্নসঙ্কট প্রবল হয়েছে। এই অভাব নিবারণের জন্যে সেখানকার বিদ্বানের দল এবং গবর্মেণ্ট যে রকম অসামান্য দাক্ষিণ্য প্রকাশ করছেন, সেরকম উদ্বেগ এবং চেষ্টা আমাদের বহুসহিষ্ণু বুভুক্ষার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ নিয়ে বড়ো বড়ো অঙ্কের ঋণ স্বীকার করতেও তাঁদের সঙ্কোচ দেখি নে। আমাদের দেশে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় অতি অল্প লোক, বাকি বারো আনা লোক আধপেটা খেয়ে ভাগ্যকে দায়ী করে এবং জীবিকার কৃপণ পথ থেকে মৃত্যুর উদার পথে সরে পড়তে বেশী দেরি করে না। এর থেকে যে নির্জ্জীবতার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিমাণ কেবল মৃত্যুসংখ্যার তালিকা দিয়ে নিরূপিত হোতে পারে না। নিরুৎসাহ, অবসাদ, অকর্ম্মণ্যতা, রোগপ্রবণতা মেপে দেখবার প্রত্যক্ষ মানদণ্ড যদি থাকত, তাহোলে দেখতে পেতুম এদেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত জুড়ে' প্রাণকে ব্যঙ্গ করছে মৃত্যু, সে অতি কুৎসিত দৃশ্য, অত্যন্ত শোচনীয়। কোনো স্বাধীন সভ্য দেশ মৃত্যুর এরকম সর্ব্বনেশে নাট্যলীলা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীকার করতেই পারে না, আজ তার প্রমাণ ভারতের বাইরে নানাদিক থেকেই পাচ্ছি।

শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। শিক্ষার অভিষেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই এক ইঞ্চিমাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নিচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূর-প্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোন সভ্যসমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্ম্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই।

এমন কোনো কোনো গ্রহ উপগ্রহ আছে যার এক অর্দ্ধেকের সঙ্গে অন্য অর্দ্ধেকের চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদ আলোক অন্ধকারের

বিচ্ছেদ। তাদের একটা পিঠ সূর্য্যের অভিমুখে অন্য পিঠ সূর্য্য-বিমুখ। তেমনি ক'রে যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে-সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্য্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্নজাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরো বেশী প্রবল। একই নদীর এক পারের স্রোত ভিতরে ভিতরে অন্য পারের স্রোতের বিরুদ্ধ দিকে চলেছে; সেই উভয় বিরুদ্ধের পার্শ্ববর্ত্তিতাই এদের দূরত্বকে আরো প্রবলভাবে প্রমাণিত করে।

ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য সকল সভ্য দেশে শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থা যে তথাকার সব মানুষের জন্য, কবি অতঃপর তাহাই বলিয়াছেন।

শিক্ষার ঐক্যযোগে চিত্তের ঐক্যরক্ষাকে সভ্যসমাজ মাত্রই একান্ত অপরিহার্য্য ব'লে জানে। ভারতের বাইরে নানাস্থানে ভ্রমণ করেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাদেশে। দেখে এসেছি এসিয়ার নবজাগরণের যুগে সর্ব্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে যে সব দেশ চিত্তের ও বিত্তের আদান প্রদান বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে তারা কেবলি হঠে যাবে, কোণ-ঠেসা হয়ে থাকবে—এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোনো ভদ্রদেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ৎ মানে নি। আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম তখন সেখানে আট বছর মাত্র নূতন স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন হয়েছে, তার প্রথমভাগে অনেককাল বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থসচ্ছলতা ছিলই না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে শিক্ষা বিস্তার হয়েছে সেটা ভাগ্যবঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল ব'লেই মনে হোলো।

শিক্ষার ঐক্যসাধন যে মহাজাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনের মূলে, কবির বক্তৃতায় সেকথা বাদ পড়ে নাই।

শিক্ষার ঐক্যসাধন ন্যাশনাল ঐক্যসাধনের মূলে, এই সহজ কথা সুস্পষ্ট ক'রে বুঝতে আমাদের দেরী হয়েছে তারও কারণ আমাদের অভ্যাসের বিকার। একদা মহাত্মা গোখলে যখন সার্ব্বজনিক অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন সব চেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলা প্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকেই। অথচ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা এই বাংলাদেশেই সব চেয়ে মুখর ছিল। শিক্ষায় অনৈক্যে বিজড়িত থেকেও রাষ্ট্রিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলা সম্ভবপর, এই কল্পনা এ প্রদেশের মনে বাধা পায় নি, এই অনৈক্যের অভ্যাস এমনই ছিল মজ্জাগত।

এখানে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে, মহামতি গোখলে সার্ব্বজনিক অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উদ্যোগে প্রবলতম বাধা পাইয়াছিলেন গবর্মেণ্টের কাছ থেকে। গবর্মেণ্ট অনিচ্ছুক না থাকিলে বাংলা দেশের কোন কোন "গণমান্য" লোকের বাধা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইত। এবং হয়ত তাঁহারা বাধা দিতেনও না।

আমাদের দেশে বিদ্যা ও শিক্ষার প্রচারের আগেকার ব্যবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার যে-তুলনা কবি করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

এদেশে একদা বিদ্যার যে ধারা সাধনার দুর্গম তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নির্ঝরিত হোত সেই একই ধারা সংস্কৃতিরূপে দেশকে সকল স্তরেই অভিষিক্ত করেছে। এজন্যে যান্ত্রিক নিয়মে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের কারখানা-ঘর বানাতে হয়নি, দেহে যেমন প্রাণশক্তির প্রেরণায় মোটা ধমনীর রক্তধারা নানা আয়তনের বহুসংখ্যক শিরা উপশিরা যোগে সমস্ত দেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হোতে থাকে, তেমনি ক'রেই আমাদের দেশের সমস্ত সমাজ-দেহে একই শিক্ষা স্বাভাবিক প্রাণ-প্রক্রিয়ায় নিরন্তর সঞ্চারিত হ'য়েছে—নাড়ীর বাহনগুলি কোনোটা বা স্থূল কোনোটা বা অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু তবু তারা এক-কলেবরভুক্ত নাড়ী, এবং রক্তও একই প্রাণভরা রক্ত।

আমাদের সমাজের বনভূমিতে একদিন উচ্চশীর্ষ বনস্পতির দান নীচের ভূমিতে নিত্যই বর্ষিত হোত, আজ দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়েছে মাটিকে সে দান করেছে অতি সামান্য, ভূমিকে সে আপন উপাদানে উর্ব্বরা করে তুলছে না। জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের এই প্রভেদটাই লজ্জাজনক এবং শোকাবহ। আমাদের দেশ আপন শিক্ষার ভূমিকাসৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন। এখানে দেশের শিক্ষা এবং দেশের বৃহৎ মন পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সেকালে আমাদের দেশের মস্ত মস্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামবাসীর মনঃপ্রকৃতির বৈপরীত্য ছিল না। সেই শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতি তাদের মনের অভিমুখিতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল,—সেই ভোজে অর্দ্ধভোজন তাদের ছিল নিত্য, কেবল ঘ্রাণে নয়, উদ্বৃত্ত উপভোগে।

কিন্তু সায়ান্স-পড়া পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে আমাদের দেশের মনের যোগ হয় নি—জাপানে সেটা হয়েছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে,—তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে জাপান স্বরাজের অধিকারী। এটা তার পাস-করা বিদ্যা নয়, আপন-করা বিদ্যা। সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্, সায়ান্সে ডিগ্রিধারী পণ্ডিত এদেশে বিস্তর আছে যাদের মনের মধ্যে সায়েন্সের জমিনটা তলত্বলে; তাড়াতাড়ি যা' তা' বিশ্বাস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ; মেকি সায়ান্সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে তারা সায়ান্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ শিক্ষার নৌকোতে বিলিতি দাঁড় বসিয়েছি, হাল লাগিয়েছি, দেখতে হয়েছে ভালো, কিন্তু সমস্ত নদীটার স্রোত উল্টো দিকে—নৌকো পিছিয়ে পড়ে আপনিই।

কবির নীচের কথাগুলি শিক্ষাসপ্তাহের আয়োজনকর্ত্তা গবর্মেণ্ট ও তাহার আমলাদের লজ্জাবোধ কিঞ্চিৎ সচেতন করিবে কি?

আধুনিক কালে বর্ব্বর দেশের সীমানার বাইরে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে শতকরা আট-দশ জনের মাত্র অক্ষর-পরিচয় আছে। এমন দেশে ঘটা ক'রে বিদ্যাশিক্ষার আলোচনা করতে লজ্জা বোধ করি। দশজন মাত্র যার প্রজা তার রাজত্বের কথাটা চাপা দেওয়াই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডে আছে, কেম্ব্রিজে আছে, লণ্ডনে আছে, আমাদের দেশেও স্থানে স্থানে আছে, পূর্ব্বোক্তের সঙ্গে এদের ভাবভঙ্গী ও বিশেষণের মিল দেখে আমরা মনে ক'রে বসি এরা পরস্পরের সবর্ণ,—যেন ওটিন-ক্রীম ও পাউডর মাখলেই মেমসাহেবের সঙ্গে সত্য সত্যই বর্ণভেদ ঘুচে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় যেন তার ইমারতের দেওয়াল এবং নিয়মাবলীর পাকা প্রাচীরের মধ্যেই পর্য্যাপ্ত।

অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ বলতে শুধু ঐটুকুই বোঝায় না, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিক্ষিত ইংলণ্ডকেই বোঝায়। সেইখানেই তারা সত্য, তারা মরীচিকা নয়। আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ থেমে গেছে তার আপন পাকা প্রাচীরের তলাটাতেই। থেমে যে গেছে সে কেবল বর্ত্তমানের অসমাপ্তিবশত নয়; এখনো বয়স হয় নি ব'লে যে-মানুষটি মাথায় খাটো তার জন্যে আক্ষেপ করবার দরকার নেই, কিন্তু যার ধাতের মধ্যেই সম্পূর্ণ বাড়বার জৈবধর্ম্ম নেই, তাকে যেন গ্রেনেডিয়ারের স্বজাতীয় ব'লে কল্পনা না করি।

গোড়ায় যাঁরা এদেশে তাঁদের রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, দেখতে পাই তাঁদেরও উত্তরাধিকারীরা বাইরের আসবাব এবং ইঁট কাঠ চুণ সুরকির প্যাটার্ণ দেখিয়ে আমাদের এবং নিজেদেরকে ভোলাতে আনন্দবোধ করেন।...আমাদের নালিশ এই যে, তলোয়ারটা যেখানে তালপাতার চেয়ে বেশি দামী করা অর্থাভাববশতঃ অসম্ভব ব'লে সংবাদ পাই, সেখানে তার খাপটাকে ইস্পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে আসল কাজ এগোয় না। তার চেয়ে ঐ ইস্পাতটাকে গলিয়ে একটা চলনসই গোছের ছুরি বানিয়ে দিলেও কতকটা সান্ত্বনার আশা থাকে।

প্রাচীন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। কবি দৃষ্টান্ত দিতেছেন—

আমাদের দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আজও আছে বারাণসীতে। অত্যন্ত সত্য, নিতান্ত স্বাভাবিক. অথচ মস্ত ক'রে চোখে পড়ে না। এদেশের সনাতন সংস্কৃতির মূল উৎস সেইখানেই, কিন্তু তার সঙ্গে না আছে ইমারৎ, না আছে অতি জটিল ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থাপ্রণালী। সেখানে বিদ্যাদানের চিরন্তন ব্রত দেশের অন্তরের মধ্যে অলিখিত অনুশাসনে লেখা। বিদ্যাদানের পদ্ধতি, তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা, তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুশিষ্যের মধ্যে অকৃত্রিম হৃদ্যতার সম্বন্ধ সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা ক'রে এসেছে, কেন না সত্যেই তার পরিচয়।

কেহ যেন মনে না করেন, কবি কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

বিদেশ থেকে যেখানে আমরা যন্ত্র কিনে এনে ব্যবহার করি, সেখানে তার ব্যবহারে ভয়ে ভয়ে অক্ষরে অক্ষরে পুঁথি মিলিয়ে চলতে হয় কিন্তু সজীব গাছের চারার মধ্যে তার আত্মচালনা আত্মপরিবর্দ্ধনার তত্ত্ব অনেক পরিমাণে ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। যন্ত্র আমাদের আয়ত্ত হোতে পারে কিন্তু তাতে আমাদের স্বানুবর্ত্তিতা থাকে না। স্বাধীন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেখানে ন্যাশনল কলেজ গড়া হয়েছে, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনায় যেখানে দেখা গেল অর্থ ব্যয় অজস্র হয়েছে, সেখানেও ছাচ-উপাসক আমরা ছুঁচের মুঠো থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতে ছাড়িয়ে নিতে পারছি নে। সেখানেও শুধু যে ইংরেজী য়ুনিভার্সিটির গায়ের মাপে ছেঁটে ছুঁটে কুর্ত্তি বানাচ্চি তা নয়, ইংরেজের জমি থেকে তার ভাষাসুদ্ধ উপড়ে এনে দেশের চিত্তক্ষেত্রকে কোদালে কুড়ুলে ক্ষত বিক্ষত ক'রে বিরুদ্ধ ভূমিতে তাকে রোপণের গলদঘর্ম্ম চেষ্টা করছি; তাতে শিকড় না ছড়াচ্চে চারিদিকে, না পৌঁছচ্চে গভীরে।

পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদিকের কৃতিত্বের এই প্রশংসা করিয়াছেন—

ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ বয়সে অল্প, সেই জন্যই বোধ করি তার সাহস বেশি, তা ছাড়া একথাও বোধ করি সেখানে স্বীকৃত হওয়া সহজ হয়েছে যে, শিক্ষাবিধানে কৃপণতা করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর কিছুই হোতে পারে না। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিচলিত নিষ্ঠার সহায়তায় আদ্যন্তমধ্যে উর্দ্দু ভাষার প্রবর্ত্তন হয়েছে। তারি প্রবল তাড়নায় ঐ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ইমারতও হোলো, সিঁড়িও হোলো; নিচে থেকে উপরে লোক-যাতায়াত চলছে। হোতে পারে, সেখানে যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তবুও চারিদিকের প্রচলিত মত ও অভ্যাসের দুস্তর বাধা অতিক্রম ক'রে যিনি এমন মহৎ সঙ্কল্পকে মনে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্থান দিতে পেরেছেন সেই স্যর আকবর হয়দরির সাহসকে ধন্য বলি। বিনা দ্বিধায় জ্ঞান-সাধনার দুর্গমতাকে তাঁদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রে সমভূম ক'রে দিয়ে উর্দ্দুভাষীদের তিনি যে মহৎ উপকার করেছেন, তার দৃষ্টান্ত যদি আমাদের মন থেকে সংশয় দূর এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির বিলম্বিত গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে, তবে একদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্য সকল সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্য্যায়ে দাঁড়িয়ে গৌরব করতে পারবে। নইলে প্রতিধ্বনি ধ্বনির সঙ্গে একই মূল্য দাবি করবে কোন স্পর্দ্ধায়? বনস্পতির শাখায় যে পরগাছা ঝুলছে সে বনস্পতির সমতুল্য নয়।

রাজকোষে যথেষ্ট টাকা না থাকায় শিক্ষার জন্য যথেষ্ট টাকা দেওয়া চলে না, এই অছিলাটা সম্বন্ধে কবি বলেন—

এদেশে বহু রোগজর্জ্জর জনসাধারণের আরোগ্য বিধানের জন্যে রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয়সঙ্কোচ করতে হয়, দেশজোড়া অতি বিরাট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জ্জন করতে অর্থে কুলোয় না, অর্থাৎ যে সব অভাবে দেশ অন্তরে বাহিরে মৃত্যুর তলায় তলাচ্চে তার প্রতিকারের অতি ক্ষীণ উপায় দেউলে দেশের মতোই, অথচ এদেশে শাসনব্যবস্থায় ব্যয়ের অজস্র প্রাচুর্য্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্য ধনী দেশকেও অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এমন কি, বিদ্যাবিভাগের সমস্ত বাহ্ ঠাট বজায় রাখবার ব্যয় বিদ্যা পরিবেশনের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ গাছের পাতাকে দর্শনধারী আকারে ঝাঁকড়া করে তোলবার খাতিরে ফল ফলবার রস জোগানে টানাটানি চলেছে। তাহোক, এর এই বাইরের দিকের অভাবের চেয়ে এর মর্ম্মগত গুরুতর অভাবটাই সব চেয়ে দুশ্চিন্তার

বিষয়। সেই কথাটাই বলতে চাই। সেই অভাবটা শিক্ষা যথাযোগ্য আধারের অভাব।

দেশের খালবিল নদী-নালায় আজ জল শুকিয়ে এল, তেমনি রাজার অনাদরে আধমরা হয়ে এল সর্ব্বসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করবার স্বাদেশিক ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে মানুষকে লিখনপঠনক্ষম করিবার আয়োজন, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, এখনকার চেয়ে আগে প্রচুর ও ব্যাপক ছিল, তাহা আমরা বার বার তাথ্যিক সংখ্যা সহযোগে ও অনেক ইংরেজের সাক্ষ্য হইতে প্রমাণ করিয়াছি। কবিও বলিতেছেন—

রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদ্রি এডাম সাহেব বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায়, বাংলা বিহারে এক লক্ষের উপর পাঠশালা ছিল; দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্ততঃ ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এছাড়া, প্রায় তখনকার ধনী মাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্ত্তব্যের অঙ্গরূপে পাঠশালা রাখতেন, গুরুমশায় বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাছ থেকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতা এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন—

অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলা-ভাষার শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্য্যন্ত নিয়ে চলুন, দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে; এই সঞ্জীবনী-ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক, পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক, বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।

জানিনে, হয়তো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলবেন, একথাটা কাজের কথা নয়, এ কবিকল্পনা। তা হোক, আমি বলব, আজ পর্য্যন্ত কেজো-কথায় কেবল জোড়াতাড়ার কাজ চলেছে, সৃষ্টি হয়েছে কল্পনার বলে।

—

নারীহরণকারীদের বেত্রদণ্ডের উদ্যোগ

নারীহরণকারীদের বেত্রদণ্ড দিবার আইন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে প্রণয়ন করিবার চেষ্টা সরকার পক্ষ হইতে হইতেছে। ইহা খুবই আবশ্যক। এরূপ দুর্বৃত্তদের অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড, বেত্রদণ্ড এবং স্থলবিশেষে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন, যে-সব লোক নারীহরণকারীদিগকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অপহৃতা নারীকে লইয়া যাইতে ও স্ব স্ব গৃহে লুকাইয়া রাখিতে সাহায্য করে, তাহাদেরও সমুচিত শাস্তি হওয়া উচিত।

—

কচুরীপানা উচ্ছেদ আইন

কচুরী পানার দ্বারা বঙ্গের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার আক্রমণ ও বিস্তারে বিস্তর শস্যক্ষেত্র চাষের অনুপযোগী হইয়া গিয়াছে, অনেক নদীনালা নৌকা চালাইবার অনুপযোগী হইয়াছে এবং অনেক পুষ্করিণী খাল বিল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। হয়ত ম্যালেরিয়ার বিস্তারও পরোক্ষ ভাবে ইহার দ্বারা হইতেছে। এই হেতু ইহার উচ্ছেদ আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে।

আমাদের বিবেচনায় ইহার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সুব্যবহার সম্ভবপর না হইলে উচ্ছেদ সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়নের অধ্যাপক ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন বলিয়াছেন, যে, কচুরী পানা হইতে, লাভ রাখিয়া, আলকোহল বা সুরাসার উৎপন্ন হইতে পারে এবং অন্যান্য দ্রব্যও প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার পরীক্ষা হওয়া চাই। যদি কচুরী পানা হইতে লাভজনক কোন পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই সব পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ও কাটতি বুঝিয়া তদনুরূপ কচুরী পানা থাকিতে দিয়া বা আর্জাইয়া বাকী নষ্ট করা কর্ত্তব্য।

—

বহু দেশমহাদেশে অশান্তি

ইটালী আবিসীনিয়া আক্রমণ করায় তথায় ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে এবং ইটালী সেখানে বর্ব্বরাধম ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু কেবলমাত্র আবিসীনিয়াতেই যে অশান্তি বিদ্যমান তাহা নহে। সীরিয়ায় ফরাসীদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবলভাবে চলিতেছে। ফলে সেখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রাণনাশ হইয়া গিয়াছে এবং ফরাসী পণ্যদ্রব্যের বয়কট ঘোষিত হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনে ব্রিটিশ মুরুব্বির আশ্রয়ে অত্যন্ত বেশী ইহুদী আসিয়াছে এই অজুহাতে তথাকার আরবেরা দাবী করিয়াছেন, যে, প্যালেষ্টাইনে আর ইহুদীদের আগমন কিছুকাল বন্ধ থাক; কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সচিব এই দাবী মানেন নাই। রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে রাশিয়া ও জাপানের যে ছোটখাট সংঘর্ষ হইয়াছে, তাহা বৃহত্তর যুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। মাঞ্চুরিয়ার

লোকেরাও জাপানের প্রভুত্ব ঝাড়িয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি দেখাইতেছে। মোঙ্গোলিয়াতেও জাপানের আচরণ চাঞ্চল্যের কারণ হইয়াছে। জাপান ত চীনের উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াই আছে; তাহার উপর চৈনিক কম্যুনিষ্টরা চীনের কোন কোন শহর ও অঞ্চল দখল করিতেছে। মিশর দেশের লোকেরা ব্রিটিশ প্রভুত্ব সহ্য করিতে আর প্রস্তুত নহে। তথাকার ছাত্রদের ও অন্য অনেক স্বাজাতিকদের মধ্যে গুরুতর বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে; আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনেকের প্রাণহানি হইয়াছে। গ্রীসে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব হইয়া গিয়াছে। আরব স্বাজাতিকতা আরবের সর্ব্বত্র স্বজাতীয়ের কর্ত্তৃত্বস্থাপনপ্রয়াসী হইয়াছে। হেজাজ কন্‌ফারেন্সে সুলতান ইবন সাদ ও ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের সন্ধির ফলে আরবের লোহিতসাগরের উপকূলবর্ত্তী আকবা ও ওমান বন্দর ব্রিটিশ কর্ত্তৃত্বাধীন রহিয়াছে। উক্ত বন্দর দুটি মক্কা ও মদিনার সন্নিকটে ও মুসলমানদের চক্ষে পবিত্র। ঐ দুটী বন্দর হেজাজ অঞ্চলের কর্ত্তৃত্বাধীন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

—

সুভাষচন্দ্র বসু ও ডি ভ্যালেরা

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু স্বদেশে ফিরিবার পথে অন্য কোন কোন দেশে কিছু কাজ করিয়া আসিতেছেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী ডবলিনে মিঃ ডি ভ্যালেরার সহিত কিয়ৎকাল কথাবার্ত্তা হয়, মিঃ ডি ভ্যালেরা সুভাষবাবুকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। সুভাষবাবু বলেন, পরলোকগত শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল মৃত্যুশয্যায় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সহিত আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্পর্ক রাখিতে বলিয়াছিলেন; তাহাই স্মরণ করিয়া তিনি আয়ার্ল্যাণ্ড আসিয়াছেন। রয়টারের প্রতিনিধির কাছে সুভাষবাবু বলেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে আয়ার্ল্যাণ্ডের সাফল্য ভারতীয়দের আশা ও উৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়াছে।

—

জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিকারচেষ্টা

লক্ষ্ণৌতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ক একটি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেকে—সকলে নহে—এইরূপ মত প্রকাশ করেন, যে, যেহেতু ভারতবর্ষে যত মানুষ থাকে তাহাদের পুষ্টির জন্য আবশ্যক খাদ্য জন্মে না এবং চাষের উপযোগী সব জমীতে খাদ্য উৎপন্ন করিলেও সকলের জন্য যথেষ্ট খাদ্য জন্মিবে না, অতএব যন্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহাররূপ কৃত্রিম উপায়ে বংশবৃদ্ধি কমাইতে বা বন্ধ করিতে হইবে। আমরা এই পরামর্শের পক্ষপাতী নহি। এই প্রকার যুক্তির অনুসরণ করিয়া কোন কোন দেশে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভপাত ও ভ্রূণহত্যা পর্য্যন্ত সমর্থিত হইতেছে—রাশিয়াতে তাহার অনুকূল আইনও আছে। এবম্প্রকার যুক্তি ও মনোভাব অতঃপর, সকল শিশুকে পালন করিবার সামর্থ্য না থাকিলে কতকগুলিকে বধ করিতে হইবে, এইরূপ মতেরও সৃষ্টি করিতে পারে।

চাষের যোগ্য সমুদয় জমীর চাষ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমীর ফলন বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন খাদ্য ও অন্যবিধ ধন সকল লোকের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বণ্টনের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা খাদ্যাভাব দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। নানাবিধ পণ্যশিল্পের প্রবর্ত্তন দ্বারা লোকদিগকে ধনী করিয়া সেই ধনের সাহায্যে অন্য দেশ হইতে খাদ্য আমদানীও করিতে পারা যায়। মানুষদের জীবনযাত্রা প্রণালী যত উৎকৃষ্ট হয় ও সংস্কৃতির দিকে তাহাদের ঝোঁক যত বাড়ে, তাহাদের সন্তানবৃদ্ধি তত কম হয়। অতএব, এই দিকে মন দেওয়া উচিত। কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নিরোধের পরামর্শে এবং যন্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে ফল এই হয়, যে, এই সব উপায় কেবল শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা অবলম্বন করে ও তাহাদের বংশ কমিতে থাকে এবং অশিক্ষিত লোকেদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। তাহাতে সংস্কৃতির অবনতি হয়, জাতির উন্নততর স্তরের ক্ষমতা ও প্রভাব কমিয়া যায়।

—

বিবাহ না-হওয়ার সঙ্গীন সমস্যা

কয়েকমাস পূর্ব্বে কলিকাতার ঢাকুরিয়া হ্রদে সত্তর বৎসর-বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত গবর্ন্মেণ্ট কর্ম্মচারী কিশোরীমোহন মজুমদারের পুত্র সুশীলকুমার মজুমদার ও এক বিবাহিতা নারী আভা সেন একত্রে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করে। গত ৫ই

ফেব্রুয়ারী কিশোরী বাবুর গড়পার রোড গৃহে প্রাতঃকালে তাঁহার চারিটি অবিবাহিতা কন্যাদের বেলা ৮॥০টা পর্য্যন্ত নিদ্রা হইতে উঠিতে না দেখিয়া তাহাদের মাতা দরজা ভাঙিয়া ঢুকিয়া দেখেন, যে, চব্বিশ বৎসর বয়স্কা পারুলবালা, বাইশ বৎসর বয়স্কা দেবী, কুড়ি বৎসর বয়স্কা গঙ্গা ও আঠার বৎসর বয়স্কা যমুনা অজ্ঞান হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। ডাক্তার আসিয়া সকলকে হাসপাতালে পাঠাইতে বলেন। একজনের পথে, ও দুই জনের হাসপাতালে, মৃত্যু হয়, এবং পারুলবালা শঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে থাকে। সকলেই আত্মহত্যার জন্য আফিং সেবন করিয়াছিল। তাহাদের বিবাহে পণের জন্য বহু টাকার আবশ্যক হওয়ায় তাহাদের পিতাকে সঙ্কট হইতে মুক্তি দিবার জন্য তাহারা আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। তাহাদের তিন ভগ্নীর ইতিপূর্ব্বে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

অনেক প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহ না-হওয়ায় যে এইরূপ মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটে তাহার কারণ অনেক। পণ দিয়া জামাই কিনিবার প্রথা এবং বরের কর্ত্তৃপক্ষ ও বরদের দ্বারা পশুর মত বরের দর হাঁকা ইহার একটি কারণ। যাহাদের টাকা কম, তাহারা জামাই কিনিতে পারে না। আর একটি কারণ যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যা। তাহারা উপার্জ্জক না হইয়া বিবাহ করিতে চায় না। আর একটি কারণ যুবকদের মধ্যে ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রতি আসক্তি এবং সাদাসিধা চালচলনের প্রতি বিরাগ। আর একটি কারণ বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার—বিশেষতঃ অর্থকরী শিক্ষার—অভাব। অর্থকরী শিক্ষা পাইলে তাহারা অবিবাহিতা থাকিয়াও কাহারও গলগ্রহ না হইতে পারে। তাহার উপর আছে অবিবাহিতা বালিকাদের প্রতি গঞ্জনাবাক্য প্রয়োগ, দুর্বৃত্ত লোকদের তাহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা, তাহাতে বাধা দিবার সমাজের অপ্রবৃত্তি ও অক্ষমতা এবং বালিকাদেরও আত্মরক্ষায় অসামর্থ্য।

এই সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমাজকে প্রতিকারচিন্তা করিতে হইবে।

—

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব

হাবড়া জেলা কর্ম্মীসম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি এই :—"বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারে বাংলাভাষার দান স্মরণ করিয়া এই সম্মেলন বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভাকে (অর্থাৎ কংগ্রেসকে) অনুরোধ করিতেছে।" বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা আমরাও উচিত মনে করি। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বর্ত্তমান বৎসরের অধিবেশনে সভাপতি অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই মতের অনুকূল যুক্তি মডার্ণ রিভিয়ুতে একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু কংগ্রেসকে এ বিষয়ে কোন অনুরোধ করিতে চাই না; কারণ এরূপ অনুরোধ রক্ষিত হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। বাঙালীরা নিজেদের সাহিত্যসম্পদ বাড়াইয়া চলুন, বাংলা ভাষার দুর্ব্বলতা ও অসম্পূর্ণতা দূর করুন, এবং তাহা যাহাতে অন্যভাষাভাষীরা সহজে শিখিতে পারেন, তাহার নানা উপায় অবলম্বন করুন।

—

নব শিক্ষাসংঘ

আগে এই মাসের বিবিধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তৃতাটি হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা তিনি নব শিক্ষাসংঘের উদ্যোগে বঙ্গীয় শিক্ষাসপ্তাহের এক দিন পড়িয়াছিলেন। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ।" বিশ্বভারতী ইহা একটি পুস্তিকার আকারে বাহির করিয়াছেন। মূল্য আট আনা। তাহাতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের "শিক্ষার স্বদেশী রূপ" শীর্ষক প্রবন্ধটিও আছে। ইহাও নব শিক্ষাসংঘের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। "শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের স্থান" শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধটি আমরা অন্যত্র ছাপিয়াছি, তাহাও এই সংঘের অধিবেশনে পঠিত হয়, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই। এই নব শিক্ষাসংঘের অধিবেশনে আরও অনেক অনুধাবনযোগ্য প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে। এই সংঘের ("New Education Fellowship"এর) সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ, শান্তিনিকেতন। সম্পাদকদিগকে চিঠি লিখিলে তাঁহারা সমুদয় সংবাদ দিবেন।

—

প্রদর্শনীতে কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয়ের প্রচারকার্য্য

কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয় ত্রিপুরা জেলার একটি অতি ক্ষুদ্র পল্লী-প্রতিষ্ঠান হইলেও আজ আঠার বৎসর যাবৎ কুটীর-শিল্পের উন্নতিকল্পে বাংলা ও আসামের নানা স্থানের প্রদর্শনীতে ইহার কর্ম্মীদল উপস্থিত হইয়া হাতে-হাতিয়ারে কাজ দেখাইয়া দেশবাসীকে কুটীর-শিল্পের দিকে কতখানি আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে, তাহা নানা স্থানের প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বান হইতেই বুঝিতে পারা যায়। গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর খাসমহাল, ও জয়দেবপুর (ভাওয়াল রাজ ষ্টেটের), এই তিনটি প্রদর্শনীতে পাটের ও কাপড়ের তাঁতে নানা প্রকার ডিজাইনের কাজ, বেত-বাঁশের সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কাজের শিক্ষাপ্রণালী ইহার কর্ম্মীদল (Demonstration party) হাতে-হাতিয়ারে লোক শিক্ষার জন্য দেখাইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম প্রদর্শনীতে যাইবার জন্য বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও পরিচালক শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ দত্ত বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। তথায় কর্ম্মীদলকে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয়

প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ খরচ বহন করিলে যে-কোন স্থানের প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া হাতে-হাতিয়ারে কাজ দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

ছবিটিতে স্বয়ং সম্পাদক সত্যভূষণ দত্ত প্রধান শিল্পশিক্ষক দ্বারা বেতের একটি নূতন ডিজাইনের কাজ দেখাইতেছেন।

—

মহিলাদের কন্‌ফারেন্স

সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের রাজধানীতে সমগ্র-ভারতীয় মহিলা কন্‌ফারেন্সের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আমরা মাঘের প্রবাসীতে করিয়াছি। ইহার সভানেত্রী হইয়াছিলেন ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের মহারাণী সেতু পার্ব্বতী বাঈ। অধিবেশন হইয়াছিল ত্রিবন্দ্রমের কৌডিয়ার প্রাসাদে। ত্রিবাঙ্কুড় মাতৃতন্ত্র দেশ। এখানে মহারাজার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার ভাগিনেয়, তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারী হন না। মহারাজার স্ত্রী মহারাণী বলিয়া অভিহিত হন না, তাঁহার মাতা বা ভগিনী মহারাণী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সাধারণ লোকদের মধ্যেও উত্তরাধিকার মাতার দিক হইতে হয়, অর্থাৎ পিতার উত্তরাধিকারী তাঁহার পুত্র হন না, তাঁহার ভাগিনেয় হন।
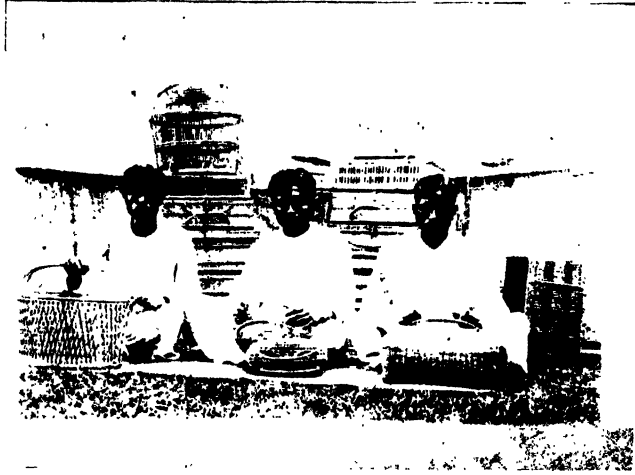
এহেন দেশে গিয়া মহিলারা বিশেষ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনা এবং বাসস্থান, আহার, দেখান-শুনান প্রভৃতির ব্যবস্থাও উত্তম হইয়াছিল।

গত মাসে কলিকাতায় টাউনহলে ভারতীয় মহিলাদের এবং অন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নানা দেশের মহিলাদের কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল। বড়োদা রাজ্যের মহারাণী সভানেত্রী হইয়াছিলেন। ভাল বক্তৃতা অনেকগুলি লইয়াছিল। সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতায় অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :—

"This is not an educational conference, but since education is the foundation on which we must build, I must refer to it. The education given in our schools, and particularly our universities, is often so unsuited to the particular needs of women generally, that it is practically useless, and often harmful, since it saps energies which could be put to so much better use. One of the most glaring defects in our educational system

কোচিয়ার প্রাসাদ—ত্রিবন্দ্রম

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু ইহার সবটাই মন্দ নয়।

মহারাণী খুঁত ধরিয়াছেন, কিন্তু প্রতীকার সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। মহিলাদের যে এই কন্ফারেন্সগুলি হয়, তাহার নেত্রীত্ব করেন অভিজাত সম্ভ্রান্ত ধনী শ্রেণীর মহিলারা তাহাতে যোগদান করেনও অধিকাংশ স্থলে ঐরূপ শ্রেণীর মহিলারা। নেত্রী ও সভ্যাদের মধ্যে অনেক সরকারী চাকরোদের পত্নী আছেন। ইংরেজ মহিলাও আছেন। এই জন্য রাষ্ট্রীয় অধিকার বিষয়ে এই
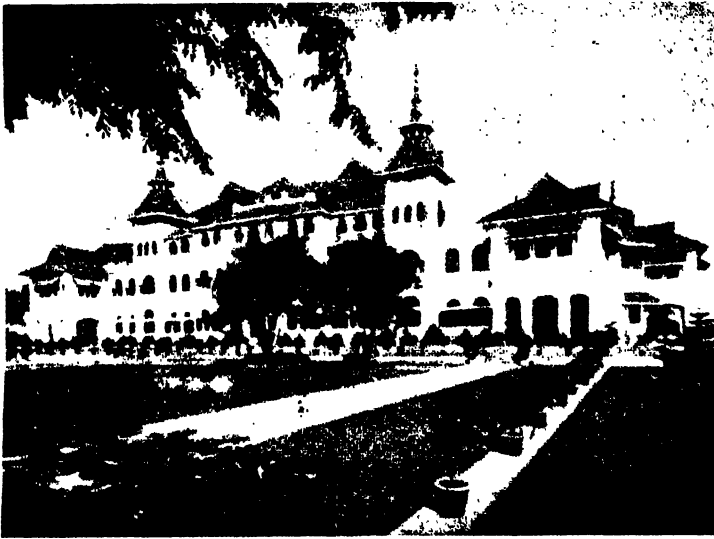
is its lack of care for cultural development; and nowhere is that lack felt more keenly than in the home where cultural influence is more telling and fertile."

তাৎপর্য্য। ইহা শিক্ষাবিষয়ক কন্ফারেন্স নহে, কিন্তু যেহেতু শিক্ষার ভিত্তির উপর আমাদিগকে গড়িতে হইবে সেই জন্য আমাকে সে বিষয়ে কিছু বলিতে হইবে। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে—বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা প্রায়ই মেয়েদের বিশেষ প্রয়োজনের এরূপ অনুপযোগী যে তাহা কার্য্যতঃ অকেজো, এবং অনেক সময় অনিষ্টকর; কারণ এই শিক্ষালাভে যে শক্তির ক্ষয় হয় তাহার উৎকৃষ্টতর ব্যবহার হইতে পারে। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির খুব স্পষ্ট একটা খুঁত সংস্কৃতির দিকে বিকাশের অভাব, এবং এই অভাবটা পরিবারের মধ্যেই বেশী অনুভূত হয় যেখানে সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে ফলপ্রদ হইতে পারে।"

মহারাণী যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতকটা মামুলী সত্য আছে। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সকলে প্রদত্ত শিক্ষার সবটাই মেয়েদের অনুপযোগী বা অনিষ্টকর, তাহা সত্য নহে এবং তাহা আমরা স্বীকার করি না। জাগতিক বিষয়ের জ্ঞানদান ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও উৎকর্ষসাধন যেমন ছেলেদের তেমনি মেয়েদেরও শিক্ষার অঙ্গ হওয়া আবশ্যক ও উচিত। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর এই অঙ্গ ছাত্রছাত্রী উভয়েরই আবশ্যক। তা ছাড়া মেয়েদের জন্য বিশেষ করিয়া যাহা দরকার তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

কন্ফারেন্সগুলি চূড়ান্ত কথা বলেন না বা বলিতে পারেন না। তাঁহারা নারীদের অধিকার সম্বন্ধে যে-সব দাবী করেন, তাহা চূড়ান্ত দাবী নহে। চূড়ান্ত দাবী দেশের স্বাধীনতা। তাহা পুরুষ নারী উভয়ের পক্ষেই আবশ্যক। দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে নারীদের নিজেদের কিছু অধিকার লাভে বিশেষ কিছু ফল হইবে না। অথচ, যাহাতে সরকারী চাকরোদের স্ত্রীরাও যোগ দেন এরূপ প্রতিষ্ঠান হইতে স্বরাজের চূড়ান্ত দাবী হইলে ঐ চাকরোদের গোপনে উপরওয়ালাদের দাবড়ি লাভের সম্ভাবনা আছে। অতএব, আমাদের পরামর্শ উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের নিকট পৌঁছিবার বা তাঁহাদের মনোযোগ লাভ করিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, আমাদের এই মত বলা আবশ্যক, যে, সব সংস্কারের ভিত্তি যে প্রাথমিক শিক্ষা এবং যাহাতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার একত্ব বেশী, মহিলা-কন্ফারেন্সগুলি তাহাতেই খুব বেশী করিয়া মনোযোগ করুন। এই কাজটি এরূপ, যে, ইংরেজ মহিলারা ও ভারতীয় সরকারী চাকরেদের পত্নীরা কেহ ইহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন না।

ভারতবর্ষ

প্রবাসী বাঙালী বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর বসন্তকুমার দাস ডি-এসসি মহাশয় নিজাম সরকারের প্রতিনিধিরূপে লিসবনে অনুষ্ঠিত প্রাণিবিদ্যা মহাসভায় যোগ দিতে গিয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের কয়েক জাতির মাছ ও প্রাণিবর্গ সম্বন্ধে তিনি উক্ত মহাসভায় একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন ও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ উঁহার বিশেষ প্রশংসা করেন।

অধিবেশন শেষ হইবার পর ডক্টর দাস পর্টুগালের ও পরে ইংলণ্ডের বিভিন্ন জ্ঞানকেন্দ্রে ভ্রমণ করেন ও সর্ব্বত্রই বৈজ্ঞানিকসমাজ কর্ত্তৃক তিনি বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত ও সমাদৃত হন।

রয়াল সোসাইটি অব আর্টের সদস্য শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টের সদস্য আছেন। এই সোসাইটি ও ইহার অন্যান্য বাঙালী সদস্যদের কথা আমরা মাঘের প্রবাসীতে উল্লেখ করিয়াছি।

প্রবাসী বাঙালী যুবকদের কৃতিত্ব

ভারত-সরকারের মিলিটারী ফাইনান্স বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীঅনাদিচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীকালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় টেমস নটিক্যাল ট্রেনিং কলেজ হইতে সীম্যানশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারপূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

ডাঃ বসন্তকুমার দাস

শ্রীকালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগগনেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

করিয়াছেন। তিনি একটি এক্‌স্‌ট্রা ফার্ষ্ট‌ক্লাস সার্টিফিকেটও লাভ করিয়াছেন। ভারতীয়ের পক্ষে এইরূপ কৃতিত্ব এই প্রথম। ইঁহার বয়স মাত্র উনিশ বৎসর।

শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগগনেন্দ্রচন্দ্র দত্ত তিন বৎসর শিক্ষানবীশী সমাপ্ত করার পর ভারত-সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত এরোনটিক্যাল ইন্‌জিনিয়ার ও এয়ার পাইলটের কাজ করিবার অনুমতিপত্র (লাইসেন্স) পাইয়াছেন ও নবদিল্লীর ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজ কর্ত্তৃক সহকারী ইন্‌জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি রয়্যাল এরোনটিক্যাল সোসাইটি ও ইনষ্টিট্যুটের এসোসিয়েট পদভুক্তও হইয়াছেন।

শ্রীহরিহরপ্রসাদ ঘোষ যুক্তপ্রদেশের ইণ্টারমীডিয়েট বোর্ডের হাই-স্কুল (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছেন এবং বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য নেসফীল্ড বৃত্তিও পাইয়াছেন।

পাটনা প্রভাতী সংঘ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

পাটনা-প্রবাসী বাঙালী ছাত্রদের সভা প্রভাতী সংঘ প্রবন্ধ ছোটগল্প প্রভৃতির একটি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার আয়োজন করিয়াছেন। রচনা ইত্যাদি পাঠাইবার শেষ দিন ১লা বৈশাখ ১৩৪৩। এসম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে হইলে ও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে, সম্পাদক, প্রভাতী সংঘ, "পাটলিপুত্র", বাঁকীপুর, এই ঠিকানায় পত্র-ব্যবহার করিতে হইবে।

শ্রীহরিহরপ্রসাদ ঘোষ

তিনকড়ি-স্মৃতি প্রয়োগশালা

বারাণসী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের তিনকড়ি-স্মৃতি লেবরেটরী

বিগত ১২ই ডিসেম্বর বাঁকুড়া-নিবাসী শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যয়ে নির্ম্মিত তিনকড়ি-স্মৃতি প্রয়োগশালার (লেবরেটরীর) দ্বারোদ্‌ঘাটন হইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী সর্‌ জে পি শ্রীবাস্তব মহোদয় দ্বারোদ্‌ঘাটন-কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং দাতার মহাপ্রাণতার বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণ ও সেবাশ্রমের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় সেবাশ্রমের নারীবিভাগের নির্ম্মাণ-ব্যয়ও বহন করিয়াছেন।

বাংলা

ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত গত বৎসর স্ত্রী ও শিশুরোগ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন। ডাব্লিনের সুবিখ্যাত রোটণ্ডা হাসপাতাল হইতে ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিষয়ে পোষ্টগ্র্যাজুয়েট পাঠক্রম সমাপ্ত করিয়া তিনি এল-এম ডিপ্লোমা পাইয়াছেন।

ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী শ্রীক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা গবন্মেণ্ট আর্ট স্কুলের পাঠক্রম কৃতিত্বের সহিত সমাপ্ত করিলে ১৯৩৩ সালে ইটালী গবন্মেণ্ট তাঁহাকে শিল্পশিক্ষার জন্য একটি বৃত্তি প্রদান করেন ও এই বৃত্তি লইয়া তিনি ইটালীতে গিয়া ফ্লোরেন্স রয়্যাল একাডেমিতে শিক্ষালাভার্থ যোগ দেন। বিশেষ কৃতিত্বের সহিত একাডেমির শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এচিং (Etching)এর বিভিন্ন বিভাগে তিনি বিশেষজ্ঞ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

কৃতী মুষ্টিযোদ্ধা

কলিকাতার তরুণ মুষ্টিযোদ্ধা শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার গ্লোব থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে বাংলার ফেদার-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন মরিস কোনারকে পরাজিত করিয়া উক্ত চ্যাম্পিয়ন উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইনি ব্রতচারী সুদক্ষ।

১২০৷২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পাণ্ডব-রাজসভায় দ্রৌপদী

শ্রীচিন্তামণি কর

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৪২

৬ষ্ঠ সংখ্যা

দেহাতীত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই দেহখানা বহন ক'রে আসছে দীর্ঘকাল
বহু ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের রাগ দ্বেষ ভয় ভাবনা,
কামনার আবর্জ্জনারাশি।
এর আবিল আবরণে বারে বারে ঢাকা পড়ে
আত্মার মুক্ত রূপ।
এ সত্যের মুখোষ পরে সত্যকে আড়ালে রেখে;
মৃত্যুর কাদামাটিতে গড়ে আপনার পুতুল,
তবু তার মধ্যে মৃত্যুর আভাস পেলেই
নালিশ করে আর্ত্তকণ্ঠে।
খেলা করে নিজেকে ভোলাতে,
কেবলি ভুলতে চায় যে সেটা খেলা।
প্রাণপণ সঞ্চয়ে রচনা করে মরণের অর্ঘ্য;
স্তুতিনিন্দার বাষ্পবুদ্বুদে ফেনিল হয়ে
পাক খায় ওর হাসিকান্নার আবর্ত্ত।
বক্ষ ভেদ ক'রে ও হাউয়ের আগুন দেয় ছুটিয়ে,
শূন্যের কাছ থেকে ফিরে পায় ছাই,—
দিনে দিনে তাই করে স্তূপাকার।

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্ম্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ ক'রে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।
অসংখ্য দণ্ড পল নিমেষের জটিল মলিন জালে বিজড়িত
দেহটাকে সরিয়ে ফেলি মনের থেকে,—
যেখানে সরে যায় অন্ধকার রাতের
নানা ব্যর্থ ভাবনার অত্যুক্তি,
যায় বিস্মৃত দিনের অনবধানে পুঞ্জিত লেখন যত,—
সেই সব নিমন্ত্রণ-লিপি নীরব যার আহ্বান,
নিঃশেষিত যার প্রত্যুত্তর।
তখন মনে পড়ে, সবিতা,
তোমার কাছে ঋষি কবির প্রার্থনা মন্ত্র,—
যে মন্ত্রে বলেছিলেন,—হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন
উন্মুক্ত করো সেই আবরণ।

আমিও প্রতিদিন উদয়দিগ্বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত ক'রে দিই আমার জাগরণ,
বলি,—হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন,—
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে-আমার দেহের অণু পরমাণু,
তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।
আমার অন্তরতম সত্য
আদি যুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে
তোমার বিরাটে ছিল বিলীন,
সেই সত্য তোমারি।
তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহৎ স্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
কখনো নীল মহানদীর তীরে,

কখনো পারস্যসাগরের কূলে,
কখনো হিমাদ্রি-গিরিতটে,—
বলেছে. জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র,
বলেছে, দেখেছি অন্ধকারের পার হ'তে
আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের আবির্ভাব।

৭ নবেম্বর, ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

পশ্চিমযাত্রিকী

শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ

(৭)

আমরা আবার ২৫শে সেপ্টেম্বর ফ্লোরেন্স থেকে রোমের উদ্দেশে চললুম। সকাল ন'টার ট্রেনে রওনা হয়ে বিকেল পাঁচটায় ইটালীর রাজধানী রোম-নগরে এসে পৌছলুম। রোম টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে এসে আমরা একটি বোর্ডিং-হাউসে উঠলুম। এই বোর্ডিং-হাউস এক খ্রীষ্টান সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত। সমস্ত ঘরের কাজকর্ম্ম, খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য কাজের দেখা-শোনা করা সবই জনকতক 'সিষ্টার' করেন। এ সব করার জন্য অন্য লোক নেই। কেবল একটি মাত্র বুড়ো চাকরকে দেখতুম, তাকে ব্রুনো নামে ডাকতে শুনতুম। সে সমস্ত বাড়ির ঝাড়ুদারের ও নূতন বোর্ডারদের লাগেজ উঠানো-নামানোর কাজ করত। সিষ্টারদের ব্যবহার বড় ভদ্র কিন্তু জার্ম্মান ভাষা ছাড়া আর কোন রকম ভাষা এঁদের জানা ছিল না। আমরা বড়ই মুস্কিলে পড়তুম, কোন-কিছু বোঝাবার দরকার হ'লে ডিকশনারী দেখিয়ে ও বেডেকারের গাইড-বই থেকে সাহায্য নিয়ে করতে হ'ত।

রোম শহরটিকে দেখলে সেই পুরাতন রোমক ইতিহাসের কথা সব মনে পড়ে যায়। এদেশটি সমতল নয়, চার-পাঁচটি ছোট-ছোট পাহাড়ের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য রোমের রাস্তাঘাট কোনটি সমতল, কোনটিতে বা চড়াই-উৎরাই। ইটালীর অন্যান্য শহরের তুলনায় রোমের রাস্তাঘাট অনেক চওড়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমাদের দেশের মত ময়লা-ফেলা ঘোড়ার গাড়ী ও ঝাড়ুদারের হাতে ঝাঁটা ও টিনের পাত্র রাস্তায় দেখতুম। ইটালীর সর্ব্বত্র বড় বড় রাস্তাঘাটে গ্যারিবল্ডীর মূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। আমরা যখন কিছু দেখতে যেতুম, টমাস কুক কোম্পানীর কাছ থেকে একটি প্রাইভেট মোটরকার ভাড়া নিতুম ও ইংরেজী-জানা গাইড একটি নিতুম। এ রকম ব্যবস্থা এখানে এসে করেছিলুম। টমাস কুক কোম্পানীর টুরিষ্ট মোটর-বাস বা মোটর-কোচের বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু তাতে দেখতে গেলে মোটর-বাসের নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে আমাদের যেতে হয়। নিজস্ব ব্যবস্থায় খরচ একটু বেশী পড়ে বটে, কিন্তু আমরা নিজেদের ইচ্ছামত সময়ানুসারে ফিরতে ও যেতে পারি। এতে ক্লান্তিবোধ কম হয়।

রোম শহরটি একটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। আগে এ প্রাচীর দুর্গপ্রাকারের মত ব্যবহার হ'ত। এ প্রাচীরের উপর মাঝে মাঝে অর্দ্ধ-সিংহ ও অর্দ্ধ-নারীমূর্ত্তি

দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি ধূসর বর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত, গঠন অতি সুন্দর। গাইডের মুখে শুনলুম রোমের সম্রাট-গণ ইজিপ্ট দেশ হ'তে যুদ্ধ জয় ক'রে এগুলি নিয়ে আসেন ও নিজেদের দুর্গ-প্রাচীরের উপর স্থাপিত করেন। এ-সব ঘটনা সমস্তই খ্রীষ্ট জন্মাবার পূর্ব্বে ঘটে, কিন্তু মূর্ত্তিগুলিকে দেখলে মনে হয় না অতদিন আগেকার। রাস্তায় রাস্তায়

ইউরোপ-ভ্রমণ--মানচিত্র

ফোয়ারাও অনেক রকমের। চর্তুর্দ্দিকে ফোয়ারা থেকে অনবরত ধারাসারে জল পড়ছে, দেখতে বেশ। এ-সব ফোয়ারার মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, জল-দেবতা নেপচুনের ফোয়ারা। জলদেবতা নেপচুন তাঁর আটটি তেজস্বী ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়াবার ভঙ্গী অতি চমৎকার। ঘোড়াগুলির নাক ও মুখ দিয়ে সহস্রধারে জল পড়ছে। এ-সব ফোয়ারার মধ্যে কতক-গুলি সাবেক কালের এবং কতকগুলি মুসোলিনী নানা স্থান হ'তে উদ্ধার ক'রে কাজে লাগিয়েছেন। শহরের বাইরে খানিকটা বিস্তৃত জায়গায় ভ্যাটিকান। এই ভ্যাটিকানের কিছু অংশ মিশর-দেশীয় মমি ও অন্যান্য দ্রব্যদ্বারা সজ্জিত ক'রে একে ইজিপশ্যন যাদুঘর করা হয়েছে। এর ভেতর বস চেয়ে দেখবার মত মিশর-দেশীয় মমির মূর্ত্তি। এগুলি কাচের আধারের মধ্যে কাঠের কফিনে শায়িত। কতক কাচের আলমারীতে দাঁড় করানোও দেখতে পাওয়া যায়। তখনকার দিনে সৌখীন ভদ্রসমাজে মিশর-দেশীয় এ্যালাবাষ্টার-প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্রব্যের অত্যধিক আদর ছিল। ইটালীর সর্ব্বত্র এই এ্যালাবাষ্টারের দ্রব্যাদি এখনও নজরে পড়ে। ভ্যাটিকানের ভেতর এখানকার পোপের রাজপ্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন উদ্যান এবং যাদুঘর। শুধু ভ্যাটিকানই সাত দিন ধ'রে দেখলে তবে ভাল ক'রে দেখা শেষ হয়। পোপ নানান দেশ থেকে নানা রকম পুস্তক, বড় বড় ফুলদানি ও অন্যান্য অনেক জিনিস উপহার পেয়েছেন। সে-সমস্ত এই যাদুঘরে সাজানো আছে, লোকে দেখে যায়। অনেক বইয়ের মলাটের ওপর দেখলুম দামী দামী চুণী পান্না হীরা ইত্যাদি বসানো আছে। এ-সব জিনিষ অন্যান্য দেশের রাজারাজড়ারা পোপকে উপহার দিয়েছেন। এর ভেতর ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলোর হাতে-গড়া মার্ব্বেল-প্রস্তরের মূর্ত্তিগুলি দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। মূর্ত্তিগুলির শরীরের মাংসপেশী, শিরা, উপশিরা ও চোখের দৃষ্টির গড়ন দেখলে সজীব ব'লে ভ্রম হয়। তা ছাড়া এঁর হাতের সেলাই, কার্পেটের কাজ, আঁকা তৈলচিত্র ইত্যাদি সবই দেখবার মত। এঁর হাতে-আঁকা ছবিগুলি এক-একটি বড় হলের একটি পুরো দেওয়াল ভর্ত্তি। দৈর্ঘ্য বিস্তার এবং উচ্চতায় হল আমাদের দেশের একটি ছোট বাড়ির মত। রোমের অনেক গীর্জা এই মাইকেল এঞ্জেলোর সাহায্যে গঠিত হয়েছে। ইনি একাধারে ইঞ্জিনিয়ারিং, চিত্রবিদ্যা, বয়নশিল্প-বিদ্যা ও ভাস্কর-শিল্পকলা ইত্যাদি সর্ব্বগুণে গুণী ছিলেন। সেকালের রোমের রাজাদের জিম্‌নেসিয়াম বা ব্যায়ামাগার ও স্নানাগার দেখতে গেলুম। শরীরকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও সুগঠিত এবং সৌন্দর্য্যশালী করতে হ'লে যা দরকার, সে-সমস্তর ব্যবস্থা এখানে থাকতো। পুরুষগণ বলবান মল্লদের সঙ্গে কুস্তী করতেন ও তাঁদের

কর্দ্দমস্নান, তুষারস্নান, গরম ও ঠাণ্ডা জলে স্নানের ব্যবস্থা ছিল। রমণীরা রৌদ্রস্নান, শীতল ও গরম জলে স্নান এবং

সেণ্ট পিটর্স' গীর্জ্জা—রোম

গরুর ও গাধার দুধে স্নান করতেন। এ-সব স্নানের জন্য রকমারি চৌবাচ্চা ও ফোয়ারা ইত্যাদি ছিল। এ সমস্ত অর্দ্ধ-ভগ্নাবস্থায় মৃত্তিকার তলদেশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এ ধরণের স্নানের পূর্ব্বে তৈলজাতীয় পদার্থ শরীরে মর্দ্দন করাও রীতি ছিল। ব্যায়ামাগারের চতুষ্পার্শে যোদ্ধাদের মর্ম্মরমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। রোম শহরে প্রায় দু-শ কেথিড্রেল বা গীর্জ্জা আছে। এর প্রত্যেকটির কারুকার্য্য খুঁটিয়ে দেখতে গেলে রোমে কিছুদিন বসবাস করতে হয়। এখানকার সেণ্টপিটার্স কেথি-ড্রেলটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। পৃথিবীর যেখানে যা ভাল মার্ব্বেলের প্রস্তুত স্তম্ভ ও অন্যান্য জিনিষ পাওয়া গিয়েছিল, রোম-সম্রাটেরা সমস্তই লুঠ ক'রে এনে এই গীর্জ্জার ভেতর বসিয়েছেন। জেরুসালেমের রাজা সলোমনের বিখ্যাত রত্নাগার থেকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি ও পাথরের মূর্ত্তি এনেও রাখা হয়েছে। রোম শহরের রাস্তার সর্ব্বত্র মোড়ে মোড়ে অবেলিস্ক বা প্রস্তরের থামবিশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এ-সব থাম মিশর ও গ্রীস দেশ হ'তে নিয়ে আসা হয়েছিল। এর এক-একটির উচ্চতা আমাদের দেশের বার-তের তলা বাড়ির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, কিন্তু এর কোনখানে জোড় নেই। এতবড় থামটি মাত্র এক খণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। এখন এত বড় প্রস্তরখণ্ড অন্যান্য দেশ থেকে নিয়ে আসা সম্ভবপর কিনা জানি না, হয়ত নিয়ে আসতে হ'লে অনেক মাথা ঘামাতে হবে। কিন্তু তখন অতি সহজেই রোমক নৃপতিরা সমুদ্রপথে একে একমাত্র ভেলায় চড়িয়ে নিয়ে আসতেন। প্রাচীনকালে এ রকম স্তম্ভ নিয়ে আসার ছবি ভ্যাটিকানে পোপের প্রাসাদে দেখেছিলুম।

একদিন রোমে বড়াতে বেরিয়ে একটি দোকানে রজনীগন্ধা ফুলের ঝাড় দেখতে পেয়ে মিসেস্ লতিফ ও আমি দু-জনে দুটি গোছা কিনে আনি। এ ফুলগুলি আকারে

ভোজন-গৃহ—কণ্টিভার্ডে জাহাজ

আমাদের দেশের রজনীগন্ধার চেয়ে ভাল ও এর পাপড়িগুলি ডবল থাক-করা। গন্ধও খুব চমৎকার। একটু পরেই অন্য

রোমে একটি বাঙালী ছেলের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। ছেলেটির নাম শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাস। তিনি
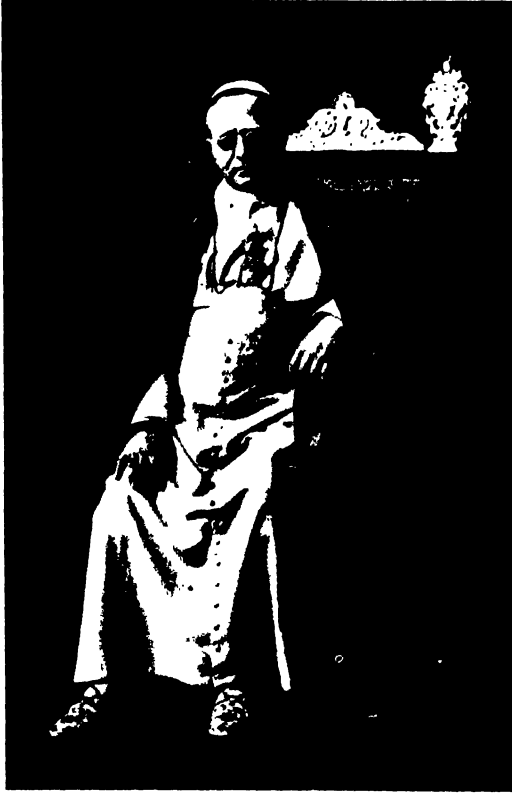
বর্তমান পোপ

রোমে এয়ারোপ্লেনের পাইলটের কাজ শিক্ষা করছিলেন। লণ্ডন থেকে আমরা আরও একটি বাঙালী ছেলেকে রোমে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে লিখেছিলুম। ভেনিস থেকে আমাদের রোমে পৌঁছবার তারিখ ও ট্রেনের সংবাদও তাঁকে দিয়েছিলুম। কোন কারণে তিনি নিজে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে না পারায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাসকে পাঠিয়েছিলেন। ইনি ষ্টেশনে এসে আমাদের তাঁর বোর্ডিং-হাউসে নিয়ে যেতে চাইলেন। লতিফেরা ও আমরা অন্য জায়গায় রোমে থাকবার ব্যবস্থা করার দরুন তাঁর আড্ডায় তখন আর যেতে পারি নি। দু-দিন বাদে ধীরেন বাবু আমাদের বাসা জার্ম্মান-হোমে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে আমরা দ্বিতীয় বার ভ্যাটিকান্ দেখতে যাই। সেদিন বিকেলবেলা তিনি আমাদের তাঁর বোর্ডিং-হাউসে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেন। ধীরেন বাবুর ল্যাণ্ডলেডী বা বাড়িওয়ালী আমাকে দেখে অনেক ক্ষণ ধ'রে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর এই এত চেয়ে দেখার কারণ তখন আমি বুঝতে পারি নি। পরে কথায় কথায় বললেন, তাঁর ধারণা ছিল, ভারতের লোকেরা আমাদের অপেক্ষা আরও বেশী কালো হয়। তখন বুঝলুম অত ফ্যালফেলানি তাকানি কেন। ল্যাণ্ডলেডী আমাদের চা ও বিস্কুট খেতে দিলেন। ধীরেন বাবু তাঁকে 'বৌদি' ব'লে ডাকেন; শুনলুম—তাঁর স্বামীকে 'দাদা' বলেন। ইটালীয়ান বৌদিদি বললেন, 'আমার ঠাকুরপী ভাল লোক।' আমি ধীরেন বাবুকে বললুম—'দেখুন যতই শেখান না কেন, ঠাকুরপো ঠিক বলতে পারে না, ঠাকুরপী বলে।' ধীরেন বাবু জবাবে বললেন—'ঠাকুরপোর বহুবচন ঠাকুরপী করেছে—ইটালীয়ান ভাষায় বহুবচন ঐ রকম ভাবে বলা হয় কি না! আমরা এখানে যে পাঁচ-ছয়

ডাক্তার ক্রনস্ভিকের কন্যা ম্যাটিল্ডা

জন ঠাকুরপো আছি!' ল্যাণ্ডলেডী আরও বাংলা ক- বলতে লাগলেন—বললেন, "আমার স্বামীকে 'ওগো' ব-

ডাকি—সময় সময় 'ওগো প্রিয়ও' বলি। তোমরা কি 'ওগো' বল?" আমার স্বামী এ-রকম প্রশ্নে মজা পেয়ে বল্লেন, "আমাদের দেশে সচরাচর বয়স্কা স্ত্রীলোকেরাই 'ওগো' ব'লে ডাকেন। অল্পবয়সীরা অন্য সম্বোধন করেন।" চা খাবার পর ল্যাগুলেডী তাঁর মোটরে আমাদের খানিকটা বেড়িয়ে নিয়ে আসবার প্রস্তাব করলেন। আমরা রাজী হলুম। ধীরেন বাবু বলতে লাগলেন—যে-কোন বাঙালীর সঙ্গে রোমে তাঁর আলাপ হয় তাঁকেই তিনি তাঁর বাসাতে নিয়ে আসেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, এটর্নী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু যখন রোমে এসেছিলেন তখন তিনি ধীরেন বাবুর সঙ্গে এ-বাড়িতে এসেছিলেন। ধীরেন বাবু যতীন বাবুকে নিয়ে তাঁদের যে ফোটো তোলা হয়েছিল তা আমাদের দেখালেন। আমরা মোটরে অনেকখানি বেড়িয়ে আবার ট্রামে ক'রে আমাদের জার্ম্মান-হোমে চলে এলুম।

রোমে থাক্‌তে থাকতেই এক নূতন ব্যাপার নজরে পড়ল। জার্ম্মান-হোমে যে সিষ্টার আমাদের খাওয়া-দাওয়ার তদারক করত, সে রাত্রে শোবার আগে আমাদের ঘরে একটি ছোট বাতি ও দেশলাই দিয়ে ব'লে গেল "নো লাইট, বোম্বার্ড"। এর বেশী আর ইংরেজী কথা এর মুখ দিয়ে কিছুতেই বেরল না। বেচারী অপ্রস্তত হয়ে হেসে বার-বার আমাদের জার্ম্মান ভাষায় কি বলতে লাগল, তা বুঝতেই পারলুম না। আমাদের ঘরের পাশে এক জন জার্ম্মান মহিলা-বোর্ডার ছিলেন। ইনি সামান্য ইংরেজী বলতে পারতেন। এঁর সাহায্যে জানতে পারলুম যে আজ রাত থেকে তিন দিন পর্য্যন্ত রোম শহরে আকাশপথে যুদ্ধের রিহার্সেল চলবে। এর জন্য আকাশে অনেক এয়ারোপ্লেন উড়বে ও তা থেকে রোম শহরে কৃত্রিম গোলাবর্ষণও হবে। মহামান্য মুসোলিনীর হুকুম এই যে গোলাবর্ষণেব বা বোম্বার্ডমেণ্টের সময় যেন কেউ ঘরে আলো না-জ্বালে ও রাস্তায় না-বেরয়। এর অন্যথা কেউ করলে তাঁকে দু-শ পঞ্চাশ লীরা বা পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হবে। বোম্বার্ডমেণ্ট আরম্ভ হবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে এক রকম বংশীধ্বনি দ্বারা সঙ্কেত ক'রে শহরবাসীকে সতর্ক করা হবে এবং শেষ হবার পূর্ব্বেও এ রকম বাঁশী বা সাইরেন দ্বারা জানানো হবে। আমরা শুনে নিয়ে শুয়ে পড়লুম। সিষ্টারও যাবার সময় আমাদের ঘরের জানালায় কালো রঙের মোটা পর্দ্দা লাগিয়ে দিয়ে গেল। যদি রাত্রে বাতি জ্বালি, বাইরে পাছে আলো দেখা যায় সেই জন্য এই ব্যবস্থা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি কখন বোম্বার্ড সুরু হবে শুনব। হঠাৎ তীব্রস্বরে সাইরেন বা সঙ্কেত-বাঁশী বেজে উঠল। অমনি রাস্তায় রাস্তায় পুলিস-প্রহরীর মোটর-বাইক বেরল শহর পরিদর্শন করবার জন্য। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শহর যেন ঘুমন্ত পুরীর আকার ধারণ করলে। তার পরেই দুম্‌দাম পট্‌পট্ শব্দে আকাশপথে গোলাবর্ষণ সুরু হয়ে গেল। আমরা মহা উৎসাহে বিছানা ছেড়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে গোলাফাটা দেখতে এলুম। সমস্ত শহর ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। আকাশের দিকে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎচমকের মত কৃত্রিম গোলার আলো দেখতে পেলুম ও এয়ারোপ্লেনের ঘর্ঘর শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। সারারাত্রি এই ব্যাপার চল্‌ল। আমরা শুয়ে পড়লুম। সকালে উঠে দেখি আবার সেই সহজ ভাব, সবাই রাস্তায় চলাফেরা করছে। শুনলুম বেলা চারটার পর আবার বোম্বার্ড হবে। আমরা খেয়ে দেয়ে রাস্তায় বেড়াতে বেরলুম। খানিকটা বেড়িয়ে ফিরছি এমন সময় আবার সেই বিকট সাইরেন বেজে উঠল। মোটর বাস ট্রাম সব মাঝ-রাস্তাতেই থেমে গেল। গাড়ীর আরোহী ও পথের পথিক সকলেই এক-ছুটে যে যেখানে পারলে লুকিয়ে পড়ল। আমরাও এক দল লোকের সঙ্গে একটি দোকানে ঢুকে বসলুম। আমাদের শুনতে একটু ভুল হয়েছিল। বেলা চারটার সময় বোম্বার্ড শেষ হবার কথা ছিল। যখন সুরু হ'ল তখন বেলা দুটা। এই দুটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত আমরা দোকানে বন্দী হয়ে রইলুম। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাসের কাছে এ গল্প করতে তিনি বল্লেন যদি এই কৃত্রিম গোলার একটি পট্‌কা বাজি কোন বাড়ির ছাদে পড়ে, তা'তে কারুর ক্ষতি হোক, বা না-হোক, পুলিসের লোক জানতে পারলেই বাড়িসুদ্ধ সকলকেই এ্যাম্বুলেন্স-কারে চড়িয়ে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে নাম লিখিয়ে আনবে। অর্থাৎ আসল যুদ্ধের সময় যা করা হয়, এখনও তার ঠিক নকল করা, নিয়ম রক্ষা চাই।

আমরা একদিন একটি ফিটন গাড়ী ভাড়া ক'রে বিকেলবেলা বেড়াতে যাই। রোমের সমস্ত গাড়ীতেই ক্যাব-মিটার লাগানো আছে। মিটারে যা ওঠে, গাড়োয়ানকে সে-রকম ভাড়া দিতে হয়। বেড়াবার সময় একটু এদিক-

ওদিক দেখছি, এমন সময় গাড়োয়ান খাঁ ক'রে মিটারটি ঘুরিয়ে যা দাম উঠেছিল, তার অপেক্ষা কিছু বাড়িয়ে দিলে। সে বোধ হয় ভেবেছিল, আমরা দেখতে পাই নি। আমরা তাকে খুব তাড়া দিয়ে উঠলুম। সে ইটালীয়ান ভাষায় বকর-বকর ক'রে কি বোঝাতে লাগল। বাড়ি ফিরে তার যা ন্যায্য প্রাপ্য তাই দেওয়া হ'ল। তার পর আরও চাইতে লাগল। তখন আমরা বেডেকারের বই খুলে তার যা ভাড়ার নিয়ম তা দেখিয়ে দিতেই সুড়সুড় ক'রে গাড়ী হাঁকিয়ে পালাল। রাস্তাঘাটে এই ধরণের লোকেরা বিদেশী লোক দেখলেই ঠকাতে চেষ্টা করে।

আমরা ৩০শে সেপ্টেম্বর রোম পরিত্যাগ ক'রে ইটালীর নেপলস শহরে এলুম। নেপলস্ আমাদের এই দ্বিতীয় বার দেখা হ'ল। প্রথম বার ভিক্টোরিয়া জাহাজ থেকে দু-ঘণ্টার জন্য নেমে পম্পীর ধ্বংসাবশেষ দেখে যাই। এবারে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ভিসুভিয়স আগ্নেয়গিরি দেখা। এখানেও একটি জার্ম্মান-হোমে উঠলুম। হোটেলের দুটি ছোকরা চাকর আমাদের জিনিষপত্র সমেত আমাদের একটি কাচের দরজা-জানালাওয়ালা বন্ধ লিফ্‌টে পুরে ওপরে নিয়ে চল্‌ল। চাকর-দুটির গায়ের দুর্গন্ধে লিফ্‌টের ছোট্ট ঘরটি ভরে গেল। আমাদের ত বমি ক'রে ফেলবার অবস্থা। সাত তলায় এসে লিফ্‌ট থামল। বাড়িওয়ালী বুড়ী হাসিমুখে এগিয়ে এল বটে, কিন্তু তার চেহারা বড়ই খট্‌খটে, হাসি যেন মুখে শোভা পাচ্ছে না। বুড়ীকে বলা হ'ল আমাদের একটি ভাল ঘর চাই। দু-দিন থাকব, ভিসুভিয়স দেখে চ'লে যাব। আমরা কি খাব জিজ্ঞাসা করতে বললুম, আমাদের গরুর মাংস দিও না, আমরা খাই না। বাড়িওয়ালী বললে—বেশ, এখানে খুব ভাল 'ভিল' (বাছুরের মাংস) পাওয়া যায়, আমি তোমাদের তাই দেব। আমরা তাও খাই না শুনে বললে—তবে তোমরা কি খাবে? এখানে ভেড়ার মাংস ও মুরগী বড়ই দুষ্প্রাপ্য। তোমরা একটু বাছুর খেয়েই দেখ না কেন? গরুতে না প্রবৃত্তি হয়, বাছুরে দোষ কি? তাকে বললুম, তোমার মাংস দিয়ে কাজ নেই, তুমি আলু কপি কড়াইসুঁটি সেদ্ধ ও রুটি মাখন ডিম দিও। আমরা তাতেই চালাব। আমার ঘরের সামনে ছোট্ট একটু বারান্দা, তার অনেক নীচে রাস্তা। রাস্তায় দেখতুম, ছোট ছেলেপিলে আদুড় গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার মাঝখানেই তরকারির খোসা ও নানা রকম আবর্জ্জনা ফেলা হচ্ছে। আমাদের দেশের মত গরু বাছুর ছাগল চলারও বিরাম নেই। রাস্তার অপর পাশে পাহাড় উঠে গেছে। তার উপর ইটালীর বস্তির বাড়িঘর। পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে আঙুরলতা ও পিচের গাছ, ফলে ভর্ত্তি। বস্তির লোকেরা সারাদিন কাপড়কাচা, জলতোলা, ছেলেপিটনো, বাসন-মাজা, ও কাপড় শুকাতে দেওয়াতে ব্যস্ত থাকৃত। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে এ সব দেখছি দেখে একটি আঠার-উনিশ বছরের মেয়ে চীৎকার ক'রে বলতে লাগল—"ইণ্ডিয়ানো"! অমনি ছেলে-বুড়ো একপাল সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভিড় ক'রে মজা দেখতে লেগে গেল। বড়রা আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে কি বলাবলি করতে লাগল ও ছোটরা ভেঙচি কাটতে সুরু করলে। আমি জানালা থেকে সরে এলুম। বিকেলে বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে একটু বেড়িয়ে এলুম। এ-সব সমুদ্রে পুরীর সমুদ্রের মত ঢেউ নেই। বেড়িয়ে ফেরবার সময় দেখি চৌরাস্তার উপর একটি ছোট্ট দোকানে গোটাকয়েক সরবতি লেবু, কয়েক বোতল ফলের সিরাপ, পাকা ফুটি ও ঝুনো নারিকেলের টুকরা বিক্রী হচ্ছে। আমরা একটি ফুটি ও কয়েক ফালি নারিকেল কিনে পাঁসিওতে (হোটেলে) ফিরে এলুম। নারিকেল ও ফুটি আমাদের দেশের মতই খেতে।

জাহাজে থাকৃতে গল্প শুনেছিলুম নেপল্‌সে একটি একোয়ারিয়াম আছে। এখানে অক্টোপাস জানোয়ার আছে। শুনে এটিকে দেখবার জন্য কৌতূহল ছিল। এক সময় রাস্তায় বেড়াতে গিয়ে এই একোয়ারিয়ামও দেখেছিলুম। অক্টোপাস বলতে আমরা যে বিশালকায় সামুদ্রিক জানোয়ার বুঝি, এটি তা নয়। এখানে যিনি আছেন, তিনি সেই বড় জানোয়ারের ছোট সংস্করণ। ওপর থেকে ছোট মাছ ফেলে দেওয়া হ'ল; ইনি গোড়ায় একটি পাশে চুপচাপ কুঁকড়ে ব'সে ছিলেন, মাছ পড়তেই শরীরকে দ্বিগুণ ক'রে ছত্রিশটি হাত বের ক'রে মাছটিকে বুকে সাপটে ধ'রে খেয়ে ফেলে আবার যেমন ছিলেন তেমন হ'লেন। এঁর মুখ ও বুকের পার্থক্য কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না। একোয়ারিয়াম দেখে ফিরে আসছি হঠাৎ পেছনে এক অদ্ভুত রকম গলার

স্বর শুনে, পেছন ফিরে চাইতে দেখি, ছুটি যুবতী আমায় হাত তুলে বক দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলুম এমন বুড়োধাড়ী মেয়ে, এত অসভ্য কেন? আমাদের দেশে ও-বয়সে যে ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরসংসার করতে হয়।

১লা অক্টোবর। দুপুরে খাওয়ার পর আমরা মোটরে ক'রে ভিসুভিয়েসের উদ্দেশে রওনা হলুম। কয়েক মাইল যাবার পর মোটর ভিসুভিয়স আগ্নেয়গিরির তলদেশে এসে থামল। এখান থেকে ওপরে ওঠবার জন্য পার্ব্বত্য রেলপথ আছে। আগে এই রেলপথটি টমাস কুক কোম্পানীর ছিল, শুনলুম ইটালীয়ান গবর্ণমেণ্ট এখন কিনে নিয়েছেন। আমাদের টিকিট আগে থাকতেই কেনা ছিল। আমরা দু-জনে ছুটি জানালার ধারে সিট দখল ক'রে বসলুম। ট্রেন ইলেকট্রিসিটির সাহায্যে ঘড়ঘড় ক'রে ওপরে উঠতে লাগ্‌ল। ট্রেনে অনেক যাত্রী ছিল। তার মধ্যে ইটালীয়ানের সংখ্যাই বেশী। এখানেও সেই ছোট ও বুড়োদের আমাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ইসারা করা ও 'ইণ্ডিয়ানো' বলা সুরু হয়ে গেল। আমাদের দলের সঙ্গে এক জন কুক কোম্পানীর গাইডও ছিল। ট্রেন থেকে দেখতে পেলুম পথের দু-পাশের ঢালু পাহাড়ের জমির রং কয়লার মত কালো ও তার উপর অজস্র কমলালেবু, পিচ, লাল ও কালো আঙুরের গাছ। আঙুরের গাছগুলি কালো জমির উপর ফলের ভারে নত হয়ে পড়েছে। যেদিকেই চাই, সেদিকেই ভিসুভিয়সের ছাই, কয়লা ও লাভার উপর এ-রকম আঙুরের খোলোর বাহার। গাইডের মুখে শুনলুম ভিসুভিয়সের লাভা আঙুর ও কমলালেবুর গাছের চাষ করার পক্ষে খুব উপযোগী। ভিসুভিয়সের এক-এক বার অগ্নি ও লাভা উদ্‌গীরণের ফলে দেশের ক্ষতি ও লাভ দুই-ই হয়। আমরা ক্রমশঃ ওপরে উঠতে লাগলুম। ট্রেন এবার এক জায়গায় থামলো। এখানে ভিসুভিয়াসের অবজারভেটরী বা মানমন্দির আছে। নিয়ত এক জন লোক এখানে থাকে। ভূকম্পন-জ্ঞাপক যন্ত্রে যখন যেমন অবস্থা টের পাওয়া যায়, নেপল্‌স্ শহরে সদর আপিসে তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠানো এর কাজ। আমরা এবার অন্য একটি ট্রেনে চড়লুম। এবারে অনেক নীচে নেপল্‌সের উপসাগরের নীল জল ও তার তীরে অনেক স্প্যাগেটী ও ম্যাকারনীর কারখানা নজরে পড়ল। স্প্যাগেটী ও ম্যাকারনী ইটালীর প্রসিদ্ধ খাদ্য। এ দুটি জিনিষ ময়দার দ্বারা প্রস্তুত হয়। ট্রেন ওপরে উঠতে উঠতে শেষে এক জায়গায় থামল। এবার সকলকে হাঁটতে হবে। নেমে চারি দিক দেখে মনে হ'ল এত বড় পাহাড়টিকে কয়লার গুঁড়ো ঢেলে তৈরি করা হয়েছে। আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে চলতে লাগলুম। বাঁ-দিকে ভিসুভিয়স ক্রমশঃ ওপরে সোজাভাবে উঠে গেছে, ডাইনে গভীর ঢালু খদ। অনেক দূরে নেপলসের উপসাগরের জলে সূর্য্যের আলো প'ড়ে বহুদূর পর্য্যন্ত হীরার মত জ্বলছিল। সেদিকে চাইলে চোখ জ্বালা করে। আমাদের পায়ে-চলা-পথ মাত্র তিন-চার হাত চওড়া।

আমরা এই পথ দিয়ে চলে অবশেষে ভিসুভিয়সের চূড়ার ওপর এলুম। পাহাড়ের ঠিক মধ্যস্থলের চূড়াটি ১৯২৮ সালে লাভা উদ্‌গীরণের ফলে ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে একটি বড় গর্ত্তে পরিণত হয়েছে। এই হ'ল ক্রেটার বা আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর। এই মুখ থেকে অনবরত গাঢ় ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। দশ-বারটি কয়লার উনান এক সঙ্গে ধরালে যে-পরিমাণ ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়, এখন সে-রকম ধোঁয়া দেখতে পাওয়া গেল। এই ধোঁয়ার রং কখনও সাদা, কখনও হলদে, কখনও কালো, কখনও বা ধূসর বর্ণের মত দেখা যাচ্ছিল। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গন্ধকের মত মৃদু গন্ধ অনুভব করতে লাগলুম। আগ্নেয়গিরির মুখের চারি দিকে একটি গোলাকার উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে। এর ভেতরে ও বাইরে চতুর্দ্দিকে নানা রকম গলিত ধাতু প'ড়ে শক্ত পাথরের মত হয়ে রয়েছে। অধিকাংশই পাথরের রং বৃন্দাবনী হরিদ্রা রঙের চন্দনের মত। কোন কোন জায়গার জমি এখনও নরম ও উত্তপ্ত। এ-সব জায়গায় মানুষে পা দেয় না, দূর থেকেই দেখলুম। শুনলুম সময়-সময় এই গন্ধকের গন্ধ এত বেশী তীব্র হয় যে লোকে এত কাছ থেকে দেখতে পারে না। এখন ভিসুভিয়সের অত্যন্ত শান্ত মূর্ত্তি, আমরা যত ক্ষণ ছিলুম, কোন রকম আওয়াজ শুনি নি। অন্য সময়ে নাকি এর ভেতর থেকে দুম্‌দাম্ আওয়াজ শোনা যায়। আগ্নেয়গিরির মুখের কাছ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। এর জন্য স্থানীয় গাইড নেওয়া দরকার। তারা জমির চেহারা দেখে ও গন্ধ অনুভব ক'রে বুঝতে পারে দেখতে যাওয়া নিরাপদ কিনা। আমাদের

সহযাত্রীদের মধ্যে দু-চার জন আমেরিকান টুরিষ্টের উৎকট সখ হওয়ায় তারা এই রকম গাইড সঙ্গে নিয়ে দেখে এল। আমাদের ফেরবার সময় হ'ল, আবার সবাই ট্রেনে ক'রে ফিরে এলুম। ফেরবার সময় ভিসুভিয়সের খানিকটা নীচেই এক হোটেলে ট্রেন-কোম্পানী আমাদের ট্রেন-সমেত লোক-জনকে বৈকালিক চা ও কেক খাইয়ে দিলে। এ-সবের দাম টিকিটের সঙ্গেই ধ'রে নেওয়া হয়। আমরা আবার নেপলস্ শহরে ফিরে এলুম। এই আগ্নেয়গিরি যা দেখা হ'ল, সে-কথা বোধ হয় কখনও ভুলব না।

২রা অক্টোবর তারিখে নেপলস্ ছেড়ে আমরা আবার ফ্লোরেন্সে এসে নামলুম। এখানে আমরা আমাদের আগেকার পরিচিত বোর্ডিং-হাউসে এসে উঠলুম। বোর্ডিঙের কর্ত্রীকে জানালুম আজ রাত্রে আমি নিজে কিছু রান্না করতে চাই। তিনি খুব খুশী হয়ে আমার রান্নার যোগাড় ক'রে দিলেন। অনেক দিন পরে আবার সেদিন রাত্রে দেশী রান্নায় মুখ বদলানো হ'ল। সে-রাতটা ফ্লোরেন্সে বিশ্রাম ক'রে আমরা পরদিন ভেনিসের ট্রেন ধরলুম। আমাদের দেশে ফেরবার জাহাজ ভেনিস থেকেই ছাড়বে। ভেনিসে পৌঁছে গণ্ডোলা চ'ড়ে হোটেল ম্যানিনে এসে উঠলুম: এখানে যে-ক'দিন ছিলুম, দু-বেলাই পূর্ব্বের দেখা দোকানগুলিকে আবার একবার ক'রে দেখে বেড়াতে লাগলুম। এ-সময় ক'টা দিন রাস্তায় অনেক ভারতবাসীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। সকলেই নানা দেশ বেড়িয়ে এখানে হাজির হয়েছে। ৭ই অক্টোবর তারিখে সবাই 'কন্টিভার্দে' জাহাজে স্বদেশে ফিরবে। একদিন বিকেলবেলা সানমার্কো স্কোয়ারে বেড়াবার সময় দেখি শ্রীযুত অবনীনাথ মিত্র মহাশয় সস্ত্রীক কোথা থেকে এসে পড়েছেন। এঁরাও ওই জাহাজে ফিরবেন। মিত্র-মহাশয়ের চুল আলুথালু, পরনের কোটে একটাও বোতাম লাগানো নেই। গলা থেকে মফলার খুলে ঝুলে পড়ছে। আমাদের দেখেই মহা উৎসাহে চেঁচামেচি ক'রে বললেন, "তোমরাও হাজির হয়েছ?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার এমন বেশভূষা কেন?" আমাকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি চুপ কর ত; আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি, আমার সাজগোজে দরকারটা কি শুনি?" শুনলুম তাঁরা হোটেল ইউনিভার্সোতে আছেন।

৭ই অক্টোবর ভোরবেলা নিজেদের জিনিষপত্র গুছিয়ে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে হোটেলের দেনাপাওনা মেটানো হ'ল। আজ মন বড় প্রফুল্ল। দীর্ঘ চার মাস পরে নিজের দেশের দিকে পাড়ি দেওয়া হবে। মন বড় ব্যস্ত, কখন জাহাজে উঠ্‌ব তাই ভাব্‌ছি। বেলা ন'টার সময় আবার গণ্ডোলা চ'ড়ে খুশী মনে গ্র্যাণ্ড-কেনালের দিকে চললুম। জাহাজ সেখানে ট্রিয়েষ্ট থেকে এসে অপেক্ষা করছে। ভেনিসের ব্যালাডপীয়ারে এসে নামলুম। জাহাজ তখন সামান্য দূরে ছিল। সিঁড়ি লাগাবার অপেক্ষায় দু-জনে দুটি স্যুটকেসের উপর ব'সে রইলুম। ঘণ্টাখানেক পরে সিঁড়ি লাগান হ'লে সার্জ্জেণ্টকে ছাড়পত্র দেখিয়ে উপরে এসে নিজেদের কেবিন-নম্বর মিলিয়ে খুঁজে বের ক'রে ঢুকলুম। লণ্ডন থেকে যা ভারী জিনিষ আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, সব দেখি কেবিনে এসে হাজির আছে। আমি লাগেজ মেলাতে বসলুম। ১৩ই জুন তারিখে বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া জাহাজে ব'সে এ-রকম সব লাগেজ মিলিয়েছিলুম। আজ ৭ই অক্টোবর তারিখে আবার সেই কাজে বসেছি। সেদিনের মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের মনের অবস্থার কত পার্থক্য তা বুঝলুম। মানুষের নিজের জায়গা এমনই জিনিষ।

আমি সারাদিন ধ'রে জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে রকমারি যাত্রী ও মালপত্র-উঠা দেখ্‌তে লাগলুম। সকলেই এক-এক ক'রে গণ্ডোলা চ'ড়ে আসতে লাগলেন। মিসেস্ জে এন্ রায় তাঁর ছেলে ও বোনপোকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। অবনীবাবুরা এলেন। সুবিখ্যাত ডোঙ্গরের বালামৃত ঔষধের অংশীদার মিঃ ও মিসেস ডোংরে তাঁদের ছেলেপিলে নিয়ে এলেন। যুক্ত-প্রদেশের শাজাহানপুরের স্বর্গীয় জালাপ্রসাদের স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গেও আলাপ হ'ল। এঁরা ট্রিয়েষ্ট থেকে জাহাজে উঠেছেন। সারাদিন পরে রাত্রি আটটার সময় প্রসিদ্ধ নৃত্যকলাবিৎ শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্করের জননী ও কলকাতার ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী মহাশয়ের কন্যা কুমারী অমলা নন্দীও এসে উঠলেন।

শুনলুম জাহাজ সেই গভীর রাত্রি না হ'লে ছাড়বে না; আমরা বেলা তিনটার সময় জাহাজ থেকে আবার নেমে গিয়ে জলের ধার দিয়ে ডাঙায় ডাঙায় চ'লে এক গীর্জ্জার সামনে এলুম। গীর্জ্জার দরজার সামনে খুব ভিড়। দেখলুম

এক জোড়া ইটালীয়ান বরকনে সন্ত-বিবাহান্তে গীর্জ্জা থেকে বেরিয়ে এল। দরজার সামনে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীর ভিড় হয়েছে। কনেটি দেখতে বেশ, সতের-আঠার বছরের হবে। বরের বয়স হয়েছে, তার ওপর দেখতেও বেঁটে মোটা। আমরা নিজের মধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করলুম বর বোধ হয় দোজবরে। সন্ধ্যার একটু আগে আবার জাহাজে উঠে এলুম। রাত্রে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েছি, অর্দ্ধেক রাত্রে দেখি জাহাজ চলতে স্থরু করেছে। যাবার সময় ভিক্টোরিয়া জাহাজে শরীর খারাপ হওয়ায় জাহাজের ইঞ্জিন-রুমটি দেখা হয় নি। এবারে কন্টিভার্ডে জাহাজে একদিন ক্যাপ্টেনকে ব'লে-কয়ে জাহাজের সব নীচের তলায় ইঞ্জিন-রুম দেখতে গেলুম। ইঞ্জিন-ঘরের টেম্পারেচার সব সময়ে এক-শ দশ ডিগ্রী। বারটি বয়লার দাউ-দাউ ক'রে জলছে। ভিক্টোরিয়া জাহাজ মোটর-ইঞ্জিনে চলে। কন্টিভার্ডে সেই সাবেক ধরণের ষ্টীমে চলে। আমরা উপর-তলায় যাত্রীরা আরাম ক'রে চলেছি, আর নীচে এই গরমে খালাসী বেচারীরা সমানে আগুনে কয়লা দিচ্ছে। চটের থলের ভেতর দিয়ে উপর থেকে শীতল বায়ু নীচের তলায় প্রবাহিত করবার ব্যবস্থা আছে। তা সত্বেও আমরা নীচে এসেই গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠলুম। ক্যাপ্টেন এ-রকম একটি থলের নীচে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। নীচে নামবার সময় লোহার মই দিয়ে নামতে হয়। এই মই সব সময় এত উত্তপ্ত যে শুধু হাতে ধ'রে নামলে, হাতে ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য আমাদের নামবার আগে দুটি খালাসী এসে আমাদের হাতের চেটোতে পুরু ক'রে ন্যাকড়া জড়িয়ে দিলে। ইঞ্জিন-রুমের ঘরের সামনে একটি বড় লোহার অটোমেটিক দরজা আছে। জাহাজ-ডুবি হ'লে যাতে ইঞ্জিনের বয়লারের মধ্যে জল না ঢুকতে পায়, তার জন্য এ-রকম দরজা তৈরি। জল একটু নীচের তলায় পৌছলেই এই দরজা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। জাহাজডুবির পরে যদি আবার এই ডুবো জাহাজ উদ্ধার করা সম্ভব হয় তা হ'লে বয়লারগুলিকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে। তারই জন্য এত বন্দোবস্ত।

বোম্বাই পৌছবার আগে ভেবেছিলুম ডেকে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখব ভারতবর্ষকে দূর থেকে কেমন দেখায়। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই রইল, পৌছবার মাত্র এক দিন আগে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে শয্যাশায়ী হ'তে হ'ল। জাহাজ বোম্বাইয়ের কাছাকাছি এসে গেছে। আমি বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কিছু বুঝতে পারি নি। হঠাৎ যেন বহুকাল পরে কানে এল "আওর থোড়া আগে লেও," আমি তড়াক ক'রে উঠে বসলুম, এ যে আমাদের দেশের কথা। পোর্টহোল দিয়ে দেখলুম জাহাজ বন্দরের কাছেই এসে পড়েছে। জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পৌছলে আমরা নেমে এখানে দু-রাত্রি বিশ্রাম করলুম। শরীর একটু সুস্থ হ'লে ২১শে অক্টোবর তারিখে বিকেলবেলার ট্রেনে রওনা হয়ে ২৩শে সকালবেলা হাওড়া ষ্টেশনে এসে পৌছলুম।

সমাপ্ত

বিপন্ন

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এম-এসসি পাস করিলাম; সঙ্গে সঙ্গে একটি চাকরিও জুটিয়া গেল। বয়স তখন এত অল্প যে প্রফেসর সেন তাঁহার নিজস্ব প্রথায় অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, "শৈলেন, তুমি, যাকে বলে এঁচড়ে পেকে গেলে।"

চাকরি—বেহারে কোন একটি কলেজে প্রফেসারী। সত্বর যোগদান করিবার তাগিদও ছিল, তাহার উপর কাকা—'শুভস্য শীঘ্রম্, শুভস্য শীঘ্রম্,' করিয়া বাড়িটাতে এমন একটা উৎকট তাড়ানে ভাব দাঁড় করাইলেন এবং আমি বালকসুলভ অবুঝপনার বশে চাকরিটা হারাইবই জানিয়া শেষ-পর্য্যন্ত এমন নিরাশ হইয়া পড়িলেন যে বাহালি-পত্র পাওয়ার পর দিনই তাড়াতাড়ি যাত্রা করিতে হইল। তাহাতে খুঁটিনাটি অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যই কেনা হইয়া উঠিল না।

কর্ম্মস্থানে পৌছিয়া বৈকালের দিকে বাজারে বাহির হইয়া গেলাম এবং একটু ঘুরিয়া-ফিরিয়া একটি বড় দেখিয়া মণিহারীর দোকানে প্রবেশ করিলাম। দোকানটিতে বেশ ভিড়, বেশীর ভাগ লোকই দাঁড়াইয়া; কাউণ্টারের সামনে সারি সারি কতকগুলি চেয়ার পাতা, সবগুলিই অধিকৃত। আমার একটু বসিতে পারিলেই ভাল হইত, কেন-না অনেকগুলি জিনিষ লইতে হইবে, বিলম্ব হইবার কথা। এদিক-ওদিক চাহিতেছি, হঠাৎ নজর পড়িল একটি কোণপানা জায়গায় একটি ছোকরা আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। চোখাচোখি হইতেই তাহার চেয়ারটি ছাড়িয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি এইখানে আসুন না; দাঁড়িয়ে কেন?"

হিন্দীতে কথা বলিল, তাহা না হইলে বেহারী বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। মাথায় আধা-বাবরি-গোছের ব্যাক-ব্রাশ চুল, কোঁচায় কাবলী-ফের্ত্তা দেওয়া কাপড় পরা, পায়ে বোতামের কালো ফিতা বের করা একখানি পাশ-বোতাম পাঞ্জাবী—টায়টোয়ে কোমরের নীচে পর্য্যন্ত নামিয়াছে, পায়ে নাগরা—এদেশী নয়, যাহা কলিকাতায় গিয়া, বাংলার সুকুমারত্বের ছাপ লইয়া আবার এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে। একটু হাসিয়া ইংরেজীতে বলিলাম—"না, থাক, ধন্যবাদ। আমি বেশ আছি।"

এক ধরণের খাতির আছে যাহা অত্যাচারের নামান্তর মাত্র, দেখিলাম এও তাই। "তাও কি হয়?" বলিয়া ছোকরা হাসিতে হাসিতে দু-পা আগাইয়া আসিল এবং আমার হাতটা ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিয়া সামনের বিক্রেতাকে বলিল, "নাও, আমার এখন থাক্, আগে এঁকে দাও; সেই থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক।"

সন্দেহ হইল দালাল নাকি? তাই বা কেমন করিয়া হয়? দেখিলাম কাউণ্টারের উপর তাহার নিজেরই বাছাই করার জন্য একরাশ জিনিষ রহিয়াছে। ফুলেল তৈল, সাবান, আরসি, চিরুণী, কয়েক রকম সুগন্ধি, লেটারপ্যাড, আরও নানা রকম জিনিষ যাহা সৌখিনীও আবার প্রয়োজনীয়ও, অথবা সৌখীন লোকের প্রয়োজনীয় বলিলে আরও ঠিক হয়। ইতিমধ্যে বিক্রেতা কাউণ্টারের ওধার থেকে একখানা চেয়ার তুলিয়া তাহার জন্য এদিকে নামাইয়া দিল। বোঝা গেল শাঁসাল খদ্দের বলিয়া বেশ খাতির আছে।

আমি বিক্রেতাকে বলিলাম, "আগে আমায় একটা ষ্টোভ দেখাও দেখি; প্রাইমাস্ হানড্রেড, আছে?"

দোকানী বলিল, "আছে বাবু, তবে একটু দেরি হবে, সামান্য একটু। আজই বাক্স এসে পৌছেছে, প্যাকিং খুলে এক্ষুনি নিয়ে আসছি।"—বলিয়া সে ফিরিল। ছোকরা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "খুলে, দাম খতিয়ে নিয়ে এস, নইলে একটা যা-তা দাম ব'লে এঁকে ঠকাবে; কিছু তাড়াতাড়ি নেই এঁর।"

তাহার পর আমায় প্রশ্ন করিল, "আপনি কি বেশী ব্যস্ত?"

বলিলাম, "না, তেমন আর কি? তবে তত ক্ষণ বরং

অন্য এক জনকে ব'লে যাক্ না, আমায় তেল, সাবান, ব্লেড্ এইগুলো ঠিক বের ক'রে।"

"আচ্ছা, সে হ'চ্ছে···তুই যা শীগ্‌গির, যেন আবার মেলা তাড়াহুড়ো ক'রে যা-তা নিয়ে আসিস্ নি···ওই আসুক মশাই, ভাল সেল্‌স্‌ম্যান।···সিগারেট খান ?"

পকেট হইতে একটি সিগারেট-কেস বাহির করিয়া সামনে ধরিল। একটা সিগারেট বাহির করিয়া মুখে দিলাম; ছোকরা নিজেও একটা ঠোঁটের মাঝে আলগা করিয়া ধরিয়া কেতাদুরস্ত ভাবে দেশলাই জ্বালিয়া আমার সামনে ধরিল। তাহার পর নিজেরটা ধরাইয়া, এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "স্মোক্ ইজ্ মাই প্যাশন্।"

একেবারে আপ-টু-ডেট্!

লক্ষ্য করিলাম, সিগারেট খাইতে খাইতে খুব চকিত এবং সংযতভাবে দু-এক বার পাশের জিনিষগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিল এবং নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবিতে লাগিল; তাহার ভাবটা দেখিলে সন্দেহ হয় যেন কি একটা কথা বলিতে চাহিতেছে অথচ যেন জো পাইতেছে না।

নিতান্ত চুপ করিয়া থাকার অস্বস্তি কাটাইবার জন্য বলিলাম, "ও জিনিষগুলো বুঝি আপনি পছন্দ করবার জন্যে আনিয়েছেন ?"

মুখের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে মাথা নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল এই ভাবে বলিল, "ঠিক কথা, এই ত আপনাকে পাওয়া গেছে, দিন ত মেহেরবানি ক'রে আমার গোটাকতক জিনিষ পছন্দ ক'রে। বলবেন বোধ হয়—'কেন আপনি নিজে কি পছন্দ ক'রতে পারেন না ?'···পারি কিন্তু জানেনেই ত—টু হেড্‌স্ আর বেটার্ দ্যান্ ওয়ান্।"

আমার মুখে এরূপ একটা অশোভন আপত্তি ধরিয়া লওয়ায় আমি একটু লজ্জিত হইয়াই বলিলাম, "সে কি কথা ?—আমার দ্বারা যদি সামান্য সাহায্য হয় ত আমি বিশেষ আনন্দিতই হব।"

"সে আমি বাঙালীদের জানি, তাঁদের সম্বন্ধে আমার ধারণাও খুব উচ্চ। আচ্ছা, এই সাবানের কথাই ধরা যাক্···"

সাবানের বাক্সগুলি একে একে সরাইয়া দিয়া—"এই ত ভিনোলিয়া, ইর্‌য়াস্‌মিক্, হিমানী, গ্লাসকো, পামঅলিভ, ক্যালকাটা সোপওয়ার্কস্, মাইসোর—আরও এই সব কি কি রয়েছে, আপনি কোন্‌টা রেকমেণ্ড করেন ?"

আমি বলিলাম, "মাফ করবেন, বিলিতীগুলির সম্বন্ধে আমি কিছু ব'লব না। তবে···"

ছোকরা ভিনোলিয়া, পামঅলিভ, ইর্‌য়াস্‌মিক-এর বাক্সগুলি সঙ্গে সঙ্গে পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "নিন্, বলুন এবার। মানে, ভিনোলিয়া দাবি করে যে অমন সফ্‌ট্ আর ডেলিকেট্ স্কিন্ অন্য সাবানে দিতে পারে না। তা যাক্ গিয়ে; এদিকে আবার স্বরাজও ত চাই মশাই ?···এখন এগুলোর মধ্যে আপনার কোন্‌টে পছন্দ ? এক কোম্পানীরই পাঁচ-সাত রকম আছে।···আচ্ছা, আপনি সায়েন্স না আর্টস্ ?

বলিলাম, "সায়েন্স।"

"আই-এস্-সি ?"

"না, এইবারে এম-এস্‌সি পাস করেছি।"

ছোকরা গভীর শ্রদ্ধার সহিত আমার দিকে চাহিল, তাহার পর বলিল, "তবে ত কথাই নেই—দি ম্যান ফর্ ইট্। আচ্ছা, সাবানে গায়ের রং ইম্‌প্রুভ্ করতে পারে ? ধরুন···"

সেকেণ্ড-কয়েক একটু চিন্তা করিয়া লইল, তাহার পর "ধরুন—এই ধরুন, কেউ যদি পাড়াগাঁয়ে—মনে করুন, এই তের-চোদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত কাটিয়ে থাকে—জানেনেই ত, পাড়াগাঁয়ের ধুলোকাদা, মেঠো হাওয়া এ সবের মধ্যে রং ত আর ঠিক থাকে না—তা এখন যদি সে রেগুলারলি সাবান মেখে যায় ত রংটার জলুস্ বাড়বে ব'লে আপনাদের সায়েন্স গ্যারাণ্টি দিতে পারে ?"

কোথায় ব্যথা, এবং আমার এত খাতিরের কারণটাই বা কি এত ক্ষণে বুঝিলাম। বলিলাম, "কি জানেন ? সায়েন্স যে গায়ের রং আর সাবানের কথা ধ'রেই কোনখানে ব'লেছে তা মনে পড়ে না; তবে সাবান জিনিষটা লোমকূপগুলো বেশী পরিষ্কার রাখে, বাইরের ময়লাও জমতে দেয় না, কাজেই গায়ের চামড়ার স্বাস্থ্যটা থাকে ভাল; সেই থেকেই···"

ছোকরা গালে হাত দিয়া খুব মনোযোগ-সহকারে কথাগুলো শুনিতেছিল; সোজা হইয়া বসিয়া, তর্জ্জনীটা একটু নামাইয়া বলিল, "দেয়ার্ ইউ আর্, হয়েছে। আচ্ছা, তা যদি হয় ত একবার ক'রে সাবান মাখলে যে-পরিমাণে উন্নতি

হবে, দু-বার ক'রে মাখলে তার চেয়ে বেশী উন্নতিই হবে নিশ্চয়, তিন-বার ক'রে মাখলে সেই অনুপাতে তার চেয়েও বেশী?—চার বার—ছ-বার—আট বার…"

হায় রে চোদ্দ-পনের বৎসরের চর্ম্ম, তোমার বিপদও অনেক!…আমি আর না-থাকিতে পারিয়া বলিলাম—"হেজে যেতে পারে।"

ছেলেটি যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। ক্ষণমাত্রে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না, ছ-বার আট বার একটা কথার কথা ব'লছিলাম।"—সঙ্গে সঙ্গে সাবানপর্ব্ব যেন চাপা দেওয়ার জন্যই একটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "তাহ'লে এ-সাবানটার সম্বন্ধে কি বলেন?—কোম্পানীটাও ভাল, গন্ধটাও ডিসেণ্ট…"

খুব বড় সাবানবেত্তা বলিয়া আমার কোন কালেই নাম ছিল না; তবু বেচারাকে সপ্রতিভ করিয়া তুলিবার জন্যই বলিলাম, "দেখি, হ্যাঁ, এইটিই আজকাল কলকাতায় খুব চ'লছে—হট্ ফেভারিট্।"

মুখটি পুলকে দীপ্ত হইয়া উঠিল—বাক্সটা একটু তুলিয়া ধরিয়া এক পাশে নামাইয়া রাখিল, মনে মনে বুঝিবা কাহার দুটি কঙ্কণপরা হাতে তুলিয়া দিল। বলিল, "এই দেখুন বেয়াদপি, আপনাকে পান অফার করা হয় নি!"

পকেট হইতে একটা রূপার ডিবা বাহির করিয়া ডালাটা খুলিয়া ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল, "জর্দ্দা খান?"

"না।"

"আচ্ছা, তেল আজকাল কলকাতায় সবচেয়ে কোন্‌টা বেশী চ'লছে?"

সাবান সম্বন্ধে সমস্ত কলিকাতাকে টানিয়া আনিয়া ভাল করি নাই দেখিতেছি; কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, ছোকরা বলিয়া উঠিল, "অত কথায় কাজ কি—আপনি নিজে কি ব্যবহার করেন তাই বলুন না। আপনারও ত চমৎকার চুল দেখছি।"

উত্তর করিলাম, "আমার কথা ছেড়ে দিন, যখন যেটা হাতের কাছে পাই, খানিকটা দিই মাথায় চাপড়ে।"—বলিয়া একটু হাসিলাম।

ছোকরা নেহাৎ যেন খাতিরে পড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্য মুখটাতে একটু হাসি টানিয়া আনিল, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর ব্যস্ততার সহিত জেরা সুরু করিয়া দিল—

"আচ্ছা, হাতের কাছে কোন্‌টা বেশী পান?"

"তার কি কোন ঠিক আছে? কোন দিন হয়ত দিলামই না তেল মাথায়।"

নাছোরবান্দা। ক্ষণমাত্র ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, না হয় অন্য দিক দিয়েই দেখা যাক্; সব চেয়ে কম কোন্‌টা পান?"

আমি আর একবার হাসিয়া বলিলাম, "সেটা আরও ব'লতে পারি না। যেটা সবচেয়ে বেশী পাই সেটার কথাই যখন মনে থাকে না, তখন সবচেয়ে কমের কথা কি ক'রে মনে থাকবে বলুন?"

আবার একটু অপ্রস্তুত ভাব; একটু মৌন থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, আপনাদের সায়েন্স কি বলে,—চুলের সঙ্গে তেলের সম্বন্ধে?"

বলিলাম, "কেশতৈল সম্বন্ধে সায়েন্স বিশেষ ক'রে ধ'রে কোথাও ব'লে গেছে ব'লে ত মনে পড়ে না। তবে কথা হ'চ্ছে—তেলটেল মাখলে, একটু শ্যাম্‌পুইং ক'রলে—চুলটা থাকে ভাল।"

ছোকরা আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে তর্জ্জনীটা নামাইয়া বলিল, "'থাকে ভাল'।…বেশ, এইবার এই দিক থেকে দেখা যাক্,—কেশতৈল হ'চ্ছে মোটামুটি তিন ক্লাসের—তিলের, নারিকেলের আর এণ্ডির,—এই তিনের কোন-না-কোন একটা দিয়ে ভাল কেশতৈল তৈরি; এখন দি কোশ্চেন্ ইজ, এর মধ্যে কোন্‌টি চুলের পক্ষে সবচেয়ে ভাল?—আপনাদের সায়েন্স কি বলে? ধরুন…" একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "এই ধরুন—আমার এক আত্মীয়া প্রায় তের-চোদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত পাড়াগাঁয়েই ছিল। আমাদের দেশের বাপ-মায়েরা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কতটা গাফিল জানেনই ত?—বিশেষ ক'রে বেহারে…এরা আবার স্বরাজ চায় মশাই!—আমার হাতে থাকলে আমি এখন দু-শ বছর কিছু দিতাম না। চুল যে সৌন্দর্য্যের একটা কতবড় অঙ্গ সেটুকুও যারা জানে না তারা আবার স্বরাজ চায় কোন্ মুখে মশাই?…'স্বাস্থ্য ভাল, স্বাস্থ্য ভাল' ব'লে যে তার বাপ-মা গুমোর করে তাতে তাদের কি বাহাদুরি?—সে ত নেচার্ দিয়েছে…শুধু চুলটার দিকে তোমরা একটু লক্ষ্য রাখতে পারলে না?—শেম্!…"

বেজায় চটিয়াছে! একবার মনে হইল বলি—'আজকাল

ত সভ্য এবং স্বাধীন জগতে চুলটা বাদই দিতেছে'—বলিয়া স্বরাজকামীদের এবং তাহার "আত্মীয়া"র বাপমায়েদের উপস্থিতের জন্য বিপন্মুক্ত করি; কিন্তু কেশের মোহ তাহাকে যেমন পাইয়া বসিয়াছে তাহাতে এ-ধরণের কথায় ফল হইবে না জানিয়া কহিলাম, "আপনি যদি তাঁর চুলের উন্নতি চান ত এখনও যে একান্ত না হয় এমন নয়…"

ছোকরা ব্যস্তভাবে বলিল, "কি ক'রে?—আমি এই জন্যেই ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—বাঙালী ব'লেই। আর আমি মশাই বাঙালীদের একটু ভালবাসি।…এদিকে আমরা বলি "বেহার ফর বেহারীজ্" ওদিকে আপনারা পাল্টা জবাব দিন—'বেঙ্গল ফর্ বেঙ্গলীজ্'—এই ক'রে দুটো প্রতিবেশী জাতের মধ্যে ভাবের কিংবা অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যাক্—ব্যস্, তাহ'লেই স্বরাজ মুঠোর মধ্যে এসে প'ড়বে আর কি!…নিন্ সিগারেট খান।…চুলোয় যাক্ সব; তবে আমাকে আপনার বন্ধু ব'লেই জানবেন।"

বলিলাম, "বড় আনন্দ এবং সৌভাগ্যের বিষয়।… ব'লেছেন ঠিকই;—পাশাপাশি দুটি জাতের মধ্যে এ-ধরণের মনোমালিন্য থাকা উচিতও নয়, আশা করা যায় থাকবেও না বেশী দিন। ঠিক কথা,—কেশ সম্বন্ধে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যা করেন…"

ছোকরা তর্জ্জনীটা উৎসাহভরে টেবিলে ঠুকিয়া বলিল, "দেয়ার ইউ আর্; আমি সেই কথাই জিজ্ঞাসা ক'রব ক'রব করছিলাম, অথচ লেডীদের কথা তুললে আপনি কি মনে করবেন ভেবে জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না।…হ্যাঁ, তাঁরা কি করেন? বাঙালী মেয়েছেলেদের কেশসৌন্দর্য্য নামী। আমাদের এখানে কথায় বলে—'ছাতা, বাজা, কেশ; তিনে বাংলা দেশ।' 'ছাজা' হ'ল ঘরের ছাউনি, 'বাজা' বুঝতেই পারেন—বাজনা, আর কেশ—এই তিন নিয়ে বাংলা দেশ। আচ্ছা ধরুন,—তাঁরা যে-উপায় অবলম্বন করেন তা'তে কতটা পর্য্যন্ত উন্নতি হ'তে পারে? যার চুল কোমর-পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে যায়, কতটা নামতে পারে তার চুল? হাঁটু পর্য্যন্ত?—নাঃ, হাঁটু পর্য্যন্ত আর হ'তে হয় না, টু লেট্, কি বলেন?"

নূতন বিবাহ, নূতন সাধ; নিরাশ করিয়া আর পাপের ভাগী হই কেন? বলিলাম, "চোদ্দ-পনের আর এমন বিশেষ কি দেরি হ'ল? এই ত মোটে চুল হবার সময় আরম্ভ হয়েছে।"

ছোকরা আমার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে স্মিতবদনে পানের ডিবা বাহির করিতেছিল; বলিল, "আসুন পান খান।…আচ্ছা, চুল কি হাঁটুর নীচেও নামতে পারে?—সে রকম যত্ন নিলে?…এই দেখুন না, এই হেয়ার অয়েলটার বাক্সের এই ছবিটা…"

বেজায় হাসি পাইল। তবুও ভাবিলাম যাহার এমনই সঙ্গীন অবস্থা যে তুচ্ছ একটা বিজ্ঞাপনের ছবিকে ধ্রুবসত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে তাহাকে দমান নিতান্ত পাষণ্ডের কাজ। বলিলাম, "তুলির টানে যতটা সহজে হয় বাস্তব-ক্ষেত্রে ততটা আশা করা যায় না, তবে চেষ্টার অসাধ্য ত কিছু নেই।"

"নিশ্চয়ই, নেপোলিয়ান আল্পস্ ক্রস্ করেছিলেন কি ক'রে?—চেষ্টা ক'রেই ত?…তাহ'লে ধরুন পায়ের গুলোর নীচে পর্য্যন্ত?—যদি খুব যত্ন নেওয়া যায়—প্রাণপণে? …সম্ভব?"

বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিতেছে। বিনীত ভাবে,—যেন এক অনির্দ্দিষ্ট পক্ষের জন্য ওকালতি করিতেছি এই ভাবে বলিলাম—"দেখুন, ও-রকম যত্ন নেওয়া কি এক উপদ্রবে দাঁড়াবে না?—গোড়ালি পর্য্যন্ত চুল নিয়ে জীবন কাটান…খোঁপা ক'রে রাখলে ভারে মাথা ঠিক রাখা দায়, খুলে রাখলে পায়ে জড়িয়ে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা…"

ছোকরা বোধ হয় ঝোঁকের মাথায় নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অধোগতির বহর দেখিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িল। একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "না, ও একটা এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম—কথায়, কথায়। কি জানেন, আপনার কোন আত্মীয়ার সৌন্দর্য্যটুকু যথাসাধ্য বাড়িয়ে যদি একটু উপকার করতে পারেন ত করেন না কি?…ব'ললে শুনব কেন?—আপনারা, বাঙালীরা, ত এটা একটা কর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরেন …"

সেই নেহাৎ গদ্যময় স্থানে, বেচাকেনার হট্টগোলের মধ্যে রচিত নিভৃতে এই নূতন প্রণয়ীর মূঢ়তা, বিহ্বলতা বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল। একবার ইচ্ছা হইল একটি সুমিষ্ট প্রশ্নের আঘাতে কৃত্রিম অথচ স্বচ্ছ রহস্যটুকু ভাঙিয়া দিয়া ব্যাপারটিকে চরমে আনিয়া ফেলি; সুধাই—"আত্মীয়াটি কি

ধরণের, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া উপকার করিলে উপকারটি আসলে কোথায় পহুঁছিবে, বন্ধু ?"

কি ভাবিয়া প্রশ্নটা আর করিলাম না।

* * *

ভালই করিয়াছিলাম।

পরের দিন কর্ম্মে যোগদান করিলাম। প্রিন্সিপাল রায় আমায় সমস্ত কলেজটি একবার ঘুরাইয়া লইয়া, দ্বিতীয় বাৎসরিক শ্রেণীর ঘরে লইয়া গিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন; এই ক্লাসেই আমার অধ্যাপনা সুরু।

ক্লাসটির উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইতে গিয়া হঠাৎ চতুর্থ বেঞ্চের এক জায়গায় আমার চক্ষু সেকেণ্ড-কয়েকের জন্য নিরুদ্ধ হইয়া গেল। দেখি একটি ছোকরা একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া আছে;—চোখে জলন্ত বিস্ময়, তাহাতেই যেন মাথার চিতাইয়া-আঁচড়ান চুল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, মুখে ছোট্ট একটি গোল হাঁ, বাঁ-হাতে কালো ফ্রেমের চশমা; সখের জিনিষ, দৃষ্টিকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য যেন পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে।

কালকের সেই ছেলেটি,—দোকানে যাহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম।

রোল্ কল্ করিতে করিতে মনে হইল যে-ছেলেটি ৮৮-তে উত্তর দিয়াছিল সে-ই যেন আবার ৯২-তেও সাড়া দিল। প্রক্সি;—আন্দাজে কাহার প্রক্সি তাহাও বুঝিলাম, তবুও দৃষ্টি একবার চতুর্থ বেঞ্চে গিয়া পড়িল। দেখিলাম সেই কেশবিলাসী ছেলেটির জায়গা খালি,—হাজরির বন্দোবস্ত করিয়া কখন নিঃসাড়ে চলিয়া গিয়াছে।

৮৮ এবং ৯২-কে আর একবার ডাকিলেই প্রবঞ্চনাটা হাতে হাতে ধরা পড়িত; কিন্তু তাহা আর করিলাম না। ভাবিলাম—যাক্, আপাতত সেও যেমন বাঁচিয়াছে, আমিও তেমনই একটা প্রবল অস্বস্তির হাত থেকে রক্ষা পাইয়াছি।

গৃহ ও বাহির

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তুমি নেই ঘরে
বাহিরে বরষা ঝরে।
ঘন বাদলের অন্ধকার
সৃষ্টির সমগ্র ঘিরে ধরে,
তুমি আছ তাহারি মাঝার।
তুমি আজ নেই ঘরে।

ঘরে দীপ জ্বালা,
সুন্দর হয়েছে নিরালা।
অচেনার দীর্ঘ যাত্রালোকে
প্রাণের এই তো পান্থশালা।
দ্বারে এসে কী খুঁজি দু-চোখে?
ঘরে আছে দীপ জ্বালা।

কেহ ঘরে রয়
কাহারো বা বাহিরে সময়।
যতক্ষণ ঘরে থাকে
পথিকের জানি পরিচয়,
যায় যবে বাহিরের ডাকে
ফেরে কিনা কী জানে হৃদয়:
ঘরে মন নাহি রয়॥

আকাশের কথা

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্ এস্‌সি

১৯০১ সালের কথা বল্‌ছি। বেতারে কে কত দূর থেকে খবর ধরতে বা পাঠাতে পারে—এই নিয়ে সারা দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন ও প্রতিযোগিতা চলেছে। সর্ অলিভার লজ, আচার্য্য জগদীশ বসু প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ কয়েক মাইল পর্য্যন্ত বেতারে খবর পাঠাতে পেরেছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রটি মারকনি বুঝতেন একটু কম। তাঁর ধারণা ছিল "যদি ৪ মাইল দূর থেকে খবর ধরা যায় তবে ৮ মাইল দূর থেকেই বা তা ধরা যাবে না কেন?" তাই তিনি দিনের পর দিন প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের দূরত্ব বাড়িয়ে সংবাদ ধরতে লাগলেন। এই রকম করতে করতে হঠাৎ একদিন রাগ্‌বী থেকে প্রেরিত সংবাদ আমেরিকায় ব'সে তিনি ধরলেন। এর আগে কিন্তু, কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেন নি যে এতদূর থেকে খবর পাঠানো বা ধরা সম্ভব হবে। সুতরাং এই অভিনব আবিষ্কারের জন্য মারকনিকে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে একটি পদক দেওয়া স্থির হ'ল। সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক লর্ড র‍্যালে। সভার শেষে তিনি হঠাৎ মারকনিকে প্রশ্ন ক'রে বস্‌লেন "আচ্ছা, সাধারণতঃ দেখা যায় যে আলোর তরঙ্গ অতি সূক্ষ্ম বাধার কোণ ঘুরে তার পিছনে পৌঁছতে পারে। তার কারণ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wave-length) খুব কম। শব্দের তরঙ্গ এর চেয়েও বড় বড় বাধার কোণ ঘুরে সেই বাধার পিছনে পৌঁছতে পারে, কারণ শব্দের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক বেশী। বেতারের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য শব্দের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে আরও বেশী। সুতরাং শব্দের সাম্‌নের বাধার চেয়েও বড় বাধার কোণ ঘুরে বেতার-তরঙ্গ না-হয় তার পিছনে পৌঁছতে পারে। কিন্তু রাগ্‌বী থেকে আমেরিকার মধ্যে উচ্চতায় প্রায় আড়াই-শ মাইল ব্যাপী প্রাচীরের মত পৃথিবীর যে বাঁক, সেই বাঁক ঘুরে কেমন ক'রে বেতারে বার্ত্তা পৌঁছল?" এর কোন সুসঙ্গত উত্তর মারকনি দিতে পারলেন না। ১৯০২ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেনেলী এবং ইংলণ্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক হেভিসাইড্ একই সঙ্গে অথচ স্বতন্ত্রভাবে জানালেন যে তাঁদের মতে উচ্চাকাশে বিদ্যুৎ-পরিচালক একটি স্তর আছে যেখান থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রতিহত হ'য়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। সুতরাং বেতার-তরঙ্গের পক্ষে এতখানি বাঁক ঘুরে আসা অসম্ভব নয়। এর ২৪ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৭৮ সালে ব্যালফুর ষ্টুয়ার্টও কিন্তু ঠিক এই কথাই ব'লে গিয়েছিলেন। পৃথিবীর দৈনন্দিন চুম্বক-ক্ষেত্রের শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি অনুমান করেন যে উচ্চাকাশে বিদ্যুৎ-পরিচালক একটি স্তর আছে। সেই স্তরের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে চুম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রই পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ। যদিও এই স্তরের প্রথম আবিষ্কারক ষ্টুয়ার্ট কিন্তু সাধারণতঃ এই স্তরকে 'কেনেলী-হেভিসাইড' বা ই-স্তর বলা হয়। এই স্তরের উপরে আরও একটি স্তর আছে তার নাম এ্যাপ্‌লটন বা এফ্ স্তর। উচ্চাকাশের যে অংশে এই দুই স্তর অবস্থিত তার নাম বিদ্যুৎ-মণ্ডল। কিন্তু কেমন ক'রে যে বেতার-তরঙ্গ উপরকার স্তর থেকে প্রতিহত হয় তা অমীমাংসিতই র'য়ে গেল। এমনি ক'রে ১৯০২ থেকে গড়িয়ে গেল ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত। এই প্রশ্নের প্রথম মীমাংসা করলেন ইক্লস্ ও লারমার;—এঁরা দু-জনে দেখালেন যে যদি কোন বায়ুরাশির অণু-পরমাণু সকল কিছু দ্বারা আহত হ'য়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু বা বিদ্যুতিনে পরিবর্ত্তিত হয় তবে সেই বায়ুরাশি যে অনুপাতে বিদ্যুৎ-পরিচালকত্ব ধর্ম্ম পায়, বেতার-তরঙ্গের গতিও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়। আমরা যতই উপরে উঠ্‌তে থাকি চাপ ততই কম্‌তে থাকে, তাই বিদ্যুৎ-মণ্ডলে চাপ পৃথিবীর চেয়ে ঢের কম। এই কারণে সেখানকার বিদ্যুতিনগুলি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা না খেয়ে বা কম খেয়ে, অনায়াসে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে। সেই জন্য ক্ষুদ্র

বেতার-তরঙ্গ বিশেষ না ক'মে উপরের স্তরের ভিতর দিয়ে স্রোতের মুখে হাল্‌কা জিনিষের মত ভাস্‌তে ভাস্‌তে অনায়াসে অনেক দূর পর্য্যন্ত যেতে পারে। তার পর কোন জায়গা থেকে প্রতিহত হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে।

এ ত গেল অনুমানের কথা। বাস্তবিক যে উপরে দু'টি স্তর আছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তখন পর্য্যন্ত কেউই দেখাতে পারেন নি। ১৯২৫ সালে সর্ব্বপ্রথম এ্যাপ্‌ল্‌টন এবং বার্নেট এই স্তর দু'টির অবস্থিতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে জানান। এই স্তর দু'টির বিষয় জান্‌বার পর উচ্চাকাশের অন্যান্য জিনিষের বিষয় জান্‌বার আগ্রহ বেশী ক'রে জাগে সবার মনে। পরীক্ষায় জানা গিয়েছে যে ভূ-গর্ভের মৃত্তিকা যেমন স্তরে স্তরে সাজানো, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উপরকার বায়ুরাশিও তেমনি স্তরে স্তরে সাজানো। (চিত্র দ্রষ্টব্য) পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রথম ১২ কিলোমিটার (১ কিলোমিটার = ⅝ মাইল) অর্থাৎ প্রায় ৭½ মাইল পর্য্যন্ত স্থানকে তাপমণ্ডল (Troposphere) বলে। একটা বোতলে তেল ও জল পুরে ঝ'াকানি দিলে তারা যেমন পরস্পর মিশে থাকে ঠিক তেমনি ক'রে এইখানে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি বায়ুর যাবতীয় উপাদান উত্তমরূপে মিশে থাকে। তার কারণ এই অংশের বায়ুরাশি সূর্য্যকিরণোত্তপ্ত পৃথিবীপৃষ্ঠের সংস্পর্শে এসে অনবরত আলোড়িত হচ্ছে। এখানে যত উচ্চে উঠা যায় বায়ুরাশি ততই পাতলা ও ঠাণ্ডা হ'তে থাকে। ঝড়, বৃষ্টি, মেঘ, বজ্রপাত প্রভৃতি যাবতীয় নৈসর্গিক ঘটনার লীলাভূমি এই স্থান। তাপমণ্ডলের উপরেই হিমমণ্ডল (Stratosphere)। এই মণ্ডলের একটা আশ্চর্য্য গুণ এই যে, তাপমণ্ডলের মত এখানে যত উচ্চে উঠা যায় বায়ু আর তত শীতল হয় না। পৃথিবী-পৃষ্ঠের ৯ মাইল উপর থেকে প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপী এই মণ্ডল। এইখানকার তাপ প্রায়—৫৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড ও চাপ সমুদ্রতলের এক-দশমাংশ। এইখান থেকে বায়ুরাশির উপাদানসকল বিভক্ত হ'তে আরম্ভ করেছে। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি ভারী বায়ুরাশি নীচের দিকে থিতিয়ে পড়ার চেষ্টা করে এবং হিলিয়াম, হাইড্রোজেন প্রভৃতি হাল্‌কা বায়ুরাশি উপরের দিকে ভেসে উঠে। মেঘের রাজ্যের বাইরে ব'লে এই হিমমণ্ডলে সব সময়েই সূর্য্য ও নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়। আকাশের রং পৃথিবী থেকে যেমন নীল দেখায় এখান থেকে তেমন দেখায় না— দেখায় ঘন কালো। পৃথিবীর দিকে তাকালে তাকে চেনাই দায় হয়। তার বুকের উপর গাছপালা, পাহাড় পর্ব্বত, নদনদী—সব যেন তালগোল পাকিয়ে এক হ'য়ে যায়— সমুদ্রগুলো শুধু আয়নার মত চক্‌ চক্‌ করে। তাপমণ্ডল ও হিমমণ্ডলের খবরাখবর পাবার জন্য আজকাল আবহাওয়াবিদ্‌রা আকাশে বেলুন ছাড়েন। তাতে

থাকে যন্ত্রপাতি যা' দিয়ে আপনা হ'তেই উচ্চাকাশের তাপ ও চাপ রেখাঙ্কিত হ'য়ে যায়। তার পর কিছু দূর উঠে যখন বেলুন ফেটে যায় তখন প্যারাসুটের সাহায্যে যন্ত্রপাতি নীচে নেমে আসে আর তাই দেখে লোকে উপরকার খবর সব জেনে নেয়। আজকাল বেলুনে চ'ড়ে মানুষও যাচ্ছে হিমমণ্ডলে। হিমমণ্ডল ও তাপমণ্ডলের মধ্যে যেখানে তাপক্ষয় হঠাৎ থেমে গেছে তার নাম তাপস্থির (Tropopause)। এখানকার আকাশ চিরনির্ম্মল, মেঘমুক্ত। তাপ প্রায় ৪৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

১ মাইল থেকে ১॥ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই স্থানটি। হিমমণ্ডলের যে অংশে অক্সিজেন আছে তার উপর সূর্য্যের অতিবেগুনী রশ্মি প'ড়ে ওজোনে পরিণত হয়। এইরূপে সঞ্চিত যে ওজোনের স্তর তাকে বলে ওজোনমণ্ডল (Ozonosphere)। পৃথিবী থেকে ৪৫।৫০ কিলোমিটার উচ্চে এই মণ্ডল বিদ্যমান। এই ওজোনমণ্ডল উপরে থেকে আমাদের বিশেষ উপকার করছে। কারণ এই স্তর যদি না থাকত তবে সূর্য্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে আমরা পৃথিবীসুদ্ধ সবাই অন্ধ হ'য়ে যেতাম। তাই যেটুকু আমাদের না হ'লে নয় সেইটুকু এসে পৌছয়, বাকীটা ওজোনদ্বারা শোষিত হয়। বর্ণবিশ্লেষণ-যন্ত্রদ্বারা সূর্য্যালোক পরীক্ষা ক'রে দেখা যায় যে সূর্য্যকিরণের বর্ণছত্র অতি-বেগুনীর দিকে হঠাৎ এক জায়গায় বেশী ক'মে গিয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা যে ওজোনমণ্ডলের ওজোনদ্বারা সূর্য্যকিরণ শোষিত হয় ব'লেই বর্ণছত্রের তেজ অতিবেগুনীর দিকে হঠাৎ ক'মে যায়। এরও উপরে পৃথিবীর পিঠ থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার উচ্চ থেকে আরম্ভ হয়েছে বিদ্যুৎ-মণ্ডল। এই বিদ্যুৎ-মণ্ডলে আছে অসংখ্য বিদ্যুতাশ্রিত জড়কণা ও বিদ্যুতিন এবং তারই জন্য এই স্তর পেয়েছে বিদ্যুৎ-পরিচালকত্ব ধর্ম্ম। এই মণ্ডল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। নীচের স্তরের নাম কেনেলী-হেভিসাইড বা ই-স্তর—পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উচ্চাকাশে ৮০।১০০ কিলোমিটার থেকে সুরু হয়েছে এই স্তর। দ্বিতীয় স্তরটি প্রায় ২৫০ কিলোমিটার উচ্চে সুরু হয়েছে। এর নাম এ্যাপ্‌ল্টন বা এফ-স্তর।

বিদ্যুৎ-মণ্ডলের উৎপত্তির কারণ কি এইবার দেখা যাক্। সূর্য্যের অতিবেগুনী রশ্মির ক্রিয়া যে বিদ্যুৎ-মণ্ডলের উৎপত্তির একটা প্রধান কারণ তা একরকম নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হ'য়ে গিয়েছে। অতিবেগুনী রশ্মি বায়ুরাশির উপর প'ড়লে তার অণু-পরমাণু থেকে বিদ্যুতিন বিচ্ছুরিত হয়। একে বলে বিচ্ছুরণ (Ionization)। এর ফলে বায়ুতে বিদ্যুতিন ও বিদ্যুতাশ্রিত অণু-পরমাণুর উদ্ভব হয় এবং এর জন্যই বিদ্যুৎ-মণ্ডলের বায়ু বিদ্যুৎ-পরিচালক হয়। উচ্চস্তরের বিদ্যুৎ-পরিচালকত্ব ধর্ম্মের জন্য দায়ী সূর্য্যের অতিবেগুনী রশ্মি। নিম্ন স্তরের বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সূর্য্য হ'তে উৎক্ষিপ্ত বিদ্যুতাশ্রিত অণু-পরমাণু ও জড়কণা (corpuscles), বিশ্বাতীত (cosmic) রশ্মি, উল্কাপাত (meteoric showers), উদীচ্যালোক (Aurora Borealis) ও বজ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি নিম্ন স্তরের বিচ্ছুরণের কারণ। এইবার আমরা এই সব বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করব।

এই যে সূর্য্য—যাকে দিনের দেবতা ব'লে আবহমান কাল আমরা পূজা ক'রে এসেছি, আমাদের সকলের থেকে সব সময়েই উপাস্য ব'লে দূরে রেখে এসেছি—কোনদিন জান্‌তে চাই নি, বুঝ্‌তে চাই নি, সত্যি এ জিনিষটা কি, বা এর মধ্যেই বা আছে কি সব—আজ বৈজ্ঞানিকরা তাকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছেন যে তার মধ্যে আছে উত্তপ্ত বায়ুরাশির চারটি মাত্র স্তর—Photosphere বা আলোক-মণ্ডল, Reversing layer বা প্রতিফলক স্তর, Chromosphere বা বর্ণমণ্ডল এবং Corona বা ছটামুকুট। আগ্নেয়গিরির ভিতর যখন গলিত ধাতু ও বাষ্পের চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তখন যেমন কোন একটা ফাটলকে আশ্রয় ক'রে সেই সব ধাতু অসাধারণ বেগে উৎক্ষিপ্ত হ'তে থাকে ঠিক্ তেমনি ক'রে সূর্য্যের ভিতরকার প্রচণ্ড তাপে প্রজ্বলিত বাষ্পরাশি যখন অসম্ভব বেগে উপরকার স্তরে আস্‌তে থাকে এবং উপরকার স্তরের বায়ুরাশি ভিতরে প্রবেশ করে তখনই এক ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। তার ফলে সেইখানে একটি বিরাট ফাটল হয় এবং তার ভিতর থেকে প্রবল বেগে অসংখ্য অণু-পরমাণু ও বিদ্যুতিন উৎক্ষিপ্ত হয়।

অধ্যাপক ডক্টর মেঘনাদ সাহা এই সূর্য্য সম্বন্ধে অনেক

মৌলিক গবেষণা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে সূর্য্যের আকাশে ধাতুর অসংখ্য পরমাণু ক্রমাগতই ভীষণ গতিতে ছুটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে এবং পরস্পরের সঙ্গে বার বার ধাক্কা খাচ্ছে। তার ফলে পরমাণু থেকে বিদ্যুতিন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এই সকল বিদ্যুতিন হয়ত আবার ঐ পরমাণুর সঙ্গে মিশে পূর্ব্বের আকার প্রাপ্ত হয়। বিদ্যুতিন যে সূর্য্য থেকে উৎক্ষিপ্ত হ'তে পারে সে সম্বন্ধে ডক্টর সাহা কিছু বলেন নি। তার পর অধ্যাপক মিল্‌নে দেখান যে সূর্য্যের ভিতরকার বিদ্যুতিন সকল বাইরের আকাশে আস্‌তে পারত যদি বিচ্ছুরণ-চাপ, মাধ্যাকর্ষণ ও স্থির-বৈদ্যুতিক চাপের অপেক্ষা বেশী হ'ত। কেবলমাত্র বিদ্যুতিন বের হ'তে পারে না। তার সঙ্গে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দু-রকমই বিদ্যুতাশ্রিত অণু-পরমাণু এবং বিদ্যুৎহীন পরমাণু (neutral atoms) ও নিঃসৃত হবে। সেকেণ্ডে এক হাজার মাইল বেগে ওরা পৃথিবীর দিকে আস্‌তে থাকে। বিদ্যুতিন-দের বিচ্ছুরণ-চাপ (radiation pressure) কম ব'লে ওরা থাকে ধনাত্মক বিদ্যুতের পিছনে। সুতরাং সূর্য্য থেকে উৎক্ষিপ্ত জলকণার যে স্রোত তার সাম্‌নেটা হয় ধনাত্মক আর পিছনটা হয় ঋণাত্মক। সেকেণ্ডে হাজার মাইল বেগে আস্‌তে আস্‌তে যখন ওরা পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্রের নিকট পৌঁছয় তখন হয় ওদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি। বিদ্যুতাশ্রিত অণু-পরমাণু সকল এই চুম্বকক্ষেত্রদ্বারা প্রতিহত হ'য়ে মেরুপ্রান্তে ছুটে যায় এবং সেখানে গিয়ে তাদের যত কিছু শক্তি আশপাশের বায়ুরাশিতে ছেড়ে দেয় আর তার ফলে সমস্ত আকাশ কিছুক্ষণের জন্য অতি তীব্র আলোয় আলোকিত হ'য়ে পড়ে। এই ঘটনার নাম অরোরা। আর বিদ্যুৎহীন জড়কণাগুলি চুম্বকক্ষেত্রদ্বারা প্রতিহত না হ'য়ে সোজা আস্‌তে থাকে নীচের দিকে এবং শেষে ই-স্তরকে বিদ্যুৎপরিচালক করে।

বাস্তবিক এই জড়কণা ও অতিবেগুনী রশ্মি বিদ্যুৎ-মণ্ডলের উৎপত্তির কারণ কিনা তা' প্রমাণ করবার জন্য সারা ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ও কলিকাতায় পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে। এ বিষয়ে মীমাংসা করতে হ'লে সূর্য্যগ্রহণই প্রশস্ত সময়। কারণ এই সময় চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে এসে প'ড়ে। সেই সময় অতিবেগুনী রশ্মি ও জড়কণার দরুণ যে কিরণস্রোত—উভয়ই চন্দ্রদ্বারা প্রতিহত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-মণ্ডলের পরিচালকত্ব ধর্ম্ম হ্রাস পাবে। কিন্তু সূর্য্য হ'তে আলো সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল এবং জড়কণা সেকেণ্ডে এক হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে আস্‌ছে। সুতরাং এই দুইয়ের জন্য যে দু'বার গ্রহণ হবে তা' কখনও এক সময়ে হবে না। একটু আগে-পিছে হবেই।

(ছবি দেখুন) অতিবেগুনী রশ্মির জন্য যে গ্রহণ হ'বে তার প্রায় দু'ঘণ্টা আগে হবে জড়কণার দরুন গ্রহণটা। প্রত্যেক গ্রহণের সময় যদি আমরা বিদ্যুৎ-মণ্ডলের দু'টি স্তরের বিদ্যুৎ-পরিচালকত্ব মাপি এবং অন্য সময়ের তুলনায় যদি হঠাৎ হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করি তবেই বল্‌তে পারব কোন্‌টার জন্য বিদ্যুৎ-মণ্ডল ঐ ধর্ম্মলাভ করেছে। ১২৩৩ সালের অগষ্ট মাসে সূর্য্যগ্রহণের সময় কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে এইজন্য পরীক্ষা হয়। তা'তে দেখা যায় যে সূর্য্যগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যখন সারা পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে গেল বিদ্যুৎ-মণ্ডলের পরিচালকত্ব ধর্ম্মও হ্রাস পে'ল। গ্রহণ ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেই ধর্ম্ম আবার বেড়ে গেল। জড়কণার দরুণ গ্রহণের সময় কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হ'ল না। এর থেকে প্রমাণ হল যে সূর্য্যের অতিবেগুনী রশ্মিই বিদ্যুৎ-মণ্ডলের উৎপত্তির কারণ এবং সূর্য্য থেকে উৎক্ষিপ্ত জড়কণার বিশেষ কোন প্রভাব নেই বিদ্যুৎ-মণ্ডলের উপর। ইউরোপ ও আমেরিকায় এইরূপই স্থির হয়েছে। কিন্তু বার্টন এবং

পল্ নামে দুই উৎসাহী যুবক নাকি জড়কণার প্রভাব সম্বন্ধে সামান্য নিদর্শন পেয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, বিশ্বাতীত (Cosmic) রশ্মির দরুণ উচ্চাকাশের বায়ুরাশি বিদ্যুৎ-পরিচালক হয়। একস্-রে বা রঞ্জন রশ্মির নাম সবাই শুনেছেন। তার চেয়ে ঢের বেশী অন্তর্ভেদী এই বিশ্বাতীত রশ্মি।

সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে বছরের মধ্যে অগষ্ট এবং নবেম্বর এই দু'মাসে খুব বেশী রকম উল্কাপাত হ'য়ে থাকে। অগষ্ট মাসে যে-সব উল্কাপাত হয় তার নাম পারসিড্ শাওয়ার (Perscid shower) এবং নবেম্বর মাসে যে উল্কাপাত হয় তাকে লিওনিড্ শাওয়ার বলে। রাত্রির ও বছরের প্রথম দিকে যে-পরিমাণ উল্কাপাত হ'য়ে থাকে শেষের দিকে সাধারণতঃ তার দ্বিগুণ হ'য়ে থাকে। জাপানের এক বৈজ্ঞানিক নাগাওকা (Nagaoka) প্রথম অনুমান করেন যে উল্কাপাতের ফলে ই-স্তর বিক্ষুব্ধ হ'তে পারে। কারণ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে উল্কা সকল ভীষণ বেগে যখন পৃথিবীর দিকে আস্তে থাকে তখন উপরকার পাতলা বায়ুরাশির সংস্পর্শে ওদের গতি ক'মে যায় এবং একটু একটু ক'রে তাদের গতিশক্তি তাপশক্তিতে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায়। তার পর যখন পৃথিবী থেকে ৯০।১০০ কিলোমিটার উপরে থাকে তখন নির্ব্বাপিত দীপশিখার মত হঠাৎ প্রচণ্ড তেজে জ্ব'লে উঠে আকাশের গায় মিলিয়ে যায় এবং তার যতকিছু শক্তি চতুষ্পার্শ্বের বায়ুরাশিতে ছড়িয়ে দেয়। স্কেলেটের অনুমান যে উল্কাপাতে ই-স্তরের বিচ্ছুরণ সম্ভব। সেই অনুযায়ী শেফার (Schaffer) এবং গুড্ য়ল (Goodall)—এঁরা দু-জনে ১৯৩২ সালের নবেম্বর মাসের উল্কাপাতের সময় পরীক্ষা ক'রে ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময় চুম্বক-বাত্যা (magnetic storm) থাকার জন্য স্পষ্ট ক রে কোন কিছুই তাঁরা জানাতে পারেন নি। সেই জন্য ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে এই পরীক্ষা হয় কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়ের অধিনায়কত্বে। শ্রীযুত প্রেমতোষ শ্যাম ও লেখক এই গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে উল্কাপাতের ফলে বিচ্ছুরণ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। সুতরাং উল্কাপাত যে ই-স্তরের বিদ্যুৎপরিচালকত্বের জন্য কতক অংশে দায়ী তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

Thunderstorm বা বজ্রপাতের সঙ্গে ই-স্তরের বিচ্ছুরণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না সে বিষয়ে অনেক গবেষণার ফলে সি. টি. আর. উইল্সন্ জানতে পেরেছেন যে অনবরত বিদ্যুৎ চম্‌কানোর জন্য যে শক্তির খরচ হচ্ছে প্রতিদিন তার পরিমাণ একবর্গ সেন্টিমিটার ভূমির উপর প্রতি সেকেণ্ড ২।৩ আর্গ (erg) পর্য্যন্ত। তাঁর ধারণা এই যে, যে-সমস্ত মেঘ থেকে বাজ পড়ে তারা ধনাত্মক বিদ্যুৎপৃষ্ট ব'লে উপরকার বিদ্যুতিনগুলিকে নীচে টেনে আনে এবং এইরূপে বিচ্ছুরণের সহায়তা করে। এ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষাও হয়েছে। বৎসরের অন্যান্য ঋতুতে যে পরিমাণ বিদ্যুতিন উচ্চাকাশে লক্ষিত হয়, বর্ষার সময় আমাদের দেশে তার চেয়েও বেশী দেখা যায়। সুতরাং বজ্রপাতে ই-স্তরও যে বিক্ষুব্ধ হয় তার প্রমাণ এইখানে পাওয়া যায়।

১৮৮২-৮৩ সালে সারা পৃথিবী জুড়ে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গঠিত হয়। এই সভার সভ্যদের কাজ ছিল আবহাওয়ার সম্বন্ধে গবেষণা করা। এই পরীক্ষার ফলে তাঁরা বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। আরও নূতন তথ্য আবিষ্কারের জন্য গত ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাস থেকে ১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত—এই তের মাস ব্যাপী এক বিরাট পরীক্ষার আয়োজন হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল পার্থিব চুম্বক (terrestrial magnetism), আকাশস্থিত বিদ্যুৎ (Atmospheric Electricity), উদীচ্যালোক (Aurora) ও চুম্বক-বাত্যার সম্বন্ধ এবং বিশেষ ক'রে বিদ্যুৎ-মণ্ডল ও পৃথিবীর উপরিস্থিত যাবতীয় স্তরের ধর্ম্ম সম্বন্ধে। এক কথায় বল্‌তে গেলে তাঁরা আঁক্‌তে চেয়েছেন উচ্চাকাশের একটি নিখুঁত ছবি—যা দেখে সবাই জান্‌তে পারেন কোথায় কত দূরে কোন্ স্তর আছে, প্রত্যেক স্তরে কোন্ কোন্ বায়ু আছে, তাদের ধর্ম্মই বা কি, প্রতি স্তরে কত পরিমাণ বিদ্যুতিন আছে, সেখানকার উত্তাপ কত, বা সেখানকার বায়ুর চাপই বা কত—ইত্যাদি। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স্, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিন্‌ল্যাণ্ড, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্ম্মেনী ইটালী, ক্যানাডা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারতবর্ষ এই কাজে লেগেছিলেন।

এদের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের দু'টি দল হয়। একদল যান্

নরওয়ের অন্তর্গত ট্রম্‌সো নগরে। অন্য দল ক্যানাডার অন্তঃপাতী মেরিয়ান হ্রদের নিকট রে (Rae) নামে নির্জন এক দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই স্থান সারা বছরই তুষারে ঢাকা থাকে। সেই শীতের দেশে, খাওয়া থাকার কষ্ট সহ্য ক'রে সারাদিন সারারাত্র সমানভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ ক'রে যাওয়া যে কত কষ্টের তা সবার বোঝবার নয়। এঁদের কাজ ছিল এখানকার বাতাসের গতি ও উত্তাপ নির্ণয় করা এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় মেঘের উচ্চতা নির্ণয় করা। তা ছাড়া উদীচ্যালোক সম্বন্ধে যতটুকু খবর পাওয়া যায় তাও তাঁরা সংগ্রহ করবেন। ট্রম্‌সো-যাত্রীদের গবেষণার বিষয় বিদ্যুৎমণ্ডল। বিশেষ ক'রে তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন ই-স্তরের সঙ্গে উদীচ্যালোকের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা। আগেই বলা হয়েছে, সূর্য্যের অতিবেগুনী রশ্মি বিদ্যুৎ-মণ্ডলের উৎপত্তির প্রধান কারণ। কিন্তু এই স্থানে দীর্ঘ শীতকাল ব্যাপী অতিবেগুনী রশ্মি থাকে না ব'লে এই স্থানের উচ্চাকাশের বায়ু কেমন ক'রে বিদ্যুৎ পরিচালক হয়, এখানকার বায়ুরশ্মির বিদ্যুতিন সংখ্যা কত, স্তর দুটির উচ্চতাই বা কত—এই সব লক্ষ্য ছিল এঁদের। নরওয়েবাসীরা যাবেন উভয়মেরুতে। সেই ভীষণ তুষারে, পায়ে চলা দুষ্কর। তাই তাঁরা যাবেন স্লেজে ক'রে। এঁদের লক্ষ্য ছিল আবহাওয়া সম্বন্ধে গবেষণা করা। অন্য দেশের লোকেরা নিজেদের দেশে বসেই পরীক্ষা করবেন এইরূপ স্থির ছিল। এই সব দেশ থেকে সারা বছর ব্যাপীর পরীক্ষার ফল লণ্ডনের উভয়মেরু-সংক্রান্ত বার্ষিক সভার (Polar Year-Committée-র) সভাপতির কাছে লিখে জানান হয়েছে। এই পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ এখনও জানা যায় নি। তবে কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়ের অধীনে ডক্টর হৃষীকেশ রক্ষিত ই ও এফ্‌ স্তরের উচ্চতা নির্ণয় করেন। তাতে জানা যায় কলিকাতায় ই-স্তরের উচ্চতা পৃথিবীপৃষ্ঠ হ'তে ৯০ কিলোমিটার এবং এফ স্তরের উচ্চতা ২৫০ কিলোমিটার। এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বেতারের সাহায্যে খবর পাঠাতে হ'লে প্রেরক যন্ত্র থেকে বেতারের ঢেউ আকাশে ছাড়া হয়। সেই ঢেউ কেবল মাত্র দু'টি উপায়ে স্থানান্তরে যেতে পারে—ভূ-পৃষ্ঠসংলগ্ন হ'য়ে কিংবা উচ্চাকাশের স্তরসমূহ থেকে প্রতিহত হ'য়ে। যে সমস্ত তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন হ'য়ে যায় তাদের নাম ভূ-তরঙ্গ আর আকাশের উচ্চস্তর থেকে প্রতিহত হ'য়ে যারা আসে, তাদের নাম আকাশ-তরঙ্গ। দুটি স্থানের ব্যবধান খুব বেশী হ'লে আকাশ তরঙ্গ দিয়ে আমরা খবর পেয়ে থাকি—ভূ-তরঙ্গ কোন কাজেই লাগে না তখন। কারণ ঘর-বাড়ি, পাহাড়-পর্ব্বত, গাছ-পালা, নদী-নালা, বৈদ্যুতিক তার ইত্যাদির দ্বারা এই তরঙ্গ শোষিত হয় এবং ক্রমেই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হ'য়ে শেষে মিলিয়ে যায়। তাই বেশী দূর আর পৌঁছতে পারে না। যেখান থেকে তরঙ্গ প্রেরিত হয় এবং আকাশ-তরঙ্গ যেখানে পৌঁছয়—এই দুই স্থানের ব্যবধানকে উল্লম্ফন (skip distance) বলে। উপরের স্তর থেকে প্রতিহত হ'য়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসতে বেতার-তরঙ্গের কত সময় লাগে তা যন্ত্রের সাহায্যে মেপে তার থেকে বিদ্যুৎ-মণ্ডলের বিভিন্ন অংশের উচ্চতা হিসাব ক'রে বার করা হয়। আমাদের দেশের পুরনো পুঁথি খুঁজলে দেখতে পাই যে উচ্চাকাশের এই স্তরের সম্বন্ধে আগেকার লোকেরাও জানতেন। একাদশ শতাব্দীতে আরবরা, পৃথিবীতে কতক্ষণ গোধূলি থাকে তার থেকে গণনা ক'রে উপরকার আকাশের উচ্চতা নির্ণয় করেছেন সাড়ে সাতান্ন মাইল। অথচ ই-স্তরের উচ্চতা প্রায় ৯০ কিঃ মিঃ অর্থাৎ ৫৬ মাইল। এই দু'য়ের মধ্যে কি আশ্চর্য্য মিল। তা ছাড়া ভাস্করাচার্য্য ব'লে গিয়েছেন,

ভূমের্ব্বহির্দ্বাদশ যোজনানি
ভূবায়ুরত্রাম্বুদ বিদ্যুদাদ্যম্‌।

অর্থাৎ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আকাশ আছে যার উচ্চতা বারো যোজন। এইখানে মেঘ, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য নৈসর্গিক ঘটনা সংঘটিত হয়। (১২ যোজন=৯৬ মাইল)। আমরা আগেই দেখেছি এই ৯৬ মাইলের মধ্যে তাপমণ্ডল, তাপস্থির হিমমণ্ডল ও ই-স্তর পড়ে। সুতরাং এদিক থেকে তাঁদের সঙ্গে আধুনিক মতের অনৈক্য ঘটে নি। উচ্চাকাশের স্তর উচ্চতা নির্ণয় ছাড়া, প্রতি ঘন-সেণ্টিমিটারে কত পরিমাণ বিদ্যুতিন আছে তা-ও জানা গিয়েছে। ই-স্তরের প্রতি ঘন-সেণ্টিমিটারে ১ লক্ষ ও এফ স্তরের প্রতি ঘন-সেণ্টিমিটারে দশ লক্ষ বিদ্যুতিন আছে। বৎসরের সকল সময়েই যে এই

পরিমাণ বিদ্যুতিন থাকে তা নয়। সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, দিবারাত্র, ঋতুপরিবর্ত্তন, চুম্বক-বাত্যা ইত্যাদির সহিত এর হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। রাত্রি অপেক্ষা দিনে, দুপুর অপেক্ষা সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের সময়, শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মে, শুষ্ক আবহাওয়া অপেক্ষা আর্দ্র মৌসুমী বাতাসে এই বিদ্যুতিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়।

বেলুন বা বেতারের সাহায্যে উচ্চাকাশের বিষয় যতটুকু জানা গিয়েছে তা' ছাড়া অন্য উপায়ে বাকী যা-কিছু সব জানা যাবে—এ কল্পনা বৈজ্ঞানিকরা করেন। তাঁদের ধারণা রকেটের সাহায্যে তাঁরা এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে বা উপগ্রহে অনায়াসে যেতে পারবেন। তার জন্য জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকা—এই কয় জাতি মিলে প্রাণপণে চেষ্টা আরম্ভ করেছে। বার্লিন শহরের উপকণ্ঠে রাইনিকেনড্রফে (Reinickendrof) এই এয়ারোড্রোমের হেড-কোয়ার্টার। গত মহাযুদ্ধে সব চেয়ে ভীষণ বিস্ফোরক টি. এন. টি. ব্যবহৃত হয়েছিল তা' হয়ত সবাই জানেন। তার চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিশালী অর্থাৎ যার একটি গোলা দিয়ে একটি শহরকে একসঙ্গে ভেঙে চুরমার ক'রে পুড়িয়ে দেওয়া যায়) সেই T4-এর সঙ্গে আরও কতকগুলি কি মিশিয়ে নাকি ডক্টর লিয়ন্স্ (Dr. Lyons) রকেটের জন্য fuel তৈরি করেছেন, যার জোরে রকেট পাবে সেকেণ্ডে দুই মাইল গতি। তাঁরা বলেন, প্রথম প্রথম রকেটে ক'রে চিঠিপত্র দেশ দেশান্তরে বিমান-ডাকের চাইতেও অল্প সময়ের মধ্যে পাঠানো হবে। তার পর হবে যাত্রীর ভিড়। লোকে এরোপ্লেনের মত নির্ভয়ে রকেটে ক'রে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবে। তার পর তৈরি হবে এমন রকেট যার সাহায্যে এই পৃথিবী থেকে যে-কোন গ্রহ বা উপগ্রহে লোক চলাচল সহজ ও সুগম হয়ে উঠবে। কেমন ক'রে তা সম্ভব হবে তার আভাসও বৈজ্ঞানিকরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, পৃথিবী থেকে যদি কোন জিনিষ হিমমণ্ডলের দিকে সেকেণ্ডে ৫ মাইল বেগে উঠতে থাকে এবং ৬০ মাইল যাবার পর সেটা হঠাৎ থেমে যায়, তবে সেটা তার নীচে নেমে আসবে না এবং ঠিক একই গতিতে সেখানে ঘুরতে থাকবে। এইরকম আরো কতকগুলো ছুঁড়ে দেওয়া হবে হিমমণ্ডলের দিকে, বৈদ্যুতিক শক্তির আধার, বেতারের সরঞ্জাম, রকেটের fuel, খাবার ও পানীয় ভর্ত্তি বড় বড় পাত্র বোঝাই ক'রে। এইগুলোর নাম হবে meteor Island বা আকাশ-বন্দর। সমুদ্রের উপর দিয়ে সুদূরগামী জাহাজ যেমন অনবরত চলতে পারে না—তার কয়লা, জল ও লোকজনের বিশ্রামে জন্য স্থানে স্থানে বন্দর থাকে তেমনি এই meteor-island-গুলো হবে আকাশের বন্দর। পৃথিবী থেকে যাত্রীরা এখানে এসে দু-চার দিন বিশ্রাম করবেন, তার পর গাড়ী বদল ক'রে অর্থাৎ নূতন রকেটে ক'রে আরও উপরে উঠবেন অন্য গ্রহের উদ্দেশ্যে। সেগুলাও যখন অন্য কোন গ্রহের আকর্ষণের মধ্যে এসে তার চতুর্দ্দিকে ঘুরতে থাকবে তখন আবার সেইগুলোই হবে উচ্চাকাশের বন্দর। এমনি ক'রে আকাশের মাঝে মাঝে ষ্টেশন হবে এবং তাতে লেখা থাকবে বড় বড় অক্ষরে "সূর্য্যে যাবার পথ" (This way to Sun), "চন্দ্রে যাবার পথ" (This way to Moon)। পৃথিবী থেকে যে-সব হাউই যাত্রী নিয়ে আকাশ বন্দরে পৌঁছে দেবে তারাই আবার ওখান থেকে fuel নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। এমনি ক'রে পরস্পরের মধ্যে সংযোগের ব্যবস্থা থাকবে। আকাশ-বন্দরের কোনটার fuel বা খাবার ফুরিয়ে গেলে বেতারে পৃথিবীতে খবর পাঠাবে আর অমনি হাউই ভর্ত্তি fuel কিংবা খাবার উঠবে আকাশে এবং ঠিক্ সময়ে পৌঁছে দেবে ওখানে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা যে এই আকাশ-বন্দরগুলো মানুষের পরম উপকারে লাগবে। ওখানে যদি মস্ত বড় এক আয়না বসানো যায় আর তাই দিয়ে সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত ক'রে পৃথিবীর অন্ধকার যেখানে তার ওপর ফেলা হয়, তবে সেখানটা দিনের মত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ বছরের মধ্যে ছ-মাস রাত যেখানে, সেখানে এ দিয়ে মানুষ কত কাজ করতে পারবে। তার পর উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর বরফ গলিয়ে ফেলা যাবে এর সাহায্যে এবং সেই জমীতে চাষবাসের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। ভাসমান বরফের চাঁইয়ের ধাক্কা লেগে জাহাজ ভেঙে যাবার আর ভয় থাকবে না—তার আগেই সেই বরফের স্তূপ গলিয়ে ফেলা যাবে। যুদ্ধে কামান, গোলাগুলির পরিবর্ত্তে এই দিয়ে শহরকে শহর জালিয়ে দেওয়া যেতে পারে কিংবা এর সাহায্যে শত্রু-সৈন্যের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে হটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যে-সমস্ত লোকের দরকার হবে এই বিরাট আয়না তৈরি করতে তাদের বিশ্রামের জন্য সপ্তাহ অন্তর নূতন লোক যাবে পৃথিবী থেকে। তারা ফিরে এলে কত মজার গল্প শুনতে পাব!

দাদার দুরভিসন্ধি

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরঞ্জন ঘোষালের বাড়ি বেলঘরে। তিনি গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয়ে পণ্ডিতী করতেন। অঙ্ক-বিদ্যায় তাঁর খুব নাম-ডাক ছিল;—শুভঙ্কর ঘোষাল বললেই সকলে তাঁকে বুঝে নিত। বুদ্ধি নিতে আসত। পণ্ডিতী ক'রে আর বুদ্ধি বিতরণ ক'রে সংসার চল্‌ত মন্দ নয়।

দুটি ছেলে—জগৎ আর শশীকে ইংরেজী পড়িয়ে তার সঙ্গে নিজের বিদ্যা বুদ্ধি মিশিয়ে মানুষ ক'রে তোলবার তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল। জগৎ ম্যাট্রিক পাস করলে বটে, কিন্তু হিসেবে আর বুদ্ধিতে বাপের প্রিয় হ'তে না পেরে একটি চাকরি জোগাড় করে আগ্রায় চলে গেল।

ঘোষাল-মশায় বলতেন "জগৎ কেবল একটা নিরীহ জেণ্টেলম্যান হয়ে গেল, তাতে সংসার কি সমাজের কোন উপকারই হয় না,—বাজে জিনিষ হয়ে রইল।"

* * *

শশী দিন-দিন শশিকলার মত বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে উৎপাত অশান্তিও বাড়তে লাগল। পুকুরের মাছ আর বাগানের ফল শশীর দলই দখল ক'রে রইল। ঘোষাল-মশাইকে কেউ কিছু জানালে, তিনি বলতেন "ভুলে গেলে চলবে কেন, ও-বয়সে সব ছেলেই ও-রকম করে' থাকে। ওটা চিরকেলে নিয়ম, ওতে বুদ্ধি খেলে কত! ও না থাকলে বিদ্যাসাগর—বিদ্যাসাগর হতেন না। যে-সব ছেলের বুদ্ধি খেলে না তারাই বাড়ি থেকে নড়ে না। ওটা দরকার, ওতে বাধা দিতে নেই। আচ্ছা, আমি বারণ ক'রে দেব, কিন্তু দেখে নিও—ও শুনবে না......"

ইতিমধ্যে শশী কৈশোরে পৌঁছে গিয়েছে, ইস্কুলেও ফোর্থ ক্লাসে উঠেছে। শশী যে-ক্লাসে ঢোকে, তা থেকে নড়তে চায় না—বিধু মাষ্টারের খুব প্রিয়, তিনি পড়া দেন—পড়া নেন না। সর্ব্বদা তাকে এ-কাজে ও-কাজে ইস্কুলের বাইরেই থাকতে দেন, কারণ সে ক্লাসে থাকলে অন্য ছেলেগুলির কিছু হবে না, এই তাঁর ধারণা। অথচ তাকে প্রমোশনও দেন; বলেন—"ও বুদ্ধির জোরে 'মেক-অপ্' ক'রে নেবে।" তাঁর উদ্দেশ্য সত্বর তাকে ডগায় ঠেলে দিয়ে ইস্কুলের বার ক'রে দেওয়া, নচেৎ নবাগত ছেলেদের কিছু হবে না। বাড়িতে বাপ তাকে গণিত শেখান, বলেন, "গণিত যার জানা আছে তার কাছে আর সব ত জলবৎ, বুদ্ধি বাড়াতে এমন বিদ্যে আর নেই—" শশীর লেখাপড়া জলবৎ হয়ে চলল।

ঘোষাল-মশাই শশীকে নাবালক রেখেই ইহলোক ত্যাগ ক'রে গেলেন—অবশ্য শশীকে তাঁর বুদ্ধিটুকু যথাসম্ভব দিয়ে এবং বড়ছেলে জগৎ যে মানুষ হয় নি—এই দুঃখ নিয়ে।

জগৎ সপরিবারে আগ্রা থেকে এসে শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ করলে। শশীর ইচ্ছা ছিল—পঞ্চাশের বেশী খরচ না করা হয়। জগৎ তা পারলে না, আড়াই-শ পড়ে গেল।

গ্রামের সকলে বললে, "জগৎ করবে বইকি, তার সময় ভাল; মানসম্ভ্রম বজায় রেখেই করেছে।"

পশুপতিবাবু জ্ঞাতিখুড়ো, তিনি বললেন,, "তা করুক না, তবে শশী নাবালক, তার শেয়ার থেকে না গেলেই হ'ল।"

শশী বল পেয়ে বললে, "শর্ম্মা পঁচিশের বেশী এক পয়সা দেবেন না।"

পশুপতিবাবু বললেন, "তা পার ত বলব বাপের বেটা, তিনি বাজে খরচের বিপক্ষে চিরদিনই ছিলেন। এক দিন ভাগ-বাঁটরা হবেই, তোমাদের এক-অন্ন, জগতের রোজগার ব'লে আলাদা কিছু থাকতে পারে না। যা-ইচ্ছা খরচ সে করতে পারে না। অর্দ্ধেকে তোমার পুরো দাবি রয়েছে। আমি ন্যায্য কথাই কব।"

শশী মনে মনে দৃঢ় হয়ে রইল।

আগ্রায় ফেরবার আগে জগৎ শশীকে বললে, "একটু খেটে কোন প্রকারে এণ্ট্রেন্সটা পাস ক'রে ফেল ভাই! তা হ'লেই আমি সাহেবকে ধ'রে তোমাকে একটা কাজে বসিয়ে দিতে পারব।" জগৎ চলে গেল।

শশী একটু মুচ্‌কে হেসে মনে মনে বললে, "হুঃ—আমি খেটে এন্‌ট্রেন্স্‌ পাস করি, আর উনি কর্ত্তামি ক'রে বাহাদুরিটা নিন্‌! এত মুখ্‌খু শশী নয়। খাটব আমি, পাস্‌ ক'রব আমি, আর নাম কিনবেন উনি। যদিও করতুম,—এই খতম্‌।"

২

পিতার মৃত্যুর পর সংসার দেখবার ভার নিলে শশী, আর বড়ভাই জগৎ আগ্রা থেকে মাসিক পঁচিশ টাকা পাঠাতে লাগল। তখন গ্রামে পঁচিশ টাকায় দু-তিনটি লোকের ভালই নির্ব্বাহ হ'ত।

কিন্তু জ্ঞাতি পশুপতি খুড়ো বললেন, "তুমি যে-রকম বুদ্ধিমান হিসিবি-ছেলে, ওই পঁচিশ টাকাতেই ডাল-ভাত খেয়ে কাটাতে পারবে; আমাদের সাধ্য কিন্তু ছিল না। জগৎও যদি ওই রকম সমঝে চলে, তা হ'লে আর ভাবনা কি—যথেষ্ট টাকা হুড়্‌ হুড়্‌ ক'রে জমে যাবে। আমরা ত জানি ও-সব আপিসে পাওনা-গণ্ডা বেশ আছে। তা ছাড়া পশ্চিমে সবই সস্তা-গণ্ডা। সেখানে ক-টাকাই বা সংসার খরচ লাগে! কাশী গিয়ে ত দেখে এসেছি।—তবে জগতের ঠিক্‌ ঠিক্‌ আয়টা তোমার জানা থাকলে···তোমার মনটায় বল থাকে। সে আর কি ক'রে জানবে···"

শশী বললে, "আমিও শুভঙ্কর ঘোষালের ছেলে, দেখুন না—এক চালে সব বার ক'রে নিচ্ছি।"

খুড়ো সস্নেহে বললেন—"তোমার ওপর ভালবাসা আর বিশ্বাস আছে বলেই সব কথা কই,—তুমি পারবে। তবে বাবুরা স্ত্রীটিকে নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে বাড়ির কথা ভুলে যান। তখন অনাবশ্যক চাকর দাসী পোলাও-কালিয়া ঘি দুধ রাবড়ী, না হ'লে চলে না। তাই এক-একটি কুপো ব'নে যেতে দেরিও হয় না। দয়া ক'রে দেশে আসেন কেবল মেয়ের বিয়ে দিতে। মনে ক'রো না সেরেফ জল-হাওয়ার গুণে অমন শরীর হয়। বাংলা দেশে জল হাওয়ার অভাব নেই, বরং অতিরিক্তই আছে। যাক্‌, খ্যাটের আর বিলাসিতার খরচ কি এখান্‌ থেকে ধরা যায়। এ ত তোমার বাড়ির গাছের ঝিঙে-ভাতে খেয়ে থাকা নয়! ভরসা কেবল, হিঁদুর ছেলের ধর্ম্মজ্ঞান, ছোট ভাইকে কি আর পথে বস্যাবে···"

শশী বাধা দিয়ে বললে, "বাবা ব'লে গেছেন—খবরদার বিষয়-কর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্মচিন্তা যেন স্পর্শ না করে,—অতবড় মুখ্‌খুমি আর নেই। ওটা স্ত্রী-আচার ব'লে জেনে রেখো। গজ-হিসেবে যাঁরা টিকি রাখেন, আদালতে ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে কিছু বলবার সময় মতলবের আর সুবিধের কথাই তাঁরা ক'ন। ধর্ম্ম স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে, মর্ত্ত্যে কিন্তু ডোবায়। ওটা নির্ব্বোধের জন্যে।—আমার জন্যে দাদার ধর্ম্মভাব আসবে ভাবেন?"

খুড়ো হুঁকো রেখে উঠতে উঠতে বললেন, "যাক্‌, আমি নিশ্চিন্ত হলুম। ঘোষালদা তোমাকে কিছু ব'লে যেতে বাকি রাখেন নি দেখছি; ওই সঙ্গে আমারও কর্ত্তব্য কমিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর কাছে যে মানুষ হয়েছে তার আর মার নেই।"

শশী দাদাকে এক দীর্ঘপত্র লিখে, খরচ সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিলে। শেষ বললে, "কোন্‌ ব্যাঙ্কে কত জমা আছে এবং কোন্‌ কোম্পানীতে কত টাকার জীবনবীমা করা হয়েছে,—আমাদের দু-জনেরই সব জেনে রাখা উচিত। কারণ কে কখন আছে বা নেই তার স্থিরতা নেই। বাবা একথা সর্ব্বদাই বলতেন। আরও বিশেষ ক'রে বলতেন—স্ত্রীবুদ্ধিতে চললে পুরুষ পৌরুষ খোয়ায়, অধঃপতিত হয়,"—ইত্যাদি।

* * *

শশীর যে কথা সেই কাজ। সে ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করলে। কারণ দরকারী যা-কিছু তা শেখা হয়ে গিয়েছে। বাপ তাকে হিসেবে পাকা ক'রে দিয়ে গিয়েছেন—সুদ-কষা পর্য্যন্ত। ইংরেজী যা শেখা হয়েছে, তাতে চাকরি আটকায় না; চিঠিপত্র সাহেবেরাই লেখে—বাবুদের কপি করা কাজ।

বিধুমাষ্টার সানন্দেই তার সব কথা সমর্থন করলেন। বললেন, "যাদের নষ্ট করবার টাকা আছে তারা চিরদিন পড়ুক না—তা-না ত আমাদের চাকরি থাকবে কেন! তোমার সঙ্গে ত সে কথা নয়, তুমি আমাদের নমস্ত ঘোষাল-মশায়ের ছেলে। যা শিখেছ তা গেরস্থর ছেলের জন্য যথেষ্ট। ওর ওপর গেলেই কবিতা লেখা আর কাগজে জ্যেঠামি করা বাড়ে বই ত না। তোমাকে সে কুপরামর্শ দিয়ে আমি পাপ বাড়াতে পারব না। লেখাপড়া যদি জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধির জন্যে হয়, আর ঘোষাল-মশাইয়ের বুদ্ধির যদি এক কাঁচ্চাও পেয়ে থাক ত

কোনো মাড়োয়ারি-বাচ্চাও তোমাকে ঠকাতে পারবে না,—এ আমি গঙ্গাজল ছুঁয়ে বলতে পারি। আর যদি রোজগারের কথা তোল, পশুপতি বাবুর কাছে শুনেছি—জগৎ বেশ দু-টাকা কামাচ্ছে। তোমার চার দিকে চট-কলের কুলি আর কন্যাদায়গ্রস্ত কেরানী, সেই টাকা আনিয়ে মোটা সুদে ছাড়লে একটা হৌসের মুচ্ছুদ্দির মোটা রোজগার ঘরে বসেই করতে পারবে। হিসেব যখন হাসিল করেছ, তোমার আবার ভাবনা কি—টাকা লাফিয়ে বাড়বে। বুদ্ধির টেস্ট্ টাকা-রোজগারে।"

বিধুমাষ্টার প্রফুল্ল মনে বাড়ি ফিরলেন। ইস্কুলটা যেতে বসেছিল,—তাঁর দুশ্চিন্তা গেল।

পাঁচ জনকে হাতে রাখা চাই। শশী বার-বাড়িতে অপেরার রিহার্সেল বসিয়ে দিলে। নানা পক্ষী এক বৃক্ষে এসে জুটল। গ্রাম সরগরম। শশী বাঁয়াতবলা বাজায়। বন্ধুরা বলে—হাত বড় মিঠে। পথে বেরিয়ে বলে, "কন্ধকাটা হ'লেই ভাল ছিল, মাথানাড়ার চোটে তিন হাতের ভেতর কারুর ঘেঁষবার জো নেই। আবার ও-চেহারায় পার্ট দিয়ে যে এড়ান যাবে তার উপায়ও নেই।"

মূলোজোড়ে অভিনয় ক'রে এসে শশীকে ম্যালেরিয়ায় ধরল। কোনো ওষুধেই ত বাগ্ মানলে না। শেষ রক্তমাংস সব গুড়িয়ে পেটজোড়া পিলেতে দাঁড়াল। পেট আর কানদুটিই লোকের নজরে পড়ে।

পশুপতি খুড়ো এসে পরামর্শ দিলেন,—আগ্রায় জগতের কাছে গেলে এক সপ্তাহে সেরে যাবে, আর শশীর যা-যা জানবার আছে তাও সহজে আদায় হয়ে যাবে,—কাজ গুছিয়ে আসতে পারবে।

শুনে শশীর যাবার উৎসাহ বাড়ল। সেই দিনই অবস্থা জানিয়ে জগৎকে পত্র দেওয়া হ'ল। টেলিগ্রাফে টাকা এল। মা, 'ছোটলোকের মেয়ে' সম্বন্ধে অর্থাৎ বড় বধূ সম্বন্ধে বার-বার সাবধান ক'রে দিয়ে সাশ্রুনয়নে—'এস বাবা' ব'লে শশীকে বিদায় দিলেন।

৩

জগৎ ষ্টেশন থেকে শশীকে নিয়ে বাসায় পৌঁছতেই, বড়বউ ছুটে গিয়ে শশীর চেহারা দেখেই কেঁদে ফেললেন। "এর আগে আমাদের খবর দাও নি কেন ঠাকুরপো!" স্বামীকে বললেন, "আজই সাহেব ডাক্তারকে এনে দেখান চাই,—সাণ্ডেল-মশাইও সঙ্গে থাকবেন।"

শশীর চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষা, পথ্য, রীতিমত চলতে লাগল। ব্যবস্থা সবই প্রথম শ্রেণীর। বড়বউ গৃহ-কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে, দিনরাত শশীর সেবাতেই রইলেন। রন্ধনাদির জন্য এক জন ঠাকুরকে রাখা হ'ল।

ঔষধে পথ্যে আর সর্ব্বোপরি বড়বউয়ের আন্তরিক সেবা-যত্নে শশী দেড় মাসের মধ্যে সেরে উঠল। এখন চল্‌ল পথ্যের পালা। দিনে রাতে ছয়টা ডিম, এক পাউণ্ড লোফ্, পাঁচ-পো মাংস, এক আউন্স পোর্ট, দুটো লেবু, একটা বেদানা ইত্যাদি। যেমন যেমন ক্ষুধা বাড়বে, সেই মত পথ্যও বাড়বে।—বড়বউয়ের ইচ্ছা ও আগ্রহ, জগৎ ক্ষুণ্ণ করলে না।

শশীর স্বাস্থ্য ও চেহারার দিন-দিন উন্নতি দেখে বড়-বউয়ের আনন্দ ধরে না। জগতের মুখে কিন্তু দিন-দিন চিন্তার চিহ্ন ধরা পড়তে লাগল। বড়বউ আর থাকতে না পেরে, একদিন কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনলেন, "সব মিটিয়েও এখনও তিনশোর ওপর দেনা, তার উপর নিত্য বাড়তি খরচ ত দু-টাকার কম নয়। ভাবছি—আমার সত্তর টাকায়, কোন্ দিক্ সামলাব?"

বড়বউ বললেন, "ও কথা মুখে আনতে নেই, ঠাকুরপোকে যে ফিরে পেয়েছি এই ঢের। তুমি ভেব না, আমার খান-দুই গহনা কালই বেচে চিন্তামুক্ত হও। শশী ঠাকুরপো লেখাপড়া শিখেছে, হিসেবে সিদ্ধহস্ত, সে শীগ্‌গিরই রোজগারে লাগবে। সংসারের জন্যে তার চিন্তা কম নয়। প্রায়ই আমাকে আয়-ব্যয়ের কথা সব খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে। বলে—দাদা ব্যাঙ্কে কত রাখতে পেরেছেন খোঁজ নিও দিকি। বাড়াবাড়ি খরচ সব কমান চাই—"

"বলে নাকি" ব'লে জগৎ একটু হাসলে।

বড়বউ বললেন, "তবে ছোকরা-বয়স কিনা, যাত্রা-থিয়েটারের বাই একটু আছে। যাক্, তুমি ও-নিয়ে ভেব না, যা বললুম তা কালই করা চাই। এই মাসটা বাদে ঠাকুরকে আর রাখব না; ঠাকুরপোরও সেই মত। আমার নরেশকে ইস্কুলে দিয়ে আসা আর নিয়ে আসার জন্যে আর লোকের দরকার নেই, তাই ভাণ্টা চাকরটাকে ত জবাব দেওয়াই হয়েছে। একা ছক্কন-ই সংসারের সব কাজ করতে পারবে।"

জগৎ বললে "ভাল কথা, ভাণ্টার হিসেব যে চুকিয়ে দেওয়া হয় নি। সে আজ সকালে এসেছিল।"

"ওর জন্যে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। আমি ঠাকুরপোকে দিয়ে হিসেব করিয়ে কালই তার পাওনা চুকিয়ে দেব। হিসেবের কাজ ঠাকুরপোর মুখে মুখে।"

"তবে তাই ক'রো, গরিবকে ফেরাফিরি না করা হয়।"

শশী আগ্রায় পৌঁছে পর্য্যন্ত শুয়ে শুয়ে সব লক্ষ্য করছিল,—তার ত কেবল অসুখ সারতে আসা নয়। সে দেখছিল— সাহেব ডাক্তার, ডাক্তার সান্যাল, পেটেণ্ট ফুড্, ঔষধ। পথ্য—ফ্রুট্-যুস্, ডিম, স্যুপ ইত্যাদি। আবার ঠাকুর চাকর দাসী, ভাইপো নরেশকে বাড়িতে পড়াবার মাষ্টার। সবই ত অনাবশ্যক খরচ দেখছি! কই আমাকে ত বাড়িতে পড়াবার জন্যে কোন দিন মাষ্টার দরকার হয় নি—তাতে কি লেখাপড়া আটকেছে না কম হয়েছে? এত বাড়াবাড়িতে আর টাকা থাকবে কি? ওই সঙ্গে আমাকেও যে ডোবান হচ্ছে,—এক অন্নের টাকা যে! আমার জন্যে যেটা খরচ করা হচ্ছে, সেটা তো ওঁর শেয়ার থেকে যাবে, উনি ওঁর কর্ত্তব্য করছেন। আমি চাই নি, বলতেও যাই নি। সেরে উঠে আমি সব কাজ ফেলে ন্যায্য খরচের লিষ্ট বানাব, তা হ'লেই বাড়তিটা বেরিয়ে আসবে। সেই ধ'রে গোড়া থেকে বোঝাপড়া। হিসেবের কড়ি, বাবা বলতেন,—বাঘে হজম করতে পারে না। তার ওপর লাটসাহেবের কথা চলে না। সেরে উঠি আগে।

৪

শশী আর এখন সে শশী নেই,—চেহারা ফিরে গিয়েছে। বেলঘরের ফতুয়া, দোলাই আর চটি চাকররা পেয়েছে। দাদার পরিচিত দোকানে দরাজ অর্ডার চলছে,—কামিজ, কোট, চেষ্টারফিল্ড, শূ সবই ফার্ষ্ট ক্লাস। দাদার কর্ত্তব্যে কেউ না খুঁৎ ধরতে পারে! মনেও বেশ স্ফূর্ত্তি দেখা দিয়েছে। আগ্রার বেঙ্গলী থিয়েটর ক্লাবে যায় আসে। পথ্য পূর্ব্ববৎই আছে, কেবল লোফের পরিবর্ত্তে দুধ রুটি চলছে। বড়বউ দু-খানা ক'রে বাড়িয়ে সেটা দু-ডজনের উপর তুলে দিয়েছেন। আহারের সময় নিজে কাছে ব'সে গল্প করেন আর শশীর স্বাস্থ্যের ও শরীরের উন্নতি দেখে মনে মনে আনন্দ উপভোগ করেন,—'শাশুড়ী দেখে নিশ্চয়ই খুশী হবেন'।

আজ শশীর খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এলে তিনি বললেন, "একটা কাজ ক'রে দেবে ভাই? ওঁর সময়ও হয় না আর হিসেবের কাজে বিরক্তও হন্, বলেন—সারাদিন ওই ক'রে এসে আর ভাল লাগে না।"

শশী বললে, "কি বলই না, কাজটা কি? হিসেবের কাজ কি সকলের আসে! বাবা তা বুঝেছিলেন, তাই তাঁর নামটা বজায় থাকবে ব'লে আমাকে হিসেবে পাকা ক'রে গিয়েছেন। ওটা আমার সখের আর ঝোঁকের কাজ—ওই ত খুঁজি। তা না-পেয়েই ত ওই আনাড়ি ছোঁড়াদের ক্লাবে গিয়ে বসি। সব একদম বার্লি পাউডার, ওরা আবার প্লে করবে! দু-হপ্তা চেষ্টা ক'রে কেউ জটায়ুর পার্ট করতে পারলে না। দেখিয়ে দিয়ে মুস্কিলে পড়েছি, এখন আমাকেই ধ'রে বসেছে। আমারই ভুল, কথায় কথায় এক দিন ব'লে ফেলি—তরণীসেনবধে তরণীর কাটামুণ্ড সাজতে হয়। কাটামুণ্ড যখন 'রাম রাম' বলতে বলতে ষ্টেজের উপর গড়িয়ে বেড়ায়, অডিয়েন্স স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। শেষ পর্য্যন্ত সেই ট্রাজিক্ ব্যাপার সইতে না পেরে সব পালিয়ে যায়। তাকে বলে প্লে—ভারি কসরতের কাজ। জটায়ু সাজাও সোজা নয় বৌদি। শুধু ডানায় আর ঠোঁটে তিরিশ সের বইতে হয়—ইস্পাতের 'সেট' কিনা..."

"না ঠাকুরপো, ও তিরিশ সের বোঝা বওয়া হবে না ভাই, কত ভাগ্যে তোমাকে ফিরে পেয়েছি! ও আর কেউ করুক।"

"কেউ পারলে ত! আমরা কলকেতা-ঘেঁষা ছেলে, একটা কিছু দেখিয়ে দিয়ে যাব না? ঠোঁট তয়ের করতে দিয়েছি ইস্পাতের, কেন জান? রাবণকে যখন শূন্যপথে তেড়ে তেড়ে আক্রমণ করব—করতালি বাজাব ওই ঠোঁটেই। তবে না সব তাক্ মেরে যাবে।—নাম করবে না, তবে আর প্লে কি?"

বড়বউ দেখলেন—হিসেবের গন্ধ হয়ে যায়। বললেন, "তবে ত দেখতেই হবে ভাই।"

"আলবৎ, তুমি দেখবে না! আমি নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব,—খাতিরটে দেখো একবার।"

"এখানে কিছুই দেখতে শুনতে পাই না। ভাগ্যে যদি

এমন সুযোগ এল, এই সময় পোড়ারমুকো ভাণ্টার মাইনের হিসেবের জন্তে মনে একটুকু স্বস্তি নেই। সকাল-বিকেল এসে দাঁড়ালে কি কিছু ভাল লাগে?"

শশী হেসে বললে, "কি বিপদ, ও আবার একটা কাজ নাকি। শশী শর্ম্মা শুনেছে কি হয়ে গেছে। তামাক টানতে টানতে সেরে রাখছি,—সকালেই বেটার নাকের ওপর ধরে দিও।"

"আঃ বাঁচালে ঠাকুরপো। ছক্কন তামাক দিক, আমি কাগজ পেন্সিল বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি......"

"এই হিসেবের জন্তে কাগজ পেন্সিল চাই নাকি। কত পাঁজাকালি, পুকুরকালি খালি হাতে করলুম—পেন্সিল্ ছুঁলুম না,—ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব সারলুম, আর এই ইতু-পূজোতে ঢাকের ব্যবস্থা! দেখলে বাবার আত্মা যে স্বর্গে ছি ছি ক'রে উঠবে!"

শুনে বড়বউ অপরাধীর মত একটুকু হ'য়ে গেলেন, বললেন, "আমি কি ক'রে জানব ঠাকুরপো,—উনি যে ধোপার হিসেবটাও কাগজ পেন্সিল না নিয়ে করতে পারেন না—দেখেছি কিনা। তাই......"

হাসিমুখে শশী সোজা হয়ে বললে "সে-কথা বাবাও জানতেন, তাই না আমাকে তাঁর সব বিদ্যেটুকু দিয়ে নিশ্চিন্তে দেহ ত্যাগ করতে...'নিশ্চিন্তে' বলতে পারি না বোধ হয়—বাঁশকালিটে বলতে বলতে তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। ও-বিদ্যেটা তিনি ভিন্ন বাংলায় আর কারও জানা ছিল না। কি করি, তাঁর ছেলে হয়ে পারব না, তাই বুদ্ধির জোরে,—যাক্, সে কথা। এখন আমাকে কেবল ব'লে দাও—ভাণ্টার মাইনে ছিল কত, সে ক-দিনের পাবে, গর-হাজরি প্রভৃতি আছে কি না—ব্যস্।"

বড়বউ এক টুকরো কাগজে সব টুকে রেখেছিলেন,—উঠে গিয়ে এনে শশীর হাতে দিলেন।

শশী তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, "তোমাদের না লিখে বুঝি কোনো কাজ হয় না! পরে শিস্ দিতে দিতে, যেন 'শণ্ট' ক'রে বাইরে চলে গেল।

বড়বউ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

৫

ছক্কন তামাক সেজে নিয়ে এল। শশী চেয়ারে ঠেস দিয়ে হিন্দীতে প্রশ্ন করলে, "তাওয়া দিয়েছিস্ ত হায়!"

ছক্কন "হাঁ হুজুর" ব'লে সটকার নলটি শশীবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাজ করতে গেল।

চক্ষু বুজে সটকায় মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে শশীর মসীকৃষ্ণ মুখমণ্ডল সহসা আরামের হাসিতে মেঘ-রাতের জ্যোৎস্নার মত আভা দিলে,—"এই এক হিসেবেই বউঠাকরুণকে দাদার বিদ্যেটার বহর বুঝিয়ে দিয়ে যাব!"

আত্মপ্রসাদ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে টানটাও দ্রুত দাঁড়িয়ে গেল। টানের প্রথম ঝোঁকটা মিটিয়ে,—"বেটার বেশ মিষ্টি হাত ত—সেজেছে খাসা!—টানতে টানতেই কাজটা সেরে রাখা যাক্।"

বউঠাকরুণের লেখা কাগজখানা হাতেই ছিল।—"সেকেলে সংসারের মেয়ে, সবিস্তার সব লিখে রেখেছেন;—কি আবশ্যক কি অনাবশ্যক—সে জ্ঞান নেই! পড়েই দেখা যাক্—"

"আজ মাসের ১৯শে, বেস্পতিবার সন্ধ্যে পউনে ছয়টার সময় ভাণ্টাকে ব'লে দেওয়া হ'ল—কাল থেকে তাকে আর দরকার নেই। এর মধ্যে আর তিন বেলা কামাই আছে। একদিন সওয়া দশটা বেলায় এসেও ছিল। তা হোক বেচারাকে যখন ছাড়িয়েই দেওয়া হ'ল, সে সব আর ধ'রে কাজ নেই, কতই বা পাবে! পায় ত মাসে স-পাঁচ টাকা আর সাত আনা জলপানি।"

বড়বউ নিজের মন্তব্য সহ ওই সব লিখে রেখেছিলেন। স্বামী তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতেন না। কিন্তু ভাণ্টার ভাগ্যে হিসেবের ভারটা, অভাবনীয় ভাবে পড়ল পাকা লোকের হাতে।

পাঠান্তে শশী নিজে নিজেই বললে—"তা ত বটেই! কামাইগুলো আর ধ'রে কাজ কি! এই ক'রেই দু-জনে মিলে আমার সর্ব্বনাশটা ক'রে আসছেন। কতক যাচ্ছে হিসেব জানেন না ব'লে,—আন্দাজে রাউণ্ড সম্ দিয়ে সারেন,—বাহবা নেন, অথচ তার আধাআধি যাচ্ছে শশীর মুণ্ডে। তার বেলা ত দয়া নেই, যত দয়া ভাণ্টার গরহাজরির দাম দেবার বেলা! তা আর হ'তে দিচ্ছেন না শর্ম্মা, তা যতই মেওয়া আর কালিয়া পোলাও খাওয়াও। হিসেবের

কড়ি—কড়ায় গণ্ডায় ক'সে ধরে দেব। এবার আর মুখ্খুর হাতে হিসেব পড়ে নি।"

সটকার নলটা তুলে নিয়ে শশী টানের দ্বিতীয়াঙ্ক সুরু করলে।—"বাঃ বেটার হাত কি মিষ্টি,—বাঁয়াতবলা শেখে না কেন! অনায়াসে আতা হুসেন হ'তে পারত। যাক্, নিশ্চিন্ত হয়ে শোয়াই ভাল।"

কাগজখানায় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে—"অ্যাঃ—সব মাটি করেছে। মেয়েমানুষের কাজ কিনা, আসল কথাটাই যে নেই,—মাস কোথায়?—৩০ কি ৩১ কি ২৮শে মাস, জানা চাই ত। তা থাকলে ত হয়েই গিয়েছিল। থাক্, সকালেই হবে—দু-মিনিটের মামলা!"

* * *

রোগমুক্তির পর বল বাড়ায় স্ফূর্তিও বাড়ে। শশী চেষ্টারফিল্ড্ চড়িয়ে মর্ণিংওয়াকে বেরোয়, আধ মাইলের আদেশটাকে তিন মাইলে প্রোমোশন দিয়েছে। ভাইপো নরেশও আজ দু-দিন তার সঙ্গ নিয়েছে।

"এসেই চা খেতে খেতে পাপ মিটিয়ে দেওয়া যাবে—মাসটা জানা চাই ত।" উভয়ে বেরিয়ে পড়ল। কথা কইতে কইতে তাজমহলে হাজির।

নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "এটা কাদের বাড়ি কাকা?"

"আ মুখ্খু, বাড়ি কি রে? বাড়ির কি চূড়ো থাকে? —মন্দির রে, মন্দির দেখিস নি? এই দিকেই ত হিঁদুর যত দেবতার স্থান। বোধ হয় শাক্যসিংহের বাড়ি। এই খান থেকেই নমস্কার কর্।" নিজেও করলে।

ফিরে এসে দেখে—ভাণ্টা হাজির। বিরক্ত হয়ে বললে, "তোমারা কি রাত পোয়াতে তর সয় নেহি? একটু বইসো। চা খাকে দিচ্ছি। হাঁ—কি মাস মনমে হায়,—বলতে পারতা? তা হ'লে দাঁড়কে দাঁড়কে সেরে দেতা।

"ফেরবুয়ারী হুজুর।"

শুনে শশী আপনা আপনি উচ্চারণ করলে—

"February has 28 days"

নরেশ নিজের বই গুছিয়ে নিয়ে অন্য ঘরে যাচ্ছিল। শুনতে পেয়ে বালক বললে, "না কাকা—twenty nine-এ বছরটা Leap year যে।"

"ওঃ Leap year, আচ্ছা—no fear—"

ছকন চা এনে দিলে। তাকে তামাক দিতে বলা হ'ল—"তেইয়া দেকে কাল কো মতন্ সাজনা।"

চায়ে চুমুক দিয়ে—"হুঁ, ফিগারগুলো মাথায় গুছিয়ে নি" ব'লে কাগজখানা বার করে—

(১) উনত্রিশ দিনে মাস

(২) উনিশ দিনের (পুরো নয়) সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা পর্য্যন্ত

(৩) তিন বেলা কামাই—(শর্ম্মা সেটা কাটবেনই)।

(৪) একদিন সওয়া দশটার পর আসে।—(বেটার খুশী নাকি?)—কখন সকাল হয়েছিল সেটা ত জানা চাই। পাঁজি দেখলেই বেরিয়ে আসবে।

(৫) মাস-মাইনে স-পাঁচ, আর সাত আনা জলপানি; একুনে ৫।৶ আনা।

"বস্—এই ত মামলা! এই ত মুটোর মধ্যে এনে ফেললুম। বাকি রইল—গুড়ুক টানতে টানতে টপাটপ বসিয়ে দেওয়া।"

গুড়ুকে টান দিয়ে,—"দু-একটা ফিগার টোকা দরকার হবে দেখছি। খোঁচখাঁচগুলো সাফ করা চাই। না হ'লে খোট্টাকে বোঝানো যাবে না,—মুখ্খুর সঙ্গে কারবার। কিন্তু পাঁজিখানা চাই ত, সূর্য্যোদয়টা দেখতে হবে। হতভাগা সন্ধ্যা পউনে-ছ'টায় কাজ ছেড়ে মরেছে যে! বেস্পতিবার ভর-সন্ধ্যে বেলায় এমন কাজও করে!—এঁদেরই বা আক্কেল কি? হিসেব জানলে আর···"

ভাণ্টার প্রতি—"দেখ্ ভাণ্টু, আমি থারা মহুষ্য হায়, আমার কাছমে গোঁজাকা মিল্ পাবে না। তোমারা একটি কানাকা কড়ি তঞ্চক হ'তে দেঙ্গা নেই। কিন্তু একটু বিলম্ব হোঙ্গা। পঞ্জিকাটা দেখতে হোগা কিনা। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করকে রাখেঙ্গা,—তুমি বৈকালমে আও।"

ভাণ্টা বাঙালীদের সংসারে কাজ ক'রে বাংলা বলাটা বেশ সড়গড় ক'রে ফেলেছিল। বললে "আপনি ভাবতা কেনো বাবু, হামি খোকাবাবুকে দেখতে আসে,—ঘড়ি ঘড়ি ইচ্ছা হোয় কিনা। আপনি যা হিসাব দিবে, হামি তাই নিবে।"

"এই ত ভাল মানুষকা বাত! আচ্ছা—এখন বাড়িকা মধ্যসে পঞ্জিকা আনকে দিয়ে যাও।"

ভাণ্টা পাঁজি এনে দিয়ে চ'লে গেল।

"এইবার ক-ঘণ্টা ক-মিনিট বার ক'রে নিয়ে শ্রাদ্ধটা সেরে রাখি।—উদয় দেখছি ছয়টা ৫৩ মিনিট। আর যাবে কোথায় ?"

"নাঃ, খোট্টার দেশ,—শুভঙ্কর চলবে না,—কাগজ চাই। তা না ত ওদের মাথায় ঢুকবে কেন! ছেলেটা দেখছি খাতা নিয়ে সরে গেল। আচ্ছা, দেয়ালে এলম্যানাক আর কিসের জন্যে ঝোলে? কাজে লাগুক।"—টেনে নিয়ে তার উল্‌টো পিঠে হিসেব স্বরু ক'রে দিলে।

"দুত্তোর—ইংরিজি শিখে কি মুখ্‌খুমিই করা হয়েছে! একেই বলে—দু-কূল খোয়ানো। ওরা কি আমাদের ভাল করতে এসেছে? এমন এক আট এনে ছেড়ে দিয়েছে যা আমাদের চিরকেলে চার! কখনও সেটা চার হয়েও যাচ্ছে, কখনও আট। লেখবার সময়ও যে তা না হয়েছে, তা এখন কে বলবে? মাথা ঘুলিয়ে দিলে। দূর করো এখন থাক, স্নানাহার ক'রে ঠাণ্ডা মাথায় দেখতে হবে। কাগজও চাই···

"ইস, আজ যে আবার বাঘা-রিহার্সেল রয়েছে! এই সময় যত আপদ জুটল। একটা ব্রেন, ক-দিক সামলাবে? নাঃ, আজ আর ভাণ্টাটাণ্টা নয়···"

শশী স্নানাহার ক'রে গুড়ুক টানতে টানতে শয্যা নিলে। "ও হবেইখ'ন—বসলেই উড়িয়ে দেব।"

বেলা চারটেয় ঘুম ভাঙল।

"যাক্, অনামুকো বেটা আসে নি—বাঁচা গেছে। আজ হাঁড়ি-কাবাব রাঁধতে বলেছি। সাড়ে আটটার মধ্যে লুচি-সংযোগে ভোগ লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ব—আজ ঝটাপটি রিহার্সেল! এক চক্কোর যমুনার হাওয়া লাগিয়ে এলেই বেশ 'জষ্টিস্' করা যাবে। ইকোয়েল্ শেয়ারার, অর্দ্ধেক ওড়ানো চাই। ওই হাওয়া লাগিয়েই ত কেষ্টো হাঁড়ি-হাঁড়ি ননী সামলাত।"

বাইরে পা বাড়াতেই বারান্দায় ভাণ্টাকে দেখে প্রাণটা বিগড়ে গেল। এখানে কলেরায় এত লোক মরছে আর এ বেটা···"কি রে ভাণ্টা, আসা হায় কেত্তা'খন? এই তোমার কথাই ভাবতা থা—গরিব লোকের এক পয়সা না যায়। কিন্তু যো দিন মে কোই গরুজরু নেই ছোড় দেতা আর তুমি কি বোলকে নোক্‌রি—যা গরুজরুকা বাবা বললেই হয়, সেটা ছোড় দিলে? হিঁদুকা বাচ্চা একটু শাস্ত্রজ্ঞান তো থাকা উচিত থা···"

—হামি কি করবে, বড়বাবু ছোড়িয়ে দিলে···

—হুঁ বুঝেছি, আচ্ছা, আমি ইস্‌কা বিহিত করবো। সেই জন্যেই তো ইতস্তত করকে বিলম্ব করতা হায়।

—দোকানদার তাগাদা ছোড়ছে না, তাই দিক্ করতে হোতা বাবুজি। আচ্ছা, হামি কাল আসবে।

* * *

চঞ্চুবাদ্য-রিহার্সেলে সকলকে তাক্ লাগিয়ে এসে শশী শুয়ে পড়ল। স্ফূর্ত্তি ফুট কাটতে লাগল,—"জটায়ুর যদি একখানা গান থাকে, of course 'কানাড়া', তা হ'লে সবাইকে বড়ালের নাম ভুলিয়ে দি। পাখীতে যখন কথা কয়—গাইবে না কেন।" নাসিকাধ্বনি···

ঘুম ভাঙল সাড়ে সাতটায়! "ইস কখন কি করবো! বিঘ্নের চেয়ে বিপদ আর নেই। অঙ্কটা ভাল জানি ব'লে আমার ঘাড়েই রাজ্যির জুলুম। কই এত মিঞা রয়েছেন তো—"

"পায় লাগি বাবুজি"—কানে আসায় শশীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল!—হারামজাদার কি আর কোন কাজ নেই! প্রকাশ্যে—"বইসো ভাণ্ট—বহুত কথা হায়। তোর কে কে হায় বল দিকি।—জরু, কাচ্চাকে-বাচ্চা, তারা সব কেমন হায়···"

ভাণ্টা আজ সাত দিন ঘুরছে, সে আজ যা-হয় একটা কিছু না ক'রে উঠবে না—এই ভেবেই এসেছিল। কিন্তু শশী স্নেহস্বরে কুশল জিজ্ঞাসা করায় গরিব জল হয়ে গেল। কাতর কণ্ঠে বললে—"কিষণজি সব সাফাই কোরকে দিছে বাবু। দোঠো বিটিয়া ছোড়কে, জরুকো লিছে।"—সে কেঁদে ফেললে।

"আ হা-হা! দুঃখ করিস নি ভাণ্টা,—কিষণজির কামই ওইরূপ হায়। স্বচিয়ে আর কি হোগা বাবা! মেয়েদের সাদির সময় যেন খবর পাই,—ভুলিস নি ভাণ্টা।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—"আচ্ছা, বারাণ্ডামে মাজদুরখানা পাতকে, ওই কাগজপত্তোরগুলো রাখ। আমি মুখ হাত ধোকে আসতা হায়;—আজ তোর হিসেব সারকে তবে অন্য কাজ। দেখতা তো কাগজকা ডাঁই!"

কাগজ, নরেশের খাতা, এলম্যানাক—অঙ্ককষার দাপটে সত্যই একত্রে মিলে একটি মোট দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অঙ্কের অন্তরালে শশীর চেষ্টার বিরাম ছিল না, কিন্তু মাথায় পুঙ্খানুপুঙ্খের সদিচ্ছা ঢোকায়, সামলাতে পারছিল না। অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল।

শশী 'আতা হায়' ব'লে বাড়ির মধ্যে যেতে যেতে,—"হারামজাদা আমাকে আবার রোগে না ফেলে ছাড়বে না···"

কথাগুলি অস্ফুটে উচ্চারিত হ'লেও বড়বউ শুনতে পেয়ে—"কি গো ঠাকুরপো—কার রোগের কথা ব'লচ? রোগের কথা শুনলে যে প্রাণ চম্‌কে ওঠে···"

"চমকে ত ওঠে, কিন্তু সেই ব্যবস্থাই ত করা হয়েছে দেখছি। হিসেব ত নয়,—কণ্টিকারির ঝাড়!"

"সে বুঝি এখনও"—বলেই বড়বউ থেমে গেলেন।

"করে দিন না বড়বাবু!"

"হ্যাঁ—তাঁর মুরোদ ভারী! পারলে তো!" ব'লে বড়বউ নিজের ভুলটা সামলালেন।—"না না, অত কষ্ট ক'রে আবার অসুখে পড়তে হবে নাকি? ওকে গোটাপাঁচেক টাকা ফেলে দাও ভাই—পাপ মিটুক। মায়ের কৃপায় কত ক'রে তোমাকে···"

শুনে শশী খুশী হ'ল বটে, কিন্তু বললে, "তোমরা ওই বড়মানুষিটা ছাড় দিকি! ওতে যে এ গরিবকে ডোবানো হচ্ছে। ও বেটার যা ন্যায্য পাওনা, তার এক পয়সা বেশী দেওয়া হ'তে পারে না। ওদের মাইনে দস্তরমত সর্ব্বত্রই এফ-ও-আর্-ই Fore, চার টাকা, তা নেপালেই কি আর ভূপালেই কি,—তা জান? যাক্, ও সব আর চলবে না···"

"সেই ত ভাল, তা হ'লে যে বাঁচি। ওই যে কি বললে···'এফ-ও-আর-ই' (Foie), তাই কর তো ভাই। ইস্—ডিমগুলো চড়িয়ে এসেছি যে" বলতে বলতে তিনি দ্রুত চ'লে গেলেন।

শশী হাতমুখ ধুয়ে—"কই হালুয়া কই?"

"এই যে ভাই" বলেই বড়বউ দুটো ডিমসিদ্ধ আর এক প্লেট হালুয়া হাজির ক'রে দিলেন।—"চা-টা খেয়েই যাও ভাই।"

"দাও, ব্রেন্‌টা বাগিয়ে নেওয়াই ভাল। আজ ফিনিশিং টচ্ দিতে হবে। ফ্রাক্‌সনগুলো রিডক্‌সন্ করলেই খতম।"

দাদার কর্ত্তব্য, শশী কোনো দিনই ক্ষুণ্ণ করছিল না।

* * *

ভাণ্টা সেই হিসাবের তাড়া বারান্দায় সাজিয়ে হতাশ হ'য়ে বসে ছিল।

শশী উপস্থিত হয়ে বললে, "কিরে ভাণ্টা, কি দেখতা হায়। এই ইস্‌কোই বলে হিসেব। এ যা কর দেতা হায়—মোক্ষোম। যা তামাক সাজকে আন দিকি।"

ভাণ্টা তামাক সাজতে গেল, শশী চুল ফিরুতে ঘরে ঢুকল।

একটা গরু চরে বেড়াচ্ছিল। ফাঁক পেয়ে হিসেবের তাড়াটা টেনে নিয়ে চর্ব্বণে মন দিলে!

ভাণ্টার চীৎকার শুনে, সিল্কের চাদরখানায় মুখ মুছতে মুছতে শশী বাইরে এসে, গরুটার অভদ্রতা দেখে, চাদর-খানা চট্ ক'রে তার গলায় দু-পাক জড়িয়ে—"আর যাবে কোথায়? ভাণ্টা, থানামে দিয়ে আয় ত। আমি ছাড়বার পাত্তোর নই।"

ভাণ্টাকে দেখে আর তার চীৎকারে গরুটা চার পা তুলে ছুটল। শশী গেল প'ড়ে, চাদর রইল গরুর গলায়। ভাণ্টা ছুটল তাকে ধরতে।

"সখের ফরমাসি জিনিষ—সাত টাকার চাদরখানা ছিঁড়ে-খুঁড়ে না আনে। ইস্, হিসাবের খানিক খানিক যে খাবলে নিয়েছে দেখছি। মাথা খেলে,—কি অভদ্রাই পড়েছে! হবে না—বেস্পতি বারের ব্যাপার!—বারোটা বাজল ভাণ্টা যে ফেরে না।—যাক্ বেটাকে যতক্ষণ না দেখি ততক্ষণই ভাল। কিন্তু চাদরখানা যে···"

ভাণ্টা হিসাব সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিল। তাই অনেক কষ্টে চাদরখানি গরুর গলা থেকে উদ্ধার ক'রে—ঘরে রেখে, বৈকালে মুখ শুকিয়ে, মাথায় পটি বেঁধে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির।

"কিরে—কি হুয়া?"

সে অতি কষ্টে বুঝিয়ে দিলে—গরুর পিছে দেড় কোশ দৌড়েছে, তিন বার গিরেছে, মাথায় চোট্ খেয়েছে, তবুও কুছু করতে পারে নি। গরু রেলপার গায়েব হোয়ে গিয়া। সে নড়তে পারছে না, সর্ব্বশরীরমে বড়া দরদ।—"কুছু দাওয়াই দেন হুজুর।"

তার অবস্থা দেখে শশীর আর কথা সরল না। তার হাতে একটা সিকি দিয়ে বললে, "সর্ব্বাঙ্গকা দরদটা মরনা চাই। ভাঙের চেয়ে দাওয়াই নেই। কিন্তু আচ্ছা করকে বানানো চাই। সব মশলা জানতা ত? তার পর বেশ করকে পিসন্, পিছে ঘুণ্টন..."

"উ-সব হামি খুব জানছে বাবু। মথুরাজিমে হামার ঘর আছে।"

"তবে আর কেয়া, আজই আচ্ছা হয়ে যাবি।"

সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল।

শশীর মনে কিন্তু সারা দিন সুখ নেই। এই অবস্থায় ভাইপো নরেশ ইস্কুল থেকে এসে হাসতে হাসতে বললে— "আজ কোম্পানীর বাগানে বেড়াতে যেতে হবে কাকা।"

"আমি আজ বেরুব না,—কাজ আছে।"

"হিসেব হয় নি বুঝি?"—কথাটা নরেশ সহজ ভাবেই কয়েছিল। শশীর মাথায় তা আগুন ছড়িয়ে দিলে। সে সরোষে বললে, "ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মত থাক্, ফের যেন—"

বালক ধীরে ধীরে বিমর্ষ মুখে চ'লে গেল।

শশীর মগজে তখন নানা সন্দেহ ফুট কাটতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সে ভাইপোর ওই কথার মধ্যে বিদ্রূপ আবিষ্কার করলে,—"এ ত ওই বাচ্চার কথা নয়, নিশ্চয় বাড়িতে ধাড়িদের মধ্যে এ-নিয়ে কথা হয়। তা হোক্, আমি কিন্তু তা ব'লে নিজে শেয়ারের কড়ি দাতব্য করছি না,—হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খ না ক'রে ছাড়ছি না। বাবা বলতেন—'নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে অন্যের কথা কানে নিয়েছ কি ঠকেছ'।"

এই ব'লে হিসেবের তাড়াটা টেনে নিয়ে ছড়িয়ে ফেললে। প্রত্যেক ছোট-বড় কাগজে চোখ বুলিয়ে— "তাই ত—পেজ-মার্ক দেওয়া হয় নি,—কলম চললে ত আর জ্ঞান থাকে না। কোথা থেকে আরম্ভ,—খুঁটটা একবার খুঁজে পেলে যে হয়। খুঁট মিলল না—সব একাকার হয়ে ব'সে আছে।—শশীর মাথাটা বোঁ ক'রে উঠল।

চাকরদের ঘরে ভাণ্টা ভাং ঘুণ্টনে ঘর্ম্মাক্ত। "সিদ্ধি না খেলে বুদ্ধি খুলবে না,—এক ঢোক্ চড়িয়ে দেখি। কি রে ভাণ্টা,—কেত্তা দূর! বাঃ, বেশ খুসবু ছেড়েছে! একটু দে দিকি চাক্‌কন্ করি—ভক্ষণ পরমে হোগা।

ভাণ্টা, মনের মত এক বাটি দিলে।

"জয় ত্র্যম্বকজী—বাঃ, তুই এমন সুন্দর বানাতা—এত্তা দিন বলিস নি!"

পাঁচ মিনিটেই শশীর বুদ্ধি খুলতে আরম্ভ হয়ে গেল। —"ব্যস্—মেরে দিয়েছি,—'শ্রীশ্রীহরি শরণম্' না লিখে শর্ম্মা কোনো দিন এক অক্ষরম ফাঁদেন না। যেখানে শ্রীহরি, সেইখানেই ত আরম্ভ! এই ত শ্রীহরি রয়েছে...কিন্তু মাঝ-মধ্যিখানে শ্রীহরি এলেন কি করে?"

শশীর ভাবের উদয় হয়ে পড়ল। খাতার পৃষ্ঠা, এলম্যানাকের পৃষ্ঠা, মায় ম্যাপের পৃষ্ঠা সর্ব্বত্রই শ্রীহরির বিকাশ! সে সুর ধরলে—

> হরি হে তুমি কিনা পারো!
> তুমি ডগায় ছিলে, মধ্যে এলে—
> কোনো বেটার ধার, না ধারো।
> এই যে—তলা ঘেঁযেও উঁকি মারো!

ক্যাবাৎ!—শশী হেসেই খুন।

তার পরের ওলট্-পালট্ অবস্থাটা শশী নিজে উপভোগ করতে পারে নি,—করেছিলেন অন্য অনেকে। দাদা বউ-ঠাকরুণ, নরেশ,—সকলেই। পাড়ার প্রবীণ উমেশবাবু পর্য্যন্ত। জগতের সেইটাই হয়েছিল সবার বড় লজ্জার কারণ।

শশীর মাথায় ঘড়া-ঘড়া জল ঢালা দেখে, বউঠাকরুণ ভয়ে ভাবনায় আড়ষ্ট! ডাক্তার ডাকবার জন্যে ব্যাকুল ভাবে স্বামীকে কেবলই কাতর অনুরোধ করছিলেন।

জগতের মাথা তখন বিরক্তিতে, লজ্জায়, রোষে ভর্ত্তি। —কর্কশ রকমের একটা ধমক খেয়ে স্ত্রী চমকে কেঁপে উঠলেন, যেহেতু এটা তাঁর অভ্যস্ত পাওনা ছিল না।

"ও বয়সে বেকার ব'সে থাকলে অবান্তর পাঁচটা নিয়ে দিন কাটাতে হয়,—নেশাটা তারই একটা। ভয় নেই, ওদের ওসব অভ্যস্ত বিদ্যে," বলতে বলতে উমেশ বাবু চলে গেলেন। জগতের যেন মাথা কাটা গেল।

(৬)

উপভোগ্য সংবাদগুলি প্রচার হ'তে বিলম্ব হয় না। সকলে অনেকেই এসে সংবাদ নিয়ে গেলেন,—প্রবাসের সুখই এই।

কয়েক ঘর মাত্র থাকায়, প্রীতির বন্ধনে একটু আঁট থাকাটা স্বাভাবিক। শশী কিন্তু থিয়েটার-পার্টির কমরেড্‌দের চিন্তাকুল দৃষ্টির ও প্রশ্নের ভাষা ও ভাবের মধ্যে বিদ্রূপের লুকোচুরিই পাচ্ছিল।

বাড়ির সকলেই বেশ চুপচাপ—যেন কিছু হয় নি। কথা-বার্তাও বেশ সংযত। সেইটাই কিন্তু শশীর কাছে কদর্থপূর্ণ ঠেকছিল। নরেশ ইস্কুল থেকে ফিরে, বারবাড়িটা গম্ভীর মুখে পার হয়ে, ভিতর বাড়িতে নাকি হাসিমুখে ঢুকেছিল;—সেটা শশীর দৃষ্টি এড়ায় নি। তার রগ দুটো দপ দপ্ ক'রে উঠল। "হুঁ—এই কালে এই বিষ! আচ্ছা, আজ আর নিদ্রা নয়, হিসেব শেষ ক'রে তার পর যা মনে আছে—না খাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, অপরের ত খাচ্ছি না, নিজের শেয়ার রয়েছে।"—শশী নীরবে মাথা গুঁজে আহার শেষ করলে। বড়বউ একটি কথাও উচ্চারণ করতে সাহস পেলেন না। নিয়মমত দুধের বাটি পাতের কাছে ধ'রে দিতেই—"ও আর কেন" ব'লে শশী উঠে পড়ল।—তিন কদমেই বারবাড়ি।

বড়বউ ভয়ে আড়ষ্ট ছিলেন,—শশীর মেজাজ জানতেন। যা বলবেন, শশী আজ সেটা কি ভাবে নেবে—এই তাঁর ভয়। তিনি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুরপো দুধ খেলে না, এইটাই তাঁকে কেবল আঘাত করতে লাগল। ভাবলেন—দুধের বাটি নিয়ে নিজে বারবাড়িতে যান। এই সময় জগৎ এসে পড়ল। সব শুনে জগৎ মানা করলে,—"বোধ হয় তার পেট ভাল নয়,—কাল খাইও।"

তাঁর মন কিন্তু বুঝল না,—নিজেও কিছু খেলেন না।

এই সময় নরেশ এসে বাপকে বললে, "আমার খাতা কাগজ, পেন্সিল—সব গিয়েছে বাবা, আর কিছু নেই—"

"বেশ হয়েছে,—যা শু'গে যা বলছি" ব'লে তার মা এমন এক ধমক্ দিলেন, সে কেঁপে উঠলো!

ছক্কন বাইরে এক ডিবে পান আর তামাক দিয়ে গেল। শশী আজ অঙ্কের একোদ্দিষ্ট করবেই,—উপকরণ সংগ্রহ ক'রে বসেছে। মাসাধিকের পরিশ্রম গরুর গর্ভে গিয়েছে, তায় দক্ষিণা—সিল্কের চাদর। "যাক্, ফ্রেশ ফাঁদলে আর কতক্ষণ। একটা সাংঘাতিক ভুল ধরা পড়ে নি, তাই পাওনাটা কখনও ১১ টাকা কখনও ১৪, কখনও ১৭ দাঁড়াচ্ছিল। সাত আনা জলপানিটে যে তিরিশ দিনে পায়, অথচ ফেব্রুয়ারি যে ২৯ দিনে! তাই ত বলি—এত হয় কি ক'রে! উঃ ভারী ধরা পড়েছে।"

শশী নূতন ক'রে ফাঁদলে বটে, কিন্তু সামনে সেই স্বখাত সলিল—প্রতি পদক্ষেপে সেই 'সওয়া' 'পউনে', সাড়ের পেঁচা আর সূর্যোদয়ের দণ্ড, পল, পাশ ফিরতে দেয় না। হাত বাড়ালেই যেন রুষ্ট সজারুর গায়ে হাত পড়ে। তাকে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ করতেই হবে—'সেয়ার বাঁচাতে হবে'। এ যে বাঁশকালির চেয়ে গেঁটে!—বেণী মাষ্টার কি-একটা সাফাই-সঙ্কেত বলে দিয়েছিলেন, মনে পড়ছে না। শশী চক্ষু বুজে সেটা স্মরণ করতে বসল। একাগ্রতায় কি না হয়। ভাঙের মিঠে প্রভাব সাহায্য করলে, শশীকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে!

সে স্বপ্ন দেখলে, বেণী মাষ্টার ব'লছেন, "আ মূর্খ, শুভঙ্করের ছেলে হয়ে বাপের নাম ডুবুচ্ছিস্! এত বুদ্ধি ধরিস, আর এটা ধরতে পারলি নি ওটা অঙ্ক নয়! ওটা তোকে তাড়াবার ভদ্র ফন্দি। আর থাকতে আছে, চলে আয়। পশুপতি রয়েছে। আমরা থাকতে তোর ভাবনাটা কি?"

শশীর প্রাণে যা খেলছিল, এটা ছিল তারই ছায়া-চিত্র।

সে যেন অকূলে কূল পেলে। মুখে হাসি দেখা দিলে।—"উঃ কি দুরভিসন্ধি! ওটা অঙ্কই নয়—তা না ত সাঁইত্রিশ পাতা কষেও শশীশর্ম্মা কূল পায় না! যা ভেবেছিলুম আর স্বপ্নে যা শুনলুম, একদম ঘাটে ঘাটে মিল! ওটা অঙ্কই নয়। মা ব'লে থাকেন মন নারায়ণ,—very true—কিন্তু কি দুরভিসন্ধি! আসল মতলবটা ছিল, শুধু তাড়ানো নয়, আমার মাথাটা বিগড়ে দিয়ে বিষয়সম্পত্তির একেশ্বর হওয়া!—এই হওয়াচ্ছি!—তাই ত কাগজ নেই যে।" নরেশের ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা সামনে ছিল, "ও আর কেন, ঐ বাপ-মার ছেলে—জুচ্চুরি শিখবে ত!"—ভারতসমুদ্র মন্থন আরম্ভ ক'রে দিলে। তিন ভাগ জলকে তোলপাড় ক'রে খস্ খস্ ক'রে কলম চালালে।

সেটা টেবিলের উপর দোয়াত চাপা—চিৎ হয়ে রইল।

(৭)

শশী প্রত্যহ মর্ণিং-ওয়াকে যায়। বড়বউ চায়ের জল

চড়িয়ে বাসি পাট সারেন। শশী তাঁর নিজের বাঁধা ফেভারিট সং—

আমার বুকে আঁকা রামের নাম,
uncle, nephew, father, mother—
sister, brother,—সবই রাম।—

গাইতে গাইতে ফেরে, এবং তা কানে এলেই বড়বউ চা ছাড়েন। শুনতে না পাবার কোনো কারণই নেই। একে ত তাঁর কান সেই প্রতীক্ষায় থাকে, তার ওপর শশী 'সিষ্টার' কথাটির উপর এমন একটি টনক-নড়া ও চমকভাঙা গমক্ দেয়, যা বধিরেরও শ্রবণ-সুলভ।

আজ রোদ উঠল—এখনও ঠাকুরপোর সাড়া নেই। বড়বউ একটু চঞ্চল হ'লেন।—"কাল দুধ খায় নি, শরীর ভাল আছে ত? ছক্কন দেখ ত, ছোটবাবু বেড়িয়ে ফিরেছেন কিনা।"

ঠাকুরপো দুধ না খাওয়ায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না। উঠান থেকেই একটু চড়া গলায় বললেন, "তিন পোর বেলা হ'ল, এখনও কারুর ওঠবার নাম নেই। দেখাদেখি ছেলেটাও গোল্লায় গেল। লেখাপড়া হবে—না ছাই হবে!"

নরেশ চোখ রগড়াতে রগড়াতে তাড়াতাড়ি উঠে এসেই ধমক্ খেলে—"এর ওপর আর এক চোখ দেখাতে হবে না—দু-চোখ বোজ্!—দুগ্গা দুগ্গা!"

বালক হকচকিয়ে, দালানের ক্লকটার দিকে চেয়ে সভয়ে বললে, "তুমি দেখ না মা—এখনও ছ'টা বাজতে তিন মিনিট।"

"ও ঘড়ি আর দেখতে হবে না। এসে পর্য্যন্ত এক ফোঁটা তেল পেয়েছে কিনা! মাথার ওপর দিনরাত কেবল টিক্ টিক্ করতে আছে। যা, তোর কাকা বেড়িয়ে ফিরেছেন কিনা দেখে আয়।"

কথাগুলো রুষ্ট কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়ায় জগৎবাবুও আধ ঘণ্টা আগেই উঠে পড়লেন,—"কি আজ ব্যাপার কি? শেষরাত্রে উঠে হৈ চৈ লাগিয়ে মানুষের ঘুমভাঙাবার এত ধুম পড়ে গেছে কেন? ঘড়িটার দিকে দেখলেই ত হয়,—কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা···"

—ছেলে একবার দেখিয়ে গেল, তুমিও দেখাচ্ছ। ওটা আর ঘড়ি আছে নাকি?

—তবে ওটা কি?

—এদেশে টিকটিকি ডাকে না ব'লে বোধ হয় রাখা হয়েছে! পরের মেয়ের মত দিন রাত খেটে চলেছে, খেলে কিনা খোঁজ নেবার দরকারও আছে বলেও কেউ ভাবে না। সাত বছর হ'ল এসেছে, কোনো দিন অয়েল করাতে ত দেখলুম না। নিজেদের ত পায়ে, পেটে, মাথায়, তিন রকম তেল লাগে···

জগৎ একটু হাসি টেনে বললে, "তাই বুঝি নিজের জন্যে আর এক রকম বাড়াবার চেষ্টায় আছ, মধ্যম নারাণটা বাকি থাকে কেন···"

নরেশ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিলে, "সব চুরি হয়ে গেছে মা, কাকার সুটকেস, বাঁশী, করতালি—সব···"

—তোর কাকা কোথায় বল না-রে পাজি···

বালক থতমত খেয়ে বললে, "বোধ হয় চোর ধরতে···"

মা চোখ রাঙিয়ে বললেন, "দেখবি?"

সে বাপের পেছনে পেছনে বাইরে পালাল।

বড়বউয়ের মাথা ঘুরতে লাগল। তিনি দালানেই ব'সে পড়লেন। চড়ানো চায়ের জল, ফুটে ফুটে শেষ হয়ে গেল।—"ঘুম ভেঙেই গাধার ডাক শুনলুম। সাত সকালে···মাক কাপড় এনে ম'লো। হতভাগা ছেলে উঠেই এক চোখ দেখালে। রাতে ঠাকুরপো দুধ খেলে না, বললে—'ও আর কেন!' আবার চুরির কথা শুনছি! ঠাকুরপো ছেলেমানুষ, একটুতে অভিমান করে। এখানে আমি ছাড়া তার অভিমান সইবার আর কে আছে। ওঁরা ছেলেদের মন কতটুকু বোঝেন। ওঁর কথা শুনেই ত কাল রাতে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা পেতে পারলুম না।—ভালয় ভালয় দিন কাটিয়ে দাও ঠাকুর, আমার বড় ভয় হচ্ছে—"

হঠাৎ উঠে কয়েকটি পয়সা তুলসীতলায় রেখে, হাতজোড় ক'রে কত কি জানিয়ে প্রণাম ক'রে এলেন।

—"তাই ত, বাইরে এতক্ষণ এরা করছে কি, সাড়ে সাতটা যে হ'ল।—সুটকেস নিয়ে কে আবার মর্নিং-ওয়াকে যায়!—তার জিনিষই কি চুরি যাবে?" বুকটা তাঁর শিউরে উঠল—"শাশুড়ীর কাছে কি ক'রে মুখ দেখাব? ঠাকুর লজ্জা রাখো···—কেন মরতে ভাঙা দিনে ভাণ্টাকে ছাড়ান হয়েছিল, মাসে মাসে মাইনে পাচ্ছিল—কোন গোল ছিল না···"

এই ভাবের এলোমেলো দুর্ভাবনা তাঁকে অত্যন্ত কাতর আর ভীত ক'রে তুলতে লাগল।

ক্ষণপূর্ব্বে জগৎ স্ত্রীর সঙ্গে রহস্যই করছিল। সে ভাবছিল—শশী তো কারুর চাকরি করে না, সময় সম্বন্ধে তার দুর্ভাবনা কিসের! দেশে কেরানী না থাকলে ক'টা ঘড়িই বা বিক্রি হ'ত! বেড়িয়ে ফিরতে একটু দেরি হচ্ছে দেখে—বড়বউয়ের এতটা চাঞ্চল্যই বা কেন সেটা তার মাথায় আসছিল না। সে চাকরি করে, মাইনে এনে দেয়। সংসার চলে গেলেই হ'ল, কেউ না কিছু বললেই হ'ল।

সুটকেস্ নেই শুনে জগৎ ভাণ্টার খোঁজ করবার তরেই বাইরে যায়। ভেবেছিল, ভাণ্টা বোধ হয় আজও মাইনে পায় নি, এ সেই বেটারই কাজ।

কি কি গিয়েছে, দেখতে গিয়ে যখন দেখলে—গড়গড়ার সৌখীন নলটি নেই, তখন ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে গেল। স্বগতোক্তি বেরুল,—"তাই ত গিয়েছেই ত—গিয়েছেই ত বটে! বলা নেই, কওয়া নেই,—কারণ কি?"—তাঁর ক্ষুব্ধ প্রাণের পরিচয় মুখময় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।—"সে গেল কেন,—কোথায় গেল?—বড়বউ,—উঁহু—সে ত কিছু বলবার মানুষ নয়…"

সহসা নরেশ নাকীসুরে ব'লে উঠল—"এই দেখ বাবা, কাকা আমার গ্রামারের খাতা ছিঁড়ে কি করেছেন দেখ! ও-পিঠে অর্থভঙ্গ-সন্ধ্ব ছিল—সব গিয়েছে। আর এই ভারতবর্ষের মানচিত্রে, ভারতসমুদ্র একেবারে মাটি হয়ে গেছে বাবা।" বলতে বলতে বালক কেঁদে ফেললে।

মহা-সমুদ্রের মাঝখানে বড় বড় হরপে নিজের নাম দেখতে পেয়ে, জগৎ ম্যাপখানি হাতে নিয়ে, চোখ বুলিয়ে চমকে উঠলেন! এ সব কি? সেদিন নেশার ঝোঁকে লিখেছিল বোধ হয়। না, কালকের তারিখ যে। মাথা খারাপ হ'ল নাকি! তাই ত—

বিষম দুর্ভাবনাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ির মধ্যে ছুটলেন।

আজ ছুটির দিন। ইকনমিক্ ফার্ম্মেসির লোক্ ওষুধের বিল নিয়ে তাগাদায় এসেছিল। বাবুর বাড়ি চুরি হয়ে গেছে শুনে, ধীরে ধীরে ফিরে গেল।

বড়বউ একভাবেই সেই দালানে ব'সে, অপরাধীর মত ঠাকুর-দেবতার কাছে ক্ষমাভিক্ষা করছিলেন।

জগৎ এসে, ম্যাপখানি এগিয়ে ধরে—"এই দেখ, তোমার ঠাকুরপো নেশার ঝোঁকে কি কাণ্ড ক'রে বসেছে। এখন কি করা উচিত?"

শুনেই বড়বউয়ের চেহারা মুহূর্ত্তে ফ্যাকাশে—রক্তশূন্য! তিনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইলেন—মুখে কথা সরলো না। কষ্টে ক্ষীণস্বরে কেবল বললেন, "লেখা নাকি? কি লিখেছে?"

"লিখেছে আমার মাথা!—শশী আমাকে লিখছে—

"জগৎবাবু,—পুরুষ বাচ্চায় স্পষ্ট কথা কয়। তাড়াবার মতলবে শাস্ত্রছাড়া হিসেব মেটাতে দেয় না। দুরভিসন্ধিটা আগে বুঝতে পারি নি। বেশ—চললুম। বোঝাবুঝি হবে কাটগড়ায়। নিজের হিসেব ঠিক রেখো।

শ্রীশশীভূষণ ঘোষাল"

বড়বউ ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু ত বুঝতে পারলুম না…"

"সিদ্ধি পেলেই বুঝতে পারবে।"

"না-না, ছেলেমানুষে একটুতে অভিমান ক'রে—অমন কত ভুল করে। তুমি শীগগির খোঁজ নাও, কাল থেকে তার খাওয়া হয় নি।"

বাইরে একটা গোলমাল হওয়ায়—"দেখ-দেখ, সে এসে থাকবে। হরি লজ্জা রাখো"…

জগৎ বাইরে গিয়ে ত্যাখে, থিয়েটার পার্টির কমরেডরা শশীর খবর নিতে এসেছে।

বিক্ষিপ্তচিত্ত জগৎ তাদের বললেন, "শশী বোধ হয় কোথায় চ'লে গিয়েছে, তোমরা একটু দেখতো ভাই—কোথায় সে গেল। আমি ষ্টেশনে খোঁজটা নি…"

একটু মজা উপভোগ করা ছাড়া, শশীর জন্য তাদের বড় চিন্তা ছিল না।

সকলেই সতৃষ্ণ ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে শেষ বললে, "তাই ত, কোথায় গেল, কই কোথাও পাত্তা পাচ্ছি না ত।"

তারা জটায়ুকেই খুঁজছিল!

ট্যারা চোখ

শ্রীবামাপদ বসু

চোখ ট্যারা হ'লে কি মুখের সৌন্দর্য্য বাড়ে? এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে—সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি সকলের সমান নয়, কিন্তু অধিকাংশ পাঠকই লেখকের সঙ্গে একমত হ'য়ে স্বীকার করবেন যে ট্যারা চোখ মুখশ্রী নষ্ট করে। শুনেছি, "গজ-চক্ষু," "লক্ষ্মীট্যারা" নাকি মেয়েদের সুলক্ষণ আর সেই জন্যেই এক ভদ্রলোক ট্যারা মেয়ে পছন্দ ক'রে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে এই 'সুলক্ষণ'টিই কন্যাদায়কে আরও দায়গ্রস্ত ক'রে তুলেছে।

সামুদ্রিক শাস্ত্রে যাই থাকুক আর তাতে ট্যারা-চোখ-ওয়ালা মেয়ের বাপের যে সুবিধাই হোক না কেন, চিকিৎসা-শাস্ত্রে বলে, যে-চোখটি ট্যারা হয় তার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ কমে যায়, আর যথাসময়ে তার প্রতিকার না করলে দৃষ্টি একেবারে নষ্টই হয়ে যায়। তখন দুটি চোখ থাকা সত্ত্বেও ট্যারা-চোখ-ওয়ালা লোক এক-চোখো লোকের অবস্থাই পায়। অন্য চোখটি মুখের উপর থাকে মাত্র—দৃষ্টির কিছুমাত্র সাহায্য করে না, উল্টে অনেক সময়ে যথেষ্ট অসুবিধাই ঘটায়।

ট্যারা চোখের অসুবিধা ও বিপদ

সব রকম সরকারী চাকরিতে—বিচার-বিভাগে, রেল-বিভাগে, নৌ-বিভাগে, পুলিস-বিভাগে ও চিকিৎসা-বিভাগে ট্যারা-চোখ-ওয়ালা লোকের প্রবেশাধিকার নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ট্যারার প্রবেশ নিষেধ। ট্যারা লোক কোন্ জিনিষ কত দূরে আছে, সেটা কত বড়, কোন্ যান কত জোরে চল্‌ছে, এ সব চট্ ক'রে বুঝতে পারে না, আর প্রায়ই একটা জিনিষ দুটো দেখে বলে এরা মোটর চালালে পদে পদে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। পথে বেরলে এদের গাড়ী-চাপা-পড়ার ভয় খুবই বেশী। উড়োজাহাজ চালান ট্যারা-চোখো-লোকের দ্বারা হবেই না। একটা থেকে অন্য জিনিষ কত দূরে আছে, জিনিষটা মোটা কি পাতলা ভাল ক'রে বুঝ্‌তে না-পারার জন্যে এরা ভাল ছবি আঁকা শিখতে পারে না। অন্যে 'ট্যারা' ব'লে উপহাস করে এ জন্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মানসিক শক্তি স্ফুরণে ব্যাঘাত ঘটে।* এ সব ছাড়া মেয়ের বাপ সহজে ট্যারা জামাই করতে রাজী হন না। আর ট্যারা মেয়ের বিয়ে দেওয়া ত চিরন্তন সমস্যার উপর আরও একটা নূতন সমস্যা।

ট্যারা চোখের দৃষ্টি যত দিন যায় তত কমে যেতে থাকে—অনেক সময়ে খুবই কম হয়ে যায়। যদি ভাল দৃষ্টি থাকে ত একটা জিনিস দুটো দেখে। পড়ার সময় লেখা উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। হিসাবনবীশ ৪৯ কে ৯৪ দেখে হিসাবের গরমিল ঘটায়। এদের অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হয়। কখনও কখনও মৃগী রোগের মত মূর্চ্ছা হয়। শরীর প্রায়ই অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে থাকে। স্নায়বিক শক্তির অপচয়ই এই সকলের কারণ।

ইতিহাস

খুব পুরনো পাশ্চাত্য চিকিৎসা-গ্রন্থে ট্যারা চোখের উল্লেখ দেখা যায়।† তখনকার কালের চিকিৎসকেরা ওটাকে একটা জন্মগত বৈকল্য বলেই ভাবতেন, সুতরাং তার কোনও প্রতিবিধানের চেষ্টাও ছিল না। বাইশ-শ বছর আগে (৪৬০—৩৫৭ খ্রীঃ পূঃ অঃ) গ্রীস্ দেশে চিকিৎসা-শাস্ত্রের জন্মদাতা হিপোক্রেটস্ লিখে গেছেন যে ছেলেদের মৃগী রোগ থেকে চোখ ট্যারা হয় আর বাপ-মা'র চোখের ঐ দোষ থাক্‌লে সন্তানে সেটা বর্ত্তায়।

সপ্তম শতাব্দীতে আর এক জন গ্রীক চিকিৎসক ট্যারা চোখ সারাবার জন্যে এক রকম মুখোস পরাবার ব্যবস্থা করতেন। এই মুখোসে দুটো ছোট ছোট ফুটো থাকত—

---

* "Ridicule of children is well-nigh criminal. It retains its effect upon the souls of the child, and is transferred into the habits and actions of his adult-hood." *Understanding Human Nature*—Alfred Adler.

† চরক বা সুশ্রুতে আমি ট্যারা চোখের কোনও উল্লেখ পাই নাই।

তার ভিতর দিয়ে দেখতে হ'ত। চেষ্টা ক'রে দেখতে দেখতে ট্যারা চোখ সোজা হয়ে যাবার সম্ভাবনা—এই ছিল তাঁর মত।

আধুনিক শল্যবিদ্যার (Surgery) জন্মদাতা ফ্রান্সের বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক আমব্রোয়াজ পারে (Ambroise Paré—1517-90) লিখিত চিকিৎসা-গ্রন্থে ট্যারা চোখের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা কতকটা শেষোক্ত গ্রীক চিকিৎসকের ব্যবস্থারই মত। ট্যারা চোখ হবার কারণ সম্বন্ধে ইনি বলতেন যে শিশু যখন দোলায় শুয়ে দোল খায় তখন যদি এক পাশ থেকে আলো এসে চোখে পড়ে, শিশু স্বভাবতঃ সেই দিকেই চেয়ে থাকে। সেই আলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে থেকে থেকে চোখটা ট্যারা হয়ে যায়। এ ছাড়া ট্যারা-চোখওয়ালা কেউ যদি শিশুর কাছে থাকে, তাকে নকল করতে গিয়ে শিশুও ট্যারা হয়ে যায়। কিছুদিন আগেও ট্যারা হবার এই কারণ দুটি ট্যারা-চক্ষুতত্ত্ববিদ্‌গণের কাছে অসম্ভব বলেই মনে হ'ত, কিন্তু খুব সম্প্রতি এক জন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, যদি শিশু ট্যারা-প্রবণ হয় তা হ'লে এই সকল সামান্য কারণ থেকেও চোখ ট্যারা হয়ে যায়। স্কুল-ঘরের জানালা দিয়ে আলো যদি এক পাশ থেকে আসে তা হ'লেও ট্যারা-প্রবণ ছেলেরা ট্যারা হয়ে যেতে পারে।

ইউরোপে পুরাকালে শবব্যবচ্ছেদের সুবিধা ছিল না। এটা একটা মহাপাপ বলেই গণ্য হ'ত—সুতরাং চোখ কি রকম ক'রে কাজ করে সেটা জানবার ভাল উপায়ও ছিল না, তাই কতকগুলো ভুল ধারণার উপর নির্ভর ক'রে তখনকার দিনের চিকিৎসকেরা রোগের কারণ নির্ণয় করতেন। তার পর উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিখ্যাত ফরাসী শারীর-সংস্থানবিদ্যাবিশারদ তেনঁ (Jaques Rene Tenon) শবব্যবচ্ছেদ করে অক্ষিগোলক (globe) আর অক্ষিকোটরের (orbit) পুঙ্খানুপুঙ্খ সূক্ষ্ম বর্ণনা ক'রে চক্ষু-চিকিৎসা-শাস্ত্রে নব-যুগ আনেন। কিন্তু ট্যারা চোখ ব্যবচ্ছেদ ক'রে রোগের কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না। কাজে কাজেই পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর ধ'রে এর চিকিৎসা-প্রণালীও বিশেষ এগুলো না। মধ্যে কেবল এক জন চিকিৎসক ভাল চোখটাকে দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা একটা সূক্ষ্ম কালো রেশমের ঠুলি দিয়ে ঢেকে রাখতে উপদেশ দিতেন। এতে ভাল চোখটার দৃষ্টি কমে গিয়ে ট্যারা চোখের সঙ্গে সমান হ'ত। ব্যাধি খুব পুরনো না হ'লে এই ব্যবস্থায় সারবার সম্ভাবনা—এই ছিল তাঁর মত।

এই সময়ে জন্ টেলার ব'লে এক জন চিকিৎসক অস্ত্রোপচার ক'রে ট্যারা-চোখ সারাবার এক উপায় উদ্ভাবন করেন। একালে চিকিৎসকেরা বেশীর ভাগই বুজরুক হ'ত। ম্যাকবেথের ডাইনীদের 'কুহক-কটাহে' যে-সব জিনিষের ফর্দ্দ পাওয়া যায় সেকালের চিকিৎসকদের পরীক্ষাগারে সেই ধরণের অনেক জিনিষেরই দর্শন পাওয়া যেত। টেলর সময়ের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। এই জন্যে অনেকে অস্ত্র ক'রে ট্যারা চোখ সোজা করাটা টেলারের বুজরুকি ব'লে সন্দেহ করেন। কিন্তু টেলার সত্যই বিদ্বান ছিলেন। এটা তাঁর বুজরুকি না-ও হ'তে পারে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মেনীতে, চক্ষু-চিকিৎসকদের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ফন্ গ্রায়াফে (Von Graefe) চোখ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি দেখালেন, যে ছ-জোড়া ফিতের মত মাংসপেশীর সাহায্যে আমাদের চোখ ঘোরে ফেরে তার কোনও একটা যদি স্বাভাবিক মাপের চেয়ে ছোট কিংবা বড় হয় তা হ'লে চোখ ট্যারা হ'য়ে যায়। অস্ত্রোপচার ক'রে বড় পেশীটাকে ছোট ক'রে দিয়ে ট্যারা চোখ সোজা করা যায়। তখনকার দিনের অনেকেই গ্রায়াফের মত মানলেন। ট্যারা চোখের উপর অস্ত্র ক'রে সারাবার চেষ্টা হ'তে লাগল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, অনেক চোখই অস্ত্রোপচার ক'রে আশানুরূপ ফল দিলে না। চোখ যেদিকে ট্যারা ছিল অস্ত্র করবার কিছুদিন পরে তার উল্টো দিকে ট্যারা হয়ে যেতে লাগল।

ঠিক এই সময়ে হল্যাণ্ডে বিখ্যাত ওলন্দাজ চিকিৎসক ডনডার্স (Donders, 1864) দেখালেন যে, চোখের এমন একটা দোষ থাকলে ট্যারা হয়, যে-দোষের প্রতিকার সুনির্ব্বাচিত চশমার সাহায্যে করা যায় আর তাতে ট্যারা চোখ সোজাও হয়। এতে চোখের উপর বেপরোয়া ভাবে অস্ত্র করা কম্‌ল। ডনডার্সের মত অনুযায়ী চশমা ব্যবহারে এক শ্রেণীর ট্যারা চোখ সোজা হয় বটে, কিন্তু ট্যারা হবার আসল কারণটা দূর হয় না।

চোখ ট্যারা হবার আসল কারণটা কি তা দেখালেন বর্ত্তমান যুগে ক্লড্ ওয়ার্থ।

ট্যারা চোখ কেন হয়

১। আমাদের দু-চোখে যে-কোন একটা জিনিষের ছায়া আলাদা আলাদা পড়ে। জিনিষটার কতকটা অংশ ডান চোখে বাঁ-চোখে এক সঙ্গেই দেখা যায় আর কতকটা অংশ শুধু ডান চোখে দেখি বাঁ-চোখে দেখতে পাই না। অন্য কতকটা অংশ শুধু বাঁ চোখে দেখি ডান চোখে দেখি না। সুস্থ সবল চোখ দুটি ছ-জোড়া পেশীর সাহায্যে এমন ভাবে ঘোরে যাতে দুটি চোখের ছায়া এক হয়ে মস্তিষ্কের অংশ-বিশেষে একটি নূতন ছবির জ্ঞান জন্মায়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরই মত এই জ্ঞানের স্ফুরণ সকলের সমান ভাবে হয় না। কোন কোন লোকের এ জ্ঞান একেবারেই থাকে না, আবার কারুর এর চরম বিকাশ হয়। চোখের দুটো ছবিকে এক ক'রে দেখবার শক্তি যাদের কম থাকে, কি যাদের একেবারেই থাকে না, তাদের চোখের কয়েকটা ব্যারাম, অত্যধিক মানসিক বা স্নায়বিক উত্তেজনা, ভয় বা কোন দৌর্ব্বল্যকারক ব্যারাম হ'লে তারা সহজেই ট্যারা হ'য়ে যায়। এই সকল লোকের একটা চোখ যদি কোন কারণে কিছুদিনের জন্য বন্ধ ক'রে রাখা হয় তা হ'লেও চোখ ট্যারা হ'য়ে যেতে পারে। এই হ'ল ক্লড্ ওয়ার্থের মত।

২। অদূরদৃষ্টি (myopia বা short sight) বা দূর দৃষ্টি (hypeıopia বা long sight) থাকলেও চোখ ট্যারা হ'য়ে যেতে পারে। (ডনডার্সের মত)।

৩। যে ছ-জোড়া পেশীর সাহায্যে চোখ ঘোরে ফেরে তাদের কোন-একটা যদি স্বাভাবিক মাপের চেয়ে ছোট বা বড় হয় তাহ'লে সেই চোখটি ট্যারা হ'তে পারে। (ফন্ গ্রায়াফের মত)।

৪। যে-সকল পেশীর সাহায্যে চোখ ঘোরে সেই সকল পেশীকে যে স্নায়ু চালিত করে সেই স্নায়ু অবশ হ'লে চোখ ট্যারা হয়।

৫। চোখের কোটরে যদি আব হয় তাহ'লে চোখটি স্থানভ্রষ্ট হয়ে ট্যারা হ'তে পারে। এটি কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নয়।

৬। বাপ-মা'র চোখ ট্যারা থাকূলে সন্তানের চোখ ট্যারা হ'তে পারে।

৭। ছোট ছেলেদের তড়্কা হ'লে ট্যারা হ'তে পারে।

ট্যারা চোখের শ্রেণী-বিভাগ

ট্যারা চোখ দুই শ্রেণীর হয়। 'ব্যক্ত ট্যারা' আর 'গুপ্ত ট্যারা' (manifest and latent)। চোখ বেঁকে রয়েছে দেখেই আমরা বল্‌তে পারি এ লোকটির চোখ ট্যারা—এ হ'ল ব্যক্ত ট্যারা। গুপ্ত ট্যারার চোখ যে বাঁকা তা সাধারণতঃ বোঝা যায় না। খুব আধুনিক কতকগুলি যন্ত্রের সাহায্যে ধরা যায়। এদের প্রত্যেকটিকে আরও দুই ভাগে ভাগ করা যায়—'স্থায়ী ট্যারা' (fixed) ও 'অস্থায়ী ট্যারা' (alternating)।

স্থায়ী ট্যারার একটি চোখ সব সময়েই একই দিকে বেঁকে থাকে। অস্থায়ী ট্যারার চোখ একবার বেঁকে যায় আর একবার সোজা হয়। যখন ডান চোখ বেঁকে থাকে তখন বাঁ-চোখ সোজা হয়—যেন সহজ চোখ। অল্প পরেই সোজা চোখটা বেঁকে যায় তখন যে চোখটা বাঁকা ছিল সেটা সহজ চোখের মত সোজা হয়।

স্থায়ী ট্যারাকে আরও পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ১। অন্তর্বৃত্তি * ২। বহির্বৃত্তি, ৩। উর্দ্ধবৃত্তি, ৪। অধোবৃত্তি ও ৫। বৃত্তবৃত্তি।

অন্তর্বৃত্তি ট্যারা চোখ নাকের দিকে বেঁকে থাকে, বহির্বৃত্তি রগের দিকে। উর্দ্ধবৃত্তি ট্যারার একটা চোখ উপর দিকে উঠে যায় আর অধোবৃত্তির একটি চোখ নীচের দিকে বেঁকে থাকে, অন্য চোখটি সহজ অবস্থায় থাকে। বৃত্তবৃত্তি ট্যারা চোখের উপরের দিক নাকের দিকে বা রগের দিকে বৃত্তাকারে বেঁকে যায়।

ব্যক্ত ট্যারা মুখশ্রী নষ্ট করে আর সময়ে সময়ে কষ্টদায়কও হয়, কিন্তু গুপ্ত ট্যারা থাকলে অসুবিধা আর যন্ত্রণাই বেশী হয়।

কত বয়স থেকে ট্যারা চোখের প্রতীকার করা উচিত

খুব অল্প বয়সেই—এমন কি দেড় বছর দু-বছর বয়সেই ট্যারা চোখের প্রতীকার করা আবশ্যক। অনেকে মনে করেন যে ছোট বয়সের ট্যারা বড় হ'লেই সেরে যাবে—এটি খুবই ভুল ধারণা। যত দেরি হয়, সারান অসম্ভব না হ'লেও কষ্টসাধ্য হ'য়ে পড়ে, আর ট্যারা চোখের দৃষ্টি কমে যেতে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মত ছিল যে, শিশুর বয়স ছ-বছরের উপর হ'লে আর ট্যারা-চোখ সারান যায় না। সম্প্রতি জানা গেছে

* বৃত্তি—স্বভাব

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

দেবদাসী

শ্রীসত্যব্রত সাহা
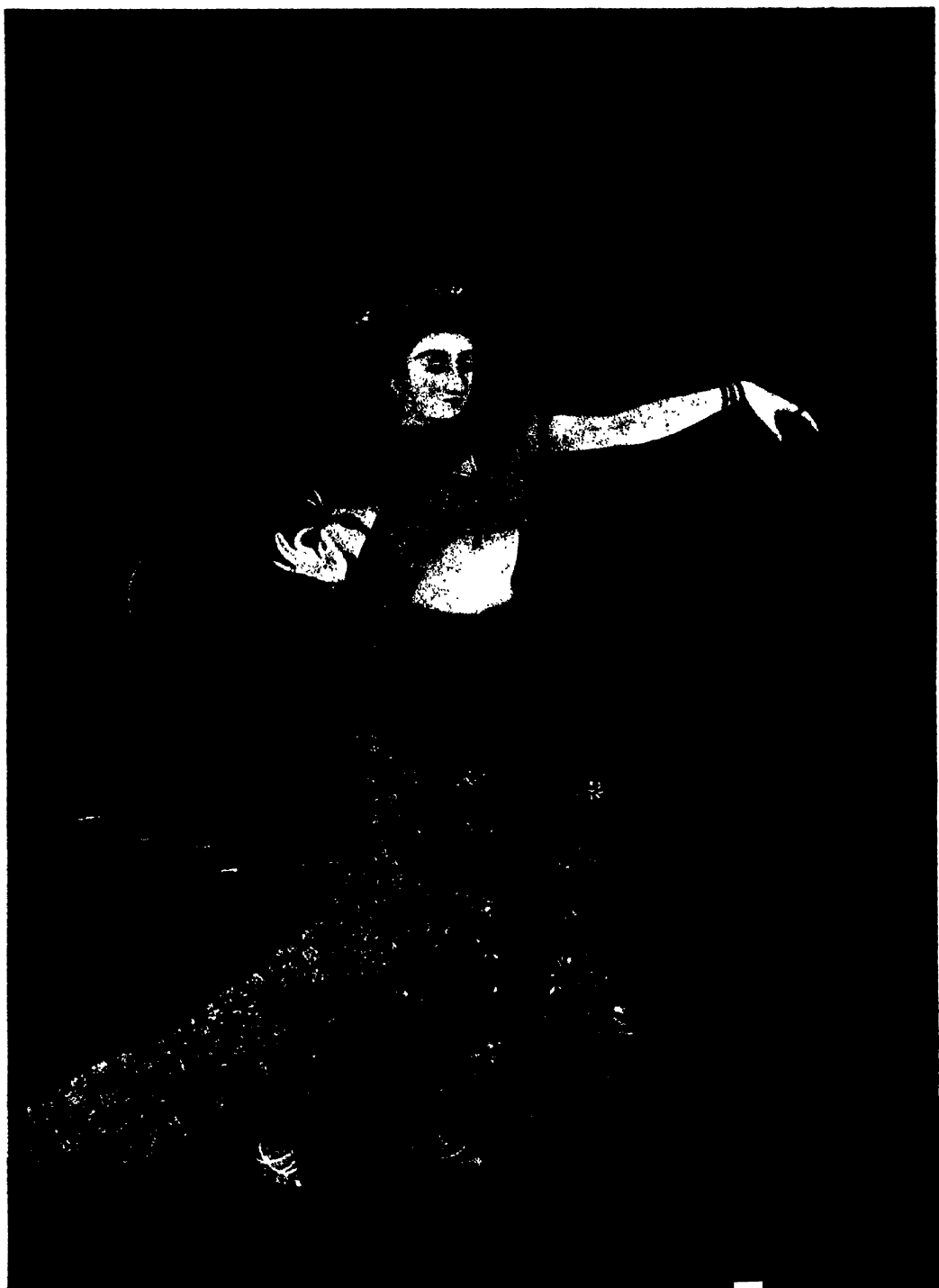
যে, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হ'লেও, শরীর ভাল থাকলে, ট্যারা-চোখ সারান যায়। তাই ব'লে দেরি করা একেবারেই

উচিত নয়। ট্যারা কিনা সন্দেহ হ'লেই ট্যারা-তত্ত্ববিৎ দিয়ে চোখ পরীক্ষা করান আবশ্যক।

ট্যারা চোখ কিসে সারে

দু-চোখের দুটি ছবিকে এক ক'রে দেখবার শক্তির উন্মেষ না হওয়াই চোখ ট্যারা হবার প্রধান কারণ—এই হচ্ছে আজকালকার ট্যারা-চক্ষুতত্ত্ববিদ্‌গণের মত। অন্যান্য কারণগুলি এই প্রধান কারণটিকে সহায়তা করে মাত্র। এই সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা যায়। এই শক্তিকে জাগিয়ে তুলে দু-চোখকে একত্রে কাজ করাতে পারলেই ট্যারা-চোখ সারে। যাদের এই শক্তির স্ফুরণ হয় নি, বা এর বিকাশ অসম্পূর্ণ রয়েছে তাদের এই শক্তি বিকাশের উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। ক্ষীণ শক্তিকে উপযুক্ত শক্তিশালী করবার ব্যবস্থাও হয়েছে। এর সাফল্য নির্ভর করে ট্যারা-চক্ষু-বিশেষজ্ঞের বহু অভিজ্ঞতা আর কয়েকটি খুব আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যের উপর।

হিসাব ক'রে অস্ত্রোপচার করলে দু-চোখ সোজা হ'তেও পারে, কিন্তু দু-চোখ একসঙ্গে দেখে না। অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে চোখ দুটিকে সোজা করা মাত্র, কিন্তু সব সময়ে এ উদ্দেশ্য সফল হয় না।

দু-চোখের দুটি ছায়াকে একটি ক'রে দেখতে শেখান হচ্ছে

সুনির্ব্বাচিত চশমা পরালেও চোখ সোজা হ'তে পারে। কিন্তু এতেও দু-চোখ একসঙ্গে দেখে না। অস্ত্রোপচারের পর আর চশমা পরাবার পর দু-চোখকে একত্রে দেখতে শেখাতে হয়।

বোঝাবার সুবিধার জন্য চোখই 'দেখে' বা 'দেখে না' বলা হ'ল, কিন্তু আসলে দর্শনজ্ঞান হয় আমাদের মস্তিষ্কের একটা অংশে—চোখ দুটি 'দেখবার' জন্য যন্ত্রের কাজ করে মাত্র। চোখে আলো প'ড়ে রূপবহা স্নায়ু (optic nerve) দিয়ে উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছায়। মস্তিষ্ক এই উত্তেজনায় সাড়া দেয়—তা'তে দর্শনজ্ঞান হয়। কোন-কোন অবস্থায় মস্তিষ্ক এই উত্তেজনায় সাড়া দেয় না, উদাসীন থাকে। তখন দৃষ্টিও হয় না। মস্তিষ্ক চায় খুব ভাল ক'রে 'দেখ্‌তে'। দু-চোখের ভিতর যে দুটি ছায়া পড়ে, তার একটি যদি কোন

কারণে অস্পষ্ট হয়, তার সঙ্গে অপর চোখের স্পষ্ট ছায়াকে মিলালে মিলিত ছায়াটিও অস্পষ্ট হয়। সুতরাং মস্তিষ্ক অস্পষ্ট ছায়াটিকে আমল দেয় না—স্পষ্ট ছায়াটিকেই দেখে, অন্যটির সম্বন্ধে উদাসীন থাকে।

অন্যটির সঙ্গে একত্রে কাজ করতে হ'লে যদি কোন রকম কষ্ট হয় বা তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করতে হয় তা হ'লেও সেই চোখ দিয়ে যে উত্তেজনা যায়, মস্তিষ্ক তার সম্বন্ধে

দু-চোখের দুটি ছায়াকে এক ক'রে রাখবার ক্ষীণ শক্তিকে বাড়ান হচ্ছে

উদাসীন থেকে তার পক্ষে কষ্টকর কাজ থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেয়। চোখকে ট্যারা ক'রে কাজের বার ক'রে দেওয়াও এই রকম নিষ্কৃতি দেওয়ার একটা উপায়। যত দিন যায় মস্তিষ্ক এই উদাসীনতায় তত বেশী অভ্যস্ত হয়। তখন ঝাপ্‌সা দৃষ্টিকে চশমার সাহায্যে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলেও বা অস্ত্রোপচার ক'রে চোখকে সোজা ক'রে দিলেও মস্তিষ্কের এই অভ্যাস দূর হয় না। সুতরাং সে চোখে দৃষ্টিও হয় না আর যেটুকু থাকে তাও ক্রমে ক্রমে কমে যায়। মস্তিষ্কের এ রকম অবস্থার প্রতীকারের উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে।

খুব সম্প্রতি ট্যারা চোখ সম্বন্ধে উন্নত জ্ঞানের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে মস্তিষ্ককে এই উদাসীনতা থেকেও বিরত হ'তে শিক্ষা দেওয়া যায়।

এই প্রথায় শিক্ষার ফলে চোখ দুটি একসঙ্গেই দেখে আর ভবিষ্যতে ট্যারা হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে না। এইটিই প্রকৃত শারীরবিজ্ঞানসম্মত রোগমুক্তি। এই নূতন বিজ্ঞানের ইংরেজী নাম—Ocular Callisthenics বা মৃদু ব্যায়াম দ্বারা বিকৃত চক্ষুকে সৌষ্ঠবদান।

বিশ্বপন্থ

(দাদূ)

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

অম্বর ধরণী চন্দ্র দিনমণি সলিল
পবন দিবারাত্রি—
জাগ্রত অনুদিন বিশ্বসেবাব্রতে,
এরা সবে কার পথে যাত্রী ?
উদিল মহম্মদ, নূর-দূত জেব্রেইল,
অনুসরি বল কার পন্থা ?

ছিল কি এঁদের হেথা মুরসিদ্ পীর কেহ ;
বিনে সে বিপদভয়হন্তা ?
অন্তরে রহি সদা, পন্থা সুগম করি,
অন্তর কর মম ধন্য।
অলখ ইলাহী প্রভু, বিশ্ব-জগত-গুরু,
তুমি বিনা গতি নাহি অন্য ॥

এগজাম্পল

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

পৃথিবীতে যাহারা চক্ষু মেলিয়া দেখে ও কান পাতিয়া শোনে, তাহাদের কাছে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব কিছু থাকিতে পারে না।

সরসী কলেজে আসিত। তাহার শাড়ীর নিত্য নূতন বর্ণ, নিতুই নব শব্দ; জুতার বৈচিত্র্য অনন্ত; যে সুগন্ধিটুকু সে ব্যবহার করিত, তাহার গন্ধ চিরদিন অম্লান।

সহপাঠিনীদের সঙ্গে সরসীর ভাবও ছিল না, ভাবের অভাবও ছিল না; সহপাঠীদের কাহাকেও যে উপেক্ষা করিত, তাও নয়, কাহারও সহিত আলাপও যে করিত, তাও নয়। শিক্ষকগণ আসিতেন, বক্তৃতা দিতেন, চলিয়া যাইতেন। সরসী বোধ হয় সব শুনিত, সব বুঝিত, কিন্তু কখনও কথা বলিত না, কোন প্রশ্ন করিত না এবং কদাচিৎ প্রশ্নের উত্তর দিত। তবে সে যে ক্লাসে ঘুমাইত না, সেটা সবাই দেখিত।

কলেজের ষ্টীমার-পার্টির চাঁদার খাতায় সব শেষ ও সব চেয়ে মোটা অঙ্ক সহি করিত সরসী। কিন্তু যথাসময়ে জেটি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ষ্টীমার বংশীধ্বনি করিয়া গলা ধরাইয়া ফেলিল, সবাই আসিল, সরসী আসিল না। পর দিন, সহপাঠিনীরা সহপাঠিগণের প্ররোচনায় কৈফিয়ৎ চাহিলে, সরসী মৃদু হাসিল, কথা কহিয়া জবাব সে দেয় না।

শেক্সপীয়ার প্লে—ছাত্র-ছাত্রীরা অভিনয় করিবে, ইংরেজ শিক্ষক রিহার্সাল দিতেছেন, বিরাট সমারোহ, লাট ও লাট-পত্নী উপস্থিত থাকিবেন, সাজসজ্জার মহা আয়োজন চলিতেছে। চাঁদার খাতা সরসীর কাছে গেল, এবার যুবক-গণই চাঁদা সাধিতে বাহির হইয়াছেন। সরসী সর্ব্বপ্রথমেই সহি করিল এবং এমন একটা স্থূল অঙ্ক বসাইয়া দিল যে, যে লিখিল ও যে দেখিল, দুজনেই বুঝিল যে, সে অঙ্কের কাছেও কেহ পৌঁছিবে না। ভাবে ও ভঙ্গিমায় অপার সন্তোষ প্রকাশ করিয়া মধুপের দল গুঞ্জন করিল, আসতে হবে কিন্তু; ষ্টীমারপার্টির মত ফাঁকি দিলে চলবে না।

সরসী বাক্যে নয়, শুদ্ধ মৃদু হাস্যে জবাব দিল। পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, বলুন আসবেন?

হাসির যদি অর্থবোধ সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইহারা নিশ্চিত বুঝিল, সরসী আসিবে।

অর্থ ভুল, কারণ সে আসিল না। ছাত্র এবং ছাত্রীমহলে তাহার না-আসা লইয়া দীর্ঘ আলোচনা, বহু মন্তব্য, অনেক প্রিয় ও অপ্রিয় কথা হইল; এবং শেষে রেজোলিউসন হইল, কেহ তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবে না। সে যে আসে নাই, ইহারা যেন তাহা লক্ষ্যই করে নাই, এই ভাবটা ফুটাইতে হইবে।

বড় কঠিন। মেয়েরা যদিবা পারিল, ছেলেরা পারিল না। চিন্ময় অভিনয়-রজনীতে সরসীর জন্য একখানি ও তাহার পাশে আর একখানি চেয়ার অতিকষ্টে রিজার্ভ করিয়া রাখিয়া ছিল; সরসী যে গন্ধ ব্যবহার করে, সেই গন্ধ দিয়া সে রুমাল, শার্ট, গেঞ্জি সিক্ত করিয়া আসিয়াছিল; হগ মার্কেটে অর্ডার দিয়া একটি বিশেষ রূপের ও আয়তনের বোকে তৈয়ার করাইয়া আনিয়াছিল; একখানি প্রোগ্রামে আতর মাখাইয়া রাখিয়াছিল। বেচারার অনেকগুলি টাকা এই সব কাজে খর্চ্চ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দুঃখ ছিল না; কিন্তু ব্যর্থতার দুঃখ অন্তরে অস্বীকার করা যায় না। পূর্ব্ববর্ণিত রেজোলিউসন তাহার অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু পেন্সিল কাটিতে কাটিতে যে সময়ে সরসী ক্লাসের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, পাণের পিচ না ফেলিলে চলে না বলিয়া চিন্ময়ও সেই সময় বারান্দায় আসিয়া পড়িল।

উভয়ের মধ্যে ব্যবধান এক হাত, আস্তে কথা বলিলে শোনা যায়। চিন্ময় বলিল, কাল প্লেতে এলেন না যে!

পেন্সিলের শিষটা যাহাতে সূচের মত হয়, আবার ভাঙ্গিয়াও না যায়, সেই জন্য সরসীকে বিশেষ যত্ন লইতে হইতেছিল, কথা কহিবার অবকাশ ছিল না, মৃদু হাসিল।

—আমরা কিন্তু বড্ড ডিসাপয়েণ্টেড হয়েছি।

অন্যের ডিসাপয়েণ্টমেণ্টে দুঃখ প্রকাশ করা নিয়ম, সরসী সকল নিয়মের বহির্ভূত, ঈষৎ হাস্য করিল।

ক্লাস হইতে অনেকেই বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, চিন্ময় থামের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া ছিল, তাহাকে দেখা যায় না, কিন্তু সরসীর মুখের মৃদু হাসি দেখিয়া দর্শকগণ বুঝিয়া লইতেছিল যে, কেহ-না-কেহ সেখানে আছে এবং প্রশ্ন করিতেছে। সেই কেহ কে হইতে পারে ভাবিতে গিয়া অনেকেই শিক্ষকের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইল এবং লেকচার তাহাদের কানে শব্দহীন হইয়া পড়িল।

পেন্সিলের শিষ সরু হইল এবং ভাঙ্গিল না, সরসী ক্লাসের মধ্যে স্বস্থানে আসিয়া বসিল। চিন্ময় রুমাল দিয়া ঠোঁটের পাণের দাগ উঠাইতে উঠাইতে ক্লাসে ঢুকিল। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে চোখের ভাষায় বলিল, হ্যাংলা! ছেলেরা ভাবিল, ক্লাস কি আজ অফুরন্ত পরমায়ু লইয়া আসিয়াছে!

কিন্তু পরমায়ু অফুরন্ত নয়। ঘণ্টা পড়িয়া গেল। ছেলেরা মেয়েরা না দেখিতে পায় ও না বুঝিতে পারে, এমন ভাবে চিন্ময়কে ঘিরিয়া বসিল ও দাঁড়াইল। সমবেত প্রশ্ন, কেন আসে নি, কি বললে?

উত্তর, কথা বললে না, শুধু হাসলে। সেই পেটেণ্ট হাসি।

অনেক ক্ষণ পরে প্রশ্নকারীদের মনে হইল, চিন্ময় রেজোলিউশন-বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছে, তাহাকে ধমক দেওয়া হইল। ধমকে উগ্রতা ছিল না, তাই চিন্ময়ও উগ্র হইল না; নতুবা সে উগ্র হইত। সে অপমান সহিয়াছে, আঘাত সহিবার ক্ষমতা ছিল না।

ক্লাস বসিবার পূর্ব্বে একটি তরুণী অভিমানভরে বলিয়া গেল, কথা রাখতে পারলেন না ত!

ক্লাস যখন ভাঙিয়া গেল, তখন সেই মেয়েটি আবার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে বলিল, ঐ ক'রেই ত ওঁর দেমাক আপনারা বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

লজ্জাভ্রষ্ট মুখ তুলিবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিবার জন্য মুখ তুলিতে হইল এবং দেখা গেল যে, সরসী ছাড়া সব ক'টি তরুণীই তাহার পানে গম্ভীর মুখভাব ও সুগম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। জবাব দেওয়া হইল না।

প্রিন্সিপ্যালের বিদায়-সম্বর্দ্ধনা। থার্ড ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহই বেশী। কার্য্যকরী সমিতি গঠনের পরই প্রস্তাব হইল, সরসীর নিকট হইতে চাঁদা লইয়া আত্মসম্মানের গণ্ডে পাদুকাঘাত করা হইবে না। পরের প্রস্তাবে, চিন্ময়কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল।

খাতা সকলের কাছে গেল, সরসীর কাছে গেল না। সরসী দেখিল, বুঝিল এবং একটু হাসিল। এই হাসিটা অধরে ফুটিল না, ঠোঁটে ফুটিয়া ঠোঁটেই মিলাইল।

চিন্ময় অতিরিক্ত একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া গোপনে সরসীর মোটর-চালকের হাতে দিয়া আসিল।

বিদায়-সম্বর্দ্ধনা সভা বসিয়াছে, বক্তৃতার দামোদরবন্যা ছুটিয়াছে, প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের প্রশংসার কুতবমিনার আকাশ স্পর্শ করিতেছে, একটি লোক রৌপ্য-আধারে সজ্জিত স্বর্ণাঙ্কিতকলেবর পুস্তকরাশি আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া দিল। আধারের গায়ে একটি টিকিট ঝুলিতেছিল, হাজার দুগুণে দু'হাজার চোখের দৃষ্টি সেইদিকে ছুটিল। খুব ছোট অক্ষরে ছোট একটি নাম তাহাতে লেখা ছিল, সরসী দে, থার্ড ইয়ার ক্লাস, আর্টস্।

বিশ্বাসঘাতক কোন সময়েই বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারে না। চিন্ময় এক ফাঁকে সরসীকে বলিল, কত প্রেজেণ্টই ত এসেছিল, আপনার শেক্সপীয়ার সেট সকলের উপরে গেছে।

যে হাসিতে শব্দ নাই, বোধ হয় কোন বিশেষ ভাবও প্রকাশ করে না এবং যাহার অর্থ হয় না, সেইরূপ একটুখানি হাসি সরসী হাসিল।

—নিজে এসে দিলে ডক্টর আলেকজাণ্ডার খুব খুশী হতেন কিন্তু।

আবার অর্থহীন সেই হাসি।

—আমি কিন্তু আশা করেছিলুম—

—থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি ইন্‌ভিটেশন।

পরীক্ষা হইয়া গেল। সরসী পাস করিল, ফোর্থ ইয়ারে উঠিল, কিন্তু কলেজে আসিল না।

মেয়েরা বলাবলি করিল, এক-আধটা দীর্ঘনিঃশ্বাস কেহ বা চাপিয়াও ফেলিল, কেহ অন্তরে খুশী হইল, বুঝিল, সরসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে বা বিবাহ আশু হইয়াছে।

চিন্ময় চিন্তিত হইল; অন্য ছেলেরা চিন্তিত হইল না বটে তবে গবেষণা করিতে লাগিল।

চিন্ময় যত পাণ খাইত, তাহার অর্দ্ধেক খাইত দোক্তা। কলেজের আফিস-ঘরে একজন কেরাণী খুব পাণ খাইতেন, হঠাৎ চিন্ময় তাঁহাকে মুঠা মুঠা পাণ উপহার দিতে লাগিল এবং অল্প দিনেই দোক্তাতেও পোক্ত করিয়া আনিল।

ইহার প্রয়োজন ছিল। সরসীর ঠিকানাটা কেহ জানিত না। সে কাহাকেও বলে নাই, প্রশ্ন করিয়াও নিরর্থক হাসি ছাড়া কোন জবাব কেহ পায় নাই। তাহার মোটর গাড়ীগুলির নম্বর দেখিয়া মোটর-ডাইরেক্টারী খুঁজিলে পাত্তা পাওয়া সম্ভব হইত বটে, কিন্তু কেন জাগে নাই তা জানি না, তবে তরুণদের মাথায় বুদ্ধিটা জাগে নাই।

চিন্ময় ঠিকানাটা পাইল। পাইল, কিন্তু কাহাকেও বলিল না।

গেটে দরোয়ান কহিল, দিদিবাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না। দরোয়ানগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোক, কথার নড়চড় করিল না, এক দিনেও না, এক মাসেও না। মাসাধিক-কাল হাঁটাহাঁটি করিয়া চিন্ময় যাহা দেখিল, শুনিল এবং জানিল, তাহা এই :—

এই বাড়িতে কর্ত্তা বা গৃহিণী নাই, অর্থাৎ দিদিবাবুই সর্ব্বেসর্ব্বা। বাড়িটি সুপ্রকাণ্ড, আধুনিক কালের রাজপ্রাসাদ বলা চলে। দিদিবাবুর বিবাহ হয় নাই, হইবেও না; কারণ তিনি বিবাহ করিবেন না। এই প্রাসাদাভ্যন্তরে কোন পুরুষ মানুষের গতিবিধি নাই। বাড়ির মধ্যে চাকর-বাকর নাই, চাকরাণী ও বাকরাণী আছে এবং অনেকগুলিই আছে। তিনখানি—বড়, মাঝারি ও ছোট—মোটরগাড়ী আছে।

এই রহস্যাচ্ছাদিত বাড়িটার রহস্যভেদে অসমর্থ হইয়া চিন্ময় আবার কলেজ ও পাঠ্যপুস্তকাদিতে মনোনিবেশ করিয়াছে। যেদিন কলেজ থাকে না ও পাঠ্যপুস্তকে অরুচি হয়, সেদিন এবং যে-রাত্রে ঘুম হয় না এবং গরম বোধ হয় সে-রাত্রে চিন্তা করে। সকালে উঠিয়া গরম গরম সিঙাড়া ও চা খায় এবং খবরের কাগজের ওয়াণ্টেড পাঠ করে। কোন্ চাকরীটা তাহাকে দিলে যোগ্যতার সহিত করিতে পারে, তাহারও বিচার-বিতর্ক করে। একদিন ওয়াণ্টেডের পার্শ্বে দেখিল, সরসী দে নাম্নী এক ভদ্রমহিলা একখানি মোটর-লঞ্চ কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণসহ সাক্ষাৎ করিতে বলা হইয়াছে। ঠিকানা, সেই বটে!

চিন্ময় পাঠ্যপুস্তকগুলাকে ঠেলিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দরোয়ান এবার ফটক পার হইতে দিল এবং একটি সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল।

একটু পরে সরসী ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

চিন্ময় চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে বসিতে বলিল। চিন্ময় বসিলে, বলিল, কই, কি পার্টিকিউলার্স এনেছেন দেখি?

চিন্ময় বলিল, কিসের পার্টিকিউলার্স?

—মোটর-লঞ্চের।

—ওঃ! সেটা আনা হয় নি।

—তবে?

—আপনাকে দেখতে এলুম। আপনি কলেজ ছেড়ে দিলেন?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—ভাল লাগল না।

—আমিও ছেড়ে দোব।

—কেন?

—ভাল লাগছে না। আপনার পাষ্ট টেন্স, আর আমার প্রেজেণ্ট পারফেক্ট। আসলে আমরা এক।

সরসী বসিতে উদ্যত হইয়াছিল, চেয়ার ঠেলিয়া দিল।

চিন্ময় বলিল, আমি বলছি কি, আমরা এক মত পোষণ করি।

সরসী প্রস্থানোদ্যত হইয়া, হাত তুলিয়া নমস্কার করিতে যাইতেছিল, চিন্ময় বলিল, কাল কি সব পার্টিকিউলারস্ নিয়ে আসব?

—থ্যাঙ্কস্, আনবেন। নমস্কার।—সরসী পর্দ্দা ঠেলিয়া চলিয়া গেল।

সমস্ত দুপুর ঘুরিয়া মোটর-লঞ্চের সন্ধান ও বিস্তারিত বিবরণ লইয়া চিন্ময় বাসায় ফিরিল। বাসাটা মেসের, কেহ কৈফিয়ৎ চায় না। মাসিক খরচ বাকী না পড়িলে ও অসুখে শয্যাশ্রয় না করিলে কে কার খোঁজ করে?

অনেকগুলি মোটর-লঞ্চের অনেকগুলি ছবি, মূল্যের তালিকা, কলকব্জার বিবরণ, এক-কথায় যাহাকে ফুল

পার্টিকিউলার্স বলে, তাহা লইয়া চিন্ময় সরসীর সম্মুখীন হইল।

কাগজপত্রগুলা দেখিয়া সরসী কহিল, আপনি বিজ্ঞাপনটা বুঝতে পারেন নি ব'লে মনে হচ্ছে।

—ইংরেজীতে লেখা বিজ্ঞাপন, বুঝতে পারব না এ রকম মনে হওয়াটা কি ঠিক?

—ইংরেজী ভুলেও যেতে পারেন ত!—সরসী মুখ নীচু করিয়া একটু হাসিল, বলিল, নতুন লঞ্চ ত আমি কিনতে চাই নি।

চিন্ময় হাসিয়া বলিল, ওঃ, এই কথা। সেটা আমার সংস্কার। মহিলারা, অন্ততঃ আমাদের দেশের মেয়েরা, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিষ ব্যবহার করেন না এই হচ্ছে আমার সংস্কার।

—কেন, তা'তে দোষ কি? সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কি ভাল জিনিষ পাওয়া যায় না?

—হয়ত যায়, নয়ত যায় না; কিন্তু কথা তা নয়। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ডে তাঁদের অরুচি, এই আমি দেখে এসেছি। দোজবরে বর যতই ভাল হোক, মেয়েরা বিয়ে করতে চায় কি?

সরসী মুখটা ফিরাইয়া হাস্যগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

চিন্ময় কহিল, আপনি রাজী থাকলে সেকেণ্ড, থার্ড, ফোর্থ, মেনি হ্যাণ্ড দেখাতে পারি।—সেও মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল।

সরসী অন্যমনস্কের মত কাগজপত্রগুলা পুনরায় টানিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, কত দাম পড়বে বলছেন?

চিন্ময় অঙ্ক দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐ যে! আটাশ হাজার টাকা।

—বড্ড বেশী!

চিন্ময় বলিল, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড নিলে অনেক কমে হয় কিন্তু।

সরসী সে কথাটা যেন শুনে নাই, কহিল, নূতন অথচ কিছু সস্তা ক'রে দেয় না?

চিন্ময় ঢোঁক গিলিয়া কহিল, দেয়; কিন্তু গরিবের কমিশনটা মারা যায়। তা' আপনি যদি বলেন—

—আমি এমন অন্যায়ই বা বলব কেন! আপনি এত কষ্ট করছেন—

—কষ্ট! কষ্টটা কি করলুম!

—এই আনাগোনা—

—সে ত দু-মাস ধরে করছি, আপনার দরোয়ানদের জিজ্ঞেস করুন না।

—দু-মাস ধরে? মোটর-লঞ্চের বিজ্ঞাপন ত এই চার দিন হ'ল বেরিয়েছে।

—তা ঠিক।

—তবে? আপনি দু-মাস—

—সে আমার অন্য দরকার ছিল।

—কি দরকার?

—বলতেই হবে?

—না বলবেন কেন?

—না বলবার কোন কারণ নেই। অভয় দিলেই বলতে পারি?

সরসী অভয়বাণী উচ্চারণ করিল না। তাহার নীরবতাকে অভয় মনে করিয়া চিন্ময় কহিল, হঠাৎ কলেজ ছেড়ে দিলেন। কলেজ যেতেন, আর কিছু না হোক, চোখের দেখাও ত দেখতে পেতুম—

সরসী বাধা দিয়া বলিল, তিন নম্বরের মডেলটা আমার পছন্দ। দামটা একটু বেশী বটে—

চিন্ময় কহিল, ঐ মডেলেরই সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড একখানি লঞ্চ আছে—

—তা বেশী হ'ক, আমি ঐটেই নোব।

—তা আমি জানি। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড আপনাদের জন্যে নয়। নেহাৎ যাদের জোটে না, এই যেমন, যারা মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বর তারাই খোঁজে।

—কবে ডেলিভারি পাওয়া যাবে?

—যবে চাইবেন।

—যত শীঘ্র হয়।

—বেশ, তাই হবে।

—আপনাদের লোক এসে ট্রায়াল দিয়ে যাবে ত?

—নইলে দাম দেবেন কেন?

—সই-টই করতে হবে?

—করলে ভাল হয়।

দিন-আষ্টেক পরের কথা। চিন্ময় আসিয়া বসিয়া আছে।

সরসীর দাসী খবর দিয়াছে, মেম-সাব স্নান করিতেছেন। সুতরাং অপেক্ষা করিতেই হইবে। ইত্যবসরে চা, চুরুট আসিয়াছে, চিন্ময় চা খাইয়া ফেলিয়া অন্য বস্তুটির ঘন ঘন সদ্ব্যবহার করিতেছে।

—গুড মর্ণিং, এই নিন্ চেক্।—সরসী চেক্ হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল।

চিন্ময় চেক্ লইতে ভুলিয়া গেল। স্নানের পর মেয়েদের বড় ভাল দেখায়—অবশ্য স্নানের অঙ্গ হিসাবে স্নানের পরে যে মেয়েরা প্রসাধন করিতে জানে।

সরসী বলিল, আপনার কমিশন পেয়েছেন?

চিন্ময় কহিল, চেক জমা দিলে পাব।

—কত পাবেন?

—দশ পারসেণ্ট, তা শ-আড়াই টাকা হবে। বার পার-সেণ্টের চেষ্টা করব।

—মন্দ কি!

চিন্ময় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, মন্দ আবার। আপনি যদি মাঝে মাঝে এমনই সব জিনিষ কেনেন, দরখাস্ত বগলে ক'রে আপিস আদালত চষে বেড়াতে হয় না।

—আপনার কাছে আর কিছু কিনতে ইচ্ছে নেই।

—আমার অপরাধ?

—"কালবোশেখী" দেখেছেন?

—অনেক। ছেলেবেলায় পাড়াগাঁয়ে থাক্‌তাম, কালবোশেখী দেখি নি আবার!

—সে কালবোশেখী নয়, ঐ নামের কাগজ!

—কাগজ? না, দেখি নি। নেটিভ কাগজ আমি পড়ি নে।

—যা-তা লিখেছে?

চিন্ময় চটিয়া লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, কি লিখেছে? আমি চুরি করেছি? দাম বেশী নিয়েছি? তা আর বলতে হয় না! মার্শাল কোম্পানী, ইউরোপীয়ান ফার্ম্ম, তারা ছেঁচড়ামি করে না। দাঁড়ান-না আপনি, ঐ সব যদি লিখে থাকে, মার্শাল কোম্পানী কালই দশ লাখ টাকার ড্যামেজ চেয়ে হাইকোর্টে মামলা রুজু করবে, বাছাধনরা তখন মজা বুঝবেন। ভালই হ'ল, আপনি বলেছেন, আমি যাবার সময় এসপ্ল্যানেডের মোড় থেকে একখানা, কি নামটা বললেন, কালবোশেখী না?—কালবোশেখী নিয়ে যাচ্ছি, আজই লায়ন সাহেবকে ট্র্যান্সলেট ক'রে দোব। কালই দেখবেন, কেস্ ফাইল হয়ে গেছে—ইউরোপীয়ান ফার্ম্ম, ওরা বাপকেও রেয়াদ ক'রে না। অন্ততঃ, খুব কম হ'লেও দশ লাখ।

—না, না, সে সব লেখে নি।

—তবে? তবে কি লিখতে পারে? খারাপ লঞ্চ, সেকেণ্ডহ্যাণ্ডকে নিউ ব'লে বেচা হয়েছে, সে ত একই কথা! সেম্ ড্যামেজ!

—না, না, তাও নয়। তারা কোম্পানীর বিরুদ্ধে কিছু লেখেনি।

—আমার বিরুদ্ধে? কি লিখেছে শুনি? আমি জোচ্চুরি করিছি। বেশী কমিশনের লোভে—

—তাও না।

—তবে?

—আপনাকে কাগজটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি পড়ে দেখুন। সরসী চলিয়া গেল, যাইবার সময় তাহার পাতলা ঠোঁটে হাল্কা একটু হাসি ঝিলিক মারিয়াছিল।

কাগজ আসিল, পড়া হইল, রাগে চিন্ময়ের মাথামুড় খুঁড়িতে ইচ্ছা হইল না বরং সে-যেন লেখাটা উপভোগ করিল। অনেকবার খবর পাঠাইতে সরসী আসিলে, চিন্ময় বলিল, এই! আমি ভেবেছিলুম না-জানি কি গালাগাল মন্দ করলে!

—এ ত গালাগালেরও বেশী।

চিন্ময় অবাক হইয়া কহিল, গালাগালির বেশী! কি বলছেন আপনি!

—সে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারব না

—তা সত্যি! আমারই লজ্জা হচ্ছে।—বলিয়া চিন্ময় লজ্জায় জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সবিনয় নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

কয়েক দিন পরে মার্শাল কোম্পানীর এক চিঠি চিন্ময়ের কাছে গেল, তাহাতে লেখা, যে-মহিলাটি মোটর-লঞ্চ কিনিয়াছেন তিনি সেলিং এজেণ্টকে ডাকিয়াছেন। কোম্পানী লিখিয়াছে—কোম্পানীর পণ্য বহুবিধ। আর কিছু অর্ডার আনিলে এজেণ্টকে শতকরা কুড়ি পারসেণ্ট কমিশন দিলেও কোম্পানীর আনন্দের সীমা থাকিবে না।

চিন্ময় গেল এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, আমাকে সোজা চিঠি লিখলে আমি ধন্য হতুম।

—আপনার ঠিকানা কোথা পাব? আপনি ত ঠিকানা রেখে যান নি।

—সেটা আমার দোষ বটে; কিন্তু ঠিকানা দিই কোন্ সাহসে বলুন, আপনার দরোয়ানরা আমায় বুঝিয়েছিল, পুরুষ মানুষের লেখা বইও আপনি বাড়িতে ঢুকতে দেন না।

—না, না, ওসব বাজে কথা।

—আর একখানা লঞ্চ কিনবেন? থার্ড হ্যাণ্ড, অর্থাৎ তেজবরে বটে কিন্তু ইন্ এক্সলেণ্ট কণ্ডিসান্।

—তার জন্যে ডাকি নি।

চিন্ময় দুঃখিত ভাবে বলিল, আমি ভাবলুম, গরিবের ভাগ্যে আবার কিছু কমিশন প্রাপ্তিযোগ আছে।

—কালবোশেখী বড় জ্বালাচ্ছে।

—আবার লিখেছে?

—হ্যাঁ।

—তাদের নামে কেস ক'রে দিন।

—করতে হ'লে আপনাকে করতে হয়।

—আমার গ্রাউণ্ড কি?

—সে আপনি জানেন।

—উঁহুঁ আমি ভেবে দেখেছি, আমার কোন গ্রাউণ্ড নেই, কেন না যা লিখেছে, তা সত্যি হ'লে আমি বেঁচে যাই।

—তার মানে?

আপনার সঙ্গে আমার—আপনি আমাকে—যদি আপনি —ঠিক বলতে পাচ্ছি নে বটে, কিন্তু আপনি বুঝতে পাচ্ছেন ত, আমি যা বলতে চাইছি।

—আমি বিয়ে করব না, তা জানেন?

—শুনিছি।

—কার কাছে?

—আপনার দরোয়ানদের কাছে।

—তাদের সঙ্গে আপনার খুব ভাব বুঝি!

—গরজে গয়লা ঢেলা বয়! আপনার দরোয়ান, তাই তাঁরা আমার প্রিয়।

—দেখুন, আমি বিয়ে করব না, ঠিক। আমাদের একটা কি দোষ ছিল, তাই আমি আর আমার বাবা সমাজ-টমাজ ছেড়ে, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বরাবর একলা থাকি। বাবা মারা গেলেন, তবুও একলা রইলুম এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত তাই থাকব। বিয়ে আমি করব না। অধীনতা স্বীকার—

—ঠিক বলেছেন, বঙ্কিম বাবুর কবিতাতেও আছে—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়?

—ওটা বঙ্কিম বাবুর কবিতা নয়, হেম বাবুর কিম্বা রঙ্গলালের। ঠিক মনে নেই।

—ও একই কথা, কবিতা কবিতা, বঙ্কিম বাবুরও যা রবি বাবুরও তাই, হেমবাবুরও তাই, রঙ্গলালেরও তাই। হ্যাঁ যা বলছিলুম, আজকাল মেয়েরাও চান্ না স্বামীর অধীন হ'তে, পুরুষরাও চায় না, হেনপেক্‌ড হ'তে। পুরুষরা ঐ কথাটাকে ডিক্স্‌নারি থেকে তুলে দেবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে, তা বোধ হয় জানেন। এখন ইকোয়াল ষ্ট্যাটাস্। বিয়ে হ'লেও উভয় পক্ষ থেকে সেটা মেনটেন্ করা যায়।

—কি ক'রে?

—বলছি। আপনার দাসীকে একটু চা দিতে বলবেন? থ্যাঙ্কস্। ধরুন, সমাজ বলছে বিয়ে কর—বেশ করলুম; কাল বলছে, কেউ কারও বশ্যতা স্বীকার ক'রো না। বেশ, আলাদা থাকলুম। তবে যদি বলেন, বিয়ে করা তা হ'লে কেন? তার উত্তরে আমি বলব, সংস্কার একটা চলে আসছে, মাত্র সেইটের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ।

—সংস্কার ত অন্য অনেক কথাও বলে।

—কি? ঘর-সংসার করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। বলুক, সব মানা যায় না। যেমন দেখুন, আপনাদের শাস্তর বলে আট-ন-বছরে মেয়েদের গৌরীদান কর। কে তা মানে বলুন? নীতিকথায় আছে, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। পরের জিনিষ ঢিল পাটকেল মনে ক'রে ফেলে দিন বা পকেটে পুরে ফেলুন দেখি, তখনই হাতে হাতকড়ি।

—আপনি ওরকম বিয়ে করতে পারেন?

—বাই জোভ! ওরকম পাই নি ব'লেই এতদিন করি নি। যেদিন পাব, সেইদিনই মালা-বদল।

—তার পর?

—তার পর আমি কলেজ যাব—না, কলেজ আর যাব না, এজেন্সি করব, আর তিনি তাঁর যা ইচ্ছে, করুন, আই কেয়া

এ ফিগ্। আসল কথা কি জানেন? আমি যদি বেবাক্ বিয়ে না করি, লোকের কাছে শুধু' হাজার-লক্ষ কোটি কৈফিয়ৎ দিতে হবে, আর হাজার জন হাজার রকম ভাববে, বলবে, চাই কি কাগজেও লিখবে। আর, বিয়ে ক'রে যদি স্ত্রীর সঙ্গে বাস না করি, লক্ষ কোটী লোকেরও লক্ষ কোটী রকম ভাববার উপায় নেই। পরের জন্য মাথা না ঘামিয়ে যারা কিছুতেই থাকতে পারে না, তাদেরও ভাবতে হ'লে একটি কথাই ভাবতে হবে যে, এদের বনিবনাও হয় না, তাই আলাদা থাকে। তা ছাড়া ভাববার আর কিছুই কেউ পাবে না। ওঃ, বড্ড চিনি দিয়ে ফেলেছে চা'টায়! আপনি বুঝি একটু বেশী চিনি খান্! না, না, বদলাতে হবে না। কি আর হয়েছে এতে, আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! কখন কখন চা'য়ে আমি বেশী চিনি খেয়ে থাকি।

—যাক্, দেখা গেল যে বাঙলা দেশে এমন একজন লোক অন্ততঃ আছেন, যিনি ট্র্যাডিসান ভাঙবার জন্যে প্রস্তুত।

—হাঁ, আমি সেই কালাপাহাড়ই বটে!

সরসী হঠাৎ বাহিরে রৌদ্রালোকিত বাগানের পানে চাহিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, ওঃ, অনেক বেলা হয়ে গেল দেখছি।

—হাঁ। আচ্ছা, নমস্কার। যদি কিছু দরকার হয় খবর দেবেন, এই আমার ঠিকানা। নমস্কার।

কালবোশেখীর ঝড়, বড় ভয় দেখায়।

পরের সপ্তাহে চিন্ময় চিঠি পাইল, একবার আসিবেন।

আসিল।

সরসী বলিল, আপনার জন্যে একটি ক'নে ঠিক করেছি। কণ্ডিসনাল ম্যারেজ। আপনার মত বদলায় নি ত?

—না। আমার গায়ের রঙ আর মত, দুইই অপরিবর্ত্তনীয়।

—বিয়ের পরই আপনি ক'নেকে ছেড়ে চ'লে যাবেন ত?

—পরদিন কালরাত্রি, সে দিনটা যাব না, ফুলশয্যার পরদিন যাব, আর আসব না।

—তা হ'লেই হবে।

—ক'নে কোথায়?

—আছে, তার জন্যে ব্যস্ত কেন? কত টাকা চাই বলুন দেখি?

—শ-খানেক হ'লেই হবে। একটা সিল্কের কাপড়, সিল্কের জামা ও চাদর আর দু-চার ছড়া মালা বা গোড়ে।

—অত কমে রাজী হবেন না। আমি বলছি মেয়েটির কিছু টাকাকড়ি আছে।

—আমার সেটার অভাব। কিন্তু টাকার জন্যে বিয়ে করা আমি কাপুরুষের কাজ ব'লে মনে করি।

—ডাওরী—

—আমি ষ্টুডেণ্টস্ এ্যাণ্টি-ডাওরী লীগের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট।

—তবেই ত মুস্কিলে ফেললেন।

—কি মুস্কিল।

—মেয়ের মত হচ্ছে, কিছু টাকাকড়ি না দিলে তার এক রাত্রের স্বামীর ওপর সুবিচার করা হবে না।

—ঐ ত নিচ্ছি এক-শ টাকা।

—বড্ড কম।

—আচ্ছা, পাঁচ-শ। রাজী?

—আচ্ছা, তা এক রকম হতে পারে। মেয়েটির সম্বন্ধে কিছু জানতে চান? তা'কে দেখতে চান?

—তাড়াতাড়ি কি! চারি চক্ষুর মিলন ত হবেই। আর জানবার বাকীই বা কি রইল?

—কি জানলেন? কিছুই ত বলি নি।

—যা বলেছেন তাই যথেষ্ট। মেয়েটি বিয়ে করতে রাজী, ঘর করতে অরাজী; আমিও বিয়ে করব, ঘর করব না, বেশ মিলেছে।

—মেয়ে এস্টাব্লিশ করতে চায় যে, স্ত্রীলোক হ'লেই যে জীবনযাত্রায় পুরুষের গললগ্ন হ'তে হবে তার কোন মানে নেই।

—একজ্যাক্টলি! পুরুষও দেখাতে চায় যে স্ত্রীলোক ছাড়াও জীবন যাপন করা যায়।

সরসী বলিল, শুনুন তা হ'লে সত্যি কথাটা বলি আপনাকে। পুরুষ জাতটার বড় দম্ভ, তাদের বাদ দিয়ে নারীর জীবনযাত্রা নাকি অচল! এ পর্য্যন্ত, দেখাও তাই গেছে বটে। আমি নতুন একটা এগজাম্পল সেট্ করতে চাই যে—না, তা নয়। ভগবান স্ত্রী ও পুরুষকে যেমন আলাদা ক'রে সৃষ্টি করেছেন, তারা আলাদা থাকতেও পারে। আমার কেউ নেই, আমি একা, কাজেই সমাজের ভয় দেখাবার

বা জাতে ঠেলবার লোকও নেই। বাবার রেখে-যাওয়া কিঞ্চিৎ আছে, তাই নেড়েচেড়ে বেশ থাকব। সেই জন্যেই কিছুদিন কলেজে পড়েছিলুম, ইংরেজী নভেল-টভেলগুলো বুঝতে পারি, ব্যাঙ্কের হিসাব কষতে পারি, সেইটুকুই আমার যথেষ্ট। কলেজে কারও সঙ্গে কথা কয়েছি কোনদিন ?

চিন্ময় বলিল, সেই ত করেছিলেন মুস্কিল! কথা কইতেন না বলেই ত কথা কইবার জন্যে সবাই ছট্‌ফট্‌ করত। দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের দিকেই লোক বেশী আকৃষ্ট হয়, তা জানেন তা! সে কথা যাক্! আপনি যেমন আপনার কথা বললেন, আমিও তেমনি আমার কথাটা বলি। বিয়ে করবার ইচ্ছে আমারও নেই। দশ-পনের বছর আগে বিয়ে করার দরকার লোকের হ'ত; এখন সে দরকারই কমে গেছে। যে রকম স্ত্রী-স্বাধীনতার হাওয়া বইছে—

সরসী ছি ছি করিয়া উঠিল।

চিন্ময় বলিল, আমার কথাটা আগে শেষ করি, তার পর ছি ছি করবেন, যা খুশী করবেন। আমি বলছি, আগেকার কালে মেয়েরা ছিলেন পুরুষদের কাছে রূপকথার রাজকন্যের মত। তাঁদের মেঘবরণ চুল, আর কুঁচবরণ রঙের কথাই শোনা যেত; চোখে দেখা যেত না। তাই তাঁদের একটিকে পাবার জন্যে লোকের আগ্রহের সীমা থাকত না। এখন পথে ঘাটে ট্রামে বাসে দেখে দেখে অভিনবত্ব আর কিছু নেই। তাই আকর্ষণও কমে গিয়েছে। আপনি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন না, না? আর একটু খুলে বলি, তাহ'লে?

বলিয়া সে একটি সিগারেট ধরাইল; ধরাইয়া গোটা কতক টান্ মারিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিল, একটা দৃষ্টান্ত দিই, শুনুন। সেকালে নিয়ম ছিল, স্বামী-স্ত্রীতে দিনের বেলা দেখাই হ'ত না। গভীর রাত্রে দেখাশুনো হ'ত। সমস্ত দিন পরস্পরের মন পরস্পরের দিকে টান্‌ত, অহরহ দেখা না-হওয়ায় টানটা গভীর এবং আন্তরিক থাকত। রাত্রের মিলনটা সুখের হ'ত। এখন দিনে রাতে উঠতে বসতে খেতে শুতে এ ওর সঙ্গে লেপ্টে থাকেন, ফলে স্ত্রীর মধ্যে যে আকর্ষণের বস্তু, তা ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এরই ফলে পুরুষরা নারীর অভিনবত্ব ভুলে যাচ্ছে, তার খোঁজই পাচ্ছে না। তাই মেয়েরা হয়ে পড়ছে খেলার বস্তু, আর পুরুষরাও মেয়েদের কাছে সাধারণ ঘর-করণার জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইটেই আমার ভাল লাগে না। আর সেই জন্যেই আমি বিয়ে করব না ঠিক করেছি। কোন কমনপ্লেস্ কাজ—যা সবাই করে, তা করতে আমার ভাল লাগে না। সে ত আপনি কলেজেও দেখেছেন, কোন ছেলেই সাহস ক'রে আপনার সঙ্গে কথা কইতে আসত না, আর আমি—

সরসী বলিল, অনেক বেলা হয়ে গেল। এক কাজ করুন, আপনি আমার এখানেই ছুটি—

চিন্ময় ব্যস্ত হইয়া কহিল, না, না। সেটা বড্ড কমনপ্লেস্ কাজ! আমার ভাল লাগে না।

ফুলশয্যার রাত্রি। বর ও ক'নে 'পেসেন্স' খেলিয়া কাটাইয়া দিল। দু-একবার ডামি রাখিয়া ব্রীজ খেলাও হইয়াছিল, রাত্রি প্রভাত হইল বলিয়া এ-খেলাটা জমিল না। চা আসিল ও খাওয়া হইয়া গেল।

চিন্ময় বলিল, তুমি আমার জীবনের আদর্শটাকে রূপ দিয়েছ, তোমায় কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব!

সরসী কহিল, কিছু না বললেই আমি ভাল বুঝতে পারব। আপনাকে না পেলে আমিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতুম।

দু-জনে একমত হইয়া বলিল, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা বুঝিবে যে জগতে স্ত্রী পুরুষের এবং পুরুষ স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল না হইলেও জগৎ অচল হয় না।

—আপনি এখন কোথায় যাবেন?

—মেসে।

—কি করবেন?

—স্নান করব, খাব, তার পর এপ্লিকেশন লিখে আপিসে আপিসে ঘুরব।

—শেষেরটা না করলে হয় না?

—দিন-কতক নিশ্চয়ই হতে পারে, পাঁচ-শ টাকার ব্যালেন্স কিছু আছে।

—মাঝে মাঝে আসবেন?

—তা—

—সকালের দিকে আসবেন।

—না-হয় দুপুরের দিকে।

—সকালটাই ভাল।

—বেশ।

আট দিন পরে। বেলা সাতটা। সরসী বিছানায় আড়-মোড়া ভাঙিতেছিল, দাসী চিন্ময়ের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। সেইখানেই ডাক পড়িল।

—খবর ভাল ?

—হ্যাঁ, কাল রাত্রে ঘুম হয় নি। আজ সেই জন্য এখনও বিছানায় পড়ে আছি।

—ঘুমের অত্যন্ত অন্যায় না হওয়া। তা হ'ল না কেন ?

—কে জানে! রাজ্যের স্বপ্ন সারারাত জ্বালাতন করেছে। চা খাবেন ?

হাতঘড়িটা দেখিয়া চিন্ময় বলিল, হুকুম কর, চোঁ ক'রে এক চুমুক টেনে নিই। আটটায় স্নান করি, সাড়ে আটটায় নাকে মুখে গুঁজে ছুটতে হয়।

—কোথায় ?

—আপিসে।

—চাকরি হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—কত টাকা মাইনে ?

—ত্রিশ।

কক্ষ বহুক্ষণ নিস্তব্ধ।

—কি করতে হয় ?

—রেকর্ড-কীপার। বাংলা বা ফার্সী ভাষায় দফতরী।

ঘরে সূচিপতনের শব্দও শুনা যায়।

—ঐ যা, আটটা বেজে গেল, উঠলুম।

—একটু বসুন।

—সাহেবটা বড় পাজী, ট্যাঁস কি না।

—চাকরি ছেড়ে দিন।

—হাতের লক্ষ্মী।

—আমি দু-শ টাকা ক'রে দোব।

—স্ত্রীদত্ত অর্থ নোব না, প্রতিজ্ঞা। চললুম।

সরসী একটু বিমর্ষ।

—আবার কবে আসবেন ?

—দেখি। তুমি আর খানিক ঘুমাবে বোধ হয়।

—না, উঠি। শীঘ্র একদিন আসবেন।

—আচ্ছা।

—আজ ত রবিবার, আজ এত ওঠবার তাড়া কেন ?

—আমার আবার রবিবার! পেয়াদার যেমন শ্বশুরবাড়ি! গেরণের দিন, মেসে হাঁড়ী ফেলেছিল, রান্না হয় নি ব'লে একটু দেরিতে গেছলুম, টেঁশ্ সাহেবটা দু-দিনের মাইনে ফাইন করলে। আবার গাল দিতে এসেছিল, আমি বললাম, মাইনে যত খুশী কাট, নো গালাগাল। বেটা চটে আছে, কোন্ দিন হয়ত বলে বসবে, ইওর সার্ভিস নো লঙ্গার রিকয়ার্ড।

—ও চাকরী ছেড়ে দিলেই ত হয়।

—আর একটা না পেলে—

—বিদেশে, জমিদারী ঘেঁটে কাজ করবেন ?

—কি কাজ ?

—ম্যানেজারী। রুক্মিণীর কাছে আমার একটি জমিদারী আছে, ম্যানেজার মারা গেছে, লোক নিতে হবে।

—কত মাইনে ?

সরসী হাসিল, বলিল, কত হ'লে আপনার চলে ? দু-শ টাকা।

চিন্ময় গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, আগের ম্যানেজার কত পেত ?

—তিন-শ। গ্রেড হচ্ছে দু-শ থেকে তিন-শ। ভয় নেই, আপনার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা কিছু করছি নে।

—তা না করলেই আমি খুশী হব। কবে যেতে হবে ?

—কালই যেতে পারেন। আমি নায়েবকে চিঠি পাঠিয়ে দিই। আপনাকে লেটার অফ এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিতে হবে কি ?

—হ্যাঁ, তা দিতে হবে বইকি!

—বেশ; কাল সকালেই—আচ্ছা, আমি আপনার মেসে যেতে পারি ?

—পার; কিন্তু কেন ?

—চিঠিটা দিয়ে আসব। আপত্তি নেই ত ?

—না।

—এই ঘরে মানুষ থাকে ?

—একুশ টাকা আট আনা মাইনে যে পায়, সে থাকতে পারে।

—কিন্তু আমার ত একটা—

চিন্ময় হাসিয়া বলিল, এর ভেতর তুমি কে?

সরসী সে কথার উত্তর না দিয়া, হাত-ব্যাগ হইতে লেটার অফ এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট বাহির করিয়া চিন্ময়ের হাতে দিল।

—থ্যাঙ্কস্।

—পৌঁছে চিঠি দেবেন ত?

—ম্যানেজার দেবে, না-হয় নায়েব ত দেবেই।

সরসী একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহির হইয়া গিয়া মোটরে উঠিল।

মেসের অনেকে জিজ্ঞাসা করিল, কে গো?

চিন্ময় দুর্ভেদ্য রহস্যাচ্ছন্ন হাসি হাসিয়া, যে যাহা ভাবিতে চায়, তাহারই সুযোগ করিয়া দিল।

নায়েবের চিঠিখানি দরকারী ও পড়িবার মত। সবটায় আমাদের দরকার নাই; কতকটা এই :—

পৌষ কিস্তিতে আমাদের আদায় হয় চার হাজার টাকার উপর। নতুন ম্যানেজারের দয়া-দাক্ষিণ্যের চোটে এ বছর চার-শত টাকাও আদায় হয় নাই। যে কাঁদুনি গায়, সেই রেহাই পায়। এমন করিলে জমিদারী রাখা যায় না। নতুন ম্যানেজারকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া মহলশাসনের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না, বিষয়-আসয় নিলামে চড়িবে।

নায়েব যে জবাব পাইল, তাহা এই :—

আমি শীঘ্রই মহল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি।

নায়েবের বড় আনন্দ। অনেক দিন, প্রায় ছয় মাস নিরানন্দের পর আনন্দের সূচনা। ভরা শ্রাবণের শেষাশেষি কড়া রৌদ্র।

ম্যানেজার গেল না, নায়েব প্রভুকে ষ্টেশনে রিসিভ করিতে গিয়া ম্যানেজারের বিরুদ্ধে দশখান করিয়া লাগাইল। প্রজারা কুক্কুরজাতীয় জীব, আস্কারা পাইলে মাথায় উঠিতে অভ্যস্ত। ম্যানেজার মহলের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। পৌষ কিস্তির এখনও আট দিন সময় আছে, উহাকে আজই ডিস্‌মিস্ করিলে, নায়েব কিস্তির পুরা টাকা আদায় করিয়া দিবার ভরসা দিল। ডিস্‌মিস্ করিতে বিলম্ব করিলে আদায়ের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ম্যানেজারের তলব পড়িল। নায়েব পায়ে রবার-সোল জুতা পরিয়া ডিঙি মারিতে মারিতে পাশের ঘরের আলমারীর পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

'জমিদার' বলিল, আপনি আমার জমিদারীর সর্ব্বনাশ করেছেন। চার-শ টাকা আদায় হয় নি, চার হাজার টাকা রেভেনিউ।

—তিন বৎসর অজন্মা, প্রজারা খেতেই পাচ্ছে না, তা টাকা দেবে কোথা থেকে?

—জমিদারের খাজনা চলে কি ক'রে?

—জমিদারের রিজার্ভ ফণ্ড থাকা উচিত। যারা রিজার্ভ রাখে না, সব নিজেদের বিলাসে খরচ করে, তাদের জমিদারী না থাকাই সঙ্গত। প্রজার রক্ত শোষণ করবার জন্যে রাজা নয়, প্রজানুরঞ্জনের জন্য রাজা। তোমার খাজনা আদায় হয় নি বটে, কিন্তু তোমার প্রজারা তোমাকে দয়াময়ী রাণী ব'লে আশীর্ব্বাদ করছে।

'তোমার' শব্দটা আলমারীর পার্শ্বে লুক্কায়িত নায়েবের গায়ে জ্বালা ধরাইয়া দিল। সে জমিদার হইলে এই স্পর্দ্ধার উচিত সাজা দিত।

—আপনার দ্বারা জমিদারী শাসন চলবে না।

—প্রজাদের মারতে হবে?

—আমার নায়েব টাকা আদায় ক'রে দেবে।

—প্রজাবিদ্রোহ হবে। খেতে না পেয়ে তারা শুকনো খড় হয়ে আছে; অত্যাচারের স্ফুলিঙ্গ পড়লেই জ্বলে উঠবে।

—আমার কলিয়ারীর ম্যানেজারীর পোষ্ট খালি হয়েছে, আপনাকে সেখানে যেতে হবে।

পাশের ঘরে নায়েব নৃত্য করিল। জুতার হিল রবারের, তাই নিঃশব্দ।

বাহিরে অনেক লোক জমায়েত হইয়া বড় গণ্ডগোল করিতেছিল। ম্যানেজার মুখ বাড়াইয়া জনতা দেখিয়া লইয়া বলিল, তোমার হাজার হাজার প্রজা তোমাকে দেখতে আর প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছে।

সরসী দৃশ্যটা দেখিয়া আসিল। বসিয়া বলিল, কিন্তু আপনার এখানে থাকা হবে না।

—আমার অপরাধ? তুমি ওদের দেখ, ওদের চেহারা, কাপড়-চোপড় দেখ, ওদের কথা শোন। তার পর—

দেখি, বলিয়া সরসী বারান্দায় বাহির হইল। সেখানে যে কোলাহল উত্থিত হইল, তাহা প্রচণ্ড ও ভীষণ, কিন্তু তাহার ভিতরে অসীম মাধুর্য্য ছিল। প্রজাদের মোদ্দা কথা এই যে, রাণীমার দয়ায় তাহারা বাঁচিয়া আছে; নতুবা তাহারা বাচ্চা-কাচ্চা লইয়া প্রাণে মারা পড়িত। দলের মধ্যে যাহারা বর্ষীয়ান্ তাহাদের আশীর্ব্বাদ শুনিতে শুনিতে সরসীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

ঘরে আসিয়া বসিতে ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল, কি গো! আমি অ্যায় করিছি ব'লে মনে হচ্ছে আর? আমায় ট্রান্সফার করবে?

সরসী হাসিয়া বলিল, সে কথা পরে হবে। এসে পর্য্যন্ত একখানা চিঠিও ত লেখ নি।

—কেন, রিপোর্ট সব পাঠিয়েছি ত।

—রিপোর্ট আর চিঠি কি এক?

প্রজারা রাণীমার জয়ধ্বনিতে আকাশ, বাতাস, প্রান্তর মুখরিত করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। অল্পবয়সের নারীর কর্ণে তাহা মধুবর্ষণ করিতে লাগিল।

সরসী বলিল, অন্য সময় কথা হবে।

—বেশ; কখন আসব? কাল সকালে?

—কেন? আজ রাত্রে?

চিন্ময় বলিল, রাত্রে! উঁহু! সকালেই ভাল।

সরসী অভিমানভরে কহিল, কিসের ভাল! রাত্রে এস!

—রাত্রে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাত্রে! কতবার বলব আর?

—কিন্তু কণ্ট্রাক্ট ছিল কি?

—আমি কণ্ট্রাক্টার নই, অত খবর জানি নে।

—আমি জানিয়ে দিচ্ছি। কণ্ট্রাক্ট ছিল যে, তুমি এবং আমি চিরদিন পৃথক্ এবং একা একা থাকব।

—সে কণ্ট্রাক্ট কে ভাঙছে?

—আর কণ্ট্রাক্ট ছিল আমরা সকাল ছাড়া অন্য সময়ে মিট্ করব না।

—কিন্তু তখন চাকরি করতে না। এখন যখন আমার ষ্টেটে চাকরি করা হচ্ছে, যখন আসতে বলব, তখন আসতে হবে। যা করতে বলব—

—তা ত আমি করি নে দেখেছ। তুমি প্রজা ঠেঙাতে বলেছ, আমি তাদের মাফ করিছি।

—খুব করেছ, আমার ব্যাঙ্কের টাকা ভেঙে রেভেনিউ দিতে হবে। সে যাক্, রাত্রে আসছ ত?

—হুকুম লঙ্ঘন করব কেমন করে, যতক্ষণ চাকরি আছে।

—এইখানে খাবে।

—এও কি চাকরির অঙ্গ?

—হ্যাঁ।

—তার পর?

সরসী উঠিয়া আসিয়া চিন্ময়ের কাঁধের উপর একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, দেখ যে এগজাম্পল সেট্ করব ভেবেছিলুম, তা করা বড় শক্ত। তুমি কি বল?

—আমারও ঐ মত। এগজাম্পল ভাল, তবে সেট্ করা শক্ত। লাফিয়ে সাগর লঙ্ঘন করা বীরত্বের কাজ, সেকালে হয়ত সম্ভব ছিল, কিন্তু একালে কেউ পারে না।

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, (প্রথম খণ্ড, ১৮১৮-১৮৩৯ সন)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস্, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ২৲। ১৩৪২।

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানি সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলীভুক্ত। ইহাতে ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ পর্য্যন্ত দেশী সাময়িক পত্রের কথা আছে। সংক্ষেপে ইহাতে সাময়িক পত্র সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় যথাযথভাবে আলোচিত হইয়াছে। সেকালের হিন্দী ফার্সী ও উর্দ্দু সংবাদপত্রের বিবরণও ইহাতে বাদ পড়ে নাই। পূর্ব্বে সাময়িক পত্রের ইতিহাসমূলক অনেক কথা কয়েক জন বিশেষজ্ঞ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, সঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল, ডক্টর মোরেনো ও কণীন্দ্রনাথ বসু, কেদারনাথ মজুমদার এবং ন্যাশান্যাল ম্যাগাজিনের এক জন লেখকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইঁহাদের লেখায় অনেক খবর পাওয়া যায়। তবে বর্ত্তমান ইতিহাসখানিতে সাময়িক পত্রসম্বন্ধীয় ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত দুর্লভ উপাদানগুলির প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি যেরূপ সতর্কতার সহিত আলোচিত হইয়াছে, পূর্ব্বে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সেরূপ সুযোগ সুবিধা হয় নাই। পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল ঘাঁটিয়া বিজ্ঞানসম্মতপ্রণালী অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার শ্রমসাধ্য অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্র হইতে বহু প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন তথ্য সমাবিষ্ট হইয়াছে। পরিশিষ্টে গ্রন্থকার বেলীর (Bayleyর) অতি দুষ্প্রাপ্য বিবরণটী মুদ্রিত করিয়া দিয়া তখনকার সংবাদপত্রের পরিচালকগণকে কিরূপ নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছিল তাহারও পরিচয় দিয়াছেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় সাংবাদিক- ও সংবাদপত্র- সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের যথেষ্ট সাহায্য হইবে। এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই গ্রন্থ সযত্নে পাঠ ও রক্ষা করা উচিত।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

(১) রামপ্রসাদের মা (২) কবীর-পন্থা—স্বামী ভূমানন্দ। প্রকাশক শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পি ৬৪ মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ।৴০, ।০ আনা।

আমরা স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত "রামপ্রসাদের মা" এবং "কবীর-পন্থা" নামক দুইখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। প্রথম গ্রন্থে গ্রন্থকার সাধক রামপ্রসাদের সাধনা ও জ্ঞান সম্বন্ধে সপ্রমাণ আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রামপ্রসাদ তাঁহার স্বীয় উপাস্য দেবীকে প্রথমে সাকার ভাবে উপাসনা করিলেও পরে সাধনার প্রভাবে সর্ব্বব্যাপক চিন্ময়রূপে অর্থাৎ অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপে সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গুরুদত্ত মন্ত্রের সাধনফলে মন্ত্র, দেবতা, গুরু ও আত্মার অভেদ সিদ্ধ হয়—প্রথোমোক্ত গ্রন্থের ইহাই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। দ্বিতীয় গ্রন্থে কবীর সাহেবের সাধনপন্থা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিবদ্ধ হইয়াছে। কবীর যোগী ও জ্ঞানী ছিলেন—অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভই তাঁহার সাধনার চরম উদ্দেশ্য ছিল। কবীরের মুখ্য সাধনা ছিল নাদানুসন্ধান, যাহাকে শব্দযোগ বা অনাহত সাধনা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। যোগীমাত্রই এই সাধনার সহিত পরিচিত। আমরা বঙ্গীয় পাঠকসমাজে এই গ্রন্থদ্বয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

নাপিত ব্রাহ্মণ পুরাণ—শ্রীগোপালকৃষ্ণ শীল প্রণীত ও প্রকাশিত। মিরেশ্বরী, চট্টগ্রাম। পৃ. ।০+৫০২+২

নাপিত জাতি যে আসলে ব্রাহ্মণ, তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু গ্রন্থকারের সামর্থ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল না।

কেদার-বদ্‌রী ভ্রমণ-কাহিনী—শ্রীরাজলক্ষ্মী দেব্যা। রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়, কলিকাতা, মূল্য ৸০ আনা। পৃ. ১০৪।

ভক্তিমতী তীর্থযাত্রিণীর সরল ভ্রমণ-কাহিনী।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

হাওয়া বদল—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, ৬০ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

'পূজা কনসেসনের (sic) সুবিধা গ্রহণ' করিয়া বিমলাচরণ 'পিতা, মাতা, পত্নী এবং ভগ্নী প্রভৃতিকে লইয়া' হাওয়া বদল করিতে বৈদ্যনাথ গিয়াছিলেন এবং 'একদিন ত্রিকূটের পথে প্রবুদ্ধযৌবনার সহিত প্রথম পরিচয়' তাঁহার হইল। এইরূপে কাহিনীর আরম্ভ। তার পর পরিসমাপ্তি এই রূপে: "ডলির (ঐ প্রবুদ্ধযৌবনা) নিজকে সামলাইতে দেরি হইল। পরে শান্ত হইয়া বলিল, তোমার হাতখানা দেবে একবার আমার হাতে? বিমলা হাতখানা ডলির হাতে তুলিয়া দিল।"

আখ্যায়িকা অন্তঃসারশূন্য, চরিত্রগুলি সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে এরূপ বলা চলে না। ভাষা স্থানে স্থানে অসংযত।

সখের শ্রমিক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

সখের শ্রমিক, মামা বাবু, পথভোলা, নাচের ছন্দ—এই চারিটি গল্প ইহাতে আছে। চারিটি গল্পই হাস্যরসাশ্রিত। সাধারণ বাঙালী পাঠকের দুঃখ ও দারিদ্র্যের পথেই জীবনযাপন করিতে হয়। স্বল্প অবসরের মুহূর্তে চিত্তবিনোদনের জন্য এই শ্রেণীর পুস্তকের আবশ্যকতা আছে। ছাপা বাঁধাই ভাল।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য—[১৬০০—১৭০০ অব্দ] ডক্‌টর মুহম্মদ এনামুল হক, এম্-এ, পিএইচ-ডি এবং সাহিত্যসাগর আবদুল করিম, সাহিত্যবিশারদ প্রণীত। গুরুদাস

চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য দেড়টাকা মাত্র।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার আশ্রয়ে দৌলত কাজী, মাগন ঠাকুর ও আলাওল নামক তিন জন মুসলমান কবি বহু সুন্দর কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও পুরাণাদির অনুবাদই যে-সাহিত্যের প্রধানতম উপজীব্য বিষয় ছিল, সেই সাহিত্যের মধ্যে ইঁহারা নানা দিক্ দিয়া বৈচিত্র্যের ও স্বতন্ত্র কাব্যরসের সৃষ্টি করেন। ইঁহাদের আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য বহু মুসলমান কবিও এই যুগে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্যের সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান ও বাংলা দেশের প্রচলিত রূপকথা অবলম্বনে ইঁহারা বাংলা ভাষার নানা উপাদেয় কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ইহাকে গতানুগতিকতার দোষ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এই সকল কবি ও ইঁহাদের কাব্যের পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারদ্বয় এই যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই সাহিত্যে তাৎকালিক মুসলমান সমাজের যে চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে তাহার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের এক অজ্ঞাত অংশ এই গ্রন্থের দ্বারা আলোকিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই। তবে দুঃখের বিষয় আপাততঃ পাঠকগণকে গ্রন্থোক্ত বর্ণনা পাঠেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। বর্ণিত পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি এখনও অমুদ্রিত—যেগুলি বটতলা বা অন্য অপ্রখ্যাত স্থান হইতে কোনও রূপে মুদ্রিত হইয়াছে সেগুলিও সাধারণের নিকট তেমন সুলভ নহে। সুযোগ্য গ্রন্থকারদ্বয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মতভাবে ইহাদের মধ্যে বিশিষ্ট গ্রন্থগুলির মনোরম সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া বর্ণিত সাহিত্যের রসগ্রহণে সাহিত্য-রসিকদিগকে সহায়তা করিবেন কি?

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কৃষিপল্লী—শ্রীমনমোহন সিংহরায় প্রণীত, হুগলী জেলা কৃষি সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ৬০ পৃ. মূল্য ৵০।

মনমোহন বাবু স্বয়ং জমীদার। জমীদার হইলেও তিনি কৃষিকার্য্যে অনুরক্ত; মাঠে কৃষকদের সহিত একযোগে কাজ করিয়াছেন। কিরূপে "হাতে-হেতেড়ে" চাষ করিতে হয়, কি উপায়ে কৃষিকার্য্যকে লাভজনক করিতে পারা যায়, এই সম্বন্ধে মনমোহন বাবু তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। কৃষি-পল্লী সম্বন্ধে বাংলায় এইরূপ পুস্তকের একটা অভাব ছিল, লেখক তাহা দূর করিয়াছেন। আশা করি, এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাকে ছেলেদের প্রাইজ-বই করিয়া বিতরণ করিলে ভাল করিবেন ইহা আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

সচিত্র ছেলেদের যশোহর—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। পৃ. মূল্য ।৵০। কল্যাণী প্রেস, যশোহর।

ছেলেদের জন্য লিখিত যশোহরের ইতিহাস। বহু তথ্য আছে বটে, তবে তথ্যের ভারে ইহা ছেলেদের কাছে একটু নীরস বোধ হইবে। বইখানির মূল্য আরও কিছু কম হইলে ভাল হইত।

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

বিশুবিশ্বস—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিতার বই। ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক বর্ত্তমান সভ্যতার নিষ্পেষণে "সর্ব্বহারা" হইয়াছে ইহা সত্য নহে। সুতরাং এদেশে "সর্ব্বহারা"দের জন্য যাঁহারা অশ্রুপাত করেন তাঁহারা প্রধানতঃ ইউরোপীয় মুটে-মজুর এবং জাহাজের খালাসীদের জন্যই করেন। মানবত্বের দিক দিয়া অবশ্যই ইহার মূল্য দেওয়া যায়, যদি সে অশ্রুপাতে ছন্দপতন না হয় এবং তাহাতে আন্তরিকতা থাকে। বিশুবিশ্বস-কাব্য সে দিক দিয়া সার্থক হয় নাই। "প্রলয়ের তালে তালে ঠেকা দেয় আজ পরাণের পাখোয়াজ"—ইহা বাঙালী বিশুবিশ্বসের উদ্গার।

সোনালী স্বপন—নাজিরুল ইসলাম। মধুকর প্রকাশালয়, ১২।১, সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

গল্পের আকারে প্রবন্ধ। ভাষার উচ্ছ্বাস অত্যন্ত বেশী। "আকাশে একখানা ডাবডেবে চাঁদ 'লেকের' পাড়ের আম-বাগানের মাথার উপর দিয়ে থাবা থাবা আলো আর মায়া ছুঁড়ে মারছিল আমাদের দিকে।" "আজ কাউরি ভালবাসা ছোট বলে মনে হয় না।"—প্রভৃতি সাহিত্যে অচল। ইহা ছাড়া বহুস্থানে ভাবে ও ভাষায় শ্লীলতা রক্ষিত হয় নাই। 'দেশসেবক' নামক লেখাটির মাত্র শেষের দুই পাতা গল্পের রূপ লইয়াছে। বইতে ছাপার ভুল অগণিত।

ব্রজবিদেহী শ্রীসন্তদাস—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী। প্রকাশক শ্রীশিশিরকুমার বাহা, নিম্বার্ক আশ্রম, শিবপুর, হাওড়া। মূল্য ।০

সাধু সন্তদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। বইখানি সুলিখিত।

দীন শরতের বাউলগান—শ্রীশরৎ চন্দ্র নাথ। প্রকাশক শ্রীপবিত্ররঞ্জন সরকার, ৪০ হিন্দুস্থান পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

পল্লীকবির রচিত দেহতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণ, গৌর নিতাই প্রভৃতি বিষয়ক গীতি-পুস্তক। প্রাচীন পল্লীগীতির সহিত তুলনীয়।

পথের পরিচয়—শ্রীমৎ সন্তদাস স্বামী ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজের উপদেশাবলম্বনে তদীয় শিষ্য শ্রীগুরুদাস দেবশর্ম্মা সঙ্কলিত। প্রকাশক, শ্রীদাশরথি চট্টোপাধ্যায়। মূল্য বারো আনা। তত্ত্বোপদেশ।

মূর্ত্ত প্রশ্ন—শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

যে কয়েকটি সমস্যা আমাদের সমাজ-দেহ কলঙ্কিত করিতেছে, নারীহরণ এবং নারীহরণজনিত সমস্যা তন্মধ্যে অন্যতম। মূর্ত্ত প্রশ্নের লেখক প্রধানতঃ এই সমস্যাটির একটি রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, কারণ সমস্যা সমস্যা-রূপে লোকের মনে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিলে তাহা সমাধানের জন্যও লোকে তৎপর হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু কোন সমস্যাকে গল্পের ভিতর আনিতে হইলে তাহাকে খানিকটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গল্পের সঙ্গতির দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিতে হয়। অন্যথায় গল্পের সার্থকতা থাকে না। লেখক মূর্ত্ত প্রশ্নে গল্পটাকে মুখ্য করেন নাই। বর্ণনায় এবং ঘটনায় কয়েক স্থলে অত্যুক্তি হইয়াছে এবং যাহাদের লইয়া গল্প তাহাদের কাহারও কাহারও চরিত্রের দৈন্য দেখাইবার সময় লেখক নিজে সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই।

চিকিৎসা-ঘটিত বর্ণনায় কয়েকটি ভুল হইয়াছে। "এখনি চার সিরাম ব্লাড পেলে একবার ইনজেক্ট করি।" এরূপ ডাক্তার বলেন না। কারণ সিরাম রক্তের মাপ নহে, রক্তের তরল অংশ। এক দেহ হইতে অন্য দেহে রক্ত ইনজেক্ট করিতেও ব্লাড-গ্রুপিং-এর জন্য আনুবীক্ষণিক পরীক্ষা প্রয়োজন, ডাক্তার এখানে তাহা করেন নাই। বইয়ে ছাপার ভুলও

অনেক। কিন্তু এসব ত্রুটিসত্ত্বেও বইখানি পড়িতে অসুবিধা হয় না। গ্রন্থে চিন্তা করিবার মত অনেক বিষয় আছে এবং ইহার প্রচার সাধারণ গল্পের বই প্রচার অপেক্ষা অধিকতর সার্থকতা লাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস।

আকাশ রহস্য—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ ও শ্রীতাপসবালা দেবী। প্রকাশক ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

গ্রহনক্ষত্রবিষয়ক গ্রন্থ। বক্তব্যের সরলতা গ্রন্থখানির প্রধান বৈশিষ্ট্য। পড়িতে এবং পড়িয়া বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। ইংরেজী কতকগুলি বিখ্যাত বই ইহার ভিত্তি হইলেও লেখক-লেখিকা বিশেষ যত্ন করিয়া ভারতবর্ষীয় গণনারীতি, রাশিচক্রের পরিচয় এবং গ্রহনক্ষত্রের ভারতীয় নাম ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বহুচিত্রশোভিত। বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তকের অভাব আছে, সেজন্য সর্ব্বত্র ইহার প্রচার বাঞ্ছনীয়।

রাতের ফুল—শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী। প্রকাশক দি কলিকাতা ট্রেডিং কোং, ৭৯-৯, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

উপন্যাস। ঘটনা হাস্যকররূপে অস্বাভাবিক। পড়া যায় না।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

(১) প্রাক্তনী (২) লীলায়িতা—শ্রীসুশীলকুমার দে প্রণীত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ ও ১৲ টাকা।

সংস্কৃত সাহিত্যের পঠন-পাঠন বা আলোচনা এখনও দেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠীর বাহিরেও যাঁহারা এই প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করেন, অনেক স্থলেই সংস্কৃত সাহিত্য সেই সকল গুণজ্ঞ ব্যক্তিকে মুগ্ধ করে, কিন্তু আত্মবিস্মৃত করে না; কল্পনাকে কুতুকিনী করে, কিন্তু আত্মপ্রকাশে উদ্দীপিত করে না।

কিন্তু 'প্রাক্তনী'র কবির চিত্তে, প্রাচীন যুগের সাধারণ কর্ষণার ধারার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীন কবিদের রসজীবন-ধারাও পৌঁছিয়াছে। তাই কবি সুশীলকুমার কেবল প্রাচীন সাহিত্যের রস উপভোগ করেন নাই, সেই উপভোগকে তাঁহার-কাব্যগ্রন্থে অভিনব সৃষ্টির রূপ দিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমান জীবনের বাস্তব পরিবেষ্টনী বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার কবিচিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের স্বপ্নলোকে আপনাকে হারাইতে পারিয়াছে। সেই স্বপ্নলোকের প্রতি কেবল শ্রদ্ধা নয়, গভীর মমতাও জাগিয়াছে। এই কারণে, সাহিত্যের গত যুগকে তাঁহার নিজের প্রাক্তন জীবন বলিয়া মনে হইয়াছে; সেই স্বপ্ন-জগৎকে তাঁহার কবিজীবনের প্রাক্তন লীলাভুবন বলিয়া বোধ হইয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথ একদিন বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে পূর্ব্বজীবনের যে প্রথম প্রিয়াকে খুঁজিতে গিয়াছিলেন, তিনিই আমাদের কবির জন্মজন্মান্তরের সৌহৃদ-পাত্রী স্মৃতিস্বপ্নাবগাহিনী প্রাক্তনী।

সীতা, শকুন্তলা, উর্ব্বশী, বাসবদত্তা, উমা, বসন্তসেনা, মহাশ্বেতা ও পত্রলেখা—বর্ত্তমান কাব্যে প্রাক্তনীর এই আটটি রূপের রসোন্মেষ দেখান হইয়াছে বলিয়া বহুবচন প্রয়োগ করিতেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাক্তনী এক বই দুই নয়; তাহার রূপ বিবিধ, তাই তাহাকে বহু বলিয়া মনে হয়। যুগে যুগে কবিমানস-সিন্ধুর মন্থনে যে-সকল রস-লক্ষ্মীর অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহারা একই অখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন রসধারার গূঢ়তম ও মনোজ্ঞতম অভিব্যক্তি। পূর্ব্ব নায়িকাগণের রস-জীবন কবি মর্ম্মে মর্ম্মে উপভোগ করিয়াছেন, এবং সেই আনন্দের প্রেরণায় আপন কবি-মানসের মাধুরী মিশাইয়া বিস্মৃত জীবনগুলিকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। তাই ইহারা অনুকৃতি মাত্র নহে—সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে ইহারা সকলেই তিলোত্তমা; সংস্কৃত কবির কাব্য বা নাট্যের 'কনককণিকা'গুলিকে তিল তিল করিয়া আহরণ করিয়া ইহারা পরিকল্পিত। তাই বলিয়া ইহারা প্রাণহীন জড় প্রতিমা নয়। জীবনের গূঢ়তম সত্য যাহাদের প্রাণবস্তু, উপভোগের আনন্দ যাহাদের সৃষ্টির প্রেরণা, তাহারা প্রাণহীন প্রতিমা কি করিয়া হইবে? 'প্রাক্তনী'র কবির রসদৃষ্টির ও মানস-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহা সম্ভব হইয়াছে; কারণ, বাস্তব-জগৎকে ভুলিয়া পূর্ব্বতন কবিদের কল্পজগতের স্বপ্নে বিভোর না হইলে বর্ত্তমান যুগের কবির পক্ষে ইহা সফল হইত না।

অতীত যুগের অফুরন্ত রসভাণ্ডার হইতে উপাদান সংগ্রহ করিলেও, রস-সৃষ্টির মূল পদ্ধতি কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাহার ফলে, বহিরঙ্গের দিক্ হইতেও কবিতাগুলি প্রাচীন কাব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র হয় নাই; বর্ত্তমান যুগের রসাদর্শের বিচারেও নূতন সৃষ্টির গৌরব লাভ করিয়াছে। সেই জন্য যথেষ্ট সতর্কতা, সংযম, শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য-বোধ ও রচনা-চাতুর্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে। যে সকল ভাববস্তু বা উপাদান আধুনিক কালের পাঠক-চিত্তের অপরিচিত বা বিসংবাদী তাহা স্বভাবতই পরিবর্জ্জিত, এবং যাহা অনুকূল, তাহাই নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তথাপি কোনও স্থলে মূল চিত্রটিকে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান যুগে বিচ্ছেদাত্মক প্রীতিকে কবিতার স্থায়ী ভাব স্বরূপ গ্রহণ না করিলে রতিভাবাত্মক রচনাকে রসোত্তীর্ণ করা কঠিন, এ-কথা কবি বুঝিয়াছেন। সেই জন্য 'বাসবদত্তা' কবিতায় উদয়নের পরিণতি দেখাইবার জন্য মিলনে নহে, বিরহে, রত্নাবলী প্রিয়দর্শিকার বিলাসে নহে, স্বপ্নবাসবদত্তার স্বপ্নে শেষ করিয়াছেন; 'বসন্তসেনা'য় মরণবিহীন প্রেমের মহিমায় বারবিলাসিনী হত্যার কদর্য্যতাকে শোভন রূপ দান করিয়াছেন। 'উমা' কবিতায় যে লোকোত্তর বিচ্ছিত্তি ও দেহাতীত প্রেমের ইঙ্গিত ফুটাইয়াছেন, তাহা কেবল সংস্কৃত কাব্যের কথা নয়।

কবির ভাষা ও ছন্দ তাহার ভাববস্তুর সম্পূর্ণ উপযোগী। সুকুমার, চিক্কণ ও স্বপ্নমদিরাময় হইলেও, কবি কুত্রাপি নিরর্থক বাগাড়ম্বরের প্রশ্রয় দেন নাই; বাক্যগুলি ব্যঞ্জনাগর্ভ, স্বচ্ছ ও স্ফুটার্থক এবং রচনার রসবত্তারই সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু শব্দগুলির অর্থই সর্ব্বস্ব নয়; প্রাচীন কবিদের কাব্যে স্থান পাইয়া শব্দগুলি যে রস-মণ্ডলী লাভ করিয়াছে, রসজ্ঞের চিত্তে তাহারই আবির্ভাব বাঞ্ছিত করে। কোন কোন স্থলে পূর্ব্বতন কবিদের শ্লোকাংশগুলিও রচনার অঙ্গীভূত হইয়াছে। সেগুলি স্বর্ণপ্রতিমার অঙ্গে মণিমাণিক্যের মত জ্বল জ্বল করিতেছে; কিন্তু তাহারা কোথাও স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, রচনার দীপ্ত অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

যৌবন-লীলার লঘু মাধুরীর নব-নব বৈচিত্র্যে, কবির দ্বিতীয় কাব্যটির নাম—'লীলায়িতা' সার্থক হইয়াছে। যেমন পরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবিদের রচনা অবলম্বন করিয়া তিনি 'প্রাক্তনী'তে নূতন যুগোপযোগী নিজস্ব রস-সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি প্রাচীন কালের বহু অখ্যাত ও অজ্ঞাতনামা কবিদের শ্লোকগুলি তিনি এই গ্রন্থে বাঙ্গালা ছন্দ ও ভাষার সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। এই দুইখানি কাব্য হইতে প্রাচীন যুগের রস-জীবনের একটি সমগ্র আভাস পাওয়া যাইবে। আপাতদৃষ্টিতে অনুবাদ মনে হইলেও, কবিতাগুলির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে; কারণ, প্রাচীন শ্লোকের ভাব ও ভঙ্গী নিপুণভাবে রক্ষা করিলেও, ইহাতে কবি স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ ভাষা ও ছন্দের নৈপুণ্যে নূতন মাধুর্য্যের মধুচক্রিকা সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে রচয়িতার শুধু সংস্কৃত-সাহিত্য-জ্ঞান নহে, রসজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যাইবে; এবং পূর্ব্বে তাঁহার রস-সৃষ্টি ও মানস-প্রকৃতির যে-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা আছে বলিয়াই তাঁহার এ রচনাও সার্থক ও সফল হইয়াছে।

দুইখানি কাব্যই বঙ্গীয় কাব্য-ভাণ্ডারে অভিনব সম্পদ।

শ্রীকালিদাস রায়

চিঠিপত্রে সাম্প্রদায়িক ভাষা

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় যে তীব্র সাম্প্রদায়িকতা প্রবিষ্ট করান হইতেছে, তৎপ্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গত অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে ঐ সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ ছাপা হইবার পর 'অমৃত বাজার পত্রিকা,' 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'দৈনিক বসুমতী'তে ঐ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় লেখা আমি দেখিয়াছি। অন্য কোন কাগজে আলোচনা হইয়া থাকিলে তাহা আমি দেখি নাই। ইহার ফলে যদি এ ব্যাপারে কোন সম্মিলিত চেষ্টা হয়, যাহাতে সাহিত্য ও ভাষা হইতে এই বিষ দূর হইতে পারে, তবে খুব সুখের বিষয় হইবে। 'প্রবাসী'-সম্পাদক এ আলোচনায় অগ্রণী হইয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

কিন্তু সর্ব্বোপরি আনন্দের বিষয় এই, যে, রবীন্দ্রনাথ এদিকে মনোযোগ দিয়াছেন। ১৩৩৯ সালের বৈশাখের 'প্রবাসী'তে "মক্তব মাদ্রাসার বাংলা ভাষা" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রকাশিত হয়। তাহার পরেও, 'প্রবাসী'তে তাঁহার কয়েকখানি চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে, যাহাতে কয়েক জন মুসলমান ভদ্রলোককে সাম্প্রদায়িক বাংলা সম্বন্ধে কবিবর নিজের মত জানাইয়াছেন। পৌষের (১৩৪২) 'প্রবাসী'তে তিনি ঐরূপ একখানি পত্রে বলিয়াছেন যে ইউরেশীয়ানেরা * যদি বাংলা লিখিতে আরম্ভ করে, তবে তাহারা মা, বাবা, এই কথার বদলে পাপা, মামা, কথা বাংলায় চালাইলে বাংলার প্রতি অত্যাচার করা হইবে। ইহার পূর্ব্বেও (কোন্ মাসের 'প্রবাসী'তে মনে নাই) রবীন্দ্রনাথ ঐরূপ কথা কোন মুসলমান ভদ্রলোককে লিখিয়াছিলেন এবং সে পত্র ছাপা হইয়াছিল। মুসলমান ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন—ঘরে তাঁহারা যে-সব কথা ব্যবহার করেন, লিখিত ভাষায় তাহা কেন ব্যবহার করিবেন না? যথা—"আম্মা" শব্দ। "মা"র পরিবর্ত্তে যাঁহারা ঐ কথা ঘরে ব্যবহার করেন, লিখিত বাংলাতে তাহা কেন চালাইবেন না? রবীন্দ্রনাথ এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ঘরে মুসলমানেরা (তথা ইউরেশীয়ানেরা) যাহাই ব্যবহার করুন না কেন, বাংলা রচনায় বাংলার প্রকৃতি বজায় রাখিয়া লিখিতে হইবে। ঐ বিষয়ে আজ একটু বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাই।

"আমরা ঘরে যে-সব কথা ব্যবহার করি, লিখিত বাংলায়ও তাহাই ব্যবহার করিব।" মুসলমান-ভাইদের এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই বোধ হয়, টেক্‌স্‌ট বুক কমিটি বাংলা রচনা-শিক্ষা পুস্তকে হিন্দু ও মুসলমানদিগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পত্রলিখনপ্রণালী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদিও ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে সকল অথবা বেশীর ভাগ বাঙালী মুসলমান পরিবারে ঐরূপ ভাষা কথ্যভাষারূপে ব্যবহার হয় কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। যদি কেহ মনে করেন যে পত্রাদির ভাষা যাহা ইচ্ছা হউক না কেন, উহাতে বাংলা ভাষার কিছু আসে যায় না, তাঁহাকে বাদ দিয়া শিক্ষিত বাঙালী সমাজের সম্মুখে সাম্প্রদায়িক পত্র লেখার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি। আমার হাতের কাছে যে কয়খানি বই রহিয়াছে, তাহা হইতেই ঐগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই বইগুলির মত আরও বহু পুস্তক আছে যেগুলি মক্তব মাদ্রাসার পাঠ্য নহে, সাধারণ উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়ের পাঠ্য। বলা বাহুল্য, এই পুস্তকগুলির রচনা-শিক্ষণের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। কেবল সাম্প্রদায়িক পত্রলিখনপ্রণালীর দৃষ্টান্ত রূপেই ঐগুলির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি। সব পুস্তকই টেক্‌স্‌ট বুক কমিটির অনুমোদিত।

পি. ঘোষাল ও এস্. কে. বিশ্বাস প্রণীত (Middle Class Book of Bengali Composition for Classes VII and VIII by P. Ghosal & S. K. Biswas) পুস্তক হইতে* :—

---

* বঙ্গের অনেক ইউরেশীয়ান বেশ বাংলা বলিতে পারেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।

* বঙ্গাক্ষরে লিখিত আরবী কথাগুলি যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্; ভুল থাকিলে পাঠক দয়া করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন—প্রবন্ধ-লেখক।

"মুসলমানদিগের পত্র লিখিবার নিয়ম—

(পিতার প্রতি পুত্র)

খোদা হাফেজ

আদাব তছলিমাৎ বহুৎ বহুৎ বাদ আরজ এই যে আপনার দোয়াতে এ বাটীর সকলেরই কুশল জানিবেন। ইতিমধ্যে বুবু সাহেবার জ্বর হইয়াছিল, খোদার ফজলে এখন ভাল আছেন। ... ... আশা করি শীঘ্রই উত্তর দানে সুখী করিতে মর্জ্জি ফর্ম্মাইবেন। জোনাবে আরজ ইতি।

খাক্‌সার
খোদাবক্স।

(পুত্রের প্রতি পিতা)

ইয়ারব

দোয়া হাজার হাজার পর সমাচার এই ... ... পত্রে আমার দোওয়া জানিবে ও তোমার বুবু সাহেবা ও অপর সকলকে জানাইবে। আমার শারীরিক কুশল জানিবে ইতি।

দোয়াগো
রহিমবক্স।

শিরোনাম—

১ম পত্রের—জনাব মুন্সী রহিমবক্স খোন্দকার কেবলা গা
সাহেবে পাক জনাবেষু।

২য় পত্রের—নুরচসম্

মিঞা খোদাবন্দ (খোদাবক্স ?) খোন্দকার
দোয়াবরেষু।"

পত্র লেখার সাধারণ নিয়ম এইরূপে দেওয়া হইয়াছে :—

"১। পত্রের শিরোভাগে খোদা ভরসা, ইলাহী ভরসা প্রভৃতি খোদাতালার অভিবাদনসূচক বাক্য দিয়া পত্র আরম্ভ করিতে হয়।

২। তারিখ ও ঠিকানা—(হিন্দু পত্রের ন্যায়)*

"৩। পাঠ—পিতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে মোবারক বা পাক-জনাবেষু—আদাব তছলিমাৎ বহুৎ বহুৎ আরজ ইত্যাদি; আশীর্ব্বাদের পাত্রকে—আজিজল কদর অথবা নুরচসম্—দোওয়া বহুৎ বহুৎ ইত্যাদি; বন্ধুর প্রতি—আলাম বহুৎ বহুৎ অথবা আছ্‌ছালামো আলায়কুম রহমতুল্লাহে বরকাতুহু; প্রজা জমীদারকে—মেহেরবানেষু—সেলাম বহুৎ বহুৎ হুজুরে আরজ এই ইত্যাদি।

"৪। ....

৫। নাম স্বাক্ষর—নাম স্বাক্ষরের পূর্ব্বে উপরে (ক) পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের পত্রে—খাক্‌সার ইত্যাদি, (খ) আশীর্ব্বাদের পাত্রের প্রতি খয়ের তালেব, দোয়াগো ইত্যাদি, (গ) সাধারণ ভদ্রলোকের প্রতি—বান্দা ইত্যাদি এবং (ঘ) জমীদারের প্রতি—খাদেম ইত্যাদি লিখিতে হয়।

"৬। শিরোনাম :— (ক) পিতা প্রভৃতি গুরুজনকে আরজৎ বখেদমতে জোনাব সাহেব—পাকজোনাবেষু ইত্যাদি, (খ) মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে—ব আলি জনাব কয়েজমাব সাহেবা জোনাবেষু (গ) আশীর্ব্বাদের পাত্রকে—নুরচসম্ দোয়াবরেষু ইত্যাদি (ঘ) ভ্রাতাজ্যেষ্ঠের প্রতি—বখেদমত শরিফ জোনাব খেদমতেষু (ঙ) সাধারণ ভদ্রলোকের প্রতি—মেহেরবান্ সাহেব সমীপেষু ইত্যাদি এবং (চ) বন্ধু ও সমবয়স্কের প্রতি—মেহেরবান্ কাদ্‌রদান্ জনাব—মেহেরবানেষু এবং (ছ) জমীদারের প্রতি—বজনাব আলীসানেষু ইত্যাদি লিখিতে হয়।

মুসলমান পত্রে 'বাবু' না লিখিয়া 'মৌলবী' বা 'মুন্সী' লিখিতে হয়।"

* ভবিষ্যতে এ বিধান নাও থাকিতে পারে—প্রবন্ধ-লেখক।

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম্-এ, পি-আর-এস্ ও শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত, সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ প্রণীত প্রাথমিক রচনা শিক্ষা (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য) হইতে :—

"হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে পত্রের পাঠ লিখিবার রীতি এক রকম নহে। আবার সমুদয় পত্রেই শিরোনামার পাঠে এবং পত্রের গর্ভের পাঠে পার্থক্য আছে।"

অতঃপর "হিন্দুগণের শিরোনামায়" কি কি থাকিবে তাহা লিখিয়া, "মুসলমানগণের শিরোনামায়" এই সব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

"১। পিতা, জেঠা, খুড়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি পুরুষ গুরুজনদিগের নিকট—

নামের পূর্ব্বে—জোনাব, বখেদমতে কেবলায়ে দোজাহানকাবারে বন্দেগান, জোনাব কয়েজমাব আলিসান জোনাব হজরৎ, আরজদস্তে বখেদমতে বন্দেগান আলিসান ইত্যাদি।

নামের শেষে কেবলগাহ সাহেব জোনাবেষু, বখেদমতেষু, জোনাবেষু ইত্যাদি।

নামের সঙ্গে শ্রী, শ্রীযুক্ত প্রভৃতি লিখিবার রীতি নাই।

"২। পুত্র ছাত্র প্রভৃতি পুরুষ স্নেহের পাত্রের নিকট—নামের পূর্ব্বে—নুরচসম্ ইত্যাদি, নামের শেষে—দোয়াবরেষু কদরেষু ইত্যাদি। নামের সঙ্গে শ্রী বা শ্রীমান্ লিখিবার রীতি নাই।

"৩। মা, জ্যেঠি, খুড়ী ইত্যাদি স্ত্রীলোক গুরুজনদিগের নিকট—নামের পূর্ব্বে—বখেদমতে হজরৎ মোকদ্দুমা মাহ্‌মা, আখবি সাহেবা আকিফা মাদুমা ইত্যাদি।

নামের শেষে—সাহেবা জোনাবেষু, ছালামতেষু। নামের সঙ্গে—শ্রীমতী বা শ্রীযুক্তা লিখিবার রীতি নাই।

"৪। কন্যা, ছাত্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোক স্নেহের পাত্রীর নিকট—নামের পূর্ব্বে—আজিজা খাতুনকদর নুরচসম্; নামের শেষে—দোয়াবরাসু; নামের সঙ্গে—শ্রীমতী বা শ্রী লিখিবার রীতি নাই।

৫। শিক্ষক, মৌলভী, মোল্লা প্রভৃতির নিকট—নামের পূর্ব্বে—জোনাব ওস্তাদ সাহেব কয়েজ রেছান। নামের শেষে—খেদমতেষু ... ...

"৬। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় লোকদের নিকট—নামের পূর্ব্বে—মেহেরবান্। নামের শেষে—মেহেরবানেষু ... ..."

"মুসলমানদিগের পত্রগর্ভের পাঠ" সম্বন্ধে—

"ভগবানের নাম—হবিব্ ইলাহী ভরসা ইত্যাদি। (গুরুজনের প্রতি) পত্রারম্ভের পাঠ—পাকজোনাবেষু, বখেদমতেষু। হাজার হাজার আদব তছলিমৎপর আরজ এই—নাম স্বাক্ষরের পূর্ব্বে—খাদেম, রাকেমেবান্দা, খাক্‌সারে ইত্যাদি।"

* * *

"শিক্ষক, মৌলভী, মোল্লা প্রভৃতির নিকট—পত্রারম্ভের পাঠ—খেদমতেষু হাজার হাজার আদাব বন্দেগিপর আরজ এই। নাম স্বাক্ষরের পূর্ব্বে—খাক্‌সার।"

"বন্ধু, বন্ধুস্থানীয় লোক বা সাধারণ ভদ্রলোকের নিকট—মেহেরবানেষু, সেলাম আদাবপর আরজ এই—নাম স্বাক্ষরের পূর্ব্বে—আল আজিজ, রাকে মানেওয়াজ, বান্দা।

"হিন্দুপত্রের আদর্শ" ও "মুসলমান পত্রের আদর্শ" দুই-ই আছে। শেষোক্ত আদর্শের মধ্যে—

কনিষ্ঠভ্রাতা জ্যেষ্ঠকে লিখিতেছেন :—"বখেদমতে কেবলায়ে দোজাহান কাবায়ে বন্দেগান্ জোনাব মৌলভী আব্দুল মজিদ ভাই সাহেব পাক জোবানেষু"—পত্রারম্ভে "পাক জোবানেষু" এবং নাম স্বাক্ষর—"খাদেম ইউসুফ আলি।" পিতা পুত্রকে—"নুরচসম্" অমুক, "বাবামিয়া দোওয়াবরেষু"। কন্যা মাতাকে লিখিতেছেন—"বখেদমতে হজরত মোকদ্দুমা মাছুমা আম্মাসাহেবা খেদমতেষু"—নাম স্বাক্ষর—"ফিদ্‌বি* অমুক। বন্ধু লিখিতেছেন—"দোস্ত সাহেব মেহেরবানেষু"।

খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, এম-এ, বি-টি ও অক্ষয়কুমার রায়, বি-এ, বি-টি প্রণীত "রচনা-সার" (৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য) পুস্তকে পূর্ব্বোদ্ধৃত পাঠগুলির মতই সব, কেবল দু-এক জায়গায় প্রভেদ। যথা :—

গুরুজনকে পত্রের গর্ভের পাঠ—"বাদ কদমবুসী খেদমত শরিফে ফিদরিয়ানা আরজ এই"—। সাধারণ ভদ্রলোককে—"মেহেরবানেষু—বাদ সালামে মসনুন আরজ এই" এবং স্বাক্ষরের পূর্ব্বে "আরজগুজার"।

"মুসলমানদিগের নামের পূর্ব্বে শ্রী লিখিবার প্রথা নাই।"—"মৃত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে হিন্দুদের বেলা ৺ এবং মুসলমানদের বেলা নামের পরে মরহুম লেখা হয়।"

অতঃপর বিখ্যাত সাহিত্যিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চারু-রচনা"তে কি আছে, দেখা যাউক। ভূমিকার প্রথম বাক্যটি ছাত্রদের নিশ্চয়ই মনে রাখা উচিত :—

"বাঙ্গালা ভাষা হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাঙ্গালীর মাতৃভাষা।"

পুস্তকের "পত্রলিখন" অধ্যায়ে "মুসলমানদিগের পত্র লিখিবার রীতি" শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র প্রকরণ আছে। ইহাতে "হবিব সহায়," "হক্ নাম ভরসা," "এলাহি ভরসা," "ইয়াহক্" প্রভৃতি "খোদাতালার অভিবাদনসূচক" শব্দ, এবং "বখেদমতে বন্দেগান আলিশান মৌলভী জনাব" "ব আলি ফয়েজমার জোনাবা কুলসুম সাহেবা জোনাবেষু," "বজনাব আলীসান্—আলীসানেষু" ইত্যাদি আবশ্যক বস্তু আছে। এই প্রকরণের নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য :—

"বাঙ্গালা পত্রে সংস্কৃত পাঠ ও শিরোনাম উঠিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী মুসলমানদের পত্রও বাঙ্গালা হওয়া উচিত। তবে তাঁহাদের সমাজে আরবী ফারসী শব্দের অধিক প্রচলন থাকাতে তাঁহাদের ভব্য সমাজে প্রচলিত শব্দ বরং ব্যবহার করা চলিতে পারে, কিন্তু ফারসী, আরবী শব্দের শেষে সংস্কৃত বিভক্তি "সু" যোগ করা কদাপি উচিত নয়। অতএব খেদমতেষু না লিখিয়া কেবল "সাহেবের খেদমতে"* লেখা ভাল।"

"ফারসী আরবী শব্দে সংস্কৃত বিভক্তি যোগ অথবা ফারসী আরবী শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের সমাস অত্যন্ত অসঙ্গত। তাহা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। সবচেয়ে ভাল সোজাসুজি বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ ও শিরোনাম লেখা।"

এই সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা হয়, "যদি তাহা না পারা যায়, তবে সোজাসুজি ফারসী বা আরবীতে চিঠি লেখাও খিচুড়ী ভাষায় লেখার চেয়ে ভাল।"

পরমশ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহোদয়ের "বাঙ্গালা রচনা-প্রবেশ" (পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের জন্য) পুস্তকে ছাত্রগণকে পূর্ব্বোক্ত রূপ আরবী বাক্যগুলির বাংলা অর্থ দেওয়া আছে। অনেক বয়স্ক লোকেরও তাহাতে উপকার হইতে পারে।

"শ্রীশ্রীখোদা সহায়," "শ্রীশ্রীহকনাম" ইত্যাদির পর—"বনামে খোদা (ঈশ্বরের নামে)," "হয়াল করিম (তিনিই মহান্ দাতা)," "ইয়া রব্ব (হে প্রভো)," "বখেদমতে জোনাবে আলীশান মৌলভী হাজী মোহম্মদ বজলুল করীম খান সাহেব আলী জোবানেষু (মহামহিম মহোদয় গৌরবান্বিত মৌলভী হাজী মোহম্মদ বজলুল করীম খান সাহেবের সেবায়)"

"আরজদস্তে বখেদমতে কিব লাগাহ জোনাব মৌলবী জামালুদ্দীন চৌধুরী ওয়ালিদ সাহেব (= পিতৃদেব) পাক জোবানেষু," "বখেদমতে মখদুমা মুকর্‌রমা মুসম্মৎ শ্রীযুক্তা···ওয়ালিদা সাহেবা (= মাতৃদেবী) সমীপে," (শ্রীযুক্তা সম্বন্ধে অন্য গ্রন্থকারদের আপত্তি—প্রবন্ধ-লেখক), "নুরচশম্ (চক্ষের জ্যোতি)," "দোস্তে আজিজে মন্ (আমার প্রিয় বন্ধু)," "জেয়াদা ওয়াস্ সালাম (অধিকন্তু অভিবাদন জানিবেন)" ইত্যাদি ইত্যাদি। চিঠিতে লেখকের নাম স্বাক্ষরের পূর্ব্বে বিশেষণগুলির অর্থ :—

"খাদেম (সেবক)," "খাক্‌সার (ধূলিতুল্য)," বান্দা (দাস)," 'রাকেমে বান্দা (দাসলেখক)," "কমতরীন (ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র)" "দোয়াগো (প্রার্থনাকারী)।"

পাঠক মনে করিতে পারেন যে আমি পণ্ডিতগণের কথা চুরি করিয়া একখানি আরবী অভিধান লিখিতে বসিয়াছি! কিন্তু আমার বিনীত বক্তব্য এই যে ঈশ্বরের নামগুলি বাদ দিয়া বাকী পাঠগুলি আরবীতে না হইয়া বাংলায় হইলে কি দোষ হইত?

যাহা হউক, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে চিঠিপত্রের ভাষাও হিন্দু মুসলমান ভেদে যাহাতে সাম্প্রদায়িক

* এখানেও আরবী শব্দে "এ" বিভক্তি লাগিয়াছে। "এ" সংস্কৃত কি বাংলা?—প্রবন্ধ-লেখক।

মূর্ত্তি ধারণ করে, সে ব্যবস্থা টেক্‌স্‌ট বুক কমিটির অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা করা হইতেছে। উক্ত কমিটির নির্দ্দেশ-মত লিখিত না হইলে কোন পুস্তক পাঠ্য হইতে পারে না। নতুবা, বোধ হয় অন্ততঃ সুনীতি বাবু, সুকুমার বাবু ও চারু বাবুর পুস্তকে সাম্প্রদায়িক ভাষা শিক্ষার উপদেশ ও বিধান থাকিত না।

এ-কথা বলিয়া রাখা ভাল যে আমার উক্তি সংশোধন-সাপেক্ষ। চিঠিপত্রে সাম্প্রদায়িক ইচ্ছানুসারে বাংলা ভাষাকে যদি ভাঙিয়া-চুরিয়া গড়িয়া লওয়া সঙ্গত হয়, তবে আমি ত্রুটি স্বীকার করিব। এ-বিষয়ে বহুমান্য ব্যক্তিগণের (যথা, রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী-সম্পাদক, ও অন্য শ্রদ্ধেয়গণের) মত শিরোধার্য্য।

শুনিতে পাই, কতিপয় ইংরেজ নাকি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে বসিয়া কি তাঁহারা নিজেদের মধ্যে চিঠি লিখিবার কালে "Bakhedmatey zonabey alishun," "Arzdostey Bakhedmatey kiblagah zonab," "Khadem," "Khaksor" "Rakeme Banda" Nurchasm" ইত্যাদি লিখিয়া থাকেন? ইংলণ্ড সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন বাঙালী উত্তর দিতে পারেন। বান্দা নাচার!

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে এই প্রকার ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কুফলের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কার্য্যগত অসুবিধাও আছে। মনে করা যাউক যে কোন শ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিক্ষক মহাশয় "পিতাকে পড়া শুনা সম্বন্ধে একখানি পত্র" লিখিতে বলিলেন। হিন্দু ছাত্রেরা কি "পিতৃদেব" এবং মুসলমান ছাত্রেরা "ওয়ালিদ সাহেব" লিখিতে বাধ্য হইবে? এবং ঐরূপ না লিখিলে কি নম্বর পাইবে না? অধিকন্তু, কোন ছাত্র যদি "আরজদস্তে বখেদমতে" লিখিতে গিয়া "আজরদাস্তে বদেখমতে" লিখিয়া বসে তবে. উহা যে ভুল তাহা বুঝাইয়া দিবার মত আরবী পণ্ডিত সব স্কুলে থাকিবে ত?

প্রসঙ্গক্রমে, একটি কথা উল্লেখ করিতেছি। সাম্প্রদায়িক ভাষা সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে আলোচনা হইবার পর, সম্প্রতি কোন "ন্যাশন্যালিষ্ট" মৌলানা সাহেব নিজের কাগজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা প্রবেশিকা পাঠ্যখানির বিরুদ্ধে ভীষণ ভাবে লাগিয়া গিয়াছেন। যিনি নিজ মুখে কোন কংগ্রেসী-সম্মেলনীতে বলিয়াছিলেন, "আমি জাতিতে বাঙ্গালী, ধর্ম্মে মুসলমান" তিনি বাস্তবিকই এই প্রবন্ধ লিখিতেছেন, অথবা অন্য কেহ লিখিয়া তাঁহার নামে চালাইতেছে, জানি না। যদি তিনি নিজে উহার লেখক না হন, তবে অতীব আনন্দের বিষয় হইবে। যাহা হউক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের "আত্মজীবনী" প্রথম আক্রমণের বিষয়। জবাকুসুম সঙ্কাশং ইত্যাদি মন্ত্রের যে স্বপ্নাতীত অলীক অর্থ করা হইয়াছে, তাহার জন্য লেখকের কল্পনাকে বাহাদুরী দিতে হয়।

"কাশ্যপেয়" কথার অর্থ মাতালের পুত্র, "সূর্য্যদেবের পিতাঠাকুর খুব মদ খাইতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে কশ্যপ বা মাতাল।" "একে জড় উপাসনার মন্ত্র" তাহার উপর, "বিশ্ববিদ্যালয় মুছলমান ছাত্রকে শিখিতে ও বলিতে বাধ্য করিতেছেন—প্রণতোঽস্মি।" "আলোচ্য পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধই হয় পৌরাণিক উপকথা, না হয় হিন্দুর মহিমা গরিমার গৌরব গাথা।"...অধিকাংশ প্রবন্ধই এইরূপ পৌরাণিক হিন্দুয়ানীর ভাব, সংস্কার ও বিশ্বাসের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু মুছলমানের দৃষ্টিতে ঐগুলি...এছলামবিরোধী কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

"সীতার অগ্নিপরীক্ষা" "বেহুলার গল্প," "প্রভাতচিন্তা" রবীন্দ্রনাথের "গুপ্তধন," ও "গান্ধারীর আবেদন," গিরিশচন্দ্রের "সিদ্ধার্থ ও বিম্বাসার" (?), নবীন সেনের "বুদ্ধের গৃহত্যাগ," দেবেন্দ্রনাথ সেনের "মা", সত্যেন্দ্রনাথের "নম নম গিরিরাজ" ইত্যাদি অর্থাৎ গদ্য ও পদ্য প্রত্যেক পাঠটিই "এছলাম-বিরোধী ও মোছলেম-বিদ্বেষী ভাব ও ভাষায় পরিপূর্ণ।" এমন কি "বিষাদসিন্ধু"ও বাদ পড়ে নাই। "এই পুস্তকখানির সহিত এছলামের ও ইতিহাসের এমন কি, সাধারণ বিবেকবুদ্ধির সম্পর্ক খুব কমই আছে।" সৌভাগ্যবশতঃ, লেখক মহোদয়ের উপযুক্ত শক্তি নাই; নতুবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-বিক্রেতাদের দোকানের সমস্ত পুস্তকই বোধ হয়, "এছলাম-বিরোধী" বলিয়া পোড়াইয়া ফেলিতেন! এইরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়াই বোধ হয়, লোকে বিশ্বাস করিত যে আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার বিখ্যাত গ্রীক-পুস্তকালয়, আরবেরা দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু লেখকের খুব বেশী অধ্যবসায় দরকার। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের "প্রবেশিকা" কেন, সমগ্র দেশের, সহস্র সহস্র নগর, গ্রাম, নদনদী, পর্ব্বত সবগুলির নাম-সংস্কার

করিতে হইবে। কত কত "পৌরাণিক উপাখ্যান" কত "এছলাম-বিরোধী" হিন্দুভাব ও বিশ্বাস ঐ সবগুলির সঙ্গে না জড়িত আছে! এই ধরুন, 'মাসিক মোহাম্মদী' কার্ত্তিক ১৩৪২। কার্ত্তিক একটি হিন্দু দেবতার নাম। অনেক "পৌরাণিক উপাখ্যান" ঐ নামের সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশতঃ জড়িত। "কার্ত্তিক" থাকিলে, "অগ্রহায়ণ", "পৌষ," "মাঘ" "ফাল্গুন" ইত্যাদি কতই না আসিয়া পড়ে! এবং দেবদেবী, নক্ষত্র, চন্দ্র (আর একটি দেবতা!) এ সব জঞ্জাল চাপিয়া বসে! শুধু তাহাই নহে। "কলিকাতা" হইতে অনেক পত্র, পত্রিকা, পুস্তক প্রকাশিত। ঐ নামের সঙ্গে অনেকের মতে, সেই কালী দেবতার সম্পর্ক আছে! ইংরেজেরা নিশ্চয়ই পতিত খ্রীষ্টান; নতুবা ঐ পৌত্তলিক নাম বদলাইয়া দিত। তবে আগামী বঙ্গীয় আইন সভায় (নূতন সংস্করণের) একটা চেষ্টা হইতে পারে। হিমালয়, বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বত, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি গিরিশৃঙ্গ, ("দুর্জ্জয়লিঙ্গ" আরও ভয়ানক!), গঙ্গা, যমুনা, প্রভৃতি নদী, যশোহর, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর ইত্যাদি বাংলার জেলা, পাটনা, বোম্বাই (মুম্বই), উদয়পুর, মেবার, রামেশ্বর সেতুবন্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি সকলেই লেখক সাহেবের কৃপা ভিক্ষা করিতেছে! "হিন্দুস্থান," "ভারতবর্ষ"! তোমরাও সাবধান। কাশী, গয়া, বুদ্ধগয়া, পরেশনাথ, মথুরা, বৃন্দাবন, জালামুখী, জালন্ধর, তোমরাও এখন পরলোকগমন কর!

কিন্তু লেখক সাহেব ইংরেজীর বেলা কি করিবেন? ধরুন, "Select Readings from English Prose" (প্রবেশিকার পাঠ্য)। টড সাহেবের "Study" প্রবন্ধে প্লেটো, সক্রেটিসের প্রশংসাসূচক উক্তি আছে। ইঁহারা "মুছলমান" ছিলেন না। সুতরাং এখানেও "এছলাম-বিরোধী" "মুছলমান" বিদ্বেষ" আছে। "Herculean effort" এই কথায় "পৌরাণিক উপাখ্যানে"র অস্তিত্ব বর্ত্তমান, কিন্তু অতি ভয়ঙ্কর সেই "রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কলের" গল্প। একে ভূতের গল্প, তাহাতে আরভিং সাহেব গল্পের শিরোভাগে কবি কার্টরাইটের ঘোর পৌত্তলিকতাপূর্ণ (নিশ্চয়ই "এছলাম বিদ্বেষ" পূর্ণ!) কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিয়াছেন:—"By Woden, God of Saxons, From Whence comes Wensday" ইত্যাদি। "পৌরাণিক যুগের "পৌত্তলিক" কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্যাক্সনদিগের দেবতা "ওডেনের" নাম যে পুস্তকে আছে, তাহার কি দশা হওয়া উচিত? শুধু "Select Readings from English Prose" নহে, কার্টরাইটের ও আরভিং-এর পুস্তক এবং উহার ছোঁয়া যাহাতে যাহাতে লাগিয়াছে, সব দগ্ধ করা উচিত। বোধ হয়, ইংরেজের কাছে এ আব্দার করিলে আজকালকার দিনে মঞ্জুর হইতেও পারে! ইংরেজী সাহিত্যে ঐরূপ "কুসংস্কার" আরও যথেষ্ট আছে। কোন পুস্তকে, যদি ম্যামন, কি জুপিটার, কি মিনার্ভা, কি ভিনাসের কথা থাকে, তবে উপায়? মরিস সাহেবের "Atalanta's Race" নামক কবিতা-পুস্তক বহু মুসলমান ছাত্র পড়িয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছেন। উহাতে সেকালের গ্রীকদের ডায়ানা ও ভিনাস দেবীর সম্বন্ধে অনেক কিছু আছে। এখানেও বিচার করা উচিত। গদ্যে ও পদ্যে এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। কিন্তু আরও বিপদ যে আছে! ইংরেজী দিনের নামের প্রত্যেকটির সঙ্গে কোন-না-কোন "পৌত্তলিক" দেবতার সম্বন্ধ আছে। যথা:—মনডে (Monday)—মুনের অর্থাৎ চন্দ্রের দিন; সানডে (Sunday)—সান্ অর্থাৎ সূর্য্যের দিন; থার্সডে (Thursday)—থর দেবতার দিন ইত্যাদি। ইংরেজী মাসের নামের মধ্যেও "পৌরাণিক" দেবদেবীর গন্ধ আছে। ইংলণ্ডের বহু স্থানের নামের সঙ্গে ঐরূপ অনেক খারাপ ব্যাপার জড়িত আছে! ইংরেজেরা সেইগুলি ভাষায় ব্যবহার করিলেও, ধার্ম্মিকেরা ছাড়িবে কেন? কিন্তু ইংরেজের ভাষা ও সাহিত্য বদলান অথবা বর্জ্জন, "হিন্দুর" ভাষা ও সাহিত্যকে এরূপ করার চেয়ে কঠিন। শুনিয়াছি, ফার্সী ভাষায় "শাহনামা" নামক গ্রন্থ আছে। উহাতে অ-মুসলমান যুগের পারসীক মহাপুরুষগণের অনেক বর্ণনা আছে। পারস্যের মুসলমানেরা সে-সম্বন্ধে কিছু করিয়াছেন কি না, জানি না। না-করিয়া থাকিলে, অন্যেরা লাগিয়া যাউন।

শরতের মেঘ

শ্রীপুষ্প দেবী

শুনতে পেলাম শব্দ আমার দিকেই আসছে। তাহ'লে আমারই কাছে আসছেন দেখছি। বড়-একটা আসেন না ত, অবশ্য প্রয়োজন ছাড়া। আসবার সময়ই বা কই? যাক্—

উঃ হেঁটে আসছেন তাও যেন ছুটে। ওই হাই-হিল প'রে ওঁরা যে কি ক'রে অত ছোটেন, ভাবলেও আমার মাথা ঘুরে যায়। এ যুগের প্রগতি-জীবন যেমন দ্রুত, এঁদের চলার গতিও তেমনই। এ যুগের মতই সশব্দ, বাধাহীন ও রূঢ়। চলার পথে কত কি যে দ'লে, চূর্ণ ক'রে, নষ্ট ক'রে গেলেন তাও পিছন ফিরে দেখবার অবসর এঁদের নেই। গতিই ওঁদের বিলাস, গতিই ওঁদের আনন্দ।

তিনি দ্রুতপদে এসে দ্রুত হস্তে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকেই যেন ঈষৎ আশ্চর্য্য হয়ে ফিরছিলেন। বুঝলাম গতির দ্রুততায় এঁরা গতিহীনদের চোখে দেখতে পান না। সুউচ্চ ও সূক্ষ্ম কণ্ঠ শোনা গেল—"বেয়া—রাঃ!"

"হুজু—র—র!"

"সাব কাঁহা?"

"আপ্‌না কাম্‌রামে, হুজুর!"

"কভি নেহি—"

বেয়ারা প্রতিবাদ না করাতে তিনি কি ভেবে ঘরে ঢুকে একটু ভাল ক'রে দেখেই বিরক্ত বিস্ময়ে ব'লে উঠলেন—"এ কি? এমন সময় শুয়ে? এত কিসে মগ্ন যে আমি ঘরে ঢুকলাম সাড়া দিলে না? সামান্য ভদ্রতাও কি ভুলেছ?"

হায় রে, নিজের স্ত্রীর কাছেও ভদ্রতার বুলি আওড়াতে হবে? আচ্ছা, দিনরাত কি এরা হাঁপিয়ে ওঠে না? না, বাঁধা গৎগুলো ওদের অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে, কষ্ট করতে হয় না, আপনিই বেরিয়ে আসে। সোসাইটির শাণযন্ত্রে এরা পালিশ হয়ে চকচক্ করে। ভুলচুক ওদের হয় না। অকৃত্রিম অনাড়ম্বরের মাঝে ওরা বাঁচে না, দম বন্ধ হয়ে আসে। এই নিখুঁত নির্ভুলতার চাপে এদের মনটা গেছে পিষে—ম'রে। কিন্তু সেটা তারা জানে না এবং এইটাই আমার সব চেয়ে ভাল লাগছিল না। সেতারের সমস্ত তার ঢিলে হয়ে গেলে যেমন লাগে, কোন সুরই বাজে না, আমারও তেমনই মনে হচ্ছিল।

নিজেকে অসুস্থ মনে হচ্ছিল। দেহে না মনে সেটাই ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কাছারি থেকে ফিরে কাপড় ছেড়ে একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। একটা ক্লান্ত অবসাদ। মন যেন একটা অবলম্বন চাইছিল। আজ হঠাৎ মনে হ'ল, জীবনটা কাটালাম একটা রুক্ষ শূন্যতার মধ্যে। মধুর অসহায়তায় কারুর সবল প্রেমের শরণও পেলাম না, কেউ ভীরু নির্ভরে আশ্রয়ও চাইলে না। সব সময় সতর্ক স্বাধিকার নিয়ে খুশী থাকা যায় না, অন্ততঃ এক জনের কাছে দুর্ব্বল হ'তে সাধ হয়। শাসন-দণ্ড সব সময় হাতে নেওয়ার চেয়ে কারুর কাছ থেকে দণ্ড মাথায় নিতে ইচ্ছে করে। জীবনটা ত আর আড়ষ্ট কঠিন নিয়মানুবর্ত্তিতার জের টানা নয়, প্রথার বন্ধন থেকে মুক্তি না পেলে যে বাঁচা অসম্ভব। ছদ্মবেশে যে জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে। স্বভাব মাঝে মাঝে ছুটি চায়। তাই আজ সমস্ত মন চাইছিল—বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, অকৃত্রিমতা; সমাজের দেওয়া খোলসটা প্রাণের ওপর থেকে টেনে খুলে, ছুটে মুক্ত নীলাকাশের তলায় যেতে। এত দিন ত বাঁধাধরা নিয়মের দাসত্ব ক'রে অর্দ্ধেক জীবনীশক্তি ক্ষয় করলাম, আজ না-হয় একটু বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাঁচার খোরাক জোগাড় করি।

চোখ বুজে শুনতে পেলাম একটা দ্রুত কঠিন খট্ খট্ শব্দ। বুঝলাম শ্রীমতীর আগমন। এঁদের আবির্ভাবের বার্ত্তা এঁরা বহু দূর হ'তেই জানিয়ে আসেন।···স্বপ্নের পাপড়ির ওপর সকুণ্ঠ সতর্কতায় পা ফেলে মানসী আসে চুপে চুপে, দেহে-মনে একটা মোহাবেশ জাগিয়ে, পায়ের শব্দ শোনা যায় না, কিন্তু সে পদধ্বনি শব্দের অতীত হয়ে অনুভূতি জাগায় প্রাণে।···এঁরা সশব্দচারিণী, মোহ ভাঙিয়ে আসেন। যা-কিছু সুকোমল, সুকুমার এঁরা পায়ের তলায় পিষ্ট ক'রে আসেন।

ট্র্যাজেডি মনে হয়। নিজেকে যে হারিয়েছে, নিজেকে যে ভুলেছে, তার চেয়ে বড় ক্ষতি আর কি হ'তে পারে?

"ভাবলাম সাড়া দিয়ে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করি কেন? প্রয়োজন ছাড়া ত আর আমাকে দরকার নেই।"

শুনে আমার দিকে চাইলেন, বুঝতে চেষ্টা করছিলেন, ব্যঙ্গ না সত্য? কারণ ওরকম কথা বলা আমার স্বভাব নয়। এত দিন তাঁর কোন কথায় আমি কথা বলি নি। না করেছি বিদ্রূপ, না দিয়েছি বাধা। তাই বোধ হয় একটু···থাক্ সে কথা।

আমার দিকে চেয়ে তিনি আমার কথাটা বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। চিত্তের কোমলতা হারিয়ে এদের বুদ্ধিও কঠিন হয়ে গেছে। তিনি তাঁর আঁকা ভ্রূভুটি (জানি না কেন বিশ্বশিল্পীর আঁকার ওপর 'ফিনিশিং টাচ্' দিতে গেছেন, কারণ তিনি ও-কাজটা বাকী রাখেন নি, অতি যত্নে, অতি নিপুণভাবে ভ্রূ-দুটি এঁকেছিলেন।···বোধ করি প্রকৃতির ওপর কলম-চালানই এ যুগের ব্রত!) ওপরে তুলে কোমলতাহীন স্বরে, যেন কোন ইনসিওরেন্সের এজেন্টের সঙ্গে কথা কইছেন এমনি সুরে বললেন, "দরকার না থাকলে তোমার কাছে ব'সে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। এসেছিলাম জানতে আজ মিসেস্ সিনার য়্যাট হোমে আসছ ত? দেখছি এখনও ত রেডীই হও নি, তার পর আবার যাবে ক্লাবে। নইলে আমার সঙ্গেই যেতে পারতে। যাক্, তাতে কিছু এসে যাবে না, তুমি তোমার কারেই এস। আমার ওয়েট করার মত সময় নেই, আরও দু-একটা এন্‌গেজমেন্ট আছে।" ব'লে একবার নিজের শুভ্র, সুগোল হাতখানায় বাঁধা রিষ্ট-ওয়াচটা চোখের পাশ দিয়ে দেখে নিলেন।

ভারী অস্বস্তি লাগছিল, তাই বললাম, "আমি আজ কোথাও যেতে পারব না। কিন্তু ঐ উৎকট সামাজিকতার খোলসটা ফেলে দাও না। ওগুলো আমার বিষাক্ত ধোঁয়ার মত লাগছে, দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।"

কিছুক্ষণ ও হতবুদ্ধির মত চেয়ে রইল। বুঝলাম কথাগুলো মাথার মধ্যে ঢুকছিল না। তার পর কুপিত বিস্ময়ে বললে, "তোমার কথাগুলো ঠিক বুঝলাম না। What on earth do you mean? সিরিয়াস্ জোকের সময় এটা নয়, এটুকু মনে রেখো। মাথাটা কি কোর্টেই ফেলে এসেছ আজ? যাক্—ও সব বাজে কথা শোনবার মত—well, I have no time to spare, চললুম—তুমি আসছ ত?"

হাসি পেল। ডাকলাম। সেই বহুদিন আগে যখন কৃত্রিমতার আবরণে আমাদের প্রাণটা ঢাকা পড়ে নি, সহজ ছিলাম, তখন যেমন ডাকতাম, আজও তেমনই করেই ডাকলাম, "নন্দা!"

সুনন্দার পা আটকে গেল। যেন পথ চলতে চলতে কত যুগ পূর্ব্বের ফেলে-আসা হারানো জিনিষ খুঁজে পেয়েছে, যেন বহুদিন-বিস্মৃত সুর মর্ম্মবীণায় বেজে উঠেছে, তাই সশঙ্ক অবিশ্বাসে কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে থেকে, আমার দিকে ফিরে চাইলে। আবার স্পষ্ট স্বরে ডাকলাম, "নন্দা, আজ তোমার ভদ্রতা নাই-বা রাখলে? আমার শরীরটা ভাল নেই, একটু কাছে ব'সো না সু! বহুকাল ত আসা ছেড়ে দিয়েছ।"

সুনন্দা থমকে গেল। বাইরের সামাজিকতা ও কাঠিন্যে তার মনটা এমন অসাড় হয়ে গেছে যে আমার অকৃত্রিমতা ও কোমলতা সেখানে বুঝি সাড়া জাগায় না। আমার 'নন্দা' সকলের তথা সোসাইটির বহুপরিচিতা সু-খ্যাতা 'মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী'র তলায় চাপা প'ড়ে গেছে। নিষ্ঠুর সোসাইটির যত্নে আমার নন্দা 'মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী'তে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তবু মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর মধ্যে যে তন্দ্রাহতা, আত্মবিস্মৃতা সুনন্দা লুকিয়ে ছিল, সে আঘাত পেয়ে পলকের জন্যে জেগে উঠে কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে বললে, "কি হয়েছে তোমার আজ বল ত? নিশ্চয়ই মন খারাপ হয়েছে? কেস্ বুঝি—"

তার কথা শেষ হবার আগেই তার হাতটা হাতের মধ্যে তুলে নিলাম, মনে হ'ল,—না, আজও আমি মরি নি, নন্দাকে পেলে আজও আমি দশ বছর আগেকার মতই সুখী হ'তে পারি। তাই তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, "না, কিছুই আমার হয় নি। আজ শুধু তোমায় চাইছি নন্দা। তোমার ছদ্মবেশটা খুলে এস আমার কাছে।"

আমার সুনন্দা সত্যই সুন্দরী ছিল। মনে পড়ে গেল, তাকে দেখে দেখে আমার কিছুতেই তৃপ্তি হ'ত না। তাই যখন-তখন তার দিকে চেয়ে থাকতে বড় ভাল লাগত। হয়ত

সে কোন কাজ করছে কিংবা আমারই অগোছালো আলমারীটা গোছাতে বসেছে, অমনই আমি কাজ ফেলে নিতান্ত অসময়ে গিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে পড়তাম। হঠাৎ আমায় এমন কাজের সময় শুয়ে পড়তে দেখে নন্দা ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠত, "এমন সময় শুয়ে পড়লে যে? শরীর ভাল লাগছে না?"

তার কর্ম্মরত মূর্ত্তি আমার ভাল লাগলেও তাকে কাছে পেতে যে আরও ভাল লাগত এটা অস্বীকার করি কি ক'রে? তাই একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে বলতাম, "কি জা—নি, বুঝতে পাচ্ছি না।"

আর নন্দার দূরে থাকা হ'ত না, কাজ ফেলে ব্যস্ত হয়ে কাছে আসতে আসতে বলত, "এই ত দিব্যি ভাল ছিলে, এখনই আবার হ'ল কি? গা ভাল ত, দেখি।" কপালে হাত দিয়ে নন্দার উদ্বেগ খানিকটা কমত আর আমার উদ্বেগটা বাড়ত। কারণ জানতাম আমায় ভাল দেখলে নন্দা আর কাছে ব'সে থাকবে না।

নন্দার সুন্দর মুখে সশঙ্ক উৎকণ্ঠার ছায়া দেখতে আমার ভারী ভাল লাগে। কেন জানি না, আমার জন্যে নন্দার এই সোদ্বেগ আকুলতা, সস্নেহ সতর্কতা—এ যেন আমার মনে এক সগর্ব্ব তৃপ্তি এনে দেয়। আমার জন্যে, শুধু আমার জন্যে নন্দার সমস্ত চিত্ত ত্রস্ত, ব্যস্ত, চিন্তিত,—এই কথা ভাবতে ভাবতে নিষ্ঠুর উল্লাসে সমস্ত মন ছেয়ে যায়। এই মধুর স্বার্থপরতা যেন কিছুতেই এড়ানো যায় না। আমার নন্দার সামান্য দুঃখ উদ্বেগ মুছিয়ে নিতে আমার আকুলতার অন্ত নেই, তবু আমার জন্যে সে দুঃখ পাক্, এ নির্ম্মম মাধুর্য্যটুকু উপভোগ করার লোভ যেন সামলানো যায় না। তাই যখন দেখলাম সুনন্দার স্বপ্ন-উতল চোখে উৎকণ্ঠার ছায়া মিলিয়ে গেছে, ওষ্ঠাধরে ফুটেছে তৃপ্তিস্নিগ্ধ হাসি, তখন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। ওর ওই আয়ত আঁখির তারায় কাঁপবে শঙ্কাতুর কাতরতা, সে যে কি সুন্দর! ওর সুন্দর মুখে ফুটে উঠবে ক্লিষ্ট ব্যাকুলতা —সে.দেখার লোভ যে আমার কি!

বুঝলাম সুনন্দা পালাতে পারে, তাই গম্ভীর উদাস মুখে বললাম, "গা দেখলেই যদি সব অসুখের সন্ধান পাওয়া যেত, তাহ'লে লোকে মরত না কখনও—"

ব্যস, আর দরকার ছিল না।

ত্রস্তে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে ভর্ৎসনা-মধুর কণ্ঠে ব'লে উঠল, "ছিঃ! ঐ সব অলক্ষুণে কথাগুলো ব'লে আমায় দুঃখ না দিলে বুঝি স্বস্তি পাও না? আচ্ছা, আমায় দুঃখ দিতে তোমার মায়াও হয় না একটু?" শেষের দিকে কণ্ঠ তার অভিমান-কাতর হয়ে আসত। নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলতাম, "আর আমায় ফেলে পালাতে তোমার একটুও মায়া হয় না বুঝি?"

"পালাব আর কোথা? কাজ করব না?"

"না, কাজ তোমায় করতে হবে না। আমায় কষ্ট দিয়ে কি কাজ তোমার হবে শুনি?"

এবার সুনন্দা হেসে ফেললে। কি সুন্দর সে হাসি! চাঁদের আলোর মত চিত্ত-স্নিগ্ধ-করা, ফুলের মত মর্ম্ম-মুগ্ধ-করা। হাসতে হাসতে বললে, "কি ছেলে মানুষ তুমি গো! এ সময়ে তোমার কাছে ব'সে থাকলে চলবে কি ক'রে?"

"তা জানি নে, কিন্তু তোমায় নইলে আমার চলবে না এটা জানি— " ব'লে নন্দাকে কাছে টেনে নিতাম।

"তুমি বড্ড লোভী হচ্ছ কিন্তু দিন দিন, উপোস করানো দরকার হয়ে পড়েছে।"

"কি প্রকার? সূক্ষ্ম না স্থূল?"

"শেষেরটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহ'লে আমারই লোকসানের ভয় বেশী।"

"কিন্তু প্রথমটায় আমার লোকসান এত বেশী যে সে আমার সইবে না নন্দা।" তার পর কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলতাম, "সত্যি বল সু, লোকসান কি আমারই একলার?"

"না গো মশাই না, সে কথা জান বলেই না আমায় এমন ক'রে জব্দ করতে পার—" ব'লে সুনন্দা তার রক্ত-পাগল-করা, মধুবর্ষী ওষ্ঠাধরের চকিত স্পর্শের বিদ্যুতে আমায় মুগ্ধ, আহত, পাগল ক'রে ছুটে পালাত।

তাই বলছি, সে নন্দার চূর্ণাবশিষ্টও আর খুঁজে পাওয়া যাবে কি? আমার কল্পিত অসুখের ভয়ে যার মুখে ছল ছল বিষণ্ণতা নেমে আসত, আজ সত্যকার অসুস্থতা তার এনগেজমেণ্ট নিবারণ করে না। না ডাকলেও যে অকারণে কাজের অজুহাতে কাছে কাছে ফিরত, আজ কিসের ডাকে

আমার ডাককে উপেক্ষা ক'রে নিষ্ঠুর দর্পে চ'লে যাবার শক্তি সে পেয়েছে ?

হায় ! সুনন্দাকে হয়ত আমি ধ্বংসস্তূপ হ'তে উদ্ধার করতে পারি। কিন্তু 'মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী' তাঁর বহু কষ্টার্জ্জিত অধিকার ছাড়তে রাজী নন যে। তাঁর ক্ষতি যে বড় বেশী হয়ে যায়। তাই আমার কথার উত্তরে 'মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী' তাঁর রাগরক্ত ওষ্ঠাধরকে সুকৌশলে ও সু-অভ্যস্ততায় বঙ্কিম ক'রে উত্তর দিলেন, "আমার ত এখনও মাথা খারাপ হয় নি যে তোমার সিলী সেন্টিমেণ্টালিজম শুনব ব'সে ব'সে। তোমার একটু লজ্জাও করল না ? সত্যি ! বোধ হয় কি বলছ তাও জান না। যাক্, তোমার জন্যে ত আর প্রেষ্টিজ নষ্ট করতে পারি না। It's rather too late and I must be off। শুয়ে শুয়ে অসুস্থ কল্পনার আশ্রয় নেওয়ার চেয়ে এস আমাদের য়্যাট হোমে।"

সুনন্দা সুন্দরী। কিন্তু এত দিনে লক্ষ্য পড়ল আমার, ওর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আর নেই। প্রসাধন ও কৃত্রিমতায় ওর রূপ পর্য্যন্ত নষ্ট হ'তে বসেছে। ওর চোখের সে মাধুর্য্য গেছে হারিয়ে, এসেছে একটা অকারণ রুক্ষতা। ওর স্বভাবরক্ত ওষ্ঠপুট, যা আমি মর্ম্ম-মাতাল-করা ব'লে বর্ণনা করতাম, সেও দেখি আজ কৃত্রিম বর্ণরঞ্জিত।

কি কঠিন সৌন্দর্য্য ! সে সহজ প্রাণের হাসি নেই, আছে সবের প্রতি একটা সদর্প উপেক্ষার প্রাণহীন ওষ্ঠকুঞ্চন (অবশ্য সেইটাকেই ওঁরা হাসি ব'লে মনে করেন এবং তাই নিয়ে গর্ব্বের আর অন্ত নেই !)। আজ সুনন্দাকে দেখে হঠাৎ মনে হ'ল, তার নিজস্ব যা-কিছু ছিল, সমস্তই মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর মধ্যে হারিয়ে গেছে। আমার 'নন্দা' ছিল অ-সম্পূর্ণতায় সুন্দর, কিন্তু সোসাইটির যত্নে দেখছি 'মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী' পারফেক্ট্। তা সত্যি, তাঁর ত্রুটি নেই। বাইরের জন্যে তিনি ঘরকে দেখবার অবসর পান না। স্বামী বা সন্তানের অসুখের জন্যেও তাঁকে কখনও কোন সামাজিক কর্ত্তব্যে অনুপস্থিত দেখা যায় নি। তাঁর বিশ্রাম নেই, ত্রুটি নেই, ক্লান্তি নেই সোসাইটির জন্যে, অথচ ঘরের…থাক্ সে কথা।

তাই ত বলছিলাম, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী p-e-r-f-e-c-t. She is sweet, she is an a-n-gel, she is a w-o-n-d-e-r !

কিন্তু আমি ভাবছি, এতে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী কি আমার 'নন্দা'র চেয়ে সুখী হ'তে পেরেছে ? তবে কেন তার মধ্যে অতৃপ্তির ছায়া ? হায় ! আমার নন্দার চিতাভস্মে গ'ড়ে উঠেছে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর সম্মান-সৌধ।

আজ আমি অবাক হয়ে ভাবি, আমি নন্দাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম কি ক'রে ? কোন্ অনাদরের ত্রুটির মাঝে নন্দা আমার হারিয়ে গেছে। উৎকট সাহেবিয়ানার প্রবল বন্যায় অজ্ঞাতে ক্ষয় হচ্ছিল আমাদের দাম্পত্য জীবনের কূল, যখন পাড় ধ্বসে গেল, ধ্বংসলীলায় মুগ্ধ আমি তখনও যদি রাখতাম নন্দাকে আমার বুকে লুকিয়ে !

এখন ভাবতে পারছি এই কথা, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও ভাবতে পেরেছিলাম কি, একথা আমি ভাবতে পারব ? কিন্তু দোষ ত আমাদেরই। আমরা নিজেরা মাতাল হয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিকতার নেশা থেকে গৃহলক্ষ্মীদেরও দূরে রাখি নি, নিজের হাতে তুলে দিয়েছিলাম—হয়ত তাদের আপত্তি সত্বেও—সেই উগ্র, তীব্র কালকূট। আজ যদি তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে থাকে, যদি সমস্ত পরিবেষ্টনী বিষের ধোঁয়ায় প্রাণঘাতী হয়ে থাকে, তাহ'লে দোষ নিজেকে ছাড়া আর কাকেই বা দিতে পারি ?

ভাসতে ভাসতে কোথায় যে চলেছিলাম, আজ তীরে এসে দেখি—সাথী নেই, একা ! এ নির্ম্মম একাকিত্বের ভারে মন যেন ভেঙে পড়ছে, হারানোর হাহাকারে বুক আমার চূর্ণ হয়ে গেল, অশ্রু-করুণ মিনতি তাই কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ছে, "নন্দা, নন্দা, ফিরে এস, ফিরে এ—স নন্দা—"

নন্দা কি শুনতে পাবে না আমার ডাক ? তবে এও জানি যদি নন্দা শুনতে পায়, কিছুই তাকে আটকাতে পারবে না ! কিন্তু সে শুনতে যে পাবে না, সোসাইটির ঘন আবরণে আহত হয়ে সে-ডাক হারিয়ে যাবে।

শুয়ে শুয়েই শুনতে পেলাম সুনন্দার দ্রুত পদধ্বনি থমকে গেল। কার অভিবাদনের উত্তর দিচ্ছে তার সু-অভ্যস্ত সদা-ব্যস্ত, কৃত্রিম কণ্ঠস্বর, তাও কানে এল। মোটা গলায় প্রশ্ন হ'ল, "সুপ্রিয় বাড়ি আছে নাকি ?"

"হুঁ: ! বলছে ত শরীর ভাল নেই। A bit indisposed …আপনি আসছেন ত ? তবে আর কি ? সুপ্রিয়কেও নিয়ে

চলুন না, ওকে আর কুঁড়েমির প্রশ্রয় দেবেন না। আচ্ছা... Cheerio !"

সুনন্দা চলে গেল। সে গেল, কিন্তু রেখে গেল তার কণ্ঠোচ্চারিত আমার নামটাকে। সেটা যেন কাঁটা হয়ে বুকে বিঁধে রইল। সুনন্দা গেল কিন্তু কাঁটা গেল না। মনের মধ্যে সেই কাঁটার খচখচানি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জাগালে আর এক দিনের কথা।

এক দিন ছিল যেদিন জ্যোৎস্নার-জোয়ার-লাগা রজত রজনীতে তাকে কাছে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বলেছি, "তোমায় আমি নিত্য নব নামে ডেকেও তৃপ্তি পাই নে, মনে হয় কিছুতেই যেন আমার সীমাহীন ভালবাসা প্রকাশ করতে পারলাম না। তাই নামের জালে আমার অন্তরের আকুতি ধরা পড়ল না। কিন্তু তুমি কি আমায় একবারও আমার নিজের নামে ডাকবে না, সু ?"

তার সুধাবর্ষী ওষ্ঠাধর ও প্রেমসিক্ত কণ্ঠস্বরে আমার নিজের নামটা শোনবার সে কি শিশুসুলভ আগ্রহ! কিন্তু নন্দা এত কথা বলতে পারে, আমার নামটা উচ্চারণ করতে তার যত লজ্জা! বহু সাধ্যসাধনায় একটা তিক্ত ওষুধ খাবার মত মুখ ক'রে যদি বা প্রস্তুত হ'ত, অকস্মাৎ কলঝঙ্কৃত হাস্য-প্লাবনে সব ভেসে যেত। আবার কিছুক্ষণ পরে চেষ্টা ক'রে গম্ভীর হয়ে বলতে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ফেলত। আমি অভিমান-গম্ভীর কণ্ঠে বলতাম, "আচ্ছা সু, আমার নামের শেষার্দ্ধটা ত বলা তোমার পক্ষে অতি সহজ, কারণ আমায় সম্বোধন করার ওইটেই শ্রেষ্ঠ শর্ট-কাট, আর প্রথম অক্ষরটা ত তোমার নামেরও প্রথম অক্ষর। তবে...? তাহ'লে বুঝি শেষার্দ্ধটার সম্বন্ধে সন্দেহ—

"যাঃও—" সঙ্গে সঙ্গে সাদর কণ্ঠাবেষ্টন। আমি সাভিমান অনুযোগে বলতাম, "সত্যিই আমি যাচ্ছি। আমার নামটার যখন নেহাৎই দুর্ভাগ্য—"

আমার কথা শেষ হবার আগেই নন্দা মধুর লজ্জা মুখে মেখে আমার মুখখানা নিজের দিকে ফেরাতে ফেরাতে বলত, "রাগ ক'রো না, প্রিয়।"

আমার আর অভিমান করা হ'ত না, সতৃপ্ত উল্লাসে তাকে বুকে নিয়ে আদরে আদরে আচ্ছন্ন ক'রে দিতে দিতে বলতাম, "কিন্তু ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে গেলে চলবে না। কেমন ক'রে বুঝব যে এটা তোমার ভালবাসার স্বীকারোক্তি কি সম্বোধন।"

"আচ্ছা গো আচ্ছা, ফাঁকি দেব না। তোমায় ফাঁকি দেওয়া যায় না কি ? সু—প্রি—য়, সু—প্রিয়, সুপ্রি—য়! হ'ল ?"

তখন বোধ করি নন্দাকে চুম্বন-বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। সে কি অবর্ণনীয় তৃপ্তি! নামটা যেন বিদ্যুতের মত আমার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত, সঞ্চালিত হচ্ছিল। সে এ—ক দি—ন!

কিন্তু আজ আমার নামটা একান্ত অক্লেশে, অনায়াসে কুণ্ঠাহীন স্বরে সুনন্দা উচ্চারণ ক'রে গেল। আমার নামটা আজ আর তার কাছে বিশেষ কিছু নয়, সাধারণের সঙ্গে আজ আমার পার্থক্য ঘুচে গেছে। আমি সুপ্রিয় চ্যাটার্জ্জী, তার বেশী নয়!

পর্দ্দার বাইরে থেকে বেয়ারা বললে, "হুজু—র—র!"

তার বলবার আগেই আমি বুঝেছিলাম সে কি বলতে এসেছে, কিন্তু আজ আর ওসব ভাল লাগছিল না, তাই তাকে উত্তর না দিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, "ভেতরে আয় সুব্রত।"

সে পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে বললে, "মেমসাহেব ত হুকুম দিয়ে গেলেন, তোমাকে যাতে কুঁড়েমির প্রশ্রয় না দিই। তা আমার পক্ষে তাঁর আদেশ অমান্য করা উচিতও নয়, সাহসও নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল ত হে? এমন সময় শুয়ে থাকবার পাত্র ত তুমি নও। অসুখ করেছে বলেও ত মনে হচ্ছে না। হ'ল কি তোমার ?"

তার অতগুলো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শুধু বললাম, "বোস সব বলছি, ব্রত।

সুব্রত বিস্মিত কৌতূহলে একটু থমকে গিয়ে বললে, "কি বললে আবার বল ত।"

"অবাক হয়ে গেছিস বড্ড, না? নন্দাও হয়েছিল, কিন্তু সে সাড়া দেয় নি। বলছিলাম কি জানিস ব্রত।"

আমার কথা শেষ না-হ'তেই ব্রত বললে, "কি বলছিস তা জানি না, তবে এটুকু জানতে চাই, তুই কি সত্যিই আমায় ব্রত ব'লে ডাকলি প্রিয়?"

ব্যথা পেলাম ব্রতর কথায়। বহু দিনের অব্যবহার্য্য, অনাদৃত সেতারে সুর বাঁধতে গেলে প্রথমটা যেমন হয়, আমার কণ্ঠে 'ব্রত' নামটাও তেমনি লাগছিল।

একটা কথা, সুব্রত ছিল আমাদের সোসাইটির শরীরী প্রতিবাদ। সমাজের আচার-ব্যবহারগুলোকে সে বিশেষ সুনজরে দেখত না এবং সত্য মতামত প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হ'ত না। কিন্তু আশ্চর্য্য, তার এই বিমুখতা ও অপ্রিয় সত্য-ভাষণের জন্য কেউ তার ওপর রাগ করতে পারত না, বস্তুতঃ তার ওপর যেন রাগ করা যায় না। তার মধ্যে এমন একটা সবল, মধুর ব্যক্তিত্ব ছিল যেটার প্রভাব এড়ান যেন শক্ত হয়ে পড়ত। সামাজিক অনুষ্ঠানে যে সে অনুপস্থিত থাকত এমন নয়। সে উপস্থিত থাকত তার তীব্র মধুর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। তার কথার হুলে জ্বালা ধরলেও তাকে ত্যাগ করতে পারতাম না, মধুর লোভটা যেন দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠত।

আমরা যেখানে সুট প'রে গেছি (অবশ্য সেটা যখন বাধ্যতামূলক) সে এসে দাঁড়াত ধুতি-চাদর প'রে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তার ব্যবহারকে স্পর্দ্ধা ব'লে বিকৃত করার সাহস বা মনোবৃত্তি আমাদের কারও হ'ত না। সে আমাদের মধ্যে থাকলেও মনে হয় সে যেন ঠিক আমাদের মত নয়, এমন একটা জিনিষ তার মধ্যে আছে যেটা আমাদের নেই। সে সকলের ওপর, তাই তার সবই শোভন, সুন্দর!

কিন্তু ব্রতর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজকের নয়, আমরা আবাল্য-সহচর। কেবল মধ্যে সমাজের প্রভাবে আমাদের সম্বন্ধটা যেন একটু চিড় খেয়ে গিয়েছিল। তাই আমার কথায় সে একটু বিস্ময় অনুভব ক'রে বললে, "আজ যে এত উচ্ছ্বাস! ব্যাপার কি?"

ব্রতর কথার উত্তর দিলাম না। মনের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল, ব্রতর হাত ধরে ব্যাকুল হয়ে বললাম, "ব্রত, বল ত ভাই, নন্দা কি আমার ডাকে সাড়া দেবে না?"

একটু চুপ ক'রে থেকে উত্তর দিলে ব্রত, "বড় শক্ত কথা ভাই। যে স্রোতের টানে ভেসে গেছে, তাকে ফিরিয়ে আনা বড় শক্ত।"

বিষণ্ণ বেদনায় স্তব্ধ হয়ে রইলাম। ব্রত তা লক্ষ্য ক'রে বললে, "কিন্তু তুই কথার পেছনে মিথ্যে ছুটে মরবি কেন প্রিয়, তাতে না-পাবি শান্তি, না-পাবি সান্ত্বনা। তার চেয়ে চল্ ফ্ল্যাট হোমে। মেমসাহেবও খুশী হবেন তোমায় দেখলে, অন্ততঃ আমি যে কুঁড়েমির প্রশ্রয় দিই না সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। চল্—"

"না, আজ ওসব কৃত্রিমতার মধ্যে হাঁপিয়ে উঠব। সইবে না ভাই।"

হেসে সুব্রত এক টানে আমায় তুলে বললে, "সয় কি না একবার পরখ করেই দেখ না প্রিয়। আজ আবার বহুদিন পর ভায়োলেট সেনের দেখা মিলতে পারে। বেশ ত প্রিয়, আমি কথা দিচ্ছি ভায়োলেটের মধুর সঙ্গও যদি সইতে না পার, আমি নিজেই তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাব। সত্যি বলছি, দেরি করিস নে, উঠে পড়্। কাব্যচর্চ্চা ইচ্ছে হয় বাড়িতে ব'সে 'মিসেস্'-এর সঙ্গে করিস—নিরালায়, মানাবে ভাল, সইবেও। কিন্তু এ তোমার একান্ত পণ্ডশ্রম হচ্ছে, আমার মত অ-কবির কাছে এর মূল্য কাণাকড়িও নেই।"

ব্রতর সঙ্গে কেউ কখনও পেরেছে? যেতেই হ'ল।

সেখানে যেতেই একটা উগ্র, তীব্র আবহাওয়ায় মনটা নেশাখোরের মত ঝিমিয়ে পড়ল। অন্য কিছু আর মনের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করলে না। সমস্ত ভাবনাগুলোও যে কোথায় ডুব মারলে, তার সন্ধানও পেলাম না।

ভায়োলেটের সামনে এনে ব্রত চুপিচুপি বললে, "ইচ্ছে হয় এবার সেণ্টিমেণ্টালিজমের চর্চ্চা কর্, আপত্তি নেই।"

বহুদিন পর ভায়োলেটের সঙ্গে দেখা—খুশীই হলাম। সে তার রূপ-ভারাবনত ক্ষীণ তনুকে লীলায়িত ক'রে বললে— "চ্যাটার্জ্জী, এখানটা বড্ড ভীড়, let's go somewhere else."

আলো-ছায়া-বিজড়িত একটা নিরালা কোণে ব'সে তার সঙ্গে গল্প ক'রে ফিরছি, হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল—সুনন্দাকে ঘিরে অনেকে জটলা করছে। মিঃ সিনা সুনন্দার পায়ের কাছে অর্দ্ধশায়িতভাবে বসে কি যেন অত্যন্ত মনোযোগে চোখ-কান দিয়ে শুনছেন। ব্যাপারটা নতুন নয়, অস্বাভাবিক নয়, অন্যায় ত নয়ই। এই রকমই হয়ে থাকে। আমার ওপর সুনন্দার দৃষ্টি পড়েছিল, দেখলাম ওর ঠোঁটে চাপা হাসির বিদ্যুৎ চমকে উঠল।

আমি ভায়োলেটকে বললাম, "ভায়োলেট, সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?"

তার রাগ-অলস, পক্ষ্মচ্ছায়াচ্ছন্ন চোখ দুটিকে আমার চোখের ওপর রেখে, একটা অদ্ভুত মোহময় হাসি হেসে উত্তর দিলে, "Indeed! no."

আমি জানতাম সুনন্দার রূপটা ভায়োলেটের কোনদিনই সইত না। আমাকে যথেষ্ট পছন্দ করলেও সুনন্দাকে বিশেষ করত না। সুনন্দাও তাই। যদিও পরস্পরের মৌখিক সৌহার্দ্যটা কিছুমাত্র কম ছিল না, বরং দেখা হ'লে যেন একটু বেশীই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত ওরা।

আমার পাশ দিয়ে ব্রত চলে গেল। সমস্ত মুখখানায় চাপা হাসি ফেটে পড়তে চাইছে। কিন্তু ব্রত ত চিরদিনই হাসে। আজকের হাসিতে কিছু বিশেষত্ব আছে কি ?

* * *

সুনন্দার 'কারে'ই ফিরছিলাম। ড্রাইভার চালাচ্ছিল।

আমার পাশে সুনন্দা। হঠাৎ সে আমার পানে চেয়ে একটু হেসে বললে, "আজ তোমার হয়েছিল কি ?"

আমার নিজেরও তাই মনে হ'ল। সত্যিই ত আমার হয়েছিল কি ? ঐ ত সুনন্দা। রূপময়ী, মোহময়ী। কিছু ত অস্বাভাবিক লাগছে না। বেমানানও মনে হচ্ছে না ...তবে ?

হেসেই উত্তর দিলাম, "বোধ করি একটু ভাবপ্রবণ, একটু কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। বাস্তবতায় অরুচি ধ'রে গিয়েছিল, একটু মুখ বদলালাম আর কি।"

"মন্দ নয়। কিন্তু ভাবের ঘোর কাটল কি ভায়োলেটের ছোঁওয়া লেগে ?"

"বোধ করি। কিন্তু সিনার আজকের 'ম্যাসিডুয়িটি' প্রশংসনীয়। ওকে একবারও অন্য কোথাও যেতে দেখলাম না আজ। তুমিই বুঝি আজ ওর 'গেষ্ট অব অনার' সুনন্দা ? আত্মসমর্পণের অমন আন্তরিক, অকপট অভিনয় আর দেখি নি। তোমার চরণতলে ওকে বড় মানিয়েছিল! My heartfelt compliments, Mrs. Chatterjee."

সজ্জা-সুন্দর লীলায়িত দেহখানাকে অভিবাদনের ভঙ্গীতে ঈষৎ নমিত ক'রে সুনন্দা উত্তর দিলে, "Thanks Mr. Chatterjee."

দু-জনেই হাসলাম। এতে আমাদের রাগ হয় না, ঈর্ষাও নয়। সয়ে গেছে। অভ্যস্ত আমরা। পরস্পর পরস্পরকে কটাক্ষ করি। তাতে সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হয় না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাল ক'রে বসলাম।

মেঘদূতের অনুবাদ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী

পরমপ্রীতিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য
মহাশয়ের সমীপে—

প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন—

প্রিয় সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়,

আপনার মেঘদূতখানি উপহার পাইয়া অত্যন্ত অনুগৃহীত হইয়াছি। এজন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিবেন।

প্রথমেই বলি, আমি ইহা আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি, এবং পড়িবার সময় কোন ক্লান্তি অনুভব করি নাই, অনুভব করিয়াছি বস্তুতই পরম আনন্দ। আমি অকপট হৃদয়ে বলিতে পারি আপনার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে ইহা নিজের স্থান অচিরেই অধিকার করিয়া লইবে। যাঁহারা বাঙলায় পদ্যে মেঘদূত পড়িতে চান তাঁহাদিগকে আপনার এই অনুবাদ পড়িতেই হইবে বলিয়া আমি মনে করি

আপনার ছন্দটি একদিকে যেমন বর্ণনীয় বিষয়ের অনুকূল, অপর দিকে তেমনি মূল সংস্কৃত ছন্দটির অনুরূপ হইয়াছে। মন্দাক্রান্তাকে পরিহার করিয়া খুব ভাল করিয়াছেন, বুদ্ধিমানের কাজ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আপনার নিবেদনে বৈষ্ণব কবিদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা খাঁটি সত্য। কিন্তু ইহা কেবল ভাব ও ছন্দেরই সম্বন্ধে নহে; সংস্কৃত হইতে বাঙলায় অনুবাদেও বৈষ্ণব কবিদেরই পদ্ধতি অনুসরণীয় বলিয়া আমার মনে হয়। এ কথা বহুদিন হইল আমার মনে জাগিয়াছিল, আজ তাহা প্রকাশ করিবার অবসর হইল। বৈষ্ণব কবিরা সংস্কৃত হইতে ভাষায় বহু অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদ নহে, কিন্তু তাহা হইলেও বহু স্থলে মূলের ভাবটি তাহাতে অতি প্রাঞ্জল ও অবিকল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আপনারও অনুবাদে আমি ইহা দেখিতে পাইতেছি। দুই একটি উদাহরণ দিতে পারা যায়:—

মূল

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা। পূর্ব্ব, ৭।

অনুবাদ

তাপিত যে জন, ওহে নবঘন! তুমি ত শরণ তার
কুবেরের কোপে প্রিয়া-হারা মোর লও গো বারতা-ভার;
যেতে হবে তব যক্ষপতির বাসভূমি অলকায়,—
সিত গৃহ যার—উপবনবাসি-হরশির-চাঁদিমায়।

ইহা সুন্দর। মূলের সমস্ত ভাব ইহাতে পাওয়া যায়। তবে একটা কথা এখানে লক্ষ্য করিবার এই যে, প্রথম পঙ্‌ক্তিতে "নবঘন" এই শব্দে 'নব' বিশেষণটি অনাবশ্যক, ইহা মূলে নাই, কেবল অনুবাদে ছন্দপূরণের সাহায্য করিয়াছে। 'নবঘন' স্থলে 'পয়োধর' বা ঐরূপ কোনো শব্দ অনায়াসেই দেওয়া যাইত।

মূল

মন্দং মন্দং নুদতিপবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়ন সুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ। পূর্ব্ব, ৯।

অনুবাদ

অনুকূল বায় যখন তোমায় ধীরে ধীরে লয়ে যায়,
বাম পাশে থাকি মত্ত চাতক সুমধুর সুরে গায়,
গর্ভাধানের উৎসব-রসে আকাশে মালিকা গাঁথি,
সত্যই তোমা আঁখি-বিনোদন! সেবিবে বলাকা-পাঁতি।

মূল

তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখাস্যা—
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থিগাঢ়োপগূঢ়ম্। উত্তর, ৩৬।

অনুবাদ

সেই কালে যদি ওগো জলধর! ঘুম-সুখে রয় প্রিয়া,
একটি প্রহর রহিয়ো নীরবে তাহার শিয়রে গিয়া;
অতি দুখে মোরে স্বপনে পাইয়া যেন ভুজলতা তার
আমার কণ্ঠে দৃঢ়বেষ্টন নাহি করে পরিহার।

মূল

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈব।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য! সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপগতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ। উত্তর, ৩৯।

অনুবাদ

এ কথা কহিলে, পবন-তনয়ে জানকীর মত প্রিয়া—
উন্মুখী হ'য়ে তোমারে হেরিবে সাদরে আকুল-হিয়া;
পরে সাবধানে শুনিবে সকল; সৌম্য! রমণীদের—
সুহৃদের দে'য়া প্রিয়ের বারতা অনুরূপ মিলনের।

মূল

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ কচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥ উত্তর, ৪৩।

অনুবাদ

শ্যামায় অঙ্গ, চকিত-হরিণী-নয়নে চাহনি-ভাস,
শশীতে মুখের লাবণ্য, কলাপি-কলাপে চিকুর-পাশ,
তটিনীর তনুলহরীতে ভ্রূর বিলাস দেখিতে পাই
হায় গো মানিনি! একঠাঁয়ে তব সকল তুলনা নাই।

এই সব অনুবাদ চমৎকার, এবং বস্তুই উপভোগ্য।

এই অনুবাদখানি বস্তুতই অতি উপাদেয়। তাই যদি ইহাতে কোন দোষ বা ত্রুটি থাকে তবে অপনয়ন করিয়া ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করা ভাল। এই উদ্দেশ্যে নিয়ে কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখিতেছি কোনো কোনো স্থলে মূলের ভাব ঠিক প্রকাশ পায় নাই। যেমন

মূল

অন্তঃসারং ঘন। তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়। পূর্ব্ব, ২০।

অনুবাদ

সারবান্ হলে জিনিতে তোমায় বায়ু হবে বলহীন।
পূর্ণ-ই শুধু গৌরব পায় লঘুতা লভয়ে দীন।

'তুলয়িতুং'কে 'জিনিতে' দ্বারা প্রকাশ করা যায় কি? এখানে প্রথম চরণে 'পারিবে না' এইরূপ কিছু লিখিয়া নিষেধকে সাক্ষাৎ প্রকাশ করা উচিত ছিল। দ্বিতীয় চরণে 'পূর্ণ' ও 'রিক্ত' আছে। দ্বিতীয় শব্দটির ভাব 'দীন' পদের দ্বারা ঠিক প্রকাশ পায় কি?

মূল

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিত বসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ। পূর্ব্ব, ৪৩।

অনুবাদ

তব বরষণে পুষ্ট ধরার সৌরভে মধু-গন্ধ,
দ্বিরদেরা তাই পান করে যারে মুখরি' নাসিক মন্দ;

মূলে ও অনুবাদে অনেক ভেদ হইয়া গিয়াছে মনে হয়।

মূল

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং—পূর্ব্ব, ৬২।

অনুবাদ

সত্যই সেথা বলয়-মকর-আঘাতে ছুটায় জল।

মূলে আছে "বলয় কুলিশ" অনুবাদে কুলিশের অর্থ করা গিয়াছে 'মকর' ইহা ঠিক নহে। এইরূপ মূলে "হরিত কাপিশ" (পূর্ব্ব, ২১) অর্থে 'হরিত হিরণ'; "অণুকচ্ছ" 'সলিলশিয়রে'; "অধিক সুরভি" অর্থে 'নব সুরভি' সঙ্গত মনে হয় না। এইরূপ "ধৌতাপাঙ্গ (শুক্লাপাঙ্গ) অর্থে 'সিত আঁখি' (পূর্ব্ব, ৪৫), "জীর্ণ" (পত্র) বুঝাইতে 'পলিত' (পূর্ব্ব, ৩০) ভাল মনে হয় না। মূলের "দীর্ঘযাম" (ত্রিযামা) বুঝাইতে 'গুরুযামা' (উত্তর, ৫৭); "পেশল ইন্দ্রনীল" বুঝাইতে 'চারুনীলা" (উত্তর, ১৬) কেমন মনে হয়। "ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্" (উত্তর, ৪) এখানে "ভিত্ত্বা" বুঝাইতে 'টুটি' সঙ্গত মনে হয় না, কেনন ইহা অকর্ম্মক ক্রিয়া, মূলের ক্রিয়াটি সকর্ম্মক।

বইখানিতে এইরূপ এখানে সেখানে এক-আধটু ত্রুটি আছে বলিয়া মনে হয়। যদি তাহাই হয় তবে পরবর্ত্তী সংস্করণে (আশা করা যায়, ইহা অনতিবিলম্বে হইবে), ইহা সংশোধন করিয়া দিলে ভাল হইবে। অধ্যাপক দাশ-গুপ্তের ভূমিকা অনুবাদখানির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে।

ইতি ১০ই পৌষ, ১৩৪২।

স্বরলিপি

কোথা হ'তে এলে কোথা যাবে তুমি কে জানে!
তবু জানি রবে চিরদিন নিভৃতের ধেয়ানে।
বনে অকারণ পুলক তোমার লাগে,
মনে অরূপের মোহন বিলাস জাগে ;
এই আসা-যাওয়া গেঁথে লব আজি কি গানে!
অতিথি তোমারে পরাব সুরের মালা,
অনুরাগ-দীপে করিব ভবন আলা।
তব উদ্দাম নৃত্যছন্দে মাতি,
উৎসুক হিয়া কাটাবে দিবসরাতি,
বনবীথিকারে মুখরিত করি কি গানে!

কথা, সুর ও স্বরলিপি—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I রা গা ধা । (ধ)পা মা গা I রা মা (ম)গা । রা সন্‌া সা I
কো থা হ তে এ লে কো থা যা বে তু মি

I রা গা মা । -া গা রা I রা পা পা । পক্ষা পক্ষা পা I
কে জা নে ০ ত বু জা নি র বে চি০ র

I পা -র্সা -নর্সা । -ধপা -পা -রা I রা গা মা । পা রা গা I
দি ০ ০০ ০০ ০ ন্ নি ভৃ তে র ধে য়া

I মা -পা -ধা । (ধ)পা মা -গা II
নে ০ ০ ও গো ০

-া -া I পা পা পা । না (ন)ধা -না I র্সা র্রা র্রা । র্গর্রা র্সা -না I
ব নে অ কা র ণ্ পু ল ক তো মা র্

I না র্সা -া । -া -া -া I র্সা র্গা (র্গ)র্রা । র্গা র্মা র্গা
লা গে ০ ০ ০ ০ ম নে অ রূ পে র

I র্রা র্গা র্মা । র্গা র্রা র্সা I র্সা -া না । ধা -া না I
মো হ ন বি লা স জা ০ ০ গে ০ ০

I র্সা -র্গা র্গর্রা । র্সা না র্সা I ধা ণা ধা । পা রা গা I
এ ই আ সা যাও য়া গেঁ থে ল ব আ জি

I মা ণা ণধা । পা -া রা II
কি ০ গা নে ০ ০

-া -া I{ মা পা পা । পা পা পা I পা ধা না । না র্সা সনা I
অ তি থি তো মা রে প রা ব সু রে র

I ধনা -র্সা র্সনা । ধপা -া -া I (পা ধর্সা র্সা । র্সা র্সা র্রর্সা I
মা ০ ০ লা ০ ০ অ সু রা গ দী পে

I র্সনা র্সা না । না ধা পা I পা -া ধা । না -া -মা) } I
ক রি ব ভ ব ন আ ০ ০ লা ০ ০

I পা পা পা । -না নধা না I র্সা -া -র্রা । র্গর্রা -া র্সা I
ত ব উ ০ দ্দা ম নৃ ০ ত্য ছ ন্ দে

I না র্সা -া । -া -া -া I র্সা র্গা র্গর্রা । র্গা র্মা র্গা I
মা তি ০ ০ ০ ০ উ ৎ সু ক হি য়া

I র্রা র্গা র্মা । র্গা র্রা র্সা I র্সা -া না । ধা -া -না I
কা টা বে দি ব স রা ০ ০ তি ০ ০

I র্সা র্সর্গা র্গর্রা । র্সা না র্সা I ধা ণা ধা । পা রা গা I
ব ন বী থি কা রে মু খ রি ত ক রি

I মা -ণা ণধা । পা -া রা II II
কি ০ গা নে ০ ০

বাগ্‌দত্তা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রাণুর সঙ্গে রজত রায়ের আজ তিন মাস ধরিয়া পূর্ব্বরাগের পালা চলিতেছে, কিন্তু কিছু সুবিধা হইতেছে না। উভয় পক্ষ ধনী, বিবাহে কোন বাধা নাই, তবুও। রজত ইতিমধ্যে তিন বার মোটর ও চার বার বাসা বদল করিয়াছে, সাধনা অদম্য উৎসাহে চলিয়াছে, সিদ্ধির দিকে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

আসল কথা, প্রত্যেকের একটি করিয়া মর্ম্মস্থান আছে, সেখানে হাত না-পড়া পর্য্যন্ত সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই মর্ম্ম এত অবারিত যে হাত দিতেই সেখানে পড়ে। দু-এক জনের মর্ম্ম সত্যই রহস্যময়, আমাদের রাণু সেই দলের। রজত কি ছাই এত কথা বোঝে, না তাহার ভাবিবার সময় আছে! সে নিয়ত আসে যায়, রাণুর সঙ্গে গল্প করে, গান শোনে, চা খায়; সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে মুখ গম্ভীর করিয়া মোটর হাঁকাইয়া বাড়ি ফেরে। অবশেষে উভয় পক্ষের কর্ত্তারা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রজতের ব্যারিষ্টার পিতা তাহাকে শুভবিবাহের এক মাসের নোটিশ দিলেন। শুনিয়া রজত তৃতীয়তম মোটর হাঁকাইয়া রাণুর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণুর কাছে খবর গেল। রজত বসিয়া টেবিলের বই লইয়া নাড়িতে লাগিল। হাঁ, একটা কথা অনাবশ্যক মনে করিয়া বলি নাই, বিশেষ, শুনিলে হয়ত রাণুর উপরে পাঠকের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতে পারে, এমন কথাও মনে হইয়াছিল। কিন্তু আর গোপন করিয়া ফল নাই, রজতের হাতে এখনই তাহা ধরা পড়িবে। রাণু মহাভারত পড়ে। পয়ারে বাঁধা খাস কাশীদাসী গ্রন্থ।

বই নাড়িতে নাড়িতে রজত একখানি কাশীদাসী মহাভারত আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। বহু অধ্যয়নের চিহ্ন তাহার মার্জ্জিনে। তাহাতে ছোট বয়সের মোটা অক্ষর ও বড় বয়সের ছোট অক্ষর সবই আছে। সে অন্যমনস্ক ভাবে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ দেখিল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পাতায় লেখা আছে, "উঃ, অর্জ্জুন কত বড় বীর। নিশ্চয় অনেক বাঘ সে মারিয়াছে।" আবার, আর এক পাতায়, ভীমের বক রাক্ষস বধের ছবির তলায়,—"ভীম না জানি কত বাঘ মারিয়া ফেলিয়াছে।" এক, দুই, তিন! এক মুহূর্ত্তের মধ্যে রজতরঞ্জনের মনে একটা দিব্যদৃষ্টির বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল! এমন দিব্যদৃষ্টি লাভ জীবনে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। বাহিরে রাণুর পদশব্দ শোনা গেল। রজত মহাভারত যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ভদ্রলোকের মত বসিল। রাণু প্রবেশ করিতে সে বলিয়া উঠিল—রাণু আমায় দিন-পনরর ছুটি দিতে হবে!

"কেন?"

"একবার সুন্দরবনে যাব।"

রাণু ঠাট্টার সুরে বলিল, "জমিদারী দেখতে বুঝি,—নায়েবেরা খুব চুরি করছে!"

রজত বলিল, "হাঁ, জমিদারী ত দেখা দরকারই আর ঐ সঙ্গে গোটাকয়েক বাঘও মারব!"

'বাঘ'! রাণু চমকিত হইয়া উঠিল। রজত আড়চক্ষে তাহা লক্ষ্য করিল।

"আপনি বাঘ মারতে পারেন? কই, আমাকে ত বলেন নি?"

রজত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, "হামেশাই ত মারছি, কত বলব! আমি যে দু-বেলা ভাত খাই, তা-ও ত তোমাকে বলি নি।"

রাণু বিস্মিত ভাবে বলিল, "কিন্তু আপনাকে দেখে ত মনে হয় না যে আপনি বাঘ মারেন।"

রজত চেয়ার হেলান দিতে দিতে বলিল, "আমাকে দেখে কার কি মনে হবে সেজন্য কি আমি দায়ী?"

"আপনি ক'টা বাঘ মেরেছেন?"

"হবে পঞ্চাশ-ষাটটা"

"তার মধ্যে রয়াল বেঙ্গল ক'টা?"

রজত হাসিয়া বলিল, "রয়াল বেঙ্গল ছাড়া ত আমি অন্য কিছু মারি নে।"

রাণু এত ক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, এবার বসিয়া পড়িল।

রজত এত ক্ষণ বসিয়াছিল, এবার দাঁড়াইয়া উঠিল; কহিল, "চলি তবে।"

"না, না, একটু বসুন; চা খেয়ে নিন।"

চা হইল, জলযোগ হইল। রজত চা পান করিয়া বুঝিল আজকার চায়ে চিনির সঙ্গে রাণুর অনুরাগ মিশিয়াছে।

রজত জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল রাণু, তোমার জন্য একটা বাঘ আনব না কি?"

রাণু বিস্মিত আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ, মজা হবে, বেশ মজা হবে।"

রজত ধীর ভাবে প্রশ্ন করিল, "জ্যান্ত না মরা?"

রাণু ভীতভাবে বলিল, "জ্যান্ত? না, না, সে হবে না।"

"আচ্ছা তবে মরা-ই আনব," এই বলিয়া রজত উঠিয়া পড়িল।

রাণু দুয়ার পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিল; একবার থামিল, একবার ইতস্তত করিল, একবার কাশিল, তার পরে বলিয়া উঠিল, "না-হয় বাঘ-শিকারে না-ই গেলেন!"

রজত হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

রাণু লজ্জাজড়িত উৎকণ্ঠার সহিত বলিল, "তবে একটু সাবধানে থাক্‌বেন। কবে আসবেন?"

"দিন-পনরর মধ্যে" বলিতে বলিতে রজত আর একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাহির হইয়া আসিল। রজত আজ রাণুর চোখে এমন একটি আশ্বাসভরা দীপ্তি এবং সিক্তপ্রায় আঁখিপল্লবের ভঙ্গী দেখিতে পাইয়াছে, যাহাতে সে বুঝিল বহুদিন অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া দূরে দীপের আলো দেখিয়া কলম্বসের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, আর কি সান্ত্বনা পাইয়াছিল সেই হতাশ নাবিক সমুদ্রের জলে সদ্যভগ্ন বৃক্ষপল্লবের সাক্ষাতে।

দিন-পনর পরে একদিন বিকালে রাণুদের বাড়িতে রজতের মোটর আসিয়া থামিল। রজত লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, এবং পাঁচ-সাত জন লোকের সাহায্যে টানিয়া নামাইল প্রকাণ্ড এক বাঘ। রাণুর এত দিন উৎকণ্ঠায় কাটিতেছিল, খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল; দেখিল সত্যসত্যই তাহার বাঘ আসিয়াছে, একেবারে খাঁটি রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

রাণু বিস্ময়ে, ভয়ে, গর্ব্বে, উল্লাসে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে মাপিয়া দেখিল বাঘটা নাক হইতে লেজের ডগা পর্য্যন্ত পাকা নয় ফুট! রজত রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। রাণু জিজ্ঞাসা করিল, "রুমালে রক্ত কিসের? আপনার?"

রজত হাসিয়া বলিল, "বাঘের।"

রাণু ছোঁ মারিয়া রুমাল কাড়িয়া লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। রজত তাহাকে অনুসরণ করিল।

ঘরের মধ্যে কি হইল জানি না। কিন্তু যখন রজত বাহির হইয়া আসিল তাহার মুখে কলম্বসের আমেরিকা-আবিষ্কারের গর্ব্ব ও তৃপ্তি।

রজত রাণুর বাপের কাছে তাহার প্রার্থনা জানাইল। তিনি আনন্দে তাহার করমর্দ্দন করিলেন। পরের দিন আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। রাণু রজতের বাগ্‌দত্তা বধূ।

বিবাহের দিন পয়লা বৈশাখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রজত প্রত্যহ আসে, গল্প করে, চা খায়, রাণুর সঙ্গে কয়েকটা ঘণ্টা কাটাইয়া বাড়ি ফেরে। সেদিন বাঘ-শিকারের গল্প হইতেছিল। রাণু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি গাছে উঠে বাঘ মার?"

রজত সিগারেটে শেষ টান মারিয়া বলিল, "প্রথমে তাই করতাম, এখন মাটিতে দাঁড়িয়ে মারি!"

রাণু শিহরিয়া উঠিল।

"আচ্ছা ক'টা গুলিতে বাঘ মরে?"

"একটা! দেখ নি বাঘটার দুই চোখের মাঝখানে গুলির দাগ!"

রাণু দেখিয়াছে বটে।

অনেক রাতে রজত উঠিয়া গেল। রাণু যাইবার সময় তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে সে আর বাঘ মারিবে না। কিন্তু রজত কি প্রতিজ্ঞা করিতে চায়! শিকার না করিতে পারিলে তাহার আর বাঁচিয়া লাভ কি! অবশেষে অনেক অনুযোগ, অনুরোধ, অভিমানের পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রজত প্রতিজ্ঞা করিল। রাণুর বুক গর্ব্বে ফুলিয়া

উঠিল, রজত সত্যই তাহাকে ভালবাসে নহিলে এত বড় ত্যাগস্বীকার করিবে কেন ?

রাণু বসিয়া ভাবিতে লাগিল, শিকারের কাহিনী, সুন্দর-বনের গভীর অরণ্য ; পালে পালে হরিণ ; ইতস্তত বাঘ ; যেখানে-সেখানে অজগর সাপের দল। তার মধ্যে একাকী বন্দুকধারী বীরপুরুষ ! উঃ, তার কল্পনা বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিল। এমন স্বামী-সৌভাগ্য তার হইবে সে কখনই ভাবে নাই। রাত এগারটা বাজে দেখিয়া সে উঠিয়া পড়িল ; দেখিল রজত একখানি বই ফেলিয়া গিয়াছে, আধুনিকতম একখানা কন্টিনেন্টাল উপন্যাস। রাণু বইটি লইয়া বিছানায় আসিয়া শুইল। বইখানা পড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে কি মন বসে ! প্রথমেই দুই রুগ্ন যুবক-যুবতীর চা-পানের কাহিনী ! কোথায় সুন্দরবনে বাঘ-শিকার, আর কোথায় চা-পানের গল্প ! নাঃ, জীবনে যদি কোথাও রোমান্স থাকে তবে তাহা ওই সুন্দরবনে। রাণু বই ফেলিয়া দিল। পাতার মধ্য হইতে একখানা কাগজ উড়িয়া পড়িল। বোধ হয় রজত পাতায় চিহ্ন রাখিয়াছে মনে করিয়া রাণু কাগজখানা তুলিল, দোকানের বিল। রজতের নাম দেখিয়া রাণু পড়িল, লেখা আছে—Supplied to Mr. Rajat Ranjon Ray a Royal Bengal tiger measuring nine feet from head to tail for Rs. 350 only less advance Rs. 100—Rs. 250 only.

হাঁ, দোকানের বিলই বটে। একেবারে সাহেবী দোকানের। ম্যানেজারের অস্পষ্ট নাম-সহিটি পর্য্যন্ত নিভুর্ল। বিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাণুর মগজের মধ্যে এক ঝলক দিব্যদৃষ্টি খেলিয়া গেল এবং সে ভারী একটি স্বস্তি অনুভব করিল।

ইহার পরে ঘটনা সংক্ষেপ। পাঠক ভাবিতেছেন বিবাহ ভাঙিয়া গেল। তাহা নয়, বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়াছিল, আমরা নিমন্ত্রণ খাইয়াছি। রাণু কোনদিন সে বিলের কথা রজতকে জানায় নাই। রজত মাঝে মাঝে শিকারে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। রাণু তাহাকে প্রতিজ্ঞার কথা মনে করাইয়া দিত। সেই নয় ফুট দীর্ঘ বাঘটার মাথা রাণুর বসিবার ঘরের দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখা হইল। রাণু তাহার তলায় লিখিয়া দিল—যতোধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ। রজত চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও আবার কি ?"

রাণু বলিল, "ও একটা সখ।"

রজত নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিল ওটা বোধ হয় রাণুর একটা মহাভারতীয় সংস্কার।

বর্ষশেষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবীতে আসা-যাওয়া দুইই সত্য, লাভক্ষতি জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ পাশাপাশিই চলেছে। তবু একটা দিনকে আমরা বিশেষভাবে চিহ্নিত ক'রে নিই, মনটাকে রাখতে চাই শেষ হওয়ার দিকে, ক্ষয়ক্ষতি বিচ্ছেদবেদনার দিকে। জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ জীবনের প্রতিক্ষণেই আছে—কিছু আসে কিছু যায়। তবু এক সময় আমরা ভয় নিয়ে আসি ভগবানের কাছে, বলি ভয় দূর কর, দুঃখ দূর কর। প্রিয়বিচ্ছেদে দাও সান্ত্বনা, এই যে অন্ধকার, এই যে ক্ষতি এর হাত থেকে বাঁচাও।

এই সংসারে মানুষ প্রথম পূজা এনেছে ভয় থেকে। সেদিন মানুষ জানতো না, অমোঘ নিয়ম এই জগতের, এর মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। তাই অকস্মাৎ যখন কোন ঝড় এসেছে, আঘাত এসেছে পশু কি মানুষের কাছ থেকে, প্রবল কোন শত্রু আক্রমণ করেছে, তখন সে এসেছে প্রবলতর দেবতার কাছে পরিত্রাণ ভিক্ষা করতে। সেদিন খুব ছোট হয়েই সে তার দেবতার কাছে এসেছে তার মনুষ্যত্বকে আত্মনির্ভরকে খর্ব্ব ক'রে, বলেছে তুমি বাঁচাও আমাকে। কত তার অনুষ্ঠান সেই পূজার, কত জীবহত্যা, রক্তে ভাসিয়েছে পৃথিবী—ভেবেছে, যিনি আমাকে মারতে পারেন তাঁকে খুশী করতে হবে হিংস্রতা দিয়ে, তবেই আমি বাঁচব। আপনার অপঘাত বাঁচাবার জন্য মানুষ কত নির্দ্দোষ পশুকে মেরেছে, মনে করেছে যিনি ভয় দিয়েছেন তাঁর পূজা হবে নিষ্ঠুর রক্তপাতে—নিষ্ঠুর তিনি, তাঁর দয়া নেই। অন্যকেও বেদনা দিয়েছে নিজেও বেদনা পেয়েছে, কত রকমের অদ্ভুত কৃচ্ছ্রসাধন করেছে। ক্রমাগতই সে বলেছে, নিষ্ঠুর আমার দেবতা, নিষ্ঠুরতাতেই তাঁর আনন্দ, তারই উপকরণ যদি জোগাই তবেই আমি সিদ্ধিলাভ করব—এই বলে সে পশুবধ করেছে, মনুষ্য বলি দিয়েছে। এই ভয়বোধ থেকে মানুষ হয়েছে নিষ্ঠুর, হিংস্র।

এই ভয়কেই যদি আজকের দিনে আমরা সামনে নিয়ে আসি তবে আমরা কলুষ নিয়ে দুর্ব্বলতা নিয়ে আসব, তাঁর প্রতি অবিশ্বাস নিয়ে আসব। সমস্ত দুঃখ মেনে নিয়ে আমরা আজ বলব, আমি যে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছি, সমস্ত দুঃখ বেদনাকে আমরা জয় করব। এমন কিছু আমার মধ্যে আছে যা মৃত্যুঞ্জয়, এমন আরোগ্যতত্ত্ব এমন অমৃত আছে যা সমস্ত দুঃখকেই আত্মসাৎ করতে পারে। সেই শক্তির জন্যই আজ আমাদের প্রার্থনা, দুঃখকে বীর্য্য দিয়ে জয় করব এই কথাটাই যেন আজ আমরা বল্‌তে পারি। বর্ষশেষের প্রার্থনায় আজ এমন কথা বলব না যে সেই দুঃখের ধারাকে নিবৃত্ত কর, বল্‌ব আমাকে সেই বীর্য্য দাও যাতে সকল দুঃখের উর্দ্ধে উঠতে পারি। আত্মাকে তো মৃত্যু আঘাত করে না, কোনো ক্ষয়ক্ষতি স্পর্শ করে না। আমার পরাভব নেই, তুমি আমাকে মানুষ করেছ—এই ব'লে মানুষ পরম গৌরবে আসুক তাঁর মন্দিরে—তাঁরচরণতলে এই প্রমাণ করুক যে, যে-মানুষ সৃষ্টি করে তার পরাজয় নেই, মৃত্যুর পরাভবকে সে স্বীকার করে না। তাঁর হাতের জয়তিলক তিনি মানুষের ললাটে পরিয়েছেন। সেই গৌরবে কত দুঃখ কত ক্ষতি কত মৃত্যু তাকে সইতে হয়েছে তবু নির্ভয়ে সে চলেছে তাঁর অভিসারে, আপনাকে পেয়ে জয়ী হয়েছে। ভয় পেয়েছে তো পশু—মানুষ তো ভয় পায় না, সে ভগবানকে বলেছে আমরা তোমার অভয় আশ্রয় চেয়েছি তুমি আমাদের ভয় দূর ক'রে দেবে ব'লে নয়, আমরা ভয় জয় করব ব'লে।

অন্ধকারে ভয় আপনাকে বাড়িয়ে দেখে। আমাদের মধ্যে যে ছোট-আমি আছে তারই ছায়ায় আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠি। রাত্রির অন্ধকারে পশু ভয় পায় না—কিন্তু গ্রহণের অন্ধকারে কাকপক্ষী আশঙ্কায় ভয়ে স্তব্ধ—কারণ এর মধ্যে সামঞ্জস্য নেই, এটা আকস্মিক। দিনের সঙ্গে রাত্রি সামঞ্জস্য-সূত্রে গাঁথা, তাই রাত্রির আবির্ভাবে ভয় নেই। মানুষেরও যে-মোহ তার মধ্যেই তার ভয়—সেই ভয় দূর করতে হ'লে ছোট আমি-কে সরিয়ে দিতে হয়। সমস্ত বিশ্বের মধ্যে

আপনার মিলনকে দেখতে পারলে ভয় দূর হয়ে যায়। যত ভয় সে এই কৃত্রিম ছায়াতেই, তাই অথর্ব্ববেদে বলেছে

যথাহশ্চ রাত্রী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।

—হে আমার প্রাণ, ভয় ক'রো না—দিন ত রাত্রিকে ভয় করে না, এদের সম্বন্ধ সহজ, এদের মধ্যে বিরুদ্ধতা নেই—এরা হাতধরাধরি ক'রে চক্রের মত নৃত্য করছে। হে আমার প্রাণ, ভয় ক'রো না।

যথা ভূতং চ ভব্যঞ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।

—এই যে অতীতকাল ও ভবিষ্যৎকাল এরা তো পরস্পরকে ভয় করছে না ঈর্ষা করছে না। হে আমার প্রাণ, তুমি এদের মত সহজ হও, ভয় ক'রো না।

ভয় হচ্ছে কৃত্রিম অন্ধকারে, আমার চৈতন্য যেখানে অবরুদ্ধ, সেইখানে যে ছোট-আমি-র প্রভাব। স্বার্থসাধনার কত ভয়, কেবলই চিন্তা—বুঝি ঠকলুম, বুঝি আমার ধনসম্পত্তি চোরে নেবে তাই ভয়। আমার অহং যেখানে ছায়া ফেলেছে সেখানেই ভয়—অন্ধকারে বিচ্ছিন্ন তথ্যকে আঁকড়ে ধরে মনে করি এই সত্য—এ গেলে আমার সবই গেল। কিন্তু সকল আলোকের মধ্যে যে মিল তাকে দেখতে পেলে, পরম আশ্রয়কে লাভ করলে আর ভয় নেই। সেই মন্ত্রে বলেছে

দিষ্টং নো অত্র জরসে নি নেষজ্
জরা মৃত্যবে পরি ণো দদাত্বথ
পক্বেন সহ সং ভবেম।

—আমাকে অদৃষ্ট তো নিয়ে যাবেই জরাতে, জরা নিয়ে যাবে মৃত্যুতে—তাতে ভয় কিসের? সেই তো আমার চরম পরিণতি, মৃত্যুর সেই পরিপূর্ণতার রূপে আমি সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলিত হব—তাতে ভয় কিসের? মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে যেন এই রকম জোরের সঙ্গেই আমরা বল্‌তে পারি এই আমাদের জীবনের চরম পরিপূর্ণতা।

আমাদের এই জীবনে কত বেদনা কত আনন্দ কত সাধনা—এ কি একটা অপরিণতিতে শেষ হবে? সে কথাটা খাপছাড়া মনে হয়। জীবনে কত বিচিত্ররূপে সত্যের প্রকাশ, কত আনন্দ জলে স্থলে আকাশে—এ কি নিরর্থক হ'তে পারে? যে বল্‌তে পেরেছে আমার আর কিছুতে প্রয়োজন নেই, সে অপেক্ষায় আছে সেই চরম পাওয়ার যার পরে আর চাইবার কিছু নেই, তখন সে চায় সম্পূর্ণকে, পরিণতিকে। এই চাওয়া নির্ভীকের, বীরের। সে বলেছে, মৃত্যু জরা আসে আসুক—সেই মৃত্যুতে আমি মিলব পরমপরিপূর্ণের সঙ্গে। এই বীর্য্যের কথাই যেন আজ আমরা বলতে পারি। আমাদের ছোট-আমি বিশ্বাসহীন, তাই তার ভয় অন্ধকারকে। যাক চলে আমাদের জীবন থেকে এই সংশয়, আজকের সূর্য্যাস্তের সঙ্গে বিসর্জন দিই সব ভয় যা আমাদের পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়; দিন যেমন সহজে সূর্য্যাস্তের তোরণ পার হয়ে অসীম নক্ষত্রলোকের শান্তির মধ্যে উত্তীর্ণ হয়, তেমনি জীবনের তোরণের পর তোরণ উত্তীর্ণ হয়ে অবশেষে চরম পরিণতিতে নির্ভয়ে পৌঁছবার আকাঙ্ক্ষা যেন আমরা স্থির রাখতে পারি। বর্ষশেষের এই প্রার্থনা।

চৈত্রসংক্রান্তি ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

ভ্রম-সংশোধন

গত ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান" প্রবন্ধের শেষ বাক্যটিতে ("শুধু উপভোগ করবার উদ্দেশে জগতে জন্মগ্রহণ করে...") 'উদ্দেশে" শব্দটির পরে "নয়" শব্দটি বাদ পড়ায় অর্থ-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। শেষ বাক্যটি এইরূপ হইবে :—

"শুধু উপভোগ করবার উদ্দেশে নয়, জগতে জন্মগ্রহণ ক'রে সুন্দরকে দেখেছি, মহৎকে পেয়েছি, ভালবেসেছি ভালবাসার ধনকে, এই কথাটি মানুষকে জানিয়ে যাবার অধিকার ও শক্তি দান করতে পারে এমন শিক্ষার সুযোগ পেয়ে দেশ ধন্য হোক, দেশের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা অমৃত-অভিষিক্ত গীতলোকে অমরত্ব লাভ করুক।"

জন্মস্বত্ব

শ্রীসীতা দেবী

(২৩)

প্রথম দিনটা ত কোন মতে কাটিয়া গেল, তাহার পর সময় যেন আর কাটিতে চায় না। মমতা ভাবিয়া পায় না, বারোটা ঘণ্টা সে কি করিবে। কাজকর্ম্ম কিছুই নাই, একটা কাজ করিবার তিনটা করিয়া মানুষ আছে। পড়িবার বই সব সে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু পড়ায় সে এক মিনিটও মন দিতে পারে না। বাহিরের আকাশ, চারি দিকের উন্মুক্ত প্রান্তর, দিগন্তে বিলীয়মান গাছের শ্যামশ্রেণী তাহার দুই চোখকে টানিয়া নেয়, মন তাহারই ভিতর ডুবিয়া যায়, হাতের বই কখন হাত হইতে খসিয়া পড়ে—তাহার খেয়াল থাকে না। কিন্তু শুধু বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সারাটা দিন ত কাটে না? মনের ভিতরটা কেবলই অস্থির অশান্ত হইয়া ওঠে, কেমন যেন হু হু করিতে থাকে। এখানে আসিয়া সে শান্তি পাইবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু শান্তি পাইল কই? কলিকাতার চেয়েও যেন এখানটা তাহার অসহ্য বোধ হইতেছে। সেখানে সে নিশ্চয় করিয়া জানিত যে অমরের দেখা পাইবে না, কারণ অমর সে দেশেই নাই। কিন্তু এখানে সে যে অতি নিকটে, একেবারে ঘরের পাশে, দৈব সদয় থাকিলে মমতা তাহাকে দিনে দশ বার দেখিতে পাইত। এখানেও কেন নিষ্করুণ ভাগ্য তাহাকে এমন করিয়া বঞ্চিত করে? চোখে একবার দেখা, তাহাও কি এত বেশী? এটুকুও কি পাইতে নাই?

বাড়ির অন্য সকলেরও সময় ভাল কাটিতেছিল না। সুরেশ্বর আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, যে, সশরীরে উপস্থিত হইয়া একটু ধমক ধামক করিলেই দুষ্ট প্রজারা শিষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিলেন অবস্থা অত সহজ নয়। যাহাদের শেষ সম্বল খড়ের ঘর, গরু বাছুর পর্য্যন্ত বন্যা-স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহারা ধমক খাইলেও খাজনা দিতে পারে না। উৎপীড়িত হওয়া তাহাদের বহু শতাব্দীর অভ্যাস, মুখ বুজিয়া সব তাহারা সহ্য করে, কিন্তু টাকা দেয় না।

সুরেশ্বর স্থির করিলেন এখানে বসিয়া মুষ্টিমেয় প্রজার উপর তম্বি না করিয়া সারা জমিদারী ঘুরিয়া বেড়াইবেন; তাহা হইলে কিছু কাজ হইলেও হইতে পারে। সব জায়গায়ই ত কলিকাতার এই দুষ্ট স্বেচ্ছাসেবকের দল বসিয়া নাই? ইহারা এই স্থানে এমন করিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া থাকাতেই যে এখানকার প্রজারা এত অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে সে-বিষয়ে সুরেশ্বরের সন্দেহমাত্র ছিল না। এখান হইতে নড়িবার আগে এই কলিকাতার ডেঁপো ছোক্‌রাদের কি ভাবে সায়েস্তা করিয়া যাইবেন সে-বিষয়ে তিনি অনেক ফন্দি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যামিনীর দিন কলিকাতায়ও ভাল কাটিত না, এখানেও ভাল কাটিতেছিল না। সেখানে তবু কাজের একটা বাঁধাধরা নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। তাহারই অনুসরণ করিয়া দিন এক রকম কাটিয়া যাইত। এখানে তত কাজ নাই, এবং কলিকাতার নিয়মে এখানে কাজ করাও কঠিন। ঠিক সময়ে কাজ করার এখানে মূল্য নাই, চাকর-বাকর সুবিধামত যখন যাহা খুশী করে, অনেক বকাবকি করিয়াও তাহাদের শোধরান যায় না। সব চেয়ে তাঁহার অস্বস্তি লাগিত নিজের অক্ষমতায়। এই যে দরিদ্র, উৎপীড়িত, বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামবাসীর দল, ইহাদের দুর্গতি তিনি দিনের পর দিন চোখের উপর দেখিতেছেন, অথচ কিছুই তাঁহার করিবার উপায় নাই। সুরেশ্বর তাহাদের পিষিয়া ফেলিয়া টাকা আদায় করিবার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু তাহাদের মারিয়া ফেলিলেও ত তাহারা জমিদারের খাঁই মিটাইতে পারিবে না? এ ত আর চোখে দেখা যায় না! বরং দূরে যখন ছিলেন, তখনই ভাল ছিলেন।

সব চেয়ে ভাল ছিল সুজিত, যদিও আসিবার সময় আপত্তি করিয়াছিল সেই সকলের চেয়ে বেশী। এখানে কি করিয়া যে একটা ঘণ্টাও কাটিতে পারে তাহাই ছিল তাহার ভাবনার বিষয়। কিন্তু আসিয়া দেখিল কতকগুলি

সুবিধা এখানে আছে, যা কলিকাতায়ও নাই। এখানে যত ঘণ্টা খুশী বসিয়া মাছ ধরা যায়। একটা ঘোড়া বেশ ভালই পাওয়া গিয়াছে, সকাল সন্ধ্যা খুব দৌড় করান যায়। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী দুই ধারে দাঁড়াইয়া আভূমি নত হইয়া নমস্কার করে, তাহাও দেখিতে বেশ লাগে। মাইল দুই-তিন দূরে একটা বড় বিল আছে, সেখানে পাখী যথেষ্ট। একদিন গিয়া খানিকটা শিকার করিয়া আসা যায় কিনা, সে ভাবনাও সুজিত ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাবী জমিদার রূপে এখানে যতটা সম্মান সে পায়, কলিকাতায় তাহার দশ ভাগের এক ভাগও সে পাইত না। সুতরাং এখানে আসিয়া আর যেই ঠকুক সে ঠকে নাই।

তৃতীয় দিন সকাল হইতে আকাশটা একেবারে সুন্দর পরিষ্কার হইয়া গেল। কোথাও মেঘের লেশমাত্র নাই। বর্ষা শেষ হইয়া এবার শরৎ যে দেখা দিবে, কলিকাতায় তাহা এত স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায় না। ঘন নীল আকাশের দিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে চাহিয়া সুরেশ্বর বলিলেন, "এই রকম দিন থাকলে কালই বেরিয়ে পড়া যায়। আমি বাদলার ভয়েই দেরি করছিলাম।"

যামিনী বলিলেন, "এর পর আর বিষ্টি থাকবে না বোধ হয়, আশ্বিন মাস পড়ে গেল।"

সুজিত বলিল, "কাদাটা ভাল ক'রে শুকিয়ে গেলে ঐ কাগ্‌মারী বিলটায় একদিন শুটিঙে যেতাম। খুব পাখী আছে নাকি ওখানে।"

সুরেশ্বর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বড় সাপখোপ জায়গাটায়, গেলেও খুব সাবধানে যাবে।"

মমতা বলিল, "বাপ রে বাপ, এই একটা ঘরের মধ্যে ব'সে হাঁপিয়ে মরবার জো হয়েছে আমার। বিকেল অবধি এই রকম পরিষ্কার থাকলে আমি ঠিক একটু বেড়িয়ে আসব।"

এই প্রস্তাবই যদি যামিনীর মুখ দিয়া বাহির হইত, তাহা হইলে সুরেশ্বর একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিতেন। কিন্তু মমতার কোনো অনুরোধ আজ পর্য্যন্ত তিনি ঠেলিতে পারেন নাই। বলিলেন, "তা যেও ঐ পূব দিকের মাঠটায়। বেশ পরিষ্কার, ঝোপঝাপ বেশী নেই, আর লোকজনের বসতিও তত নেই। এক জন ঝি আর এক জন দরোয়ান সঙ্গে নিও।"

কথাবার্ত্তা হইতেছিল সকালে চায়ের টেবিলে। মমতা আর যামিনী সকাল হইতেই চা খাইতেন, সুজিত আর সুরেশ্বরের অনেকটাই দেরি হইত। যামিনী দ্বিতীয় বার আসিয়া আবার চায়ের টেবিলে হাজিরা দিতেন, মমতা কোন দিন আসিত, কোন দিন আসিত না।

মমতা বেড়াইতে যাইবার অনুমতি লাভ করিয়াই উঠিয়া গেল। এক জায়গায় কিছুতেই সে বেশী ক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিত না। সুজিতেরও বাপমায়ের সান্নিধ্য বেশী প্রিয় ছিল না, সে দ্বিতীয় চায়ের পেয়ালাটা শেষ করিয়াই উঠিয়া নিজের ঘরে প্রস্থান করিল।

যামিনীও উঠিবেন উঠিবেন করিতেছেন এমন সময় সুরেশ্বর বলিলেন, "খুকীর এখনও বিয়ে হয় নি দেখে প্রজারা বড় অবাক হয়েছে। এ রকম প্রথা পাড়াগাঁয়ে এখনও চলে নি কি না।"

ইহার উত্তরে কি বলিলে সুরেশ্বর চটিয়া উঠিবেন না, তাহা ভাবা দরকার। কাজেই যামিনী চট্ করিয়া কিছু উত্তর দিলেন না।

সুরেশ্বর নিজেই বলিয়া চলিলেন, "মেয়ের বিয়ে এই রকম জায়গায় দিতে পারলে সুবিধে হয় অনেক। দুষ্ট প্রজা বশে আসে, দু-পয়সা বেশী তাদের কাছ থেকে পাওয়াও যায়। আমার বাবা গল্প করতেন যে মেয়ের বিয়েতে কখনও তাঁদের ঘর থেকে টাকা বার করতে হয় নি, প্রজারাই চালিয়ে দিয়েছে। অবিশ্যি কল্‌কাতায় যে রেটে খরচ, এখানে সে রেটে খরচ হয় না।"

যামিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যা না তোমার প্রজা-দের অবস্থা, তারা আবার তোমার মেয়ের বিয়ের খরচ দেবে। খেতে না পেয়ে সব শুকিয়ে মরছে।"

সুরেশ্বর সৌভাগ্যক্রমে একেবারেই চটিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন না। বলিলেন, "হুঁঃ। ওসব মামুলি বাঁধিগৎ। আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ প্রজা চরিয়ে খেয়েছে, ওদের আমরা খুব চিনি। যে-বছর মাঠে সোনা ফলে সে-বছরেও ওদের মুখে ঐ বুলি শুনবে। চোখে গামছা না দিয়ে ওরা জমি-দারের সামনে আসেই না।"

ঠাকুর আসিয়া কি একটা জিজ্ঞাসা করায় যামিনী বাঁচিয়া গেলেন। প্রতিবাদ সুরেশ্বর সহ্য করিতে পারেন না, আর এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করা ছাড়া উপায়ও ছিল না।

ঠাকুরের সমস্যার মীমাংসা করিয়া যামিনী ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন মমতা কোথা হইতে একটা চরকা জোগাড় করিয়া সুতা কাটিতে বসিয়া গিয়াছে। সুতা কাটা কোন জন্মে তাহার অভ্যাস নাই, চরকাও বোধ হয় এই সে প্রথম চোখে দেখিল। কাজেই সুতা যা হইতেছে তাহা বুঝাই যায়। মমতার কিন্তু ধৈর্য্যের অবধি নাই, ছেঁড়া সুতা ক্রমাগত জোড়া লাগাইয়া সে একমনে কাজ করিয়া চলিয়াছে।

যামিনী একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকি হচ্ছে, মা? চরকা কোথায় পেলে?"

মমতা মুখ তুলিয়া চাহিল; গালের কাছটা তাহার একটু লাল হইয়া উঠিল। বলিল, "নিধুকে দিয়ে আনিয়েছি, মা। একেবারে অকর্ম্মা হয়ে ব'সে থাকতে ভাল লাগে না, যদি একটুও সুতো তৈরি করতে পারি, তা বেচে যা দু-এক আনা পাব, তা আমার ইচ্ছেমত ত খরচ করতে পারব?"

যামিনী একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তা অবিশ্যিই পারবে। কিন্তু দু-এক আনা পয়সাও কি আর তুমি ইচ্ছামত খরচ করতে পাও না? আমি ত তোমাকে কিছু বাধা দিই না, তোমার বাবাও তোমাকে কিছু বলেন না।"

মমতা বলিল, "তা জানি মা, কিন্তু টাকা ত সব বাবার, যেভাবে খরচ করলে তিনি রাগারাগি করবেন, সেভাবে খরচের জন্যে তাঁর টাকা নিতে ইচ্ছে করে না।"

যামিনী আন্দাজে বুঝিলেন মেয়ের ব্যথা কোন্ খানে, বলিলেন, "তা করে না বটে; তবে চরকাই কাট। পাড়াগাঁয়ে টাকা রোজগার করার আর ত কোন উপায় দেখি না।"

দুপুর বেলার অনেকটাই মমতার এই চরকা লইয়া কাটিয়া গেল। সুতা হউক বা না-হউক সময় ত কাটিল, সেইটাই বা কি কম লাভ? বিকাল হইতে-না-হইতে সে চুল বাঁধিয়া, কাপড় বদ্‌লাইয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। যামিনীকে বলিল, "তুমি যাবে মা?"

তিনি গেলে সুরেশ্বর হয়ত চটিয়া উঠিবেন। কিন্তু ঘরের কোণে বসিয়া বসিয়া যামিনীরই বা দিন কাটে কিরূপে? তিনিও একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তা চল। দাঁড়াও, আমি গা ধুয়ে আসছি চট্ ক'রে।"

আধ ঘণ্টা পরেই যামিনী মেয়েকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে ঝি দরোয়ানও চলিল, যদিও কাহারও যাইবার বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন ছিল না।

পূর্ব্ব দিকের মাঠটা পতিত জমি, গোচারণের জন্যই কেবল ব্যবহৃত হয়। এদিকে চাষও হয় না, লোকজনের বসতিও নাই। মোটের উপর পরিষ্কার, বেড়াইবার পক্ষে ভাল। খানিক দূর আসিয়াই মমতা বলিল, "বিষ্টি যদি আর না নামে ত বাঁচা যায়। রোজ তা হ'লে এখানে বেড়াতে আসি।"

যামিনী বলিলেন, "তুমিই আসবার জন্যে সব চেয়ে ব্যস্ত হয়েছিলে মা, তোমারই এখন একেবারে ভাল লাগ্‌ছে না।"

মমতা আরক্ত মুখে চুপ করিয়া রহিল। কেন যে সে আসিতে চাহিয়াছিল, আর কেনই যে তাহার ভাল লাগিতেছে না, তাহা সে মাকে বুঝাইবে কিরূপে?

খানিক পরে বলিল, "সারাদিন খালি একটা ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে হবে তা ত মনে করি নি?"

যামিনী বলিলেন, "রোজ বেড়াতে বেরিও বিকেল বেলাটা, তাহ'লে অতটা খারাপ লাগবে না। এদিকে লোকজন কিছু নেই, তোমার বাবা আপত্তি করবেন না।"

সঙ্গের ঝি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ঐ উত্তুর দিক থেকে কয়েকটি ছোক্‌রাবাবু আস্‌তেছে মা। ফিরে যাবেন নাকি?"

যামিনী তাকাইয়া দেখিলেন চার-পাঁচটি যুবক আসিতেছে বটে। হাতে তাদের মস্ত মস্ত চটের থলি, এক জনের হাতে মস্ত একটা ঝুড়ি। বুঝিলেন ইহারা কলিকাতার স্বেচ্ছাসেবক দলের কেহ হইবে, কোথাও কাজে গিয়াছিল, এখন নিজেদের আড্ডায় ফিরিয়া চলিয়াছে।

মমতা কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ফিরে গিয়ে কি হবে মা? আমরা যেমন যাচ্ছি যাই না?"

কলিকাতায় তাঁহারা পর্দ্দানশীন ভাবে থাকেন না, সুতরাং এই কলিকাতার ছেলের দল তাঁহাদের দেখিয়া ফেলিলে নিশ্চয়ই চণ্ডী অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না। যামিনী বলিলেন, "না ফিরব না, ওরা যাচ্ছে যাক না। তাতে কি?"

ছেলের দল তখন বেশ খানিকটা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। মমতার বুকের রক্ত উদ্দাম তালে নাচিয়া উঠিল, পা দুইটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অমরকে সে চিনিতে পারিয়াছে। সেও কি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে? মমতার কি তাহাকে না-চিনিবার ভান করিয়া চলিয়া যাওয়া

উচিত? না দাঁড়াইয়া কথা বলা উচিত? তাহার মা কি মনে করিবেন? ঝি দরোয়ানই বা কি মনে করিবে?

কিন্তু অমরই তাহার হইয়া প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিল। কাছে আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনারা এসেছেন কয়েক দিন হ'ল, শুনেছি। কিন্তু এত কাজ আমার ঘাড়ে যে সময় ক'রে দেখা করতে পারি নি।"

উত্তেজনায় মমতার সারা দেহ তখন কাঁপিতেছে। সর্ব্বনাশ, সে কি পড়িয়া যাইবে নাকি? গলা যেন তাহার বুজিয়া গিয়াছে, সে কথার উত্তর দিবে কি করিয়া?

যামিনী বিস্মিত ভাবে একবার মমতার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ছেলেটি মমতাকেই লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছে বুঝা গেল, কিন্তু মেয়ে অমন অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে কেন? কোথায় ইহাদের আলাপ হইল, কেমন করিয়া? একটা সন্দেহ বিদ্যুতের মত তাঁহার মনে খেলিয়া গেল।

মমতাকে একটু আড়াল করিবার জন্য তিনিই অমরের কথার উত্তর দিলেন, যদিও সে তাঁহার অপরিচিত। বলিলেন, "হ্যাঁ, আমরা দিন-চার হ'ল এসেছি, এখনও গুছিয়ে উঠতে পারি নি। আজ এই প্রথম বাড়ি থেকে বেরলাম।"

মমতা প্রাণপণ বলে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল, "মা, ইনি আমাদের ক্লাসের ছায়ার দাদা অমরবাবু।" মায়ের পরিচয়টা আর অমরের কাছে দিবার দরকার হইল না। সে অবনত হইয়া যামিনীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "একদিন আমাদের ক্যাম্পে যাবেন, কেমন কাজ করছি সব দেখে আসবেন।"

তিনি ক্যাম্পে গেলেই হইয়াছে আর কি? সুরেশ্বর তাহা হইলে বোধ হয় যামিনীকে আস্ত গিলিয়া খাইবেন। কিন্তু সে কথা ত আর এই ছেলেটির সামনে বলা যায় না? সুতরাং বলিলেন, "চেষ্টা করব যেতে। কাজকর্ম্ম কি রকম চলছে?"

অমর বলিল, "ভালই, তবে আপনাদের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে আরও ভাল চলে। এখানকার কর্ম্মচারীরা আমাদের উদ্দেশ্যটা ঠিক বোঝে না মনে হয়। মনে করে আমরা তাদের কোন অনিষ্ট করতে এসেছি।"

যামিনী ইহার উত্তরে কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। কর্ম্মচারীদের দোষ কি? খোদ কর্ত্তাই ত যত নষ্টের মূলে? সচরাচর লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে তাঁহার ভাল লাগে না, নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয় করিতেই তাঁহার এক মাস কাটিয়া যায়। কিন্তু এই পরহিতব্রতী, সবলদেহ যুবকটিকে প্রথম পরিচয়েই তাঁহার বেশ ভাল লাগিতেছিল। যে-সব মানুষের মধ্যে তাঁহার বাস, তাহারা স্বার্থ ছাড়া জগতের আর কোন জিনিষ বুঝিতে পারে না। স্বার্থের খাতিরে লোকের গলায় ছুরি দিতেও তাহাদের আট্‌কায় না। এ ছেলেটি কিন্তু যেন অন্য জগতের মানুষ। তরুণ বয়সে যে দৃষ্টি দিয়া যামিনী জগৎকে দেখিতেন, সেই দৃষ্টির ঘোর এখনও যেন ইহার চোখে লাগিয়া আছে।

বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তাদের ব'লে কয়ে দেখব। এ সব ক্ষেত্রে আমাদের কথা ত তত চলে না। ওঁকে আপনারা যদি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেন ত হয়ত কিছু কাজ হ'তে পারে।"

মমতা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমি বাবাকে আজই বলব।"

অমর তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "বলবেন নিশ্চয়। টাকাকড়িরও আমাদের এখন তত সুবিধে নেই, আরও কিছু হাতে এলে কাজের ক্ষেত্র আরও আমরা বাড়াতে পারি, ছোট-খাট হাসপাতালও একটা খুলতে পারি।"

পশ্চিম আকাশে ধীরে ধীরে মেঘের সঞ্চার হইতেছিল। সেদিকে চাহিয়া যামিনী বলিলেন, "এখন আমরা আসি তবে। বৃষ্টি নেমে পড়তে পারে।"

অমর তাঁহাদের নমস্কার করিয়া আবার নিজের সঙ্গীদের লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। যামিনী আর এক পাক ঘুরিয়া মমতাকে লইয়া বাড়ি ফিরিয়া চলিলেন। সারাপথ মা-মেয়েতে কোন কথাই হইল না।

(২৪)

যামিনী বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঝড়ের ইঙ্গিত করিতেছে দেখিয়া চাকরেরা তখন সব ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আলোও সবগুলি জ্বালিয়া রাখিয়াছে। সুরেশ্বর সন্ধ্যা হইতেই ঘরে দোর দিয়া একটি পশ্চিমা ভৃত্যকে দিয়া দলাই

দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

মলাই করান, ডাক্তার নাকি এই বিধান দিয়াছেন। তাই গৃহিণীর বেড়াইতে যাওয়া, বা আকাশে মেঘের সঞ্চার কোনটাই তাঁহার চোখে পড়ে নাই, তাহা না হইলে এত ক্ষণে মহা চেঁচামেচি লাগিয়া যাইত।

মমতা ঘরে ঢুকিয়াই পায়ের জুতা খুলিয়া সোজা শুইয়া পড়িল। যামিনী বলিলেন, "কাপড়-চোপড় ছেড়ে শো না? শরীর খারাপ লাগ্‌ছে নাকি?"

মমতা সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া জানাইল, তাহার খানিকটা খারাপই লাগিতেছে। যামিনীর মেয়ের কাছে অনেক কথা জানিবার ছিল, কিন্তু এখনই তাহাকে উত্যক্ত না করিয়া তিনি অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। অমরের সঙ্গে হঠাৎ এ ভাবে সাক্ষাৎ হওয়াতে মমতা যে অত্যন্তই বিচলিত হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিতেই পারিয়াছিলেন। কারণটাও অনুমানে অনেকটাই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারই মেয়ে ত? অদৃষ্টও যে তাঁহার মত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু যামিনীর মা-ই তাঁহাকে আজীবন তুষানলে দগ্ধ হইবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছিলেন, যামিনীকে এখন ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে তিনি কন্যার জন্য কি ব্যবস্থা করেন। হয়ত নিজের ভবিষ্যৎ জীবন আরও কণ্টকাকুল হইয়া উঠিবে, কিন্তু মমতাকেও কি নিজের মত ধনৈশ্বর্য্যের রাক্ষসীর সম্মুখে তিনি বলি দিতে পারিবেন?

মমতা অনেক ক্ষণ শুইয়া পড়িয়া রহিল। মা নিশ্চয়ই এখন তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। মমতা সব তাঁহাকে ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিবে কি? মা হয়ত তাহার রকম সকম দেখিয়াই অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। সব জানাজানি হইয়া গেলে লোকে তাহাকে কি মনে করিবে? অমরই বা তাহাকে কি মনে করিল? মমতা ত জানে না অমরের মনের ভাব কি? সবই ত তাহার আন্দাজ? অমরের হৃদয়ে মমতার হয়ত কোন স্থানই নাই, কিন্তু মমতা যে তাহাকে কি চোখে দেখিয়াছে, তাহা ত সে বোধ হয় প্রকাশই করিয়া ফেলিল? মাগো, এ লজ্জা সে রাখিবে কোথায়?

যামিনী এমন সময় ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া মমতার পাশে আসিয়া বসিলেন। তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কিছু ভাল বোধ করছ কি মা?"

মমতা বলিল, "হ্যাঁ মা, এইবার উঠব।"

যামিনী বলিলেন, "থাক একেবারে খাবার সময় উঠো। ঐ অমর ছেলেটির সঙ্গে তোমার কোথায় আলাপ হ'ল?"

মমতা বলিল, "ছায়ার জন্মদিনে যে তাদের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম, সেইখানেই আলাপ হয়েছিল।

যামিনী বলিলেন, "ও, ঐ একদিনেরই আলাপ?"

মমতার যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাইতে লাগিল। এক দিনের আলাপে এমন করিয়া আর কেহ কি হৃদয় দান করিয়া বসিয়াছে? মা কি তাহাকে পাগল মনে করিতেছেন? সত্যই ত ক'টা কথাই বা সে অমরের সঙ্গে বলিয়াছে? ছায়ার কাছে গল্প অনেক শুনিয়াছে বটে, কিন্তু সে ত কত লোকেই কত লোক সম্বন্ধে শোনে? কিন্তু মাকে কি সে বুঝাইবে? চোখের দৃষ্টি যে কথা বলে, তাহা কি সে বুঝাইতে পারে? আবার ধীরে ধীরে বলিল, "সেই মিটিঙের দিনও দেখা হয়েছিল।"

যামিনীর কাছে অনেকগুলি জিনিষই পরিষ্কার হইয়া গেল—মমতা কেনই বা গলার হার খুলিয়া দিল, কেনই বা কলিকাতা ছাড়িয়া এখানে আসিবার জন্য এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইল তাহার সম্মুখে শুইয়া এ যেন মমতা নয়, তাঁহার কন্যা নয়। যামিনীই যেন নিজের হারান তরুণীজীবনে ফিরিয়া গিয়াছেন, তিনিই যেন অসহ্য হৃদয়-বেদনায় লুণ্ঠিত হইতেছেন। যাহাকে আর জীবনে কোন দিন দেখিবেন না, সেই হতভাগ্য বঞ্চিত প্রতাপের মুখ তাঁহার মানস দৃষ্টির সামনে ভাসিয়া উঠিল। নিজের জীবনের যত জ্বালা, যত ব্যর্থতা, অপমান, সব ত তিনি সেই প্রথম জীবনের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। নারীর জন্মগত একমাত্র অধিকার, সে অধিকার প্রাণ দিয়া ভালবাসিবার, অন্যের প্রাণঢালা ভালবাসা পাইবার। সেই স্বত্ব তিনি ধনের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে বিন্দুমাত্র সুখ বা শান্তি দিতে পারে নাই। আজ কি ভগবান এই ভাবে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুবিধা জুটাইয়া দিলেন। যে-অধিকার হইতে নিজেকে তিনি বঞ্চিত করিয়াছিলেন, কন্যার জন্য সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় নিজেকে যদি ভিখারিণীও হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে কি?

হয়ত শেষ জীবনে তিনি শান্তি পাইবেন, যদি কন্যাকে তিনি সুখী দেখিয়া যাইতে পারেন।

মমতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটি কি করে?'

মমতা কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "বি-এ পাস করেছেন। ওঁর বাবা ল পড়তে বলেছিলেন, কিন্তু উনি দেশের কাজ করতে চান, তাই করছেন।"

যামিনী মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন মেয়ে সব খবরই জোগাড় করিয়াছে দেখি। মাত্র একবার দেখা হইলে কি হয়? বন্ধু ছায়ার সাহায্যে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সবই জানা হইয়া গিয়াছে। মমতা যামিনীর মেয়ে বটে, কিন্তু জমিদার সুরেশ্বরেরও মেয়ে। তাঁহার মত একেবারে সংসারজ্ঞানহীনা হইতে পারে না।

কিন্তু এখন আর বেশী কথা বলাইয়া মমতাকে আরও বিচলিত করিয়া তুলিতে তিনি চাহিলেন না। ঘরের আলোটা যাহাতে তাহার চোখে না লাগে এমন ভাবে দরজার আড়ালে সরাইয়া দিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। সুবিধামত অমরকে ডাকিয়া ভাল করিয়া আলাপ করিতে হইবে। কিন্তু সুরেশ্বর যে আসিয়াই ইহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহাই ত বিপদ।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার সময় আসিয়া পড়িল। এখানে সন্ধ্যারাত্রির পরই চারি দিক এমন গভীর নীরবতায় পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে যে ঘুমাইয়া পড়া ছাড়া আর কিছুর কথা মনেই আসে না। চাকরবাকর কলিকাতায় রাত বারোটা একটা পর্য্যন্ত হৈ চৈ করে, এখানে কিন্তু সাতটার মধ্যে সকলকে খাওয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার জন্য তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ভাগ্যক্রমে সুরেশ্বরের সকাল সকাল খাওয়াই নিয়ম, তাই তাহারা খানিকটা বাঁচিয়া গিয়াছে।

মমতা সকলের সঙ্গে খাইতে উঠিয়া আসিল। তবে খাইল না প্রায় কিছুই, কথাবার্ত্তাও বিশেষ কিছু বলিল না। সুরেশ্বর খাইতে খাইতে বলিলেন, "কালই সকালে বেরুব ভাবছি। ও মেঘ কিছু না, দেখলে ত? একটু জোরে হাওয়া দিতেই উবে গেল। সকালে উঠে কাপড়-চোপড় তিন দিনের মত গুছিয়ে নিতে হবে। রবিবারেই ফিরে আসব। খোকা যেতে চাস নাকি সঙ্গে?"

সুজিত বলিল, "তা যেতে পারি।" বেড়াতেই যখন সে আসিয়াছে তখন যতটা বেড়ান যায় ততই ভাল। আর প্রজারাও যুবরাজকে চিনিয়া রাখুক, পরে ইহারই হুকুম মত ত তাহাদিগকে চলিতে হইবে?

মমতা হঠাৎ বলিল, "আমরা এখানে আর সব জড়িয়ে কত দিন থাকব বাবা?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "এক মাসের বেশী ত নয়ই। তোমার, খোকার সব পড়া কামাই হচ্ছে। নিতান্ত দায়ে পড়ে আসা, না হ'লে এই বাজে সময়ে কেউ আসে? ওদিকে দেবেশেরও বিলাত যাবার সময় হয়ে এল, গিয়ে তাদের সঙ্গে সব কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে ফেল্‌তে হবে।"

মমতার মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। অবশ্য সেটা তাহার মা ছাড়া আর কেহ লক্ষ্য করিল না। গলা দিয়া কোন খাদ্যই আর তাহার পার হইল না।

সুজিত ও সুরেশ্বরের তখনও খাওয়া শেষ হয় নাই। কাজেই টেবিলে তাহাকে বাধ্য হইয়া বসিয়া থাকিতে হইল। মিনিট দশ পরে আবার সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এখানকার প্রজাদের অবস্থা কি রকম দেখলে?"

সুরেশ্বর বলিলেন, "মন্দ কি? যেমন থাকে ছোটলোকের অবস্থা তেমনই আছে।"

মমতা যেন আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, "এদের অবস্থার খানিকটা উন্নতি করা একান্ত দরকার। কত দেশে কত কিছু করা হচ্ছে গরিবদের জন্যে, আমাদের দেশেই কেন হবে না?"

সুরেশ্বর হঠাৎ সাধু সাজিয়া বলিলেন, "সে সব দেশে কত কোটীপতি, লাখপতি আছে, তারা সখ ক'রে পরের উপকার ক'রে বেড়ায়, আমাদের দেশে সকলেরই প্রায় এক দশা, কে কাকে দেখে।"

মমতার আজ সাহসের সীমা ছিল না। সে বলিল, "তা কি ঠিক বাবা? আমাদের অবস্থা আর ঐ যে গ্রামের মানুষগুলো না খেয়ে, কাপড় না প'রে, মাঠে ঘাটে পড়ে মরছে, তাদের অবস্থা এক রকমই?"

সুরেশ্বর এইবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন, "পৃথিবীর সব মানুষ ত ঠিক এক অবস্থায় থাকতে পারে না। উঁচু, নীচু থাকবেই, সমাজের সংসারের কল্যাণের জন্যেই এ নিয়ম

সবাই সমান হ'লে সংসার চলে না। ছোট একটা পরিবারেও ত দেখ যে কেউ উপরে কেউ নীচে।"

মমতা বাপের যুক্তি মানিল না, বলিল, "তাই ব'লে মানুষ হয়ে যারা জন্মেছে, তারা মানুষের মত থাকতে পারবে না? ওদের অবস্থা ত শেয়াল কুকুরেরও অধম। ওদের জন্যে নিশ্চয় কিছু করা উচিত।"

যামিনী ক্রমেই তর্কের গতিক দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। মমতা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে এবং সুরেশ্বরও রাগিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যাইতে পারে, তাহাতে মমতার কিছু লাভ হইবে না। সুরেশ্বরেরও শরীর সুস্থ নয়, বেশী রাগারাগি করিলে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। কিন্তু ইহাদের থামান যায় কিরূপে?

সুরেশ্বরের কিন্তু মেয়ের সঙ্গে তর্ক করিবার তত ইচ্ছা ছিল না। যাহা নিজে মিথ্যা বলিয়া জানেন, ভাষার জোরে তাহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করার মত বিদ্যা তাঁহার ছিল না। স্ত্রী হইলে না-হয় চীৎকার করিয়া, বকিয়া, থামাইয়া দেওয়া যাইত, কিন্তু মেয়ের সঙ্গে ঠিক সে-রকম ব্যবহার করা চলে না।

সুতরাং তিনি অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ওসব চেষ্টা করতে গেলে অনেক ভেবে করতে হয়। হট্ ক'রে কিছু করতে গেলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি।"

পাছে মমতা আরও কথা বাড়ায়, এই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মমতা খানিক ক্ষণ অস্বাভাবিক রকম মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর সেও টেবিল ছাড়িয়া শুইতে চলিয়া গেল।

পর দিন সকালে আর কাহারও সমাজতত্ত্ব আলোচনার সময় রহিল না। সুরেশ্বর দুই দিনের জন্যও কোথাও গেলে এমন পরিমাণ সোরগোল বাধিয়া যায় যে লোকে মনে করে সেনানী পল্টন এক দেশ হইতে আর এক দেশে চলিয়াছে। ভোর হইতে বেলা নটা-দশটা পর্য্যন্ত কাহারও আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় রহিল না। অবশেষে সুরেশ্বর খাইয়া-দাইয়া যখন হাতীতে চড়িলেন, তখন বাড়ির লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মমতার নাওয়া-খাওয়া কিছুতেই আজ আর মন নাই। সে কেবল অস্থির ভাবে ঘর আর বাহির করিয়া বেড়াইতেছে। যামিনী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, স্নান ক'রে দুটো খেয়ে নে, শেষে কি একটা অসুখ-বিসুখ বাধাবি?"

একটা ঝি মমতার চুলে তেল দিবার জন্য বাটি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এখনও সব রান্না হয় নি, এই ত সবে হাট থেকে আনাজপাতি নিয়ে এল।"

এখানে সপ্তাহে দুই দিন হাট হয়, তাহারই উপর তিন চার খানি গ্রামের নির্ভর। হাটের দিন ছাড়া অন্য দিনে কোথাও কিছু পাইবার উপায় নাই। যামিনীদের সংসারে অবশ্য এসব অসুবিধা অনুভব করিবার উপায় নাই, কিন্তু গ্রামবাসীরা এ দুঃখটা বেশ পুরাপুরি ভোগ করে।

যামিনী বলিলেন, "তা হোক, ও স্নান ক'রে আসুক। তত ক্ষণে সব রান্না হয়ে যাবে।" বলিয়া তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

দুই জন চাকর তখন রান্নাঘরের প্রশস্ত রোয়াকের উপর ঝুড়ি হইতে চাল, চিঁড়া, শাক তরকারি সব নামাইয়া রাখিতেছে। ঠাকুর একটা রুইমাছ হাতে করিয়া আন্দাজ করিতে চেষ্টা করিতেছে যে সেটার ওজন কত। যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর চেয়ে ছোট মাছ ছিল না? এটা ত অন্ততঃ চার পাঁচ সের হবে। এত মাছ কে খাবে এক দিনে?"

চাকর হারু উত্তর দিল, "কোথায় মাছ মা-ঠাকরুণ? মাত্তর চাট্টিখানিক জিনিষ এসেছে হাটে। জলে সব ক্ষেত-খামার ভেসে গেল মানুষের, কেই বা জিনিষ আনছে আর কেইবা কিনছে? মাছ এই রকম দুটো এসেছিল, একটা আমি নিলাম, আর একটা ঐ ডোমপাড়ার ছোকরা বাবুরা নিতে যাচ্ছিল তা নায়েববাবু হাঁ হাঁ ক'রে এসে জেলের হাত থেকে মাছ কেড়ে নিলেন। বাবুরা আজ ফেনভাত খাবেন এখন—বাবুমশায় নাকি হাটের সব লোককে বারণ ক'রে দিয়েছেন তাদের জিনিষ বেচতে। প্রজা ক্ষ্যাপানোর মজা বুঝুন এখন কলকাতার বাবুরা।"

যামিনী ধমক দিয়া বলিলেন, "বাজে বক্‌তে হবে না, যা করছিস্ তা কর।" স্বামীর কীর্ত্তি শুনিয়া তাঁহার ত চক্ষু স্থির হইবার জোগাড় হইয়াছিল।

পিছন হইতে হঠাৎ ধরাগলায় মমতা বলিয়া উঠিল, "দূর ক'রে ফেলে দাও ও মাছ মা, চাই না আমরা খেতে। আমরাও নুনভাত খাব।"

ঝি-চাকর সকলে হাঁ করিয়া তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া যামিনী তাড়াতাড়ি মেয়েকে টানিয়া লইয়া খাইবার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। ঝিটা পিছন পিছন আসিতেছে দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, "যা জলটল ঠিক ক'রে দে, খুকীর কাপড় তোয়ালে সব গুছিয়ে রেখে আয়।"

মমতার দুই চোখ তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছে। ঠোঁট কাঁপিতেছে; পাছে মায়ের কাছে তাহা ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে। যামিনী মেয়ের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "অল্পেতে অত ঘাবড়ে যেয়ো না মা, মেয়েমানুষের জীবনভরা কত পরীক্ষা। এত দিন মায়ের কোলের শিশু ছিলে, কিছু বোঝ নি, এখন ক্রমে অনেক দেখতে হবে, অনেক বুঝতে, সহ্য করতে হবে।"

মমতা বলিল, "আমি পারি না মা, এত অন্যায় এত অবিচার আমার সহ্য হয় না। আমি সত্যিই আজ নুনভাত ছাড়া কিছু খাব না।"

যামিনী বলিলেন, "আচ্ছা, আগে স্নান ত ক'রে এস, তার পর দেখা যাবে। ওরা এক দিন নুনভাত খেলেও মারা যাবে না। মানুষ একেবারে না খেয়েও অনেক দিন বেঁচে থাকে।"

মমতা স্নান করিতে চলিয়া গেল। যামিনী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ বিষয়ে কি করা যায়। সুরেশ্বর ক্রমেই পাগলের মত ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য যামিনী ত প্রায় নীরবে তাঁহার বহু উৎপাত অনেক বৎসর ধরিয়াই সহ্য করিয়া আসিতেছেন, এটাও তিনি সহ্য করিতেন। কিন্তু মমতা ত সহ্য করিবে না? ঝোঁকের মাথায় এমন একটা কিছু করিয়া বসিবে, যাহাতে বাপে মেয়েতে চির দিনের মত ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবে। সে সংসারজ্ঞানহীনা বালিকামাত্র, সুরেশ্বরের রোষানল হইতে যামিনী কেমন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবেন?

মমতা স্নান করিয়া আসিলে পর তিনি নিজে স্নান করিয়া আসিলেন। দুই জনে খাইতে বসিলেন, কিন্তু খাওয়া কাহারও হইল না। মমতা নুন মাখিয়া দুই গ্রাস ভাত মুখে দিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল। মেয়ের রকম দেখিয়া যামিনীও নামেমাত্র আহার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভৃত্যের দল গভীর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মাছ তরকারি যেমন সব আনিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি সব উঠাইয়া লইয়া গেল। সব-কিছু তাহাদেরই ভোগে আসিবে, ইহাতে তাহাদের মনে মনে যে আনন্দ না হইতেছিল তাহা নয়, কিন্তু এত কষ্ট করিয়া আনা এত বড় তাজা মাছটা কি কারণে গৃহিণী এবং দিদিমণি দুই জনেরই অপছন্দ হইয়া গেল, তাহা তাহারা বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিল না।

যামিনী দুপুরে ঘণ্টাখানিক শুইয়া থাকেন, রোজই যে ঘুম হয় তাহা নয়, তবে বিশ্রাম করেন। মমতার কলেজে যাওয়ার অভ্যাস, দুপুরে সে শুইতে পারে না, বই হাতে করিয়া, শুইয়া বসিয়া, ঘোরাঘুরি করিয়াই বেলাটা কাটাইয়া দেয়। ঝি-চাকরের দল ঘণ্টাখানিক ধরিয়া কাছারীর উদ্যানসংলগ্ন বড় পুকুরটায় স্নান করে, তাহার পর পেট পুরিয়া খাইয়া, ঘুমাইয়া বাকী দুপুরটা কাটাইয়া দেয়।

যামিনী নিয়মমত আজও একখানা বই হাতে করিয়া শুইয়াছিলেন। খানিক পরে বোধ হয় ঘুমাইয়াই পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ একটা গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া বসিলেন। নিধু ঝি পাশে দাঁড়াইয়া বক্‌বক্ করিতেছে, তাহার গোটাকয়েক কথা কানে যাইতেই তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্‌ছিস্ কি তুই? পাগল হয়েছিস্?"

নিধুর তখন প্রায় চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে, সে ক্রন্দনবিকৃত নাকী সুরে বলিল, "পাগল কেনে হব মা? পেত্যয় না যায়, আপনি উঠে দেখুন। দিদিমণি দু-বেলার যত মাছ তরকারি সব ঢেলে নিয়ে বাগদী বৌয়ের সঙ্গে কোথা চলে গিয়েছেন।"

যামিনীর তখন আতঙ্কে গলা শুকাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু মনের মধ্যে কন্যার সাহসে একটু যে গর্ব্বের সঞ্চার হয় নাই তাহাও নয়। এই মেয়ে পারিবে নিজের স্বত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে।

পায়ে চটি পরিয়া, একটা ছাতা হাতে করিয়া যামিনী যেমন বেশে ছিলেন, তেমনি অবস্থায়ই বাহির হইয়া পড়িলেন। নিধুকে বলিলেন, "তুই আয় আমার সঙ্গে।"

মমতা যে কোথায় গিয়াছে তাহা আর তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইল না। নিধু চোখ মুছিতে মুছিতে তাঁহার পিছন পিছন চলিল।

হাড়িপাড়ার কাছাকাছি আসিতেই দেখিতে পাইলেন দূরে মমতা আসিতেছে। তাহার পিছনে বাগ্‌দীবৌ, সে কাছারি-

বাড়ির গোয়ালে কাজ করে। জমিদার-কন্যার হুকুম অমান্য করিতে সে সাহস করে নাই, প্রকাণ্ড পিতলের গামলা ভরিয়া মাছ তরকারি সে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

মায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়া মমতা বলিল, "বাবা আমায় যা বলেন বলুন মা, তুমি আমাকে আড়াল করতে যেও না।"

যামিনীর মুখে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, সে সব হবে এখন, তুমি বাড়ি চল ত।"

(২৫)

বাড়িতে পৌছিয়া মা-মেয়েতে আর কোন কথা হইল না। মমতা আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল, উত্তেজনার প্রথম ঝোঁকটা কাটিয়া যাওয়ার পর তাহার ঝি-চাকরদের কাছে মুখ দেখাইতেও লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তাহারা এ ব্যাপারটা সহজে ভুলিবে না। কোথায় এক-এক জন আধ সের করিয়া মাছ খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহার বদলে কিনা শুধু বেগুনপোড়া দিয়া ভাত খাইতে হইল? এ দুঃখ কি ভুলিবার?

মমতা মাছ তরকারি লইয়া যখন ছেলেদের আড্ডায় উপস্থিত হইল, তখন বেশীর ভাগ ছেলেই স্নান করিতে গিয়াছিল, শুধু দুই জন পাহারায় ছিল। দুইটিই মমতার অপরিচিত, মমতাকেও তাহারা বোধ হয় চেনে না। যুবক দুই জন অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া মমতা জোর করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অমরবাবু কি এখানে নেই? আমি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

এক জন উত্তর দিল, "তিনি স্নান করতে গিয়েছেন, এখনই আসবেন। আপনি বসুন।" আর এক জন তাড়াতাড়ি চালাঘরের ভিতর হইতে একটা মোড়া বাহির করিয়া আনিল।

মমতাকে সৌভাগ্যক্রমে বেশী ক্ষণ বসিতে হইল না। মিনিট পাঁচের ভিতরই দেখা গেল যে অমরেন্দ্র স্নান সারিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সে একলা নয়, সঙ্গে আরও কয়েক জন যুবক আছে।

মমতাকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিল। মমতা একবার তাহার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল অমরের চোখের দৃষ্টিতে শুধু বিস্ময় নয়, আরও কিছু আছে। বুঝিল সে ভুল করে নাই।

অমর জিজ্ঞাসা করিল, "এত রোদে এত দূর হেঁটে এসেছেন? আমাকে ডেকে পাঠালে ত আমিই যেতাম।"

মমতা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আপনাকে ডাকব কি ক'রে? আমার বাবা যা ব্যবহার করছেন আপনাদের সঙ্গে, তাতে আমি আর মা বড় লজ্জা পেয়েছি। আজ নাকি হাটে আপনারা কিছু জিনিষ কিনতে পান নি?"

অমরের সঙ্গীরাও অত্যন্ত অবাক হইয়া খানিক দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের চোখের সম্মুখে মমতাকে বসাইয়া রাখিতে অমরেরও অস্বস্তি লাগিতেছিল, কিন্তু উপায়ই বা কি? এটা ক্যাম্প মাত্র, অমরের বাড়ি নয় যে সে নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিবে।

মমতার কথার উত্তরে সে বলিল, "তা পাই নি বটে, তবে তাতে আমাদের এমন কিছু অসুবিধা হয় নি। চাল ত আমাদের মজুতই আছে? আর এখানে ত কষ্ট করতেই আসা।"

মমতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি কিছু মাছ আর তরকারি এনেছি, আপনারা খাবেন। কালও পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করব।"

অমর মুগ্ধ বিস্ময়ে খানিক ক্ষণ মমতার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মা পাঠিয়েছেন?"

মমতার গলা যেন বুজিয়া আসিতেছিল। অমর নিশ্চয়ই তাহাকে অসম্ভব রকম বেহায়া মনে করিতেছে। কিন্তু উপায় কি? নিজের কৃত কর্ম্মের দায় মমতাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। মায়ের উপর তাহা চাপাইবার ইচ্ছা তাহার নাই।

গলা পরিষ্কার করিয়া সে বলিল, "না আমিই এনেছি, মা জানেন না, গিয়ে মাকে বল্‌ব।" আর তাহার দাঁড়াইতে ভরসা হইল না। বাগ্‌দীবৌকে তাহার সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল।

অমর তাহার সঙ্গে সঙ্গে খানিক দূর অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার পর এক জায়গায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা আমি তা হ'লে এখন আর এগোব না, ওরা সবাই অপেক্ষা ক'রে আছে। বিকেলে যাব একবার।"

মমতা কোন মতে তাহার নমস্কারের উত্তরে প্রতি-নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। পিছন ফিরিয়া

তাকাইবার একটা উগ্র ইচ্ছাকে প্রাণপণে দমন করিতে করিতে সে দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল। পথে যামিনীর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

যামিনী সারা দুপুর কত যে চিন্তা করিলেন তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। মেয়েকে অমরের হাতে সমর্পণ করিতে তাঁহার অনিচ্ছা নাই। সে ভদ্রঘরের ছেলে, সুস্থ সবল, লেখাপড়াও শিখিয়াছে। রোজগারের চেষ্টায় না ঘুরিয়া যখন এমন করিয়া দেশের কাজে লাগিতে পারিয়াছে, তখন ঘরে হয়ত মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে। তাহাই ঢের।

কিন্তু অমরের মন তিনি জানিবেন কিরূপে? মমতা যে তাহাকে হৃদয় দান করিয়া বসিয়া আছে, তাহা কি সে জানে? জানিলেও নিজের মনে তাহার কি কোন প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে? সুরেশ্বর প্রাণ থাকিতে এ বিবাহে মত দিবেন না, তাঁহার শত্রুতার সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়া লইয়াও কি সে আগ্রহ করিয়া মমতাকে গ্রহণ করিবে? যে-আশায় তিনি দরিদ্রের হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করিতে চাহিতেছেন, তাহা তাঁহার পূর্ণ হইবে ত? ইহার চেয়ে শত গুণ বেশী দরিদ্র প্রতাপকে একদিন যামিনী নিজে আকুল আগ্রহে বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেও প্রতাপের প্রাণঢালা ভালবাসার গুণেই। অতখানি ভালবাসা কি অমর তাঁহার কন্যাকে দিতে পারিবে?

কে এ কথার উত্তর দিবে? মমতা নিজে কিছুই জানে না। যামিনীকেই সন্ধান লইতে হইবে। সৌভাগ্যক্রমে সুরেশ্বর এখানে নাই, না হইলে মমতার কাণ্ড দেখিয়া কি প্রলয় যে তিনি বাধাইয়া বসিতেন, তাহার ঠিকানা নাই। যামিনীকে এই দুই-তিন দিনের অবসরে মমতার সমস্ত জীবনের আর নিজের অবশিষ্ট জীবনেরও ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। মমতার বিবাহ হইয়া গেলে সুরেশ্বরের গৃহে যামিনীর আর স্থান হইবে না, তাহা এক রকম ধরিয়া লওয়া যায়।

রোদ পড়িতে আরম্ভ করিল। নিজেই বেড়াইবার ছলে বাহির হইয়া হাড়িপাড়ার দিকে যাইবেন, না দরোয়ানকে দিয়া অমরকেই ডাকাইয়া পাঠাইবেন, যামিনী তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় এক জন চাকর আসিয়া খবর দিল যে কলিকাতার সেই ছোকরাবাবুদের দলের এক জন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

যামিনী বিস্মিত হইয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন। অমরই দাঁড়াইয়া আছে। যামিনীকে দেখিয়া সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া প্রণাম করিল। যামিনী বলিলেন, "ও আপনি? ওঁর কাছে কি এসেছিলেন? উনি ত এখানে নেই?"

অমর বলিল, "না মা, আমি আপনারই সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

সুজিতের ঘরটা খালি ছিল, যামিনী অমরকে লইয়া সেইখানেই বসাইলেন। চাকরদের চায়ের জোগাড় করিতে বলিয়া দিলেন।

অমর বলিল, "আপনার মেয়ে আজ আমাদের অনেক মাছ তরকারি সব দিয়ে এসেছেন। কালও পাঠাবেন বল্‌ছিলেন। কিন্তু এ নিয়ে যদি সুরেশ্বর বাবুর সঙ্গে রাগারাগি বেধে যায়, সেটা বড় খারাপ হবে। আমাদের চলেই যাবে এক রকম ক'রে, এতটুকু অসুবিধাতে আমরা কাজ ফেলে পালাব না। আপনারা আমাদের জন্যে ভাববেন না।"

যামিনী একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি না ভাবলেও মমতা ভাববেই। তার এই গরিব উৎপীড়িত প্রজাদের উপর বড় মায়া। উনি তাদের জন্যে কিছু করছেন না, এতে সে বড় দুঃখ পাচ্ছে। আপনারা তাদের জন্যে এত করছেন, এ জন্যে আপনাদের প্রতিও তার খুব শ্রদ্ধা। আপনাদের কষ্ট সে দেখতে পারে না।"

অমর খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবু বারণই করবেন। বেশী কিছু গণ্ডগোল এ নিয়ে হ'লে, বড় দুঃখের বিষয় হবে না কি?"

যামিনী বলিলেন, "সংসারে থাকলে সব গণ্ডগোল ত এড়িয়ে চলা যায় না? আপনাকে ত আমি সবে চিনলাম, কিন্তু তবু অনেক দিনের পরিচিতই মনে হচ্ছে।"

অমর বলিল, "আমাকে 'আপনি' বলবেন না, মা।"

যামিনী হাসিয়া বলিলেন, "তা না-হয় নাই বল্‌লাম। মমতাকে আমি বল্‌লে ত শুনবে না সে, তুমিই বুঝিয়ে বল। তার জন্যে আমার ভাবনার অন্ত নেই। ওকে শেষ

অবধি ওর বাপের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে পারব কি না জানি না। কিন্তু ভয় দেখিয়ে ওকে কোন লাভ নেই, ভয়ে ও দমে না।"

অমর বলিল, "না-হয় অন্য রকমে আমাদের সাহায্য করুন তিনি। খোলাখুলি বাপের বিরুদ্ধাচরণ নাই করলেন?"

যামিনী বলিলেন, "বাবা, তোমাকে তা হ'লে সব কথা স্পষ্ট ক'রে বলতে হয়। ওঁর কেন জানি না ধারণা হয়েছে তোমরা এখানে এসে প্রজাদের তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছ, খাজনা দিতে বারণ করছ, এই জন্যে তাঁর ভয়ানক রাগ তোমাদের উপর। যে-কোন উপায়ে তোমাদের এখান থেকে তাড়াতে তিনি একেবারে উঠে-পড়ে লেগেছেন। এখন যে-ভাবেই মমতা তোমাদের সাহায্য করতে যাবে, তাতেই ওঁর বিষদৃষ্টিতে পড়বে। আমি যে কি করব, তা ভেবেও পাচ্ছি না।"

অমর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি কি কিছু করতে পারি?"

যামিনী বলিলেন, "তোমাকে হয়ত অনেক কিছুই করতে হবে। সে আমার সময় মত বলব। আজ মমতাকে একটু ব'লে যাও, সে যেন এ নিয়ে জেদ ক'রে বাড়াবাড়ি না করে। উনি অতি রাগী মানুষ, রাগলে তাঁর জ্ঞান থাকে না।"

চাকর চায়ের সরঞ্জাম লইয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "চা কি এই ঘরে দেব মা?"

যামিনী বলিলেন, "না, চা খাবার-ঘরেই দাও, আর দিদিমণিকে খবর দাও।"

মমতা মায়ের ডাকে উঠিয়া মুখ ধুইয়া, খাইবার ঘরে প্রবেশ করিল। ভিতরে ঢুকিয়াই সে দাঁড়াইয়া গেল, পা যেন তাহার আর চলিতে চায় না। অমর বিকালে আসিবে বলিয়াছিল, কিন্তু সত্যই যে সে আসিবে, তাহা মমতা আশা করে নাই।

যামিনী বলিলেন, "আয় চা খেয়ে নে। সারাটা দিন ত তোর উপোস করেই কাটল।"

মমতা আস্তে আস্তে আসিয়া চেয়ারে বসিল। অমর একবার তাহার দিকে তাকাইয়া চোখ ফিরাইয়া নিল। একটা নমস্কার করিল বটে, কিন্তু তাহাও যেন অন্য দিকে চাহিয়া। এই মেয়েটি কেন এমন করিয়া তাহাদের জন্য বিপদ বরণ করিতেছে? শুধু প্রজাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়াই কি?

যামিনী প্লেটে করিয়া খাবার সাজাইয়া অমরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় চা দি? চা খাও ত?"

অমর বলিল, "চা খাই বটে, তবে এখানে আসার পর বিশেষ আর জোটে না। এত খাবার আমায় কেন দিচ্ছেন? আজ দুপুরে একটু অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে গেছে, এখনই আর খেতে পারব না।"

যামিনী মমতাকে খাবার দিতে দিতে বলিলেন, "কি আর বেশী, সামান্যই ত দিয়েছি।"

অমর প্লেটটা টানিয়া নিজের সামনে রাখিল বটে, কিন্তু তখনই খাইতে আরম্ভ করিল না। মমতার দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন, আমাদের কষ্ট করা অভ্যাস আছে, খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা আমরা স্বচ্ছন্দে সয়ে যেতে পারব। কিন্তু এ নিয়ে যদি আপনাকে কোন রকম শক্ত কথা শুনতে হয়, তা হ'লে সেটা সহ্য করা ঢের বেশী শক্ত হবে। আমার অনুরোধ আপনি আমাদের জন্যে বিন্দুমাত্রও ভাববেন না।"

যামিনী দেখিলেন তাঁহার মেয়ের চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িবার যোগাড় হইয়াছে। কিন্তু যেমন করিয়া হউক মমতার কথা এখন মমতাকেই বলিতে হইবে। যামিনী ত তাহার হইয়া সকল যায়গাই কথা বলিতে পারেন না?

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মমতা বলিল, "আমি যা উচিত মনে করি, তা একটু শক্ত কথার ভয়ে করব না কেন? আমি কি এতই অপদার্থ?"

অমর ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি একেবারেই তা মনে ক'রে কথাটা বলি নি। কিন্তু আপনাকে কোন ভাবে আমাদের জন্যে দুঃখ পেতে হচ্ছে, এটা সহ্য করা আমার পক্ষে শক্ত। তাই বলছি।"

যামিনী একটা ছুতা করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। ইহাদের যাহা-কিছু বলিবার আছে, বলিতে দেওয়া ভাল। তিনি থাকিলে মিথ্যা সঙ্কোচে হয়ত তাহারা বাধা পাইবে।

মমতা হয়ত মায়ের চলিয়া যাওয়ার অর্থ বুঝিতে পারিল।

এবার অমরের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আপনাদের কষ্ট সহ্য করতে দেওয়াও যে আমার পক্ষে ততখানিই শক্ত।"

অমর ইহার উত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। বলিবার কথা ত তাহার জিহ্বায় ভিড় করিয়া আসিতেছে, কিন্তু সবই কি বলা যায়? মমতা কি করুণা করিয়াই এতটা করিতেছে, না আরও কিছু আছে ইহার মধ্যে?

দুই জনের নীরবতা ক্রমে দু-জনেরই পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। মমতা ভাবিল মা ফিরিয়া আসিলে বাঁচা যায়। অমর ভাবিতে লাগিল উঠিয়া পড়িবে কিনা, কিন্তু চলিয়া যাইতেও যে কিছুতেই ইচ্ছা করে না।

অবশেষে বলিল, "আমার অনুরোধ বলেই কিছু যদি না করেন, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যে।"

মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যিই আপনি তাই চান?"

অমর বলিল, "তাই চাই। আপনি যদি স্বাধীন হতেন তা হ'লে আমাদের কাজে আপনার সাহায্য পেলে যত আনন্দ আমার হ'ত, তা মুখে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু আপনার বাবা আপনার অভিভাবক এখনও, তাঁর বিরুদ্ধে গেলে অনেক কষ্ট পেতে হবে। সেটা আমি চাই না।"

মমতা কথার উত্তর দিল না। অমর তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, মমতার দুই চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার যাতে অশান্তি না হয়, তারই জন্যে একথা আমি বল্‌ছি।"

মমতা গাঢ়স্বরে বলিল, "আপনাদের কোন উপায়েই যে আমি সাহায্য করতে পারব না, এর চেয়ে বড় অশান্তি আমার আর কিছুতে হবে না।"

অমর বলিল, "তা হ'লে আপনার যা করতে ইচ্ছা হবে তাই করবেন। আমার আর কিছু বলবার নেই।"

যামিনী এই সময়ে ফিরিয়া আসিলেন। অমর তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, আপনার মেয়েকে আমি বোঝাতে পারলাম না। তাঁকে আপনিও আর বাধা দেবেন না। কিন্তু আমাকে ডাকবেন যখনই আপনার দরকার হবে। প্রাণ দিয়েও যদি কোন সাহায্য আপনাদের করতে পারি তা আমি করব।" নত হইয়া যামিনীকে প্রণাম করিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

যামিনী বলিলেন, "দেখলে ছেলের রকম। একটু কিছু মুখে না দিয়েই চলে গেল।"

মমতাও না খাইয়া টেবিল হইতে উঠিয়া পড়িল। দুই চোখের জল গোপন করিবার জন্যই যেন ছাদে পলায়ন করিল।

পর দিন সকালে যামিনীই লোক দিয়া অমরদের ক্যাম্পে তরিতরকারি খানিকটা পাঠাইয়া দিলেন। সুরেশ্বর যদি জানিতে পারেন যে এ ব্যাপারে স্ত্রীও লিপ্ত আছেন, তাহা হইলে কন্যাকে বাদ দিয়া স্ত্রীর শাস্তি বিধান করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। ইহাই তাঁহার চিরদিনের নিয়ম। মমতা সারাটা দিন তাঁহাকে এড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল।

কর্ম্মচারীর দল গৃহিণী ও জমিদার-দুহিতার কাণ্ড কারখানা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। বাংলা দেশের মেয়ের এত বুকের পাটা। এত সাহস যে তাহাদের হইতে পারে, তাহাই এ মানুষগুলির জানা ছিল না। খুব পল্লবিত ভাবে সকল সংবাদ বহন করিয়া, শীঘ্রই একখানি পত্র সুরেশ্বরের ঠিকানায় চলিয়া গেল।

সুরেশ্বর ত রাগে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হইয়া গেলেন। অপরাধিনীরা সামনে থাকিলে তখনই একটা খুনোখুনি কাণ্ড হইয়া যাইত। কাছে যাহাকে পাইলেন তাহাকেই বকিয়া, গাল দিয়া, এবং চাকর-বাকরকে চড়, লাথি মারিয়া তিনি গায়ের ঝাল মিটাইতে লাগিলেন।

ডাক্তারবাবু খানিক ক্ষণ তাঁহার রকম-সকম দেখিয়া বলিলেন, "আপনি যদি এত বাড়াবাড়ি করেন, তা হ'লে কম্প্লিকেশ্যনের জন্যে আমি দায়ী হব না।"

সুরেশ্বর পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এই দেখ, দেখে তার পর কথা বল," বলিয়া চিঠিখানা তাঁহার পায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

ডাক্তার চিঠিখানা পড়িয়া, মুড়িয়া আবার খামের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া বলিলেন, "বেশ ত, তাঁরা যদি আপনার অমতে কিছু একটু করেই থাকেন, ফিরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে বোঝা-পড়া করলেই হবে। এত উত্তেজিত হবার কি হয়েছে?"

সুরেশ্বর রাগে গোঁ গোঁ করিতে করিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। দেশে এই রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খের আধিক্য হওয়াতেই না স্ত্রীলোকদের এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে?

তখনই ফিরিয়া যাইবেন, না যে-কাজে আসিয়াছেন তাহা সারিয়া যাইবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতেই তাঁহার সারা দুপুর কাটিয়া গেল। অবশেষে কাজ সারিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। এখানে তাঁহার আগমনে প্রজারা কিছু টিট্ হইয়াছে বোধ হইতেছিল। হঠাৎ চলিয়া গেলে সব পণ্ড হইতে পারে।

যামিনীকে যথাসম্ভব কড়া করিয়া তিনি একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেন। ফিরিয়া গিয়া কন্যা এবং স্ত্রী কাহাকেও যে তিনি রেয়াৎ করিবেন না, তাহা স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন। অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিয়া স্বাধীনচেতা কন্যার বিবাহ দিয়া তাহার স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ তিনি করিবেন। দেবেশ যে বিলাত যাইবার আগেই বিবাহ করিতে রাজী, তাহা পূর্ব্বে তিনি স্ত্রীকে জানান নাই, এখন জানাইলেন।

চিঠিখানা আসিয়া পৌছিল যামিনী যখন স্নান করিতে যাইতেছেন। তাহার আগে স্বামীর অপমানসূচক ভাষায় একবার তাঁহার মুখটা লাল হইয়া উঠিল, তাহার পর চিঠিখানা দেরাজে বন্ধ করিয়া, তিনি যেমন স্নান করিতে যাইতে-ছিলেন, তেমনই চলিয়া গেলেন।

মমতার স্নানাহার হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিলেন। তাহার পর তাহাকে শুইবার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়ে দেখ।"

চিঠি পড়িয়া মমতার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া উঠিল। দীপ্ত চোখে মায়ের দিকে তাকাইয়া সে বলিল, "বাবা যদি আমাকে মেরেও ফেলেন, তা হ'লেও দেবেশবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে পারবেন না।"

যামিনী বলিলেন, "তা পারবেন না জানি, কিন্তু উৎপাত যথেষ্টই করবেন। একটা উপায় আছে, যদি রাজী হ'স্।"

মমতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা?"

যামিনী বলিলেন, "কলকাতায় ফিরে গিয়ে কালই আমি অমরের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দিতে পারি। তুই রাজী আছিস্?"

মমতা অন্য দিকে মুখ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু তিনি কি রাজী হবেন?"

যামিনী বলিলেন, "হবে বলেই ত মনে হয়। সেটা তাকে ডেকে জেনে নিচ্ছি। কিন্তু এটা জেন যে ধনী বাপের মেয়ে হওয়ার যা-কিছু সুখ সুবিধা সব থেকে তুমি চিরদিনের মত বঞ্চিত হবে। বাপ তোমার যা রাগী, কোন দিন এ ব্যাপার ভুলবেন ব'লে মনে হয় না।

মমতা মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি সে-সব সুখ-সুবিধা কিছুই চাই না মা। বাবা অন্যায় ক'রে রাগ করেন ত কি করব? কিন্তু তিনি তোমার উপর বড় অত্যাচার করবেন মা।"

যামিনী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা করেন করবেন, ওসব আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। তোমাকে যদি যথার্থ সুখী হ'তে দেখি, সব আমার সইবে। কিন্তু খুব ভাল ক'রে বুঝে দেখ মা? মায়ের ভালবাসা ছাড়া এ বিয়েতে আর কিছু তুমি পাবে না।"

মমতা বলিল, "সেই ঢের মা। তার চেয়ে বেশী আর কি আছেই বা পাবার?"

সন্ধ্যার সময় বাগ্‌দী-বৌয়ের হাতে একটা চিঠি দিয়া যামিনী অমরকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিলেন। সে যেন এই আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিল।

যামিনী আজও তাহাকে সুজিতের ঘরে বসিতে বলিলেন, তাহার পর চিঠিখানা বাহির করিয়া আনিয়া বলিলেন, "এই দেখ ওঁর চিঠি। এখান থেকে কেউ তাঁকে খবর দিয়ে থাকবে।"

চিঠির ভাষা পড়িয়া ক্ষোভে বিরক্তিতে অমরের মুখ কালো হইয়া উঠিল। বলিল, "আমি কি যে বলব ভেবে পাচ্ছি না। এ-রকম যে হবে তা মনে করতে পারি নি।"

যামিনী বলিলেন, "আমি জানতাম যে এই রকমই হবে। ওঁকে ত চিনি। কিন্তু মেয়েকে আমার রক্ষা করব কি ক'রে তাই বল।"

অমর বলিল, "আপনি যা করতে বলবেন আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি। কি রকম হ'লে আপনাদের সুবিধা হয়?"

যামিনী বলিলেন, "মমতাকে মেরে ফেললেও সে ওখানে বিয়ে করবে না। আমি চাই তুমি তাকে নাও। রাজী আছ?"

অমর নীরবে মিনিট-দুই বসিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি ত তাঁর যোগ্য একেবারেই নই। আমি গরিবের ছেলে, চাকরিও করছি না।"

যামিনী বলিলেন, "কিন্তু চাকরি পরে করতে ত পার? এক বছরের মত ব্যবস্থা আমি তোমাদের ক'রে দেব, তার পর অবশ্য তোমায় করতে হবে। আর যোগ্যতার ভাবনা ত আমার মেয়ের, তোমার নয়। ওকে বাঁচাবার আর ত উপায় দেখি না। অবশ্য মন যদি তোমার অনুকূল না থাকে, তা হ'লে কথা নেই।"

অমর বলিল, "একমাত্র ঐ বাধাটাই নেই, আর সবই আছে।"

যামিনী বলিলেন, "আর সব বাধা লজ্জন করা যায়, ঐ-টাই যায় না। উনি পরশু ফিরবেন লিখেছেন, তার আগেই কলকাতায় গিয়ে আমাদের কাজ শেস ক'রে নিতে হবে। আজ রাত্রেই বেরতে পারবে?"

অমর এত ক্ষণে হাসিল, বলিল, "আমি ত পারিই মা, আপনারা কি পারবেন? কিন্তু আপনার মেয়ে নাবালিকা, বিয়ে হলেও সুরেশ্বর বাবু গোলমাল করতে পারেন।"

যামিনী বলিলেন, "মমতার বয়স আঠারো পার হয়ে গেছে, আমিই তাকে সম্প্রদান করব। আইনতঃ গোলমাল করবার অধিকার থাকলেও বিয়ে হয়ে গেছে জানলে তিনি কিছুই আর করবেন না। লোকের সামনে ছোট হওয়াকে তিনি বড় ভয় করেন, সেই ভয়েই কিছু করবেন না।"

অমর বলিল, "যাক্, ভয় কিছু আমি করি না। আমার যা-কিছু ভয়, সবই ওর জন্যে। আচ্ছা, আমি তা হ'লে যাই, চলে যাবার একটু যোগাড় করতে হবে ত?"

যামিনী বলিলেন, "হ্যাঁ, রাত্রে একটা নৌকা ঠিক রেখো। কিন্তু যাবার আগে মমতার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাও; দু-জনে ত এ বিষয়ে একটা কথাও বল নি।"

তিনি বাহির হইয়া গিয়া মমতাকে ঘরের ভিতর পাঠাইয়া দিলেন। সে ভিতরে আসিয়া নীরবে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অমরের দিকে চাহিতেও তাহার ভরসা হইতেছিল না।

অমর তাহার কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "আমি কতটা যে দরিদ্র সব দিক দিয়ে, সব জেনে তুমি এগোচ্ছ ত?"

মমতা এইবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "ধনের প্রতি কোনও লোভ আমার নেই। আমি যা করছি তার জন্যে কোন দিন আমাকে অনুতাপ করতে হবে না জানি।"

অমর বলিল, "তোমার এই বিশ্বাস যেন ভগবান কোন দিন না ভাঙেন।"

সমাপ্ত

বড়োদায় ব্রতচারী দল

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, পিএচ-ডি,
রাজরত্ন, জ্ঞানরত্ন, তত্ত্ববাচস্পতি (বড়োদা)

বহুদিন হইতেই বাংলার নূতন ব্রতচারী সম্প্রদায়ের কথা শুনিতেছিলাম, কিন্তু চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ আজ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মিঃ গুরুসদয় দত্ত গত বৎসর যখন লণ্ডনে ব্রতচারী-বার্ত্তা প্রচার করিতেছিলেন,

রায়বেঁশে নৃত্য

মরাঠা সিপাহীদের নৃত্য

কাঠিওয়াড়ী সিপাহীদের রাসনৃত্য

কাঠি নৃত্য

বড়োদার মহারাজা শ্রীমন্ত সয়াজীরাও গায়কবাড় তাঁহার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া প্রচারার্থ তাঁহাকে বড়োদায় আহ্বান করেন এবং তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন।

ব্রতচারী ও বড়োদার সিপাহীদের সম্মিলিত বেণী নৃত্য

মিঃ গুরুসদয় দত্ত বিলাত হইতে বোম্বাইয়ে নামিয়াই বড়োদা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ব্রতচারী দলের কয়েকটি শিক্ষক ও ছাত্রকে কলিকাতা হইতে আনাইয়া লন। এই দলের সাহায্যে তিনি বড়োদায় কয়েক দিন ধরিয়া নাগরিক-দিগকে ব্রতচারী সম্প্রদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শ, এবং ধর্মে, সমাজে ও শিক্ষায় ব্রতচারীর বর্ত্তমান স্থান সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শরীর গঠনের জন্য উপযোগী নৃত্যাদি যোগ্য গীতের সহিত প্রদর্শন করিতেছেন। বড়োদা সাধারণতঃ একটি অতি নিরানন্দ স্থান, এখানেও বাংলা দেশের মত ছেলেদের শরীর অসুস্থ ও মন বিষাদে পরিপূর্ণ। তাহা ছাড়া সম্পূর্ণ উৎসাহের অভাব, নূতন জিনিস ইহারা সহজে বুঝিতে পারে না, বুঝিলেও গ্রহণ করিতে পারে না। তাহা সত্ত্বেও মিঃ দত্ত ব্রতচারী দলের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া এবং নৃত্য-গীতাদি দেখাইয়া তাঁহার দলের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমি যে-সভায় উপস্থিত ছিলাম, সে-সভায় বড়োদার দেওয়ান সাহেব সর্ ভি. টি. কৃষ্ণমাচার্য্য তাঁহার স্ত্রী লেডি কৃষ্ণমাচার্য্যের সহিত উপস্থিত ছিলেন। তাহা ছাড়া পারস্যের এক রাজকুমার এবং বড়োদার রেসিডেণ্ট সাহেবের স্ত্রী মিসেস বেয়র এবং তাঁহার কন্যা, বড়োদা রাজ্যের সেনাপতি এবং অপরাপর বহু গণ্যমান্য সরকারী অফিসার উপস্থিত ছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, অগ্রজপ্রতিম গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি অন্যান্য অনেকে সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। মোট প্রায় দুই সহস্র শিক্ষক, ছাত্র এবং স্ত্রীলোক সেই সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া মিঃ দত্তের ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আর

শিবাজীর মূর্ত্তির নিকট ব্রতচারীর দল।

বক্তৃতার মধ্যে মধ্যে ব্রতচারী দলের ছেলেরা আসিয়া কখনও বা স্বর করিয়া তাহাদের ষোল পণ, সতেরো মান ইত্যাদি আবৃত্তি করিতেছিল, কখনও বা এক একটি গান করিয়া অপূর্ব্ব নৃত্য প্রদর্শন করিতেছিল। কখনও কীর্ত্তনের স্বর, কখনও মুসলমানী স্বর, কখনও বিলাতী ফৌজের স্বর; কখনও বীররস, কখনও শান্তরস, ব্রতচারীদের গান ও নৃত্য হইতে ফুটিয়া উঠিয়া দর্শকবৃন্দের মন মোহিত করিতেছিল। দত্ত সাহেব কখনও কথা কহিতেছিলেন, কখনও বক্তৃতা দিতেছিলেন, আর যখনই একটু অধীর হইতেছিলেন তখনই আসিয়া ছেলেদের সঙ্গে যোগদান

করিয়া হয় গান করিতেছিলেন, নয়ত নৃত্য করিতেছিলেন। মিঃ দত্তের উৎসাহের বাণী, অভয়বাণী, তেজোবাণী সভাস্থিত সকলের কর্ণে যেন অমৃতবর্ষণ করিতেছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ তন্ময় হইয়া সকলে দত্ত-সাহেবের এই নূতন সম্প্রদায়ের বিবরণ শুনিতেছিল। সে দিনের সে দৃশ্য আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না।

এই বিরাট ব্রতচারী সম্প্রদায়ে ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক নর-নারী যোগদান করিয়াছেন এবং দিন দিন এই সম্প্রদায় তীব্রবেগে বিস্তার লাভ করিতেছে। ব্রতচারী সম্প্রদায়ে ধর্ম্ম, জ্ঞান, শিক্ষা, তরুণতা, নারীস্বাতন্ত্র্য, আনন্দ ও শ্রমের মূলমন্ত্র একাধারে নিহিত রহিয়াছে। মিঃ দত্তের অভয় বাণী বাঙালীর চিত্তে নবজীবনের সাড়া আনিয়া দিয়াছে; নিরানন্দ বাঙ্গালীর মনে আশা ভরসা ও আনন্দের স্রোত বহাইয়া দিয়াছে।

ব্রতচারী পরিচেষ্টা সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন, সে-সকলের পুনরুক্তি এখানে করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার, যে, যাহারাই অভিনিবেশপূর্ব্বক এই পরিচেষ্টা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ইহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। অনেক পদস্থ ইংরেজ, পদস্থ বাঙালী, জমিদার, বণিক, ব্যবসায়ী ভুক্তির তিন উক্তি বাংলা ভাষায় উচ্চারণ করিয়া ব্রতচারী দলভুক্ত

বড়োদায় ঢালী নৃত্য

হইয়াছেন। বাঙালী ছাড়াও বহু অবাঙালী, বিহারী, মান্দ্রাজী, পঞ্জাবী, মরাঠা ও গুজরাতী ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। ব্রতচারীদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, তাই ইহার ভিতর সকল জাতিকেই দেখিতে পাইবেন—হিন্দু, মুসলমান, অস্পৃশ্য, খ্রীষ্টিয়ান ও ব্রাহ্ম। তাহা ছাড়া ব্রতচারী বয়সের মর্য্যাদা রাখে না। তাই বালক, তরুণ, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, স্ত্রী কিংবা পুরুষ সকলেই ব্রতচারী হইয়া আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন।

লক্ষ্মীবিলাস-প্রাসাদের সিংহদ্বার (বঙ্গের স্থাপত্যের অনুরূপ)

ব্রতচারীরা জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ এই পাঁচটিকেই ব্রত বলিয়া মানেন, এবং এই পাঁচটিরই অনুশীলন জীবনে করিয়া থাকেন। ভুক্তির তিনটি উক্তি পড়িলে মনে হয় সেই বহুপুরাতন বুদ্ধদেবের কথা, যিনি ত্রিশরণ পাঠ করিলেই লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন এবং নিজের সঙ্ঘে স্থান দিতেন। ঠিক সেই পুরাতন বাণী বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

আবার আড়াই হাজার বৎসরের পর ধ্বনিত হইতেছে; ঠিক সেই ভাবে নহে, কেবল একটু পরিবর্ত্তিত ভাবে, অর্থাৎ যে ভাবে আমরা বুঝিতে পারি অথবা বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা বিনা কষ্টে বিনা ক্লেশে বুঝিতে পারে। "আমি বাংলাকে ভালবাসি, আমি বাংলার সেবা করব, আমি বাংলার ব্রতচারী হব।" এই ত্রিশরণে বাংলা—বুদ্ধ, সেবা—ধর্ম্ম এবং ব্রতচারী—সঙ্ঘ। বাঙালী শ্রীযুত গুরুসদয় দত্তের নেতৃত্বে আজ এই নূতন ত্রিশরণে দীক্ষিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা কি হইতে পারে?
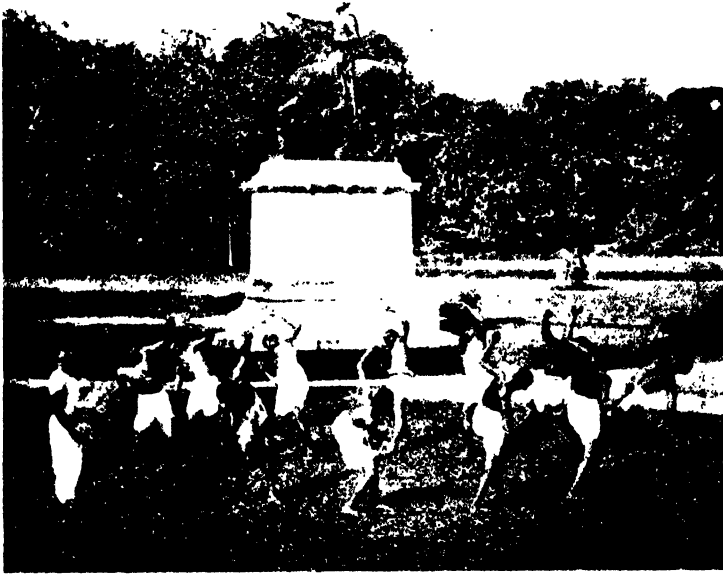
শিবাজীর মূর্ত্তির পাদমূলে রায়বেঁশে নৃত্য

বর্ত্তমান বাঙালীদের দুর্দ্দশার চিত্র অনেকেই দিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব কোন্ দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পরশুরাম যেরূপ "কচি-সংসদে" দেখাইয়াছেন তাহা অতুলনীয়। লেখাপড়া-শেখা বাঙালী পাতলা হবে, রক্তহীন হবে, মেয়েমানুষের মত নাম রাখবে, কাপড় পরবে, পথ চলবে, চোখে চশমা পরবে, অল্পে ক্লান্ত হবে, খুব ঘুমুবে আর একেবারেই পরিশ্রম করবে না, এই দাঁড়াইয়াছিল বাঙ্গালীর আদর্শ। এইরূপ অদ্ভুত আদর্শ লইয়া বাঙালী ধ্বংসপথে অগ্রসর হইতেছিল। সেই ধ্বংসোন্মুখ বাঙালীকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রতচারী পরিচেষ্টা আগুয়ান হইয়াছে, এবং ব্রতচারী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মিঃ গুরুসদয় দত্ত সেই পরিচেষ্টাকে প্রেরণা দিতেছেন। বাঙালীর মনে কি করিয়া আশা, ভরসা, উদ্যম ও আনন্দ আনিতে পারে, কি করিয়া বাঙালী জাতির প্রাণে নবচেতনা আনিয়া দিতে পারে, তাহাই শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের একমাত্র চিন্তার বিষয়, একমাত্র সাধনা, একমাত্র ধ্যান হইয়াছে।

আজ বাঙালী অন্নহীন, বস্ত্রহীন, বুদ্ধিহীন, বিদ্যাহীন, নিরাশার মহাসাগরে ভাসিতেছে। আজ তাহাদের নূতন বাণী শুনাইবার জন্য বাংলার শিক্ষক-রূপে গুরুসদয় আসিয়াছেন, বাঙালীর মনে আশা দিতে, বাঙালীর প্রাণে নবচেতনা দিতে, বাঙালীকে কাজ শিখাইতে, বাঙালীকে হাস্য ও আনন্দরসে পরিপ্লুত করিতে, বাঙালীর শরীরে অটুট স্বাস্থ্য ও অমিত তেজ দিতে। বাঙালী-চরিত্রে বাঙালী সমাজের গলদ কোথায়, নিপুণ বৈদ্যরাজের ন্যায় তিনি তাহা ধরিয়াছেন এবং তাহার প্রতীকার তিনি করিয়াছেন। খাঁটি বাংলা দেশের সংকৃষ্টির ভিতর দিয়া বাঙালীকে তিনি নূতন জাতি করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মিঃ দত্ত আসিয়াছেন কাজ করিতে, ভগবান তাঁহার সহায়। তাঁহার বাণী লোককে শুনিতে হইবে, এই শুনাইবার অধিকার লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পরম করুণাময় তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন এবং দলে দলে বাঙালী ব্রতচারী হইয়া নিজের জীবন পরিপূর্ণ করুক, সফল করুক, এবং দত্ত-সাহেবের আজীবনের সাধনার সিদ্ধি বিধান করুক, ইহাই প্রার্থনা।

পরিশেষে ইহাও বলিয়া রাখা দরকার, যে, আমি ব্রতচারী নহি, ব্রতচারী কখনও হইব কিনা তাহা ভবিষ্যতের যোগাযোগের উপর নির্ভর করে। ব্রতচারী পরিচেষ্টা আমাদের মত বহুদূরপ্রবাসী বাঙালীর মনে যে কি ভাব আনয়ন করে, তাহারই একটা ধারণা এখানে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনরূপ দলপুষ্টির জন্য অতিরঞ্জিত কথা ইহাতে বলি নাই।

মহিলা-সংবাদ

মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীমতী রুক্মিণী লক্ষ্মীপতি তামিল নাড়ু প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে সভানেত্রীত্ব করেন।

শ্রীমতী রুক্মিণী লক্ষ্মীপতি

ডাঃ কুমারী দেবী বলিরাম

সিন্ধুদেশবাসিনী ডাঃ কুমারী দেবী বলিরাম, এম্-বি. বি-এস্, এল্-এম্ (ডব্লিন), এম্-সি-ও-জি (লণ্ডন), বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিনী হইয়া সম্প্রতি দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। সিন্ধুদেশবাসিনী মহিলাদের মধ্যে এইরূপ প্রচেষ্টা এই সর্ব্বপ্রথম।

শ্রীযুক্তা নির্ম্মলিনী হালদার, বি এ, এল-টি, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির প্রথম বাঙালী হিন্দু মহিলা গ্রাজুয়েট। ইনি ইঁহার স্বামী ডাঃ হালদারের সহিত বহুদিন যাবৎ মুজঃফর-

শ্রীমতী নির্ম্মলিনী হালদার, বি-এ, এল্-টি,
মুজঃফরনগরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট

নগরে বাস করিতেছেন, এবং তথাকার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট। সম্প্রতি তিনি ঐ স্থানের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নারী-কল্যাণ-

মূলক বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ আছে, এবং এইরূপ বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বার্ত্তা তিনি হিন্দুস্থানী মহিলাগণের মধ্যে বহুল প্রচার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাঁহার উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯৩৪ সনে রবীন্দ্রনাথের "নটীর পূজা" হিন্দীতে অনূদিত হয় এবং মীরাট দুর্গাবাড়ী বালিকা-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা স্নেহসুধা গুপ্তের সহায়তায় তিনি উহা হিন্দুস্থানী বালিকাদিগের দ্বারা স্থানীয় জেলা প্রদর্শনীতে অভিনয় করান। তাঁহার মধুর ব্যবহারে স্থানীয় মহিলাগণের মধ্যে তিনি অতিশয় ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্রী।

শেরকোটের রাণী ফুলকুমারী সাহেবা বিজনৌর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভানেত্রীর পদে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভারতীয় মহিলার এইরূপ সম্মান এই সর্ব্বপ্রথম।

গ্রামের সমস্যা : স্ত্রীশিক্ষা

শ্রীঅবলা বসু

বাংলার এই শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনের সপ্তাহে অন্ততঃ শহরের সকলেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একমত। স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেরই উচ্চশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিক্ষার মাপকাঠির হারেই আজকাল জাতীয় জীবনের উন্নতি অবনতির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান জগতের উন্নত জাতিগুলির তুলনায় পরাধীন ভারতের শিক্ষার হার যে অতি নগণ্য তাহা সকলেই জানেন। যেখানে উন্নত জাতির শতকরা প্রায় ৯০, ৯৫ জন লিখনপঠন-ক্ষম, সেখানে ভারতের প্রায় শতকরা ততজনই বা আরও অধিক লিখনপঠনে অক্ষম। ভারতের শিক্ষাসমস্যা স্ত্রীপুরুষ সকলের পক্ষেই সমান।

পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র বাহিরে থাকায় ও সংসারের আর্থিক ব্যবস্থা সাধারণতঃ পুরুষকে করিতে হয় বলিয়া আমাদের দৃষ্টি পুরুষদের শিক্ষার দিকেই বিশেষভাবে পড়ে। মেয়েদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র সাধারণতঃ অন্তঃপুরে সীমাবদ্ধ বলিয়া এবং তাহাদিগকে সংসারের আর্থিক সমস্যা পূরণ করিতে হয় না বলিয়া মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের মন সজাগ নয়। এই জন্যই আমাদের শিক্ষাও তাহার যথার্থ মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। শিক্ষা যে কেবলমাত্র চাকরি বা ধনাগমের কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করা নয়—শিক্ষা যে মানবজাতির ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত ও রাষ্ট্রগত সমস্ত প্রয়োজন ও কল্যাণ সাধনের পথকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়—ইহাও আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। তাই স্ত্রীশিক্ষার কথায় এখনও অনেকেই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থাকে, অথচ সর্ব্বত্রই ভাবী সমাজের, ভাবী জগতের আগন্তুকেরা অন্তঃপুরে মেয়েদের প্রভাবের মধ্যেই মানুষ হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষকে 'মানুষ' করিয়া তুলিতে হইলে যে গভীর ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত, রাষ্ট্রগত, জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা ত ইহারা লাভ করিবার সুযোগ পায় না—দেশের উন্নতি হইবে কি করিয়া ?

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে একটু সজাগ ভাব আসিয়াছে, তাহার মূলেও কিন্তু এই শিক্ষার মর্য্যাদা তেমন ভাবে স্থান লাভ করে নাই যেমন আর্থিক সমস্যা স্থান লাভ করিয়াছে। সেই জন্যই দেখিতে পাই বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা চাকরির উমেদারীতে যেমন ব্যস্ত, শিক্ষার মর্য্যাদাদ্বারা পরিবার ও সমাজকে বলশালী করিয়া তুলিতে তেমন সজাগ নন। এই জন্যই আজও আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নরনারীর মধ্যে দেশের সমস্যা, গ্রামের সমস্যা, জাতীয় জীবনের সর্ব্বদিকের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহা সমাধানের জন্য তেমন আগ্রহ দেখিতে পাই না।

দেশের বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষা, দেশের ছেলেমেয়েদের চরিত্রে ও চিন্তায় বল আনিতে পারিতেছে না। এই জন্য সকলেই

শিক্ষার সংস্কার হওয়া একান্ত দরকার এই কথা বলিতেছেন। এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাবোধের সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র স্ত্রী-পুরুষের কর্ম্মস্থল ও মানসিক গতির বিভিন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থলবিশেষে উভয়ের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থাও করিতে হইবে। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহা আজ তর্কের বিষয় না হইয়া, সমাজের ঐক্য ও সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য উভয়ের শক্তিরই বিভিন্ন দিক দিয়া সমানই যোগ্যতা ও আবশ্যকতা রহিয়াছে, ইহাই চিন্তার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। উভয় শক্তিরই সমান আবশ্যকতা ও যোগ্যতা—এই বোধ না হইলে দুর্ব্বলশক্তি নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না এবং প্রবলশক্তিও অপব্যবহারে নিজেকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। সমাজের মঙ্গলসাধনক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের শক্তিকেই এই জন্য তুল্য আসন দিতে হইবে।

নানা কর্ম্মোপলক্ষে শহরে যাঁহারা বাস করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারের মেয়েরা অতি সহজেই—ছোট বড়, নিম্ন উচ্চ, সাধারণ শিল্প,—যে-কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত হইয়া নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের সে সুযোগ নাই, সুদূর পল্লীতেই যাঁহাদের আজীবন বাস করিতে হইবে, তাঁহাদের শিক্ষালাভের সুব্যবস্থা করাই আমাদের পক্ষে মহা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। অথচ সমস্ত দেশ এই পল্লীতেই—পল্লীর জীবনমরণ সমস্যার উপরই দেশের ভাবী উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে। শহর নানাবিধ সুখসম্পদে, জ্ঞানবিজ্ঞানে যতই কেন উজ্জ্বল হইয়া উঠুক না, গ্রামের অর্থবিত্তশিক্ষা-দীক্ষাসম্পন্ন লোকসমূহকে যতই সে নিজের কবলে টানুক না কেন, যদি তাহা দেশের প্রাণের সঙ্গে যোগ রাখিতে না পারে, তবে তাহা বিকারগ্রস্ত রোগীরই মত নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হইবে। সেই জন্য ঘরে বাহিরে, শহরে গ্রামে শিক্ষা ও উন্নতির যোগসূত্রটি স্থাপন করা চাই। পুরুষের সঙ্গে যেমন নারীর, তেমনই শহরের সঙ্গে গ্রামের শিক্ষা ও উন্নতি একই যোগে হওয়া চাই।

গ্রামের প্রতিটি সমস্যাই একে অন্যের সহিত এমনভাবে জড়িত, যে একের আলোচনায় অপরটিও চোখে ভাসিয়া উঠে। সেই জন্যই আজ আমাদের আলোচনার বিষয় 'গ্রামের মেয়েদের মধ্যে কি ভাবে শিক্ষা বিস্তার করা যায়' হইলেও, সাধারণ ভাবে গ্রামের কথাই মাথা তুলিয়া দেখা দিবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে গ্রামের মেয়েদের প্রকৃত উন্নতি ও শিক্ষা সমগ্র গ্রামের উন্নতি অবনতির উপরই নির্ভর করে; কারণ সমগ্র জীবনের পরিপুষ্টি ও সার্থকতাতেই খণ্ড জীবনেরও সফলতা।

দেশ যেমন অর্থে দরিদ্র, তেমনই মনেও দরিদ্র। সেই জন্য বাংলার গ্রামে যে সামান্য কতকগুলি বালক-পাঠশালা বা ততোধিক কম মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় রহিয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট মেয়েরাও পড়িবার সুযোগ পায় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একত্রে পড়িতে দিবার মত সাহস এখনও আমাদের দেশে হয় নাই। সেই জন্য ধীরে ধীরে পল্লীতে কিছু কিছু বালিকা-পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অথচ যোগ্য শিক্ষয়িত্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই না-থাকায় এই সব পাঠশালা কোনও উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। বালিকা-পাঠশালা দেশে অত্যন্ত কম থাকায় এবং মেয়েদের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলাচলের নানা অসুবিধা ও বাধা থাকায় শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদের অন্য কোন পাঠশালার উন্নতি অবনতির সঙ্গে বা অন্য পাঠশালার শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটে না—শহরের বিদ্যায়তনের সঙ্গে পরিচয় ত দূরের কথা। যে-সমস্ত পাঠ্যবিষয় শিক্ষা-বিভাগ হইতে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষয়িত্রীদেরও তেমন না থাকায় তাঁহারা ছাত্রীদের মনে কোন রকমের কৌতূহলের সৃষ্টি করিতে পারেন না। গ্রামের পাঠশালাগৃহগুলি সুন্দর ও প্রশস্ত না হওয়ায় এবং সেখানে লাইব্রেরী, খেলাধূলা বা আমোদ-প্রমোদেরও কোন ব্যবস্থা না থাকায়, এই শিক্ষাস্থানগুলি মেয়েদের মনে কোন দিক্ দিয়াই আকর্ষণের স্থল হয় না। অভিভাবক-অভিভাবিকারা মেয়েদের শিক্ষাসম্বন্ধে উদাসীন হওয়ায় গৃহেও মেয়েদের মনে বিদ্যালাভের কোন আগ্রহের সৃষ্টি হয় না। অধিকাংশ শিক্ষিত গ্রামবাসী গ্রাম ছাড়িয়া শহরে বাস করায় গ্রামের আবহাওয়াও শিক্ষাসম্বন্ধে কোন উৎসাহের সৃষ্টি করে না। মাঝে মাঝে উপরিতন বিভাগ হইতে এই সব বিদ্যালয় পরিদর্শনের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা এত সাময়িক ও শাসনের রঙে

এত রঞ্জিত, যে তাহাতে কেবল ভয়েরই উৎপত্তি হয়, অন্য বিশেষ কোন ফলোদয় হয় না। ইহার উপর উচ্চশিক্ষিত যুবকদের বেকার-সমস্যা অতি তীব্র হওয়ায় বর্ত্তমানে সাধারণ শিক্ষার উপরই একটা অবিশ্বাস ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

এই সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষার উপর গ্রামবাসীর বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে হইবে। গ্রামবাসীকে বুঝাইতে হইবে, যে, গ্রামের আর্থিক, নৈতিক, সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য মনের জাগরণের প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথমে, এবং সমস্ত দৈন্য দূর করিবার জন্য চাই সেই যথার্থ শিক্ষা যাহা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দৈন্যের মূলীভূত কারণকে দেখাইয়া দিতে পারে এবং তাহা দূর করিবার জন্য সাহস ও বীর্য্যের সহিত সকলকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিতে পারে। এই কার্য্য বর্ত্তমান পাঠশালার মত ক্ষীণপ্রাণ নাড়ীছাড়া অনুষ্ঠানের দ্বারা হইতে পারে না।

সকলেই বলিয়া থাকেন আমাদের গ্রামগুলি একেবারে সর্ব্বদিকেই অজ্ঞতার অন্ধকারে রহিয়াছে; কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম্মনীতি, উৎসব-আনন্দ কোন দিকেই নূতন প্রাণের সাড়া নাই—মান্ধাতার আমলের বিধিব্যবস্থাতেই জর্জ্জরিত। অন্তঃপুর-জীবনের সর্ব্বত্রই—ধাত্রীবিদ্যা, সন্তানপালন, খাদ্য, স্বাস্থ্য, সাংসারিক নিত্য বিধিনিষেধ, পূজাব্রত—অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বোঝা জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, পুরাতনের এই দুর্ভেদ্য দুয়ার ভেদ করিতে হইলে, বাহিরের বিজ্ঞানসম্মত কতকগুলি উন্নত বিধির ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না—যদি না সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রাণ থাকে। কারণ কেবলমাত্র প্রাণপূর্ণ শ্রদ্ধাই জীর্ণতা ও অজ্ঞানতা ভেদ করিয়া প্রাণধর্ম্মীর প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে; প্রাণ স্পর্শ করিলেই তখন আর কোন নূতন ও উন্নত বিধিই বাহিরের চাপানো বস্তু বলিয়া মনে হয় না, কাজেই তাহাকে গ্রহণ করিতে তখন মনে কোন বিদ্রোহ থাকে না।

এই জন্য চার-পাঁচটি গ্রামকে লইয়া এক একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই কেন্দ্রগুলি গ্রামের নাড়ীর সঙ্গে যোগ রাখিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রামের দৈহিক, নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইবে। গ্রামের আত্মচেতনা ও আত্মবিশ্বাসকে জাগাইয়া দেওয়াই এই সব কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কাজ হইবে। এই সব কেন্দ্র এক দিকে যেমন বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবে, তেমনই অপর দিকে অন্তঃপুর ও জনসাধারণেরও নানাবিধ অজ্ঞতা দূর করিবার আয়োজন করিবে; লিখনপঠনক্ষমতামূলক বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, কৃষি, পূর্ত্ত প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইবে। এই সব কেন্দ্র গ্রামের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সময়, নিয়ম, বিষয়, খেলাধূলা, সেবাশুশ্রূষা, আমোদ-প্রমোদ, সমস্ত দিক দিয়াই গ্রামের জীবনের অঙ্গাঙ্গী ব্যবস্থার অনুযায়ী করিয়া গ্রামেরই বিশেষ ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হইবে।

এই ভাবের কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে পারিলে, গ্রামের মনের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে একবার জাগাইতে পারিলে, আর কোন দিকেই অগ্রগতিতে বাধা পড়িবে না। তখনই গ্রামে গ্রামে পাঠশালা-স্থাপনা অনায়াসকার্য্য হইবে—তখন এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত থাকিয়াই প্রাথমিক শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত প্রাথমিক বিধান বাংলার বিধবা মহিলাদের দ্বারা সম্পন্ন করিবার বিপুল ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু প্রথম এই ভাবের কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার জন্য চাই শিক্ষাদীক্ষায় চরিত্রে আদর্শে উজ্জ্বল প্রাণবান্ ত্যাগী কর্ম্মীমণ্ডলী—যাঁহাদের ত্যাগ, যাঁহাদের জ্ঞান, যাঁহাদের চরিত্র, যাঁহাদের শ্রদ্ধা গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে ও যাঁহাদের নিকট গ্রামবাসী তাহাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান করিয়া লইতে পারিবে।

এই উপলক্ষে আমরা একবার খ্রীষ্টীয় সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারি। খ্রীষ্টীয় মিশনরীরা যেভাবে নিজেদের দেশ ত্যাগ করিয়া, সভ্য সমাজের সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আমোদ-প্রমোদ, ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া পৃথিবীময় পল্লীতে পল্লীতে অখ্যাত অজ্ঞাত স্থানে নিরক্ষর পল্লীবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে ব্যাপৃত, তাহা বাস্তবিকই শ্রদ্ধা ও অনুকরণের যোগ্য। তাঁহাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমাদের মিল বা সহানুভূতি না হইতেও পারে, কিন্তু তাঁহাদের ত্যাগ ও সাহস, তাঁহাদের ধৈর্য্য ও মানবতা আমাদের মনে স্বতঃই শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তাঁহাদের পিছনে যেমন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য রহিয়াছে, আমাদের দেশেও এই ভাবের কর্ম্মী প্রেরণের

পিছনে বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নারীশিক্ষা সমিতি, জাতীয় মহাসমিতি ও সরকার বাহাদুর যদি সচেষ্ট হন, তবেই তাহা অনায়াসসাধ্য হইতে পারে। এই সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যদি এই দিকে উৎসাহী হইয়া, আর্থিক চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়া উচ্চশিক্ষিত আদর্শ পরিবার ও যুবক-যুবতীকে এই ভাবের কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার কাজে নিয়োগ করিতে পারে, তবেই মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রামের জীবনে আবার প্রাণ ও আনন্দের সঞ্চার হইতে পারে।

মণিপুর-প্রবাসে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

গত বৎসরের ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মণিপুরী নৃত্য-উৎসব সম্বন্ধীয় আমার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই মণিপুরের 'যাকাইরোল' বা জাগরণ নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ডাক্তার লৈরেন সিংহ নিংথৌজম আমায় দুর্গাপূজার ছুটিতে ইম্ফলে গিয়ে 'কুয়াক-তলবা' উৎসব দেখবার জন্যে

নাগা নৃত্য

নির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে একখানা পত্র লেখেন। গেল বছর নানা কারণে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নি। এবার কিন্তু পূজাবকাশে ইম্ফলে গিয়ে মণিপুরীদের অন্যতম প্রধান জাতীয় উৎসব 'কুয়াক-তল্বা' দেখবার মতলব বহু দিন আগে থেকে স্থির ক'রে রেখেছিলুম। তাই আমাদের রেডক্রস সোসাইটির আপিস যেদিন বন্ধ হ'ল সেই দিনই (২রা সেপ্টেম্বর) রাত্রের ট্রেনে মণিপুরের উদ্দেশে রওনা হওয়া গেল। পরদিন রাত আন্দাজ নয়টার মণিপুর রোড ষ্টেশনে নেমে পড়লাম। রাত্রিটা ষ্টেশনেই কাটিয়ে ৪ঠা তারিখ সকাল বেলা ইম্ফল-গামী মোটরে উঠলাম। এ জায়গা থেকে ইম্ফলের দূরত্ব-এক-শ চৌত্রিশ মাইল,—মোটর-ভাড়া কুল্যে এক টাকা।

প্রাচীন বাংলা বা দরবার-গৃহ

নীচুকর্ডের গেট ছাড়িয়ে আমাদের মোটরখানা বনানী-মণ্ডিত নাগাপাহাড়ে প্রবেশ ক'রে হিলিমিলি রাস্তা বেয়ে চলতে লাগল। দু-ধারে দূরপ্রসারী মহাবন, স্থানে স্থানে বনস্পতি-সমূহের শীর্ষদেশ থেকে পুষ্পখচিত লতাগুচ্ছ ঝলঝলে ঝালরের মত দোলায়মান। শ্যামল বনভূমি অতিক্রম ক'রে মোটরখানা দুর্গম বন্ধুর গিরিপথ বেয়ে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে আরোহণ করতে লাগল। রাস্তার বাঁদিকে সুগভীর খদের ওপারে সুবিন্যস্ত অনন্ত পর্ব্বতমালার বর্ণবৈচিত্র্য অপূর্ব্ব। নিকটের পাহাড়শ্রেণী ঘনসবুজ, তার পরের সারি পাঁশুটে রঙের, আর

সকলের শেষ সারিতে সংস্থাপিত আকাশস্পর্শী শৈলরাজি নীলাভ। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সাজানো সবুজ আর হলুদে রঙের শস্যক্ষেত্রগুলোর মাঝখানে সরু নোয়ানো বাঁশের ডগায় সাদা-কালো বস্ত্রখণ্ডসমূহ টাঙানো।

বেলা বারোটায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নয় হাজার ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত নাগা পাহাড়ের রাজধানী কোহিমায় এসে মোটর থামলে দেখি, রাস্তার ধারে একটা ঘরে একপাল নাগা মেয়ে-পুরুষ একটা মুরগীর খাঁচা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কোহিমার নাগারা আঙ্গামী নাগা নামে পরিচিত। পুরুষগুলো প্রত্যেকেই লম্বায় অন্তত ছ-ফুট। এদের মাংশপেশী-বহুল সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের সৌষ্ঠব দু-দণ্ড তাকিয়ে দেখতে

"কুয়াক-তলবা" উৎসবে ডুলিতে গ্রাম-প্রধানের আগমন

ইচ্ছা করে। প্রায় সবাইকে বলা যেতে পারে ব্যূঢ়োরস্ক আর বৃষস্কন্ধ। আসামের আর কোন পাহাড়ী জাতির মধ্যে এমন সুগঠিতঅবয়ববিশিষ্ট লোক ত আমার নজরে পড়ে নি। আঙ্গামী মেয়েরাও বেশ ফরসা ঢেঙা। পুরুষদের গলায় শাঁখের টুক্‌রো দিয়ে তৈরি মালা। সর্দ্দারদের কণ্ঠাভরণের মাঝখানে আস্ত এক একটি শঙ্খ ঝুলানো, বাহুতে হাতীর দাঁতে প্রস্তুত বাজুবন্ধের মত আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার গয়না ; গায়ে হাতাহীন কালো জামা, এদের কাছা-না-দিয়ে পরা কালো রঙের কটিবাসে গাঁথা সারি সারি কড়িগুলো বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আগেকার দিনে মানুষের
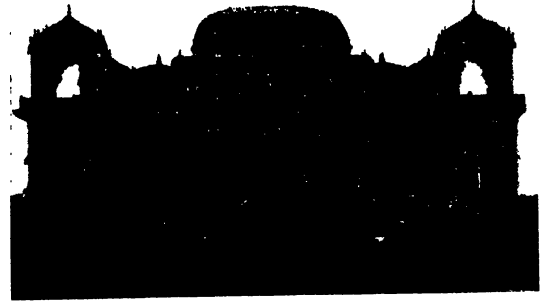
বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ

মাথা কেটে আনতে না পারলে আঙ্গামী পুরুষরা পরিধেয়তে কড়ি গাঁথবার অধিকারী হ'ত না। পরনের বস্ত্রখণ্ডে গাঁথা কড়ির সারির সংখ্যা থেকে কে কি পরিমাণে নরহত্যা করেছে, তা বোঝা যেত। কোহিমাতে পুলিস-কর্ম্মচারীরা আমাদের অনুমতিপত্রগুলো পরীক্ষা ক'রে মোটর ছাড়বার অনুমতি দিলে। মোটরখানা এখন একটার পর আর একটা উৎরাই ভেঙে ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগল। অপরাহ্ণে 'মাও' থানায় পৌঁছবার পর আবার মোটর দাঁড় করানো হ'ল। সঙ্গে সঙ্গেই অনেক-গুলো মুণ্ডিতমস্তক ছোট ছোট নাগা ছেলেমেয়ে বিক্রয় নানান্‌ তরিতরকারীসহ এসে হাজির। ছেলেমেয়ে সকলেরই ন্যাড়ামাথায় এক একটি ক'রে টিকি। পথিপার্শ্বে বিক্রেয় দ্রব্য নিয়ে উপবিষ্ট অবিবাহিতা কিশোরীদের মাথার চুল খুব ছোট ক'রে ছাঁটা। বিয়ের পর নাকি তবে মেয়েদের মাথার চুল কামানো হয় না। এখানকার পুরুষদের মাথার চার পাশ ক্ষুর দিয়ে চেঁচে কামানো, শুধু করোটির ওপর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ কেশ, চাঁদির ওপরকার ঝুঁটি-বাঁধা। স্ত্রীপুরুষ সকলেরই সর্ব্বাঙ্গে গয়নার প্রাচুর্য

তাদের কানের তেলোর ফুটোর মধ্যে লাল, কালো, সবুজ ইত্যাদি হরেক রঙের তুলো এবং সুতোর গোছা গোঁজা, গলায় পল-তোলা রঙীন কাচ, লাল পাথর, কর্ণেলিয়ান, মাড়ীসমেত পশুদন্ত, পুঁতি, কাচে খচিত হরিণের হাড়,

শিক্ষিত খ্রীষ্টিয়ান নাগা দম্পতি

পালিশ-করা শাঁখের টুকরো ইত্যাদি নানা জিনিষে তৈরি সারি সারি রকমারি হার, হাঁটু পর্য্যন্ত নোংরা বস্ত্র পরিহিত মেয়েরা লম্বাটে ধাঁজের মাটির জলপাত্রে ভরা এক একটি চাঙারি পিঠে ক'রে দল-বেঁধে রওনা হয়েছে অনতি-দূরস্থ ঝরণাতলার পানে। চল্‌তে চল্‌তে আমাদের পানে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে অকারণে ফিক্‌-ক'রে হেসে উঠছে।

ঘণ্টাখানেক বাদে মাও থেকে মোটর ছাড়লে। রাত আটটায় ইম্‌ফলে পৌছে মোটর-ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্ম-শালায় আশ্রয় নিলাম। এক মাড়োয়ারী 'মহারাজ' এই ধর্ম্মশালার চৌকিদারী করেন আর 'মহারাণী' অর্থাৎ চৌকীদার-মহারাজের স্ত্রীটি মুসাফিরদের জন্যে রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করেন।

৫ই সেপ্টেম্বর। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চা-পানার্থে মহারাণীর দ্বারস্থ হলাম। ইনি যে এক জন প্রচণ্ড রকমের উগ্রচণ্ডা তা এই অল্প সময়ের মধ্যেই টের পেয়েছি। বর্ত্তুলাকার দেহের ওজন তার পাকা আড়াই মণ, গায়ের রং মিশ কালো, তার অর্দ্ধঅনাবৃত বিপুল উদরটি দেখে খুব সম্ভব তার স্বজাতিদেরও মনে হিংসার উদ্রেক হয়। এদিকে ইনি কিন্তু ভারি লজ্জাবতী, আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সরমে রাঙা (?) হয়ে জিব কেটে ঘোমটা টানেন; ওদিকে আবার আমাদের উপস্থিতিতেই মহারাজকে লক্ষ্য ক'রে চোখাচোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতে কসুর করেন না। তদুপরি সে-বেচারাকে উদ্দেশ ক'রে সময় সময় তারস্বরে যে-সমস্ত নিতান্ত অসঙ্গত এবং অভিধান-ছাড়া বিশেষণ প্রয়োগ করেন, সেগুলো তার কানে নিশ্চয় মধুবর্ষণ করে না।

মণিপুরীদের পোলো বা কাঙ্গাই খেলা

চা-পানান্তে ধর্ম্মশালার একান্ত সন্নিকটে অবস্থিত ডাক্তার নৈরেন সিংহের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। আমার পরিচয় পেয়ে ডাক্তারবাবু আমায় স্বাগত করলেন। এঁর সঙ্গে মণিপুরের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ক আলাপ বেশ জমে উঠল। ইনি মনে করেন যে, মণিপুরীরা হিন্দু-ধর্ম্মের আওতায় আসবার আগে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও তাঁর 'সত্তর বৎসরে' অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। অবশেষে মণিপুরের শিল্প-কলার প্রসঙ্গ

উত্থাপিত হ'লে ডাঃ সিং আমায় হাতীর দাঁতের দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতিমূর্ত্তি, ছোট ছোট বাক্স-পেটরা, পিত্তল-নির্ম্মিত মণিপুরী বাচ খেলার দৃশ্য ইত্যাদি হরেক রকমের জিনিষ দেখালেন। এগুলো মণিপুরী রূপকারদের উচ্চাঙ্গের শিল্পপ্রতিভার পরিচায়ক। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বল্‌লেন যে, আজ ইম্‌ফল থেকে সাত মাইল দূরবর্ত্তী 'বর' নামক স্থানে সুপ্রসিদ্ধ দুর্গামন্দিরে অষ্টমী তিথি উপলক্ষে রাজার উপস্থিতিতে এক মস্তবড় উৎসব উদ্‌যাপিত হবে। এই উৎসব দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ডাঃ সিং লম্বি নামক একটি ছোকরাকে আমায় সঙ্গে করে 'বর'এ নিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন।

বাঁশের তৈরি মণিপুরী রথ

ডাক্তার সিংহের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লম্বির সঙ্গে ইম্‌ফলের রাস্তায় বেরনো গেল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বারে-শ ফুট উচ্চে মনোরম উপত্যকাভূমিতে এই নয়নমুগ্ধকর জনবহুল ইম্‌ফল নগরীটি অবস্থিত। আকাশ-ছোঁয়া পর্ব্বতমালা বৃত্তাকারে শহরটিকে ঘিরে রেখেছে। তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে সুপ্রশস্ত সিধা রাজপথগুলোর উভয় পার্শ্বে সার-বাঁধা বিরাটকায় গর্ভেলিয়া তরুশ্রেণী স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ব্রিটিশ রেসিডেন্সীর সন্নিকটেই প্রকাণ্ড 'পোলো' খেলার মাঠ। 'কাঙ্গাই' বা পোলো মণিপুরীদেরই জাতীয় ক্রীড়া। 'পোলো'খেলায় মণিপুরীরা অপরাজেয়। 'পোলো'র মাঠ ছাড়িয়ে আমরা প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের পানে এগিয়ে চল্‌লাম। রাস্তার ডানদিকে ব্রিটিশ রেজিমেণ্টের ময়দান। অদূরে, দেওয়ালে-ঘেরা প্রকাণ্ড কেল্লার প্রবেশপথের মুখে অবস্থিত খড়ে-ছাওয়া, আড়কাঠে খোদাই-করা 'কংলা' বা দরবার গৃহটি গঠন-কৌশলের বৈশিষ্ট্যে নবাগত পথিকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট করে। আগে নাকি 'কংলা'র বহিঃপ্রাঙ্গণে পাথরে-তৈরি দুটো বিরাট আকারের ড্রাগন (নংসা) সংস্থাপিত ছিল। তখনকার দিনে এই 'নংসা' দুটোর সুমুখেই রাজার বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্যেরা নাগা জল্লাদের খড়্গে পঞ্চত্বলাভ করত। অধুনা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নংসাগুলোকে কোথায় স্থানান্তরিত

করেছেন, আমার পথপ্রদর্শকের নিকট থেকে সে-সম্বন্ধে কোন হদিস্ পেলাম না। দরবার-গৃহের ঠিক সুমুখেই আন্দাজ আধ মাইল লম্বা সিধা সড়ক—এই সড়কের ওপরেই প্রতি বৎসর মণিপুরীদের 'লামচেল' বা দৌড়-প্রতিযোগিতা হয়। এই স্থানে দাঁড়িয়ে অনতিদূরে অবস্থিত

টাংখুল নাগ:

টিকেন্দ্রজিতের পরিত্যক্ত প্রাসাদের পানে তাকিয়ে বিষাদে মন ভ'রে ওঠে। নিজ ভবনেই বন্দীদশায় জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে মণিপুরের মুকুটমণি, অমিতবিক্রমশালী মহাবীর কৈরন সিংহকে—টিকেন্দ্র এ নামেই মণিপুরের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট পরিচিত ছিলেন—ইংরেজের বিচারে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এমনিতর শোচনীয়ভাবে অকালে টিকেন্দ্রজিতের জীবনাবসান না হ'লে মণিপুরের ইতিহাস বোধ করি আজ অন্যরূপ হ'ত। যাক্ সে কথা।—আপাততঃ দুর্গ এবং রাজপুরী ইত্যাদির বর্ণনা শেষ করা যাক। কেল্লাটির দক্ষিণ দিককার কতক অংশ একটি ডিম্বাকৃতি—শাদা গম্বুজওয়ালা লালরঙের অত্যুচ্চ ইটের পাঁচিলে ঘেরা; পেছনে ইদানীং শুষ্ক গড়খাই। আগেকার দিনে বারো মাস এই পরিখা জলে ভর্ত্তি থাকৃত এবং সেপ্টেম্বর মাসে এখানেই বিপুল সমারোহের সহিত তিন দিন ব্যাপী নাচ-খেলা হ'ত। এই পরিখাটির পশ্চাতে অপরিসর ইম্ফল নদী প্রবাহিত।

'যাকাইরোল-সম্পাদক ডাক্তার নৈরেন সিংহ নিংথৌজম

কেল্লার যে-অংশটুকু ইটের দেওয়ালে ঘেরা ঠিক তার বিপরীত দিকে খড়ের চালাযুক্ত নাতিবৃহৎ রাজপুরী আর এক রশিমাত্র ব্যবধানে মণিপুর-রাজবংশের ইষ্টদেবতা গোবিন্দজীর ইষ্টকে নির্ম্মিত মন্দির আর তৎসংলগ্ন নাটমণ্ডপটি অবস্থিত। দেউলের ফাটলধরা দেওয়াল থেকে চূণ বালি খ'সে পড়ছে, আর যে-সুরম্য নাটমন্দির একদা নানা উৎসবাদি উপলক্ষে নগরের শ্রেষ্ঠ নটীদের কণ্ঠসঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠত, আজ পারাবতের কূজন সেখানকার নিবিড় স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। এই পরিত্যক্ত রাজপুরী, ভগ্ন জীর্ণ শ্রীহীন দেবমন্দির আর নাটমণ্ডপ আর সুগভীর পরিখাবেষ্টিত সুরক্ষিত দুর্গ ইত্যাদি দেখে, খজেনবা, গরীব নেওয়াজ, গম্ভীর সিংহ, চন্দ্রকীর্ত্তি প্রভৃতি স্বাধীন মণিপুরী নৃপতিদের আমলে ইম্ফল নগরীটি যে কিরূপ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল, তা কতকটা আঁচ করতে পারা যায়।

প্রাচীন রাজপুরী থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে

প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠের মধ্যে বর্ত্তমান রাজার নবনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদটি অবস্থিত। সুমুখের শান-বাঁধানো চত্বরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারা। প্রাসাদের হাতার ডানদিকে পুরনো কংলোর ছাঁদে তৈরি দেওয়ালহীন দরবারগৃহ আর বাঁদিকে স্বর্ণপাতমণ্ডিত গুম্বজদ্বয়বিশিষ্ট গোবিন্দজীর মন্দির—আলিসার পরে গুটিকতক স্বর্ণকুম্ভ সংস্থাপিত। মন্দিরাভ্যন্তরে গোবিন্দজী এবং গৌরনিতাই প্রভৃতির মৃন্ময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরসংলগ্ন বিশাল নাটমণ্ডপের বিরাট স্তম্ভসমূহ বিচিত্রিত। রাজপ্রাসাদের পিছন দিকে ইটের পাঁচিলে ঘেরা ক্রিকেট খেলার প্রকাণ্ড মাঠ। মণিপুরের বর্ত্তমান রাজা চূড়াচাঁদ সিংহ স্বয়ং নাকি এক জন পাকা ক্রিকেট খেলোয়াড়।

ব্লাউস ও শাড়ী পরিহিতা দুটি মণিপুরী লৈছাবী (কুমারী)

ইম্ফলের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখে বাঙালীপাড়ায় জনষ্টন হাইস্কুলের শিক্ষক কুমুদনাথ দে, এম-এ, মহাশয়ের বাসায় এসে উপস্থিত হলাম। বন্ধুবর হিমাংশু সেন এঁর কাছে একখানা পরিচয়-পত্র দিয়েছিলেন। কুমুদ বাবু আমায় সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

কুমুদ বাবুর বাসা থেকে বেরিয়ে আমরা 'বর'এর পথে পা চালিয়ে দিলাম। রাস্তার দু-পারে কলাবন আর বাঁশ-ঝাড়ের অবকাশপথ দিয়ে নজরে পড়ছে ছায়াঢাকা সারি সারি ঘর-বাড়ি আর দু-একটা চুণকাম-করা মন্দিরের চূড়ো। কোন-কোন বাড়ির সামনে বিকশিত পদ্ম ফুলে ভর্ত্তি এক একটি সরোবর। এ-সমস্ত সুপরিচিত দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে যেন বাংলা দেশের পল্লীপথ দিয়ে চলেছি।

বর্শাধারী নাগা

মাঝে মাঝে রাস্তার পাশেই ছতরির নীচে মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা দোকান-পাট সাজিয়ে ব'সে আছে। দলে দলে তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা নক্সা-পেড়ে আঁজি-কাটা ফানেক-পরা মেয়েরা চলেছে সার-বেঁধে নৃত্যচ্ছন্দে পদক্ষেপ করতে করতে উৎসবে যোগ দিতে। এরা প্রায় সকলেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণা। সুমুখের পানে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যেন সুবেশা নারীদের এক শোভন শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে উৎসব-ক্ষেত্রের অভিমুখে। পথচারী পুরুষরা সংখ্যায় এত অল্প যে এই শোভাযাত্রার মধ্যে এরা যেন প্রক্ষিপ্ত। মেয়েদের মধ্যে কারও কারও গলায় কয়েক নর স্বর্ণহার, কানে সোনা

দুল, আঙুলে সোনার আংটি ইত্যাদি অল্পস্বল্প গয়নাগাঁটি আছে বটে, কিন্তু বেশীর ভাগই সম্পূর্ণরূপে নিরাভরণা। নিজেদের নিরাভরণ-নিটোল দেহকে এরা পুষ্পাভরণে সজ্জিত করেছে, বিবাহিতা নারীরা খোঁপায় গুঁজেছে বনফুল, কুমারী কিশোরী আর তরুণীরা কানে পরেছে ফুলের দুল, গলায় দুলিয়ে দিয়েছে ফুলের মালা, হাতে তাদের এক একটি ক'রে স-মৃণাল বিকাশোন্মুখ পদ্মকোরক। সবাকারই ললাট, নাসিকা এবং কপোলে শ্বেত চন্দনের পত্রলেখা। চল্‌তে চল্‌তে ক্লান্ত হয়ে কেউ কেউ পথিপার্শ্বস্থ ছত্তরির তলায় ব'সে জিরুচ্ছে আর খাবার কিনে খাচ্ছে। পসারিণীর কাছে খাদ্যদ্রব্য ছাড়া আছে এক একটি পত্রপুটে পাঁচ-সাতটি ক'রে সুগন্ধি ফুল। খেয়ে-দেয়ে, যাবার কালে মেয়েরা দু-এক পয়সা খরচ ক'রে ফুল কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এদের এই পুষ্প-প্রীতি দেখে মনে পড়ল ফুল-কেনা সম্বন্ধে মহম্মদের উপদেশ থেকে কবি সত্যেন দত্তের অনূদিত নিম্নোক্ত কয়েকটি পংক্তি—

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি।
দুটি যদি জোটে তবে অর্দ্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী।

মহাপুরুষের এই উপদেশ এরা দেখছি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। সভ্যতাভিমানী আমাদের মতন পয়সা খরচ ক'রে পুষ্প ক্রয় করাকে এই তথাকথিত অসভ্য মেয়েরা অনাবশ্যক অপব্যয় ব'লে মনে করতে আজও শেখে নি। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এদের অন্তরতম প্রকৃতির নিবিড় যোগ-সূত্র আজও ছিন্ন হয়ে যায় নি। চার-পাঁচ মাইল এগোবার পর দেখি রাস্তার দু-ধারে ধানের ক্ষেত শরতের সোনালী রোদে ঝলমল্ করছে। এদেশে যে অমন চোখজুড়ানো মাঠ-ভরা সোনার ধান দেখব, তা কল্পনারও অতীত ছিল। এদেশের লোকেরাও ঠিক্ আমাদেরই মতন, "এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে," ব'লে গর্ব্ব অনুভব করতে পারে। রাস্তার ডানদিকে ধানক্ষেতের শেষপ্রান্তে কোথাও চক্রবাল-ঘেঁষা সুদূর নীল বনরেখা, আর কোথাও বা সুস্পষ্ট দেখা যায় একেবারে সমতল ভূপৃষ্ঠ থেকে তরঙ্গায়িত পাহাড়ের মালা স্তরে স্তরে ক্রমোচ্চ ভাবে অভ্রভেদ ক'রে উঠেছে। নীল সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গমালা আকাশের নীলিমা স্পর্শ করবার জন্যে যেন আকুল আবেগে উচ্ছ্বসিত।

বেলা চারটের সময় 'বরে' পৌঁছে ছোট একটি টিলার উপর আরোহণ করলাম। একটি বড় চালাঘরের সামনে সু-উচ্চ সরু বাঁশের ডগায় কতকগুলো লাল কাপড়ের ঝালর এবং সেগুলোর নীচে একটা চওড়া লাল কাপড় পতাকার মত টাঙানো। গৃহাভ্যন্তরে আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ জন মণিপুরী পুরুষ করতাল বাজিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে হরি-কীর্ত্তন করছেন, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু-জনে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে খোল বাজাচ্ছেন। কীর্ত্তনগায়ক এবং খোল-বাজিয়েদের মাথায় শাদা উষ্ণীষ, পরনে ধবধবে শাদা কোঁচানো ধুতি, কোমরে শাদা চাদর জড়ানো, গা আদুড়। গলায় তাদের উপবীত, কণ্ঠে তুলসীর মালা, ললাটে চন্দনের তিলক এবং সিঁদুরের ফোঁটা, সর্ব্বাঙ্গে বৈষ্ণবের নিদর্শন-চিহ্ন হরিনামের ছাপ। কিছু সময় কীর্ত্তন শুনে, দুর্গামন্দিরে প্রবেশ করলাম। একটি কক্ষে মেঝের ওপর এক সারিতে কতকগুলো সিঁদুরমাখানো শিলাখণ্ডের নিকট ব'সে মণিপুরী পাণ্ডারা দর্শনার্থীদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করছে। এই প্রস্তরখণ্ডগুলোর নাম 'লাইফাম' অর্থাৎ দেবীর অধিষ্ঠানস্থল। এ ছাড়া এ মন্দিরে দুর্গার কোনো মূর্ত্তি নেই। মন্দিরের পিছন দিকে মেরাপ বেঁধে মাটিতে বিছানো ফালাও বিছানায় রাজার বসবার ঠাঁই করা হয়েছে। হঠাৎ অদূরে ব্যাণ্ডের বাজনা বেজে উঠল। অনতিপরেই রাজা সৈন্যদল সমভিব্যাহারে উৎসবস্থলে এসে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করলেন। রাজা ঘোর কৃষ্ণকায়, মোটা এবং বেঁটে। এমনতর মিশকালো রং মণিপুরীদের মধ্যে বড়-একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এঁর চেহারায় বা পোষাক-পরিচ্ছদে রাজোচিত কোন লক্ষণই নেই। আসলে ইনি হচ্ছেন এক জন ভুঁইফোড় রাজা। এঁর পিতা চৌবী জৈম ছিলেন মণিপুরের নিতান্ত নগণ্য এক প্রজা। এদিকে, খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। সুতরাং রাজদর্শনের পরই আমরা ইম্ফলের পথে রওনা হলাম। শহরে পৌঁছে নেমন্তন্ন রক্ষার জন্যে কুমুদ বাবুর বাসায় গিয়ে শুনলুম যে আজ বাবুপাড়ায় মণিপুরীদের দ্বারা 'খাম্বা আর থইবি' নামক একটি পালা অভিনীত হবে। খাওয়া-

দাওয়ার পর মণিপুরী অভিনয় দেখবার উদ্দেশ্যে যাত্রার আসরে যাওয়া গেল।

অভিনয় বহুক্ষণ সুরু হয়েছে। এখন রাজকুমারী 'থইবি'র জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ 'চিংখু তেল হেইবা' আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে ঢোলের বাজনার তালে তালে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে সবাইকার কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছেন। দেশে যাত্রার আসরে বহুবার ভীমসেনদের হাঁকডাক শুনে আঁৎকে উঠেছি। কিন্তু এই বীরবরের ঢোলের আওয়াজ ছাপানো ভীম-নাদের কাছে সে-সমস্ত কোথায় লাগে; আমাদের যাত্রা-দলের ভীম-মশাইরা এখানে এসে দিনকতক এই প্রচণ্ড অভিনেতাটির শাগরেদি করলে আসর আরও সরগরম ক'রে তুলতে পারতেন। যাক্, যত ক্ষণ বাক্যযুদ্ধ চলছিল তত ক্ষণ অবশ্য আশঙ্কার কোন হেতু ছিল না। কিন্তু শেষে যখন মহারাজ অসিযুদ্ধ অর্থাৎ লম্ফঝম্ফ ক'রে বেমালুম তলোয়ার ঘুরিয়ে ধুন্ধুমার বাধিয়ে তুললেন, তখন অচিরেই সামিয়ানায় টাঙানো পেট্রোমাক্সটা চুরমার হয়ে একটা মারাত্মক ব্যাপার ঘটবে ভেবে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য এই বিপর্য্যয় কাণ্ড সত্ত্বেও কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। 'পথের পাঁচালী'র বিচিত্র কেতুর মত ইনিও দেখছি সব বাঁচিয়ে চ'লে কেরামতি দেখাতে জানেন, বহুক্ষণ লাফানো-ঝাঁপানোর পর মহারাজ ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে ব'সে হাঁপাতে লাগলেন। একটু বাদে মাথায় পাগড়ী, গায়ে সাটিনের কোর্ত্তা একটি যুবক আর কুমারী-বেশে সজ্জিত একটি সুশ্রী বালক রঙ্গস্থলে এসে নাচ সুরু করলে। বালকটি সেজেছে রাজকুমারী 'থইবি' আর যুবকটি নিয়েছে রাজকুমারীর প্রেমাস্পদ 'খাম্বা'র ভূমিকা। এদের নৃত্য শেষ হ'লে এক ব্যক্তি বাঁশ ও কাপড় দিয়ে তৈরি একটা ষাঁড়কে রঙ্গস্থলে নিয়ে এল। তখন 'খাম্বা'র ভূমিকার অভিনেতা যুবকটি কিছু সময় বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী সহকারে লাফালাফি ক'রে অবশেষে নিশ্চলভাবে খাড়া হয়ে এই নকল ষাঁড়টার কানের কাছে মুখ নিয়ে কান-ফাটা আর্ত্তনাদ জুড়ে দিলে। এর তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে আমার পাশেই উপবিষ্ট মণিপুর-প্রবাসী জনৈক বাঙালী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা ক'রে অবগত হলাম যে, 'খাম্বা' আর 'থইবি'র মূল উপাখ্যানে আছে, 'খাম্বা' শারীরিক শক্তি প্রয়োগে একটা অমিতবলশালী দুরন্ত পাগলা ষাঁড়কে বাগ মানাতে অসমর্থ হয়ে অবশেষে সঙ্গীতের মোহিনীশক্তি প্রভাবে উক্ত চতুষ্পদটির মন গলিয়ে তাকে বন্দী করে। আপাততঃ সেই ব্যাপারটারই নাকি অভিনয় চলছে। ওঃ! তাহ'লে আমি যে জিনিষটাকে আর্ত্তনাদ মনে করেছিলাম তার নাম সঙ্গীত! কিন্তু এই প্রাণান্তকর সঙ্গীতের চোটে আমার যে মাথায় খুন চড়বার যোগাড়। এর চাইতে বরং একটি জীবন্ত ষাঁড় আসরে এসে যদি সঙ্গীত জুড়ে দিয়ে আমাদের মন গলাবার প্রয়াস সুরু ক'রে দিত, তাহলেও বোধ করি এতদূর অসহ্য হয়ে উঠত না। বাস্তবিক এই মণিপুরী সঙ্গীত যে কিরূপ কর্ণপীড়াদায়ক তা স্বকর্ণে না শুনলে আপনারা ধারণাও করতে পারবেন না। যাই হোক, তবু রক্ষা এই যে, অল্পক্ষণ মধ্যেই মহাসঙ্গীত এবং পালা সায় হ'ল।

৬ই সেপ্টেম্বর। আজ বেড়াতে বেড়াতে ইম্ফলের 'সেনা কাইথেল' নামক নারীদের প্রকাণ্ড বাজারে এসে উপস্থিত হলাম। এ বাজারে বেচা-কেনায় বড় অগুণতি মেয়েদের ভিড় দেখে মনে হচ্ছে যেন এখানে নওরোজ উৎসবের ধুম লেগে গেছে। সার-বাঁধা চালাঘরগুলোর ভেতরে এবং বাইরে কাতারে কাতারে বিবাহিতা মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ পসরা নামিয়ে ব'সে গেছে। কোন কোন পসারিণী ডাবাহুঁকোয় ধূমপানে রত। সওদা করতে ইচ্ছুক নারীদল খুরোওয়ালা বেতের চুবড়ি মাথায় নিয়ে ব্যস্ত-সমস্তভাবে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করছে। হাটে পণ্য বিক্রয় করা মণিপুরের অভিজাত নারীরাও অপমানকর ব'লে মনে করেন না। মিসেস্ গ্রিমউড্ তাঁর 'মাই থ্রি ইয়ার্স ইন্ মণিপুর' নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, রাজপরিবারের মেয়েরা পর্য্যন্ত এই 'সেনা কাইথেল' বাজারে সওদা আর বেসাতি করতেন। এই বাজারে সমাগত মণিপুরের উপত্যকার চতুষ্পার্শ্বস্থ পাহাড়গুলোর অধিবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর নাগাদের সংখ্যা বড় কম নয়। তন্মধ্যে কাঁধ থেকে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত লাল-শাদা বা লাল-নীল রঙের দীর্ঘ বস্ত্রে আবৃত-দেহ টাংখুলরা সবচেয়ে দলে পুরু। এদের পাখীর পালক, পশু-লোম, সরু বাঁশের টুকরো, চাঁচা-ছোলা অর্দ্ধবৃত্তাকার মোষের শিং ইত্যাদি দ্বারা শোভিত শিরস্ত্রাণগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। 'কাবুই'দের লজ্জাসরমের বালাই কম। পুরুষদের

পশ্চাৎদেশ সম্পূর্ণ অনাবৃত। খালি, সামনের দিকে এক একটি ঝোলা নেংটি ঘুন্‌সিতে আটকানো। মেয়েদের দেহের মধ্যভাগটুকু মাত্র এক একখানা নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন অপ্রশস্ত বস্ত্রখণ্ডে আবৃত। এক হাট লোকের সাম্‌নে সম্পূর্ণ অনাবৃতবক্ষ কোন কোন কাবুই-জননী সন্তানকে স্তন্যদানে রত। এক-এক শ্রেণীর নাগাদের আবার এক এক রকমের চুলের ফ্যাশান। মারিংদের চুল কৃষ্ণচূড়া খোঁপার ধরণে ঝুঁটি-বাঁধা। চিরুদের বাবরি চুলে সিঁতি-কাটা, এদের শুধু কানের পাশ আর ঘাড়ের চুল কামানো আর বাবরিতে সরু বেতের ফালি জড়ানো। কোন কোন নাগার হাতে সুদীর্ঘ দু-ধারী বর্শা। হড্‌সন সাহেবের 'দি নাগা ট্রাইবস্ অব্ মণিপুর' নামক পুস্তকে এই সমস্ত নাগার আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ইত্যাদি সংক্রান্ত চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

৭ই সেপ্টেম্বর। আজ বিজয়া দশমী। মণিপুরীদের মতে আজকের দিনটি বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শুভ এবং পবিত্র দিন। আজ এই পরম শুভদিনে বর্ত্তমান রাজবাটীর পিছন দিককার খাতের পাড়ে 'কুয়াক-তলবা' নামক বিরাট উৎসব রাজ-সমারোহে সমাপিত হবে। রাজা স্বয়ং এবং রাজ্যের অধিনায়ক আজ উৎসবক্ষেত্রে সমাগত হয়ে সমবেত প্রজামণ্ডলীর সমক্ষে তাদের কল্যাণ-সাধনব্রত সমগ্র বৎসর ধ'রে কায়োমনোবাক্যে প্রতিপালন করবার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন।

হৃদয়ে কৌতূহল অপরিসীম, সুতরাং দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করেই, চনচনে রোদের মধ্যে মাইল-দেড়েক হেঁটে খালের পাড়ে এসে পৌঁছলাম। কি প্রকাণ্ড জনতা এখানে, লোক একেবারে গিস্‌গিস্ করছে। উৎসবের ঢের দেরি কিন্তু স্ত্রীলোক এবং পুরুষেরা বিভিন্ন সারিতে বিভক্ত হয়ে কেমন ধীরস্থির শান্তভাবে ব'সে আছে। হট্টগোলের লেশমাত্রও নেই। বহুক্ষণ পরে উলঙ্গপ্রায় নাগাদের দ্বারা বাহিত ডুলিতে ক'রে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সর্দ্দারগণ একে একে উৎসব ক্ষেত্রে এসে জমায়েৎ হ'তে লাগলেন। মস্তকে তাঁদের বেগুনী রঙের পুষ্পস্তবকে শোভিত শাদা উষ্ণীষ, গলায় কয়েক ছড়া ফুলের মালা, হাতে ভারী ওজনের খাঁজ-কাটা নিরেট সোনার চুড়ি, গায়ে চুড়িদার হাতাযুক্ত লম্বা ধবধবে শাদা জামা, পরনে নক্সা-ছাপা মালকোঁচা-মারা কাপড়। ডুলির 'পরে হলদে রঙের ঝালর দেওয়া লাল-কালো এবং মেটে রঙের প্রকাণ্ড গোল ছাতা, সম্মুখভাগে মহাবীরের মূর্ত্তি-আঁকা পতাকা, আর ভিতরে বিভিন্ন আধারে রাজার জন্য আনীত নানা সওগাত। খানিক বাদে রাজপুরী থেকে এক বিচিত্র শোভাযাত্রা উৎসবক্ষেত্রের পানে এগিয়ে আস্‌তে লাগল। সর্ব্বাগ্রে আস্‌ছেন অশ্বারোহী-সৈন্যদল-পরিবৃত রাজা প্রকাণ্ড এক হাতীর পিঠে সোনালী জরির চওড়া ফিতেয়-মোড়া কাচে খচিত রগরগে-লাল মখমলের আচ্ছাদন-যুক্ত হাওদায় ব'সে। মাথার ওপর তাঁর ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত উত্তরচ্ছদ। তাঁর পাশে উপবিষ্ট এক জনের হাতে সবুজ মখমলে তৈরি সোনালী জরির ফুল-তোলা ছোট একটি ছাতা। হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় অন্য এক জন উভয় হস্তে ধ'রে রেখেছেন একটি স্বর্ণখচিত আড়ানি, রাজ্যের অধিনায়ক অমাত্যবর্গ এবং পাত্রমিত্রগণ চলেছেন পৃথক পৃথক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে। সবুজ কোটপ্যাণ্ট-পরা পদাতিক সৈন্যদল সার বেঁধে চলেছে ব্যাণ্ডের বাজনার তালে তালে মার্চ্চ করতে করতে, পুরোভাগে তাদের বিচিত্রিত ধ্বজা এবং সুদীর্ঘ বর্শাহস্তে জনকতক সৈন্য, আর মাঝখানে ঘেরা-টোপ দেওয়া একটি চতুর্দ্দোলা। সকলের পিছনে আস্‌ছে খোলকরতালসহ কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়।

উৎসবক্ষেত্রে এসে গজপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ ক'রে রাজা পাত্রমিত্র সভাসদ এবং সর্দ্দারগণপরিবৃত হয়ে সদ্যনির্ম্মিত একটি চালাঘরে মেঝেয় পাতা সুপ্রশস্ত লাল বস্ত্রখণ্ডের 'পরে উপবেশন করলেন। ওদিকে অধিনায়কও পাশাপাশি অবস্থিত আর-একটি ঘরে স্বীয় পার্শ্বচরগণ বেষ্টিত হয়ে অধিষ্ঠিত হলেন। রাজার আজকের বেশভূষায়ও কোন বৈশিষ্ট্য নেই। মাথায় শাদা পাগড়ী, গায়ে শাদা সার্ট, পরনে ফিন্‌ফিনে সাদা ধুতি, কটিতে সাদা চাদর জড়ানো। কিন্তু পাত্রমিত্রদের পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার দেখবার জিনিষ। অধিকাংশেরই গায়ে সবুজ সাটিনের কোর্ত্তা, বাহুতে সোনার বাজুবন্ধ, হাতে সোনার চুড়ি, পরনে জরদা গোলাপী লাল ইত্যাদি হরেক রঙের নক্‌সা-দার সিল্কের কাপড়, মাথায় পুষ্পশোভিত উষ্ণীষ। রাজার পার্শ্বে উপবিষ্ট দু-জনের হাতে সিংহমুখো সোনার মুষল। হুঁকোবরদার, তাম্বুলকরঙ্কবাহী ইত্যাদি সকলেই

যে যার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসেছে। অনতিদূরে উর্দ্ধে উত্তোলিত বিরাট ধ্বজাসমূহ বাতাসে পত্‌পত্‌ ক'রে উড়ছে।

খানিক বাদে রঙীন বস্ত্রপরিহিত জনকতক সৈন্য উৎসব-প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে সুরু করলে বর্শানৃত্য। এক হাতে তাদের পশুলোমে শোভিত সুদীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ বর্শা, অন্য হাতে মজবুত ঢাল। পায়ে চামড়ায় তৈরি তুলোভরা পাদচ্ছদ, নৃত্যঅন্তে এরা উপুড় হয়ে মাটিতে সটান শুয়ে প'ড়ে বাহুগুলো সুমুখের পানে প্রসারিত ক'রে রাজাকে প্রণতি জানালে। তার পর এল বছর-নয়েকের একটি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুকুমার শিশু, দু-হাতে দুখানা শাণিত তরবারি ক্ষিপ্রগতিতে এবং অপূর্ব্ব কৌশলে ঘুরিয়ে এই বীরশিশু অসি-ক্রীড়ার নৈপুণ্যে সবাইকার তাক লাগিয়ে দিলে। এই সময় আজানুলম্বিত কালো কোর্ত্তা পরিহিত কয়েক জন যুক্তকরে দাঁড়িয়ে রাজপ্রশস্তি আবৃত্তি করলে আর কোটপ্যাণ্ট-পরা সৈন্যেরা রাজাকে প্রণাম করবার জন্যে ভূঁয়ে লুটোবামাত্র এরা তাদের সর্ব্বাঙ্গ লম্বা চাদরে ঢেকে দিলে। অকস্মাৎ গম্ভীর নির্ঘোষে যুগপৎ বেজে উঠ্‌ল কতকগুলো শাঁখ, সঙ্গে সঙ্গেই রাজা গাত্রোত্থান ক'রে ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নি অবস্থিত আর একটি পর্দ্দা-ঘেরা ছোট ঘরের ভিতর ঢুক্‌লেন। সেখানকার কৃত্য অন্তে রাজা পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে এসে আসন গ্রহণ করবার পর, তাঁরই নির্দ্দেশমত সমাগত সর্দ্দারদের মধ্যে যারা এ বছর কোন-না-কোন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থ হয়েছে, তাদের সম্মানিত করবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার পরিচ্ছদ, পাখীর পালক এবং এমনি ধরণের আরও নানা জিনিষ বিতরণ করা হ'ল। অতঃপর শোভাযাত্রাটি পুনর্গঠিত হয়ে এগিয়ে চল্‌ল রাজপুরীর দিকে। পুরদ্বারের নিকট এসে দেখি মহার্ঘ পরিচ্ছদে ভূষিতা অপূর্ব্ব সুন্দরী রাজান্তঃপুরিকারা চিত্রার্পিতবৎ প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রার সমারোহ অবলোকন করছেন। রাজবাটীর সুমুখের ফাঁকা ময়দানে পৌঁছেই মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমিও তখন আমার আস্তানার পথ ধর্‌লাম।

মইরাঙের পথে—লোগতাক হ্রদ

৮ই সেপ্টেম্বর। ক্লান্ত-উৎসব ইম্‌ফল নগরী আজ ভোর-বেলা থেকেই একেবারে নিঝুম। এই কয় দিনের অনিয়ম আর ঘোরাঘুরির দরুন আজ আর নড়তে চড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু মনে পড়্‌ল যে, ছুটিও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে এবং মণিপুরের সুপ্রসিদ্ধ লোগতাক হ্রদ এখনও দেখা হয় নি। চটপট শরীরটাকে চান্‌কে নিয়ে মাইলখানেক রাস্তা হেঁটে এসে মইরাংগামী মোটর ধরলাম। মইরাং ইম্‌ফল থেকে ২৭ মাইল দূরবর্ত্তী একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান, এখান থেকেই নৌকা ক'রে হ্রদ দেখতে যেতে হয়। ডাঃ লৈরেন সিংহের নিকট থেকে মইরাংএর খাইদ্রাক্‌পা বা প্রধান রাজকর্ম্মচারীর নিকট লিখিত একখানা পরিচয়-পত্র পূর্ব্বেই যোগাড় করা ছিল।

মোটরটা মণিপুরী মেয়েতে ভর্ত্তি। এদেশে পুরুষদের চাইতে মেয়েদের সংখ্যা যে ঢের বেশী, তা হাটে-ঘাটে, রাস্তায়, মোটরে সর্ব্বত্রই নজরে পড়ে। এদেশে এসে অবধি একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে, এখানকার বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা কুমারীদের মতন লাবণ্যময়ী নয়। এর হেতুটা বোধ করি এই যে, বিয়ের পর মেয়েদের হাট-বাজার করা থেকে সুরু ক'রে সব রকম খাটুনি অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে যাওয়ায় অনতিকাল মধ্যেই তাদের চেহারার লাবণ্যটুকু নিঃশেষে উবে যায়। সে যাই হোক, মোটরে ঠিক আমার পাশেই যে তরুণী কুমারীটি বসেছেন, তিনি কিন্তু অনুপম রূপলাবণ্যবতী। গরমের চোটে শ্রীমতী আসমানী রঙের গাত্রাবরণ (ইনাফি) খুলে কোমরে জড়ালেন। অনাবৃত সুগৌর মুক্তামসৃণ অংস দেশ, গ্রীবা আর সুডৌল বাহুদুটি যেন কোন সুনিপুণ রূপকার পাথর কুঁদে বহু আয়াসে গড়েছে। অর্দ্ধবৃত্তাকারে কাটা ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ বেষ্টিত গোল মুখখানা যেন মেঘে-ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদের মত রহস্যাবৃত। টানা টানা সুন্দর চোখ দুটিতে বনহরিণীর মত চকিত দৃষ্টি। ডান গালে, ছোট একটি কালো তিলও নজরে পড়ল। মণিপুরে যদি তেমন সৌন্দর্য্য-পিয়াসী কবি কেউ থাকেন, তা হ'লে এই তিলটির বদলে তিনি যে অকাতরে ইম্‌ফলের রাজসিংহাসন দিয়ে দিতে রাজী হবেন, তাতে তিলমাত্রও সংশয় নেই।

তরুণীর সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ সমাপন ক'রে অবশেষে পথ-দৃশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করা গেল। দু-ধারে দিকচক্রবাল পর্য্যন্ত প্রসারিত, কোথাও হিরণবরণ কোথাও বা মরকত-হরিৎ ধানের ক্ষেতে শরতের সোনালী রোদের ঝলমলানি।

এখানে সেখানে তরুচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন এক একটি পল্লী। অবিকল বাংলা দেশের অনুরূপ শ্যামলশ্রীমণ্ডিত অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবি। ধানক্ষেতের পার্শ্বস্থ অনতিগভীর খালে মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা পলো ইত্যাদি দিয়ে মাছ ধরছে।

বেলা ঠিক বারোটার সময় মইরাঙে পৌঁছে মোটর থেকে নেমে এক মণিপুরী ছোকরাকে সামনে পেয়ে, তাকে ডাঃ সিংহের চিঠিখানা দেখালাম। চিঠিখানা প'ড়ে সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বল্লে যে, সে খাইত্রাকৃপা তোম্বসিংহের নাতি, নাম তার মাঙ্গি, এবং আমাকে সঙ্গে ক'রে খাইত্রাকৃপার বাড়িতে নিয়ে এল। বাড়ির সামনেটা চালাযুক্ত মাটির দেয়ালে ঘেরা। ভিতরে প্রশস্ত আঙিনায় বেড়া-ঘেরা তুলসী-মঞ্চ। বাসগৃহটি সুবিশাল এবং সুদৃশ্য। ঘরের খুঁটি এবং কড়ি ইত্যাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মজবুত শালকাঠে তৈরি। এই বিরাট ভবনের তুলনায় দরজা জানালাগুলো আয়তনে ছোট এবং সংখ্যায় কম ব'লে গৃহাভ্যন্তর স্বল্পালোকিত। ঘর-দোর সমস্তই তকৃতকে ঝকৃঝকে, উত্তমরূপে নিকানো পুছানো। ঘরের দাওয়ায় আন্দাজ আধ হাত উঁচু একটা খাটুলিতে ব'সে পীতবাস-পরিহিত প্রকাণ্ড জোয়ান খাইত্রাকৃপা ধূমপানে রত। মাঙ্গি আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলে, ইনি 'ভাই' ব'লে আমায় সম্বোধন করেই আকার ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। বুঝ্‌লুম বাংলা ভাষার ঐ একটি মাত্র শব্দই তাঁর পুঁজি। মাঙ্গি অবশ্য দোভাষীর কাজ ক'রে মুস্কিল আসান করলে।

খানিক জিরিয়ে, লোগতাক যাত্রার উদ্দেশ্যে মাঙ্গি এবং আরও কয়েক জন সহ নদীতে এসে নৌকায় উঠলাম। একটা আস্ত গাছ কুঁদে নৌকাখানা তৈরি, এত অপ্রশস্ত যে পাশাপাশি দু-জন পর্য্যন্ত বসবার জো নেই। খালের মত অপ্রশস্ত এবং অগভীর নদীটির বুকের উপর দিয়ে আমাদের নৌকাখানা এগিয়ে চল্‌ল। দু-ধারে দিগন্তবিস্তৃত তৃণ-ভূমিতে গরু, মোষ, টাটুঘোড়া ইত্যাদি বিচরণ করছে। দূরে ঝাঁকে ঝাঁকে বলাকাশ্রেণী ব'সে রয়েছে দেখে মনে হয় যেন সবুজের উপর শাদা রঙের ছোপ। নদী ছাড়িয়ে তার পর নীবার জাতীয় এক প্রকার ধান গাছে পরিপূর্ণ এক সুবিস্তীর্ণ জলায় এসে পড়লাম। যেদিকে তাকাই খালি সবুজ আর সবুজ, পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে যেন সবুজের বান ডেকেছে। অবশেষে যখন হ্রদের মুখে এসে পৌঁছলাম তখন চারিদিককার দৃশ্যের সৌন্দর্য্যে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। রহস্যময়ী প্রকৃতি তাঁর মুখের ওপর থেকে সবুজ ঘোমটাখানা অপসারিত ক'রে কি অপূর্ব্ব সুন্দর নয়নমুগ্ধকর রূপেই না আমার বিস্মিতবিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে আত্মপ্রকাশ করলেন। সুমুখে স্বচ্ছ নীল স্থির অচঞ্চল বারিরাশির অনন্ত বিস্তার। সেই দিগন্তবিসারী জলরাশিমধ্যে কোথাও বিচিত্র বর্ণের পুষ্পখচিত জলজ তৃণময় ভাসন্ত দ্বীপমালা, কোথাও বনরাজিশ্যাম ছোট এক-একটি পাহাড়। নীল আকাশের কোল-ঘেঁষা ঘন-নীল পাহাড়ের সারি এই বিশাল হ্রদকে চতুষ্পার্শ্বে বলয়াকারে ঘিরে রেখেছে। আকাশ আর পাহাড়ের নীলিমার সঙ্গে হ্রদের নীলিমার সে এক অপূর্ব্ব সুসঙ্গতি। হ্রদমধ্যে মাথায় পাগড়ী-বাঁধা অনাবৃত-উৰ্দ্ধাঙ্গ নিটোলদেহা স্ত্রীলোকরা নৌকা বেয়ে চলেছে। কোন কোন নৌকায় একটি স্ত্রীলোক পিছনে ব'সে ধরেছে হাল আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আর একটি মেয়ে জাল ফেলে মাছ ধরছে। একেবারে তন্ময় হয়ে এই সমস্ত ছবির পর ছবি দেখছি আর মনে হচ্ছে যেন এক মায়া-ঘেরা রূপকথার দেশের ভিতর দিয়ে চলেছি। ক্রমে, নৌকাখানা আমাদের বাঁশ-বনে ভরা হ্রদগর্ভস্থ ছোট একটি পাহাড়ের পাদমূলে গিয়ে পৌঁছল। দূর থেকে যে-পাহাড়টিকে শুধু বনময় ব'লে মনে হয়েছিল, নিকটে এসে দেখি, তার গায়ে সারি সারি ঘর-বাড়ি। সভ্য জগতের সংস্রব থেকে সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন এই পাহাড়-দ্বীপবাসীরা কি ভাবে জীবন যাপন ক'রে তা দেখবার জন্য নৌকা বেঁধে কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে এক বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। গৃহস্বামিনী দাওয়ায় মাদুর পেতে দিয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করলে। একপাল মেয়ে সেখানে ব'সে তুলো ধুনছে আর সুতো কাটছে, কয়েকটি স্ত্রীলোক ঢেঁকিশালে ধান ভানছে। উঠানে কয়েকটি লালরঙের মোষ বাঁধা। এক টেরে এক থুখ্‌ড়ে বুড়ী জবুথবু হয়ে রোদে ব'সে লম্বা হাতাওয়ালা একটা কালো কোর্ত্তায় বোতাম পরাচ্ছে। সমস্ত বস্তী অসংখ্য সারস এবং চড়ুই ইত্যাদি নানা পাখীর কাকলিতে মুখরিত। নানা প্রকার শব্দের সংমিশ্রণ এক বিচিত্র ঐকতানের সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ের ওপাশে মণিপুর-রাজ্যের 'হাইকর' বা ফলের বাগান। উদ্যান-

পালের অনুমতি নিয়ে দুষ্প্রবেশ্য জঙ্গলের ভিতর দিয়ে খাড়াই পথ বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠলাম। সেই অত্যুচ্চ স্থান থেকে বহু নিম্নস্থ পাহাড় এবং দ্বীপমালায় খচিত লোগতাক হ্রদটি পটে আঁকা ছবিটির মত দৃশ্যমান হ'ল। ফলের বাগান দেখে নেমে এসে আবার হ্রদের জলে নৌকা ভাসিয়ে দেওয়া গেল। মইরাঙে ফিরে যখন নৌকা থেকে অবতরণ করলাম তখন শুক্লা একাদশীর খণ্ড চাঁদ থেকে ঝরে-পড়া কুন্দশুভ্রজ্যোৎস্নাধারা অদূরস্থিত পাহাড়টিকে অপরূপ মায়াময় ক'রে তুলেছে।

রাত্রিকার ভোজনপর্ব্ব চুকলে খোলা বারান্দায় আমার শয়নের স্থান নির্দ্দেশ করা হ'ল। দেখে আমার ত চক্ষুস্থির। বাড়িতে ঘর মোটে একখানা। আমরা ঘরে ঢুকলে আবার এদের জাত যায়; তাই এ ব্যবস্থা। মাজি যথেষ্ট অভয় দিলেও ভরসা পেলাম না। এখানকার ঝোপে-জঙ্গলে হিংস্রপশুদের বিদ্যমানতা খুবই সম্ভব এবং নিশ্চয়ই তারা এ জায়গার অধিবাসীদের মত বৈষ্ণবভাবাপন্ন হয়ে ওঠে নি। রাত্রে যদি তাঁদের মধ্যে কেউ দয়া ক'রে শুভাগমন করেন, তা হ'লে খাই-ব্রাক্‌পাকে যে কাল প্রভাতে অতিথি-সৎকারের পরিবর্ত্তে মৃত-সৎকারের আয়োজন করতে হবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। ভয়ে আর উদ্বেগে সারা রাত দু-চোখের পাতা এক করতে পারলাম না।

৯ই সেপ্টেম্বর। আজ সকাল-বেলা মইরাঙের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাং জিংএর মন্দির দেখতে আসা গেল। মন্দির-সংলগ্ন প্রশস্ত আঙিনায় নৃত্যের স্থান। মইরাঙের মণিপুরী মেয়েদের নাচ অনুপম। নৃত্যশিল্পী মণি বর্দ্ধন শুনলাম নৃত্য-শিক্ষা ব্যপদেশে মণিপুরে অবস্থানকালে নাচ দেখ্‌তে একবার এখানে এসেছিলেন।

বেলা দুটোর সময় ইম্‌ফলযাত্রী মোটরে এসে বসলাম। মোটর ছাড়বার কিছুক্ষণ আগে মাজি বেজায় বেঁটে শিম্পাঞ্জীর মত আকৃতিবিশিষ্ট এক ছোক্‌রা সহ হাজির। ছোকরাটি এসেই একেবারে যাত্রার দলের দূতের ভঙ্গীতে, বঙ্গভাষার সপিণ্ডীকরণপূর্ব্বক বল্লে, "আমি আপনাকে একটা কঠা নিবেডন করিটে এসেসে।" বল্লাম, "ভাল, অসঙ্কোচে কর 'নিবেডন'।" শ্রীমানের নিবেদন শুন্‌লে কিন্তু শিক্ষিতা বাঙালী কুমারীরা লজ্জায় অধোবদন হবেন। তার একান্ত ইচ্ছা সে একটি লেখাপড়া-জানা বাঙালী মেয়ের পাণিগ্রহণ করে আর আমাকে ঘটকালিতে নিযুক্ত করতে চায়। বামনাবতার-টির এই উৎকট ইচ্ছার মূলে কি, তা নির্জ্ঞানবিৎ ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ই বল্‌তে পারেন। আমি তাকে তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বল্‌তেই সে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠল, "কিম্‌টু যদি প্রেম হই, টবে?" বাস্‌ রে, এ যে বিকৃত বঙ্গভাষায় সেই দুরূহতম চিরন্তন প্রশ্ন। প্রেমিক-প্রবরের এই জটিল প্রশ্নের কি জবাব দেব ভাবছি, এমন সময় এই নাটকীয় মুহূর্ত্তে, ড্রাইভারের কি অন্যায়, মোটরে ষ্টার্ট দিলে। মোটরে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলাম, বামন-মশায় চাঁদ ধরবার আশায় যে-রকম মরিয়া হয়ে উঠেছেন, তাতে শেষটায় তাঁর অদৃষ্টে না কোন দুর্গতি ঘটে।
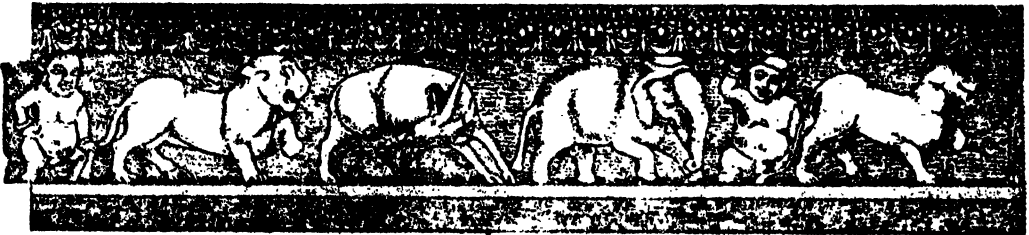
জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(৩১)

এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শরৎ-অপরাহ্ণের সূর্য্যালোক ভিজে বারান্দার রেলিঙে ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। উমার ছোট ঘরের দরজার খয়ের-রঙের পর্দ্দাটি সরানো। বারান্দার কোণে কাপড়ের ট্রাঙ্ক, বইয়ের বাক্স, সুটকেস, নানা জিনিষ প্যাক করিয়া জড়ো করা।

ছোট ঘরটি অগোছাল। শূন্য আলমারীর একটি ডালা খোলা, বাতাসে নড়িয়া উঠিতেছে। টেবিলের উপর কতকগুলি বই ও শাড়ী। পূর্ব্বের জানলায় সিল্কের শাড়ীর নীল পর্দ্দাটি খুলিয়া পড়িয়াছে। খোলা জানলা দিয়া আমগাছের চিকন পাতাগুলি দেখা যাইতেছে।

চেয়ার হইতে কতকগুলি খাতা, ছবি, সাবানের বাক্স সরাইয়া তক্তাপোষের উপর রাখিয়া, উমা অরুণকে বলিল, ব'স।

কণ্ঠে একটু হাসির সুর আনিয়া অরুণ বলিল, বা, বসব কি, তোমার এখন কিছুই গোছান হয় নি, কি হেল্‌প করব বল।

উমা গম্ভীরভাবে বলিল, তোমায় কিছু হেল্‌প করতে হবে না, লক্ষ্মিটি, ব'স দেখি চুপ ক'রে।

তক্তাপোষের জিনিষগুলি একপাশে ঠেলিয়া দিয়া, বসিয়া অরুণ বলিল, তা হ'লে তুমিও বস। সারাদিন যা খেটেছ।

উমা একটু বিরক্তির স্বরে বলিল, আচ্ছা, চেয়ারটা খালি করলুম কিসের জন্য!

অরুণ মিনতির সুরে বলিল, তুমি ব'স চেয়ারটায়।

উমা শ্রান্ত। অরুণের অনুরোধও সে আজ রাখিতে চায়। ধীরে সে চেয়ারে বসিল। ম্লান হাসিয়া বলিল, তার পর?

—তার পর আর কি, সেই চিরপুরাতন কাহিনী।

—কাহিনীটা কি?

—রাজকন্যা চলেছেন অচিন দেশে।

—সে দেশে রাজপুত্রকে যেতে ত কেউ বারণ করে নি।

—কিন্তু পক্ষীরাজ ঘোড়ার পা খোঁড়া হয়ে গেছে যে।

—ঠাট্টা রাখ। খ্রীষ্টমাসের সময় দিল্লীতে এস। খুব ঠাণ্ডা হবে বটে, কিন্তু ভাল লাগবে।

—আমার পরীক্ষার কথাটা ভুলেই যাচ্ছ? এ দু-বছর যা পড়েছি জানই ত।

—পড়ে ত উল্টে যাচ্ছ, অত সাধতে পারি না।

—আচ্ছা যাব। উঠো না, কোথা যাচ্ছ? একটু ব'স।

—বসলে চলবে কেন, কত জিনিষ যে প্যাক করতে হবে, এমন tired লাগছে, আচ্ছা বসি।

—জিনিষ ত প্রায় সব বাঁধাই হয়ে গেছে। কেন তুমি এমন পালিয়ে বেড়াচ্ছ, এক দিন তোমার একটুও দেখা পাই নি—

—তাতে কি আসে যায়।

অরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল।

—ব'স, দাঁড়িও না। তুমি জান না, আমি কি ক্লান্ত। তুমি জান না আমার কি খারাপ লাগছে। মাকে এত ক'রে বললাম, আমি থাকি কলকাতায়, কলেজের বোর্ডিঙে বেশ থাকব, পড়ব, কিছুতেই রাজী হলেন না।

উমার ক্লান্ত করুণ মুখের দিকে চাহিয়া অরুণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

—বল কিছু, চুপ ক'রে বসে থেক না। ভাল লাগে না আমার।

—মেসোমশাইকে ফেলে বোর্ডিঙে থাকা কি তোমার উচিত হবে।

—উচিত—উচিত—সারাক্ষণ উচিত, খালি কর্ত্তব্য ক'রে যাও—শুধু পরের প্রতি কর্ত্তব্য, আর আমার নিজের প্রতি বুঝি কর্ত্তব্য নেই—

—দিল্লীতেও ত তুমি পড়াশোনা করতে পারবে।

—পড়াশোনা করতে কে চায়, আমি ছেড়ে দেব পড়াশোনা।

—উমা, যাবার আগে এত মন খারাপ ক'রো না, তুমি জান—

—চুপ কর অরুণ, ভাল লাগে না আমার।

—তুমি একটু শোও, একটু বিশ্রাম কর, অথবা চল, গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবে, গাড়ীটা রয়েছে।

—আমি কোথাও যেতে চাই না, তুমি ব'স। শোন, সত্যিই আমি তোমাকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তোমার নিমন্ত্রণ ছিল, আর খাবার টেবিলে একবার গেলাম না। কেন জান, আমার কেমন কান্না পাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছিল, তোমাকে দেখে হঠাৎ আমি হয়ত কেঁদে ফেলব। এটা আমার মনের অবসাদ জানি। কিন্তু সবার সামনে সত্যি যদি কেঁদে ফেলি, সবাই কি ভাববে বল ত। শোন, তোমার সঙ্গে হিসাবনিকাশ ত করা হয় নি।

—কিসের হিসেব ?

—বা, তোমায় কি কি জিনিষ কিনতে দিয়েছিলাম, দাম ত দিই নি।

—ভারী ত জিনিষ।

—না, কত টাকা পাবে ? হিসেব করেছ ?

—হিসেব করি নি আর এখন করতেও পারছি না।

—করেও বিশেষ লাভ হ'ত না, আমার হাতে কিছুই টাকা নেই। তুমি আরও সব কি জিনিষ এনেছ, এক গাদা—বই রোমাঁ রোলাঁর জন্ ক্রিসটোফার আমি আনতে বলি নি।

—ওটা আমার উপহার।

—আর বাকী জিনিষের দামগুলি ?

—ভয় নেই, তোমায় দিতে হবে না, Book of Friendshipএ ওটা জমা রইল।

—অর্থাৎ আমার নামে খরচ ত।

—এ বইতে জমা ও খরচের মধ্যে প্রভেদ নেই।

—বড় মজার হিসেবের খাতা ত। যাক, এক দিন ত হিসেব করতে হবে।

—আজ সে কথা নাই ভাবলে।

—যত দিন ক্রেডিট পাওয়া যায়, মন্দ কি!

বাহিরে সন্ধ্যার ম্লান আলো। আমগাছের পিছনে চাঁদ উঠিল। ক্রমান্ধকারময় গৃহে উমার রহস্যময়ী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া অরুণের চোখে জল ভরিয়া আসিল।

(৩২)

পূজার পূর্ব্বেই উমারা কলিকাতা ছাড়িয়া দিল্লী চলিয়া গেল। কেবলমাত্র উমার সহিত নয়, মামীমা, চন্দ্রা, অজয়, রায়-পরিবারের সকলের সহিত অরুণের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছিল যে তাহাদের ছাড়িয়া জীবন যাপন করা সে কল্পনা করিতে পারিত না। উমারা যত দিন চলিয়া যায় নাই, তাহাদের কলিকাতা-ত্যাগের কথা সে মনের এক কোণে ঠেলিয়া রাখিয়া দিত, ভাবিত, শেষ পর্য্যন্ত হয়ত যাওয়া হইবে না, হয়ত হেমবাবুর আবার অসুখ করিবে অথবা গবর্ণমেণ্ট হইতে হুকুম আসিবে, খ্রীষ্টমাসের পর কাজে যোগ দিতে হইবে।

উমারা সত্যই চলিয়া গেল।

কিন্তু তাহাদের বিরহকাতরতায় জীবন যতখানি শূন্য, পৃথিবী যতখানি অন্ধকার হইয়া উঠিবে ভাবিয়াছিল, তেমন কিছু হইল না। স্বীয় মানসিক অবস্থা দেখিয়া অরুণ বিস্মিত, একটু লজ্জিত হইল। আকাশ তেমনই নীল, সূর্য্যালোক তেমনই উজ্জ্বল, মানবজীবন তেমনই আনন্দময় রহিয়াছে।

অরুণ অনুভব করিল, তাহার হৃদয় যেন অত্যন্ত বেদনা-সহিষ্ণু, নির্ম্মম হইয়া গিয়াছে। নরম লোহা পুড়াইয়া পিটিয়া যেমন তীক্ষ্ণ সুদৃঢ় ইস্পাত তৈয়ারী হয়, তেমনই তাহার হৃদয়কে আঘাতের পর আঘাত দিয়া কে যেন কঠোর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এ কঠোরতা জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ, বিদ্বেষ নয়। সে জীবনকে আরও গভীরভাবে বুঝিতে, সত্যদৃষ্টিতে দেখিতে চায়।

কখনও সে আনমনা হইয়া উমাদের বাড়ির পথে চলিয়া যায়, শূন্য বাড়ির দিকে চাহিয়া থাকে, বুকে একটা ব্যথা খচ্ করিয়া বাজে। কখনও বা বই পড়িতে পড়িতে বা পথে চলিতে চলিতে সে ভাবে উমা এখন কি করিতেছে, উমাও কি এখন তাহার কথা ভাবিতেছে। অন্তর উদাস হইয়া ওঠে।

এ বেদনা জ্বালাময় নয়, স্বপ্নমধুর।

এ বেদনায় সত্তার নবজন্ম হয়। বাস্তববাদী বিশ্লেষণ-কুশল নাস্তিক তার্কিক অরুণকে পিছনের অন্ধকারে ঠেলিয়া দিয়া

নিত্যকালের কল্পলোকবাসী কবি অরুণ অগ্রসর হইয়া আসিল। উমা তাহার হৃদয়ে বেদনা দিয়াছে। উমা তাহার জীবনের কল্যাণী শক্তি।

বেদনার অপূর্ব্ব রহস্যকে অরুণ অনুভব করিল। অশ্রুঘন দুঃখের রহস্যলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। পৃথিবীর সকল দুঃখীর সহিত সমবেদনায় অন্তর ভরিয়া উঠিল। এক বৎসর পূর্ব্বে অরুণ দেহ-মনে নবজাগ্রত যৌবনের যে সহজ উল্লাস অনুভব করিত সে নিছক আনন্দময় অনুভূতি আর হয় না, শরতের জ্যোৎস্নাশুভ্র রাত্রে যৌবনের মত্ততা লাগে বটে, সে মত্ততা বসন্তের রক্তিম উচ্ছ্বাস নয়, হেমন্তের অশ্রুঘন কুজ্ঝটিকাময়।

তাহার দ্বৈত-জীবন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রতিদিনের-জানা কলেজে-পড়া সহজ অরুণ ইউরোপের ইতিহাস, শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ মুখস্থ করে, প্রতিমাকে লইয়া বেড়াইতে যায়, বাণেশ্বরের সহিত তর্ক করে, জয়ন্তকে সাংসারিক পরামর্শ দেয়, বন্ধুদের লইয়া দল বাঁধিয়া পিক্‌নিক্ করিতে বাহির হয়। সহসা এক অজানা অরুণ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। পূর্ব্বে সে ছিল প্রেমিক, কবি, উদাসী, ভাববিলাসী। এখন সে বলে, আমি দুঃখের সাধক। জীবনে দুঃখের অর্থ, সার্থকতা কি বলিতে পার? বন্ধুরা দেখে, হঠাৎ অরুণ অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে। তাহার প্রফুল্ল সুন্দর মুখ ব্যথিত, করুণ।

অরুণের মস্তিষ্কে বিভিন্ন নদীস্রোতের মত দুইটি ধারা প্রবাহিত হইয়া চলে। প্রতিদিনের সহজ স্বাভাবিক অনুভূতি-গুলির পাশ দিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়া প্রেমবিহ্বল সত্যানুসন্ধিৎসু আত্মার চিন্তাধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায়। চিন্তাস্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্তে সে মাঝে মাঝে দিশাহারা হইয়া ওঠে।

কেন এ জীবন? কেন এ সংগ্রাম? কেন এত দুঃখ?

চলিতে চলিতে সে পথের কোন মোড়ে থামিয়া যায়। ট্রাম, মোটর গাড়ী, গরুর গাড়ী, জনস্রোত—এই জীবনধারা তাহার নিকট ভোজবাজীর মত অলীক মনে হয়। যেন ইহার পিছনে আর একটা জীবন রহিয়াছে। সেই অদৃশ্য বিকশমান প্রাণশক্তিকে সে দেখিতে চায়। যখন সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত তখন জীবনের অর্থ সহজেই খুঁজিয়া পাইত। মায়ের হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে ভিড়ে মাকে হারাইয়া ফেলিলে, অজানা পথে শিশু যেমন অসহায় ভাবে দিশাহারা ঘুরিয়া কাঁদিয়া বেড়ায় তেমনি অরুণের পথহারা আত্মা কাঁদিয়া ওঠে। অন্ধকার অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করে, বোবা আকাশ কোন উত্তর দেয় না।

আকাশ হইতে উত্তর পায় না বটে, কিন্তু নীলিমার অপরূপ লাবণ্যে অন্তর স্নিগ্ধ হয়। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যরূপ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া যায়। প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম ছিল বলিয়া অরুণ বাঁচিয়া গেল, নহিলে হয়ত সে পাগল হইয়া যাইত।

শুধু প্রকৃতির রূপদর্শন নয়, প্রকৃতির স্পর্শ অনুভব করা চাই। বৃষ্টির দিনে সে ভিজিতে ভিজিতে পথে চলে; প্রখর রৌদ্রে হাঁটিয়া কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া মুক্ত ধান্যক্ষেত্রের পার্শ্বে গিয়া বসে। জ্যোৎস্নারাত্রে ছাদের উপর অনাবৃত দেহে শুইয়া থাকে। প্রকৃতি তাহার অতি নিকট অতি প্রিয় হইয়া উঠিল।

(৩৩)

শীতের রাত্রি কুহেলিকাময়। চাঁদের আলো কুজ্ঝটিকার মধ্যে মিশিয়া গিয়া চারি দিকে অস্পষ্টতা, আবছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। স্তব্ধ, সুশীতল, মায়াময় রাত্রি।

ডিনারের সময় অত্যধিক মদ্যপানের ফলে শিবপ্রসাদ অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন। মধ্যরাত্রে অত্যন্ত জলপিপাসায় ঘুম ভাঙিয়া গেল। এক গেলাস ঠাণ্ডা জল তাড়াতাড়ি পান করিয়া তিনি ঘরের সম্মুখের বারান্দায় বাহির হইলেন। শীত করিতে লাগিল। কিন্তু ড্রেসিং-গাউনটা খুঁজিয়া পরিবার উৎসাহ নাই।

কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন নিশীথিনী অবগুণ্ঠিতা নারীর মত। আইয়োনিক থামগুলি রাত্রির শুভ্রতায় মিশিয়া গিয়াছে। বারান্দার ইজিচেয়ারে শিবপ্রসাদ শুইয়া পড়িলেন।

চোখে স্বপ্ন ঘনাইয়া আসিল। অতীত জীবনের সুমধুর স্মৃতি স্বপ্নরূপে আসিল।

শিবপ্রসাদের মনে হইল, এ রাত্রি সুইজারল্যাণ্ডের তুষারশুভ্র শীতের রাত্রি। পাসিয়ঁর বারান্দায় সেজলঙে তিনি শুইয়া আছেন। পৃথিবীভরা শুভ্র তুষার-বন্যার উপর

স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালার মত নীলাকাশ হইতে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছে। তুষারসমাচ্ছন্ন নিদ্রিত পাহাড় বন মাঠ গ্রামের উপর জ্যোৎস্নার অপরূপ লাবণ্য। এ স্বপ্নপুরী!

আচ্ছা ষ্টেলা কোথায় গেল! ষ্টেলা!

শিবপ্রসাদ চেঁচাইয়া ডাকিলেন—ষ্টেলা ডিয়ার!

নিশীথিনী যেন শিহরিয়া উঠিল, মৃদু বাতাসে গাছের পাতাগুলি কাঁপিয়া চাঁদের আলোয় ঝক্‌ঝক্‌ করিতে লাগিল। শিবপ্রসাদ দেখিতে লাগিলেন, কি সুন্দর বরফ পড়িতেছে, সাদা ফুলের পাপড়ির ঝর্ণাধারার মত, পেঁজা তুলার মত ধীরে বরফ পড়িতেছে। যেন কোন গোপনচারিণী নিঃশব্দচরণে আসিতেছে, আসিতেছে। শুভ্রবসনা সুন্দরীর স্বপ্নশীতল অঞ্চল গীর্জ্জার তোরণে, সালে-গুলির ত্রিকোণ-ছাদে, ঢেউ-খেলান মাঠের উপর, পাইনবনের মাথায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।

আচ্ছা, ষ্টেলা গেল কোথায়? ষ্টেলা!

বিবাহের পর শিবপ্রসাদ ষ্টেলাকে লইয়া সুইজারল্যাণ্ডে শীতকাল কাটাইয়াছিলেন।

ষ্টেলা কি এত রাত্রে স্কি করিতে গেল?

ষ্টেলা!

শিবপ্রসাদ দেখিলেন, মোটা থামের আড়াল হইতে ষ্টেলা বাহির হইয়া আসিল, ঘনকৃষ্ণ ফার্-ওভারকোটে দেহ আবৃত, প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপের মত মুখখানি।

ষ্টেলা বলিল, বা, চল, স্লেজ যে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘোড়ার গলার ঘণ্টার মৃদুধ্বনি দূর হইতে ভাসিয়া আসিল।

ষ্টেলা তাঁহার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চল।

শিবপ্রসাদ শিহরিয়া উঠিলেন। ইজিচেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পা যেন অবশ। আবার বসিয়া পড়িলেন। ষ্টেলা তাঁহার পাশে বসিল।

দুই জনে স্লেজে করিয়া পাশাপাশি চলিয়াছেন। শুভ্র স্বপ্নভরা পথ। তুষারাবৃত ঘুমন্ত গ্রাম ছাড়াইয়া স্লেজ নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। কখনও পাইনবনের রহস্যঘন স্তব্ধতা, কখনও তুষারাবৃত মুক্ত প্রান্তরের শুভ্র অনির্ব্বচনীয়তা, কখনও নিদ্রিত গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ। স্লেজ ছুটিয়া চলিয়াছে। পাইনগাছের পাতাগুলি হইতে বরফ ঝরিয়া পড়িতেছে।

মাইলের পর মাইল স্তব্ধ শুভ্র পথ। কোথায় পথ কিছুই বোঝা যায় না। ষ্টেলা চুপ করিয়া শিবপ্রসাদের পাশে বসিয়া।

সম্মুখে এক বৃহৎ খাদ। চতুর্দ্দিকে অকলুষ শ্বেতবর্ণের অসীম বিস্তারের মধ্যে ঘনকালো গভীর খাদ অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে।

স্লেজ্‌গাড়ী ওই খাদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ কি! খাদের প্রায় কিনারায় আসিয়া পৌঁছিল। এবার যে খাদের অন্ধকার গর্ভে অতলে ডুবিয়া যাইবে। ঘোড়াগুলি উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। এই অনন্ত শুভ্রতার মধ্যে কালো খাদ বুঝি তাহাদের মোহিনীর মত মন ভুলাইয়াছে। খাদের উপর ঘোড়া দুইটি লাফাইয়া পড়িল।

ষ্টেলা!

শিবপ্রসাদ আর্ত্তনাদ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন, তার পর ইজিচেয়ারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙিল না।

ভোর-রাতে অরুণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বড় শীত করিতে লাগিল। জানলার দিকে চাহিয়া দেখিল, চারি দিক স্বপ্নময় অবাস্তব। বড় সুন্দর কুজ্ঝটিকা। কলিকাতায় এরূপ কুয়াশা বড় হয় না।

বিছানা হইতে উঠিয়া সে জানলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কুয়াশায় গাছগুলি কি সুন্দর আবছায়াময় দেখাইতেছে। ইংলণ্ডের শীতের প্রভাতের মত হইবে।

সে বারান্দার বাহির হইল। বাগানের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল।

এ কি! কাকা বারান্দায় ইজিচেয়ারে ঘুমাইতেছেন! নিদ্রিত মুখখানি কি শান্ত। হয়ত অত্যধিক মদ্যপানে রাত্রে অত্যন্ত গরম বোধ হইয়াছে। একটি কম্বল আনিয়া অরুণ শিবপ্রসাদের দেহের উপর বিছাইয়া দিল। বাগানের গাছ-গুলির দিকে চাহিয়া রহিল। শীত করিতে লাগিল। বিছানাতে গিয়া শুইয়া পড়িল।

কুয়াশা তখনও সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই।

প্রতিমা ঘরে ছুটিয়া আসিল উন্মাদিনীর মত।

—দাদা! দাদা!

অরুণ জাগিয়া চমকিয়া চাহিল।

—দাদা! সর্ব্বনাশ হয়েছে আমাদের!

অরুণ লাফাইয়া উঠিল।

—কি হয়েছে, কি পাগলের মত বকছিস্—কি সুন্দর স্বপ্ন হয়েছিল—

—দাদা! কাকা! কাকা!—

প্রতিমা আর বলিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল।

অরুণ শিবপ্রসাদের ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

বৃহৎ খাটের ওপর শিবপ্রসাদের মৃতদেহ। মাথার নিকট ডাক্তার বসু ও পায়ের নিকট ছকু খানসামা দাঁড়াইয়া মূক পুত্তলীর মত।

অরুণকে দেখিয়া ডাক্তার বসু হাতের ষ্টেথিস্কোপটা পকেটে রাখিলেন, চাপা গলায় বলিলেন—হার্ট ফেলিয়র!

উদ্‌ভ্রান্তের মত অরুণ একবার ডাক্তার বসুর মুখের দিকে, একবার শিবপ্রসাদের দীর্ঘ স্থির দেহের দিকে চাহিল। ঘরেতে যেন তার দম আটকাইয়া আসিল। নিমেষের মধ্যে সে বুঝিল, তাহার কাকা আর নাই।

ছুটিয়া সে বারান্দায় গেল। ভোররাত্রে যে ইজিচেয়ারে সে কাকাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছে, সে চেয়ার শূন্য। সত্যই তবে কাকা নাই।

বিমূঢ়ের মত সে কাকার ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িল। প্রতিমার ক্রন্দনধ্বনি, ঠাকুমার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ তাহার কানে আসিল। কিন্তু, আশ্চর্য্য, তাহার চোখে জল আসিল না; রাত্রিজাগরণের পর যেমন চোখ জ্বালা করে, সেইরূপ তাহার দুই চোখ জ্বলিতেছে।

খেয়াল হইল, সে কাকার ইজিচেয়ারে বসিয়া। একবার দাঁড়াইয়া উঠিল, আবার বসিয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্তে সে যেন কত বড় হইয়া গিয়াছে। এই পরিবারে কাকার স্থান তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

সূর্য্যের আলো শাণিত খড়্গের মত কুয়াশাকে খান্ খান্ করিয়া কাটিতেছে। প্রভাতের আলোর দিকে চাহিয়া এবার তাহার চোখে জল আসিল।

(ক্রমশঃ)

মর্ম্মবেদনা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

(নোগুচির "The Pilgrimage" হইতে)

ওগো ভগবান্, এই বুকে মোর যে অনল শিখা জ্বলে,
তারি ছায়াখানি উঠিল কি ভাসি ভানুর অস্তাচলে?

অশান্তিময় ক্ষুব্ধহৃদয় তোলে কি প্রতিধ্বনি,
সিন্ধু-বেলায় উথলে যখন তরঙ্গ গরজনি?

আর্ত্ত-আরবে পথহারা বায়ু আঁধারে যখন ধায়,
অন্তর্গূঢ় মোর বেদনা কি সে তিমিরে ভাষা পায়?

নয়নে আমার বারিধারা যবে ঝরে পরমেশ্বর,
স্বর্গের ব্যথা অশ্রুনির্ঝরে নামে কি এ ধরা 'পর?

আলোচনা

"চণ্ডীদাস-চরিত"

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিগত ফাল্গুন সংখ্যার 'প্রবাসী'তে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার "চণ্ডীদাস চরিত" শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধে কৃষ্ণসেন-রচিত "চণ্ডীদাস-চরিত" কাব্যের পুঁথির প্রাপ্তি-সম্পর্কে আমার নাম করিয়াছেন (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪২, পৃ. ৬৮৫)।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক "চণ্ডীদাস-পদাবলী" সম্পাদন-কার্যে নিযুক্ত হই, এবং ১৩৩৯ সালে আমরা উভয়ে বাঁকুড়া জেলার কতকগুলি স্থানে "চণ্ডীদাস"-রচিত পদ ও অন্য রচনার সন্ধানে গমন করি। রবিবার ১৬ই মাঘ হইতে বুধবার ১৯শে মাঘ, এই কয় দিন আমরা বাঁকুড়ার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামশরণ ঘোষ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয়গণের অতিথিরূপে অবস্থান করি।. রামশরণ বাবু ও সত্যকিঙ্কর বাবুর সৌজন্যে ছাতনা, শুশুনিয়া পাহাড় ও অন্য দুই একটি স্থান দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। ১৮ই মাঘ সরস্বতী পূজার পরের দিন সত্যকিঙ্কর বাবু তাঁহার মোটরে করিয়া পুঁথির সন্ধানে আমাদের মৌলবনা গ্রামে লইয়া যান, এই গ্রামটি বাঁকুড়া শহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। সাহানা মহাশয়ের কুলপুরোহিত-বংশীয় শ্রীযুক্ত শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আমরা অতিথি হই, এবং সেখানে তাঁহার সংগৃহীত ও মৌলবনা গ্রামের অন্য কয়েক জন সজ্জনের গৃহে স্থিত বিস্তর পুঁথি হরেকৃষ্ণ বাবু ও আমি খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখি, কিন্তু আমাদের কার্যের উপযোগী কিছুই পাই নাই। আমাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত রামানুজ করও ছিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আমি শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মল্লিকের নিকট শুনি যে ছাতনার দক্ষিণের একটি গ্রামের অধিবাসী জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে চণ্ডীদাস কর্ত্তৃক রচিত পদের বহু পুঁথি আছে। উক্ত ভদ্রলোকের নাম ও ঠিকানা হরিপ্রসাদ বাবু আমায় দিয়াছিলেন, কিন্তু সে নাম ও ঠিকানা আমি রাখি নাই, এবং আমার মনেও নাই; সম্ভবতঃ মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও লখিয়াকোল (অথবা কেল্লাকুড়া ?) গ্রাম, এইরূপই শুনিয়াছিলাম বা লিখিয়া লইয়াছিলাম। "চণ্ডীদাস-চরিত" অথবা তদনুরূপ কোনও গ্রন্থের কথা শুনি নাই. "চণ্ডীদাস"-রচিত পদেরই কথা শুনিয়াছিলাম। যাহা হউক, "চণ্ডীদাস"-এর প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশিত রচনার প্রাপ্তির সম্ভাবনায় আমি বাঁকুড়ার বন্ধুদের নিকটে (খুব সম্ভব রামশরণ বাবু ও সত্যকিঙ্কর বাবুর নিকটে) এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কৃষ্ণসেন-রচিত "চণ্ডীদাস-চরিত" পুঁথির প্রাপ্তির সহিত আমার সম্পর্ক এইটুকু মাত্র—আমি ঐ পুঁথির নামও শুনি নাই।

উহার বহু পরে, ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর নিকট পত্রযোগে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়ায় এই অভিনব "চণ্ডীদাস-চরিত"-এর পুঁথির আবিষ্কার এবং তন্মধ্যে চণ্ডীদাসের আত্মোক্তিতে তাঁহার জন্ম-তারিখ, মায় দিল্লীর ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সমকালিক পর্য্যন্তের উল্লেখ—এই সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিলেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের নিকট হরেকৃষ্ণ বাবু ও আমি উভয়ে শুনিলাম যে শ্রীযুক্ত রামানুজ কর উক্ত পুঁথির সন্ধান পাইয়া রমেশ বাবুকে ঢাকায় খবর পাঠান। রমেশ বাবু আমাদের কাছে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, যদি পুঁথিখানি কৃত্রিম না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সামসময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখকে প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থে বিশেষভাবে অপ্রত্যাশিতই বলিতে হইবে।

আমরা পরে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের "চণ্ডীদাস-চরিত" পুঁথির আলোচনা প্রসঙ্গে বিগত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে এই নবাবিষ্কৃত পুঁথির অন্তর্গত কাহিনী পড়িলাম। পুঁথির কথাভাগ পড়িয়া এবং উহার ভাব ও ভাষা দেখিয়া আমার মনে এই পুঁথির অকৃত্রিমতা-সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ হইয়াছে; ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে বিদ্যানিধি মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ পড়িয়াও সে সন্দেহ নিরসিত না হইয়া বরং আরও সুদৃঢ় হইতেছে। উপস্থিত এ-সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিচার প্রকাশ করিবার নিতান্ত সময়াভাব; এবং সম্পূর্ণ পুঁথিটি প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা পুঁথিটি লইয়া আলোচনার সুযোগ না পাওয়া পর্য্যন্ত, উহার সম্বন্ধে সমস্ত বক্তব্য বলিতে পারিতেছি না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আমাদের সম্পাদিত "চণ্ডীদাস-পদাবলী"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; আমাদের সম্পাদকীয় বক্তব্যে এই নবাবিষ্কৃত "চণ্ডীদাস-চরিত" তথা পূর্ব ও পরে আবিষ্কৃত অন্যান্য বাঙ্গালা ও সংস্কৃত চণ্ডীদাস-চরিত তথা চণ্ডীদাস-বিষয়ক নানা গাল-গল্প সম্বন্ধে পূর্ণ বিচার থাকিবে।

"চণ্ডীদাস" এই নামের আড়ালে অন্ততঃ তিন জন চণ্ডীদাস-নামা কবি বিদ্যমান, উহা আমাদের স্থির ধারণা দাঁড়াইয়াছে—"বড়ু-চণ্ডীদাস," "দ্বিজ-চণ্ডীদাস" ও দীন-চণ্ডীদাস"। ইঁহাদের ব্যক্তিত্ব নির্ণয় বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি জটিলতম সমস্যা। এই তিন জন চণ্ডীদাসের মধ্যে কে, কোথায়, কবে ছিলেন, কি কি করিয়াছিলেন, তাহার বিচারের চেষ্টা অল্প কয়েক জন ব্যক্তি করিতেছেন। "বড়ু" বা আদি চণ্ডীদাস, অথবা প্রথম চণ্ডীদাস, যাঁহার পদ শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়াই বোধ হয় টানাটানি। "বড়ু-চণ্ডীদাস" বীরভূমের নান্নুর বা নান্নুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, অথবা বাঁকুড়ার ছাতনার অধিবাসী,— সে-সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ পক্ষপাত-শূন্য। বড়ু-চণ্ডীদাসকে আমরা এতাবৎ বীরভূম নান্নুরের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া আসিয়াছি; যদি তিনি ছাতনারই লোক হন, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বীরভূমের নান্নুর ও বাঁকুড়ার ছাতনা, উভয় সম্বন্ধেই সাধারণ বাঙ্গালী শিক্ষিত ব্যক্তি উদাসীন। তবে ১৩৩৪ সাল হইতে "ছাতনার চণ্ডীদাস"-বাদ নূতন করিয়া* প্রচারিত হইয়াছে; এই প্রচারের পরে ছাতনায় বোধ হয় নূতন এক বার্ষিক উৎসব—"চণ্ডীদাস-মেলা"রও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। "চণ্ডীদাস" সম্বন্ধে নানা গাল-গল্প প্রচলিত আছে, এই সব গল্পের পুথিও আছে, রজকিনী-সংসর্গ, সমাজচ্যুত করিবার কথা, চণ্ডীদাসের মৃত্যু ইত্যাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া বীরভূম ও বাঁকুড়া উভয় জেলাই এখন চণ্ডীদাসকে আপনার বলিতে চাহিতেছেন। অজ্ঞাতপরিচয় বড় কবি, বা কবি-গোষ্ঠী, যাঁহারা একটি জাতির সাহিত্যের প্রতীক-স্বরূপ হইয়া পড়েন,

---

* প্রচারকার্য্য কেহ করিয়া থাকিলে তাহা নূতন হইতে পারে। কিন্তু চণ্ডীদাস ছাতনায় ছিলেন, ইহা আমি বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি।—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

তাঁহাদের লইয়া এইরূপ টানাটানি চলে : যেমন গ্রীক কবি হোমরকে লইয়া নানা গ্রীক শহরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, কোন্ শহর তাঁহার জন্মস্থান ; যেমন আবার নূতন করিয়া জয়দেব-সম্বন্ধে ঐরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত দেখিতেছি। বহুপূর্ব্বে প্রচারিত ছাতনা-বাসী কবি রাধানাথ দাস রচিত "বাশুলী-চরিত" গ্রন্থে চণ্ডীদাসের নামোল্লেখও নাই। কৃষ্ণসেনের নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস-চরিত পড়িয়া বিলক্ষণ সন্দেহ হয় ; উহাতে বিভিন্ন চণ্ডীদাস-চরিত বা চণ্ডীদাস-কাহিনীর একটি সামঞ্জস্যের চেষ্টা পাইতেছি। এই সামঞ্জস্যবিধানের মধ্যে নিতান্ত আধুনিক-পন্থী ভাষা ও ভাব দেখিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীদাস-সমস্যা এখন যেভাবে দেখা দিয়াছে তাহার সহিত যাঁহাদের কিঞ্চিৎ-মাত্রও পরিচয় আছে তাঁহারা এই শ্রেণীর রচনা সম্বন্ধে, ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবেন, সন্দেহ নাই। "চণ্ডীদাস-চরিত"-এর কাহিনী-বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন"-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এবিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ নিশ্চয়ই অবহিত হইবেন।

—

উত্তর

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

শ্রীযুত "প্রবাসী"-সম্পাদক শ্রীযুত সুনীতিকুমার-চট্টোপাধ্যায়ের পত্রখানি আমার উত্তরের নিমিত্ত আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। পত্রখানির উপরে বিষয়ের নাম নাই। পড়িয়া দেখিলাম, এটি "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা নয়, তৎসম্বন্ধে আমার মতের প্রতিমত নয়, কারণ প্রতিজ্ঞা ও হেতু নাই ; তৎসম্বন্ধে নূতন তথ্যও নয়। এটি প্রকীর্ণক।

১। দেখিতেছি, আমি "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথী-প্রাপ্তি-বৃত্তান্তে অসাবধান হইয়াছিলাম। (ক) সন ১৩৪০ সালে নয়, সন ১৩৩৯ সালের মাঘ মাসে শ্রীযুত সুনীতিকুমার-চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ায় আসিয়াছিলেন। (খ) তিনি কিম্বা তাঁহার সংবাদ-দাতা শ্রীযুত হরিপ্রসাদ-মল্লিক "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথীর অস্তিত্ব শুনেন নাই। তিনি শ্রীযুত রামশরণ-ঘোষকে লখ্যাসিনী গ্রামে তিনটি দ্রব্য অন্বেষণ করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত ঘোষ লিখিয়া লইয়াছিলেন। (১) চণ্ডীদাসের পদের পুথী ; (২) চণ্ডীদাস নামযুক্ত টুকরা পাথর ; (৩) চক্র-চামর-শঙ্খ-চিহ্ন-যুক্ত টুকরা পাথর, সে পাথরে "মদনমোহন...পদযুগল...বাসলী" লেখা আছে। শ্রীযুত রামানুজ-কর চণ্ডীদাসের পদের পুথী খুজিতে গিয়া "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথী পাইয়াছিলেন। 'চণ্ডীদাসের পুথী' অর্থে চণ্ডীদাসসম্বন্ধীয় যে-কোন পুথী বুঝায়। এই কারণে শ্রীযুত কর আমাকে 'চণ্ডীদাসের পুথী' বলিয়াছিলেন। আমিও তদনুরূপ লিখিয়াছি। আমার অসাবধানতা স্বীকার করিতেছি।

২। চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় ভট্টশালী-মজুমদার-সংবাদ দিয়াছেন। কেন, বুঝিতে পারিলাম না। ইহার মধ্যে কিছুই গোপনীয় ছিল না। সন ১৩৪০ সালের পৌষ হইতে সন ১৩৪১ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত আমি কলিকাতায় ছিলাম। আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাসে শ্রীযুত রামানুজ-কর আমার সঙ্গে দেখা করেন, এবং বলেন, তিনি লখ্যাশোল গ্রামে চণ্ডীদাসের এক পুথী পাইয়াছেন। তিনি পুথী লইয়া যান নাই। কিন্তু পুথীর কোন কোন স্থান তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি পুথীর "ডিল্লিরাজ ফিরাজ খাঁ" ইত্যাদি আবৃত্তি করেন। আমি দেখিলাম, পুথীতে সত্যমিথ্যা যাহাই থাকুক, প্রথমে ইতবৃত্তীয় কাল-পরীক্ষা কর্ত্তব্য। আর, যাহারা ভারতের ও বঙ্গের রাজাদিগের কাল নির্ণয় করিতেছেন, তাঁহারা নির্ভুল বলিতে পারিবেন। আমি সর্ব্বজ্ঞ নই। আমাকে বই দেখিতে হইত, অধুনা প্রকাশিত আবশ্যক বই পাইতাম না। ভ্রম-বিমুখও হইয়াছিলাম। এই কারণে শ্রীযুত রামানুজ-কর আমার কথা-মত ঢাকায় শ্রীযুত নলিনীকান্ত-ভট্টশালীকে পত্র লেখেন। দৈবক্রমে কলিকাতায় শ্রীযুত রমেশচন্দ্র-মজুমদারের সহিত করের সাক্ষাৎ ঘটে, কর তাঁহাকেও সন তারিখ মিলাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। দুই জনই করের নিকট পত্রদ্বারা উত্তর পাঠাইয়াছিলেন। আমি বাঁকুড়া আসিয়া পুথী ও এই দুই পত্র পাই। ইহার পরে শ্রীযুত ভট্টশালীকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল। শ্রীযুত ভট্টশালী হিজরা ও আরবী মাসের উল্লেখ করিয়া ইংরেজী সাল ও মোটামুটি মাস জানাইয়াছিলেন। আমি হিজরা ও আরবী মাস হইতে শকে ও ইংরেজী সালে কালগুলি কষিয়া দিয়াছি। শ্রীযুত মজুমদার ইংরেজী সাল দিয়াছিলেন, হিজরা দেন নাই। আমি হিজরা জানিবার প্রয়োজন দেখি নাই। আমি তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত কাল গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের সহিত শ্রীযুত করের কিম্বা আমার পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল, পাঠককে এই সংবাদ জ্ঞাপনের কোন প্রয়োজন দেখি নাই।

৩। "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথীর অকৃত্রিমতা-সম্বন্ধে চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের "ঘোরতর সন্দেহ" হইয়াছে। কিন্তু "উপস্থিতে" তাঁহার "নিতান্ত সময়াভাব।" তিনি পুথী দেখেন নাই, পড়েন নাই।" পুথী মুদ্রিতও হয় নাই। সময়াভাব ও সুযোগাভাব বুঝি। কিন্তু অসাময়িক ও অযৌগিক অনুমানের প্রয়োজন বুঝি না। জানি না, তিনি কোন্ পাঠকের নির্বন্ধ এড়াইতে না পারিয়া যুক্তিহীন মন্তব্য "প্রবাসী"তে প্রকাশ করিতেছেন।

৩। চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় আর যে-যে কথা লিখিয়াছেন, সে-সব অপ্রাসঙ্গিক। এসবের মধ্যে দুইটার উল্লেখ কর্ত্তব্য মনে করি। (১) সন ১৩৩০ সালে শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর-সাহানা ও আমি "ছাতনায় চণ্ডীদাস" প্রবন্ধ লিখি। চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় আমাদের নাম উহ্য রাখিয়া লিখিয়াছেন, আমরা ছাতনায় চণ্ডীদাস "নূতন করিয়া প্রচার" করিয়াছি। (২) "এই প্রচারের পরে ছাতনায় বোধ হয় নূতন এক বার্ষিক উৎসব—'চণ্ডীদাস মেলার'ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।" এই দুই বাক্যের অর্থ স্পষ্ট। ছাতনাবাসী অ-বিত্ত, অ-শিক্ষিত, অ-পদস্থ, কিন্তু বোধ হয় কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞানে বঞ্চিত নহেন। তাঁহারা উক্তি দুইটি পড়িয়া কৌতুক অনুভব করিবেন।

আমি আর এক কৌতুকের কথা লিখি। গত বৎসর (সন ১৩৪১ সালে) পৌষ মাসে শুনিয়াছিলাম। ছাতনার মদন-গোপাল ঠাকুরের এক বৃদ্ধ সরলচিত্ত দেঘরিয়া কথায় কথায় আমাকে বলিয়াছিলেন, বীরভূমের দুই উকীল ছাতনা তদারক করিতে গিয়াছিলেন। 'বীরভূমের উকীল', 'ছাতনা তদারক' শুনিয়া আমার কৌতূহল হইয়াছিল।

—তদারকের হেতু কি ?

—তাঁরা কলিকাতা হাইকোর্টে মকদ্দমা ক'রবেন।

—মকদ্দমা ? কিসের মকদ্দমা ?

—তাঁরা ব'লছেন, আমরা এক জাল চণ্ডীদাস গ'ড়ছি।

—তাঁরা কবে গেছলেন ?

—দু-বছর হ'ল।

—তাঁদের নাম কি ?

—আজ্ঞে, তাঁরা বড়লোক, মোটরে গেছলেন, নাম সুধাতে পারি কি ?

—আসামী কে ?

—বাঁকুড়ার সত্যবাবু [শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর-সাহানা] ও আর এক জন। [দেঘরিয়া আমার বাড়ীতে মাস দুই ছিলেন, কিন্তু জানিতেন না, অপর আসামী আমি।]

—কোন্ পক্ষে জয় হবে?

—আজ্ঞে, হাইকোর্টের কথা, কে ব'লতে পারে। তাঁরা বড়লোক, কালও কলি।

—আয় কোন্ পক্ষে?

—আমরা চিরকাল শুনে আসছি, চণ্ডীদাস আমাদের গাঁয়ের লোক।

—বীরভূমের লোকও যে সে কথা বলে।

—ব'ললে কি হবে, সেখানে বাসুলী নাই।

শ্রীযুত সুনীতিকুমার-চট্টোপাধ্যায়ের ছাতনা-দর্শন নিষ্ফল হয় নাই। তিনি ছাতনাবাসীর নিকট এক পদবী পাইয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের নিবাস-বিচারে নানা অদ্ভুত হেতু ও অপসিদ্ধান্ত শুনিয়া শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে, অনেক শিক্ষিত জনের তর্ক-বিদ্যা পুস্তকস্থা রহিয়া যায়, প্রয়োগে আসে না। কিছুদিন পূর্ব্বে এক ইঞ্জিনিয়র বলিতেছিলেন, তিনি বীরভূমে ছিলেন, নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের বাসুলী দেবী দেখিয়াছেন। তাহার দৃঢ় ধারণা, চণ্ডীদাস সে গ্রামবাসী ছিলেন।

—কোন্ চণ্ডীদাস?

—কোন্ চণ্ডীদাস আবার কি?

—বীরভূমে নান্নুর গ্রাম কোথায়?

—বোলপুর হ'তে ক্রোশ ছয় যেতে হয়।

—গ্রামের নাম নান্নুর?

—নিশ্চয়।

—বাসুলী প্রতিমার ক'খানা হাত? হাতে কি আছে?

—হাত গণি নি, হাতে কি আছে, মনে প'ড়েছে না।

—আসন কি?

—আমি কি অত দেখেছি?

—

সিংহভূমকে উড়িষ্যাভুক্ত করিবার চেষ্টা

শ্রী—

সিংহভূমকে উড়িষ্যাভুক্ত করিবার চেষ্টা সম্পর্কে 'প্রবাসী'র আশ্বিন মাসের সম্পাদকীয় মন্তব্যের বিরুদ্ধে শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্ম্মা যাহা লিখিয়াছেন তাহা একদেশদর্শী, ও ন্যায়ানুগ নহে।

"সিংহভূম জেলাকে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তত্রত্য উড়িয়ারা বহুদিন হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন" ইহা সত্য কথা নহে। ইদানীং তত্রত্য কয়েক জন উড়িয়া ও বিশেষ করিয়া খরসোয়ান-নিবাসী এক জন উড়িয়া মুখ্যতঃ এই আন্দোলন চালাইলেও, পূর্ব্বে বর্ত্তমান উড়িষ্যার উড়িয়ারাই এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক ছিলেন ও এখনও ইহা চালাইতেছেন। যথা, আন্দোলনের প্রথম সোপানস্বরূপ ও ভূমি প্রস্তুতের জন্য ৺বাবু গোপবন্ধু দাস ১৯১৭ সালে চক্রধরপুর ও বাহার-গোড়ায় দুইটি "উড়িয়া" উচ্চ-ইংরেজী-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উড়িষ্যার গোদাবরী মিশ্র ও কৃপাসিন্ধু মিশ্র ইহাদের প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। কেহ উড়িয়া শিখিতে রাজী না হওয়ায় দুই বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয় দুইটি বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

"সিংহভূম বহুকাল হইতে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ইত্যাদি"। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য নাই। বর্ত্তমানের সিংহভূম জেলা শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য ক্রমবিবর্ত্তনে সৃষ্ট। বর্ত্তমানের সিংহভূম পুরাকালে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের সমষ্টি ছিল। যথা,

১। পোড়হাট অর্থাৎ কোল্হান রাজ্য। ইহার রাজগণ রাঠোর রাজপুতবংশসম্ভূত সিংহগোষ্ঠীর। পোড়হাটই আদিম ও প্রাকৃতিক সিংহভূম। অধিবাসিগণ আদিমজাতীয় "হো"। লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে "হো"দের সংখ্যা বেশী ও অন্যান্য জাতিরা পরে বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা হইলে "প্রকৃতপক্ষে হো ও উড়িয়া এদেশের আদিম অধিবাসী" কিরূপে হইলেন? এই কোল্হান পরগণা বর্ত্তমান জেলার অর্দ্ধেক।

২। ধলভূম। উড়িয়ারা ধলভূমের রাজাকে উড়িয়া বলিয়া দাবি করিলেও তিনি স্বীয় পরিচয় বাঙ্গালী বলিয়া দিয়া থাকেন। অধিকাংশ অধিবাসী বঙ্গভাষী।

"The Western dialect of Bengalee is spoken in its extreme form in the east of Chotanagpur division in the district of Manbhum and in the tract called Dhalbhum, etc." (Dr. Grierson's Linguistic Survey of India, Vol. V, part I, page 69.)

প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে ধলভূম মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক শতাব্দী পূর্ব্বে Reg. XIII of 1833 দ্বারা জঙ্গলমহালের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(৩) খরসোয়ান (৪) সেরাইকেলা। এই রাজ্যদ্বয়ের রাজা উড়িয়া হইলেও অধিবাসিগণ উড়িয়া হইতে বাধ্য নহেন।

১৯২১ সালের সেন্সস রিপোর্ট অনুসারে উড়িয়ারা সংখ্যায় সমগ্র জেলার অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশেরও ন্যূন। হাণ্টার সাহেবের 'ষ্ট্যাটিসটিক্যাল একাউণ্টস' বা 'ইম্পীরিয়াল গেজেটিয়ার' এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন দলিল।

"The population is polyglot. Of every 100 persons 38 speak Ho, 18 Bengalee and 16 Oriya. Santali and Mundari are also spoken widely" (*Imperial Gaz.* ii. 398.)

উপরোক্ত পুস্তক প্রণয়নের সময় উড়িয়া-বাঙালী প্রশ্ন উঠে নাই।

"The composition of the population, its geographical position and its economic interests militate against its inclusion into Orissa. The Sub-committee recommends its exclusion" (Simon Commission Sub-committee)

১৯২৪ সালের সিংহভূমের তৎকালীন ডেপুটী কমিশনর বিহার সরকারকে এই রিপোর্ট দেন।

"Singbhum is not an Oriya-speaking district and there is not a real demand for Oriya education except among a very small minority, and that Bengalee is the universal medium of communication and by far the commonest spoken."

জিলা বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান মিঃ ডেন্ (Mr. Dain) ১৯২৮ সালে লেখেন, "There will be no moral justification for introducing Oriya into these schools."

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট-সংশ্লিষ্ট একটি মানচিত্রে দেখা যায় যে জামসেদপুর ও পাশপুর থানায় উড়িয়া জনসংখ্যা শতকরা ০ হইতে ১০ ও ঘাটশীলা, কালিকাপুর ও বাহারগোড়া থানায় শতকরা ১০ হইতে ২৫।

Doubtful ৮৫,৫৩০ অধিবাসী উড়িয়া enumerator-এর হস্তে উড়িয়া বলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তৃতীয় পক্ষের হস্তে বাঙালী

হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়, কারণ মিশ্রিত-ভাষী সীমান্তরেখাবাসিগণকে বাঙালী বলিলে কেহ দোষ দিতে পারেন না।

প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বে ও পরে ওডোনেল কমিটির সময় উড়িষ্যার উড়িয়াগণ ও খরস্তানের একটি লোক ও তাঁহার পুত্র ও আত্মীয়গণ এই আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন। ভদ্রকের রাজকর্ম্মচারিগণ এবিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। শেষোক্ত ভদ্রলোক, যিনি খরস্তান-রাজের এক জন অবসরপ্রাপ্ত আমলা, প্রায় প্রত্যেক দিন উড়িয়া খবরের কাগজে তীব্র বাঙালী-বিদ্বেষপূর্ণ লেখা লিখিয়া আসিতেছেন ও তাঁহার আত্মীয় উড়িয়া রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য উড়িয়া রাজকর্ম্মচারিগণের সহায়তায় বালেশ্বর ও ভদ্রক হইতে বহু টাকা চাঁদা জমিদার ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া সিংহভূমবাসিগণকে উড়িয়া বানাইবার চেষ্টায় সম্প্রতি ছয়টি মাইনার স্কুল খরস্তান অঞ্চলে স্থাপন করিয়াছেন। এতদর্থে বালেশ্বর ও ভদ্রকের কতিপয় উড়িয়া রাজকর্ম্মচারী (ডেপুটি, মুন্সেফ, প্রভৃতি) এরূপ জুলুম করিয়া চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন যে ইহা সাধারণে "সিংহভূম চাঁদা" নামে প্রখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

এরূপ অবস্থায় সম্পাদক মহাশয় আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা অসঙ্গত হয় নাই।

—

বিক্রমপুর

শ্রীবিনোদবিহারী রায়, বেদরত্ন

ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য "বিক্রমপুর" নামক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিলাম।

বর্ম্মচন্দ্র ও সেন-বংশীয় রাজগণ যে-বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান বিক্রমপুর সে-বিক্রমপুর নহে। উহা পরগণা বিক্রমপুর। বিশ্বেশ্বর বাবু যথার্থই বলিয়াছেন ঐ পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোন স্থান নাই। সুতরাং নদীয়া জেলার বিক্রমপুরই (রেণেলের ম্যাপ) যে বর্ম্মচন্দ্র সেন বংশের রাজধানী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। (নব্যভারত ১৩২৩।৩১২ পৃষ্ঠা)। এই বিক্রমপুরের রাজাই রামপালকে সাহায্য করিয়া থাকিবেন (রামচরিত)। এই বিক্রমপুর ব্যতীত আর বিক্রমপুর নাই। বিক্রমপুরভুক্তি নামে হিন্দু রাজত্বকালে যে স্থানগুলি কথিত হইত, মুসলমান আমলে তাহাই পরগণা নামে কথিত হইয়াছে। ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ পর্য্যন্ত এই পরগণা বিস্তৃত।

বল্লাল সেন নামে দুই জন রাজাই ছিলেন। বিখ্যাত প্রথম বল্লাল সেন ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ছিলেন। আর এক জন বৈদ্য বল্লাল সেন ছিলেন তিনি পঞ্চদশ খ্রীষ্ট শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গেই রাজত্ব করিয়াছেন। বাবা আদম তাঁহার সমসাময়িক এবং তাঁহার মৃত্যুর কারণ। বল্লালচরিতে এই দুই বল্লালকে এক করিয়া লিখিত হইয়াছে। বল্লালচরিত সমসাময়িক গ্রন্থ নহে।

প্রথম বল্লাল সেন সুবর্ণগ্রামে রাজধানী করিয়াছিলেন একথা ঠিক। সুতরাং সেখানে তাঁহার কীর্ত্তি থাকা অসম্ভব নহে। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরের ভূমিশুক্ত নাম তখনও হয় নাই। তাই লক্ষ্মণসেনের এক তাম্রশাসনে ধাত্রীগ্রাম ও কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের এক তাম্র-শাসনে ফল্গুগ্রাম লিখিত আছে। লক্ষ্মণসেন পলায়ন করিয়া সমতটে গিয়াছিলেন। তখনও পূর্ব্ববঙ্গ নাম হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরের নাম দনৌজা মাধবের সময় হইয়া থাকিবে (আদাবাড়ী শাসন)। বৈদ্য বল্লাল ইঁহার পরে ছিলেন। আলোচনার স্থান বেশী নহে সেজন্য সংক্ষেপে লিখিলাম। আদিশূরও মিথ্যা নহে। ইনি আইন-ই-আকবরীতে আদশূর নামে কথিত হইয়াছেন। ইঁহার পূর্ণ নাম আদিত্যশূর। আদিত্যকে বাঙালী "আদি" বলিয়াই ডাকে, ইহা কে না জানে? (*Antique Review*, vol. v. p. 12-17)। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করেন নাই। পশ্চিম-বঙ্গে (রাঢ়ে) ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে এবং বরেন্দ্রে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছেন।

—

"রামকৃষ্ণ পরমহংস"

শ্রীশ্রীগোবিন্দ গোস্বামী সরস্বতী

গত ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা' বলিতে যাইয়া এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"তিনি যদিও জীবনের প্রথম ও মধ্য অবস্থায় একজন হিন্দু সাধক ছিলেন, কিন্তু শেষ অবস্থায় তাঁহার বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।" ইহা লেখকের নিজস্ব মনগড়া একটি ধারণা, এবং এ ধারণা ভুল।

বেদে যে চরম ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মজ্ঞান সাধন বর্ণিত আছে হয়ত পরমহংসদেব শেষে তাহারই সাধনা করিতেন। কিন্তু তজ্জন্য তিনি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়া ছিলেন একথা বলা যাইতে পারে না। কারণ বেদ ত হিন্দুধর্ম্মের বাহিরের শাস্ত্র নহে, বরং বেদই হিন্দু ধর্ম্মের প্রাণ। আর শেষ অবস্থায়ও সকল হিন্দু ভক্তকেই হিন্দুদের আচরিত প্রতিমা-পূজা ইত্যাদি বাদ দিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনেরই উপদেশ তিনি দিয়াছেন, এমন প্রমাণ ত পাওয়া যায় না। কাজেই পরমহংস-দেব সম্বন্ধে উহা লেখকের একটি ভ্রান্ত ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে।
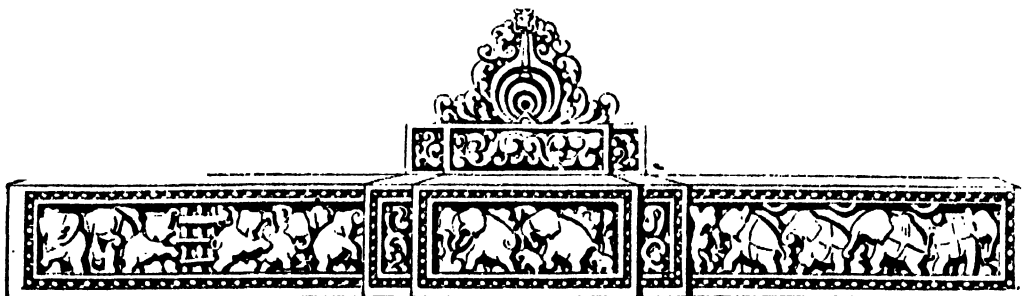
কলিকাতায় আন্তর্জাতিক মহিলা-সম্মেলন

শ্রীকমলা দেবী

বিগত ৩০শে জানুয়ারি হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত কলিকাতায় টাউনহলে আন্তর্জাতিক মহিলা-সংসদ (International Women's Council) এবং ভারতবর্ষের জাতীয় মহিলা-সংসদের (National Council of Women in India) একটি সম্মিলিত অধিবেশন হয়। ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে এইরূপ কোন প্রকার অধিবেশন হয় নাই। এই অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের বহু মহিলা প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতেও বহু স্বনামধন্যা মহিলার আগমন হইয়াছিল। নারীজাতির কল্যাণ-সংক্রান্ত বহু বিষয় এই অধিবেশনে আলোচিত হয়।

আন্তর্জাতিক নারী-সংসদ ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য নারী-প্রগতির বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার মধ্যে সংযোগ স্থজন এবং সামাজিক উন্নতির প্রসার-ক্ষেত্রে নারীর স্থান দৃঢ়তর করিয়া তোলা। ভিন্ন ভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানের মিলন-কেন্দ্র এই আন্তর্জাতিক নারী-সংসদের সহিত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের, সকল ধর্ম্মের এবং সকল আদর্শের বহু নারী-প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত আছে। বর্ত্তমানে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত সেই ক্ষুদ্র সংসদ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া ৪০টি বিভিন্ন জাতীয় নারী-সংঘের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল জাতীয় সংঘেরও প্রত্যেকেরই বহু শাখাপ্রশাখা আছে। এইরূপে বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক নারী-সংসদের সহিত ৪ কোটী নারী-সভ্যের সংযোগ আছে। সকলেরই মূল আদর্শ শান্তি ও সামাজিক উন্নতি। প্রত্যেক পাঁচ বৎসর পরে পরে এই সংসদের পঞ্চবার্ষিক অধিবেশন হয়। ইহাতে নানান ক্ষেত্রের কার্য্যবিবরণী আলোচিত হয় এবং ভবিষ্যতে কোন্ দেশে নারীর কল্যাণার্থ কি প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারণ করা হয়। অতীতের বহু অভিনব আদর্শ, যাহা পরে সর্ব্বজনস্বীকৃত বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে, এই আন্তর্জাতিক নারী-সংসদের অধিবেশনে প্রথম প্রচারিত হয়। যথা, ১৯০৪ সালে বার্লিনে নরনারীর নৈতিক আদর্শের সাম্যবাদের প্রস্তাব প্রথম গৃহীত হয় এবং ঐ অধিবেশনেই নারী ও শিশুর ক্রয়-বিক্রয় সর্ব্বদেশে নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টার স্থচনা হয়। অদ্যাবধি এই ক্ষেত্রে পূর্ণ তেজে সংগ্রাম চলিতেছে। ঐ অধিবেশনেই নারীদিগের রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক অধিকারে পুরুষের সহিত সাম্য দাবি করিয়া এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship) স্থাপিত হয়। ইহার কার্য্য এখনও চলিতেছে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে জাতি, ধর্ম্ম, দেশ নির্ব্বিচারে নারীর আর্থিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রগতি এই সংসদের লক্ষ্য। কোন সঙ্কীর্ণ মতবাদ অথবা সাম্প্রদায়িকতা সমর্থন না করায় সংসদের শক্তি ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের জাতীয় মহিলা-সংসদ আন্তর্জাতিক মহিলা-সংসদের অন্তর্গত এবং সকল অধিকারে অন্যান্য জাতির নারী-সংঘগুলির সহিত সমকক্ষ। আমাদের জাতীয় নারী-সংসদ ব্রহ্মদেশ লইয়া ছয়টি প্রাদেশিক শাখা-সংঘে বিভক্ত। এই প্রাদেশিক সংঘগুলির সহিত বহুসংখ্যক নারী-প্রতিষ্ঠানের সংযোগ আছে। অতএব ক্ষুদ্রতম কোন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোন সমস্যাও শেষ অবধি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে আলোচিত হইতে পারে।

আন্তর্জাতিক সংসদের অধিবেশন নানা দেশের রাজধানীতে ইতিপূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এ বৎসর এই অধিবেশন কলিকাতায় হইয়াছে।

কলিকাতার অধিবেশনে নিম্নলিখিতরূপ প্রতিনিধি সমাগম হয়। বহির্দ্দেশের ২৪ জন, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের ১৯ জন ও বাংলার ৩০ জন প্রতিনিধি। ইহা ছাড়া নানা স্থান হইতে অনেক দর্শক আসিয়াছিলেন। কোন্ দেশ হইতে কত জন প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন তাহা নিম্ন-লিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। আয়রল্যাণ্ড ১,

বরোদার মহারাণী

শ্রীযুক্ত মানেকলাল প্রেমচাঁদ

ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী

তাহাতে ভারতীয় নারীর দাবি পুরাপুরি গ্রাহ্য না হইলেও যেটুকু হইয়াছে সেইটুকুর সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে এবং তদনুসারে কাজ চালাইলে অদূর ভবিষ্যতে আদর্শসিদ্ধি নিশ্চিত হইবে।

অধিবেশনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সকল আলোচনার পূর্ণ বর্ণনা এক্ষেত্রে দেওয়া অসম্ভব, কিন্তু অধিবেশনের কার্য্য যে কিরূপ ব্যাপক হইয়াছিল তাহা প্রস্তাবনার ও আলোচনার বিষয়গুলি দেখিলেই বুঝা যায়। গ্রামসংস্কার, বালিকাদিগের শিক্ষা, সমাজ-কর্ম্মীদিগের শিক্ষা, শিশুশিক্ষা, চলচ্চিত্র, স্কুলের স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণ, খাদ্য ও স্বাস্থ্য, আইন-সংক্রান্ত অধিকারের অভাব, রাষ্ট্রীয় অধিকার, মাতৃমঙ্গল ও প্রসবকালীন মৃত্যুর হার, নারী ও শিশুর ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহা ব্যতীত সর্ব্বদেশের উন্নতি ও মঙ্গল-সংক্রান্ত তিনটি প্রস্তাব এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। প্রথমটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহ নিবারণের জন্য লীগ অব্ নেশ্যন্সের পারস্পরিক সর্ত্ত ও অঙ্গীকার

গ্রেট্ ব্রিটেন ৮, বেলজিয়ম ১, রুমেনিয়া ৪, সুইটজারল্যাণ্ড ৩, ফরাসী দেশ ২, ডেনমার্ক ১, গ্রীস্ ১, হল্যাণ্ড ১, অস্ট্রেলিয়া ২, নিউজিল্যাণ্ড ১। দর্শকদিগের মধ্যে চীনদেশ হইতে ১ ও অস্ট্রেলিয়া হইতে দুই জন আসিয়াছিলেন।

৩০শে জানুয়ারি বড়োদার মহারাণীর সভাপতিত্বে অধিবেশন আরম্ভ হয়। মহারাণী উক্ত দিবসে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি ও অভ্যাগতের সম্মুখে আপনার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি নারীদিগের শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। শিক্ষা সম্বন্ধে মহারাণী বলেন, যে, নারীদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে নিজেদের কর্ত্তব্য উপযুক্তরূপে করিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে মাতৃত্বের কার্য্যেও অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রাষ্ট্রে যে নূতন নিয়মতন্ত্রের সৃষ্টি হইল,

প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রে বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। দ্বিতীয়টি সর্ব্বদেশে ও সকল ক্ষেত্রে নরনারীর সমান অধিকার গ্রাহ্য করাইবার জন্য। তৃতীয়টি চলচ্চিত্রে যে প্রায়ই কোন-কোন দেশ-বিদেশের কুৎসা ও নিন্দামূলক চিত্র দেখান হইয়া থাকে, তাহার প্রতিবাদ হেতু উত্থাপিত হয়। চলচ্চিত্রে সামাজিক দুর্নীতি ও কুৎসিত আচার-ব্যবহারকে কেন্দ্র করিয়া গল্পের সৃজন হইয়া থাকে। অর্থোপার্জ্জনের জন্য এই সকল বিষয়ের প্রচার কখনও হইতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক বিদ্বেষ ও কলহের সৃষ্টি হয়, এবং পরস্পরের প্রতি যে-শ্রদ্ধা ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বের প্রধান বন্ধন, সেই শ্রদ্ধার বিশেষ হানি হয়। ভারত এই ঘৃণ্য ব্যবসার ফলে দেশে দেশে কলঙ্কের রঙে রঞ্জিত হইয়া বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে।

লেডী এজরা

প্রিন্সেস কান্তাকুজেন
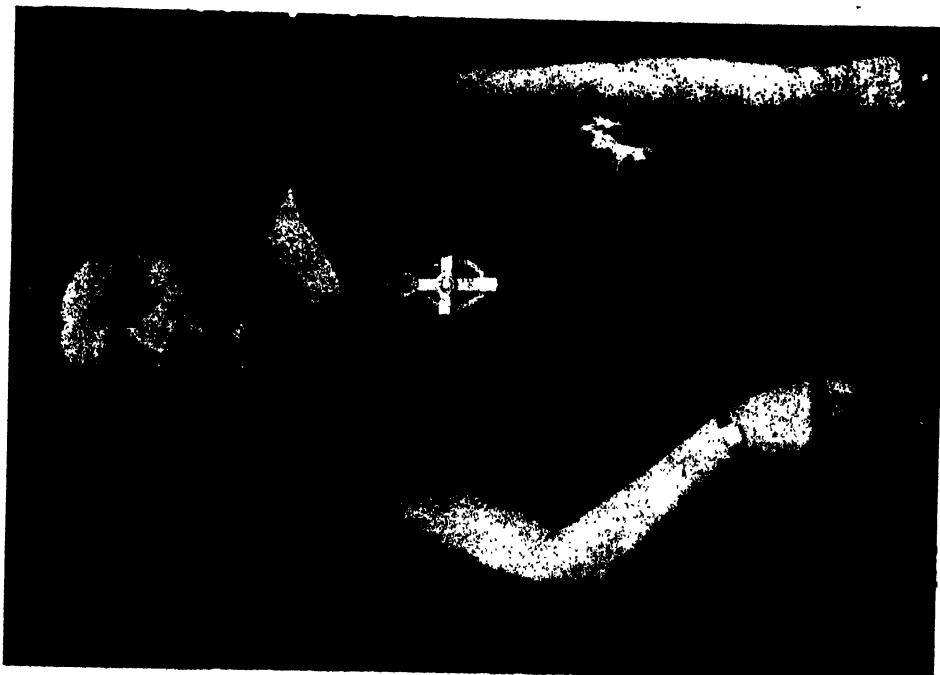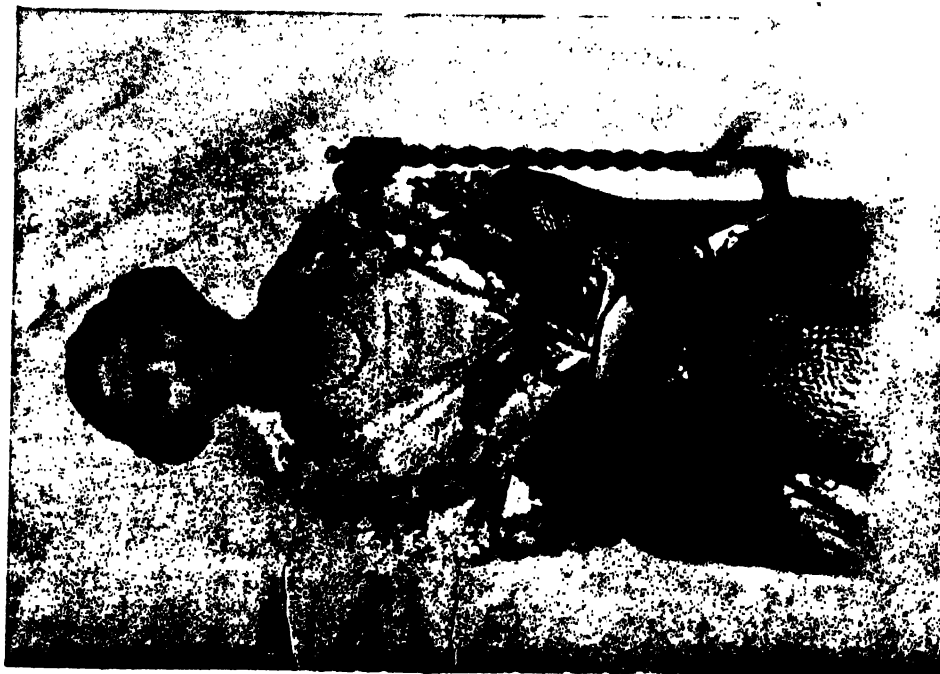
এই ব্যাপারের প্রতিবাদ নারী-সংঘ হইতে অতি তেজের সহিত করা হইয়াছিল।

প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য জাতীয় নারী-সংঘগুলি যথাসাধ্য করিতে চেষ্টা করিবেন।

শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় গ্রামের লোকের চরম দারিদ্র্যের কথা তোলেন ও বলেন, যে, যত দিন গ্রামবাসী নিজ রোজগারের শতকরা ৮০।৮৫ টাকা খাজনা হিসাবে দিতে বাধ্য হইবে তত দিন গ্রামের কোন উন্নতি হইবে

আন্তর্জাতিক মহিলা-সম্মেলনের কতিপয় প্রতিনিধি ও বন্ধুগণ

লেডী পেণ্টল্যাণ্ড গ্রামসংস্কার বিষয়ে আলোচনায় বলেন, যে, ইংলণ্ডে গ্রামবাসী মহিলা-সংঘের (Country Women's Association) কর্ত্তৃত্বাধীনে ৬৪টি শাখা-সংঘ আছে এবং ভারতে এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় সংঘ গঠন করিলে গ্রামসংস্কার-কার্য্য আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। উপরন্তু নারীর অবস্থা ইহাতে আরও উন্নত হইবে। লেডী নীলকণ্ঠ গ্রামের অধিবাসীদিগের দুঃখ ও দুর্দ্দশার আলোচনা করিয়া বলেন, যে, এই দুর্দ্দশার মূল কারণ শিক্ষার অভাব এবং এই অভাব দূর করা রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যতীত অসম্ভব। ভারতের জাতীয় নারী-সংঘের দেখিতে হইবে যাহাতে রাষ্ট্র নিজ কর্ত্তব্য উপযুক্তরূপে সম্পাদন করেন। লেডী অবলা বসু গ্রামের শিক্ষা ও শিল্পের আলোচনা করেন। তিনি বলেন, যে, গ্রামে গ্রামে সংঘ স্থাপন করা প্রয়োজন এবং নারী-শিক্ষক তৈয়ারী করা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত গ্রামের নষ্ট শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার অত্যাবশ্যক।

না, ব্রিটিশ প্রতিনিধিবৃন্দের নেত্রী ডেম এলিজাবেথ ক্যাডবেরী বলেন, যে, গ্রামসংস্কার-কার্য্যে সঙ্গীত শিক্ষা ও প্রচার বিশেষ প্রয়োজনীয়। সঙ্গীতের প্রচার হইলে গ্রাম্য জীবনে কিছু আনন্দ আসিতে পারিবে। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের গ্রামে গ্রামে ও স্কুলসমূহে গ্রামোফোন ও রেডিওর সাহায্যে সঙ্গীতের প্রচার করা হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে সাক্ষাৎভাবে সর্ব্বত্র গান বাজনা করিতে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। সঙ্গীতচর্চ্চার জন্ত ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে ৮০টি বিভিন্ন দল গঠিত হইয়াছে। ইহার পর বালিকাদিগের শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হয়। এই সূত্রে শ্রীমতী সরলা রায় বলেন, যে, এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে বালিকাদের শিক্ষা একটি বিশেষ বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হওয়া দরকার। এই বোর্ড অবশ্য শিক্ষা-বিভাগের অধীনে কাজ করিবে। বালিকাদের সকল পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যবিষয়, পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয় এই বিশেষ বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে চলিবে। এতদ্ব্যতীত বালক

শ্রীযুক্তা এলিজাবেথ ক্যাডবেরী

শ্রীযুক্তা ইশবেল, এবারডীনের মার্কুইস-পত্নী
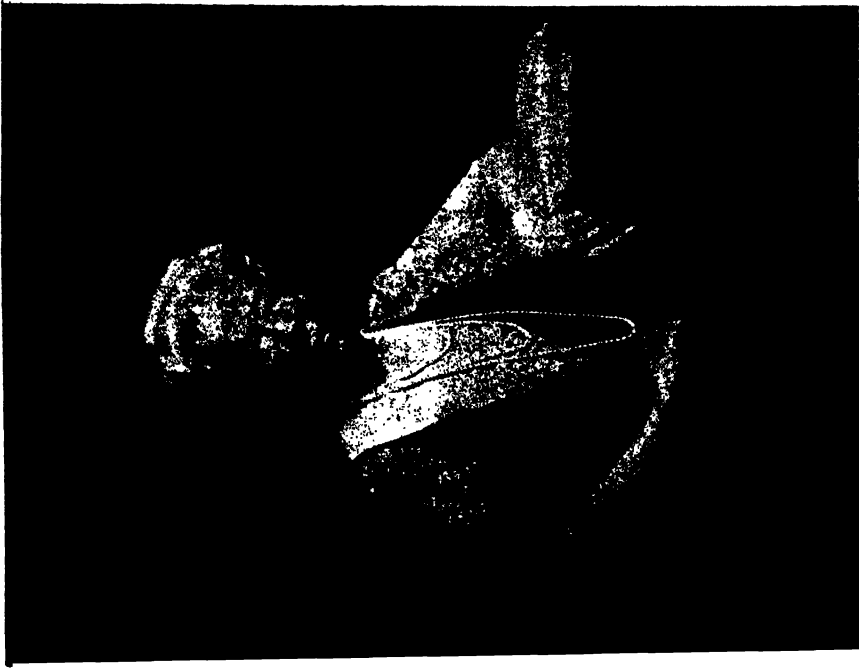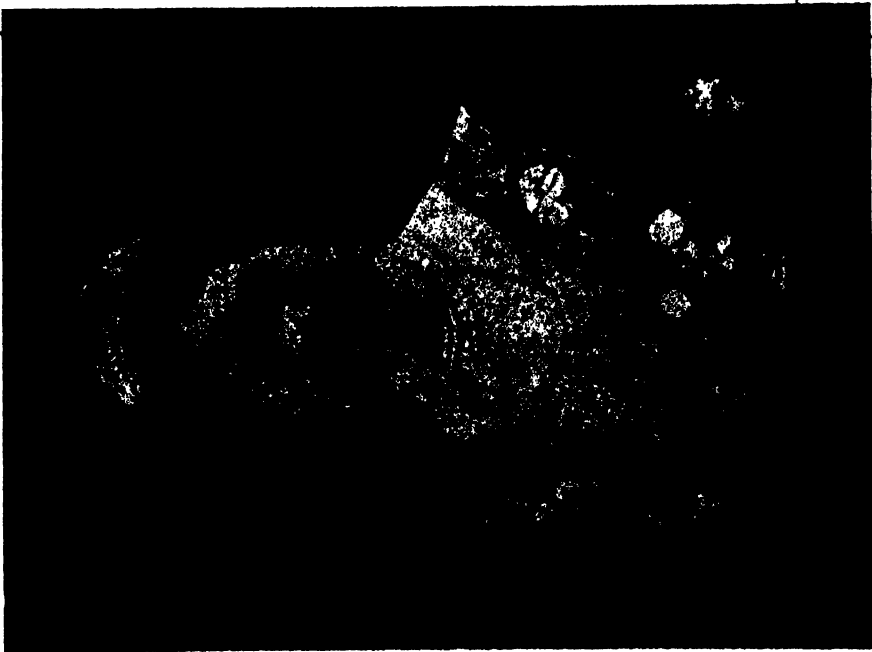
বালিকাদের শিক্ষাবাবদ ব্যয় সমান সমান হওয়া উচিত এবং বালিকাদের শিক্ষা এক জন নারী কর্মচারীর অধীনে থাকা প্রয়োজন।

সামাজিক উন্নতি-সংক্রান্ত কার্য্যে যে-সকল কর্ম্মী আত্মনিয়োগ করিবেন তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থার বিশদ আলোচনা এই অধিবেশনে করা হয়। আলোচনায় অনেকে যোগদান করেন। যথা, ডেম এলিজাবেথ ক্যাডবেরী, কুমারী উইনগেট, চীনদেশের কুমারী চিয়ান এবং রুমেনিয়ার প্রসিদ্ধ কর্ম্মী রাজকুমারী কান্তাকুজেন। স্বেচ্ছায় ও এই কার্য্যের জন্য বিশেষ শিক্ষা না পাইয়াও যাঁহারা সমাজসেবা করেন তাঁহাদের কাজ খুবই প্রয়োজনীয় বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু বিশেষ শিক্ষাব্যতীত এই কার্য্যের সুব্যবস্থা কোন নেতৃস্থানীয় লোক করিতে পারেন না। কিন্তু সমাজ-সেবার কার্য্যে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার একান্ত অভাব আছে। নারী ও সংবাদপত্রের কাজ, এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া সুইটজারল্যাণ্ডের লেখিকা কুমারী সেলভেগর বলেন, যে, যদিও নারীরা সংবাদপত্রের কার্য্যে স্থান লাভ করেন তথাপি সে স্থান শুধু নীচের দিকের, অর্থাৎ অল্প রোজগারের ও মর্য্যাদার। নারীদের উচিত নিজেদের বিষয় নানা গভীর সমস্যার আলোচনা সংবাদপত্রে করা। শুধু খুঁটিনাটি বিষয়ের লেখা চালাইলে সংবাদপত্রে নারীর স্থান উন্নত হইবে না।

ইহার পরে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার লইয়া বিশেষ আলোচনা হয়। আমাদের দেশের মাতৃত্ব একটা মহামারী বলিলেও চলে। কেননা, এই স্বাভাবিক ব্যাপারে বহুসংখ্যক নারী প্রতিবৎসর ভারতে প্রাণ হারান। এই বিষয়ের একটি প্রতিবিধান অবশ্যকর্ত্তব্য। কারণ এই মৃত্যুর অধিকাংশই সুব্যবস্থা থাকিলে কখনও ঘটিতে পারে না। বোম্বাই হইতে আগত ডাঃ শ্রীমতী খিরাদ এই বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যান করেন।

পরিশেষে নারী ও শিশু ক্রয়-বিক্রয়, আইনে নারীর অধিকারাভাব ও বাল্যবিবাহ আলোচিত হয়। কুমারী শেফার্ড বলেন, যে, শিশু ও নারী ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে সমাজের মত দৃঢ়তররূপে প্রকাশিত না হইলে শুধু আইনের দ্বারা এই ঘৃণ্য ব্যাপার বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। যদিও বর্ত্তমানে এই ক্ষেত্রে অধিকসংখ্যক লোক কার্য্যে নামিয়াছেন, তবুও এই কার্য্যে সকলের আরও বেশী সহানুভূতি প্রয়োজন। উদ্ধার-কার্য্যের জন্য সকল প্রদেশে নিখিল বঙ্গ মহিলা সমিতির (All Bengal Women's Unionএর) মত সংঘ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এখন অবধি অধিকাংশ উদ্ধার-কার্য্য মুক্তি ফৌজ, মিশন-সমূহ, ব্রাহ্মসমাজ, সেবাসদন ও ভারত-ভৃত্য সমিতি। (Servants of India Society) করিয়া থাকেন।

বেগম শা নাওয়াজ বলেন, যে, লীগ অফ নেশ্যন্সের সংগৃহীত সংখ্যাসমূহের পর্য্যালোচনায় বুঝা যায় যে ভারতবর্ষ নৈতিক দিক দিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশগুলির সমকক্ষ।

উপরোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে আন্তর্জ্জাতিক নারী সংঘের অধিবেশনে বহু ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছে। বিষয়গুলি সকল ক্ষেত্রে নূতন না হইলেও নানা দেশের সমর্থনে ও সহানুভূতিতে এই আলোচনার মূল্য খুবই অধিক বলিয়া ধার্য্য হইতে পারে।

আলোচনা ব্যতীত সম্মিলনের একটা সামাজিক দিকও ছিল। ষ্টীমার-পার্টি, চা-পার্টির সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের পরস্পরের সহিত মেলামেশা ও বন্ধুত্বের সুযোগ দেওয়া হয়। যথার্থ বলিতে গেলে এই সামাজিক মিলনের মধ্য দিয়াই প্রকৃত ও চিরস্থায়ী বন্ধনের সূচনা হয়।

সম্রাটের মৃত্যুর জন্য অনেকগুলি সামাজিক নিমন্ত্রণ প্রভৃতি শেষ অবধি বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু যে কয়টি হইয়াছিল সেগুলি খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। একদিন সকলে ষ্টীমার করিয়া বেলুড় দেখিতে যান। প্রতিনিধিরা সকলেই বেলুড় মঠ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার বহু স্কুল-কলেজ ও নারী-প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিবর্গকে দেখান হয়।

পরিশেষে কলিকাতা কর্পোরেশনের তরফ হইতে মেয়র ও অল্ডারম্যানরা অধিবেশনের প্রতিনিধি ও দর্শকদিগকে একদিন অভ্যর্থনা করেন। মেয়র সকলকে কলিকাতায় স্বাগত সম্ভাষণ করেন। প্রতিনিধিদিগের তরফ হইতে ডেম এলিজাবেথ ক্যাডবেরী, রাজকুমারী কান্তাকুজেন ও শ্রীমতী ফরিদুন্‌জি প্রত্যুত্তর দান করেন। এইখানেই অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

ভারতবর্ষ আবহমান কাল হইতে বিশ্বমানবের বার্ত্তায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। বিশ্বজনীন শান্তি ও সখ্যের আদর্শ ভারতে চিরন্তন। কবি রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান ভারতে এই বাণী পুনরায় নূতন করিয়া উচ্চারণ করেন ও তাঁহার বিশ্বভারতী আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা ও সভ্যতার মিলনক্ষেত্র।

এই জন্য শান্তি ও আন্তর্জ্জাতিক সখ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত বিশ্বনারীসংঘ যে ভারতকে নিজেদের মিলনক্ষেত্র রূপে নির্ব্বাচন করিলেন ইহা অতি সুখের বিষয়।

অধিবেশন বিশেষ সফল হইয়াছে। কারণ, ভারতের চিরঅনুসৃত আদর্শের সহিত এই আন্তর্জ্জাতিক সংঘের আদর্শের অপূর্ব্ব সমন্বয়।

মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের বার্ষিক প্রদর্শনী

সম্প্রতি মান্দ্রাজ সরকারী আর্ট স্কুলের পঞ্চম বার্ষিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের

আবদুল হাকিমের প্রতিমূর্ত্তি ; শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক গঠিত

শিষ্য-প্রশিষ্যদের অধ্যক্ষতায় সরকারী শিল্পবিদ্যালয়গুলি নূতন রূপ পাইতেছে, গতানুগতিকতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সত্যকার শিল্পসাধনার কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। মান্দ্রাজ আর্ট স্কুলও তাহারই দৃষ্টান্তস্থল। শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যখন মান্দ্রাজ আর্ট স্কুলে প্রদর্শনীর আয়োজন হয় তখন স্থানীয় "হিন্দু" পত্রিকা লিখিয়াছিলেন : "এই প্রদর্শনী দেখিয়া মন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। ছাত্রদের কাজে আর সে বাঁধা রীতির ছাপ নাই—সৌন্দর্য্যের সন্ধানে এখন তাহারা নিজেরাই যাত্রা করিয়াছে। অতঃপর তাহাদের নব নব কল্পনার অবকাশ মিলিবে।" এই আশা যে নিষ্ফল হয় নাই তাহা বর্ত্তমান বর্ষের প্রদর্শনীর চিত্র ও মূর্ত্তিগুলির প্রতিলিপি দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়।

এই প্রদর্শনী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বাহ্ণে দেবীপ্রসাদ মান্দ্রাজ রোটারি ক্লাবে যে-বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার শিল্পসাধনার আদর্শের কথা পরিস্ফুট :

"বিভিন্ন দেশের ভাষা যেমন পৃথক, তেমনই বিভিন্ন দেশ-কালের শিল্পের আঙ্গিক (টেকনিক) ও ঐতিহ্যের পার্থক্য হওয়াও স্বাভাবিক।...শিল্পীর শিল্পকর্ম্ম যতদিন প্রাণবন্ত হয় ততদিন কেবল জাতীয় ঐতিহ্যের অনুসরণে কোন ক্ষতি নাই ; শিল্পী যে-ধারাই অনুসরণ করুন, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা এবং শিল্প-কৌশল প্রত্যেক শিল্পীর পক্ষেই অপরিহার্য্য। এই শিল্প-কৌশলে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিলে, শিল্পের বিষয়বস্তু যতই মহৎ হউক না কেন, কেবল ভাবালুতা দ্বারা এবং ঐতিহ্যের অনুসরণে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি হয় না।...

"আমরা কেবল প্রাচীন ধারারই অনুসরণ করিয়া চলিব, এবং বিংশ শতাব্দীর সকল বৈদেশিক প্রভাব হইতে আপনাদিগকে মুক্ত রাখিব, একথা জোর করিয়া বলা চলে না ; অতীতের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে গিয়া বর্ত্তমানকে আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। কোন শিল্পী যদি বিদেশীয় শিল্পশৈলীর সহায়তায় সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে ও নিজের

মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের প্রদর্শনীতে মাদ্রাজের গবর্ণর

তরুবীথি : শিল্পী শ্রীবারীন্দ্রচন্দ্র নাগ

শ্রীবীরভদ্র চিত্রা কর্তৃক পরিকল্পিত আসবাব

দড়ির ঝোলা
শ্রীকিরণময় ধর

ভগবান্ বুদ্ধ- শিল্পী শ্রীগোপাল কৃষ্ণন্

ভোর-- শিল্পী শ্রীতানিচলম্

ভাবকে রূপ দিতে পারেন তবে সেই বিদেশী শিল্পশৈলীকে আমাদের গ্রহণ ও আত্মসাৎ করিয়া লইতে দ্বিধান্বিত হওয়া উচিত নয়…সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই শিল্পীর উদ্দেশ্য, তাহার নিকট দেশী-বিদেশীর ভেদ নাই।"

মান্দ্রাজের আর্ট স্কুলের গত প্রদর্শনীর কয়েকটি চিত্র ও মূর্ত্তির প্রতিলিপি মুদ্রিত হইল।

এই বিদ্যালয়ের কারু-বিভাগও শ্রীবীরভদ্র চিত্রার শিক্ষকতায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে। শ্রীযুক্ত চিত্রা শান্তিনিকেতনে শ্রীনন্দলাল বসুর ও লক্ষ্ণৌতে শ্রীঅসিতকুমার হালদারের শিক্ষকতায় চিত্রে ও কারুকর্ম্মে বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পিত কতকগুলি গৃহসজ্জাদ্রব্যের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। আমাদের দেশে গৃহসজ্জায় সাধারণত রুচিজ্ঞান সৌন্দর্য্যবোধ বা পরিমাণ-বোধের কোন পরিচয় একান্ত দুর্লভ; আমাদের পারিপার্শ্বিকের সহিত বেমানান গৃহসজ্জার পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত চিত্রার পরিকল্পনাগুলি বহুলভাবে প্রচারিত হইলে আনন্দের বিষয় হইবে।

নৃপতি অষ্টম এডোয়ার্ডের বাণী

ইংলণ্ডের নৃপতিদের একটি রীতি আছে, যে, তাঁহারা প্রত্যেকে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার পর তাঁহাদের প্রজাবর্গকে নিজ প্রীতি ও শুভ ইচ্ছার বাণী প্রেরণ করেন। নূতন নৃপতি অষ্টম এডোয়ার্ড সেই রীতির অনুসরণ করিয়া রেডিওর সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র তাঁহার বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে ভারতবর্ষের নরেন্দ্রগণ ও প্রজাদিগের উদ্দেশে বলিয়াছেন :—

"To the Princes and people of India I send greetings as King-Emperor. The manifestations of your sorrow and your loyalty at this time have been a source of deep gratification to me. Associations in peace and war between the British and Indian peoples have long been honourable and the examples set by Queen Victoria, King Edward the Seventh and King George lays on me as their successor a solemn trust to maintain and strengthen these associations."

তাৎপর্য্য। "ভারতবর্ষের নরেন্দ্র ও প্রজাবর্গকে আমি রাজা ও সম্রাটরূপে সাদর সম্ভাষণ প্রেরণ করিতেছি। এই সময়ে আপনাদের (বা তোমাদের) শোক ও রাজভক্তির প্রকাশ আমার গভীর তৃপ্তির কারণ হইয়াছে। শান্তির সময় ও যুদ্ধকালে ব্রিটিশ ও ভারতীয় লোকেদের সাহচর্য্য দীর্ঘকাল সম্মানজনক হইয়াছে, এবং রাণী ভিক্টোরিয়া, রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড ও রাজা পঞ্চম জর্জের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরূপে আমার উপর সেই সাহচর্য্য রক্ষা ও বলবৎ করিবার গম্ভীর ভার অর্পণ করিতেছে।" [অর্থাৎ ব্রিটিশ জাতি ও ভারতীয় জাতির মধ্যে যাহাতে ছাড়াছাড়ি না হয়, তাহা দেখিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে। এই কর্ত্তব্য কিরূপে সাধিত হইবে তাহা অবশ্য উক্ত হয় নাই।]

ইহার পর তিনি আর একটি বাক্যে বলিয়াছেন, যে, সতত তাঁহার চেষ্টা হইবে সকল মানুষের কল্যাণসাধন করা ("whose constant effort will be to continue and promote the well-being of his fellowmen")। ভারতীয়েরাও মানুষ বলিয়া এই কল্যাণসাধন-সংকল্পের ফলভাগী হইবার আশা করিতে পারিবে।

সর্ব্বশেষে নূতন নৃপতি এই কামনা করিয়াছেন :—

"May the future bring peace and understanding throughout the world, and prosperity and happiness to the British people, and may we be worthy of the heritage which is ours!"

তাৎপর্য্য। "ভবিষ্যৎ যেন সমগ্র জগতে শান্তি ও পরস্পরের ভাব ও চিন্তা সম্বন্ধে বোধ, এবং ব্রিটিশ জনগণের জন্য সম্পদ ও সুখ আনয়ন করে, এবং আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা পাইয়াছি তাহার যেন যোগ্য হইতে পারি।"

ব্রিটিশ জনগণ সমগ্র জগতের মানবসমাজের অংশ। সুতরাং নূতন নৃপতি ব্রিটিশ জনগণের জন্যও ভবিষ্যতে শান্তি ও অন্য জাতিদের সহিত পরস্পরবোধের বিনিময় চাহিতেছেন, ইহা উহ্য। অধিকন্তু তিনি ব্রিটিশ জনগণের জন্য সম্পদ ও সুখ চাহিতেছেন।

নৃপতি অষ্টম এডোয়ার্ড কি বলিয়াছেন ও কি বলেন নাই, তাহা সকলেরই ভাবিবার বিষয়।

—

সর্ দীনশা এডুলজি ওয়াচা

৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা কংগ্রেস স্থাপন করেন এবং বোম্বাইয়ে তাহার প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন,

সর্ দীনশা এডুলজি ওয়াচা

তাঁহাদের অন্যতম সর্ দীনশা এডুলজি ওয়াচা সম্প্রতি ৯২

বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯০১ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তিনি তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি অর্থনৈতিক বিষয়ে এবং বাণিজ্যিক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সম্পদ যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তাহার আড়ম্বর ছিল না। টাকা জমাইয়া লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইবার ঝোঁক তাঁহার ছিল না। তিনি সাদাসিধা ভাবে জীবন যাপন করিতেন, পবিত্রচেতা লোকহিতব্রত মানুষ ছিলেন, এবং দানে ও অন্য প্রকারে মানুষকে সাহায্য করিতে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। গবন্মেণ্ট তাঁহাকে অযাচিতভাবে "সর্" পদবী দেন, এবং তিনি প্রথমে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি শেষ বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়নরত থাকিয়া নিজ প্রিয় অর্থনৈতিক বিষয় সমূহে জ্ঞান সঞ্চয় করিতেন।

—

নবীনচন্দ্র বড়দলই

আসামের এক জন প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক নেতা নবীনচন্দ্র বড়দলই ৬১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গৌহাটীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তিনি তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯১৫ সালে সার্ব্বজনিক প্রচেষ্টা-সমূহে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। তিনি আসাম সভার সম্পাদক ছিলেন। মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কারের ফল হইতে আসামকে বাদ দিবার যে আমলাতান্ত্রিক চেষ্টা হয়, তাহার প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত ১৯১৮ সালে ইংলণ্ডে যে ডেপুটেশ্যন প্রেরিত হয়, তিনি তাহার সভ্য ছিলেন। তিনি ১৯১৯ সালে কংগ্রেসে ও ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।
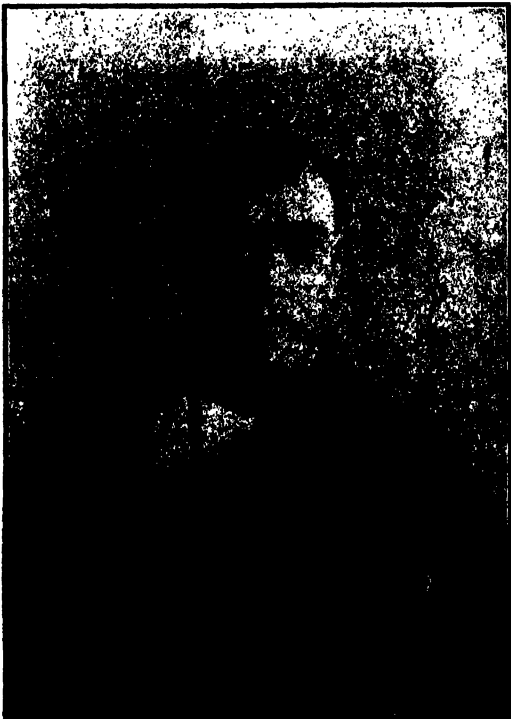
নবীনচন্দ্র বড়দলই

—

দেশী রাজ্যের মহারাণীগণ

দেশী রাজ্যের মহারাণীদিগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে; এবং তাঁহাদিগকে অর্থচিন্তাতে বিব্রত হইতেও হয় না।

ইন্দোরের মহারাণী সাহেবা হোলকর

তাঁহারা জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। মহিলাদের কন্‌ফারেন্সে ও অন্য কোন কোন সার্ব্বজনিক কার্য্যে ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাণী, বড়োদার মহারাণী, ময়ূরভঞ্জের রাণীমাতা সুচারু দেবী যোগ দেওয়ার ফল ভাল হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান কো-অপারেটিভ রিভিয়ু নামক ইংরেজী ত্রৈমাসিকে দেখিলাম ইন্দোরের মহারাণী হোলকর তথাকার সমবায়-প্রচেষ্টার আন্তরিক কল্যাণসাধিকা; তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে ইন্দোরের প্রধান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। ইন্দোরের মহিলারা যে সমবায়-প্রচেষ্টাকে সফল করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, তাহার পশ্চাতে মহারাণীর প্রভাব বিদ্যমান আছে, অনুমান করা যাইতে পারে।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের অক্সফোর্ডে নিয়োগ

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা ফাল্গুনের প্রবাসীতে লিখিয়াছি। তিনি ইতিপূর্ব্বেও ইংলণ্ডে আপ্টন লেক্‌চার্স ও হিবার্ট লেকচ্যার্স দিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়া গৌরবের বিষয়।

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, পিএইচ-ডি, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের একটি তথ্যপূর্ণ বাংলা জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে কেহ খুব বেশী বেতন না পাইলে তাহার পদগৌরব আছে মনে করা হয় না। বড় বড় সরকারী চাকরির বেতন এদেশে যত বেশী, অন্য কোন দেশে তত নহে। অন্যান্য বিভাগের মত শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর, ইন্সপেক্টর ও বড় অধ্যাপকদেরও বেতন বেশ মোটা রকমের। ইংলণ্ডে তাহা নহে—যদিও ইংলণ্ড ভারতবর্ষের চেয়ে খুব বেশী ধনী এবং তথাকার লোকদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়ও অনেক বেশী। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন যে চাকরিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহার বার্ষিক বেতন নয় শত পাউণ্ড অর্থাৎ ১২০০০ টাকা। ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগসমূহের অনেক বিদেশী ও দেশী অধ্যাপক ইহা অপেক্ষা অধিক বেতন পান।

Waltair S. Radhakrishnan
5/11/36.

সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্
[শ্রীমতী রাণী চন্দ কর্ত্তৃক অঙ্কিত]

ভারতীয় ডাক্তারের বীরত্ব

ক্যাপ্টেন পতিতপাবন চৌধুরী নয় বৎসর ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে অস্থায়ী ভাবে কাজ করেন। এইরূপ অস্থায়ী চাকরিতে কাহাকেও নয় বৎসরের বেশী রাখা হয় না। তাহার পর হয় অস্থায়ী অফিসারকে স্থায়ী করা হয়, নতুবা তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। বিশেষ যোগ্যতা থাকিলে অস্থায়ী অফিসারের স্থায়ী হইবারই কথা। সব স্থানে তাহা হয় কি না জানি না। ক্যাপ্টেন চৌধুরীর অস্থায়ী কার্য্যের নয় বৎসর সময় শেষ হইবার পূর্ব্বে তিনি নিজের প্রাণকে বিপন্ন করিয়া লোএ-আগ্রার যুদ্ধক্ষেত্রে সাংঘাতিক ভাবে আহত মালাকন্দের পোলিটিক্যাল এজেণ্ট মিঃ বেষ্টের এবং কয়েক জন সৈনিকের চিকিৎসা করেন। তখনও সেখানে গুলি চলিতেছিল। এই প্রকার বীরত্বের জন্য তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইবার পর তাঁহাকে মিলিটারী ক্রসে ভূষিত

ক্যাপ্টেন পতিতপাবন চৌধুরী

করা হইয়াছে। তাঁহাকে স্থায়ী ভাবে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে চাকরি দিলে তাঁহার গুণের প্রকৃত সম্মান করা হইবে। তিনি এলাহাবাদের এংলোবেঙ্গলী ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের ছাত্র ছিলেন, এবং লক্ষ্ণৌ মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী এম্ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

জাপানী চিত্রকর কোসেৎসু নোসু

জাপানী চিত্রকরের ছবি

কাশীর নিকটস্থ প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থ সারনাথে যে নূতন বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম মূল-গন্ধকুটি-বিহার। এই বিহারের প্রাচীরের ভিতরের দিক্ চিত্রিত করিবার ভার এক জন জাপানী চিত্রকরকে দেওয়া হয়। তাঁহার নাম কোসেৎসু নোসু। তাঁহার কতকগুলি মন্দির-গাত্রের ছবির প্রতিলিপি ও অন্য ছবি সম্প্রতি কলিকাতা গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে তাহার প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দের উদ্যোগে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার সৌজন্যে কয়েক খানি চিত্রের ফোটোগ্রাফ আমরা পাইয়াছি এবং তজ্জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। চিত্রকরের তোলা ফোটোগ্রাফগুলি

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ

মার-কন্যা বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন

সুস্পষ্ট না হওয়ায় আমরা সবগুলি ছাপিবার চেষ্টা করিলাম না।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন আগামী ১৩৪৩ সালের পৌষ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাঁচীতে হইবে স্থির হইয়াছে। ঐ শহরে অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী আছেন, যাঁহাদের চেষ্টায় এই অধিবেশনটির কাজ সুসম্পন্ন হইবে আশা করিতেছি। তাঁহারা ইতিমধ্যেই উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

বেঙ্গল ফিজিক্যাল কাল্‌চার কনফারেন্স

ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্ম ভিন্ন ভিন্ন সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া আসিতেছে ;—রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কংগ্রেস, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য-সম্মেলন, বিজ্ঞান মহাসভা, দর্শন কংগ্রেস, ঐতিহাসিক সভা ইত্যাদি ইত্যাদি। শরীর গঠন, শক্তি ও স্বাস্থ্য চর্চ্চা যদিও ভারতবাসীর পক্ষে, বিশেষ করিয়া বাঙালীর পক্ষে, একান্ত আবশ্যক, তথাপি এ বিষয়ে ভারতবর্ষে কখনও কোন কংগ্রেস বা কনফারেন্স হয় নাই। শক্তি ও স্বাস্থ্য চর্চ্চার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার সম্যক আলোচনার উদ্দেশ্যে বিগত ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই মার্চ কলিকাতায় সিনেট হলে এক আলোচনা-সভা বা কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। এরূপ আলোচনা-সভা ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও হয় নাই বলিয়া এবং বাংলায় এই সম্বন্ধে আজকাল বিশেষ একটা জাগরণ আসিয়াছে বলিয়া এই অধিবেশন উল্লেখযোগ্য। ৫ঠা বেলা ৪-৪৫ ঘটিকায় সিনেট হলে সভাপতি সর্ নীলরতন সরকার মহাশয় আলোচনা-সভা আরম্ভ করেন। অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি সর্ হরিশঙ্কর পাল নিজ অভিভাষণে শরীর ও স্বাস্থ্য চর্চ্চা সম্বন্ধে বহু প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। শরীর ও শক্তি চর্চ্চা যে শুধু মাংসপেশীগুলিকেই বাড়াইয়া তোলে না, পরোক্ষভাবে মানুষের ইচ্ছাশক্তি, নৈতিক গুণাগুণ, সাহস, সংযম ও একাগ্রতাকে পুষ্ট করিয়া তোলে, একথা সর্ হরিশঙ্কর জোরের সহিত বলেন। জীবনসংগ্রামে সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সফলতা লাভ করিতে হইলে মানুষের যে-সকল ক্ষমতা প্রয়োজন হয়, শক্তি ও স্বাস্থ্য সাধনাদ্বারা সেই

শ্রীসন্তোষ দত্ত

সকল ক্ষমতা আমরা অর্জ্জন করিতে পারি। পাশ্চাত্ত্য জাতিদের উন্নতি বিশেষ করিয়া শক্তি ও স্বাস্থ্য চর্চ্চার ফল। প্রাচীন ভারতের গৌরবও ঐ শক্তি ও স্বাস্থ্যের ভিত্তির উপরে

পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমানে যে এই ক্ষেত্রে আবার একটা নব জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে ইহাই আমাদের এই দুঃখদারিদ্র্যপীড়িত দেশের পক্ষে একটা বড় আশার কথা। সকল প্রকার দেশী ও বিদেশী খেলা, মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, সাঁতার, নৌচালনা, ড্রিল, জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতির দিকে আমাদের পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। জাতীয় কর্ম্মশক্তির অনেকাংশ এই দিকে ব্যয় করিতে পারিলে তবেই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব হইবে।

সর্ নীলরতন সরকার মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় কয়েকটি বিষয়ের দিকে বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া বাংলায় শুধু শরীর-বর্জ্জিত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এই পন্থার দোষ বুঝিয়া এখন জাতির শরীর ও শক্তির বনিয়াদ দৃঢ়তর করিবার জন্য তৎপর হইয়াছেন। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনের অধিক শরীর ও শক্তির দিক দিয়া বিকল। কাহারও চক্ষু, কাহারও শ্রবণশক্তি খারাপ, কেহ বা ফুসফুসের পীড়ায় বা অপর কোন রোগে আক্রান্ত। কয়েকটি খেলোয়াড়কে বিশ্ববিজয়ী করিয়া তোলা অপেক্ষা সকল বালক বালিকা ও যুবক যুবতীকে আরও অধিক শক্তি ও স্বাস্থ্য অর্জ্জন করাইতে পারিলে কাজ ভাল হইবে। বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিজয় করিবার আগে নিজের শরীরকে জয় করা দরকার। শরীর ও মনের সকল শক্তির পূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন। একপেশে হইয়া বাড়িয়া উঠিলে জগতে আমাদের স্থান পিছনেই থাকিয়া যাইবে। দেহকে এমন করিয়া গড়িতে হইবে যে রোগ সে মন্দিরে প্রবেশ করিতে অক্ষম হইবে। মানুষের জন্ম হইয়াছে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, অকালমৃত্যুর জন্য নহে। বাঁচিয়া থাকিবার পথ শরীর ও শক্তি সাধনার ভিতর দিয়া। এই সাধনা আত্মা ও মনের পবিত্রতা ও উন্নতির আকর।

বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার কনফারেন্সের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি মেজর ডাঃ পি, কে, গুপ্ত মহাশয় বলেন, যে, বাংলা নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছে। সে প্রেরণা আজ লক্ষ লক্ষ বাঙালী যুবকের প্রাণে জীবন্তরূপে বর্ত্তমান। এ একটা ফাঁকা আওয়াজ নহে। বাংলার ভবিষ্যতের সম্বল এই নূতন সাধনার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র। সকলকেই এই কার্য্যে নামিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি এই কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের মিলিত চেষ্টা যদি একমুখী না হয়, তাহা হইলে চেষ্টা সফল হইবে না।

শ্রীদেবেশচন্দ্র ঘোষ

অতঃপর অধিবেশনের কার্য্য নিম্নলিখিতরূপে সম্পন্ন হয়।

৪ঠা মার্চ্চ। স্বাস্থ্যশিক্ষা শাখা। সভাপতি সর্ নীলরতন সরকার। এই শাখায় ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায়, এম-বি, ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-বি, ডাঃ রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর, মেজর ডাঃ পি কে গুপ্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করেন।

৪ঠা মার্চ্চ। চিকিৎসামূলক ব্যায়াম শাখা। সভাপতি মেজর পি কে গুপ্ত। প্রবন্ধ-পাঠক ও বক্তা:—ডাঃ আর এন ঘোষ, এম বি, ডাঃ এস কে সেন, এম-বি, মিঃ বি কে বাঁড়ুজ্যে, মিঃ ভূপেশ কর্ম্মকার, মিঃ ইউ এন বাঁড়ুজ্যে প্রভৃতি।

৫ই মার্চ্চ। জলক্রীড়া শাখা। সভাপতি রায় ডাঃ হরিধন দত্ত বাহাদুর। বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন, মিঃ শ্যামচাঁদ দত্ত, মিঃ শান্তি পাল, বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য,

শ্রীনীলমণি দাস

মিঃ প্রভাস ঘোষ, মিঃ মাখনলাল ধর, মিঃ দেবেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

৫ই মার্চ্চ। শক্তিপরিচায়ক খেলা ও শরীর গঠন শাখা। সভাপতি স্বামী যোগানন্দ। বক্তা ও প্রবন্ধপাঠক মধুসূদন মজুমদার, অরবিন্দ ঘোষ, বি কে বাঁড়ুজ্যে, দিগেন দেব, সমীরণ বাঁড়ুজ্যে, কেশব গুপ্ত, হরেন কাপাসী, রাধানাথ বাঁড়ুজ্যে, কেশব সেনগুপ্ত, নীলমণি দাস, কুঞ্জলাল বসু, বিধুভূষণ জানা, রবীন সরকার প্রভৃতি।

৬ই মার্চ্চ। বড় ও ছোট খেলা ও দৌড়ধাপ (athletics)। সভাপতি মিঃ এস এন বন্দ্যোপাধ্যায়, বার-এট-ল। বক্তা ও প্রবন্ধ-পাঠক প্রফেসর শৈলজারঞ্জন রায়, মিঃ গোষ্ট পাল, মিঃ কে ভট্টাচার্য্য, মিঃ রবীন সরকার, মিঃ হাবুল সরকার প্রভৃতি।

৬ই মার্চ্চ। খোলা হাওয়ায় জীবনযাত্রা শাখা। সভাপতি মিঃ এন এন বসু, বার-এট-ল। বক্তা ও প্রবন্ধপাঠক মিঃ ডি এন মুখুজ্যে ও মিঃ বি কে জোশী, বার-এট-ল।

৬ই মার্চ্চ। পুরুষোচিত ক্রীড়াকলাপ শাখা। সভাপতি, মল্লযুদ্ধ-বিভাগ, মিঃ জে সি গুহ (গোবর বাবু); সভাপতি, লাঠি ও অসি বিভাগ, মিঃ পুলিনবিহারী দাস; সভাপতি, মুষ্টিযুদ্ধ-বিভাগ, মিঃ ডি, পি, খেতান

বক্তা ও প্রবন্ধপাঠক সত্যেন গাঙ্গুলী, পি বল্লভ, কমলাকান্ত গুপ্ত, সন্তোষ দত্ত, সুবলচাঁদ চন্দ, জগৎকৃষ্ণ শীল, অশোক চট্টোপাধ্যায়, রবীন সরকার, সুশীল মিত্র প্রভৃতি। অধিবেশনের সূত্রে ৫ই ও ৬ই সন্ধ্যায় জিমন্যাষ্টিক, লাঠি, ছুরি, তলোয়ার, রামদা', সড়কি, বল্লম ইত্যাদির খেলা, মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, ইত্যাদি দেখান হয়। ইহাতে কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক স্বনামধন্য খেলোয়াড় যোগদান করেন। তাহার মধ্যে ফরিদপুরের ডাঃ সুবোধচন্দ্র সরকার, এম-বি'র নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। তিনি ফরিদপুর হইতে অনেকগুলি খেলোয়াড়কে লইয়া আসেন ও কলিকাতায় প্রায় দেখা যায় না এরূপ বহু খেলা দেখান। কুমারী বাণী ঘোষ ও কুমারী বীণা ঘোষের লাঠি ও তলোয়ার খেলাও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। বাংলায় যে বালিকাদের মধ্যে এরূপ খেলোয়াড় আছে তাহা অনেকে না দেখিলে বিশ্বাস করিতেন না।

জাতিগঠনের কাজে বাংলা-সরকারের ব্যয় হ্রাস

গত কয়েক বৎসর যেমন বাংলা-গবর্মেণ্টের আয়ব্যয়ের হিসাবে ঘাটতি দেখা গিয়াছিল, এবারেও তাই। ভারত-গবর্মেণ্ট বাংলা দেশে সংগৃহীত রাজস্ব খুব বেশী পরিমাণে শোষণ করায় এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ভারত-গবর্মেণ্টকে ন্যায়পরায়ণ করিতে পারিলে তবে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে।

১৯৩৬-৩৭ সালে যত রাজস্ব বাংলা-গবর্মেণ্টের হস্তগত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের কোন বৎসরের চেয়ে কম নয়, বরং বেশী। সুতরাং ১৯৩৬-৩৭ সালে শিক্ষা ও চিকিৎসা বিভাগে বরাদ্দ কমাইবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু কমান হইয়াছে দেখিতেছি। ১৯২৯-৩০ সালে শিক্ষার বরাদ্দ ছিল ১,২৯,৫৪,০০০, কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ সালের বরাদ্দ হইয়াছে ১,১৮,৮২,০০০ টাকা। ১৯২৯-৩০ সালে চিকিৎসা-বিভাগের বরাদ্দ ছিল ৫৫,৬৯,০০০ টাকা, কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ সালের বরাদ্দ হইয়াছে ৪৯, ৯২,০০০ টাকা।

অন্য দিকে শাসন, পুলিস ও জেল বিভাগের বরাদ্দ বাড়ান হইয়াছে। তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল।

	১৯২৯-৩০	১৯৩৬-৩৭
শাসন	১,২৪,৩৩,০০০৲	১,৩৭,২০,০০০৲
পুলিস	২,০৭,১৬,০০০৲	২,৩০,৪৯,০০০৲
জেল	৩৪,৪৫,০০০৲	৪৩,৮০,০০০৲

বাংলা দেশে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোক নাই বলিলেই চলে, এবং রুগ্ন লোকেরও সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে। এই জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা বিভাগের বরাদ্দ কমান খুবই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। অন্য দিকে বঙ্গের লোকেরা অধিক হইতে অধিকতর অসন্তুষ্ট, অশান্ত ও দুর্দান্ত হইয়া উঠিতেছে। সেই জন্য তাহাদিগকে সায়েস্তা ও ঠাণ্ডা করিবার নিমিত্ত শাসন, পুলিস ও জেল বিভাগের খরচ বাড়ান দরকার। ব্রিটেন নামক সভ্য দেশে নির্বোধ লোকেরা বলিয়া থাকে বটে, যে, এক একটা ইস্কুল খুলিলে এক একটা জেল বন্ধ করা যায়। কিন্তু সেটা পাশ্চাত্য দেশের অকেজো কথা। প্রাচ্য দেশের কেজো হদিশ—জেল বাড়াও, স্কুল কমাও; শিক্ষক কমাও, হাকিম, পুলিস এবং জেল-দারোগা বাড়াও। পাশ্চাত্য দেশে এ রকম একটা ধারণাও চলিত আছে, যে, রোগের আধিক্য মানুষের অপরাধ-প্রবণতা বাড়ায়; সুতরাং সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত হইলে অপরাধ-প্রবণতা কমে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশ প্রাচ্য দেশের পক্ষে কার্য্যকর নহে।

—

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত এটর্নী মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি রামমোহন রায়ের দৌহিত্রীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। তিনি বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত বাংলা ও ইংরেজী কয়েকখানি ভাল বহি আছে। তিনি এক সময়ে থিয়সফিষ্ট ছিলেন এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কী ও কর্ণেল অলকটের সহিত আমেরিকা গিয়াছিলেন। তিনি পরে পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর শিষ্য হন। তিনি অতি সজ্জন ছিলেন এবং বহু জনহিতকর প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। এক সময়ে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া ছিলেন যাহাতে থাকিয়া কলুষিত জীবন ত্যাগানন্তর নিরাশ্রয় নারীরা সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিতে পারে। যৌবন-কালেই তিনি এরূপ জ্ঞানী ও বাক্‌পটু ছিলেন, যে, বিখ্যাত কবি ডবল্যু বি য়ীট্‌স তাঁহার সহিত পঞ্চাশ বৎসরেরও পূর্ব্বে পরিচিত হইয়া থাকিলেও গত বৎসর তাঁহাকে একখানি চিঠিতে লেখেন :—

Dear Mohini Chatterjee,

I have often wondered where you were. Somebody sent me a book of yours a couple of years ago which interested me, and now I have been able to get your address through a friend. I write merely to tell you that you are vivid in my memory after all these years. That week of talk when you were in Dublin did much for my intellect, gave me indeed my first philosophical exposition of life. When I knew you, you were a very beautiful young man; I think you were twenty-seven years old, and astonished us all, learned and simple, by your dialectical power. My wife tells me that I often quote you. . . . .

য়ীটসের The Winding Stair নামক গ্রন্থে মোহিনী বাবুর সম্বন্ধে একটি কবিতা আছে।

—

শ্রীমতী কমলা নেহরু

দীর্ঘকাল সাংঘাতিক ব্যাধির সহিত সংগ্রাম করিয়া শ্রীমতী কমলা নেহরু দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ও স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই নারীরত্ন আত্মোৎসর্গ, কষ্টসহিষ্ণুতা ও সাহসের সহিত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। আমি যখন ১৯২৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জেনিভায় ছিলাম, তখন তিনি তাঁহার স্বামী, ছোট ননদ কৃষ্ণকুমারী ও কন্যা ইন্দিরার সহিত চিকিৎসার্থ সেখানে ছিলেন। তাঁহারা যে হোটেলের একটি ফ্ল্যাটে ছিলেন, তথায় একদিন গিয়াছিলাম। ১৯২৬এরও আগে হইতে তিনি পীড়িত ছিলেন। দেশে ও বিদেশে চিকিৎসা যত ভাল হইতে পারে, তাহা তাঁহার হইয়াছিল, এই সান্ত্বনা তাঁহার স্বামী ও আত্মীয়েরা অনুভব করিতে পারেন। চিকিৎসা হইতে পারিত কিন্তু হয় নাই, এ দুঃখ দুর্বিবহ এবং কখনও ইহার উপশম হয় না। তাঁহার আত্মীয়দিগের কেবল ঐ দুঃখটা নাই। ভারতের সেবিকা তিনি ছিলেন। তাঁহার দেহাবশেষ ভারতেরই গঙ্গাগর্ভে স্থান পাইয়াছে।

—

অন্নদাচরণ সেন

গত ১৫ই ফাল্গুন কলিকাতার সিটি কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি ৪০ বৎসর শিক্ষকতার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তাহার মধ্যে মদ্যপাননিবারণী সভা প্রধান। সাধু চরিত্রের গুণে তিনি শিক্ষকসম্প্রদায়ের অন্যতম অলঙ্কার ছিলেন।

—

চণ্ডীচরণ লাহা

কলিকাতায় কলেজ ষ্ট্রীটে মেডিক্যাল কলেজের হাতায় শ্যামচরণ লাহা চক্ষু-চিকিৎসালয় ঐ পথ দিয়া যাঁহারা যান

তাঁহাদের চোখে পড়ে। এই শ্যামচরণ লাহা মহাশয়ের পুত্র চণ্ডীচরণ লাহা ৮০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, খুলনা, চব্বিশ-পরগণা ও হাবড়া জেলায় তাঁহার জমিদারী ছিল। তা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল। তিনি খুব ধনশালী ছিলেন অথচ খুব অনাড়ম্বর চা'লে চলিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে তাঁহার ২২৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের প্রাসাদের সম্মুখে ফুটপাথে বেড়াইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে না চিনিলে কখনই মনে করিতে পারিতেন না, যে, তিনি কলিকাতার ধনীলোকদের মধ্যে এক জন। তিনি দানশীল ছিলেন। নিজের জমিদারীতে ও অন্যত্র শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি এবং রোগীর চিকিৎসার জন্য তিনি বিস্তর টাকা দিয়াছিলেন। হুগলীর জলের কলের জন্য লাহা-পরিবার যে এক লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন, কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে তাঁহারা ৭৫,০০০ টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অংশ ছিল।

—

নিখিলভারত স্থানিক স্বায়ত্তশাসন কন্‌ফারেন্স

আগামী ২৮শে মার্চ্চ দিল্লীতে সর্ ঘুলাম হুসেন হিদায়ৎ-উল্লার সভাপতিত্বে নিখিলভারত স্থানিক স্বায়ত্তশাসন কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইবে। ভারতবর্ষের বহু জেলাবোর্ড ও ম্যুনিসিপালিটির প্রতিনিধিরা ইহাতে উপস্থিত হইবেন। এই কন্‌ফারেন্সের কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোমকে ইহার শিক্ষা-শাখার সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন। এই মনোনয়ন যথাযোগ্য হইয়াছে। অমলবাবু ঐ গেজেটের সম্পাদকরূপে পৌরজনের ও ম্যুনিসিপালিটি-সমূহের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য—বিশেষতঃ স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় কর্ত্তব্য—সম্বন্ধে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কাগজখানিকে এ বিষয়ে বঙ্গের প্রধান শিক্ষাদাতা বলা যাইতে পারে।

—

স্বর্ণময়ী প্রমদাসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়

আমরা স্বর্ণময়ী প্রমদাসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সন ১৩৪১ সালের কার্য্যবিবরণ পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। ইহার দ্বারা বিস্তর পীড়িত লোকের সাহায্য হইয়াছে। ইহার কার্য্যক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। তদর্থে সর্ব্বসাধারণে সাহায্য করিলে সাহায্যের সদ্ব্যবহার হইবে।

—

পত্রলিখন-প্রণালী

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, বিদ্যালয়ে মুসলমান ও হিন্দু ছেলেমেয়েদিগকে কি রকম চিঠি লিখিতে শিখান হয়, তাহার কতকগুলি নমুনা দিয়াছেন। মুসলমানরা কি সত্যই ঐ রকম চিঠি লেখেন? জানিতে কৌতূহল হয়। হিন্দুরা কি রকম চিঠি লেখেন তাহা জানা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ।

আমরা বাল্যকালে "পত্রকৌমুদী" নামক একখানি পুস্তক দেখিয়াছিলাম। উহা বোধ হয় বটতলার ছাপা। উহা আমাদের বিদ্যালয়পাঠ্য বহি ছিল না। উহাতে কি রকম সব পাঠ ছিল, ঠিক মনে নাই। দু-একটা অস্পষ্ট স্মৃতি আছে। কোনও "মধ্যম ভট্টাচার্য্য" মহাশয়ের সাধ্বী পত্নী প্রোষিত-ভর্তৃকা অবস্থায় তাঁহাকে কিরূপ চিঠি লিখিবেন, তাহার ব্যবস্থায় যে-সকল দুরূহ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার ছিল, তাহা একালের কোন বিরহিণী—তিনি অধ্যাপক-পত্নী হউন বা অন্য যিনিই হউন—নিশ্চয়ই ব্যবহার করেন না; সেকালে কোন মহিলা করিতেন কিনা জানি না।

আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। বৈবাহিক (কন্যার পিতা) অন্য বৈবাহিককে (বরের পিতাকে) "মদেকসদয়" বলিয়া সম্বোধন করিবেন, এইরূপ বিধান ছিল। ইহা এখন ক্রূর পরিহাস মনে হইবে। কন্যার পিতা এখন বরের পিতাকে "মদেকনির্দ্দয়তম" বলিয়া সম্বোধন করিলে বহুবহু ক্ষেত্রেই সত্যের সীমা লঙ্ঘিত হইবে না।

—

"চণ্ডীদাস-চরিত"

আগামী বৈশাখ সংখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত "চণ্ডীদাস-চরিত" নামক পুরাতন পুথী অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত টীকাসহ প্রকাশিত করিব। এই পুথীর অন্য গুণাগুণ সুধীবর্গের বিচার্য্য। আমরা কেবল এইটুকু বলিতে পারি, যে, ইহা উপন্যাস অপেক্ষা কম মনোরম হইবে না।

—

রাজশাহী বিভাগ প্রজা-সম্মেলন

গত ১৬ই ফাল্গুন দিনাজপুরের হিলি বন্দরে রাজশাহী বিভাগের প্রজাসম্মেলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মৌলবী নাজির আহমদ চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন মৌলবী আফ্‌তাব উদ্দীন চৌধুরী। তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছেন, প্রায় দশ হাজার হিন্দু ও মুসলমান সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন :—

আমার বলিবার মূলকথা দুইটি। শুধু বৈষম্যের নাশে কল্যাণ নাই, কল্যাণ সকল বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্যে, সুসমাধানে, প্রত্যেককে সকলের কল্যাণানুগ করায়। ইহাই সত্যকার সাম্যবাদ। আপনাদের বাঁচিবার সত্যকার পথ পরকে নষ্ট করা নয়, আপনি সচেতন হওয়া। জাগ্রত মানুষের ঘরে চুরি হয় না, হয় নিদ্রিতের ঘরে, অলসের ঘরে, অজ্ঞের অচেতনের ঘরে। ইহাই প্রজার দুঃখের মূলকথা, এইখানেই তাহার

জীবন-মরণের চাবিকাঠি। যে নেতা, যে শাসক, যে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রজাকে শিক্ষিত করিবে, তাহার নষ্ট মনুষ্যত্ব ফিরাইয়া দিবে, তাহার আপন কল্যাণের পথে তাহাকে সজাগ করিবে, সেই করিবে প্রজাসাধারণের সত্যকার কল্যাণসাধন।

যদি সমাজের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতি সকল শ্রেণীর লোকের সহযোগিতা ও ঐক্যবোধের উপরই নির্ভর করে, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সমাজের কেবল অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যই সকল দুঃখ-দুর্দৈবের জন্ত দায়ী নয়। সমাজের ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি থাকিতে পারে এবং মানবজাতির ইতিহাসে ত্রুটিবিচ্যুতিহীন প্রতিষ্ঠান আজও সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু যদি আমরা শুধু সেই ত্রুটিগুলির সংশোধন না করিয়া, যেন তেন উপায়ে সমগ্র ব্যবস্থাটাকেই দূর করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগের কল্যাণের পথে সেই দুর্দৈবই হয়ত অন্য আকারে দেখা দিবে। সেই জন্যই শ্রেণী-বিরোধের নামে আমাদের উত্তেজিত হইবার কিছু নাই। আমরা যদি উপযুক্ত ব্যবস্থার গুণে জাতীয় ধন-সম্পত্তিকে যথাসম্ভব শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ও সমাজের কল্যাণকর কার্য্য-কলাপের মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতে পারি, তাহা হইলে ধনিক ও জনসাধারণের মধ্যে বিরোধমূলক কোন বৈষম্যই থাকিবে না। আমাদের অনুভব করিতে হইবে, যে আমরা প্রত্যেকেই পরস্পরের জন্ত এবং আমরা যদি কর্ম্মে চিন্তায় ও ব্যবহারিক জীবনে এই অনুভূতিকেই সার্থক করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের জাতীয় জীবনে কোন সমস্তাই দুরূহ থাকিবে না এবং কোনও দুঃখই আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না।

এই সব কথা সুচিন্তিত।

সভায় যে-সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, মৌলবী আফ্‌তাব উদ্দীন চৌধুরী "তাহার মোটামুটি নকল" আমাদিগকে যাহা পাঠাইয়াছেন তাহা নীচে মুদ্রিত হইল।

১। ঋণ-লাঘব আইনকে অবিলম্বে বলবৎ করার জন্ত এই সম্মেলন বাংলার গবর্ন্মেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।

২। ২১ ইঞ্চি হাতের ৮৭ হাত মাপের নলে দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন পরগণার জমির পরিমাণ চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান জরিপে যে পুরাতন প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া ১৮ ইঞ্চি হাতের ৮০ হাত নল ব্যবহার করা হইতেছে, ইহাতে প্রজাসাধারণের দ্বিবিধ ক্ষতি করা হইতেছে। যথা, (১) জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার জন্ত খাজানার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, (২) সেসের হার বৃদ্ধি পাইবে। এই সম্মেলন রেভিনিউ-বোর্ডকে অনুরোধ করিতেছে, জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণে যেন পুরাতন প্রথা বহাল রাখা হয়।

৩। পৃথিবীব্যাপী মন্দার ফলে ফসলের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। এই সম্মেলন মূল্য হ্রাসের অনুপাতে প্রজার খাজানা হ্রাসের দাবি করিতেছে।

৪। এই সম্মেলনের মতে পাট, ইক্ষু প্রভৃতি কৃষিজাত প্রধান প্রধান ফসলের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

৫। কৃষিজাত ফসলের, বিশেষ করিয়া ধান্তের, রেলভাড়া এমন ভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত যাহাতে বিদেশী চাউল আমদানী দ্বারা এদেশের কৃষকসম্প্রদায়ের ক্ষতি না হয়। এই সম্মেলন গবর্ন্মেণ্ট ও রেল কর্ত্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছে।

৬। উত্তরবঙ্গের করতোয়া, আত্রেয়ী, গর্ভেশ্বরী, ইত্যাদি নদীগুলির জীবনীশক্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য গবর্ন্মেণ্টকে সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছে।

৭। কোন কোন জমিদার দেশের এই দুর্দ্দিনে প্রজার খাজানা বৃদ্ধি করিতেছেন জানিয়া এই সম্মেলন দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং জমিদারগণকে খাজানা বৃদ্ধি না করার জন্ত অনুরোধ জানাইতেছে।

—

"গবর্ন্মেণ্টের পরাজয়"

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আগে আগেও "গবর্ন্মেণ্টের পরাজয়" বহু বার হইয়াছে এবং গবর্ন্মেণ্ট ভৎ‌সিত হইয়াছেন; এখনও তাহা ঘটিতেছে। কিন্তু তাহাতে গবর্ন্মেণ্টের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তবে, এই সব পরাজয় ও ভৎ‌সনা সম্পূর্ণ নিষ্ফল নহে; ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, যে, সরকার জনপ্রতিনিধিদের বিশ্বাসভাজন নহেন।

—

সমগ্র ভারতে শিক্ষার সরকারী ব্যয় হ্রাস

বাংলা গবর্ন্মেণ্ট শিক্ষার জন্ত ব্যয় কমাইয়াছেন, দেখাইয়াছি। মোটের উপর যে অন্যান্ত প্রদেশেও শিক্ষার জন্য ব্যয় কমিতেছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, এই ব্যয় হ্রাস একটি সমগ্রভারতীয় সরকারী শিক্ষা-নীতির ফল।

"ভারতবর্ষে শিক্ষা" ("Education in India") নাম দিয়া ভারত-গবর্ন্মেণ্টের শিক্ষা-কমিশনার প্রতি বৎসর একখানি রিপোর্ট বাহির করেন। ইহা বিলম্বে বাহির হয়। সম্প্রতি বর্ত্তমান মার্চ্চ মাসে ১৯৩৩-৩৪ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি গত ছয় বৎসর সমগ্র ভারতে সরকারী শিক্ষা-ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছিল:—

বৎসর।	সমগ্র ভারতে সরকারী শিক্ষাব্যয়।
১৯৩৪	১১৪৭০৩১৫০ টাকা
১৯৩৩	১১৩৫৫০৭২৮ টাকা
১৯৩২	১২৪৬০০৪৮১ টাকা
১৯৩১	১৩৬০২৭১১৬ টাকা
১৯৩০	১৩২৫৩৮০৪৪ টাকা
১৯২৯	১৩১৮১০১৪৫ টাকা

ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে, ১৯৩৩এর চেয়ে ১৯৩৪এ খরচ কিছু বাড়িয়া থাকিলেও ১৯৩৪এর খরচ ১৯২৯, ১৯৩০, ১৯৩১, ও ১৯৩২ এর চেয়ে ঢের কম।

আমরা আগে দেখাইয়াছি, যে, বঙ্গে শিক্ষার জন্য ১৯৩৬-৩৭ সালের সরকারী ব্যয়ের বরাদ্দ ১৯২৯-৩০এর চেয়ে কম—১৯২৯-৩০এ ছিল ১,২৯,৫৪,০০০, কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ হইয়াছে ১,১৮,৮২,০০০। আলোচ্য সমগ্র-ভারতীয় শিক্ষা রিপোর্টটিতে দেখিতেছি, বঙ্গে ১৯৩৪ সালে সরকারী শিক্ষাব্যয় ছিল ১,৩৪,৮৮,৮৫২ টাকা।

সুতরাং বঙ্গে সরকারী শিক্ষাব্যয় ১৯৩৪ সালেও ১৯৩৬-৩৭-এর বরাদ্দ অপেক্ষা অধিক ছিল।

—

বঙ্গে ও অন্যত্র সরকারী শিক্ষাব্যয়

ভারতবর্ষের অন্য সব প্রদেশগুলির প্রত্যেকটির চেয়ে বঙ্গের লোকসংখ্যা বেশী; কিন্তু বাংলা-গবর্মেণ্ট অন্য বড় বড় প্রদেশগুলির চেয়ে শিক্ষার জন্য ব্যয় কম করেন। তাহা ১৯৩৪ সালের সরকারী শিক্ষা-ব্যয়ের নিম্নমুদ্রিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

প্রদেশ।	সরকারী শিক্ষাব্যয়।
মাদ্রাজ	২৪৬০২৯৬০
বোম্বাই	১৭৬১৭১৬৮
বাংলা	১৩৪৮৮৮৫২
আগ্রা-অযোধ্যা	১৯৭৬৫৩৬১
পঞ্জাব	১৫৯৯২২৫৬

—

বঙ্গে ও অন্যত্র মোট ছাত্র-বেতন

অন্য দিকে বঙ্গে ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন আদায় হয় অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে খুব বেশী। ১৯৩৪ সালের অঙ্কগুলি নীচে দিতেছি।

প্রদেশ।	ছাত্রদত্ত বেতনের সমষ্টি।
মাদ্রাজ	৯৫৮৫৫৭০
বোম্বাই	৯২২৩৪৯৪
বাংলা	১৮৬৭২০০৮
আগ্রা-অযোধ্যা	৭৩৬২৩৮৬
পঞ্জাব	৭৫৬৩৮৯০

—

বঙ্গের শাসন-রিপোর্ট

বঙ্গের ১৯৩৪-৩৫ সালের সরকারী শাসন-রিপোর্ট গত ৭ই মার্চ্চ বাহির হইয়াছে। ইহাতে কংগ্রেসকে ও জাতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে খাট করিবার একটা চেষ্টা লক্ষিত হয়। রিপোর্টটির ভূমিকায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত লিখিত হইয়াছে, "The report is published under the general authority and with the approval of the Government of Bengal, but this approval does not necessarily extend to every particular expression of opinion"। সুতরাং কোথাও কোন গলদ বাহির হইলে বাংলা-গবর্মেণ্ট বলিতে পারিবেন, "এটা আমাদের অনুমোদিত নহে," কিন্তু যে মন্তব্যটি তাহার জন্ত দায়ী তিনি আড়ালে অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবেন।

এবার তাড়াতাড়ি বহিখানির পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম, রিপোর্টলেখক সংবাদপত্রাদির সাম্প্রদায়িক ভাগ করিয়া হিসাব দেন নাই। তাঁহার সুবুদ্ধি হইয়াছে।

—

প্রবাসীর মলাটের ছবি

মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের প্রবাসীর মলাটে শীত ও বসন্তের চিত্র দেওয়া হইয়াছিল। তাহার আগে কয়েক মাস মানস-সরোবরে জয়া ও বিজয়ার সাহত পার্ব্বতীর স্নান ছবির বিষয় ছিল।

—

জাপানে সৈনিক প্রাধান্য

জাপানে সৈনিক-বিভাগের প্রাধান্য স্থাপনার্থ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী কয়েক জন নিহত হইয়াছে। তাহার পর নূতন যে মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে, তাহাতে যোদ্ধাদের প্রভাবের জয় লক্ষিত হয়।

জাপানে যে সামরিক-বিভাগের প্রভাব এই প্রকারে আরও বাড়িল, তাহাতে আপাততঃ জগতে শান্তির সম্ভাবনা কমিল।

—

জাপান ও রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা

চীন জাপানের আততায়িতায় বিপন্ন; অধিকন্তু তথায় কম্যুনিষ্টরা (সাম্যবাদীরা) প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে চীনে জাপানের শক্তি কমিবে কিনা বলা যায় না—জাপানীরা নিজেদের দেশে কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করিয়া আসিতেছে।

মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গোলিয়া লইয়া জাপানের সঙ্গে রুশিয়ার যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া একটা আতঙ্ক জন্মিয়াছে। এখন রুশিয়া স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের অধীন নহে। তাহার সামরিক বল ও ধনসম্পদ বাড়িয়াছে। রুশিয়া এখন ১,৩০,০০,০০০ (এক কোটি ত্রিশ লক্ষ) সুশিক্ষিত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে সমর্থ। তাহার এরোপ্লেনের সংখ্যা বোধ হয় অন্য যে-কোন একটা দেশের চেয়ে বেশী। সুতরাং এখন তাহার ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে জাপান জিতিবেই বলা যায় না।

—

জার্ম্মেনী ও ফ্রান্স

গত মহাযুদ্ধের অবসানে যে সন্ধি হয়, তদনুসারে রাইন-ল্যাণ্ডের (যে-অঞ্চলের মধ্য দিয়া রাইন নদী প্রবাহিত, তাহার) "অসামরিকত্ব" (demilitarization) সাধিত হয়। কিন্তু সম্প্রতি হের হিটলার সেখানে সৈন্যদল পাঠাইয়াছেন এবং জার্ম্যানীর অন্যত্র যেমন সেখানেও তেমনি নিজ নাৎসি দলের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। ইহা লইয়া ফ্রান্সের সহিত জার্ম্যানীর মানোমালিন্য এবং সমগ্র ইউরোপে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধ না বাধিয়া যায়।

—
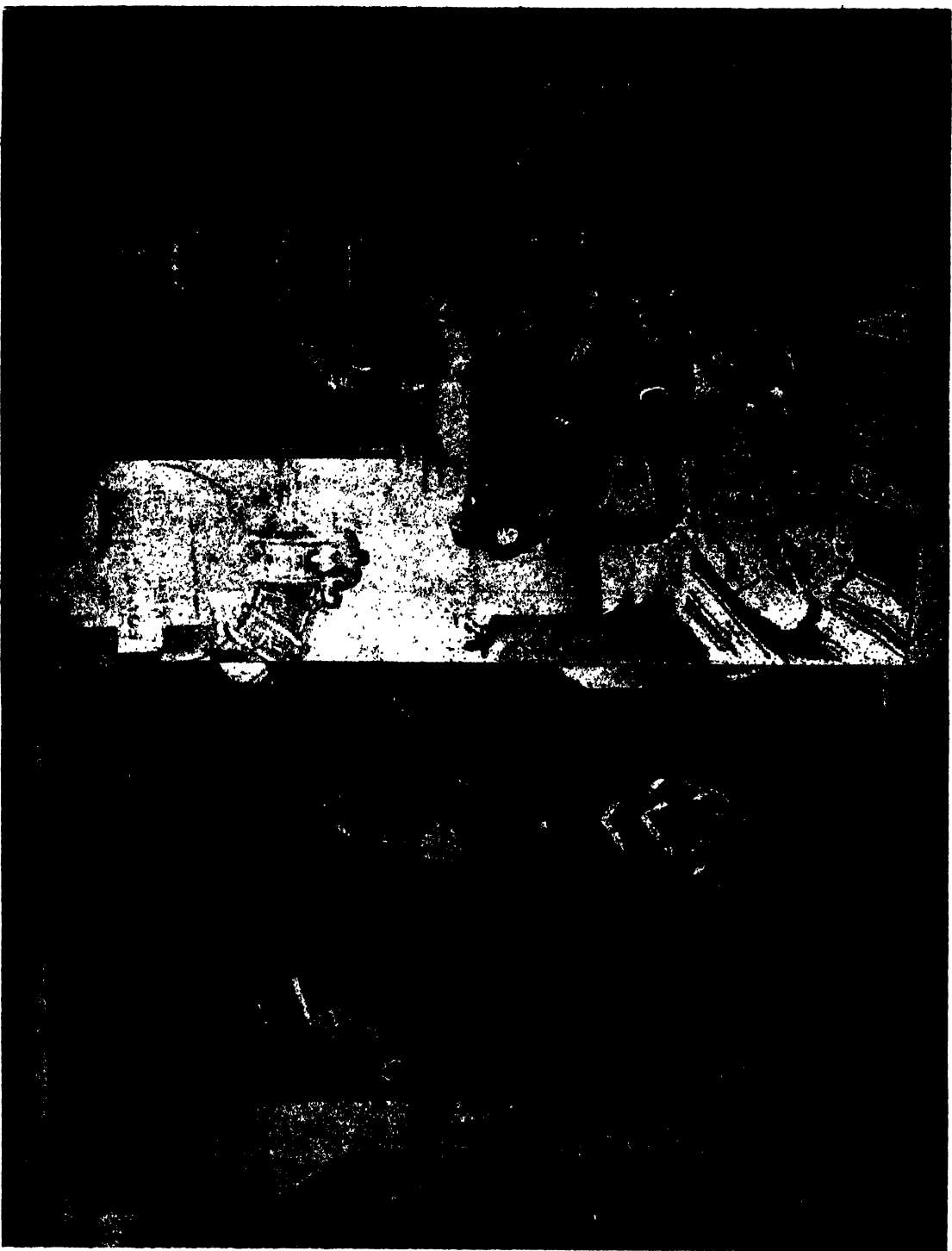
শান্তিনিকেতনের বালক-বালিকাগণকর্তৃক চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের অভিনয়

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্ত্তৃক "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্য অভিনয়

বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের সাহিত্য শিল্প ও অন্যান্য নানা বিভাগের ন্যায় অভিনয়কলাও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বহু পরিমাণে উন্নতি ও বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। অভিনয়ের জন্য নাট্যরচনা ও দৃশ্যসজ্জার সংস্কার করিয়া এবং স্বয়ং অভিনয়নৈপুণ্য দেখাইয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশে অভিনয়ের একটি বিশেষ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ যে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য অভিনয় করেন তাহাতেও আমরা রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার একটি নূতন পরিচয় পাইলাম। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নাটকটি সুপরিচিত। সেই নাটকটির কথাবস্তু বর্ত্তমান অভিনয়ে নবরচিত নৃত্য ও গীতের সহযোগে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে বিলাতী ব্যালে ও গীতিনাট্যের অপেরার) অভিনব সমন্বয় হইয়াছিল—এই নাট্যরূপ আধুনিক যুগে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্রেও আমরা নৃত্যগীতসমন্বিত অভিনয়ের উল্লেখ পাই।

চিত্রাঙ্গদা ও অর্জ্জুনের ভূমিকায় যাঁহারা নৃত্যাভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহাদের অভিনয় বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। অন্যান্য ভূমিকার অভিনয়গুলিও চমৎকার হইয়াছিল। বেশভূষা, আভরণ ও বর্ণসংযোজনার পরিকল্পনাগুলি বিচিত্র ও মনোহর হইয়াছিল। অভিনয়ের সময় মনে হইতেছিল যেন ভারতীয় চিত্রকলার আলেখ্যগুলিকে জীবন্ত দেখিতেছি।

ভারতবর্ষে অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য একটি নূতন অধ্যায় রচনা করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের মর্ম্মকথাটি রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করেন :—

প্রভাতের প্রথম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে,
অর্দ্ধসুপ্ত চক্ষুর পরে লাগে তারি আঘাত।
অবশেষে সেই আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে জাগ্রত জগতে।
তেমনি সত্যের প্রথম আবির্ভাব সাজ-সজ্জার বহিরঙ্গে,
বর্ণ-বৈচিত্র্যে,
তাই দিয়ে অসংস্কৃত চিত্তকে সে করে মুগ্ধ।
অবশেষে নিজের সেই আচ্ছাদন যখন সে মোচন করে
তখন প্রবুদ্ধ মনের কাছে নির্ম্মল মহিমায় তার বিকাশ।
এই কথাটিই চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্ম্মকথা।
এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে আছে, প্রথমে প্রেমের বন্ধন
মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হ'তে
নিরলঙ্কার সত্যের সহজ মহিমায়।

—

ইটালী ও আবিসীনিয়ার যুদ্ধ

ইটালীকে খনিজ তেল পাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইবে কি হইবে না, করিলে তাহার ফলাফল কি হইবে, তাহার আলোচনা এখনও চলিতেছে। ওদিকে ইটালী বলিতেছে আবিসীনিয়াকে সে প্রায় পিষিয়া ফেলিয়াছে, এবং একটা গুজবও রটিয়াছে (কে রটাইয়াছে জানা যায় নাই) যে আবিসীনিয়ার সম্রাট ইটালীর অধিকৃত স্থানসকল তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধিস্থাপনে রাজী! অবশ্য আবিসীনিয়ার পক্ষ হইতে এরূপ গুজবের সত্যতা স্বীকৃত হয় নাই।

ইটালী আবিসীনিয়াকে নিশ্চিত পরাজিত করিবার পর, কিংবা আবিসীনিয়াকে পরাজিত করিবার তাহার সামর্থ্য নাই ইহা নিশ্চিত বুঝা যাইবার পর, লীগ অব নেশ্যন্সের ব্রিটেন ফ্রান্স প্রভৃতি প্রধান সভ্যেরা ইটালীকে শাস্তি দেওয়া-না-দেওয়া সম্বন্ধে একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন আশা করা যাইতে পারে!

—

কচুরীপানা উচ্ছেদের আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কচুরীপানা উচ্ছেদের আইন পাস হইয়াছে। এরূপ আইন আবশ্যক বটে। তবে, যাহাতে ইহার অপব্যবহারে গ্রামের অধিবাসীরা কোথাও উৎপীড়িত না-হয়, সেদিকে জেলা-কর্ত্তৃপক্ষকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যে উদ্ভিদ স্বভাবতঃ খুব বেশী জন্মে, তাহা কোন-না-কোন কাজে লাগান মানুষের বুদ্ধির সাধ্যাতীত নহে। বঙ্গের বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এদিকে পড়া উচিত। ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেনের দৃষ্টি কচুরীপানার উপরে আছে। আশা করি তিনি কার্য্যতঃ কিছু করিতে পারিবেন।

—

সিঙ্গাপুরের রণতরী-আড্ডা ও জাপান

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান প্রবল। তাহার পক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড আক্রমণ অপেক্ষাকৃত সহজ। ব্রিটেন সাহায্য না করিলে এই ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি জাপানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। অথচ, ইংলণ্ড হইতে ইহাদের সাহায্যার্থ রণতরী পাঠাইতে যত সময় লাগে, জাপান তাহার আগে অষ্ট্রেলিয়ায় রণতরী পাঠাইতে পারে। ভারতবর্ষের উপরও যে জাপানের লোলুপ দৃষ্টি আছে, তাহা জানা কথা। এই সব কারণে ব্রিটেন সিঙ্গাপুরে একটি বড় রকমের রণতরীর আড্ডা তৈয়ার করিয়াছেন। তাহাতে বহুকোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। এখান হইতে ব্রিটেন জাপানের সম্ভাবিত কোন দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিতে পারিবেন আশা

করেন। ডচ্‌দের অধিকৃত জাভা প্রভৃতি দ্বীপেও জাপানী আক্রমণের ভয় আছে। এই জন্ম অনুমিত হইয়াছে, যে, সিঙ্গাপুরের আড্ডা নির্ম্মাণ ব্রিটেন হল্যাণ্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া করিয়াছেন।

অন্য দিকে জাপানও নিশ্চিন্ত নাই। সিঙ্গাপুরের প্রণালী পার না হইয়াই, সিঙ্গাপুরের আড্ডার নিকটে না আসিয়াই, জাপানের জাহাজ যাহাতে ঈপ্সিত নানা স্থানে যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা জাপান করিতেছে।

সুয়েজ যোজক কাটিয়া সুয়েজ খাল খননের আগে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে জাহাজ আসিত দক্ষিণ-আফ্রিকা ঘুরিয়া—কয়েক মাস সময় লাগিত। আমেরিকার পানামা যোজক কাটিয়া পানামার খাল খনন করিবার আগে উত্তর-আমেরিকার জাহাজকে এক দিকের মহাসাগর হইতে অন্য দিকের মহাসাগরে যাইতে হইলে দক্ষিণ-আমেরিকা বেষ্টন করিয়া যাইতে হইত। তাহাতে অনেক সময় লাগিত।

সুয়েজ খাল ও তাহার পর পানামা খাল হওয়ায় ইউরোপ ও আমেরিকার জাহাজ অনেক কম সময়ে গন্তব্য নানা স্থানে যাইতে পারে।

জাপানও শ্যামদেশের অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ একটি স্থানে একটি খাল কাটিয়া জাহাজ যাতায়াতের সুবিধা করিতেছে। ইহা শ্যামে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রভাবের বহির্ভূত অঞ্চলে এবং সিঙ্গাপুরের ৭০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই খাল কাটিতে চারি বৎসর লাগিবে। তখন সিঙ্গাপুরের কাছে না গিয়াও, সিঙ্গাপুর অতিক্রম না করিয়াও, জাপানী জাহাজ অনেক জায়গায় যাইতে পারিবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে শ্যামদেশে যে বিপ্লবের ফলে তদানীন্তন রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তিনি ব্রিটিশ জাতির বন্ধু ও ব্রিটিশ প্রভাবাধীন ছিলেন। জাপানী উক্ত খাল খননে তাঁহার মত ছিল না। এই জন্য জাপানী ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁহার সিংহাসনত্যাগ ঘটে। এখন শ্যামে জাপানকে বাধা দিবার কেহ নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য মহাদেশে এমন একটা জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে যাহারা কূট রাজনীতিতে ব্রিটিশ জাতির সহিত টক্কর দিবার মত বুদ্ধিকৌশল ও সাহসের অধিকারী। কিন্তু ব্রিটিশ জাতি এখনও ভারতীয় মহাজাতিকে বশে রাখিতেই ব্যস্ত, তাহার সত্যকার বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা লাভে চেষ্টিত নহে।

—

নারীহরণাদি অপরাধে বেত্রদণ্ড

এত দিন বলাৎকার অপরাধের জন্য, কারাদণ্ডের মত, তদ্ব্যতীত বেত্রদণ্ডও হইতে পারিত—যদিও সকল স্থলে বা অধিকাংশ স্থলে তাহা হইত না। সর্ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় গবর্ন্মেণ্ট পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই আইন করাইয়াছেন, যে, নারীহরণ নারীধর্ষণাদি ঘটিত সকল প্রকার অপরাধে বেত্রদণ্ড হইতে পারিবে। ইহা ঠিক্ হইয়াছে। ইহা ছাড়া অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা করিলে এইরূপ পৈশাচিক দুষ্কর্ম্ম দমনের আরও সাহায্য হয়।

সর্ ব্রজেন্দ্রলালের বিলটির আলোচনার সময় মুসলমান সদস্যেরা—বিশেষতঃ মিঃ এইচ এফ সুহ্রাবর্দ্দী—শোচনীয় ও লজ্জাকর ব্যবহার করিয়াছেন, যদিও বঙ্গে মুসলমান নারীদের বিরুদ্ধেই উক্ত প্রকার অপরাধ বেশী হয়। অবশ্য এই সব অপরাধ যাহারা করে, তাহাদের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকই বেশী। কিন্তু দুর্বৃত্ত লোকেরা মুসলমান, হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান বা অন্য কিছু নহে—তাহারা যে-কোন ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে। সুতরাং তাহারা কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই সহানুভূতির যোগ্য নহে। অত্যাচরিতা নারীরা যে সম্প্রদায়েরই হউন তাঁহারাই সকল সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সাহায্যের যোগ্যা—মুসলমান সম্প্রদায়েরও সহানুভূতি ও সাহায্যের যোগ্যা। কারণ, কোরানের আদেশ, "নারীকে মাতার ন্যায় সম্মান করিবে।"

সর্ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু মিঃ সুহ্রাবর্দ্দীর সমুচিত জবাব দিয়াছিলেন।

এক জন হিন্দু কুমার বাহাদুরের বক্তৃতাও অদ্ভুত রকমের হইয়াছিল।

সুরাবর্দ্দীর কৈফিয়ৎ।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বেত্রদণ্ড বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ এইচ, এফ, সুরাবর্দ্দী হিন্দু নারী, হিন্দু পত্রিকা, হিন্দু জুরী, হিন্দু বিচারক প্রভৃতির সম্বন্ধে যে অবজ্ঞা উক্তি করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে তিনি পরে এক কৈফিয়ৎ জারি করিয়া বলিয়াছেন, "কোনও কোনও শ্রেণীর হিন্দু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই আমি অভিযোগ করিয়াছি, সমগ্র হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে নহে। বস্তুতঃ কোন মুসলমান হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করিতে পারে না।"

মিঃ সুরাবর্দ্দী ব্যবস্থাপক সভায় লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে হিন্দু সভা, হিন্দু সংবাদপত্র, হিন্দু জজ, হিন্দু জুরীদের নিন্দা হইয়াছিল। অতঃপর সরকারী রিপোর্টে উহা কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে এবং এখন বলিতেছেন সমস্ত হিন্দুদের তিনি নিন্দা করেন নাই।—সঞ্জীবনী

—

শাসনসংস্কারের বহির্ভূত অঞ্চল

ভারতবর্ষের কতকগুলি অঞ্চল আগে হইতেই ব্যবস্থাপক সভার প্রভাবের বাহিরে ছিল—হাকিমরা সেগুলি যথাইচ্ছা শাসন করিতেন। ১৯৩৫ সালের নূতন ভারতশাসন আইন অনুসারে আরও কতকগুলি অঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক ভাবে শাসনসংস্কারের বাহিরে রাখা হইতেছে। ওজুহাৎ এই, যে, তথাকার অধিবাসীরা আদিমজাতীয় ও অসভ্য,

তাহারা প্রতিনিধিতন্ত্র-প্রণালী ও আইনানুগ শাসনের মর্ম বুঝে না এবং অপেক্ষাকৃত উন্নততর ভারতীয়েরা তাহাদিগকে ঠকাইয়া নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন (exploit) করে। তাহা হইলে, প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য কি করিলেন? তাহাদিগকে এত বৎসরেও আত্মরক্ষায় সমর্থ কেন করিতে পারিলেন না? যাহাদের কোন বর্ণমালা পর্য্যন্ত নাই এরূপ অনেক অসভ্য জাতিকে সোভিয়েট রুশিয়া ৫।১০।১৫ বৎসরেই সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে।

যে-সব অঞ্চল আগে শাসনসংস্কার-বহির্ভূত ছিল না, তাহাদিগকে নূতন করিয়া বহির্ভূত করা আরও অদ্ভুত ব্যবস্থা। যেমন ধরুন, ময়মনসিংহের সেরপুর ও সুসঙ্গ পরগনা আংশিক ভাবে শাসনসংস্কারের বহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাহাতে ঐ জেলার উকীলসভার এক অধিবেশনে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা হইয়াছে, এবং এই প্রতিবাদ ভারত-গবর্মেণ্ট ও বাংলা-গবর্মেণ্টকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানান হইয়াছে। সভা গবর্মেণ্টকে এরূপ প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, যে, ঐ দুই পরগনার সাড়ে নয় লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে কেবল ত্রিশ হাজার অধিবাসী মাত্র আদিম সমাজের অন্তর্ভূত এবং তাহারাও আবার উন্নততর সমাজের রীতিনীতি শতাধিক বৎসর ধরিয়া পালন করিয়া আসিতেছে।

—

ব্যবস্থাপক সভায় বাক্যকথনের স্বাধীনতা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি সর্ আবদুর রহিম সম্প্রতি তাঁহার এই একটি রুলিং বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, উহার সদস্যদের স্বাধীনভাবে বক্তৃতা করিবার অধিকার সভার হলের মধ্যে আবদ্ধ এবং "law did not protect publication of any such speech in other than official reports, such as in a newspaper, however faithful or *bona fide* such publication might be," "সরকারী রিপোর্ট ভিন্ন অন্য কোথাও, যেমন খবরের কাগজে, এই সব বক্তৃতার প্রকাশ শাস্তি হইতে আইন দ্বারা রক্ষিত নহে, যদিও তাহা যথাযথ হয় এবং খুব ভাল বিশ্বাসে ও সৎ উদ্দেশ্যে করা হয়।"

সর্ আবদুর রহিম যখন সভাপতি হন নাই, তখন তাঁহার মত ইহার বিপরীত ছিল। যাহা হউক, নব কলেবরে জন্মান্তরের পর মানুষ যাহা বলে, পূর্ব্বজন্মের কথার সহিত তাহার মিল না থাকিলে তাহা লইয়া তর্ক করিবার আবশ্যক নাই।

আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে বলিতেছি। সদস্যেরা যাহা বলেন তাহা খবরের কাগজে ঠিক্ ঠিক্ ছাপিতে না পারিলে তাঁহারা কি করিতেছেন তাঁহাদের নির্ব্বাচকেরা ও অপরসাধারণ কি প্রকারে তাহা জানিবে? তাঁহারা প্রতিনিধি, অতএব তাঁহারা প্রতিনিধির কার্য্য ঠিক্ মত করিতেছেন কিনা জানা আবশ্যক। সরকারী রিপোর্ট সকলে পায় না, তাহা ইংরেজীতে, খবরের কাগজের চেয়ে তার দাম বেশী, এবং তাহা সংগ্রহ করাও কঠিনতর। স্বামী-স্ত্রীতে শয়নকক্ষে পরস্পর কি বিশ্রম্ভালাপ বা ঝগড়া করেন, বাহিরের লোকদের তাহা জানিবার অধিকার নাই। ব্যবস্থাপক সভার হল কি দাম্পত্য শয়নকক্ষের মত কিছু?

সরকারী রিপোর্টে যাহা ছাপিলে কাহারও অপরাধ হয় না, কেহ ঠিক তাহার নকল ছাপিলে কেন অপরাধ হইবে? কোন্ আইনে লেখা আছে যে, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের রাজদ্রোহ-উত্তেজক বা গবর্মেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা-জনক এমন কোন কথা ছাপিলে গবর্মেণ্ট প্রেসের প্রিণ্টার, প্রকাশক বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কোন অপরাধ হয় না, যাহা অন্য কেহ ছাপিলেই অপরাধ হয়? আমরা সেই আইনের সেই ধারাটি জানিতে চাই।

যাহার ঠিক্ নকল অন্যে ছাপিলে তাহার শাস্তি হইতে পারে এরূপ জিনিষ গবর্মেণ্ট নিজের রিপোর্টে ছাপেন কেন? ব্যবস্থাপক সভার সরকারী রিপোর্টগুলি ত সংবাদপত্র-সম্পাদক ধরিবার ফাঁদ নহে, যে, তাহাদিগকে ঐ সব রিপোর্টে প্রকাশিত কোন কোন জিনিষ ছাপিবার লোভে ফেলিয়া তাহারা ফাঁদে পড়িলে পরে তাহাদিগকে শাস্তি দিবার সুবিধা হইবে।

—

"বঙ্গীয় জাতীয় মিউজিয়াম"

শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে নিজের ছাত্রদের এবং অন্য দেশী ও বিদেশী শিল্পীদের কাজের প্রদর্শনী যে মধ্যে মধ্যে করেন, তাহা তাঁহার শিল্পানুরাগের পরিচায়ক। তাঁহার এই শিল্পানুরাগ বাল্যকাল হইতে লক্ষিত হইতেছে। তিনি যখন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, বিদ্যালয়ে সাধারণ লেখাপড়া শিখিতেন, শিল্পবিদ্যালয় কলাভবনের ছাত্র ছিলেন না, তখনও ছবি আঁকিতেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডন্যাল্ড যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসেন (তখন তিনি খুব ভারতবন্ধু বলিয়া আদৃত হইতেন), তখন কলিকাতায় সমবায় ম্যান্সন্সের নীচের তলায় একটি চিত্র-প্রদর্শনী হয়। তাহাতে শ্রীমান্ মুকুলেরও আঁকা কয়েক-খানি ছবি ছিল। তাহার মধ্যে একখানির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া (তাহা আমাদেরও ভাল লাগিয়াছিল) মিঃ ম্যাকডন্যাল্ড চিত্রকরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, এবং পরে এই মর্ম্মের কথা বলেন, যে, শিক্ষার সুযোগ পাইলে এই বালক ভবিষ্যতে ভাল চিত্রকর হইবে। মিঃ ম্যাকডন্যাল্ড অবশ্য ভবিষ্যদ্বক্তা নহেন। কিন্তু দেশে ও নানা বিদেশে শিক্ষা-লাভ ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের পর এখন শ্রীমান্ মুকুলের কৃত-

কার্য্যতার সময়, মিঃ ম্যাকডন্যাল্ডের যে কথাগুলি শুনিয়াছিলাম তাহা মনে পড়িতেছে।

শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে বঙ্গের একটি জাতীয় মিউজিয়াম স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। তাহাতে বাঙালী ও অন্য দেশী শিল্পীদের কাজ রক্ষিত হইবে, প্রদর্শনী হইবে, ভাল ভাল শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইবে, ইত্যাদি। এরূপ একটি মিউজিয়াম একান্ত আবশ্যক। এই জন্য তাঁহার চেষ্টার সাফল্য সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছেন :—

I have read with great interest your scheme for a Bengal National Museum. I agree with you that an organised centre such as you suggest could do much to educate our public in the value of the indigenous arts and crafts of this province and create a genuine interest in their promotion. It is an object very dear to my heart and I cannot help welcoming any endeavour towards its realization. You have my best wishes.

—

দিব্য-স্মৃতি উৎসব

গত ২৪শে ফাল্গুন দোল পূর্ণিমার দিন দ্বিতীয় বার্ষিক দিব্য-স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে। সান্তাহার রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী সিদ্ধিপুরের "ভীমসাগর" নামক বৃহৎ জলাশয়ের তীরে উৎসব হয়। একাদশ শতাব্দীতে অত্যাচারী রাজা মহীপালের বিরুদ্ধে সেনাপতি দিব্যের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করিয়া প্রজারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দিব্যকে রাজা করেন। উৎসব এই ঘটনার স্মারক। ভীম মহারাজা দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। ভীমসাগর, ভীমের জাঙ্গাল, প্রভৃতি তাঁহারই স্মৃতিচিহ্ন। উৎসবে নানা স্থান হইতে প্রায় ২০০০ মহিলা ও পুরুষ যোগ দিয়াছিলেন। এবারকার উৎসবে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্যর্ যদুনাথ সরকার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার সরল বক্তৃতাটি সকল বাঙালীর আদ্যোপান্ত পড়া উচিত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, যে, এরূপ ভাবে দিব্য ও ভীমরাজের জীবনী তিনি বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন "যেন আট বৎসরের শিশু পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারে।" আমরা বক্তৃতাটির কয়েকটি অংশ মাত্র নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

আমাদের আজকার এই সম্মেলন একটা সভার বৈঠক নহে, এটা দেশপূজার, নেতাপূজার পুণ্য সমারোহ। কিন্তু এই সমারোহ শুধু বরেন্দ্র-সন্তানদের উৎসব ভাবিলে ভুল হইবে, ইহা সমস্ত বাঙ্গালীর উৎসব। আজ যে পুরুষ-সিংহ দুটির স্মৃতি বুকে ধরিয়া আমরা আসিয়াছি, তাঁহারা সমস্ত বঙ্গদেশের সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব। বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল কাপুরুষ চির-পরাধীন বলিয়া যে নিন্দা শুনা যায়, সেই অপবাদ খণ্ডন করিবার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিব্য ও ভীমরাজের সত্য জীবন-কাহিনী।

প্রায় বারো-শ বৎসর হইল আমাদের সোনার বাঙ্গালার বড় দুরবস্থা আসে। দেশের মাথার উপর কোন এক জন খুব বড় রাজা ছিলেন না; কেবল ছোট ছোট জমিদার আর সর্দ্দার চারি দিকে মাথা তুলেছে; এ ওর জমি ধন দখল করে, এ ওর প্রজাদের লুট করে, যেমন কতকগুলি বোয়াল মাছ পুকুরের যত পুঁটি চেলা খাইয়া ফেলিতেছে। তখন সব দেশবাসীরা একজোট করিয়া গোপাল নামক এক জন সেনাপতির পায়ে ধরিয়া বলিল, "আপনি আমাদের সবার উপর রাজা হইয়া বসুন। আপনি দুষ্ট অত্যাচারী লোকদের শাসন করুন, আমরা আপনার কথা মানিয়া চলিব, আপনাকে খাজনা দিব।" সেই বীর রাজা গোপাল হইতে এক রাজবংশ আরম্ভ হইল, নাম পাল-বংশ। পাল-রাজারা সমস্ত বাঙ্গালা অধিকার করিয়া পূবে পশ্চিমে দক্ষিণে, পাটনা আসাম উড়িষ্যা পর্য্যন্ত অনেক দেশ জয় করিলেন। পাল-রাজার গুণে বাঙ্গালায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসিল।

এইরূপে পৌনে তিন-শ বছর সুখে কাটিয়া গেল। তার পর যিনি রাজা হলেন তাঁর নাম মহীপাল। আর অমনই এই সুন্দর রাজ্যে আগুন লাগিল। এই রাজার যেমন চরিত্র খারাপ, তেমনই বুদ্ধি কাঁচা।

মহীপাল নির্ভয়ে প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিলেন। কোন অন্যায় কাজ তাঁহার বাকী রহিল না। কোন লোকের ধন মান স্ত্রী কন্যা নিরাপদে থাকিল না। এইরূপ অসাধু অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে দেশের সব লোক ক্ষেপিয়া উঠিল, বলিতে লাগিল, "এই শয়তানের শাসন আর সহ্য করা যায় না। প্রাণ যায় সেও ভাল, কিন্তু ইহাকে তাড়াইব।" দেশের যত প্রধানেরা—করদ-রাজা সর্দ্দার জমিদার ধনী—সকলে জোট বাঁধিয়া নিজ নিজ সৈন্য হাতী ঘোড়া যুদ্ধের রথ একত্র করিলেন। সেই "অনন্ত-সামন্ত-চক্র"এর যোদ্ধারা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত, তার সীমা দেখা যায় না।

গোঁয়ার রাজা কোন কথা না শুনিয়া সেই অসীম বিপক্ষ দলকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হইলেন, তাঁহার মাথা কাটা গেল। পাল-বংশের সোনার রাজসংসার ছারখার হইয়া গেল।

যুদ্ধ জয় করিয়া দেশের সব সর্দ্দার আর প্রধানেরা বলিলেন যে, "রাজা বিনা রাজ্য চলিতে পারে না; আমরা দিব্যকে রাজা করিব।" এই দিব্য কে?

তিনি মহীপালের বাপের সময়ে বড় সেনাপতি ছিলেন; রাজার সৈন্য লইয়া অনেক প্রদেশে গিয়া যুদ্ধে জিতিয়া খুব নাম করেন। তাঁহার বীর বলিয়া এত বেশী সুনাম ছিল যে লোকে তাহা একটা উপমার কথা মনে করিত, যেন তিনি বীরত্বের সীমা, ইহার বেশী বীর কেহ হইতে পারে না। দিব্য যেমন বীর, তেমনি ধার্ম্মিক ভাল মানুষ। অথচ দিব্য এমন সাধু পুরুষ যে অত অবহেলা অত্যাচার পাইয়াও নিজের মনিব মহীপালকে রাজ্যলোভে বা প্রতিহিংসার রাগে আক্রমণ করেন নাই। যখন মহীপালের শাসন প্রজাদের অসহ্য হইয়া উঠিল, যখন দিব্য দেখিলেন যে দেশ-উদ্ধার, লোকের মানসম্ভ্রম রক্ষা তাঁহারই কর্ত্তব্য, তখন তিনি বিদ্রোহী-দলে যোগ দিলেন, এই কলির দুষ্ট রাবণকে বধ করিয়া আমাদের বরেন্দ্রীমাতা-স্বরূপা সীতাকে উদ্ধার করিলেন।

দিব্য তখন বুড়া হইয়াছেন, সংসারের সুখভোগের ইচ্ছা নাই। কিন্তু মাতৃভূমি অরাজক থাকিলে সকলেই নষ্ট হইবে, এই জন্য শান্তি-রক্ষার, দুষ্টদমনের দেশশাসনের ভারী বোঝা তিনি নিজ কাঁধে তুলিয়া লইলেন, "আমি পারিব না" একথা বলিলেন না। ইহাই আমাদের জননী জন্মভূমির প্রকৃত সেবকের মত কাজ—নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাহি না, কিসে আর সকলোকের ভাল হয় তাহার জন্য মাথা খুঁড়িয়া শেষ দিনগুলি কাটাইলেন।

বরেন্দ্রীর সর্ব্বসম্মত রাজা হইবার পর দিব্য বেশী দিন বাঁচেন নাই।

দিব্য-স্মৃতি-উৎসবে যোগদানের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল হইতে গরুর গাড়ীতে মহিলাদের আগমন

দিব্য-স্মৃতি-উৎসবের সভাপতি সর্ যদুনাথ সরকারের সভামণ্ডপে আগমন

দিব্যোর মৃত্যুর পর তাঁহার ভাইপো ভীম বরেন্দ্রীর রাজা হইলেন বুদ্ধিমান, আর তেমনি খাটিয়ে কাজের লোক। ভীম অনেক বৎসর এবং জেঠার মহৎ কাজ সম্পূর্ণ করিলেন। এই ভীম যেমন বীর তেমনি ধরিয়া এই বরেন্দ্র দেশ রক্ষা করিলেন। —

বাঁকুড়ায় অন্নকষ্ট

কয়েক মাস পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার অনেক অংশ বন্যায় বিধ্বস্ত হয়। অজন্মা হেতু এবং বন্যার ফলে তখন হইতে বিস্তর গ্রামে অন্নকষ্ট হইয়াছে। মধ্যে ধান কাটার সময়ে ও পরে কোথাও কোথাও দরিদ্র লোকদের সামান্য সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু এখন আবার তথাকার লোকেরাও বিপন্ন হইয়াছে; অন্যত্র ত অন্নকষ্ট লাগিয়াই ছিল, এবং বাঁকুড়া-সম্মিলনী প্রভৃতি কোন কোন সমিতি কয়েকটি কেন্দ্রে নিরন্ন লোকদিগকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এখন অবস্থা কিরূপ তাহা বাঁকুড়া রিলীফ কমিটির আবেদনে বর্ণিত হইয়াছে। এই কমিটিতে জেলা-জজ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ও অন্য বহু সম্ভ্রান্ত লোক আছেন। তাঁহাদের আবেদন বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকাদিগকে তাহা পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। যাঁহারা সাহায্য দিতে চান, তাঁহারা রিলীফ কমিটির সম্পাদককে বাঁকুড়ায়, কিংবা বাঁকুড়া-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঋষীন্দ্রনাথ সরকারকে ২০এ, শাঁখারীটোলা ঈষ্ট লেন, কলিকাতা, ঠিকানায় তাহা পাঠাইলে তাঁহাদের দানের সদ্ব্যয় হইবে।

বাঁকুড়া জেলার জামজুড়ী গ্রামের কয়েক জন নিরন্ন লোক

জামজুড়ী গ্রামে বাঁকুড়া-সম্মিলনীর কেন্দ্রে কতকগুলি সাহায্যপ্রার্থী লোক

বার বার নিরন্ন লোকদের চিত্র ছাপিতে লজ্জা বোধ হয় কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার অন্যতম উপায় বলিয়া অগত্যা ইহা ছাপিতেছি।

—

ভারত-গবর্মেণ্টের আয়ব্যয়

ভারত-গবর্মেণ্টের বা কোন প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের আয়-ব্যয়ের আলোচনা করিয়া কোন গবর্মেণ্টকেই জনমত অনুসারে চালাইতে পারিব, এরূপ দুরাশা পোষণ করি না। কেবল সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি মাত্র।

১৯৩৬-৩৭ সালে, সরকারী রেলগুলার আয় বাদে, ভারত-গবর্মেণ্টের আয় ৮৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সরকারী রেলগুলার ব্যয় বাদে, অন্য মোট ব্যয় হইবে আনুমানিক ৮৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। উদ্বৃত্ত থাকিবে আনুমানিক দুই কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা।

এই উদ্বৃত্ত হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ভারতবর্ষের মানুষদের আর্থিক অবস্থা ভাল। যে-দেশে গবর্মেণ্ট প্রজাদের মত অনুসারে চলিতে বাধ্য নহে, তাহা দরিদ্র হইলেও, তথায় বেশী করিয়া ট্যাক্স বসাইয়া ও আদায় করিয়া রাজকোষে সচ্ছলতা ও উদ্বৃত্ত দেখান যাইতে পারে। অবস্থাটা ভারতবর্ষে এই রূপ। তদ্ভিন্ন, গবর্মেণ্টের প্রাদেশিক অংশগুলি হইতেও ইহা দেখান যায়। প্রায় সমুদয় প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের ১৯৩৬-৩৭ সালের আয়ব্যয়ের হিসাবে ঘাটতি দেখা যাইতেছে। যথা, আগ্রা-অযোধ্যায় ৭৪ লক্ষ, বঙ্গে ৪১ লক্ষ, পঞ্জাবে ১৬ লক্ষ, বিহারে ১১ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশে ৮ লক্ষ। বোম্বাইয়ে ৪১ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে সিন্ধুদেশকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে পৃথক করিয়া দিয়া। কিন্তু এই সিন্ধুদেশেরই ঘাটতি পূরণের জন্য তাহাকে এক কোটি আট লক্ষ টাকা ভারত-গবর্মেণ্টের তহবিল হইতে দিতে হইবে। অতএব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সামান্য উদ্বৃত্ত ভ্রান্তিজনক মরীচিকা।

ভারত-গবর্মেণ্ট উদ্বৃত্ত দেখাইতেছেন প্রধানতঃ দুই উপায়ে—(১) অনাবশ্যকরূপ অধিক ট্যাক্স আদায় করিয়া এবং (২) প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহের নিকট হইতে, বিশেষতঃ বঙ্গের নিকট হইতে, এত অধিক টাকা লইয়া যে তাহারা নিজ নিজ ব্যয় নির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে।

—

ভারত-গবর্মেণ্টের সামরিক ব্যয়

সামরিক ব্যয়কে ডিফেন্সের অর্থাৎ দেশরক্ষার ব্যয় বলা হয়। "দেশরক্ষার ব্যয়" নামটি স্বাধীন দেশসমূহের পক্ষে ঠিক, কারণ সেই সব দেশে জলে স্থলে আকাশে যুদ্ধের যে আয়োজন করিয়া রাখা হয়, তাহা তথাকার স্বাধীনতা ও সম্পদ রক্ষার জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে। এই নামটি সম্পূর্ণ সত্য সেই সব দেশের পক্ষে যাহারা অন্য কোন পরদেশের মালিক নহে ও মালিক হইতেও চাহে না। কারণ, তাহাদের যুদ্ধায়োজন আর কোন জাতিকে বশে আনিবার বা বশে রাখিবার জন্য প্রযুক্ত হয় না। যে-সকল দেশ স্বয়ং স্বাধীন অধিকন্তু অন্য কোন কোন পরদেশের প্রভু হইয়া তাহাদিগকে অধীন রাখে বা পরদেশ জয় দ্বারা সাম্রাজ্য স্থাপন ও বৃদ্ধি করিতে চায়, তাহাদের যুদ্ধায়োজনকে আংশিক ভাবে দেশরক্ষার ব্যয় বলা যাইতে পারে—সম্পূর্ণ রূপে নহে; কারণ, ইহার কতক অংশ পরদেশকে বশে আনিবার ও রাখিবার জন্য ব্যয় করা হয়।

ভারতবর্ষের যুদ্ধায়োজনকে ঠিক্ দেশরক্ষার ব্যয় বলা যায় না। ব্রিটেনের বৃহৎ জমিদারী সায়েস্তা রাখিবার এবং তাহা ব্রিটেনের স্বাধিকারে রাখিবার ব্যয় ইহাকে বলা যাইতে পারে।

নাম যাহাই দেওয়া হউক, ১৯৩৬-৩৭ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ আনুমানিক কত হইবে দেখা যাক। মোট রাজস্ব ৮৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪৫ কোটি ৪৫ লক্ষ সামরিক ব্যয় ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যেও একটু কৌশল আছে। তাহা বলিতেছি। সরকারী রেলগুলি দু-রকমের। এক রকমের রেলওয়েকে বলা হয় বাণিজ্যিক, অর্থাৎ তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য যাত্রী ও মাল বহিয়া অর্থ উপার্জ্জন। দ্বিতীয় প্রকার রেলওয়েকে বলা হয় ষ্ট্রাটেজিক, অর্থাৎ সেগুলি প্রধানতঃ যুদ্ধের জন্য আবশ্যক। এই দ্বিতীয় প্রকার রেলে এবার প্রায় দু-কোটি টাকা লোকসান অনুমিত হইয়াছে। এই দু-কোটি টাকাও সামরিক ব্যয়ের মধ্যে ধরিয়া মোট সামরিক ব্যয় ৪৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা দেখাইলে তবে ঠিক হইত।

যাহা দেখান হইয়াছে, তাহাই মোট রাজস্বের অর্দ্ধেকের অধিক—শতকরা ৫০·৯ ভাগ।

মোট ব্যয় হইবে ৮৫ কোটি ৩০ লক্ষ। তাহার মধ্যে সামরিক ব্যয় ৪৫ কোটি ৪৫ লক্ষ। মোট ব্যয়ের অর্দ্ধেকের অধিক—শতকরা ৫৩·২ অংশ—হইবে সামরিক ব্যয়।

—

আদর্শ গৃহস্থের দারোয়ান-লাঠিয়ালের ব্যয়

কোন গৃহস্থের বার্ষিক মোট ব্যয় যদি হয় হাজার টাকা এবং তাহার মধ্যে দারোয়ানদের ও লাঠিয়ালদের বেতন ও লাঠির দাম প্রভৃতি বাবতে যদি মোট ব্যয় হয় ৫৩২ টাকা, তাহা হইলে সেই গৃহস্থকে আদর্শ গৃহস্থ মনে করিতে আমরা আইন অনুসারে বাধ্য। পরিবারবর্গের জন্য অন্যান্য ব্যয় যত কমই

হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি কি? ভারত-গবন্মেণ্ট এইরূপ আদর্শ গৃহস্থ।

—

কোয়েটার ব্যয়

রাজস্বসচিব ধরিয়াছেন কোয়েটার সরকারী, সামরিক ও অসামরিক ঘরবাড়ী পুনর্নির্ম্মাণের মোট ব্যয় সাত কোটির উপর হইবে। বস্তুতঃ নয় কোটিরও অধিক হইবে। কাজ শেষ হইতে ৭।৮ বৎসর লাগিবে। বৎসরে ১ কোটি টাকা করিয়া খরচ হইবে।

ইহা অত্যন্ত বেশী। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের ২৮ কোটি লোকের শিক্ষার জন্য গবন্মেণ্ট ১৯৩৪ সালে মোট ১১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। আর কেবল একটা যুদ্ধের ঘাঁটি শহরের জন্য ৯ কোটি খরচ করিবেন!

—

গ্রাম অঞ্চলের পুনর্গঠন

গত বৎসর ভারত-গবন্মেণ্ট সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষের গ্রামসমূহের পুনর্গঠনার্থ এক কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন; এবারও ঐরূপ একটা কিছু করিয়াছেন। গত বৎসরের দান সম্বন্ধে সর্ ডানিয়েল হ্যামিল্টন গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতার মহাবোধি হলে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :—

> While we heartily appreciate this friendly gesture of the Government of India, and are very grateful indeed for it as a first instalment which we trust will be repeated, I hope His Excellency will not accuse me of looking a gift horse in the mouth when I draw attention to the fact that one crore of rupees divided among thirty crores of needy people is only two pice, or one halfpenny, per head, which will not go far in reconstructing either a down-and-out Scotsman or a down-on-his luck Bengali "brither." To reform a man you have to begin at his grandmother, in which case, three generations hence, the two pice will amount to only two rupees in the year 2000; and, if something bigger is not forthcoming, the down and out may be dead long before then, even if he does not waste the two pice in riotous living.

আমাকে সর্ ডানিয়েল হ্যামিল্টনের এই বক্তৃতাসভায় সভাপতির কাজ করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেকের বার্ষিক দুই পয়সা আয় বাড়িলে তাহা উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন যাপনে ব্যয়িত হইতে পারে, তাঁহার এই উক্তির মধ্যে যে তীক্ষ্ণ বাণ আছে, তাহা শ্রোতৃবর্গ যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত আমি সভাস্থলে বলিয়াছিলাম, যে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত "রাজশাহী জেলার আত্রাই অঞ্চলে বাড়ী বাড়ী গিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক [প্রবাসীতে] লিখিয়াছেন, যে, তথাকার রায়তদের বার্ষিক আয় মাথাপিছু ১৫ হইতে ২৮ টাকা। এই কথা শুনিয়া লেডী হ্যামিল্টনের চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়াছিল।

—

সামরিক ব্যয় ও বঙ্গের প্রতি অবিচার

আমরা অনেক বার লিখিয়াছি, আবার লিখিতেছি, ভারত-গবন্মেণ্ট বাংলা দেশ হইতে অন্য প্রত্যেক প্রদেশ অপেক্ষা বেশী রাজস্ব আহরণ করেন। ভারত-গবন্মেণ্টের যে-যে বিভাগে যত যত ব্যয় হয়, তাহাতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের লোকদের উপকৃত হইবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে—বাংলা বেশী টাকা দেয় বলিয়া বাংলার খুব বেশী অধিকার আছে।

কিন্তু সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয় অন্য সকল বিভাগ অপেক্ষা বেশী হইলেও, এই বিভাগ হইতে বাঙালীরা বেতনাদি বাবতে অতি সামান্য টাকা পায়। বাঙালী সিপাহী ও অফিসার নাই বলিলেই চলে. সামান্য অল্পসংখ্যক বাঙালী কেরাণী হিসাবরক্ষক প্রভৃতির কাজ করে। সৈন্যদলের জন্য আবশ্যক সাজসরঞ্জাম ও খাদ্যদ্রব্যাদিও বাংলা দেশ হইতে ক্রীত হয় না বলিলেই চলে।

যেহেতু, যে-কারণেই হউক, যোদ্ধাদের মধ্যে বাঙালীর স্থান হয় নাই, সেই জন্য সামরিক বিভাগের বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য অসামরিক বিভাগে খুব বেশী পরিমাণে বাঙালী কর্ম্মচারী লওয়া উচিত। তাঁবু, গাড়ী, রসদ প্রভৃতিও বাংলা দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করা উচিত।

—

সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির বিভীষিকা

কয়েক বৎসর ধরিয়া লীগ অব নেশুন্সের একটা আলোচনার বিষয় ছিল কেমন করিয়া শক্তিশালী দেশ-সকলে রণসম্ভার কমান যায়। তাহার ফলে কাহারও রণসম্ভার কমে নাই। রণসম্ভার তাহাদের সকলেরই বাড়িয়াছে—অবশ্য ঐ আলোচনার ফলেই বাড়িয়াছে বলিতেছি না।

ব্রিটেনের খুব বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। তাহার টাকা আছে—বাড়িতে পারে।

কিন্তু ভারতবর্ষের নূতন ব্রিটিশ প্রধান সেনাপতি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষেরও—দরিদ্র ভারতবর্ষেরও—সামরিক ব্যয় হ্রাস পাওয়া দূরে থাক্‌, আরও বাড়িবে। ইহাতে ভারতীয়েরা পুলকাধিক্যে মূর্চ্ছিত হয় নাই।

—

ইনকাম্‌ ট্যাক্স ও ডাক মাশুল

ভারত-গবন্মেণ্টের তহবিলে উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া গ্রাম পুনর্গঠনের জন্য টাকা দেওয়া হইবে, আগে বলিয়াছি। আরও কিছু কিছু সুবিধা কতকগুলি লোক পাইবে।

এক হাজার টাকা হইতে দু-হাজার যাহাদের বার্ষিক আয় তাহাদিগকে ইন্‌কাম ট্যাক্স হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে।

ইহা অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক ইহাদের চেয়েও দরিদ্র। তাহাদের কি সুবিধা করা হইল?

ইন্‌কাম ট্যাক্স ও সুপার-ট্যাক্সের উপর যে এক-ষষ্ঠাংশ অতিরিক্ত ট্যাক্স বসান হইত, তাহার অর্দ্ধেক কমান হইল। এই ট্যাক্স অপেক্ষাকৃত ধনী লোকেরাই দেয়। ইহা কমান আবশ্যক ছিল না এবং উচিত হয় নাই।

ডাকমাশুল কমাইবার নামে বাস্তবিক তাহা বাড়ান হইল। এখন এক আনা মাশুলে আধ তোলা ওজনের এবং পাঁচ পয়সা মাশুলে আড়াই তোলা ওজনের চিঠি যায়। অতঃপর এক আনা মাশুলে এক তোলা ওজনের চিঠি যাইবে, এবং এক তোলার উপর প্রত্যেক তোলায় বা তোলার কোন ভগ্নাংশের জন্য দু-পয়সা করিয়া লাগিবে। যখন আধ তোলা ওজনের চিঠির মাশুল এক আনা করা হয়, তখন হইতে পাতলা চিঠির কাগজ ব্যবহার করিয়া পত্রলেখকেরা ঐ আধ তোলার মধ্যেই কাজ সারিতেছিলেন। যাঁহাদের তাহাতে কুলাইত না, তাঁহারা পাঁচ পয়সা খরচ করিয়া মোট আড়াই তোলা ওজনের পর্য্যন্ত কয়েকখানা চিঠির কাগজ ভর্ত্তি করিয়া চিঠি লিখিতে পারিতেন। এখন তাঁহাদিগকে কত লাগিবে দেখুন। প্রথম এক তোলা এক আনা, দ্বিতীয় এক তোলা আধ আনা, এবং তদূর্দ্ধ আধ তোলা আধ আনা—মোট দুই আনা। অর্থাৎ আগে আড়াই তোলা ওজনের চিঠি যাইত পাঁচ পয়সায়, এখন হইতে তাহার জন্য দিতে হইবে দুই আনা। এমন কি সওয়া তোলা, দেড় তোলা চিঠির জন্যও লাগিবে ছ পয়সা, যাহা এ পর্য্যন্ত পাঁচ পয়সায় যাইত। অতএব, খাম-ভরা চিঠি-সম্বন্ধে গবন্মেণ্ট মোটের উপর কোন অনুগ্রহ করিলেন না, বরং অসুবিধাই করিয়া দিলেন।

দরিদ্র লোকদের বাস্তবিক সুবিধা হইত, যদি এখনকার চেয়ে ছোট পোষ্টকার্ডও এক পয়সা মাশুলে পাঠাইবার নিয়ম গবন্মেণ্ট করিতেন। যখন পোষ্টকার্ডের চলন প্রথম হয়—সে বোধ হয় প্রায় ৫৬ বৎসর আগেকার কথা, তখন উহা যেরূপ ছোট ছিল, তাহাই করিয়া এক পয়সা মাশুল ধার্য্য করিলে ভারতবর্ষের মত গরিব দেশের যোগ্য ব্যবস্থা হয়।

পোষ্টকার্ডের দাম উর্দ্ধপক্ষে দু-পয়সার চেয়ে বেশী করা কোনক্রমেই উচিত নয়।

রাজস্বসচিবের বক্তৃতায় পোষ্টকার্ডের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু সরকারী ডাক-বিভাগের একটি বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানান হইয়াছে, যে, পোষ্টকার্ডের আয়তন অতঃপর ৫½ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা এবং ৪½ পর্য্যন্ত চৌড়া হইতে পারিবে। কিন্তু এইরূপ বড় পোষ্টকার্ড ব্যবহর্ত্তারা নিজে প্রস্তুত করাইবেন বা বাজার হইতে কিনিবেন, না ডাকঘরেও তাহা পাওয়া যাইবে?

যাহা হউক, পোষ্টকার্ড বড় হইলেও তিন পয়সা খরচ করিয়া লোকে তাহাতে যত কথা লিখিতে পারিবে, চারি পয়সার খামে তাহার আট দশ গুণ বেশী কথা লিখিতে পারিবে। সুতরাং পোষ্টকার্ড-লেখক দরিদ্র লোকের চেয়ে খামের মধ্যেকার চিঠির লেখকের সুবিধাই বেশীই রহিল।

—

রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী

রেলওয়ে লাইনগুলি চলে মাল ও যাত্রী বহন করিয়া। যাত্রীদের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের টিকিটের দামেই যাত্রী-গাড়ীর অধিকাংশ খরচ উঠে। সুতরাং প্রথম হইতেই তাঁহাদের সুবিধা দেখা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের উচিত ছিল। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধা সামান্য কিছু কমিয়া থাকিলেও এবং তাঁহাদের উপর রেলের কর্ম্মচারীদের দুর্ব্যবহারও কিছু কমিয়া থাকিলেও, সর্ব্বপ্রধান খরিদ্দারের যেরূপ সুবিধা ও ব্যবহার পাওয়া উচিত, তাঁহারা এখনও তাহা পান না। তাহা তাঁহাদের পাওয়া উচিত ও আবশ্যক।

রেলের কর্ত্তৃপক্ষ বোধ হয় মনে করেন, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা ত সখ করিয়া রেলওয়ে যোগে ভ্রমণ করে না, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাই তাহা করে, সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলা আরও আরামপ্রদ ও স্বাস্থ্যানুকূল করিয়া কি লাভ? তাহারা বাধ্য হইয়াই রেলে যাতায়াত করে, এবং গাড়ী যেমনই হউক, বাধ্য হইয়াই তাহাতে ভ্রমণ করিবে। আগেই বলিয়াছি, ন্যায়ের দিক্ দিয়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের আরও সুবিধা পাওয়া উচিত। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের কথাটা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ব্যবসার দিকটা দেখিলেও বুঝা যাইবে, যে, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলা উৎকৃষ্টতর করিলে তাহাতে লাভ হইবে। সখ জিনিষটা ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকদের একচেটিয়া নহে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকদেরও সখ আছে। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলা ভাল হইলে তাহারাও সখ করিয়া অল্পস্বল্প ভ্রমণ করিবে, এবং তাহাতে রেলওয়েগুলির আয় বাড়িবে।

সরকারী রেলওয়েগুলির আয়ব্যয়ের হিসাবে কেবল যে সামরিক রেলওয়েগুলার জন্যই দু-কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে দেখা যায়, তাহা নহে, বাণিজ্যিক রেলওয়েগুলাতেই প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতিপূরণের জন্য রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নানা উপায় অবলম্বন করিবেন শুনা যাইতেছে। তাহার মধ্যে একটা, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি। আমাদের বিবেচনায় এই উপায় অবলম্বন কেবল যে অবিচক্ষণতার পরিচায়ক হইবে তাহা নহে, অকৃতজ্ঞতারও পরিচায়ক হইবে।

বাংলা
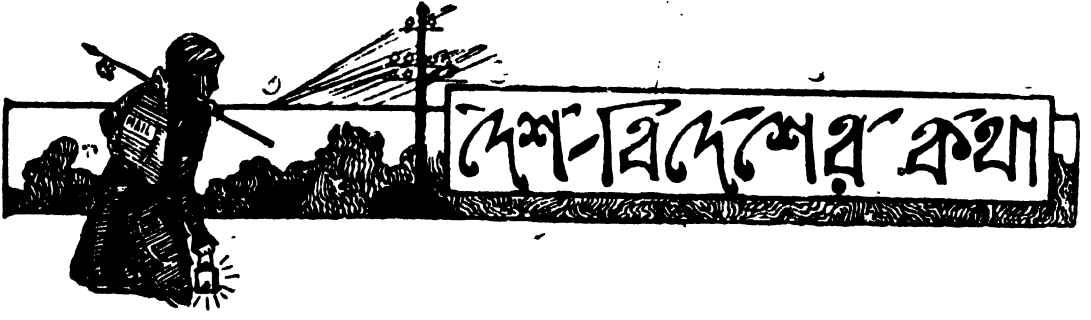
সঙ্গীত- ও সন্তরণপটু কুমারী বেলা সরকার

কুমারী বেলা সরকার বালি ব্রিজ হইতে বেনিয়াটোলা ঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গায় ৭ মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় গত তিন বৎসর কৃতিত্বের সহিত

কুমারী বেলা সরকার

উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ভবানীপুর সুইমিং এসোসিয়েশনের বার্ষিক প্রতিযোগিতারও গত তিন বৎসর কুমারী বেলা বালিকাদের মধ্যে প্রথম হইয়াছেন।

কুমারী বেলা সঙ্গীতেও বিশেষ পারদর্শিনী। এই বৎসর এলাহাবাদে নিখিল-ভারত সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় ও কলিকাতায় নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনে ধ্রুপদগানে কুমারী বেলা প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কৃতী বাঙালী যুবক

শ্রীবিনয়কুমার সেন ইনকরপোরেটেড ও চার্টার্ড একাউন্টেন্সি দুই পরীক্ষাতেই অল্প সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহা বিশেষ কৃতিত্বের বিষয়।
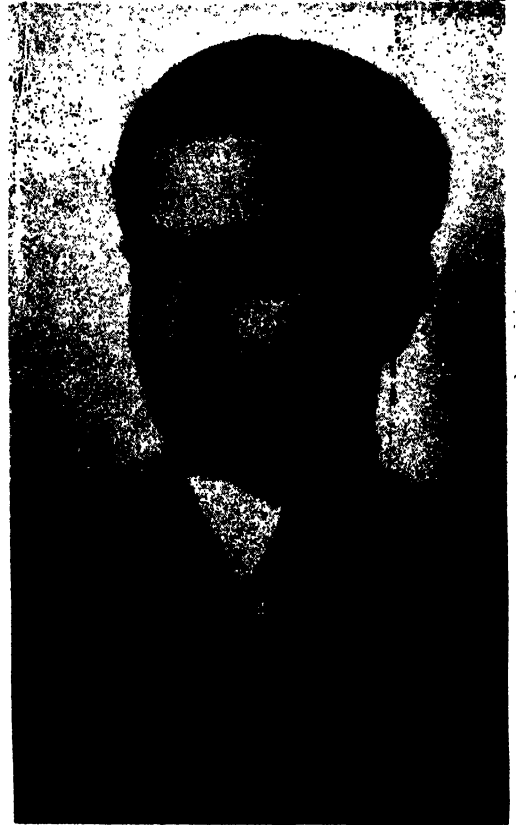
শ্রীবিনয়কুমার সেন

স্বর্গীয় ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়

সুপণ্ডিত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন শিক্ষায়তনে অধ্যাপকতা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গত ১লা ফাল্গুন ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

শিবপুর হিন্দুস্থান সংঘের বার্ষিক শিল্পপ্রদর্শনী

শিবপুর হিন্দুস্থান সংঘের উদ্যোগে এই বৎসর ২৬শে জানুয়ারি হইতে

শিল্পী শ্রীঅবনী সেন অঙ্কিত একখানি স্কেচ
শিবপুর হিন্দুস্থান সংঘের বার্ষিক চিত্রমেলায় প্রদর্শিত

২র ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত একটি কলা-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। অনেক তরু শিল্পীর চিত্রে ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যে প্রদর্শনী মনোরমভাবে সজ্জিত হইয়াছিল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

ভারতবর্ষ

প্রবাসী বাঙালীর কৃতিত্ব

হিন্দুস্থান জীবনবীমা কোম্পানীর বোম্বাই শাখার কর্ম্মসচি শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার সম্প্রতি বোম্বাই চেম্বার অব কমার্সের সভ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মাঘ মাসের প্রবাসীতে, রেঙ্গুন-নিবাসী শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন বসু লণ্ডন ও এডিনবরা হইতে চিকিৎসাবিদ্যায় বিভিন্ন উপাধি লাভ করিয়াছে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। গত জানুয়ারি মাসে বসু-মহাশ লণ্ডন হইতেও এম-আর-সি-পি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁ বর্ম্মা-সরকারের সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ রায় শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু বাহাদু মহাশয়ের পুত্র।

১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত